

4

9 8 14 2







# বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

বাক্যের সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিব্রি প্রভৃতি ভাষার চলিত  
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও নিবাস; সমুদ্রযাত্রা এবং  
আর্থ ও অনার্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় এসিয়ার ব্যক্তি-  
গণের বিবরণ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ভাষ্য,  
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোচ্যার্থী,  
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা;  
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কুশিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের  
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণামুদ্রিত বৃহৎভিধান।

চতুর্দশ ভাগ।

মংসুদ্বাদশী—মিব।

১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্রামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সংকলিত ও

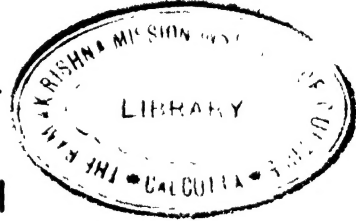
প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিড্লে লেন, শ্রামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে

এ, বসু এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯ সাল।



RMIC LIBRARY	
Doc No 98149	
Class No.	
Date	March
By	
For	✓
On	✓
8k 3.1	509
Checked	Rg.

# বিশ্বকোষ

## চতুর্দশ ভাগ।

### মৎস্যপিত্তা

### মৎস্যরক্ষ

মৎস্যদ্বাদশী (জী) মার্গশীর্ষের শুক্লাদ্বাদশী। এই দিন মৎস্যভক্ষণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ।

মৎস্যদ্বোপ (পুং) মৎস্যপ্রধানো দ্বীপঃ শাকপাখিবাতিভ্যাং সমাসঃ। দ্বোপভেদ। (বিষ্ণুপুং)

মৎস্যধানী (জী) মৎস্য্য ধীয়ন্তে যত্রৈতি মৎসা-ধাঞ-ল্যুট্-ভীপ্। মৎস্যরক্ষার্থ পাত্র, চলিত খারী, খানুই, পর্যায়—কুবেণী, মৎস্যকরঙিকা, খারয়িকা, মৎস্যবন্ধনী, কুবেণি, কুবেণা, কুপিনী, কুপিনি। (ভরত)

মৎস্যনাথ (পুং) মৎস্যেন্দ্রনাথ। [মৎস্যেন্দ্র দেখ]

মৎস্যনারী (জী) ১ সত্যবতীর নামান্তর। ২ অন্ধাকার মৎস্য ও অন্ধাকৃতি নারীমূর্তি (Mermaid)।

মৎস্যনাশক (পুং) নাশয়তীতি নশ-গিচ্-থুল্, মৎস্যানাং নাশকঃ, সদৈব মৎস্যভক্ষকতয়াস্য তথ্যত্বং। কুরর পক্ষী। (ভৃগুপ্রাঃ) (ত্রি) ২ মৎস্যনাশকর্তা।

মৎস্যনাশন (পুং) নাশয়তীতি নশ-গিচ্-ল্য, মৎস্যস্য নাশনঃ কুররপক্ষী। (হেম) চলিত মাছরাঙা পাখী।

মৎস্যপিত্ত (জী) মৎস্যস্য পিত্তম্। মীনপিত্ত, মাছের পিত্ত। “মৎস্যাদিপিত্তং সংগুহং নিষজ্যাবৈর্ষিত্যবিতম্।

দিনান্তঃ শুদ্ধিমায়াতি সত্যং গুরুবচো যথা।” (সারকোঃ)

মৎস্যপিত্তা (জী) কটুরোহিণী। ইহার পর্যায়—

“কটী, কটুকা, ভিক্কা, কৃষ্ণভেদা কটুরা।

অশোকা মৎস্যশকলা চক্রাদী শকুলামিনী।

মৎস্যপিত্তা কাণ্ডকহা রোহিণী কটুরোহিণী।” (ভাবপ্রাঃ)

মৎস্যপুরাণ (জী) অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পুরাণ-ভেদ। [ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণশব্দে দেখ।]

মৎস্যবন্ধ (পুং) মীনঘাতক, ধীবরজাতি। (বৃহৎসং ১৫।২২)

মৎস্যবন্ধক (ত্রি) মৎস্যান্ বন্ধাতি বন্ধ-থুল্। ১ মীনঘাতক। (পুং) ২ সন্ধরজাতিভেদ, ধীবরজাতি।

“নৃপায়ামেব তস্যৈব জাতো হি মৎস্যবন্ধকঃ।”

(উশনঃসংহিতা)

মৎস্যবন্ধিন্ (পুং) মৎস্যান্ বন্ধুঃ ধর্তুঃ শীলমস্য মৎস্যবন্ধ-ইনি। ধীবরজাতি, জেলে।

“কৈবর্তো ধাবরো দাসো মৎস্যবন্ধী চ জালিকঃ।” (হলায়ুধ)

মৎস্যবন্ধিনী (জী) মৎস্যবন্ধিন্-স্ত্রিয়াং ভীপ্। ১ মৎস্যধানী। ২ ধীবরপত্নী।

মৎস্যমুদ্রা (জী) পূজাস্থ-মুদ্রাভেদ, সকল পূজাতেই এই মুদ্রার আবশ্যক হয়। ইহার লক্ষণ—

“দক্ষপাণিপৃষ্ঠদেশঃ বামপাণিতলং ত্র্যসং।

অম্বুষ্ঠো চালয়েৎ সম্যক্ মুদ্রেয়ং মৎস্যরূপিনী ॥

মৎস্যমুদ্রা চ কৃষ্ণাখ্যা লেলিহা মুণ্ডসংজ্ঞিকা।

মহাযোনিরিতি খ্যাতা সর্ষসিদ্ধিসমৃদ্ধিহা ॥” (তন্ত্রসার)

দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে বামপাণিতল স্থাপন করিয়া অম্বুষ্ঠ

সঞ্চালন করিলে এই মুদ্রা হয়। ইহাকে কৃষ্ণমুদ্রাও কহে।

এই মুদ্রা অতীষ্টসাধিকা।

মৎস্যরক্ষ (পুং) মৎস্যরক্ষ পুষোদরাদিভ্যাং সাধু। মৎস্যরক্ষ পক্ষী, মাছরাঙা পাখী। (ভৃগুপ্রাঃ)

মৎস্যরঙ্গ (পুং) মৎস্যান্ রঙ্গতি ভক্ষণার্থং তৎসমীপং গচ্ছ-  
তীতি মৎস্য-রঙ্গি-অচ্। পক্ষিবিশেষ, চলিত মাছরাঙ্গা পাখী।  
পর্যায়—ম্পাণী, জলমদগু, মণীচক্ৰ, মৎস্যশন, মীনরত্ন,  
মৎস্যরঙ্গ, সূচিক্রক। (শব্দরত্নাং)

মৎস্যরাজ (পুং) মৎস্যেষু রাজা শ্রেষ্ঠঃ, সমাসান্তট্।  
১ রোহিত মৎস্য। (ত্রিকাং) ২ বিরাটরাজ।

“তস্য তদ্বচনং ক্রত্বা মৎস্যরাজঃ প্রতাপবান্।”

(ভারত ৪।৬৯২১)

মৎস্যবিদ্ (ত্রি) কটুকা, চলিত কটকী। (রাজনিং) (পুং)  
২ মৎস্যাত্তবিদ্।

মৎস্যবেধন (ক্ৰী) মৎস্যো বিধ্যতেহনেনেতি মৎস্য-বিধ-  
করণে লুট্, মৎস্যানাং বেধনমিতি বা। বড়িশ, বড়িশী, ইহা  
দ্বারা মাছ ধরা হয়।

মৎস্যবেধনী (ক্ৰী) মৎস্যবেধন-ভীপ্। ১ মদগুপকী। (জটধর)  
২ বড়িশ। (শব্দরত্নাং)

মৎস্যগন্ধিন্ (ত্রি) মৎস্যগন্ধশ্চ।

মৎস্যসংঘাত (পুং) ক্ষুদ্রমৎস্যোর ঝাঁক।

মৎস্যসন্তানিক (পুং) মৎস্যানাং সন্তানিকোহত্। মৎস্যব্যঞ্জন  
বিশেষ।

“দক্ষোহুকায়ে সলবণো বেশবারৈরুপকৃতঃ।

সীর্জকঃ কটুতৈলেন মৎস্যসন্তানিকো ভবেৎ ॥” (শব্দচং)

• মৎস্যে লবণ, আদার রস ও বেশনাদি মিশাইয়া কটুতৈল  
দ্বারা অঙ্গারে পাক করিলে ইহা প্রস্তুত হয়।

মৎস্যসূক্ত (ক্ৰী) একখানি প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক গ্রন্থ। কাহারও  
কাহারও মতে এই গ্রন্থ হলায়ুধের রচিত, কিন্তু গ্রন্থে তাহার  
কোন আভাস নাই।

মৎস্যহন (পুং) মৎস্যঃ হন্তি হন-কিপ্। মৎস্যহন্তা, মৎস্য-  
ঘাতক, ধীবর।

মৎস্যাক্ষক (পুং) সোমলতা।

মৎস্যাক্ষী (ক্ৰী) মৎস্যানাং অক্ষীগীষ অক্ষীণি পুন্সরূপাণি  
চক্ষুঃ যস্যাঃ। মৎস্যাক্ষি (বহুব্রীহৌ) গক্ধ্যাক্ষোঃ স্বাক্ষাং  
ষচ্। পা ৫।৪।৭৩) ইতি ষচ্, ভীপ্ চ। ১ ব্রাহ্মীশাক।  
২ সোমলতা। ৩ গণ্ডপূর্ণা। (রাজনিং) ৪ মৎস্যাদনী।

মৎস্যাক্ষী (ক্ৰী) মৎস্যানাং অক্ষমিব অক্ষঃ যস্যাঃ। হিল-  
মোচিকা। (ত্রিকাং)

মৎস্যাদ (পুং) মৎস্যঃ অতি অদ্-ঘঞ্। মৎস্যাত্তক, মৎস্য-  
ভোজনকারী।

মৎস্যাদনী (ক্ৰী) মৎস্যোদরীভূত ইতি মৎস্য-অদ-লুট্। গোরা-  
দিদ্বাং ভীষ্। ১ জলপিপ্লী। (রাজনিং) ২ মৎস্যাক্ষী।

মৎস্যাবতার (পুং) মৎসরূপী ভগবানের অবতারভেদ।

[ মৎস্যশব্দ দেখ ]

মৎস্যশন (পুং) মৎস্যান্ অশ্নাতিতি মৎস্য-অশ-লু। ১ মৎস্য-  
রঙ্গ পক্ষী। (ত্রিকাং) (ত্রি) ২ মৎস্যাত্তক।

মৎস্যাসন (ক্ৰী) ক্রত্বামলোক বোগাক্ আসনভেদ।

“অথ মৎস্তাসনং পৃষ্ঠে হস্তোপরি করাহুলিঃ।

পাদযুগলমানেন বৃদ্ধাশুষ্ঠন্ত যোজনম্ ॥” (কৃত্তয়ামল)

মৎস্যাসুর (পুং) অসুরভেদ।

মৎস্যোদ্ভ্রনাথ, একজন বিখ্যাত হঠযোগী, গোয়ালপাড়ার গুরু।  
নেপালে হান পদ্ম-পাণি বোধিসত্ত্বের অবতাররূপে পূজিত।  
প্রবাদ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে ইনি নেপালে আসেন। নেপালে  
ইহার ‘রথঘাড়া’ হইয়া থাকে।

মৎস্যেশ্বরতীর্থ (ক্ৰী) তীর্থভেদ।

মৎস্যোদরিন্ (পুং) বিরাট, মৎস্যরাজ।

মৎস্যোদরী (ক্ৰী) মৎস্যাত্ত উদরঃ উপত্যক্তানং যন্তাঃ। মৎস্ত-  
গর্ভে জাতদ্বাদশাত্তথাৎ। ১ ব্যাসমাতা মতাবতী, মৎস্যগন্ধা।  
২ কাশাস্থিত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থের বিষয় কাশীখণ্ডে  
এইরূপ লিখিত আছে, গণাধিপ ও গণনিচর কৈলাস  
পঙ্কত হইতে কাশীতে আসিয়া কাশীর চতুর্দিকে এক শৈল-  
দুর্গ নিষ্কাশ করেন, এই দুর্গের চারিদিকে একটা গভীর  
পার্বত্য প্রস্তুত করিয়া তাহা মৎস্যোদরীর জলে পূর্ণ করেন।  
এই মৎস্যোদরী তীর্থ বহিঃ ও অন্তঃচারিত্বরূপে দ্বিধা  
বিভক্ত হইয়াছে। এই তীর্থ গঙ্গাজলের সহিত মিলিত  
বলিয়া পবিত্র। অন্তঃসলিলা হইয়া গঙ্গা যখন এই  
তীর্থে আসিয়া মিলিত হয়, তখন এই মৎস্যোদরী তীর্থ  
অতি পবিত্র হয়। সেই সময় তথায় শত কোটি হুগ্য  
ও চক্রগ্রহণ-তুলা পুণ্যকাল উপস্থিত হয়। গঙ্গা ও মৎস্যো-  
দরীর সহিত স্থিতিনিবন্ধন সমস্ত লিঙ্গ, সমস্ত পক্ষ ও  
সমস্ত তীর্থ তথায় উপস্থিত থাকেন। যে কোন সময়ে  
এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে পিও দান করিলে  
সকল পাতক বিদূরিত হয় এবং তাহার আর জন্মগ্রহণ করিতে  
হয় না। যখন গঙ্গার বারি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়, তখন  
এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র মৎস্তাকার ধারণ করিয়া থাকে। দেবগণ  
বলিয়া থাকেন, বহুতীর্থে স্নান এবং বিপুল ভগ্নাত্মা নিরর্থক,  
কারণ এক মৎস্যোদরীতে স্নান করিলে সকল ফললাভ হয়,  
এমন কি, মুক্তি পর্যন্তও হইয়া থাকে।

স্বর্গ, মর্ত্য ও রম্যভূতে বহুতর তীর্থ আছে, কিন্তু তৎসমু-  
দায় মৎস্যোদরী তীর্থের কোটি অংশেরও তুল্য নহে।  
কৈলাসবাসী গণপতি স্বয়ং এখানে আসিয়া এই মহাতীর্থ

নিৰ্মাণ করিয়াছেন। গন্ধমাদন পর্ত্ত ভূবঃসংজ্ঞক লিঙ্গ এখানে আগমন করিয়া গণপতির পূৰ্বদিকে অবস্থান করিতে-  
ছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে পুণ্যবান্ মানবগণ তুলোক  
প্রভৃতির উৰ্দ্ধলোকে দিব্যভোগভাগী হইয়া বহুকাল বাস  
করিয়া থাকে। ভোগবতীর সহিত ভগবান্ হাটকেবর সপ্ত-  
পাতাল ভেদ করিয়া এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং  
শেষ ও বাহুিক প্রভৃতি নাগগণ মণি, মাণিক্য ও রত্ননিচয়  
দ্বারা যত্নপূৰ্ব্বক তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদ নিৰ্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।  
এই লিঙ্গ স্বর্ণময় এবং রত্ন দ্বারা খচিত। এই লিঙ্গের পূজায়  
অশেষ ঐশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে। (কাশীখণ্ড ৬৯ অং.)

মংস্ত্রোপজীবিন্ (ত্রি) মংস্ত্রেন মংস্যাদারণবিক্রয়াদিনা  
উপজীবতি উপ-জীব-গিনি। ধীবর, যাহারা মংস্ত্রবিক্রয় দ্বারা  
জীবিকা নির্বাহ করে।

মথ, ১ বিলোড়ন। ২ প্রতীঘাত। ভাদি। পরস্মৈ। সকং সেট্।  
মথি মথধাতু—৩ হিঙ্গ। ৪ পীড়ন। মথ বিলোড়ন, ক্র্যাদি।  
পরস্মৈ। সকং সেট্। ভাদিপক্ষে লট্ মথাত। লোট্ মথত্।  
লিট্ মমাথ, মেথত্। লুট্ মথিতা। লুঙ্ অমথীৎ। ক্র্যাদিপক্ষে  
লট্ মমথি। মথ্যতি, মথীতঃ, মথন্তি। গিঙ্ মথীয়াৎ।  
লঙ্ অমথ্যাৎ, লিট্ মমমথ, মমমথত্, লুট্ মমথিতা, লুট্  
মমমথ্যতি। লুঙ্ অমমথীৎ, অমমথীতঃ, অমমথীষুঃ। সন্  
মিমথিষতি, মিমমথিষতি। যঙ্ মামথ্যতে, মামমথ্যতে। যঙ্  
লুক্ মামমথি, মামমথি। গিচ্ মাথ্যতি, লুঙ্ অর্মাথ্যাৎ, অমমমথ্যাৎ।  
মথন (ক্রী) মথ্যতে ইতি মথ-ভাবে লুট্। ১ বিলোড়ন,  
চলিত মণ্ডয়া।

“কাহং মন্দমতিঃ কেনং মথনং ফীরবারিধেঃ।

কিং তত্র পরমাণুর্বে যত্র মজ্জতি মন্দরঃ॥”

(ভাগবত ১১।১১ টীকায় স্বামী) ২ অস্ত্র বিশেষ।

“ঐর্ধাকমস্ত্রমৈল্লক্ষ্য আধেয়ঃ শৈশিরং তথা।

বায়ব্যাং মথনং নাম কাপালমথ কিল্করম্॥”হরিবং ২৩৬।১০।

(পুং) মথতি রোগানিতি মথ-কর্তৃণি লুট্। ৩ গণিকারিকা

ব্রহ্ম। (রত্নমালা) (ত্রি) ৪ মথনকারক।

মথনাচল (পুং) পর্ত্তভেদ, মন্দর পর্ত্তভেদ।

মথা (ক্রী) বৈদিক নিধন মন্ত্রভেদ।

মথাত (ক্রী) সামভেদ।

মথিত (ক্রী) মথ-কৃত। ১ নির্জল খোল।

“যোবন্ত মথিতং তক্রমদাসিচ্ছিকাপি চ।

কসরং নির্জলং যোলাং মথিতম্ভসরোদকম্॥” (ভাবপ্রঃ)

ইহার শুধ—কক্ষ-পিত্তনাশক, কটিকর, ধাতুপুষ্টিদায়ক।

(রাজবং) (ত্রি) ২ আলোড়িত।

মথুরা (ক্রী) মথ্যতে পাপরাশির্ঘয়া ইতি মথ-(মন্দি-বাণীভাষ্যাদি।  
উৎ ১৩২) ইতি উন্নত্। তীর্থভেদ, স্বনামখ্যাত পুরী, পর্যায়—  
মধুপুর, মধুপুরী মথুরা। (শব্দরত্নাং)

নামোৎপত্তি।—সকল পুরাণেই মথুরার উল্লেখ আছে।  
কিন্তু মথুরার উৎপত্তির কথা কেবল রামায়ণ ও হরিবংশে  
পাওয়া যায়। রামায়ণে লিখিত আছে, লোনার জ্যেষ্ঠ  
পুত্র মধুদৈত্য মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া এক অপূৰ্ণ শূল  
লাভ করে। মহাদেব তাহাকে বর দিয়াছিলেন যে, এই শূল  
যতদিন তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততদিন চরাচর মধো  
কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। এই অঙ্গুত বর  
লাভ করিয়া মধু এক সুপ্রভ পুর নিৰ্মাণ করিলেন (১)।  
যথাকালে তাঁহার পত্নী কুন্তনসীর গর্ভে লবণদৈত্যের জন্ম  
হইল। লবণ নিতান্ত দুর্কিনীত ও অবাধ্য থাকায় মধু  
তাহাকে শিবদত্ত শূল অর্পণ করিয়া যক্ষণালয়ে চলিয়া গেল।  
ক্রমে লবণের দৌরাশ্রয় তপোবনবাসী ঋষিগণ আশ্রয় হইয়া  
উঠিলেন এবং সকলে গিয়া রামকে সেই অত্যাচারকাহিনী  
জানাইলেন। শক্রয় রামের আদেশ লইয়া লবণকে বধ করিতে  
আসিলেন। শক্রয়ের বীরত্বে ও কৌশলে লবণ নিহত হইল।  
ইত্যাদি দেবগণ প্রীত হইয়া বর দিতে উপস্থিত হইলে  
শক্রয় এই বর চাহিলেন যে, এই দেবানন্দিত মধুপুরী  
মথুরা শীঘ্রই রাজধানী হউক। দেবগণও প্রীতমনে বর দিলেন  
যে, এই পুরী শুরসেনা নামে খ্যাত হইবে (২)। তখন শক্রয়  
সেনা আনাইয়া পৌরজানপদ স্থাপন করিলেন। ষাটবর্ষ মধো  
এই স্থান শুরসেনাদিগের দেশ বলিয়া গণ্য হইল। এখানকার  
ক্ষেত্র সকল শস্তশোভিত হইল। বাসব যথাকালে বারি  
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরপুরুষগণ শক্রয়ের বাহুবলে  
সুরক্ষিত হইয়া রোগরহিত হইল। এখন মধুপুর যমুনাতীরে  
অর্দ্ধচক্রের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল। সুরম্য হস্ত্যরাজি  
তাহার সমধিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল। নগরপ্রাঙ্গণ আপগরাজি-  
বিরাজিত, নানাবিধ বাণিজ্যবস্ত্র দ্বারা সুশোভিত এবং এখানে  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বসতি হইল। পূর্বে লবণ

(১) “এবং মধুর্বার লঙ্। দেবাং হুমহদভুতম্।

ভবনং সোহস্রশ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস ব্রহ্মভূম্॥” (উত্তরকাণ্ড ১৪।১০)

(২) “প্রভূবাচ মহাবাহুঃ শক্রয়ঃ প্রযত্নবান্।

ইদং মধুপুরী রম্যা মথুরা দেবনির্মিতা।

নিবেশঃ প্রাপ্ত্ব রাজ্যীযমেব যেন্ত বরঃ পরঃ ১২০

তং দেবাঃ প্রীতমনসো বাচমিত্যেব রাধবস্॥

ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শুরসেনা ন সংশয়ঃ ১৬

তে ত্রয়োক্তা মহারানো দিব্যাক্ষরহস্তাঃ॥” (উত্তরকাণ্ড ১৩ অং)

দৈত্য যে সকল প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিল, এখন শক্রয় সেই সকল আগর সুগাধবলিত ও চিত্রকার্য দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তাহার সৌন্দর্য্যবন্ধন করিলেন। বণিকগণ নানা দিগ্দেশ হইতে আসিয়া বিবিধ বাণিজ্য বস্তু ক্রয়-বিক্রয়পূর্ব্বক নগরের গৌরব বৃদ্ধি করিল \*।

রামায়ণের উক্ত প্রমাণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, উত্তর-কাণ্ড রচনাকালেও এই স্থান মথুরা নামে খ্যাত ছিল না, তখন মধুপুরী ও মধুরা নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

মহাভারতেও প্রায় সকল পুরাণেই মথুরা নাম পাওয়া যায়। অধিক সম্ভব, রামায়ণোক্ত মধুপুরী বা মধুরাই কালে মথুরা নামে খ্যাত হইয়াছিল।

বর্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন, এখানকার মথুরা সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে 'মহোলি' নামে যে ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহাই আদিম রাজ্য মধুদৈত্যের মধুপুরী। পরে আখ্যরাজ শক্রয় যে পুরী নির্মাণ করেন, তাহা বর্তমান ভূতেশ্বর-মন্দির ও তারকটবড়া বস্তুমান কাটরা গ্রামে অবস্থিত ছিল, কালে সে সমস্ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশেষে যমুনা-দুর্গ-শোভিত বস্তুমান সহরই মথুরা নামে খ্যাত হইয়াছে।† কিন্তু তাঁহাদের মত সমাধান বলিয়া বোধ হয় না। কারণ উক্ত রামায়ণের বচন হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, যেখানে মধুদৈত্য পুরনির্মাণ করিয়াছিল এবং যেখানে তৎপুত্র লবণ নানা ভবন নির্মাণ করাইয়াছিল, সেই স্থানেই রামানুজ শক্রয় শূরসেনদিগের রাজধানী মধুরা পত্তন করিয়াছিলেন। সেই পুরা যমুনাতীর পয্যন্ত বিস্তৃত ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। একপ হলে কাটরা নামক স্থানের নিকট যে প্রথম আখ্য

মথুরা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। শূরসেনদিগের প্রভাববিস্তারের সহিত বাদবগণ পূর্ব্বস্থান হইতে একটু অগ্রসর হইয়া যমুনার ঠিক উপরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই পুরাণ-ইতিহাসে 'মথুরা' নামে খ্যাত। এই মথুরার সমৃদ্ধির সঙ্গে সুপ্রাচীন মধুপুরী বা মধুরা নগরী পরিত্যক্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে এই স্থান 'মধুবন' নামে খ্যাত হইল।

বাদব-রাজধানী মধুরাপুরী কালে সুবিস্তৃত হইয়া মথুরা-মণ্ডলে পরিণত হইল। মহাসংহিতার ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক প্লিনি আরিয়ান প্রভৃতির গ্রন্থে এই মথুরামণ্ডল শূরসেন নামে বর্ণিত এবং ইহার অধিকাংশ বর্তমান মথুরা জেলার অন্তর্গত।

এই জেলা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আগ্রাবিভাগের অন্তর্গত। অক্ষা° ২৭°১৪'৩০" হইতে ২৭°৫৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১২'৩০" হইতে ৭৮°৩৩' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১৪৫৩ বর্গ-মাইল। যমুনার দক্ষিণকূলস্থ মথুরানগরই ইহার সদর। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারের পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পয্যন্ত এই জেলার শাসনকার্য্য আগ্রা ও সম্রদাবাদ হইতে সম্পাদিত হইত। পরে অরুং, মহার, কোশা, সাদাবাদ, জলেশ্বর মাট, লোহ-ঝিল ও মহাবননামক ৮টি তহসীল লইয়া মথুরাজেলার সংগঠন হয়। তদবধি জেলার ব্যবতীয় রাজকীয় কার্য্য মথুরা-সদর হইতেই সম্পাদিত হইতেছে।

এই স্থান বহু প্রাচীন। পুরাণ-গ্রন্থে ইহাই কৃষ্ণ-বল-রামের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক-জগতে মথুরার মাহাত্ম্য বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান-প্রাধান্ত সময়ে, এই স্থান নানা সমৃদ্ধিতে ভূষিত হইয়া জনসাধারণের নয়ন আকৃষ্ট করিয়াছিল। কেবল যে ত্রীকুম্ভের লীলাভূমি বলিয়াই এই স্থান হিন্দুর প্রাচীনতম পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে তাহা নহে; খৃষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধ-বিহার ও সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্থানের মাহাত্ম্য তৎকালীন বৌদ্ধজগতে বিস্তৃত হইয়াছিল। তাই আমরা প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমীর "Modoura of the gods" এবং আরিয়ান ও প্লিনির Methora শব্দে মথুরার উল্লেখ পাই।

দীর্ঘ-প্রবাহা যমুনা নদী এই জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করিয়াছে। এই যমুনা ভিন্ন সমগ্র জেলায় আর দ্বিতীয় নদী নাই। বর্ষারস্বেই যমুনার ঐশ্বর্য্য বাড়িয়া উঠে। তখন এই স্বর্ধ্যকন্ডা ধরস্রোতে দশদিক্ ভাসাইয়া কুলকুল নাদে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়। এই সময়ে যমুনা যখন কাল-

\* "স পুরা দিব্যসঙ্কশো বধে বাদশমে শুভে।

নিবিশিঃ শূরসেনানাং বিষয়শ্চাকৃতোভয়ঃ।

ক্ষেত্রাণি শস্যযুগ্মানি কালে বধতি বাসবঃ।

অরোগবীরপুরুষাঃ শক্রয়ভূজপালিতাঃ।

অর্ধচন্দ্রপ্রতীকশা যমুনাতীরশোভিতা।

শোভিতা গৃহমুখোচ্চ চত্বরপাণবীথিকৈঃ।

চাতুর্বর্ণ্যসমাধুক্তা নানাবাণিজ্যশোভিতাঃ।

যচ্চ তেন পুরা শুভ্রং লবণেন কৃতং মহং।

ওচ্ছোভয়তি শক্রয়ো নানাবর্ণোপশোভিতম্।

আর্য্যৈশ্চ বিহারৈশ্চ শোভমানাং সমস্ততঃ।

শোভিতাঃ শোভনীয়ৈশ্চ তথা নৈব বনামুধৈঃ।

তাং পুরীং দিব্যসঙ্কশাং নানাপোষোপশোভিতাম্।

নানাদেশগতৈশ্চাপি বণিকভিঃপশোভিতাম্।" (উত্তরকাণ্ড ১৩ অঃ)

† Growse's Mathura, p. 216; Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. XX. p. 31.

বৈষ্ণোবিস্তারপূর্বক ধীর-সমীরণে লহরী তুলিয়া নাচিতে থাকে, তখন যমুনা-তারবর্তী মথুরা ও বৃন্দাবনতীর্থধাম অপূর্ব শোভায় ভূষিত হয়। সৌন্দর্য্যপ্রিয় মানব, যমুনার অতুল শোভা-সন্দর্শনার্থ তীর্থকামী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দারণ্যে আসিয়া থাকেন। মেঘমালাসদৃশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ যমুনা-বক্ষ বায়ুহিরোলে আন্দোলিত ও উচ্ছলিত হইয়া যেরূপ শোভাময়ী হয়, তাহা জয়দেব প্রভৃতি ভক্তকবির কাব্যগীতিতে সুস্পষ্ট ও সরল কথায় বর্ণিত হইয়াছে। [ বৃন্দাবন দেখ। ]

মথুরানগরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত যমুনাবক্ষও ঐ দৃশ্যের অভাব নাই। সহরগাজের কএকটি ঘাট শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিবোধে এক একটি তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। অপর পার্শ্বের প্রান্তরভাগে স্থানে স্থানে যমুনাপ্রবাহে হ্রদাকার খাতসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র হ্রদগুলিতে প্রায় সকল সময়ই জল থাকে। স্থানীয় চাষবাসের পক্ষে উহার জল বিশেষ উপকারী। যখন বর্ষাপগমে যমুনাবক্ষ শুষ্ক হইয়া ক্ষুদ্র একটি স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করে, তখন উহার উভয় পার্শ্বেই বিস্তৃত বালুকাময় চর পড়িয়া থাকে। ঐ চর অতিক্রম করিয়া ক্ষেত্রাদিতে জলানয়ন করা অসাধ্য। শীতকালে ঐ চরভূমিতে তরমুজ প্রভৃতির চাষ হয়।

জেলায় সর্বত্রই এাষ সমতল। কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণের ভরতপুর-সীমান্তপ্রদেশে চুণা পাথরের একটি গও-শৈলশ্রেণী দৃষ্ট হয়। উহা পার্শ্ববর্তী সমতলভূমি হইতে ২৫০ ফিট এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ৫৫৬ ফিট হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৬২০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছে।

জেলায় পূর্বভাগে মাট, মহাবন ও সয়দাবাদ তহসীল। গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বেদ্য মধ্যে অবস্থিত হওয়ায়, এই বিভাগ স্বাভাবিক উন্নয়ন লাভ করিয়াছে। এখানে ইন্দারা, গঙ্গা-খালের জলনালীসমূহ ও কএকটি নদীশাখা বিস্তারিত থাকায়, স্থানীয় ক্ষেত্রসমূহ জলপ্রাচুর্য্যহেতু প্রভূত শস্যশালী হইয়াছে। স্থানে স্থানে আশ্রকানন ও মেওয়া-বাগানসমূহ উর্বরত্বের পরিচয় দিতেছে। ভদৌরার উত্তরাংশে যমুনার এক একটি প্রাচীন খাত ক্ষুদ্র হ্রদে পরিণত হইয়াছে।

যমুনার অপর পার্শ্ববর্তী পশ্চিমভূভাগে জল না থাকায় শস্তাদির সেরূপ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় না। এখানকার কোণী, ছাতা ও মথুরা তহসীল স্বভাব-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ না হইলেও পৌরাণিক দেবমহাত্ম্যে ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল দেবচরিত্র ও পূর্বতন কীর্ত্তি সাধারণের দেখিবার জিনিস।

ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের লীলাভূমি

হইলেও, এই পবিত্রক্ষেত্রে সেরূপ কোন অলৌকিক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থানবিশেষে কএকটি জিনিস সেই প্রাচীন ক্রিয়া-কলাপসমূহের স্মৃতিমাত্র ঘোষণা করিতেছে। এখনও মথুরাধামে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, বসুদেব ও দেবকীর কারাগৃহ, কংসরাজের দুর্গ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শিত হইয়া থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ষা বাতীত মথুরা বা বৃন্দাবনক্ষেত্রের শোভা বৃদ্ধি হয় না। প্রায় ৮ মাস কাল যমুনার কলেবর বিগুপ্ত হইয়া একটি স্রোতস্বিনীর ভাষা থাকে, কিন্তু বর্ষার চারিমাস যখন যমুনাবক্ষ ঢলের জলে পরিপ্লাবিত হইয়া উঠে, তখন স্থানীয় সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। তীর্থযাত্রীগণ প্রায় এই বর্ষা ঋতুতেই এখানে আগমন করেন। অনেক যাত্রী তীর্থকামনায় ৮৪ বন পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

যমুনাবক্ষ জলপ্লাবিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় হ্রদ ও পার্শ্ববর্তী স্রোতস্বিনীসমূহ পূর্ণকলেবরা হইয়া উঠে এবং মক্কাপ্রায় গওশৈল, বালুকাময় প্রান্তরসমূহ ও হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ-শস্তাদিতে এবং ফল পুষ্পে পূর্ণ হইয়া শ্রামলা ধরিত্রীর জ্যোৎস্না-বহা প্রকাশ করিয়া থাকে।

কৃষিক্রীড়া-অধিবাসি-সম্প্রদায় ক্ষুদ্রপল্লীতে বাস না করিয়া, অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত গওগ্রামসমূহে বাস করে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত বছরশত লোকের একটি গওগ্রাম মধ্যে বাস করিবার কএকটি কারণও আছে। প্রায় যমুনাপ্লাবিত সমগ্র ভূমি-ভাগের জল ঈষৎ লবণাক্ত হয়। এই নিমিত্ত স্মৃষ্ট জলের লোভে তাহারা একস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে, অথবা শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ প্রভৃতি লীলাসমূহের সহিত সংলগ্নবোধে পবিত্র জানিয়া তাহারা সেই পুণ্যক্ষেত্রসমূহ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রধানতঃ জাট ও মহারাষ্ট্র-বিপ্লব হইতে আত্ম-রক্ষা-করণোদ্দেশ্যেই সেই গ্রামসমূহের সুরক্ষার কারণ বলা যাইতে পারে। মথুরা তহসীল ভিন্ন পশ্চিমবিভাগের অপর সকল স্থানেই জলের টান। আশ্রা-খাল ও তাহার শাখাগুলি বিস্তারিত হওয়ায় এখানে কৃষিকার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

একমাত্র যমুনা ও আশ্রাখালে পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাসমূহ গমনাগমন করিতে পারে, কিন্তু মথুরা হইতে আচ্চনেরা ও মথুরা-হাতরাস পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের ও তীর্থযাত্রীগণের গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। জলপথের বাণিজ্য-সুবিধার জন্য মূল আশ্রাখাল হইতে একটি ৮ মাইল বিস্তৃত বড় শাখা-খাল মথুরানগর



পর্যন্ত আসিয়াছে। তুলা, লবণ, চাউল, চিনি, তামাক ও মসলা প্রভৃতি এখানকার প্রধান বাণিজ্যবস্তু।

লোহ-ঝিলনামক বিস্তীর্ণ জলরাশি বর্ষাকালে হৃদাকারে পরিণত হইয়া দীর্ঘায়তন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে উহার আয়তন লগ্নে ২৫০ ও প্রস্থে ১৫ মাইল থাকে।

এই জেলার অধিকাংশ স্থান বনময় ও গোচারণভূমি। বহুবিভাগে জালানি কাঠ ব্যতীত অপর কোনরূপ ভাল কাঠ জন্মে না। স্থানে স্থানে শস্তক্ষেত্র ও উপবনসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার বৃক্ষাদির ফল, পত্র, বীজ বা গাছের ছাল ঔষধ, রপ বা ভোজনকার্যে ব্যবহৃত হয়। জেলার পশ্চিমে বর্সনা ও নন্দগাঁও নামক স্থানে বেলে-পাথর ও মথুরায় কাঁকর পাওয়া যায়। এখানকার গৃহাদি প্রায় প্রস্তরনির্মিত। মধ্যে মধ্যে কএকটি মুক্তিকা-দেউলের গৃহও দেখা যায়।

মথুরার পুরাতন।

মথুরার আদি ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। রামায়ণ হইতে জানা যায়, শক্রয় লবণদৈত্যকে বধ করিয়া মধুপুরে শূরসেন-দিগকে স্থাপন করিয়াছিলেন। শূরসেনদিগের বাসহেতু এখানকার বিস্তৃত জনপদ শূরসেন নামে খ্যাত হইয়াছিল। মহাসংহিতায় মধুপুর বা মথুরার কোন উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু এই শূরসেন-জনপদ এক্ষণিদেশের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

• শক্রয়ের বংশধরগণ এখানে কিছুকাল বাজত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বংশলোপের সহিত শূরসেনগণ প্রবল হইয়া রাজ্য অধিকার করেন। ভাগবতাদি পুরাণপাঠে জানা যায় যে, যজ্ঞকুলভিলক শ্রীকৃষ্ণ এই শূরসেন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। পরে কংস কিছুকালের জন্য এই রাজ্য নিজ অধিকারে রাখিয়াছিল এবং যমুনাতীরস্থ মথুরায় তাহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই মথুরা-নগরীর নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিধন করিয়া তৎপিতা উগ্রসেনকে পুনরায় মথুরারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। পরে জরাসন্ধভয়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকাপুরী আশ্রয় করিলেও এই স্থান শূরসেন-দিগের হস্তচ্যুত হয় নাই। মেগাস্থেনিসের বর্ণনামতে আরিয়ান লিখিয়াছেন যে, মেথোরা (Methora) ও ক্লিসোবোরা (Chiosobora) শূরসেনদিগের এই দুইটা প্রধান নগরীর মধ্য দিয়া যমুনা নদী বহিতেছে। পাশ্চাত্য-বর্ণিত ‘মেথোরা’ ও ‘ক্লিসোবোরা’ মথুরা ও কৃষ্ণপুরের বৈদেশিক উচ্চারণ। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মথুরা ও কৃষ্ণপুর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া-

ছিল এবং এখানে শূরসেনগণ রাজত্ব করিতেন তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। আবার প্লিনি লিখিয়াছেন যে, ঐ দুই-প্রসিদ্ধ নগরী পালিবোথ্রা অর্থাৎ পাটলিপুত্র-রাজ্যের অন্তর্গত। অধিক সম্ভব, মেথোরাজ চক্রগুপ্তের আধিপত্যকালে সুপ্রাচীন শূরসেনরাজ্য পাটলিপুত্রের সামীল হইয়াছিল। ব্যক্তবিক, মথুরামণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া অতি পূর্বকাল হইতে কেবল যে হিন্দুগণের নিকট পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে, তাহা নহে; জৈন ও বৌদ্ধগণের নিকটও এই স্থান পুণ্যভূমি বলিয়া বহুদিন হইতে আদৃত। জৈনদিগের ১৯শ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও ২১শ তীর্থঙ্কর নমীনাথ মথুরায় জন্ম ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। সেজন্ত ধার্মিক জিনগণের নিকট মথুরার প্রত্যেক ধূলিকণা পর্যন্ত পবিত্র। প্রকৃততত্ত্ববিদগণের যত্নে মথুরার নানাস্থান খুঁড়িয়া যে সকল প্রাচীন কীর্তি বাহির হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই জৈন। উন্মধ্যে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, নানা শ্রেণীর জৈনগণ মথুরায় তীর্থ করিতে আসিতেন ও নানা দেবকীর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। জৈনরমণীগণেরও স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মথুরার নবাবিস্কৃত খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর এক-খানি জৈনলিপি হইতে জানা যায় যে, কুমারমিত্রা নামে একজন সাদ্বী পতির মৃত্যু হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক শিষ্য কুমারভট্টির উপদেশদাতা হইয়াছিলেন। এরূপ প্রমাণ অত্যা বিরল, সেজন্ত উল্লেখ করলাম।

জৈনদিগের সহিত এখানে বৌদ্ধকীর্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উপগুপ্ত সম্রাট অশোকের সমসাময়িক। মথুরায় বুদ্ধ-শিষ্যগণের অধিষ্ঠান হইলেও এই উপগুপ্তের সময় খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী হইতেই মথুরায় বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করিয়াছিল। মথুরা হইতে যে প্রাচীনতম বৌদ্ধলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অনেকটা অশোকলিপির অনুরূপ। এতদ্বারা সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মপ্রবেশের আভাস পাওয়া যায়।

খৃষ্ট পূর্ব ২য় শতাব্দীর শেষভাগে মথুরায় শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়, মথুরার প্রথম শকক্ষত্রপগণ সকলেই মিত্রোপাসক বা সৌর ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে মথুরায় সৌরগণের প্রভাব ও হুযাপূজা বিশেষ প্রচলিত হয়। সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন স্তূপমূর্তি মথুরার পুরাকীর্তির ধ্বংস হইতে বাহির হইয়াছে। পরবর্ত্তিকালে এই শকরাজগণের মধ্যে কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, আবার কেহ কেহ বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। মথুরার বৌদ্ধ-শকাধিপগণের মধ্যে কনিঙ্কের নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ।

[ ভারতবর্ষ শক ৩৬৭-৩৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ]

শকপ্রভাব ধর্ম হইলে মথুরামণ্ডল ব্রাহ্মণতন্ত্র গুপ্ত-

মন্দিরগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে শ্রবসেনগণ আবার স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্বক আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে রাজপদে বসুণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং মথুরায় আগমন করেন, সে সময়েও তিনি এখানে স্থানীয় স্বাধীন রাজার দর্শন পাইয়াছিলেন।

মহাবন হইতে রাজা অজয়পালদেবের ১২০৭ সংবতে (অর্থাৎ ১১৫০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সে সময়েও মথুরামণ্ডল যজ্ঞবংশীয় শ্রবসেনরাজেরই অধিকারে ছিল। সুদীর্ঘকাল রাজ্যভোগের পর শ্রবসেনরাজ-বংশীয়গণ মহম্মদ ঘোরীর হস্তে মথুরারাজ্য বিসর্জন দিয়াছিলেন। মধ্যে একবার হিন্দু-অধিকার স্থাপিত হইলেও মথুরা আলাউদ্দীন খিলজীর সময় হইতে চিরদিনের জন্ত হিন্দুকর্তৃত্ব হইল। তৎপরে বৃট্টশাসিকেরা না আসা পর্যন্ত মুসলমানদিগেরই শাসনাধীনে থাকে। এইরূপে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাধান্যকালেই মথুরায় নানা সাম্প্রদায়িক-কীৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধপ্রাধান্যসময়ে, মথুরামণ্ডলে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে এই পবিত্রক্ষেত্রে অসংখ্য কীৰ্ত্তি, ধর্মস্মৃতি ও স্মৃতিস্তূপ (Relics)-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বৌদ্ধপ্রভাব বহুদিন হইতে অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতীয় তীর্থযাত্রীগণ ব্যতীত স্রদ্ধা চীনদেশ হইতে পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ৪০০ খৃষ্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করেন। তিব্বত হইতে কাশ্মীর, কাবুল, কান্দাহার ও পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধতত্ত্বের লুপ্ত শাস্ত্রগুলি উদ্ধারমানসে তিনি প্রথমেই বৌদ্ধদের প্রধান আড্ডা মধ্যদেশান্তর্গত মথুরাধামেই আগমন করেন। এখানে তিনি মাসাবধি বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃত্তান্তপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালেও এখানে ২০টা সজ্জারাম ও বিহারাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে তিন অনেকগুলির প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ দাতার নিদিষ্ট তাম্রফলক দেখিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল মঠাদিতে প্রায় ৩ সহস্র বৌদ্ধযতি থাকিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ৬টা স্মৃতিস্তূপের উল্লেখ করিয়া যান, তন্মধ্যে ধর্ম্মাচার্য্য সারীপুত্র, মুদগলপুত্র ও আনন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। হহার কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দী পরে, প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং ভারতে (৫২২-৬৪৫ খৃঃ) আগমন করেন। তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি মথুরাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, উহার পরিধি প্রায় ২০ লি হইবে। তাহার আগমনকালেও

ফা-হিয়ান-বর্ণিত ২০টা সজ্জারাম বিদ্যমান ছিল। দুঃখের বিষয়, তৎকালে বৌদ্ধপ্রাধান্যের ক্রমিক অবনতি হওয়ায় বৌদ্ধযতিদিগের সংখ্যাও কমিয়া আসিতেছিল। তিনি এখানে প্রায় ২ সহস্র যতিকে শাস্ত্রালোচনা করিতে দেখিয়া গিয়াছেন। অশোক-নির্ম্মিত ৪টা স্তূপ, পূর্ববর্তী ৪ জন বুদ্ধের পদচিহ্ন এবং শাক্যমুনিশিষ্য সারীপুত্র, মোদগলান, পূর্ণমৈত্রায়ণীপুত্র, উপালি, আনন্দ, রাহুল, মঞ্জুশ্রী ও অপরাপর বোধিসত্ত্বের স্মরণার্থ নির্ম্মিত কএকটা স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে বৌদ্ধযতিগণ প্রতি বৎসর ১ম, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম মাসের উপবাসকালে উক্ত স্তূপসমূহের নিকট সমবেত হইয়া অর্চনাদি করিতেন। নগরের পূর্বদিকে ৫৬ লি দূরে উপগুপ্ত-নির্ম্মিত একটা সজ্জারাম ও তন্মধ্যস্থ তথাগতের নখস্তূপ, উহারই উত্তরভাগে অবস্থিত গওশৈলের উপর একটা শুভা বুদ্ধের বিচরণভূমি। তদক্ষিপে চারি বুদ্ধ ও সারীপুত্র, মুদগলপুত্র প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের উপাসনাভূমির বিষয় তিনি লিখিয়াছেন। তাহার আগমনকালে ঐ বনমধ্যে বৌদ্ধাচার্য্যগণের স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত স্তূপ তিন নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত পরিব্রাজক মথুরাধামে ৫টা হিন্দুমন্দিরের অবস্থানও দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানকালে এখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরিবর্তন ও দীর্ঘকাল অবস্থান নিবন্ধন চীন-পরিব্রাজক-দ্বয়বর্ণিত বৌদ্ধ-কীৰ্ত্তিস্তূপগুলি নিয়তিবশে ভগ্ন, প্রোথিত ও হিন্দুর হৃদয় হইতে, ধর্ম্মাস্তরের অনাস্থাপ্রযুক্ত, চিরকালের জন্ত অপনোদিত হইয়াছিল। তৎপরে প্রকৃতবলিদ ভাঃ কনিংহামের যত্নে উহার এক একটা নিদর্শন হইতে বৌদ্ধপ্রাধান্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রথমে কেশবদেব-মন্দিরের কাটরা মধ্যে কএকটা স্তূপ ও যশোবিহার হইতে বুদ্ধমূর্ত্তির নিদর্শন ও যশোবিহার নাম হইতেই অম্বুমক্লিঙ্গা বাড়িয়া উঠে।

কিন্তু কালের বিচিত্র গতি! সহস্রের পর সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া চলিল, জল ও বায়ু নিত্যন্ত দূষিত হইয়া লোকসকল বিনষ্ট হইতে লাগিল; তত্পরি বিধাতার বিড়ম্বনা। কালের ক্ষয়শীল ক্রোড়ে রক্ষিত হইয়াও যাহা স্মৃতিচিহ্নরূপে জাগিতে ছিল, হৃদয়স্ত গজনীপতি মাকুদ, সিকেন্দরুলোদী, শাহজহান ও অরঙ্গজেব প্রভৃতি বিধর্ম্মা মুসলমানগণের অত্যাচারে তাহা লুপ্তিত ও বিপর্য্যস্ত হইল। প্রকৃত কথা বলিতে কি, হিন্দুধর্ম্মদেবী যবনগণ হিন্দুর কীৰ্ত্তি এককালে লোপ করিবার চেষ্টায় পূর্বতন ধর্ম্মসাবশেষগুলি বিপর্য্যস্ত এবং

কোথাও বা ধনভাণ্ডের আশায় তাহার ভিত্তি পর্যন্ত খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছিল। তাহার বৌদ্ধ বা জৈন প্রতিকৃতিসমূহের মুখ, নাসা বা হস্তপদাদি ছেদন করিয়া ফেলিয়াছে! এইরূপে এক স্থানের জিনিস অন্য স্থানে অন্তরিত হওয়ায় উহা সাধারণের ধারণার বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে; অর্থাৎ জৈনমূর্তিগুলি বৌদ্ধ-প্রতিমূর্তির সহিত একত্রীভূত হইয়া গিয়াছে, আবার কোথাও বা হিন্দু ও বৌদ্ধমূর্তিসমূহ একত্র হইয়া রহিয়াছে। অধুনাতনকালে কোন কোন ধনিব্যক্তি দ্বেবোদ্ধেশে মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিতে বাইরা কোন কোন স্থলে ঐ উভয় প্রকার মূর্তিই সংযোজন করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্বিবন্ধন প্রস্তুতব-বিদগণের বিশেষ গোলযোগ ঘটয়াছে। আরও দুঃখের বিষয়, কোন কোন পাশ্চাত্য-প্রবৃত্তবদ্ পূর্বতন জৈন ও বৌদ্ধপ্রতিমূর্তির প্রভেদ লক্ষ্য করিতে না পারিয়া ঐ সমস্ত এক একটা বৌদ্ধপ্রতিমূর্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখনও মথুরায় অনেক জৈনমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কেশো (কেশব) পুরের উপকণ্ঠস্থিত শেঠ-দিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নিকটে জৈনযুগের শিল্পকাব্য-সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ জম্বুস্বামীর ভজনাগৃহ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহার স্রবণার্থ বৈদীর নিম্নদেশে একখানি শিলাফলকে জম্বুস্বামীর নাম খোদিত আছে। এই জম্বুস্বামীই জৈনদিগের শেষ ঋতকেবলী সূত্রেণের শিষ্য। সূত্রেণ শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। মণিরাম পুরোক্ত মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ২য় তীর্থঙ্কর চন্দ্র-প্রভুর প্রতিমূর্তি স্থাপন করেন। তৎপরে শেঠ রঘুনাথ দাস গোয়ালিয়রের এক প্রাচীন ভগ্ন মন্দির হইতে অজিতনাথের প্রস্তবপ্রতিমূর্তি আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মথুরা-মণ্ডলেব নানা প্রাচীন স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া বহু নিম্ন হইতে নানা সম্প্রদায়ের পুরাকীর্তি বাহির হইতেছে। তদ্বারা মথুরা পূর্বকালে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ও নানা সম্প্রদায়ের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য ছিল, তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে।

মথুরার ইতিহাস।

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, গোকুলে নন্দগৃহে অবস্থান, বৃন্দারণ্যে গোপাঙ্গনা-সঙ্গে কেলিবিহার, তাহার মথুরায় আগমন, কংসনিধন ও রাজপাটগ্রহণ প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি-সমূহ আজিও প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। বলিতে কি, এখনও প্রত্যেক হিন্দুর প্রাণ মথুরা-বৃন্দাবনের নামে নাচিয়া উঠে। মথুরা আখ্যায়িকাতে একটি প্রাচীন কেন্দ্রস্থান। বৃন্দারণ্য তাহার উপকণ্ঠস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম

\* অমেকে ইহাকেই প্রাচীন "কুলপুৰ" বলিয়া অনুমান করেন।

মাত্র। মথুরায় এখনও কংসকারাগার, বিশ্রান্তিঘাট প্রভৃতি প্রাচীন পীঠ বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন যুগে এখানে যে সম্প্রদায় বিশেষের অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাদেরও প্রভূত স্মৃতিচিহ্ন আজিও মথুরাবক্ষে বিরাজ করিতেছে।

রাখাল-বালকরূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার অংশ-বতার বলদেব লীলার সাথী হইয়া মথুরাধামে দ্বাপরীলীলা শেষ করিয়া গিয়াছেন। এখনও মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, গোকুল ও মহাবন প্রভৃতি স্থানে তাহার অসংখ্য নিদর্শন পড়িয়া আছে। এ সকল দেবকীর্তি দর্শন করিলে স্বতঃই মনোমধ্যে এই দেবতীর্থের পবিত্রতা উপলব্ধি হয়। কালে এই তীর্থ-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইলে, বহুলোক মথুরাধামে গমন করিয়াছিল। বৌদ্ধশ্রাদ্ধসময়ে মথুরা নগরই নির্বাণ-ধ্মপ্রচারের মুখ্যকেন্দ্র হইয়াছিল। চান-পরিব্রাজক ফাহিয়ান খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে এবং হিউএন্ সিয়াং ৭ম শতাব্দীতে এই স্থানের বৌদ্ধপ্রাধান্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে গজনাপতি মাক্কুদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হইতে মথুরা নগর একবারেই শ্রীহীন হইয়া পড়ে। এ মহাবিপদে মথুরা-নগরের ও তৎপার্শ্ববর্তী দেবভূমির অনেক প্রাচীন কীর্তি ধ্বংসে পারণত হইয়াছিল। তদবধি মোগলসম্রাট অকবর শাহের রাজত্ব পর্যন্ত আর কেহই মথুরার নষ্টশ্রী-উদ্ধারের চেষ্টা পান নাই। মাক্কুদ ও সুলতান সিকেন্দর লোদী (১৫০ খৃঃ) মথুরার যে সন্ধান করিয়া গিয়াছেন, সম্রাট অকবর শাহ তাহারই জীর্ণসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাহারই হীনচেতা বংশধর শাহজহান ও অরঙ্গজেব উহার সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন করিয়া গিয়াছেন। মোগল-রাজবংশের অবসানে এখানে ভরতপুরের জাট-রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

মোগলপ্রভাব ধর্ম হইয়া আসিলে, জাটগণ মন্তকোত্তলন করে। সেই অরাজকতা ও শাসন-বিশৃঙ্খলতার সময় জাটগণ দস্যুত্ব দ্বারা নানা স্থানে লুণ্ঠন ও বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। বদনসিংহনামা জনৈক ব্যক্তির বলবীর্ঘ্যে বশীভূত হইয়া জাটদল তাহাকেই দলপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে সর্দার বদনসিংহ সহরে আসিয়া বাস করেন। এখানে তাহার অদৃঢ় প্রাসাদ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। বার্ষিকে উপনীত হইলে বদনসিংহ স্বীয় অধিকৃত প্রদেশসমূহ পুত্র-দিগকে ভাগ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যমল্লকে মথুরা প্রভৃতি অধিকাংশ রাজ্য এবং কনিষ্ঠ প্রতাপসিংহকে ভরত-পুরের দক্ষিণপশ্চিমাংশ দান করেন। বদনসিংহের মৃত্যুর পর, সূর্য্যমল্ল ভরতপুরে বাইরা রাজোপাধি গ্রহণ করেন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রোহিলা-বিদ্রোহদমনের জন্য মোগলসম্রাট আকবর শাহ জাটসর্দার স্বর্গামলকে আহ্বান করেন। জাট ও হোলকর-সেনাদল উজীর সর্দার জেদের অধিনায়কতায় অভিযান করিয়াছিল। যুদ্ধকালে সেনানী সর্দার বিদ্রোহী হন। ঐ সময়ে জাটসর্দার দলবলসহ উজীরের পক্ষাবলম্বন করেন, কিন্তু মোগল-সেনাপতি গাজি উদ্দীন মহারাষ্ট্রসৈন্তের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। উভয়পক্ষের বিবাদ গুরুতর বাধিল দেখিয়া উজীর সর্দার জজ অযোধ্যাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গাজি-উদ্দীন কাহারও কিছু করিতে না পারিয়া অবশেষে ভরতপুর অবরোধ করিয়া বসিলেন। মহারাষ্ট্র সহযোগী সেনাদলের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকায় তিনি বহু দিন অবরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি দিল্লীনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আকবরশাহকে সিংহাসনচ্যুত ও ২য় আলমগীরকে রাজমুকুট পরাইয়া নিজ জিহাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আকবরশাহ হুদাণি যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন সর্দার জহান খাঁ মথুরাবাসীর নিকট হইতে করসংগ্রহের চেষ্টা পান। কিন্তু অধিবাসিগণ বিপদ বুঝিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নিরাপদ প্রকারে কোন ক্ষতি করিতে না পারায় তাহার ক্রোধবহি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি নগরলুণ্ঠনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। নগর মধ্যে যত ধন-রত্ন ছিল, সকলই জহান খাঁর করায়ত্ত হইল, যাহারা তাহার লুণ্ঠনকার্য্যে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই মুসলমানের তীক্ষ্ণ তরবারিমুখে জীবন বিসর্জন করে।

ইহার ঠিক দুই বর্ষ পরে, নব সম্রাট ২য় আলমগীর গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন। এই বিশৃঙ্খলতার সময়ে আফগনরাজ আকবরশাহ পুনরায় দিল্লী অভিমুখে আসিয়া দেখা দিলেন। বিখ্যাত চক্ৰী গাজি উদ্দীন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মথুরা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। এখানে তিনি ভরতপুরের জাটসর্দার ও মহারাষ্ট্র-সেনাদল একত্র করিয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ-রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। মিলিত হিন্দুবাহিনী আকবরশাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইল, কিন্তু মহারাষ্ট্র-সেনাপতির সহিত এই ঘটনার পূর্বেই বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় স্বর্গামল পাণিপথ-রণক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই। তিনি সুবিধা পাইয়া আগ্রা নগর মহারাষ্ট্র-কবল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় শাসনাধীনে আনিলেন। [সদাশিব ভাউ দেখ]

আকবর শাহ হুদাণ্য শাহ আলমকে দিল্লীসিংহাসনে বসাইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। এই সময় সুবিধাজনক বুঝিয়া

জাটসর্দার স্বর্গামল রোহিলা-উজীর নাজীর-উদ্দৌলাকে আক্রমণ করাই প্রেরণ বোধ করিলেন। তিনি সৈন্তে দিল্লীর ও ক্রোশ অদূরে শাহদেরা নামক স্থানে উপনীত হইলেন, অকস্মাৎ রাজকীয় সেনাদল, তাঁহাকে আক্রমণ ও ধৃত করিল। স্নেহহস্তেই তাহার জীবনীলা শেষ হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর, প্রথম পুত্রের এই অভিযানের অধিনায়কতা গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহারও মোগলহস্তে নিহত হন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র আবিতা খাঁর বিদ্রোহের সময় আগ্রা রাজ্য হারাইয়া, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার চতুর্থ পুত্র সমস্ত রাজ্য হারাইয়া অবশেষে ভরতপুরসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সিন্ধ-রাজের সহিত রাজপুত রাজগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে জাটগণ সিন্ধ-রাজের সহায়তা করিয়া ছিলেন। জাটসেনাসাহায্যে সিন্ধরাজ গোলাম কাদের কর্তৃক অবরুদ্ধ আগ্রা নগরী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সময়ে মথুরানগরী সহ আগ্রা পুনরায় সিন্ধরাজকবলে আসিয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ভরতপুররাজ রণজিৎ সিংহ ৫ সহস্র জাট অশ্বারোহী লইয়া সিন্ধরাজবিরুদ্ধে ইংরাজসেনাপতি লর্ড লেকের সহগামী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রসেনা পরাজিত হইলে, জাটসর্দার পারিতোষিক স্বরূপ ইংরাজ-রাজের নিকট হইতে কৃষ্ণগড়, রেবারি ও মথুরার দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগ লাভ করেন। কিন্তু পর বৎসরেই তিনি দীর্ঘ-যুদ্ধে পরাজিত হোলকররাজকে আশ্রয় দিয়া ইংরাজের প্রণয়স্বহ ছিন্ন করিলেন। লর্ড লেক-পরিচালিত ইংরাজ-সেনা ভরতপুর দুর্গ অবরোধ করিল, কিন্তু এবার দুর্গ অধিকৃত হইল না বটে, তথাপি ইংরাজপ্রদত্ত প্রদেশগুলি ও সমগ্র মথুরা জেলা ইংরাজ খাস করিয়া লইলেন।

ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, মথুরা অঞ্চলে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মিরাতের সিপাহিবিদ্রোহসংবাদ মথুরায় পৌঁছিলে এখানকার সিপাহিসৈন্তের স্বেচ্ছাবস্ত ক্রম হয়। উক্ত বর্ষের ১৬ মে ভরতপুর সৈন্ত আসিয়া পৌঁছিলে সেই মিলিত সেনাদলকে ইংরাজ-সেনানী দিল্লী অভিমুখে পরিচালিত করিলেন। ২৬শে তারিখে তাহারা হোদল নামক স্থানে ছাউনী করে। ৩০শে তারিখে মথুরা হইতে রাজকোষ আগ্রায় স্থানান্তরিত করিবার কালে সহগামী সিপাহীদল বিদ্রোহী হয়। ইংরাজ-কর্মচারিগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া হোদলে পলাইয়া আসিলেন। এদিকে অনতিবিলম্বেই, ভরতপুরসৈন্ত বিদ্রোহী হইল দেখিয়া ইংরাজ-কর্মচারিগণ তথা হইতেও পলাইতে বাধ্য হইলেন। তৎকালীন

ইংরাজ-মেজিষ্ট্রেট সাহায্যলাভের প্রত্যাশায় আগ্রা অভিযুখে যাত্রা করেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ ব্যর্থ হইল দেখিয়া তিনি পুনরায় মথুরানগরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে শেঠ উপাধি-ধারী ধনিগণ ১৪ই জুন তারিখে তাঁহাকে এই বিপদে আশ্রয় দিয়া বিশেষ বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। আলিগড়ে গোয়ালিয়র সেনাদলের বিদ্রোহিতা প্রশমিত হইলে, নিম্নারের সেনাদল মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ইংরাজগণকে তাড়াইয়া দেয়। এ সময় ইংরাজগণ আগ্রায় পলাইয়া রক্ষা পান। ক্রমে মথুরার সমগ্র পুরুষবিভাগে বিদ্রোহবাহি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। এই অক্টোবর মেজিষ্ট্রেট সাহেব একদল সেনা লইয়া অগ্রসর হন। পথিমধ্যে দেবকর্ণ নামক জনৈক বিদ্রোহ-দলপতিব সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয় পক্ষে একটা শব্দ বৃদ্ধের পর দেবকর্ণ ইংরাজহস্তে বন্দী হন। এই সময়েই কর্ণেল কটন সসৈন্তে আগ্রা হইতে কোশা এবং তথা হইতে মথুরা-ভিমুখে আসিয়া গ্রামবাসী বিদ্রোহীদিগকে দমনপূর্বক পুনরায় আগ্রা ভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদবধি মথুরায় আর কোন বিপত্তির সূচনা হয় নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় হাতরাসের জাটরাজগণ ও মথুরার শেঠ বণিকগণ ইংরাজরাজের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহাদের কতক পরিচয় এইখানে প্রদত্ত হইল।

মাধব সিংহ নামা জনৈক জাট রাজপুতানা হইতে মুর্সানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র ঠাকুর নন্দরাম ফৌজদার ছিলেন। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার ১৪শ পুত্রের মধ্যে জলকরণ সিংহ মুর্সানসম্পত্তির অধিকারী হন ও জয়সিংহ ফৌজদারপদ লাভ করেন। জয়সিংহের পুত্র বদন-সিংহ হাতরাসে যাইয়া বাস করিলেন। জলকরণের প্রপৌত্র রাজা ভগবন্তসিংহ ও জয়সিংহের প্রপৌত্র ঠাকুর দয়ারাম বিশেষ বলশালী হইয়াছিলেন। এই সময়ে মথুরা ও আলিগড় জেলার অধিকাংশ স্থান তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত সামন্তদ্বয় স্বাধীনতা-অবলম্বনের চেষ্টা পাঠিলে ইংরাজগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। মেজর জেনারেল মাসেল সসৈন্তে যাইয়া মুর্সান রাজকে পরাজিত করেন। কিন্তু হাতরাস রাজ কিছুতেই ইংরাজের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহেন না। তাঁহারা আলিগড়-দুর্গে আশ্রয় লইলে, ইংরাজসৈন্য সেই দুর্গ অবরোধ করিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ, উভয় পক্ষ হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে থাকে। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে বান্ধুখানায় আশ্বিন লাগার সমগ্র দুর্গ প্রায় ধ্বংস হইয়া যায়। দয়ারাম সকলই নষ্ট হইয়াছে জানিয়া রাত্রিযোগেই ভরতপুরে পলায়ন করেন, কিন্তু ভরতপুররাজ

রণধীর সিংহ তাঁহাকে আশ্রয়দানে অস্বীকৃত হইলে তিনি তথা হইতে জয়পুর যাত্রা করেন। ইংরাজসেনা তাঁহার দুর্গ ভাঙ্গিয়া দেয় এবং তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি ইংরাজ-সরকারে আইসে। ইংরাজরাজ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার খোর-পোষের জন্য মাসিক ১ হাজার টাকা ধার্য্য করিয়া দেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র ঠাকুর গোবিন্দ-সিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের পক্ষ হইয়া বিদ্রোহানল মধ্যে ঝাঁপ দেন। তাঁহার বীরত্ব ও রাজভক্তি দেখিয়া ইংরাজ-রাজ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই সময় ইংরাজের সাহায্য-কল্পে তাঁহার বহুল অর্থব্যয় ও বৃন্দাবন-প্রাসাদ বিদ্রোহীদিগের দ্বারা লুপ্তিত হইয়াছিল। ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি ইংরাজের নিকট হইতে ৫০ হাজার টাকা ও লর্ড ক্যানিংয়ের সহিত একখানি জমিদারী সনদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র-সন্তানাদি কিছুই ছিল না। তদীয় বিধবাপত্নী রাণী সাহেবকুমারী রাজা হরিনারায়ণ সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনের কেশাঘাটের অদূরস্থ রাজপ্রাসাদে তাঁহারা বৎসরের অধিক দিন অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

শেঠ লছমিচাঁদ সিপাহীবিদ্রোহের সূচনা দেখিয়া পুর্নাক্ষে কলেক্টার খরগহিল সাহেবকে সংবাদ দিয়াছিলেন। আগ্রায় সংবাদ যাহবার পূর্বেই বিদ্রোহগণ যুরোপীয়গণের বাস-ভূমিতে আশ্বিন লাগাইয়া দেয়। মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি যুরোপীয়গণ লছমিচাঁদের আলয়ে আশ্রয় লাভ করেন।

গোয়ালিয়ররাজের ধনাধ্যক্ষ গোকুলদাস পরিখজীর ধনেই এই বণিকবংশ সমগ্র ভারতে জোদায়ান্ন খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গোকুলদাস বজ্রভাটাত্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ভ্রাতৃবর্গের সহিত মনোবিবাদ ও অপুত্রকানিবন্ধন তিনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যুকালে স্বীয় বিধবাকার্যের সহকারী মণিরামকেই আপনায় প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মণিরামের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লছমিচাঁদ গদিতে উপবেশন করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লছমিচাঁদের মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র রঘুনাথ দাস সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু নাবালক পুত্রের কর্তৃত্বকল্পে রাধাকৃষ্ণ ও গোবিন্দদাস (লছমিচাঁদের অপর ভ্রাতৃদ্বয়) কাব্য চালাইতে থাকেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা পথান্ত সমগ্র ভারতের প্রত্যেক বাণিজ্যপ্রধান নগরে মণিরাম-লছমিচাঁদ নামধের ধনীর হুণ্ডী চলিত। রামানুজ-মতাবলম্বী স্বামী রঙ্গাচাৰ্য্যের নিকট তাঁহারা ঐক্যবন্ধনে দীক্ষিত হন। এখনও বৃন্দাবনস্থ রঙ্গজীর মন্দির তাঁহাদের কীৰ্ত্তি ঘোষণা

করিতেছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে, গোবিন্দ-দাস একক বাণিজ্য চালাইয়া ছিলেন। তিনি কৃতকাযের পুরস্কারস্বরূপ ইংরাজরাজের নিকট হইতে C. S. I. উপাধি লাভ করেন। তাঁহার এবং তৎপরবর্তী লছমিচাঁদের পুত্র রঘুনাথদাসের যত্নে মথুরাধামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

এতদ্বিধা এখানকার সমদাবাদবাসী লালখানী নামক মুসলমান নবাববংশ উল্লেখযোগ্য। ইহারা রাজোরের বড়গুজর ঠাকুর কুমার প্রতাপসিংহ হইতেই আপনাদের বংশ-আখ্যা কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে। প্রতাপসিংহ দিল্লীখর পৃথ্বী-রাজের সমদাময়িক ছিলেন। ইহার বংশধর লালসিংহ সম্রাট অকবর কর্তৃক খান উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই বংশ লালখানী আখ্যায় বিধোষিত হয়। তাঁহার পৌত্র হিত-মাদ্ রায় সম্রাট অরঙ্গজেব কর্তৃক ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইতিমাদের ৭ম পুরুষ অধস্তন নাহর আলী খাঁ ও হুন্দে খাঁ বুলন্দশহরের কুমোনা হুগে থাকিয়া ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করেন। তদনুসারে তাঁহারা অপহৃতসর্বস্ব হইয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজরাজ অমুকম্পা করিয়া ছতারিবাসী ঐ বংশের মর্দন আলী খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি দান করেন। এই ব্যক্তি সায়দাবাদ সম্পত্তি খরিদ করিয়া বংশের সম্মান বুদ্ধি করিয়া যান। ঐ বংশে নবাব মর্ ফৈজ আলী খাঁ ইংরাজরাজের নিকট হইতে K. C. S. I. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দু হইতে বংশের উৎপত্তি স্মরণ করিয়া এখনও তাহারা অনেক বিষয়ে হিন্দু রক্ষা করিয়া আসিতেছে। পুরুষগণ কুমার এবং রমণীগণ ঠাকুরাণী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও প্রাচীন হিন্দুপ্রথার প্রকরণসমূহ দৃষ্ট হয়। বর্তমান বংশধরগণ গোড়া মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ঐ বংশের প্রধান ব্যক্তি ছতারির নবাব বলিয়া পরিচিত। ইনি ওহাবি-মতাবলম্বী।

মথুরামণ্ডলস্থ তীর্থপ্রসঙ্গ।

মথুরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, \* এই জন্য ইহা সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্তর্গত। ভাগবত ও হরিবংশাদি মতে শ্রীকৃষ্ণ যে যে লীলা করিয়াছিলেন, তাঁহার পাদম্পর্শে যে যে স্থান পবিত্র হইয়াছিল, অধুনাতন কালে সেই সেই স্থানই

এক একটা তীর্থ বা পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রকীর্ত্ত হইয়াছে। কিন্তু মথুরায় এই তীর্থ বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ইহা ঐক্ষণ্যধর্মের পুনরুদ্ভাবের পর ঘটয়াছে, কারণ মহাভারতে নানা তীর্থপ্রসঙ্গ থাকিলেও মথুরা তীর্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রাখিবার জন্য কৃষ্ণপুর বা কেশবপুর স্থাপিত হইয়াছিল, খৃষ্টপূর্ব ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতেও সেই কৃষ্ণ বা কেশবপুরের খ্যাতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ কীৰ্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, যে সময় প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণ সংকলিত হয়, সে সময়েও মথুরায় নানা তীর্থ ও নানাবনের অস্তিত্বই ছিল না।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া মথুরায় যমুনা সলিলে স্নান এবং বিষ্ণুর অর্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। ‘পিতৃদেবভাগ্য অন্যান্য উন্নতিলাভ পুরুষগণের সম্পদ অবলো-কন করিয়া এই কথা বলিয়া থাকেন যে, আমাদের কালে কি এমন কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হইবে, যে মথুরাক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠ-মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে উপবাস করিয়া যমুনা সলিলে স্নান ও বিষ্ণুর অর্চনা করিবে। তাহাতে আমরা পরম গতি লাভ করিব।’ এই দিন অতিশয় পুণ্যপ্রদ, যমুনার স্নান, বিষ্ণুপূজা, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যাহা তীর্থকর্তব্য, তাহার অমুষ্ঠানে ইহকালে বিবিধভোগ এবং অন্তিমে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

(বিষ্ণুপুরাণ ৬৮ অঃ)

বিষ্ণুপুরাণের উক্ত বিবরণ হইতে এই মাত্র জানা যাইতেছে যে, মথুরানগরী-প্রবাহিত যমুনা নদীই হিন্দুর নিকট পুণ্যকালে পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য ছিল।

এমন কি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন এই মথুরাদর্শনে আসেন, সে সময়ে তিনি নানা সম্রদায়ের ৫টা মাত্র (হিন্দু) দেবমন্দির দেখিয়াছিলেন। স্মরণ্য যে এ সময়েও মথুরায় বহুতীর্থস্থান, বহুবন ও বহু দেব কল্পিত হয় নাই।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পর হইতেই ঐক্ষণ্যধর্মাব্রাহ্মণ্যের স্ত্রোতপাত। সম্রাট হর্ষদেবের মৃত্যুর সহিত বঙ্কনসাম্রাজ্য লোপ, মগধে হিন্দুপ্রবর গুপ্ত রাজগণের প্রাধান্যলাভ এবং তাহারই অনতিপরে কনোজে হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ যশোদত্তদেবের অভ্যুদয়। প্রায় সমস্ত আর্গ্যবর্ন্তে আবার কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণপ্রভাব প্রবর্তিত হইয়াছিল।

অধিক সম্ভব, সেই সময়ে যখনচৈতন্য বৈষ্ণবগণ কর্তৃক বরাহ-পুরাণোক্ত তীর্থ ও বনসমূহ প্রতিষ্ঠিত এবং তত্ত্বমহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে শৈব, শাক্ত ও সৌরগণও স্ব স্ব

\* “অযোধ্যা মথুরা মারা কাশী কাকী অবন্তিকা।

পুরী দ্বারবর্তী চৈব সম্ভেতা মোক্ষদায়িকা: ॥

অযোধ্যা রামনগরী মথুরা কৃষ্ণপালিতা।

এতদ্ব্যপ্তি পৃথিবীমধ্যে ন গণ্যন্তে কলানন।” (ভূতত্ত্বকিত্তর)

ইষ্টদেবের মাহাত্ম্যপ্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বরাহ-  
পুরাণে তাহার বর্ণিত আভাস পাওয়া যায়।

বরাহপুরাণে মথুরামাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে—

“ইন্দ্রস্যোব পুরী রম্যা যথা নাক্ষত্রমরাবতী ।  
জম্বুদ্বীপে তথোৎকৃষ্টা মথুরা নাম বল্লভা ॥  
বিংশতিযোজনানাং হি মথুরাঃ সমা গুলম্ ।  
পদে পদে স্বমেধানাং ফলং নাত্র বিচারণা ॥  
ন মুরা কথিতং দেবি ব্রহ্মণশ্চ মহাত্মনঃ ।  
রুদ্রস্ত ন ময়া পূৰ্ণং কথিতঞ্চ বসুন্ধরে ॥  
ময়া শ্রুগোপিতং পূৰ্ণং শুভাদ্গুহ্যতরং পরম্ ।  
অত্র ক্ষেত্রে পুরী রম্যা সৰ্ব্বরক্তবিভূষিতা ।  
তস্তাং তিষ্ঠন্তি তীর্থানি তানি বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥  
ষট্ কোটিসহস্রাণি ষট্ কোটিশতানি চ ॥  
তীর্থসংখ্যা চ বসুন্ধ্রে মথুরায়াঃ মনোদিতা ।  
গোবর্ধনং তথা ক্রুরং বে কোটী দক্ষিণোত্তরে ॥  
প্রসন্ননঞ্চ ভাণ্ডীরং কুরুক্ষেত্রসমানি ঘট্ ।  
পুণ্যং পুণ্যতরং শ্রেষ্ঠমেতদ্ বিশ্রুতিসংজ্ঞকম্ ॥  
অসিকুণ্ডং সর্বকুণ্ডং কোটিতীর্থসমং স্বতম্ ।  
অবিমুক্তং সোমতীর্থং যমনস্তিন্দুকং ততঃ ॥  
চক্রতীর্থং তথা ক্রুরং দ্বাদশাদিতাসংজ্ঞিতম্ ।  
এতং পুণ্যং পবিত্রঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ।  
কুরুক্ষেত্রোচ্ছ্রিতগুণং মথুরায়াং ন সংশয়ঃ ॥  
যে পঠন্তি মহাভাগাঃ শৃণ্বন্তি চ সমাহিতাঃ ।  
মথুরায়ান্ত মাহাত্ম্যং তে যান্তি পরমং পদম্ ॥”

( বরাহপুঃ ১৫৮ অঃ )

শ্রীকৃষ্ণ বসুধাকে বলিয়াছিলেন, প্রিয়ে ! সমগ্র জম্বুদ্বীপের  
মধ্যে এই মথুরা পুরীই আমার প্রিয়। ইহা ইন্দ্রের অমরাবতীর  
ভায় রমণীয়। এই মথুরামণ্ডলের বিস্তার বিংশতি যোজন।  
এখানে প্রতিদিকক্ষেপে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। আমি  
এই পুরীর বিবরণ পূর্বে ব্রহ্মা বা রুদ্র কাহারও নিকট প্রকাশ  
করি নাই। অতি গোপনে হহাকে আমি রক্ষা করিয়াছি।  
এই ক্ষেত্রে একটি সৰ্ব্বরক্তভূষিত রমণীয় পুরী আছে। তথায়  
বহুসংখ্যক পবিত্র তীর্থ বিস্তারিত। আমি মথুরায় ষট্ কোটি  
সহস্র ও ষট্ কোটি শত তীর্থসংখ্যা নির্দেশ করিয়াছি। এত-  
দ্ভিন্ন গোবর্ধন ও অক্রুর প্রভৃতি আরও ছই কোটি তীর্থ দক্ষি-  
ণোত্তরদিকে বিস্তারিত আছে। প্রসন্নন ও ভাণ্ডীরা দি ছয়টি  
তীর্থ কুরুক্ষেত্রের তুল্য। এই তীর্থ সকল অতি পবিত্র ও  
সর্বশ্রেষ্ঠ। অসিকুণ্ড ও বৈকুণ্ঠ কোটিতীর্থতুল্য এবং চক্রতীর্থ  
ও অক্রুর, অবিমুক্ত, সোমতীর্থ, যমন, তিন্দুক ও দ্বাদশাদিত্য

তীর্থ। এই তীর্থ সকল অতি পবিত্র ও মহাপাতকহর।  
মথুরামণ্ডলের তীর্থ কুরুক্ষেত্র হইতে সাতগুণ অধিক পুণ্য-  
প্রদ। এই মথুরামাহাত্ম্য যাহারা সমাহিত হইয়া পাঠ বা  
শ্রবণ করে, তাহারা পরমপদলাভের অধিকারী হয়।

উপরে নানাতীর্থের উল্লেখ থাকিলেও বরাহপুরাণে বিশেষ-  
ভাবে দ্বাদশতীর্থ দ্বাদশবন ও পঞ্চস্থলের উল্লেখ আছে।

বরাহ-পুরাণে মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত যে দ্বাদশটি পবিত্র  
বনের উল্লেখ আছে, তাহাদের এইরূপ। প্রথম মধুবন, এই  
বনে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে। মানবগণ ইহার দর্শনে সমস্ত  
অষ্টাষ্ট লাভ করে। দ্বিতীয় তালবন, ভক্তিমান ব্যক্তি  
এই বনে আসিয়া স্নান করিলে কৃতকৃত্য লাভ করিতে  
পারে। তৃতীয় কুম্ভবন, এই বনে গমনমাত্রই মানবের  
সম্ভাভাষ্ট লাভ হয়। বিশেষতঃ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা একা-  
দশীতে এখানে আসিয়া যে মানব স্নান করে, তাহার রুদ্র-  
লোক প্রাপ্তি ঘটে। চতুর্থ কাম্যক বন, এখানে আসিলে  
মানবের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। এই বনে আসিয়া ইহার  
যে কোন স্থানে মৃত্যু ঘটিলেই বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি নিশ্চিত।  
পঞ্চম বকুল বন, এই বনে গমন করিলে অস্তে অগ্নিলোক লাভ  
ঘটে। ষষ্ঠ ভদ্রবন, এই বন যমুনার পরপারে অবস্থিত।  
ইহা দেবগণেরও দুর্লভ। এখানে আসিয়া মানব যদি একান্ত-  
মনে বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হয়, তবে এই বনমহিমায়  
তাহার নাগলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সপ্তম খাদির বন, এই  
প্রসিদ্ধ বনে গিয়া নর বিষ্ণুলোকগমনে অধিকারী হয়।  
অষ্টম মহাবন, এই বনটি বিষ্ণুর বড়ই প্রিয়। এখানে  
আসিয়া স্নান করিলে ইন্দ্রলোকে গতি হয়। নবম লোহজঙ্ঘ  
বন, ইহা লোহজঙ্ঘ কর্তৃক রক্ষিত। এই বনমহিমায়  
সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। দশম বিশ্ববন। এই বন দেবগণেরও  
পূজনীয়। এখানে গিয়া মানব ব্রহ্মলোকগমনে অধিকারী  
হয়। একাদশ ভাণ্ডীর বন, এই বন যোগিগণেরও  
সুহৃদ। ইহার দর্শনমাত্রই মানবের গর্ভবাসক্লেণ ঘূচিয়া  
যায়। এখানে আসিয়া বাসুদেবকে দর্শন করিলে তাহার আর  
জন্মমরণক্লেণ থাকে না। দ্বাদশ বন বৃন্দাবন, এখানে আসিয়া  
বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ-সন্দর্শনে মানবের সর্বপাপ  
প্রশমিত ও যমভয় বিদূরিত হয়।\*

\* রম্যঃ মধুবনঃ নাম বিষ্ণুস্থানমসুত্তমম্ ।

ভং নৃষ্ট । মদ্রজো দেবি কৃতকৃত্যো হি জায়তে ॥৩০

একাদশী গুরুপক্ষে মাসি ভাদ্রপদে তথা ।

ভস্তাং স্নাতো নরো দেবি কৃতকৃত্যো হি জায়তে ॥৩১



\* দ্বাদশতীর্থ যথা—১ অবিমুক্ততীর্থ, ২ বিশ্রান্তিতীর্থ, ৩ প্রয়াগ-তীর্থ, ৪ কনথলতীর্থ, ৫ তিন্দুকতীর্থ, ৬ স্বর্গ্যতীর্থ, ৭ ধ্রুবতীর্থ, ৮ তীর্থরাজ, ৯ ঋষিতীর্থ, ১০ মোক্ষতীর্থ, ১১ কোটিতীর্থ ও ১২ বায়ুতীর্থ।

উক্ত দ্বাদশতীর্থের মধ্যে অবিমুক্ততীর্থে স্নান করিলে মুক্তি হয়। সকল তীর্থস্নানে যে ফল, এক বিশ্রান্তিতীর্থে দেবমুক্তি দর্শনে সেই ফল এবং স্নান করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল ও এখানে মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠলাভ হইয়া থাকে। কনথল অতি শুভতীর্থ, এখানে স্নানমাত্র স্বর্গলাভ ঘটে। তিন্দুকতীর্থ স্নানেও বৈকুণ্ঠলাভ। রবিবারে, সংক্রান্তিদিবসে ও চন্দ্রস্বর্গ্যগ্রহণে স্বর্গ্যতীর্থে স্নান

করিলে রাজহুয়-ফললাভ হয়। ধ্রুবতীর্থে পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের মুক্তি এবং স্নানকারী বৈকুণ্ঠলাভ করিয়া থাকে। ধ্রুব-তীর্থের দক্ষিণে তীর্থরাজ, এখানে স্নান করিলে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি এবং তাহার দক্ষিণে অবস্থিত ঋষিতীর্থে স্নান করিলে ঋষিলোক প্রাপ্তি ও তথায় মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠলাভ ঘটে। ঋষিতীর্থের দক্ষিণে মোক্ষতীর্থ, সেখানে স্নান করিলেই মোক্ষ, কোটিতীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মলোক, বায়ুতীর্থে পিতৃদান করিলে পিতৃলোকতৃপ্তি, বিশেষতঃ এখানে জ্যৈষ্ঠমাসে পিতৃদান করিলে গম্যাপিতৃদানের ফললাভ হয়, \* বরাহপুরাণমতে এই দ্বাদশ

\* “অবিমুক্তে নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোতাসংলভ্যম্।

তথাত্ৰ মৃচাতে প্রাণায়াম লোকং স গচ্ছতি ॥৩২

বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিপ্রভৃষম্।

যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকং প্রপদ্যতে ॥৩৩

সর্বকর্ত্তার্থেবু যৎ স্নানং সর্বকর্ত্তার্থেবু যৎ ফলম্।

তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্টু। দেবং গতশ্রমম্ ॥৩৪

ন চ যজ্ঞেন তপসা ন ধ্যানেন চ সংযমেঃ।

তৎ ফলং লভতে স্নাতো যথা বিশ্রান্তিসংজ্ঞকে ॥৩৫

কালক্রয়ন্ত বহুধে যঃ পশুতি গতশ্রমম্।

কৃড়া প্রদক্ষিণে য়ে তু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৩৬

অস্তি চাচ্চৎ পরং শুভং সর্বসংসারমোক্ষণম্।

যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকং প্রপদ্যতে ॥৩৭

প্রয়াগং নাম তীর্থস্ত দেবানামপি দুর্লভম্।

যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোমকলং লভেৎ ॥৩৮

ইন্দ্রলোকং সমাসাদ্য নরোহসৌ দেবি মোষতে।

অথাত্ৰ মৃচাতে প্রাণায়াম লোকং স গচ্ছতি ॥৩৯

তথা কনথলং নাম তীর্থং শুভং পবঃ মম।

স্নানমাবেণ তরাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে ॥৪০

অস্তি ক্ষেত্রং পরং শুভং তিন্দুকং নাম নামতঃ।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥৪১

“ততঃ পরং স্বর্গ্যতীর্থং সর্বপাপপ্রমোচনম্।

বৈরোচনেন বলিনা স্থায়াস্তারাদিতঃ পুরা ॥৪২

তস্মিন্ তীর্থে নরঃ স্নাতঃ সর্বপাপেঃ প্রমুচ্যতে।

তথাত্ৰ মৃচাতে প্রাণায়াম লোকং গচ্ছতি ॥৪৩

আদিত্যাহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রস্বর্গ্যমোঃ।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজহুয়কলং লভেৎ ॥৪৪

ধ্রুবং যত্র সন্তপ্তং স্বেচ্ছয়া পরমং তপঃ।

তত্র বৈ স্নানমাত্রেন ধ্রুবলোকে মহীয়তে।

তথাত্ৰ মৃচাতে প্রাণায়াম লোকে মহীয়তে ॥৪৫

ধ্রুবতীর্থে তু বহুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।

পিতৃস্তারয়তে সর্বং পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ ॥৪৬

দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্ত তীর্থরাজঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকং প্রপদ্যতে ॥৪৭

বনং ক্রমদকং নাম তৃতীয়কৈবল্যম্।

তত্র গঙ্গা নরো দেবি কৃতকৃত্যো হি জায়তে ॥৩২

একাদশী কৃষ্ণপক্ষে মাসি ভাদ্রপদে হি যা।

তত্র স্নাতো নরো দেবি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৩৩

চতুর্থং কাম্যকবনং বনানং বনমুত্তমম্।

তত্র গঙ্গা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥৩৪

বিমলস্ত চ কুণ্ডে তু সর্বপাপিণেঃ প্রমুচ্যতে।

যশুত্র মৃচাতে প্রাণায়াম লোকং স গচ্ছতি ॥৩৫

পঞ্চমং বকুলবনং বনানামুত্তমং বনম্।

তত্র গঙ্গা নরো দেবি অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি ॥৩৬

যমুনায়োঃ পরে পারে দেবানামপি দুর্লভম্।

অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠং বনমুত্তমম্ ॥৩৭

তত্র গঙ্গা তু বহুধে মদভক্তো মংগরায়ণঃ।

তত্বনস্য প্রভাবেণ নাগলোকং স গচ্ছতি ॥৩৮

সপ্তমস্ত বনং ভূমে খারিরং লোকবিশ্রুতম্।

তত্র গঙ্গা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি ॥৩৯

মহাবনকণ্ঠমস্ত সর্বৈব তু মম প্রিয়ম্।

যত্র গঙ্গা তু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥৪০

লোহজল্যবনং নাম লোহজল্যেন রক্ষিতম্।

নবমস্ত বনং নাম সর্বপাতকমাশনম্ ॥৪১

বনং বিধবনং নাম দশমং দেবপুঞ্জিতম্।

তত্র গঙ্গা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৪২

একাদশস্ত ভাতীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্।

তস্ত দর্শনমাত্রেন নরো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥৪৩

ভাতীরং সমুদ্রপ্রাপ্য বনানং বনমুত্তমম্।

বাহুদেবং ততো দৃষ্টু। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৪৪

বৃন্দাবনঃ ষোড়শমং বৃন্দয়া পরিস্ক্রিতম্।

মম চৈব প্রিয়ং ভূমে মহাপাতকনাশনম্ ॥৪৫

বৃন্দাবনঞ্চ গোবিন্দং যে পশুন্তি বহুধায়ে।

ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃত্যং গতিম্ ॥৪৬

( বরাহপুরাণ ১৫৩ অধ্যায় )



তীর্থ দেবগণেরও ছন্দ, এখানে স্নান, দান, জপ ও হোম করিলে সহস্র গুণ ফল হইয়া থাকে। এমন কি, এই সকল তীর্থনাম স্মরণ করিলেও সকল পাপ দূর হয়। \*

পঞ্চস্থল যথা—১ম অর্কস্থল, ২য় বীরস্থল, ৩য় পুষ্পস্থল, ৪র্থ মহাস্থল ও ৫ম কুশস্থল।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে,—অর্কস্থল যমুনার অপর পারে ভাণ্ডহরের নিকট অবস্থিত, এখানকার কুণ্ডে স্নান করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্থ্যালোকে গতি হয়। অর্কস্থলের নিকট সপ্তসামুদ্রক কূপ। এখানে মরিলে মৃতব্যক্তি বিম্বলোক প্রাপ্তি ঘটে। বীরস্থল সলিল-সনিকটবর্তী ও পদ্ম-কুমুদভূষিত, এখানে এক রাত্রি উপবাসী থাকিয়া স্নান করিলে বীরলোকে বিরাজিত হয়। কুশস্থলও মঙ্গলপ্রদ এবং পাপহর। এখানে স্নান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পুষ্পস্থল শ্রেষ্ঠ শিবক্ষেত্র, এখানে আসিয়া স্নান করিলে শিবলোক লাভ হয়।†

তদ্বাক্ষণে মহাদেবঃ ঋষিতীর্থং পরং মম।

তত্র স্নাতো নরো দেবী ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে।

অথাত্র মৃচাতে প্রাণান্নম লোকং মহীয়তে ॥৩০

দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্ত মোক্ষতীর্থং পরং মম।

তত্র বৈ স্নানমাত্রেন মোক্ষমেব প্রপদ্যতে ॥৩১

তত্র বৈ কোটিতীর্থং হি দেবানামপি দুর্লভম্।

তত্র স্নানেন দানেন মম লোকং মহীয়তে ॥৩২

কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সন্তপ্য পিতৃদেবতাঃ।

তারিতাঃ পিতরন্তেন তত্রৈব আপিতামহাঃ ॥৩৩

কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং মহীয়তে ॥৩৪

তত্রৈব বায়ুতীর্থস্ত পিতৃণামপি দুর্লভম্।

পিতৃদানাত্ম তত্রৈব পিতৃলোকং স গচ্ছতি ॥৩৫

গয়াপিতৃপ্রদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।

তৎ ফলং লভতে দেবি ত্র্যোচনং দানান্নমঃশতঃ ॥৩৬

\* “স্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্লভানি চ।

স্নানং দানং জপং হোমং সহস্রগুণিতং ভবেৎ ॥৩৭

এথাং স্মরণমাত্রেন সর্বপাপেষাং প্রমুচ্যতে।

তীর্থানাক্ষেব মাহাত্ম্যং শ্রদ্ধা কামানবাগ্নিঃ ॥৩৮

( বরাহপুরাণ ১০২ অঃ )

† “অস্তি ভাণ্ডহরং নাম পরপারেশু দুর্লভম্।

দৃষ্টপ্তেহরহস্তত্র আধিত্যাঃ শুভকামিণঃ ॥১০

তত্র চাক্ষুশে কুণ্ডে স্নানং যঃ কুরুতে নরঃ।

সর্বপাপাবিনিষ্কৃষ্টঃ স্থ্যালোকে ব্রজেরষিঃ।

তত্রাত্র মৃচাতে প্রাণান্নম লোকং স গচ্ছতি ॥১১

অর্কস্থলসমীপে তু কুপস্ত বিম্বলোকম্

সপ্তসামুদ্রকং নাম দেবানামপি দুর্লভম্ ॥১২

তত্র স্নানেন বহুধে বহুক্ষণদানসঃ।

অথাত্র মৃচাতে প্রাণান্নম লোকং স গচ্ছতি ॥১৩

উপরোক্ত প্রধান কএকটি বন ও তীর্থস্থল ভিন্ন বরাহ-পুরাণে ধারাপতনক, গোবর্গ, ব্রহ্ম, শিব, সোম, সরস্বতীপতন, দশাশ্বমেধ, মানস, নাগ ঘণ্টাভরণ, অনন্ত, অকুর, বৎসজীড়নক ভাণ্ডীর, কেশি, কালিকোদ, যমলার্জুন, বকুল, গোপীশ্বর, বহুপত্র, ফাঙ্কনক, বৃষভাজনক, সংপীঠক, পিশাচ, যমুনা, কৃষ্ণ-গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থগুলিও মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত ষাটশবন ভিন্ন শাশবন ও বহুলবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, শাশ স্থ্যাকুশায় কুষ্ঠ-রোগবিমুক্ত হইলে মথুরায় আসিয়া ভবিষ্যৎ পুরাণের বিধি-অনুসারে শাশবনে স্থ্যামৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন \*।

মথুরা পরিভ্রম।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে,—কাত্তিকমাসের কৃষ্ণা-অষ্টমীর দিন মথুরায় গিয়া বিশ্রাস্তিতীর্থে স্নান করিতে হয়। স্নানান্তে পিতৃ ও দেবার্চনাপূর্বক দীর্ঘনিষ্ক, কেশব ও বিশ্রাস্তি-দর্শনের পর প্রদক্ষিণ করিয়া সেই দিন উপবাসী থাকিবে। অথবা যৎকিঞ্চিৎ পবিত্র বস্ত্র আহার করিবে। ইহার পর সায়ংকালে আশ্বস্তিদির নিমিত্ত একখানি দস্তকাঠ ব্যবহার করিবে। এই দিন রাত্রি ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করিতে হয়।

পর দিন নবমী তিথি। এই দিন প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃ-কৃত্য সমাধা করিতে হয়। পরে মৌনালয়নপূর্বক ধৌতবস্ত্রে স্নানাদি সমাপন করিয়া তিল, অক্ষত ও কুশাদি লইয়া পিতৃ ও দেবপূজায় নিযুক্ত হইবে। এই দিন বিশ্রাস্তিতীর্থে রাত্রি আগিতে হয়। রাত্রিকালে হস্তে একটা প্রক্ষালিত প্রদীপ লইয়া বন গমনপূর্বক যাত্রিগণ, পূর্বের ঐবাদি ঋষিগণ যেমন

তত্র বীরস্থলং নাম ক্ষেত্রং গুহ্যং পরং মম।

আসন্নসলিলকৈব পয়োৎপলবিভূষিতং ॥১৪

যন্তত্র কুরুতে স্নানমেকরাত্রোষিতো নরঃ।

স মৎপ্রসাদাৎ স্নাত্বোর্ণ বীরলোকে মহীয়তে।

অথাত্র মৃচাতে প্রাণান্নম লোকং স গচ্ছতি ॥১৫

কুশস্থলঞ্চ তত্রৈব পুণ্যং পাপহরং গুহ্যম্।

তত্র স্নাতো নরো দেবি ব্রহ্মলোকং মহীয়তে।

অথাত্র মৃচাতে প্রাণান্নম লোকং স গচ্ছতি ॥১৬

তত্র পুণ্যকলং নাম শিবক্ষেত্রমমুত্তমম্।

এতে পঞ্চ স্থালাখ্যাতা মহাপাপবিনাশনাঃ।

তেষু স্থানেষু বহুধে ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥১৮(বরাহপুরাণ ১০৭অঃ)

“শাশস্ত্র সহ স্থ্যোপ রথহেমন দিবানিশম্।

রবিং পপ্রজ্ঞ খদ্যাস্তা পুরাণ্য স্থ্যভাষিতম্ ॥

ভবিষ্যৎপুরাণমিতি খ্যাতঃ কৃষ্ণা পূনর্বনম্।

শাশ্বঃ স্থ্যঃ প্রতিষ্ঠাক কারয়ামাস তদ্বিৎ ॥” ( বরাহপুরাণ )

অনুক্রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপে সেই স্থানে পরিক্রমণ করিবে। এই স্থানে ভক্তিসুত্র হইয়া প্রদক্ষিণ করিলে সকল কামনা, এমন কি, হয়মেধ-ফল পর্যন্ত লাভ হয়।

এই ভাবে রাতে জাগরণ করিয়া নবমী তিথি অতিবাহিত হইলে, পর দিন ব্রাহ্মমুহুর্তে উঠিয়া সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত তীর্থস্নানার্থ যাত্রা করিতে হয়। এই তীর্থের নাম দক্ষিণ-কোটিক। এখানে আচমনাদি শেষ করিয়া হনুমানকে প্রসন্ন করিবে।

তথায় পদ্মনাভ, দীর্ঘবিকু, দেবী বসুমতী ও দানবদলিনী অপরাজিতা দেবী দর্শন ও পরে গৃহদেবী ও বাসুদেবীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনপূর্বক মোনৌ হত্যা গমন করিবে। দক্ষিণ-কোটিকে আগমনানন্তর স্নান, পিতৃতর্পণ ও দেবনমস্কার করিয়া ইক্ষুবাগদেবীদর্শনে যাইবে। পরে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সহিত বালকরূপে যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেট সেই রূপধারী কৃষ্ণের বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করিবে। ইহার পর সর্বপাপ-হর বৎসপুত্র, অর্কহুল, বীরহুল, কুশহুল, গুণহুল ও মহাহুল দর্শনে আসিবে। ঐ সকল দর্শন করিলে ব্রহ্মসঙ্গ লাভ হয়। এখানে সিদ্ধমুখ শিব দেখিয়া হয়মুক্তিতে যাইবে। সেখানে শিবকুণ্ডে স্নান করিলে মহা ফললাভ হয়। কৃষ্ণের মল্লিকা দর্শন করিয়া কদম্বথণ্ডে আসিবে, এখানে আসিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। এখানে দক্ষিণদিকে কৃষ্ণের রক্ষণার্থ যোগিনী-পরিবৃত্তা চর্চিকা নামী যোগিনী রহিয়াছেন। পরে বর্ষখাত-নামক কুণ্ডে আসিয়া স্নান ও পিতৃতর্পণ করিবে। অনন্তর ক্ষেত্রপাল দেখিয়া ভূতেশ্বর শিবদর্শনে আসিবে। এই শিব দর্শন না করিলে মথুরাপরিক্রম সফল হয় না। সেখানে কৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধ, বালহুদ ও কুঙ্কটক্রীড়ন নামক কৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি আছে, এই সকল দর্শন করিলে অপর কোন পাপ থাকে না। এখানে কৃষ্ণপূজিত স্নগন্ধিভূষিত কয়েকটা সমুচ্চ স্তম্ভ আছে। প্রদক্ষিণপূর্বক এই স্তম্ভের পূজা করিলে সকল পাপ দূর হয়। এখান হইতে মুক্তিপ্রদ নারায়ণ-স্থানে যাইবে। বসুদেব দেবকীর গর্ভরক্ষার জন্ত এখানে একান্ত স্তুত্যা থাকিতেন। এহ স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া, পরে যথাক্রমে বিশ্ববিনায়ক, ও কৃষ্ণপালিতা কুঞ্জিকা ও বামনা নামী ব্রাহ্মণী দর্শন করিয়া গর্তেশ্বর শিব, মহাবিভেশ্বরী দেবী ও প্রভামল্লী দর্শন করিবে। উক্ত শিব দর্শন করিলে তীর্থ যাত্রাফল সিদ্ধ হইবে। এখানে কৃষ্ণবলরাম গোপগণের সহিত কংসবধের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, সে জন্ত এখান সঙ্কেতক নামে প্রসিদ্ধ। এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে সঙ্কেতকেশ্বরী ও স্বচ্ছসলিল সঙ্কেতকুণ্ড আছে। তৎপরে সর্বপাপহর গোকর্ণেশ্বর দর্শন করিবে।

পরে সরস্বতী নদী দেখিয়া বিশ্বরাজ গণেশ ও গঙ্গা দেখিতে আসিবে। অনন্তর কুন্ড-মহালয় ও ক্ষেত্রপ দেখিয়া উত্তর-কোট অতিমুখে যাত্রা করিবে। তথায় গণেশ্বর গোপদিগের সহিত কৃষ্ণের দ্যুতক্রীড়াস্থান ও গোপালকৃষ্ণ দেখিয়া আসিবে।

কৃষ্ণ বাল্যকালে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, এখানে তাহার রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে। এখান হইতে যমুনার জলে মহাতীথে গিয়া স্নান ও পিতৃতর্পণ করিবে। পরে গাঙ্গাতীর্থ, ভদ্রেস্বর, মহাতীর্থ ও সোমতীথে স্নান করিয়া সোমেশ্বর দেখিতে হইবে। অনন্তর সরস্বতাসঙ্গম, ঘটাতরগণ, গরুড়কেশব, ধারালোপনক, বৈকুণ্ঠ, খণ্ডবেল, মন্ডাকিনীসঙ্গম, অসিকুণ্ড, গোপতীর্থ, মুক্তিকেশ্বর, বৈলক্ষ্যগরুড় ও বিশ্রান্তিতীথে দেব ও পিতৃতর্পণ করিয়া দেবপূজা করিবে। তৎপরে স্মরণী দেবীর নিকট গিয়া তাঁহার অর্চনাতে পিঙ্গলাদেবের সাক্ষাৎ করিতে হইবে। অনন্তর ককোটক নাগ এবং কৃষ্ণস্থাপিতা সিদ্ধিকা দেবীকে দেখিতে যাইবে। এই দেবী কংসবধার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পর বজ্রানন ও শুক্ল নবমীতে মাথুরগণের কুলেশ্বর সূর্যদেবকে দর্শন ও দানাদি সম্পন্ন করিয়া মথুরাযাত্রা শেষ করিবে \*।

পরিক্রমকালে যেখানে যেখানে দেবতা পাইবে, সেই সেই দেবোদ্দেশে পূজা দিবে ও মঙ্গল প্রার্থনা করিবে।

( বরাহপুরাণ ১৬০০ অং )

বরাহপুরাণে যেরূপ তীর্থপরিক্রমা বর্ণিত আছে, এখন তদনুসারে পরিক্রমা হয় না। এখন ব্রজভক্তিবিশ্বাসমতে যেরূপ তীর্থপরিক্রমা হইয়া থাকে, তাহাই নিম্নে লিখিত হইল ;—

মথুরামণ্ডলের দাদশবন পরিক্রমণ কালে, তীর্থযাত্রীগণ মথুরানগর হইতে বাহির হইয়া পাঁচ কোশ দক্ষিণপশ্চিম বর্তমান মহোলি গ্রামে স্থাপিত মধুবনে যাইয়া থাকেন। তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে তালবন-পরিদর্শনে গমন করিতে হয়। এখানে বলরাম ধেমুকাশুরকে নিহত করেন। বর্তমান তাসিগ্রামে তালবন অবস্থিত। তৎপরে উল্লুগীওএ কুমুদবন, বাথিগ্রামের বহলাবন ও কৃষ্ণকুণ্ড দর্শন করিয়া থাকেন।

উক্ত বহলাবন নামক পবিত্র নিকুঞ্জের প্রাচীন নাম বহলা-বতী ছিল। সম্ভবতঃ ঐ স্থানে এক সময়ে বহলাবতী নগরী বিরাজ করিত। কাল সহকারে অথবা সাম্প্রদায়িক বিরোধে

\* “স্থ্যং তং বরদং দেবং মাথুরাণীং কুলেশ্বরম্।

দৃষ্ট। তজ্জৈব দানক দত্তা যাত্রাং সমাপয়েৎ ॥

এবং প্রদক্ষিণং কৃৎস্না নবম্যাং শুক্লকোয়মে।

সকল কুলং সমাদায় বিকুলোকে মহীয়তে ॥” (বরাহপুরাণ ১৬০০ অং)

ঐ জনস্থান অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়া যায় ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা ও বৃন্দাবনের সমীপবর্তী হওয়ায় লোকে উহাকে স্মৃতিগথের বহিভূত করিতে পারে নাই। প্রবাদ, এই গ্রামে বহুলানামে এক পবিত্রচেতা পরম্বিনী গাভী ছিল। একদা ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সে শার্দূলরাজের নিকট ক্ষণকালের জন্য প্রাণ ভিক্ষা করিল। তদনন্তর স্বর্গহে প্রত্যাগত হইয়া সে আপন শিশুকে স্তনপান করাইয়া পুনরায় ব্যাঘ্রসমীপে উপনীত হইল। ব্যাঘ্র আর কেহই নহেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরম্বিনীর সাধুতার পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন ব্যাঘ্ররূপ পরিহারপূর্ব্বক শশচক্রগদাপদ্মধারী বক্সিমোহনঠামে বহুলাকে দেখা দিলেন। এখানে কৃষ্ণকুণ্ডের পার্শ্বে বহুলা-গাই পীঠ অবস্থিত থাকিয়া অত্য়পি সেই অতীত-স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

বর্তমান বাথিগ্রামের পার্শ্বদেশে একটা বৃহৎ পুষ্করিণীর ব্যবধানে বহুলাবন তীর্থ। এখানে একটা ক্ষুদ্র গম্বুজ মধ্যে গো-মন্দির বিস্তৃত আছে। মন্দিরের প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ একটা প্রস্তরগাত্রে বহুলাগাই, তাহার শাবক ও জীবভরহারী শ্রীমধুসূদনমূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। উক্ত পুষ্করিণীর অপর পারে মুরলীমোহনের প্রাচীন মন্দির এবং গোমন্দিরের সন্নিকটে রাধাকৃষ্ণ বা বিহারী-জীর মন্দির অবস্থিত। মুরলীমোহনমন্দির প্রাচীন শিরনৈপুণ্যে পূর্ণ হইলেও ধ্বংসাপন্ন পতিত হইয়াছে, কিন্তু বিহারী জীর মন্দিরটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। বাথি গ্রামের দুর্গ-সন্নিকটে ভরতপুররাজ স্বর্ধ্যমন্ডের গুরু মোহান্ত রামকৃষ্ণ দাস কর্তৃক সীতারামের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরাণিক জন-শ্রুতির মাহাত্ম্য ও বিগত শতাব্দির সমৃদ্ধি এই স্থানের তীর্থস্থ সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু হায়! বহুলাবতা বনেই পর্য্যবসিত রহিল। শ্রীকৃষ্ণের বিচরণভূমি-স্বরূপে এইস্থান একটা তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল।

তৎপরে যথাক্রমে তোম, বক্ষিণগ্রাম ও মুধরাই অতিক্রম-পূর্ব্বক রাধাকুণ্ড-গ্রামকুণ্ডে আসিতে হয়। রাধাকুণ্ড ও গ্রামকুণ্ড নামক দুইটা সরোবরের নাম হইতে এইস্থান রাধাকুণ্ড নামেই বিখ্যাত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্ট নামক বৃষকে হত্যা করিয়া এই সরোবরে স্নানপূর্ব্বক গো-হত্যা-পাতক হুইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এইস্থান প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অদূরে অবস্থিত। এখানেও বৃন্দাবনের স্থায় গোবিন্দ-জী, গোপীনাথ ও মদন-মোহনের মন্দির আছে। গোবিন্দ-জী মন্দিরের পার্শ্বেই উক্ত কুণ্ডবয় অবস্থিত। আশ্চর্য্যের বিষয়,

উহার একটী জল কৃষ্ণরূপবৎ কাল ও অপরটী জল শ্রীরাধিকার তপ্তকাঞ্চনাদেব অমুকরণে হরিদ্রাবর্ণ; কিন্তু উভয়কুণ্ডই পরস্পরের সহিত সংযোজিত। এই দুইটা কুণ্ডই স্নানের পর নারিকেল হস্তে লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তীর্থস্নানের ফলশ্রুতি করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত অরিষ্ট বৃষের উপাখ্যান স্মরণ করিয়া অরিষ্ট গ্রামে (মথুরা ও গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের মধ্যবর্তী বর্তমান অরিষ্ট) তাহার বাসভূমি কল্পিত হইয়াছে।

উক্ত কুণ্ডবয়ে স্নানদানের পর, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ও তৎ-সমীপবর্তী কল্লোলকুণ্ড, মাধুরীকুণ্ড, ময়ূরবন, চন্দ্র-সরোবর, নারায়ণ-সরোবর প্রভৃতি তীর্থ পরিদর্শন করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত অরিষ্ট-উপবন মধ্যে কল্লোল কুণ্ড অবস্থিত। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সমীপদেশে বসাইগ্রামে কৃষ্ণ ও বলরামকে সঙ্গে লইয়া গোপ-রাজ নন্দ, যশোমতী ও রোহিণীর সহিত বাস করিয়া-ছিলেন। এইজন্ত এই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। চন্দ্র-সরোবরে ব্রহ্মা গোপিনীগণের নৃত্য দেখিয়া এতাদৃশ পুলকিত ও আশ্রয়হারা হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই আমোদ উপভোগ করণার্থ এক রাত্রিকে ছয় মাসব্যাপিনী করিয়া লইয়াছিলেন। বর্তমান পর্ণালি গ্রামে (মানচিত্রের মহম্মদপুর) ঐ পুণ্যসালিলা পুষ্করিণী অবস্থিত। ভরতপুররাজ নাহরাসিংহ এহ সরোবরের প্রস্তরসোপান নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন।

তৎপরে সকলেই পৈঠা দর্শনে গমন করে। প্রবাদ, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ কালে ব্রজবাসিগণ পৈঠার প্রদর্শিত গুহা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দের কোপবন্ধি হইতে রক্ষা পান। এখানে চতুর্ভুজ-মন্দির অবস্থিত ছিল। সম্রাট অরঙ্গজেব উহা ভাঙ্গিয়া দিলে, সেই ভিত্তির উপরে আর একটা নূতন মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। অতঃপর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরি দিয়া অস্ত্রোত্তর গ্রামে আসিয়া পরপারস্থিত স্নগন্ধি শিলা, সিন্দূরী-শিলা এবং সুন্দরশিলা ও গোবর্দ্ধন-নাথ দর্শনপূর্ব্বক গোপালপুর, বিলছ ও গাঠোলি গ্রামে আসিতে হয়। প্রবাদ, গাঠোলি গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রেম-গ্রন্থি বন্ধন হইয়াছিল।

অন্তরে গোবিন্দদেব ও বলদেবের দুইটা প্রাচীন মন্দির এবং গোবিন্দকুণ্ড নামে তথায় একটা পুণ্যতীর্থ। পুষ্করিণী আছে। রাণী পদ্মাবতী ঐ পুষ্করিণী স্থাপন করিয়া যান। লোক-মুখে প্রকাশ, ঐ কুণ্ডের জলে স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয় এবং ইহার তীরে শ্রাদ্ধকালে পিণ্ডদান করিলে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানের অমুক ফল লাভ হইয়া থাকে।

এখান হইতে মথুরা-সীমান্ত বাহিয়া ভরতপুররাজ্যের অন্তর্গত কামবনে যাইতে হয়। ঐ স্থান বর্তমানে একটা

তহনৌলের সদররূপে গণ্য এবং মথুরানগর হইতে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে যাদীরা লুক-লুক গুহা ও অম্বাসুর-গুহা পরিদর্শন করিয়া থাকে। প্রবাদ, এই লুক-লুক গুহার শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে সঙ্গে লইয়া লুকাচুরী (চোক-ফুটল) খেলিতেন এবং এই অম্বাসুরগুহায় তিনি অম্বুরবরকে নিধন করিয়াছিলেন। তৎপরে কবারগাঁও অতিক্রমপূর্বক পুনরায় উৎসাহের বলদেব-মন্দির সন্দর্শন করিয়া পর্তোপরি বসানা গ্রামে উঠিয়া লাডলী-জী, দোহনীকুণ্ড, প্রেম সরোবর, সাকরি-ঘোর ও গহ্বরবন পরিদর্শনে আসিয়া থাকে।

যেখানে বৃকভাঙ্গ ও তৎপত্নী শ্রামননোমোহিনী শ্রীরাধিকাকে লালনপালন করিয়াছিলেন, তথায় ললি বা লাডলী-জীর মন্দির স্থাপিত। মন্দিরপার্শ্ব একটা স্থান এখনও রাধার পালন-গৃহ বলিয়া কথিত হয়। চক্ৰোত্তীর নিকট দোহনীকুণ্ড অবস্থিত। যশোদা স্বীয় দুগ্ধপাত্র বুইবার সময় এইখানেই রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণকে বিচরণ করিতে দেখিয়া-ছিলেন। প্রেম-সরোবরে নবদম্পতির প্রেমসাগর উথলিয়া উঠে। সেই প্রেম-প্রবাহ হইতে এই সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে। উহারই অনতিদূরে দুইটা গওঠৈলের মধ্যবর্তী পথে সাকরি-ঘোর দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, গহ্বর বন হইতে দুগ্ধকাণ্ডকে আগতা গোপললনাগণের নিকট হইতে দুগ্ধ লইবার জন্য কৃষ্ণ এই স্থানে লুকাইয়া থাকিতেন।

তৎপরে সঙ্কেত গ্রামে সঙ্কেত-স্থান, এইখানে বাঁশরীসঙ্কেতে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি কৃষ্ণদর্শনে আগমন করিতেন। রিঠোরায় চক্ৰাবলীর কুঞ্জ, এখানে রাধাকে বঞ্চনা করিয়া ভগবান্ সখী চক্ৰাবলীর মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছিলেন। নন্দগ্রামে নন্দালয় ও পান-সরোবর পর্যবেক্ষণ করিয়া যাত্রিগণ ‘করহেলা’ দর্শন করিতে আইসেন। নন্দালয়ে এখনও শ্রীকৃষ্ণের বালা-লীলাফেরসমূহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ভগবান্ নন্দের গাভীকুল সস্তাড়ন করিয়া যখন সন্ধ্যাকালে গৃহে আসিতেন, তখন যে সরোবরে গাভী সকল জলপান করিত, তাহাই পান-সরোবর নামে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে কদম্ব বৃক্ষ-শাখায় হাত ধলাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাস-লীলা করিতেন, তাহাই কংহেলা নামে কথিত। অতঃপর কামই, এখানে রাধাকৃষ্ণ যুগলমুখিতে দর্শন দিয়া জনৈক সখীর মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া-ছিলেন। তৎপরে অঙ্গনপুষ্করী, এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নয়নে অঙ্গন দান করেন ও যেখানকার জল লইয়া রাধা শ্রীকৃষ্ণের তৃষাপনোদন করিয়াছিলেন, তাহার নাম পিয়ারা-তীর্থ। এই তীর্থ দর্শন করিয়া তাহারা উত্তরা-তিমুখে যথাক্রমে খৈরার অন্তর্গত খদিরবন, কুমারবন,

জাবক-বন ও কোকিলবন সন্দর্শন করিয়া চরণপাহাড় আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে ঐরাবতপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনা করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত বনগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ আছে।

অতঃপর তাহারা দধিগ্রাম অতিক্রম করিয়া পরিক্রমার উত্তরসীমা কোটবনে আসিয়া সমুপস্থিত হন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দধিগ্রামে থাকিয়া গোপিনীগণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিতেন এবং বলরাম তাহারই ছল-পরামর্শে বথান গ্রামে গোপাল বিচরণ করাইতেন। এখান হইতে গৃহাতিমুখে যাইতে হইলে প্রথমেই শেষই গ্রামে (বর্তমান হথান) উপনীত হইতে হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই স্থানে গোপাঙ্গনাদিগকে নারায়ণ ও অনন্তরূপে দেখা দিয়াছিলেন। তৎপরে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া খেলবন (শেরগড়ে), বিহার-বন, চীরঘাট (শিয়ারা প্রান্তস্থিত), নন্দঘাট, বকবন, আতস, নরি-সেম্রি, ছটিকরা, অক্রুর ও ভাতরাধা অতিক্রম করিয়া বুন্দাবনে আসিতে হয়।

খেলবনে শ্রীকৃষ্ণ মালা গাঁথিয়া গোপিনীগণের সহিত রস-কৌতুক করিতেন। চীরঘাটের কদম্ব-বৃক্ষে তিনি ব্রজবাসিনী রমণীগণের নানকালীন ত্যাক্তবাস লইয়া আরোহণ করিয়া-ছিলেন। উহা ‘ব্রজহরণ’ ঘাট নামেও প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ দশনের প্রত্যাশায় বরুণদেব একদিন নানকালে গোপুরাজ-নন্দকে যমুনাজলে লইয়া যান। সাধারণে এই সংবাদে ভয়ে অভিভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে অবতরণপূর্বক নন্দকে উদ্ধার করেন। এই ভীতিব জ্ঞাত নিকটবর্তী স্থান ভয়গাঁও নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বকবনে ভগবান্ বকাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্তী বশাই নামধেয় গ্রামদ্বয়ে ভগবান্ কড়ক গোপাঙ্গনগণের বন্দীকরণ উল্লেখিত হয়। নরিসেম্রিতে প্রতিবৎসর চৈত্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে নবহর্গার মেলা হয়। এখানে শ্রামলাদেবী বিদ্যমান আছেন। ছটিকরা, অক্রুর প্রভৃতি গ্রামে কংস-নিমন্ত্রণে অক্রুর কড়ক মথুরায় কৃষ্ণানয়ন-কালে কংসাসুচরাদির নিধন প্রসঙ্গ কথিত হইয়া থাকে। ভাতরাধা গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট দেবরূপী বালকদ্বয় মথুরা যাত্রাকালে অগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে অষ্টাপি সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া ভাতমেলা নামে একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এখানে যমুনা অতিক্রম করিয়া জাহান্নারপুরে বেগবন, মাটনগর পার্শ্বে ভদ্রবন, ভাণ্ডারবন, ডাঙ্গোল, মান-সরোবর, ও পরে পিপরোলী গ্রামের পিপলকুঞ্জ দর্শন করিয়া লোহবন, রাবল ও বুড়িয়া-কা-খেরা সন্দর্শন করিতে হয়।

বেলবন শ্রীধাম-সখার আবাস বলিয়া কথিত, ভাণ্ডীরবনে বলরাম প্রলম্বাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। ডাঙোলিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বংশী রাখিয়া মানসমোহর তীয়ে শ্রীরাধার মানভঞ্জন করেন। লোহবনে লোহাসুরের পরাজয় স্থচিত হয়। রাবলে শ্রীরাধার মাতুলালয়। এখানে পিতা শর্তাসুর সহিত বৃকভাঙ্গপন্নী বাস করিতেন। বুড়ী-কা-খেরায় অনেক বৃদ্ধার পুত্রের সহিত রাধা-সহচরী মানবতীর বিবাহ হয়। একদিন লালসামুদ্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্বামীর রূপ ধরিয়া মানবতীর গৃহে প্রবিষ্ট হন। মানবতী সাদরে তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন এবং যাইবার কালে শান্তডীকে বলিয়া গেলেন, যদি কেহ তাহার স্বামীর মত পুনরায় ধারদেশে আইসে, তাহা হইলে বৃদ্ধা যেন ধার খুলিয়া না দেয়, বরং তাহাকে ইষ্টক প্রহারে তাড়াইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের এই ছলনার ঐ লোকটার মন্তক চূর্ণ হইয়াছিল।

এস্থান পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রিগণ বন্দী গ্রামে বলি ও অনান্দ-বিশোধার বিম্বতা দাসীঘর) মন্দির এবং বলদেব গ্রামে রেবতীমন্দির দর্শন করিয়া হুথোরার অদূরস্থ চিত্তাহরণ ও ব্রহ্মাণ্ড-ঘাট দর্শনে আসিয়া সমুপস্থিত হন। এইখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মূখ-মধ্যে বশোদাকে ব্রহ্মাও দর্শন করাইয়াছিলেন। এতদ্বিধি মহাবনের শ্রীকৃষ্ণসংলগিত মানা খটনস্থল ও গোফুলের নদীতীরবর্তী অস্থল্য দেবমন্দির দর্শন করিয়া তাহার ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং আপনাপনিই পরিত্রমণে ক্ষান্ত হইয়া সর্বশেষে মথুরার পরম পবিত্র তীর্থ বিশ্রান্তি-ঘাটে আসিয়া পূণ্য কার্যের সমাধা করেন।

উপরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলরূপে যে দ্বাদশটা বনের উল্লেখ করা গেল, সেইরূপ শ্রীরাধারও লীলাভূমি বলিয়া ২৪টা বন কীর্তিত হইয়া থাকে। এতদ্বিধি নারায়ণ-উক্ত ব্রজভক্তি-বিলাসে ১৩৩টা বন পরিক্রমণের কথা লিখিত আছে—

১। দ্বাদশ বন—মহাবন, কাম্যবন, কোকিলবন, ভাগবন, কুমুদবন, ভাণ্ডীরবন, ছত্রবন(ছাত্তানগর), বদীরবন, লোহবন, ভদ্রবন, বহুবান ও বিম্ববন বা বেলবন।

২। দ্বাদশ উপবন—ব্রহ্মবন, অঙ্গরাবন, বিম্বলবন, কদম্ব-বন, স্বর্ণবন, প্রেমবন, সুরভিবন, ময়ূরবন, মননগীতিবন, শেখারীবন, নারদবন, পরমানন্দবন।

৩। দ্বাদশ প্রতিবন—রক্তবন, বাস্তাবন, করহেলা, কাম্য-বন, অঙ্গনবন, কামবন, কৃষ্ণকোপক, নন্দপ্রেক্ষণ, ইন্দ্রবন, শিকাবন, চন্দ্রাবতীবন ও লোহ বা লোহজজবন।

৪। দ্বাদশ অধিবন—মথুরা, রাধাকুণ্ড, নন্দগ্রাম, গভস্থান, ললিতাগ্রাম, বৃকভাঙ্গপুর, গোফুল, বলদেব, গোবর্দ্ধন, জাব-

বন, বৃন্দাবন ও সঙ্কেত। এতদ্বিধি ৫টা সেব্যবন, ১২টা তপোবন, ১২টা মোক্ষবন, ১২টা কামবন, ১২টা অর্থবন, ১২টা ধর্মবন ও ১২টা সিদ্ধিবন। প্রত্যেক বনেই দেবলীলাসচিত্ত প্রসঙ্গ ও দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

বরাহপুরাণ ও ব্রজভক্তিবিলাস উভয় হইতেই তীর্থ-পরিক্রমা উদ্ধৃত হইল। দেখিলেই জানা যায় যে, বরাহপুরাণে উক্ত বিবরণ সংকলিত হইবার সময় বৈষ্ণব মথুরাপ্রদক্ষিণ হইত, কালে তাহার স্থিতি লোপ হইয়া যায়। অনেকেই জানেন, রূপসনাতন বৃন্দাবনের প্রাচীন স্থান নিরূপণ করিবার জন্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীে তাহাদেরই শিষ্য নারায়ণ ভট্ট ব্রজভক্তিবিলাসে মথুরা-পরিক্রমা লিপিবদ্ধ করেন। রূপসনাতনের চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলাভূমির যতদূর সন্ধান হইরাছিল এবং পরিক্রমা সম্বন্ধে সাধারণের বৈষ্ণব সুবিধা বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই ব্রজ-ভক্তিবিলাসে বর্ণিত দেখা যায় এবং তদনুসারেই ধার্মিক হিন্দুগণ মথুরাপরিক্রমা করিয়া থাকেন।

সাধারণে অবগত আছেন, মথুরামণ্ডলের বিম্ববন, ভাণ্ডীর বন প্রভৃতি স্থান যমুনাতীরে সংস্থাপিত। যমুনার পূর্বতন তট ষাভসমূহ পরিদর্শন করিলেও যমুনার পূর্বতন গতিবিধির অনেকটা জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং এখনও সেই কালিন্দী কুলধ্বংসিনী হইয়া স্থানবিশেষ ভাসাইয়া দিতেছে। যমুনা-বক্ষে ইন্দ্রাসমূহ জাগ্রত থাকিয়া অতীত শ্রুতির পরিচয় দিতেছে। পূর্ব যে ‘যমুনাপুলনে’ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনা সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন, তাহা এখনও একটা বালুকাময় প্রাঙ্গণে পধ্যবাসিত হইয়াছে।

তাৎক্ষণিক্রমণের আরও একটি স্বতন্ত্র নিয়ম আছে। কোন প্রাচীন দেবমন্দির বা দেবতীর্থ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইলে, পাণ্ডা বা পুরোহিতগণ তাহা রক্ষার বিশেষ যত্নবান্ হন। তাহার তাহারই পার্শ্ববর্তী ভূমিতে অপার একটা স্থানে সেই তীর্থের অমুরূপ করিয়া আর একটা তীর্থস্থানের ঘোষণা করিয়া থাকেন। সকল জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। কে বলিতে পারে! সেই দ্বাপরযুগের কথা; যথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছিলেন, তাহা অত্যাশঙ্কিত বর্তমান আছে। যুগবিপ্লব্যে একটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্তে আর একটা নূতন করিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। এতদ্বিধি সুপ্রাচীন মথুরাধামে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যহেতু নান অনর্থও সংঘটিত হইয়াছে।

অধিবাসী।

মথুরার বিভিন্নশ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে জাট ও চৌহা

ব্রাহ্মণগণের সংখ্যাই অধিক। চৌবেগণ সাধারণ অধিবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে বলবান। 'মথুরার চৌবে' বলিলেই ইহাদের বলের পরিচয়পক্ষে যথেষ্ট হয়। বৃন্দাবনে মহোৎসব (মহুৎসব) দিতে হইলে মথুরাবাসী চৌবে ব্রাহ্মণদিগকে মিঠাই তক্ষণ কুরাইতে হয়। বৃন্দাবনজীর্থে এই 'মহুৎসব' দান বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে।

সমগ্র জেলার মধ্যে মথুরানগরের জন-সংখ্যাই অধিক। তন্নিম্নে বৃন্দাবন, কোশী, মহাবন, গুপ্তা, ছাতা ও সরিষা-নামক নগর কর্তী স্থান পায়। উক্ত নগর কর্তীর জনসংখ্যা পক্ষ সহস্র হইতে অধিক। সাধারণ অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং অনেকে ভূম্যধিকারী। এতদ্বিধি অনেকানেক ধনশালী ব্যক্তিরও বাস দেখা যায়, উহারা সাধারণতঃ 'মহাজনৌ' ব্যবসা করিয়া থাকে। এখানে ধর্মীয় ও রবি নামক দুই প্রকার চাষই হয়।

জলাভাবহেতু এখানকার অধিবাসীদিগকে সমস্ত সময় কষ্ট পাইতে হয়, কখন কখন সেই সজে ছতিকরূপ মহামারী দেখা দিয়া সাধারণ অধিবাসীকে বিপদসমুদ্রে বিলোড়িত করে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সহায় পরগণায় এইরূপ বিপৎপাত হয়। এমন কি, অস্বাভাব্যে তথাকার নিয়ন্ত্রণীয় অধিবাসীদিগকে মুষ্টিমেয় অল্পের জন্ত অল্পমূল্যে আপনাদের জী-পুত্রকেও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। ১৮২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে মহাবন ও জলেশ্বরের অধিবাসীদিগকে অল্পকষ্টে প্রলোভিত হইতে হয়। ১৮৩৭-৩৮ খৃঃ মথুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশে ও দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বাবিভাগে মহা অল্পকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৬০-৬১ খৃঃ জলাভাবহেতু জেলার অধিকাংশ স্থানে ফসল জন্মে নাই। তৎপরে অস্বাভাব্যে প্রায় অর্ধেক লোক স্ব স্ব জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্বক অন্ত্র যাহা বাস করে। ইহার পর, পুনরায় ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টিহেতু শস্তের মূল্য বাড়িয়া যায়। ঐ সময়ে অস্বাভাব্যে মথুরা ও পার্শ্ববর্তী বহু লোক প্রলোভিত হয়। মৃতের সংখ্যাও বহু গুণে পরিবৃদ্ধিত হইয়াছিল। গবর্মেণ্ট ১৮৭৮ খৃঃ অঃ আগাষ্ট মাস পর্যন্ত প্রত্যাহ প্রায় ২০ হাজার লোককে অল্প দিতেন। স্থানীয় অতিথিশালায় পর বৎসর জুন মাস পর্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ খন্ড, অকমণ্ডা, পীড়িত ও বালককে অন্নদান করা হইয়াছিল।

২ মথুরাজেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। মথুরা-পরগণার সহিত সম্পৃক্ত। মথুরানগরেই এতদ্বত্বের সদর-কাছারি অবস্থিত। ইহা পূর্বদিকে যমুনা নদী ও উত্তরপশ্চিমে ভরতপুর-পরগণামালার পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। গোবিন্দনের নিকটবর্তী গিরিরাজ নাম গণ্ডেশলই এখানকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এই পরগণা পার্শ্ববর্তী সমভল-ক্ষেত্র হইতে প্রায় ১০০ ফিট উচ্চ এবং ৫ মাইল বিস্তৃত। ত্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক লীলা প্রসঙ্গে এই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়া থাকে। পরগণাব উপরে ত্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পার্শ্ব-ভ্রমার তাহার কথকিং উল্লেখ করা গিয়াছে। বাস্তবিক কাশীধামে যেক্ষণ শিবলিঙ্গের বাহল্য দৃষ্ট হয়, তক্ষণ এই মথুরামণ্ডলে বিষ্ণু-মূর্তিরও অভাব নাই। প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর গৃহেই ভগবদ্ভার্য্য বিরাজ করিতেছেন।

এই তহশীলের পূর্বভাগে যমুনা নদীই চাষবাসের একমাত্র উপায়। স্থানবিশেষে ইন্দারা কাটিয়া জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে, কিন্তু যমুনাগর্ভের নিম্নতাপ্রযুক্ত ঐক্লপ হন্দারা কাটিয়া জল আনিবার পক্ষে বহল ব্যয়ের আবশ্যক দেখিয়া সাধারণ লোকে তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হয় না। অত্রা খাল কীর্তিত হইবার পর, এখানে জলের অনেক সুবিধা হইয়াছে। জাতদ্রব্যের মধ্যে তামাকু, হস্ত, ছোলা, ভুলা, যব, গম, জুয়ার ও বজ্রা প্রধান।

মথুরানগরী, জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর। যমুনা নদীর দক্ষিণকূলে আগ্রানগর হইতে ১৫ কোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষাঃ ২৭°৩০' ১৩" এবং দ্রাঘিঃ ৭৭°৪৩' ৮৫" পূঃ।

এই নগর পূর্বকালে মহামুন্সিফালী রাজধানীরূপে গণ্য ছিল। রামায়ণ, পুরাণ ও বৌদ্ধশাস্ত্র ললিতবিস্তর হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এইস্থান বিশেষ সমৃদ্ধ ও কনোজাদি বিভিন্ন শ্রীমঙ্গল রাজধানীর নিকটবর্তী জ্ঞানীয় বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্মপ্রচারকল্পে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহাদেরই কেহ কেহ একের ধর্মসাধারণ পরিত্যাগ করিয়া সেই সুরম্য যমুনাভীরের অপর এক স্থানে বসবাস করিয়াছিল; কালক্রমে মথুরায় একের অবসানে অন্তের প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। এইরূপে মথুরামণ্ডলে একগণ্যযুগের পর, প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধযুগ চলিয়া গিয়াছে তৎপরে পুনরায় হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ক্রমে শ্রী, নিম্বাক, মাধব, বিষ্ণু ও বলভাচায়া প্রভৃতি মাস্ত্রদায়িকগণ মথুরায় প্রতিপত্তি লাভ করেন। পূর্বাপর ধর্মবৈরতাহেতু একের অবসানে, তাহাদের ধর্মতীর্থে হইতে অপর দেবমানাদি নিম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নগরায়ন অন্তস্থানে গিয়া পুনর্গঠিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত হাঙ্গবর্ণিত গ্রীক ও মুসলমান রাজত্বগণের হস্তে মথুরার প্রাচীন কীর্তিগুলি যে বিশেষরূপে নিগূহাত হইয়াছিল, তাহাতে কোনমাত্র সন্দেহ নাই। শত্রু-প্রতিষ্ঠিত মথুরা বা প্রকৃত মথুরা কোন স্থানে ছিল, তাহা নির্দেশ করা অকঠিন। এত

এক হিন্দুশাস্ত্রে মথুরামণ্ডল পরিদর্শনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার কারণ, মথুরামণ্ডলের কোন না কোন স্থানে প্রাচীন মথুরাভার্থ অবস্থিত আছে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া যে সকল বনভূমির উল্লেখ আছে, তাহাও সম্ভবতঃ সেই পৌরাণিক যুগে গ্রাম বা নগর ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরসিংহই সেই সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিতে যাইতেন। বিষ-বনে শ্রীদাম সখার আলয় ছিল বলিয়া কথিত। কাল সহকারে সেই সকল স্থান বনাকারে পরিণত হইয়াছে। পরিভ্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএন্ সিয়াং মথুরা পরিদর্শন করিয়া কতকগুলি বৌদ্ধ-সম্ভারাম ও হিন্দুমন্দিরের উল্লেখ করিয়া যান।

এই প্রাচীন কীর্তিসমূহ লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিষম গোল-বোপ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন স্তূপ দেখিলেই বৌদ্ধকীর্তি বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণে বিশেষ বস্তু ও অধ্যবসায়ের সহিত আলোচনা করায়, উহার মধ্য হইতে অনেকগুলি জৈনকীর্তির নিদর্শন বাহির হইয়া পড়িয়াছে। [ মথুরা জেলার পুরাতত্ত্ব দেখ ]

এক্ষণে মথুরাধামে যে সমস্ত প্রাচীন কীর্তি পরিলক্ষিত হয়, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

পরিভ্রাজক হিউএন্ সিয়াং এখানে ২০ টি সম্ভারাম ও ৫ টি মন্দির দেখিয়া যান। কিন্তু ফা-হিয়ানের ৪০০ খৃষ্টাব্দের বৃত্তান্তের সহিত ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে হিউএন্ সিয়াংএর বিবরণীর সামঞ্জস্য করিলে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতেই এখানকার বৌদ্ধপ্রাধিকারের অবসানকাল বলিয়া কল্পনা করা যায়। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর উপশৃঙ্গের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দী এখানে বৌদ্ধধর্মের সবিশেষ বিস্তৃতি কল্পনা করা যায়। বৌদ্ধসমৃদ্ধির অবসানে মথুরার সমৃদ্ধিও অন্তর্মিত হয়। এক্ষণে মথুরানগরের চতুর্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ যে বৃহৎ স্তূপরাজি দেখা যায়, তাহা হইতে প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন না পাওয়া গেলেও উহাদিগকে এক একটি প্রাচীন কীর্তির স্মারকবিশেষ বলিয়া অনুমান হয়। কেহ কেহ যমুনাতীরবর্তী ঐ স্তূপগুলিকে স্বভাব-জাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঐশ্বর্যবাদের অদূরে ঐরূপ একটি স্তূপের উপর মথুরার প্রাচীন দুর্গ এবং কাটুরার মধ্যবর্তী ঐরূপ একটি স্তূপোপরি সম্রাট অরজ্জবের মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এতদ্বিধি আনন্দ টীলা ও বিনায়ক টীলা খনন করিয়া প্রাচীন কীর্তি বাহির করা হইলেও উহাদের নাম এবং হিউএন্ সিয়াংএর বর্ণনা অনুসরণ করিলে আনন্দ ও উপালির কথা স্মরণ হয়।

জামালপুর ও তদ্বিকটবর্তী ককালী বা জৈনটীলা ও কাটুরাস্তূপ হইতে অনেক বৌদ্ধনিদর্শন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ককালীটীলা ককালীদেবীর অধিষ্ঠান-স্থানরূপে সাধারণে পূজিত হইলেও এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধ ও জৈনকীর্তির নিদর্শন এবং শকরাজ কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বহুদেবের লিপিস্বত্ব স্বাক্ষরশীল দিগম্বর তীর্থঙ্কর মূর্তি ও ষোড়শ-ধর্মদিগের পদ্মপ্রতীক মূর্তি এবং মোঘা-অক্ষরে লিখিত কএকখানি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে। ককালী-টীলার অদূরস্থ কাটুরার নিকটে ভূতেশ্বর-মহাদেব মন্দিরের পশ্চাৎ-দিক্‌বর্তী একটি গণ্ডশৈলের উপর কতকগুলি বৌদ্ধনিদর্শন বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উক্ত মন্দিরের পার্শ্বদেশে বলভদ্র-কুণ্ড-নামক পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী বিস্তৃত। এখানে অনেক বৌদ্ধকীর্তির স্মারকবিশেষ পতিত থাকিলেও এই স্থানে হিন্দু-মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমায় বলভদ্রকুণ্ডে একটি মেলা হয়। এতদ্বিধি উহার ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চৌবাড়া বা চৌরাশি স্তূপ অবস্থিত। উহার একস্থান হইতে ১ টি দস্তবিমণ্ডিত স্বর্ণকোটা পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এখনও মথুরার সমস্ত স্থান বিশেষরূপে অন্বেষিত হয় নাই, তাহা হইলে মথুরাধামের নানাস্থানে প্রতিমূর্তি ও ভগ্ন স্তম্ভ ব্যতীত আরও অনেক কীর্তি বাহির হইয়া পড়িত। প্রসিদ্ধ চীন-পরিভ্রাজক হিউএন্ সিয়াং যে সকল বৌদ্ধ-সম্ভারামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ কানিংহাম্, ফুরার, বার্গেস্ প্রভৃতির যত্নে স্তূপনিহিত শিলা-ফলক হইতে তাহার মধ্যে যশোবিহার, উপশৃঙ্গবিহার, সম্ভ-মিত্রসদবিহার, হুবিষ্কবিহার ও কুণ্ডকবিহারের নাম পাওয়া গিয়াছে।

১৬৩১ খৃষ্টাব্দে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ কেশবদেবের মন্দির সম্রাট অরজ্জব কতক বিধ্বস্ত হয়। ঐ স্থান এক্ষণে কাটুরা নামে পরিচিত। সম্রাট অরজ্জব কেশবদেব মন্দিরের স্মারকবিশেষ লইয়া তদুপরি একটি ইদ্দগা বা মসজিদ নির্মাণ করান। এখনও মসজিদ-গাত্রস্থ ১৭১৩ ও ১৭২০ সন্বতের নাগরীলিপি তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে রেলপথ-বিস্তার-কল্পে কাটুরার নিম্নতর-খননকালে কতকগুলি বৌদ্ধমূর্তি ও মোঘাররাজ মহাদিত্যের ভগ্ন-শিলাফলক পাওয়া গিয়াছিল। ঐ কাটুরার পশ্চাত্তাগে কেশবদেবের বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছে। উহার সন্নিকটে পোতরকুণ্ড ও কংসের কারা-গড় বা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। এই পোতরকুণ্ডের পশ্চাত্তাগে ধূলকোটা- (মথুরানগরের প্রাচীন বন্দ) পরিবেষ্টিত স্থানে একটি সুবৃহৎ



স্তূপ দেখা যায়। উহা সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধ-মঠাদির নিদর্শন হইবে।

বলভদ্রকুণ্ডের অদূরস্থ ভূতেশ্বর-মহাদেব-মন্দির ও চতু-  
পার্শ্বস্থ ভগ্নাবশেষসমূহ নিরীক্ষণ করিলে অমুমান হয় যে,  
ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার পূর্বে,  
এখানে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ঐরূপে এখানে  
কোন এক সময়ে কাম্যাবনে কামেশ্বর, গোবর্দ্ধনে চক্রেস্বর ও  
বৃন্দাবনে গোপেশ্বরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভূতেশ্বর-মহাদেবমন্দির-সংলগ্ন কাজীবাগ নামক উদ্ভানে  
একটি ক্ষুদ্র মসজিদ দেখা যায়। উহাতে হিন্দুধর্মের কোন  
নিদর্শন না পাইলেও উহার গঠনকার্য্য দেখিয়া অমুমান হয়  
যে, উহা এক সময়ে হিন্দুকর্তৃক নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। উহার  
গঠনকার্য্য সম্পূর্ণরূপে হিন্দুভাবে পূর্ণ, তাহাতে আদৌ মুসল-  
মান-মসজিদের আভাস নাই।

কাটরার দ্বারপথ অতিক্রম করিয়া দিল্লীরাস্তার ধারে  
'কুজা' গৃহের প্রাচীর দৃষ্ট হয়। অষ্টরীষশৈলের নিকট  
বৃন্দাবনদ্বার ও শাহগজ সরাই ছাড়াইয়া সম্রাট অকবরশাহের  
শাসনকর্তা আলী খাঁর ছত্রির সম্মুখে উপনীত হওয়া যায়।  
ইহার অদূরে সরস্বতা-সঙ্গমস্থল। উহার দক্ষিণপার্শ্বে  
মহাদেবমন্দির। নিকটবর্তী কৈলাসপর্ব্বতে গোকর্ণেশ্বর-  
তীর্থ এবং ঐ সেতুর নিম্নদেশে গার্গী ও শার্গী তীর্থ। প্রবাদ,  
গোকর্ণ অষ্ট বীতরাগের মধ্যে একজন। ইনি মহাদেবের  
অবতার এবং তাঁহার গার্গী ও শার্গী নামী পত্নীদ্বয় গৌরীর  
অংশাবতারমাত্র। এখানে কতকগুলি ভৈরবমূর্তি, শীতলা-  
দেবী, মশানী ও মায়াবিদ্যা দেবীর মূর্তি স্থাপিত আছে।  
কৈলাসশৈলের অপর পার্শ্বস্থ রাস্তার ধারে রামলীলার মাঠ।  
তাহার পার্শ্বেই সরস্বতীকুণ্ড অবস্থিত।

যমুনাতীরে জয়পুররাজ বিহারীমল্লের পত্নীর সতীত্বের-  
নিদর্শনস্বরূপ ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র রাজা ভগবান্দাস  
কর্তৃক 'সতীবুকজ' নিৰ্ম্মিত হয়। উহা ৫৫ ফিট উচ্চ ও চারি  
তল। সম্রাট অরঙ্গজেব উহার চূড়াদেশ ভাঙ্গিয়া দেন।

কঙ্কালী-টিলার নিকট শিবতাল নামক পবিত্র পুষ্করিণী।  
বারাণসীরাজ পটনৌমল্ল ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে উহার চতুর্দিকে উচ্চ  
প্রাচীর নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা-  
একাদশীতে এখানে একটি মেলা হয়। প্রাচীরের বহির্দেশে  
কারুকার্য্যযুক্ত অচলেশ্বর মহাদেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

নগরের ঠিক মধ্যস্থলে জুম্মা-মসজিদ স্থাপিত। ইহা সম্রাট  
অরঙ্গজেবের রাজ্যকালে ১০৭১হিঃ আবদুল্লাহ খাঁ কর্তৃক কোন  
হিন্দুকৃষ্টিতঃ ধ্বংসাবশেষের উপর গঠিত হয়। নগরোপকণ্ঠস্থ

মনোহরপুরে সম্রাট মহম্মদ শাহের বাজতুকালে নিৰ্ম্মিত আব  
একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। যমু-  
নার উত্তরসীমায় একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পতিত  
আছে, উহাকে সাধারণ লোকে 'কংস-কা-কিলা' নামে অভি-  
হিত করে। কিন্তু অত্র প্রবাদ, সম্রাট অকবর শাহের  
বিখ্যাত সেনানী জয়পুররাজ মানসিংহ ঐ দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া-  
ছিলেন। কালবশে তাহাষ্ট ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে।  
এখানে মানসিংহের বংশধর অম্বরেস্বর সবাই জয়সিংহ  
স্বীয় অভ্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান-আলোচনার একটি মানমন্দির  
(observatory) নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উক্ত জয়সিংহ  
সম্রাট মহম্মদ শাহ কর্তৃক ১৭২১ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশের শাসন-  
কর্তা নিযুক্ত হইলেন। তৎকালেই ঐ মানমন্দির স্থাপিত  
হয়, কিন্তু এক্ষণে সে গৃহের আর চিহ্নমাত্র নাই।

মথুরার কেলা হইতে যমুনা-বাগ পয়াস্ত বিস্তৃত যমুনাবক্ষে  
সর্ব্বসমেত ২৪টি মন্দির ঘাট আছে। ঐগুলির প্রত্যেকটিতে  
কোন না কোন তীর্থপ্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়া থাকে। উত্তরে  
গণেশঘাট, মানসঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, চক্রতীর্থঘাট, কৃষ্ণগঙ্গাঘাট,  
কালিঙ্গরেশ্বর মহাদেবমন্দির, সোমতীর্থ বা বসুদেবঘাট, ব্রহ্ম-  
লোকঘাট, ঘণ্টাভরণঘাট, ধারাপতনঘাট, সঙ্গমনতীর্থঘাট বা  
বৈকুণ্ঠঘাট, নবতীর্থঘাট ও অসিকুণ্ডঘাট এবং দক্ষিণভাগে  
অবিমুক্তঘাট, বিশ্রান্তিঘাট, প্রয়াগঘাট, কনখলঘাট, ত্রি-  
লোকঘাট, সূর্য্যঘাট, চিন্তামণিঘাট, ধ্রুবঘাট, ঋষিঘাট, মোক্ষঘাট,  
কোটিঘাট ও বুদ্ধঘাট। কংসাসুরকে নিহত করিয়া ভগবান্  
শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রান্তিঘাটেই বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এখানে  
পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডদান করিলে যমুনাগর্ভস্থ কচ্ছপসমূহ  
আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই বিশ্রান্তিঘাটের সন্নি-  
কটে কংসখাঁড়ি নামে একটি খাত আছে। প্রবাদ, কংসের  
মৃতদেহ অশ্বোষ্ঠির নিমিত্ত এতস্থান দিয়া যমুনাতীরে আনীত  
হয়। যোগঘাটে নন্দকন্যা যোগনিদ্রাকে কংস শাণের উপর  
আছড়াইয়া ছিলেন। যোগঘাট ও প্রয়াগঘাটের মধ্যস্থলে  
বেণীমাধবতীর্থ ও শৃঙ্গারঘাট অবস্থিত। প্রয়াগঘাটে রামেশ্বর  
মহাদেব এবং শৃঙ্গারঘাটে পিপ্পলেশ্বর মহাদেব ও বটুকনাথ  
বিগ্রহমান আছেন। এতদ্ভিন্ন প্রায় প্রত্যেক ঘাটেই শৈব বা  
বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। মথুরার ঘাটশোভা অতুলনীয়।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ভয়ানক ভূমিকম্পে মথুরার অনেক  
প্রাচীন কার্টি ধ্বংস হইয়া যায়। বর্তমান অট্টালিকাগমূহের  
মধ্যে যমুনাবাগের ছত্রি, মথুরা-প্রবেশদ্বার, বাহুবর, অসি-  
কুণ্ডের দ্বারকাবীশ ও বিশ্রান্তিঘাট, গতশ্রমমন্দির, খুটানদিগের  
গির্জা, 'হাড়িঙ্গ আর্চ' বা হোলি-দরজা, তেঙাখোরার রাধাকৃষ্ণ



মন্দির, সাতঘরার বিজয়গোবিন্দমন্দির, কংসধেরার বলদেব-মন্দির, লোহারের ভৈরবনাথমন্দির, স্বামিঘাটের মদনমোহন-মন্দির, পেঠ কুশালের গোবর্দ্ধননাথমন্দির, স্বামিঘাটের বিহারী-জীর মন্দির, নিকাটির গোবিন্দদেবমন্দির, স্বামিঘাটের গোপীনাথমন্দির, 'হার্ডিঞ্জ আর্চে'র সন্নিকটস্থ বলদেবমন্দির, সাতঘরার মোহনজী, অসিকুণ্ডের মদনমোহন, কংসখাড়ের গোবর্দ্ধননাথ, দীর্ঘবিষ্ণুমন্দির, সতীবুরুজ, আবছুন-নবি ও অরঙ্গ-ক্বেবের মন্দির, লছমিচাঁদের বাসভবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মথুরাদাস, মধ্যদেশীয় স্বর্ণশেখরবাসী একজন কায়স্থপণ্ডিত, হিন্দুধর্মতত্ত্ব নামে সংস্কৃত নাটিকা রচনা করেন।

মথুরানাথ, (পৃঃ) ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। হানি ১৬১০ খৃষ্টাব্দে স্ব্যাসিকাস্তমঞ্জরী নামে একখানি স্ব্যাসিকাস্তের টীকা প্রণয়ন করেন।

মথুরানাথকবি, শ্রামকল্পলতিকার-প্রণেতা। গুপ্তিপাড়ায় ইনি মথুরেশ কবি নামেই প্রসিদ্ধ। গুপ্তিপাড়ায় প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনা যায়, মথুরেশ রামানন্দ-আশ্রমের সমসাময়িক ছিলেন; তিনি প্রায় ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রামকল্প-লতিকার রচনা করেন। তিনি সিদ্ধ বলিয়াও গণ্য ছিলেন। এক সময় তিনি এক কলসী মদ আনিতেছিলেন, পথে সিদ্ধ রামানন্দের সঙ্গে দেখা হয়। রামানন্দ জানিতেন যে, মথুরেশের কলসীতে মদ আছে, অথবা তিনি বন্ধুর শক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কলসী মধ্যে কি? মথুরেশ উত্তর করেন যে, গঙ্গাজল। রামানন্দ একটু গঙ্গাজল চাহিলেন, মথুরেশও অমনি কলসী হইতে জল বাহির করিয়া দিলেন। মথুরেশ সম্বন্ধে একুপ অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

মথুরানাথচক্রবর্তী, প্রমথব্রাহ্মণ ও গুজিরব্রাহ্মণ নামক জ্যোতির্বিদগণের নামক।

মথুরানাথতর্কবাগীশ, নবদ্বীপের একজন প্রধান নৈয়ায়িক, রামতর্কবাগীশের পুত্র, সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণির শিষ্য ও বাসুদেব সার্কটোমের প্রশিষ্য। ইহার রচিত 'মথুরা-নাথী বা মথুরী, গুণকিরণাবলী-প্রকাশটীকা, তত্ত্বচিন্তামণি-টীকা, তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকটীকা, ভ্রাম-লীলাবতীটীকা, ভ্রাম-লীলাবতীপ্রকাশ-রহস্য ও সিদ্ধান্তরহস্য প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ নব্য-নৈয়ায়িকসমাজে নব্যভাষ্যের প্রধান গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মথুরীই মথুরা-নাথের অপূর্ণ-প্রতিভার উজ্জল নিদর্শন, এখানি রঘুনাথ-শিরোমণি-রচিত তত্ত্বচিন্তামণি ও তত্ত্বচিন্তামণিদীপ্তির টীকা হইলেও ইহাতে মথুরানাথ যে বিচার ও তর্কশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

উপরোক্ত প্রধান গ্রন্থগুলি ব্যতীত মথুরানাথ-বিরচিত নব্য ভ্রামশাস্ত্র ঘটত বহুতর পাতড়া দেখা যায়, তন্মধ্যে কতকগুলি তাঁহার উক্ত কোন গ্রন্থের অন্তর্গত, অথবা স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

অভাবচতুষ্টয়রহস্য, অনুপসংহারি-পূর্ণপক্ষরহস্য, অনু-পসংহারিসিদ্ধান্তরহস্য, অহুমানপ্রামাণ্যবাদরহস্য, অহুমিতি-পরামর্শ, অহুমিতিরহস্য, অপূর্ণবাদরহস্য, অভিধাষিচার-রহস্য, অর্থাধ্যাহার-পূর্ণপক্ষালোকরহস্য, অর্থাপত্তিপূর্ণপক্ষ-রহস্য, অর্থাপত্তিরহস্য, অর্থাপত্তিসিদ্ধান্তরহস্য, অবচ্ছেদ-কল্প-লক্ষণরহস্য, অবয়বগ্রন্থরহস্য, অসাধারণ-পূর্ণপক্ষরহস্য, অসাধারণরহস্য, অসিদ্ধগ্রন্থরহস্য, অসিদ্ধপূর্ণপক্ষরহস্য, অসিদ্ধ-সিদ্ধান্তগ্রন্থরহস্য, আকাঙ্ক্ষাগ্রন্থরহস্য, আকাঙ্ক্ষাপূর্ণপক্ষালোক-রহস্য, আকাশখণ্ডন, আকাশবাদার্থ, আখ্যাতবাদরহস্য, আসত্তি-গ্রন্থরহস্য, উদাহরণলক্ষণরহস্য, উপনয়লক্ষণরহস্য, উপাধিদূষ-কতাবীজ-পূর্ণপক্ষরহস্য, উপাধিদূষকতাবীজরহস্য, উপাধিপূর্ণ-পক্ষরহস্য, উপাধিবাদরহস্য, উপাধিবিভাগরহস্য, উপাধিসামান্য-লক্ষণরহস্য, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থরহস্য, উপাধ্যাত্যগরহস্য, কেবল-ব্যতিরেকিপূর্ণপক্ষরহস্য, কেবলব্যতিরেকিসিদ্ধান্তরহস্য, কেব-লাঘ্যগ্রন্থরহস্য, কেবলাঘ্যপূর্ণপক্ষরহস্য, কেবলাঘ্যসিদ্ধান্ত-রহস্য, গুণদীপ্তিনামে গুণপ্রকাশদীপ্তিটীকা, জ্ঞাপক্ষতা-বাদ, জ্ঞাতিমালা, তর্কপ্রতিবন্ধকতারহস্য, তর্করহস্য, তাৎ-পর্থাগ্রন্থরহস্য, দ্বিতীয়চক্রবর্তিলক্ষণরহস্য, দ্বিতীয়লক্ষণরহস্য, ভ্রামমূলপরিভাষা, পক্ষতাগ্রন্থরহস্য, পক্ষতাটীকা, পক্ষতাপূর্ণ-পক্ষগ্রন্থরহস্য, পক্ষতারহস্য, পক্ষতাসিদ্ধান্তরহস্য, পরামর্শপূর্ণপক্ষ-রহস্য, পরামর্শসিদ্ধান্তরহস্য, প্রতিক্ষালক্ষণরহস্য, প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদরহস্য, প্রত্যক্ষালোককটিকা, প্রত্যক্ষলোকরহস্য, প্রথমপ্রগল্ভলক্ষণরহস্য, প্রথমলক্ষণরহস্য, প্রামাণ্যবাদরহস্য, বাধগ্রন্থরহস্য, বোদ্ধাধিকাররহস্য, ভাবপ্রত্যয়বাদার্থ, যোগ্যতা-গ্রন্থরহস্য, যোগ্যতাপূর্ণপক্ষরহস্য, লক্ষণবাদরহস্য, লিঙ্গকারণতা-পূর্ণপক্ষরহস্য, লিঙ্গকারণতাসিদ্ধান্তরহস্য, লিঙ্গোপস্থিতলৈঙ্গিক-ভাবনিরাসরহস্য, লিঙ্গোপস্থিতলৈঙ্গিকভাববিচার, বিধিবাদ, বিধিবাদটীকা, বিরুদ্ধগ্রন্থপূর্ণপক্ষরহস্য, বিরুদ্ধসিদ্ধান্তগ্রন্থরহস্য, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার, বিশেষব্যাপ্তিরহস্য, ব্যতিরেকপূর্ণপক্ষ-রহস্য, ব্যতিরেকিরহস্য, ব্যতিকরণধর্মাবচ্ছিন্নভাবখণ্ডন, ব্যাধি-করণধর্মাবচ্ছিন্নভাবরহস্য, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়রহস্য, ব্যাপ্তিপঞ্চক-রহস্য, ব্যাপ্তিপূর্ণপক্ষরহস্য, ব্যাপ্তিবাদ, ব্যাপ্তিবাদরহস্য, ব্যাপ্ত্যমুমমরহস্য, শক্তিপ্রকাশবোধিনী, শক্তিবাদরহস্য, শব্দরহস্য, শব্দনিত্যতারহস্য, শব্দপ্রামাণ্যরহস্য, শব্দা-

লোকরহস্য বা শব্দমণিপরিচ্ছেদালোকটীকা, সংশয়কারণতা-  
র্থাপত্তিপূর্ণপক্ষরহস্য, সংশয়কারণতাব্যাপত্তিরহস্য, সংশয়-  
পক্ষতাবিচার, সংশয়বাদার্থ, সংশয়ানুমিত্তিরহস্য, সঙ্গতানুমিতি-  
বাদ, সংপ্রতিপক্ষগ্রহরহস্য, সংপ্রতিপক্ষপূর্ণপক্ষরহস্য, সংপ্রতি-  
পক্ষসিদ্ধান্তগ্রহরহস্য, সন্নিকর্ষবাদার্থ, সব্যভিচাররহস্য, সব্যভি-  
চারসিদ্ধান্তরহস্য, সাধারণপূর্ণপক্ষরহস্য, সাধারণরহস্য, সামান্ত্র-  
নিক্রিগ্রহরহস্য, সামান্ত্রলক্ষণরহস্য, সামান্ত্রভাবরহস্য, সিংহ-  
বাহুরহস্য, সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্য, স্বপ্রকাশরহস্য, হেতুভাসরহস্য।

উপরোক্ত ভাষ্যগ্রন্থ ব্যতীত মথুরানাথ আয়ুর্দায় টীকা নামে  
একখানি জ্যোতির্গ্রন্থ রচনা করেন।

মথুরানাথশুক্র, কাশীবাসী একজন মহাপণ্ডিত, মালবের  
অন্তর্গত পাটলিপুত্রগ্রামে ইহার জন্মস্থান। ইনি খৃষ্টীয় ১৮শ  
শতাব্দে কাশীধামে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি নানাশাস্ত্রীয় বহু-  
গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়—

অঘপঞ্চবিবেচন, অঘপঞ্চষষ্টি, আচারাক, আচারোন্নাস,  
আত্মপূরণদীপিকা, অশৌচনির্ণয়টীকা, আশ্বলায়নশ্রুতবৃত্তি,  
কালমাধবচক্রিকা, কালাতত্ত্বটিপ্পন, কুমারীতন্ত্রবিবরণ, কুবলয়া-  
নন্দবৃত্তি, কৃত্যসার, ক্রিয়াকোমুদী, গণকভূষণটীকা, গণেশ-  
স্তোত্র, গুরুস্বর্গ্যগোচরবিচার, গোরক্ষশতকটীকা, ছন্দঃকল্পলতা,  
জটাপটলটিপ্পন, জাতককল্পলতা, জ্যোতিঃসিদ্ধান্তসার\*, তিথি-  
নির্ণয়, দিলীপচরিত, দিব্যতত্ত্বলঘুটীকা, হর্গার্চনামৃতরহস্য,  
নৈষধীয়টীকা, পঞ্চমীসুখোদয়, পাণিগ্রহাদিকৃত্যনির্ণয়, পিঙ্গল-  
বৃত্তি, প্রবোধচন্দ্রোদয়বৃত্তি, বৃহৎসংহিতাটিপ্পন, বৃহদারণ্য-  
কোপনিষদ্রথবৃত্তি, ব্রহ্মহুত্রলঘুবৃত্তি, ভগবদ্গীতাপ্রকাশ,  
ভুবনেশ্বরীবিবরণরহস্য, ভৈরবসপথ্যাবিধি, ভৈরবার্চনকল্পলতা,  
মঙ্গরত্নাকর, মলমাসতত্ত্বটীকা, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্রথ্যাটিপ্পন,  
মিতাক্ষরা নামে প্রত্নমনোরমাটীকা, মিতাক্ষরা নামে যাজ্ঞ-  
বল্ক্যর আচার্য্যায়টীকা, যজ্ঞরাজ, যজ্ঞরাজকল্প, যজ্ঞরাজ-  
টীকা, যজ্ঞরাজপদ্ধতি, যুদ্ধজ্যোৎসবটিপ্পনী, যোগকল্পলতা,  
যোগবর্ণন, বৃত্তদর্পণ, বৃত্তসুখোদয়, বৈষ্ণামৃতলহরী, শারদা-  
তিলকপ্রকাশ, শিবপূজাপ্রকাশ, ষট্চক্রাদি সংগ্রহ, সহম-  
চক্রিকা, সাহিত্যদর্পণটিপ্পন, সিদ্ধান্তচক্রিকা, স্তোত্রাধিতমুক্তাবলী,  
সৌভাগ্যোপনিষদ্রথটিপ্পন, হঠযোগসংগ্রহ, হনুমন্তোদ্ধার ও  
হারাবলীকোষটিপ্পনী।

মথুরাপুর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবারের  
অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। দেওয়ানের হাট নামেও প্রসিদ্ধ।  
এখানকার হাট স্থানীয় বাণিজ্যভাণ্ডার বলিলেও চলে।

\* এই গ্রন্থখানি রাজা দালচন্দ্রের আদেশে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

২ যশোহর জেলার খিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত একটি  
গ্রাম।

মথুরেশ (পুং) ১ ত্রীকৃষ্ণ। ২ মথুরানাথ কবি।

[ মথুরানাথ কবি দেখ। ]

মথুরেশ বিদ্যানিধি, জ্যোতিঃসাগরসাররচয়িতা।

মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি  
১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সারস্বন্দরী নামে অমরকোষটীকা প্রণয়ন করেন।

এতদ্ভিন্ন শঙ্করদ্রাবলী নামে তদ্রচিত আর একখানি অভিধান  
পাওয়া যায়। তদ্রচিত গ্রন্থ হইতে তাঁহার বংশাবলী সম্বন্ধে  
প্রকাশ যে, সর্দানন্দের পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র কানীন্যথ,  
তৎপুত্র চন্দ্রবন্দ্য, তৎপুত্র শিবরাম, এই শিবরামের পুত্র খ্যাত-  
নামা মথুরেশ। [ বিশ্বকোষ কুলীনশব্দে বংশাবলী দেখ। ]

মথুরা (স্ত্রী) মথ-বাহুলকাৎ উরঃ টাপ্। মথুরা। (বিরূপকোষ)

মথু (ত্রি) আলোড়ন। (শব্দ ১১৮১৫)

মথু (ত্রি) মথনশীল। (শব্দ ৮৪৬২৩)

মথ্য (ত্রি) মথনীয়, মথনযোগ্য।

মদ, ১ হর্ষ। ২ মত্তীভাব। দিবাদি° পরৈশ্চ° অক° সেট্। লট্  
মাগত্। লোট্ মাগত্। লিট্ মমাদ, মেদত্। লুট্ মদিত।  
লুট্ মদিষ্যতি। লুঙ্ অমদৎ, অমদতাৎ। সন্-মিমদিষতি।  
যঙ্ মামগত্। যঙ্ লুক্ মামগি। উৎ+মদ=উন্মাদ, চিত্ত-  
বিকার। প্র+মদ=প্রমাদ, অনবধানতা। মদ-গিচ্° লট্,  
মদয়তি।

মদ, মদি, মদ ধাতু—১ স্ততি। ২ মোদ। ৩ মদ-গর্ষ। ৪ স্বপ্ন,  
নিদ্রা। ৫ কান্তি। ৬ গতি। ৭ জড়ভাব। ভাদি° আত্মনে°  
অক°। স্ততি ও গতি অর্থে স্ক° সেট্। লট্ মন্দতে। লিট্  
মমনে। লুট্ মন্দিত। লুঙ্-অমন্দিষ্ট, অমন্দিষ্যতাৎ, অমন্দিষত।  
মদ, তৃপ্তিযোগ, তৃপ্তীকরণ। চুরাদি° আত্মনে° স্ক° সেট্।  
লিট্ মাদয়তে। লুঙ্ অমীমদত।

মদ (পুং) মদয়ীততি মদ-অচ্। হস্তিগণ্ডস্থল। পর্যায়—দান।

“মদসিক্তমুখৈর্মুগাধিপঃ করিত্তিবর্তয়তে স্বয়ং হতৈঃ।”

(ভারবি ২।১৮)

মত্ততে ইতি মদ (মদোহল্পপসর্গে। পা ৩।৩।৬৭) ইতি অপ্।

২ হর্ষ। পর্যায়—আমোদ। “সোমপাঃ পিব গোদা ইদ্রেবতো

মদঃ” (শব্দ ১।৪১২) “মদো হর্ষঃ” (সায়ণ) ৩ রেতঃ। ৪ কন্তুরী।

‘মৃগনাভিমুগমদো মদঃ কন্তুরীকণ্ডঃ।’ (ঐবৃকররমা°)

৫ রোগবিশেষ, উন্মাদরোগভেদ।

“স চাপ্রবুদ্ধস্তরুণো মদসংজ্ঞাং বিভর্তি চ।”

(মাধবনিদান—উন্মাদাধিকার)

[ বিশেষ বিবরণ উন্মাদ ও মদাতার শব্দ দেখ। ]

৫ গর্ল। (মেদিনী) ৬ মন্ত। ৭ কৈব্য, মন্ততা। (হেম)  
 “মৃগরাকো দিব্যশপঃ পরিবাদঃ ত্রিযো মদঃ।  
 তৌধ্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ॥” (মহু৭।৪৭)  
 ৮ কল্যাণবস্ত। (ধরপি) মদলক্ষণ—  
 “অহং মহাত্মা ধনবান্ মতু ল্যাঃ কোহন্তি ভূতলে।  
 ইতি বজ্জায়তে চিত্তং মদঃ প্রোক্তঃ স কোবিদৈঃ ॥”  
 (পদ্মপুং ক্রিয়াযোগসাং।)

আমি অতি মহাশয় এবং ধনবান্, আমার সদৃশ কেহ  
 ভূতলে নাই, এই প্রকার যে চিন্তাভিমান, তাহাকে মদ কহে।  
 অহঙ্কার হইতে মদের উৎপত্তি হয়।

“বুদ্ধৈর্মোহঃ সমভবদহকারাদভূতমঃ।” (মংগ্যপুং ৩ অং)  
 ৯ দানবভেদ। (হরিবং ৩৮৬)

মদকট (পুং) মদং কটতি প্রকটয়তি কট-অচ। ষণ্ড,  
 চলিত ঝাঁড়। (হেম)

মদকর (পুং) ১ ধুতুর বৃক্ষ। ত্রিযাং ভীপ্। ২ খাতকী বৃক্ষ।  
 ৩ সুরা। (বৈয়াকনিং) (ত্রি) ৪ মত্ততাজনক, মদবর্ধক।

মদকরিন্ (পুং) মত্তহস্তী।

মদকূল (পুং) মদেন কলোহব্যাক্তমধুরধনির্ধাত মত্তহস্তী।  
 পর্যায়—মদোংকট। (অমর) ২ অব্যক্ত-প্রলাপী। (শব্দরত্নাং)  
 (ত্রি) ৩ মদ্যব্যক্তবাচী।

“মদকল-ময়ূরকণ্ঠবিভিরবকৌণানি।” (উত্তরচরিত ২ অং)

মদকুসিরা, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্ত-  
 গত একটি তালুক। ভূপরিমাণ ৪৫১ বর্গ মাইল। এখান-  
 কার দক্ষিণভাগ পর্বতময়। পশ্চিমে উর্দুর সমতল ক্ষেত্র-  
 সমূহ বিরাজিত, জলপ্রাচুর্য্যহেতু এখানে প্রভূত পরিমাণে  
 শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। অক্ষাং ১৩° ৫৬' ৩০" উঃ  
 এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৮' ৪০" পূঃ। পূর্বে এখানে বিজয়নগর-  
 রাজের অনেক পলিগার সামন্তের রাজধানী ছিল। নগরের  
 উত্তরস্থ পর্বতোপরি পরিখা ও প্রাচীর-পরিবেষ্টিত একটি  
 দুর্গ আছে। ঐ দুর্গে সামন্তরাজ বাস করিতেন। ১৭৪১  
 খৃষ্টাব্দে মুরারিরাও এবং ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলী এই  
 স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন।

মদকারিন্ (ত্রি) মদং মত্ততাং করোতি কৃ-গিনি। মত্ততা-  
 জনক, মদবর্ধক সুরাদি।

“বুদ্ধিং লুপ্তি বদু ব্যঃ মদকারি তদুচ্যতে ॥”

(শাব্দধরসংহিতা)

বাহ্যতে বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, তাহা মদকারী নামে অভিহিত।

মদকৃত (ত্রি) মদং করোতি কৃ-কিপ্ ভূক্ চ। মত্ততাকারক।

মদকৃদুদ্রম (পুং) ভালবৃক্ষ। (বৈয়াকনিং)

মদকোহল (পুং) বেচ্ছাধীন বিচরণকারী বৃষ।

‘ইট্‌চরো গোপতিবণ্ডো গোবুবো মদকোহলঃ’ (হেম ১২৫৯)

মদগন্ধ (পুং) মদস্ত দানন্তেব গন্ধো বস্ত। সপ্তচ্ছন্দবৃক্ষ,  
 চলিত ছেতেন গাছ। ২ মন্ত। (রাজনিং)

মদগন্ধা (স্ত্রী) মদগন্ধ-টীপ্। ১ মদিরা। ২ অতনী। (রাজনিং)

মদগমন (পুং) মহিব। (বৈয়াকনিং)

মদয়ী (স্ত্রী) মদং মত্ততাং হস্তীতি মদ-হন-টক্ ভীপ্।  
 পুতিকা। (অটাদ্র)

মদচ্যুৎ (ত্রি) পর্কহস্তা। (ঋকসংহিতা ১।৫১।২)

মদচ্যুত (ত্রি) মত্ততা জন্ত ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ। (ঋক্ ৯।৯৮।৩)

মদজল (স্ত্রী) হস্তি দানবারি।

মদংখান্, জটনৈক পাঠানসর্দার। ইনি সিন্ধু-প্রদেশের হাই-  
 দরাবাদ জেলার প্রাচীন বাদিন-নগর ধ্বংস করেন।

মদছিপ (পুং) মত্তহস্তী।

মদধার (পুং) মদপ্রধানা ধারা বস্ত। পর্বতভেদ। (ভারতং ২৯ অঃ)

মদন (পুং) মদয়তি মদ-গিচ্ ল্য। কামদেব।

ইহার উৎপত্তিবিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত  
 আছে,—লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে সময় দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি-  
 গণকে সৃষ্টি করিয়া মরীচি প্রভৃতি মানস পুত্রগণকে সৃষ্টি  
 করেন, তখন তাঁহার মন হইতে এক পরম রূপবতী কামিনী  
 আবির্ভূত হয়। এই রমণী সন্ধ্যা নামে খ্যাত। এই সন্ধ্যাই  
 সাংকালে অর্জিতা হইয়া থাকেন।

এই বরবর্ণিনীকে দেখিয়া ব্রহ্মা, দক্ষ প্রজাপতি ও মরীচি  
 প্রভৃতি তাহার মানস পুত্রগণ সকলেই নিতান্ত উৎসুক  
 হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই স্ত্রী সৃষ্টিমধ্যে কি করিবেন  
 এবং কাহারই বা হইবেন? এই সময় ব্রহ্মার মন হইতে  
 কাঞ্চনচূর্ণবৎ পীতবর্ণ এক মনোহর চঞ্চল পুরুষ আবির্ভূত  
 হইলেন। এই পুরুষের বক্ষঃস্থল পীবর, নাসিকা সুচারু, উরু,  
 কটি ও জন্মস্থান সুবৃত্ত, কুস্তল নীল ও কুঞ্চিত, ক্র-মুগল পরস্পর-  
 সংলগ্ন, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রসদৃশ। এই পুরুষ কশুগ্রীব, মীন-  
 কেতু ও মকরবাহন। পুষ্পময় পঙ্কশরে ও কুম্ভকাম্বুকে  
 শোভিত হইয়া কমনীয় পুরুষ তখন স্বীয় নয়নযুগল দুরাইতে  
 ছিলেন। দক্ষ প্রভৃতি ইহাকে দেখিয়া সাতিশর উৎকণ্ঠিত  
 হইলেন।

এই পুরুষ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি  
 কোন্ কর্ম করিব, আমি যখন পুরুষ, তখন কার্য্য করাই  
 আমার উচিত, অতএব আপনি আমাকে কোন প্রশস্ত ও ভাব্য  
 কর্মে নিযুক্ত করুন এবং আমার অমররূপ নাম, ধাম ও গন্য

নির্দেশ করিয়া দিন। ব্রহ্মা তখন অণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তোমার এই মনোমোহন-মুক্তি ও পুষ্পময় পঞ্চশরে জীপুরুষদিগকে মোহিত করিয়া চিরস্থায়িনী সৃষ্টির প্রবর্তক হও। দেব, গন্ধর্ব্ব, কিয়র, সর্প, মনুষ্য, পক্ষ, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রাণিমায়েই তোমার শরণ্য হইবে। অস্ত্র প্রাণীর কথা দূরে থাকুক, আমি, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমরাও তোমার বশবর্তী হইব। তুমি অয়ং প্রচ্ছন্নরূপে প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সতত সুখজনক হইয়া সনাতন সৃষ্টির প্রবর্তক হও। সকল প্রাণীর মনই তোমার পুষ্পবাণের লক্ষ্য হইবে। তুমি উহাদিগের সতত মত্ততা ও আনন্দ সম্পাদন করিবে। আমি তোমার এই বৃত্তি নির্দেশ করিলাম।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাদের এবং বিধাতার চিত্ত মথিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছ, এইজন্ত লোকে তুমি মন্থন-নামে অভিহিত হইবে। জগতে তুমি অসাধারণ কামরূপী, তোমার সৃষ্ণ কেহ নাই, এইজন্ত তোমার নাম কাম, লোক-সমূহকে মত্ত করিবে এইজন্ত মদন, মহাদেবের দর্পনাশে সমর্থ এইজন্ত দর্পক ও কন্দর্প নামে খ্যাত হইবে। তোমার পঞ্চশরের যেরূপ পরাক্রম, বৈষ্ণবাত্ম ও রৌদ্রাত্ম প্রভৃতিরও তাদৃশ বিক্রম নহে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল বা সনাতন ব্রহ্মলোক সকল স্থানেই তুমি থাকিবে। যে হেতু তুমি সর্বব্যাপী, অধিক আর কি বলিব, তোমার সমান কেহই নাই। এই প্রজাপতি দক্ষ তোমার অভিলষিতা পত্নী প্রদান করিবেন।

অনন্তর মদন রমণী-ক্ল-সৃষ্ণ কুসুমনির্মিত শরাসন এবং হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারণ নামে প্রসিদ্ধ মুনি-দিগেরও জ্ঞাননাশক পুষ্পময় পঞ্চশর গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি করিয়া কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, ব্রহ্মা যে আমার বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিলেন, তাহা এই মুনিগণের সমক্ষে ব্রহ্মার উপরই নিরোগ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। ইহা ভাবিয়া মদন সক্ষ্যার সাক্ষাতে ব্রহ্মার উপরই শরক্ষেপ করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মার মনোবিকার উপস্থিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা কামমোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সক্ষ্যাকে দেখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শরীর হইতে একোনপঞ্চাশৎ সাস্থিকতাবের আবির্ভাব হইল। আর কামশর-বিকা সক্ষ্য হইতে বিকোকাদি হাব সকল এবং চতুষ্টিকলা উৎপন্ন হইল।

ব্রহ্মার একরূপ কাম্যাব দেখিয়া মহাদেব তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—ব্রহ্মন্! নিজ তনয়াকে দেখিয়া তোমার কি কাম্যাব উপস্থিত হইল? তুমি বেদশাস্ত্রসমূহের

নিয়ামক, তোমার পক্ষে এই বেদবিগর্হিত কার্য নিত্যত অযোগ্য। আর পুত্রবধু ও কন্তা মাছুতুল্যা, ইহাদিগের প্রতি কাম্যাসক্ত হওয়া অতীব পাপের কার্য, ইহা বেদের সিদ্ধান্ত। তুমি সামান্ত কামের প্রভাবে তাহা বিস্মৃত হইলে কিরূপে? অনন্তর পিতামহ শঙ্করের কথায় লজ্জিত হইয়া মদনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন তিনি মদনকে বলিতে লাগিলেন, “তুমি আমাকে যখন একরূপ লজ্জা দিয়াছ, তখন তুমি এই অপরাধে মহাদেবের নরনানলে দগ্ধ হইবে।” ব্রহ্মা এই অভিশাপ প্রদান করিলেন।

এই নিদারুণ অভিশাপ শুনিয়া মদন ব্রহ্মাকে কহিলেন,— ব্রহ্মন্! আপনি যে বলিয়াছিলেন, আমি, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমরা সকলেই তোমার বশবর্তী, আমি তাহারই পরীক্ষা করিয়াছি মাত্র, আমি নিরপরাধ, অতএব আমার এই শাপ মোচন করুন। ব্রহ্মা তখন স্তব্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, যেভাবে তোমার শাপ মোচন হইবে, তাহার উপদেশ দিতেছি, তুমি মহাদেবের নরনানলে ভস্মীভূত হইয়া পশ্চাৎ তাঁহারই অশ্রুগ্রহে আবার শরীর পাইবে। মহাদেব যখন দারপরিগ্রহ করিবেন, তখন তিনিই তোমাকে শরীরী করিবেন। এই বলিয়া ব্রহ্মা অস্তহিত হইলেন।

পরে দক্ষ মদনের পত্নী নির্দেশ করিয়া তাহাকে কহিলেন, মদন! এই আমার দেহজাত কন্তা, ইহার নাম রতি। তুমি ইহাকে বিবাহ করিয়া স্নেহ কালাতিপাত কর। মদন ইহাকে বিবাহ করিয়া অমুরাগে মুগ্ধ হইলেন।

অনন্তর মদন দেবগণের প্ররোচনার মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইয়া মহাদেবের নরনানলে ভস্মীভূত হন। মহাদেবের সহিত পার্শ্বভীর বিবাহ হইলে পরে মদন পুনরায় শাপবিমুক্ত হইয়া শরীর পরিগ্রহ করেন। (কালিকাপু. ১ ৭অ)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ে মদনের উৎপত্তিবিবরণ লিখিত আছে। বাহ্যভায়ে তাহা লিখিত হইল না।

২ যোগাচার্য্যরূপ শিবের অবতার বিশেষ।

“যুগাবর্তেষু সর্বেষু যোগাচার্য্যঙ্কলেন তু।

অবতারানি সর্বত্র শিষ্যাংচ ভগবন্ বদ ॥”

উপমহ্যুর্বাচ।

“শ্বেতঃ স্তুতারো মদনো স্নেহোত্রঃ কঙ্ক এব চ।”

(শিবপুরাণ বায়ুল. ২।১০।১-২)

মদরতি ভক্তানাং মন ইতি মদ-পু, মনসি আনন্দজনকস্থা-  
দন্ত তথাযং। ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩২) ৪ মত্ততা,  
বয়রোহা কামিনীদিগের তাবিশেষ।



• নমো হারার কামার দেবদেবত দুর্ভয়ে।  
 অক্ষিবিম্বিবেজ্ঞাণং মনঃকোতকরার চ॥” (তিথিতত্ত্ব)  
 এই ব্রত মানবের আধিব্যাখিনাশক। অতএব ইহা  
 সকলেরই করা আবশ্যক।

মদনদয়ন (পুং) শিব-মহাদেব।

মদনদহন (পুং) মদনভস্মকারক শিব।

মদনদেব, দাক্ষিণাত্যের গঙ্গাম জেলার কিমেড়ী সামন্ত-  
 রাজ্যের জটনৈক রাজা।

মদনদ্বাদশী (স্ত্রী) মদনপূজাবিষয়িণী দ্বাদশী। চৈত্রমাসের  
 ত্রয়োদশী। এই দ্বাদশী তিথিতে মদনব্রত করিতে হয়।

“শ্রোতুমিচ্ছামহে স্তত ! মদনদ্বাদশীব্রতম্।

• স্মৃতানেকোনপঞ্চাশং যেন লেভে দিতিঃ পুনঃ ॥”

(মৎস্তপুরাণ ৭ অধ্যায়)

বিশিষ্ট দিভিকে এই ব্রতের উপদেশ দেন, দিতি এই ব্রত  
 করিয়া একোনপঞ্চাশং পূজা লাভ করেন। এইরূপে ক্রমে  
 এই ব্রতের প্রচার হয়। যিনি বিধিপূর্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান  
 করেন, তিনি নিখিলপাপবিসুক্ত হইয়া ইহলোকে নানাবিধ  
 সৌভাগ্য এবং অন্তিম বিম্বলোকপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বস্তুপুরাণ ৭ অধ্যায়ে এই ব্রতের বিশেষ বিবরণ লিখিত  
 আছে, বাহ্যভায়ে তাহা লিখিত হইল না।

মদননালিকা (স্ত্রী) ভট্টা-স্ত্রী, অধিবাসিনী রমণী।

মদননৃপ (পুং) মদনপাল, মদনরাজ।

মদনপক্ষিন্ (পুং) খঞ্জন খণ্ড, খঞ্জনপাখী। (শব্দচ.)

মদনপঞ্চানম প্রাক্রিয়াণব নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

মদনপল্লী, মাজার-প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত  
 একটি তালুক। ভূপরিমাণ ৫৯৩ বর্গ মাইল। এই তালুকের  
 সর্বত্রই প্রায় পর্বতময়, কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমের মহিস্বর-  
 অধিত্যকা-সংলগ্ন স্থান সমধিক উর্বরা। ১৮৭৬-৭৮ খৃষ্টাব্দের  
 দুর্ভিক্ষে এখানকার অধিবাসিবৃন্দ বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিল।

২ উক্ত কড়াপা জেলার একটি নগর, সমুদ্র-পৃষ্ঠ  
 হইতে ২১০ হাজার ফিট্ উচ্চ একটি মনোরম স্থান।  
 অক্ষা. ১০°৩৩'৩৭" উঃ এবং দ্রাঘি. ৭৮°০২'৪৫" পূঃ। মদন-  
 পল্লিগিড়, মদনপল্লী ও বটলহুতিগিড় নামক তিনটি ক্ষুদ্র  
 পল্লি লইয়া এই নগর গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় বসনিকোণ-  
 শৈলে একটি বহুপ্রাচীন দেবমন্দির দৃষ্ট হয়।

মদনপাঠক (পুং) মদনঃ তদ্বদীপকং পঠতীতি পঠ-মূল,  
 স্বরেন কামোদীপনাত্থাৎ। কোকিল। (রাজনি.)

মদনপাল (পুং) ১ মদনরাজ। ২ রত্নপতি মদন।

মদনপাল, পালবংশীয় জটনৈক বজ্রেশ্বর। [পালরাজবংশ দেখ।]

মদনপাল, বুদাউনের রাঠোরবংশীয় জটনৈক রাজা।  
 গোপালদেবের পুত্র, গাধিপুরে ইহার রাজধানী ছিল। শিলা-  
 লিপিতে ইহার বীরত্বের বিশেষ পরিচয় আছে।

মদনপাল, কনোজের গহরবার (রাঠোর)-বংশীয় জটনৈক  
 রাজা। চন্দ্রদেবের পুত্র। ইনি ১১৬১ সন্থতে বিজয়ান  
 থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

মদনপাল, টাকবংশীয় জটনৈক হিন্দুরাজ। দিল্লীর উত্তর-  
 দিকস্থিত যমুনাতীরবর্তী কাঠা (কাটা) মগরে তিনি রাজত্ব  
 করিতেন। তাঁহার পিতা হরিশ্চন্দ্র, পিতামহ তরতপাল  
 ও পিতামহের রত্নপাল নাম পাওয়া যায়। মদন-পারিজাত-  
 প্রণেতা বিখ্যাত তট্ট তাঁহার সত্যাপণ্ডিত ছিলেন। মদন-  
 বিনোদনিঘণ্ট হইতে তাঁহার রাজ্যকাল ১৫৩১ সন্থৎ  
 (১৩৭৫ খৃঃ অঃ) স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাঁহার ঔৎসায়ে  
 তাঁহার রাজ্যকালে আনন্দলজীবন, তিথিনিধয়সার, মদন-  
 পারিজাত, মদনপালবিমোদ, চন্দ্রপ্রকাশ, শূদ্রশম্বোধিনী,  
 সিদ্ধান্তগণ্ড ও স্মৃতিকৌমুদ নামক গ্রন্থগুলি রচিত হইয়া  
 তন্মধ্যেই প্রচারিত হয়।

মদনপাল, বোদামমুতার রাষ্ট্রকূটবংশীয় জটনৈক রাজা।

মদনপাল মহারাজ, করোলের জটনৈক হিন্দুরাজ। ইনি  
 স্বীয় সঙ্গপুত্রের অন্তঃসংস্রবাজ্যের নিকট হইতে G. C. S. I  
 উপাধি লাভ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিস্মৃতিকারোণে তাঁহার  
 মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতৃপুত্র লক্ষ্মণপাল  
 সিংহাসন লাভ করেন।

মদনপুর, উঃ পঃ প্রদেশের ললিতপুর জেলার অন্তর্গত  
 একটি গঞ্জগ্রাম। তদানীন্তন নগরের ধ্বংসাবশেষপাশে  
 স্থাপিত। এখানে ধ্বংসপ্রায় ৬টি প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন  
 আছে। তন্মধ্যে উত্তরদিকে প্রাচীন নগরের নিকটে স্থাপিত  
 ৩টি জৈনমন্দির সন্ধ্যাপেক্ষা প্রাচীন। উহার ১টির গায়ে  
 ১২০৬ সন্থতে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে এই স্থানের মদনপুর  
 নাম পাওয়া যায়। এতদ্বিহীন স্থানীয় ‘বারদারী’ নামক ক্ষুদ্র  
 গৃহের স্তম্ভে চোহানরাজ পৃথ্বীরাজের ঘটনাসম্বলিত দুই-  
 খানি শিলালিপি আছে। উহার একখানিতে পৃথ্বীরাজ  
 কর্তৃক পরমর্দি (পরমাল) দেবের পরাজয় ও অপরাধানিতে  
 ১২০৯ সন্থতে জেজাক-ভুক্তিরাজ্যের অধিকারপ্রাপ্ত উল্লি-  
 খিত হইয়াছে। আর একটি স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায়  
 যে, এই গৃহ পূর্বে স্থানীয় একটি শিবমন্দিরের দালান ছিল।  
 বর্তমান বড় ও ছোট কাছারির নিকটস্থ দীর্ঘিকার উত্তর-  
 পশ্চিমে দুইটি এবং উক্ত দুইয়ের উত্তর-পূর্বে একটি নানা-  
 প্রকার কারুকার্যযুক্ত শিবমন্দির স্থাপিত আছে।



মদনপুর, চন্দেলারাজ মদনবর্ধের (১১২২-১১৬৫) প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন নগর। উঃ পঃ প্রদেশের হামীরপুর জেলার কুলপাহাড় তহসীলের অন্তর্গত। সেট মহেট্ গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত। এক্ষণে এই নগর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে।

মদনপুর, নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী একটি গওগ্রাম। কালী-গঞ্জের অধীনে অবস্থিত। এখানে ই, বি, এন্স রেলপথের একটি ষ্টেশন আছে।

মদনপুর, মধ্য প্রদেশের বিলাসপুর জেলার মুন্সেলী তহসীলের অন্তর্গত একটি ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ২৫ বর্গ মাইল। এখানকার ভূস্বাদিকারী রাজগোড়বংশীয়। খাজ, গম, ছোলা-ঋতুতি এখানকার প্রধান জাতদ্রব্য।

মদনভট্ট, কল্যাণরাজচরিত প্রণেতা। ত্রীকৃষ্ণের পুত্র।

মদনভবন (কী) মদনভ ভবনঃ। ১ মদনগৃহ, জীচিহ্ন, ভগ। ২ অন্নদানবিধি লগ্নম স্থান, জাম্বাহান।

“অংশানেতান্ বদতি বকনশ্চাত্যুজ্ঞান্ সূত্বান্।

তানেবাংশান্ মদনভবনেষাং নচান্ সুনীচান্।”

(জ্যোতিষার্থদীপিকা)

মদনভাবি (মদনভানবী), বোম্বাই প্রদেশের ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। এখানে রামলিঙ্গদেব ও কল্পদেবের দুইটি প্রাচীন মন্দির আছে। উত্তরেরই গাত্রে প্রতিষ্ঠাকালজ্ঞাপক শিলালিপি দেখা যায়।

মদনমঞ্চুকা (কী) মদনবেগের গুরসে কলিঙ্গদেনার গর্ভ-জাতা কন্যা। (কথাসরিৎসাং।)

মদনমঞ্জরী (কী) ১ বাসবমতা-বর্ণিত নারিকাত্তম। ২ যক্ষ-রাজ দুর্ভতির কন্যা। ৩ কাকভেদ।

মদনমনোহর, পলপীযুগলতা ও শ্রীকৃষ্ণপ্রদীপপ্রণেতা। ইনি মধুসূদন পণ্ডিতরাজের পুত্র ছিলেন।

মদনমহোৎসব (পুং) ভবিষ্যপুরাণে ত্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির-সংবাদে এক মদন-পূজা বা মদনোৎসবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এই উৎসব উল্লেখের উপক্রমে প্রকাশ,—ভগবান্ পশুপতি শৈলমুতার পাণিপীড়নের পূর্বে পাশুপত ব্রত অবলম্বন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। মহাবোধীর যোগে বিদ্য যটাইয়া আপনাদিগের ও ভগবতী গৌরীর মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বিশ্বজয়ী কামকে ভগ্নার পাঠাইয়া দিলেন। আপন দলবল সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে রতিপতি পশুপতির তপোবনে যাত্রা করিলেন। এই সময় নিত্যস্ত-স্বপ্নং বসন্ত আসিয়া বনান্তে তাঁহার সহ্য হইলেন।

তখন যুদ্ধের নিম্নাদে, ভূজের শুভ্রনে, বীণার স্বরধরে, সঙ্গীতের বিমোহন তানে, কলকঙ্কালের কলকলাপে, মলয়ানিলের মুহু মন্দ সঞ্চরণে, মন্দ মন্দ গন্ধবহাদ্দোলিত প্রহ্ননপুঞ্জের পরিমল-হিলোলে ও বিমোহনী কামিনীকুলের মোহন-কটাক্ষে জগৎ মাতাইয়া বসন্তসহায় রতিকান্ত গৌরী-কান্তের আগ্রমপ্রান্তে উপনীত হইলেন; যেন মহারাজাধিরাজ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া সসৈন্তে পররাষ্ট্র আক্রমণ করিলেন।

তখন বিশ্ববিজয়ী ফুলধর আপন ফুল-ধনুতে ফুলশর জুড়িয়া দিয়া ফুলমনে আকর্ষণ আকর্ষণ করিলেন। অবিলম্বে ফুলশর সেই কঠোরসংঘমী ত্রিপুরহর হরের সমাধিহরণের জন্ত প্রেরিত হইল। কিন্তু হায় বিধির বিধি বিপরীত! মন্যধের মত্ততা এইবার ফুরাইয়া গেল। আপন অমোঘ ফুলশর বিফল হইল। যোগিবরের যোগমগ্ন অটল মন টলিল না। দেখিতে দেখিতে অবিলম্বে সেই কোপকব্যবিত প্রলয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তির ললাটকলকের তৃতীয়-নয়ননিঃসৃত নিদারুণ কোপবলি আসিয়া অনন্তের সর্বক্ষেপে পতিত হইল। মুহূর্তমধ্যে মদনের মোহনবপু পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।

গৌরী রতিপতির দেহ দগ্ধ হইতে দেখিয়া মিথুদ্বয়ের রতির প্রীতি-কামনায় বহু বিলাপান্তে ভবের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া মদনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্ত তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। মহাদেব উত্তর দিলেন, প্রিয়ে! আমার কোপে যাহার দেহ দগ্ধ হয়, তাহার আর পুনরুজ্জীবন সম্ভবিত্তে পারে না। যাহা হউক, আমি বৎসরের মধ্যে একটি দিন মাত্র নিরুপণ করিয়া দিতেছি। এই দিন অনন্ত শরীরে আবির্ভূত হইবে। সেই দিনটী,—বসন্তকালের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী।

ভগবান্ ভবের অভিপ্রায়ে সেই দিন ভুবনে মনোভবের আবির্ভাব হইল। তদবধি শুক্লপক্ষীয় বাসন্তী ত্রয়োদশীতে সকলেই মদনের পূজা বা উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই দিন প্রভাত হইতে মনোরম মন্থাখ্যতনে গিয়া বরাহনাগের সানন্দে সঙ্গীত ও বহুবিধ বিলাসসামগ্রী দ্বারা বিবিধ বিনোদ-লীলায় কেলি করিতে হয়। পরে মধ্যাহ্নে মদনের পূজা। পূজায় ভক্তির সহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া নানাবিধ প্রিয়বস্ত্র উপহার দিতে হয়। \*

\* কৃষ্ণ উবাচ।—

“গৌরীবিবাহাঙ্কগ্রাহ চরঃ পাশুপতং ব্রতম্।

উমাপতিঃ পশুপতিধন্যাক্তো বভূব হ।

ব্রহ্মাদিতস্ত সমস্ত্য বিবৃথৈঃ পুত্রলঙ্করে।

পৌর্য্যো মনোজিহ্বিতপূর্ণায় চ অহর্বিতেঃ।

পূজার মন্ত্রটি এই,—

“নমো মারায় কামায় দেবদেবায় মূর্তয়ে ।

ব্রহ্মবিশ্বশিবৈজ্ঞান্যঃ মনঃকোভকবায় বৈ ॥”

পূজার পর মদনকে মোদক দিবার বিধি আছে ; মোদক-দানান্তে দক্ষিণা । দক্ষিণায় ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিয়া হৃষ্টমনে বিদায় দিতে হয় । ইহার পর ত্রতনিষ্ঠা রমণীকে স্বয়ং সেই মন্মথায়তনে গমন করিয়া মনে মনে মদনের অধিষ্ঠানচিন্তা ও পরে তাহার স্নান এবং বসন-ভূষণ-মালা-চন্দনাদি দ্বারা পূজা বিধান করিতে হয় । পূজার পর নিশাসমাগমে আবার উৎসবের আয়োজন । এই মহোৎসবে রাজি জাগিয়া থাকিতে হয় । রাজি বাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়, এজন্ত কর্পূর, কুঙ্কুম, গন্ধ, তাম্বুল ও মণ্ডাদি বিবিধ বিলাস-সামগ্রী ও মনোরম দীপমালা প্রভৃতি দান করা কর্তব্য ।

অহিতঃ ক্ষোভাধার্য সমর্থ ইতি মন্থথঃ ।

ততো মারঃ স্মরঃ কামো বাজগাম তদাশ্রমম্ ॥

রতিপ্রীতিমদোন্মাদবসন্তস্তীয়াসহায়বান্ ।

বিধানবারুণীদীর্ঘ-শৃঙ্গারৈঃ পরিবারিতঃ ॥

আত্মপূরাগকমল-মলিতীকৃতশেখরঃ ।

বীণাসুদঙ্গসঙ্গীত-কোকিলাভঙ্গগীতিকম্ ॥

দক্ষিণানিলদুতন্ত্রীকটাক্ষেক্ষিতবীৰ্য্যবান্ ।

মহারাজাধিরাজো বা স্মরঃ প্রাপ্তো হরাস্তিকম্ ।

স্বমনস্তাপমাসজ্য মদনোন্মাদকং শরম্ ।

চিক্কেপ ত্রিপুরায় সমাধিভঙ্গহেতবে ॥

বৃদ্ধা তন্ত স সঙ্কল্পঃ কঃ কুঙ্কোহঙ্কুলদ্রব্যা ॥

ললাটাদগ্নিমহজ্জ্বলতীয়াসহায়বান্ ॥

কামোহবলোকিতস্তেন ভস্মভূতস্ততঃ ক্ষণাৎ ॥

দক্ষঃ দৃষ্টুঃ স্মরঃ শোকে রতিপ্রীতিহিতে তদা ।

করণং বিলম্বপাশ সর্পমস্ত্রশিশো গতম্ ॥

ততঃ শোকাস্ত্রহৃদয়া গৌরী কদ্রুমুবাচ হ ।

কৃক প্রসাদং দেবেশ রতিপ্রীত্যা বৃক্ষধর ।

সঞ্জীবয়েত্ব শস্তো মদনং কৃপয়া প্রভো ।

তচ্ছ্রুত্বা তু মহাদেবো হৃদ্যান্ প্রোবাচ পার্শ্বতীম্ ॥

উপপ্লুতং জগৎ সর্বং মন্থথেন সমীরণা ॥

ময়া দক্ষস্ত কামস্ত পুনরাগমনং কৃতঃ ।

অগ্নিন্ বসন্তসময়ে গুরুপক্ষে ত্রয়োদশী ।

অস্ত্রাং মনোভবো দেবি ভবিষ্যতি শরীরবান্ ।

এবং বরমসৌ দম্বা মন্থথায় যুধিষ্ঠিরঃ ॥

জগাম হিমবৎ-শৃঙ্গং কৈলাসং পার্শ্বতীপ্রিয়ঃ ।

পূজাবিধানমপরং কথ্যামি শৃণু তৎ ।

লীলাবিলাসগমনং গর্বিভবামরাসনা ॥

গাঙ্কর্যসীতবাদিত্র প্রেক্ষণীয় সমাকুলম্ ।

নন্দ্যাবর্জরতিজীড়া প্রীতি বিদ্যাধরীযুতম্ ॥

-----

প্রতিবর্ষে এই ভাবে যে এই ত্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার রোগশোকাদি কিছুই থাকে না । আয়ু, আরোগ্য, সৌভাগ্য, কীর্তি ও শ্রী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় এবং দেশে স্মৃতিষ্ক প্রভৃতি সম্ভাব্য শুভলক্ষণ প্রাপ্ত হইত হয় ।

মদনোৎসব ভারতবর্ষের একটা বহু প্রাচীন জাতীয় মহোৎসব । এক সময়ে ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই এই মহোৎসবে যোগদান করিত । রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, নাগর নাগরী—এ মহোৎসবের দিন সকলেই সকল অশান্তি তুলিয়া গিয়া অবাধ আমোদ-প্রমোদে ভাসিত । একদিকে শাস্ত্রাহু-শাসন, অত্রদিকে প্রকৃতির নবীন ভূষণ, সুতরাং ধর্মপ্রাণ মানব-মন এ মহামোদে সহজেই গলিয়া যাইত—সকল তুলিয়া বিপুল পুলকে আকুল হইত ।

যখন বসন্ত-সমাগমে ভারতীয় প্রকৃতি দেবী পূরণ ভূষণ ফেলিয়া দিয়া নবীন সাজে সাজিতে বসিতেন, কুসুমসৌভময়া বাসন্তী বনরাজি যখন ধীরগতি-মলয়ানিল-হিল্লোলের মৃদু-মন্দ আন্দোলনে নাচিয়া উঠিত, কোকিলকুল পুলকে পঞ্চম তান পরিত, মধুলোভী মধুপেরা ঝঙ্কার তুলিয়া নবোদিত কিশ-লয়দল ছুলাইয়া অন্ধের ছায় চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইত, নাগর-নাগরীরা তখন হহতেই চুতাসুরের নবোদগম-প্রত্যাশা ঐশ্বর্য্যের সহিত উৎসবের দিন গণনা করিত । উৎসবের দিন সঙ্গীত, সুরা, আবার, কুঙ্কুম ও অগ্নি বিলাসসামগ্রীর প্রভাবে,—সহৃদয় ঋতুরাজের সহিত রতিপতি যেন সত্য সত্যই উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেন, নাগরনাগরীগণের বসন্ত-বিজয়দোষণায় হর্ষকোলাহল গগনপ্রাঞ্জে ধ্বনিত হইত ।

এখন এ উৎসব একরূপ উঠিয়া গিয়াছে । ইহার স্থানে

মধ্যাহ্নে পূজয়েন্তুতা \* \*

মদনোন্মাদন কোন্মদন নরো নারীসমবিতঃ ।

নমো দেবায় মারায় দেবদেবায় মূর্তয়ে ।

ব্রহ্মা বিশ্বশিবৈজ্ঞান্যঃ মনঃকোভকবায় চ ।

উক্তে বসন্তয়িত্বা তু দেবদেবঃ মনোভবম্ ।

তত্তত্তত্তত্তত্তো দেহা মোদকা মুখমোদকা ।

নানাপ্রকারান্ ভক্ষ্যাংস্ত কামোহয়ং প্রীয়াতামিতি ।

ততো বিসর্জয়েদবিপ্রান্ দম্বা যুগ্মং সর্পক্ষিণা ।

স্বাপিতঃ পূজয়েন্নরী বসন্তমল্যাদিভূষণৈঃ ।

কামোহয়মিতি সন্ধিষ্ঠ্য প্রকৃষ্টেনায়রায়না ॥

মন্মথায়তনে তস্মিন্ যজমানঃ প্রকৃষ্টবাক ।

রাজো জাগরণং কুপ্যাৎ স্বখবারিষা ভবেৎ ॥

কর্পূরকুঙ্কুমকোদগন্ধতাম্বুলসজ্জনৈঃ ।

স্রগ্ধারী মন্যদর্শিনেচ কুপ্যাৎ রাজন্ মহোৎসবম্ ॥

( ভবিষ্যোত্তরপূরণ )



এখন বর্তমান প্রচলিত হোলী বসিয়া আবীর-কুঙ্কুমাদির মধ্যাদা রাখিয়া চলিতেছে। হোলী শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসবের অঙ্গ। কতদিন হইতে এই দোলোৎসব মদনোৎসবের স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে, সে ঐতিহাসিক-রহস্য সহজে ভেদ হইবার উপায় নাই।

পূর্বে এই মদনোৎসব যে একটি প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য ছিল, প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, নাটকাদিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণে মধুমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে যে মদন ব্রতের উল্লেখ আছে, তাহার নাম মদনোৎসব। বসন্তসমাগমে ইহার অনুষ্ঠান হইত। বলিয়া ইহা বসন্তোৎসব নামেও কীৰ্ত্তিত। পুরাণে মদনব্রত বা মদনোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, কাব্য-নাটকাদিতে তাহার লৌকিক চিত্র প্রস্তুতিত রহিয়াছে। অস্তান্ত ব্রতের জায় ইহাতেও কঠোরতা ছিল, ত্যাগ স্বীকার ছিল ও দক্ষিণা ছিল, আমোদ প্রমোদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভোজনাদিও বিশেষ আবশ্যিকতা ছিল। ইহার আভাস রত্নাবলী-নাটিকার রাজা ও বিদূষকের কথায় সুব্যক্ত।

রাজা বলিলেন—‘সেই মনোভব নামে মাত্র তুষ্টি অনুভব করেন, এ উৎসব তার নয়—ইহা আমারই মহান্ উৎসব’ বিদূষক সহর্ষে উত্তর করিলেন,—

“মহারাজ! এ উৎসব আপনারও নয়, কামদেবেরও নয়, ইহা শুধু এই ব্রাহ্মণ বটুরই উৎসব।” ব্রতান্তে রাজা পাদ্য, অর্ঘ্য, মালাচন্দন ও প্রণামমাত্র লাভ করিবার সময় বিদূষক বদন্তঠাকুর রাণীর নিকট হাতভরা সস্তিবাচনের ডালি দক্ষিণা পান।

এই উৎসবে রাজা প্রজা সকলেই হিন্দোলায় দোল খাইতে খাইতে বসন্তোৎসবের মাধুর্য্য বিস্তার করিতেন। মহাকবি কালিদাস ইহার আভাস অনেক স্থানে দিয়াছেন,—রঘুবংশে উল্লিখিত হইয়াছে, দশরথ কামিনীভুজলতাল্পেষ-কণ্টকিত-কণ্ঠে হিন্দোলায় চলিতেন। যথা,—

“অনুভবন্নহবেলমুতুংসবং  
পটুরপি প্রিয়কর্ন্তজিঘৃক্ষ্মা।  
অনয়দাসনরজ্জুপরিগ্রাহে  
ভুজলতাং জলতামবলাজনঃ ॥” (রঘু ৯।৪৬)

এই দোল খাইবার কথা মালবিকাগ্নিমিত্রে রাণী ইরা-বতীর মুখেও বিবৃত হইয়াছে।

রত্নাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়, রাণী বাসবদত্তা অশোক-তরুন্মূলে কামদেবের অর্চনা করিতেছেন। পূজান্তে সৌভাগ্য-বতী সধবাগণ ঘে পতিপাদপদ্ম পূজা করিতেন, রাণী বাসবদত্তা

তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। অশোকবৃক্ষই মদনপূজার প্রস্তুতক্ষেত্র, সিদ্ধিদায়ক বলিয়া অশোক পঞ্চবটীর অন্তর্গত। ভগবান্ মন্মথের সঙ্গে ইহার আর একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই যে, তাঁহার সুবিখ্যাত পুশ্পময় পঞ্চবাণের মধ্যে অশোকপুশ্প একটি। বসন্তসমাগমে অশোকের কুসুমোদগমের বিলম্ব ঘটিলে, প্রেমদা-কুল প্রমাদ গণিয়া তাহার ফুল ফুটাইবার জন্ত মন্ত্রতন্ত্রের আশ্রয় লইতেন এবং অশোকবৃক্ষে চরণাবত করিতেন। অশোককে এইরূপ দোহা দান করা শাস্ত্রে কবিপ্রসিদ্ধি বলিয়া উল্লেখিত। যথা,—

“পাদাঘাতাদশোকং বিকশতি বকুলঃ যোষিতামাস্তমত্বেঃ।”

( সাহিত্যদ ৩য় প ০ )

শাস্ত্রকারগণ বসন্তসমাগমে অশোকতরুন্মূলে মদনপূজার ব্যবস্থা করায় কোশলে নরনারীগণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যকগ্রন্থে অশোকের অনেক গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

মদনপূজায় অশোকতরু প্রস্তুত হইলেও অঞ্জলিদানে চূত মঞ্জরীরই প্রাধান্য। মদনোৎসবের উল্লেখের সহিত ইহার আভাস আমরা শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্কে দেখিতে পাই। পশ্চাত্তাপতপ্ত হৃদয় মদনোৎসব নিবারণ করিবার জন্ত চূত-মঞ্জরীচয়ন নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পরভৃতিকা ও মধুকরিকা এ রহস্য না জানিয়া নবচূতাকুরোদগম দেখিবামাত্র আনন্দিতমনে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক মদনকে চূতাকুর দান করিয়া-ছিলেন। তাহাদিগের চূতাকুরদানের প্রাকৃত মন্তব্য এই;—

“গমো ভাবদে মমরধ্বজাষ।

অরিহসি মে চূতাকুর! দিগ্নো কামস্ব গহিদচাবস্ব

পাহিঅজগজ্জুঅইলক্কো পঞ্চস্তুরিআ সরোহোহুং। (শকুন্তলা ৬অঃ)

এতদ্ভিন্ন মালতীমাধব, বাসবদত্তা প্রভৃতি গ্রন্থেও মদনোৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মদনোৎসবের বাছাড়স্বর বড়ই হৃদয়োদ্দাদক, তাই নর-নারী ইহাতে সহজে অমুরক্ত হইত। ভারতের জায় সুখ-সেবাদেশের বসন্তসমাগম স্বভাবতঃই মনোরম। মনে হয়, ঋতুরাজ আস্ত্রপ্রভাবেই ভারতীয়গণকে প্রথমে বনজাত লতা-কুসুমের সুশোভিত করিয়া উৎসবময় করিয়াছিলেন। কালে তাহাই জাতীয় মহোৎসবে পরিণত হইয়াছিল। ক্রমে তাহার সহিত নৃত্য, গীত, আবীর, কুঙ্কম, হিন্দোলা ও সুরা প্রভৃতি সম্মিলিত হইয়া মধুমাসকে একান্তই মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল! মধুসমাগম সময়ে প্রিয়জনসম্মুখে সন্তমসকোচ ঘুচিয়া গিয়া কত নিভৃত হৃদয়ভাব সঙ্গীতরূপে উচ্ছৃঙ্খলিত হইয়া উঠিত। বৎসরের সেই একদিন!

. এই মহোৎসবের উদ্ভাসদৃশ্য যে কি স্বকোশলে চিত্রিত হইয়াছে, যেন এখনও তাহা প্রত্যক্ষের ভাষা প্রতীয়মান। রথায়ুধ প্রতিশব্দিত—মাদলের উদ্ভাস বাদ্যনিবাদ চারিদিকে প্রধাবিত—বিকীর্ণ আবীরচূর্ণে দিগন্ত আচ্ছন্ন,—যন্ত্রধারানিঃসৃত সুরজিত বারিধারায় গৃহাঙ্গণ প্রাবিত ও অঙ্গনাগণের সুরজিত পদবিমর্দনে কন্দমিত। নাচিয়া নাচিয়া নাগরীদল পরিপ্রাস্ত হইলে প্রণয়ীর কণ্ঠাঙ্গেবে বিগ্রামলাভ;—পুনরায় নৃত্য,—এ দৃশ্য যে কি হৃদয়োন্মাদক, তাহা রত্নাবলীতে বাণত হইয়াছে।

এই মদনোৎসব উপলক্ষে নৃত্য-গীতাদির ভাষা নাটক-তিনয়েরও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এত মদনোৎসব উপলক্ষেই ত্রিহর্ষদেবের সভায় রত্নাবলী-নাট্যকার প্রথম অভিনয় সূচসমাহিত হয়। ত্রিহর্ষদেব স্ত্রীপ্রসিদ্ধ বর্দ্ধনবংশীয়, শিলাদিত্য নামে পরিচিত। ৬১০ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিউএন সিয়াং ইহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই সময় ত্রিহর্ষদেব সমগ্র উত্তর-ভারতের সার্বভৌমিক সম্রাট। রত্নাবলীর প্রস্তাবনায় প্রকাশ,—এই মদনোৎসবে যোগদান করিবার জন্যই তাঁহার রাজধানীতে বহুসংখ্যক সামন্ত নরপতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, কত দিন হইতে এই ভারতীয় জাতীয় মহোৎসব হোলীতে পরিণত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া হ্র্ষট। তবে এপর্য্যন্ত জানা যায় যে, যখন ভারতের অতুল প্রতাপে সমগ্র এসিয়াখণ্ডের জল-স্থল সমুজ্জল ছিল;—স্থল-পথে গান্ধার বাহ্লীক, তিব্বত, তাতার ও মহাচীন এবং জলপথে লঙ্কা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও জাপান পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হইত, ভারতীয় বাণিজ্যদক্ষ বণিককুল ভারত ও প্রশান্ত-মহাসাগরবক্ষে অর্ণবপোতে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গমনাগমন করিত; নালন্দার স্ত্রীপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-বিদ্যালয়ে নানা-দেশীয় নানাজাতীয় অধ্যয়নশীল ছাত্রবৃন্দ বিবিধ বিদ্যার অমূল্য-শীলনপূর্ব্বক ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার দেশ-দেশান্তরে বহন করিয়া ভারতগোরব সর্বত্র স্ত্রীপ্রসারিত করিত; তখনও সেই গোরবের দিনেও এই মদনোৎসবের অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ ছিল।

অনেকে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের—

“চন্দনাশুক্রকন্তুরী কুঙ্কুমদ্রবসংযুতম্।

আবীরচূর্ণং রুচিরং গৃহতাং পরমেশ্বর।”

এই মন্ত্রে ত্রীকৃষ্ণকে আবীরপ্রদানের কথা উল্লিখিত দেখিয়া হোলীর স্ত্রী টানিয়া আনিতে পায়েন, কিন্তু ত্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদনোৎসবে আবীরচূর্ণ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই তখনকার দোল ছিল। এখন মদনোৎসবের পরিবর্তনের ভাষা আবীরেরও

বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে। বিলাতী-রঙের প্রভাবে নাগরিকগণের উত্তরীয় ও পরিধেয় নীল বেগুনি প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইতেছে। তখন মদনোৎসবে বস্ত্র-রঞ্জন কোমল, ব্যবহৃত হইত। আবীরের লাল ও কুঙ্কুমের পীতবর্ণের প্রাধান্য ছিল। তখন কাশ্মীর, বাহ্লীক ও পারসীক দেশ হইতে উত্তম, মধ্যম ও অধম-ভেদে ত্রিবিধ কুঙ্কুমের আমদানি হইত।

যখন ইসলামের নবোন্মিত মহাশক্তি ধীরে ধীরে পশ্চিম সাগর-তীরে পুঞ্জীভূত হইয়া ভারতসীমান্তে প্রসারিত হয়, তখনও ভারতবর্ষে মদনোৎসবের প্রাধান্য ছিল। অল্ বেরুণী-কৃত ভারত-বিবরণীতে তাহার পরিচয় পরিবর্তিত। বিখ্যাত পুরুষোত্তমদেব তত্রিচিত ‘হারাবলী’ শব্দকোষে হোলকাকে বসন্তোৎসব নামে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ‘কবিচরিত্রক’ নামক মরাঠী গ্রন্থে এই পুরুষোত্তমদেব শালিবাহন শব্দকেই চতুর্দশ শতকের কলিকাদিগণের উল্লিখিত। দায়ভাগেব টাকায় হোলকাশন ‘হোলী ইতি ভাষা’ বলিয়া ব্যাখ্যাত। অতএব মুসলমানশাসনসময়েই যে পুরাতন বসন্তোৎসব বা হোলকা ইদানীন্তন হোলী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

মদনোৎসব পরাধীন জাতির মধ্যদা রাখিতে অক্ষম। অবরোধপ্রথা ইহার সম্পূর্ণ অননুকূল। তাই মুসলমান-শাসনের প্রারম্ভে ও অবসানে এ উৎসবের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটয়াছে। পূর্বে মদনপূজার সঙ্গে বিষ্ণুপূজাও ছিল। এখন মদনপূজা গিয়া বিষ্ণুপূজা আছে। উভয় পূজারই বাহ্য অঙ্গ একরূপ ছিল; তাই আবীর-কুঙ্কুম-নৃত্য গীত সমান আছে কেবল যে উৎসব মহিলাকুলেরই আয়ত্ত ছিল, তাহা পুরুষ-সমাজে সংক্রামিত হইয়া নৃত্য-গীত-দোলারোহণ হইতে রমণী-দিগকে শতৈঃ শতৈঃ সরাইয়া দিয়াও এখন আবীরকুঙ্কুমের তরঙ্গহিলোল সমাহিত হইতেছে।

মদনোৎসব হোলীতে পর্য্যবসিত হইবার পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত হিন্দুর সর্বপ্রধান পর্ব বলিয়া মুসলমানদিগের নিকট পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগে কোম্পানী বাহা . দ্রের কলিকাতা গেজেটে যে ছুটির তালিকা প্রকাশ পায়, তাহাতেও হোলীর ছুটিই হিন্দুর সর্বাপেক্ষা বড় ছুটি ছিল। কাল ও অবস্থার বিপর্য্যয়ে সমাজের আচারব্যবহারের ভাষা উৎসব-আনন্দের প্রকৃতিরও যে কত বৈলক্ষণ্য ঘটে, ভারতীয় ইতিহাসে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট। পূর্বে পুষ্প-মালা ও চন্দনা দি মদনোৎসবে সমাদরে গৃহীত হইত। নাগরনাগরীরা পুষ্পমালা বিভূষিত হইয়া হিন্দোলায় দোল খাইত, এখন তাহা সমস্তই ত্রীরাধাকৃষ্ণের চরণারবিন্দে সর্মর্পিত।

মদনোৎসব এখন বিখ্যাত হোলীপর্বে রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ভগবন্নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উদ্দেশে এই হোলী উৎসব হইয়া থাকে। পুরীধামেও জগন্নাথের পূজা উপলক্ষেও হোলীর আয়োজন হয়। উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই ভগবানের উদ্দেশে ফাল্গুন গুরুপক্ষে প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এক পক্ষ পর্যন্ত ফল্গু-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। মদন-ভব্নের অনুক্রমিকা অবলম্বনেই হউক, আর হিমালীনিষিদ্ধ ঐতসমীরণাত্ম্যেই হউক, উৎকল মানবজাতি এককালে সমগ্র জগৎ জুড়িয়া এই উৎসবে মত্ত হইয়াছিল। নববসন্তে স্বভাবশোভাসম্পন্ন মানবপ্রাণে যে নবীন বিধান প্রকল্পিত উৎসাহ জাগাইয়া দেয়, তাহারই অনুকূলে এই বসন্তোৎসবের হইয়াছে। ভগবন্নারায়ণ সর্ব জগতের পালনকর্তা, তাহারই কৃপায় ধরা নবকলেবর ধারণ করিয়া জগদ্বাসীর পালনের উপযোগী হয় বলিয়াই মদনের বিকলে নারায়ণেরই পূজা বিধান প্রকীর্ণিত হইয়াছে। সতীপতি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলে সৃষ্টিকার্যের ব্যত্যয় ঘটে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বসন্তমুখা মদনের সাহায্যে দেবাদিদেব মহাদেবের তপোভঙ্গ করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবকোপে মদন ভস্মীভূত হয়। বসন্ত মদনের সহচর ছিলেন বলিয়া বসন্তকালেই মদনের পূজা বিহিত হয়। এক্ষণে তাহাই রূপকভাবে নারায়ণোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হোলিপর্বে পর্যাবসিত হইয়াছে।

গুপ্ত আমাদের বাসভূমি ভারতবর্ষে নয়, সুদূর ইংলণ্ড প্রভৃতি ইংরাজরাজ্যেও এই বসন্তপূজার বিধান দেখা যায়। পূর্বতন ইংরাজদিগের মে দিনে (Merry-makings on May Day) আনন্দোৎসবের বিধান ছিল, এখনও অনেক ব্রোপীয়েসের মধ্যে “May Fool” বানাইয়া আমোদ প্রমোদ করিবার রীতি আছে। মথুরার বাথেন গ্রামে যেরূপ বাছোন্দ্যমের সহিত হোলি-উৎসব সমাহিত হয়, ঠিক তদনুরূপ প্রক্রিয়াতে রোম-রাজধানীর ফালিক্ অর্গি (Phallic orgies) সম্পাদিত হইত। জুবিনেল (Juvenal) ও ক্যাটালাস্ (Catullus) কৃত গ্রন্থে তাহার বখেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ভারতীয় হোলিপর্বে গৌসাঁইদের ক্রিয়াপরম্পরা এবং কোতুককারীদিগের খোল করতালাদি বাদ্যাদ্যমের সহিত উন্মাদ নৃত্যনাদি ভীষণ ক্রীড়াপ্রদর্শনী দেখিলে স্বতঃই সিবি্লির কেরিবেণ্টিস্ বা ফ্রিজিয়ান্ পুরোহিত (Corybantes or Phrygian priests of Cybele) দিগের কথা মনে পড়ে। গ্রীস-রাজ্যেও ডিওনিসিয়ায় ভারতীয় হোলি-উৎসবের প্রতিক্রম নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানেও শস্ত-শ্রামলাপ্রকৃতির প্রতিমূর্তি ফেলাসের (Phallus) উৎসবে

দোলঘাতার জায় একটা যাত্রা ও উৎসব সংঘটিত হইত এবং বর্তমান ব্রজবাসীদিগের জায় তাহারাও মদ্যপানে বিভোর হইয়া চিত্তমুগ্ধ উপলব্ধি করিত। ফেলাসের উৎসবে মদ্যপান না করা উৎসবকারীর পক্ষে ঘৃণার বিষয় ছিল।

মদনমালিনী (স্ত্রী) বাসবদত্তায় বর্ণিত নায়িকাভেদ।

মদনমোদক (পুং) বাজীকরণাধিকারে মোদক ঔষধবিশেষ। এই মোদক স্বল্প ও বৃহৎ ভেদে দুই প্রকার। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিকলা, কুড়, শটী, সৈন্ধবলবণ, ধনিয়া, কাকড়াশুকী, তালীশপত্র, কটফল, নাগেশ্বর, বম্বানী, বনবম্বানী, যষ্টিমধু, মেথি, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, ঈষদ্ ভজ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ, সমবেত চূর্ণের সমান, সর্বসমষ্টি সমান চিনি এবং এই পরিমাণে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুতের নিয়মানুসারে এই মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা ঐ স্বল্প মদনমোদক।

মহামদনমোদক-প্রস্তুতপ্রণালী—শতাবরীচূর্ণ, ভূমিকুয়াণ্ড-চূর্ণ, বেড়েলার মূলচূর্ণ, গোরক্ষচাকুলিয়ার ছালচূর্ণ, গোস্তুর-বীজচূর্ণ, কুলেবাড়ার বীজচূর্ণ, আলকুণীবীজচূর্ণ, প্রত্যেকে সমভাগ মিলিত ২ পল; ঘৃতভজ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ ৮ পল, শর্করা ৩২ পল, পাকার্থ শতমূলিরস, ভূমিকুয়াণ্ডরস এবং দুগ্ধ প্রত্যেকে ৮ পল (মতান্তরে দুগ্ধ ১৬ পল), এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঘটানিয়মে পাক করিবে, পরে পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া তাহাতে কৃষ্ণতিলচূর্ণ ২ পল, প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, শুড়তুক, তেজপত্র, এলাইচ, সৈন্ধব, ধনিয়া, জায়ফল, জয়িতী, বালা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, কুন্দকুথোটি, মূতা, মউরা, মুরামাংসী, জটামাংসী, তালীশপত্র, তেজপত্র, বারেন্দ্র (পচাপাতা), গেটেলা, হরীতকা, গুল্ফা, চই, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকণ্ঠ ও শৈলজ এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে সকল দ্রব্য ভজ্জনযোগ্য, গন্ধ-বৃদ্ধির জন্ত তাহা ভাজিয়া চূর্ণ করিবে, এই সকল চূর্ণ দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে মিলাইয়া ২ পল, সৈন্ধব ও ত্রিকটুচূর্ণ যে পরিমাণে দিলে স্বাদ হয়, সেই পরিমাণ বিবেচনা করিয়া দিতে হইবে। মোদক প্রস্তুত হইলে এই মোদক ত্রিকটু ও ত্রিজাতকচূর্ণে আলোড়িত করিয়া ভাঙে তুলিতে হইবে।

এই মোদক বাজীকরণাধিকারে প্রধান মোদক। ইহা সেবন করিলে অধিক রমণীসংসর্গে ক্ষমতা জন্মে। (রসরত্নাং) মদনমোদনী (স্ত্রী) গণিকারিকা। (বৈজ্ঞকনিং)।

মদনমোহন (পুং) মদন উন্মাদকচ্চাসৌ মোহনশ্চেতি কর্মধাং, মুহ-গিচ-ল্যু। শ্রীকৃষ্ণ।

“বন্ধে মদনপোপালং কৈশোরাকারমদভূতম্।

বমাছথে বিনোদীয়ে শ্রীমদমদনমোহনম্॥” (পদ্মপুং পাতালখণ্ডে)

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ১৭৩৪ শকে (১৮১৫ খৃঃ অঃ) নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিশ্বগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইহার পিতা ৮রামধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের একজন পুস্তকলেখক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় ভ্রাতা ৮রামরত্ন চট্টোপাধ্যায় ঐ কার্যভার প্রাপ্ত হন। ইনি প্রথমে পিতৃহীন ভ্রাতৃপুত্র মদনমোহনকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া সংস্কৃত-কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। কিছুদিন এখানে থাকিয়া মদনমোহনের সীড়া জন্মে, কাজেই তাঁহাকে পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া বাইতে হয়। দেশে একটি চতুষ্পাঠী ছিল, সেইখানে তিনি ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পরে পুনর্বার সংস্কৃত-কলেজে প্রবেশপূর্বক তিনি ১৭৬৪ শক [ ১৮৪২ খৃঃ অঃ ] পর্যন্ত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ইংরাজীতেও কিঞ্চিৎ ব্যাপ্তি লাভ হইয়াছিল।

পঠদশাতেই ৮ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ছই জনেই সংস্কৃত-কলেজের সমুচ্ছল রত্নস্বরূপ হইয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় মদনমোহন রসতরঙ্গিনী ও বাসবদত্তা নামে দুইখানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি দেখিয়া স্নকবি ৮জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিতশ্রবর ৮প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি সংস্কৃত-কলেজের তাত্‌কালিক অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহার প্রতি প্রশংসা হইয়া তাঁহাকে কবিত্বের অমুরূপ কাব্যরত্নাকর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পরে তিনি তাঁহার বহুগণ কর্তৃক তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

পাঠসমাপনান্তে তর্কালঙ্কার মহাশয় যথাক্রমে কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালা, বারাসতবিদ্যালয়, কলিকাতা-ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও কৃষ্ণনগর-কলেজে অধ্যাপনা করিয়া পরিশেষে ১৭৬৯ শকে (১৮৪৭ খৃঃ অঃ) কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্যাদ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার অধ্যাপনা ও সদালাপে ছাত্রগণ বিশেষ পরিতুষ্ট হইতেন। তিনি যে কেবল নামেই মদন ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার রমণীয়রূপ, সর্বজন-হৃদয়াজ্ঞাদক রসিকতা ও সহাস্তবদন-বিনির্গত সুধারসবর্ষী বাক্যালাপে তাঁহাকে প্রকৃতই ‘মদন’ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ৩ বৎসর কালমাত্র সংস্কৃত-কলেজে ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি দেশহিতকর কার্যের আয়োজন করিয়া যান। তিনি কলিকাতা মহানগরীতে ‘সংস্কৃত বঙ্গ’ নামে মুদ্রায়ন্ত্র স্থাপন করিয়া অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। এই সময়ে শিক্ষা-

সমাজের অধ্যক্ষ জে, ই, ডি, বেথুন সাহেবের সাহিত্য তাঁহার পরিচয় হয়। উক্ত বেথুন সাহেব এতদেন্নীয় কামিনীকুলের বিদ্যাশিক্ষার জন্ত কলিকাতায় একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রধান উদ্যোগী হইয়া হেডমা পুর্করিগীর তীরে বালিকাবিদ্যালয়-সংস্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি মহ-নির্দোষত্বের ‘কথাপোষং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিস্বতঃ’ বচন উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে বালিকাবিদ্যালয়গামী করিতে চেষ্টা পান এবং যাহাতে এতদ্বিশেষে সাধারণের উৎসাহ জন্মে, এজন্ত সমাজচ্যুতির ভয়কেও ভ্রক্ষেপ না করিয়া স্বীয় দুইটি কন্যাকে ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন।

এই সময়ে বালক-বালিকাগণের পাঠোপযোগী শিশুবোধক ও নীতিশিক্ষা ভিন্ন অপর পুস্তকের অভাব দেখিয়া তিনি শিশু-শিক্ষা প্রণয়ন করেন। সেই সময়েই ‘সংস্কৃতভরতী’ নামী একখানি মাসিক পত্রিকা তাঁহারই বস্ত্রে প্রচারিত হয়। এই পত্রিকায় তদ্রচিত শ্রীশিক্ষাবিবক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সাধারণে তাঁহার ওজস্বিতার বিশেষ পরিচয় পাইয়া-ছিলেন। মহাত্মা বেথুন, তর্কালঙ্কারের এই অসীম অধ্যবসায়ের পুঙ্কার দিতে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তেজস্বী ব্রাহ্মণ তাঁহার উপকারপ্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখেন নাই।

১৭৭২ শকে (১৮৫০ খৃঃ অঃ) তিনি মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং ক্রমাগত ৬ বৎসর কাল ঐ কার্য করিয়া সেই স্থানেই ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটপদে নিযুক্ত হইলেন। জুঃথের বিষয়, মুর্শিদাবাদে কাণ্ডভারপ্রাপ্তির পর, তিনি এককালে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বহরম-পুর ত্যাগ করিয়া তিনি উক্ত জেলার কান্দীনামক স্থানে ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট হইয়া গমন করেন। এখানে বিস্মৃতিকারোণে আক্রান্ত হইয়া ১৭৭৯ শকে (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার জীবনীলা শেষ হয়। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গবাসীর এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

তাঁহার অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা জন্মিয়া ছিল। তন্মধ্যে মাত্র কএকটি কন্যা জীবিতা আছেন। কন্যাগণের মধ্যে কেহ কেহ পৈত্রিক কবিত্বশক্তির কিঞ্চিৎ উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। দেশীয় কামিনীগণের উন্নতিবিধানার্থ তর্কালঙ্কারকে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। স্বীয় কন্যাাদিগকে বালিকাবিদ্যালয়ে প্রেরণ ও বিধবাবাবাহের সুহায়ত্বকরণ অপরাধে তাঁহাকে নিজ বাসগ্রামে ৮৯ বৎসর সমাজ-বহিষ্কৃত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে রসতরঙ্গিনীই প্রথম রচনা। ইহাতে

কএকটি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের পড়াহুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।  
সংস্কৃত কবিতার এরূপ সরল ও মধুর অহুবাদ ভারতচন্দ্র  
ভিন্ন আর কেহই করিতে পারেন নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে  
( ১৭৫৮ শকে ) যশোর জেলার নওয়াপাড়া-নিবাসী জমিদার  
৮কালীকান্ত রায়ের প্ররোচনায় তিনি স্ববদ্ধ কবির সংস্কৃত  
বাসবদত্তাকে পন্ন্যাসাদি ছন্দে প্রণয়ন করেন। ইহাই তাঁহার  
দ্বিতীয় গ্রন্থ। অতঃপর তিনি বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ  
১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা সঙ্কলন করেন। তাঁহার  
এই তিনখানি গ্রন্থ বালক-বালিকাদিগের বর্ণমালাশিক্ষা ও  
প্রাথমিক পাঠের বিশেষ উপযোগী। প্রথম ভাগের শেষে অসং-  
যুক্ত হলবর্ণে সরল ও মধুর যে কবিতা তিনি রচনা করিয়া গিয়া-  
ছেন, তাহা অসামান্য-প্রতিভাপ্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে।  
৮বিদ্যাসাগরপ্রণীত ১ম ও ২য় ভাগ বর্ণগরিচয় তাঁহার  
১ম ও ২য় ভাগ শিশুশিক্ষার স্থান অধিকার করিয়াছে বটে,  
কিন্তু ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষার ভ্রায় স্কুমারমতি শিশুদিগের  
পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তক বোধ হয় এপর্যন্ত রচিত  
হয় নাই। নিম্নে কয়খানি গ্রন্থ হইতে তাঁহার কবিত্ব-প্রতি-  
ভার পরিচয় প্রদত্ত হইল—

বাসবদত্তায়—কামিনীর সজ্জা।

হৃদিবিলাসে পটুবসনা। কুচ-কলসে কৃতকসনা ॥  
শ্রব অলসে মুহুসনা। তহু উলসে মদনসনা ॥  
জ্বনতটে ধৃতরসনা। অধরপটে স্নিত-দশনা ॥  
জিতবরটা গজগমনা। অরুণথটা সমচরণা ॥  
কনকছটা-জিনি বরণা। চমরসটা কচরচনা ॥  
ভগতি যথাগতমতিনা। কবি মদন দ্রুতগতিনা ॥

কামিনীর রূপবর্ণন।

কুটিল কুন্তলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী।  
কুণ্ডলী করিয়া যেন কালকুণ্ডলিনী ॥  
রমণী স্বরূপমণি সদা রক্ষা করে।  
তার চোরে অপাঙ্গভঙ্গীর বিবে জারে ॥  
ভালে ভাল বিলসিত অলকা বিলাসে।  
মুখপদ্ম-মধু-আশে অলি আসে পাশে ॥  
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ-স্বয়মা।  
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা ॥  
ফুলধরু ছাড়ি ধরু দেখিয়া ভ্রুধরু ॥  
অভিমান হর হতাশনে ত্যজে তরু ॥  
নাসাবংশ নয়নযুগল মাঝে শোভে।  
যেন বৈসে শুকপক্ষী গুপ্তবিষলোভে ॥

কিংবা নেত্র-সুখাসিন্দুবিভাগের হেতু।  
তার মধ্যে বুঝি বিধি বাঁধিয়াছে সেতু ॥  
সুদীর্ঘ নয়ন তাতে রঞ্জিত-অঞ্জন।  
সে চাক্ষু্য শিখিবারে চঞ্চল খঞ্জন ॥  
একেত অসহ শর কটাক্ষ বিষম।  
তাহাতে অঞ্জন কটু কালকূট সম ॥  
কি কহিব অধর অধর করে বিষ।  
অহুমানি ত্রিভুবনে নাহি প্রতিবিষ ॥  
কুন্দ-সুকুমুমসম দশনের শোভা।  
ঈর্ষায় দাড়িষ বীজ বুঝি শোণ-আভা ॥  
হাস্তমুখা সে যখন মুহু মুহু-হাসে।  
পন্ন্যাসগোপরি কত মুক্তা পরকাশে ॥  
শোভে ভূজমৃগাল লাবণ্য-সরোবরে।  
পানিপদ্মপ্রকাশে নখর-রবিকরে ॥  
\* \* \* \* \*  
স্বলনী মধ্যখানি কি বাধানি তার।  
আছে কিনা আছে অহুমান করা ভার ॥  
\* \* \* \* \*

নিজ নিপুণতা ধাতা জ্ঞাপন করিতে।  
অপরূপ রূপ তার সৃজিল জগতে ॥  
তার নিদর্শন দেখে এই বিপরীত।  
নখচন্দ্রের করে পাদপদ্ম বিকশিত ॥  
বুঝি মণি নুপুরের করি কলধ্বনি।  
পঞ্চশরে পঞ্চশরে জাগায় সে ধনী ॥  
সপ্তস্বরাস্বরসম স্তনি তার স্বর।  
বুঝি পিক উছ উছ করে নিরন্তর ॥  
হেরি হরে হেন মন পুনঃ পাওয়া ভার।  
মদনের মোহ হয় ভাবি রূপ তার ॥

রসতরঙ্গিনীর একটি সংস্কৃতশ্লোকের অহুবাদ,—

কমলিনী মলিনী দিবসাত্যায়ে শশিকলা বিকলা ক্ষণদ্বাক্ষরে,  
ইতি বিধিবিদধে রমণীমুখং ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ ॥  
নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে।  
দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে ॥  
ইহা দেখি বিধি কৈল রমণীর মুখ।  
দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্রে সুখ ॥  
অতএব একবারে বিজ্ঞ হওয়া ভার।  
দেখিয়া স্তনিয়া হয় নৈপুণ্য সবার ॥ ইত্যাদি।

মদনরাজ ( পুং ) মদনপাল।

মদনরিপু ( পুং ) মদনত্ৱ রিপুঃ। ১ শিব। ২ মদনকল।

মদনরেখা (স্ত্রী) বিক্রমাদিত্যের মাতা।

মদনললিতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৬টি করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

• “বেদান্ধৈর্মদনললিতা মোভো নমলসাঃ।” (রত্নরত্না•)

এই ছন্দের, ১, ২, ৩, ৪, ১০, ১১, ১২, ১৬ অক্ষর গুরু, তত্ত্বিন্ন বর্ণ লঘু।

মদনলেখ (পুং) মদন-জ্ঞাপনার্থং লেখঃ। স্বকীয় অমুরাগ-জ্ঞাপনের অস্ত্র নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি প্রেরিত পত্র।

মদনলেখা (স্ত্রী) বারানসীরাজ প্রতাপমুখের কন্যা।

(কথাসরিংসা•)

মদন বনারস, উঃ পঃ প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। এখানে মদন নামধেয় জনৈক রাজার আশ্রয় ও মদনেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। আইন-ই-অকবরিতে এই স্থানের নামোল্লেখ আছে। পরে সন্ন্যাসী অকবরশাহের জোনপুরের শাসনকর্তা খাঁ জম্মান ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই প্রাচীন নগরভাগে নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জম্মানিয়া নামকরণ করেন।

মদনবর্ষদেব, চন্দ্রলবঙ্গীয় জনৈক রাজা। পৃথ্বীবন্দ্যার পুত্র। হিনী স্বীয় ভূজবলে চৈদি ও মালবরাজ্য জয় এবং কাশীরাজকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। শিলালিপি হইতে ১১২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিজয়মানকাল স্থচিত হয়।

মদনবেগ (পুং) বিদ্যাধরদিগের রাজভেদ।

মদনশলাকা (স্ত্রী) মদনোদ্দীপিকা শলাকেব অন্তঃ কামোদ্দীপকত্বাৎ তথাৎ। ১ কামোদ্দীপক ঔষধ। ২ সারিকাপক্ষী। (মেদিনী) ৩ কোকিলা। (শব্দরত্না•)

মদনসদন (স্ত্রী) ১ জ্যোতির্ভেদ। ২ লগ্নাবধিক সপ্তম স্থান।

মদনসারিকা (স্ত্রী) মদনোদ্দীপনায় সারিকা। ১ পক্ষিভেদ, চলিত শালিক শাখী, পথ্যায়—শলাকা, সারিকা, চিত্রগোচনা, কুণ্ণী। (জটধর)

মদনসিংহ, ১ যোগেশতক নামে আয়ুর্বেদশাস্ত্ররচয়িতা। ২ শক্তিসিংহের পুত্র। হিনী মদনরত্নপ্রদীপ নামক গ্রন্থপ্রণেতা বলিয়া প্রকাশ।

মদনসুন্দর ভাস্করদেব, কিসেড়ির জনৈক সামন্তরাজ।

মদনসেনা (স্ত্রী) তাম্রলিপ্তরাজ বীরভদ্রের কন্যা।

মদনহরা (স্ত্রী) প্রাকৃত ছন্দোভেদ।

মদনা, স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষিবিশেষ। ইহার দেধিতে অনেকাংশে টিয়া পাখীর মত। কেবল ঠোঁট ও বক্ষদেশ লাল। অপর চারি পার্শ্ব গোলাপী ও পাণ্ডটে, গায়ে সবুজবর্ণ। ইহার সুন্দর বুলি কাটিয়া দেবকথা কহিতে পারে।

মদনাগড়, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। পীরজাগড় শৈলমালার পশ্চিম ঢালুদেশে একটি স্বভাবসুন্দর বাঁধের সমীপে অবস্থিত। অক্ষা• ২০°৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি• ৭৯°৩২' পূঃ। পরন্তুগাত্রাবাহী একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর জলরাশি সুদীর্ঘ বাঁধ দ্বারা এই জলাশয়ে আনীত হইয়াছে। বাঁধের শেষসীমায় একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। নগরভাগ পরিত্যক্ত হইলেও, উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে এখনও চান্দাবাস চলিতেছে।

মদনাগ্রক (পুং) মদনঃ উন্মাদকঃ অগ্রং শিরোভাগো যন্ত। কোদ্রব। (রাজনি•)

মদনাকুশ (পুং) মদনস্ত্র অকুশ ইব। পুরুষচিহ্ন, লিঙ্গ, উপস্থ। (ত্রিকা•) ২ মৈথুনকালে নখাঘাত।

মদনাচায্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

মদনাদিত্য (পুং) কাশীরের জনৈক রাজা। (রাজত• ৬। ১৩৩)

মদনাস্তক (পুং) মদনস্ত্র অন্তকঃ। শিব।

মদনায়ুধ (পুং) মদনস্ত্র আয়ুধঃ। ১ ভগ। (শব্দচ•) ২ মদনের অস্ত্র।

মদনায়ুধ (পুং) মদনস্ত্র আয়ুর্জীবনং ইব সমাসাত্তোহ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ কামবর্দ্ধকত্বাত্তথাত্ত্বং। কামবর্দ্ধিকুপ। (রাজনি•)

মদনালয় (পুং) আলীয়ার্তেহ্মিন্নিত আ-লী-অধিকরণে অচ্, মদনস্ত্র অলয়ঃ। ১ ভগ, জ্যোতির্হ। ২ লগ্নাবধি সপ্তমস্থান, জায়ান্তান।

মদনাবস্থা (স্ত্রী) মদনস্ত্রাবস্থা। কামাবস্থা, এই অবস্থা উদ্বেগরূপা, অধাৎ বিরহ। “ততঃ প্রবিশতি সমদনাবস্থো রাজা নিঃশ্বস্ত—  
জানে তপসো বাঁধ্যং সা বালা পরবর্তীতি মে বিদিতং।  
ন চ নিম্নাদিব সলিলং নিবর্ততে মে ততো হৃদয়ম্॥”  
(শকুন্তলা ৩অ•)

মদনিকা (স্ত্রী) মুচ্ছকটিক-বণিত একজন নায়িকা।

মদনী (স্ত্রী) মাতৃতি অনয়া ইতি মদ-করণে ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ সুরা। (হারাবলী) ২ কন্তুরী। ৩ অতিমুক্তক। (রাজনি•) ৪ মেথিকা। ৫ মণ্ড। ৬ ধাতকীবৃক্ষ।

মদনীয় (ত্রি) ১ মণ্ড। ২ মদনোদ্দীপক বস্তু।

মদনীয়হেতু (পুং) ১ ধাতকীবৃক্ষ, ধাইফুলের গাছ।

(বাভট হৃত্ত্বাহা• ২৫ অ•)

মদনীয়ী (স্ত্রী) মল্লিকাবৃক্ষ। (বৈজ্ঞানিকনি•)

মদনেচ্ছাফল (পুং) মদনেচ্ছাং ফলতি জনয়তীতি অচ্। বক্রদাল, আত্রবৃক্ষ। (রাজনি•)

মদনোৎসব (পুং) মদনায় উৎসবঃ। উৎসববিশেষ।

চলিত হোলাকা-উৎসব। পর্যায়—সুবসন্তক। (হারাবলী)  
[মদনমহোৎসব দেখ।]

মদনোৎসব (স্ত্রী) মদনার উৎসবো যন্তাঃ। স্বর্গবেত্তা।  
মদনোদ্যান (স্ত্রী) ১ সুরমা উদ্যান। ২ মালতীবাধব-বণিত  
উদ্যানভেদ।

মদপতি (পুং) ১ সৌমরসের কর্তা। ২ ইন্দ্র ও বিষ্ণুর  
নামান্তর।

মদপোল্লম্, (মেধবায়পলম) মাজ্জাজ-প্রেসিডেন্সীর গোদা-  
বরী জেলার নর্শাপুর নগরের উপকণ্ঠস্থিত একটি গওগ্রাম।  
অক্ষা° ১৬°২৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°৪৪'২০" পূঃ। এখানে  
মাদাপালাম্ নামক উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্রবয়নের কারবার  
আছে, ইংরাজবণিক্ সম্প্রদায়ের মহলিপত্তন-কুঠী হইতে  
এখানকার বস্ত্রের বাণিজ্য চালিত হইয়া থাকে।

মদপ্রয়োগ (পুং) মদস্ত প্রয়োগঃ। করিমিগের মদো-  
ক্ষম। পর্যায়—ব্যস্তার। (ত্রিকা°)

মদভঞ্জিনী (স্ত্রী) মদং উন্মত্ততাং তনক্তি, দূরীকরোতিতি  
মদ-ভন্জ (নলিগ্রহিপচাদিতো ল্যুণিনাচঃ। পা ৩।১।১৩৪)  
ইতি গিনি, স্ত্রিয়াং ভীপ্। শতমূলী। (শব্দচ°)

মদবন্ত (ত্রি) মদেন মত্তঃ। ১ মদদ্বারা উন্মত্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্।  
২ ছন্দোভেদ।

মদমুচ্ (ত্রি) মদ-মুচ্-কিপ্। মদস্রাবী।

মদয়ন্তিকা (স্ত্রী) মদয়ন্তী ততঃ কন্ টাপ্, পূর্ব্বত্বশ্চ।  
মল্লিকা। (শব্দরত্না°)

“ত্রিফলায়ক্ ত্রিকটুকা সুরমা মদয়ন্তিকা।”

(সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থ্য° ৯অ°)

মদয়ন্তী (স্ত্রী) মদ-অচ্, ভীপ্। বনমল্লিকা, চলিত কাট-  
মল্লিকা। (রত্নমালা) ২ মল্লিকা।

মদয়ন্তী, সুর্যাবংশীয় কল্যাণপাদ-রাজপত্নী। [কল্যাণপাদ  
শব্দ দেখ] ব্রাহ্মণীর শাপে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম হইয়া রাজা  
স্বীয় পত্নী মদয়ন্তীকে বশিষ্ঠহস্তে প্রদান করেন। বশিষ্ঠ  
দ্বারা মদয়ন্তীর গর্ভসঞ্চারণ হয়। সাতবৎসর কাল কিছুই  
সন্তানাদি প্রসূত হইল না দেখিয়া প্রসূতর দ্বারা তাঁহার গর্ভ  
বিদারণ করা হইল। জাতপুত্র অশ্বক নামে বিদিত হইলেন।

মদয়িত্ত (ত্রি) মদ-গিচ্-তৃচ্। মত্ততা-জনক।

“কিসলয়প্রসবোহপি বিলাসিনাং মদয়িত্তাদয়িত্তাপ্রবণাপিতঃ।”

(রঘু ৯।৩১)

মদয়িত্তু (স্ত্রী) মদয়তিতি মদ-গিচ্ (তুনিহুবিপুংগিদসি-  
ভোগেরিত্তুচ্। উণ্ ৩।২২) ইতি মদি-ইত্তুচ্, (অসাম-  
জাভাযোংবিহুয়ু। পা ৬।৪।৫৫) ইতি পেরদাদেশঃ। ১ মদ্য।

(পুং) ৩ কামদেব। ৩ শৌণ্ডিক। (শব্দরত্না°) ৪ মদযুক্ত।  
(মেদিনী) ৫ মেঘ। (ত্রিকা°)

মদরাগ (পুং) ১ মদন। ২ মত্ততাজনিত ক্রোধযুক্ত ব্যক্তি।  
৩ মত্ত কুকুট।

মদপতিপুর (স্ত্রী) কাশ্মীরের একটি নগর। (রাজত° ৭।২৬৭)  
মদলেখা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে  
৭টা করিয়া অক্ষর হইবে। ইহার লক্ষণ—

“মেদো গঃ স্ত্র্যাং মদলেখা” (বৃত্তরত্না°) ১, ২, ৩, ৬  
ও ৭ অক্ষর গুরু, তত্ত্বিন্ন বর্ণ লঘু। ২ গজের দানবারিপত্জি।

মদবরবিলগম্, মাজ্জাজ-প্রেসিডেন্সীর তিলেবরী জেলার  
অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২° ৩০' উঃ এবং দ্রাঘি°  
৭৭° ৫৮' ২০" পূঃ। ত্রিবিম্বিত্তুর নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।  
এখানে একটি সুন্দর মন্দির ও শিবধ্বজ বিদ্যমান আছে।

মদবারি (স্ত্রী) হস্তীর মদকল।

মদবিক্ষিপ্ত (পুং) মদেন বিক্ষিপ্তচলিতমনাঃ। মত্তহস্তী।

মদবুদ্ধ (ত্রি) সোমপানে দুষ্ট।

মদবৃন্দ (পুং) ১ হস্তী। ২ মদসমূহ।

মদশাক (পুং) মদকরঃ শাকোহস্ত। উপোদকী, চলিত  
পুঁই। (রাজনি°)

মদশৌণ্ডক (পুং) জায়ফল।

মদসার (পুং) মদং সারয়তি দূরীকরোতি ইতি মদ-স-গিচ্,  
অণ্। তুলবৃক্ষ। (রাজনি°)

মদস্থল (স্ত্রী) মদস্ত স্থলং। ১ মদস্থান, সুরাপানস্থান।  
২ সুরাপান।

“অবদংশঃ সুরাপানং শুণ্ডাপানং মদস্থলম্ ॥” (শব্দরত্না°)

মদস্থান (স্ত্রী) মদস্ত স্থানং। মত্তপানস্থান, পর্যায়—শুণ্ডাপান।

মদহস্তিনী (স্ত্রী) মদেন হস্তিনীব। মহাকরজ। (রাজনি°)

মদাহি, আসাম-প্রদেশবাসী পাক্তীয় ব্রাহ্মজাতিবিশেষ।  
মণিপুর নীমাঙ্গেই ইহাদের বসবাস দেখা যায়।

মদহেতু (পুং) মদস্ত হেতুঃ। ১ ধাতকী। ২ মত্ততাকারক।

মদাঘ (পুং) ঋষিভেদ।

মদ্যাচ্য (পুং) মদেন মদজনকরসেন তাড়ীতি ষ্যাভেন আচ্যঃ  
যুক্তঃ। ১ তালবৃক্ষ। (ত্রি) ২ মদযুক্ত।

মদ্যাচ্য (স্ত্রী) মদেন আচ্য। লোহিতকিণ্টী। (শব্দচ°)

মদাতক্ক (পুং) মদজনিতঃ আতক্কঃ রোগঃ। মদাত্যয় রোগ।  
(রাজনি°) [মদাত্যয় দেখ]

মদাত্যয় (পুং) মদেন অত্যয়ো নাপোমুখতা অজ। মদ্যপান-  
জনিত রোগবিশেষ, পর্যায়—মদাতক্ক, পানাত্যয়, মদব্যাদি,  
মদ। (রাজনি°)



এই রোগের নিদান—

“বিষম্ যে গুণা দৃষ্টাঃ সন্নিপাতপ্রকোপণাঃ ।

ত এব মত্তে দৃষ্টন্তে বিষে তু বলবত্তরাঃ ॥

• তন্মাদবিধিপীতেন তথা মাত্ৰাধিকেন চ ।

যুক্তেন চাহিতৈরনৈরকালে সেবিতেন চ ॥

মত্তেন থলু জায়ন্তে মদাত্যয়মুখাগদাঃ ।” ( মাধবনি )

বিষে ধেরূপ সন্নিপাত-প্রকোপণাদি গুণ আছে, মত্তেও সেই সকল গুণ অবস্থিতি করে, কিন্তু বিষে আধিক্যরূপে থাকে, এ কারণ অনিয়মে, অধিকমাত্রায় বা অহিতজনক দ্রব্যসহযোগে অকালে মত্তপান করিলে এই মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হয়। অবৈধ মত্তপানে নানাপ্রকার বিকার উপস্থিত হয়। আহারীয় দ্রব্য ব্যতিরেকে অনবরত মত্তপান করিলে অত্যন্ত ক্লেশকর মদাত্যয়াদিরোগ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই শরীর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

এই রোগের অন্তর্বিধ কারণ—ক্রোধযুক্ত, ভীত, পিপাসার্ত, শোকাভিভূত, ক্ষুধিত, ব্যায়ামকারী, ভারবাহী ও পর্যটন-প্রযুক্ত, ক্ষীণ, মলমূত্রাদির বেগরোধকারী এবং অতিষাভাদি দ্বারা আহত ব্যক্তি মত্তপান করিলে তাহার নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। অত্যন্ত জলপান অথবা অতিশয় রুক্ষদ্রব্য সেবন-হেতু উদর ক্ষত হইলে ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণবস্থায় এবং দুর্বল অবস্থায়ও মত্তপান করিলে মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হয়।

এই রোগের সামান্য লক্ষণ—অত্যন্ত শারীরিক ক্লেশ, মোহ, হৃদয়ে বেদনা, অরুচি, সর্বদা পিপাসা, জ্বর, কখন শীত, কখনও বা উষ্ণবোধ, শিরঃপীড়া, পার্শ্ব ও ত্রিকস্থানে বেদনা, অস্থিসন্ধিসমূহে বেদনা, অতিশয় জ্বন্তগ, শ্বস্রগ, কম্পন, শ্রান্তিবোধ, হৃদয়ের অবরোধ, কাস, হিকা, শ্বাস, নিদ্রাক্ষয়, শরীরকম্প, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, মলভেদ, কফজ বমনোদগ, ভ্রম, প্রলাপ ও অসাড়তার লক্ষণ প্রকাশ হয়। রোগী চিত্তভ্রংশ হইয়া তৃণ, ভক্ষ, লতা, পত্র ও ধূলিপূর্ণ বা পক্ষিগণ কর্তৃক আক্রান্ত বোধ করে এবং ব্যাকুলতার সহিত অলীক স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে।

এই মদাত্যয় রোগ বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, শ্লেষ্মজ্বর এবং ত্রিদোষজ্বর। বাতজ্বর মদাত্যয়ের নিদান—দ্রুতগতি, শোক, ভয়, ভারবহন ও পর্যটন দ্বারা দেহক্লেশ। রুক্ষদ্রব্য বা অন্ন ভোজনকারী ও পরিমিতাশনকারী ব্যক্তি যদি রুক্ষ ও পরিণত মত্ত রাত্রিজাগরণ করিয়া অধিকমাত্রায় পান করে, তবে তাহার শীঘ্রই এই বাতজ্বর মদাত্যয় রোগ উপস্থিত হয়। এই বাতিক মদাত্যয় রোগে হিকা, শ্বাস, শিরোবর্ণন, পার্শ্বশূল, অনিদ্রা, এবং অত্যন্ত প্রলাপ উপস্থিত হয়।

XIV

১০

পিত্তজ্বর মদাত্যয়ের নিদান—অত্যন্ত অন্ন, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভোজন। ক্রোধাধিত ব্যক্তি যদি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ও অন্ন মত্ত অধিকমাত্রায় পান করে, তাহা হইলেও এই তীব্রতর পৈত্তিক মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে পিপাসা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্মোদগম, মোহ, অতীসার, বিভ্রম এবং দেহ হরিদ্বর্ণ হয়।

শ্লেষ্মিক মদাত্যয়ের নিদান—যে ব্যক্তি কোন প্রকার পরিশ্রম করে না, অথচ দিবানিদ্রা, শয়ন ও উপবেশন-সুখে রত এবং মধুর, স্নিগ্ধ ও গুরু দ্রব্য ভোজন করে, সেই ব্যক্তি অধিকমাত্রায় মত্ত পান করিলে তাহার শীঘ্রই শ্লেষ্মিক মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে বমি, অরুচি, ক্ষয়, তন্দ্রা ও যেন শরীর আদ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং দেহের গুরুত্ব ও শীতলতা বোধ হয়।

ত্রৈদোষিক মদাত্যয় রোগে উক্ত সকল প্রকার লক্ষণ হয়, এবং উপরি উক্ত মিলিত সমস্ত হেতু দ্বারা এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই মদাত্যয়রোগ পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পান-বিভ্রমভেদে বহু প্রকার। কফাধিক্য, দেহের গুরুতা, মুখের বিরসতা, মলমূত্ররোধ, তন্দ্রা, অরুচি, পিপাসা, শিরঃপীড়া এবং সন্ধিসমূহে ভেদনবদ্ বেদনা হইলে পরমদ নামক মদাত্যয় জানিতে হইবে। পানাজীর্ণরোগে উদরাগ্নান, উদগার এবং দাহ উপস্থিত হয়। পৈত্তিক মদাত্যয় যে সকল কারণে উৎপন্ন হয়, এই পানাজীর্ণরোগ সেই সকল কারণে হইয়া থাকে। পানবিভ্রমরোগে হৃদয় ও শরীরে বেদনা, কফশ্রাব, কঠ হইতে ধূমবৎ নির্গম, মুচ্ছা, বমি, মত্ততা, শিরঃপীড়া ও মুখ কফে লিপ্তপ্রায় জ্ঞান এবং নানাপ্রকার স্মৃতি, মৈত্রেয়, পিষ্টক-লডুকাদি স্মরাবিকৃতি ও অপ্রবিকৃতিতে বিবেচ্য জন্মে।

অসাধ্য-মদাত্যয়রোগের লক্ষণ—যে মদাত্যয়-রোগীর ওষ্ঠদেশ লম্বমান হইয়া নিম্নাভিমুখী হয়, দেহের বাহ্যভাগ অত্যন্ত শীতল, অত্যন্ত দাহ, মুখ তৈলাক্ত, জিহ্বা ও দন্ত কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ, চক্ষুর পীত বা লোহিতবর্ণ হয়, তাহাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা করিবেন। হিকা, জ্বর, কম্প, পার্শ্বশূল, কাস ও ভ্রমপরিপীড়িত পানাহত রোগীকেও পরিভাষা করা বিধেয়।

এই রোগের চিকিৎসা—যে প্রকার অগ্নিদগ্ধ স্থানে অগ্নি দ্বারা শ্বেদ দেওয়া হিতকর, তদ্রূপ মত্তসমুদ্ভূত রোগে মত্তপান করা হিতজনক। অনিয়মে বা অতিমাত্রায় মত্তপান দ্বারা যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণার্থ উপযুক্ত অথচ সম-পরিমাণে মত্তপান করিবে।

হোলক, খৈকল, বদরী, দাড়িম-রস, ও ঘৃত দ্বারা গুরু-ক্রমণ করিবে, পরে উহার সহিত ধমানী, হবুয়া, জীরা ও



তুঁটচূর্ণ এবং সৈন্ধব বথাসম্ভব সংযুক্ত করিয়া চাটনি প্রস্তুত করিয়া তৎসহযোগে মত্তপান করিলে বহুকালোৎপন্ন বাত-পৈত্তিক-মদাত্যয়রোগও প্রশমিত হয়। মত্ত ৪ পল, সৌবর্জল ২ মাষা, ত্রিকটুচূর্ণ ৪ মাষা এবং জল ২ কর্ষ একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে বাতিক পানাত্যয় প্রশমিত হয়। চই, সৌবর্জল, হিঙ্গু, ছোলঙ্গ লেবুর ত্বক্, তুঁট এবং যমানীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মত্তপান করিলে পানাত্যয় রোগ উপশম হয়। লাব, তিত্তিড়ি, কুঙ্কড়া ও ময়ুর এই সকল পক্ষী, মৃগ, মংস্ত ও আনুপ মাংসের রস অঙ্গের সহিত, মুখপ্রিয় ত্রিধ্ব উষ্ণ লবণ অম্লদ্রব্য ও বেশবারের সহিত এবং গোধূম-নির্মিত বিন্ধু দ্রব্যের (লুচি আদি) সহিত মত্তপান করিলে বাতিক মদাত্যয় নষ্ট হয়। যৌবন-মদোন্মত্তা কামিনীগণের গাঢ় আলিঙ্গন, স্নেহজনক উষ্ণশয্যা, উষ্ণ আচ্ছাদন প্রভৃতিতেও প্রবল বাতিক মদাত্যয় প্রশমিত হয়। পৈত্তিক মদাত্যয়-রোগে সর্পিপ্রকার শীতল ক্রিয়া হিতকর এবং চিনি ও মধু-সংযুক্ত অর্দ্ধ জলমিশ্রিত মত্ত সেবন বিধেয়। খর্জুর, দ্রাক্ষা, পরুষ ফল ও দাড়িমের রস দ্বারা শীতল মত্ত কিংবা চিনিযুক্ত মাধ্বীকমত্ত অথবা অল্প কোন মত্ত বহু পরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া পান করিলে পৈত্তিক মদাত্যয় আশু উপশম হয়।

শশক, কপিঞ্জল, এণ, অসিতপুচ্ছ লাব ও ছাগমাংসের রস, অন্নরসযুক্ত দ্রব্য, পলতার ঘূষ, বর্ষলকলায়, মুগের ঘূষ এবং দাড়িম-আমলকী-সম্বলিত শালি ও যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন অথবা দ্রাক্ষা, আমলকী, খর্জুর ও পরুষ ফলের ঘূষ ও মাংসরস প্রভৃতি নানাপ্রকার তর্পণ প্রয়োগ, শীতল অন্ন, পানীয়, শীতল স্থানে শয়ন ও উপবেশন, শীতল বায়ু সেবন, শীতল জল সংস্পর্শন, পট্টবস্ত্র, পদ্ম, উৎপল, মণি, মুক্তা ও চন্দন-দ্রব্য শীতল জল স্পর্শ এবং চন্দ্রকিরণ-সেবন পৈত্তিক মদাত্যয়-রোগে বিশেষ উপকারী।

শ্লেষ্মিক মদাত্যয় রোগে যমানী ও ত্রিকটুচূর্ণ সংযুক্ত রুক্ষতর্পণ এবং যব ও গোধূমজাতীয় অন্ন রুক্ষঘূষের সহিত ভোজন করাইবে। কিংবা অত্যাধিক কটুদ্রব্য (মরিচাদি) চূর্ণসংযুক্ত খবকৃত অন্ন প্রদান করিবে। ছাগমাংস রস বা জাজ্বল-মাংসরস, কক্ষ অথচ অন্ন অন্ন মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে এবং ত্রিকটু দ্বারা ঘূষ প্রস্তুত করিয়া অন্ন অন্ন মিলিত করিয়া পান করিলে শ্লেষ্মিক মদাত্যয় রোগ প্রশমিত হয়। হাঁড়ীতে অথবা খাপরায় করিয়া কটু, অন্ন ও লবণমিশ্রিত নীরস মাংস ভাজিয়া ভোজন করিলেও শ্লেষ্মিক মদাত্যয় নষ্ট হয়। শ্লেষ্মিক মদাত্যয় রোগে রোগীকে বমনকারক দ্রব্যসংযুক্ত মত্ত পান করাইয়া বমন এবং রোগীর লাহুসারে উপবাস করাইবে।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক মদাত্যয়রোগে যে সকল ক্রিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, সান্নিপাতিক মদাত্যয়রোগেও ঐ সকল মিশ্রিতভাবে প্রয়োগ করিবে।

কুমড়ার রস শুড়ের সহিত সেবন করিলে কোদ্রব-জন্তু মত্ততা সঘর প্রশমিত হয়। সুপারী ফলভক্ষণে মত্ততা উপহৃত হইলে তৎক্ষণাৎ তৃপ্তিপূরক জলপান করিবে, তাহা হইলে বমি, মুচ্ছা ও অতীসারসংযুক্ত সুপারী ফলজাত মত্ততা সদ্য বিদূরিত হইবে। মত্তপান করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ ঘৃত-সংযুক্ত চিনি লেহন করে, তাহা হইলে ঐ পীত মত্তে কিছু মাত্রও মত্ততা জন্মে না।

( ভাবপ্রং মদাত্যয়রোগাধিকাং )

সুশ্রুতে লিখিত আছে—অজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য ব্যতিরেকে অপরিমিত মাত্রায় মত্ত পান করিলে তাহা শরীরস্থ অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া মত্ততা জন্মায়। মত্ততাবশতঃ ইন্দ্রিয়ের ভাব অত্রথা হইলে তাহার ইন্দ্রিয়নিচয় অবশ হইয়া অপ্রকাশ নিগূঢ় ভাব প্রকাশ করে। মত্ততার তিন অবস্থা পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিম। পূর্বাবস্থায় বীৰ্য্য, রতি, প্রীতি, হর্ষ এবং বাকশক্তি বৃদ্ধি হয়। মধ্যাবস্থায় প্রলাপ, হর্ষ এবং ভ্রাত্যান্যাত্ম উভয়প্রকার ক্রিয়াই সম্পাদিত হয়। পশ্চিম অবস্থায় ক্রিয়াশক্তি ও চেতনা-রহিত হওয়ায় শয্যাগত হইতে হয়। অনাহারে অতিশয় মত্তপান করিলে বিবিধ প্রকার কষ্টসাধ্য রোগ হয় এবং শরীরভেদ হয়। ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকাভিভূত ও ক্ষুধার্ত, পরিশ্রম, ভারবহন ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইলে, বেগের অবরোধ করিলে বা বেগাভিহত হইলে, অতিশয় অন্নভক্ষণে উদর পূর্ণ হইলে, অজীর্ণ ভোজন করিলে, হৃস্কল হইলে অথবা কোনরূপে উষ্ণ-তার দ্বারা তাপিত হইলে মদ্যপান কর্তৃক বিবিধ বিকার-ব্যাধি জন্মে। এই পান জন্ত বিকার চারিপ্রকার—পানাত্যয়, পরমদ, পানাজ্ঞা এবং পানবিভ্রম। ( সুশ্রুত চিকিৎসা ৪৭ অং )

[ মদ্য দেখ। ]

মদাঙ্ক ( ত্রি ) মদেন অঙ্কঃ। মদমত্ত, মত্ততার দ্বারা অঙ্ক।

মদামদ ( ত্রি ) সদামদোন্মত্ত।

মদাস্নাত ( পুং ) মদায় মত্ততোদ্রেকায় আয়াতে বাধ্যতে স্নেতি আ-র-কক্ষণি ক্র। গজচক্কা, চলিত—হাতীর উপরের ডকা। ( হারাবলী )

মদাস্বর ( পুং ) মদো দানবারিঅধরমিবাস্ত্রাচ্ছাদকত্বাৎ। মত্তহস্তী। ( ত্রিকাং )

মদার ( পুং ) মদ্যতি মত্তো ভবতীতি মদ (অজি-মদি-মন্দিভ্য আয়ন। উণ্ ৩।১৩৪) ১ হস্তী। ২ ধৃত। ( বিশ্ব ) ৩ শূকর। ৪ কামুক। ৫ গন্ধভেদ। ৬ মত্তহস্তী। ৭ নৃপভেদ। ( উপাধি )

মদারপুর, অযোধ্যা-প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার তঙা তহশীলের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। এখানে ধ্বংসাবশিষ্ট অনেকগুলি ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে। স্থানীয় লোকে ঐ স্থলিকে ভররাজগণের কীর্তি বলিয়া ঘোষণা করে।

মদারি (মদারিয়া) উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী মুসলমান-ফকির-সম্প্রদায়বিশেষ। জিলশাহ 'মদার' এই মত প্রবর্তন করেন। কাণপুর জেলার মাখনপুরে তাঁহার আশ্রানা ছিল। মাখনপুরের শাহ মদার-মসজিদে রক্ষিত বিবরণীতে প্রকাশ;— তাঁহার বহুশত শিষ্য ও প্রশিষ্য ছিল। তাহার উত্তর-ভারতের প্রধান নগরে থাকিয়া তাঁহার মত বিস্তার করে। ৮৩৮ হিজরায় ১৭ জমাদিউল আওবলে তাঁহার মৃত্যু হয়। মাখনপুরে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান আছে।

মদারিগণ হিন্দুবোঙ্গী বা সন্ন্যাসিগণের অমুকরণে গাত্রে বিভূতি মাখিয়া থাকে। গলদেশে ও মস্তকে তাহার লোহ-পুঙ্খল বাঁধে এবং মাথায় টুপী ও কাল নিশান ধারণ করিয়া বেড়ায়। তাহার কখনও ভজনা করে না বা কোন পর্বে উপবাসীও থাকে না, প্রায় সর্বদাই ভাজ (ভাং) পানে বিভোর হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিক আলোচনায় জানা যায় যে, শাহ মদার জৌনপুররাজ ইব্রাহিম শাহ সিকরি রাজত্বকালে মাখনপুরে আসিয়া বাস করেন। স্থানীয় প্রবাদ মতে, ইনি চৌহানরাজ পৃথ্বী-রাজের সমসাময়িক। ইহার প্রদর্শিত অনেক বুদ্ধকির কণা শুনা যায়। প্রবাদ, তিনি প্রায় ৩৮৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে স্বাসরোধপূর্বক যোগাবলম্বন করায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই। তিনি দম্ রোধ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়া-ছিলেন বলিয়া তাঁহারই মৃত্যুর পর, 'দম্-মদার' নামে তৎক্ষেত্রে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখনও প্রায় সকল মুসলমান প্রধান স্থানেই 'দম্-মদারপরব' দেখা যায়। এই সাম্প্রদায়িক-গণের কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, তিনি অদ্যাপিও জীবিত থাকিয়া, স্থানবিশেষে কোন কোন ভক্তকে দেখা দিয়া থাকেন। তিনি রমণীজাতির উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। প্রবাদ, রমণীগণ তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেই হৃদয় মধ্যে দাহ ও বেদনা অনুভব করে।

কামুন-ই-ইসলাম নামক গ্রন্থে 'ধম্মাল কুদ্দা' নামে ইহা-দের একটি উৎসব দেখা যায়। ঐদিন ইহারা একটি অগ্নি-কুণ্ড করিয়া শাহ মদার ফকিরদিগকে সমবেত করে। ফকির-গণ 'ফতিহা' সমাপনান্তে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে চন্দনকাষ্ঠ নিক্ষেপ করে এবং সর্বপ্রথমে প্রধান ফকির দম্-মদার শব্দ উচ্চারণ-পূর্বক অগ্নিতে ঝাপাইয়া পড়িলে পর, তৎপশ্চাৎ অপর সকলে

অগ্নিতে পড়িয়া চলিয়া বেড়ায়। ফকিরগণের অগ্নিবিচরণ শেষ হইলে, সকলে আসিয়া হৃৎ ও চন্দন দ্বারা তাহাদের পা ধুইয়া দেয়। তৎপরে তাহাদের গলায় মালাদান করিয়া শরবত পান ও ভোজনাদি করান হয়।

মদারিদিগের মধ্যে দুইটি শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে তকাদার বা গৃহী মদারিগণ বিবাহাদি করিয়া সর্বতোভাবে গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়া থাকে এবং মদেকগণ সন্ন্যাসীর মত ইত-স্ততঃ বিচরণ করিয়া দিন যাপন করে। মদার শাহের সমাধিক্ষেত্রের মাছায়া কীর্ত্তন করিয়া শিবপণ্ডিত এইরূপ গীতি রচনা করিয়াছেন।

নাহী সলোন, কাড়ে, হিলসে,

নাহী যাত বিহার, নাহী যাত বুধারে

আজমীড়ে, যুনের কো কোন্ গণে ?

আলি ঔর হৈ পীর অনেক বড়ারে।

জোত অখণ্ডিত, মঙ্গলমণ্ডিত,

শিউ পণ্ডিত কবিরাজ ফুকারে।

জাপর রীষত হৈ কর্তার

সো আনত হুয়ার মদার, তিহারে।

মদার্মদ (পুং) মদাশ্বঃ মদজন্তুঃ অশ্বঃ নেত্ররোগবিশেষঃ দদাতীতি দা-ক। ফলকমংস্য। (ত্রিকা০)

মদালস (ত্রি) মদেন অলসঃ। মত্ততা দ্বারা অলস।

মদালসা (স্ত্রী) গন্ধকরাজ বিশ্বকটুর কন্যা। ইহার বিষয় মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে;—

শক্রজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজ গালবের তপোরক্ষাব জন্ত তদীয় আশ্রমে গমন করেন। একদিন গালব সন্ধ্যাবন্দনায় নিবিষ্ট আছেন, এই সময় এক দানব শূকররূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল, ইহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলে, রাজকুমার ঋতধ্বজ তৎক্ষণাৎ শরাসন গ্রহণ করিয়া শূকরের অমুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, পরে তাহাকে নারাচে বদ্ধ করিলে, ঐ শূকর মহাবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। ঋতধ্বজ গালব-প্রদত্ত কুবলয়নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার অমুগমন করিতে লাগিলেন। সেই শূকর সবেগে সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া অবশেষে ভূপৃষ্ঠে এক গর্ভ মধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। রাজকুমারও অস্বারোহণে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৈঠ মহাগতে নিপতিত হইলেন; কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি আলোক ও পাতাল দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কোনরূপে আর শূকরের সন্ধান পাইলেন না।

অনন্তর তিনি পাতালে ইন্দ্রপুরীর গ্রায় শত শত প্রাসাদ-

পরিবেষ্টিত প্রাকারশোভিত পুষ্প দর্শন করিলেন। সেখানেও প্রবেশ করিয়া শূকর দেখিতে পাইলেন না। পরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কীর্ণাঙ্গী ললনাকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,— তুমি কি জন্তু কাহার নিকট বাইতেছে? কিন্তু সেই ললনা কোন কথা না বলিয়াই প্রাণাদে আরোহণ করিল। কুমারও একস্থানে অশ্ব বন্ধন করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। কুমার প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পরমসুন্দরী এক কুমারী কামসহচারিণী রতির ভ্রায় সুবিত্তার্ণ পর্য্যবেক্ষণ আসীনা রহিয়াছেন। কামিনী ইহাকে দেখিয়া যেমন পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে উপবিষ্টা হইলেন, অমনি মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

রাজকুমার ঋতধ্বজও তাঁহাকে ভয় নাই বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তিনি পূর্বে যে রমণীকে দর্শন করেন, তৎকালে সেই কামিনী ব্যজন গ্রহণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে সেই সুন্দরীকে বাতাস করিতে লাগিলেন। পরে তাহার চেতনা হইলে, রাজকুমার তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। অনন্তর তাহার সখী কহিল, দেবলোকে বিবাহবন্ধ নামে বিখ্যাত যে গুরুবরাজ আছেন, ইনি তাঁহারই আত্মা। ইহার নাম মদালসা। আমি ইহার সখী। ইনি একদিন উদ্যানভ্রমণে গিয়াছিলেন। এই সময়ে বজ্রকেতু দানবের পুত্র দুর্ভাষা পাতালকেতু তমোময়ী মায়া আবিষ্কার করিয়া ইহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে এবং আগামী ত্রয়োদশী দিন ইহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এই ব্যাপারে ইনি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন, কিন্তু সুরভী প্রতিবেদন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,— দুর্ভাষা কখনই তোমাকে লাভ করিতে পারিবে না। দানব মর্ত্যলোকে গমন করিলে, যিনি শরপ্রহারে তাহাকে বিদ্ধ করিবেন, তিনিই অচিরে তোমার স্বামী হইবেন। ইনি আমার সখী, আমার নাম কুণ্ডলা, আমি বিদ্ধাবানের কন্যা এবং পুষ্করমাণীর পত্নী। শুভ আমার স্বামীকে সংহার করিয়াছে, তদবধি আমি ব্রতধারণ করিয়া এইখানে আছি। এই আমার সখীর পরিচয় দিলাম, এখন আপনার বথার্থ পরিচয় দিয়া আমাদের কোতূহলনিবৃত্তি করুন। অনন্তর কুমার কহিলেন, আমি রাজা শত্রুজিতের পুত্র, নাম ঋতধ্বজ। পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মুনীগণের রক্ষাসাধন-উদ্দেশ্যে গালবের আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম। তথায় আসিয়া মুনীগণের রক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, কোন এক ব্যক্তি শূকররূপ ধারণ করিয়া বিয় করিতে উদ্যত হইল। তখন আমি তাহাকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি শর-

প্রহারে বিদ্ধ করিলাম এবং সে যেমন অতিবেগে তথা হইতে অবতরণ করিল, আমিও তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলাম। পরে এক গর্তমধ্যে পতিত হইয়া আমি অশ্বারোহণে একাকী অন্ধকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। তদনন্তর আলোক প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে দেখিতে পাইলাম। এই আমার বথার্থ পরিচয় জানিবেন।

তখন কুণ্ডলা অতিশয় চৌধারিতা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমার এই সখী আপনাকে দেখিয়া আপনার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন এবং আপনি নিশ্চয়ই সেই দানবকে বিদ্ধ করিয়াছেন, অতএব আপনি এই রমণী-ললামভূতা কামিনীকে গ্রহণ করুন। তখন রাজকুমার কহিলেন, আমি পরাধীন, পিতার আদেশ ব্যতিরেকে কিরূপে ইহাকে বিবাহ করিতে পারি। ইহাতে কুণ্ডলা কহিলেন, আপনি এরূপ বলিবেন না, কেন না ইনি দেবকন্যা, ইহাকে বিবাহ করিলে কোন দোষ হইবে না। রাজকুমার তাহাতে সন্মত হইলে ইহাদের কুলশুদ্ধ তুচ্ছক তথায় উপস্থিত হইয়া বৈবাহিক বিধি বধারীতি সম্পাদন করাইলেন।

পরে ঋতধ্বজ মদালসাকে অশ্ব আরোহিত করিয়া পাতাল হইতে বহির্গমনে অভিলাষী হইলেন। ইহা জানিতে পারিয়া সমবেত দৈত্যগণ রাজকুমার ঋতধ্বজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কুমারের অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধে সকল দৈত্যই প্রাণত্যাগ করে।

পরে ঋতধ্বজ অশ্বারোহণে পিতৃপুরে আগমন ও পিতৃদেবকে প্রণিপাতপূর্বক সমুদয় ঘটনা আত্মপূর্বক কাণ্ডন করিলেন। অতিশয় প্রীত হইয়া পিতা পুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বহুকাল পরে রাজা পুনরায় পুত্রকে কহিলেন,— তুমি পুনরায় ব্রাহ্মণগণের রক্ষার জন্ত পৃথিবী পর্য্যটন কর। ঋতধ্বজ পিতার আজ্ঞানুসারে সেইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা ঋতধ্বজ বিচরণ করিতে করিতে বহুনাতে গমন করিলেন, তথায় পাতালকেতু দানবের অমূল্য তালকেতু মায়াবলে মূনিরূপ ধারণপূর্বক একটা আশ্রম করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ঋতধ্বজকে দেখিবামাত্র তালকেতু পূর্ববৈর অরণ করিয়া রাজপুত্রকে কহিল, কুমার! আপনি ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্ত ভ্রমণ করিতেছেন। আমি বজ্রাঘাতানের ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু দক্ষিণা দিবার ক্ষমতা নাই, আপনি যদি আপনার কণ্ঠস্থিত হার আমায় প্রদান করিয়া আমার এই আশ্রম রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি তল মধ্যে প্রবেশপূর্বক বক্ষণের শ্রব করিয়া শীঘ্রই তোমার নিকট

আগমন করি। রাজকুমার তাহার এই কথার সম্মত হইয়া তাহাকে কঠোর প্রদানপূর্বক তাহার পুনরাগমন পর্য্যন্ত আশ্রমস্থান তার গ্রহণ করিলেন। এদিকে তালকেতু জলাশয় হইতে উঠিয়া শত্রুজিৎ নৃপতি প্রভৃতির সমক্ষে গিয়া কহিল,—বীর ঋতধ্বজ আমার আশ্রমস্থানে তপস্বীগণের রক্ষাকাধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে যজ্ঞদেবী দৈত্যগণের সহিত যথাক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শূদ্র তাপসগণ বনমধ্যে তাঁহাকে দহন করিয়াছে। মদালসা স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিহার করিলেন।

এদিকে তালকেতুও যমুনাঙ্গল হইতে বিনির্গত হইয়া প্রণয়-প্রকাশনস্তর রাজপুত্রকে কহিল, তুমি আমার বহুদিনের মনোরথ পূর্ণ করিলে, তোমার মঙ্গল হউক, এখন তুমি গৃহে গমন করিতে পার। তখন রাজকুমার তাহাকে প্রণাম করিয়া পিতৃ-পুরোদেশে প্রস্থান করিলেন।

রাজা ও পুরবাসিবর্গ কুমারকে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। কুমার পিতার চরণবন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতাঃ! কি হইয়াছে? পিতা আশুপুত্রিক সমস্ত ঘটনা কহিলেন। রাজকুমার মদালসাকে ছদ্মবেশে সহিত তালবাসিতেন, স্তত্রাং তাহার মৃত্যুবাস্তা শুনিয়া একেবারে শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু পিতামাতার সম্মুখে শোকপ্রকাশে লজ্জিত হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায়! সেই সাধবী বালা আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াই প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু আমি এখনও তাহার বিরহে জীবিত রহিয়াছি, স্তত্রাং আমার হৃদয় নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি জগতে আর নাই।

রাজকুমার এইরূপ সবিলাপ বহু চিন্তার পর মতি স্থির করিয়া পত্নীর উদ্দেশে জলদান ও অশ্রুত কঠব্য কর্ম সম্পাদন করিলেন বটে, কিন্তু প্রাণপ্রতিমার বিরহে সমস্ত সুখশান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া গভীর বিষাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার পূর্বসুহৃদ নাগরাজ অশ্বতরের পুত্রদ্বয় কুমারের মনের অবস্থা জানিতে পারিয়া পিতার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিল, পিতাঃ! আমাদের প্রিয়সখা ঋতধ্বজ এখন মদালসার বিরহে সমুদয় ভোগ সুখ ত্যাগ করিয়া সর্বদাই বিষন্ন মনে কালাযাপন করেন। মদালসাকে যদি পুনরায় তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই তাহার প্রকৃত উপকার করা হয়। কিন্তু তাহা কাহার সাধ্য? স্বয়ং ঈশ্বরও পারেন কিনা সন্দেহ, অস্ত্রের কথা আর কি বলিব।

নাগরাজ পুত্রদ্বয়ের কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন,

XIV

লোকে যদি অসাধ্য জানিয়া কোন কাণ্ডে উদ্ভম না করে, তাহা হইলে উদ্ভমহানিবশতঃ বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব স্বকীয় পুরুষকার পরিহার না করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। দৈব ও পুরুষকার এই উভয় বলেই সকল কর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে। অতএব আমি তগোবলে অচিরে এই অসাধ্য কাণ্ড সাধন করিব। এই বলিয়া নাগরাজ হিমালয়স্থিত পল্লাবতরুতীরে গমন করিয়া স্নান তপস্বয় প্রবৃত্ত হইলেন।

নাগরাজ তপস্বয় সুরতী ও মহাদেবকে প্রীত করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, কুবলয়াশ্বের পত্নী মদালসা যে বয়সে মরিয়াছেন, তিনি সেই বয়সেই আমার হৃদিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করুন। পূর্বে তাঁহার যেরূপ কাস্তি ছিল, সেইরূপ কাস্তি হউক। তিনি যেন জাতিশ্রম্মা এবং পূর্বের হ্রায় যোগিনী ও যোগমাতা হইয়া আমার গেহে জন্মগ্রহণ করেন।

মহাদেব ইহাতে কহিলেন, আমার প্রসাদে তাহা হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তুমিও প্রযত্নচিত্ত হইয়া নিজেই মধ্যমপিণ্ড তক্ষণ করিবে। মধ্যমপিণ্ড তক্ষণ করিলে, কল্যাণী মদালসা যে অবস্থায় মরিয়াছে সেই অবস্থাতেই তোমার দক্ষিণ কর্ণ হইতে সমুদ্ভূতা হইবে।

অনন্তর নাগরাজ ঐরূপে যথাবিধানে শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া মধ্যমপিণ্ড তক্ষণ করিলেন। পরে আপনাতত্ত্ব লিখিত ধ্যান করিতে করিতে নিখাস ত্যাগ করিবারাত্র তাহার মধ্যমকর্ণ হইতে ক্ষণাঙ্গী মদালসা সমুদ্ভূতা হইলেন। নাগরাজ এত ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। আপনাতত্ত্ব গৃহমধ্যে সেই স্নদতাকে দ্রাগগদাহায্যে অতিগোপনে রাখিয়া দিলেন।

একদা নাগরাজ পুত্রদ্বয়কে কহিলেন,—তোমরা যত্নপূর্বক রাজকুমার ঋতধ্বজকে নিমন্ত্রণ করিয়া এই নাগলোকে আনয়ন কর। পুত্রদ্বয় রাজকুমারের নিকট যাইয়া পিতার অনুমতি জ্ঞাপন করিলে, ঋতধ্বজ আনন্দসহকারে নাগলোকে আগমন করিলেন। নাগরাজ অতি যত্নসহকারে কুমারকে আহ্বাদি করাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্র! তুমি আমার গৃহে অভ্যাগত, অতএব তোমার কি প্রিয় সম্পাদন করিব, তাহা নিশ্চয়চিন্তে আমাকে বল। ঋতধ্বজ উত্তর করিলেন, আমার স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি কিছুই প্রার্থনীয় নাই। এই কথা বলিয়া বহুদয়ের প্রতি দৃষ্টি নিষ্কপ করিলেন।

অতঃপর নাগপুত্রদ্বয় পিতার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, ইহার পত্নী কোন দ্রাক্ষা দৈত্য কঠক প্রতারিত হইয়া স্বামীর মৃত্যুবাস্তা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহার পত্নীর নাম

মদালসা, তিনি গুরুস্বরাজের ছুহিতা। অধুনা তাঁহাকে দেখিবার জন্ম ইহার মন নিতান্ত উৎসুক রহিয়াছে, আপনি যদি তাহাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত উপকার করা হয়।

নাগরাজ কহিলেন, পঞ্চভূতের সহিত একবার বিয়োগ হইলে পুনরায় তাহাদের সহিত সেইরূপে সংযোগ হওয়া স্বপ্ন বা আত্মার মায়া ভিন্ন অল্প কোন উপায়েই সম্ভাবিত নহে।

তখন ঋতধ্বজ প্রণাম করিয়া লজ্জাসহকারে তাঁহাকে কহিলেন, তাত! আপনি অধুনা সেই মদালসাকে যদি মায়া করিয়াও দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি পরম অমুগ্ধ হইতাম।

নাগরাজ কহিলেন,—বৎস! যদি মায়াদর্শনে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহা দর্শন কর। এই বলিয়া তিনি গৃহগুপ্তা মদালসাকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাহাদের সকলকে ভূলাইবার জন্ম কতিপয় অক্ষুট মন্ত্রপ্রয়োগপূর্বক রাজপুত্রকে মদালসা সন্দর্শন করাইয়া কহিলেন, বৎস! দেখ দেখি এই সেই তোমার ভাৰ্য্যা মদালসা কি না? রাজকুমার মদালসাকে দেখিয়া শোকে মুচ্ছিত হইলেন। মদালসা তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার প্রাতি কুমারের ভালবাসা পুত্রের হৃদয় অবিচলিত আছে। এখন আমাকে মায়া বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে, বাস্তবিকই আমি মিথ্যা, মায়াস্বরূপ। ব্যয় আকাশ, তেজ, জল ও পৃথিবীসমবায়্যে বাহার জন্ম, তাহা মায়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

অনন্তর নাগরাজ অশ্বতর রাজপুত্রকে আশ্বাসিত করিয়া ধৈর্য্যে মৃত মদালসাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন, তৎসমুদয় বর্ণন করিলেন। তখন ঋতধ্বজ ভাৰ্য্যাকে লাভ করিয়া আত্মাত্ম আশ্বাসিতচিত্তে নিজ অশ্বকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র অশ্ব তথায় সমাগত হইল। তখন তিনি নাগরাজকে প্রণাম করিয়া সপত্নীক সেই অশ্বে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঋতধ্বজ স্বপ্নের সমাগত হইয়া পরলোকপ্রাপ্তা মদালসাকে পুনরায় দৈর্ঘ্যে লাভ করিয়াছেন, তৎসমস্ত পিতার নিকট আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলেন। মদালসাও স্বপ্ন ও স্বপ্নের চরণে প্রণাম করিয়া স্বজনদিগকে বথাযোগ্য বন্দনাদি করিলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে রাজা শত্রুজিৎ কালধর্ম্মের বশবৃত্তী হইলেন। পৌরগণ ঋতধ্বজকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। তিনি প্রজাদিগকে ঔর্য্য পুত্রের হৃদয় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মদালসার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, পিতা

পুত্রের নাম বিক্রান্ত রাখিলেন; মদালসা পুত্রের নাম শুনিয়া হাস্ত করিলেন। একদিন ঐ পুত্র অব্যাক্তস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে মদালসা তাহাকে সান্ত্বনা করিবার ছলে বলিলেন,—পুত্র। তুমি সন্ধ্যোপার্জিৎবিশিষ্ট, তোমার কোনরূপ নাম নাই, এখন কেবল কল্পনাবলে তোমার নামকরণ হইয়াছে। তোমার এই দেহ পঞ্চভূত-বিনিশ্চিত, সুতরাং ইহা যেমন তোমার নহে, তুমিও তেমনি ইহার নহে, তবে তুমি কি হেতু রোদন করিতেছ! অথবা তুমি রোদন করিতেছ না, এই রাজপুত্রকেই আশ্রয় করিয়া ঐরূপ শব্দ স্বয়ং প্রাহৃত্ত হইতেছে। তোমার ইন্দ্রিয়নিচয়েও বিবিধ ভৌতিক গুণ ও অগুণ সকল কল্পিত হইয়াছে। ভূত সকল যেরূপ ভূতসহায়ে অগ্নি ও জলদানাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তোমার সেরূপ বুদ্ধি নাই, ক্ষয়ও নাই। তোমার এই দেহ আবরণ-মাত্র। ইহা দীর্ণ হইবে, তহাতে তুমি মোহে আচ্ছন্ন হইও না। শুভাশুভ কল্পনাবলেই তোমার দেহে এই আবরণ সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। পিতা, মাতা ও স্ত্রী এবং আত্মীয় অনাত্মীয় কেহই কিছু নহে, তুমি তাহাদিগকে বহু মাননা করিও না। যাহারা মোহাচ্ছন্ন চিত্ত, তাহারাই হৃৎথকে হৃৎথের উপশমের কারণ ও ভোগ সকলকে সুখলাভের হেতু বলিয়া জানে। বিক্রান্ত জননীর নিকট জন্মাবধি এইরূপ বিবিধ আত্মজ্ঞান শিক্ষা করিয়া জ্ঞান ও বাসনাত্যাগী হইয়া গার্হস্থ্যমধ্যে একেবারেই প্রবৃত্তি-শূন্য হইল।

তদনন্তর মদালসার দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা তাহার নাম সুবাহ রাখিলেন। ইহাতেও মদালসা হাস্ত করিলেন এবং এত কুমারকেও পূর্বসমত আত্মবোধ শিক্ষা দিলেন। শিক্ষার ফলে এই পুত্রও জ্ঞান লাভ করিয়া কামনা ও ক্রিয়া বিহীন হইল।

পরে তৃতীয় পুত্র জন্মিলে রাজা তাহার নাম শত্রুমদন রাখিলেন। ইহাতেও মদালসা হাস্ত করিলেন, পরে তাহাকে আত্মবোধ প্রদান করিলে, এই পুত্রও সংসারে প্রবৃত্তি-শূন্য হইল।

অনন্তর চতুর্থ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, রাজা মদালসাকে কহিলেন,—তুমি প্রতিবারই আমার নামকরণ করিবার সময় হাস্ত করিয়া থাক, এইবার এই পুত্রের তুমিই নামকরণ কর। মদালসা তখন এই পুত্রের নাম অগর্ক (খেপা কুসুর) রাখিলেন। রাজা এই নাম শুনিয়া কহিলেন, তুমি নিতান্ত অসমর্থ নাম রাখিয়াছ। ইহাতে মদালসা কহিলেন, রাজন! লোকাচারে একটা নাম রাখিতে হয় বলিয়া একটা রাখিয়া দিলাম। আপনার কৃত নাম সকলেরও কোনরূপ অর্থই নাই।

প্রাক্তপুরুষগণ আত্মাকে সর্বব্যাপী বলিয়া থাকেন। ক্রান্তি শব্দে একদেশ হইতে অত্ৰদেশ গতি বুঝাইয়া থাকে, আত্মা সর্বগ ও সর্বব্যাপী এবং দেহের ক্ষেত্র, তাহার আবার গতি ক্রোধান। সুতরাং আপনি যে বিক্রান্ত নাম রাখিয়াছেন, তাহার কোন অর্থ হয় না। আত্মার কোনরূপ মূর্তি নাই, সুতরাং অপর পুত্রের নাম যে সুবাহ রাখিয়াছেন, তাহাও সৰ্বথা অর্থশূন্য।

তৃতীয় পুত্রের যে অরিমর্দন নাম রাখিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত অসঙ্গত, ইহার কারণ একাকী আত্মা সকল শরীরেই বিরাজমান আছেন, তখন আর তাহার শত্রুই বা কে, আর মিত্রই বা কে? ভূত দ্বারা ভূতেরই লয় সাধিত হয়। যাহার মূর্তি নাই, তাহার আবার লয় কিরূপে হইতে পারে। আত্মা ক্রোধাদি সর্ববিধ দোষ-বিবিরাজিত, তিনি আবার শত্রুমর্দন করিবেন কিরূপে? যদি কেবল ব্যবহারের জন্তই এরূপ নিরর্থক নাম কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে আমি অলর্ক নাম নিরূপণ করিয়াছি, তাহা কি জন্ত নিরর্থক হইবে?

রাজা তখন মদালসাকে কহিলেন, তুমি বাহা কহিলে তাহা প্রকৃত, কিন্তু এখন তোমার নিকট আমার এই অমুরোধ যে, তুমি তিন পুত্রকে নিরুত্তিমার্গে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছ, তাহাতে তাহার সকলেই কাননাসূত। এখন তুমি এই পুত্রকে প্রবৃত্তিমার্গের বিষয় উপদেশ দাও। মদালসা তাহাই হইবে বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে বিবিধ প্রকারে গার্হস্থ্যমার্গে রাজধর্ম প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে ও বিশদ-রূপে উপদেশ দেন, এই উপদেশ শুণে অলর্ক অশেষ গুণান্বিত হইয়াছিলেন।

মদালসা পুত্রগণের শিক্ষাচ্ছলে যে সকল উপদেশ দেন, তাহা অমূল্য রত্নস্বরূপ এবং বেদান্ত ও নীতিশাস্ত্রের সারভূত। বিশেষ বিবরণ মার্কেণ্ডেয়পুরাণের মদালসোপাখ্যানে দ্রষ্টব্য।

অলর্ক উপযুক্ত হইলে রাজা ঋতধ্বজ তাহার উপরই রাজ্য-রক্ষার ভার দিয়া সন্ত্রীক প্রত্যাগ্যা অবলম্বন করেন। মদালসা যাইবায় সময় পুত্রকে কহিলেন, বৎস! গৃহী স্বভাবতঃই মমতা-পরায়ণ, সেইজন্ত দুঃখের আশ্রয়ীভূত হইয়া থাকে। অতএব গৃহ-ধর্মের অমুরণপূর্বক রাজ্য করিতে করিতে বধন অসহ্য দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখন তুমি আমার প্রদত্ত এই মণিময় অমুরীয় হস্ত হইতে বাহির করিয়া পরমধ্যে সন্মাক্ষরে সন্নিবেশিত শাসন পাঠ করিবে। এই বলিয়া তাহার প্রস্থান করেন।

পরে অলর্ক অমুরীয়-লিখিত শাসনানুসারে দত্তাত্রেয়ের নিকট যোগ শিক্ষা করেন। (মার্কেণ্ডেয়পু. ২০-৪০ অ.)

মদালাপিন্ (পুং) মদেন মত্ততয়া আলপতীতি আ-লপ্-ণিনি। কোকিল। (শব্দমালা)

মদাবর, উঃ পঃ প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। বর্তমান মদাবর নামে খ্যাত। চীন-পরিব্রাজক এই স্থানকে মদিপুর নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১১১৪ খৃষ্টাব্দে এই নগর ত্রিহীন হইয়া পড়ে। পৃথ্বীরাজের শাসনকালে ঘোরীবংশীয় আফগান্ সুলতানগণের অত্যাচারে এইস্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। পরে সেই ধ্বংসকীর্ত্তর উপকরণ লইয়া জুম্মামসজিদ, হিদায়ত শাহ-মসজিদ ও ফকির-তাকিয়া প্রভৃতি নি্মিত হয়। হিউএন্সিয়াং স্থানীয় গুণপ্রভ-সজ্জারাম ও সজ্জবদ্রাবিহারের উল্লেখ করিয়াছেন।

মদাবস্থা (স্ত্রী) ১ উন্মত্তাবস্থা। ২ ক্রোধাবস্থা।

মদাহব (পুং) মদো মৃগমদ-আহবা আখা যন্ত-ভৃশ্বঃ। কস্তুরী।

মদি (স্ত্রী) মদাতি কৃষ্টশেত্র-লোভঃ মদ-ইন্ পৃষোদদাদিহাৎ সাধুঃ। কৃষিসাধন কর্ষণযন্ত্রভেদ, চলিত মই, ধাতুক্ষেত্রে কর্ষিত ভূমি সমান করিবার নিমিত্ত মই দেওয়া হইয়া থাকে।

মদিন্ (ত্রি) মদয়তীতি মদি-ণিনি। তপ্ক। (শুক্রযজু. ৬২৭)

মদিস্তম (ত্রি) অতিশয়েন মদী তমপ্, বেদে হুমাগমঃ।

অতিশয় তপ্ক। (শুক্রযজু. ৬২৭)

মদির (পুং) মদ-কিরচ্। রক্তখদির। (শব্দচ.)

(ত্রি) ২ মদকর। “আশুভিঃ পিবন্তো মদিরং মধু” •

(ঋক্ ৫৬১১১) ‘মদিরং মদকরং’ (সায়ণ)

মদিরা (স্ত্রী) মাথতীতি মদ-কিরচ্, অজাদিহাৎ টাপ্।

১ মত্তধ্বজন। (শব্দরত্না.)

“যদি মদিরায়তনয়নাং তামধিকৃত্য প্রহরতীতি” (শকুন্তলা ৫৫)

মাথতানয়েতি মদ (ইষিমদীতি। উণ্ ১৫২) ঠ্ঠি

কিরচ্। ২ মদকদ্রব্যবিশেষ, চলিত মদ। পর্যায়—সুরা,

হলিপ্রিয়া, হালা, পরিশ্রব, বরুণাঙ্গজা, গন্ধোত্তমা, প্রসন্ন,

ইরা, কাদম্বরী, পরিশ্রতা, কশু, মথ, মালিকা, কপিণী,

গন্ধমাদনী, মাধবী, কন্তোয়, মদ, কাপিশায়ন, বারুণী, মত্তা,

সীতা, চপলা, কামিনী, প্রিয়া, মদগন্ধা, মার্শ্বক, মধু, সন্ধান,

আনব, অমৃত, বীরা, মেধাবী, মদনী, সুপ্রাভতা, মনোজা,

বিধাতা, মোদিনী, হল্য, গুণারিষ্ট, সরক, মধুশব্দা, মদোৎকটা,

মহানন্দা, সীধু, মৈরয়, বলবল্লাভা, কারণ, তত্ত্ব, কৈবল্য তত্ত্ব,

মদিষ্ঠা, পরিপ্লুতা, কল্প, স্নাতুরগা, শূণ্ডা, হারহস্ত, মাপ্যক,

মদনা, দেবস্টা, কাপিশ, অন্ধিজা। (হেম) •

“মাধ্বীকং পানসং দ্রাক্ষং থজ্জরং তালমৈকবম্।

মৈরয়ং মাঞ্চিকং টাকং মধুকং নারিকেলজম্॥

মুখ্যমদবিচারোৎথং মত্তানি দ্বাদশৈব চ।” (জটীধর)

মাধ্বীক, পানস, জাক, খজুর, তাল, ঐকব, মৈরেষ, মাকিক, টাক, মধুক, নারিকেলজ ও অন্নবিকারজ এই ষাট প্রকার মদ্য। ইহার সামান্য গুণ—স্বমধুর, কফ ও বায়ুনাশক, লঘু, পুষ্টিকর, হৃদয়, সারক, মদবর্দ্ধক।

ধাতকীরস ও শুড়াদি দ্বারা কৃত মদিরার নাম গোড়ী, ইহার গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মধুর, বাতনাশক, পিত্ত ও বলকারক, দীপন, পথ্য, কাস্তি ও তৃপ্তিকারক।

পুষ্ণপ্রবাহি মধুসারযুক্ত মদিরা মাধ্বী, ইহার গুণ—মধুর, নাভ্যক্ষ, পিত্ত, বাত, পাণ্ডু, কামলা, গুণ, অর্শ ও প্রমেহনাশক। বিবিধ প্রকার ধাতুজাত মদিরা পৈষ্টী, ইহার গুণ—কটু, অন্ন, তীক্ষ্ণ, বাতহর, কফকর, ঈষৎ পিত্তকর, মোহন। তালাদিরস-নির্ঘাসকৃত মদিরা সৈকী ও হালা, ইহার গুণ—শীতল, কষায়, অন্ন, পিত্তহর, বাতবর্দ্ধক। সর্ষাপ্রকার তৃণ-বৃক্ষনির্ঘাসকৃত মদিরার গুণ—শীতল, গুরু, মোহন, বলবর্দ্ধক, হৃদয়, তৃষ্ণা ও সন্তাপনাশক। নানাজবাসমূহ দ্বারা কৃত মদিরা কাদম্বরী, ইহার গুণ—স্বমধুর, পিত্তপ্রমনাশক, মদবর্দ্ধক। ঐকব-মদিরাগুণ—শীতল, ও মদবর্দ্ধক। যব ও ধাতুকৃত-মদিরাগুণ—গুরু ও বিষ্টভদায়ক। শর্করা ও ধাতুকীতোয়-কৃত মদিরাগুণ—শীতল ও মনোহর। (রাজনিঃ)

ঋতুবিশেষে পেষ্য মদিরা—

• “গোড়ী তু শিশিরে পেষ্য পৈষ্টী হেমন্তবর্ষয়োঃ।

• শরদগ্ৰীষ্মবসন্তেষু মাধ্বী গ্রাহ্য ন চাত্মথা ॥” (রাজনিঃ)

গোড়ীমদ্য শিশিরকালে, পৈষ্টীমদ্য হেমন্ত ও বর্ষাকালে, এবং মাধ্বী মদ্য শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে পান করিবে।

স্বপ্নতে মদের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

• মদ্য—উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, স্নায়ু, বিশদ, রুক্ষ, আণ্ডকারী, ব্যাবায়ী এবং বিকাশী। উষ্ণতাপ্রযুক্ত শৈত্য, এবং তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত মনের গতি নাশ করে, স্নায়ুতাপ্রযুক্ত সকল অবয়বে প্রবেশ করে, বিশদপ্রযুক্ত কফ ও শুক্রনাশ করে, রুক্ষ বলিয়া বায়ু কুপিত করে, আণ্ডকারিতা বলিয়া দেহে শীঘ্র কার্য করে, ব্যাবায়ী বলিয়া হর্ষোৎপাদন এবং বিকাশিতপ্রযুক্ত শরীরে সঞ্চরণ করে। ইহা অন্নরসবিশিষ্ট, লঘু, রুচি ও অগ্নিদীপ্তিকর। কাহারও কাহারও মতে লবণ ব্যতীত অপর আর সকল রসই ইহাতে আছে। স্নিগ্ধ অন্ন, মাংস ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত মদ্যপান করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি হয়। বিধিপূর্বক পানে কামনা, মনের তৃষ্টি, ধৈর্য, তেজঃ ও অতিবিক্রম প্রভৃতি গুণ জন্মে। অজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য ব্যতিরেকে অপরিসীম মাত্রায় পান করিলে শরীরস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া মত্ততা জন্মায়। মত্ততা দ্বারা ইন্দ্রিয়ভাবের

অজ্ঞা হইলে অবশ হইয়া অপ্রকান্ত নিগূঢ়ভাব প্রকাশ করে। মদ্য সেবন করিয়া মত্ততা উপস্থিত হইলে তাহার তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যম। মত্ততার পূর্বাৱস্থায় বীৰ্য্য, প্রীতি, রতি, হর্ষ এবং বাকশক্তি বৃদ্ধি হয়। মধ্যম অবস্থায় হর্ষ, প্রলাপ এবং জ্ঞান ও অজ্ঞার উভয় প্রকার ক্রিয়াই সম্পাদিত হয়। পশ্চিম অবস্থায় ক্রিয়াশক্তি ও চেতনারহিত হয়, তখন অজ্ঞান হইয়া শুইয়া থাকে। অপরিসীম মত্ত পান করিলে বিবিধ পীড়া জন্মে। [ ইহার বিষয় পানাতায় শব্দে দেখ ]

অন্নরসবিশিষ্ট মদ্যমাত্রাই—পিত্তকর, অগ্নিকর, রুচিকর, ভেদক, বাতশ্লৈষ্মার শাস্তিকর, মুখপ্রিয়, বস্তিশোধক, লঘুপাক, বিদাহী, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, উত্তেজক, প্রফুল্লকর ও মলমূত্রবর্দ্ধক।

মারীক (দ্রাক্ষা বা অনুরজাত) মদ্য—অবিদাহী, মধুর, রুক্ষ, পশ্চাৎ কষায়, লঘু, সারক, শোষ ও বিষমজরনাশক, ইহা মধুর বলিয়া রক্ত-পিত্ত-রোগেও ব্যবহার করা যায়। খজুরমদ্য—দ্রাক্ষামদ্যের সহিত ইহার অন্নই প্রভেদ, বায়ু-প্রকোপকর, বিশদ, রুচিকর, কফর, কৃণকারী, লঘু, কষায়, মধুর, মুখপ্রিয়, স্বগন্ধি এবং ইন্দ্রিয়-উত্তেজক।

সুরা—সুরা সামান্যতঃ কাস, অর্শ, গ্রহণীদোষ, মূত্রাঘাত ও বায়ু-শাস্তিকর, স্তম্ভ, ক্ষয়, পুষ্টি এবং অগ্নিদীপ্তিকারী। যেতা অর্থাৎ শর্করাজাত সুরা—কাস, অর্শ, গ্রহণী, শ্বাস, প্রতিক্রিয়া, ছদ্মি, অরুচি, হৃদয়, কৃক্ষিদেহের বেদনা এবং শূলনাশক এবং মূত্র, কফজ্ঞাত রক্ত ও মাংসবর্দ্ধক। সুরা যবসংযোগে প্রস্তুত হইলে দোষ, কফ বাত, অর্শ ও কোষ্ঠ-রোগের শাস্তিকর, পিত্ত ও অন্ন কফকর এবং রুক্ষ। মধুলিকা—অর্থাৎ মউরি জাত সুরা পুরোক্ত গুণযুক্ত, মলমূত্র-রোধক, গুরু ও শ্লৈষ্মাবর্দ্ধক।

আফিকী (তিনিশবৃক্ষজাত) সুরাসামান্যের গুণ-বিশিষ্ট, রুক্ষ, অন্নকফকর, তেজোবৃদ্ধি ও পরিপাককারক।

কোহল (তীক্ষ্ণমদ্যবিশেষ) বায়ু, পিত্ত ও কফবৃদ্ধিকর, ভেদক, তেজস্কর ও মুখপ্রিয়।

জগল (দ্রাক্ষাপ্ররিশ্রুত মদ্য) মলমূত্ররোধক, উষ্ণ, পরিপাককর, রুক্ষ এবং তৃষ্ণা, কফ ও শোফের শাস্তিকর।

বকস (মদ্যবিশেষ) হর্ষজনক, প্রবাহিকা, আটোপ, অর্শ ও বায়ুজ্ঞাত শোফের শাস্তিকর এবং সারক, শক্তিরোধকর বলিয়া সংগ্রাহক ও বায়ুর প্রকোপকর, অগ্নিকর, মলমূত্রজনক, বিশদ, অন্নমাদক ও গুরুপাক।

গোড়সীধু (শুড়জাত তীক্ষ্ণ মদ্য) কষায়, মধুর, পাচক ও অগ্নিকর।



শার্করশীধু (শর্করাজাত তীক্ষ্ণমদ) মধুর, রুচিকর, অগ্নিকর, বস্তিশোধনকর, বাতশ, পরিপাকে মধুর, হৃদ্য ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। পকরসজাত শীধু (ইক্ষুরস, গুড়, চিনি প্রভৃতি কোন দ্রব্যের রস অগ্নিতে চোয়াইয়া যে মাদক রস জন্মে; তাহাকে পকরসজাত শীধু কহে) ইহা পুরোক্ত গুণ-বিশিষ্ট, বলকারী, বর্ণকর, সারক, শোফনাশক, অগ্নিকর, হৃদ্য, রুচিকর, শ্লেষ্মা এবং অর্শের হিতকর।

মাক্ষিকশীধু শরীরক্লেশকারী, শীতলরসবিশিষ্ট, শোথ ও উদররোগনাশক, বর্ণকর, স্বর ও ব্রণের পক্ষে হিতকর, কোষ্ঠরোগ ও অর্শরোগের শাস্তিকর, পাণ্ডুরোগনাশক, মল ও মূত্রের কঠিনতাসম্পাদক, লঘু, কষায়, মধুর, পিত্ত ও রক্তপ্রসাদনকর।

জাম্ববশীধু (জাম্বলের মদ্য) মলমূত্ররোধক, কষায় ও বায়ুপ্রকোপকর। সুরাসব (তাল খর্জুর প্রভৃতির রস মাতিয়া উঠিলে সুরাসব হয়) ইহা তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, মূত্রবৃদ্ধিকর, কফ ও বায়ুর শাস্তিকর, মুখপ্রিয়। স্থিরমদ, অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী মদ মত্ততাকর ও বায়ুনাশক, মধ্বাসব (মধুজাত আসব) লঘু, ছেদক, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষের শাস্তিকর, তিক্ত, কষায়, শোফন তীক্ষ্ণ, স্বাদু, অথচ বায়ুবৃদ্ধিকর নহে।

মৈরের আসব (খাতকী পুষ্প, গুড় ও আমানীসংযোগে যে মাদক রস প্রস্তুত হয়, তাহাকে মৈরের আসব কহে) ইহা তীক্ষ্ণ, কষায়, মাদক, অর্শ, কফ ও গুণনাশক, কৃমি, মেদ ও বায়ুর শাস্তিকর এবং গুরুপাক।

মুদ্বীক ইক্ষুরসাব (আম্বুর ও ইক্ষুরসসংযোগে যে মাদক রস প্রস্তুত হয়,) বলকর, পিত্তনাশক ও বর্ণকর। মধু-পুষ্পজাত শীধু—বিদাহী, অগ্নিকর, বলকর, রুক্ষ, কষায়, কফ-নাশক ও বাতপিত্তের প্রকোপকর।

অগ্রাত কন্দমূল ও ফলজাত আসবের গুণ তাহাদিগের রস দ্বারা নির্ণয় করিবে। নূতন মদ্য—চক্ষুরোগকারী, গুরুপাক, বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপকর, অনিষ্টগন্ধযুক্ত, বিরস ও বিদাহী। পুরাতন মদ্য স্নগন্ধি, অগ্নিকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, কৃমিনাশক, নাড়ীপথের শোধনকর, লঘু ও বায়ুপিত্তের শাস্তিকর।

অরিষ্ট দ্রব্যসংযোগে সংস্কৃত হওয়াতে অধিক গুণকারী হয়। এই কারণ বহুদোষের নাশক, কফ-বাতশ, সারক, পিত্তবিরোধকারী, শূল, আখ্যান, উদররোগ, প্রীহা, জ্বর, অজীর্ণ ও অর্শের হিতকর।

অরিষ্ট, আসব এবং শীধু ইহাদিগের দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া এবং প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিবেচনা করিয়া ব্যবহার

করিবে। ইহা গাঢ় হইলে বিদাহী, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, বিরস, কৃমিকর ও গুরুপাক হইয়া থাকে। তরুণ হইলে অপ্রিয় ও তীক্ষ্ণ এবং মন্দপাত্রে থাকিলে উষ্ণ হয়। যে মদ্য অন্ন ওষধি-বিশিষ্ট, পর্যুষিত, নিশ্বল ও পিচ্ছিল, অথবা বাহ্য পাত্রে অব-শিষ্ট থাকে, তাহা গ্রহণ করিতে নাই। যে মদ্যের উপকরণ-দ্রব্য অন্ন ও বাহ্য তরুণ এবং পিচ্ছিল, সেই মদ্য গুরুপাক, কফ-প্রকোপকর এবং দুর্জর। উপকরণ দ্রব্য অতিরিক্ত হইলে মদ্য পিত্ত-প্রকোপকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী, অপ্রিয়, ফেনিল, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, কৃমিকর, বিরস ও গুরুপাক হইয়া থাকে। পর্যুষিত হইলে বায়ুর প্রকোপকর ও সকল প্রকার দোষ-জনক। যে মদ্য অধিককাল থাকাতে জাতরস হয়, তাহা বাতশ্লেষ্মার শাস্তিকর, রুচিকর, নির্দোষ, স্নগন্ধি, সেবনযোগ্য ও মাদক।

রস ও বীৰ্য্যভেদে মদ্য নানা প্রকার। মদ্য বীৰ্য্যকর, স্নান, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও প্রফুল্লকর বলিয়া জঠরাগ্নির সহিত হৃদয়-দেশস্থ ধমনীপথে প্রবেশপূর্বক উর্দ্ধে গমন করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্চালিত ও উন্মাদিত করে। মদ্যপান করিলে শ্লেষ্মাপ্রকৃতির লোক অধিক বিলম্বে মত্ত হয়, বায়ুপ্রকৃতির লোক অনতিবিলম্বে মত্ত হয় এবং পিত্তপ্রকৃতির লোক শীঘ্রই মত্ত হয়। মদ্যপানে মত্ত হইলে সাত্বিকপ্রকৃতি পুরুষের শোচ, দাক্ষিণ্য, হর্ষ, সৌন্দর্য্যভিলাষ, গীত, অধ্যয়ন ও সুরতক্রীড়াতে উৎসাহ জন্মিয়া থাকে। রাজসিক প্রকৃতি-লোকের দুঃখশীলতা, সাহসপুরুষ আত্মত্যাগ ও কলহেচ্ছা জন্মিয়া থাকে। তামসিকপ্রকৃতিলোকের অশোচ, নিদ্রা, মাৎসর্য্য, অগম্যাগমনাভিলাষ এবং অসত্যভাষণ এই সকল ঘটিয়া থাকে। কোন ফল বা মূল লবণযুক্ত তৈলে মগ্ন করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে, পরে জলে ফেলিয়া রাখিবার পর, মাতিয়া উঠিলে তাহা শুক্ক হয়। ইহা মদ্যের ত্রায় মাদক। গুণ—রক্তপিত্তকর, ছেদক, পাচক, স্বরের বিকৃতিকর, জারক, শ্লেষ্মা, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক এবং লঘুপাক। এই শুক্ক চোয়াইয়া যে রস জন্মে, তাহা তীক্ষ্ণোষ্ণ, মূত্রল, হৃদ্য, কফন, কটু-পাক ও বিশেষরূপে রুচিকর। গুড়রস কিংবা মধুসংযোগে যে সকল শুক্ক প্রস্তুত হয়, তাহা চক্ষুরোগকর ও লঘু।

(সুশ্রুত শারীরস্থান মদ্যবর্গ ৪৫ অ° ও উত্তরতন্ত্র ৪৭ অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, মদ্য, শীধু, মৈরের, মিরা, মদিরা, সুরা, কাদম্বরী, বারুণী, হালা ও বলবল্লা এই কএকটি মদ্যের নাম। সামান্যতঃ লোকে মাদকার্থে যে সকল বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাকেই মদ্য কহে। এই মদ্য অরিষ্ট, সুরা, শীধু ও আসব প্রভৃতি ভেদে নানা প্রকার।



সকল প্রকার মদ্যই উষ্ণবার্ধ, পিত্তবর্ধক, বায়ুনাশক, ভেদক, রক্ত, অতিশয় কফকারক, অন্নরস, অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিজনক, পাচক, আশুকারী, তীক্ষ্ণ, স্বল্পমার্গাহুসারী এবং বিশদ। ঔষধ ও জল একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে অরিষ্ট কহে। অরিষ্ট সকল প্রকার মদ্য অপেক্ষা গুণাধিক্যজনক, বিশেষতঃ লঘুপাক। অরিষ্টসমূহের গুণ উহার উপাদান-দ্রব্যের গুণের ভায়ে জানিতে হইবে।

শালি ও ষষ্টিক পিষ্ট প্রভৃতি দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে সুরা কহে। সুরা গুরু, বলজনক, স্তম্ভবদ্ধক, শরীরের পুষ্টিসম্পাদক, মেদোজনক, কফপ্রদায়ক, ধারক এবং শোথ, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী ও মূত্রকচ্ছুনাশক।

বারুণী সুরার প্রভেদমাত্র। পুনর্বারুণী শিলাতে পেয়ণ করিয়া যে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহাকে বারুণী কহে। তাল অথবা খেজুরের রস মিশ্রিণে যে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহাও বারুণী নামে অভিহিত। বারুণী সুরার ভায়ে গুণদায়ক, বিশেষতঃ লঘু, এবং পীনশ, আত্মান ও শূলনাশক।

ইক্ষুরস সিদ্ধ করিয়া যে শীধু প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে পকরসশীধু এবং অপক ইক্ষুরস দ্বারা যে শীধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে শীতরসশীধু বলা যায়। পকরসশীধু শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক, বর ও বর্ণপ্রসাধক, অগ্নিবদ্ধক, বলকারক, বায়ু ও পিত্তবদ্ধক, স্তম্ভঃমিথকারক, রুচিজনক এবং মেদ, শোথ, অর্শ, শোথ, উদর ও কফরোগনাশক। শীতরসশীধু পকরসশীধু হইতে অল্পগুণদায়ক, বিশেষতঃ লেখনগুণযুক্ত।

অপক ঔষধ ও জল দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে আসব কহে। আসবের গুণ উপাদানসামগ্রীর ভায়ে জানিতে হইবে।

নূতন মদ্য—অভিযানী, ত্রিদোষজনক, সারক, অরুণ, শরীরের উপচয়কারক, দাহজনক, দুর্গন্ধযুক্ত, বিশদগুণাঘিত এবং গুরু। পুরাতন মদ্য—রুচিজনক, কৃমিনাশক, কফয়, বাতাপহারক, হৃদয়গ্রাহী, সুগন্ধি, লঘু ও রেতঃশোধক; ইহাই বিশেষ গুণকারী।

মদ্যপানের বিধানানুসারে যথাকালে উপযুক্তমাত্রায় হিতকর-দ্রব্যের সহিত স্ফুটচিত্তে যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, তাহার ঐশীত মদ্য অমৃতের ভায়ে গুণকারী হয়। কিন্তু মদ্য স্বভাবতঃ অদ্বৈত ভায়ে জানিতে হইবে, অর্থাৎ বিধিপূর্বক সেবন করিলে অন্নপানাদি যেকোন দেহের হিতকর এবং অবিধিপূর্বক সেবন করিলে যেকোন অহিতকর, মদ্যও তদ্রূপ

জানিবে, সুতরাং যথানিয়মে পান করিলে অমৃততুল্য এবং নিয়মাতীত্রে পান করিলে রোগের হেতুভূত হইয়া থাকে।

মদ্য পান করিয়া মুখা, এলবালুকা, কুড়, জীরা, ধনে ও এলাচ একত্র চর্ষণ করিলে মদ্যজনিত মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

( ভাবপ্রঃ মদ্যবর্ণ )

চরক প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে মদ্যের বিষয় এইরূপই লিখিত আছে, বাহ্যভায়ে তাহা লিখিত হইল না।

ব্রাহ্মণের মদ্য পান করিতে নাই। মদ্যপানে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়। মহাত্মভব শুক্লাচার্য্য সুরার প্রতি এই অভি-শাপবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন,—

“যো ব্রাহ্মণোহম্যপ্রভূতীহ কশ্চিৎ

মোহাৎ সুরাং পাশ্চতি মন্দবুদ্ধিঃ।

অপেতধর্মো ব্রহ্মহা চৈব স তা-

দগ্নিন্নোকে গহিতঃ স্তাৎ পরে চ॥

ময়া চেমাং বিপ্রধর্মোক্তমীমাং

মধ্যাদাং বৈ স্থাপিতাং সর্ললোকে।

সন্তো বিপ্রাঃ শুশ্রবাসো গুরুণাং

দেবা লোকাস্চোপশৃঙ্খ সর্কে॥” (মহাভারত ১।৩২ অঃ)

আজ হইতে যে ব্রাহ্মণ মোহহেতু সুরাপান করিবে, সেই মন্দবুদ্ধি ধম্মচ্যুত, ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত এবং ইহ ও পর-লোকে গহিত হইবে। আমি ব্রাহ্মণের ধর্মবিষয়ে এই সীমা ও মধ্যাদা জগতে স্থাপন করিলাম। ইহা সাধুগণ, ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ প্রভৃতি শ্রবণ করুন।

রাজনির্ঘণ্টে লিখিত আছে,—দ্বিজ ঔষধার্থেও মদ্যপান করিবেন না। এই স্থলে দ্বিজ শব্দ দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে। এই শ্রেষ্ঠ বর্ণেরই মদ্যপান নিষিদ্ধ। মৃত-ব্যক্তি যদি জীবন পায়, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণকে মদ্যপান করাইবে না।

“মদ্যপ্রয়োগং কুরুন্তি শূদ্রাদিষু মহাস্তিষু।

দ্বিজৈস্তিষ্ঠন্ত ন গ্রাহং যদ্যপ্যজীবয়েন্মৃতম্॥” (রাজনিঃ)

পুরাণাদিতেও ব্রাহ্মণের মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

“অদেয়কাপ্যপেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেব চ।

দ্বিজাতীনামনালোচ্যং নিত্যং মদ্যমিতি স্থিতম্॥

তস্মাৎ সর্লপ্রযত্নেন মদ্যং নিত্যং বিবজ্জয়েৎ।

পীত্বা পততি কশ্মভাস্বস্ত্যযো দ্বিজোত্তমঃ॥”

( কৃষ্ণপুঃ ১৬ অঃ )

দ্বিজাতিদিগের মদ্য অদেয়, অপেয়, অস্পৃশ্য, অতএব দ্বিজাতিগণ অতিশয় যত্নসহকারে মদ্য পরিত্যাগ করিবেন, যদি কোন শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণও মদ্যপান করেন, তবে তিনিও কশ্ম

হইতে পত্তিত হন এবং তাঁহার সহিত আলাপ পরীক্ষা করিতে নাই।

গুরুত্বপূর্ণের ২২ অধ্যায়েও বিজ্ঞাতির মদ্যপানের বিষয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাহ্যিকভাবে তৎপ্রমাণাদি প্রদর্শিত হইল ন।

তত্ত্ব-মতেও মদ্যপান নিষিদ্ধ—

“নারিকেলঞ্চ খাজুরং পানসঞ্চ তথৈব চ।

ঐক্ষবং মধুকং টাকং তালৈঞ্চৈব চ মাক্ষিকম্ ॥

দ্রাক্ষত্ব দশমং ক্ষেয়ং গোড়ং চৈকাদশং স্মৃতম্।

পৈষ্টঞ্চ দ্বাদশং প্রোক্তং সর্বেষামধমং স্মৃতম্ ॥

মধ্যমং মধুজং গোড়ং শেষকোত্তমমিষাতে।

এতদ্বাদশকং মদ্যং ন পাতব্যং দ্বিজৈঃ কচিৎ।

ক্ষত্রিয়াদিঃ পিবেৎ সৰ্বং পৈষ্টীমেকান্ত বর্জয়েৎ ॥

সুয়াং পীত্বা দ্বিজো মোহাৎ কামাৎ তক্রাদিমিশ্রিতাম্।

ত্রৈবার্ষিকং ব্রতং কুর্যাদীষ্মিন্শ্রে তু বার্ষিকম্ ॥

তক্রাদিমিশ্রিতাং কিঞ্চিৎ সুয়াং পীত্বা হ্যকামতঃ।

কৃচ্ছ্রাঙ্গপাদমুচ্ছার্য পুনঃ সংস্কারমহিতি ॥

মুখপ্রবেশমাত্রস্ত প্রায়শ্চিত্তাক্ষিপ্যচরেৎ।

অমুপনীতো দেবেশি! ব্রতং ত্রৈবার্ষিককরেৎ ॥”

( শ্রীমৎশতস্কৃত মহাতত্ত্ব চতুর্বিংশতিসাহস্রে ৩৬ পটল )

নারিকেল, খাজুর, পানস, ঐক্ষব, মধুক, টাক, তাল, মাক্ষিক, দ্রাক্ষ, গোড়, পৈষ্ট ও মধুজ এই দ্বাদশ প্রকার মদ্য। এই দ্বাদশ প্রকার মদ্যই ব্রাহ্মণের অপেয়। এই সকল মদ্যের মধ্যে পৈষ্টমদ্য সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, মধুজ ও গোড় মদ্য মধ্যম, ইহা ভিন্ন আর সকল প্রকার মদ্য উৎকৃষ্ট। ক্ষত্রিয়াদি পৈষ্ট মদ্য ভিন্ন অপর একাদশবিধ মদ্য পান করিতে পারিবে। অমুপনীত ব্যক্তি মদ্য পান করিলে ত্রৈবার্ষিক ব্রত আচরণ করিবে।

“পৈষ্টীপানে ব্রাহ্মণস্ত মরণান্তিকমুচ্যতে।

মাধ্বী-গোড়া-সুয়াপানে দ্বাদশাঙ্গং বিধীয়তে ॥

ইতরেবাস্ত পানেন শুদ্ধিশ্চাত্ত্রায়ণেন তু।

রাজত্ববৈশ্বর্যোচ্চাপি গোড়ী মাধ্বী ন শস্ততে ॥

মোহাৎ ক্ষত্রস্ত বৈশ্বশ্চ পীত্বা কৃচ্ছ্রং ঘৃণং চরেৎ।

শূদ্রোহপি গোড়ীং পৈষ্টীঞ্চ ন পীবেদ্বীনসংস্কৃতাম্ ॥

কামাৎ পীত্বা সুয়াং বিপ্রো মরণান্তিকমচরেৎ ॥

চরেচ্চাত্ত্রায়ণং জ্ঞানাতঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্ব এব চ।

পৈষ্টীপানে তু শূদ্রস্ত প্রাজ্ঞাপত্যং বিনির্দিশেৎ ॥

জ্ঞানাদভ্যাসবোপে তু চাত্ত্রায়ণত্রয়ং স্মৃতম্ ॥”

( মৎশতস্কৃত মহাতত্ত্ব চতুর্বিংশতিসাহস্রে ৩৬ পটল )

ব্রাহ্মণ পৈষ্টীমদ্য পান করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মাধ্বী ও গোড়ীসুয়াপানে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত এবং অস্ত্র মদ্য-সেবনে চাত্ত্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব গোড়ী ও মাধ্বীমদ্য পান করিলে কৃচ্ছ্র-ব্রতচরণে শুদ্ধিলাভ করিবে।

মদ্যপান শূদ্রেরও নিষিদ্ধ। শূদ্র পৈষ্টী-মদ্যপানে প্রাজ্ঞা-পত্য-ব্রতাস্থাপন করিবে। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানতঃ ও একবারের পক্ষে জানিতে হইবে। জ্ঞানপূর্বক সেবনে এবং অভ্যাসে চাত্ত্রায়ণত্রয় আচরণ করিতে হয়।

উৎপত্তিতত্ত্বে লিখিত আছে—

“সিদ্ধমদ্রা ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।

কলৌ তু ভারতে বর্ষে লোকা ভারতবাসিনঃ।

গৃহে গৃহে সুয়াং পীত্বা বর্ণভ্রষ্টা ভবন্তি হি ॥”

( উৎপত্তিতত্ত্ব ৬৪ পটল )

বাহাদুরের মস্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহারাই বীর, কেবল মদ্যপানে বীর হয় না। কলিকালে ভারতবর্ষে মদ্যপান করিলে বর্ণ-ভ্রষ্ট হইতে হয়। মহানির্লক্ষণতত্ত্বে লিখিত আছে—

“দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।

কেবলং পশুভাবেন মস্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্বর্ণগাম্ ॥” (মহানির্লক্ষণতত্ত্ব)

কলিকালে দিব্য ও বীরভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেবল পশুভাবেই মস্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। ভৈরবতত্ত্বে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে মদ্য নিবেদন অথবা নিজে ভক্ষণও করিবেন না।

“ন দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেবৈ কথঞ্চন।

ক্ষেমকামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥” (ভৈরবত)

“নারিকেলোদকং কাংস্তে তাত্রে গব্যং তথা মধু।

রাজত্ববৈশ্বর্যোর্দ্দেয়ং ন দ্বিজস্ত কদাচন ॥

এবং প্রদানমাত্রো হীনায়ুর্ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥” (আগমতত্ত্ববিলাস)

কাংস্তপাত্রে নারিকেলোদক, তাম্রপাত্রে গব্য ও মধু, এই সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের পক্ষে দেয়। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে নহে।

স্মৃতি, তত্ত্ব প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। মনুতে লিখিত আছে—

“সুয়াং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুয়াং পিবেৎ।

তয়া স্বকায়ে নিদং মূচ্যতে কিম্বিধাং ততঃ ॥

সুয়া বৈ মলমদ্রানাং পাপ্যা চ মলমুচ্যতে।

তন্মাদ্ ব্রাহ্মণরাজত্বো বৈশ্বশ্চ ন সুয়াং পিবেৎ ॥

গোড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়ান্ত্রিবিধাঃ সুয়াঃ।

বৈশ্বৈবকা তথা সৰ্বা ন পাতব্য দ্বিজোত্তমৈঃ ॥

বক্ষরকঃপিশাচাঃ মদ্যং মাংসং সুরাসবন্ম ।

তদব্রাহ্মণেন নাক্তব্যং দেবানামগ্নতাঃ হবিঃ ॥” (মহু ১১ অ০)

ব্রাহ্মণ মোহপ্রযুক্ত সুরাপান করিলে, অগ্নিবর্ণ সুরাপানে দেহভাগ করিয়া পাপমুক্ত হইবেন। সুরা অগ্নের মল, এইজন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেরই মত্ত অপেয়। গোড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী এই তিন প্রকার সুরা। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন সুরাই পান করা বিধেয় নহে।

“মত্তমদেয়মপেয়মগ্রাহং” ( উশনাঃ )

মত্ত দান, পান ও গ্রহণ করিতে নাই।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—দেবতার উদ্দেশে মত্ত নিবেদন করিলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন।

“স্বগাত্রকুধিরং দত্তা আত্মহত্যাংমবাধুয়াৎ ।

মদ্যং দত্তা ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥” (কালিকা পু০)

সকল শাস্ত্রেই মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মত্তপান বিশেষ নিষিদ্ধ।

মত্ত দাদশবিধ, তাহা পূর্বেই অভিহিত হইয়াছে, ইহা সেবনে মত্ততা উপস্থিত হয়, এই জন্ত ঐ সকলের নামই মদ্য। প্রায়শ্চিত্তের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

• “গোড়ীং মাধ্বীং সুরাং পৈষ্টীং পীত্বা বিপ্রাঃ সমাচরেন্ ।

তপ্তকৃচ্ছ্রং পরাকঞ্চ চান্দ্রায়ণমহুক্রমাৎ ॥” ( প্রায়শ্চিত্তবিং )

• গোড়ী, মাধ্বী, ও পৈষ্টীমত্ত পান করিয়া ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র, পুরাক ও চান্দ্রায়ণ অহুষ্ঠান করিবেন। এই ত্রিবিধ সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণের মহাপাতক হয়। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গোড়ী ও মাধ্বী এই দ্বিবিধ মদ্যপানে মহাপাতক হইবে না। কিন্তু পৈষ্টী সুরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই পান করা নিষিদ্ধ।

“একা মাধ্বী চ গোড়ী চ পৈষ্টী চ ত্রিবিধাঃ সুরাঃ ।

দ্বিজাতিভিন্ন পাতব্যঃ কদাচিদপি কহিচিৎ ॥”

ইতি যমবচনে দ্বিজাতিপদং ব্রাহ্মণপরেমব, অতএব দ্বিবিধ-সুরাপানে ন ক্ষত্রিয়াদীনাম মহাপাতকং। তাবদন্ত দোষাভাব-মেবাহ বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

“কামাদপি হি রাজতো বৈশ্ণো বাপি কথঞ্চন ।

মদ্যমেব সুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে ॥

তদেবং পৈষ্টীনীষেধস্তৈর্বার্ণকানাং, গোড়ীমাধ্বীনীষেধস্ত ব্রাহ্মণানাম্বেব ।” ( প্রায়শ্চিত্তবিবেক )

এই বচন দ্বারা বুঝা যায় যে, গোড়ী ও মাধ্বীসুরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পান করিলে দোষাবহ হইবে না। কিন্তু পৈষ্টীমদ্যপানে মহাপাতক হইবে। উপরি-উক্ত বচনে যে “দ্বিজাতি-পাতব্য” এইরূপ অভিহিত হইয়াছে, তাহাতে দ্বিজাতিপদে

ব্রাহ্মণ বৃত্তিতে হইবে। কারণ, অজ্ঞাত বচনে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মদ্যপানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বচনসকলের সঙ্গতির জন্য দ্বিজাতিপদ ব্রাহ্মণপরে, ইহাই সুসঙ্গত।

ব্রাহ্মণের ক্রীণগও মদ্যপান করিতে পারিবে না। যে ব্রাহ্মণী মদ্যপান করে, তাহার পতিলোকগমনে অধিকার থাকে না।

“তজ্জাতোঃ ক্রীণামপি সুরাপাননিষেধঃ, যথা ভবিষ্যে,—

“তস্মাৎ ন পেয়ং বিপ্রৈঃ সুরামদ্যং কথঞ্চন ।

ব্রাহ্মণ্যাপি ন পেয়া বৈ সুরা পাপভয়াবহা ॥”

“যা ব্রাহ্মণী সুরাপী স্মারতাং দেবাঃ পতিলোকঃ নয়ন্তি। স্রতি। ন চৈবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যক্রীণামনিষেধঃ ॥” ( প্রায়শ্চিত্তবিং )

মহুতে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিয়া মরণান্ত যে প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে, তাহা জ্ঞানতঃ এবং অভ্যাসতঃ, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পান করিলে ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

“এতচ্চ মরণপ্রায়শ্চিত্তং কামকৃতে যথাহ বৃহস্পতিঃ—

“সুরাপানে কামকৃতে জলন্তীং তাং বিনিঃক্ষিপেৎ ।

মুধে স হি বিনির্দগ্নৌ যুভঃ শুক্লিমবাপ্নুয়াৎ ॥” প্রায়শ্চিত্তবিং

এই যে সকল প্রায়শ্চিত্তের বিধান লিখিত হইল, তাহা গোড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী সম্বন্ধে জানিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ পানস, ব্রাহ্ম প্রভৃতি মদ্যপান করিলে তৈরাত্ত্রিক ত্রতাচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

“অপর্যুযিত-পানসাদ্যো কাদশবিধমদ্যপানে ত্রিরাত্রং। পানসঃ ব্রাহ্মমাধুকমিতাদ্যভিধায়, পুলস্ত্যঃ,—

“ত্রাক্ষকুটকুর্জর-পনসাদেশেচ যো রসঃ ।

সদ্যোজাতস্ত তং পীত্বা ত্রাহাৎ শুক্ল্যেৎ দ্বিজোত্তমঃ ॥”

( প্রায়শ্চিত্তবিবেক )

বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্ত অর্দ্ধেক।

[ অন্যান্য বিষয় মত্ত ও সুরাসার শব্দে দেখ। ]

তত্ত্ব কোলাচারীদিগের মদ্যপানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

“কুলাচাররতো বীরঃ কুলসঙ্গী সদা ভবেৎ ।

সদ্বিদাসেবনং কুর্য্যাৎ সোমপানং মহেশ্বরী ॥

সুরাপানরতো নিত্যং বলিপূজাপরায়ণঃ ।

নরশ্লাগশ্চ মহিষো মেঘঃ শূকর এব চ ॥

ইত্যাদেস্ত বলোদ্যতৈঃ পূজয়েৎ শ্বেইদেবতাম্ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রকুর্য্যাচ্চ দিনে দিনে ॥

কুলবারে কুলকে' চ তিথৌ চ কুলকে তথা ।

ভৈরব্যাঃ কল্পিতং চক্রং সংস্থাপ্য পূর্ব্বং প্রিয়ে ॥

সুরাণাং শোধনং কুর্য্যাৎ যথাবৎ পরমেশ্বর।  
 প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্কে বর্ণা বিজোভমাঃ ॥  
 নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্কে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥  
 • বিজয়াঞ্চাহুকরঞ্চ বিজো দদ্যাদ্ যুগে যুগে ॥”

( উৎপত্তিতত্ত্ব ৬৩ পটল )

কুলাচারিগণ সর্কদা কুলসঙ্গী হইয়া সোমপান করিবেন।  
 শক্তি উদ্দেশে বলি ও পূজা দিয়া নিত্য সুরাপানে রত থাকি-  
 বেন। কুলবার, কুলতিথি ও কুলনক্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও  
 কাম্যকর্মে অহুষ্ঠান করিয়া ভৈরবীচক্রে কল্পনা করিবেন,  
 ভৈরবীচক্রে কল্পিত হইলে সুরাশোধন করিতে হয়। এই  
 চক্রে সকল বর্ণই বিজোভম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন।  
 ইহার অবসান হইলে পুনরায় যে যে বর্ণ, সে সেই বর্ণই  
 থাকে। ইহাতে বিজয়া (সিদ্ধি) ও অহুকর-দ্রব্য দেওয়া  
 আবশ্যক। সুরার অভাবে গোক্ষীর অহুকর হইতে পারে।

“দ্রব্যভাবে চাহুকরৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ॥

সুরাভাবে চ গোক্ষীরং বিজো দদ্যাদ্ যুগে যুগে ॥”

( নিরুত্তরতত্ত্ব ৫ পটল )

তদ্ব্যমতে, শোধন না করিয়া ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে ব্রহ্ম-  
 ষাভী এবং শোধিত সুরা পান করিলে ব্রাহ্মণ জলদগ্নির দ্বায়  
 তেজস্বী হইয়া থাকেন।

“অসংস্কৃতাং সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥

সংস্কৃতাং সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো জলদগ্নিবৎ ॥”

( উৎপত্তিতত্ত্ব )

আবার মাতৃকাভেদতত্ত্বে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণ মদ্যপান  
 করিলে মহামোক্ষ এবং তৎক্ষণাৎ শিবরূপতা প্রাপ্ত হইয়া  
 থাকেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ক্ষত্রিয়াদি সায়ুজ্য  
 প্রভৃতি মহামোক্ষ লাভ করেন। যেকোন জলে জল লীন হয়,  
 তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মদ্যপান দ্বারা ব্রহ্ম লীন হন। মদ্যপান ব্যতীত  
 তত্ত্বজ্ঞান হয় না। গায়ত্রী জপ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তাহা  
 নহে, যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তখনই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন।  
 ব্রহ্মজ্ঞান শব্দের অর্থ এইরূপ,—দেবতাদিগের অমৃত ব্রহ্ম,  
 তাহাই লৌকিক সুরা এবং এই সুরভোগমাত্রই সুরা নামে  
 অভিহিত হয়। ব্রহ্মশাপাদি মোচনরূপ মন্ত্রপাঠ করিলে সুরা  
 ব্রহ্মময়ী হইয়া থাকে। মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত-সুরার পাপ দূর হয় ও  
 মুক্তি ঘটিয়া থাকে। এইরূপ সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ-  
 পদবাচ্য, বেদজ্ঞ, অগ্নিহোত্রী ও দীক্ষাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন।

“ব্রাহ্মণস্ত মহামোক্ষো মদ্যপানে প্রিয়ংবদে ॥

ব্রাহ্মণঃ পরমেশানি বহি পানাদিকং চরেৎ ॥

তৎক্ষণাৎ শিবরূপোহসৌ সত্যং সত্যং হি শৈলজে ॥

XIV

তোয়ে তোরং যথা লীনং তৈজসং তৈজসে যথা ॥

ঘটে ভথে যথাকালং বায়ৌ বায়ুর্যথা প্রিয়ে ॥

তথৈব মদ্যপানেন ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণি প্রিয়ে ॥

লীয়েতে নাত্র সন্দেহঃ পরমাশ্রয়ী শৈলজে ॥

সায়ুজ্যাদিমহামোক্ষং নিযুক্তং ক্ষত্রিয়াদিষু ॥

মদ্যপানং বিনা দেবি তত্ত্বজ্ঞানং ন লভ্যতে ॥

অতএব হি বিপ্রস্ত মদ্যপানং সমাচরেৎ ॥

বেদমাতৃজপেনৈব ব্রাহ্মণো ন হি শৈলজে ॥

ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি! তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

দেবানামমৃতং ব্রহ্ম তদেব লৌকিকী সুরা ॥

সুরং ভোগমাত্রেণ সুরা তেন প্রকীর্ণিতা ॥

মন্ত্রত্রয়ং সদা পাঠ্যং ব্রহ্মশাপাদিমোচনম্ ॥

প্রকুর্যাতু হি যেনৈব তদা ব্রহ্মময়ী সুরা ॥

হবিরারোপমাত্রেণ বহির্দীপ্তো যদা ভবেৎ ॥

শাপমোচনমাত্রেণ সুরা মুক্তিপ্রদায়িনী ॥

অতএব হি দেবেশি! ব্রাহ্মণঃ পানমাচরেৎ ॥

স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞঃ সোহগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ ॥

বহ কিং কথ্যতে দেবি স এব নিগুণাত্মকঃ ॥

মুক্তিমার্গমিদং দেবি! গোপ্তব্যং পশুসঙ্কটে ॥

প্রকাশ্যং সিদ্ধিহানিঃ শ্রীং নিন্দনীয়ো ন চাত্তথা ॥”

( মাতৃকাভেদতত্ত্ব ৩ পটল )

সুরা শোধন করিয়া পান করিতে হয়। সুরাশোধন-  
 বিধির বিষয় তত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে,—

পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া কৃতাজলিপুটে বামে গুরু-  
 গণকে এবং দক্ষিণে গণপতিকে নমস্কারপূর্বক মধ্য-  
 দেশে দেবীকে প্রণাম করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিতে  
 হইবে। • তদনন্তর সমস্ত শরীরে মাতৃকাবর্ণস্ত্রাস করিয়া  
 ঋষ্যাদিষ্টাস, ও স্বকল্পবিধানাসূসারে ষড়ঙ্গস্ত্রাস করা  
 বিধেয়। অনন্তর ভূমিতে ত্রিকোণ বা ষট্‌কোণ মণ্ডল করিয়া  
 তাহার উপর মদ্যপাত্র রাখিতে হইবে। ‘ফট্’ এই মন্ত্র দ্বারা  
 পাত্র প্রোক্ষণপূর্বক মূল মন্ত্র দ্বারা ঐ ঘটে মদ পুরিয়া  
 চতুর্দশ স্বরাষিত শক্তিবীজ, নাদবিন্দুসংযোগে তত্পরি এক-  
 শত বার জপ করিতে হইবে। পরে খেজু, যোনি, গালিনী  
 ও মংস্তমুদ্রা দেখাইবে।

“শিব উবাচ।—

শৃণু পার্শ্বতি বক্ষ্যামি তেযাং বৈ শোধনক্রিয়াম্ ॥

পদ্মাসনে সংবিভ্র করপুটে সমাচরেৎ ॥

বামে গুরুমন্ত্রত্যা দক্ষিণে গণপতিং স্মরেৎ ॥

মধ্যে দেবীং মমস্ত্য প্রাণায়ামত্রয়করেৎ ॥

শরীরে মাতৃকাং স্তম্ভাধ্যাদিভাসমাচরেৎ ।  
 স্বকল্লোক্তবিধানেন বড়লজ্ঞাপমাচরেৎ ॥  
 পশ্চাদ্ ভূমো ত্রিকোণং বা ষট্‌কোণং বা মহেশ্বরী ।  
 বিলিখ্য মণ্ডলং শুদ্ধং তন্তোপরি ষটং ভাসেৎ ॥  
 বহুধা প্রোক্ষণং কৃত্বা ফট্‌কারেণ পুনঃ পুনঃ ।  
 ততস্তন্মিন্‌ কারণত্ব মূলে নৈব চ স্থাপয়েৎ ॥  
 মাতৃবর্ণেন দেবেশি ! বিপরীতেন চৈব হি ।  
 পুনঃ ফট্‌কারমস্ত্রেণ প্রোক্ষণং কারয়েৎ স্তবীঃ ॥  
 ততো বিয়চ্ছক্তিবীজং চতুর্দশবরাধিতম্ ।  
 নাদবিন্দুযুগং কৃত্বা তন্তোপরি শতং জপেৎ ॥  
 ততো মূলং জপেন্নয়ঃ স্নানবীজং ততঃ পরম্ ।  
 ধেনুং ঘোনিং গালিনীঞ্চ ত্রিষণ্ডং মীনসংজ্ঞকম্ ।  
 দর্শয়িত্বা বরারোহে ষটং ধৃত্বা পঠেদ্ব্যম্ ॥”

( কৈবল্যতন্ত্র ২ পটল )

পরে এই মদ্যপূর্ণ ষট ধরিত্রা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ  
 করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

“ও একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলহৃদয়ং ধ্রুবম্ ।  
 কচোক্তবাং ব্রহ্মহত্যং তেন তে নাশনাম্যহম্ ॥  
 ও সূর্য্যমণ্ডলমন্তুতে বরুণায়সম্ভবে ।  
 অমাব্যাজময়ে দেবি শুক্রশাপাধিমুচ্যতাম্ ॥  
 ও বেদানাম্‌ প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি ।  
 তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যং ব্যপোহতু ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে আনন্দভৈরবকে  
 ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান যথা,—

“রক্তবর্ণং চতুর্দ্বারং ত্রিনেত্রং বরদং শিবম্ ॥  
 জটাজুটধরং দেবং বাহুকিকণ্ঠধিতম্ ॥  
 ভদ্রকক্ষ কপালধ মৃদগং পাশমুত্তমম্ ।  
 ধারিণং তং যজ্ঞদেবং ব্যাঘ্রচন্দ্রাধরং শিবম্ ॥”

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হইবে। পরে  
 নিম্নোক্ত ধ্যানে আনন্দভৈরবীর পূজা করিতে হয়।

ধ্যান যথা—

“আনন্দভৈরবীং দেবীং বরাভয়লসংকরাম্ ।  
 ঘোররূপাং বরারোহাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসম্ ॥  
 রক্তবর্ণাং মহারোজীং সহস্রভৈরবাবিতাম্ ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদৈঃ স্তূরমানাং শিবাং ভজে ॥”

পরে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ঐক্য ভাবনা  
 করিয়া স্তব্ধাগারজী স্মরণ করিতে হইবে।

গায়ত্রী যথা—“ও স্তব্ধাদেবৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ।”

এই গায়ত্রী পাঠ করিলে পরে মদ্যভক্তি হয়। এই

স্তব্ধা মধ্যে বিষদণ্ড দ্বারা মূল মন্ত্র লিখিয়া রক্তবস্ত্রে পূজা  
 করিয়া ইহা আচ্ছাদন করিতে হইবে। পরে এই মদ্য  
 নির্লিকারচিত্রে পান করিবে, এইরূপে মদ্য পান করিলে  
 ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই হইয়া থাকে।

“ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বিষয়াণাঞ্চ পার্শ্বতি !

সর্কেষাং কারণং যন্মাং কারণং পরিকীর্তিতম্ ॥

অস্মাকঞ্চ মহেশানি শরীরকারণং হি তৎ ।

মৃত্যুজয়োহং বীরেশি বীরকার্য্যপ্রসাদতঃ ॥

নির্লিকারেণ দেবেশি নির্লিকলেন চেতসা ।

সেব্যমানং কুলং ভদ্রে ভক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥

নির্লিকলো মহেশানি মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ ।

সবিকলো বরারোহে রোরবং যাতি নিশ্চিতম্ ॥”

( কৈবল্যতন্ত্র ২ পটল )

প্রাণতোষিণী প্রভৃতিতেও মদ্যশোধনের বিষয় উল্লিখিত  
 হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

[ স্মরা দেখ ]

২ বাসুদেবপদী। ( ভাগবত ৯২৪৪৫ ) ও ছন্দোভেদ,  
 এই ছন্দের প্রতি চরণে ২২টি করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার  
 লক্ষণ—

“সপ্তভকারকৃতাবসিতৌ চ গুরুঃ কবিভিঃ কথিতা মদিরা”  
 ( বৃত্তরত্নাং টীকা )

এই ছন্দের ১, ৪, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৯, ২২ অক্ষর গুরু,  
 ভিত্তি বর্ণ লঘু।

মদিরাধ ( ত্রি ) মদিরে ইব অক্ষিণী যন্ত ইতি ( অক্ষোহ-  
 দর্শানাং । পা ৫।৪।৭৬ ) ইতি অহ। ১ খণ্ডনতুল্যনেত্রা  
 ( পুং ) ২ বিরাটরাজের ভ্রাতা। ( ভারত ৪।২০। ) স্ত্রিয়াং  
 ডীপ্, মদিরাধী—মত্তলোচনা।

“অবিদিতস্বধঃখং নিগুণং বস্ত্ত কঞ্চিং

জড়মতিরহি কশ্চিন্মোক ইত্যোচচক্ষে।

মম তু মতমনস্বেরতারুণ্যঘূর্ণ-

অদকলমদিরাধীনীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ ॥” ( অমর-শ-৩ )

মদিরাগৃহ ( ক্রী ) মদিরাগৃহম্ । মদ্যের গৃহ, মদ্যসজ্জান-  
 গৃহ। পর্য্যায়—গঞ্জা।

“ভাণ্ডাগারে বিচূর্ণজং খনো থঞ্জা সুরাগৃহে।

মদ্যভাণ্ডে স্তব্ধা গুঞ্জা গুঞ্জা স্তাং কাককৃক্ষিকা ॥”

( ভরতহৃত হডডচন্দ্র )

মদিরাধ ( পুং ) ১ বিরাট নৃপতির সেনাপতিভেদ। ( ভারত  
 উদ্যোগপ-৩ ) ২ হিরণ্যহতের স্বত্তর প্রাচীন নৃপভেদ।

( ভারত অমরশা-১৪৮ অ-৩ )

মদিষ্ঠা (ত্রী) মনোহরা অতীতি মদ-ইনি ইয়মতিশয়েন  
মদিনীতি ইঠন, ইনো লোপঃ, টাপ্। মদিরা। (হেম)

মদিমু (ত্রি) মততাবুক প্রকুল। (নিরুক্ত ৪১২)

মদী (ত্রী) মদাতি চূর্ণকরোতি কষ্টক্ষেত্রলোষ্টাদিকমিতি  
মদ ইনঃ কৃদিকারাদিতি পক্ষে ভীষু, পুষোদরাদিভ্যাং সাধুঃ।

১ চষক বস্ত্র। (নানার্থে হেম) ২ কষক বস্ত্র। (বৈশ্ববর্গে জটধর)

মদীয় (ত্রি) মম ইদং অশ্বচ্ছাদীয়। মৎসবন্ধীয়, চলিত আমার।

“হে দেবতান্ত্রপোংশেন মদীয়েনৈব ভূপতিঃ।”

(কথাসরিংসাং ২৮৯০)

মহুরা, মাজার-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণস্থ একটা জেলা। প্রাচীন  
হিন্দুরাজগণের অধিকারে ইহা মধুরা বা মধুরাপুরী নামে খ্যাত  
ছিল। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, এই মধুরারাজ্য একটা  
জেলারূপে পরিণত হয়। ভূপরিমাণ ৮৪০১ বর্গ মাইল।  
অক্ষা° ৯°৪' হইতে ১০°৪৪' এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৪' হইতে  
৭৯° ২০' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই জেলা ৬টা তালুকে  
বিভক্ত। তন্মধ্যে রামানন্দ ও শিবগঙ্গা প্রধান। মহুরা-  
নগরে জেলার বিচার-সদর স্থাপিত।

এই জেলার পশ্চিম ও উত্তরভাগে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা  
বিস্তৃত। দক্ষিণপশ্চিমের ত্রিবাঙ্কোড় শৈল উহার অংশমাত্র।  
শেষোক্ত শৈলের পলনীশাখা এই জেলার অন্তর্গত। স্থানীয়  
লোকে উহাকে বরাহপর্বত বলে। অদূরে উহার সর্বোচ্চ  
শৃঙ্গ কর্ণাট ৮ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ। এই শৃঙ্গাবলীর  
মধ্যস্থলে একটা ৭ হাজার ফিট বিস্তীর্ণ অধিত্যকা ভূমি। উহার  
পরিমাণ প্রায় ১ শত মাইল। এখানকার কোদৈকাজল  
নামক স্থানে যুরোপীয়গণের স্বাস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠিত। এই-  
স্থানে যুরোপীয়গণের যত্নে দিন দিন কাকিচাসের উন্নতি  
হইতেছে। ইহার পূর্বভাগে নাটমগ্রামের সন্নিকটে  
শিরুমলয়, করুণমলয়, নাটম ও অলগড় গিরিশ্রেণী।  
ইহাদের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ ৪৪০০ ফিট। ঐ সকল পর্বতে  
বহু পূর্বকালে জনমানবের বসবাস ছিল। এখন জলবায়ুর  
পরিবর্তনে স্থানীয় স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটান্নাছে এবং সেই  
সকল স্বাস্থ্যাবাস পরিত্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মহুরানগরের  
সন্নিকটে কএকটা গুপ্তশৈল দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে গিরিহর্গ-  
শোভিত দিগুগল এবং অনমলয় (হস্তিপর্বত) ও মুসল-  
মানদিগের পরম পবিত্র স্বকুমলয় পর্বত উল্লেখযোগ্য।  
স্বকালে অনেক মুসলমান-সাধুর সমাধিমন্দির অবস্থিত।

দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত বৈগাই নদী এখানকার প্রধান।  
মহুরানগর এই নদীতীরে অবস্থিত। সুরলি, বরাহনদী ও  
বট্টলগুণ্ড বৈগাইনদীর কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। এতদ্ভিন্ন

গুণ্ড ও বর্ষলাই নামে আরও দুইটা নদী আছে। নদীগুলি  
পার্বত্যীয় বর্ষার বন্যায় পরিপ্লাবিত হইয়া ভীষণবেগে সমুদ্র-  
সঙ্গমে গমন করে এবং বৎসরের অপর সকল সময়েই ক্ষুদ্র  
প্রোতস্থিনীর স্রাব বহিয়া যায়। এই সময় নদীবক্ষে আলি  
বাধিয়া জলরোধপূর্বক শস্যক্ষেত্রে জল সিঞ্জন করা হইয়া  
থাকে।

সমগ্র জেলার মধ্যে প্রায় ১০৯৮ বর্গ মাইল স্থান পর্বত ও  
বনে সমাচ্ছন্ন। ঐ বনের প্রায় একতৃতীয়াংশ ইংরাজ-  
গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। পলনীপর্বতে শালবৃক্ষ-  
ব্যতীত, সুপারি, এলাচ, দারুচিনি ও মরিচাদি জন্মে। পার্বত্য-  
বিভাগে নানাবর্ণের প্রস্তর পাওয়া যায়। উহার মধ্যে নানা  
প্রকার ওপাল, স্ফটিক, ক্যালসিডোনি, জেম্পার ও গার্গেট  
প্রধান। খনিজ পদার্থের মধ্যে সোরা, লবণ, চূণ ও লৌহের  
কারবারই অধিক। পলনীপর্বতগাত্র-বিদ্যোতকারিণী প্রোত-  
স্থিনাসমূহ হইতে স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়া থাকে।

মহুরারাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস পাণ্ড্যরাজবংশের সাহিত্য  
জড়িত। মধুরাপুরে পাণ্ড্যরাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।  
গ্রীক ভৌগোলক টলেমী ও পেরিপ্লাসের বর্ণনা হইতে পাণ্ড্য-  
রাজবংশের সমৃদ্ধির কথা শুনা যায়। মধুরাপুরীর স্থলপুরাণে  
পাণ্ড্যরাজবংশের উল্লেখ আছে। উহার অধিকাংশস্থল  
পৌরাণিক উপাখ্যানে গ্রথিত হওয়ায় সাধারণের বিশ্বাসের  
অযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম-  
প্রচার ও শিবলিঙ্গাদি প্রতিষ্ঠা হইবার আভাস পাওয়া যায়।  
প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধানে শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির  
সাহায্যে মধুরার পাণ্ড্যরাজকীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্বারা  
জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী  
পর্যন্ত এখানে পাণ্ড্যরাজ-শাসন বিদ্যমান ছিল। দাক্ষিণাত্যে রাজা  
রাজেন্দ্রচোলের অভ্যুদয়ে পাণ্ড্যরাজ নিস্তেজ হইয়া পড়েন।  
খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাণ্ড্যবংশের শেষ রাজা  
সুন্দরপাণ্ড্য পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইহারই রাজত্ব-  
কালে মালিক নাএব কাফুর মহুরা অধিকার করেন।  
অতঃপর মহুরায় ৮ জন মুসলমান রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।  
মুসলমান-শক্তির অবসান হইলে ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে কম্পন উদৈয়ার  
বলপুরুষ মহুরাসিংহাসন অধিকার করেন। ১৪০৪ খৃষ্টাব্দ  
পর্যন্ত মহুরা উক্ত উদৈয়ার-বংশের হস্তে থাকে। ১৪০৪-১৪৫১  
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে হুইজন নায়করাজ এবং ১৪৫১-১৪৯৯  
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পুনরায় ৪ জন পাণ্ড্যরাজ ও তৎপরে  
১৪৯৯—১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নায়কবংশের আধিপত্য  
বিদ্যমান হয়। [ বিস্তৃত বিবরণ পাণ্ড্যবংশে দেখ। ]

চোল ও পাণ্ড্যরাজবংশধরদিগকে পরাজিত ও মুসলমান-প্রতিপত্তি অবসরপ্রায় দেখিয়া বিজয়নগরের অধিপতিগণ মন্তকোতোলন করিয়াছিলেন। ক্রমে এই মহাপ্রভাবশালী রাজবংশ দাক্ষিণাত্যে একটি হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দির প্রারম্ভে বিজয়নগরাদিগণ এখানকার নায়কবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ নায়ককে মহারাজাশাসনে নিয়োগ করেন। বিশ্বনাথ স্বীয় বীৰ্য্যবলে কেবল যে মহারাজাশাসনে উচ্ছল করিয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি নিজ রাজ্যাংশ ৭২ জন সর্দারের মধ্যে বিভাগ করিয়া রাজ্যের বল-ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন। ঐ ৭২ জন পলিগার বা পালৈয়করগণ মহুয়া নগরের ৭২টা ব্লক্জে অবস্থিত থাকিয়া নগর রক্ষা করিতেন। ১৫৫২—১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ্বনাথ মহারাজাশাসনে আসীন থাকিয়া যে বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়া যান; তাহাই তাঁহার বংশধরগণ অব্যাহত ভোগ করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা তিরুমল (১৬২৩-১৬৫২ খৃঃ অব্দ) স্বীয় ভূজ-বলে দাক্ষিণাত্যের তিরেবল্লী, ত্রিবাঙ্কোড়, কোয়ম্বাটুর, সালাম ও ত্রিচীনপল্লী প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া আপনাদি প্রভাব সুদূর রাখিয়াছিলেন। জেজুইট ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহার বলবীৰ্য্য ও মহাবীর কথ্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা তিরুমল যে ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার রাজত্ব হইতে তিনি সেনাবিভাগের সংস্কার করিয়া বল বৃদ্ধি করেন। তাঁহার দ্বারা মহুয়ানগর নানা রাজকীয় সৌধমালায় বিভূষিত হইয়াছিল। ঐ সকল অট্টালিকার অধিকাংশই এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত।

ক্রমে জয়োল্লাসে স্পর্ধিত হইয়া মহারাজ অবশেষে বিজয়নগরাদিগণের অধীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিতে কৃত-সম্বল হইলেন। এই স্বত্রে বিজাপুরের মুসলমান-রাজগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। মুসলমান সুলতানের হস্তে পরাজিত হইয়া তিনি রাজকর প্রদানপূর্ব্বক অব্যাহতি পান। তাঁহার জীবনের শেষসময়ে মহিমুরসৈন্তের আক্রমণে তিনি বিশেষ উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। ভেদমন্ত্রকুশল রাজা তিরুমল দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজগণের মধ্যে একরূপ বৈরভাব স্থাপন করিয়া যান যে, তাহারই ফলে পরবর্ত্তিকালে সমগ্র দক্ষিণভারতে মুসলমানপ্রাধান্য সংস্থাপিত হয়।

তিরুমলের মৃত্যুর পর, মহারাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর ভ্রাতা একোজীর তাজোর-আক্রমণ, মহিমুরের উদৈর্য্য-রাজবংশের ও মুসলমানরাজ হায়দার শাহার আধিপত্য এবং কর্ণাটক নবাবগণের দক্ষিণাপাশ্বাত্মী রাজাপ্রবৃত্তি মহারাজ্যের অবনতির প্রধান কারণ। ১৭৪০

খৃষ্টাব্দে চাঁদ সাহেব মহুয়া অধিকার করেন। তদবধি মহুয়ার নায়কবংশের আধিপত্যের অবসান হয়। অতঃপর ২০ বৎসর ধরিয়া মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে মহারাজ্য ছারখার হইয়া যায়। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটক-রাজ বালাজীর প্রতিনিধিস্বরূপে হংরাজকোম্পানী এই জেলায় পারদর্শনভার গ্রহণ করেন। কর্ণাটকের উক্ত শেষ স্বাধীন নবাব ১৮০১ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রদেশের শাসনভার সর্লভো-ভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে নানা যুদ্ধবিগ্রহের পর দিণ্ডিগল তালুক মহিমুর-রাজশাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

রামনাদ ও শিবগঙ্গা সামন্তরাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস থাকার উহা স্বতন্ত্রভাবেই আলোচিত হইবে। রামনাদের সেতুপতি-বংশীয় সর্দারগণ রামেশ্বরমন্দিরের সেবাহিত। ইহারা বলেন, অবোধ্যাপতি রামচন্দ্র তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষকে এই দেবমন্দিরের অধ্যক্ষতা প্রদান করেন। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, সেতুপতি-রাজগণ পাণ্ড্যরাজবংশের সহিত মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন। নায়করাজগণের অধিকারকালে এই সেতুপতি-সর্দারগণ ৭২ জন পলিগার সর্দারের প্রধানতম বলিয়া গণ্য হইতেন। মরবর নামক রামনাদের দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসীর সাহায্যে নায়কবংশ আপনাদের রাজমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া একরূপ সুদীর্ঘ কাল দাক্ষিণাত্যে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

১৬৫২ খৃষ্টাব্দে তিরুমলরাজের মৃত্যু ঘটিলে রাজ্য মধ্যে মহাবিশৃঙ্খলতা ঘটে। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যেও সেতুপতি স্বীয় বংশাচরিত সুরল ও সহদয় ব্যবহার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দির প্রারম্ভে কএকটি দুর্ভিক্ষে রামনাদ জনশূন্য হইয়া পড়ে। কৃষিকার্য্যের অভাবে ও রাজনৈতিক অন্ত্রবিপ্লবে রামনাদের রাজতন্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে ইহার তৃতীয়-পঞ্চমাংশ রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণের ও অপর দ্বি-পঞ্চমাংশ জনৈক বিরোহি-সামন্তের অধিকারভুক্ত হয়। এই সামন্তের বংশধরগণ শিব-গঙ্গার রাজা নামে খ্যাত।

হংরাজাধিকারের প্রারম্ভে এই সামন্তবংশধরের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ চলিতে থাকে। নানা যুদ্ধবিগ্রহে উভয় সামন্তরাজ্যেরই বিস্তর ক্ষতি হয়। ঐ সময়ের বিশৃঙ্খল শাসনে রাজ্যের শস্তহানিপ্রবৃত্ত রাজকোষও সর্পিণ হইয়া পড়ে। কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া রামনাদ-রাজসংসারের অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু শিবগঙ্গা-রাজের রাজ-কার্য্য এখনও অনেকাংশে বিশৃঙ্খল রহিয়াছে।



মহুরার খৃষ্টধর্মপ্রচার, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা। এই সুপ্রাচীন ধর্মপ্রচারকালের লিখিত বিবরণীতে আমরা মহুরার প্রকৃত ইতিবৃত্তের কতকগুলি ধারাবাহিক ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দির প্রারম্ভে মহুরার জেহুইট খৃষ্টানসম্প্রদায়ের একটি গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একজন পর্তুগীজ-ধর্মযাজক কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর জালিককে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া আপনাদের জাতীয় কার্য সমাধা করিতেছিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ডি নোবিলি মহুরাপরিদর্শনে আগমন করেন। মহুরাবাসী জনসাধারণের ধর্মভক্তি নিরীক্ষণ করিয়া তিনি আপনাকে হিন্দু-ধর্মপ্রচারক বলিয়া পরিচিত করিতে মনে মনে কল্পনা করিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত ক্রলানুরের ধর্মযাজকের (Arch-bishop of Cranganore) অমুমতিক্রমে, সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্বক তিনি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি কেবল স্বল্পমাত্র তণ্ডুলকণা, ছদ্ম ও তিক্ত শাকাদি দিবসে একবার ভোজন করিয়া উদরপুষ্টি করিতেন এবং নিরন্তর একটি নিষ্কিন প্রকোষ্ঠ মধ্যে লুপ্তিত থাকিয়া যোগে মগ্ন হইতেন। তাঁহার এই যোগাবলম্বনের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল, তিনি এইরূপ নিষ্কিন অন্তরালে থাকিয়া তামিলভাষা অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

ক্রমে তাঁহার এই পবিত্র ভাবান্তরের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার ধর্মমত জানিতে ব্যাকুল হইল। তিনি আপনাকে রোমের কুলীন ব্রাহ্মণ-বংশীয় বলিয়া সাধারণে পরিচয় দিলেন এবং জাতিতে ফরাসী হইলেও তিনি ঈশ্বরসাধনার নিমিত্ত গুরুরূপে রোম হইতে ভারতে প্রেরিত হইয়াছেন, ইহাই সাধারণ্যে প্রকাশ করিলেন। ভক্ত হিন্দুগণ তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞানগভীরতা, পরিকাররূপে তামিলশাস্ত্রবাক্যের উচ্চারণ, বুদ্ধিবৃত্তির পরিস্ফুটতা দর্শন করিয়া তাঁহার এই প্রবন্ধনাবাক্যে মুগ্ধ হইল। এক্ষণে তাঁহার অবধূতের জ্ঞান বেণুভূষা দেখিয়াও তাঁহার প্রতি তাহাদের বিশেষ ভক্তি ও বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। খৃষ্টধর্মের নিদর্শনস্বরূপ তিনি তিনখানি স্বর্ণের ও দুইখানি রৌপ্যের কুশচিহ্ন ধারণ করিতেন।

তাঁহার মোহনবাক্যে মোহিত হইয়া তদেশবাসী বহু লোকে তৎপ্রবর্তিত খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। চতুর নোরিলি হিন্দুদিগের চিরপ্রচলিত ক্রিয়াপদ্ধতির কোন বিষয়েই হতক্ষেপ করেন নাই। এইরূপে সাধারণের মনোরঞ্জনপূর্বক তিনি দাক্ষিণাত্যে লক্ষপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। স্বয়ং রাজা তিরুমল তাঁহার মনোহর-বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার

কাণ্ডে সহায়ভূতি জানাইয়াছিলেন। এই ধর্মপ্রচারকরে জেহুইটপ্রবর 'কুন্দন' নামে তামিলভাষায় একখানি খৃষ্টধর্ম-গ্রন্থ প্রচার করেন। এমন কি, তিনি 'বাইবেল' গ্রন্থ সংক্ষেপে অমুবাদ করাইয়া, উহাকে যজ্ঞক্ষেত্রের অংশীভূত করিতে চেষ্টা পান। প্রায় ৪০ বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রমের পর, তিনি ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের নিকটবর্তী একটি গওগ্রামে জীব-লীলা সম্বরণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি অতি দীনভাবেই কালবাণন করিয়াছিলেন। তামিলভাষায় তদ্রচিত কএকখানি ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত আছে।

তাঁহার মৃত্যুর পর জন্ ডি ব্রিটো নামা অনেক পর্তুগীজ দাক্ষিণাত্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। তিনি অসভ্য মর্যাবর জাতিকে সভ্যতালোকে আনয়নের জন্ত স্থায়ী জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিষেবশতঃ তিনি, সেতুপতি-রাজ্যের আদেশে, ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। এই জেহুইট সম্প্রদায়ের শেষ ধর্মযাজক বেস্চি (Beschi) মহুরায় থাকিয়া তামিল-ব্যাকরণ ও কএকখানি সাহিত্য প্রণয়ন করেন।

রাজা তিরুমলের রাজত্বসময়ে, অনেকগুলি পথ ও ছত্র নিশ্চিত হয়। তাঁহার রাজ্যের উত্তরসীমা উক্তান্তর হইতে দক্ষিণসীমা সেতুপতি পর্য্যন্ত একটা সুদীর্ঘ পথ প্রস্তুত করাইয়া তিনি বাজীদিগের সুবিধার জন্ত মধ্যে মধ্যে একএকটি ছত্র স্থাপন করেন। স্থানীয় লোকের সুবিধার জন্ত তিনি অনেকগুলি পুষ্করিণীর সংস্কার ও কতকগুলি নূতন কূপ খনন করাইয়াছিলেন, এতদ্বিধা মহুরার রাজত্ববন, বসন্তমণ্ডপ, তেঙ্গাকুলম্ বৃহৎ বাঁধা পুষ্করিণী, মীনাক্ষীদেবীর মন্দির ও কএকটি গোপুর তাঁহার কীর্তির নিদর্শন।

মধুরাপুরী সুনন্দরলিঙ্গের মন্দির ও তিরুমল নায়কের প্রাসাদের জন্ত প্রসিদ্ধ। সুনন্দরলিঙ্গের উৎপত্তিবিষয়ে স্থল-পুরাণে যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

ত্রৈতাযুগে এক দিবস ইন্দ্রালয়ে দেবনর্তকীগণ নৃত্য করিতেছে, ইন্দ্র মনোনিবেশপূর্বক তাহা দেখিতেছিলেন, দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় আসিলে ভ্রমবশতঃ ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অভিবাদন ও সম্ভাষণাদি করেন নাই। এই ব্যাপারে দেবগুরু বৃহস্পতি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া দেবসভা হইতে প্রস্থানপূর্বক নিজ গুরুত্বপদ ত্যাগ করিয়া তপস্তার্থ গমন করেন। ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত ব্রহ্মাকে জানাইলে পিতামহের আদেশানুসারে তিনি বিশ্বরূপ নামে ত্রিশিরাকে গুরুত্ব বরণ করেন ও বৃহস্পতিকে অশ্বেষণ করিতে কয়েকটি দূত পাঠান। ত্রিশিরা দ্বষ্টার পুত্র, কিন্তু দৈত্যকুলের দোহিতা; দেবগুরুত্বপদ পাইয়া যজ্ঞ



আহুতি দিবার সময় প্রকাশ্যে দেবতাদিগের এবং গোপনে আপন মাতামহকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দেবরাজ ক্রমে ইহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। ত্রিশিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন। পরে দেবতাদিগের সাহায্যে ঐ পাপকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, উদ্ভিদ, জল ও পৃথিবীতে নিক্ষেপপূর্বক ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হন। সেই অবধি উদ্ভিদ হইতে নির্যাস, জল হইতে রজ, জল হইতে ফেন ও পৃথিবী হইতে কারমুক্তিকঙ্ক (সাজিমাটি) উৎপন্ন হইল। ইন্দ্র পাপ হইতে মুক্ত হইলেও তাহার আর একটি বিপদ উপস্থিত হইল। বৃষ্টা পুত্রনিধনে দ্রুঃখিত হইয়া অপর বলিষ্ঠ পুত্রলাভের উদ্দেশে পুত্রেষ্টী বজ্র করিয়া বৃজ নামে অসীম পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করেন। বৃজ ক্রমে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া ত্রিলোকে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ইন্দ্র অনন্তোপায় হইয়া চতুরাননের উপদেশে বিষ্ণুর শরণাগত হন। পদ্মনাভ সহস্রাক্ষকে দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্রায়ুধ নির্মাণ করিয়া বৃজের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। ইন্দ্র উক্ত উপায়ে বৃজকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৃজে ব্রাহ্মণ্য থাকায় ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে পুনরায় লিপ্ত হইয়া মহাকষ্ট পাইতে লাগিলেন; নিরুপায় ইন্দ্র তখন স্বর্গত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আগমনপূর্বক পদ্মকর্ণিকার মধ্যে লুক্কায়িত হন। শাসনকর্তা অভাবে স্বর্গের অরাজকতা দেখিয়া দেবগণ বৃহস্পতির শরণাগত হইলে তিনি পূর্ব অপরাধ মার্জনা করিয়া ইন্দ্রের অশেষবেগে বহির্গত হন। বৃহস্পতি তাঁহাকে পদ্মবনে দেখিতে পাইয়া পাপক্ষয়ের ক্ষুদ্র ভুলোকে তীর্থপয়াটন করিতে আদেশ দেন। তদনন্তর তীর্থপয়াটন, দর্শন ও স্নান করিতে করিতে ক্রমে কল্যাণপুরের সগ্নিকট কদম্ববনে আসিয়া পৌছিলামাত্র ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। ইন্দ্র পাপ-মুক্তির কারণ অবগত হইবার মানসে কদম্ববন অন্বেষণ করিতে করিতে এক অনাদিলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন; বিশ্ব-কর্ষাকে আস্থান করিয়া উক্ত লিঙ্গের উপর মন্দির নির্মাণ করাইলেন। লিঙ্গের নাম সুন্দর রাখিয়া বৃহস্পতি দ্বারা বৈদিক মতে তাঁহার পূজা করাইলেন।

তাঁহার পূজার সন্তুষ্ট হইয়া সুন্দরলিঙ্গ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখা দিলেন, ইন্দ্রও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক স্তব করিয়া ‘প্রত্যহ তাঁহাকে পূজা করিতে পান’ এইরূপ প্রার্থনা করেন। মহাদেব আদেশ করেন যে, স্বর্গে অনেক দিন হইতে অরাজকতা হইয়াছে, পূজা করিবার নিমিত্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া এখানে থাকিবার আবশ্যকতা নাই; বৎসরান্তে বৈশাখী পূর্ণি

মাতে স্বর্গ হইতে আসিয়া পূজা করিলে বৎসরের পূজাকল লাভ হইবে, এখন পরাজ্যে প্রত্যাগমন কর।

মহাদেব ইন্দ্রকে এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলে, ইন্দ্র গুহ্য সম্ভিষ্যাহারে স্বর্গে গমন করেন। তদবধি ইন্দ্র বৎসরান্তে বৈশাখী পূর্ণিমাতে কদম্ববনে আসিয়া মহাদেব সুন্দরেশ্বরের পূজা করিয়া বাইতেন; এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কদম্ববনের নিকটে কল্যাণপুরে কুলশেখর পাণ্ডুরাজের রাজত্বকালে ধনসঞ্চয় নামে কোন বণিক পথভ্রমে খুঁজিতে খুঁজিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কদম্ববনে পুরোক্ত মন্দিরস্থ লিঙ্গ দেখিতে পায়, তথায় রাজ্যোপাসন করিয়া পর দিবস সেই সংবাদ রাজাকে জ্ঞাপন করে; রাজা উক্ত বনে রাজধানী স্থাপন ও মহালিঙ্গের পূজাপদ্ধতি মর্ত্যলোকে প্রচার করেন। অধিক্রমে মহাদেব সেই রাজ্যে রাজাকে প্রত্যাদেশ করেন, রাজা জঙ্গল কাটাইয়া তথায় রাজধানী নির্মাণ-পূর্বক দেবালয়ের সংস্কার করিলেন। কাশী হইতে অধিক আনাইয়া মহালিঙ্গের পূজার নিয়ম করিয়া দিলেন। রাজধানীর নাম কি রাখিবেন মনে মনে ইহা ভাবিতেছেন, এই সময়ে মহাদেব প্রত্যক্ষ হইয়া নতন পুরীতে আপন মন্তকস্থিত অমৃত ছড়াইয়া দেন, তদনন্তর রাজা রাজধানীর নাম মধুরা-পুরী রাখিলেন। এইরূপে রাজা কুলশেখর কর্তৃক সুন্দরলিঙ্গের পূজা মর্ত্যলোকে প্রচারিত, মধুরাপুরী নির্মিত এবং তাহা পাণ্ডুরাজাদিগের রাজধানীরূপে পরিণত হইল। ইহা কোন সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

স্থলপুরাণের মতে যখন অযোধ্যাপতি দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ চতুর্দশ বৎসর বনে আসেন এবং যখন লঙ্কাধিপতি রাবণ পঞ্চবটীবনে সীতাকে অপহরণ করে, তখন রামচন্দ্র অগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে লঙ্কার উদ্দেশে আসিবার সময়ে অগস্ত্য মুনির আদেশানুসারে মধুরাপুরীতে আসিয়া সুন্দরদেবের পূজা ও আরাধনা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রাজা অনন্তগুণপাণ্ড্য মধুরাপুরীতে রাজত্ব করেন; ইনি কুলশেখর হইতে ১১ পুরুষ অন্তর ছিলেন। অতএব স্থলপুরাণের মতে মধুরাপুরী ত্রৈতাগুণে স্থাপিত হয়। পুন্সেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজা কুলশেখর পুরী নির্মাণ করিয়া কাশী হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্বক সুন্দরদেবের পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহাতে অনেকে অস্বস্তি করেন যে, কুলশেখর পাণ্ডুরাজার সময়ে দক্ষিণদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাঁহারই সময়ে আর্য্যাবস্ত হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া দক্ষিণদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

অতি প্রাকাল হইতে দক্ষিণদেখে শিবলিঙ্গের বেষ্টন বহুলপ্রচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা ইহাও মনে করিতে পারি যে, উহা দ্রাবিড় অর্থাৎ তামিলদিগের দেবতা ছিল। আর্ঘ্য-ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণদেখে আসিয়া সর্বত্র উহার বহুলপ্রচার দেখিতে পান ও উহা আপনাদিগের দেবতা করিয়া লয়েন। চিৎত্বরমাহাস্ম্যমতেও পঞ্চম মহুর পুত্র খেতবর্ণ চিৎত্বরতীর্থে নানান্তে হিরণ্যবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া কালী হইতে তিন হাজার ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন; ইহাও পূর্বাঙ্গ-মানের পোষক বলিয়া অস্বীকৃত হয়।

ইহাতে ৯টি গোপুর আছে, তন্মধ্যে ১টি ১৫২ ফিট উচ্চ। এই দেবালয়ের প্রাকার পূর্ব-পশ্চিমে ৭৪৪ ফিট এবং উত্তর-দক্ষিণে ৮৩৭ ফিট। কথিত আছে যে, বিশ্বনাথবংশীয় রাজগণ বাহিরের বৃহৎ প্রাকার ও চারিটি গোপুর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, বিশ্বনাথ নায়ক নূতন করিয়া করেকটি মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া দেন, অরিয়নায়ক সহস্র স্তম্ভ-মণ্ডপ প্রস্তুত করেন। মৃত্যুঞ্জয় নামক গ্রহ পাঠে জানা যায় যে, তিরুমল নায়ক গর্ভগৃহ হইতে কপালী দেবীর মন্দিরের দেওয়াল পর্যন্ত নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন ও তাহারই সময়ে এই দেবালয় উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল।

প্রথমে শিবগঙ্গাতীর্থের জলস্পর্শ করণান্তর বিবেশ্বর সুন্দরলিঙ্গের ও মীনাক্ষী দেবীর দর্শন ও অর্চনাদি করিতে হয়। তৎপরে সাধারণে সহস্র স্তম্ভ-মণ্ডপ ও বসন্তমণ্ডপনামে বৃহৎ মণ্ডপষয় পরিদর্শন করিতে গমন করে। ইহা তিরুমল নায়ক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০০ গজ ও প্রস্থে ২০ গজ। ইহার ছাদ ১২০ এক শত কুড়িটি প্রস্তরস্তম্ভের উপর নির্মিত, প্রত্যেক স্তম্ভ ২০ ফিট উচ্চ।

ইহার মধ্যে জল প্রবাহিত হইবার পরঃপ্রণালী আছে। এই মণ্ডপে সুন্দরলিঙ্গদেবের বসন্তক্ৰীড়া উৎসব হইয়া থাকে। ইহা বৈশাখী শুক্লাপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত দশদিন ব্যাপিয়া মহাসমারোহে নিম্ন হয়। তৎকালে উক্ত জলপ্রণালী জলে পরিপূর্ণ থাকে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তথাকার উত্তম বায়ু জলসংযোগে শীতল হইবে। এই বসন্ত-উৎসব-মণ্ডপের খামে দশ প্রকার মূর্তি খোদিত। তাহাতে তিরুমলের ও তাঁহার পূর্ব নয় পুরুষের এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের ধর্মপত্নীগণের মূর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। সন্তবতঃ ১৬২৪-২৬ খৃঃ অব্দে মধ্যে আরম্ভ হইয়া ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে শেষ হইয়াছিল, একপুস্তকানিতে পাওয়া যায়।

দেবালয়ের বাসন ও অলঙ্কারাদি দেখিবার জিনিস। বাস-

নের মূল্য ৫০,০০০ হাজার ও মণিযুক্তাদির মূল্য অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য টাকার অধিক হইবে। তথা হইতে তিরুমল নায়কের রাজভবন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজভবনের একাংশমাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, অপরাংশ তাঁহার পৌত্র শোকানাথ তামিলরা সেই মশলা দ্বারা ত্রিশিরাপঞ্জীর হৃৎমধ্যে রাজভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পুরাতন রাজভবন সম্প্রতি মেয়ামত হইয়া সেশন জজের কোর্টরূপে পরিণত হইয়াছে। এই ভবনটি দুই অংশে বিভক্ত এবং দেখিবার উপযুক্ত।

অতঃপর তথা হইতে তেল্লনকুলম্ নামক বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা রাজভবন হইতে পূর্ব-উত্তর দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার প্রত্যেক দিক্ ১২০০ গজ লম্বা, চারি দিকে উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তরের সোপান এবং সর্ব উপরে এক গ্রেনাইট প্রস্তরের কলস। স্থানে স্থানে দেবঘোটক, ময়ূর ও অশ্বাত্ত পশুমূর্তি সুশোভিত। কলসের মধ্যদিকে বেড়াইবার একটা প্রশস্ত রাস্তা আছে, তথায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনেকেই বায়ু সেবন করিতে গমন করে। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটা উপদ্বীপ আছে, সেই উপদ্বীপের চতুর্দিকে প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। ইহার উপর মধ্যস্থলে দ্বিমূল দেবালয় ও চারি কোণে ৪ চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকার্যবিশিষ্ট দৈব-মন্দির। মধ্যস্থলে রাস্তা ও রাস্তার পার্শ্ব নানাবর্ণের লতাশৃঙ্গ দ্বারা সুশোভিত।

উৎসবের সময় এক দিবস দেবালয় ও পুষ্করিণীর চারি-দিকে এক লক্ষ বাতি দেওয়া হয়। সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুন্দরলিঙ্গ মীনাক্ষীদেবীর সহিত আগমনপূর্বক তেল্লনের উপর চড়িয়া উপদ্বীপের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

তথা হইতে ৫ মাইল দূরে তিরুপারকুন্ডম্ সেতুহমল্লরের পার্শ্বদেখে এক শৈবমন্দির আছে, এই শৈবমন্দিরও দেখিবার জিনিষ।

মধুরার প্রধান উৎসব বৈশাখী শুক্লাপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত হইয়া থাকে। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত পৌর্ণমাসীতে জম্বের পূজা করিতেন, তদনুসারে দ্বাদশদিবস পর্যন্ত উৎসব হইয়া থাকে। এখানকার লোকের মনে ধারণা আছে যে, উক্ত পৌর্ণমাসীতে সুন্দরলিঙ্গের অর্চনা করিলে সর্বসমর-অর্চনার ফলপ্রাপ্ত হয়। এই কারণে সেই সময় ৩০৮০ হাজার লোক একত্র সমবেত হইয়া থাকে।

মধুরাপুরী এখন জেলার প্রধান নগর হইয়াছে। এখানে জেলার মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, জেলার সেশনজজ, সবডিনেট জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, হেড্‌ আসিস্ট্যান্ট কালেক্টর, পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, জেলার মেডিকেল অফিসার আদি প্রধান প্রধান কর্ম-

চারীর হেড্-কোয়ার্টার হইয়াছে। পুরাতন দুর্গ এখন নাই; নগরটি বহু প্রজাবিশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী এবং প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপাল নগর। এখান হইতে গোকর গাড়ীতে পাঁচ দিনে রামেশ্বর যাওয়া যায়। পথে থাকিবার উত্তম উত্তম ছত্র আছে, পূর্বের ভ্রম দৃষ্টান্ত নাই।

মধুরাপুরীতে অনেকগুলি হ্রদবৃত্ত বন্দু হইয়াছে, নতুন ভবনের মধ্যে নতুন জেলখানা, সিবিএল এবং লাইসিং-ইন্স হোস-পাতাল, জেলার স্কুল, ও আমেরিকান প্রোটেষ্ট্যান্টমিসন বোডিং স্কুল দেখিবার উপযুক্ত। আইমারি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ৮টি মিউনিসিপাল স্কুল আছে। এখানকার ভাষা তামিল হইলেও অনেকেই ইংরাজি বলিতে পারেন।

এখানকার বায়ু শুষ্ক, উষ্ণ ও সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এখানে শীতকাল নাই বলিলেও চলে, এমন কি পৌষমাসে সাধা লংকুথের কামিজ ব্যবহারও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। স্থান স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষা অধিক পরিমাণে হয়। সময়ে সময়ে অতিশয় জলের প্রাচুর্য্যবশত দেখিতে পাওয়া যায়। রামেশ্বরের যাত্রীর ভিড়ে সময়ে সময়ে বিস্মৃতিকা আসিয়া উপস্থিত হয়।

এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে বেঙ্গালর, মরাবর ও কন্নড়জাতিই প্রধান। বেঙ্গালরগণ সাধারণতঃই কৃষিজীবী। জ্বাদ, পাণ্ডরাজগণ কর্তৃক ইহার। এদেশে আনীত হইয়াছে। ইহার। সকলেই বিপুল তামিলভাষার কথা কয়। অনেকে ইহাদিগকে জাবিড়ীর জাতির শাখা বলিয়া অস্বীকার করেন। মরাবর ও কন্নড়গণ বল্লিয়ার্ন নামে খ্যাত। সমুদ্রোপকূলবর্তী রামনাদ ও শিবগঙ্গা-বিষয়ের মধ্যে মরাবর-জাতির বাস দেখা যায়। ইহাদের শারীরিক গঠন ও উপ-ধর্ম্মসেবির অধুধাবন করিলে ইহাদিগকে স্থানীয় আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। ইহার। রামনাদ ও শিবগঙ্গার রাজাদিগকেই আপনাদের সর্দার বলিয়া জানে। ইংরাজ-অধিকারের পূর্বে, ইহার। যুদ্ধকৌশল দ্বারা বীরত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছে। অস্ত্রাস্ত্র জাবিড়ীর জাতির ভ্রম ইহার। শব প্রোথিত করে এবং বিধবার বিবাহ দেয়।

কন্নড়গণ দস্তাবেজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। পছ-কোট। সামন্তরাজ্যে ইহাদের প্রধান আড্ডা। ইহার। একপ উক্ত ও দুর্ভিক্ষ বে, সময় সময় ইংরাজরাজের বিরোধিতা-চরণ করিয়া ইংরাজসেনাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছে। ইহার। কোন জাতি হইতে সমৃদ্ধ, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। পার্শ্ববর্তী অসভ্য জাতির ভ্রম ভূতপ্রভাদি উপদেবতার উপাসনা করাই

ইহাদের ধর্ম্ম। এতদ্বির মুসলমানের ভ্রম স্বাক্ষর ও জীলোকদিগের বহুসামিক-ব্যবহারও তাহাদের মধ্যে দৃষ্টি-গোচর হয়। বাস্তবঃ ইহার। অগ্ন্যপার অসভ্য জাতির মত কর্তৃক করিয়া বাড়াইয়া রাখে।

মধুরার ইংরাজ-শাসন বিস্তৃত হইবার পূর্বে, এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ‘হন্তের’ প্রতিপক্ষতা লইয়া মধ্যে মধ্যে বড়ই বিরোধ উপস্থিত হইত। কোথা হইতে এই বিবাদের সূত্র-পাত হয়, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু কালে কএকটি জাতি রাজা কর্তৃক ‘দক্ষিণহন্ত’ ও ‘বামহন্ত’ বলিয়া বিভোবিত হওয়ার পরস্পরের বিবেচিতাবশতঃ তাৎকালিক রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ হইয়া পড়ে। এখানকার বাবতীর সম্রাটবর্ণের লোকে পরিমার্গিগের দ্বারা ‘বলাদেই’ (দক্ষিণহন্ত) নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং কর্তৃক, স্বর্গকার প্রভৃতি পক্ষশিল্পী ও চর্ম্মকারাদি নিম্নশ্রেণীর লোক ‘বামহন্ত’ বলিয়া অভিহিত। এই কথার উত্থাপনেই উভয় পক্ষে ঘোর বিবাদ বাধে, কিন্তু পরিমাণ ‘দক্ষিণহন্ত’ জাতির পক্ষে থাকায় শেষোক্ত জাতিরা কিছুই করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ ও মুসলমানগণ এই হস্তবিভাগের সময় স্বতন্ত্র ছিলেন, সুতরাং তাহাদিগকে এই বিবেচনাবহির মধ্যে পতিত হইতে হয় নাই। ঐ দুই প্রতিপক্ষদলে পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া রাজ্যের মহা অনর্থ সাধিত করে। মধুরাবাসী চকিলি (চর্ম্মকার) জাতির পুরুষগণ ও তাহাদের রমণীরা বামহন্তের বিভাগে পতিত হইয়াছে। এখনই দক্ষিণ ও বামহন্তবিভাগের সূত্রপাত হয়, তখন ইহাদের মধ্যে স্বামী ও জ্ঞাত কথ। থাকে না। এই বিবাদসূত্রে কখন কখন একএকটি খণ্ডযুদ্ধে বহু লোকের প্রাণ হানি হইয়াছে।

মধুরাপুরী, দিওগল, পলনি, কিলকরই, রামনাদ, অরুঙ্গ-কোটই, পেরিয়কুলম্, দেবীকোট।, পার্শ্বাণ্ডি, তিরুমল্লম ও শিবগঙ্গা এখানকার প্রধান নগর। মধুরানগরে রেল-পথ বিস্তৃত হওয়া অবধি এখানকার বাণিজ্য সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্বির কীলাকরই, দেবীপাটম্, পম্ব ও টোণ্ডী নামক সমুদ্রবন্দরেও জেলার আমদানী রপ্তানী সমাধা হইয়া থাকে। চাউল, তামাক, কার্পাসবস্ত্র, সোরা, লবণ, নোনামাছ, নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য ও মসলা এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি তালুক (উপবিভাগ)। ভূপরিমাণ ৩৩৫ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। বৈগাই নদীর দক্ষিণ-কূলে অবস্থিত। অক্ষা. ৯°৫৫' ১৩" উঃ এবং দ্রাঘি. ৭৮°

৯৪৪" পূঃ। এখানে শৃষ্টপূর্নাক্ষের বহু পূর্ন হইতে পাণ্ডুরাজ-  
গণের রাজধানী ছিল। সেই সময় হইতে এই নগর রাজ-  
নৈতিক উন্নতির ও ধর্মবিস্তারের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। রাজা  
তিক্ষমলের অধিকারে এখানে নানা কারুকাধ্যযুক্ত যে সৌধ-  
মালা নির্মিত হইয়াছিল, তাহার শিরনৈপুণ্য সাধারণের  
আলোচনার যোগ্য।

মধুরা-স্থলপুরাণে এইস্থানের মাহাত্ম্য কীর্ণিত হইয়াছে।  
ইহা দাক্ষিণাত্যের মথুরা বা মধুরাপুরী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু  
ইহা বিষ্ণুকেন্দ্রের পরিবর্তে শৈবকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।  
এখানকার রামেশ্বর, স্কন্দেশ্বর ও মীনাক্ষীদেবীর মাহাত্ম্যই  
প্রসিদ্ধ। স্থলপুরাণে মধুরানগরের প্রতিষ্ঠা ও দেবকেন্দ্রের  
পবিত্রতা কীর্ণিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে মধুরানগর মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত  
হয়। মুসলমানগণ এখানকার হিন্দু-অধিবাসীদিগকে কঠোর  
পীড়নে উৎপীড়িত করে এবং তাহারা স্কন্দরলিঙ্গ-মন্দিরের  
বহির্ভাগ ধ্বংস করিয়া তাহাদের দেবদেবিতা চরিতার্থ করে।  
তাহারা এই স্মৃৎস মন্দিরের ১৪টা চূড়া, গোপুর ও মন্দির-  
বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ গৃহ ও অস্ত্রাস্ত্র মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া যায়।  
কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে, স্কন্দেশ্বরের ও মীনাক্ষীদেবীর গর্ভ-  
গৃহ তাহাদের নিষ্ঠুর হস্তে পতিত হয় নাই।

মুসলমানগণ এস্থান হইতে বিতাড়িত হইলে, মন্দিরের  
সেবাইত পূজকগণ দেবোত্তর সম্পত্তির আশ্রয় হইতে বর্তমান  
৪টা গোপুর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরের ধ্বংসা-  
বশেষ আলোচনা করিয়া মিঃ ফাউলার প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ  
চমৎকৃত হইয়াছেন। এখনও ইহা উত্তর-দক্ষিণে ৮৪৭ ফিট  
লম্বা ও প্রস্থে ৭৪৪ ফিট হইবে। উহার চতুর্দিকস্থ ৯টি  
গোপুরের একটি প্রায় ১৫২ ফিট উচ্চ। মধুরার নায়ক-  
বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ নায়কের সহকারী ও সেনাপতি  
আর্য্য নায়ক বা নায়ক মুখলির প্রতিষ্ঠিত সহস্রস্তম্ভমণ্ডপের  
ভাঙ্গরশিল্প ও চিত্রচাতুর্য্য লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।  
বিনি একবার স্বক্ষে ইহা না দেখিয়াছেন, তিনি উহার  
কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এখন ঐ মণ্ডপে  
২২৭ টা স্তম্ভ বিরাজিত।

উপরি উক্ত মন্দির ব্যতীত, রাজা তিক্ষমলের প্রাসাদ,  
বসন্তমণ্ডপ, তমকস্ প্রাসাদ ও তেঙ্গাকুলম্ নামক দীর্ঘিকা  
উল্লেখযোগ্য। স্কন্দেশ্বর দেবকে গ্রীষ্মের সময় স্থানান্তরিত  
করিবার ভঙ্গ বসন্ত (পুণ) মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল।  
তেঙ্গাকুলম্ নামক হ্রদ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ২৪০০ হস্ত।  
ইহার চতুর্দিক দানাদার প্রস্তরে মণ্ডিত। বৎসরে একদিন

এই পুষ্করিণীর চতুর্দিকে প্রাচীন জালাইয়া স্কন্দেশ্বরমন্দিরের  
প্রতিমূর্তিগুলিকে নৌকায় উত্তোলনপূর্বক জলবিহার  
করান হয়।

ইংরাজশাসনে মধুরানগরের অনেক স্মৃতি সাক্ষ্য  
হইয়াছে। ইংরাজরাজ নিজব্যয়ে তিক্ষমল-প্রাসাদের সংস্কার  
করিয়া তন্মধ্যে রাজকীয় কাছারি প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন।  
মহুরা, আসাম-প্রদেশের কাছাড় জেলায় প্রবাহিত একটি  
নদী। বরাকনদীর দক্ষিণাধীন একটি শাখামাত্র। উত্তর-  
কাছাড়-পর্বতমালা হইতে এই নদী বোঙ্গপাই নামে প্রবা-  
হিত হইয়া পরে মধুরা নামে আখ্যাত হইয়াছে।

এই নদীর পুণ্যসলিলতা সন্থকে একটি কিংবদন্তী প্রচার  
আছে;—অনেক কাছাড়রাজ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলে,  
নিজাযোগে স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হন যে, কল্যাণ প্রত্যাশে মধুরা-  
নদীতে স্নানকালে নদীতীরে যাহা ভাসিতে দেখিবেন, তাহাই  
তুলিয়া লহবে। তাহা দ্বারা তোমার মহামঙ্গল সাধিত হইবে।  
স্বপ্নাদিষ্ট রাজা প্রত্যাশে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া মধুরা-  
সলিলে স্নানার্থ গমন করেন। স্নানান্তে সন্মুখে একটি  
সপ্তকে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি উহার পুচ্ছাগ্র ধরিয়া  
ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে সপ্তবর তীক্ষ্ণ তরবারিতে রূপা-  
স্তরিত হইল। ঐ তরবারি-প্রভাবে রাজা পুনরায় তাঁহার নষ্ট-  
রাজ্য উদ্ধার করিলেন। পরে তিনি ঐ তরবারি একটি মন্দিরে  
স্থাপনপূর্বক রণচণ্ডী নামে অভিহিত ও পূজা করিয়াছিলেন।  
ক্রমে ঐ রণচণ্ডীদেবী সমগ্র কাছাড়বাসীর কুলদেবতা হইয়া-  
ছেন। ঐ দেবীপীঠ কাছাড় নগরে স্থাপিত ছিল। কাছাড়রাজ্য  
ইংরাজশাসন-ভুক্ত হইলে রাণীরা ঐ তরবারি ও দেবীমূর্তি বড়-  
খোলায় লইয়া যান। পরে তথা হইতে ঐ তরবারি চুরি  
যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কাছাড়-বিদ্রোহ এই দেবী অপহরণের  
জন্ত ঘটিয়াছিল।

মহুরা, যবদ্বীপের পশ্চিমসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। দ্বীপবর্ষের  
ব্যবধানে এক ক্রোশ বিস্তীর্ণ একটি প্রাণালী আছে। ভূতত্ত্বের  
আলোচনা ও এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থান দ্বারা এই দ্বীপকে  
যবদ্বীপের অংশ বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপবাসী লোকের  
মুখে প্রকাশ,—ভগবানের অবতার ত্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের জন্ম-  
ভূমি, মধুরানগরীর নাম হইতে এই স্থানের মহুরা (মথুরা)  
নামকরণ হইয়াছে। যব ও বালীদ্বীপে হিন্দুপ্রাধাত্য বিস্তা-  
রিত হইবার সময়, একরূপ হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য জ্ঞাপনার্থ  
নামকরণ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

[ যব ও বালীদ্বীপ দেখ। ]

এখানকার অধিবাসিগণ সর্বাংশে যববাসীর অনুরূপ, কিন্তু

তাহাদের ভাষা যবভাষা হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। ঐ দ্বীপের পূর্বভাগের কথিত ভাষার নাম সুমনপ, উহা কতকাংশে স্পেনীয় ভাষার সহিত সংমিশ্রিত। পশ্চিমাংশ-বাসীর ভাষা পৰ্তুগীজমিশ্রিত, উহা মদুরা নামে খ্যাত। মদুরা ভাষার এক হাজার কথা কহিতে হইলে মদুরী কথা ২৫০টি, যব ১৭০, মলয় ১৪৫, যব ও মলয়মিশ্রিত ৩৬০, সংস্কৃত ৪০ ও ৩৫০ আরবী কথা কহিতে হয়।

মদু(ধু)রাস্তাকমু, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর চিলেকলপট জেলার অন্তর্গত একটি তালুক বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫২৬ বর্গ মাইল। এখানকার খেদকৈনাড় নামক ভূভাগে উৎকৃষ্ট নারিকেল জন্মে। কালীয়ার ও পালার নদী এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

২ উক্ত উপবিভাগের একটি গওগ্রাম ও বিচার সদর। এখানে স্থানীয় উপর ভ্রব্যের বাণিজ্যের হাট আছে।

মদোৎকট (পুং) মদেন দানবারিণা উৎকটঃ। মত্তহস্তী।

“তে তান্ গ্রাম্যজান্ দৃষ্টা সর্কে বনগজাস্তথা।

সমাজবস্ত বেগেন জিঘাংসন্তো মদোৎকটঃ॥” (ভারত ৩।৬।৮)

(ত্রি) মদেন গর্গাদিনা উৎকটঃ। ২ মদোন্মত্ত। জিঘাং টাপ্, মদোৎকট, মদিরা। (রাজনিঃ)

মদোদগ্র (পুং) মদেন হর্ষণে দর্পেণ, উদগ্রঃ উগ্রঃ। ১ মত্ত, মদোদ্রুত। “মদোদগ্রাঃ কক্ষ্মন্তঃ সরিতাং কুলমুদ্রজাঃ।” (রঘু ৪।২২) জিঘাং টাপ্, নারী। (শব্দমাং)

মদোদ্রুত (ত্রি) মদেন মত্ততয়া উদ্রুতঃ। মত্ত।

মদোন্মত্ত (ত্রি) মদেন উন্মত্তঃ। ১ মদ দ্বারা উন্মত্ত। (পুং) ২ তত্ত্বসারোক্ত মত্তভেদ।

“মদ্রো বাপাথবা বিদ্যা সপ্তাধিকদশাক্ষরঃ।

কট্কারপঞ্চকাধির্থে মদোন্মত্ত উদাহৃতঃ॥” (তত্ত্বসার)

মদোল্লাপিণ্ (পুং) কোকিল। জিঘাং ভীপ্।

মদু (পুং) মজ্জতীতি মস্জ (ভূ-মু-তু-চরিত্বিতি। উণ্ ১।৭) ইতি উ। ১ পক্ষি বিশেষ। চলিত পানকোড়ি। ইহার মাংসগুণ—বায়ুনাশক, শিথ, ভেদক, শুক্রকারক, শীতল ও রক্তপিত্তনাশক। (রাজবঃ) ২ পণ্যমুগভেদ।

“মদুশুম্বিকবৃক্ষায়া ক বহুশপ্তিধাসবানরপ্রভৃতয়ঃ পর্ণমৃগাঃ” (সুশ্রুত সূত্র ৪। ৪৬ অঃ)

৩ মদুগুর মৎস্ত। (নীলকণ্ঠ)

মদুগুর (পুং) মাদ্যতি জলং প্রাপ্য জঘ্যতীতি মদু (মদুগুরা-দয়চ্। উণ ১।৪২) ইতি উরচ্, নিপাতনাৎ সিদ্ধঃ। মৎস্ত-বিশেষ, চলিত মাগুর মাছ।

“শ্রমণো গোতমঃ শ্রামকো বত ভো

শ্রমণো গোতমো মদুগুরচ্ছবিঃ॥” (ললিতবিস্তর ৩২।৭)

ইহার গুণ—মধুর, শিথ, সংগ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক ও শুক।

ভাবপ্রকাশমতে বাতনাশক, বলকর, বৃষ্য, কফবর্দ্ধক ও লঘু। মৎস্তের মধ্যে মদুগুর শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক।

“কফপিত্তকরা মৎস্তা রোহিতং মদুগুরং বিনা।” (বৈদ্যকনিঃ)

রোহিত ও মদুগুর ভিন্ন সকল মৎস্তই কফকর। ২ বর্ণ-সঙ্করজাতিবিশেষ।

“নিবাদং মদুগুরং হতে দাশং নাবোপজীবিনম্।”

(ভারত ১৩।২।৮৩)

মদুগুন্ মীনবিশেষান্ রাত্ৰি আদত্তে রা-ক, তং। (নীলকণ্ঠ) ৩ ভুবুরি।

“তস্মাদেতে জলে মদ্য মদুগুরা নাম বিপ্রতাঃ।

যে হরন্তি সদাঃ সংখ্যান্ সমুদ্রোদরচারিণঃ॥” (হরিবংশ)

মদুগুরক (পুং) মদুগুরঃ স্বার্থে কন্। মদুগুর মৎস্ত। (শব্দরত্নাঃ)

মদুগুরসী (স্ত্রী) মদ্যো পক্ষি বিশেষে রসো বস্তাঃ ভীপ্। শৃঙ্গিমৎস্ত, চলিত শিঙ্গিমাছ। (শব্দরত্নাঃ)

মদ্বিথেরা, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কন্‌ জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষাং ১৫°১৫' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭৭°২৭' পূঃ। হিজ্রি নদীর তীরে অবস্থিত।

মদুর, মহিষুর রাজ্যের মহিষুর জেলার একটি প্রাচীন উপ-বিভাগ। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মাণ্ড্য ও মলবরী তালুকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। সিম্‌লা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষাং ১২° ৩৫' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭৭° ৫' ২০" পূঃ। ইহা পূর্বে একটি প্রাচীন নগর মধ্যে গণ্য ছিল। স্থানীয় অসংখ্য প্রাচীন মন্দির ও পুষ্করিণাদি তাহার পরিচয় দিতেছে। পাণ্ডুরাজ অর্জুন তীর্থপরিদর্শনে আসিয়া এই স্থানের অর্জুনপুর নাম রাখিয়া বান। হোয়শাল বম্মালবংশীয় জনৈক নরপতি এই নগর এক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়া বান। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক হর্গ ও অত্যাচার অনেক কীর্তি ধ্বংসে পরিণত হয়। তদবধি আর এখানকার কোন সংস্কার সাধিত হয় নাই। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্থানে মদুর তালুকের বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে সিম্‌লা নদীর উপর সেতু বাঁধিয়া বঙ্গলুর-মহিষুর-রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। মদুরে ঐ রেলপথের একটি স্টেশন আছে।

মদ্য (স্ত্রী) মাদ্যতি জনোহনেন মদ (গদ-মদ-বমশাঃ পসর্গে। পা ৩।১।১০০) ইতি করণে বৎ। সুরা।

“কিন্তু! মাংসনিষেধণং প্রকুর্যে কিং তেন মদ্যং বিনা  
মদ্যকাপি তব প্রিয়ং প্রিয়মহো বারাজগাভিঃ -সহ।

বেদ্যার্থকৃতিঃ কুতস্তব ধনং দ্যুতেন চৌর্যেণ বা

এতাবানপি সংগ্রহোহস্তি ভবতো নষ্টস্ত কাশ্য গতিঃ ॥”

(সাহিত্যদর্পণ)

ভারতে মদ্য।

মদ কি সভ্য কি অসভ্য সকল সমাজেরই আপতরম্য  
বিলাসের সামগ্রী। সকল সভ্যসমাজের মনীষিগণই বহু পূর্ব-  
কাল হইতেই ইহার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া মুক্তকণ্ঠে  
ইহা পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই নিষেধ  
স্বত্বও সভ্যসমাজ হইতে মস্তুর অমুরক্তি কিছুতেই বিলুপ্ত  
হইতে পারে নাই। আজকাল ভারতে মদের প্রবাহ দেখিয়া  
কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদেশিক প্রভাবই বৃদ্ধি মদের  
এত প্রসার হইয়াছে। খোলা ভাঁটা উঠিয়া গিয়াছে বটে,  
কিন্তু এখন নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আবগারি বা সরাপের  
দোকান বিলাতী প্রভাব ঘোষণা করিতেছে।

আজকাল যেমন বিলাতী মদের সর্বত্র প্রচার দেখিতেছি,  
পূর্বে ভারতেও সেইরূপ নানাবিধ দেশী মদ প্রচলিত ছিল,  
এখন বরং অনেকে দোষাবহ ও সমাজনিষ্ঠ মনে করিয়া  
পান করা দূরের কথা, অনেকে মদ্যস্পর্শও করেন না, কিন্তু  
এমন একদিন গিয়াছে যে, ভারতীয় উচ্চ সমাজভুক্ত নরনারী  
সকলেই অবোধে মদ্যপান করিতেন ও আমোদের সামগ্রী ভাবি-  
তেন। এখন যেমন যুরোপীয় সভ্য দ্রুপদ একত্র মদ্যপান  
করিয়া বিহ্বল হইয়া থাকেন, ভারতেও একদিন এরূপ দৃষ্টান্ত  
বিবল ছিল না।

আমরা বেদসংহিতা হইতেই ভারতীয় আর্ধ্যগণের মধ্যে  
মদ্যপানের আভাস পাই। ঋকসংহিতার (১।১১৬।৭) বহু সুরা-  
কুস্তুর উল্লেখ আছে।\* তৎকালে শুঁড়িরা সুরাগলে দূতি বা  
চামড়ার বোতলে সুরা রাখিত এবং সাধারণে মনে করিত যে,  
তাহা পান করিলে আর মরিতে হইবে না। (১।১২১।১০)  
বৈদিক সৌত্রামণি ও বাজপেয় যাগের সুরা একটা প্রধান  
অঙ্গ; সুরা না হইলে ঐ দুই যাগ হইতেই পারিত না। তা  
ছাড়া বৈদিক ঋষিগণ সোমরসপান জীবনের একটা প্রধান  
কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। সোমরসের প্রস্তুতপ্রণালী,  
তাহার অভিযুক্ত অবস্থা, তাহার পানবিধি ও রক্ষাপ্রণালী  
আলোচনা করিলে সোমরসও তীত্র মাদক দ্রব্য বলিয়া মনে  
হয়। দেবগণও এই সোমরসপানে বিভোর থাকিতেন,

সোমরস পান করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, ঋগ্বেদ হইতে  
তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। [সোম দেখ।]

বৈদিক যুগে আর্ধ্যগণ শীতপ্রধান স্থানেই বাস করিতেন,  
সুতরাং সুরা বা সোমরস তাঁহাদের মধ্যে জীবনীশক্তিবিবর্দ্ধক  
বলিয়াই গণ্য হইত। সে জন্ত বেদে সুরাপানের নিষেধ  
নাই। ক্রমে যখন আর্ধ্যগণ গ্রীষ্মপ্রধান ভারতক্ষেত্রে অগ্রসর  
হইলেন, অনিষ্টকারিতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে লাগি-  
লেন, সেই সঙ্গে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রে “মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং”  
অর্থাৎ মদ্য পানের অযোগ্য, দিব্য অযোগ্য ও গ্রহণের  
অযোগ্য বলিয়া প্রচার করিলেন। এই সময়ে সুরাপান  
মহাপাতক মধ্যে গণ্য হইল।

কেন সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে মহাভারতে  
আদিপর্বে একটা উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, —

‘দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ  
করিবার জন্ত শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। অশুরেরা  
তাহা জানিতে পারিয়াছিল, পাছে তিনি ঐ বিদ্যা শিখিয়া  
পরে দেবগণকে দান করেন, এই আশঙ্কায় এক দিন তাহার  
কচকে মারিয়া ফেলিল, তাঁহার অস্থ্যবশেষ সুরায় মিশ্রিত  
করিয়া শুক্রাচার্যের উদরস্থ করাইল। শুক্রকন্যা দেবযানি  
কচের প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছিল। সে পিতার নিকট গিয়া  
জানাইল, ‘যদি কচকে বাঁচাইয়া না দেন, তাহা হইলে  
নিশ্চয়ই প্রাণ রাখিব না।’ প্রিয়হৃদিতার অহুরোধে শুক্রা-  
চার্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কচ  
শুক্রের উদরে সেই মন্ত্রপ্রভাবে জীবন পাইলেন এবং উদর  
হইতে গুরুকে উত্তর দিলেন। এখন শুক্রাচার্য বিষম সমস্ত্রায়  
পড়িলেন। কি করিয়া কচকে উদর মধ্য হইতে বাহির  
করিয়া আনেন? উদর বিদীর্ণ করা ভিন্ন আর উপায় নাই।  
তখন শুক্রাচার্য কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দান করিলেন।  
কচও গুরুর উদর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিলেন ও মৃতসঞ্জী-  
বনী মন্ত্র দ্বারা আবার গুরুর প্রাণদান করিলেন। এখন  
শুক্রাচার্য বৃদ্ধিলেন যে, সুরাপ্রভাবেই তিনি ব্রাহ্মণের দেহাব-  
শেষ উদরস্থ করিয়াছেন। আর সেই ব্রাহ্মণ অপর কেহ নহেন,  
তাঁহারই শিষ্য। তখন অশুরগুরু সুরাপান বিশেষরূপে নিষেধ  
করিয়া ব্যবস্থা করিলেন।’ [মদিরা দেখ।]

মদ্র ও বাজবক্ষ্য উভয়েই ঘোষণা করিলেন যে, সুরাপান  
আর প্রায়শ্চিত্ত নাই, উষ্ণ সুরাশু, উষ্ণ ঘৃত বা উষ্ণ গোমুত্র  
পান দ্বারা মরণই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত\*। অগ্নিরা, বশিষ্ঠ,

\* “কারোত্তরাজ্জহাদমন্ত্র বৃকঃ শতং কুন্তী অসিকন্তং সুরায়াঃ ॥” (ঋক ১।১১৬।৭)

+ “সুযো বিবমা সজামি দূতিং সুরাবতো গৃহে ॥” (১।১২১।১০)

\* “সুরাং পীজা বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ ॥

তরা স্বকায়ৈ নিদং মূচাতে কিধিধ্যৎ ততঃ ॥

পৈঠানদী প্রভৃতি কোন কোন ধর্মশাস্ত্রকার কেবল উত্তম সুরাপানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু দেবল ইহাতেও রাজি নহেন, তিনি আবার বলেন যে, রৌপ্য, তাম্র বা নীলক গলাইয়া তাহাই গরম গরম খাইয়া দেহভ্যাগই সুরাপানীর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত +।

এমন কি, না জানিয়া শুনিয়া সুরাপান করিলেও দ্বিজাতি-ত্রয়ের পুনঃসংস্কার আবশ্যক ‡। ভগবান্ মহুও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সুরা অন্নমল, মলই পাপ, অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কেহই সুরাপান করিবে না। গোড়ী, পৈঠী ও মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরা, একবিধই হউক বা সর্ববিধই হউক কোন প্রকার মদ্যই ব্রাহ্মণের পানযোগ্য নহে §। অধিক কি, যে ব্রাহ্মণী সুরাপান করে, সে পতিলোকে যাইতে পারে না এবং হহলোকে কুকুরী, গৃধিনী বা শূকরী হহয়। জন্মগ্রহণ করে, ধর্মশাস্ত্রে এরূপ উক্তিও দেখা যায়। \*\* মহু স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, রাজা গুরুতল্লগমনে লগাটে ভগচিহ্ন, সুরাপানে সুরাস্বরূপ, সুরবর্ণরূপে কুকুরপদ এবং ব্রহ্মহত্যাক্ষ কবচচিহ্ন লগাটে আঙ্কিত করিয়া দোষাকে ছাড়িয়া দিবেন। তাহাদের সহিত কাহারও ভোজন, বজ্রন, যাজন, পঠন পাঠন ও বিবাহ-সংক্রমণ স্থাপন উচিত নহে, তাহারা সর্বদ্বন্দ্ববহিষ্কৃত হইয়া দানভাবে পৃথিব্যাতে বিচরণ করিবে। তাহাদের লগাটাক্রিত চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার জ্ঞাতকুটুম্ব সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কেহহ তাহার সম্মান করিবে না, হুইই মহুর আদেশ। ††

গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।

পয়ো ঘৃতং বা মরণাদ্গোশকুসুমমেব বা।" (মহু ১১।১১-১২)

ব্রাহ্মবক্ষ্য ও অঃ ঔষ্টব্য।

+ "সুরাপানে ব্রাহ্মণো রূপ্যতাম্রনীলকানামস্তু তমমগ্নিকরং

পীষা শরীরত্যাগাৎ পুয়তে।" (দেবল)

‡ "অজ্ঞানাত্ সুরাং পীষা রেতো বিন্মূত্রমেব বা।

পুনঃসংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতিয়ঃ।"

§ "সুরা বৈ মলমন্নানং পাপুমা চ মলমুচ্যতে।

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণরাজস্রো বৈশ্বশ্চ ন সুরাং পিবেৎ।

গোড়ী পৈঠী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়ান্নিবিধাঃ সুরাঃ।

যথৈবৈকা তথা সৰ্বা ন পাতব্যা দ্বিজোক্তমৈঃ।" (মহু ১১।১৪-১৫)

\*\* "পতিলোকং ন সা যাতি ব্রাহ্মণী যা সুরাং পিবেৎ।

ইহৈব সা শুনী গৃধী শূকরী চোপজায়তে।"

†† "গুরুতল্লগে ভগঃ কাথ্যঃ সুরাপানে হর্যাক্ষজঃ।

শুয়ে চ স্বপদং কাথ্যং ব্রহ্মধ্বশিরাঃ পূমান্।

অসন্তোজ্যা হসংযোজ্যা অসংপাঠ্যবিবাহিতাঃ।

চরয়ুঃ পুশিবাঃ দীনাঃ সর্বদ্বন্দ্ববহিষ্কৃতাঃ।

জ্ঞাতিস্বর্গভিত্তেভ্যে ভ্যক্তব্যঃ কৃতলক্ষণাঃ।

নির্দগ্না নির্দম্ভাঃ সুরাপানোহুদ্যশাসনম্।" (মহু ১২।৩৭-২৩৯)

ধর্মশাস্ত্রের কঠোর অমুশাসনেও সর্বসাধারণের মত পরিবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুনি, ঋষি, যতি, সন্ন্যাসী, তপস্বী অথবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অবশ্য ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ মানিয়া চলিতেন, ধার্মিক ও সন্ন্যাস গৃহভ্রমণও অনেকটা তাহাদের অমুদ্বর্তী হইয়া চলিতেন; কিন্তু ভারত-বাসী বহুসংখ্যক জন সাধারণের তুলনায় তাহারা মূটিমেয়। বাস্তবিক বেদ যুক্তি ছাড়িয়া দিয়া প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা অনায়াসেই জানিতে পারি, ভারত-বর্ষে রাজাধিরাজ হইতে দরিদ্রের কুটীরে পর্য্যন্ত মদের কি রূপ বহুলপ্রচার ও সমাদর ছিল।

মহু মদ্যপান সম্বন্ধে এরূপ কঠোর অমুশাসন করিলেও তিনি জন সাধারণের অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রেষ্ঠ বর্ণ তাঁহার বিধি অমুদ্যারে চলিলেও সাধারণে অমুদ্বর্তী হইবে না। সেই জন্য আবার ইহাও ব্যবস্থা করিলেন যে, মাংসভক্ষণে, মদ্যপানে অথবা মৈথুনে দোষ নাই, ইহাই সাধারণের প্রবৃত্তি; কিন্তু ইহা হইতে নিবৃত্তি হইলে মহাকল হয়। \* অবশেষে ব্যবস্থা হইল যে, ব্রাহ্মণের পক্ষেই সকল প্রকার মদ্যপান নিষিদ্ধ। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কেবল পৈঠী মদ্য নিষেধ, কিন্তু গোড়ী প্রভৃতি নিষেধ নাই। শূদ্র পৈঠী প্রভৃতি সকল প্রকার মদ্যই গ্রহণ করিতে পারে। †

মহু প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র বলিয়া নহে, শ্রোতহুত্র মধ্যেও মাধ্বীক বা মউয়া মদ, গোড়ী বা রম, তাল বা তাড়ী প্রভৃতি মদ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ভারতের আদিকাব্য বাঙ্গালীয় রামায়ণে সুরা ও সুরাপানের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। এই রামায়ণের একস্থানে দেখিতে পাই, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠ মৈরয়ে ও উৎকৃষ্ট আসব দ্বারা বিশ্বামিত্রের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ‡। ভরত যখন রামচন্দ্রের দর্শনলাভাশায় তপোবনে উপস্থিত হন, পথে এক রাজা তিনি ভরদ্বাজের আশ্রমে সন্নিবিষ্ট আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ সুরার সন্নিবিষ্ট আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ সুরার ও বিবিধ মাংসাদি দ্বারা তাঁহার আতিথ্য সংস্কার করিয়া-

\* "ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।

প্রবৃত্তিরেবা ভুতানাং নিবৃত্তিঞ্চ মহাকলা।"

† "ত্রৈবর্ষিকানামুৎপত্তিপ্রভৃতিপৈঠীপ্রতিবেধঃ। ব্রাহ্মণস্ত তু মদ্যমাত্র-প্রতিবেধোহপ্যুৎপত্তিপ্রভৃতেব। রাজস্রোতয়োঃ ন কদাচিদপি গোড়াদিমদ্যনিবেধঃ। শূদ্রস্য তু ন সুরাপ্রতিবেধো নাপি মদ্য-প্রতিবেধঃ।" (মিতাকরা)

‡ "ইকু স্তুত্বা লাক্সাম্ মৈরয়োক্ত বরাসবান্।

পানবিন চ মহাবীণি ভক্ষ্যাক্ষোক্তাচানপি।" (রামায়ণ ১।৫৩৭)



ছিলেন।\* এই অযোধ্যাকাণ্ড মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে জানা যায় যে, সুরা এক সময়ে সাধারণের নিকট উৎকৃষ্ট পেষ বসিয়া আদৃত হইত।

\* সতী সাধবা—সীতাদেবী রামের সহিত বনগমনকালে গন্ধার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন,—

“সো হাং দেবি নমস্তামি প্রার্থয়ামি চ শোভনে।

প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে ॥

গবাং শতসহস্রঞ্চ বজ্রাণ্যরঞ্চ পেশলম্।

ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাত্যামি তব শ্রিয়চিকীর্ষয় ॥

সুরাঘটসহস্রৈশ মাংসভূতৌদনেন চ।

যক্ষ্যে হ্যং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা ॥”

(রামায়ণ ২।৫২।৮২)

হে দেবি! আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি ও স্তব করিতেছি, নরব্যাঘ্র (রাম) সুস্থশরীরে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করিলে, আমি তোমার উদ্দেশে ব্রাহ্মণ-দিগকে উৎকৃষ্ট শত সহস্র গো, বজ্র ও অন্ন দান করিব। আর বরে ফিরিয়া আসিয়া তোমার প্রীতির জন্ত হাজার ঘড়া মদ ও মহাবলি দিয়া মাংসোদন অর্পণ করিব।

তৎপরে সীতা বনন যমুনা পার হইতেছেন, তখনও যমুনার উদ্দেশে পূর্ববৎ মদ্যপ্রদানের কথা পাওয়া যায়।† কেবল প্রার্থনা বলিয়া নহে, উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে,—অযোধ্যায় অশোকোদ্যানেন কুশান্তরণে রামচন্দ্র উপবিষ্ট, অন্ধে সীতা। পুরন্দর যেমন শটীকে অমৃত পান করাইয়া থাকেন, সেইরূপ রামচন্দ্র সীতাকে হাতে ধরিয়া উৎকৃষ্ট মৈরেষ্যক মদ্য পান করাইতেছেন। রামের ব্যবহারের অন্ত কিঙ্করগণ বিবিধ কল ও নানাপ্রকার স্তম্ভে মাংস যোগাইতেছে। নৃত্যগীত-বিশারদ কিন্নরীপরিবৃত্তা অঙ্গরোগণ ও কুশলা রূপবতী রমণীগণ মদ্যপানে বিভোর হইয়া রাজা রামচন্দ্রের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে।‡

\* “স্বদীনি চ পেশানি মাংসানি বিবিধানি চ।২১

সুরাং সুরাপাঃ পিবত পায়সক বভূক্ষিতাঃ।

মাংসানি চ স্তম্ভেযানি ভক্ষান্তাঃ যো যদিচ্ছতি ॥”৫২

(রামায়ণ অযোধ্যা ৯১ সর্গ)

† “অস্তি দেবি তরামি হাং পারয়েন্নে পতিব্রতম্।

যক্ষ্যে হ্যং গোসহস্রৈশ সুরাঘটশতেন চ ॥”

‡ “কুশান্তরণসংজ্ঞীর্ণে রামঃ সগ্নিঃসদা হ।

সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেষ্যকং শুচি ॥

পায়সামাস কাঙ্কুষঃ শটীমিব পুরন্দরঃ।

মাংসানি চ স্তম্ভটানি ফলানি বিবিধানি চ ॥

XIV

এত গেল আয্যরাজ রামচন্দ্রের ঘরের কথা। রাবণ ও সুগ্রীবের প্রাসাদেও সুরার যথেষ্ট সমাদর দৃষ্ট হয়। বাম্বাণ্য কিক্কিয়ার রাজপথ-বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন;—

“চন্দনান্তরুপদ্যানাং গন্ধৈঃ সুরভিগন্ধিতাম্।

মৈরেষ্যাণাং মধুনাঞ্চ সন্ধ্যোদিতমহাপথাম্ ॥” (রামা\*৪) ৩৩৭।

কিক্কিয়ার মহাপথ সকল চন্দন, অমর ও পদ্মগন্ধে সুরভিত এবং মৈরেষ্য মদ্যসমূহে সম্যক্ অন্মোদিত। এই বর্ণনা হইতেই মদের উপর বানরগণের কিরূপ আসক্তি ছিল, তাহাব কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে।

রাবণের অন্তঃপুর ও পানভূমির বর্ণনা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন রাবণগৃহে স্ত্রীপুরুষ মধ্যে কিরূপ সুরা-স্রোত প্রবাহিত হইত। তৎসম্বন্ধে লিখিত আছে,—

“মাংসৈঃ কুশলসংযুক্তৈঃ পানভূমিগতৈঃ পৃথক্।

দিব্যাস্ত্রঃ প্রসঙ্গা বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি ॥

শর্করাসবমাধ্বীকাঃ পুষ্পাসবফলাসবাঃ।

বাসচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈশ্চৈষ্ট্যৈশ্চৈষ্ট্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥”

(রামায়ণ অন্তঃপুরকাণ্ড ১১।২২-২৩)

অনিপুণ পাচক কর্তৃক সুপক মাংস, দুগ্ধ হইতে, স্বয়ং ক্ষরিত নানাজাতীয় স্নানিষ্মল সুরা এবং শৌণ্ডিক কর্তৃক প্রস্তুত বহুবিধ মদ্য সকল স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রাখা হইত। শর্করাসব, মাধ্বীক, পুষ্পাসব ও ফলাসব বিবিধ গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত হইয়া স্থানে স্থানে পৃথগ্ভাবে সুসজ্জিত আছে।\*

“হিরণ্ময়ৈশ্চ কলশৈর্ভাজনৈঃ ক্ষাটিকৈরপি ॥

জাম্বুনদময়ৈশ্চৈষ্ট্যৈঃ করতৈরপি সংবৃত্তা।

রাজতেনু চ কুন্তেষু জাম্বুনদময়ৈশ্চ ॥

পানপ্রোষ্ঠাঃ তথা ভূমিঃ কপিপ্তজ দদশ হ।

সোহপশুচ্ছতকুন্তানি সাধোর্মণিময়ানি চ ॥

তানি তানি চ পূর্ণানি ভাজনানি মহাকপিঃ।

কচিদদ্ধাপশেষাণি কচিৎ পীতাত্তশেষতঃ ॥

কচিদৈব প্রপীতানি পানানি স দদশ হ।

কচিৎক্ষাণ্ডৈশ্চ বিবিধান্ কচিৎ পানং বিভাগতঃ ॥”

(রামায়ণ ৫।১১।২৮-২৯)

স্বর্ণ, রজত, জাম্বুনদ প্রভৃতি নানাজাতীয় ধাতুমিষ্মিত মদ্যপূর্ণ কলস কমণ্ডলু দ্বারা আচ্ছন্ন সেই পানভূমির অপর শোভা হইয়াছে। স্বর্ণ, রজত ও মণিময়পানপাত্র সকল

রামসাত্যাবহারার্থে কিক্কিয়ার্ত্তর্গমাহরন্।

উপানুভাংস রাজানঃ নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥

অঙ্গরোগণসম্বাশ্চ কিন্নরীপরিবারিতাঃ।

দক্ষিণা-রূপবত্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবল্লভাঃ ॥” (রামা\* উত্তর ৫২।১৮-২১)



মদ্যে পরিপূর্ণ হইয়া পানশালার স্থানে স্থানে স্তম্ভিত রহিয়াছে। কোন স্থানে পাত্রস্থ সুরা অক্ষীত, কোথাও পানপাত্র মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কোন স্থানের পানীয় মদ্য কিছুমাত্র পীত হয় নাই। কোথাও নানা প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় মদ্য পান-ভূমির স্থানে স্থানে বিভাগক্রমে বিস্তৃত আছে।

রামায়ণে বৈষ্ণব প্রমাণ বিদ্যমান, মহাভারতে আবার তদপেক্ষা বহু প্রমাণ রহিয়াছে। মহাভারতের সকল প্রধান-চরিত্রই অল্পাধিক মত্তদেবী ছিলেন, মহাভারতের নানা স্থানেই তাহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এমন কি, তৎকালে সকল উৎসবেই মদ চলিত। শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে মদ্যপায়ী বলিয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিতেন বটে, কিন্তু নিজেও আসবৎসহে এককালে বিরত ছিলেন না। মহাভারতে মদ্যপান সম্বন্ধে স্পষ্ট লিখিত আছে।

“ভারতানাং যাদবানাং মদ্যপানন্ত বর্ণ্যতে।

উভৌ মধ্বাসবৌ ক্ষীবৌ উভৌ চন্দনচর্চিতৌ।

উভৌ পর্য্যাক্ষরধিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জুনৌ ॥”

ভারত ও যাদবগণের মদ্যপানের কথা বলিতেছি :—

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই মদ্য ও আসবপানে রক্তনেত্র, উভয়ে চন্দনচর্চিত ও উভয়েই পর্য্যাক্ষ আকৃষ্ট দেখিয়াছি। সেই সময়ে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণও মত্তপানে স্তম্ভিত করিতেন। বিরাটপর্বে লিখিত আছে, বিরাট-রাজমহিষী স্তম্ভিতা সৈরিক্রীকে বলিতেছেন,—

“পর্লগ্নং ত্বং সমুদ্ভিশ্চ সুরাময়ং চ কারয়।

তত্রৈন্যং প্রেষয়িষ্যামি সুরাহারী তবাত্তকম্ ॥

উত্তীর্ণ গচ্ছ সৌরশ্চি, কীচকস্ত নিবেশনম্।

পানমানয় কল্যাণি পিপাসা মাং প্রবোধতে ॥”

অর্থাৎ হে সৈরিক্রি! আমার পিপাসা হইয়াছে, যাও, কীচকের গৃহে গিয়া আমার পানার্থ সুরা আনয়ন কর।

মহাভারতে মোঘলপর্বে যাদবগণের মদ্যপ্রিয়তা ও মদ্যপানহেতু যদুবংশধ্বংস-প্রসঙ্গ সবিস্তার বর্ণিত আছে।

হরিবংশ ১৪৬ ও ১৪৭ অধ্যায় হইতে উচ্চ ক্ষত্রিয়সমাজে কিরূপ সুরা সমাদৃত হইত, তাহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে বলদেবাদি যাদবগণ সমভিব্যাহারে পিণ্ডারকতীরে আসিয়া জলক্রীড়ার উদ্ভাস হইয়াছিলেন, সেই সময়ের বর্ণনা পাঠ করিলে জানা যায় যে, স্নয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্নীগণের সহিত, কাদম্বরীপ্রিয় বলদেব রেবতীর সহিত, অর্জুন সুভদ্রার সহিত ও অপরাপর যাদব কুমারগণ স্ব স্ব প্রেমসীমার সহিত মত্তপানে বিভোর হইয়াছিলেন। সেই আমোদ-

তরঙ্গে যাদবরমণীগণের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া হরিবংশ-কার লিখিয়াছেন,—

“হস্তপ্রমুদৈর্জলযন্তকৈশ্চ প্রকটকৃপাঃ সিঞ্চিচুস্তদানীং।

রাগোচ্ছতা বাক্‌নিমগ্নমতা সর্গর্ষণাধোক্ষজদেবপন্থ্যঃ ॥”

আরতনেত্রী জলমুক্তিস্রুতাঃ স্রীণাং সমকং পুরুষায়মাণাঃ।

তেনোপরেসুঃ স্তুচিরঞ্চ ভৈমা মানং বহন্তো মদনং মদঞ্চ ॥”

( হরিবংশ ১৪৮।৫০-৫১ )

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ বাক্‌নীসেবনে মত্ত হইয়া অমুরাগভরে পরস্পরের গাত্রে জলযন্ত-মুক্ত সলিল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আরতনেত্র, অলকোলিতে মত্ত ও অভিমানে রত হইয়া সেই নারীগণ পুরুষের মত মদনমদে আসক্ত হইয়া পড়িলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, মত্তপানের দোষে যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। ভাগবতকার কি বালতেছেন, শুধুন—

“বাক্‌নীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাং।

অজানতামিবাশ্রোতাং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥” (১।১৫ অঃ)

তাহাদের মনোবৃত্তি বাক্‌নী মদ্যপানে মাতিয়া উঠায় পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে না পারিয়া দম্বদ্বন্দ্ব তহারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন তাহাদের মধ্যে চারি পাঁচ জন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন।

দেবী চণ্ডিকা অতিশয় সুরাপান করিতেন। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে লিখিত আছে যে, কুবের নিজে তাহাকে অক্ষয়সুরা-পরিপূর্ণ পানপাত্র যোগাইতেন।\* মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধকালে ভগবতী বলিতেছেন, ‘রে মূঢ়! তুই ক্ষণকাল গর্জন কর, যে পদ্যন্ত না আমি মধুপান করি।’†

অপরাপর পুরাণেও যেমন মদ্যপানের নিষেধ বিধি আছে, সেইরূপ মদ্যপায়ী ও মদ্যপানের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

মোটের উপর কি ভ্রাত, কি স্মৃতি কি তত্ত্ব, সর্বত্রই মত্তপানের নিষেধবিধি দৃষ্ট হয়।

[ মদিরাশব্দে এতৎসম্বন্ধে বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের অভ্যাসের পূর্বে শাক্ততাত্ত্বিক-দিগের যথেষ্ট প্রভাব হইয়াছিল। তৎকালে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে অধিকাংশ লোকেরই এক প্রকার সুরাতরঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। এই সময়েরই—

\* “দদাবশুস্তং সুরা পানপাত্রং ধনাধিপঃ।

গণৌ পুনঃ পুনঃচৈব লহাসাক্ষিপলোচনা।” (চণ্ডী)

ভতঃ ক্রুদ্ভা জগদ্রাজা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।

+ “গর্জ গর্জ কণ্ঠঃ মূঢ়ঃ মধুং দাবৎ পিবাম্যহং।” (চণ্ডী)

“পীষা পীষা পুনঃ পীষা পুপাত ধরণীতলে।

উষার চ পুনঃ পীষা পুনজন্ম ন বিদ্যাতে ॥”

(কালীবিলাসতর)

• ইত্যাদি শ্লোকের সৃষ্টি হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁহার শিষ্যগণের চেষ্টায় মত্তপান অনেকটা হাস হইলেও বহু-সংখ্যক শাক্তগণের অহুসারে বিশেষতঃ শাক্ত-তন্ত্রের অহু-শাসনবলে মত্তপান নিবারণিত হইতে পারে নাই। সুরার বিষবৎ অপকারিতা ও ধ্বংসোন্মুখতা সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ায় ক্রমে সাধারণের হৃদয়ে সুরাবিষের জন্মিয়াছে। হংরাধা-ধিকারের প্রারম্ভে ও বিলাতী মদের প্রথম প্রচলনে এদেশে কিছুকাল মদ্যপানীর সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে প্রত্যেক সমাজের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা যায় না। এই সুরার প্রভাবে একদিন বজ্রের ঘরে ঘরে ক্রন্দনধ্বনি ও মহানর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। এখন সে দিন গিয়াছে, এখন শিক্ষাপ্রভাবেই হউক, অথবা ঘৃণা বিধেই প্রযুক্তই হউক, সুরাব্যাধি অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের অত্যাধিকার সুরা পান নিবারণের যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্মপ্রচারকগণ এককালে সুরাপান নিবারণ করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধভাতক ও অবদান-সমূহে সুরাপানের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাক্ষিস্তূপ হইতে যে ৩৩ প্রেমিকপ্রেমিকার চিত্র বাহির হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায়, প্রেমিকপ্রেমিকার বদনকমলে সুরাপাত্র রহিয়াছে। নাগানন্দ নাটকে মাতালের চরিত্র বেশ চিত্রিত হইয়াছে। কালিদাসের সকল কাব্য ও নাটকেই উচ্চ ক্ষত্রিয়-সমাজের সুরাপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শকুন্তলা নাটকে দেখিতে পাই, দীঘর নষ্ট অঙ্গুরীয় বাহির করিলে রাজশ্রালক নগরপাল নিকটবর্তী শৌণ্ডিকালয়ে গিয়া সেই অঙ্গুরীয় বিনি-ময়ে সুরাপানের ব্যবস্থা করিতেছেন। রঘু দিগ্বিজয় উপলক্ষে যখন কলিঙ্গে আসিয়া উপনীত হন, তৎকালে তাঁহার সৈন্তগণ এখানে পানভূমি প্রস্তুত করিয়া নারিকেলাসব পান করিয়া-ছিল। (রঘু ৪।৪২) আবার যখন রঘু পারশ্ব জয় করিয়া আসেন, তাহার সৈন্তগণ তখন দ্রাক্ষা-সুরাপানে ব্যস্ত হইয়াছিল। (রঘু ৪।৬৫) মহারাজ অজ ইন্দুমতীর ক্রন্দন বিলাপ করিতেছেন, ‘হে মদিরাক্ষি! তুমি আমার মুখার্চিত সুরা রসবৎ পান করিতে, এখন কেমন করিয়া তুমি পর-লোকোদ্দেশে নত্ন বাপ-দুগ্ধিত জলাঞ্জলি পান করিবে।’\* অমিষবর্ণ নিজ কুলদ্রাবীণের সহিত মদ্যপান করিতেন, রঘু-

বংশে তাহা বিবৃত হইয়াছে। (১৯।১২) কুমারগঙ্গবে লিখিত আছে, শিব যখন হিমালয়-প্রাসাদে বাইতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে সকল কুলাজনা ছুটাছুটি আসিয়া গবাক্ষপথে দেখিতেছিল, তাহাদের মুখ হইতে আসবগন্ধ বাহির হইতেছিল।†

নানাতন্ত্রেই সংস্কৃত মদ্যপানের ব্যবহার ও অসংস্কৃত মদ্য-পানের নিষেধ আছে। শাক্ততন্ত্রগমূহই কিছু মদের অহু-কুল। কিন্তু অপরাপর তন্ত্রে সেরূপ ব্যবস্থা নাই।

মোটের উপর মদ্য নানাপ্রকার, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। [মদ্যিরা শব্দ দেখ।]

ইহার মধ্যে কোন্ মদ্য কি উপায়ে প্রস্তুত হইত, তদ্বিষয়ে মন্তব্যসংকলনে এইরূপ লিখিত আছে—

পানস।—“অপকং পনসৈকৈব আত্মক বদরং তথা।

স্থাপয়িত্বা ঘটে নিত্যং দদ্যাদামপয়ঃফলম্ ॥

ত্রৈলোক্যবিজয়দৈকৈব মাতুলঙ্গং তথৈব চ।

সমেহহনি ততো দদ্যাৎ সন্ধানাং সবমীরিতম্ ॥”

কাঁচা কাঁটাল, আম ও কুল ঘটে রাখিয়া প্রত্যাহ তাহাতে কাঁচাজল ঢালিবে, পরে তাহাতে কএক দিন কতকগুলি গাঁজার পাতা ও মাতুলঙ্গ লেবুর রস দিবে, তাহাতে গাঁজলা হইলে বুঝিবে যে পানস মদ্য হইয়াছে।

দ্রাক্ষ।—“দধি মধু ঘৃতকাপি মঞ্জিষ্ঠা তিক্তকং তথা।

অহুপানে তু দেবেশি দ্রাক্ষমদ্যং স্ননিশ্চিতং ॥”

দধি, মধু ও ঘৃত আঙ্গুরের রসে মিশাইলে তাহা মাতুলঙ্গ উঠিবে, তাহাতে মঞ্জিষ্ঠা ও চিরাতার অহুপান দিবে, তাহা হইলে দ্রাক্ষমদ হইবে।

মাধুক।—“বিড়ঙ্গং শালবং মূলং—

মধুনা সহ সংস্থাপ্য শেষে পাকং সমাচরেৎ।

পিপ্পলী লবণং দত্ত্বা মধুনা মদ্যমীরিতং ॥”

মধুর সঙ্গে শালব মূল রাখিয়া পরে পাক করিবে, অবশেষে তাহাতে পিপ্পল ও লবণ ছড়াইয়া দিবে।

ধাক্কুর।—“পানসং পকথঙ্কুরং আর্দ্রং সোমলতারসম্।

একাকৃত্যগ্নিসন্ধানাং ধাক্কুরং মদ্যমীরিতম্ ॥”

পাকা খেজুরের সঙ্গে কাঁটাল, আদা ও সোমলতার রস একত্র মিশাইয়া আগুনে সীতলে লইয়া রাখিবে, তাহাতে ধাক্কুর মদ্য হয়।

তাল।—“পকতালং দস্তিশাকং ককুভঞ্চ তথৈব চ।

এতৈরেব তু সন্ধানাং তালমদ্যং প্রকীর্তিতম্ ॥”

+ “তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্যাপ্তান্তরাসান্নকুহলানাম্ ॥

বিলোল নেত্রমধৈর্গন্ধাঃ সহস্রপ্রভাভরণা ইবাসন্ ॥” (কুমার ৭।৭)

\* “মদিরাক্ষি মদানার্শিতং মধু পীষা রসবৎ কথং সু মে।

অহুপাত্তসি বাপদুগ্ধিতঃ পরলোকোদ্দেশং জলাঞ্জলিম্ ॥” (৮।৬৭)

পাকা তালের সঙ্গে দস্তিশাক ও ককুড়ের পাতা মিশাইয়া রাখিয়া দিলে তালমদ্য হয়।

ঐক্ষব। “ইক্ষুদণ্ডং মরীচঞ্চ বদরঞ্চ তথা দধি।

শেষে তু লবণং দত্ত্বা ইক্ষুমদ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥”

মাধ্বীক।—“নবং মধু তথা বিধং পকং শর্করয়া সহ।

সন্ধানাজ্জায়তে মদ্যং মাধ্বীকং শরতো রসম্ ॥”

নূতন মধু ও পক বিধ শর্করার সহিত মিশাইলে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম মাধ্বীক।

টঙ্কমাধ্বীক।—“শতাবরী টঙ্কমূলং লক্ষণং পদ্মমেব চ।

মধুনা সহ সন্ধানাং টঙ্কমাধ্বীকমীরিতম্ ॥”

শতাবরী, টঙ্কমূল, লক্ষণ ও পদ্ম এই সকল মধুর সহিত মিলাইলে টঙ্কমাধ্বীক প্রস্তুত হয়।

মৈরেষ।—“মালুরমূলং বদরী শর্করা চ তথৈব চ।

এষামেকত্র সন্ধানাং মৈরেষং মদ্যমীরিতং ॥”

বিষমূল, বদরী ও শর্করা এই সকল বস্তু এক সঙ্গে মিশাইয়া মৈরেষ মদ্য প্রস্তুত করিতে হয়।

গোড়ী।—“দধি ত্রৈলোক্যবিজয়া তথৈব চ করীকণা।

গুড়েন সহ সন্ধানাং গোড়ীমদ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥”

দধি, ত্রৈলোক্যবিজয়া ও করীকণা গুড়ের সহিত মিশাইয়া গোড়ীমদ্য তৈয়ার করিতে হয়।

• নারিকেলজ।—“ইন্দ্রজিহ্বা পঞ্চদাত্রী নারিকেলজলং তথা ॥

কদলীফলসন্ধানাং মদ্যং তন্নারিকেলজম্ ॥”

ইন্দ্রজিহ্বা, পঞ্চদাত্রী ও নারিকেল জল এই সকল কলার সহিত মিশাইয়া নারিকেলজ মদ্য হয়।

পৈষ্টী।—“শঙ্খলীমর্দশিকান্নমুঞ্চোদকসমম্বিতম্।

বক্তো সন্তাপয়েৎ কিঞ্চিং স্থাপয়িত্বা দিনদ্বয়ম্।

শেষেহহনি তু সম্প্রাপ্তে জীবনং তত্র নিঃক্ষিপেৎ।

শৃঙ্গবেরং মরীচঞ্চ মাতুলঙ্গং তথৈব চ।

এতেষামেব সন্ধানাং পৈষ্টীমদ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥”

গরম জলে অঙ্গসিক্ত অন্ন ও শঙ্খলী অগ্নিতে কিঞ্চিৎ জাল দিতে হয়। দুই দিন পর্যন্ত এইভাবে রাখিয়া তৎপর দিবস তাহাতে জল নিক্ষেপ করিবে। হাজার পর উহাতে শৃঙ্গবের, মরীচ ও মাতুলঙ্গ মিশাইয়া লইলে পৈষ্টীমদ্য তৈয়ার হয়।

এতদ্ভিন্ন মৃতসজ্জাবনী সুরানামেও শুক্রাচার্য্য-উক্ত-বিত এক প্রকার স্বাস্থ্যকর মদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ :—

নূতন গুড় ২/২ সের, বাবলাছাল, কুলছাল ও গুপারি প্রত্যেক ১/২ সের, লোধ ১/৪ সের, আদা ১/১০ পোয়া সমুদয়ের অষ্ট গুণ জল। প্রথমে গুড় গুলিয়া পরে যথাক্রমে আদা,

বাবলার ছাল ও কুলের ছাল উহাতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তম-রূপে মিলাইবে। অনন্তর সুপারি ও লোধ প্রক্ষেপ দিয়া সরাব দ্বারা পাত্রের মুখ আচ্ছাদন ও উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া ২০ দিন সেই অবস্থায় রাখিবে। তৎপরে মৃগয় মোছিকা বস্ত্রে ও ময়ূরাক্ষেপি বস্ত্রে মন্দ মন্দ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে পাত্র মধ্যে সুপারি, এলবালুক, দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্ম-কাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, সলুকা, যমানী, মরীচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটা, জটামাংসী, গুড়বৃক্ষ, এলাইচ, জায়ফল, মুখা, গোটোলা, শুঠ, মেথি, মেঘশুঙ্গী ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৪ তোলা কুটিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পরে যথাবিধি চুয়াইয়া সুরা উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ধাতু অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, বা কফপ্রধান বিবেচনা করিয়া ও বয়স-অল্পসারে ইহার মাত্রা ব্যবস্থা করিবে।

বৈদেশিক হরা।

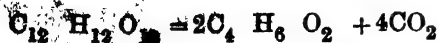
এবার অপর দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। খৃষ্টজন্মের বহু পূর্বে অসত্য মিসরবাসীদের মধ্যে ধাত্ত ও যবোৎপন্ন মত্তব্যবহারের উল্লেখ আছে। হেরোদোটাস্ (৪৫০ খৃঃ পূঃ), প্লিনি ও হেলেনিকাস্ প্রভৃতির বর্ণনা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। গ্রীকগণ মিসরবাসীদের নিকট হইতে কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজক মত্ত-প্রস্তুত-করণোপায় শিক্ষা করিয়াছিল। বিখ্যাত কবি আর্কিলোকাস্ (Archilochus ৭০০ খৃঃ পূঃ), একাইলাস্ (Aeschylus ৪৭০ খৃঃ পূঃ), সফোক্লিস্ (Sophocles ৪২০ খৃঃ পূঃ) ও থিওফ্রাস্টাস্ (Theophrastus ৩০০ খৃঃ পূঃ) যব প্রভৃতি হইতে মত্তপ্রস্তুতের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। মিসরের ধাত্ত-মত্তের ‘জিথাম্’ নাম হইতে গ্রীকগণ স্বদেশজাত মত্তের জিথো-নামকরণ করেন। এই মত্ত তত্ত্বদেশবাসীরা নিত্য ও উৎসব-সময়ে ব্যবহার করিত। জেনোফন কর্তৃক ৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রচিত ‘দশ সহস্রের পলায়নবিবৃতি’তে আমেগিয়াবাসীর মত্ত-পানের উল্লেখ আছে। দিওদোরাস্ সিকুলাস্ গালাসিয়াবাসীর (Galatians) জিথো মত্তসেবনের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী টাসিটাস জর্জাণবাসীর সামাজিক আচার-ব্যবহার-বর্ণনাকালে বিয়ার (Beer) মত্ত-প্রচলনের উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনির বর্ণনামুসারে স্পেন-দেশের Ceria ও প্রাচীন গলরাজ্যের Cerveria নামক উত্তেজক মত্ত ধাত্ত হইতে প্রস্তুত বলিয়া জানা যায়। ধাত্ত-লক্ষ্মী (Ceres)এর নাম হইতে উক্ত মত্তদ্রব্যের নামকরণ হইয়া থাকিবেক। উক্ত দেবীর উৎসব উপলক্ষে এই মত্ত-পানের বহুলপ্রচার ছিল। সুবিখ্যাত রোমকসম্রাট জুলিয়াস সিজর স্বীয় সেনাগণকে বিয়ার মত্ত পান করিতে দিতেন।

প্রথমে প্রাচীন ব্রুটন রাজ্যে গলাধিপত্য বিস্তারিত হইলে, ব্রুটনগণ মত্তচোলাইপ্রথা শিক্ষা করে। অতঃপর রোমকগণ ব্রুটন রাজ্য হইতে অপসৃত হইলে সাক্সনগণ ব্রুটন জয় করিয়া তদেশবাসীর নিকট হইতে এই প্রথা অবগত হয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকার কাক্রি আতিমিউবিয়া ও আবিসিনিয়াবাসী অসভ্যজাতির মধ্যে ধাতু, জনার, বব, রাই প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ হইতে মত্ত প্রস্তুত করিবার প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কবিয়ার Quass মত্ত অনেকাংশে আবিসিনিয়ার তেজ-কর buna মত্তের অরূপ। চীনদেশের সাম্শি মত্ত চাউল হইতে প্রস্তুত। তাতার জাতির কোমিশ-সুরা বোটকীর দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হয়। জাপানবীণের সকে, অজামি নাগা-দিগের জু ও সমগ্র ভারতের নিকট জাতির পেয় পচাই মত্ত একরূপ। কথিয়ানদিগের ধাতু হইতে প্রস্তুত শেরু অনেকাংশে লেপ্‌চা, লুসাই, নাগা, খ্যান, কয়েন ও সিমলাইশেলের অধিবাসিগণের পেয় মত্ত ধাতু-গমাদি হইতে প্রস্তুত দেলী মত্তের স্তার। ভাত পচাইয়া সেই আমানি মধ্যে সোমাদি মাদক লতা পচাইয়া যে হাড়িয়া বা পচাই মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই প্রায় নিকট জনসাধারণের সেবনীয়।

বর্তমান মদ্য-প্রস্তুতপ্রণালী।

ইংরাজ-গবর্মেণ্টের চোলাই-খানা (Distillery) মধ্যে চাউল চোলাই করিয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা বঙ্গদেশে 'খাটি' খেনো মদ নামে প্রসিদ্ধ। শুড়, ইক্ষুরস, মধু প্রভৃতি মিষ্ট পদার্থ এবং খজুররস ও তালের রস (তাড়ি), প্রভৃতি হইতেও মদিরা প্রস্তুত হয়। মাদকপ্রধান সিদ্ধি, গাঁজা, ধূতুরবীজ প্রভৃতি হইতে অথবা তৎপদার্থসম্মিশ্রণে অল্প পদার্থে মাদক উৎপন্ন করিয়া তাহা হইতে মদ্য চোলাই করা যাইতে পারে। মদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে উৎকৃষ্ট রসপূর্ণ ধাতাদি বীজ বাছিয়া লইয়া তাহাকে কোন পুত্রে পচাইয়া গাঁজলা তুলিবে। পরে নিয়মমত বকবন্ধে চোলাই করিয়া সেই দ্রব্যের সার পদার্থ গ্রহণ করিতে হয়। সুরাসার (Alcohol) ব্যতীত মদ্য জন্মিতে পারে না। মত্তপ্রস্তুতকরণোপযোগী পদার্থের শর্করা-গুণবিশিষ্ট অংশের (Saccharine matters) গাঁজান এবং চোলাই কালে অঙ্গারাদি পার্থিব-পদার্থের নাশ হেতু সুরাসার উৎপন্ন হয়। জাফাদি পচাইয়া সুরামণ্ড (Yeast) প্রস্তুত হইলে গাঁজালা হইবার সময়, জাফার শর্করপদার্থসমূহ সুরাসার ও অঙ্গারাদি রূপান্তরিত হইয়া যায়।



জাফাদি

সুরাসার

অঙ্গারাদি

XIV

প্রায় সকল প্রকার মত্ত বা অরিষ্টাদিতে এই সুরাসার আছে, কিন্তু জল ও অজ্ঞাত পদার্থের মিশ্রণহেতু উহা তেজো-হীন থাকে। পুনঃ পুনঃ চোলাই করিলে ভিন্ন পদার্থসমূহ বিয়োজিত হয় বটে, তথাপি তাহাতে জলীয় অংশ বর্তমান থাকে। M. Sæmmering গো-পটিকা (Ox's bladder) মধ্যে মত্ত পুরিয়া, তদুপরে মাছের পটপটি (Ingleba) আচ্ছাদন দিয়া ১০৫° হইতে ১২০° উত্তাপে শুক করিলে, অথবা বড়মুখ বোতল মধ্যে সুরা রাখিয়া তাহার মুখ পটকার বস্ত্র তন্ত দিয়া আবদ্ধ করিয়া রোজে দিলে জলীয় ভাগ উপায় যায়। এই সুরাসারই মাদকতার বীজ। ইংলণ্ড হইতে যে পরিষ্কৃত সুরাসার (Rectified Spirits of wine) ভেবজার্থ আনীত হয়, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) ০.৮৩৫।

[ সুরাসার দেখ।

মত্তের মধ্যে ড্রাকাকফলজাত মদ্যই (Vinum gallici) প্রধান। ইহা বলকাবক, উত্তেজক ও বিরোচক। এই কারণে, বহু পূর্বকাল হইতে ইহা সেবনের বিধি দেখা যায়।

এই ড্রাকাকফল মদিরার প্রাচীন গ্রন্থসমূহে প্রকৃত মদ্য (Wine) নামে অভিহিত হইয়াছে। কি হিন্দু প্রধান ভারতে, কি খৃষ্টপ্রধান সূদূর যুরোপখণ্ডে বহু পূর্বতন যুগ হইতে এই মদ্যপানের বহুলপ্রচার ছিল। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও নাটকাদি হইতে তাহার প্রমাণ পূর্বকই উদ্ধৃত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্বগ্রন্থ বাইবেলেও ইহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। নোয়ার মদ্যোন্নততা (Genesis IX. 21), মহাত্মা পলের পানাহুজা (Timothy V. 23; Judges IX. 13) প্রভৃতি পাঠ করিলে সর্বশেষ অবগত হওয়া যায়। স্বয়ং কবি হোমার ও নাসাল মদ্যের প্রস্তুতকারিতা ও বেলোতেজকতার বিবরণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

যুরোপে যে সকল উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার অধিকাংশই সুপক ড্রাকাকফলের নির্যাস হইতে সমুদ্ভূত। প্রথমে সুপক ড্রাকাকগুলিকে চোবাচ্ছা (Vat) মধ্যে গোরু অথবা মনুষ্যের পদদলিত করিয়া যে রস নির্গত হয়, তাহাকে টাটকা-সরাপ (must) বলে। পরে কাঠনির্মিত একটি বৃহদাকার হোজ্ মধ্যে ঐ টাটকা সরাপ ও ড্রাকার বাকী সিঞ্চ (Marc) কেলিয়া পচাইতে দেওয়া হয়। অনতিবিলম্বে ঐ পাত্র হইতে গাঁজলা ফুটিতে থাকে। তখন রসও অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হয় এবং তাহা হইতে অঙ্গারায় বাষ্প নির্গত হইতে থাকে। ঐ সময়ে সিঞ্চগুলি রসের উপর ভাসিয়া উঠে। ক্রমে বখন বৃহদগুলি থামিয়া আইসে, তখন তলস্থিত।

মদ্য নলে করিয়া অল্পপাত্রে টানিয়া লওয়া হয় এবং সেই দ্রাক্ষা-সিক্তগুলিকে উত্তমরূপে নিষ্পেষিত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যদি গাঁজলা খামিবার পূর্বে মত্ত বোতল মধ্যে পুরিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সেই মদ্য মাসে ঢালিবার সময়, অঙ্গারায়ের অলঙ্কিত-নির্গমনহেতু ফেনপুঞ্জ উত্তোলিত করে। শ্যাম্পেন (Champagne) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মদ্য এইরূপে পূর্নাঙ্কেই চোলাই করা হয়। সুরামণ্ডের রস নিঃসৃত করিয়া, গাঁজলা উঠিবার পূর্বে সিক্তগুলি উঠাইয়া লইলেই মদ্যের বর্ণ সাদা হয়। মদ্য রঙ্গ করিবার জন্য পূর্বে লাক্‌ডাইর (Lac-dye) ও পরে গালার (Sellac) ব্যবহার দেখা যায়। দ্রাক্ষাজাত মদ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। আরব—ইম্বু, খামার; ব্রহ্ম—ব্ৰহ্ম-প্যং-র, চান—ব্ৰহ্ম-উ, ফরাসী—Vin, জার্মান—Wine, গ্রীস—oinos, হিন্দি—দাক্-কা-মদ, অঙ্গুর-কা-সরাব, ইতালী ও স্পেন—Vino, লাতিন—Vinum, মলয়—বু-আঙ্গুর, পারস্য—মেই, পৰ্তুগীজ ও রুস—Wino, Wino-graduse; সংস্কৃত—দ্রাক্ষা-মদিরা; তামিল—সরয়ম, তেলগু—সরই।

বৈজ্ঞানিক হাম্বোল্টের (Mr Humbolt) মতে বাগিচায় উপযোগী উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে ৪৭° হইতে ৬২° পর্যন্ত বায়বিক তাপ হইলে যথেষ্ট হয়। যেন স্থানবিশেষের শীতকালের তাপ ৩৮° কম, অথবা দারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপ ৬৮° ডিগ্রীর অধিক না হয়, কারণ তাপ অধিক হইলে গাঁজলা উঠিতে উঠিতেই রস অম্লান্বাদযুক্ত হইয়া যায়। এই হেতু ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্রে কখনও উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয় না। গ্রীষ্মের পর বর্ষার সমাগমও ইহার আর একটা কারণ। আঙ্গুর পাকিবার পরই বৃষ্টিপাত হওয়ায় এখানে সেই সময়ে দ্রাক্ষাফল রোজে শুকাইয়া কিস্মিস্ প্রস্তুত করিবার উপায় থাকে না। ডাঃ রয়ল বলেন, দাক্ষিণাত্যের কুনাবর অধিত্যকায় ৯ হইতে ১০ হাজার ফিট উচ্চ স্থানে সুস্বাদু আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। ঐ স্থানের জলবায়ু মদ্যপ্রস্তুতকরণের প্রকৃত উপযোগী। কাশ্মীর, কান্দাহার, কাবুল ও বোখারা প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমদেশের জলবায়ুর সাম্যতাহেতু দ্রাক্ষামদ্য প্রস্তুত করিতে কষ্ট হয় না। পারস্য-রাজ্যের খোন্সের জেলায় প্রস্তুত সিরাজ নামক মদ্য এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা সাধারণতঃ লাল ও সাদা বর্ণের হইয়া থাকে। লাল সিরাজে শতকরা ১৫ ভাগ ও সাদা মদ্যে ২০ ভাগ সুরানার মিশ্রিত আছে।

মুসলমানপ্রভৃতি খৃষ্টীয়শাস্ত্রে ধর্ম্মবান্ধবদিগের দীক্ষার সময়,

হৈমন্তিক উৎসবে ও অন্যান্য মহাপর্বে দেবোদ্দেশে মদ্য দান বা পানের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদিগের পূজাপর্বেও দ্রাক্ষামদ্য ভিন্ন অন্য প্রকার মাদক-দ্রব্য ব্যবহারেরও রীতি ছিল। তাহারা প্রত্যেক দেবতার পূজায় অপরাপর ভোজ্য ও পুষ্পাদি উপহারের সহিত দেবতাকে মদ্য দান করিয়া তৃপ্তি বোধ করিত। দেবপূজায় বলিদানের পূর্বে তাহারা ছাগলাদি শৃঙ্গধারী পশুর শৃঙ্গগুলি মদ্য দ্বারা ধৌত করিয়া দিত। এতদ্ভিন্ন দেবতার উপভোগার্থ বেদীর উপর স্থাপিত পিষ্টকগুলির উপরে মদ্য ঢালিয়া দিবার বিধি ছিল। এমন কি, দৈনিক তাহারা যে মদ্য ব্যবহার করিত, তাহাও তাহারা দেবতাদিগের নিবেদন না করিয়া সেবন করিত না। খৃষ্টান ও যিহুদীদিগের মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয় নাই।

মাদকদ্রব্যমাত্রই মুসলমানধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য কোরাণে মদ্য 'খামার' নামে অভিহিত। কিন্তু বর্তমান ইসলামধর্ম্মসেবিগণ কোরাণের বচনকে উপেক্ষা করিয়া পানাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাষ্টিল-রাজদূত Ruy Gonzalez de Clavijo ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে তুর্করাজ তৈমুরবেগের সভায় আসিয়া উপনীত হন। এখানে হোজাদা পক্ষোপলক্ষে সকল নরনারী মদ্যপানে উন্মত্ত হইত। ক্লাভিজো স্বয়ং ঐ উৎসবে নিমগ্নিত হন। তৈমুরের পত্নী কানোবেগম তাঁহাকে মদ্যপান করিতে অহুরোধ করেন।

পারস্যের সিরাস্প্রদায়ের লোকেরা মদ্যপানে বিরত হইলেও অপর সকলে মদ্যকে প্রিয়পেয় মধ্যে গণ্য করে। অনেকে অহিফেন হইতে প্রস্তুত আরক সেবন করিয়া থাকে। বলিতে কি, পারস্যবাসিগণ মাদকপ্রিয়। তাহারা দ্রব্যের উপকারিতা-বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখে না। সর্বদা নেশায় বিভোর থাকাই যেন তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে পারস্যে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে—'যিনি সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে চান, তিনি যেন সিরাজ-মদ্য এবং বেগ্‌দেবাদেকান্তের কটী খান ও যেস্তবাসিনী গোলাপ-কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন।'

সিরাজের মত্ত ও দ্রাক্ষাকানন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। শীত-প্রধান জাগ্রোন্ পর্বতের পাদপ্রান্তে অবস্থিত থাকায়, এই দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রচুর স্মিষ্টরসবাহী ফলসমূহে পরিপূর্ণ থাকে। জলবায়ুর শৈত্যতা প্রযুক্ত এই স্থান উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুতকরণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। জনৈক জার্মান মদ্য-পরীক্ষক সিরাজ মদ্যের গুণ পরীক্ষা করিয়া উহাকে বাগাঁড়ী মদ্যের অনুরূপ বলিয়াছেন। সিরাজ মদ্যের পর, তেহরান, য়েজদ, কশ্বিন, তাব্রিজ, ইস্পাহান প্রভৃতি দেশজাত মদ্য নিম্নাসন লাভ করিয়াছে। বর্তমান পারস্যবাসিগণ পার্সী, যিহুদী ও

আর্মীনি মদ্য-ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে তেজস্বর মদ্য ক্রয় করিয়া থাকে। উক্ত বণিকসম্প্রদায় স্ব স্ব বাণিজ্যোপযোগী মদ্য প্রস্তুতের জন্ত দ্রাক্ষা চাষ করিলেও লাভের আশায়, অথবা মাদকতা বৃদ্ধির জন্ত উহাতে মেশী মত্ত (Arrack) জাফরান্ অথবা সিন্ধি, গাঁজা বা দোস্তার আরক মিশ্রিত করে। সিয়াপোষ নামক লাল মদ্য প্রচুর পরিমাণে চর্ম-খলিতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

কাবুলের প্রায় প্রত্যেক আমীরের গৃহেই মদ্য প্রস্তুত করিবার কল আছে। কাবুলীরা প্রথমে আঙ্গুরগুলিকে একটি মুক্তিকানিধিত বৃহৎ গামলায় অথবা চোবাচ্চা মধ্যে পদ-দলিত করিয়া রস বাহির করে। পরে সেই চোবাচ্চার নিম্নস্থিত গর্ত দিয়া ঐ রস বাহির করিয়া নলপথে অপর একটি ক্ষুদ্র-মুখ মুৎপাত্রে (জালাবিশেষের) মধ্যে লইয়া যায়। নিকাসিত সমগ্র রস এইরূপে পাত্রমধ্যস্থ হইলে, উহার মুখ বন্ধ করিয়া এবং প্রায় ৪০ দিন তদবস্থায় রাখিয়া দিলে রস পচিতে থাকে। তৎপরে সচ্ছিন্নকর্দমনিধিত কুঁজার ত্রায় পাত্রবিশেষ তন্মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া মুখবিবর উত্তমরূপে সূজির আটা দিয়া আবদ্ধ করা হয়। ইহাতে রস পকতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন আফগান রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কিস্মিস্ ও আঙ্গুর হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়। উক্ত কিস্মিস বা আঙ্গুরী মদ্য প্রায়ই বিকৃত হয়। উহা হুর্সল-দেহের বিশেষ উপকারী। কখন বা ব্যবসায়ীরা উক্ত উভয় প্রকার মদ্যে দোলা চিনির স্রবাসার মিশাইয়া উহার মাদকতা বৃদ্ধি করিয়া বাজারে বিক্রয় করে।

চীনবাসিগণ ধাতু, জনার, যব প্রভৃতি মিষ্টরসায়ক মাদক শস্যসমূহ হইতে মদ্য প্রস্তুত করিতে জানে। ঐ মদ্য মাদক-গুণবিশিষ্ট হইলেও বিশেষরূপে পরিস্কৃত নহে। কেবল বক-গুজ দ্বারা চোয়াইয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র। শীতের আধিক্য হইলে তাহারা অল্পমাত্রায় মদ্য পান করে। তাহাদের বিশ্বাস, আগ্নেয়-গিরিপ্রধান তর্কান্ রাজ্য হইতে দ্রাক্ষা মদ্য চীনে আনীত হয়। অগ্ন্যুৎপাদক দেশসম্ভব বলিয়া দ্রাক্ষামদ্য এরূপ অগ্ন্যুদ্দীপক গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। পানে শরীরে দাহ ও উষ্ণতা হয় দেখিয়া চীনবাসিগণ অধিক পরিমাণে দ্রাক্ষামদ্য পান করে না। মোগল-রাজবংশের অধিকারকালে তাহারা অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্য চোলাই করিয়া মদ্য প্রস্তুত-প্রথা শিক্ষা করে। পূর্বে চীনবাসীর পক্ষে শ্রামদেশোৎপন্ন চন্দনীমদ্য বিশেষ আদরের ছিল। এক্ষণে তাহারা লাল, সাদা, হরিদ্রা প্রভৃতি বর্ণের নানারূপ মদ্যের আবিষ্কার করিয়াছে। ঐ মদ্য তাহারা উত্তপ্ত করিয়া পান করে। উহার মাদকতাবলি ক্ষণস্থায়ী।

এক্ষণে ভারতে যে সকল উৎকৃষ্ট মদ্য বিক্রয় হয়, তৎ সমুদায় যুরোপ হইতে আনীত; তন্মধ্যে শেরি, শ্যাম্পিন্, হরিকি, ক্রারেট ও বার্গাণ্ডী মদ্যই প্রধান। অনেকে ইতালী, হাঙ্গেরী ও গ্রীক মদ্যপানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। রেগিশ মদ্য একমাত্র ধনীরাই পের।

এতদ্দেশে যব হইতে যে প্রকার সরাপ (Malt liquors বা Beers) প্রস্তুত হয়, তাহাতে সরাপ-প্রস্তুতকারীকে কএকটি বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথমে সুপুষ্ট ও রসযুক্ত বীজগুলিকে রোদ্রে শুক করিয়া অথবা ১২০° F তাপে ভাঁটিতে সেকিয়া লইবে। পরে জলে পচাই-বার পূর্বে হপ্ (Hop বা *Humulus Lupulus*) নামক গুণাবিশেষের সহিত মিশ্রিত করিবে। মদ্যপ্রস্তুতের জন্ত সর্বদাই উৎকৃষ্ট জল ব্যবহার করা কর্তব্য। জলে লবণাক্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে মদ্যের বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ঐ জলে ক্লোরাইড্ অব সোডিয়াম, সালফেট অব পটাশ, সালফেট অব লাইম, সালফেট অব ম্যাগ্নেসিয়া, কার্ব-নেট অব লাইম, ম্যাগ্নেসিয়া, কার্বনেট অব আয়রন, সাইলিসিক এসিড্ ও ক্লোরাইড্ অব ক্যালসিয়ম্ প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে মদ্য উৎকৃষ্ট হয়। ইংরাজ-চোলাইকারগণ কার্বনেট ও সালফেট অব লাইম অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বরপার জল ব্যবহারে সমধিক উপকারিতা পাওয়া যায়।

মদ্য চোলাই করিতে হইলে প্রথমে যবাদি শতকে চূর্ণ ও মর্দিত করিয়া জলে ফুটাইবে। তৎপরে তাহাতে হপ্ নামক মাদকতোৎপাদক তিক্ত গুণ মিশ্রিত করিয়া শীতল করিবে। পরে গাঁজা উঠিলে সেই মত্তকে পরিস্কার করিয়া বোতলে পুরিয়া লইবে। বোতলে অথবা পিপায় পুরিবার পূর্বে সেই শীতল মদ্যকে ১৪০° তাপযুক্ত বাষ্প দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে গাঁজনকালে উৎপন্ন কীটাদি নষ্ট হইয়া যায়। উত্তপ্ত মদ্যকে শীতল করিবার জন্ত এক্ষণে নূতন নূতন পস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মাদকতাবলিবিশিষ্ট কতকগুলি উদ্ভিদের রস, ফল, ফুল, শিকড় অথবা ছাল হইতে মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মাদক-গুণবিশিষ্ট উদ্ভিদ মাত্রই Narcotics নামে অভি-হিত। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি গাছড়া মদ্য গাঁজাইবার অথবা তত্তৎকার্যের সহযোগিতা হেতু উল্লিখিত হইয়াছে।

মদ্যকীট (পুং) মদ্যজাতঃ কীটঃ। সুরাজাতকীটভেদঃ।  
মদ্যক্রম (পুং) মদ্যোৎপাদকো ক্রমঃ। মাড্রক্ষ। (রাজনিঃ)  
মদ্যপ (ত্রি) মদ্যং পিবতি পা-ক। ১ মদ্যপায়ী, যে মদ্য পান করে। (পুং) ২ দানবভেদঃ। (হরিবঃ ২৪০ অঃ)

মদ্যপক্ক (পুং) মদ্যানাং পক্ হৈব। সুরাকক্। চলিত—মেয়া।

পর্যায়—মেদক, জগল। (হেম)

মদ্যপান (ক্লী) মদ্যস্ত পানং। মদ খাওয়া।

“ততঃ সহ তয়া নার্যা মদ্যপানমথাপিবৎ।” (মার্কণ্ডপু. ১৭।২২)

মদ্যপাশন (ক্লী) মদ্যপৈরশ্রুতে ভূজ্যতে ইতি অশ্-কর্মণি  
লুট্। পানরূচক তক্ষা, মদ্যপানরোচক তক্ষাদ্রব্য, চাট্‌নি।

পর্যায়—উপদংশ, অবদংশ, চক্ষ। (হেম)

মদ্যপীত (ত্রি) পীতঃ মদ্যং যেন, আহিতাদিভাং পরনিপাতঃ।

সুরাপানকর্তা, যিনি মদ্যপান করিয়াছেন। ত্রিয়াং ভীপ্।

মদ্যপুশ্পা (ক্লী) মদ্যানি মদ্যসাধনানি পুশ্পাণ্যস্তাঃ। ধাতকী।

মদ্যবীজ (ক্লী) মদ্যস্ত বীজং। নানাদ্রব্যাকৃত সুরাবীজ।

পর্যায়—কিষ, নয়হু, নয়হু। (হেম)

মদ্যভাজন (ক্লী) মদ্যস্ত ভাজনং। মদ্য রাখিবার পাত্র,  
মদ্যভাণ্ড, মদ্যপাত্র।

মদ্যমণ্ড (পুং) মদ্যস্ত মণ্ডঃ। মদ্যফেন, পর্যায়—কারোত্তম,  
কারোত্তর, সুরামণ্ড। (অমর)

মদ্যবাসিনী (ক্লী) মদ্যানামিব বাসো গন্ধোহস্তা অস্তীতি  
ইনি ভীপ্। ধাতকীবৃক্ষ। (রত্নমালা)

মদ্যসন্ধান (ক্লী) মদ্যস্ত সন্ধানং উপাদনার্থং আয়োজনং।  
সুরাসজ্জাকরণ, মদ্যোৎপাদন-ব্যাপার, পর্যায়—অসুতি,  
আসব, অভিষব।

মদ্যামোদ (পুং) মদ্যস্তেবামোদো গন্ধো যন্ত। ১ বকুলবৃক্ষ।  
(রাজনি.) ২ মদ্যের গন্ধ।

মদ্র (পুং) মন্দতে ইতি মদি মোদাদৌ (ক্ষয়িতকীতি।  
উণ্ ২১৩) ইতি রক্। ১ দেশবিশেষ, মদ্রদেশ।

“বৈরাটপাণ্ডারোমধ্যে পূর্নদক্ষক্রেসেণ তু।

মদ্রদেশঃ সমাখ্যাতো মাদ্রীহা তত্র তিষ্ঠতি ॥”

(শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ পটল)

বিরাট এবং পাণ্ডা এই উভয় দেশের মধ্যে পূর্ন ও দক্ষিণ-  
ক্রেমে এই দেশ অবস্থিত। ২ হর্ষ। (ক্লী) ৩ মঙ্গল, ভদ্র, শুভ।  
মদ্র, প্রাচীন জনপদ ভেদ। বর্তমান রাবী ও বিলম্ নদীর  
মধ্যে অবস্থিত ছিল। [আখ্যাবর্ত দেখ।]

২ উত্তর মঙ্গ নামক জনপদ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি  
সুপ্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। প্রাচীন মিডিয়া রাজ্য  
(Media) উত্তর মঙ্গ বলিয়া কথিত। [মিডিয়া দেখ]

মদ্রক (ত্রি) মদ্রেষু জাত ইতি মঙ্গ (মঙ্গবজ্যোঃ কনু। পা  
৪।২।১৩১) ইতি কনু। ১ মঙ্গদেশভব। ২ দেশভেদ।

“গাক্ষায়া যবনাশ্চৈব সিদ্ধসৌবীরমঙ্গকাঃ।” (মৎস্কপু. ১১৩।৪১)

৩ জনৈক প্রাচীন কবি।

মদ্রকার (ত্রি) মঙ্গ ভঙ্গং করোতীতি (ক্ষেমপ্রিয়মদ্রেহণচ্।

পা ৩।২।৪৪) ইতি পক্ষে অণ্। ক্ষেমকর, মঙ্গলকারক।

মদ্রকর (ত্রি) মঙ্গং করোতীতি কৃ-খচ্, মুমাগমঃ। ক্ষেম-  
কর, মঙ্গলকারক।

‘ক্ষেমকরোহরিষ্টেরাতিঃ স্ত্রীমঙ্গলকরকরো।’ (ত্রিকা.)

মঙ্গনগর (ক্লী) মঙ্গস্ত নগরং। মঙ্গদেশ, উত্তরদেশ।

মঙ্গনাভ (পুং) নিষাদ-ওরসে উপন্ন জাতিবিশেষ।

মঙ্গপ (পুং) মঙ্গং মঙ্গদেশং পাতি রক্ষতি পা-ক। মঙ্গপতি,  
মঙ্গদেশের রাজা।

মঙ্গসুতা (ক্লী) মঙ্গস্ত সুতা। মঙ্গরাজকন্যা মাদ্রী, ইনি  
পাণ্ডুর দ্বিতীয়া ভার্যা এবং নকুল-সহদেবের জননী।

মঙ্গকস্থলী (ক্লী) পানিহ্যুক্ত দেশভেদ। (পা. ৪।২। ১২৭)

মঙ্গনু (পুং) মাদ্যতীতি মদ (মা-মদি-পদ্যক্তি-পৃথকিত্যো বনিপ্।  
উণ্ ৪।১১২) ইতি বনিপ্। ১ শিব। (ত্রি) ২ মদনশীল।

“ইন্দ্রায় মধেন সূতঃ” (ঋক্ ৮।৮।১১৯) ‘মধেন মদনশীলার’ (সায়ণ)

মঙ্গর্গাণ, মঙ্গর্গায়, মঙ্গর্গ্য (ত্রি) মঙ্গর্গস্তায়মিতি (অ-শক্বে  
যংখ্যবস্ত্রতরস্তাং। পা ৪।৩।৬৪) ইতি ক্রমেণ খচ্ছযং-  
প্রত্যয়াঃ। মঙ্গর্গসম্বন্ধী। (সিদ্ধান্তকো.)

মঙ্গিধ (ত্রি) মম ইব বিধা যন্ত। আমার তুল্য, মংসদৃশ।

“ন মঙ্গিধো যন্ততি ভারমগ্রাং।” (ভট্ট ১স)

মঙ্গব্য (ত্রি) সোমপানযোগ্য। (ক্লী) ২ সোমযুক্ত, মিষ্ট।

(পুং) ৩ মধুমাস।

মধু (ক্লী) মত্তস্তে বিশেষেণ জানন্তি জনা যশ্বিন্ মন্ (ফলি-  
পাটিনমিমনিজনাং গুপ্তপতি-নাকিধতশ্চ। উণ্ ১।১৯) ইতি  
উ, ঘচাত্তাদেশঃ। ১ মত্ত।

“মধুবদবীতগ্রীড়া যথা যথা লপতি সমুখং বালা।”

(আখ্যাসপ্তশতী ৪২৫)

২ ক্ষীর। ৩ জল। (বিষ) ৪ রসভেদ, মধুররস। (শঙ্করদ্বা.)

৫ পুস্পরস, চলিত ফুলের মো। পর্যায়—মকরন্দ, মরন্দ,

মরন্দক। (শঙ্করদ্বা.) ৬ ক্ষুদ্র মক্ষিকা দ্বারা কৃত, চলিত মো,

(Honey) হিন্দী—সহদ, তামিল—মধ, তৈলঙ্গ—তেলে।

পর্যায়—ক্ষৌদ্র, মাক্ষিক, ক্ষুদ্রমাসব, পুস্পাসব, পবিত্র, পিত্ত্য,

পুস্পরসাহবর, মাধ্বীক, সারথ, মক্ষিকাবাস্ত, কয়টীবাস্ত, ভৃগু,

বাস্ত, পুস্পরসোত্তব।

ইহার গুণ—গীতবীর্ধ্য, লঘু, দীর্ঘকায়সংযুক্ত, মধুররস,

রুক্ষ, ধারক, ক্রুশতাকারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিদীপ্তি-

কারক, স্রববর্দ্ধক, ত্রণের শোধন ও রোপণকারক, শরীরের

কোমলতা-সম্পাদক, হৃদয়মার্গাঘ্নসারী, শ্রোতঃসমূহের বিশো-

ধক, আক্লাদজনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারী, বর্ণপ্রসাদক, মেধা



ও শুষ্ককারী, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, যোগবাহী, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্ধক এবং কুষ্ঠ, অর্শ, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্রান্তি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিকা, অতীসার, মলরুদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগনাশক।

মক্ষিকার আতিভেদে মধু ৮ প্রকার। যথা—মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌষ্টিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদালক ও দাল। পিঙ্গলবর্ণ বৃহৎ মধুমক্ষিকাকে মাক্ষিক কহে। এই মক্ষিকা দ্বারা যে মধু হয়, তাহার নাম মাক্ষিক মধু। এই মধুর বর্ণ তৈলের তায়। এই মাক্ষিক মধু সকল মধু হইতে শ্রেষ্ঠ, লঘু এবং নেত্ররোগ, কামলা, অর্শ, ক্ষত, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়বিনাশক।

ভ্রামর মধু—কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম, প্রসিদ্ধ ষট্পদযুক্ত ভ্রামর দ্বারা সঞ্চিত ক্ষটিকতুল্য নির্মল মধুকে ভ্রামর মধু কহে। এই মধু রক্ত-পিত্তনাশক, মূত্ররোধক, গুরু, মধুর, বিপাক, অভিষান্দী, অত্যন্ত পিচ্ছিল ও শীতবীৰ্য্য।

ক্ষৌদ্র মধু—কপিলবর্ণ সূক্ষ্ম মক্ষিকার নাম ক্ষুদ্রা, তৎকৃত মধুর নাম ক্ষৌদ্র। এই মধুর বর্ণ কপিল। ইহার গুণ পুষ্কৌক্ত মাক্ষিক মধুর তায় এবং প্রমেহনাশক।

পৌষ্টিক মধু—কৃষ্ণবর্ণ মক্ষিকের তায় ক্ষুদ্রকার ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক এক প্রকার মধুমক্ষিকা আছে, তাহার নাম পুষ্টিকা। এই মক্ষিকা বৃহৎ বৃক্ষের কোটরাভ্যন্তরে যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে পৌষ্টিক মধু কহে। ইহার বর্ণ স্নেহের তায়। গুণ—রুক্ষ, উষ্ণবায়ু, পিত্তবর্ধক, দাহজনক, রক্তদূষক, বাতবর্ধক, প্রমেহ ও মূত্ররুদ্ধনাশক এবং গ্রন্থি প্রভৃতি ক্ষতশোধক।

ছাত্রমধু—কপিল ও পীতবর্ণ এক প্রকার মক্ষিকা আছে, ইহার প্রায়ই হিমালয়প্রদেশের বনে মোচাক প্রস্তুত করে। ঐ চাক হইতে উৎপন্ন মধুকে ছাত্রমধু বলা যায়। এই মধু কপিল ও পীতবর্ণ। গুণ—পিচ্ছিল, শীতবীৰ্য্য, গুরু, মধুর, বিপাক, তৃপ্তিকারক, কৃমি, শ্বিত্র, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, ভ্রম, পিপাসা, মোহ ও বিষদোষনাশক।

আর্ঘ্য মধু—জরংকার মূনির আশ্রমজাত মধুকৃষ্ণের নির্ঘাসকে আর্ঘ্য মধু বলা যায়। মালবদেশে উহা শ্বেতক নামে খ্যাত। কাহারও কাহারও মতে তীক্ষ্ণতুণ্ডবিশিষ্ট পীত-বর্ণ ষট্পদাবৃত এক প্রকার মক্ষিকা আছে, তাহাকে আর্ঘ্য কহে। তৎকৃত মধুই আর্ঘ্য নামে অভিহিত হয়। এই মধু অত্যন্ত হিতকর, কফ ও পিত্তবিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ, কষায়, তিক্তরস, কটু, বিপাক এবং বল ও পুষ্টিবর্ধক।

ঔদালক মধু—কপিলবর্ণ ক্ষুদ্রকার এক প্রকার মক্ষিকা আছে, উহার প্রায়ই বন্দীক (উইয়ের ঢিগী) মধ্যে বাস

করে। এই মক্ষিকা দ্বারা কপিপ বর্ণ অথচ অল্প পরিমাণে যে মধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে ঔদালক মধু কহে। এই মধু রুচি-কারক, স্বরবর্ধক, কুষ্ঠ ও বিষদোষনাশক, কষায়, অল্পরস, উষ্ণবীৰ্য্য, কটু, বিপাক এবং পিত্তবর্ধক।

দালমধু—পুষ্প হইতে মধু করিত হইয়া পত্রোপরি পতিত হইলে তাহাকে দালমধু কহে। এই মধু অল্প-কষায়রস, কিন্তু কষায় রস অল্প, মধুর রস অধিক, লঘুপাক, অগ্নিদীপ্তি-কারক, কফ, রুক্ষ, রুচিকর, বমি ও প্রমেহনাশক, শিথ, শরীরের উপচয়কর এবং ওজনে গুরু।

নূতন ও পুরাতন মধুর গুণ—নূতন মধু পুষ্টিকারক, সারক এবং অতিশয় কফনাশক নহে। পুরাতন মধু ধারক, রুক্ষ, মেদোনাশক এবং অত্যন্ত কৃশতাকারক। মধু, চিনি ও গুড় ইহা সম্বন্ধে অতীত হইলে পুরাতন হইয়া থাকে।

সবিষ-মক্ষিাগণ বিষাক্ত পুষ্প হইতে আহরণ করিয়া মধু প্রস্তুত করে, এ কারণ শীতল মধুই ব্যবহার্য্য ও গুণকারী। বিষাক্তপ্রযুক্ত উষ্ণ মধু অথবা উষ্ণ-দ্রব্যের সহিত মধু সেবন করিতে নাই। উষ্ণার্থ ব্যক্তির পক্ষেও উষ্ণকালে মধুসেবন নিষিদ্ধ, কারণ উহা বিষের তায় অপকার করে।

(ভাবপ্রকাশ মধুবর্ণ)

সূক্ষ্মতে ইহার গুণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, মধু—মধুর, পশ্চাৎ কষায়, রুক্ষ, শীতল; অগ্নি, বর্ণ, বল, লেখন ও কান্তিকর; লঘু, মুখপ্রিয়; সন্ধান, রোগণ, শোধন এবং সংসর্গশক্তির বৃদ্ধিকারক, সংগ্রাহী, দৃষ্টির হিতকর, সূক্ষ্মপথ-গামী; পিত্ত, শ্লেষ্মা, মেহ, মেদ, হিকা, শ্বাস, অতীসার, ছর্দি, তৃষ্ণা, কৃমি ও বিষনাশক, প্রকৃষ্টভাজনক এবং ত্রিদোষ-শাস্তিকর। মধু লঘুতাপ্রযুক্ত কফ এবং পিচ্ছিলতা, মাধুর্য্য ও কষায়ভাবপ্রযুক্ত বাতপিত্ত। এই মতেও পুষ্কৌক্ত রূপ মধু ৮ প্রকার।

নূতন মধু—পুষ্টিকর, সারক। পুরাতন মধু মেদ, স্থূলতা-হারী, সংগ্রাহী ও লেখনকর। মধু পক হইলে ত্রিদোষ শাস্তি করে এবং অপক থাকিলে ত্রিদোষ বৃদ্ধি হয়। মধু বিবিধ প্রকার দ্রব্যের সংযোগে বহুবিধ রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। নানাবিধ দ্রব্যের সারাংশ থাকা প্রযুক্ত ইহার যোগবাহী (সংযোগ-জনিত) গুণ অতি উৎকৃষ্ট; দ্রব্য, রস, গুণ, ও বিপাকে পরস্পর বিরুদ্ধ।

মক্ষিকার বিষ সংযুক্ত থাকে বলিয়া সকল প্রকার মধুই উষ্ণসংযোগে বিরুদ্ধ হয়। স্বয়ং উষ্ণ হইলে বা উষ্ণ-সংযুক্ত হইলে ইহা বিষতুল্য হয়। ইহা বৃষ্টির জলের সহিত, সংযুক্ত হইলে অধিকতর বিরুদ্ধ হয়। উষ্ণ দ্রব্যসংযুক্ত মধু বমন

কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা পরিপাক হয় না এবং উৎপন্নও থাকে না; এই কারণে বমনের স্থলে পূর্বের দ্বার বিরুদ্ধ গুণ হয় না। অগ্নি মধু অতিশয় কষ্টদায়ক। (সুশ্রুত সূত্রস্থঃ ৪৫ অঃ)

মধুমক্ষিকা প্রভৃতি পতঙ্গজাতি সত্ত্বানোৎপাদনের জন্য যে ঝড়-নির্দোষ করে, তাহাই সাধারণতঃ মধুচক্র বা মোচাক নামে প্রসিদ্ধ। উহা প্রায়ই চক্রাকার নির্মিত হয় এবং মোমাছিগণ পুষ্পমধু আহরণ করিয়া তাহাতে রাখে বলিয়া উহার মধুচক্র নাম হইয়াছে। পুষ্পের স্মৃষ্টি রস গ্রহণ করিয়া মোমাছিগণ, যখন তাহা আপনাদের ভরণ-পোষণের জন্য চক্রমধ্যে নিহিত করে, তখন ঐ মধু তরল থাকে, ক্রমে তাহা গাঢ় হইয়া মধুর আকারে রূপান্তরিত হয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নানা উপায়ে মধু সংগ্রহ করে। গুরু অথবা কৃষ্ণপক্ষে মোমাছিগণ চাক ছাড়িয়া অল্পজ গমন করে, ঐ সময়ে আহরণকারীরা চাক অধেষণে বাইরা বনমধ্যস্থ মোচাকগুলি ভাঙ্গিয়া আনে। পরে তাহা নিষ্পেষিত করিয়া মধু বাহির করিয়া লয়। দিক্‌গুলি 'মম' নামে অভিহিত।

এই মধু পুষ্পরসের ভারতম্যাহুসারে গুণাগুণ লাভ করে। কমলাবনে উৎপন্ন মোচাকের মধু কমলামধু নামে খ্যাত। ইহা ঠিক কমলানুবর মত স্বগন্ধযুক্ত হয়। ইহা ঔষধাদির সহিত সেবনেও বিশেষ উপকারী। পদ্মবন হইতে আহৃত চক্রের মধু সর্ষাপেক্ষা বিশেষ গুণগ্রন্থ। ইহা চক্ররোগে বিশেষ ফলদায়ক। সাধারণ পুষ্প হইতে আহৃত মধু—মধুনামেই উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঔষধাদির অল্পপান ও ভক্ষ্যরূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। মধুর আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহা দ্রব্যমাত্রকেই সতেজ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ। চূতাদি ফলগুলি মধুভাঙে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে কখনই নষ্ট হয় না এবং স্বাদ পূর্ণরূপ থাকে। সেবনকালে পাত্রমধ্যস্থ ফল উঠাইয়া জলে ধোতকরণান্তর সেবন করিলে 'দধাসময়ের উৎপন্ন ফলের মিষ্টরসাবাদ অমৃতত্ব করা যায়। এতদ্বিন্ন বিধাক্ত পুষ্প হইতে উৎপন্ন মধু—বিষমধু নামেই পরিচিত। উহা পান করিলে মস্তিষ্কের ক্ষয়কণ্ডা সন্নিপস্থিত হয়। মক্ষিকাগণ একরূপ বৃক্ষের পুষ্পমধু পান করিয়া মাতঙ্গল হইয়া যায়। জেনোফন কৃত 'হল সহস্রের পলায়ন'-বিবৃতিতে রোমকসেনাগণের বিষমধুপানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। \*

বিভিন্ন দেশে মধুর বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে। আরব—আসল-উল-নবল, ইজুবীস; গ্রীক—প্যর, চীন—হু-মিচ, ডল-কার—Honig, Honing, মিসর—দিব্‌স আসল; ফরাসী ও

স্পেন—Miel, হিব্রু—মেবাস, হিন্দি—মধু, মহাইতালী—Mole, Miele; লাতিন—Mel, বল্লর—মহু, আরবের—মদু, মনিমন্-লাবা; পারস্য—সহাদ, রব—Med, সংস্কৃত—মধু, বাঙ্গালা—মধু, মউ, সিংহল—সিপনী, হাইন্—Haning; তামিল ও তেলগু—তন্নু তোনা।

সাধারণ লোকে চাক হইতে মধু খাইবার বা লইবার সময় পাকাটী বা তবৎ নলাকার পদার্থের মুখে তুলনীপত্রের রস লাগাইয়া সেই দীর্ঘনল চক্রমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তৎপরে সেই নলমধ্য দিয়া রস নিঃসৃত হইতে থাকিলে নিম্নে একটি পাত্র দিয়া থাকে। কখন কখন আহরণকারী সর্ষাপেক্ষে তুলনীপত্রের রস মাখিয়া চাক ভাঙ্গিয়া আনে। তুলনীপত্র-রসের তীব্র গন্ধে মক্ষিকাগণ আর নিকটে আসিতে পারে না। চক্রের নিম্নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে ধূম ও তাপে মক্ষিকারা পলায়ন করে।

(পুং) ৭ মধুক্রম। চলিত মউল গাছ। ৮ বসন্ত ঋতু।

“নিবেশয়ামাস মধুধিরেকান্ নামা ক্ষরাণীব মনোভবস্য ॥”

(কুমারসম্ভব ৩২৭)

৯ দৈত্যভেদ। ভগবান্ বিষ্ণু এই দৈত্যকে বিনাশ করান

মধুহৃদন নামে খ্যাত হন। ১০ চৈত্রমাস। (মেদিনী)

“রেনজতুর্গতিবশাৎ প্রবর্তিনৌ ভাস্বরস্ত মধুমাধবাবিব।”

(রঘু ১১৭)

১১ অশোকবৃক্ষ। (হেম) ১২ ষষ্টিমধু। (শকরত্নাঃ)

১৩ অম্লরবিশেষ।

“শক্ররশ্চ মধোঃ পুত্রং লবণং নাম রাজসম্।

হস্তা মধুবনে চক্রে মথুরাং নাম বৈ পুরীম্ ॥”

(ভাগবত ৯।১১।১৪)

মধু, জনৈক প্রসিদ্ধ কবি। ইনি ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য করিতেন বলিয়া 'ধর্ম্মাধিকরণ মধু' নামে খ্যাত ছিলেন।

মধুক (ক্লী) মধুবেতি মধু (সংজ্ঞায়াং চ। পা ৫।৩।২৭) ইতি কন্, যদা মধু মধুরং কার্য্যতীতি কৈ-ক। ১ ষষ্টিমধু।

“ষষ্ঠ্যাহঃ মধুকং ষষ্টি ক্লীতকং মধুযটিকা।

ষষ্টিমধুহলে জাতা জলজাতিরসা পুরী ॥” (বৈদ্যাকরত্নঃ)

২ জপু। (হেম) ৩ বন্দিতের। ৪ ষষ্ঠ্যাহঃ। ৫ বিহগাস্তর।

মধুক, অনাম-প্রসিদ্ধ মহারা বা মৌর্য বৃক্ষ। ইহার পুষ্প হইতে মাধ্বীক স্রা প্রসৃত হয়। [মউয়া দেখ।]

মধুকণ্ঠ (পুং) মধু মধুরঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠযরো বহু। কোকিল।

মধুকণ্ঠ, জনৈক সুপ্রাচীন কবি।

মধুকর (পুং) করোতি মক্ষিকোক্তীতি ক-অচ, মধুনঃ কর্ণঃ। ভ্রমর।

‘সর্বতঃ সারমাদভে যথা মধুকরো বৃধঃ।’ (ভাগ০ ৪।১৮২)

২ কামী। (ধরনি) ৩ ভুজরাজ বৃক্ষ। (শব্দমালা)

মধুকরগড়, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটি গিরিভূমি। শিলা-  
লিপি হইতে জানা যায়, রাজা উদয়াদিত্যের পর মালবের  
পরমাররাজ নরবর্মন এখানে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন।  
মধুকরসাহ, ওড়ুয়া গ্রামনিবাসী জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব।  
তিনি সর্বদা বিষ্ণু নাম কীর্তন ও বৈষ্ণবচরণ সেবা করিয়া  
বিনাতিপাত করিতেন। একদিন কতকগুলি বিষ্ণুবেদী  
পাশে গাধার গলায় তুলসীর মালা ও নাসায় তিলক দিয়া  
তাহাকে বাটী মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ  
মধুকর তাহা কোন ভক্তের ভেদ মনে করিয়া গাধার চরণ-  
বন্দনাদি করিয়াছিলেন। (ভক্তমাল) তাহার আশ্রয়ে বহু  
বৈষ্ণব কবি কাব্য রচনা করেন।

মধুকরসাহ (পুং) রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র।

মধুকরসাহী, মধুকরসাহ সম্বন্ধীয়।

মধুকরিন্ (পুং) মক্ষিকা বিশেষ।

মধুকরিকা (স্ত্রী) মালবিকায়মিত্র-বর্ণিত সখীভেদ।

মধুককটিকা (স্ত্রী) মধুমধুরা ককটিকেব। মধুর জর্ঘীর  
বিশেষ। চলিত মউকুটি। পর্যায়—কুশা, বীজপুর, মধুর,  
মধুককটী। ইহার গুণ—বাহু, রোচন, শীতল, গুরু, রক্তপিত্ত,  
ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিকা ও ভ্রমনাশক। (ভাবপ্র০)

মধুককটী (স্ত্রী) মধুমধুরা ককটী। মধুবীজপুর। (রাজনি০)

মধুকলোচন (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭২)

মধুকোণ্ড (স্ত্রী) বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমকোণ্ড।

মধুকাদি (পুং) বিষমজর কষায় ভেদ। ইহার প্রস্তুত  
প্রণালী—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মূতা, আমলা, ধনে, বেণার মূল,  
গুগলু, ও পটোলপত্র এই সকল দ্রব্য একত্র ৩২ তোলা জলে  
সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইতে হইবে। পরে ইহাতে  
পিপূলচূর্ণ ২ মাষা ও মধু ২ মাষা প্রক্ষেপ দিতে হইবে। এই  
কষায় সেবনে বিষমজর প্রশমিত হয়। (ঔষজ্যরত্না০ জরাদি০)

মধুকাদিঘৃত (স্ত্রী) ঘৃতৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—  
বিস্তর গব্যঘৃত ৪ শরাব, কাথার্থ যষ্টিমধু ৮ পল, জাফা ১৬ পল,  
পাকার্থ জল ১৬ শরাব, শেষ ৪ শরাব। এই ঘৃত ককার্থ  
পিপূল ৮ পল, ঘৃতপাক করিবার প্রণালীর অনুসারে পাক  
করিয়া নামাইতে হইবে, পরে ইহাতে মধু ৮ পল ও শর্করা  
৮ পল প্রক্ষেপ দিতে হইবে। এই ঘৃত সেবনে কালরোগ  
নিবারিত হয়। (বৈদ্যক)

মধুকাল্যলৌহ (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—যষ্টি-  
মধু, ও ত্রিকলা প্রত্যেকে ১ তোলা, জারিত দোহ ৪ তোলা,

এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া শয়নকালে ঘৃত ও মধুর  
সহিত ২ মাষা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে নানাবিধ নেত্র-  
রোগের উপশম হয়। (ঔষজ্যরত্না০ নেত্ররোগাধি০)

মধুকাল্যবলেহ (পুং) অবলেহ ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—  
চিনি ৫২ তোলা ও শতমূলীর রস ২ সের একত্র পাক করিতে  
হইবে। পাক ঘনীভূত হইলে যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, লাহা,  
রক্তোৎপলমূল, রসজ্ঞন, কুশমূল, বেণার মূল, বেড়েলামূল,  
বাসকমূল, কুল আটির শাঁস, মূতা, বেলতঁটা, মোচারস, দারু-  
হরিদ্রা, ধাইফুল, অশোকছাল, জাফা, জবাহুলের কুড়ি,  
কচি আমপাতা, কচি জামপাতা, পল্ল, শতমূলী, ভূমিকুসুম,  
রৌপ্য, লৌহ ও অত্র প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ  
করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। ইহা  
শীতল হইলে ১ পল মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবন  
করিলে ঘোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল ও রক্তাক্তিসার প্রভৃতি  
পীড়ার শাস্তি হয়। (ঔষজ্যরত্না০ জ্বরোগাধি০)

মধুকার (পুং) মধুকর, মধুমক্ষিকা।

মধুকাক্রয় (পুং) মধুচ্ছিষ্ট, চলিত মম্। (বৈদ্যকনি০)

মধুকাক্ত (পুং) মধুক বৃক্ষ, মউল গাছ। (বৈদ্যকনি০)

মধুকুটিকা, মধুকুটী (স্ত্রী) মধুঃ মধুরা কুটীব মধু-  
কুটু-স্ত্রিয়াঃ ভীষ, স্বাথে কন, স্ত্রিয়াঃ টাপ্। পুরুষ হ্রস্ববাক্য।  
জর্ঘীর বিশেষ, চলিত মথুর বা মহুর। পর্যায়—মাতুলুঙ্গা,  
সুগন্ধা, নিরুজা, পুতিপুন্ডিকা, অত্যঙ্গা, দেবদ্বী। ইহার গুণ—  
শীতল, বাহু, গুরু, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তনাশক। (রাজনি০)

মধুকুস্তা (স্ত্রী) স্কন্দপুরাণের মাতৃভেদ।

মধুকুল্যা (স্ত্রী) ১ মধুর স্রোতস্বতী। ২ কুশবীপস্থ নদীভেদ।

মধুকূট, একজন প্রাচীন কবি।

মধুকুৎ (পুং) মধু করোতি সন্ধিনোতীতি কৃ-কিপ্-ভূগাগমন্।  
ভ্রমর। “অথ যেহস্ত দক্ষিণা রশ্ময়ন্তা এবাস্য দক্ষিণা মধু-  
নাড্যো যজুঃযোব মধুকৃতো যজুর্বেদ এব পুংস্ তা অমৃতো  
আপঃ” (ছান্দোগ্যোপনি০ ৩।১২)

মধুকেশট (পুং) মধুনঃ পুস্পরসস্য কে শিরসি অগ্রভাগে  
শটতি গচ্ছতীতি শট্ কর্তরি অচ্। ভ্রমর। (ত্রিকা০)

মধুকেশ্বর, বনবাসীর অন্তর্গত শিবলিঙ্গভেদ।

মধুকৈটভ (পুং) মধুশ্চ কৈটভশ্চ, ইতরেতরদ্বন্দ্বঃ। মধু ও  
কৈটভ নামে দুইজন অশুর। এই শব্দ বিবচনান্ত।

“দৈনন্দিনে তু প্রলয়ে প্রসুপ্তে গুরুভুজজে।”

তত্ত্ব প্রবণবিড় জাতাবসুরো মধুকৈটভো ॥” ইত্যাদি।

(কালিকাপুং ৩১ অ০)

এই অশুরদ্বয়ের উৎপত্তি-বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ

লিখিত আছে, দৈনন্দিন প্রলয়কালে ভগবানের নিদ্রাবস্থায় একদিন তাহার কর্ণবিবর হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব নির্গত হয়। এই সময় কৃষ্ণপৃষ্ঠস্থিতা পৃথিবী প্রলয়জলে নিমগ্ন। পৃথিবীর এই অবস্থার পরিবর্তনে স্রষ্টাকালে প্রজাগণ বাহাতে তদুপরি স্থখস্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে, তাহারই উপায় উদ্ভাবনের জন্ত ভগবতী যোগনিদ্রা ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তখন তিনি প্রস্রুত; সুতরাং অনন্তোপায় হইয়া যোগমায়ী বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ তাহার কর্ণে প্রবেশ করাইলেন এবং নথের অগ্রভাগ দ্বারা বিষ্ণুর কর্ণমল চূর্ণ করিয়া দিলেন। সেই বামকর্ণের মল হইতে এক অম্বর উৎপন্ন হয়। তাহার পর দেবী দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগ বিষ্ণুর দক্ষিণ কর্ণে প্রবেশ করাইলেন। পূর্বের ভ্রায় এই কর্ণমল বিঘূর্ণিত হওয়ায় তাহা হইতেও এক অম্বর উৎপন্ন হইল। প্রথম অম্বর উৎপন্ন হইয়াই মধুপান করিবার জন্ত প্রার্থনা করে, এই নিমিত্ত মহাদেবী তাহার নাম রাখিলেন মধু, আর শেষোক্ত অম্বর উৎপন্ন হইয়াই মহামায়ার হস্তে কীটের ভ্রায় শোভা পাইয়াছিল, তাই দেবী তাহার নাম রাখিলেন কৈটভ। তখন মহামায়া সেই অম্বরদ্বয়কে কহিলেন,—তোমরা বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ কর। তাহা হইলেই বিষ্ণু তোমাদিগের প্রাণসংহার করিবেন। যদি তোমরা নিজের প্রার্থনায় বিষ্ণুর হস্তে নিহত হও, তাহা হইলেই তিনি তোমাদিগকে বধ করিতে পারিবেন, নচেৎ তিনিও বধ করিতে সমর্থ হইবেন না।

এইরূপে মহামায়া কর্তৃক মোহিত হইয়া সেই অম্বরদ্বয় বারংবার বিষ্ণুর শরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল। তখন তাহারা ব্রহ্মাকে বলিল, অজ্ঞ আমরা তোমাকে এই স্থানেই বধ করিব। অতএব যদি তুমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ কর। অনন্তর ব্রহ্মা ভীত হইয়া বহুবিধ স্তব দ্বারা যোগনিদ্রা জগৎপ্রস্থ মহামায়াকে প্রসন্ন করেন। যোগমায়ী স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, মহাভাগ! কি নিমিত্ত আমার স্তব করিলে, তোমার কোন প্রিয়কাৰ্য্য করিতে হইবে, তাহা আমাকে বল, আমি অদ্যই তোমার সেই প্রিয়কাৰ্য্য করিব। তখন বিধাতা মহামায়াকে কহিলেন, যে পর্যন্ত এই মধুকৈটভ আমাকে না মারিয়া ফেলে, সেই সময় মধ্যে আপনি বিষ্ণুকে প্রবেশিত এবং এই মধু ও কৈটভ অম্বরদ্বয়কে মোহিত করুন। তখন মহামায়া বিষ্ণুকে প্রবেশিত এবং মধু ও কৈটভকে মোহিত করিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণু প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে ভীত এবং ঘোররূপে মধু ও কৈটভ অম্বরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি অম্বরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি মধু ও কৈটভকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর ফণার অগ্রভাগ দ্বারা যুধ্যমান মধু, কৈটভ এবং নারায়ণ এই তিন বীরকে বহন করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন ব্রহ্মা অর্দ্ধবোজন বিস্তৃত এবং অর্দ্ধবোজন আয়ত একটা শিলারূপা স্থিতিশক্তি ধারণ করিলেন। বিষ্ণু সেই শিলার উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই শক্তি জলে মগ্ন হইলে ভগবান্ বিষ্ণু পাঁচ হাজার বৎসর জলের মধ্যে থাকিয়া সেই অম্বরদ্বয়ের সহিত নিরন্তর বাহযুদ্ধ করেন। তখন জগৎপতি বিষ্ণু সেই উভয় অম্বরকে বধ করিতে অসমর্থ হইলেন এবং তাহাতে ব্রহ্মার সাতিশয় ভয় হইল।

তখন সেই বলদর্পিত অম্বরদ্বয় বার বার মহামায়ার বিমোহিত হইয়া নিজ হইতেই বিষ্ণুকে কহিল,—হে মাধব! তোমার যুদ্ধনৈপুণ্যে আমরা তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। এক্ষণে আমরা সত্য বলিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিবে, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। তাহাদের সেই বাক্য শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন,—‘হে মহাবলদ্বয়! যদি তোমাদের আমাকে কিছু দিবার থাকে, তবে তোমরা আমার বধ্য হও, এই বর প্রদান কর।’ অম্বরদ্বয় এই কথায় অসম্মত হইল না। তাহারা কহিল, তোমার নিকট হইতেই আমাদের বধ শোভা পায়। তবে যেখানে জল নাই, তুমি আমাদের সেইরূপ স্থানে বধ কর। তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ইঙ্গিতে ব্রহ্মাকে কহিলেন,—তোমার শক্তিরূপিণী শিলাকে শীঘ্র উদ্ধৃত করিয়া এইরূপে ধারণ কর, বাহাতে আমি তাহার উপর অবস্থান করিয়া এই মহাবল অম্বরদ্বয়কে বধ করিতে সমর্থ হই। ব্রহ্মা শিলাকে উদ্ধৃত করিয়া ঈশানকোণে কুর্মপর্কতরূপে ধারণ করেন। বায়ুকোণে অনন্ত এবং নৈঋতকোণে জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্বয়ং শৈলরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অগ্নিকোণে বিষ্ণু স্বয়ং অপর একরূপে অবস্থিত হইয়া সেই ব্রহ্মশক্তিশিলাকে ধারণ করিলেন, মধ্যে ব্রহ্মা এবং আর একটা বরাহ অবস্থান করিতে লাগিল। বিষ্ণু বরাহের পৃষ্ঠোপরি অবস্থিত হইয়া অধোগত শিলাকে অবষ্টন্তন করিয়া রাখিলেন। পরে বিষ্ণু চক্র দ্বারা মধু ও কৈটভের মৃত্যুক নিজ জবনে রাখিয়া ছেদন করিলেন। সেই ব্রহ্মশক্তি শিলা দুহুহুঃ বহুপূর্বক ধৃত হইলেও অধোগত হইল। অনন্তর

বিষ্ণু ব্রহ্মশক্তি শিলাকে যত্নপূর্বক উদ্ধৃত করিয়া সেই মৃত মধু ও কৈটভের শরীরে স্থাপিত করিলেন। পৃথিবী উদ্ধৃত হইলে ভোররাশি দ্বারা রুদ্ধিত পৃথিবী এই অশ্বর-ঘরের মেদ-বিলেপনে দৃঢ় হইলেন, এই জন্ত তদবধি পৃথিবীর নাম মেদিনী হইল। (কালিকাপুরাণ ৬১ অধ্যায়)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে এই অশ্বরঘরের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে;—কল্পান্তে সমুদয় জগৎ একাধিবীকৃত করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রার আশ্রয়প্রসঙ্গে অনন্তের কণামণ্ডলে শয়ন করেন। তৎকালে মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত অতীব ভয়ঙ্করপ্রকৃতি দুই অশ্বর তদীয় কর্ণমল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাতিকমল আশ্রয় করিয়াছিলেন। অশ্বরঘরকে অবলোকন ও বিষ্ণুকে প্রস্তুত দেখিয়া বিষ্ণুর প্রবোধের জন্ত যোগমায়ার স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা যোগমায়ার স্তব করিলে, যোগময়া বিষ্ণুকে প্রবোধিত করিয়া অশ্বরঘরের সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মার নয়নগোচরে আবির্ভূত হইলেন। বিষ্ণু অহিংশয়া হইতে উখিত হইয়া সেই দুর্ভাষা অশ্বরঘরকে অবলোকন করিলেন। অশ্বরঘর অতিবীৰ্য্য ও পরাক্রমসম্পন্ন। তাহারা রোষাকর্ণলোচনে ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ হরি তখন বাহুমাত্র আয়ুধসহায়ে তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে পাঁচ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহারা মহামায়া কর্তৃক বিমোহিত ও অতি বলোন্মাদে অভিভূত হইয়াছিল, সেইজন্ত ভগবান্কে কহিল, আমাদের নিকট বরগ্রহণ কর। ভগবান্ কহিলেন, তোমরা যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর দান কর, যেন তোমাদিগকে আমি বধ করিতে পারি।

এই অশ্বরঘর তখন সমুদায় জগৎ জলময় দর্শন করিয়া ভগবান্কে বক্ষণ করিবার জন্ত কহিল, আমরা তোমার যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমারই হস্তে আমাদের মৃত্যু হওয়া সর্বতোভাবে প্রশস্ত। অতএব যেখানে জল নাই, সেইখানেই আমাদের সংহার কর। তখন বিষ্ণু তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অবনোপরি স্থাপনপূর্বক চক্র দ্বারা তাহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। (মার্কণ্ডেয়চণ্ডী মধুকৈটভবধ ১ম অধ্যায়)

মধুকোষ (পুং) মধুর্থঃ কৃতঃ কোষঃ মধ্বাধারঃ কোষো বা।

মধুমক্ষিকাকৃত কোষ, চলিত মোচাক্, পর্যায়—মধুক্রম।

মধুকোষ (দেশজ) ছাগলের অন্তকোষ।

মধুক্রম (পুং) মধুনঃ ক্রমঃ পুনঃপুনঃমধুপানক্রমঃ। মধুকোষ, মোচাক্, পর্যায়—মধুবার। (অমর)

মধুক্রেতাড়ী (স্ত্রী) ঘৃত বা তৈল দ্বারা ভর্জিত সমধু-পিষ্টক-ভেদ, ইহা গুরু ও পুষ্টিকর। (চরক সূত্রস্থা ২৭ অ°)

মধুকীর (পুং) মধুবৎ ক্ষীরং নির্যাসোহস্ত। খজুরবৃক্ষ।

মধুখজুরিকা (স্ত্রী) মধুমধুরা খজুরী, ততঃ কন্ টাপ্, পুন্স্যা হ্রস্বং। অতি মিষ্ট খজুরবিশেষ, পর্যায়—মধুককটিকা, কোলককটিকা, কণ্টকিনী, মধুকলিকা, মাধ্বা, মধুরা, মধুর-খজুরী, মধুখজুরী। ইহার গুণ—মধুর, বৃষ্য, সস্তাপ ও পিত্তশাস্তিকর, শীতল এবং বীৰ্য্যবর্দ্ধক। (রাজনি°)

মধুগঙ্গা, নদীভেদ।

মধুগড়, উঃ পঃ প্রদেশের জলৌন জেলার অন্তর্গত একটা তহসীল। যমুনা ও পাহুজ নদীর সংযোগস্থানে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৮২ বর্গ মাইল। এখানকার রামপুর, জগমোহন-পুর ও গোপালপুরের ভূমালিকারিগণ ইংরাজ-গবর্নমেন্টকে রাজ্যের প্রদান করেন না। ঐ সকল সামন্তরাজ্যের শাসন ও বিচারভার রাজগণের হস্তে স্তম্ভ থাকিলেও, জেলার ডেপুটি কমিসনরের মতামুসারে তাঁহাদিগকে রাজকার্য পরিচালনা করিতে হয়।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা নগর ও তন্মামক তহসীলের বিচার সদর। এই নগরের অপর নাম রাণীজু।

মধুগন্ধ (পুং) ১ বকুলবৃক্ষ। ২ অজুনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৩ মধুর গন্ধ।

মধুগন্ধপ্রসূনক (পুং) অজুনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মধুগাঙ্গিক (ত্রি) মধুগন্ধযুক্ত।

মধুগায়ন (পুং) মধু গায়তীতি গৈ (লুট্ চ। পা ৩।১।৪৭) ইতি লুট্ বা মধৌ বসন্তে গায়নঃ ৭তৎ। কোকিল। (রাজনি°)

মধুগিরি, মহিসুর-রাজ্যের তুমকুড় জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। ভূপরিমাণ ৪৩৭ বর্গ মাইল। এই স্থান বিশেষ উর্বরা। এখানকার ছিন্নদ-শলাকিনামক ধাতুর চাউল মহিসুরবাসীর বিশেষ আদরের সামগ্রী। পিনাকিনী, জয়মঙ্গলী ও কুমুদতী নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত। মদগিরি নগরে ইহার বিচার সদর স্থাপিত।

২ উক্ত তুমকুড় জেলার অন্তর্গত একটা নগর। মদ-গিরি-দুর্গের উত্তর সীমায় অবস্থিত, অক্ষা° ১৩°৩৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৬' পূঃ। এই নগরের চতুর্দিকই পর্বত-পরিবেষ্টিত। দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ায়, এই স্থান মহিসুরপতি হারদার আলী ও টিপুসুলতানের রাজত্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭৭৪ ও ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মহারাজার সৈন্ত

কর্জুক আক্রান্ত হওয়ার এই নগর অনেকাংশে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় বেক্টরমণস্বামী ও মল্লেশ্বরমন্দির সাধারণের দেখিবার জিনিস। লোহ, ইস্পাত, কার্পাস বস্ত্র, কঞ্চল এবং তাম্র, পিত্তল ও রৌপ্য-বাসনাদি এখানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে।

মধুগিরিচূর্ণ, মহিস্বর রাজ্যের তুমকুড় জেলার অন্তর্গত একটি পর্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯৩৫ ফিট উচ্চ। মদগিরি নগর-রক্ষণার্থ শৈলোপরি একটি প্রাচীন দুর্গ স্থাপিত। অক্ষা° ১৩°৩৯'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৪'৪০" পূঃ। পর্বতোপরি কএকটা প্রস্তবণ আছে। এখানকার পর্বতগাত্র-খোদিত শস্ত্রভাণ্ডার সাধারণের দেখিবার জিনিস। পলিগার সর্দারগণের নিম্নিত মৃৎপ্রাচীরের পরিবর্তে হায়দার আলী প্রস্তর-প্রাচীর দিয়া এই দুর্গের অনেক সংস্কার করেন।

মধুগুঞ্জ (পুং) মধুরং গুঞ্জনমস্য, পবনৈরিত-শুকফলশব্দস্ত মধুরহাং তগাহঃ। শোভাজনবৃক্ষ, সজিনা গাছ। (শব্দমাং)

মধুগ্রহ (পুং) বাজপেয় যাগে মধু দ্বারা হোমভেদ।

মধুবোষ (পুং) মধুমধুরো ঘোষো যন্ত। কোকিল। (শব্দমাং)

মধুচক্র (ক্ৰী) মৌচাক।

মধুচ্ছদা (ক্ৰী) মধুঃ মধুরশ্ছদঃ পর্ণমস্যাঃ, যদ্বা মধু ছাদয়তি রদ্যপিক্যেন পরাভবতীতি ছদ-পিচ্, য, যে হ্রস্বচ। ময়ুরশিখা। ইহার গুণ—লঘু, পিত্তশ্লৈশ্মা ও অতিসারনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

মধুচ্ছন্দস্ (পুং) ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ। ইনি মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের তনয়। ইহার সময়ে আর্ঘ্যাবর্তে ঋষিসমাজে জ্যোতিষাদি বিজ্ঞান বিষয়ের কতকটা উন্নতি হইয়াছিল, ঋগ্বেদের নানা স্থান হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধুচ্যুৎ (ত্রি) ১ মধুক্ষরিত। (পুং) ২ বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ।

মধুজ (ক্ৰী) মধুনো জাতঃ জন ড। শিক্ত্ব, মোম। (রাজনিং)

মধুজম্বীর (পুং) মধুমধুরঃ জম্বীরঃ। (Citrus limetta, the sweet lime of India) মধুর-জম্বীরবৃক্ষ, মিঠা লেবুগাছ।

মধুজা (ক্ৰী) মধোঃ মধুদৈত্যমেদসো জাতা প্রাহুত্বা ইতি জন-ড, টাপ্। পৃথিবী, মধু ও কৈটভদৈত্যের মেদে পৃথিবী গঠিত হয়। [মধুকৈটভ দেখ] মধুনো জায়তে অ ইতি। ২ সিতা, পর্যায়—মহাশ্বতা। (ত্রিকাং)

মধুজিৎ (পুং) মধুঃ মধুনামানঃ দৈত্যঃ জিতবান্ ইতি জি-ক্ৰিপ্, তুগামশ্চ। বিষ্ণু। (দেবীভাগ০ ১।৫।৬২)

মধুজিহ্ব (ত্রি) মধুরভাষিজিহ্বোপেতং, মাধুর্য্যরসাস্বাদক জিহ্বায়ুক্ত। “উপহৃয়ে মধুজিহ্বঃ হবিষ্কৃতম্” (ঋক্ ১।১৩৩) ‘মধুজিহ্বঃ মধুরভাষিজিহ্বোপেতং মাধুর্য্যরসাস্বাদকজিহ্বোপেতং বা’ (সারণ)

মধুজীরক (পুং) জীরকভেদ, মিঠাজীরা। (Pimpinella anisum, Common anise) হিন্দী—সোঁফ, তৈলঙ্গ—পেদজিল-কর, তামিল—সোঁফু। বস্বে—আনিহুন।

মধুজীবন (পুং) বিভীতকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিং)

মধুতাল (পুং) শ্রীতালবৃক্ষ। (রাজনিং)

মধুতুণ (পুং ক্ৰী) মধুরং তুণং। ইক্ষু। (ত্রিকাং)

মধুতৈলবস্তি (পুং) নিরুহবস্তিভেদ। এরুৎকাথ ৮ পল, মধু ও তৈলমিলিত ৮ পল, শলুকা অর্দ্ধ ফল এবং সৈন্ধব অর্দ্ধ-পল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটা কাঠখণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিয়া যে বস্তি প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে মধু-তৈলবস্তি কহে। এই বস্তি দ্বারা মেদ, গুণ্ডা, কৃমি, প্লীহা, মল ও উদাবর্ত নষ্ট হয়। শরীরোপচয়, বল, বর্ণ, শুক্র এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ভাবপ্রং)

মধুত্রেয় (ক্ৰী) মধুনাং মধুরদ্রব্যানাং ত্রেয়ম্। মধুরদ্রব্যত্রয়, মধু, ঘৃত ও চিনি এই তিনটি দ্রব্য। (রাজনিং)

মধুত্ব (ক্ৰী) মধুনো ভাবঃ ত্ব। মধুর ভাব বা ধর্ম, মধুরত্ব।

মধুদীপ (পুং) মধৌ বসন্তে দীপাতে ইতি দীপ-ক। কামদেব।

মধুদূত (পুং) মধোর্বসন্তস্ত দূত ইব, বসন্তাগমনাং প্রাগস্ত মুকুলোদগমদর্শনাং তথাহং। আত্মবৃক্ষ।

“আত্মঃ প্রোক্তো রসালশ্চ সহকারোহতিসৌরভঃ।

কামাঙ্কো মধুদূতশ্চ মাকন্দঃ পিকবল্লভঃ ॥” (ভাবপ্রং)

মধুদূতী (ক্ৰী) মধোর্বসন্তস্য দূতীব। পাটলাবৃক্ষ (ভাবপ্রং)

মধুদোষ (পুং) উদকদোহক, বৃষ্টিজলের কর্তা।

“এতদুচ্ছৈ মধুদোষ মধুঃ” (ঋক্ ৭।১০।১১) ‘মধুদোষঃ মধুন উদকস্য দোহকং বৃষ্ট্যদকস্ত কর্তারং’ (সারণ)

মধুদোহ (পুং) মধুদোহন, মধু বাহির করণ।

মধুদ্রে (পুং) মধুনে দ্রাতি পুষ্পাং পুষ্পং গচ্ছতীতি দ্রা-ক। ভ্রমর। (ত্রিকাং)

মধুদ্রব (পুং) মধুমধুরো দ্রবো নির্ধাসোহস্ত। রক্তশিগ্রু-বৃক্ষ, লাল সজিনা গাছ। (শব্দরত্নাং)

মধুদ্রুম (পুং) মধ্বর্থং মত্বার্থং মধুংপাদকো বা ক্রমঃ তৎ-পুষ্পেভ্যো মদ্যসম্ভবাদস্ত তথাহং। বৃক্ষবিশেষ, চলিত মোলগাছ, পর্যায়,—মধুক, শুড়পুষ্প। (অমর)

মধুদ্বিষ্ (পুং) মধুঃ দ্বেষ্টি দ্বিষ-ক্ৰিপ্। বিষ্ণু। (ভাগ০ ৩।৭।১২)

মধুধা (ত্রি) স্তুতিলক্ষণ-বাক্যধারণক। সোমধারণক। বা আদিত্যধাত্রী।

“উর্দ্ধং মধুধা দিবি” (ঋক্ ৩।৩।১৫) ‘মধুধা মধুরাশি স্তুতি-লক্ষণানি বাক্যানি দধাতীতি, মধুসোমঃ তং ধারয়তীতি বা, যদ্বা মধুধাদিত্যধাত্রী।’ (সারণ)



মধুধাতু (পুং) মধুনা তৎপথ্যায়-নাম্না প্রসিদ্ধো ধাতুঃ। মাক্ষিক।

“বর্ণমাক্ষিকমাখ্যাং তাপীজং মধুমাক্ষিকম্।

তাপাং মাক্ষিকধাতুশ্চ মধুধাতুশ্চ স নৃত্যঃ ॥” (ভাবপ্রঃ)

মধুধার (ত্রি) উদকধারাবৃত্ত মেঘ। “ব্রহ্মণস্পতি মধুধার-  
মভিষমোজসা তৃণং” (ঋক্ ২১২৪৪) ‘মধুধারঃ মধুর্মানয়িত্রী  
উদকধারা তাদৃশং’ (সায়ণ)

মধুধারা (স্ত্রী) মধুনো ধারা ৬৩২। মধুর ধারা, মধুবর্ণ।

“অবিদিতগুণাপি সংকবিভগিতিঃ কণেষু বমতি মধুধারাম্”।

মধুধূলি (স্ত্রী) মধুমধুরা ধূলিরিব। খণ্ড, চলিত খাঁড় গুড়।

মধুধেনু (স্ত্রী) মধুরচিভা ধেনুঃ। দানার্থ মধ্বাদি-নিম্নিত  
সবৎসা ধেনু। এই ধেনুদানের বিষয় বরাহপুরাণে সন্নিহিত  
লিখিত আছে, এখানে অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইল,—

গোময়োপলিপ্ত ভূমিতে কৃষ্ণাজিনের উপর ১৬ কলসী  
মধু দ্বারা ধেনু এবং ইহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৪ কলস মধু দ্বারা  
বৎস কল্পনা করিতে হইবে। এই ধেনুর স্বর্ণ দ্বারা মুখ,  
অঙ্কুরচন্দনে শৃঙ্গ, তাম্রময় পৃষ্ঠ, পটুময়ী সান্না অর্থাৎ গলকথল,  
গুড় দ্বারা মুখ, শকরা দ্বারা জিহ্বা, পুষ্পে গুটবয়, ফলে দন্ত,  
কুশা দ্বারা রোম, রৌপ্যের ক্ষুর এবং প্রশস্ত পত্র দ্বারা শ্রবণ  
কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপে ধেনু ও বৎস প্রস্তুত করিয়া  
ইহার চারিদিকে তিল পাত্র রাখিয়া ঐ ধেনুকে বস্ত্রযুগ্ম দ্বারা  
আচ্ছাদন করিতে হইবে। কাংশপাত্রে দোহনপাত্র রাখিয়া  
যথা নিয়মে এই ধেনু পূজা করিতে হইবে। সংক্রান্তি, চন্দ্রপূর্ণি-  
গ্রহণ প্রভৃতি পূণ্য দিনে আয্যাবস্তোৎপন্ন বেদবেদাঙ্গপারগ  
ব্রাহ্মণকে এই ধেনু দান করিতে হয়। যিনি এই ধেনু দান  
করেন, যে স্থলে নদী সকল মধুবাহিনী, কন্দমসকল পায়সময়  
এবং সিন্ধু, মূনি ও ঋষি বাস করেন, তথায় তাহার গতি হয়।  
নানাবিধ ভোগ করিয়া তথায় শেষে ব্রহ্মলোক গমন করেন।

মধুনদী, ভোজকটরাজ্যের অন্তর্গত একটা নদী।

মধুনাড়া (স্ত্রী) ১ মধুচক্রের গর্ত। ২ ঋগ্বেদের মন্ত্রভেদ।

মধুনাপত্ত, জনৈক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ। তিনি হায়দরাবাদ-রাজ  
আবুহোসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৬৭৬ খ্রীঃাব্দে তাহার  
আমন্ত্রণে মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজী ৭০ হাজার সেনা লইয়া  
হায়দরাবাদ নগরে প্রবেশ করেন। গোলকোণ্ডা নগরে  
তাঁহার অভ্যর্থনা হয়। আবুহোসেনের সহিত সন্ধি-  
সূত্রে বিজাপুররাজের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধে। মধুনা-  
পত্ত মুসলমান সুলতানকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র-  
বিপ্লবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। [ হায়দরাবাদ দেখ। ]

মধুনাপিত, বাঙ্গালা-প্রদেশবাসী ময়রা বা মোদকজাতির  
একটা শাখা। মিষ্টান্নপ্রস্তুত ও বিক্রয় ইহাদের জাতীয়

ব্যবসা। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে,  
মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মন্তক মুণ্ডন করায়, তাঁহার ভৃত্যস্বয়  
একপ উচ্চশ্রেণীভূক্ত হয়। একদা কৌরকর্ণের পর, তাহার  
মহাপ্রভুকে এবং বিধ কন্মের জ্ঞাত জাতিচ্যুতিভয় জানাইলে  
মহাপ্রভু তাহাদিগকে মিষ্টান্নবিক্রয়ের আদেশ দেন। তদ-  
বধি এই বংশ ময়রা-শ্রেণীভূক্ত হইয়াছে। অপর একটা  
আখ্যান হইতে জানা যায় যে, মধু নামে এক নাপিত নিমাই-  
এর সন্ন্যাসগ্রহণকালে মন্তক মুণ্ডন করিয়াছিল। তৎকালে  
সেই ব্যক্তি মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করে যে, মহাপ্রভুর  
মন্তক মুণ্ডন করিয়া সে কিরূপে ব্যক্তিসাধারণের নথকেশ  
কর্তন করিবে? তদবধি মহাপ্রভুর রূপায় সেই মধুনাপিতের  
বংশধরগণ মোদকের কাধ্য করিয়া মধুনাপিত আখ্যায় বিভূ-  
ষিত হয়।

ইহাদের মধ্যে বিশ্বাসমোদক, জাতিমোদক, মধুমোদক ও  
রেলাতি মোদক নামে চারিটা থাক এবং আলম্যান, ভরদ্বাজ,  
কাঞ্চপ, মোকাল্যা, পরাশর ও শান্তিল্য প্রভৃতি গোত্র প্রচ-  
লিত আছে।

সগোত্র ও সমানোদক বাদ দিয়া ইহারা বিবাহাদি করে।  
বালিকাবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রশস্ত। বিধবাবিবাহ সাধা-  
রণতঃ নিষিদ্ধ। নবশাখের অন্তর্গত না হইলেও ইহারা নব-  
শাখ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হস্তে জলগ্রহণ  
করিতে পারে। ইহারা সকলেই বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী।

মধুনালিকেরক (পুং) মধুমধুরো নারিকেলঃ স্বার্থে কন,  
রলয়োতৈরক্যাং রস্য লভং। মধু নারিকেল, এই নারিকেল  
কোষ্ঠকে প্রসিক্ক, বধে মোহানারল। চলিত বামন নারিকেল।  
পথ্যায়—মাধ্বীক ফল, মধুফল, অসিতজফল, মাক্ষিকফল,  
মুখফল, বহুকুর্ক, হৃৎফল। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, দাহ,  
তৃষ্ণা ও পিত্তনাশক। বল, পুষ্টি, কাশ্তি ও বীৰ্য্যবদ্ধক এবং  
কচিকর। (রাজনিঃ)

মধুনিসূদন (পুং) বিষ্ণু।

মধুনিহন্তু (পুং) বিষ্ণু।

মধুনিষ্পাব (পুং) মুকুটশিখী, চলিত মুকুট শীম। ইহার  
গুণ—কচিকর, মধুর, জ্বলং কষায়, শীতল, বলকর, আশ্বাসনকর,  
গুরু ও পুষ্টিদায়ক। (রাজনিঃ)

মধুনী (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ, চলিত মাকড়হাতা, মাকড় হাউলী।  
পথ্যায়—স্বতমণ্ডা, বায়সোলী, স্তমঙ্গলা। (রত্নাবলী)

মধুনেতৃ (পুং) মধু নয়তি পুস্পেভ্যঃ সংগহাতীতি না-তৃচ।  
ভ্রমর। (শব্দচঃ)

মধুপ, মহাদ্রিগণিত জনৈক রাজা। (সহাং ৩৩১৫৪)



মধুপ (পুং) মধু পিবতীতি পা-ক। ১ ভ্রমর। (অমর) (ত্রি)  
মধু জলং পাতীতি পা-ক। ২ বারিরক্ষক। “চিদগং মধুপঃ  
নয়ান মসি তং” (ঋক্ ৫।৩২।৮) ‘মধুপং মধুনোহন্তসঃ পাতারঃ  
পালয়িতারং (সায়ণ) ৩ মধুপানকর্তা। “বাজারেটে মধু-  
পাবিষে চ” (ঋক্ ১।১৮।১২)

‘মধুপো মধুরস্য সোমরসস্ত পাতারৌ’ (সায়ণ)

মধুপটল (পুং) মধুচক্র।

মধুপতি (পুং) কক্ষ।

মধুপর্ক (পুং) মধুনো পর্কঃ সম্পর্কো যন্ত পৃচ-ষঞ, মধুনা  
সংবাদনায় তথায়। পূজোপচারভেদ, যোড়শোপচারের  
মধ্যে ষষ্ঠোপচার।

“দধি সর্পির্জলং কোদ্রং সিতৈতত্তিষ্ঠ পঞ্চতিঃ।

প্রোচাতে মধুপর্কস্ত সর্গদেবৌষতুঠয়ে ॥

জলস্ত সর্গতঃ স্বস্তং সিতা দধি যুতং সমম্।

সর্গেধামধিকং কোদ্রং মধুপর্কে প্রযোজয়েৎ ॥

তদ্রূপং কাংস্যপাত্রেন রৌপ্যেথৈতভবেন বা।

জ্যোতিষ্টোমাস্থমেধানৌ পূর্বে চেঠে প্রপূজনে ॥

মধুপর্কঃ প্রতিষ্ঠোহরং সর্গদেবৌষতুঠিদঃ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধকঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

মধুপর্কঃ সৌখ্যভোগ্য-তুষ্টিপুষ্টিপ্রদায়কঃ ॥”

(কালিকাপুং ৬৭ অং)

‘দধি, যুত, জল, মধু এবং চিনি এই পাঁচটা দ্রব্য একত্র  
মিশ্রিত করিলে মধুপর্ক হয়। ইহা দেবতাগণের তুষ্টিপ্রদ  
হইয়া থাকে। মধুপর্কে জল অতি অল্পমাত্রায় দিতে হইবে।  
চিনি, দধি এবং যুত তুল্য পরিমাণে এবং মধু অধিক পরিমাণে  
দিতে হইবে। এই মধুপর্ক জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, পূর্ত,  
ইষ্ট বা পূজার কাংস্যপাত্রে রৌপ্য অথবা ষেতমর পাত্রে দান  
করিতে হয়। মধুপর্ক সমুদয় দেবতাগণের তুষ্টিপ্রদ এবং  
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক। মধুপর্ক দান করিলে  
সৌখ্য, ভাগ্য, তুষ্টি ও পুষ্টি লাভ হয়।

উদ্রমতে যুত, দধি ও মধুমিশ্রিত করিয়া মধুপর্ক দিতে হয়।

“মাজ্যং দধিমধুমিশ্রং মধুপর্কং বিহবুধাঃ।” (তত্ত্বসার)

“সংযুক্তানামিকাস্তুষ্ঠা ত্রিশ্রোহস্তাঃ সংপ্রসারিতাঃ।

মধুপর্কে চ সা মুদ্রা বিধতিঃ পরিকীর্তিতা ॥”

(হরিতকিবিলাস)

অনামিকা ও অকুষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া এবং অপর তিনটা  
অকুষ্ঠি প্রসারিত করিয়া মধুপর্ক দিতে হয়। পারশ্বরগৃহ-  
স্থত্রের মতেও দধি, মধু ও যুত একত্র করিয়া কাংস্যপাত্রে  
মধুপর্ক দিতে হয়।

“মধুপর্কং দধিমধুযুতমপিহিতং কাংস্তে কাংস্ত্রেন”

(পারশ্বরগৃহস্থত্র ১।১।৫)

দক্ষিণাত্যের চিংপাবন ব্রাহ্মণগণ বিবাহের পূর্বে বা  
অব্যবহিত পরে মধুপর্ক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। উহা  
কতকংশে অম্বদেশের পঞ্চামৃতপানের ত্রায়। জামাতাকে  
সমুখে কাষ্ঠাসনে বসাইয়া শাকুড়ী পায়ে জল ঢালিতে থাকে  
এবং ষণ্ডর গামছা দিয়া জামাতার পা মুছাইয়া দেয়।  
তৎপরে ষণ্ডর একখানি কোণীতে দধি, দুগ্ধ, মধু ও মাখন  
একত্র করিয়া জামাতার দক্ষিণহস্তের তালুতে ঢালিয়া দেয়।  
জামাতা উহাকে গণ্ডু্য করিলে পর, তাহাকে ষণ্ডাবোগ্য বেশ-  
ভূষাপ্রদানপূর্ব্বক গৃহে লইয়া যায় এবং সম্প্রদানকার্য্যে  
ব্রতী হয়।

মধুপর্কিক (ত্রি) মধুপর্কদানকালে ত্রুতিপাঠক, মাজল্যোপ-  
স্থাপক।

“পঠন্তি পাণিশ্রণিকা মাগধা মধুপর্কিকাঃ।

বৈতালিকাশ্চ সূতাশ্চ তুষ্ঠবুঃ পুরুবর্ষভম্ ॥” (ভারত ৭ অং)

মধুপর্ক্য (ত্রি) মধুপর্কমহতি (দণ্ডাদিত্যো যঃ পা ৫।১।৬৬)  
ইতি য। মধুপর্কার্হ, মধুপর্কের যোগ্য।

মধুপর্গিকা (স্ত্রী) মধিব হিতং পর্ণমস্তাঃ ততঃ স্বার্থে কন্  
টাপ্, অত ইত্য়ৎ। ১ গান্তারীবৃক্ষ। ২ নীলীবৃক্ষ। ৩ বরাহ-  
জাত্য। (শব্দচং) ৪ গুড়ুচী। ৫ স্তদর্শনা।

“স্তদর্শনা সোমবরীচক্রাহবা মধুপর্কিকা।” (ভাবপ্রং)

মধুপর্ণী (স্ত্রী) মধু ইব হিতং পর্ণং যস্তাঃ গোরাদিত্যং  
ভীষ্। ১ গুড়ুচী। ২ গান্তারীবৃক্ষ। ৩ নীলীবৃক্ষ। (মেদিনী)  
৪ মধুবীজপু। (রাজনিং) ৫ বিকস্কতবৃক্ষ। (বৈদ্যকরত্নমাং)

মধুপাকা (স্ত্রী) পাকেন মধুমধুরা, রাজদস্তাদিত্যং পূর্ব্ব-  
নিপাতঃ টাপ্। মড়ুভজা। (রাজনিং)

মধুপাণি (ত্রি) ১যাহার হাত মিষ্ট। ২যাহার হাতে মধু আছে।

মধুপায়িন্ (পুং) মধু পিবতীতি পা-নি, ততঃ (আতোয়ুচ্  
নিচক্রতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ইতি যুচ্। ১ ভ্রমর। (ত্রি)  
২ মধুপানকর্তা।

মধুপাল (পুং) মধুরক্ষক। (রামাং ৫।৬।১০)

মধুপালিকা (স্ত্রী) মধু পালয়তীতি পালি-ধূল্ টাপ্, অত  
ইত্য়ৎ। গস্তারী। (শব্দমালা)

মধুপিঙ্গ, মুনিবিশেষ। (শিঙ্গপুং ৭।৪৮)

মধুপিঙ্গাক্ষ (ত্রি) ১মধুর ত্রায় পীতবর্ণ চক্ষুযুক্ত। ২মুনিভেদ।

মধুপীলু (পুং) মধুমধুরঃ পীলুঃ। মহাপীলু, চলিত আখরোট।

মধুপুর, বাকালার ভাগলপুর জেলার উত্তরে অবস্থিত একটা  
প্রাচীন নগর। মধুপুর-উপবিভাগের সদর। পর্কান্ নদীর

মধুপুষ্পে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫৫' ৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৪২' ৫১" পূঃ। এই স্থান দুর্গাদেবীর কৃপাশ্রয় সুরিকের লীলাক্ষেত্র বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণচিনিহিত পূর্বতন হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের মূর্ত্তা এই স্থানের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতেছে।

মধুপুর, বাঙ্গালার নীওতাল পরগণার অন্তর্গত একটি গও-গ্রাম। এক্ষণে স্বাধীয়াবাসক্কে পরিগৃহীত হইয়াছে। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ড লাইনের একটি স্টেশন থাকার সমন্বয়নের বিশেষ সুবিধা আছে। স্থানীয় পার্শ্বতা দৃষ্ট অজীব মনোহর।

মধুপুর, পূর্ববঙ্গের সুরমাঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ৩২° ২২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩২' পূঃ।

মধুপুর, বাঙ্গালা প্রদেশের ঢাকা জেলার উত্তর হইতে ময়মন-সিংহ জেলার মধ্য ও ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ একটি জঙ্গল। গড়গুজালি নামেও প্রসিদ্ধ। এই স্থান পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ। মধ্যে মধ্যে ১০০ ফিট উচ্চ এককটী গও শৈলও দৃষ্ট হয়। এক্ষণে ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদারদিগের যত্নে ইহার কতকাংশে আবাস হইয়াছে।

মধুপুর, বা সবাই মধুপুর, রাণপুরানার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। জয়পুররাজধানী হইতে ২১০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে দুইটা মেলা হয়। প্রত্যেক মেলাতেই বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

মধুপুর, বাঙ্গালার দরভঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৬° ১০' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ২৫' ১১" পূঃ। বহ্রামপুর, হরসিংহপুর, গোপালঘাট ও দরভঙ্গা নগর সমনের প্রধান পথ এই নগরে মিলিত হওয়ার এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। জিহত ও পূর্ণিমা জেলার সহিত বাণিজ্যপরিচালনার জন্য সুবিস্তৃত পথ আছে। নবাবাদ নীলকুঠী ইহার সন্নিহিত অবস্থিত।

মধুপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাড় বিভাগের পোর-বন্দররাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। এই প্রাচীন নগরে খ্রীষ্টকের একম মন্দির বিদ্যমান আছে। প্রবাদ, খ্রীষ্টকৃষ্ণ কল্পিতদেবীকে ভয় করিয়া এখানে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মধুপুর বা মধুপুরী, মধুরার নামান্তর। [মধুরা দেখ।]

মধুপুরী (স্ত্রী) অশোভনাময় দৈত্যাত্ত পুরী। মধুরা।

মৈমিষঃ কাক্ষমঃ সেতুঃ প্রভাসোৎপ কুশলী।

‘সারঙ্গদী মধুপুরী পশ্যাৎ কিস্কিন্দয়তথা’ (ভাগবত ৭।৪।২১)

মধুপুষ্প (পুং) মধু প্রচুরাণি পুষ্পাণ্যন্ত। ১ মধুক্রম। (করমলা)

২। পিঙ্গলবৃক্ষ। ৩। অশোকবৃক্ষ। ৪। মল্লবৃক্ষ। (রাজনিঃ)

মধুপুষ্পা (স্ত্রী) মধুপুষ্প-জিহাং টাপ। ১ মল্লবৃক্ষ, নাগদন্তীবৃক্ষ। ২ ধাতকী বৃক্ষ। (বৈজ্ঞানিকনিঃ)

মধুপৃক্ (ত্রি) কক্ষফল দ্বারা সংযোজনকারী (অগ্নি)। ‘বচ-স্তা মধুপৃচং ধনসা জোহবীমি’ (শক্ ২।১০।৬) ‘মধুপৃচং মধুনা কক্ষফলেন বজমানং সংযোজয়ন্তুমগ্নিঃ’ (সারণ)

মধুপৃষ্ঠ (ত্রি) মধুর পৃষ্ঠভাগ, মনোহর পৃষ্ঠদেশ। ‘মধুপৃষ্ঠং বোরমরাসমখং’ (শক্ ২।৮।৮) ‘মধুপৃষ্ঠং মধুরপৃষ্ঠভাগং’ (সারণ)

মধুপেয় (ত্রি) মধুং পাতব্য, মধুত্বা পানযোগ্য।

‘বাহুরনো মধুপেয়ো বরাহ’ (শক্ ৬।৫।২১) ‘মধুপেয়ো মধুং পাতব্যঃ’ (সারণ)

মধুপ্রতীক (ত্রি) স্মৃতপ্রযুক্তাবয়ব, স্মৃত দ্বারা অবয়বযুক্ত।

‘স্মৃতেনামিঃ সমজ্যতে-মধুপ্রতীক আহতঃ’ (শক্ ১০।১১।৮)

‘মধুপ্রতীকো স্মৃতপ্রযুক্তাবয়বঃ’ (সারণ)

মধুপ্রিয় (পুং) মধু মদ্যঃ প্রিয়মন্ত। ১ বলরাম। ২ ভূমিজন্ম।

‘নাদেবী জী নান্দরসকৃৎসগন্ধো মধুপ্রিয়ঃ’ (জটধর)

(ত্রি) ৩ মধ্যপ্রিয়।

মধুফল (পুং) মধু মধুরং ফলমন্ত বা মধু মন্তঃ ফলাং বন্ত।

১ মধুনারিকেল। (রাজনিঃ) ২ বিককত বৃক্ষ। (শক্ ৮০)

মধুফলিকা (স্ত্রী) মধু মধুরং ফলাং যন্তাঃ, মধুফলসংজ্ঞায়াং

কন্-টাপ অত ইতং। মধুখর্জুরিকা। (রাজনিঃ)

মধুবহুল (স্ত্রী) মধুনা মধো বা বহুলা। ১ বাসন্তীলতা।

(রাজনিঃ) ২ শুক্রযুথিকা। (বৈজ্ঞানিকনিঃ)

মধুবিশ্বী (স্ত্রী) কুন্দকলতা, চলিত কুন্দকী। (বৈদ্যকনিঃ)

মধুবীজ (পুং) মধুমধুরং বীজং যন্ত। দাড়িম। (রাজনিঃ)

মধুনীজপুর (পুং) মধুনাঃ মধুপূর্ণানাং বীজানাং পুরঃ সমুহো

যন্ত। মধুককটিকা, হিন্দী মিঠাবিজোরা। পর্যায়—মধুপর্ণী,

মধুরককটী, মধুবল্লী, মধুককটী, মধুরফলা, মহাফলা, বর্জমান।

ইহার গুণ—মধুর, শীতল, দাহনাশক, ত্রিদোষশান্তিকর, কচি-

কর, পথ্য, ক্ষুর ও দুর্জর। (রাজনিঃ)

মধুভাগ (ত্রি) বাহার অংশে মধু আছে।

মধুভাব (পুং) প্রাকৃত ছন্দোভেদ।

মধুভিদ (পুং) মধুং ভয়ামানং দৈত্যঃ তিনতি নাশয়তীতি ভিদ-

কিপ্ ভূগাথমন্ত। বিষ্ণু।

‘তাম্ভন মহমুখরিতা মধুভিচ্ছরিত-

গীষ্মশেষমারতঃ পরিতঃ অবতি ॥’ (ভাগবত ৪।২৯।৪০)

মধুভূজ (ত্রি) মধু-ভূজ-কিপ্। ক্ষুদ্র সুখভোক্তা।

‘স এব পূর্ব্যাং মধুভূজ পঞ্চালেষু স্বপার্ষদৈঃ’

উপনীতং বলিঃ গৃহ্ণন্ জীজিতোনবিদভয়ম্ ॥’ (ভাগ৪।২৭।১৮)

‘মধুভূজ ক্ষুদ্রসুখভোক্তা’ (শ্রীমদ) ২ মধুভোজী।

মধুমক্ষ (পুং) পুং মোমাছি।

মধুমক্ষিকা (স্ত্রী) মধুক্ষয়িকা মক্ষিকা। কীটবিশেষ।  
মোমাছি, পখায় সরবা। (অমর) [মোমাছি দেখ।]

মধুমজ্জন্ (পুং) মধুমধুরো মজ্জা যন্ত। আখোট বৃক্ষ। (রাজনিং)

মধুমং (ত্রি) মধুমধুরসোহস্ত্যন্ত মতুপ্। ১ মাধুর্যযুক্ত,

মধুরসবিশিষ্ট। “মধুমং পার্থবঃ রজঃ” (মৎস্তসূক্ত)

২ কান্দীরবৃক্ষ।

মধুমত, কান্দীর সন্নিকটে দেশভেদ। (ভারত ভীষ্ম ৯৫২)

মধুমতিগণেশ, কাব্যদর্শন নামে কাব্যপ্রকাশটাকারচরিত।

মধুমতী (স্ত্রী) মধুমং জিহ্বাঃ উপ্। ১ নদীবিশেষ। এই  
নদীর জল অগ্নিদীপক।

“চন্দ্রভাগাশুপসাম্যং জলং কিঞ্চ মধুমতমগ্নিদীপনম্।”

(রাজনিং)

২ উপাশ্রয় নারিকাবিশেষ। ইহার উপাসনায় সিদ্ধি লাভ  
হয়, যাহার এই সিদ্ধি হয়, তাহার শত শত দেবচৌকী বশীভূত  
হয়। তিনি স্বর্গ, মর্ত্য বা পাতাল যেকোনো যাইতে ইচ্ছা  
করেন, এই চৌকীগণ সেই স্থলে তাহাকে লইয়া যায়।

“তথা মধুমতাশিকার্জারতে নাত্র সংশয়ঃ।

দেবচৌকী শতশতং তন্ত বশ্যা ভবন্তি হি॥

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে স যত্র গচ্ছামিচ্ছতি।

তটেব চৌকিঃ সকা নর্যস্তি নাত্র সংশয়ঃ॥”

(কুকলাশদাপিকা ৩ পটল)

৩ পাতঞ্জল দর্শনোক্ত সমাধিসিদ্ধিভেদ। “তত্র মধুমতী-  
নামাত্মনৈবৈরাগ্যাদিবশাদপাত্ত-রজস্তমোশেষশুখপ্রকাশময়-  
সম্ভাবনয়ানন্দোৎপাদ্যবিদ্যোতনরূপম্বুতন্তব প্রজ্ঞাখ্যা সমাধি-  
সিদ্ধিঃ।” (সমদর্শনসং পাতঞ্জলদং) বে সমর অভ্যাস ও  
বৈরাগ্য দ্বারা রজঃ ও তমোমল একেবারে দূরীভূত হয়,  
তখন সবশেষের প্রকাশ দ্বারা অতন্তব প্রজ্ঞা হইয়া থাকে,  
এইরূপ প্রজ্ঞা উপর হইলে মধুমতী নামী সমাধি সিদ্ধি হয়।

[বিশেষ বিবরণ সমাধি শব্দে দেখ]

৪ গঙ্গা। (কাণীখং ২৯১৩৩) ৫ ইক্ষুকুপ্পর হর্যশ্বের  
ভার্গ্যা, ইনি মধু নৈভ্যের কন্যা।

“মাসৌদ্রাজা মনোবংশে শ্রীমান্ ইক্ষুকুসম্ভবঃ।

হর্যশ্ব ইতি বিখ্যাতো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ॥

তন্ত্রাসীদ্ধিরিত্য ভার্গ্যা মধোদৈত্যন্ত বৈ সূতা।

দেবী মধুমতী নাম বৎসেদ্রুশ শচী যথা॥” (হরিবং ৯৩১২১৩)

৬ ছন্দোভেদ। (ছন্দোমং)

মধুমতী, বাঙ্গালার ফরিদপুর ও যশোর জেলার মধ্যে প্রবা-  
হিত একটি নদী। ইহা পুণ্যসলিলা গঙ্গানদীর একটি শাখা।

স্থানবিশেষে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। নদীয়া জেলার  
কুষ্টিয়া নগরের সন্নিকটে মূল নদীগাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া  
গড়াই নামে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে মধুমতী নাম গ্রহণ  
করিয়াছে। পরে বাথরগঞ্জ জেলায় প্রবেশকালে গোপাল-  
গঞ্জ থানা হইতে বেলশ্বর নামে সুন্দরবনের মধ্য দিয়া বঙ্গোপ-  
সাগর মুখে হরিণঘাটা নামে পতিত হইয়াছে। খুলনা হইতে  
ভৈরবনদ ও আঠারবাঁকী অতিক্রম করিয়া মধুমতীতে গিয়া  
পড়িয়াছে। ফরিদপুর জেলার বারানিয়া ও মধুমতীর সঙ্গম-  
স্থল কীর্তনখোলা নামে অভিহিত। যখন গড়াই নদী খর-  
স্রোতে প্রবাহিত ছিল, তখন বর্ষাকালে বারানিশ ও মধুমতীর  
স্রোতোজলে প্রবলবেগে ঘাতপ্রতিঘাত হইয়া কীর্তনের ত্রাস  
খন খন শব্দ উত্থিত হইত।

১ বোগিনীতন্ত্রোক্ত একটি নদী।

২ নন্দদানদীর শাখাভেদ। (রেবাকণ্ড)

মধুমতী, প্রাচীনকালের অন্তর্গত স্থানভেদ। (প্রভাসথং)

মধুমত্ত (ত্রি) ১ মধুপানে মত্ত। ২ বদন্তাগমে উৎকৃষ্ট।

৩ মহাকরম।

মধুমতন (পুং) মধুঃ তন্মানং দৈত্যং মত্বাভীতি মত্ব-ন্যা।  
বিষ্ণু। (ভাগ০ ৩৯.৩৯)

মধুমদ (পুং) মত্তের মাদকতাশক্তি।

মধুমত্ত (স্ত্রী) নগরভেদ।

মধুমন্ত (পুং) মধুমিশ্রণজাত মত্তভেদ।

মধুময় (ত্রি) মধু স্বরূপে ময়ট। মধু, মধুতুল্য।

মধুমর্কটী (স্ত্রী) মধুজাতা মর্কটী, মধ্যপদলোপকর্ম্মাং। মধু-  
জাত খণ্ড, দ্রব্যখণ্ড।

মধুমর্জী (স্ত্রী) মধুপ্রধানা মর্জী। মালতী। (শব্দমাং)

মধুমন্তক (স্ত্রী) মধুমধুরগঃ মন্তকে উপরিভাগে যন্তঃ।  
পিষ্টকবিশেষ।

“মধুতৈলমুতৈর্মধ্যে বেষ্টিতঃ সন্মিতাশ্চ বাঃ।

মধুমন্তকমুদ্রিষ্টং তন্ত্রাখ্যা পরিমাজ্জনম্॥” (শব্দচং)

“সন্মিতা বেষ্টিতা মধ্যে মধু দৃশ্য স্তুতে শূতা।

মধুমন্তকমুদ্রিষ্টং তদ্ব্যং গুরু হৃজ্জরম্॥” (রাজনিং)

ময়দা স্তুতে ভাজিয়া উপরে মধু দিলে এই পিষ্টক হয়,

ইহা বলকর, গুরু ও হৃজ্জর।

মধুমাধব (পুং) বসন্তকাল। (ভাগবত ৮।৮।১১)

মধুমাধব, মধুমাধবী নামী অমরকোষ-টাকারচরিত। রাম-  
মুকুট, রামানন্দ, ভরতসেন প্রভৃতি ইহার মত উদ্ধৃত  
করিয়াছেন।

মধুমাধবসহায়, আনন্দতীর্থকৃত তত্ত্বসারের লিখ্যপ্রণেতা।

মধুম্বেধী (স্ত্রী) মধুযুক্ত মাধবী। বাসন্তী লতা।

“অন্তর্জগৎষু বিকসন্মধুম্বেধীনাঃ

গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োপ্যানিলং ক্রিপস্তুঃ।” (ভাগ০ ৩।১৫।১৭)

• ‘অম্বিকসন্তাঃ মধু মকরন্দঃ তদ্বৃক্কাঃ মাধব্যাঃ বাসন্ত্যো  
লতাঃ, যথা অম্বিকসন্তাধবঃ প্রসন্নকরন্দাঃ মাধব্যাঃ মধু-  
কালীনাঃ সুনন্দাঃ’ (স্বামী)

২ রাগিণীভেদ। ৩ মস্তবিশেষ। (মহাভা০) ৪ ছন্দোভেদ।

মধুম্বেধীক (স্ত্রী) মধুমধুযুক্ত মাধবীকং। মদ্য।

মধুমান, পৌরাট্র জনপদের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর।  
সিভোদের পশ্চিমে অবস্থিত। পাণিনির কচ্ছাদিগণে এই  
নগরের উল্লেখ আছে।

মধুমারক (পুং) মধুনাঃ মারকঃ ভক্ষকভাং তথাবমস্ত।  
ভ্রমর। (রাজনি০)

মধুমালতী (স্ত্রী) মালতীপুষ্প বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

মধুমালপত্রিকা (স্ত্রী) চিবিলিকা। (রাজনি০)

মধুমিশ্র (ত্রি) ১ মধুযুক্ত। (পুং) ২ জনৈক গ্রন্থকার। ইনি  
ভাবচন্দ্রের পুত্র।

মধুমুরনরকবিনাশন (পুং) বিষ্ণু, কৃষ্ণ, ইনি মধু, মুর এবং  
নরকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। (গীতগো০ ১২০)

মধুমূল (স্ত্রী) মধু মধুরঃ মূলঃ। রক্তালুক, চলিত মোআলু।

মধুম্বেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ।

“নর এব প্রমেহাস্ত কালেনাপ্রতিকারিণঃ।

মধুম্বেহমারান্তি তদমাখ্যা ভবন্তি হি॥”

(চরক সূত্রভা০ ১৭ অ০)

উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা না করিলে সর্বপ্রকার প্রমেহ-  
রোগই কালবিলম্বে মধুম্বেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ভাব-  
প্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—মধুম্বেহরোগ  
দুঃসাধ্য। মধুম্বেহে মূত্র মধুর আয় হয়। মধুম্বেহ হই  
প্রকারে উৎপন্ন হয়, যথা—এক প্রকার ধাতুক্ষয়প্রযুক্ত বায়ু  
কুপিত হইয়া, অথবা প্রকার অপর দোষ কর্তৃক বায়ু অবরুদ্ধ হইয়া  
শেণোক্ল রূপে বে মধুনেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে দোষসমূহের  
লক্ষণ সকল অকস্মাৎ উপস্থিত হয়, এবং কখন ক্ষীণ কখনও  
বা পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কষ্টসাধ্য হয়। ধাতুক্ষয়হেতু  
কুপিত বায়ু কর্তৃক বে মধুম্বেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে মাত্র  
কুপিত বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শরীরাবয়বের  
মধুরতাপ্রযুক্ত সর্ব প্রকার মেহরোগেই প্রায় মধুর আয়  
মধুরসযুক্ত মূত্র ত্যাগ হয়, এ কারণ সমস্ত মেহরোগকেই  
মধুম্বেহ বলা যাইতে পারে। (ভাবপ্র০ প্রমেহাধি০)[প্রমেহ দেখ]  
স্বক্বে লিখিত আছে,—

দিবাস্বপ্ন, অপরিশ্রম ও শীতল, শিথ, ও মধুর জ্বর অন্ন  
সেবন করিলে প্রমেহ রোগ জন্মে। এইরূপ অহিতাচারী  
পুরুষের বাত পিত্ত শ্লেষ্মা পরিপাক না হইয়াই মেদ ধাতুর  
সহিত একত্র হইয়া মূত্রবাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশপূর্বক  
অধোভাগে গমন করে, তথায় বস্তুমুখ আশ্রয় করিয়া ভেদ-  
করণের আয় বহুনা হয়। করতল ও পদতলে দাহ, দেহ শিথ,  
পিচ্ছিল ও ভার, মূত্র শুক্লবর্ণ ও মধুর, তন্দ্রা, অবসাদ, পিপাসা,  
দুর্গন্ধ, শ্বাস, তালু, গলদেশ, জিহ্বা ও দন্তে মলের উৎপত্তি,  
কেশের জটিলভাব এবং নখরুদ্ধি এই সকল পুঙ্ক লক্ষণ হইয়া  
থাকে এবং মূত্র আবেল ও পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে।  
কিছু দিন অতীত হইলে মেহরোগে পীড়িতা সকল উৎপন্ন হয়।

এই সকল লক্ষণ এবং পীড়িতাতে অতিশয় পীড়িত ও  
উপজীববিশিষ্ট হইলে মধুম্বেহ বলা যায়। মধুম্বেহ অসাধ্য।  
মধুম্বেহরোগী কোন স্থানে গমন করিলে শ্রান্তিপ্রযুক্ত উপ-  
বেশন করিতে ইচ্ছা করে, উপবেশন করিলেই নিদ্রিত হয়।  
সকল প্রকার মেহরোগই কালগত হইলে যখন অপ্রতিবিধেয়  
হইয়া উঠে, তখন তাহাকে মধুম্বেহ কহে। মধুম্বেহরোগীকে বৈদ্য  
পরিভাষ্য করিলে নিম্নলিখিত যোগ দ্বারা চিকিৎসা করা  
কষ্টব্য। জ্যৈষ্ঠমাসের সূর্য্যাক্ষরগণে পাক্তীয় শিলা তাপিত  
হইলে তাহা হইতে জতুর আয় রস পাওয়া যায়। তাহাকে  
শিলাজতু কহে। ইহা সকল ব্যাধিনাশক। ইহাতে জপু,  
লৌহ প্রভৃতি ৬ প্রকার ধাতুর সারভাগ আছে, তাহা  
এই সকল ধাতুর স্ব স্ব গন্ধ দ্বারা জানা যায়, এইজন্ত ইহাকে  
ষড়্ভোনি বলে। জতুর আয় প্রভাবিশিষ্ট এই শিলাজতু  
লৌহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার রস ও বীণ্য লৌহের আয়।  
যে শিলাজতু তিক্ত, কটু, কষায়, সারক, কটুপাক, উষ্ণবীণ্য,  
শোষণ ও ভেদনকর, তাহাদিগের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ, গুরু, শিথ  
শকরাহীন শিলাজতুই উৎকৃষ্ট এবং যে শিলাজতু গোমূত্রগন্ধ-  
বিশিষ্ট, তাহাও শ্রেষ্ঠ।

এইরূপ শিলাজতু প্রাতঃকালে সারগণের দ্বারা (সারগণাধি,  
বক্রগাদি, বীরতমাদি, সালসারাদি ও অগ্রোধাদিগণে যে  
সকল বৃক্ষ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদিগের সারই সারগণ নামে  
অভিহিত) ভাবিত করিয়া সারজলে নিম্নলিখিত পিষিয়া  
উপযুক্তদ্বারা সেবন করাইবে। জীর্ণ হইলে জাজলরস-  
যোগে অন্ন ভোজন করাইতে হইবে। এই অমৃততুল্য গিরি-  
জাত ঔষধ তুল্য পরিমাণে সেবন করা হইলে দেহের বর্ণ ও  
বল জন্মে এবং মধুম্বেহ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত ও শত বৎসর  
পরমায়ু হয়।

গিরিজাত অমৃততুল্য মানিকধাতুও এই প্রণালীতে

সেবন করা যায়। মাসিক দুই প্রকার, স্বর্ণপ্রভা ও রক্ত-প্রভা। স্বর্ণপ্রভা মধুর ও রক্তপ্রভা অম্ল। মাসিক সেবন করিয়া কপোতমাংস ও দ্রীসঙ্গ বর্জন করিতে হইবে। রোগী শ্রদ্ধাবান্ ও আরোগ্যবিষয়ে বরুণরায়ণ হইলে পিতৃ-দৌষভাত মধুমেহ ও কুষ্ঠাদিরোগ নিরাকৃত হয়।

পশ্চিম সমুদ্রের তীরে যে সকল আটকী বৃক্ষ (অড়হর) আছে, সাগর-তরঙ্গবিলেপে ও সমীরণ-হিলোলে তাহাদিগের পল্লব সর্বদা কম্পিত হয়। বর্ষাগমে তাহাদিগের সুগন্ধফল সংগ্রহ করিয়া মজ্জা বাহির করিতে হইবে। এই মজ্জা শুক করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। এই চূর্ণ তিলের তায় জোষিতে পীড়ন করিয়া তৈল বাহির করিতে হইবে। এই তৈল অগ্নিগন্ধ করিয়া নির্জল হইলে অগ্নি হইতে সামাইয়া শুক গোময়ের মধ্যে একপক্ষ কাল রাখিতে হইবে। শুকপক্ষে শুভদিনে এই তৈল যথাঋণ্য পরিমাণে নিরোক্ত মস্ত পাঠ করিয়া পান করিবে। মন্ত—

“মজ্জসার মহাবীৰ্য্য সর্কান্ ধাতূন্ বিশোধয়।

শাচক্রগদাপাণি স্তামাজাপয়তেহচ্যুতঃ॥”

এই তৈলসেবনে রোগীর অধঃ ও উর্দ্ধদৌষ সংশোধিত হয়। প্রাতঃকালে এই তৈল পান করিয়া অপরাহ্নে স্নেহ ও লবণবর্জিত নীতল যবাণু পান করিবে। এই বিধি অনু-সারে ৫ দিন তৈল পান করিয়া পরে মুকামুষ ও অন্ন আহারে একপক্ষকাল যাপন করিবে। ইহাতে মধুমেহ আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত-মধুমেহ চিঃ)

এই রোগে পথ্যাপথ্য—

দিবসে স্নান পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ, মধুর ও ছোলার ডাইলের ঘূষ, ছাগ, হরিণ ও কপোতমাংস, পটোল, ডুমুর, যজ্ঞডুমুর, খোড়, ঝিঞে, মোচা, কাঁচকলা, সজিনাশাক ও ভাঁটা প্রভৃতি তরকারী খাওয়া উচিত। রাতিকালে গম বা যবের আটার রটি, ঐ সকল তরকারী এবং মাখনতোলা দুধ আহার করিবে। আমলকী, জাম, কেশর, পাকা কলা, পাতি বা কাগড়ী লেবু খাওয়া যাইতে পারে। রুক্ষক্রিয়া, অবদানে ও হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ, পর্বাটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ উপকারক। পীড়ার প্রবলাবস্থায় দিবসে অন্ন বন্ধ করিয়া গম বা যবের আটার রটি, অথবা কেবলমাত্র মাখনতোলা দুধ পান করিয়া থাকা আবশ্যক। গরম জল নীতল করিয়া পান এবং ঐ অবস্থায়ই সহ্য মত স্নান করা বিধেয়।

নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম—কফজনক ও গুরুপাক দ্রব্য, জলাভূমিভাত, মাংস, দধি, অধিক দুগ্ধ, মিষ্ট দ্রব্য, কুম্ভাণ্ড, লাউ, কলায়ের

ডাইল, লঙ্কার ঝাল ও অধিক জলপান, সুরাপান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক মিষ্টা, মৈথুন ও কামস্ত্র এই রোগে বিশেষ অমিষ্টকারক।

মধুমেহিন্ (ত্রি) মধুমেহঃ অন্ত্যন্তোতি ইনি। মধুমেহ-যোগবৃদ্ধ।

মধুযষ্টি (ত্রি) মধু+মধুরা যষ্টিঃ। ইক্ষু। (শব্দচঃ)

মধুযষ্টিকা (ত্রি) মধু+মধুরা যষ্টিঃ ততঃ কন্ টাপ্। যষ্টিমধু; পথ্যায়—মধুক, স্নীতক, যষ্টিমধুকা, মধুযষ্টি। (ভরত)

“যষ্টিাধ্বং মধুকং যষ্টিস্নীতকং মধুযষ্টিকা।

যষ্টিমধুরূপে জাতা জলজাতিরস্যা পুরা॥” (বৈত্তকরত্নাঃ)

মধুযষ্টি (ত্রি) মধুযষ্টিকৃদিকারাদিত পক্ষে জীব্। মধু-যষ্টিকা। (শব্দমালা)

মধুর (পুং) মধু মাধুর্য্যং রাতাতি রা-ক, যধা (মধু মাধুর্য্য-মতাতাতি উষ্মুসিনুক্ষমধো রঃ। পা ৫।২।১০৭) ইতি র। মিরদ। পথ্যায়—গোলা, রসজোঠ, গুলা, স্বাদু, মধুলক। (হেম) ইহার গুণ শ্রীণন, বলকর, বৃংহণ, বায়ুপিত্তনাশক, রসায়ন, গুরু, মিষ্ট, চক্ষুর হিতকর ও তর্পণ। (রাজবঃ)

“মধুরো হি রসঃ শীতো ধাতুতত্ত্ববলপ্রদঃ।

চক্ষুষ্যো বাতপিত্তঃ কুর্ধ্যাৎ হোল্যাকফকৃমীন॥

বালবৃদ্ধকৃতক্ষীণবর্ণকেশেজ্রয়োজসাম্।

প্রশস্তো বৃংহণঃ কঠো গুরুঃ সন্ধানকুমতঃ।

বিষয়ঃ পিচ্ছিলশচাপি মিথঃ স্রীতায়ুষো হিতঃ॥” (ভাবপ্রঃ)

মধুররস শান্তবীৰ্য্য, ধাতুপোষক, শুভ্রদৃঢ়বর্দ্ধক, বলকারক, প্রসন্নতাকারক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, হুলতাকারক, মল-বর্দ্ধক, কৃমিজনক এবং বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ, বর্ণ, কেশ, ইন্দ্রিয় ও জোষাতুর পক্ষে প্রশস্ত, মাংসবর্দ্ধক, গুরু, ভয় ও ক্ষতসন্ধানকারক, বিষদোষনাশক, পিচ্ছিল, মিষ্ট, স্রীতি-জনক ও আগুর হিতকর।

অতিরিক্ত মধুর রস সেবন করিলে অর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্কুদ, কৃমি, হুলতা, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, মেদ, ও কফরোগ উৎপন্ন হয়। মধুর রস প্রায়ই কফকারক, কেবল পুরাতন শালি, যব, মুগ, গোধূম, মধু, চিনি এবং জাজলমাংস কফ-কারক নহে। (ভাবপ্রঃ)

২ জীবক। ৩ রক্তসিগ্রু। ৪ রাজাস্র। ৫ রক্তেক্ষু। ৬ শুড়।

৭ শালি। (রাজনিঃ) ৮ বীজপুরবিশেষ।

“বীজপুরোৎপন্নঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্টী।” (ভারপ্রঃ)

৯ স্কন্ধের সৈনিক ভেদ।

“মধুরঃ সুর্য্যাদ্যন্ত কিরীটী চ মহাবলঃ।”

(ভারত ৯৪৫৩৩)

(ত্রি) ১০ মধুররসবিশিষ্ট, স্বাদু।

“ন ধর্মশাস্ত্রং পঠিতীতি কারণং ন চাপি বেদাধ্যয়নং ছরাস্বনঃ।  
স্বভাব এবাত্ তথাতিরিচাতে যথা প্রকৃত্য। মধুরং গবাং পরঃ॥”  
(হিতোপঃ ১।৭২) ১১ প্রিয়। (মেদিনী)

কবিকল্পলতার মতে পারিভাষিক মধুর-বিদ্যোক্তি, প্রিয়া-  
ধরকুচাদি, শশী, জী ও বালোক্তি। (ক্লী) ১২ বজ।  
(রাজনিং) ১৩ বিষ। (মেদিনী) ১৪ মাধুর্যগুণ।  
১৫ মাধুর্যবৃক্ষ। ১৬ শাস্ত। ১৭ স্রীতিজনক। ১৮ মনোহর।  
১৯ মজ্জর তৃণ। ২০ মাতুলুঙ্গবৃক্ষ। ২১ বাতামবৃক্ষ।  
২২ কাকোলি। ২৩ বস্ত্রবদর। ২৪ মধুকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিং)  
২৫ কাকোলাদিগণ। (চক্রদং স্বরভেদবিং) ২৬ খেত নিম্বা, ব,  
চলিত বরবটী। ২৭ রাজমাংস, মটর। (রাজনিং)

মধুরক (পুং) মধুরসংজ্ঞায়াং কন্। জীবকবৃক্ষ। (অমর)  
মধুর-স্বার্থে ক। মধুরশব্দার্থ।

মধুরকণ্টক (পুং) মধুরঃ কণ্টকো বস্ত্র। মংস্ত্রবিশেষ।  
দ্রিমাং টাপ্। মংস্ত্রবিশেষ। পর্যায়—কজ্জলী, কজ্জলা,  
অনন্তা, মাধ্বী। (শব্দরত্নাং)

মধুরককটী (ক্লী) মধুরবীজপুত্র, চলিত মিষ্টলেবু। রাজনিং

মধুরকুম্মাণ্ড (ক্লী) কুম্মাণ্ডভেদ, ছাচি কুমড়া।

মধুর খর্জুরী (ক্লী) মধুখর্জুরী বৃক্ষ। (রাজনিং)

মধুরগণ (পুং) কাকোলাদিগণোক্ত দশবিধ দ্রব্য। যথা—  
কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুদগপর্ণী, মাংস-  
পর্ণী, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, ও কঁকড়াশুঙ্গী। (সুশ্রুত)

মধুরজম্বীর (পুং) মধুরো জম্বীরঃ নিত্যকর্মধা। জম্বীর-  
বিশেষ, মিঠা জাম্বীর, পর্যায়—মধুজম্বীর, মধুজম্ব, মধুজম্বল,  
রসজাবী, শর্করক, পিত্তজাবী। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, কফ,  
পিত্ত, শোফ ও শ্রমনাশক। (রাজনিং)

মধুরজম্বল (পুং) মধুরজম্বীর বৃক্ষ। (রাজনিং)

মধুরজীবকাদি (পুং) জীবন্তী ও মধুকবৃক্ষ জীবকাদিগণ।  
এই গণ যথা—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, ঋক্তি, বৃদ্ধি,  
কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শূর্ণপর্ণীভয়। (রাজনিং)

মধুরজ্বর (পুং) মধুরনামক জ্বরবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

“জরো দাহো ভ্রমো মোহো হতীসারো বমিস্তথা।

অনিদ্রা চ মুখং রক্তং তালুজিহ্বা চ শুষ্যতি ॥

গ্রীবায়াং পরিদৃশ্যন্তে ফোটকঃ সর্বপোপমাঃ।

স্বতাপশনাং শ্বেদরোধাং মধুরো জারতে নৃণাম্ ॥” (বৈদ্যকনিং)

অতিরিক্ত স্বতভোজন বা শ্বেদরোধ হইলে মানবদিগের  
মধুরনামক জ্বর হয়। ইহাতে দাহ, শ্রম, মোহ, অতীসার,  
বমি, তৃষ্ণা, অনিদ্রা, মুখ রক্তবর্ণ, তালু ও জিহ্বা শুষ্ক,

গ্রীবাদেশে সর্বপের জ্বর ফোটক এই সকল উপজব  
হইয়া থাকে।

মধুর আচার্য্য, পুষ্পাজলিতিকা, ভগবতগুণদর্পণ ও স্কন্দর-  
মণিসম্বর্ড নামক গ্রন্থত্রয়প্রণেতা।

মধুরতা (ক্লী) মধুরতা ভাবঃ তল্-টাপ্। মধুরত্ব, মাধুর্য্য।  
“যদ্যপি তো মধুরতাং ন জহাতি হীকুঃ” (উত্তট)

মধুরত্রয় (ক্লী) মধুরাণাং ত্রয়ম্। মিলিত সমভাগ মধু, যুত  
ও চিনি।

“সিতা মাক্ষিকসর্পীংষি মিলিতানি বদা তদা।

মধুরত্রয়ং.....” (রাজনিং)

মধুরত্রিফলা (ক্লী) মধুরা ত্রিফলা। সমভাগ ত্রাফা, গাভারী ও  
খর্জুর, অর্থাৎ কিস্মিস, গামারফল ও খেজুর এই তিন একত্র।

“ত্রাফাকাম্বাখর্জুরীফলানি মিলিতানি তু।

মধুরা ত্রিফলা জ্ঞেয়া.....” (রাজনিং)

মধুরত্ব (ক্লী) মধুরতা ভাবঃ ত্ব। মধুরতা, মাধুর্য্য।

“ন নিম্ববৃক্ষো মধুরত্বমেতি” (উত্তট)

মধুরত্বচ (পুং) মধুরা ত্বচা যস্য। ধববৃক্ষ, চলিত ধাওয়া গাছ।

মধুরনিম্বন (ত্রি) মধুরো নিম্বনো যস্য। মধুরস্বরযুক্ত।

দ্রিমাং টাপ্। মধুরস্বরযুক্তা নারী। (ত্রিকাং)

মধুরফল (পুং) মধুরং ফলমন্ত। ১ রাজবদর, চলিত নারকুলে

কুলের গাছ। (রাজনিং) ২ তরমুজ (তরমুজ)। (বৈদ্যকনিং)

মধুরফলা (ক্লী) মধুরবীজপুত্রকবৃক্ষ, মিঠালেবু। (রাজনিং)

২ চির্ভটিকা। (বৈদ্যকনিং)

মধুরবিশ্বী (ক্লী) কুন্দুরলতা, চলিত কুন্দরুকা। (বৈদ্যকনিং)

মধুরলতা (ক্লী) বল্লীযষ্টিমধু। (বৈদ্যকনিং)

মধুরবর্ণ (পুং) মধুরাণাং মধুরজব্যাণাং বর্ণঃ সমূহঃ। হৃদ্যাদি-

কুম্মাণ্ডান্ত দ্রব্যগণ, কাকোলাদিগণ, দুগ্ধ, স্নাত, বসা, মজ্জা,

শালিধান্ত, ষাটধান্ত, যব, গোধূম, মাষকলাস, পাণিফল,

কেহুস, সসা, গোমুক, ককটী, অলাব, তরমুজ, কতকফল,

গিলোডা (জম্বীরবিশেষ), পিরাল, পদ্মবীজ, গাভারীফল,

মোল, ত্রাফা, খর্জুর, ক্ষীরই, তাল, নারিকেল, ইন্দুবিকার,

শীতবেড়োলা, শ্বেতবেড়োলা, আলকুণী, ভূমিকুম্মাণ্ড, পরশা,

গোকুরী, মূর্খালতা, মহরি ও কুম্মাণ্ড প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ

মধুরবর্ণ। (সুশ্রুত সূত্রস্থাং ৪২ অং)

মধুরবল্লী (ক্লী) মধুরা বল্লীতি নিত্যকর্মধা। মধুবীজপুত্র।

মধুরবাচ্ (ত্রি) মধুরা বাচ্ বস্ত্র। মিষ্টভাবী, মধুরবাক্যযুক্ত।

মধুরবাতাম, মিষ্ট বাতাম, মিঠা বাতাম। (Dulcis.)

মধুরবীজপুত্র (পুং) মিষ্ট মাতুলঙ্গবৃক্ষ, মিষ্ট লেবুগাছ। (রাজনিং)

মধুরশীল, জটনক প্রাচীন কবি। ২ মহাভারতবর্ণিত জটনক রাজা।

মধুরস (পুং) মধুর্মধুরো রসো যন্ত। ১ ইক্ষু। (শব্দমাং)।  
২ তাল। (রাজনিং)

মধুরসা (স্ত্রী) মধুর্মধুরো রসো যন্তাঃ। মূর্খা।

“তেজনো পিনুনী দেবী তিষ্ঠবন্তী পৃথক্শচ।

মধুশ্রেণী মধুরসা মূর্খা নিদ্রহনৌতি চ ॥” (বৈথকরত্নমাং)

২ ডাক্ষা। ৩ গাস্তারী। (ভাবপ্রং) ৪ হৃদিকা। (মেদিনা)

৫ প্রসারণী। ৬ শতপুষ্পী, চলিত শুল্ফা। (বৈথকনিং)

মধুরস্রবা (স্ত্রী) মধুরস্ত মধুরসস্ত স্রবো যন্তাঃ। পিণ্ড-  
খজ্জুরী। (রাজনিং)

মধুরস্বর (ত্রি) মধুরঃ স্বরো যন্ত। গন্ধরূপ।

মধুরা (স্ত্রী) মধুর-টাপ্। ১ শতপুষ্পা। ২ মিশ্রয়া। ৩ মধুরা-  
নগরী। ৪ মধুককটিকা। ৫ মেদা। ৬ মধুলী। ৭ মধু-  
বটিকা। (মেদিনী) ৮ কাকোলী। ৯ শতাবরী। ১০ বৃহজ্জীবন্তী।

১১ পালঙ্ক্যশাক। (রাজনিং) ১২ মহাশিখা। ১৩ কদলী-  
বৃক্ষ। (পথ্যায়মুং) ১৪ শ্বষভক। ১৫ মহুর। ১৬ মহামেদা।

(বৈথকনিং) ১৭ মধুখজ্জুরাবৃক্ষ। ১৮ মাতুলুঙ্গ। ১৯ বটিমধু।

২০ মধুরিকা। (মেদিনী) ২১ কাঞ্জিক। (ত্রিকাং)

মধুরাকর (পুং) ইক্ষু। (পথ্যায়মুং)

মধুরাকর (ত্রি) মধুরাণি অক্ষরাণি যন্ত। মধুর-অক্ষরযুক্ত  
বাক্য, অমধুর বাক্য। (ক্লী) মধুর এইরূপ অক্ষর।

মধুরাজালুক (ক্লী) মিষ্টরসালুকভেদ, চলিত মোআলু,

ইহার গুণ—শীতল, মধুর, বায়ুকারক, পাকে কটু, কটিকর,  
দাহ ও পিত্তনাশক, শোষ, তৃষ্ণা ও কফনাশক, অগ্নিমান্দ্য,  
মল, স্তম্ভ ও কফকারক। (বৈথকনিং)

মধুরাস্তক, চোলরাজবংশের জটনৈক রাজা। মহারাজ গণ্ড-  
রাদিত্যের পুত্র। [চোলরাজবংশ দেখ]

মধুরান্নক (পুং) মধুরান্নসৌ অন্নশ্চেতি নিত্যকন্ধ্যাং। ততঃ  
স্বার্থে কন্। আত্মাতক। (শব্দচং)

মধুরান্নফল (পুং) মধুরং মিষ্টং আত্মবৎ ফলং যন্ত। রেফল,  
পথ্যায়—আম। পিয়ারুবৃক্ষ। (রত্নমালা)

মধুরান্নরস (পুং) নাগরজবৃক্ষ, নারঙ্গালবুর গাছ। (বৈথকনিং)  
২ মধুর ও অন্নরসযুক্ত।

মধুরালাপা (স্ত্রী) মধুরঃ স্রুতিস্বথকরঃ আলাপঃ শব্দো  
যন্তাঃ। সারিকা। (রাজনিং) (ত্রি) ২ মধুর আলাপযুক্ত।

মধুরালাবুনী (স্ত্রী) অলাবু বাহুলকাৎ নক্, পুবেদরাদিত্যং  
বৃষঃ ভীষ্চ, ততঃ মধুরা চানৌ অলাবুনী চেতি নিত্যকন্ধ্যাং।

রাজালাবু, মিঠালাবু, মিঠা লাউ। (রাজনিং)

মধুরালিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র মংস্ত্রবিশেষ, চলিত মউরলা মাছ।

মধুরাবট (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত জটনৈক রাজা। (রাজতং ৭। ৭৬৭)

মধুরাষ্টক (ক্লী) বসন্তাচার্য্যকৃত কৃষ্ণাষ্টকভেদ।

মধুরিকা (স্ত্রী) মধুর-স্বার্থে কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্ অত ইৎক্ষ।  
ক্ষুপবিশেষ, চলিত মোরী, পথ্যায়—শালের, শাতিশিব, ছত্রা,  
মিশী, মিশ্রয়া, সাগেয়, মিসি, মিসী, মিশি, অবাগুপ্পী,  
মঙ্গল্যা, মধুরা, মধুরী। ইহার গুণ—রোচক, শুক্রকারক,  
দাহ, রক্ত ও পিত্তনাশক। (বাজবং)

মধুরিত (ত্রি) মধুযুক্ত।

মধুরিপু (পুং) মধোরস্বরবিশেষস্ত রিপূর্নামকস্যাং। বিষ্ণু।

“শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দরমোহনমধুরিপুরুষম্।”

(গীতগোবিন্দ ২। ৯)

মধুরিমন্ (পুং) অন্নমেধামতিশয়েন মধুরঃ দৃঢ়াদিহাং ইমনিচ্।  
অতিশয় মধুর।

মধুরুহ (পুং) ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি যুতপৃষ্ঠের পুত্র।

“আত্মা মধুরুহো মেরুপৃষ্ঠঃ সুধামাত্রাজিষ্ঠো লোহিতার্ণো  
বনস্পতিরিতি যুতপৃষ্ঠস্বতাঃ।” (ভাগং ৫। ২০। ২১)

মধুরেণু (পুং) মধুর্মধুরো রেণুরন্ত। ১ কটভীৰুক্ষ। (রাজনিং)  
২ গুরুপুষ্পাটলা। (বৈথকনিং)

মধুরোদক (পুং) মধুরাণি উদকানি যন্ত। জলসমুদ্র। এই  
সমুদ্র স্বাহজলযুক্ত, গুফরদ্বীপবেষ্টিত এবং সপ্তসমুদ্রের শেষ  
সমুদ্র। (জটাত্তর)

মধুরৌষধ (ক্লী) মধুরগণ। (ভাবপ্রকাশ)

মধুল (ক্লী) মধুপুষ্পরসাদিকং লাতি স্বকারণথেন গৃহ্যতীতি-  
লা-ক। ১ মজ। (শব্দচং) স্ত্রিয়াং টাপ্। মধুলা নিবিষী-  
কন্তী মধুবিদ্যা। “অদ্য যোজনং হবিষ্টা মধুলা চকার”  
(শব্দ ১। ১১। ১০) ‘হে বিষ! স্বা স্বাং মধু অমৃতং চকার বিষস্ত  
বিষভাবং দুরেহপনোন্ত অমৃতীচকারেতি এবৈষা মধুলা মধু-  
দাত্তী নিবিষীকন্তী মধুবিদ্যা যদেতদাদিত্যস্ত মণ্ডলে বিষ-  
যোজনং তেন চামৃতীকরণং যদন্তি এষা মধুবিদ্যা’ (সায়ণ)

মধুল, প্রাচীন বিশালরাজ্যের অন্তর্গত স্থানভেদ। (দিশিং)

মধুলী, বিদ্যাপক্সতপার্ষ্ণ্য নগরভেদ। (দিশিং ৪৮। ৫। ১)

মধুলয় (পুং) মধুর্মধুরসো লগ্নোহত্। রক্তশোভাজন। (রত্নমাং)

মধুলতা (স্ত্রী) মধুপ্রধানা লতেতি মধ্যপদলোপিককন্ধ্যাং।

শূলীতৃণ। (রাজনিং)

মধুলিকা (স্ত্রী) মধুল-সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অত ইৎক্ষ।

১ রাজিকা। (রাজনিং) ২ ব্রহ্মাচর মাতৃভেদ।

“পৃথুবজ্জ। মধুলিকা মধুকুস্তা তথৈব চ।” (ভারত ৯। ৪৬। ১২)

৩ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, চলিত মধুলী। ৪ কপিলদাক্ষা।

৫ পুষ্পপরাগ। (বৈথকনিং) ৬ শমীদ্বাভভেদ। (চরক সূত্রং)

মধূলিহ্ (পুং) মধু লেচি আশ্বাদয়তীতি লিহ-কিপ্। ভ্রমর।



মধুলোহন (পুং) মধু লেটীতি মধু-লিহ-গিনি। ভ্রমর।

“দত্তাবধানঃ মধুলেহিগ্নৌ প্রশান্তচেষ্টে হরিণঃ জিঘাংসুঃ।”

(ভট্ট ২।৭)

মধুলোলূপ (পুং) মধুনি লোলূপঃ। ভ্রমর। (রাজনিং)

মধুবচস্ (ত্রি) মধুরভাষী। (ঋক্ ৪।৩।৫)

মধুবটী (স্ত্রী) মহাভারতাক্ত প্রাচীন জনপদভেদ।

মধুবন (ক্ৰী) মধুনা তরান্না দৈত্যেন কৃতং বনং, মধ্যপদলোপি কশ্মণাং। মথুরাং বনুনাতীরবর্তী বনবিশেষ। এইখানে শক্রয় লবণ দৈত্যকে নিহত করিয়া মধুপুরী নির্মাণ করেন।

“ততাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনাস্তটং শুচি।

পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥”

(ভাগবত ৪।৮।৪২) [মথুরা দেখ।]

মধুপ্রধানং বনং। ২ কিস্কিন্দার অদূরবর্তী স্ত্রীবেশ বন-বিশেষ। হনুমান্ প্রভৃতি লক্ষ্য হইতে সীতার সংবাদ লইয়া আসিয়া এই বনে মধুপানপুঙ্ক আমোদ করিয়াছিল।

“বালিনা রক্ষিতং যত্নং ক্ষান্তং মধুবনং মহৎ।

স্ত্রী চ প্রবগশ্রেষ্ঠ তদুত্তমং পবনাস্থজঃ ॥” (রামাং ৩২৮।২৭)

মধৌ বনতি শস্যতে ইতি বন-অচ্। ৩ কোকিল। (শব্দচং)

মধুবন, বারানসী-বিভাগের আজমগড় জেলার অন্তর্গত একটি গাওগ্রাম। এই স্থান খৃষ্টীয় ৬৩১ অব্দে স্থানীয়স্বরপতি হর্ষবদ-নের অধিকারভুক্ত ছিল। [মথুরা দেখ।]

মধুবন (ক্ৰী) প্রমোদোৎথান। যে উপবন বা নিকুঞ্জ মধৌ নায়ক নায়িকা প্রেমালোপ করিয়া থাকেন।

মধুবন, আদিপুরাণবর্ণিত স্থানভেদ। (আদিপু. ১ অং)

মধুবনী, (মধুবাণী) প্রাচীন তৈরভূক্তের অন্তর্গত একটি জন-পদ। এক্ষণে বাক্সালার দরভঙ্গাজেলার একটি উপবিভাগ মধ্যে গণ্য। ভূপরিমাণ ১৩৪২ বর্গ মাইল। মধুবাণী, বেণিপতি, খজৌলী ও ফুলপাড়া থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার একটি নগর ও তহসীলের বিচার সদর। অক্ষাং ২৬° ২১' ২০" উঃ এবং ৮৬° ৭' পূঃ। এখানকার বাজারে বহুবিধ পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে। এখান হইতে নেপালরাজ্যে বাইবার একটি পথ আছে।

মধুবর্ণ (ত্রি) মধুসদৃশরূপ। “স্বতনুফতা মধুবর্ণমর্জতে” (ঋক্ ১।৮।৭২) ‘মধুবর্ণং মধুসদৃশবর্ণং’ (সায়ণ) ২ স্কন্দাম্বচরভেদ।

মধুবল্লী (স্ত্রী) মধুপ্রধানা বল্লী। ১ যষ্টিমধু। ২ ক্রীতনক, কারবেলক।

“তোয়বল্লী রাজবল্লী মধুবল্লী কারবেলকম্।” (বৈজয়ন্তসমালো)

মধুবার (পুং) মধুনো মত্তস্ত বারঃ, সময়ঃ পর্য্যায়ো বা। মধুক্রম, পুনঃ পুনঃ মত্তপানপরিপাটী। অবিশ্রান্ত মত্তপান।

মধুবাহন (পুং) নানাবিধ খাদ্যাদি-বহনে যুক্ত।

“এয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে” (ঋক্ ১।৩৪।২) ‘মধুবাহনে

মধুরদ্রব্য্যাণাং নানাবিধখাদ্যাদীনাং বহনেন যুক্তো’ (সায়ণ)

মধুবাহিন্ (ত্রি) মধু-বহ-গিনি। ১ মিষ্টদ্রব্যবাহী ব্যক্তি। ২ নদীভেদ। (মহাভারত ৬০)

মধুবিদ্যা (স্ত্রী) গুপ্তবিজ্ঞাভেদ।

মধুবিদ্বিস্ (পুং) বিষ্ণু।

মধুবিলা (স্ত্রী) নদীভেদ।

মধুবীজ (পুং) দাড়িম। (রাজনিং)

মধুবাজপূর (পুং) মধুককটিকা। (রাজনিং)

মধুবৃধ্ (ত্রি) মধু-বৃধ-কিপ্। মধুবর্দ্ধক। “বজ্রে স্তম্ভগা মধুবৃধঃ” (ঋক্ ১০।৭৫।৮) ‘মধুবৃধং মধুবর্দ্ধকং’ (সায়ণ)

মধুবৃষ (ত্রি) মধুবর্ষী।

মধুবৈণী, প্রাচীন নদীভেদ। এই নদীতীরে ৯৬০ বিক্রম-সংস্কৃতে মহাসামন্তাধিপতি গুণরাজের সহিত কনৌজরাজ মহেন্দ্রপালের সামন্ত উদভট্টের যুদ্ধ ঘটে।

মধুব্রত (পুং) মধু মধুসংক্রয়ো এতৎ ব্রতমিব সততাস্থশীলনীং বস্যা, যদা মধুব্রতয়তি নিয়তং ভূক্তো ইতি ব্রতি-অণ্। ভ্রমর।

“মালাং মধুব্রতবক্রথাগরোপযুগাং” (ভাগবত ৩।২৮।২৮)

(ত্রি) মধুব্রতং এতৎ কশ্ম যন্ত। ২ উদকাথকশ্ম।

“মধুনো দ্যাংবা পৃথিবী মিমিশ্রতাং মধু শ্চুতা মধুহুথে মধু-এতে” (ঋক্ ৬।৩০।৫) ‘মধুএতে উদকাথকশ্ম্যাণো’ (সায়ণ),

মধুব্রতবোধানিধি, পরমরসিকের ও রামরসিকের নামক হুঁখানি গ্রন্থরচয়িতা।

মধুশকরা (স্ত্রী) মধুজাতা শকরা। মধুজাতশকরা, চালত সিতাখণ্ড, পাটালী।

“মাধ্বী সিতা মধুংপন্নী মধুজা মধুশকরা।

মাধ্বীকশকরা চৈষা ক্ষৌদ্রজা ক্ষৌদ্রশকরা ॥

যদগুণং যন্মধু প্রোক্তং তদগুণা তন্ত শকরা।

বিশেষাঙ্গলবুযা চ তর্পণং ক্ষীণদেহিনাম্ ॥” (রাজনিং)

পর্যায়—মাধ্বী, সিতা, মধুংপন্নী, মধুজা, মাধ্বীকশকরা, ক্ষৌদ্রজা, ক্ষৌদ্রশকরা। মধুর যে গুণ, ইহারও সেই গুণ, বিশেষ ক্ষীণশরীরের পক্ষে বল, বুযা এবং তর্পণকর। ২ শ্বেতনিম্পাব। (রাজনিং)

মধুশাক (পুং) মধুমাধুযুক্তা শাখা যন্ত। মধুজীল, মধুকরুন্ড, মউলগাছ। (শব্দচং) (ত্রি) ২ মধুরশাখাবিশিষ্ট। “মধুশাখঃ স্থপিল্ললঃ” (শুক্লযজুঃ ২৮।২০) ‘মধুরা রসবতী শাখা যন্ত।’ (মহী)

মধুশিগ্রু (পুং) মধুপ্রধানঃ শিগ্রুঃ। রক্তগোভাজন বৃক্ষ, লাল সজিনা গাছ। (জুহুত) ২ শ্বেতশিগ্রু। (রাজনিং)

মধুশিতা (ক্ৰী) শ্বেতনিপাব। (রাজনি°)  
 মধুশিষ্ট (ক্ৰী) মধুশিষ্ট, মোম।  
 মধুশেষ (ক্ৰী) মধুশেষ: শেষো বক্ত। সিদ্ধ, চলিত মোম।  
 মধুশ্চুৎ (ত্রি) মধুশ্চাবী। “মধুশ্চুতং স্বতমিবস্বপুতং” (ঋক্ ৪।৫৭।২) ‘মধুশ্চুতং মধুশ্চাবী’ (সারণ)  
 মধুশ্চাত (ত্রি) মধুশ্চাবী।  
 মধুশ্চী (ক্ৰী) বাসন্তীশোভা। (কুমার° ৩।৩০)  
 মধুশ্ৰেণী (ক্ৰী) মধুনাং মধুররসানাং শ্রেণির্ধ্বজ। মূৰ্দ্ধা।  
 “মূৰ্দ্ধা মধুরসা দেবী যোরটা তেজনী স্তভা।  
 মধুলিকা মধুশ্ৰেণী গোকর্গী পীলুপর্ণ্যপি ॥” (ভাবপ্র°)  
 মধুশ্ৰাসা (ক্ৰী) মধুশ্ৰুতোরো শাসোহস্মাৎ। জীবন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°)  
 মধুযুৎ (ত্রি) ১ মিষ্টবাদী। ২ সোমরস-চৌর্য্যান।  
 মধুজীল (পুং) মধু মকরন্দং জীবতি নিঃক্ষিপতীতি জীব ইণ্ডপ-  
 ধ্বাৎ ক। পুষ্যোদরাদিহাং বস্ত্র লভ্যং। মধুকবুক্ষ, মউল-  
 গাছ। (ভাবপ্র°)  
 মধুসুখ (পুং) মধোর্বসন্তস্ত সখা ইতি (রাজাহঃসখিভাষ্টচ।  
 পা ৫।৪।১১) ইতি টচ। কামদেব। (হলায়ুধ°)  
 মধুসংকাশ (ত্রি) দেখিতে মিষ্ট, সুদর্শন।  
 মধুসংক্রান্তিব্রত (ক্ৰী) ব্রতভেদ। এই ব্রত মহাবিশুব-  
 সংক্রান্তিতে লইতে হয়।  
 মধুসন্দর্শ (ত্রি) দেখিতে সকলের প্রীতিকর। (অথর্ব ১।৩৪।৩)  
 মধুসম্ভব (ক্ৰী) সিদ্ধ, মম। (রাজনি°) জ্বিয়াং টাপ্  
 ২ কপিলদাক্ষা। (বৈদ্যকনি°)  
 মধুসহায় (পুং) কামদেব।  
 মধুসারথি (পুং) মধুর্ষনস্তঃ সারথির্ধ্বজ। কামদেব। (ত্রিকা°)  
 মধুসিকুথক (পুং) সিকুতীতি সিচে: থক্, স্বার্থে কন্, মধু  
 মধুসং সিকুথকং যন্ত। ১ স্থাবর বিষভেদ। (হেম) ২ মধুশিষ্ট,  
 মোম। (ভাবপ্র°)  
 মধুসু(শু)ক্ৰ (ক্ৰী) পিপ্লীমূল ও জ্বীররসকৃত সন্ধানবিশেষ।  
 “জ্বীররস ফলরসং পিপ্লীমূলসংযুতম্।  
 মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধাত্তরশৌ নিধাপয়েৎ।  
 ত্র্যহেণ তজ্জাতরসং মধুসুক্রমুদাহৃতম্ ॥” (শাক্ধরস°)  
 জ্বীরফলের রস এবং পিপ্লীমূল একত্র মধুভাণ্ডে  
 করিয়া ধাত্তরশির মধ্যে রাখিতে হইবে, তিন দিন পরে  
 ঐ ভাণ্ড বাহির করিয়া যে রস হয়, তাহা মধুসুক্র নামে  
 অভিহিত।  
 মধুসুহৃদ (পুং) মধোর্বসন্তস্ত সুহৃদ। কামদেব।  
 মধুসূক্ত (ক্ৰী) বৈদিকসূক্তভেদ। ‘মধুবাভা ঋতায়ত’ ইত্যাদি  
 বৈদিক মন্ত্রকে মধুসূক্ত কহে।

মধুসূদন (পুং) মধু পুন্দরসং হৃদয়তি ভক্ষয়তীতি হৃদ-গিচ-  
 ল্য। ১ ভ্রমর। (জটোথর) মধুঃ তন্মানামঃ অম্বরঃ হৃদয়তি  
 নাশয়তীতি। ২ শ্রীকৃষ্ণ।  
 “বনেষু কৃষা সুরতিপ্রচারঃ প্রকাষীমুখো মধুবাসরেষু।  
 গায়ন্ কলং ক্রীড়তি পদ্মিনীষু মধুনি পীষা মধুহৃদনোহসৌ ॥”  
 (ছন্দোম° ১।১।৩)  
 এই শ্লোকে মধুহৃদন পদটি শ্লিষ্ট, ভ্রমর ও শ্রীকৃষ্ণ এই  
 উভয় অর্থই বুঝাইয়াছে।  
 মধুহৃদনশব্দের ব্যুৎপত্তি—  
 “হৃদনং মধুদৈত্যস্ত বশ্যাং স মধুহৃদনঃ।  
 ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদৈর্ভিন্নার্থমীপ্সিতম্ ॥  
 মধুক্ৰীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্ম শুভাশুভে।  
 ভক্তানাং কর্ম্মণ্যাকৈব হৃদনং মধুহৃদনঃ ॥  
 পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।  
 করোতি হৃদনং যো হি স এব মধুহৃদনঃ ॥”  
 (ব্রহ্মবৈবর্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১।১০ অ°)  
 ভগবান্ বিষ্ণু মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এই জন্ত  
 তিনি মধুহৃদন নামে খ্যাত। যিনি ভক্তদিগের কৃত শুভাশুভ-  
 কর্ম্মের নাশ করেন, তিনি মধুহৃদন। ভ্রান্তদিগের পরিণামে  
 যে অশুভ কর্ম্ম তাহার নাম মধু, এই অশুভকর্ম্মরূপ মধুকে  
 নাশ করেন বলিয়া তাঁহাকে মধুহৃদন কহে।  
 যে ব্যক্তি মহাবিপদে পড়িয়া মধুহৃদননাম স্মরণ করেন,  
 তাঁহার বিপত্তি দূর এবং সম্পদ লাভ হইয়া থাকে।  
 “মহাবিপত্তৌ সংসারে যঃ স্মরন্মধুহৃদনম্।  
 বিপত্তৌ তস্ত সম্পত্তির্ভবেদিত্যাহ শঙ্করঃ ॥”  
 (ব্রহ্মবৈবর্তপু° প্রকৃতিখণ্ড ৩৪ অ°)  
 বিপদে পড়িলে সকলেরই মধুহৃদন নাম স্মরণ করা উচিত,  
 তাহা হইলে সকল বিপদ দূরে যায়।  
 মধুসূদন, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ১ উপসর্গবিচার-  
 টীকা, চিত্ররূপবাদটীকা, তর্কহৃত-ভাষ্যটীকা, নিগ্রহস্থানহৃত-  
 টীকা ও প্রতিজ্ঞাসূত্রটীকাপ্রণেতা। ২ চন্দ্রোদয়ীলনতত্ত্বরচ-  
 য়িতা। ৩ জ্যোতিঃপ্রদীপাঙ্কুরপ্রণেতা। ৪ নীতিসারসংগ্রহ-  
 রচনাকর্তা। ৫ লঘুগ্রহমঞ্জরী-সঙ্কলয়িতা। ৬ শ্রাদ্ধদর্পণপ্রণেতা।  
 ৭ মঞ্জুভাষিণী নামী বিশ্বভূষণটীকাপ্রণেতা। বালকৃষ্ণের  
 ছাত্র গোকুলনিবাসী নরসিংহের পৌত্র ও মাধবের পুত্র।  
 ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।  
 মধুসূদন, গোয়ালিয়রের অনৈক রাজা। ভুবনপালের পুত্র।  
 মহীপালের পর তিনি সিংহাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। ১১৬১  
 সংবতে উৎকীর্ণ তাঁহার শিলালিপি পাওয়া যায়।

মধুসূদনগোস্থামিনু, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ব্রজরাজ গোস্থামীর পুত্র। ইনি মহারাজ রণজিৎ সিংহের দানের অধ্যক্ষ ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ ও দেবীদত্ত প্রসাদ নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দেবীদত্তের মৃত্যু হয়। মধুসূদন স্বীয় জীবৎকালে গোদানবিধিসংগ্রহ, জীবৎপিতৃক-বিভাগব্যবস্থা, জীবৎপিতৃকবিভাগ-ব্যবস্থাসার, তড়াগাদি-প্রতিষ্ঠাবিধি, নির্ণয়সংগ্রহ, পঞ্চকশাস্তিবিধি, মহাপ্রভা নামে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা, মিতাক্ষরাসার, মূলশাস্তিবিধি, বৃষোৎ-সর্গবিধি, ব্যবহারসারোদ্ধার, ব্যবহারার্থসার ও সপ্রসাদরাধা-কৃষ্ণপ্রতিষ্ঠাবিধি নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মধুসূদনঠাকুর, তব্ধিষ্টামণ্যালোককণ্টকোদ্ধার, বৈতনির্ণয় বা বৈতনির্ণয়প্রকাশ ও সময়প্রদীপজ্যোদ্ধার প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা।

মধুসূদনদত্ত, বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ কবি।

[ মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেখ ]

মধুসূদনদীক্ষিত, স্বত্বিরত্নাবলীপ্রণেতা। ইনি মহেশ্বর দীক্ষি-তের পুত্র।

মধুসূদনজুজন্তী, অস্ত্রাপদেশশতকপ্রণেতা।

মধুসূদন নাপিত, নাপিত জাতীয় একজন বাঙ্গালী কবি।

ইনি ‘নলদময়ন্তা’ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই গ্রন্থে কবি আপনার পরিচয় দিয়াছেন,—

“ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উদ্ভব।

যাহার কবিত্ব কীর্তি লোকেতে সম্ভব ॥

তাহার তনয় বাণীনাথ মহাশয়।

পৃথিবী ভরিয়া যার কীর্তির বিজয় ॥

তাহান তনয় শিষ্য শ্রীমধুসূদন।

শুনিয়া প্রভুর কীর্তি উন্নাসিত মন ॥”

উক্ত পরিচয় হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কবির পিতামহও একজন কবি ছিলেন।

মধুসূদনপণ্ডিত, আয্যশতকপ্রণেতা।

মধুসূদনবাচস্পতি, অবৈতমঙ্গল, অশৌচসংক্ষেপ ও মধু-মতী নাম্নী যুগব্যোমটীকারচয়িতা।

মধুসূদন সরস্বতী, বঙ্গদেশীয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। কাশ্যপগোত্রীয় পুরন্দরাচার্যের তৃতীয় পুত্র। ইনি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। একদিন তাঁহার মহাম ভ্রাতা যাদবের সঙ্গে মধুসূদন বাক্লা গমন করেন, তথায় বাক্লাধিপতি মধুসূদনের কাব্য সকল শুনিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করেন, এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন,—আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, স্থান ভিন্ন

আপন আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি আপ-নাকে তাহাই দিব।

মধুসূদন নৃপতি কর্তৃক সংকৃত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, মামুষের প্রশংসা নিষ্ফল, অতএব আমি ভগবদারা-ধনায় জীবন অতিবাহিত করিব। এইরূপ স্থির করিয়া শঙ্ক-রের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রথমে কাশীপুরে যাত্রা করিলেন; পথে মধুমতী নামে নদী ছিল। মধুসূদন এই নদীতীরে গমন করিয়া তাহার উপাসনা করেন। পরে নদী মৃতিমতী হইয়া মধুসূদনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বর দিলেন। এইরূপ প্রবাদে অত্য়পিও তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণ নদীবক্ষে নিভীকচিত্তে যাতায়াত করিতেছেন।

মধুসূদন ২০ বৎসরের সময় বারানসীপুরী গমন করিয়া তথায় বিখ্যাত সরস্বতী নামক এক দণ্ডীর নিকট হইতে দণ্ডগ্রহণ করেন। বিখ্যাত ভিন্ন শ্রীধরসরস্বতীর নিকটও তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দণ্ডগ্রহণের পর শ্রীক্ষেত্রের সমীপে নদীতীরস্থ কোন বনে ১৭ বৎসর তপস্তা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান কালে উৎকলে অজন্মাহেতু দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। উৎকল-পতি মুকুন্দদেব দৈব শাস্তির জন্ত শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন। এখানে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার দেখা সাফাৎ হইল। রাজার স্তবে ও সংকারে মুগ্ধ হইয়া মধুসূদন শস্য বৃদ্ধি হইবে বলিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করেন। তাহার আশীর্বাদ সফল হইয়াছিল।

দিল্লীস্থর মধুসূদনের পাণ্ডিত্য ও প্রভাবের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। বীরসিংহ নামে এক রাজার পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি একদিন স্বপ্নে জানিলেন যে, মধুসূদন নামে এক যতি আছেন, তাঁহার সেবা করিলে নিশ্চয়ই পুত্র হইবে। তদনুসারে রাজা মধু-সূদনের অধেষণে বাহির হইলেন। সে সময়ে মধুসূদন এক নদীতীরে মুক্তিকা মধ্যে ধ্যানস্থ ছিলেন। ঘটনাক্রমে রাজা সদলে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হন। শিবিরের শুভ-রোপণার্থ মুক্তিকা খননকালে সকলে মধুসূদনকে দেখিতে পাইল। রাজাও নিশ্চয় করিলেন যে, “ইনিই মধুসূদন।” তথায় রাজা মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইলেন এবং মধুসূদনের সেবার জন্ত লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই ঘটনার তৃতীয় বর্ষে মধুসূদন নেত্র উন্মীলন করিলেন। অনেকের তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতা দৃষ্টে বিস্মিত হইল। মধুসূদন রাজ-ভোগ ও রাজদত্ত মন্দির পরিত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন।

কোন সময়ে পরিব্রাজক মধুসূদন দ্বারবন্ধাধিপের পণ্ডিত-সভায় আগমন করেন। মধুসূদনের সর্লশাস্ত্রপারদর্শিতা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হয়। তাহাতে দ্বারবন্ধাধিপ হস্তচালনা দ্বারা নিম্নলিখিত শ্লোকটা পাইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে সর্লত্র প্রবাদ প্রচলিত আছে,—

“মধুসূদনসরস্বত্যা: পারং বেতি সরস্বতী।

পারং বেতি সরস্বত্যা: মধুসূদনসরস্বতী॥”

পরিব্রাজক মধুসূদন বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার সর্লশাস্ত্রপারদর্শিতার যথার্থ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহার বিরচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়—

অবৈতএকমিদ্ধি, অদ্বৈতরত্নলক্ষণ, আত্মবোধটীকা, আনন্দ-মন্দাকিনী, ঋগ্বেদজটাদ্যষ্টবিধকৃতবিবরণ, কৃষ্ণকুতূহলনাটক, এতানভেদ, ভক্তিসামান্যনিরূপণ, ভগবদগীতাগূঢ়ার্থদীপিকা, ভগবদ্ভক্তিরসায়ন, ভাগবতপুরাণপ্রথমশ্লোকব্যাখ্যা, মহিমন্তোত্র-টীকা, যজুর্বেদভাষ্য, রাজপ্রতিবোধ, বেদস্তুতিটীকা, বেদান্ত-কল্পলতিকা, শাণ্ডিল্যস্মৃতিটীকা, শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশটীকা, সংক্ষেপ-শারীরকসারসংগ্রহ, সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দু, হরিলীলাব্যাখ্যা।

মধুসূদনী (স্ত্রী) মধুসূদনতীতি মধুসূদ-পিচ্-ল্যা, স্ত্রিয়াং ভীপ্।  
পালঙ্ক্যশাক। চলিত পালঙ্ক্যশাক। (হেম)

মধুসেন (পুং) মধুপুরের জনৈক রাজা।

মধুসুন্দ (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

মধুস্থান (স্ত্রী) মধুচক্র। মোচাক।

মধুসুন্দ (পুং) ১ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। ২ মধুক্ষরণ।

মধুস্র (পুং) মধুনাং মকরন্দানাং স্রবঃ ক্ষরণং যস্যাদিত।  
মধুকবুক্ষ। ২ মোরটলতা, চলিত ক্ষীর কড়ার। ৩ পিণ্ডী-  
থেছুরগাছ।

মধুস্রবস্ (পুং) মধুনি স্রবতি নিঃক্ষিপতীতি স্র কর্তরি  
অস্রন্।\* মধুকবুক্ষ। (জটধর)

মধুস্রবা (স্ত্রী) মধুস্রব-টাপ্। ১ মধুবৃষ্টিকা, বাষ্টিমধু। ২ জীবন্তী।  
৩ রক্ত লক্ষ্মালুকা। (বৈদ্যকনিং) ৪ মূল্য। ৫ ক্ষীরমূল্য।  
৬ হংসপদা, চলিত গোয়ালিয়া লতা। (রত্নমালা)

মধুস্রাব (পুং) ১ মোরটলতা। (রাজনিং) ২ মধুকবুক্ষ।

মধুস্রর (পুং) মধুর্মনোহরঃ স্ররো যন্ত। কোকিল। (শব্দরত্নাং)

মধুহনু (পুং) মধুং তরানমানমস্রং হস্তাতি হন কিপ্। বিষ্ণু।  
(হেম) (ত্রি) ২ মধুনাশক।

“সরস্বতাং সংহতৈরেব হর্ললৈলবানপি।

অমিত্রং শক্যতে হস্তং মধুহা ভ্রমরৈরিব॥” (ভারত ৩৩৩৬৮)

৩ প্রসহজাতীয় পক্ষিভেদ। (চরক স্তত্রহাং ২৭ অং)

মধুহস্ত (পুং) মধুদৈত্যহস্তা বিষ্ণু।

মধুক (পুং) মহতীতি মহ (উল্কাদয়শ্চ। উণ্ ৬৪১) ইতি  
উক-নিপাতিতশ্চ বৃক্ষবিশেষ, চলিত মউলগাছ। (Bassia  
latifolia) হিন্দী—মহুয়া, বনমহুয়া, তামিল—কট-ইল্লাবি,  
তৈলঙ্গ—পিন্না, বঙ্গে—মোহা। পর্যায়—গুড়পুস্প, মধুক্রম,  
বানপ্রস্থ, মধুজীল, মধুক, মধু, মধুপুস্প, মধুস্রব, মধুবৃক্ষ,  
রোধপুস্প, মাধব। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, পিত্তদাহ ও  
শ্রমনাশক, বাতবর্দ্ধক, বীৰ্য ও পুষ্টিবর্দ্ধক। ইহার পুষ্পগুণ—  
মধুর, হৃদ্য, হিম, পিত্তবিদাহকারক। ইহার ফলগুণ—বাতা-  
ময় ও পিত্তনাশক। (রাজনিং)

ভাবপ্রকাশমতে মধুর, শীতল, গুরু, বৃংহণ, বল-গুরুকর,  
ও বাতপিত্তনাশক। ইহার ফল শীতল, গুরু, স্বাদু, শুক্রবর্দ্ধক,  
বাতপিত্তনাশক, অরুচি, তৃষ্ণা, অস্র, দাহ, শ্বাস, ক্ষত ও  
ক্ষয়নাশক। (ভাবপ্রং)

ইহার তৈলগুণ গাভারাতৈলের ত্রায়, অহৃদ্য, তর্পণ  
এবং বৃংহণ। ইহার ত্বকুগুণ—রক্তপিত্তর এবং ত্রণের  
শোধন ও রোগণকর। (রাজবং) (স্ত্রী) ২ যষ্টিমধু। (রাজনিং)

মধুকপর্ণসাহস্রী (স্ত্রী) তুলসীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিং)

মধুকপর্ণা (স্ত্রী) অথঠা, চলিত আমড়া গাছ। (বৈদ্যকনিং)

মধুকফাগিত (স্ত্রী) মধুক পুষ্পোপ শকরা, মউলফুলের চিনি।  
গুণ—রুক্ষ, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক, ও বাস্তবোধকর।

(সুশ্রুত স্তত্রহাং ৪৫ অং)

মধুকশর্করা (স্ত্রী) মধুকস্য শকরা। মউলফুলের চিনি।

মধুকসার (পুং) মধুকরস, মউলের সার আটা।

মধুচ্ছিষ্ট (স্ত্রী) মধুনঃ উচ্ছিষ্টমবশিষ্টং। (Cera, Alia,  
wax-) মধুর অবশিষ্ট, চলিত মম, হিন্দী মম, তৈলঙ্গ মৈনম,  
তামিল মধুক্ষু। পর্যায়—সিক্তক, শিক্তক, শিক্ত।  
(শব্দরত্নাং) গুণ—ক্ষতরোগে শিথ ও হিতকর।

মধুথ (স্ত্রী) মধু-উৎ-স্থা-ক। মধুচ্ছিষ্ট, মম।

মধুথিত (স্ত্রী) মধুনঃ উথিঃ। শিক্ত, মম। (রাজনিং)

মধুৎপন্ন (স্ত্রী) মধুকৃত শকরা। (রাজনিং)

মধুৎসব (পুং) মধোৎসবত্যা উৎসবো যত্র। চৈত্রী পুণিমা।

“কক্ষুকা। (প্রবিশ্রু সক্রোধং) মা তাবদনাত্তজ্ঞে! দেবেস  
প্রতিবিদ্ধেহপি মধুৎসবে চূতকলিকাতঙ্গমারভসো”

(শকুন্তলা ৬ অং) ২ বসন্তোৎসব।

মধুদক (স্ত্রী) মধুমিশ্রিতং উদকং। জল মিশান মধু।

“স্বরা ক্রশানাং স্থলানামহুপানমধুদকম্।” (সুশ্রুত)

মধুদ্যান (স্ত্রী) বাসস্তিক উদ্যান।

মধুপত্র (স্ত্রী) মধোপ্তম্যো দৈত্যস্য উপত্র আশ্রয়ঃ অভি-  
ধানাং স্ত্রীবহঃ। মথুরা। (হেম) (পুং) মথুরা। (জটধর)

মধূল (পুং) মধু-উরতি প্রাপ্তোতি মধু-উর-গতো ক, রস্যা লব্ধঃ। জলজ ও গিরিজ মধুকবুক্ষ, চলিত জলমহরা, গিরিমহরা। (জটধর)

মধূলক (পুং) মধূল-স্বার্থে কন্। জলজ মধুকবুক্ষ। পর্যায়—দীর্ঘপত্রক, গোরশাক, মধূল, স্বল্পপত্রক। (রত্নমালা) স্থলজ মধুকবুক্ষ। (ক্লী) ২ মদ্য।

মধূলিকা (স্ত্রী) মধূল-কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্ৰক। ১ মূলা। ২ ষষ্টিমধু। ৩ জলবস্ত্র। (ভাবপ্র০) ৪ কুখাত্তভেদ। ৫ স্বল্পগোধূম। ৬ মধ্যদেশজ গোধূম। ৭ স্বল্প গোধূমোথসূরা। ৮ মক্ষিকাবিশেষ, ইহার দংশনে স্বয়ম্, অগ্নিস্পর্শের ত্রায় দাহ ও শোক এই সকল উপদ্রব হয়। সূক্ষ্মত কল্পসং ৮ অ০) ৯ মর্কটহস্তিত্ব, চলিত মাকড়হাতা। (চন্দ্রদ.)

মধূলী (স্ত্রী) মধূল-গোরাদিহাং ঙীষ্। ১ ক্লীতনক। ২ মধুককটী। ৩ আত্র। (রাজনি০) ৪ জলজ মধুষ্টি। ৫ মধ্যদেশজ গোধূম। (ভাবপ্র০)

মধুবক (ক্লা) মধুচ্ছিষ্ট, মন্। (বৈদ্যকনি০)

মধ্য (ক্লী) মথতে ইতি-মন্ (অগ্নাদয়শ্চ। উণ্ ৪:১১১) ইতি বক্ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ১ সংখ্যাবিশেষ, দশান্ত্য সংখ্যা, শতসাগর সংখ্যা। (হেম)

“মধ্যকৈব পরাক্ষিপ সপরাধাত পণ্যাতাম্।” (ভারত ২৬১১৪)

২ অবসান, পর্যায়—বিরাম। (ত্রিকা০) ৩ মন্দ ও শীঘ্র-গতি ভিন্ন নৃত্যবিষয়ক গমনবিশেষ। (ভরত) ৪ লয়-বিশেষ। ৫ মধ্যমাবৃন্তি।

“বিলম্বিতং ক্রতং মধ্যং তত্তমোঘো ঘনং ক্রমাৎ” (অমর)  
(পুং) ৬ দেহমধ্যভাগ, চলিত মাজা, পর্যায়—মধ্যম, অবলয়, বিলয়। (মেদিনী) ৭ মধ্যভাগমাত্র।

“নেক্ষেতোত্তমাদিত্যং নাস্তং যাস্তং কদাচন।

নোপস্থঃ ন বারিহং ন মধ্যং নভসো গতম্ ॥” (মহু ৪৩৭)

৮ আবুকালের মধ্যমাবস্থা বিশেষ। সূক্ষ্মতের নতে, ১৬ বৎসরের পর ৭০ বৎসর পর্যন্ত মধ্যকাল। “ষোড়শমস্ত্যোরন্তরে মধ্যং বয়স্তস্ত বিকল্পো বৃদ্ধিযৌবনং” (সূক্ষ্মত সূত্রসং ৩৫ অঃ)

৯ গ্রহক্ষুটসাধক অক্ষবিশেষ। গ্রহদিগের ক্ষুট স্থির করিতে হইলে পীত্ব ও মধ্য আনয়ন করিয়া পরে ক্ষুট নির্ণয় করিতে হয়। [ক্ষুট দেখ] (ত্রি) ১০ উপপুত্র, ত্রাধ্য। ১১ অন্তর। ১২ অধম। (শঙ্করভা০) ১৩ পশ্চিম দিক্। ১৪ মধ্যম।

“উত্তমাদমমধ্যানি বৃদ্ধা কায্যানি পার্থিবঃ।

উত্তমাদমমধ্যানু পুরুষেষু নিবোজয়েৎ ॥” (মংস্তপু০ ৮২ অঃ)

মধ্যকুরু (পুং) জনপদভেদ।

মধ্যক্ষমা (স্ত্রী) ১ ক্ষাপকটীতটালিনী স্ত্রী। ২ ছন্দোভেদ।

মধ্যখণ্ড (ক্লা) সূর্য প্রতিবর্ষে আষাঢ়মাসের শেষে গগন-মণ্ডলের উত্তরদিকে যে কাল পর্যন্ত গমন করেন, সেই সীমার নাম উত্তরক্রান্তি এবং উত্তরক্রান্তি হইতে যে পর্যন্ত দক্ষিণ-দিকে গমন করেন, তাহার নাম দক্ষিণক্রান্তি। এই দুই গতির অপর নাম দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। এই দুইটা সীমা বা রেখার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয়, তাহার নাম মধ্যখণ্ড। এই মধ্যখণ্ডে ১২ রাশি ও তাহার অংগত ১০১৬টা নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গগনমণ্ডলে মধ্যখণ্ডের উত্তরে যে অংশ, তাহাকে উত্তরখণ্ড কহে। যুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহার মধ্যে ৩৫ রাশি ও তদন্তর্গত ১৪৫৬ নক্ষত্র এবং দক্ষিণ দিকে যে খণ্ড, তাহার নাম উত্তর খণ্ড। ইহার মধ্যে ৪৬ রাশি ও তদন্তর্গত ২২৫টি নক্ষত্র অবস্থিত। প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ ঐ মধ্যখণ্ডে অবস্থিত যে সকল অচল নক্ষত্রসমূহ আছে, তাহা-দিগের কতকগুলির এক একটা আকৃতি কল্পনাপূরক দ্বাদশ-ভাগে বিভাগ করিয়া রাশিচক্রের নাম ও সামা নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ দ্বাদশটা রাশির নাম মেঘ, বুধ, মিতুন, ককট, সিংহ, কক্সা, তুলা, বাশ্চক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মান। মেঘরাশির প্রথমার্শেই ক্রান্তিপাত হয়, যে দুইদিন সূর্য ঐ রেখার থাকেন, সেই দুইদিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়। বিষুবরেখার উত্তরদিকে ৬টা রাশি অর্থাৎ মেঘ, বুধ, মিতুন, ককট, সিংহ ও কক্সা এবং দক্ষিণদিকে আর ৬টা রাশি অর্থাৎ তুলা, বাশ্চক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মান।

[পৃথিবী দেখ।]

মধ্যগত (ত্রি) মধ্যং গতঃ। মধ্যাহ্নে, মধ্যম।

“ভোগযোগেন মালিখং নেতুং মধ্যগতোহাপ সঃ।

ন শক্যতে অ পকেন প্রতিমেন্দ্রিবামলঃ ॥” (রাজতরং ১২৭২)

মধ্যগন্ধ (পুং) মধ্যে ফলাভ্যন্তরে গন্ধোহস্ত। আত্মবুক্ষ। (শঙ্কর)

মধ্যচারিণ্ (ত্রি) মধ্য-চর-ণিনি। মধ্যস্থলে বিচরণকারী।

মধ্যজিহ্বা (ক্লী) জিহ্বার মধ্যস্থান।

মধ্যজ্যা (স্ত্রী) বিষুবরেখাহ জ্যাভেদ।

মধ্যতস্ (অব্য০) মধ্য-তসিল্। মধ্য হইতে অথবা মধ্যে।

মধ্যতা (স্ত্রী) মধ্য-ভাবে-তল্ টাপ্। মধ্যস্থ, মধ্যের ভাব বা ধর্ম।

মধ্যতাপিনী (স্ত্রী) উপনিষদভেদ।

মধ্যদিন (ক্লী) মধ্যাহ্ন, দিবসের মধ্যভাগ।

মধ্যদেশ (পুং) মধ্যচ্চাগৌ দেশশ্চেতি। দেশবিশেষ। পর্যায়—মধ্যম।

“হিমবন্ধিক্যায়োর্মধ্যং যঃ প্রাক্ বিনশনাদপি।

প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥” (মহু ২২১)

প্রাণের পশ্চিমস্থিত দেশ, এই দেশের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিক্রাপর্কত, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র এবং পূর্বে প্রাণ।

মধ্যদেশভা ( দ্বী ) রক্তকশালি, শালিখাতবিশেষ । (রাজনিং)  
মধ্যদেশ্য ( ত্রি ) মধ্যদেশে ভবঃ যৎ, মধ্যদেশোক্তব। মধ্য-  
দেশজাত ।

মধ্যদেহ ( পুং ) দেহের মধ্য, উদর ।

মধ্যনিহিত ( ত্রি ) মধ্যস্থানে স্থাপিত বা রক্ষিত ।

মধ্যন্দিন ( পুং ) দিনস্ত মধ্যং রাজদস্তাদিত্যং মধ্যশস্য পূর্ক-  
নিপাতঃ, পুষ্পদরাদিত্যং নকারাগমঃ, মধ্যন্দিনং পুশ্পবিকা-  
শকদেনাত্যাতীতি অচ্। বন্ধুবন্ধু । ( রাজনিং ) ( ক্রী )  
২ মধ্যাক্ষ ।

“মধ্যন্দিনেহর্করাতে চ শ্রাঙ্কং ভুক্ত্বা চ সামিষম্ ॥” (মহু ৪।৩৩)

মধ্যন্দিনীয় ( ত্রি ) মধ্যাক্ষ সম্বন্ধীয় ।

মধ্যপঞ্চমূলক ( ক্রী ) মধ্যং মধ্যমং পঞ্চমূলকম্। পঞ্চমূল  
পাচনবিশেষ ।

“বলাপুনর্নবৈব গুণপূর্ণপণী দ্বয়েন তু ।

একত্র যোজিতে নৈব শ্রামধ্যং পঞ্চমূলকম্ ॥” (রাজনিং )

বলা, পুনর্নবা, এরণ্ড, শূর্ণপদীদ্বয় অর্থাৎ শালপণী ও পুশ্চি-  
পণী একত্র যোগ করিলে এই পাচন হয় ।

মধ্যপদলোপিন্ ( পুং ) মধ্যপদস্ত লোপোহন্ত্যস্ত ইনি ।  
বাক্যরূপপ্রসিক্ত শাকপার্থিবাদিক মধ্যপদলোপযুক্ত সমাস-  
ভেদ । সমাসবাক্যের মধ্যস্থিত পদের লোপ হয়, এই জন্ত  
উহার নাম মধ্যপদলোপী । কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে  
মধ্যপদ লোপ হয় ।

মধ্যপতিত ( ত্রি ) মধ্যভাগে পতিত, অবস্থিত ।

মধ্যপাক ( পুং ) তৈলাদির নাতিমুহু খরপাকবিশেষ । (চক্রদং)

মধ্যপাত ( পুং ) ১ মধ্যভাগে পতন । ২ আলাপ পরিচয়, সম্বন্ধ ।  
৩ জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত পাতভেদ ।

মধ্যপুষ্প ( পুং ) জলবেতস ।

মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটা ভূমিভাগ । জনৈক  
চিফ্‌কমিসনরের কতৃৎস্থানে শাসিত । অক্ষাং ১৭°৫০'  
হইতে ২৪°২৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° হইতে ৮৫°১৫' পূঃ মধ্য ।  
প্রাচীন গোণ্ডবানা রাজ্য এবং মালব ও হিন্দুস্থানের কত-  
কাংশ লইয়া এই প্রদেশ গঠিত । ইহা উত্তর সীমায় বৃন্দেল-  
খণ্ড হইতে দক্ষিণে মাজ্জাজ-প্রসিডেন্সী এবং পূর্ববঙ্গ-সীমান্ত  
হইতে পশ্চিমে মালব ও দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত । ভূগরি-  
মাণ উত্তর-দক্ষিণে ৫০০ মাইল ও পূর্বপশ্চিমে প্রায় ৬০০  
মাইল । সর্বমুহু ১১৩২৭২ বর্গ মাইল । লোকসংখ্যা ১  
কোটি ১৫ লক্ষেরও অধিক ।

ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য সকল স্থানে একরূপ নহে । উত্ত-  
রাংশে বিদ্যা-অধিত্যকা হইতে নির্গত শ্রোতঃসমূহ উত্তরাভিমুখে  
গিয়া গঙ্গার প্রান্তভাগে বিস্তৃত হইয়াছে । এষ্ট অংশই বিদ্যা-  
স্তর, এই স্তর মধ্যে আয়েয় প্রস্তর নিহিত । সাগর ও দামো  
জেলার দক্ষিণে নন্দদার উপত্যকায় মণ্ডলা, ভবলপুর, নর-  
সিংহপুর, হোসঙ্গাবাদ ও নিমারের কতকাংশ অবস্থিত এবং  
নিমারের বাকী অংশ তান্ত্রী উপত্যকায় অবস্থিত । এই  
অংশে নরম মাটির স্তর ও দক্ষিণাংশে অতি প্রাচীন  
পাহাড়ের ছোট ছোট চাপ দেখা যায় । তাহারও দক্ষিণে  
বেতুল, ছিন্দবাড়া, সেওনি, ও বালাঘাট অঞ্চলে সাতপুরার  
অধিত্যকায় দানাদার ও বালুপাথরের জমি দৃষ্ট হয় । শেবোক্ত  
জেলার মধ্য অধিত্যকা প্রায় ২০০০ ফিট উচ্চ হইবে ।  
তাহারও দক্ষিণে বরধা ও বেণগঙ্গার উপত্যকায় অবস্থিত  
নাগপুরের সমতল ক্ষেত্র, ইহার মধ্যে নাগপুর, বরধা, ভাণ্ডারা  
ও চন্দা জেলা অবস্থিত । ঘাটসমূহের নিম্নে ছত্রিশগড়ের সম-  
তল ক্ষেত্র, ইহার মধ্যে রায়পুর ও বিলাসপুর জেলা । এই  
বিভাগে জঙ্গল ও সাহুমর সবলপুর জেলাও অবস্থিত ।  
সম্মুখের দক্ষিণে চন্দা জেলার সংলগ্ন বনভূমি ও অসভ্য-  
জাতির নিবাস অন্ধ্রবাসীরা রাজ্যসমূহ ।

এখানকার সাতপুরা শৈলমালার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি-  
সুন্দর ও চিত্রাকর্ষক । কোথাও সমুদ্রত শৈলমালা, কোথাও  
সুজলা সুফণা নদাপ্রবাহসঙ্কুণা উল্লসিত ভূমি । বউলমালা-  
পাথরের অধিত্যকা মধ্যো ও এখানে হিমু ও অহিফেন-ক্ষেত্র  
দেখিতে পাওয়া যায় । সমুদ্র অমরকণ্টকের জলপ্রপাতমালা  
হইতে নন্দদা বাহির হওয়া মন্ডরপ্রস্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত  
হইয়াছে । বরধা, বেণগঙ্গা ও গোদাবরী নিম্নতর যেন উত্তাল-  
তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে ।

এই প্রদেশে ব্রহ্মদেব ও অভাব নাই । নবগাঁও ব্রহ্মই  
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার পরিমাণ প্রায় ১৭ মাইল, স্থানে স্থানে  
২০ ফিট পর্য্যন্ত গভীরতা দৃষ্ট হয় । ভেরাঘাট ও মুক্তগিরিতে  
স্বভাবের শোভা দেখিলে কখনই ভুলিতে পারা যায় না ।  
মুক্তগিরি যেন প্রকৃত সংসারমুক্ত সাধুর জন্মস্থান হইয়াছে ।  
এখানে হিন্দুর তীর্থস্থানেরও অভাব নাই ।

এই প্রদেশের এক তৃতীয়াংশের অধিকস্থানে কৃষিকর্ম  
হইতেছে, তেমন গভীর জঙ্গল নাই, অথবা বনভূমি হইতে  
সেব্রপ উপযোগী মূল্যবান কাঠও অধিক পাওয়া যায় না ।  
পূর্বে এখানকার অসভ্যজাতিগণ ‘দহিয়া’ প্রণালীতে কৃষি-  
কাণ্ড চালাইত, তাহাতে এক এক সময় বন-জঙ্গল পুড়িয়া  
নিঃশেষ হইত, ইহাতেও সুপ্রাচীন মূল্যবান কাঠ হইবার

সুবিধা হয় নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বনভাগরক্ষার আইন হইলে ধ্বংসের হস্ত হইতে অনেক মূল্যবান বৃক্ষ রক্ষা পাইয়াছে। এখন গবর্নমেন্টের বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বন রক্ষিত, সেই সকলের পরিমাণ প্রায় ২৫৮০ বর্গমাইল।

এখানে নানাস্থানে নিকুট কয়লা ও উৎকৃষ্ট আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। বরোরায় কয়লা তুলিবার এবং চান্দার লৌহ প্রস্তুতের বৃহৎ কারখানা আছে। চান্দার কারখানায় কাজ চলিলে প্রতিবর্ষে প্রায় ২৬০০০০ টন লৌহ বা ইস্পাত উৎপন্ন হইতে পারে। ১৮৮১-২ খৃষ্টাব্দে রিটারবোন সোয়ার্জ নামে একজন অষ্ট্রিয়াবাসী লৌহপরীক্ষক এখানকার লৌহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, এখানকার লৌহ ইংলণ্ডের বাজারে যে কোন উৎকৃষ্ট লৌহের সমকক্ষতা করিতে পারে।

এই প্রদেশ ৪টা বিভাগ, ১৮টা জেলা ও ১৫টা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত।

নাগপুর-বিভাগে—নাগপুর, ভাগুয়া, চান্দা, বরধা ও বালাঘাট এই ৫টা জেলা, এই বিভাগের পরিমাণ ২৪০৪০ বর্গ মাইল। জবলপুর-বিভাগে—জবলপুর, সাগর, দামো, সেওনি ও মওলা এই ৫টা জেলা, পরিমাণ ১৮৬৮৮ বর্গমাইল। নর্মদা-বিভাগে—হোসঙ্গাবাদ, নরসিংপুর, বেতুল, ছিন্দাবাড়া ও নিমার এই ৫টা জেলা, পরিমাণ ১৭৫১৩ বর্গমাইল। ছত্তিশগড়বিভাগে—রায়পুর, বিলাসপুর ও সখলপুর এই ৩টা জেলা, পরিমাণ ২৪২০৪ বর্গ মাইল।

এই প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলির নাম ও ভূপরিমাণ এইরূপ—

রাজ্যের নাম।	বর্গ মাইল।	রাজ্যের নাম।	বর্গ মাইল।
কালাহান্দী	৩৭৪৫	কবন্ধা	৮৮৭
রায়গড়	১৪৮৬	ছুইকদান(কোন্দকা)	১৭৪
সারঙ্গড়	৫৪০	কাঙ্কের	৬৩৯
পটনা	২৩৯২	খয়রাগড়	২৪০
শোনপুর	২০৬	নন্দগাঁও	২০৫
রাইরাখোল	৮৩৩	মক্কাই	২১৫
বামড়া	১২৮৮	বস্তার	১৩০৬২
শক্তি	১১৫	রাজ্যসমূহের মোট পরিমাণ	২৮৮৩৪

ভিন্ন ভিন্ন রাজার নিজ কর্তৃত্বাধীন হইলেও উক্ত ১৫টা রাজ্য বৃটিশাধীন ৫টা জেলার সহিত সংলগ্ন। তন্মধ্যে মক্কাই হোসঙ্গাবাদের সহিত, বস্তার চান্দার সহিত, নন্দগাঁও রায়পুরের সহিত, কবন্ধা ও শক্তি বিলাসপুরের সহিত এবং কালাহান্দী, রায়গড়, সারঙ্গড়, পটনা, শোণপুর, রাইরাখোল ও বামড়ারাজ্য সখলপুর জেলার সহিত সংযুক্ত।

এখানে নানাজাতি, ও নানাসম্প্রদায়ের বাস। অসভ্য আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে গোণ্ড, মারিয়া, ভীল, হলবা প্রভৃতির বাস। ইহাদের কাল রঙ, চেপ্টা নাক ও মোটা ঠোঁট দেখিলে ইহাদিগকে আর আৰ্য্যজাতি বলিয়া মনে হয় না। [ তত্তৎ শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এখানে সংনামী, কবীরপন্থী, কৃষ্ণ-পাতিয়া, নানকপন্থী, সিংহপন্থী, ধামি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বাস।

হিন্দুদিগের মধ্যে এখানে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, চামার, কুন্দি ও তেলার সংখ্যাই বেশী।

এখানে হিন্দুর সংখ্যা ৮৮ লক্ষেরও অধিক হইবে।

এতদ্বির প্রায় অকলঙ্ক জৈনের বাস, ইহারা ব্যবসা উপলক্ষে এখানে আসিয়াছে। সর্বাপেক্ষা সাগর জেলাতেই ইহাদের সংখ্যা অধিক।

এখানে আড়াই লক্ষের অধিক মুসলমানের বাস, তন্মধ্যে মুসলিম সংখ্যাই শতকরা ৯৪ জন। এতদ্বির শিয়া, ওহাবী ও ক একজন ফরাজীও দৃষ্ট হয়। মিসনরীদিগের চেষ্টায় এখানে খৃষ্টানও হইয়াছে। খৃষ্টানদিগের মধ্যে রোমানক্যাথলিকের সংখ্যাই কিছু বেশী। সকল প্রকার খৃষ্টানের সংখ্যা ১২ হাজারের অধিক হইবে না।

সহর।—এই প্রদেশে ৫২টা সহর। •যথা—নাগপুর, জবলপুর, কাম্ভি, সাগর, বুর্হানপুর, রায়পুর, চান্দা, হোসঙ্গাবাদ, খাণ্ডবা, উম্মের, সখলপুর, গড়াকোটা, হর্দা, ভাঙ্গুরা, নরসিংপুর, সেওনি, পটনা, ছিন্দাবাড়া, দামো, মুচারা, খাপা, ছিন্দাবাড়া, গাদরবাড়া, অর্বা, বরোরা, শোণপুর, রামভেতক, বিলাসপুর, পাকুণা, দেওরী, তুন্সর, নরখের, মোহাগপুর, ধম্ভারী, হট্ট, নন্দগাঁও, বরধা, সেহোদী, কবন্ধা, রতনপুর, অরমোরা, হুঙ্গরপুর, মোহপা, খুর্ন, খল্‌মেখর, অস্তি, রেহলী, মোহগাঁও, মোহারী, দেওলী, সাওনের। এই সকল নগরের মধ্যে নাগপুর ও জবলপুরের লোকসংখ্যাই অধিক।

কৃষি।—এখানে ধাত, যব, গোধূমাদি সকল প্রকার শস্ত, কার্পাস ও নানাবিধ তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। রায়পুর অঞ্চলেই কেবল তামাকের চাষ হইয়া থাকে।

বাণিজ্য।—এখানে লৌহ-আকরের ও লোহা-গালাই-এর কাজই প্রধান। বুর্হানপুরের জরির কাজ এবং নাগপুর ও ভাগুয়ার বুটদার পরিষেয় বস্ত্র ভারতের সর্বত্রই আদৃত হইয়া থাকে। এখানে প্রধানতঃ নানা প্রকার কাটা কাপড়, নোহার জিনিস, লবণ, নারিকেল, বিলাতী মদ, তামাক ইত্যাদি আমদানী এবং তুলা, শস্য, ঘৃত, সর্ষপাদি তৈলকর বীজ ও দেশীয় দ্রব্যজাত রপ্তানী হইয়া থাকে। মধ্যভারত,



বোম্বাই ও কলিকাতার সহিত এখানকার বাণিজ্য সম্বন্ধ। এখন এই প্রদেশ হইয়া বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ে বাওয়ার আমদানী রপ্তানীর যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। বর্ষাকালে নদী-পথেও বাণিজ্য চলে।

জলবায়ু।—এইস্থান পার্শ্বত্যা ও এখানকার ভূগর্ভে প্রস্তুত নিহিত, বৃষ্টিপাতে শীত্ৰই এইস্থান খুইয়া যায় এবং সমুদ্র হইতে দূরবর্তী; এই সকল কারণে এইস্থান স্বভাবতঃই শুষ্ক ও উষ্ণ। আষাঢ় হইতে ভাদ্র পর্যন্ত এখানে মসুম-বায়ু বহিতে থাকে, তাহাতে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়, তথাপি নয় মাস এখানে যথেষ্ট গরম থাকে, কিন্তু আর্দ্রতা অনেক কমই দেখা যায়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে দারুণ গ্রীষ্ম হয়, সেরূপ গ্রীষ্ম বাঙ্গালা কি উত্তরপশ্চিম প্রদেশেও অল্পভূত হয় না। শীতকালে নাগপুর ও কলিকাতার শৈত্য প্রায় একরূপ। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়পড়তা ৪৫ ইঞ্চি। এ প্রদেশে কোন ঋতুতেই দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু প্রায়ই পাওয়া যায় না, শীতকালে উত্তরপূর্ব ও পূর্বীয় বায়ু বহিতে থাকে। কিন্তু কাস্তন মাস আসিতে না আসিতেই পূর্ব-বায়ু বন্ধ হইয়া যায়।

ইতিহাস।—অতি পুরাকালে এখানে মুনিষ্কামিগণের বাস ছিল; তাহাদের বাসভূমি নানা তীর্থে পরিগণিত হইয়াছে। এ প্রদেশের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জ্ঞান যায় যে, এখানে নানা স্থানে হৈহয় বা চৌদারাজবংশ ও শবররাজগণ রাজত্ব করিতেন। তৎপরে সোমবংশী রাজগণ প্রবল হইয়াছিলেন। [চৌদি, হৈহয়, শবর ও সোমবংশী দেখ।] খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত জবলপুর অঞ্চলে সোমবংশীয়দিগের অধিকার ছিল এবং সাতপুরার দক্ষিণাংশে মালবের পরমার-রাজগণ অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। চান্দার গোড় বা গোড়বংশ হৈহয়-বংশের নিকট হইতেই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দী তাহাদের প্রভাব সূত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। সাতপুরা আদিত্যকায় নিমার ও সাগর জেলা প্রায় ৭শত বর্ষ গোলি নামক ভোল সর্দার-গণের শাসনাধীন ছিল, এখনও এ অঞ্চলে গোলিগণের প্রভাব ও কান্তিকলাপের কথা সর্বত্র শুনা যায়। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী এই বংশের আশা নামে আইর খান্দেশের পার্শ্বত্যা অঞ্চলে প্রবল প্রতাপে অধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, মুসলমান ঐতিহাসিক কেরিতা তাহার প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার দশ সহস্র গোধন, বিংশতি সহস্র মেঘ এবং সহস্র ঘোটকী ছিল। তাহারই নাম অনুসারে আশীরগড়ের নামকরণ হইয়াছে।

কেরিতা হইতে আরও জানা যায়, প্রায় ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দেও

খেরলার স্বাধীন হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন। ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে খেরলা বান্ধনি-রাজের অধিকারভুক্ত হইলে এখানকার স্বাধীন রাজবংশ বিলুপ্ত হয়। মালবে মুগলমহাশক্তি ঋক হইয়া পড়িলে গড়মণ্ডলা হইতে গোড়রাজ সংগ্রাম সা বাহির হইয়া ৫২টি গড় অধিকার করিয়া বসেন। [মণ্ডলা দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী প্রাচীন হৈহয়-বংশের পুনরায় প্রভাব দৃষ্ট হয়। গোড়দিগের অভ্যাদয় হইতে মহারাষ্ট্রদিগের সমাগম পর্যন্ত এখানকার গোণ্ডবানা প্রদেশ প্রকৃতই স্বাধীন ছিল। গোড়রাজগণ নাম মাত্র দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতেন। এখানে সর্বত্র সামন্তশাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। মহারাষ্ট্রদিগের আগমনে গোণ্ডবানার স্বত্বশাস্তি বিলুপ্ত হয়। ১৭৪১ হইতে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভোন্স্বে-বংশ দেওগড়, চান্দা ও ছত্তিশগড়ে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। গড়মণ্ডলার রাজবংশ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের হস্তে রাজ্য-বিসর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্র-শাসননীতিতে দোষগুণ উভয়ই ছিল। প্রথমতঃ দেশবাসিগণ মহারাষ্ট্রাধিকারে তেমন কষ্ট অনুভব করিতে পারে নাই, কিন্তু খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে যখন মরাঠা-শাসনকর্তৃগণের নানা কারণে অথের প্রোঞ্জন হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে তাহারও বহুবিধ কল স্থাপন করিয়া অধিবাসী-দিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। নিরীহ কৃষকগণের আর গৃহে বাস সুবিধা হইল না, তাহার স্ব স্ব কৃষিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দস্যবৃত্তি অবলম্বন করিল। ক্রমে ক্রমে সহস্র সহস্র কৃষক মিলিত হইয়া ভীষণমুক্তি ধারণ করিল। তাহাদের সঙ্গে তাঁবু অথবা কোনপ্রকার মোট ছিল না, তাহার কেবল অস্ত্র ও অগ্নির সাহায্যে গ্রাম ও নগরবাসীর সর্বনাশ করিতে লাগিল। তাহাদের ভীষণ অত্যাচারে দেশ জনশূন্য, কোষ অর্থশূন্য ও সর্বত্র হাহাকার উঠিয়াছিল। এই সময়ে (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে) ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট অসা সাহেবকে পদচ্যুত করিলেন। প্রথমে সাগর ও নন্দদারাজ্য ব্রিটিশ-শাসনভুক্ত হইল এবং ভোন্স্বেবংশীয় ৩য় রঞ্জী নাবালক ছিলেন বলিয়া তাহারও রাজ্য ব্রিটিশ তত্ত্বাবধানে আসিল। রঘুজী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সাবালক হন, কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাহার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহার রাজ্যও ব্রিটিশ শাসনাধীন হইল।

ব্রিটিশাধিকারে প্রথম প্রথম সামান্য কল ধার্য হওয়ার প্রজাগণ অনেকটা শান্ত হইল। এখন গবর্নমেন্ট অল্পে অল্পে কলবৃদ্ধি করিতেছেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নিজাম গোদাবরীর বামকূলে অবস্থিত

শিরোধ, নওগাঁ, অলবকা, চেরলা, ভদ্রাচলম ও রাকপন্নী এই ৬টা তালুক ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দেন।" শেখোক্ত দুইটা তালুক ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মাজ্জাজ প্রেসিডেন্সির সামীল হইয়াছে। অপর চারিটা এখনও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত আছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সাগর, নাগপুর ও নর্মদাভূভাগ লইয়া মধ্যপ্রদেশ গঠিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নিনার জেলা ও তৎপর বর্ষে আরও ৭০০ বর্গমাইল মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত হইয়াছে। শেখোক্ত ভূভাগ বিজয়রাঘবগড় নামে গণ্য ছিল, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়।

শাসন।—বর্তমানকালে মধ্যপ্রদেশ ভারত-গবর্মেণ্টের খাস তরাবধানে একজন চিফ কমিসনর দ্বারা শাসিত হয়, তাঁহার সাহায্যার্থ একজন সেক্রেটারী ও একজন জুনিয়ার সেক্রেটারী আছেন। এখানকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সমূহ ভিন্নভাবে এক একজন প্রধান বিচারপতির অধীন, এই বিচারপতি “জুডিসিয়াল কমিসনর” নামে খ্যাত। শাসন-বিভাগে ৪ জন কমিসনর, ১৮ ডেপুটি কমিসনর, ১৩ আসিষ্টাণ্ট কমিসনর, ৩৩ এক্স্ট্রা-আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ও ১৮টা জেলায় ৪৯ জন তহশীলদার আছেন।

মধ্যভুক্ত (ত্রি) কোন খাণ্ড ভোজন করিবার মধ্যভাগে খাওয়া।

মধ্যভাগ (পুং) দেহের মধ্যদেশ, কটিভাগ।

মধ্যভাব (পুং) ১ মধ্যাবস্থা। ২ বাহা দূরে নয়, নিকটেও নয়।

মধ্যভারত, ভারতের মধ্যাংশ। এফগে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের শাসনাধীন নির্দিষ্ট কতকগুলি ভূভাগ লইয়া “মধ্যভারত” কল্পিত হইয়া থাকে। এই বিস্তৃত ভূভাগ বড়লাটের এজেন্সির অধীন। ইন্দোর, ভীল বা ভোপাবর, ডেপুটি ভীল, পশ্চিম মালব, ভূপাল, গোয়ালিয়ার, গুণা, বৃন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ড এজেন্সি লইয়া মধ্যভারত এজেন্সি গঠিত। ইহার উত্তর পূর্বসীমায় উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিমে রাজপুতানা, পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে খান্দেশ ও রেবাকাস্তা, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ এবং পূর্বে ছোটনাগপুরের চঙ্কবখার নামক গড়-জাত। ইহার একদিকে গাজ্যপ্রদেশ ও অপরদিকে চবল ও চিতোর-গিরিমালা। অক্ষা° ২১° ২৪' হইতে ২৬° ৫২' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° হইতে ৮৩° পূঃ পর্যন্ত। ভূপরিমাণ ৭৫০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৯৩ লক্ষ।

এই মধ্যভারতের মধ্যে অনেকগুলি রাজ্য আছে। তন্মধ্যে ইন্দোর, দেবাস, বাগলি, ও ১৫টা ঠাকুরাত ইন্দোর এজেন্সির অধীন। ধারা, বাবুয়া, আলী রাজপুর, জোবৎ ও ১৩টা ঠাকুরাত ভীল বা ভোপাবর এজেন্সির অধীন। পরগণা মানপুর, বরবাণী, ও ১০টা ঠাকুরাত ডেপুটি ভীল

এজেন্সির অধীন। জাওয়া, রতলাম, সীতামউ, মৈলানা, ভূপাল, রাজগড়, নরসিংগড়, খিলচিপুর, কুর্বাই, মকহদনগড়, মুহম্মদগড়, পথারী, বসোদা ও ১৭টা ঠাকুরাত ভূপাল এজেন্সির অধীন। গোয়ালিয়ার ও তদধীন ১৫টা সর্দারের ক্ষুদ্র রাজ্য গোয়ালিয়ার এজেন্সির ও গুণা সর্ব-এজেন্সির অন্তর্গত। ওড়ুয়া বা তেহরী দতিয়া, সম্পথর, পল্লা, চখারি, অজয়গড়, বিজাবর, ছত্রপুর, বাওনি, আলিপুরা, বিরোন্দা, জসো, কালি-জর, গোরীহর, খনিয়া ধানা ও ১৭টা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য বৃন্দেল-খণ্ড এজেন্সির এবং রেবা, নাগোদ, মৈহর, সোহাবল, কোতী, সিন্দপুরা ও রায়গাঁও বাঘেলখণ্ড-এজেন্সির অধীন।

গবর্ণর জেনারলের এখানকার এজেন্সিই মধ্যভারতের সর্বময় কর্তা। তিনি ইন্দোরে অবস্থান করেন এবং দেশীয় সকল রাজা ও সামন্তবর্গকে পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় মধ্যভারতীয় রাজত্ববর্গের সাহিত ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কায্য নিকাহ হয়।

মধ্যম (পুং) মধ্যো ভবঃ মধ্য-ম। সপ্তস্বরের মধ্যে পঞ্চমস্বর। (অমর) সঙ্গীতশাস্ত্র মতে চতুর্থ স্বর, ইহা ক্রোড়স্বর তুল্য, ইহার উচ্চারণস্থান বক্ষ, ব্যাকরণ মতে অধর। ইহা বিপ্রবণ, ইহার সংজ্ঞা অস্তর অর্থাৎ চতুঃস্বর মিলিত, ইহার তান চতুঃস্বরীংশতি, এই সকল তান আবার প্রত্যেকে দ্বাত্রিংশরূপে ভিন্ন, সমুদয়ে ৭৬৮।

এই স্বরের চিহ্ন (ম) এই স্বর তীক্ষ্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। তাহার চিহ্ন (ম) মধ্যমকে স্বর (ষড়্জ) করিলে সপ্তগ্রাম নিম্নলিখিত রূপ হয়। যথা—

ম=স, প=খ, ধ=গ, নি=ম, স=প,  
ঋ=ধ, গ=নি।

গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে দুইটা এবং পঞ্চম ও নবমের মধ্যে চারিটা শ্রুতি আছে। গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যস্থিত দুইটা শ্রুতির নাম ধী রৌদ্রী ও ক্রোধী এবং মধ্যম পঞ্চমের মধ্যস্থিত শ্রুতি চারিটার নাম বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি ও মার্জনী।

২ মধ্যম নামে একটা রাগ আছে, উহার নামান্তর মধ্যমা বা মধ্যমাদি, উহা ভৈরবরাগের জ্ঞী। (সঙ্গীত-দামোঃ) ৩ উপ-পতিভেদ। ইহার লক্ষণ—প্রিয়ার ক্রোধের সময় যিনি অম্বরগ-প্রকাশ করেন না অথচ চেষ্টা দ্বারা মনোভাব জানেন, তিনি মধ্যম। উদাহরণ—

“আস্যাং যদ্যপি হাস্যবজ্রিতমিদং লাসোন হীনং বচো-  
নেত্রে শোণসরোজকান্তিকচিরে কাপি ক্ষণং স্থীয়তে ॥”

মাগায়াঃ করণোদ্যমে মকরিকারন্তঃ কুচাস্তোজমো-  
ধূপঃ কুণ্ডলঘোরগীষু স্তনোঃ সায়ন্তনো দৃশ্যতে ॥”

৪ নারকভেদ, উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে নারক  
তিন প্রকার।

“উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে।

নারিকার যেই ক্রম নারক সে ক্রমে ॥” ( রসমঞ্জরী )

৫ মধ্যদেশ। (অনর) ৬ গ্রহদিগের সাময়িক সংজ্ঞাবিশেষ।

“দ্যুচরচক্রহতো দিনসঞ্চয়ঃ কহ হতো ভগণাদি ফলং গ্রহং।

দশশিরঃ পূরমধ্যমভারক্রে ক্রিতিজসন্নিধিগে সতি মধ্যমঃ ॥”

( সিদ্ধান্তশিরোমণি )

৭ মুগভেদ। ৮ রাগভেদ। ( ধরণি ) ( ত্রি ) ৯ মধ্যভব।

পর্যায়—মাধ্যম, মধ্যমায়, মাধ্যন্দিন। ( হেম ) মানবের  
মধ্যমবয়সে পিত্তবর্জিত হয়।

“বাল্যে বিবর্জিতে স্নেহা মধ্যমে পিত্তমেব তু।

ভূয়িষ্ঠঃ বর্জিতে বায়ু বৃদ্ধে তদ্বীক্ষ্য যোজয়েৎ ॥”

( সূত্রত প্রস্থান ৩৫ অং )

মধ্যমথগু ( ক্রী ) ১ বীজগণিতোক্ত সংজ্ঞাভেদ। ২ মধ্যভাগ।

মধ্যমজাত ( ত্রি ) মধ্যম উৎপন্ন, মেধো।

মধ্যমন্দির ( পুং ) একজন পণ্ডিত। ইনি মহাভারতের তাৎপর্য-  
নির্ণয় প্রণয়ন করেন। [ মধ্বাচাৰ্য্য দেখ। ] ২ মধ্যস্থিত মন্দির।

মধ্যমদশমূলতৈল ( ক্রী ) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-  
প্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, কাথের জন্ত দশমূল, করঞ্জবীজ,  
নিসিন্দাপত্র, জয়ন্তাপত্র প্রত্যেকে ৬ পল, জল ৬৪ সের।

কথার্থে কাথোক্ত দ্রব্য সকল প্রত্যেকে ৬ তোলা, তৈলপাকের  
বিধানানুসারে যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে।  
যথানিয়মে এই তৈল মাথিলে শিরোরোগ, বাতশ্লেষ্মোদ্রব পীড়া,  
কাশ, শোথ, জীর্ণজ্বর, কর্ণ ও চক্ষুরোগ, মস্তান্ত্ত, অঙ্গবৃদ্ধি,  
শ্রীপদ প্রভৃতি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। শিরোরোগাধিকারে  
একটি শ্রেষ্ঠ তৈল। ( ভৈষজ্যরত্নাং শিরোরোগাধি )

মধ্যমনায়িকার্চুর্ণ ( ক্রী ) চূর্ণৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—  
পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ৩ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেকে ৪ তোলা,  
গন্ধক ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, সিদ্ধিপত্র ১৯ তোলা, এই  
সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে এই  
চূর্ণ হইবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ  
অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত।

এই ঔষধের অর্দ্ধ পরিমাণে স্বল্পনায়িকার্চুর্ণ হয়। ইহা  
অত্যন্ত ঔষধবৃদ্ধিকারক। এতদ্ভিন্ন কাশ, শ্বাস, শূল ও অর  
প্রভৃতি রোগেও বিশেষ উপকারী। ( ভৈষজ্যগ্রহণীরোগাধি )  
মধ্যমনারায়ণতৈল ( ক্রী ) বাতব্যাধি রোগাধিকারে তৈলৌ-

ষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—কাথের জন্ত বেলছাল,  
অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, স্তোণাক, শ্বেতবেড়োলা, পারিতজ,  
কণ্টিকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষচাকুলিয়া, গণিয়ারি, গন্ধভা-  
লিয়া ও পারুল, ইহাদের মূল প্রত্যেকে ২০ পল, পাকের জন্ত  
জল ৫১২ সের, শেষ ১২৮ সের। ছাগছন্ধ বা গব্য ছন্ধ ৩২  
সের, শতমূলীর রস ৩২ সের, তিলতৈল ৩২ সের। কঙ্কের  
জন্ত রান্না, অশ্বগন্ধা, মউরি, দেবদারু, কুড়, শালপানি, চাকুলে,  
মুগানি, মাষানি, অশুড়, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী,  
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা,  
যষ্টিমধু, তগরপাছকা, মুখা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষ-  
ভক, কঁাকলা, ক্ষীরকঁাকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ,  
বালা, বচ, পলাশমূল, গেঠোলা, শ্বেত পুনর্নবা, ও চোরছলী,  
( মেদা ও মহামেদার অভাবে অশ্বগন্ধা ও অনন্তমূল, জীবক ও  
ঋষভকের অভাবে গুলঞ্চ ও বংশলোচন, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির অভাবে  
বেড়োলা ও গোরক্ষ চাকুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ) এই  
সকল দ্রব্য ২ পল। এই তৈল তৈলপাকের বিধানানুসারে  
পাক করিয়া কর্পূর, কুঙ্কুম ও মুগনাভি একত্র ৩ পল প্রক্ষেপ  
দিয়া নামাইতে হইবে।

এই তৈল বাতব্যাধি-রোগাধিকারে অতিশয় শ্রেষ্ঠ তৈল।  
যথানিয়মে এই তৈল মর্দনে সকল প্রকার বাতব্যাধি, পশুতা,  
শিরোরোগ, মস্তান্ত্ত, হস্তান্ত্ত, ইন্দ্রিয়দৌরল্য, শুক্রহীন,  
বধিরতা, অঙ্গবৃদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়।  
( ভৈষজ্যরত্নাং বাতব্যাধিরোগাধি )

মধ্যমপাণ্ডব ( পুং ) মধ্যমশাস্ত্রী পাণ্ডবশ্চেতি তস্ত পুঙ্ক-  
পরয়োদ্যয়োদ্যোমধ্যম্যবর্ত্তিত্বাৎ তথাৎ। অর্জুন।

“নেতা মধ্যমপাণ্ডবো ভগবতো নারায়ণশাংশজঃ।”

( ভারবটিকা ১।৪৬ মল্লিনাথ )

মধ্যমভূতক ( পুং ) মধ্যমশাস্ত্রী ভূতকশ্চেতি। কৃষাবল-  
ভূতক, চলিত কৃষাণ।

“উত্তমশাস্ত্রীয়োহত্র মধ্যমস্ত কৃষাবলঃ।

অধমো ভারবাহা শ্রাদ্ধিত্যেয ত্রিবিধো ভূতঃ ॥” ( মিতাকরা )

মধ্যময়ান ( ক্রী ) বৌদ্ধমতসিদ্ধ নিকাগের মধ্যবর্তী উপায়ভেদ।

মধ্যমরাত্র ( পুং ) মধ্যরাত্র, নিশীথ, অর্দ্ধরাত্র।

মধ্যমলোক ( পুং ) মধ্যমশাস্ত্রী লোকশ্চেতি কন্মধাং।  
পৃথিবী। “তাং দেবতাপিত্রিতথিক্রিয়াথা-

মত্ৰক্-যথৌ মধ্যমলোকপালঃ।” ( রঘু ২।১৬ )

‘মধ্যমলোকপালঃ ভূপালঃ’ ( মল্লিনাথ )

পৃথিবী স্বর্ণ ও পাতালের মধ্যে বাল্য। ইহার নাম মধ্যমলোক।

মধ্যমবয়স ( ক্রী ) ১৬ বৎসর হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিতকাল।

মধ্যমবয়স্ক (ত্রি) মধ্যমং বয়ো বস্তু কপ্। মধ্যবয়সবৃদ্ধ।  
মধ্যমবাহু (ত্রি) মধ্যগমন ধারা বাহক। “মাবো রথো  
মধ্যমবাহুতে” (ঋক্ ২।২৯।৪) ‘মধ্যমবাহু মধ্যমেন  
মধ্যগমনেন বাহকো বাহুঃ’ (সায়ণ)

মধ্যমবিকুটৈল (ক্ৰী) বাতব্যাধি-রোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ-  
বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৮৪ সের,  
কাথের অশ্ব শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বেড়োলা,  
এরওমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলের  
মূল, ঝাটীমূল প্রত্যেকে ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।  
ককার্থ পূর্ণবা, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, রক্তচন্দন, অশুরু,  
শৈলজ, তগরপাত্কা, কুড়, এলাচি, জটামাংসী, শালপাণি,  
বেড়োলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব-লবণ, ও রান্না প্রত্যেকে ৪ তোলা,  
গব্যাহু ৮ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। তৈলপাকের  
বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। বথানিয়মে  
এই তৈল মর্দন করিলে—সকল প্রকার বাত, ইন্দ্রিয়দোষালা,  
অর্দ্রিত, গলগণ্ড, বক্ষঃশূল, পার্শ্বশূল, অস্ত্রবৃদ্ধি, রতিশক্তি-  
হীনতা, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালিয়া), কামলা, পাণ্ডু,  
অশ্মরী প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাং বাতব্যাধি-রোগাধিঃ)

মধ্যমশী (পুং) ১ মধ্যমস্থানে বর্তমান। “ততো বন্ধং  
বিবোধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব” (ঋক্ ১০।২৭।১২) ‘মধ্যমশী-  
মধ্যমস্থানে বর্তমানঃ’ (সায়ণ) ২ দেহমধ্যস্থিত মর্শ্বভাগ-  
হিংসক, অথবা ত্রিশূলমধ্যভাগ দ্বারা হিংসাকারী।

“ততো বন্ধং বিবোধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব” (শুক্রযজুঃ ১২।৮৬)  
‘উগ্রো মধ্যমশীরিব মধ্যে দেহমধ্যে ভবং মধ্যমং মর্শ্বভাগং  
শৃণাতি হিনস্তি মধ্যমশী শূ হিংসারাগ্ কিপ্, যবা উগ্রো ক্রদ্রো  
মধ্যমেন ত্রিশূলমধ্যভাগেন শৃণাভীতি মধ্যমশীঃ’ (বেদদীপঃ)

মধ্যমসংগ্রহ (পুং) মধ্যমশাস্ত্রো সংগ্রহশ্চেতি। জীসংগ্রহ-  
রূপ বিবাদবিশেষ। এই বিবাদ গন্ধমালা ও বজ্র-ভূষণাদি  
প্রেরণ এবং নানাবিধ প্রলোভন দ্বারা হয়।

“ত্রিবিধং তৎ সমাখ্যাতং প্রথমং মধ্যমোত্তমম্।

আদেশকালভাবান্তির্নিজনে চ পরজিয়ঃ ॥

প্রেষণং গন্ধমালায়ানাং ধূপভূষণবাসসাম্।

প্রলোভনং চান্দ্রপানৈর্মধ্যমং সমুদাহৃতম্ ॥

সহাসনং বিবিক্তেযু পরম্পরমপাশ্রয়ঃ।

কেশাশেখিগ্রহশ্চৈব সম্যক্ সংগ্রহণং স্বতম্ ॥”

(মিতাক্ষরা জীসংগ্রহপ্রকরণ)

মধ্যমসাহস (ক্ৰী) সহসা ক্রিয়মাণং কৃতং বা সহসা—অণু,  
মধ্যমক্ তৎ সাহসকেতি। ১ বলদর্পিত-ব্যক্তির বজ্র, পশু

ও অরণ্যানাদির ভয়, আক্ষেপ ও উপমর্দাদিরূপ সহসা  
ক্রিয়মাণ কর্ম।

“কলমূলোদকাদীনাং ক্ষেত্রোপকরণস্ত চ।

ভক্ষ্যাক্ষেপোপমর্দাষ্টৈঃ প্রথমং সাহসং স্বতম্।

বাসঃপশ্বরণানানাং গৃহোপকরণস্ত চ।

এতেনৈব প্রকারেণ মধ্যমং সাহসং স্বতম্ ॥” (মিতাক্ষরা)  
(পুং) ২ দণ্ডবিশেষ, এই দণ্ড পঞ্চশতপণরূপ।

“পণানাং যে শতে সার্ব্ধে প্রথমং সাহসং স্বতঃ।

মধ্যমং পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রশ্চেব চোত্তমঃ ॥

লোভাৎ সহস্রং দণ্ডম্ মোহাৎ পূর্ণস্ত সাহসম্।

ভরাহা মধ্যমো দণ্ডো মৈত্র্যাৎ পূর্ণং চতুর্গম্ ॥”

(মহু ৮ অং সাক্ষিপ্রকরণ)

মধ্যমস্থ (ত্রি) মধ্যমে মধ্যমস্থানে ভিত্তীভীতি স্থা-ক। মধ্য-  
স্থিত, মধ্যবর্তী।

মধ্যমশ্লেহ (ক্ৰী) মধ্যভাগে অবস্থানশীলতা।

মধ্যমা (ক্ৰী) মধ্যম-টাপ্। ১ অঙ্গুলিভেদ। ২ ত্র্যক্ষর-  
চ্ছন্দঃ। ৩ দৃষ্টরজ্জ্বা নারী। ৪ কর্ণিকা। (মেদিনী)  
৫ হৃদয়োথিত বুদ্ধিযুক্ত নাদরূপ বর্ণ।

“পশ্চাৎ পশ্চাত্ত্য হৃদয়গো বুদ্ধিযুক্তং মধ্যমাধ্যাঃ” (অলঙ্কারকোঃ)

৬ স্বীয়াদির অন্তর্গত নায়িকাভেদ। প্রিয়তম হিত বা  
অহিত আচরণ করিলে যিনি হিত বা অহিত আচরণ করেন,  
তিনি মধ্যমা অর্থাৎ ইহার চেষ্ঠা ব্যবহারানুসারিণী হইয়া  
থাকে। (রসমঞ্জরী) ৭ ক্ষুদ্রজঘ্রুবক, ছোট জামগাছ।  
৮ কাকোণী। (মেদিনী)

মধ্যমাগম (পুং) বৌদ্ধদিগের আগমচতুষ্টয়ের মধ্যে এক-  
খানি আগম।

মধ্যমাজ্জিরস (পুং) ঋষিভেদ।

মধ্যমাগ্নি (পুং) অর্কার্থ অগ্নিতাপবিশেষ। মুষ্টিমের কাষ্ঠের  
চতুরংশের দ্বারা যে অগ্নি, তাহার দ্বিগুণ অগ্নির নাম মধ্য-  
মাগ্নি। (অর্কচিঃ)

মধ্যমাজ্জুলি (ক্ৰী) মধ্যমা অঙ্গুলিঃ। অঙ্গুলিভেদ, তর্জুনী  
ও অনামিকার মধ্যস্থিত অঙ্গুলি।

মধ্যমাত্রেয় (পুং) ঋষিভেদ।

মধ্যমাদি (পুং) সঙ্গীতের মাত্রাভেদ।

মধ্যমাহরণ (ক্ৰী) বীজগণিত-প্রসিদ্ধ অব্যক্তমানজ্ঞাপক  
গণনাভেদ।

মধ্যমিক (পুং) মধ্যম-ইকন্। মধ্যম।

মধ্যমিকা (ক্ৰী) মধ্যমৈব কন্ টাপ্, অত ইকং। দৃষ্টরজ্জ্বা  
নারী। (রত্নাবলী)

মধ্যমীয় ( দ্বি ) মধ্যমে ভবং মধ্যমশ্রেণং বেতি ( গহাদিত্যম্  
পা ৪২১১৩৮ ) ইতি ছ। মধ্যম। ( হেম )

মধ্যমেশ্বর ( পুং ) মধ্যমস্ত স্থানস্ত ঈশ্বরঃ। কাশীস্থিত শিব-  
লিঙ্গবিশেষ। গঙ্গায় স্নান করিয়া এই শিবলিঙ্গপূজনে ইহ-  
কালে পুণ্য ও পরকালে শিবলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

“ধৃত্যস্ত খলু তে বিপ্রা মন্দাকিক্তাং কৃতোদকাঃ।

অর্চয়ন্তি মহাদেবং মধ্যমেশ্বরমীশ্বরম্ ॥”

( কুশ্মপুরাণ ৩১ অং )

২ কুনাওনের অন্তর্গত হিমালয়স্থ একটা পুণ্যস্থান। শিব-  
উপপুরাণে ও হিমবংশেও ইহার সাহায্য বর্ণিত আছে।

মধ্যযব ( পুং ) মধ্যো মধ্যমো যবঃ। ষট্শেতমধ্বপরিমাণ।

মধ্যযোগিন্ ( ত্রি ) মধ্যযুজ্-গিনি। মধ্যবর্তী।

“যদুনাগতানিপোষাদ্ দ্বাদশরৌদ্রাচ্চমধ্যযোগিনি।”

( বৃহৎসংহিতা ৪৭ )

মধ্যরাত্রি ( পুং ) মধ্যং রাত্র্যেঃ ( পূর্ণাপরাধরেতি। পা ২১২১১ )  
তীত সমাসঃ, ততঃ ( অহন্ সঠৈকেতি। পা ৫৪৮৭ ) ইতি  
সমাসান্তোহচ, পুংস্বক। নির্গাথ, অন্ধরাত্রি।

“উদকে মধ্যরাত্র্যে চ নিম্নত্রস্ত বিসর্জ্যেৎ।” ( মনু ৪১১০৯ )

উচ্ছিন্নঃ শ্রাদ্ধভুক্ত্যৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥” ( মনু ৪১১০৯ )

মধ্যরেখা ( স্ত্রী ) পৃথিবীর মধ্যভাগস্থিত কল্পিত রেখা।  
দেশান্তর স্থির করিতে হইলে এই রেখা হইতে স্থির করা  
অবশ্যক।

“সূর্যমেরুগঙ্গাস্তবভূমি-মধ্যরেখা স্বদেশান্তরযোজনং যৎ।”

( দিনপঞ্জিকা )

সূর্যমেরুগঙ্গা ও লঙ্কার মধ্যগত ভূমির উপর দিয়া উত্তর-  
দক্ষিণাবর্ত্তণ যে একটা রেখা কল্পিত হইয়াছে, তাহার নাম  
মধ্যরেখা। এহ মধ্যরেখা হইতে দেশান্তর নিকপণ করিতে  
হয়। আমাদের দেশ অর্থাৎ কলিকাতা মধ্যবেতার দুই শত  
যোজন পূর্বে অবস্থিত।

মধ্যলয় ( স্ত্রী ) জ্যোতিষোক্ত দশলয়-সাধন প্রণালী বিশেষ।

প্রথমে প্রাক্নাড়ী, পশ্চাৎ নাড়ী ও উন্নত নাড়ী স্থির করিয়া  
লঙ্কাদ্বয়ে বে মূলক খণ্ডা লিখিত আছে, সেই মূলক খণ্ডা  
গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত নাড়ী দ্বারা তাৎকালিক রবির যে  
ক্ষুণ্ট হইবে, তাহাতে পূর্ণ ও ধন সংযোগ এবং বিয়োগ করিলে  
মধ্যলয় স্থির হইবে। ইহাতে বিশেষ এই যে, পূর্বাধিকের  
মধ্যলয় স্থির করিতে হইলে লঙ্কাদ্বয় খণ্ডা যোগ এবং পশ্চিম  
দিকে বিভাগ করিতে হয়।

“প্রাক্ পশ্চাত্তনাড়ীভিত্ত্যলঙ্কাদ্বয়স্বভিঃ।

ভানৌ ক্ষয়ধনে কৃষা মধ্যলয়ং তদা ভবেৎ ॥” ( সূর্যাসি ৭৪৮ )

মধ্যলোক ( পুং ) মধ্যচ্চাসৌ লোকশ্চেতি। পৃথিবী।

মধ্যলোকেশ ( পুং ) মধ্যলোকানামীশঃ। রাজা। ( হেম )

মধ্যবয়স্ ( ত্রি ) মধ্যং বয়ঃ। জীবনের মধ্যভাগ, চলিত  
আদ্যবয়স্।

মধ্যবর্ত্তিন্ ( ত্রি ) মধ্যো বর্ত্ততে বৃত্ত-গিনি। মধ্যস্থ।

মধ্যবিদরণ ( স্ত্রী ) চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণের পর মোক্ষবিশেষ।

“মধ্যো যদি প্রকাশঃ প্রথমং তন্মধ্যবিদরণং নাম।

অন্তঃকোপকরণং স্যাৎ স্তুভিক্ষদং নাতিবৃষ্টিকরম্ ॥”

( বৃহৎসংহিতা ৫৮৯ )

মধ্যস্থল প্রথমে প্রকাশিত হইলে তাহাকে মধ্যবিদরণ  
নামক মোক্ষ কহে। ইহা প্রাণিগণের মানসিক কোপ-  
কারক ও স্তুভিক্ষপ্রদ হইলেও সূচাক্ষ বৃষ্টিপ্রদ নহে।

মধ্যবৃত্ত ( স্ত্রী ) নাভি।

মধ্যশরীর ( ত্রি ) মধ্যং শরীরং। মধ্যদেহ, চলিত মাজারী শরীর।

মধ্যশায়িন্ ( ত্রি ) মধ্যো শেতে শী-গিনি। ১ মধ্যভাগে শয়ন-  
কারী। ২ মধ্যবর্তী।

মধ্যশ্রেণীকায়স্থ, মেদিনীপুর-জেলাবাসী একশ্রেণীর কায়স্থ।

এই শ্রেণীর কায়স্থগণ আদি বঙ্গজ ও দক্ষিণরাষ্ট্রীয়  
কায়স্থগণের সম্ভান। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রাজা  
বল্লালসেন যে সময়ে কুল বন্ধন করেন, তৎকালে বতক-  
গুলি ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারী কতকগুলি  
কায়স্থ বল্লালের কুলবিধি স্বীকার না করিয়া বর্ত্তমান মেদিনী-  
পুর জেলায় আসিয়া বাস করেন। এই জেলা তৎকালে  
রাজা বল্লালসেনের রাজ্যের বহির্ভূত ও উড়িষ্যার অন্তর্গত  
ছিল। তাহারা বাদালা ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তিহানে বাস-  
হেতু ব্রাহ্মণগণ মধ্যশ্রেণী-ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ মধ্যশ্রেণী-কায়স্থ  
নাম গ্রহণ করেন, ও আজ পর্য্যন্ত এই নামেই পরিচিত হইয়া  
আসিতেছেন। তাহার পর অত্যাচার বঙ্গজ ও দক্ষিণরাষ্ট্রীয়  
কায়স্থগণ আসিয়া উক্ত কায়স্থগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

মধ্যশ্রেণী-কায়স্থগণের কুলজ হইতে জানা যায় যে, কোত-  
রঙ্গ হইতে কাশ্যপগোত্রীয় গুহ, বালী হইতে কৃষ্ণাজেয়গোত্রীয়  
দত্তবংশ, সাকরাইল্ হইতে কাশ্যপগোত্রীয় দাসবংশ, মুরশিদা-  
বাদ হইতে বিশ্বামিত্রগোত্রীয় মিত্রবংশ, এ ছাড়া সোকালাইন-  
গোত্রীয় ঘোষ, কাশ্যপগোত্রীয় দে, শাঙল্যগোত্রীয় দে ও  
মোদগলাগোত্রীয় দাসবংশ বঙ্গের নানা স্থান হইতে আসিয়া  
মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে বাস করেন।

গত ৪০১৫০ বৎসরের মধ্যে দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থের সহিত  
এই শ্রেণীর কায়স্থগণের কতকগুলি আদানপ্রদান হইয়াছে,  
তাহাও জানা যায়। এই জেলার জকপুরগ্রামবাসী দক্ষিণরাষ্ট্রীয়

কায়স্থ পদ্মপাশ মিত্র কাঁথীর গড়-কিশোরনিবাসী মধ্যশ্রেণী-কায়স্থ রাজা যাদবরাম রায়ের দৌহিত্র রাজা স্বরূপ নারায়ণ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত রাজা যাদবরাম রায়ের দৌহিত্রের পুত্র ৬ রাজা মুকুন্দলাল রায়ের পুত্র রাজা উপেন্দ্র লাল রায় খানাকুল কৃষ্ণনগরের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ গোর বসু ও হরি বসুর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এইরূপ সম্বন্ধের অভাব নাই। এই সকল কারণে মধ্যশ্রেণী-কায়স্থগণকে বঙ্গের অন্যান্য কায়স্থগণের এক শাখা বলিয়াই মনে হয়।

এই শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে কাঁথীর গড়কিশোর-গ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় স্বর্গীয় রাজা যাদবরাম রায় ভাটপাড়া ইত্যাদি স্থানের বহুতর ব্রাহ্মণগণকে নিকরে জমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত জমি নানা দেশীয় ব্রাহ্মণগণ এ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

মেদিনীপুর জেলায় কাশ নামে এক নিম্ন জাতির বাস আছে, তাহাদের সহিত এই মধ্যশ্রেণী-কায়স্থগণের কোন সম্বন্ধ নাই।

**মধ্যশ্রেণী-ব্রাহ্মণ, মেদিনীপুর-জেলাবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।**

উৎকল ও বঙ্গের মধ্যস্থলে বাসহেতু তাঁহারা মধ্যশ্রেণী নামে গণ্য। কেহ কেহ মনে করেন যে, উৎকল (বৈদিক) ও রাঢ়ী-শ্রেণীর মিশ্রণে এই শ্রেণীর উৎপত্তি, এজন্য ইহারা মধ্যশ্রেণী নামে খ্যাত হইয়াছেন। মধ্যশ্রেণীর কুলজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ বলেন, যে সময় গৌড়াধিপ বল্লালসেন কুলমধ্যাদা স্থাপন করেন, সে সময় লক্ষ্মীপতি প্রভৃতি যে সকল ব্রাহ্মণ অশাক্তীয় বলিয়া বল্লালের কুলমধ্যাদা স্বীকার করেন নাই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং অথবা তাঁহাদের বংশধরগণ বল্লাল-রাজ্যসীমার বাহিরে মেদিনীপুরে আসিয়া বাস করেন, ও পুণ্ড্রোক্ত কারণে মধ্যশ্রেণী নামে খ্যাত হন।

মধ্যশ্রেণী নাম হইবার সম্বন্ধে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আরও দুইটি কারণ দেখাইয়া থাকেন। ১ম দেবীবরের সঙ্গে বিবাদ, ২য় গঙ্গাধরের বহু জ্ঞী মধ্যে এক জ্ঞীকে ভ্রমক্রমে মাতৃসম্বোধনহেতু মধ্যশ্রেণী নামে পৃথক্ থাক গঠন।

দেবীবরের সঙ্গে কেন বিবাদ হইল, এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়,—

দেবীবর সমগ্র রাঢ়-বঙ্গে রাঢ়ী কুলীন ব্রাহ্মণ মধ্যে মেল বন্ধন করিয়া বাঙ্গালার প্রান্তর্ভূমি মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে ভামুগ্রামবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ মেলবন্ধনের আবশ্যকতা অবধারণ করিবার জন্য এক মহাসভা আহ্বান করিলেন। ভামুয়ার নিকটবর্তী পিণ্ডকুট-গ্রামবাসী

ভরদ্বাজগোত্র গঙ্গাধরভট্ট সভাপতি হইলেন। তিনি উপস্থিত সভ্যগণের অভিপ্রায়ে মেলবন্ধনে আপত্তি করেন। তাহাতে দেবীবর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—

‘ক্রোধে বলে দেবীবর, কুল গেল রে গঙ্গাধর।’

রোষে বলে গঙ্গাধর, নির্কংশ যা দেবীবর ॥’

যাহা হউক, দেবীবর ব্যর্থমনোরথ হইয়া চলিয়া আসিলেন এবং তদবধি মেদিনীপুর জেলার তখনকার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া মধ্যশ্রেণী বলিয়া গণ্য হইলেন।

মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, সাবর্ণ, ঘৃতকৌশিক, কৃষ্ণাজেয়, পরাশর ও গোতম গোত্রই প্রধান। প্রথম পঞ্চগোত্রের গাঞী আছে এবং কাহার সন্তান তাহা বলিতে পারেন। গাঞী যথা—মুখটী, বাঁড়রী, চাঁটুতি, গাঙ্গোলা, ডিওসাই, মাঘচটক, চৌৎখণ্ডী, কাঞ্চিলাল, সাঁটেস্বরী, পাবহাল, পুতিতুও (টইয়া) ও অম্বলি। শেষোক্ত গোত্রগুলির গাঞী নাই এবং কাহার সন্তান, তাহাও বলিতে পারেন না। শেষোক্তগুলি বৈদিক।

ইহাদের সমাজ ছয়টি—১ ভামুয়া (ময়না-রাজবাটীর নিকট), ২ চাঁপাডালি (কাঞ্চিজোড়া-রাজবাটীর নিকট), ৩ গোকুলনগর (নাড়াজোল-রাজবাটীর নিকট), ৪ ভোগদণ্ড (কেদার পরগণায়), ৫ পীতপুর (চাঁপাডালির নিকট), ৬ মহারাজপুর (বাঁটালের নিকট)।

উপসমাজ দুইটি—গ্রামাট ও মুয়াড়।

ভামুয়া সমাজের আদি নৃসিংহ। এই সমাজেব প্রধানগণ ময়নারাজের সভাপণ্ডিত, চাঁপাডালি সমাজেব প্রধান কাঞ্চীজোড়া রাজের গুরু এবং পীতপুর সমাজের প্রধান কাঞ্চীজোড়ার সভাপণ্ডিত।

গঙ্গাধর ভট্ট (মুখটী গাঞি) মধ্যশ্রেণীর সমাজ গঠন করেন, এ কারণ তাঁহার সন্তানবর্গের সমাজে সমধিক সম্মান। বাসিবিবাহের দিন গঙ্গাধরের পদে তৈল দিবার জন্য তৈল-হরিদ্রা পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। চাঁপাডালির কায়দেব ভট্টাচাৰ্য্য দাশু বাঁড়ুয়ার (দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়) সন্তান, হনি বলিয়া গ্রাম হইতে চাঁপাডালি আগমন করেন। এখন ইহার বংশে ১৩শ পুরুষ হইয়াছে।

গোকুলনগরের সামাজিকেরা তিকড় চট্টের সন্তান। অবসখীব সন্তান বলিয়াও পরিচিত। প্রথমে ইহাদের আদি পুরুষ দনঞ্জয় পাটুলি হইতে রাণা, পরে রাণা হইতে গোকুলনগরে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের এক শাখা মহারাজপুরে গিয়া বাস করিয়াছেন।

ভোগদণ্ড-সমাজের ব্রাহ্মণেরাও দাশু বাঁড়ুয়ার সন্তান।

ইহাদের আদিপুরুষ অহংক। এই সমাজে দৈবজ্ঞবোধ ঘটে, গোকুলনগরের ভট্টাচার্য্যেরা ইহাদিগকে সমাজে তুলিয়া লয়েন।

পীতপুর-সমাজের প্রধানেরা পারিষদাল গাঞি, তট-নারায়ণের সন্তান, ইহারা সমাজে প্রধান। আদিপুরুষের নাম ত্রীপতি তর্কবাচস্পতি।

সুরাড়ে গঙ্গাধরের সন্তানগণ বাস করেন। ইহারা সমাজে বিশেষ সম্মানিত।

তমলুকের বর্গভীমার অধিকারীরা মধ্যশ্রেণী হইলেও আপ-নাগিগকে রাঢ়ারের সন্তান বলিয়াই পরিচয় দেন। ইহাদের আদি-বাস ত্রিবেণী। আদিপুরুষ কৃষ্ণদেব ও বিষ্ণুদেব দুই ভাই।

উক্ত সকল সমাজেই অনেক সুপণ্ডিত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সংক্ষিপ্তদ্বারের টীকাকার গোম্বীচন্দ্র (উখাসনী), সংক্ষিপ্ত-সারের টিপ্পনকার কবিচন্দ্র (শান্তিল্য) এবং অপর টিপ্পনী-কার কবিরত্ন চক্রবর্তী (ভরদ্বাজ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মধ্যসূত্র (ক্ৰী) মধ্যরেখা।

“রাফসালয়দেবোক্তঃ শৈলশ্যোর্মধ্যসূত্রগাঃ।

রোহীতকমবস্ত্রীক বধা সন্নিহিতং সরঃ ॥” (হৃদ্যসিকান্ত ১৬২)

মধ্যস্থ (ত্রি) মধ্যে বাদি-প্রতিবাদিনোরন্তরে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক।

মধ্যস্থারী, পর্যায়—নিম্নে।

“বন্ধুজাত্যরিমধ্যস্থমিত্রোদাদীনবিধিঃ।

“সর্ক এব হি সর্কেষাং ভবন্তি ক্রমশো মিথঃ ॥”

(ভাগবত ৬।১৬৫)

২ উভয়পক্ষহীন, যিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না।

“শ্রদ্ধা যুদ্ধোদ্যমং রামঃ ফুরুগাং সহ পাণ্ডবৈঃ।

তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্যস্থঃ প্রথমো কিল ॥”

(ভাগবত ১০।৭৮ অ০)

৩ স্বার্থরক্ষাপূরক পরার্থসাধক, যিনি নিজের অনিষ্ট না হয়, একরূপভাবে পরের কার্য সাধন করেন, তাঁহাকে মধ্যস্থ কহে।

“তে বৈ সংপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থস্য বাধেন যে মধ্যস্থাঃ পরকীরকার্যকুশলাঃ স্বার্থাবিরোধেন যে।

তেহমী মাছুষরাক্ষসাঃ পরহিতং যৈঃ স্বার্থতো হস্ততে

যে তু ব্রহ্ম নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে ॥” (প্রাণঃ)

মধ্যস্থতা (ক্ৰী) মধ্যস্থ্য ভাবঃ তল-টাণ্। মধ্যস্থের ভাব স্বার্থ, মধ্যস্থের কার্য।

“সর্কঃ স্বার্থপরো লোকঃ কুতো মধ্যস্থতা কচিং।”

(কামন্দকী নীতি ৮।৭১)

মধ্যস্থল (ক্ৰী) মধ্যং স্থলং, শরীরমধ্যবর্ত্তিভাং তথাং।

১ কটিদেশ। ২ মাঝখান।

“কুচো মরিসমিভো সুরজমধ্যমধ্যস্থলী।

অহো তিমিরমঞ্জরী সহচরী নরীন্দ্ৰ্যতে ॥” (উদ্ভট)

মধ্যস্থান (ক্ৰী) মধ্যং স্থানং। মধ্যভাগ।

মধ্যস্থিত (ত্রি) মধ্যে স্থিতঃ। মধ্যস্থ, মধ্যবর্তী।

মধ্যস্থরিত (ত্রি) শব্দের মধ্যস্থিত বর্ণের স্বরিতোচ্চারণভেদ।

(বাক্যসনেরপ্রতি ২।১)

মধ্যা (ক্ৰী) মধ্য-টাণ্। ১ মধ্যমাসুলি। ২ নারিকাবিশেষ।

যাহার লজ্জা ও মদনেচ্ছা উভয়ই সমান, তাহাকে মধ্য-নারিকা কহে। ইহার চেষ্টা—প্রিয়তম কৃতাপরাধ হইলে ধৈর্য্য এবং অধৈর্য্য হইলে বক্রোক্তি ও পক্ষ-বাক্যপ্রয়োগ—

“স্বাপে প্রিয়াননবিলোকনহানিরেব

স্বাপচ্যুতো প্রিয়করগ্রহণপ্রসঙ্গঃ।

ইথং সরোরুহমুখী পরিচিস্তরতী

স্বাপং বিধাতুমপি হাতুমপি প্রপেদে ॥” (রসমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে মধ্যার লক্ষণ এইরূপ লিখিত

আছে—

“লজ্জা আর রতি-আশা সমান যাহার।

রসিক পণ্ডিতে কহে মধ্যা নাম তার ॥

রতিরসে কৃতী পতি, মোরে ভাল বাসে অতি,

দেয় নিজানুরী কণ্ঠমালা।

আঁখি আড়ে নাহি রাখে, সদা কাছে কাছে থাকে,

সুখ বটে কিন্তু এক জালা ॥

নথাঘাত দেখি বৃকে, দস্তচিহ্ন দেখি মুখে,

সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা।

শয্যা ঠেকি এই দোষে, না হইলে পতি রোষে,

শরীর হইল খালা পালা ॥”

এই মধ্যানারিকা ধীরাদিভেদে তিন প্রকার, মধ্যাধীরা, মধ্যা-অধীরা ও মধ্যাধীরাধীরা। ইহাদের লক্ষণ—

“মানকালে মধ্যা প্রাগলভ্যার তিন ভেদ।

ধীরা অধীরা আর ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ ॥

প্রকারে প্রকাশে কোথ যে জন সে ধীরা।

সোজানুজী যাম কোথ সে হয় অধীরা ॥

কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় কোথ।

ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ ॥”

মধ্যাধীরার উদাহরণ—

“আজি প্রভু দড় দড়, বেশ বানায়ান্ধ বড়,

খেত-রক্ত-চন্দনের চাঁদ ভাল ধরেছ।

মন দেখি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, নয়ন হ’য়েছে রাঙ্গা,

বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে দোষ ক’রেছ ॥



তোমা বিনা প্রভু নাই,      যাইবার নাহি টাই,  
কামদেব চাঁদ ধেন তেন মন হ'রেছে।

অপরাধ ক্ষমা কর,      নূতন চন্দন পর,  
এই লও নবমালা বাসীমালা পরেছ।”

মধ্যা অধীরা—

“নোহাগ করিয়া নিত্য,      বলহ আমার ভৃত্য  
আজি দেখি একীকৃত্য দর্পণেতে চাও হে।

সুধরে কজ্জল-দাগ,      নয়নে তাঘুলরাগ,  
অলক্তাক্ত ভালভাগ কার কাছে পাও হে॥

মোরে প্রাণ ব'লে ডাক,      অস্ত্রের নিকটে থাক,  
বুঝিলাম মনোরাগ মনকলা খাও হে।

তোমা দেখে হয় ভীতি,      কঠিন তোমার রীতি,  
বুঝিহু তোমার প্রীতি যাও যাও যাও হে॥”

মধ্যা ধীরাধীরা—

“তুমি মোর প্রাণপতি,      কখন করিল রতি,  
বুঝি স্থখে ভুলেছিহু তেই নাই মনে হে।

বুকে দেখি নখচিহ্ন,      অধর দশনে ভিন্ন,  
ভালে আলতার দাগ রক্তমা নয়নে হে॥

শ্রম-বাক্ মুখ ধোও,      ক্ষণেক শয্যায় শোও,  
ছুঁয়া শুদ্ধ কর মালা তাঘুল চন্দনে হে।

কত জান ভারি ভূরি,      দেখিতে দেখিতে চূরি,  
পরিহার নমস্কার তোমা হেন জনে হে॥”

( ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী )

মধ্যাহ্নুলি (ত্রী) মধ্যমা অস্থলিঃ। তর্জ্জনী ও অনামিকার  
মধ্যস্থিত অস্থলি।

মধ্যানয়ন (ত্রী) গ্রহদিগের ফুট-গণনার প্রণালীবিশেষ।  
রবি প্রভৃতি গ্রহের ফুট গণনা করিতে হইলে শীঘ্র, মধ্য,  
কেন্দ্র প্রভৃতি স্থির করা আবশ্যক, নচেৎ গ্রহদিগের ফুট-  
রাশ্যাদির জ্ঞান হয় না। সূর্য্য মেঘে আছে, মেঘরাশি ৩০  
ডিগ্রী অর্থাৎ ত্রিশ অংশ। এই ত্রিশ অংশের মধ্যে রবি কোথায়  
আছে, কত অংশ, কত কলা এবং কত বিকলায় আছে,  
তাহার নির্ধারণের নামই ফুট। এই ফুট স্থির করিতে হইলে  
মধ্যানয়ন করিতে হয়। রবি প্রভৃতি সকল গ্রহেরই মধ্যানয়ন  
করা আবশ্যক। কেবল কেতুর মধ্যানয়নের নিয়ম দেখিতে  
পাওয়া যায় না, কারণ রাহগ্রহ যে রাশির যত অংশে অবস্থিত  
আছেন, তাহার সপ্তম রাশির তত অংশে কেতুগ্রহ থাকিবে;  
সুতরাং রাহুর মধ্যানয়ন করিলে কেতুর আর মধ্যানয়নের  
প্রয়োজন হয় না।

জ্যোতিষশাস্ত্রে মধ্যানয়নের নিয়ম লিখিত আছে। অধুনা

দিকাস্তরহস্তের মতেই প্রায় ফুটগণনা হইয়া থাকে। সূর্য্য-  
দিকাস্ত্র প্রভৃতি গ্রহের মতেও ফুট গণনা করিতে পারা যায়।  
রবি, বুধ ও শুক্রের মধ্যানয়নের নিয়ম—

প্রথমে অক্ষপিণ্ড ও দিনবৃন্দ স্থির করা আবশ্যক, অক্ষ-  
পিণ্ড ও দিনবৃন্দ নিম্নোক্তরূপে স্থির করিতে হয়। প্রথমে  
কত শকাব্দ চলিতেছে, তাহা স্থির করিয়া ঐ শকাব্দের অক্ষ  
হইতে ১৫১৩ অক্ষ বিয়োগ করিলে অক্ষপিণ্ড হইবে। এই  
অক্ষপিণ্ড দুই স্থলে রাখিয়া একটিকে ৩৬৪ ও অপরটিকে  
৭ দিয়া গুণ করিবে। এই দুই অক্ষও পৃথক্ স্থানে  
রাখা আবশ্যক। ঐ সপ্তগুণিত অক্ষপিণ্ডকে পুনরায়  
আর এক স্থানে রাখিয়া ১৩৫০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে।  
ভাগফল অস্ত্রস্থানস্থিত অক্ষপিণ্ডে যোগ করিয়া, অস্ত্র  
অক্ষপিণ্ডকে ১০০০ দিয়া গুণ করিবে। অতঃপর উহাতে  
১৩৩২ যোগ করা আবশ্যক। তদনন্তর ঐ সপ্তপূরিত অক্ষ-  
পিণ্ডে ঐ অক্ষ যোগ করিয়া ৮০০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে।  
ভাগফল যাহা থাকিবে, তাহাকে ৩৬৪ দিয়া গুণ করিবে,  
গুণফল অক্ষ অক্ষপিণ্ডে যোগ করিলে দিনবৃন্দ হয়।

“বিশেষযুক্তোক্তান (১৫১৩) শকাব্দপিণ্ডঃ

কৃতাদ্বার্টেম-(৩৬৪) গুণিতো নগ-(৭) ঘাং।

অদ্যং খবাণামিধরাংশ-(১৩৫০) যুক্তাং

সহস্র-(১০০০) নিম্নাদ্বয়মাগ্নিবিধিঃ-(১৩৩২)।

যুক্তাং খথাঠো-(৮০০) কৃতযুক্ত ক্রিয়াদি

গতাহযুক্তঃ শশিতো দিনৌষঃ।” (দিকাস্তরহস্ত)

এইরূপে অক্ষপিণ্ড ও দিনবৃন্দ স্থির করিয়া তাহার পর  
মধ্য স্থির করিতে হইবে। দিনবৃন্দ দুই স্থলে রাখিয়া  
একটিকে ৭০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে, ভাগফল যাহা লক্ষ  
হইবে, তাহা অপর ঐ লক্ষকে অপর দিনবৃন্দে হীন করিবে।  
পুনরায় দিনবৃন্দকে ৯০০০ দিয়া হরণ করিলে যে ভাগফল  
থাকিবে, তাহাই অংশাদি। তৎপরে অক্ষপিণ্ডকে ৮ দিয়া  
গুণ, পরে ৭০২ দিয়া ভাগ দিলে কলাদি নিরূপিত হয়। এই  
কলাদি পূর্ব্বস্থাপিত অংশাদিতে হীন করিবে। তাহার পর  
উহাতে দেশাস্তর-কলা হীন করিলে শুদ্ধদিনাদি হইবে। ঐ  
দিনকে ৩০ দিয়া ভাগ করিয়া, উহার ভাগশেষ অক্ষ দ্বারা  
অংশাদি সংস্থাপন করিবে। তৎপরে ঐ লক্ষকে ১২ দিয়া  
হরণ করিয়া লক্ষাক পরিভাগ করিবে। ইহার শেষ অক্ষ দ্বারা  
রাশি নির্ণয় হয়। তদনন্তর রাশি প্রভৃতিতে রবির ক্ষেপাক  
যোগ করিলে রবি, বুধ ও শুক্রের মধ্যরাশ্যাদি স্থির হইবে।  
রবি, বুধ ও শুক্র এই তিন গ্রহের পুঙ্কোক্তরূপে মধ্য স্থির  
করিতে হয়।

“দিনঃ ঋতুঃশ- ( ৭০ ) বিষুক্ দিনস্ত  
ঋতুগোহঃশো- ( ৯০০০ ) নিতমঃশকাস্তম্ ।  
গজা- ( ৮ ) হতাকাঙ্খিতপু ( ৭০২ ) লক্ষ-  
লিপ্তো নিত্যং স্বর্ঘ্যভুজ্ঞমধ্যম্ ॥  
রবিক্ষেপঃ ১১২৭।৫৬৪০।৩৭, রবিশুক্ৰবুধানাং মধ্যানি ।”  
( সিদ্ধান্তরহস্য )

চন্দ্রগ্রহের মধ্যানয়নপ্রণালী—

দিনবৃন্দকে তিন দিয়া পূরণ করিয়া দুই স্থলে রাখিবে ।  
একটিকে ১৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লক্ষ হইবে, ঐ লক্ষাক  
পূর্বোক্ত ত্রিগুণিত দিনবৃন্দে যোগ করিতে হইবে । পুনরায়  
ঐ দিনবৃন্দকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া যোগ করিলে অংশাদি  
হইবে । পুনরায় দিনবৃন্দকে ১৪০ দ্বারা ভাগ দিলে কলা  
প্রভৃতি স্থির করা যাইবে । উহা পূর্বস্থাপিত অংশাদিতে  
হীন করিবে । তৎপরে অক্ষপিকুণ্ডকে ৮০ দিয়া গুণ, ও ৬১০০  
দ্বারা ভাগ করিলে যে কলাদি লাভ হয়, তাহা যোগ  
করিয়া শুদ্ধ দিনাদি জানা যাইবে । ঐ দিনকে ৩০ ভাগ  
দিলে যাহা শেষ থাকিবে, তাহা দিন এবং লক্ষাক ১২ দিয়া  
হরণ করিলে যাহা শেষ থাকিবে, তাহা রাশি । ঐ রাশ্যাদিতে  
দেশান্তর কলা ৩৩৪৭।৮ হীন ও তাহাতে চন্দ্রের ক্ষেপাক  
যোগ দিলে চন্দ্রগ্রহের মধ্যরাশ্যাদি স্থির হইবে ।

“দিনঃ ত্রি- ( ৩ ) নিম্নঃ ঘন- ( ১৭ ) ভাগযুক্তঃ

মাশা- ( ২০ ) দ্ববসঃ বিধুরংশকাদি ।

বিঘস্রথেষ্ট্রাংশ ( ১৪০ ) কলঃ মলিপুঃ

কষ্টা- ( ৮১ ) হতাকাঙ্খিতপু ( ৬১০০ ) পৈঃ ॥

চন্দ্রক্ষেপঃ ৪১৬৫৩৫২২৩ । চন্দ্রমধ্যম্ ।” ( সিদ্ধান্তরহস্য )

মঙ্গলগ্রহের মধ্যানয়নপ্রণালী—

দিনবৃন্দকে দুই দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল লাভ  
হয়, তাহা এবং দিনবৃন্দকে ২০ দ্বারা হরণ করিয়া যাহা লাভ  
হয়, তাহাও একত্র যোগ করিবে । পুনরায় দিনবৃন্দকে  
১০২০ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফল যাহা হইবে, তাহা হইতে  
ক্ষিপ্যাক করিলে অবশিষ্টকে কুজাংশাদি জানিবে । পরে  
অক্ষপিকুণ্ডকে ১০ দিয়া পূরণ ও ১৯৯২ দ্বারা ভাগ করিয়া  
যাহা লক্ষ হইবে, তাহা স্থাপিত কুজাংশে কলাদি হীন  
করিবে, পরে তাহা হইতে দেশান্তর ১২২ কলা পরিত্যাগ  
করিবে । অনন্তর দিনসমূহকে ৩০ দিয়া হরণ করিয়া লক্ষাক  
দ্বাদশ দ্বারা ভাগাবশিষ্ট রাশি প্রভৃতিতে ক্ষেপ রাশ্যাদি ৭১০।  
১০৮৫০ যোগ করিলে মঙ্গলগ্রহের মধ্যরাশ্যাদি স্থির হইবে ।

“দিনঃ যমা- ( ২ ) পুং নথ- ( ২০ ) ভাগযুক্তঃ

দিনাষ্ট্রাংশ- ( ১০২০ ) বিষুক্ কুজঃ স্যাৎ ।

অংশাদিরক্ষাদ্ গুণিতাং ঋতুগোহঃশো- ( ১০ )

নেত্রাক্ষগোহঃ- ( ১৯৯২ ) দ্বতলিপ্তিকো নঃ ॥

মঙ্গলক্ষেপঃ—৭১০।১০৮৫০, মঙ্গলমধ্যম্ ।” ( সিদ্ধান্তরহস্য )

বৃহস্পতিগ্রহের মধ্যানয়নের নিয়ম—

দিনবৃন্দকে দুই দিয়া গুণ করিয়া ৭০৩ দিয়া ভাগ করিলে  
যে ভাগফল হয়, ঐ ফল দ্বিগুণিত দিনবৃন্দে হীন করিয়া  
যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা  
লক্ষাক হইবে, তাহা বৃহস্পতির অংশাদি, তৎপরে অক্ষ-  
পিকুণ্ডকে ৪ দিয়া পূরণ করিয়া ২০৭০ দিয়া ভাগ দিতে হইবে ।  
ইহা দ্বারা কলাদি লাভ হইবে । ইহা পূর্বস্থাপিত অংশাদির  
কলাদিতে যোগ করিয়া দেশান্তর পল ১৩০, হীন করিলে বৃহ-  
স্পতির শুদ্ধ অংশাদি হয় । পরে দিনগণকে ৩০ দিয়া ভাগ  
করিলে যাহা শেষ থাকিবে, তাহা অংশ এবং লক্ষাককে ১২  
দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহা রাশি । এই  
প্রকারে রাশ্যাদি সংস্থাপন করিয়া তাহাতে ক্ষেপাক  
৬২৯৫০।৪৮৯ যোগ করিলে বৃহস্পতির মধ্যরাশ্যাদি হইবে ।

“দিনঃ যমঃ ত্রিগুণঃ ( ৭০৩ ) লক্ষ-

হীনাদিনাদ্ দ্বাদশলক্ষমিধ্যম্ ।

অংশাদিরক্ষাদ্গগমেন ( ৪ ) নিম্নাং

থাগাভ্রনেত্রা- ( ২০৭০ ) শুকলাষ্ট্রিতশ্চ ॥

বৃহস্পতিক্ষেপঃ ৬২৯৫০।৪৮৯ । বৃহস্পতিমধ্যম্ ।” ( সিদ্ধান্তরহস্য )

শনিগ্রহের মধ্যানয়নপ্রণালী—

দিনবৃন্দকে ৩০ দিয়া হরণ করিয়া লক্ষাক দুই স্থলে রাখিয়া  
দিবে । পরে একটিকে ৩১৫ দিয়া ভাগ করিলে যে অক্ষ লক্ষ  
হইবে, তাহা পূর্বস্থাপিত অক্ষে যোগ করিলে যে ফল হইবে,  
ঐ অক্ষ শনিমধ্যের অংশাদি । অনন্তর দ্বিগুণিত অক্ষপিকুণ্ডকে  
৫৯১ দিয়া ভাগ করিয়া লক্ষকলাদি হইবে, উহা তাহাতে যোগ  
করিয়া পরে দেশান্তর পল হীন করিলে শুদ্ধ দিনাদি হইবে ।  
তৎপরে পূর্বের ত্রায় দিনাদি ৩০ এবং দ্বাদশ দ্বারা হরণ ও  
শেষে রাশ্যাদি সংস্থাপন করিয়া ক্ষেপাক ২৮১০।৫৪৫ যোগ  
করিলে শনিমধ্যের রাশ্যাদি স্থির হইবে ।

“মন্দোচ্চ্যবৃন্দাং খণ্ডগৈ- ( ৩০ ) বিতক্তঃ

সবাগচন্দ্রাণ্যিবলেন ( ৩১৫ ) যুক্তঃ ।

অংশাদিরক্ষাদ্গগমেন ( ২ ) নিম্নাং

ভূনন্দবাগোদৃ- ( ৫৯১ ) লিপ্তিকাচাঃ ॥

শনিক্ষেপঃ ২৮১০।৫৪৫, শনিমধ্যম্ ।” ( সিদ্ধান্তরহস্য )

রাহুগ্রহের মধ্যানয়নপ্রণালী—

দিনবৃন্দকে ২০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে,  
তাহা একস্থানে রাখিয়া পুনরায় দিনবৃন্দকে ৩ দিয়া পূরণ

করিবে। পরে ১০০৫ দিয়া হরণ করিয়া লক্ষ্য পূর্ণস্থাপিত  
অঙ্কে যোগ করিলে রাহমণ্যের অংশাদি হইবে। তৎপরে  
অক্ষপাণ্ডকে ৬ দিয়া পূরণ করিয়া ৪২১ দিয়া ভাগ দিলে যে  
কলাদি লক্ষ হইবে, তাহা পূর্বাঙ্কে যোগ করিয়া দেশান্তরপল  
বিপল ৮৯ হান করিলে রাহর শুক্রদিনাদি নিশ্চয় হইবে।  
পরে দিনসমূহকে ৩০ দিয়া ভাগ করিয়া বাহা শেষ থাকিবে,  
তাহা অংশ এবং লক্ষ্য ১২ দ্বারা ভাগ দিলে বাহা শেষ,  
তাহা রাশি। ইহা সংস্থাপিত করিয়া রাহর ক্রোপাক ৮১২৬৩০।  
৪১১৫, যোগ করিলে রাহগ্রহের মধ্যরাশিাদি স্থির হইবে।

“দিনং নখাপ্ত (২০) ত্রি-(৩) হতহ্যবৃন্দাং

বাণাভ্রদিচ্ (১০০৫) লক্ষ্যগুণং শকাভ্যম্।

রসাহতাদ্যং কুয়মাকি (৪২১) লক্ষ-

লিপ্তাযুতোহংগুর্ধিপরীতগত্যা ॥

রাহক্লেপঃ—৮১২৬৩০।৪১১৫।” (সিদ্ধান্তরহস্য)

এইরূপ প্রণালী অম্বসারে রবি প্রভৃতি গ্রহের মধ্যানয়ন  
করিতে হয়।

সহজে মধ্যানয়ন করিবার জন্ত সিদ্ধান্তরহস্যে রবি  
প্রভৃতি গ্রহের কতকগুলি খণ্ডা লিখিত আছে। ঐ সকল  
খণ্ডা দ্বারা অতি সহজেই রবি প্রভৃতি গ্রহদিগের মধ্যানয়ন  
করিতে পারা যায়। ঐ সকল খণ্ডা কতকগুলি নির্দিষ্ট  
অক্ষমাত্র। ঐ খণ্ডার অক্ষপাণ্ড ও দিনবৃন্দ যোগ করিলে  
ফলভাগ প্রভৃতি না করিয়াই উহা স্থির করা যায়। বাহুল্য  
ভয়ে ঐ সকল খণ্ডা লিখিত হইল না। কিন্তু কি উপায়ে  
খণ্ডা দ্বারা মধ্য স্থির হয়, সেই নিয়ম প্রদর্শিত হইল।  
কেবল সিদ্ধান্তরহস্যে এই খণ্ডা দেখিয়া লইলে এই নিয়মাত্ম-  
নারে স্থির হইবে। ঐ সকল প্রত্যেক গ্রহের ছয় ছয়টি  
কোঠা লিখিত আছে, প্রত্যেক কোঠায় নয় শ্রেণী অঙ্ক  
আছে। ইহার প্রথম কোঠা এককের সংখ্যা, দ্বিতীয় কোঠা  
দশকের, তৃতীয় কোঠা শতকের, চতুর্থ কোঠা সহস্রের, পঞ্চম-  
কোঠা অশ্বতের, ও ষষ্ঠ কোঠা লক্ষের সংখ্যা জানিতে হইবে।

দিনবৃন্দের এককাদি সংখ্যায় যত অঙ্ক থাকিবে, এককাদি  
কোষ্ঠার সেই সংখ্যার শ্রেণীর রাশি, অংশ, কলা, বিকলা,  
অঙ্কলক্রমে গ্রহণ করিয়া একত্র যোগ করিতে হইবে। পরে  
তাহাতে ক্লেপ যোগ করিলে বাহা হইবে, তাহা সেই গ্রহের  
দিনবৃন্দ দিবসের দুইগ্রহর এবং রাত্রির মধ্য ও শীতাদি হইবে।

সমস্ত অঙ্ক যোগ করিলে যদি বার রাশির অধিক হয়,  
তাহা হইলে বার বাদ দিয়া লইতে হইবে। দিনবৃন্দাঙ্কের  
একক দশক করিয়া গণনার সময় শূন্য প্রাপ্ত হইলে সেই  
সংখ্যার কোষ্ঠার অঙ্ক গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাহ।

মধ্যান্তিক (পুং) তৃতীয় বৌদ্ধ স্থির।

মধ্যান্তিকেশ্বর (পুং) লিখুভেদ, নেবু।

মধ্যায়ুস্ (স্ত্রী) মধ্যঃ আয়ুঃ। মধ্যমরূপ আয়ুঃ। সাধারণতঃ  
জীবগণ দীর্ঘায়ুঃ, মধ্যায়ুঃ ও অল্পায়ুঃ এই ত্রিবিধ আয়ুঃ প্রাপ্ত  
হইয়া থাকে। ৩৩ বৎসর হইতে ৬৫ বৎসর পর্যন্ত মধ্যায়ুঃ  
বলা যায়। জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা এই আয়ু স্থির করা যায়।  
জ্যোতিষে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

“বলহীনে বিলয়েশে জীবৈ কেদ্রত্রিকোণগে।

ষষ্ঠাষ্টমবায়ে পাপে মধ্যায়ুরুদাহতম্ ॥

শুভে কেদ্রে ত্রিকোণস্থে শনৌ বলসম্বিতে।

ষষ্ঠে বাপাষ্টমে পাপে মধ্যায়ুরুদাহতম্ ॥

লগ্নে ত্রিকোণে কেদ্রে বা মধ্যায়ুশ্চ মিশ্রিতে ॥”

(সর্গার্থচিন্তাঃ)

লগ্নাধিপতি বলবান্ বৃহস্পতি কেদ্রে বা কোণস্থিত, (লগ্ন,  
চতুর্থ, সপ্তম ও দশমের নাম কেদ্রে এবং নবম ও পঞ্চমের  
নাম কোণ) হইলে এবং ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে পাপগ্রহ  
থাকিলে জাতকের মধ্যায়ুঃ হইয়া থাকে। কেদ্রে ও কোণে  
শুভগ্রহ শনি বলবান্ এবং ষষ্ঠাষ্টমে পাপগ্রহ হইলেও মধ্যায়ুঃ  
হয়। ইহা ভিন্ন লগ্ন ও কেদ্রে কোণে তুল্য পরিমাণ শুভাশুভ  
যোগ হইলেও মধ্যায়ুঃ হয়।

“জন্মলগ্নেশ্বরঃ খেটো ভানোরধিস্থঃ সূর্যদৃ।

বা চেদীর্ঘায়ুরপবা সমে মধ্যায়ুরুচ্যতে ॥” (সর্গার্থচিন্তাঃ)

যদি রবি লগ্নাধিপতি হয়, আর জন্ম-রাশিধিপতির সহিত  
যদি রবির সমভাব হয়, তাহা হইলে মধ্যায়ুঃ। যদি রবি  
লগ্ন ও রাশি উভয়েরই অধিপতি হয়, তাহা হইলে রবি যে  
রাশিতে থাকে, সেই রাশির অধিপতির সহিত সমভাবাপন্ন  
হইলেও মধ্যায়ুঃ হয়। [আয়ুর্দায় ও মৃত্যু দেখ।]

মধ্যার্জুন—১ কাবেরী ও কোলকর্ণনদীর মধ্যস্থিত পুণ্যক্ষেত্র।

এখানকার স্থলপুরাণে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ২ বটারণ্যের  
২ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত ক্ষেত্রভেদ। (দেশাবলী)

মধ্যাবর্ষ (স্ত্রী) বর্ষার মধ্যভাগ।

মধ্যান্ত্রি, লতাভেদ (Grewia Asiatica)

মধ্যাহ্নারীণীলপি (স্ত্রী) ললিতবিস্তরবর্ণিত ৬৪ প্রকার  
লিপির মধ্যে একপ্রকার লপি।

মধ্যাহ্ন (পুং) মধ্যঃ অহঃ, সমাসান্তঃ টচ, (অহোহ্ন  
এতেভাঃ। পা ৪।৪।৮৮) ইত্যাহ্নাদেশঃ, পুংস্বক্। দিবসের  
অষ্টমুহূর্ত্তাঙ্ক মধ্যভাগ, ইহার অপর নাম কুতপ-কাল।

“অহো মুহূর্ত্তো বিখ্যাতো দশপঞ্চ চ সর্বদা।

তত্রাষ্টমো মুহূর্ত্তো যঃ সঃ কালঃ কুতপঃ স্ততঃ ॥

মধ্যাহ্নে সৰ্বদা যশস্বিনী ভবতি ভাস্করঃ ।

তস্মাদনন্তকলদন্তরারম্ভো বিশিধ্যতে ॥”

( মৎস্যপু. শ্রাদ্ধক. ২২ অ. )

মধ্যাহ্নকালে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সাধারণ বিধি, যদি কোন তিথি উভয় দিনই মধ্যাহ্নব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে কোন দিন হইবে, ইত্যাদির সীমাংসার জন্ত কুতব-রোহিণ ও সঙ্গব প্রভৃতি মধ্যাহ্নের বিভাগ আছে।

[ ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রাদ্ধ দেখ। ]

২ ত্রিধা বিভক্ত দিনের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্নের ইহাই সাধারণ অর্থ। দিবামান ৩০ দণ্ড হইলে প্রথম দশদণ্ড বাদ দিয়া বৈশাখ দণ্ড তাহাই মধ্যাহ্ন। দিনমানের কমি বেনী স্থলে ভাগ-হার দ্বারা মধ্যাহ্নকাল নির্ণয় করিতে হয়। পূর্বাঙ্ক, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন এইরূপে দিনমানের তিনটা ভাগ করিত হইয়াছে। পূর্বাঙ্ককাল দেবপূজার জন্ত, মধ্যাহ্নকাল পিতৃকৃত্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি এবং অপরাহ্নকালে কেবল সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধের জন্ত বিহিত হইয়াছে।

৩ পঞ্চাধা বিভক্তদিনের তৃতীয় ভাগ। দিবামানকে পাঁচ ভাগে বিভাগ করিয়া প্রথম দুইভাগ বাদ দিয়া তৃতীয়ভাগের নাম মধ্যাহ্ন। এই কাল ১২ দণ্ডের পর ৬ দণ্ড।

“প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাঃ স্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেবত্ব।

• মধ্যাহ্নমুহূর্ত্তঃ স্ত্রীন্” ( দক্ষসং. )

মধ্যেগঙ্গ ( অবা. ) গঙ্গায়াঃ মধ্যং ( পারে মধ্যে বষ্ঠা বা। পা ২।১।১৮ ) ইত্যব্যয়ীভাবসমাসঃ। গঙ্গার মধ্য। অব্যয়ীভাবসমাস হইলে অব্যয় হয়, এই জন্ত এই শব্দ অব্যয়।

মধ্যেগুরু ( ত্রি ) মধ্যে গুরুঃ, ( মধ্যাঙ্গুরো। পা ৬।৩।১১ ) ইতি সপ্তম্যা অনুক্। মধ্যদেশে গুরুশব্দযুক্ত।

মধ্যেজ্যোতিস্ ( ত্রী ) ত্রিষ্টুত্বেন্দ্রের নামান্তর।

মধ্যেনগর ( অবা. ) নগরস্য মধ্যং। নগরের মধ্যভাগ।

মধ্যেনদি ( অবা. ) নদ্যাঃ মধ্যং। নদীর মধ্যভাগ।

মধ্যেপৃষ্ঠ ( অবা. ) পৃষ্ঠস্য মধ্যং। পৃষ্ঠের মধ্যভাগ।

মধ্যেমার্গ ( অবা. ) মার্গস্য মধ্যং। মার্গের মধ্যভাগ, পথের মধ্য।

মধ্যেবারি ( অবা. ) বারিণো মধ্যং। জলের মধ্যভাগ।

মধ্যেসভ ( অবা. ) সভায়াঃ মধ্যং। সভার মধ্যভাগ।

মধ্যেদাত্ত ( ত্রি ) মধ্যবর্ণে উদাত্তযুক্ত।

মধ্ব ( পুং ) ইহার প্রকৃত নাম মধু। মধ্বসম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

[ মধ্বাচার্য দেখ। ]

মধ্বক ( পুং ) মৌমাছি।

মধ্বক ( ত্রি ) মধুর স্বায় অক্ষিযুক্ত।

মধ্বদ্ ( ত্রি ) মধু-অদ্-কিপ্। উদকপায়ী। “যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ স্পর্গাণি বিশিষ্টে” ( ঋক্ ১।১৬৪।২২ ) ‘মধ্বদঃ উদকস্রোতারঃ’ ( সায়ণ ) ২ মধুপানকারী।

মধ্বমুখভঙ্গ ( পুং ) } অঙ্গরদীক্ষিত-রচিত মধ্বাচার্যের  
মধ্বমুখমর্দন ( ক্রী ) } মতথওনবিষয়ক গ্রন্থ।

মধ্বর্গস্ ( ত্রি ) মধুরঙ্গলযুক্ত। “অপিষন্ মধ্বর্গসো নদ্যা-শততঃ” ( ঋক্ ১।৬২।৬ ) ‘মধ্বর্গসো মধুরোদকশততঃশো নদ্যাঃ’।

মধ্বরিষ্ঠ ( ক্রী ) গ্রহণীরোগোক্ত অরিষ্ঠভেদ।

( চক্রদত্ত চি. ১২ অ. )

মধ্বল ( পুং ) মধু অলভীতি অল্-অণ্, সংখ্যাপূর্ককৃত্বাং বৃদ্ধা-ভাবঃ। মধুবার, অতিপান, পুনঃপুনঃ সুরাপানপরিপাটী।

মধ্বজীলা ( ক্রী ) মধুগুচ্ছ।

মধ্বাচার্য, মধ্বাচার্যের মতাবলম্বি-সম্প্রদায়ভেদ। [মাধ্ব দেখ] মধ্বাচার্য, মাধ্ব বা মধ্বাচারি-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক একজন মহাত্মা। ইনি দক্ষিণাপথের অন্তর্গত তুলুভূমিবাসী মধিকী-ভট্টের পুত্র। প্রথমে তাঁহার নাম হইয়াছিল বহুদেবাচার্য। নারায়ণ-পণ্ডিতরচিত মধ্বাচার্যবিজয় প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে লিখিত আছে;—স্বয়ং বায়ু নারায়ণের আদেশে ধর্মসংস্থাপনার্থ আবির্ভূত হইয়া মধ্বাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার আবির্ভাবকাল ১১২১ শক। তিনি বাল্যকালে অনন্তেশ্বরের মঠে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। ৯ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সনককুলোদ্ভব অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্যের (অপর নাম শুকানন্দ) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার পর তিনি গুরুদত্ত পূর্ণ-প্রজ্ঞ নাম লইলেন। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইয়াছিল। সংসারপরিত্যাগের পর তিনি আনন্দতীর্থ, আনন্দজ্ঞান, জ্ঞানানন্দ, আনন্দগিরি প্রভৃতি নামেও পরিচিত হইলেন।

মধ্ববিজয়ে লিখিত আছে,—তিনি গীতাভাষ্য প্রণয়ন করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং তথায় ব্যাসদেবকে ঐ গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন। ব্যাসদেবও প্রীত হইয়া তাঁহাকে তিনটা শালগ্রাম শিলা অর্পণ করেন। এই শিলাত্রয় মধ্বাচার্যের যত্নে সুরক্ষণা, উদ্দিশি, মধ্যতল এই তিন স্থানের মঠে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত শালগ্রাম ব্যতীত তিনি উদ্দিশিতে এক কৃষ্ণমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও এইরূপ উপাখ্যান আছে,—

কোন বণিকের একখানি অর্ণবপোত হারকা হইতে মল-বারে গমনকালে তুলুবের নিকট গিয়া অকস্মাৎ ডুবিয়া যায়। সেই জলখানে এক কৃষ্ণবিগ্রহ গোপীচন্দন মৃত্তিকায় ঢাকা ছিল। মধ্বাচার্য্য দৈবজ্ঞানবলে তাহা জানিতে পারিয়া

জল হইতে বিগ্রহকে উত্তোলনপূর্ব্বক উদ্দিপিতে প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি উদ্দিপিত মধ্বাচার্য্যদিগের প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইল। মধ্বাচার্য্য উদ্দিপিতে কিছুকাল থাকিয়া ৩৭ খানি মূলগ্রন্থ ও কতকগুলি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। গ্রন্থমালিকা-স্তোত্রে ঐ ৩৭ খানির উল্লেখ আছে, যথা—

১ ঈশাবাস্তোপনিষদ্ভাষ্য, ২ উপাধিখণ্ডন, ৩ শ্লোকময়-  
ঋগ্বেদভাষ্য, ৪ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য ও তট্টপ্লনী, ৫ কথালক্ষণ,  
৬ কৃষ্ণাকর্ণামৃতমহার্ণব, ৭ কর্মনির্ণয়, ৮ কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য  
ও তট্টপ্লনী, ৯ কেনোপনিষদ্ভাষ্য ও তট্টপ্লনী, ১০ ছান্দোগ্যো-  
পনিষদ্ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, ১১ জয়ন্তীকল্প, ১২ তত্ত্ববিবেক,  
১৩ তত্ত্বসংখ্যান, ১৪ তত্ত্বোদ্যোত, ১৫ তত্ত্বসার, ১৬ তৈত্তিরীয়ো-  
পনিষদ্ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, ১৭ দ্বাদশস্তোত্র, ১৮ নরসিংহ-  
নথ্যস্তোত্র, ১৯ প্রপঞ্চ-সিদ্ধান্তানুমানখণ্ডন, ২০ প্রমাণলক্ষণ,  
২১ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, ২২ বৃহদারণ্যকভাষ্য  
ও তাহার টিপ্পনী, ২৩ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও তাহার টীকা, ২৪ ব্রহ্ম-  
সূত্রামৃতভাষ্য, ২৫ ব্রহ্মসূত্রানুব্যাহা (ত্ৰায়বিবরণ),  
২৬ ভগবদ্গীতাভাষ্যনির্ণয়, ২৭ ভগবদ্গীতাভাষ্য, ২৮ তাৎপৰ্য-  
পূরণভাষ্যনির্ণয়, ২৯ মহাভারতভাষ্যনির্ণয়, ৩০ মাণ্ডু-  
ক্যোপনিষদ্ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, ৩১ মায়াবাদখণ্ডন, ৩২ মুণ্ড-  
কোপনিষদ্ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, ৩৩ বতিপ্রণবকল্প, ৩৪ খমক-  
ভারত, ৩৫ বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়, ৩৬ সদাচারস্বত্ব, ৩৭ সন্ন্যাসপদ্ধতি।

উপরোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত আত্মজ্ঞানোপদেশটীকা, আখ্যা-  
স্তোত্র, উপদেশসাহস্রীটীকা, উপনিষৎপ্রস্থান, কৈবল্যোপনিষ-  
দ্ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, কোষীতক্যোপনিষদ্ভাষ্যটিপ্পনী, খণ্ডপু-  
টীকা, গুরুস্বত্ব, গোবিন্দভাষ্যপীঠক, গোবিন্দাষ্টকটীকা, গোড়পাদীয়ভাষ্যটীকা, তৈত্তিরীয়শ্রুতিবার্তিকটীকা, ত্রিপুরী-  
প্রকরণটীকা, নারায়ণোপনিষদ্ভাষ্যটিপ্পনী, ত্ৰায়বিবরণ, পক্ষী-  
করণপ্রক্রিয়াবিবরণ, বৃহজ্জাবলোপনিষদ্ভাষ্য, বৃহদারণ্যক-  
বার্তিকটীকা, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যনির্ণয়, ব্রহ্মানন্দ, তত্ত্বসারসংগ্রহ, ভগব-  
দ্গীতা প্রস্থান, ভগবদ্গীতাভাষ্যবিবেচন, মিতভাবিণী, রামোত্তর-  
ভাষ্যনির্ণয়ভাষ্য, বাক্যবৃত্তিবিবরণ, বাক্যসুধাটীকা, বিষয়সংগ্রহ-  
নামভাষ্য, বেদান্তবার্তিক, শতশ্লোকীটীকা, সংহিতোপনিষ-  
দ্ভাষ্যটিপ্পনী, সত্ত্ব, সদাচারস্বত্বস্তোত্র, সূত্রপ্রস্থান, স্বত্ববিবরণ,  
স্বত্বসারসংগ্রহ, স্বরূপনির্ণয়টীকা, হরিমীড়োস্তোত্রটীকা  
ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়। উপরোক্ত সমস্ত  
গ্রন্থের মধ্যে মধ্বভাষ্য অর্থাৎ দ্বৈতপক্ষে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যই সর্ব-  
প্রধান ও মধ্বাচার্য্যের যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপরিচায়ক।

কিছুদিন পরে মধ্বাচার্য্য দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া দাক্ষি-  
ণাত্যের শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যদিগকে বিচারে পরাস্ত

করিয়া অবশেষে বদরিকাশ্রমে গমন করেন। মধ্বাচার্য্য-  
দিগের বিশ্বাস, আজও তিনি তথায় অবস্থান করিতেছেন।  
১১২১ শকে ( ১১২২ খৃষ্টাব্দে ) তাঁহার তিরোধান ঘটে।

মধ্বাচার্য্যের পাণ্ডিত্যগুণে বিমুগ্ধ হইয়া অল্পদিন মধ্যেই  
বহুসংখ্যক শিষ্য হইয়াছিলেন। তিনিও শিষ্যগণের সুবিধার  
জন্ত উদ্দিপির মন্দির ব্যতীত স্থানে স্থানে আরও আটটা মন্দির  
স্থাপন করিয়া তাহাতে যথাক্রমে রামগীতা, লক্ষ্মণগীতা, বিভূজ-  
কালীয়দমন, চতুর্ভুজকালীয়দমন, সুবিট্টল এহরূপ অষ্ট মূর্ত্তি  
প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ ভ্রাতা ও গোদাবরীতীরস্থ ব্রাহ্মণ-  
কুলোদ্ভব আটজন সন্ন্যাসীকে ঐ সকল মন্দিরের অধ্যক্ষপদ  
প্রদান করেন। সেই সকল মন্দির এখনও রহিয়াছে ও  
শিষ্যপরম্পরা অধ্যক্ষতা করিয়া আসিতেছেন। আটটা  
মন্দিরই তুলুবার অন্তর্গত।

মধ্বাচার্য্য প্রিয়শিষ্য পদ্মনাভতীর্থকে রামচন্দ্রমূর্ত্তি ও  
ব্যাসপ্রদত্ত শালগ্রাম শিলা প্রদান করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন,  
‘আমার মত প্রচার কর আর উদ্দিপির মন্দিরের ব্যয়নিস্কাহার্থ  
ধনরত্ন সংগ্রহ কর।’ গুরুর উপদেশক্রমে পদ্মনাভ চারিটা মঠ  
স্থাপন করেন। তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা তথাকার  
অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন।

মধ্বাচার্য্যের মতে,—সর্বপ্রাণে একমাত্র অদ্বিতীয় আনন্দ-  
স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ ছিলেন, তখন কি ব্রহ্মা কি শঙ্কর  
কেহই ছিলেন না।\* সেই বিষ্ণুর দেহ হইতেই সমুদয় জগৎ  
উৎপন্ন হইয়াছে।† তিনি জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ সত্তা স্বীকার  
করায় তাঁহার মত দ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।  
তাঁহার মতে, একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই অশেষ সদ্গুণসম্পন্ন,  
নির্দোষ ও স্বতন্ত্র, তত্ত্বিন্ন আর সমস্তই অস্বতন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের  
অধীন। মহোপনিষদের এই উক্তি হইতে মধ্বাচার্য্যের  
মতের প্রকৃত আভাস পাওয়া যায়। যথা—

“যথা পক্ষী চ হৃদয়ং নান্যাত্মকং যথা।

যথা নভঃ সমুদ্রাণ্য চ শুদ্ধোদলবর্ণে যথা ॥

চৌরোপহৃদ্যো চ যথা যথা পুংবিষয়াবপি।

তথা জীবৈশ্বর্য্যো তির্য্যো সর্বদেববিলক্ষণো ॥”

পক্ষী ও হৃদয়ে, বৃক্ষ ও রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধ জল ও  
লবণে, চৌর ও অপকৃত দ্রব্যে এবং পুরুষ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে  
যেমন পার্থক্য, ঈশ্বর ও জীব সেইরূপ পরম্পর তিন্ন ও বিল-

\* “একো নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।

আনন্দ এক এবাং আসীন্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥”

† “বিক্রোদে হাঙ্কগং সর্বমাবিরালীং।”

ক্ষণ। জীবেশ্বরের অভেদ ভিন্ন মধ্বাচার্য আরও পঞ্চপ্রকার ভেদজ্ঞান স্বীকার করেন। যথা—

জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জড়জীবভেদ এবং জীব-গণের ও জড়পদার্থের পরস্পরভেদ। এই পঞ্চভেদই মধ্বাচার্য্যকর্তৃক ‘প্রপঞ্চ’ নামে বর্ণিত হইয়াছে।\* তাঁহার প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানখণ্ডনগ্রন্থে এই প্রপঞ্চের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

তিনি পরমাত্মায় জীবের লয় বা বিকল্পানুষ্টি অথবা পাণ্ডপতদিগের যোগ ও পঞ্চরাত্রদিগের সাযুজ্যও স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, নারায়ণ বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মী, ভূমি ও নীলাদেবী এই তিন পত্নীর সঙ্গে স্বর্গীয় বেশভূষায় সুশোভিত হইয়া অনির্বচনীয় ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি স্বরূপাবস্থায় গুণাতীত, কিন্তু যখন মায়ার সহিত সংযুক্ত হন, তখন সব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবরূপে আবির্ভূত হইয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। ময়া হইতে তাঁহাদিগের উদ্ভব ও মায়ার যোগেই তাঁহারা স্ব স্ব কাৰ্য্য সম্পাদন করেন। বিশ্বকারণ বিষ্ণু হৃদয়, ললাট ও পার্শ্বদেশ এবং অন্ত্রাঙ্গ অঙ্গ হইতে শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

তিনি আপন শিষ্যমণ্ডলীকে এইরূপ সাধনপ্রণালী উপদেশ করিয়াছেন—

সাধনার অঙ্গ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমে অঙ্কন বা বিভিন্ন অঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খচক্রাদি চিহ্নধারণ। দ্বিতীয় অঙ্গ—নামকরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর নামানুসারে পুত্রাদির নাম রাখা। তৃতীয় অঙ্গ—ভজন, কাব্যিক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ ভজন। দান, পরিভ্রাণ ও পরিরক্ষণ এই ত্রিবিধ কাব্যিক ভজন; সত্য, হিত ও প্রিয়কথন এবং শাস্ত্রানুশীলন এই চারিটি বাচিক ভজন; দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক ভজন। ইহার এক একটি সম্পাদনপূর্ব্বক নারায়ণে আত্মসমর্পণ করাকেই ভজন বলে।† তাঁহার মতে, বিষ্ণুর প্রসাদে চরমসুখপ্রাপ্তিই মনুষ্যের একমাত্র কামনার বিষয় ও সাধনের মুখ্য প্রয়োজন। শিব ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ অনিত্য ও ক্ষরশব্দব্যাচ্য, কেবল লক্ষ্মীই

অক্ষর। বিষ্ণু ঐ ক্ষরাক্ষর হইতে প্রধান ও স্বতন্ত্র।\* বিষ্ণুর গুণোৎকর্ষের জ্ঞান হইলেই তাঁহার প্রসাদপ্রাপ্তি ঘটে, জীবেশ্বরের অভেদ মানিলে যে তিনি অমুকুল হন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।† বিষ্ণুর প্রতি ষাঁহার প্রীতি জন্মে, তাঁহার আর জন্মান্তর হয় না। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া সারূপ্য, সালোক্য, সামিথ্য ও সান্ধি এই চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করিয়া অনির্বচনীয় সুখভোগ করিয়া থাকেন।

অনেকেই মনে করেন যে, মধ্বাচার্য্য প্রথমে শৈবব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন এবং শৈব ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদভঞ্নের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু হহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার আদিনাম ‘বাসুদেব’ ছিল, এই নাম হইতেই তিনি আজন্ম বৈষ্ণব ছিলেন, বোধ হইতেছে। বৈষ্ণবগৃহে জন্ম হইলেও আদিবৈষ্ণবদিগের স্থান পাক্ষরাত্র-মতে তাঁহার আস্থা ছিল না। পাক্ষরাত্র-দিগের ‘বাসুদেব’ই উপাত্ত, কিন্তু তিনি বাসুদেবের স্থানে ‘বিষ্ণু’কে স্থাপন করিয়াছিলেন। পুরাবিদগণ মনে করেন, তাঁহারই বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারপ্রভাবে সুপ্রাচীন পাক্ষরাত্র-ধর্ম্ম লোকের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ভারতভাষ্যনির্ণয়ে তিনি লিখিয়াছেন যে, ঋগাদি চতুর্বেদ, পাক্ষরাত্র, ভারত, রামায়ণ, ব্রহ্মসূত্র ও বৈষ্ণবপুরাণ-সমূহ হইতে তিনি আপন মত সঙ্কলন করিয়াছেন। বিষ্ণুর প্রাধান্যস্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাহার পরিপোষক গ্রন্থই তাঁহার গ্রন্থ, অপর অগ্রাহ।

বাস্তবিক তাঁহার দ্বৈতবাদপ্রচারে অদ্বৈতবাদিগণের হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিয়াছিল। এমন কি, শঙ্করমতাবলম্বী কোন অদ্বৈতবাদী আদিত্যপুরাণ মধ্যে মধ্বাচার্য্যের যথেষ্ট নিন্দা করিতে ক্রটি করেন নাই। সাধারণের কৌতূহল নিবারণের জন্য এখানে আদিত্যপুরাণের উপত্মাসটা উদ্ধৃত হইল :—

‘যখন সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জিত ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইবে, স্নেহের ব্রাহ্মণধর্ম্ম বধ করিতে থাকিবে, বেদপাঠ উঠিয়া যাইবে, জৈন-বৌদ্ধাদির যথেষ্ট প্রোচুর্ভাব হইবে, ব্রাহ্মণ স্নেহাচারী ও শূদ্র ব্রাহ্মণঘাতী হইবে, সেই সময় ঋতুরাজ বসন্ত ব্রাহ্মণের গুণে বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম লইয়া মধু নামে খ্যাত হইবে। তাহা হইতে কণাট ভিলঙ্গাদিদেশ

\* “জীবেশ্বরভিদ্ভা চৈব জড়েশ্বরভিদ্ভা তথা।

জীবভেদো মিথ্যৈচৈব জড়জীবভিদ্ভা তথা ॥

মিথ্যন্ত জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ।

সোহয়ং সত্যোহপ্যানাদিশ্চ সাদিশ্চেন্দ্রশাস্ত্রায় যঃ ॥” (সর্ব্বদর্শন খৃত)

† “ভজনং দশবিধং বাচ্য সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ কায়েন দানং পরি-ভ্রাণং পরিরক্ষণং মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি। অত্বেকৈকং নিষাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনং।” (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞা)

\* “মোক্শন্ত বিষ্ণুপ্রসাদমন্তরণে ন লভ্যতে প্রসাদন্ত গুণোৎকর্ষজ্ঞানাদেব নাভেদজ্ঞানাতঃ।”

† “ব্রহ্মা শিবঃ সুরাদ্যশ্চ শরীরক্ষরণাং ক্ষরাঃ।

লক্ষ্মীরক্ষরণেহহাদক্ষরাতঃ পরো হরিঃ।” (মহোপনিষৎ)

দৃষ্ট হইবে। সেই বিধবাপুত্র পদ্মপাহকের নিকট শিষ্য-  
ভাবে বেদান্ত অধ্যয়ন করিবে। তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ শাস্ত্র  
অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার মনে কুতর্ক উপস্থিত হইবে। তাহাতে  
গুরু নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা  
করিবেন। পরে যখন গুরু বুঝিবেন যে, কপটতা অবলম্বন  
করিয়া সে শাস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে, তখন মধুকে এই বলিবেন,  
'তোমার কোন সিদ্ধান্তই ক্ষুণ্ণ পাইবে না।' তখন মধু  
বলিবে, 'আপনার কথা অত্যন্ত হইবার নহে। আমার  
প্রার্থনা, পূরুষপক্ষ যেন আমার হৃদয়ে দৃঢ় থাকে।' গুরু  
বলিবেন, সিদ্ধান্তে অন্ধতা ও পূরুষপক্ষে পটুতা তোমার হইবে  
বটে, কিন্তু তোমার শিষ্যগণ পাপিষ্ঠ হইবে। তাহারা মোহ-  
বশে সিদ্ধান্তজ্ঞানহীন, লোভবশে রাজসেবক, ক্রোধবশে  
পরুষভাষী, দম্ভপ্রভাবে ধাত্মিকবেশধারী ও হেতুবাদবশতঃ  
সর্বশাস্ত্রতত্ত্ব বৃত্তিতে অন্ধম হইবে; স্বল্পকাল মধ্যেই তাহারা  
চিরদিনের জ্ঞান ঘোর নরকে গমন করিবে। অভিশপ্ত  
হইবার পর মধু বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিবে, তজ্জ্ঞান মধু  
দাক্ষিণাত্যে মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত হইবে। কলিযুগে তাহার  
প্রভাবও যথেষ্ট থাকিবে। আখ্যাবর্ত্ত, উৎকল, গোড়,  
গঙ্গাতীর, গোদাবরীতীর ও অরুণোদর্য্য ব্যতীত অত্রস্থানে  
তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ বিস্তৃত হইবে। মহারাষ্ট্রেই তাহাদের  
মত বিরল প্রচার হইবে। তাহারা হেতুবাদী হইবে, তাহারা এই  
হেতুবাদ করিবে যে, এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা এবং মায়াবদ্ধ  
এইরূপ মায়াবাদী বাহারা তাহারাই বস্তুতঃ তত্ত্ববাদী। সেই  
মিথ্যাবাদীরা কস্মকালও প্রবর্ত্তক জৈমিনীর মীমাংসা, ঈশ্বর-  
প্রতিপাদক গোতমপ্রণীত ত্রায়দর্শন, পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক-  
বোধক কপিলপ্রণীত সাংখ্য, ঈশ্বরপ্রতিপাদক বৈশেষিক-  
দর্শন ও যোগশাস্ত্র পাতঞ্জল এ সকলকেই শৈবশাস্ত্র বলিয়া  
থাকে। এমন কি, অদ্বৈতপোষক সন্ন্যাসপ্রণীত বেদান্তশাস্ত্র,  
ষড়ঙ্গসম্বন্ধিত বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি ও  
উপস্মৃতি তাহাদের মতে শৈবশাস্ত্র। সেই হেতুবাদীরা বলিবে,  
'লোক মহেশ্বরকে পরাংপর মনে করে, কিন্তু বেদমার্গবহিস্কৃত  
পাপিষ্ঠেরা মধ্বাচার্য্যকে মানে না। বস্তুতঃ তাহারা তাঁহাকে  
বিধবাপুত্র বলিয়া থাকে।' মহাশ্রুত মধু প্রচ্ছন্নচার্য্যাক, কলি-  
কালে এই মধু শিবনিন্দাপ্রবর্ত্তন করিবে।'\*

\* "ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে সর্বধর্ম্মবিবর্ত্তিতে।

য়েচ্ছৈত্র্যক্ষণধেনুনাং বিধ্বংসনকরে খরে।

অখ্যাখ্যায়বট্কারে জৈনবৌদ্ধাদিসমুদলে।

ব্রাহ্মণে য়েচ্ছমার্গস্থে শ্রেয় ব্রাহ্মণযাতিনি।

সৌরপুরাণে মধ্বাচার্য্য শৈবদেবী বলিয়া বর্ণিত হইলেও  
এরূপ অযথা আক্রমণ ত্রায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার  
অনন্তেশ্বর নামক শিবমন্দিরে দীক্ষা, শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত  
তীর্থ উপাধিগ্রহণ, তাঁহার ও তত্ত্বতাবলম্বিগণ-প্রতিষ্ঠিত  
মন্দিরাদিতে বিষ্ণুর সহিত একত্র শিবপার্বতীর পূজা ইত্যাদি  
পর্যালোচনা করিলে তাঁহাকে কখনই শিবদেবী বলিতে  
পারা যায় না। বিশেষতঃ শঙ্কর ও মাধ্ব-গুরুদিগের শিষ্যেরা  
পরস্পর উভয়পক্ষীয় গুরুদিগকেই নমস্কার ও শ্রদ্ধা ভক্তি

তদা বসন্তঃ কর্ণাটতৈলঙ্গাদিকদূষকঃ।

মধুনামা চ বিধবাক্ষেত্রে বিপ্রান্তবিঘাতি।

গোলকঃ স তু পাপিষ্ঠঃ পদ্মপাহকমীশ্বরম্।

বেদান্তব্যাব্যাহিরতং শিষ্যেচ্ছনান্ধমিঘাতি।

শাস্ত্রং পূর্ণং ততোহবীত্যা স্থিত আত্মিকবর্জিতঃ।

কিমগ্নিহোত্রঃ কো যাগো হেতুমেবং করিষ্যতি।

গুরুস্বাক্ষর্য্য তদাক্যং ব্রাহ্মণো ন ভবেদমম্।.....

গুরুবচঃ—অম্মাতা কেন দত্তা রে কস্মা পুত্রী কদা কথম্।

কস্মৈ দত্তা চ বিধিনা কেন তদ্বক্রহি মা চিরম্।

মধুরবচঃ—বিধবা জননী নাথ ব্রাহ্মণেন তপস্বিনা।

গতিং সমভূং তদ্ভাদয়ং দেহস্ততোহস্তবৎ।

গুরুবচঃ—কপটেন যতঃ শাস্ত্রং মন্তোহবীত্যাং দুরায়মান।

তেন সিদ্ধান্তমধ্যাদা কদাচিত্তা ক্ষুণ্ণমিষম্।.....

অন্ধতা তব সিদ্ধান্তে পূরুষক্ষে চ পাতবম্।

ভবদেব পরশ্বেকং পাপাঃ শিষ্যা ভবন্ত তে।

মোহাৎ সিদ্ধান্তরহিতা লোভাৎ তে নৃপদেবকাঃ।

ক্রোধাৎ কঠিনবক্তারো দম্ভধেবেণ হৃদরাঃ।

হেতুবাদেন শাস্ত্রাণি সর্বাণি ন বিদন্তি তে।

নিরয়েষবধোরেষু গমিষ্যন্ত্যচিরাদিরম্।

মধুনামা ততঃ প্রাপ্য শাপং তং দ্রষ্টবুজ্জিমান্।

বাদরায়ণসূত্রাণাং ব্যাখ্যানং স করিষ্যতি।

মধ্বাচার্য্যস্ততো ভাবান্দাক্ষিপাতো মহান্ কলৌ।

তচ্ছিষ্যাঃ প্রতিশিষ্যান্ত নার্য্যাবর্ত্তে ন চোৎকলে।

ন গোড়ে ন চ গঙ্গারাস্ত্রীরে গোদাবরীতে।

নারুদুদারগামধ্যে চ ভৎপ্রচারো ভবিষ্যতি।

বধা যথা কলেবরোঃ প্রচারো হি ভবিষ্যতি।

তথা তথা মহারাষ্ট্রে হৈতুকাঃ বিরলাঃ কচিং।

পঞ্চ বংশ সন্ন্যাসী পঠিতো দ্রষ্টবুজ্জিমান্।

শিষ্যোপশিষ্যদংযুক্তো হেতুবাদং করিষ্যতি।.....

মন্যন্তে ত্রীমহেশানং সর্বাণ্যেব পরাংপরম্।

পাপিষ্ঠা নৈব মন্তন্তে বেদমার্গবহিস্কৃতঃ।

আচার্য্যং মধুনামানং বদন্তো বিধবাহতম্।

প্রচ্ছন্নোহসৌ মহাদ্রষ্টশ্চাকাকো মধুসংজ্ঞকঃ।

ভবিষ্যতি কলৌ বিপ্রাঃ শিবনিন্দাপ্রবর্ত্তকঃ।" (সৌরপুরাণ ১০ অ.)



করেন। এমন কি, শৃঙ্গেরিমঠের শঙ্করাচার্য্য উদ্বিগ্নগরের কৃষ্ণমন্দিরে পূজা করিতে আসেন। এই সকল দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে বরং মনে হয় যে, মধ্বাচার্য্য একজন প্রকৃত বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণব ও শৈবসম্প্রদায় মধ্যে সদ্ভাবস্থাপনে বিরত ছিলেন না। তিনি যে দার্শনিক মত প্রচার করেন, তাহা পূর্ণ-প্রজ্ঞদর্শন নামে খ্যাত। [ পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন দেখ। ] তাঁহার নতানুবর্তী ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্বাচার্য্য বা মাধ্ব নামে গর্ব্বিত পরিচিত।

[ মাধ্ব দেখ। ]

মধ্বাধার (পুং) মধুনঃ আধারঃ। মধুক্রম, মৌচাক্। (বৈদ্যকনিং)  
মধ্বাত্র (পুং) বন্ধ রসাল।

মধ্বালু (স্ত্রী) মধু মধুরং আলু, মধুবৎ মিষ্টত্ব তথ্যঃ। মূল।  
চলিত মোআলু, অতিপয় স্মিষ্ট। গুণ—রক্তপিডনাশক, শুষ্ক, স্বাদু, গীতল, শুভ্র ও শুক্রকর। (রাজবং)

মধ্বালুক (স্ত্রী) মধ্বালু-স্বার্থে কন্। কন্দবিশেষ, মোআলু।  
মধ্বালুক এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্বাবাস (পুং) আম্রবৃক্ষ। (রাজনিং)

মধ্বাশিন্ (ত্রি) মধুপানকারী।

মধ্বাসব (পুং) মধু মধুকপ্পাসরসন্তেন কৃত আসবঃ। মধুক-  
প্পকৃত মত্ত, পর্যায়—মাধ্বক, মধু, মাধ্বক। মোউয়া  
ফুলের মদ।

“মুখপ্রিয়ঃ স্থিরমদো বিজ্ঞেয়োহনিলনাশনঃ।

মধুমধ্বাসবচ্ছেদী মেহকুষ্ঠবিষাপহঃ॥”

(সুশ্রুত ও সূত্রস্থ্য ৪৫ অং) [ মদিরা মত্ত দেখ ]

মধ্বাসবনিক (পুং) মধ্বাসবনমুৎপাত্তভেনাস্ত্যসোতি মধ্বা-  
সবন-ঠন্। শৌণ্ডিক। (শব্দমালা)

মধ্বাহুতি (স্ত্রী) মধু দ্বারা আহুতি।

মধ্বিজ্জা (স্ত্রী) মধু ঈজতে প্রাপ্তোতি কারণেহেনতি ঈজ-ক,  
পৃষোদরাতিত্বাৎ হ্রস্বঃ। মদিরা। (হেম)

মন্, ১ জ্ঞান, অববোধন। ২ বিবেচন। দিবাদি। আত্মনে।  
সকং অনিট্। লট্ মন্ততে। লিট্ মেনে। লুট্ মন্তা। লৃট্  
মন্ততে। লৃঙ্ অমংস্তত। লৃঙ্ অমংস্ত, অমংসাতাং অমংসত।  
সন্ মিমংসতে। বঙ্ সমস্ততে, যঙ্ লুক্ সমস্তি। গিচ্  
মানয়তি। লৃঙ্ অমীমনৎ। মন—১ গর্ব্ব। ২ অর্জ, পূজা।  
ভাদি। পরস্মৈ গর্ব্বার্থে অকং অর্জার্থে সকং সেট্। লট্  
মনতি। গুঙ্ অমানীৎ। মন—ধৃতি। এই ধাতু অদন্ত চুরাদি।  
পরস্মৈ অকং সেট্। লট্ মনয়তি। লৃঙ্ অমীমনৎ। মন—  
বোধ। তনাদি। আত্মনে। সকং সেট্। লট্ মন্ততে।  
অনু+মন=অনুমতি, অনুজ্ঞা, আদেশ।

“দেবরায় প্রদাতব্য। যদি কতাহুমীয়তে॥” (মহু ৯৯৭)

অতি+মন=সম্মতি, সম্যক্ বোধ। অব+মন=অবজ্ঞা।

সম্+মন=সম্মতি, পূজা, সম্মান। অপ, অব+মন=অপমান,  
অবমান।

মন (পুং) মন্ততে স্মৃতিভাদিশৃণুণেন আদ্রিয়তে ইতি মন্-  
ঘ। ১ জটামাংসী। (শব্দচং) (দেশজ) ২ পরিমাণবিশেষ,  
৪০ সেরে এক মণ। ৩ মন, চিত্ত। [ মনস্ দেখ ]

মন আপ (ত্রি) আপ্রোতীতি আপ-অহ্, মনসো আপঃ।  
মনোজ্ঞ। (ত্রিকাং)

মনধ্বজ্ (ত্রি) মনঃ দ্বারা প্রসাধন। “মনধ্বজা মনস্তান”  
(ঋক্ ১০।১০৬।৮) ‘মনধ্বজা মনসা প্রসাধনং যয়োন্তো ঋজতি  
প্রসাধনকর্তা অস্মাক্তাবে ঘঞ’ (সায়ণ)

মনঃক্ষেপ (পুং) মনের উদ্বেষ, মনের গোলমাল।

মনঃপতি (পুং) বিষ্ণু।

মনঃপর্য্যায় (পুং) জৈনদিগের মতে, নির্বাণমুক্তি হইবার  
শেষাবস্থার পূর্বাবস্থা। [ জৈন দেখ ]

মনঃপ্রসাদ (পুং) চিত্তপ্রসাদ, মনের শান্তি।

মনঃপ্রীতি (স্ত্রী) মনের প্রীতি। মনের আনন্দ।

মনঃশিল (পুং) মনো মানসং শিলতি আকর্ষতি স্বগন্ধে-  
নেতি শিল্-ক। মনঃশিলা।

‘উদৈর্মর্নঃশিলশ্চহেব বিদ্যার্যমাণা’ (অমরটীকা ভরত)

মনঃশিলা (স্ত্রী) মনঃশিল দ্বিগ্যং টাপ্, যদা মনঃপ্রসাদিকা  
শিলা ধাতুবিশেষঃ। রক্তবর্ণ ধাতুবিশেষ, (Realgar) খনিজ  
উপরমভেদ, চলিত মন্ডাল।

“মনঃশিলা বিচ্ছুরিতা নিবেহঃ শৈলেন্ননক্কেষু শিলাতলেষু।”

(কুমার ১৫৫)

ইহার পর্য্যায়—ফুনটী, মনোজ্ঞা, নাগজিহ্বা, নৈপালী,  
শিলা, মনোগুপ্তা, কল্যাণিকা, রোগশিলা, গোলা, দিব্যোষধি।  
ইহার গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, লেখন, বিষ, ভূতাবেশ, ভয় ও উন্মাদ-  
নাশক; বশ্কারক, তিক্ত, কফনাশক, সারক, ছদিকারক,  
কুষ্ঠ, জ্বর, পাণ্ডু, কাস ও শ্বাসনাশক এবং শুক্র ও মল-  
কারক। (রাজনিং)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে লিখিত আছে, যে মনঃশিলার বর্ণ  
জবাফুলের তায়, তাহাই উৎকৃষ্ট, এইরূপ মনঃশিলাই ঔষধার্থে  
ব্যবহার করা উচিত। মনঃশিলা শোধন করিয়া ঔষধে  
ব্যবহার করিতে হয়। অবিশোধিত মনঃশিলা বলহীন, মল-  
বন্ধ, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, জন্ডোঁর্গ ও অগ্নিমান্দ্যকর এবং  
শোধিত হইলে সর্বরোগহর।

মনঃশিলা-শোধনপ্রণালী।—মনঃশিলা জরতীর পাতা ভূজ-

রাজ ও রক্তবর্ণ বকপুন্সের রসে ভাবনা দিয়া, দোলা ধরে একদিন ও ছাগমূত্রে এক প্রহর পাক করিবার পর কাঁজিতে ধুইয়া লইতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে মনঃশিলা বিস্কৃত হয়।

মতান্তরে—টাবালেবু, জয়ন্তী, বটপত্র ও আদার রসে পুনঃপুনঃ ভাবনা দিলে মনঃশিলা বিস্কৃত হয়। ইহার গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, কফর, লেখন ও সারক। ভূতাবেশ, ভয়, কাস ও শ্বাসনিবারক। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

ভাবপ্রকাশমতে—অবিশোধিত মনঃশিলা সেবনে বলহানি এবং নিশ্চরই, ক্রমি, মলমূরয়োধ ও শর্করার সহিত মূত্রকৃচ্ছ-রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শোধিত মনঃশিলা—গুরু, বর্ণকর, সারক, উষ্ণবীৰ্য্য, লেখনগুণবৃদ্ধ, কটু তিক্তরস, স্নিগ্ধ এবং বিষ, শ্বাস, কাস, ভূত, কফ ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্রঃ)

ঝুনান, কেইচাউ ও কনসাট নামক স্থানে মনঃশিলা স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়। কুমাউন, চিত্রল ও কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমাংশে, হরিতালের সহিত কোথাও বা কেবল মনঃশিলার চাপ পাওয়া যায়। স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইলে ইহার বর্ণ ও আকার কতকটা চুণী পাথরের মত দেখায়।

কোন একটা আবৃত পাত্রে মনঃশিলা গরম করিলে গলিয়া যায়। বেশী উত্তাপ পাইলে ইহার মৌলিক অংশ পৃথক হয় না, বরং ইহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। উজ্জ্বল মনঃশিলার চাপ স্বভাবতঃই কঠিন, ভঙ্গপ্রবণ, স্বচ্ছ ও নয়ন-রঞ্জন, রক্তবর্ণ। ১৯৮ ভাগ এন্‌ হাইড্রাইড (Arsenious an hydride) ও ১১২ ভাগ গন্ধক একত্র মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে কৃত্রিম উপায়ে মনঃশিলা প্রস্তুত হইতে পারে।

ঔষধে ব্যবহার করিবার জন্ত নেবু অথবা আদার রস দিয়া মনঃশিলা বিস্কৃত করিয়া লওয়া হয়। অরে সাধারণতঃ পারদ ও হরিতালের সহিত একত্র ব্যবহৃত হয়। সোণায় পাইন দিবার সময় মনঃশিলার আবশ্যক। ঔষধের পেয়লা এবং নানা প্রকার কাজ করা বাসনের ব্যবসাতেও মনঃশিলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মনপাড়, মাদ্রাজপ্রেসিডেন্সীর তিরেবল্লি জেলার অন্তর্গত একটা অন্তরীপ। অক্ষা° ৮° ২৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩০' পূঃ। সমুদ্রগর্ভস্থ এই গিরিদেশ বালুকাময় চরে পরিপূর্ণ। নিরন্তর সমুদ্রসলিল কলোলে প্রতিধাত হওয়ায় ইহা বিভিন্ন স্তরবদ্ধ হইয়াছে। এই শৈলশিখরে একটি ক্ষুদ্র গির্জা উন্নত মস্তকে খৃষ্টধর্মের প্রচার কামনা করিতেছে। পরিচ্ছন্নাকাশে প্রায় ১০ মাইল দূর হইতে ইহার সৌধচূড় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মনপাড় পরেটের উত্তরস্থ উপসাগর মুখে একটি ক্ষুদ্র

নদীই মোহানায় বালুকা প্রোথিত একটি স্রবহৎ গির্জা প্রাচীন কুলশেখরপত্তন বন্দরের পরিচয় দিতেছে।

মনমাড়, নাসিকজেলার চাঁদর মহকুমায় একটা নগর। অক্ষা° ২০° ৪৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৮' ৪০" পূঃ। নাসিক সহর হইতে ৪৫ মাইল উত্তরপূর্বে গ্রেট্‌ ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ের জবলপুর লাইনের ধারে অবস্থিত। এখানে ধোন্দ ও মনমাড় ষ্টেট্‌ রেলওয়ে মিলিত হইয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তি চূড়াকারগিরি ও তাহার পশ্চাৎবর্ত্তি অংকাই ও সংকাই নামক শৃঙ্গদ্বয় দেখিবার জিনিষ। থানেশ ও মালোগাঁও হইতে এখানে বহুত তুলা রপ্তানি হইয়া থাকে।

মনবান, অযোধ্যাপ্রদেশের সীতাপুরজেলার একটা পরগণা। ইহার উত্তরসীমায় বারী পরগণা, পূর্বে ও দক্ষিণে লক্ষৌজেলা এবং পশ্চিমে গোমতী ও সরায়ন নদী। ভূপরিমাণ ৬৯ বর্গ মাইল। ইহার অধিকাংশ স্থানেই এখন চাষ হইতেছে। এই পরগণায় ৬৯ খানি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ৩৯ খানি তালুকদারী ও ৩০ খানি জমীদারী বলিয়া পরিগণিত। ঐ সকলের মধ্যে ৬৫ খানি পনবার ক্ষত্রিয়গণের অধিকারভুক্ত। প্রবাদ অকবর বাদশাহের রাজ্যকালে পনবার জাতীয় তিন সহোদর গোণালিয়র হইতে আসিয়া লক্ষৌজেলায় ইতোজা ও মহনা এবং সীতাপুরজেলায় সরোরা নীলগাঁও আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাহাদের বংশধরগণ এখন ঐ সকল সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, কেবল মহনা অধিকারী ১৮৫৭ খৃঃ অঃ সিপাহী-বিদ্রোহে যোগদান করায় উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

২ উক্ত মনবান পরগণার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম ও পরগণার সদর। লক্ষৌ ও সীতাপুর রাষ্ট্রের ১ মাইল পশ্চিমে ও বারী সহরের ৪ মাইল দক্ষিণ সরায়ন নদীকূলে অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ, স্বর্ঘ্যবংশীয় রাজা মাকাতা এখানে নগর পত্তন করিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ স্থান জঙ্গলে পূর্ণ হয়। পরবর্ত্তিকালে ইহার পূর্বাংশে একজন আহীর, পশ্চিমে মুস্তাফা খাঁ নামে একজন মুসলমান আসিয়া বাস করে। মুস্তাফা সেই প্রাচীন নগর পুনঃনির্মাণ করেন, তাহার নামানুসারে এই স্থান মানপুর-মুস্তাফাবাদ নামে খ্যাত হয়। রাজা মাকাতার গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। উচ্চ ভূমির উপর নদী-মুখী গড়ের স্রবহৎ ও সুদৃঢ় গঠন বিষয়োদ্দীপক। ইহার প্রাচীন ইষ্টকরাশি গ্রামবাসীরা গৃহনির্মাণকাণ্ডে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মনবিক্রম, কালীকটের একজন প্রসিদ্ধ রাজা।

[ সামরী রাজবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

মনঃসংযোগ (পুং) মনঃ সংযোগঃ। মনোযোগ।

“ঐন্‌ মনঃসংযোগ এব জ্ঞানসামান্যে কারণম্” (মুক্তাবলী)

মনঃস্টৈশ্চর্য্য (ক্লী) মনসঃ স্টৈশ্চর্য্য। মনের স্থিরতা।

মনশ্চিৎ (ত্রি) মানসে প্রতিফলিত।

মনন (ক্লী) মনত ইতি মন-লুট্। অনবরত অহুচিন্তন। বেদান্তার্থের অমুগুণ যুক্তি দ্বারা অদ্বিতীয় বস্তুর অনবরত অহুচিন্তন। প্রতিতে লিখিত আছে, আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসন করা কর্তব্য। প্রতিবাক্যাসারে শ্রবণ, তৎপরে ঐ প্রতিবাক্যের পুনঃপুনঃ চিন্তনের নাম মনন।

“শ্রোতব্যঃ প্রতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিঃ।”

(সাংখ্যদো বিজ্ঞানভিক্সু)

প্রতিবাক্যাসারে শ্রবণ, তৎপরে উৎপত্তি প্রভৃতি দ্বারা ইহা মনন এবং পরে নিধিধ্যাসন করিতে হয়। ২ বোধন।

“মননাং পাপতদ্ভাতি মননাং স্বর্গমশ্নুতে।

মননাং মোক্ষমাপ্নোতি চতুর্লগ্নময়ো ভবেৎ ॥”(গায়ত্রীতন্ত্র ১।৪)

৩ ধারণ। ৪ বুদ্ধি। ৫ অহুমান।

মনস (ক্লী) মনতে বুধ্যতেহেনেনেতি মন্ (সর্লধাতুভ্যোহস্মন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইতি অস্মন্। লিঙ্গশরীরাবয়ববিশেষ। সপ্তদশ অবয়বযুক্ত সূক্ষ্মশরীর, ইহার অপর নাম লিঙ্গশরীর। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ ক্রিয়েন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব। বেদান্তমতে স্কল ও বিকল্লায়িকা অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ, ইহা ক্রিয়েন্দ্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া মনোময়কোশ হয়।

“মনো নাম স্কল্লবিকল্লায়িকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ, মনস্ত ক্রিয়েন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সং মনোনয়কোশো ভবতি।”(বেদান্তসার)

গভস্থিত বালকের সপ্তম মাসে মন জন্মে। (সুখবোধ) সূত্রের মতে পঞ্চম মাসে ইহা প্রতিবুদ্ধ হয়।

“পঞ্চমে মনঃ প্রতিবুদ্ধতরং ভবতি”(সূত্রশারীরহা• ৩ অ•)

পর্যায়—চিত্ত, চেতস্, হৃদয়, স্বাস্ত, হৃদ, মানস, অনঙ্গক, অঙ্গ। (শব্দরত্না•) ঞায়মতে ইহার গুণ—পরহ, অপরহ, সংখ্যা, পরিমার্জিত, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, বেগ। মনো-গ্রাহ্য স্বথ, হৃৎ, ইচ্ছা, ধ্রু, মতি ও যত্ন। ইহা পরমাণু স্বরূপ। শ্রীরোমনিমতে বায়বায় পরমাণু।

“পরপরহং সংখ্যাদ্যাঃ পঞ্চবেগশ্চ মানসে।

মনোগ্রাহ্যং স্বথং হৃৎখমিচ্ছাধ্রুবেষো মতিঃ কৃতিঃ ॥

অবৌগপদ্যজ্জ্ঞানানাং তত্ত্বাণুমিহেযুতে ॥”

(ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

সাংখ্যকারিকা মতে ইহার লক্ষণ—

“উভয়ায়ুকমজ মনঃ সংকল্লকমিদ্ভিয়ঞ্চ সাধম্মাং।

গুণপরিণামবিশেষান্নানাহং বাহুভেদাশ্চ ॥”

(সাংখ্যাকা• ২৭)

মনে ইন্দ্রিয়ধর্ম আছে, এই জন্ত ইহা উভয়ায়ুক, অর্থাৎ মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ক্রিয়েন্দ্রিয় উভয়ই বলা যায়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আকৃষ্ট হইয়া কার্য্য করে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ক্রিয়েন্দ্রিয়ার অধ্যক্ষ হয় বলিয়া উহাকে ক্রিয়েন্দ্রিয় বলা যায়। মন সংকল্লায়ক, সংকল্ল অর্থাৎ বিবেচনা করা মনেরই অসাধারণ ধর্ম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বস্তুর সামান্য আকারমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, পরে মন তাহার বিশেষাকার নির্ধারণ করে। সত্ত্বগুণের পরিণাম নানা প্রকার। সত্ত্বগুণের কোন এক বিশেষ পরিণামে মনের জন্ম। “মহদাখ্যং আদ্যং কায্যং তন্মনঃ।” (সাংখ্যাহ• ১। ৭১) প্রকৃতির বাহা আত্মকার্য্য, প্রথম বিকাশ বা প্রথম পরিণাম তাহারই নাম মহত্ত্ব। ইহারই কার্য্য মন, অর্থাৎ মহত্ত্ব হইতেই মনের উৎপত্তি। ইহা মননবৃত্তিক, অর্থাৎ ইহার কার্য্য মনন বলিয়াই মন নাম হইয়াছে। মনন শব্দের অর্থ নিশ্চয়। “তদগ্নয়ময়ত্বেশ্চ।” (সাংখ্যাহ• ৩। ১৫) লিঙ্গশরীরের একাবয়ব মন, ইহা অগ্নয়ম, অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিণামে উৎপন্ন।

সাংখ্যদর্শনমতে মন জন্মপ্রবণ, সেই জন্ত ইহা ভাব-বিকারবিশিষ্ট। ভাবশব্দের অর্থ জায়মান বস্তু। যে যে বস্তু জন্মে, সেই সেই বস্তুরই বুদ্ধি, ভ্রাস, পরিবর্তন ও বিনাশ হয়। বস্তু এবং বিধ পরিণামকে, দার্শনিক গণিতেরা ভাববিকার শব্দে উল্লেখ করেন। আত্মা ব্যতীত, ভাববিকারগ্রস্ত নহে, এমন জন্তবস্তু অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নাই।

প্রাকৃতিক কাব্য নিত্যন্ত দুঃখোধ্য। মনই জাগতিক সমুদায় পদার্থের কেবল একমাত্র পরীক্ষক, কিন্তু মনের পরীক্ষক কে? চিন্তা করিতে গেলে মোহ উপস্থিত হয়। যদি বল, মন আপনিই আপনার পরীক্ষক, একথাও সঙ্গত নহে, কারণ আপনি আপনার প্রমাণ, আপনি আপনার পরীক্ষক বলা আর আপনি আপনার স্বন্ধে আরোহণ করিতেছি বলা তুল্য কথা। মন কি? তাহার স্বরূপ কি? শক্তি কি এবং সংস্থানই বা কিরূপ? মনের উপর এ সকল নির্ণয়ের ভারার্ণ করিতে গেলে আপনি আপনার স্বন্ধারোহণ করার দোষ মনের উপর নিজেপ করিতে হইবে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বুদ্ধি, যাহার যেরূপ আকার, যাহার যেরূপ গুণ, তত্তাবতের সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মায় না, একমাত্র মনই বিশিষ্ট বুদ্ধির জনক। এই কথা স্থির থাকিলে মনের পরীক্ষক দুর্লভ হইয়া পড়ে।

ইহাতে কপিল বলেন,—সামান্য প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। যখন আত্মার ও মনের বিষয় চিন্তা করা যায়, তখনই দেখা যায়, মন ও আত্মার স্পষ্ট ভিন্ন ভাব দাঁড়াইয়াছে। বাহারি বলেন, মন ও আত্মা

একই বস্তু, তাঁহারাও আত্মা ও মনের বিচারকালে আত্মাকে ভিন্ন না করিয়া বিচারনিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যখনই মনের অহংসন্ধান করেন, তখনই তাহাদের মন আত্মা হইতে পৃথক্ হয় এবং পৃথক্ হইয়া আত্মার স্বরূপ পরীক্ষা করে; কিন্তু বিচারশক্তির অভাব বা ভ্রমবশতঃ তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারেন না। সেই জন্তই মুখে বলেন, মনের নামান্তর আত্মা, আত্মার নামান্তর মন।

কেহ কেহ বলেন, দীপের জ্বালা মনের স্বরূপপ্রকাশকত্ব শক্তি আছে। দীপ যেমন আপনাকে ও আপনার প্রকাশ-বস্তুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ মনও আপনার ও আপনার স্বরূপ-সত্তার অবধারণ করিয়া থাকে।

মন কি? ক্রিয় পদার্থের নাম মন—এই প্রশ্নের প্রত্যু-ত্তরে কপিল বলেন যে, মন একটা দেহাশ্রিত বস্তু। মন দেহা-শ্রিত পদার্থ বটে, কিন্তু তাহা অস্থিমাংসাদির জ্বালা নহে। মন অহং দ্রব্যের পরিণাম বিশেষে উৎপন্ন হইলেও তাহা ক্ষণক্ষণসী নহে। তব্জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত উহার স্থায়িত্ব থাকে। প্রাণের সংযোগবিনষ্ট হইলে যখন স্থূল শরীর নিপতিত থাকে, তখন মন অস্থিমাংসাদির জ্বালা তন্মধ্যে অবস্থিত থাকে না। শরীর বিনাশ নামক বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মন শীঘ্র সেরূপ বিকারপ্রাপ্ত হয় না।

নৈয়ায়িকদিগের দিক্কাতে মন নিত্য ও নিরবয়ব। মনের অবয়ব নাই, স্তব্ধতা উপাধিও নাই। অবয়ব না থাকায় মনের উপচয়-অপচয়ও নাই। তবে যে আহারাভিজানিত মনের ত্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে, তাহা মনের নহে, মনের গোলকের অর্থাৎ অবস্থিতি স্থানের। গোলকের উপচয় মনের উপর নিঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু হোত্রের অগ্নিতাবশতঃ ইন্দ্রিয়শক্তির অন্নতা থাকে, যোবনে সেই সেই স্থান পুষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়শক্তিও পূর্ণ হয়। আবার বান্ধকো ত্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহাই পূর্ণোক্ত নিরবয়বের নিদর্শন। নিরবয়বপদার্থের আবার বিনাশ কি? অবয়বের বিভাগ হওয়াই ধ্বংস, এইজন্ত নিরবয়ব মনের ধ্বংস নাই।

মন একপ্রকার নিরবয়ব দ্রব্য। দ্রব্য বলিলে আমাদের সহজ জ্ঞানে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলভাবের উদয় হয়, দ্রব্যের স্বরূপ বস্তুতঃ তাহা নহে। যাহাতে যাহার গুণ বা ধর্ম থাকে, তাহা দ্রব্য। এ লক্ষণ সাবয়ব ও নিরবয়ব উভয়েই বিদ্যমান।

মন হৃদয়। এমন কি, মন বায়বীয় পরমাণু তুল্য। তাদৃশ হৃদয়তানিবন্ধন যুগপৎ অর্থাৎ এককালে দুই বা ততোধিক বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। সেই কারণে এক সময়ে দুই বস্তুর জ্ঞান হয় না। ‘অন্তঃকমনা অভূবং নাশ্রোষং’ আমি

অন্তঃকমনা ছিলাম, তজ্জন্তু শুনিতে পাই নাই। একদিকে মন থাকিলে যে অন্তরিকে তাহার ঔদাস্য থাকে, তৎপ্রতি কারণ মনের পরমাণু তুল্যতা। মন যখন এক ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হইয়া তদ্ব্যবস্থার গ্রাহ্য বিষয়ে নিমগ্ন থাকে, তখন আর তাহার এমন কোন প্রদেশ (অংশ) থাকে না যে, সে অন্তঃপ্রদেশে বা বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া তদন্তর ভাল মন্দ বিবেচনা করিবে। স্থূল বা সাবয়ব বস্তুই দুই বা ততোধিক বস্তুতে সংযুক্ত হইতে পারে। কারণ তাহার অনেক প্রদেশ (স্থান) আছে। কিন্তু মন এত হৃদয়, যে একের সহিত সংযুক্ত হইবার কালে সে তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়। সেই কারণেই মানবের এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান জন্মে না। তবে যে ভোজনাদিকালে আমরা যুগপৎ স্পর্শ ও রাসন জ্ঞান জন্মে বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা আমাদের ভ্রম। বস্তুতঃ তাহা ক্রমশঃ হয়, যুগপৎ হয় না। যেমন একশত পদ্মপত্র একটা হুতার দ্বারা একযোগে বিদ্ধ করিলে তাহা যুগপৎ বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ ভ্রম।

ইহাই নৈয়ায়িকদিগের মত। কিন্তু সাংখ্যের মত অত-বিধ। সাংখ্য বলেন, মন অনিত্য, মন উৎপন্ন বস্তু সেই কারণে ইহা অনিত্য। অনিত্য বলিয়া মন ঘটপটাদির জ্বালা ক্ষণবিনাশী নহে। মন জীবের জীবন্ত লোপ অর্থাৎ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

মন সাবয়ব। মন যদি নিরবয়ব হইত তাহা হইলে সে কাহার সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারিত না। মনের ত্রাস বৃদ্ধি হয় না, তদীয় আধার স্থানেরই ত্রাস বৃদ্ধি হয়। সেই ত্রাস বৃদ্ধি মনে আরোপিত হইয়া থাকে। মন হৃদয় বটে, তাহা বলিয়া পরমাণু তুল্য নহে। হোত্রের অগ্নিচর হইলেই যে পর-মাণু জ্বালা পরিমাণে হৃদয় ও নিরবয়ব হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বায়ু যে ইন্দ্রিয়ের অগ্নিচর বস্তু, তাহা বলিয়া কি বায়ুর অবয়ব নাই? বায়ুও সাবয়ব, তাহাও পুঞ্জীভূত পরমাণুপ্রবাহ।

এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান হইবে না এমন কোন নিয়ম নাই।

‘ক্রমশোহক্রমশেচ্ছন্দ্রিয়বৃত্তিঃ’ ইন্দ্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়িক-জ্ঞান স্থলবিশেষে ক্রমে হয়, স্থলবিশেষে অক্রমে অর্থাৎ এককালে হয়।

মন সাবয়ব কি নিরবয়ব? নম্বর কি অনম্বর? এককালে বহু জ্ঞান হয় কি না? ইত্যাদি কথা লইয়া দর্শনশাস্ত্রে বিস্তারিত বাদ-প্রতিবাদ আছে, এই স্থলে কেবল তাহার দিক্কা-মাত্র প্রদর্শিত হইল। অধিকন্তু নৈয়ায়িকদিগের ত্রিক্রিয় উপর

অধিক নির্ভর; কিন্তু সাংখ্যাচাৰ্য্যদিগের নির্ভর আশ্রয়বাক্য, যুক্তি তাহার সাহায্যকারী মাত্র। প্রধান আশ্রয়বাক্য বেদও বলিয়াছেন, মন সাবয়ব, সেইজন্য অনেকেই মনের সাবয়ব স্বীকার করেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদের বৰ্ণনায় এ সম্বন্ধে একটা আখ্যায়িকা আছে, তাহা এইরূপ। উদ্দালক খেতকেতুকে ব্রহ্মবিদ্য করিবার মানসে প্রতিদিন সোদাহরণ প্রস্নের অবতারণা করিতেন। একদিন বলিলেন, “ন নাথ কশ্চনামতমবিজ্ঞাতযুদাহরিষ্যতি” বৎস! আমাদের বংশের কোন ব্যক্তি অদ্বিত ও অবিজ্ঞাত পদার্থের উদ্বেষণ করেন নাই। অর্থাৎ সকলেই সৰ্ব্বজ্ঞ ছিলেন। তাহাতে খেতকেতু বলেন ইহা কিপ্রকারে সম্ভব হয়। খেতকেতুর এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে উদ্দালক বাহ্যভূতের রহস্য উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ অধ্যাত্মভূতের তত্ত্ব কথনকালে বলিলেন, “অন্নময়ঃ হি সৌম্য! মন আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্,” হে সৌম্য! খেতকেতো! মন অন্নময় অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর পরিণামবিশেষ। প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়ী। খেতকেতু এই সকল কথার মন্তব্য বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, “ভূম্ব এব মাং ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু” আবার বলুন, আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তখন উদ্দালক খেতকেতুর বোধের জন্ত বলিতে লাগিলেন, পৃথিবী-ধাতু, অপ্-ধাতু ও তেজো-ধাতু। ধাতুর নামান্তর ভূত এবং পৃথিবী-ধাতুর নামান্তর অন্ন। আকাশ, বায়ু ও ঐ ত্রিবিধ ভূত পরস্পর অম্লবিক্ত হইয়া সৰ্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। পূৰ্ব্বোক্ত ত্রি-ধাতু বা পঞ্চধাতু আত্মা ভিন্ন সমস্ত পদার্থের উপাদান ও পোষক। বহিঃস্থ অন্নাদি ধাতু আধ্যাত্মিক ধাতুতে সংযুক্ত বা অম্লপ্রবিষ্ট হইয়া সে সকলের স্থিতি ও পুষ্টিসাধন করিতেছে। তাহার প্রণালী এইরূপ—

ভুক্তান্ন জঠরাগ্নিতে পরিপাক হইয়া প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা স্থূলতমভাগ (অন্নমল) তাহা পুরীষ, যাহা মধ্যম তাহা মাংস, যাহা হৃদয় তাহা ইন্দ্রিয় ও মন। যেমন দধি মগুন করিলে তাহার মধ্য হইতে তাহার সার বা হৃদয় ধাতু মিশ্রিতভাবে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ তেজ, অপ্ ও অন্ন এই ভুক্ত ত্রিবিধ দ্রব্য জঠরানল ও বায়ু দ্বারা মণ্ডিত হইলে তাহাদের সারাংশ উদ্ধে উঠিত হয়। পরে তাহা নাড়ীপথে শিরো প্রেশিরা দিয়া চালিত হইয়া সেই সেই পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পুষ্টি করিতে থাকে। উদানবায়ু সার উদগত, অপান-বায়ু অসার নিঃসারিত এবং ব্যানবায়ু সমুখিতসার সমুদায়কে রস-রক্তাদি-আকারে পরিণামিত করিয়া শরীরের সর্বদিকে লইয়া যায়। এইজন্য বলিয়াছি, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়

ও বাক্য তেজোময়। ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে কি অন্ন, কি জল, কি তেজ কিছুই উপযোগ করিও না, ঘোড়ার দিনে আমার নিকট আসিও।

খেতকেতু পঞ্চদশ দিন অনাহারের পর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পিতা কহিলেন, ‘সৌম্য! যজুঃসি সামানি চাধ্যসি’ হে সৌম্য! তোমার ঋক্ যজুঃ ও সাম অধ্যয়ন করা হইয়াছে। খেতকেতু বলিলেন, ‘ন চৈম্যঃ প্রতিভাস্তি ভোঃ’ হে পিতা! আজ আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। তখন ঋষি কহিলেন, যেমন কাষ্ঠাভাবে মহৎপরিমাণ অগ্নিও নিবিয়া যায়, আবার খেতাতপগ্নিমিত জলদ্বারা কাষ্ঠযোগ করিলে তাহা হইতে স্তমহান্ প্রজ্বলন উপস্থিত হয়। সেইরূপ আহারাতাবে তোমার ইন্দ্রিয় ও মন ক্ষীণ হইয়া, নির্লিপ্যপ্রায় হইয়াছে, কিছু উপযোগকর, তাহা হইলে পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে। তখন সমুদয় আবার তোমার স্মরণপথে আসিবে। ঋষি উদ্দালক এইরূপে আহারের হ্রাস-বৃদ্ধিতে মনের হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া দেখাইয়া সাবয়বত্বনিবন্ধন জন্ত অবধারণ করাইয়া ছিলেন। সাংখ্য এই মতের অনুগামী, স্মৃতির সাংখ্যমতে মন সাবয়ব ও নশ্বর। নশ্বর হইলেও ইহা ক্ষণভঙ্গুর নহে। সাংখ্য বলেন, মন সাক্ষাৎ মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রতিদেহে বিরাজ করিতেছে। আমার আত্মা, তোমার আত্মা ও অস্ত্রের আত্মা অবস্থান করিতেছে। মোক্ষ অথবা মহাপ্রলয় ব্যতীত তাহার বিনাশ নামক বিকারের কাল আসিবে না।

কেহ কেহ মনকে আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অতি সংক্ষেপে তাহাদের মত আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

মন যে আত্মা নহে তাহার প্রমাণ কি? জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি যে কিছু চেতন, গুণ, সংকল্প, বিকল্প, অবধারণ প্রভৃতি চেতন কার্য্য, সমস্তই সমনস্ক পদার্থে দৃষ্ট হয়, অজ্ঞান নহে। ইন্দ্রিয় নির্লিপ্যপ্রায় হইলে প্রাণ তৃক্ষীভাব অবলম্বন করিলেও মন নিবৃত্ত থাকে না, স্বপ্ন, স্মৃতি ও অমুখ্যানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। মন যদি প্রসুপ্ত বিলীন বা ধ্বংস হয়, তাহা হইলে সমুদয় ব্যাপার লুপ্ত হইয়া যায়। এই অম্লব্যতিরেকপ্রমাণে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, মনই আত্মা। আত্মা তদতিরিক্ত নহে। আলোক যেমন আপনার সত্তা-ক্ষুতি বজায় রাখিয়া অস্ত্রের সত্তাক্ষুতি উপলব্ধি করায়, তেমনি মনও আপনার সত্তাক্ষুতি স্থির রাখিয়া ইন্দ্রিয়দৃষ্ট বাহ্যপদার্থের সত্তাক্ষুতি অবধারণ করে। অসংখ্যশক্তিসম্পন্ন মন বিশেষ বিশেষ শক্তি বা গুণ অনুসারে বিশেষ বিশেষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংকল্প-বিকল্প-শক্তি লইয়া মন, কল্পী

ও ভৌক্তী শক্তি লইয়া বুদ্ধি, স্বীয় সত্ত্বাধীনি শক্তি লইয়া আত্মা। বাহারই মন্তক আছে, তাহারই মন বা আত্মা আছে। বাহার মন্তক নাই, তাহার মন বা আত্মা নাই। মনোগোলকের তারতম্য থাকিতে সকলের মন বা আত্মা সমান ক্ষমতাবাহী নহে। পশু, পক্ষী প্রভৃতির মানসগোলক অপূর্ণ, সেইজন্য তাহাদের মন বা আত্মা অপূর্ণ। কীট-পতঙ্গাদির তদপেক্ষাও অপূর্ণ। অতএব আত্মা মন নামে ভিন্ন, বস্তুতঃ উহা এক। সকল দর্শনশাস্ত্রেই এক বাক্যে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। মন জড়বস্তু, জড় স্বয়ং প্রেরিত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে কপিল বলেন,— মনকে আত্মা বলিয়া নিশ্চিত থাক। মুমুক্শুদিগের সঙ্গত নহে। ঋষিরা ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও প্রজ্ঞা উপাদান দ্বারা জানিয়া ছিলেন যে, আত্মা, নিত্য, শুদ্ধস্বভাব ও চিৎস্বরূপ। আত্মা যে মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, তাহা মননশীল জ্ঞানিমহুয়ের অমুভব-সিদ্ধ, এই অমুভবের প্রণালী এইরূপ—

মন যখন স্থিরভাবে আপনাকে দর্শন করে, তখন সে উপলব্ধি করে যে, আমি আত্মা নহি, আত্মার অধীন। আমি আত্মার ভোগোপকরণমাত্র। আমি সক্রিয় ও সবিকার, আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার। কোনও কালে বা কোন অবস্থায় আত্মার বিকার দৃষ্ট হয় না। সংশয়, নিশ্চয়, বিপর্যয়, সন্ধান, নির্বাচন এই সকল মনেই হয়, আত্মা ঐ সকলের দর্শক বা সাক্ষিমাত্র।

মন যখন আপনার নির্ণয়ে বা নির্বাচনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে উক্ত প্রকারে আত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়। মন আত্মা হইতে পৃথক্ না হইয়া আপনাকে নির্বাচন করিতে পারে না। একটু প্রণিধান করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জ্ঞান-ব্যবহার কিরূপ প্রণালী দ্বারা সম্পন্ন হয়। ‘আমার মন’ ব্যতীত ‘আমি মন’ একথা কেহ কখন বলে না, তদাকার জ্ঞানও হয় না। ‘আমার মন’ এই স্বতঃ উপপন্ন জ্ঞানের ব্যবহারপরম্পরা লক্ষ্য করিলে আত্মার সহিত মনের দৃষ্টদৃশ্যভাব ব্যতীত ঐক্য সম্বন্ধ প্রকাশ পাইবে না। আত্মা দ্রষ্টা, মন দৃশ্য। আত্মার সহিত মনের যদি ঐরূপ স্থিরতর সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে মাহুষ অবশ্য কখন না কখন ‘আমার মন’ ইহার পরিবর্তে ‘আমি মন’ এইরূপ বলিত। কিন্তু কেহ তাহা ভ্রমেও বলে না। এইজন্য বিশ্বাস করা উচিত যে, আত্মা মন নহে।

আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ‘আমার’ ইত্যাকার সাক্ষ্যপ্রত্যয় মাকুলমনে চির বিজ্ঞান আছে এবং তাহার সম্পূর্ণ নিমিত্ত অনেকগুলি বিশেষণ বা সম্বন্ধপূরক বস্তু তন্নি-

কটে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণে সেই সাক্ষ্যবিজ্ঞান এক সময়ে একরূপ থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন সময়েও একরূপ থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। কখন আমার মন, কখন আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি, আমার হস্ত, আমার পদ ইত্যাকার একটা একটা জ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান প্রসব করে। কিন্তু যখন ‘আমি জ্ঞান’ জন্মে, তখন তাহাতে কোন প্রকার সাক্ষ্য থাকে না। সেইজন্য আমি এই আত্মসত্ত্বাবোধক জ্ঞান নিরাক্ষ্য এবং তাহাতে কোন বিশেষণ বা সম্বন্ধপূরক বস্তুর অধর থাকে না। অতএব ‘আমি’ স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধ। অথচ আমি এই বোধটী মনের চির নিরুচ্চ ও স্বতঃসিদ্ধ ভাববিশেষ। এইজন্য উহা বুদ্ধি।

আত্মা চৈতন্যরূপী, মন জড়রূপী। চৈতন্যের স্বভাব প্রকাশ, জড়ের স্বভাব অপ্ৰকাশ। মন যে জড় বা অপ্ৰকাশস্বভাব তাহা অমুভব ও বুদ্ধিসিদ্ধ। মন যদি আত্মার দ্বারা প্রকাশস্বভাব হইত, তাহা হইলে মানব স্মৃতি, মুচ্ছা ও মুগ্ধাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইত না। কেননা স্বভাবের কদাচ অস্তিত্ব হয় না। উচ্ছতা নাই, অথচ আমি আছে, একরূপ হয় না। অতএব স্মৃতি-মুচ্ছাদি মানস-অপ্ৰকাশ অবস্থা দেখিয়া মনের জড়ত্ব অবোধে নির্ণীত হইতে পারে।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে এই যে, আত্মাকে প্রকাশ রূপী বলিলেও সেই ফল। স্মৃতি মুচ্ছা প্রভৃতি অপ্ৰকাশ অবস্থা দেখিয়া যেমন মনের অপ্ৰকাশত্ব অবধারণ কর, তেমনই আত্মারও জড়ত্ব অবধারণ করিতে পার।

ইহার উত্তরে কপিল বলেন, একথা সঙ্গত নহে, কারণ আত্মার প্রকাশস্বভাব কোনও সময়ে তিরোহিত হয় না। ইহাতে বিশেষ এই যে, সংযুক্ত-আত্মায় মনের প্রকাশ দ্বিগুণিত। যেমন দিবসে গৃহভিত্তিতে যে আলোক থাকে, স্বচ্ছকাচ দ্বারা যখন বাহিরের আলোক তাহাতে প্রতিফলিত করা যায়, তখন সেই ভিত্তিস্থ সাধারণ আলোক দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। এই দ্বিগুণিত আলোক অতি তীব্র ও অত্যধিক উজ্জ্বল। তজ্জপ মনঃসংযোগকালের প্রকাশ দ্বিগুণিত।

দ্বিগুণিত বলিয়া জাগ্রৎকালের চৈতন্য অধিক বিস্পষ্ট, অর্থাৎ জাজ্ঞান্যমান। কাচস্থানীয় মন যখন তমোগোত্রক-বশতঃ মলিন থাকে, তখন আত্মপ্রকাশের প্রতিবিম্বগ্রহণে অক্ষম। তখন আত্মার প্রকাশ বিলুপ্ত প্রায় বা অল্পতা প্রাপ্ত হয়। তাহাই স্মৃতি ও মুচ্ছাদি কালের এক গুণ প্রকাশ। জাগ্রৎকালের দ্বিগুণিত প্রকাশ তখন কমিয়া গিয়া একগুণিত হয়, সুতরাং আমরা বলিয়া থাকি মুচ্ছা ও স্মৃতিকালে জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তখনও আত্মা একগুণিতপ্রকাশে বিরাজিত থাকেন।

ইহাতে যদি বল সে অবস্থাতেও আত্মার প্রকাশ বা সত্য-ক্ষুধি থাকে, এ সিদ্ধান্তের প্রমাণ কি? প্রমাণ—সুশোখিত ও মুচ্ছিত ব্যক্তির সুশুভ্র ও মুচ্ছিতের অব্যবহিত পরেই অমৃত্যু হয়, আমি মুচ্ছিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। এই অমৃত্যুর একদেশে যে ‘আমি’ ও ‘ছিলাম’ অংশ আছে, তাহাই তাত্‌কালিক আত্মগততার বা আত্মপ্রকাশ থাকার অমুমানক। তৎকালে যদি কোন প্রকার সত্যক্ষুধি না থাকিত, তাহা হইলে কদাচ জীবের ঐরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থিত হইত না। পূর্বাভূতব জন্ত সংস্কারের বলেই স্মরণাত্মক জ্ঞান উদ্ভিত হয়। এ নিয়ম স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তখন আমি স্বাভাবিক প্রকাশে অবস্থিত ছিলাম।

বিষয়ের অক্ষুরণ, মনের অপ্রকাশ ও অজ্ঞান এ সকল তুল্য কথা। মন যে তৎকালে আত্মপ্রতিবিম্বগ্রহণে অক্ষম ছিল, বিষয়গ্রহণে বিরত ছিল, তাহা আর কেহ দেখে নাই, কেবল আত্মাই তাহা দেখিয়াছিল। মন এখন তমসচ্ছন্ন, আত্মা তাদৃশ মনকে অর্থাৎ তমসচ্ছন্ন মনকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই সুশুভ্র বা মুচ্ছিতের পর তাহা স্মরণ করিতে তিনি সমর্থ হন।

মন আপনার সত্যক্ষুধি বজায় রাখিয়া অতীত প্রকাশ করে, একমাত্র মনের বলেই জীব সব্যাপার, মনের অভাবে নির্ব্যাপার, স্মরণাত্মক মনই আত্মা এ সকল কথা নিতান্ত স্রেয়। আত্মা মনঃ দ্বারাই বিষয় গ্রহণ করেন, এইজন্ত মনকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। (সাংখ্যাদ্যঃ)

মন কোথায় অবস্থিত? মনের এই অবস্থিতিস্থান লইয়া শাস্ত্রকারদিগের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কোন কোন পুরাণ ও তত্ত্বমতে—মনের স্থান জুগলের অভ্যন্তর। দেহব্যাপিনী ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটি প্রধান নাড়ী আছে। এই নাড়ী তিনটি নাতি, মতান্তরে জ্বপিণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া মূলধারে গিয়াছে। তথা হইতে ত্রিশারাক্রমে তিন দিকে উভয় পার্শ্ব ও মধ্যস্থি বা মেরুদণ্ড অংশ করিয়া সন্তক পর্য্যন্ত আবর্তিত হইয়াছে। ঐ তিন প্রধান নাড়ীর অনেক শাখানাড়ী আছে। তাহারও আবার অনেক প্রশাখা আছে, ফল সমস্ত শরীরটা প্রায় শিরাবাণ্ড। অশ্বখপত্র জীর্ণ হইলে যেমন তাহা তত্ত্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ শরীরও তত্ত্বময়, অর্থাৎ শিরানয়।

উক্ত নাড়ীত্রয়ের মধ্যে মূণালতন্ত্র অপেক্ষাও হৃদয় স্নেহময় তন্ত্র শুষ্কাকারে আছে। আশ্রয়ভূত শিরার সহিত সেই সকল স্নেহতন্ত্র একত্রিত হইয়া গিয়া শেষ হইয়াছে। যে স্থানটিতে স্নেহময় তন্ত্রশুদ্ধ শেষ হইয়াছে, সেই স্থানটি ঐহিক অর্থাৎ গাঁটবুরু। এই তন্ত্রগ্রন্থির বৃত্তভাগ আত্মা

চক্র ও উর্দ্ধভাগ সহস্রার চক্র। মন এই আত্মাচক্রে অবস্থিত, এবং এইখানে থাকিয়াই আপনার কার্য্য করিয়া থাকে। মন যখন চিন্তাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন মস্তকস্থিত সমুদয় স্নায়ুসমূহ স্পন্দিত হইতে থাকে এবং চোক, মূখ, ক্র প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থান বিকৃত ও কুঞ্চিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়েও মতবৈধ আছে। কেহ বলেন, মনের স্থান মস্তক নহে, মনের স্থান হৃদয়। হৃদয়ভ্যন্তরে যে অপূর্ণাকার মাংস খণ্ড আছে, অর্থাৎ বাহ্যকে হৃদয় বল, সেই মাংস খণ্ডের উদরাকাশেই মনের বাসভূমি। তাহাদের অনুভব এই যে, মনুষ্য যে কিছু ধ্যান বা চিন্তা করে, তাহা হৃদয়ে রাখিয়াই করে এবং তাহাদের ধ্যেয় বস্তু সকল হৃদয়াকাশেই প্রতি-বিম্বিত হয়। এই কারণে মন মস্তকে নহে, হৃদয়ে।

নৈমারিকদিগের মতে মন দ্রব্যপদার্থ।

“দ্রব্যং গুণাস্তথা কৰ্ম্ম সামান্যং সৰ্বিশেষকম্।

সমাবায়স্তথা ভাবাঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীৰ্ত্তিতাঃ॥”

ক্ষিত্যপ্তজ্ঞো মরুদ্যোম কালা দিক্ দেহিনো মনঃ।

দ্রব্যাদি.....॥” (ভাষ্যপরিচ্ছেদঃ)

নব্য-নৈমারিকগণ প্রথমে জাগতিক পদার্থকে দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্তভাগে বিভাগ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, যোম, কাল, দিক্, দেহ ও মন এই নয়টি দ্রব্য পদার্থ।

সাংখ্যমতেও মন দ্রব্যপদার্থ। বেহ কেহ বলেন, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে মনের উৎপত্তি, স্মরণাত্মক মন দ্রব্যপদার্থ হইতে পারে না। মন যখন গুণোৎপন্ন, তখন উহা দ্রব্যপদার্থ নহে, গুণপদার্থ। সাংখ্য ইহার উত্তরে বলেন, প্রকৃতি গুণপদার্থ নহে, দ্রব্যপদার্থ। প্রকৃতি পুরুষরূপ পশ্চকে বন্ধ করে, এইজন্ত উহা গুণ নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক উহা গুণপদার্থ নহে, প্রকৃতি দ্রব্যপদার্থ, স্মরণাত্মক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মনও গুণপদার্থ নহে দ্রব্যপদার্থ।

[ সাংখ্যদর্শন দেখ। ]

আত্মার মনঃসংযোগ হইতেই জ্ঞান হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, শব্দস্পর্শাদি যে কিছু উপলব্ধি হয়, মনই তাহার প্রধান সহায়। মনঃসংযোগে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সন্ধ হইলে জ্ঞান হয়।

“অণু মনঃসংযোগেব জ্ঞানসামান্যে কারণম্।” (মুক্তাবলী)

জ্ঞানসামান্যের প্রতি স্বক্ এবং মনঃসংযোগই প্রধান কারণ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, এবং সর্বশেষে মনের সহিত আত্মার সন্ধ এত ক্রম হয় যে, তাহা



বলিয়া শেষ করা যায় না। এক হৃদিকা আঘাতে শতপত্র ছিন্ন করিলে প্রত্যেক পত্রের ছিন্ন পর পর হয়, কিন্তু তাহা কালের হস্ততা হেতু অগ্ৰভব করা মানববুদ্ধির অসাধ্য।

মন অতিশয় হস্ত, এইজন্ত এক কালে দুইটা বিষয়ের জ্ঞান হয় না।

“অযোগপঞ্চাজ্জ্ঞানানাং তত্ত্বাণুমিহেষ্যতে।” (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

মন অগ্ৰ, অর্থাৎ হস্ত, এইজন্ত জ্ঞানের অযোগপঞ্চ, এক-কালে কোন জ্ঞানই হয় না। চক্ষুঃসংযোগ হইলেই যে জ্ঞান হয়, তাহা নহে। মনে কর, মন একটা বিষয় চিন্তা করিতেছে, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু একটা পদার্থ দেখিল, দেখিবামাত্র কি তাহার জ্ঞান হইবে? না, তাহা হইবে না। কারণ দর্শনেন্দ্রিয়ের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে পদার্থের জ্ঞান জন্মাইতে পারে, তবে দর্শনেন্দ্রিয়া চক্ষু এবং মন উভয়ের পরস্পর সঞ্চদ্ব হইয়া আত্মা হইতে জ্ঞান হয়।

“আত্মা মনসা যুজ্যতে মন ইন্দ্রিয়েণ ইন্দ্রিয়ং বিষয়েণ তদ্বাদধ্যক্ষং ইত্যুক্ত দিশা জ্ঞানং জায়তে।” (ছারদর্শন)

মন সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত এককালে সংযুক্ত হইতে পারে না, ক্রমশঃ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিভিন্নকালে সংযুক্ত হইয়া জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। নিখিল বিষয়ের সহিত এক-কালে ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ হয় না বলিয়া এককালে সমুদয় জ্ঞান হয় না।

মন আত্মগুণ ও জ্ঞানসুখাদি প্রত্যক্ষকরণ। অর্থাৎ মনঃ দ্বারা আত্মারই জ্ঞানসুখাদির প্রত্যক্ষ হয়।

“যুগপজ্জ্ঞানানুপপত্তির্মনসো লক্ষং” (গৌতমসূ. ১১।১৬)

গৌতম-সুত্রানুসারে এক কালীন জ্ঞানের অনুপপত্তিই মনের লক্ষণ। মন এককালীন বহুজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। মন এককালে এক বিষয়ের জ্ঞানই জন্মাইয়া থাকে।

ছায়বৃত্তিকার বলেন, ‘সুখাদ্যুপলক্ষিসাধনমিন্দ্রিয়ং।’ মন-সুখাদি উপলক্ষ সাধন হইয়া থাকে, মন ব্যতীত সুখাদির জ্ঞান হইতে পারে না, এইজন্তই ‘সুখাদ্যুপলক্ষিসাধনং ইন্দ্রিয়ং মনঃ’ এইরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বাংস্তায়ণ বলিয়াছেন—‘যুগপত খলু ভ্রাণাদীনাং গন্ধাদীনাঞ্চ সন্নির্কর্ষেহু সন্সু যুগপজ্জ্ঞানানি নোৎপত্ততে তেনানু-মীয়তে অস্তি তত্দিন্দ্রিয়সংযোগিগহকারিনিমিত্তান্তরমব্যাপি যতাসমিধেনোৎপত্ততে জ্ঞানং সন্নিপেচোৎপত্তত ইতি মনঃ।’

এককালে ভ্রাণাদি ও গন্ধাদির সন্নির্কর্ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, অতএব ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, যে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হইবে, সেই সেই ইন্দ্রিয়যুক্ত সহকারি ও অব্যাপি অস্ত্র একটা কারণ আছে, বাহার সম্মিধানে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না,

এবং সম্মিধানে জ্ঞান হয়। বাহার সাহায্যে জ্ঞান জন্মে, সেই ইন্দ্রিয়ের নামই মন।

নৈয়ারিকদিগের মতে মনের ৮টা গুণ, সংখাদি পঞ্চক, পরহ, অপরহ ও বেগ। ‘মনোবিভূতি মীমাংসকাঃ মনো-নেঞ্জিরমিতি মায়াবাদি-প্রভৃতয়ো বদন্তি।’

মীমাংসকেরা বলেন মন বিভূ। মায়াবাদী বৈদান্তিকগণ মনের ইঞ্জিয়ত্ব স্বীকার করেন না।

সাংখ্য ও নৈয়ারিক ইহারা উভয়েই মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পাতঞ্জল-দর্শনে লিখিত আছে, ‘যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ।’ পাতঞ্জল সূ. ১২) চিত্ত অর্থাৎ মনোবৃত্তি সমূহকে বন্ধ করার নাম যোগ। মনের বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করিতে না পারিলে যোগ অসম্ভব। [যোগ দেখ।]

মনের বৃত্তির বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, মনোবৃত্তি অসংখ্য, স্মৃতিরাজ এক একটা করিয়া গণিতে গেলে শেষ হয় না, মনস্তত্ত্ববিদ যোগীদিগের মতে মনোবৃত্তি অসংখ্য হইলেও তাহার অবস্থাবিভাগ অসংখ্য নহে। মানবদিগের মানসিক অবস্থা পাঁচ প্রকারের অধিক নহে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার মনের বৃত্তি বা অবস্থা।

মনের ক্ষিপ্তাবস্থা—ক্ষিপ্ত অর্থে পাগল নহে, মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলাবস্থার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। মন যে, স্থির থাকে না, এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, ইহা হউক, উহা হউক করিয়া সর্বদাই অস্থির হয়, জলোকার জায় একটা ছাড়িয়া অত্র একটা, সেটা ছাড়িয়া আর একটা গ্রহণ করিবার জন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়, তাহাই তাহার ক্ষিপ্তাবস্থা। স্থূল তাৎপর্য এই যে, বাহ্য বস্তুর আকাজক্ষার অস্থির থাকাই মনের চিত্তাবস্থা।

মনের মূঢ়াবস্থা—মন যখন কর্তব্যাকর্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হয় এবং নিদ্রাতন্ত্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তনোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাকে মূঢ়াবস্থা কহে।

মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা—বিক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত পুরোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অভিন্নতাই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে,—চিৎের পুরোক্ত প্রকার চাকল্যের মধ্যে অধিক স্থিরতা, অর্থাৎ মন চঞ্চলতাব হইলেও সে যে মধ্যো মধ্যো স্থির হয়, সেই স্থির হওয়ার নামই বিক্ষিপ্তাবস্থা। মন যখন ঈশ্বজনক বিষয় পণিতাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাত্ম্য চাকল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জন্ত নিরবলম্বত্বলা হয়, অথবা

কেবলমাত্র সুখাবাদে নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাকে মনের ক্ষিপ্তাবস্থা বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

মনের একাগ্র অবস্থা—একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। মন যখন কোন এক বাহ্য বস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্জাতত্ব নিশ্চল নিরুদ্ভাব দীপশিখার স্থায় স্থির বা অবিকম্পিতভাবে বর্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিজ্ঞত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র সার্বিক-বৃত্তি উদ্ভিত থাকে, অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় সার্বিকবৃত্তিমাত্র প্রবাহিত থাকে, তখন জানিতে হইবে যে, মনের একাগ্র অবস্থা হইয়াছে।

মনের নিরুদ্ধাবস্থা—পূর্বোক্ত একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিরুদ্ধাবস্থায় অনেক প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই,—একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় তাহা থাকে না, মন তখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্যর্থের স্থায় নিশ্চেষ্ট থাকে। দম্ব হ্রের স্থায় কেবলমাত্র সংসারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ পরিণাম থাকে না। তখনই নিরুদ্ধাবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে।

মনের নিরুদ্ধাবস্থা আর মনের লয় বা বিনাশ প্রায় তুল্য কথা। নিরুদ্ধাবস্থায় মনের লয় হইলে কিছুই থাকে না। ইহাতে কেহ কেহ বলেন মনের লয় ও আত্মার অভাব প্রায় তুল্য কথা। ইহাতে পাতঞ্জলদর্শনের মত এই যে, উহা তুল্য কথা নহে, অনেক প্রভেদ আছে। অজ্ঞ মানবদিগের ঐক্য ভ্রম হয় বটে, কিন্তু মন ও আত্মা যে পৃথক পদার্থ, তাহা যোগীদিগের সমাধিকালেই প্রমাণীকৃত হয়। মন ও আত্মা এক হইলে সমাধি অর্থাৎ মনোবৃত্তি লয় হইবামাত্র অবশ্যই দেহ পতন হইত, যখন তাহা হয় না, তাহাদের শরীর যখন যেমন তেমনিই থাকে, তখন আর তৎকালে তাহাদের মনোলায় হইয়াছে বলিয়া আত্মার লয় হইয়াছে বলিতে পার না; বরং তৎকালে তাহাদের আত্মার যথার্থরূপ ও পার্থক্য অজ্ঞভূত হয়, এইরূপ বলাই বিধেয়। অতএব মনোবৃত্তির নিরোধকালেই পুরুষ বা আত্মা আপনার প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, অল্প সময়ে সেরূপ থাকেন না। অল্প সময়ে তিনি চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া বিবিধভাবে দৃশ্য হন।

মনের বৃত্তিও প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তি আবার দুই প্রকার। তন্মধ্যে ক্লেশদায়ক বলিয়া এক প্রকারের নাম ক্লিষ্ট এবং ক্লেশের (সংসারদুঃখের) নাশক বলিয়া অল্প প্রকারের নাম অক্লিষ্ট। বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইবামাত্র চিত্ত যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই

বিষয়াকার প্রাপ্তি হওয়ার নাম বৃত্তি। অর্থাৎ দেহস্থ ইন্দ্রিয় ও বহিঃস্থ বিষয় এই দুইয়ের সম্বন্ধবশতঃ মনের বিবিধ অবস্থা বা পরিণাম হইতেছে। সেই সকল মনঃপরিণামের নাম বৃত্তি, তাহাকে আমরা জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করি। বিষয় অসংখ্য, সুতরাং বৃত্তিও অসংখ্য। বৃত্তি অসংখ্য হইলেও শ্রেণী বা প্রকারগত ভেদ অসংখ্য নহে। প্রকারগত বিভাগ প্রধানকল্পে পাঁচ এবং অল্প একভাবে তাহা দুই। সেই দুইয়ের নাম ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। রাগ, ঘেব, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশের অর্থাৎ সংসারদুঃখের কারণ বলিয়া ক্লিষ্ট। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি তাহার বিপরীত অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ বলিয়া অক্লিষ্ট। মনের এই ক্লিষ্টবৃত্তিগুলি হেয় এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিগুলি উপাদেয়।

পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তি যথা,—প্রমাণবৃত্তি, বিপর্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি ও স্মৃতিবৃত্তি। অতিসংক্ষিপ্তভাবে ইহাদের লক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মনোবৃত্তি সকল অবলম্বিত বস্তুর অবিকল সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইলেই তাহা প্রমাণ বা সত্যজ্ঞান নামে গণনীয়। আর বিপরীতভাবে উৎপন্ন হইলে তাহা বিপর্যয় ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া স্বীকার্য। প্রমাণবৃত্তি সকল তিন প্রকার কারণে উদ্ভিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ, অহুমান ও আগম। [ বিশেষ বিবরণ প্রমাণ শব্দে দেখ। ]

যে জ্ঞান মিথ্যা, বাহ্য তদ্রূপে স্থায়ী হয় না, অর্থাৎ বাহ্য বিষয়দর্শনের পর অন্তথা হইয়া যায়, সেই জ্ঞানের নাম বিপর্যয়। এই বিপর্যয় জ্ঞানকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, বস্তু এক প্রকার, কিন্তু মনোবৃত্তি অল্প প্রকার, এইরূপ হইলেই তাহা বিপর্যয় বা ভ্রম হয়। এই বিপর্যয় নামক ভ্রমের রজ্জু সর্প, স্তম্ভের ভ্রম ও মরুমরীচিকা প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

মনের বিকল্প নামক বৃত্তি,—বস্তু নাই, অথচ শব্দ জন্ত এক প্রকার মনোবৃত্তি জন্মে, তাদৃশ মনোবৃত্তির নাম বিকল্প। বস্তু নাই অথচ শব্দের প্রভাবে মনোবৃত্তি জন্মে, ইহার দৃষ্টান্ত আকাশকুসুম। বস্তুতঃ আকাশকুসুম নাই; অথচ উহা শুনিবামাত্র মনোমধ্যে এক প্রকার বৃত্তি জন্মে। পদার্থ দুইটি কিন্তু শব্দের প্রভাবে একটা মাত্র বৃত্তি জন্মিলে তাহাও বিকল্প বৃত্তি।

মনের নিদ্রা নামক বৃত্তি, মনোবৃত্তি বাহ্যতে সমুদয় মীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদ্ভিত থাকে, তখন তাহা নিদ্রা বা সুশুপ্তি নামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ নিদ্রাও এক প্রকার মনোবৃত্তি। প্রকাশমতাব সম-

গুণের আচ্ছাদক তমোগুণের উদ্বেক অবস্থাকেই আমরা নিদা বলি। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির আলম্বন। যখন তমোময় অর্থাৎ অজ্ঞানময় নিদ্রাবৃত্তির উদয় হয়, তখন সর্বপ্রকাশক সৰ্ব গুণটী অভিতূত থাকে। সূতরাং তৎকালে কোনও প্রকার প্রকাশ বস্তুর প্রকাশ থাকে না। সেই জন্তই লোকে বলে, ‘আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না। বস্তুতঃ তাহার কোনও জ্ঞান ছিল না, এরূপ নহে, অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ছিল। সেই জন্তই সে নিদ্রা ভঙ্গের পর, তৎকালে অজ্ঞান বৃত্তিকে স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময় বৃত্তি অহুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গের পর তাহা তাহার স্মরণ হয়, এবং সেই স্মরণের দ্বারাই নিদ্রার বৃত্তি নির্ণয় হয়।

মনের স্মৃতি নামক বৃত্তি।—বস্তু একবার অহুভূত অর্থাৎ প্রমাণ বৃত্তিতে আকৃষ্ট হইলে তাহা আর যায় না, সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেই থাকারই নাম স্মৃতি। তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা, শুনা বা অনুভব করা যায়, চিত্রে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। উদ্বোধক উপস্থিত হইলেই সেই সংস্কার বা শক্তি বিশেষ প্রবল হইয়া চিত্রে সেই পূর্বাভূত বস্তুর স্বরূপ পুনরুদিত করিয়া দেয়। সেই সকল সমুদিত মনোবৃত্তির নাম স্মৃতি বা স্মরণ।

এই পাঁচ প্রকার ভিন্ন, মনের আর কোন প্রকার বৃত্তি নাই। এই পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তিকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই সংসার-দুঃখের অবসান হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা এই মনোবৃত্তি নিরোধ করা যায়। নচেৎ মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে না। (পাতঞ্জলদর্শন)

বৈতকশাস্ত্রে মনের উৎপত্তি ও ধর্ম্মাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—ত্রিগুণাত্মক মহত্ত্ব হইতে ত্রিগুণাবৃত্ত অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কারও তিন প্রকার, সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক। রাজস অহঙ্কারের সহিত সাত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়। এই ইন্দ্রিয় একাদশ,—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন।

মন আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ স্বকার্য্যে প্রবর্তিত হয়, এই জন্ত মনকে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয়ই কহে। মনের বিষয় জ্ঞান। মনকে আশ্রয় না করিয়া কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করিতে পারে না। চক্ষুঃ কর্ণাদি যে কোন ইন্দ্রিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মনই তাহাদের প্রধান সহায়।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে যখন মন উৎপন্ন, তখন সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে মনও তিন প্রকার। সাত্বিক মনের লক্ষণ—

XIV

“নাস্তিক্যং প্রবিতজ্য ভোজনমমুত্তাপশ্চ তথ্যং বচো  
মেধাবুদ্ধিধৃতিকমাশ্চ করুণা জ্ঞানক নির্দম্বতা।  
কর্ম্মানিন্দিতমস্পৃহঞ্চ বিনয়ো ধর্ম্মং সন্নিবাদেরা-  
দেতে সৰ্বগুণাবিতস্ত মনসো গীতা গুণা জ্ঞানিভিঃ ॥”

(ভাবপ্রঃ প্রথমঃ)

নাস্তিক্য, মোক্ষ ও পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা, সদসদ্বিবেচনাপূর্ব্বক ভোজন, অক্রোধ, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, মেধা, বুদ্ধি, ধৃতি, কাম, ক্রোধ ও লোভাদিতে অপ্রবৃত্তি, কমা, করুণা, আত্মতত্ত্বজ্ঞান, কপটাতাব, অনিন্দিত কর্ম্মাচরণ, অস্পৃহা, বিনয় এবং ব্রতপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান, এই সকল সাত্বিক-মনের কার্য্য। যাহাদের মন সৰ্বগুণাবৃত্ত, তাহারা এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। রাজসিক মনের লক্ষণ—

“ক্রোধস্তাড়নশীলতা চ বহলং দুঃখসুখেচ্ছাদিকা  
দম্বঃ কামুকতাপ্যলীকবচনং চাধীরতা দুষ্কৃতিঃ।  
ঐর্ষ্যাদভিমানিতাতিশয়িতানন্দোহধিক্যচাটনম্  
প্রথ্যাতা হি রজোগুণেন সহিতৈত্ততে গুণাশ্চেতসঃ ॥”

(ভাবপ্রঃ পূর্ব্বঃ)

ক্রোধ, তাড়নশীলতা, অত্যন্ত দুঃখ ও সুখেচ্ছা, দম্ব, কপটতা, কামুকতা, মিথ্যাবাক্যকথন, অধীরতা, অহঙ্কার, ঐর্ষ্যে অতিশয় অভিমানিতা, অধিক আনন্দ ও পরিভ্রমণ, এই সকল রাজসিক মনের লক্ষণ। যাহাদের মন রজোগুণাবৃত্ত, তাহারা এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তামসিক মনের লক্ষণ—

“নাস্তিক্যং সুবিষয়তাতিশয়িতালভঞ্চ দুঃখা মতিঃ  
প্ৰীতিনিদিতকর্ম্মশর্ম্মণি সদা নিদ্রালুতাহনির্গম্।  
অজ্ঞানং কিং সর্বতোহপি সততং ক্রোধোদ্যতা মূঢ়তা  
প্রথ্যাতা হি তমোগুণেন সহিতৈত্ততে গুণাশ্চেতসঃ ॥”

(ভাবপ্রঃ পূর্ব্বঃ)

নাস্তিকতা, অতিশয় বিষয়ভাব, অধিক আলস্ত, দুঃখবুদ্ধি, সর্বদা নিদিতকর্ম্মজনিত সুখে প্রীতি, দিবানিশি নিদ্রালুতা, সর্বদা অজ্ঞানতা, সর্বদা ক্রোধ ও মূঢ়তা এই সকল তামসিক মনের লক্ষণ। যে সকল ব্যক্তির মন তমোগুণাবৃত্ত, তাহারা এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

জীবাত্মা মনোবৃত্ত হইয়াই পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করিয়া থাকে। ইচ্ছা, বেদ, দুঃখ, সুখ, বিষয়জ্ঞান, প্রয়ত্ত, সংকল্প, বিচারণা, স্মৃতি, বুদ্ধি, কলাবিজ্ঞতা, প্রাণবায়ুর উর্দ্ধ নয়ন, অপান বায়ুর অধঃপ্রেরণ, নয়নের উন্নীলন ও নিম্নীলন এবং কৃত্যকরণোৎসাহ এই সকল গুণ মনোযুক্ত জীবে অবস্থিতি করে। (ভাবপ্রঃ)

অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক

ইন্দ্রিয়েরই এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমা। (সুশ্রুত শারীরস্থ্যঃ ১ অঃ)

জ্যোতিষের মতেও চন্দ্রমাই মন। মনের শুভাশুভের বিষয় চন্দ্র দিয়াই স্থির করিতে হয়।

“কালান্মা দিনকৃষ্ণনস্ত হিনশ্চঃ সৰ্বং কুজো জ্যো বচঃ।”(বৃহজ্জাঃ) আত্মা স্থায়ী, মন চন্দ্র, বল মঙ্গল ইত্যাদি।

বৈদ্যক গ্রন্থে পূৰ্ণোক্তরূপ যে মনের উৎপত্তি প্রভৃতির বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রানুরূপ। গর্ভস্থিত ক্রণের পঞ্চম মাসে মন জন্মিলে শুক্লিণীর দেহ অশুচি হয়। যতদিন প্রসব না হয়, ততদিন গর্ভিণী অশুচি থাকে। এই জন্ত ঐ জ্ঞী কোন ধর্মকর্মের অধিকারিণী নহে। মন জন্মিলেই জীবপদবাচ্য হয়, কারণ জীব মনের সাহায্যেই সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। মহাভারতে লিখিত আছে—

“ধৈর্য্যোপপত্তির্য্যাক্তিঃ চ বিসর্গঃ কল্পনা ক্ষমা।

সদগচ্ছাসুতা চৈব মনসো নববৈ গুণাঃ ॥”

(ভারত মোক্ষদ্বন্দ্বপঞ্চ ৯০ অধ্যায়)

মনের নয়টা গুণ। ধৈর্য্য, উপপত্তি, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, মনোরথরত্তি, ক্ষমা, সং অর্থাৎ বৈরাগ্যাদি, অদং অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি এবং অস্থিরতা এই ৯টা গুণ। মন অধ্যাত্তত্ব।

“অধ্যাত্মং মন ইত্যাহঃ পঞ্চভূতান্মারকম্।

অদ্বিত্যত্বঞ্চ সদ্ব্যবচক্রমাংচাধিদৈবতম্।”

(ভারত অশ্বমেধপঃ ৪২ অঃ)

ইহার স্বরূপ—

“অনিরূপ্যমদৃশ্যঞ্চ জ্ঞানভেদং মনঃ স্মৃতম্ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ প্রকৃতিখঃ ২৩ অঃ)

অনিরূপণীয় অদৃশ্যজ্ঞানভেদই মন নামে অভিহিত। ইহাকে দেখা বা নিরূপণ করা যায় না, কেবল জ্ঞান দ্বারা ই অস্বীকৃত হয়।

মনসব (দেশজ) বিচারবিভাগীয় কর্মচারী ভেদ (Munsiff)।

মনসবদার (পারসী) উপাধি বিশেষ। প্রধান সুবাদারের অধীনে শত-সৈন্যের নেতা মাত্রই উক্ত সম্মানের যোগ্য।

“ফরমানী মহারাজ মনসবদার।

সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার ॥” (অন্নদানঙ্গল)

মনসহরা, পঞ্জাবের হাজারা জেলাস্থ একটি নগর ও মনসহরা তহসীলের প্রধান সদর। অক্ষাঃ ৩৪°২০'২১" উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭৩° ১৪'০৩" পূঃ। আবটাবাদের উত্তরে শিরহন নদীর সঙ্গমে কান্কা-সরাই হইতে কান্ধীর ঘাইবার পথের ধারে অবস্থিত। এখানে তহসীলের কাছারী, ডাকঘর ও থানা আছে।

অধিবাসী ক্ষত্রিগণিকেরা শস্ত্র ও দেশভ্রাত্র্যে দ্রব্যের বিপ্লবত বাণিজ্য চালাইয়া থাকে। এখানকার লোক সংখ্যা প্রায় ৪০০০ হাজার।

মনসা (জী) মনঃ ভক্তাভীষ্টপূরণায় মননং অন্ত্যাত্মা ইতি মনস্-অর্শ-আদিবাদচ, ততষ্টাপ্, যদা মননমহঙ্কারমিতি স্তুতি নাশয়তীতি সো-ক। দেবী বিশেষ। পণ্ড্যায়—কদ্দ, মনসাদেবী, বিষহরী। (জটধর)

এই দেবীর প্রভাব এক সময়ে বঙ্গের সর্বত্র বিদিত ছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গবাসী মহাসমারোহে এই দেবীর পূজা করিতেন। তাঁহার মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ বঙ্গভাষায় শত শত মনসা-মঙ্গল প্রচারিত হইয়াছিল। মনসা পূজার সেরূপ ধুমধাম না থাকিলেও এখন জ্যৈষ্ঠমাসে দশহরার দিন বঙ্গের ঘরে ঘরে মনসার পূজা হইয়া থাকে। এখনও অমুগন্ধান করিলে বিভিন্ন গ্রন্থকার রচিত ৪০৫০ প্রকার মনসা-মঙ্গলের গানের পুঁপি পাওয়া যায়।

এই দেবী জরৎকার মূন্নির পত্নী, আন্তিকের মাতা এবং বাহুকির ভগিনী। ইহার নামের ব্যুৎপত্তি—

“শ্রীয়াং মনসাখ্যানং যং শ্রুতং ধন্যবন্তু তঃ।

কত্মা সা চ ভগবতী কথপশু চ মানসী ॥

তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি।

মনসা ধ্যায়তে বা বা পরমাত্মানামীশ্বরী ॥

তেন সা মনসা দেবী বোগেন তেন দীব্যতি।

আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ প্রকৃতিখঃ মনসোপাখ্যান ৪৫ অঃ)

এই দেবী কথপ মূন্নির মানসী কত্মা, এইজন্ত ইহার নাম মনসা, অথবা ইনি পরমাত্মাকে মনে মনে ধ্যান করেন বলিয়া মনসা নামে খ্যাত। এই দেবী আত্মারামা, বৈষ্ণবী ও সিদ্ধযোগিনী।

“ভৃগুং জগৎসু গৌরী সা সূন্দরী চ মনোহরা।

জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী ॥

শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবীতি কীর্তিতা।

বিষ্ণুভক্ত্যততো শঙ্খদ্বৈষবী তেন নারদ ॥

নাগানাং প্রাগরক্ষিত্রী যজ্ঞে জন্মেজয়স্ত চ।

নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগভগিনীতি চ ॥

বিষং সংহত্বু নীশা সা তেন বিষহরীতি সা।

সিদ্ধং যোগং হরাং প্রাপ তেনাতিসিদ্ধযোগিনী ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ প্রকৃতিখঃ ৪৫ অঃ)

এই দেবী জগতে অতিশয় গৌরবর্ণী, সূন্দরী ও মনোহরা, এইজন্ত ইহার এক নাম জগদ্গৌরী, শিবের শিষ্যা বলিয়া

শৈবী, অতিশয় বিকৃত এইজন্ত বৈষ্ণবী। জগজ্জয়ের যজ্ঞে নাগদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া ছিলেন বলিয়া নাগেশ্বরী, বিষ-সংহারে লম্বা বলিয়া বিষহরী এবং মহাদেবের নিকট সিদ্ধযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এই জন্ত ইহার সিদ্ধযোগিনী নাম হইয়াছে।

“জরংকার্জগ্নগৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।

বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥

জরংকার্জপ্রিয়াস্তিকমাতা বিষহরীতি চ।

মহাজ্ঞানমুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা ॥

ছাদশৈতানি নামানি পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ।

তস্ত নাগভয়ং নান্তি তস্ত বংশোদ্ধবন্ত ৷”

( ব্রহ্মবৈবর্তপুং প্রকৃতিখণ্ডে ৪৫ )

মনসাদেবীর দ্বাদশ নাম যথা—জরংকার্জ, জগ্নগৌরী, মনসা, সিদ্ধযোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরংকার্জপ্রিয়া, আস্তিকমাতা, বিষহরী ও মহাজ্ঞানমুতা। এই দ্বাদশ নাম বিনি পূজাকালে পাঠ করেন, তাঁহার বা তৎসংঘীয়ের সর্পভয় থাকে না। সর্পভয় উপস্থিত হইলেও এই দ্বাদশ নাম স্মরণ করা আবশ্যিক, তাহাতে সর্পভয় বিদূরিত হয়।

মনসাদেবীর উৎপত্তিকারণ—

“পুরা নাগভয়াক্রান্তা বভূবুর্মানবা ভূবি।

বান্ বান্ খাদন্তি নাগান্চ তে ন জীবন্তি নারদ ॥

নগ্নান্চ সমুজ্জে ভীতঃ কণ্ঠগঃ ব্রহ্মণাথিতঃ।

বেদবীজাহুসারেণ চোপদেশেন ব্রহ্মণঃ ॥

নগ্নাধিষ্ঠাতৃদেবীস্তাং মনসাং সমুজ্জে ততঃ।

তপসা মনসা তেন বভূব মনসা চ সা ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্তপুং প্রকৃতিখণ্ডে ৪৬ অং )

পুরাকালে মানবগণ অতিশয় সর্পভয়ে আক্রান্ত হইয়াছিল, নাগগণ যাহাকে দংশন করিত, তৎক্ষণাৎ সে প্রাণত্যাগ করিত। ব্রহ্মা কণ্ঠপকে এই কথা বলিলে, কণ্ঠপ অত্যন্ত ভীত হইয়া ব্রহ্মার উপদেশ ও বেদবীজের অহুসারে মন্ত্র সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপে তিনি মনসাকে সৃষ্টি করেন। এই দেবী তপোবলে মন দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিলেন, এইজন্ত ইহার নাম মনসা হয়।

এই দেবী কুমারী অবস্থায় মহাদেবের আশ্রয়ে গমন করেন, তথায় বহুকাল তপশ্বী করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া ইহাকে মহাজ্ঞান দেন এবং সাম অধ্যয়ন করণানন্তর কল্পতরুরূপ অষ্টাঙ্গ কৃষ্ণময়দীপা, স্তব, পূজা, পুরশ্চরণ প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা দেন। মনসা এইরূপে জ্ঞানলাভ করিয়া মহাদেবের আজ্ঞাহুসারে গুরুকে উপাস্য করিতে গমন করেন। তথায় ত্রিগুণপরিমিত কাল

ধরিয়া ত্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তপস্বী করেন। এই দীর্ঘকাল তপস্বীর পর তিনি সিদ্ধ হন। ভগবান্ বিষ্ণু ইহাকে তপঃ-শীর্ণা দেখিয়া প্রথমে ইহার পূজা করেন এবং এই বর প্রদান করেন যে, ‘অতাবধি তুমি পৃথিবীতে পূজিতা হও।’ পরে মহাদেব ইহার পূজা করেন। তৎপরে কণ্ঠপ এবং দেবতা সকল, তদনন্তর ময়ূ, মুনি ও নাগগণ, ক্রমে মানবগণ তাঁহার পূজা করেন। এইরূপে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে মনসাপূজার প্রচার হয়।

“কুমারী সা চ সমুদ্র জগাম শঙ্করালয়ম্।

ভক্ত্যা সংপূজ্য কৈলাসে তুষ্ঠাব চন্দ্রশেখরম্ ॥

দিব্যং বর্ষসহস্রকং তং যিষেবে মূনেঃ সূতা।

আপ্ততোষো মহেশশ্চ তাকু তুষ্ঠো বভূব হ ॥

মহাজ্ঞানং দদৌ তেষ্টে পাঠয়ামাস সাম চ।

কৃষ্ণময়ং কল্পতরুং দদাবষ্টাঙ্গং মূনে ॥

লক্ষ্মীমায়াকামবীজং গুহ্যং কৃষ্ণপদস্তথা।

ত্রৈলোক্যামঙ্গলং নাম কবচং পূজনক্রমম্ ॥

সর্বপূজ্যকং স্তবনং ধ্যানং ভূবনপাবনম্।

পুরশ্চর্যাক্রমঞ্চাপি বেদোক্তং সর্বসম্মতম্ ॥

প্রাপ্তা মূর্ত্যুজ্জয়াজ্ জ্ঞানং পরং মূর্ত্যুজ্জয়ং সতী।

জগাম তপসে সাক্ষী পুরুষং শঙ্করাজ্জয়া ॥

ত্রিগুণকং তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণকং পরমায়নম্।

সিদ্ধা বভূব সা দেবী দদশ পুরতঃ প্রভূম্ ॥

দৃষ্ট্বা কৃশাঙ্গাং বালাকু কপয়া চ কৃপানিধিঃ।

পূজাকু কারয়ামাস চকার চ স্ময়ং হরিঃ ॥

বরঞ্চ প্রদদৌ তেষ্টে পূজিতা স্তং ভবে ভব।

বরং দদা চ কল্যাণ্যে সপ্তশ্চাত্তদর্পে বিভুঃ ॥

প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমায়ন।

দ্বিতীয়ে শঙ্করেনৈব কণ্ঠপেন সুরেণ চ ॥

মমুনা মুনিনা চৈব নাগেন মানবাদিনা।

বভূব পূজিতা সা চ ত্রিযু লোকেষু সূততা ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্তপুং প্রকৃতিখণ্ডে ৪৬ অং )

কণ্ঠপ জরংকার্জ নামে মহাতেজস্বী তপস্বীর সহিত ইহার বিবাহ দেন। একদা জরংকার্জ গুরুরত্নীথে বটরূক্ষমূলে মনসার উদ্দেশে মত্তক রাখিয়া নিদ্রা যান; এমন সময়ে দিনমণি অন্তর্মিত হন। মনসা সায়াঃকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বামীকে ধন্যলোপভয়ে নিতান্ত ভীত হন, স্বামীবৎ নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারেন না, এ দিকে সন্ধ্যার কালও অতীত হয়। তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া ধীরে ধীরে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর জরংকার মনসার প্রতি কুপিত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কেন আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে। তুমি জান,—যে স্ত্রী স্বামীর অপ্রিয়কারিণী হয়, তাহার কুস্তীপাক নরক এবং ইহ ও পরলোকে দুর্গতির সীমা থাকে না।

তখন মনসা স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত চিতে তাঁহার ভরণপ্রাপ্তে পড়িয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি জানি,—যে ব্যক্তি শৃঙ্গার, আহার ও নিদ্রাভঙ্গ করে, তাহার দুর্গতির শেষ থাকে না, তথাচ আপনার সন্ধ্যালোপ হয়, এই ভয়ে নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি; কারণ যদি কোন ব্রাহ্মণ সাংকাল অতীত হইলে সন্ধ্যার উপাসনা না করে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। আমি ধর্মলোপভয়ে এই নিদ্রাভঙ্গ করিয়া যদি অপরাধিনী হইয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন।

জরংকার মনসার এই কথা শুনিয়া স্বর্গদেবকে অভিশাপ দিতে উত্তত হন। ভগবান্ স্বর্গ তাহা জানিতে পারিয়া সন্ধ্যার সহিত তৎসমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে সন্ধ্যোধন-পূর্বক বলেন, আপনার নিদ্রাভঙ্গ না হইলে আমি অন্তর্মিত হইতাম না, আমার অন্তের সময় দেখিয়া মনসা আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছে। অতএব আমাকে আপনার শাপ দেওয়া উচিত নহে, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। স্বর্গের এই কথায় জরংকার স্বর্গের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আর শাপ দিলেন না। তখন স্বর্গদেব হুটমনে স্বর্গস্থানে গমন করিলেন।

জরংকার পূর্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে মনসাকে পরিত্যাগ করেন। তখন মনসা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ইষ্টগুরু মহাদেব ও জন্মদাতা কশ্যপকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। মহাদেব ও কশ্যপ তথায় সমাগত হইলে জরংকার তাঁহা-দিগকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আপনারা কিজন্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন, আমি তদনুসারে কার্য্য করিব।

ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি ধর্মপত্নী মনসা তোমার ত্যজ্যা হয়, তাহা হইলে স্বধর্মপালনের জন্ত ইহাতে পুত্রোৎপত্তি করিয়া ত্যাগ করাই বিধেয়। কারণ যদি কেহ ধর্মপত্নীতে পুত্রোৎপত্তি না করিয়া তাহাকে ত্যাগ করে, তবে তাহার তপস্যার ফল হয় না, বরং তপোভঙ্গ হইয়া থাকে।

জরংকার ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক মনসার নাতিস্পর্শ করিয়া কহিলেন, মনসে! আমার এই করস্পর্শে তোমার গর্ভ হইল, এই গর্ভে ধার্মিকপ্রবর এক সন্তান জন্ম

গ্রহণ করিবে। এই পুত্র বৈষ্ণবাগ্রণী, তেজস্বী, তপস্বী ও যশস্বী প্রভৃতি নানা সৎগুণশালী হইবে। পরে জরংকার মনসাকে নানাপ্রকার উপদেশ বাক্যে প্রবোধ দিয়া তপস্কার্য্য গমন করিলেন।

পরে মনসা মহাদেবের আলয়ে গমন করিলেন যথাকালে তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। মহাদেব স্বয়ং এই পুত্রকে বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করাইলেন। এই পুত্র অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিল বলিয়া ইহার নাম আন্তিক হয়। ‘আন্তি’ অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলিয়া আন্তিক নাম হইয়াছিল। তদনন্তর মনসা গুরু মহাদেবকে প্রণাম করিয়া পিতা কশ্যপের আশ্রয়ে আগমন করেন।

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৪৬ অধ্যায়)

মহাভারতে ‘আন্তিক মুনির মাতা জরংকারর পত্নীর’ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি মনসাদেবী কি না, তাহা স্থিররূপে বলা যায় না। কারণ মনসা বলিয়া তাঁহার নামের কোন উল্লেখ নাই। মনসার দ্বাদশ নামের মধ্যে জরংকার একটা নাম, মহাভারতে জরংকার নামেরই উল্লেখ আছে। মহাভারতোক্ত উপাখ্যান এইরূপ—

বাসুকির জরংকার নামে এক ভগিনী ছিল। জরংকার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নাগরাজ বাসুকি অলঙ্কৃত ভগিনীকে লইয়া অরণ্য মধ্যে জরংকার মুনির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! তপস্বিনী এই কন্যা আমার ভগিনী ও আপনার স্বনাম্নী, ইহাকে ভার্য্যার্থে পরিগ্রহ করুন, যথাসক্তি আমি ইহার ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। আমি আপনার নিমিত্তই এতদিন এই কন্যা রাখিয়াছি। ঋষি কহিলেন, আমার এই নিয়ম থাকিল যে, আমি ইহার ভরণপোষণ করিব না এবং এই কন্যা কখন আমার অপ্রিয়কর্ম্ম করিবে না, করিলে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব। এই প্রতিজ্ঞায় জরংকার যথাবিধি জরংকারর পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে বাসুকিভগিনী জরংকার ঋতুস্নাতা হইয়া মহামুনি ভর্তার নিকট যথাবিধানে গমন করিতে হতাশন-সদৃশ দীপ্তিবৃক্ক এক গর্ভ ধারণ করিলেন। শুক্লপক্ষীয় শশ-ধরের গ্রায় ঐ গর্ভ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদিন মহাযশা জরংকার নাগভগিনীর ক্রোড়ে মন্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হন। এদিকে ভগবান্ স্বর্গদেব অন্তাচলচূড়াবল্লবী হইলেন, তথাপি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন মনস্বিনী বাসুকিভগিনী দিবাবসান হওয়াতে ধর্মলোপভয়ে ভীতা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, স্বামীর নিদ্রা

ভঙ্গ করিব কি না? নিদ্রা ভঙ্গ করিলে এই ধর্মশীল ভর্তার নিকট অপরাধী হইতে হইবে এবং নিদ্রাভঙ্গ না করিলে ধর্মলোপ হইবার সম্ভাবনা, এই বিষয় আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যাহাতে স্বামীর ধর্মলোপ না হয়, তাহাই করা আবশ্যক। তখন তিনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! দিবাকর অন্তমিত হইয়াছেন, গাত্রোথান করিয়া জলস্পর্শপূর্বক সন্ধ্যোপাসনা করুন, দেখুন, অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

জরংকার নিদ্রোখিত হইয়া সহধর্মিণীকে কহিলেন, হে ভূজঙ্গমে! তুমি আমাকে স্পৃহা অবজ্ঞা করিলে, আমি তোমার নিকটে আর থাকিব না, এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করিব। আমি নিদ্রিত থাকিলে দিবাকর কখনই অন্তমিত হইতে পারিতেন না, ইহা আমি নিশ্চিত জানি। আমি তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা কখনই মিথ্যা হইবে না।

সাম্বী জরংকার কৃতাজ্জলিপুটে বাষ্পগদগদলোচনে কহিলেন, হে বিজ্ঞোত্তম! এই নিরপরাধিনী পত্নীকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে, যেহেতু আপনি ধর্মজ্ঞ। বিশেষতঃ আমি সর্বদা ধর্মপথে থাকিয়া আপনার স্নেহা, হিতানুষ্ঠান ও প্রিয়সাধন করিতেছি। যে উদ্দেশ্যে আমার ভ্রাতা আপনার সহিত আমার পরিণয় সম্পাদন করিয়াছেন, মন্দভাগ্যা আমি, তাহাও লাভ করিতে পারি নাই। অতএব তিনিই বা আমাকে কি বলিবেন। আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাখে অভিজুত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে, আপনার ঔরসে আমার গর্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাও এ পর্যন্ত হয় নাই। আপনার ঔরসে পুত্র জন্মিলে আমার জ্ঞাতিগণের মঙ্গল হইবে। হে ভগবন্! আমি জ্ঞাতিদিগের হিতাভিলাষিণী হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার সহিত আমার এ সম্বন্ধ নিষ্ফল করিবেন না। আপনি মহাত্মা হইয়া এই অব্যক্তরূপ গর্ভাধান করিয়া কিরূপে নিরপরাধিনী ভাষ্যাকে ত্যাগ করিয়া যাহতে উত্তম হইয়াছেন। পত্নীর এই বাক্যে জরংকার তৎকালোপযুক্ত বাক্যে কহিলেন, হে স্নেহগে! বৈখানরতুল্য পরমধার্মিক এক ঋষি তোমার গর্ভে আছে। জরংকার ভাষ্যাকে এই কথা বলিয়া উগ্র-তপশ্চায় কৃতনিশ্চয় হইয়া বনগমন করিলেন।

ভর্তা গমন করিবামাত্র জরংকার ভ্রাতার সমীপে গমন করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বায়ুকি সেই অপ্রিয় বার্তা শুনিয়া ভগিনীকে কহিলেন, ভজ্জ! আমাদের যাহা উদ্দেশ্য ও যে অভিপ্রায়ে তোমাকে সম্প্রদান করিয়া-

ছিলাম, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। পিতামহ দেবগণের সহিত বলিয়াছিলেন যে, নাগগণের হিতের নিমিত্ত তোমার গর্ভে সেই ঋষির ঔরসে যদি এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র সর্পগণকে সর্পধ্বজ হইতে মুক্ত করিবে, সেই মুনিসত্তম হইতে তোমার গর্ভ হইয়াছে কি না? আমার ইচ্ছা যে, তোমাকে যে উদ্দেশ্যে দান করিয়াছি, তাহা নিষ্ফল না হয়। যদিও আমার এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অশ্রায়, তথাপি ইহা আমাদের গুরুতর কার্য বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমার ভর্তা মহাতপস্বী, কোন মতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারা যাইবে না।

জরংকার বায়ুকির এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি সেই মহাত্মাকে যাইবার সময় সন্তানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে ‘অস্তি’ অর্থাৎ সন্তান গর্ভে আছে এই কথা বলিয়া বনগমন করিয়াছেন। আমার স্বপ্ন হয়, তিনি পরিস্ফুটলেও কখন মিথ্যা কথা কহেন না, তবে এই আপৎকালে কি নিমিত্ত মিথ্যা বলিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, অগ্নি ও স্নাতুল্য তেজস্বী তোমার এক পুত্র হইবে।

পরে সময় উপস্থিত হইলে, জরংকার দেবতুল্য এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র নাগরাজগৃহে প্রতিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি যখন গর্ভস্থ ছিলেন, তখন তাঁহার পিতা ‘অস্তি’ এই কথা বলিয়া বনগমন করেন, তন্নিমিত্ত ইহার নাম আস্তিক হয়। ইনি ভগবান্ চ্যবনের নিকট সাস্ত্রবেদ অধ্যয়ন করেন। এই আস্তিক মুনিই জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময় সর্পদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। (ভারত ১।৩৪-৫০ অ০)

[ জরংকার দেখ। ]

মহাভারতোক্ত বিবরণ এইরূপ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও লিখিত আছে,—আস্তিক জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময় সর্পদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু মহাভারতে এইরূপ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইহার পূজার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরাণের মতে মহাদেব ও নারায়ণ প্রভৃতি সকলেই ইহার পূজা করিয়াছিলেন এবং মর্ত্যলোকেও ইনি পূজা-নীয়। ইহার পূজনে সর্পভয় বিদূরিত হয়, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

দেবীভাগবতের ২য় স্কন্ধে আস্তিকমর্ত্য জরংকার উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, এই উপাখ্যানও মহাভারতোক্ত উপাখ্যানের ত্রায়। ইহাতেও মনসা নামের উল্লেখ ও পূজা-



বিধান দৃষ্ট হয় না। অতএব আত্মীক মাতা জরংকার মনসা দেবী কি না, তাহা স্মৃধীগণের বিবেচ্য।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইহার পূজাদির বিধান এইরূপ লিখিত আছে।

“পূজাবিধানং স্তোত্রঞ্চ ক্ষয়তাং মুনিপুঙ্গব।

ধ্যানঞ্চ দামবেদোক্তং দেবীপূজাবিধানকম্ ॥”

ধ্যান—

“শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রক্তভূষণভূষিতাম্।

বহিঃকৃষ্ণাংস্ত্র্যকাদানাং নাগবজ্রোপবীতিনীম্ ॥

মহাজানযুতাকৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতীম্।

সিদ্ধাধিষ্ঠাত্রীদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্তপু. প্রকৃতিখ. ৪৬ অ. )

এই ধ্যানে নানাবিধ উপচার দ্বারা মনসাদেবীর পূজা করিতে হয়। এই দেবীর দ্বাদশাঙ্গর মন্ত্র যথা—‘ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্রীং ঐং মনসাটদৈব্যা স্বাহা’ এই দ্বাদশাঙ্গর মন্ত্র কল্পতরু-স্বরূপ। এই মন্ত্র ৫ লক্ষ জপ করিলে মানবের মন্ত্রসিদ্ধি হয়। বাহার মন্ত্র সিদ্ধি হয় তিনি সিদ্ধপুরুষ। তাঁহার নিকট বিধ অমৃত তুল্য। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তিতে অথবা পঞ্চমী তিথিতে স্মৃধীশাখায় এই দেবীর আবাহন করিয়া পূজা করিতে হয়। যিনি এইরূপে পূজাদি করেন, তিনি ধনবান্, পুত্রবান্ ও কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকেন।\*

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইহু কতৃক মনসাপূজাস্থলে ইহার দশা-  
ঙ্গর মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

“গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহিঃ বিষ্ণুং শিবং শিবাম্।

সংপূজ্যাদৌ দেবষট্কে পূজয়ামাস তাং সতীম্ ॥

\* “ইতি ধ্যান তু তাং দেবীং মূলেনৈব প্রপূজয়েৎ।

নেবেদ্যৈর্বিবিধৈর্দীপৈঃ পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ ॥

মূলমন্ত্রেণ বেদোক্তো ভক্তানাং বাঞ্ছিতপ্রদঃ।

মুনে! কল্পতরুনাম হসিকো দ্বাদশাঙ্গরঃ ॥

ওঁ হ্রীং শ্রীং ঐং মনসাটদৈব্যা স্বাহেতি কীর্ত্তিতঃ।

পঞ্চলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ নৃণাম্ ॥

মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ব্যস্ত স সিদ্ধো জগতীতে।

স্বধাসমং বিধং তস্ত ধনস্তুরিসমো ভবেৎ ॥

ব্রহ্মনাষট্কে সাক্ষাৎ স্মৃধীশাখায় যজ্ঞতঃ।

আবাহু দেবীমীশাতাং পূজয়েদ্ যো হি ভক্তিতঃ ॥

পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়াং দৈব্যা দদ্যাক যো বলিম্।

ধনবান্ পূজবাংষ্টব কীর্ত্তিমাংস্ত ভবেদ্বদ্রবম্ ॥

পূজাবিধানং কথিতং তদাধ্যানং নিশাময়।

কথয়ামি মহাভাগ যৎ শ্রুতং ধর্মবন্তু তঃ ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্তপু. প্রকৃতিখ. ৪৬ অ. )

ওঁ হ্রীং শ্রীং মনসাটদৈব্যা স্বাহেত্যেবঞ্চ মন্ত্রতঃ।

দশাঙ্গরেণ মূলেন দদৌ সঞ্চ যথোচিতম্ ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্তপু. প্রকৃতিখ. ৪৬ অ. )

পূজার বিধানানুসারে প্রথমে গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা ইহাদিগকে পূজা করিয়া ‘ওঁ হ্রীং শ্রীং মনসা-  
টদৈব্যা স্বাহা’ এই দশাঙ্গর মন্ত্রে মনসাদেবীর পূজা করিতে  
হইবে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ত্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে ৫১ অধ্যায়ে  
ধ্যান ও পূজাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

মনসার ধ্যান—

“চারুচম্পকবর্ণাভাং সর্কাজমুনোহরাম্।

ঈষদাস্ত্রপ্রসন্নাস্তাং শোভিতাং হৃদ্যবাসিনাং ॥

কবরীভারশোভাচাং রক্তাভরণভূষিতাম্।

সর্কভরণপ্রদাং দেবীং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্ ॥

সর্কবিজ্ঞাপ্রদাং শাস্তাং সর্কাবজ্রাবিশারদাম্।

নাগেন্দ্রবাহিনীং দেবীং ভজে নাগেশ্বরীং পরাম্ ॥”

এই ধ্যানে পূজার পদ্ধতি অনুসারে মনসা পূজা করিতে হয়।

মনসার স্তব—

“নমঃ সিদ্ধিস্বরূপায়ৈ সিদ্ধিদায়ৈ নমোনমঃ।

নমঃ কণ্ঠপকথায়ৈ বরদায়ৈ নমোনমঃ ॥

নমঃ শঙ্করকথায়ৈ শঙ্করায়ৈ নমোনমঃ।

নমস্তে নাগবাহিন্যৈ নাগেশ্বর্য্যো নমোনমঃ ॥

নমো নাগভগিন্যৈ চ যোগিন্যৈ চ নমোনমঃ।

নমোহস্তিকজন্যৈ চ জনৈস্ত জগতাং নমঃ ॥

নমো জরংকারন্যৈ জরংকারকথ্যৈ নমঃ।

নমশ্চিরং তপস্বিন্যৈ সূর্য্যদায়ৈ নমোনমঃ ॥

নমস্তপঃস্বরূপায়ৈ ফলদায়ৈ নমোনমঃ।

সুশীলায়ৈ চ সাত্বিক্যৈ চ শান্ত্যৈ চ নমোনমঃ ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্তপু. ত্রীকৃষ্ণজন্মখ. ৫১ অ. )

এইরূপ মনসা পূজা ও স্তবাদি করিলে সকল অর্থাষ্ট  
সিদ্ধি হয়।

রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতিতবে মনসাপূজার বিধানাদি বাহা  
লিখিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণোক্ত পূজার সহিত কোন  
মিল নাই। বর্তমানে যে মনসার পূজা হইয়া থাকে, রঘুনন্দ-  
নের মতানুসারে অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় লিখিত হইল।

“সুপ্তে জনাঙ্কিনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাজনে।

পূজয়েন্ননসাদেবীং স্মৃধীবিটপসংস্থিতাম্ ॥

পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্কৈরনন্তরম্।

পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পরগী ॥

মনসাং দেবীং বিষহরীং স্মৃধী সিজ ব্রহ্ম—

দেবীঃ সপুজ্য নহা চ ন সপ্ভয়মাগ্নুয়াং ।  
পঞ্চমাং পুজয়েন্নাগান্ অনজ্ঞাতান্মহোরগান্ ।  
ক্ষীরং সর্পিংস্ত নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহম্ ॥” (তিথিতত্ত্ব)  
আষাঢ়মাসে তগবান্ বিষ্ণু নিদ্রিত হইলে কৃষ্ণপক্ষের  
পঞ্চমী তিথিতে ভবনান্ত্রনে সিদ্ধবৃক্ষে মনসাদেবীর পূজা  
করিতে হয় ।

গৃহের অন্তরে (দাওয়া) সিদ্ধগাছ পুতিয়া পূজার বিধানানু-  
সারে ঐ দেবীর পূজা করিতে হয় । এই দিন পঙ্গু জাগরিত  
হয়, যথাবিধানে মনসাদেবীকে পূজা করিলে সর্পভয় থাকে না ।  
পূজায় ক্ষীর ও সর্পিঃ নৈবেদ্য দিতে হয় । এই তিথিতে  
মনসাপূজার পর নাগদিগেরও পূজা করা আবশ্যিক, এ জন্ত  
ঐ তিথিকে নাগপঞ্চমীও কহে ।

মনসাধ্যানং যথা—

“দেবীমম্বা মহীনাং শশধরবদনাং চারুকাঙ্কিং বদাং  
হংসারুঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্পদাং সর্পদৈব ।  
স্মেরাত্মাঃ মণ্ডিতাঙ্গাঃ কনকমণিগণৈর্নাগরৈরনেকৈ-  
র্বন্দেহং সাষ্টনাগামুকুচবুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্ ॥”

(পদ্মপুরাণং)

এই ধ্যানে মনসার পূজা করিতে হয়, পরে অনন্ত, বাহ্লিক,  
পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুণার, ককট ও শঙ্খ এই অষ্ট নাগ  
পূজা করা আবশ্যিক ।

২ কামরূপস্থিত নদীবিশেষ ।

“ততস্ত মনসা নাম নদী পুণ্যতমা পরা ।

সরিং সা মনসাখ্যা তু তৃণবিন্দবতারিতা ॥

বৈশাখং সকলং মাসং যত্নাং স্নাত্বা নরোত্তমঃ ।

বিষ্ণুলোকমবাটৈপ্যব ততো মোক্ষমবাগ্নুয়াং ॥”

(কালিকাপুঃ ৭৪ অঃ)

সমস্ত বৈশাখ মাস ধরিয়া এই নদীতে অবগাহন স্নান  
করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, তদনন্তর মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ।

মনসাদেবী (স্ত্রী) মনসা চাসৌ দেবী চেতি যদ্বা মনসা  
দীব্যভীতি দিব্ অচ্, ভীপ্ (মনসঃ সংজ্ঞায়াং । পা ৬।৩।৪)  
ইতি বিভক্ত্যধুঙ্ । মনসা ।

“সম্পূজ্য মনসাদেবীং প্রযযুঃ স্থালয়ঞ্চ তে ।”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ প্রকৃতখঃ ৪৬।১১৮)

মনসাপঞ্চমী (স্ত্রী) নাগপঞ্চমী । আষাঢ়ী কৃষ্ণপঞ্চমীতে  
মনসাদেবীর উৎসব হয় ।

মনসাবৃক্ষ (দেশজ) মনসা, সিদ্ধগাছ, সংস্কৃত নাম স্নুহী  
(Euphorbia Ligularia)

মনসিকার (পুং) মনে নরন, মনোযোগ ।

মনসিজ (পুং) মনসি জায়তে ইতি জন-ড (হলদন্ত্যং সপ্তম্যাঃ  
সংজ্ঞায়াং । পা ৬।৩।৯) ইতি সপ্তম্যা অনুল্ । কামদেব ।

“কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্ত তদ্বাবদর্শনাখ্যাসি ।

অকৃতার্থেহপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে ॥”

(শকুন্তলা ২ অঃ) (ত্রি) ২ মনোজাত মাত্র ।

মনসিন্ (ত্রি) মনগুক্ত । (তৈত্তিরীয় সং ৭।৫।১২।১)

মনসিশয় (পুং) মনসি শেতে ইতি শী (অধিকরণে শেতে ।  
পা ৩।২।১৫) ইতি অচ্, ততঃ সপ্তম্যা অনুল্ । কামদেব ।

(হলায়ুধ)

মনসুর ইবন্ জমছুর, থলিফা ২য় মর্বানের অধীনস্থ সিদ্ধপ্রদেশ-  
শের একজন শাসনকর্তা । অল্ মসুদীর মতে ইনি মনহুরিয়া  
প্রতিষ্ঠা করেন । কিন্তু বলাজিরের মতে মহম্মদই বিন  
কাসিমই মনহুরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা । খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্য-  
ভাগে ইনি সিদ্ধ শাসন করিতেন । থলিফা আবু মস্লাম  
ইহার উপর বিরক্ত হইয়া আবছুর রহমনকে সিদ্ধপ্রদেশের  
শাসনকর্তা করিয়া পাঠান । কিন্তু সিদ্ধসীমান্তে মনহুর  
তাহাকে বিনাশ করেন । তৎপরে কাবুং তামিমি সিদ্ধর  
শাসনভার প্রাপ্ত হন । তাঁহার হস্তে মনহুর পরাজিত ও  
রাজ্যচ্যুত হন । অবশেষে তিনি মরুভূমে তৃষ্ণায় জীবন  
বিসম্বলন করেন ।

মনসুরকোট, গঞ্জাম জেলার বহামপুর তালুকের একটা  
গ্রাম । অক্ষাঃ ১৯°১৭' উঃ, দ্রাঘিঃ ৮৪°৫৮' পূঃ । গোপাল-  
পুরের ও মাইল পূর্বে অবস্থিত । এক সময়ে এইস্থানে মুসল-  
মানদের শাসনকেন্দ্র ছিল ।

মনসুর নগর, অবোধাপ্রদেশের হরদৌই জেলার অন্তর্গত  
মাহাবাদ তহসীলের একটা পরগণা । উত্তরসীমায় আলম  
নগর ও পিহানি, পূর্বে গোপামউ, দক্ষিণ ও পশ্চিমে সারা । ভূ-  
পরিমাণ ২৬ বর্গ মাইল । এখানকার জমি মন্দ নয়, এখানকার  
জঙ্গলে শূকর, নীলগাই ও বন্য গোমহিষ দৃষ্ট হয় । ইহার  
মধ্যে মধ্যে শত সকল নষ্ট করিয়া থাকে । এখানকার চৌহান-  
দিগের অধিকারভুক্ত গ্রামসমূহের জমি উৎকরা । এখানে  
প্রধানতঃ যব, গম ও বজ্রার চাষ হইয়া থাকে । ছোলা,  
বজ্রা, মাষ, নীল, তামাক, ইক্ষু ও অহিকেনেরও চাষ আছে ।  
১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদীর চাকলাদার সারা ও গোপামউ হইতে  
কতকগুলি গ্রাম লইয়া এই নূতন পরগণা গঠন করেন ।  
এখানকার প্রধান গ্রাম মনহুর নগর । তথায় একটা ক্ষুদ্র  
বিদ্যালয় আছে ।

মনস্ক (স্ত্রী) মনোযোগ ।

মনস্কান্ত (ত্রি) মনোমত । প্রিয় ।

মনস্কাম (পুং) মনসঃ কামঃ কামনা। মনস্কামনা, মনোরথ, মনের অভিলাষ।

মনস্কার (পুং) মনসি মনসো বা কারো নিশ্চয় ইতি, বা কৃ ভাবে ঘঞ, মনসঃ কারো বিকারঃ করণমিতি বা। মনের সূখাদি, মনের সূখাভিলাষ, পর্যায়—চিত্তভোগ। (অমর)

মনস্তাপ- (পুং) মনসঃ তাপঃ, মনঃপীড়া।

“মনস্তাপং ন কুর্বাৎ আপদং প্রাপ্য পার্থিবঃ।

সমবুদ্ধিঃ প্রসন্নাত্মা সূখহংথে সমো ভবেৎ ॥”

(গরুড়পুং ১১১ অং) ২ অমৃতাপ।

ব্রাহ্মণ কর্তৃক যদি দৈবাৎ যজ্ঞোপবীত ছিন্ন হয়, তাহা হইলে মনস্তাপ দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয়।

“ব্রাহ্মণেন যদা দৈবাৎ ছিন্নং যজ্ঞোপবীতকম্।

মনস্তাপেন শুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধাপস্তম্বে ২৩বীহুনিঃ ॥

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

মনস্তাপিন্ (ত্রি) মনস্তাপযুক্ত, মানসিক-ক্লেশবিশিষ্ট।

মনস্তাল (পুং) তল্যত ইতি তল প্রতিষ্ঠায়াঃ ঘঞ, মনসি তালঃ প্রতিষ্ঠা যন্ত। ১ হুর্গাদেবীর সিংহ। (ত্রিকাং)

(ক্লী) ২ হরিতাল।

“হরিতালং মনস্তালং বর্ণকং নটভূষণম্।” (বৈষ্ণবকরত্নমাং)

মনস্তোকা (ক্লী) হুর্গার নামান্তর।

মনস্ত্ব (ত্রি) মনে মনসি বা তিষ্ঠতীতি স্থা-ক, পক্ষে বিসর্গস্ত লোপঃ। মনোহবচ্ছিন্ন, অন্তঃকরণহিত।

“আব্রহ্মং মম্মনস্ত্বং যদিপি মম মনো মধ্যতঃ কপি নাভূৎ।

তন্তে পুণ্যপ্রতাপাদিহ শরদি সতঃ সিদ্ধিমাভূৎ স্তথেন ॥” (উদ্ভট)

মনস্বিন্ (পুং) প্রশস্তঃ মনোহস্ত্যন্তেতি মনস্-বিনি। শরভ।

(রাজনিং) (ত্রি) ২ প্রশস্তমনোযুক্ত।

“মনস্বিগহিতঃ পদ্মঃ সমারোটু মাস্প্রতম্।”

(কারকটাক্য হুর্গাদাস)

মনস্বিনী (ক্লী) মনস্বিন্-ভীপ্। প্রশস্তমনাঃ ক্লী।

“মনস্বিনীমানবিষাতদগং তদেব জাতং বচনং শ্রবন্ত।”

(কুমারসং ৩.৩২) ২ যুকপুং পত্নী। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫২।১৭)

৩ প্রজাপতিপত্নী, ইনি সোমবস্তুর জননী।

“ধূম্রায়াস্ত বরঃ পুরো ব্রহ্মবিষ্ঠো ধ্রুবস্তথা।

চন্দ্রমাস্ত মনস্বিতাঃ খসায়ঃ খসনস্তথা ॥” (ভারত ১।৬৬।১৯)

মনঃসংকল্প (পুং) মনসঃ সংকল্পঃ। মনের সংকল্প, ইচ্ছা।

মনঃসঙ্গ (পুং) মনোযোগ।

মনঃসদৃ (ত্রি) মনে অবস্থানকারী। “ধ্রুবসদং স্বা নৃষদং মনঃসদং” (শুক্ল যজুং ৯।২) ‘মনঃসদং মনসি সীদতীতি মনঃসদৃ তং’ (বেদদীপং)

মনঃসন্তাপ (পুং) মনসঃ সন্তাপঃ। মনঃপীড়া, মনস্তাপ।

মনঃসারময় (ত্রি) হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর ভাবযুক্ত।

মনঃশিলা (ক্লী) মনঃশিলা।

মনঃসুখ (ক্লী) মনসঃ সুখং। মনের সুখ, মনের আনন্দ।

(ত্রি) মনসি সুখং যন্ত। ২ মনঃসুখযুক্ত, যাহার মনে সুখ আছে।

মনঃস্থ (ত্রি) মনসি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। অন্তঃকরণস্থিত।

মনঃস্থিরীকরণ (ক্লী) মনসঃ স্থিরীকরণং। মনের একা-গ্রতাকরণ।

মনহংস, ছন্দোভেদ।

মনা, (ক্লী) মনন, স্তোত্র। “প্রমদয়ম্ নানাং গূর্ভহোতা” (ঋক্-১।১৭৩।২) ‘মনাং মননং স্তোত্রং’ (সায়ণ) ২ মনঃ। “চিদসি মনাসি ধীরসি” (শুক্লযজুং ৪।১৯) ‘ত্বং চিদসি মনাসি ধীরসি, অন্তঃকরণস্ত চিত্তমনোবুদ্ধয়ঃ ইতি তিস্রো বৃত্তয়ঃ, তল্লক্ষণানি’ (বেদদীপং)

মনাক্ (অব্যং) মন্যতে ইতি মন জ্ঞানে বাহুল্যক্য আক্-প্রত্যয়ঃ। ১ অন্ন।

“মরুধরমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্।

আনতান্ ভার্গপোপাগাচ্ছান্তবাহো মনাগ্ বিভূঃ ॥”

(ভাগ০ ১।১০।৩৫) ২ মন্দ। (মেদিনী)

মনাকা (ক্লী) মন্যতে ইতি মন- (বলাকাদয়শ্চ। উপ্-৪।১৪) হস্তিনী। (উজ্জল)

মনাকর (ক্লী) মনাক্ যথা তথা করোতীতি কৃ-অচ্।

১ মঙ্গল্যা, মল্লিকাগন্ধযুক্ত অঙ্কুর। (শকচং) (ত্রি) মনাক্

অন্নস্ত করঃ। ২ দ্রব্যং কারক, অঙ্গকারক।

মনাগোলি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষাং ১৬°৪০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৪' পূঃ।

মনাজ (ক্লী) সামভেদ।

মনানক্ (অব্যং) অন্ন, দ্রব্যং। “মনানগ্রতো জহতু বিয়ন্তা।”

(ঋক্ ১।৬।১৬) ‘মনানক্ অন্নং রতঃ জহতু’ (সায়ণ)

মনায়ী (ক্লী) মনোঃ ক্লী মনু (মনোরৌক। পা ৪।১।৩৮)

ইতি ভীপ্ উদাত্তৈকরশ্চ। মনুর পত্নী। (জটধর)

মনায়ু (ত্রি) মনঃ দ্বারা যুক্ত। “বিশ্বস্ত বাচমবিদন্ মনায়োঃ”

(ঋক্ ১।৯২।৯) ‘মনায়োঃ মনসা যুক্তস্ত বাগ্ ব্যবহারসমর্থস্ত

প্রাণিজাতস্ত’ (সায়ণ)

মনাবস্থ (ত্রি) মনা মননং স্তোত্রং বস্তু ধনং যন্ত। স্তুতিধন

স্বই বাহাদেব একমাত্র ধনস্বরূপ। “দেবাববিশ্বস্তা মনা

বহু” (ঋক্ ৫।৭৪।১) ‘হে দেবৌ হে মনাবস্থ স্তুতিধনৌ’

(সায়ণ)। এইস্থলে অগ্নিনীকুমারবয়সের বিশেষণ হইয়াছে বলিয়া ‘মনাবহু’ দ্বিবচন হইয়াছে।

মনাবী (স্ত্রী) মনোঃ স্ত্রী মনু (মনোরৌ ক। পা ৪।১।৩৮) ইতি ভীপ্, ঔকারশাস্ত্রাদেশঃ। মনুপত্নী। “স। মনোরৈব জায়াঃ মনাবীং প্রবিবেশ” (শতপথব্রাঃ ১।১।৪।১৬)

মনিষ্ণা (স্ত্রী) নদীভেদ। (মহাভারত)

মনিত (ত্রি) মন-বোধে ক্ত। জ্ঞাত। (অমর)

মনীক (স্ত্রী) মনুতে শোভার্থমাজিযতে ইতি মন্ (অলী-কাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২৪) ইতি কীকনুপ্রত্যয়েন নিপাতনাং সাধুঃ। অজ্ঞন। (উজ্জল)

মনীষা (স্ত্রী) ঈষ-অ টাপ্, মনস ঈষা গমনঃ (শককাদিষু পরকপঃ বাচ্যঃ। পা ১।১।৬৪) ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা সাধুঃ।

বুদ্ধি। “উত প্রজাভ্যোহবিদো মনীষাঃ” (ঋক্ ৫।৮।১০) ‘মনীষাঃ বুদ্ধিঃ’ (সায়ণ)

২ স্ততি। “আমনীষামন্তরীক্ষত নৃত্যঃ” (ঋক্ ১।১০।৬)

‘মনীষাঃ স্ততিঃ’ (সায়ণ)

মনীষিকা (স্ত্রী) মনীষা। (ভাগ০ ৫।১০।২৬)

মনীষিত (ত্রি) মনীষা সঙ্গার্থার্থে তারকাদিহাদিতচ্, যধা মনস-ঈষ-ক্ত। মনোহভিলষিত, বাঞ্ছিত।

“মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাঃ।” (কুমার ৫)

মনীষিতা (স্ত্রী) মনীষিণো ভাবঃ ‘ততনো ভাবে’ ইতি তল্-টাপ্। বুদ্ধিমত্তা, মনীষিত।

মনীষিন্ (পুং) মনীষাহন্ত্যন্তেতি ত্রীহাদিহাদিনি। পণ্ডিত।

“যদ্বূর্ত্যবয়বাস্থানান্তেষ্টেমান্ত্রাশ্রয়ন্তি ষট্।

তন্মাক্ষরীরমিত্যাছন্তস্ত মূর্ধ্বিঃ মনীষিণঃ।” (মনু ১।১৭)

(ত্রি) ২ বুদ্ধিযুক্ত। মেধাবী।

“চয়্যরি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিহত্রীক্ষণা যে মনীষিণঃ” (ঋক্ ১।১৬।৪৫) ‘মনীষিণঃ মেধাবিনঃ’ (সায়ণ)

মনু (স্ত্রী) মন্ (শৃ শ্চ স্মি হীতি। উণ্ ১।১১) ইতি উ। ১ পৃক্। (রাজনিঃ) ২ মনুপত্নী। “মনোঃপত্নীতি মনু (মনো রৌবা। পা ৪।১।৩৮) ইত্যত্র বা গ্রহণেন দ্বাবপি বিকল্যেতে, তেন ত্রৈকুপ্যং ভবতি মনোঃ স্ত্রী—মনায়ী, মনাবী, মনু, পক্ষে ভীবভাবঃ” (কাশিকা)

হুইটা বিকল্প হইলে তিনটা পদ হয়, এই অর্থ জীলিঙ্গে ‘মনু’ শব্দের উত্তর ভীপ্ না হইয়া মনু এইরূপ পদ রহিল।

(পুং) মনুতে ইতি মন-উ। ৩ মনুষ্য। (শব্দরত্নাঃ) “মনো-বিশ্বন্ত যেদিম আদিত্যারায় ঈশতে” (ঋক্ ৮।৪।৭।৮) ‘মনোঃ মনুষ্যন্ত’ (সায়ণ) ৪ জিনভেদ। (ত্রিকাঃ) ৫ মজ। (জটধর)

“গোহিরণ্যকবজ্রাভৈস্তোষয়েদুগুমাশ্বানঃ।

যদা দদাতি সত্ত্বষ্টঃ প্রসন্নবদনো মনুষ্যঃ॥”

(গোতমীয় তন্ত্র ৭।৫)

৬ ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ, ইনি প্রজাপতি ও ধর্মশাস্ত্রব্রহ্মা। প্রতিকল্পে চতুর্দশ মনু হইয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এই সকল মনু গত হইয়াছেন, বর্তমান বৈবস্বত মনু। সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধন্বসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি। দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি এই সকল মনু পরে হইবে।

(ভাগ০ ৮।১ অ০)

মৎস্তপুরাণে লিখিত আছে—১ স্বায়ম্ভুব মনু, ইনি ব্রহ্মা ও গায়ত্রী হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার দশপুত্র, অগ্নীধ, অঘিবাহ, রিফ, সবল, জ্যোতিমান, দ্ব্যতিমান, হব্য, মেধস, মেধাতিথি, বহু। স্বারোচিষ মনু দ্বিতীয়, ইহার চারিপুত্র—নভ, নভস্য, প্রস্থতি, ভাবন। ঔত্তম মনু তৃতীয়, ইহার দশপুত্র,—ঈষ, উজ্জ, ভূজ, শুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্ত, নভ ও সহ। চতুর্থ তামস মনুর দশপুত্র,—অকল্মষ, তপোক্ষরী, তপোমূল, তপোধন, তপোরতি, তপস্ত, তপোহ্যতি, পরস্তপ, তপোভাগী ও তপোযোগী। পঞ্চম রৈবত মনুর দশপুত্র যথা—অরুণ, তরুদশী, বিতবান, হব্যপ, কপি, মুক্ত, নিরুৎস্রক, সত্ত, নিশ্বোহ, প্রকাশক। ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষ, ইনি ঋবপোত্র রিপুঞ্জয় হইতে ব্রহ্মদোহিত্রী বীরণকতা বীরণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ভাৰ্যা নডলা। উরু, পুরু, শতহাস, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টপ, অতিরাত্র, স্বপুচ্ছ, ও অতিমহা এই দশটা ইহার পুত্র।

সপ্তম বৈবস্বত মনু—এই মনু সূর্য্য হইতে সংজ্ঞাতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহারও দশপুত্র,—ইল, ইক্ষাকু, কুশনাভ, অরিষ্ট, রিষ্ট, নরিষ্যন্ত, কক্রষ, শর্য্যাতি, পৃষধ ও নাভাগ।

অষ্টম সাবর্ণি মনু—এই মনু সূর্য্য হইতে ছায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহারও দশপুত্র,—ধৃতি, বরীমান, যবস, সুরবর্ণ বৃষ্টি, চরিষু, ঈড্য, স্রমতি, বহু ও শুভ্রা। নবম রৌচ্য, ইনি রুচিপ্রজাপতির পুত্র। দশম মনু ভোতা, ইনি ভূতি মনু নামক প্রজাপতির পুত্র। একাদশ মনু,—মেরু সাবর্ণি ইনি ব্রহ্মার পুত্র। দ্বাদশ মনু ঋতু। ত্রয়োদশ ঋতুধামা। চতুর্দশ বিষ্ণুসেন।

মৎস্তপুরাণে নবমাধ্যায় হইতে একবিংশতি অধ্যায় পর্য্যন্ত এই সকল মনুর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে—

“স্বায়ম্ভুবো মহুঃ পুংসঃ মহুঃ স্বারোচিষস্তথা ।

ঔত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥

যড়েতে মনবোহতীতাস্থথা বৈবস্বতোহধুন ।

সাবর্ণিঃ পঞ্চ রৌচ্যাশ্চ ভৌত্যাশ্চাগামিনম্বমী ॥” ইত্যাদি

( মার্কণ্ডেয়পুং ৫৩ অং )

প্রথমে স্বায়ম্ভুব মহু, পরে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এই ৬ মহু অতীত হইয়াছেন, এইক্ষণ বৈবস্বত মহুর অধিকার । ইহার পর যথাক্রমে পঞ্চসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্যা এই তিন মহুর আবির্ভাব হইবে ।

স্বায়ম্ভুব মহুর দশ পুত্র । ইহার সাকলেই পিতৃভূষা এই সকল পুত্র সপ্তদ্বীপ ও পর্বতাদির অধিপতি ছিলেন ।

( মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৩ অধ্যায় )

ভাগবতে লিখিত আছে—

“অহো অমৃতমেতন্মে ব্যাপৃততাপি নিত্যদা ।

নহেধস্তে প্রজা নুনং দৈবমত্র বিঘাতকম্ ॥

এবং যুক্তকৃতত্তস্য দৈবকাবেক্ষতস্তদা ।

কস্ত রূপমভূদেবা যৎকারমভিচক্ষতে ॥

ভাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপত্তত ।

বস্ত তত্র পুমান্ সোহভূমহুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্ ।

জী চামীচ্ছতরূপাখ্যা মহিষস্ত মহান্মনঃ ॥

তদা মিথুনধ্বংগে প্রজা হেধাংবভূবিরে ।

স চাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যাত্মজীজনং ॥”

( ভাগবত ৩.১২.৩৩—৩৬ )

স্বায়ম্ভুব—প্রথম মহু । পূর্বে ব্রহ্মা যখন দেখিলেন,— মহাবীৰ্য্য সপ্তর্ষি প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্টি বিস্তৃত হইল না, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া আপনাই আপনার হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য! আমি সর্বত্র ব্যাপ্ত আছি, তথাচ আমার প্রজা নিত্য বৃদ্ধি পাইতেছে না । ইহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দৈবই ইহুর একমাত্র প্রতিকূল কারণ । তিনি যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন, তখন ঠাহার সেই মূর্তি আপনা হইতে অতি আশ্চর্য্য প্রকারে দিবা বিতরু হইল । এইদ্রষ্টা উহা অত্মাপিও কায়-নামে অভিহিত হয় । এই ছই অংশ দ্বারা তিনি মিথুন অর্থাৎ জ্যোতিষ হইলেন । তদ্বাধ্য যিনি পুরুষ, ঠাহার নাম স্বায়ম্ভুব মহু এবং যিনি জ্যোতিষ ঠাহার নাম শতরূপা, ইনি স্বায়ম্ভুব মহুর পত্নী হইলেন । এই সময় হইতেই মিথুন ধর্ম দ্বারা প্রজা সকল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।

স্বায়ম্ভুব মহুর শতরূপা পত্নীতে পাঁচটি অপত্য হয়, তাহার মধ্যে ছই পুত্র এবং তিন কন্যা । পুত্রদ্বয়ের নাম প্রিয়ব্রত ও

উত্তানপাদ, এবং কন্যাদ্বয়ের নাম—আকুত, দেবহুতি ও প্রহৃতি । মহু আকুতিকে ঋচর হস্তে সম্প্রদান করেন, মধ্যমা দেবহুতি কন্দমের পত্নী এবং তৃতীয়া প্রহৃতি দম্বের বনিতা হন । ইহার সন্তান সন্ততি দ্বারা জগৎ পূর্ণ হয় ।

( ভাগবত ৩.১২-১৩ অং )

স্বারোচিষ—দ্বিতীয় মহু । এই মহু আয়র পুত্র । সুরেশ এবং রোচিষ্য প্রভৃতি ইহার পুত্র । এই মন্বন্তরে ভূষিতাদি দেবতা এবং ঠাহাদের ইন্দ্র রোচন ও উর্ক স্তম্বাদি করিয়া সপ্তর্ষি ছিলেন । এই মন্বন্তরে বেদশিরা নামক ঋষি হইতে তৎপত্নী ভূষিতার গর্ভে বিভু নামে বিখ্যাত এক দেব উৎপন্ন হন । ইনি কৌমার ব্রহ্মচারী ছিলেন । অষ্টাশ্রুতি সহস্র মুনি ইহার নিকট ব্রতশিক্ষা করেন ।

উত্তম—তৃতীয় মহু । এই মহু প্রিয়ব্রতের পুত্র । পবন, সৃজয় এবং বজ্রহোত্রাদি ইহার পুত্র । এই মহুর সময়ে প্রমদাদি সপ্তর্ষি হন । ইহার সাকলেই বশিষ্ঠের পুত্র । সত্য, বেদশ্রুত, ভদ্র প্রভৃতি দেবতা, ও সত্যাজ্ঞ ও তাহাদের ইন্দ্র । এই মন্বন্তরে ধর্মের স্মৃতি নারী ভাষ্যার গর্ভে ভগবান্ পুরুষোত্তম সত্যব্রতগণের সহিত উৎপন্ন হইয়া সত্যসেন নামে খ্যাত হন । সত্যসেন ইন্দ্রের সখা ছিলেন । ইহারই হস্তে দ্রুত যক্ষ রাক্ষসাদি ভূতদ্রোহী ভূতসকল বিনাশ-প্রাপ্ত হয় ।

তামস—চতুর্থ মহু । ইনি তৃতীয় মহু উত্তমের ভ্রাতা । পুণ্ড্র, ষ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি ইহার দশ পুত্র । এই মন্বন্তরে সত্যক, হরি ও বীর নামে দেবগণ, ত্রিশিখ নামক ইন্দ্র এবং জ্যোতির্ধামাদি সপ্তর্ষি ছিলেন । এই মন্বন্তরে উল্লিখিত সত্যকাদি ব্যতীত বিশিষ্ট পরাক্রমশালী বৈদ্যুতি-গণও দেবতা হইয়াছিলেন । এই বৈদ্যুতিগণ বিদ্যুতির পুত্র । কালবশে বেদ সকল যখন বিনষ্ট হইতেছিল, তখন ঐ সকল দেবতা স্ব স্ব তেজে তৎসমস্ত ধারণ করিয়াছিলেন । এই মহুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু হরিণীর গর্ভে হরিমেধস্ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া হরি নামে বিখ্যাত হন । ভগবান্ হরি গ্রাহের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন ।

( ভাগবত ৯.১-৫ অং )

রৈবত—পঞ্চম মহু । ইনি চতুর্থ তামস মহুর সহোদর ভ্রাতা । রৈবত মহুর পুত্র অর্জুন, বলি ও বিক্ষাদি । এই মন্বন্তরে বিভু ইন্দ্র, ভূতরয়াদি দেবগণ ও হিরণ্যায়োমা, বেদশিরা, উর্কবাহ প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ ছিলেন ।

চাক্ষুষ—ষষ্ঠ মহু । ইনি চক্ষুষের পুত্র । পুরু, পুরুষ,

হুহায় প্রভৃতি তাহার পুত্র। এই মন্বন্তরে মঙ্গরম হস্ত্র, আপ্যাদ-  
গণ দেবতা এবং হ্যাম্ব ও কীরকাদি ঋষি ছিলেন। এই মহুর  
সময়ে বৈরাজের ঔরসে এবং দেবসন্ততির গর্ভে ভগবান্  
বিষ্ণু স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অজিত নামে বিখ্যাত হন।

( ভাগবত ৮।৫ অ० )

বৈবস্বত—সপ্তম মহু। বিবস্বান্ পুত্র শ্রাকদেব সপ্তম মহু  
নামে বিখ্যাত হন। বর্ধমানে এই মহুর অধিকার চলিতেছে।  
ইক্ষাকু, নভাগ, ধুই, শব্যতি, নরিঘাত্ত, নাভাগ, দিষ্ট, কল্লব,  
পূবধ এবং বস্তমান্ এই দশটা বৈবস্বত মহুর পুত্র। এই মন্ব-  
ন্তরে আদিত্য, বহু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়  
ও ঋতুগণ দেবতা। পুরন্দর ঐ সকল দেবতার ইন্দ্র। কাশ্যপ,  
অজি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি, এবং ভরদ্বাজ এই  
মন্ত্র ঋষি। এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু কশ্যপ হইতে আদিতর  
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

বিবস্বানের দুই পত্নী, ইহার দুইজনেই বিশ্বকর্মার তনয়া,  
নাম সংজ্ঞা ও ছায়া। কোন কোন ঋষির মতে তাহার বড়বা  
নামে তৃতীয়া বনিতা ছিল। ঐ সকল পত্নীর মধ্যে সংজ্ঞার তিন  
অপত্য,—যম, বশা (বসুনা) এবং শ্রাকদেব। ছায়ার একপুত্র ও  
এক কন্যা। পুত্রের নাম সর্বাণ এবং কন্যার নাম তপতী। এই  
কন্যা শতরূপের বানতা। বড়বা নামী পত্নীর গর্ভে অশ্বিনী-  
কুমারদ্বয় উৎপন্ন হন।

সাবর্ণি—অষ্টম মহু। নিম্বোক ও বিরজন্ত প্রভৃতি ঐ  
মহুর পুত্র। এই মহুর সময়ে সূতপা, বিরজা এবং আনুত-  
প্রভা এই সকল দেবতা এবং বিরোচনাস্বজ বলি ইহাদের  
ইন্দ্র। গালগ, দাপ্তমান্, পরশুরাম, অশ্বখামা, রূপ, ঋষ্যশৃঙ্গ  
এবং বাদরামাদি সপ্তাধি। এই মন্বন্তরে দেবগুহ্য হইতে  
সরস্বতীর গর্ভে ভগবান্ অবতারণা হইয়া সাকভৌম নামে  
খ্যাত হইবেন।

দক্ষ সাবর্ণি—নবম মহু। বরুণ হইতে ইহার উদ্ভব।  
ভূতকেতু, দীপ্তকেতু ইত্যাদি তাহার তনয়। এই মন্বন্তরে  
মরাচি গর্ভ প্রভৃতি দেবতা, অমৃত ইন্দ্র এবং দ্রাতিমান্  
প্রভৃতি সপ্তাধি হইবেন। এই মহুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু  
আয়ুমান্ হইতে অম্বদারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ঋষত  
নামে বিখ্যাত হইবেন।

ত্রক্ষ সাবর্ণি—দশম মহু। ইনি উপশ্লোকের পুত্র।  
ভূরিবেণ প্রভৃতি ইহার সন্তান। এই মন্বন্তরে হবিয়ান্,  
স্ককত, সত্য, লর, মূর্তি প্রভৃতি সপ্তাধি। সুবাসন ও আব-  
রুদাদি দেবতা এবং শঙ্কু ইন্দ্র। এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু  
বিশ্বকর্মে বিপ্রের গৃহে বিহুতির গর্ভে স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ

করিয়া, পরে বিথক্সেন নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। তৎকালে  
দেবরাজ শম্বুর সহিত ইহার বিশেষ সখ্যতা হইবে।

ধন্যসাবর্ণি—একাদশ মহু। ইহার সত্যধন্যাদি দশপুত্র  
হইবে। এই মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কালগম নিক্ষাপ ও রুচি  
প্রভৃতি দেবতা, বৈধ্বত ইন্দ্র, এবং অরুণাদি সপ্তাধি হইবেন।  
ভগবান্ বিষ্ণু আর্ধ্যাকের ঔরসে বৈধ্বতার গর্ভে জন্মগ্রহণ  
করিয়া ধর্ম্যসেতু নামে প্রসিদ্ধ হইবেন।

রুদ্র সাবর্ণি—দ্বাদশ মহু। দেবযান, উপদেব এবং  
শ্রেষ্ঠাদি ইহার পুত্র। এই মন্বন্তরে হরিতাদি দেবতা।  
গন্ধধামা ইন্দ্র। তপোমুষ্টি, তপদী ও অমীধু প্রভৃতি  
সপ্তাধি। ভগবান্ বিষ্ণু সত্যবহা বিপ্রের স্নত্নতা নামী বনি-  
তার গর্ভে অংশরূপে উৎপন্ন হইয়া সুধামা নামে খ্যাত  
হইবেন।

দেব সাবর্ণি—ত্রয়োদশ মহু। চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি  
তাহার পুত্র। এই মন্বন্তরে স্ককম্বা, স্ক্রামাদি দেবতা।  
দিবস্পতি ইন্দ্র এবং নিম্বোক ও তরদর্শাদি সপ্তাধি হই-  
বেন। এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু দেবহোত্র হইতে  
বৃহতীর গর্ভে অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া যোগেশ্বর নামে  
প্রসিদ্ধ হইবেন।

ইন্দ্র সাবর্ণি—চতুর্দশ মহু। উরু, গভীর, ব্রহ্ম প্রভৃতি  
ইহার পুত্র। এই মন্বন্তরে চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা ও শুচি  
তাঁহাদের ইন্দ্র এবং অমিবাছ, শুচি, শুদ্ধ ও মাগধ  
প্রভৃতি সপ্তাধি। ভগবান্ বিষ্ণু সত্যায়ণ হইতে বিনতার  
গর্ভে অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করবেন। ইহার নাম হইবে  
বৃহদ্রাহু।

এই চতুর্দশ মহুর কাল প্রমাণ সহস্রযুগ।—(ভাগবত ৮।১৪)

এই সকল মহু, মহুপুত্র, সপ্তাধি ও ইন্দ্র প্রভৃতি ইহার  
সকলেই পরম পুরুষ দৈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া থাকেন,  
অর্থাৎ তত্তম্বন্তরে যজ্ঞ প্রভৃতি যে সকল পুরুষ-মূর্তি দৈশ্বর্যাব-  
তারের কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল মূর্তি কর্তৃক নিয়োজিত  
হইয়াই মহু সকল জগতের কার্য্য নিরূপণ করেন। চতুর্যুগান্তে  
শ্রুতি সকল কালগ্রস্ত হইয়াছিল। তত্তম্বন্তরে ঋষিগণ স্ব স্ব  
তপোবোলে সে সকল দর্শন করেন। পরে সেই সমস্ত শ্রুতি  
হইতেই সনাতন ধর্ম্ম পুনরার প্রকটিত হয়। তদনন্তর ভগবান্  
হরির আদেশে মহুগণ স্ব স্ব কালে সংযত হইয়া অবনী মণ্ডলে  
চতুর্দশ ধর্ম্ম প্রচার করেন। প্রজাপাল মহুপুত্র সকল  
তত্তম্বন্তরাবসান পণ্ডিত পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐ ধর্ম্ম পালন  
করিয়া থাকেন। ( ভাগবত ৮।১৫ অ० )

দেবী ভাগবতে লিখিত আছে—

“স চতুর্মুখ আসাণ্ড প্রাহুর্ভাবং মহামতে !

মহুং স্বায়ত্ত্বং নাম জনয়ামাস মানসাত্ ॥

স মানসো মহুপুত্রো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।

শতরূপাঞ্চ তৎপত্নীং জজ্ঞে ধর্মস্বরূপিণীম্ ॥” ইত্যাদি ।

( দেবীভাগ০ ১০।১।৬-৭ )

ভগবান্ বিষ্ণুর নাভি পদ্ম হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া নিজ অন্তঃকরণ হইতে স্বায়ত্ত্ব মনু ও ধর্মস্বরূপিণী তদীয় পত্নী শতরূপাকে উৎপাদন করেন। এইজন্ত স্বায়ত্ত্ব মনু ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। স্বায়ত্ত্ব মনু উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে আদেশ করেন।

স্বায়ত্ত্ব মনু ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রজাসৃষ্টির ভার প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীরসমুদ্রতীরে দেবী ভগবতীর মুখগায়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। দেবী ভগবতী তাঁহার তপশ্চায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। স্বায়ত্ত্ব মনু দেবী ভগবতীর বরে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। ( দেবীভাগ০ ১০।১—৭ )

স্বায়ত্ত্ব মনু পিতার আজ্ঞামুসারে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মহাপ্রভাবসম্পন্ন দুই পুত্র এবং আকুতি, দেবহুতি ও প্রস্থতি নামে তিন কন্যা জন্মে। মনু আকুতিকে মহর্ষি রুচিসহ, দেবহুতিকে প্রজাপতি কর্দ্দমসহ এবং প্রস্থতিকে প্রজাপতি দক্ষের সহিত বিবাহ দেন। মহর্ষি রুচির ঔরসে আকুতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র ভগবান্ আদিপুরুষ বিষ্ণুর অংশ। কর্দ্দমের ঔরসে দেবহুতির গর্ভে সাংখ্যাচাৰ্য্য কপিল দেব জন্ম গ্রহণ করেন। প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে প্রস্থতি গর্ভে কতকগুলি কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন দেব, দানব, পশু ও পক্ষী প্রভৃতিও দক্ষ হইতে উৎপন্ন। এই সকল প্রজাগণই বিশ্বসৃষ্টির প্রবর্তক। স্বায়ত্ত্ব মনুস্বরে ভগবান্ যজ্ঞ যামনামক দেব-গণে পরিবৃত্ত হইয়া নিজ মাতামহ মনুকে রাক্ষসাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কপিল কিছুদিন আশ্রমে থাকিয়া ঈশ্বর গর্ভধারিণী দেবহুতিকে তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ কপিল শাস্ত্র ( সাংখ্য শাস্ত্র ) ধ্যানযোগাদির উপদেশ দিয়া পুলহাশ্রমে গমন করিয়া যোগাবলম্বন করেন। মনুর পুত্রগণ সমস্ত প্রাণি-জগতের সুখাদি প্রাপ্তি ও লোকব্যবহার প্রসিদ্ধির নিমিত্ত দ্বীপবর্ষ ও সমুদ্রাদির ব্যবস্থা স্থাপন করেন।

স্বায়ত্ত্ব মনুর ষোষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্মান্ হিতা বহিষ্কৃত-তীর পাণি গ্রহণ করেন। ইহার দশপুত্র ও এক কন্যা। কন্যাই সর্বকনিষ্ঠা। অগ্নীধি, ইয়জিষ্ব, যজ্ঞবাহ, মহাবীর, রুদ্রশ্রু, যুতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও কবি

ইহার এই দশপুত্র। এই পুত্রগণের মধ্যে কবি, সবন ও মহাবীর এই তিন জন সংসারবিরাগী হইয়াছিলেন।

প্রিয়ব্রতের অপর ভাৰ্য্যাতে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র হয়। ইহার সকলেই বিশ্ববিখ্যাত। এই পুত্রত্ৰয়ই কালে মহাপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া এক একটা মনু-স্তরের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত এই সকল পুত্রগণের সহিত একাদশ অর্কুদ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত দীর্ঘকালেও তাঁহার কোন প্রকার ঐন্দ্রিয়িক বা শারীরিক বলের হ্রাস হয় নাই।

প্রিয়ব্রত এক সময়ে দেখিলেন যে, দেব দিবাকর পৃথিবীর একভাগে প্রকাশিত হইলে অপর ভাগ অন্ধকারময় থাকে, এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়া তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—আমার রাজ্য-শাসনকালে এইরূপ ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না, আমি যোগপ্রভাবে ইহা নিবারণ করিব। প্রিয়ব্রত মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জগৎ আলোকময় করিবার জন্ত একখানি সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান রথে আরোহণ করিলেন, এবং প্রতিদিন সাতবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই পর্য্যটনে চক্রনেমি দ্বারা যে সকল ভূভাগ ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতেই সপ্ত সাগরের উৎপত্তি হয়। ঐ সপ্ত সাগরের মধ্যে যে সকল ভূভাগ ছিল, তাহা সপ্তদ্বীপ নামে বিখ্যাত এবং সাতটা সাগর সপ্তদ্বীপের পরিধাস্বরূপ হইল। প্রিয়ব্রতের সাত পুত্র জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপের অধিপতি হন। ( দেবীভাগ০ ৮।৩-৪ অ০ )

দ্বিতীয় মনু—স্বারোচিষ। এই মনু প্রিয়ব্রতের পুত্র। স্বারোচিষ কালিন্দীতটে দেবী ভগবতীর মুখগায়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপশ্চা করেন। ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে মনুষ্যরাধিপত্য প্রদান করেন। এই মনু স্বীয় অধিকার কাল পর্য্যন্ত যথাবিধি ধর্ম সংস্থাপন-পূর্ব্বক পুত্রগণের সহিত রাজ্য ভোগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

তৃতীয় মনু প্রিয়ব্রতের উত্তম নামক পুত্র। রাজর্ষি উত্তম বিজন গঙ্গাতীরে থাকিয়া তিন বৎসর কাল বাণ্ডববীজ জপ করেন এবং তাহারই ফলে তিনি দেবীর অমৃতগ্রহভাজন হন। ইনি নিরুণ্টক রাজ্য ও অনবচ্ছিন্ন সম্ভ্রতি লাভ করিয়া অনন্তর যাবতীয় রাজ্যস্ব ও যুগধর্মভোগপূর্ব্বক অন্তে রাজর্ষিগণপ্রাপ্য উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হন।

চতুর্থ মনু—প্রিয়ব্রতের তামস নামক অপর পুত্র। রাজর্ষি তামস নর্মদার দক্ষিণকূলে কামবীজ জপপূর্ব্বক জগন্ময়ী মাহেশ্বরীর আরাধনা এবং শরৎ ও বসন্তকালে



নবরাত্র ত্রাহুষ্ঠান করেন। প্রসন্নরূপিনী দেবীর বরে মহু নিকটকরাজ্য ভোগ করিয়া ভোগাবসানে স্বর্গ গমন করেন। এই মহুর দশপুত্র ছিল।

পঞ্চম মহু—তামসের কনিষ্ঠ প্রিয়ব্রতের পুত্র রৈবত। রাজর্ষি রৈবত কালিন্দীতীরে পরম সিদ্ধিদায়ক কামবীজ জপ করিয়া দেবীর আরাধনা করেন। দেবীর বরে ইনি মনস্তরাধিপত্য প্রাপ্ত হন। রৈবত মহু ব্যবস্থামুসারে ধর্ম বিভাগ করিয়া সমস্ত বিষয় উপভোগপূর্বক অন্তে সর্বোত্তম ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

ষষ্ঠ মহু—চাক্ষুষ। ইনি অঙ্গরাজের পুত্র। এই মহু একদিন পুলহাশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে বলেন,—আমি আপনার শরণাগত হইলাম। কোন্ উপায়ে আমি পৃথিবীর একাধিপত্য লাভ করিয়া আমার বংশের চিরস্থায়িত্ব ও আমার স্থির ধোবনত্ব প্রাপ্ত হইব, এবং কেমন করিয়াই বা অন্তে মুক্তি লাভ করিতে পারিব, তাহা আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। পুলহ মহুর প্রার্থনার তাহাকে দেবীর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন।

চাক্ষুষ মহু মহর্ষি পুলহের আদেশে তপস্তার্থ বিরজা নদীতীরে উপস্থিত হন। মহু এইখানে বাগ্ভব মন্ত্র জপ করিয়া দেবী ভগবতীর উপাসনা করেন। দেবী তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মনস্তরীয় নিকটক রাজ্য, প্রভূত বলশালী কতকগুলি পুত্র এবং বিষয়ভোগান্তে অন্তে মুক্তিলাভের বর দান করিয়া তিরোহিত হইলেন। চাক্ষুষ নৃপতি ভগবতীর বরে মহুশ্রেষ্ঠ হইয়া সকল প্রকার স্বভোগে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহার পুত্রগণও প্রভূত বলশালী হইয়া দেবীর পরম ভক্ত ও সর্বত্র মাননীয় হইল। এই মহু রাজ্যভোগাবসানে দেবী-পদে লীন হইয়াছিলেন।

সপ্তম মহু—বৈবস্বত। বৈবস্বত মহুও দেবী ভগবতীর তপস্তা করিয়া মনস্তরাধিপত্য লাভ করেন।

অষ্টম মহু—স্বর্ঘ্য-পুত্র সাবর্ণি। নরপতি সাবর্ণি পূর্ব জন্মে দেবীর আরাধনা করিয়া, তাঁহারই বরে মহু হইয়াছিলেন। ইনি স্বারোচিষ-মনস্তরে চৈত্রবংশোৎপন্ন সুরথ নামে রাজা ছিলেন ও পরে শত্রু কর্তৃক পরাজিত হইয়া অরণ্য গমন করেন, তথায় মেঘসম্বন্ধির সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার উপদেশে দেবী ভগবতীর মৃগয়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া কঠোর তপোহুষ্ঠান করেন। দেবী ভগবতী ঈহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করেন। দেবীর বরে ইহজন্মে বিবিধ স্বভোগ করিয়া পরজন্মে ইনি সাবর্ণি মহু হইয়াছিলেন।

নবমাদি চতুর্দশ মহু—পূর্বকালে বৈবস্বত মহুর কল্পব, পৃষধ, নাভাগ, দিষ্ট, শর্ঘ্যাত্তি এবং ত্রিশঙ্কু নামে মহাবল-পরাক্রান্ত ছয়টি পুত্র হয়। এই পুত্রগণ সকলেই কালিন্দী নদীর পবিত্র তীরে গমন করিয়া প্রত্যেকেই দেবী ভগবতীর মৃগয়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠাপূর্বক তথায় চতুর্দশ বর্ষ পর্যন্ত দেবীর আরাধনা করেন। দেবী তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অভিলষিত বর দান করেন।

মহাবল রাজপুত্রগণ পৃথিবীমণ্ডলে সাম্রাজ্যলাভ ও বিবিধ বিষয়ের উপভোগ করিয়া জন্মান্তরে মনস্তরাধিপতি হইয়াছিলেন। দেবীর অমুগ্রহে তাঁহাদের মধ্যে প্রথম কল্পব নরপতি দক্ষ সাবর্ণি নামে নবম মহু, দ্বিতীয় পৃষধরাজ মেরুসাবর্ণিনামে দশম মহু, তৃতীয় নাভাগ নৃপতি স্বর্ঘ্য সাবর্ণি নামে একাদশ মহু, চতুর্থ দিষ্ট নরপতি চন্দ্রসাবর্ণিনামে দ্বাদশ মহু, পঞ্চম শর্ঘ্যাত্তি ঋতুসাবর্ণিনামে ত্রয়োদশ মহু এবং ষষ্ঠ ত্রিশঙ্কু বিষ্ণুসাবর্ণিনামে চতুর্দশ মহু হইয়াছিলেন। ভগবতী ভ্রামরী দেবীর অমুগ্রহে এই চতুর্দশ মহুই জিভুবনে মহাপ্রতাপশালী, পরাক্রান্ত ও সর্বলোকের পূজ্য হইয়াছিলেন।

(দেবীভাগবত ১০।১-১৩ অ०)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—প্রথম স্বায়ম্ভুব মহু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ, তৃতীয় ওত্তমি, চতুর্থ তামস, পঞ্চম রৈবত, এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ এই ছয় মহু অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে স্বর্ঘ্যাত্তনয় বৈবস্বত নামে সপ্তম মহুর অধিকার। স্বায়ম্ভুব মহুর বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহু স্বারোচিষ, এই মনস্তরে পারাবতগণ ও ভূষিতগণ দেবতা, বিপশিচং ইহাদের ইন্দ্র; উর্জ, স্তব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিম্বর ও উর্কীরবান্ সপ্তর্ষি ছিলেন। চৈত্র ও কিস্কুরুষাদি স্বারোচিষের পুত্র। তৃতীয় মহু ওত্তমি,—এই মনস্তরে ইন্দ্র সুশান্তি, এবং বশিষ্ঠের সাত পুত্র সপ্তর্ষি ছিলেন। অজ, পরশু ও দিব্য প্রভৃতি ওত্তমির পুত্র। চতুর্থ মহু তামস,—সুরূপগণ, হরিগণ, সত্যগণ ও সুদীগণ এই মনস্তরের দেবতা। ইহার প্রত্যেকেই সপ্তবিংশতিসংখ্যক ছিলেন। রাজা শিবি শত যজ্ঞ করিয়া ইহাদের ইন্দ্র লাভ করেন। জ্যোতির্ধামা, পুণ্ড্র, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও গীবর ইহার সপ্তর্ষি। নর, ধ্যাতি, শাস্ত্র, হয়, জাহ্নুজল্য প্রভৃতি তামস মহুর পুত্র।

পঞ্চম মহু রৈবত,—এই মনস্তরে অমিতাভ; ভূতরজস্ ও সুরমেশগণ দেবতা এবং ইহাদের ইন্দ্র বিভূ। হিরণ্যরোমা, দেবপ্রী, উর্জবাহ, বেদবাহ, সুধামা, পর্যাত্ত ও মহামুনি ইহার

সপ্তর্ষি, বলবন্ধু, স্রুসঙ্কার ও সত্যক প্রভৃতি রৈবত মহুর পুত্র।

স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস ও রৈবত এই চারি জন মহুই প্রিয়ত্রতের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজর্ষি প্রিয়ত্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন। তদীয় তপোবলেই ইঁহারা মনস্তরাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

চাক্ষুষ—বষ্ঠ মহু। এই মনস্তরে আত্ম, প্রমত্ত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ দেবতা, এই গণ প্রত্যেকে ৮টি করিয়া। মনোজব ইঁহাদের ইন্দ্র। স্রমেধা, বিরাজ, হবিমান, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিসু ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। উরু, পুরু, শত-ছায়, প্রমুখ, স্রমহাবল প্রভৃতি চাক্ষুষ মহুর পুত্র।

স্বর্ঘ্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মহু। এই বৈবস্বত মনস্তরে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা, পুরন্দর ইঁহাদের ইন্দ্র। বলিষ্ঠ, কান্তপ, অত্রি, জমদগ্নি, গোতম, বিশ্বামিত্র ও তরদাজ ইঁহারা সপ্তর্ষি। ইন্দ্রাকু, নাভাগ, ধৃতি, শর্ঘ্যাতি, নরিন্যস্ত, নাভ, কক্লব, পৃথু ও বসুমান এই ৯টি বৈবস্বত মহুর পুত্র।

প্রথম স্বারজুব মনস্তর কালে আকৃতির গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু অংশরূপে মানসদেব যজ্ঞনামে উৎপন্ন হন। স্বারোচিষ মহুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু অজিতমানস দেব তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে উত্তম মহুর সময়ে ঐ তুষিত সুরোত্তম সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া সত্যনামে বিখ্যাত হন; তামস মহুর সময় ঐ সত্য হরিগণের সহিত হর্য্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন;—তাঁহার নাম হয় হরি। রৈবতমহুর সময় হরি রাজসগণের সহিত সমুতির গর্ভে জন্মিয়া মানস নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মহুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠনামক দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বৈবস্বত মহুর সময় ভগবান্ বিষ্ণু কান্তপ হইতে অদিতির গর্ভে বামন-রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। পূর্কোক্ত মহু, সপ্তর্ষি, দেবতা, দেবরাজ ও মহুপুত্র, ইঁহারা সকলই ভগবান্ বিষ্ণুর বিভূতি।

অপর সপ্ত মহুর বিবরণ এইরূপ;—সাবর্ণি অষ্টম মহু। বিশ্বকর্মার সংজ্ঞা নামে এক কন্যা হয়, স্বর্ঘ্য সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। সংজ্ঞার গর্ভে স্বর্ঘ্যের ঔরসে মহু, যম ও যমী নামে তিনটি সন্তান হয়। কিছু দিন পরে সংজ্ঞা ভর্তার তেজ সহ করিতে না পারিয়া ছায়ানামী একটি কন্যাকে স্বামিশ্রদ্ধায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং তপস্যা করিতে গমন করেন। ছায়া সংজ্ঞার অমুরূপা ছিল। দিবাকর ছায়াকে সংজ্ঞা বিবেচনা করিয়া তাহার গর্ভে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন করেন। প্রথম পুত্রের নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয় পুত্র সাবর্ণি মহু ও কন্যার নাম তপতী। ছায়ার গর্ভে

স্বর্ঘ্যের যে মহু নামে পুত্র হইয়াছিল, এই পুত্র তাঁহার সমান-বর্ণ বলিয়া সাবর্ণি মহুনামে বিখ্যাত হন। এই মনস্তরে স্রুতপ, অমিতাভ ও মুখাগণ দেবতা, বিরোচন বলি ইঁহাদের ইন্দ্র, এই দেবগণ আবার প্রত্যেকে একবিংশতি ছিলেন। গালব, রাম, রূপ, অশ্বথামা, ব্যাস ও স্ব্যশ্বদ প্রভৃতি সপ্তর্ষি এবং বিরজা, আকরীবান্ ও নিম্বোহাদি এই মহুর পুত্র।

দক্ষসাবর্ণি—নবম মহু। এই মহুর সময়ে পার, মরীচি, গর্ভ ও স্রুধর্ম এই ত্রিবিধ দেবগণ, ইঁহাদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ করিয়া দেবতা এবং অকুত ইঁহাদের ইন্দ্র। দ্যুতিমান্, ভব্য, বসু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিমান্ ও সত্য ইঁহারা সপ্তর্ষি। ধৃত-কেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা প্রভৃতি এই মহুর পুত্র।

ত্রক্সসাবর্ণি—দশম মহু। এই মহুর সময় সুধাম ও বিরুচ-গণ দেবতা, এই দুইগণে দশশত দেবতা এবং শান্তি ইঁহাদের ইন্দ্র। হবিমান্, স্রুততি, সত্য, অপাঙমূর্তি, নাভাগ, অপ্রতিমোজা ও সত্যকেতু ইঁহারা সপ্তর্ষি এবং স্রুক্ষেত্র, উত্তমোজা ও হরিসেন আদি করিয়া এই মহুর দশপুত্র। ইঁহারা সকলই পৃথিবী শাসন করেন।

ধর্মসাবর্ণি—একাদশ মহু। ইঁহার সময় বিহঙ্গমগণ, কাম-গমগণ ও নিম্বাণরতিগণ দেবতা; এই সকল দেবগণের প্রত্যেকগণে ত্রিশ জন করিয়া দেবতা। বৃষ ইঁহাদের ইন্দ্র। নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুমান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিমান্ ও অনস ইঁহারা সপ্তর্ষি। সর্কগ, সর্কধম্মা ও দেবানীক প্রভৃতি এই মহুর পুত্র।

রুদ্রপুত্র সাবর্ণি—দ্বাদশ মহু। এই মহুর সময় হরিতগণ, লোহিতগণ, স্রুমনোগণ, স্রুধর্মগণ ও তারগণ দেবতা ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণেই দশজন করিয়া দেবতা। অশ্বথামা ইঁহাদের ইন্দ্র। তপস্বী, স্রুতপা, তপোমূর্তি, তপো-রতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন ইঁহারা সপ্তর্ষি এবং দেব-বান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উক্ত মহুর পুত্র।

রৌচ্য—ত্রয়োদশ মহু। এই মনস্তরে স্রুতামগণ, স্রুধর্মগণ ও স্রুধর্মগণ দেবতা, ইঁহাদের প্রত্যেক গণে ৩০ জন করিয়া দেবতা ছিলেন; দিবস্পতি ইঁহাদের ইন্দ্র। নিম্বোহ, তন্মদশী, নিম্বকম্প, নিরুস্রুত, ধৃতিমান্, অবায় ও স্রুতপা ইঁহারা সপ্তর্ষি, চিত্রসেন ও বিচিত্রাদি উক্ত মহুর পুত্র।

ভোতা—চতুর্দশ মহু। এই মনস্তরে চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোবৃদ্ধগণ দেবতা এবং শুচি ইঁহাদের ইন্দ্র। অগ্নিবাহ, শুচি, মাগধ, অরীধ, যুক্ত ও

অজিতাদি সপ্তর্ষি। উরু, গভীর, ত্রয় প্রভৃতি উক্ত মহুর পুত্র।  
এই মহুপুত্রগণ সকলেই পৃথিবীপাল।

প্রতি চতুর্থ যুগাবসানে বেদ-বিপ্লব হয়। সেই কারণ সপ্তর্ষি-  
গণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বেদের উদ্ধার করেন। মহু প্রত্যেক  
সত্যযুগে ধর্মশাস্ত্রের প্রণেতা হন। মহুর অধিকার কাল  
পব্যস্ত দেবগণ বজ্রভুক হইয়া থাকেন। মহুপুত্র ও তবংশী-  
য়েরা এক মনস্তর কাল পর্যন্ত পৃথিবীপালন করেন। মহু,  
সপ্তর্ষি, দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগণ এবং মহুপুত্র ভূপালগণ, ইহারা  
প্রতি মনস্তরে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এইরূপ চতুর্দশ মহু  
অতীত হইলে এক কল্প হয়। মহুগণ, মহুপুত্র ভূপালগণ,  
ইন্দ্রগণ, দেব ও সপ্তর্ষিগণ ইহারা সকলেই বিষ্ণুর ভূবনস্থিতি-  
কারক সাত্বিক অংশ। ( বিষ্ণুপুরাণ ৩১-৩ অং )

সকল পুরাণেই মহু ও মহুপুত্রগণের বিষয় লিখিত আছে,  
বাহ্য্য ভয়ে তৎসমুদায় প্রদর্শিত হইল না। মহুগণই আদি  
রাজা। ভগবান্ মহু হইতেই এই সৃষ্টি পালিত হইয়া থাকে।

হরিবংশে এই মহুর বিষয় বাহ্য লিখিত আছে, অতি  
সংক্ষিপ্তভাবে তাহা বিবৃত হইল—

স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ওরুমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈব-  
স্বত, সাবর্ণি, ভৌত্য, রোচ্য, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, মেরুসাবর্ণি  
ও দক্ষসাবর্ণি এই চতুর্দশ মহু।

এই চতুর্দশ মহুই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মনু নামে  
কীর্ণিত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি বৈবস্বত মহুর অধিকার  
চলিতেছে ; সূতরাং ইহার পূর্বে ছয় মহু অতীত হইয়াছেন  
ও সাবর্ণি প্রভৃতি সপ্ত মহু অবশিষ্ট আছেন। এক এক মহুর  
অধিকার শেষ হইলে যথাক্রমে সাবর্ণি প্রভৃতি মহু আবির্ভূত  
হইবেন।

প্রথম স্বায়ম্ভুব মহু। এই মহুর সময়ে মরীচি, অত্রি,  
অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ, ব্রহ্মার এই সপ্ত পুত্র  
সপ্তর্ষি এবং বামনামা দেবগণ ছিলেন, এই মহুর অগ্নীধু, অগ্নি-  
বাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিমান্, হ্যতিমান্ ও হব্য  
প্রভৃতি করিয়া দশপুত্র।

স্বারোচিষ মহুর সময় বশিষ্ঠপুত্র ওরুমি, কশ্যপ, স্তম্ব, প্রাণ,  
বৃহস্পতি, দত্ত ও চ্যবন ইহারা সপ্তর্ষি। তুর্ষিত নামে দেবগণ।  
হবিষ, স্রুতি, জ্যোতিঃ, আপ, মূর্ত্তি, অয়স্বর, প্রথিত, নভস্ত,  
নভ ও উজ্জ্ব ইহারা মহুর পুত্র। তৃতীয়—ওরুমি মহু। এই  
মহুর সময় বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র এবং হিরণ্যগর্ভের উজ্জ্ব প্রভৃতি  
পুত্র সপ্তর্ষি, ভামুগণ দেবতা এবং ঈশ, উজ্জ্ব, তমুজ্জ্ব, মধু,  
মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্ত ও নভ, ইহারা মহুপুত্র। চতুর্থ  
তামস মহুর সময় কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জম্ব্য, ধামা, কপীবান্ ও

অকপীবান্ ইহারা সপ্তর্ষি; সত্যগণ দেবতা; হ্যতি, তপস্ত,  
সুতপা, তপোমূল, তপোশন, তপোরতি, অকম্বাব, ধর্মী, ধর্মী  
ও পরস্তপ ইহারা উক্ত মহুর পুত্র। পঞ্চম রৈবত মহুর সময়  
বেদবাহু, বেদশিরা, হিরণ্যারোমা, পর্জন্ত, সোমতনয়,  
উজ্জ্বাহু অগ্নিনন্দন, ও সত্যানেত্র ইহারা সপ্তর্ষি, অভূতরজস,  
প্রকৃতি, পারিগ্ৰব ও রৈভ্য ইহারা দেবতা। ধৃতিমান্, অব্যয়,  
যুজ্জ, তম্বদশী, নিকুংসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, কৃতী  
ও সত্যবান্ এই সকলে উক্ত মহুর পুত্র।

চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মহুর সময়—ভৃগু, নভ, বিবস্বান্,  
সুধামা, বিরজা, অতিনামা, ও সহিষ্ণু ইহারা সপ্তর্ষি এবং  
আপ্য, প্রভূত, ঋতু, ত্রিদিববাসী, পৃথুক ও লেখা এই পঞ্চবিধ  
দেবগণ ছিলেন।

সপ্তম বৈবস্বত মহুর সময়—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম,  
ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ও ঋচীকপুত্র জমদগ্নি ইহারা সপ্তর্ষি,  
সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, মরুদগণ, আদিভাগ্য ও অশ্বিনী-  
কুমারদ্বয় দেবতা এবং ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি করিয়া এই মহুর  
দশ পুত্র।

সকল মহুর প্রারম্ভেই লোক সকলের ব্যবস্থা ও রক্ষার  
জন্ত সপ্তর্ষিগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অতীত ছয় মহু ও  
বর্তমান মহুর বিষয় বিবৃত হইল। অনাগত মহুর সংখ্যা ছয়টি।  
ভবিষ্যৎ মনস্তরে সাবর্ণিনামা পাঁচ জন মহু আবির্ভূত হইবেন,  
তাঁহাদের মধ্যে একজন স্বর্গ্যতনয় বলিয়া বৈবস্বত সানর্গি  
নামে অভিহিত, অপর চারিজন প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র,  
ইহারা স্মেরু পর্বতে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন  
বলিয়া মেরুসাবর্ণি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহারা  
সকলেই দক্ষহুহিতা প্রিয়ার গর্ভসম্ভূত। সূতরাং দক্ষের  
দৌহিত্র। রুচিনামক প্রজাপতির রোচ্য ও ভৌত্য নামে  
দুই পুত্র হয়, পরে এই দুই পুত্র মহু হইয়াছিলেন।  
শেযোক্ত মহু রুচি-ভার্য্যা ভূতিদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন বলিয়া উহার নাম ভৌত্য হইয়াছে।

সাবর্ণি মহুর সময়—রাম, ব্যাস, দীপ্তিমান্, ভরদ্বাজ,  
অশ্বখামা, গৌতম, শরদ্বান্, গালব ও রুরু ইহারা সপ্তর্ষি।  
ইহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ ছিলেন। এই সপ্তর্ষিগণ ভিন্ন ভিন্ন  
গোত্রের প্রবর্ত্তক। ইহারা কৃতাদি যুগচতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণাদি  
চারিবর্ণের ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমসমূহের বিধান করিয়াছেন।  
বরীমান্, অবরীমান্, সংযত, ধৃতিমান্, বসু, চরিকু, আধ্য, বিষ্ণু,  
রাজ ও স্মৃতি এই দশটি সাবর্ণি মহুর পুত্র। [ মনস্তর দেখ ]

চতুর্দশ মহুর অধিকার শেষ হইলেই এক কল্প পূর্ণ হয়।  
মানবীয় এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিন, উত্তরায়ণ

দেবগণের দিবা এবং দশিগায়ন রাত্রি। দেবতাদিগের দশ বৎসরে মহুর এক অহোরাত্র, উহার দশগুণে মহুর এক পক্ষ, উহার দশগুণে এক মাস, ঐরূপ দ্বাদশ মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অন্নন, দুই অন্ননে এক বৎসর হয়। ইহার চারি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ, চারিশত বৎসর সন্ধ্যা, ও চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ, তিন হাজারবৎসর ত্রেতা, ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন শত বৎসর, দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর, কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর, ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ শত বৎসর। ইহারই একসপ্ততি যুগ এক এক মহুর ভোগকাল। এই মহুর ভোগকালই মন্বন্তর নামে অভিহিত। এইরূপে এক মহুর কাল অতীত হইলে অপর মহু হইয়া থাকে। এইরূপে বখন চতুর্দশ মহুর ভোগকাল শেষ হয়, তখনই এক কল্প শেষ হইয়া থাকে। ( হরিবংশ ৭-৯ অ০ )

[ অস্ত্রাত্ত বিবরণ মন্বন্তর দেখ ]

হিন্দুশাস্ত্রে মানবজাতির আদিপুরুষ বলিয়া সনাতন চতুর্দশ মহুর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্যেকে এক এক মন্বন্তর অর্থাৎ ৪৩২০০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি সহস্র বৎসর কাল পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। উপরে স্বায়ত্ত্ববাদি চতুর্দশ মহুর নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সপ্তম বৈবস্বত মহুর বর্তমান অধিকার। ইনি স্বীয় ধার্মিকতার জন্য পুরাকালে ঈশ্বরের বিশেষ অমুগ্রহ লাভ করেন। ঐ সময়ে ভগদ্বাসী সকলে অধ্যাত্মচরণে লিপ্ত হইয়াছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণে মহাপ্রলয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে, তৎপ্রসঙ্গে মহুরও উপাখ্যান কীর্তিত হইয়াছে। প্রলয়ের বিষয় তিনি পূর্বেই মংস্ত্র কর্তৃক অবগত হইয়াছিলেন। মংস্ত্ররূপী ভগবান্ তাঁহাকে একখানি জাহাজ নির্মাণ করিয়া আশ্রয় রাখিতে উপদেশ দেন। পূর্বাদেশ মত সেই মংস্ত্র আসিয়া জাহাজ চালনা করে। এই মহাপ্রলয় হইতে মহু পরিভ্রাণ লাভ করেন; পরে তাঁহা হইতে পুনরায় জগতে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হয়। [ মংস্ত্রাবতার দেখ। ]

হিব্রুদিগের নিকট ইনিই নোয়া (Noah) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

খৃষ্টধর্মশাস্ত্র বাইবেলগ্রন্থে নোয়ার উপাখ্যান আছে। মানব-সৃষ্টি ও তদ্রক্ষাক্ষে ভগবান্ কএকজন পেট্রিয়াক (প্রজাপতি) নিযুক্ত করেন। নোয়া তন্মধ্যে একজন। ইনি লামেকের (Lamech) পুত্র। ৯৫০ বৎসর ইহার জীবন-কাল বলিয়া কথিত আছে।

৯ শত বৎসর জীবন-যাপনের পর, নোয়া জাম, হাম ও

জাফেথ নামে তিন পুত্র লাভ করেন। এই সময়ে প্রজাবৃদ্ধি-বশতঃ ধরা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। নরনারীগণের প্রেমোন্মাদ, কামুকতা, পরস্পরে ঈর্ষা ও ঈর্ষরে অনমুরক্তি-প্রযুক্ত সমগ্র ধরাবাসী আত্মরিক-ভাব ধারণ করিয়াছিল। জগদীশ্বর এই বৈলক্ষণ্য দেখিয়া পাপপ্রবাহ প্রশমনের জন্য জগদ্বিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি একমাত্র কৃপাপাত্র ও ভক্ত নোয়াকে জীবধ্বংসের সূচনা জানাইয়া তাঁহাকে নোকা (Ark) নির্মাণ দ্বারা আশ্রয়ক্ষার উপদেশ দিলেন। নোয়া তাঁহার আদেশক্রমে জাহাজমধ্যে জগতের যাবতীয় পদার্থ সংস্থাপনপূর্বক সপরিবারে আরোহণ করিলেন। ক্রমে প্রলয়প্রাবনে ধরা পরিপ্লুত হইয়া গেল। নোয়ার জাহাজ ধীরে ধীরে ঈশ্বর-কৃপায় আরারাত্ গিরিশৃঙ্গে আসিয়া সংলগ্ন হইল। এখানে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সপরিবারে ঈশ্বরের তৃপ্তির জন্য যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর তাঁহার পূজার তৃপ্ত হইয়া আশ্বাসবাক্যে তাঁহাকে অভয়দান করেন। মহাপ্রাবনের পর, তিনি প্রায় ৩৫০ বৎসর জীবিত থাকিয়া ধরাধামে প্রজাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। (Genesis V-IX)

বিভিন্ন প্রাচীন জাতির নিকট নোয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঐ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থেই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। বাবিল-বাসীদিগের মতে কেরাক (Kerak) গ্রামের দক্ষিণাংশে বেকায়া অথবা সিলো-সিরিয়ার সমতল-ক্ষেত্রে নোয়ার সমাধি-মন্দির বিস্তারিত আছে। তাঁহার সমাধি-স্থানের উপর ১০ ফিট লম্বা, ৩ ফিট প্রশস্ত এবং ২ ফিট উচ্চ একটা প্রস্তর-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উক্ত সমাধি-মন্দিরটা প্রায় ৬০ ফিট উচ্চ। এই সুবৃহৎ অট্টালিকার গঠনকার্যও নিতান্ত মন্দ নহে। ইহা সাধারণের নিকট একটা তীর্থ-ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। নোয়ার সমাধির ৪ মাইল অদূরে হার্মিস্ নিকার (Hermes Nicha) ভগ্ন-মন্দির দৃষ্ট হয়। হার্মিস্ নিকা গ্রীক এবং রোমকদিগের নিকট জলদেবতা (Mercury) বলিয়া পূজিত। বাইবেল গ্রন্থের নোয়া, মুসলমানদিগের নিকট 'নু' (Nuh) নামে পরিচিত। বাবিলন বা কালদিয়ার অধিবাসিগণের বেরোসাসবাসী জিসুথ্রুস্ (Xisuthros) অথবা সিসুথ্রুসের (Sisuthros) সহিত খৃষ্টধর্মশাস্ত্রোন্নিখিত নোয়া হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মহুর অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইনিই লিডিয়ানদের নিকট মোস্ (Maues), ফ্রিজিয়ানদের নিকট 'নোএ' (Noe), এবং গ্রীকদের নিকট দেউকলীয়ন্ (Deucalion) নামে প্রসিদ্ধ।

মহাপ্রলয় সম্বন্ধে কাল্দীয়ান (Chaldaean) জাতির যে উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সহিত হিব্রু বাইবেলের

জেনেসিস্ গ্রন্থে লিখিত ঘটনার সহিত অনেক ঐক্য দেখা যায়। কালদায়দিগের শিশুশ্রু ও আকাডিয়াবাসীরা নোয়া নদীর অসাধারণ পবিত্র চরিত্রগুণে মহান্নাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট মনুষ্যাগণ তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জলে মগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। উক্ত মহান্নাবনের সময় যে নিজির (Land of Nizir) নামক স্থানে শিশুশ্রুসের জাহাজ আশ্রয় লাভ করে, তাহাও বাবিলনের উত্তরপূর্বাংশে পৌর-মাম্ নামক পর্বতের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

৪ বিষ্ণু। “বিশ্বকর্মা মহুস্তটী স্থবিঠো স্থবিরো ঐবঃ।”

( ভারত ১৩।১৪৯।১৯ )

৫ মননপ্রধান বিধান। “তন্নিগ্রহঃ নিদধে নাগেহয়িং বমাহর্মনবতীর্ণবর্হিৎ” ( শুক্লযজু. ১৫।৪৯ ) ‘মনবঃ মনন-প্রধানাঃ বিহাঃসঃ’ ( বেদদীপ. ) ৬ অন্তঃকরণ।

“দেহোহসবোহকা মনবো ভূতমাত্রা-

নাত্মানমন্ত্রক বিহুঃ পরং বৎ ॥” ( ভাগ. ৬।৪।২৫ )

‘মনবো অঃকরণানি’ ( বামী ) ৭ ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা। মনুর রচিত মানবশ্রোতহ্র ও মানবগৃহসূত্রও দৃষ্ট হয়।

৮ কৃশাশ্বের পুত্রভেদ।

“কৃশাশ্বোহর্জিষি ভাঘ্যায়ং ধুমকেতুমজীজনং।

ধিবগায়ং বেদশিরং দেবলং বয়নং মহুন্ ॥” ( ভাগবত ৬।৬২০ )

মনু ( মহুসংহিতা ), মানবধর্মশাস্ত্র। হিন্দু ধর্মের অবশ্রপালনীয় প্রধান কর্তব্য সমূহ এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতি মাত্রে-রই আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কলাপের যথা কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া যে মহু সংহিতা নামক ধর্মশাস্ত্র প্রকটিত রহিয়াছে, মহুই তাহার সঙ্কলয়িতা বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধি।

মহুবিবচিত এই সংহিতা গ্রন্থের কাল নির্ণয় করিতে বাইয়া প্রকৃত্তবিশ্লগ্গণ মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মিঃ হাণ্টার প্রভৃতির মতে ইহা খৃষ্ট পূর্ব ৫ম শতাব্দীতে সঙ্কলিত হয়। ডাঃ কল্ডওয়েল, এলফিনষ্টোন প্রভৃতির বিবেচনার ইহার সঙ্কলন খৃষ্ট পূর্ব ৯ম শতাব্দীর কোন সময়ে হইয়াছিল। সার উল-লিয়ম জোন্স ও অধ্যাপক উইলসনের মতে খৃষ্ট পূর্ব ৮ম শতাব্দীর পূর্বে ইহার কোন কোন অংশ সংগৃহীত হইয়াছিল, বৌদ্ধ যুগের সমসাময়িক কালে অথবা তাহার পরবর্ত্তী সময়েও কোন কোন অংশ গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাপকের মতে খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে মহুসংহিতা গ্রন্থ বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উইলসন সাহেব আরও বলেন উক্ত সংহিতা পাঠ করিলে অস্বাভাবিক হয়, যে উহার স্থতিনিবন্ধগুলি প্রাচীনতম স্থতিপুঞ্জের অংশোদ্ধার মাত্র। মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের পরবর্ত্তী সময়েও ইহার কতকাংশ সংযোজিত

হয়। শিব ও কৃষ্ণচরিত্রের কোন উল্লেখ না থাকায় উহার কতকাংশ রামায়ণ ও মহাভারতের পূর্ববর্ত্তী বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ রামায়ণ ও মহাভারতেও ইহার শ্লোকনিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার অনেক স্থলে বৈদিক যুগের উন্নতির প্রকৃষ্ট নিদর্শনসমূহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মহর্ষি ভৃগু বর্ত্তমান মহু-সংহিতা প্রচার করেন, তজ্জন্ত ইহা ভৃগুসংহিতা নামেও খ্যাত। অনেকের বিশ্বাস, মানবগৃহসূত্র ও মানবধর্ম-সূত্র অবলম্বনে বর্ত্তমান সংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার সহিত মানবগৃহসূত্রের অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও মহুসংহিতার সহিত অনেক বিষয়েই মিল নাই।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে স্থষ্টির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রারম্ভে—

“আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজাতমলক্ষণম্।

অপ্রত্যর্কমবিজ্ঞেয়ং গ্রন্থগুণমিব সর্বতঃ ॥” ( মহু ১।৫ )

এই শ্লোকটি মহুযা মাত্রকে জগৎ স্থষ্টির সূচনা জানাইয়া দেয়। অতঃপর মহুযা জাতি বা সমাজ বিশেষের সমূহ অনিষ্ট পাতাদির উল্লেখ আছে। রাজার এবং লোক সাধারণের ধর্ম, সমাজ, গার্হস্থ্যজীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে কর্তব্যতাও সবিস্তার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্ উইলিয়ম জোন্স ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে মহামতি হটন, লুসেলিয়ো দেলাং কামস, বুল্‌হর প্রভৃতির অনুবাদ যুরোপের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।

মনুকুলাদিত্য, জনৈক রাজার উপাধি। ইহার আদেশানুসারে সর্গজাত্য সংক্ষেপশারীরক রচনা করেন।

মনুচেহর, পারস্যের পিসদাদীয়বংশীয় জনৈক প্রাচীন রাজা। ইনি ফরাহনের পরে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি অতিশয় সচ্চরিত্র এবং ধার্মিক ছিলেন। ইহার প্রধান সচিব শামের সাহস ও বুদ্ধিকৌশলে পারস্যরাজ্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। ১২০ বৎসর কাল রাজত্বের পর মনুচেহর পরলোক গমন করেন। তদীয় পুত্র নোজার রাজত্বকালে তুরাণরাজ পশদে পারস্যদেশ আক্রমণ করেন।

মনুগ ( পুং ) মনুর পৌত্র, প্রিয়ব্রতের পুত্র দ্যুতিমান, দ্যুতিমানের পুত্র মনুগ। ( মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৩২৩ )

মনুজ, জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার। ইনি বৈদ্যসর্গস্ব নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

মনুজ ( পুং ) মনোজাত ইতি জন-ড। মহুযা, মানব। মহু হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মহুজ কহে।

“মর্গাপবর্গে মাহুযাং প্রাপ্নুবন্তি নরা মুনৈ !।

যথাভিকৃতিং স্থানং তদ্যন্তি মহুজা দ্বিজ ॥” ( বিষ্ণুপু. ১।৩।১০ )

মনুজপতি (পুং) মনুজানাং পতিঃ। মনুষ্যদিগের অধিপতি, রাজা। “প্রীতিষ্ঠ নির্নিমিত্তং মনুজপতীনাং স্তুতিকঞ্চ।” (বৃহৎসংহিতা ৪।২)

মনুজলোক (পুং) মনুষ্য লোক।

মনুজাত (ত্রি) মনু বা মানব হইতে উৎপন্ন।

মনুজাত্মজ (পুং) মানব। ত্রিমাং টাপ্ নারী।

মনুজাধিপ (পুং) মনুজানাং অধিপঃ ৬তং। মনুজদিগের অধিপতি, রাজা, মনুজেন্দ্র। মনুজাধিপতি।

“কুর্য্যাৎ পঞ্চদশাং পীড়াং মনুজাধিপতৈব।” (বৃহৎসং ৩৪।২১)

মনুজী (স্ত্রী) মনুজ গোরাদিভ্যাং ভীষ্। মানুষী। (জটধর) কাহারও কাহারও মতে ভীষ্ না হইয়া টাপ্ হইবে। টাপ্ করিয়া মনুজ।

“বিদ্বাদধরাণাং নারীষু সাক্ষরীষু মনুজাম্ চ।” (হরিবং ১৭৩।২৩)

মনুজেন্দ্র (পুং) মনুজানাং ইন্দ্রঃ। মনুষ্যদিগের রাজা।

মনুজ্যেষ্ঠ (পুং) ১ অসি, তরবারি। ২ বৃদ্ধ। ৩ দণ্ডভেদ।

মনুজ (স্ত্রী) মনোভাবঃ ৬। মনু ভাব বা ধর্ম।

“ঘোহসাবস্মিন্ মহাক্ষত্রে তনয়ঃ স বিবস্বতঃ।

শ্রাক্ষদেবহিতি খ্যাতে মনুজে হরিণার্চিতঃ॥” (ভাগ০ ৮।২৪।১১)

মনুপ্রীত (ত্রি) মনু কর্তৃক প্রীত। মনুষ্য কর্তৃক প্রীত। “আপ্যং মনু প্রীতাসঃ জনিম বিবস্বতঃ” (ঋক্ ১০।৩৩।১) ‘মনুপ্রীতাসঃ মনুষ্যোঃ প্রীতাঃ’ (সারণ)

মনুভূ (পুং) মনোভবতীতি ভূ-ক্ৰিপ্, মনুভূরূপতিস্থানঃ যন্তেতি বা। মনুষ্য। (শব্দচং)

মনুযুগ (স্ত্রী) মনুযুগ, মহাযুগ, মনুপরিমিত কালবিশেষ। [ মনু ও মনুযুগ দেখ। ]

মনুরাজ (পুং) মনু মানব ইব রাজতে ইতি রাজ-ক্ৰিপ্, মনুষ্যবদাচারবদাদ্রস্ত তথাহং। কুবের। (ত্রিকাং)

মনুহিত (ত্রি) মনুনা হিতং, মনোরোগাদিক উসিন্ প্রত্যয়ঃ, তৃতীয়া কণ্ঠ্যনীতি পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরতঃ। ১ মনু অর্থাৎ ব্রহ্ম দ্বারা হিত, ব্রহ্মে অবস্থাপিত। ২ মনুষ্যদিগের হিত। “শং ঘোষন্তে মনুহিতং তদীমহে” (ঋক্ ১।১০।৬৫) ‘মনুহিতং মনুনা ব্রহ্মণা হিতং স্ব্যবস্থাপিতং যথা মনুষ্যাণামনুকূলং’ (সারণ)

মনুবৎ (অব্যং) মনুরিব ইবার্থে বতি। মনুর ত্যায়।

“ত্বা দূতাসো মনুবৎ বদেম” (ঋক্ ২।১০।৬) ‘মনুবৎ মনুরিব বদেম’ (সারণ)

মনুবৃত (ত্রি) মনুষ্যকর্তৃক নির্মাচিত বা নিযুক্ত।

মনুশ্রেষ্ঠ (পুং) বিষ্ণু।

মনুষম্ (পুং) মন-উসিন্। “মনুষম্ শাসনীং পিতৃণ্যং পুত্রো মন কস্ত জায়তে” (ঋক্ ১।৩১।১১) ‘মনুষম্ মনোঃ’ (সারণ)

মনুষী (স্ত্রী) মনুষ্যস্ত স্ত্রী, মনুষ্য (হরগবধমুক্তমনুষ্য-মৎস্তানামপ্রতিবেধঃ। পা ৪।১।৬৩) ইত্যস্ত বার্তিকোক্ত্যা ভীষ্, (হলন্তদ্ধিতস্ত। পা ৬।৪।১৫০) ইতি বলোপঃ। মানুষী, মনুষ্যপত্নী। (শব্দরত্নাং)

মনুষেন্দ্র (পুং) মনুজেন্দ্র। (কণাসরিংসাং ২৯।১২৮)

মনুষ্য (পুং) মনোরপত্যমিতি মনু (মনোভাবাৎ ঋগ্ভেতৌ যুক্ত। পা ৪।১।৬৩) ইতি ষৎ যুগগমচ। মনুর অপত্য, পর্গার,—মানুষ, মর্ত্য, মনুজ, মানব, নর, ভূমিজ, দ্বিপদ, চৈতন, ভূষ, মনু, পঞ্চজন, পুরুষ, পুরুষ, পুমান্, না, মর্ণ, বিট্। (জটধর) ব্রহ্মার নববিধ সৃষ্টির মধ্যে এক প্রকার সৃষ্টি।

“অর্ধাক্ষত্রোত্তম নবমঃ ক্ষত্রে কবিধো নৃণাম্।

ব্রজোহধিকাঃ কর্মপরো দুঃখে চ স্তম্ভমানিনঃ॥”

(ভাগবত ৩।১০।২৪)

সৃষ্টি চারি প্রকার, জরায়ুজ, অণুজ, বৈদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্য জরায়ুজ। মনুষ্যজন্ম ব্যতীত জীবের মুক্তি হইতে পারে না। মনুষ্য জন্ম হইলে তাহাদের মুক্তির জন্ত চেষ্টা করা আবশ্যিক। পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে বহু লক্ষ জন্মের পর মনুষ্যজন্ম হয়।

“বিমুক্তিহেতুকাশা তু নরযোনিঃ কৃতান্তাত্মা।

না মুঞ্চন্তি হি সংসারে বিভ্রান্তমনসো গতাঃ॥

জীবা মনুষ্যতাং মন্তে জন্ম নামমৃতেরপি।

তদীদৃক্ হুল্লভং প্রাপ্য মুক্তিধারং বিচেষতঃ॥” ইত্যাদি (অগ্নিপুং সর্গকথন নামাখ্যায়)

পুণ্যাদিগের মুক্তির জন্তই মনুষ্য জন্ম হইয়া থাকে। যাহারা মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া মুক্তির জন্ত চেষ্টা করেনা, মহামার্যভিত্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহাদের জন্মই নিষ্ফল। মনুষ্যদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই ভগবান্ শ্রীহরি।

“মনুষ্যাণাং পিতা মাতা ভ্রাতা চ শ্রীহরির্থা।

বিশেষতো মনুষ্যাণাং পিতা মাতা জনাধিনঃ।

ভ্রাতা চ সর্বলোকানাং বাৎসল্যগুণসাগরঃ॥”

(পাণ্ডোত্তরখণ্ড ৭৮ অং)

স্বাভিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মনুষ্য তিন প্রকার। যে সকল মনুষ্যের প্রকৃতি সত্ত্ববল্লা, তাহারা সাভিক, রজগুণাধিক্যে রাজসিক এবং তমোগুণাধিক্যে তামসিক মনুষ্য হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ সম্মিলিত হইয়াই কার্য করে, তথাচ বাহার যে গুণ প্রবল হয়, তাহার অল্প গুণের অপ্রবল ভাবে ঐ প্রবল গুণেরই সহায়তা করে।

যেদ্রুপ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনই শরীর ধারণের উপ-



যোগী, তথাচ ইহাদের মধ্যে যখন কোন একটী প্রবল হয়, তখন অন্য দুইটীও প্রবলের সহায়তা করে, তদুপ মনুষ্যের গুণ সম্বন্ধে জানিতে হইবে।

“উর্কং গচ্ছন্তি সত্বা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।

জঘন্তগুণবৃত্তিহা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥” (গীতা ১৪ অ°)

[ মানবশব্দ দেখ। ]

(ত্রি) ২স্ততিকারক। “হোতা মনুষ্যো ন দক্ষঃ” (ঋক্ ১৫২৪)

‘মনুষ্যঃ লোকিকো বন্দী দাতারং প্রভুং বহুবিধয়া স্তত্যা স্তোতি’ (সারণ) ৩ মনুষ্য সম্বন্ধ। “প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি” (ঋক্ ১৯২১১) ‘মনুষ্যা মনুষ্যাণাং সম্বন্ধীনি যুগানি কৃত-ব্রোতাদীনি’ (সারণ) ৪ মনুষ্যদিগের হিত। “দশারিত্রো মনুষ্যাঃ স্বধা” (ঋক্ ২১৮১) ‘মনুষ্যো মনুষ্যাণাং হিতঃ’ (সারণ)

মনুষ্যাকার (পুং) মনুষ্যাকারঃ। পুরুষাকার, পুরুষের কৃতি-সাধ্য চেষ্টা।

মনুষ্যকিল্বিষ (ক্লী) মনুষ্যস্ত কিল্বিষঃ। মানবদিগের পাপ।

মনুষ্যকৃত (ত্রি) মনুষ্যৈঃ কৃতঃ। মনুষ্য কর্তৃক অশ্রুতিত শুভাশুভ। “মনুষ্যকৃতশ্চৈনদোহবযজ্ঞনমসি” (শুক্ল যজুঃ ৮।১৩)

‘মনুষ্যকৃতস্ত মনুষ্যেষু কৃতস্ত দ্রোহিনিন্দাদিরেনসঃ’ (বেদদীপ°)

মনুষ্যগন্ধর্ষ (পুং) মানবরূপী গন্ধর্ষ।

মনুষ্যচর (ত্রি) মনুষ্যের সহিত ব্যবহারশীল। (তৈত্তিসং ৬।৪।৯)

মনুষ্যচ্ছন্দস্ (ক্লী) মনুষ্যচ্ছন্দঃভেদ।

(তৈত্তিসং ৫।৪।৮।৩।১)

মনুষ্যজ (ত্রি) মনুষ্যাং জায়তে জন-ড। মনুষ্য হইতে জাত।

“পতিস্তরীয়ন্তে মনুষ্যজাঃ” (ঋক্ ১০।৮।৫।৪০)

মনুষ্যতা (ক্লী) মনুষ্যস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। মনুষ্যত্ব, মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম।

“স্বতন্ত্রতা মনুষ্যাণাং পরতন্ত্রা সন্না বলা।

নরোহপি পরতন্ত্রো যন্তস্ত কীদৃক্ মনুষ্যতা ॥”

(রামায়ণ ১।১২৫।২৯)

মনুষ্যত্রো (অব্য°) মনুষ্য মধ্যে।

মনুষ্যত্ব (ক্লী) মনুষ্যস্ত ভাবঃ ত্ব। মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম।

মনুষ্যদেব (পুং) মনুষ্যেষু দেব ইব। নরদেব, রাজা।

মনুষ্যধর্ম্মান্ (পুং) মনুষ্যস্তেব ধর্ম্ম আচারো যন্ত (ধর্ম্মাদিনিচ্-কেবলাৎ। পা ৫।৪।১২৪) ইতি সমাসাস্তো অনিচ। কুবের।

মনুষ্যযজ্ঞ (পুং) মনুষ্যোভ্যো মনুষ্যার্থং যো যজ্ঞঃ। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত যজ্ঞভেদ। অতিথিপূজন, ন্যূজ, অতিথি-সংকারের নামই মনুষ্যযজ্ঞ।

“তান্তেব মহাস্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি” (শতপথব্রা° ১।১।৫।৩।১)

গৃহস্থ প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে পঞ্চস্থানাকৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

[ পঞ্চ মহাযজ্ঞ দেখ। ]

মনুষ্যরথ (পুং) মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী রথবিশেষ।

মনুষ্যরাজ (পুং) মনুষ্যাণাং রাজা, ‘রাজাহঃ সম্বিতাষ্টচ’ ইতি টিচ। মনুষ্যদিগের রাজা, মনুজ্ঞেয়।

“মেবো যমায় কৃষ্ণো মনুষ্য রাজার” (শুক্লযজুঃ ২৪।৩০)

মনুষ্যালোক (পুং) নৃলোক, মানবলোক, পৃথিবী।

“দেবলোকার পশিতারং মনুষ্যালোকার প্রকরিতারং”

(শুক্লযজুঃ ৩০।১২)

মনুষ্যবিশ্ (ক্লী) মনুষ্যালোক। (ঐতরেয়ব্রা° ১।৯)

মনুষ্যসভা (ক্লী) মনুষ্যসমূহ।

মনুষ্যসব (পুং) ১ নরমেধযজ্ঞ। ২ মনুষ্যকৃত যজ্ঞ।

“যো বৈ সোমেন স্মরতে স দেবসবঃ। যঃ পশুনা স্মরতে স দেবসবঃ। য ইষ্টা স্মরতে স মনুষ্যসবঃ।” (তৈত্তি° ব্রা° ২।৭।৫।১)

মনুষ্যোন্দ্র (পুং) মনুষ্যাণামিন্দ্রঃ ৩তৎ। মানবদিগের ইন্দ্র, মনুষ্যদিগের রাজা, মনুষ্যেশ্বর।

মনুষ্বৎ (অব্য°) মনুষ্য যজ্ঞ সদৃশ। “মনুষ্বদিত্ত্র সবনং জ্ষাণঃ” (ঋক্ ৩৩।২।৫) ‘হে ইন্দ্র মনুষ্বৎ মনোবজ্রমিব মমেদং সবনং’ (সারণ)

মনুস্ (পুং) মনুতে জানাতীতি মন-জ্ঞানে উসি-নিৎ চ। মনু, প্রজাপতি। “বরুণো মিত্রো অর্ঘ্যমা সীদন্ত মনুষো যথা” (ঋক্ ১।২৬।৪) ‘মনুষঃ প্রজাপতেঃ’ (সারণ)

মনুসব (পুং) মনু বা মনুষ্যকৃত যজ্ঞ। (তৈত্তি° সং ৭।৫।১৫।৩)

মনেয়, হাসানপুর পরগণার অন্তঃপাতী খুদ্রখানালা নামক একটী কুদ্রনদীর তীরে এই স্থান অবস্থিত। আধুনিক মানচিত্রে এইস্থান মিনিয়া নামে অঙ্কিত। ইহা ভূইলা দী হইতে ৩৪ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

যুবরাজ সিদ্ধার্থ (বুদ্ধ) তদীয় অনুচর ছন্দকের সঙ্গে মনেয় নামক স্থানে অশ্বারোহণে অবনী নদী অতিক্রম করেন। মনেয়কোরা নদী বর্তমান রামগ্রাম হইতে ৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত। পুরাতন মনেয় সহর বর্তমান মনেয় নামক গ্রাম হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। ঐ স্থানে এখন স্তূপাকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তথাকার লোকেরা ইহাকে ‘তমেশ্বর দী’ বলিয়া থাকে; যেহেতু ঐ উচ্চ স্থানোপরি তমেশ্বরনাথ নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। এই স্থানে ‘তমেশ্বর সাগর’ নামক একটী চতুষ্কোণ পুষ্করিণী আছে। উক্ত শিবলিঙ্গের একটী নাম মন, সম্ভবতঃ উক্ত মনেশ্বর শিব-লিঙ্গের নামানুসারে মনেয় নাম হইয়াছে।



মনোক, জনৈক প্রাচীন কবি।

মনোগত (ত্রি) মনো গতঃ। মনঃস্থিত, মনে বাহা আছে।

মনোগতি (ত্রী) মনঃ গতিঃ ৬৩২। মনের গতি, অবস্থা, মনের বৃত্তি।

“পরিভ্রাজামি স্বাং কাম! হিমা সৰ্গমনোগতীঃ।”

(ভারত ১২।৬৬২৭)

মনোগিবী (ত্রী) ইচ্ছা।

মনোগুপ্তা (ত্রী) মনসা মনঃ শব্দেন গুপ্তেব। মনঃশিলা।

মনোগ্রহণ (ত্রী) মনসঃ গ্রহণম্। মনের গ্রহণ, মনকে লওয়া। ২ মনঃ দ্বারা গ্রহণ, যথা—স্বথ হঃখাদি।

মনোগ্রাহিন্ (ত্রি) মনসা গৃহ্যতীতি গ্রহ-গিসি। মনঃ দ্বারা গ্রহণকারী।

মনোগ্রাহ (ত্রি) মনসা গ্রাহঃ। স্বথ হঃখাদি, স্বথ হঃখ প্রভৃতি মনেই অধুভব হয়, এইজন্য ইহা মনোগ্রাহ।

মনোজ (পুং) মনসি জাতঃ জন-ড। মনসিজ, কাম।

মনোজগ্মান্ (পুং) মনসো জগ্ম যন্ত। কন্দর্প। (ত্রিকা০)

মনোজব (পুং) মনস ইব জবোহন্ত, একদৈব সৰ্গগামিত্বাং তথাৎ। ১ বিষ্ণু।

“মনোজবস্তীর্থকরো বসুরেতা ধমুগ্রনঃ।” (ভারত ১৩।১৪২৮৭)

মনসশ্চিত্তস্ত জবঃ। ২ মনের বেগ। ৩ অনিলপত্নী - শিবির পুত্র।

“অনিলস্ত শিবাতার্য্য যন্তাঃ পুত্রো মনোজবঃ।” (হরি ৩।৪২)

৪ ক্রদের পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫২।১১) ৫ তীর্থ-ভেদ। এই তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়।

“মনোজবে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ।”

(ভারত ৩৮।৩৮৫) ৬ ষষ্ঠ মনস্তরের ইন্দ্র।

“মনোজব স্তথৈবেব্রজঃ সংখ্যাতো যজ্ঞভাগভূক্।”

(মার্কণ্ডেয়পুং ৭৬।৫৩)

৭ মেধাতিথির পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।২০।২৫) মনো জবং বেগবদ্ যস্মিন্, যদা মনো জবতি পিতায়মিতি কৃত্বা

ধাবতাস্মিন্ জু-সৌত্রধাতুঃ অচ্। ৮ পিতৃত্বা। পর্যায়— পিতৃসন্নিভ। (অমর) ৯ অতিশয় বেগবান্।

“তমবধাবন্ বেগেন তুরগোহিসৌ মনোজবঃ।”

(মার্কণ্ডেয়পুং ২১।৮)

মনোজবস্ (ত্রি) মনের দ্বার বেগযুক্ত, মনের দ্বার বেগশালী।

“মনোজবা স্বা পিতৃভিদক্ষিণভঃ পাতৃ” (শুক্লযজুঃ ৫।১১)

‘মনোজবাঃ মনোবদ্ বেগযুক্তঃ যমো দেবঃ’ (বেদদীপ০)

মনোজবস্ (ত্রি) মনোজবতাস্মিন্, জু—বাহুলকাৎ অসচ্। পিতৃসন্নিভ। (অমরটীকায় স্বামী)

মনোজবা (ত্রী) মনো জবতাজেতি, জু-অচ্, টাপ্। ১

অধিজিহ্বাবৃক্ষ। (জটধর) ২ বহিজিহ্বা বিশেষ।

“মনোজবা চ বা জিহ্বা লঘিমা শুণলক্ষণা।

তয়া নঃ পাহি পাণেভ্য ঐহিকাচ্ মহাভয়াৎ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুং ৯২।৫৪)

৩ ক্রদের মাতৃগণভেদ।

“মনোজবা কণ্টকিনী প্রথমা পুতনা তথা॥” (ভারত ৯।৪৩।১৬)

৪ ক্রৌঞ্চদ্বীপের নদী বিশেষ। (ভারত ১।৫৬।১৮) মন ইব জবো যস্যাঃ। বেগবিশিষ্টা ত্রী।

“অহঃ স্ব বিরহানেন যথাকামং মনোজবা।” (ভারত ১।১৫।১৮)

মনোজবিন্ (ত্রি) মন ইব জবো হন্ত্যন্তেতি ইনি। মনোজব, মনের দ্বার বেগযুক্ত।

মনোজবুদ্ধি (ত্রী) মনোজস্ত কামস্ত বুদ্ধির্ভয়াৎ। ১ কামবুদ্ধি কুপ। (রাজনিং) মনোভবস্ত বুদ্ধিঃ। ২ কামবুদ্ধি।

মনোজাত (ত্রি) মনসি জাতঃ। মনোৎপন্ন, মনে বাহা হয়। দর্শন, শ্রবণাদি ইচ্ছারূপ, মন হইতে বাহা উৎপন্ন।

“যে দেবা মনোজাতা মনোযুজো দক্ষক্রতবস্তেনোহিবন্ত”

(শুক্লযজুঃ ৪।১১) ‘মনোজাতাঃ, দর্শনশ্রবণাদীচ্ছারূপাঃ মনসঃ উৎপন্ন—ইচ্ছাৎপত্তৌ তেবাং প্রবর্তমানহাং’ (বেদদীপ০)

মনোজিত্র (ত্রি) অমুনানলক্।

মনোজ (ত্রি) মন ইব জবতে জু-ক্টিপ্। মনের দ্বার বেগযুক্ত। “ইন্দ্রবায়ু মনোজুবা বিপ্রা হবন্ত উতরে” (ঋক ১।২।৩৩)

‘মনোজুবা জবতি গতিকর্ণা, মনোবজ্জবত ইতি মনো-জুবা মনইব বেগযুক্তো’ (সায়ণ)

মনোজ্ঞ (ত্রী) মনো জানাতি জ্ঞাপয়তি তোষয়তীতি অন্তর্ভূত-ণ্যার্থে-জ্ঞা-ক। ১ সরল কাষ্ঠ। (রত্নমালা) (ত্রি) মনসা জানাতীতি, যদা মনঃ জ্ঞাপয়তি তোষয়তীতি জ্ঞা-ক। ২

মনোহর, পর্যায়—সুন্দর, রুচির, চারু, সুধম, সাধু, শোভন, কান্ত, মনোরম, রচা, মজ্জ, মজ্জল, বজ্জর, বজ্জর, পেশল,

পেশল, সুমনস্, বাম, অভিরাম, নন্দিত। (শঙ্করভা০)

“মনোজ্ঞঃ শুচি নাত্যুৎ প্রত্যগ্রমশনং হিতম্।

পূর্বে মধুরমদ্রীয়াং যদ্যোহন্নলবণৌ রসৌ॥” (সুশ্রুত ১।৪৬)

৩ কুলপুঙ্গ। (রাজনিং)

মনোজ্ঞতা (ত্রী) মনোজ্ঞস্ত ভাবঃ তন্ম টাপ্। মনোজ্ঞের ভাব বা ধর্ম, মনোহরত্ব।

মনোজ্ঞশব্দাভিবর্জিত (পুং) কংসভেদ।

মনোজ্ঞস্বর (পুং) গন্ধর্বভেদ। সুন্দর স্বর।

মনোজ্ঞা (ত্রী) মনোজ-জিহ্বাং টাপ্। ১ মনোহরা। ২ মনঃশিলা। (রত্নমালা) ৩ রাজপুত্রী। (জটধর) ৪ বক্ষ্য-

ককোটকী। ৫ আবর্তকী। ৬ হুলজীরক। ৭ জাতীপুষ্প।  
৮ মদিরা। (রাজনিঃ)

মনোত্ (ত্রি) প্রজ্ঞাতা, উত্তমরূপে যিনি জানেন। ২ মান-  
স্বিতা। “ঋং শুক্রস্ত বচসো মনোতা” (ঋক্ ২।৯।৪) ‘মনোতা  
প্রজ্ঞাতা ভবসি, যদ্বা মানস্বিতা’ (সারণ) ২ দাতা। “পুরু-  
বহু মনোতরা রয়ীণাং” (ঋক্ ৮।৮।১২) ‘রয়ীণাং ধনানাং  
মনোতরা মন্তারো দাতারো মন্ততে স্তুতি পৃষোদরাদিহাদ্ রূপ-  
সিদ্ধিঃ’ সারণ)

মনোদগু (ক্লী) মানসিকবৃত্তিনিরোধশক্তি। (মহু ১২।১০)

মনোদত্ত (ত্রি) চিন্তায় অভিনিবিষ্ট।

মনোদত্ত, কলাদীক্ষা নামক গ্রন্থরচয়িতা।

মনোধর, কাব্যদর্পণ নামে কাব্যপ্রকাশটীকা প্রণেতা।

মনোদাহিন্ (পুং) মন-দহ-গিনি। মনঃপীড়নাদায়ক, যিনি  
মনকে দহন করেন।

মনোদ্রুত (ত্রি) মনসা দ্রুতঃ। মনঃ দ্বারা কলুষিত। মন  
বাহ্যের পাপযুক্ত।

“মৃত্যোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।

রজসা স্ত্রীমনোদ্রুতা সন্ধ্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ ॥” (মহু ৫।১০৮)

‘মনোদ্রুতা পরপুরুষমৈখুনসকল্লাদিদুঃখিতমানসা’ (কুম্বক)

মনোহিধিনাথ (পুং) প্রাণপতি, স্বামী।

মনোধৃত (ত্রি) সংযতমনস্ক, জিতেন্দ্রিয়। “কবীনাং মনো-  
ধৃতঃসু কৃতস্তকৃত আং” (ঋক্ ৩।৩৮।২) ‘মনোধৃতঃ সংযত-  
মনস্কাঃ’ (সারণ)

মনোহনবস্থান (ক্লী) মনসঃ অনবস্থানং। চিত্তের অনব-  
ধানতা।

মনোনাশ (পুং) মনসো নাশঃ। মনের নাশ, মনোনাশ।  
যখন জীবের মুক্তি হয়, তখন মন অহঙ্কারে লীন হয়।

মনোহনুগ (ত্রি) মনসা অনুগচ্ছতি মনস্-অনু-গম-ড।  
হৃদয়ানুগ, মনের অনুগামী।

“প্রিয়মাবেদয়িষ্যামি ভবতো যন্নোহনুগঃ।” (হরিব.)

মনোহপহারিন্ (ত্রি) মনঃ অপহরতি হু-গিনি। মনো-  
হারী।

মনোভব (পুং) মনসঃ মনসি বা ভবতীতি ভূ-অচ, মনসঃ  
ভব, উৎপত্তিগ্ধৃতি বা। ১ কন্দর্প। (হলায়ুধ) (ত্রি) ২  
মনে উৎপন্ন।

“দৃশ্যমানা বিনার্ধেন ন দৃশ্যন্তে মনোভবাঃ।

কর্মভির্ধ্যায়তো নানাকর্মাণি মনসো ভবান্ ॥” (ভাগ. ৩।১৫।২৪)

মনোহিভিপ্রায় (পুং) মনসঃ অভিপ্রায়ঃ। মনের অভি-  
প্রায়, ইচ্ছা।

মনোহিভিরাম (পুং) মনসঃ অভিপ্রায়ঃ। মনোজ্ঞ, জ্ঞানর।

“মনোহিভিরামাঃ শৃংস্তো রথেনেমিশ্বনোমুখো।” (রঘু. ১ সর্গ)

মনোভিরাম, জন্মপদ্ধতিপ্রণেতা।

মনোভূ (পুং) মনসঃ মনসি বা ভবতীতি ভূ-কিপ্। কাম-  
দেব। (শন্দরত্না.)

“শ্রামা শুভতে শশিনা তয়া মনোভূর্মধুংসবস্তন।

মদমুদিতমানসানাং তেনাপি মৃগীদৃশাং লীলা ॥”

(কলাবিলাস ১।৩৩)

মনোভূৎ (ত্রি) মনের পোষণকারী। (শতপথব্রা. ৮।১।৩৬)

মনোমথন (পুং) মদন।

মনোময় (ত্রি) মনস্-স্বরূপার্থে ময়ট্। মনোরূপ।

“স ভূতহ্মেন্দ্রিয়সম্মিকর্ষং মনোময়ং দেবময়ং বিকার্যম্।

সংসাধ্য গত্যাহ সহ তেন যাতি বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসমিরোধম্ ॥”

(ভাষা. ২।২।৩০)

ম’নামুসি (ত্রি) আধ্যাত্মিকাদি তাপক্লিষ্ট মন।

মনোমুহ্ (ত্রি) উন্মাদকারী, মনোমোহনকারী।

মনোযায়িন্ (ত্রি) ১ ইচ্ছামত গমনকারী। ২ শীঘ্রগামী।

মনোযুজ্ (ত্রি) মনসা যুজ্যতে যুজ্-কিপ্। মনের দ্বারা  
যুক্ত। “যে দেবা মনোজাতা মনোযুজো দক্ষকৃতবস্ত্রে নোহবস্ত্র”  
(শুক্লযজু. ৪।১১) ‘মনোযুজঃ রূপাদিদর্শনকালেহপি মনসা  
যুক্তা এব বর্তন্তে’ (বেদদীপ.)

মনোযোনি (পুং) মন এব যোনিরুৎপত্তিস্থানং যন্ত।  
মনোভূ, কন্দর্প। (হেম)

মনোরঞ্জন (ক্লী) মনসঃ রঞ্জনং। মনের তৃপ্তিসম্পাদন।

মনোরথ (পুং) মনসঃ রথ ইব, মন এব রথোহত্রেতি বা ইচ্ছা।

“ইতস্ততশ্চ বৈদেহীমবেষ্টুং ভর্তৃচোদিতাঃ।

কপয়শ্চেরুরার্তস্ত রামস্যেব মনোরথাঃ ॥” (রঘু ১১।৫৯)

মনোরথ, কাশ্মীরপতি জয়্যাপীড়ের প্রতিপালিত জনৈক  
কবি।

“মনোরথঃ শব্দতত্ত্বচর্চকঃ সন্ধিমাংস্তথা।

বভূবুঃ কবয়ন্তস্য বামনাশ্বাশ্চ মন্ত্রিণঃ ॥” (রাজত. ৪।৫৯৬)

২ একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধস্থবিয়।

মনোরথ-তৃতীয়া (জ্ঞী) ১ চৈত্রমাসের শুক্লতৃতীয়া। ২ উক্ত  
তিথিতে কর্তব্য ব্রতভেদ। এই ব্রত করিলে মনোরথ  
সিদ্ধি হয়।

মনোরথদায়ক (ত্রি) ১ মনোভীষ্ট-সফলকারী। (পুং)  
২ কল্লবৃক্ষ।

মনোরথ-দ্বাদশী, ১ চৈত্রশুক্রত্রয়োদশী। ২ ঐ তিথিতে অহ-  
ষ্ঠেয় ব্রতভেদ।

মনোরথক্রম (পুং) কামদেব।

মনোরথসিক্তি (স্ত্রী) মনোরথসা সিক্তিঃ। মনোরথের সিক্তি, অভিলাষপূরণ।

মনোরথসৃষ্টি (স্ত্রী) কামনিক সৃষ্টি, মনগড়া।

মনোরম (ত্রি) মনো রময়তীতি রম-শিচ্-অণ। মনোজ, মনোহর।

“পুরস্তাধিমলে পাশ্রে সুবিত্তীর্ণে মনোরমে।

সুদঃ সুপৌদনং দত্তাং প্রদেহাংসু সসংস্কৃতান্ ॥”

(সুশ্রুত ১৪৬ অ০)

মনোরমা (স্ত্রী) মনোরম-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ গোরোচনা।

(রাজনি০) ২ বুদ্ধিশক্তিবিশেষ, পর্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কারা, স্বাহা, শ্রী, তারিণী, জয়া অনন্তা, শিবা, গোকেশ্বর-মুখা, খদ্রবাসিনী, তজ্রা, বৈশ্রা, নীলসরস্বতী, শাশ্বতী, মহাতারা, বসুধারা, ধনন্দরা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (ত্রিকা০)

৩ ইন্দ্রাবর নামক বিজ্ঞাধরের কন্যা।

“অহমিন্দীবরাধাস্য সূতা বিজ্ঞাধরস্য বৈ।

নামা মনোরমা জাতা সূতায়ামক্ষুধনঃ ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুং ৬২।১৩)

৪ সপ্ত সরস্বতীর মধ্যে একজন।

“সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা।

সরস্বতী চৌষবতী সুরেশ্বরীমলোদকা ॥” (ভারত ৯।৩৮।৪)

পূর্বে মুনিগণ মনের দ্বারা সরস্বতীর পূজা করিয়াছিলেন, এইজন্ত ইনি মনোরমা নামে খ্যাত হন।

“উদ্ধালকেন যজ্ঞতা পূর্বেং ধ্যাত্বা সরস্বতী।

অজগাম সরিস্রেষ্টা তং দেশমুখিকারণং ॥

পূজ্যমানা মুনিগণৈব ব্রহ্মজিনসংবৃতৈঃ।

মনোরমেতি বিখ্যাতা সা হি তৈর্মনসা কৃত্য ॥”

(ভারত ৯।৩৮।২৪-২৫)

৫ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে দশটি অক্ষর থাকিবে, ইহার মধ্যে ১, ২, ৩, ৭, ৯ বর্ণ লঘু, তন্নিম্ন বর্ণ গুরু।

ইহার লক্ষণ ও উদাহরণ—“নয়গজৈর্ভবেন্নোরমা”

“তরপিজাতটে বিহারিণী ব্রজবিলাসিনী বিলাসতঃ।

সুররিপোত্তমঃ পুনাতু বঃ স্কৃততশালিনাং মনোরমা ॥”

(ছন্দোমঞ্জরী) ৬ মনোহরা।

মনোরা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত করাচী জেলার একটি অন্তরীপ। এই স্থানে ১২০ ফিট উচ্চে একটি আলোকগৃহ আছে। এই আলোক প্রায় ১৭ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হয়। অক্ষা° ২৪° ৪৭' ১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ১' পূঃ। মনোরা

ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিদিগের বিভাগালয় আছে। এতদ্ভিন্ন গির্জা, পুস্তকালয় ও বিলিয়ার্ড খেলিবার স্থান আছে। প্রতি বর্ষে কোন একজন শ্রীরের সম্মানার্থ এইখানে মেলা হইয়া থাকে। এই পাহাড় অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। মনোরা বন্দরের জেটী হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে, রেলওয়ে লাইনের দক্ষিণদিকে একটা দ্বীপ আছে। উক্ত দ্বীপে জলবায়ুনিরূপক একটি মানমন্দির রহিয়াছে।

মনোরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর থানা-জেলার অন্তঃপাতী একটি বন্দর। অক্ষা° ১৯° ১২' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৫০' পূঃ। এই নগরে পৃষ্ঠগীর্জাদিগের একটি প্রাচীন গির্জা আছে। ষোড়বন্দর বাণিজ্যবিভাগের ৬টা বন্দরের মধ্যে মনোরি একটি।

মনোলায় (পুং) মনসঃ লয়ঃ। মনের লয়, মনের নাশ। প্রকৃতি-পুরুষের সাক্ষাৎকার হইলে মন অহঙ্কারে লীন হয়। মনোলি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলাগামজেলার একটি নগর। হাবেলী হইতে ৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬° ১৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৪০' পূঃ। এই স্থান পশ্চিমী-সুতার কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। এইখানে জেনারল্ ওয়েলস্ লি (অনন্তর ডিউক) বিখ্যাত দ্রুত বিন্দেব বাগকে মহিসুর হইতে সুদীর্ঘ পথ অত্যাশ্রয়পূর্বক ধৃত করেন। এই নগরে পঞ্চলিঙ্গদেবের ৮ টি মন্দির আছে।

মনোলৌল্য (স্ত্রী) ধামধেনালী।

মনোবতী (স্ত্রী) ১ অপ্সরোভেদ। ২ চিত্রাঙ্গদ বিজ্ঞাধরের কন্যা। ৩ অসুরপতি সুরমায়ের কন্যা। ৪ মেরুশেখরস্থ পুরভেদ।

মনোবাত (ত্রি) মনের বেগ, চিত্তের বেগ। “প্রণো বন্ধমানা মনোবাতা” (ঋক্ ৩।৩৮।২) “মনোবাতা মনোবেগা” (সায়ণ)

মনোবিকার (পুং) মনের বিকৃতি।

মনোবিদ (পুং) মনোজ্ঞ, যাহারা মনোভাব জানিতে পারে।

মনোবিনয়ন (স্ত্রী) মনঃশিক্ষা।

মনোবিরুদ্ধ (ত্রি) মনে বাহ্য ধারণা করা যায় না। (পুং) ২ দৈবপুরুষগণভেদ।

মনোবৃত্তি (স্ত্রী) মনসঃ বৃত্তিঃ। মনের ব্যাপার, মনের কাণ্ড।

“অহো চেষ্টাপ্রতিক্রিপিকা কামিনো মনোবৃত্তিঃ” (শকুন্তলা)

মনোবেদশিরস্ (স্ত্রী) মস্তকবিশেষ।

“সুদেবা ইতি চৈকেন দেয়া গাবশ্চ দক্ষিণাঃ।

জপেচ্ছাকুনস্কৃতং বা মনোবেদশিরাসি চ ॥” (বৃহৎসং ৪।৮।৭৩)

মৃগ ও পক্ষীদিগের পীড়া উপস্থিত হইলে ‘শাকুনস্কৃত’ বা

‘মনোবেদশিরাসি’ মস্তক জপ করিবে।

মনোহত (ত্রি) মনসা মনসি বা হতঃ। প্রতিহত। (অমর)

মনোহর (পুং) ১ অধি। ২ অহরভেদ।

মনোহর (ত্রি) হরতীতি ক্-অচ, মনসো হরঃ। মনোজ্ঞ।

“জীগাং সুখোত্তমক্লুরং বিপ্লবার্থং মনোহরম্।”

(মহাসংহিতা ২।৩৩)

(পুং) ২ কুলধ্বজ। (স্ত্রী) ৩ সুবর্ণ। (রাজনি) ৪ কর্ণ-  
মাসের ৩য় দিন।

মনোহর, ১ পদ্যাবলীধৃত জনৈক কবি। ২ ব্রহ্মজীবনির্ণয়-  
গ্রণেতা।

মনোহরকৃষ্ণ, পিজলচ্ছন্দঃের টীকাকর্তা।

মনোহরর্থী, জনৈক ইতিহাসরচয়িতা।

মনোহরগড়, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ পলিটিকাল  
এজেন্টের অধীন সাবস্তবাক্তী রাজ্যের অন্তর্গত একটি গিরি-  
দুর্গ। অক্ষা° ১৬°২' ৪৫" উ° এবং দ্রাঘি° ৭৪°১' পূঃ। সাবস্ত-  
বাক্তী নগর হইতে ১৪ চৌক মাইল উত্তরপূর্বে রাংনা পার্বত্য-  
পথের দক্ষিণে অবস্থিত। মনোহর-দুর্গ নিম্নে প্রস্তরে নিম্নিত  
এবং প্রায় ২৫০০ ফিট উচ্চ। প্রবাদ, পাণ্ডবদিগের  
রাজ্যকালে এই দুর্গ নির্মিত হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ-  
সময়ে এই দুর্গের সৈন্তেরা কোলাপুর-বিদ্রোহীদের পক্ষ অব-  
লম্বন করিয়াছিল। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের প্রথমেই জেনারেল ডেলা-  
মটী এই দুর্গ অধিকার করেন। উক্ত বিদ্রোহদমন হইলে  
মনোহরগড় এবং ইহার রাজস্ব সাবস্তবাক্তী রাজ্যের অন্তর্গত হয়।

মনোহরদাস, জনৈক হিন্দু রাজা (১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ)। ইনি  
দানমনোহরপ্রণেতা সদাশিবের প্রতিপালক ছিলেন।

মনোহরদাস, জনৈক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। ইনি কোন্ কুলে  
জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পিতা-মাতার নাম কি, তাহার  
কিছুই জানিবার উপায় নাই। পদকর্তা জ্ঞানদাস তাহার  
বন্ধু ছিলেন, সুতরাং তিনি জ্ঞানদাসের সম-সাময়িক  
কবি। চরিতামৃত নিত্যানন্দ-শাখার মনোহর দাসের  
নামোল্লেখ আছে, যথা—

“শঙ্কর মুকুল জ্ঞানদাস মনোহর।”

অতএব মনোহর “নিত্যানন্দ পরিবার”ভুক্ত প্রাচীনভক্ত।  
সারাবলিগ্রন্থে লিখিত আছে, তাঁহার আর একটি নাম ছিল  
চৈতন্ত এবং লোকে তাঁহাকে আউলিয়া বলিত। যথা—

“আদি নাম মনোহর চৈতন্য নাম শেষ।

আউলিয়া হইয়া বুলে স্বদেশ বিদেশ॥”

মনোহর নিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম পত্নী জাহ্নবা দেবীর  
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মনোহর কৃষ্ণপ্রণে পান্ধেলর স্তায় ভ্রমণ  
করিতেন বলিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে “আউলিয়া মনোহর”  
বলিত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে—

“মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য মনোহরদাস।

আউলিয়া বলি তাকে সর্বত্র প্রকাশ॥”

এই মনোহর দাস একদা বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে,  
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করেন,  
তাহাতে মনোহর উত্তর করেন।

“বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বারকোশ।

রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥

আচার্যের সেবক রাজা শ্রীবীরহাধির।” ইত্যাদি।

ইহাতে জানা যাঁতেছে যে, বিষ্ণুপুরের নিকট কোন এক  
গ্রামে তাহার বাস ছিল।

মনোহর দাস দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন, খেতরীর প্রসিদ্ধ  
মহোৎসবে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। নরোত্তমবিলাসে  
ঐ মহোৎসববিবরণে তাহার নাম পাওয়া যায়। কথিত আছে,  
১৬৫৭ শকের ২৯এ পৌষ তারিখে হুগলীর বদনগঞ্জ নামক  
স্থানে মনোহর দাসের মৃত্যু হয়। এই গ্রামের কুপারাম সিংহ  
মহাশয়কে তিনি অতি স্নেহ করিতেন বলিয়া শেষাবস্থায়  
প্রায়ই ঐ স্থানে থাকিতেন।

তাঁহার কবিত্বের প্রভূতপরিচয় পদকল্পতরু প্রভৃতিতে উদ্ধৃত  
পদ্যাবলী হইতে উপলব্ধি করা যায়।

মনোহরদাস, অম্বরগবল্লীনামক একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থপ্রণেতা।  
উক্ত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পরারচ্ছন্দে ১৬১৮ শকে রচিত হয়।  
কাটোয়ার নিকটবর্তী “বেগুনকোলা” গ্রামে তাহার বাস ছিল।

শ্রীনিবাস আচার্যের শ্যালক রামচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য  
রামশরণ চট্টরাজ; মনোহর দাস এই রামশরণের নিকট  
মন্ত্র গ্রহণ করেন। মনোহর দাস তাঁহার গুরুদত্ত নাম। যথা—

“তিহো মোর গুরু তাঁর পদপ্রাপ্তি আশ।

তাঁর দত্ত নাম মোর মনোহর দাস॥

কাটোঙা নিকট বাইগুনকোলা পাটবাড়ী।

সেখানে বসতি আর ছাড়ি সর্ব বাড়ী॥” (অম্বরগবল্লী)

মনোহর রায়, যশোর জেলার অন্তঃপাতী চাঁচড়ার উত্তর-  
রাষ্ট্রীয় কার্যস্থবংশীর জমিদারগণের পূর্বপুরুষ। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে  
মনোহর রায় যুসুফপুর (যশোর জমিদারী) প্রথম প্রাপ্ত  
হন বলিয়া কথিত। এই জমিদারীতে ২৩টা পরগণা ও  
রাজস্ব ১৮৭৭৫৪ টাকা আয় নির্দিষ্ট ছিল।

মনোহরবীরেশ্বর (পুং) একজন প্রসিদ্ধ আচার্য।

মনোহর শর্মা, একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ও টীকাকার।

ইনি রাজা মাণিক্যমল্লের আদেশে সুবোধিনী নামী প্রত্নবোধ-  
টীকা ও সুভাষিনী নামী কীরাতাজ্জুনীয় টীকা রচনা করেন।

মনোহর শাহী, মুর্শিদাবাদ চাকলায় অন্তর্গত একটি পরগণা।

মনোহর সিংহ, গোড়দেশীয় একজন রাজা। রাজা হৃদয়ে  
যে তাম্রফলক দান করেন, তাহাতে ইহার নাম দৃষ্ট হয়।

মনোহরা (স্ত্রী) মনোহর-টাপ্। ১ মনোহারিণী। ২ জাতী।

• স্বর্ধ্বখী। ৪ ধরনামক বস্তুর পত্নী ও শিশিরের মাতা।

“মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোহর্থ বরুণস্তথা।” (বিষ্ণুপু ১।১৫।১১৪)

৫ অঙ্গরোষিণেব। (ভারত ১৩।১৯।৪৫)

মনোহর্তৃ (ত্রি) মনো হরতীতি হৃ-তৃচ্। মনোহরণকর্তা,  
মনোহারক, বিনি মন হরণ করেন।

“বাসনং তেহপমেয়ামি ত্রিলোক্যাং যদি ভাব্যতে।

তমানেষ্যে বয়ং যন্তে মনোহর্তা তমাদিশ ॥”

(ভাগবত ১০।৬২ অ০)

মনোহারিন্ (ত্রি) মনো হরতীতি হৃ-তৃচ্। মনোহর।

(অমরটীকার স্বামী)

“গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্ছ্যুতম্।

ত্রিপুরারিশিরাচারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥”

(বায়ীকিকৃত গঙ্গাস্তব)

মনোহারী (স্ত্রী) ১ অবিখ্যাতী নারী। ২ মনোহরকারিণী।

মনোহ্লাদ (পুং) মনসঃ হ্লাদঃ। মনের আমোদ, মনস্তৃষ্টি।

মনোহ্লাদিন্ (ত্রি) হৃদয়, মনের সুখকর।

মনোহ্রা (স্ত্রী) মনঃ হ্রয়তি আক্লয়তীবেতি হ্রে (আতো

হ্রস্পসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক, টাপ্। মনঃশিলা।

“মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহ্রা নাগজিহ্বিকা ॥” (ভাবপ্র০)

মন্তব্য (ত্রি) মন্যতে ইতি মন-তব্য। মাননীয়, ভাব্য।

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”

মন্তি (স্ত্রী) মন-ক্টিচ্ (নক্টিচি দীর্ঘশ্চ। পা ৬।৪।৩৯) ইতি  
বিশেষত্বজ্ঞানং ন অচুনাংসিকলোপঃ। মতি।

মস্ত (পুং) মন্যতে ইতি মন (কমি মনি জনি গাভারাহিত্যশ্চ।

উণ্ ১।৭৬) ইতি তুন্। ১ অপরাধ।

“সতীত্রটৈতত্ত্রিমমস্ত মস্তমস্তবরং বজ্রিণি মার্জিতান্মি।”

(নৈষধচরিত ৬।১১০) ২ মনুষ্য। ৩ প্রজাপতি (মেদিনী)

• আক্ষিকতবে দ্বাত্রিংশৎ মস্ত অর্থৎ অপরাধের বিষয়  
এইরূপ লিখিত আছে,—

ভগবত্ত্বকদিগের ক্ষত্রিয়ের সিদ্ধান ভোজন, অনিষিদ্ধাদিনে  
দস্তধাবন না করিয়া অথবা মৈথুনের পর স্নান না করিয়া বিষ্ণু-  
গৃহে গমন, শব্দস্পর্শের পর স্নান না করিয়া রক্তশলা ক্রীসংস্পর্শ,  
স্নান না করিয়া বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ, শব্দস্পর্শের পর স্নান  
না করিয়া বিষ্ণুর নিকটে অবস্থান, বিষ্ণুকে স্পর্শ করিয়া  
বাতকন্ম, বিষ্ণুর কাথ্য করিতে করিতে পুরীষত্যাগ,  
বৈষ্ণবশাস্ত্রের নিন্দা করিয়া শাস্ত্রাস্ত্রের প্রশংসা, অত্যন্ত

মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কৰ্ম্মাচরণ, অবিধিপূর্বক  
আচমন করিয়া বিষ্ণুর মন্দিরের নিকট গমন, পাপাচরণ করিয়া  
বিষ্ণুর উপসর্পণ, ক্রুদ্ধাবস্থায় বিষ্ণুস্পর্শ, নিষিদ্ধপুষ্প দ্বারা বিষ্ণু-  
পূজা, রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন, অন্ধকারে  
দীপ ব্যতীত বিষ্ণুস্পর্শ, ক্রুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কৰ্ম্মা-  
চরণ, কাকস্পৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কৰ্ম্মাচরণ, বিষ্ণুকে  
কুক্কুরোচ্ছিষ্ট দান, বরাহমাংস ভোজন করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ,  
জালপাদ ও শরারিমাংস ভোজন করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ,  
প্রদীপ স্পর্শ করার পর হস্ত প্রকালন না করিয়া বিষ্ণুস্পর্শ ও  
তাহার কৰ্ম্মাচরণ, স্নান গমনের পর স্নান না করিয়া বিষ্ণুর  
উপসর্পণ, পিণ্ড্যক ভোজন করিয়া বিষ্ণুর সেবা, বিষ্ণুকে বরাহ-  
মাংস নিবেদন, মস্ত স্পর্শ বা পান করিয়া বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ,  
অপরের বস্ত্র বা অশুচি বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কৰ্ম্মাচরণ,  
বিষ্ণুকে নবান্ন নিবেদন না করিয়া নবান্নভোজন, বিষ্ণুকে  
গন্ধপুষ্প না দিয়া ধূপদীপদান, জুতা বা খড়ম পায় দিয়া  
বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ, ভেরীশব্দ ব্যতীত বিষ্ণুর প্রবেদন, অজীর্ণ-  
বতায় বিষ্ণুগৃহপ্রবেশ, এই দ্বাত্রিংশৎ মস্ত।

(আক্ষিকতবে চতুর্থ ধার্মিক কৃত্য।

বরাহপুরাণেও এই দ্বাত্রিংশৎ মস্তর বিষয় বর্ণিত আছে।

বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না।

৪ জাতা। “য দ্বিশিরে ভুবনস্ত প্রচেতসো বিশ্বস্ত স্বাতুর্জগ-

তশ্চ মন্তবঃ” (ঋক্ ১০।৬৩।৮) ‘মন্তবঃ সর্বস্তু বেদিতারঃ’ (সায়ণ)

৫ মদনীয়। “মুবোরচ্ছিদ্রা মন্তবোহসর্গাঃ” (ঋক্ ১।১৫২।১)

‘মন্তবঃ মদনীয়ঃ’ (সায়ণ)

মন্তমৎ (ত্রি) জ্ঞানবৃত্ত, জ্ঞানী। “আতবে দস্ত মন্তমঃ

পুষ্পবো বৃণীমহে” (ঋক্ ১।৪২।৫) ‘মন্তমঃ মন জ্ঞানে কমি-

মনিজনাভ্যাদিনা। উণ্ ১।৭৩ ভাবে তুপ্রত্যয়ঃ, মন্তজ্ঞানং

অস্তান্তীতি মন্তমান্ তৎসংবুদ্ধৌ’ (সায়ণ)

মন্তু (ত্রি) মন্ততে জ্ঞানাতীতি মন (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্

২।৯৫) ইতি তৃচ্। ১ বিদ্বান্। (উজ্জল) ২ মননকর্তা।

“স হি কর্তা মন্তা বেদিতা বোদ্ধা দ্রষ্টা ধাতা বিশ্বকৰ্ম্মা

বিশ্বরূপঃ” (চরক শারীরস্থ্য ০ ৪ অ০)

মন্তু (পুং) মন্তাতে গুপ্তং পরিভাষ্যতে ইতি মন্তি-গুপ্তভাষণে

ঘঞ্, যধা মন্তরতে গুপ্তং ভাষতে অচ্। ১ বেদভেদ, মন্ত-

স্বরূপভাগ, বেদ মন্ত ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বিভক্ত।

“প্রনুং ব্রহ্মগম্পতিমন্তং বদত্বাকথ্যং” (ঋক্ ১।৪০।৫)

২ তন্ত্রাত্মক মন্তভাগ।

“নিষেকাদিশ্রাশানান্তো মন্তৈষ্যন্তোদিতো বিধিঃ।

তন্ত শাস্ত্রোদ্ধিকারোহস্মিন্ জ্ঞেয়ো নাত্তন্ত কন্তুচিং ॥” (মহু২।১৬)

৩ ঔপনিষদ, গোপনে কৰ্তব্যাবধারণ, চলিত মন্ত্রণা, পরামর্শ।  
বিকৃতাদ্ প্রভৃতি ব্যক্তির নিকট মন্ত্রণা গ্রহণ করিতে নাই।  
“ব্যঙ্গাদহীনা বধিরাঃ কুবোনিবু রতান্চ বে।  
তেবাং মন্তো ন স্মৃদঃ প্রোক্তঃ কবিভিরেব চ ॥  
কামুকানাং জড়ানাঞ্চ স্ত্রীজিতানাং তথৈব চ।  
ঋতুরস্ত গৃহে নিত্যং জামাতা কর্ণকারকঃ।  
তস্তাপি ন ভবেদ্রঃ কার্যাসিকৌ কদাচন ॥”

( জৈমিনিভারত অষ্টমোপসর্গ ২ অধ্যায় )

বিকৃতাদ্, অঙ্গহীন, বধির, কুবোনিতে রত, কামুক, জড়, স্ত্রী ও ঋতুরগৃহে কর্ণকারক জামাতা এই সকল ব্যক্তির মন্ত্রণার কোন কার্য সিদ্ধ হয় না। [ বিশেষ বিবরণ মন্ত্রণা শব্দে দেখ। ] ৪ দেবদ্বির সাধন। মন্ত্র দ্বারাই দেবদ্বির আরাধনা করা হইয়া থাকে।

মীমাংসাদর্শন-প্রতিপাদিত মন্ত্রাত্মকই দেবতা। দেবতাই মন্ত্রস্বরূপ। মীমাংসার লিখিত আছে, দেবগণ শরীরী বা সচে-  
তন নহেন। যে দেবতার যে মন্ত্র বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই দেবতা সেই মন্ত্রস্বরূপ। মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতার সত্তা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। বরং তদ্বিরোধী প্রমাণই বহুতর আছে। যদি মন্ত্র ভিন্ন একজন শরীরী দেবতা থাকেন, এবং সেই দেবতার পূজা সময়ে তিনি আবাহনাদি দ্বারা করুণাপূর্বক ঘটে কিংবা প্রতিমাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সে ঘটে বা সে মুণ্ডর প্রতিমাদিতে তাঁহার সমাবেশ সম্ভবে না। কারণ, ইন্দ্রের পূজার তাহাকে ঘটে বা মুণ্ডর প্রতিমায় আবাহন করিলে ঐরাবতের সহিত তিনি যদি তাহাতে প্রবেশ করেন, তবে ঐ ঘট বা মুণ্ডপ্রতিমা ঐরা-  
বতের সহিত ইন্দ্রদেবের ভারবহনে অশক্ত হইয়া নিঃসন্দেহে চূর্ণ হইয়া যায়। আর কি প্রকারেই বা অন্ন পরিমিত ঘটে তাদৃশ বৃহদাকার ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের অধিষ্ঠান সম্ভবে? এই সকল দোষ পরিহারের জন্য দেবতাকে মন্ত্রাত্মক বলিলে আর কোন গোল থাকে না।

এইজন্য মীমাংসা-দর্শনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, মন্ত্রই দেবতা, যে দেবতার পূজাদি করিতে হয়, মন্ত্র পাঠ করিয়া করিলেই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন্ত্র ভিন্ন পূজাদি হইবে না। দেবতা-  
দিগের স্ততিবাচক শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে মন্ত্র হইবে, তাহা নহে। কারণ বেদে প্রত্যেক দেবতার বিভিন্ন মন্ত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই সেই মন্ত্রই ততদ্ দেবতার স্বরূপবোধক। ঐ সকল নির্দিষ্ট মন্ত্রে পূজাদি করিতে হইবে। ( মীমাংসাদর্শন )

মন্ত্রশব্দের ব্যুৎপত্তি—

‘মননাং ত্রায়তে স্বান্ তন্মাত্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।’ (আহিকতত্ত্ব)

মনন হইতে ত্রায় করে, এইজন্য মন্ত্র নামে অভিহিত হয়।  
যাহারা মন্ত্রদীক্ষিত নহে, শাস্ত্রে তাহাদের নিন্দা আছে।

“অদীক্ষিতানাং মর্ত্যানাং দোষঃ শূণ্য বরাননে।

অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্ত জলং মূত্রসমং স্মৃতম্।

তৎকৃতং তস্ত বা শ্রাদ্ধং সর্গং বাতি হৃদোগতিম্ ॥” (মৎস্কসূ.)

যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রদীক্ষিত নহে, তাহাদের অন্ন বিষ্ঠার  
জায়, জল মূত্রতুল্য এবং তাহাদের কৃত সমুদয় কার্যই নিফল।

জীব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর সংসারদুঃখ ভোগ করি-  
তেছে, জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, ইহা জীবের অবশ-  
জ্ঞানী, ইহার হাত হইতে নিকৃতিলাভের উপায় নাই।  
হৃদয়দর্শী ঋষিগণ জীবের এই ভবদুঃখমোচনের জন্য ভগবদ্ভূ-  
তপাসনার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। একমাত্র ভগবদ্বারা-  
ধনা দ্বারাই জীবের সকল দুঃখ নিবৃত্তি হয়।

বেদান্তাদি নানা শাস্ত্রে এই সকল উপাসনাপ্রণালী প্রক-  
টিত হইয়াছে। এই উপাসনা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-  
রূপ। কিন্তু শ্রবণ-মননাদি দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে অতীব  
দুঃসাধ্য, এইজন্য তাহাদিগের পক্ষে সঙ্কল্যোপাসনাই একান্ত  
বিধেয়।

দুর্বল্যাদিকারীর পক্ষে সঙ্কল্যোপাসনা ব্যতীত আর কিছু  
মাত্র দুঃখনিবৃত্তির উপায় নাই। এইজন্য সঙ্কল্যোপাসনা শাস্ত্রে  
প্রশংসিত হইয়াছে। এই সঙ্কল্যোপাসনা মন্ত্রসাধ্য অর্থাৎ  
মন্ত্র দ্বারাই এই উপাসনা হইয়া থাকে, এইজন্য শ্রুতি, স্মৃতি,  
পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে মন্ত্র সকল নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল  
মন্ত্রে দেবতাদিগের পূজা জপ প্রভৃতির অমুষ্ঠান করিলে  
জীবের চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে অনায়াসেই জীব  
সংসারসাগর পার হইতে সমর্থ হইয়া থাকে।

অতএব মন্ত্রই সাধারণ মানবের উদ্ধারের উপায়। বৈদ্বি-  
কোপাসনা এক্ষণ বিলুপ্তপ্রায়। কাজেই বৈদিক মন্ত্রের  
হৃদিশাও তদনুসরণ। অনেক বৈদিক মন্ত্র যথাযথ উচ্চারিতই  
হয় না, তাহার অর্থবোধ ত দূরের কথা।

এক্ষণে তাত্ত্বিক ও পৌরাণিক উপাসনাপ্রণালী অমুষ্ঠিত  
হইয়া থাকে। এইজন্য তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাদির বিষয় একটু বিশেষ-  
ভাবে আলোচনা করা হইল।

“অথ বস্তপি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোপপুরাণসংহিতাদাবধ-  
প্রকাণ্ডো বিহিতানেকবিত্তো বিবিধোপাসনাকাণ্ডো বিত্ততে  
তথাপি কলাবাপ্তফলদায়কত্বাৎ স্মরণোপায়ত্বাচ্চ, আগমোক্ত-  
বিধিনা উপাসনং নিরূপ্যতে।

মহানির্বাণতন্ত্রে বিদ্যায়োক্তাসে—

‘বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নান্তি গতিঃ প্রিয়ে।

ঐতিশ্রুতিপুরাণাদৌ মঠৈবোক্তং পুরা শিবে ॥  
 আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজ্ঞেণ জুধীঃ ।  
 কলাবাগমবৃক্ষজ্য বোহিত্যমার্গে প্রবর্ততে ।  
 ন তন্ত্ৰ গতিরন্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।  
 কলৌ তন্ত্ৰোদিতা মন্ত্ৰাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ ।  
 শস্ত্ৰাঃ কশ্মলু সন্দেশু ভ্রপবজ্রক্রিয়াদযু ॥  
 নিবীৰ্যাঃ শ্রোতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব ।  
 সত্যাদৌ সকলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব ॥  
 পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সন্দেশ্মিয়সমমিতাঃ ।  
 অমূরণ্ভাঃ কার্যেযু বক্র্যাস্ত্রোপসঙ্গমো যথা ॥  
 ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্ত্রাং শ্রম এব হি কেবলম্ ।  
 কলাবন্ত্ৰোদিতৈর্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ ।  
 ভূষিতো জারুবীণীয়ে কুপং খনতি হৃষ্মতিঃ ॥  
 নাভ্যঃ পদ্মা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে ।  
 যথা তন্ত্ৰোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ ॥”

( হরতত্ত্বদীপ্তিত্ত্বত মহানির্দীপ্ততত্ত্ব )

ঐতি, শ্রুতি, পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতা প্রভৃতিতে বিবিধ উপাসনাপ্রকৃতি বিহিত হইয়াছে, তথাচ একমাত্র আগমোক্ত উপাসনাই আশু ফলদায়ক ও সুগম। এইজন্ত সকলেরই এই তন্ত্ৰোক্তপ্রণালী অল্পসংখ্যে উপাসনা করা কর্তব্য। বিশেষতঃ কালকালে আগমোক্ত বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান নাই। যদি কোন ব্যক্তি আগমবিহিত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য মার্গে প্রবর্তিত হন, তাহা হইলে তাহার কাৰ্য্যসিদ্ধি হয় না। কালতে তন্ত্ৰোক্ত মন্ত্র সকলই সিদ্ধ ও আশুফলপ্রদ। বৈদিক মন্ত্র সকল বিষহীন সর্পের স্ত্রায় নিরীক্ষ্য। সত্যাদি যুগে ঐ সকল বৈদিক মন্ত্রই সফল ছিল, এখন ঐ সকল মন্ত্র মৃত। অতএব মৃত মন্ত্র দ্বারা যে সকল কাৰ্য্যমুত্তান করা যায়, তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। একমাত্র আগমোক্ত মন্ত্রই ইহ ও পরলোকে সুখপ্রাপ্তি ও মোক্ষের কারণ।

বৈদিকমন্ত্র নিষ্ফল কি তাত্ত্বিক মন্ত্র নিষ্ফল এই বিষয়ের মামাংসা ভাত দুইই, তবে এই পথান্ত বলা যাঠিতে পারে, বৈদিকোপাসনা বিশেষ কষ্টসাধ্য, তাত্ত্বিক উপাসনা সুখসাধ্য এবং পুণ্ড্র ও বলিগ্রাহ্য, অবিকারিতভেদে এই সকল উপাসনা-প্রণালী অল্পসংখ্যে হওয়া থাকে। ছন্দল অবিকারীর পক্ষে তাত্ত্বিক উপাসনা সুগম। ঐক্ষণ যেরূপ উপনীত না হইলে কোন পুজাদির অবিকারী হয় না, তজ্জপ উপযুক্ত গুরু নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করিলে মানব তন্ত্ৰোক্ত কোন কাৰ্য্যই করিতে পারে না। ঐক্ষণাদি বসন্ত উপনীত হইতে পারে, কিন্তু তন্ত্ৰোক্ত মন্ত্রগ্রহণে চারিবর্ণের সমান আধিকার।

উপযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। গুরু কি প্রকার গুণসম্পন্ন হইলে তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

“চতুর্থাং বর্ণানাং মন্ত্রদানে ঐক্ষণ এবাধিকারী, তন্ত্ৰং বিশ্বসারতন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে—

জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শাস্ত্রমানসঃ ।

পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সৰ্বকল্মষপারায়ণঃ ।

আশ্রমো দেশস্থায়ী চ গুরুরেব বিদীয়তে ॥”(হরতত্ত্বদীপ্তিত্ত্ব)

ব্রাহ্মণ চারি বর্ণকেই মন্ত্র দিবে। জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী,

প্রশান্তচিত্ত, ও পিতৃমাতৃহিতে রত এই সকল গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ গুরু হইবেন।

তন্ত্রদানে লিখিত আছে—

“শাস্ত্রো দাস্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্ ।

শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচিদীক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্ ॥

আশ্রমো ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ ।

নিগ্রহাহুগ্রহে শক্তো গুরুকর্তব্যভিধীয়তে ॥” ( তন্ত্রসার )

শাস্ত্র অর্থাৎ প্রকৃন্দনবানতাদিরূপবিষয়ে উৎকট অমুরাগ রহিত ও শমাদগুণযুক্ত, দাস্ত, কুলীন অর্থাৎ কোণাচাররত, বিনয়শীল, অশ্রমও, পাবদ্রবেশধারী, স্ববেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি কাৰ্য্যনিরত, সুপ্রতিষ্ঠ, আশ্রমো অর্থাৎ গৃহস্থাদি-আশ্রমে স্থিত, উদাসীন নহেন, ঈশ্বরপরায়ণ, তৎপর, তন্ত্র ও মন্ত্র-বিশারদ, নিগ্রহাহুগ্রহে শক্ত, জ্ঞাতানন্দায় সমজ্ঞান হত্যাদি গুণশালী ব্যক্তিই প্রকৃত গুরুবাচ্য। আরও লিখিত আছে, যিনি মন্ত্র প্রদান করিয়া উদ্ধার করিতে পারেন এবং অভিপায় দ্বারা বিনাশ করিতে সমর্থ হন, এইরূপ ঐক্ষণশ্রেষ্ঠ, সত্যবাদী গৃহস্থ ব্যক্তিকেই গুরু কার্য্যে।

যদি কোন ব্যক্তির গুরু স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরুকাৰ্য্যে বরণ করিলেই তাহার কাৰ্য্যের সফলতা হয়। পুণ্ড্রোক্ত রূপ গুরুর নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করা বিধেয়।

যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য, মত্ৰক অক্ষর ও দেবপ্রতি-মূর্তিকে শিলাজ্ঞানে গুরু প্রভৃতির সহিত মনুষ্যাদিবৎ ব্যবহার করে, তাহার ঘোরতর নরক হয়। পিতা ও মাতা জন্মের কারণ, অতএব যত্নপূর্বক তাহাদের সেবা করা আবশ্যক। কিন্তু মন্ত্রদাতা গুরু ধন্যাদন্যপণপ্রদায়ক, অতএব তাহাদিগকে দেবতাজ্ঞানে অর্চনা করিবে। গুরু পিতামাতা ও অভীষ্ট দেবতাস্বরূপ এবং একমাত্র গুরুই আন্তরে নিস্তার-কারণ। বাহার প্রতি মহাদেব কৃষ্ট হন, তাহাকে গুরুদেব জ্ঞান



করিতে পারেন, কিন্তু যাহার প্রতি গুরু কুপিত হন, তাহার নিস্তারকর্তী কেহ নাই। বাক্য, মন, শরীর ও কাণ্য দ্বারা সর্বদা গুরুর হিতাহুষ্ঠান করিবে। পিতা শরীর উৎপাদন করেন বটে, কিন্তু গুরু জ্ঞানদাতা, অতএব হুঃখ-সাগরস্বরূপ এই ভবসংসারে গুরু ভিন্ন আর পরিত্রাতা কেহ নাই। যাহার বক্তৃ হইতে বর্ণ ব্রহ্মময় শরীর বিনির্গত হয়, তিনি অবশ্যই নরকার্ণব হইতে উদ্ধার করেন।

গৃহীত মন্ত্র পরিত্যাগ করিলে মৃত্যু হয় এবং গুরু পরিত্যাগ করিলে দরিদ্রতা এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় পরিত্যাগে ঘোরতর নরক হয়। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট অশ্রু দেবতার অর্চনা করে, তাহার নরকে গতি ও পুজাদি নিষ্ফল হয়।\*

নির্দিত গুরুর লক্ষণ—

“স্বিত্রী চৈব গলংকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ।

কুনথঃ শ্রাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতোহধিকান্দকঃ॥

হীনান্দঃ কপটা রোগী বহ্নাশী বহুজল্লকঃ।

এতৈর্দোষৈ বিমুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥”

অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ কদম্ব্যং কিতবং তথা।

ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকম্॥

জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জয়েন্নতিমান্ সদা।

সদা মংসরসংযুক্তং গুরুং তস্ত্বেণ বর্জয়েৎ॥” (তন্ত্রসাব)

ধবল ও কুষ্ঠরোগী, বামন, কুনথী, শ্রাবদন্ত, স্ত্রীবীভূত, অধিকান্দ, হীনান্দ, কপটাচারী, বহুজল্লক, অভিশাপগ্রস্ত,

পুত্রহীন, কুংসিতাকার, ধূর্ত, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকাণ্য-রহিত, শঠ, গুরুনিন্দক, জলদোষী, রক্তবিকারী ও সদা গলিত এই সকল দোষযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই।

গুরু শিষ্যকে প্রথমে যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া মন্ত্র প্রদান করিবেন। শিষ্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে মন্ত্র প্রদান করা গুরুর উচিত নহে।

শিষ্যালক্ষণ—

“শাস্ত্রো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।

সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যাতঃ।

এবমাদিগুণৈযুক্তঃ। শিষ্যো ভবতি নাতথা॥” ইত্যাদি (তন্ত্রসার)

শর্মাধি-গুণযুক্ত, বিনয়ী, বিশুদ্ধস্বভাব, শ্রদ্ধাবান্, ধৈর্য-শীল, সৎকর্মসমর্থ, সৎশিক্ষণী, আভ্যন্তরীণ ও জিতে-দ্রিয় এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তি শিষ্যের উপযুক্ত অর্থাৎ এইরূপ গুণযুক্ত ব্যক্তিকেই গুরু মন্ত্র প্রদান করিবেন।

পাপাত্মা, ক্রুরকর্মী, বঞ্চক, কপণ, অতি দরিদ্র, আচার-ভ্রষ্ট, মদ্রভ্রষ্ট, মদ্রবেশী, নিন্দক, মুখ, তাথবেশী, গুরুভক্তি-বিহীন, অলস, মাগনবেশী, অতিশয় কাতর, দাঁড়ক, দরিদ্র, রোগী, সদা অশান্ত চিত্ত, ক্রোধী, লোভপরতন্ত্র, হিংসা ও মাংসগ্ৰাসী, ককশভাষী, অন্যায় উপাঞ্জনেন ধনবান্, পা-দ্র্যরত, পণ্ডিতবেশী, পণ্ডিতাভিমাত্রী, সূচক, খল, বহুভোক্তা, দুষ্টচরিত্র ও নির্দিত ব্যক্তিকে গুরু কখন মন্ত্রপ্রদান করিবেন না। এই সকল দোষাবিশিষ্ট ব্যক্তি শিষ্যের অল্পযুক্ত।

গুরু বাহাকে মন্ত্র দিবেন, প্রথমে তাহাকে এক বৎসর কাল আপনার নিকট রাখিয়া তাহার দোষগুণ পরীক্ষা করি-বেন। শিষ্যের দোষগুণ পরীক্ষা না করিয়া গুরু তাহাকে মন্ত্র দিলে শিষ্যকৃত পাপ গুরুরই হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, মন্ত্রীর পাপ রাজ্যতে, স্ত্রীকৃত পাপ স্বায় ভর্তাতে এবং শিষ্যার্জিত পাপ গুরুরই সংক্রামিত হয়। অতএব গুরু শিষ্যের স্বভাবাদি না জানিয়া তাহাকে মন্ত্র দিবেন না। গুরুর নিকট গুণবান্ ব্রাহ্মণ এক বৎসর, ক্ষত্রিয় দুই বৎসর, বৈশ্য তিন বৎসর এবং শূদ্র চারি বৎসর থাকিবেন। শিষ্য এতরূপে গুরুর নিকট দার্ষিক্য থাকিলে গুরু তাহার দোষ গুণ সমগ্রই বুঝিতে পারিবেন, পরে তিন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মন্ত্র দিবেন।

“সদৃশঃ স্বাশ্রিতঃ শিষ্যঃ বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।

রাজ্ঞি চামাত্যজ্ঞো দোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্তারি॥

তথা শিষ্যার্জিতং গাপং গুরুঃ প্রাপ্যোতি নিশ্চতম্।

বর্ষেকেন ভবেদ্যোগ্যো বিপ্রো গুণসমমিতঃ।

\* “গুরো মাতৃবুদ্ধিস্ত ময়ে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।

প্রতিমাহ শিলাবুদ্ধিঃ কুরাণো নরকং ব্রজেৎ॥

জন্মহেতু হি পিতরো পুত্রন্যৌ প্রযত্নতঃ।

গুরুশিষ্যেতঃ পূজ্যো ধর্মাধর্মপ্রদর্শকঃ॥

গুরুঃ পিতা গুরুমাতা গুরুদেবো গুরুপতিঃ।

নিবে কণ্ঠে গুরুস্ত্রাতা গুরো রণ্টে ন কশ্চন॥

গুরোর্যেহিতং প্রকট্য বাৎসন্যকায়কশ্রুতিঃ।

অহিতাচরণাদেব বিষ্টায়াং জায়তে কৃমিঃ॥

শরীরদো পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ।

গুরোগুরুতরো নাস্তি সংসারে হুঃখসাগরে॥

যন্ত বক্তৃবিনির্জাতং বর্ণব্রহ্মময়ং বপুঃ।

ভারয়েন্নাত্র সন্দেহো নরকার্ণবতো ব্রহ্ম॥

মন্ত্রত্যাগান্তবেদ্যুতগুরুত্যাগাদিরিত্যত।

গুরুমন্ত্রপরিত্যাগো নরকং ব্রজেৎ॥

গুরো সন্নিহিতে যন্ত পূজয়েদম্ভ্যাবতঃ।

স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ॥

উৎপাদকব্রহ্মদাত্ত্রোগুরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।

তন্মাত্মস্তুতং নততং পিতুরপাধিকং গুরুম্॥

গুরুবদ গুরুপুত্রৈব গুরুবৎ তৎসুতাদিষু॥” ইত্যাদি (তন্ত্রসার)

বর্ষধ্বনেন রাজতো বৈশ্বস্ত বৎসরৈঃস্বিত্তিঃ ॥

চতুর্ভিবৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা ॥” (তন্ত্রসার)

ইহার মধ্যে একটু বিশেষ এই যে, স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র কোন নিয়ম নাই। অর্থাৎ গুরু যদি শিষ্যকে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত নিয়মামুসারে শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার আবশ্যক নাই।

“স্বপ্নে তু ন কালনিয়মঃ, স্বপ্নে তু নিয়মো ন হি।” (তন্ত্রসার)

মন্ত্র, দেবতা ও গুরু এই তিনের ভেদজ্ঞান করিতে নাই। কলিকালে তন্ত্রোক্ত বিধানক্রমে দেবতার আরাধনা করিবে, কারণ সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে শ্রুতোক্ত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত ও কলিকালে তন্ত্রোক্ত কার্য্যই বিহিত হইয়াছে। কলিযুগের ব্রাহ্মণগণ অপবিত্র ও শূদ্রাচারতৎপর, সুতরাং তন্ত্র ভিন্ন বেদাদি কার্য্যে তাঁহাদের সিদ্ধি নাই। এইজন্য গুরু তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করিবেন।

“আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবানু যজ্ঞেৎ সূধীঃ।

ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চাত্তবিধানতঃ ॥

কৃতে ঋতুত্ব মার্গঃ শ্রাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।

দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ ॥

অশুভাঃ শূদ্রকর্ম্মাণঃ ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

তেষামাগমমার্গেণ সিদ্ধির্ন শ্রোতবয়না ॥

মন্ত্রার্থা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।

তেষাং তিদ্দা ন কর্তব্য। যদিচ্ছেচ্ছু ভমান্বনঃ ॥” (তন্ত্রসার)

মন্ত্রগ্রহণে একটু বিশেষ এই, উদাসীন ব্যক্তি উদাসীনের নিকট, বনস্থ বনবাসীর নিকট, যতি যতির নিকট, গৃহস্থ গৃহস্থের নিকট ও বৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবে। গৃহস্থ কখন উদাসীন ও সন্ন্যাসী প্রভৃতির নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবেন না। আজকাল কেহ কেহ সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আরও একটু বিশেষ এই যে, শাক্তের নিকট শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব এই তিন জনই মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারিবেন।

“উদাসিনোহপ্যুদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনঃ।

যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তা গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী ॥

বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ।

শাক্তিকে ত্রিতরং বিভাদৌক্ষাষ্মিনী ন সংশয়ঃ ॥

গুরুরপি গৃহস্থ এব কুলার্গবে—

সর্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরচ্যতে।

কলত্রপুত্রবানু বিপ্রো দয়ালুঃ সর্বসম্মতঃ।

দৈবে পিত্রেহরিমিত্রে চ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ ॥” (তন্ত্রসার)

কল্পশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, স্রীপুত্রবানু, দয়ালু, ও সর্ব

প্রিয়, জ্ঞানবানু ব্রাহ্মণকে গুরু করিয়া তাঁহার নিকটই মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

পিতাদির নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই। বোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে,—পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর ও শত্রুপক্ষ-প্রিত এই সকল ব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, কারণ গণেশবিমবিগীতন্ত্রের বচনামুসারে যতি, পিতা, বনবাসী ও উদাসীন ইহাদিগের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে তাহাদের অকল্যাণ হয়। কল্পধামলে কথিত আছে,—পতি স্বীয় ভাৰ্য্যাকে; পিতা পুত্র ও কন্তাকে এবং ভ্রাতা সহোদরকে মন্ত্র দিবে ন। পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হন, তবেই তিনি পত্নীকে মন্ত্র দিবে ন। পিতাদির নিকট যে মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সিদ্ধমন্ত্র ভিন্ন অস্ত্র স্থলে বৃদ্ধিতে হইবে। পিতাদি যদি সিদ্ধমন্ত্র হন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে। যতি প্রভৃতির নিকট যদি সিদ্ধমন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনায়াসেই তাঁহাদিগের নিকট মন্ত্র লওয়া যাইতে পারে।

“পিতৃমন্ত্রং ন গৃহীয়াৎ তথা মাতামহস্ত চ।

সোদরস্ত কনিষ্ঠস্ত বৈরিপক্ষাপ্রিতস্ত চ ॥

তথাচ গণেশবিমবিগীতঃ—

যতেদীক্ষা পিতৃদীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।

বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা ॥

কল্পধামলে—

ন পত্নীং দীক্ষয়েত্ত্বা ন পিতা দীক্ষয়েৎ স্ত্রীতাম্।

ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ ॥

সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।

ইত্যাদি নিষেধবচনাদেভ্যো মন্ত্রং ন গৃহীয়াৎ,

ইদম্ভ সিক্তেতরবিষয়ং, সিদ্ধমন্ত্রে ন দুষ্যতীতি বচনাৎ,

যতেরপি দীক্ষোক্তা শক্তিজামলে—

“তীর্থাচারযুতো মন্ত্রী জ্ঞানবানু স্নসমাহিতঃ।

নিত্যনিষ্ঠো যতিঃ খ্যাতো গুরুঃ শ্রোত্বোক্তিকোহপি চ ॥

যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে।

তদৈব তাস্ত দীক্ষেত তাস্ত। গুরুবিচারণম্ ॥” (তন্ত্রসার)

সিদ্ধমন্ত্রাতিরিক্ত মন্ত্র যদি পিতাদির নিকট লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। দশ হাজার পায়তী জপ করিলে উহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

মন্ত্রগ্রহণে লিখিত আছে,—পিতার মন্ত্র নির্বীৰ্য্য, অর্থাৎ তাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া ঐ মন্ত্র অপাদি করিলে কোন ফল হয় না। আর একটু বিশেষ আছে যে, শৈব ও শাক্ত

মন্ত্রবিষয়ে কোন দোষ নাই। ইহা কোলদীক্ষাপর, অর্থাৎ কোলাচারবিহিত দীক্ষাতে পিতার নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। মন্ত্রবিবেচনার পিতা জ্ঞানী জ্যেষ্ঠপুত্রকে মন্ত্রপ্রদান করিতে পারেন। গঙ্গা, কাশী প্রভৃতি মহাতীর্থে এবং চন্দ্র-সূর্যগ্রহণকালে মন্ত্রগ্রহণে কোন দোষবিচার নাই।

“নির্বীৰ্য্যক পিতৃমন্ত্রং শৈবে শাক্তে ন দ্রব্যতি।

ইতি বচনং কৌলিকমন্ত্রদীক্ষাপর, অত্র হেতুঃ যোগিনী-তন্ত্রে,—শক্তাদিবিদ্যামধিকৃত্য দীক্ষানিবেশ্যং, বধা শাক্তে তারাদিবিদ্যায়ং মন্ত্রতন্ত্রে তথা প্রতিপাদন্যং, তথাচ নিজকুলভিলকায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় দদ্যাদিত্যাदि।”

“মন্ত্রোবিষয়া দাতব্যো জ্যেষ্ঠপুত্রায় ধীমতে।

মহাতীর্থে উপরাগে সতি সর্বত্র ন দোষঃ ॥” (তন্ত্রসার)

স্বপ্নলব্ধ ও জ্ঞীপ্রদত্ত মন্ত্র পুনর্বার সংস্কার করিলেই শুদ্ধ হয়। সাধ্বী, সদাচারতৎপর, গুরুভক্তা, জিতেজিয়া, সর্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা ও স্নানীলা, এই সকল গুণযুক্তা স্ত্রীর নিকটেও মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিধবা স্ত্রী উক্ত গুণ-শালিনী হইলেও তাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই। স্ত্রী-গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণে শুভ ফল হয়, বিশেষতঃ মাতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে অষ্টগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। যে স্থলে স্ত্রীগুরু নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বিধবাপর বৃত্তিতে হইবে, নচেৎ স্ত্রীমাত্রই মন্ত্রগ্রহণে নিষিদ্ধ নহে।

“স্বপ্নলব্ধং ত্রিমা দত্তং সংস্কারেণৈব শুধ্যতি।

সাধ্বী চৈব সদাচারী গুরুভক্তা জিতেজিয়া।

সর্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা স্নানীলা পূজনে রতা ॥

গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জিতা।

ত্রিমা দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতৃশাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥

বস্ত্তস্ত স্ত্রীপদং বিধবাপরং” (তন্ত্রসার)

স্বপ্নপূর্বক গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।—মন্ত্র গ্রহণ না করিলে জপ-পূজাদি সকলই বিফল হয়, অতএব প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। দীক্ষার মানবের দিব্য জ্ঞান জন্মে এবং পাপরাশি ক্ষয় হয়, ব্রহ্মচর্যাগাদি সকল আশ্রমেই দীক্ষার আবশ্যক, এই বিশ্বাসসার সমস্তই দীক্ষামূল, দীক্ষা ব্যতীত এই জগতের কোন কার্যই হয় না। জপ, তপস্বী প্রভৃতি সমস্ত কার্যই দীক্ষার উপর নির্ভর করে। মন্ত্রদীক্ষিত হইয়া যে কোন আশ্রমেই থাকুন না কেন, সর্বত্রই তাঁহার কার্য সিদ্ধ হইবে। অদীক্ষিত ব্যক্তি মরণের পর ঘোরতর নরকে গমন করে। মন্ত্রদীক্ষাবিহীন ব্যক্তির পিশাচদ্বন্দ্ব হয় না।

যদি কেহ গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ না করিয়া পুস্তকাদি-দ্বারা মন্ত্রগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার নরক হয় এবং সহস্র

মন্তব্যেরও তাহার মুক্তি হয় না। অতএব সঙ্গুগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করাই অবশ্যকর্তব্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণকেই মন্ত্র দিবেন। বিজ্ঞাতিকে মন্ত্র দিলে ব্রাহ্মণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

“যো দদাতি বিজ্ঞাতিত্যো মহামন্ত্রং মহেশ্বরী।

স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যা মোদতে ব্রহ্মসরিধৌ ॥” (কল্পধামল)

কত্রিয়াদি বর্ণত্রয়, যদি উপযুক্ত ব্রাহ্মণ গুরু না পান, তাহা হইলে পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন কত্রিয়গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারেন। বৈশ্ব এবং শূদ্র বৈশ্ব সঙ্গুগুরুর নিকট মন্ত্র লইতে পারেন। কিন্তু শূদ্র কখন শূদ্রকে মন্ত্র দিবেন না। শূদ্র শূদ্রকে মন্ত্র দিলে উভয়েরই নরক হয়। এই নিয়ম কলিকাল ভিন্ন অন্য যুগের জন্ত। কলিতে একমাত্র ব্রাহ্মণই চারি বর্ণের মন্ত্রদাতা; ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও মন্ত্র দিবার অধিকার নাই।

“চতুর্গং বর্ণানাং মন্ত্রদানে ব্রাহ্মণ এবাধিকারী।

অত্রাহ্মলোম্যেন কত্রিয়বৈশ্বরোরপি গুরুবং, তথাচ

ভুবনেশ্বরীতন্ত্রে প্রথমপটলে—

ব্রাহ্মণঃ সর্বকালজঃ কুর্য্যাৎ সর্বেষু মন্ত্রগ্রহণম্।

তদভাবে বিজ্ঞপ্রেষ্ঠঃ শাস্ত্রাত্মা ভগবন্ময়ঃ ॥

কত্রিবিটশূদ্রজাতীনাং কত্রিয়োহুগ্রহে ক্ষমঃ।

কত্রিয়স্তাপি চ গুরোরভাবাদীনুশো যদি।

বৈশ্বঃ শ্রান্তেন কার্য্যশ্চ শূদ্রে নিত্যমুগ্রহঃ ॥

শূদ্রঃ শূদ্রযুগাৎ শ্রদ্ধা বিজ্ঞাং বা মন্ত্রমুত্তমম্।

গৃহীত্বা নরকং বাতি হুংখং প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥”

কুলার্ণব মতে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রভেদে মন্ত্রও চারি প্রকার। গুরু মন্ত্র দিবার সময়, অহ্মলোমক্রমে দিবেন, কখন প্রতিলোমক্রমে দিবেন না। মারাবীজ মন্ত্র ব্রাহ্মণজাতীয়, ত্রীবীজ কত্রিয়, কামবীজ বৈশ্ব, এবং বাগ্ভববীজ শূদ্রজাতীয়। এই চতুর্বীজশূত্র যে মন্ত্র তাহার নাম পৌলস্ত্য। গুরু মন্ত্র দান-কালে ব্রাহ্মণকে চতুর্বীজযুক্ত, কত্রিয়কে ত্রিবীজ, বৈশ্বকে দ্বিবীজ এবং শূদ্রকে এক বীজযুক্ত মন্ত্র প্রদান করিবেন।

“অথ মন্ত্রাণাং ব্রাহ্মণকত্রিয়াদিভেদঃ, কুলার্ণবে—

ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্বঃ শূদ্রো ভবতি বৈ মনুঃ।

অহ্মলোমেন দেয়ঃ শ্রাৎ প্রতিলোমেন ন কচিৎ ॥

মারাবীজং ব্রাহ্মণঃ শ্রাৎ ত্রীবীজং কত্রিয়ঃ স্মৃতম্।

কামবীজং ভবৈবৈশ্বো বাগ্ভবঃ শূদ্রৈরিতম্ ॥

চতুর্বীজপরিত্যক্তো মন্ত্রঃ পৌলস্ত্যসংজ্ঞকঃ।

চতুর্বীজং ব্রাহ্মণানাং কত্রিয়াণাং ত্রিবীজকম্।

বীজতমস্ক বৈশ্বানাং শূদ্রাণামেকবীজকম্ ॥”

শূদ্রের পক্ষে নির্ধিক্ত মন্ত্র—ব্রাহ্মণ শূদ্রকে কখন প্রণব বা প্রণবঘটিত মন্ত্র প্রদান করিবেন না। যদি কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রকে আত্মমন্ত্র, গুরু মন্ত্র, অজপামন্ত্র (হংস) বাহা ও বাহা প্রণবসংযুক্ত প্রভৃতি মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে মন্ত্রদাতা ও মন্ত্রগ্রহীতা উভয়েরই নরক হয়। সাবিত্রী, প্রণব, লক্ষ্মীবীজ (শ্রী৬), এই সকল যদি জ্ঞী কিংবা শূদ্র উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহাদের নরক হয়। গোপাল, শিব, ছর্গা, সূর্য্য ও গণেশ ইহাদেরই মন্ত্রগ্রহণে শূদ্র অধিকারী। অস্ত্র দেবতার মন্ত্রগ্রহণে শূদ্র পাপভাগী হয়।

“প্রণবাত্মং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্কণা।

আত্মমন্ত্রং গুরোর্মন্ত্রং মন্ত্রকাজপসংজ্ঞকং ॥

বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্ভিজঃ।

শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ॥

ঋতিরপি, সাবিত্রী প্রণবঃ যজুর্লক্ষ্মীঃ জ্ঞীশূদ্রো যদি জ্ঞানীয়াং স মৃতোহধোগতিঃ।

গোপালমন্ত্রমুদেয়ো মহেশস্ত চ পাদজৈঃ।

তংপদ্ম্যাস্ত্যপি সূর্য্যস্ত গণেশস্য মনুস্তথা।

এবাং দীক্ষাধিকারী স্যাদন্থা পাপভাগ্ ভবেৎ ॥”(তন্ত্রসার)

সকলেরই অমুকুল মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত। তারাচক্র ও রাশিচক্র প্রভৃতি চক্রবিচারে যে মন্ত্র অমুকুল হইবে, সেই মন্ত্রই গ্রহণ করিতে হইবে।

সিদ্ধসারস্বত তন্ত্রের মতানুসারে নৃসিংহ, সূর্য্য ও বরাহ, ইহাদিগের মন্ত্র, প্রাসাদবীজ (হৌঁ) প্রণব ও কুটমন্ত্র ইহাদিগের সিদ্ধাদি শোধনের আবশ্যকতা নাই।

তারচক্র, ১০টা রাশিচক্র, নামচক্র এই সকল চক্র বিচারে সঙ্গ হইলেই মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে। অস্ত্র চক্রবিচারের আবশ্যকতা থাকে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তারচক্র, রাশিচক্র ও নামচক্র বিচার অবশ্যকর্তব্য, অস্ত্র ঋণিধনী প্রভৃতি চক্র দ্বাৰা যে বিচার করিবে না, তাহা নহে, কারণ বচনান্তরে লিখিত আছে, ধনী মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই, ইত্যাদি বচন নিষ্ফল হয়। ইহাতে এইরূপ মায়াসা করা যাইতে পারে যে, পূর্কোক্ত বচন তারচক্রাদির প্রশংসাপর। মন্ত্রগ্রহণে সকল চক্র দ্বারা মন্ত্র উদ্ধার করিয়া মন্ত্র লইতে হইবে।

অম্লক, জাণ্ডকপ্রদঃ, মালামন্ত্র, ত্রাফরী মন্ত্র ও বেদোক্ত মন্ত্র এই সকল মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধাদি শোধন প্রয়োজন নাই। বিংশতি অক্ষরের অধিক বর্ণঘটিত যে মন্ত্র তাহাকে মালামন্ত্র, নপুংসক মন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষরী ও পঞ্চাক্ষরী প্রভৃতি মন্ত্রে এবং সর্কপ্রকার বৈদিক মন্ত্রে সিদ্ধাদি শোধন করিতে হইবে না। যে মন্ত্রের অন্তে ‘হং ফট্’ আছে, তাহাকে পুংমন্ত্র, যাহার অন্তে

বাহা আছে তাহাকে জীমন্ত্র, এবং যে মন্ত্রের পর নম আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র বলে।

“তারচক্রং রাশিচক্রং নামচক্রং তথৈব চ।

অত্র চেৎ সঙ্গণো মন্ত্রো নাত্তচক্রং বিচিত্তয়েৎ ॥”

ইতি তু প্রধানতয়া বোদ্ধব্যং—

তথাচ ‘ধনিমন্ত্রং ন গৃহীয়াৎকুলক তথৈব চ।’

ইত্যাদি তথা দর্শনাৎ তত্তচক্রবিচারস্ত আবশ্যকত্বাৎ প্রথমং তদ্বিক্রপ্যতে।

অম্লককে স্থিয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্রাফরে।

বৈদিকেষু চ সর্কেষু সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ ॥

হংসস্তাষ্টাক্ষরস্যাপি তথা পঞ্চাক্ষরস্য চ।

একদ্বিত্রাদিবীজস্য সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ ॥” ইত্যাদি।

কালী, তারা, মহাছর্গা, ঝরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী এবং কালী, তারা, ষোড়শা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, ও কমলা এই দশমহাবিভা ইহাদিগের মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধাদি শোধন, নক্ষত্রাদিবিচার, কালাদি শুদ্ধি ও অরিমিত্রাদি বিচার করিতে হয় না। এই সকল দেবতা সিদ্ধবিভা, এই জন্য কোন বিচার করিতে হইবে না।

তন্ত্রের পূর্কোক্ত বচনানুসারে জানা যায় যে, কালী তারাদি মহাবিভার মন্ত্রগ্রহণে কোন বিচার করিতে হইবে না। বাস্তবিক তাহা নহে, এই সকল বচন প্রশংসাপর। কিন্তু সকল মন্ত্রগ্রহণেই বিচারের আবশ্যক, কারণ কোন স্থলে দেখা যায়, অম্পেও বৈরিমন্ত্র লাভ হয়, এবং তাহা দ্বারাও অনিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া মন্ত্র সকল বিচারপূর্ক গ্রহণ করিতে হয়।

“কালী তারা মহাছর্গা ঝরিতা ছিন্নমস্তিকা।

বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ ॥

কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।

ইত্যাত্মাঃ সকলা দেব্যঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদা।

সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ ॥

কালী তারা মহাবিভা ষোড়শা ভুবনেশ্বরী।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিভা ধুমাবতী তথা।

বগলা সিদ্ধবিভা চ মাতঙ্গী কমলাক্ষিকা ॥

এতা দশ মহাবিভাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষান্তি নক্ষত্রাদিবিচারণা ॥

কালাদিশোধনং নান্তি নারিমিত্রাদি দূষণম্।

সিদ্ধবিদ্যা তন্না নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ।

নান্তি কিঞ্চিৎসহাদেবি ছুঃখসাধ্যং কদাচন ॥

ইত্যাদি বচনাদিষু বিচারো নাস্তি, বস্তুতস্ত ইদং প্রশংসা-  
পরং, সর্বত্র বিচারসাবশ্যকত্বাৎ দ্রষ্টব্যং কদাচিৎকৈরিতমম্ভ  
অপ্রাদৌ প্রাপ্ত্যা তদোষণ্য দৃষ্টব্যং" (তত্ত্বনার)

অতএব এই সকল বচন দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, সিদ্ধ  
বিদ্যা বা মহাবিদ্যা যাহারই কেন মন্ত্র হউক না, মন্ত্র সকল  
বিচার করিয়া তবে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমে কুলাকুল  
চক্র বিচার করিতে হইবে।

#### কুলাকুল চক্র।

বায়ু,	অগ্নি,	ভূ,	জল,	আকাশ,
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ঌ	ঐ ঔ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ এই পঞ্চভূতময়  
পঞ্চাশং বর্ণ ক্রমশঃ রাখিয়া কুলাকুল নির্ণয় করিতে হইবে।  
মন্ত্রগ্রহীতার নামের আশ্রয় ও যে মন্ত্রগ্রহণ করিবে, সেই  
মন্ত্রের আদি অক্ষর এই দুই অক্ষর যদি একভূত বা একদৈবত  
হয়, তাহা হইলে এই মন্ত্র স্বকুল, অথবা অকুল হইবে।  
অকুল মন্ত্রগ্রহণ করাই শাস্ত্রসম্মত, অকুল মন্ত্রগ্রহণ করিবে না।

এই কুলাকুল বিচারের সুবিধার জন্ত একটা চক্র আঁকিত  
করা গেল। এই চক্র দেখিলে সহজেই মন্ত্র স্থির করা  
যাইবে। এই চক্র পঞ্চ কোঠায় বিভক্ত, ঐ সকল কোঠায়  
উপরিভাগে বায়ু, অগ্নি, ভূ, জল ও আকাশ এই পাঁচটা নাম  
লিখিত হইয়াছে। ইহাদের নীচে এক একটা কোঠাতে যে যে  
বর্ণ আছে, তাহার একভূত বা একদৈবত। নামাঙ্কর,  
মন্ত্রাদ্যঙ্কর এক কোঠা স্থিত হইলে মন্ত্রগ্রহণে শুভ। আর  
যদি সাধক নামাদি বর্ণ ও মন্ত্রাদি বর্ণ একভূত বা একদৈবত  
না হয়, তবে উক্ত বর্ণদ্বয়ের পরস্পর মিত্রতা থাকিলেও মন্ত্র  
গ্রহণ চলিতে পারে। নামাদি বর্ণের সহিত যে যে বর্ণের  
মিত্রতা বা শত্রুতা আছে, তাহা এইরূপ স্থির করিতে হইবে।  
বারুণ বর্ণ ভৌমবর্ণের এবং মারুত বর্ণ আশ্ব্যে বর্ণের মিত্র।  
মারুতবর্ণ পাণ্ডি বর্ণের এবং আশ্ব্যে বর্ণ বারুণ বর্ণের ও  
পাণ্ডি বর্ণের শত্রু। আকাশ সর্ববর্ণের মিত্র। এইরূপে  
বর্ণ সকলের শত্রুমিত্রতা নিরূপণ করিয়া মিত্র মন্ত্র গ্রহণ

করিবে, শত্রু মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। এইরূপ কুলাকুল চক্র  
বিচার করিয়া পরে রাশিচক্র দ্বারা বিচার করিতে হইবে।

#### রাশিচক্র।

বৃষ উ উ ঋ মিথুন ১২ ১৩	মেঘ অ আ ই ঈ ১৪ ১৫	মীন য র ল ব ১৬ ১৭ ১৮ ১৯
কর্কট ২০ ২১	রাশি চক্র	২২ ২৩ ২৪ ২৫
সিংহ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১	৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭	৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১

এইরূপে রাশিচক্র স্থির করিয়া পরে বিচার করিতে  
হইবে। স্বীয় জন্মরাশি হইতে মন্ত্ররাশি অর্থাৎ যে রাশিতে  
মন্ত্রের আদি বর্ণ দৃষ্ট হইবে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিলে  
যদি মন্ত্ররাশি হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ হয়, তবে মন্ত্রগ্রহণ  
করিবে না। যদি জন্মরাশি জানা না থাকে, তবে নামের  
আদি অক্ষরসম্বন্ধীয় রাশি গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে। এইরূপ  
গণনাতেও ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশি স্থিত মন্ত্র পরিত্যাগ  
করিতে হইবে। এক, পঞ্চম ও নবম রাশিগত মন্ত্র বন্ধুর  
হয় হিতকারী। দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশম রাশি স্থিত মন্ত্র-  
মিত্র, তৃতীয়, একাদশ ও মধ্যম মন্ত্র পুষ্টিকর, দ্বাদশ, অষ্টম  
ও চতুর্থ মন্ত্র ঘাতক। ইহাতে একটু বিশেষ এই, বিষ্ণু-  
মন্ত্র বিষয়ে চতুর্থ মন্ত্র ঘাতক। দ্বাদশ রাশি লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ,  
বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম, কর্ম, আয় ও ব্যয় এই  
দ্বাদশ রাশির দ্বাদশ সংজ্ঞা। জন্ম রাশিগত মন্ত্রগ্রহণে মন্ত্র-  
মিত্র, ধনস্থানস্থিত মন্ত্রে ধনলাভ, ভ্রাতৃস্থানে ভ্রাতার উন্নতি,  
বন্ধুপ্রিয়তা, পুত্রস্থানে পুত্রলাভ, শত্রু স্থানে শত্রুকিল, কলত্র  
স্থানে মধ্যবিধ ফল, মৃত্যুস্থানে মৃত্যু, ধর্মস্থানে কাণ্ডমিত্রিকি,  
ত্যাগস্থানে ধনসম্পত্তি ও ব্যয় স্থানে সঞ্চিত ধন ব্যয় হয়।  
রাশিচক্রে শুভাশুভি বিচার করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিবে।

পরে নন্দ্রচক্র স্থির করিয়া মন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

নক্ষত্রচক্রের গণনা সহজে বোধগম্য হইবে, এইজন্য একটা চক্র অঙ্কিত করা গেল, এই চক্র দেখিলে সহজেই মন্ত্র স্থির করা যাইবে। এই চক্রটা সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় বিভক্ত। ইহার প্রথম হইতে সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় অশ্বিনাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও বচনানুসারে যে যে কোষ্ঠায় যে যে বর্গ ও গণ লিখিত আছে, তাহা দ্বারা মন্ত্র স্থির করিবে।

নক্ষত্রানুসারে গণ স্থির করিয়া মন্ত্র বিচার করিবে। স্বভাতিতে পরম প্রীতি, অন্ত জাতিতে মধ্যম প্রীতি, রাক্ষস ও

মাহুবে বিনাশ, রাক্ষস ও দেবগণে শত্রুতা জানিতে হইবে। অন্য নক্ষত্র ও মন্ত্রের আদি অক্ষর যে গৃহে পড়িবে, সেই গৃহগত নক্ষত্র লইয়া গণনা করিতে হইবে। যদি মন্ত্র ও মন্ত্রগৃহীতার এক গণ হয়, তাহা হইলে মন্ত্র শুভ, এবং যাহার নরগণ, সে দেবগণ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। মহাযোগ ও রাক্ষসগণে মৃত্যু এবং রাক্ষসগণ ও দেবগণে শত্রুতা হয়, সুতরাং এইরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

### নক্ষত্রচক্র ।

অশ্বিনী অ আ দেব	ভরণী ই মাহুভ	কৃত্তিকা ই উ উ রাক্ষস	রোহিণী ঋ ঋ ঋ নর	মৃগশিরা এ দেব	আর্দ্রা ঐ নর	পুনর্বসু ও ঔ দেব	পুষ্যা ক দেব	অশ্লেষা খ গ রাক্ষস
মঘা ঘ ও রাক্ষস	পূর্বাষাঢ়া চ নর	উত্তরফল্গুনী ছ জ নর	হস্তা ঝ ঞ দেব	চিরা ট ঠ রাক্ষস	ষাতি ড দেব	বিশাখা ঢ ণ রাক্ষস	অনুরাধা ত থ দ দেব	জ্যেষ্ঠা ধ রাক্ষস
মূল্য ন প ফ রাক্ষস	পূর্বাষাঢ়া ব নর	উত্তরাষাঢ়া ভ নর	শ্রবণা ম দেব	ধনিষ্ঠা য র রাক্ষস	শতভিষা ল রাক্ষস	পূর্ভাদ্রপদ ব শ নর	উত্তরভাদ্রপদ ষ স হ নর	রেবতী ল ক অং দেব

জন্ম, সম্পৎ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরম মিত্র এইরূপে জন্ম নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র নক্ষত্র পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে, যদি জন্ম নক্ষত্র হইতে মন্ত্র নক্ষত্র তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম হয়, তবে সেই মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বিতীয়, নবম কিংবা চতুর্থ মন্ত্র শুভ, অন্ত মন্ত্র অশুভ। এই মন্ত্র স্থায়ী জন্ম নক্ষত্র হইতে গণনা করিতে হইবে। যাহার জন্মনক্ষত্র জানা না থাকে, তাহার স্বনামা-অক্ষরসম্বন্ধি নক্ষত্র গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে।

এই নক্ষত্রচক্রানুসারে মন্ত্র স্থির হইলে অকথহ, অকড়ম এবং ঋগিধনিচক্রে মন্ত্র বিচার করিবে।

[অকথহ, অকড়ম ও ঋগিধনিচক্রের বিষয় তৎতৎ শব্দে দেখ।]

শুক্র বিশেষ প্রণিধানপূর্বক এই সকল চক্রে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া শিষ্যকে প্রদান করিবে।

মন্ত্রের কালনির্ণয়।—চৈত্র মাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধি, বৈশাখে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে, বহু-নাশ, শ্রাবণে দীর্ঘায়ুঃ, ভাদ্রমাসে সন্তাননাশ, আশ্বিনে রত্ন-লাভ, কার্ত্তিক ও অগ্রহারণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষ মাসে শত্রুবৃদ্ধি ও পীড়া, মাঘে মেধাবৃদ্ধি ও কাম্বনে মন্ত্র গ্রহণে সকল মনো-রথ পূর্ণ হয়।

এইরূপে মাসের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু মন্ত্রগ্রহণে যদি বিহিত মাস মলমাস হয়, তাহা হইলে ঐ মাসে মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। কারণ মলমাসে সকল কার্যই নিমিত্ত। চৈত্রমাসে যে দীক্ষা উক্ত হইল, তাহা গোপাল বিষয়ে জানিতে হইবে। কারণ বচনান্তরে লিখিত আছে, চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে দুঃখ ভোগ ও মরণ হইয়া থাকে। অতএব চৈত্রমাসে গোপাল মন্ত্রই গ্রহণ করা যাইতে পারে। আষাঢ় মাসে মন্ত্রগ্রহণে যে বহু নাশ হয়, তাহা সকল দেবতার পক্ষে নহে, কেবল শ্রীবিষ্ণু মন্ত্র বিষয়েই জানিতে হইবে।

মন্ত্র সঞ্চকে এই যে মাসের বিষয় অভিহিত হইল, ইহা সৌর মাসই জানিতে হইবে। কারণ মন্ত্রগ্রহণে চান্দ্রমাসের কোন আবশ্যকতা নাই। সৌরমাসই প্রশস্ত।

মন্ত্রগ্রহণে বার নিয়ম।—রবিবারে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বিভ-লাভ, সোমবারে শান্তি ও মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষর হয়, অতএব মঙ্গলবারে মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। বুধবারে সৌন্দর্য লাভ, বৃহস্পতিবারে জ্ঞানবুদ্ধি, শুক্রবারে সৌভাগ্য এবং শনিবারে বশোহানি হয়। অতএব রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই সকল বারে মন্ত্রগ্রহণ চলিতে পারে। কেবল শনি ও মঙ্গল এই দুই বার মন্ত্রগ্রহণে নিষিদ্ধ।

মন্ত্রগ্রহণে তিথি-নিয়ম।—প্রতিপদ তিথিতে মন্ত্রগ্রহণে জ্ঞান নাশ, দ্বিতীয়াতে জ্ঞানবুদ্ধি, তৃতীয়ায় শুচিতা, চতুর্থীতে বিত্তনাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞানক্ষয়, সপ্তমীতে সুখ-লাভ, অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে শরীরক্ষয়, দশমীতে রাজ-সৌভাগ্য, একাদশীতে শুচিতা, দ্বাদশীতে সৰ্ব্বকার্যাসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দশীতে তিথ্যক্‌যোনিতে জন্ম, অমাবস্তায় কার্যাহানি এবং পূর্ণিমাতে ধর্মবুদ্ধি হয়।

মন্ত্রগ্রহণে অস্বাধ্যায় অর্থাৎ যে যে দিনে বেদ পাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সেই দিন বর্জন করিবে। সন্ধ্যাগর্জ্জন, ভূমিকম্প ও উল্কাপাতের দিন অস্বাধ্যায়। অত্যাশ্রু তন্ময়ে যে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশীর বিধান দেখা যায়, তাহা বিষু বিষয়ে জানিতে হইবে। পঞ্চমী, সপ্তমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, পূর্ণিমা, ত্রয়োদশী ও দশমী তিথি মন্ত্রগ্রহণে প্রশস্ত। ষষ্ঠী তিথিতে শিবমন্ত্রগ্রহণে দোষ নাই।

মন্ত্রগ্রহণে নক্ষত্র।—অধিনী নক্ষত্রে মন্ত্রগ্রহণ করিলে শুভ, ভরগীতে মরণ, কৃত্তিকাতে হুঃখ, রোহিণীতে জ্ঞানলাভ, মৃগশিরায় সুখ, আর্দ্রাতে বন্ধনাশ, পূর্নর্ষ্মতে ধন, পুষ্যাতে শত্রুনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘাতে হুঃখমোচন, পূর্বফল্গুনীতে সৌন্দর্য্য, উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান, হস্তায় ধন, চিত্রায় জ্ঞানবুদ্ধি, স্বাতিতে শত্রুবিনাশ, বিশাখায় হুঃখ, অশ্বরাধাতে বন্ধবুদ্ধি, জ্যেষ্ঠাতে স্ততহানি, মূলার কীর্তিবুদ্ধি, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় যশোবুদ্ধি, শ্রবণাতে হুঃখ, ধনিষ্ঠাতে দারিদ্র্য, শতভিষায় বুদ্ধিবুদ্ধি, পূর্বভাদ্রপদে সুখ এবং রেবতী নক্ষত্রে কীর্তিবুদ্ধি হয়।

আর্দ্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের যে নিষেধ উক্ত হইয়াছে, তাহা শিবমন্ত্র ও বহুবিষয়ে। জ্যেষ্ঠা ও ভরগী নক্ষত্র রাম-মন্ত্রবিষয়ে জানিতে হইবে।

মন্ত্রগ্রহণে যোগ-নিয়ম।—শুভ, সিদ্ধ, আয়ুস্মান, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, বুদ্ধি ও হর্ষণ এই সকল যোগ সর্ব মন্ত্রগ্রহণে প্রশস্ত। রত্নাবলীতন্ময়ে লিখিত আছে,—প্রীতি, আয়ুস্মান, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বুদ্ধি, ধ্রুব, সুকস্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়াণ, শিব, ত্রপ্পা ও ইন্দ্র এই ষোড়শ যোগ মন্ত্রগ্রহণে বিশেষ প্রশস্ত।

মন্ত্রগ্রহণে করণ-নিয়ম।—বব, বাণব, কোলব, তৈতিল, ও বণিজ এই সকল করণ মন্ত্রগ্রহণে শুভ।

মন্ত্রগ্রহণে লয়নিয়ম।—বুধ, সিংহ, কস্তা, ধনুঃ ও মীন এই সকল লয়ে এবং চন্দ্র-তারার শুদ্ধিতে মন্ত্রগ্রহণ কর্তব্য। বিষ্ণু-মন্ত্রগ্রহণে স্থিরলয় অর্থাৎ বুধ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই সকল লয় প্রশস্ত। শিবমন্ত্রগ্রহণে চরলয় ও শক্তিমন্ত্রগ্রহণে দ্ব্যয়ক লয় শুভকর। মন্ত্রগ্রহণকালে তৎকালীন লয়াপেক্ষা তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ এবং লয় ও চতুর্থ, সপ্তম,

দশম, নবম ও পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে মন্ত্রগ্রহণ করিবে। মন্ত্রগ্রহণে বক্রীগ্রহ অনিষ্টকারী।

মন্ত্রগ্রহণে পক্ষ-নিয়ম।—শুরুপক্ষে মন্ত্রগ্রহণ করিলে শুভফল হয়। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী পর্যন্ত মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে। অগস্ত্যসংহিতার মতে শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষই মন্ত্রগ্রহণে প্রশস্ত। কালোত্তরে লিখিত আছে,—সম্পৎকামী ব্যক্তি শুরুপক্ষে এবং মোক্ষকামী কৃষ্ণপক্ষে মন্ত্রগ্রহণ করিবে।

নিষিদ্ধ মাসেও তিথিবিশেষে মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারা যায়। রত্নাবলীতে লিখিত আছে,—ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী, কার্তিকী শুক্লা নবমী, চৈত্রের কামচতুর্দশী (কোন মতে ত্রয়োদশী), বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠমাসের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমী ও শ্রাবণের কৃষ্ণাপঞ্চমী এই সকল দিনে নক্ষত্রাদি নিষিদ্ধ হইলেও মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে।

ইহা ভিন্ন চৈত্রের শুক্লা ত্রয়োদশী, বৈশাখের শুক্লা একাদশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দশী, আষাঢ়ের নাগপঞ্চমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাদ্রের জ্যৈষ্ঠমী, আশ্বিনের মহাষ্টমী, কার্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী, পৌষের চতুর্দশী, মাঘের শুক্লা একাদশী, ফাল্গুনের শুক্লা ষষ্ঠী, এই সকল তিথি মন্ত্রগ্রহণে প্রশস্ত।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি সংক্রান্তি দিনে, চন্দ্র-স্বধ্যগ্রহণে, যুগাদ্যা তিথি ও মন্বন্তরা তিথিতে মন্ত্রগ্রহণ প্রশস্ত। স্বধ্যগ্রহণে স্বধ্যগ্রহণ কালের সমান আর শুভকাল নাই। স্বধ্য ও চন্দ্র উভয় গ্রহণকালেই মন্ত্রগ্রহণ প্রশস্ত।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শুভ লগ্নে, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে এবং মিত্র-তারাতে তারামন্ত্রগ্রহণ করিবে। তারামন্ত্রদীক্ষায় অশ্ব-রাধা ও রেবতী নক্ষত্র এবং আশ্বিন ও কার্তিক মাস প্রশস্ত।

সোমবারে অমাবস্তা, মঙ্গলবারে চতুর্দশী, রবিবারে সপ্তমী তিথি হইলে শত পর্কের সমান হয়, এই পর্কে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বিশেষ শুভ হয়।

যামলে লিখিত আছে,—গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থে, কুরুক্ষেত্রে, প্রয়াগে, কাশীক্ষেত্রে অথবা কোম পীঠস্থানে, মন্ত্রগ্রহণে কালাকাল শুদ্ধির প্রয়োজন নাই। এতদ্ভিন্ন অত্র স্থানে মন্ত্রগ্রহণ করিতে হইলেই বিশুদ্ধ কাল দেখা আবশ্যক।

বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে,—দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্যন্ত যত তিথি আছে, তাতার প্রতি তিথিতেই মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে। দুর্গাদেবীর বোধনে, অশোকাস্তমীতে, রামনবমী দিনে এবং শুক্লর আজ্যক্রমে যে কোন সময়ে মন্ত্রগ্রহণ করা যায়, তাহাতে কালাকালাদি বিচারের আবশ্যক নাই।



গুরু রূপাপূৰ্ণক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া যদি মন্ত্র দেন, তাহা হইলে লগ্নাদি বিচার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ এই সময়ে সকল বার, সকল তিথি এবং সকল নক্ষত্রই শুভ ফল প্রদান করে।

মন্ত্রস্থাননির্ণয়।—গোশালা, গুরুগৃহ, দেবালায়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, আমলকীবৃক্ষের সমীপ, পৰ্ব্ব-তাগ্র, পৰ্ব্বতগুহা ও গঙ্গাতট এই সকল স্থানে দীক্ষাগ্রহণ করিলে কোটিগুণ ফল হয়।

মন্ত্রগ্রহণে নিব্ধিত স্থান।—গয়া, ভাস্করক্ষেত্র, বিরজাতীর্থ, চম্পপৰ্বত, চট্টগ্রাম, মাতঙ্গদেশ এবং কল্যাণগ্রহ এই সকল স্থানে মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ। \*

যদি গুরু অন্তর্গত কিংবা বুদ্ধাবস্থায় থাকেন, অথবা গুরু ও রবি এক গৃহস্থিত হন, তাহা হইলে মেঘ, বৃশ্চিক ও সিংহে মন্ত্রগ্রহণে কোন দোষ হয় না।

মন্ত্রগ্রহণের পূর্বদিন গুরু শিষ্যকে আহ্বান করিয়া পবিত্র কুশল্যার উপবেশন করাইয়া নিদ্রামন্ত্রে তাহার শিখা বন্ধন করিবেন, শিষ্য শয়নকালে ঐ মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইবেন।

নিদ্রামন্ত্র—‘ও হিলি হিলি শূলপাণয়ে স্বাহা’

মন্ত্রান্তর—

“নমো জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাশ্বনে।

রামায় বিশ্বরূপায় ব্রহ্মাধিপত্যয়ে নমঃ ॥

অগ্নে কথয় মে তথ্যং সুরকার্যেষু শেষতঃ।

ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাত্যামি স্বংপ্রসাদান্নহেতুঃ ॥”

পরদিন প্রাতঃকালে গুরু শিষ্যের নিকট স্বপ্নের শুভা-শুভ জিজ্ঞাসা করিবেন। শিষ্য সমস্ত স্বপ্নবিবরণ গুরুর নিকট নিবেদন করিবেন। কল্যা, ছত্র, রথ, প্রদীপ, অট্টালিকা, পদ্ম, নদী, হস্তী, বৃষ, মালা, সমুদ্র, সর্প, বৃষ, পৰ্ব্বত, বোটিক, যজ্ঞীয় মাংস ও মদ্য এই সকল স্বপ্ন দেখিলে শিষ্যের মন্ত্র-সিদ্ধি হইবে। †

\* “গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চম্পপৰ্বতে।

চট্টলে চ মতঙ্গে চ তথা কল্যাণেষু চ।

ন গুপ্তীয়াং ততো দীক্ষাং তীর্থেষু পাকতি ॥” ( তন্ত্রসার )

† “গুরুদীক্ষাপূর্বদিনে স্বশিব্যমভিমন্ত্রয়েৎ।

দুৰ্ভলযাগং পরিকৃত্য শিবাং তত্র নিবেশয়েৎ।

স্বাপমন্ত্রেণ মন্ত্রজঃ শিষ্যঃ শিবাং ব্রবন্ধয়েৎ।

তদন্তঃ স্বাপমন্ত্রেণ পঠেদ্বারজঃ শিষ্যঃ।

ঐগুরোঃ পাদুকাং ধ্যায়া উপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

মন্ত্রের আট প্রকার দোষ আছে, বথা,—অভক্তি, অক্ষর-ভ্রান্তি, লুপ্ত, ছিন্ন, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কথন ও স্বপ্নে কথন।

১ মন্ত্রকে অক্ষরজ্ঞান করার নাম অভক্তি, মন্ত্রই দেবতার স্বরূপ, ইহা বিবেচনা করিয়া মন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিলে সেই দেবতা প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত ফল প্রদান করিবেন। এই মন্ত্র কতকগুলি অক্ষরসমষ্টি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া পূজাদি করিলে তাহা সিন্ধু হইবে না, বরং নিরয়গামী হইতে হইবে। অত্ৰ মন্ত্রের প্রশংসা করিয়া নিজের মন্ত্র অফল এইরূপ বিবেচনা করাও অভাক্ত নামে অভিহিত। ২ অক্ষরভ্রান্তি, গুরু বা শিষ্যের ভ্রমবশতঃ মন্ত্রের বর্ণবৈপরীত্য, অথবা বর্ণাধিক্য। ৩ লুপ্তমন্ত্রে বর্ণের ন্যূনত্ব। ৪ ছিন্ন মন্ত্রান্তর্গত যুক্তবর্ণের একদেশ ন্যূনত্ব। ৫ হ্রস্ব, মন্ত্রের দীর্ঘবর্ণস্থানে হ্রস্ব শব্দপ্রয়োগ। ৬ দীর্ঘ, মন্ত্রের হ্রস্বস্থানে দীর্ঘপ্রয়োগ। ৭ কথন, মন্ত্রের নিকট স্বীয় মন্ত্র প্রকাশ। ৮ স্বপ্নে কথন, নিদ্রাকালে মন্ত্র মন্ত্রের নিকট বলা। মন্ত্রের এই আট প্রকার দোষ। \*

“অক্ষরে ভ্রান্তিঃ গুরোঃ শিষ্যস্ত বা ভ্রান্ত্যা মন্ত্রেষু বর্ণবৈপ-রীত্যং বর্ণাধিক্যঞ্চ। লুপ্তঃ, মন্ত্রেষু বর্ণন্যূনত্বং। ছিন্নঃ, মন্ত্রান্ত-র্গতযুক্তবর্ণৈকদেশন্যূনত্বং। হ্রস্বঃ, দীর্ঘস্থানে হ্রস্বপ্রয়োগঃ। যত্বেত্যেতদোষমোরক্ষরভ্রান্ত্যন্তর্ভূতত্বেন পৌনরুক্তং ত্য়াং, তথাপি এতদোষয়োঃ পৃথকপ্রার্নাশ্চত্বে বক্ষ্যমাণত্বাং অক্ষরভ্রান্তি-স্তদিতরাবধয়া, কথনমন্ত্রেণ স্বীয়মন্ত্রপ্রকাশঃ, স্বপ্নোক্তাভি

তারো হিলিষয়ঃ শূলপাণয়ে দ্বিষ্ট হরিতঃ।

স্বপ্নমানস্ত মন্ত্রেঃস্বং শত্বনা পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

ইতি মন্ত্রেণ সাক্ষ্যে দেবঃ প্রার্থ্য স্বপেচ্চ বা।

অগ্নে শুভাশুভং দৃষ্টং পূচ্ছেৎ প্রাতঃ শিশুঃ গুরুঃ ॥

কল্যাং ছত্রং রথং দীপং প্রাসাদং কমলং নদীম্।

কুঞ্জরং বৃষভং মালাং সমুদ্রং কণিনং ক্ষমম্ ॥

পৰ্বতং তুরগং মেঘমামমাংসং হরাদবম্।

এবমাদীনী সৰ্বাণি দৃষ্টী সিদ্ধিমবাগ্নুয়াৎ ॥” ( তন্ত্রসার )

\* অভক্তিঃ মন্ত্রেষু অক্ষরবুদ্ধ্যাদিরূপা, তদ্রূপং কুলার্ণবে দ্বাদশোক্তাসে—

গুরো মনুষ্যবুদ্ধিস্ত মন্ত্রে চাক্ষরভাবনা।

প্রতিমাহ শিলাবুদ্ধিঃ কুলার্ণবো নরকং ত্রয়েৎ ॥

দেবতাস্তরমন্ত্রপ্রশংসয়া স্বমন্ত্রস্ত অফলবুদ্ধ্যাদিরূপা চ।

অভক্ত্যা নৈব সিদ্ধিঃ ত্য়াং কল্পকোটিপতৈরপি।

এবং মন্ত্রশাস্ত্রাধা বা চেতি ভ্রান্ত্যা হি বাতুলঃ ॥

লুপ্তবর্ণে বুদ্ধিনাশস্থিত্তে নাশোঃ ভবেৎ কিল।

হ্রস্বোচ্চারে ব্যাধিযুক্তো দীর্ঘজাপে বপুঃক্ষয়ঃ ॥

কথনে যত্নমাদ্যোতি স্বপ্নে তু লুপ্ত শৈলজঃ।

কালিকায়াক্ত তারায় মন্ত্রোহপি জলদগ্নিবৎ ॥” ( হরতত্ত্বদীপ্তি )

‘অগ্নে ব্রাহ্মণরূপিদেবেন স্বীয়মন্ত্রস্ত প্রহরণং তস্মিন্ স্বীয়মন্ত্র-  
প্রকাশ ইতি যাবৎ।’ (হরতব্দীধিতি)

মন্ত্র উক্ত প্রকার দোষদুষ্ট হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত  
করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই মন্ত্র শুভময় হইয়া  
থাকে, নচেৎ প্রতিপদে বিঘ্ন হয়। বাহাতে মন্ত্রের এইরূপ  
দোষ না ঘটে, শিষ্য সেজন্য সতত সচেতন থাকিবেন।

মন্ত্রে অভ্যক্তিদোষ ঘটিলে বহুজপ, হোম এবং বহু কা-  
র্য দ্বারা উহা দূর করিতে হয়। এইরূপে অভ্যক্তি গিয়া  
যদি ভক্তির উদ্রেক ঘটে, তবে তাহার সিদ্ধিলাভ হইতে আর  
বেগী বিলম্ব হয় না।

“বহুজপাং তথা হোমাং কার্যক্রেণাদিবিস্তরাং।

যদি ভক্তিভবেৎ দেবি তস্ত সিদ্ধিরদূরতঃ ॥” (হরতব্দীধিতি)

মন্ত্রে অক্ষরভ্রান্তিদোষ ঘটিলে গুরু, তদভাবে তংপুত্র,  
তাঁহার অভাবে গুরুলক্ষণবিশিষ্ট কোন সাধকের দ্বারা মন্ত্রের  
দোষ পরিহার করাইয়া তাঁহার নিকট পুনরায় ঐ মন্ত্র  
গ্রহণ করিবে।

“গুরুণা তৎস্মতেনৈব সাধকেন বরাননে।

অক্ষরে দুষণং হিহ্না পুনমন্ত্রং প্রকাশয়েৎ ॥” (হরতব্দী•)

মন্ত্রের লুপ্ত দোষ ঘটিলে গুরু, গুরুপুত্র বা কোন সাধক  
সমাহিত চিত্তে লুপ্তবর্ণ নির্ণয় করিয়া শিষ্যকে মন্ত্র দিবেন।

মন্ত্রের ছিন্ন দোষ ঘটিলে গুরু প্রভৃতি উহা নিরাকরণ  
করিয়া শিষ্যকে দিবেন, এবং উহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ লক্ষ  
জপ করিবেন। ইত্যাদি।

সকল প্রকার দোষই গুরু স্থির হইয়া নিরাকরণ করি-  
বেন। মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার।—

“জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং বোধনং তথা।

অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ॥

তর্পণং দীপনং গুপ্তিদৃশৈতা মন্ত্রসংক্রিয়া ॥” (তন্ত্রসার)

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ,  
আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি এই দশ প্রকার মন্ত্রের  
সংস্কার। এই দশবিধ সংস্কার করিয়া গ্রহণ মন্ত্র করা  
আবশ্যক।

নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার করিতে  
হয়। কুঙ্কম, রক্তচন্দন অথবা ভস্ম দ্বারা স্তব্ধাদি পাত্র  
মাতৃকায়ন্ত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে শক্তিমন্ত্রে রক্ত-  
চন্দন, ও শিবমন্ত্রে ভস্ম দ্বারা মাতৃকা যন্ত্র লিখিয়া মন্ত্র সংস্কার  
করিতে হয়। মাতৃকায়ন্ত্র ভিন্ন মন্ত্রের সংস্কার হইবে না।  
নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে মাতৃকা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইবে।

[ মাতৃকায়ন্ত্র শব্দ দেখ ]

‘হেসো’ এই মন্ত্রকে কর্ণিকা করিয়া দুই দুইটা স্বর দ্বারা  
কেশর অঙ্কিত করিবে। তৎপরে অষ্ট দল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া  
ঐ পদ্মের অষ্ট পত্র মধ্যে অষ্টবর্ণ লিখিবে। পদ্মের বহির্ভাগে  
চতুর্দার ও চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিয়া পদ্ম বেষ্টন করিবে। যন্ত্রের  
চতুর্দিকে বং এবং চতুষ্কোণে ঠং লিখিবে এবং ককারাদি ম  
পর্যন্ত পঞ্চ বর্ণ এবং ষ হহতে ব পর্যন্ত, শ হহতে হ পর্যন্ত  
ও ল ক্ষ এই অষ্টবর্ণপদ্মের পূর্বাদক্ হইতে আরম্ভ করিয়া  
ঈশাণকোণ পর্যন্ত অষ্ট দলে লিখিতে হইবে। তৎপরে চতু-  
রস্র ও চতুর্দার লিখিয়া চতুর্দ্বারে বং এবং চতুষ্কোণে ঠং  
লিখিয়া যন্ত্র অঙ্কিত করিবে।

মন্ত্রের জননসংস্কার।—মাতৃকা যন্ত্র হইতে যে মন্ত্রবর্ণ সকল  
উদ্ধার করা যায়, তাহাকে জনন-সংস্কার কহে।

জীবন উদ্ধৃত বর্ণ সকলের পঙ্ক্তিক্রমে প্রত্যেক বর্ণ  
প্রণব দ্বারা পুটিত করিয়া এক এক বর্ণ একশত জপ  
করিতে হইবে, ইহাকেই মন্ত্রের জীবন বলা যায়। মতান্তরে  
দশবার জপ করিলেও হয়।

তাড়ন—মন্ত্রের বর্ণ সকল পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়া বং এট  
মন্ত্রে চন্দ্রনোদক দ্বারা তাড়ন করিবে, ইহা শতবার করিতে  
হয়। মতান্তরে দশবার করিলেও হইতে পারে।

বোধন—মন্ত্রের বর্ণ সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে লিখিয়া মন্ত্র-  
বর্ণসংখ্যক রক্তকবরী পুষ্প দ্বারা রং এট মন্ত্রে মন্ত্রবর্ণ সকলকে  
হনন করিবে, ইহাকে মন্ত্রের বোধন কহে।

অভিষেক—মন্ত্রের বর্ণ সকল লিখিয়া মন্ত্রাখর সংখ্যক  
রক্ত করবা পুষ্প দ্বারা রং এই মন্ত্রে এক একবার বর্ণ সকল  
অভিমন্ত্রিত করিয়া তন্ময়দ্রোক্ত বিধানে অশ্বথ পল্লব দ্বারা  
মন্ত্রের বর্ণ সংখ্যানুসারে অভিসিঞ্চন করিবে।

বিমলীকরণ—সুঘুমার মূল ও মধ্যভাগে দেয় মন্ত্র চিত্তা  
করিয়া জ্যোতিষ্ময় অর্থাৎ ও হ্রৌ এই মন্ত্রে মলত্রয় দ্বন্দ্ব  
করিবে। ইহার নাম মন্ত্রের বিমলীকরণ। আনব্য, মায়িক  
ও কাশ্মণ এই ত্রিবিধ মল। যোষা অর্থাৎ স্ত্রী হইতে যে মল  
উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মায়িক মল, পুরুষ হইতে উৎপন্ন  
মলকে কাশ্মণ মল এবং এই উভয়বিধ মলকে আনব্য মল  
বলা যায়। এই ত্রিবিধ মল সর্কশাস্ত্রানুসৃত। মন্ত্রের  
বিমলীকরণ করিলে এই ত্রিবিধ মল নষ্ট হয়।

আপ্যায়ন—স্বর্ণ ও কুশ অথবা পুষ্পোদক দ্বারা পূর্ব-  
লিখিত জ্যোতিষ্ময় মন্ত্র আপ্যায়ন করিবে।

তর্পণ—পূর্বোক্ত জ্যোতিষ্ময় দেয় মন্ত্রের বর্ণসংখ্যায় জল  
দ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে বিশেষ এই, শক্তিমন্ত্র-  
বিষয়ে মধু দ্বারা, বিষ্ণু মন্ত্রে কর্পূরমিশ্রিত জল দ্বারা এবং

শিবমন্ত্রে ছন্দ দ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। অভিষেকও এই-রূপ প্রণালীতে করিতে হয়।

দীপন—“ওঁ হ্রীং ত্রীং”মন্ত্রে মন্ত্রের দীপ্তি সাধন করিতে হইবে।

গুপ্তি—যে মন্ত্র তপ করিবে, তাহা প্রকাশ করিবে না, সর্বদা গোপন ভাবে রাখিতে হইবে। এইরূপে মন্ত্রের প্রণালীতে মন্ত্রের সংস্কার করিয়া গ্রহণ করিলে সাধক অভীষ্ট লাভ করে।\*

মন্ত্রগ্রহণের পূর্ক দিন গুরু ও শিষ্য উভয়েই সংযত হইয়া থাকিবেন। পরে মন্ত্র লইবার দিন গুরু দীক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে শিষ্যকে মন্ত্র দিবেন।

বংশপরম্পরায় এক এক দেবতার উপাসক দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ কোন বংশ কালীমন্ত্র উপাসক, কেহ বা তারামন্ত্র, ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন বংশে মহাবিষ্ণুদি বিভিন্ন দেবতার উপাসনা প্রণালী প্রচলিত আছে। বোধ হয়, ঐ বংশের কোন মহাপুরুষ ঐ দেবতার উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তদবধি তাহার বংশপরম্পরাক্রমে ঐ দেবতার উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। এক একটা দেবতার অনেক-গুলি বীজ মন্ত্র আছে, গুরু পূর্বোক্ত প্রণালী অনুসারে বীজমন্ত্রের মধ্যে কোন বীজমন্ত্র তাহার অমুকুল মন্ত্র হইবে, তাহা স্থির করিয়া শিষ্যকে দিবেন। কিন্তু কুল-দেবতা ঠিক রাখিবেন। কুলদেবতা পরিত্যাগ করিয়া অত্

দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করিলে সিদ্ধি হয় না। এইজন্য সর্বদাই কুলদেবতার প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়া বিধেয়।

মন্ত্রগ্রহণে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতির ভেদবুদ্ধি বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। ইহার মধ্যে যে কোন দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করা যাউক না কেন, ভক্তিপূর্বক উপাসনা করিলে তাহাতেই সিদ্ধি হইবে। কালী তারাদিনামে পৃথক্ হইলেও উহা বস্তুতঃ পৃথক্ নহে, এক; কেবল সাধকদিগের হিতের জন্য মহামায়া নানারূপ ধারণ করিয়াছেন।

“ধ্যায়ন্তি তং বৈষ্ণবাস্চ কৃষ্ণং শ্রামলমুন্দরম্।

কেচিচ্চতুর্ভূজং শাস্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরম্ ॥

ত্রিশূলধারিণং কেচিৎ পঞ্চবক্তং দিগম্বরম্।

নানারূপঞ্চ পশুন্তি ধ্যানামুসারতঃ স্যাম্ ॥

সা দেবী প্রকৃতিত্রীক্ষা তেজোমণ্ডলবাসিনী।

কেবলং প্রকৃতিশৈচক্য দৃষ্টতে ভক্তিযোগতঃ ॥

ভিত্তিতে সা কতিবিধা সূর্যো দর্পণসন্নিধৌ।

আকাশো ভিত্তিতে যাদৃক্ ঘটস্থাদিস্তথা চ সা ॥

একৈব সা মহাবিষ্ণু নামমাত্রং পৃথক্ পৃথক্।

চিত্তরূপা মহামায়া পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥

সেবকানুগ্রহার্থায় নানারূপং দধার সা।” ইত্যাদি।

( হরতত্ত্বদীর্ঘিতিত্বতত্ত্ববচন )

অনুক ‘কালীমন্ত্র’ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আমি ঐ মন্ত্রগ্রহণ করিলে সিদ্ধি হইতে পারিতাম, সাধকের এইরূপ ভাবনা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। যাহার যে কুল-দেবতা আছে, সেই দেবতার মন্ত্রগ্রহণই তাহার পক্ষে শুভকর।

সাধক যদি দৈববশতঃ অনেকগুলি মন্ত্র লাভ করে, তাহা হইলে সেই সকল দেবতারই পূজাদি করিতে হইবে এবং ঐ সকল দেবতার মধ্যে যে দেবতার প্রতি তাহার ভয় হইবে, তাহার মন্ত্রাদি জপ করাই বিধি।

“অথ দৈবাং গৃহীতবহুমন্ত্রসাধকস্ত ইতি কর্তব্যতামাহ, সমর্যচারতন্ত্রে অষ্টমপটলে—

বহুমন্ত্রী যদা দেবি সাধকো দৈবযোগতঃ।

তস্ত কস্ত জপং কুর্যাৎ পুত্রনাদিকমেব চ ॥

সর্বদেবনমস্কারং নিত্যং কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ।

জপাদিকস্ত তস্তৈব যত্র শঙ্কা প্রজায়তে ॥” (হরতত্ত্বদীর্ঘিতি)

গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিয়া যদি দেশান্তর গমন করেন, বা তাঁহার মৃত্যু হয় এবং শিষ্য যদি দুরদৃষ্টবশতঃ নিজমন্ত্র বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে শিষ্য প্রথমে গুরুপুত্রকে ডাকাইয়া মন্ত্রবিস্মৃতির কথা নিবেদন করিবে এবং গুরুপুত্রও সেই দেবতার সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন; পন্থ মন্ত্র শুনিয়া শিষ্যের

\* “মন্ত্রাণাং মাত্রিকায়দ্বাক্ষারো জননং স্মৃতম্।

পত্রিক্রমেণ বিধিনা মুনিভিঃ স্তত্র নিশ্চিতম্ ॥

প্রণবাস্তবিতান্ কুর্যাদ মন্ত্রবর্ণান্ জপেং স্ত্রধীঃ।

প্রত্যেকং শতবারস্ত জীবনং তদুদাহৃতম্ ॥

মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দ্রনাভসাম্।

প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ববস্তাড়নং মতম্ ॥

দশধা শৃণু দেবেশি তাড়নং পরিকীর্তনম্।

বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংস্ত প্রস্থনৈঃ করবীৰজৈঃ ॥

তদন্তবর্ণসংখ্যাকৈঃ স্তত্রাশ্রয়েণ বোধনম্।

বিলিখ্যাক্ষরসংখ্যাতৈঃ পুষ্পৈরস্তব্ধাদিভিঃ ॥

মন্ত্রবর্ণান্ বক্তিনৈকমভিমম্র্য স কুং স কুং।

তদন্তব্রহ্মোক্তবিধিনা অভিষেকঃ প্রকীর্তনঃ ॥

অন্থথপন্নবৈঃ সিক্বেং মন্ত্রী বর্ণাংসংখ্যয়া।

সঙ্কিত্য মনসা মন্ত্রং স্মর্যম্মূলমধ্যতঃ ॥

জ্যোতির্ময়ৈণ বিধিবদ্ধেহম্মলত্রয়ং যতিঃ।

স্বর্ণেন কুশতোয়েন পুষ্পতোয়েন বা থবা ॥

স্তেন মন্ত্রেণ বিধিবদাধ্যায়নবিধিঃ স্মৃতঃ।

মন্ত্রেণ বারিণা যন্ত্রে তর্পণং তর্পণং মতম্ ॥

মধুনা শক্তিমন্ত্রেহু বৈষ্ণবে চেন্দ্রমজ্জলৈঃ।

শৈবে যুতেন দুগ্ধেন তর্পণং সমাগীরিতম্ ॥” ইত্যাদি। ( তন্ত্রসার )

যদি ঐ মন্ত্র স্মরণ হয়, তাহা হইলে শিষ্য সেই মন্ত্রেরই উপাসনা করিবে। যদি গুরুপুত্রও না থাকে, তাহা হইলে সেই বংশে যে কেহ মন্ত্রাভিজ্ঞ থাকিবেন, তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিবে। যদি গুরুবংশীয় কেহ না থাকে, তাহা হইলে মন্ত্রতন্ত্রাভিজ্ঞ কোন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পূর্বোক্ত নিয়মামুসারে মন্ত্র স্থির করিবে। শিষ্য যদি অতিশয় হ্রদৃষ্ট-বশতঃ কুলদেবতাও বিস্মৃত হন, তাহা হইলে গুরুপুত্রগণ শিষ্য সমীপে সকল দেবতার নাম উচ্চারণ করিবেন, ঐ সকল দেবতার নাম শুনিয়া যদি দেবতা স্মরণ হয়, তাহা হইলে ঐ দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করাই বিধেয়। যদি কোন ক্রমে দেবতার নাম স্মৃতিপথে না আসে এবং অতীতকালে জানিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের যে দেবতার প্রতি অধিক ভক্তি থাকে, শিষ্য সেই দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করিবেন।

“অথ হ্রদৃষ্টবশাং মন্ত্রবিস্মৃতৌ গুরৌ দেশান্তরগতে যুতে বা উপায়নাম্ কালীবিলাসতন্ত্রে তৃতীয়পটলে—

দবা মন্ত্রঃ তথা বিদ্যাং গুরুদেবশাস্ত্রং গতঃ।

শিষ্যৈঃ গুরুমুখাচ্ছূয়া মন্ত্রো বিদ্যা চ বিস্মৃতা।

কিং কৰ্তব্যং তদা দেবি শিষ্যেণ বদ সাম্প্রতম্॥

শ্রদ্ধা চাত্তরস্তান্ত্রাত্মিকস্ত স্মর্যজিতে।

পূর্ববিদ্যাং তথা শ্রদ্ধা জ্ঞাত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥

তথা গুরুপুত্রাদিনা তদভাবে তৎশাস্ত্রজ্ঞাতে নাশ্চেনাখিলেষু মন্ত্রজ্ঞাতে সচ্চরিতেষু স্বসমস্ত অৰণ্যাদবশ্যং স্মৃতিজায়তে, প্রচুরহ্রদৃষ্টবশেন তত্রাপ্যনিশ্চয়ে তদেবতামন্ত্রাস্তরং গৃহীয়াং তত্রাপ্যতিহ্রদৃষ্টবশাং দেবতাবিস্মৃতৌ বহু দেবেষু উচ্চরিতেষু যদি স্মৃতিজায়তে, তদা তন্মন্ত্রং গৃহীয়াং। তত্রাপি দেবতাস্মৃতিরভাবে যত্র প্রচুরতরভক্তিঃ সৈবোপায়া।

“স্বাস্তঃকরণবৃত্ত্যেব যত্র শ্রদ্ধা গরীয়সী।

সৈবোপায়া প্রযত্নেন বিচারস্তত্র নিষ্ফলঃ॥”

( হরতত্ত্বদীপ্তি )

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গুরু কিংবা গুরুদত্ত মন্ত্র ত্যাগ করিতে নাই। কিন্তু গুরু যদি মহাপাতকী বা দেবনিন্দক প্রভৃতি দোষদুষ্ট হন, তবে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অত্র গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ মন্ত্রও যদি অমুচ্ছাৰ্য্য, শত্রুগৃহগত, কিংবা অসংস্কৃত ও অবৈধভাবে গৃহীত হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করা চলে এবং তাহাতে কোন প্রত্য-বায়েরও আশঙ্কা নাই।

“গৃহীতমন্ত্রস্ত্যক্তব্যো গুরুশ্চৈবদোষসংযুতঃ।

মহাপাতকযুক্তো বা গুরুশ্চৈবদেবনিন্দকঃ॥

XIV

অমুচ্ছাৰ্য্যশ্চ যো মন্ত্রঃ শত্রুগৃহগতস্তথা।

অসংস্কৃতগৃহীতশ্চাবিবিদীক্ষাপুরঃসরঃ।

তাক্সা সৰ্বপ্রযত্নেন পুনগ্রাহ্যং যথাবিধি॥

ইতি বচনাদ্গুরুস্মরণং গৃহীয়াং” ( হরতত্ত্বদীপ্তি )

অকারণে গুরু ও মন্ত্রত্যাগ করিলে পূর্বোক্ত ফল হইয়া থাকে, নচেৎ নহে। মন্ত্রদাতা গুরুর মৃত্যুতে শিষ্যের তিন দিন অশৌচ হয়।

“গৃহীতো দেবতামন্ত্রঃ সাবিত্রীগ্রহণং কৃতম্।

যস্মাত্তস্ত ত্রিরাত্রস্ত রক্ষোদ্বিত্যাগ্রহো যতঃ॥”(হরতত্ত্বদীপ্তি)

শিষ্য গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া বাহাতে মন্ত্র সিদ্ধি হয়, তাহার প্রতি বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

মন্ত্রসিদ্ধির উপায়—

“সমাগমুত্তিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।

পুনস্তেনৈব কৰ্তব্যং ততঃ সিদ্ধৌ ভবেদ্বৈশ্বম্॥

পুনরুত্তিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।

পুনস্তেনৈব কৰ্তব্যং ততঃ সিদ্ধৌ ন সংশয়ঃ॥

পুনঃ সোহুত্তিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধৌ ন জায়তে।

উপায়ান্ত্র কৰ্তব্যঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ॥

ভ্রামণং রোদনং বশ্রং পীড়নং শোষণোষণে।

দহনাস্তং ক্রমাৎ কুর্য্যাদ ততঃ সিদ্ধৌ ভবেদমমুঃ॥”

ইত্যাদি। ( তন্ত্রসার )

যথাবিধি পুরশ্চরণাদির অমুষ্ঠানে মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। সম্যকরূপে পুরশ্চরণাদি অমুষ্ঠান করিলেও যদি মন্ত্র সিদ্ধি না হয়, তবে পূর্বের ত্রায় পুরশ্চরণাদি আবার করিতে হইবে। তাহাতেও যদি মন্ত্র সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনরায় পুরশ্চরণাদির অমুষ্ঠান করিবে। এইরূপে তিনবার যথোক্ত বিধানে কার্য্যামুষ্ঠান করিলেও যদি মন্ত্র সিদ্ধি না ঘটে, তবে শঙ্করোক্ত সপ্তবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ভ্রমণ, রোদন, বশীকরণ, পীড়ন, শোষণ, গোষণ ও দাহন এই সপ্তবিধ উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে।

মন্ত্রের ভ্রমণ যথা,—বং এই বায়ুবীজ দ্বারা মন্ত্রবর্ণ সকল গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ মন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণ সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া একটা বায়ুবীজ এবং একটা মন্ত্রাক্ষরযন্ত্রে সমস্ত যন্ত্রবর্ণ লিখিয়া শিলারস, কপূর, কুঙ্কুম, উশীর ও চন্দন এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহা দ্বারা যন্ত্রোপরি মন্ত্র সকল লিখিতে হইবে। পরে ঐ লিখিত মন্ত্র ছন্দ, স্মৃত, মধু ও জল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। যথাবিধানে পূজা, জপ ও হোম করিতে হইবে। ইহাই মন্ত্রের ভ্রমণ। এইরূপ অমুষ্ঠান করিলে অচিরে

মন্ত্র সিদ্ধি হয়। ইহাতেও যদি মন্ত্রের সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের রোধন করিবে। মন্ত্রের রোধন,—ঐ এই বীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া যথাসাধ্য জপ করিবে। যদি রোধনক্রিয়াতেও মন্ত্র সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের বশীকরণ করিতে হইবে। মন্ত্রের বশীকরণ,—অলঙ্ক, রক্ত-চন্দন, কুড়, ধূতুরবীজ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য দ্বারা ভূজপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিবে। ইহাকে মন্ত্রের বশীকরণ কহে। এই রূপ বশীকরণ করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের পীড়ন করিতে হইবে। মন্ত্রের পীড়ন,—অধরোত্তরযোগে মন্ত্র জপ করিয়া অধরোত্তররূপিনী দেবতার পূজা করিবে। পরে আকন্দের ছুঁই দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া পদ দ্বারা আক্রমণপূরক প্রাতিদিন হোম করিবে। ইহাই মন্ত্রের পীড়ন। ইহাতেও যদি মন্ত্র সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের পোষণ করিতে হইবে। মন্ত্রের পোষণ,—মূল মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ত্রিবিধ বালাবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং গোহৃৎ দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া হস্তে ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে মন্ত্রের সিদ্ধি না হইলে মন্ত্রের শোষণ করিতে হইবে। মন্ত্রের শোষণ,—বৎ এই বায়ুবীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে এবং ঐ মন্ত্র যজ্ঞর ভঙ্গ দ্বারা ভূজপত্রে লিখিয়া গলে ধারণ করিবে। উক্ত প্রকারেও মন্ত্র সিদ্ধি না হইলে মন্ত্রের দাহন করিতে হইবে। মন্ত্রের দাহন,—মন্ত্রের এক একটা অক্ষরের আদি, মধ্যে ও অন্তে রং এই অগ্নিবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং গলাগ্নিবীজের তৈল দ্বারা সেই মন্ত্র লিখিয়া স্বকদশে ধারণ করিবে।

এই সকল প্রক্রিয়ার এক একটা করিলেই মন্ত্র সিদ্ধি হয়, বহু প্রক্রিয়া অনাবশ্যক। একটা প্রক্রিয়া দ্বারা যদি মন্ত্র সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলেই পরবর্তী প্রক্রিয়া করা প্রয়োজন।

মন্ত্রসিদ্ধির অন্তবিধ উপায়—অনুলোম ও বিলোমে মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া শতবার মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে কেবল মন্ত্র জপ করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালাতে জপ করিতে করিতে যখন লক্ষ জপ পূর্ণ হইবে, তখন নিশ্চয়ই মন্ত্র সিদ্ধি হইবে।

“ভ্রামণং বায়ুবীজেন গ্রন্থনং ক্রমযোগতঃ।

তন্ময়ং যন্তে হালিখ্য শিল্লকপূরকুঙ্কুমৈঃ ॥

উপীরচন্দনাভ্যাস্ত মন্ত্রং সংগ্রাহতং লিখৎ।

ক্ষীরাজ্যমবৃত্তোয়ানাং মধ্যে তল্লিখিতং ভবেৎ ॥

পূজনাং জপনাক্রোমাং ভ্রামিতঃ সিদ্ধিদো ভবেৎ।

ভ্রামিতো নৈব সিদ্ধিঃ স্ত্রাদোধানং তস্ত কারয়েৎ ॥

সান্নস্বতেন বীজেন সংপৃষ্টিকৃত্য সংজপেৎ।

এবং ক্রকো ভবেৎ সিদ্ধো নচেদেতদ্বর্ণাকুর ॥

অলঙ্কং চন্দনং কুঠং হরিদ্রামাদনং শিলা।

এতৈস্ত মন্ত্রমালিখ্য ভূজপত্রে সূশোভনে ॥

ধার্যঃ কণ্ঠে ভবেৎ সিদ্ধঃ পীড়নং বাস্ত কারয়েৎ।

অধরোত্তরযোগেন পদানি পরিজপ্য বৈ ॥

ধ্যয়েচ্চ দেবতাং তদ্বদধরোত্তররূপিনীম্।

বিজ্ঞামাদিত্যঙ্কেন লিখিৎসাক্রম্য চাত্মনুগা।

তথা ভূতেন মন্ত্রেণ হোমঃ কার্যো দিনে দিনে ॥

পীড়িতো লজ্জরাবিষ্টঃ সিদ্ধঃ স্ত্রাদথ পোষণেৎ।

বালায়াজিতয়ং বাজমাগ্নস্তে তস্ত যোজয়েৎ ॥

গোক্ষীরমধুনালিখ্য বিজ্ঞাং পাণৌ বিধারণেৎ।

পোষিতোহয়ং ভবেৎ সিদ্ধো নচেৎ কুর্কীত শোষণম্ ॥

দ্বাভ্যাস্ত বায়ুবীজাভ্যাং মন্ত্রং কুর্য্যৎ বিদভিতম্।

এষা বিজ্ঞা গলে ধার্য্য লিখিৎস বরভূতনা ॥

শোষিতশ্চাপ্যসিদ্ধশ্চৈদহনীয়োহগ্নিবীজতঃ।

আয়েয়েন তু বীজেন মন্ত্রেষ্টেকৈকমক্ষরম্ ॥

আগ্নস্তমধ উজ্জ্বল যোজয়েদাহকর্ণাণি।

ব্রহ্মবৃক্ষস্ত তৈলেন মন্ত্রমালিখ্য ধারণেৎ ॥

স্বকদশে ততো মন্ত্রঃ সিদ্ধঃ স্ত্রাচ্ছকরোদিতঃ।

ইত্যেবং কাথিতং সমাকৃ কেবলং ভাক্তযোগতঃ ॥

এতেন তু কৃতার্থঃ স্ত্রাদ বহিঃ কিসু সূত্রত।

অথাত্মং সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসিদ্ধেস্ত কারণম্ ॥

মাতৃকাপুটিং কৃত্বা পমন্ত্রং প্রজপেৎ সূচীঃ।

ক্রমোংক্রমাচ্ছতাবৃত্যাতদন্তে কেবলং মনুম্ ॥

এবম্ প্রত্যহং কুর্যাদ্ যাবমক্ষং সমাপাতে।

নিশ্চিতং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্ত্রাদিত্যুক্তং কন্মবেদিতিঃ ॥” (তন্ত্রসার)

মন্ত্র সিদ্ধি হইল কি না? তাহা নিম্নোক্ত লক্ষণ দ্বারা জানা যাইবে।

মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ,—মনোরথসিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। সাধক যখন যে অভিলাষ করেন, তখন অক্লেপে সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। মৃত্যুহরণ, দেবতাদর্শন প্রভৃতিও মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ। যাঁহার তপোযোগাদি দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধি হইবে, তিনি দেবতাকে দেখিতে পান, মৃত্যু নিবারণ করিতে পারেন, পরকায় প্রবেশ অর্থাৎ অস্ত্রের মনোগত ভাব জানিতে পান, এবং তাঁহার অদৃষ্টবশে পরপুরে প্রবেশ, শূন্যমার্গে বিচরণ ও সর্বত্র গমনের শক্তি হয়। এতস্তির খেচরী দেবীগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি তাহাদিগের কথা শ্রবণ করিতে পারেন। ভূচ্ছিন্নদর্শন, পাথিবতত্ত্বজ্ঞান, দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি, বাহন ভূষণাদি বহু দ্রব্যলাভ এবং দীর্ঘজীবনপ্রাপ্তি এ সকলও তাঁহার ঘটিয়া থাকে। মন্ত্রসিদ্ধি ব্যক্তি রাজা বা রাজপরিবার-

বর্ণের বণীকরণ এবং সর্বস্থানে চমৎকারজনক কাব্য প্রদর্শন করিয়া সুখে কাল যাপন তাহার দৃষ্টিমাত্রই রোগোপশম এবং সর্বপ্রকার বিষ নিবারণ হইয়া থাকে ও সর্বশাস্ত্রে অঘটনশুলভ পাণ্ডিত্য লাভ হয়। তিনি সন্মত বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, মুক্তি-কামনা, সর্বপরিভ্যাগশক্তি, সর্ববণীকরণক্ষমতা, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস, সর্বভূতের প্রতি দয়া এবং সর্বজ্ঞতা গুণের অধিকারী হন। এই প্রকার গুণ মধ্যবিধ সিদ্ধির লক্ষণ।

কীর্তি ও বাহনভূষণাদি লাভ, দীর্ঘজীবন, রাজপ্রিয়তা, রাজপরিবারাদি সর্বজনবাৎসল্য, লোকবণীকরণ, বিপুল ঐশ্বর্য, অতুল ধনসম্পত্তি, পুত্রদারাদি সম্পদ, এত সকল গুণ অধম মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ। মন্ত্রসিদ্ধির প্রথম অবস্থায় এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। বাস্তবিক যাহারা প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাহারা সাক্ষাৎ শিবত্ব।

মন্ত্রের দোষ।—পূর্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র ভুবনেশ্বরীর একাঙ্কর মন্ত্রের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, তাহাতে তিনি এই মন্ত্রের প্রতি অভিশাপ দেন, সেই অভিশাপে উক্ত মন্ত্র ভেজোহীন হয়, যদি কেহ ভুবনেশ্বরীর একাঙ্কর মন্ত্রের উপাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধি হয় না। পরে এই মন্ত্রের শাপোক্তার হয়। তৎপরে এই মন্ত্রকে বাগ্বীজ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া আরাধনা করিলে ঐ দোষ নিরাকৃত হয়। এইরূপে ভুবনেশ্বরীর কামরাজাখ্য অভিমন্ত্রিত মন্ত্র কামবীজ দ্বারা পুটিত করিলেও উহার দোষ নষ্ট হয়।

ভারবিচার মন্ত্রে সকার যোগ করিলে শাপদোষ বিদূরিত হয়। ভৈরবী প্রভৃতি বিচার মন্ত্র সুষুপ্তাদি দোষযুক্ত হইলে জপ করিবে না। সুষুপ্ত, দক্ষ, ও কীলিত মন্ত্র জপ করিলে মৃত্যু হয়। মদোন্নত, মুচ্ছিত, বীণ্যহীন, স্তম্ভিত, ছিন্ন, বৃদ্ধ, বৃদ্ধ ও নির্বীণ্য মন্ত্র জপে কোন ফল হয় না।

বিশ্বদারতন্ত্রে লিখিত আছে,—ছিন্ন, বৃদ্ধ, শক্তিহীন, পরাশ্রুত, বধির, নেত্রহীন, কীলিত, স্তম্ভিত, দক্ষ, শস্ত, ভীত, মলিন, তিরস্কৃত, ভেদিত, সুষুপ্ত, মদোন্নত, মুচ্ছিত, হতবীণ্য, হীন, প্রধ্বস্ত, বালক, কুমার, বুবা, প্রোঢ়, বৃদ্ধ, নিঃশিংশক, নির্বীণ্য, সিদ্ধিহীন, মন্দ, কুট, নিরংশক, সন্মহীন, কেবর, কীবহীন, ধূমিত, আলিঙ্গিত, মোহিত, ক্ষুধার্ত, অতিদৃগু, অঙ্গহীন, অতি ক্রুর, সত্রাড়, শাস্তমানস, স্থানভ্রষ্ট, বিকল, নিঃস্নেহ, অতিবৃদ্ধ ও পীড়িত এই সকল মন্ত্র দূষিত।

ছিন্ন প্রভৃতির লক্ষণ তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে—যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অবসানে বায়ুবীজ (যং) বা বক্রণ বীজ (বং) সংযুক্ত থাকে, অথবা যাহা ত্রিধা, চতুর্ধা বা পঞ্চধা স্বর বিশিষ্ট হয়; তাহাকে ছিন্নমন্ত্র কহে।

যে মন্ত্রের আদি, মধ্য অথবা অন্তে দুইটা পৃথাবীজ (লং) যুক্ত আছে, তাহার নাম রুদ্ধমন্ত্র, এই মন্ত্র ভুক্তি ও মুক্তি-প্রদানে অযোগ্য। যে মন্ত্রের মধ্যে কামবীজ (ক্লী) নাই এবং আদিতে মায়াবীজ (ম্রী) এবং অক্ষুবীজ (ক্ৰো) আছে, তাহার নাম পরাশ্রুতমন্ত্র, যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অবসানে হং অথবা সং এই বীজ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম বধির। যে মন্ত্র পঞ্চাঙ্কর এবং র, শ ও স বর্জিত, সেই মন্ত্র নেত্রহীন, উক্ত মন্ত্রের আরাধনা করিলে হং, শোক ও রোগ হইয়া থাকে। যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে ‘হংসঃ’ ‘হৌ’, ঐ, হং ফট্, ক্রো, ক্লী ও নমামি’ এই সকল বীজ থাকে, তাহাকে কীলিত মন্ত্র কহে। উক্ত মন্ত্রে আরাধনা করিলে কোন প্রকার সিদ্ধি হয় না। যে মন্ত্রের মধ্যে লং ও ফট্ ইহার কোন একটি বীজ এবং অন্তে দুইটা বীজ না থাকে, সেই মন্ত্রকে স্তম্ভিত বলে। উক্ত মন্ত্রে কোনরূপ সিদ্ধি হয় না। যে সপ্তাঙ্কর মন্ত্র র ও য এই বর্ণদ্বয় সংযুক্ত, তাহাকে দক্ষমন্ত্র, যে মন্ত্র ঙ্গাঙ্কর, ত্র্যাঙ্কর, ষড়্‌াঙ্কর, অথবা অষ্টাঙ্কর ও ফট্ এই বীজসংযুক্ত, সেই মন্ত্রকে শস্ত কহে। এত সকল মন্ত্রও সর্বসিদ্ধিদায়ক নহে। যে মন্ত্রের আদিতে হ্রীং বা ওঁ এত বীজদ্বয়ের একটিও নাই, সেই মন্ত্রকে ভীতমন্ত্র, যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অবসানে চারিটা করিয়া বর্ণ আছে, সেই মন্ত্রকে মলিন মন্ত্র বলা যায়, এই মন্ত্রের আরাধনা করিলে সকল প্রকার বিঘ্ন হয়। যে মন্ত্রের মধ্যে দকার, আদিতে হ্রীং, এবং অন্তে ফট্ এই ত্রিবিধ বীজ থাকে, সেই মন্ত্র তিরস্কৃত, যে মন্ত্রের স্বদ্বয়ে হকারদ্বয়, শীর্ষে বষট্ এবং মধ্যে বোষট্ আছে, সেই মন্ত্রকে ভেদিত কহে, উক্ত মন্ত্রের উপাসনা বিশেষ নিষিদ্ধ। ‘হংসঃ’ এই বীজবিহীন ত্র্যাঙ্কর-মন্ত্রকে সুষুপ্ত মন্ত্র বলে। বিদ্যা অথবা মন্ত্র অর্থাৎ জীদৈবত বা পুংদৈবত মন্ত্র যদি সপ্তদশাঙ্কর ও ফট্‌কার পঞ্চকাদি যুক্ত হয়, তাহাকে মদোন্নত মন্ত্র কহে। যে সপ্তদশাঙ্করমন্ত্রের মধ্যে ফট্‌কার থাকে, সেই মন্ত্র মুচ্ছিত, এই মন্ত্রের আরাধনায় কোন প্রকারই সিদ্ধিলাভ হয় না। যে মন্ত্রের অবসানে পঞ্চ ফট্‌কার আছে, সেই মন্ত্র হতবীণ্য। যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে ফট্‌কার চতুর্ধয় বিদ্যমান আছে এবং ঐ মন্ত্র যদি অষ্টাদশাঙ্কর হয়, তাহা হইলে উচ্চা হীন মন্ত্র। যে একবিংশাঙ্কর মন্ত্রের ‘ওঁ হ্রীং ক্রো’ এই বীজদ্বয় সংযুক্ত আছে, তাহাকে প্রধ্বস্ত মন্ত্র, যে মন্ত্র সপ্তাঙ্কর, তাহা বালক, অষ্টাঙ্কর মন্ত্র কুমার, ষড়্‌াঙ্কর মন্ত্র বুবা, এই সকল মন্ত্রের উপাসনা করিলে কোন প্রকার সিদ্ধি হয় না। যে মন্ত্রে চতুঃষষ্টি বর্ণ আছে, তাহাকে প্রোঢ়, যে মন্ত্র ত্রিংশদাঙ্কর, চতুঃষষ্টি বর্ণ, শতাঙ্কর অথবা চতুঃশতাঙ্কর, তাহাকে বৃদ্ধমন্ত্র,

যে মন্ত্র নবাক্ষর তাহার নাম ত্রিংশ, যে মন্ত্রের অন্তে 'নঃ' ও মধ্যে স্বাহা শব্দ থাকে এবং বট্ ও ছ্ এই দুই শব্দ বিদ্যমান নাই, বোষট্ এবং ফট্ কারযুক্ত, অথচ শিবশক্তিবর্ণবিহীন সেই মন্ত্র নির্বোধ্য, যে মন্ত্রের আদি মধ্যাদিতে বট্ প্রকার ফট্ কার থাকে, সেই মন্ত্র সিদ্ধিহীন, যে মন্ত্রে পংক্তাক্ষর বর্তমান আছে, সেই মন্ত্রের নাম মন্দ, একাক্ষর মন্ত্রকে কুণ্ড এবং দ্ব্যাক্ষর মন্ত্রকে নিরংশক কহে। ষড়ক্ষর মন্ত্র কেকর, সার্কিবাংশাক্ষর মন্ত্র শুমিত। এই সকল মন্ত্রই নিন্দিত। সার্কিবীজদ্বয়যুক্ত এক বংশাক্ষর কিংবা ত্রিংশাক্ষর মন্ত্রকে আলিঙ্গিত, যে মন্ত্র দ্বাবংশাক্ষরযুক্ত, তাহাকে মোহিত, যে মন্ত্র চতুর্বিংশতিবর্ণ কিংবা সপ্তবিংশতি বর্গ, তাহাকে ক্ষুধার্ত, যে মন্ত্র দ্বাবিংশতিবর্ণ, একাদশাক্ষর, পঞ্চবিংশতিবর্ণ, বা ত্রয়োবিংশতিবর্ণ তাহা অতি দৃপ্ত, যে মন্ত্র ষড় বিংশতি বর্ণ, ষট্ ত্রিংশাক্ষর বা একোত্রিংশাক্ষর, তাহা অঙ্গহীন, যে মন্ত্র অষ্টাবিংশাক্ষর অথবা একবিংশতি বর্ণযুক্ত এই মন্ত্র অতিক্রুর, এই মন্ত্র সকল কার্যেই নিন্দনীয়। যে মন্ত্র বংশাক্ষর, অথবা ত্রিংশাক্ষর, তাহা অতিক্রুর, চত্বারিংশৎ হইতে ত্রিংশটি পর্যন্ত বর্ণবিশিষ্ট মন্ত্র সত্রীড়, যে সকল মন্ত্র পঞ্চাশটি বর্ণযুক্ত, তাহা শান্তমানস, পঞ্চাশটি হইতে একোদশত পণ্যস্ত বর্ণবিশিষ্ট মন্ত্র স্থানভ্রষ্ট, যে সকল মন্ত্র ত্রয়োদশাক্ষর বা পঞ্চবিংশতিবর্ণবিশিষ্ট, তাহা বিকল, যে যে মন্ত্র শতাক্ষর, দ্বাদ্ধিশতাক্ষর, দ্বিশতাক্ষর, একনবতিবর্ণ, দ্বিনবতিবর্ণ, অথবা দুইশত সংখ্যক বর্ণবিশিষ্ট, মন্ত্র সকল নিঃস্নেহ। চারি শত হইতে সহস্র পর্যন্ত ষাবতীয় কবর্ণ সংখ্যাবিশিষ্ট মন্ত্রকে অতিবুদ্ধ কহে। এই মন্ত্র সকলশাস্ত্রে নিন্দিত। যে যে মন্ত্রে সহস্রাধিক বর্ণ আছে, সেই সেই মন্ত্রকে পীড়িত, যে সকল মন্ত্রে দুই সহস্রের অধিক বর্ণ আছে, সেই সকল মন্ত্র স্তোত্র নামে অভিহিত, এই স্তোত্ররূপ মন্ত্র হইলে তাহাকে সপ্তভাগে বিভাগ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে।

মন্ত্র কিংবা বিদ্যার আরাধনা করিতে হইলে অবশ্য উক্ত দোষ সকল বিচার করিয়া কার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি কথিত 'দোষ' সকলের বিচার না করিয়া মন্ত্রাদিগ্রহণ ও তাহার জপাদি করে, শতকোটিকল্পেও তাহার সিদ্ধি হয় না। অতএব সুবিজ্ঞ সাধক বিশেষ বিবেচনার সহিত মন্ত্রের দোষ সকল বিচার ও বিধানক্রমে শাস্তি করিয়া মন্ত্রের জপাদি করিবেন।

মন্ত্রের দোষশাস্তি—

“তদৈব ছিন্নাদিহুতা মন্ত্রান্ত্রে নিরূপিতাঃ।

তে সর্বে সিদ্ধিমায়াস্তি মাতৃকাংপ্রভাবতঃ।।

মাতৃকাণিঃ পুটীকৃত্য মন্ত্রঃ বিদ্যাঃ বিশেষতঃ।

শতমষ্টোত্তরং পূর্নং প্রজপেৎ ফলসিদ্ধয়ে।।

তদা মন্তো মহাবিজ্ঞা যথোক্তফলদো ভবেৎ।

মাতৃকাপুটিতং কৃত্বা মধ্যে বর্ণং বিধায় চ।।

মন্ত্রবর্ণাংস্ততঃ কুর্ধ্যাৎ শোধনং তন্ত্রবেদিভিঃ।

বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং তাং সঙ্কোচাধারপঙ্কজম্।

তত্বেপন্নান্ মন্ত্রবর্ণান্ কুণ্ডতশ্চ গতাগতান্।

ব্রহ্মরদ্ধাবধি ধ্যাত্বা বায়ুমাণ্ড্য কুন্তয়েৎ।।

সহস্রং প্রজপেৎ মন্তী মন্ত্রদোষপ্রশান্তয়ে।

এষু দোষেষু প্রাপ্তেষু মায়াং কামমথাপি বা।।

ক্ষিপ্ত্বা চান্দো শ্রিয়ৈকৈব তদ্বৃণবিমুক্তয়ে।

তারসংপুটিতো বাপি দুষ্টমন্তোহপি সিধ্যতি।।

যন্ত যত্র ভবেত্তক্তিঃ সোহপি মন্ত্রঃ প্রসিধ্যতি।

প্রণবো মাতৃকাদেবী কল্পেথ্যমৃতত্ৰয়ম্।

অমৃতত্রয়সংযোগাদ্ দুষ্টমন্তোহপি সিধ্যতি।।” ( তন্ত্রসার )

মন্ত্রের যে ছিন্নাদি দোষের বিষয় কথিত হইয়াছে, নিম্নোক্ত প্রণালীতে তাহার শাস্তি হইয়া থাকে। মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মন্ত্র বা বিদ্যাকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের পূর্কে অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণের এক একটা বর্ণ পূর্কে এবং এক একটা বর্ণ পরে যোগ করিয়া অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে, তাহা হইলে মন্ত্রের পূর্কোক্ত ছিন্নাদিদোষের শাস্তি হয় এবং সেই মন্ত্র যথোক্ত রূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ মন্ত্র মধ্যে যে যে বর্ণ আছে, তাহাদিগের প্রত্যেক বর্ণের পূর্কে অকারাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকা বর্ণ সকলের এক একটা বর্ণ পূর্কে এবং এক একটা বর্ণ পরে যোগ করিয়া জপ করিবে। পরে যোনিমুদ্রা বন্ধনপূর্বক আধারপদ্ম সঙ্কোচিত করিয়া মূলাধার হইতে উৎপন্ন বর্ণ সকলকে ব্রহ্মরদ্ধ পর্যন্ত গতাগতরূপে চিন্তা করিবে। তদনন্তর বায়ু পূরণ করিয়া কুন্তক এবং সহস্রবার জপ করিলে মন্ত্রদোষের শাস্তি হয়।

অত্র প্রকার মন্ত্র সকল পূর্কোক্ত ছিন্নাদিদোষগ্রস্ত হইলে মন্ত্রের আদিতে হ্রীং ক্লীং ত্রীং এই বীজত্রয়যুক্ত করিয়া জপ করিলে মন্ত্রের দোষ শাস্তি হইয়া থাকে। তন্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, ঐ বীজ দ্বারা মন্ত্রকে পুটিত করিয়া জপ করিলে দুষ্ট মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্রগুহির নানা প্রকার প্রণালী কথিত হইল। যাহার যে প্রণালীতে ভক্তি হয়, সে সেই প্রণালী মতে মন্ত্র শোধন করিবে।

তন্ত্র হইতে আরও জানা যায় যে, প্রণব, মাতৃকাবর্ণ ও মায়াবীজ এই তিনটি অমৃত স্বরূপ, এই অমৃতত্রয়যুক্ত করিয়া মন্ত্র জপ করিলে সর্বপ্রকার মন্ত্রদোষ শাস্তি হইয়া থাকে। মন্ত্রের পূর্কে এবং পরে ঐ এই মাতৃকা বর্ণ এবং হ্রীং এই বীজ-



ত্রয়যুক্ত করিয়া জপ করিলে মন্ত্রের দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া মন্ত্র বিত্ত্বক হয়। (তন্ত্রসার)

শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ কুল-দেবতাহুসারে স্ব স্ব শুভজনক মন্ত্র গ্রহণ করিবেন।

[ কাণী তারা প্রভৃতি শব্দে তত্ত্বদেবতার মন্ত্র ও বীজ দ্রষ্টব্য। ]

তন্ত্রশাস্ত্রে বৈষ্ণবমন্ত্রেরও যথাযথ বিধান আছে, অধুনা অনেকেরই মনের এইরূপ ধারণা যে, তন্ত্রে কেবল শৈব ও শাক্তমন্ত্রই বিহিত, বাস্তবিক তাহা নহে, তন্ত্রে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকল মন্ত্রেরই বিধান দেখিতে পাওয়া যায় এবং দীক্ষাগ্রহণকালে তন্মুসারেই মন্ত্র গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু গোশ্বামারা যেখানে মন্ত্র প্রদান করেন, সেইখানেই কেবল এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতির মতে মন্ত্র দিয়া থাকেন। বর্তমানকালে অনেক বংশে পুরুষেরা বৈষ্ণব এবং তাহাদের স্ত্রীগণ শাক্তপাসক, ইহারা তন্ত্রের মতাহুসারেই মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন।

মানব উপযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া তাহার উপাসনায় জিতাপরহিত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন। মন্ত্র সিদ্ধি হইলে পরমপুরুষার্থ লাভ হয়।

মন্ত্র গ্রহণ পূর্বক যোগাবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। যোগ ব্যতিরেকে মন্ত্র দ্বারা কিংবা মন্ত্র ব্যতিরেকে কেবল যোগ দ্বারা কিছুই ফল হয় না। মন্ত্র ও যোগ উভয় সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। অন্ধকারাবৃত গৃহে বৈদ্য প্রদীপের সহায়তায় ঘট লক্ষিত হয়, সেইরূপ মায়াসমাবৃত আত্মা যোগসহকৃত মন্ত্র বলেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। যাহারা বিষয়াসক্ত তাহাদিগের পক্ষে আত্মসাক্ষ্য-কার হ্রাস। যাহারা নিলিপ্তভাবে মন্ত্রযোগের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের পক্ষেই এই আত্মদর্শন সুলভ।

“মত্ৰাভ্যাসেন যোগেন জ্ঞানং জ্ঞানায় কল্যাতে।

ন যোগেন বিনা মত্ৰো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ ॥

দ্বয়োরভ্যাসনং যোগো ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্।

তমঃপরিবৃত্তে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে ॥

এবং মারাবৃত্তো হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ।

এবং তে কথিতঃ একম্ মন্ত্রযোগমন্তুতমম্।

হৃৎভং বিষয়াসক্তৈঃ সুলভং তাদৃশামপি ॥” (তন্ত্রসার)

মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিয়া সাধক কিরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহার বিষয় তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে।

“হৃদানীঃ কথয়ে তেহং মন্ত্রযোগমন্তুতমম্।

বিষয় শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং মুনৈঃ ॥

চক্রস্থিতিতেজোভিজীবত্রৈক্যরূপকম্।

তিস্রঃ কোট্যন্তদর্শেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ ॥” (তন্ত্রসার)

এই পঞ্চভূতময় শরীর ব্রহ্মাণ্ড নামে অভিহিত, ইহাতে চক্র, সূর্য্য ও অগ্নির তেজোদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্পাদিত হয়। এই শরীরে সাক্ষিকোটি নাড়ী আছে, তাহার মধ্যে দশটী নাড়ী প্রধান, এই দশটির মধ্যে তিনটি নাড়ী প্রধান-তমা। চক্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপে এই তিন নাড়ী মেরুদণ্ডে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। যে নাড়ী বামভাগে অবস্থিত, তাহা চন্দ্ররূপিণী, গুরুবর্ণা, শক্তিরূপা এবং অমৃতময়ী, ইহার নাম ইড়া। দক্ষিণদিকে অবস্থিত সূর্য্যরূপিণী দাড়িধকুসুম-বর্ণা, পুরুষরূপ এবং বিষময়-নাড়ীর নাম পিজলা। যে নাড়ী মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে, গমন করিয়াছে, তাহার নাম সুষুম্না। এই নাড়ী সর্ব্বতেজো-রূপিণী ও বহুরূপিণী। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বিচিত্রা নামে এক নাড়ী আছে, এই নাড়ী অমৃতস্রাবণী ও সর্বদেবময়ী। এই বিচিত্রা নাড়ী বিসমস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্দু স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। মূলাধার পদ্মে একটা ত্রিকোণ আছে, ইহার তিন দিকে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। এই ত্রিকোণের মধ্য স্থলে কোটি সূর্য্যসদৃশ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বিস্তারমান আছেন এবং ত্রিকোণের উর্দ্ধ দেশে ক্রীং এই কামবীজ রহিয়াছে। স্বয়ম্ভু লিঙ্গের উর্দ্ধ দেশে অগ্নিশিখাকারা, ব্রহ্ম-রূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থান করিতেছেন, ইহার বহির্দেশে চতুর্দলে ব, শ, ষ, স, এই বর্ণচতুষ্টয় রহিয়াছে, মূল চক্রের উর্দ্ধ দেশে অগ্নির ত্রায় তেজোময় ও হীরকের ত্রায় নিম্নলিখিত ষড়্‌দল পদ্ম আছে, ইহার নাম অধিষ্ঠানচক্র। ব, ভ, ম, য, ব, ল এই ৬টা বর্ণ ষড়্‌দলে আছে।

চতুর্দলপদ্ম আধার-ষট্‌কের মূল বলিয়া উহা মূলাধার নামে খ্যাত। তাহার উপরি অধিষ্ঠিত বালিয়া দ্বিতীয় চক্রের নাম স্বাধিষ্ঠানচক্র। ইহার উর্দ্ধ নাভিদেশে মণিপুর; তথায় অর্থাৎ প্রভাসম্পন্ন দশদল পদ্ম আছে। ইহার বর্ণ মেঘের ত্রায় এবং তেজোময়। এই পদ্মের দশদলে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ এই দশটা বর্ণ রহিয়াছে। এই পদ্ম শিবের অধিষ্ঠান। সূত্ররং ইহা বিশ্বের কারণ। এই মণিপুরের উর্দ্ধে হৃদয় মধ্যে উত্তমপ্রভাকরসদৃশ অনাহত পদ্ম রহিয়াছে, এই পদ্মের দ্বাদশ দলে ক অবধি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ বিরাজিত, এই পদ্মের মধ্যে দশ সহস্র দিবাকরসদৃশ তেজঃপুঞ্জ বাণলিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন। এই বাণলিঙ্গ শব্দ ব্রহ্মময়। এই স্থানে অনাহত শব্দ প্রত্যক্ষ হয়। এইজন্ত মুনীগণ ইহাকে অনাহত পদ্ম বলেন। এই পদ্ম পরম পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত

ও আনন্দধাম। ইহার উপরি দেশে বিগুহ চক্র নামে ষোড়শ পদ্য রহিয়াছে। এই ষোড়শ দলে ধূম বর্ণ ষোড়শ স্বরবর্ণ বিস্তারিত আছে, এই পদ্য মহাপ্রভায় সমুজ্জ্বল। এই পদ্য জীবের হংসঃ মন্ত্র জপকে বিগুহ করিয়া দেয়, অর্থাৎ হংসঃ হইতে সোহং; সোহং হইতে ও, এইরূপে পরিণত করে। এই নিমিত্তই ইহার নাম বিগুহ পদ্য; ইহাকে আকাশচক্রও কহে। ইহার উপরি দেশে জহয়ের মধ্যে আত্মা কতৃক অধিষ্ঠিত আচ্ছাচক্র রহিয়াছে। এই স্থানে গুরুর আচ্ছা সংক্রামিত হয় বলিয়া ইহাকে আচ্ছাচক্র কহে। ইহার উর্দ্ধ-দেশে কৈলাসপুরী ও বোধনী চক্র বিস্তারিত।

প্রথমে মন্ত্রের পুরক দ্বারা মূল্যধারে মনঃ সংস্থাপিত করিতে হইবে। গুহদেশে ও মেট্রদেশের মধ্যস্থলে মূল্যধারে যে কুণ্ডলিনী শক্তি রহিয়াছেন, ঐস্থান আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে জাগরিত করিতে হয়। পরে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণু-গ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদনকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও অশ্রুত লিঙ্গ ভেদপুঙ্কক ঐ কুণ্ডলিনী দেবীকে বিন্দুচক্রে লইয়া যাইতে হইবে। পরে তাহা হইতে উৎখিত লাক্ষারসদৃশ যে অমৃত রস উৎপন্ন হইবে, তদ্বারা কৃষ্ণা নাম্নী যোগসিদ্ধি-দারিনী দেবীর তর্পণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরশিব, সাবিত্রী, মহালক্ষ্মী, ভদ্রকালী, ভুবনেশ্বরী, ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি ষট্চক্রোক্ত দেবতার তর্পণ করিতে হইবে। অনন্তর মন্ত্রসাধক সেই সূক্ষ্ম-রূপ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে পুনরায় মূল্যধারে আনয়ন করিবে। এইরূপ প্রতিদিন মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিলে জরামরণ প্রভৃতি কোন ভয় থাকে না। এইরূপে উপযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিলে দূষিত মন্ত্র সকলও সিদ্ধ হয়, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহাই মন্ত্রযোগ। এইরূপ মন্ত্রযোগ সিদ্ধ হইলে সাধক মহাদেবের আশ্রয় গুণ-সম্পন্ন হন।

এই মন্ত্রযোগ অবলম্বন করিয়া নিম্নোক্তরূপে ধারণা করিতে হইবে। যিনি যে দেবতার মন্ত্রের সাধনা করিবেন, তিনি দিক্‌কালাদির অনবচ্ছিন্ন সেই দেবে চিত্তসমর্পণপুঙ্কক জীব ব্রহ্মের ঐক্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তন্ময় হইয়া যাবেন। যদি সাধকের চিত্ত নিম্নলিখিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র সিদ্ধ হইতে পারিবে না। এইরূপ স্থলে মন্ত্রযোগী অবয়বযোগ দ্বারা অর্থাৎ যে কোন অবয়বে চিত্তসমাধান দ্বারা যোগ অভ্যাস করিবে। সাধক নিজ নিজ ইষ্টদেবতার শরীরে এইরূপে মনোনিবেশ করিয়া ধারণা অভ্যাস করিবে। মন্ত্রযোগী যে কোন ইষ্ট মন্ত্র অবলম্বন করিয়া জপ, হোম প্রভৃতির অমুষ্ঠান করিবেন। ইহা

ভিন্ন তাহার আর অশ্রু কিছুই অবশ্যকর্তব্য কর্তব্য নাই। যে সময় সাধক পরম ভক্ত জাত হইতে পারিবেন, তখন আর তাহার পক্ষে কোন বিধিনিষেধই থাকিবে না।

মন্ত্রযোগের প্রকারান্তর শারদাতিলকে লিখিত আছে,—

“যগ্নবতাস্থলায়ামং শরীরং উভয়াশ্রয়কম্।

গুহধ্বজান্তরে কন্দমুংসেধাদ্যজুলং বিদুঃ ॥” (তন্ত্রসার)

শিব ও শক্তি এই উভয়াশ্রয় শরীর যগ্নবতি অজুল দীর্ঘ। গুহদেশ ও ধ্বজের মধ্যস্থলে দুই অজুলি উন্নত একটা পথ আছে। ইহার বিস্তার তাহার দ্বিগুণ, এই পথ গোলাকার। এই মূল্যধার হইতে যে সমুদায় নাড়ী উদ্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি নাড়ী প্রধান। ইহার মধ্যে বামদিকে যে নাড়ী আছে, তাহার নাম ইড়া, দক্ষিণদিকে যে নাড়ী আছে তাহার নাম পিঙ্গলা, মধ্যস্থলে যে নাড়ী আছে তাহার নাম সূক্ষ্মা। এই সূক্ষ্মা মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সূক্ষ্মা নাড়ী শিখা দ্বারা পাদাস্ত্রগুণে এবং শিরা দ্বারা উর্দ্ধ ব্রহ্ম-স্থান পর্যন্ত গমন করিয়াছে। এই নাড়ী চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিস্বরূপ। এই সূক্ষ্মা নাড়ীর মধ্যে চিত্রা নামে এক নাড়ী আছে, ইহার মধ্যে পদ্মসদৃশ ব্রহ্মরন্ধ্র রহিয়াছে। এই নাড়ীতে সমুদয় আধার বিস্তারিত। ইহাই দিব্যমার্গ, ইহা দ্বারা অমৃতানন্দ ভোগ করা যায়।

আধারপদ্মের মধ্যস্থলে একটি অতি সুন্দর ত্রিকোণ মণ্ডল আছে, এই ত্রিকোণমণ্ডল দিব্য ও জ্যোতিষ্ময়। উহাতে সকলের আশ্রয়রূপা বিহীনতাসদৃশা পরমদেবতা কুণ্ডলিনী অবস্থান করিতেছেন। তাহার আকার নিদ্রিত সর্পের আশ্রয়। এই কুণ্ডলিনী শক্তি হংসঃ আশ্রয়পুঙ্কক জীবাশ্রাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হংসঃও প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে। পুঙ্কক নাড়ীপথও প্রাণবায়ুর আশ্রয়। সমুদায় ব্যক্তির মূল্যধার হইতে যথাবিধানে বায়ু উদ্গত হইয়া নাড়ীপথে গমনপুঙ্কক শরীর হইতে বহির্দেশে গমন করে। এই প্রাণবায়ুর পারমাণ সচরাচর ছাদশাশ্রুল মাত্র।

সাধক সূর্য্যমুহু আসনে বিগুহ বস্ত্র ও কুশাদি বিস্তার করিয়া মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিবেন। আরম্ভের সময় তিনি প্রাণবায়ু দ্বারা যথাবিধানে দেহে ভূতৌদয় পরিত্যক্ত হইবেন। পরে দৃঢ়তার নিমিত্ত দেহে সেই সেই ভূতের অর্জনা করিবেন।

মন্ত্রযোগাভ্যাসের সময় সমাহিতহৃদয়ে অজুলি দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয় দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিবে। অজুলি দ্বারা উভয় কর্ণ, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা উভয় লোচন, মধ্যমাঙ্গ দ্বারা উভয় নাসারন্ধ্র, ও অবশিষ্ট অজুলি দ্বারা বদন দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয় সমুদয় প্রাণ ও মনের একতা অলুপ্তানপূর্বক বায়ু ধারণ করিবে। ইহা

অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ বহুবিধ নাদ শুনিতে পাইবে। প্রথমে মন্ত্র ভঙ্গীনাৎ, পরে বীণাধ্বনি, বংশীধ্বনি প্রভৃতি বহুবিধ ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ অভ্যাস করিলে সংসারের অজ্ঞানাকার বিদূরিত হয় এবং ‘হংসঃ’ লক্ষণ অব্যয় জ্ঞান প্রকাশমান হইয়া থাকে। বিন্দু ও বিগল পুরুষ ও প্রকৃত তত্ত্বরূপ। এই পুরুষপ্রকৃতি হইতে ‘হংসঃ’ উৎপন্ন হইয়াছে। ‘হং’ এই বর্ণটি পুরুষ, এবং ‘সঃ’ এই বর্ণটি প্রকৃতি। ‘হংসঃ’ ইহার নাম অজপা, বীজমন্ত্রাদি দ্বারা সর্বদা ইহার উপাসনা করেন। যে সময় সাধক প্রকৃতিপুরুষকে আপনার নিত্য আশ্রয় মনে করিয়া একাভাবাপন্ন হন, তখন ঐ ‘হংসঃ’ সোহংঃ রূপে পরিণত হয়। পরে মূর্তিরূপ সকার ও হকার লোপ করিয়া পূস্বরূপ সন্ধি করিলে ‘ঐ’ এই পদ হয়। এই সময় সাধক পরমানন্দময়, নিত্যটোতত্ত্বরূপ সেই প্রণবকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে ভাবনা করিবেন। এই সময় যোগিগণ আত্মনিষ্ঠ হইয়া আত্মায়বাক্যের অগোচর, আদ্য, আত্মস্বরূপ, ও আনন্দরসসাগর প্রণব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তখন তাহাদের অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দু এই পঞ্চরশ্মিসমন্বিত, সন্নিয়ম, অচ্যুত, মন্ত্রসুখাসাগর স্বরূপ পরম পুরুষ প্রত্যক্ষীভূত হন। ইহা হইল মন্ত্রযোগীর চরম লক্ষণ।

মন্ত্রযোগ অভ্যাসকালে সাধক এইরূপ ভাবনা করিবেন যে, মূলধার পদ্মে উদ্ভিদ ভূজঙ্গরাজাদৃশ বিহ্যংসমকান্তি কুণ্ডলিনী শক্তি চক্র সমুদয় ভেদ করিয়া স্বযুম্মাপণে গমন-পুনরুৎপন্ন সহস্রদল কমলাস্তরগত চক্রমণ্ডল হইতে বিগলিত দিব্য অমৃতধারায় পরিপ্লুতা হইতেছেন এবং পরিশেষে পুনরায় নিজস্থানে আসিতেছেন। কোটিহুয়াসান্নিভা সমস্ত জননী জগন্মোহিনী কুণ্ডলিনী শক্তি অনন্ত অব্যয় গুণসম্পন্ন নিত্য ‘হংসঃ’কে হস্তে লইয়া আধার কমল হইতে বহির্গমনপুরুষ শিবনিকেতনে গমন করিতেছেন। পরে তাহার সতিত পরম সূত্র অমুভব করিয়া পুনরায় নিজস্থানে প্রত্যাগমন করিতেছেন। মন্ত্রযোগী এইরূপ ধ্যান করিবেন। (তন্ত্রদ্বার)

পূর্বোক্তরূপ মন্ত্রযোগ অবলম্বন করিয়াই সাধক সিদ্ধ হইতে পারিবেন। কেবল মন্ত্রগ্রহণ করিলেই যে সিদ্ধি হয় তাহা নহে, মন্ত্রগ্রহণ করিয়া যথাবিধানে পূর্বোক্তরূপে মন্ত্রযোগের অমুষ্ঠান করিলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

তন্ত্রমতে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে একমাত্র সঙ্গুতরূপ ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

তন্ত্র-মতে উচ্চাটন, বশীকরণ, শাস্তি প্রভৃতির মন্ত্রও অভিহিত হইয়াছে। [ঐ সকল বিষয় তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য]

পুরাণাদিতে প্রত্যেক দেবতার পূজাকথনে তাঁহাদিগের

মন্ত্র অভিহিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রে তাঁহাদিগের পূজা করিতে হয়।

হারীতে চিকিৎসিত স্থানে জরনাশক মন্ত্র এইরূপ লিখিত আছে—

“ওং হ্রাং হ্রাং শ্রীং সুগ্রীবায় মহাবলপরাক্রমায় স্ব্যাপুত্রায় অমিততেজসে ঐকাহিকঘ্যাহিকঘ্যাহিকচাতুর্থকমহাজর-ভূতজর-ভয়জর-শোকজর-ক্রোধজর-বেলাজর প্রভৃতি জরাণাং দহ দহ হন হন পচ পচ অবতর অবতর, কিলি কিলি বানর-রাজজরাণাং বন্ধ বন্ধ হ্রাং হ্রাং হ্রাং ফট্ স্বাহা”

(হারীত চিকিৎসিতস্থা•২ অ•)

তিব্বত,চীন ও জাপান দেশে বৌদ্ধসম্প্রদায়েও মন্ত্র প্রচলিত আছে। ঈশ্বরের উপাসনায় মূল মন্ত্রোচ্চারণ। সেখানেও মন্ত্র সমুদায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত। আরাধ্য দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া মন্ত্র পাঠ করা হয়। উপাসক অনেক সময়ে মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারে না। বিভিন্ন দেবতার আরাধনার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। খৃষ্টজন্মের ১৫০ বৎসর পূর্বে পতঞ্জলি হিন্দুধর্মে “জীবের ঈশ্বরে লয়” তত্ত্ব প্রকাশ করেন। গান্ধার দেশের জনৈক সন্ন্যাসী অসঙ্গ প্রথমে এই মত প্রকাশ করেন। পরে ৭০০ খৃঃ অব্দে যোগাচার্যের সহিত মন্ত্রযুক্ত হয় এবং এই উভয়ের নাম মন্ত্রযান হয়।

মন্ত্রের তিনটি প্রধান বিষয়ঃ—

১। আরাধ্য দেবতার নাম।

২। উচ্চারণের মন্ত্র।

৩। মন্ত্রের উচ্চারণসংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্ত মালা।

মন্ত্রের ক্ষমতা অসাধারণ। মন্ত্রপাঠকালে প্রায় গাতব্যোগে উচ্চারিত হয় এবং অঙ্গুলির মুদ্রা করা হয়।

মন্ত্রকার (পুং) মন্ত্রং করোতি কৃ(ন শব্দশ্লোককলহগাথা-বৈরচাটুংস্জমন্ত্রপদেষু। পা ৩২।২৩) ইতি অণ্। মন্ত্রকৃৎ, মন্ত্রকারক।

মন্ত্রকুশল (ত্রি) মন্ত্রায় কুশলঃ। ১ মন্ত্রণাবিষয়ে দক্ষ।

২ মন্ত্রজ্ঞ, তন্ত্রমন্ত্রে পারদর্শী।

মন্ত্রকৃৎ (পুং) মন্ত্রং কৃতবান্ মন্ত্র-কৃ-কিপ্, ভূগাগমন্ট। ১মদ্রো, মন্ত্রণাকারক। ২ দোষাত্যকারী।

“যদ্য অয়ং মন্ত্রকৃদ্বো ভগবানথিলেশ্বরঃ।

পোরবেল্লগৃহং গম্বা প্রবিবেশাশ্বাসংকৃতম্ ॥” (ভাগবত৩।১০)

‘মন্ত্রকৃৎ দোষাত্যকারী সনু’ (স্বামী) (ত্রি) ৩ মন্ত্রপ্রয়োগকারী, অথবা মন্ত্রদ্রষ্টা।

“তব মন্ত্রকৃতো মন্ত্রদূরাং প্রশসিতারিভিঃ।

প্রত্যাদিহস্ত ইব মে দৃষ্টলক্ষভিঃ শরাঃ ॥” (রঘুবংশ ১।৬১)

‘মন্ত্রকুণ্ডঃ মন্ত্রণাং শ্রুতঃ প্রয়োক্তৃর্বা’ (মল্লিনাথ),

ঋগ্বেদাঙ্কমণিকায় মন্ত্রকুণ্ড অধিদিগের নাম পাওয়া গিয়াছে, অকারাদি ক্রমে তাঁহাদের নাম নিয়ে উদ্ধৃত হইল,—

অংহোমৃগ্ বামদেব্য, অক্ষমোজবান্, অগস্ত্য, অগ্নি, অগ্নি-  
বৃত্ত হোত্র, অগ্নিযুপ্তোর, অঘমর্ষণ মাধুচ্ছন্দস, অজ্ঞ ওরব,  
অজিরা, অজমাট সৌহোত্র, অত্রি ভৌম, অত্রি সাংখ্য, অনামত-  
পাকুচ্ছপি, অনিল বাতায়ন, অন্ধীওশ্রাবাণি, অপ্রতিরথ ঐন্দ্র,  
অভিতপা সৌধ্য, অভিবর্ত্ত অজিরস, অমহীযু অজিরস,  
অধরীষ বাধাগির, অযাশ্র অজিরস, অরিষ্টনেমি তাক্ষ্য,  
অরুণ বৈতহব্য, অর্চন হিরণ্যাত্প, অর্চনানা আত্রেয়,  
অর্ষদ কাশ্বেয়, অবৎসার কাশ্রপ, অবস্থ্য আত্রেয়, অশ্বমেধ  
ভারত, অশ্বক্ষিকাদায়ন, অষ্টকবৈশ্বামিত্র, অষ্টাদংষ্ট্র বৈরুপ,  
অসিতকাশ্রপ, আয়ুঃকাধ, আসঙ্গপ্রায়োগি, ইটভার্গব, ইয়বাহ  
দাট্যচ্যুত, ইন্দ্র, ইন্দ্রমুকবান্, ইন্দ্রবৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমতিবাসিষ্ঠ,  
ইরিথিষ্টকাধ, ইষ আত্রেয়, উচথ্য অজিরস, উৎকীলকাত্য,  
উপমন্ত্যবাসিষ্ঠ, উপস্তুতবাষ্টিহব্য, উরুক্ষয় আমহীষব,  
উবচক্রি আত্রেয়, উলবাতায়ন, উশনাকাব্য, উরু অজিরস,  
উরুক্ষণ যামায়ন, উরুগ্রীবা, আর্ষুদি, উরুনাভা ব্রাক্ষ,  
উরুসম্মা অজিরস, ঋজিষা ভারদ্বাজ, ঋজাশ্ব বাধাগির,  
ঋগক্ষয়, ঋষভবৈরাজ, (শাকর) ঋষভ বৈশ্বামিত্র, ঋষা-  
শৃঙ্গ বাতরশন, একহ্য নোধস, এতশবাতরশন, এবয়ামরুদ্  
আত্রেয়, কক্ষিবান্ দৈর্য্যাতমস (ওশিজ), কথবোর, কত-  
বিশ্বামিত্র, কপোতনৈঋত, করিক্রতবাতরশন, কর্ণশ্রুদবাসিষ্ঠ,  
কলিপ্রগাথ, কবষত্রৈলুয, কবিতার্গব, কশ্রপমারীচ, কুংস অজি-  
রস, কুমার আত্রেয়, কুমার আত্রেয়, কুমার যামায়ন, কুংসুতি  
কাধ, কুন্ডলবহিষ শৈলুধি, কুশিকত্রীশীরথি, কুশিকসৌভর, কুসী-  
দী কাধ, কুংগ গাংসমদ, কৃতবশা অজিরস, কুত্বুভার্গব, কুশকাধ,  
কুক্ষ অজিরস কেতু আত্রেয়, গয় আত্রেয়, গয়প্রাত, গর্গভারদ্বাজ,  
গবিস্তির আত্রেয়, গাথীকৌশিক, গুংসমদ অজিরস শৌনহোত্র,  
গুংসমদভার্গব শৌনক, গোতমরহুগণ, গোধা, গোপবন আত্রেয়,  
গোবৃক্কী কাথায়ন, গোরিবীতি শাক্ত্য, গর্ষসৌধ্য, গর্ষতাপস,  
গোর অজিরস, চক্ষুর্মানব, চক্ষুঃসৌধ্য, চিত্রমহাবাসিষ্ঠ, চ্যবন-  
ভার্গব, জমদগ্নিভার্গব, জয় ঐন্দ্র, জরৎকর্ণসর্প ঐরাবত, জরিতা-  
শাক্ষ, জুতিবাতরশন, জেতা মাধুচ্ছন্দস, তপুর্মা বাহস্পত্য,  
তাষ পাথ্য, তিরস্কা অজিরস, ত্রসদম্ম্য পৌরুকুংস্ত, ত্রিত আপ্য,  
ত্রিশিরা ঙ্গাষ্ট্র, ত্রিশোক কাধ, ত্র্যকুণ ত্রৈবৃক্ষ, ত্রষ্টা গর্ভকতা,  
দমন যামায়ন, দিব্য অজিরস, দীর্ঘতমা ওচথ্য, দ্বিমিত্র কোংস,  
দ্ববহা বান্দন, দৃঢ়চ্যুত আপ্য, দেবযুনি ঐরশ্মদ, দেবরাত বৈশ্বা-  
মিত্র, দেবলকাশ্রপ, দেববাত ভারত দেবপ্রবা ভারত, দেবপ্রবা

যামায়ন, দেবাত্তিথি কাধ, দেবাপি আষ্টিষেণ, দ্যতান মাকুতি,  
দ্যমি বিশ্বচর্ষণি আত্রেয়, দ্যমিকবাসিষ্ঠ, দ্রোণশাক্ষ, দ্বিত আপ্য,  
ধরুণ অজিরস, ধ্রুব অজিরস, নভঃ শভেদন বৈরুপ, নর ভারদ্বাজ,  
নহবমানব, নাভাককাধ, নাভানেদিষ্ট মানব, নারদকাধ, নিঋবি-  
কাশ্রপ, নিপাত্তিথিকাধ, নৃমেধ অজিরস, নেমভার্গব, নোধা  
গৌতম, পতঙ্গপ্রাজাপত্য, পরাশরশাক্ত্য, পুরুচ্ছপদৈবদাসি,  
পর্কতকাধ, পবিত্র অজিরস, পায়ু ভারদ্বাজ, পুনর্বৎস কাধ, পুরুষীচ  
সৌহোত্র, পুরুমেধ অজিরস, পুরুহমা অজিরস, পুরুরবা ঐল,  
পুষ্টিগু কাধ, পুতঙ্গ অজিরস, পূরণ বৈশ্বামিত্র, পুরুআত্রেয়,  
পৃথুবৈণ্য, পৃথককাধ, পোর আত্রেয়, প্রগাথকাধ, প্রচেতা  
অজিরস, প্রজাপতি পরমেষ্ঠী, প্রজাপতি বাচ্য, প্রজাপতি  
বৈশ্বামিত্র, প্রজাবান্ প্রাজাপত্য, প্রতর্দন কাশীরাজ-  
দৈবদাসি, প্রতিক্রত আত্রেয়, প্রতিপ্রভ আত্রেয়,  
প্রতিভান্ন আত্রেয়, প্রতিরথ আত্রেয়, প্রণ বাসিষ্ঠ, প্রভুবসু  
অজিরস, প্রযশ্বান্ আত্রেয়, প্রয়োগভার্গব, প্রস্থককাধ, প্রিয়-  
মেধ অজিরস, বকু গোপায়ন, বক্রআত্রেয়, বাহুব্রুতআত্রেয়, বৃধ-  
আত্রেয়, বৃধসোম্য, বৃহদ্রুত বামদেব্য, বৃহদ্রিষ আথক্সণ, বৃহ-  
মতি অজিরস, বৃহস্পতি লোক্য, ব্রহ্মাত্তিথি কাধ, ব্রহ্মমান বাধা-  
গির, ভরদ্বাজবাহস্পত্য, ভর্গপ্রাগাথ, ভাবযব্য, ভিক্ষু অজিরস,  
ভিষগ্ আথক্সণ, ভূবন আপ্য, ভূতাংশ কাশ্রপ, ভৃগু বারুণি,  
মংস্ত্র সামদ, মথিত যামায়ন, মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, মনু আপ্যব,  
মনু বৈবস্বত, মনু সাধরণ, মনুতাপস, মনু্যবাসিষ্ঠ, মরুত,  
মাত্রিষা কাধ, মাক্ষাতা যৌবনাশ্ব, মাত্র মৈত্রাবরুণি, মুদগল-  
ভামাশ্ব, মুর্ধ্যান্ অজিরস (বামদেব্য), মুক্তবাহা দ্বিত আত্রেয়,  
মৃদীকবাসিষ্ঠ, মেধাত্তিথিকাধ, মেধ্যকাধ, মেধ্যাত্তিথি কাধ,  
বক্ষনাশন প্রাজাপত্য, যজ্ঞ আত্রেয়, যজ্ঞ প্রাজাপত্য, যমবৈব-  
স্বত, যযাতি নাহব, রক্ষোহা ব্রাক্ষ, রহুগণ অজিরস, রাতহব্য  
আত্রেয়, রামজামদগ্ন্য, রেণুবৈশ্বামিত্র, রেত কাশ্রপ, লবঐন্দ্র,  
লুণধানাক, বৎস আত্রেয়, বৎসকাধ, বৎসপ্রি ভালন্দন, বক্র  
বৈথানস, বকু অজিরস, বরুণ, বত্রিআত্রেয়, বশ অশ্ব্য, বসিষ্ঠ  
মৈত্রাবরুণি, বসু ভারদ্বাজ, বসুকর্ণ বাসুক, বসুকৃদ্ বাসুক,  
বসুক্র ঐন্দ্র, বসুক্রবাসিষ্ঠ, বসুমনা, রৌহদশ্ব, বসুরোচিষ  
অজিরস, বসুশ্রুত আত্রেয়, বসুধব আত্রেয়, বাগ্ আঙ্কী,  
বাতজুতিবাতরশন, বামদেবগৌতম, বিন্দু-অজিরস, বিপ্র-  
জুতিবাতরশন, বিপ্রবজ্রগোপায়ন, বিভ্রাট্‌সৌধ্য, বিমদ ঐন্দ্র,  
বিরূপ-অজিরস, বিবশ্বান্ আদিতা, বিবৃহাককাশ্রপ, বিশ্বক-  
কাঞ্চি, বিশ্বকর্ষা ভৌবন, বিশ্বমনা বৈবস্ব, বিশ্বসামা  
আত্রেয়, বিশ্বামিত্র গাথিন, বিশ্বাবসু দেবগন্ধর্ষ, বিষ্ণু প্রাজা-  
পত্য, বিহব্য অজিরস, বীতহব্য অজিরস, বৃশজার, বৃষগণ

বাসিষ্ঠ, বৃষাকপি, ঐন্দ্র, বৃষাণক, বাতরশন, বেণভার্গব, বায়ু আঙ্গিরস, ব্যাঘ্রপাদ-বাসিষ্ঠ, শংখ্যবাহস্পত্য, শক-পুত নামেধ, শক্তি-বাসিষ্ঠ, শম্বা যামায়ন, শতপ্রভেদন-বৈরূপ, শবরকাঞ্চীবত, শশকর্ণ কাণ্ড, শাৰ্ঘ্যাত মানব, শাস ভারদ্বাজ, শিখণ্ডী কাশ্যপ, শিবি ঔশীনর, শিরিষিষ্ঠ ভারদ্বাজ, শিশু আঙ্গিরস, শুনঃশেপ আজিগতি, শুন-হোত্র ভারদ্বাজ, শ্রাবাশ্র আত্রেয়, শ্বেন আত্রেয়, শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, শ্রুতবন্ধু গোপায়ন, শ্রুতবিদ্ আত্রেয়, শ্রুটিগু কাণ্ড, শম্বনন আঙ্গিরস, সধরণ প্রাজাপত্য, সংবর্ত আঙ্গিরস, সঙ্কুস্ক যামায়ন, সত্যধৃতি বারুণি, সত্যশ্রবা আত্রেয়, সদাপুণ আত্রেয়, সত্রিবেকরূপ, সধ্বংসকাণ্ড, সপ্তর্ষি, সপ্তগু আঙ্গিরস, সপ্তবজ্রি আত্রেয়, সপ্তিবাজস্বর, সপ্তম ভারদ্বাজ, সর্ষহরি ঐন্দ্র, সবা আঙ্গিরস, সস আত্রেয়, সহদেব বার্ষাগির, সাধনভোবন, সারিস্কশার্জ, সিন্ধুকিৎ প্রৈয়মেধ, সিন্ধুরীপ আশ্বরাষ, স্ককক্ষ আঙ্গিরস, স্ককীর্তিকাঞ্চীবত, স্ততস্তুর আত্রেয়, স্তদা পৈজবন, স্তদীতি আঙ্গিরস, স্তপর্ণকাণ্ড, স্তপর্ণ তাক্যপুত্র, স্তবন্ধ গোপায়ন, স্তমিত্র কোৎস, স্তমিত্রবার্ধাষ, স্তরাধা বার্ষাগির, স্তবেদা শৈরীষি, স্তহস্তা ঘোষেয়, স্তহোত্রভারদ্বাজ, সোতরি কাণ্ড, সোম, সোম-চুতি ভার্গব, স্তমমিত্র শার্জ, স্তামরশ্মি ভার্গব, স্তম্ভ্যাত্রেয়, হরিমন্ত আঙ্গিরস, হর্যাত প্রাগাথ, হবিধান আঙ্গিরস, হিরণ্যগর্ভ-প্রাজাপত্য ও হিরণ্যাস্তপ আঙ্গিরস।

- এই সকল মন্ত্রকুণ্ড ঋষিদিগের নামেই ব্রাহ্মণদিগের গোত্র প্রচলিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন মন্ত্রপুরণে ৯২ জন মন্ত্রকুণ্ড ঋষির নাম পাওয়া যায় ;—ভৃগু, কাশ্যপ, প্রচেতা, দধীচ, আশ্ব-বান্, ঔর্ক, জমদগ্নি, বেদ, সারস্বত, আশ্টিবেণ, চাবন, বীতহব্য, সুবেদস, বৈণ্য, পৃথু, দিবোদাস, ব্রহ্মবান্, গৃৎস, শৌনক, অঙ্গিরা, ত্রিত, ভারদ্বাজ, লক্ষ্মণ, কৃতবাচ, গর্গ, সিত, সাকৃতি, গৌরবীতি, মাক্ষাতা, অশ্বরীষ, যুবনাথ, পুরুকুৎস, স্তমদ, সদস্তবান্, অজমীঢ়, অশ্বহার্য্য, উৎকিল, কবি, পৃষদশ্ব, বিরূপ, কাব্য, মুদাল, উতথ্য, শরদ্বান্, বাজশ্রবা, আশ্বাস্ত, স্তচিভি, বামদেব, উশিজ, বৃহদ্রুক্ষ, দীর্ঘতমা, কাঞ্চীবান্, কশ্যপ, সহ, আবৎসার, নিশ্রব, বিষ্ণু, অসিত, দেবল, অত্রি, অর্চনানা, শ্রাবাশ্ব, গবি-ষ্ঠির, কর্ণকৃত, পূর্বাতিথি, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ইন্দ্রপ্রমতি, ভবদ্বহু, মিত্রাবরূপ, কুণ্ডিন, বিশ্বামিত্র, গাধেয়, দেবরাত, মধুচ্ছন্দা, অঘমর্ষণ, অষ্টক, লোহিত, ভূতকীল, মারুতি, দেব-শ্রবা, দেবরাত, পুরাণ, ধনঞ্জয়, শিশির, শালকায়ন, অগস্ত্য, দৃঢ়হায়, ইন্দ্ৰবাহ, অগস্তি, ভলনন, বৎস ও সঙ্কীল। \*

\* “এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্বে কুণ্ডলশস্ত্র নিবোধত।

ভৃগুঃ কাব্যঃ প্রচেতান্চ দধীচো হ্যাম্বানপি।

মন্ত্রপুরণোক্ত এই মন্ত্রকুণ্ড ঋষিদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই ছিল।

মন্ত্রগণ্ডক ( পুং ) মন্ত্রপ্রধানো গণ্ডকঃ, মধ্যপদলোপিকর্ম্মণা।  
বিদ্যা। ( হারাবলী )

ঔর্কোহং জমদগ্নিঃ বেদঃ সারস্বতস্তথা।

আশ্টিবেণচাবনচ বীতহব্যঃ স্ববেদসঃ।

বৈণ্যঃ পৃথুর্দিবোদাসো ব্রহ্মবান্ গৃৎসশৌনকো।

একোনবিংশতিহেতে ভৃগবো মন্ত্রকৃতম্ভাঃ।

অঙ্গিরাশ্চৈব ত্রিতস্ত ভারদ্বাজৌহং লক্ষ্মণঃ।

কৃতবাচস্তথা গর্গঃ সিতসাকৃতিরেব চ।

গৌরবীতিশ্চ মাক্ষাতা অশ্বরীষস্তথৈব চ।

যুবনাথঃ পুরুকুৎসঃ স্তমদশ্চ সদস্তবান্।

অজমীঢ়ো হৃষহার্য্যশ্চ হ্যৎকিলঃ কবিরেব চ

পৃষদশ্বো বিরূপশ্চ কাব্যশ্চৈব মুদালঃ।

উতথ্যশ্চ শরদ্বাশ্চ তথা বাজশ্রবা অপি।

আশ্বাস্তাশ্চ স্তচিভিঃ বামদেবস্তথৈব চ।

উশিজো বৃহদ্রুক্ষশ্চ ঋষির্দীর্ঘতমা অপি।

কাঞ্চীবাস্চ ত্রয়শ্চিশং শ্রুতা হ্যঙ্গিরসাম্ভবরাঃ।

এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্বে কাশ্যপাশ্চ নিবোধত।

কাশ্যপঃ সহাবৎসারো নিশ্রবো বিদ্যা এব চ।

অসিতো দেবলশ্চৈব যড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ।

অত্রির্চর্চনানাশ্চৈব শ্রাবাশ্বোহং গবিষ্ঠিরঃ।

কর্ণকৃতো ঋষিঃ সিন্ধুস্তথা পূর্বাতিথিশ্চ যঃ।

ইত্যেতে ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রকুণ্ডস্য মহর্ষয়ঃ।

বশিষ্ঠশ্চৈব শক্তিশ্চ তৃতীয়শ্চ পরাশরঃ।

ততস্তু ইন্দ্রপ্রমতিঃ পঞ্চমস্ত ভবদ্বহুঃ।

ষষ্ঠস্ত মিত্রাবরূপঃ সপ্তমঃ কুণ্ডিনস্তথা।

ইত্যেতে সপ্ত বিজ্ঞেয়া বাসিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ।

বিশ্বামিত্রশ্চ গাধেয়ো দেবরাতস্তথা বলঃ।

তথা বিদ্বান্ মধুচ্ছন্দো ঋষিচ্ছোহং অঘমর্ষণঃ।

অষ্টকো লোহিতশ্চৈব ভূতকীলশ্চ মারুতিঃ।

দেবশ্রবা দেবরাতঃ পুরাণশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।

শিশিরশ্চ মহাতেজাঃ শালকায়ন এব চ।

ত্রয়োদশৈতে বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মিষ্ঠাঃ কৌশিকা বরাঃ।

অগস্ত্যোশ্চথ দৃঢ়হায় ইন্দ্ৰবাহস্তথৈব চ।

ব্রহ্মিষ্ঠাগস্ত্যয়ো হেতে প্রায়ঃ পরমকীর্তয়ঃ।

মহুর্বেবশ্বতশ্চৈব হলো রাজা পুরুশ্রবাঃ।

ক্ষত্রিয়াণাং বরা হেতে বিজ্ঞেয়া মন্ত্রবাদিনঃ।

ভলনশ্চ বৎসশ্চ সঙ্কীলশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।

এতে মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়া বৈশ্বানার প্রবরাঃ শ্রুতাঃ।

ইতি বিনবতিঃ প্রোক্তো মন্ত্রা বৈশ্ব বহিষ্কৃতাঃ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বা ঋষিপুত্রাশ্চ শ্রুতাঃ।

ঋষীণাম্ভ শ্রুতা হেতে ঋষিপুত্রাঃ স্ততর্ষয়ঃ।” (মন্ত্রপু. ১২১অ.১)

মন্ত্রগুপ্ত ( পুং ) দশকুমারচরিতের একজন কুমার।

মন্ত্রগুপ্ত ( স্ত্রী ) মন্ত্রণাগোপন।

মন্ত্রগুট ( পুং ) মন্ত্রে মন্ত্রণাবিষয়ে গুটঃ। গুপ্তচর। (শব্দরত্নাং)

মন্ত্রগৃহ ( ক্রী ) মন্ত্রস্ত মন্ত্রণায় গৃহম্। মন্ত্রণাগার। যে গৃহে মন্ত্রণা করা হয়।

“সুসংবৃত্তং মন্ত্রগৃহং স্থলং চাক্রস্থ মন্ত্রয়েৎ।

অরণ্যে নিঃশলাকে বা ন চ রাত্রৌ কথঞ্চন ॥”

( ভারত ১৫৫১২২ )

মন্ত্রজল ( ক্রী ) মন্ত্রপুত্ৰং জলম্। মন্ত্র দ্বারা পবিত্রাকৃত জল, মন্ত্রোদক।

“দৃষ্টৌ শয়ানান্ বিপ্রাংস্তান্ পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্ ॥”

( ভাগবত ৯।৩২৭ )

মন্ত্রজা ( স্ত্রী ) মন্ত্রাং জায়তে ইতি মন্ত্র-জন-ড, টাপ্। মন্ত্রশক্তি।

মন্ত্রজিহ্বা ( পুং ) মন্ত্র এব জিহ্বা বস্যা। ১ অগ্নি। (হেম)

“অমৃতং নাম যৎসন্তো মন্ত্রজিহ্বেষু জুহ্বতি।

শোভেত মন্দরক্ষুক্ষুভিত্তোদধিবর্ণনা ॥” ( মাঘ ২।১০৭ )

মন্ত্রজ্ঞ ( পুং ) মন্ত্রং জানাতীতি জ্ঞা-ক। ১ চর। ( ত্রি ) ২ মন্ত্র-জ্ঞাতা, যিনি উত্তমরূপে মন্ত্রণা জানেন।

“ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্ত ত্রাক্ষণৈঃ সহ পার্থিবঃ।

মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্ ॥” (মহু ৮।৪)

মন্ত্রণ ( ক্রী ) মন্ত্র-লুট্। মন্ত্রণা।

“অবস্করে মন্ত্রণঞ্চ যৎকৈতজ্জপকৃতবা।” ( মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫০।৮৭ )

মন্ত্রণা ( স্ত্রী ) মন্ত্র-ভাবে যুচ, টাপ্। নিজ্জনে কথব্যাবধারণ।

কবিকল্পলতার লিখিত আছে, কাব্যাদিতে মন্ত্রণা-বষণ-বর্ণনাকালে নিম্নোক্ত বিষয়ের বর্ণনা করা আবশ্যিক।

পঞ্চাঙ্গ, শক্তি, ষাড়্-গুণ্য, উপায়, সিদ্ধি, উদয় ও হৈর্য্যো-ন্নতি প্রভৃতি মন্ত্রণা বিষয়ে আলোচনা করিতে হয়।

“মন্ত্রে পঞ্চাঙ্গতশক্তিষাড়্-গুণ্যোপায়সিদ্ধয়ঃ।

উদয়াশ্চিন্তনয়াশ্চ হৈর্য্যোন্নত্যা দিশ্চ জয়ঃ ॥” (কবিকল্পলতা)

তিন জনের সহিত মন্ত্রণা করিলে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে; অতএব দুইজনে মিলিয়া মন্ত্রণা করিবে।

“ষট্-কর্ণো ভিদ্যাতে মন্ত্রশ্চতুর্কর্ণশ্চ ধার্য্যতে।

দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যেকো ন বুধ্যতে ॥”

( গরুড়পুঃ ১১৪ অং )

কাপিকাপুরাণে লিখিত আছে, রাজা বহুবিদ্যাবিশারদ, বিনীত, সংকুলোদ্ভব, ধর্ম্মার্থকুশল ও সরলচিত্ত ব্রাহ্মণদিগকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রণার উপযুক্ত সময়বোধে তাঁহাদের মনে কাহারও কাহারও সহিত মন্ত্রণা করিবেন। অনেকের সহিত মন্ত্রণা এবং সর্পদা মন্ত্রণা করা নিষিদ্ধ। বিশেষ আব-

শ্যক হইলে একবার একজনের সহিত আর একবার অপর জনের সহিত এইরূপে সকল মন্ত্রীর সহিতই মন্ত্রণা করিবেন। অস্ত্রের ছল করিয়া একবারে সকলের সহিত মন্ত্রণাও করিতে পারেন। অত্যন্ত গোপনীয় এবং সুরক্ষিত গৃহে অথবা উপ-দ্রবশূন্য নিজ্জন অরণ্যে গিয়া মন্ত্রণা করা উচিত। রাত্রিকালে মন্ত্রণা করিতে নাই। মন্ত্রণাস্থলে বালক, বানর, নপুংসক, শুক, সারিকা এবং বিকৃতাবয়ব মনুষ্যাদিগকেও আসিতে দেওয়া বিধেয় নহে। রাজাদিগের গুট-মন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে যে দোষ হয়, তাহার প্রতীকার করা সুদক্ষ শত শত রাজারও সাধ্যা নহে।\* মহাভারতের শাস্তিপর্বে ও রাজধর্ম্মাশ্বমেধশাসনপর্বে মন্ত্রি-মন্ত্রণার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

রাজ্যের মূল মন্ত্রণা, এইজন্ত রাজা উপযুক্ত মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিবেন। রাজা সুপ্রস্তুত, সংকুলসম্বৃত, উৎকোচগ্রহণে বিরত, বাতিচারদোষবিহীন, স্নানবস্ত্র, বেদজ্ঞ, অহঙ্কারশূন্য, বিনয়বুদ্ধিসম্পন্ন, সংস্কারভা-বিত, তেজস্বী, ধীর, ক্ষমামান, শুচি, অহরন্ত, কাযাদক্ষ, গম্ভীর, অকপট, মিতভাষী, কর্তব্যাকর্তব্যবিবেক-বিশারদ, হস্তিতজ্ঞ, দয়াশীল, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুকাৰ্য্যপারায়ণ এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন। তেজোবিহীন, বদ্ধবাক্তবপরিত্যক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলে সমুদয় কাৰ্য্যই সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। যেমন অল্পজ্ঞানসম্পন্ন মন্ত্রী সংকুলোদ্ভব ও ধর্ম্মার্থকামযুক্ত হইলেও মন্ত্র পরীক্ষা করিতে পারেন না, তদ্রূপ অসংকুলসম্বৃত ব্যক্তি বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও নায়কবিহীন সৈন্যের তায় ক্ষম্ভাকাগদশনে অসমর্থ হন। অস্থিরসকল ব্যক্তি বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও উপায়জ্ঞ হইলেও কাব্যসাধনে সমর্থ হন না। জ্ঞানিত মুখবাক্তি কাব্য আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু কোন্ কাব্যের কি বিশেষ ফল,

\* “মন্ত্রিগন্ত নৃপঃ কুধ্যাৎ বিপ্রান্ বিদ্যাবিশারদান্।

বিশুদ্ধাং কুলীনাংশ্চ ধর্ম্মার্থকুশলান্জুন ॥

মন্ত্রয়েতৈঃ সমং কালে নাত্যর্থং বহুভিচ্চরেৎ।

একৈকেন তু কর্তব্যং মন্ত্রস্ত তু বিনিশ্চয়ম্ ॥

বাস্তবেনৈব সমন্তেষু বাস্তস্ত ব্যাপদেশতঃ।

স্বয়ং বৃত্তং মন্ত্রগৃহং স্থল আরোহ মন্ত্রয়েৎ ॥

অরণ্যে নিঃশলাকে বা ন যামিচ্ছাং কদাচন।

শিশূন্ শাখায়ুগান্ যশান্ শুকান্ বৈ সারিকাস্থতা ॥

বর্জয়েন্নমন্ত্রগেহেযু মনুষ্যাদিহৃদ্যতংগুণা।

দুষণং মন্ত্রভেদেধু নৃপাণাং যত্র জায়তে।

ন তৎ সম্যক্ সমাশ্র্যতুং দক্ষৈর্নৃপশতৈরিপি ॥”

( কাপিকাপুরাণ ৮৫ অং )

তাহা জানিতে পারে না। অমুরাগবিহীন মন্ত্রী কখনই বিশ্বাসের পাত্র হয় না। অতএব তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা রাজার অকর্তব্য। অগ্নি যেমন সমীরণের-সহায়তায় মহাপাদপ ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ অমুরক্ত মন্ত্রী ও অজ্ঞান মন্ত্রীদিগের সহিত বড় যত্ন করিয়া রাজাকে উৎসন্ন করিতে পারে। প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া কখন অমুগতকে পদচ্যুত এবং কখন বা তিরস্কৃত করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। অমুগত ব্যক্তিরাই প্রভুর ঈদৃশ ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন। মন্ত্রিগণও অনেক সময় ভূপতির উপর সাতিশয় কোপাবিত হন, কিন্তু যে মন্ত্রী রাজার প্রিয়কার্য্য করিতে অভিলাষী হইয়া সেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন, বুদ্ধিমান ভূপতি স্থখ দুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয় সমজ্ঞান করিয়া তাহারই সহিত সকল বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন। কুটিল ব্যক্তি বিবিধগুণসম্পন্ন ও অমুরক্ত হইলেও তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি শত্রুদিগের সহিত মিলিত হয় এবং পুরবাসীদিগের সম্মান না করে, সে শত্রুত্বা, তাহার নিকট মন্ত্র প্রকাশ করা নিতান্ত দুরোধের কার্য্য। অশুচি, অহঙ্কারী, আত্মপ্রাধিপত্যপরায়ণ, অমুহুদ, ক্রোধপরতন্ত্র ও লুন্ঠ ব্যক্তির মন্ত্রণাশ্রবণের উপযুক্ত নহে।

আগন্তুক ব্যক্তি যদি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রভুভক্ত হন, পূর্বে যাহার পিতা অজ্ঞানরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি তাহার পিতৃপদে সংস্থাপিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সংকৃত ও হয় এবং কোন কারণবশতঃ কোন ব্যক্তিকে যদি নির্দন করা হয়, তবে সেই ব্যক্তি অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইলেও, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার নিকট বা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যক্তিগণের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না। যিনি প্রজাবান্, মেধাবী, বিশুদ্ধস্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, আত্মতুল্য, প্রিয়মুহুদ, সত্যবাদী, সচরিত্র, গম্ভীরস্বভাব, লজ্জাশীল, মুহু, পাপদেষা, প্রগল্ভ, সন্তোষপরায়ণ, মন্ত্রজ্ঞ, কালদর্শী, শৌর্য্যসম্পন্ন, যুদ্ধনিপুণ ও নীতিবিশারদ এবং যিনি সাস্ত্রনাবাক্য দ্বারা লোক সকলকে বশীভূত করিতে পারেন, পুরগ্রামবাসী ধার্মিক লোকেরা যাহাকে বিশ্বাস করেন এবং আপনার ও শত্রু প্রভৃতির বিষয় যিনি বিলক্ষণ বিদিত, তিনিই মন্ত্রণা-শ্রবণের উপযুক্ত। মন্ত্রী ঐরূপ গুণসম্পন্ন ও সংকৃত হইলে নিশ্চয়ই রাজার মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হন।

স্বীয় প্রভু, প্রজাগণ ও শত্রুপক্ষের ছিদ্রাঘেষণে সচেষ্ট হওয়া মন্ত্রীর অবশ্যকর্তব্য। মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলেই রাজার রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞতম মন্ত্রিগণ অরতির দোষ দর্শন করিবারাত্র তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এই-রূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন শত্রুপক্ষ তাহার কোন

ছিদ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়। কুশ্য যেরূপ আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয় গোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ মন্ত্রীরাও মন্ত্রণা সকল গোপন করিয়া রাখিবেন।

মন্ত্রণা ও চর রাজ্যরক্ষার মূল কারণ। মন্ত্রী সকল বৃত্তি-লাভার্থ রাজার অমুসরণ করিয়া থাকেন। রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে অহঙ্কার, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিবেন। রাজা অকপট মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। অন্ততঃ তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা রাজার অবশ্যকর্তব্য। রাজা তিন জন মন্ত্রীর মত গ্রহণ করিয়া এবং উহা সবিশেষ অনুধাবন-পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামমুখ গুরুর সমীপে যাইবেন এবং তাহার নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। গুরু ঐ চারি জনের মত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে যদি সেই সিদ্ধান্ত সাধারণের মতানুযায়ী হয়, তাহা হইলে তদনুসারে কাণ্ডা করাই ভূপতির কর্তব্য।

মন্ত্রনির্ণয়কুশল মহাত্মারা মন্ত্রণা করিবার এইরূপ রীতি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উক্তমুত্রে মন্ত্রণা করিতে পারিলে প্রজাগণকে অনায়াসে বশীভূত করা যায়। মহীপাল যেখানে মন্ত্রণা করিবেন, তথায় যেন বামন, কুজ, কুশ, খল্ল, অন্ধ, জড়, নপুংসক বা তিথ্যকুশোনি, অবস্থান না করে। নৌকায় বা কুশকাশবিহীন, অনাবৃত জনশূন্যপ্রদেশে অবস্থান করিয়া বাক্যদোষ ও অন্নদোষ সকল পরিহারপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবেন।

আরও লিখিত আছে, চারিজন পাবক একজন, আটজন অস্ত্রধারী মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এক বিংশতি বৈশ্য, বিনীতস্বভাব অতিপবিত্র তিন জন শূদ্র এবং এক জন শুশ্রূষাদি অষ্টগুণসম্পন্ন পুরাণবেদী স্ত্রীকে অমাত্য-পদে নিযুক্ত করা রাজার কর্তব্য। অমাত্যগণ সকলেই যেন পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিবান্, অপক্ষপার্ভী, বিচারক্ষম, লোভবিহীন ও মৃগয়াদি সপ্তবিধ দোষবিবর্জিত হন।

এই সকল অমাত্যের মধ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ, তিন জন ক্ষত্রিয় ও এক জন স্ত্রী এই আট জনকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন। রাজা এই ৮ জনের সহিত মন্ত্রণা করিবেন।

( ভারত শাস্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্মাশ্বশাসনপর্ব্ব, ৮৪, ৮৫ অং )

যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে, রাজ্যের মূল মন্ত্রণা, এই জন্ত রাজা যতক্ষণ নিঃসন্দেহে ফলপ্রাপ্ত না হন, ততক্ষণ মন্ত্রণা করিবেন। অর্থ ও অনর্থ এই দুয়ের সংশয় যাহাতে পরাগিত হয়, তাহাকে মন্ত্র কহে। অতিগোপনে এই মন্ত্রণা করিতে হয়। মন্ত্রণাকালে জড়, মুক, বধির, তিথ্যকুশোনি, জী, ম্লেচ্ছ, ব্যাদিগ্ৰস্ত, বিরুতান্দ্র প্রভৃতিকে বঞ্জন করা বিধেয়। বিষ অথবা শস্ত্রে এক জনই প্রাণ ত্যাগ করে, কিন্তু মন্ত্রবিপ্লবে



রাষ্ট্রসম্পদ সকলই বিনষ্ট হয়। এইজন্ত মন্ত্রণা গোপন করাই  
বিধেয়। মন্ত্রণা কার্য্য দ্বারাই প্রকাশ পাওয়া উচিত।\*

মস্ততস্ (অব্যং) মস্তাদিতি মস্ত (পঞ্চম্যাস্তসিল্। পা ৫।৩।২  
৭) ইতি পঞ্চমীস্থানে তসিল্। মস্ত হইতে।

মস্ততোয় (কৌ) মস্তপুতং তোয়ং। মস্তজল, মস্ত পড়িয়া যে  
জল দেওয়া যায়। (দেশজ) জল পড়া।

মস্তদ (পুং) মস্তং দদাতীতি মস্তদা-ক। শিষ্যের কর্ণে  
শিষ্যাদিগের কুলদেবতাহুসারে ইষ্টমস্তদাতা, মস্তদাতা গুরু।

“পরাপরগুরুগাঞ্চ নির্ণয়ং শৃণু পাকতি।

আদৌ সর্বত্র দেবশি মস্তদঃ পরমো গুরুঃ।

পরাপরগুরুষং হি পরমেষ্ঠী ব্ৰহ্ম গুরুঃ ॥”

(বৃহদ্রাণ্যতন্ত্র ২'পটল)

মস্তদাতা গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ, মস্তদাতা গুরুর পিতা  
পরম গুরু এবং বিষ্ণুরূপ, তৎপিতা পরাপর গুরু ও সাক্ষাৎ  
মহেশ্বর তুল্য।

“মানবস্ত মহেশানি সংক্ষেপাদিগদানি তে।

গুরুঃ পরমগুরুশ্চ পরাপরগুরুস্তথা।

সগুরুঃ পরমেশানি সাক্ষাদ্ এক ন সংশয়ঃ ॥

তৎপিতা পরমগুরুঃ স্বয়ং বিষ্ণুঃ ক্ষিতৌ সদা।

তৎপিতা পরাপরগুরুর্মহেশ্বরসমঃ সদা ॥

(শাক্তানন্দতরঙ্গিণীযুত মহিষমর্দিনীতন্ত্র)

মস্তদর্শিন্ (ত্রি) মস্ত-দৃশ-গিন্। বেদবিৎ।

\* “মস্তমূলং যতো রাজ্যং ততো মন্ত্রং সুরক্ষিতম্।

কুর্য্যাজ্ঞা সদা মন্ত্রান্ কর্ণগা আ কল্যেদয়ান্ ॥

অর্থানর্থো হি যত্রোভৌ সংশয়শ্চ পরীক্ষাতে।

স মন্ত্র ইতি বিজ্ঞেয়ঃ শেষাশ্চ খলু বিজ্ঞায়াঃ ॥

একমেব বিয়ং হস্তি শস্ত্রেণৈকশ্চ বধ্যতে।

সরাষ্ট্রং সম্পদং হস্তি রাজানং মন্ত্রবিদ্রবঃ ॥

করিয়ান্ ন প্রভাষেত কৃতান্ত্রেব তু দর্শয়েৎ।

ধর্ম্মার্থকামার্থ্যাণি কৃতো মন্ত্রো ন ভিদ্যতে ॥

পিরিপৃষ্ঠমুপারোহ প্রাসাদং বা রহোগতঃ।

স্বপথে নিঃশলাকে বা তত্র মন্ত্রো বিধীয়তে ॥

তত্র সাম প্রয়োক্তব্যং কার্য্যেণ গুণবৎস্বপি।

দানং লুকেহপি ভেদশ্চ শব্দভেদশ্চ নিশ্চয়ঃ ॥

জড়মূকান্ধবধিরান্ তিষ্ঠাণ্ যোনীন বয়োহধিকান্।

ক্রীয়েচ্ছব্যাদিতব্যান্ মন্ত্রকালে নিষেধয়েৎ ॥

ইতি সম্পত্ততঃ প্রোক্তো রাজনীতিরিয়ং ময়া।

যত্তি বর্গা বিরুদ্ধং স্রাজ্ঞানীতিস্তুদ্রুচ্যতে।”

(যুক্তিকল্পতরু—নীতিবৃদ্ধি)

“অধ্যভাবে তু বিপ্রস্ত পাণাবেবোপপাদয়েৎ।

যো হুয়িঃ স দ্বিজো বিপ্রৈশ্চ মন্ত্রদর্শিত্বকৃত্যতে ॥” (মহু ৩।২।১২)

‘মন্ত্রদর্শিত্ববিবেদবিভিঃ’ (কুল্লুক)

২ মন্ত্রদর্শনকারিমাত্র, মন্ত্রদ্রষ্টা।

মস্তদাতৃ (ত্রি) মস্তং দদাতীতি মস্তদা-তৃচ্। মস্তদানকর্তা;  
গুরু, যিনি মন্ত্র দেন। মস্তদাতা গুরু সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।  
গুরুদিগের মধ্যে প্রথমে জন্মদাতা পিতা, তদপেক্ষা শত গুণ  
মাতা এবং তদধিক বিভাদাতা, তাহা হইতেও মস্তদাতা গুরু  
পূজনীয় ও শ্রেষ্ঠ। গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া সংসার-  
সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এইজন্ত তিনি সর্বাপেক্ষা  
পূজনীয়। মাতা ও পিতা প্রভৃতি গুরুজন সংসারসমুদ্র পার  
করিতে কেহই সমর্থ নহেন, এক গুরুই তাহা করিতে পারেন,  
অতএব সত্য, তপস্যা ও পুণ্য প্রভৃতি সকলই গুরু। শিষ্য  
মস্তদাতা গুরুর নিকট ইষ্টমন্ত্র লাভ করিয়া সেই মন্ত্রপ্রভাবে  
অনায়াসেই ভবচ্ছের মোচন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। \*

[ গুরু ও মন্ত্র শব্দ দেখ ]

\* “সর্বৈষাঞ্চ গুরুগাঞ্চ জন্মদাতা পরো গুরুঃ।

পিতৃঃ শতগুণৈর্মাতা পূজ্যা বন্দ্যা গরীয়সী ॥

বিদ্যাদাতা মস্তদাতা জ্ঞানদো হরিভক্তিদঃ।

পূজ্যো বন্দ্যশ্চ সর্বশ্চ মাতৃঃ শতগুণৈর্গুরুঃ ॥

মস্তমূলগণেনৈব গুরুরিত্যুচ্যতে বৃথৈঃ।

আত্মো বন্দ্যো গুরুরয়মজ্ঞানরোপিতো গুরুঃ ॥

• অজ্ঞানতিমিরাক্রান্ত জ্ঞানপ্রদশলাকর্য্য। •

চক্ষুঃশ্রীতিভং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

অনীক্ষিতস্ত মুখস্ত নিরুত্ননির্ভ্রাতি নিশ্চিতম্।

সর্বকর্ম্মস্বনর্হস্ত নরকে তৎপশোঃ হিতিঃ ॥

জন্মদাতারদাতা বা মাতাম্যে গুরবস্তথা।

পারং কর্ত্ত্বং ন শক্তান্তে যোরে সংসারসাগরে ॥

বিদ্যামন্ত্রজ্ঞানদাতা নিপুণঃ পারকর্ম্মণি।

ন শক্তঃ শিবামূর্ত্তিসমীকরণেচরোহপরঃ ॥

গুরুবিষ্ণুগুরুব্রহ্মা গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুধর্ম্মো গুরুঃ শেষঃ সর্বাশ্চা নিগুণো গুরুঃ ॥

সর্বভীষীশ্রমশ্চৈব সর্বদেবপ্রোক্তো গুরুঃ।

সর্ববেদশাস্ত্রপাণ্ড সর্বরূপী হরিঃ স্বয়ম্ ॥

অভীষ্টদেবে রুটে চ গুরুঃ শক্তো হি রক্ষিতুম্।

গুরো রুটেহভীষ্টদেবো ন হি শক্তো হি রক্ষিতুম্ ॥

সর্বৈ প্রহ্লাদ যং রুটে দৃষ্টা যং দেবব্রাহ্মণাঃ।

তমেব রুটে ভবতি গুরুরেব হি দেবতঃ ॥

ন গুরোশ্চ প্রিয়শ্চাত্মা ন গুরোশ্চ প্রিয়ঃ মৃতঃ।

ধনং প্রিয়ো ন চ গুরোর্ন চ ভাৰ্য্যা প্রিয়ু তথা ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুং শ্রীকৃষ্ণজয় খং ৫৯)

মন্ত্রদীধিতি (পুং) মন্ত্রেণ দীধিতির্দীপ্তির্ভূত। অগ্নি।  
মন্ত্রদৃশ্ (ত্রি) মন্ত্রদৃশ্-কিপ্। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, মন্ত্রকৃৎ ঋষি।

“কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মর্ত্য-

ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃবিঃ পুরুষস্ত যন্ত ॥” (ভাগবত ৮২৩২৯)

‘মন্ত্রদৃগৃবিঃ বশিষ্ঠঃ’ (স্বামী)

মন্ত্রদেবতা (স্ত্রী) মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

মন্ত্রদ্রুম (পুং) চাক্ষুষমবস্তুরের ইন্দ্র।

“ইন্দ্রো মন্ত্রদ্রুমস্তত্র দেবা আপ্যাদয়ৌ গণাঃ।

মুনয়স্তত্র বৈ রাজন্ হব্যান্ধারকাদয়ঃ ॥” (ভাগবত ৮৫৮)

মন্ত্রধর (পুং) ১ মন্ত্রী। ২ মন্ত্রগাকুল।

মন্ত্রধারিন্ (পুং) ১ সচিব। ২ মন্ত্রণাতিক্ত।

মন্ত্রপতি (পুং) মন্ত্রাধিষ্ঠিত দেববিশেষ।

মন্ত্রপত্র (ক্লী) মন্ত্রলিখিত পত্র। বাহাতে মন্ত্রগাবিষয় লিখিত হয়।

মন্ত্রপূত (ত্রি) মন্ত্রেণ পূতঃ। মন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত।

“ব্রহ্মণী মন্ত্রপূতেন তোয়েনাশ্রে নিরাকৃতাঃ।”

(দেবীমাহাত্ম্য ৮৯৩৬)

মন্ত্রপূতায়ন (পুং) মন্ত্রেণ পূতঃ আত্মা যন্ত। গরুড়। (ধরণি)

মন্ত্রপ্রয়োগ (পুং) মন্ত্রস্ত প্রয়োগঃ। মন্ত্রের প্রয়োগ।

মন্ত্রফল (ক্লী) মন্ত্রণায়াঃ ফলং। মন্ত্রের উদ্দেশ্য।

মন্ত্রবীজ (ক্লী) মূলমন্ত্র।

মন্ত্রভেদ (পুং) মন্ত্রণা-বার্থকরণ।

মন্ত্রময় (ত্রি) মন্ত্র স্বরূপার্থে ময়ট্। মন্ত্রাস্বক, মন্ত্রস্বরূপ।

মন্ত্রমূর্তি (পুং) শিবের নামান্তর।

মন্ত্রমূল (ত্রি) মন্ত্র এব মূলং যন্ত। রাজ্য, রাজ্যরক্ষার মন্ত্রগাই মূল। মন্ত্রগাই বাহার প্রধান কারণ, তাহাই মন্ত্রমূল।

মন্ত্রযান, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে তিব্বতে প্রচলিত মন্ত্রাত্মক মন্ত্রভেদ।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে (হিউ এন্ সিয়াক্সের ভারত-

বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে), বৌদ্ধধর্মের নানাপ্রকার কালনিক

গল্প ও উৎসব প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এতাদৃশ বৌদ্ধধর্মই ৩৪০ খৃঃ-

অব্দে তিব্বতদেশে প্রচলিত হয়। অনন্তর আরও ৩৪ শতাব্দ

কাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের অধিকতর অবনতি দেখা যায়।

এই সময় উক্ত ধর্মের রহস্য কেবলমাত্র কতকগুলি অর্থহীন

ভাষায় সমাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রযান নামে অভিহিত হয়। নাগার্জুন

এই মতের প্রবর্তক বলিয়া সর্বসাধারণের নিকট মন্ত্রযান

বিশেষ আদৃত হইয়াছিল।

১০ম শতাব্দীতে উত্তরভারতে অর্থাৎ কাশ্মীর এবং নেপালে

তান্ত্রিক ধর্ম প্রচারিত হয়। এই তান্ত্রিক ধর্ম কালচক্র নামে

খ্যাত। এই শ্রেণীর বৌদ্ধেরা মন্ত্রযানপ্রথা অবলম্বন করেন।

এই মন্ত্রযানের অন্ত নাম বজ্রযান। উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোক-  
দিগকে বজ্রাচাৰ্য্য বলা হইত।

মন্ত্রযুক্তি (স্ত্রী) মন্ত্রের প্রয়োগ।

মন্ত্রযোগ (পুং) মন্ত্রস্ত যোগঃ। মন্ত্রপ্রয়োগ, মন্ত্র পাঠ করা।

“স্তোতব্যো মন্ত্রযোগেন সত্যা দেবী সরস্বতী।

দর্শয়িষ্যসি যৎ সত্যং সত্যে সত্যবতা হসি ॥”(বৃহৎ স. ২৬২)

মন্ত্রলা কানামা, মাত্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে কারমুল জেলার

অন্তঃগামী নলমলয় পাহাড়ের গিরিপথ বিশেষ। অক্ষা. ১৫°

৫৪' উঃ এবং দ্রাঘি. ৭৮° ৫৮' পূঃ।

মন্ত্রবৎ (অব্য.) মন্ত্র ইবার্থে বতু। মন্ত্র সদৃশ, মন্ত্রের তায়।

“মেথলামজ্জিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুন্।

অপ্পু প্রাপ্ত বিনষ্টানি গৃহীতানি মন্ত্রবৎ ॥” (মহু ২১৬৪)

(ত্রি) মন্ত্র-অন্ত্যার্থে মতৃপ্। ২ মন্ত্রগুক্ত।

“প্রাপ্তানাতিবর্দ্ধনাং পুংসো জাতকশ্চ বিধীয়তে।

মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাত্ত হিরণ্যমধুসর্পিষাম্ ॥” (মহু ২২২)

মন্ত্রসংস্কার (পুং) মন্ত্রস্ত সংস্কারঃ। মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার।

মন্ত্রের দশটা সংস্কার আছে, যেরূপ জীব গর্ভাধানাদি দশবিধ

সংস্কার দ্বারা বিত্তকি লাভ করে, সেইরূপ মন্ত্রও এই সকল

সংস্কারে বিত্তক হয়। একমাত্র গুরুই মন্ত্রের সংস্কর্তা। তিনিই

মন্ত্র সংস্কার করিয়া শিবাকে দিবেন। অসংস্কৃত মন্ত্র নিষ্ফল।

[ মন্ত্র দেখ ] ২ বিবাহ।

“অনুতাবুতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎ পতিঃ।

অথন্ত নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ ॥”(মহু ৫১৫৩)

কুলুক ও মেধাতিথি উভয়েই মন্ত্রলংস্কারের অর্থ বিবাহবিধি

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

‘মন্ত্রসংস্কারো বিবাহঃ তস্ত কর্তা ভর্তা’ (কুলুক)

‘মন্ত্রসংস্কারো বিবাহবিধিঃ তস্ত কর্তা’ (মেধাতিথি)

মন্ত্রসংস্কারকৃৎ (পুং) সংস্কারং করোতি কৃ-কিপ্। পতি, স্বামী।

মন্ত্রসংস্ক্রিয়া (স্ত্রী) মন্ত্রস্ত সংস্ক্রিয়া। মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার।

মন্ত্রসংহিতা (স্ত্রী) বৈদিক মন্ত্রসংগ্রহ।

মন্ত্রসাধন (ক্লী) মন্ত্রস্ত সাধনং। মন্ত্রণার সাধন, মন্ত্রের সাধন,

অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি।

মন্ত্রবাদিন্ (পুং) ১ মন্ত্রোচ্চারণকারী। ২ মন্ত্রজ্ঞ।

মন্ত্রবিদ্ (পুং) মন্ত্রং পঞ্চাঙ্গমন্ত্রান্ বেত্তীতি বিদ্-কিপ্। চর।

“এতৎ শ্রদ্ধা রূপদো যজ্ঞসেনঃ সর্বং তস্মৈ মন্ত্রবিদভ্যো নিবেত।

মন্ত্রং রাজা মন্ত্রয়ামাস রাজন্ যথায়ুক্তং রক্ষণে বৈ প্রজানাম্ ॥”

(ভারত ৫১৯৩৫) (ত্রি) ২ মন্ত্রজ্ঞাতা। “সোহং ভগবতো

মন্ত্রবিদেবান্মি” (ছান্দোগ্যোপ. ৭।১।৩) মন্ত্রং বেদার্থং বেত্তীতি

বিদ্-কিপ্। ৩ বেদার্থবিদ, বেদার্থবেত্তা।

“সহস্রং হি সহস্রাণামনুচাং যত্র ভুক্ততে ।

একস্তান্ মস্ত্রবিদ্ভীতঃ সর্বানহসি ধর্মতঃ ॥” (মহু ৩।১৩১)

মস্ত্রবিদ্যা (স্ত্রী) ভোজবিজ্ঞা ।

মস্ত্রশ্রুতি (স্ত্রী) গুপ্তমস্ত্র শ্রবণ ।

মস্ত্রশ্রুত্যা (স্ত্রী) মস্ত্র দ্বারা শ্রবণীয় । “মস্ত্রশ্রুত্যাং চরামসি ।

(শব্দ ১০।১৩৪।৭) ‘মস্ত্রশ্রুত্যাং মস্ত্রেণ সার্থ্যাং’ (সারণ)

মস্ত্রবর্ণ (পুং) ১ মস্ত্রোন্নিখিত বিষয় । ২ মস্ত্রেণ এক একটা অক্ষর ।

মস্ত্রবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কুজ গ্রাম । শিগগাঁ হইতে ৪ মাইল পূর্বে অবস্থিত । এই স্থানে ৩ খানি শিলালিপি আছে । একখানি হনুমান-মন্দিরের সম্মুখে, দ্বিতীয়খানি গ্রামের পূর্বকটকের নিকটে এবং তৃতীয়খানি বামণ ভাঁড়ীর রাজসভায় স্থাপিত । উহার মধ্যে একখানির তারিখ ৮৩৫ খৃষ্টাব্দ এবং ৪র্থখানি রাষ্ট্রকূটরাজ ১ম অমোঘবর্ষের সময়ে উৎকীর্ণ ।

মস্ত্রসাধ্য (ত্রি) মস্ত্রেণ সাধ্যঃ । যাহা মস্ত্র দ্বারা সাধন করা যায় ।

মস্ত্রসিদ্ধ (ত্রি) মস্ত্রেণ সিদ্ধঃ । মস্ত্র দ্বারা সিদ্ধ, যাহার মস্ত্র সফল হইয়াছে ।

মস্ত্রসিদ্ধি (স্ত্রী) মস্ত্রস্ত সিদ্ধিঃ । মস্ত্রেণ সফলতা ।

মস্ত্রসূত্র (স্ত্রী) সূত্রগ্রন্থত মস্ত্র । (কবচাদি)

মস্ত্রস্পর্শ (ত্রি) মস্ত্রেণ স্পৃশতীতি (স্পৃশোহমদকে ক্রি। পা ১।২।৫৮) ইতি ক্রি। মস্ত্রকরণক স্পর্শকর্তা, মস্ত্রদ্বারা স্পর্শকারী ।

মস্ত্রারাদন (স্ত্রী) মস্ত্রস্ত আরাধনং । মস্ত্রেণ আরাধন ।

মস্ত্রার্থাধ্যায় (পুং) ধর্মুর্নৈদোক্ত কাঠকোপনিষদের ঋষি-অমুক্তমণি নামক অধ্যায় ।

মস্ত্রাবলী (স্ত্রী) মস্ত্রগানমুহ ।

মস্ত্রিক (পুং) মস্ত্রিন্ স্বার্থে কন্ । মস্ত্রী ।

মস্ত্রিকা (স্ত্রী) উপনিষদভেদ, মস্ত্রিকোপনিষদ ।

মস্ত্রিত (ত্রি) মস্ত্রোহস্ত জাতঃ, ইতচ্ বা মস্ত্র-ক্ত । মস্ত্র দ্বারা সংস্কৃত, অভিমস্ত্রিত ।

“শিষ্যঃ স্বলঙ্কৃতং বেত্তামুপায়িমুপবেশয়েৎ ।

মস্ত্রিতং প্রোক্ষণীতোদৈঃ শাস্তিকুণ্ডলৈশ্চত্বা ॥

মূলমস্ত্রেণাষ্টশতং মস্ত্রিতৈরতিষেচয়েৎ ॥” (নিবন্ধ)

মস্ত্রিতা (স্ত্রী) মস্ত্রিণো ভাবঃ তন্-টাপ্ । মস্ত্রিত, মস্ত্রীর ভাব বা ধর্ম, মস্ত্রীর কাণ্ড ।

মস্ত্রিন্ (পুং) মস্ত্রো গুপ্তভাষণমস্ত্রাতীতি মস্ত্র-ইনি, যদ্বা মস্ত্রমতে ইতি মস্ত্র (নন্দিগ্রহাতি । পা ১।১।১৪৪) ইতি গিনি । কন্তব্যানিচ্চকর্তা, গিনি মস্ত্রণার অবধারণ করেন । পর্যায়—ধীসচিব, অমাত্য, নচিব, ধীসধ, সামবাধিক । (হেম)

ইহার লক্ষণ—

“মস্ত্রী ভক্তঃ শুচিঃ শূরোহমুক্তো বুদ্ধিমান্ ক্ষমী ।

আত্মিক্যাদিকুশলঃ পরিচ্ছেদী স্ত্রদেশজঃ ॥”

(কবিকল্পলতা)

শুচি, বীর, অমুক্ত, বুদ্ধিমান্, ক্ষমার্শাল, স্ত্রাংশাজ্ঞে বিশেষ পারদর্শী, পরিচ্ছেদযুক্ত ও স্ত্রদেশোৎপন্ন ব্যক্তি মস্ত্রী হইবার উপযুক্ত ।

“বহুভিমস্ত্রয়েৎ কামঃ রাজা মস্ত্রং পৃথক্ পৃথক্ ।

মস্ত্রিণামপি নো কুয্যাৎ মস্ত্রী মস্ত্রপ্রকাশনম্ ॥

ন কচিৎ কস্ত বিখ্যাসো ভবতীহ সদা নৃণাম্ ।

নিশ্চয়শ্চ সদা মস্ত্রে কাণ্ডা একেন হরিণা ॥”

(মৎস্তপুং ১৮৯ অং)

রাজা প্রত্যেক মস্ত্রীর সহিত বিভিন্ন সময়ে মস্ত্রণা করিবেন । মস্ত্রিণগণও অপর মস্ত্রীর নিকট মস্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না । মস্ত্র প্রকাশ হইলে বিষম অনর্থ ঘটে । [মস্ত্রণা দেখ ।]

মস্ত্রিপতি (পুং) মস্ত্রিবর । শ্রেষ্ঠী মস্ত্রী ।

মস্ত্রিপ্ৰধান (পুং) মস্ত্রিণাং প্রধানঃ । মস্ত্রিশ্রেষ্ঠ, সচিবশ্রেষ্ঠ ।

মস্ত্রিমুখ্য (পুং) প্রধান মস্ত্রী ।

মস্ত্রিবংশ, নারোরাম রত্নরাও মস্ত্রিবংশের আদি পুরুষ । ইনি রত্নগিরির অন্তঃপার্শ্বী কোচরে নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন । ১৬৯১ খৃঃ অব্দে ইনি মরাঠা সেনাপতি ধনাজিরাও বাদবের মস্ত্রি গ্রহণ করেন ।

যখন মহারাষ্ট্ররাজ শাহু সাতারায় ফিরিয়া আসিতোছিলেন, তখন তারাবাই তাহার গতিরোধ করিতে আদেশ করেন । এই নিমিত্ত ধনাজি তাহাকে বাধা প্রদান করেন । এই বিদ্রোহ সময় হইতেই নারোরাম বরাবর রাজার বিশ্বাসভাজন ছিলেন, এই নিমিত্ত রাজা তাহাকে ‘রাজাজা’ উপাধি এবং পারিতোষিক স্বরূপ ৪০০০ টাকা প্রদান করেন । ৪ বৎসর পর অর্থাৎ ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে তিনি ‘মস্ত্রী’ খেতাব প্রাপ্ত হন এবং কয়েকটা জেলার শাসনভার গ্রহণ করেন ।

ইনি অতিশয় ধান্মিক ছিলেন । ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ইহার যন্ত্রে সিদ্ধপুরে ও আশান গ্রামে একটা ধান্মশালা স্থাপিত হয় । ইনি নিজ গ্রামেও অনেক মন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণ এবং ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন ।

১৭৪৭ খৃঃ অব্দে নারোরাম পরলোক গমন করিলে ভদীর পুত্র ঘনশ্যাম ‘মস্ত্রী’ খ্যাতি প্রাপ্ত হন । ঘনশ্যাম যে কয়েকখানি গ্রাম ইনাম পাইয়াছিলেন, পেশবা বালাজি-বাজীরাও তাহার সনন্দ দিয়াছিলেন ।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ঘনশ্যাম ডিলাড়ীতে (তাজগাঁও) একটা

মন্দির নির্মাণ করেন। এতদ্বিধি তিনি কালীক্ষেত্রে বাইরা অনেক সংকার্য ও দানধানাদি করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি কয়েকটি মন্দির ও বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন। অতঃপর সরাসপথ অবলম্বন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি কালীধামেই বাস করেন এবং ১৭৮০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মানবলীলা শেষ হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর ঘনশ্যামের পুত্র রঘুনাথ রাও সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। রঘুনাথ রাও অনেক সংকার্য করিয়া ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অনন্তর তদীয় পুত্র জয়বন্ত রাও তাঁহার স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৩২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। শেষ পেশবা বাজিরাও অজ্ঞানপূর্বক তাঁহার অধিকৃত কয়েকটি স্থান কাড়িয়া লয়েন।

রঘুনাথ রাও জয়বন্ত, ১৮০৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে মহারাজ প্রতাপ সিংহ কর্তৃক ইনি মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার অধিকৃত স্থান মধ্যে তিন থানি গ্রাম বাদে আর সমস্তই ছাড়িয়া দেন। তিনি জায়পরায়ণতা ও সাহসিকতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। মন্ত্রী হইয়া তিনি সূচাঙ্গরূপে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ইসলামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৎপরে মন্ত্রিবংশের প্রতিনিধি তৎপুত্র আনন্দরাও রঘুনাথ। মন্ত্রি লাভ করেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ইনি একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর সরদার হন। ইহার বার্ষিক আয় প্রায় ১৮১০০০ টাকা।

মন্ত্রিবর (পুং) মন্ত্রিণাং বরঃ। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ।

মন্ত্রিবিক (পুং) বিদ্যাপর্যন্তের পার্শ্ববর্তী দেশভেদ।

“দ্রবিড়বিদেহাঙ্গাঙ্গকভাসাকৌরুণাঃ সমন্ত্রিবিক।” বৃহৎসংঃ ১৬।১১।

মন্ত্রেশ্বর, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটা গ্রামের নাম, এখানে একটা থানা আছে। অক্ষাঃ ২৩° ২৫' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮৮° ২' পূঃ।

মন্ত্রোদক (ক্লী) মন্ত্রপুতঃ উদকং। মন্ত্রপুত জল।

মহু, ১ বিলোড়ন। ২ প্রতীঘাত। ৩ হিংসা। ৪ পীড়ন। ভাদি। পক্ষে ক্রাদি। পরশ্মৈ। সক। সেট্। ভাদিপক্ষে লট্ মথতি মথতু। লিট্ মমাথ, মেথতুঃ। লুট্ মথিতা। লুঙ্ অমথাং। ক্রাদিপক্ষে লট্ মহতি, মথতি, মথীতঃ মথুস্তি, লিট্ মহীয়াং, লুঙ্ অমথাং। লিট্ মহমহ, মহমহতুঃ। লুট্ মহিতা। লুট্ মহিষ্যতি। লুঙ্ অমহিৎ, অমহিষ্টাৎ অমহিষুঃ। লুট্ মিমথিষতি, মিমথিষতি। বঙ্ মামথ্যতে। বঙ্ লুক্ মামস্তি। মামথ্যতে, মামস্থি নিচ্ মামথতি, মহমহতি। লুঙ্ অমীমথৎ, অমমহৎ।

মহু (পুং) মথ্যতে ইনেন মহ করণে ঘঞ। মহদণ্ডক।

“মামথ্যমতিমহেন জ্ঞানোদধিমহুত্তমম্।

নবনীতং তথা দগ্নো মলয়াচ্চক্ষনং যথা ॥” (ভারত ১২।৩৪।১১)

২ শাক্তব। স্মৃতাভ্যক্ত শক্ত শীতল জলে পরিপ্লুত করিয়া নাতিসাত্ত্ব ও নাতিসাত্ত্ব অর্থাৎ খুব পাতলাও নহে খুব ঘনও নহে, মাঝামাঝি রূপ করিলে মহু হয়, ইহার নামান্তর শাক্তব।

“শক্তুভিঃ সর্পিষাভ্যাক্তৈঃ শীতবারিগরিপ্লুতৈঃ।

নাত্যচ্ছো নাতিসাত্ত্বশ্চ মহু ইত্যভিধায়তে ॥” (ব্রাহ্মনিঃ)

ইহার চলিত নাম পেয়া। শক্তু দ্রব্য দ্বারা আলোড়িত হইলেই মহু হয়। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

“জলে চতুঃপলে শীতে ক্ষুঃ দ্রব্যপলং কিপেৎ।

মুৎপাত্রে মহুয়েৎ সম্যক্ তন্মাক্ দ্বিপলং পিবেৎ ॥” (ভাবপ্রঃ)

চারি পল শীতল জলে এক পল চূর্ণ দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া মুক্তিকানিমিত্ত পাত্রে সম্যক্ মহু করিলে তাহাকে মহু কহে। এই মহুপানের মাত্রা দুই পল।

বৈজ্ঞক শাস্ত্রে বহু প্রকার মহুর উল্লেখ আছে। স্মৃত, শক্তু, দাড়িম ও গুড় দ্বারা এক প্রকার মহু হয়। স্মৃত, শক্তু ও জল দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার ও দ্রাক্ষা, শর্করা ও ইক্ষুর দ্বারা তৃতীয় প্রকার মহু প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ স্খোবলকর, পিপাসা ও শ্রমনাশক।

৩ ফান্টভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—এক পল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া এক কুড়ব অর্থাৎ অঙ্কসেরপরিমিত জলে নিঃক্ষেপ করিয়া মুক্তিকানিমিত্ত পাত্রে স্থাপন করিবে, পরে উহাকে উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া বস্ত্রে ছাকিয়া লইতে হইবে। ইহারও সেবনমাত্রা দুই পল। ইহাতে মধু, চিনি ও গুড় প্রভৃতি দিতে হইলে এক কষ পরিমাণে প্রক্ষেপ দিতে হইবে।

৪ মারগ। ৫ মদন। ৬ কম্পন। (ত্রিকাঃ) ৭ নেত্রমল। (ধরণি) ৮ নেত্ররোগ। (বিশ্ব) ৯ অংগু। (শল্যরত্নাঃ) ১০ কুহন। ১১ বিলোড়ন।

“আতিষ্ঠং প্রত্যাপেক্ষসমুত্তিঃ স চিরং নৃপঃ।

প্রাণ্ মহাদনভিব্যক্তরদ্রোণপুষ্টিরিবার্ণবঃ ॥” (রঘু ১০।২০)।

মহু (পুং) ১ মহুকারী। ২ মুনিভেদ। ৩ তদ্বংশধরগণ।

মহুজ (ক্লী) মহুেন মহুনেন জায়তে ইতি জন-ড। নবনীত।

মহুদণ্ডক (পুং) মহায় মহুনায় যো দণ্ডঃ। ততঃ স্বাথে কন্।

মহানদণ্ড, চলিত ছাঁচুনি, খোলমোনী, ঘড়েন। পয়্যায়—

বৈণাথ, মহু, মহান, মহা, করহর্ষক, মহু, ভক্তাট, তক্তাট।

মহু (ক্লী) মহু-লুট্। ১ বিলোড়ন। ২ কুহন।

“চিরারক্টিদধাপি সাগরজাপি মহুনম্।” (ভারত ১।১৮।১০)

(পুং) মথ্যাত্যানেতি মহু করণে লুট্। ৩ মহানদণ্ড।

“গোভিষ সমকর্ণাসু ব্রজ নির্যোগভূমিষ।  
মহনাবতপূর্ণে গর্গরে নদংসু চ ॥” (হরিবংশ ৮২।৩৬)  
মহনঘটি (স্ত্রী) অন্নো ঘটঃ অন্নার্থে ভীষ, মহনর্থঃ মহনস্ত বা।  
ঘটি। দধিমহনপাত্র।  
‘কলনী মহনঘটি মহনী চাপি গর্গরী।’ (জটায়ু)  
মহুপর্বত (পুং) মহশৈল, মন্দর পর্বত।  
মহনোদ্ধব (ক্লী) নবনীত, মাখন। (বৈত্কনিং)  
মহুর (ক্লী) ক্লেষণতীতি মহ-বাহুলকাৎ অরন্। ১ কুস্থভী।  
(মেদিনী) (পুং) ২ কোষ। ৩ ফল। ৪ বাধ। ৫ মহানদণ্ড।  
৬ সূচক। (বিষ) ৭ মন্দগামী যোদ্ধা। ৮ কোপ। (অজয়)  
(ত্রি) ৯ মন্দ।  
“ধতে সালসমহুরং ভূবি পদং নির্যাতি নাস্তঃপুরাং”।  
(সাহিত্যদ. ১।৬৮) ১০ পৃথু। ১১ বক্র। ১২ নিশ্চল।  
“রাজ্যাভিষেকসলিলক্ষালিতমোলেঃ কথাসু কৃষ্ণত।  
গর্জভবমহুরাক্ষী পশ্চতি পদপঙ্কজঃ রাজা ॥”  
(আর্য্যাসপ্তশতী ৪৮৮)  
১৩ জড়। (শব্দরত্নাং) ১৪ নীচ। ১৫ মন্দগামী। (হেম)  
১৬ বৈশাখ মাস। ১৭ হরিণ।  
মহনজ্বর (পুং) জ্বরবিশেষ। ইহার লক্ষণ—  
“অরো দাহো ভ্রমো মোহো হতীসারো বমিস্তথা।  
অনিদ্রা মুখশোষশ্চ তালুজিহ্বে চ শুষ্ক্যতি।  
গ্রীবায়াং পরিদৃষ্টে ফোটকাঃ সর্ষপোপমাঃ।  
স্বতাননাং শ্বেদরোধাং মহুরো জায়তে নৃণাম্ ॥”  
(যোগরত্নাকর)  
অতিরিক্ত স্বতভোজন বা শ্বেদরোধে এই জ্বর হয়।  
জর, দাহ, ভ্রম, মোহ, অতীসার, বমি, অনিদ্রা, মুখশোষ,  
তালু ও জিহ্বা শুষ্ক এবং গ্রীবাদেশে সর্ষপদৃশ ফোটক  
প্রভৃতি লক্ষণ মহনজ্বরে প্রকাশ পায়।  
মহুরা (স্ত্রী) মহুর-স্ত্রিয়াং টাপ্। কৈকেয়ীর দাসী। রামের  
রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া মহুরা কৈকেয়ীকে রামের  
বনবাস দিবার অস্ত্র মন্ত্রণা দেয়। কৈকেয়ী মহুরার কথায়  
রাজা দশরথের পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে বর প্রার্থনা করিয়া  
রামচন্দ্রকে বনে পাঠান। এই দাসী কৈকেয়ীর পিজালয়  
হইতে আসিয়াছিল। (রামায়ণ)  
“রামাভিষেকে বিদ্যার্থং যতস্ত ব্রহ্মবাক্যতঃ।  
মহুরাঃ প্রবিশস্বাদৌ কৈকেয়ীঞ্চ ততঃ পরম্ ॥”  
(অধ্যায়রামাং অযোধ্যাকাং ২ অং)  
মহুর (পুং) মহ বাহুলকাৎ অরু। চামরবাত, চামর বায়ু।  
পথায়—কুঠের। (ত্রিকাং)

মহুশৈল (পুং) মহাচল, মন্দর পর্বত।  
মহা (স্ত্রী) মখনহেতু। “যত্র মহাং নিবস্তুতে” (ঋক্ ১।২৮।৪)  
‘মহাং মখনহেতুং, মথ্যতেহতি মহা, মথি বিলোড়নে  
করণে ষজ্, ততষ্টাপ্’ (সারণ) ২ মেথিকা।  
“বল্লরী চন্দ্রিকা মহা মিত্রপুষ্পা চ কৈরতী।” (ভাবপ্রং)  
মহা (থিন্) (পুং) মহ-ইনি, স চ কিং। মহানদণ্ড।  
মহাচল (পুং) মহাদ্রি, মন্দরপর্বত।  
মহান (পুং) মহতেহনয়েতি মহ-বাহুলকাৎ আনচ্। মহদণ্ডকা  
“মহানারণিসংযোগাং মহনাচ্চ সমুদ্ভবঃ।  
পাবকস্ত যথা তদ্বৎ কথং মে স্ত্রাং স্ত্রতোদ্ভবঃ ॥”  
(দেবীভাগবত ১।১০।২৫)  
২ আরগধ। (রাজনিং) ৩ মন্দর পর্বত। সমুদ্রমহন  
সময়ে এই পর্বত মহনদণ্ড হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম  
মহান হইয়াছে।  
“প্রবিশেষাথ পাতালং মহানঃ পর্বতোত্তমঃ।” (রামাং ১।৪৫।২৭১)  
৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১২৮)  
মহানক (পুং) মহান ইবেতি (ইবেপ্রতিকৃত্তো। পা ৫।৫২৬)  
ইতি কনু। তৃণভেদ, এক প্রকার বাস। মহারাত্রি—মারবেলি,  
কলিঙ্গ—মারবলী। পর্যায়—হরিত, দৃঢ়মূল, তৃণাঙ্ঘ্রি।  
ইহার গুণ—নিষ্ক, প্রিয়, মধুর এবং দোষীদিগের পক্ষে বিশেষ  
উপকারী। (রাজনিং)  
মহানভৈরব (পুং) অগ্নিপিত্ত-রোগাধিকারে রসৌষধবিশেষ।  
প্রস্তুতপ্রণালী—শোধিত পারদ, তাম্র, হিন্দু, পুষ্করমূল,  
সৈন্ধব, গন্ধক, হরিতাল ও কটুকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে  
চূর্ণ করিবে। পরে এই চূর্ণ পুনর্গবা, দেবদারু, নিম্বী,  
তণ্ডুলীয়ক, ও তিক্ত কোশাতকীর রসে একদিন মর্দন  
করিতে হইবে। এইরূপে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার পরিমাণ  
এক মাষা। এই ঔষধ মধু দ্বারা লেহন করিলে অগ্নিপিত্ত-  
রোগ আশু প্রশমিত হয়।  
“মৃতং স্তৃতং মৃতং তাম্রং হিন্দুপুষ্করমূলকম্।  
সৈন্ধবং গন্ধকং তালং কটুকীং চূর্ণয়েৎ সমম্ ॥  
পুনর্গবা দেবদারুনিম্বী তণ্ডুলীয়কৈঃ।  
তিক্তাকোশাতকীদ্রাবৈদৈনকং মর্দয়েদ্দৃঢ়ম্ ॥  
মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রেঃ রসো মহানভৈরবঃ।”  
(রসচিকিৎসা ২ অং)  
২ একজন প্রসিদ্ধ হঠযোগী। হঠযোগপ্রদীপিকায় ইহার  
উল্লেখ আছে।  
মহাবল (পুং) বেদবর্ণিত সর্পভেদ। ইহার গাছে দেহ জড়াইয়া  
মাথা নিম্ন করিয়া ঝুলিয়া থাকে। (ঐত্তরয়েত্রাং ৩।২৬)

মস্থিত্ (পুং) মথনকারী।

মস্থিন্ (ত্রি) মস্থ-অস্ত্যর্থ ইনি। পীড়াকারক।

“পরিভাবীণি তারাগাং পশু মস্থীনি চেতসাম্।”

(ভট্ট ৬৭৪) ‘চেতসাং মস্থীনি পীড়াকারীণি’ (অন্নমঃ) ২ মস্থন-  
যুক্ত। (ক্ৰী) ৩ সোম। (ঋক্ ৩৩২।২)

মস্থিনী (স্ত্রী) মস্থা মস্থনং অস্ত্যস্তাং মস্থ-ইনি ভীপ্। দধিমস্থন-  
পাত্র, পর্যায়—গর্গরী, কলসী। (হেম)

মস্থিপ (ত্রি) মথিত সোমপানকারী।

মস্থিবৎ (ত্রি) মথিত-সোমযুক্ত।

মস্থিশোচিস্ (ত্রি) মথিত সোমদৌণ্ডীল।

মস্থু (পুং) বীরব্রতের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।১৫।১৫)

মস্থোদক (পুং) ছন্দসমুদ্র, মণ্ডোদক।

মস্থোদাধি (পুং) মথাতে হনো মস্থ-কর্ষণি ষঞ, মস্থশাসো  
উদধিচেতি, মস্থায় উদধিরিতি বা। ক্ষীরসমুদ্র।

মন্দ (পুং) মন্দতে ইতি মন্-অচ্। ১ শনি।

“শুক্রেন্দুধজীবানাং বারাঃ সর্ষজ শোভনাঃ।

ভান্নভূতমন্নাং শুভকর্ম্ম কেষপি ॥” (জ্যোতিঃসারসঃ)

২ হস্তিজাতিবিশেষ। (মেদিনী) ৩ যম। (ত্রিকাং)

“তত্র মন্দমিবালোক্য সাত্তিপ্রায়ঃ স মাং নৃপঃ।

পপ্রচ্ছ রে কিমীদৃক্ স্বং সজ্জাতঃ কথ্যতামিতি ॥”

(কথাসরিংসাং ৩২।১৫৫) ৪ প্রলয়। (অজয়)

৫ জঠরানল বিশেষ।

“ভীক্সঃ পিত্তাধিক্ষেন জায়তে জঠরায়িকঃ।

বাতপ্লেয়াধিক্ষেন জায়তে মন্দসংজ্ঞকঃ ॥”

(হার্যীত চিকিৎসিতহাং ৬ অঃ)

বায়ু ও প্লেয়ার আধিক্যে অগ্নির মন্দতা হয়। (ত্রি)

৬ অতীক্ষ। ৭ মূর্খ, মূঢ়।

“মন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্পহাস্ততাম্।” (রঘু ১।৩)

৮ শৈব। ৯ অভাগ্য। ১০ রোগী। ১১ অন্ন। (মেদিনী)

“মন্দং মন্দং মৃদতি পবনশ্চান্নকুলো যথা স্বাং” (মেঘদূত ১।৪)

১২ অলস।

“প্রায়েণান্নায়ুষঃ সভ্যাঃ কলাবসিন্ যুগে জনাঃ।

মন্দাঃ স্তম্ভমন্তয়ো মন্দভাগ্যা হু পুত্রতাঃ ॥” (ভারত ১।১।১০)

‘মন্দাঃ অলসাঃ’ (স্বামী) ১৩ মদরত। ১৪ খল। (হেম)

মন্দক (ত্রি) ১ নিকোঁধ। ২ মন্দকারী, মূঢ়। ৩ বুদ্ধিশূন্য  
সরল। ৪ মহাভারতোক্ত জাতিবিশেষ। (মহাঃ ভীষ্মপর্ব)

মন্দকর্ণি (পুং) জনৈক প্রাচীন মুনি।

মন্দকর্ষন (ক্ৰী) ১ গ্রহগণের মন্দ স্পষ্টগতির ফলানয়নরূপ  
ক্রিয়াবিশেষ।

“গ্রহভুক্তৈঃ কলং কার্য্যং গ্রহবন্দকর্ষণি।” (স্ব্যাসিঃ ২।৪৮)

‘মন্দকর্ষণি গতিমন্দকলক্রিয়ানিমিত্তমিত্যর্থম্ ॥’ (টীকা)

(ত্রি) ২ নিশ্চেষ্ট, কার্য্যহীন, জড়বৎ।

মন্দকারিন্ (ত্রি) মন্দং করোতি কৃ-ণিনি। অপকারকারক।

“পাতালে তু এবেষ্টব্যং ম স্থয়া মন্দকারিণা।”

(কথাসরিংসাং ২২।২০৬)

মন্দগ (ত্রি) মন্দং অন্নং গচ্ছতীতি গম-ড। মুহুগামী।

“মন্দগাশ্চ শমিজ্ঞানিবৃষহংসগজজিহ্বঃ।” (কবিকল্পলতা)

২ শাকদ্বীপস্থিত শূদ্র জনপদবিশেষ।

“তত্র পুণ্য জনপদাশ্চাচারো লোকসম্মতাঃ।

মগাশ্চ মশকাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা ॥” (ভারত ৬।১।৩৩)

মন্দগতি (ত্রি) মন্দা গতির্য্য। ১ মন্দগতিবিশিষ্ট গ্রহ। গ্রহ-  
দিগের মন্দ শীঘ্র প্রভৃতি গতি আছে। রবির সমোপে গ্রহ-  
দিগের গতি শীঘ্র এবং দূরে মন্দগতি হইয়া থাকে। ২ মুহু গতি-  
বিশিষ্ট। মুহুগতি।

মন্দগামিন্ (ত্রি) মন্দং গচ্ছতীতি গম্-ণিনি। মুহুগমনশীল।

পর্যায়—মহর, শৈবরগামী, মন্দ। (শব্দরত্নাবলী)

মন্দচেতস্ (ত্রি) মন্দং চেতো যন্ত। ছরাছা, পাশাশয়।

মন্দজননী (স্ত্রী) মন্দন্ত শনৈশ্চরন্ত জননী। শনৈশ্চরের বাজা,  
স্বর্ষাপন্নী। (ত্রিকাং)

মন্দজরস্ (ত্রি) যিনি ধীরে ধীরে বার্ক্যে উপনীত হইতেছেন।

মন্দজাত (ত্রি) ধীরে ধীরে উৎপন্ন।

মন্দট (পুং) মন্দমটতীতি অট-অচ্, শককুদিষাং সাধুঃ।

পারিতদ্রব্যক। (শব্দরত্নাং)

মন্দতা (স্ত্রী) মন্দন্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। আলস্য।

“হ্রমৈধ্বং মন্দতা চ স্বপ্নে মৈথুননিত্যতা।

নিরাকরিক্ষুতা চৈব বিজ্ঞয়াঃ পাশবা গুণাঃ ॥” (সুশ্রুত শারীরহাং)

২ মন্দত্ব, মন্দের ভাব বা ধর্ম্ম। ৩ ক্ষীণতা।

“মধ্যস্ত প্রথিমানমেতি জঘনং বক্ষোজরোর্মন্দতাং।

দূরং যাতুদরঞ্চ রোমলতিক। নেত্রাজ্জবং ধাবতি ॥”

(সাহিত্যাদং ৩।৬৮)

মন্দধৌ (ত্রি) মন্দা ধীর্য্য। অল্পবুদ্ধি।

মন্দন (ক্ৰী) মন্দতে স্তোতি অনেন মন্দ- (কৃপূ বৃজিমন্দি-

নিধাক্রঃ ক্রাঃ। উণ্ ২।৮১) ইতি করণে কৃ। স্তোত্র।

মন্দনাগ (পুং) প্রাচীন জনভেদ। ইহার অস্ত্র নাম মল্লনাগ।

[ মল্লনাগ দেখ ]

মন্দপরিধি (পুং) গ্রহদিগের করুপথে পরিভ্রমণকারী

মন্দোচ্চ বা মীচোচ্চগতির পরিমাণবিশেষ। “স্ব্যস্ত পরমা-

কর্ষণোৎপন্ন-পরমপূর্বাপরগমনরূপ-পরমমন্দকলাংশানাং জ্যা

পরমফলজ্যা তত্ত্বলোব্যাসাঙ্কেনোংপরবৃত্তে কক্ষাবৃত্তস্থিতাংশ-  
প্রমাণেন যোঃশান্তে মন্দপরিধ্যাংশাঃ কেদ্রযুগপদাস্তে নীচোচ্চ-  
সমেহর্কে চতুর্দশচক্রস্ত তত্র তে দ্বাত্রিংশংকেদ্রবিষমপদাস্তে  
নীচোচ্চাভ্যাং ত্রিভাস্তুরিতে চকারাছুক্তা মন্দপরিধ্যাংশা বিংশতি-  
কলোনাঃ সন্তঃ স্বধ্যচক্রয়োর্মন্দপরিধ্যাংশা ভবন্তি”

( স্বধ্যাসিঃ ২৩৪ টীকা )

মন্দপাল ( পুং ) ঋষিভেদ। ( মমু ৯২৩ )

মন্দপ্রজ্ঞ ( ত্রি ) মন্দা প্রজ্ঞা যন্ত। অল্পজ্ঞান।

“মন্দস্ত মন্দপ্রজ্ঞস্ত বয়ো মন্দায়ুধশ্চ যঃ।

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকশ্চিভিঃ ॥”

( ভাগবত ১।১৬।১০ )

মন্দফল ( ক্রী ) স্কুটসাধিত গ্রহগতিভেদ। Equation of  
the apsis or the anomalistic equation of the planet.

মন্দবুদ্ধি ( ত্রি ) মন্দা বুদ্ধিযন্ত। মূঢ়বুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি, মন্দধী।

( ক্রী ) মন্দা বুদ্ধি। অল্পা বুদ্ধি।

মন্দভাগিন্ ( ত্রি ) মন্দভাগ্য-দ্বিগুণ ভীপ্। হতভাগিনী।

ইহার প্রাকৃত—‘মন্দভাইনী’ ( শকুন্তলা )

মন্দভাগ্য ( ত্রি ) মন্দং ভাগ্যং যন্ত। হতভাগ্য।

মন্দভাজ্ ( ত্রি ) মন্দ-ভজ-ধি। মন্দভাগ্য।

মন্দভাষিণী ( ক্রী ) মৃদুভাষিণী, মঞ্জুবাদিনী।

—মন্দমতি ( ত্রি ) মন্দা মতিযন্ত। মূঢ়বুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি।

“মন্দাঃ স্তুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হু পুরুষতঃ ॥”

( ভাগবত ১।১১।১০ )

মন্দমেধস্ ( ত্রি ) মন্দা মেধা যন্ত। মন্দবুদ্ধি।

মন্দমন্দ ( অব্য ) অল্প অল্প।

“মন্দমন্দমুদিতঃ খং প্রযযৌ

ভীত ভীত ইব শীতমযুধঃ ॥” ( ভারবি )

মন্দয়ৎসথ ( ত্রি ) যজ্ঞমাদিগের প্রীতিবিধায়ক ইন্দ্রের সখা  
সোম। ( ঋক্ ১।৪৭ )

মন্দয়ন্তী ( ক্রী ) হুগী।

মন্দয়ু ( ত্রি ) স্ততিযুক্ত। ( ঋক্ ১।১৭।৩২ )

মন্দর ( পুং ) মন্দ-বাহুলকাৎ অরঃ। মন্থশৈল, মন্থনপর্বত।

দেব ও অশুরগণ মিলিত হইয়া যখন সমুদ্রমন্থন করেন, তখন  
এই পর্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়াছিলেন।

“মন্থানং মন্দরং কৃত্বা তথা নেত্রঞ্চ বাসুকিমা।”

( ভারত ১।১৮।১৩ )

মহাভারতে লিখিত আছে, এই পর্বত একাদশ সহস্র  
যোজন প্রোধিত ছিল। নরকদেবগণ মিলিত হইয়া এই  
পর্বতকে উত্তোলিত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই

কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট  
জানাইলে তিনি বাসুকিকে এই পর্বত উন্মূলিত করিতে  
বলেন। বাসুকি বলপূর্বক ইহাকে উন্মূলিত করিয়া সমুদ্র-  
তীরে লইয়া যান। পরে দেবাসুরগণ ইহাকে মন্থানদণ্ড  
করিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। [ সমুদ্রমন্থন শব্দ দেখ ]

( ভারত ১।১৭, ১৮ অং )

২ মন্দার পাদপ। ( মেদিনী ) ৩ স্বর্গ। ৪ হারভেদ।

( হেম ) ৫ মুকুর। ৬ কুশদ্বীপস্থিত পর্বতবিশেষ।

“মন্দরঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ সর্বধাতুময়ঃ শুভঃ।

মন্দ ইত্যেব যো ধাতুরপামর্থ্যে প্রকাশকঃ।

অপাং বিদ্যারণ্যে চৈব মন্দরঃ স নিগদ্যতে ॥”

( মৎস্তপুরাণ ১২।১৬১ )

৬ তন্মামক লুতাদিকীটবিষ-নাশক অগদবিশেষ।

( বাভট উত্তরতন্ত্র ১৭ অং ) ( ত্রি ) ৭ বহুল। ৮ মন্দ।

মন্দরগিরি, বাঙ্গালা-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র পর্বত।

অক্ষা° ২৪° ৫০' ২৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪' ৪১" পূঃ।

সাতশত ফুটের অধিক উচ্চ। হিন্দুর নিকট মন্দরগিরি অতি

পবিত্র বলিয়া গণ্য। এই পাহাড়ের উপরে প্রায়ই বৃক্ষ ও

তৃণাদি নাই। ইহার গায়ে অনেকগুলি পুষ্করিণী এবং

ইহার চারি ধার ঘুরাইয়া একটা সর্পের মূর্তি ক্ষোদিত

আছে। পুরাণে কথিত আছে, বিষ্ণুর কণ মল হইতে

রহদাকার এক দৈত্য উৎপন্ন হয়। এহ দৈত্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু

ও শিবকে সংহার করিতে উত্তত হইয়াছিল। ভগবান্

বিষ্ণু দশ সহস্র বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়া ইহার মস্তক ছেদন

করেন; কিন্তু মস্তকহীন দেহ পুকের ত্রায় যুদ্ধ করে দেখিয়া

বিষ্ণু মন্দরগিরির দেহোপরি নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় হাঁটু দ্বারা

দৈত্যকে চাপিয়া রাখেন। তদবধি বিষ্ণু সকল সময়েই এখানে

অধিষ্ঠিত আছেন, বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মধু ও কৈটভ

নামক দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন বলিয়া ভগবান্ এখানে

মধুসূদন নামে খ্যাত। “মন্দরে মধুসূদনঃ” ( পুরাণ )

আরও প্রবাদ আছে যে, সুরাসুরগণ এই মন্দরগিরি লইয়া

সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী কোন মুনির অভিশাপে

সমুদ্রগর্ভে পতিত হন; তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত এবং

অমৃতলাভের আশায় সমুদ্রমন্থন করা হয়। এই মন্থন-

ব্যাপারে সহস্রফণাধারী বাসুকি মন্থনরজ্জু এবং এই মন্দর

গিরি মন্থনদণ্ড হইয়াছিল। ভাগলপুরের এই মন্দরগিরি যে

পুরাণোক্ত মন্দরপর্বত এ বিষয়ে অনেক শিক্ষিত হিন্দু সন্দেহ

করেন; কিন্তু এখানকার জনসমাজের এ বিষয়ে তিলমাত্র

সন্দেহ নাই।



এতদ্বিধ এই পাহাড়ে অনেক স্বাভাবিক ও মনুষ্য-কৃত কোতুলজনক পুরাকীর্তির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। ইহার পাদদেশে ২১০ মাইল ব্যাপিয়া কয়েকটি পুষ্করিণী আছে, এতদ্বিধ অট্টালিকা ও প্রস্তরের প্রতিমূর্তিও অনেক দেখা যায়। ইহা দ্বারা অস্ফুট হইয়া যে, বহুকাল পূর্বে এখানে একটি নগর ছিল। এই নগর সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তীও আছে যে, এই নগরে ৫২টি বাজার ও ৫৩টি গলি ছিল। ইহা ব্যতীত ৮৮টি পুকুর ছিল। মন্দরগিরির পদপ্রান্তে ভগ্নাবশেষ একটি মন্দির আছে। ইহার দেয়ালের গায়ে অসংখ্য চতুষ্কোণ গঠিত রহিয়াছে। প্রবাদ, দেওয়ালি উৎসবের সময় প্রত্যেক গৃহস্থই গঠিত এক একটি দীপ দান করিত। ইহার অনতিদূরে আর একটি ভগ্ন অট্টালিকা বর্তমান। কেহ কেহ বলেন, ইহা চোলরাজের প্রাসাদ।

এই অট্টালিকা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে প্রস্তরনির্মিত একটি বারেন্দা আছে। ইহার উপর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখণ্ড শিলালিপি দৃষ্ট হয়। উক্ত শিলালিপি পাঠে জানা যায়, ২৭৭ বঙ্গাব্দ পূর্বে এই নগরের সমৃদ্ধি বর্তমান ছিল। বর্তমান কালে পৌষসংক্রান্তির দিন মধুসূদনের প্রতিমূর্তি নগর হইতে পাহাড়ের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। এই সময়ে প্রায় ৩০৪০ হাজার লোক নানা দেশ হইতে এই স্থানে সমবেত হইয়া এই উৎসবে যোগদান করে। এই উৎসব উপলক্ষে এখানে ১৫ দিন পর্যন্ত মেলা হইয়া থাকে। কাঞ্চীপুরের চোলরাজ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সকল তীর্থ পর্যটন করেন; কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই; অবশেষে ইহার নিকটবর্তী কোন পুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়া ব্যাধিমুক্ত হন, এই জ্ঞাত্য সেই পুষ্করিণী পাপহারিণী নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রবাদ, ব্রহ্মা এখানে লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসীর ভগবানের তপস্বী করিয়াছিলেন। তপস্বীত্ব একটি শুপারি ও অশ্রুজ্ঞান জিনিস যজ্ঞায়িতে নিক্ষেপ করেন। ঐ শুপারি গড়াইয়া নিম্নস্থ হ্রদ মধ্যে পতিত হয়। ঐ যজ্ঞীয় শুপারিপ্রভাবে হ্রদ পুণ্যতোয়া হয় ও তাহাতে স্নান করিয়াই রাজার ব্যাধি দূর হইয়াছিল। নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা স্বগ্রাম হইতে মৃতদেহ আনিয়া পাপহারিণীর জলে নিক্ষেপ করে।

মন্দরশূঙ্গের নিকট একটি বৌদ্ধ-মন্দির আছে। জৈনেরা ইহাকে বিশেষ পবিত্র মনে করেন। এখানে সীতাকুণ্ড নামে ১০০ ফিট দীর্ঘ ও ৫০ ফিট বিস্তৃত একটি দীর্ঘিকা আছে। প্রবাদ, সীতা ও রাম অরণ্যবাসকালে এইখানে ছিলেন এবং সীতা উহাতে অবগাহন করায় উহার সীতাকুণ্ড নাম হয়।

অনেক পণ্ডিত বলেন, কালাপাহাড় সমস্ত দেবদেবীর

মূর্তি ধ্বংস করিতে করিতে মন্দরগিরিতে উপস্থিত হইবার পূর্বেই মধুসূদন সীতাকুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করেন এবং মাটির ভিতর দিয়া ভাগলপুরের নিকটবর্তী কাজরাণী হ্রদে গিয়া উপস্থিত হন। অবশেষে একজন পাণ্ডার প্রতি স্বপ্নাদেশ হওয়ায়, পাণ্ডা পুনরায় মধুসূদনকে মন্দিরে আনিয়া নূতন মন্দিরে স্থাপিত করেন।

সীতাকুণ্ড হইতে কয়েক ফিট উর্দ্ধে শঙ্খকুণ্ড নামে আর একটি প্রস্তবণ আছে। শঙ্খ নামে এক রাক্ষস এই জল মধ্যে বাস করিত বলিয়া ইহার নাম শঙ্খকুণ্ড হয়। এই শঙ্খের দৈর্ঘ্য ৩ ফিট এবং বিস্তার ১ ফুট। মহাভারতে কথিত আছে, এই শঙ্খাসুরের দেহ হইতেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রস্তুত হয়। এতদ্বিধ এখানে আকাশগঙ্গা নামে আর একটি প্রস্তবণ আছে।

মন্দরগিরির গহ্বরে প্রস্তরখোদিত অনেক প্রতিমূর্তি আছে। তন্মধ্যে নরসিংহরূপধারী বিষ্ণুমূর্তিই শ্রেষ্ঠ।

বরাহপুরাণ হইতে জানা যায়, ভগবান্ বিষ্ণু শিবের পুত্র স্বল্পের নিকট বলিয়াছিলেন যে, মন্দর সমস্ত তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই স্থানে লক্ষ্মী বিষ্ণুর সহিত সন্মিলন বিরাজমান রহিয়াছেন। এতদ্বিধ অনেক যোগী ঋষি এখানে বাস করিয়া থাকেন।

[ অপর বিবরণ মন্দর শব্দে দ্রষ্টব্য ]

মন্দরহরিণ (পুং) জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপের অন্তর্গত একটি দ্বীপ।

মন্দরায়, মোগল-রণতরীর জনৈক অধ্যক্ষ। খৃষ্টীয় ১৬০২ অব্দে বাঙ্গালার অন্তর্গত শগদ্বীপ লইয়া পর্তুগীজদিগের সহিত মোগলদের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে মন্দরায় নিহত হন।

মন্দবিস্ম (ত্রি) ১ বিষহীন। ২ অত্যন্ত বিষবিষিষ্ট।

মন্দবিস্মর্পিন্ (ত্রি) মন্দ মন্দ গমনশীল।

মন্দশোর, মধ্যভারতের অন্তঃপাতী গোয়ালিয়ার রাজ্যের একটি নগর। চম্বল নদীর একটি শাখার তীরে অবস্থিত। উজ্জয়িনী হইতে উত্তরপশ্চিমদিকে প্রায় ৮০ মাইল দূরবর্তী। মহারাষ্ট্র-পিঞ্চারি যুদ্ধের পর মন্দশোরে হোলকর ও ইন্ড্রাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হয় (১৮১৮ খৃঃ অব্দ)। মন্দশোরে একটি রেলওয়ে স্টেশন ও মুসলমান রাজাদের আমলের একটি প্রস্তরময় ভূভেদ্য ভূগর্ভ আছে। সাধারণ লোকে মন্দশোরকে 'দশোর' বলিয়া থাকে। ইহাই রস্তিদেবের রাজধানী স্প্রাটীন দণ্ডপুর।

এই নগরে কুমারগুপ্ত এবং বন্ধুবন্দ্যার একখণ্ড শিলালিপি আছে। ইহাতে বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন রেশমবস্ত্রনির্মিতা কি প্রকারে লাটবিষয় হইতে স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরে কুমারগুপ্তের

রাজ্যশাসনের উল্লেখ আছে। তাঁহার অধীনে বিশ্ববর্ষার পুত্র বন্ধুবর্ষা দশপুরের শাসনকর্তা ছিলেন।

মন্দসান (পুং) মন্দতে স্ত্যাদিকং প্রাপ্নোতীতি মন্দ- (ঋজি-বৃধিমন্দিহিতাঃ কিং। উণ্ ২।৮৭) ইতি সানচ্।  
১ অগ্নি। ২ প্রাণ। ৩ নিক্রা। (উজ্জল) (ত্রি) ৪ মোদমান।

“মন্দসানো মরুতান্” (ঋক্ ১।১০০।১৪) ‘মন্দসানো মোদমানঃ’ (সায়ণ)

মন্দসানু (পুং) মন্দং মন্দতাং সনোতি দদাতীতি মন্দ-সন্ বাহুলকাৎ উন্। ১ স্বপ্না। ২ জীব। (উজ্জল)

মন্দহার, রাজপুত্রদিগের একটা সম্প্রদায়। মুজাকরনগর এবং সাহরাণপুর জেলায় এই সম্প্রদায়ের অনেক রাজপুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জাবের নিকটবর্তী স্থানেও ইহাদের অনেকের বাস আছে। কথিত আছে, ইহারা অধোধ্য হইতে আসিয়া চেনেল এবং বর রাজপুত্রদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, ছিন্দে আসিয়া বাস করে। পরে ইহাদের দ্বারা পাতিয়ালায় অন্তঃপাতী কলারয়ে রাজধানী স্থাপিত হয়। এখন ইহারা ষমুনানদীর তীরে চোহানের দক্ষিণে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহারা ফিরোজশাহ কর্তৃক পাতিয়ালায় অন্তঃপাতী সমান নামক স্থানে অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছিল। মন্দহার, কন্দহার, বরগুজার, শজুরাল এবং পাগিহার রাজপুত্রদিগের মতে তাহারা রামচন্দ্রের পুত্র লব হইতে উৎপন্ন। স্মৃতরাং সুখ্যবংশীয় রাজপুত্র বলিয়া ইহারা গৌরব করিয়া থাকেন। কর্ণালে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হয় না।

ন্দা (স্ত্রী) মন্দ-দ্বিরাং টাপ্। সংক্রান্তিবিশেষ। যদি উত্তরকল্লনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী নক্ষত্রে রাবি সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মন্দাসংক্রান্তি কহে। এই সংক্রান্তির সংক্রমণের অব্যবহিত পরেই তিন দণ্ডকাল পুণ্যতম।

“মন্দা মন্দাকিনী গাজ্জা ঘোরা চৈব মহোদরী।

রাক্ষসী মিশ্রিতা প্রোক্তা সংক্রান্তিঃ সপ্তধা নৃপ ॥

“মন্দা প্রবেষু বিজ্ঞেয়া মুদো মন্দাকিনী তথা।

কিপ্রে গাজ্জাং বিজানীয়াহুগ্রে ঘোরা প্রকীৰ্তিতা ॥” (তিথিতত্ত্ব)

২ বল্লীকরজ, লতাকরজ। (বৈজ্ঞকনিং)

মন্দাক (স্ত্রী) মন্দাতে স্ত্যুতে ইতি মন্দ-বাহুলকাৎ আক।  
১ স্তবন। ২ স্রোতঃ। (উজ্জল)

মন্দাকিনী (স্ত্রী) মন্দাকানি স্রোতাংসি সন্ত্যস্তাঃ ইতি মন্দাক-  
ণিনি, যথা মন্দমকিতুং শীলমস্তাঃ শিনি, মন্দান্নঃ সরসঃ অকতি  
গচ্ছতীতি। স্বর্গগঙ্গা, পথ্যায়—বিয়লগঙ্গা, স্বর্গদী, স্মৃদীর্ষিকা,  
স্বর্গদা, দেবভূতি, স্বর্গপদ্মা, সুরেশ্বরী। ব্রহ্মবৈবর্ত-মতে—

“প্রধানধারা যা স্বর্গে সা চ নন্দাকিনী স্মৃতা।

যোজনায়ুতবিত্তীর্ণা প্রস্থেন যোজনা স্মৃতা ॥

ক্ষীরতুল্যজলা শতনৃত্যুতসুতরজিহী।

বৈকুণ্ঠাদ ব্রহ্মলোকক ততঃ স্বর্গে সমাগতাঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুং জন্মখণ্ড ৩৪অং)

গঙ্গার যে প্রধানধারা স্বর্গে গমন করে, তাহার নাম মন্দাকিনী, ইহার বিস্তার অযুত যোজন, প্রস্থ এক যোজন, ইহার জল তুণ্ডের জ্বার শুভ্রবর্ণ এবং অত্যাশ্রয় তরলযুক্ত, এই ধারা বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মলোক হইয়া স্বর্গে আসিয়াছে।

বর্তমান বদারিকাশ্রমের উত্তরে গঙ্গার এক শাখা মন্দাকিনী নামে খ্যাত। স্বল্পপুরাণে হিমবংশেও ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

২ সংক্রান্তিবিশেষ। মৃগশ্রবণ নক্ষত্রে সংক্রমণ হইলে এই সংক্রান্তি হয়। ৩ চিত্রকূটস্থ নদীবিশেষ।

“ততো গিরিবরশ্রেষ্ঠে চিত্রকূটে বিশাম্পতে।

মন্দাকিনীং সমাসাশ্র সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥”

(ভারত ৩।৩৫।৫৮)

এই নদী চিত্রকূট পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহা সর্বপাপনাশিনী। ৪ দ্বারকাস্থিত নদীবিশেষ।

(হরিবংশ ১৫।২২) ৫ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১২টা করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—

“ন ন র র ঘটিতা তু মন্দাকিনা” (ছন্দোমণি) এই ছন্দে ১,২,৩,৪,৫,৬,৮,১১ অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মন্দাক্রান্তা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৭টা করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ছন্দের ১,২,৩,৪,১০,১৩, ১৪,১৬, ১৭ অক্ষর গুরু, হ্রস্বভিন্ন বর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ—

“চত্বারঃ প্রাক্ স্ততম্ গুরবো দ্বো দশৈকাদশো চ

মুখ্যো বণৌ তদম্ কুমুদামোদিনি দ্বাদশান্তো।

তদ্বচ্ছাত্তো যুগরসহরৈর্যত্র কাণ্ডে বিরামো

মন্দাক্রান্তাং প্রবরকবরস্তম্বি তাং সংগিরন্তে ॥” (ঋতবোধ)

২ অল্প অক্রান্ত।

“মন্দাক্রান্তা বিসৃজ্যত রসঃ নেক্ষুণ্টিঃ সমগ্রম্” (শ্রুতারতিলক)

মন্দাক্ষ (স্ত্রী) মন্দে সমুচিত্তে অক্ষিণী নেত্রে যন্মাং। (অন্ধোহ-  
দর্শনাং। পা ৪।৪৭৬) ইতি সমাসান্তঃ অচ্। লজ্জা।

“মন্দাক্ষমন্দাক্ষরমুজ্জমুক্তা তস্তাঃ সমাকৃষ্ণিতবাচি হংসঃ।”

(নৈষধ ৩৬১)

মন্দাগ্নি (পুং) মন্দঃ পাচনাসমর্থশাসায়শ্চৈততি। ১ অগ্নি-  
মান্দারোগ, কফ দ্বারা মন্দীকৃত জঠরানল। মাধবকরের  
নিদানে লিখিত আছে—

“মন্দস্তাক্ষোহথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্বিধঃ ।

কফপিত্তানিলাধিক্যাত্তং সাম্যাজ্জঠরোহনলঃ ॥

বিষমো বাতজ্ঞান্ রোগাংস্তীক্ষ্ণঃ পিত্তসমুন্নতান্ ।

করোত্যগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসমুন্নতান্ ॥

সমা সমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যগ্ধিপচাতে ।

অগ্নাপি নৈব মন্দাগ্নেবিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ ।

কদাচিৎ পচাতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচাতে ॥”

মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম ও সম এই চারি প্রকার জঠরানল। ইহার মধ্যে কফের আধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি, বাতাধিক্যে বিষমাগ্নি এবং সমতা ঘটিলে সমাগ্নি হইয়া থাকে। বিষমাগ্নি বাতজ্ঞ রোগ, তীক্ষ্ণাগ্নি পিত্তবৃদ্ধি, মন্দাগ্নি কফজ রোগ ও সমাগ্নি পরিমিত ভূক্ত দ্রব্যপাক করিয়া থাকে। দেহের মন্দাগ্নিতে কখন অন্নও পাক হইয়া থাকে, কিন্তু বিষমাগ্নিতে কখন সম্যক্ পরিপাক হয় কখন বা আদৌ পরিপাক হয় না। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

“অগ্নাপি নৈব মন্দাগ্নের্মাত্রা ভূতাপি পচাতে ।

ছদ্মিঃ সাদঃ প্রসেকঃ স্রাজ্জিরোজঠরগৌরবম্ ॥”

মন্দাগ্নিতে অন্নমাত্রায়ও আহারীয় দ্রব্য সম্যক্ পরিপাক করিতে পারে না; পরিপাক না হইলে বমি, শরীরের অবসন্নতা, প্রসেক এবং মস্তক ও উদরের গুরুত্ব হইয়া থাকে।

হারীতের মতে, বাত, পিত্ত ও কফের সমতা হইলে জঠরাগ্নিও সমতাপ্রাপ্ত হয়। ঐ তিনের বৈষম্য ঘটিলে বিষমাগ্নি জন্মে। পিত্তাধিক্যে জঠরাগ্নি তীক্ষ্ণ এবং বাতশ্লেষ্মাধিক্যে মন্দ হয়। (হারাত চিকিৎসিত ৬ অধ্যায়)

টিকিৎসা।—গুরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—চিত্রক ৮ভাগ, শূরণ ১৬ ভাগ, শুষ্কী ৪ ভাগ, পিপ্পলী ২ ভাগ, পিপ্পলীমূল ও বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, মুষলি ৮ ভাগ, ত্রিফলা ৪ ভাগ, এই সকলের দ্বিগুণমাত্রায় গুড় দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ভক্ষণ করিলে মন্দাগ্নি প্রভৃতি অজীর্ণ রোগ নিবারিত হয়।

বৈদ্যক-হারীতের মতে, উষ্ণ অন্নমণ্ড হিঙ্গু ও সৌবর্জল দিয়া সেবন করিলে বিষমাগ্নিও সমতাপ্রাপ্ত হয়। মন্দ ও অগ্নিদীপক হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—হরীতকী ও শুঠ, গুড় অথবা পৈন্ধবের সঙ্গে সর্ষপা আহার করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। গুড়ের সহিত শুঠ, বা কৃষ্ণজীরা, হরীতকী অথবা দাড়িম প্রত্যহ ভক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে। ভাবপ্রকাশমতে, গুড়াষ্টক, হিঙ্গুষ্টক, বৃহদগ্নিমূখচূর্ণ, বৈষ্মানর-ক্ষার, ভাস্করলবণ, শমশর্করচূর্ণ, বড়বানলচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ মন্দাগ্নিনিবারক। [অগ্নিমান্দ্য দেখ]

২ মন্দঃ অগ্নির্হস্ত। অগ্নিবিষিষ্ট।

XIV

“গোহির্জীর্ণব্যাধিভূঃখার্তো মন্দাগ্নিঃ সংপ্রজায়তে ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুং ১৫।৩২)

মন্দাত্মান্ (ত্রি) মন্দ আত্মা যন্ত। মূঢ়, নির্বোধ। (রামাং ৩।৪৬।২০)

মন্দাদর (পুং) ১ অন্নাদর, উপযুক্ত আদর বা যত্ন না করা।

(ত্রি) ২ অন্ন সম্মানযুক্ত, যে উচিত মত আদর বা যত্ন পায় নাই।

মন্দানল (ত্রি) মন্দাগ্নি। [মন্দাগ্নি দেখ।]

মন্দানিল (পুং) মন্দ মন্দ বায়ু, মলয় পর্বতের মুহু মন্দ বায়ু।

মন্দায়ুস্ (ত্রি) মন্দমায়ুর্গন্ত। অল্পায়ু। (ভাগবত ১।১৬।১০)

মন্দার (পুং ক্রী) মন্দাতে তুয়তে প্রশস্ততে বেতি। মদি-আরন্ (অজ্জিমদিমন্দিভ্য আরন্। উণ্ ৩।১৩৪।) ১ স্বর্গীয় পঞ্চ বৃক্ষান্তর্গত দেববৃক্ষ বিশেষ (Erythrina Indica) পারিভ্রজ।

‘পট্টেতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।

সস্তানঃ কল্লবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্ ॥’ (অমর)

মন্দার, পারিজাত, সস্তান, কল্লবৃক্ষ ও হরিচন্দন এই পঞ্চ দেববৃক্ষ। ইহার মধ্যে মন্দারই প্রথম।

“মন্দারাগামমুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোক্ষাঃ” (মেঘদূ. উৎখ)

ভারতে নানা স্থানে এই গাছ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা, হিন্দী—পঞ্জিকা, পাঁজরা, ফরাদ, মন্দার; বাঙ্গালা—পালিতা মাদার, কাছাড়ী—মাদার, উড়িয়া—পালুয়া, চালুয়া, মরাঠী—পান্সারা, ফন্দরা, পঙ্গরু; গুজরাভী—পনরবো, তেলগু—মহামেদ, বারিজমু, মোদগু; তামিল—মুরুকা, কলাগ-মুরুকু, সাঁওতাল—মরারবাহা।

এই বৃক্ষ অতি অল্পদিন মধ্যে বড় হইয়া উঠে; কিন্তু আকার মধ্যম রকমের অর্থাৎ বেশী বড়ও নয় এবং নিতান্ত কমও নহে। ইহার স্বদেশ সরল ও প্রথম অবস্থায় কণ্টক-ময় থাকে, পরে বড় হইলে কাঁটা পড়িয়া যায়। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে মন্দার বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষ হইতে গাঢ় ধূসরবর্ণ এক প্রকার আঠা প্রস্তুত হয়; রক্তিম বর্ণ পুষ্পগুলি দেখিতে অতি মনোহর। এই ফুলগুলি সিদ্ধ করিয়া লাল রং প্রস্তুত হয়। এতদ্বিন্ন ইহার ছাল হইতেও রং প্রস্তুত হয়, এরূপ শুনা যায়।

রেভারেণ্ড এ ক্যাথেল সাহেব বলিয়াছেন যে, ইহার ছাল হইতে এক প্রকার রজ্জুনিষ্ঠাণের উপযোগী সূত্র প্রস্তুত হয়। মন্দারের কাঁচি পাতাগুলি চড়চড়ি করিয়া আহার করিতে দেখা যায়। ইহার কাঠ অতি হালকা এবং অতি সহজেই চিরিতে পারা যায়। সূর্য্যের উত্তাপ লাগিলে ইহা ফাটিয়া যায় না। ইহার

উপর অতি উৎকৃষ্ট বাগিস লাগান যায়। ইহা দ্বারা বায়ু খেলনা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অপরন্তু ইহা জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহৃত হয়। মন্দার কাঠ দিয়া ব্যবহারোপযোগী অনেক বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বাস্তালায় এবং দক্ষিণভারতে পাণের গাছ এবং মরিচ গাছে তৈরী দিবার নিমিত্ত ইহা রোপিত হইয়া থাকে। এতদ্বিত্ত ইহা দ্বারা বাহিরের বেড়া দেওয়া হয়।

গুণ—ইহার ছাল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা পিত্ত-নিবারক ও অরুনাশক। চক্ষু উঠিলে ইহার কজ্জল-ব্যবহার উপকারক। ইহার রস কুমিনাশক ও বিরেকক। ডাক্তার কানাইলাল দে মহোদয় বলিয়াছেন যে, ইহার পাতা বাঘাতে দিলে কাটিয়া যায় এবং সন্ধিস্থলের বেদনা নাশ করে।

ছালের ভিতরের দিকে রস পরিপূর্ণ থাকে, ইহা অগ্নিশিখার উপর ধরিলে এক প্রকার কজ্জল প্রস্তুত হয়, তাহা চক্ষুতে লাগাইলে জলপড়া ভাল হইয়া থাকে। ইহার টাটকা রস কাণ-কামড়ানি এবং দাঁতের গোড়া-ব্যথায় বিশেষ ফলপ্রদ। এতদ্বিত্ত আরও অশ্রু রোগে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

২ হস্ত। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। ৪ ধূত, ধূতরাগাছ। ৫ হস্তী। ৬ স্বর্গ। ৭ হিরণ্যকশিপু পুত্রভেদ। ৮ একজন বিত্যাধর। ৯ পক্ষভেদ, মন্দরগিরি। ১০ বিদ্যাক্ষেত্রভেদ, এখানে একাদশটি কুণ্ড আছে। বরাহপুরাণে এই পুণ্যগ্রামের 'মাহাত্ম্য' সন্নিহিত বর্ণিত হইয়াছে,—তাহার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি—

বিদ্যাক্ষেত্রে মন্দারের ফুল ফুটিলে ভগবান্ আসিয়া খেলা করিতেন। তাহার প্রভাবে গিরিকোড়ে একাদশটি কুণ্ড বাহির হইয়াছিল। এখানে মনোহর শিলাতলে মন্দরমূলে ভক্তগণকে অগুগ্রহ করিবার জন্ত ভগবান্ অবস্থান করেন। তথায় দেখিতে পাহবে, দ্বাদশ ও চতুর্দশার দিন মধ্যাহ্নকালে মন্দারকুসুম ফুটিয়াছে, আর কোন দিন এমন পুষ্পোদগম দেখিতে পাহবে না। এখানে মন্দারকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া একাহারে থাকিলে পরমাগতি লাভ হয়। এখানে মরণ ঘটিলেও লোক বিষ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। এই কুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে প্রাপণ নামক গিরি, তাহা হইতে তিনটি ধারা দক্ষিণমুখে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে ধারা দক্ষিণে পতিত হইয়া উত্তরমুখে প্রবাহিত, তাহার নাম স্নানকুণ্ড, তাহার দক্ষিণে সমশ্রোতঃ একটি মহাত্তদ। মন্দারের পূর্বে এক গুহাকোটর অবস্থিত, তাহা হইতে মুসলধারে একটি ধারা পতিত হইতেছে। তাহার দক্ষিণদিকে শিলো-

চ্চ হইতে পাঁচটি ধারা বাহির হইয়াছে। তাহার পশ্চিম পার্শ্বে চক্রাবর্ত নামক মহাত্তদ, তাহার বায়ুকোণে আবার তিনটি ধারা বাহির হইয়াছে। ইহার দক্ষিণদিকে তিন ক্রোশের ভিতর গম্ভীরক নামে একটি অগাধ মহাত্তদ অবস্থিত। পশ্চিম পার্শ্বেও সপ্তধারা বাহির হইয়া একস্থানে পড়িয়া হ্রদ-কার ধারণ করিয়াছে। যে যে ধারার উল্লেখ করা হইল, তাহার প্রত্যেকটিতেই স্নান করিলে অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। স্মরণ ভগবান্ বলিয়াছেন, বিদ্যাক্ষেত্রলোপার মন্দার আমার স্যামন্তপঞ্চক। এখানে আমি অবস্থান করিয়া থাকি। ইহার দক্ষিণে আমার চক্র, বামভাগে আমার গদা, এবং অগ্রভাগে যথাক্রমে লাক্ষ্মণ, মুসল, ও শঙ্খ রহিয়াছে।\*

মন্দারপুষ্প (ক্লী) মন্দারের ফুল, মাদার ফুল।

মন্দারমালা (স্ত্রী) ১ মন্দার ফুলের মালা।

“আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাক্ষা

মন্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা ॥” (শকুন্তলা ৭ অঙ্ক)

২ বস্তুর কথা এক বিত্যাধর ভাষা।

মন্দারবস্তী (স্ত্রী) মাঘনাসের গুক্রাবস্তী।

মন্দারমগ্নমী (স্ত্রী) মাঘনাসের গুক্রামগ্নমী। এই দিন মন্দারমগ্নমী ব্রত করিতে হয়, তদ্বিবরণ ভবিষ্যোত্তরপুরাণে বিবৃত হইয়াছে।

মন্দারিতা (স্ত্রী) ১ মন্দার প্রতি দ্রুগা। ২ মন্দার-বৃক্ষশালাতা।

মন্দারিন্ (ত্রি) মন্দারবৃক্ষযুক্ত।

মন্দারিন্, চীনদেশীয় কণ্ঠচারিবিশেষের উপাধি। মন্দারিন্ শব্দটি পল্লীগুজ ভাষার ‘মন্দর’ (Mandar) শব্দ হইতে উৎপন্ন। ‘মন্দর’ শব্দের অর্থ শাসন করা। বাস্তবিক পক্ষে মন্দারিন্ শব্দ সংস্কৃত মন্ট্রিন্ শব্দের অপভ্রংশমাত্র। মাগয়ে মন্দারিন্ শব্দে উচ্চ শ্রেণীর কণ্ঠচারী বুঝায়।

ব্রহ্মদেশের প্রত্যেক নগরে একজন করিয়া ডেপুটী আছে, তাহাকে মন্দারিন্ বলা হইয়া থাকে।

‘মন্দারিন্ ভাষা’ চীনদেশে প্রচলিত। চীনদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা এবং উচ্চপদস্থ কণ্ঠচারীরা এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তথায় এই ভাষা কুয়ান হুয়া (Kuan hua) নামে অভিহিত হয়। অত্যাশ্র ভাষা অপেক্ষা ইহার অঙ্গুর সংখ্যা সর্বাধিক। অল্প।

\* “স্যামন্তপঞ্চককৈব মন্দারস্য গিরৌ মম ॥

ভক্ত তিষ্ঠামি হুত্রোণি। বিদ্যাস্য গিরিমূর্ধনি।

মন্দারে পরমং গুহ্যং তস্মিন্ গুহ্যশিলোচ্চয়ে ॥

দক্ষিণে সংস্থিতং চক্রং বামে স্থানে চ বৈ গদা।

লাক্ষ্মণং মুসলকৈব শঙ্খং তিষ্ঠতি চাশ্রিতঃ ॥” (বরাহপুরাণ)

মন্দার ( পুং ) মন্দার । ( উজ্জল ৩১০৪ )

মন্দাকীর্ণ, অযোধ্যার রাজপুত্র-সম্প্রদায়বিশেষ । কাহারও মতে, ইহাদের আদিপুরুষ কৃষ্ণসিংহের অধিকৃত মণ্ডলগ্রাম হইতে এবং কাহারও মতে, আদি পুরুষের মধ্যে মন্দর শা নামক কোন এক ব্যক্তির নামানুসারে মন্দাকীর্ণ নাম হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে কতক হিন্দু আছে এবং কতক শেরশার সময় মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে ।

মন্দাস্ত্র ( ক্রী ) মন্দাস্ত্রম্ যন্ত্রাং । লজ্জা ।

মন্দিরকুর ( পুং ) মৎস্যবিশেষ । মল্লিকুরূড় পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ।

মন্দির ( ত্রি ) ১ মদকর । “হরিং যতঃ মন্দিরং হৃদয়ং বৃধে”

( শ্লোক ১১২১৮ ) ‘মন্দিরং মদকরং’ (সায়ণ) ২ হর্ষযুক্ত ।

“এমেনং সৃজতা স্তুতে মন্দিমিত্রায় মন্দিনে ।” ( শ্লোক ১১২২ )

‘মন্দিনে হর্ষযুক্তায়’ ( সায়ণ )

মন্দিরিনীস্পৃশ্ ( ত্রি ) হর্ষজনক সৌমস্পর্শকারী ।

মন্দির ( ক্রী ) মন্দাতে স্থপাতে বা স্তূপতেইত্ৰ মদিঙ্ স্বপনে স্ততো ইতি মদিঙ্-কিরচ্ ( হর্ষমদিদীতি । উণ্ ১ । ১৫২ ) গৃহ । কেহ কেহ স্বপন, জাডা, মদ স্ততি, গতি বা নামার্থে মদিঙ্ উত্তর হর প্রত্যয় করিয়া মন্দির শব্দের সাধন-প্রণালী নিরূপণ করিয়াছেন । অমরটিকায় ভরত উল্লেখ করিয়াছেন ;—অবগের মতে নগর, পুর ও মন্দির তিন শব্দই পুং ও ক্রীবাচিন্দ্র মধ্যে গণ্য । ইহার জ্ঞানিদের রূপ মন্দিরা । যথা—“মন্দিরান্যবরাণানি মধুমুকুটাদয়ঃ ।”

মন্দির শব্দে সাধারণতঃ কোন দেব বা দেবীর আয়তন বুঝা যায় । প্রাচীন বহু পুৰাণ ও ধর্মশাস্ত্রাদিতে এই দেবমন্দিরের নিৰ্মাণ, প্রতিষ্ঠা, ও তজ্জন্ত অশেষ ফলের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । ভগবানের মন্দির-নিৰ্মাতার যে কত ফল ও কত পুণ্য উপাৰ্জিত হয়, তাহা অনেক পুরাণেই কীর্তিত । বামন-পুরাণ বলেন,—যিনি বিষ্ণুর মন্দির নিৰ্মাণ করান, তাহার পবিত্র নিত্য লোক সকল নিত্যই করায়ত্ত । তিনি ইচ্ছানুসারে বিবিধ ভোগস্বখের অধিকারী হইয়া থাকেন । তাহার আপনার সহিত সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত নিজ পিতৃ ও মাতৃকুল উদ্ধার হয় । পিতৃগণ সর্বদা ভগবান হরি ও মহাপুরুষগণের নিকট এই বিষাদগান গাহিয়া থাকেন,—হায় ! আমাদের কুলে কখন কি কোন বিষ্ণুভক্ত পুরুষ জন্মিবে অথবা কেহ কি কখন শুদ্ধাচারে থাকিয়া হরির মন্দির নিৰ্মাণ কাণ্ড শেষ করিবে ?

“যঃ কারয়েন্নন্দিরং কেশবস্ত

পুণ্যান্ লোকান্ স জয়েচ্ছান্তান্ বৈ ।

দ্বাবাসান্ পুষ্পকলাতিপদান্

ভোগান্ ভুক্তে কামতঃ শ্রাবনীয়াং ॥

আসপ্তমং পিতৃকুলং তথা মাতৃকুলং নরং ।

তারয়েদান্যনা সার্কং বিষ্ণুমন্দিরকারকঃ ॥

ইমাশ্চ পিতরো দৈত্য-গাথা গায়ন্তি যোগিনঃ ।

পুরতো যজ্জিংহস্ত হনঘস্ত তপস্বিনঃ ॥

অপি নঃ স্বকূলে কশ্চিদ্ভিক্ষুভক্তো ভবিষ্যতি ।

হরিমন্দিরকর্তা যো ভবিষ্যাত শুচিএতঃ ॥”

অগ্নিপুরাণ বলেন,—যাহারা হরির মন্দির নিৰ্মাণ করিব বলিয়া মনে মনে সতত ধারণা করেন, তাহারা পুণ্যতন শত জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হন, আর যিনি মন্দির নিৰ্মাণ করা-ইয়া দেন, তাহার সম্বন্ধে ত কথাই নাই । তিনি ভূত ও ভবিষ্যতেরও অমৃত কুল পয়স্ক বিষ্ণুলোকে উপনীত করিয়া থাকেন ।

এইরূপ বিষ্ণুধর্মোত্তরের তৃতীয় কাণ্ডেও ভগবানের মন্দির-নিৰ্মাতার রাজস্ব ও অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফলপ্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়া পরে কীরূপ মন্দির করিলে কি পরিমাণ পুণ্য লাভ হয়, তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিত হইয়াছে । মন্দির—মুত্তিকা, দারু, প্রস্তর, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্রবণ ও অত্যাচ্ছত্র চিত্র বিচিত্র রত্ন দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে যিনি মুত্তিকা দ্বারা নিৰ্মাণ করান, তাহার পুণ্যফল অপেক্ষা দারু দ্বারা মন্দির-নিৰ্মাতার শতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয় । এইরূপে উপাদানের উৎকর্ষানুসারে উত্তরোত্তর শত গুণ করিয়া অধিক পুণ্য লাভের উল্লেখ আছে ।

স্কান্দ, নারসিংহ, হর্ষশীর্ষ ও বিষ্ণুরহস্ত প্রভৃতি অনেক ধর্মগ্রন্থে বিষ্ণু-মন্দিরনিৰ্মাণে এইরূপ বহুবিধ ফলপ্রাপ্তির বিষয় উল্লিখিত আছে ।

মন্দির নিৰ্মাণের কাল ।

দেবমন্দির নিৰ্মাণ করিতে হইলে শাস্ত্রনির্দিষ্ট শুভাশুভ কাল বিবেচনা করিয়া সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত । শুভ কাল না দেখিয়া এইরূপ কাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলে অনেকের ভাগ্যে এই শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে বিলম্ব ঘটে এবং কাহারও বা একেবারেই উদ্দেশ্য সফল হয় না ; অধিকন্তু ফলে ইহার আরম্ভে ও অবসানে নানারূপ বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় ।

মাস ।—মন্ত্রপুরাণের মতে বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কাঠিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন এই কয়টি মাসই মন্দির-নিৰ্মাণের প্রশস্ত কাল এবং এই উল্লিখিত কয়েকটি মাসের যে কোন মাসে মন্দিরনিৰ্মাণকার্য সমাধা করিলেই মন্দির-নিৰ্মাতা একটা না একটা শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

বৈশাখে ধনরত্ন, আষাঢ়ে ভূতারত্নাদি, শ্রাবণে মিত্রলাভ, কার্তিকে ধন ধাত্ত এবং ফাল্গুনে পুত্র ও রত্নলাভ এবং মাঘে মন্দিরনিৰ্মাণে লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট; কিন্তু ইহাতে অগ্নি-ভরের আশঙ্কা আছে। এতদ্ব্যতীত অমূল্লিখিত মাসাদিতে মন্দির নিৰ্মাণ করিলে ব্যাধি প্রভৃতি নানা বিঘ্ন ঘটয়া থাকে।

নক্ষত্র.—মাসের ত্রায় নক্ষত্র বারাদিও দেখিয়া লইতে হয়। নক্ষত্রের মধ্যে অশ্বিনী, রোহিণী, মূলা, উত্তরাষাঢ়া, স্বাতী, হস্তা ও অশ্লরাধা এই সকল নক্ষত্র মন্দিরনিৰ্মাণে প্রশস্ত।

বার।—রবি ও মঙ্গলবার ব্যতীত অত্র সমস্ত বারই এই কার্যে শুভ ফলদায়ক।

যোগ।—বজ্র, ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত, অতিগণ্ড, বিকৃষ্ট, গণ্ড ও পরিঘ যোগ তিন অত্র সমস্ত শুভযোগই ইহাতে মঙ্গলজনক।

এতদ্বিন্ন শুভ তিথি ও করণ এবং শ্বেত, মৈত্র, মাহেন্দ্র ও গাক্ষর্য প্রভৃতি শুভ মুহূর্ত্ত দেখিয়া এই কার্যের শুভারোপণ ও ভিত্তিস্থাপনাদি কর্তব্য।\*

হরশার্ঘের মতে বর্ষার সময় কোনরূপ বাস্তবকার্য করা নিষিদ্ধ। ইহাতে চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী তিথি, মঙ্গলবার, বিষ্টিকরণ এবং অন্তত নক্ষত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের চন্দ্রতারা শুক ও সৌম্যগ্রহের কেন্দ্রস্থানস্থিতি প্রভৃতি ভাল রূপ দেখিয়া শুনিয়া এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।†

“চৈত্রে ব্যাধিমব্যাধোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ।

বৈশাখে ধনরত্নানি জৈষ্ঠে মুহূর্ত্তং তথৈব চ।

আষাঢ়ে ভূতারত্নানি পশুপর্ণমধ্যম্ যথা।

শ্রাবণে মিত্রলাভস্ত হানিং ভাষ্যপদে তথা।

পত্নীনাশকাশ্মগুণে কার্তিকে ধনধাত্তকং।

মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তদ্বরজং ভয়ং।

লাভস্ত বাহশো বিদ্যাভিঃ মাঘে বিনির্দ্দেশেং।

কাকনং ফাল্গুনে পুত্রানিতি কালবলং কৃতং।

অশ্বিনীরোহিণীমূলমুত্তরাত্তর্যমৈন্দ্রম্।

স্বাতী হস্তাশ্লরাধা চ গৃহীরন্তে প্রশসাতে।

আদিত্যভৌমবর্জক সর্বে বারাঃ শুভাবহাঃ।

বজ্রব্যাত্তাশ্লানি ব্যতীপাতাতিগণ্ডকে।

বিকৃষ্টগণ্ডপরিঘান্ বর্জ্যযোগেষু কারয়েং।

শ্বেতমৈত্রে চ মাহেন্দ্রে গাক্ষর্যভিজিহোহিণে।

তথা বৈরাঙ্গসাবিত্রে মুহূর্ত্তে গৃহমারভেং।

চন্দ্রাদিত্যবলং লকালগ্নং শুভনিরীক্ষিতং।

শুভোষ্টাদি প্রকর্তব্যমন্ত্র পরিবর্জয়েং।”

† “বাস্তু কৰ্ম্ম ন চারভাং বর্ধাকালে বিজ্ঞানতা।

কৃৎপক্ষে ত্রিভাগান্তে শুক্লপাদৌ দ্বিতীয়কে।

মন্দিরের স্থাননির্ধারণ।

সাধারণতঃ উত্তম পরিকৃত স্থানেই দেবমন্দির নিৰ্মাণ করা কর্তব্য। কোন্ স্থান ভাল, কোন্ স্থান মন্দ প্রথমে তাহার পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। পরীক্ষা না করিয়া যেখানে সেখানে দেবমন্দির নিৰ্মাণ ও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে ফল বিপরীত ঘটে। কিরূপ স্থানে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দিরনিৰ্মাণ শুভ ফল পাইবার অধিকারী হন, তৎসম্বন্ধে দেবীপুরাণের মত এই,—যে স্থানের মৃত্তিকা গন্ধ, স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধাদি দ্বারা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইবে, মন্দির নিৰ্মাণ করিয়া দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে সেই স্থানই শ্রেষ্ঠ এবং সেইরূপ শুভ স্থানেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি সুরশ্রেষ্ঠগণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। ইহার বিপরীতে ভয়েরই সম্ভাবনা অধিক।

“দেবোবিষ্ণুস্তথা ব্রহ্মো ব্রহ্মাভ্যাঃ সুরসন্তমাঃ।

প্রতিষ্ঠাপ্যাঃ শুভে স্থানে অত্রথা তে ভয়াবহাঃ।

পর্ভাদিলক্ষণা ধাত্রী গন্ধস্বাদেন যা ভবেৎ।

বর্ণেন চ সুরশ্রেষ্ঠ সা মহী সৰ্বকামদা।” ( দেবীপু. )

মন্ত্রপুরাণে মন্দিরস্থান পরীক্ষা করিবার আর এক রকম প্রণালী দেখিতে পাই। তাঁহার মতেও মন্দির-নিৰ্মাণের পূর্বে তাহার স্থান পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের চারি প্রকার বর্ণের স্থান বা ভূমি প্রশস্ত। যথা—ব্রাহ্মণের শ্বেত, ক্ষত্রিয়ের রক্ত, বৈশ্যের পীত ও শূদ্রের কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে মন্দিরভূমির উক্ত প্রকার বর্ণপার্থক্যান্বয়ের ত্রায় সেই স্থানের মৃত্তিকার মধুর, কষায়, কটু প্রভৃতি স্বাদেরও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে বর্ণের যেরূপ স্বাদযুক্ত ভূমির উপর মন্দির নিৰ্মাণ করা বিহিত হইয়াছে, তাহার তদনুসারেই কার্য করা বিধি।

“পূর্ব্বং ভূমিং পরীক্ষেত পশ্চাৎ বাস্ত্বং প্রকল্পয়েৎ।

শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈবানুপূর্ব্বশঃ।

চতুর্থী নবমী বর্জ্যা তিথিঞ্চাপি চতুর্দশী।

ভৌমস্য তু দিনঃ বর্জ্যঃ করণং বিষ্টিসংজ্ঞিতং।

ক্ষিত্যস্তরীক্ষদিব্যোৎপেক্ষংপাতৈর্ভয়পীড়িতম্।

উপস্পৃষ্টং গ্রহৈর্ভক্ত ব্যতীপাতহতং তথা।

চন্দ্রতারাশুকুলে চ কার্যং কৰ্ম্ম বিজ্ঞানতা।

ঋণাণি চাত্র শতানি নৈকং তং শত্রুদৈবতম্।

পুষ্যং পৌষকং সাবিত্র্যং বায়ব্যং বৈকব্যং তথা।

দ্বিরাংগে চ দ্বিহরে লগ্নে কৰ্ত্ত শোণচর্য্যক্।

কেত্রে সৌম্যগ্রহো বস্য ত্রিকোণে তু সুরেন্দ্রম্।

পাপশোণচর্য্যস্থানে তদা কার্যং সমারভেৎ।” ( হরশীর্ষ )

বিপ্রাদেঃ শততে ভূমিরতঃ কার্যং পরীক্ষণম্।

বিপ্রাণাং মধুরাস্বাদা কষায়া ক্ষত্রিয়স্ত চ।

কষায়ে কটুতা তদ্বৈদ্যশূদ্রেণ শততে ॥” ( মৎসপুং )

মন্দিরনিৰ্মাণের স্থান মনোনীত করিয়া তাহার আর একটি পরীক্ষা করা দরকার। পরীক্ষাটা এই—মনোনীত স্থানে প্রথমে একটা গত্ত কাটিতে হইবে, এই গত্তের পরিমাণ অল্পই মাত্র। ইহার চারিদিক্ বেষণ করিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া রাখিবে, পরে ইহার মধ্যস্থানে একটা কাঁচা শরাব রাখিয়া তাহার উপর দ্ব্য দিয়া চারিদিকে চারিটা বটিকা জালিয়া দিবে। বটিকার চারিদিকের শিখাগুলি যখন জালিয়া উঠিবে এবং তাহাদের দাঁড়িপরাশি যখন সমানভাবে পুঁছাদি দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে, তখন সেই ভূমির উৎকৃষ্টতা বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে এইরূপ পরীক্ষিত বাস্তব সমূহিকনামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমূহিক বাস্তব গৃহ-প্রাসাদাদি নিৰ্মাণবিষয়ে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণের পক্ষে মঙ্গলাবহ।

এইরূপ পরীক্ষার পর গত্তপূরণ করিতে হয়। তখনও আর একটি পরীক্ষা আছে,—গত্ত হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকাগুলি দ্বারা গত্তপূরণ করিবার সময় যদি সেই মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ উদ্ভূত হয়, তাহা হইলেই সেই স্থানের উৎকৃষ্টতা, আর যদি কমিয়া যায়, অর্থাৎ উত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা গত্ত পরিপূরণ হইতে কিঞ্চিৎ বাকী থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানের নিকৃষ্টতা এবং যদি সমান সমান হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত বুঝিতে হইবে। মোট কথা,—গত্তপূরণ সম্বন্ধে উল্লিখিত তিন প্রকার অবস্থার প্রথম অবস্থার মঙ্গলপ্রাপ্ত, দ্বিতীয়ে ক্ষতি এবং তৃতীয়ে লাভ বা ক্ষতি তাহার কিছুই সম্ভাবনা নাই। \*

মন্দিরভূমির পরীক্ষা সম্বন্ধে আর এক নিয়মও উল্লিখিত হইয়াছে। পুঁছোক্ত পরীক্ষাপ্রণালী না করিতে পারিয়া মন্দিরকর্তা এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারাও স্থানের উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টতাদি বুঝিয়া লইয়া কার্য্য করিতে পারেন। সে পরীক্ষা

\* “অবাস্তবমানে বে গত্তে স্বস্তিলেপ্ত চ মঙ্গলঃ।

ব্রতমামশবাবস্থং কুয়া নস্তিচতুঃপদং ॥

জালয়েদ্বুপরীক্ষাং পূর্ণং তৎ সৰ্বদ্বিগুণং।

দীপ্ত্যা পূর্ণাদি গৃহ্যবিধানানামুপলক্ষণং।

বাস্তবঃ সমূহিকো নাম দীপ্যতে সপ্ততন্ত যঃ ॥

শুভদঃ সপদবর্ণানং প্রাসাদেশু গৃহেষু চ।

অরস্ত্রমাত্রকং গত্তং পরীক্ষ্যং তাতপূরণে ॥

অধিকে শ্রিয়মাপ্নোতি নুনে হানিং সমে সমন্।

ফালকুণ্টেহথবা দেশে সৰ্ববীজানি রোপয়েৎ ॥

দ্বিপকসপ্তরাজেণ যত্র রোহস্তি তাযপি।

জ্যোষ্ঠা মধ্যা কনিষ্ঠা ভূবর্জীয়েত্তরা সদা ॥” ( মৎসপুত্রাণ )

এই ;—কোন স্থান মনোনীত করিয়া অগ্রে তাহা লাজল দিয়া কৰণ করিতে হয়, পরে সেই কৃষ্ট স্থানে নানা প্রকার বীজ বোপণান্তে যদি তিন রাত, পাঁচ রাত অথবা সপ্তরাত্রি মধ্যে তাহা হইতে অঙ্কুরোদগম দেখিতে পাওয়া যায়, তবে উক্ত অঙ্কুরোদগমের ক্রমিক কালানুসারে সেই স্থান জ্যোষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করিতে হয়। এই নিয়মের বাস্তবিকম যেরূপে লক্ষ্য হইবে, সে স্থান পরিত্যাজ্য ; সে স্থানে মন্দির-নিৰ্মাণের সঙ্কল্প না করাই মঙ্গল।

হয়শীর্ষের মতে যে স্থানে সর্বসম্পন্ন সুরভিগণ বৃষের সহিত বজ্রেন্দ্রে বিহার করে, যেখানে স্কন্দরীগণ পুরুষের সহিত কেলি জড়ায় নিরত হয়, বাহা পুঁছো নরপতিগণের আবাসস্থান, আশ্রয় আবার ভূমি ও বাজিকগণের পবিত্র স্থান ছিল এবং যে স্থানের গন্ধ কাশ্মীর, চন্দন, কপূব, অশুভ, কমল, উৎপল, জাতা, চম্পক, পাটল, মল্লিকা, নাগকেশর, দধি, দ্বীপ, ঘৃত, মরিচা, আসব অথবা ত্রীণ্ডর আশ্রয় প্রদাত হয়, এবং যেখানে মানসলিক দ্রব্যের ধ্বনি হইয়া থাকে, মন্দির বা প্রাসাদ নিৰ্মাণ করিবার পক্ষে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণেরই সেই সেই স্থান প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন চূর্ণক, ছঃশদ, নানাবর্ণ, বিবর্ণ, বর্ণহীন, বক্র, স্থচিমুখ, শূর্ণসদৃশ, গোমুখ, ত্রিকোণাকৃতি, হস্তিপৃষ্ঠতুল্য ও শকটাকার প্রভৃতি ভুলক্ষণাবিধি নিকৃষ্ট স্থান সৰ্বথা পরিত্যাজ্য। \*

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র অনুসারে, ভদ্রিকা, পূর্ণা ও ধূমানামক চারিপ্রকার ভূমির উত্তেজ দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারি প্রকার ভূমির মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার ভূমি প্রাসাদ বা মন্দিরনিৰ্মাণবিষয়ে প্রশস্ত এবং শেষোক্ত ভূমি তদ্বিষয়ে পবিত্রতাজ্য। যে স্থান তিব্বক, নাবিকেন, কুশা, কাশ, পদ্ম

\* “অবাস্তবমানে বে গত্তে স্বস্তিলেপ্ত চ মঙ্গলঃ ॥

হৃদয়ানার পতিতঃ পুণ্ড্রঃ যঃ সত্তমঃ ॥

বাজ্যং পূর্ণং গৃহং যস্যামানং বান্ধবঃ ॥

কাম্যোৎপাদনামোদা কপূবাপ্তকক্ষ্মিনী ॥

কমনোৎপাদনামোদা চ জাতিচম্পকক্ষ্মিনী ॥

পাটল্য মরিকাপক্ষ্মা নাগকেশরক্ষ্মিনী ॥

দধিকারাজ্যক্ষ্মা চ মন্দিরাসবক্ষ্মিনী ॥

অগ্নিপ্রাণিগক্ষ্মা চ শুভদ্রব্যক্ষ্মা চ য়া ॥

সকেষ্যং বর্ণানং চমিঃ সপদ্যাবাবনা মতা ॥

চূর্ণকঃ ছঃশদা য়া চ নানাবর্ণা চ ছঃপা ॥

ব্রতক্ষিচন্দ্রদৃশা বিস্তাৰাদ্বিগুণমাতা ॥

বিবর্ণা বর্ণহীন্য চ বক্রা স্থচিমুখা তথা ॥

বিবর্ণা শূর্ণসদৃশা গোমুখী চ ত্রিকোণিকা ॥

যডশা শূর্ণসদৃশা দস্তিপৃষ্ঠোপমা চ য়া ॥

সরোষপদমা য়া চ দিগ্‌মুখা শকটাকৃতিঃ ॥

এবং প্রকারা য়া ভূমিবর্জ্যা যজ্ঞেন দেশিকৈঃ ॥” ( হয়শীর্ষ )



ও হৃদ্যবর প্রভৃতি দ্বারা স্নোভিত, তাহার নাম স্নপদ্মা। নদী, সমুদ্র, তীর্থসান্নিধ্য, পুষ্পবৃক্ষ, ক্ষীরবৃক্ষ, বন, উদ্যান, লতা, গুল্ম ও অন্যান্য যজ্ঞীয় বিবিধ বৃক্ষ দ্বারা যে স্থান পরি-শোভিত, তাদৃশ পাবিত্র ক্ষেত্রের নাম ভদ্রা। বকুল, অশোক, প্লক্ষ, আম্র, লোহিতক, মাধবী, মুক্তা, শূকধাত্ত, পুণাগ, অদূরবর্তী পল্লত, ও অল্প পরিমিত জলাদি দ্বারা যে স্থান উপলব্ধিত, উহার নাম পূর্ণা। এতদ্ব্যতীত যে স্থান বিব, অর্ক, স্নুহি, ও পীলুবন দ্বারা পরিবৃত, যেখানে গৃধ্র, গোমাষু, কাক ও বারবিলাসিনীগণ বসবাস করিতেছে, যেখানকার মৃত্তিকা কঙ্কর ও কাঠিচূর্ণ এবং যথায় কণ্টকময় নানাজাতীয় তরুর উৎপত্তি দেখা যায়, তাহারই নাম ধূম্রা। এই ধূম্রা ভূমিই প্রাসাদাদি নিৰ্ম্মাণের সম্পূর্ণ অক্ষপযোগী।

এতদ্বিন্ন মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিবার আয়োজন করিয়া তাহার ভিত্তি স্থির করিবার জন্ত কীরূপ ভূমি পরিগ্রহ করা কৰ্ত্তব্য এবং সেই পরিগ্রহীত ভূমিখণ্ডের পরীক্ষাদিহে বা কীরূপভাবে করা উচিত, তাহার যথাযথ বিবরণ মংস্তপুৰাণ ও হৃদ্যবর পঞ্চরাত্রে আরও কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে তৎসমস্ত প্রদত্ত হইল না।

মন্দিরনিৰ্ম্মাণের পূর্বে চারিদিকে এক একটা চতুরঙ্গ শিলা বা ইষ্টক নিবেশিত করিয়া মন্দিরের স্তম্ভ নিৰ্ম্মাণ করিবে। এই স্তম্ভ চিহ্ন দ্বারা মন্দিরস্থান চিহ্নিত করিয়া পরে সেইখানে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। এতদ্ব্যতীত ব্যতীত উত্তম পায়স প্রস্তুত করিয়া একাগ্রমনে দ্বাদশটা বৈষ্ণবকেও সেই স্থানে ভোজন করান প্রয়োজন।

“চতুরঙ্গাং শিলাং গৃহ ইষ্টকাং বা স্নোভনাম্।

চতুর্দিক্ নিবেশ্যাত স্তম্ভচিহ্নস্ত কাব্যেৎ ॥

এবং কৃদ্বা স্তম্ভচিহ্নং ব্রাহ্মণাংস্তত্র ভোজয়েৎ।

বৈষ্ণবান্ পায়সেনাগ্র্যান্ দ্বাদশৈব সমাহতাঃ ॥” (মংস্তপুঃ)

কৰ্ম্মকণ্ঠা মন্দিরনিৰ্ম্মাণ কাণ্ডে আরম্ভ করিয়া যদি নিজ গাত্রে চুলকনা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ দোষিতে পান, তবে যে স্থানে মন্দির, প্রাসাদ বা ভবনের ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে, তাহার অভ্যন্তর ভূমির কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই যে একটা শল্য রহিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিবেন এবং বুঝিয়া সেই শল্য উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন। শল্য উদ্ধার করিয়াই মন্দির নিৰ্ম্মাণ কাণ্ডে পুনরার প্রবৃত্ত হইবেন, কারণ সশল্য স্থান ভীতিপ্রদ এবং শল্যপুঞ্জ স্থান মঙ্গলাবহ।

“গৃহারন্তেহতিকণ্ঠুতিঃ স্বাম্যঙ্গে যত্র জাবতে।

শল্যস্তপনয়েত্তত্র প্রাসাদে ভবনেহথবা।

সশল্যং ভয়দং যস্মাদশ্ল্যং ভয়নাশনম্ ॥” (মংস্তপুঃ)

হৃদ্যবর পঞ্চরাত্রে আছে,—গৃহকর্তার নিজের কোন অঙ্গ বিকৃত হইলে, বাস্তব মধ্যে শল্য আছে, ইহাই জানিতে হইবে। এতদ্বিন্ন যদি কোন দল্লক্ষণাবৃত শকুন দৃষ্ট হয়, অথবা তাহার শব্দ শুনা যায়, তবে সেই কুলক্ষণ শকুন শব্দে যাহাব নাম উচ্চারিত হইবে, বাস্তবমধ্যস্থিত সেই শল্য তাহার বলিয়াই জানিবে।

“আদিশেহাস্তনঃ শল্যং গৃহিণোহঙ্গবিকারতঃ।

শকুনো দৃশ্যতে বাপি যন্ত বা শ্রুয়তে ধ্বনিঃ ॥

কীর্ত্যতে যন্ত বৈ নাম শল্যং তন্ত বিনাদিশেৎ ॥” (হৃদ্যবরঃ)

অতঃপর বিহিত বিধান মতে বাস্তবমণ্ডল ঠিক করিয়া লগ্ন্যা পরে তৎ তৎ স্থানস্থিত দেবতাদিগকে পূজা করিতে হয়। এই পূজার ব্যক্তিগণের নামসংখ্যার বাহুল্য হেতু এই স্থানে উল্লিখিত হইল না।\*

এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ, বাস্তবপূজাবিধি, কোন কোন দেবতাকে কি কি প্রকার ভূত বলিপ্রদান এবং মন্দির বা প্রাসাদের ভিত্তিখনন করিবার সময় যে সকল পূজা প্রক্ৰিয়া ও কুস্তস্থাপনের প্রণালী প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে, হৃদ্যবর পঞ্চরাত্র ও মংস্তপুৰাণে তাহার সবিস্তার প্রক্ৰিয়াপদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

মন্দির বা প্রাসাদনিৰ্ম্মাণ কার্য যদি শিলা বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়, তবে তাহাতে কীরূপ লক্ষণাক্রান্ত শিলা ব্যবহার করা উচিত, তৎসম্বন্ধে মংস্তপুৰাণের উল্লেখ এইরূপ;—শিলাই হউক, অথবা ইষ্টকই হউক, উভয়ই চতু-কোণ, দেখিতে স্নন্দর, চারিদিকে সমান অথবা সকল দিক্ গোলাকার হওয়া বিধি। চারিদিকে সম্পূর্ণ সমতল, মণ্ডা-কৃতি ও অনতোন্নত শিলাই স্নলক্ষণাবৃত; স্তম্ভাং এহরূপ শিলাই ব্যবহাৰ্য বলিয়া নিদ্রিষ্ট। শিলাগাত্রে যদি কুশ, দূরা, ধ্বজ, ছত্র, চামর, অক্ষুশ, তোরণ, কুম্ভ, মংস্ত, মাক্ষালিক মৃগ, পক্ষী, হস্তী, বজ্র, বুধ অথবা অন্য কোনরূপ প্রশস্ত দ্রব্যের

\* “পক্ষগব্যোবধিজলৈঃ পরীক্ষিত্বাবলোচয়েৎ।

এবংশীতিপদং কৃত্যাজেখাতিঃ কনকেন তু ॥

পশ্চাৎপোষ্য চানিষা যজ্ঞেনালোভ্য সপতঃ।

দশপূর্ণায়তা রেখা দশচৈবোত্তরায়তাঃ ॥

সকলবাস্তবভাগেযু বিজ্ঞেয়া নবকা নব।

একশীতিপদং কৃত্বা বাস্তবং সকলবাস্তব ॥

পদস্থান্ পূজয়েদেবান্ ত্রিংশৎপক্ষদশৈব চ।

দ্বাত্রিংশদ্বাহতঃ পূজ্যঃ পূজ্যাচ্চাত্তে ত্রয়োদশ ॥

নামস্তান্ প্রাক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবেদ্য মে।

ঈশকোপাধিযু স্তান্ পূজয়েচ্চ বিধানতঃ।

শিবী চৈবাপ্য পক্ষিযো জয়ন্তঃ কুলিশাযুধঃ ॥” ইত্যাদি (মংস্তপুঃ)

চিহ্ন থাকে, তবে সেই শিলা গৃহনিৰ্মাতার পক্ষে মঙ্গলাবহ হয়। এতদ্ব্যতীত যে শিলা শুক্লবর্ণ, বাহার গাত্রে গো ও অশ্বখুরের চিহ্ন, বাহা গম্বাদি লক্ষণ এবং স্বস্তিক, বেদিক ও নন্দ্যাবস্তক চিহ্নে চিহ্নিত, সেইরূপ শিলাও প্রশস্ত এবং তাহাই সঙ্গপ্রকার অর্থসম্প্রদানপূৰ্ব্বক গৃহকর্তার সুখাবহ বলিয়া কথিত।\*

শিলার আয় ইষ্টকেরও লক্ষণাদি ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইতে হয়। ইষ্টক দ্বারা মন্দিরাদি নিৰ্মাণ করিতে হইলে ইষ্টকগুলি যাহাতে কোনরূপ দোষদুষ্ট না হয়, সৰ্ব্বাঙ্গে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। মন্ত্রপুরাণের মতে মন্দিরাদির নিৰ্মাণকায়ে যে সকল ইষ্টকের প্রয়োজন হইবে; সেগুলি সমস্তই একবর্ণ, সুপক, সুপ্রমাণ, দেখিতে সুন্দর ও চতুষ্কোণ হওয়া আবশ্যিক। এতদ্ভিন্ন যে সকল ইষ্টক কৃষ্ণবর্ণ, কঙ্করময়, ভগ্ন, অল্পপক অথবা অধিকমাত্রায় পক হইয়া যায় এবং যে সকল ইষ্টকের মধ্যে মধ্যে খণ্ড খণ্ড অস্থি ও অঙ্গার দৃষ্ট হয়, মন্দির কিংবা প্রাসাদনিৰ্মাণে সেই সকল ইষ্টক একেবারেই অগ্রাহ্য।†

ইষ্টকের লক্ষণ মধ্যম্বে হর্যশীর্ষ পঞ্চরাত্রে উক্ত. হইয়াছে,— মন্দির বা প্রাসাদাদি তৈয়ারি করিতে যে সকল ইষ্টক লাগিবে, সে গুলি সমস্তই সুন্দর পরিপাকীকরণে প্রস্তুত হওয়া বিধি। ইষ্টকগুলির প্রমাণ নানাদিক দ্বাদশাঙ্গুল হইবে এবং সমস্তই একবর্ণ, সুপক, সুপ্রমাণ, দেখিতে সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইষ্টকের কোন না কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেগুলির দৈর্ঘ্য সম্ভবমত থাকিলেও প্রশস্ততায় কম আছে, যেগুলির গাত্র সম্পূর্ণ অল্প অবস্থায় নাই এবং যে সকল ইষ্টক কদাকার, কৃষ্ণবর্ণ,

কঙ্করময়, মল্লপক, গোলাকৃতি, স্থূল, ভগ্ন, জর্জরিত, ক্ষুদ্রাকৃতি, অস্থি ও অঙ্গারখণ্ডে মিশ্রিত, সেই সকল ইষ্টক একেবারেই নিষিদ্ধ।\*

প্রস্তর বা ইষ্টক উভয়ের মধ্যে যাহা দ্বারাই দেবমন্দির বা প্রাসাদ নিৰ্মাণ কার্য সমাধা করিতে মনস্থ করা হয়, শাস্ত্র-বাক্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাই যথাযথভাবে বিচাষ করা উচিত। মন্দির হউক বা প্রাসাদই হউক, যদি তাহা ইষ্টক দ্বারা নিৰ্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে কেবল ইষ্টক দিয়াই সে কার্য সমাধা করিবে। শিলা বা প্রস্তরখণ্ডের সাহায্য লওয়া তাহাতে সম্পূর্ণ গহিত। এইরূপ শিলা বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নিৰ্মাণ করিতে গিয়া কেবল তাহারই সাহায্যে নিৰ্মাণ কার্য শেষ করিবে। ফল কথা, ইষ্টক ও প্রস্তর উভয় দ্বারা একযোগে মন্দির বা প্রাসাদপ্রস্তুতকরণ প্রশস্ত নহে, ইহাই হয়শীর্ষ ও মন্ত্রপুরাণের মত।

সাধারণতঃ প্রাসাদ বা মন্দির নিৰ্মাণ করিতে গিয়া কিরূপ পরিমাণে তাহার কোন স্থান তৈয়ারি করিতে হয়, তৎসংক্ষেপে মন্ত্রপুরাণে এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে;—প্রথমে যথোক্তরূপ বাস্তবালি সমাধা করিয়া মন্দিরনিৰ্মাণের পরিমিত ভূমি ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। এই ষোড়শ ভাগের চারভাগ মন্দিরের গভভূমি ও অবশিষ্ট দ্বাদশ ভাগ তাহার ভিত্তিস্থানরূপে নির্দেশ করিবে। চারি ভাগের প্রমাণ অনুসারে ভিত্তির উচ্চায় ঠিক করিতে হইবে এবং ভিত্তির উচ্চায় যত পরিমাণ হইবে, তাহার শিখরের উচ্চায় তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে হির করিয়া লইবে। শিখরের পরিমাণের চারিভাগের একভাগ পরিমাণে তাহার প্রদাপনা দিয়া চারিদিকে নির্গমমাগ রাখিবে। গভভূমির পরিমাণ যত হইবে, মন্দির বা মণ্ডপের বিস্তার তাহার দ্বিগুণ ও আয়াম তাহার তিন ভাগে নিৰ্মাণ হইবে। এইরূপে গভপারিমিত স্থান পাঁচ ভাগ করিয়া একভাগ দ্বারা আরক্ত মন্দির বা প্রাসাদের পূৰ্ব্ভাষা নিকপণ করিবে এবং গভস্থলের সমান পরিমাণে

\* “শিলা বাধেষ্টকা বাপি চতুশ্চো লক্ষণাশ্চিতাঃ।

প্রাসাদাদৌ বিধানেন স্তম্ভাঃ স্তম্ভোচনঃ ॥

চতুরঙ্গাঃ সমাঃ কৃষ্ণা সমস্তাদথ নেষ্টকাঃ।

শিলাকপাঃ স্মৃতা বিদ্যা নন্দ্যাব্যবেষ্টকাগ্নিকাঃ।

সম্পূণাঃ স্তম্ভাঃ ব্রহ্মাঃ সুযমা লক্ষণাশ্চিতাঃ।

কুশলকৃষ্ণা ধাতাঃ সধরুহুচ্যামরাঃ ॥

সাক্ষুণ্ডোত্তোরণোপেতাঃ কৃষ্ণমৎসাকসাম্বিতাঃ।

দর্পনা হস্তিবজ্রাঃ প্রশস্তপ্রবালান্বিতাঃ ॥

শস্ত্রপক্ষিমুগাঙ্কশ্চ বৃগাঙ্কঃ সৰ্বদা হিতাঃ ॥”

† “ইষ্টকানাম্ সমাসেন লক্ষণং শৃণু সাস্প্রতম্।

একবর্ণা সুপকাস্থ সুপ্রমাণা মনোরমাঃ ॥

নন্দ্যাব্যবেষ্টকাঃ কাথ্যান্চতুৰঙ্গাঃ সুগন্ধিতাঃ।

অস্ত্রাঙ্গরাশ্চিতা নেষ্টাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সশকরাঃ ॥

মল্লপকা বিপকাস্থ বহুদিক্কাশ্চ বজ্রিতাঃ।

ভগ্নাশ্চ বিষমা হীন্য বজ্রনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥” ( মন্ত্রপুঃ )

\* “স্তম্ভা লক্ষণোপেতা দ্বাদশাঙ্গুলসম্মিতাঃ।

সুযমাবিতাগেন নেপুণ্যেন চ সম্মিতাঃ ॥

সুপকঃ সুপ্রমাণাস্থ একবর্ণা মনোহরাঃ।

বিমলা ইষ্টকাঃ কাথ্যান্চতুৰঙ্গাঃ সুগন্ধিতাঃ ॥

ভিন্নকণাশ্চাপ্রযত্নঃ পানিপাদবিবজ্রিতাঃ।

সশকরাঃ কৃষ্ণবর্ণা অস্ত্রাঙ্গরাশ্চিতাশ্চ য়াঃ ॥

বিবর্ণা মল্লপকাস্থ য়াঃ পীন্য পিণ্ডিকাশ্চ য়াঃ ॥

হীন্য বিষমা ভগ্না বজ্রনীয়াঃ বিবজ্রিতাঃ ॥” ( হয়শীর্ষ )

তাহার মুখমণ্ডপ স্থির করিবে। মন্দিরাদির নিৰ্ম্মাণবিষয়ে হইল হইল মন্তপুৰাণের সামান্য বিধি।\*

হয়শার্শ-পঞ্চরাত্রের মতেও চতুষ্কোণ ক্ষেত্রভূমি ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার চারিভাগে মধ্য এবং দ্বাদশভাগে ভিত্তি স্থির করিতে হয়। এইরূপে চারিভাগে তাহার জ্যেষ্ঠাচ্ছায়, জ্যেষ্ঠাচ্ছায়ের দ্বিগুণ মঞ্জরী, মঞ্জরীর চারিভাগে প্রদক্ষিণা এবং প্রদক্ষিণার পরিমাণ অহুসারে উভয় পার্শ্বে নির্গমমার্গ নিৰ্ম্মাণ করিবে। এই প্রকার বিধান মত অত্যাঁত সমস্ত প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্য স্থান স্তম্ভ দ্বারা বিভূষিত করিবে এবং গৰ্ভভূমির প্রমাণ মত মুখমণ্ডপ স্থির করিয়া লইবে। সূর্য স্তলেই একাংশিত পদপরিমিত ভূমে বাস্ত-পূজা সমাধা করিয়া পরে মণ্ডপাদির নিৰ্ম্মাণকাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে এবং প্রত্যেক পাদান্তরিত ভূমিহিত দেবগণকে যথাযথ অর্চনা করিয়া প্রাকারবিভাসের সময়ও তাঁহাদিগের বিধিমত পূজা করিবে। হয়শার্শ পঞ্চরাত্র সৰ্বসাধারণের পক্ষে এইরূপ লক্ষণেরই নিয়ম করিয়াছেন।

উক্ত প্রকার লক্ষণ ব্যতীত হয়শার্শে ও মাংস্ত্রে মন্দিরমণ্ডপাদির আরও লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, বাহ্যভায়ে সমস্ত প্রদত্ত হইল না। [ প্রাসাদ ও মণ্ডপ দেখ। ]

মন্তপুৰাণের এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে,—নিৰ্ম্মাণ-প্রণালীর পার্থক্য অহুসারে প্রাসাদাদি নানা নামে পরিচিত হইয়া থাকে। যে প্রাসাদের চারিটি দ্বার, এক শত শৃঙ্গ, ষোড়শটি উপস্থিত গৃহ এবং শিখরগুলি নানা রকম চিত্রিত তাহার নাম—মেরু প্রাসাদ। এইরূপ দ্বাদশভূমিক প্রাসাদের নাম মন্দির ও দশভূমিকের নাম কৈলাস। এই প্রকার নিৰ্ম্মাণপার্থক্যে ক্রমশঃ কুণ্ড, সিংহ, মৃগ, বিমান, হৃন্দক, শ্রীপক্ষ, মৃগাবি, বনভিৎ, ছান্দক, সৰ্বভদ্রক, গজ, নন্দন,

\* “এবং বাস্তব্যাং দদ্য ভজ্যেৎ ষোড়শভাগিকং।

তস্ত মধ্য চতুর্ভুজং ত্রিগোণং ত্রৈলোক্যং।

ভাগদ্বাদশকং তত্র ভিত্ত্যর্থং পরিকল্পয়েৎ।

চতুর্ভুজেন ভিত্তানাং মুচ্ছায়ঃ স্যাৎ প্রমাণতঃ।

দ্বিগুণঃ শিখরোচ্ছ্রায়ো ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়ঃ প্রমাণতঃ।

শিখরোচ্ছ্রায় চার্দ্ধেন বিধেয়া তু প্রদক্ষিণা।

চতুর্ভুজং তত্র জ্যেষ্ঠো নির্গমস্ত তথা বৃধেঃ।

গৰ্ভস্থ বৃদ্ধং ভাগো বিস্তারো মণ্ডপস্য তু।

আবৃত্তঃ স্তম্ভঃ ত্রিভুজঃ ত্রৈলোক্যঃ স্থাপত্যঃ।

পঞ্চভাগেন সংভজ্য গৰ্ভমানং বিচক্ষণঃ।

ভাগমেকং গৃহাং তু প্রাপ্তব্যাং কল্পয়েৎ।

\* গৰ্ভস্থ বৃদ্ধমো ভাগদ্বিত্যে মুখমণ্ডপঃ।

তস্তং সামান্যমুদ্ভিষ্টং প্রাসাদস্যেহ লক্ষণং।” (মন্ত্যাপুঃ)

নন্দিবর্ধন, হংস, বৃষ, অগ্নি, পদ্মক ও সমুদ্রক প্রভৃতি নাম নির্দিষ্ট আছে। বাহ্যভায়ে প্রত্যেকের নিৰ্ম্মাণপার্থক্য প্রদর্শিত হইল না।

এইরূপে যথাবিধি নিৰ্ম্মাণকাৰ্য্য শেষ করিয়া পরে তাহার চারিদিকে প্রাকার তৈয়ারি করিয়া দিতে হয়। হয়শার্শের মতে প্রাকারের উচ্ছ্রায় পরিমাণ হইবে প্রাসাদের চারি ভাগের এক ভাগ। পঞ্চহস্ত দেবতার পাঠ হইবে এক হাত পাঠ এবং তাহার দ্বিগুণ হইবে গরুড়মণ্ডপ।\*

মন্তপুৰাণে উক্ত আছে,—মন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহার অদূরে চারিদিকে বৃক্ষাদি রোপণ ও জলাশয়াদি খনন করিতে হয়। ইহার পূর্বদিকে ফলবান্ বৃক্ষ, দক্ষিণে ক্ষীর-বৃক্ষ, পশ্চিমে কমলকুমুদাদি-পরিণোভিত জলাশয় এবং উত্তরে তাল নল প্রভৃতি তরু ও সুরম্য পুষ্পবাটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সকল দিকেই স্থির বা অস্থিরভাবে জল রাখা প্রশস্ত এবং পরিখাবলয় দ্বারা সমস্ত দিকই বেষ্টিত করা বিধেয়। বাম্যদিকে তপোবনস্থান, উত্তরে মাতৃকাগৃহ, অগ্নিকোণে অগ্নিস্থান, নৈঋতে বিনায়ক, বাকুণে শ্রীনিবাস, বায়বে গ্রহমালিকা এবং উত্তরে যজ্ঞশালা ও নিৰ্ম্মাণস্থান নির্দেশ করিবে। এতদ্বিধি বাকুণে বলিনিৰ্ম্মপণস্থান এবং অগ্নিদিকে গরুড়স্থান প্রস্তুত করিবে। এইরূপে অত্যাঁত আবশ্যকীয় স্থানও যথাযথ ভাবে নির্দেশ করিয়া শুভ মণ্ডপ-সংলগ্ন দেবায়তন নিৰ্ম্মাণ করিবে।\*

জীর্ণোদ্ধার।

বিবৃদ্ধম্মোত্তরে লিখিত আছে, রাজ্য মধ্যে দেবালয় ভঙ্গ হইলে, সে রাজার রাজ্যেও নানাহান ভঙ্গ হইয়া থাকে।

\* “প্রাসাদস্য চতুর্ভাগে প্রাকারোচ্ছ্রায়ো ভবেৎ।

পঞ্চহস্তস্য দেবস্য একহস্তা তু পাঠকঃ।

তস্মাত্তু দ্বিগুণঃ প্রোক্তস্তথা গরুড়মণ্ডপঃ।

একহস্তাদি কুকীত ত্রিংশদ্ব্যন্তমেব চ।” (হয়শার্শ)

+ “পূর্বেণ ফলিনো বৃক্ষাঃ ক্ষীরবৃক্ষাস্ত দক্ষিণে।

পশ্চিমে নলং ত্রৈলোক্যং পশ্চিমে পুষ্পবাটিকা।

উত্তরেণ তালৈস্তালৈঃ শুভা ত্র্যং পুষ্পবাটিকা।

সর্বতন্ত জলং ত্রৈলোক্যং স্থিরমস্থিরমেব চ।

সর্বতন্তাপি কর্তব্যং পরিখাবলয়াদিকম্।

যাম্যে তপোবনস্থানমুত্তরে মাতৃকাগৃহম্।

মহানসং তথাগ্রে নৈঋতে তু বিনায়কঃ।

বাকুণে শ্রীনিবাসস্ত বায়বে গ্রহমালিকা।

উত্তরে যজ্ঞশালাস্ত তু নিৰ্ম্মাণস্থানমুত্তরে।

বাকুণে সোমদৈবতো বলিনিৰ্ম্মপণং স্তুতম্।

পরতো গরুড়স্থানং তথাগ্রেণ যথোচিতম্।

এবমায়তনং কুর্ধ্যাচ্ছ্র মণ্ডপসংযুতম্।” (মন্তপুৰাণ)

আবার সেই দেবালয়ের জীর্ণসংস্কার করিয়া দিলে ভগ্নবিপ্রব উপশমিত হয় এবং পুণ্যসঙ্কর হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবীপুরাণের মতে, মূল দেবগৃহনিৰ্মাণ অপেক্ষা জীর্ণোদ্ধারে শতগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

হরিভক্তিবিলাসের মতে, দেব বা দেবালয় প্রতিষ্ঠা বাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেই বিধাহুসারেই সম্পন্ন করা কর্তব্য।

(ক্লী পুং) মন্দন্তে মোদন্তে লোকা বত্র। ২ নগর।

৩ অশ্বজাহ্নুর পশ্চিম বা পশ্চাদ্ ভাগ। (হেম ৩২৭৮)

“অধরে চ ততো জাহ্নু নির্দিষ্টং শাস্ত্রকোবিদৈঃ।

মন্দিরং পশ্চিমো ভাগঃ কলাচী জাহ্নুনোহগ্রিমঃ।”

(অশ্ববৈদ্যক ২২১)

(পুং) ৪ সমুদ্র। ৪ গৃহ। ৬ শিবির। ৭ গন্ধর্বভেদ।

মন্দিরপশু (পুং) মন্দিরচরঃ মন্দিরপালিতো বা পশুঃ, মধ্যপদলো। বিড়াল।

মন্দিরমণি (পুং) শিব। (হেম)

মন্দিরা (স্ত্রী) মন্দির-টাণ্। ১ মন্দুরা, অশ্বশালা। ২ মন্দির।

৩ বাত্ববিশেষ।

মন্দিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় মোহনকর, ‘মাদয়িত্তম।’ (ঋক্ ৮।২।২)

মন্দির (পুং) ঋষিভেদ। (কাত্য। ১০ শ্রোঃ ১৩।৩২৪) (ক্লী) ২ মঞ্জীর।

মন্দু (মান্দুগড়) মালবের প্রাচীন রাজধানী। ঘোরীবাংশীয় হোসঙ্গ এই স্থানে অনেকগুলি কারুকাব্যসম্পন্ন প্রাসাদ নিৰ্মাণ করেন এবং তাঁহার রাজত্বকালেই ইহার বিশেষ উন্নতি হয়। এখানে একটি অত্যাশ্চর্য মসজিদ আছে। এই মসজিদ অপেক্ষাও মন্দুর রাজপ্রাসাদ সকল অধিকতর মনোরম। এই সকল প্রাসাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রাসাদটো জাহাজমহল নামে খ্যাত; জাহাজ ধেরূপ সলিলোপরি ভাসমান থাকে, তদ্রূপ এই প্রাসাদও দুইটা বিশাল সরোবর মধ্যে অবস্থিত। মালবের অত্র একজন রাজা বাজ বাহাজুরের প্রাসাদও অতি সুন্দর।

এখন ইহা মধ্যভারতের অন্তঃপাতী ধাররাজ্যের একটি পরিত্যক্ত সহর বলিয়া গণ্য। অক্ষাঃ ২২° ২১' উঃ, দ্রাঘি ৭৫° ২৬' পূঃ। নর্মদা নদীর দক্ষিণতীরে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৩১৩ অব্দে মন্দোগড় স্থাপিত হইয়াছিল।

১৫শ শতাব্দীতে হোসঙ্গ ঘোরী মন্দোগড় নিৰ্মাণ করেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে গুজরাতের শাসনকর্তা বাহাজুর শা এই গড় অর করিয়া স্বীয় রাজ্য ভুক্ত করেন। অবশেষে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আকবর বাদশাহর অধিকারভুক্ত হয়।

XIV

মন্দুমহল শিরগিরা, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সখলপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র জমিদারী। সখলপুর নগর হইতে ৪২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়। মন্দুমহলের রাজা ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহে বোগদান করেন। কিন্তু অবশেষে পরাভূত হইয়া ১৮৬২ খৃঃ অব্দে পুনরায় রাজ্যে স্থাপিত হন। জমিদারের বাস-স্থান শিরগিরা গ্রাম, এইস্থান উতালী নদীর তীরে অবস্থিত।

মন্দুর (ত্রি) মন্দি-উন্। মাদকর, আমোদজনক।

“ইজ্জেন স হি দৃশ্যমে সংজগ্মানো অবিভ্যাবা।

মন্দু সমানবর্চসা।” (ঋক্ ১।৩।৭)

মন্দুরা (স্ত্রী) মন্দন্তে স্বপত্তি মোদন্তে বা অশ্বা বত্র। মন্দ-উরচ্ (মন্দিবাশিমণীতি। উণ্ ১।৩৯) ততটোপ্। বাজিশালা, আস্তাবোল।

“উপাহরম্মমজ্ঞচকলৈঃ

ক্ষুরাকলৈঃ কোদিতমন্দুরোদরম্।” (নৈষধ ১।৫৭)

২ শয্যার দ্রব্যভেদ, চলিত মাদুর।

মন্দেহ (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। (রামাঃ ৪।৪।৪২) ২ কুশধীপ-বাসী শূদ্রজাতি। (বিষ্ণুপুঃ ২।৪।১৫)

মন্দোচ্চ (পুং) গ্রহগণের গতিভেদ। (Apsia)

সুধ্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে—

“অদৃশ্যরূপাঃ কালস্ত মূর্তয়ো ভগণাশ্রিতাঃ।

শীঘ্রমন্দোচ্চপাতাখা গ্রহাণাং গতিহেতবঃ।” (২।১)

কালবশে গ্রহগণের গতিকরণ অদৃশ্যরূপ ও ভগণাশ্রিত শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ ও পাতনামা মূর্তি হইয়া থাকে।

“বক্রাহুবক্রা কুটীলা মন্দা মন্দতরা সমা।

তথা শীঘ্রতরা শীঘ্রা গ্রহাণামষ্টধা গতিঃ।” (২।১২)

বক্র, অহুবক্র, কুটিল, মন্দ, মন্দতর সম, শীঘ্রতর ও শীঘ্র-গ্রহগণের এই আট প্রকার গতি।

“গ্রহঃ সংশোধ্য মন্দোচ্চাৎ” মন্দোচ্চভোগ হইতে রাশ্যাদির সংশোধন করা যায়।

মথুরানাথ দৈবজ্ঞ রচিত গ্রহার্ণবে গ্রহগণের মন্দোচ্চ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে,—

“রবেমন্দোচ্চকং নেত্রং মৈত্রমঙ্গির্গজার্ণবো।

কুজস্ত ঋতয়ো নন্দা নগেবু রসবহুঃ।

বৃহস্ত সপ্ত কুর্ভো নবেন্দুধাদশক্রমাৎ।

শুরোবাণশ্চত্বয়মো খং খং রাশ্যাদিকং ক্রমাৎ।

ভৃগোর্ঘমো নবেন্দুশ্চ গোহয়ীখং মন্দভূতকম্।

শনেঃ শৈলারসযমো রসায়ী রসবহুঃ।

ঘাপরাস্তে শুরোকারে নিলীখে চ গতা ইমে।”

২ রাশি, ১৭ অংশ, ৭ কলা ও ৮ বিকলা রবির মন্দোচ্চ বলিয়া কথিত। এইরূপ ৪ রাশি ৯ অংশ, ৫৭ কলা ও ৩৬ বিকলা মঙ্গলের; ৭ রাশি, ১০ অংশ, ১৯ কলা ও ১২ বিকলা বুধের; ৫ রাশি ও ২১ অংশ বৃহস্পতির; ৪ রাশি, ১৯ অংশ ও ৩৯ কলা শুক্রের এবং ৭ রাশি, ২৬ অংশ, ৩৬ কলা ও ৩৬ বিকলা শনির মন্দোচ্চ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

কল্যাপিওকে ৩৮৭ দিয়া পূরণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লাভ হইবে, তাহাই হইল কলাদি। পূর্বে যে ২ রাশি, ১৭ অংশ, ৭ কলা ও ৪৮ বিকলা রবির মন্দোচ্চ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহার কলাদির সহিত এই ভাগলক্ষ কলাদি যোগ করিয়া দিলে রবির মন্দোচ্চ হইবে। এইরূপ কল্যাপিওকে ২০৪ দিয়া পূরণ করিয়া যদি দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করা যায়, তবে যে অঙ্ক লক্ষ হইবে, সেই লক্ষ অঙ্ক কলাদি হইবে এবং এই কলাদি পূর্বকথিত মঙ্গলের মন্দোচ্চের সহিত যোগ করিলে মঙ্গলের মন্দোচ্চ হইবে। এই প্রকারে ৩৬৮ দিয়া কল্যাপিকে পূরণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি লক্ষ হইবে, উহা পূর্বোক্ত বুধের মন্দোচ্চে যোগ করিলে বুধের মন্দোচ্চ স্থির হইবে। কল্যাপিকে ৯০০ দিয়া পূরণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি লক্ষ হইবে, উহা পূর্বোক্ত বৃহস্পতির মন্দোচ্চে যোগ করিলে বৃহস্পতির মন্দোচ্চ হইবে। কল্যাপিওকে ৫৩৫ দিয়া পূরণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি লক্ষ হইবে, উহা শুক্রের পূর্বোক্ত মন্দোচ্চে যোগ করিয়া দিলে শুক্রের মন্দোচ্চ নির্ণীত হইবে। এইরূপ ৩৯ দিয়া কল্যাপিওকে পূরণ করিয়া যদি দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করা যায়, তবে তাহাতে যে কলাদি লক্ষ হইবে, তাহা পূর্বকথিত শনির মন্দোচ্চের সহিত যোগ করিলে শনির মন্দোচ্চ নির্ধারিত হইবে।

“কল্যাপিওং নগরামরাটম-

বেদাভ্রনেত্রগজতর্করাটমঃ।

খগগ্রহৈঃ সায়করামবাটৈ-

ন ব্যাঘ্রাভিঃ সৃষ্টকুজাদিকানাম্ ॥

জুহা দিলটৈর্বিভজেৎ কলাত্মং

মন্দোচ্চকে যোহ্যামিদং ক্রমেণ ॥”

রবি প্রভৃতি গ্রহগণের মন্দোচ্চ ক্ষুণ্টের নিমিত্ত আনয়ন করা প্রয়োজন। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচটা গ্রহের মন্দোচ্চে যদি ২৪ অংশ যোগ করা যায়, তবে সিদ্ধান্তরহস্যের মন্দোচ্চের সহিত ঐক্য হয়। চন্দ্রকেন্দ্রের পাঁচ কলা ভাগ করিলে সিদ্ধান্তরহস্যের চন্দ্রকেন্দ্রের সমান হইবে। এইরূপ হইলেই সমস্ত গ্রহের মধ্য, শীঘ্র, ও মন্দোচ্চ

ইত্যাদি সিদ্ধান্তরহস্যের সমান করিয়া লওয়া যায়। এই উভয় মতই বর্তমানে প্রচলিত।

মন্দোদরী (ক্রী) লঙ্কাধিপ রাবণ রাবণের মহিষী, ময়দানবের কন্যা। ইন্দ্রজিতের মাতা। (রামায়ণ, মহাভারত)

[ রাবণ দেখ। ] ২ কুমারামুচর মাতৃভেদ।

মন্দোদরীশ (পুং) রাবণ।

মন্দোদরীসুত (পুং) ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ।

মন্দোর, রাজপুতনার মধ্যে বোধপুর রাজ্যের একটি বিখ্যাত নগর। অক্ষা° ২৬° ২১' উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৫' পূঃ।

খৃষ্টীয় ১৩৮১ অব্দে চণ্ড নামধারী জনৈক রাঠোর রাজপুত পরিহাররাজ্যের নিকট হইতে এই স্থান অধিকার করেন। ১৪৫৯ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত ইহা রাঠোর রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগরের চতুঃপার্শ্ব ছুভেত্ত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং ইহা একরূপ উচ্চ স্থানে নিম্নিত যে, এস্থান হইতে নিকটবর্তী সমুদ্রয় স্থানহ দৃষ্টিগোচর হয়। ভগ্নাবশেষ যাহা আছে, তন্মধ্যে দেব-দেবীর মূর্তি এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বীরপুরুষগণের মূর্তি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এতদ্ভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের অনেক কীর্তি রাখিয়াছে। এখানে আজিৎ সিংহের একটি পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ ও পরলোকগত অত্যাচারী অনেক নৃপতির স্মরণার্থ বহু মন্দির পাওয়া আছে।

মন্দোরে পুরাকালে জুলাগড় নামে একটি দুর্গ ছিল। এই স্থানে পঞ্চকুণ্ড নামে একটি তীর্থস্থান আছে। পঞ্চ-ধারায় জলস্রোত আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে বলিয়া ‘পঞ্চকুণ্ড’ নাম হইয়াছে। রায়গঞ্জার কীর্তিস্তম্ভের নিকট একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তন্মধ্যে ২ খানি শিলালিপি ছিল। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকখান শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

মন্দোরে ২টা মাত্র ক্ষুদ্র মন্দির ছিল, তন্মধ্যে একটি খুলি-সাহ হইয়াছে।

মন্দোরের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই মালা। বাগানের কাজই ইহাদের উপজীবিকা। এত নিমিত্তই বোধ হয় মন্দোরে অনেক বাগান আছে। এখানকার বাগানগুলি অত্যাচার স্থানের বাগান হইতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর, তন্মধ্যে লালসাগরবাগ এবং ‘উজিরের বাগ’ই প্রধান।

মন্দোদ্যু (ক্রী) ঈষৎক্ষণ। (ত্রি) ঈষৎক্ষণবান।

মন্দু (পুং) মন্দ্যতে বুধ্যতে অনেন, মদি-রক্ (ক্ষয়িতকীতি।

উণ্ ২।১৩) ১ গভীরধ্বনি।

“মন্দন্বৈশ্বশ্বনিভিরবলাবর্ণমোক্ষোৎসুকানি।” (মেঘদূ ১০০)

২ বাদ্যবিশেষ। পথ্যায়—মড্ড, মৃদঙ্গক। (ত্রি) ৩ ছট।

“হোতা মন্দো বরেণ্যঃ।” (ঋক্ ১।৫।৭) ‘মন্দো ছটঃ’ (সায়ণ)

৪ মাদনশীল। “অগ্রে জুষ্ম প্রতিহায তদ্বচো মন্ম স্বধাথ ঋতজাত  
স্বকৃতো ॥” (ঋক্ ১১৪৪৭) ‘মন্ম মাদনশীল’ (সায়ণ) ৫ গভীর।  
“মন্ময়া বাচা প্রাতঃসবনং শংসেৎ।” (ঐতরেয়ব্রাঃ ৩৪৪)  
(ক্লী) ধ্বনিভেদ।

“তালীষু তারং বিটপেষু মন্ম শিলাসু রুক্ষং সলিলেষু চণ্ডম।  
সঙ্গীতবীণা ইব তাদ্যমানাস্তালাহসারেণ পতন্তি ধারাঃ ॥”

মন্মারগুড়ি, মন্মাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলাস্থ  
একটি নগর। অক্ষা ১০° ১৪' ১০" উঃ দ্রাঘিঃ ৭৯° ২৯'  
৩০" পূঃ। তঞ্জোর নগর হইতে ২০ মাইল দক্ষিণপূর্বে  
অবস্থিত।

এইস্থান দেশী কাপড় ও ধাতব বাসনের কারবারের জন্ম  
বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই নগরে ৯টি পুরাতন মন্দির আছে,  
তন্মধ্যে ৪টি বিষ্ণুমন্দির ও ৫টি শিবমন্দির। ইহার মধ্যে  
সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরটি বিজয়রাম নায়ক নির্মাণ  
করেন। এই মন্দিরে তামিল ভাষায় লিখিত কয়েকখান  
শিলালিপি আছে। ইহা ছাড়া একটি পুরাতন জৈনমন্দির  
দৃষ্ট হয়।

মন্মি (দেশজ) অভিষাপ। মনস্তাপ।

মন্মুরাম, অর্থবৎসত্রবাদরচয়িতা।

মন্মজিহ্ব (ত্রি) মাদকজিহ্বাবৃক্ষ। “ত্বামগ্রে প্রথমং দেব-  
রস্তো দেবং মর্তা অমৃত মন্মজিহ্বঃ।” (ঋক্ ৪১১১৫) ‘মন্ম-  
জিহ্বঃ দেবানাং মাদয়িত্রী জিহ্বা যস্য তং’ (সায়ণ)

মন্মযু (ত্রি) মদকর শব্দকামনাকারী। “প্র বো যিষ্যা মন্ম-  
যুবো” (ঋক্ ৯৮৬১৭) ‘মন্মযুবো মদকরং শব্দং কামায়মানাঃ’ (সায়ণ)

মন্মাজনী (ক্লী) মন্ম-অজ্-ল্যুট্ কীপ্। মদকর রসের  
প্রেরয়িত্রী।

“উপো মতিঃ পৃচাতে সিচাতে মধু

মন্মাজনী চোদতে অন্তরাসনি।” (ঋক্ ৯৬৯১০)

‘মন্মাজনী মদকরস্ত রসস্ত প্রেরয়িত্রী’ (সায়ণ)

মন্ম (পুং) মন্ম, মথন। (ষড়্-বিংশত্ৰাঃ ৬৮)

মন্মাতৃ (পুং) ১ মেধাবী। (নিঘণ্টু) ২ যুবনাথের পুত্র,  
মাকাতা।

“তমাগ্নম ত্রিপত্যং মন্মাতৃদহ্নাহস্ত মময়িং” (ঋক্ ৮১৩৯৮)

‘মন্মাতৃদৌবনাথস্ত মাকাতৃঃ’ (সায়ণ)

মন্মুলাল, একজন ঐতিহাসিক, বাহাডুর সিংহ মুন্সীর পুত্র।  
ইনি ‘তারিখ-ই-শাহআলম্ নামে’ দিল্লীশ্বর শাহআলমের বিস্তৃত  
ইতিহাস রচনা করেন।

মন্মথ (পুং) মন্ম পচাদাচ্, পৃষোৎ। কামদেব।

ব্রহ্মবৈবর্তে লিখিত আছে,—

“মনো মথ্যতি সর্কেষাং পঞ্চবাণেন কামিনাম্।

তন্মাম মন্মথস্তেন প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥”

পঞ্চবাণ কামিগণের মন মথন করে বলিষা মনীষিগণ  
তাহার ‘মন্মথ’ নাম রাখিয়াছেন। নৈষধচরিতে লিখিত  
আছে—“ন মন্মথস্বং স হি নাস্তি মূর্খিঃ” (৮১২৯) অর্থাৎ  
তুমি মন্মথ নও, কারণ তাহার ত মূর্খি নাই।

[ কামদেব ও মদনমহোৎসব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

২ কর্পিথ বৃক্ষ। ৩ কামাচিন্দ্র। ৪ ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত  
২৯শ বর্ষ।

মন্মথকর (পুং) কুমারাহুচরভেদ।

মন্মথলেখ (পুং) প্রেমপত্র।

“কাস্তো মন্মথলেখ এষ নলিনী-পত্রে নৈথৈরর্পিতঃ” (শকু ৩অ)

মন্মথা (ক্লী) মন্মথ-টাপ্। হেমকুটের দাক্ষায়ণী।

মন্মথানন্দ (পুং) মন্মথং আনন্দয়তীতি আ-নন্দ-ণিচ্-পচাণ্চচ্।  
মহারাজচূত, আত্মভেদ। (রাজনিঃ)

মন্মথালয় (পুং) ১ আশ্রয়স্থ। ২ কামিজনের অর্ভাষ্ট  
পূরণের স্থান।

মন্মথিন্ (ত্রি) কামী।

মন্মন (ক্লী) ১ মননীয় ধন। “তন্মো রায় স্তমহো ভূরি মন্ম।”  
(ঋক্ ৪১১১২) ‘মন্ম মননীয়ং তদ্বনং’ (সায়ণ) ২ অভিভূত  
কাম। “নিচে ভারো হি মরুতো গুণস্তং প্রণেতারো যজমানস্ত  
মন্ম।” (ঋক্ ৭৫৭১২) ‘মন্মাভিমতং কামং’ (সায়ণ)  
৩ মননীয় স্তোত্র। “অগ্রে স্তোমং জুষ্ম মে বন্ধুস্থানেন মন্মনা।”  
(ঋক্ ৮৪৪১০) ‘মন্মনা মননীয়েন স্তোত্রেন’ (সায়ণ)

মন্মন (পুং) ১ গদগদ আলাপ। ২ দম্পতীর কথনবিশেষ,  
কর্ণমূলে গুপ্তালাপ।

“স্বরতে কর্ণমূলে তু নিজদেয়ভাষয়া।

দম্পত্যোঃ কথনং যত্তু মন্মনং তং বিজুবুধাঃ ॥” (চিন্তামণি)

মন্মায় (ত্রি) আমাতে অবস্থিত। “বীতরাগ ভয়ক্রোধা মন্মায়  
মামুপাশ্রিতাঃ ॥” (গীতা ৪১০)

মন্মশাস্ (অব্য) মন্মনস্তোত্র দ্বারা।

“যদিহ মন্মশস্তা নানা হবস্ত উতয়ে।” (ঋক্ ৮১৫১০)

‘মন্মশো মন্মনা স্তোত্রেন’ (সায়ণ)

মন্মসাধন (ত্রি) অর্ভাষ্টপূরণকারী।

“রায়ো বুরঃ সঙ্গমনো বস্থনাং

যজ্ঞস্ত কেতুর্নামসাধনো বেঃ।” (ঋক্ ১৯৬৬)

‘মন্মসাধনো মননীয়স্তাভিলাষিতস্ত সাধয়িতা।’ (সায়ণ)

মন্মোক, একজন প্রাচীন কবি। সঙ্কটকণামতে ইহার  
কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

মন্ড (ত্রি) মন-যৎ। মননীয়। এই শব্দ অপর শব্দের যোগে  
প্রযুক্ত হয়, যেমন পণ্ডিতমন্ড, শ্রীমন্ড ইত্যাদি।

মন্ডকা (দ্বী) মন্ডা, গ্রীবা।

মন্ডন্তী (দ্বী) অগ্নিমন্ডুর কন্ডা। (মহাভারত বন)

মন্ডা (দ্বী) মন্ডতে জায়তে শুভ্রহঃখাদিকমনরা, মন্-করণে  
কাপ্ স্মিরাং টাপ্। গ্রীবার পশ্চাৎগের শিরা, ঘাড়ের শিরা।

“মন্ডা পার্শ্বশিরো গলাং।” (চক্রদত্ত)

মন্ডাচালী (দ্বী) অশ্বের বাতব্যাধিভেদ, ইহাতে শুভ্রগ্রীবার  
ক্ষুরণ হয়। (জয়দত্ত)

মন্ডার (মণিয়ার), মণিবণিক, কংসকার জাতি হইতে  
উদ্ভূত। আন্দননগর, ধারবাড় এবং বেলগী প্রভৃতি স্থানে  
এই জাতির বাস। ইহারা অরঙ্গজৈবের সময় মুসলমান ধর্মে  
দীক্ষিত হয়। আন্দন নগরের মন্ডারের মধ্যে কতক অংশ  
আরঙ্গাবাদ হইতে আসিয়াছিল, এবং অবশিষ্টাংশ কাসার  
জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা  
দক্ষিণী হিন্দুস্থানী এবং বিস্তৃত কানাড়ী অথবা মিশ্রিত-মরাঠী।  
ইহাদের গঠন মধ্যমাকার এবং বর্ণ কৃষ্ণ ও ধূসর। ইহারা  
মাথা কামাইয়া ফেলে, কিন্তু দাড়ি রাখে। মন্তকে মহারাজ্যীয়  
পাগড়ি এবং গায়ে জামা পরে। জীলোকেরা হিন্দুদিগের  
জ্ঞান বেশভূষা করিয়া থাকে। তাহারা সকলের সম্মুখে  
উপস্থিত হইতে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হয় না এবং পুরুষের  
কার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। জীপুরুষ উভয়েই অতি  
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ইহারা কাঁচের চুড়ী, গালার চুড়ী এবং লোহের বাসন  
ইত্যাদির ব্যবসা করে। এতদ্ভিন্ন ইহারা হুচ, পিন, তালা,  
চাবি ও অন্যান্য জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকে। কাঁহারও বা  
স্থায়ী দোকান আছে, কেহ বা ফেরী করিয়া বিক্রয় করিয়া  
বেড়ায়। ইহাদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহা  
জাতীয় সমিতি দ্বারা মীমাংসিত হয়। কোন ধনবান ব্যক্তি  
সমিতির কর্তা হন। তাহার অর্থদণ্ড করিবার ক্ষমতা  
আছে। ইহারা অগ্নিসম্প্রদায়ভূক্ত হইলেও প্রধানতঃ দুই  
শ্রেণীতে বিভক্ত;—

১। বঙ্গরহাং অর্থাৎ চুড়ী-ব্যবসায়ী ও ২য় মন্ডার  
অর্থাৎ চুড়ী ও বাসন-ব্যবসায়ী। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সামা-  
জিক পার্থক্য কিছুই নাই, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি  
হয় এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের সহিতও ইহাদের বিবাহ  
হইতে কোন বাধা নাই।

মন্ডান্তস্ত (পুং) বাতব্যাধি বিশেষ। মাধবকরের নিদানে  
লিখিত আছে—

“দিবানিশপ্রাশনমান-বিকৃতোক্তিনিরীকণৈঃ।

মন্ডান্তস্তং প্রকুরতে স এব স্নেয়গা যুতঃ॥”

দিবানিশপ্রা, আহার ও স্নানের বিকৃতি এবং উক্তদৃষ্টিপ্রযুক্ত  
মন্ডান্তস্ত জন্মে, ইহা স্নেয়া কর্তৃক উৎপন্ন হয়।

দশমূলীকাথ, পঞ্চমূলী, কক্ষ স্নেদ, ও নস্ত মন্ডান্তস্তে  
প্রযোজ্য। ২ অশ্বের বাতব্যাধি বিশেষ। [বাতব্যাধি দেখ।]

“নমন্ত্যন্নমতি গ্রীবা স্তক্কা চ যন্ত বাজিনঃ।

মন্ডান্তস্তং বিজানীয়াদ্রোগং তন্ত স্মারুণম্॥” (জয়দত্ত)

মন্ড্য (পুং দ্বী) মন্-যুচ্। (যজ্ঞমনিষ্ঠুদিসিজনিত্যে যুচ্।  
উণ্ ৩২০) ১ স্তোত্র। ২ কর্ম। ৩ শোক।

“অভি যো বিশ্বা ভুবনানি চষ্টে স মন্ড্য মর্ন্ত্যেচ্চাচিক্ত।”

(ঋক্ ৭৬১১) ‘মন্ড্যং স্তোত্রং কর্ম বা’ (সারণ) ৪ বাগ।

“অন্নং বহন্তি মন্ডবে” (ঋক্ ৬১৬৪৩) ‘মন্ড্যধিগং’ (সারণ)  
৫ কোপ, ক্রোধ। (অমর)

“নাততান্নিবধে দোষো হস্তর্ভবতি কশ্চন।

প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্ড্যন্তঃ মন্ড্যমুচ্চতি॥” (মহু ৮৩৫১)

৬ শোক। ৭ দৈন্ত। ৮ অহংকার। ৯ শিব। ১০ অগ্নি।

“যঃ প্রশান্তেযু ভূতেষু মন্ড্যর্ভবতি পাবকঃ।” (ভারত বন)

১১ বিতথের পুত্র রাজভেদ। (ভাগবত ৯২১১১)

মন্ড্যদেব (পুং) ১ ক্রোধাতিমানী দেবতা। (মহু ৮৩৫১)  
২ ঋষিভেদ।

মন্ড্যদেব (মহুদেব ওরফে গোপাল দেব)—একজন প্রসিদ্ধ  
বৈয়াকরণ। কৃষ্ণদেবের অমুজ ও শঙ্কুদেবের পুত্র। ইনি  
পরিভাষেন্দুশেখরোক্তার নামে পরিভাষেন্দুশেখরের টীকা,  
বৈয়াকরণসিদ্ধান্তভূষণসারের টীকা, শঙ্কেন্দুশেখর ও লঘু  
শঙ্কেন্দুশেখরের টীকা প্রণয়ন করেন।

মন্ড্যমণা (দ্বী) ভেকপণী, খুলকুড়ি।

“শিলাতলে মন্ড্যমণীদলন্ত।” (ভৈষজ্যরত্নাং)

মন্ড্যমৎ (ত্রি) মন্ড্য-মতুপ্। ১ ক্রোধযুক্ত।

“তদ্বামস্ত সহসে মন্ড্যমচ্ছবঃ।” (ঋক্ ৭১০৪৩) ‘মন্ড্যমৎ

ক্রোধযুক্তং’ (সারণ) (পুং) ২ অগ্নির নামান্তর।

‘যঃ প্রশান্তেযু ভূতেষু মন্ড্যর্ভবতি দারুণঃ।

অগ্নিমন্ড্যমগ্নাম দ্বিতীয়ে ভাস্কতঃ সূতঃ॥” (ভারত বনপং)

মন্ড্যময় (ত্রি) ১ ক্রোধময়। ২ অতিদারুণ। স্মিরাং জীপ্।

“এবং মন্ড্যময়ীঃ মুক্তিং কৃতান্তমিব বিলতম্।” (ভাগবত ৪১৭১২৮)

মন্ড্যমী (ত্রি) মন্ড্যং মিনাতীতি, ‘মীক্ হিংস্রায়াং কিপ্’।

১ কোপকারী। ২ অভিমহ্যমান শক্রর হিংসাকারী।

“স মন্ড্যমীঃ সমদনস্ত কর্তা” (ঋক্ ১১০০৬)

‘মন্ড্যমীন্যোঃ কোপস্ত নির্যাতা’ (সারণ)



মন্রোশমন (ত্রি) ক্রোধনিবারণের উপায়।

“অয়ং দর্ভো বিমন্রাকঃ স্বায়চারণায় চ।

মন্রো বিমন্রাকস্তানং মন্রোশমন উচ্যতে॥” (অথর্ষ ৬৪৩১)

‘মন্রোশমনঃ ক্রোধনিবারণোপায়ঃ’ (সায়ণ)

মন্রোষাবিন্ (ত্রি) ক্রোধপূর্ক্ক সোমসবনকারী।

“অতাহি মন্রোষাবিনং হ্রুবাংসমুপারণে।” (ঋক্ ৮১৩১১)

‘মন্রোষাবিনং ক্রোধেন সোমং হ্রুন্তঃ’ (সায়ণ)

মন্রোসূক্ত (ক্ৰী) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৩ম ও ৮৪ম সূক্ত।

মন্রো (সব্ হেস্তর মন্রো)—জটনৈক ইংরাজসেনাপতি।

মেজর কার্ণাকের মৃত্যুর পর মেজর হেস্তর মন্রো তাঁহার পদ লাভ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি অসীম সাহস ও অদম্য উৎসাহের সহিত কাণ্ড করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বজ্রারে বিশেষ রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন। খৃষ্টীয় ১৭৬৪ অব্দে ২২ অক্টোবর তারিখ সর্বশুদ্ধ ৭০৭২ জন সৈন্য লইয়া মন্রো বজ্রারে উপস্থিত হন। তথায় উজ্জীর সূজা উদৌলা এবং মীর কাসিম ৪০ হাজারের অনধিক সৈন্যে বেষ্টিত শিবিরে অবস্থান করিতে ছিলেন। ইহাদের বামপার্শ্বে গঙ্গা নদী এবং পশ্চাৎপাশে বজ্রার নগর থাকায় সৈন্যশিবির অতিশয় দুর্ভেদ্য হইয়াছিল। এই নিমিত্তই ইঁহার আত্মরক্ষার্থ কক্ষিৎ শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২৩ শে তারিখ প্রাতঃকালে মন্রোর সৈন্য-সমূহ আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল। ৩ ঘণ্টা কাল যুদ্ধের পর উজ্জীরের সৈন্যেরা পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরাজদিগের যুদ্ধারম্ভের সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছিলে তাহাদিগের অধিকৃত ভারত-বর্ষস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণসমূহ ইংরাজসৈন্য কষ্টক আক্রান্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে জেনারল সার হেস্তর মন্রো মাদ্রাজ-সৈন্যদলের অভিনেতা হইয়া পুঁদিচেরী দখল করিতে অগ্রসর হন। তখন সার এডওয়ার্ড ভাবনন্ ইংরাজপক্ষ হইতে কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হন। ফরাসীসেনাপতি মঃ ক্রোঁজোলি ওখানি যুদ্ধজাহাজ লইয়া তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। উভয় পক্ষে সম্মুখসমর উপস্থিত হয় এবং ইংরাজেরা জয়লাভ করেন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে হায়দার আলী যখন নবো-বন্দর প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন মন্রো তাঁহার গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া কাঞ্চীপুরাভিমুখে প্রত্যাগমন করেন।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে মন্রো নাগপট্টন অবরোধার্থ গমন

করেন। তিনি বিশেষ কৌশল ও সাহসের সহিত এই অবরোধ-কাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মন্রোর সৈন্যসংখ্যা চারি সহস্রের অধিক নহে। কিন্তু অবরুদ্ধ নগরের সৈন্যসংখ্যা ৮ সহস্রেরও অধিক। এইরূপ অল্প সৈন্য দ্বারা নগর জয় করিয়া তিনি অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে জেনারল মন্রো জেনারল প্রিজলার (Pritzler) সহ শোলাপুরে পেশবার সৈন্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষে সর্বশুদ্ধ ৯৭ জন হত ও আহত হয়, কিন্তু পেশবার পক্ষে ৮০০ জনেরও অধিক নিহত হইয়াছিল।

মন্রো (সার টমাস) জটনৈক ইংরাজসেনাপতি, মাস্গোর একজন বণিকের পুত্র। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে মাদ্রাজ পদাতিক সৈন্যদলে নিযুক্ত হন এবং মহিসুর ও অত্যাচার যুদ্ধে বিশেষ রণকৌশল দেখাইয়া সেনাপতি লাভ করেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কর্ণাটক প্রদেশে শান্তিস্থাপন করিবার জন্ত মাদ্রাজ হইতে তথায় আগমন করেন। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মন্রন্তর (ক্ৰী) মনোরন্তরমন্নি অথবা মনোরন্তরমবকাশোহ-বধিবাস্তানতি। দিব্যযুগের একসপ্ততি যুগ।

“মন্রন্তরস্ত দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ” (অমর)

দিব্য পরিমাণে একসপ্ততি যুগের নাম মন্রন্তর। এই একসপ্ততি যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুষ্টয়গের, সাধক এবং ইহা মন্রন্তর বলিয়া কথিত।

“এবং চতুষ্টয়গাথ্যানাং সাধিকা হোকসপ্ততিঃ।

কৃতত্রেতাাদিযুগানাম্ মনোরন্তরমুচ্যতে॥” (লিঙ্গপু.)

‘মন্নাং স্বায়ত্ত্বাদীনামন্তরমবকাশোহবধিবাস্তানতি মন্রন্তরম্’ মন্রন্তর শব্দের এইরূপও ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল নারায়ণের মতে দৈবযুগের সহস্র যুগে এক্রার এক দিন। এই এক দিনমানের নাম মন্রন্তর। ইহা চতুর্দশ ভাগে বিভক্ত।

“দৈবিকানাং যুগানাস্ত সহস্রং ব্রহ্মণো দিনং।

মন্রন্তরং তথৈবৈকং তস্ম ভাগাষ্টদশ॥”

এক এক মন্রন্তর কত বর্ষকাল স্থায়ী হয়, তাহার সংখ্যা লিঙ্গ-পুরাণে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার মাত্ত্ব মান,—৩০৬,৭২০,০০০ এইরূপ চতুর্দশ মন্রন্তরে এক্রার একদিন নিরূপিত হইয়াছে \*।

\* “ত্রিশং কোটীস্ত বর্ষাণাং মাত্ত্বেন যিজ্যেত্তমঃ।

সপ্তষষ্টিশতাব্দানি নিযুতাব্দিকানি তু ॥

বিশতিশ্চ সহস্রাণি কালো যঃ সাধিকাং বিনা।

মন্রন্তরস্য সংখ্যায়া লিঙ্গেহস্মিন্ কথিতা যিজ্যেঃ” (লিঙ্গপু.)

যুগ চারিটি,—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। এই চারি যুগের সমুদায়ে মান, দৈব পরিমাণে ষাটশ সহস্র বৎসর। প্রথমে সত্যযুগ, ইহার মান—৪০০০ হাজার বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ মান ৪০০ শত বৎসর; সমুদায়ে মান ৪০০০ হাজার ৮ শত বর্ষ; দ্বিতীয় ত্রেতাযুগ, ইহার মান—২ হাজার ৬ শত বর্ষ। তৃতীয় দ্বাপর যুগ, ইহার মান—২৪০০ বর্ষ। চতুর্থ কলি-যুগ, ইহার মান,—এক হাজার ২ শত বর্ষ। এই যুগচতুষ্টয়ের যে মান নির্দিষ্ট হইল, এই সমস্ত মানই দৈবপরিমাণে জানিতে হইবে। জ্যোতিষবচনে মানুষ্যমানে সত্যত্রেতাাদির মান এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে,—

“বষষিমেভা তুতুরক্ষু মাসা।

বেদা রসাতৌ তুজবক্ষিবেদাঃ।

এতানি শৃণুত্বেতাদিতানি

যুগান্দসংখ্যাঃ পরিকীর্তিতানি ॥” (জ্যোতিঃশাস্ত্র)

অর্থাৎ মানুষ্যমানে সত্যের মান ১,৭২৮,০০০ বর্ষ, ত্রেতার ১,২২৬,০০০ বর্ষ, দ্বাপরের ৮৬৪,০০০ বর্ষ এবং কলির ৪,৩২,০০০ বর্ষ। সমষ্টিতে ৪,৩২০,০০০ বর্ষ।

এই যুগচতুষ্টয়ের মানুষ্যমান সঙ্ক্ষেপে এতদপেক্ষা অগ্নিপুরাণে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। তাঁহার মতে কলিযুগের মান—৪ লক্ষ ২২ হাজার, দ্বাপরের ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার, ত্রেতার ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার এবং সত্যযুগের মান ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বৎসর। চারিযুগের মোট মানুষ্যমান—৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বর্ষ। এই চারি যুগের একসপ্ততিবার আবর্তনের নাম একটা মহাস্তর। এই মহাস্তরের মোট মান হইল ৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। এইরূপ চতুর্দশটা মহাস্তরে এক কল্প কাল হয়।\*

\* “বর্ধলক্ষাণি চষারি ভবেৎ কলিযুগঃ ক্রমে।

ষাট্রিংশত্যা সহস্রৈশ্চ সহিতাক্ষপি সংখ্যায়া।

চতুষ্টয়সহস্রাণি লক্ষাণ্যষ্টৌ চ সংখ্যায়া।

বর্ধাণাং দ্বাপরং প্রোক্তং যুগং পূর্বনিদর্শনাৎ।

ত্রেতা ষাটশলক্ষাণি বর্ধাণাং পরিকীর্তিতাঃ।

বষষত্যা সহস্রৈশ্চ সংযুক্তানি ভবন্তি হি।

দশ সপ্ত চ লক্ষাণাং বর্ধাণাং কৃতং যুগম্।

সহস্রৈরষ্টবিংশত্যা সংযুক্তানি সংখ্যায়া।

ত্রিচষারিংশলক্ষাণি সহস্রাণি চ বিংশতিঃ।

মানুষ্যেণ প্রমাণেন ভবেৎ চতুর্যুগং ক্রমাৎ।

সপ্তবষ্টিক লক্ষাণি ত্রিংশৎ কোট্যন্তেষব চ।

বিংশতিক সহস্রাণি মহাস্তরমিহোচ্যতে।

চতুর্যুগৈকসপ্তত্যা মহাস্তরমিতি শ্রুতিঃ।

কল্পো মহাস্তরৈকচতুর্দশভিক্রম্যতে ॥” (অগ্নিপু.)

কালিকাপুরাণের মতে মহাস্তর অর্থে মহুর কাল অর্থাৎ মহু যত কাল পর্যন্ত প্রজা পালন করেন। একটা মহুর অবস্থিতি কালই মহাস্তর। এই মহাস্তরের দৈবমানে যে এক-সপ্ততি যুগ, তাহাই এক মহাস্তরের পরিমাণ কাল বলিয়া কথিত। এইরূপ চতুর্দশটা মহাস্তরে এক কল্প হয় এবং এই এক কল্পকালই ব্রহ্মার একটা মাত্র দিন।

“মহাস্তরং মনোঃ কালো বাবৎ পালয়তে প্রজাঃ।

একো মহুঃ স কালস্ত মহাস্তরমিতি শ্রুতম্ ॥

তদেকসপ্ততিযুগৈদে বানামিহ জায়তে।

তৈশ্চতুর্দশভিঃ কল্পো দিনমেকস্ত বেধসঃ ॥”

(কালিকাপুরাণ ২৭ অ.)

এক কল্পকাল ব্রহ্মার এক দিন। এই দিনমানের মধ্যেই ক্রমাগত চতুর্দশ মহুর অধিকারকাল শেষ হইয়া যায়। এক মহুর অধিকারকাল শেষ হইলে অল্প মহুর অধিকারকাল উপস্থিত হয়। এইরূপে চতুর্দশ জন মহু পর পর যথারীতি পৃথিবীতে রাজা হইয়া স্ব স্ব ভোগ্য কাল পর্যন্ত রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সকল মহুর মধ্যে একজন মহুর রাজত্ব বা অধিকারকাল যতদিন পর্যন্ত থাকে, তাহারই নাম মহাস্তর। মহুগণের স্ব স্ব নামানুসারেই চতুর্দশটা মহাস্তরের চতুর্দশটা ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে।

ভাগবতে লিখিত আছে,—ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যেই চতুর্দশ মহুর অধিকারকাল হয়। এক মহুর অধিকারকাল যত কাল পর্যন্ত চলিয়া আসে, সেই কালেরই নাম মহাস্তর। মহুগণের নাম ও কোন্ কোন্ মহুর পর কোন্ কোন্ মহুর অধিকারকাল চলিতেছে, তৎসঙ্ক্ষেপে এইরূপ নির্দেশ আছে,—প্রথম স্বায়ম্ভুব মহু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মহু, তৃতীয় উত্তম, চতুর্থ তামস, পঞ্চম রৈবত, ষষ্ঠ চাক্ষুষ, সপ্তম বৈবস্বত। বর্তমান কালে এই বৈবস্বত মহুরই অধিকার চলিতেছে। অতঃপর অষ্টম মহু সাবর্ণি, নবম দক্ষ সাবর্ণি, দশম ব্রহ্ম-সাবর্ণি, একাদশ ধর্মসাবর্ণি, দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণি, ত্রয়োদশ দেবসাবর্ণি, চতুর্দশ ইন্দ্রসাবর্ণি।

এই চতুর্দশটা মহাস্তরের প্রত্যেক মহাস্তরেই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতার, এক এক জন ইন্দ্র ও পৃথক পৃথক ভাবে দেবগণ, সপ্তর্ষি, মহু ও মহুপুত্রগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এক এক মহাস্তরে এক এক জন মহু পৃথিবীতে রাজা হইয়া প্রজাগণের উপর ও এক এক জন ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়া দেবগণের উপর আধিপত্য করেন। দেবগণের উপর আধিপত্য ব্যতীত যথাকালে বারিবর্ষণ করাও তাঁহার একটা কাজ। ইন্দ্র যথাকালে বর্ষণ করিলেই প্রজাগণের সর্ববিধ সুখ শান্তি

সংঘটিত হয়। দেবগণ প্রভাগেণের অমুষ্টিত বজ্রাদি কর্ণে পরিতুষ্ট হইয়া সেই সেই কর্ণের যথোপযুক্ত ফল বিতরণ করেন। সপ্তর্ষিগণ ধর্মশাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং মহাস্তর-ভেদে ভগবান্ বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই সকলকে স্ব স্ব কার্যে নিয়োগ করেন ও তাঁহারই হস্তে ধর্মদ্রোহী দৈত্য রাক্ষস প্রভৃতির উচ্ছেদ সাধন হইয়া সর্বত্র শান্তিবিধান হয়। প্রথমতঃ পৃথিবীতে মহু রাজা হন, পরে তাঁহার অবসানে তদীয় পুত্র-পৌত্রাদিগণ মহাস্তরকালের শেষ সময় পর্য্যন্ত যথাক্রমে রাজ্যসনে উপবেশ করিতে থাকেন। যে মহু রাজা হন, তাঁহার আমলেই যে এই স্তরীর্ণ মহাস্তর কাল অতিবাহিত হয়, তাহা নহে। তাঁহার অভাবে তদীয় বংশধরগণের রাজত্ব ব্যাপারও মহাস্তরের শেষ সময় পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। এই রূপে যখন যখন মহাস্তরের নিয়মিত সময় ফুরাইয়া যায়, তখনই অস্ত্র ইন্দ্র মহু এবং দেব ঋষি প্রভৃতি সমস্তই অস্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্যে ব্যাপৃত হইতে থাকেন।

কোন মহুর অধিকারকালে ভগবানের কোন অবতার কে ইন্দ্র, কাঁহার কাঁহার দেবগণ ও সপ্তর্ষি এবং মহুর পুত্র পৌত্রাদিহি বা কে কে, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ মহু শব্দে লিখিত হইয়াছে। [ মহু দেখ ]

মার্কণ্ডেয়পুরাণের মহাস্তরানুগণন অধ্যায়ে মহাস্তরবিবরণ-শ্রবণে বিবিধ ফলপ্রাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বতন মহাস্তরগুলি শ্রবণ করিলে মানব বিবিধ ফললাভের অধিকারী হইতে পারে। স্বারোচিষ মহাস্তরের বিবরণশ্রবণে মানবের সর্ব কামনা পূর্ণ হয়, ঔত্তম মহুর উপাখ্যান শ্রবণে ধনপ্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ তামসে জ্ঞান, রৈবতে বুদ্ধি ও অরুণা জী, চাক্ষুষে আরোগ্য, বৈবস্বতে বল, সূর্যাসাবর্ণিকে গুণবান্ পৌত্র, ব্রহ্মসাবর্ণিতে মাহাত্ম্য, ধর্মসাবর্ণিতে শুভ মতি, রুদ্র-সাবর্ণিতে জয়, দক্ষসাবর্ণিতে শ্রেষ্ঠজাতি ও সদ্গুণ, রৌচ্যে শক্রনাশক্ষমতা, এবং ভোত্যে দেবপ্রসাদ, অগ্নির জায় তেজস্বিতা ও গুণবান্ বহুপুত্র লাভ হয়। প্রত্যেক মহাস্তরের দেব, ঋষি ও ইন্দ্র প্রভৃতির নাম শুনিয়া মানব সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। দেবর্ষিগণও প্রীত হন, তাঁহারা প্রীত হইয়াই মানবদিগকে শুভমতি দান করেন। শুভমতি হইলেই মানব সুপথে চলিয়া শুভকর্মের অমুষ্ঠান করে এবং শুভকর্মের অমুষ্ঠানেই মানবের সর্ববিধ মঙ্গল সম্ভবিত হয়।

[ বিস্তৃত বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের ৩১-২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ]

পুরাণাদি গ্রন্থে মহাস্তরের উল্লেখ থাকিলেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সুপ্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে মহাস্তরের উল্লেখ নাই। ২ ( চলিত ) ছর্ভিক।

মহাস্তর ( জী ) কালভেদ, আবারমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টাদশ ও ত্রয়োদশের শুক্লপক্ষের তিন দিন মহাস্তর বলিয়া খ্যাত।

মহীশ ( পুং ) জ্ঞানেশ। ( বেতাখতরভাষ্যে শঙ্কর )

মহাদ্য ( ক্রী ) দাত্ত

মনস্ব ( আরব্য ) ১ কার্য। ২ পদমধ্যাদ। ৩ মন্ত্রিত্ব।

মনস্বদার ( পারস্ত ) ১ রাজকর্মচারী। ২ মাণ্ডলিক, ম্যাজি-  
ষ্ট্রেট। ৩ যে ব্যক্তি রাজকীয় কন্মচারিপদে নিযুক্ত।

মনস্বদারী, ১ বিশ্বস্তের কর্ম। ২ মনস্বদারের কর্ম।

মনস্ব ( আরব্য ) প্রতিষ্ঠিত, নিযুক্ত।

মনস্ববা ( আরব্য ) ১ প্রতিষ্ঠা। ২ কোশল।

মনসেফ ( আরব্য ) ১ জায়গর। ( পুং ) ২ বিচারকতা, জায়গাপনকারী, চলিত কথায় মুনসেফ্। এখন মুনসেফ বলিলে দেওয়ানী বিভাগের নিয়ন্ত্রণীয় বিচারপতি বুঝায়।

মপফ, মপুফ ( পুং ) মকুট, বনমূল।

মপফক, মপুফক ( পুং ) বনমূল।

মফসল ( আরব্য ) ১ স্পষ্ট, বিস্তৃত, পূর্ণ, বিস্তৃত ভাবে।  
৩ পল্লীগ্রাম, নগর নহে।

মফৎখোরা ( পারস্ত ) ১ বৃত্তিভোগী, যে বিনা কাজ করিয়া  
অর্থ লাভ করিয়া থাকে।

মফির ( ক্রী ) জনপদভেদ।

মবারক ( পারস্ত ) ১ ভাগ্যবান্। ২ পবিত্র, পুণ্যপ্রদ। ৩ সুখী।

মবলক ( আরব্য ) ১ গন্তব্য স্থান। ২ মুজার মোট সংখ্যা।  
৩ বহু, অনেক।

মভ্র—গতি। ভাদি। পরস্মৈ। সক। সেট। মভ্রতি।

মম ( অব্য ) মদীয়, আমার।

মমকার } ( পুং ) একজনের নিজস্ব, নিজের কোন বিষয়।

মমকৃত্য } ( ক্রী ) হিতকর বা সুবিধাজনক।

“মমকারো মৃগাকীষু ক ইবাং সচেতনাম্।

সদেহেহুপগ্নেহপি যঃ সোহুজ্ঞ কথং মতঃ ॥” ( কুশুমাজাল )

মমতা ( জী ) মম ভাবে তল্ টাপ্। ১ আমারই ইত্যাকার জ্ঞান, মমত্ব।

“তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।” ( মাক্ ৮৩ )  
২ দর্প। ৩ অভিমান। ‘দর্পোহতিমানো মমতা’ ( হেম ২১:৩১ )  
উত্থোর পত্নী, ঋষি দীর্ঘতমার মাতা, ইনি ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া  
গণ্য ছিলেন।

“তোমাং বমসৈ মমতেব শৃং” ( ঋক্ ৬১:১২ )

‘মমতা নাম ব্রহ্মবাদিনী দীর্ঘতমসো মাতা’ ( সায়ণ )

মমতাসূত্র ( পুং ) মমতয়া সূত্রঃ। ১ কৃপণ। ২ অভিমানাদ-  
বিশিষ্ট।

মমত্ব (ক্লী) মম ভাবে হ। মদায়ত্ব, এই বস্তু আমার ইত্যাকার ভাব। “হঃখায়তনভূতো হি মমদালম্বনো গৃহী।” (মার্কং) ২ স্নেহ। “সোহচিস্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টেতনঃ।” (চণ্ডী) ৩ গর্ব, অহঙ্কার।

মমসত্য (ক্লী) সংগ্রাম, স্বামিত্বলাভের জন্ত যুদ্ধ।

“স্বাঃ জনা মম সত্যোষিজ্জ” (শক্ ১০।৪২।৪)

‘মমসত্যোষু সংগ্রামেযু’ (সায়ণ)

মমক (ত্রি) মদীয়। “পিতৃযংপুত্রো মমকস্ত জায়তে।”

(শক্ ১।৩১।১১)

মমাত্ব (ক্লী) নামভেদ।

মমাপত্য (পুং) মব্যবন্ধনে আল (মব্যতেযলোপো মশ্যাপত্যুট্ চালঃ। উণ্ ৫।৫০) ইতি ধাতুযলোপঃ মকার-শ্চাস্ত্য আপত্যুভাগমশ্চ। বিষয়। (উজ্জল দত্ত)

মম্মট, প্রসিদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থকার। অনেকের বিশ্বাস, মহিমম্ভট সংক্ষেপে মম্মট হইয়াছে। ইনি কাব্যপ্রকাশ, শব্দব্যাপার-বিচার, কাব্যামৃততরঙ্গিনী ও সঙ্গীতরত্নমালা রচনা করেন।

মম্মভট্ট, সূর্যাসিক্তাস্তটিকা প্রণেতা।

মম্মা, মিসরদেশ-প্রসিদ্ধ রক্ষিত মৃতমহুয়া (Mummy)।

ময়—গতি। ভাদি-আত্মনে-সক-সেট্। লট ময়তে।

ময় (পুং) একজন প্রসিদ্ধ দানব। দেবশিল্পী যেমন বিষ্ণু-কন্যা, দানবগণের মধ্যে ময় সেইরূপ অদ্বিতীয় শিল্পী। রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে (১২ সর্গে) লিখিত আছে, ময় দিতির সূত। তিনি হেমানাম্না অপ্সরার রূপে মুগ্ধ হইয়া দৈববলে তাহার পাণিগ্রহণ করেন। হেমা রূপে শুণে শচীর সদৃশ। তাহার গর্ভে মায়াবী ও হুম্মুতি নামে দুইটা পুত্র ও মন্দোদরী নামে একমাত্র কন্যা জন্মে। হেমা দেবকার্যে ত্রয়োদশ বর্ষের জন্ত স্বর্গ গমন করেন। তাহার বিরহক্লেশনিবারণ জন্ত ময়দানব বিচিত্র নিম্মাণশক্তিপ্রভাবে হীরক-বৈদূর্য্য-ইন্দ্রনীল-খচিত এক স্বর্ণময় পুর নিম্মাণ করিয়া তথায় কিছুকাল বাস করেন। কিছু দিন পরে সেই পুরী হইতে বাহির হইয়া হেমা গর্ভজাতা মন্দোদরীকে সঙ্গে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে থাকেন। সেত বনে ঘটনাক্রমে রাবণের সহিত ময়দানবের দেখা হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে উভয়ের পরিচয় জানিতে পারেন। ময়দানব কন্যার পাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন, এখন রাবণকে ঋষিকুলোৎপন্ন জানিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাবণ ময়ের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সেই বন মধ্যে অগ্নি সাধনী করিয়া মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সময়ে যৌতুকস্বরূপ তপোবললব্ধ এক অমোঘ শক্তি রাবণকে দিয়াছিলেন। এই শক্তির আঘাতেই লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হন।

কিষ্কিন্দাকাণ্ডে (৫০।৫১ সর্গে) লিখিত আছে, যখন বানরগণ সীতাস্থেয়ণে চারিদিক্ পর্য্যটন করিতেছিল, তখন তাহারা দক্ষিণদিকে ময়দানব-রক্ষিত ঋক্ষবিল নামে এক সুহৃগ্নম বিল দেখিতে পায়। এই অপরিচিত স্থানে আসিয়া তাহারা পথহার্য হইয়াছিল। এই ঋক্ষবিল মধ্যে ময়দানবের শিল্প নিদর্শন স্বর্ণ-রৌপ্য বৈদূর্য্যাদি-নির্ম্মিত স্বর্ণময় গবাক্ষ-শোভিত সপ্ততল গৃহ, স্বর্ণময় বৃক্ষ ও স্বর্ণময় পদ্মমংস্তাদি-শোভিত অপূর্ব উপবন ছিল। হেমার সহচরী ও মেরুসাবর্ণির কন্যা স্বয়ংপ্রভা নামে এক তাপসী এই গৃহরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। হনুমান্ তাহার নিকট জানিতে পারেন যে, এ সমস্ত ময়দানবের কাণ্ড। তিনি হেমাকে লইয়া এখানে বাস করিতেন। হেমার প্রেমেই শেষে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে।

রামায়ণ, মহাভারত ও নানাপুরাণে ময়দানবের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। কিষ্কিন্দাকাণ্ডে ৪৩ সর্গে লিখিত আছে, ময়দানব মৈনাকগিরির উপর এক অপূর্ব নানা মণিরত্ন-খচিত প্রাসাদ নিম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় অশ্বমুখা নারীগণ অবস্থান করিত।

যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় কালে যে অভূতপূর্ব সভা নিম্মিত হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া দুর্যোধনের হৃদয়ে ঈর্ষানল জলিয়া উঠে, সেই মহাসভাও এই ময়দানবের কীর্তি।

ময়দানব শিল্পশাস্ত্রও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ময়শিল্প নামে এক খানি ক্ষুদ্র-সংস্কৃত শিল্পগ্রন্থ পাওয়া যায়, অনেকের বিশ্বাস, তাহা ময়দানবের রচিত।

ময়তে দ্রুতং গচ্ছতীতি ময়-পচাত্তচ্। ২ উট্ট। ৩ অশ্ব-তর। ৪ অশ্ব। ৫ চিকিৎসক। (ক্লী) ৬ অশ্ব। ৭ দেশভেদ। (ত্রি) গম্ভা।

“হয়োহস্ত ত্যোহসি ময়োহস্তকাসি” (বাজসনেনয়সং ২২।১৯)  
‘ময়োহনি ময়তে গচ্ছতি ময়ঃ, বদা ময় ইতি স্থখনাম স্থখ-রূপোহসি।’ (মহীধর)

ময়, সূর্যাসিক্তাস্ত-বর্ণিত একজন প্রাচীন জ্যোতির্বিদ। সূর্য্য-সিক্তাস্ত মতে, ইনি সূর্য্যের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা লাভ করেন। কেহ কেহ ইহাঁকেই মিসরীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিদ তলেমি (তুরময়) মনে করেন; কিন্তু তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

ময়ক্ষেত্র দক্ষিণাপথের অন্তর্গত একটা পুণ্যস্থান।

ময়গ্রাম কাশ্মীরের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। (রাজং ৮৩)

ময়চা (দেশজ) শুষ্কলতাভেদ।

ময়ট (পুং) ময়-অটন্ (শকাতিভ্যোহটন্। উণ্ ৪।৮১)  
তৃণযুক্ত হস্তা, প্রাসাদ। ২ পর্ণকূটার।

ময়দা ( পারশ ) গোধূমচূর্ণ, গম-গুঁড়া।

গোধূম-( গম ) চূর্ণ আমাদের দেশে ময়দা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সমগ্র জগৎবাসীর একটা আহাৰ্য্য মধ্যে গণ্য। আকারভেদে ইহা চারি প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—১ অতি সূক্ষ্ম চূর্ণগুলি ময়দা, ২ অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের চূর্ণ আটা, ৩ মোটা দানাবৃক্কগুলি সূজি এবং ৪ নিকৃষ্ট প্রকার ভূষি-মিশ্রিত আটা। এই চারি প্রকার ময়দাই আহাৰ্য্যের তার-তম্যানুসারে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যত প্রকার উৎকৃষ্ট পকান (মিঠাই) আছে, তাহার সকলগুলিই ময়দা ও মিষ্টের সহযোগে উৎপন্ন। আটার একমাত্র রুটী প্রস্তুতই প্রশস্ত। সূজি ‘হালুয়া’ নামক মিষ্ট দ্রব্যের জন্ম, কখন বা রুটীতেও ব্যবহৃত হয়। ভূষিকাটা আটা একমাত্র হুর্লন্দেহ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহাতেও রুটী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গোধূম পেষণ করিবার জন্ম আমাদের দেশে জাঁতা নামক যন্ত্রের ব্যবহার হয়। ঐ জাঁতা সাধারণতঃ খালার স্থায় চেপ্টা গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিম্নচক্রের কেন্দ্রস্থলে একটা দণ্ড উত্তোলন করিয়া উপরিস্থ চক্রের কেন্দ্র বিন্দু করিয়া উহার উপরে বদাইয়া দেওয়া হয় এবং উপরিস্থ চক্রের একদেশে অবস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ছিদ্রপথ দিয়া গো-ধূম প্রবেশ করাওয়া সেই উপরিস্থ অর্দ্ধ খণ্ড প্রস্তরভাগ কাঁচ দ্বারা ঘুরায় হয়। এইরূপে ঘুরাইলে নিম্নস্থ স্থিরচক্রের সহিত উপরিস্থ ভ্রাম্যমাণচক্রের নিষ্পেষণহেতু ছিদ্রপথপ্রবিষ্ট গো-ধূমগুলি ক্রমে চূর্ণ হইয়া যায়। পরে চালুনী নামক যন্ত্রের দ্বারা সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর অংশগুলি বিশ্লিষ্ট করিয়া ময়দা, আটা ও সূজি প্রভৃতি বিভাগ করিয়া লওয়া হয় এবং অবশিষ্ট গোধূমের খোসাগুলি গমের ভূষি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। কখন কখন এই গমের ভূষি উত্তমরূপে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ করিয়া আটার সহযোগে ভূষির আটা নামে বিক্রীত হয়।

জাঁতার নিষ্পেষিত ময়দা বা আটা সর্বাঙ্গপেক্ষা উত্তম খাদ্য ও ইহা অধিক পুষ্টিকর, কিন্তু এখন এই জাঁতাবান্ধা আটার বহুলপ্রচার দেখা যায় না। যুরোপীয় বণিক্‌সমি-তির বাণিজ্যসৌকার্য্যার্থ বর্তমান যুগে গোধূমনিষ্পেষক যন্ত্র (Flour-Mill) আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা দ্বারা গোধূম চূর্ণ করিতে মনুষ্যের সাহায্য অনেক কম লাগে।

ময়দা সাধারণতঃ তিন প্রকার হইয়া থাকে। উহা ১, ২ ও ৩ নং নামে অভিহিত। ময়দাব্যবসায়িগণ নিষ্পেষক যন্ত্রে গোধূম চূর্ণ করিবার পূর্বে গোধূমবীজের বলকারিত্ব ও ভেদ নিরীক্ষণ করিয়া তারতম্য নিরূপণ করেন। এইরূপে পুষ্ট,

মধ্যম ও অপুষ্ট বীজ হইতে ময়দার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হইয়া থাকে।

গোধূমবীজ যন্ত্রে নিষ্পেষিত করিবার পূর্বে, বিশেষরূপে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। প্রথমে কুলা অথবা চালুনী দ্বারা উহাতে সংশ্লিষ্ট ভিন্নজাতীয় বীজগুলি বিশ্লিষ্ট করা আব-শ্যক, তদন্তে গারসংলগ্ন যুক্তিকারাদি বিদূরিত করিবার জন্ম উক্ত বীজগুলি উত্তমরূপে বিধৌত করিয়া শুকাইতে হয়। স্থানবিশেষে রৌদ্রের পরিবর্তে যন্ত্রোত্তিত উষ্ণ বাষ্প দ্বারা বীজ-গুলিকে শুকাইয়া দৃঢ় করিয়া লওয়া হয়।

পূর্বে যুরোপখণ্ডের বিভিন্ন দেশেও আমাদের দেশের স্থায় জাঁতার বহুলপ্রচার ছিল। উন্নতিশীল জাতিমাজই উন্নতির পথে লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত যন্ত্রের প্রকৃষ্টতা-সাধনে যত্নবান্ হইয়া-ছিল। তাহার প্রথমে মনুষ্যপরিশ্রমের লাভবতার জন্ম বায়ু-যন্ত্রের (Wind-Mill) সাহায্যে জাঁতা ঘুরাইত। এইরূপে প্রতি মিনিটে ১০০ হইতে ১২০ পাক জাঁতার ঘূর্ণনহেতু মধ্য-স্থিত নিষ্পেষক স্থানে দাঁতকাটা থাকায় বীজচূর্ণের বিশেষ সুবিধা হইল বটে, কিন্তু ঘর্ষণ জন্ম দারুণ তাপবৃদ্ধি হেতু ময়দার বিশেষ হানি হইবার আশঙ্কা ছিল। কারণ ঐরূপে উত্তরোত্তর তাপতপ্ত হইলে ময়দা জড়াইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

ক্রমে এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্ম ময়দার কলের অধ্যাক্ষগণের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা জাঁতার অভ্যন্তরস্থ নিষ্পেষিত ময়দার জমাট দূরীকরণ জন্ম উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, এতদর্থে বন্ধপরিষ্কার হইয়া কর্কোরণ, গর্ডন, টেলার, বভিল, পিসেল, মালেলান, বাক্স, শুভিয়ার, ওয়েষ্ট্রাপ, স্কাইলার, ভক্স, সিইলি, হারউড্, হোয়াইট প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদগণ বিজ্ঞানতত্ত্বের আবিষ্কারে ময়দার কলের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। বভিল সাহেব উত্তপ্ত বাষ্প অথবা বায়ু দ্বারা বীজ তপ্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। মহায়া হোয়াইট দেশীয় চক্রার প্রথায় গোলাকার লঘুমান প্রস্তর রোলার দ্বারা গম গুঁড়াইতে প্রয়াস পান। তিনি রোলারের ঘর্ষণকালে উত্তাপনিবারণের জন্ম বায়ুপ্রবেশকল্পে ৫৬ টি ছিদ্র করিয়া দেন। পেষণীর নিম্নদেশে স্থাপিত ভেরিসুখ বায়ুনল দ্বারা উক্ত ছিদ্রপথে বায়ুপ্রবেশের সুবিধা হইয়া থাকে। ওয়েষ্ট্রাপ সাহেবের কোণাকার পেষণযন্ত্র প্রকৃষ্ট প্রথাবলম্বনে প্রস্তুত হইয়াছিল। উহার উপরের কোণাকার প্রস্তরখণ্ডের অভ্যন্তরভাগ নিম্নস্থ কোণাকার স্তম্ভের অমুরূপ খাতকাটা। গম-ভাঙ্গাই কালে উপরের কোণাকার খাতবৃত্ত প্রস্তরস্তম্ভটী স্থির ও দৃঢ় সংলগ্ন

থাকে এবং নিম্নের কোণাকার স্তম্ভটি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিতে থাকে। ঘূর্ণনকালে তাপ অধিক হইলেও, গমচূর্ণ নির্গমনের জন্য জঁতার নিম্নস্থ প্রসারিত থাকায়, ময়দা সহজে নিম্নে আসিয়া পড়ে। উহা কোন ক্রমেই সমতল জঁতার দ্বারা জমাট বাধিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন উহাতে গোধূমগুলি এরূপভাবে পিষ্ট হইয়া যায় যে, তাহার খোসা বা ভূষির গায়ে আদৌ শাঁস থাকে না। বাহা থাকে, তাহাও ময়দা ছাঁকিয়া লইবার পর পুনরায় অল্প জঁতায় ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই কালে প্রতি কোয়ার্টার পরিমিত গম হইতে অল্পাংশ কলের অপেক্ষা, প্রায় ১ সিলিং অধিক মূল্যের ময়দা পাওয়া যায়। সাইলিং এন্টিফ্রিকশন কর্ণ মিল (Schicle's Anti-friction corn-mill) একখানি হ্রাজপৃষ্ঠ (convex) ও অপরখানি কূজপৃষ্ঠ প্রস্তরফলকে গঠিত। এতদ্ভিন্ন ফ্রান্স-দেশবাসী M. Falguiere ও M. D Arblay স্বতন্ত্র প্রথায় ময়দার পেষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত ক্রীমিয়ান যুদ্ধের স্বাক্ষাভা সময়ে ইংরাজগবর্মেণ্ট ক্রাইজার ও এবাস্তান্স নামক দুইখানি ইমারে ময়দার কল সংযুক্ত করিয়া পাঠান। উক্ত কল-ইঞ্জিনিয়ার-প্রবর মিঃ ফেয়ার-বেয়ারেণের যন্ত্রে ষ্টীমারমধ্যস্থ এঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। উহাতে প্রতি ঘণ্টায় ২০ বৃশেল এবং সমস্ত দিনে ২৪ হাজার পাউণ্ড ময়দা প্রস্তুত হইত।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে স্বাক্ষাভার সন্নিকটে আসিয়া ক্রাইজার ময়দা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। উহা হইতে প্রত্যহ ১৮ হাজার পাউণ্ড ময়দা ইংরাজসেনাবৃন্দের ভোজনার্থ প্রস্তুত হইত। যে তিন মাস কাল ঐ রণতরী স্বাক্ষাভায় ছিল, তাহাতে সে সর্বসমেত ১৮ লক্ষ পাউণ্ড গম ভাঙ্গিয়া ১৩৩০ হাজার পাউণ্ড ময়দা বাহির করে। অবশিষ্টাংশ ভূষি ও ঝাড়ন-রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। গমের দাম ও গুঁড়াইবার খরচা একত্র করিলে দেখা যায় যে, প্রতি পাউণ্ড (অর্ধসের) ময়দায় গবর্মেণ্টের ১ পেনি মাত্র ব্যয় পড়িয়াছিল। ক্রাইজার প্রত্যহ যে পরিমাণে ময়দা ভাঙ্গিয়াছিল, এবাস্তান্স তাহারই অমুরূপ কুটী প্রস্তুত করিয়া সেনাদিগের খাদ্য যোগাইয়াছিল।

বর্তমান জগতের প্রায় সকল দেশেই ময়দা প্রস্তুত করিবার কল স্থাপিত। ঐ কল যন্ত্রীর মতামুসারে বিভিন্ন ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ দুই প্রকার কলেরই বিশেষ সমাদর দেখা যায়,— ১ জঁতাভাঙ্গা (Grind-stone) ও অপর রোলার-মিলের (Roller-Mill) ময়দা।

এই ময়দা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত; ফরাসী—Flour de farine, জার্মান—Feines mehl, Sammel mehl হিন্দি—ময়দা, আটা; মলয়—তপুজ, পুন্ড, লুমং; পর্তুগীজ—Floride farine সংস্কৃত—গোধূমপিষ্ট, সমিতা, সমীদ; সিংহল—ত্রিশুপিটে, তামিল—গোদধ মবু; তেলগু—গোধূমপিণ্ডি, ইতালি—সেমোলিনা। বাঙ্গালার গোধূমপিষ্ট জাত দ্রব্য ময়দা, আটা ও সূজি ময়দা নামে প্রসিদ্ধ। চালুনি দ্বারা পরিষ্কৃত সূক্ষ্মাংশ ময়দা এবং বড় দানাযুক্ত সূজি নামে অভিহিত। গমের শাঁস ভাঙ্গিয়া যেরূপ খাত্তোপযোগী ময়দা প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ ধাতের চাউল হইতেও সফেদা প্রস্তুত হইয়া থাকে, কোথাও কোথাও ময়দার পরিবর্তে সফেদার ব্যবহার দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন দুর্লভ ব্যক্তির খাদ্যার্থ মাগু, বব, আরাকুট, শচী, পানিকল প্রভৃতি দ্রব্য হইতেও ময়দার দ্বারা এক প্রকার পালো প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভারতীয় চাউলের দ্বারা, গম (wheat) ও ময়দা (Meal of wheat-flour) বাণিজ্যের একটা উপকরণ মধ্যে গণ্য। বহু-প্রাচীন কাল হইতে গম ও ময়দার বাণিজ্য চালিয়া আসিতেছে। যুরোপ, আমেরিকা, ভারত, চীন, ব্রহ্ম, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রায় সর্বত্রই গোধূমের চাষ ও বাণিজ্য অপ্রতিহত রহিয়াছে। প্রাচীন আয়ুরবেদশাস্ত্রে ও অনেকানেক প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় গোধূমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রকাশে গোধূমের উৎপত্তিস্থান ও বীজাদির বিশেষত্ব নির্ণীত হইয়াছে। [গোধূম দেখ]

প্রাচীন হিন্দুগণ এই গোধূম চূর্ণ করিয়া ময়দা প্রস্তুত করিতে জানিতেন। ভাবপ্রকাশ, অভিধান-চিহ্নমাণি, রাজ-নির্ঘণ্ট প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ‘সমিতা’ শব্দে ময়দার উল্লেখ আছে,—

“গোধূমা ধবলা ধোতা: কুটিতা: শোণিতাস্ততঃ।

প্রোক্ষিতা যন্ননিষ্পিষ্টাশ্চালিতা: সামিতা: স্মৃতা: ॥”

(রাজনির্ঘণ্ট)

এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তৎকালের জনগণ গম কুটিয়া, ধুইয়া, শুকাইয়া নিষ্পেষণ-যন্ত্র দ্বারা চূর্ণ করিয়া চালিয়া লইয়া ময়দা প্রস্তুত করিবার পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিল; কিন্তু তাহার যে ময়দা কুটিয়া বিভিন্ন দেশবাসীর সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইংলণ্ড প্রভৃতি সুদূর যুরোপ-খণ্ডের গম রপ্তানী হইত তাহা সপ্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই গমের বাণিজ্যরক্ষার জন্য ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম ৩য় এডওয়ার্ড ১৩৬০-১ খৃষ্টাব্দে (34 th Edw. 111

O. 20) আইন বিধিবদ্ধ করিয়া যান। উহার পরবর্তী শতাব্দী-সমূহেও ঐরূপ বিভিন্ন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। উহা যুরোপে Corn-law and Corn Trade নামে কথিত হইয়া থাকে।

ময়দান ( পারসী ), ক্ষেত্র, মাঠ।

ময়ন ( পুং ) ১ মদন বৃক্ষ। ( স্ত্রী ) ২ মধুচ্ছিষ্ট মৌচাক।

ময়না, স্বনাম-প্রসিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষ ( Gracula religiosa )। ইহাদের সর্গগাত্র চিকণ কৃষ্ণবর্ণ পালকে আবৃত, কেবল পদবয়, ঠোঁট, চক্ষুপদ্ম ও কর্ণরন্ধ্রের পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি হরিদ্রা বর্ণ চন্দ্র দ্বারা আচ্ছাদিত। পক্ষীগুলির বিশেষ-রূপ সৌন্দর্য না থাকিলেও, স্বরমাধুর্য্যে ইহারা জন সাধারণের মন হরণ করিতে পারে। কেনেরি, বুলবুলবোস্তা প্রভৃতি পক্ষীর ত্রায় তাল-লহরী তুলিয়া মানবমন মোহিত করিতে না পারিলেও, ইহারা আপনাপন স্বভাবদ্বারা গুণে ও শিক্ষাকোশে একরূপ সুমধুরস্বরে মানব-মুখোচ্চারিত শব্দ বা গানগুলি অভ্যাস করিয়া লয়, যে তাহা শ্রবণ করিলে যুগপৎ আনন্দ ও বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এক একটা পক্ষী স্বীয় স্বাভাবিক শক্তিবলে একরূপ অসাধারণ ভাবে কথা কহিয়া থাকে, যেন সেইরূপ বাক্যধারী কোন মনুষ্য কথা কহিতেছে। স্বাধীকৃত প্রভৃতি দেব নাম, শায় ও গৃহস্থ ব্যক্তিবর্গের নাম বাহার মুখে যেরূপ ভাবে শুনিতে পায়, স্বীয় অভ্যাসবলে, ঠিক সেইরূপ গলার স্বর নিঃসৃত করিয়া ইহারা একরূপ ভাবে ডাকে, ভ্রম হয় যেন উপরি তল হইতে ঐরূপ স্বরধারী কোন গুরু জন ডাকিতেছেন।

ইংলেণ্ডে এই জাতীয় পক্ষী Mino Bird নামে প্রসিদ্ধ। যবদ্বীপে বিত্ত ও মেঞ্চো এবং সুমাত্রায় টিওঙ্গ নামে আখ্যাত। পক্ষিতত্ত্ববিদগণ এই জাতীয় পক্ষীদিগকে শাখাচারী (insectivorous) পক্ষিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া Coracias থাক মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্থানভেদে ময়না-পাখীর আকৃতিগত নানা বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। যব, সুমাত্রা এবং পূর্বসমুদ্রস্থ যাবতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে সকল ময়না দেখা যায়, তাহাদের আকৃতি ভারতীয় পার্শ্বত্যা-প্রদেশজাত ময়না অপেক্ষা অনেকাংশে স্বতন্ত্র।

পূর্বদ্বীপপুঞ্জজাত ময়নাগুলির ঠোঁট স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র ও লুট। যেন দীর্ঘ মস্তকে ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় সংলগ্ন। পদবয় ক্ষুদ্রাকার হইলেও ভারতীয় ময়নার মত। পুচ্ছ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মস্তকের উপর খুঁট আছে, কর্ণপার্শ্বে ও ঘাড়ের হরিদ্রা চন্দ্রের দাগ এবং পক্ষবয়ের অগ্রবর্তী দুইটা পালক হরিদ্রারঞ্জিত হুই হয়।

ভারতীয় পক্ষীগুলির পদবয় ও পুচ্ছদেশ অপেক্ষাকৃত লম্বা

কোন কোন পক্ষিতত্ত্ববিদ ইহাদিগের স্বর স্বাতন্ত্র্যতা লক্ষ্য করিয়া Eulabes Indicus, Mino Dumontii, Gracula, calva, Sturnus Indicus, প্রভৃতি নামে শ্রেণী বিভাগ করিয়া গিয়াছেন।

ইহারা সাধারণতঃ পোকা, ছাতু ও পাকা ফল খাইতে ভাল বাসে। কোন কোন পাহাড়ী ময়নাকে ছাগমাংস খাওয়াইয়া তাহার দেহপুষ্টি করিতে দেখা গিয়াছে। ইহারা সহজেই পোষ মানেন। হিমালয়ের পার্শ্বত্যা প্রদেশ ও আসাম হইতে ছানা ধরিয়া আনিয়া পক্ষিব্যবসায়িগণ সহরে বিক্রয় করে। ঐ সকল পক্ষিষাবক পালন করা সুকঠিন। কারণ স্বচ্ছন্দে পিতা মাতা কর্তৃক পালিত হইয়া তাহারা যেরূপ ক্ষুধা পাইয়া সবল হয়, গৃহস্থের পিঞ্জরাবাসে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারা সেরূপ স্বচ্ছন্দ লাভ করে না; কাজেই তাহাদের গোড়িম ভাঙ্গিবার সময় অথবা কাণের গ্যাজ ফুটিবার সময় শারীরিক দুর্বলতা হেতু মরিয়া যায়।

পোষ মানিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা শীঘ্র দিতে ও বক্তার স্বর অনুকরণ করিয়া কথা কহিতে অভ্যাস করে। মার্সডেন সাহেব লিখিয়াছেন যে, ময়নার ত্রায় অপর কোন পক্ষিজাতি একরূপ স্পষ্টরূপে মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে পারে না \*। Bontius সাহেব যবদ্বীপে এক মুসলমানরমণীর পালিত ময়না দেখিয়া চমৎকৃত হন। ঐ পক্ষী নিরন্তর “আওরঙ্গ নসরগি কাটজোর মকান্ বিবি।” অর্থাৎ খুঁটান কুকুর, শ্যুরথেকো বলিয়া ডাকিত। M. Lesson ঐরূপ আর একটা পক্ষীকে মলয়-ভাষায় যাবতীয় পদ আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছিলেন।

ময়নাগড়, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। তমলুকুর পশ্চিমে সুবর্ণরেখা-নদীতীরে অবস্থিত। ময়নারাজবংশের অধিকারকালে এই স্থান গড়বাটিকা ও নানা দেবমন্দিরে পরিশোভিত হইয়া অপূর্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। ঘনরামকৃত ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ করিয়া এই রাজবংশের প্রতাপ ও প্রতিপত্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়।

রাজা গোবর্দ্ধন বাহবলীজ্ঞ এই প্রাচীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে উক্ত জেলার সবঙ্গ পরগণার ভূম্যধিকারী ছিলেন। বুদ্ধ ও মঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা-হেতু এবং ইহার বীরত্ব-দর্শনে প্রীত হইয়া মেদিনীপুরের তখনকার স্বাধীন মহারাত্রী-সর্দার মহারাজদেও রাজা বাহাহর

\* “It has the faculty of imitating human speech in greater perfection than any other of the feathered tribe.”



ইহাকে রাজা ও বাহুবলীজ্ঞ উপাধি এবং ময়না (ময়না-চৌধুরা) পরগণা পারিতোষিক দিয়া সম্মানিত করিয়া যান।

গোবর্দ্ধনের পুত্র রাজা পরমানন্দ বাহুবলীজ্ঞ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্বত্র পরিত্যাগপূর্বক ময়নায় আসিয়া বাস করেন। এখানে তাঁহার নির্মিত ময়নাগড় প্রাসাদ অত্যাশ্চর্য্য বিস্তারিত রহিয়াছে। রাজা পরমানন্দের পর যথাক্রমে মাধবানন্দ, গোকুলানন্দ, রূপানন্দ, জগদানন্দ, ব্রজানন্দ, আনন্দানন্দ, ও রাধাশ্রামানন্দ বাহুবলীজ্ঞ প্রভৃতি ময়নাগড় রাজপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজা রাধাশ্রামানন্দের পিতামহ ব্রজানন্দ বাহুবলীজ্ঞ হইতে ময়নারাজবংশের সমৃদ্ধির ভ্রাস হইতে থাকে। তাঁহার শাসনকালে মেদিনীপুর জেলার ভীষণ বন্যা ও হুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হওয়ার ময়নাগড়ে হাহাকার পড়িয়া যায়। রাজা হুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত প্রজাবর্গের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া ক্ষণ জালে জড়িত হইয়া পড়েন। এদিকে প্রজাগণও জীবিকাার্জনে অক্ষতকার্য্য হইয়া তাঁহার রাজ্য হইতে পলায়ন করিল। এই হুর্ভিক্ষ সময়ে অর্থাভাবহেতু তিনি সর্বত্র ও ময়না সম্পত্তির কতকাংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহার পুত্রবর্তী রাজস্বগণ দেবমন্দিরস্থাপন, পুষ্করিণীখনন ও ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া ময়নাগড়-রাজবংশের খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। এই পুত্রপুরুষগণের কোন এক ব্যক্তি তাম্রলিপ্তরাজকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শ্রীরামপুর প্রভৃতি নয়খানি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। পূর্বতন রাজগণের মধ্যে লাউসেনের নাম প্রসিদ্ধ। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধাশ্রাম বাহুবলীজ্ঞের ময়নাগড় ও তমলুক ভূসম্পত্তির আয় ২০ হাজার টাকা মাত্র ছিল। বুদ্ধ রাজা দয়াদাক্ষিণ্যে তদেশবাসী জনগণকে বিশেষরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনটি কুমারই ‘ছত্রপতিরাজ’-নামে অভিহিত।

ময়নামতী, ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত একটি গিরিমালা।

ইহা পূর্বে ত্রিপুরারাজ্যের সম্পত্তি মধ্যে গণ্য ছিল।

ময়নামতী, বঙ্গরাজ মাণিকচাঁদের মহিষী। ইহার ধ্বংসাবশেষ বিশেষ খ্যাতি আছে। (মাণিকচাঁদের গান)

ময়মনসিংহ, বাঙ্গালাপ্রদেশের ঢাকা-বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। বাঙ্গালার ছোট লাট বাহাদুরের শাসনাধীন। অক্ষা. ২৩° ৫৬' হইতে ২৫° ২৫' উঃ এবং দ্রাঘি. ৮৯° ৪৩' হইতে ৯১° ১৮' পূঃ। ইহার উত্তরে গারো পর্বতমালা, পূর্বে শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা, দক্ষিণে ঢাকা এবং পশ্চিমে যমুনা নদী। ভূপরিমাণ ৬২৮৭ বর্গ মাইল। ময়মনসিংহ নগর বা নশিরাবাদ এই জেলার সদর।

এই জেলার অধিকাংশ স্থান সমতল। প্রায় সর্বত্রই শ্রামল শস্যক্ষেত্র বিরাজমান। বহুসংখ্যক নদী ও খাল প্রায় সর্বত্র প্রবাহিত হওয়ার ক্ষেত্র সমুদয় উর্বরা-শক্তিসম্পন্ন। এই প্রদেশের একমাত্র মধুপুর-জঙ্গল বা গড়-গুজালিস্ কষণো-পযোগী নহে। এই জঙ্গল ঢাকা জেলার উত্তরাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ময়মনসিংহের মধ্যদেশে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহার তলদেশ সাধারণ ক্ষেত্র হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। উচ্চতা সর্বত্র সমান নহে, তবে কোন স্থান ১০০ ফিটের অধিক নহে। অসংখ্য শালবৃক্ষ এই জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ মাইল ও প্রস্থ ৬ হইতে ১৬ মাইল। ভূপরিমাণ ৪২০ বর্গ মাইল। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এই জঙ্গলময় স্থান অতিশয় অস্বাস্থ্যকর; অত্যাশ্চর্য্য ভাবেও ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে।

যমুনানদী দাওকোবা নামক স্থান দিয়া এই জেলার প্রবেশ করিয়াছে, পরে উত্তর-দক্ষিণাভিমুখে প্রায় ৯৪ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া সেলিমাবাদ পর্যন্ত আসিয়াছে। পণ্ডিতব্যবাহী নৌকা-সমূহ সকল সময়েই যমুনাবক্ষে যাতায়াত করিতে পারে। বর্ষাঋতুতে ইহার পরিসর এত অধিক হয়, যে কোন কোন স্থানে ৫৬ মাইলের অধিক বিস্তৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। যমুনাপ্রান্তে অত্যন্ত বেগবান্ বলিয়া প্রত্যেক বৎসর নুতন নুতন চর জাগিয়া থাকে। ব্রহ্মপুত্র নদ এই জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে করাইবাড়ার নিকট দিয়া দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে তোক পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। মেঘনা নদী ময়মনসিংহের অতি অল্প স্থান ব্যাপিয়া প্রবাহিত।

ময়মনসিংহের জমি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—১ বালুয়া, ২ দোরস, ৩ মতিয়ার। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জমি নদীর তীরে অবস্থিত এবং বালুকাপূর্ণ। ইহাতে নীল ও বহু পরিমাণে পাট জন্মিয়া থাকে। ২য় শ্রেণী জলাভূমি। এই জমিতে বোরোধান জন্মে। ৩য় শ্রেণীর জমি সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার উর্বরাশক্তি অত্যন্ত অধিক। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। মধুপুর জঙ্গলের নিকটবর্তী কোন কোন স্থানে লৌহমিশ্রিত লাল মাটি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জেলার পূর্বভাগে অনেক জলাশয় স্থান আছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে হাওড়া-বিল উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত জঙ্গল থাকায় এই জেলার নানাবিধ বন্য জন্তুর বাস দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে নদীর তীরবর্তী চরের উপর বহু বাঘ ভালুক বাস করিত। সম্প্রতি বাঘের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। চিতা বাঘ, হরিণ, বন্য মহিষ, শূকর প্রভৃতি বহু

পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গারো এবং স্নুসঙ্গ পাহাড়ে হস্তী বাস আছে। তথা হইতে প্রতি বৎসর গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অনেক হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। পূর্বে কেবল মাত্র রাজারই হস্তী ধরিবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এখন উক্ত ক্ষমতা রাজা গবর্ণমেন্টের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরীগঞ্জ ও শেরপুর সর্বশুদ্ধ পাঁচটি প্রধান নগর। এতদ্ভিন্ন মুক্তাগাছা ও বাজিতপুর নামে দুইটি ক্ষুদ্র মিউনিসিপালিটি আছে। পূর্বে জামালপুরে সৈন্যদিগের আড্ডা ছিল। কিশোরীগঞ্জে প্রতি বৎসর মহাসমারোহের সহিত মেলা হইয়া থাকে। ছোট ছোট সহরগুলির মধ্যে উলাকানি অথবা ভৈরববাজার সর্বা-পেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। এই স্থানে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। অনেক গৃহপালিত পক্ষ এই গঞ্জে বিক্রয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ফটিকা, বিষ্ণু অথবা নতের বাজার, মাদারপুর, নলিতাবাড়ী, শজুগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, কালিয় চাপরা এবং মুক্তাগাছা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলি বাণিজ্যের জন্ত বিখ্যাত। চরগড়-জরিফা নামক সামান্ত পল্লীগ্রামে মৃত্তিকানিশ্চিত পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, বঙ্গদেশীয় কোন স্বাধীন মুসলমান রাজা এই দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ সর্বশুদ্ধ ১৪৬ মাইল উৎকৃষ্ট রাস্তা আছে। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ঢাকা ও ময়মনসিংহ রেলপথ খোলা হয়।

এই জেলায় চাউল ও পাট অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানকারে কলেক্টর সাহেবের রিপোর্টে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্বে যে সমস্ত জমি একেবারে পতিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, এখন তাহাতে প্রভূত পাট উৎপন্ন হওয়ায় শত সহস্র গরীব লোক স্বল্পকাল মধ্যেই সম্ভ্রান্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তিল, সরিষা, তামাক, ইক্ষু ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তুলা, গুপারি, নারিকেল, চিনি, গম প্রভৃতি অত্যন্ত দেশ হইতে আমদানী হয়। চাউল, পাট, নীল, চামড়া, পিতল ও তামার বাসন, ঘৃত ইত্যাদি এখান হইতে দেশদেশান্তরে রপ্তানি হইয়া থাকে।

পূর্বকালে কিশোরীগঞ্জ ও বাজিতপুরের মলমল বস্ত্র অতি বিখ্যাত ছিল। এই দুই স্থানেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠী ছিল। বর্তমান সময়ও কোন কোন স্থানে মলমল নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে। অতি স্থান শীতলপাটী ও মাহুর অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এখানে “ঢাকাই ক্ষীর” নামে উৎকৃষ্ট ক্ষীর ও মোট! রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। অক্ষা° ২৪° ২১' হইতে ২৫° ১১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ২' হইতে ৯১° ২'

পূঃ। ভূপরিমাণ ১৮৪৯ বর্গ মাইল। এখানে দুইটি প্রধান নগর ও ৩৩৩৭টি গ্রাম আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২৪° ২৫' ৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ২৬' ৫৪" পূঃ। এইস্থান ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এখানকার ক্ষেত্রফল ৯৬০ একার। বর্ষার সময় ব্রহ্মপুত্র নদের খরতর স্রোতে পণ্য লইয়া নৌকা সকল বাতায়ত করিতে পারে না বলিয়াই নশিরাবাদ বাবদা-বাণিজ্যের জন্ত তত বিখ্যাত নহে। এই স্থানে ২টি প্রাচীন হিন্দু-দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। সহরে উচ্চ ইংরাজি ও বঙ্গবিদ্যালয় আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে দাতব্য চিকিৎসালয় ও মিউনিসিপালিটির পুলিশ সৈন্য আছে। ময়রা, বাদ্দালার প্রসিদ্ধ হালুইকর জাতি। পকান মিঠাই ও সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়। ইহারা কোথাও মোদক বা কুড়ি নামেও প্রসিদ্ধ। মধুনাপিতগণ ময়রার কার্য্য করিলেও জাতিতে তাহারা ময়রা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঢাকার ময়রাদিগের মধ্যে এক-পাটিয়া ও দোপাটিয়া নামে দুইটি থাক দৃষ্ট হয়, কিন্তু মধ্য-বাদ্দালার ময়রাদিগের মধ্যে ৪টি স্বতন্ত্র থাক আছে, যথা;—রাঢ়াশ্রম, ময়রাশ্রম, অজাশ্রম ও ধর্ম্মাশ্রম বা ধর্ম্মস্রুত।

বিবাহেও উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। ময়রাদিগের বিবাহে বরের চতুর্দিকে কত্থাকে সাতবার ঘুরাণ হয়, কিন্তু মধুনাপিতদিগের মধ্যে বরকেও কত্থার সহিত চক্র করিয়া ঘুরিতে হয়। সগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু কোথাও কোথাও পিও প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করিয়াও বিবাহাদি চলিতেছে। বিবাহ-ব্যাপারে ইহারা হিন্দুর শাস্ত্রবিহিত প্রথাসমূহের অঙ্গসরণ না করিলেও কতকংশে তাহাদের আচরণাদির অনুকরণ করে। ইহাদের মধ্যে আশ, চন্দ্র, দত্ত, বরাট, দে, দানা, শুই, ইন্দু, লাহা, নাগ, নন্দী, রক্ষিত ও রাজ পদবী দৃষ্ট হয় এবং আলম্যান ভরদ্বাজ, চন্দ্রশ্বষি, মধুশ্বষি, কাশ্যপ, গৌতম ময়ুরশ্বষি, গণেশশ্বষি, শাণ্ডিল্য ও সোমশ্বষি প্রভৃতি গোত্র প্রচলিত আছে। আশ, বরাট, দাস, ও নন্দী উপাধিধারিগণ কুলীন ও অপর সকলে মৌলিক। মৌলিকগণকে কুলীনকতা গ্রহণ করিতে হইলে কুলমর্যাদা দিতে হয়। এমন কি, মৌলিকের গৃহে কোন কাণ্ড উপলক্ষে উপস্থিত কুলীনমণ্ডলী মর্যাদাস্বরূপ বস্ত্র লাভ করিয়া থাকেন।

বালিকা বিবাহই প্রশস্ত, কিন্তু কোথাও কোথাও বয়স্ক কত্থার বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাতে সমাজে কোনরূপ দোষ স্পর্শে না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত সম্প্রদান ও সিন্দুর-দানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ।

ইহারা গোড়া হিন্দু। অনেকেই বৈষ্ণব-মন্দিরবাসী। হিন্দুর সকল দেবতার প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। কালী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিপূজায়ও ইহাদের কোনরূপ বিশ্বাস নাই। শ্রীমদ্ভগবানে ইহারা গণেশের পূজা না করিয়া কখনও ইক্ষুজাত শর্করায় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে না। মানভূমের ময়ূরারা মোহনগিরি, সাহেবসিয়া, যটী ও ভাই পূজায় ছাগ-বলি ও গিষ্ঠাদি উৎসর্গ করে। এই সকল পূজায় ব্রাহ্মণের ষাঙ্ককতা করিবার আবশ্যকতা নাই।

মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে কেহ কেহ ভস্ম বা নাভি লইয়া গঙ্গায় দেয়। ৩০ দিনে অশোচাত্ম হইয়া ৩১ দিনে শ্রদ্ধ এবং তদন্তে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া থাকে।

হেঁহারা নবশাখ মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণেরাও ইহাদের হস্তে  
মিষ্টান্ন ও জলগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

ময়নটক (পুং) মধুষ্টক পৃষোদরাদিহাং সাধুঃ। বনমুক।  
 ময়স্ (ক্লী) সুখ। “জরিভূতা ইন্দ্রময় ইবাণো ন তুষাতে”  
 (ঋক্ ১১.৭৫।৩) ‘ময়ঃ সুখং’ (সারণ)

ময়মরস্ (ক্লী) ময়-নিশ্চিত সরোবরভেদ।  
 ময়স্কর (ত্রি) ময়স্করোত্তীতি কু-ট। মোক্ষসুখকারক।

“শঙ্করায় চ মন্বন্তরায় চ নমঃ শিবায়” ( শুক্লযজুঃ ১৬।৪১ )

‘ময়ো মোক্ষস্থং কৰোতি ময়স্করঃ তং’ ( বেদনাপ )

ময়া (স্ত্রী) ময়তে গচ্ছতি রোগো ইনয়া ময়-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্।  
১ চিকিৎসা। (শকচ০) (ত্রি) ২ অশ্লদ্ব শব্দের তৃতীয়ায়  
এক বচনে ময়া হয়। ইহার অর্থ আনা কতৃক।

“हृदैव दृष्टानि मदैव यानि जन्मान्तराणीव दशान्तराणि ॥”

( হিতৈষীদেব ১২২১ )

ময়্যারাম মিশ্র, ব্যবহারনির্ণয়প্রণেতা।

ময়ালগুড়িকা, আগামের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম।

মধিবসু ( ঐ ) মন্ত্রভেদ । ( ঐতরেয়ব্রা• ২২৬ )

ময়ী (স্ত্রী) ময় (পুংবাগাদিত। পা ৪।১।৪৮) ইতি ঙ্রীবা।  
ময়স্বীজাতি, উষ্ট্রী। (ব্যাকরণ)

ময়ু (পুং) ময়ঙ্ গতো যুদ্ধাদিভ্যাং কু, যদা মিনোতি অশুদ্ধং  
করোতিতি মি ( ভৃম্মশীত্‌চরিত্রংসরিংতানপনিমিসম্ভা গ্য উঃ।  
উণ্‌ ১৭) ইতি উ। ১ কিংব। (অমর) ২ মুগ। (মেদিনী)

“ময়ুং পশুং মেধমগ্নে জুযস্ব তেন চিব্বানস্তম্বে নিবীদ”

( ଖ୍ରୀ.ବି. ୧୭୮୭ )

“मम्रं पशुं तुरगवदनं किम्पुरुषं पशुं मम्रं कृम्यगं वा”

( महीधर )

যক্ষরাজ (পুং) গয়নাং কিম্বরাণাং রাজা (রাজাহঃসম্ভিভাষ্ট্।  
পা ৫।৪।৯১) ইতি ট্। কুবের। (শব্দরত্নাঃ)

ময়ূষ্ক (পং) ময়ূন্ মৃগান্ শুকতি প্রীণয়তাতি শুক-অচ  
ষডং। বনমূলা, মৃগান। (অমরটীকা)

ময়ূক ( পুং ) ময়ূর । ( হেম )

मयूख ( पुं ) मापयन् गगनं अमापयन् एवति गच्छतीति प्रयो-  
 दरादिद्वां माधुः इत्यमरटीकायां रघुनाथः, यद्वा मातिं पार-  
 मातीव मा ( माडु उक्थे मय्य च । उ० ६२६ ) इति उक्थः मया-  
 देशश्च । १ किरण, दीप्ति । २ ज्वाला ।

“अथाक्कावरं गिरिगह्वराणां दध्नामयूथैः शकलानि कूक्षन् ।

ভূয়: স ভূতেশ্বরপାର୍শ্ববର୍ତ୍ତী কিঞ্চিদিহস্মাথপতিং বভ্রাসে ॥”

(রঘু ২৪৬) ৩ শোভা। (মেদিনা) ৪ কৌল। (অজয়)

৫ পক্ষত। “পৃথিবীমভিতো ময়ুধেঃ” (ঋক্ ৭৮৩।৩ ‘ময়ুধেঃ পক্ষতৈঃ’ (সায়ণ)

मयूथमाला (श्री) मयूथानां माला । किरणमाला ।

ময়ূখবৎ (ত্রি) ময়ূখ অন্ত্যার্থে মতৃপ্‌ মস্ত্র বঃ। কিরণযুক্ত,  
ময়ূখবিশিষ্ট।

“মধ্যে চেষ্টাবতি হি মধ্যদেশপীড়া রুকেষ্টেন্ন তু রুচিরেম্মগুথবত্তি.”  
(বুহৎস• ৪৭।৭)

ময়ূখাদিত্য (পুং) আদিত্যভেদ ।

મયૂથિન ( ત્રિ ) મયૂથ અસ્ત્યાર્થે હિનિ । મયૂથનિશિષ્ટે ।

ময়ূখী, ভারতীয় প্রাচীন আখ্যায়িকার যুদ্ধাঙ্গবিশেষ। বৈশ-  
ম্পায়নোক্ত ধমুস্কেন্দ্রএহে ইহার আকৃতি ও কাব্যের বিষয়  
এইরূপ লিখিত আছে ;—

“मग्नो कृतवर्तिः श्रां मुष्टिबुद्धा नरोन्नता ।

किङ्किनीमधुत्रा चित्रा कणिकामहकारिणी ॥

आघातक प्रतीघातं विधातं पविमोचनम्।

অভিদ্রবণমিত্যতে মনুখীং পঞ্চ সংপ্রিতাঃ ॥” ( ধনুর্বেদ )

ময়নগরী. জৈনপুর জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গাওগ্রাম।

ময়ূর (পুং) ময়ূরিব রৌতি শব্দায়তে ইতি রা-ক, প্ৰযোদরাদি-  
 ত্বাৎ সাধুঃ । অথবা মীনাতি হস্তি সর্পানিতি মী-উরন্ (মীনাতে-  
 ক্ররন্ উণ্ ১৬৮) অনামখ্যাত পদ্যবিশেষ । ইহার  
 পয়ায়—বহগ, বহিন্, নীলবণ্ড, ভূজঙ্গভূজ, শিখাবল, শিখিন্,  
 কেকিন্, মেঘনাদামূল্যাসিন্, প্রচলকিন্, চন্দ্রকিন্, সিতাপাঙ্গ,  
 ধ্বজিন্, মেঘানন্দিন্, কলাপিন্, শিখাণ্, চিত্রাপঙ্কক, ভূজ-  
 গতোগিন্ মেঘনাদামূল্যাসক ।

“यदा तु ज्ञानकीर्तिर्भुज्येन शङ्कितं धनु-

सुता नगाः प्रकम्पिताः सुमेरुमन्दरादयः ।

ভগ্নান্ভবান্নজোহভবদ্ভবান্নযুক্ত সবাহন-

স্তদা ময়ুরমস্তকে জগজ্জ পন্নগঃ স্বয়ম ॥” (উদ্ভট)

ময়ূর বড় সুন্দর পক্ষী । ইহার মত অপূৰ্ব সুন্দর পক্ষী

সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। এই পক্ষিজাতি যখন আপন মনে নিভূতে বসিয়া থাকে, তখন ইহাদের সৌন্দর্য্যরাশি ততদূর বিকাশ পায় না; কিন্তু ইহারা যখন মেঘের ধীর-গম্ভীর ডাক শুনিয়া অথবা অন্ত কোনরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আপন আপন পেখম ধরিয়া কখন ধীরমহুরগমনে এবং কখন বা নাচিয়া নাচিয়া নানা ভঙ্গিমায়ে বেড়ায়, তখন ইহাদের সেই নীল-পীতলোহিতাদি নানা বর্ণের চিত্রবিচিত্র সৌন্দর্য্যময় পেখমের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলে সেই বিশ্বশিল্পী বিদ্যাতার যে কতদূর নিঃশাংকৌশল, সত্যত কেবল তাহাই ভাবিতে ইচ্ছা হয়।

ময়ূরের পক্ষ বা পিচ্ছগুলি কোন সময় কি জন্ত, কিরূপে এইরূপ চিত্রবিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইল, তাহার উপাখ্যান বায়্মিক রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

হৃদ্যন্ত রাবণ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে গম্বিত হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত ব্যক্তিকেই তুণের আশ্রয়ত্ববোধে কাহাকে অবমানিত কাহাকে তিরস্কৃত, কাহাকেও বা লাজিত বিধ্বস্ত ও করিতে লাগিল। দেবগণ তাহার ভয়ে সত্যত ভীত ও সশঙ্কিত। এই সময়ে রাজা মকন্তের যজ্ঞ আরম্ভ হয়। যজ্ঞে দেবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সকলেই হুত্বচিত্রে স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার জন্ত সমাগত হন। বৃহস্পতির ভ্রাতা ব্রহ্মর্ষি সত্বর্ষ যজ্ঞের হোতৃপদ গ্রহণ করেন। মহাধুমধামের সহিত যজ্ঞ আরম্ভ হইল; কিন্তু অদূরে পুষ্পকারোহণে রাবণ আসিয়া দেখা দিল। হর্ষ গেল—বিষাদ আসিল। দেবগণ ভীত হইলেন। তাহার রাবণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্ত প্রত্যেকে তিথ্যগৃদে প্রবেশ করিলেন।

যাহারা তিথ্যগৃদে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ইন্দ্র ময়ূর, ধন্বরাজ বায়স, কুবের কুকলাশ এবং বরুণ হংস হইয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত দেবগণই দেহপরিবর্তন করিয়া সে যাত্রা রাবণের হস্ত হইতে রক্ষা পান। রাবণ চলিয়া গেলে, দেবগণ আবার নিজ নিজ মূর্তি পরিগ্রহ করেন। তখন দেবগণ প্রীত হইয়া যিনি যাহার দেহ ধারণ করিয়া ছিলেন, তিনি তাহাকে এক একটা বর প্রদান করেন। এই বরদাতৃগণের মধ্যে ইন্দ্র ময়ূরকে বরদানে আপ্যায়িত করিলেন। ইন্দ্রের বরে ময়ূরের গাত্রে সহস্র সহস্র বিচিত্র নেত্র উদ্ভাসিত হইল, সর্পভয় বিদূরিত হইয়া গেল এবং ইন্দ্র যখন বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাহার অপূর্ণ প্রীতির নিদর্শন প্রকাশ পাইল। ময়ূরের কণ্ঠদেশ পূর্ণ হইতেই নীল-বর্ণে রঞ্জিত ছিল, এখন সুরেশ্বর সমীপে বর পাইয়া বিবিধ চিত্র বিচিত্রতায় চারু অঙ্গে চমৎকার শোভা ধারণ করিল \*।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ময়ূরকে পাবোনি (Pavonia) নামক পক্ষিশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। উক্ত শ্রেণীর পক্ষিবর্গের সাধারণ লক্ষণ;—চকু স্নকঠিন ও মূক এবং অগ্রভাগ বক্রাকার। গওহলে অত্রাণ অবয়ব অপেক্ষা পালক কম, মস্তক পালকাকৃত এবং তত্পরি চূড়া। ডানার পাতার মধ্যে ছয়খানি সন্ধ্যাপেক্ষা লম্বা পাখা। পুচ্ছের পালক ১৮টা। লেজের পালকগুলি অত্যন্ত লম্বা ও বড় বড়। ময়ূরী অপেক্ষা ময়ূর-গুলির পুচ্ছ অধিকতর দীর্ঘ।

উল্লিখিত পক্ষিশ্রেণীর মধ্যে দুই প্রকার ময়ূর বর্ণনাযোগ্য। ১ম সাধারণ ময়ূর ও ২য় জাপানী ময়ূর।

প্রথম জাতীয় ময়ূরের মস্তকে ২৪ খানি পালক থাকে। পুচ্ছাবরক পালক সমস্ত অসমান। সন্ধ্যাপেক্ষা উপরের খানি অধিক ক্ষুদ্র। এই সমস্ত পালকে চাকচিক্যশালী নেত্র আছে। ময়ূরেরা ইচ্ছাপূর্বক পুচ্ছকে চক্রাকার করিয়া তুলিতে পারে। তাহাকেই ‘পেখম ধরা’ বলে। এই সময় স্থ্যের কিরণ পুচ্ছোপরি পতিত হইলে যে অপূর্ণ শোভা হয়, তাহা বর্ণনা করা কবির অসাধ্য। ময়ূরীর পুচ্ছ এতাদৃশ লম্বা ও চাকচিক্যবিশিষ্ট নহে।

ভারতবর্ষের উত্তরাংশে অসংখ্য ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অতি সহজেই পোষ মানিয়া থাকে। অনেক হিন্দু-দেবালয়ে পালে পালে পালিত ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়।

বাহুন সাহেব ও অত্রাণ পণ্ডিতের মতে আদোকসান্দারের সময়ে ময়ূর ভারত হইতে গ্রীস রাজ্যে নীত হয়; অনন্তর তথা হইতে যুরোপের সর্বত্র প্রেরিত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক নির্ণয় করিয়াছেন যে, পেরিক্লিসের পুঙ্কে গ্রীসে ময়ূর আনীত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ময়ূরের (P. japonensis) বর্ণ নীল ও সবুজ মিশ্রিত। ইহাদের গাত্রে স্থ্যের কিরণ পড়িলে উপরি উক্ত বর্ণ অধিকতর গাঢ় দেখায় এবং কিরণের তারতম্য অঙ্গমাণে এক বর্ণ অত্র বর্ণে পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়।

\* “দৃষ্টো দেবাস্ত তদক্ষো ববদানেন হৃদ্যম্।

তিথ্যগৃদোনি সমাবিষ্টাস্তস্য বধণভীরবঃ।

ইন্দ্রো ময়ূরঃ সত্বর্ষো ধন্বরাজস্ত বায়সঃ।

কুকলাশো ধনাব্যাক্ষো তংসচ্চ বরণোহস্তবঃ।

হৃদ্যন্তরাবীন্দ্রো ময়ূরঃ নীলবর্ণিণম্।

প্রীতোহস্মি তব ধর্মজা ভূজগাঙ্কিন তে ভবম্।

ইদং নেত্রসংস্পৃষ্ট যন্তদর্শে ভবিষ্যতি।

বর্ধমানো ময়ি সুদং প্রাপ্যসে প্রীতিলক্ষণঃ” (বামা-উঃ ১৮ স)

এই উভয় জাতীয় ময়ূরেরই আকার ও গঠন এক প্রকার। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ময়ূরের চূড়া ১ম শ্রেণীর ময়ূরের চূড়া অপেক্ষা দ্বিগুণ লম্বা এবং চূড়ার পালক গোড়া হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত সমভাবে কাটা। গওদেশে চক্ষু ও কাণের নিকট দিয়া পালক নাই। গ্রীবা ও বক্ষঃস্থলের পালক ক্ষুদ্র ও গোলাকার। ডানার পালকের রং অধিকতর নীলবর্ণ। পুচ্ছের পালক সাধারণতঃ ধূসরবর্ণ, কিন্তু স্থগ্যালোকে সবুজবর্ণে পরিণত হয়। পুচ্ছের অগ্রভাগ অত্যন্ত লম্বা ও রেশমের স্তায় মন্থণ। ইহার উপরে স্তম্ভর স্তম্ভর চক্ষু আছে। ইহাদের চক্ষু খেতবর্ণের আভাবিশিষ্ট। সাধারণ ময়ূরের চক্ষু অপেক্ষাকৃত লম্বা ও সরু।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। “জাবা ময়ূর” নামে এক জাতীয় ময়ূর মলয়-উপদ্বীপে দৃষ্ট হয়। ইহারা দেখিতে অতি স্তম্ভর। ইহাদের বর্ণ সাধারণ ময়ূরের বর্ণ অপেক্ষা পৃথক্ এবং ইহাদের চূড়ায়ও বিশেষ পার্থক্য আছে।

“আসানী ময়ূর” (P. Assamicus) আসাম, মলাকা, ব্রহ্মদেশ এবং ভারতীয় অম্বুদীপসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় ময়ূরের প্রত্যেকদিকটক আছে। ইহার ১০১২ খানি স্তম্ভ স্তম্ভ পালক থাকে। ইহাদের রং সাধারণ ময়ূরের রং অপেক্ষা অধিকতর সবুজ ও স্বর্ণবর্ণ; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প নীলের আভাবিশিষ্ট।

“জাপানী ময়ূর” নামে এক প্রকার ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গ্রীবার রং কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের নাম জাপান-ময়ূর হইলেও জাপানদেশে পাওয়া যায় না। কোচিন চানে ইহারা বনে চরিয়া বেড়ায়।

রাজপুত্র রাজস্ববর্ণের মধ্যে ময়ূরাকৃতি কৌলীশ্রুপদসূচক চিহ্ন অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ময়ূর হিন্দু দেবতা কার্তিকেয়ের বাহন; এই নিমিত্ত ইহাকে পবিত্র পক্ষী বলিয়া হিন্দুগণ মনে করিয়া থাকেন। শুদ্ধ এদেশে নহে, যুরোপেও ময়ূর জুনোর (Juno) প্রিয় পক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রাজপুত্রগণ শিখিপুচ্ছ ঘারা উষ্ণীয়সুশোভিত করেন, ইহার অনুকরণ করিয়া বিলাতের ধর্মযোদ্ধগণও টুপির উপর ময়ূরের পালক পরিধান করিয়া থাকেন। ভারতবাসী অশিক্ষিত লোকদিগের বিশ্বাস, ময়ূরপুচ্ছের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে, এই নিমিত্ত যাত্রাকরণে অনেক সময়ে একতড়া ময়ূরপুচ্ছ হাতে করিয়া লইয়া বেড়ায়। বিশেষতঃ জৈন-সন্ন্যাসিগণ ময়ূরপালক প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পুরাণে অনেক স্থলে ময়ূর সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান

দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, একদিন শিব স্বীয় সহধর্মিণী ভগবতীর মনস্তষ্টির জন্ত মনোহর নৃত্য আরম্ভ করেন; তাঁহার তৃত্য নন্দী তালে তালে মৃদঙ্গ বাজাইতে থাকে। গজানন ও ময়ূরোপরি উপবিষ্ট কার্তিকেয় উৎসব দর্শন করিতে লাগিলেন। বিষধর ফণী শিবের গলদেশ বেঁধে রাখিয়া মন্তকের উপর শোভা পাইতেছিল। মেঘ দেখিলে ময়ূরেরা অত্যন্ত পুলকিত হয়; কার্তিকেয়ের বাহন মৃদঙ্গের গভীর ধ্বনি মেঘগর্জন মনে করিয়া আক্সাদে উল্কা-স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। চিরশত্রু ময়ূরের ডাক শুনিয়া শিবকণ্ঠস্থ সর্প ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। নিকটে গণেশের শুভ্র দেখিতে পাইয়া সর্প বিবর-ভ্রমে শশব্যস্তে তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া হস্তীর ললাটোপরি উপবিষ্ট মদগন্ধাকৃষ্ট মধু-মক্ষিকাগণ ভয়ে উড়িয়া পলায়ন করিল।

যুরোপে প্রচলিত নীতিগম “ময়ূরপুচ্ছ শোভিত দাঁড়কাক” বর্তমান সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন। লঙ্কারূপেও ঠিক এইরূপ একটা উপন্যাস প্রচলিত আছে।

দিল্লীর সম্রাট শাহ জাহানের ময়ূরাসন ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। পেখমখারী ময়ূরাকৃতিতে উক্ত আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। নীলবর্ণের মণিমাণিক্য পুচ্ছোপরি সুশোভিত হওয়ায় যেন স্বভাবিক ময়ূরপুচ্ছের স্তায় শোভা পাইত। টাবারনিয়ার নামক জনৈক জহরী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ময়ূরাসন নির্মাণ করিতে ৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়; কিন্তু নাদিরনামার গ্রহকর্তা বলেন ২ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল; স্বট সাহেবের মতে ১ কোটি মাত্র।

ময়ূরের মাংস সেবন করিলে দৈহিক অনেক উপকার হয়। ইহার গুণ—শ্রোত্র, নেত্র, অগ্নি, মেধা, বর্ণ, শ্রবণ ও স্নায়ুর হিতজনক, বলকর, উষ্ণ, বাতঘ্ন, এবং শুষ্ক ও মাংস-বর্দ্ধক। হেমন্তে, শিশিরে কিংবা বসন্তে এই ময়ূরমাংস সেবন করিতে হয় এবং এই সকল সময়েই ময়ূরমাংসের ব্যবহার করিলে সমধিক উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন বর্ষা, শরৎ কিংবা গ্রীষ্মে ময়ূরমাংস কুপথ্য। কারণ ঐ সকল সময়ে ময়ূর বিষভোজন করে, তাই তাহার দেহমাংস অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে; সুতরাং তৎসেবনে বিলক্ষণ অনিষ্টই সংঘটিত হয়।

“ময়ূরঃ শ্রোত্ৰেনেত্র্যগ্নিমৈধাবর্ণশ্রাব্যম্।

হিতে বল্যো গুরুশ্চোক্ষো বাতঘ্নঃ শুক্রমাংসদঃ ॥

হেমন্তকালে শিশিরে বসন্তে সেব্যং হি মাহুরমুশস্তি মাংসম্।

উক্ষো হি বর্ষা বিষভোজনৈশ্চ

বর্ষাশরদগ্রীষ্মযুগেষুপথ্যঃ ॥” (রাজনির্ঘণ্ট)

রাজবল্লভের মতে ময়ুরমাংস যদি এরওতৈল দিয়া ভাজিয়া লওয়া যায়, তবে তাহা বিষের স্থায় কাজ করে।

২ ময়ুর-শিখাক্ষুপ। পর্যায়—থরাশা, কারবী, দীপ, লোচমস্তক, অপামার্গ। “পিপ্ললীপিপ্ললীমূলঃ চব্যচিত্রকময়ুর-বর্ষাভূসিকং বা ক্ষীরং পিবেৎ” (সুশ্রুত চিকিৎসা• ২৩ অঃ) ৩ অম্বরবিশেষ।

“ময়ুর ইতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ যন্ত মহাময়ুরঃ।” (মহাভারত)

৪ মুমেকশৈলের উত্তরদিগবর্তী পর্বতবিশেষ।

“স্বর্ণশৃঙ্গী শতশৃঙ্গী প্লক্ষো মেঘপর্বতঃ।

বিরজাক্ষো বরাহাদ্রিময়ুরো দারুদিস্থতা।”

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৪১৩)

৫ একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি ময়ুরভট্ট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মানভূজাচার্য্য প্রণীত ভট্টামরায়্য স্তোত্রের টীকার প্রারম্ভে ও মেরুভূজপ্রণীত প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি প্রসিদ্ধ কবি বাণভট্টের খণ্ডর এবং উজ্জয়িনীপতি বুদ্ধভোজ মহাপতির একজন সভাসদ ছিলেন। প্রবন্ধচিন্তামণিতে ইনি আবার বাণভট্টের শ্যালক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বাণভট্ট ও ময়ুরভট্ট উভয়েই কবি ও সমসাময়িক তাহা শাঙ্গধরপদ্ধতি প্রভৃতি ও প্রসিদ্ধ কবিরাজশেখর হইতে জানিতে পারা যায়। যথা ;—

“অহো প্রভাগো বাগেদব্য্য যম্মাতঙ্গদিবাকরঃ।

শ্রীহর্ষস্তাভবৎ সভাঃ সমো বাণময়ুরয়োঃ।”

প্রবাদ, কবি ময়ুরভট্ট কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া স্বর্ঘ্যের আর্য্য-ধন্যার্থস্থ্যশতক নামক স্তোত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে স্ব্যাপ্রসন্নতায় তিনি সেই রোগ হইতে মুক্ত হন। ময়ুরভট্ট-প্রণীত স্থ্যশতকের শেষ শ্লোকটি এই ;—

“শ্লোকাঃ শ্লোকস্ত ভূতৈয শতমিতি রচিতাঃ শ্রীময়ুরেণ ভক্ত্যা যুক্তশ্চেতান্ পঠেৎ যঃ সক্রদপি পুরুষঃ সর্বপাপৈবিমুক্তঃ।

আরোগ্যং সংকবিরং মতিমতুলবলং কান্তিমাযুঃপ্রকর্ষং।

বিজ্ঞানৈশ্বর্য্যমর্থং স্বধমপি লভতে সোহত্র স্বর্ঘ্যপ্রসাদাৎ।”

ময়ুর, পদচক্রিকা নামক অভিধানপ্রণেতা।

ময়ুরক (ক্লী) ময়ুরগ্রীবাব প্রতিকৃতিরিতি ময়ুর- (ইবে প্রতিকৃতো। পা ৫।৩।৯৬) ইতি কন্ অস্ত ময়ুরকঠ-কাস্তি-তুলাহ্যতিহ্যং তথাং। অঙ্গনবিশেষ। চলিত তুতিয়া। পর্যায়—তুখাঙ্গন, শিপিগ্রীব, বিতুন্নক।

“তুখং বিতুন্নকঞ্চাপি শিখিগ্রীবং ময়ুরকম্।” (ভাবপ্র•)

২ অপামার্গ। স্বার্থে কন্। ৩ ময়ুর। (বিষ) ৪ ময়ুর-শিখা। (জটাধর) ৫ গন্ধক। (চক্রদত্ত) ৬ বিষভেদ।

ময়ুরকেতু (পং) স্কন্দভেদ।

ময়ুরগতি (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ২৪টা করিয়া অক্ষর থাকে। তন্মধ্যে ১,৪,৭,১০,১৩,১৬,২৩,২৪ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

ময়ুরগ্রীবক (ক্লী) ময়ুরস্ত গ্রীবায়্যঃ কন্ধরস্ত বর্ণ ইব বর্ণো যন্ত, বহুগ্রীবো কন্ হ্রস্বশ্চ। তুখ। (রাজনি•)

ময়ুরচটক (পং) ময়ুর ইব চটকঃ। গৃহকুকুট। (হারাবলী)

ময়ুরচূড় (ক্লী) ময়ুরস্তেব চূড়া অগ্রভাগো যন্ত। হ্যোগ্নেয়ক নামক গন্ধদ্রব্য, চলিত গেটেলা। (রাজনি•)

ময়ুরচূড়া (ক্লী) ময়ুরস্ত চূড়ৈব চূড়া শিখা যন্তাঃ। ময়ুরশিখা।

ময়ুৎজজ্ঞ (পং) ময়ুরস্ত জজ্ঞেব জজ্ঞা যন্ত। শোণাক।

ময়ুরতুখ (ক্লী) ময়ুর ইব তুখং, ময়ুরবর্ণবাদস্য তথাং। তুখ। (রাজনি•)

ময়ুরধ্বজ, পুরাণবর্ণিত জনৈক প্রাচীন হিন্দু রাজা। রত্ন-পুরে তাহার রাজধানী ছিল। একদা তিনি নন্দদানদৌতটে এক মহাযজ্ঞে ব্রতী হন। তিনি জিতক্রোধ, জিতকাম, অহৃয়াবিহীন ও শুর ছিলেন। দেবদ্বিজের তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ময়ুরধ্বজ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় পুত্র তাম্র-ধ্বজকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করেন।

এদিকে হস্তিনাপুরে রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধের আয়োজন করিয়া স্বীয় যজ্ঞিয়-অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। মহাবীর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় সেই অশ্বের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাম্রধ্বজ পাণ্ডবগণের যজ্ঞিয় অশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গতিরোধ করিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর পাণ্ডবীয় সেনা পরাভূত হইল। তাম্রধ্বজ নরনারায়ণকে মুচ্ছিত দেখিয়া অশ্বদ্বয় লইয়া যজ্ঞমণ্ডপে প্রত্যাবৃত্ত হইল। পিতা ময়ুরধ্বজ পুত্রমুখে যুদ্ধসংবাদ অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদেবী পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন।

চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়ের কার্য্যোদ্ধারের জন্ত স্বয়ং বুদ্ধ ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্বক পার্থকে বালকশিষ্যরূপে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা ও রাণীর সম্মুখে উপনীত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা ময়ুরধ্বজ নমস্কার করিবার পূর্বে ব্রাহ্মণের স্ততিবাচনপ্রয়োগে কথঞ্চিংক্ষুব্ধ হইয়া পরম ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, “এক কালরূপী সিংহ আমার পুত্রকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে, সে রাজার অর্দ্ধদেহ পাইলে, আমার পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে।” এই কথা শুনিয়া রাজা স্বীয় অর্দ্ধ দেহ ছেদন করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাজাজ্ঞার মহিষী কুম্ভবর্তী ও পুত্র তাম্রধ্বজ করপত্র লইয়া

রাজার মন্তক ছেদন করিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে রাজার বামনেত্র হইতে বারিবিন্দু পতিত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মনঃক্লেশপ্রদত্ত শরীর গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। তদন্তরে রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি বিধিও হইবার যন্ত্রণায় কাদিতেছি না। আমার একমাত্র বামাস্ত্রেরই দুঃখ রহিয়া যাইতেছে, যেহেতু আমার দক্ষিণাঙ্গ ব্রাহ্মণকার্য্যে ব্যয়িত হইল, আর বামপার্শ্ব ভূমিতে বৃথা পতিত রহিয়া গেল, সেইজন্য কেবলমাত্র বামাস্ত্রিতেই বারিবর্ষণ হইতেছে। রাজার এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে ভগবান্ বাসুদেব প্রসন্নচিত্তে রাজসমক্ষে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর রাজাকে প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিয়া পদ্মাপুত্র-সমভিষাহারে যজ্ঞ করিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, তুমি রাজা বুদ্ধিতির এই অশ্বও গ্রহণ কর এবং যথাকালে দুই অশ্ব আভূতি দিয়া চিরস্থায়িনী-কীর্ত্তি স্থাপন কর।

ভগবান্কে প্রত্যক্ষ করিয়া রাজা ময়ূরধ্বজ ভক্তি-মধুরস্বরে নারায়ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তন্নের আরাধনাগ তুষ্ট হইয়া ভগবান্ রাজার প্রার্থনা-মতে তাঁহারই যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞসম্পন্ন করাইলেন। অনন্তর অর্জুন ত্রিবিদ্য রাজভবনে অতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর রাজা ময়ূরধ্বজ অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অশ্বপালনে নিযুক্ত হইলেন। (জৈমিনীয় ভারত)

ময়ূরধ্বজ, উঃ পঃ প্রদেশের বিজনৌর জেলার অন্তর্গত দুর্গ-স্বরক্ষিত একটি প্রাচীন নগর। বর্তমানে মুন্সাবার জুর বা মোরধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রবাদ আছে, পাণ্ডবগণের সমসাময়িক রতনপুররাজ ময়ূরধ্বজই এই দুর্গ ও নগর স্থাপন করেন। আবার অনেকে অস্বীকার করেন যে, সৈয়দ সালর মসাদউদ গাজির জৈনশত্রু ময়ূরধ্বজই এই দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা। তাহা হইলে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দির প্রারম্ভেই এই দুর্গের নিয়োগকাল স্থির করা যায়। এক্ষণে দুর্গের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অধিকাংশ স্থানই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহার পূর্বভাগের ঠিক মধ্যস্থলে ‘শেরগড় বা শ্রীগড়’ নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষসমূহ অস্বাভাবন করিলে, উহাকে একটি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া মনে হয়। এই স্থানের প্রতিমূর্ত্তি ও শিল্পকাব্যযুক্ত প্রস্তরাবলী লইয়া নাজিবাবাদ ও পাথরগাড়ের দেবমন্দিরাদি গঠিত হইয়াছে।

ময়ূরপদক (ক্ৰী) ময়ূরশ্বেব পদকং স্থানং। নখাঘাত।

‘তথ্য বকেরকোলা চ নখাঘাতে তু মুণ্ডনম্।

ময়ূরপদকং ব্যাজনখকোংপলপত্রকে ॥’ (শব্দমালা)

ময়ূরপদ্ম, কেকাবলীপ্রণেতা একজন মহারাত্রী কবি।

ময়ূরপুচ্ছ (পুঃ) ময়ূরের পুচ্ছ, ময়ূরের লেজ।

ময়ূরপুর, মহারাজ অদূরবর্তী একটি শৈল। এখানে কান্তিকেশ্বর এক দানবকে নিহত করিয়া তাহাকে ময়ূররূপে পরিবর্তিত করেন, সেই ময়ূরই তদবধি তাঁহার বাহনরূপে নির্দিষ্ট হয়। এখানে কান্তিকেশ্বরের পবিত্র তীর্থ অবস্থিত। ময়ূরপুরমাহাত্ম্যে দেবতীর্থের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। (শিবপুরাণ) ময়ূরবিদলা (ক্ৰী) ময়ূরান্ বিশেষণ দলতি স্বপুন্পাদি-শোভয়া তিরস্করোত্তীত বি-দল-অচ্-স্ত্রিয়াং টাপ। অযষ্ঠা। (বৈদ্যকনিঃ) ময়ূরভঞ্জ, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি দেশীয় সামন্ত রাজ্য। অক্ষাঃ ২১° ১৭’ হইতে ২২° ৩৩’ ৪৬’’ উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮৫° ৪২’ ৩০’’ হইতে ৮৭° ১৩’ ৫৫’’ পূঃ মধ্যে। ইহার উত্তরসীমান্য সিংহ-ভূম, মানভূম ও মেদিনীপুর জেলা, পূর্বে বালেশ্বর জেলা, দক্ষিণে পুরী জেলা ও নীলগিরি সামন্তরাজ্য এবং পশ্চিমে কেউন্ডার সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৪২৪৩ বর্গ মাইল।

এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। কোথাও শস্ত-পূর্ণা শ্রামলা ধরিয়া, কোথাও নীলময়রী বিস্তীর্ণ বনরাজি, কোথাও জলময় সুন্দর উপত্যাকাপ্রদেশ, কোথাও বা হরিদ্বর্ণ তৃণক্ষেত্রসমূহ বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণে মেঘা-শনি পর্বতমালা উন্নতমস্তকে অবস্থিত থাকিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছে। ঐ সকল নিবিড় বনমালা ও পর্বতবক্ষে মদমত্ত মাতঙ্গযুথ স্বেচ্ছায় বিচরণ করিয়া থাকে। বর্তমান সময়ে ঐ সকল হস্তী ধারণার জন্য নানাস্থানে খেদা স্থাপিত হইয়াছে।

ময়ূরভঞ্জ সামন্তরাজ্য প্রধানতঃ তিনটি বিভাগে বিভক্ত ;— ১ আসল ময়ূরভঞ্জ, ২ উপের বাঘ ও ৩ বামনঘাট। শেখোক্ত স্থান দুইটি পূর্বে ইংরাজ গবর্মেণ্টের কত্বাধীনে পরিচালিত হইত, কিন্তু এখন তাহা রাজসরকারের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। বারিপদা (অক্ষাঃ ২১° ৫৬’ ৫’’ উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮৬° ৪৫’ ৪১’’ পূঃ) এবং দাসপুর (অক্ষাঃ ২১° ৫৭’ ৪০’’ উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮৬° ৭’ ১১’’ পূঃ) নামক গ্রামদ্বয় ইহার প্রধান সদর।

এই রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কোন্ সময়ে ময়ূরভঞ্জ-রাজ এখানে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন, তাহার কোন প্রকৃত আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ নাই। পূর্বে ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার কুরুদ মহল ও মধ্যপ্রদেশের কতকাংশ জঙ্গলে আবৃত ছিল। বলা বাহুল্য যে, এই ময়ূর-ভঞ্জ রাজ্যেরও অধিকাংশ স্থান বনজাতির নিভৃত নিকেতনে পর্যাবসিত ছিল, তখনও এখানে সভ্যতার আলোক বিকশিত হয় নাই। মুসলমান রাজগণের অধিকারকালে ময়ূরভঞ্জ



ও তাহার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলভাগ ঝারখণ্ড নামে পরিচিত ছিল এবং ময়ূরভঞ্জের রাজা 'ঝারখণ্ড-কিং-বংশ' নামে গণ্য হইতেন।

এখানে ভঞ্জ, পুরাণ, বাথুরী, ভূঁইয়া ও জুয়াঙ্গা প্রভৃতি আদিম জাতির বাস ছিল। প্রবাদ, একসময়ে ঐ সকল অসভ্যজাতির জনৈক সর্দার এই বজ্রভূমে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

ভটমুখে (কাহারও মতে ২ সহস্র, কাহারও মতে ১৩ শত বর্ষাধিক পূর্বে) শুনা যায় যে, রাজপুতানার জয়পুর-রাজ-সম্পর্কীয় জয়সিংহনামা জনৈক কেচুয়াবংশীয় রাজপুত তীর্থযাত্রা-ব্যাপদেশে পুরীধামে আগমন করেন। তথা হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ময়ূরভঞ্জ ও কৈউঝরে সামন্তরাজ্য স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার আদিসিংহ ও জ্যোতিঃসিংহ নামে দুই পুত্র ছিল। যুবরাজদ্বয় উক্ত রাজ্যদ্বয়ের অধিপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন। বৈতরণী নদীর উভয় পার্শ্ববর্তী আদিপুর ও জ্যোতিঃপুরে তাঁহাদের রাজপাট স্থাপিত হইল। এখনও ঐ নগরদ্বয় বিদ্যমান আছে। আদিপুরের চতুষ্পার্শ্বে এখনও বহুশত ধ্বংসাবশিষ্ট দেবমন্দির, নানা কাককাঁচাযুক্ত প্রতিমূর্তি, প্রস্তরখণ্ড ও পুষ্করিণী প্রভৃতি পূর্ববর্তী রাজগণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। স্থানীয় রাজকুলদেবী কীচকেশ্বরীর ভগ্ন-মন্দির অद्याপি বিদ্যমান আছে। প্রবাদ, ইনি মহা-ভারতোক্ত কীচকের ইষ্টদেবী ছিলেন।

সাধারণের বিশ্বাস, যখন হিন্দুধর্মদেবী কালাপাহাড় উড়িয়ায় আগমন করে, তখন সে আদিপুরের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করিয়াছিল।

স্থানীয় আদিম অধিবাসিবৃন্দের মনস্ত্বপ্তির জন্ত এই রাজ-বংশের স্বতন্ত্র উৎপত্তিকথা পরিকল্পিত হইয়াছে। কিংবদন্তী আছে যে, এই রাজবংশ প্রথমে ময়ূরের ডিম্ব ফাটিয়া (ভজ্ঞন-পূর্বক) তাহার কুসুম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই হেতু ময়ূর এই রাজবংশের কুলচিহ্ন। এইজন্ত পূর্বে কেহই এখানে ময়ূরহত্যা করিতে পারিত না। যদি কেহ ময়ূরভঞ্জরাজ্য মধ্যে ময়ূর বধ করিত, তাহা হইলে সে রাজ্যদেশে দণ্ডিত হইত। অনেকে এই কিংবদন্তীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ময়ূরভঞ্জ নামের কর্ত্তনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আদিম ভঞ্জজাতির বাসভূমি বলিয়া এইস্থান পূর্বে 'ভজ্জমি' নামে খ্যাত হইত। অনার্য্য ভজ্জসর্দার-দিগের প্রভাব ধ্বংস (ভজ্ঞন) করিয়া এখানে আর্য্যজাতির প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইলে বিজ্ঞতা সূত্বে আর্য্যগণ এই স্থানের ময়ূরভঞ্জ আখ্যা প্রদান করেন, অথবা ময়ূরভঞ্জ নামক জনৈক ভজ্জসর্দারকে পরাভূত করিয়া, ইহার ময়ূরভঞ্জ নাম রাখেন।

বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জরাজবংশ ভজ্জজাতির গোষ্ঠীপতি। কৈউঝর, বোদা, দশপল্লা, কণিকা ও ঘুমসর প্রভৃতি সামন্ত-রাজবংশ এই ময়ূরভঞ্জবংশ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন। ময়ূরভঞ্জরাজবংশের প্রাচীনতম কীর্ত্তির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পূর্বতন রাজত্বগণের কীর্ত্তিকলাপ হয় কালের অতল কবলে নিপতিত, না হয় তাহা সংস্কারসম্পন্ন হইয়া অপরের নামে বিঘোষিত হইতেছে। রাজকীয় ইতিহাস না থাকাই ইহার একমাত্র কারণ। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বৈষ্ণনাথ ভজ্জ দেব বারিপদায় জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ করা-ইয়াছিলেন। মুসলমানগণের উড়িয়া-আক্রমণ কালে ময়ূর-ভঞ্জরাজ রাজঘাটে থাকিয়া ভীমবিক্রমে মুসলমানবাহিনীর মনোরথ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। একটা মাত্র মুসলমানসেনা সূবর্ণরেখা পার হইয়া কটক নগরীতে পদার্পণ করিতে পারে নাই। মুসলমানদিগকে বিমুখ ও ছত্রভঙ্গ দেখিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মুসলমানগণ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ এবং তদ্রাজ্য লুণ্ঠন করে। এমন কি, মুসলমানের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত তাঁহাকে নানাহানে লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

মহারাজীন্দ্রদিগের আক্রমণকালেও ময়ূরভঞ্জ-রাজকে বিশেষ নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। লুণ্ঠনপ্রিয় মহারাজ-জাতি কতক উৎপাদিত হইয়া রাজা দামোদরভজ্জ দেব ও তাঁহার পিতৃপিতামহগণ হরিহরপুর ছাড়িয়া পলায়ন করেন এবং বিভিন্ন গিরিজর্গে আশ্রয় লইয়া কালাতিপাত করিতে থাকেন। অবশেষে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজীন্দ্রসর্দারের সহিত ভজ্জরাজের মিত্রতা স্থাপিত হয়। তদবধি ইংরাজাধিকার পর্য্যন্ত তাঁহারা মহারাজীন্দ্রদিগের অধীন ছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা যদুনাথ ভজ্জের সহিত ইংরাজ গবর্নমেন্টের সন্ধি হয়, তদনুসারে তিনি ইংরাজরাজকে যথাযোগ্য রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া ইংরাজের বশতা স্বীকার করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যদুনাথের মৃত্যুর পর রাজা শ্রীনাথভজ্জ দেব ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজকাব্য পর্য্যালোচনা করেন। তৎপরে রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র ভজ্জদেব ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার দাদশবর্ষীয় নাবালক পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ভজ্জ দেব ময়ূর-ভজ্জের রাজপদে অভিষিক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভজ্জ স্বীয় বদান্ততা ও উচ্চ অস্তঃকরণের জন্ত ইংরাজরাজের নিকট হইতে 'মহারাজ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান রাজা শ্রীরামচন্দ্র বারিপদায় জন্ম গ্রহণ করেন। কটকস্থ রাভেনসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে

সহস্রে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইংরাজরাজের অধিকরণে তিনি একটা ব্যবস্থাপক সভা লইয়া রাজ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহার রাজত্বের আয় ১০ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ১০৬৭ টাকা ১০ আনা ৬ পাই মাত্র ইংরাজসরকারে কর দিতে হয়। রাজ্যের শাস্তিবিধান জন্ত তিনি নিজ ব্যয়ে ৪৮৩ জন পুলিশপ্রহরী ও ৯৭২ জন সেনা রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্বসমেত ৩১৫টা বিভাগ আছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ও ২রা জানুয়ারী ভারত-প্রতিনিধি লর্ড কুর্জেন বাহাদুর দিল্লী মহানগরীতে সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ডের সিংহাসনারোহণ-ঘোষণাকালে যে দরবার আহ্বান করেন, তাহাতে ময়ূরভঞ্জরাজ বঙ্গীয় সামন্তরাজগণের মধ্যে বিশেষ-রূপে সম্মানিত ও মহারাজোপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

ময়ূরভঞ্জের রাজবংশ।

- ১ মহারাজ জয়সিংহ।
- ২ আদিভঞ্জদেব।
- ৩ মহারাজ নীলধর ভঞ্জদেব
- ৪ " লক্ষণাগ্রজ "
- ৫ " বিম্বেশ্বর "
- ৬ " ভরত "
- ৭ " দিলীপেশ্বর "
- ৮ " বামদেব "
- ৯ " বসুদেব "
- ১০ " কিশোরি "
- ১১ " নারায়ণ "
- ১২ " নীলকণ্ঠ "
- ১৩ " বীরকেশরী "
- ১৪ " কপিলেশ্বর "
- ১৫ " ত্রিলোচন "
- ১৬ " দাশরথি "
- ১৭ " শ্রীকৃষ্ণ "
- ১৮ " গদাধর "
- ১৯ " অরণ্যেশ্বর "
- ২০ " গোপীনাথ "
- ২১ " রাধাকৃষ্ণ "
- ২২ " পৃথ্বীনাথ "
- ২৩ " বৈকুণ্ঠনাথ "
- ২৪ " বীরেশ্বর "
- ২৫ " রামচন্দ্র "
- ২৬ " বলভদ্র " ১৪২৩—১৪৬৪ খৃষ্টাব্দ।

- ২৭ " হরিকৃষ্ণ " ১৪৬৪-১৪৯১ খৃষ্টাব্দ।
- ২৮ " নীলকান্ত " ১৪৯২-১৫২০
- ২৯ " শাস্তি " ১৫২০-১৫৫৬
- ৩০ " বৈষ্ণনাথ " ১৫৫৬-১৬০০
- ৩১ " জগন্নাথ " ১৬০০-১৬৪৩
- ৩২ " হরিহর " ১৬৪৩-১৬৮৮
- ৩৩ " সর্বেশ্বর " ১৬৮৮-১৭১১
- ৩৪ " বীর বিক্রমাদিত্য ১৭১১-১৭২৮
- ৩৫ " রঘুনাথ " ১৭২৮-১৭৫০
- ৩৬ " চক্রধর " ১৭৫০-১৭৬১
- ৩৭ " দামোদর " ১৭৬১-১৭৯৫
- ৩৮ " স্মৃতিদেব " ১৭৯৬-১৮১০
- ৩৯ " যমুনাদেব " ১৮১০-১৮১৩
- ৪০ " ত্রিবিক্রম " ১৮১৩-১৮২৮
- ৪১ " যদুনাথ " ১৮২৮-১৮৬৩
- ৪২ " ক্রীনাথ " ১৮৬৩-১৮৬৮
- ৪৩ " কৃষ্ণচন্দ্র " ১৮৬৮-১৮৮২
- ৪৪ " শ্রীরামচন্দ্র (বর্তমান) ১৮৮২

ময়ূরভঞ্জের উৎপত্তিকথা ও রাজবংশের তালিকা ময়ূরভঞ্জরাজ হইতে যেরূপ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই প্রকাশিত হইল। কিন্তু ভঞ্জরাজগণের যে চারিখানি প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ময়ূরভঞ্জের উৎপত্তিকথা ভিন্নরূপ বলিয়াই বোধ হয় এবং রাজবংশের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও বথায়থ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ রাজা রণভঞ্জদেব ও তৎপুত্র রাজভঞ্জদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

“আনীং কোট্যাপ্রমমহাতপোবনাধিষ্ঠানে মায়ূরাণ্ডং ভিভা শূলদণ্ডবীরভদ্রাখ্যঃ প্রতিপক্ষনিধনদক্ষো বশিষ্ঠমুনিপালিতো নৃপতিঃ।”

অর্থাৎ কোটি-আশ্রম নামক শ্রেষ্ঠ তপোবন প্রদেশে শূলধারী, বিপক্ষবিনাশে দক্ষ, বশিষ্ঠ-মুনিপালিত বীরভদ্র ময়ূরাণ্ড ভেদ করিয়া নৃপতি হইয়াছিলেন।

উক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে, বীরভদ্রই ভঞ্জবংশের আদি রাজা। ময়ূরাণ্ড ভঞ্জনহেতুই সম্ভবতঃ বীরভদ্রশাসিত স্থান ময়ূরভঞ্জ নামে খ্যাত হয়। বীরভদ্র কোট্যাপ্রমে রাজা হন, সেই জন্ত তাঁহার বংশধর কোট্যভঞ্জ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কোট্যভঞ্জের পুত্র দিগ্ভঞ্জ, তৎপুত্র রণভঞ্জদেব এবং তৎপুত্র রাজভঞ্জদেব। এই বংশীয় নেত্রভঞ্জ দেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম রণভঞ্জ-

দেব। এতদ্ব্যতীত ভক্তবংশীর রাজা বিদ্যাধরভক্তের তাম্র-শাসনে লিখিত আছে, তাঁহার পিতা শিলীভক্তদেব, পিতামহ দিব্ভক্তদেব এবং আপিতামহের নাম রণভক্ত দেব। ইহার সকলেই খ্যাতনামা নৃপতি ও বহুসংখ্যক শাসন দান করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল রাজভক্তের কাহারও নাম তালিকায় পাওয়া যাইতেছে না। এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যিক।

ময়ূররথ (পুং) কন্দ, কার্তিকের।

ময়ূররোমন্ (ত্রি) ময়ূরস্ত রোম ইব রোমো যন্ত। ময়ূরের রোম সদৃশ রোমযুক্ত।

“হরিভির্থা হি ময়ূররোমভিঃ” (ঋক্ ৩৪৫।১)

‘ময়ূররোমভিঃ ময়ূররোমসদৃশরোমযুক্তঃ’। (সারণ)

ময়ূরবর্ষ্মন, কাদম্ববংশীয় জনৈক রাজা। কণাড়া উপকূল-বর্তী জয়ন্তী বা বনবাসী নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। কদম্বরূপে দেবাদিদেব মহাদেবের বর্ষ্ম পতিত হওয়ার তাঁহার জন্ম হয়। এই কিংবদন্তী অনুসরণ করিয়া তাঁহার বংশধরগণ কাদম্ব নামে বিখ্যাত হন।

২ উক্ত বংশীয় রাজা চন্দ্রবর্ষ্মার পুত্র। বলভীপুরে ইহার জন্ম হয়। ইনি উত্তরভারতের পঞ্চগোড় হইতে বহু ব্রাহ্মণ আনাইয়া দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের বাসযোগ্য ভূমিদান করেন। ইহারই যত্নে বাসরগোদি, বকুর, মন্দলুর ও কড়ব নগর স্থাপিত হয়। তৎকর্তৃক প্রত্যেক নগরেই এক এক জন ব্রাহ্মণ গ্রামপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

[ কাদম্ববংশ দেখ ]

ময়ূরবাহন, (পুং) ১ কার্তিকের। ২ কল্লকারিকাসারপ্রণেতা।

ময়ূরব্যাংসক (পুং) ১ ধৃতময়ূর। ২ ময়ূরো ব্যাংসকঃ ইতি নিপাতনাৎ সমাসঃ। পাণিনীর সমাস প্রকরণোক্ত নিপাত-নিম্পন্ন শব্দ ভেদ। (ময়ূরব্যাংসকাদয়শ্চ। পা ২।১।৭২) এতে নিপাত্যন্তে। (বৃত্তি) ময়ূর ব্যাংসকাদি শব্দের নিপাতনে সমাস হইয়া থাকে। আদি পদে উচ্চাবচ, নিশ্চপ্রচ, অকিঞ্চন এবং ক্রিয়া সাততো অস্মীতপিবতা, পচতভৃজ্জতা ও স্বাদ-মোদতা প্রভৃতি অস্ত্যন্ত অনেক শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে।

ময়ূরশর্ষ্মন (পুং) কবিভেদ। অনেকে ময়ূরভট্ট বলিয়া মনে করেন।

ময়ূরশিখা (স্ত্রী) ময়ূরস্ত শিখৈব শিখা অগ্রং যন্তাঃ। স্বনাম-খ্যাত কুপবিশেষ (Culotia cristata)। পর্যায়—বহিচ্ছূড়া, শিখিনী, শিখালু, স্থশিখী, শিখা, শিখাবলা, কোকশিখা। ইহার গুণ—রসে স্বাদু, মুক্তকঙ্ক, ও বালগ্রহাদিদৌবনাশক, এবং বস্ত্রকর্ণে প্রশস্ত।

“ময়ূরাহ্মা শিখা প্রোক্তা সহস্রাঙ্জিমৃকচ্ছদা।

নীলকণ্ঠশিখা লবী পিভ্তেন্দ্রাতিসারজিৎ॥” (ভাবপ্রঃ)

ময়ূরশেপ্য (ত্রি) ময়ূরবর্ণশেপযুক্ত ইন্দ্রের অশ্বযয়।

“হিরণ্যে হরী হতি ময়ূরশেপ্যা” (ঋক্ ৮।১।২৫) ‘ময়ূর-শেপ্যা ময়ূরশেপো ময়ূরবর্ণশেপো যদ্যন্তো নৃপাংসু লুগিতি বিভক্তেড্যাদেশঃ’ (সারণ)

ময়ূরসারিণী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহা চারিটা চরণে পূর্ণ।

প্রত্যেক চরণে ১০টি করিয়া অক্ষরে থাকে। তন্মধ্যে ১, ২, ৫, ৭, ৯ ও ১০ লঘু, তন্ময় সকলই গুরু।

ময়ূরসারিন্ (ত্রি) ১ ময়ূরের স্থায় পুচ্ছবিস্তারকারী। ২ গর্কিত।

ময়ূরাসন, ১ আসনভেদ। (হৃতসং ৫৬।৪।২)

২ মোগল-সম্রাট শাহজহান-নির্মিত প্রসিদ্ধ ময়ূরাকার সিংহাসন। হীরকাদি মণিমুক্তা ও স্বর্ণনিখচিত, এমন কি, ইহা জগতে একটা ছল্লভ বস্তু বলিয়া গণ্য। উহার ময়ূরের পেশম ভাগ জহরতাদি দ্বারা একরূপ স্নকৌশলে সুবিন্যস্ত, যে কিছুতেই তাহা স্পষ্টিকণ ময়ূরপুচ্ছাপেক্ষা হীনসৌন্দর্য্যের নহে। ইংরাজ-ইতিহাসে ইহা “Peacock Throne” নামে পরিচিত। পারস্যরাজ নাদির শাহ দিল্লীলুণ্ঠনকালে অস্ত্যন্ত মহামুখ্য রত্নাদির সহিত এই জহরতাদি-মণ্ডিত সিংহাসন লইয়া যান। ইহার মূল্য আনুমানিক ৬ কোটি টাকা।

ময়ূরস্থল, প্রাচীন তীর্থভেদ। ব্রহ্মাওপুরাণান্তর্গত ময়ূরস্থল-মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

ময়ূরাক্ষক, রাজা বিখবর্ষ্মার মন্ত্রী। ইনি অনেক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ময়ূরাক্ষী, বাঙ্গালার বীরভূমি জেলার সিউড়িনগরের উত্তরে প্রবাহিত একটা নদী। বৈষ্ণবনাথতীর্থের পূর্ববর্তী সাঁওতাল পরগণার তিওর নামক পর্ব্বত হইতে উদ্ভিত হইয়া হারপুরের নিকট বীরভূমি জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এখানে ইহা ময়ূর বা কানা নামেও পরিচিত। এই নদী দিয়া পণ্যবাহী নৌকা সকল অজয় ও ভাগীরথীসদৃশ পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে।

ময়ূরাদ্যমৃত (স্ত্রী) দ্ব্যতৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ দশমূল প্রত্যেকে ৩ পল এবং বেড়েলা, রান্না, যষ্টিমধু ও তরুণ ময়ূরমাংস ৩ পল। কেহ কেহ বলেন, তরুণ ময়ূর একটাতে যত মাংস থাকে, তাহাই গ্রাহ্য। ময়ূরের পক্ষ, পিত্ত, অত্র, বিঠা, বক্তৃৎ, চরণ ও মুখ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট মাংস লইতে হইবে। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কথার্থ জীবক, গুণ্ডক, মেদ, মহামেদ, কঁাকলা, ক্ষীরকঁাকলা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানি, মাষাণি ও জীবনীমুগগোন্ধ দশবিধ দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা;

পরে দ্বতপাকের বিধানানুসারে এই দ্বত পাক করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে শিরোরোগ ও অর্দিত প্রভৃতি ব্যাধি নিরাকৃত হয়।

অভ্যবধি—দ্বত ১৬ সের, কাপার্থ তরুণ ময়ূরমাংস ১২০। সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বেড়োলা ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। কদার্থ প্রপোণরীক, জীবক, ধ্বতক, মেদ, মহামেদ, কাকলা, ক্ষীরকাকলা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, দুগানি ও মাষাণি মিলিত ৪ সের। দ্বত-পাকের নিয়মানুসারে এই দ্বত পাক করিতে হইবে। ইহা পান করিলে শিরোরোগ, নেত্ররোগ, অপস্মার, বিষদোষ, শ্বাস, কাস ও বিষমজ্বর প্রভৃতি আশু নিরাকৃত হয়। শিরো-রোগাধিকারে ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

( ভৈষজ্যরত্নাংশ শিরোরোগাধি )

ময়ূরারি ( পুং ) জেঠি, টুকটুকী।

ময়ূরিকা ( স্ত্রী ) ময়ূরবৎ বর্ণোহন্ত্যাত্তাঃ ময়ূর-ঠন্ টাপ্।  
১ অঘট্টা। ( রাজনি ) ২ বিষাক্ত কীটভেদ।

ময়ূরিকাবন্ধ ( পুং ) রতিবন্ধভেদ।

ময়ূরী ( স্ত্রী ) ময়ূর-স্রিয়াং ভীষ্। ময়ূর-স্ত্রীজাতি।

“কিমব্যক্তেহসি নিনদে কৃতস্তোহপি স্বমীদৃশী।

স্তনরিতোময়ূরীব চকিতোৎকৃতিত্বা স্থিতা ॥”

( উত্তররামচরিত ৩৮ )

ময়ূরেশ ( পুং ) কাষ্টিকেশ। গণেশপুরাণে ময়ূরেশকথা লিখিত আছে।

ময়ূরেশ্বর, বীরভূমি জেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম; মুর্শিদাবাদ হইতে সিউড়ি আসিবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫৯' ৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৮' ২০" পূঃ। এখানে রেশম-সূত্র প্রস্তুত ও গুটী উৎপাদন করিবার বিস্তৃত কারবার আছে।

ময়ূরেশ্বর ( স্ত্রী ) লিঙ্গভেদ।

ময়ূরেশ্বর ( পুং ) ময়ূরানবের নামান্তর।

ময়ৌভব ( ত্রি ) সংসারসুখপ্রদ, সংসারের সুখ যিনি দেন।

“নমঃ সন্তোষ্য চ ময়ৌভবায় চ নমঃ” ( গুরুষজ্ঞঃ ১৬৪১ )

“ময়ৌভবায় ময়ঃ সুখং ভবত্যাম্ময়ৌভবঃ সংসারসুখপ্রদঃ তৎ” ( বেদদীপ )

ময়ৌভু ( ত্রি ) যক্ষফল-সমুত সুখের জননিতা।

“নোমস্তুতো ময়ৌভুবদমিনী শৃগুং” ( ঋক্ ১।৮৯।৪ )

‘ময়ৌভুবঃ ময়সঃ যোগফলভূতস্ত সুখস্ত ভাবয়িতারঃ’ ( সারণ )

ময় ( পুং ) ১ মূত্রা। ২ জগৎ।

মরক ( পুং ) ত্রিরস্তু জনা যন্মাংস্ব-অপাদানে অপ্ ততঃ  
স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্ দধা যু ভাবে অপ্, মরো মরণমিতি

শব্দেন কার্যতি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক। মারি। চলিত মড়ক, পর্যায়—মারী, মারক। ( জটধর )

“হতাশনো জলং ব্যাধিহৃৎকো মরণস্তথা।

ইতি পঞ্চবিধং দৈবং ব্যাসনং মাহুৎ পরম্ ॥” ( কামনীতি ১৩২০ )

২ দৈব ব্যাসন।

জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে—

“যাবদ্যাত্তত্ত্বমুর্গবি ধুবি স্বসে মন্থথে বাস্তিনাধ্যাং

তাবদুভিকপীড়া ভবতি চ মরকং সংশয়ং যান্তি লোকাঃ।

হাহাকারা তথোর্বী মন্থজভয়করী কেরুয়াবৈশ্চ ভীমৈঃ

শূত্রগ্রামা ভবেয়ুন রপতিরহিতা ভূয়িকঙ্কালমালা ॥

বক্রং করোতি রবিজো ধরণীহুতো বা

মূলক্ হস্তমঘরেবতিমৈত্রভেবু।

ছত্রোপভঙ্গপতনানি চ সৈনিকানাং

সর্বত্র লোকমরণং জলধৌতদেশঃ ॥

মাংসাহীন সমাদায় অশানাদ্ গৃধ্বায়সঃ।

শ্মা শৃগালোহথবা মধ্যে পুরস্ত প্রবিশস্তি চেৎ ॥

বিকরস্তি গৃহাদৌ চ অশানং সা মহী ভবেৎ।

চৌরেণ হস্ততে লোকঃ পরচক্রসমাগতঃ ॥” ( জ্যোতিস্তত্ত্ব )

যে সময় সূর্য্যপুত্র বৃষ ধনু, মীন ও মিথুন রাশিতে অবস্থান করেন, সেই সময় হুতিক ও মরক হয়। পৃথিবীর চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উথিত হয় এবং শৃগালগণ ভয়ানক রব করিতে থাকে, নগর ও গ্রাম সকল জনশূন্য, রাজার মৃত্যু এবং চারিদিকে কেবল কঙ্কালমালা দৃষ্ট হয়। রবিপুত্র বা মঙ্গল যদি মূলা, হস্তা, মঘা, রেবতী এবং মৈত্রগণোক্ত নক্ষত্রে বক্রী হন, তাহা হইলে মরক হয়। গৃধ, বায়স, শৃগাল ও কুকুরাদি যদি অশান হইতে মাংস বা অস্থি গ্রহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে অচিরে সেই স্থানে মরক হয় এবং উহা অশানে পরিণত হইয়া থাকে।

ভগবতী হুর্গাদেবী যে বৎসর দোলায় আগমন করেন, সেই বৎসর মরক হয়।

“নৌকায়াং শল্যাবৃদ্ধিঃ স্তাং দোলায়াং মরকং ভবেৎ।”

( জ্যোতিস্তত্ত্ব )

যে স্থলে মরক উপস্থিত হয়, অচিরে সেই স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয় এবং মরকভয়নিবারণের জন্ত শাস্তি করা আবশ্যিক। দেবীমাহাত্ম্যপাঠ, বটুকভৈরবস্তবপাঠ, তুলসী দ্বারা বিষ্ণুপূজন প্রভৃতিতে ইহার শাস্তি হয়।\* ইহা ভিন্ন মারীভয়

\* উপসর্গানশেষাং মহামারীসমুদ্ভবান্।

তথা ত্রিবিধ্যুৎপাতং মায়ায়াঃ শময়েদন ॥” ( চণ্ডী )

উপস্থিত হইলে রক্ষাকালীপূজা, নগরকীর্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। [ মারী ও মহামারী দেখ ]

২ প্রাচীন জাতিবিশেষ।

“দার্সাদা মরকাটেশ্ব কুরটামদারকাঃ।

একপাদাঃ খশা ঘোষাঃ স্বর্গভোমানবন্তকাঃ।”

( মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫৮।৫১ )

মরকত (ক্লী) মরকাং মারিভয়াং তরন্ত্যনেন তনু-ত, বধা মরকং মরণং তণোভীতি লোভামরণমনাদৃতা তস্মিন্ রস্ত্রে প্রবর্ততে ইতি মরকতং, অমরটীকায়াং ভরতঃ। হরিবর্ণ মণিবিশেষ (Emerald)। চলিত পান্না। পর্যায়—গারুড়ত, অঙ্গগর্ভ, হরিমণি, মরক্ত, রাজনীল, গরুড়াক্ষিত, রোহিণের, সৌপর্ণ, গরুড়োক্তীর্ণ, বৃষরত্ন, অঙ্গগর্ভজ, গরলারি, বাগবোল, গারুড়। ইহার গুণ—বিষয়, অশীতল, রসে মধুর, আম ও পিত্তনাশক, রুচিকর, পুষ্টিপ্রদ, তূতনাশক।

“বহুধা গুরু বহুধাঃ স্নিগ্ধং গাত্রক মর্দিবসমেতম্।

অব্যক্তং বহরঙ্গং শৃঙ্গরীমরকতং শুভং বিড়ম্বাং॥

শর্করিলকপিলরুক্ষং মলিনং লঘু হীনকাস্তিকঅম্বঃ।

ত্রাসযুতং বিরুতাদং মরকতমমরোহপি নোপভুঞ্জীত॥”

( রাজনিং )

স্বচ্ছ, অর্থাৎ স্ননির্মল, ওজনে ভারি, ছায়াযুক্ত, স্নিগ্ধগাত্র, অভীজকাস্তি, অব্যক্ত, অঙ্গহীন নহে অথচ স্বগঠন, শৃঙ্গার-গুণবর্ধক, এইরূপ গুণযুক্ত মরকত শুভ, এবং ইহাই ধারণ করা কর্তব্য। শর্করিল অর্থাৎ কঁাকরদার, কলিল অর্থাৎ আবিল, রুক্ষ, অস্নিগ্ধ, মলিন, ওজনে হালকা, হীনকাস্তি, কস্মাবর্ণ, ত্রাস দোষযুক্ত, বিরুতাদ, এইরূপ লক্ষণযুক্ত মরকত অশুভ। দেবগণেরও ঈদৃশ মরকত ধারণ করা বিধেয় নহে। এই মণির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃষ। বৃষগ্রহ বিরূপ হইলে এই রত্নধারণে শুভ হয়।

ইহার লক্ষণ—

“শুকপক্ষনিভঃ স্নিগ্ধঃ কাস্তিমান্ বিমলস্তথা।

স্বর্ণচূর্ণনিভেঃ স্নৈম্মরকটেশ্ব বিন্দুতিঃ॥” ( অগ্নিপুঃ )

মরকত অর্থাৎ মরকত মণির বর্ণ শুকপক্ষীর পক্ষের সদৃশ,

স্নিগ্ধ, লাবণ্যযুক্ত এবং স্ননির্মল। ইহার অভ্যন্তর যেন স্ন স্বর্ণচূর্ণপরিপূরিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

“ইন্দ্রাযুধঃসর্গর্ভেন হরিতেন সমপ্রভম্।

কীরপক্ষসমচ্ছায়ং গরুড়োরঃ সমুদ্রবম্।

লক্ষং মরকতং কাস্তং নলিকাগ্রনলপ্রভম্॥” ( মানসোদ্যোত )

ইন্দ্রধনুর গর্ভস্থ হরিবর্ণের ন্যায় বর্ণ, নীলকণ্ঠ বা ময়ূর পক্ষীর ন্যায় কাস্তিবিশিষ্ট, মনোহর ও কমলীয় কাস্তি, এই মণি গরুড়ের বক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহা নলিকা নামক তৃণের অগ্রভাগের প্রভার ত্রায় স্ন ও প্রভাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণের ৭১ অধ্যায়ে এই মণির উৎপত্তি, আকর, ছায়া, দোষ, পরীক্ষা ও মূল্যাদির বিষয় নির্ণীত হইয়াছে।

[ বিস্তৃত বিবরণ পান্না শব্দে দেখ ]

মরকতপত্নী ( ক্লী ) মরকতমিব পত্রং যন্তাঃ ভীষ, তদ্বর্ণ-সাদৃশ্যদেবাতান্তথাঃ। পাটী নামক পত্রশাক ( রাজনিং )

মরকতময় ( ক্লী ) পান্নাযুক্ত।

মরকাস্তার, একটা প্রাচীন নগর। ( অযোধ্যা-মহাভাষ্য )

মরকত ( ক্লী ) মরকত পৃষোদরাদিত্যং সাধুঃ। মরকতমণি।

মরগ্রাম, বীরভূম-জেলার রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা° ২৪° ৮' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৫৩' ৩০" পূঃ। রামপুরহাট হইতে ৪ মাইল দক্ষিণপূর্বে এবং বহরমপুরের ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই নগরপার্শ্ব দিয়া ঘরকা নদী প্রবাহিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয় এবং রেশমের ধুতী ও সাড়ী প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইয়া থাকে।

মরখোরা, উঃ পঃ প্রদেশের ললিতপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। যামিনী নদীর তীরে অবস্থিত।

মরঙ্গবরু, ( বরাগাই ) বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটা পাহাড়। অক্ষা° ২৩° ৩২' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২৯' ২৫" পূঃ। হাজারিবাগ ও লোহারডাঙ্গা জেলার সীমান্ত দেশে অবস্থিত। এই পর্বত দামোদরনদীর উপত্যকা হইতে ২৪০০ ফিট ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৪৫ ফিট উচ্চ।

মরণ ( ক্লী ) স্মৃত্যন্তেহনেতি মৃ-করণে লুট্। ১ বৎসনাত নামক বিষ। ( রাজনিং ) ভাবে লুট্। ২ বিজাতীয় আত্ম-মনঃসংযোগধ্বংস, পর্যায়—পঞ্চদ্ব, কালধ্বংস, দৃষ্টান্ত, প্রলয়, অত্যয়, অন্ত, নাশ, মৃত্যু, নিধন, ভূমিলাভ, নিপাত, আত্মারক্ষ, মৃত্যু, কীর্তিশেষ, মহানিভ্রা, মহাপথগম, সংস্থান। ( জটধর )

মরণের বিষয় দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—আত্মা অজর ও অমর, শাস্ত্রসিদ্ধান্তবাক্যে কাহারও মতবৈধ

মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরায়িজে ভয়ে।

উৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।

বন্ধনে চ তথা ঘোরে পঠেং ত্রোত্রং সমাধিতঃ॥

( বিবসারোদ্ধারতন্ত্রে আপদুদ্ধারক )

গ্রহবজ্রঃ শান্তিকৈশ্চ কিং স্নিত্তি নরা বিজ।

মহাশাস্ত্রিকরঃ ঐশ্বামন্তলস্যা পুজিতো হরিঃ।” ( জ্যোতিষতত্ত্ব )

নাই। ইহা যদি স্থির হয়, তাহা হইলে মরে কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলে জন্ম, জীবন ও মরণ এই তিনেরই মীমাংসা হইয়া যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'নায়ং হস্তি ন হন্ততে' আত্মা কাহাকেও মারেন না এবং নিজেও মরেন না। কারণ 'মরণ' নামক কোন দ্রব্য পদার্থ নাই। যে ঘটনাকে আমরা মরণ নামে অভিহিত করিয়া থাকি, তাহার প্রতি একটু বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, মরণ কি? কতকগুলি তৃণ, কাষ্ঠ ও রজ্জু প্রভৃতি অবয়ব একত্র করিয়া একটা অবয়বী (গৃহাদি) নির্মাণ করিলে, জল বায়ু ও মৃত্তিকা আহরণ করিয়া অত্র একটা অবয়বী (ঘটাদি) প্রস্তুত করিলে, ক্ষিতি, জল ও বীজ একত্র হইল, তাহাতে অঙ্গুর জন্মিল, এতদ্বারা জন্মের সূচনাই করা হইল। কারণ পূর্বে গৃহের জন্ম ছিল না। তৃণ, কাষ্ঠ বা রজ্জু সহযোগেই তাহার উৎপত্তি বা বিকাশ ঘটিল স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে মরণ যে কি? তাহা অনুধাবন করিতে গেলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে এই সকল পদার্থের স্বজাতীয় সংযোগের পর বিজাতীয় ধ্বংসের নাম মরণ। যে কতকগুলি তৃণ, কাষ্ঠ ও রজ্জু প্রভৃতি অবয়ব একত্র করিয়া একটা অবয়বী (গৃহাদি), নির্মাণ করিলে, জল, বায়ু ও মৃত্তিকা আহরণ করিয়া অত্র একটা অবয়বী (ঘটাদি) প্রস্তুত করিলে, ক্ষিতি, জল ও বীজ একত্র হইল, তাহাতে অঙ্গুর জন্মিল, তাহা হইতে শাখা-পল্লবাদি উৎপন্ন হইল, বলিলে,—বৃক্ষ জন্মিয়াছে। কিছু দিন পরে সে সকলের যে সকল অবয়ববিশিষ্ট হইল, অথবা সে সকল অবয়বের সংযোগ বিধ্বস্ত হইল, বলিলে কি না,—গৃহভগ্ন হইয়াছে, এবং বৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, কিরূপ ঘটনার উপর তোমরা ভয়, ধ্বংস ও মরণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছ। বলিতে কি, অবয়বের শৈথিল্য, বিকার অথবা সংযোগধ্বংস, এই অস্ত্রতমের উপরেই মরণাদি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তবে উহা নির্জীব পদার্থ হইতে উঠাইয়া সজীব পদার্থে আনয়ন কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, জীবন্ত পদার্থের মরণ কি? জন্ম, মরণ আর কিছুই নহে, অবয়বের অপূর্ণ সংযোগভাব জন্ম এবং তাহার বিয়োগভাব মরণ। 'মৃত্যুরত্যন্তবিস্তৃতিঃ' মরণ ও আত্যন্তিক বিস্মরণ সমাম কথা। যে কারণকূট জীবকে দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, সেই কারণকূট বা সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইলে আত্যন্তবিস্মরণ বা মহাবিস্মরণ নামক মরণ হয়।

মরণ হইলে দেহাদির অত্র প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। অতএব অবয়বসকলের অপূর্ণসংযোগের নাম জন্ম এবং বিয়োগ-

বিশেষের নাম মরণ। এইজন্ত সাংখ্যাচার্য্যেরা ইহার লক্ষণ নিম্নোক্তরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,

“অপূর্ণদেহেজ্জিরাতিসংঘাতবিশেষেণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ” ইহাতে অবধারণ করা যাইতে পারে যে, মরণ সাবয়ব বস্তুরই হয়, নিরবয়ব বস্তুর নহে। নিরবয়বের অবয়ব নাই, সুতরাং মরণও নাই। আত্মা নিরবয়ব; সেজন্ত আত্মার মরণ নাই। নিত্যাত্ম হস্ত ও নিরবয়ব ইজ্জিগণেরও মরণ নাই।

আত্মা মরে না, ইজ্জি মরে না, এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে, আমি মরিব, আমি মরিলাম, এইরূপ না বলিয়া দেহ মরিয়াছে, দেহ মরিবে, এইরূপ বলাই ত উচিত! কিন্তু, কৈ কেহই ত সেরূপ বলে না। না বলিবার কারণ কি? কারণ,—লোকে এই দৃষ্টমান সংঘাতের অর্থাৎ দেহ, ইজ্জি, প্রাণ, মন এই সকলের সম্মিলন তাবের বিনাশ লক্ষ্য করিয়াই মরণ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংসই উক্ত শব্দের প্রধান লক্ষ্য। প্রাণ-ব্যাপার নিবৃত্ত না হইলে অস্ত্রগুলির সম্বন্ধ নিবৃত্ত হয় না। 'জীবন' 'মরণ' এই শব্দদ্বয়ের ধাতব অর্থ অন্বেষণ করিলেও কথিত অর্থ প্রতীত হয়। জীব ধাতু হইতে জীবন ও মৃ ধাতু হইতে মরণ। জীব ধাতুর অর্থ প্রাণধারণ ও মৃ ধাতুর অর্থ প্রাণপরিচ্যোগ; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণ যতরূপ দেহেজ্জিরাতিসংঘাতে সম্মিলিত থাকে, ততরূপই তাহার জীবন এবং তাহার বিচ্ছেদ হইলেই মরণ। কাজেই বলিতে হইবে, মরণে আত্মার বিনাশ হয় না, দেহের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হয় মাত্র। জন্মতেও নূতন আত্মা হয় না, নূতন শরীর উৎপন্ন হয় মাত্র। আমি মরিলাম বা অমুক মরিল এ সকল শব্দের অর্থ ঔপচারিক। আত্মার অধ্যাস থাকাতেই দেহাদিসংঘাত অহংপ্রত্যয়গম্য হয় এবং সেই কারণে সেই সেই প্রকারের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংস যথার্থ মরণ।

জীব জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কার্য্যে আসক্ত হইতেছে, অসংখ্য প্রকার জ্ঞান মাথায় করিয়াছে। সে সকলের সংস্কার হস্তশরীরে পর পর উপলিপ্ত হইয়াছে। জরা উপস্থিত হইয়াছে, জীর্ণবস্ত্রের ছায়া বা সর্পের নির্দোষ-ত্যাগের ছায়া পুনরায় জরা জীর্ণদেহের পরিবর্তন আবশ্যক। আর আয়ু নাই, মরণকাল উপস্থিত, যে বাহু বায়ু এতদিন শরীরবায়ুকে অগ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, যে বাহু-তেজ দৈহিক তাপ সমান রাখিয়া আসিয়াছে, সে বায়ু ও সে তেজ এখন শরীরবায়ুর ও শরীরতেজের প্রতিকূল।

এই কারণে এখন ভূক্তভবের বখাখণ্ড পাক ও রসরক্তাদির উৎপত্তি ও সংকরণ অবরুদ্ধ হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া লোকে স্থির করিল, মুমূর্ষুকাল উপস্থিত। অবিলম্বে শরীর ও বাহ্যভেদ উভয়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল। অমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়িল। এই সময় মুখ্য প্রাণ আপনার বৃত্তি গুটাইয়া লইলেন ও বলবৎ বেগধারণ করিলেন। শ্বাসোচ্চ্বাস বৃদ্ধি পাইল, তখন শ্বাস বা টান চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে টানিতে লাগিল, তাহারও আপন আপন স্থান ত্যাগ করিয়া প্রাণে আসিয়া মিশিল। তখন মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়-ময় সূক্ষ্মশরীর সঙ্কোচ করিয়া লইয়া স্ব স্থান নাভি পরিত্যাগ করিয়া কর্ণে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাণ এই স্থানে থাকিয়া চিত্তকে আকর্ষণ করিল, চিত্তও স্থানচ্যুত হইল এবং প্রাণে আসিয়া মিশিল। এই অবকাশে মুখ্য প্রাণ স্বীয় উদ্গমন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চৈতন্যবিধি সূক্ষ্মশরীর লইয়া বহির্গত হইল; তখন বাটুকৌশিক বা স্থূল শরীর পড়িয়া রহিল। ইহাই মৃত্যু।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, নাভি, মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার, পায়ের বুদ্বাঙ্গুলি ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই কএকটি স্থান প্রাণনির্গমনের দ্বার। যে স্থান দিয়া জীবের প্রাণ নির্গত হয়, সে স্থান কোন এক বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হয়। চক্ষু দিয়া নির্গত হইলে চক্ষু শিথিল হইয়া থাকে, মুখ দিয়া নির্গত হইলে মুখ ফাঁক হইয়া যায়। লিঙ্গ দিয়া নির্গত হইলে লিঙ্গচ্ছিন্ন বিচ্ছারিত হয়। উত্তম জন্ম হইবার হইলে উর্দ্ধচ্ছিন্ন এবং অধম জন্ম হইবার হইলে অধম ছিদ্র দিয়া প্রাণবায়ু নির্গত হয়। উর্দ্ধ-চ্ছিন্নের মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রই শ্রেষ্ঠ এবং অধমচ্ছিন্নের মধ্যে পাদাঙ্গুলি সর্বাঙ্গাপেক্ষা অধম। ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া প্রাণত্যাগ হওয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি এবং পাদাঙ্গুলি দিয়া প্রাণবহির্গত হওয়া নরকগমনের লক্ষণ।\* শিরশ্ছেদ ও বজ্রপতনাদি দ্বারা হঠাৎ মরণ হইলেও কথিত প্রকার নিয়ম প্রতীপালিত হয়। কিন্তু ইহা অতি শীঘ্র নির্বাহ হইয়া যায়। একরূপ শীঘ্র, যেন সমস্ত ক্রিয়াগুলি একযোগেই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

\* মরণের পূর্বে অন্তর্জলী করিয়া তাহাতে পায়ের বুদ্বাঙ্গুলি টিপিয়া রাখিবার এবং গুণবানের নাম শুনাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, মৃত্যুর সময় প্রাণ পাদাঙ্গুলি দিয়া বাহির হইলে জীবের অধোগতি হয়, এই জন্তই বোধ হয়, এরূপ পাদাঙ্গুলি টিপিয়া রাখা হয়, কিন্তু পাদাঙ্গুলি টিপিয়া রাখিয়া কি হইবে? যাহার বৈশ্বকর্ম, তদনুসারে তাহার প্রাণ তত্তৎ স্থান দিয়া নির্গত হইবেই, শত চেষ্টাতেও তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

মুমূর্ষুর উত্তরাধিকারীরা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ঈশ্বরের নাম মুমূর্ষুর কর্ণ-গোচর করিতে চেষ্টা পায়। ঈশ্বরের নাম শুনাইলে যদি মুমূর্ষুর চিত্তে ঈশ্বরভাবের

মরণকালে স্থূলদেহ পতিত থাকে, কিন্তু তদেহের অর্জিত সংস্কার সূক্ষ্মশরীর অবলম্বনে বিজ্ঞান থাকিয়া যায়, বৃথা বিনষ্ট হয় না; সেই জন্তই মরণের পর তদেহের অর্জিত জ্ঞানকর্ম অর্থাৎ ধর্মাদি তাহার অভিনব অবস্থা উপস্থাপিত করিয়া থাকে। মৃত্যুসময় তদেহের পরিচিত সমুদয় বস্তু ভূলাইয়া দেয় এবং ভবিষ্যদেহ ও ভবিষ্যৎ দেহের ভোগ্য ও ভোগ্যসম্বন্ধীয় ভাবনা বিজ্ঞানে পর্যাবসিত করে। যত প্রকার যাতনা থাকুক, মরণসময় সর্বাঙ্গাপেক্ষা ভয়ানক। কোন প্রকার উৎকট রোগ হইলে, কি মুচ্ছাদি দ্রুত অবস্থা ভোগ হইলে তদ্বারা যেমন পূর্ণগতি জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পূর্ণাভ্যন্ত বিষয় ভুলিয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যুসময়ও মুমূর্ষুর বিজ্ঞান সমুদয় ভাব বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন করাইয়া অভিনব ভাবনার উত্থাপন করিয়া থাকে।

জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম করিয়াছে, বৈ-রূপ ধ্যান করিয়াছে, যেরূপ অভিনিবেশে নিমগ্ন থাকিয়া কাল যাপন করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অমূর্ত্য নূতন এক পরিবর্তন, নূতন এক ভাবনা উপস্থিত হয়, ইহার নাম ভাবনা-ময় শরীর। মরণের অব্যবহিত পূর্বে যাহার বৈরূপ দেহ হইবে, তদনুরূপ তাহার ভাবনাময় শরীর হয়। এই ভাবনাময় শরীর স্বাপ্ন-শরীরের অমূর্ত্য। ভাবনাময় শরীর হইলে পরে মৃত্যু হইয়া থাকে। কারণ, ভাবনাময় শরীরে জীব অস্ত্র দেহান্তর আশ্রয় করিলে পর এই স্থূল দেহ পড়িয়া থাকে, এইরূপ অবস্থার নাম মরণ।

এই ভাবনাময় দেহের নাম কেহ কেহ আতিবাহিক দেহ বলিয়া থাকেন। এই আতিবাহিক দেহ অতি অল্পকালস্থায়ী। মরণকালীন হৃৎকেন্দ্র বিষয় বিজ্ঞপ্তিরা এইরূপ লিখিত আছে,—

“মরণে যানি হৃৎখানি প্রাপ্তোতি শূণ্য তাত্ত্বি।

শ্লথগ্রীবাজিহ্বস্তোহথ ব্যাপ্তো বৈপথুন্য নরঃ ॥

মুহুরানিপরবশো মুহুরানিবল্যভিতঃ।

হিরণ্যধাত্তনয়ভাষ্যাত্ত্যগ্হাদিবু ॥

উদয় হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় কৃতার্থ হইবে। তাহার ভাবনাশরীর হয় ত দ্বন্দ্বভাবে রচিত হইবে। এ দেশে যে অন্তর্জলী করিবার ও নাম শুনাইবার রীতি আছে, তাহার মূল আর কিছুই নহে, যদি তাহার সঙ্গতি হয়। যদিও আশায় আশায় মুমূর্ষুর জ্ঞানঃ মুমূর্ষুকে ঈশ্বরের নাম শুনার ও অন্তর্জলী করিয়া তাহার পাদাঙ্গুলি চাপিয়া রাখে, কিন্তু রাখিলে কি হইবে? পূর্বের ধ্যান, পূর্বের অভিনিবেশ, পূর্বের অভ্যাস না থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরবিষয়ক ভাব শরীর ও আশাস্বরূপ প্রাণ বিনির্গত হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈশ্বকর্ম তদনুসারে প্রাণ নির্গত হইবে।





এতে কথং ভবিষ্যন্তীত্যতীত মমতাকুলঃ ॥  
 মন্থভিত্তিমহারোগৈঃ ক্রকটৈরিব দারুণৈঃ ।  
 শরৈরিবাস্তকস্ত্রোত্রৈশ্চিত্তমানাসু বন্ধনঃ ॥  
 বিবর্তমানতারাক্ষিহস্তপাদং মুহুঃ ক্ষিপন্ ।  
 সংস্রাম্যমাতাষোষ্ঠপুটো ধূরধুরায়তে ॥  
 নিরুদ্ধকশ্চৌ দোণৈরুন্নানখাসপীড়িতঃ ।  
 তাপেন মহতা ব্যাক্তস্থষাচার্ত্ততথা ক্রুধা ॥  
 ক্লেশাং ক্রান্তিমাপ্নোতি বাম্যাক্ষরপীড়িতঃ ।  
 ততশ্চ যাতনা দেহং ক্লেশেন প্রতিপত্ততে ।  
 এতত্তত্তানি চোগ্রাণি হুঃখানি মরণে নৃণাম্ ॥” (বিষ্ণুপুঃ ৬।৫অঃ)

জীব মৃত্যুকালে নিম্নোক্তরূপ হুঃখ অনুভব কারয়া থাকে।  
 ঈষা, হাটু ও হস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত কাঁপে,  
 বারংবার মুচ্ছা এবং কখন কখন অন্ন অন্ন জ্ঞানের  
 সঞ্চার হয়। সেই সময় আমরা এই ত্রৈলোক্য, ধনধান্য, পুত্র  
 ভাণ্ডা, ভৃত্য, গৃহ প্রভৃতি আমার অভাবে কি প্রকারে থাকিবে  
 এইরূপ মমতায় জীব আকুল হইতে থাকে। কঠোর করাততুল্য  
 মণ্ডভেদী মহারোগরূপ ঘরের নিদারুণ শরসমূহ দ্বারা দেহের  
 অস্থিধ্বংস সকল বিচ্ছিন্ন এবং নরনর্য ঘূরিতে থাকে। তালু  
 কঠ, ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন জীব যাতনায় কেবল বারংবার  
 হাত পা ছুড়িতে থাকে। ক্রমে দোষসমূহে নিরুদ্ধকঠ  
 হইয়া উচ্ছ্বাসের আশ্রয় নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়ে এবং  
 ক্রুধা ও তৃষ্ণার যাতনায় নিতান্ত ক্লেশ পাইতে থাকে। মরণ-  
 কালে প্রাণিগণের এই সমস্ত এবং আরও অনেক প্রকার  
 হুঃখ উৎপন্ন হয়।

পুণ্যবান্দিগের স্থপে এবং পাপীদিগের নানা প্রকার  
 ক্লেশে মরণ হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে স্মম্নো-  
 পাখ্যানে পুণ্যাত্মা ও পাপীদিগের মৃত্যুবিষয়ে বিশেষ বিবরণ  
 লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

৩ মরণজনক বস্তু।

“অগ্নিরাগঃ স্নিগ্ধো মূৰ্খঃ সর্পী রাজকুলানি চ।

নিত্যং পরোপসেব্যানি সত্ত্বঃ প্রাণেহরাণি যট্ ॥”

(গরুড়পুঃ ১১৪ অঃ)

অগ্নি, জল, স্ত্রী, মূৰ্খ, সর্প ও রাজকুল এই সকল সতত  
 পরোপসেবা হইলে মরণের কারণ হয়।

“অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোহপানস্ত কর্ষতি।

শশ্বিনা তু যদা ভিন্না তদৈব মরণং ধ্রুবম্ ॥” (বৈষ্ণবকনিঃ)

অপান বায়ু প্রাণবায়ুকে এবং প্রাণবায়ুও অপান বায়ুকে  
 কর্ষণ করে; এইরূপ উভয়ে পরস্পর কর্ষণ করিতে থাকিলে  
 যে সময় শশ্বিনী ভিন্না হয়, তৎক্ষণাৎ মরণ হইয়া থাকে।

মরণধর্ম্মান্ (ত্রি) মরণং ধর্ম্মং যন্ত। জীব, বাহার মৃত্যু  
 অবশ্যজ্ঞাবী, মরণশ্রভাব।

মরণান্ত (ত্রি) মরণং অন্তো যন্ত। মরণ পর্যন্ত, মরণাবধি।  
 মরণান্ত-কপ্। মরণান্তক, মরণ পর্যন্ত।

মরণোত্তর (ত্রি) মরণাহুত্তরঃ। মরণের পর।

মরত (পুং) মৃ-গতো (ভৃমৃদৃশিবজ্যোতি। উণ্ ৩।১১০)  
 ইতি অতচ্। মরণ। (উজ্জল)

মরন্দ (পুং) মরণং মরণং ততি খণ্ডয়তি ভ্রমরাণাং জীবন-  
 হেতুত্বাৎ, দো-ক, যদা মরন্দ পুষোদাদিভ্যাং সাধুঃ। মক-  
 রন্দ। (শব্দরত্নাঃ)

“মাকন্দমুকুলত্বেন মরন্দশৃঙ্গিমন্দিরে।

কেলিতলে মুকুন্দেন কুন্দবৃন্দেন মণ্ডিতা ॥” (স্তবাবলী)

মরন্দক (পুং) মরন্দ স্বার্থে কন্। মকরন্দ।

মরন্দোকস্ (ক্ৰী) মকরন্দ স্থান, মোচাক।

মরম (দেশজ মন্ড শব্দজ,) হৃদয়ের সাক্ষ্যস্থান।

মর্ম্ম (আরবী) প্রস্তরভেদ (Marble)। (দেশজ) ২ মরণের  
 জন্ত গালাগালি।

মরবার, ভারতবর্ষের প্রাচীন অনাথ্য-জাতিবিশেষ।

মরহরা, উঃ পঃ প্রদেশের ইটা জেলার অন্তর্গত একটি নগর।

অক্ষাঃ ২৭° ৪৪' এবং দ্রাঘিঃ ৭৮° ৩৬' ৪৫" পূঃ। ইটা-নগর

হইতে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মরহরা নগরে মুসলমান

বাসিন্দা অধিক। নগরमध्ये তাহাদেরই বিশেষ প্রাতিপত্তি

দৃষ্টিগোচর হয়। নগরের ভিতর দিয়া একটা প্রশস্ত পাক

রাস্তা উত্তর দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে। নগরের দুই স্থানে

দুইটা বাজার আছে। সহরের সন্নিকটে সৈয়দদিগের বাসভূমি

‘মিয়ান্-কি-বস্তা’; হাজার চতুর্পার্শ্ব উচ্চ প্রাচীরপরিবেষ্টিত

এবং প্রকাণ্ড ফটক পরিশোভিত। এখন সৈয়দ শাহ বরকৎ

উল্লার সম্ভ্রামসম্মতিগণ উহা ভোগদখল করিতেছেন। উল্ল-

খিত সৈয়দ শাহের সমাধিমন্দির নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কর-

য়াছে। তুলা ও নীলের কারবার জন্ত এই নগর প্রসিদ্ধ।

এখানে মিউনিসিপালিটি আছে।

মর্ম্ম (আরবী) প্রলেপোষণ।

মরা (দেশজ) মৃত, গতাস্থ, মড়া। ২ হৃদয়াদি জীবস্থান।

মরাই (দেশজ) ধাত্তের গোলা।

মরাকালী (স্ত্রী) মরণ মরণহুঃখং অকতি প্রাপ্নোত্যনেতি

পক্ করণে ঘঙ্ স ইব অলতি প্রাপ্নোতীতি অন্ অচ্ গোরা-

দিভ্যাং জীষ্। বৃষ্টিকালী, চলিত বিছুটা। (রত্নমালা)

মরাঞ্চিয়া (দেশজ) মরাকে। বাহার পুত্র জন্মিয়া মৃত্যুমুখে  
 পতিত হয়।

মরাঠা, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ধারবাড় জেলার কৃষিজীবী-জাতিবিশেষ। মহারাষ্ট্রকেশরী প্রবলপ্রতাপাধিত শিবাজী ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজনাগণের সময় যখন মহারাষ্ট্র বিজয়-বৈজয়ন্তী উদ্ভান থাকে, তখন শত সহস্র মরাঠা ও ব্রাহ্মণ সেই রাজগণের অঙ্গন করিয়া ধারবাড়ে বসবাস করিয়া-ছিল। ধারবাড়ের বর্তমান মরাঠা জাতি সেই রাজ অঙ্গন-দিগের সন্তানসন্ততি।

ইহাদের মাতৃভাষা মরাঠী, কিন্তু ইহারা দেশস্থ অন্যান্য লোকের সহিত কণাড়ী ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত পুরুষের নামে, প্রত্যেক দেবনামীয় শব্দের পর জী ও রায় শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। জীলোক-দিগের নামে প্রায় ঐক্যে 'বাজে' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্বিন্ন সাধারণতঃ তাহারা ভৌন্সলে, চবান, দাকলে প্রভৃতি বংশাভিধানেও অভিহিত হয়। জেজুরির খাণ্ডোবা, পন্ডর-পুরের বিঠোবা প্রভৃতি ইহাদের প্রধান আরাধ্য দেবতা।

মরাঠাজাতি অত্যন্ত সাহসী, বলবান, শ্রমশীল, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান, দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। সাধারণতঃ ইহারা এক-তারা কাঁচা ঘরে বাস করে। ইহারা মিতাহারা, রুটী, ডাল, শাক সবুজী, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি ইহাদের আহাৰ্য্য। এতদ্বিন্ন পূজাপারোপণক্ষে মিঠান্ন, মাংস প্রভৃতিও ভোজন করে। ইহাদের মধ্যে মাদকদ্রব্যপান প্রচলিত আছে।

ইহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ তত সুদৃশ্য নহে। পুরুষেরা হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত পায়েজামা পরিধান করে, গায়ে জামা ও চাদর এবং মস্তকে পাগড়ি ব্যবহারই প্রচলিত। জীলোকে গা কাঁচুলী ধারণ করে বটে, কিন্তু কাপড় পরিয়া পুরুষের ন্যায় কাছা দেয় ও আঁচলে অঙ্গ ঢাকিয়া রাখে। জীপুরুষ সকলেই বিশেষরূপ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। মনোহর নানা রঙ্গের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ভাল বাসে। ধনশালী মরাঠাপত্নীরা কখনও সাধারণের সন্মুখে বাহির হয় না এবং যখন বাহির হয়, তখন হস্ত ও মুখ উত্তমরূপে আবৃত করিয়া বহির্গত হয়। মরাঠা রমণীগণ পুরুষের সংস্পর্শে পথে ঘাটে ভ্রমণ করিতে লজ্জা বোধ করে না।

মরাঠাগণ চাষ বাস এবং মজুরের কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জন করে। কেহ ব্যবসা বাণিজ্যে এবং কেহ বা গবর্নমেন্টর অধানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজকাব্য্য করিতেছে।

ইহাদের সাম্প্রদায়িক ব্যয় তত অধিক নহে। এক শত টাকার বিবাহ ব্যয় সম্পন্ন হয়। এই জাতি অত্যন্ত ধর্ম্মশীল। ব্রাহ্মণের প্রতি ইহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি আছে। হিন্দুর পালনীয় সমস্ত ব্রত-নিয়ম ও উপবাসাদি প্রতিপালন ইহারা

কর্তব্য কন্ম বলিয়া মনে করে। ইহারা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। মন্ত্রতন্ত্রে ইহাদের বিশ্বাস আছে। ষোড়শ সংস্কারের সমুদয়-গুলি ইহারা অগ্রহণ করে না। বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, মহালয়াপার্কণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রতিপালন করিতে দেখা যায়। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ এবং বহু-বিবাহ প্রচলিত আছে। জাতীয় মোহাদি ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপ বিস্তারিত। সামাজিক বিবাদবিসম্বাদ জাতীয়পঙ্কায়ত দ্বারা মীমাংসিত হইয়া থাকে।

মরাঠানালা, বর্গী নামক মহারাষ্ট্র দম্বাদিগের উপস্রব-নিবা-রণার্থ কলিকাতার দক্ষিণ ও পূর্বসীমায় কাটাখাল। ইংরাজ ইতিহাসে ইহা মরাঠা-ডিচ (Maratta Ditch) নামে প্রসিদ্ধ। আলীপুরের জেলের সন্মুখে আদিগঙ্গায় মরাঠানালা মোহানা এবং সাঁকারিপাড়া প্রভৃতি ভবানীপুরের পল্লীবিশেষে এখনও খাত দৃষ্ট হয়। শ্রামবাজার প্রভৃতি উত্তর-কাল-কাতাংশে খাত বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতাকে একটি পৃথক্ প্রেসিডেন্সী বলিয়া ঘোষণা করেন। কলিকাতার আঁঠানে যত্নপর কোম্পানীর কর্মচারিগণ, প্রকারান্তরে কলিকাতার কত্তা হইলেও লণ্ডনের কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরের নিকট আপনাপন কৃতকার্য্যের হিসাব দিতে বাধ্য ছিলেন। ১৭১৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তা কতৃক নানারূপ নিপীড়িত হইয়া কলিকাতা কাউন্সিল দিল্লীর সত্রাণ্টের নিকট হইতে তাহাদের অধিকার ও ক্ষমতা সকল পুনর্ব্বার বন্ধমূল করিয়া লইলেন। এতদ্বিন্ন হুগলি নদীর উভয় পার্শ্বে ৮৮ খানি গ্রাম খরিদ করিবার অমুমতিও এই সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মরাঠাগণ দক্ষিণবঙ্গে একরূপ অত্যাচার, উৎপাত ও লুণ্ঠনাদি করিয়াছিল যে, গ্রামবাসিগণের বসবাস করা একে-বারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই জন্ত স্থানীয় বাগিন্দাগণ অশ্ব-বোহী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্তের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্ত কোম্পানির সীমানার চতুঃপার্শ্বে নিজ নিজ বায়ে একটি খাল খনন করিবার অমুমতি পাইয়াছিল। এই খাল অন্ধ-চক্রাকারে সূতানটা ইহতে দক্ষিণে গোবিন্দপুর পর্যন্ত ৭ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। ইহার ৩ মাইল খনন কারিতে প্রায় ৬ লাখ টাকা ব্যয় ; এ সময় মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয় দূরীভূত হওয়ার আর এ খালের প্রয়োজন হইল না, সুতরাং মরাঠা-নালা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। অত্যাগি সেই অবস্থায় আছে।

মরাঠিস্তা, বঙ্গদেশের মধ্যবর্তী তিস্তানদীর গুরু খাত।

মবাতোব (আরবী) সম্মান।

মরাধার (দেশজ) যাহার ধার নাই। ভোঁতা।

মরামর্নাই, আনামে প্রবাহিত একটি নদী। মরামর্নাই শব্দের অর্থ মরা অর্থাৎ শুষ্কময় নদী। দাক্কা পাহাড় হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের লোহিতশাখার উপনদী গিচোলার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদী দরঙ্গ ও লক্ষ্মীপুর জেলার সীমা নির্দেশ করিতেছে।

মরামাস (দেশজ) শুক মাংস। রোগাদির পর মৃতকের উপর চুলের গোড়া হইতে যে সকল মাংস উঠিয়া থাকে।

মরাম্মত (আরবী) জীর্ণসংস্কার। (মেরামত)

মরাম্মতা (আরবী) জীর্ণ সংস্কারের কার্য।

মরায় (পুং) একাধি বাগভেদ। (রূ) সামভেদ।

মরায়িন্ (ত্রি) শত্রুদিগের মারক।

“উপরতে রেবান্ মরায়ী এথতে” (শব্দ ১০।৩০।৪)

‘মরায়ী শত্রুগণঃ মারকঃ’ (সারণ)

মরায়ু (ত্রি) মরণলীল।

“তামে জরাধরং মরায়” (শব্দ ১০।১০৬৬) ‘মরায়ু মরণলীলঃ শরীরং’ (সারণ)

মরার (পুং) মরং মরণমলতি নিবারয়তীতি অল-অণ্, লশ্চ রৎ; শতরক্ষণস্থান। চলিত মরাই। (জটায়র)

মরারাম (পুং) দৈত্যভেদ। (কথাসরিংসা ৪৭।২০)

মরাল (পুং) মৃ-অলচ্। রাজহংস। (জটায়র)

“ভৈমীসমীপে স নিরীক্ষ্য যত্র তাধুলজাধুনদহংসলক্ষ্মীম্।

কৃতপ্রিয়াদুতামহোপকারমরালমোহজ্জটমানমূহে ॥

(নৈষধচরিত ৬।৭২)

২ কজ্জল। ৩ কারওব। ৪ তুরঙ্গম। ৫ বারিবাহ।

৬ দাড়িম্বিপিপ। ৭ খল। (সারণত) (ত্রি) ৮ মস্তণ।

মরাল, মস্তণিশেষ।

মরালক (পুং) মরাল ইব প্রতিকৃতিরিতি মরাল-কন্। কলহংস। (রাজনিং)

মরালিকা (স্ত্রী) সপ্তলা। মনসাবিশেষ।

(বৈয়াকরণিকটু)

মরাবর (মরব), ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তবাসী আদিম জাতি-বিশেষ। মহুরা, তিনেবেল্লী, রামনাদ ও শিবগঙ্গা জেলার ইহাদের বাস। নিকটবর্তী অন্যান্য জাতির সহিত ইহাদের আচার-ব্যবহার কিংবা আকৃতিপ্রকৃতির কোনরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না। ইহারা অত্যন্ত ছোট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ এবং অতিশয় সাহসী ও প্রমত্ত। শরীরের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। আকৃতি মধ্যম ব্রহ্ম অর্থাৎ বেশী লম্বাও নয় এবং বেশী খর্বও নহে। ললাট খাঁট, চক্ষু বড় বড় এবং কোটরগত। ইহারা জীলোকদিগের ন্যায় দীর্ঘ-কেশ রাখিয়া থাকে। রামনাদ ও শিবগঙ্গা জেলার জীলোকেরা

২৫।৩০ হাত লম্বা বস্ত্র পরিধান করে। একরূপ সূদীর্ঘ বস্ত্র জড়াইতে জড়াইতে পশ্চাদ্ভাগে আনিয়া বন্ধন করে।

ইহারা কাক ব্যতীত অন্যান্য সকল জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহপ্রথা বিস্ময়জনক। বর-কন্যার বয়সের পার্থক্য সত্ত্বে কোনরূপ লক্ষ্য রাখে না। এতদ্বিন্ন বিবাহসময়ে বরের সম্মতি অথবা উপস্থিতিরও আবশ্যক নাই। প্রতিনিধি স্বরূপ তাহার কাষ্ঠাসন আনিয়া বিবাহকার্য সম্পন্ন হইতে পারে।

ইহারা স্থানীয় দেবদেবীর পূজায় মদ, মাংস ও ফলমূলাদি উপকরণ দিয়া থাকে। এতদ্বিন্ন ভূত-প্রেতাদির পূজায় ছাগাদি পশুও বলি দেয়। ওলাউঠা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী উপস্থিত হইলে গ্রামস্থ সমস্ত লোক একত্র হইয়া নৃত্য-গীতাদি উৎসব করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে অনেককেই চৌকিদারের কার্য করে। ইহারা অতিশয় বিশ্বস্তভাবে প্রভুর কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ডাকাতি করিয়াও জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। ‘মরব’ শব্দের প্রকৃত অর্থ বীর। রামনাদ ও তিনেবেল্লাতে ইহারা সাধারণতঃ ‘দেবর’ ও ‘ঠবন’ উপাধিতে অভিহিত, ইহার অর্থ সৈন্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসিযুদ্ধের সময় মরাবরগণ ইংরেজ অথবা ফরাসিপক্ষ অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশ্বস্ততার সহিত যুদ্ধকার্য চালাইয়াছিল।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অসম্মান করেন, যে ‘মরাবর’ সিংহলদ্বীপের সন্নিহিত মহাদেশবাসী মরুলো জাতি। ইহারা শব্দ প্রস্তুত করিত। ইহাদের বিস্তৃত ইতিহাস জানা যায় না। খৃষ্ট-জন্মের ২০০ শত বৎসর পূর্বে ইহাদের রাজা কিরাত কুলভূষণ পাণ্ডুরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিধম হৃদ্যশাপন করিয়াছিলেন।

রামায়ণে দণ্ডকারণ্যবাসী আদিম অসভ্যগণই রাক্ষস নামে বর্ণিত হইয়াছে। টেলর সাহেব বলেন, ভারতের দক্ষিণ-প্রাচ্যবাসী এই অসভ্যজাতিদিগকেই বাহ্ম্যিক রাক্ষস ও বানর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; মরাবরদিগের আকৃতি, প্রকৃতি ও আহাৰ্যাদির উপর লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাহ্ম্যিকোক্ত রাক্ষস হইতে ইহাদের প্রকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু সাহেবের উক্ত মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ মহাভারতে মরাবরগণ ‘দাশেরক’ নামে খ্যাত।

মরি, পঞ্জাবের অন্তঃপাতী রাবলপিণ্ডী জেলার উত্তর-তহসীল। অক্ষা° ৩৩° ৪১’ ৩০” হইতে ৩৪° ৫’ ১৫” উঃ এবং দ্রাঘি°

৭৩° ১৫' হইতে ৭৩° ৩৮' পূঃ। এখানকার জঙ্গলাবৃত্ত শৈল-শিখরোপরি মরিচ স্বাভাবিক অবস্থিত।

মরিচ শৈলশৃঙ্গের চতুঃপার্শ্ব প্রাকৃতিক দৃষ্টসমূহ অতিশয় মনোহর। পাহাড়ের চারিদিক শাল, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত; তলদেশ শস্তপূর্ণ ও পশুচরাগে ভূষারাবৃত কাম্বীরের পর্কতমালা। দক্ষিণাংশের শৈলগুলি তত উচ্চ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে; কিন্তু ইহাদের উপরিস্থিত বৃক্ষ সমুদয় অতীব মনোরম। পাহাড়ের পার্শ্বদেশস্থ পল্লী ও কুটারগুলি অতিসুন্দর।

মার্গাণা নামক গিরিসঙ্কটে একটি মনোহর স্তম্ভ ও ঝরণা আছে। দিল্লী-অধিকারসময়ে সেনাপতি জন নিকলসনের মৃত্যু উপলক্ষে উল্লিখিত স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত ঝরণা-বারি পিপাসাতুর পথিকগণের তৃষ্ণা দূর করিয়া থাকে। মার্গা-নার নিকটে মরিগাহাড় চিত্রাপাহাড়ের সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই তহনীলের ভূ-পরিমাণ ২১০ বর্গ মাইল। এই স্থানে সর্বমুদ্র ৯৪টা নগর ও গ্রাম আছে। গম ও ধান্যাদি এখান-কার প্রধান শস্ত।

তহনীলের রাজস্ব ৭৬২০ টাকা। একজন সহকারী কমিশনার ও একজন তহনীলদারের প্রতি শাসনভার অর্পিত। ২টা দেওয়ানী ও ২টা ফৌজদারী আদালত এবং ২টা থানা এই তহনীলে বর্তমান।

**মরিচ** (ক্লী) ত্রিযুগে নশ্বতি প্লেয়াডিকমেনেনি মু-বাহল-কাং ইচ্। স্নানামখ্যাত বস্ত্রলাকার কটু দ্রব্যবিশেষ (Piper nigrum, Black Pepper)। চলিত গোলমরিচ। হিন্দী—মিরী, কালমরিচ; তৈলঙ্গ—মিমিয়লু, তামিল—মিলগু, মহারাষ্ট্র—মরিচ, কলিঙ্গ—মেশম্ব। সংস্কৃত পর্যায়—পবিত, শ্রাম, কোল, বল্লজ, উষণ, যবনেঠে, বৃতফল, শাকাস, ধর্মপতন, কটুক, শিরোবৃন্ত, বীর, কফবিরোধি, মূষ, সর্কহিত, কৃষ্ণ, বেলেজ, কোলক, বরিষ্ঠ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লঘু, প্লেয়নাশক, বাত, কৃমি ও হৃদ্রোগনাশক। (রাজনিং) পাকে স্বাদু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ ও শুক্রনাশক। (রাজবং)

**ভাবপ্রকাশ-মতে—**

“মরিচং বেলেজং কৃষ্ণমুষণং ধর্মপতনম্।

মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং বীপনং কফবাতজিৎ ॥

উষ্ণং পিত্তহরং রুক্ষং শ্বাসশূলকৃমীন হরেৎ।

তদাঙ্গং মধুরং পাকে নাতুষ্ণং কটুকং শুষ্কং।

কিঞ্চিৎকৃষ্ণং প্লেয়প্রসেকি তাদপিত্তলম্ ॥” (ভাবপ্রং)

২ ককোল। (রাজনিং) ৩ কতকফল। ৪ কুমরিচ,

XIV

লঙ্কামরিচ। (বৈজ্ঞানিকং) (পুং) ৫ মল্লবকবৃক্ষ, চলিত গন্ধতুলসী। (রাজনিং)

মরিচ ঝাল-মসলা মধ্যে গণ্য। ইংরাজিতে ইহাকে Pepper বলে। বাঙ্গালায় ইহা গোল মরিচ, কালমরিচ প্রভৃতি নামে পরিচিত। সাধা মরিচকে সফেদ মরিচ বা সা-মরিচ বলা হইয়া থাকে। হিন্দী—বেলজঙ্গ, মরিচাও, কলুঙ্গ, কালা মরিচ, গোল মরিচ।

ইহার সাধারণ গুণ—কটু, উষ্ণ, উষ্ণ, শুষ্ক, বায়ুনাশক। কবিরাজী মতে মরিচ সবিরাম জ্বরে, অজীর্ণ রোগে ও অর্শ রোগে বিশেষ উপকারী। ইহা পিপুল ও আদার সহিত একত্র ত্রিকটু নামে ব্যবহৃত হয়। কেশহীনতা এবং চর্মরোগে মরিচচূর্ণ মালিশ করিলে ফল দর্শে। হেকিমী মতে মরিচ বল-কারক ঔষধ। কৃষ্ণরোগে ইহা বাহিরে প্রয়োগ করা বাইতে পারে। দস্তরোগে মরিচচূর্ণ দ্বারা দস্তধাবন করিলে উপকার দর্শে। সর্পদষ্টস্থানে ইহার প্রলেপ উত্তেজক ও বিষনাশক বলিয়া ব্যাখ্যাত। অরজনিত দৌরল্যো, ওলাউঠার এবং মাথা-ধরা রোগে ইহা উত্তেজক বলিয়া গণ্য। গলার ভিতর ঘা, অর্শ ও চর্মরোগে মরিচ বাহিরে ব্যবহৃত করা যায়। বিস্ফোটকে মরিচ ঘসিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ—মরিচে রজন, চকিঁতৈল এবং তৈল এই তিনটি পদার্থ আছে। তন্মধ্যে রজন আছে বলিয়াই ইহার একরূপ উগ্র (কাল) আশ্বাদ।

যুরোপে অতি প্রাচীন কাল হইতে মরিচ মসলা ও ঔষধ-রূপে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে মরিচ মসলারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য অনাবশ্যক।

মরিচের চাস।—মরিচ গাছ লতার ঝায়। অনেককাল জঙ্গল-ভূমে আপনা হইতে এই গাছ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। গঞ্জাম ও মাদ্রাজ প্রদেশে বিনা চাসে প্রচুর পরিমাণে মরিচ জন্মিয়া থাকে। আসাম ও মলবার-জঙ্গলে মরিচ জন্মে। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ-ভারতের উষ্ণপ্রধান জলসিক্ত জমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতে যুরোপের সহিত ভারতের মরিচের ব্যবসা চলিয়া আসিতেছে। এই বাণিজ্য রক্ষাকল্পে বহুকালাবধি দক্ষিণভারতের পশ্চিমাংশে পর্যাপ্ত পরিমাণে মরিচ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুমাত্রা, শ্রাম, এবং মলয়-উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও মরিচের চাস আছে; কিন্তু ইহার মধ্যে মলবারের মরিচ সর্বাধিক উৎকৃষ্ট।

জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার অনতিপূর্বে মরিচ গাছের কলম বা কাটা ভাল রোপিত হয়। যে সমস্ত বৃক্ষের কল

অসমান অথবা কণ্টকপূর্ণ সেই সকল গাছের তলদেশে প্রায়ই চারা বসাইয়া থাকে। কারণ তাহা হইলে মরিচলতা বৃক্ষগাছে দৃঢ় সংলগ্ন থাকিতে পারে। গাছ ২০৩০ ফিট পর্যন্ত লম্বা দেখা যায়, কিন্তু কাটিয়া ও ছাটিয়া দেওয়ার এত লম্বা হইতে পারে না। গাছের চতুর্দিক পরিষ্কার রাখা আবশ্যক, যেন অন্য কোন ঝোপলা গাছ না জন্মিতে পারে। ৩ বৎসর পরে মরিচ জন্মিতে আরম্ভ করে। এক এক ডালে প্রায় ২০ হইতে ৫০ গুচ্ছ পর্যন্ত মরিচ হইয়া থাকে। ৩ বৎসর পর্যন্ত গাছ বাড়ে, অ৪ বৎসর কাল সমভাবে থাকে, ইহার পর গাছ মরিচে আরম্ভ করে। অনন্তর পুরাতন গাছ কাটিয়া নূতন গাছ লাগান হয়। সবুজবর্ণ মরিচ লালবর্ণ হইতে আরম্ভ করিলেই সংগ্রহ করিয়া তাহার পরদিনই হস্তে মর্দন করিয়া দ্রব হইতে ফল বিচ্যুত করিয়া সূর্য্যের কিরণে অথবা নামাস্ত্র অগ্নির উত্তাপে শুক করা হয়। শুক মরিচ জলে নোত করিয়া খোলা ছাড়াইয়া সাদা মরিচ প্রস্তুত হয়। সময় সময় ইহা ক্লোরিন গ্যাস দ্বারা পরিষ্কার করা হইয়া থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ডাক্তার রক্সবার্গ (Roxburgh) সমুলকোটর উত্তরে পার্শ্বপ্রদেশে বহু মরিচ-গাছ দেখিয়া তথায় উহার চাষ আরম্ভ করেন এবং ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে তাহার প্রাপ্ত মরিচ-বাগানে অনূন পঞ্চাশ হাজার চারা উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

মরিচের দুই প্রকার ফুল হইয়া থাকে; যথা—স্বীকৃতীয় ও পুরুষজাতীয়। স্বীকৃতীয় ফুল হইতে যে মরিচ উৎপন্ন হয়, তাহার বাল তত উন্নত নহে।

বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীতে কেবল কণাড়া জেলার মরিচের চাষ হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে শুপারি বাগানে মরিচের চারা লাগান হয়; এক একটা শুপারি গাছের নিকট ৪টা করিয়া প্রোথিত হইয়া থাকে। চারাগুলির মূল মাটিতে পুতিয়া অগ্রভাগ গাছের গায়ে হেলাইয়া দেওয়া হয়। পরে বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র গাছের ডাল বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক।

সচরাচর তিন প্রকার বিভিন্ন জাতীয় মরিচ দেখা যায়, যথা, করিমলীসক, শাঘর এবং আখিন-মার্তিগ। এই তিন প্রকার মরিচের মধ্যে গুণের কোন পার্থক্য দেখা যায় না; কিন্তু প্রকারভেদে মরিচ অন্নবিস্তর জন্মিয়া থাকে। প্রথমোক্ত মরিচ সর্বাঙ্গাৎ অধিক পরিমাণে জন্মে, কিন্তু এই মরিচ উৎপন্ন করা সর্বাঙ্গাৎ হুঃসাধ্য। ক্ষেত্রে রীতিমত চাষ না হইলে ফসলের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায় এবং মরিচের গুণও উৎকর্ষাক্ষেত্র মরিচ হইতে কম হইতে থাকে।

পুরাকাল হইতে যুরোপের সহিত পূর্বদেশের মরিচের বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে মধ্যযুগে ইহার অতি-শয় সমুন্নতি হইয়াছিল। স্ক্রিকিয়ার ও হনবুরীর ভৈষজ্যতত্ত্ব নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, খৃষ্টজন্মের ৪ শত বৎসর পূর্বে মরিচ জন-সমাজের ব্যবহার্য্য জিনিস মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহার ব্যবসা সম্বন্ধে কোতুহলজনক বিবরণও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এরিয়ান্ কৃত পেরিপ্লাস-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, নীলকুণ্ডা (বর্তমান মলবারতীরস্থ অন্তরীপ) হইতে মরিচ রপ্তানি হইত। যাহা হউক, মধ্যকালে মরিচের ব্যবসা যে অত্যন্ত মঙ্গলার অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক ছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্বকালে রোম ও ইংলণ্ডে মরিচের উপর শুক আদার করা হইত। ২য় হেনরীর রাজত্বকালে মরিচব্যবসায়ীদের একটা সমিতি সংস্থাপিত হয়। পরে ঐ সমিতি ‘গ্লোসারস্ কোম্পানি’ নামে অভিহিত হয়। মধ্যকালে মরিচের দর অত্যন্ত অধিক ছিল; কারণ ইজিপ্তের মধ্য দিয়া তখন মরিচ লইয়া বাইতে হইত, এতদ্বিধকন ব্যবসায়ীদের অধিক শুক ও খরচা পড়িত। ইংলণ্ডে ১ পাউণ্ড মরিচের মূল্য ১ শিলিং ও খরচা পড়িত। ইংলণ্ডে ১ পাউণ্ড মরিচের মূল্য ১ শিলিং ছিল। এই নিমিত্ত ও অত্যন্ত কারণে পণ্ডগীজেরা ভারতবর্ষে আসিবার জন্য অল্প পথ আবিষ্কার করিতে। বঙ্গীল হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে তাহার এ বিষয়ে সফল-মনোরথ হইলে মরিচের মূল্য পূর্বাঙ্গাৎ অনেক কমিয়া যায় এবং মলয়-দ্বীপপুঞ্জে ইহার চাষ আরম্ভ হয়। অতঃপর মরিচের ব্যবসা পণ্ডগীজদিগের একরকম একচেটিয়া হইয়া উঠে। লিংসোটেনের বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই সময় পণ্ডগীজরাজ মলবার-উপকূলস্থিত প্রত্যেক হুগের লোকের সঙ্গে সুদৃঢ় নিয়মাধীন চুক্তিতে মরিচের কারবার করিতেন। এরূপ চুক্তিতে হুগের লোকদিগকে কঠিন নিয়মাবলি থাকিতে হইলেও তাহাদের এই সুযোগ ছিল যে, অন্য কেহ মরিচের চাষ করিতে পারিত না। এমন কি, করিলে তাহার প্রাণ-দণ্ড পর্যন্ত হইত।

বর্তমান সময়ে মলবারের একচেটিয়া ব্যবসা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ মলয়দ্বীপপুঞ্জ ও ইহার পূর্ববর্তী স্থানসমূহে মরিচ জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি দেখা যায় যে, এ বিষয় ভারতবর্ষ অত্যন্ত অনেক স্থানের নিরে পড়িয়া আছে। মিলবরণ বলিয়াছেন যে, ১৮২৯ খৃঃ অব্দে সুমাত্রায় ১৬৮০০০ পিকাল (১ পিকাল ১৩৩ পাউণ্ড) মলয়-উপদ্বীপে ২৮০০০ পিকাল। শ্রামোপমাগরকুলে ৬০০০ পিকাল। বর্ণিও দ্বীপে ১০০০ পিকাল এবং ভারতের

পশ্চিম তীরে কেবল মাত্র ৩০০০ পিকাল মরিচ জন্মিয়াছিল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে এদেশে মোট ২৭৫৭৬৭১০ পাউণ্ড মরিচ রপ্তানি হয়; তদ্ব্যতীত ট্রেট-সেটলমেন্ট হইতে ২৫০০০০০ এবং ভারতবর্ষ হইতে ২৫০০০ পাউণ্ড প্রেরিত হয়। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে এ অঞ্চল হইতে রপ্তানি মোট ২৮৫৫৫৩২৪ পাউণ্ড, তদ্ব্যতীত ট্রেট সেটলমেন্ট হইতে ২৮০৪১০২৬ পাউণ্ড।

**মরিচপত্রক** (পুং) মরিচ পত্রাণীষ পত্রাণি বভেতি বহ-  
ত্রীহৌ ক। সরলবৃক্ষ। (রাজনিং)

**মরিচসদৃশ** (পুং) ককোলবৃক্ষ। (বৈজ্ঞকনিং)

**মরিচাদ্যচূর্ণ**, চূর্ণৌষধ ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, দাড়িধবীজচূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন শুড় ১৬ তোলা এবং ববল্লার ১ তোলা মর্দন করিয়া উপযুক্ত মায়ায় প্ররোগ করিলে অতি দুঃসাধ্য কাস এবং যে কালে পুরাদি পর্য্যন্ত নির্গত হয়, তাহাও উপশমিত হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্নাং কাসাধিকার)

**মরিচাদ্যতৈল** (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। এই তৈল ব্লম ও বৃহত্তেজে দুই প্রকার। প্রস্তুতপ্রণালী—ব্লম মরিচাদ্যতৈলে কটুতৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, ককার্থ মরিচ, হরিতাল, মনছাল, মুখা, আকন্দ্রের আটা, করবীমূল, তেউড়ীমূল, গোময়রস, রাখালশস্যার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেব-দারু, রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং বিব ৮ তোলা লাগে। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হয়। এই তৈল ব্যবহার করিলে দক্ষ ও শিথিল প্রভৃতি সকল প্রকার কুষ্ঠ-রোগ আশু নিরাকৃত হয়।

**মরিচাদ্যতৈল**—কটু তৈল ১৬ সের, গোমূত্র ৬৪ সের, ককার্থ মরিচ, তেউড়ীমূল, দস্তিমূল, আকন্দ্রের আটা, গোময়-রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশস্যার মূল, করবীমূল, হরিতাল, মনছাল, চিতামূল, জশলাঙ্গলামূল, বিড়ঙ্গ, চাকুলেবীজ, শিরীষছাল, নিমছাল, ছাতিম-ছাল, সিজের আটা, গুলঞ্চ, সোঁদালপত্র, ডহরকরজবীজ, মুখা, খদিরসার, পিপুল, বচ, লতাকটকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ পল, বিব ২ পল। মৃতপাত্রে বা লৌহপাত্রে তৈলপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত এবং দেহের কমলীয়তা বর্দ্ধিত হয়। কুষ্ঠাধিকারে ইহা একটি অত্যাৎকৃষ্ট তৈল। প্রথম যৌবনে যে রমণীকে এই তৈলের নস্ত প্রদান করা যায়, বৃদ্ধাবস্থাতেও তাহার স্তন্যগুণ শিথিল না হইয়া পৌনঃপুনত অবস্থায় থাকে। এই তৈল দ্বারা গো অশ্বাদিরও বাতরোগ দূরীকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং কুষ্ঠরোগাধিং)

**মরিমন্** (পুং) স্মরিতে ইতি মৃ-(অনিমৃঙ, ত্যামিমনি।  
উৎ ৪।১৪৮) ইতি ইমনি। মৃত্যু। (উজ্জল)

**মরিয়া**, আসামবাসী মুসলমানজাতির শাখাবিশেষ।

**মরিয়াডিহি**, মধ্যপ্রদেশের দামোজেলার হট্টা তহসীলের অন্ত-  
র্গত একটা গওগ্রাম। অক্ষা° ২৪° ১৬' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭৮° ৪২'  
পূঃ। হট্টা নগরের ১০ মাইল উত্তরে যোগিন্দার-নালায় তীরে  
অবস্থিত। এখানে বারবারী নামক প্রাসাদ ও দুর্গ আছে।  
চক্রবর্তীর বুদ্ধেশ্বরাজগণ মরিয়াডিহি দর্শনকালে এই দুর্গ  
নির্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। এই গ্রামের  
নিকটে তাঁহাদের একটা রজালয় ছিল। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে  
হামিরপুর জেলার মধ্যবর্তী কিয়দংশ স্থানের পরিবর্তে তাঁহারা  
এই পল্লী ইংরাজহস্তে সমর্পণ করেন। এই স্থান দেশীয়  
মোটো কাপড়ের জন্ম প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন এখানে একটা থানা ও  
বিভাগালয় আছে।

**মরিয়াম্ উজ্জমানী**, মোগল-সম্রাট অকবর শাহের প্রধান  
মহিষী ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের মাতা। কচ্ছবহ-সদ্বার-  
রাজা বিহারী মন্ডের এই রূপবতী কস্তুর রূপলালসায় আসক্ত  
হইয়া সম্রাট তাঁহার পাণিপীড়ন করেন। জাহাঙ্গীরের  
রাজ্যকালে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রা-নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।  
জাহাঙ্গীর পিতার বিখ্যাত সিকন্দরার সমাধিমন্দিরের পাশে  
আপনার পুণ্যবতী জননীর সমাধিমন্দির নির্মাণ করাইয়া  
দেন। কেহ কেহ বলেন, অকবরশাহ প্রাণপ্রিয়া সহ-  
ধর্ম্মণীকে স্বীয় অভিলষিত সমাধিমন্দিরের পাশে কবর দিয়া  
ছিলেন। ঐ সমাধিমন্দির 'রোজা মরিয়াম্' নামে খ্যাত।  
সাধারণের নিকটে ঐ "রোজা মরিয়াম্" অকবর শাহের  
Maria or Mary নাম্নী খৃষ্টান্ মহিষী কবর বলিয়া  
পরিচিত।

**মরিয়াম্ মকানী**, সম্রাট অকবর শাহের মাতা, হমায়ুনের  
পত্নী এবং সেখ আব্দুল জামের প্রপৌত্রী। তাঁহার প্রকৃত নাম  
হামিদাবানো বেগম, মৃত্যুর পর মরিয়াম্ মকানী নামে  
বিখ্যাত হন। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে হমায়ুনের সহিত তাঁহার  
বিবাহ হয়। অকবরের জন্মের পর তিনি মক্কায় তীর্থযাত্রা  
করেন এবং তথা হইতে ৩ শত বলবান্ আরবী খোজা লইয়া  
দিল্লী রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাহাদিগের বাসের জন্ত  
জন্ত তিনি প্রাচীন দিল্লী-নগর্যাংশে হমায়ুন-মসজিদের পাশে  
১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আরবসরহাই প্রস্তুত করাইয়া দেন। ১০৬৩  
খৃষ্টাব্দে ৭৮ বর্ষ বয়সে আগ্রা-নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। হমায়ুন-  
মসজিদে তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

**মরিয়াছ**, উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের জৌনপুর জেলার দক্ষিণ-

তহসীল। মরিয়াহ পরগণাও যতদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই তহসীলও ততদূর ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহার প্রায় সমুদয় স্থানই সমতল, মধ্যে মধ্যে কতকগুলি সামান্য জলবিশিষ্ট ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। উত্তর-পশ্চিমকোণ হইতে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিতা বিশাহী নদী এই তহসীলকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তর-পূর্বাভিমুখে শাহী নদী অবস্থিত। জোনপুর হইতে মির্জাপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তা এই তহসীলের উত্তরদক্ষিণ দিক দিয়া গিয়াছে। এখান হইতে কাশী ও প্রতাপগড় বাহবার জন্য একটা কাঁচা রাস্তা আছে। ভূপরিমাণ ৩২৯ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ২১৫ মাইল মাত্র ভূমিতে আবাস হইয়াছে। কৃষকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কোএরি, আহীরা এবং চামার।

২ উক্ত তহসীলের একটা প্রধান সদর। অক্ষা. ২৫° ৩৬' ৮" উঃ এবং দ্রাঘি. ৮২° ৩৬' ৪০" পূঃ। মির্জাপুরের রাস্তার উপর, জোনপুর সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। মরিয়াহ সহরে একটা সুদীর্ঘ প্রধান রাস্তা আছে। এখানে জমির এত অভাব যে, গৃহের সন্নিকটস্থ স্থান পর্যন্ত চাস করা হইয়া থাকে। পুরাকালে এই স্থান তন্তুবায়াদিগের জন্ম বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে হারা অপরাপর স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। এই নগরে একটা তহসীল-কাছারী, দেওয়ানী আদালত, ইংরাজি বিজ্ঞানালয়, ডাকঘর, থানা ও সৈন্যদিগের আড্ডা আছে। মঙ্গলবার ও শুক্রবারে এখানে হাট বলিয়া থাকে।

মরিসস্, ভারত-মহাসাগরস্থ একটা দ্বীপ (Mauritius), পূর্বে হা ফরাসিদিগের অধিকারে ছিল এবং মরিসস্ নামের পরিবর্তে আইল-ডি-ফ্রান্স নামে অভিহিত হইত। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর এই স্থান ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের বসবাস হওয়ায় অনেক ক্রীতদাস লাভ করিয়াছে। জলবায়ুর প্রভাব ও মৃত্তিকার আদ্রতা হেতু এই স্থানে মরণকর নানা রোগের প্রভাব দেখা যায়। যে সকল দীন দুঃখী অল্পকষ্ট ভারতীয় কুলি মরিসস্ দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই অকালে জীবন হারাইয়াছে। রামায়ণোক্ত রাবণাহুচর মারীচ রাক্ষসের নামানুসরণ করিয়া এই দ্বীপ বাঙ্গালার 'মারীচসহর' নামে ঘোষিত হইয়াছে।

এই দ্বীপে ভারতমহাসাগরের অক্ষা. ২০° হইতে ২০° ৩৪' ৮" এবং দ্রাঘি. ৫৭° ২০' হইতে ৫৭° ৪৬' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা উত্তরদক্ষিণে ৩৮ মাইল এবং পূর্বপশ্চিমে ২৭ মাইল। ভূপরিমাণ ৭ শত বর্গ মাইল।

এখানকার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত। ১ ভারতীয় ঔপনিবেশিক, ২ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বা মুক্ত ক্রীতদাস-সম্প্রদায়, ৩ ফরাসী ঔপনিবেশিক এবং ৪ তদ্দেশের আদিম অধিবাসী।

এই দ্বীপের চতুর্দিকে সমান্তরাল মালাকারে বেষ্টিত উন্মুখ-প্রায় দ্বীপাবলী দৃষ্টিগোচর হয়। ভাটীর সময় উহাদিগের চূড়া সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ভূমির স্থায় সমুদ্রবক্ষে জাগিয়া থাকে; কিন্তু জোয়ারের জলে তাহা সমাক্রমে ডুবিয়া যায়। উক্ত প্রবালশৃঙ্গের কএকটা বর্তমানে দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে। মূলদ্বীপে উপস্থিত হইলে এই প্রবালশৃঙ্গের মধ্য দিয়া ১০।১২ বাক ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়।

মরিসস্ দ্বীপে কএকটা উচ্চশৃঙ্গ গিরিমালা দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের ত্রাবাণ্ট অন্তরীপের নিকটবর্তী শৈলমালায় শৃঙ্গ ৩ হাজার ফিট্ এবং উত্তর-পূর্বের লুই-বন্দরস্থ 'পিটার বোট' নামক পর্বতের শৃঙ্গ ২৬ শত ফিট্ উচ্চ। পর্বতগুলির প্রস্তরসমূহ পর্যবেক্ষণ করিলে প্রতীতি হয়, আয়ের পর্বতের অগ্ন্যাকীরণ জন্মই ঐ সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূমি-ভাগ সমধিক উর্বরা হইলেও জলময় খাতে পরিপূর্ণ।

পাক্তীয় ভূভাগে জাহাজ-প্রস্তুতকরণোপযোগী কোন-কাষ্ঠাদি পাওয়া যায় না। বহুবিভাগে একমাত্র ইবনি লৌহকাষ্ঠ ও লালকাষ্ঠ হইতে কতক পরিমাণ আয় হইয়া থাকে, কিন্তু তেঁতুল, নারিকেল, বাঁশ ও তুঁথফলের গাছ প্রভৃতি গৃহকক্ষে ও আলানি কাষ্ঠরূপেই ব্যবহৃত হয়।

কার্তিক হইতে প্রায় বৈশাখ পর্যন্ত এখানে নিরন্তর বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় সমুদ্র দ্বীপ-ভাগ জলময় থাকে। এইরূপ জলসিক্ত থাকায় তথাকার বায়ু স্বাস্থ্যের বিশেষ হানিকর হয়। এখানকার দারুণ গ্রীষ্মের উষ্ণতা ৮৭° F এবং অত্যধিক শৈত্যতা ৬০° F কম হয় না। বায়ু সাধারণতঃই দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী।

খাওয়ার জন্ত তথাকার অধিবাসিগণ ধাতু, গম, ছোলা, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য, বাঁটা দরসাম্বাদক মূল এবং নানাপ্রকার শাক সবুজ উৎপাদন করিতে শিখিয়াছে। উৎকৃষ্ট ফলের মধ্যে আম্র, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি প্রধান। এতদ্ব্যতীত এখানে প্রভূত পরিমাণে ইক্ষুর চাস হইয়া থাকে। ঐ ইক্ষুজাত চিনি ভারতবর্ষ ও যুরোপের নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। এই চিনি আমাদের দেশে মারীচসহরের চিনি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অশ্বগবাদি নাই বলিলেও চলে। তৃণাদির অভাবহেতু অশ্বস্থান হইতে আনিয়া পালন করিবার উপায়ও নাই। দেশ-বাসীর ব্যবহারের জন্ত কতকগুলি খচ্চর ও গর্দভ দেখা যায়।



ছাগ, ভেড়া ও শূকর যথেষ্ট আছে, উহা সাধারণের আহাৰ্য্য-  
মধ্যে পরিগণিত।

লুই বন্দর (Port Louis) ইহার প্রধান নগর। অক্ষা-  
২০° ৯' দঃ এবং দ্রাঘিঃ ৫৭° ২৯' পূঃ। দ্বীপের উত্তরপশ্চিম  
কোণের উপসাগর একটি ক্ষুদ্র সমুদ্র-কাঁড়ির মুখে অবস্থিত।  
কাঁড়ির মোহানার অদূরে টোনেলিয়ার দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত  
একটি প্রবালশৈল আছে। ঝটিকার সময় পোতাঙ্গি উহার  
মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীষণ বায়ুর আন্দোলন হইতে রক্ষা পায়।  
করাসী ও ইংরাজের ভ্রায় মুসল্য জাতির শাসনে থাকিয়া এই  
নগর সৰ্ব্ববিধে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই নগরের হুগ, সেনানিবাস,  
আদালত, বাজার, বিশ্ববিদ্যালয়, থিয়েটার, হাসপাতাল, ডক, ও পুস্তকাগার উল্লেখযোগ্য, এতদ্ভিন্ন মহে-  
বার্গ ও গ্রাওপোর্ট নামক ক্ষুদ্র নগরদ্বয়ে নানা দ্রব্যের  
বাণিজ্য চলিয়া থাকে। একজন গবর্নর ব্যবস্থাপক-সমিতির  
মতানুযায়ী হইয়া সিচিলিস্ দ্বীপপুঞ্জ সহ এই দ্বীপ শাসন  
করিয়া থাকেন।

বটেভিয়া, বোম্বাই, মুরাত, মফট, কলিকাতা, মাস্ত্রান,  
পারস্ত ও আরব্যোপসাগর-তীরবর্তী নগরসমূহ, আফ্রিকার  
পশ্চিম উপকূল, উত্তরাংশ অন্তরীপ, মাদাগাস্কার এবং সুদূর  
ইংলণ্ড ও মার্যচ সহরের চিনি প্রভৃতি নানা দ্রব্যের রপ্তানি  
হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এখানকার নীল, লবঙ্গ ও নানা প্রকার  
কাঠ বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। ভারত হইতে তুলা ও রেশম  
এবং ইংলণ্ড হইতে কার্পাসবস্ত্র, মস, তৈল, টুপি, লৌহ ও  
ইস্পাতের ব্যবহারযোগ্য পাত্রাদি এখানে আনীত হইতেছে।  
আরব ও পারস্তোপকূলবর্তী নগরে মরিসস্-চিনির কারবার  
আছে। চিনির পরিবর্তে এখান হইতে তাহার মেরু  
( শুক আত্ম, পেস্তা প্রভৃতি ) দ্রব্য লইয়া বাহিত। মাদাগাস্কার  
দ্বীপের সহিত একমাত্র খাদ্য ও গবাদি পশুর কারবার আছে।

১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিকদিগের দ্বারা মরিসস্ ও  
বোম্বাই দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা এই দ্বীপ  
অধিকার করিলেও, প্রকৃতপক্ষে এখানে উপনিবেশ স্থাপন  
করে নাই। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিক-সম্প্রদায় এই  
দ্বীপে আদিরা উপস্থিত হন। তাহারা আপনাদিগের প্রজাতন্ত্রের  
সম্পাদক মরিস্ (Maurice) সাহেবের নামানুসারে এই দ্বীপের  
মরিসস্ নাম রাখেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে তাহারা সৰ্ব্বপ্রথম  
গ্রাওপোর্ট নামক নগরে বাস করেন, কিন্তু স্থানীয় অস্বাস্থ্যতা-  
নিবন্ধন তাহারা ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য  
হন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে করাসীরা এই দ্বীপ অধিকারপূর্বক  
লুই বন্দরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। করাসীঅধিকারে এই

দ্বীপ ( Isle de France ) নামে অভিহিত ছিল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দ  
পর্য্যন্ত করাসীগণ এই দ্বীপের বাণিজ্যিক অপ্রতিভভাবে  
রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধি সন্ধে জামিন  
স্বরূপ এই স্থান ইংরাজকে সমর্পিত হয়। ( বৃহৎসং ১৪২৩ )  
মরীচ ( ক্রী ) সু-বাহুল্যং দৈচঃ। স্বনামখ্যাত কটুদ্রব্যবিশেষ,  
গোলমরিচ। [ মরিচ দেখ। ]

মরীচি ( পুং ) ত্রিযুক্তে পাপরাশির্দ্বিমিতি সু ( মুকনিভ্যা-  
মীচিঃ। উণ্ ৪।৩০ ) ইতি দ্বিচি, তপঃপ্রভাবানন্ত তথাৎ।  
মুনিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ মানস পুত্র। ইহার ভাৰ্য্যা  
কর্দমমুনিকল্পা কলা, পুত্র কশ্যপ ও পুণিমা। ( ভাগবত )

প্রতিদিন ইহার উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। সপ্তর্ষিদিগের  
মধ্যে ইনি সর্বপ্রধান।

২ নমুপুত্র। ( হরিবংশ ৩৮২ ) ৩ মরুগণের অন্ততম।

“মরীচিমরুতামশ্বিন নক্ষত্রাণামহং শলী।” ( গীতা ১০।২১ )

৪ প্রিয়ব্রতবংশীর সম্রাজের পুত্র।

“চিত্ররথাদুর্গায়াঃ সম্রাড্জনিষ্ট। ভতঃ উৎকলার্য্য

মরীচিমরীচৈর্কিন্দুমত্যাঃ বিন্দুমামুদপতত ॥”

৫ বট-ত্র্যসরেণু-পরিমাণ। ( ভাগবত ৫।১৫।৪-১৫ )

( পুং ক্রী ) ৬ কিরণ। ৭ মহর্ষিভেদ। ৮ দৈত্যভেদ।

“গর্ভং দধত্যকমরীচয়োহস্মাদ্বিগৃহ্মিত্রাম্রবতে বহুনি।”

( রঘু ১৩৪ )

( ক্রী ) ত্রিযুক্তে ইব দেবা যদর্শনাদিতি মু-দ্বিচি। ৯ অজ-  
রোবিশেষ।

“মরীচিঃ শুচিকা চৈব বিদ্রাঘর্গা তিলোত্তমা।

অধিকা লক্ষণা ক্ষেমা দেবী রক্তা মনোরমা ॥”

( ভারত ১।২৩।৫৯ )

ত্রিযুক্তে বারিভ্রমেণ জীবা বস্তাঃ, সু-অপাদানে দ্বিচি।  
১০ মরীচিকা।

“বেশ্য প্রেমণি সস্তাবো যদশ্বিন্ বৃধাতে স্বরা।

সত্যং ভবতি কিং আতু জলং মরুমরীচিমু ॥”

( কথাসরিংসাং ৫।৭।৯১ )

মরীচি, ১ শকরাচার্যের জনৈক শিষ্য। ২ জনৈক বিখ্যাত  
জ্যোতির্বিদ। নারদীরসংহিতায় ইহার উল্লেখ আছে। ৩ জনৈক  
পুরাণোক্ত প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পৌত্র। ৪ পুরাণোক্ত  
মুনিবিশেষ। ইহার ঔরসে সঙ্কতীর গর্ভে পৌর্ণমাস নামে  
এক পুত্র জন্মে। ৫ জনৈক সংহতাকার। ৬ উপপুরাণভেদ।  
মরীচিকা ( ক্রী ) মরীচিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্। যুগলুকা,  
স্বর্ধাকরণে জল-ব্রহ্ম। অতি দূরে প্রেত স্বর্ধাকরণদর্শনে  
পিপাসার্ত্ত যুগ জলভ্রমে তদভিমুখে ধাবমান হয়, যুগের এই-

রূপ ভ্রমকে মরীচিকা কহে। গ্রীষ্মকালে উৎকট রবিরশ্মি সিকতামূলে পতিত হইলে বালুকা উত্তপ্ত হইয়া দূর হইতে জলবৎ প্রতীয়মান হয়। যে ভ্রমে মৃগগণ জলভ্রমে ধাবিত হইয়া ভগ্নমনোরথ হয়, এইরূপ ভ্রান্তির নাম মরীচিকা। কেহ কেহ তীক্ষ্ণ স্বর্গ্যকিরণোত্তপ্ত বালুকাসংশ্লিষ্ট বায়ু হইতে উদ্ভূত বাষ্পরাশিকে মৃগতৃষ্ণা (Mirage) কহেন।

‘গ্রীষ্মে মরুদেশনিকতাদাবর্ককরাঃ প্রতিকলিতা দূর-স্থানাঃ জলভেনাভাস্তি তদ্বাচিকা মৃগতৃষ্ণা, উৎকট-রবিরশ্মি-জলকিতবাষ্পজালঃ মরীচিকা, দূরশূন্যে যন্ময়ুথৈর্জলমিব দৃশ্যতে ইত্যপরে’ (ভরত) মৃগের ধেক্ষপ মরুভূমিতে জল-ভ্রম হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানানু জীবের ভ্রমে এই জগদ্ভ্রান্তি হই-তেছে। [ মৃগতৃষ্ণা দেখ। ]

২ বৌদ্ধমতে জগদন্তরভেদ।

মরীচিগর্ভ (ত্রি) মরীচি আলোককণা গর্ভে যন্ত। ১ স্বর্ঘ্য।

২ জগৎভেদ। ৩ দক্ষসাবনি মন্বন্তরে দেবগণভেদ।

মরীচিতোয় (ক্লী) মরীচিকা, মৃগতৃষ্ণা।

‘স্বয়ং পরাভিধ্যানেন বিভ্রংশিতস্তিত্ত্বৈব মরীচিতোর-প্রায়াস্ত্রানেনবাভিধাবতি’ (ভাগবত ৫।১৪।১০)

মরীচিন্ (ত্রি) মরীচি অন্ত্যর্থে ইনি। ১ কিরণযুক্ত। (পুং) ২ স্বর্ঘ্য ও চন্দ্র।

মরীচিপ (ত্রি) ১ স্বর্গ্যরশ্মিপানে দেহধারী। ২ মরীচিপালক দেবতা।

‘দেবেভ্যাম্রা মরীচিপেভ্যঃ’ (শুক্লযজুঃ ৭।৩)

‘মরীচিপেভ্যঃ মরীচিপালকেভ্যঃ’ (বেদদীপঃ)

৩ ঋষিকুলবিশেষ।

মরীচিপতন (ক্লী) নগরভেদ।

মরীচিমৎ (ত্রি) মরীচি অন্ত্যর্থে মতৃপ্। মরীচিযুক্ত। কিরণ-যুক্ত। (পুং) ২ স্বর্ঘ্য।

মরীচিমালিন্ (ত্রি) মরীচিমালা অন্ত্যাপ্তি ইনি। মরীচি-মালাযুক্ত, চন্দ্র ও স্বর্ঘ্য। ২ কিরণমালাবিশিষ্ট।

মরীমুজ্ (ক্লী) পুনঃ পুনঃ মার্জনে দ্বারা পরিষ্কার করণ।

মরীমুশ (ত্রি) অমৃতভব-করণ।

মরীময়ি (ক্লী) হংরাজী Mary শব্দের অপভ্রংশ। রোমক-সিদ্ধান্তে যে মরীময়িপুত্রের উল্লেখ আছে, তাহা মেরিপুত্র খৃষ্টের নামান্তর বলায় অসম্মিত হয়।

মরু (পুং) ত্রিষতেৎস্মিতি মৃ (ভৃগুশীতি। উপ্. ১।৭) ইতি উ। ১ নির্জলদেশ, মরুভূমি।

‘মরুশ্চা গচ্ছ ভীকৃৎ সঃ সরস্বতী মরুন্ প্রতি।’

(ভারত ১৩.১৫৪।২৭)

২ পর্কত।

‘তদ্রাপশ্চাম বৈ সর্কে মধু পীতমমালিকম্।

মরুপ্রপাতে বিষমে নিবিষ্টে কুন্তস্মিন্তম্ ॥’ (ভারত ৫।৬৪।১৮)

৩ দাশেরক দেশ। পথ্যায় ধর্ম।

‘শাশ্বত কারকুণীয়া মরবন্ত দশেরকাঃ’ (হেম)

৪ মরুবক বৃক্ষ। (ভাবপ্রঃ) ৫ নিমিৎবাণীর হর্ঘ্যখপুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।১৫)

৬ স্বর্ঘ্যবাণীর ভাবীরাজবিশেষ। ভগবান্ কঙ্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া স্নেহদ্বিগকে নিধন ও মরুকে অবোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করেন। পরে বিশাখপুত্র রাজার কস্তার সহিত ইহার বিবাহ হয়\*।

৭ বসুদিগের অন্ততম। [ কঙ্কিদেব। ]

‘বাসবামুগতা দেবী জনন্যামাস বৈ স্তান।

মরুং বৈ প্রথমং দেবং দ্বিতীয়ং ধ্রুবমব্যয়ম্ ॥’

(হরিবংশ ১২৩।৪৭)

৮ নরকাসুরের সহচর অসুরভেদ। ৯ শীঘ্ররাজের পুত্র-ভেদ। ১০ মারবার রাজ্য ও তদ্রূপবাণী।

মরুক (পুং) ১ ময়ুরভেদ। ২ মৃগবিশেষ।

মরুকচ্ছ (পুং) দেশবিশেষ।

‘নেপাল-ভূমি-মরুকচ্ছ-সুরাষ্ট্র-মদ্রান্।’ (বৃহৎসং ৪।২২)

মরুকুচ্চ (পুং) দেশবিশেষ। ইহার পাঠান্তর মরুকুংস এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

‘বেণুমতী কঙ্কনুকা গুরুহা মরুকুংসচন্দ্ররক্ষাখ্যাঃ।’

(বৃহৎসংহিতা ১৪।২৩)

মরুকেশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ। (দ্বন্দ্বপুং নাগরং ১০২।১৩)

মরুকোট, দেশভেদ। (দ্বন্দ্বপুং নাগরং ১০২।৪)

মরুচীপট্টন (ক্লী) দেশভেদ।

‘কাকীমরুচীপট্টনচেধ্যাধ্যাকসিংহলা ঋষভাঃ।’ (বৃহৎসং ১৪।১৫)

\* “খগণাষ্মিষুতন্তুস্মাক্ষিরণ্যো নাভসংজিতঃ।

ভতঃ পুষ্পার্ণবন্তুস্মাদুললোহখাগ্রিবর্গকঃ।

ভস্মাৎ শীঘ্রাভবৎ পুত্রঃ পিতা মেহতুল্যবিক্রমঃ।

ভস্মাৎস্বয়ং মাং কেহপীহ বৃধশ্চাপি হসিতকম্।

কন্যাপগ্রামনাসাদ্য শিদ্ধি সন্তপসি হিতম্।

ভবাবতারঃ বিজায় ব্যাসাৎ সত্যবতীহতাৎ।

প্রতীক্য কালং লক্ষ্যাকং কালপ্রাপ্তত্বাশ্রিতকম্।

মরো। ভাস্মভিরেক্ষ্যামি নিগদাণ্যাপুরেহধুনা।

হৃদা স্নেহানথশ্রীষ্টান্ অগ্নাত্তবহিংসকান্।

বিশাখপুত্রপালতনয়ঃ বিনয়াঃ স্বভাষা।

বিবাহে ক্রচরাপাকীং স্তন্যদীং তাং প্রদাস্যতি ॥’ (কল্পিতপুং ১২৮০)

মরুজ (পুং) মরৌ নির্জলদেশে জায়তে ইতি জন-ড। ১ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ.) (স্ত্রী) ২ বংশাজুর। (বৈজ্ঞকরং) (ত্রি) ৩ মরুদেশজাত।

মরুজা (স্ত্রী) মরুজ স্ত্রিয়াং টাপ্। যুগেক্ষারু। (রাজনিং)

মরুজাতা (স্ত্রী) ১ কপিকচ্ছলতা, আলকুশী। ২ লবুকুহিরী।

মরুটা (স্ত্রী) উচ্চ-ললাটবুরু স্ত্রী। (শব্দরত্নাং)

মরুণ্ডা (স্ত্রী) উচ্চললাটা নারী। (ত্রিকাং)

মরুত (পুং) ত্রিযতে প্রাণিনো যদভাবাদিতি যু-বাহুলকাৎ উত। ১ বায়ু।

“তদেনাং মুখমরুতেন বিশদ্যাং করবাণি” (শকুন্তলা)

২ দেব। (ভরতযুত ব্যাভি) ৩ ঘণ্টাপাকুলিষক। (শব্দচং)

৪ যজুংগীয় রাজভেদ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ রাজর্ষি ছিলেন।

মিতেয়ুর পুত্র ও উশনার পৌত্র। ইহার কবলবহি নামে

এক পুত্র জন্মে। (লিঙ্গপুরাণ)

মরুৎ (পুং) ত্রিযতে প্রাণী যস্তাভাবাদিতি যু (মুগ্ধাকৃতি।

উণ্ ১।১৯৪) ইতি উৎ। ১ বায়ু।

“ভৃগুতাপভূতা ময়া ভবান্ মরুদানাদিত্যারসায়কান্।”

(নৈষধচরিত ২।৫৩)

হিন্দুশাস্ত্রে মরুৎ শব্দের অর্থ বায়ু। সর্বশুদ্ধ উনপঞ্চাশটি মরুৎ দেবতা। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে তাঁহাদের জন্ম হয়। মতান্তরে দিতিপুত্র পবনকে ইন্দ্রদেব উনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। অন্তর “মা রোদাহ” অর্থাৎ “ক্রন্দন করিও না” বলিয়া সন্তাষণ করিলেন, এই নিমিত্তই মরুৎ নাম হইল। [পবন দেখ।]

২ মরুবক বৃক্ষ। (ভাবপ্রং) ৩ দেব। ৪ সাধাবিশেষ।

“ধর্ম্মালঙ্ঘ্যত্বঃ কামঃ সাধ্যাসাধ্যান্ ব্যজায়ত।

প্রভবং চ্যবনকৈবল্যদীপানঃ সুরভীঃ তথা।

অরণ্যং মরুতকৈব বিখ্যাবল্ বলক্রবো ॥” (হরিবংশ ১৯৬।৪৫)

৫ ভাতৃবংশ দেবতাবিশেষ।

“ভাতৃগাং প্রায়ণং ভাতা যোহহুতিষ্ঠতি ধর্ম্মবিৎ।

স পুণ্যবন্ধুঃ পুরুষো মরুতিঃ সহ মোদতে ॥” (ভাগবত ৬।৫অং)

‘মরুতিঃ ভাতৃবংশলৈঃ দেবৈঃ’ (আমী)

৬ হিরণ্য। ৭ ঋত্বিক্। (নিঘণ্টু) ৮ গ্রন্থিপূর্ণ বৃক্ষ। (মেদিনী)

(স্ত্রী) ৯ পৃকা। (শব্দরত্নাং)

মরুৎ, মুসলমানদিগের স্বর্গীয় দূতভেদ। কোরাণে লিখিত আছে,—আদমের পুত্রগণ পৃথিবীতে নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করে। ধরাধামে এই অত্যাচার দর্শনে স্বর্গীয় দূতগণ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া জগৎ-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিকট তৎসমুদায় জ্ঞাপন করিলেন। জগৎপিতা তদনুসারে মরুৎ ও হারুৎ

নামক দেবদূতদ্বয়কে মনোনীত করিয়া ধরাধামে প্রেরণ করেন। তাঁহারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সাতিশ্বর নৈপুণ্যের সহিত স্ব স্ব কর্তব্য কার্য সমাধা করিতে লাগিলেন। অবশেষে জোত্রা (শুরুগ্রহ) রমণীদেহ ধারণপূর্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে, তাহারা তাঁহার রূপলাবণ্য সন্দর্শনে মুগ্ধ ও প্রেম-পীড়িত হইয়া প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর উক্ত রমণী স্বর্গে গমন করিলে পর, মরুৎ ও হারুৎ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু স্বর্গরক্ষক রিদগান্ তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার শেষবিচারের দিন পর্যন্ত বাবিলনে আবদ্ধ থাকিলেন।

মরুৎকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, মরুতো অপান-বায়োঃ করঃ। ১ রাজমাষ। (শব্দচং) (ত্রি)

২ মরুৎকারী।

“কষায়মধুরাঃ শীতাঃ কটুশাকা মরুৎকরাঃ।

বন্ধমূত্রপূরীষাশ্চ পিত্তশ্লেষ্মহরাস্তথা ॥”

(সুশ্রুত সূত্রহা ৪৬ অং)

মরুৎকর্শ্মন্ (পুং) ১ উদরাধান। ২ বায়ুনিঃসরণ।

মরুৎক্রিয়া (স্ত্রী) মরুতঃ ক্রিয়া। অপানোঃসর্গ, বাতকর্শ্ম।

মরুত (পুং) মরুদন্ত্যন্তেতি মরুৎ-(তপ্পূর্বকমরুত্যাং। পা

৫।২।১২২) ইত্যত্র কাশিকোক্ত্যা তপ্। চন্দ্রবংশীয় রাজ-

বিশেষ। ইনি অবীক্ষিতরাজের পুত্র। মরুত চক্রবর্তী

নরপতি ছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ

লিখিত আছে—চন্দ্রবংশীয় রাজশ্রেষ্ঠ করকর্মের অবীক্ষিত

নামে এক পুত্র হয়। অবীক্ষিত বীরপুরুষগণের অগ্রণী

ছিলেন। ইনি বিদিশাদিপতি বিশালের কন্যাকে স্বয়ং-

বরসভায় হরণ করিলে, সমবেত নরপতি সকল সম্মিলিত

হইয়া যুদ্ধস্থলে ইহাকে বন্ধন করেন। ইহার পিতা এই

সংবাদ অবগত হইয়া রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রের

বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন।

পরে বিদিশাদিপতি রাজা বিশাল ঐ কন্যাকে অবীক্ষিতের

সহিত বিবাহ দিবার জন্ত বলেন, কিন্তু রাজগণের নিকট

পরাক্রান্ত অবীক্ষিত দৈন্তপ্রাপ্ত হন। এই কারণে ঐ কন্যার

পাণিগ্রহণে সম্মত হন নাই। এদিকে বিশালতনয়া অবীক্ষিত

ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইহার

পিতা কন্যাকে অনেক বুঝাইয়া অপর রাজকুমারকে পতিবে

বরণ করিতে বলেন। ইহাতে তিনি বলেন,—পিতা! যদি

ইনি আমাকে পরিগ্রহ না করেন, তাহা হইলে আমি আপনার

নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, তপস্তা ভিন্ন অস্ত্র কেহই এ

জন্মে আমার ভক্ত হইতে পারিবে না। রাজা বিশাল

অনন্যোপায় হইয়া আর কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ঐ কন্যা তপস্কার্থ বন গমন করিলেন। রাজকুমারী কঠোর তপোমুঠান করিয়া শরীরক্ষয় করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহাকে আশ্বত্থাগে স্থিরসঙ্কল্প জানিয়া দেবদূতকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—‘আমি দেবদূত, দেব-তারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, ‘এই শরীর অতীব দুর্বল’। ইহা তুমি ত্যাগ করিও না। তুমি চক্রবর্তীর জননী হইবে তোমার পুত্র অরাতিকুল নির্মূল করিয়া সপ্তদ্বীপ-পৃথিবী ভোগ করিবেন। রাজকুমারী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, “স্বামী ব্যতিরেকে আমার তাদৃশ পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে? অবীক্ষিত ভিন্ন অন্য কেহই এ জন্মে আমার ভর্তা হইবেন না; ইহাই আমি পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমার পিতা ও স্বামীর জনক করকম বারংবার অনুরোধ করিলেন এবং আমিও তাঁহাকে বহুবিধ বিনয় ও যাজ্ঞা করিয়াছিলাম, তথাপি তিনি আমাকে পরিগ্রহ করিলেন না।’

ইহাতে দেবদূত কহিলেন, তোমার আর অধিক বলবার প্রয়োজন নাই। তোমার নিশ্চয়ই পুত্র জন্মিবে। অতএব তুমি অধর্ম করিয়া আত্মাকে ত্যাগ করিও না। এই কাননেই অবস্থিতি করিয়া এই ক্ষীণশরীরকে পোষণ কর।

কালক্রমে অবীক্ষিতজননী বীরা পুত্রকে কহিলেন, ‘আমি কিমিচ্ছক ব্রতের অমুষ্ঠান করিব, তুমি ইহার সহায়তা কর।’ ইহাতে অবীক্ষিত কহিলেন, ‘ধন আমার পিতার আয়ত্ত, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তবে আমার শরীর দ্বারা বাহা হইতে পারে, তাহা আমি সম্পন্ন করিব, ইহা প্রতিজ্ঞা করিলাম।’

অবীক্ষিত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে রাজা করকম তাহার সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, ‘বৎস! আমি এক বিষয়ে তোমার নিকট প্রার্থী। আমাকে অভিলষিত বস্তু প্রদান কর, তখন অবীক্ষিত কহিলেন, তাত! আপনাকে বাহা দান করিতে হইবে, তাহা বলুন, সাধাই হউক, আর অসাধাই হউক, অবশ্যই সম্পাদন করিব। রাজা কহিলেন ‘আমাকে আমার ক্রোড়ে পৌত্রের মুখ দর্শন করাও।’ অবীক্ষিত কহিলেন, রাজন! আমি আপনার একমাত্র পুত্র। তাহাতে আবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি। আমার স্ত্রীপুত্র কিছুই নাই, তবে আমি কিরূপে পৌত্রের মুখ দর্শন করাইব। রাজা কহিলেন, তুমি অন্ত্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ। সম্প্রতি প্রতিজ্ঞা অমূল্যে পুনরায় দারপরিগ্রহ কর। ইহাই আমার প্রার্থনা। অবীক্ষিত তাহাতে সন্মত হইলেন।

অতঃপর একদা রাজনন্দন অবীক্ষিত যুগয়ার গমন করিয়া- ছিলেন, তথায় বিচরণ করিতে করিতে, শুনিতে পাইলেন, কোন রমণী চীৎকার করিয়া কহিতেছে, আমি রাজা করকমের পুত্র পৃথিবীস্থর বীমান্ অবীক্ষিতের ভাৰ্য্যা। হুয়াত্মা অম্বর আমাকে হরণ করিতেছে। অবীক্ষিত এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই কি আমার ভাৰ্য্যা? অথবা ইহা কাননবাসী হুট-প্রকৃতি শাশ্বতী রাক্ষসগণেরই মায়া; বাহা হউক, আমি বধন আসিয়াছি, তখন বধার্থতঃ জানিয়া ইহার প্রতীকার করিব। অবীক্ষিত স্থিরচিত্তে শব্দলক্ষ্য করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দম্বর পুত্র দৃঢ়কেশ দণ্ডহস্তে সর্কালকারকৃষিতা এক কন্তাকে গ্রহণ করিয়াছে। তিনি তদ্বি-বন্ধন “ত্ৰাহি ত্ৰাহি,” রবে চীৎকার করিতেছেন। অবীক্ষিত তখন কালবিলম্ব না করিয়া দানবকে যুদ্ধে আত্মানপূর্ব্বক তাহাকে সংহার করিলেন।

হুয়াত্মা দানব নিহত হইলে, দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন,—‘তুমি বরপ্রার্থনা কর, তিনি পিতার প্রিয় কামনার মহাবীৰ্য্য পুত্র প্রার্থনা করিলেন। দেবগণ বলিলেন, তুমি যে এই কন্তাকে মোচন করিলে, ইহারই গর্ভে তোমার মহাবল চক্রবর্তী পুত্র হইবে।

এই সময় তুলস নামক গন্ধৰ্ব্ব অস্ত্রান্ত সহচরগণে পরিবৃত হইয়া তথায় সমাগত হইল এবং বলিতে লাগিল, এই মালিনী আমারই নন্দিনী, ইহার নাম ভামিনী। অগস্ত্যের অভিশাপে বিশালের তনয়া হইয়াছে। তুমি এই নৃপায়জ্ঞাকে গ্রহণ কর, ইহার গর্ভে তোমার চক্রবর্তী পুত্র হইবে। রাজপুত্র অবী-ক্ষিত এই কথায় সন্মত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিছু দিন অতিবাহিত হইলে তাঁহার এক পুত্র হইল। তুষ্ক এই জাতবালকের জাতকন্দাদি সমাধান করিয়া এই-রূপে স্তব করিতে লাগিলেন,—“মরুৎ তোমার মঙ্গল করুন, পূর্ব্ব-মরুৎ ধূলিরাশি উষিত না করিয়া তোমার কল্যাণকরে প্রবাহিত হউন, দক্ষিণমরুৎ অক্ষীণ ও নির্মূল হইয়া তোমার অক্ষুণ্ণে অবস্থিতি করুন, পশ্চিম-মরুৎ তোমাকে উৎকৃষ্ট বীৰ্য্য প্রদান এবং উত্তর-মরুৎ তোমার বিশিষ্টরূপ বলাধান করুন।” এইরূপে ব্রহ্মায়ন সমাহিত হইলে, অশরীরীণী বাণী বলিতে লাগিলেন, তোমার গুরু বারংবার তোমার উদ্দেশে মরুৎ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব এই বালক পৃথিবীতে ‘মরুভূমি’ নামে অভিহিত হইবে। পৃথিবীস্থ সকল রাজাই ইহার আজার বশীভূত হইবেন।

অনন্তর রাজপুত্র অবীক্ষিত আপনার পুত্র মরুভূমি ও কলত্রের সহিত নিজ ভবনে গমন করিলেন। রাজা পৌত্র

মুখাবলোকন করিয়া অভিযয় প্রীতি লাভ করিলেন। এইরূপে কিছুদিন অভিযাহিত হইলে একদা রাজা অবীক্ষিতকে কহিলেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বনে বাইব, অতএব তুমি রাজ্য গ্রহণ কর।

অবীক্ষিতও তপশ্চরণার্থ অরণ্যগমনে অভিলষী হইয়াছিলেন। এইজন্য পিতা এইরূপ আদেশ করিলে তিনি অমুনয় বিনয়সহকারে কহিতে লাগিলেন,—পিতা! আমি পৃথিবী পালন করিব না, আমার মন হইতে লজ্জা এখনও যায় নাই, অতএব আপনি অস্ত্র কাহাকে রাজ্যে নিয়োজিত করুন। দেখুন আমি বন্দী হইয়াছিলাম, আপনিই আমাকে মোচন করিয়াছেন, আমি স্বীয় বীর্ঘ্যে উদ্ধার পাই নাই। স্তত্রাং আমার আবার পৌরুষ কি? যদি পৌরুষ না রহিল, তাহা হইলে কিরূপে পৃথিবী শাসন করিব।

পিতা কহিলেন,—পিতা বৈরূপ পুত্র হইতে ভিন্ন নহেন, পুত্রও তেমনি পিতা হইতে অভিন্ন। তোমাকে অন্য কেহ মুক্ত করে নাই, স্বয়ং পিতাই তোমাকে মোচন করিয়াছেন। পুত্র কহিলেন,—নরেশ্বর! আমি আর মনের গতি কিছুতেই ফিরাইতে পারিতেছি না। অন্যের সাহায্যে মুক্ত হইয়া আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। বলিতে কি, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঘাহারা পিতার উপাঞ্জিত অর্থভোগ করে অথবা পিতৃকৃত চেষ্টায় কৃচ্ছ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাহাদের যে গতি হইয়া থাকে, আমারও যেন সেই গতি হয়।

পিতা বারংবার বলিলেও অবীক্ষিত তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না; তখন তাঁহার পুত্র মরুত রাজা হইলেন।

মরুত পিতার আজ্ঞানুসারে পিতামহের নিকট রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ওরসপুত্রের জ্ঞায় প্রজাদিগকে পালন এবং যথাবিধানে ভূরি ভূরি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীদেবী মহাত্মা মরুত কর্তৃক পরিপালিতা হইয়া সন্তত, দেব-সমাজে মরুতের গুণানুকীর্তন করিতেন। রাজা মরুত যজ্ঞ করিয়া কেবল রাজগণকে অতিক্রম করেন নাই; শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবরাজকেও পরাভূত করিয়াছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র সর্বশ ইহার যজ্ঞে ঋষিক ছিলেন। রাজা মরুত সুরগণ-সেবিত স্বর্ণময় মুক্তবান্ পরীক্ষিতের শূদ্র বজ্রার্থ আহরণ করেন। ইহার যজ্ঞীয় প্রাসাদ সকল স্বর্ণ দ্বারা নিশ্চিত ছিল।

এইরূপে রাজা মরুত রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে, একদা এক তপস্বী তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, ‘রাজন! জপসমন্তলী সম্প্রতি মদোন্নত উরগগণ কর্তৃক বিযাতিভূত হইয়াছেন, উদ্দর্শনে ভবদীয় পিতামহী বলিয়া

দিয়াছেন,—‘তোমার পিতামহ সম্যকরূপে পৃথিবী পালন করিয়াছেন, তিনি তপশ্চরণে নিযুক্ত হইয়া ঐর্কের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি যে রাজ্যপালনে সমর্থ নহ, তাহা তিনি দেখিতে পাইতেছেন, কেন না তোমার পিতামহের ও পূর্বপুরুষগণের অধিকারে বাহা ঘটে নাই, তোমার শাসনে তাহা ঘটতেছে। তুমি নিশ্চয়ই ভোগলুপ্তে আগন্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ার বশীভূত হইয়াছ। তুমি প্রজাগণের তদ্রাত্ত্র অবগত নহ। দংশনশীল ভূজঙ্গপাতাল হইতে সমাপ্ত হইয়া সপ্ত মুনিপুত্রকে দংশন, জলাশয়াদিতে ব্বেদ, মৃত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিয়া জল সকল দূষিত করিয়াছে। তাহাদের দোষাত্ম্যে অনলে আহৃত হৃত সমিধাদিও ঐরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঋষিগণ অনায়াসেই সর্পকুল ভ্রম করিতে পারেন, কিন্তু এই বিষয়ে তাহাদের অধিকার নাই, তুমিই একমাত্র অধিকারী।’

রাজা মরুত তাপসের এই কথা শুনিয়া শরাসন গ্রহণ-পূর্বক ক্রতপদে ঐর্কের আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তিনি সর্পদষ্ট সপ্ত ঋষিকুমারকে দর্শন করিয়া মুনিগণের সম্মুখে বারংবার আপনার নিন্দা করিয়া বলিলেন,—‘রে ছষ্ট ভূজঙ্গগণ! মদার বীর্ঘ্যের অবমাননা করিয়া তোমরা ব্রাহ্মণগণের শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিয়াছ। আজ আমি তোমাদিগের প্রতি যে কঠোর দণ্ডবিধান করি, দেবাসুর, মানব ও সমুদ্র সংসার তাহা দর্শন করুক।’

মরুত এইরূপ কহিয়া পাতাল ও ভূতল সমস্ত নাগগণের বিনাশের জন্ত সর্ষতক অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। অস্ত্রের তেজে সমস্ত নাগলোক দগ্ধ হইতে লাগিল। নাগগণ অনন্তোপায় হইয়া মরুতজননী ভামিনীর শরণাগত হইল। ভামিনী স্বামী অবীক্ষিতকে নাগগণের রক্ষার নিমিত্ত অমুরোধ করিলেন। অবীক্ষিত উত্তর করিলেন, নাগগণ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়াই মরুত ক্রোধের সহিত এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বশীভূত হইয়াছে, স্তত্রাং তাহার এই ক্রোধের শাস্তি করা সহজ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তখন নাগগণও অবীক্ষিতের শরণাপন্ন হইল। অবীক্ষিত শরণার্থী নাগগণের এবং স্বীয় পত্নী ভাবিনীর বিশেষ অমুরোধ শুনিয়া বলিলেন, ভদ্রে! আমি সত্বর তথায় বাইয়া অবীক্ষিতকে এই উত্তম হইতে নিবারণের চেষ্টা করিব, ক্ষত্রিয়ের শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করা বিধেয় নহে। যদি মরুত আমার কথায় অস্ত্র-সংহার না করে, তাহা হইলে অস্ত্র দ্বারা তাহার অস্ত্রের প্রতিরোধ করিব।

অবীক্ষিত এই কথা বলিয়া পুত্রের সমীপে গমনপূর্বক কহিলেন, মরুত ! অস্ত্র সংহরণ কর, ক্রোধের বশীভূত হইও না। মরুত পিতার এই কথা শ্রবণ ও বারংবার তাহাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিলেন, তাত ! এই পন্নগেরা আমার নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। দেখুন, আমি এই পৃথিবী শাসন করিতেছি, আমার শাসন অবজ্ঞা করিয়া ইহারা আশ্রমবাদী নিরপরাধ সাত জন ঋষি-বালককে দংশন করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহারা যজ্ঞীয় স্তুত সমুদয় ও জল দূষিত করিয়াছে। এই কারণেই আমি ইহাদিগকে বধ করিতে উত্তত হইয়াছি। আপনি আমাকে এ বিষয়ে কোনরূপ অহুরোধ করিবেন না।

অবীক্ষিত এই কথা শুনিয়া কহিলেন, এই ভূজঙ্গেরা বতাই অপরাধ করিয়া থাকুক, তোমাকে আমার অহুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে। তুমি অস্ত্রপ্রয়োগে নিবৃত্ত হও। ইহাতে মরুত কহিলেন, যদি আমি এই পাপী সকলের নিগ্রহে যত্ন না করি, তাহা হইলে আমাকেই নরকে গমন করিতে হইবে। অতএব আমাকে নিবারণ করিবেন না। অবীক্ষিত কহিলেন, এই পন্নগসকল আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, শরণাপন্নকে আশ্রয় প্রদান করা ক্ষত্রিয়ের একান্ত ধর্ম; অতএব আমার প্রতি গৌরববশতঃ অস্ত্র উপসংহার কর। মরুত কহিলেন, ইহারা হুষ্ট ও অপরাধী, ইহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিব না। আমি নিজের ধর্ম লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে আপনার কথা রক্ষা করিব। হুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই রাজার অবশ্যকর্তব্য কর্তব্য, তাহা না করিলে নরকে গমন করিতে হয়।

এইরূপে পিতা বারংবার অহুরোধ করিলেও পুত্র যখন অস্ত্র উপসংহার করিলেন না, তখন তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—এই পন্নগ সকল ভীত ও আমার শরণাগত হইয়াছে, এই কারণে তোমাকে অহুরোধ করিতেছি, তথাপি তুমি ইহাদিগকে হত্যা করণে উত্তত হইয়াছ। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়াও ইহার প্রতিরোধ করিব। কেবল তুমিই অস্ত্রবিদূহ নহ, আমিও অস্ত্র সকল অংগত আছি। আমার সমক্ষে তোমার আবার পুরুষ কি? তুমি অতি হুত্ব হইয়াছ।

অনন্তর রাজা অবীক্ষিত কালান্ত্র গ্রহণ করিয়া পুত্রের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিলেন। তখন মরুত উটকঃস্বরে বলিলেন,—আমি হুষ্টের শাসন জ্ঞাত এই সংবর্তক অস্ত্র বোজনা করিয়াছি, আপনার বধের জ্ঞাত নহে। তবে আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি কালান্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। দেখুন! আমি

আপনার পুত্র, তাহাতে আবার সংপথে থাকিয়া সর্বদা আপনার আজ্ঞা পালন করিতেছি, প্রজাগণের পরিপালন করাই আমার কার্য।

এই কথা শুনিয়া অবীক্ষিত কহিলেন,—আমিও শরণাগতকে রক্ষা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তুমি তাহার ব্যাঘাত করিতেছ। অতএব জীবন থাকিতে আমার নিকটে পার পাইবে না। হয় তুমি আমাকে অস্ত্রে বধ করিয়া এই সকল হুষ্ট সর্পকে সংহার কর, না হয় আমি তোমাকে অস্ত্র-বলে নিহত করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিব। বিপদে পড়িয়া শরণাগত শত্রুকেও যে ব্যক্তি অহুরোধ না করে, তাহার জীবনে শিক। আমি ক্ষত্রিয়, ইহারা ভীত হইয়া আমার শরণ লইয়াছে, কিন্তু তুমি ইহাদের অপকার করিতেছ; অতএব তুমি কিরূপে আমার বধা নহ?।

ইহাতে মরুত কহিলেন, মিত্র, বান্ধব, পিতা বা গুরু ইহাদিগের মধ্যে যে কেহ হউক না কেন, প্রজাপালনে বিশ্ব করিলে রাজা অবশ্যই তাহাকে বধ করিবেন। অতএব আমি আপনাকে প্রহার করিব, আপনার কোপ করা অহুচিত।

পিতা ও পুত্র উভয়কে পরস্পর-সংহারে কৃত-নিশ্চয় দেখিয়া, ভার্গবাদি মুনিগণ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং মরুতকে কহিলেন,—পিতার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করা তোমার কর্তব্য নহে। পরে তাহার অবীক্ষিতকেও বলিতে লাগিলেন, তোমার এই পুত্র বিশ্বাতবিক্রম, ইহাকে সংহার করা তোমার উচিত নহে। তখন মরুত কহিলেন, আমি রাজা, হুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন আমার কর্তব্য কন্ম। ভূজঙ্গগণ দোষ করিয়াছে, আমি তাহার দণ্ডবিধান করিব। অবীক্ষিত কহিলেন, শরণাগতের রক্ষা করাই আমার একমাত্র কার্য। আমার এই পুত্র শরণাগতের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব সন্মত অপরাধী।

তখন ঋষিগণ কহিলেন, ভূজঙ্গগণ যে ব্রাহ্মণদিগকে দংশন করিয়াছে, তাহার ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারগণকে বাঁচাইয়া দিবে, অতএব পিতাপুত্রের বিবাদে প্রয়োজন নাই। তোমরা দুই জনেই রাজশ্রেষ্ঠ। ঐ সময় অবীক্ষিতজননী বীরা সমাগত হইয়া পুত্রকে কহিলেন,—তোমার পুত্র মরুত আমারই কথামুসারে এই সকল পন্নগকে সংহার করিতে উত্তত হইয়াছে। আমার মতে মৃত ব্রাহ্মণেরা যদি জীবন পান, তবে তোমার শরণাগত সর্পগণও উদ্ধার পাইবে।

তদনন্তর ভূজঙ্গম সকল ব্রাহ্মণতনয়দিগকে দিব্য ওষধি

ধারা বিষ সংহরণপূর্বক জীবিত করিল। তখন মরুত্ব পিতার চরণ বন্দনা করিলে, অবীক্ষিতও তাঁহাকে শ্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

রাজাধিরাজ মরুত্ব অরিষড়্‌বর্গ জয় ও ধর্ম্যতঃ পৃথিবী পরি-পালন করিয়া ভোগ সকল সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। বিদর্ভ-তনয়া প্রভাবতা, সুবারতনয়া সৌবীরা, মগধপতি কেতু-তনয়া সুকেনী, মদ্রতনয়া কেকয়ী, কেকয়তনয়া সৈরিকী, সিদ্ধতনয়া বহুমতী এবং চেদিতনয়া সুশোভনা মরুত্বের এই সকল পত্নীর গর্ভে তাঁহার অষ্টাদশ পুত্রের জন্ম হয়। পুত্র-গণের মধ্যে নরিষ্যস্ত সর্ব প্রধান।

এই মরুত্বচরিত শ্রবণ করিলে সকল লোকের পাপ নষ্ট এবং পরলোকে শুভ হইয়া থাকে। (মার্কণ্ডেয় পুং ১২৮-১৩২) ২ যদুবংশীয় করকমপুত্র। (ভাগবত ৯২৩১৭)

৩ শিলেয়ুয়াজপুত্র। (হরিবংশ ৩৬৭)

মরুত্বক (পুং) মরুদিব তকতি হসতীতি তক-হাসে অচ্। মরুবক বৃক্ষ। (ভাবপ্রা.)

মরুত্বম (ত্রি) মরুৎ-তুলা বেগগামী।

“ইত্ৰতমা হি দিক্ষা মরুত্বমা দত্মা” (ঋক্ ১১৮২১২)

‘মরুত্বমা মরুবেগগামিনো’ (সায়ণ)

মরুৎপতি (পুং) মরুতাং পতিঃ ৬তং। ইত্ৰ।

“আচাধ্যো ব্রহ্মণো মৃষ্টিঃ পিতা মৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ।

জাতা মরুৎপতেমৃষ্টিমাতা সাক্ষাৎ কিত্তন্তুঃ ॥ (ভাগ০ ৬৭৭২০)

মরুৎপথ (পুং) মরুতাং পথ্য। (ঋক্ পুঃ পথ্যমানক্ষে। পা ৫৪৭৭৪) ইতি অসমাপাত্তঃ। আকাশ।

মরুৎপাল (পুং) মরুতো দেবান্ পালয়তীতি পালি-অচ্। দেবরাজত্বাদস্ত তথাৎ। ইত্ৰ।

মরুৎপুত্র (পুং) মরুতো বায়োঃ পুত্রঃ। ভীমসেন।

মরুৎপ্লব (পুং) মরুদিব প্লবতে দ্রুতং গচ্ছতীতি প্লু-অচ্। সিংহ। (ত্রিকা০)

মরুৎফল (ক্লী) মরুতাং বায়ুনাং ফলমিব। ঘনোপল। (শব্দমা০)

মরুত্বৎ (পুং) মরুতো দেবাঃ পালনীয়ত্বেন সন্ত্যস্ত ইতি মরুৎ (মধ্বাদিত্যশ্চ। পা ৪১৮৬) ইতি মতৃপ্ মস্ত ব, সংজ্ঞায়াং প্রত্যয়বকারে পরে ন তস্ত দ। ১ ইত্ৰ। (অমর) ২ ধর্ম-পুত্র দেবগণভেদ।

“ধর্মস্ত বসবঃ পুত্রা রুদ্রাশ্চামিততেজসঃ।

বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ মরুত্বশ্চ ভারত ॥”

(ভারত ১২১২০৭১২৩)

মরুজ্ঞনকষেনাস্ত্যন্তেতি মতৃপ্ মস্ত ব। ৩ হনুমান্। (শব্দরত্না০) (ত্রি) ৪ বায়ুবিশিষ্ট।

“বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ। বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ ॥”

(ভট্ট ১০১২০)

ভট্টির এই এক শ্লোকেই সকল অর্থেরই উদাহরণ আছে।

(স্ট্রী) মরুত্বতী,—দক্ষ, প্রজাপতির কন্যা। ইনি ধর্মের পত্নী।

“ভামূল্যা ককুদ্যানিবিষা সাধ্যা মরুত্বতী।

বহুসুহৃতা সংকরা ধর্মপত্ন্যাঃ সূতান্ শৃণু ॥” (ভাগ০ ৬৬৪৪)

মরুত্বতীয় (ত্রি) মরুৎ ইত্ৰসম্বন্ধীয় মাধ্যম্নিন যাগভেদ।

মরুৎসথ (পুং) মরুতাং দেবানাং সথ্য। (রাধাহঃসমিভঃ ট্চ। পা ৫৪১১১) ইতি ট্চ। ১ ইত্ৰ। (ধরণি) মরুতো বায়োঃ সথ্য। ২ অয়ি।

“তাবদাশু বিদধে মরুৎসথৈঃ সা স পুণ্ড্রজলবর্ষিভির্ঘনৈঃ।”

(রঘু ১১৩৩)

মরুৎসমি (ত্রি) ১ সরস্বতী। ২ ইত্ৰ।

মরুৎসহায় (ত্রি) মরুৎ সহায়ো যন্ত। অয়ি।

“বিচরতি মরুৎসহায়ঃ সপ্তাশ্চিঃ সপ্তাদিবসাত্তঃ।” (বৃহৎসং ৩২১১৩)

মরুৎসুত (পুং) বায়ুপুত্র, হনুমান্, ভীম। (ভাগ০ ৯১০১২)

মরুৎস্তোত্র (ত্রি) মরুৎগণের সহিত স্তুত।

“মরুৎস্তোত্রস্ত বৃজনস্ত গোপাঃ” (ঋক্ ১১০১১১)

‘মরুৎস্তোত্রস্ত মরুত্বিঃ সহ স্তোত্রং যন্ত’ (সায়ণ)

মরুৎস্তোম (পুং) ১ মরুৎসম্বন্ধীয় স্তোম। ২ একাহযাগভেদ।

মরুদান্দোল (পুং) মরুৎ বায়ুরান্দোল্যভেদেহনেতি আন্দোলি করণে ঘঞ্। ১ ধবিজ। ২ হরিণ বা মহিষচন্দ্রে বিনিশ্চিত পাথাবিশেষ। (শব্দমালা)

মরুদিষ্ট (পুং) মরুতাং দেবানামিষ্টঃ। গুণ্ণুলু। (রাজনি০)

মরুদেব (পুং) ইক্ষাকুবংশীয় রাজভেদ। ঋষভ নামক অহিতের পিতা। (স্ট্রী) মরুদেবী—ঋষভের মাতা।

“ভবিত, মরুদেবোহথ স্নানক্ষত্রোহথ পুষ্করঃ।

তস্তাত্তরাক্ষন্তংপুত্রঃ সূতপাত্তদমিত্রজিৎ ॥” (ভাগবত ৯১২১১১)

মরুদেশ (পুং) ১ মরুভূমি। ২ মাড়বার নামক জনপদ।

মরুদগণ (পুং) মরুৎসমূহ।

মরুদ্বজ (ক্লী) মরুৎস বায়ুধ্ব ধ্বজঃ পতাকেব, নভসি বায়ু-বশাচ্চলিতত্বাদস্ত তথাৎ। বাততুল, চলিত বুড়ীর সূতা।

‘গ্রীষহাসং বংশকণং বাততুলং মরুদ্বজম্।’ (হারাবলী)

মরুদ্বজ (পুং) ১ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। ২ সামবেদের শাখাভেদ। ৩ বিষ্ণু।

মরুদ্রবা (ক্লী) মরুৎ বায়ুর্ভব উৎপত্তিকারণঃ যন্ত্যঃ। তাম্র-মূল্যাকৃপ, চলিত খিরাই। (রত্নমালা)

মরুদ্রথ (পুং) মরুৎ বায়ুরথো যানমিবাশ্চ, উর্য্যাং স্তোকাং



বিয়তি বহুতরং গচ্ছতীতি তথাৎ। ১ অশ্ব। (ত্রিকা০)  
২ দেবরথ। (হেম)

মরুদ্রুম (পুং) মরোনির্জলদেশস্ত ক্রমঃ, মরুজাতো ক্রমো  
বা। বিটখদির। (রত্নমালা)

মরুৎবজ্রন্ (ক্লী) মরুতাং বায়ুনাং দেবানাং বা বজ্র পদ্মাঃ।  
আকাশ। (ত্রিকা০)

মরুজাহ্ন (পুং) মরুতা বায়ুনা উচ্ছতেহসৌ ইতি কশ্মপি ষঞ,  
যথা মরুদ্বায়ু বাহ ইব যন্ত। ১ ধূম। ২ অগ্নি। (শব্দমালা)

মরুজিহা (ক্লী) নদীভেদ, মরুভূমি।

মরুজিহপ (পুং) মরো নির্জলদেশে যিগো হতীব। উষ্ট্র।

মরুজীপ (পুং) মরুভূমির মধ্যস্থিত মরুভোর বাসযোগ্যস্থান।  
ইংরাজিতে ইহাকে Oasis বলে।

মরুজুতা (ক্লী) নদীভেদ, কাবেরী নদী।

মরুজুধা (ক্লী) পুণ্যা-নদীভেদ। “শতক্রচ্ছত্যাগা মরুজুধা  
বিতস্তা অসিক্তা বিবেতি মহানদ্যাঃ” (ভাগ০ ৫।১৩।১৭)

মরুজুধ (ত্রি) ১ মরুৎ কর্তৃক বর্জমান।

“শং নঃ শোচা মরুজুধঃ” (ঋক্ ৩।১৩৩)

‘মরুজুধঃ মরুজুধঃ বর্জমানঃ’ (সায়ণ)

২ পত্রাবের অন্তর্গত একটা নদী। ৩ নদীমাত্র। (নিকট)

মরুজুগ (পুং) মরুতো বেগঃ। ১ বায়ুবেগ। ২ দৈত্যভেদ।

মরুজুহ্মন্ (পুং) নিরুদকদেশ, জলশূন্য প্রদেশ।

“ইমাং বিজ্ঞাং পুরা কশ্চিৎ কোশিকো ধারয়ন্ বিজঃ।

যোগধারণয়া স্বাং জহৌ স মরুজুহ্মনি ॥” (ভাগ০ ৬।৮।৩৮)

‘মরুজুহ্মনি নিরুদকে দেশে’ (স্বামী)

২ বিজ্ঞাধর ইন্দ্রবরের খণ্ডর।

মরুজু (ক্লী) নগরভেদ।

মরুজুাম (ত্রি) (মার্কণ্ডপুং ৬৩।১০)। মরুজুগের নাম।

মরুজুমালা (ক্লী) মরুজুর্মাল্যতে ধার্যতে ইতি মল-ধারণে  
কশ্মপি ষঞ, টাপ্। পূকা। চলিত পিড়িংশাক (Trigonella  
Corniculata)।

“স্মৃক্তান্ধক্ ব্রাহ্মণী দেবী মরুজুমালা লতা লঘু।” (ভাবপ্র০)

‘মরুপথ (পুং) দেশভেদ।

“প্রাচুর্ভবন্তি সুস্বাদা নন্তো মরুপথেষপি।”

(রাজতরং ৪।২৮৮)

মরুপ্রিয় (পুং) মরুনির্জলদেশঃ প্রিয়োহস্ত। উষ্ট্র। (হেম)

মরুফগঞ্জ, বলদেশস্থ পাটনা জেলার অন্তর্গত একটা গঞ্জ।

পাটনা সহরের এই হাটে বিস্তৃত কারবার আছে। দেশ-

দেশান্তর হইতে জলপথে বহু পণ্যদ্রব্য এখানে আমদানী

রপ্তানি হইয়া থাকে। লবণ, চাউল, তুলা, কাঠ ও চিনি যথেষ্ট

পরিমাণে এখানে আনীত হয় এবং গম, বার্লি, সরিষা, যুত  
এবং লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য এখান হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত  
হইয়া থাকে।

মরুভূমি (পুং) দেশভেদ।

“সৌরে মরুভবপুঙ্করসৌরাষ্ট্রা ধাবতো মরুদাস্ত্যজননাঃ।”

(বৃহৎসং ৫।৩৮)

মরুভূ (ক্লী) মরু নির্জলা ভূ-ভূমিঃ। ১ দাসেরক দেশ, চলিত  
মারবাড়। ২ তদেশ ও তজ্জনপদবাসীমাত্র। ৩ নির্জলভূমি।

মরুভূতি (ক্লী) যৌগক্ষরায়ণের পুত্র।

মরুভূমি, বৃক্ষ-লতাদি-পরিশূন্য বালুকাময় বিস্তীর্ণ পতিত

ভূখণ্ডই সাধারণতঃ মরুভূমি-পদবাচ্য। জলের অভাবহেতু,

এই স্থানের অমূর্করত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ

প্রশস্ত বালুকাময় প্রান্তর মধ্যেও স্থানে স্থানে বৃক্ষলতাদি ও

জলাশয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। ঐ সকল স্থান ‘ওয়েসিন্’ নামে

খ্যাত। এতদ্বিন্ন জনমানবশূন্য তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর

প্রভৃতিকেও মরুভূমি বলা হইয়া থাকে। রুবিয়া ও আমেরি-

কায় ঐরূপ জনশূন্য মরুপ্রান্তর পরিলক্ষিত হয়। বালুকাময়

প্রান্তরের মধ্যে আরবদেশের মরুভূমি এবং আবার আফ্রিকার

‘শাহারা’ নামক মরুভূমি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিখ্যাত;

উভয়েরই পূর্বাংশ উর্বর। আফ্রিকার লিবিয়া নামক মরু-

অংশ বিশেষ বিখ্যাত। তেগাজ্জার নিকটস্থ মরুদেশে ইতস্ততঃ

সৈন্ধবলবণের স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। নান্ন অন্ত-

রীপ হইতে নীল-নদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এরূপ একটা বালুকাময়

ভূভাগ লবণবিমিশ্রিত ও জলশূন্য হওয়ায় তথাকার মৃত্তিকার

আদৌ উৎপাদিকা শক্তি নাই। কেবলমাত্র মধ্যে

মধ্যে ২১০১ স্থানে জল দেখিতে পাওয়া যায়; তথার ক্ষুধা-

তৃষ্ণা-কাতর বণিকগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া

থাকে। একমাত্র উষ্ট্রে আরোহণ করিয়াই মরুভূমি দিয়া

গমনাগমন করা যায়। মরুভূমির মধ্যস্থিত এরূপ ক্ষুদ্র উর্বরা-

ক্ষেত্রকে মরুদীপ (Oasis) কহে।

উষ্ট্র ভিন্ন অন্য কোন যানারোহণে মরুবক্ষে বিচরণ করা

অসম্ভব। যে হেতু উষ্ট্র ব্যতীত অপর কোন প্রাণীই প্রচণ্ড

স্বর্ণাকিরণোত্তপ্ত বালুকায় উপর দিয়া জলপান ব্যতিরেকে

গমনাগমন করিতে পারে না। এতদ্বিন্ন সময় সময় মরুভূমিতে

এক প্রকার আগ্নেয়কর দূষিত বায়ু সমুৎপন্ন হইয়া থাকে,

উষ্ট্রেরা দূর হইতে আত্মাণ ধারী উক্ত বায়ুর আগমন বুঝিতে

পারে এবং সেই বিবাক্ত বায়ু হইতে পরিজ্ঞাপনাভের জন্ত

গুড়ি মারিয়া মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়ে। বণিকেরা এত-

দ্রিষ্য অবগত থাকার, উষ্ট্রের শরনের অব্যবহিত পরেই আপ-

নারাও মুক্তি দিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে শুইয়া পড়ে। বায়ু বহিয়া গেলে বখা সময়ে উষ্ট্র উখিত হয়। তখন সেই বায়ুসঞ্চালিত বালুকা-তুপও উষ্ট্রের পৃষ্ঠ হইতে অপসারিত হইয়া যায়। এইজন্ত উষ্ট্র মরুসমুদ্রের পোতরূপে উক্ত হইয়া থাকে।

প্রাচীন লোকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, মরুভূমিবক্ষে ভূতযোনি প্রভৃতি অপদেবতা বাস করে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিত প্লিনি লিখিয়াছেন যে, আফ্রিকার মরুক্ষেত্রে অপদেবতাগণ মনুষ্যাকৃতি ধারণপূর্বক পথিকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়; আবার পরক্ষণেই বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে। মধ্যএসিয়ার লোকসমাজেও এইরূপ বিশ্বাস প্রবল। তাহারা বলে যে, কোন কোন স্থান হইতে এই ভূতগণ অখণ্ড হইতে পথিকদিগকে আকাশমার্গে উঠাইয়া লইয়া যায়।

আফগানদিগের বিশ্বাস, পর্বতোপরি নির্জন স্থানে এবং মরুভূমিতে নির্জনপ্রিয় ভূতগণ বাস করিয়া থাকে। আফগান ভাষায় ইহারা “ঘোল-আই-বিবর্ণ” নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা আরও বলে যে, উল্লিখিত ভয়ঙ্কর দানবগণ সজীব মনুষ্য ধরিয়া আহাৰ করিয়া থাকে।

মরুভূমি বলিলে সাধারণতঃ আমরা বালুকাপূর্ণ জনহীন স্থানই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু মরু শব্দের প্রকৃত অর্থ ধরিলে, মরুভূমি শব্দে অমূর্ষের শব্দহীন পতিত জমিও বুঝায়। উত্তর-আমেরিকায় একরূপ জঙ্গলপূর্ণ অকর্ষিত স্থানকে প্রেরীজ (Prairies) এবং রুশিয়ায় ইহাকে স্টেপিজ্ (Steppes) কহিয়া থাকে। ভারতবর্ষেও মরুভূমি আছে। তাহা সিন্ধু নদের পূর্ব হইতে রাজপুতনার মধ্য-পর্ধ্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান বালুকাময় হইলেও স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপুসা জঙ্গল ও বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কোথাও কোথাও অধিবাসিগণের গৃহপালিত গো, মহিষ, ছাগ, মেঘপ্ৰভৃতি জন্তু পরিবৃত ক্ষুদ্রপশুসমূহ দৃষ্টিগোচর পতিত হয়। নদী না থাকায় জলাভাবপ্রযুক্ত সময় সময় শতাব্দির অজন্মা হইয়া থাকে। বৃষ্টির জলই তত্তদ্ গ্রামবাসীর একমাত্র অবলম্বন। প্রচুর শস্ত উৎপন্ন না হইলে কেবল দ্রব্যাদি পানই গ্রামবাসিগণের একমাত্র আহার্য। নিয়মিতরূপে বৃষ্টিপাত হইলে বজরা শস্ত ও শাক সবুজি জন্মে।

প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে রাজপুতনার মরুদেশ ‘মরুস্থলী’ নামে উক্ত হইয়াছে। এখন উহা রাজপুতনার মরুভূমি নামেও কথিত হইয়া থাকে। ইহার ভূ-পরিমাণ ৬০০ বর্গ মাইল।

সমস্ত বিকানীর রাজ্য বালুকাপূর্ণ। এই স্থানের অধিকাংশ অধিবাসীই নীচজাতি। জাটগণ এই স্থানে আসিয়া

উপনিবেশ স্থাপন করিবার পূর্বে পরমারবংশীয় রাজগণ এই মরু প্রদেশে শাসন করিতেন। ইহারা শাস্তিপ্রিয় শ্রমজীবী।

একই অক্ষোপরিস্থাপিত ভারতবর্ষের ও আফ্রিকার মরুভূমির পার্থক্য লক্ষ করিয়া ভূতত্ত্ববিদগণ বিশেষ বিস্ময়পর হইয়াছেন। আজিও কেহ ইহার তত্ত্বাঙ্গল্যকানে সমর্থ হন নাই। বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকাখনন করিয়া তাঁহারা যে পরীক্ষা করেন, তদ্বারা জানা গিয়াছে যে, মৌরয়াক মরুভূমিতে ২০ ফুট ফিট্‌ নিম্নে জল পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু ভারতের কোন মরুতেই এরূপ কথা শুনা যায় না। ডেসমথ নামক স্থানে প্রায় দুই তিন শত ফিট্‌ না খুঁড়িলে জল দেখা যায় না; এতদ্ভিন্ন ৬০ ফিটের কম কোন গর্তেই পানোপযোগী জল উঠে না।

স্বচ্ছ শৈলমালার (Crystalline rocks) খলিত অংশগুলির অগ্নি-প্রস্ফুটনস্বকীয় বালুকাকণায় (Siliceous Sand) পরিণতি হইতে মরুভূমির উৎপত্তি স্বীকার করা যায়। এতদ্ভিন্ন অগ্নি-প্রস্ফুটন অর্থাৎ চকমকি-পাথর কালবশে চূর্ণ হইয়াও উল্লিখিতরূপে বালুকায় পরিণত হইয়া থাকে। এই জগতে পরিবর্তনশীল পার্থিব পদার্থমাত্রই কালবশে নিরন্তর রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। প্রকৃতির এই নিয়মামুসারে উপরি উক্ত চূর্ণগুলি পুনরায় একত্র হইয়া বালুকা-প্রস্তরের পরিণত হয়। অনন্তর এই বালুকা-প্রস্তর, সচরাচর যাহাকে বেলেপাথর বলা হয়, ভূ-মধ্য নিহিত তাপে উত্তপ্ত হইয়া স্ফটিক-মণি (quartz) শৈলে পরিবর্তিত হইতে দেখা যায় এবং পরে সেই স্ফটিকমণি ক্রমিক তাপযোগে বিশ্লিষ্ট ও বিচূর্ণ হইয়া বালুকা-রূপে পুনরায় পর্যাবসিত হইয়া থাকে। এইরূপে পরিবর্তিত বালুকাময় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কালে মরুভূমি নামে আখ্যাত হয়। যে সকল স্থানে উপরি উক্ত শৈলশ্রেণী বিস্তৃত ছিল, সেই সমুদয় দেশই দীর্ঘ কাল পরে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন মরুভূমির উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও একটা কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে;—সমুদ্রাংশ অনেক সময় পৃথিবী-বক্ষে উপসাগরাকারে বা স্থবিশ্তীর্ণ ভূদাকারে প্রবেশ করিতে দেখা যায়, সেই লবণাক্ত জলরাশি কালে শুষ্ক হইয়া অমূর্ষের বালুকগর্ত উত্তোলিত করে। সেই বালুকাময় ভূদ বা উপসাগর খাত বহুকাল ধরিয়া বৃক্ষলতাাদি পরিণত হইয়া মরুবৎ পড়িয়া থাকে। উহার বালুকাকণা সময় সময় সূর্য্য-কিরণের উত্তাপে বিঘাত হইয়া দাঁড়ায়। বহু পূর্বকালে পৃথিবীবক্ষে এরূপ অনেক সমুদ্রাদি বিস্তৃত ছিল এবং এখনও আছে। কে বলিতে পারে, কোন না কোন অভাবনীয়

কারণে এই সমুদায় ভূ-মধ্যস্থ সাগরগর্ভ কালক্রমে শুষ্ক হইয়া বালুকাময় তৃণহীন ক্ষেত্ররূপে পর্যাবসিত না হইবে? উল্লিখিত বালুকাপূর্ণ ক্ষেত্রই মরুভূমি নামে অভিহিত।

পৃথিবীর অনেক স্থলেই বিস্তীর্ণ মরুভূমি দৃষ্ট হয়। এতাদৃশ বিশাল বালুকাময় স্থান দেখিলেই সাধারণতঃ আমরা মনে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকি। তাহার কারণ, আমরা মনে করি, যদি এই স্থানগুলি বালুকাময় মরুভূমি না হইয়া উর্বরা শস্যক্ষেত্রে পূর্ণ হইত, তাহা হইলে জগৎবাসীর অনেক উপকার সাধিত হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইবার পূর্বে আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আপন ইচ্ছায় চালিত হয় না। সেই মঙ্গলময় সর্গ-নিয়ন্তা বিশ্বপিতার ইচ্ছাধীনে জগৎ পরিচালিত হইতেছে। তিনি জীবের অমঙ্গলের জন্ত কিছুই করেন না। ভূ-পৃষ্ঠ নিয়তই রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। এই হেতু পৃথিবীর উপরিভাগ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থা ধারণ করিয়া থাকে। ভূ-তত্ত্ব পাঠে অবগত হওয়া যায় যে “মরুভূমি” ঐ সমস্ত অবস্থান্তরের মধ্যে একটা, অর্থাৎ ভূ-তলদেশ এই-রূপে মরুভূমিতে পর্যাবসিত না হইলে যেন জগদীশ্বরের নিয়ম অপূর্ণ রহিয়া যাইত; তাই জগতের সৃষ্টিবৈচিত্র্যরক্ষার জন্ত বিধাতার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। তাহা না হইলে কখনই সেই অমূল্য ভূখণ্ড হইতে শস্যশ্রামলা ধরিত্রীর আবির্ভাব হইতে পারিত না।

সচরাচর দেখা যায়, মরুভূমির বালুকারাশি সূর্য্যাকিরণে উত্তপ্ত হইয়া অসহনীয় হইয়া পড়ে। ইহার কারণ কি? তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ অন্বেষণ করিয়া যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহাই নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইল। প্রোফেসর টিঙাল সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, বালুকার তাপসঞ্চালন-শক্তি অন্ত্যাত্ম ধাতু অপেক্ষাও অধিক। ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, কাঠের তাপসঞ্চালনশক্তি ১২° কিন্তু বালির উক্ত শক্তি ৯০° ডিগ্রী। এই নিমিত্ত দেখা যায় যে, বৃক্ষাদি-পূর্ণ ক্ষেত্রোপরি সূর্য্যাকিরণ পতিত হইলে অতি আন্তে আন্তে সামান্য উষ্ণ হইতে দেখা যায় এবং আবার সূর্য্যাকিরণের প্রধরতা হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইতে থাকে; কিন্তু বালুকাময় ক্ষেত্রে সূর্য্যাকিরণ পতিত হইলে অতি শীঘ্রই অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং সূর্য্যাস্তের পর অতি অল্পকাল মধ্যেই শীতল হইতে দেখা যায়।

সাহারা মরুভূমি—এই মরুক্ষেত্রের স্থানে স্থানে বালুকা-রাশি ভূ-পাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমুদয় বালুকাস্তূপ

স্থিতিশীল নহে। প্রবল পবন বেগে নিরন্তর একস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে ২১১টা পাহাড় দেখা যায়। এতদ্বিধ কোন কোন স্থানে জনবিশিষ্ট গর্ত্ত বা অগাধ আছে। এই সকল জলাভূমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ-গাছড়াও জন্মিয়া থাকে।

অনেক সময় এখানকার জলীয়-বাষ্পহীন উত্তপ্ত বায়ু লোহিত বর্ণ বাষ্পের স্তায় দৃষ্ট হয়। ইহার লাল আভা দিখলয়ে পতিত হওয়ায় বোধ হয়, যেন অসংখ্য আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে অগ্নিশিখা বিক্ষিপ্ত হইতেছে। সাহারা মরুভূমিতে ২১১টা থর্জ্জুর ও অন্ত্যাত্ম বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বানর ও মুগগণ এই সকল ফল লইয়া মধ্যে মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এখানে অসংখ্য উষ্ট্রপক্ষী (Ostrich) বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইহারা টুকটুকি ও শব্দাদি খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। এই মরুস্থলে কোন নির্দিষ্ট পথ নাই। এই নিমিত্ত পথিকদিগকে ঞ্চবতার লক্ষ্য করিয়াই গন্তব্য স্থানে যাইতে হয়। এখানকার “সামুন” নামক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বায়ু এক্ষণে ভয়ঙ্কর যে, উষ্ট্র-পৃষ্ঠস্থিত পানীয় জলসমূহ ক্ষণকাল মধ্যেই শুষ্ক করিয়া ফেলে। কথিত আছে যে, ১৮০৫ খৃঃ অব্দে একদল যাত্রীমধ্যে দুই সহস্র লোক ও ১৮০০ উষ্ট্র জল পিপাসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই শাহারার মরুভূমিতে পথিকগণ মরীচিকার কুহকে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে।

আফ্রিকার উত্তরপূর্ব্ব এবং পূর্ব্বদিকের মরুবিভাগের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশে তিব্বু নামক বর্ব্বর জাতির বাস আছে। উত্তর-পূর্ব্ব “বার্কা” মরু ভাগ (প্রাচীন “সিরেনাইকা”) ভূ-মধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই উভয়ের সহিতই “লিবিয়া” নামক মরুভাগ সংযুক্ত। লিবিয়া-মরু মিসর রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা দক্ষিণে নিউবিয়া ও আবিসিনিয়ার অমূল্য-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অতঃপর ইহা নীলনদ পার হইয়া পুনরায় লোহিত-সাগরের উপকূল বহিয়া সুরেজ-যোজক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পরে সুরেজ (একশ্রেণী কাটা খাল) যোজক অতিক্রম করিয়া আরবদেশে পালেস্তিন পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

আরবদেশের মরুবিভাগের মধ্যবর্তী স্থলে প্রসিদ্ধ সিনাই শৈলের পাদদেশে কয়েকটা উর্ব্বর উপত্যকা আছে, তথায় আঙ্গুর, পেয়ারা ও অন্ত্যাত্ম উপাদেয় ফল জন্মিয়া থাকে।

মিসোপোটেমিয়ার মরু ইউ-ফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর মধ্যবর্তী। গ্রীক ভাষায় মিসোপোটেমিয়া শব্দের অর্থ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান; এই নিমিত্তই উক্ত মরু ও দেশের নাম মিসো-

পোটেন্সিয়া হইয়াছে, আফ্রিকা ও আরবের মরুক্ষেত্র অপেক্ষা এই স্থান অতি ভয়ঙ্কর। এখানকার জল লবণাক্ত এবং গন্ধকপূর্ণ।

পারস্ত-রাজ্যে সর্বশুদ্ধ ৫টা মরু আছে। সমগ্র রাজ্যের ১০ ভাগ স্থানের প্রায় ৩ ভাগই মরুভূমি। এখানকার সর্ব-প্রধান মরুস্থল খোরাসান ও ইরাক-অজেমীর মধ্যবর্তী। ইহার দক্ষিণে কারমানিয়া মরু। অপর ৩টির নাম কিরার, মেক-রান ও করকোমা।

তাতার দেশের মরুভূমির পরিমাণ প্রায় ৫৪০ হাজার বর্গমাইল। ইহার অর্ধেক স্থান বালুকাময়। উল্লিখিত বালুকা-পূর্ণ ক্ষেত্র কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তরাংশ দিয়া ডন-নদী পর্যন্ত গিয়াছে এবং ইউরাল নদীর পূর্বদিকে ইসিমের জঙ্গলের (Steppe of Isim) সহিত মিলিত হইয়াছে। আরল-হ্রদের দক্ষিণস্থিত খারাজেম প্রদেশের মরুভূমিতে একটা উর্বরা ক্ষেত্র আছে। ইহা খিবা প্রদেশের একটা ক্ষুদ্র জেলা বলিয়া গণ্য। ইহা এক্রপ ক্ষুদ্রায়তন যে, অথারোহণে ৩ দিবস মধ্যেই চতুর্দিক ঘুরিয়া আসা যায়।

আফগানি-স্থানের বিস্তৃত মরুভূমি আফগান-রাজ্যের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। উহার সর্বত্রই বালুকাময় মরুক্ষেত্র; কেবলমাত্র পূর্ব ও উত্তর সীমান্তবর্তী পর্বতগুলির তলদেশ এবং লোরা ও হেল্মন্দ নামক নদীদ্বয়ের তীরস্থ প্রদেশসমূহে তথাকার অধিবাসিগণের জীবিকোপযোগী শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরে যে মরুভূমিসমূহের কথা লেখা হইল, তাহা প্রায় সমস্ত্রপাতে পৃথিবীপৃষ্ঠের একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে কোথাও কোথাও বক্ররেখা পাত করিলেও উহাকে এক শৃঙ্খলে গ্রথিত বলা যায়। আফ্রিকা মহা-দেশের শাহারা মরুক্ষেত্রের পশ্চিমদেশবর্তী আটলান্টিক মহাসাগরস্থ বোজাডর অন্তরীপ হইতে ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে শাহারা, মিসর, আরব, তাতার, পারস্ত, আফগানহান ও ভারতের সিন্ধুপ্রদেশস্থ মরুভূমিসমূহ একসূত্রগ্রথিত বলিয়া অনুমান হয়। মধ্যে সিন্ধু-নদ ব্যবধান না থাকিলে রাজপুতনার অধূরুর 'মরুস্থলীকেও আমরা ঐ বিস্তীর্ণ মরুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারি। অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, এই বিশাল মরুভূ-বক্ষে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রাকার উর্বরক্ষেত্র বা গ্রামসমূহ বিরাজিত আছে। পশ্চিম-আফ্রিকা হইতে পশ্চিম-ভারত পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ মরুরাজ্য প্রায় ১৪ শত ভৌগোলিক মাইল ব্যাপিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হার্শোন্ট সাহেবের মতে উহা ভূপৃষ্ঠস্থ ২৭ লক্ষ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই বিস্তীর্ণ মরুরাজ্য বোধ হয় কোন অভাবনীয় কারণে অগদীশ্বর কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যেন অনন্তকাল অধূরুর পড়িয়া রহিয়াছে। যেন অগংপিতার নির্দেশ মতে তাহার বিশালবক্ষ আতপ-তাপক্লিষ্ট হইয়া অনন্তব্যবস্থা লঙ্ঘ করিতেছে। শতশত এই মরুরাজ্যের অন্তরালে আরও অনেকগুলি মরু-ভূমি দৃষ্ট হয়। উপরি উক্ত মরু-সাম্রাজ্যের এশিয়া-বিভাগের উত্তরাংশে মধ্যএশিয়ার অধিত্যাকাভূমির বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্র নয়নগোচর হইয়া থাকে।

এশিয়ার মধ্য-মালভূমির মরুক্ষেত্রের পূর্বাংশে সর্ব-প্রথমে ছোট-বুকারিয়া নামক উর্বরক্ষেত্র মরুভূমির মধ্য-গত হইলেও সম্পূর্ণরূপে অধূরুরা নহে। ইহার উত্তর-সীমান্তস্থিত পর্বতশ্রেণী হইতে বহুসংখ্যক নদী বহির্গত হও-য়ায়, তথাকার অধিকাংশ স্থান অপেক্ষাকৃত শস্তোৎপাদক হইয়াছে। সোঙ্গরিয়া হইতে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ আর একটা মরুক্ষেত্র চীনদেশের বিখ্যাত প্রাচীর পর্যন্ত পৌছিয়াছে। চীন রাজ্যে ইহা শামো নামে অভিহিত। ইহার দৈর্ঘ্যে অনুন ১৫০০ মাইল।

তাপের সাতিশয় প্রাথম্য হেতু অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে একটু বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট হয়। আফ্রিকার শাহারা ব্যতীত এক্রপ বিশেষত্ব অপর কুত্রাপি দৃষ্টিপথাক্রম হয় না। এখানে সময়ে সময়ে অদ্ভুতদৃশ্য নরীতিকাসমূহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, বৎসরের মধ্যে ৬ মাস কাল সূর্য্যদেব অষ্ট্রেলিয়ার অধিকতর নিকটবর্তী থাকেন এবং এই ৬ মাস কাল পৃথিবীর গতি অপেক্ষাকৃত বেগবতী থাকে। এই সময় পৃথিবী সূর্য্যের নিকটস্থ বলিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক তাপগ্রহণ করেন, কিন্তু ইহার গতি অপেক্ষাকৃত বেগবতী হওয়ার অল্প ৬ মাস কাল অপেক্ষা কম তাপ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু এই উভয়কালেই সমভাবে তাপ বিতরিত হইয়া থাকে।

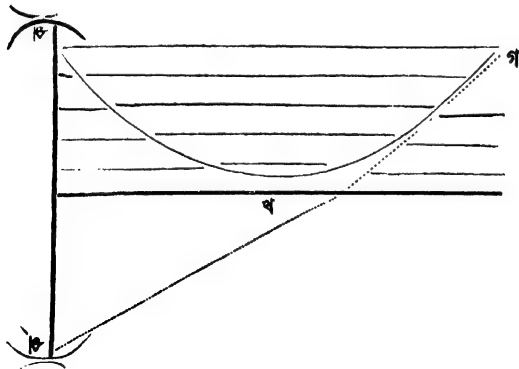
উত্তরায়নকালে বিষুবক্রান্তিবিন্দুতে সূর্য্যের আগমন হেতু পৃথিবী সূর্য্যের অধিক নিকটস্থিত হন। ঐ সময় সর্বাপেক্ষা অধিক সূর্য্যকিরণ ভূমণ্ডলে পতিত হইয়া থাকে। এই হেতু গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যভাগে দক্ষিণ-গোলার্ধে রবির উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইয়া থাকে। তাপের প্রখরতা হেতু অষ্ট্রেলিয়ার মরুক্ষেত্র সাধারণতঃ হটের পীড়ার ভ্রায় দেখায়।\*

দক্ষিণ-আফ্রিকার নমকোয়াল্যাও নামক ভূমিতে এতাদৃশ তাপ ও উত্তাপের ভারতম্যবশতঃ উপরোক্ত ঘটনা ঘটিয়া

\* ইহার দৃষ্টাবলীর বিষয় Capt. Stokes R. N. কৃত Discoveries in Australia ও Sturt's Narrative of Central Australia গ্রন্থ।

থাকে। শাহারা প্রভৃতি মরুভূমিতে পথিকগণ অনেক সময় মারাবিনী মরীচিকার কুহকে পড়িয়া প্রাণ হারায়। এই মরীচিকা একটা দৃষ্টিভ্রম মাত্র। উত্তাপ জন্ম বায়ুচাপের তারতম্য হেতু মরুভূমিঃস্থ বায়ুস্তর এরূপ বিভিন্ন চাপযুক্ত হয় যে, উহার একটা স্তরভাঙ্গুর দিয়া দিগন্তলম্বিত বৃক্ষাদি অপর স্তরে নিম্নাভিমুখে প্রতিভাত হয়। দৃষ্টিতে এরূপ উন্টা প্রতিমূর্ত্তি পথিকের নয়নপথে পতিত হইলে, তাহার মনে হয়, যেন জল মধ্যে উক্ত দ্রব্যের বিপরীত ছায়া পড়িয়াছে। এই ছায়াদর্শনে জলভ্রম উপস্থিত হওয়ার পথিকেরা সতৃষ্ণ-অবস্থায় দ্রুতগতিতে কল্পিত জল-ক্ষেত্রটিমুখে অগ্রণর হইতে থাকে, কিন্তু অবশেষে তাহাদের আশা উত্তপ্ত বায়ুপূর্ণ বালুকাময় স্থান দর্শনে একেবারে ভয় হইয়া যায়। এরূপ শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায় ভ্রম্যশ হইয়া পথিকগণ পিপাসার প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে। কিরূপে এই মরীচিকার উৎপত্তি হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

মরুভূমিঃস্থ বায়ুর ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে। ভূ-তলঃস্থ বালুকারাশি প্রথর রবির তাপে উত্তপ্ত হওয়ার, তৎসংলগ্নে সর্বনিম্ন বায়ুস্তর উপরি উপরি বায়ুস্তর হইতে অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও পাতলা হইয়া থাকে, এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বায়ুস্তর বিভিন্ন ঘনত্ব বা চাপবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ উপরিঃস্থ বায়ুস্তরের ঘনত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বায়বীয় পদার্থের ঘনত্ব কম হইলে কিরণের বক্রীকরণশক্তিও (Refracting power) হ্রাস পাইয়া থাকে। সুতরাং আলোকরশ্মিও ক্রমশঃ অধিকতর বক্রগতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে।



মরুভূমিঃস্থ বায়ুস্তরসমূহের চাপবৈলক্ষণ্যহেতু যে অত্য-শচর্য মরীচিকার নৈসর্গিক চিত্র দিগন্তে পরিদৃশ্য হয়, তাহার বিশেষ কারণ উপরিস্থিত চিত্রে পরিষ্কৃত করা গেল। চিত্রস্থিত ক একটি বৃক্ষ, খ ভূপৃষ্ঠস্থ সমতল ভূমি এবং গ

একজন দর্শক। এতদ্বিত্ত্ব ক, খ ও গ'র মধ্যবর্তী সরল রেখাগুলি বিভিন্ন বায়ুস্তর।

একণে মরুভূমিঃস্থ ক চিত্রিত বৃক্ষের কিরণপুঞ্জজনিত ছায়াপাত বথাক্রমে বিভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া খ'তে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক হইতে খ'তে আসিবার কালে আলোকরশ্মি এক স্তর হইতে অল্প স্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃই বক্রভাবে ধারণ করে। এইরূপে অবশেষে এমন স্তরে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সেখান হইতে আলোকরশ্মি আর বক্রগতি না পাইয়া একেবারে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। খ যেন এতাদৃশ বায়ুস্তর। অতএব খ স্তরে প্রতিবিম্বিত চিত্র আলোকরশ্মি দ্বারা পুনরায় ক্রমশঃই বিভিন্ন স্তর দিয়া বক্রগতিতে গ'তে পৌছিয়া থাকে। খ হইতে গ'তে যাইবার কালে কিরণপুঞ্জের বক্রগতি ক হইতে খ পর্যন্ত গতির বিপরীত দিকে হইবে, তাহার কারণ এক্ষণে আলোকমালা হাল্কা বায়ুস্তর হইতে ক্রমশঃ ঘন বায়ুস্তরে প্রবেশ করিতেছে। অতএব গ-স্থিত দর্শকের চক্ষে ক-স্থিত বৃক্ষরশ্মি যেন বালুকাপূর্ণ ক্ষেত্রের নিম্ন হইতে ক গ পথে না আসিয়া খ গ পথে আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়।

এইজন্ম বৃক্ষের উন্টা-প্রতিকৃতি সাধারণতঃই পথিকের নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন খ স্থানে জল থাকায় বায়ু-মধ্যস্থ ক বৃক্ষ খ জলে প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং মরুভূমিপৃষ্ঠে বিচরণকারী তৃষ্ণাতুর পথিকের পক্ষে উহা যে জলাশয়ঃস্থ চিত্র বলিয়া জান হইবে, তাহাতে আর আর আশ্চর্য্য কি! তাপ ও তৃষ্ণাক্রিষ্ট পথিক অদূরে জলাশয়-ভ্রমে তৃষ্ণাপনোদনের জন্ম বেগে ধাবিত হয়। অবশেষে জল না পাইয়া তৃষ্ণার শুষ্ককর্ষ ও হতাশাস হইয়া অকালে প্রাণ হারায়। দৃষ্টিভ্রম জন্ম ঘটে বলিয়া ইহাই মরীচিকা বা ভ্রুগ-তৃষ্ণা নামে উক্ত হইয়াছে।

আমেরিকা মহাদেশে আরও একপ্রকার সমতল মরুক্ষেত্র আছে, তাহা বালুকাময় মরুর মত নহে। উহাতে জলদ্রাঘি দৃষ্ট হয়। তাহা পম্পস্, সাভেনাস্ প্রভৃতি নামে খ্যাত।

মরুভূরুহ (পুং) মরুভূবি রোহতি জায়তে ইতি ক্রহ (ইণ্ড-পথজ্যাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।৩৫) ইতি ক। করীর বৃক্ষ। (ভাবপ্রঃ) (ত্রি) মরুভূমিজাত।

“সংপুংসো মরুভূরুহ ইব জীবনমাজ্যমাশান্তম্।”

(আর্য্যাসপ্তশতী ৬৭৬)

মরুমহী (ত্রি) মরুভূমি। (রাজতরং ৪।২২৪)

মরুল (পুং) স্মিত্তে অলং বিনতি মৃ-উল। কারণ্ডব পক্ষী।

মরুব (পুং) মরুঃ নির্জলদেশং বাতি প্রাণোত্তীতি বা-ক।

বৃক্ষবিশেষ। চলিত মরুয়া বা নাগদানা, পর্যায়—স্বরপত্র, গন্ধ-  
পত্র, ফণিজ্বক, বহুবীর্ণ্য, শীতলক, সুরাস্ব, সমীরণ, জঘীর,  
প্রহুসুম, মরুবক, আজম-স্বরভিপত্র, মরিচ। ইহার গুণ—  
কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিড়্বক, আয়ান। শূল ও স্বগ্-  
দোষনাশক। (রাজনিং) ভাবপ্রকাশমতে ইহার পর্যায়—  
মরুতক মরুবক, মরুং, মরু, কণী, ফণিজ্বক, প্রহুপ্প, সমীরণ।  
গুণ—অগ্নিপ্রদ, হৃদা, তিক্ত, উষ্ণ, পিত্তবর্ধক, লঘু, বৃদ্ধিকাদির  
বিষহর, প্লেগ, বাত, কুষ্ঠ এবং ক্রিমিদোষনাশক; কটুপাক,  
কটিকর, কক্ষ এবং শ্লগক্ষুদ্র।

মরুবক (পুং) মরুব স্বার্থে ইবার্থে বা কন্। কণ্টকিবৃক্ষ-  
বিশেষ। পর্যায়—পিণ্ডীতক, শ্বশন, করহাটক, শল্য, মদন।  
২ স্বল্পপত্রতুলসী, পর্যায়—সমীরণ, প্রহুপ্প, ফণিজ্বক,  
জঘীর। (অমর) ৩ জঘীরভেদ। (ভরত) ৪ পুষ্পবৃক্ষ-  
বিশেষ, মরুয়াফুল। পর্যায়—গুরুপ্প, তিলক, কুলক।  
৫ ক্ষুপবিশেষ, চলিত নাগদানা। পর্যায়—স্বরপত্র, গন্ধপত্র।  
৬ ব্যাঘ্র। ৭ রাহ। (ত্রি) ৮ তরানক। (জটধর)

মরুবতুর, মাজাজ-প্রেসিডেন্সীর তাজোর জেলার অন্তর্গত  
একটি প্রাচীন গ্রাম।

মরুসম্ভব (ক্ৰী) মরুঃ সম্ভব উৎপত্তিস্থানমন্ত। চাপক্যমূলক।  
“মূলকং দ্বিবিধং প্রোক্তং তত্রৈকং লঘুমূলকম্।

শালমর্কটকং বিপ্রং শালয়ং মরুসম্ভবম্ ॥” (ভাবপ্রং)

মরুসম্ভবা (স্ত্রী) মরৌ সম্ভবো যন্তাঃ টাপ্। ১ মহেন্দ্রবাকী,  
চলিত—মাকাল ফল। ২ ক্ষুদ্র ছুরালতা। ৩ হ্রস্ব খদির।  
৪ কার্পাস। (রাজনিং)

মরুস্থল (ক্ৰী) মরুভূমি।

মরুস্থলী, রাজপুতনার অন্তর্গত বর্তমান মাড়বার-প্রদেশের  
প্রাচীন সংস্কৃত নাম।

মরুস্থা (স্ত্রী) মরৌ তিষ্ঠতীতি স্থা-ক জিয়াং টাপ্। ক্ষুদ্র-  
ছুরালতা। (রাজনিং)

মরুক (পুং) জিয়াতে ইবেতি যু- (মুকণিভ্যাম্‌কোকণৌ। উণ্  
৪৩৯) ইতি উক, ভয়শীলবাদন্ত তথাস্থং। ১ মৃগবিশেষ।  
২ ময়ূর। ৩ শগী। (উজ্জল)

মরুস্তবা (স্ত্রী) মরৌ ধ্বপ্রদেশে উত্তবতীতি উৎ-ভূ-অচ্,  
জিয়াং টাপ্। ১ কার্পাসী। ২ যবাস। ৩ হ্রস্ব খদির।  
৪ ছুরালতা। (রাজনিং)

মরুভূ (স্ত্রী) মরুভূমি।

মরোলিক (পুং) মরোলি স্বার্থে কন্। মরক। (শব্দরত্নাং)

মরোলিন্ (পুং) মরৌ নির্জলদেশে লীয়তে জিয়াতে মরুলী-  
ইন্‌ পুণ্যোদগাদিহাং সাধুঃ। মরক।

‘জলরপজ মরো মরোলিরসিংহকঃ।’ (ত্রিকাং)

মরোলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তঃপাতী ঠানাজেলার একটি  
বন্দর। অক্ষা° ২০° ১৮’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৬’ পূঃ।

মরোরী, উঃ পঃ প্রদেশের পিলিভীৎ জেলার অন্তর্গত  
একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। বিলাসপুর সহর হইতে ৪ ক্রোশ  
পূর্বে অবস্থিত। এখানে খনাত নদীর দক্ষিণ-কূলে একটি  
সমৃদ্ধিশালী নগরের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

মর্ক, মৌজিক ধাতু। ১ সর্পণ, ভাদি পরম্‌০ সর্ক° সেট্। লট্  
মর্কতি। লোট্‌ মর্কত্। লুঙ্‌ অমর্কীৎ।

মর্ক (পুং) মর্কতি চেষ্টেতে ইতি মর্ক (ইন্‌-ভী-কা-পা-শল্যতি  
মর্কিভ্যঃ কন্। উণ্‌ ৩৪৩) ইতি কন্‌, যবা মর্কতি সর্পতীতি  
মর্ক-অচ্‌। ১ দেহ। ২ বাঘ। (উজ্জল) ৩ শুক্রপুত্র।

“উপধামগৃহীতোহসি মর্কায় স্বা” (শুক্রযজুঃ ৭।১৬)

‘মর্কঃ শুক্রপুত্রোহস্বরঃপুরোহিতঃ’ (বেদদীপং)

৪ বানর।

“মর্কান্‌ ভোক্ষান্‌ বিভজতি স চেন্নান্তি ভাণ্ডং ভিনন্তি।”

(ভাগবত ১০।৮।২৯)

‘মর্কান্‌ মর্কটান্‌’ (স্বামী)

(ত্রি) ৪ মার্জয়িতা।

“স্বরশ্চ মর্ক উপরো বতুবান্‌” (ঋক্‌ ১০।১৭।২০)

‘মর্কো মার্জয়িতা’ (সায়ণ)

মর্কক (পুং) মর্ক ইবার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্‌। গলগণ্ডপক্ষী,  
চলিত হাড়গিলা পাখী। ২ উর্ণনাভ, চলিত মাকড়সা।

মর্কট (পুং) মর্কতি গচ্ছতীতি মর্ক- (শকাদিভ্যোহিট্‌। উণ্‌  
৪।৮১) ইতি অটন্‌। বানর।

“যমায় কৃষ্ণঃ মহুয়ারায়া মর্কট” (শুক্রযজুঃ ২৪।৩০)

২ উর্ণনাভ।

“অয়মুদগৃহীতবড়িশঃ কর্কট ইব মর্কটঃ পুরতঃ।”

(আর্য্যাসপ্তশতী ৩২২)

৩ স্থাবর-বিষভেদ। (হেম) ৪ গলগণ্ডপক্ষী, হাড়-  
গিলাপাখী। (ত্রিকাং)

মর্কটক (পুং) মর্কট স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্‌। ১ বানর।  
২ জুতা। ৩ শস্ত্রভেদ। (মেদিনী)

“শ্রামাকাঙ্ক্ষনীবারা জটীলাঃ সগবেধুকাঃ।

তথা বেণুযবাঃ প্রোক্তান্তধন মর্কটকা যুনে ॥” (বিক্রপুঃ ১।৬২৫)

৪ মৎস্তভেদ। ৫ দৈত্য। (শব্দরত্নাং)

মর্কটতিন্দুক (পুং) মর্কটপ্রিয়তিন্দুকঃ, মধ্যপদলোপি  
কর্মধাং। কুপীন্দু। (ভাবপ্রং)

মর্কটপিপ্ললী (স্ত্রী) মর্কটত পিপ্ললীবা। অপামার্গ। (রাজনিং)

মর্কটপ্রিয় (পুং) মর্কটশ্র প্রিয়ঃ। কীরবৃক্ষ। (শব্দমালা)  
 মর্কটবাস (পুং) মর্কট উর্ণনাভস্তস্ত বাসঃ আবাসস্থানং।  
 লুতাত্ত্ব, চলিত মাকড়সার জাল। পর্যায় আশাবন্ধ।  
 মর্কটশীর্ষ (ক্লী) মর্কটশ্র শীর্ষমিব তদ্বর্ণবাদেবাস্ত তথাৎ।  
 হিঙ্গুল।

“রক্তং মর্কটশীর্ষঞ্চ হিঙ্গুলং দরদো রসঃ।” (বৈথকরত্নং)

মর্কটহ্রদ (ক্লী) বৈশালীর অন্তর্গত হ্রদভেদ।

মর্কটাস্র (ক্লী) মর্কটশ্র আশ্রমিব তদ্বর্ণবাদেবাস্ত তথাৎ। বানর-  
 মুখ। মর্কটশ্র আশ্রমিব আস্রং যস্ত। (ত্রি) ২ বানরমুখ।

মর্কটী (স্ত্রী) মর্কতি বায়ুবেগেন ইতস্ততো গচ্ছতীতি মর্ক-  
 অটন, স্ত্রিয়াং ভীপ্। ১ কপিকচ্ছু।

“কপিকচ্ছুরায়ুগুপ্তা বৃষা প্রোক্তা চ মর্কটী।

অজরা কবুরা ব্যাঙ্গা হুঃস্পর্শা প্রাবৃষায়ণী ॥” (ভাবপ্রং)

২ অপামার্গ। ৩ অজমোদা। ৪ করঞ্জভেদ, চলিত  
 মাকড়া করঞ্জ। ৫ বানরী।

মর্কটীত্রত (ক্লী) ত্রতবিশেষ।

মর্কটেন্দু (পুং) মর্কটে খগবিশেষে ইন্দুবির। কাকতিন্দুক  
 বৃক্ষ, চলিত কুচিলা।

‘কাকেন্দুঃ কুলকঃ কাকপীলুকঃ কাকতিন্দুকে।

মর্কটেন্দুঃ সিন্ধুপুত্রো দ্বাবেভৌ তত্র কীন্তিতৌ ॥’ (শব্দচং)

মর্থামাউ, উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার মোরাওন  
 উপবিভাগের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। এই নগরের  
 চতুর্দিকে বিভিন্ন প্রস্তর-প্রতিমূর্তি ও ইষ্টকখণ্ডপূর্ণ স্থূপ সকল  
 দেখিলে অশ্রুমান হয় যে, পূর্বকালে এই নগরে হিন্দুপ্রাধাত্ত  
 অক্ষুণ্ণ ছিল; পরে মুসলমানগণ সেই সমস্ত প্রাচীন হিন্দুকীর্তি  
 ধ্বংস করিয়া তাহারই মাল-মসলা হইতে মুসলমানদিগের  
 উপযোগী সৌধমালা গঠিত করিয়া লইয়াছে।

মর্গাও, পত্নীগীজ-অধিকৃত গোয়ারাজ্যের সালসেট্ (গাঢ়াপুরী)  
 জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১৫° ১৮’ উঃ এবং দ্রাঘি°  
 ৭৪° ১’ পূঃ। পঞ্জাম হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে শাল-  
 নদীর তীরে উক্ত জেলার ঠিক মধ্যস্থলে মনোরম সমতল  
 ক্ষেত্রোপরি অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে এই নগরে  
 বহুপূর্বকাল হইতে আর্ঘ্যজ্ঞাতির উপনিবেশ ছিল এবং  
 এখানে তাঁহাদের একটি প্রধান মঠ বা ধর্মমন্দির স্থাপিত  
 হইয়াছিল। এই মঠ হইতে ইহার নাম মঠগ্রাম হয়। বর্ত-  
 মানে মঠগ্রামের অপভ্রংশে মর্গাও নামে ঘোষিত হইতেছে।  
 মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমান সৈন্তগণ কিছুকাল পর্যন্ত এই  
 নগর লুণ্ঠন করিতে থাকে; কিন্তু এই স্থানে এত সমৃদ্ধিশালী  
 লোক বাস করিতেন যে, এক্রপ লুণ্ঠনের পরও তথায় অনেক

ধনী লোকের বাস ছিল। এইস্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টা-  
 লিকা আছে। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এইস্থানে খৃষ্টানধর্ম প্রচারিত হয়  
 এবং ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে এখানকার প্রথম গির্জা প্রস্তুত হইয়া-  
 ছিল। মরগায়ে টাউন হল, গবর্নমেন্ট বিতালয়, থিয়েটার  
 এবং দরিদ্রাশ্রম আছে। ১৮১১ খৃঃ অব্দে এইস্থানে একটি  
 সৈন্তাবাস নিশ্চিত হয় এবং তথায় একদল সেনা রক্ষিত  
 হইত। বর্তমান সময়ে ঐ বারিকে পুলিশ-কন্সটারী ও  
 সামান্য কয়েক জন মাত্র সৈন্তের আড্ডা আছে।

মর্কর (পুং) মর্কতি গচ্ছতীতি মর্ক-বাহুলকাৎ অর। ভৃঙ্গরাজ।  
 (শব্দরত্নাং)

মর্করা (স্ত্রী) মর্কর স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দরী। ২ ভাণ্ড।  
 ৩ সুরঙ্গ। ৪ নিম্বলা স্ত্রী। (বিশ্ব)

মর্নুগোল (পারসী) ১ কুলুপ। ২ নিপীড়ন। ৩ সঙ্গীত  
 কালে ব্রকম্পন, গিট্‌কিরী।

মর্চ, সৌত্র দাতু। ১ গ্রহণ, চুরাদি, পরস্মৈৎ সকং সেট্। লট্  
 মর্চয়তি। লোট্‌ মর্চয়তু। লুঙ্‌ অমমর্চৎ।

মর্চ্যা (দেশজ) ময়লা, লোহাদি কোন দ্রব্যে ময়লা বা জঙ্ক  
 পড়িলে তাহাকে মর্চ্যা কহে।

মর্জ (স্ত্রী) মৃজ্যতে ইতি মৃজ্‌ শুক্লো (মৃজেণ্ডগ্‌শচ। উণ্  
 ১৮১) ইতি উ, ঙ্‌শচ। ১ শুক্লি। (মেদিনী) মাষ্টি শোধয়তি  
 বসনমিতি মর্জ-উ। ২ রজক। ৩ পীঠমর্দ। (শব্দরত্নাং)

মর্জ্জা, পঞ্জাব-প্রদেশের বশহর রাজ্যের অন্তর্গত একটি  
 পাক্তা পথ। অক্ষা° ৩১° ১৬’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৭’  
 পূঃ। ইহার উচ্চতা ১৬০০০ হইতে ১৭০০০ ফিট্‌। কেবল-  
 মাত্র জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত এই পথে যাতায়াত  
 করা যায়। অপর সকল সময়েই তুষারপাতনিবন্ধন পথ  
 আবৃত থাকে।

মর্জ্জাত (কাণা), বঙ্গদেশে খুলনা জেলার মধ্যে প্রবাহিত একটি  
 নদী। ইহার সমুদ্রসঙ্গমস্থানও মর্জ্জাত নামে খ্যাত। অক্ষা°  
 ২১° ৪৪’ উচ্চ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ০২’ পূঃ। পাটনী দ্বীপ হইতে  
 ৮৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার মুখ অতিশয় বিস্তীর্ণ।  
 নদীর মোহনা হইতে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে পারভাঙ্গা  
 নামক দুইটি দ্বীপ আছে।

মর্জ্জাদপট্টি, উঃ পঃ প্রদেশের বারানসী বিভাগের মীর্জাপুর  
 জেলার একটি গওগ্রাম। প্রাচীন ভদোহি নগরের উপকণ্ঠে  
 অবস্থিত। এখানকার সৈয়দ সালর গাফির দরগা অতি  
 প্রাচীন। প্রতি বৎসর এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে।

মর্জ (পুং) স্ত্রিয়তেইদৌ ইতি মৃ (হসিমুখিণিতি। উণ্ ৩৮৬)  
 ইতি তন্। ১ মনুষ্য।



“পৌর্ণমাশ্রামাবস্থাঃ পর্ষস্বত্রেষু প্রস্তুতঃ।

মমৈষ সংক্রান্তো মর্ত্যোভবিতা পাপনাশনঃ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুঃ ১০০।১৮)

২ মাণবক। স্মিত্তেহত্রেতি। ৩ ভুলোক। (উজ্জল)

মর্তবান, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মের তেনাসেরিম-প্রদেশের আমহাট্ট জেলার অন্তর্গত একটি বিভাগ। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা শৈলশ্রেণী বিরাজিত। এই শৈলশ্রেণীর পূর্ববর্তী স্থানসমূহ জঙ্গলে আবৃত এবং কর্ষণের অল্পপঙ্ক। পশ্চিমভাগে সুবিস্তীর্ণ উর্বরা ক্ষেত্র। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল বিস্তৃত থাকায় স্থানীয় শস্তাদি স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। বস্ত্রার সময় সমুদ্রজল নদীর তিতর প্রবেশ করিয়া পশ্চিমফুলডাত শস্তাদি নষ্ট করিয়া থাকে। উহার দক্ষিণাংশে বাঁধ আছে বলিয়া সমুদ্র-জলের গতি রুদ্ধ হওয়ায় ভূমিভাগে প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং ঐ স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক পারমাণে শস্ত জন্মে।

এখানকার অধিবাসিগণ তলৈঙ্গ, তাহাদের কথিত ভাষাও তলৈঙ্গ নামে খ্যাত। উহা উত্তর-ব্রহ্মের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

২ উক্ত স্থানের প্রধান নগর। শালুএন্ নদীর দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬° ৩২' উঃ; দ্রাঘি° ৯৭° ৩৮' পূঃ। এখানে শালুএন্ নদীর তীরভূমে একটি দেবালয় আছে।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, পেগুর প্রথম রাজা থ-ম-ল ৫৭৬ খৃঃ অব্দে মর্তবান নগর নিৰ্ম্মাণ করেন, অতঃপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একরাজ ইহার আধিপত্য বৃদ্ধি করেন। পূর্বে মর্তবানে রাজধানী ছিল, পরে ১৩২৩ খৃঃ অব্দে পেগু নগরীতে রাজধানী পরিবর্তিত হয়। পেগু ও শ্রামের লোকদিগের সহিত ব্রহ্মদেশবাসীর বৃদ্ধকালে এই নগরী পুনঃ পুনঃ অবরুদ্ধ ও লুপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রামের রাজা মর্তবান অধিকার করিয়া তথায় জনৈক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অনন্তর ইহার ইতিবৃত্ত সন্ধিক্ষে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশের রাজার নিযুক্ত শাসনকর্তাদিগের আবাস এই নগরীতে ছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে ইংরাজ কর্তৃক এই নগরী অবরুদ্ধ ও অধিকৃত হয়। পুনরায় ১৮৫২ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় যুদ্ধে ব্রহ্মদেশবাসীরা কয়েক সপ্তাহ পরে ইহার উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

মর্তোলি, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের কুমায়ন জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। অক্ষা° ৩০° ২১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৩' পূঃ। জুহার পার্শ্বা-পথে নিকট দিয়া যে রাস্তা হুদদেশে (চীনা-

ধিকৃত তিব্বৎ) গিয়াছে, তাহারই উপরে এই গ্রাম অবস্থিত। উত্তরাংশের শীতপ্রধান পর্য্যটনমধ্যে অবস্থিত বলিয়া শীতকালে এখানকার অধিবাসিগণ নিম্নস্থ উপত্যকায় নামিয়া আসিয়া অবস্থান করে। এই গ্রামটা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১৩৫২ ফিট, উচ্চে স্থাপিত।

মর্ত্য (পুং) স্মিত্তেহত্রেতি মর্ত্যো ভুলোকন্তত্র ভবঃ মন্ত-যৎ, যদা মর্ত এব যৎ। ১ মনুষ্য। ২ মধ্যমলোক। (জটীধর) (ক্লী) ৩ শরীর।

“তত্ত্বাস্তদ্যোগবিধূতমাত্যং মর্ত্যমভূৎ সরিং।

(ভাগবত ৩।৩৩।৩২)

মর্ত্যকৃত (ত্রি) মনুষ্য কর্তৃক অশ্রুতি।

‘মর্ত্যকৃতং পুরাবাগো দেব রিম্পাহি’ (শুক্লযজুঃ ৮।২৭)

‘মর্ত্যকৃতং মর্ত্যোমু যজ্ঞদর্শনাথমাগতেষু কৃতমবজ্ঞারূপং’

(বেদদীপং)

মর্ত্যাতা (ক্লী) মর্ত্যস্ত ভাবঃ তল-টাপ্। মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম, মর্ত্যত্ব।

মর্ত্যাত্রা (অব্য°) মর্ত্যাদিগের পালয়ত্রী।

‘নৃত্য উষো দেবি মর্ত্যাত্রা সূজাতে’ (ঋক্ ১।১২৩।৩)

‘মর্ত্যাত্রা মনুষ্যাণাং পালয়ত্রী’ (সায়ণ)

মর্ত্যত্ব (ক্লী) মর্ত্যভাবে ত্ব। মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম।

মর্ত্যভূম (ক্লী) মনুষ্যের অবলম্বনীয় পস্থা।

মর্ত্যধর্ম (পুং) মর্ত্যত্ব ধর্মঃ। মনুষ্যের ধর্ম।

মর্ত্যধর্মন্ (পুং) মনুষ্য-ধর্মযুক্ত।

মর্ত্যভাব (পুং) মর্ত্যস্ত ভাবঃ। মনুষ্যস্ত ভাব, মনুষ্যত্ব।

মর্ত্যভূবন (ক্লী) মর্ত্যালোক, মনুষ্যালোক।

মর্ত্যমহিত (ত্রি) মর্ত্যে মহিতঃ। ১ মনুষ্য কর্তৃক পূজিত।

(পুং) ২ দেবতা।

মর্ত্যমুখ (পুং) ১ মনুষ্যের মুখ মুখবিশিষ্ট। ২ কিম্বদ, যক্ষ প্রভৃতি।

মর্ত্যালোক (পুং) মনুষ্যালোক, পৃথিবী।

মর্ত্যোমিত (ত্রি) মারক বা অস্ত্র কর্তৃক প্রেরিত।

‘যুগ্মেষিতো মরুতো মর্ত্যোমিত আ যোনো’ (ঋক্ ১।৩৯।৮)

‘মর্ত্যোমিতঃ মারকৈরশ্রৈব প্রেষিতঃ’ (সায়ণ)

মর্দ, [মৃদ দেখ]

মর্দ (পুং) মৃদ-ঘঞ্। ১ মর্দন। ২ মর্দনশীল।

মর্দ (দেশজ) মরদ, বলবান ব্যক্তি।

মর্দক (পুং) মর্দনকারক।

মর্দন (ক্লী) মৃদ ভাবে লুট্। অঙ্গমর্দন, চলিত গা-টেপা।

পর্দায়—সংবাহন, সঞ্চাল। (শব্দরত্না°) ইহার গুণ—ভ্রমহর,

নিদ্রা, শুক্র ও স্বপ্নপ্রদ, মাংস, রক্ত ও বৃক্কপ্রসঙ্গকারক ; বায়ু ও কফনাশক। (রাশ্ববো) ২ চূর্ণন। ৩ কদন।

“তেবাং মৈরোরদোবেণ বিষমীকৃতচেতসাম্।

নিম্নোচতি রবাবানীদবেণুনামিব মর্দনম্ ॥”

(ভাগবত ৩৪২)

(ত্রি) মৃদ-ল্য। ৩ মর্দনকারক।

“দ্রব্যে ক্রিষ্ণলজ্জ্বানং মর্দনং ত্রিদশৈশ্বরম্।”

(মহাভারত ১৩।১৪।৭২)

মর্দনসিংহ, মহাপ্রদেশের ডানপুরের জনৈক হিন্দু রাজা।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় শাহ-গড়ের রাজগণ বিদ্রোহী হইলে, স্বযোগ দেখিয়া তিনি কুবাই মহকুমা অধিকার করিয়া বসেন। অতঃপর ইনি শাহগড়-রাজ ও গড়-অমাপানীর নবাব আদিল মহম্মদের সহযোগে ইংরাজাধিকৃত সমগ্র সাগর জেলা অধিকারপূর্বক ভাগ করিয়া লইলেন। ৮ মাস কাল পর্যন্ত ঘটনাস্রোত এই ভাবে প্রবাহিত থাকে। সাগরনগর ও হুর্গ ইংরাজরাজের শাসনাধীনে থাকিলেও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ বিদ্রোহীদিগের করতলগত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে সার হিউগ্ রোজ প্রথমে আদিল মহম্মদকে পরাভূত করেন, তদনন্তর তিনি মর্দন সিংহকে পরাস্ত করিয়া সাগর জেলা বিদ্রোহ-হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

মর্দান, পঞ্জাবপ্রদেশের পেশাবর জেলার অন্তর্গত একটি তহসীল। পেশাবরের মধ্যস্থলে স্রাত এবং কাবুল নদীর পূর্বে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩৩২ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে প্রায় ১০০টা নগর ও গ্রাম আছে। গম, যব, তুলা, ইক্ষু, জোয়ার প্রভৃতি শস্ত এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে এক জন আদিষ্টাণ্ট কমিশনার ও একজন তহসীলদার আছেন।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রাধান নগর ও বিচার সদর।

মর্দল (পুং) মর্দং মর্দনং লাভীতি লা-ক। বাস্তবিশেষ, চলিত মাদল। পর্যায় শুক (শব্দরত্নাং)

“মৃদলানকশঙ্খানাং মর্দলানাঞ্চ নিবনৈঃ।

ধরোষ্ট্রাখতরৈশ্চৈব মত্তা যাত্তামহে স্বধম্ ॥”

(ভারত ৮।৪৪।১২)

মর্দিত (ত্রি) মৃদ-কর্শণি ক্র। ১ গ্রহিত। ২ চূর্ণিত।

“তিস্তিভীকলরসেন মর্দিতো রামবাণ ইতি বিক্রতো রসঃ।”

(ভাবপ্রঃ)

মর্ঘ, গতি। ভ্রূহি পরমৈ সৰ্ব সেট্। লট্ মর্গতি। লোট্ মর্গতু। লুঙ্ অমর্ঘীৎ।

মর্দা (পারসী) পুরুষ।

মর্দানা (পারসী) ১ পুরুষ। ২ পুরুষসম্বন্ধীয়। ৩ মনুষ্যোচিত।

৪ সাহস। (দেশজ) ৫ হস্তালকারবিশেষ।

মর্দাদামী (পারসী) ১ পুরুষমাহুয। ২ ভদ্রলোক।

মর্ফা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ বান্দাজেলার একটি প্রাচীন নগর। এখানকার ধ্বংসপ্রায় হুর্গভাগ সেই পূর্বসমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। এই নগর পাশা-রাজবংশীর জনৈক বাবেল রাজার রাজধানী ছিল। এই বংশের শেষ রাজা চাচরীয়ার যুদ্ধে ১৭৮০ খৃঃ অব্দে নিহত হইয়াছিলেন; তদবধি ঐ হুর্গ ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছে। এই দুর্গে ৪টা ফটক আছে। তন্মধ্যে কয়েকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

মর্ফাকীল (পুং) মর্ফ কীলতি বিধাতীতি কীল-ক বহা মর্ফনি গুচবিষয়ে কীলশুক্রিব। ভর্তা। (জটায়ব)

মর্ফগ (ত্রি) মর্ফ তৎ গচ্ছতীতি মর্ফ-ড। মর্ফজ।

মর্ফগাঁও পশ্চিমবঙ্গের অধিকৃত সাগরসেটা জেলার অন্তর্গত একটি উপদ্বীপ, নগর ও বন্দর। মর্ফগাঁও উপদ্বীপ গোয়া-বন্দরের দক্ষিণে জুয়ারি নদীর বামতীরে অবস্থিত। এই উপদ্বীপের অগ্রভাগ ২০০ ফিট উচ্চ একটি সমতল ক্ষেত্র।

মর্ফগাঁও নগর ও বন্দর উক্ত উপদ্বীপের পূর্ব-সীমানায় পঞ্জীমের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার প্রায় সমস্ত লোকই খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী। গত সপ্তদশ শতাব্দের শেষভাগে পশ্চিমীজ-রাজপ্রতিনিধি গোয়া হইতে মর্ফগাঁওয়ের রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে মনস্থ করেন। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে নতুন রাজপ্রাসাদের ভিত্তি আরম্ভ হয়; কিন্তু তাহার পরবর্তী শাসনকর্তা অটালিকা নির্মাণ বন্ধ করিয়া দেন। বাহাইউক, তৎপরবর্তী রাজপ্রতিনিধি নিটানো ডি মেলা ক্যাপ্টেনের শাসনকালে ঐ রাজপ্রাসাদের সমস্ত গঠনকার্য সম্পন্ন হয় এবং শাসনকর্তা তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে গোয়া নগর মহারাষ্ট্র-করকবলে পতিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তথাকার নিরাশ্রয় অধিবাসিগণ এবং মঠ-বাসিনী খৃষ্টান-সন্ন্যাসিনীগণ এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে এখানে একটি পুরাতন গির্জার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার গঠনকার্য অতি মনোহর।

মর্ফগাঁও হুর্গে কয়েকদিগের গারদখানা হইয়াছে।

মর্ঘজ (ত্রি) মর্ঘ তৎ জানাতীতি জ্ঞা-ক। ১ মর্ঘবিদ। ২ তৎজ্ঞ।

“তেষামাপততাং বীর শীঘ্রং পূর্বমথো দৃঢ়ম্।

ক্ষিপ্তোত্তো ভবদীৎ ত্রাতামর্ঘজো মর্ঘবেদিতঃ ॥”

(ভারত ৭।৩৫।২০)

মর্শ্ব (ত্রি) মর্শ্ব হস্তি হন্তৃক্। মর্শ্বাতক।

মর্শ্বচর (ক্লী) হৃদয়।

মর্শ্বচ্ছিদ (ত্রি) মর্শ্ব ছিনতি ছিদ্-কিপ্। মর্শ্বচ্ছেদকারক।

মর্শ্বাত্র (ক্লী) হৃদয়াচ্ছাদক মর্শ্ববিশেষ।

মর্শ্বন্ (ক্লী) মৃ (সর্গধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) ইতি মনিন্। ১ স্বরূপ। ২ তত্ত্ব।

“মৃগয়া ন বিগীয়তে নুপৈরপি ধর্ম্মাগমমর্শ্বপারগৈঃ।

অরহুন্দর! মাং বদত্যন্তবধর্ম্মঃ সদরো দরোজ্ঞঃ ॥”

(নৈষধ ২।৯)

৩ সন্ধিস্থান। ৪ জীবস্থান।

“সন্নিপাতঃ শিরাস্বাসুসন্ধিমাংসাস্তিসম্ভবঃ।

মর্শ্বাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ ॥” (ভাবপ্রঃ)

শিরা, স্বাসু, সন্ধি, মাংস এবং অস্থি ইহাদের একত্র সন্নিবেশকে মর্শ্ব কহে। মর্শ্বস্থানে প্রাণ বিশেষরূপে অবস্থিতি করে। সূত্রতে লিখিত আছে, মর্শ্বস্থান ১০৭টি। এই মর্শ্ব সকল পাঁচ ভাগে বিভক্ত,—মাংসমর্শ্ব, শিরামর্শ্ব, স্বাসুমর্শ্ব, সন্ধিমর্শ্ব ও অস্থিমর্শ্ব। ইহার মধ্যে আবার মাংসমর্শ্ব ১১, শিরামর্শ্ব ৪১, স্বাসুমর্শ্ব ২৭। ইহার মধ্যে প্রত্যেক পাদে ও হস্তে ১১, উদরে ও বক্ষঃস্থলে ১২, পৃষ্ঠে ১৪ এবং গ্রীবা ও তাহার উর্দ্ধদেশে ৩৭। ক্ষিপ্ৰ, তলহৃদয়, কূর্ক, কূর্কশির, গুল্ফ, জাহু, ইন্দ্রবন্তি, উরু, আগি লোহিতাক্ষ ও বিটপ, এই একাদশ করিয়া মর্শ্ব প্রত্যেক পাদে অবস্থিত।

উদর ও বক্ষোদেশস্থিত মর্শ্ব—গুদ, বন্তি, নাভি, হৃদয়, স্তনমূল, স্তনরোহিত, অপলাপ, অবস্তন্ত। পৃষ্ঠদেশস্থিত মর্শ্ব—কটীকতরুণ, কুকুন্দর, নিতম্ব, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী, অংশকলক এবং অংশধর। বাহস্থিত মর্শ্ব—ক্ষিপ্ৰ, তলহৃদয়, কূর্ক, কূর্কশির, মণিবন্ধ, ইন্দ্রবন্তি, কূর্পর, আগি, উরু, লোহিতাক্ষ এবং কক্ষধর।

স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত মর্শ্ব—ধমনী ৪টি, মাতৃকা ৮, কৃকাটিকা, ২, বিধুর ২, ফণ ২, অপাঙ্গ ২, আবর্ত ২, উৎক্ষেপ ২, শঙ্খ ২, স্থপনী ১, নীমন্ত ৫, শৃঙ্গাটক ৪ এবং অধিপতি নামক এক। এই ৩৭ টি মর্শ্বস্থান স্কন্ধসন্ধির উপরিভাগে স্থিত।

এই সকল মর্শ্বের মধ্যে তলহৃদয়, ইন্দ্রবন্তি, গুহমণ্ডল এবং স্তনরোহিত এই সকল মাংসমর্শ্ব। নীলা, ধমনী, মাতৃকা, শৃঙ্গাটক, অপাঙ্গ, স্থপনী, ফণ, স্তনমূল, অপলাপ, অপস্তন্ত, হৃদয়নাভি, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী, লোহিতাক্ষ এবং উরু এই সকল শিরামর্শ্ব। আগি, বিটপ, কক্ষধর, কূর্ক, কূর্কশির, বন্তি, ক্ষিপ্ৰ, অংশ, বিধুর এবং উৎক্ষেপ এই সকল স্বাসুমর্শ্ব, কটীকতরুণ, নিতম্ব, অংশকলক এবং শঙ্খ, এই সকল,

অস্থিমর্শ্ব। জাহু, কূর্পর, নীমন্ত, অধিপতি, গুল্ফ, মণিবন্ধ, কুকুন্দর, আবর্ত এবং কৃকাটিকা, এই সকল সন্ধিমর্শ্ব। এই সকল মর্শ্বের পাঁচ প্রকার কার্য্য; যথা—সম্ভঃ প্রাণনাশক, কালান্তরে প্রাণনাশক, বিশল্যায়, (যে স্থানের শল্য বাহির করিলে মৃত্যু হয়) বৈকল্যকর, (যাহা দ্বারা কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের বিকৃতি হয়) এবং পীড়াকর। ১২ টি মর্শ্ব সম্ভঃ প্রাণনাশক, ৩৩ টি কালান্তরে প্রাণনাশক, ৩ বিশল্যায়, ৪৪ বৈকল্যকর এবং ৮ টি পীড়াকর।

হৃদয়, বন্তি, নাভি, শৃঙ্গাটক, অধিপতি, শঙ্খ, শির ও গুদ, এই সকল মর্শ্ব আহত হইলে সম্ভঃ প্রাণনাশ হয়। বক্ষমর্শ্ব, নীমন্ত, তল, ক্ষিপ্ৰ, ইন্দ্রবন্তি, কটীকতরুণ, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী এবং নিতম্ব এই সকল মর্শ্ব আহত হইলে কালান্তরে প্রাণনাশ হয়। উৎক্ষেপ এবং স্থপনী এই দুই মর্শ্ব বিশল্যায় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। লোহিতাক্ষ, জাহু, উরু, কূর্ক, বিটপ, কূর্পর, কুকুন্দরধর, কক্ষধরধর, বিধুরধর, কৃকাটিকধর, অংশ, অংশকলক, অপাঙ্গ, নীলাধর, মন্ত্রাধর, ফণধর এবং আবর্তধর এই সকল মর্শ্ব আহত হইলে অঙ্গ বৈকল্য হয়। গুল্ফধর, মণিবন্ধধর ও কূর্কশির চারিটি, এই ৮ টি মর্শ্ব আহত হইলে বাতনা হয়। ক্ষিপ্ৰ মর্শ্ব সকল বিদ্ধ মাজেই অথবা কিছুকাল পরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

এই সকল মর্শ্বের মধ্যে সদ্য প্রাণনাশক মর্শ্ব অগ্নিগুণবিশিষ্ট। এই অগ্নিগুণের অন্নতা হইলে শীঘ্র প্রাণ বিনষ্ট হয়। যে সকল মর্শ্ব কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে, তাহারা সৌম্য ও আয়েয় এই উভয়গুণবিশিষ্ট হয়। যে সমস্ত মর্শ্ব বিশল্য প্রাণনাশক, তাহাতে বায়ুগুণ অধিক। যতকাল শল্যের মুখ বন্ধ থাকিয়া অভ্যন্তরে বায়ু অবস্থান করে, ততকাল রোগী জীবিত থাকে, শল্য বাহির করিলেই বায়ু নিঃসৃত হয়। অতএব যাবৎ শল্য থাকে, তাবৎ জীবিত থাকে। শল্য বাহির করিলেই মৃত্যু হয়। যে সকল মর্শ্ব বৈকল্য, তাহারা সৌম্য। সৌম্যগুণের স্থিরতা ও শীতলতাহেতু সেই সকল মর্শ্ব প্রাণ আশ্রয় করিয়া থাকে। যে সকল মর্শ্ব পীড়াকর, তাহারা অগ্নি ও বায়ুগুণবিশিষ্ট, কারণ অগ্নি ও বায়ু উভয়ে যন্ত্রণাদায়ক। কেহ কেহ বলেন, পীড়াকর মর্শ্ব কেবল অগ্নি ও বায়ুগুণবিশিষ্ট নহে, উহা পাঞ্চভৌতিক।

কাহার কাহারও মতে মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও গুরু এই পাঁচটি ধাতুই যে মর্শ্ব বর্ধিত ও মিলিত হয়, তাহাই সম্ভঃ প্রাণনাশক হইয়া উঠে। উক্ত ধাতুসমূহের সংযোগ থাকা প্রযুক্ত ঐ মর্শ্ব আহত হইলে সদ্যঃ প্রাণবিনাশ করে। যে মর্শ্ব পুরোক্ত ধাতু সকলের মধ্যে চারিটি ধাতুর সংযোগ

থাকে, তাহা আহত হইলে কালান্তরে মৃত্যু হয়। তিনটা ধাতুর সংযোগ থাকিলে মর্শ্বস্থান হইতে শল্য বাহির করিলে মৃত্যু হয়। যে মর্শ্বে দুইটা ধাতুর সংযোগ থাকে, তাহা আহত হইলে অঙ্গের বৈকল্য এবং যে মর্শ্বে একটা মাত্র ধাতু মিশ্রিত থাকে, তাহা আহত হইলে শোণিত-নিঃসরণ হইয়া থাকে।

শরীরে প্রধানতঃ চারি প্রকার শিরা আছে, তৎসমুদায়ই মর্শ্বস্থানে সন্নিবদ্ধ। তাহারায় বায়ু, অস্থি, মাংস ও সন্ধি সকল পোষণ করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে। মর্শ্বস্থান ক্ষত হইলে, বায়ুক্ৰিয় জন্ত শিরা সকল আহত স্থানের চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় এবং দেহে তীব্র যাতনা জন্মায়। সেই যাতনায় শরীর অতিভূত হইয়া নাশ পায় বা সংজ্ঞাহীন হয়। অতএব যে ব্যক্তি শল্য বাহির করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি মর্শ্বস্থান যত্নপূর্বক পরীক্ষা করিয়া শল্য বাহির করিবেন।

যে সকল মর্শ্ব সত্ত্ব-প্রাণহর, তাহারায় অন্তর্ভাগে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে প্রাণনাশক হয়। যে সকল মর্শ্ব কালান্তরে প্রাণহর, তাহারায় অন্তর্ভাগে বিদ্ধ হইলে অঙ্গের বৈকল্য জন্মায়। যে সকল মর্শ্ব বিশল্য-প্রাণহর, তাহারায় অন্তর্ভাগে বিদ্ধ হইলে বেদনা উৎপন্ন করে। সত্ত্ব-প্রাণহর মর্শ্ব আহত হইলে সাত দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। যে সকল মর্শ্ব কালান্তরে প্রাণহর, তাহারায় আহত হইলে পক্ষান্তে বা মাসান্তে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ক্ষিপ্ৰনামক মর্শ্ব আহত হইলে কোন কোন সময়ে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণ বিনষ্ট হয়। যে সকল মর্শ্ব বিশল্য-প্রাণহর বা অঙ্গবৈকল্যকর, তাহারায় বিশেষরূপে আহত হইলে প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

পাদাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যস্থ ক্ষিপ্ৰনামক মর্শ্ব আহত হইলে আক্ষেপে (খঁচুনিতে) মৃত্যু ঘটে। মধ্যমাঙ্গুলির সমস্তত্রয় পাদ-তল-মধ্যস্থিত তলহৃদয় মর্শ্ব আহত হইলে উৎকট পীড়ায় প্রাণবিয়োগ হয়। ক্ষিপ্ৰ মর্শ্বের উপরিভাগের উভয়পার্শ্বে কুর্চ নামক মর্শ্বদ্বয় অবস্থিত, ইহা আহত হইলে ভ্রমণকালে পা কাঁপিতে থাকে। গুল্ফসন্ধির অধোভাগস্থ উভয়দিকের কুর্চ-শির নামক মর্শ্বদ্বয় আহত হইলে পীড়া ও ফুলা জন্মে। পা ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থানে গুল্ফ নামক মর্শ্ব, আহত হইলে পা শুষ্ক ও খঞ্জ হয়। জঙ্ঘার মধ্যস্থানে পশ্চাদিকে ইন্দ্র-বস্ত্র নামক মর্শ্ব আহত হইলে শোণিতক্ষয়ে মৃত্যু ঘটে। জঙ্ঘা এবং উরুর সন্ধিস্থানের জাহ্নবনামক মর্শ্ব আহত হইলে খঞ্জ হইয়া থাকে। জাহ্নব তিন অঙ্গুলি উর্দ্ধে উভয়পার্শ্বে অগ্নি নামক মর্শ্বদ্বয় অবস্থিত, উহা আহত হইলে পা অতিশয় ফুলিয়া চলচ্ছত্রিহিত হইয়া যায়। উরুর মধ্যস্থিত উর্ধ্বী মর্শ্ব আহত হইলে শোণিতক্ষয় হইয়া পা শুষ্ক হয়। উরুমূলস্থিত লোহিতাক্ষ

মর্শ্ব আহত হইলে পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। বঙ্কণ এবং মুষ্ণুঘরের মধ্যে বিটপ নামক মর্শ্ব, ইহা আহত হইলে বগুতা, বা শুক্রেয় অন্ততা হয়। দুই পারে ও দুই হাতে এই একাদশ মর্শ্ব স্থান সন্নিবিষ্ট আছে। তন্মধ্যে বিশেষ এষ্ট যে, পাদের গুল্ফ, জাহ্ন ও বিটপ নামক মর্শ্ব, হস্তদ্বয়ের মণিবন্ধ, কুর্পর ও কক্ষধর নামক তিন মর্শ্বের নামান্তর মাত্র। বঙ্কণ ও মুষ্ণুঘরের মধ্যস্থিত বিটপ মর্শ্ব বক্ষঃ ও কক্ষার মধ্যস্থিত কক্ষধর মর্শ্বের সদৃশ। ইহা বিদ্ধ হইলে একই রূপ উপদ্রব হয়। মণিবন্ধ নামক মর্শ্ব আহত হইলে কুষ্ঠতা (অঙ্গুলি কঁকড়ে যাওয়া), কুর্পর মর্শ্ব আহত হইলে কুণি (ছোট হইয়া যাওয়া) এবং কক্ষধর মর্শ্ব আহত হইলে পক্ষাঘাত হয়।

মূলোক্ত-সংলগ্ন বায়ু ও পুরীষের নিঃসরণ-পথকে গুল্ফ-মর্শ্ব কহে। ইহা আহত হইলে সত্ত্বোমৃত্যু হয়। কটি দেশের অভ্যন্তরে অল্প মাংসরক্তবিশিষ্ট মূত্রাশয় আছে, তাহাই বস্তি নামে কথিত মর্শ্ব। অশ্মরীরোগ ভিন্ন ইহার উভয়পার্শ্বে ভেদ করিলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়, এবং পার্শ্বভেদে মূত্রস্রাব-ব্রণ জন্মিবার সম্ভাবনা। যত্নপূর্বক চিকিৎসা করিলে এই ব্রণ আরোগ্য হয়। পকাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে নাভি নামক মর্শ্ব অবস্থিত। ইহা শিরাসকলের উৎপত্তি স্থান, এই স্থানে আঘাত লাগিলে সত্ত্বো মৃত্যু হয়। স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে আমাশয়ের দ্বার—বক্ষঃ, ইহাই হৃদয় নামক মর্শ্ব এবং রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয়। ইহা আহত হইলে সত্ত্বোমৃত্যু ঘটে। স্তনদ্বয়ের অধোভাগে প্রত্যেক দিকে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে স্তনমূল নামক মর্শ্বদ্বয়, এই মর্শ্ব কক্ষপূর্ণ, স্তূতরাং ইহা আহত হইলে কাস ও শ্বাসের দ্বারা প্রাণবিয়োগ হয়। স্তন-দ্বয়ের অগ্রভাগের উর্দ্ধে প্রত্যেকদিকে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে স্তনরোহিত নামক মর্শ্বদ্বয়, ইহা শোণিতপূর্ণ, এইজন্ত ইহা আহত হইলে শোণিতস্রাব বা কাসরোগে প্রাণবিনষ্ট হইয়া থাকে। অংশকূটের অধোভাগস্থ উভয়পার্শ্বের উপরি-ভাগে অপলাপ নামক মর্শ্বদ্বয়, ইহা আহত হইলে ক্ষতস্থান হইতে রক্তনির্গম হইয়া থাকে এবং ঐ রক্ত পুরে পরিণত হইলে মৃত্যু ঘটে।

বক্ষের উভয়পার্শ্বে বায়ুবাহিনী নাড়ীদ্বয় অবস্থিত। এই নাড়ীদ্বয়ে অপস্রুণ্য নামক মর্শ্বদ্বয় আছে। ইহারায় সর্ষদা বায়ু-পূর্ণ, স্তূতরাং আহত হইলে কাস বা শ্বাসরোগে মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী।

পৃষ্ঠদেশে—মেরুদণ্ডের উভয়দিকে শ্রেণিগতস্থানে যে অস্থিমর কটীকতরুণ নামক মর্শ্বদ্বয় আছে, ইহা আহত হইলে রক্তক্ষয় জন্ত পাত্ত, বিবর্ণ ও রূপের বিকৃতি হইয়া মৃত্যু হয়। জঙ্ঘা-দ্বয়ের বাহিরপার্শ্বে পৃষ্ঠবংশের অল্প নিম্নভাগের উভয়দিকের

কুকুল নামক মর্শ্ব, ইহা বিদ্ধ হইলে শরীরের অধোভাগে স্পর্শজ্ঞান থাকে না এবং ক্রিয়াশক্তির ব্যাঘাত জন্মে। শ্রেণি-মধ্যস্থিত অস্থিকাণ্ডের উপরিভাগে যে স্থান আশয়ের আচ্ছাদন ও অধোভাগের পার্শ্বদেশে সংলগ্ন, শরীরের উভয়পার্শ্বস্থিত সেই নিতম্ব নামক মর্শ্ব আহত হইলে শরীরের অধোভাগ শুষ্ক হইয়া যায় এবং দুর্বলতাপ্রযুক্ত পরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে। জঘনঘর হইতে বক্রভাবে উর্দ্ধদিকে এবং জঘনঘর ও পার্শ্বঘরের মধ্যস্থলে, অধোভাগের পার্শ্ববরে সংলগ্ন পার্শ্বসন্ধি নামক রক্তপূর্ণ মর্শ্ব বিদ্ধ হইলে মৃত্যু হয়। স্তনমূলের সহিত সমান রেখাশ্রিত পৃষ্ঠদেশের উভয়-পার্শ্বের বৃহতী নামক মর্শ্ব বিদ্ধ হইলে সাতিশর শোণিত-স্রাবহেতু মৃত্যু ঘটে। পৃষ্ঠের উপরিভাগে পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়-পার্শ্বে ত্রিক-সন্ধি (তিন অস্থির সন্ধি)-সংলগ্ন অংশফলক নামক মর্শ্ব বিদ্ধ হইলে বাহুঘর নিম্পন্ন ও শুষ্ক হয়। বাহুঘরের উর্দ্ধদেশে গ্রীবার মধ্যস্থলে স্বক-নিবন্ধনার্থ সন্ধি-স্থানের অংশ নামক মর্শ্ব বিদ্ধ হইলে বাহু শুষ্ক হয়।

স্বকসন্ধির উপরিস্থিত মর্শ্ব সকল কঠিনালীর উভয়দিকে চারিটা ধমনী, দুইটা নীলা ও দুইটা মজা মধ্যে সন্নিবদ্ধ। ইহারা বিদ্ধ হইলে মুকতা, শরীরের বিকৃতি এবং রসজ্ঞানের অভাব হয়। গ্রীবার উভয়পার্শ্বের শিরামাতৃকা নামক মর্শ্ব বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মস্তক এবং গ্রীবার সন্ধিস্থানস্থিত ক্রুকাটিকা নামক মর্শ্ব আহত হইলে চল-মুচ্ছিতা (মাথাচালা) নামক উপদ্রব জন্মে। কর্ণঘরের পার্শ্ব-দেশের অধোভাগস্থ বিধুর নামক মর্শ্ব বিদ্ধ হইলে গন্ধ-জ্ঞানের অভাব ঘটে। জ-যুগের অন্তর্ভাগে চক্ষুর বাহিরের অধোভাগে অপান্ন নামক মর্শ্ব, ইহা আহত হইলে অন্ধ বা দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত জন্মে। জর উপরিভাগের নিম্নদেশে আবর্ত নামক মর্শ্ব আছে। ইহা বিদ্ধ হইলে অন্ধ বা দৃষ্টি-হীনতা হইয়া থাকে। জপুচ্ছের অন্তর্ভাগের উপরে কর্ণ ও ললাট-মধ্যস্থ শঙ্খনামক মর্শ্ব বিদ্ধ হইলে সত্তোমৃত্যু হয়। শঙ্খ-ঘরের উপরিভাগে কেশমূলের অন্ত পর্য্যন্ত উৎক্ষেপ নামক মর্শ্ব অবস্থিত, ইহা যে পদার্থ কর্তৃক বিদ্ধ হয়, সেইটা সেই স্থানে যতক্ষণ সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ, অথবা পাকিয়া সেইটা আপনা হইতে খলিত হইলে রোগী জীবনলাভ করে, শল্য বাহির করিলে মৃত্যু নিশ্চয়। জরঘরের মধ্যে স্থপনী নামক মর্শ্ব অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে পুষ্কোক্ত মর্শ্ববিদ্ধের দ্বারা ফল হয়। মস্তকের অস্থির পাঁচটা সন্ধিস্থান সীমস্ত নামে কথিত, এই স্থান বিদ্ধ হইলে উন্মাদ, ভয় ও চিন্তনাশের দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ও জিহ্বা এই চারিটা ইন্দ্রিয় যে সকল শিরা দ্বারা সন্তর্পিত হয়, অর্থাৎ গন্ধবাহী, শব্দবাহী, রসবাহী ও রূপবাহী যে সমস্ত শিরা আছে, তাহাদিগের সন্ধিস্থানকে শৃঙ্গাটক মর্শ্ব কহে। শৃঙ্গাটক চারিটা, ইহা বিদ্ধ হইলে সত্তো-মৃত্যু হয়। মস্তকের অভ্যন্তরের উপরিভাগে শিরা সকলের সন্ধিস্থানের বাহিরে রোমের আবর্ত আছে, তথাকার অধি-পতি নামক মর্শ্ব আহত হইলে সত্তোমৃত্যু ঘটে।

উর্দ্ধাধর, সকল শিরা, বিটপ, কক্ষপার্শ্ব ও স্তনঘরের উপরিদিকের মূল প্রভৃতি স্থানে শত্রুপাত করিতে হইলে মস্তককার নিমিত্ত একাঙ্গুল পরিমিত স্থানের অন্তরে বিদ্ধ করিবে। মণিবন্ধ ও শুষ্ক-স্থানে দুই অঙ্গুলি এবং জাহ্নু ও কর্ণ-ঘরে তিন অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া শত্রুপাত করা আবশ্যক। হৃদয়, বস্তি, কুর্চ্ছ, স্তন, নাভি ও মূচ্ছা এই সকল স্থানে চারি অঙ্গুল, গলদেশে এবং কঠিনালীর উভয়দিকে শত্রুপাত করিতে হইলে পঞ্চাঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া কার্য্য নিম্পন্ন করিবে। রোগী অঙ্গুলি সংযত করিলে করতলে যে পরিমাণ হয়, সেইটাই পঞ্চাঙ্গুলির পরিমাণ জানিবে।

অবশিষ্ট মর্শ্বস্থান সকল রক্ষা করিতে হইলে মর্শ্বস্থানের অর্দ্ধাঙ্গুলি অন্তরে শত্রুপাত করা বিধেয়। মর্শ্বজ ব্যক্তির পুরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, শত্রুক্রিয়ার এই প্রকার পরিমাণে ত্যাগ করা আবশ্যক। মর্শ্বের পার্শ্বদেশ অভিহত হইলেও মর্শ্বনাশ হয়, অতএব শত্রুপাতকালে মর্শ্বের স্থান পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। হস্ত, পদ ও শিরা ছিন্ন হইলে উহা সঙ্কুচিত হয় এবং সেই স্থান হইতে অল্পরক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহাতে মনুষ্য ছিন্নশাখ তরুর দ্বারা একবারে বিনষ্ট হয় না। ক্ষিপ্ত ও তল নামক মর্শ্ব আহত হইলে অতিশয় রক্ত নিঃসরণ হয় এবং বায়ু জন্ম পীড়া জন্মে।

মর্শ্বস্থান আহত হইলে যদিও চিকিৎসার গুণে মনুষ্য জীবিত থাকতে পারে, তথাপি তাহার অঙ্গের বিকলতা বিদ্রিত হয় না।

মর্শ্বস্থানে সোম, বায়ু, তেজ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও ভূতাত্ম সকল অবস্থিতি করে। এইজন্য মর্শ্ব অভিহত হইলে শরীর জীবিত থাকে না। যে সকল মর্শ্ব আত্ম প্রাণনাশক, তাহারা আহত হইলে ইন্দ্রিয়জ্ঞান, মনোবুদ্ধির বৈপরীত্য ও বিবিধ প্রকার ভীত বেদনা জন্মে। যে সকল মর্শ্ব কালাগুরে প্রাণনাশক, তাহারা আহত হইলে ক্রমশঃ ধাতুক্লেষ হয় এবং তজ্জন্য বিবিধ বেদনা দ্বারা প্রাণ নাশ হইয়া থাকে। যে সকল মর্শ্ব আহত হইলে শরীরের বিকলতা জন্মে, স্মৃতিপূর্ণ বৈজ্ঞ কর্তৃক সেই আহত স্থান চিকিৎসিত হইলে কেবল মাংস

অঙ্গহীন হইয়া রোগী জীবিত থাকে। যে সকল মর্শ্বস্থান হইতে শলা বাহির করিলে মৃত্যু হয়, কুঠিবেগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে অতিশয় পীড়া ভোগ করিয়া তাহাতে অবশেষে বিকলাঙ্গ হইতে হয়। ছেদ, ভেদ, আঘাত, দহন, বা বিদারণ প্রভৃতি যে কোন কারণে মর্শ্বস্থান আহত হউক, তাহার ফল সমান হয়।

অধিক হউক বা অল্পই হউক মর্শ্ব আহত হইলে নানাপীড়া জন্মে। প্রায়ই অঙ্গের বিকলতা বা মৃত্যু উপস্থিত হয়। মর্শ্ব আহত হইলে শরীরে যে সকল বিকার জন্মে, তাহার প্রায়ই কষ্টসাধ্য, অতিশয় যত্নের সহিত চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থান ৬ অঃ।)

এই সকল মর্শ্ব সহজে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া গেল। ইহাতে মর্শ্বের নাম, অবস্থিতিস্থান এবং আহত হইলে কিরূপ ফল হইতে পারে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

#### মর্শ্বস্থানের তালিকা।

মর্শ্বের নাম	অবস্থিতি-স্থান	আহত হইলে যে ফল হয়।
১ ক্ষিপ্ৰ	বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনির	আক্কেপক-উপক্রমে
মায়ুমর্শ্ব,	মধ্যে,	মৃত্যু হয়।
২ তলহৃদয়	মধ্যমাঙ্গুলির মূল	পাদমূর্ট রোগ
মাংসমর্শ্ব,	হইতে সরলরেখাঙ্কিত	হইয়া মৃত্যু হয়।
	পাদতলের মধ্যস্থল,	
৩ কূর্ক	ক্ষিপ্ৰের উপরিভাগে	সঞ্চরণকালে পা
মায়ুমর্শ্ব,	উভয়পার্শ্বে,	কাঁপিতে থাকে।
৪ কূর্কশির	গুলফসন্ধির অধোভাগে	রোগ ও ফুলা
মায়ুমর্শ্ব,	উভয়পার্শ্বে,	হয়।
৫ গুলফ-	পদ ও জন্তবার	পদ শুষ্ক বা খঞ্জ
সন্ধিমর্শ্ব,	সন্ধিস্থান,	হয়।
৬ ইন্দ্রবস্তি	প্রত্যেক পার্শ্ব ও	শোণিত ক্ষয় হইয়া
সন্ধিমর্শ্ব,	জন্তবার সন্ধিস্থান,	মৃত্যু হয়।
৭ জাহ্নসন্ধি	জন্তবা ও উরুর	খঞ্জ হয়।
সন্ধিমর্শ্ব,	সন্ধিস্থান,	
৮ আপি	জাহ্নুর উর্দ্ধ উভয়দিকে	ফুলিয়া উঠে ও চলি-
মায়ুমর্শ্ব,	তিন অঙ্গুলি পরিমিত,	বার শক্তি থাকেনা।
৯ উর্কা	উরুদেশের	রক্ত ক্ষয় হইয়া পা
শিরামর্শ্ব,	মধ্যস্থল,	সক হয়।
১০ লোহিতাক্ষ	উর্কার উর্দ্ধে কূচকির	শোণিত ক্ষয় হইয়া
শিরামর্শ্ব,	অধোভাগে উর্দ্ধ মূলে,	পক্ষাঘাত হয়।

১১ বিটপ	কূচকি ও কোষের	যণ্ডতা বা গুচ্চের
শিরামর্শ্ব,	মধ্যস্থল,	অন্নতা হয়।
১২ গুদ	স্থূল-অস্ত্রিতে সংলগ্ন বায়ু	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
মাংসমর্শ্ব,	ও পুরীঘনিঃসারি,	
১৩ বস্তি	কটিদেশাভ্যন্তরে	অশ্মরীরোগ ভিন্ন
মায়ুমর্শ্ব,	অন্ন মাংস ও রক্তবিশিষ্ট	তাহার উভয়দিক্
	মূত্রাশয় বা বস্তি,	ভেদ করিলে বাঁচে
		না, একদিক্ ভেদ
		করিলে মূত্রজাবী
		ত্রণ জন্মে।
		তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।
১৪ নাভি	পক ও আমাশয়ের	
শিরামর্শ্ব,	মধ্যস্থিত শিরা-মূল,	
১৫ হৃদয়	স্তনদ্বয়ের মধ্যে	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।
শিরামর্শ্ব,	আমাশয়ের দ্বার,	
১৬ স্তনমূল	প্রত্যেক স্তনের অধো-	ককসঞ্চয় জন্ত শ্বাস
শিরামর্শ্ব,	ভাগের উভয়পার্শ্বে,	ও কাসরোগে মৃত্যু।
১৭ স্তনরোহিত	স্তনগ্রন্থিভাগে	রক্তসঞ্চয় জন্ত শ্বাস
মাংসমর্শ্ব,	উভয়পার্শ্বে	ও কাসরোগে মৃত্যু।
১৮ অপলাপ	অংসকূটের অধোভাগে	রক্ত পূরণের প্রাপ্ত
শিরামর্শ্ব,	ও পার্শ্বের উপরিভাগে,	হইয়া মৃত্যু হয়।
১৯ অপস্তু	বক্ষঃস্থলের দুইদিকে	বায়ু হেতু কাস ও
শিরামর্শ্ব,	বায়ুবাহিনী নাড়ী,	শ্বাসরোগে মৃত্যু।
২০ কটীকতরুণ	কটীর নিম্নে পৃষ্ঠদণ্ডের	শোণিতক্ষয়প্রযুক্ত
অস্থিমর্শ্ব,	উভয়দিকে শ্রোণিদেশের	পাণ্ডুর্বর্ণ ও বিকৃপ
	অস্থিহৃদয়ের সংলগ্ন স্থান।	হইয়া মৃত্যু হয়।
২১ কুন্দর	পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে	শরীরের অধোভাগ
সন্ধিমর্শ্ব	জঘনের পার্শ্বে ও বহি-	স্পন্দহীন ও ক্রিয়া-
	র্ভাগে অন্ননীচে।	হীন হয়।
২২ নিতম্ব	শ্রোণিকাণ্ডের উপর-	শরীরের অধোভাগ
অস্থিমর্শ্ব,	পার্শ্বদ্বয়ের প্রান্তভাগে	শুষ্ক এবং দুর্বলতা
	পক্ষাশয়ের উপরিস্থ	জন্ত মৃত্যু হয়।
	আবরণ সংলগ্ন স্থানে,	
২৩ পার্শ্বসন্ধি	অধোভাগে পার্শ্বের	রক্তপূর্ণ হইয়া মৃত্যু
শিরামর্শ্ব,	অভ্যন্তরে সংলগ্ন, জঘন	হয়।
	ও পার্শ্বের মধ্যস্থলে জঘন	
	হইতে বক্রভাবে উর্দ্ধদিকে,	
২৪ বৃহতী	পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে	অতিশয় শোণিত-
শিরামর্শ্ব,	স্তনমূল-হইতে সরল	নিসরণ জন্ত উপ-
	রেখায় স্থিত।	দ্রবে মৃত্যু হয়।

মর্শ্বের নাম	অবস্থিতি-স্থান	আইত হইলে যে কল হয়।
২৫ অংশফলক শিরামর্শ্ব,	পৃষ্ঠদেশের উভয়দিকে পৃষ্ঠের উপরিভাগে ত্রিক-স্থানে সংলগ্ন,	বাহ্যিক স্পন্দনহীন ও শুষ্ক হয়।
২৬ অংশ, স্বাস্থ্যমর্শ্ব,	বাহ্যিকের উর্ধ্বে গ্রীবার উভয় দিকে স্বকলসংলগ্ন স্থানে,	বাহ্যিক ক্রিয়াশক্তি-হীন হয়।
২৭ নীলা ও মত্তা,	কণ্ঠনালীর উভয়পার্শ্বে চারিটা ধমনীর দুইটা নীলা ও দুইটা মত্তা,	মুক্ততা, স্বরের বিকৃতি ও রসগ্রহণে পারগতা।
২৮ শিরা মাতৃকা,	গ্রীবার উভয়পার্শ্বে দুইটা করিয়া ৪টা শিরা,	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
২৯ ক্রকটিকা,	মস্তক ও গ্রীবার সন্ধি-স্থানে উভয়পার্শ্বে,	মস্তক সঞ্চালন করিতে থাকে।
৩০ বিধুর,	কর্ণের পশ্চাদ্দেশের অধোভাগে,	বধিরতা।
৩১ ফণা,	উভয় নাগারকুর অভ্যন্তরে সংলগ্ন,	গন্ধজ্ঞানের নাশ হয়।
৩২ অপান্ধব,	ভ্রুপুচ্ছ-প্রান্তভাগের নিম্নদেশে চক্ষুর বাহিরে,	অন্ধ অথবা দৃষ্টি-শক্তির ব্যাঘাত।
৩৩ আবর্তব,	ক্রুরের উপরিভাগে ও নিম্নদেশে,	অন্ধ অথবা দৃষ্টির ব্যাঘাত হয়।
৩৪ শব্দব,	ভ্রুপুচ্ছ প্রান্তে উপরিভাগে কর্ণ ও ললাটের মধ্যে,	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।
৩৫ উৎকোপব,	শব্দ্যের উপরি কেশের প্রান্তভাগ,	বিক্ষলতা বাহির করিলে মৃত্যু হয়, কিন্তু সেই স্থান পাকিয়া আপনা হইতে শল্য বাহির হইলে মরে না।
৩৬ স্থপনীব,	ক্রুরের মধ্যদেশে,	পূর্বোক্তরূপ ফল।
৩৭ সৌমন্তপক	মস্তকবিভাজিনী ৪টা সন্ধি,	উন্মাদ, ভয় বা চিত্ত-নাশ দ্বারা মৃত্যু।
৩৮ শৃঙ্গাটক ৪টা,	চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহবার সমস্তপার্শ্ব শিরা সকলের সম্মিলন-স্থানে।	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।
৩৯ অধিপতি,	মস্তকের অভ্যন্তরে উপরিভাগস্থ শিরা-	

সম্মিলিত স্থানে এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।  
 বহিঃ রোমাবর্ত স্থানে  
 আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদগণ এই সকল মর্শ্বস্থানের বিষয়ে এক মত নহেন। কোথাও সম্পূর্ণরূপে ও কোথাও বা কিয়দংশ-মাত্র ঐক্য দৃষ্ট হয়। শিরামর্শ্ব সকল প্রায়ই একরূপ।  
 ভাবপ্রকাশ ও চরক প্রভৃতি বৈয়াক্ষণ্যেও মর্শ্বের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, ঐ সকল ইহারই অনুরূপ, তজ্জ্ঞ সে সমস্ত আর লিখিত হইল না।  
 মর্শ্ব স্পর্শ করিতে নাই।  
 “পরম্পরে গাং চরত্বাং ন চাচক্ষৌত কত্চিৎ।  
 ন সংবসেৎ স্ততকে চ ন কং বৈ মর্শ্বণি স্পৃশেৎ ॥”  
 (কৃষ্ণপু. উপবি. ১৫ অ.)  
 মর্শ্বপারগ (পুং) মর্শ্বপারং গচ্ছতীতি গম-ড। মর্শ্বজ, তত্ত্বজ।  
 মর্শ্বপীড়া (ত্রি) মর্শ্বণঃ পীড়া। মনঃপীড়া, মনঃক্লেশ।  
 মর্শ্বভেদ (পুং) মর্শ্বণঃ ভেদঃ। মর্শ্বচ্ছেদ।  
 মর্শ্বভেদন (পুং) ১ মর্শ্বভেদক অস্ত্র। (ত্রি) ২ মর্শ্বভেদকারী।  
 মর্শ্বভেদিন্ (ত্রি) মর্শ্ব ভিনতি ভিদ্ গিনি। মর্শ্বভেদকারী, যিনি মর্শ্ব ভেদ করেন।  
 মর্শ্বময় (ত্রি) মর্শ্ব-স্বরূপে ময়ট। ১ মর্শ্বস্বরূপ। ২ গুণ বিষয় স্বরূপ।  
 মর্শ্বর (পুং) মর্শ্ব তৎ মর্শ্বতাবক্ত শব্দ বা রাতীতি রা-ক।  
 বস্ত্র বা পত্রের ধ্বনি, মর্শ্বমর্ ধ্বনি, শুক পত্রাদির অব্যক্ত ধ্বনি।  
 “অভ্যভূত বাহানাং চরতাং গাত্রশিজ্জিতৈঃ।  
 মর্শ্বরঃ পবনোকূতরাজতালীবনধ্বনিঃ ॥” (রঘু ৪।৫৬)  
 (ত্রি) মর্শ্বরধ্বনিকারক। (দেশজ) ৩ প্রস্তরভেদ, মারবেল পাথর (Marble)।  
 মর্শ্বরপর্বত, মধ্যপ্রদেশের জবলপুর জেলার অন্তর্গত বিষ্ণু-গিরির একটি শাখা। জবলপুর হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এবং মীরগঞ্জ রেলস্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে নর্মদানদী-তীরে অবস্থিত। মর্শ্বর পর্বত ম্যাগনেসিয়া নামক খনিজ পদার্থ-যুক্ত চূণের পাথরে পূর্ণ। উচ্চতা ১২০ ফিট। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। শুক্লারজনীতে চন্দ্ৰের আলোক উহার চাকচিক্যময় শ্বেতধবল বন্ধে পতিত হইলে পার্শ্বতীয় সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায়। সেই তুষার ধবল পর্বতবন্ধ, সেই নীলিময়ী বনমালা, সেই প্রশান্তপ্রবাহ নর্মদার রজতধারা চন্দ্রালোকসিক্ত হইয়া একটি অপূর্ণ ও অনি-র্কচনীয় সৌন্দর্য্য সেই পার্শ্বতীয় প্রদেশকে বিভূষিত করিয়াছে। প্রকৃতির ক্রোড়ে এই শান্তিময়ী শোভা সদর্শনার্থ মানাহান হইতে বহুলোক জবলপুরে সমাগত হয়। আর্ধ্য-



জাতির রঙ্গভূমি এই ভারতভূমে, বত প্রকার কৃত্রিম ও অকৃত্রিম শোভনীয় কীৰ্ত্তি স্থাপিত আছে, তন্মধ্যে মর্শ্বনা-তীর-বর্তী এই মর্শ্বরশ্মলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠতম।

কথিত আছে, দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় বজ্র দ্বারা এই পর্বত বিদীর্ণ করিয়া স্রোতস্বিনী মর্শ্বদার রুদ্ধ গতি মুক্ত করিয়াছেন। এখনও স্থানীয় লোকে সেই ঐরাবতের পদচিহ্ন সন্ধানার্থ রণক্ষেত্রে দেখাইয়া থাকে। অনেকে ইন্দ্রের বিচরণভূমিবোধে সেই হস্তিপাদেরও পূজা করে। উক্ত পাহাড়ের একটা উচ্চ শৃঙ্গে শিবমন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে অনেক দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি মুসলমানেরা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। শুনা যায় যে, সংগ্রামপূরে অবস্থিত-কালে অরঙ্গজেবের সৈন্যগণ কর্তৃক এই মন্দির বিধ্বস্ত হয়।

**মর্শ্বরপ্রস্তর**, স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রস্তরভেদ (Marble)। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণের মতে ইহা এক প্রকার দানাবিশিষ্ট চূণাপাথর। কালবশে ও জলবায়ুর গুণে মর্শ্বর-প্রস্তর অতিশয় দৃঢ় ও কঠিন হয় এবং অতি সহজেই উহা মসৃণ বা পালিশ করা যাইতে পারে। কোন কোন মর্শ্বর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, কোন কোন মর্শ্বর আবার বরফের তায় স্বেতবর্ণ। এতদ্বিধ সবুজ, ধূসর, লাল, নীল এবং হরিদ্রাবর্ণের প্রস্তরও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মর্শ্বরপ্রস্তর একাধিক বর্ণবিশিষ্ট।

চীন, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে মর্শ্বর-প্রস্তর পাওয়া যায়। চীনদেশের এক ফুট চতুষ্কোণ নীলবর্ণের মর্শ্বর ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-আমেরিকা ইত্যাদি স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা গৃহাদির মেজে করা হয়। ক্যান্টন-নগরে লালবর্ণের অতি স্নানর মর্শ্বর পাথর পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা টেবিল ও টুল প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সির মর্শ্বর অতি উৎকৃষ্ট ও দৃষ্টপাণ্ড। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে ইহা নমুনা-রূপ প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত নমুনা দৃষ্টে জানা যায় যে, ইহা দ্বারা মূল্যবান প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করা যাইতে পারে। জবলপুরের নিকটে স্বেত মর্শ্বর অপরিপাণ্ড পাওয়া যায়। তথায় ইহা চূণ প্রস্তুত এবং পূর্নসংস্কার কাণ্ডে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**মর্শ্বরহাই**, বাঙ্গালার সিংহভূম জেলার অন্তর্গত গণ্ডেশ্বরভেদ।

**মর্শ্বরী** (স্ত্রী) মর্শ্বর গোরাদিহাং ভীষ্। ১ পীতদারু, দারু-হরিদ্রা। (মেদিনী) ২ সরলকান্ঠ। (বৈষ্ণবকনি) ৩ কণ্ঠস্থ শিরাবিশেষ। (বাভট উ० ১ অ०)

**মর্শ্বরীক** (পুং) স্নিয়ত ইবাসাবিতি- (ফররীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ত্বেতি ঙ্কন প্রত্যয়েন নিপাতনাং সাধুঃ। নীন।

**মর্শ্ববিদ্** (পুং) মর্শ্ব বেত্তীতি বিদ-কিপ্। মর্শ্বজ্ঞ, পর্যায়—

কার্পটিক, মশ্বিক, মর্শ্ববেদী। (জটধর)

“বকনাসন্ততোহবাদীত্রক্ষোহয়ং পরমর্শ্ববিৎ” (কথাসংসাং ১০৬২।২০)

**মর্শ্ববিদারণ** (ত্রি) ১ মর্শ্বচ্ছেদকারক। (স্ত্রী) ২ মর্শ্বচ্ছেদ।

**মর্শ্ববিভেদন** (ত্রি) মর্শ্ববি-ভিদ্-গিনি। মর্শ্বভেদকারক।

**মর্শ্ববেদিন** (পুং) মর্শ্ব বেত্তীতি বিদ-গিনি। মর্শ্ববিদ, মর্শ্বজ্ঞ।

**মর্শ্ববেদিন** (ত্রি) মর্শ্ব বিদ্যাতি বিদ-গিনি। মর্শ্ববেদকারক, মর্শ্ববেদক।

**মর্শ্বস্পৃশ্** (ত্রি) মর্শ্ব স্পৃশ্ভীতি মর্শ্ব স্পৃশ্ (স্পৃশোহহ্মকে কিন্। পা ৩।২।৫৮) ইতি কিন্। মর্শ্বস্পর্শক, পথ্যায়—অরুণ্ড, ব্যথক। (হেম)

**মর্শ্বান্তিক** (পুং) ১ মর্শ্ব পর্য্যন্ত। ২ মর্শ্বস্পর্শী ক্লেশ।

**মর্শ্বাতিগ** (ত্রি) মর্শ্ব-অতি-গম-ড। মর্শ্বভেদী।

**মর্শ্বান্বেষণ** (স্ত্রী) তথ্যাসন্ধান।

**মর্শ্বান্বেষিন** (ত্রি) তথ্যাসন্ধানকারী।

**মর্শ্বাবরণ** (স্ত্রী) বর্ণ চন্দ্র।

**মর্শ্বাবিদ** (ত্রি) মর্শ্ব বিদ্যাভীতি মর্শ্ব-ব্যধ্-কিপ্।

**মর্শ্বাবিদ** (গ্রাহিজ্যোতি। পা ৩।১।১৬) ইতি সস্ত্যসারণঃ, (নহি বৃতি-বৃষি-ব্যধি-ক্ৰাচসহিতনিষু কো। পা ৩।১।১৬) ইতি দীর্ঘত্বং। সন্ধিস্থানবেদকতা, মর্শ্বজ্ঞ।

“চিরং ক্লিশিত্য মর্শ্বাবিদ্রামো বিলুপিতপ্রবম্।

শব্দায়মানমব্যাসীভূয়দং ক্ষণদাচরম্ ॥” (ভট্ট ৫।৫২)

**মশ্বিক** (ত্রি) মশ্ব বেত্তীতি মর্শ্ব-ঈক্। মর্শ্ববিদ। (জটধর)

**মর্মুজেন্দ্র** (ত্রি) সকল লোক কর্তৃক পরিচরণীয়।

“শ্রিয়ং বসানো অমৃতো বিচেতা মর্মুজেন্দ্রঃ” (ঋক্ ২।১।১১)

‘মর্মুজেন্দ্রঃ সর্বৈক পরিচরণীয়ঃ’ (সায়ণ)

**মর্য্য** (পুং) মৃ যৎ। মর্য্য।

“স্পীপ্যানিব ঘোষা মর্য্যায়ৈব কথ্য” (ঋক্ ৩।৩।১০)

‘মর্য্যায়ৈব মর্য্যায়ৈব’ (সায়ণ)

**মর্য্যক** (পুং) মর্ত্যসংজ্ঞ, মর্ত্যসমূহ, রাষ্ট্র।

“কে মে মর্য্যকং বি ববজং” (ঋক্ ৫।২।৫)

‘মর্য্যকং মর্ত্যসংজ্ঞং রাষ্ট্রং’ (সায়ণ)

**মর্য্যস্ত্রী** (ত্রি) মর্য্য কর্তৃক ভজনায়া।

“মর্য্যস্ত্রীঃ স্পৃহয়দ্বর্ণো অগ্নিনাভিনুশে” (ঋক্ ২।১।৫৫)

‘মর্য্যস্ত্রীঃ মর্তব্যঃ মর্তব্যঃ স্রয়ণীয়াঃ ভজনীয়াঃ’ (সায়ণ)

**মর্য্য** (অব্য०) স্নিয়তেহবশিষ্যতে হত্র মৃ-যৎ, টাপ্। সীমা।

**মর্য্যাদক** (ত্রি) মর্য্যাদাকর্তা।

**মর্য্যাদা** (স্ত্রী) মর্য্য-দা-অঙ্। ১ ভাষ্যপথস্থিতি।

“মর্য্যাদায়াং স্থিতো ধর্ম্মো শমশ্চৈবাস্ত লক্ষণম্।”

(ভারত ১৫।২৫।২৫)

পর্যায়—দংস্থা, ধারণা, স্থিতি। অমরটীকায় ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপঃ লিখিত আছে, ‘পর্যাদীয়তে মর্যাদা পর্য্যাপ্ত পূর্বাং দাঞো ঙঃ নিপাতনাং পশু মঃ’ (ভরত) মর্যোতি সীমার্থে অব্যয়ঃ তত্র দীয়তে মর্যাদেতি স্বামী (রায়মুক্ত) ‘ত্রিযন্তে হজেতি মর্য্যা তাং দদাভীতি মর্যাদা’ (সারস্বতী) ২ সীমা। (জটধর) ৩ কূল। (হেম)

“কল্মাভবাসংকোভলজ্জিতাশেষভূতঃ।

হৈর্য্যপ্রসাদমর্যাদান্তা এব হি মহোদধেঃ।”

(প্রবোধচন্দ্রোদয় ১। ৬)

৪ দেবাতীথির পুত্র। (ভারত ১৯৫২৩) ৫ নিয়ম।

৬ সদাচার। ৭ মান, সম্মম, গৌরব, সম্মান।

মর্যাদাগিরি (পুং) মর্যাদা সীমা তজ্জ্ঞাপকো গিরিঃ। কুলাচল, বর্ষসীমা পর্কত। ‘উত্তরোত্তরেণ ইলাবৃতং নীলঃ ষ্ঠেতঃ শৃঙ্গবানিতি ত্রয়ো রম্যকহিরণ্যকুরুগাঃ বর্ষাধাঃ মর্যাদাগিরয়ঃ প্রাগায়াতাঃ’ (ভাগবত ৫। ১৬ অ০)

ইলাবৃতবধের উত্তরভাগে উত্তরাদি দিকক্রমে ক্রমশঃ নীলগিরি, ষেতগিরি ও শৃঙ্গবান্ গিরি এই তিন পর্বত যথাক্রমে রম্যকবর্ষ, হিরণ্যবর্ষ ও কুরুবর্ষের সীমাপর্বতস্বরূপ আছে। ঐ পর্বতত্রয় পূর্বদিকে আয়ত এবং প্রত্যেকটি অযুত বোজন উচ্চ।

মর্যাদাচল (পুং) মর্যাদা-পর্বত, সীমা-পর্বত।

মর্যাদাস্থিত (ত্রি) মর্যাদাযুক্ত, সম্ভাস্ত।

মর্যাদাবৎ (ত্রি) মর্যাদা অন্তর্থে মতুপ্ মত্ব ব। মর্যাদা-বিত, মর্যাদাযুক্ত।

মর্যাদাবন্ধ (ত্রি) ১ অধিকারে রক্ষণ। (দিব্যাং ২৯২৬) ২ সম্মানের সহিত আবদ্ধ করণ। ৩ নজরবন্দী।

মর্যাদাসাগর, কলচুরী-বংশীয় রাজভেদ। মহারাজাধিরাজ সোড়দেবের বংশধর।

মর্যাদাসিন্ধু (ত্রি) মর্যাদাসাগর, বিশেষরূপে সম্মানিত।

মর্যাদাহানি (পুং) মর্যাদায়া হানিঃ। মর্যাদার হানি, সম্মানের হানি।

মর্যাদিন্ (ত্রি) ১ সীমাযুক্ত। ২ অঙ্কগত। (স্ট্রী)

মর্ক, ১ পূর্তি। ২ গতি। ভাদি- পরশ্ম- স্ক- সেট্। লট্ মর্কতি। লোট্ মর্কতু। লিট্ মমর্ক। লুঙ্ অমর্ক্যৎ। গিচ্ মর্কয়তি। লুঙ্ অমমর্কৎ। সন্ মিমর্কিষতি।

মর্ঘ (পুং) মৃ-ঘঞ্। ক্ষান্তি।

“অমর্ঘশ্চেন্ন জনশ্চ জন্তানা ন জাতহায়েন ন বিবিষাদয়ঃ।”

(কিরাতার্জুনীয় ১। ৩০)

মর্ঘণ (স্ট্রী) মৃ-লুট্। ১ ক্ষমা। ২ ধর্ষণ।

“ন চাপ্যধর্ষে ন স্ত্রুধিভেদনে পরস্বহায়ে পরদারমর্ষণে।

কদর্য্যভাবে চ রমেঘ্ননঃ সদা নৃণাং সদাধ্যানমিদং বিজ্ঞানতাম্॥”

(ভারত ৩। ৩১২৯)

মর্ঘয়তীতি মৃ-গিচ্-ল্য। (ত্রি) ৩ মর্ষণ।

“ইদং পবিত্রং পরমীশচেষ্টিতং যশস্তমায়ুষ্যমঘোষমর্ষণম্।”

(ভাগবত ৪। ৭। ৫৮)

মর্ষণীয় (ত্রি) মৃ-অনীষন্। মর্ষণার্থ, ক্ষমার বোধ্য।

মর্ষিত (ত্রি) মৃ-ক্ত। ১ ক্ষমায়ুক্ত। ২ ক্ষান্তিবিশিষ্ট।

“তত্রাহামষিতো ভীমন্তশ্চ শ্রেয়ান্ বধঃ স্তৃতঃ।

ন ভর্তুনীঘ্ননশ্চার্থে যোহহন স্তপ্তান্ শিশুন বৃথা॥”

(ভাগবত ১। ৭। ৫১)

ভাবে ক্ত। (স্ট্রী) ৩ মর্ষণ।

মর্ষিতবৎ (ত্রি) মৃ-ক্তবতু। ক্ষান্ত।

মর্ষিন্ (ত্রি) মৃ-গিনি। মর্ষণযুক্ত।

মর্ষীক্য (স্ট্রী) ছন্দোভেদ।

মর্ষসিদ্ (আরবী) উপদেশক। আচাধ্য। গুরু। যিনি ধর্ম্মকর্ম্মের কঠব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিয়া দেন।

মর্ষসিয়া (আরবী) সমাধিস্তম্ভগাত্রস্থ লিপি।

মর্ষাট্টা (দেশজ) মহারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ। [মরাঠা দেখ।]

মল, ধূতি। ভাদি আশ্মনে- স্ক- সেট্। লট্ মলতে। লোট্ মলতাং। লিট্ মেলে, মেলাতে, মেলিরে। লুঙ্ অমলিষ্ট। গিচ্ মলয়তে। লুঙ্ অমীমলত। সন্ মিমালিষতে। যঙ্ মামল্যতে।

মল (পুং স্ট্রী) মূত্রাতে শোষাতে মূজ- (মূজেষ্টলাপচ। উণ্ ১। ১০৯) ইতি অলচ্ টিলোপচ, যদা মলতে ধারয়তি ব্যাধ্যাদি-দৌর্গন্ধমিতি মল-অচ্। ১ পাপ।

“পশ্চিমাস্ত্র সমাসীনো মলং হস্তি দিবাকৃতম্।” (মহু ২। ১০২)

‘দিবাকৃতং মলং দিবাজ্জিতং পাপং’ (কুল্লুক)

২ বিষ্ঠা। ৩ কিট্ট। (অমর) অমরটীকায় ভরত লিখিয়া-

ছেন, ‘পাপং কিষিৎ, বিট্ বিষ্ঠা, কিট্টং কলঙ্কো মণ্ডুরাদি য়েদাদিচ এষ মলঃ’

“বসো গুক্রমস্বজ্জা মূত্রং বিট্ কর্ণবিব্রথাঃ।

শ্লেয়াশ্চক্ষুশ্চ। য়েদো দ্বাদশৈতে নৃণাঃ মলাঃ॥” (ভরত)

মনুষ্যমাত্রেরই দ্বাদশটা মল আছে;—যথা বসো, গুক্র, অশ্বক্, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেয়া, অশ্রু, গাত্রমল ও য়েদ। ৪ কর্পূর। ৫ বাতপিত্ত কফ। (শব্দচ০)

“মর্কেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।

তৎপ্রকোপস্ত তু প্রোক্তং বিবিধাহিতদেবনম্॥” (নিদান)

মলশব্দের টীকায় ইহার অর্থ বায়ু পিত্ত ও কফ বলিয়া

খাত হইয়াছে। বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়াই সকল রোগ উৎপন্ন হয়।

পারিভাষিক মল—

“কত্রিষ্মত মলং ভৈক্ষ্যং ত্রাঙ্কণস্তাত্তং মলম্।

মলং পৃথিব্যা বাহীকাঃ স্ত্রীণাং মদপ্রিয়ো মলম্ ॥”

( ভারত ৮৪৫২৩ )

কত্রিষ্মের মল ভিক্ষাকার্য্য, ত্রাঙ্কণের মল অত্রত, অর্থাৎ অধর্ম্মাচরণ, পৃথিবীর মল বাহীক এবং স্ত্রীদিগের রূপগর্ভই মল।

৬ মলিন।

“মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলাঃ।”

( ঋক্ ১০।১৩৬২ )

‘মলাঃ মলিনানি’ ( সায়ণ )

মলিন পদার্থমাত্রই মল শব্দে অভিহিত।

মলক ( পুং ) মধ্যদেশীয় জনপদভেদ। ( মার্ক ০ পুং ৫৭।৩৩ )

মলকর্ষণ ( ত্রি ) ময়লা পরিষ্কারকরণ।

মলকানগিরি, বিশাখপত্তন জেলার অন্তঃপাতী একটি তালুক ও নগর। এই তালুকের অন্তর্গত অনন্তপল্লি, গরিশপল্লী, কন্দকাধের, মলকানগরি ও নর্ম্মকোট নামক পাঁচ থানি গওগ্রামই প্রসিদ্ধ। অনন্তপল্লি ও মলকানগরিতে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গ আছে।

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। স্থানীয় দুর্গ এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

মলকাপুর, কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। নন্দীগ্রাম হইতে ১৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে মুনিয়ার নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার চতুঃপার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর এবং মন্দিরস্থ প্রতিমূর্ত্তি গুলি ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ এই স্থানকে জৈনালপাড়ু নামে অভিহিত করে। ধ্বংসাবশেষমূহ আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, সম্ভবতঃ পূর্বে বৌদ্ধগণ এই গ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, পরে শৈব-সম্প্রদায় এখানে প্রসার বৃদ্ধি করে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গণেশের স্মরণ্য প্রাতিমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

মলকাপুর, মাদ্রাজের কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। বেজবাড় হইতে ৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার একটি মন্দিরের স্তম্ভগাত্রে একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। উক্ত শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কোণাপল্লির শৈলহর্গবিজেতা মশানদয় অলীকুদ্পন মলকু ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে এখানে একটি সরাই নির্মাণ করিয়াছিলেন।

মলকুট, দক্ষিণ-ভারতের কুমারিকা সন্নিকটস্থ একটি প্রদেশ।

চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং কাকীপুর হইতে ৫০০ মাইল দক্ষিণে আসিয়া এইস্থানে উপনীত হন। মলকুট প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে মলয়পর্বত। এই পর্বতে প্রচুর পরিমাণে চন্দন কাষ্ঠ পাওয়া যায়। চীনভাষায় মলকুট “মলয়কুট” বলিয়া অভিহিত। এই প্রদেশের দক্ষিণ সমুদ্র-বেষ্টিত, উত্তরে দ্রাবিড় রাজ্য। ইহার পূর্বাংশে অবস্থিত তঞ্জোর ও মহুরা এবং পশ্চিমাংশে অবস্থিত কোয়ম্বাতোর, কোচিন এবং ত্রিবান্দুর মলয়কুট প্রদেশের অন্তর্গত।

মলয়কুটের রাজধানী কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, টলেমার সময় প্রাচীন মহুরা নগরে ছিল। অথবা কুইল নগরে ইহার রাজধানী ছিল। এতদ্বিধ চরিত্রপুর বন্দরকেও ইহার রাজধানী-রূপে গণ্য করা যায়।

লক্ষাদ্বীপে যাইতে হইলে এই সহর হইতে কাহাজে আরোহণ করিতে হইত। আবুরিহান্ এবং রসিদুদ্দীন বলিয়াছেন যে “মলয়” এবং “কুস্তল” নামে ভারতবর্ষের দক্ষিণে ২টি প্রদেশ ছিল। এই দুইটি নিকটবর্তী জেলা একত্র হইয়া মলয়কুট হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, “মলয়” পাণ্ড্য নামে এবং “কুস্তল” ত্রিবাকোড় নামে অভিহিত হইয়াছে।

মলকোষ্ঠক ( পুং ) রাজপুরুষভেদ। ( রাজতর ৮.৫১১ ) মলকা ( মালক ), মলয়-উপদ্বীপের সমুদ্রতীরবর্তী নগরবিশেষ। এখানকার আলোকমঞ্চ অক্ষাঃ ২°১৪' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ১০°২১' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। মলকাজেলার দৈর্ঘ্য ৪০ মাইল এবং পরিসর গড় ২৫ মাইল; ভূপরিমাণ ১০০০ বর্গ মাইল। মলয়-ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মলকা নামে এক প্রকার বৃক্ষ হইতে মলকা নগরের নাম হইয়াছে। মলকা জেলার মধ্যবর্তী কতক অংশ শৈলশ্রেণিপূর্ণ।

গোয়া ব্যতীত মলকার পূর্বে এদেশে অন্য কোন স্থানে যুরোপবাসিগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। তৎকালীন বাণিজ্যবন্দরমধ্যে ইহা একটি বিখ্যাত বলিয়া পরিগণিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৫১১ অব্দে পর্তুগীজগণ মহম্মদ শাহের হস্ত হইতে মলকা গ্রহণ করেন। ১৩০ বৎসরকাল নিরীয়ে পর্তুগীজের অধিকারে থাকিয়া পরে ওলন্দাজদিগের হস্তে পতিত হয়। ওলন্দাজগণ ৭৪ বৎসর শাসন করিলে পর ইংরাজেরা এই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ সর্বপ্রথমই পর্তুগীজদিগের বহুমূল্য দুর্গবাটিকা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে, মলকা পুনরুদার ওলন্দাজগণের হস্তগত হয়; কিন্তু তাঁহারা ইংরাজদিগের নিকট হইতে বেনকুলেন ও সুমাত্রার অত্যাচার

নিবেশের পরিবর্তে দান করিয়াছেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের দক্ষিণে স্থির হইয়াছে যে, দ্বীপপুঞ্জে বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ স্থান ওলন্দাজগণের এবং উত্তরস্থ স্থান ইংরাজদিগের অধিকারে থাকিবে।

এখানকার খনিজ দ্রব্যের মধ্যে টিন সর্বপ্রধান। শত সহস্র টিনবাসী টিনখনিতে কাণ্ড করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে। বিলাতে যে দরে টিন বিক্রয় হয়, এই স্থানে তাহার অর্ধেক দর। মলকা নগরের নিকটে ৬০০ উচ্চপ্রস্রবণ আছে। এই বরষার জলের উচ্চতা ১৩৭ ডিগ্রী। নিরন্তর ইহা হইতে উচ্চ জল বহির্গত হইতেছে।

**মলকা-প্রণালী,** মলয়পর্বত ও সুমাত্রার মধ্যবর্তী জলপথ। বঙ্গোপসাগর হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিতে হইলে এই জল-প্রণালীর মধ্য দিয়া আসিতে হয়। ইহার উত্তরসীমায় সিঙ্গাপুর দ্বীপ। মলকাপ্রণালীর স্রোত তত প্রবল নহে, কিন্তু প্রণালীমধ্যে প্রবাহমাণ জলরাশি আন্দোলিত না হইলেও দূর হইতে ইহার জলপ্রবাহের আগমন-শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। রাত্রিকালে অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এই শব্দ বিশেষ ভয়ের কারণ হয়। তরঙ্গসমূহ গুরুতরবেগে আসিয়া আছাদের গায়ে আঘাত করে এবং কখন কখন কেনরাশিসমূহের তরঙ্গাভিঘাতগুলি বেগে পাটাতনের উপর আসিয়া পড়ে। সময় সময় ক্ষুদ্রতরঙ্গী ইহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া লমুদ্রগর্ভে লীন হইয়া থাকে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০০ মাইল এবং প্রস্থে স্থানবিশেষে ৩০ হইতে ৩৮০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমসীমায় পিনাং প্রভৃতি এবং পূর্বসীমায় সিঙ্গাপুর প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এসিয়া মহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমদিকস্থিত রাজ্যসমূহের জলপথ-বাণিজ্য এই প্রণালী দিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে চোরা-বালি এবং বহু শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় সময়ে সময়ে বাণিজ্যপোতের ঘাতাত্তের বিশেষ অসুবিধা ঘটিত। ইংরাজ-গবর্নমেন্ট ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যোন্নতিকল্পে পণ্য পরিষ্কার করিয়া দেন। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে বোলোনাবাসী লুডোভিকো বাবেমানামক জনৈক ব্যক্তি নদীর মোহানা-বোধে এই প্রণালীতে প্রবেশ করেন। পাশ্চাত্য বণিকসম্প্রদায় তৎপরবর্তিকাল হইতে এই পথে গমনাগমন করেন।

**মলগ (পুং) রজক।**

**মলজ,** হুন্দরবনবাসী লবণপ্রস্তুতকারী জাতি বিশেষ। সমুদ্র-তীরবর্তী হুন্দরবনের জমি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—মধুর অর্থাৎ কর্ণবযোগ্য জমি এবং নিমকীন্ অর্থাৎ

লবণযুক্ত ভূমি। শেযোক্ত নিমকীন জমিতে সমুদ্রজল উঠিলে লবণাক্ত কর্দম বালি একত্র করিয়া মলজগণ বখানিরম্বে লবণ উৎপন্ন করিয়া থাকে। মলজগণ কার্তিক মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত লবণের খালাড়িতে (কারখানা) কার্য করে; তদনন্তর ইহারা চাপ করিতে যায়। পরিশ্রমের ভার-তম্য অনুসারে তাহাদের কমিবেশী বেতন আছে, ইহারা স্ব স্ব জমির লব্ধ অতি অল্প মাত্র কর দেয়। তাহার অধিকাংশই নিজের চাকরান্।

**মলগ্ন (পুং) মলং হস্তীতি হন-টক্। ১ শাস্ত্রদীকন্দ।**

(রাজনিং) (ত্রি) ২ মলনাশক।

**মলদ্বী (স্ত্রী) মলয়-দ্বিরাং ভীষ্।** নাগদমনী। (রাজনিং)

**মলজ (স্ত্রী) মলাজ্জারতে ইতি জন-ড। ১ পুর। (শব্দচং)**

(ত্রি) ২ মলোদ্ভব।

**মলত্ব (স্ত্রী) মলত্ব ভাবঃ তল্-টাপ্।** মলতা, মলের ভাব বা ধর্ম।

**মলদ (পুং) ১ দেশভেদ।** কালিন্দী ও মহানন্দার সম্মিলনে অবস্থিত। ইহার বর্তমান নাম মালদা বা মালদহ। মেগস্থেনিস্ এই স্থানকে Maliudai শব্দে উল্লেখ করিয়াছিলেন। ২ তদদেশবাসী লোক। ত্রিরাং টাপ্। ৩ ক্রান্তির কল্প। ইহার অপর নাম মলন্দা।

**মলদিক্কাঙ্গ (ত্রি) মলেন দিগ্ধং অঙ্গং বস্ত্র।** মলযুক্তদেহ।

**মলদূষিত (ত্রি) মলেন দূষিতঃ।** মলিন। (অমর)

**মলদ্রাবিন্ (পুং) মলং বিষ্ঠাং দ্রাবয়তি** চালয়তীতি দ্র-শিচ্-গিনি। জয়শাল। (রাজনিং)

**মলধাত্রী (স্ত্রী) ধাত্রীভেদ, যে ধাত্রী মল পরিষ্কার করে।**

**মলধারিন্ (পুং) জৈন সন্ন্যাসিভেদ।**

**মলধারিনরচন্দ্রসূরি, জনৈক জৈন কবি।**

**মলধারি নরেন্দ্রসূরি, জৈন স্থরভেদ।** ইনি একজন কবি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

**মলন (স্ত্রী) মল্যতে মল্যতে ইতি মল-লুট্। ১ মর্দন।** মলতে ধারয়তি বৃষ্টিতাপো মল যতো লু। ২ পটবাস, চলিত তাঁবু।

**মলপঙ্কিন্ (ত্রি) ১ মলযুক্ত। ২ পঙ্কিগুণ।**

**মলপু (স্ত্রী) মলাং পাশাং পুনাতীতি পু-কিপ্।** কাকোড়ু-মরিকা। (অমর)

“বিভীতকঙ্কঃ মলপুজটানাং কাথেন কৃষা ঞ্জসংযুতেন।”

(ভাবপ্রকাশ)

**মলপ্রাণদেশ (পুং) দেশভেদ।**

**মলবার,** মাজাজ-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বৃত্তীশ রাজ্যভূক্ত একটি জেলা। অক্ষা° ১০° ১৫' ও ১২° ১৮' উঃ এবং দ্রাঘি°

৭৫° ১৪' ও ৭৬° ৫২' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমায় দক্ষিণ-কাণাড়া, পূর্বসীমায় কুর্গ, মহিসুর রাজ্য, নীলগিরি এবং কোয়ম্বাতোর জেলা, দক্ষিণে কোচিন রাজ্য এবং পশ্চিম-দিকে আরব-সাগর। ভূপরিমাণ ৫৭১৫ বর্গ মাইল। কালিকট নগর এই জেলার সদর।

মলয়ালম্ (মলবার) দেশের প্রাচীন নাম চের এবং কেরল। আধুনিক গ্রীকদিগের 'মলী' (Mali) শব্দে বর্তমান মলবার নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ 'মলবার' নাম আরব-বাসিন্দৃক প্রদত্ত হয়। [ কেরল ও চের দেখ। ]

লাসেন্দ্রাহেব বলেন যে, 'বার' প্রত্যয়টি সংস্কৃত 'বাড়' (অর্থাৎ প্রদেশ) হইতে উৎপন্ন। কিন্তু বিশপ ক্যালডোয়েল বলেন, পারস্ত 'বার' হইতে উৎপন্ন। বাহা ইউক 'মলবার' শব্দটি 'ধারবার' 'মারবার' শব্দের সমতুল্য; অর্থাৎ প্রদেশ অথবা সমুদ্রতীরবর্তী স্থান-বোধক।

১৭২২ খৃঃ অব্দে ত্রিরঙ্গপত্তনের সন্ধিতে মলবার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত ও বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৭২৬ খৃঃ অব্দে ৪ জন অধ্যক্ষের হাতে শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছিল। পরে ১৮০০ খৃঃ অব্দে দুইজন অধ্যক্ষের পদ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্তে প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন কালেক্টর নিযুক্ত হয়। পর বৎসর মলবার মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হইল।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে তেলিচেরী এবং কালিকটে ২টা জেলা স্থাপিত হয়। অনন্তর ঐ দুইটা জেলা উঠাইয়া দিয়া বর্তমান উত্তর-মলবার ও দক্ষিণ-মলবার জেলাদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দক্ষিণভারতের এই জেলা সমুদ্রোপকূলে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রায় ১৪৫ মাইল বিস্তীর্ণ; ইহার বিস্তার উত্তরাংশে ২৫ মাইল এবং দক্ষিণাংশে ৭০ মাইল। উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে একটা দ্বীপ ও ডিল্লী পাহাড়। এতদ্বিন্ন পশ্চিমঘাট পর্বত সমুদ্রতীর হইতে সমান্তরভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পালঘাট-খাদ টহার একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে অনুমান ২৫ মাইল ব্যাপিয়া পশ্চিমঘাটপর্বত মধ্যে খাদ রহিয়াছে। এই গর্তের পশ্চাদ্ভাগে পর্বত যেন তুপাকার হইয়া শূন্যে উঠিয়াছে। নীলগিরি ও অনমলয় পাহাড় এই খাদের পার্শ্বদেশে অবস্থিত। ইহার ভিতর দিয়া মলয় পবন কোয়ম্বাতোরে প্রবাহিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মহিসুর, কুর্গ, কোচিন প্রভৃতি স্থানের নিকটে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য পথ আছে।

মলবারে অনেকগুলি নদী আছে, তন্মধ্যে বিশ্বপত্তন ধর্মপট্টন, কোটা, মহী, কদলবন্দী প্রভৃতি প্রধান বলিয়া গণ্য। ভাহুর ও জিচুড নামক ২টা প্রচ্ছলিত হ্রদ মলবারের লৌপ্য

ও উর্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে। নদীর সংখ্যা অধিক বলিয়া বাণিজ্যকাণ্ডে প্রায়ই জলপথে চলিয়া থাকে। চাউল, মরিচ, মসলা, কাঠ ইত্যাদি এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য। শিল্প ও অস্ত্রাস্ত্র বড় বড় কাঠ নদীর স্রোতে ভাসাইয়া আনা হয়। এই স্থানে মৎস্যজীবী বহু সংখ্যক জাতি বাস করে। মাছ ধরবার জন্য তাহাদিগকে কোনরূপ রাজস্ব দিতে হয় না; তীরস্থ বন্দরসমূহে মৎস্যের ব্যবসা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, প্রতি বৎসর লক্ষাধীনে প্রায় ১৭০০০০ টাকা মূল্যের মৎস্য রপ্তানি হইয়া থাকে। মলবারের জলভাগ যেরূপ বিস্তীর্ণ, জঙ্গলময় স্থানও তদ্রূপ সুবিশাল। হস্তী, মহিষ, হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানারূপ জন্তু ইহার ভিতরে বাস করিয়া থাকে।

মলবারের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই উভয় স্থানের লোক, ভাষা, আইনকানুন, রীতিনীতি সমস্তই একরূপ। কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে, বিভিন্ন শাসনকর্তা দুই স্থানে শাসন করিয়া থাকেন। পুরাতত্ত্ব পাঠে জানা যায় যে, চেরর রাজ্যে শেষ রাজা চেরম্যান্ পেরুমাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণাভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন। ইনি কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু সম্প্রতি এরূপ জানা যায় যে, আরবোপকূল-বর্তী সফ্‌হাইনামক স্থানে তাঁহার কবর বর্তমান আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, তিনি ৮২৭ খৃঃ অব্দে মক্কায় উপস্থিত হন এবং ৮৩১ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। ইহার পর মলবার কয়েক জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার শাসনাধীন হয়, তন্মধ্যে উত্তরে কোলত্তিরী বা চেরাকল এবং দক্ষিণে জামোরিন্ (সামরীরাজ) প্রসিদ্ধ। ইহাদের এবং কোচিনরাজের সহিতই পত্তুগীজদিগের প্রথম সংস্রব ঘটে।

১৪৯৮ খৃঃ অব্দে ভাস্কোদাগামা মলবারে উপস্থিত হন। অনন্তর তৎপরবর্তী শাসনকর্তা কোচিন, কালিকট এবং কনানুরে আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজগণ পত্তুগীজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বা হইয়া বাণিজ্যার্থ ভারত-বর্ষে উপনীত হন। ইহারা প্রথমে কনানুর জয় করিয়া পরে কোচিন সহর ও দুর্গ এবং তন্নগরের অধিকার করিয়া লন এবং ১৭১৭ খৃঃ অব্দে চেংবাই দ্বীপ স্বয়ং রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু ইহার পর হইতেই তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল। ইহারা কনানুর-রাজবংশের নিকট কনানুর নগর বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কোচিন, চেংবাই প্রভৃতি স্থান তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল। কন্নাসীরা ১৭২০ খৃঃ অব্দে সর্বপ্রথমে ইহাতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৭৫২

খৃঃ অব্দে কালিকট এবং ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ডিল্লীপাহাড় তাহার অধিকারভুক্ত হয়। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা গুলশান-দিগের হাত হইতে কোচিন ছাড়িয়া লন। ইংরাজের সহিত ফরাসীদিগের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধবিগ্রহেই তাঁহাদের বাণিজ্যের বিশেষ হানি হয়। ইংরাজগণ ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে কালিকটে, ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে তেলিচেরীতে এবং ১৭১৪ খৃঃ অব্দে আঞ্জো ও চেংবাই প্রকৃতি স্থানে খীম প্রভৃৎ বিস্তার করেন।

প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া মহারাষ্ট্রীয় জলদস্যুগণ মলবার-উপকূলের বন্দর ও নগরগুলি লুটপাট করিতেছিল, কিন্তু ইংরাজগণ ইহাদিগকে পরাভূত করিয়া এদেশে শান্তি স্থাপন করেন। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের বিবাদ প্রশমিত হইলে হায়দর আলীর পুত্র টিপু সুলতান এইখানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম-বিস্তার ও নরহত্যা আরম্ভ করেন। এই নিমিত্ত মহাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং তাহার সহিত ইংরাজগণ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নিরাশ্রয় রাজগণ ইংরাজগণকে যোগদান করিলেন। প্রায় সমস্ত মলবার ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। বোম্বাই-গবর্নমেন্ট যে সমস্ত কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশীয় রাজাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। এই প্রকারে দেশমধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলেও মধ্যে মধ্যে মাপিলারা আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। টিপু সুলতান ও তাঁহার নায়ক-সহকারীগণ নজেরি-ওয়াটসন নামক স্থান অধিকার করিলেন, কিন্তু পরে সেখানেও সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন।

আরবীয় ঔরসে মলবারী রমণীর গর্ভজাতা সন্তানেরা মাপিলা নামে অভিহিত। ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। কেবলমাত্র তহফে-উল-মুজাউদানে যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত গ্রন্থে চেরমান পেরুমালের মুসলমানধর্মগ্রন্থ ও মক্যাত্তা প্রভৃতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন কোদল লুর, কোলম, ডিল্লী প্রভৃতি স্থানে ৯টা মসজিদের কথা বর্ণিত আছে। মাপিলা ও নায়রদিগের সঙ্গে বরাবর বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। নায়র-জাতি আতশয় ধর্মশীল ও জ্ঞানপরাগ। ধর্ম্যাজ্ঞ অজ্ঞ মাপিলাগণ সর্বদা ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত এবং সময় সময় অত্যাচার ও প্রাণনাশ করিতে কুষ্ঠিত হইত না। নায়রদিগের বিবাহপ্রথা অতি কৌতূহলজনক। পূর্বে ইহাদের মধ্যে বহুখামগ্রহণ প্রচলিত ছিল; সম্প্রতি শুনা যায়, এ কুপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

এক আদিপুরুষ হইতে যে সমস্ত কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিত, তাহারা সকলেই একত্র বাস করিত। এই বাসগৃহকে

‘তরবাদ’ বলে। ইহাদের মধ্যে বহুভ্রাতা প্রচলিত থাকিলেও হই ভ্রাতা এক জীকে বিবাহ করিতে পারিত না। দক্ষিণ-মলবারে সাধারণ লোকের মধ্যে জীলোকে স্বামী বাদীতে বাস করে বটে, কিন্তু রাজা ও অমিদারগণের জী কখনও ‘তরবাদ’ পরিত্যাগ করিয়া যায় না।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বাবিলন হইতে মিশনারীগণ মলবারে উপস্থিত হইয়া প্রথম গির্জা স্থাপিত করেন। এই স্থানে ৪ শ্রেণীর খুষ্টান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

(১) আকোবাইটু, (২) সিরিয়ান-প্রথাবলম্বী রোমান ক্যাথলিক (৩) লাতিন-প্রথাবলম্বী রোমান ক্যাথলিক ও (৪) প্রোটেস্ট্যান্ট। কনানুর, কালিকট ও কোচিনে ৩টি ধর্মশালা আছে।

মলবারে কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। ১৮৮৩-৮৪ খৃঃ অব্দের সরকারী বিবরণী হইতে জানা যায় যে, এখানে ৯৩৮০২৬ একর জমি করিত হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে ২,৮৫৬, ৩৬২ একর জমি কর্ষণোপযোগী ছিল। উক্ত বৎসর ১৮১, ৭১৬০ রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউল, ছোলা, কাকি, চা, মরিচ, দারুচিনি, শুপারি, নারিকেল প্রভৃতি বিশেষ আবশ্যকীয়। এই স্থানে অসংখ্য নারিকেলবাগান আছে। প্রতিবর্ষে প্রায় ২ কোটি টাকার নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৭২৭ খৃঃ অব্দে কনানুর ও তেলিচেরীর মধ্যবর্তী রন্দত্তরা নামক স্থানে কাকি, মরিচ, দারুচিনি ইত্যাদির চাস আরম্ভ হয়। সম্প্রতি এইখানে চা’র চাস প্রচলিত হইয়াছে এবং অপব্যাপ্ত কাকি ও চা উৎপন্ন হইয়াছে। মলবারে অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দৈব ছবিপাক প্রায়ই দেখা যায় না, এজন্য এইখানে অজ্ঞান স্থানের জ্ঞান ছিটিকানি খুব কম।

এখানে কাপড়, টালি, হুট ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পালঘাটের মোটা কাপড় ও মাথুর উল্লেখযোগ্য। কালিকটে প্রস্তুত ‘কালিকো’ নামক বস্ত্র এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বেপারে কেম্বিস, এবং পালিঘাটে রেশম প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বন্দোবস্তে এখানকার রাজস্ব আদায় হইত। তামাকের ব্যবসা গবর্নমেন্টের একচেটিয়া ছিল, মরিচের উপর শুদ্ধ গ্রহণ করা হইত। এতদ্ভিন্ন এলাচের কারবার এবং স্বর্ণসংগ্রহও গবর্নমেন্টেরই একচেটিয়া ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে এরূপ বন্দোবস্ত উঠিয়া গিয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত জেলার খাজনা সর্বমুদ্র ২৮২৭২০ টাকা নির্ধারিত হয়। এই সমস্ত রাজস্বই জমির উপর আদায় হইয়া থাকে।

মলবারে ২টা জজ আদালত ৩টা সবজজ আদালত, ১৮টা মুলেক-আদালত, ১টা ডিষ্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেট ও আসিষ্ট্যান্ট মাজিস্ট্রেট, ৪টা ডেপুটি মাজিস্ট্রেট এবং ৩২টা সবডেপুটি ও ৫টা বেঞ্চ মাজিস্ট্রেট কোর্ট আছে।

এখানে অপরিখ্যাপ্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। এখানকার বায়ু আর্দ্র, এবং বৈশাখ মাসে দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে মলয়পর্বত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ মেঘাক্ত করিতে থাকে। মালবার নাতিশীতোষ্ণ স্থান। বাস্তবিক স্থানটা বেশ স্বাস্থ্যকর।

মলভুজ্ (পুং) মলঃ ভূক্তে ইতি ভূজ্-কিপ্। কাক। (জি) ২ মলভোজিমাভ্র, কৃমি, শূকর প্রভৃতি।

মলভেদিনৌ (স্ত্রী) মলঃ ভিনভৌতি ভিন্-গিনি, ত্রিবাং ভীব্। কটুকা। (রাজনিং)

মলমল্লক (স্ত্রী) কৌশীন।

মলমাস (পুং) মলঃ মলিনশাসৌ মাসশ্চেতি কর্মধারয়ঃ। অধিক মাস। পর্যায়—মলিন্দুচ, অধিমাস, অসংক্রান্তমাস, নপুংসক। ইহার লক্ষণ—“রবিসংক্রান্ততাববিশিষ্টচান্দ্রমাসতঃ মলমাসতঃ” (শ্রাবণবৈকটীকায় ত্রীকৃষ্ণ তর্কলকার)

রবি-সংক্রান্তির অভাববিশিষ্ট চান্দ্রমাসতাই মলমাসতঃ। মলমাসতঃ মলমাসের বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহার স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইল,—

“বাদশমাশাঃ সংবৎসরঃ কচিং জ্যৈষ্ঠদশমাশাঃ সংবৎসরঃ।”

বার মাসে বৎসর হয়, কখন কখন তের মাসেও বৎসর হইয়া থাকে। মাসশব্দের প্রকৃত অর্থ চান্দ্রমাস, সৌর মাস নহে। বারটা চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর। শব্দের এই উক্তি দ্বারা মলমাসের অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। মলমাস হইলে তের মাসে বৎসর হয়।

“অমাবস্তারয়ঃ যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জিতম্।

মলমাসঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিত্তি কর্কটে॥”(মলমাসতঃ)

হুইটা অমাবস্তার শেষকণ যদি এক সৌরমাসের মধ্যে পড়ে, তাহা হইলে মলমাস হয়। মলমাস হইলে হুইটা চন্দ্র-মাস হয়, তন্মধ্যে প্রথমটা মল বা মলিন্দুচ, দ্বিতীয়টা শুদ্ধ। হুইটা চন্দ্রমাস হইবার তাৎপর্য এই যে, গুরুপক্ষীর প্রতিপদে অমাবস্তা বহিত পূর্ণকণ অর্থাৎ পূর্ণ-অমাবস্তার শেষ সময় যে সৌর-মাসের মধ্যে পড়িবে, সেই গুরুপক্ষীর প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত ত্রিশং তিথিরূপ মাস, ইহা সৌরমাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা সৌর বৈশাখমাসে একটা অমাবস্তার স্কে হইলে পরবর্তী গুরুপক্ষীর প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত যে মাস, তাহা মুখ্য চান্দ্র বৈশাখ। মলমাসের বিষয়

হিস করিতে হইলে প্রথমে মাস কর প্রকার, তাহাদের লক্ষণ কি? ইত্যাদি বিষয় জানা আবশ্যক। মাস চারি প্রকার—সৌরমাস, চান্দ্রমাস, নাক্ষত্রমাস এবং সাবনমাস। চান্দ্রমাসের হিসাবে মলমাস, হয়, এইজন্য চান্দ্রমাসের বিষয় জানা আবশ্যক।

তিথিষটিত মাসই চান্দ্রমাস। চান্দ্রমাস দ্বিবিধ, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র। গুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত এই ত্রিশং তিথিতে যে চান্দ্রমাস হয়, তাহাই মুখ্যচান্দ্র। আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ত্রিশং তিথিতে যে মাস হয়, তাহা গৌণচান্দ্র, কর্মবিশেষে কোন স্থলে মুখ্যচান্দ্র, আবার কোন স্থলে গৌণচান্দ্রের উল্লেখ করিতে হয়। [মাস শব্দ দেখ]

হুইটা গুরুপক্ষীর প্রতিপদের পূর্ণকণ অর্থাৎ হুইটা অমাবস্তার শেষ সময়ই এক সৌরমাসে পড়িলে পূর্ণোক্ত সাবন-রূপ লক্ষণানুসারে হুই মাসের এক রূপই নাম হয়। গুরুপক্ষীর প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত ত্রিশং তিথিরূপ মাস একটা নহে, হুইটা। তন্মধ্যে প্রথমটা মল, দ্বিতীয়টা শুদ্ধ। এই জন্তই তের মাসে বৎসর হয়। কর্মযোগ্য কালনির্ণয়ের জন্তই মলমাসের এইরূপ সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

আষাঢ় মাসের গুরুপক্ষীর পঞ্চমীতে মনসা-পূজা করিতে হয়, আষাঢ় মাসে হুইটা গুরুপক্ষীর পঞ্চমী হইলে কোন্ গুরুপক্ষীর পঞ্চমীতে পূজা করিবে, এইরূপ সংশয় হয়। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা কাহারও পিতার মৃততিথি হইলে কোন্ পূর্ণিমাতে সে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। ইত্যাদি সন্দেহ দূর করিবার জন্তই মলমাস পরিচায।

“ইন্দ্রায়ী যত্র হুয়েতে মাসাদিঃ স প্রকীর্তিতঃ।

অন্নীষোমৌ শ্বতৌ মধ্যে সমাপ্তৌ পিতৃসোমকৌ॥

তমতিক্রম্য তু রবির্বিদাগচ্ছৎ কথঞ্চন।

আজ্ঞো মলিন্দুচো জ্যৈষ্ঠো দ্বিতীয়ঃ প্রকৃতঃ শ্বতঃ।

তস্মিন্ধ প্রকৃতো মাসি কুর্ধ্যাৎ শ্রাদ্ধঃ যথাবিধি॥”

(অশ্ব হারীত)

গুরুপক্ষীর প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত যে মাসের মধ্যে রবি সংক্রমণ না হয়, সেই মাস পূর্ণোক্তরূপে এক সংজ্ঞা-প্রাপ্ত মাসদ্বয়রূপে পরিণত হয়। তন্মধ্যে প্রথমটা মলিন্দুচ, আর দ্বিতীয়টা শুদ্ধ। শুদ্ধ মাসে শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে। আশ্বলায়ন ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে,—

“অর্দ্ধমাসা বৈ অথত্যাং সন্তোহকমারস্ত মাসান্ত ত্র্যম ইতি তে বাদশাহং ক্রতুযুগাবন্ জ্যৈষ্ঠদশং ব্রাহ্মণঃ কৃষা অগ্নিন্ বৃষ্টোদতিষ্ঠন্ তন্মাসোহনারতন ইত্যমহম্ভবতি।”



ইহার তাৎপর্য,—অর্ধমাস সকল মাস হইবার ক্ষুদ্র জরোদশ অর্থাৎ মলমাসকে ত্রাক্ষণ করিয়া দ্বাদশাহসাধ্য বজ্র করেন, তার পর তাঁহারা সেই মলমাসে আত্মপাপসমূহ বিসর্জন করিয়া অভিলষিত উন্নতি প্রাপ্ত হন।

মলমাসের নিয়মনাই। চৈত্র প্রভৃতির ক্ষার মলমাস অমুক মাসের পরে এবং অমুকমাসের পূর্বে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। মলমাস অন্ত মাসকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে।

সকল মাসের পাপ এই মাসে প্রক্ষিপ্ত হয়, শাস্ত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইজন্য মলমাসে কোন ধর্ম-কর্ম করা উচিত নহে। নিত্যকর্ম না করা অসাধ্য, আর কতকগুলি নৈমিত্তিক কর্মও বাহা মলমাসে কর্তব্য, তাহাও না করা অসাধ্য। কাজেই সেগুলি মলমাসে করিতে হয়।

দিবা ও রাত্রির পরিমাণ ৬০ দণ্ড, তিথির মান কিন্তু গড়ে ৫৮ দণ্ড। সূত্ররূপে গড়ে ৩০ দিনে ৩১টি তিথি হয়, এইরূপে বৎসরে ১২টি তিথি অধিক পাওয়া যায়। সার্কি-বি (আড়াই) বৎসরে ৩০টি তিথি বৃদ্ধি হয়, তবেই দেখ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি ক্রমে মাসসংজ্ঞা ধরিয়া লইলে আড়াই বৎসরের পরে যে চান্দ্র-কার্ত্তিকমাস হইবে, তাহার সঙ্গে দৌরকার্ত্তিক মাসের ৩০ দিন অন্তর ঘটয়া যাইবে। ৫ বৎসর পরে দেখা যায় যে, সৌর ও চান্দ্রমাসে ৬০ দিন অন্তর হইয়াছে, এইরূপে কখন দৌর-আশ্বিন মাসেও চান্দ্র বৈশাখ মাস হইতে পারে। এরূপ হইলে মাসের যে সাধারণ লক্ষণ আছে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এখন দেখ, ৩০টি তিথি বৃদ্ধি হইলেই অমনি মলমাস হইবে। মলমাস হইলে একই সংজ্ঞার দুটি চান্দ্রমাস হয়, তাহাতে আর ৩০ দিনের অধিক অন্তর ঘটতে পারে না। আমাদের বত কিছু চান্দ্রমাস ঘটত ক্রিয়া, তাহা চিরকালই অন্ততঃ ৩০ দিনের মধ্যে হইবে। সুখাচান্দ্র-আশ্বিনের কার্য হয় সৌর আশ্বিনে, না হয় সৌর কার্ত্তিকে হইবে, ইহার ব্যতিক্রম হয় না।

যে বৎসরে মলমাস হয়, তাহা হইতে তৃতীয় বৎসরে পুনরায় মলমাস হইয়া থাকে। পূর্বে যে আড়াই বৎসরের কথা কথিত হইয়াছে, তাহা প্রারম্ভিক অভিপ্রায়ে। ফলস্বরূপ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত দশমাসই মলমাস হইতে পারে। মাঘমাস কদাচিত্ মলমাস হয়, পৌষমাস কখনই মলমাস হয় না।

মলমাস ৩ বৎসর অন্তর হয়, ইহা বলা গিয়াছে বটে, কিন্তু অল্পক ভট্ট ১৫৫ শকাব্দে এইরূপ দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, অমাবস্তার তুলাসংক্রান্তি, (সৌর কার্ত্তিক মাস আরম্ভ) তার পরবর্তী অমাবস্তার পর দিন অর্থাৎ শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদে বৃশ্চিক-সংক্রান্তি (সৌর অগ্রহারণ মাস আরম্ভ)

তার পর অমাবস্তার ধর্মসংক্রান্তি (সৌর পৌষমাস আরম্ভ) হইয়াছে, ইহাতে কার্ত্তিক মাস মলমাসলক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে অথচ ইহার পরেই আবার বৈশাখ মাসে মলমাস। এইরূপ এক বৎসরের মধ্যে দুটি মলমাস কিরূপে সম্ভব হইল? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে,—এরূপ হইতে পারে না, দুটি মলমাস এক বৎসরে কখনই হইবে না। এরূপ স্থলে মাসের ত্রিবিধ পরিভাষা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। যথা ভাদ্র-লজ্জিত, ক্ষয় এবং মলমাস। উক্ত স্থলে কার্ত্তিক মাস ভাদ্র-লজ্জিত, অগ্রহারণ ক্ষয় এবং বৈশাখ মল।

ভাদ্রলজ্জিত এবং মলমাসের লক্ষণ একই প্রকার। তবে মলমাসে মাস বৃদ্ধি হয়, ভাদ্রলজ্জিতে তাহা হয় না, তবে এস্থলের একটি নিয়ম এই যে, বৈশাখ প্রভৃতি ছয় মাসের মধ্যে কোন মাসে, আর কার্ত্তিক প্রভৃতি ছয় মাসের মধ্যে কোন মাসে যদি মলমাস দেখা যায়, তাহা হইলে বৈশাখ প্রভৃতির মধ্যেই মলমাস হইবে, কার্ত্তিকাদি ছয় মাসের মধ্যে যদি দুটি মাস মলমাসলক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে যে মাস প্রথমে তাহাই মলমাস হইবে। আশ্বিন এবং বৈশাখ যদি মলমাস লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে বৈশাখ মাসই মলমাস হইবে, আশ্বিন মাস হইবে ভাদ্রলজ্জিত।

যে বৎসর একটি মলমাস ও একটি ভাদ্রলজ্জিত মাস হয়, সেই বৎসর একটি ক্ষয় মাসও হইয়া থাকে। যে সৌর মাসের মধ্যে একটি অমাবস্তারও অন্ত্যক্ষণ পাওয়া যায়, তাহাই ক্ষয়মাস। কার্ত্তিক, অগ্রহারণ এবং পৌষ ভিন্ন অন্ত মাসে ক্ষয়মাস হয় না।

মলমাস, ভাদ্রলজ্জিত মাস এবং ক্ষয়মাস এই তিনই বিবাহাদি কার্যে অল্পপূজ্য। তবে মলমাসে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, তিথিবিশেষবিহিত দেবপূজা এ সব কার্যও নাই, ভাদ্রলজ্জিত এবং ক্ষয়মাসে তাহা আছে।

সুখাকালানুষ্ঠেয় প্রেতশ্রাদ্ধ, গর্ভাধান, পুংসবনাদি অন্ন-প্রাশনান্ত-সংস্কার, এবং সকল সংস্কারান্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, মধা-জরোদশীশ্রাদ্ধ, শাস্তিশস্ত্যয়ন, মলমাস-মৃতব্যক্তির বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, এই কতিপয় কার্য মলমাসে করা যাইতে পারে। এতদ্বিত্ত নৈমিত্তিক ও কাব্যকর্মমাত্রই মলমাসে নিষিদ্ধ।

“প্রারম্ভো ন শুভঃ সৌম্যো দ্ব্যষ্টশ্চাষাঢ়কস্তথা।

মধ্যমো চৈত্রবৈশাখাবধিকোহস্তঃ স্তুতিকৃৎ” (মলমাসতত্ত্ব) বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মলমাস হইলে প্রারম্ভ শুভ হইয়া থাকে, চৈত্র ও বৈশাখ মধ্যম, ইহা তিন অন্ত মাস মলমাস হইলে স্তুতিক হয়।

মলম্ (আরবী) প্রলেপ ঔষধবিশেষ। (ointment)

মলম্বা (আরবী) তাম্রপত্রকে স্বর্ণপত্র দ্বারা আবৃতকরণ, গিল্টি কার্য।

মলয় (পুং) মলতে ধরতি চন্দনাদিকমিতি মল (বলি-মলি-তনিভ্যঃ কয়ন্। উণ্ ৪।১৯) ইতি কয়ন্। শব্দার্থাৎ পর্যন্ত। পৃথ্যায়—আবার, দক্ষিণাচল, চন্দনাজি, মলয়াচল। এই পর্যন্ত সপ্ত কুলপর্যন্তের অন্তর্গত এবং মলবারে প্রসারিত।

“মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুক্তিমানুরুপর্যন্তঃ।

বিদ্যাস্ত পারিপাত্রস্তু সপ্তৈবাত্র কুলাচলাঃ ॥”

(মার্কণ্ডেয় পুঃ ৫৭।১০)

২ শৈলাঙ্গ। ৩ দেশবিশেষ।

“অঙ্গা বঙ্গা মণ্ডুরকা অন্তর্গরিবহিগিরী।

ততঃ প্রবঙ্গমাতঙ্গ-মলয়ামলবন্তিকাঃ ॥” (মৎস্যপুঃ ১১৩।৪৪)

৪ আরাম। ৫ নন্দনবন। ৬ অষ্টাদশ উপদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ। (শব্দমালা) [উপনিবেশ শব্দ দেখ।]

৭ ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র। (ভাগ০ ৫।৪।১০)

৮ গরুড়বংশীয়দিগের অজ্ঞাতম। (ভারত ১।১০।১।১৪)

মলয়, ১ মলয়-উপদ্বীপবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা মলয়ভাষায় কথা কয়। মাদাগাস্কারবাসী “হোবা” জাতির সহিত ইহাদের আকৃতিতে অনেকটা সৌগাৎ আছে। পেন্সল সাহেব লিখিয়াছেন যে, মরিলম্ ও বোর্বোঁ আবিষ্কার-কালে মাদাগাস্কারে মলয়জাতির বাস দেখা গিয়াছিল। শব্দতত্ত্ববিদ ক্রফোর্ড উক্ত দ্বীপের প্রচলিত ভাষার মধ্যে মলয়ভাষাগত শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইয়াছেন। এতদ্বিত্তি অপর্যাপ্ত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের বিবরণ-পাঠে জানা যায় যে, মলয়জাতি এক সময়ে সুদূর মাদাগাস্কার দ্বীপেও বাস করিত।

মলয় উপদ্বীপ এবং তাহার পশ্চিমস্থ দ্বীপপুঞ্জে মলয়-জাতির বাস আছে। ইহারা বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত; সুতরাং ইহাদের কথিত মলয় ভাষাতেও নানাপ্রকার পার্থক্য দেখা যায়। প্রোফেসর এ, এইচ, কৌন্ মলয়জাতি ও মলয়-ভাষার বিস্তৃত তালিকা দিয়া গিয়াছেন।

জাতিতত্ত্ববিদগণ গাত্রবর্ণ লক্ষ্য করিয়া এই বিস্তীর্ণ মলয়-জাতিতে দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর বর্ণ তাম্রের তায় উজ্জল ও মস্তকের চুল পাতলা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মলয়দিগের আকৃতি অবিকল নিগ্রিটো-জাতির অধরূপ।

এই তুল্যতা-দর্শনে অনেকে ইহাদিগকেও নিগ্রো বলিয়া অভিহিত করেন। আন্দামন দ্বীপ হইতে প্রাপ্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপবাসিগণ নিগ্রো বা নিগ্রিটো নামে অভিহিত হইলেও

তাহাদের মধ্যে অন্যান্য দ্বাদশ প্রকার বিভিন্ন থাক দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীর কলেবর অতিশয় ধর্ম্ম অর্থাৎ ৫ ফিটেরও কম, আবার কোন কোন জাতির শরীর প্রায় ৬ ফিট লম্বা।

মিং পেন্সল মলয়দিগকে মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মরিজ ওয়াগনর পেন্সলের মতানুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, মলয় ও মোঙ্গলীয় জাতির মস্তকের খুলির আকৃতি, শরীরের গঠন ও গাত্রের রং এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক একরূপ। এমন কি, ইহারা যদি উভয়েই এক প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করে, তবে কে মলয় ও কে মোঙ্গলীয় তাহা চিনিয়া লওয়া কঠিন।

নিউগিনিবাসী মলয়জাতির একটা শাখা ‘পাপুয়ান’ নামে প্রসিদ্ধ। ওয়ালেস সাহেবের বিশ্বাস, পাপুয়ান ও মলয়জাতির মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠতা বা নিকট সম্বন্ধ নাই।

সুমাত্রাদ্বীপের মধ্যবর্তী মেনাঙ্কাবুর সমতলক্ষেত্রেই মলয়-জাতির আদি বাসস্থান। তথা হইতে ইহারা ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

পূর্বে মলয়-উপদ্বীপ এবং বর্ণিয়া দ্বীপে আদিম অসভ্য-জাতির বাস ছিল; মলয়গণ এখানে আসিয়া নির্ঝিন্দা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তদ্দেশবাসিগণ কোনরূপে মলয়-গণকে বিভাড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্মায়সলক স্থান-দ্বয়ে ক্রমশঃই মলয়জাতির আধিপত্য বিস্তৃত হইল। এখান হইতে দূরবর্তী স্থানসমূহে বাসার্থ তাহারা সেই সেই দেশ অধিকারে কৃতনিশ্চয় হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু তথায় অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী সুসভ্য জাতির বাস থাকায় মলয়গণ কৃতকার্য হয় নাই। তাহারা সেই সেই দূরবর্তী স্থানসমূহে উপনিবেশ মাত্র স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়াছিল। মলয়-উপদ্বীপের অধিবাসিগণ সমস্তই মলয়জাতি। এতদ্বিত্তি অতি অল্পসংখ্যক পার্শ্ববর্তী নিগ্রো এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। অসংখ্য মলয়জাতির বাসনিবন্ধন এই স্থান মলয়-উপদ্বীপ নামে খ্যাত হইয়াছে।

প্রাচীনতম মলয়-রাজ্যগুলির রাজ্যোপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, পালেমবঙ্গ নামক স্থানে মলয়জাতির আদি বাস-স্থান ছিল। জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে বাইরা এক একটা ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে এবং ঐ সকল সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ রাজা বলিয়া খ্যাত হইতেন। এইরূপে স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিলেও তাহাদের পরম্পরের রাজবংশকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক আখ্যান পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থসমূহ যবদ্বীপের

সহিত পালেমবঙ্গের বহু পূর্বকাল হইতে যে সংশ্রব ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মলয়সহিত কর্তৃক পালেমবঙ্গ-বিজয়ের বহুপূর্বে, যবদ্বীপবাসী কর্তৃক পালেমবঙ্গ জয় ও তথায় উপনিবেশ স্থাপনের উল্লেখ আছে। মেনাক্-কাবু, মলকা প্রভৃতি মলয়রাজ্যের রাজবংশধরগণ আপনাদিগকে পালেমবঙ্গ-রাজবংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। আদিবাসভূমি পালেমবঙ্গে থাকিয়াই প্রাচীন মলয়জাতি ভারতীয় হিন্দুর ও যবদ্বীপবাসীর আচারাদির অনেক বিষয় অমুকরণ করিয়াছিল। এমন কি, সেই প্রাচীন যুগে মলয়গণ আপনাদিগের কথিত ভাষা মধ্যেও সংস্কৃত ও কবি-ভাষার অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। সেই সময় হইতেই তাহারা ভারতীয় রাজতন্ত্রের অমুকরণে রাজ্যশাসন-প্রণালী সংগঠিত করিয়া স্মারাজ্যদ্বীপে একটা ধর্ম ও কর্ম-রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল।

মলয়জাতির মধ্যে ৪টা প্রধান ও কয়েকটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র থাক দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন অপরপর শ্রেণীগুলি “অসভ্য” নামে পরিচিত। প্রধান ৪টির নাম বিশুদ্ধ “মলয়” “যব” বাসী, “বুগি” এবং “তগল”। ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ মলয়গণ মলয়-উপদ্বীপ, স্মারাজ্য ও বর্ণিও দ্বীপে বাস করে। ইহাদের ভাষা মলয়। আরবী বর্ণমালা ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। ইহারা সকলেই মুসলমান-ধর্মাবলম্বী। যববাসী মলয়জাতির বাসস্থান যবদ্বীপ, স্মারাজ্যের কিয়দংশ, মদুরা, বালি এবং লঙ্কাকের কিয়দংশ। যববাসিগণ মুসলমান-ধর্মাবলম্বী, কিন্তু বালি ও লঙ্কাবাসী মলয়গণ হিন্দু-ধর্মাবলম্বী। কবি ও যবনভাষা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু সকলেই দেশীয় বর্ণমালায় লেখাপড়া শিক্ষা করে। বুগি-জাতির বাসস্থান সেলিবিস্ দ্বীপ। ইহারা বুগি এবং মাক্‌সরের ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা মুসলমান-ধর্মাবলম্বী। তগলজাতির বাসস্থান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী। ইহাদের মাতৃভাষা তগল, কিন্তু স্পেনীয় ভাষায় ইহারাও কথোপকথন করিয়া থাকে।

বটুকবাসী অসভ্য মলয়জাতি, স্মারাজ্যবাসী বিভিন্ন মলয়-জাতি, বর্ণিও-দ্বীপের যক (যক্ষ), মলয়-উপদ্বীপের জকুল এবং উত্তরসেলিবিসের স্থলু, বৌক প্রভৃতি দ্বীপবাসী অনার্য মলয়জাতি মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আকৃতিতে মোঙ্গলীয় জাতির সহিত মলয়জাতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। শুদ্ধ আকৃতিতে নহে, প্রকৃতিতেও তাহার বথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই উভয় জাতির রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার সমস্তই এক

প্রকার। মলয়দিগের রং শালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। বেশ কৃষ্ণবর্ণ ও খোচাখোচা। ইহারা দাড়ি কামাইয়া কেবলমাত্র গোঁপ রাখে। ইহাদের শরীর যুরোপবাসী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ধর্ম। দেহ জটপুষ্ট, কিন্তু গঠন তেমন সুচারু নহে। অস্বাস্থ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত তুলনায় হস্ত ও পদ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, পদ ক্ষুদ্র, মস্তক গোলাকার, লগাট প্রশস্ত, জহর আকৃতি। বদনমণ্ডল বৃহৎ, ওষ্ঠ প্রশস্ত। চক্ষু লম্বা ও সরু। কর্ণ খুব বড় ও কুৎসিত; দন্তগুলি বড় বড় এবং শুভ্র বর্ণ। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত মলয়-বালক-বালিকা দেখিতে মন্দ নহে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক বয়স হইলে অতি কুৎসিত দেখায়। মলয়-যুবতীগণ ২১টা সন্তান-প্রসবের পরই অল্পবয়সে বৃদ্ধার হ্রাস হইয়া পড়ে।

মলয়জাতি স্বভাবতঃ লজ্জাশীল, কিন্তু ততদূর ধৈর্যশীল নহে। অনেক সময়ই ইহারা পরস্পরে দাঙ্গা হান্ধামা করিয়া থাকে। ইহাদের মনোগত ভাব বাহ্য চোঁহারা বা হাবভাবে বুঝিবার উপায় নাই। ইহারা ধীরভাবে অস্ত্রের সহিত আলাপ ও আহার ব্যবহার করে। বালকেরা প্রবীণের সম্মুখে কখনও চাকল্য প্রকাশ করে না। উচ্চশ্রেণীর মলয়জাতি অতিশয় ভদ্র। গর্কিত ও অসদ্ব্যবহারীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসা লইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে ইহারা উদারতা ও দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা বৃদ্ধ পিতা, মাতা ও আত্মীয়গণের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে।

মলয়জাতির অধিকাংশই মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে দ্বীপপুঞ্জের একিনিস্ জাতি ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে। পরে মলকার মলয়জাতি ১২৭৬ খৃঃ অব্দে, মলক্যাবাসিগণ ১৪৭৮ খৃঃ অব্দে এবং সেলিবিস্-বাসিগণ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হয়। বলপ্রকাশ কিংবা কোনরূপ অত্যাচার করিয়া ইহাদিগকে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত করা হয় নাই। আরবদেশীয় বণিকগণ এবং অতীত মুসলমান-ধর্ম-প্রচারকগণ মলয়জাতির সহিত সূহৃদের হ্রাস মিশিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও সভ্যতা দেখাইয়া তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি হইতে লাগিল। এইরূপ নানাকারণে মলয়েরা নিজ নিজ ইচ্ছায় মহ-ম্মদের উপদেশ অমুকরণ করিতে লাগিল। মলয় উপদ্বীপের অধিবাসিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ এখনও পৌত্তলিক ধর্মে আস্থাবান আছে। যবদ্বীপের পার্বত্যজাতি হিন্দুধর্মাবলম্বী; ইহাদের মধ্যেও নানারূপ কুসংস্কার দেখা যায়। ইহারা বৃক্ষ, নদী, বায়ু প্রভৃতিকেও দেবতা বলিয়া পূজা করে।

মলয়দিগের দেশীয় কোন সাহিত্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পারস্য, আরব, শ্রাম প্রভৃতি দেশীয় গ্রন্থাদি ইহারা পাঠ করিয়া থাকে। ইহাদের কেবলমাত্র “হাংতুয়া” নামক একখানি উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

মলয়দিগের মধ্যে প্রচলিত প্রথা,—যুরোপবাসিগণ সাদর সম্ভাষণ কালে মুখচুশন করিয়া থাকেন, মলয়গণ ইহার পরিবর্তে নাসাগ্রভাগ মর্দন করে। অধিকাংশ লোকই জুয়া খেলা ভাল বাসে। মুরগীর লড়াই ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষ আমোদের জিনিস। মুসলমানবাসীদের মধ্যে ফুটবল খেলা প্রচলিত আছে। মলয়বাসীরা অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। দেশীয় বাস্তবজ্ঞের মধ্যে জয়ঢাক ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যায় না; তবে বেহালা বস্র ও ইহারা বাজাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে “মোদিং” নামীয় নাটক অভিনয় করিতে দেখা যায়।

ইহারা নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিয়া থাকে। তরবারি, বর্ষা, কামান প্রভৃতি বৃদ্ধ ইহাদের ব্যবহার্য।

মলয়বাসীর পরিচ্ছদ।—গ্রীপুরুষ সকলেই সারোং পরিধান করে। ৪ ফিট পরিমিত ও ৬ ফিট লম্বা বস্ত্র দ্বারা কটদেশ হইতে পদ পর্যন্ত বেঁধে পরিয়া রাখে, ইহাই সারোং নামে অভিহিত। যখন বাড়ীতে থাকে, তখন সারোংই তাহাদের একমাত্র পোষাক। কিন্তু যখন বাটী হইতে বাহিরে যায়, তখন মলুয়ার (পায়জায়া) পরিধান করিয়া বহির্গত হয়। শিলাপুত্রী মলুয়া, চীন মলুয়া ইত্যাদি নানারকমের পায়জামা ইহারা পরিধান করে। এতদ্ভিন্ন বাজু অর্থাৎ জ্যাকেট মলয়-পরিচ্ছদের আর একটি প্রধান অঙ্গ। ইহারা বংকং অর্থাৎ কটীবস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহারা মক্কাভ্রমণ করিয়া আইসে, তাহারা সকলেই পাগড়ী পরিধান করে।

মলয় দ্বীপপুঞ্জ, (Malay Archipelago) মলক্যপ্রণালীর পূর্ববর্তী দ্বীপসমূহ। বঙ্গোপসাগর হ তেনসেরিম তীরবর্তী মারগুই দ্বীপপুঞ্জ ও সমর সমর এই নামে অভিহিত হয়।

মলয়, (উপদ্বীপ বা তল-মলয়) তেনসেরিমের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে বিবুরেখা পর্যন্ত অন্যান্য ৫০০ শত মাইল বিস্তৃত একটি দেশভাগ। ইহার পরিমিত ৫০ মাইল হইতে ১৫০ মাইল পর্যন্ত। ভূ-পরিমাণ ৮৩০০০ বর্গ মাইল। জলময় পূর্বভাগ। ইহার মধ্যদেশ দিয়া বহুদূর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

বর্তমান সময় মলয়-উপদ্বীপের অধিকাংশ স্থান শ্রাম ও ইংরাজ-অধিকৃত। ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানি ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে পেনাং, ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ওয়েলিসলি প্রদেশ, ১৮২৩ খৃঃ শিলাপুত্র এবং ১৮২৪ খৃঃ অব্দে মলক্য অধিকার করেন। এই সমস্ত স্থান

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত কোম্পানির হস্তে থাকে। অনন্তর ইংরাজরাজের কর্তৃত্বাধীনে একজন শাসনকর্তার হস্তে ভ্রত হইয়া ‘স্ট্রেট সেটলমেন্ট’ নামে আখ্যাত হয়।

মলয়ের অধিকাংশ স্থানেই মলয় জাতির বাস। এতদ্ভিন্ন সোমাং, বকুন প্রভৃতি জাতিও এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সোমাং মলয়দিগের মত উচ্চ জাতি; কিন্তু সোমাদের বর্ণ অপেক্ষাকৃত কালো বলিলেও দোষ হয় না। নাসিকা খাঁলা, ওষ্ঠ পুরু এবং কেশ ছোট ছোট ও কৌকড়ান। রাইয়ং অথবা ওরাক-লৌং নামে সমুদ্রবাসী এক শ্রেণীর লোক এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় মৎস্ত আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে। ইহারা নিতান্ত দুর্দান্ত, অসহিষ্ণু, সঙ্গীতপ্রিয় ও শিল্পকার্যে নিপুণ।

কেদা, পেরাক, সেলঙ্গোর, নেগ্রী-সেবিলায় এবং শুঙ্গাই-উজাঙ্গ নামক কয়েকটি রাজ্য মলয় উপদ্বীপের মধ্যবর্তী। কেদা রাজ্য (মুয়াক্শাই) ত্রাং নদী হইতে ক্রিয়ান্ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত; অর্থাৎ ৭° ২০' উঃ হইতে ৫° ১০' উঃ পর্যন্ত। কেদার রাজ্য ২০০০০ টাকা বার্ষিক কর নিরূপিত করিয়া পেনাং ইংরাজ-দিগের নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত রাজ্য বর্তমান সময়ে তদীয় উত্তরাধিকারীকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

পেরাক অক্ষা ৪° ও ৬° উঃ মধ্য। এই স্থান স্বর্ণখনির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রায় সমুদ্রনদীতেই স্বর্ণ পাওয়া যায়। উপদ্বীপস্থ সমস্ত রাজ্যের মধ্যে পেরাক সুরক্ষাপেক্ষা বৃহৎ। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এখানে অতি অধিক পরিমাণে টিন পাওয়া যায়।

সেলঙ্গোর রাজ্য—অক্ষা ২° ৩৪' ও ৩° ৪২' উঃ মধ্যবর্তী। সমুদ্রতীর দিয়া এই স্থান প্রায় ১২০ মাইল বিস্তৃত। পূর্বে এখানকার নদীগুলি জলদস্যুদিগের আশ্রয়-স্থান ছিল।

শুঙ্গাই উজাঙ্গ ক্ষেত্রফল ৭০০০ বর্গ মাইল; মলয়জাতি এখানকার আদিম অসভ্য জাতিদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের স্থানাধিকার করিয়াছে। টিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ, নীলকান্ত মণি ও চুনি প্রভৃতিও স্থানে স্থানে উৎপন্ন হয়।

মলয়কেতু (পুং) মুদ্রারাক্ষস-বণিত জনৈক নায়ক। পুরুতকের পুত্র।

মলয়গন্ধিনী (স্ত্রী) মলয়ত গন্ধ: অন্ত্যস্তা: মলয়গন্ধ-ইনি জিয়াং ভীপ্। উমাসখীবিশেষ। (শব্দমালা)

মলয়গিরি, পাল-লহরী-প্রদেশের অন্তর্গত একটি পর্বত। ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য অতিশয় মনোরম। উচ্চতা প্রায় ৩৮২৫ ফিট। অক্ষা ২১° ২২' ২০" এবং দ্রাঘি ৮৫° ১৮' ৪১"।

মলয়গিরি, জনৈক প্রসিদ্ধ জৈনটীকাকার। উপদেশ-পদ-  
রচয়িতা হরিভদ্রের শিষ্য। শকাব্দাশাসন ও তাহার বৃত্তি,  
নন্দাধ্বনসৌকা, কর্ণ প্রভৃতিবৃত্তি, রাজপ্রতীকোপাঙ্গবৃত্তি  
প্রভৃতি ইহার কৃত কএকখানি টীকা পাওয়া যায়।

মলয়গিরি, পুরাণপ্রসিদ্ধ সপ্তকুলাচলের মধ্যে একটী। এই  
পর্বত মলয়াচল নামেও প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের মলবার-  
উপকূলস্থ মলয়ালম্ প্রদেশের পশ্চিমঘাট-পর্বতমাংশ ‘মলয়’  
নামে কথিত। আবার কেহ কেহ নীলগিরি পর্বতকেও  
মলয়াচল বলিয়া থাকেন। স্বর্ষ্যদেব উত্তরায়ণে পদার্পণ  
করিলে, যখন উত্তর-ভারত মলয়-মরুত-সঞ্চালনে স্নানসিক্ত  
হইতে থাকে; তখন আমরা বলিয়া থাকি দক্ষিণ বায়ু  
মলয়গিরি দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এদেশে এক্রপ  
কিংবদন্তী আছে যে, নিম্ন অথবা পিররা বৃক্ষে মলয়বাসিন  
লাগিলে উক্ত বৃক্ষ চন্দনবৃক্ষে পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিক মতে  
উহা দক্ষিণপূর্ব মন্থম বায়ু মাত্র। [ বায়ু দেখ ]

মলয়জ ( পুং ক্রী ) মলয়াং জায়তে জন-ড। চন্দন।

“হৃদি বিবলতাহারো নায়ে ভূজঙ্গমনায়কঃ

কুবলয়দলশ্রেণী কঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।

মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়রহিতে ময়ি

প্রহর ন হরজ্ঞাত্যানঙ্গ ! জুধা কিমুধাবসি ॥”

( গীতগোবিন্দ ৩১১ )

( ক্রি ) ২ মলয়জাত মাত্র। ৩ মলয়-দেশজাত বায়ু। ৪ রাহ।

“রাহঃ মলয়জং শূদ্রং পৈশীনঃ বাদশাজুলম্।

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাধরঃ সিংহাসনং ধ্যান্য তথাহ্বয়েৎ ॥” (গ্রহযজ্ঞতত্ত্ব)

মলয়জ, জনৈক প্রাচীন কবি।

মলয়জরজস্ ( ক্রী ) মলয়জন্ত রজঃ। চন্দনের শুভা।

মলয়দেশ ( পুং ) দেশভেদ।

মলয়ভ্রম ( পুং ) ১ মদন বৃক্ষ। চলিত ময়না গাছ। (দ্বিক্রপকোং)

২ চন্দনবৃক্ষ।

মলয়ধ্বজ ( পুং ) রাজভেদ।

“উপধেমে বীৰ্যপাণঃ বৈদর্ভীঃ মলয়ধ্বজঃ।”

( ভাগবত ৪।২৮।২২ )

মলয়পবন ( পুং ) মলয়োদ্ভব বায়ু, দক্ষিণদিকের বায়ু। বস-  
ন্তের প্রারম্ভেই এই বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। দক্ষিণে  
নীলগিরির উপর দিয়া চন্দনাদি বৃক্ষের স্নগন্ধ লইয়া আইসে  
বলিয়া ইহাকে মলয়পবন কহে। নীলগিরির অন্ততর নাম মলয়-  
পর্বত। কেহ কেহ পশ্চিম ঘাটপর্বতকেও মলয়াচল কহে।

মলয়পর্বত ( পুং ) মলয়াচল, কূলপর্বতভেদ।

মলয়প্রভ ( পুং ) রাজভেদ। ( কথাসরিংগাং ৭২।২১৮ )

মলয়প্রভসূরি, জনৈক জৈন সুরি। ইনি মানভূক্তস্বরিক্ত  
সিদ্ধজয়ন্তচরিত্রের টীকা প্রণয়ন করেন। উক্ত টীকাখানি  
১২৬০ বিক্রমাব্দে রচিত হয়।

মলয়ভূভূৎ ( পুং ) মলয়পর্বত।

মলয়ভূমি ( ক্রী ) হিমালয়-পর্বতস্থ স্থানভেদ।

মলয়রাজ, জনৈক প্রাচীন কবি।

মলয়বাট ( পুং ) ময়লানিল।

মলয়বাসিনী ( ক্রী ) দুর্গা। ( হরিবংশ ১০।২৪৫ )

মলয়া ( ক্রী ) মল-কয়ল-টাপু। ১ জিবুতা। ২ সোমরাজী।

মলয়াচল, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর মহাদ্রি-পর্বতের একটি  
অংশমাত্র। স্বল্পপুরাণের মলয়াচলখণ্ডে এখানকার দেবতীর্থা-  
দির বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

মলয়াচল ( পুং ) মলয়চ্চাসাবলশ্চেতি। মলয়পর্বত।

“পুরাগনাগকরবীরকৃতোপকারে

তস্মিন্ গৃহে কমলয়ধ্বজে শরীত।

ষত্রাহতানিলবিকম্পিতপুষ্পদাম্রি

হেমস্তবিক্যাহিমবয়লয়াচলানাম ॥” (স্মৃতি উত্তরতঃ ৪৭অঃ)

মলয়াদ্রি ( পুং ) মলয়পর্বত।

মলয়ানন্দসরস্বতী, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি শঙ্করা-  
চার্যের মতপোষক ছিলেন এবং আচার্য্যরূপে উক্ত মত  
প্রচার করিয়া যান।

মলয়ানিল ( পুং ) মলয়স্থ অনিলঃ। বসন্তকালীন বায়ু,  
পর্যায়—বাসন্ত। ( ক্রিকাঃ )

“স এব সুরভিঃ কালঃ স এব মলয়ানিলঃ।

সৈবেরমবলা কিত্ত মনোহর্যদিব দৃশ্যতে ॥”

( সাহিত্যদর্পণ ৩২২৬ )

মলয়ালম্, ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রদেশ।

মলয়ালম চক্রগিরি ( অক্ষা° ১২° ২২' উঃ ) হইতে কুমারিকা  
অন্তরীপ পর্য্যন্ত ( অক্ষা° ৮° ৪' ২০' উঃ ) বিস্তৃত। ইহার  
প্রাচীন নাম কেরল। [ কেরল দেখ। ]

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে, পরশুরাম সমুদ্র হইতে এইস্থান  
প্রথম উদ্ধার করেন; তদনন্তর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন  
নরপতি কর্তৃক উক্ত প্রদেশ শাসিত ও উত্তরভারতবাসী  
ব্রাহ্মণ-সমাগমে পবিত্র হইয়া আসিতেছে। কালিকটের  
অধিপতি, কনানুরের বেগম, ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজা, পত্তুগীজ,  
ওলন্দাজ, ফরাসী এবং টিপু সুলতান প্রভৃতি, যথাক্রমে  
কেরলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে ইংরাজরাজাই  
ইহার একমাত্র অধিপতি। মলয়ালমের সকল স্থানই শৈল-  
মালায় পরিপূর্ণ; কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে উপত্যকা দেখিতে

পাওয়া যায়। তামিল ভাষায় মলয় শব্দের অর্থ পূর্বত এবং আলম্ শব্দের অর্থ উপত্যকা। এই নিমিত্তই ইহার তামিল-নাম ‘মলয়ালম্’ হইয়াছে। ইহার অল্প নাম কেরল। কেরল নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে কোন কোন মতে “কেরম্” অর্থাৎ নারিকেল শব্দ হইতে কেরল নামের উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলেন, কেরল নামে জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নামানুসারেই এই প্রদেশের নামকরণ হইয়া থাকিবেক।

এখানকার প্রধান অধিবাসী নায়র জাতি। ইহার মলয়াল-শব্দ নামেও পরিচিত। এই স্থানের দেশজ ভাষা মলয়ালম্ অথবা মলয়ালম্। কিন্তু তামিল ভাষাও মধ্যে মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও আৰ্য্য ও অনার্য্য জাতির নানা সম্প্রদায় এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহার সাধারণতঃ কণাড়ী, শুজরাতী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষায় কথা কয়। এতদ্ভিন্ন এখানে মাপিলা নামে একশ্রেণীর মুসলমান বাস করে। আরব দেশ হইতে যে সকল মুসলমান পূর্বকালে মলবারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদেরই ঔরসে মলবারী রমণীর গর্ভজাত সন্তানগণ “মাপিলা” নামে অভিহিত। যেহেতু মা অর্থ মাতা আর “পিলা” অর্থ পুত্র; “মাপিলা” অর্থাৎ মার পুত্র।

মাপিলা জাতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অসংসাহসিক। নায়র জাতির মত ইহার অনেকই ভূসম্পত্তিশালী। মলয়ালি, দাক্ষিণাত্যবাসী পার্শ্বতীয় জাতিবিশেষ। কৃষিকার্য্য ও গো-মহিষাদি পালন ইহাদের জীবিকা অৰ্জ্জনের প্রধান উপায়। শেবারয় পাহাড়ের উপত্যকাস্থিত গ্রামসমূহে এই জাতির অধিকাংশের বাস। শুনা যায়, খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে ইহার কাকীপুর হইতে এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহাদের গৃহ মৃত্তিকা নিৰ্ম্মিত গোলাকার। সকলেই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী। ইহার তামিল ভাষায় কথা কয়।

মলয়ু (জী) মলপু-প্ৰবোধদিহাং পশু যন্তঃ। মলপু, কাকো-ডুবারক। (শব্দরত্নাং)

মলয়েন্দুসূরি, জনৈক জৈন হরি। ইনি মহেন্দ্রহরি-বিরচিত যন্ত্ররাজ নামক গ্রন্থের টীকা ও যন্ত্ররাজরচনা নামে অপর এক-খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মলয়োস্তুব (জী) মলয়ঃ উদ্ভব উৎপত্তিকারণঃ যন্ত। চন্দন।

মলয় (পুং) বৌদ্ধ মতে অত্যাচ্ছ সংখ্যা।

মলরোধন (জী) বিষ্টভ, আনাহরোগ।

মলবদেশ (পুং) মালবদেশ। [মালব দেখ।]

মলবৎ (ত্রি) মল অন্ত্যার্থে মতুপ্, মন্ত ব। মলযুক্ত।

মলবদ্বাসস্ (ত্রি) মলবদ্বাসো যন্ত। মলিনবস্ত্রবিশিষ্ট। (জী) ২ ঋতুমতী জী।

মলবল্লী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটা গ্রাম। এই স্থানে প্রাচীর-বেষ্টিত একটা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ ছিল। ইংরাজদিগের সহিত টিপু সুলতানের যুদ্ধকালে এই স্থানে টিপু সেনাদল রক্ষিত হইয়াছিল।

মলবর্ত্তিকা, প্রাচ্য জনপদভেদ। বিভিন্ন পুরাণে ইহার বল-বর্ত্তিকা, মানবর্ত্তিকা, নবদত্তিকা প্রভৃতি পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

মলবাসিক, দক্ষিণ-ভারতের অন্তর্গত একটা প্রাচীন জনপদ। বর্ত্তমান কাটলাই নামক স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত।

মলবাহিন্ (ত্রি) মল-বহ-গিনি। বলবহনকারী।

মলবিনাশিনী (জী) মলং বিনাশয়তীতি বিন-শ-গিচ্-গিনি দ্বিগাং ভীপ্। ১ শব্দপুণী। (রাজনিং) ২ খার দ্রব্যমাত্র।

মলবিশোধন (ত্রি) ১ মল-পরিষ্কারকরণ। ২ স্বর্ণাদির বাস-বাদ দেওন।

মলবিসর্জ্জন (জী) মলস্ত বিসর্জ্জনং। মলতাগ।

মলবেগ (পুং) অতীসার রোগ। (রাজনিং)

মলহস্ত (পুং) মলং হস্তীতি হন-তৃচ্। শাল্মলীকন্। (রাজনিং) (Salmalica malabarica)

মলশৈত্য (জী) তন্মামক শ্লেষ্মজ রোগ। (ভাবপ্রং)

মলশুদ্ধি (জী) মলশোধন, পেট পরিষ্কার করা।

মলহন্ (পুং) রুদ্রাশ্বের কত্ম। (হরিবং ১৬৬১ শ্লোং)

মলহর (পুং) জৈপাল বৃক্ষ। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

মলহারক (ত্রি) পাপহারক, পাপহরণকারী।

“অরক্ষিতায় রাজানং বলিষড়্ভাগহারিণম্।

তমাহঃ সর্লোকস্ত সমগ্রমলহারকম্ ॥” (মহু ৮৩০৮)

‘মলাপহারকং মলং পাপং তস্ত হারকং’ (মেধাতিথি)

২ মেথর, হাড়ি।

মলা (জী) মল-অচ্ টাপ্। ১ ভূম্যামলকী। ২ আত্মহরিদ্রা, চলিত আঁবাদ। (বৈত্তকনিং) ৩ নাভিনালা। (ত্রিকাং) (দেশজ) ৪ মরলা।

মলাকর্মিন্ (পুং) মলং বিষ্টাং আকর্ষতি স্থানাং স্থানান্তরং নয়তি আ-কৃষ-গিনি। হাড়িক, চলিত হাড়ি, মেথর। (শব্দমালা)

মলাকা (জী) মলেন মনোমালিন্তেন অকতি কুটিলং গচ্ছ-তীতি অক-অচ্, দ্বিগাং টাপ্। ১ কামিনী। ২ বেণ্ডা, অথবা জী। ৩ হস্তিনী। ৪ দূতী। (উজ্জল)

মলাকাজামরুল (দেশজ) মলাকা দেশজাত জামরুল বৃক্ষভেদ।

মলাকাঝাঁজি (দেশজ) শুষ্কভেদ। (Aldovrauda verticillata)

মলাকাটা (দেশজ) ময়লা পরিকৃত করণ।

মলাখা (পারস্য) মলক। নামক বাগিচা-বন্দর।

মলাটি (দেশজ) পুষ্টকাচ্ছাদন, পুথির পাটা।

মলাধরা (দেশজ) ময়লা ধরা। ময়লাসংযুক্ত (দ্রব্যাদি)।

মলাপকলণ (ক্ৰী) অপ-কৃষ ভাবে লাট, মলস্ত অপকর্ষণঃ।

১ পাপমোচন। ২ মলদূরীকরণ, ময়লা পরিকার করা।

মলাপহা (ক্ৰী) মলং অপহন্তীতি অপ-হন-ড, দ্বিগাং টাপ্।  
নদীবিশেষ।

“মলাপহা ভীমরথী চ বটুগা যথা চ কৃষ্ণা জলসামাগা শুভৈঃ”

(রাজনিঃ)

মলাম্ (আরবী) কোমল, নরম। মোলাএম্।

মলাভ (ত্রি) কুংসিত, কদর্য।

মলাবহ (ক্ৰী) মলং আবহতীতি আ-বহ-অচ্। নববিধ  
পাপের অন্তর্গত পাপবিশেষ।

“কুমিকোটবরো হত্যা মস্তাহুগতভোজনম্।

ফলৈধঃকুম্বস্তেরমধৈধ্যক মলাবহম্॥” (মহু ১১।১১১)

মলারি (পুং) মলস্ত অরিনাশকো রেচকত্বাৎ। সর্গকারণ।

মলাশয় (পুং) উপর, মলস্থান।

মলি (ক্ৰী) ১ অধিকার। ২ অধীনতা।

মলিক (আরবী) ১ রাজা। ২ স্ববাধিকারিণঃ।

মলিন (ক্ৰী) মলতে ধারয়তীতি মল (বহুলমস্ত্রাপি। উণ্।  
২।৪২) ইতি ইনচ্, যবা (জ্যোৎস্না ভবিষ্যতি। পা ৫।২।১১৪)  
ইত্যত্র মলশব্দাদিনক্রীমসচৌ প্রত্যয়ৌ নিপাত্যেতে ইতি  
কাশিকোক্ত্য। ইনচ্। ১ মলযুক্ত বস্ত্র। পর্যায়—মলীমস,  
কচ্চর, মলদূষিত।

“পরস্ত্রীহরণে পাপ-শব্দভয়বিবজ্জিতাঃ।

নির্ধনা মলিনা দানাদরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ।” (মহানির্ধারণ ১।৪৩)

২ দূষিত। ৩ কৃষ্ণবর্ণ। ৪ ময়লা। ৫ পাপযুক্ত, পাপিষ্ঠ।

৬ স্নান, বিষয়। ৭ নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়াত্যাগী নিকৃষ্ট।

“হ্যতিমগ্রহীং গ্রহগণো লঘবঃ।

প্রকটীভবন্তি মলিনাশ্রয়তঃ॥” (মাঘ ৯।২৩)

‘মলিনাশ্রয়তঃ নিকৃষ্টাশ্রয়গাং’ (মলিনাথ)

(ক্ৰী) ৭ ঘোল। (শব্দচ-) ৮ দোষ। (হেম) ৯ টকণ।

(রাজনিঃ) ১০ কৃষ্ণাঙ্ককণ্ঠ। ১১ সত্ত্বঃপ্রসূত-গোহৃদ্য।

১২ দস্তা। ১৩ হংস। (বৈজ্ঞকনিঃ)

মলিনত্ব (ক্ৰী) মলিনস্ত ভাবঃ স্ব। মলিনতা, মালিন্ত।

“অজারঃ শতদোতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।” (চাণক্যশতক)

মলিনমুখ (পুং) মলিনং মুখং অগ্রভাগো যন্ত। ১ অগ্নি।

২ গোলাবুল। ৩ প্রোক্ত। (ত্রি) মলিনং দূষিতং মুখং যন্ত।

৪ কুর। ৫ খল। ৬ স্নানবদন।

মলিনা (ক্ৰী) মলিন-টাপ্। ১ রজশ্বলা ক্ৰী। ২ শর্করা।

৩ বৃহতী। (বৈজ্ঞকনিঃ)

মলিনাম্বু (ক্ৰী) মলিনং কৃষ্ণবর্ণং অম্বু। ১ মদী। (হেম)

২ ময়লাজল।

মলিনাস্ত্র (ত্রি) মলিনং দূষিতং আস্ত্রং যন্ত। ১ খল।

২ স্নানবদন।

মলিনিমন্ (ত্রি) মলিন-ইমনিচ্। ১ অতিশয় মলিন।

২ মলিনতা।

মলিনী (ক্ৰী) মলমস্ত্রা অস্ত্রীতি মল-ইনি দ্বিগাং ভীপ্। রজ-  
শ্বলা নারী। (অমর) ২ স্নান, সঙ্কুচিতা।

“মলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে শশিকলা বিকলা কণদাক্ষরে।

ইতিবিধিবিদধে বনিতামুখং ভবতিবি স্তমঃ ক্রমশো জনঃ॥”

(উক্টে)

মলিনীকরণ (ক্ৰী) অমলিনং মলিনং করণং অতুততদ্ব্যুৎপে  
ড়িঃ ততো দীর্ঘঃ। নির্মল বস্ত্রম মলিন-করণ, পূর্বে বাহ্য মলিন  
ছিল না, তাহার মলিনতা সম্পাদন।

মলিন্মুচ (পুং) মলী সন্ মোচতীতি মুচ্-গত্যাং ক। মলমাস।

“তমতিক্রম্য তু রবির্ঘণা গচ্ছেৎ কথঞ্চন।

আত্মো মলিন্মুচো জ্যেয়ো দ্বিতীয়ঃ প্রকৃতঃ স্তুতঃ॥

যদা তং দর্শাস্তমাসং অতিক্রম্য তৎপূর্বমাসস্যাক্ষণ ইতি-  
রাশিঃ সন্ সূর্যোহতিবাহু গচ্ছেৎ মাসান্তরে রাশিস্তরসংযোগং  
গচ্ছেৎ তদা আত্মো অতিক্রান্তমাসো মলিন্মুচো জ্যেয়ঃ। মলী সন্  
মোচতি গচ্ছেততীতি মলিন্মুচঃ, দ্বিতীয়স্ত প্রকৃতঃ শুদ্ধ  
কর্ম্মাহত্বাৎ।” (মলমাসতত্ত্ব)

যে সময় রবি দর্শাস্তমাস অতিক্রম করিয়া (অমাবস্তা-  
দ্বয় যে মাসে গিয়াছে) মাসান্তরে রাশিস্তরসংযোগ প্রাপ্ত  
হন, তাহাকে মলিন্মুচ বা মলমাস কহে। এই দুই মাসেব  
মধ্যে পূর্ব মাস অশুদ্ধ এবং পরমাস শুদ্ধ। [মলমাস দেখ]

২ অগ্নি। ৩ চৌর।

“দংষ্ট্রাভ্যাং মলিন্মুচংজষ্টৈস্তদ্বরা উত” (শুক্লযজুঃ ১।১৭৮)

‘শুভ্রাঃ প্রকট্যাশ্চেতি দ্বিবিধাশ্চেতরাঃ প্রকটা অপি

পুনর্দ্বিবিধাঃ অরণ্যে মার্গে চ প্রকৃত্য প্রত্যহমেব পলায়মানাঃ  
প্রকটাঃ ততোহপি অতিপ্রকটা নির্ভয়া গ্রামেষেবাগত্য বন্দী-  
কারাঃ তে অত্র মলিন্মুচ উচ্যন্তে, মলং পাপাধিকামেবামন্তীতি  
মলিনঃ তথাবিধা ভূত্যা মোচতি জনে বনে বা অদৃশ্য ভব-  
ন্তীতি মলিন্মুচঃ’ (বেদদীপঃ)



পাপের অতিশয় আধিক্যবশতঃ ইহাদিগের মলিন হুঁকহে।  
ইহারা অতি ভয়ানক প্রকৃতি, গ্রাম বা অরণ্য হইতে আসিয়া  
প্রহার করিয়া পলায়ন করে।

৪ বায়ু। ( শব্দমালা ) ৫ পঞ্চযজ্ঞপরিভ্রষ্ট। ( হেম )

মলিন ( ত্রি ) অতিশয়েন মলিনঃ মল-ইষ্টন। ১ অতিশয়  
মলিন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ সরজ্ঞা নারী।

মলীয়স ( ক্রী ) মলমতান্ত্রীতি মল ( জ্যোৎস্নাতমিস্রেতি।  
পা. ৫।২।১৪৪ ) ইতি দ্বেমসচ্ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ।

১ লোহ। ২ পুষ্পকাসীস। ( ত্রি ) ৩ মলিন। ৪ পাপ।

“উপপ্লুতং পাতুমদো মদোদ্ধতৈবমেব বিশ্বস্তর বিশ্বমীশিবে।

অতে রবেঃ কালয়িতুং ক্ষমত কঃ ক্ষপাতমহাওসলীমসনভঃ।

( মাঘ ১।৩৮ )

৫ কৃষ্ণবর্ণ। ৬ মলযুক্ত।

মলীয়স্ ( ক্রী ) অতিশয়েন মলিনঃ মল-ঈয়স্। অত্যন্ত  
মলিন।

মল্লুক ( পুং ) বৌদ্ধমতে অত্যাধিক সংখ্যা।

মলুক ( পুং ) মল বাহুল্যক্য উক। কুমিবিশেষ, চলিত উকুন।

মল্লকুসেন ( মল্লনারায়ণ ), কোচবিহারের জনৈক রাজা।

মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের সমসাময়িক। ইনি মোগল-  
সেনাপতি খানজাহান হোলেন কুলি কর্তৃক পরাজিত হইয়া  
দিল্লীশ্বরকে ৫৪টা হস্তী ও রাজকর প্রদান করিয়াছিলেন।

মল্ল, ধৃতি। ভাদি- আশ্বিনে- সৰ্ব- সেট্। লট্- মল্লতে।

লোট্- মল্লতাং। লিট্- মল্লয়ে। লুঙ্- অমল্লিষ্টে। সন্- মিম-  
ল্লিষতে। গিচ্- মল্লয়তে। লুঙ্- অমল্লয়ং।

মল্ল ( পুং ) মল্লতে ধরতি বলমিতি মল্ল-অচ্। বাহুবোধী,  
চলিত পলোয়ান, মাল।

“মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্রোতা মূর্ত্তিমান্”

( ভাগবত ১০।৪৩।১৭ )

২ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। মল্লর মতে এই জাতি ব্রাত্য  
ক্ষত্রিয় হইতে সর্বগা স্ত্রীতে জাত।

“কল্লো মল্লশ রাজত্যাং ব্রাত্যগ্নিচ্ছিবিরেব চ।

নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥” ( মল্ল ১০।২২ )

‘ক্ষত্রিয়াদ্ভ্রাত্যাং সর্বাণ্যাং ঋল্লমল্ললিচ্ছিবিনটকরণশস-  
দ্রবিড়াত্যা জায়ন্তে’ ( কুল্লুক )

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের মতে লেট হইতে ভীষ্ম-কস্তুরে এই  
জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পরাশর-পদ্ধতির মতে তত্ত্ববারজীর  
গর্ভে এবং কুল্লকায়ের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি।

৩ পাত্র। ৪ কপোল। ৫ মন্ত্রভেদ। ( মেদিনী )

৬ দেশ-বিশেষ। ( ভারত বিরাট প. ১অ. )

মল্ল, দেশভেদ। মল্লজাতির বাসভূমি। মহাভারত ভীষ্ম-  
পর্বে এই প্রাচীন জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।  
এই স্থ প্রাচীন মল্লরাজ্য বর্তমানে মালভূমি নামে প্রসিদ্ধ।  
কেহ কেহ বিরাট্ রাজ্যকে মল্লরাজ্য বলিয়া থাকেন।

মল্ল, জাতিবিশেষ। ইহারা বহু প্রাচীন কাল হইতে আপনাদের  
বলবীৰ্য্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়া মল্ল নামে বিখ্যাত  
হইয়াছে। এখনও কুস্তিগীর পালোয়নগণ অসীম বলশালিত্বহেতু  
মল্ল নামে এবং তাহাদের বল-প্রদর্শনীও মল্ল-ক্রীড়া নামে উক্ত  
হইয়া থাকে। মহাভারতোক্ত প্রাচীন মল্লজাতিরগণ স্থানবিশেষে  
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অথবা কোন কোন উন্নত জাতি  
বলপূর্নক পররাষ্ট্র অধিকার করিয়া আপনাদিগকে গৌরব  
জনক মল্ল উপাধিতে ভূষিত করিতে কুন্তিত হন নাই।  
নেপালে এবং বাকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর রাজ্যে ঐরূপ এক  
সময়ে মহাবীৰ্য্যশালী মল্লরাজগণের প্রাভুতাব হইয়াছিল।  
মথুরাধিপতি কংসের সভায়ও বহুশত মল্ল ছিল। ভগবান্  
শ্রীকৃষ্ণ মথুরার আসিয়া এই দেশবিখ্যাত মল্লগণের বলগর্ব  
খর্ব করিয়াছিলেন। [ নেপাল, বিষ্ণুপুর ও মল্লযুদ্ধ দেখ। ]

মল্লক, জনৈক প্রাচীন কবি।

মল্লক, বিদ্যাপর্ব্বতের সন্নিকটস্থ প্রাচীন জাতিবিশেষ।

( মহাভারত ভীষ্ম ৯।৪৩ )

মল্লক ( পুং ) মল্ল ইব মল্ল-কন্-দৃঢ়ত্বাদন্ত তথাৎ, যদা মল্ল  
ধারণে ধূল্। ১ দন্ত। ( হেম ) ২ ব্রাহ্মণবিশেষ।

“বিলোক্য বৈকল্যহতো বক্কো তো ষ্মিনো তথা।

কুষ্ঠাসি ধেমুহন্তসৌ দ্বিজম্মা মল্লকাবিধঃ ॥”

( রাজতর. ৮।২৩২০ )

( পুং স্ত্রী ) মল্লতে ধারণতি প্রদীপমিতি মল্ল-ধূল্।

৪ নারিকেলফলাবয়বজ পাত্রবিশেষ, চলিত নারিকেলমালা।

স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ দীপাধার। ৪ মল্লিকা ( অমর ) ৫ প্রদীপ। ( মথুরেশ )

মল্লকূট, প্রাচীন গ্রাম। ( শ্রীহর্ষ ৩২ )

মল্লক্রীড়া ( স্ত্রী ) মল্লানাং ক্রীড়া। মল্লদিগের খেলা, মল্লযুদ্ধ।

মল্লখণ্ড ( পুং ) গুড়, শর্করা। ( বৈজ্ঞকনি. )

মল্লঘাটী ( স্ত্রী ) ১ নৃত্যের প্রক্রিয়াভেদ। ২ নাট্যরঙ্গবিশেষ।

মল্লচন্দ্র, জনৈক প্রাচীন রাজা।

মল্লজ ( স্ত্রী ) মল্ল তদাখ্য দেশে জায়তে ইতি জন-ড। ময়িচ।

মল্লজীঘোড়পড়ে, জনৈক মহারাষ্ট্র সদ্ধার।

মল্লজীভৌস্লে, ( মালোজী ) মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর  
পিতামহ। ইহার পিতা বাবাজী ভৌস্লে পাটেলদারী  
কাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন। দৌলতাবাদের নিকটবর্তী বেরুল  
( ইলোরা ) গ্রামে ইহার শৈল্পিক ভাস্কর্য ছিল।

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও বিশেষ পরি-  
মার্জিত হইতে থাকে। পিতাপুত্রের কার্যোপযোগিতা-সন্দর্শনে  
শ্রীত হইয়া ফলতনের দেশযুধ জগপাল রাও নায়ক নিখল-  
করের ভগিনী দীপা বাঈর সহিত তাঁহার বিবাহকাণ্ড সম্পন্ন  
করেন। বিবাহের পর, তাঁহার জীবনে নতুন ভাবের সঞ্চার  
হয়। তদবধি তিনি কার্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকেন। ১৫৭৭  
খৃষ্টাব্দে পঞ্চবিংশ বর্ষে তিনি মূর্তজা নিজাম-শাহের অধীনে  
অখারোহী সেনাদলের অধ্যক্ষ নিয়োজিত হন।

তিনি একজন গোঁড়াহিন্দু ছিলেন। বহুকাল পুত্রসন্তানাদি  
কিছুই হইল না দেখিয়া তিনি মহাদেব ও কুলদেবীর আরা-  
ধনা করিয়া পুত্রার্থী হইলেন। অবশেষে আন্ধ্রদনগরবাসী  
শাহ সরিক্ নামক জনৈক মুসলমান ফকির তাঁহার পুত্রের  
অন্তঃকরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার  
দীপাঙ্গি পুত্রবতী হইলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে পুত্র প্রসূত  
হইলে মল্লজী উক্ত ফকিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ  
ফকিরের নামানুসারে পুত্রের শাহজী নাম রাখিলেন।

এই সময়ে শিলেদার পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি বিশেষ  
উজ্জ্বলের সহিত বিবিধ রাজকাণ্ড সম্পাদন করিতে লাগিলেন।  
ক্রমেই তাঁহার সম্মান, ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে  
লাগিল। তদীয় প্রতিপালক লাধজী যাদব রাও তিন্ন অপর  
কেহই তাঁহার সমুদ্ভিতে ঈর্ষান্বিত হইত না।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্চম বর্ষীয় শাহজীকে লইয়া যাদব  
রাওর আলয়ে হোলি পর্বের নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ গমন করেন।  
যাদবরাও শাহজীর রূপ-লাবণ্য ও স্নেহলব্ধি লক্ষ্য করিয়া-  
ছিলেন এবং দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে স্বীয় কন্যাকে বালক শাহ-  
জীর পার্শ্বে বসাইয়া বলিয়াছিলেন, বালিকা তুমি ইহাকে পতি-  
রূপে পাইতে ইচ্ছা কর কি? তদনুসারে মল্লজী তাঁহার সহিত  
বৈবাহিক সম্বন্ধ আবদ্ধ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু  
যাদব রাও তাঁহার এই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ইহাতেও তিনি নিরুদ্বিগ্ন হন নাই। যাদব  
রাওর কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেওয়া তাঁহার কৃত-  
সঙ্কল্প হইয়াছিল। এই সময়ে নিজামশাহী রাজ্যের শাসন-  
বিশৃঙ্খলতা হেতু তিনি বিপুল অর্থসংগ্রহ করেন। পাছে লোকে  
তাঁহার প্রতি সন্দেহ করে, এই ভয়ে তিনি লক্ষ ধনরত্ন লইয়া  
স্বদেশ গমনপূর্ব্বক ভবানীর কৃপালক্ষ ধন বলিয়া ঘোষণা  
করিলেন।

এইরূপে অর্থবান্ হইয়া তিনি তাহার সন্ধ্যাবহার করিতে  
লাগিলেন। গুরুদ্রিগী, কৃপ প্রভৃতি খনন এবং দেবালয়াদি  
স্থাপন প্রভৃতি অনেকাধিক সংস্কারে তাঁহার বিপুল অর্থ ব্যয়

হইতে লাগিল; কিন্তু একরূপ সদমুঠান করিয়াও তিনি  
আপনার অভীষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। অখারোহী  
সেনাদল বৃদ্ধি ও পুত্রের বিবাহ তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

নিজাম শাহীর ত্রায় ঋণগ্রস্ত রাজসরকারে অর্থবানের  
প্রাধান্য হওয়াই সম্ভব। সুতরাং ৫ হাজারী অখারোহী-  
ধ্যক্ষ পদ ও রাজোপাধি লাভ মল্লজীর পক্ষে বিশেষ আশাস-  
সাধ্য হয় নাই। ক্রমে তিনি সবনরী, চাকন, পুণা, জুবা  
প্রভৃতি জেলা জায়গীর ও তত্তৎ দুর্গের অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত  
হইলেন। যাদব রাওর আর বাক্যান্তরের অপেক্ষা রহিল না।  
সুলতানের অমুরোধে তিনি কন্যার বিবাহপ্রস্তাবে সন্মত  
হইলেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং সুলতান উপস্থিত থাকিয়া শাহ-  
জীর বিবাহ কাণ্ড সম্পাদন করেন। মল্লজী বিপুল অর্থ উপা-  
র্জন করিয়া দাক্ষিণাত্যে যে সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি রাখিয়া  
যান, তাহারই ফলে তৎসংশয় শিবাজী ভবিষ্যতে বিশাল  
মহারাত্র-সাম্রাজ্য সংস্থাপনে কৃতকাণ্ড হইয়াছিলেন।

[ শিবাজী দেখ। ]

মল্লট, মেবার-রাজ্যের শুহিলবংশীয় জনৈক রাজা।

মল্লগুণ্ডিক, বীরশৈবামৃতপুরাণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মল্লতরু (পুং) পিয়ালবৃক্ষ। (রাজনিং)

মল্লভূত্যা (স্ত্রী) মল্লবংশমানং তুর্গং মল্লার তুর্গ্যমিতি বা।  
বাণ্ডবিশেষ। পর্যায়—মহাম্বন। (ত্রিকাং)

মল্লদেব (পুং) কালজ্ঞান নামক বৈষ্ণবগ্রন্থরচয়িতা।

মল্লদেব, দাক্ষিণাত্যের চেররাজ্যের জনৈক রাজা।

মল্লদেব, জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজা। উমানাথিপতি রাজা  
অভয়দেবের পুত্র। ইহার চন্দ্রবংশীয় ছিলেন।

মল্লদেব, কোচবিহারের জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি প্রয়োগ-রত্ন-  
মালাপ্রণেতা পুরুষোত্তমের প্রতিপালক ছিলেন।

মল্লদেব, মল্লপ্রকাশ নামক বৈষ্ণবগ্রন্থপ্রণেতা। এতত্তির  
কালজ্ঞান ও তৃতীয়জ্ঞরাষ্টক নামে তৎকৃত অপর দুইখানি ষণ্ড-  
গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মল্লদ্বাদশী (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ।

মল্লনাগ (পুং) নাগো হস্তীব মল্লঃ, পূর্ব্বনিপাতঃ। ১ কাম-  
সুত্রপ্রণেতা বাৎস্তায়ন মুনি। মল্লো বলীয়ান্ নাগঃ। ২ অত্র-  
মাতঙ্গ। (মেদিনী) মল্লো নাগ ইব। ৩ লেখহার। (শব্দরত্নাং)

৪ কামশাস্ত্রবিশেষ। (ধরণি)

মল্লপুর (স্ত্রী) নগরভেদ। মল্লপুর।

মল্লপুর (মল্লপুর), মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-সরকারের অন্ত-  
র্গত একটা প্রাচীন নগর। এখানকার দেবতীর্থাদির সবিশেষ  
পরিচয় ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণান্তর্গত মল্লপুর মাহাত্ম্যে বিবৃত হইয়াছে।

মল্লভট্ট, ১ জনৈক প্রাচীন বৈয়াকরণ। মল্লিনাথ নৈষধচরিতে ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। [ ভট্টমল দেখ। ]

২ আনন্দলহরী-টীকাপ্ৰণেতা।

মল্লভূ (জী) মল্লানাং ভূমিঃ। মল্লভূমি।

মল্লভূপতি, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা। প্রোলন নায়কের পুত্র। তাঁহার উৎকীর্ণ ১০৯৭ শকাব্দের শিলালিপিতে তাঁহার দানশীলতার পরিচয় আছে।

মল্লভূম, বাকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুররাজ। এক সময়ে এইস্থান বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের অধিকারে ছিল। [ বিষ্ণুপুর দেখ। ]

মল্লভূমি (জী) মল্লানাং ভূমিঃ স্থানং। মল্লজাড়াস্থান। পথ্যায়—অক্ষপাট, রঙ্গভূমি, রণস্থলী, মল্লভূ, অক্ষপাট। (জটায়ব)  
২ দেশবিশেষ মল্লভূম।

“অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানং শালপত্রে চ ভোজনম্।

শয়নং তালপত্রে চ মল্লভূমেরিয়ং গতিঃ ॥” (উদ্ভট)

মল্লমল্ল, উদার-রাঘব ও অব্যয়সংগ্রহনির্ণয় প্রণেতা। ইনি শাক্যাদিকৃত-রচয়িতা মাধবসুধার পুত্র।

মল্লমাররাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা। ইহার আজ্ঞাসারে জগন্নাথপ্রসাদ একটা হিন্দুমন্দিরে বৃত্তি দান করিয়াছিলেন।

মল্লয়, কৃষ্ণাজেলার নরশরবপেট গ্রাম হইতে ১১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি গ্রাম। এই স্থানে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরগাত্রে একখানি প্রাচীন শিলালিপি আছে।

মল্লযাত্রা (জী) মল্লানাং যাত্রা, মল্লদিগের যুদ্ধযাত্রা। পথ্যায়—মাল্লবী। (হারাবলী)

মল্লযায়্য, দৈবজ্ঞবলাস-রচয়িতা।

মল্লযুদ্ধ (জী) মল্লানাং যুদ্ধঃ ৩তং। মল্লগণের পরস্পর যুদ্ধ। ইহার পর্যায়,—নিযুদ্ধ, বাহ্যযুদ্ধ। (শব্দরত্নাং)

পুণে মল্লগণ রাজভবনাদিতে আসিয়া বিবিধ কৌশলের সহিত মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করিত। স্বয়ং রাজা এবং অত্যাচার দর্শকগণ আগ্রহের সহিত এই যুদ্ধ সন্দর্শন করিতেন। মল্লগণ পরস্পর যুদ্ধ কাণ্ডে ব্যাপৃত হইয়া কখন কখন উভয়েই তুল্যবল, তুল্যপরাক্রম ও তুল্যকৌশল হইয়া কেহই কাহাকে পরাভূত করিতে পারিত না এবং কখন বা একের হস্তে অস্ত্র হীনবল হইয়া জীবন বিসর্জন করিত।

মহাভারতের বিরাটপর্বে দেখিতে পাই,—যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব যখন অজ্ঞাতবাসের শেষ বৎসর বিরাটভবনে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণপূর্বক ভিন্ন ভিন্ন বেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে ভীম বল্লব নামে আত্মপরিচয় দিয়া পাচকবেশে বিরাটের রন্ধন-

শালায় ভারণগ্রহণ করেন। ভীমসেন যে মল্লযুদ্ধ বিষয়ে পটু, একথা বিরাটের কর্ণগোচর হইয়াছিল। কিয়দ্দিন পরে এক পক্ষ উপলক্ষে জীমূত নামক এক মল্ল আসিয়া রাজভবনে উপস্থিত হয়। জীমূত মল্লের সহিত আরও কয়েকজন মল্ল আসিয়াছিল। রাজা বিরাট এই মল্লের সহিত ভীমসেনকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। ভীমসেন পাছে আত্মপ্রকাশ পায়, এই ভয়ে অতি কষ্টে রাজাজ্ঞা পাগল করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন উভয় বীর যুদ্ধভূমে অবতরণ করিলেন। চারিদিকে দর্শকমণ্ডলা উভয়ের যুদ্ধ দেখিবার জন্য স্থিরনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। জীমূতমল্ল অসাম বলাবাক্রম-সম্পন্ন বলিয়া সমস্ত সুপরিচিত ছিল। উভয় বার রাজাকে অভিবাদন করিয়া যখন স্বীয় কটাতট সূদৃঢ়রূপে বান্ধিয়া ভীমবিক্রমে মহারথে দাঁড়াইলেন, তখন দর্শকমণ্ডলী হর্ষোৎসাহে পুলকিত হইয়া উঠিল। কত রকমে কত রঙ্গভঙ্গে অথচ অতি সুকৌশলে ও অসীম অদম্য সাহসবিক্রমে উভয় মল্ল কখন হস্তে হস্তে, কখন পদে পদে, কখন মস্তকে মস্তকে, কখন বক্ষে বক্ষে, কখন সূদৃঢ় বজ্র মুষ্টিপাতে, কখন প্রবলবেগে ভীষণ পদাঘাতে এবং কখন বা আকর্ষণ বিকর্ষণ অভ্যাকর্ষণ ও প্রকর্ষণাদি লোমহর্ষণ ভীষণ অথচ কৌতুকোদ্দীপক বহু বিচিত্র শৌর্য-ক্রীড়ায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর জীমূতমল্ল ভীমবিক্রম ভীমের হস্তে পরাস্ত হইল। ইকোদশ তাহাকে হস্ত দ্বারা উত্তোলিত করিয়া বহু শতবার শূন্য পথে ঘুরাইয়া শেষে তাঁঁ নিষ্পেষণে তাহার প্রাণাবশ্য করিলেন। স্বয়ং রাজা এবং অত্যাচার দর্শকশ্রেণী প্রাসঙ্গ জীমূতমল্লের বিনাশে ভীমকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

(মহাভারত বিরাটপর্ব ১২ অঃ)

এই মল্লযুদ্ধে সন্নিপাত, অবধূত, প্রমথ, উন্মথন, ক্ষেপণ, মুষ্টি, প্রকর্ষণ, বিকর্ষণ, অভ্যাকর্ষণ ও আকর্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় ভালরূপে শিক্ষা করিয়া লইতে হয়। এই সকল বিষয়ে বিশেষরূপ শিক্ষা না হইলে মল্লযুদ্ধে পারদর্শী বা দক্ষ হওয়া যায় না।

ভাগবতের দশমস্কন্ধে লিখিত আছে—কংসের সেনাদলের মধ্যে চাগুর, মুষ্টিক, কুট, শল ও তোশল নামে পাঁচজন মহা পরাক্রান্ত মল্ল ছিল। যখন কংস গুপ্তঘাতক প্রেরণ ও অত্যাচার বহু চক্রান্ত করিয়াও কৃষ্ণ বলরামের ধ্বংস সাধন করিতে পারিল না, তখন আপন ভবনে কৃষ্ণবলরামকে ছলক্রমে আহ্বান করিয়া নিজের প্রধান মল্ল চাগুরমুষ্টিকাদি দ্বারা মল্লযুদ্ধে তাহাদিগের বিনাশ করাই কংসের সংকল্প হইল। তখন কংসের আজ্ঞায় এক প্রশস্ত প্রাক্ষণের চারিদিকে বহুতর

সুন্দর সুন্দর মঞ্চ প্রস্তুত হইল। পুষ্পমালা, তোরণ ও পতা-  
কাদি দ্বারা সেই মঞ্চগুলি অতি সুসজ্জিত হইয়া  
রহিল। রাজা কংস দূত দ্বারা দূরদেশান্তরে নিমন্ত্রণ করিয়া  
পাঠাইলেন। যথাকালে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিয়া মল্লযুদ্ধ  
দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণবলরামও কংসদূত  
অকুর কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গোকুল হইতে কংসালয়ে আগমন  
করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নন্দগোপাদিও নিমন্ত্রিত হইয়া  
মথুরায় আসিলেন। ভৃত্যামাতা ও সামন্তরাজগণে পরিবৃত্ত  
হইয়া স্বয়ং রাজা কংস এবং অত্যাশ্রয় সম্রাট দর্শকগণ মল্লযুদ্ধ  
দেখিবার জন্য সুরম্য সুসজ্জিত মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন।

যথাসময়ে মল্লযুদ্ধে বাজিয়া উঠিল। রণরঙ্গ রণভেরীর  
নিনাদে মল্লগণের হৃদয় বীররসে উদ্দীপিত হইল। সুন্দর  
বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বলদৃষ্ট মল্লগণ বিপুল উৎসাহে রঙ্গ-  
ভূমে প্রবেশ করিল। এই সময় কৃষ্ণবলরামও মল্লযুদ্ধে  
গুনিয়া যুদ্ধ দেখিবার জন্য সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। পথে  
আসিবার সময় তাঁহাদিগের বিনাশের জন্য কংসের আদেশে যে  
মদমত্ত হস্তী রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাকে নিহত করিয়া তাহার  
দুই বিশাল দন্ত স্বক্কে স্থাপনপূর্বক কৃষ্ণবলরাম দুই ভাই যুদ্ধ  
দেখিতে আসিলেন। তখন মল্লরঙ্গভূমে সেই অসামান্য রূপ-  
লাবণ্যসম্পন্ন ভ্রাতৃত্ব সর্বজাতীয় দর্শকের নিকট যে কিরূপ  
অতুষ্ক-পূর্ব দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা ভাগবতে অতি  
সুন্দরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার একটা শ্লোক এই—  
“মল্লানামশনির্গাং নরবরঃ স্ত্রীণাং অরোঃ স্ত্রীমান্  
গোপানাং স্বজনোহসত্যং কিত্তিভূজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ  
মৃত্যুভোজপতেবিরাদ্বিছ্যাং তবঃ পরং যোগিনাং  
বৃক্ষগাং পরদেবতোতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।”

( ভাগ০ ১০।৪৩।১৭ )

কৃষ্ণবলরাম দর্শক হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কংসের  
চক্রান্তে তাঁহাদিগকে চাগুর-মুষ্টিকাঁদির দ্বারা মল্লযুদ্ধে ব্যাপ্ত  
হইতে হইল। আবার মল্লযুদ্ধে বাজিল। মল্লগণের হৃ-  
দ্বারে রঙ্গভূমি কাঁপিল। দর্শকমণ্ডলা স্থিরনেত্রে রহিল।  
তখন চাগুরের সহিত কৃষ্ণ আর মুষ্টিকাঁদ সহিত বলরাম মল্ল-  
যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হস্তে হস্তে, পদে পদে, বক্ষে বক্ষে,  
উরুতে উরুতে, মস্তকে মস্তকে পরস্পর পরস্পরের ঘাতপ্রতী-  
ঘাত আরম্ভ হইল। পরিভ্রমণ, বিক্ষেপ, পরিরম্ভ, অবপাতন,  
উৎসর্গণ, অপসর্গণ, উত্থাপন, উন্নয়ন, চালন, স্থাপন প্রভৃতি  
বহুবিধ প্রকারে সেই মল্লগণ পরস্পর জিগীষু হইয়া যুদ্ধ করিতে  
লাগিল। বহুকণ মল্লযুদ্ধের পর চাগুর, মুষ্টিকাঁদ কংসের  
প্রধান মল্লগণ কৃষ্ণবলরামের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। নিজ-

কৃত কক্ষ-ফলে অবশেষে কংস এবং তদীয় ভ্রাতৃগণও কৃষ্ণ  
বলরামের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না। তাহার্য্যও এই  
উপলক্ষে স্ব স্ব জীবন বিসর্জন করিল।

মহাভারতে উল্লিখিত আছে,—যুদ্ধটির যখন রাজস্বয়  
যজ্ঞের আয়োজন করিতে মনস্থ করেন, তখন প্রসিদ্ধ মগধবীর  
রাজা জরাসন্ধকে তাহার প্রধান অন্তরায় মনে করিয়া সর্ব-  
সম্মতিক্রমে সর্বোগ্রহে তাহাকেই নিধন করিবার সঙ্কল্প হয়। এই  
সঙ্কল্পানুসারে তখন অন্য কোনরূপ যুদ্ধোপকরণ সঙ্গে না লইয়া  
ভীম, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন এই তিন বীর ত্রাক্ষণবেশে মগধে  
যাত্রা করেন। তাঁহারা কৌশলে জরাসন্ধপুত্র প্রবেশ করিয়া  
তাঁহার নিকট যুদ্ধের প্রস্তাব করেন। জরাসন্ধ উপবাসী থাকি-  
য়াও যুদ্ধে সম্মতিদানপূর্বক স্বয়ং ভীমের সহিত বাহ্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত  
হন। কার্তিক মাসের প্রথম দিন ত্রয়োদশী তিথি সমস্ত  
দিন অনাহার। এই দিন দিব্যরাত্রি অবিশ্রান্ত ঘোরতর  
ভাবে যুদ্ধ চলিল। পরদিন জরাসন্ধ ক্রান্ত হইয়া পড়িল।  
তথাপি কৃষ্ণের উত্তেজনায় যুদ্ধ ধামিল না। শেষে এই যুদ্ধে  
ভীম জরাসন্ধকে বিপরীতভাবে নিহত করিলেন। এই  
যুদ্ধে কোন অন্ত্রাদি গৃহীত হয় নাই। এই জন্য ইহাও মল্লযুদ্ধ  
মধ্যে গণ্য। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর তদীয় কারারুদ্ধ বহু-  
সংখ্যক নরপতি মুক্তি লাভ করেন।

প্রাচীন পুরাণাদিতে এইরূপ আরও অনেক  
মল্লযুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্বকালে মল্লযুদ্ধ একটা  
প্রধান যুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। বর্তমান কালেও  
ভারতবর্ষের নানাস্থানে মল্লগণ এই মল্লযুদ্ধ বা মল্ল-  
ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে, ভারত ভিন্ন এশিয়া, যুরোপ  
ও আমেরিকাদি বিভিন্ন দেশেও এই মল্লযুদ্ধ বা মল্লক্রীড়ার  
অভাব নাই।

যুরোপের প্রাচীন সমৃদ্ধ রোমরাজ্যেও মল্লক্রীড়ার  
বিশেষ আদর ছিল। তথাকার ‘কলোসিয়াম’ নামক প্রসিদ্ধ  
রঙ্গমঞ্চে নানাপ্রকারের ক্রীড়াপ্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এত-  
দ্ভিন্ন তথাকার বিভিন্ন সহরেও এম্পিথিয়েটার রচনা করিয়া  
তন্মধ্যে মল্লক্রীড়া হইবে। [ রোম দেখ। ]

সুদূর ইংলণ্ডেও মল্লক্রীড়ার অভাব ছিল না। তথায় প্রণয়-  
প্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক যুগল স্ব স্ব বাধ্যবলে পরস্পর পরস্পরের  
প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখসমরে বিমুখ করিয়া প্রণয়িনীর প্রেমাস্পদ  
হইতেন। ইহা তথায় ডুয়েল-যুদ্ধ নামে খ্যাত। ইংলণ্ডের  
ফরাসী-বিজেতা উইলিয়াম দি কন্সটার স্বায় শাসনপ্রণালী  
মধ্যে রণ-পরীক্ষা বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ ( Trial by battle or duel )  
নাম দিয়া একটা স্বতন্ত্র শাসনবিধি লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

এই রাজ্য প্রণোদিত যুদ্ধ বিধিতে অনেক বলহীন নির্দোষ ব্যক্তি 'জোর বার মুখ তোর' এর হস্তে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে আরও একটি প্রবাদ আছে যে, মাকি-দনপতি মহাবীর আলেক্সান্দার ক্ষত্রিয়কুলতিলকে পুরু-রাজের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন।

মল্লরম্ভা, দক্ষিণ-কণাড়া জেলার অন্তঃপাতী একটি গ্রাম। উপিনাকড়ী হইতে ১৩ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামের ১১ মাইল দক্ষিণে ধর্ম্মস্থল মন্দির। উক্ত মন্দির ৭০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া খ্যাত। মন্দিরস্থিত লিঙ্গ মঙ্গলুগের মধ্যবর্তী কদিরি-মন্দির হইতে আনীত হয়।

মল্লরাজ, রসরসদীপিকা নারী অলঙ্কার-গ্রন্থপ্রণেতা।

মল্লরাজবংশ, বিষ্ণুপুর ও নেপালের প্রাচীন রাজবংশ।

[ নেপাল ও বিষ্ণুপুর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

মল্লরাত্রী (ক্ৰী) মল্লরাজ্য। মহী ও নর্ম্মদা নদীর মোহানাস্থিত একটি জনপদ। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি 'Maleo' শব্দে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মল্লর (পুং) জাতিবিশেষ।

মল্লবরম্ভা, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। তমরিকোটের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে ৬টা রাক্ষস-কীর্তিচিহ্ন এবং ২টা প্রস্তরস্তম্ভ বর্তমান আছে। এই গ্রামের নিকটবর্তী কোন ময়দানের স্মৃতিকা স্তূপ হইতে শ্বেতবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরের ছইটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি সপ্তকঙ্ক নাগমূর্তি ও তাহার চারিদিকে অস্থচরণ পরিবৃত।

মল্লবরম্ভা, উত্তর আর্কাড় জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। নিয়তিরপতির উত্তরভাগে ১০ মাইল পূর্বে এবং তিরুপতি রেল আফিস হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তর-পূর্বাংশে ছইখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মল্লবাস্তু (ক্ৰী) স্থানভেদ।

মল্লবিদ্যা (স্ত্রী) মল্লদিগের অভ্যস্ত বিদ্যাভেদ।

মল্লবেন, বাল-মল্লবেনসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা।

মল্লশালা (স্ত্রী) মল্লদিগের ক্রীড়াস্থান, চলিত কুস্তীর আব্দা।

মল্লসেন, অনেক জনপতি। তিনি সাধারণে হস্তমল্ল সেন নামে পরিচিত। তাঁহার এই হস্তী উপাধি, সম্ভবতঃ তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও স্থলদেহের পরিচায়ক। তৎকৃত অর্জুনরাজ নাটক, উদয়নরাজকাব্য, ভরতরাজনাটক, মেঘ-ধর নাটক, মৈথিলীপরিণয় নাটক প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্য ও নাটক অধুনা প্রচলিত দেখা যায়।

মল্লা (স্ত্রী) মল্লভে ধারণতি বিলাসাদিকমিতি মল্ল-ধারণে

অচ্ছিন্নাং টাপ্। ১ নারী। ২ পত্রবলী। ৩ মল্লিকা।

৪ লোঠনরাজপত্নী। (রাজতরং ৮১১১৭)

মল্লানকগ্রাম (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ।

মল্লাপুর (ক্ৰী) নগরভেদ।

মল্লার (পুং) মল্লং শব্দটি প্রাপ্নোতীতি শ-অণ্। রাগ-বিশেষ। ষড়্-রাগের মধ্যে দ্বিতীয় রাগ।

"আদৌ মালবরাগেন্দ্রস্ততো মল্লারসংজিতঃ।

ত্রীরাগস্তত্র পশ্চাদ্বে বসন্তস্তদনন্তরম্॥" (সঙ্গীতদামোঃ)

এই রাগের ছয়টি রাগিনী, যথা—বেলাবলী, পূরবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া ও কেদারিকা। এই রাগের আলোচনার সময় বর্ষাকাল।

"বেলাবলী পূরবী চ কানড়া মাধবী তথা।

কোড়া কেদারিকা চৈব মল্লারস্ত প্রিয়া ইমাঃ॥"

ইহার গানসময়ঃ—

"মেঘমল্লারাগস্ত গানং বর্ষায় সর্গদা।" (সঙ্গীতদামোঃ)

ইহার স্বরূপ—

"শ্রাব্যদাতং পলিতং দধানং প্রলম্বকর্ণঃ কুমুদেন্দুবর্ণঃ।

কৌপীনবাসাঃ সবহারচারী মল্লারাগঃ শুচিশাস্ত্রমূর্তিঃ॥"

সঙ্গীতদর্পণে রাগাধ্যায়ে লিখিত আছে, এই রাগ ষড়্-রাগের মধ্যে চতুর্থ।

"ভৈরবঃ পঞ্চমো নাটো মল্লারো গোড়মালবঃ।

দেশাধ্যায়েতে ষড়্-রাগাঃ প্রোচ্যতে লোকবিশ্রুতাঃ॥"

মেঘমল্লারিকা, মালকৌশিক, পটমঞ্জরী ও আশাবরী

এই সকল রাগ মল্লারসংশ্রয়।

"মেঘমল্লারিকা মালকৌশিকঃ পটমঞ্জরী।

আশাবরীতি বিজ্ঞেয়া রাগা মল্লারসংশ্রয়া॥" (রাগার্ণবঃ)

মল্লারি (স্ত্রী) রাগিনীভেদ, বসন্তরাগের পত্নী, মতান্তরে মেঘ-রাগের পত্নী। (পুং) ২ কৃষ্ণ। ৩ শিব। ৪ গ্রহলাঘবের জনৈক টীকাকার।

মল্লারি, বৃত্তমুক্তাবলী ও বৃত্তমুক্তাবলীতরল নামক ছইখানি গ্রন্থপ্রণেতা।

২ দিবাকর দৈবজ্ঞের পুত্র। ইনিও পিতার ভ্রাতৃ বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন। ইহার রচিত গণেশকৃত গ্রহলাঘবের টীকা ও সর্গার্থচিন্তামণি অত্মাপি লোকসমাজে বিশেষ পরিচিত।

মল্লারী (স্ত্রী) মল্লার ভীপ্। বসন্তরাগের রাগিনী।

"আন্দোলিতা চ দেশাধ্যা লোলা প্রথমমঞ্জরী।

মল্লারী চেতি রাগিণ্যো বসন্তস্ত সদাহুগাঃ॥"

(সঙ্গীতদামোঃ)

হলায়ুধমতে মেঘরাগের রাগিণী। ইহার গান-সময়  
বর্ষাকাল। স্বরগ্রাম—

ধ, নি, রি, গ, ম, ধ।

ইহার ধ্যান—

“গৌরী কৃশা কোকিলকণ্ঠনাদা গীতচ্ছলেনাশ্রুপতিং স্রবন্তী।

আদায় বীণাং মলিনা রুদন্তী মল্লারিকা ঘোবনদুনচিতা ॥”

(সঙ্গীতদর্পণ)

মল্লিকাৰ্জুন (পং) রাজভেদ।

মল্লাসুর, অসুরভেদ। ইনি দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত  
ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

[ মল্লারিমাহাভাষ্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

মল্লাসুর (পং) অসুরভেদ। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে বধ করেন, এই  
জন্ত তিনি মল্লারি নামে খ্যাত হন।

মল্লাসোমযাজিন, জীবমুক্তি-কল্যাণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মল্লি (পং) মল্লতে ধারয়তি বিজ্ঞানমিতি মল্ল (সর্লধাতুভ্য  
ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। চতুর্লিংশতি বৃত্তাইতের মধ্যে  
উনবিংশ জিন। [ জৈন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ। ]

(জী) ২ মল্লিকা। (শব্দরত্নাঃ)

মল্লি, বর্তমান বালজাতি, পুরাণে মালব নামে খ্যাত। আলেক্-  
সান্দরের সময় “মল্লি” নাম অভিহিত হইত।

মল্লি, তীর্থভেদ।

মল্লিক (পং) মল্লাতে ধার্যতেহসৌ মল্ল-ইন্ স্বার্থে কন্।

১ মলিন চকুচরণযুক্ত হংস। (অমর)

২ ভূম্যাধিকারীর উপাধিবেশেষ। পারসী মালিক শব্দজ।

“নভা শব্দরমণঠগৌরাজমল্লিকাস্বজঃ।

ভট্টটিকাং প্রকুতে ভরতো মুগ্ধবোধিনীম্ ॥”

(ভট্টিকাব্য-টীকার মঙ্গলাচরণ)

মল্লিকা (জী) মল্লিরেবেতি—মল্লি-স্বার্থে কন্, স্রিয়াং টাপ্।  
যথা মল্লিইংস ইব গুরুত্বাং মল্লি-ইবার্থে কন্। অনামখ্যাত পুষ্প-  
বৃক্ষভেদ (Jasminum Zamac)। মহারাষ্ট্র—বেলিমোগরা,  
কলিঙ্গ—বল্লিমল্লিগে, তৈলঙ্গ—মল্লিচেট্ট। সংস্কৃত পর্যায়—  
ভৃগশূত্র, ভূপদা, শতভীক, ভৃগশূত্রা, শীতভীক, ভদ্রবল্লী, গৌরী,  
বনভদ্রিকা, প্রিয়া, সোম্যা, নারীষ্টা, গিরিজা, সিতা, মল্লী,  
মদরন্তী, চব্রিকা, মোদিনী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, চক্ষুস্থান,  
মুখপাক, কুষ্ঠ, বিক্ষোটক, কণ্ঠ, বিষ ও ব্রণনাশক।  
কফনাশক। উষ্ণ, বৃষ্য, বাতপিত্ত, অশ্বক্বাধি ও অরুচি-  
নাশক। (ভাবপ্রঃ)

বামনপুরাণে এই পুষ্পোৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত  
আছে,—কামদেব যখন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে বাইরা

তাহার নয়ন-বন্ধিতে ভ্রাস্ত্রীভূত হন, তখন তাহার হস্তজট  
ধম্ব ভূতলে পতিত হইয়া পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হয়। ঐ ধম্বর  
মুষ্টিবদ্ধ স্থান হইতে মল্লিকা প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পবৃক্ষের উৎপত্তি  
হইল। (বামনপুরাণ ৬ অধ্যায়)

এই পুষ্প ইহী জাতীয় এবং শ্বেতবর্ণ। আকৃতি ও গন্ধের  
তারতম্যানুসারে ইহার মধ্যেও মল্লিকা, কাটমল্লিকা, বেল-  
মল্লিকা প্রভৃতি ভেদ দৃষ্ট হয়। অত্যাশ্রয় পুষ্পের স্তায় ইহাতেও  
উৎকৃষ্ট আভর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২ মৎস্তবেশেষ। ৩ মৃৎপাত্রভেদ। (হেম)

মল্লিকাক (পং) মল্লিকা পুষ্পমিব অক্ষিণী যতেতি (অঙ্কোহ-  
দর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ইতি অচ্। ১ মলিনচকুচরণযুক্ত  
হংস। (হেম) ২ গুরুবর্ণবেষ্টিত চক্ষুঃযুক্ত অশ্ব। (হলায়ুধ)

“মল্লিকাকান্ বিক্রপাকান্ জৌল্লবর্ণান্ মনোজবান্।

অশ্বশৈল্যং মহাবাহুস্তদপ্রতিমপৌরুষঃ ॥” (হরিবঃ ১৪।১২৫)

ঈষদ্ ধূসর বর্ণ এবং অল্লগোহিত চকুচরণবিশিষ্ট হংস।

মল্লিকাক্ষি (জী) শ্বেতবিন্দু চক্ষুঃযুক্ত অশ্ব।

মল্লিকাখ্যা (জী) মল্লিকেতি আখ্যা যজ্ঞাঃ। ত্রিপুরমালী  
পুষ্প। পর্যায়—মোহিনী, বটপত্রা, মোহনা। (রত্নমালা)

মল্লিকাগন্ধ (জী) মল্লিকায় ইব গন্ধো যজ্ঞ। মঙ্গলাগুরু।

মল্লিকাচ্ছদন (জী) আলোকরশ্মি হইতে চক্ষুঃ শীতল  
রাখিবার জন্ত যে আচ্ছাদন দেওয়া হয়।

মল্লিকাপুষ্প (পং) মল্লিকায় পুষ্পমিব পুষ্পঃ যজ্ঞ। ১ কুটজ-  
বৃক্ষ। চলিত কুড়ি। (রাজনিঃ) ২ করুণবৃক্ষ, করুণালবুর  
গাছ। (জী) ৩ স্বনামখ্যাত মল্লিকাপুষ্প। চলিত বেল ফুল।

মল্লিকাৰ্জুন (জী) ত্রীশৈলস্থিত শিবলিঙ্গ।

মল্লিকাৰ্জুন, (মল্লিকাৰ্জুন হর্গ) মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর  
মালেক্‌জেলার অন্তঃপাতী একটি গণ্ডগ্রাম। হোস্তুর হইতে  
২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন হর্গ  
স্বঃসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় প্রাচীন শিবমন্দির-  
গাত্রে অনেকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, কিন্তু সকল-  
গুলিই অস্পষ্ট। নিকটবর্তী পৰ্ব্বতশৃঙ্গে গ্রন্থ-অক্ষরে লিখিত  
একখানি শিলালিপি এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও নন্দী প্রভৃতির প্রাতি-  
মূর্ত্তি অঙ্কিত শিলাফলক দেখা যায়।

মল্লিকাৰ্জুন (গণপতি), জটৈক প্রধান হিন্দুরাজ। মল্লোর  
জেলার অন্তর্গত কোচরল্‌কোট নগরে তাহার রাজধানী  
ছিল। উক্ত গ্রামে একটি পুরাতন হর্গ আছে। শুনা যায়  
যে, মল্লিকাৰ্জুন গণপতির পুত্র গজপতি মহারাজ এই হর্গ  
নিৰ্ম্মাণ করেন।

মল্লিকাৰ্জুন, বিজয়নগরের জটৈক রাজা। মহারা ৩

ত্রিচিনপল্লী জেলার প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি দেবসেবার জন্ত করেকখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

[ বিজয়নগর দেখ। ]

মল্লিকার্জুন, ১ হিমালয়পর্বতস্থিত শিবলিঙ্গভেদ। (শিবপু.)  
মল্লিকার্জুনযোগীন্দ্র, গজবল্লরী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি শঙ্করাচার্যের ধর্মমতবিস্তারের জন্ত আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

মল্লিকার্জুনশূঙ্গ (ক্লী) স্থানভেদ।

মল্লিগাঙ্গী (ক্লী) মল্লেরিব গন্ধো যন্ত (উপমানাচ্চ। পা ৫।৪।১৩৮)  
ইতি ইকারাদেশঃ। অণুর। (শব্দচ.)

মল্লিগাঁও, খান্দেশের অন্তর্গত একটি নগর। নারুশঙ্কর নামা জনৈক মহারাষ্ট্রসর্দার এখানকার দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁহার অধীনে এখানে আরবী সৈন্ত রক্ষিত ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার সৈন্তগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ইংরাজ-করে দুর্গ সমর্পণ করে।

মল্লিতীর্থ, তীর্থভেদ।

মল্লিদেব, চোলবংশীয় জনৈক রাজা। ১১৬৮ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে মল্লিদেবের নাম অঙ্কিত দেখা যায়।

মল্লিনাথ, একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইহার প্রকৃত নাম কোলাচল মল্লিনাথ। ডাকনাম—পেড্ড ভট্ট। পেড্ড-ভট্ট নাম দেখিয়া মনে হয় ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। ইহার টীকায় ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দ, অভিধান, নীতি, জ্যোতিষ, নৃত্য, দর্শন, বেদ, উপনিষদ, এক কথায় সন্ধ্যাক্সেই ইহার অভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও কথায় কথায় কোন কোন বৈচিত্র্য ছটাময় কথার উত্তরে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন যে, অমকের কথা যেন মল্লিনাথের টীকা।

অমরপদপারিজাত নামক অমরকোষটীকা, উদার-কাব্য, একাবলীটীকাতরল, কীরাতার্জুনীয় গ্রন্থের ঘণ্টাপাথ নামক টীকা, কুমারসম্ভবের সঞ্জীবনীটীকা, তার্কিকরক্ষাটীকা, জীবাত্ম নাম্নী নৈষধীয় টীকা, সঞ্জীবনী নাম্নী মেঘদূত ও রঘু-বংশটীকা, রঘুবীরচরিত ও সর্ষঙ্গবা নাম্নী শিশুপালবধটীকা, প্রভৃতি তাহার রচিত কথখানি কাব্য, মহাকাব্য ও খণ্ড-কাব্যের টীকা পাওয়া যায়।

২ জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজা। ৩ কল্লতরু ও বৈষ্ণবর-মালাপ্রণেতা। ৪ শঙ্কেন্দ্রশেখর ও লঘুশঙ্কেন্দ্রশেখর নামক গ্রন্থের টীকা-রচয়িতা। ৪ জনৈক জৈন-তীর্থঙ্কর। মল্লিনাথ-পুরাণে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

[ জৈন শব্দে বিবৃত বিবরণ দেখ। ]

মল্লিনী (স্ত্রী) অতিমুক্তক পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি.)

মল্লিপত্র (ক্লী) মল্লোঃ পত্রমিব পত্রং যন্ত। ছত্রক। (ত্রিকা.)

মল্লিবার (ক্লী) স্থানভেদ। মলবার দেশ।

মল্লিরাও হোলকার, মল্লহররাও হোলকারের পৌত্র। ইনি পিতামহেব মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও অধিক দিন রাজ্যস্বত্বভোগ করেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর রাজ-মাতা অহল্যা বাঈর সহিত দেওয়ান গঙ্গাধর যশোবন্তের বিবাদ উপস্থিত হয়।

মল্লী (স্ত্রী) মল্লি কৃদিকারাদিত পক্ষে ভীষ্ম। মল্লিকা।

“কিং রাকেন্দ্রকরচ্ছটাক্রিদ্ধিতং কিং মোক্তিকেকরুদগতম্।

কিং মল্লীমুকুলৈঃ স্মিতং বিকশিতং কিং মালতীকুণ্ডলৈঃ ॥”

(রাজেন্দ্রকর্ণপুর ৪২)

মল্লীকর (ত্রি) অমলমপি আশ্রয়ং মল্লমিব করৌতীতি কৃ-অচ্। চৌর। (শব্দরত্না.)

মল্লীনগর, প্রাচীন নগরভেদ। (পূর্ণচন্দ্রোদয়পু. ১২ অ.)

মল্লু (পুং) মল্লতে ভরং ধারয়তীতি মল্ল-বাহুলকাৎ উ। ভালুক।

মল্লুর (পুং) মণ্ডুর, লোহকিট, লোহমল। (উজ্জল)

মল্লেশ্বর, গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। তনকু হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। রেড্ডীবংশীয় রাজ-গণের রাজত্ব সময়ে (১৩১৮ হইতে ১৪২৭ খৃষ্টাব্দ) এখানে একটি পুরাতন বেদীর উপরে মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরগাত্রে একখণ্ড শিলালিপি আছে।

মল্লোত, হিমালয়শ্রেণীর লবণশৈলীস্থিত একটি প্রাচীন নগর। রাবলপিণ্ডি মাণিক্যাল ঘুরিয়া এই নগরে উপনীত হওয়া যায়। প্রব্রতস্ববিদ্ ভাঃ কানিংহাম ইহাকে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং-বণিত সিংহপুর-রাজধানী বলিয়া অনুমান করেন।

কালর-কহারের ৪৥ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে এবং কেতাস নামক স্থানের ৯ মাইল পশ্চিমে একটি গিরিশৃঙ্গের উপর মল্লোত দুর্গ স্থাপিত। শুনা যায়, মল্লরাজ নামক জনৈক জজুহা-সর্দার এই দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন সময়ে এখানে জজুহা জাতির আধিপত্য বিস্তৃত হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। গজনীপতি মাক্কুদের ভার-তাক্রমণ সময়ে জজুহাজাতি ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়। সুতরাং মাক্কুদের পূর্বে মল্লুর রাজত্ব ও মল্লোত নগরীর ত্রিবিক্রম কল্পনা করা যায়।

প্রায় আট শতাব্দী কাল বিধর্মী মুসলমান-রাজগণের হতে পড়িয়া মল্লোত নগরীর ত্রিদৈর্ঘ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও এখানে হিন্দু-প্রাধান্যের নিদর্শন স্বরূপ একটি দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। উহার গঠনকাব্য কাশ্মীরদেশীয়



মন্দিরাদির শিল্পকার্যের অমূল্য। মন্দিরগাত্রস্থ প্রতিমূর্তি-সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাকে ব্রহ্মাধর্মের বিস্তারভূমি বলিয়া মনে হয়। শুনা যায়, এই মন্দিরে একটি মহাদেব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এখানে বৌদ্ধ সম্রাট অশোক-নির্মিত একটি স্তূপের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মল্হ (ত্রি) শব্দ। (অর্থঃ ৪৩৬।১০ঃ)

মল্হ (ত্রি) গো-স্তন।

মল্হণ (পুং) ১ দামোদরের পুত্র। ২ কবিভেদ।

মল্হন, চাবন ঋষির গোত্রসম্ভূত ছিন্দবংশীয় জনৈক রাজা। ইহার পিতার নাম বৈরবর্ষণ। রাজা মল্হণ চুলুকীখরবংশীয় অণহিলদেবীকে বিবাহ করেন। ইহার পুত্র মল্হ, পিতার জায় ওদার্যাদি সম্বন্ধে ভূষিত ছিলেন।

মল্হররাও গাইকোবাড়, বড়োদার জনৈক নরপতি। তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ ২৯শে নবেম্বর খ্রীষ ভ্রাতা খণ্ডেরাওর মৃত্যুর পর পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম মহারাজ ক্ষীরোদ রাও গাইকোবাড় সেনাধিপতি শমশের বাহাদুর, জি, সি, এস, আই। তিনি দ্বিতীয় গাইকোবাড় পীলাজী হইতে পঞ্চম পুরুষ অধস্তন ছিলেন।

রাজ-দেওয়ানের কার্যে অকর্মণ্যতা দেখিয়া ইংরাজ-কর্ম-চারী সর্ সেনুর ফিট্‌স্‌জিরাড রাজা খণ্ডেরাওকে তাঁহার পদচ্যুতির জন্য অহরোধ করেন। ইহাতে রাজার সহিত ইংরাজ-সেনানীর বিরোধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে খণ্ডেরাও প্রাণ হারান। এই সময়ে মল্হর রাও কার্যরত ছিলেন। রাজা খণ্ডেরাও ভ্রাতা মল্হরের প্রতি সন্দিহান হইয়া তাহাকে কার্যরত করেন। ইংরাজ গবর্নেন্ট তাঁহাকেই রাজবংশের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া কারামোচনপূর্বক সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

মল্হররাও হোলকর, জনৈক মহারাষ্ট্র-সর্দার। তিনি খ্রীষ ভূজবলে হোলকর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া মহারাষ্ট্র-নেতৃসমাজে বিশেষ সন্মতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। হোল-গ্রামবাসী বলিয়া তাঁহাদের বংশোদ্ভূত 'হোলকর' হইয়া-ছিল। তাঁহার পিতা উক্ত গ্রামে সামান্য চৌকুলের (পাটে-লের সহকারী) কার্য করিতেন। তাঁহার জাতিতে মহারাষ্ট্রী ধাড় বা রাখাল (শূদ্র) ছিলেন।

মহারাষ্ট্র পেশ্‌বা ১ম বাজীরাওর শাসনকালে মল্হরজী সীলাদার পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকিয়া তিনি একটি অখারোহি-সেনাদল রক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার

শৌর্যবীর্য, চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। বাজীরাও তাঁহাকে একজন উপযুক্ত সর্দার জ্ঞান করিয়া উত্তরদিক্‌স্থ দেশসমূহ জয়ের নিমিত্ত সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মালবের সুবাদার গিরিধর বাহাদুরকে রণ-ক্ষেত্রে নিহত করেন। তদনন্তর আগ্রার সমীপবর্তী প্রদেশ-সমূহ জয় করিয়া তিনি মহারাষ্ট্রগৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই তাঁহার উপর রাজামুগ্রহ। উত্তরোত্তর পদোন্নতি হেতু রাজসরকারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি সরদেশমুখী ও চৌখরসংগ্রহে নিযুক্ত হন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে পেশ্‌বা তাঁহার কার্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ইন্দোরপ্রদেশের জায়গীরদার নিযুক্ত করেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি খ্রীষ উপরিতন কর্মচারী কান্তজী কদম ভাণ্ডের অহরোধে নিজামরাজ্যে চৌখসংগ্রহের জন্য উপদ্রব আরম্ভ করেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজাম-সেনানী সফদর-জকে সমলে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি কৃতকার্যের পারিতোষিক স্বরূপ মালব-রাজ্যের কিয়দংশ জায়গীর প্রাপ্ত হন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের জগদ্বিখ্যাত পানিপথযুদ্ধে তিনি মহারাষ্ট্র-বাহিনী লইয়া গমন করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপূর্বে তাঁহার পুত্র খণ্ডেরাওর মৃত্যু হওয়ায়, রাজবধু অহল্যা বাদি খ্রীষ পুত্র মল্লিরাওকে স্বত্ত্বের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন এবং স্বয়ং বালকরাজের অভিভাবিকারূপে রাজকার্য চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু অকালে বালক মল্লিরাওর মৃত্যু হওয়ায় অহল্যা বাদি দেওয়ান গঙ্গাধর যশোবন্তের অনভিমতে তুকাজি হোলকর নামক মল্হর রাওর জনৈক প্রিয় সীলাদারকে রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। কাজেই রাজসিংহাসন মূল হোলকর-রাজবংশ হইতে স্থলিত হইয়া স্বতন্ত্র ধরে যাইয়া পড়িল। তুকাজীর কালীরাও, মলহররাও, যশোবন্ত ও ইতোজী নামে চারি পুত্র ছিল।

হোলকর-রাজবংশ।

১ মলহররাও হোলকর।

২ মল্লিরাও।

৩ তুকাজী হোলকর।

৪ কালীরাও।

৫ যশোবন্ত রাও।

৬ মল্হররাও ২য়। ৭ হরিরাও হোলকর।

মল্হর রাও হোলকর, ইন্দোররাজ তুকাজী হোলকরের পুত্র। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে দৌলতরাও সিদ্ধিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

মল্লহর রাও হোলকর ২য়, ইন্দোরের জনৈক রাজা। রাজা যশোবন্ত রাও হোলকরের পুত্র। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতা যশোবন্তের মৃত্যুর পর ইন্দোর-রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহদপুরের যুদ্ধাবসানে হংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত তাহার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার দত্তকপুত্র মার্ত্তণ্ডরাও রাজপদে অভিষিক্ত হন; কিন্তু হরিরাও হোলকর ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। হরিরাওর পর খণ্ডেরাও ইন্দোর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাহার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী মূলকরজী রাওকে সিংহাসনে বসান।

মব, নহ, বন্ধন। ভাদিৎ পরশ্বেৎ সকৎ সেট্। লট্ মবতি। লোট্ মবহ্। লিট্ মমাব। লুঙ্ অমবীৎ। নিচ্ মবয়তি। লুঙ্ অমামবৎ। সন্ মিমবযিতি। ষঙ্ মামব্যাতে, যঙ্ লুক্ মামবীতি।

মবর (ক্কা) বোধমতে অত্যাধিক সংখ্যা।

মবারক খাঁ, আফগান শাহের পুত্র। মালব-রাজ সুলতান মহম্মদের সভাসদ। সুলতান মহম্মদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কুতব-উদ্দীন সিংহাসনে অধিরোধ করিলেন। এই সময় মালবের রাজা সুলতান মহম্মদ খিলজি গুজরাতে আক্রমণার্থ সৈন্যে আগমন করেন। সুলতানপুরে উপস্থিত হইলে মালিক আলা-উদ্দীন সুলতানপুর দুর্গের ফটক বন্ধ করিয়া দিয়া খিলজির সৈন্যোপরি গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহম্মদ খিলজি এদিন পর্যন্ত এই স্থান অবরোধ করিয়া বাধিয়াছিলেন; অনন্তর কুতব-উদ্দীনের খুলতাত মবারক খাঁ মধ্যস্থ হইয়া খৃষ্টীয় ১৪৫১ অব্দে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপন করিয়া দেন।

মবারক খাঁ, সুলতান মহম্মদ শাহের ভ্রাতা। মহম্মদের মৃত্যু-সংবাদ গুজরাতে পৌছিলে তথাকার সামন্তগণ ও মন্ত্রিবর্গ দ্রাহুপুত্র মামুদখাঁ এবং মবারক খাঁকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী জানিয়া উভয়কেই খান্দেমেশের অন্তর্গত বাবল নগরে কারাবদ্ধ করিলেন।

কেহ কেহ বলেন, বাহাদুর খাঁ রাজসিংহাসন লাভের আশায় এই সময় স্বীয় দাহুর্গ ও অন্তান্ত আত্মীয়স্বজনের বধ-সাধন করিয়াছিলেন। কেবল মামুদ খাঁ পরিণাম পায়।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর, অমাত্যগণ তাহার নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু মবারক খাঁকে বিচক্ষণ ও কাণ্ডাঙ্গ জানিয়া অমাত্যগণ তাহাকে বিনাশ করিবার মানসে আরব খাঁ নামক জনৈক ভূম্যধিকারীর হস্তে এক রাত্রির জন্ত সমর্পণ করিলেন; পরদিন প্রাতঃকালেই তাহার জীবন নাশ হইবে, ইহাই

স্থির ছিল। কিন্তু আরব খাঁ অমাত্যবর্গের অভিপ্রায় মবারক খাঁর নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং উক্ত রাত্রির জন্ত স্বীয় ইচ্ছা মত কাণ্ডাঙ্গ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। মবারক খাঁ সজলনয়নে বন্ধনমোচনের প্রার্থনা করিলেন এবং আরব খাঁকে যথোচিত পারিতোষিক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। দয়া পরবশ হইয়াই হটক, আর পারিতোষিকের লোভেই হটক, আরব খাঁ তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মবারক ও আরব কএকজন বন্ধু ও অনুচর সঙ্গে লইয়া নিষ্কোষিত-তরবারিহস্তে রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে সমস্ত বুদ্ধকণ্ঠই স্ব স্ব বাস-ভবনে চলিয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র কএকজন রাজ-পরিবারস্থ ভৃত্য তথায় উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিহত হইল, কেহ কেহ ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিল। মবারক খাঁ কর্তৃক তদীয় দ্রাহুপুত্র ও কারাবদ্ধ হইল।

তদনন্তর মবারক খাঁ রাজসিংহাসনে অধিরোধ করিয়া সামন্তগণের নিকট এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, আমার দ্রাহুপুত্রের নাবালক অবস্থায় আমিই রাজকাৰ্য্যের ভার গ্রহণ করিব, যাহারা আমার নিকট অধীনতা স্বীকার-পূর্বক শরণ লইবেন, কেবলমাত্র তাহারাই স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। সামন্তগণ দেখিলেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছে। অতএব এখন বশুতা স্বীকার ভিন্ন অন্য উপায় নাই ভাবিয়া সমস্ত সামন্তগণ একে একে উপস্থিত হইয়া সেলাম করিয়া করজোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রমে তাহার নামে মুদ্রা প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিল। মবারক খাঁ এখন মবারক শাহ নাম গ্রহণ করিয়া রাজকাৰ্য্য পণ্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

মবারকশাহ (সৈয়দ), সৈয়দবংশীয় দিল্লী সম্রাট্। খিজিব খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মবারক মৈজুদ্দীন আবদুল ফতে মবারক শাহ উপাধি ধারণপূর্বক ১৪২১ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে অধিরোধ করেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই লাহোর ও দিপালপুরের শাসনভার মালিক রজবের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন। এই সময় পঞ্জাবে গকর জাতি অত্যন্ত প্রতাপাধিত হইয়া উঠে। ইহাদের নেতা যশোরাজ ঠট্ট প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিয়া জন্মতে উপস্থিত হন। এখানে কাশ্মীররাজ আলি শাহকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া তিনি সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইবার আশায় দিল্লী-আক্রমণার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লাহোর অবরোধ করিয়া মোগল-শাসনকর্ত্তা জিরাকখাঁকে শুল্লাবদ্ধ করিলেন। ইহার পর গকরগণ সরহিন্দ আক্রমণ করিয়াছিল।

তদনন্তর সম্রাট মবারক শাহ সসৈন্তে দিল্লী হইতে সর্ব-  
হিন্দে আগমন করেন। তাঁহার আগমনবার্তাশ্রবণে যশরথ  
নগর পরিত্যাগপূর্বক লুধিয়ানায় পলায়ন করিলেন। এই অব-  
সরে জিরাক খাঁও কারাগার হইতে পলাইয়া মবারক শাহের  
সহিত মিলিত হন। ১৪২১ খৃঃ অব্দে ৮ই অক্টোবর তারিখে  
সম্রাটসৈন্তের সহিত গজরদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং  
এই যুদ্ধে গজরগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। যশরথ  
জাঙ্গা নদী পার হইয়া পর্বত মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন।  
মবারক শাহ মরহম উৎসব নিকটবর্তী দেখিয়া রাজধানীতে  
আগমন করিলেন।

মবারক শাহ দিল্লীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই যশরথ  
মহার নগর পুনরায় অবরোধ করেন; কিন্তু উক্ত নগরী অদৃঢ়  
প্রাচীর-বেষ্টিত এবং সুরক্ষিত হওয়ায়, ৬ মাস অবরোধেও  
তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে তিনি নগর পরিত্যাগ-  
পূর্বক কালানোরে পলায়ন করিলেন। অতঃপর তথা হইতে  
যশরথ গুরু আক্রমণ করেন এবং তথায় কোন সুবিধা  
করিতে না পারিয়া বিপাশা নদীর তীরে পুনরায় সৈন্তসংগ্রহার্থ  
গমন করিলেন। ইত্যবসরে অত্যন্ত স্থানের শাসনকর্তৃগণ  
গাহোরে আসিয়া মবারকশাহের সৈন্তদলসহ যোগদান করিল।  
এই সমস্ত বীরপুরুষগণ একত্র হইয়া যশরথের পশ্চাৎ ধাবিত  
হইলে, তিনি ভীত হইয়া পূর্ববৎ পর্বতগুহায় আশ্রয় লইলেন।  
এইবার গজরগণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল এবং উজির মালিক  
সেকন্দর কালানোরে উপস্থিত হইয়া শত সহস্র নেতৃহীন  
গজরকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু যশরথ এমনই উত্তমশালী  
বীর ছিলেন যে, সম্রাটের সৈন্ত ফিরিয়া আসিতে না আসিতে  
তিনি আবার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অনানু বার  
হাজার সেনা সঙ্গে লইয়া তিনি গুরু রাজা ভীমরায়কে  
নিহত এবং লাহোর ও দিপালপুর প্রদেশ উৎসাদিত  
করিলেন। মালিক সেকন্দর তাঁহার অত্যাচারের প্রতি-  
বিধান হেতু অগ্রসর হইতেছেন, জানিতে পারিয়াই পুনরায়  
তিনি লুণ্ঠিত ভ্রাবাদি লইয়া গিরিগহ্বরে আশ্রয় লইলেন।

মবারকশাহের রাজত্বসময়ে যশরথ পুনঃ পুনঃ অশান্তি  
উৎপাদন করিয়াছিল। ১৪২৭ খৃঃ অব্দে যশরথ গজর পুনরায়  
কালানোর অবরোধপূর্বক মালিক সেকন্দরকে পরাভূত  
করিয়া লাহোরে দূরীভূত করেন। সম্রাট মবারক শাহ  
তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্তপ্রেরণ করিলেন বটে, কিন্তু ইহার  
পূর্বেই মালিক সেকন্দর যশরথ পরাভূত করিয়া তাঁহার  
সম্বন্ধ ধন-রত্নাদি কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

১৪২৯ খৃঃ অব্দে কাবুলের শাসনকর্তা আমীর শেখ আলি

XIV

পঞ্জাব আক্রমণ করেন। এই সুযোগে গজরগণ তাঁহার  
সহিত যোগদান করিয়া পঞ্জাবে নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে  
আরম্ভ করে। ফিরিত্তা পাঠে জানা যায়, এই ঘটনায় ৪০  
সহস্র হিন্দু বিনষ্ট হইয়াছিল। শেখ আলি যোগল-  
সৈন্ত লইয়া ইরাবতী নদীর তীর দিয়া মুলতান আক্রমণে  
অগ্রসর হইল। এখানে যোগল ও সম্রাট পক্ষে ঘোরতর  
সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পঞ্জাববাসিগণ এতাদৃশ অটল  
উত্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, যোগলেরা সম্পূর্ণ-  
রূপে পরাভূত হইল। বিজয়গুণ তাহাদের অধিকাংশেরই  
নিধনসাধন করিলেন; পলায়নের পর বাহা অবশিষ্ট ছিল,  
তাহারা বিত্তা (Jhelum) নদী পার হইতে গিয়া জলময়  
হইয়া প্রাণ হারাইল। আমীর শেখ আলি অতি অল্পবয়সে  
অহুচরবর্গের সহিত স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

১৪৩২ খৃঃ অব্দে মালিক যশরথ এবং আমীর শেখ আলি  
পুনরায় পঞ্জাব আক্রমণ করেন। এবারও কিন্তু সম্রাট-  
সৈন্তের রণকোশলে তাহাদিগকে অকৃতকার্য হইয়া প্রত্যা-  
গমন করিতে হয়। মবারকশাহ ১৪৩৫ খৃঃ অব্দে মস্কিদে  
উপাসনাকালে কয়েকজন বড়বয়সকারী গুপ্তচর কর্তৃক  
নিহত হন। তিনি সর্বশুদ্ধ ১৩ বৎসর ৩ মাস কাল রাজত্ব  
করিয়াছিলেন।

মবারিজউল মুলুক, ইদরের জনৈক শাসনকর্তা। ইহার আদি  
নাম মালিক হোসেন বামণী, সাধারণতঃ নিজাম-উল-মুলক নামে  
খ্যাত। ২য় সুলতান মুজাফর ইহাকে ইদরের শাসনকর্তৃপদে  
নিয়োজিত করেন। ইনি অত্যন্ত সাহসী বলিয়া সাধারণের  
নিকট পরিচিত। সুলতান মুজাফর নিজাম-উল-মুলককে ইদ-  
রের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করার তাঁহার উজীরগণ তাঁহার  
প্রতি বিশেষ অনুরক্তি হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত  
করিবার নিমিত্ত নিয়ত তাঁহারা ছিদ্র অন্বেষণ করিতে  
লাগিলেন।

একদিন নিজাম-উল-মুলকের সম্মুখে কোন এক ব্যক্তি  
রাণার বলবিক্রমের প্রশংসা করায় নিজাম একটা কুকুরকে  
নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে, যদি রাণা ইদরে না আহসে,  
তবে তাঁহাকে এই কুকুর বলিয়া গণ্য করি। উক্ত ঘটনা  
রাণার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি ক্রোধাক্ত হইয়া সসৈন্তে  
ইদরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাণার আগমনসংবাদ পাইয়া নিজাম-উল মুলক সুলতান  
মুজাফরকে জানাইলেন, চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্তসহ  
রাণা ইদর আক্রমণার্থ বাগরে অপেক্ষা করিতেছেন। এই  
সময়ে ইদরের সৈন্তসংখ্যা ৫ সহস্র অশ্বারোহীর অধিক নহে,

ইহার মধ্যে আবার অবিকাশই আক্ষদনগরে অবস্থিতি করিতেছিল। সুলতানের মন্ত্রিবর্গ কিছুকাল এই সংবাদ গোপন রাখিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, এক্ষণে সংবাদ গোপন করিলে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা আছে, তখন সুলতানের নিকট প্রকাশ করিলেন। সুলতান মুজাফর নিজামের সাহায্যার্থ তাহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করায় তাহারা উত্তর করিলেন যে, নিজাম-উল-মূলক অনেক সময় যথা যুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া থাকেন; অতএব বাদশাহের গুপ্তচর কর্তৃক কোন সংবাদ প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

সুলতান উজীরবর্গের পরামর্শ মত তৎকালে কোন সৈন্তই প্রেরণ করিলেন না। এদিকে রাণা সুলজিত হইয়া ইদরে উপস্থিত হইলেন। নিজাম-উল-মূলক এই সময়ে মবারিজ-উল-মূলক উপাধিধারণ করিয়াছিলেন। তিনি উপায়াত্তর না দেখিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু তাহার বন্ধুবর্গ নানারূপ উপদেশ প্রদানপূর্বক তাহাকে এতদূর দুঃসাহসিক কার্য হইতে বিরত করিলেন। তিনি ক্ষোভে ও অপমানে বিষদগ্ধ হইয়া আক্ষদনগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

আক্ষদনগর গমনকালে পশ্চিমধ্যে সুলতানের প্রেরিত সৈন্তসহ মবারিজ-উল-মূলকের সাক্ষাৎ হয়। তখন সকলে একত্র হইয়া উক্ত নগরে রাণার সহিত যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন আক্ষদনগরে সপ্তমুখ ১২০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিক সৈন্ত নগরসমীপে দুর্গমধ্যে রাখিয়া তাহারা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। রাণার সৈন্তসমূহ নগরে উপস্থিত হইলে ৪০০ মুদলমান অশ্বারোহী শত্রুসেনাদল মধ্যে প্রবেশপূর্বক তাহাদিগের নিধনসাধন করিল। এমন কি ৪০০ সৈন্ত প্রায় ২০ হাজার হিন্দু সৈন্তকে বিশৃঙ্খল করিয়া বহুদূর পর্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াও কোন ফল লাভ হইল না, কারণ রাণার সৈন্তসংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। মবারিজের বন্ধুগণ তাহাকে লইয়া আক্ষদনগর দুর্গে গমন করিলেন; তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দুর্গ শত্রুদলের হস্তগত হইয়াছে। তখন উপায় নাহ দেখিয়া মবারিজ উল-মূলক বাণিনগরে পলায়ন করিলেন।

আক্ষদাবাদের শাসনকর্তা কিয়াম উল-মূলক মবারিজ উল-মূলকের সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমধ্যে গুনিলেন, আক্ষদনগরের যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন। পরে তৃতীয় দিবসে যখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, উক্ত সংবাদ অলৌকিক। তখন মবারিজকে আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। উজ্জয়্যে রাবণপালনামক গ্রামে সমবেত হইয়া রাণার

অমুসরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন গুনিলেন, রাণা চিতোরভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তখন মবারিজ উল-মূলক পুনরায় আক্ষদনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

মবারিজ উল-মূলক ২য়, ১ম মবারিজ-উল-মূলকের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম যুসুফ। সম্রাট বাহাদুর শাহ নিজাম থাকে মবারিজ উলমূলক খ্যাতি প্রদান করেন।

মবিত (ত্রি) মব-কম্মণি ক্ত। বন্ধ।

মব্য, বন্ধ। পরশ্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ মব্যতি। লোট্ মব্যতী। লিট্ মমব্য। লুঙ্ অমব্যীৎ। গিৎ মব্যতি। লুঙ্ অমমব্যীৎ।

মশ, ১ ধ্বনি। ২ কোপ। ভাদি০ পরশ্মৈ০ অক০ সেট্। লট্ মশতি। লোট্ মশতী। লিট্ মমশ। লুঙ্ অমশীৎ।

মশ (পুং) ১ গুণ্ণু শব্দ। ২ ক্রোধ। ৩ মশক।

মশক (পুং) মশতি ধ্বনিতাতি মশ-অচ, সংজ্ঞায়াঃ কন্। ১ কাট বিশেষ। চলিত মশা। পথ্যায়—বজ্রভূণ্ড, সূচ্যাত্ত, মশক, রাতিজাগরদ। (রাজনিং)

মশক-নিবারক ধূপ যথা,—

“ত্রিফলাজ্জুনপুষ্পাণি ভগ্নাতকশিরাষকম্।

লাক্ষা সর্জরসৈচৈব বিড়ঙ্গৈচৈব গুণ্ণুলুঃ।

এতৈধুপৈর্মক্ষিকানাং মশকানাং বিনাশনম্॥”

(গরুড়পুরাণ ১৮১ অধ্যায়)

ত্রিফলা, অজুনপুষ্প, ভগ্নাতক, শিরাষ, লাক্ষা, সর্জরস, বিড়ঙ্গ এবং গুণ্ণুলু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে কাট এবং মশকের উপদ্রব শাস্তি হয়। সূক্ষ্মতর মতে মশক পঞ্চপ্রকার—সামুদ্র, পরিমণ্ডল, হস্তি-মশক, কৃষ্ণ এবং পাক্তায়। এই সকল মশকের দংশনে তাত্র কণ্ডু হয় ও দষ্টহান ফুলিয়া উঠে। পাক্তায় মশকের দংশনে দষ্টস্থানে প্রাণনাশক কাটদংশনের ত্রায় লক্ষণ হয়। দংশনহান নথরার ছিন্ন হইলে পীড়া জন্মিয়া থাকে এবং জাণ্য করে ও পাকিয়া উঠে। (সূক্ষ্মত কল্পস্থা০ ৮ অং)

২ চর্মপাত্তভেদ, স্বনামখ্যাত চর্মনিপিত স্নেহাদিপাত্ত। চামড়ার পাত্ত, ইহাতে তৈলাদি রাখা হয়। ভিস্তিরা মশকে জল ভরিয়া গৃহস্থের বাটিতে সরবরাহ করে।

৩ রোগবিশেষ, চলিত আঁচিল, হিন্দী মাশা। এই রোগের নিদান—মুগ্ধ শরীরে মাষকলায়ের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ শরীর হইতে ঈষৎ উন্নত, বেদনাবিহীন চিরস্থায়ী যে ত্রণ দেখা যায়, তাহাকে মশক কহে। (সূক্ষ্মত নিদানস্থা০ ১৩ অং)

“আবেদনং স্থিরকৈবল্যং যত্নগাজে প্রদৃশ্যতে।

মাষবৎ কৃষ্ণমুৎপন্নং মলিনং মশকং দিশেৎ॥” (ভাবপ্রং)

মশকরোগ হইলে শত্রুবারা উহা কাটিয়া ফেলিতে হইবে,

পরে ঐ ক্ষতস্থান ক্ষার বা অম্ল দ্বারা পোড়াইয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে এ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

“চর্মকালঃ জতুমণিঃ মশকাংস্তিলকালকান্।

উৎকৃতা শরৎকালে দহেৎ ক্ষারান্নিত্যামশেষতঃ ॥” (ভাবপ্রঃ)

মশকস্থানে লণ্ডনচূর্ণ ঘষিয়া দিলে উহা আরোগ্য হয়।

“লণ্ডনান্নিত্য চূর্ণস্ত ঘষৌ মশকনাশনঃ।” (গরুড়পুঃ ১৭৫অঃ)

৪ গার্গাগোত্রাপত্য জনৈক আচাৰ্য্য। ৫ শাকদ্বীপের অন্তর্গত ক্ষত্রিয়ের বাসভূমি।

**মশক,** (মশক) অথকের (Assakeni) রাজধানী।

**মশক,** স্বনামপ্রসিদ্ধ কাটাবিশেষ। (Mosquito) সাধারণতঃ

মশক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, ডাঁশ (Gnat) এবং ডাঁশ-জাতীয় পোকাবিশেষ। ইহাদের একটা হল আছে; তদ্বারা ইহারা অত্যন্ত প্রাণিগণকে দংশন করিয়া থাকে। মশকদংশন বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক; তাহার কারণ ইহারা হলবিন্দু ক্ষতস্থানে এক প্রকার বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাতেই যন্ত্রণা হয়।

অত্যন্ত অনেক প্রকার পোকা ডাঁশশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মশক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমেরিকা মহাদেশে সিমুলিয়াম্ (Simulium) শ্রেণীভুক্ত এক প্রকার মশক আছে, ম্যাক্কোয়ার্ট সাহেব এই শ্রেণীর মশক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইহাদের চক্ষু গোলাকার, ডানা প্রশস্ত। মস্তকস্থিত কেশরগুলি গোলাকার এবং ১১টি স্থানে যুক্ত। পদের চতুর্থ ষোড়শী অতি ক্ষুদ্র ও লম্বমান।

ইহারা ভূগাদির পত্ররস ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে, কিন্তু সুযোগ পাইলে ডাঁশের ত্রায় মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীর রক্ত-পানও কবিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র প্রাণী নিয়তই ইতস্ততঃ আকাশপথে বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং ভ্রমণকালে সম্মুখের পায়ের তালুদেশে দাঁত করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। উহারা সম্মুখের পদদ্বয় দ্বারা স্পর্শজ্ঞান লাভ করে।

জনৈক আনোবাসী পণ্ডিত মশক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন;—পুং-মশকগুলির সহিত জীজাতীয় মশকের কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পুং-মশকের দেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং রং অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের মস্তকে কেশর আছে। পরস্পরপরিপোষ্যোগী অঙ্গ অর্থাৎ মনুষ্যরক্ত ও পত্ররস শোষণ জন্য হৃদয় ও গুণবিশেষ থাকা সত্ত্বেও ইহারা অত্যন্ত ভীকরভাব। ইহারা কদাচিত্ মনুষ্যের আবাসে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে দংশন করিয়া থাকে; প্রায়ই লোকালয়ে প্রবেশ করে না। পায়খানা প্রভৃতি অপরিষ্কার স্থানে এবং জলদিশ অথবা জলাভূমে ইহারা থাকিতে ভালবাসে। জীজাতীয় মশকগুলি অধিকতর

সাহসী, এই নিমিত্ত ইহারা লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য-দিগকে দংশন করিয়া বিষম যন্ত্রণা দিয়া থাকে। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে ইহাদের অধিক প্রাচুর্য্য হয়।

পুং-মশকের অপ্রশস্ত মস্তকোপরি অক্ষট্রাকার চক্ষুদ্বয় শোভা পায়; উহাদের ২টী পুট প্রায় সামান্যলিত থাকে। সম্মিলন-স্থলে অতাব মনোহর কেশর দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তকস্থিত পুট ২১ মিলিমিটার পরিমিত। ইহা শৃঙ্গবৎ পদার্থে নিষ্পত্ত। ইহার বহিঃভাগ দেখিতে গোলাকার। পুং ও স্ত্রী মশকের কেশর সমান দীর্ঘ। পুং-মশকের কেশর ১.৭৫ মিলিমিটার লম্বা এবং ১৪টি ষোড়যুক্ত। তন্মধ্যে ১২টি ছোট ছোট এবং প্রায় সমদীর্ঘ, কিন্তু অবশিষ্ট ২টি অপেক্ষাকৃত অধিক দীর্ঘ ও সমানাকার। স্ত্রী-মশকের ১৩টি মাত্র ষোড় আছে। সমস্ত গুলির দৈর্ঘ্য সমান; ইহাদের প্রত্যেকের গোড়ায় গুল্লবক ১০-১২ গাছ লোম বিস্তারিত আছে। পুং ও স্ত্রী এই উভয় জাতীয় মশকেরই হৃদয় কেশর-সমূহ সর্বদাই স্বেদন দ্রবিত থাকে।

পুটের বহিঃভাগস্থ ও অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর মধ্যবর্তী স্থান এক প্রকার অসচ্ছ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ; ইহার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ডিম্ববৎ পদার্থ আছে। এই ডিম্বাকৃত পদার্থগুলি উচ্চ প্রাণীর দেহস্থিত মেদের ত্রায় কাৰ্য্য করিয়া থাকে। স্ত্রী-মশকের গঠনও পুরুষের মত, কিন্তু ইহাদের পুট (Capsule) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর এবং স্ফীকোপে দ্রবভী কেশরগাছটি অতিশয় থলুকাতি। স্ত্রী ও পুরুষ মশকের শুণ্ডে কোন বিশেষ বিভিন্নতা দেখা যায় না। কিন্তু উভয়ের পায়ের সংখ্যা সমান হইলেও অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্ত্রীমশকের পদগুলি ক্ষুদ্র; কিন্তু পুরুষের পদ ২.৭৩ মিলিমিটার লম্বা এবং শুণ্ড ২.১৬ মিলিমিটার দীর্ঘ এবং অগ্রভাগ উদ্ধদিকে বক্র।

মশকের শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে জীবতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাদের মস্তক যেরূপ ক্ষুদ্র এবং তত্বেই যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয়, তাহাতে শ্রবণোপযোগী অঙ্গ থাকা সম্ভব হয় না; অতএব নিশ্চয়ই অত্ৰ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহাদের শ্রবণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। মস্তকোপরি পুটদ্বয়ের অবস্থাত দেখিয়া সহজে অনুমান করা যায় যে, স্বেদন ইহাদের শ্রবণ-েন্দ্রিয়ের কার্য্যনির্বাহ করিবার নিমিত্ত ইহাদিগকে এই অঙ্গ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই অঙ্গের শিরা, ধমনী ইত্যাদি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, ইহাতে বাস্তবিক শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসম্পন্ন হয়।

পুং-মশকের মস্তকেই এরূপ গুট দৃষ্ট হয়; ইহার তাৎ-  
পর্য্য এই যে, পুং-মশকের শ্রবণশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক  
হইয়া থাকে। তাহার কারণ প্রকৃতির নিয়মামুসারে পুরুষই  
সর্বত্র জীব অন্বেষণ করিয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টি-  
রক্ষার নিমিত্ত তমসাময়িক নিশাকালে জীবমশকের অন্বেষণার্থ  
শুন শুন শব্দ শ্রবণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বোধ হয়, এই  
নিমিত্তই সেই সর্বত্র বিধাতা ইহাদিগকে এতাদৃশ শুনিবার  
ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। আরও দেখা যায়, রাত্রিকালে  
পুং-মশকগুলিকে ধরিতে অধিক কষ্ট হয়। ইহা দ্বারা  
স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইহাদের শ্রবণশক্তি অধিক।

হৃদয়রূপে পধ্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, জীবমশকের  
কেশরগুলি দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে, কারণ ইহাদের পদ  
অতি ক্ষুদ্র; অপরন্তু কেশরগুলি শুণ্ডের সমান দীর্ঘ এবং  
সতত দোঁলমান। কিন্তু পুং-মশকগুলির দীর্ঘ পদ দ্বারাই  
স্পর্শকাণ্ড সম্পন্ন হয়। মশা উড়িবার সময় ভূ-তন শব্দ  
উৎপন্ন হয়, তাহা উহাদের মুখনিঃসৃত শব্দ নহে। ঘন ঘন  
পদ সঞ্চালনেই এরূপ শব্দ সমুৎপন্ন হয়।

বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ মশকের দংশন-বিষ হইতেই  
ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।

[ ম্যালেরিয়া দেখ। ]

- মশককুটী (স্ত্রী) মশক সম্বন্ধার্থ চামরভেদ।  
মশকজন্তু (স্ত্রী) মশক-বিতাড়ন।  
মশকবরণ (স্ত্রী) মশা তাড়াইবার নিমিত্ত চামরবিশেষ।  
মশকহরী (স্ত্রী) মশকঃ হরতীতি হ্র- (হরতেরমুদ্যমেনহ্।  
পা ৩২১২) ইতি অচ। মশকনিবারক প্রাবরণ বিশেষ,  
চলিত মশারি, পর্যায়—চতুর্কী। (জটাধর)  
মশকাবতী (স্ত্রী) ১ নদীভেদ। ২ সাগরভেদ।  
মশকিন্ (পুং) মশকাঃ সম্বন্ধার্থমিতি মশক-ইনি। উদ্ভিদ-বৃক্ষ।  
মশচ্ছদ (পুং) শুষ্কভেদ (Andropogon Serratus)।  
মশার্ণব, অথেনবর্ণিত রাজভেদ। (অঙ্ক ১১২২১৫)  
মশহরী (স্ত্রী) মশকহরী, চলিত মশারি।  
মশা (দেশজ) মশক।  
মশান (দেশজ) মশান, সমাধিস্থান, প্রেতভূমি।  
মশান, বঙ্গদেশে প্রবাহিত গণ্ডক নদীর একটি শাখা।  
সোমেশ্বরপর্যন্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া চম্পারণ জেলার মধ্য  
দ্বারা সোমেশ্বর হ্রদের সম্মুখে দক্ষিণাভিমুখে গণ্ডকের সহিত  
মিলিত হইয়াছে। পরে পূর্বাভিমুখে দ্বীনদীর জলধারা প্রাপ্ত  
হইয়া কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার জলে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র-  
সমূহ জলসিক্ত হইয়া থাকে। এই নদী প্রায়ে অতিশয়

বিস্তীর্ণ। নদীগর্ভ বালুকাময় হেতু বজা ও বর্ষার সময় জলপূর্ণ  
হয়, কিন্তু অপর ঋতুতে শুষ্কদলিল হইয়া পড়ে।

মশাল (আরবী) দেউলী, দীপ। ধূনা ও তৈল একত্র অগ্নিতে  
উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে কাপড় ভিজাইয়া একটি কাটিতে  
জড়াইলে মশাল প্রস্তুত হয়। ২ আলোকদণ্ড। ৩ রংমশাল  
প্রভৃতি অগ্নিক্রীড়োপকরণ।

মশারি (দেশজ) মশক-নিবারণের জন্য প্রাবরণবিশেষ।  
মশহরী শব্দের অপভ্রংশ।

মশালচী (আরবী) দ্বাধারা মশাল ধরে। বাতিদার।  
মশুন (পুং) মে সময়ে স্বরতি বর্ধিতে ইতি শি-বাহু-  
নক্, ততো নিপাতনাৎ সাধু। কুজুর। (শব্দমালা)

মশুরি (মসৌরি), বৃক্ষ(উত্তর-পশ্চিম)প্রদেশের দেওয়ান।  
অন্তর্গত একটি নগর। এখন ইহা পার্শ্বত্যা স্বাস্থ্যনিবাস  
গণ্য। অক্ষা° ৩০°২৭'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৬' ৩০" পূঃ।  
হিমালয়ের পূর্বদেশে পার্শ্বত্যা-সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিত হওয়ায় ইহার  
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম। মশুরির পার্শ্বত্যা-  
লন্দোর নামক স্থানে একটি সেনাবাস স্থাপিত আছে।  
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৭৪৩০ ফিট উচ্চ। গ্রীষ্মকালে  
নানাদেশ হইতে স্বাস্থ্যলাভার্থ বহুলোক এখানে উপস্থিত হন।  
এখানে খুঁদানদিগের গির্জা, ৪৫টি বিজ্ঞান, সাধারণ পুস্তকা-  
লয় প্রভৃতি রহিয়াছে। গবর্ণমেন্টকৃত উদ্ভিজ্যোত্মান  
(Botanical garden) এখানকার মিউনিসিপালিটির  
কর্তৃদ্বারাধীনে রক্ষিত। এখানে হাসপাতাল আছে।

মশোত্রা, পঞ্জাবের কোথি রাজ্যের অন্তর্গত একটি পরগণা ও  
তাহার পাদদেশস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ৩১° ৮' উঃ  
এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৭' পূঃ। দিমলা হইতে অতি অল্পদূরে  
অবস্থিত। মশোত্রা সামান্য গণ্ডগ্রাম হইলেও গ্রীষ্মকালে দিমলা  
হইতে অনেক দূর হইতে আসিয়া থাকেন।

মশোরি, পাটনা জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। ভূপরি-  
মাণ ১২৫ বর্গ মাইল। এখানে একটি থানা আছে।

মষ, বধ। ভাদি° পরশ্বৈ স্ক° সেট্। লট্ মষতি।  
লোট্ মষতু। লিট্ মমষে, মেমতুঃ মেমুঃ। লুঙ্ অমষীৎ।  
গিচ্ মষরতি। লুঙ্ অমীমষৎ। বঙ্ মামমযতে, বঙ্ লুক্  
মামমযতি।

মষরাণ (স্ত্রী) স্থানভেদ। ইহার মষরাণ পাঠও দেখা যায়।  
মষিকুপী (স্ত্রী) মষেঃ কুপ ইব মষিকুপ অম্মার্থে ভীৎ।  
মত্ভাধার, দোয়াত। (হেম)

মষিধান (স্ত্রী) ধীরতেহ্মমিতি ধা অধিকরণে লুট্, মষেধানঃ  
স্থানং। মত্ভাধার। (হেম)

মধীলেখ্যাদল (পুং) মধীভিলেখ্যং লেখনযোগ্যং দলং  
যন্ত। ত্রীতাল বৃক্ষ। (রাজনিং)

মম্বার (ক্রী) তাথভেদ।

“মৃগান্ গুরুদতঃ কৃষ্ণান্ হিরণ্যেন পরীকৃতান্।

অদাং কশ্মণি মম্বারে নিযুতান চতুদশ ॥” (ভাগবত ৯২.০১৮)

‘মম্বারে তাথে’ (স্বামী)। ২ স্থানবিশেষ।

মস্, ১ পরিমাণ। পারণাম। দিবাদি পরশৈ স্ক\* সেট্।

নিঠায়মানট্। গট্ মম্বতি। লোট্ মম্বতু। লুঙ্ অমসং,  
অমাসীং, অমসং।

মস্‌লন্দ (আরব) ১ সিংহাসন। ২ রাজার শ্রায় ধনাঢ্য-  
ব্যক্তিদিগের বসিবার বিছানা।

মস্‌লিন্, জগৎপ্রসিদ্ধ হস্ত ও সূচিকণ কার্পাসবস্ত্র। বস্ত্র-  
মান মলমল্ নামক হস্ত বস্ত্রাপেক্ষাও কোমল ও মৃদু।  
ইংরাজবণিকগণ মাল্‌জাপ্রেসিডেন্সীর মছলীপত্তন-বন্দর  
হইতে পূর্বে মস্‌লিন্ লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস,  
মছলী বা মসলী অথবা অপভ্রংশ মসলিয়া শব্দ হইতে স্থান-  
মাহাত্ম্যজ্ঞাপনার্থ এই হস্তবস্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। আবার  
কেহ কেহ বলেন যে, তুকের জলতান বা প্রাচীন খলিফা-  
গণ স্ব স্ব ভোগসুখ চরিতার্থ করিবার জন্ত বহু পুস্কাল  
হইতে এই হস্ত ও সূচিকণ বস্ত্র শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি পরিচ্ছদ-  
রূপে ব্যবহার করিতেন। যখন সাতশী ও বন্দরে বাঙ্গালার  
বাণিজ্যপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন মুসলমান বণিকগণ ঢাকা-  
জেলার প্রস্তুত প্রসিদ্ধ মলমল্ বস্ত্র তুকের রাজধানী মোসল  
নগরে লইয়া যাইত। পরে ঢাকার তত্ত্ববায়সমিতির অবনতি বা  
হ্রাস-নিবন্ধন হইতে, আর পটুগীজাদি জলদস্যুর প্রভাবেও  
হইতে, অথবা সাতগাঁওর বাণিজ্যপ্রভাব বিলোপের হইতে,  
ঢাকাই-মলমল্ বস্ত্রের প্রচলন কমিয়া যায়। সেও সময়ে  
মৌখিন্ তুর্কগণ মোসলনগরে তাদৃশ হস্ত মলমল্ বস্ত্রবয়নের  
চেষ্টা করে। ক্রমে মোসলের হস্ততম কার্পাসবস্ত্রগুলি মোস্-  
লিন্ বা মসলিন্ আখ্যায় অভিহিত হয়।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দির প্রথমে একমাত্র ভারতবর্ষ হই-  
তেই সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন্ বস্ত্র যুরোপে রপ্তানী হইত। তৎপরে  
প্যালাগী, মাকেষ্টার ও মাসগো-তত্ত্ববায়সমিতির যত্নে সেই সেই  
স্থানে উৎকৃষ্ট মসলিন্ প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে  
ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডে মসলিন্ বস্ত্রের হতানিয়াণ  
জন্ত একমাত্র রমণী ও বালিকাদিগের পারিশ্রমিক স্বরূপ ৬০  
লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

পূর্বে ভারতে যে মসলিন্ বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার সূতা  
বিলাতী মসলিন্ অপেক্ষা দৃঢ় হইলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত

না। কারণ তৎকালে এখানে টাটকা কাপাস আনিয়া যে  
সূতা প্রস্তুত হইত, তাহা হিংগের যন্ত্রনিষ্পিষ্ট কাপাসসূত্র  
হইতে অনেকাংশে নিকট ছিল। ভারতীয় বস্ত্রের উৎকৃষ্ট  
খ্যাতি কেবলমাত্র এখানকার তত্ত্ববায়গণের যত্ন ও কার্য-  
কুশলতার ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। এখানকার  
তত্ত্ববায়গণ সূতা পাট করিতে জানে। এত কারণেই তাহা-  
দের বস্ত্রবয়নখ্যাতি আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

ভারতের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ ঢাকা জেলার তত্ত্ববায়-  
সমিতি বিশেষ পারিপাট্যের সহিত সূচিকণ মসলিন্ বস্ত্র  
প্রস্তুত করিত। এমন কি, শিশিরসিক্ত মসদানে ঘাসের  
উপর উহা বিছাইয়া রাখিলে প্রাপ্ত সেতস্থানে মসলিন্ আছে  
বলিয়া উপলব্ধি হইত না। জনৈক যুরোপীয় কবি উক্ত বস্ত্রকে  
বায়ুর জাল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।\*

মস্ক (পুং) মস্ততে পরিমায়তেন্দ্রো মস-কশ্মণি ব, অম্মার্থে  
কন্। ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, চলিত মাসা। [ মস্ক দেখ ]

মসট, কালকাতার দক্ষিণে হিত একটি গ্রাম। বালাগঞ্জ  
ও গড়িয়া নগরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। এখানে প্রাপ্ত বৎসর পৌষ-  
মাঘে মুসলমান-সাধু মাণিকপীরের উদ্দেশ্যে তিন দিন একটি  
মেলা বসিয়া থাকে। নিকটবর্তী হিন্দু ও মুসলমানগণ মেলার  
সময় মাণিকপীরের পূজা দিয়া থাকে।

মসন (ক্রী) মস্ততে ইতি মস-লুট্। সোমরাজী বৃক্ষ।

মসমস্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ।

মসরা (ক্রী) মস বাহুলকাৎ অরচ্ স্মিয়াং টাপ্। মসুর।

মসাদন ডিহি, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের গাজপুর জেলার অন্ত-  
গত একটি প্রাচীন গওগ্রাম। গাজপুর সদর হইতে ১২ ক্রোশ  
পশ্চিমে গঙ্গার উত্তরকূলে অবস্থিত। এই নগর এক্ষণে ব্রীজিষ্ট  
ও জন সাধারণ কষ্টকর পরিত্যক্ত হইলেও প্রাচীন কীৰ্ত্তিগুলি  
স্থূপাকাবে পরিণত। ঐ স্থূপটা ১৫০০ × ১০০০ ফিট্। উহার  
অন্তগত একটি ভগ্নমন্দিরসংলগ্ন প্রতিমূর্ত্ত্যাজ্ঞাখোদিত লিপি  
হইতে এই স্থানের প্রাচীন নাম ‘কেলুলেন্দ্রপুর’ জানা গিয়াছে।

এতদ্বিন্ন বৃন্দপুর ও জোহরগঞ্জের নিকটে (মসাদন ডিহি  
হইতে অর্ধকোশ দক্ষিণে) বঞ্জাবান নামক স্থানের ক্ষংসাব-  
হইতে বৌদ্ধগণের কতকগুলি মূর্ত্তা ও মৌধ্য অক্ষরমালা  
উৎপাদিবিষয়ক উপকরণাদি পাওয়া গিয়াছে। এখান হইতে

\* “Some of the muslims of India, and especially  
those of Dacca, are of the most astonishing degree of  
fineness, so as to justify their poetical description as  
webs of woven wind.”

Eng. Cyclo. Art & Sc. Vol III, p. 851.



দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গা নদীর খেয়া নামক উচ্চ ভূমিতে কতকগুলি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ইত্যদ্যতঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। এই স্থানের প্রাচীন নাম ধনপুর। এখানে মৌর্য অক্ষরে লিখিত রাজা ধনদেবের তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

মসার (পুং) মস-ভাবে কিপ্, মসং পরিমাণং ঋচ্ছতীতি ঋ অণ্। ইন্দ্রনীল মণি। (শব্দরত্নাং)

“চকান্তি বিন্দুচ্ছতকান্তিচাতুরী

ঘনাস্ত্রবিন্দুস্তিতিকৈতবাস্তব।

মসারভারাক্ষি মসারমাংসনা

তনোষি সংসারমসংশয়ং যতঃ ॥” (নৈষধচ. ৯।১০৪)

মসার, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। আর্য হটতে ৬ মাইল পশ্চিমে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের দক্ষিণে অবস্থিত। চৌনপরিভ্রাজক হিউএন্সিয়াং এই স্থান পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই স্থান মোহো-শোলো (মহাসার) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামে এই গ্রামটী গঙ্গা নদীর বড়ী বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহার ৯ মাইল উত্তর দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত দেখা যায়। পূর্বে এইস্থান দিয়া যে গঙ্গানদী প্রবাহিত ছিল, তাহার প্রাচীন খাত অদ্যপিও বিদ্যমান আছে। এখানকার পার্শ্বনাথের মন্দিরে ৭ খানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, মসারের প্রকৃত নাম ‘মহাসার’। এই স্থানের প্রাচীন নাম শোণিতপুর, প্রবাদ ইহাই বাগানুরের বাসভূমি। এখানে উষা দেবীর সাহিত শ্রীকৃষ্ণপোএ অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়। এহ স্থানের অপর একটি জৈন-মন্দিরে অনেক হিন্দু-দেবদেবীর প্রতিমূর্তি ও ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রামের পশ্চিমদিকস্থ ইষ্টকস্তূপ মধ্যে কতকগুলি বৌদ্ধপ্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ গুলি চেরুসাজ-বংশের কার্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন এখানে অনেকগুলি স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী আছে। এখানকার ধ্বংসাবশেষ হইতে একটি প্রকাণ্ড মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, উহা আর্য নগরের সরকারী উদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে।

মসারক (পুং) মসার স্বার্থে কন্। ইন্দ্রনীল মণি। (শব্দরত্নাং)

মসালী (আরবী) ১ কায়া। ২ উপকরণ। ৩ সূখ্যাতি। ৪ ব্যঞ্জনাদিতে প্রদেয় হরিদ্রাদি।

মসাহং (আরবী) ১ ভূম্যাদির পরিমাণ। ২ জ্যামিতি।

মসাহরা (আরবী) ১ মাসিক বেতন, মাহিয়ানা। ২ বৃত্তি।

মসি (পুং স্ত্রী) মস্ততে পরিণমতে হতি মস্-(বহুলমস্ত-ভাঃ) ইন্। উণ্ ৪।১১৭ ইতি ইন্। লিখিব্যার কালি, লিপি-প্রয়োজন, লেখনদ্রব্য। পণ্যায়—মসিজল, পত্রাঞ্জন, মেলা,

কালি, অঞ্জন, মসী, রঞ্জনী, মলিনাষু, মণী। (হেম) ২ শেকালিকাবৃত্ত। (শব্দরত্নাং)

মসিক (পুং) সর্পবিবর।

মসিকা (স্ত্রী) শেফালিকা। ইহার পাঠান্তর ‘মলিকা’ এই-রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

মসিকূপী (স্ত্রী) মস্তাধার।

মসিজল (স্ত্রী) লিখিব্যার কালি। (ত্রিকাং)

মসিধান (স্ত্রী) মসেধানং আধারঃ। মস্তাধার। (শব্দরত্নাং)

মসিধানী (স্ত্রী) মসেধানী। মস্তাধার, চলিত দোয়াত। পণ্যায়—মসিমণি, মেলাঙ্ক, বর্ণকূপিকা, মেলানন্দা, মেলাষু, মসিধান, মসিকূপী, মসিকূপিকা। (জটায়ুর)

মসিদ (আরবী) মসজিদ।

মসিন (স্ত্রী) মস্ততে পরিণমতে গণনয়েতি মস্-(বহুলমস্ত-ভাঃ) আপি। উণ্ ২।৪৯ ইতি ইনচ্। সপিণ্ডক। (উজ্জল)

মসিনা (দেশজ) স্নানমথ্যাত শস্ত্বেদ। [মসীনা দেখ]

মসিপণ্য (পুং) মসিঃ কালিপণ্যমস্ত। লেখক। (ত্রিকাং)

মসিপথ (পুং) লেখনী, কলম।

মসিপ্রসূ (স্ত্রী) মসং প্রকষণে হতে উদ্ভিন্নতীতি প্র-সূ-কিপ্। ১ মস্তাধার। (হারাবলী) ২ লেখনী।

মসিমণি (স্ত্রী) মস্তাধারো মণিরিবোত। মস্তাধার।

মসিবন্ধন (স্ত্রী) মসিং বন্ধনতীতি বৃদ্ধ-গচ্-ল্যু। রসগন্ধ।

মসী (স্ত্রী) মসিকৃদিকারাদতি ভীষ্। কালী।

“তদাত্তনিয়েন্মদলীকজ্জগশো মসীময়ং সল্লিপিরূপভাগিব।”

(নৈষধচরিত ৯।৬৩)

মসীজল (স্ত্রী) মস্তাজলং, রাহোঃ শির ইতিবৎ অভেদে যজ্ঞী। মসী, কালি। (ত্রিকাং)

মসীজীবিন্ (ত্রি) মসী-জীব-গনি। বাহার্য্য মসী দ্বারা জীবিকা নিব্বাহ করে।

মসীধানী (স্ত্রী) মস্তাঃ ধানী পাত্রঃ। মস্তাধার। (ত্রিকাং)

মসীনা (স্ত্রী) মস্-(বহুলমস্ত) আপি। উণ্ ২।৪৯ ইতি ইনচ্, পৃষোদরাদিত্যাদীর্ঘঃ জিহ্বাং টাপ্। স্নানমথ্যাত শস্ত্বে বিশেষ (Linum usitatissimum)। [তিসি দেখ।]

“মসিনা চাতঙ্গী চিহ্না কুমোমামালিকা মিতা ॥” (শব্দচ.)

মসাহা কৈরানবী, অনেক মুসলমান কবি। ইহার প্রকৃত নাম সাজ্জা। সম্রাট অকবর শাহের সভায় বিদ্যমান থাকিয়া ইনি অযোধ্যাধিপাত রামচন্দ্রের পত্নী সীতা দেবীর উপাখ্যান অবলম্বনে একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন।

মসুর (পুং) মস্ততে পরিণমতে হসৌ-মস্ (মসেচ্চ। উণ্ ১।৪৪) ইতি উরন্। মসুর কলার। (ত্রিকাং)

মসুদ (স্ত্রী) মস্ততি পণ্যভেন পরিণমতাত্ত্বাবিত্তি মসু-উরন  
স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ বেণী। ২ ব্রীহিভেদ। (মেদিনা)

মসুদ খাঁ, মালবের জৈনিক মুসলমান রাজা। সুলতান  
হোসেনের পুত্র। ১৪৩৫ খৃঃ অব্দে সুলতানের উজীর মালিক  
মোঘার পুত্র মহম্মদ খাঁ বিষপ্রয়োগে অত্যন্তম যুবরাজ গজনী  
খাঁর প্রাণসংহারপূর্বক স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন।  
এই সংবাদে যুবরাজ মহম্মদ খাঁ মালব পরিত্যাগপূর্বক গুজ-  
রাতরাজ সুলতান আফ্রদের নিকট আশ্রয়লাভের জ্ঞা-  
গমন করিলেন। তদনুসারে সুলতান আফ্রদ মহম্মদ খাঁর  
পক্ষ হইয়া মালবাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন। শারঙ্গপুরে  
পৌছিয়া তিনি মহম্মদ খাঁর বিরুদ্ধে কয়েক জন বিশ্বস্ত ও  
বহুদলী কাম্যচারীর অধানে এক দল সেনা প্রেরণ করিলেন।  
খাঁ জহান (মালিক মোঘী) এই সংবাদ জানিতে পারিয়া  
ক্রুদ্ধগতিতে মানুহুর্গে আশ্রয় লইলেন। গুজরাত-রাজ ও  
ইত্যবসরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন  
দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া তিনি শত্রুসেনার আক্রমণ ব্যর্থ  
করিতে লাগিলেন। অতঃপর উভয়পক্ষীয় সেনাসমূহ সম্মুখ  
সমরে প্রবৃত্ত হইল। আফ্রদ শাহ খাঁর পুত্র মহম্মদ খাঁর  
অধিনায়কতায় পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া  
শারঙ্গপুর অধিকার করিলেন।

মহম্মদ খিলজি দেখিলেন যে, দুর্গ মধ্যে থাকিয়া বিশেষ  
কোন লাভ হইবে না, অতএব তিনি তারাপুর কটক দিয়া  
বহির্গত হইয়া শারঙ্গপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথ  
মধ্যে মালিক হাজি তাহার গতিরোধের চেষ্টা করেন, কিন্তু  
অকৃতকাব্য হইয়া পলায়নপর হন।

গুজরাত-রাজ সুলতান আফ্রদ মহম্মদ খাঁকে পুনরায় মালব-  
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন;  
কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবার পূর্বেই মহম্মদ ইহলোক  
পরিত্যাগ করেন।

মসুদ (আমার সুলতান),—গজনীর সম্রাট সুলতান মাক্কুদের  
জ্যেষ্ঠপুত্র। সুলতান মাক্কুদ কনিষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে অধিকতর  
স্নেহ করিতেন বলিয়া তাঁহাকেই স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী  
মনোনীত করেন। কিন্তু মহম্মদ পাছে জ্যেষ্ঠ মহম্মদের হস্তে  
নিপীড়িত হন, এই আশঙ্কায় তিনি এক দিন মহম্মদকে  
জিজ্ঞাসা করেন,—মহম্মদ! তুমি তোমার ভ্রাতা মহম্মদের  
সহিত ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যবহার করিবে? মহম্মদ নির্ভয়-  
চিত্তে উত্তর করিল,—আপনি আপনার ভ্রাতার সহিত বৈরুপ  
ব্যবহার করিয়াছেন, আমিও ঠিক তদ্রূপ ব্যবহারই করিব।  
বাস্তবিক সুলতান কখনও স্বীয় ভ্রাতার প্রতি সদ্যবহার

করেন নাই। তাই মহম্মদের মুখে ঐরূপ উত্তর শুনিয়া সুলতান  
মনে করিলেন, যদি ইহারা উভয় ভ্রাতা এক হানে থাকে,  
তবে নিশ্চয়ই ঘোর বিবাদ ঘটাইবে, সুতরাং ইহাদিগকে  
স্থানান্তরে রাখাই শ্রেয়ঃ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জ্ঞা তিনি  
ইরাক্ জয় করিয়া মহম্মদকে তথাকার আধিপতিপদে নিযুক্ত  
করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকে মহম্মদের সহিত বিবাদ  
করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পিতার বারংবার নিষেধাজ্ঞা  
শুনিয়া মহম্মদ উত্তর করিল,—যদি মহম্মদ আমার গ্রামপ্রাপা  
সমুদায় সম্পত্তি দান করে, তবে কখনই আমি তাহার শত্রুতা-  
চরণ করিব না। উগ্র-স্বভাব মহম্মদের এই কথা শ্রবণে  
মাক্কুদ স্পষ্টই বুঝিলেন যে, গজনীর সিংহাসনলাভের আশা  
মহম্মদের মনোমধ্যে এখনও জাগরুক রহিয়াছে। ইহাতে  
সুলতান তখন বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অল্পকাল পরেই  
ইরাক্ হইতে পুনরায় গজনীতে আসিলেন, কিন্তু এখানে  
আসিয়া আর অধিক দিন রাজকাব্য করিতে পারিলেন না।  
কএক দিন পরেই তাঁহাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইল।

সুলতানের মৃত্যুর পর, তাহার ইচ্ছানুসারে মহম্মদ রাজ-  
মুকুট ধারণ করিলেন। মহম্মদ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া  
খোরাসানের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং এইখানে আসিয়া  
তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদের নিকট নিম্নলিখিত মর্মে এক  
খণ্ড লিপি প্রেরণ করেন,—‘আমি পিতৃদত্ত ইরাক্ রাজ্য  
পাইয়া সন্তুষ্ট নহি, তুমি আমার আদেশ মত আমার নামেই  
খুব্বা পাঠ করাইবো।’ মহম্মদ উক্ত প্রস্তাবে সন্মত হইলেন  
না। সুতরাং অবিলম্বে উভয় পক্ষে বিবাদ বাধিবার সূত্র-  
পাত হইল। উভয় ভ্রাতা বক্রপরিষ্কর হইয়া যুদ্ধের আয়োজন  
করিতে লাগিলেন। রাজহিতৈষিণ শাস্তিস্থাপনের চেষ্টা  
কারিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। মহম্মদ যুসুফ-  
বিন-সবক্তগিন্কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া সমরক্ষেত্রে  
অবতীর্ণ হইলেন। ৪২১ হিজিরায় নগিনাবাদে অবস্থান-  
কালে সবক্তগিন ও আমার আলি খুশাবন্দ বিদ্রোহী  
হইয়া মহম্মদের সহিত যোগদানপূর্বক মহম্মদকে নগিনা-  
বাদে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিলেন। যুদ্ধবিজয়ে আশা-  
সিত হইয়া পারিতোষিকের প্রত্যাশায় আলি খোশাবন্দ  
ও যুসুফ সবক্তগিন্ মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইলেন।  
কিন্তু ফল বিপরীত হইল, বিশ্বাসঘাতকদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া  
অমুচিত বোধে মহম্মদ আলি খুশাবন্দের কারারোধ ও সবক্ত-  
গিনের প্রাণনাশের আজ্ঞা দিলেন। অতঃপর নাগনাবাদ  
হইতে স্বচ্ছন্দমনে তিনি গজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুলতান মহম্মদ খাঁর

ভ্রাতা মহম্মদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ দয়া ও আয়তপরতার সহিত প্রজা শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে মসজিদ, বিদ্যালয় ও পাননিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি প্রত্যেক বৎসরই ভারতবাসী বিধর্মী হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতেন। এইরূপে একবার ভারতক্রমণের পর স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে তিনি নতীগিন, আলি খুশাবন্দ ও যুসুম বিন-বকুগিনের পুত্রগণ কতৃক ধৃত হইয়া তদীয় ভ্রাতা মহম্মদের নিকট সমর্পিত হন। মহম্মদ ভ্রাতাকে কারাগারে নিক্ষেপপূর্বক তাঁহার প্রাণসংহার করেন। মসূদ সন ১২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মসূদের বুদ্ধি-কৌশল ও পরাক্রম সম্বন্ধে এক অলৌকিক উপাখ্যান শুনেতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, একদা সুলতান মাক্কুদ কিরমাণের রাজ্যের নিকট বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রেরণ করেন। কিরমাণের অন্তঃপাতী খরিশ-মরু মধ্যে এক দল হরন্তু দস্যু বাস করিত। ইহাদের দলে ৮০ জন লোক ছিল। নিরাশ্রয় পথকগণের প্রতি অত্যাচার এবং তাহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করাই তাহাদের একমাত্র ব্যবসা। সুলতানের দূত একপ মূল্যবান উপহার লইয়া যাইতেছে দেখিয়া দস্যুগণ লোভসম্বরণ করতে পারিল না। তাহার সন্ধানদিগকে নিহত করিয়া সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিল। ইহার হুহ একজন মাত্র অতি কষ্টে আশ্রয়লাভ করিয়া সুলতানকে সংবাদ জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুলতান এই সংবাদ শুনিয়া বিস্ময়াবিত হইলেন। এমন সময় মসূদ হিরাট হইতে আসিয়া পিতৃসকালে উপনীত হইলেন। কিন্তু সুলতান মসূদকে কোনরূপ সম্ভাষণ করিলেন না। মসূদ অতিশয় বিনীতভাবে পিতার চরণে নিপতিত হইয়া স্রীয় অপরাধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পিতা কহিলেন,—মসূদ! তোমার মত পুত্র জীবিত থাকিতে, আমার রাজ্য মধ্যে এতদূর দস্যুবৃত্তি হইতেছে! মসূদ কহিলেন,—পিতা: আমি হিরাটে অবস্থিতি করিতেছিলাম; এই সময় খবিশ-মরুভূমে ডাকাতি হইল, তাহাতে আমার অপরাধ কি? সুলতান তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, যদি তুমি দস্যুগণকে মৃত অথবা জীবিতাবস্থায় আমার নিকট আনয়ন করিতে পার, তবেই আমি তোমার মুখাবলোকন করিব। অনন্তর মসূদ দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দস্যুদিগের অগ্নুসন্ধানে বহিগত হইলেন। তাহাদের দুর্গ-সন্ধিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, দস্যুগণ তাঁহার আগমনবার্তা শ্রবণে তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে। ইহা শুনিয়া মসূদ

তাঁহার অশ্বচরবর্গের মধ্যে ৫০ পক্ষাশ জনের প্রতি আদেশ করিলেন যে, তোমরা অস্ত্র শস্ত্র অশ্বের পৃষ্ঠস্থিত জিন মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া ছদ্মবেশে পথিকের ভ্রায় গমন কর এবং দস্যুগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগকে কোনরূপ কৌশলে ব্যাপৃত রাখিবে। মসূদ এই আদেশ দিয়া নিজে অবশিষ্ট দেড়শত সৈন্য লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। দস্যুরা অল্প সংখ্যক লোক দেখিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এমন সময় সহসা মসূদ তথায় উপস্থিত হইয়া দস্যুদিগকে বন্দী করিলেন। ৪০ জন মাত্র বন্ধনাবস্থায় সুলতানের নিকট প্রেরিত হইল; অবশিষ্ট সকলেই হত হইয়াছিল।

মসূদ, (২য় আলাউদ্দীন, সুলতান) গজনীর সম্রাট। ইহার পিতার নাম ইব্রাহিম। ১০৬১ খৃ: অব্দে গজনীনগরে মসূদের জন্ম হয়। হিন ১৭ বৎসর কাল অতিশয় আয়তপরতার সহিত প্রজাপালন করিয়া ১১১৫ খৃ: অব্দে পরলোক গমন করেন। সুলতান সঞ্জরের তগিনীর সহিত ইহার পরিণয় হয়।

সুলতান মসূদ অত্যন্ত দয়ার্জস্বদয় ও উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন; ধান্যিকতা ও আয়তপারগতা তাঁহার রাজশক্তিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

মসূদ (মালিক) গুজরাতে বাদশাহ বাহাডুর খাঁর বন্ধু। যখন বাহাডুর খাঁ মক্কুদ নগরে উপনীত হন, তখন মালিক মসূদ ও অশ্রাফ সামন্তগণ বাহাডুরের সহিত যোগদান করেন। ইহার ইমাদ-উল-মুলকের ভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক স্থানান্তরে লুক্কায়িত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। এখন বাহাডুর খাঁ ইমাদ-উল-মুলককে পরাভূত করিতে আসিয়াছেন জানিয়া মসূদ বাহাডুর খাঁর পক্ষাবলম্বন করিলেন।

মসূদ, ৩য় (সুলতান) গজনীর জটনৈক সুলতান। ইহার প্রকৃত নাম আলা উদৌলা। পিতার মৃত্যুর পর মসূদ ১৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া খৃষ্টীয় ১১১৫-১৫ অব্দে পরলোক গমন করেন।

মসূদ, (সিপা-সালার) গজনীর জটনৈক মুসলমান সাধু। হিন্দু হসলামধর্মের প্রতিষ্ঠাকালে প্রাণত্যাগ করিয়া সর্বসাধারণের পূজ্য হইয়া গিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বরাইচ জেলায় ইহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহা মুসলমানদিগের নিকট একটা পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। ভারতের পাঠান ও মোগল-সম্রাটগণ এত স্থানে উপস্থিত হইয়া সমাধির উপর উপহারাদি অর্পণ করিতেন। সুলতান ফিরোজ শাহ

১৩৭৪ খৃঃ অব্দে মসৃদের কবরস্থান পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন।

আবদর রহমন্ তিত্তিকৃত “মিরাতু-ই মসৃদী” গ্রন্থে ইহার জীবনী লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ধর্ম্মাশ্রা মসৃদ সুলতান সবক্তগণের অধানে কংগ করিতেন। অতঃপর তিনি ধর্ম্মরাজ্যের কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। গজনীপতি সুলতান মাক্কুদের আদেশানুসারে সেনাপতি সালার শাহ মুজাফর খাঁর সাহায্যার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময়ে তাঁহার পত্নী সিতরমুসল্লা তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। আঞ্জমীর নগরে সিতরমুসল্লা গর্ভে ৪০৫ হিজিরায় সালার মসৃদের জন্ম হয়, তাঁহার সৌন্দর্য ও শরীরের লক্ষণাদি দর্শনে সকলেই অস্বাভাবিক করিয়াছিলেন যে, ইনি ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ হইবেন।

সুলতান মাক্কুদ নবজাত শিশুর মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য হইয়াছিলেন এবং বহু মূল্যবান পরিচ্ছদ ও রত্ন অলঙ্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। মসৃদকে ৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন বয়ঃক্রম সময়ে মির সৈয়দ ইব্রাহিমের নিকট বিজ্ঞানভাস করিতে প্রেরণ করেন। মসৃদের এতাদৃশ অস্বাভাবিক ধীশক্তি ছিল যে, তিনি ৯ম বর্ষ বয়সেই সমস্ত বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ১০ম বর্ষে তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি তদারাবনার জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তিনি সকল বিষয়ে সুদক্ষ হইলেন। তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কের লেশমাত্র ছিল না। পাপ তাঁহার দেহ স্পর্শ করে নাই; তাঁহার পবিত্র আত্মা নিয়তই ঈশ্বরের ধানে নিমগ্ন থাকিত।

১২ বৎসর বয়সে মসৃদ রাবলের অধীক্ষর সাতুগানকে পরাভূত ও সুপরিবার বন্দী করেন। সুলতান মাক্কুদের সোমনাথ-আক্রমণকালে সালার মসৃদ ঐ স্থানে আসিয়াছিলেন এবং মন্দিরস্থিত অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া স্বদেশে বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন।

এইরূপে সালার মসৃদ ক্রমশঃ মাক্কুদের অভ্যস্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন দেখিয়া তাঁহার উজীর থুজা হসান মৈমন্দীর হৃদয়ে হিংসানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। উজীর স্বীয় কর্তব্যকাণ্ডে নানারূপ ঔদাস্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এই নিমিত্ত রাজ্য মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। মাক্কুদ দেখিলেন, উজীরকে সন্তুষ্ট না রাখিলে কিছুতেই স্বীয় রাজকাণ্ড সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইবে না, অতঃপর সালার মসৃদকে অন্তরালে রাখাই তিনি শ্রেয়স্কর মনে করিলেন। তদনুসারে সালার মসৃদ কিছুদিনের জন্য তাঁহার পিতার

আবাসে বাইয়া অবস্থিত করিতে আদিষ্ট হইলেন। ক্রুদ্ধচিত্তে স্বদেশবাসীকালে তিনি সুলতানের মুখে রাজ্যহুগ্ৰহণভের প্রতিশ্রুতি শুনিয়াছিলেন।

সেনাপতি সালার শাহ এই সংবাদ শ্রবণমাত্র কাবুল নগর হইতে সন্ন্যাস মসৃদের শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং সজলনয়নে মসৃদকে তাঁহাদের সহিত অবস্থিত করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু মসৃদ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। মসৃদ সুদক্ষ সৈন্য ও কয়েকজন পারিষদ সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিদ্ধনদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তিনি স্বীয় সহচর মধ্যে দুইজন আমীরকে ৫০ হাজার অগারোহী সৈন্য লইয়া সিদ্ধনদীর পরপারস্থ প্রদেশ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। আমীরদ্বয় তদনুসারে তথাকার রাজা অজুনরায়ের প্রাসাদ ধ্বংস করিয়া ৫ পাঁচ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক মসৃদের সমীপে উপনীত হইলেন। অনন্তর মসৃদ সসৈন্যে সিদ্ধ পার হইয়া তাঁরভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় মুগয়া-প্রমোদে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ইহার পর তিনি মুলতান নগরে উপনীত হন। এই নগর মাক্কুদের আক্রমণে ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছিল, ইহার পুনঃকিন্তু উক্ত নগরের অধিপতি রায় অজুন ও অনঙ্গপাল মসৃদের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিল,—“মহাশয়! পরের রাজ্য নষ্ট করা কি আপনার মত ধর্ম্মশীল ব্যক্তির উচিত? এহ নিমিত্ত আপনাকে পরিণামে পরিতাপ করিতে হইবে।” মসৃদ উত্তর করিলেন, “সমস্তই ঈশ্বরের রাজ্য, তিনি যাহার প্রীতি সন্তুষ্ট হন, তাহাকেই ইহার অধিকারী করেন। বিধর্ম্মী কাদেরদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করা আমাদের একান্ত কণ্ডব্য। যদি তাহারা মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ না করে, তবে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।” ইহা বলিয়া তিনি মূল্যবান বস্তাদি পারিতোষিক দিয়া দূতগণকে বিদায় দিলেন।

দূতগণ বিদায় হইতে না হইতেই মসৃদ মীর ছদেন আরব, আমীর বাজিদ জাফর, আমীর তকান, আমীর নকী, আনীর ফিরোজ এবং মরাও মক্ক আক্কদকে বহুসংখ্যক অগারোহী সৈন্যসহ অনঙ্গপালকে আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। অনঙ্গপাল স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়া সমবেত সৈন্য লইয়া যুদ্ধে প্ররত্ত হইলেন। তিন ঘণ্টা কাল তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল। ধর্ম্ম-বোদ্ধগণের মধ্যে অনেকে প্রাণত্যাগ করিলেন। অসংখ্য হিন্দু এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন; অবশেষে অনঙ্গপাল অগ্র উপায় না দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন।

এই স্থান হইতে মসুদ দিল্লীযাত্রা করেন। এই সময় রায় মহীপাল দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট সৈন্য ও যুদ্ধোপযোগী হস্তী ছিল; এই নিমিত্ত তিনি নির্ভরচিত্তে মসুদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপর প্রবল-প্রতাপশালী মসুদের সৈন্যসমূহ দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, মহীপাল তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের সেনাসমূহ দূরে অবস্থিত করিতেছিল বটে, কিন্তু যুবক বীরপুরুষগণ প্রত্যহ মল্লযুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এই প্রকারে এক মাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। মসুদ ভীত হইয়া ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মধ্যে সংবাদ পাইলেন যে, গজদ্বীপ হইতে পাঁচ জন আমীর তাঁহার সাহায্যার্থ সেনাসমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন। মহীপাল শত্রুসেনার বৃদ্ধি দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। উভয় পক্ষের সেনা সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মসুদ সরিফ উল্‌মুলকের সহিত আলাপ কার-তেছে দেখিয়া মহীপালের পুত্র গোপাল গদাঘাতে তাঁহার নাসিকায় গুরুতর আঘাত করেন। ঐ আঘাতে তাঁহার ২টা দন্ত ভগ্ন হইয়া যায়। মসুদ এতাদৃশ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও সময়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না, বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ থামিয়া গেলে, পরদিন প্রাতঃ-কালে পুনরায় সমর আরম্ভ হইল এবং উভয় পক্ষ হইতে অসংখ্য সৈন্য যমালয়ে প্রস্থান করিল। মহীপাল ও শ্রীপাল বিশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দিল্লীর সিংহাসন মসুদের হস্তগত হইল।

দিল্লী জয় করিয়া মসুদ মিরাতে গমন করেন। মিরাত-রাজ্য তাঁহার বলবিক্রমের কথা শুনিয়া অগ্রেই অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মসুদ সমুদ্র হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া কাশ্মীরভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎপূর্বে সুলতান মাস্কুদ যখন রায় জয়পালকে কাশ্মীরের সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করেন, তখন সালর মসুদ তাঁহাকে পুনঃ প্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত মসুদের আগমনবার্তা শ্রবণে জয়পাল নানা উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর মসুদ কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া জয়-পালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছত্রাভিমুখে গমন করিলেন।

এই সময় ছত্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটা উন্নতিশীল নগর ছিল এবং হিন্দুদিগের একটা পবিত্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। মসুদ এই স্থানে সদর প্রতিষ্ঠিত করিয়া চতুর্দিকে সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সালর শৈবুদ্দীন এবং

মিয়ান রাজবকে বরাহচ্ছত্র জয় করিতে পাঠাইলেন। হইরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এখানে কোনরূপ খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না; কাজেই সৈন্যে তথায় অবস্থান অসম্ভব জানিয়া মসুদকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। মসুদ এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তথাকার জমিদারগণকে কৃষিকাণ্ডের উন্নতিসাধনে যত্নশীল হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তজ্জন্ম তিনি স্থানীয় প্রজাগণকে ফসলের মূল্য অগ্রিম প্রদান করিয়াছিলেন।

অনন্তর মসুদ সুলতানুস-শলাতীন এবং মীর বখতিয়ারকে দক্ষিণ-ভারতভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, জৈন্যর তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তোমরা প্রথমে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সদ্যবহার করিবে। যদি কোন কাফের ইসলামধর্মগ্রহণ করে, তবে তাহার প্রতি সমুচিত দয়া প্রকাশ করিবে, নতুবা তরবারি দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে।

এক দিন মাণিকপুর ও কারার নরপতির নিকট হইতে দূতেরা বহুমূল্য উপঢৌকনাদি লইয়া মসুদ সকাশে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে নিবেদন করিল যে, আমরা পুরুষাযুক্ত্রমে এই রাজ্য অধিকার করিয়া আসিতেছি। এই স্থানে কোন মুসলমানের আবাস নাই। মাকিদনপতি আলেকসান্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও গঙ্গা পার না হইয়া রায় কৈদের (কেদার) সঙ্গে সন্ধিস্থাপনপূর্বক স্বদেশে ফিরিয়া যান। সুলতান মাস্কুদও কাশ্মীর পথান্ত আসিয়াই প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনারা অত্যাচারপূর্বক এ রাজ্য অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনাদের মত মহাত্মার পক্ষে এটা অতীব গর্হিত কার্য। অতএব আপনি স্বীয় সম্মান রক্ষা করিয়া স্বইচ্ছায় প্রত্যাবৃত্ত হউন; নতুবা বিষম সঙ্কটে পতিত হইবেন। এই সংবাদ শ্রবণে ক্রোধ-দগ্ধ মসুদ অধর দংশনপূর্বক বলিলেন, তুমি দূত, এত জন্ত তোমার প্রাণ রক্ষা করিলাম, যদি অজ্ঞ কেহ এই বাত্বা লইয়া আমার নিকট আসিত, তাহা হইলে তদগোচর তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইত। যাও, তোমার রাজ্যকে বলিও যে, তাহাদের দেশ সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের রাজ্য, তিনি যাহাকে ইচ্ছা অর্পণ করিতে পারেন। আমরা কেবল দেশভ্রমণ করিতে আসি নাই, আমরা এই রাজ্য অধিকার করিয়া বিশ্বস্ত কাফেরদিগকে সমূলে উৎপাটন করিব। অনন্তর দূতগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সংবাদ তাহাদের প্রভুকে জ্ঞাপন করিল। দূতমুখে মসুদের তেজস্বিতার কথা শুনিয়া হিন্দুরাজগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন।

তদুপলক্ষে রাজসভায় জনৈক ক্ষোরকার বলিল,— মহারাজের আদেশ পাইলে আমি এ কার্যের প্রতিবিধান করিতে পারি। রাজাজ্ঞা পাইয়া ক্ষোরকার বিধ-প্রয়োগে মসুমের বিনাশ সাধন করিল। এই সময়ে মসুমের বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই ভগবান্ তাঁহাকে বিবিধ প্রকার অস্বাভাবিক গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন।

মসুম (হসেন মর্জা) ইব্রাহিম হসেন মর্জার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হসেন কুলি খাঁ বখন নগরকোট অবরোধ করেন, তখন তিনি শুনিলেন যে, মর্জাগণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এই সময়ে হিন্দুদিগের সহিত মিত্রতাপ্রাপন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তিনি মর্জাগণের গতিরোধের জন্য হিন্দুরাজের সাহায্য লইলেন। হসেন কুলি খাঁর সৈন্তেরা অকস্মাৎ মর্জার সৈন্য আক্রমণ করিল। মসুম হসেন মর্জা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অথ উল্টিয়া গঠ মধ্যে পতিত হওয়ার তিনি যত্ন হইলেন। এই কারাবাসেই হসেনের প্রাণবিরোগ হয়।

মসুম, রাজপুতানার আজমীর জেলার অন্তর্গত একটি নগর ও তদ্রূপক পরগণার সদর। অক্ষা. ২৬° ৫' উঃ এবং দ্রাঘি. ৭৪° ৩২' পূঃ। আজমীর নগর হইতে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান ইতিম্মরারদারের আবাসভূমি। এখানে একটি দাতব্য ঔষধালয় আছে।

মসুমী, (মসুমী) জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। ইনি ১১৫ খৃষ্টাব্দে ভারত, সিংহল ও চান-উপকূলবর্তী নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তৎকালের একখানি বিস্তৃত উপাখ্যান রচনা করেন। তৎকৃত মান-উল্ জবাহির, অথবার-উজ্-জমান, কিতাব্-উল্ ঔযখ্ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রবৃত্তবাহুক্ষিঃসুগণের বিশেষ আদরের জিনিস। উক্ত গ্রন্থগুলি ২০ ভাগে বিভক্ত।

মিসরদেশীয় অত্যন্তকীর্তি পিরামিডের বর্ণনাকালে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, উহার অভ্যন্তরস্থ কোন প্রকোষ্ঠ মধ্যে ১ হাজার দিনার পরিমাণ প্রাচীন বর্ণমুদ্রা রক্ষিত ছিল। এতদ্বিধা উহাতে মিসরের মুসলমানরাজ যবদ-বিন্-আবহুলাব রাজত্বকালে স্থাপিত আরও অনেকগুলি প্রাচীন কীর্তির

উল্লেখ আছে। ১৫৬ খৃষ্টাব্দে মসুমীর মৃত্যু হয়।

মসুম আলীশাহ, মীর, বিখ্যাত সুফী-মতপ্রবর্তক। দাক্ষিণাত্যবাসী সৈয়দ-আলী রজার শিষ্য। দক্ষিণ ভারতে গুরু নিকট পাঠ সমাপন করিয়া তিনি ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। ক্রমে তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পরিগণিত হন।

করিম খাঁর রাজত্বসময়ে, তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া,

সিরাজে উপনীত হন। এখানে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অচিরে ৩০ সহস্র লোক তাঁহার মতামতস্বরণ করিল। ইহা দেখিয়া তথাকার গোড়া ধর্ম-বাজকগণ রাজা করিম খাঁর নিকট অনুযোগ উপস্থিত করিলেন এবং শীঘ্রই উক্ত মহাত্মাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিলেন নগর মধ্যে একটি বিশৃঙ্খলতা ঘটবার সম্ভাবনা দেখাইয়া রাজাকে অরোধ করিলেন। তাঁহার অসুস্থতাদর্শন করিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার শত্রুসংখ্যা দিন দিন পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

মসুম এই সময়ে ইস্পাহান নগরের উপকণ্ঠে বাইরা বাস করেন। করিম খাঁর মৃত্যুর পর, তিনি তথা হইতে পুনরায় স্বীয় প্রধান শিষ্য ফয়াজ আলীকে ধর্মমত-প্রচারার্থ রাজধান্যে পাঠান। অল্পকাল মধ্যেই ফয়াজ আলীর মৃত্যু হওয়ার, নূর আলী শাহ নামক জনৈক যুবক সেই কাণো নিযুক্ত হইলেন। ইনি স্বীয় উদার ও দয়ালু-হৃদয়ের জন্য সাধারণের নিকট পূজিত হইয়াছিলেন।

মীর মসুমের শিষ্যসংখ্যা এখানেও পরিবর্তিত হইতে দেখিয়া, ইস্পাহানস্থ ধর্মবাজকগণ রাজা আলা মর্দন খাঁকে জ্ঞাপন করিল,—মহারাজ! এই নব্য সম্প্রদায় আমাদের সুপ্রাচীন বিত্তক মহম্মদীয় ধর্মের বিরোধী। এই সুফী সম্প্রদায় শীঘ্রই রাজ্য মধ্যে মহান্ অনিষ্ট উপস্থিত করিবে; সুতরাং ইহাদিগকে উৎসাদিত করিয়া ইসলামধর্ম বিস্তার-পূর্বক রাজ্য সুশাসিত করুন। পুরোহিত-সম্প্রদায়ের এবং বিধ প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া রাজা এই বিরোধি-সম্প্রদায়ের যাবতীয় লোকের শত্রু ও নাসাচ্ছেদের আদেশ দিলেন। ইহাতে রাজ্যমধ্যে মহানিষ্টপাতের সম্ভাবনা হইল। উক্ত সেনামণ্ডলী এই সংবাদে উভয় পক্ষেরই নাসা ও শত্রু কলন করিয়াছিল।

অতঃপর মসুম আলী ও নূর আলী শাহ পারস্পর পরিত্যাগ-পূর্বক নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রিয়মাণশায়ে আসিয়া উপনীত হন। এখানে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মুস্তাক আলী নিহত, নূর আলী কারাবদ্ধ এবং স্বয়ং তিনিও তজন্য কালে তদেদ্বাসী কর্তৃক নিহত হন।

শত্রুবর্গ কর্তৃক বিশেষরূপে উপীড়িত হইয়াও সুফী-সম্প্রদায় আপনাপন অভীষ্ট-পথানুবর্তন করিতে নিশ্চেষ্ট হয় না। দিন দিন সুফী সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি দেখিয়া তথাকার সকলেই শঙ্কিত হইল। নূর আলী শিষ্যে রাজা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। এই সময়ে তাহাদের শিষ্যসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার হইয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে মোসলনগরে বিধ-প্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মসুম খাঁ সম্রাট্ অকবর শাহের জোনপুরস্থ জটৈক শাসন-কর্তা। ইনি ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগরের যমুনাতীরে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করান।

মসুম খাঁ ফরংখুদী, সম্রাট্ অকবর শাহের অমুগ্ধহীত জটৈক রাজদ্রোহী। পিতা মুহিন্ উদ্দীন আফগ ফরংখুদার মৃত্যুর পর তিনি হাজিরী কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া গাজিপুরপ্রদেশ তুজুল প্রাপ্ত হন। সম্রাটের বিশেষ অমুগ্ধহীতজন হইলেও তিনি মনে মনে তাহার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন। টোডর মল্লের সহিত বেহার প্রদেশে আসায় তাহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। অনতিকাল পরে সম্রাট্ ভ্রাতা মীরজা মক্কা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণে উত্তত হইল সম্রাট্ স্বয়ং তাহার প্রতিবিধান জ্ঞাতথায় গমন করেন। এই সুযোগে তিনি তর্সন খাঁকে পরাজয় করিয়া জোনপুর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। অকবর তাহাকে বালাকাল হইতেই বিশেষ স্নেহ করিতেন, সুতরাং তাহার এই রাজদ্রোহিতার জ্ঞাত তাহাকে বিশেষ কোনরূপ শাস্তি না দিয়া জোনপুরের পরিবর্তে অযোধ্যা প্রদেশ দান করিলেন। এখানেও তিনি স্বীয় দল পুষ্ট করিতে বন্ধপরি-কর হন। রাজা বীরবর ও শাহ কুলী মহরম তাহাকে বারবার নিষেধ করিয়াও কোন ফল পাইলেন না, তখন শাহ-বাজ খাঁ সপৈশ্বে তাহার দণ্ডবিধানার্থ গমন করেন।

শাহবাজ কতুক পরাজিত হইয়া মসুম নগরে আশ্রয় লন। কিন্তু তাহার সহযোগী বিদ্রোহিনেতাগণ পলায়ন করায় তিনি কংক প্রবাসিমু হইয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার কেলিয়া চলিয়া যান। পথিমধ্যে জটৈক জমিদার তাহার সন্মুখ লুণ্ঠন করেন। অতঃ-পর তিনি মুক্শুদ নানা জটৈক বন্ধুর নিকট হইতে অর্থসাহায্য লাভ করিয়া পুনরায় বরাইচ, মহম্মদাবাদ, জোনপুর প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করেন। জোনপুরে তুজুলদারদিগের দ্বারা তিনি বিশেষরূপে নিপীড়িত হইয়াছিলেন। আজিজ্ কোকার শরণাপন্ন হইলে তিনি মসুমকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করেন। এইরূপ নানাদোষে দোষী ও অত্যাচারী হইলেও অকবর শাহ তাহাকে পুনরায় মাক্কা করিলেন এবং ভবি-ষ্যতে সুখে জীবনবার্তার জ্ঞাত তাহাকে চম্পারণের অন্তর্গত মিসৌ পরগণা তুজুল দিলেন।

এখানে আসিয়াও তাহার স্বভাব পরিবর্তিত হইল না। তিনি পুনরায় বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছেন দেখিয়া আজিজ্ তাহাকে দণ্ডবিধান জ্ঞাত অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদে ভীত হইয়া তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং রাজদ্বারে উপ-নীত হইতে সীকৃত হইলেন।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি আগ্রায় আসিয়া উপনীত হন।

এবারেও তিনি সম্রাটের মাতার অমুরোধে অব্যাহতি পান। কিন্তু এই ভারবাহী জীবন আর তাহাকে অধিকদিন বহন করিতে হয় নাই। একদিন সন্ধ্যাকালে দরবার হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে, পথিমধ্যে গুপ্তচর দ্বারা তিনি নিহত হন। লোকের বিশ্বাস, সম্রাটের আদেশেই গুপ্ত ঘাতকহস্তে তাহার শিরচ্ছেদ হয়।

মসুম (মীর), জটৈক মুসলমান ঐতিহাসিক ও কবি। ইহার পূর্বপুরুষগণ বুখারাবাসী তিমিজবংশীয়। জন্মভূমি পরিতাগ ক রয়া তাহার কান্দাহারে আসিয়া বসবাস করেন। ইহার পিতা মীর সৈয়দ সফাই সুলতান্ মাক্কা দের অমুগ্ধহীত লাভ করিয়া ভক্তবাসী হন। এখানেই মীর মসুমের জন্ম হয়।

পিতার মৃত্যুর পর মসুম কিছুবাসী মোল্লা মহম্মদের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট্র হইতে লাগিল,— দারিদ্র্যকষ্টনিপীড়িত হইয়া তিনি গুরাতের দেওয়ান খাজা নিজামুদ্দীন আফগের নিকট কার্য-ভার গ্রহণ করেন। এই সময় নিজামের তবকৎ-ই অকবরী নামক গ্রন্থের সকলনে তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। ক্রমে নিজামের সহিত মীর মসুমের প্রণয় গাঢ় হইতে থাকে। তিনি মসুমকে সঙ্গে লইয়া তৎ-প্রদেশের শাসনকর্তা সহিত খাঁ ও পরে সম্রাট্ অকবরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গুণগ্রাহী সম্রাট্ তাহাকে প্রথম ২৫০ সেনার নায়ক করিয়া দেন। তৎপর ১০১২ হিজরায় তাহাকে ইরানরাজ শাহ আব্বাসের সমীপে দূতরূপে প্রেরণ করেন। এখানে তিনি বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

অকবর-নামা গ্রন্থপাঠে জানা যায়, তিনি ১৯২ হিঃ গুজ-রাত, মৈসানা ও কচ্ছবুদ্ধে স্বায় বলবাহ্যের বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। ১০১৫ হিজরায় ইরান হইতে প্রত্যাগত হইলে তিনি জাহাঙ্গীর কতুক ভক্তরের আমীন ও ১ হাজারী সেনা-নায়ক পদে নিযুক্ত হন। তথায় তাহার মৃত্যু ঘটে।

তিনি স্বীয় কবিত্ব শক্তির জ্ঞাত নাসি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তৎকৃত দিবান্, মাদন্ উলফ্কার নামক মসুমবি তারিখ-ব-সিক্ক নামক ইতিহাস ও মুফিদাৎ-ই-মসুমী নামক হকিমী গ্রন্থ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন খামসা, হলন্ ও নাজ্ ও পরিসূরৎ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য তাহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। ফতেপুরের সলিম্-চিশ্তির মন্দিরে এখনও তদ্রচিত শ্লোকাবলী প্রস্তরফলকে উৎকর্ণ আছে।

ইনি ধার্মিক ও দয়ালু ছিলেন। ভক্তবাসীর উপকারার্থ তিনি অনেকগুলি জলস্তম্ভ, সরাই ও অট্টালিকা নির্মাণ করা-ইয়া যান। এতদ্ভিন্ন তাহার জীবিতাবস্থায় দীন ছুঃখীদিগকে আর্থিক সাহায্যে ভুগু করিয়াছিলেন।



মসুমাবেগম, সম্রাট বাবরের কন্যা ও সম্রাট হুমায়ূনের ভগিনী। ষোড়শাব্দে মহম্মদ জহান মার্জা ইহার পাণিগ্রহণ করেন।

মসূর (পুং ক্রী) মস্ততে পরিমায়তেহসৌ মসু-মসেকরন্। উণ-৫৩) ত্রীহিতেদ, মসুরী-কলাই (Eivum Hirsutum and 'icer Lens) পর্যায়—মঙ্গলাক, মসুর, ত্রীহিকাঞ্চন, মসুরা, মসুরা, রাগদালি, মঙ্গলা, পৃথুবাঙ্গক, শূর, কল্যাণবীজ, গুড়বীজ, মসুরক, মঙ্গলা, মসুরকা। (ভাবপ্র.) ইহার গুণ—মধুর, শীতল, সংগ্রাহক, কক্ষ-পিত্তনাশক, বাতামরকারক, মূত্রকৃচ্ছুর, লঘু, (রাজনি.) কক্ষ, অরনাশক। (ভাবপ্র.)

ইহার ষুণ্ড—সংগ্রাহী, স্বাদুপাক, প্রমেহ, পিত্তশ্লেষ্মাজর ও অত্যাৱনাশক। (রাজনি.)

ইহার অধিপতি মেঘরাশি।

“বদ্বাবিককুতুপানাং মসুরগোধুমরালকযবানাম্।

স্থলসম্ভবোদনীনাং কনকশ্চ চ কীৰ্ত্তিতো মেঘঃ ॥” (বৃহৎসং ৪১১২)

রবিবারে মসুর ভোজন করিতে নাই, করিলে সপ্তজন্ম কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত এবং দারদ্র ও অপুত্রক হয়। বিববাদিগের মসুর-ভোজন নিষিদ্ধ।

মসুরক (পুং) মসুর ইব প্রতিকৃতিরিতি মসুর-ক, সংক্রায়াং কন্ বা। উপাধান বিশেষ, গোল বালিশ। পর্যায়—চতুর, চাতুর, অঙ্গুষ্ঠ, চক্রগু। (শব্দরত্নাং)

এই শব্দের ক্রীবলিঙ্গ প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

মসুর স্বার্থে কন্। মসুরশব্দার্থ।

মসুরকর্ণ (পুং) ঋষিভেদ।

মসুরস্নাত (ক্রী) গ্রহণীবোণে স্নাতোষপভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী,—ঘৃত ৪ সের, মসুরকাথ ৪ সের, বেনাউ ১ সেব, ঘৃতে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত পান করিলে আশু গ্রহণী রোগ নিরাকৃত হয়। (চক্রদত্ত)

মসুরযুষ (পুং ক্রী) মসুরকৃত কাথ। চলিত মুসুরের ঝোল, ইহার গুণ—সংগ্রাহী, বৃহৎ, স্বাদু এবং প্রমেহনাশক।

“মসুরযুষঃ সংগ্রাহী বৃহৎ স্বাদুঃ প্রমেহজিৎ।” (দ্রব্যগুণ)

মসুরবিদলা (ক্রী) মসুরস্তেব বিশিষ্টঃ দলমস্তাঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। কৃষ্ণত্রিবৃৎ, চলিত কালেতেউড়ী।

“মসুরবিদলাকারতুলান্নিক্রিয়কলেবরঃ।

পৌষে চান্দে চতুর্দশিংশে নবমেহন্দে সিতে মৃতঃ ॥”

(রাজতরঙ্গিণী ৬১৮৭)

২ শ্রামলতা। (রত্নমালা)

৩ আত্মাতক বৃক্ষ। ৪ মেঘশৃঙ্গী। (বৈজ্ঞানিকনি.)

মসুরসূপ (পুং) ভক্ষিত মসুরকৃত যুষ, প্রথমে মসুর ভাজিয়া

লইয়া পরে তাহার যুষ প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার গুণ—সংগ্রাহী, শীতল, মধুর, লঘু, কক্ষ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক এবং বিষমজরনাশক।

“মসুরহপঃ সংগ্রাহী শীতলো মধুরো লঘুঃ।

কক্ষপিত্তাস্রজিহ্বর্ণো বিষমজরনাশনঃ ॥” (দ্রব্যগুণ)

মসুরসংঘারাম (পুং) বৌদ্ধ মজ্জারামভেদ।

মসূরা (ক্রী) মস্ততি পরিণমতীতি মসু-উবন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ বেণ্ডা। ২ মসুরকলায়। (মেদিনী) ৩ মেঘশৃঙ্গা। ৪ ত্রিবৃৎ, তেউড়ী। (রাজনি.)

মসুরাভা (ক্রী) মসুরিকা রোগ।

মসুরিকা (ক্রী) মসুরেব মসুরা-কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইৎ।

১ কুট্টনী। (শব্দমালা) ২ বসন্তরোগ (The Small-pox)

পর্যায়—পাপরোগ, রক্তবটী, মসুরী। (শব্দরত্নাং)

ইহার নিদান—

“কটুপ্লবণক্ষারবিরুদ্ধাধ্যশনাশটনঃ।

দুষ্টিনিষ্পাবশাকটোঃ প্রদুষ্টিপয়নোদকৈঃ ॥

ক্রুরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষসমুদ্ভবাঃ।

জনয়ন্তি শরীরেহস্মিন্ দুষ্টিরকেন সংগতাঃ।

মসুরাকৃতিসংস্থানাঃ পীড়কা সা মসুরিকা ॥” (ভাবপ্র.)

কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষারদ্রব্য সেবন, বিরুদ্ধভোজন, অধ্যশন, দূষিত অন্ন, বায়ু ও জলসেবন, শিথী ও শাকাদি অতিরিক্ত সেবন এবং ক্রুরগ্রহের অন্তত দৃষ্টি দ্বারা বাতাদি দোষত্রয়-কুপিত ও দুষ্টিরক্কের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া দেহে মসুরের আঘাত আকৃতিবিশিষ্ট পীড়া উৎপাদন করে, এই রোগকে মসুরিকা রোগ কহে।

এই রোগের পূর্বলক্ষণ—মসুরিকা উৎপন্ন হইবার পূর্বে অব, কণ্ঠ, শরীরবেদনা, মানিবোধ, ভ্রম, চর্মোপরি শোথ, বিবৰ্ণতা এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। এই রোগ বাতপিত্তাদিভেদে নানা প্রকার।

বাতজ মসুরিকার লক্ষণ—বাতজন্ত মসুরিকারোগে ফোটকগুলি কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, কক্ষ, অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত, কঠিন এবং বিলম্বে পার্কিয়া উঠে। রোগীর সন্ধি, অস্থি, ও পদসমূহে বেধব্দবেদনা, কাস, কষ্ম, মানি, ভ্রম, তালু, গুঠ ও জিহ্বাশোথ, পিপাসা এবং অরুচি হয়।

পিত্তজ মসুরিকালক্ষণ—পিত্তজন্ত মসুরিকারোগে ফোটকগুলি রক্ত, পীত বা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ ফোটকে দাহ ও অত্যন্ত বেদনা হয় এবং শীঘ্র পার্কিয়া উঠে। ইহাতে রোগীর মলভেদ, শরীরে বেদনা, দাহ, পিপাসা, অরুচি, মুখপাক, নেত্রের রক্ততা এবং তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে।

রক্তজ মসূরিকা-লক্ষণ—রক্তজ মসূরিকা পিত্তজ মসূরিকার  
ভায় হইয়া থাকে।

কফজ মসূরিকা-লক্ষণ—কফজ মসূরিকারোগে ফোটক-  
গুলি খেতবন, অত্যন্ত শিথ, স্থূলকায়, কণ্ডুযুক্ত ও অল্প-  
বেদনায়ুক্ত হয় এবং বিলম্বে পাকিয়া উঠে। ইহাতে রোগীর  
কক্ষপ্রদেক, দেহের আর্দ্রতা, শুষ্কতা, শিরঃপীড়া, বমনেচ্ছা,  
অরুচি, নিদ্রাধিক্য, তন্দ্রা ও আলস্য হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মসূরিকার লক্ষণ—ত্রিদোষজ মসূরিকা  
যোগে ফোটকগুলি নালবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়।  
মধ্যভাগ নিম্ন হইয়া উখিত হয় এবং বিলম্বে পাকিয়া অত্যধিক  
পুতিগন্ধযুক্ত পুয়াদি নির্গত হয়।

সপ্তধাতুগত মসূরিকার মধ্যে রসধাতুস্থিত মসূরিকালক্ষণ—  
রসধাতুগত মসূরিকার ফোটকসমূহ তৌরোখিত বৃন্দাকৃতি  
হয় এবং উহা ভিন্ন হইলে ধলবৎ আবৃত হইতে থাকে। এই  
রোগ বিশেষ দোষযুক্ত নহে।

রক্তগত মসূরিকা লক্ষণ—রক্তগত মসূরিকারোগে ফোটক-  
গুলি লোহিত বর্ণ এবং শীঘ্রই পকতা প্রাপ্ত হয়। উহার  
চর্ম পাতলা এবং ভিন্ন হইলে রক্ত নিঃসারিত হইয়া থাকে।  
ইহা সহজসাধ্য, কিন্তু রক্ত অত্যন্ত দূষিত হইলে কষ্টসাধ্য হয়।

মাংসগত মসূরিকার লক্ষণ—মাংসগত মসূরিকারোগে  
ফোটকসমূহ কঠিন ও শিথ হয় এবং বিলম্বে পাকে। উহার  
চর্ম পুরু হয় এবং রোগী সর্বদা গাত্রবেদনা, কণ্ডু, মুচ্ছা,  
দাহ ও পিপাসা অনুভব করে।

মেদোগত মসূরিকা লক্ষণ—মেদোগত মসূরিকার ফোটক-  
সমূহ স্থূল, শিথ, বেদনায়ুক্ত, কোমল, কিঞ্চিৎ উন্নত, অথচ  
মণ্ডলাকারে উখিত হয়। ইহাতে রোগীর অত্যন্ত অর, মোহ,  
মানি ও সন্তাপ হইয়া থাকে। এই রোগ হইলে রোগী কদা-  
চিৎ রক্ষা পায়।

অগ্নি-মজ্জাগত মসূরিকা-লক্ষণ—অগ্নিগত ও মজ্জাগত  
মসূরিকারোগে ফোটকসমূহ ক্ষুদ্রাকৃতি, শরীরের সমান বর্ণ  
বিশিষ্ট, ধূস্র, চিপটিকাকার ও কিঞ্চিৎ উন্নত হয় এবং রোগী  
অত্যন্ত মোহ, বেদনা, মানি ও মর্ম্মস্থানে ছেদনবৎ বেদনা বোধ  
করে। এই রোগে শীঘ্র প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ওক্রগত মসূরিকারোগে ফোটক সকল শিথ, মসৃণ  
ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত এবং রোগীর শরীরে স্তিমিততা,  
মানি, মোহ, দাহ ও উন্নততা প্রভৃতি লক্ষণ অনুভূত হয়।  
এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এ রোগ একেবারে অসাধ্য  
জানিবে। কিছুতেই ইহার আরোগ্যের প্রত্যাশা করা যায় না।

উক্ত সপ্তধাতুগত মসূরিকা দোষের সংশ্লিষ্টতা হইতে

পারে না, এই সপ্তধাতুগত মসূরিকার সহিত যে দোষ  
কুপিতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে, দোষের লক্ষণ দ্বারা তাহা শির-  
করিতে হইবে। পরে ঐ দোষের প্রতীকার করা আবশ্যিক।

চর্মজ মসূরিকা লক্ষণ—চর্মজ মসূরিকারোগে রোগীর  
কণ্ঠরোধ, অরুচি, তন্দ্রা, প্রলাপ ও মানি বোধ হয়। এই  
রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য।

রোমান্তিকা মসূরিকা লক্ষণ—প্রথমতঃ অর হইয়া পরে  
সমস্ত শরীরে রোমকূপের ভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পীড়কা  
উখিত হইলে তাহাকে রোমান্তিকা কহে। ইহাকে চালিত  
কথায় ‘হাম’ বলা যায়। এই রোগে রোগীর কাস এবং অরুচি  
জন্মে। এই রোগ সুখসাধ্য, আপনা আপনিই আরোগ্য হয়।

সাধ্য মসূরিকা-লক্ষণ—রসগত, রক্তগত, পিত্তজ, কফজ,  
এবং পিত্তশ্লেষ্মিক মসূরিকা সুখসাধ্য, এই সকল রোগ বিনা  
চিকিৎসাতেও আরোগ্য হয়। কষ্টসাধ্যলক্ষণ—বাতজ,  
বাতপৈতিক ও বাতশ্লেষ্মিক মসূরিকা কষ্টসাধ্য, অতএব এই  
রোগ হইলে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করা আবশ্যিক।

অসাধ্য মসূরিকা-লক্ষণ—সান্নিপাতিক মসূরিকা অসাধ্য।  
অসাধ্য মসূরিকার বর্ণ ও দোষভেদে প্রবালের ভায় বা ধূ-  
ফলের ভায়, কখনও বা লৌহজালের ভায় কৃষ্ণবর্ণ এবং  
কখনও বা গুতলাফলের ভায় দেখায়। দোষভেদে উহাদিগের  
আরও নানা প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। যে মসূরিকারোগ-  
গ্রস্ত রোগীর কাস, হিকা, মেহ, অত্যন্ত অর, প্রলাপ, মানি,  
মুচ্ছা, পিপাসা, দাহ, নিদ্রাধিক্য এবং কণ্ঠদেশে ঘড়্ ঘড়্ শব্দের  
সহিত অত্যন্ত শ্বাস বহিগত হয় এবং মুখ, নাসিকা ও চক্ষু  
হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা একেবারে  
অসাধ্য। চিকিৎসক এইরূপ রোগী পরিত্যাগ করিবেন।

মসূরিকারোগের অরিষ্ট লক্ষণ—যে মসূরিকারোগগ্রস্ত  
ব্যক্তি তৃষ্ণাতুর হইয়া নাসিকা দ্বারা অত্যন্ত শ্বাস পরিত্যাগ  
করে এবং অপতানকাদি বাতদোষাভিভূত হয়, অচিরে  
তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

মসূরিকাজন্ম শোণ—মসূরিকা রোগের অন্তে কূপরে,  
মণিবন্ধে এবং অংশফলকে শোণ উৎপন্ন হইলে হৃদয়চিকিৎসা হয়।

কোন কোন কষ্টসাধ্য মসূরিকাও বিনা যত্নে শীঘ্র প্রশমিত  
হয় এবং কোন মসূরিকা অতি যত্নেও নিবারিত হয় না।

মসূরিকার চিকিৎসা।

মসূরিকা হইবার প্রারম্ভে খেতচন্দনের কঙ্কের সহিত  
হিকাশাকের রস পান করিবে অথবা কেবল হিকাশাকের  
রসপান করিলেও উপকার হয়। দশমূলী, রান্না, আমলকী,  
বেণার মূল, ছুরালতা, শুণ্ণক, ধনে ও মুখা এই সকল দ্রব্য

একত্র করিয়া ইহার কাথ সেবন করিলে বাতজ মসুরিকা প্রশমিত হয়। ফোটকের উপর মজিষ্টা, বট, পাকুড়; শিরাধ, ও বজ্রভূষের ছাল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। মসুরিকা পাকিতে আরম্ভ হইলে গুলক, যষ্টিমধু, ইক্ষুমূল ও দাড়িম এই সকল গুড়ের সহিত প্রয়োগ করিলে বায়ু প্রকৃপিত হয় না ও সম্বর পাকিয়া উঠে। এই রোগে শালিষুগ, মসুর, মধুরসযুক্ত দ্রব্য এবং অন্ন নৈশক সেবন করিতে পারা যায়।

পিণ্ডজ মসুরীরোগে প্রথমে পটোল মূলের কাণ, ও ইক্ষু মূলের সরস প্রয়োগ করিবে। নিধ, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পলতা, শেতচন্দন, রক্তচন্দন, বেনার মূল, কটকী, আমলকা, বাসক ও ছুরালভা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে উহা শীতল হইলে একটু চিনি প্রক্ষেপ দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে পিত্তজ মসুরী, দাহ, জ্বর প্রভৃতি আশু নিরাকৃত হয়। রক্তজ মসুরীরোগে রক্ত মোক্ষণ করিলে আশু উপকার দর্শে। বাসক, মুতা, চিরতা, ত্রিফলা, ইক্ষুধব, পলতা ও নিধ হৃদাঙ্গির কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে স্নৈহিক মসুরিকা নিরাকৃত হয়। শিরাধ ও বজ্রভূষের ছাল, খদির ও নিমপাতা, পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফজ ও পিত্তজ মসুরিকা নষ্ট হয়। নিধ, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পলতা, কটকী, শেতচন্দন, রক্তচন্দন, বেনার মূল, আমলকা, বাসক ও ছুরালভা, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে স্রবপ্রকার মসুরিকা, জ্বর ও বিনর্প নষ্ট এবং অন্তলীন মসুরিকা সকল পুনরায় বাহির হয়।

কাঞ্চনছালের কাথে স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও মসুরিকারোগ প্রশমিত হয়। মুখে বা কণ্ঠে এণ্ড উপর হইলে আমলকা ও যষ্টিমধুর কাথে প্রক্ষেপ দিয়া মধু চক্ষুতে সেনচন করিবে। যষ্টিমধু, ত্রিফলা, স্টোমুখা, দারুহরিদ্রা, দারু-চিনি, নালোংপল, বেণার মূল, লোধ ও মজিষ্টা ইহা প্রলেপে ও নেত্রদেচনে প্রয়োগ করিলে চক্ষুগত মসুরিকা নষ্ট হয় ও আর উৎপন্ন হয় না। বহুবীর বৃক্ষের বক্ষণ দ্বারা প্রলেপ দিলেও নেত্রগত মসুরিকার বিশেষ উপকার হয়। সক্রম মসুরিকা পক্ষ্যবক্ষণ চূর্ণ বা ভস্ম অথবা গোময়চূর্ণ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। করলা পাতার রসে হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রোমান্তা (হাম), জ্বর, বিনর্প ও এণ্ড আরোগ্য হয়।

মসুরী রোগ শীতলা বলিয়া বৈজ্ঞানিক অভিহিত হইয়াছে। শীতলা দেবী কুপিতা না হইলে এই রোগ হয় না, বোধ হয় এছাড়া উহাকে শীতলা বলা হইয়াছে।

“দেব্যা শীতলাক্রান্তা মসুরীষ হি শীতলা।

অরায় চ যথা ভূতাদিষ্ঠিতো বিষমজরঃ।

শাচ সপ্তবিধা খ্যাতা তাসাং ভেদং প্রচক্ষহে॥” (ভাবপ্র০)

দেবী শীতলাক্রান্ত মসুরীরোগকে শীতলা বলা যায়, যে প্রকার ভূতাদিষ্ঠিত বিষমজর কর্তৃক রোগী পীড়িত হয়, তদ্রূপ শীতলাদিষ্ঠিত হইলে মসুরিকা কর্তৃক পীড়িত হইয়া থাকে। শীতলা সাত প্রকার।

প্রথমতঃ জ্বর হইয়া বৃহৎ ফোটকপরিবৃত বৃহদাকারে শীতলা উদ্ভিত হয়, ইহা সপ্তাহ অন্তে বহির্গত ও তৎপরে সপ্তাহান্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং তিন সপ্তাহে শুষ্ক হইয়া স্বয়ংচ বিলুপ্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যেগুলি পাকিয়া ক্ষুটিত ও স্রাবিত হয়, তাহাতে বন-মুটিয়ার ভস্মচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। মক্ষিকানিবারণের জন্ত নিধ এবং পদ্মের শাখা ব্যবহার করিবে। যদি ইহাতে জ্বর হয়, তাহা হইলেও শীতল জন দিবে, কদাচ উষ্ণ জন দিবে না। পরিষ্কৃত, শীতল, মনোরম অগচ জন-সমাকর্ষণ না হয়, এইরূপ স্থানে রোগীকে রাখিতে হইবে। রোগী অন্তর্ভুক্ত স্পর্শ করিবে না, অথবা অন্তর্ভুক্ত নিকটে প্রমত্ত করিবে না। এই রোগ চিকিৎসা কারবার বৈজ্ঞানিক অতি বিরল। কাঁচং কোন ব্যক্তি এই রোগে চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

যাহারা নিধ এবং বহেড়ার বাজ অথবা হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া পান করে, তাহাদিগের শীতলা কখনও উৎপন্ন হয় না। মোচার রসে শেতচন্দন পেষণ করিয়া কিংবা বাসকের রস বা মধু সহিত যষ্টিমধু পেষণ করিয়া পান করিলেও শীতলারোগ হইতে পারে না। শীতলা হইবাব পূর্ণ-লক্ষণ হইলে জ্বর হওয়া মাত্র জাতীপত্রের রস অল্পপান যোগে পান করিবে। শীতলা রোগ উপস্থিত হইলে শীতলা দেবীর কবচ ধারণাদি করিতে হইবে এবং গৃহের চারিদিকে নিমপাতা বর্জন করিবে। ঐ গৃহে উচ্ছিষ্টাদি অপবিত্র কিছুই প্রবেশ করিতে দিবে না। ফোটকে দাহ হইলে শুষ্ক গোময়-ভস্ম প্রলেপ দিবে, ইহাতে ঐ ফোটক শুষ্ক হইয়া যাইবে, পাকিবে না। চন্দন, বাসক, মুতা, গুলক ও ব্রাহ্মা ইহার শীতল কষায় পান করিলে শীতলাজ্বর প্রশমিত হয়। জপ, হোম, দান, স্বস্ত্যয়ন এবং ব্রাহ্মণ, গো, শিব এবং ব্রহ্মার পূজা শীতলারোগে শুভ ফলদায়ক। রোগীর নিকট শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে শীতলা স্তোত্র পাঠ করিলে ঐ রোগের শাস্তি হয়।

শীতলা রোগের প্রভেদ—কোজ্রবা নামক শীতলা বায়ু ও কফ হইতে কোজ্রবের ভায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন

হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা পাকে, বাস্তবিক তাহা নহে।  
জলশুক্ৰবা নামক শীতলা হইলে শরীরে বেধনবৎ বেদনা  
বোধ হয়। এই রোগ সাতদিন বা দ্বাদশ দিনে বিনা ঔষধে  
প্রশমিত হয়। ইহাতে ঔষধ ব্যবহার বিশেষ আবশ্যক হইলে,  
খদিরাষ্টকের কাথ হিতকর।

উষ্মা দ্বারা ষ্ঠেতসর্ষপের আকৃতিবিশিষ্ট অথচ কণ্ডূযুক্ত ও  
ম্পন্দনপ্রিয় পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে পানিসহা নামক  
শীতলা বলা যায়। ইহা সাত দিনের পর আপনিই শুকাইয়া  
যায়।

যে শীতলারোগে সর্ষপের ঞ্চায় আকৃতিবিশিষ্ট ও পীতবর্ণ  
সর্ষপের ঞ্চায় ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে সর্ষপিকা  
কহে। এই রোগে অভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। কিঞ্চিৎ উষ্মা হইতে  
ষ্ঠেতসর্ষপের আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া এক প্রকার শীতলা  
রোগ জন্মে, এই রোগ প্রায়ই বালকগণের হইয়া থাকে।  
ইহা সহজেই শুক হইয়া যায়। লোকে ইহাকে ত্রুঃখকোদ্রবা  
বলিয়া থাকে।

যে শীতলা প্রথমতঃ জ্বর হইয়া বেদনার সহিত লোহিত বর্ণ  
অপচ উন্নত কোঠের ঞ্চায় মণ্ডলাকৃতি হইয়া উৎপন্ন হয়,  
তাহাকে ষষ্টি শীতলা কহে। মগধদেশে ইহা দাম নামে  
প্রসিদ্ধ। এই রোগে তিন দিন জ্বর থাকে।

যে শীতলারোগে ফোটক সকল মিশিয়া গিয়া একটা  
ফোটকে বহুফোটক দৃষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাকে চক্ষুজা  
বলে। হিন্দুস্থানে ইহা চরমগোটা নামে খ্যাত।

দেবী শীতলাবিশিষ্ট এই রোগ সাত প্রকার। এই সকল  
শীতলা দেবীর যথাবিধানে পূজা করা আবশ্যক।

কোন কোন শীতলারোগ বিনা ষ্ঠেত সহজে নিবারিত  
হইতে পারে, কোন কোন শীতলা অতি কষ্টে প্রশমিত হয় এবং  
কোন কোন শীতলার যতই কেন চেষ্টা করা যাউক না,  
কিছুতেই আরোগ্য হয় না।

এই সকল বদন্তরোগ হইলে দৈবের প্রতি নির্ভর করিয়া  
থাকিবে। পিশুকাচারী ব্রাহ্মণ রোগীর নিকট থাকিয়া বিশেষ  
ভক্তিসহকারে শীতলা স্তোত্র পাঠ করিবেন। বোগীও ভক্তি-  
পূরক তাহা শুনিবেন। ইহাতেই মসূরিকারোগ আরোগ্য হয়।  
শীতলা শুভ। যথা—হৃদ উবাচ।

“ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ শুভং শুভম্।

বক্তুমর্হন্তশেষেণ বিস্ফোটকভয়াপহম্॥

ঈশ্বর উবাচ।

“নমামি শীতলাং দেবীং রাসভয়াং দিগম্বরীম্।

মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্পালকৃতমস্তকাম্॥

বন্দেহং শীতলাং দেবীং সররোগভয়াপহাম্।

যামাসাশ্রু নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহং॥

শীতলে শীতলে চেতি বো ক্রাদাদ্ধপীড়িতঃ।

বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্ত প্রণশ্রুতিং॥

যন্তুান্দকমধোতু বৃহা সংপূজয়েন্নরঃ।

বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্ত ন জায়তে॥

শীতলে জরদগ্ধস্ত পুতিগন্ধগতস্ত চ।

প্রনষ্টচক্ষুঃ পুংসস্ত্যামাহ জীবিতোষম্॥

শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি হস্তরান্।

বিস্ফোটকবিশর্গান্ অমেকামৃতবর্ষিণী॥

গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চাত্রে দাক্ষণ্য নৃণাম্।

অদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে বাস্তি তে ক্ষয়ম্॥

ন মস্তো নোষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্ত বিততে।

অমেকা শীতলে জাতী নাশ্যাং পশ্যামি দেবতাম্॥

নৃণালতন্তুদগ্ধাং নাভিহ্রদযো সংস্থিতাম্।

যন্তুং বিচিস্তয়েদেবীং তস্ত মৃত্যুর্ন জায়তে॥

শ্রোতব্যাং পঠিতব্যঞ্চ নরৈর্ভক্তিসমম্বিতৈঃ।

উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহং॥

শীতলাষ্টকমেতদ্ধি ন দেয়ং যন্তু কন্তুচিং।

দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধাযিতো হি যঃ॥”

ইতি শ্রীহৃদপু্রাণে কাশীখণ্ডে শীতলাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

( ভাবপ্রকাশমসূরিকারোগাধি )

ভক্তিপূরক এই শুভ পাঠই বদন্তরোগের একমাত্র মহৌষধ।  
এই রোগ না হয়, এই জন্ত টীকা দিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া  
যায়। গোস্তনজ বা নরপাত্রজ মসূরিকা-পুয়ের দ্বারা এই  
টীকা দেওয়া হইয়া থাকে।

“ধেহুত্ত্বনমসূরিকা নরাপাঞ্চ মসূরিকা।

তজ্জলং বাহুমুলাচ্চ শস্ত্রাস্তেন গৃহীতবান্॥

বাচমূলে চ শস্ত্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ।

তজ্জলং রক্তমিলিতং ফোটকজরসম্ভবম্॥”

( ধ্বস্তরিকৃত শাক্তেয় গ্রন্থ )

গোস্তনে ও মানবের হস্তে যে বদন্ত হয়, ঐ বদন্তের  
পূর শস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে, পরে বাহাকে  
টীকা দিতে হইবে তাহার বাহুমূলে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া ঐ পূর  
রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে পরে তাহাতে জ্বর ও  
বদন্ত হইবে। এই বদন্ত ও জ্বর আপনা আপনিই ভাণ  
হয়। তবে এই সময় বিপুল হইয়া থাকা আবশ্যক। কোন-  
রূপে অন্তর্চিস্পর্শ-প্রভৃতি অনিষ্টজনক। তাহাতে রোগের  
বৃদ্ধি হইতে পারে। ৩ মশহরী, চলিত মশারি।

“দংশাংশ মশকাংশব বর্ষাকালে নিবারয়েৎ।

মস্করিকতিঃ প্রাবৃত্য মক্ষণারিনমচ্যুতম্ ॥”

(পদ্মপুঃ ক্রিয়াবোগসার ১২ অ०)

এই রোগের অপরাপর বিবরণ বসন্তরোগ শব্দে বিবৃত  
হইবে। [বসন্তরোগ দেখ।]

মসুরী (স্ত্রী) মসুর-জিয়াং ভীষ্। মসুরিকা, বসন্তরোগ।  
২ ত্রিভুং। ৩ রক্তত্রিভুং। (রাজনি०)

মসূণ (ত্রি) মসুণেতি দীপ্যতে ইতি ঋণ্ দীপ্তৌ ইণ্ডপথেতি ক,  
প্ৰযোদরাদিভ্যাং সাধুঃ। ১ অকর্কশ, স্নিগ্ধ।

“কল্পণামসুণৈঃ কটাকপাঠৈঃ কুরু মামব কৃতার্থসার্থবাহম্।”

(রঘুবংশটীকারস্তে মল্লিনাথ)

চলিত চক্চকিয়া, বাহার উপরিভাগ এরূপ সমান, যে  
স্পর্শ করিতে উচ্চ নীচ বোধ হয় না।

মসৃণা (স্ত্রী) মসৃণ-জিয়াং টাপ্। উমা, চলিত মগিনা। (মেদিনী)  
মস্কৃ গতি। ভাদি० আশ্ব० শক० সেট্। লট্ মস্কতে। লোট্  
মস্কতাং। লিট্ মস্কসে। লুঙ্ অমস্কিষ্টে। পিচ্ মস্কয়তি। লুঙ্  
অমস্কয়ৎ। সনু মিমস্কিষতি, যঙ্ মামস্ক্যতে। যঙ্ লুক্ মামস্ক্যতি।

মস্কৃ (পারসী) মুষ্ শব্দজ। মুগ্ননাতি।

মস্কট, আরবদেশের সমুদ্র-তীরবর্তী একটি বন্দর। আরবের  
পূর্বাংশে ওমান-প্রদেশ মধ্যে অবস্থিত। অক্ষাং ২৩° ৪৮’  
উঃ, দ্রাঘিঃ ৫৮° ৪০’ পূঃ। এই বন্দরের দক্ষিণ ও  
পশ্চিমে উচ্চ ভূমি এবং পূর্বাদিকে একটি দ্বীপ থাকায়  
এই বন্দর অতি নিরাপদ হইয়াছে। বাণিজ্যপোত  
নিরাপদে ইহার উত্তর দিক্ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে  
পারে। এই নগরের চারিদিকেই একটি করিয়া দুর্গ আছে;  
নগরের সন্নিকটে একটি এবং পশ্চিমপার্শ্বে অপর দুইটি অব-  
স্থিত। ইহার চারি দিক্ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। সহরের প্রায়  
সমুদ্র বাড়ীই একতল, কেবলমাত্র পর্তুগীজদিগের কয়েকটি  
মনোহর দ্বিতল ও ত্রিতল প্রস্তরময় অট্টালিকা দেখা যায়।  
এইগুলি পারস্তদেশের সৈকতভূমে নির্মিত। নগরভাগের  
জল-বহির্গমনের জন্য একটি বড় নদী আছে। বন্দরের  
মধ্যে বড় বড় জাহাজ নঙ্গর করিবার যথেষ্ট জায়গা আছে।

এই নগর আরবীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান স্থান।  
এখান হইতে ভারতবর্ষ, সুমাত্রা, মলয়-উপদ্বীপ, লোহিতসাগর,  
আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য চলিয়া থাকে।  
ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ পারস্তোপসাগরে বাণিজ্যকালে এই  
বন্দর হইতে পণ্য দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিত। এতদ্ভিন্ন পারস্তদেশস্থ  
বন্দর ও আরবদেশস্থ অন্যান্য বন্দরের সহিত এখানকার  
রীতিমত বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

XIV

এখানে বাবাম, পেস্তা, রজন, হিঙ্গু, গন্ধক, সোরা, গঁদ  
প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যই প্রধান; এতদ্ভিন্ন কাফি, নারিকেল তৈল,  
ময়, মোটা রেশম, নীল, চিনি, দারুচিনি, মুক্তা, গুণারের  
শুল্ক, মরিচ প্রভৃতি এখান হইতে নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া  
থাকে। নগরের নিকটবর্তী স্থানসমূহ উর্বর নহে, কিন্তু শাক  
সবুজি ফলমূল, মৎস্য প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী বাজারে যথেষ্ট  
আমদানী হইয়া থাকে। গো, মেঘ ও মুরগী অতি সুলভ মূল্যেই  
কিনিতে পাওয়া যায়। অল্প স্থান হইতে যে সমস্ত মাল এই  
বন্দরে আমদানী হইয়া থাকে, তাহার উপর শতকরা ৪ টাকা  
অথবা ৫ টাকা হিসাবে শুল্ক আদায় করা হয়, কিন্তু এখান  
হইতে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরে রপ্তানী হয়, তাহার  
উপর কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করা হয় না। মস্কটের ৩ মাইল  
পশ্চিমে মাজা নামে আর একটি বড় সহর আছে; এই  
উভয় সহরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি প্রশস্ত পথ  
নির্মিত হইয়াছে।

পর্তুগীজেরা ভারতমহাসাগরে বাণিজ্যার্থে আগমন করিবার  
পূর্বে মস্কটের বাণিজ্যখ্যাতি অদূর যুরোপে রাষ্ট্র হইয়াছিল।  
পর্তুগীজগণ উক্ত বন্দর অধিকার করিলে পর, এখানকার  
বাণিজ্যসমৃদ্ধি বিস্তৃত হইতে থাকে এবং এই নগর ক্রমে প্রাচ্য-  
ভূভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রথমে এই স্থান  
হরমুজের (Ormuz) শাসনাধীন থাকে, পরে ১৫০৭ খৃঃ অব্দে  
পর্তুগীজদলপতি আলবুকার্ক অধিকার করিলেন। ১৬৪৮  
খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এই নগর পর্তুগীজের অধিকারে থাকে। এই  
সময়-মধ্যে ধর্ম্মমন্দির, বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাপ্রকার অট্টালিকা  
নির্মিত হইয়া নগরের শোভা বৃদ্ধি করে। পর্তুগীজেরা গর্ভিত  
দেশীয় লোকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করায় এবং তথাকার  
পণ্যদ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক আদায় করায় তাহারা বিদ্রোহী  
হইয়া উঠে। এই বিদ্রোহের ফলে পর্তুগীজগণ তথা হইতে  
বিতাড়িত হইয়াছিল।

মস্কটের অধিবাসিগণ আরবজাতি। ইহার জাহাজ-  
চালন এবং কামান ও বন্দুক ব্যবহারে অতিশয় নিপুণ।  
পর্তুগীজেরা এদেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তাহারা এরূপ  
প্রতাপশালী হইয়া উঠিল যে, ভারতবর্ষস্থ যুরোপীয় রাজগণ  
পর্যন্ত সশঙ্কিত হইলেন। খৃষ্টীয় ১৭০৭ অব্দে তাহারা পেস্তর  
রাজার নিকট হইতে তথায় জাহাজ নির্মাণ করিবার অহুমতি  
পাইল। মলবার-তীরস্থ নগরগুলি পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে  
লাগিল। পারস্তবাসীর সহিত তাহাদের, নিয়ত যুদ্ধ  
বিগ্রহাদি চলিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহার  
দম্ভাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক নিজ নিজ বন্দরে বাণিজ্যের

উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করে। বর্তমান সময়ে এই নগরের বিশেষ সমৃদ্ধি দেখা যায়।

আরবের দক্ষিণ-পূর্ব-তীরবর্তী সমস্ত স্থান এবং আফ্রিকার ডেলগাডো অন্তরীপ হইতে গর্ডাফিউ অন্তরীপ পর্য্যন্ত উপকূলবর্তী সমুদ্র রাজ্য মস্কটের ইমামের শাসনাধীন। এতদ্বিল্ল মফিয়া, জাজিবার, রেধা, সকোটা। প্রভৃতি দ্বীপও তাঁহার অধীনে ছিল। ইমামের রাজ্যশাসনপ্রণালী বেচ্ছাচার-দোষযুক্ত হইলেও প্রজাবর্গের প্রতি বিশেষ কোন কঠোর অত্যাচারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন বিদেশীয় লোক গভীর নিশীথে নিরিপ্সে সহরের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। দিবাভাগে ও রাত্রিকালে রাস্তার উপর দ্রবাদি পড়িয়া থাকে, অথচ কেহই উহা স্পর্শ করে না। এখানকার নোসেনা নিকটবর্তী সমুদ্র রাজার সৈন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মস্কট, মস্কটদেশজাত দাড়িঘভেদ, ইহা আফগান দেশজাত বেদানা অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। বাহ্য আকৃতিতে কোন বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও ফলে আত্মদ বিভিন্ন বলিয়া অহুমিত হয়। সূচত্বর বর্ণিকগণ ইহাকে অনেক সময় বেদানা বলিয়া ক্রোতাকে প্রতারণিত করিয়া থাকে।

মক্ষর (পুং) মক্ষতে গচ্ছতানেতি মক্ষ-বাহুল্যকাদরঃ যদ্বা  
(মক্ষরমক্ষরিণৌ বেণুগরিব্রাজকয়োঃ। পা ৬।১।১৫৪) ইতি  
ঋটু নিপাতাতে ইতি কশিকা। ১ বংশ। (অমর)

২ ব্রহ্মবংশ। ( রাজনিঃ ) ৩ গতি। ৪ জ্ঞান।

মংকর, প্রাচীন মোসরি বা মোখরি জনপদের নামান্তর।

মস্করা (আরবী) ১ গল্পকারক, পরিহাসক, ভণ্ড। ২ পরিহাস।

মক্ষরা, যুক্ত-(উঃ পঃ) প্রদেশের হামীরপুর জেলায় অন্তর্গত একটি তহসীল ও তাহার সদর। হামীরপুর হইতে ১৬০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। মহেশখেরা নাম হইতে বর্তমান নামের উদ্ভব হইয়াছে। এখনও এখানে মহেশের ভগ্ন মন্দিরস্তুপ বিদ্যমান আছে।

মস্করাণী (দেশজ) মস্করা শব্দের অপভ্রংশ, ঠাট্টা, ভাষাসা  
পরিহাস।

মক্ষরিন্ (পুং) মক্ষতে ইত্যন্ততো গচ্ছতানেনেতি মক্ষ-বাহুলকা-  
দয়, মক্ষরো দণ্ডঃ সোহন্ত্যন্ত্রেতি মক্ষর-ইনি, যথা মা কৰ্ত্তুং  
কৰ্ম্ম নিবেক্ষুঃ শীলমন্ত্ৰ (মক্ষরমক্ষরিণৌ বেণুপরিব্রাজকয়োঃ।  
পা ৩।১।৪৪) ইতি ইনি নিপাতাতে। ১ ভিক্ষু, চতুর্থ আশ্রমী।

“अधीयन्नाभिविद्भिन्नाः धारयन् मङ्गरिव्रतम् ।

বদন্ বহুবলিফোটঃ ক্রক্ষেপঞ্চ বিলোকয়ন্ ॥” (ভটি ৫।৬৩)

२ छत्र ।

সম্বন্ধিহ্ন, গৌতমহত্রেয় জনৈক টীকাকার।

মস্জ, ম্মান, মশিরক ম্মান, তুদাদিৎ পৱৈয়ৎ অকৎ অনিট্। লুট্  
মজ্জতি। লোট্ মজ্জতু। লিট্ মমজ্জ, মমজ্জতুঃ মমজ্জিথ,  
মমজ্জথ, মমজ্জিব। লুট্ মজ্জক্তা, লুট্ মজ্জ্যতি। লুঙ্  
অমাজ্জ্জীৎ, অমাজ্জ্জাতাঃ, অমাজ্জ্জকুঃ। সন্ মিমজ্জ্জতি। ষঙ্  
মামজ্জতে। ষঙ্ লুক্ মামজ্জক্তি। গিচ্ মজ্জয়তি। লুঙ্ অমম-  
জ্জন্ত। ভাবে মজ্জ্যতে, অমজ্জি। কদন্তু—মজ্জনীয়, মজ্জন,  
মজ্জ, মজ্জক, মজ্জা, মংষ্টা, ময়, মংষ্টি, মংষ্টুং, মংষ্টব্য, মংষ্ট্রা,  
সংমজ্জা, মজ্জা, মজ্জ্যৎ, মজ্জ্যন্ত, মজ্জথ।

নি+মস্‌—নিমজ্জন, অত্যন্তাসক্তি, অত্যন্ত সংশ্লেষ ।

উৎ + মসৃজ—উন্মসৃজ, উৎপ্লবন ।

মসজিদ, (জুম্মা বা জামা মসজিদ) মুসলমানদিগের সাধারণ ভজনালয়। মহম্মদ-প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মোপাসনার কৰ্ম-কাণ্ডের আড়ম্বর না থাকায়, তদ্ব্যঙ্গিগণ পূৰ্বকালে এই ধৰ্মমন্দির নিৰ্মাণে আদৌ যত্ন প্রকাশ করেন নাই। তৎকালে ইহা একটা ক্ষুদ্র কুটারের আয় ছিল। ক্রমে উদামহৃদয় ধৰ্ম্মবাজিগণ ভূজবলে ও অর্থবলে বনীয়ান্ হইলে, তাহাদের মধ্যে জাতীয় প্রতিভার প্রতিভূরূপ রাজাপ্রাসাদ ও উৎকৃষ্টতর ধৰ্ম্মমন্দির নিৰ্মাণের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই বলবতী আকাঙ্ক্ষা মুসলমানদিগের রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সুদূর বিস্তৃত হই-রাছিল। যখন ইসলাম-সাম্রাজ্য পশ্চিম-য়ুরোপে স্পেন ও আফ্রিকার বনররাজ্য এবং পূর্বে ভারত ও ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ পয্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন সেই জয়স্পর্ধী বিজেতৃ-বৃন্দের উৎসাহে নানা স্থানে বিজাতীয়-রক্তশোষক মুসলমান-দিগের কীর্তিস্থজা মসজিদরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। ভারতীয় পাঠান ও মোগল এবং তুর্ক, সারাসীন প্রভৃতি মুসলমান সুলতান ও সম্রাটগণ ধৰ্ম্মমন্দির স্থাপন করিয়া যে অপর্য-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যাপি জগতে সেই মহা-সমৃদ্ধ মুসলমান-সম্প্রদায়ের ধর্মোন্মাদকতার পরিচয় দিতেছে। বিজাপুরের জুম্মা মসজিদ ও আগার মতি-মসজিদ ইসলাম-জগতের অতুলনায়-কীর্তি।

সাধারণতঃ ধন্যসেবা বা ঈশ্বরের পরিচয়্যার নিমিত্ত মনজ্জিদ মধ্যে যে সকল নিদ্রিষ্ট স্থান আৰোপিত হইয়াছে, নিম্নে প্রথমে তাহারই একটা তালিকা দেওয়া গেল।

ইহার বহিঃপ্রাঙ্গণের ( শহু ) চতুর্পার্শ্বে কুলুঙ্গী ( লীবান্ )  
পরিসংখ্যাত প্রাচীরশ্রেণী। উক্ত পরিবেষ্টিত স্থানের ঠিক  
মধ্যস্থলে 'মীড়ারা' নামক স্থান। ইসলাম-দোক্তিতমাবেই  
দেবারাধনার নিমিত্ত ভজনগানে (নেমাজে ) প্রবৃত্ত হইবার  
পূর্বে, এইখানে দেবোদেশে অভ্যন্তী পূজোপকরণাদি স্থাপন  
করে। মসজিদের যে অংশ মক্কার অভিমুখে থাকে, সেই

অংশে পাকা ছাদযুক্ত গৃহ (মক্দ্দর) নির্মিত হয়। ঐ গৃহতল প্রাঙ্গণ হইতে প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এখানে বসিয়া জনসাধারণে উপাসনা করে। গর্ভগৃহের ঠিক মধ্যস্থলে একটা 'মিহরাব্ বা কিব্লা' মক্কাভিমুখে স্থাপিত আছে। উহারই অব্যবহিত পার্শ্বে একটা উচ্চ বেদী (মিখরা)। ঐ মিখরার সম্মুখে আর একটা উচ্চ পাটাতন (ডক্ক) থাকে। কখন কখন ধর্মযাজকগণ ঐ পাটাতনে উপবিষ্ট হইয়া ভৌতিক-মন্ত্রাদি আবৃত্তি করিয়া রোগী বা গ্রহক্রিষ্ট ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করে। উহারই পার্শ্বদেশস্থিত আসনসমূহে মোল্লাগণ উপবেশন করিয়া মুসলমান সাধারণকে কোরাণ পাঠ করিয়া শুনান।

মহম্মদের মেদিনা হইতে পলায়নের অর্দ্ধশতাব্দ পরেও মসজিদে চূড়াগৃহ (মাআধিন্) নিৰ্ম্মাণের বিধি ছিল না। তৎপরবর্ত্তি-সময় হইতেই মসজিদ-সংলগ্ন এক বা ততোধিক চূড়াগৃহ-নিৰ্ম্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। ঐ চূড়াগৃহের সন্মুখ সোপানে দাঁড়াইয়া 'মোএক্বিন্' উচ্চঃস্বরে সাধারণকে আজান (নেমাজ পড়িবার প্রকৃষ্ট সময় জ্ঞাপন) দিয়া থাকে। দিবসে পাঁচবার ও রাত্রিকালে দুইবার মাত্র আজান দিবার নিয়ম। সাধারণতঃ অল্প ব্যক্তিকে মোএক্বিনের কার্য্যে প্রতী করা হয়, যেহেতু অপর লোকে সেই উচ্চচূড়ে দাঁড়াইয়া প্রতিবেশিনী কুলকামিনীগণের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিতে পারে।

প্রায় সকল মসজিদেই ব্যয়ভারবহনের জন্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ কর্তৃক ভূসম্পত্তি ও ধনরত্নাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ সম্পত্তি ও রত্নাদি পর্য্যবেক্ষণের জন্ত জনৈক নাজির নিযুক্ত থাকেন। ইমাম্ ও অন্যান্য কর্মচারি-নিয়োগের ক্ষমতাও তাঁহার হস্তে র্ত্ত।

বড় বড় মসজিদে প্রধানতঃ দুইটা করিয়া ইমাম্ নিযুক্ত হন। যিনি প্রতি শুক্রবারে ইসলামধর্ম-প্রচারার্থ বক্তৃতা করেন, তিনি খতীব্ এবং মিহরাবের সন্নিহিতে দাঁড়াইয়া যিনি কোরাণ পাঠ করেন, তিনি রাতীব্ নামে প্রসিদ্ধ। রাতীব্কে সাধারণের সহিত একত্র হইয়া ভজনা করিতে হয়। অপর সকলে তাঁহারই অধিকরণে উপাসনা করে।

ইমাম্গণ ধর্মযাজকের কার্য্য করে না। তাহাদের স্বতন্ত্র কার্য্য আছে। বিতাদান, দোকানরক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে তাঁহারা জীবিকার্জন করিয়া থাকেন। সামান্য দোষ দেখিলেই নাজির তাঁহাদিগকে কর্মচ্যুত করিতে পারেন। পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ইমাম্ উপাধিও নষ্ট হয়। এতদ্বিন্ন মসজিদের আর অল্পদূরে দ্বারবান্ ও পরিচারকাদি নিযুক্ত হইয়া থাকে।

মুসলমান রমলীগণের গৃহে থাকিয়া উপাসনা করাই বিধি! কিন্তু কোন কোন মসজিদে তাহাদের জন্ত স্বতন্ত্র উপাসনাস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল স্থান 'খাপ্রি' বা পদ্দা দিয়া সম্যক্রূপে আবৃত; রমলীগণ উহার মধ্যে থাকিয়া ভজনা করিলে, বাহিরের পুরুষমণ্ডলী তাহাদিগকে আদৌ দেখিতে পায় না। মিসররাজ্যের কায়রো-নগরস্থ সিউ-জৈনাব মসজিদে এবং জেরুসালেমের আকসা-মসজিদে ইসলামধর্ম-সেবী কামিনীকুলের উপাসনাস্থান নির্দিষ্ট আছে।

তুর্ক এবং হানিফ-সম্প্রদায়ী মুসলমানগণ যে মসজিদে উপাসনা করে, তথায় তাহাদের হস্তপদ ও মুখাদি প্রক্ষালনোপযোগী কএকটা তোয়াধার রাখিতে হয়। উহার সকলেই ভিন্ন ভিন্ন নলমুখ-নিঃসৃত জলে শৌচক্রিয়া সমাধা করে। এজন্ত প্রায় সেই সকল মসজিদে একটা উচ্চ স্থানে চৌবাচ্চা গাঁথিয়া জল রাখা হয়। স্ত্রী-সম্প্রদায়গণ পুষ্করিয়াদির স্থিরজলে আচমনাদি করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মুসলমান-ধর্মের প্রাধান্ত ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই মসজিদ-নিৰ্ম্মাণের বাহুল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যজয়ে অর্থবান্ হইয়া মুসলমান-রাজগণ প্রচুর অর্থব্যয়ে মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সকল ধর্মমন্দিরকে রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও অধিকতর শিল্পশৌষ্ঠবে শোভমান করিতে ক্রটি করেন নাই। এক একটা মসজিদের মধ্য-প্রস্তরপাচিত শিল্পচাতুর্য্য এবং ইবনি ও সোণালিপাতের সমাবেশ দেখিলে, স্বতঃই সেই পুষ্পতন শিল্পগণের অদ্ভুতকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। এককথায় উহার প্রত্যেক খিলান, প্রত্যেক দ্বার, জানালা বা দেউল, এমন কি, গৃহভাস্তরস্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রত্যেক কবাট, পদ্দা বা ছাদতলের চাঁদোয়ার কারুকায্য কলাবিদ্যার পরিচয়স্থল বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। জানালার সারসির কাজ এবং রৌপ্যাদিবিশিষ্ট আলোকদান, বাহ্য এক সময়ে বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করিয়া সাধারণো প্রচারিত ছিল, এক্ষণে শিল্পের অবনতিহেতু তৎসমুদায় দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বাহ্য কালের কঠোর স্রোত হইতে রক্ষা পাইয়া আজিও বিত্তমান আছে, তাহা স্পষ্টার সহিত প্রাচীন শিল্পের মর্যাদা রক্ষা করিতেছে।

কোন কোন মসজিদে বহু প্রাচীন কাল হইতে হস্তলিখিত গুণি বহু বস্তুর সহিত সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মরক্কোরাজ্যের যেফনগরস্থ কক্ববিন্ মসজিদে কোরাণ প্রভৃতি ইসলামধর্ম-সম্বন্ধীয় বহু শাস্ত্রগ্রন্থে লোণা বা রূপায়



উচ্চল তক্কা ও মখমলাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্রান্তরণে শোভা পাই-তেছে। ঐ পুথিসমূহের মধ্যে দার্শনিক-প্রবর আরিস্টটল-প্রণীত প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural History), এবং এভেরো' প্রভৃতি বিখ্যাত টীকাকারের গ্রন্থ পাওয়া যায়। কোন কোন পুথি খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দিরও প্রাচীন।

মহম্মদের জন্মভূমি মক্কার পূর্ব ও পশ্চিম দেশে ইসলাম-ধর্ম বিস্তৃত হইলে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন সময়ে উপাসনা-মন্দির গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু হুঃখের বিষয়, তাহারা বাস্তবিক প্রণালী কোথাও অমূল্যরূপে করে নাই। হিন্দুর মন্দির এবং খৃষ্টানদিগের গির্জা বৈরূপ একই নিয়মে গঠিত হইয়া থাকে, মুসলমানের মসজিদ-নির্মাণের সেরূপ কোন স্বতন্ত্র নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশবিশেষে বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদিগের ধর্মমন্দির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে গঠিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, উল্লুকপাণধারী মুসলমানগণ যখন যে দেশ আক্রমণ ও জয় করিয়াছিল, বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাহারা পরাজিত জাতির উৎকৃষ্ট শিল্পসম্পদ অট্টালিকা বা দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া তদুৎপন্ন করণে সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল। কখন কখন সামান্য অংশমাত্র পরিবর্তন করিয়া সেই বিজিতজাতির কীর্তি-স্তম্ভ মুসলমানগণের মসজিদে পরিণত হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম-বিস্তারের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। আবার কোথাও কোথাও অট্টালিকাসমূহের মধ্যে পড়িয়া গঠনকার্যের সঙ্গীর্ণতা হেতু মসজিদগুলি সাধারণ মসজিদ হইতে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই হেতু কার্যারোণগরের গৃহসংলগ্ন মসজিদ-এবং ভারতবর্ষ ও যুরোপীয় ভূরূপের প্রাচীনতম ধ্বংস কীর্তি-গুলির উপাদানে গঠিত মসজিদগুলি স্বতন্ত্র ধরণে নির্মিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মুসলমানগণ যে যে দেশে একরূপ কোন কীর্তিনাশের সুবিধা পায় নাই, তাহারা ঠিক সেই সেই স্থানে মক্কার মসজিদের অমূল্যরূপ মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল। ভারত হইতে কর্ভোভা ও সিরিয়া হইতে মিসররাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে আরবীর কীর্তির অমূল্যরূপ অনেক মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। মক্কার আরবদেশে বাস করিয়া মহম্মদের শিষ্যসম্প্রদায় শিল্পশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। তাই আরবের প্রধানতম মসজিদগুলি এরূপ শিল্প-শূন্য ও সরলভাবে গঠিত। কিন্তু যখন তাহারা বিভিন্ন দেশ জয় করিয়া গ্রীক, রোম ও প্রাচীন ভারতসাম্রাজ্যের কলা-বিজ্ঞান প্রকৃষ্ট নিদর্শনসমূহ নয়নগোচর করিল, তখন হইতে তাহারা দীর্ঘাষিত হইয়া জাতীয় গৌরববৃদ্ধির জন্য মসজিদ-গঠনের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিল। যোগলসত্রাট-

গণের অধিকারে ভারতীয় মসজিদগুলি বাস্তবিকের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। জেরুসালেম ও দামকাসের মসজিদের কাচের 'মোজেক'গুলি প্রাচ্যশিল্পের নিদর্শন বলিয়া প্রস্তুত-বিদগণের বিশেষ আদরগীর্ণ। কিন্তু কেহ কেহ উহাকে বাইজান্টিনাম্বাসী খৃষ্টানদিগের শিল্প বলিয়া কল্পনা করেন।

মক্কা ও মদিনার সরল প্রণালীর অমূল্যরূপে মুসলমান সাম্রাজ্য মধ্যে পূর্বকালে যে সকল মসজিদ নির্মিত হইয়া-ছিল, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। প্রাচীন কাররোর অমূল্য মসজিদ—৬৪২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দির শেষভাগে জীর্ণসংস্কার-পূর্বক উহার কলেবর বর্ধিত হইয়াছিল।

২। টিউনিস্ রাজ্যের কৈরাবান্হু সিদি-ওক্কা মসজিদ—৭ম শতাব্দির শেষভাগে নির্মিত।

৩। আলজিরিয়ার বিস্কাফ নিকটবর্তী সিদিওক্কা মসজিদ—৬৮৪ খৃষ্টাব্দে।

৪। মরক্কোরাজ্যের ফেজ্ নগরস্থ এদিস্ মসজিদ—৮ম শতাব্দির শেষভাগে।

৫। দামকাসের বিখ্যাত মসজিদ—৭০৮ খৃঃ অব্দে। এখানে ৩৯৫-৪০৮ খৃষ্টাব্দে থিওদোসিয়াস কর্তৃক খৃষ্টানদিগের একটি বাসিলিকা (ধর্মশালা) নির্মিত হইয়াছিল। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে আরবগণের দামকাস নগর অধিকার হইতে ৭০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বাসিলিকা খৃষ্টান ও মুসলমানের ব্যবহার্য ছিল। উক্ত বর্ষে খলিফা বালিদ তাহা ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্তে এই মসজিদ নির্মাণ করান।

৬। কর্ভোভার বিখ্যাত মসজিদ—৭৮৪ খৃষ্টাব্দে খলিফা আবদুল-রহমান কর্তৃক আরম্ভ হইয়া ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র হিসাম কর্তৃক সম্পন্ন হয়। এখন ইহার কতকাংশ খৃষ্টান-গির্জার রূপান্তরিত হইয়াছে।

৭। কাররো (পুরাতন) নগরের অক্ষদ ইবন-তুলুনের মসজিদ—৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

৮। কাররো (নব) নগরের অল্ অজ্জহর মসজিদ—১৭০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এখানকার প্রধান আচার্য শেখ-অল্-অজ্জহর নামে খ্যাত। ইনি মাসিক প্রায় ১ হাজার টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। এখানে ছাত্রদিগকে কোরাণ, ধর্মশাস্ত্র, জ্ঞান, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, আয়ুর্বেদ (হাকিমী), ভূগোল ও বীজগণিত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

৯। প্রাচীন দিল্লীর সুবহৎ মসজিদ—১১৯৬ হইতে ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত।

উপরোক্ত মসজিদগুলি একই সাধারণ প্রণালী

অবলম্বনে গঠিত। এতদ্বিধ মুসলমান অধিকারের মধ্যে আরও বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে জেরুসালেমের হরাম-অল-শরিফা, কুবেব-অল-শকা, অল-অকসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আফ্রিকা মহাদেশে এই শ্রেণীর মসজিদের মধ্যে কায়রো নগরীর মসজিদগুলি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শিল্পদোন্দগো পূর্ণ। তন্মধ্যে (১) ১৩৫৬-৫৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত সুলতান হসনের মসজিদ (২) ১৩২০ খৃঃ অঃ সুলতান কলাউন নির্মিত মুরিহান-কলাউন মসজিদ (৩) ইব্রাহিম আগা মসজিদ, (৪) ১৩৯৯ খৃঃ অঃ সুলতান বক্ক এবং খলিফাগণের সমাধিমন্দির, (৫) ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান কাইংবের সমাধি-মন্দির, (৬) কৈরবানস্থ আবহুয়া বদিবের সমাধিমন্দির, (৭) আলজিয়ার্স নগরের ১০ম শতাব্দির ও ১৫ম শতাব্দির ১২শ শতাব্দির মসজিদ প্রভৃতি সাধারণতঃ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাতার কবর জন্ত নির্মিত হইয়াছিল।

স্পেন রাজ্যের কর্ডোভার নিকটস্থিত জহরার সুবৃহৎ মসজিদ ৯৪১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। উহা তৎকালের কারুকান্য-খচিত। এতদ্বিধ উক্ত রাজ্যের টোলাডোর কুঠো ডি লা লুজ প্রভৃতি অনেকগুলি মসজিদ বর্তমানে গির্জায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

পারস্ত-রাজ্যে হাকিম-অল-রসিদের রাজ্যকালে যে সকল শোভাময় চাকশিল্পসম্বিত মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল, তাহার একটিও সম্প্রতি বিদ্যমান নাই। আর্জেকুম, তারিজ ও ইস্ফাহান নগরের আধুনিক কীর্তিসমূহ সেই প্রাচীন শিল্পের অংশ-মাত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ১৫৮৫-১৬২৯ খৃষ্টাব্দে শাহ আব্বাস ১ম, নির্মিত 'মসজিদ শাহ' নামক ভজনালয় পারস্ত-শিল্পের উন্নতি-পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। সুলতান হোসেনের ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের মসজিদে প্রাচীন কলাবিদ্যার অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে সহস্র বৎসরকাল মুসলমান-আধিপত্যে যে সমস্ত মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই সুবৃহৎ এবং শিল্পদোন্দগো সমাচ্ছন্ন। বিদগ্ধী মুসলমানগণের প্রথম ভারত-প্রবেশের সময় যে সকল প্রাচীনতম হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ-মন্দিরাদি যবন কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহারই উপকরণাদি লইয়া বিজেতা যবনরাজগণ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্মশাস্ত্র, দেবতা-অপবিগ্রীকরণ ও দেবমন্দিরাদি উৎসাদন মুসলমানগণের মূল মন্ত্র ছিল। এরূপ লিখিত আছে যে, প্রাচীন দিল্লীর সুবৃহৎ মসজিদ-নির্মাণকালে (১১৯৬-১২৩৫) দাসরাজগণ প্রায় ২৭টি হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার শিল্পসম্বিত প্রস্তরফলকগুলি

মুসলমান জাতির কীর্তিস্বরূপে উহাতে সংলগ্ন করিয়া যান। এখনও ঐ মসজিদগারে হিন্দু ও মুসলমানচিত্রের অপূর্ণ মিশ্রণ বা সমাবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আজ-মীরের ১৩শ শতাব্দির মসজিদও ঐরূপ হিন্দুমন্দিরের উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। এতদ্বিধ অন্ধদাবাদ, মাধু, মালদহ, বিজাপুর, ফতেপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ হিন্দুমন্দিরের উপাদানে নির্মিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে গেলে, এক এক স্থানের মসজিদ লইয়া এক একখানি গ্রন্থ লিখিতে পারা যায়।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দি এখানে ফ্লোরেন্স-দেশজাত মন্মর-প্রস্তর আনদানী হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে তদৈন্দীয় ভাস্করগণ (Mosaic workers) এখানে আসিতে আরম্ভ করে। মোগল-সম্রাটগণ তখন ভারতের অধীশ্বর। তাহারাই এই সুন্দর ও সুচিকণ মন্মর-প্রস্তর লইয়া প্রভূত ব্যয়ে আগ্রা-নগরীর জগৎ-বিখ্যাত 'তাজমহল' ও 'মতি-মসজিদ' নির্মাণ করাইয়া জগতে অমূল্য কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। [তাজমহল দেখ।]

কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগরে শাহ হামদান-বিনির্মিত একটা কাঠের মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার স্তম্ভগুলি দেবদারু বৃক্ষ এবং নানা কারুকার্য-বিমণ্ডিত।

মসজিদকুড়, বাংলার যশোহর জেলার অন্তর্গত একটা স্থান। এখানে একটা প্রাচীন মসজিদ নির্মিত ছিল। উহা এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও উহার ৯টি গম্বুজ, চারিকোণে ৪টা চূড়া ও স্তম্ভোপরিষ্কৃত ছাদ অত্যাধি বিদ্যমান আছে। অনেকে ষাটগম্বুজ-প্রতিষ্ঠাতা খান-জহানকে ইহারও নিম্নাতা বলিয়া অনুমান করেন। এই স্থান কপোতাক্ষ-ভীরবর্জী চাঁদ-খালি হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২৮' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ১৯' ৩০" পূঃ। স্মরণন কাটিয়া চাঁদ করিবার সময় এত মসজিদ বাহির হইয়াছিল। এখান-কার লোকে ঐ মসজিদে পূজা দিয়া থাকে।

মসজিদ (আরবী) মসজিদ।

মন্ত (পারসী) ১ বৃহৎ। ২ মন্ত, মদ্যপানযুক্ত। ৩ গণিত।

মন্ত (ক্কা) মন্ততে পরিমীয়তে মন্ত পরিমাণে ক্ত। ১ মন্তক।

“দণ্ডকমণ্ডলুপ্তিতহন্তঃ সুললিততিলকবিভূষিতমন্তঃ।”

(অমর মহাভাষ্য ৯৫, রঘুনাথযুত শ্লোক)

মন্তক (পুং ক্কা) মন্ততে পরিমীয়তে মন্ত (ইযাশিভ্যাং তকন্।

উণ্ ৩।১৪৮) ইত্যত্র 'বাছল্যাং মন্ততেরপি তকন্' ইত্যজ্ঞল-

দন্তোক্ত্য তকন্। ১ প্রধানাক্ষ, চলিত মাথা। পর্যায়—

উদ্যাক্ষ, শিরস, শীর্ষ, মুণ্ড, শির, বরাক্ষক, পুণ্ড্র, মৌলি, কপাল, কেশভূ, মন্ত। (রাজানি°)

তত্ত্বমতে মস্তকে অধোমুখ সহস্রদল পদ্ম আছে, এই পদ্মের কর্ণিকায় পদ্মমায়া অবস্থিত।\*

“ছত্রাকাটের: শিরোভিত্ত নৃপা নিম্নশিরা ধনী।

চিপিটেষ্ট পিতৃশূত্বার্গবাঢ্যা: পরিমণ্ডলৈ:।

ঘটমূর্চ্ছা পাপকুচিধনানৈঃ পরিবজ্জিত: ॥”(গুরুড়পুঃ ৬৬অ’)

মস্তক ছত্রাকার হইলে ধনী, চিপিটাকার হইলে পিতার যুতা এবং গোধনসম্পন্ন এবং ঘটাকার হইলে পাপী ও ধনহীন হইয়া থাকে। ২ অগ্রভাগ। ৩ উচ্চ।

মস্তক, মস্তষ্ক ও অপরাপর জীবাদির মুখমণ্ডল-সমাপ্রিত শিরোভাগ অথবা মূল জীবদেহকে আশ্রয় করিয়া কেশমণ্ডিত গ্রীবাংশলয় যে দেহভাগ উর্দ্ধে অবস্থিত আছে, তাহাই মস্তক বলিয়া গণ্য। শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ, দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু, জ্ঞাপেন্দ্রিয় নাসা, রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, কপোল, কপাল প্রভৃতি দেহাংশ এই মস্তকাংশের সংরক্ষিত আছে। এই জন্ত মস্তকচ্ছেদ বলিলে মূলদেহ হইতে মস্তকাংশের গ্রীবাস্তরাল-বিচ্ছেদকেই বুঝাইয়া থাকে।

মস্তিস্কই মস্তকের প্রধান উপাদান। মস্তিস্ক না থাকিলে মস্তকের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কার্য চলিত না। এমন কি, সমগ্র জীবদেহই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিত। এতদ্বিবন্ধন কোন কোন শাস্ত্রকার মস্তিস্ককেই জ্ঞানের আধার বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চক্ষু বাহা দর্শন করে, কর্ণ বাহা শ্রবণ করে, জিহ্বা বাহা আশ্বাদন করে, মুখ বাহা গ্রাস করে, দন্ত বাহা চর্ষণ করে, গলদেশ বাহা অধঃকরণ করে, তৎসমুদায় ব্যাপারই মস্তিস্কের অনুভূতিসাধ্য। কারণ তত্ত্বব্যাপার মস্তিস্কে অনুভূত না হইলে কখনই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ উপলব্ধি করা যায় না। মস্তকে মস্তিস্ক থাকতেই জীবদেহের বাবতীয় ক্রিয়া স্বতঃই অনুপ্রবৃত্ত হইতেছে।

সূক্ষ্মতাদি বৈজ্ঞানিকগ্রে মস্তকের উপাদানভূত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিষয় এইরূপ বলা হইয়াছে,—মস্তকাংশে প্রধানতঃ তিন প্রকার অস্থি দেখা যায়; তন্মধ্যে গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মস্তকে কপাল নামক, দন্তে রুচক নামক এবং চক্ষুকর্ণাদিতে তরুণ নামক অস্থি সন্নিবেশিত আছে। বিভিন্ন স্থানে ঐ অস্থিগুলি বিভিন্ন সংখ্যায় বিরাজিত; যথা—হনুদয়ে—২, দণ্ডে—০২, নাসিকায়—৩, তালুতে—১, গালে—২, কর্ণে—২, শঙ্খ

(রগে)—২ এবং মস্তকে—৬টা। এই সমস্ত যথাক্রমে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ, যথা;—দন্তমূলসন্ধি ৩২, নাসিকার ১, নৈত্র-মণ্ডলে ২, গণ্ডদ্বয়ে ২, কর্ণদ্বয়ে ২, শঙ্খদ্বয়ে ২, হনুসন্ধিদ্বয়ে ২, ক্র-দ্বয়ের উপরিভাগে দুইদিকে ২, মস্তকের কপালখণ্ডে ৫ এবং মূর্দ্ধদেশে ১টা মাত্র সন্ধি আছে। মস্তক ও কপালের সন্ধিকে তুল্য-সেবনী বলে। এতদ্বিত্ত মূর্দ্ধদেশে সর্বসমেত ৩৪টা স্নায়ু এবং হনুদেশে ৮, তালুদেশে ২, জিহ্বায় ১, ওষ্ঠে ২, যোগার ২, চক্রে ২, গণ্ডে ৪, কর্ণে ২, ললাটে ৪ ও মস্তকে ১টা পেশী আছে। ক্রকাটিকা, বিধুর, ফণা, অপাঙ্গ, আবর্ত, শঙ্খ, উৎক্ষেপ, স্থপনী, দীমস্ত, শৃঙ্গাটক, অধিপতি প্রভৃতি মর্শ্ব এবং ৫৬টা শিরা স্কন্ধসন্ধি ও মস্তকের মধ্যদেশে অবস্থিত।

এলোপ্যাথিক-মতানুসারী বর্তমান শারীরতত্ত্ববিদগণ ঐ সকলের সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত না হইলেও, উভয় মতে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তাহারও নুকরোটি (Cranium) ও মুখমণ্ডলের সমবেত ফলকে মস্তক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মস্তকের উপরিদেশে বস্তুত যে করোটি বা কপাল নামক অস্থি ও *Dura mater* নামক দৃশ্য মাতৃকা আছে, তাহা সামান্য কারণেই উত্তেজনা প্রাপ্ত হয়। ঐ সকলের সহিত মস্তিস্কের সংযোগ থাকায় নীত্ৰই জীবদেহ বিকৃত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রলুপ্ত, কাউর, সংভ্রাস, মৃগী, উন্মাদ প্রভৃতি রোগ মস্তিস্কের বিকৃতিহেতু ঘটয়া থাকে। নিরন্তর সূর্য্যের উত্তাপে ভ্রমণ হেতু এবং শরীরভাঙ্গুরত্ব ক্রমি জন্ত মস্তকে যে সকল রোগ জন্মে, ইংরাজীতে তাহা *Injuries of the head* নামে খ্যাত। তদ্বিবরণ বৈজ্ঞানিক শিরোরোগ শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [ মস্তিস্ক ও শিরোরোগ দেখ। ]

মস্তকজ্বর (পুং) শিরোব্যথা।

“নিশম্য লোকত্রয়মস্তকজ্বরং তমাদিদ্দৈত্যং হরিণা হতঃ মুখে।”

(ভাগঃ ৮। ৮। ৩৫) ‘মস্তকজ্বরং শিরোব্যথাং’ (স্বামী)

মস্তকস্নেহ (পুং) মস্তকস্ত স্নেহঃ। মস্তকের স্নেহ। শিরো-মজ্জা, মস্তিস্ক। চলিত মাথার ঘি।

‘গোদন্ত মস্তকস্নেহো মস্তিকো মস্তলুঙ্গকঃ ॥’ (হেম)

মস্তকাখ্য (পুং) মস্তকমিতি আখ্যা যন্ত। বৃক্ষশিরঃ, গাছের আগ। (শব্দচঃ)

মস্তগড়, পঞ্জাবের বশহর রাজ্যের অন্তর্গত একটা দুর্গ। অক্ষাঃ ৩১°২০’ উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭৭° ৩৯’ পূঃ। হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ‘ময়াল-কি-কাণ্ড’ পর্বতের উত্তরে উচ্চ শৃঙ্গোপরি অবস্থিত। বশহর গোখাদিগের অধিকারভুক্ত হইলে এই দুর্গটাও তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯ সহস্র ফিট উচ্চ।

\* “যাকে উত্তানো করো কৃষ্ণা সোহহমিতি জীবজ্ঞানঃ জগদ্রহঃ দীপকলিকা-  
কারঃ মূলধারবহুলকুলজিহ্বা সহ যম্মাবস্তনা মূলধারবাধিধানমণিপূরানাহত-  
বিশুদ্ধজ্ঞানবটচক্রাণি তিষ্ঠা শিরোহবস্থিতাশৌর্যমহাস্রবলকমলকর্ণিকান্তর্গত-  
পরমার্থান সংযোজ্য ইত্যাদি।” (ভক্তাবলী)

মস্তদারু (ক্লী) মস্তঃ মস্তকমিব উচ্চঃ দারু। দেবদারু। (ভাবপ্রঃ)

মস্তমূলক (ক্লী) মূলমেব মূল-স্বার্থে কন, মস্তমূলকঃ।

শিরোম্ধঃ। চলিত বাড়, মস্তকের মূল, মস্তকমূলক।

মস্তকিম্ (আরবী) ১ সরলভাবে দণ্ডারমান। ২ বিকৃত।

মস্তকী (ইংরাজী) Mastich শব্দের অপভ্রংশ।

মস্তাইদু খাঁ, (মহম্মদ শাকী) সুলতান বাহাদুর শাহের উজীর ইনাযুল খাঁর মুন্সী। ইনি 'ম-আশিরি আলমগিরি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে আলমগিরি অর্থাৎ অরঙ্গজেবের রাজ্যকালের ঘটনাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। মস্তাইদু খাঁ ৪০ বৎসর কাল বাদশাহের সমভিব্যাহারে থাকিয়া স্বচক্ষে অনেক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। অরঙ্গজেবের উৎসাহেই তিনি পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ১৭১০ খৃঃ অব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

মস্তাইদু খাঁ অরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যবিজয় যথার্থ বর্ণনা করিলেও অনেকস্থানে সত্যের অপলাপ করিয়া বাদশাহের বিপৎপাত সমূহ আদৌ উল্লেখ করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, অরঙ্গজেব স্বীয় রাজত্বের ১০ বৎসর অতীত হইলে পর, গ্রন্থকারদিগকে তাঁহার জীবনেতিহাস কিংবা রাজ্যসম্বন্ধীয় কোন ঘটনা লিখিতে নিষেধ করেন। কিন্তু এই নিষেধস্বত্বেও মস্তাইদু খাঁ গোপনে দাক্ষিণাত্য বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন।

মস্তাজাব খাঁ, নবাব মস্তাজাব খাঁ বাহাদুর নামে প্রসিদ্ধ। হাফিজ রহমৎ খাঁর পুত্র। ইনি "গুলিস্তানী রহমৎ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে মস্তাজাব খাঁ তাঁহার পিতার জীবনচরিত ও গোহিলাবাসী আফগানদিগের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন।

মস্তাদ্ (আরবী) ১ প্রস্তুত। ২ উপযুক্ত, পারদর্শী।

মস্তানি (পারসী) ১ মস্তভা। ২ মাদকতা।

মস্তি (স্ত্রী) মস-কিন্। পরিমাণ।

মস্তিষ্ক (ক্লী) মস্তঃ মস্তকং ইয়াতি স্বাধারত্বেন প্রাপ্নোতি ইষ গতো ক, পূর্বোদরাদিহাং সাধুঃ। মস্তকভব ঘ্রতাকার ব্রহ্ম-পদার্থ, পারদী মগজ, পর্যায়—গোদী, গোদ, মস্তকস্নেহ, মস্ত-লুঙ্গক। (হেম)

"যন্ত্রঃ শীর্ষাণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বিবৃহামি তে" (খক্ ১০।১৬৩।১)

মস্তকভ্যন্তরস্থ স্নেহবৎ পদার্থবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে মাথার ঘি, মগজ বা মজক কহে। আমরা নিত্য বাহ্য আহার করি, পাকস্থলী মধ্যে জীর্ণ হইয়া তাহার কিয়দংশ রসাকার ধারণ করে। ক্রমে ঐ রস শুষ্ক ও শোণিতে রূপান্তরিত হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধক হয়। উর্দ্ধরেতা হইলে ঐ শুষ্ক স্নেহমধ্য দিয়া ক্রমশঃ মস্তিষ্কে উপনীত হয় এবং মস্তিষ্কের স্থিতি

ও স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু অনিয়মিত শুক্রকর্মে শরীরের বলহানি ও মস্তিষ্কের শক্তিগুণের হ্রাস হইতে দেখা যায়। এই কারণে সাধু সন্ন্যাসিগণের স্থিতিশক্তির বৃদ্ধি ও চঞ্চলস্বভাব যুবকগণের মৈথুনাদি দোষে উক্ত শক্তির হ্রাস লক্ষিত হয়।

মেরুদণ্ড ও তৎসংলগ্ন কাশেরকরজ্জু মস্তিষ্কের সহিত ঘনসম্মিলিত হওয়ায় অর্থাৎ শুক্রপথবাহিনী বলিয়া নির্দ্ধারিত থাকায়, মস্তিষ্কের যাবতীয় পীড়া বা বিকৃতি মেরুদণ্ডে সমাপ্রিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের পীড়াসমূহ পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, প্রথমে কএকটি সংজ্ঞা জানিয়া রাখা আবশ্যক। মস্তিষ্কের অবচ্ছন্দতা উৎপন্ন হইলে যথাক্রমে ভার (Heaviness), স্পন্দন (Throbbing), উত্তাপ (Heat), ঘূর্ণন (vertigo), মেরুদণ্ডের জ্বালা (Burning) ও আকৃষ্টতা (Tightness) অনুভূত হয়।

মস্তিষ্কের ক্রিয়াসম্বন্ধে পরিবর্তন ঘটিলে অনিদ্রা (Insomnia), প্রলাপ (Delirium), নিদ্রাবেশ (Stupor), এবং অচেতনতা (Coma) প্রভৃতি লক্ষণ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহার পীড়ায় বিভিন্ন ইঞ্জিয়েরও নানাক্রম বৈকল্য ঘটয়া থাকে; যেমন চক্ষু মধ্য হইতে অগ্নিশিখা (Flashes), এবং চক্ষুর সম্মুখে বিবিধ বস্তুর চলাচল (Muscae Volitantes), কর্ণের ভিতর নানাক্রম শব্দানুভব (Tinnitus Aurium), আশ্বাদের বিভিন্নতা, স্পর্শশক্তির বৃদ্ধি (Hyperaesthesia) ও ধ্বংসতা (Anæsthesia), এবং বিন্‌ঝিনি (Numbness), ফুড়ফুড়ী (Tickling), চুলকোনা (Itching), পিপীলিকা গমনের ভায়া স্পর্শ (Fornication), বেধবৎ যন্ত্রণা (Pricking), প্রভৃতি স্পর্শশক্তির নানা ব্যতিক্রম (Paræsthesia) উপলব্ধি করা যায়। ইহা ব্যতীত মাংসপেশীসমূহের গতি-সম্বন্ধে আরও নানা প্রকার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে;—১ সামান্য স্পন্দন (Twitching বা Subsultus Tendinum), ২ কম্পন (Tremor), ৩ দৃঢ়তা (Rigidity), ৪ আক্কেপ (Spasms), ৫ শুক্রতর আক্কেপ (Convulsions) ও ৬ অবশাদ (Paralysis), এই সকল স্বাভাবিক পীড়ায় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বিশেষ উপকারী। যে স্থানে মাংসপেশী অবশ থাকে, তথায় বিরামযুক্ত স্রোত (Magneto-electric) এবং ধ্বংসতা থাকিলে অবিরাম স্রোত (Voltaic) ব্যবহা করা যাইতে পারে। অবিরাম স্রোত দ্বারা ক্ষয়যুক্ত পেশীর পরিপুষ্টি হইয়া থাকে।

স্নায়ুমণ্ডল ও পেশীসমূহের পীড়া শাস্তির নিমিত্ত যে যে ঔষধ সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

১। মস্তিষ্কের উত্তেজক ঔষধ—মদিরা, ইথার, ক্লোরোফর্ম, চা, কাফি, কোকো, হাওসাইমাস্, কর্পূর, চরস, স্বল্পমাত্রা অহিফেন, বেলেডোনা, তাম্বকুট, অঙ্গবর্ষণ ও বৈদ্যাতিক ঔষত প্রভৃতি।

২। মস্তিষ্কের অবসাদক ঔষধ—অহিফেন, মর্ফিয়া, ক্লোরাল্ হাইড্রাস, বিউটিল ক্লোরাল, মদিরা, ইথার, ক্লোরোফর্ম, চরস, বেলেডোনা, এট্রোপিয়া, হপ, লেটিউগ, হাওসাইমাস্, সল্ফোলেন, ব্রিমিডিয়া প্রভৃতি।

৩। স্নায়ুশূল—জেলসিমিয়ম্, ফেনাজোন্ ও এগজ্যাল্ ভাইন্ অবসাদক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কার পীড়ায় স্ট্রীক্-নিয়া ও নক্সভমিকা উত্তেজকরূপে এবং ব্রমাইডম্, ক্লোরাল্-হাইড্রাস, হাইড্রোসিএনিক্ এসিড্, কর্পূর, নাইট্রেট্ অব্ এমাইল, অহিফেন, মর্ফিয়া, ক্যালোবার বিন্, কোনাএম্, নাইকো-টাইন্ ও কুরা প্রভৃতি অবসাদক বলিয়া গণ্য।

৪। স্নায়ুর বলকারক ঔষধ—আসেনিক, ফসফরস, হাইপোকফাইটস্, কুইনাইন্, নক্সভমিকা, স্ট্রীক্-নিয়া, সল্ফেট, ভ্যালিরিয়নেট্ অব্ কপার, ক্লোরাইড্ অব্ বেরিয়াম ও গোল্ড।

৫। মেম্বল, থাইমল, ক্লোরাল্ হাইড্রাস, ক্যাম্ফর মিস্চার, কোকেন্, ইথারেসে, ক্লোরোফর্ম, অহিফেন, বেলেডোনা ও একোনাইটের লিনিমেন্ট পীড়াহানের ক্ষণিক অবসাদক ও স্নিগ্ধকারক এবং উত্তাপসম্পর্শ, ঘর্ষণ, মর্দন ও জলপারা প্রভৃতি স্থান উত্তেজক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।

৬। এমোনিয়া, কার্বনেট অব্ হাইড্রাস্ এমোনিয়া, ব্রমাইডম্, স্ট্রীট, ইথার, ক্লোরোফর্ম, ক্লোরাস্, হাইড্রোসিয়েনিক্ এসিড্, পিপারমেন্ট, ল্যাভেণ্ডার, কাজুপটা ও রু প্রভৃতির তৈল, নেম্বল, কর্পূর, হিং, এনোনাএকম্, গ্যালবেনম্, ভ্যালিরিয়েম্, মৃগনাভি, অহিফেন, মর্ফিয়া, চরস, বেলেডোনা, এট্রোপিয়া, ক্যালোবার বিন্, কোনাএম্, লোবিলিয়া স্ট্রোমোনিয়ম্ প্রভৃতি ঔষধ আক্ষেপনিবারক।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, প্রদাহ, আবাত, অথবা তন্মধ্যে তরল বা দূষিত শোণিতের সঞ্চালন; স্নায়ুশূল রোগ; পাক-স্তলী, অঙ্গ, যকৃৎ বা জরায়ুর বিবিধ পীড়া; ম্যালেরিয়াজনিত, অথবা অজ্ঞাত জর সকলে এবং অনিদ্রা, শিথিলস্বভাব, মনস্তাপ, মানসিক ও শারীরিক অত্যধিক পরিশ্রম, ক্লান্তি, চা, কাফি ও অহিফেন ব্যবহার ও নিরন্তর সুরাপান প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্কে বেদনা অনুভূত হয়। উহা শিরোবেদনা বা মাথাব্যথা (Headache বা Cephalalgia) নামে খ্যাত।

বক্তাধিক্য বা রক্তের শূন্যতা-প্রযুক্ত মস্তিষ্কের কোন পীড়া

হইলে, অথবা অজীর্ণ কিংবা পিত্তাধিক্য হেতু শিরোপীড়া উপস্থিত হইলে, কারণানুসারে এই রোগগুলি যথাক্রমে কণ্ঠেষ্টিভ এনিমিক্, নার্ভাস, ডিম্পেপ্টিক্ ও বিলিয়ান্ হেডেক্ নামে অভিহিত।

মস্তিষ্কের বেদনা ক্ষণিক, দীর্ঘকালস্থায়ী, স্পন্দনযুক্ত, কনকনে বেদনাবৎ, উত্তাপ ও ভারযুক্ত প্রভৃতি ভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে। কাফি, আলোক, শব্দ ও খাদ্যবিশেষের ব্যবহার হেতু ইহার ত্রাস বা বৃদ্ধি পায়। কখন কখন এই বেদনা এক বা উভয় পার্শ্বব্যাপী হয় এবং কখন কখন উহা একটা বিশেষ স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে।

শিরোঘূর্ণন বা মেনিয়াশ্ ডিজিজ্—স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ ও সেরিবেলমের ক্রিয়া সুচারুরূপে নিরূপিত না হইলে এই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত জ্ঞানিতে হইবে। মস্তিষ্কের পীড়া, মাদকাদি সেবন, মানসিক পরিশ্রম, ম্যালেরিয়া জ্বর, মূত্রবস্ত্রের পীড়া এবং মস্তিষ্ক ক্ষীণ হইলে এই পীড়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

অডিটরি ও ভেগস-নার্ভ কর্ণের সেমিলিউনার কেনালের অতি নিকটবর্তী হইয়া মেডুলা অবলম্বোটা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; সুতরাং উক্ত কেনালের পীড়ায় মেডুলা অবলম্বোটা ও সেরিবেলম্ আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের ক্রিয়াবৈপরীত্য ঘটয়া থাকে। শিরোঘূর্ণনকালে রোগীর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে, সে কখন সমভাবে বিচরণ করিতে পারে না। মনে করে যেন, ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছে।

মস্তিষ্কের সকল পীড়ায়, গভ ও উদরের পীড়াজনিত প্রত্যাবর্তনিক ব্যাধি সমূহে, বেলেডোনা দ্বারা শরীর বিষাক্ত হইলে এবং ইউরিমিয়া, ডায়বিটিস, জিওস্ ও ডিলিরিয়ম্ টিমেন্স প্রভৃতি রোগে মস্তিষ্কের বিকারহেতু প্রলাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রলাপ কখন প্রবল (furious) কখন বা মৃদু (low muttering) হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী কখন উচ্চৈঃস্বরে কখন বা অস্পষ্ট মৃদু অসঙ্গত বাক্য-প্রয়োগ কবে। সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা ও ওষ্ঠের স্পন্দন দেখা যায়। সামান্য ভ্রম হইতে ক্রমে বাক্যের জড়তা ও অস্পষ্টতা আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগী মধ্যে মধ্যে জ্ঞানের কথা कहিলেও তাহার শব্দাত্যাগবাহ্য স্বতঃই প্রবল থাকে।

সন্ন্যাস, ইউরিমিয়া ও বহুদুরোগে মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তাধিক্য ও রক্তশূন্য হইলে মদিরা, অহিফেন, বেলেডোনা, এসিক এসিড্, ক্লোরোফর্ম বা কার্বনিক্ অক্সাইড্ দ্বারা শরীর বিষাক্ত হইলে এবং আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রের বিদারণ ঘটিলে বা মুচ্ছা; মনস্তাপ, আতপাঘাত বা বজ্রাঘাত হইলে ক্ষীণমস্তিষ্ক

রোগীর বাহ্যবস্তুর জ্ঞান, স্পর্শ, বাক্যোচ্চারণ ও গমনাগমন-শক্তির লোপ পায়। ইহাকে Stupor বা Coma বলে।

শিথিলস্থ্যভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মাদক দ্রব্য ব্যবহারের পর, শীতলতা ও উত্তাপ অতি ভোজন, দেহমধ্যে রক্তাধিক্য বা রক্তশূন্যতা, জনতা, দূষিত বায়ুসেবন, এলুমিনিউরিয়া ও জটিস্ (ত্বা) রোগ, বিকারযুক্ত অর এবং অভুক্ত অবস্থায় নিদ্রাগমন প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্কের বিকৃতি হেতু নিদ্রাকর্ষণ- (Somnolence) রোগ এবং অরে, ক্ষিপ্তাবস্থায়, চা বা কাকি সেবনের পর, ডিলিরিয়াম্ ট্রিমেন্সে, ধনুষ্ঠকারে, জলাতকে, মেনিঞ্জাইটিস পীড়ার ও গর্ভাবস্থায় যতাবতঃ অনিদ্রা (Insomnia) রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের উষ্ণতা, রক্তাধিক্য ও রক্তশূন্যতা ইহার একমাত্র কারণ।

কোন কোন রোগী রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় স্থানান্তরে গমন ও অত্যশ্চর্য্য কৰ্ম্ম সম্পন্ন করে। নিদ্রাত্ত্বের পর তাহাদের আর কিছুই স্মরণ থাকে না। যৌবনকালে অতিভোজন, অতিশয় মনস্তাপ ও অত্যন্ত পাঠনিবন্ধন মস্তিষ্ক একরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হয়। ইহাকে Somnambulism কহে।

মস্তিষ্কে আঘাত, রক্তাধিক্য বা দূষিত রক্তের সঞ্চালন হইলে পেনীর সঙ্কোচন বা আক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হয়। বারংবার আক্ষেপ হইলে খাসপ্রখাস ও মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত গমনাগমন সম্বন্ধে নানারূপ ব্যাঘাত ঘটয়া থাকে। কখন কখন ইহা হইতে অবশতা এবং দর্শন, শ্রবণ, শ্রবণ, বাক্যোচ্চারণ ও স্মরণশক্তির হীনতা জন্মিতে দেখা যায়।

মানসিক শক্তির হ্রাস, কিংবা জিহ্বা প্রভৃতি বাগিদ্রিয় পেনীর হীনতা জন্ত জড়তা জন্মিলে এফেসিয়া (Aphasia) নামক রোগের উৎপত্তি হয়। শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে হেমিস্পিজিয়া বা প্যারালিটিক ট্রোঙ্ক হইলে প্রায়ই এফেসিয়া বর্তমান থাকে। মস্তিষ্কের বাম কর্ণপালির (Lobe) অগ্রভাগে (যে সকল অংশ লেফট মিডল্ আর্টারি দ্বারা পরিপোষিত) কোন পরিবর্তন ঘটিলে এই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এফিমিয়া (Aphemia) বা বাক্যের লোপ—সাধারণতঃ কর্পোরা ট্রায়েটেমের নিম্ন পর্য্যন্ত কোন পরিবর্তন ঘটিলে বাক্যরোধ হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে রোগী এককালে বাক্য-শক্তি হারাইয়া থাকে। মৃগী বা সন্ধ্যাস রোগের পর প্রায় এই রোগ জন্মিতে দেখা যায়। স্মরণশক্তির হ্রাস (Amnesia) হইলে রোগী এক কথার পরিবর্তে অল্প কথার উত্থাপন করে, কখন কখন ব্যক্তি বা স্থানবিশেষের নাম ভুলিয়া যায়। কোন লেখা দেখিয়া লিখিতে পারে বটে, কিন্তু কিংলিখিল, তাহা স্মরণ করিতে সমর্থ হয় না।

মানসিক প্রকৃতির এতাদৃশ বৈলক্ষণ্য হেতু স্থলবিশেষে এককালে অবশতা ও বুদ্ধিশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। ক্রমে স্মরণ-শক্তির হ্রাস ও পরে ডিমেন্সিয়ার (জড়তা) লক্ষণ প্রকাশ পায়। অগ্রে জিহ্বাই অবসন্ন হইতে আরম্ভ হয়। কনীনিকার অস-মানভাবে প্রসারিত থাকে, কখন কখন তাহাতে অপাঙ্গদৃষ্টি (Squinting) ও অক্ষিপুটপাত (Ptosis) বিদ্যমান থাকে। এই সময় রোগী চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সে যেন চলিতে অশক্ত এইরূপ ভাব প্রকাশ করে। গমনকালে রোগীকে অত্মদিকে চলিতে বলিলে, সে মাতালের ছায়া অস্থির ভাবে পাদক্ষেপণ করিতে থাকে। রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাক্য ও চলৎশক্তির হীনতা, বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস, সঙ্কোচক পেনীগুলির অবশতা, কনীনিকার প্রসারণ এবং হস্ত ও পদে প্রত্যাবর্তনিক স্পন্দন হয়। শেষাবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডল আকৃষ্ট, স্নান ও নিরাশ্রয় ভাবাপন্ন দেখা যায়। মস্তকের উত্তাপ স্বাভাবিক হইতে অধিক, কিন্তু সমগ্র শরীরের তাপ কম বলিয়া বোধ হয়। ইহাকে ক্ষিপ্তাবস্থায় অবসন্নতা (General paralysis of the insane) বলা যায়।

মস্তিষ্ক ও মজ্জার বৈধানিক পীড়ানিবন্ধন হেমিস্পিজিয়া রোগের উৎপত্তি হয়। অত্যাচ্ছ ব্যাধিতে মস্তিষ্কক্রিয়ার ভাবান্তর জন্ম ও এই রোগ জন্মিতে পারে। মৃগী, কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া ও উপদংশ রোগ এই পীড়ার অল্পতম কারণ।

মস্তিষ্কের শুভ্রবিধানের কোমলতা, কিংবা তন্মধ্যে সামান্য রূপ শোণিত পিও উৎপন্ন হইলে পীড়া আরম্ভকালে রোগীর জ্ঞান থাকে, কিন্তু অধিক রক্তস্রাব হইলে রোগী মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। এই রোগেও সময় সময় আক্ষেপ, অবশতা, বাক্য-হীনতা, স্মরণশক্তির হ্রাস প্রভৃতি পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পায়।

মস্তিষ্কের দক্ষিণপার্শ্বে রক্তস্রাব হইলে উহার বামবার্ধ অমূল্যভাবে অবশ হইয়া পড়ে এবং মস্তক ও উভয় চক্ষু দক্ষিণদিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। মস্তিষ্ক অথবা উহার মেনিজিস্ মধ্যে অধিক রক্তস্রাব হইলে হস্তপদের অবশতার সহিত দৃঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের কোমলতা হেতু হেমিস্পিজিয়ার হস্তপদের পেনীর শিথিলতা দেখা যায়।

অতস্তিন্ন স্পর্শশক্তির হীনতা (Anæsthesia) স্পর্শশক্তির বৃদ্ধি, (Hyperæsthesia), শিরঃশূল (Tic-douloureux), অর্ধশিরঃশূল (Hemicrania), মৃগীরোগ (Epilepsy, Epilepsia Mitior ও Epilepsia Gravior), এবং হিষ্টিরিয়া (Hysteria), হিষ্টেরিকেল্ ফিট্ (Hysterical fits), প্রভৃতি রোগে মস্তিষ্কক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু আক্ষেপাদিও উৎপন্ন হইয়া থাকে। [ ততদ্রোগ শব্দে দেখ। ]

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মনুষ্যমাজেই প্রায় মস্তিষ্কের প্রদাহ (Phrenitis বা Inflammation of the brain) রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কামুক, নিরন্তর পাঠে রত, অথবা স্নায়বিক-দুর্বলতাগ্রস্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ যাহাদের স্নায়ুশৃঙ্খলা স্বভাবতঃ উত্তেজিত হইয়া উঠে, এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিমাঝেই এই রোগের আক্রমণ হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিতে পারে না। বৃথা রাতিজাগরণ—বিশেষতঃ পাঠাভ্যাস লইয়া এবং অত্যধিক মত্তপান, ক্রোধ, হুঃখ ও চিন্তা, অর্শ হইতে রক্তস্রাব এবং রমণীদিগের নিয়মিত আন্তরঙ্গ্যনিরোধ প্রভৃতি কারণেও এই রোগ জন্মিতে পারে। নিবুদ্ধিতাবশতঃ অনাচ্ছাদিত স্থানে রোদ্রে শুইয়া থাকিলে কখন কখন প্রগাপের সহিত মস্তিষ্কের প্রদাহ আসিয়া দেখা দেয়। এতদ্বিন্ন মস্তকে দারুণ আঘাত লাগিলেও বহিঃকৃত হইতে অভ্যন্তরিক প্রদাহের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কের প্রকৃত প্রদাহ আসিবার পূর্বে, প্রথমে শিরোদেশে বেদনা, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ রক্তাভ ও প্রথমতঃ ভাবযুক্ত, স্মরণশক্তি বা অনিদ্রা, গাত্রচর্শ্ব শুষ্ক, মলরোধ, মূত্রকৃচ্ছ, নাসিকা হইতে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ, কর্ণবিবরে সর্কদা সঙ্গীত ধ্বনিবৎ শব্দের অনুভব ও স্পর্শশক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যখন প্রদাহ বিকাশ পায়, তখন সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রবল দাহজ্বরের দ্বারা জ্বলিতে থাকে। নান্দার গতি ক্রমশঃই ক্ষীণ ও দৃঢ় এবং বৈষম্যভাবাপন্ন হয়। কিন্তু যখন দৃঢ়-মাতৃকা (dura mater) ও কোমল মাতৃকা (Pia mater) আক্রান্ত হয়, তখন ইহা কঠিন হইয়া আইসে। তখন রোগী নিয়ত দ্রুতগামী শব্দ পরস্পরের দ্বারা শব্দ অনুভব করে। তাহার রগ, ঘাড় প্রভৃতি স্থানের শিরা সকল ধক্ ধক্ করিতে থাকে। পিপাসা না থাকিলেও তাহার জিহ্বা সর্কদা শুষ্ক ও পাংশুবর্ণবৎ দেখা যায়। তাহার চিত্তে পূর্বে যে সকল বস্তু বা ঘটনা বিশেষের ছায়া অঙ্কিত ছিল, মন সততই তত্তদ্বিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বাক্যালাপ ও বাক্শক্তিরাহিতা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পর রোগী ক্রমশঃই বিকারাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করে।

এরূপ অবস্থায় যদি কণ্ডার (Tendons) সমূহ ঘন ঘন নাচিতে থাকে, তাহা হইলে রোগ দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। ইহার উপর মূত্ররোধ, অনিদ্রা, নিদ্রাবনত্যাগ, দন্তঘর্ষণ ও আক্ষেপাদির স্বচনা দেখা দিলে, অথবা ঐ প্রদাহ ক্রমশঃ কুস্কুসে, অস্ত্রসমূহে ও গলদেশে পরিবাণ্ড হইলে রোগোপশম অদায়া জানিতে হইবে; কিন্তু যদি ঘর্ষণ-নিঃসরণ, নাসা বা অশ

দিয়া প্রভূত রক্তস্রাব, রমণীর আন্তরঙ্গ্য, অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ বা মলত্যাগ হইলে প্রদাহের উপশম হইবার অধিক সম্ভাবনা।

অতি অল্পদিনে রোগ সাংঘাতিক হইয়া পড়ে বলিয়া সত্বর ইহার প্রতীকার করা আবশ্যিক। প্রথমে তাচ্ছিল্য করিলে অথবা বিসদৃশ চিকিৎসায় ফলে এই রোগ হইতে ক্রমে উন্মাদরোগ জন্মে। কখন কখন বা রোগী অবশিষ্ট জীবনের জন্ত নিকোথ বা বাক্শূন্য হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত প্রতিবিধান জন্ত রোগীর মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অপনয়ন করা আবশ্যিক এবং যাহাতে মস্তকে অধিক রক্ত চলাচল করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

এরূপ হইলে রোগীকে সর্কদা নিশ্চেষ্ট ও শান্তভাবে নিজন স্থানে রাখা কঠব্য। কারণ বহুলোকের সহিত একত্র থাকিলে উপযুক্ত পরিশুদ্ধের ব্যতীত-প্রতিঘাতে, চিন্তাস্রোতের ব্যাঘাতে বা ইঞ্জিয়াদির উত্তেজনায় রোগের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। রোগীর গৃহে অত্যধিক আলোকও বিশেষ হানিজনক। এরূপ রোগীর পক্ষে ঈষৎ অন্ধকারবিশিষ্ট নাতিনীতোক্ষ স্থানই বিশেষ উপকারপ্রদ। কিন্তু যদি রোগীর মনোমত্ত বন্ধু পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত বাক্যালাপে রোগীর মানসিক দুর্বলতার অনেক লাঘব হইতে পারে, আবার নিজন অন্ধকারাবৃত স্থানে অধিক সময় থাকিলে বিষানোন্মত্ততা (Melancholia) আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে।

এরূপ রোগীর কথার বিপরীতে কোন কাথ্যই করিবে না। যদি রোগী কখনও কোন অসম্ভব বিষয়ের অবতারণা করে অথবা দুস্ত্যাপ্য দুর্মূল্য বস্তু প্রাপ্তির বাসনা করে, তাহা হইলে ছলে ভুলাইয়া বা তোষামোদ করিয়া তাহার মনস্তত্ত্ব করিবে; যেহেতু তাহার মতের বিপরীতে কোন কথা বলিলে প্রদাহের বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়া মন্দ ফল আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। এক কাথ্য যাহা সে ভালবাসে এবং যাহা তাহার স্বাস্থ্যের বিশেষ হানিকর হইবে না এবং মধুব গীত, মনোহর গল্প প্রভৃতি বিষয় যাহা চিত্ত সংযত করিয়া মানসিক চিন্তা অপনোদন করিতে পারে, এরূপ বিষয়ে তাহাকে সতত নিবিষ্ট রাখিবে।

ডাঃ বোয়ারহেড বলেন, কোন জলপূর্ণ পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জলনিষ্ক্ষেপপূর্বক রোগীকে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করাইলে চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অনেক সময় সফল লাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ কোন নিম্ন-মধুর সুরলহরীতে রোগীর চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারিলে নিদ্রাকর্ষণও হইতে পারে।



এরূপ অবস্থায় রোগীকে লঘুপথ্য দেওয়াই বিধেয়। কারণ গুরুপাকে উদরাগ্নান হইয়া রোগীর মস্তিষ্ক পুনরায় বিকৃত হইতে পারে। নেবুর রস, পানিফল, পাকফল, ভাল আঙ্গুর প্রভৃতি সুখণ্ডিতল ফল এবং জলবাণী বা তেঁতুল ও বালী সিদ্ধ থাকিতে দিবে। লঘু আহাৰ্য্যমাত্রই হিতপ্রদ।

এই রোগে নাসা দিয়া রক্তস্রাব, ঘাড়ের শিরচ্ছেদ (ফস্ত-খোলা), ও রগে জ্বৌক বসাইয়া রক্তশোষণ ভিন্ন বিশেষ হিত-প্রদ কোন ঔষধ দেখা যায় না। নিরন্তর শিরা বা ধমনী হইতে রক্তস্রাব অসম্ভব; সুতরাং একমাত্র নাসারন্ধ্রে কচি ঘাস বা খড় পূরিয়া ঘুরাইলে অল্প অল্প রক্তস্রাব হইতে পারে। রোগী মস্তিষ্কের যে স্থানে অধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে, ঠিক সেই স্থলে জ্বৌক লাগাইলে আশু উপকার দর্শে। রোগীর যদি অর্শ থাকে, তাহা হইলে যে উপায়েই হউক, তাহার বলি দিয়া রক্ত নিঃসারিত করিবে। বহির্বাণী হইলে তাহাতে জ্বৌক লাগাইবে। অন্তর্বাণী হইলে সেইরূপ ঔষধ দ্বারা বস্তি-প্রয়োগ করিবে অথবা মধু, মুসকর বা ব্রতকুমারী ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ক্রীলোকের আন্তর্বন্ধ হইলে তাহার নিয়মিত স্রাবের জন্ম যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিবে।

রোগীকে কখন বস্ত্রাবৃত রাখিবে না। রোগী বাহিরের শীতল বায়ুতে শ্বাসপ্রশ্বাস লইয়া যতদূর মস্তিষ্কে শীতল রাখিতে পারে, তদ্বিধে যত্ন করিবে। শিরোমুগুন করিয়া তাহাতে ভিনিগার ও গোলাপ-জল যথারীতি মর্দন করিবে, ঐ জলে ত্রাকড়া ভিজাইয়া মাথায় ও রগে রাখিবে। বরফ-মিশ্রিত শীতল জলের পটীও বিশেষ উপকারক। ঈষৎক জলে রোগীর পদদ্বয় ধোত করিবে। কারণ ইহাতে উষ্ণগ নিবারিত হইয়া মস্তিষ্কের প্রদাহ অনেক উপশমিত হয়। ঐরূপে পদদ্বয়ে ছুন্ধ ও রুটীর পুলটিস্ ঘন ঘন দেওয়া আবশ্যক। যদি ইহাতেও রোগ উপশমিত না হয়, তাহা হইলে ঘাড়ে ও মস্তকে ত্রিষ্টার দেওয়া ক্তব্য।

**মস্ত** (ক্ৰী) মস্তাতি পরিণমতীতি মস্-(সিতনিগমিমসিসব্য-বিধাঙ্ক্ কৃশিত্যন্তু। উণ্ ১৭০) ইতি তুন্। দধিভবমণ্ড, চলিত দধির মাত। পথ্যায়—দধিজল। দধি যে পরিমাণ, তাহাতে ইহার দ্বিগুণ জল দিতে হইবে, পরে ইহা আলোড়ন করিয়া লহলে তাহাকে মস্ত কহে, ইহাকে ঘোল বলা বাইতে পারে। ইহার গুণ—উষ্ণ ও অম্ল, রচিকর, পিত্তবর্ধক, শ্রম-নাশক, বলকর, তৃষ্ণা, উদরী, প্লীহা ও অর্শরোগনাশক, শ্রোতঃশুক্কিকর, কক ও বায়ুনাশক। বিষ্টস্ত, শূল, পাণ্ডু শ্বাস, বিকার ও গুল্মরোগে উপকারী এবং লঘু। (রাঙ্গনিঃ)

“মস্ত ক্রমহরং স্বপ্নং লঘুভুক্তাভিলাষকং।

শ্রোতোবিশোধনং হ্লাদিকফতৃকাবিলাপহম্।

অবুধ্যং প্রীণনং শীঘ্রং ভিনতি মলসংগ্রহম্ ॥” (ভাবপ্রঃ)

**মস্তলুঙ্গ** (পুং) মস্ত ইব লিঙ্গং সাদৃশমন্ত, পুষোদরাদিত্বাৎ ইকারন্ত উকারঃ। মস্তিক। (ত্রিকাঃ)

**মস্তলুঙ্গক** (পুং) মস্তলুঙ্গ-স্বার্থে কন্। মস্তিক। (হেম)

**মস্নদ-আলা-আদিল খাঁ**, আশীর ও বুরহানপুরের শাসন-কর্তা। সুলতান ২য় বুজাকরের জামাতা।

**মস্নদ-আলি-ফতে-খাঁ**, ইসলাম শাহের অনৈক সভাসদ। পরে ইনি সম্রাট অকবর বাদশাহের কর্মচারিপদে নিযুক্ত হন। ৯৮০ হিজিরায় নগরকেট অবরোধকালে ইনি হোসেন কুলি খাঁ জাহানের অধীনে গমন করেন। তবকৎ পাঠে জানা যায়, ইনি ২ হাজারী সেনানায়ক ছিলেন।

**মহ**, পূজা। ভাদিৎ পরশ্চৈঃ সকৎ সেট্। লট্ মহতি। লোট্ মহতু। লিট্ মহাহ মেহতুঃ মেহঃ। লুঙ্ অমহীৎ। সন্ মিমাঃ-যতি। ষঙ্ মামহতে। ষঙ্ লুক্ মামহীতি। গিচ্ মহয়াত, লুঙ্ অমোমহৎ। পূজা-অর্থে অদন্তচুরাদি ‘মহ’ ধাতু আছে। **মহ**, বৃদ্ধি। ভাদিৎ আয়নেৎ অকৎ সেট্। ইদিৎ। লট্ মহতে। লোট্ মহতাৎ। লুঙ্ অমহিষ্ট।

**মহ** (পুং) মহতে পূজ্যতেহ্মিষ্মিতি মহ-(পুংসি সংজ্ঞায়াঃ ঘঃ প্রায়েণ। পা অণ ১১৮) ইতি ঘ, যধা মহ-অচ্ (উণ্ ৪।১৮৮) ১ উৎসব।

“ন খলু দূরগতোহ্যপ্যতিবর্ততে মহমসাবিতি বদ্ধতয়োদিটৈঃ।”

(মাঘ ৬।১৯)

মহতে পূজ্যতে ইতি। ২ তেজ। (মেদিনী) ৩ যজ্ঞ। (শব্দরঃ)

“তস্মাৎ প্রাবৃষি রাজানঃ সপ্তে শত্রুং শূদ্রা যুতাঃ।

মহৈঃ সুরেশমর্জন্তি বয়মন্ত্রে চ মানবঃ ॥” (হরিবং ৭।১৮)

৪ মহিষ! (হেম) (ত্রি) ৫ মহৎ।

“মহে বৃণতে নাথঃ ত্বং” (শুক্ ১০।৯১৮) ‘মহে মহতি’ (সায়ণ)

**মহক** (পুং) ১ মহৎ ব্যক্তি। ২ কচ্ছপ। ৩ বিষ্ণু।

**মহকুমা** (দেশজ) উপবিভাগ। (Sub-division)

**মহক** (পুং) মহঃ কায়তি প্রকাশয়তীতি মহস্ কৈ-ক, পুষো-দরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বহুলামোদ। (জটায়র)

**মহৎ** (ত্রি) মহতে পূজ্যতেহ্মৌ ইতি মহ (বর্তমানে পৃথদ্ব-বৃহস্পজ্জগচ্ছত্বচ্চ। উণ্ ২।৮৪) ইতি অতি নিপাত্যতে। বৃহৎ, বড়, প্রবল, অধিক, অনেক। পথ্যায়—বিশদ্বট, পৃথ, বৃহৎ, বিশাল, পৃথুল, বড়, উরু, বিপুল, পুল, বিস্তীর্ণ। (শব্দরত্নাঃ)

বৈদিক পথ্যায়—ত্রয়, ঋষ, বৃহৎ, উগ্ৰত, তবস্, তবিস, মহিব, অম্ব, অম্বুকা, উক্ষা, ভিহায়স্, যক্ষ, ববক্ষিথ, বিবলসে,

অজ্ঞ, মাহিণ, গভীর, ককূহ, রতস, ত্রাধন, বিরপ্ণী, অকুত, বংহিষ্ট, বহিবং। এই ২৫টি বৈদিক পর্যায়। (বেদনি. ৩অ.)

২ প্রকৃতির আদি বিকারের নাম মহৎ।

“সম্বরজন্তুসমাং সামাবতা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান, মহতো-হংকারঃ” (সাংখ্যতত্ত্বকৌ.)

সম্ব, রজ এবং তমোগুণের সমানাবস্থার নাম প্রকৃতি। যখন প্রকৃতির বিকার উপস্থিত হয়, তখন এই গুণত্রয়ে বিরূপপরিণামে মহতের উৎপত্তি। এই মহৎ হইতেই স্বাবর-অস্বাভাবিক অগতির উৎপত্তি হইয়াছে। [ মহত্ব শব্দ দেখ। ]

শব্দাদি-শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ প্রয়োগ করিতে নাই।

“শব্দে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে।

বাক্যায়ং পথি নিদ্রায়ং মহচ্ছন্দো ন দীয়তে ॥”

(ভট্ট ১১৪ শ্লোক-টীকা ভরত)

শব্দ, তৈল, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিষিক, দ্বিজ, বাক্য, পথ ও নিদ্রা এই সকল শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ করিতে নাই।

৩ রাজ্য। (মেদিনী) “অথ যদি মহজ্জিগমিবেদমাবস্তায়ঃ দীক্ষিতা পৌর্ণমাস্তাঃ” (ছান্দোগ্য উপ. ৩.৩১২।৪৪)

৪ ব্রহ্ম। একমাত্র ব্রহ্মই মহৎ শব্দের অভিধেয়।

“ক্রতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্ধতে মহৎ ॥”

(ভারত ৩.৩১২।৪৪)

৫ উদক, জল। (নিঘণ্টু)

মহতাব বাগ, যমুনাভীরবতী একটি সুরম্য উজ্জ্বল। মোগল-সম্রাট শাহ জহান এই স্থানে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ এই স্থানে সমাধিকৃত হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র আলমগীর ঐ অট্টালিকার উৎকৃষ্ট সমস্ত উপকরণ স্থানান্তরে লইয়া যান। ইহার অবশিষ্টাংশ অত্যাধি দেখিতে পাওয়া যায়।

মহতী (স্ত্রী) মহৎ-ভীষ্। ১ বলকীভেদ। (মেদিনী) ২ নার-দের বীণার নাম মহতী।

“ক্ষুণ্ণভবদ্ গ্রামবিশেষমুচ্ছনা-

মবেক্ষমাণঃ মহতীঃ মুহমূর্ত্তঃ ॥” (শিঙপালবধ ১।১০)

বৃহৎপ্রমাণ। (অমরটীকা ভরত) ২ বৃহতী। ৩ বার্তাকী।

(রাজনি.) ৪ কুশদ্বীপস্থ নদীবিশেষ।

“মহতী সপ্তমী প্রোক্তা পুনশ্চৈষা দ্বিতিঃ স্মৃতা।

অস্ত্রান্ত্যভ্যোহপি সজ্জাতা শতশোহিষ সহস্রশঃ ॥”

(মৎস্যপুরাণ ১১.৩২৩)

৫ পারিপাত্রপর্কত হইতে নির্গত নদীভেদ।

(মৎস্যপুরাণ ১১.৩২৩)

মহতীদ্বাদশী (স্ত্রী) মহতীতি খ্যাতা। দ্বাদশী, মধ্যপদলোপিকর্ষাণাং। শ্রাবণদ্বাদশী।

“মাসি ভাদ্রপদে শুক্রে দ্বাদশী শ্রবণাষিতা।

মহতীদ্বাদশী জেয়া উপবাসে মহাফলা ॥”

(গরুড়পু. ১৪১ অ.)

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীর দিন যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে এই দিনের নাম মহতীদ্বাদশী, এই দ্বাদশী অতিশয় পুণ্যজনক, ইহাতে দান দান উপবাস প্রভৃতি পুণ্যকর্ম অনন্ত ফলদায়ক।

মহতীয়াণ, অসবালের (অখাল?) জনৈক খ্যাতিনামা অধিপতি।

মহৎকথ (ত্রি) ১ মহতের বাক্য বাহাতে আছে, মহতের বাক্য-যুক্ত। ২ চাটুকার, অথবা বাহারা বড় লোকের মিষ্ট কথার নির্ভর করে।

মহৎক্ষেত্রে (ত্রি) বিস্তার্ত্ত ক্ষেত্রবিশিষ্ট। (স্ত্রী) বিপুলক্ষেত্র।

মহত্ত্ব (স্ত্রী) মহত্ব তৎ তত্ত্বং। সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত দ্বিতীয় তত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব। পর্যায়—

“মহানাত্মা মতির্কিঙ্কর্জিহ্বুঃ শব্দশ্চ বীর্ঘবান্।

বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলক্ষিত্ত তথা খ্যাতিধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥

পর্যায়বাচকৈঃ শব্দৈর্মহানাত্মা বিভাব্যতে।

তং জানন্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ প্রমোহং নাধিগচ্ছতি ॥”

(ভারত আশ্বমেধিক প.)

প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্ব, সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রে ইহার বিষয় এইরূপ পর্য্যালোচিত হইয়াছে। এই মহৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরিত হয়। কথিত আছে, ‘রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন এবং তমোগুণে সংহার। ইহাতে বুঝা যায় যে, পূর্বে গুণ সমুদয়ের সাম্যভঙ্গে সর্বপ্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্ভিক্ত করিয়াছিল। তাই সত্ত্বগুণ সর্বপ্রথমে মহত্ব আকারে (মহত্ব—যারপর নাই নির্মল বিকাশ) প্রাভূত হইয়াছিল। মহত্ব স্বদয়কর্ম করিবার জন্ত বর্তমান প্রাণি-নিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতে বুঝা যাইবে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বিকাশস্থান অন্তঃকরণ। আর দৃষ্ট হইবে যে, প্রত্যেক অন্তঃকরণ হরিহরমূর্তির জ্ঞান দিমুত্তিতে অবস্থান করিতেছে। তাহার এক মূর্তি বা পরিণাম ‘মনন’ ও ‘অধ্যবসায়’ নামে এবং দ্বিতীয় মূর্তি পরিণাম বা ‘অভিমান’ ও ‘অহং’ নামে পরিচিত হইয়াছে। আমি, আমি আছি, বস্তু, বস্তু আছে, আমার, আমার কৃতিসাধ্য ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়-স্বক বিকাশের নাম অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। এই জ্ঞানশক্তি

সহজাতরূপে জীবের অন্তরাশ্রয় নিরন্তর সংলগ্ন আছে।  
জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই মহান্, মহান্ ও পূর্ণজ্ঞান সমান কথা।  
পূর্ণজ্ঞানশক্তিই সাংখ্যোক্ত মহত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দের অভিধেয়।

যে মহান্ পুরুষ এই মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বে পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত  
হন, সেই মহাপুরুষই সাংখ্যোক্ত ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা এবং  
পুরাণাদি শাস্ত্রের হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, কার্ধ্যব্রহ্ম বা ঈশ্বর।  
ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীকালোক, চতুর্লোক, স্বর্য়ালোক,  
গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকের  
সমস্ত পদার্থই এই মহান্ পুরুষের অধীন। এই মহত্ত্ব নামক  
ব্যাপকবুদ্ধি আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চতু-  
র্লোকস্থ মহুঘোর জ্ঞান, স্বর্য়ালোকস্থ মহুঘোর জ্ঞান, পশুর জ্ঞান,  
পক্ষীর জ্ঞান ইত্যাদিক্রমে সেই সেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হওয়া  
বিরাজ করিতেছে। আমরা যেরূপ এই হস্তপদাদিবিষিষ্ট দেহের  
উপর ‘আমার’ এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি। এইরূপ  
হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর সম্পূর্ণ মহত্ত্বের উপর আমি ও আমার  
ইত্যাকার অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছেন। আমাদের দেহের  
উপর যেমন আমাদের কর্তৃত্ব, এইরূপ সমষ্টি মহত্ত্বের উপর  
হিরণ্যগর্ভের কর্তৃত্ব আছে। আমরা যেমন আমাদের হস্তপদাদি  
যথেষ্ট চালিত করি, এইরূপ হিরণ্যগর্ভও সমস্ত অন্তঃকরণকে  
যথেষ্ট প্রেরণ করেন।

কপিল ইহা বিস্তৃতভাবে না বলিলেও অল্প গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে  
বর্ণিত হইয়াছে। কপিল কেবল “মহাদাখ্যঃ আশ্রমঃ কার্ধ্যঃ  
তন্ময়ঃ” (সাংখ্য- ১৭১) এই সূত্রে মহত্ত্ব শব্দ বুঝাইয়াছেন।  
প্রকৃতির যাহা আশ্রম কার্ধ্য, প্রথম বিকাশ বা প্রথম পরিণাম,  
তাহার নাম মহত্ত্ব। তাহাই মন অর্থাৎ মননবৃত্তিক অন্তঃ-  
করণ। এস্থলে মনন শব্দের অর্থ নিশ্চয়, অন্তঃকরণের বা  
বুদ্ধির যে অংশ নিশ্চয়রূপ বৃত্তি জন্মে, সেই অংশের নাম  
মহান্ ও মহত্ত্ব। বৃত্তি শব্দের অর্থ পরিণামবিশেষ।  
নিশ্চয়াকারে পরিণাম হয় বলিয়াই তাহা বৃত্তি।

ইহা বুঝিতে হইলে, সর্বদা সমুৎপন্ন বিষয়োপরতা বুদ্ধির  
অবগাহ ঋণ্ড ঋণ্ড বিষয়রাশি পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন  
কেবল বিগুপ্ত বুদ্ধিই মহত্ত্ব, এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রথমে  
কেবল চিদান্দ্রা পুরুষ ছিলেন, ও অপর কিছু ছিল না, সুতরাং  
প্রকৃতির প্রথম বিকাশে অর্থাৎ মহত্ত্ব নামক বুদ্ধিতে চিদা-  
শ্রয় অমুরঞ্জনা ব্যতীত অল্প পদার্থের অমুরঞ্জনা ছিল না,  
তাহার পরিচ্ছিন্নও ছিল না, সুতরাং তাহা অপরিচ্ছিন্ন  
ছিল। পরে প্রকৃতি হইতে যতই স্থল স্থল বিকার প্রাহুত  
হইয়াছে, ততই তাহা বিষয়পরিচ্ছিন্ন ও মলিনা হইয়াছে।  
প্রকৃতির প্রথম বিকার বা প্রথম স্ফুর্তি, যাহার সাত্ত্বিক নাম

মহত্ত্ব, তাহাই জগবীজ বা মহান্। সৃষ্টির প্রারম্ভ ও মহত্ত্ব-  
বের উৎপত্তি সমান কথা। রাম না হইতে রামায়ণের জ্ঞান  
জের না হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব হওয়াই মহত্ত্বের অপর  
লক্ষণ। জের না থাকা অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ এই বিষয়টি  
যে রূপে অমুভব করিতে হইবে, মহাবি মহু তাহা উত্তমরূপে  
বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—

“আসীদিদং তমোভূতমপ্রজাতমলক্ষণম্।

অপ্রতীক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রমুপ্তিমিব সর্বতঃ ॥

ততঃ স্বয়ম্ভূর্জবান্ ব্যাক্তো ব্যঞ্জয়দ্ভিদম্।

মহাভূতাদিবৃত্তোজাঃ প্রাহুরাসীত্তমোমুদঃ ॥” (মহু ১অ০)

এ জগৎ প্রকৃতিলীন ছিল, প্রকৃতিলীন থাকাই লয় ও  
প্রলয়। সে অবস্থা লোকের অজাত, অলক্ষ্য ও অপ্রতীক্য  
অর্থাৎ তখন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এ সকল  
ছিল না এবং প্রমাণের বিষয় প্রেমের পদার্থ ছিল না।  
সে অবস্থা প্রায় মহাহুস্থির সদৃশ।

যেমন আমাদের প্রগাঢ় মুহুর্তি ভাস্বিবামাত্র নেত্র উন্মী-  
লিত হইতে না হইতে নংগা অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত ও জ্ঞান-  
বিকাশ উপস্থিত হয়, তেমনি নিতান্ত স্থলস্থ্য প্রলয়রূপ জগৎ  
অমুপ্তি ভাস্বিবামাত্র প্রকৃতিগর্ভে স্থল-জগতের অভিব্যঞ্জক  
(অস্থুর স্বরূপ) তমোভঙ্গকারক, সৃষ্টিসামর্থ্যযুক্ত, ভগবান্  
স্বয়ম্ভূত হিরণ্যগর্ভের বা মহত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল।  
যেমন জগৎ-অমুপ্তি ভাস্বিল, অমনি মহান্ বিকাশ আসিল,  
স্থল জগৎ তদগাত্রে অঙ্কিত হইল। মহুর এই উক্তিহে মহত্ত্ব-  
বের অল্প কিছু ভাব অমুভব করা যাইতে পারে। মহত্ত্ব,  
হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মা এ সকল সমান কথা।

মহত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্বের উৎপত্তি। পূর্বেকৃত প্রথম  
পরিণামের অর্থাৎ ‘আমি আছি’ ইত্যাদি সহজাত-নিশ্চয়াত্মিকা  
বৃত্তির একদেশে যে ‘অহংবৃত্তি’ সংলগ্ন আছে, তাহাই সাংখ্যের  
অহংতত্ত্ব। এই অহংবৃত্তি যাহাতে বা যাহার পরিণামে উদয়  
হয়, তাহাই অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব প্রত্যেক আত্মার  
আশ্রিত। এই অহং একটা গণনার ব্যষ্টি ও সমস্ত গণনার  
সমষ্টি। অহং, অভিমান ও অহংতত্ত্ব নামভেদমাত্র।

মহত্ত্বের সহিত অহংতত্ত্বের প্রভেদ এই যে, মহত্ত্বের  
অন্তর্গত আমি অলক্ষ্যোৎপন্ন, আর অহংতত্ত্বের আমি লক্ষ্য-  
পূর্বক উৎপন্ন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতির প্রথম পরি-  
ণাম মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব এবং অহংতত্ত্ব হইতে  
একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতির  
এইরূপ বিরূপ-পরিণামেই জগতের সৃষ্টি। যখন আবার  
প্রকৃতির স্বরূপপরিণাম উপস্থিত হয়, তখন জগতের লয় হয়।

তৎসকল বেক্সে প্রাপ্ত হইয়া, লয় হইবার সময়ও সেইরূপে লীন হইয়া থাকে। একাদশ ইজির ও পঞ্চতমাত্র অহংতবে, এবং অহং মহতবে লীন হয় ও মহং সর্বশেষে প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। (সাংখ্যদ°)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—প্রলয়কালে গুণসাম্য অর্থাৎ সম্য, রজঃ এবং তমোগুণের নিক্রিয় অবস্থা ঘটে। পরে আবার বখন সৃষ্টিকাল উপস্থিত হয়, তখন পরমেশ্বর ইচ্ছামুগারে পরিণামী ও অপরিণামী প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা-দিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকরণে উদ্বুদ্ধ করেন। তৎপরে পুরুষাধিষ্ঠিত গুণসাম্য হইতে গুণবাজন অর্থাৎ মহতত্ত্ব উৎপন্ন হইল। এই মহতত্ত্ব ত্রিবিধ, সাত্বিক, রাজস এবং তামস। বীজ বেক্সে স্বকৃৎ দ্বারা আবৃত, সেইরূপ পূর্বোক্ত গুণসাম্য (প্রধান তত্ত্ব) কর্তৃক এই মহতত্ত্ব আবৃত অর্থাৎ প্রধানতঃ মহতত্ত্বের ব্যাপক। পরে মহতত্ত্ব হইতে অহং-তত্ত্বের উৎপত্তি ও তৎসম এইরূপে সৃষ্টি হয়।

(বিষ্ণুপুরাণ ১২ অধ্যায়)

মহত্তর (গুণী) অয়মনয়োরতিশনে মহান্ মহৎ-তরপ্। ১শ্লু।

‘শূদ্রঃ ভ্রাতৃ পাদজো দাসো গ্রামকুটো ব্রহ্মরঃ।’ (জিকা°)

২ সন্নানাই উপাধিবিশেষ। (ত্রি) ৩ অশ্বিনয় মহৎ, অত্যধিক।

‘দদর্শ ভৃশদুর্দশং সর্বদেবৈরভিষ্টতম্।’

অগ্নিগ্নাঃসমগুভ্যশ্চ বৃহভ্যশ্চ মহত্তরম্॥” (ভারত ৭।১২৯।৫২)

মহত্তমপদ, শ্রেষ্ঠপদ।

মহত্ব (ক্ৰী) মহতো ভাবঃ ত্ব। মহতের ভাব বা ধর্ম। নৈয়া-য়িকদিগের মতে দ্রব্যের প্রত্যক্ষবিষয়ে সমবায়-সদ্বক্ষে মহত্বই একমাত্র কারণ।

‘মহৎ স্বভূবিধে হেতুরিচ্ছিয়ং করণং মতম্।’ (ভাষাগরি°)

‘মহৎ স্বভূবিধ ইতি। দ্রব্যপ্রত্যক্ষে মহৎ সমবায়সদ্ব-ক্ষে কারণং, দ্রব্যসমবেতানাং গুণকর্মসামান্যানাং প্রত্যক্ষে স্বাশ্রয়সমবায়সদ্বক্ষে, দ্রব্যসমবেতসমবেতানাং রূপত্বাদীনাং প্রত্যক্ষে স্বাশ্রয়সমবেতসমবায়সদ্বক্ষো ন কারণং’ (সিদ্ধান্তমুক্তা°)

২ বৃহৎ। ৩ প্রকর্ষ, আধিক্য, ঔদার্য। ৪ শ্রেষ্ঠত্ব।

‘জনশ্চ শূদ্রোহপি মহত্বমীয়াৎ’ (রাമായণ ১।১১।১০)

‘মহৎ শ্রেষ্ঠত্ব’ (টিকা)

মহদবি, মুসলমানদিগের ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। সম্রাট অকবর-শাহের রাজত্বকালে এই সম্প্রদায়ের নেতা ইমলায় শাহ ও কৈলীর পিতা শেখ সুবারক বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়া-ছিলেন।

মহদাবাস (পুং) বৃহৎ অট্টালিকা, বড় বাড়ী।

মহদাশা (ক্ৰী) মহতী চাসৌ আশা চেতি কর্মধা°। উচ্চাশা। মহদাশ্রয় (পুং) মহতাং আশ্রয়ঃ। মহতের আশ্রয়, বড় লোকের শরণ লওয়া।

মহদি আলি খাঁ (হাকিম) অযোধ্যার রাজা নাসিরুদ্দীন হায়দরের প্রধান মন্ত্রী। ফতেগড়ের নিকটে খোদাগঞ্জে কালীনদীর উপর বে লৌহনির্মিত দোহুলামান সেতু আছে, তাহা ইহারই ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। এই সেতু প্রস্তুত করিতে সত্তর হাজার টাকা ব্যয় হয় এবং সাত বৎসরের অধিক সময় লাগে। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে মহদি আলি খাঁ পদচ্যুত হন; কিন্তু মহম্মদ আলি শাহ সিংহাসন আরোহণ করিলে পুনরায় ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে তিনি স্বীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর অতি অল্পকাল জীবনধারণ করিয়া ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

মহদি ইমাম, মুসলমানদিগের ইমামুদ্দেহ, প্রকৃত নাম কাশিম মহম্মদ। মুসলমানগণ দাদশ ইমামকে বিশেষ ভক্তি প্রদা করিয়া থাকে। এই দাদশ ইমামের শেষ ইমামের নামই মহদি এবং সর্বপ্রথম ‘আলি’। মহদি ইমাম একাদশ আস-কারির পুত্র। ৮৬৯ খৃঃ অব্দে ২২ এ জুলাই তারিখে বোগ-দাদের মধ্যবর্তী শর্মগরানই নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। ৪৫ বৎসর বয়স্ক সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটে। শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ বলেন যে, ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি একটা জলাশয়ে প্রবেশ করেন এবং উহা হইতে আর পুনরায় উৎপত্ত হইলেন না। তাঁহার মাতা স্বচক্ষে এই ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। শিয়াসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা আরও বলেন,—সম্প্রতি কোন গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছেন; কালে ইলিমার সহিত একত্র হইয়া যীশুখৃষ্টের পুনরত্মদের সময়ে বিধর্মী কাফের-দিগকে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবেন।

মহদি কাশিম খাঁ, সম্রাট অকবর শাহের অনেক চার-হাজারী সেনানায়ক। ইনি প্রথমে সম্রাট বাবরের ৩য় পুত্র আশ্কারির অধীনে কর্ম করিতেন। হুমাউনের পারস্ত হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে ইনি তাঁহার সহিত যোগ দেন। অকবর শাহ দিল্লীসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই তাঁহাকে সেনানায়ক পদে উন্নীত করেন। তবৎ পাঠে জানা যায় যে, তিনি তৎকালে পাঁচ হাজারী সেনাপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৩ হিজিরায় সম্রাট অকবর শাহের আদেশে তিনি খান্ জমান ও আবদুল মজিদ আসক খাঁকে দমনের জন্ত গড়া (জবলপুর) অভিযুগে যাত্রা করেন। কিন্তু তথাকার

শৌচনীয় অবস্থা দর্শনে বিরক্ত হইয়া ইনি স্বীয় অতিপালক সম্রাটের আদেশ উপেক্ষা করেন এবং উদাস-মনে মক্কা বাত্মা করিয়াছিলেন। মক্কা হইতে পারস্ত ও কান্দাহার হইয়া ইনি সম্রাটের রাজত্বের ১৩শ বর্ষে রণতুঙ্গগড়ে উপনীত হন। এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট অকবর শাহ রণতুঙ্গগড় অবরোধ করিলেন। কাশিম খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মসমর্পণপূর্বক সম্রাটপদে প্রাণ তিষ্ঠা মাগিলেন এবং নজরনরূপ সম্রাটিকে কতকগুলি সুন্দর পারস্তজাত অশ্ব পাঠাইলেন।

সম্রাট কাশিমের কাকুতি মিনতিতে দয়াদ্রুতিত হইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে সেনানায়কপদে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাট অকবর শাহ তাঁহাকে লক্ষ্যে প্রদেশ তুজুল দান করেন।

তিনি লাহোর নগরে বাগ-ই-মহদি কাশিম খাঁ নামে এক উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করাইয়া অবশিষ্ট বাক্যকীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১০০১ হিজরায় তিনি জীবলীলা সম্বরণ করেন।

মহদি খাঁ, (মীর্জা) নাদিরশাহের বিশ্বস্ত সচিব, ইনি মুন্সী উল-মুমালাক নামে প্রসিদ্ধ। ‘তারিখ-ই-নাদিরি’ এবং ‘তারিখ জহান্ন কুশা’ নামে ইহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তারিখ-ই-নাদিরের অন্য নাম “নাদিরনামা” অর্থাৎ নাদির শাহের ইতিহাস। সার উইলিয়ম জোনস্ উক্ত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহদি খাজা, সম্রাট বাবরশাহের জামাতা। বাবরের মৃত্যুর পর ইনি একদিন মাত্র মোগল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন।

মহদি মীর্জা, জনৈক মুসলমান-ঐতিহাসিক। ইহার রচিত “মাজমুয়া মীর্জা মহদি”-গ্রন্থে তৈমুরবংশীয় রাজগণের বংশ-কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট বাবর শাহের পিতামহ হইতে (১৪২৩ খৃঃ অব্দ) সম্রাট বাহাদুর শাহের জীবনকাল পর্য্যন্ত (১৭০৮ খৃঃ অব্দ) ঘটনাবলী এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

মহদগত (ত্রি) সাধুজনপ্রিত।

মহদগুণ (ত্রি) মহৎ গুণঃ যন্ত। ১ মহাশুণবিশিষ্ট। ২ মহতের গুণ। ৩ অতিশয় গুণ।

মহদ্বিল (স্ত্রী) আকাশ, শূন্য।

মহদ্বয় (স্ত্রী) ১ অতিশয় ভয়। ২ অত্যন্তভাব। ৩ মহৎ ব্যক্তি হইতে ভয়।

মহদ্বু (স্ত্রী) মহৎ ভবভীতি ভূ-কিপ্। বড় হওয়া। (মাঘ ৯২৯)

মহদ্যমন্ (স্ত্রী) ১ স্বর্ঘ্য। ২ তীর্থবিশেষ।

“অবশেষে মহদ্যমি আর্থরমাণ মোকতাং।” (ভারত ১৩০, ৪২)

‘মহদ্যমি তীর্থবিশেষ ইতি প্রাচঃ, মহদ্যমি স্বর্ঘ্যে, দ্যামা-নিত্যম্ মনিচ্ আদিলোপ আর্থঃ।’ (নীলকণ্ঠ)

মহদ্বৎ (ত্রি) মহৎ-মতৃপ্-মত্ ব। মহদ্বুক্ত। (ঐতং ব্রা° ৫।১৮)

মহদ্বারুণী (স্ত্রী) মহেন্দ্রবারুণীলতা।

মহদ্ব্যতিক্রম (পুং) মহাংশাস্তো ব্যতিক্রমশ্চেতি। অতিশয় ব্যত্যয়। (ভাগ° ৯।৮।১১)

মহন (স্ত্রী) ১ প্রভূত, অনেক, বিপুল। (ঋক্ ৫।৩৩।১০)

মহনীয় (ত্রি) মহ-অনীয়ন্। পূজনীয়, মান্য।

মহন্দিপাহাড়, বাঙ্গালার একটি ক্ষুদ্র পর্বত।

মহম্মদ, পশ্চিম-সীমান্তবাসী আফগানজাতিবিশেষ।

মহম বেগম, শেখ আব্দুল আমের পোতী। সম্রাট বাবর শাহ ইহার পাণিগ্রহণ করেন। মহম বেগমের গর্ভে হুমায়ুন জন্মগ্রহণ করেন। এই বেগম দিল্লীদুর্গের নিকটে ‘দিনপনা’ নামক একটি মসজিদ নির্মাণ করান। শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

মহম্মদ, মুহম্মদ (আবুল কাশেম ইবন আবদল্লা), আরবের প্রসিদ্ধ ইসলামধর্মের প্রবর্তক। ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর তাঁহার জন্ম হয়, মতান্তরে ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল তাঁহার জন্ম হইয়াছে। বাহাই হউক, তাঁহার মক্কা হইতে মদিনা-পলায়ন (হিজিরি আরম্ভ ৬২২ খৃঃ অঃ) এবং তাঁহার প্যাগম্বর-প্রসিদ্ধি (আম্মানিক ৬১০ খৃঃ অঃ) আলোচনা করিলে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্মকাল নিরূপণ করা যায়। কোরাণে লিখিত আছে যে, যেমেনের হাবসী শাসনকর্তা আব্রাহাম এই সময়ে মক্কা আক্রমণ করেন এবং এই সময়ে আরববাসিগণ সর্বপ্রথমে হস্তী দর্শন করে ও বসন্ত-ব্যাদি কষ্টক উৎপীড়িত হয়।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন মহাপুরুষের জন্মকালের সহিত কোন না কোন অলৌকিক দৈব ঘটনার সংস্রব থাকিবে। মহম্মদের জন্মকালেও সেরূপ অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলীর অভাব ছিল না। পারস্তের সগ-পুরোহিতগণের চিররক্ষিত পবিত্র অগ্নির নির্ক্ষাপণ, সমগ্র আরবদেশে উজ্জল আলোকবিস্তার প্রভৃতি ভৌতিক ব্যাপারের অবতারণা করিতে মুসলমান গ্রন্থকারগণ কাতর হন নাই। ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের জীবনকাল অলৌকিক ঘটনাসমূহে সুরঞ্জিত করিবার প্রয়াস একমাত্র মহম্মদবিশ্বাসী মুসলমানগণের পক্ষেই থাকে। আমরা অবতার বা আদর্শ পুরুষের দোষ গুণ-বিচারে অক্ষম। সম্ভব অসম্ভব ঘটনাবলী সাধারণের বিবেচ্য। তবে প্রকৃত জীবী আশ্রয় করিয়া আমরা মহম্মদের মহা-জীবনের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

খৃষ্টের জন্মভূমি পালেস্তিন। পালেস্তিনের অনতিদূরে খৃষ্ট-জন্মের পাঁচশতাধিক বর্ষ পরে আরবদেশের মক্কা নগরে মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদ তখন আরবীদিগের নিকট ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচিত। পালেস্তিনের খৃষ্ট আর মক্কার মহম্মদ, এই দুই অবতারের নিজ নিজ লীলাস্থল ও জন্মকালের মধ্যবর্তী সময় আলোচনা করিলে অসম্ভব হয়, তৎকালে আরবগণ উচ্ছৃঙ্খল অথবা পারসিক ও খৃষ্টধর্ম-প্রাভাবনে মিশ্রভাবাপন্ন হইয়াছিল। বোধ হয়, মহাপুরুষ মহম্মদ তাহাদিগের তাৎকালিক মতবিরোধ-দর্শনে স্বয়ং এক পৃথক্ মত প্রচার করিতে আগ্রহ করতেন।

মহম্মদের জন্ম ও যৌবনে পদার্পণ হইতেই আরবজাতির ঐতিহাসিক দ্বার মুক্ত হয়। ইহার পূর্বে আরবগণের অভ্যুত্থানের কোন সূচনাই দেখা যায় না। তৎকালে সমগ্র আরব উপদ্বীপ মধ্যে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দির প্রারম্ভে কিওইত-রাজগণ মধ্য-আরবের কএকটি উন্নতচেতা জাতি একত্র করিয়া একটি জাতীয় সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। ইহা আরব-ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য না হইলেও প্রস্তাবনারূপে স্মৃতি হইয়াছে বলা যায়। ইসলামধর্মের প্রতিষ্ঠার সহিত প্রকৃত আরবী ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছে।

কিওইত-বংশের অবসানে আরবে পুনরায় শাসন-বিপ্লব লভা ঘটে। এই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া নেজদ ও হিজাজের ভ্রমণশীল অধিবাসিবৃন্দ মধ্য-আরবে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু অধিকদিন তাহাদিগকে এ স্বত্বসমৃদ্ধি ভোগ করিতে হয় নাই। পারস্তরাজের অধীনস্থ হীরা ও অন্বারের লখ্মিধর্মগণীয় সামন্তগণ ধীরে ধীরে আরবে পারস্তরাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। পূর্বে হইতেই গ্রীকগণ গসসানিদ-বংশীয়গণের উপর আরবীয় শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। জুইটা বৈদেশিক শক্তিস্রোতের একত্র সমাবেশে ক্রমে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পারস্তরাজ খুশানদিগকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টিত হইলেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দির শেষভাগে নেজদ হইতে যেমন পর্যন্ত পারস্তশক্তি অক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ইসলামধর্মের ও আরব সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান-নিকেতন প্রাচীন হিজাজ ও পশ্চিমে নেজদ প্রদেশ গ্রীক, পারসিক, গসসানিদ বা লখ্মিধর্ম প্রভৃতি রাজত্বগণের কবলিত হয় নাই। তাহার পিতৃপিতামহদিগের স্মার স্বাধীনতা-স্বপ্ন ভোগ করিতে ছিলেন। মহম্মদের জন্মভূমি মক্কা নগরীর প্রসিদ্ধ কাবা মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অজ্ঞাত জাতির সহিত বাহু কনান জাতি উপনিবেশ স্থাপন করে। হুল-উল-হিজের পূর্ণিমায় মক্কা, অরফা ও কোজা

নগরে বাৎসরিক উৎসবে বহু লোকের সমাগমহেতু ক্রমশঃ একটি মহামেলার সংঘটন হয়। এই মেলায় সিরীয়া, যেমন প্রভৃতি দেশজাত বাণিজ্যের প্রচলনহেতু মক্কা নগরীর খ্যাতি ও শ্রীবৃদ্ধি জনসমাজে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে।

এই বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হইয়া কোরাইস্ (কিনান জাতির একটি শাখা) জাতি সমধিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, উক্ত জাতির বাহু হাসেমের বংশে মুসলমানকুল্যবি মহম্মদের উদয় হয়। তাহার পিতা আবদল্লা ধনে মানে সমাজের অগ্রণী ছিলেন। আরবজাতির খ্যাতনামা আদিপুরুষ ইসমাইলের বংশধর বলিয়া সাধারণে তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিত।

বাণিজ্য ব্যবসারে উত্তরোত্তর অর্থবান্ হইয়া কোরাইসগণ পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে আপনাদের প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল এবং বিভিন্ন শিক্ষিত ও উন্নতজাতির সহিত আলাপ ব্যবহারে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও বিশেষরূপে পরিমার্জিত হইয়াছিল। আরবজাতির প্রাচীন উপাসনাতথ্য 'কাবা' বহুকাল হইতে এই হাসেমবংশের কর্তৃত্বাধীনে রক্ষিত ছিল। মহম্মদের পিতৃ-পুরুষগণ পূর্ণপ্রভাবে এখানকার যাজকতা-কার্য পরিচালিত করিয়াছিলেন।

মহম্মদের জন্মের পূর্বে তাহার পিতা আবদল্লা বা আবদল্ মোওলিব্ পরলোক গমন করেন। সূতরাং তাহার পুত্রমুখ-দর্শনাকাজ্ঞা ফলবতী হয় নাই। স্বামিবিরোগবিধুরা মাতা আমিনা শোকতাপে ক্লিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় বৎসরেই প্রাণত্যাগ করিলেন; সূতরাং পিতৃমাতৃহীন শিশু মহম্মদের পালনভার তৎকালীন কাবার প্রধান পুরোহিত তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহের হস্তে স্তম্ভ হইল। বৃদ্ধের জীবলীলা ফুরাইলে, তাঁহার খুল্লভাত আবুতালিব্ আবদল্ মোওলিব্ হন, তিনিই বালকের অভিভাবক হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। বালাজীবনে মহম্মদ মেঘচারণ ও মরুদেশ হইতে বন-জাম আহরণ করিতেন। এতদ্বিত্ত তাঁহার কিশোর বয়সের আর কিছু জ্ঞান যায় না। এই সময়ে তিনি দীন দুঃখীর সহিত ভ্রমণ করিয়া দারিদ্র্যকষ্ট বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পরবর্তিকালে তাঁহাকে খুল্লভাতের সহযোগে অনেক-বার বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিরীয়া, দামাস্কাস, বোগদাদ ও বসোরা প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে হয়। ২০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পিতৃব্যের আদেশে তিনি বণিক ও তীর্থযাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচারকারী দস্যুসম্প্রদায়কে দমন করিবার জন্য সদলে যাত্রা করেন। এইরূপে সসাজে দস্যু অধেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকার তাহার যৌবন-জীবনে যুদ্ধবাসনা বলবতী হইয়াছিল। তাহার



এই উদ্দেশ্যে বীরপ্রভা তবিত্যে তাঁহার ধর্মজ্ঞানের পরি-  
পোষকতা করিয়াছিল।

যৌবনে রণরঙ্গে একপ উদ্ভূত থাকিলেও তাঁহাকে সময়  
সময় নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে দেখা যাইত। নির্ভরতার  
উপাদানভূত পৌত্তলিকাচার এবং বৃথা কষ্টকাণ্ডের আড়ম্বর  
প্রত্যাহ মক্কা নগরে দৃষ্টিগোচর করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয় আরও  
খিন্ন হইত। এমন কি, বাধ্য হইয়া কখন কখন তিনি পিতৃ-  
পিতামহগণের অমুষ্টিত ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হইতেন। কাবা-  
মন্দির-নির্মাণের সময় একদিন তাঁহাকেও সেই প্রসিদ্ধ  
কৃষ্ণ প্রস্তর সরাইতে যাইতে হইয়াছিল। এই সকল দেখিয়া  
তিনি প্রাচীন ধর্মে তাঁহার অনাস্থা জন্মিতে লাগিল। তিনি  
প্রচলিত ধর্মের সংস্কারের জন্য বিশেষ চিন্তাযুক্ত  
হইয়া পড়িলেন।

বসোরায় অবস্থানকালে একদিন তখাকার নেটোরিয় মঠা-  
ধ্যক্ষ বোহিবার সহিত তাঁহার বাক্যালাপ হয়। যুবকের বাক্যা-  
লাপ ও ধর্ম্যভিব্যক্তিতে বৃদ্ধ ধর্ম্যাজ্ঞক বৃদ্ধিলাভিলেন যে, এই  
যুবক কাশ্রে একজন মহাপুরুষ হইবেন। তদনুসারে তিনি  
তদীয় পিতৃব্য আবু তালিবের সহিত সংগোপনে সাক্ষাৎ করিয়া  
বলিয়াছিলেন, ‘মহাশয় কালে এই বালক মহাজন হইবে,  
সুতরাং আপনি বিশেষ যত্নের সহিত ইহাকে যিহুদীদিগের  
হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন।’

পঞ্চবিংশ বর্ষে পিতৃব্যর অমুঃস্মরণে তিনি খদীজা নামী  
এক ধনাঢ্য বিধবা রমণীর বিষয়কর্ম পর্য্যবেক্ষণ করিবার  
জন্ত তাহার আলয়ে গমন করেন এবং রমণীর ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধির  
জন্ত বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হন। কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে  
দেশ দেশান্তরে গমন করিতে হয়। এই সময় তিনি খৃষ্টের  
লীলাক্ষেপে পালেস্তিন ও সমুদ্রশালী প্রাচীন সিরীয়া নগরী পরি-  
দর্শন করেন। এখানে পূর্বতন ধর্ম্যাজ্ঞকদিগের প্রত্নমুষ্টি,  
হিব্রুদের পার্বত্যগুহা ও মরাসাগর প্রভৃতি নৈসর্গিক চিত্র-  
সমূহ সন্দর্শন করিয়া তিনি ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন।  
যেন কোন ঐশী শক্তিতে অমুঃপ্রাণিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কন্দর  
আলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি খৃষ্ট অবতারের অনৌ-  
কিক ক্রিয়াবলী সিরীয়ার ধর্ম্যবিস্তার স্মরণ করিয়া আত্মহারা  
হইয়াছিলেন। এই সকল স্মৃতিই যেন তাঁহার ভগ্ন আশা-  
তরুকে পুনরায় শাখা পল্লবিত করিয়া দিল।

এই ভারপ্রাপ্ত হৃদয় লইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হন।  
যৌবনমূলভ প্রণয়ে আসক্ত হইয়া তিনি কিছুকাল পরে  
খদীজার পাণিগ্রহণ করেন। বিধবা খদীজা তাঁহাকে  
স্বয়ংপিতা হইলেও, এই বিবাহে সুখময় ফল কলিয়াছিল।

মহম্মদ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণকেশদাম, প্রো-  
দিত মুখশ্রী ও লজ্জাশীলতা সহজেই রমণীর মন আকৃষ্ট করিতে  
পারিত। প্রণয়িনী খদীজা আপনাকে তাঁহার দাম্পত্যসুখের  
অংশভাগিনী করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।  
এই সন্মিলনফলে জৈশ্বের কুপায় তাঁহাদের অনেকগুল  
সন্তান সন্ততি হয়। মহম্মদের জীবদশার দুইটা শিশুপুত্র  
জীবন হারাইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নামে তিনি আবুল  
কাসিম নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার দেশবিখ্যাতা কজা কতিয়া  
পিতৃব্য আলী-বন্ আবু তালিবের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

খদীজার সহবাসে মহম্মদ সুখী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার  
হৃদয়ের কেন্দ্রীভূত ধর্ম্মলালসা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার  
মনোমন্দির হইতে বিযুক্ত হয় নাই। বিবাহের পরবর্তী  
পঞ্চদশ বর্ষ তিনি কেবলমাত্র ধর্ম্মোন্নতির চিন্তায় অতিবাহিত  
করিতেন এবং চিন্তাসংযমেয় জন্ত অহরহঃ হেবার পার্বত্য-  
গুহায় আশ্রয়। আপনায় অভীষ্ট পথানুবর্তন করিতে চেষ্টা  
পাইতেন। এই সময়ের মধ্যেও তাঁহাকে কার্য্যাহুরোধে  
পুনরায় সিরীয়া রাজ্যে ও দক্ষিণ আরবে গমন করিতে হয়।  
বিশেষভাবে তিনি যে সাময়িক জ্ঞানলাভ করেন, তাহাতে  
তিনি বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলেন যে, তত্ত্বদেশবাসিগণ প্রচলিত  
পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী নহে। তাহাদের মনেও  
ধর্ম্মাঙ্কুরের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার অজি-  
মত ব্যক্ত হইলে, অনেকে তাঁহার পথানুসরণ করিতে পারে।  
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি কএকজন জ্ঞানী যিহুদী ও  
খৃষ্টানের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হন, তন্মধ্যে আবদল্লা  
ইবন্ সালাম ও বরাকের নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বরাক  
তাঁহার শ্রালকপুত্র ছিলেন। ইনি আরবীয় পৌত্তলিকধর্ম্মে  
বিরক্ত হইয়া প্রথম যিহুদী ও পরে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।  
বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহবাসে মহম্মদ বেশ বৃদ্ধিতে পারিয়া-  
ছিলেন যে, আরবে নূতন মতস্থাপন অবশ্যস্বাভাবী।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, খদীজার সহিত পরিণয়সূত্রে  
আবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পর হইতেই মহম্মদের মনে ধর্ম্ম-  
সংস্কারের আবশ্যকতা জাগরিত হইতে থাকে। ক্রমে সেই চিন্তা-  
স্রোত বাক্যালাপে পুষ্ট হইয়া মক্কা, মদিনা ও তারফ নগরবাসি-  
জনগণের হৃদয়ক্ষেত্র আলোড়িত করে। মহম্মদের অভ্যুত্থানের  
পূর্বে অজ্ঞাত স্থানের জায় মক্কা নগরীতেও আরবীয় পৌত্তলি-  
কতার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। অনেকই ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতৃ-  
পুরুষগণের আচারিত পার্বত্যগুহাসবে যোগদান করিতে যত্নবান  
ছিলেন। তৎকালে আরবগণ বহু দেবতার উপাসনা করিত না।  
একমাত্র আল্লাই সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা ও পরম পিতারূপে



পরিবাক্ত হইতেন। তাহার আশ্রয় নামেই শপথ করিত। বিপদে পড়িলে আশ্রয় নাম লইত এবং দীক্ষা, বন্ধনী ও চুক্তিনামা প্রভৃতি স্বীকার-পত্রসমূহে ‘বিস্মিক আশ্রয়’ নামের মোহর দিত, কিন্তু নিম্নতম দেবতাবৃন্দের সাময়িক উপাসনা ব্যতীত তাহার কখনও নামোচ্চারণ করিত না। পূজা প্রভৃতিতে তাহাদের বিশেষ ভক্তি না থাকিলেও, পুণ্যাহার ভোজনোৎসবে তাহাদের মধ্যে একটা মহাপ্রশ্ন-লন সংঘটিত হইত। শত্রু মিত্র সকলেই এই পুণ্যময় দিনে পবিত্রক্ষেত্রে সমবেত ও পরস্পরের আলিঙ্গনে আপ্যায়িত হইয়া মনের বৈরভাব বিদূরিত করিত।

দেবতার অভক্তিহেতু আরববাসীদিগের পূর্বতন ধর্মভাব ক্রমশঃই অপনোদিত হইতেছিল। মত্বপান, পণ্ডহিংসা, দূতক্রীড়া, অবৈধ প্রণয়াদি, প্রতিহিংসা, আত্মকলহ, দ্বন্দ্ব-বৃত্তি প্রভৃতি ব্যাপার আরবদিগের অঙ্গভূষণ হইয়াছিল, এমন কি, তাহাদের কাব্যাদিও আদিরসপূর্ণ অশ্লীল শ্লোক-বলীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। একদা উচ্ছ্বল অবস্থায় আরব-দেশে সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ধর্মাস্তর স্থাপন আবশ্যক হইলেও, কেহই এই জাতীয় অভাবের দিকে লক্ষ্য করে নাই। কেবল-শত্রু ত্রায়েকবাণী ওময় ইবন্ আবীল্ সল্, মক্কাবাসী জৈদ্ ইবন্ উমর এবং মেদিনাবাসী আবু কায়স্ ইবন্ আবি অনস্ এবং আবু আশীর নামক মহাত্মগণ পৌত্তলিক মতের বিরোধী হইয়া নূতন পন্থাচরণে যত্নবান্ ছিলেন, কিন্তু ইহাদের কেহই চিরপ্রচলিত ধর্মমতের উচ্ছেদ কামনা করেন নাই। ইহারা আপনাপন পাপমুক্তির জন্ত একচর্য্যত্রয় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইহারা সকলেই হানিফ বলিয়া পরিচিত হইলেও, কোন বিশেষ মতামতগারী ছিলেন না। এই কারণে ইহারা কোন স্তত্র সম্প্রদায় সংগঠন করিতে পারেন নাই। সাধারণের সহিত শিষ্ট বাক্যালাপে কালাতিপাত করিলেও ইহারা সমাজ-সম্পর্কে তাহাদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ ছিলেন না। সকলেই আপনাপন আত্মার উন্নতির চেষ্টা করিতেন। জাতীয় উন্নতির দিকে ইহাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। এই নিমিত্ত ইহাদের মতপ্রচারেরও বিশেষ আবশ্যকতা হয় নাই; একমাত্র মদিনানগরে হানিফদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল।

হানিফীগণ দেবতার বহুত্বকল্পনা হইতে বিরত হইলেন বটে, কিন্তু আশ্রাকে একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। দেব-শক্তির এই একত্বকল্পনা প্রজ্ঞাধিক্তি না হইলেও তাহাদের সংস্কারবশে স্বীকাণ্য হইয়াছিল। এই মতই পরে মহম্মদীয় ইসলামধর্মরূপে খ্যাত হয়।

তাহাদের এই জ্ঞানমার্গ তর্ক, নীতিসাধনা বা যুক্তির অপেক্ষা

করে নাই। তাহারাই স্ব স্ব বিবেকবলে একচর্য্য হইয়া জগতের সমস্ত কামনা বিসর্জন দিলেন। ইহা পৌত্তলিক ধর্মের ঘোর বিরোধী হইলেও পাপকালন ও শেষ বিচারের বিশেষ উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

এইরূপে তাহাদের মধ্যে বাইবেলোমিথিত আত্মাহামের ধর্মমত (ideas of Law and Gospel) গুনকল্পীপিত হয়। তাহার ঈশ্বরের সেই পূর্ণ ধর্মভাব্যক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া নূতন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহম্মদ ধর্মাস্তরপ্রয়াগী বরকা-ইবন্-নওকল নামা তাহার জনৈক শ্যালকের সহিত আসিয়া এই হানিফদলে মিলিত হন। তাহাদের ধর্মমতগুলি মহম্মদের হৃদয়ক্ষেত্রে সুবীজ বপন করিয়া দিল, তজ্জাত তিনি সেই বিশ্বব্যাপী সর্বজ্ঞ জগদীশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করিলেন এবং ‘তিনি যেন তাহারই দাসদাস মহম্মদকে কর্তব্যের পথে নিযুক্ত করেন’ এই প্রার্থনা করিয়া তিনি প্রগাঢ় তত্ত্বিত্তরে জগৎপিতাকে আপনার জগৎরায় বাখা জানাইলেন।

অতঃপর বুদ্ধ জৈদ্ ইবন্ অম্বরের পথানুবর্তন করিয়া মহম্মদ বৃক্ষলতাদি-পরিশূন্য নির্জন হারাতেলশুর্কে আসিয়া যোগা-বলম্বনপূর্বক ঈশ্বরারামনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে একাকী কএকবৎসর ভগবদ্ধ্যানে অতিবাহিত করিয়া মহম্মদ বোগসিদ্ধ হইলেন। তাহার অন্তরে হানিফমত বলবৎ ছিল। তিনি মানসিক উত্তেজনার কখন কখন ঈশ্বরকে সাক্ষাৎকার করিতেন। কখন বা ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর হইয়া দশা প্রাপ্ত হইতেন। ক্রমে ধর্মোন্মাদকতায় তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে সুগভীর ঈশ্বর-প্রেম পরিপ্লাবিত হইয়াছিল।

এইরূপে ঈশ্বরানুগ্রহে জ্যোতির্জ্ঞান হইয়া চত্বারিংশ বর্ষে মহম্মদ প্যাগম্বরূপে প্রকটিত হন। তিনি সাধারণ যোগীর ছায় গিরিগুহার লুক্কায়িত না থাকিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত সত্যধর্ম বিস্তারের জন্ত জনসমাজে তাহার ইসলাম্ (মুক্তি) ধর্মপ্রচারের জন্ত বহির্গত হইলেন। বাইবেলোমিথিত খৃষ্টীয় মহাত্মগণ যে অসংশয়িত উদ্যমভরে পবিত্র ধর্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইসলাম-প্রবর্তক মহম্মদও তদনুরূপে আগ্রহভরে আপনায় অতীষ্ট বস্তু জনে জনে বিতরণ করিতে ত্বরিতপ্রস্তু ও মুক্তহস্ত হইলেন। মহম্মদের এই নবধর্ম প্রতিষ্ঠার অমুকূলে আরও দুইটা ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। তৎকালে হানিফগণ নবধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্ত একজন প্যাগম্বরের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল। এদিকে যিহুদী-গণের মধ্যে মেসায়ার আবির্ভাব আশা জন্মিত হইতেছিল। হানিকী-মতামতগারী মহম্মদের কথিত বাক্যগুলি ঈশ্বরপ্রোক্ত

বলিয়া গ্রহণ করিতে হানিক্‌ষিগের কোন বিধা হইল না। আর অনভিজ্ঞ রিহদীসম্প্রদায় তাঁহাকেই মেসীয়া জানে তাঁহার চরণে শরণ লইল। মহম্মদীয় ধর্মে নীক্ষাগ্রহণের পর, এই দুই বিভিন্ন সম্প্রদায় ক্রমে একধর্মাবলম্বী ও এক আতিতে পরিণত হইয়াছিল।

মহম্মদের ধর্মমত ও তৎপ্রচার বিবৃত করিবার পূর্বে, আগে তাঁহার যোগসিদ্ধির একটা অলৌকিক ঘটনা ও মুক্তিলাভের উপাখ্যানটি উদ্ধৃত করা গেল। হীরাশুঙ্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্বক তিনি কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র যোগসমূহ সাধনা করিতে ছিলেন। ঐ সময়ে রমদান মাসে নিশাযোগে এক স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল (Gabriel) নিদ্রিত মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তস্থিত একখানি রেশমী পত্র বাহির করিয়া মহম্মদের সম্মুখে ধরিলেন এবং তিনি ঐ দেবলিপি পাঠ করিতে অসক্ত হইলেও, তাঁহাকে আবৃত্তি করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে মুশা, যীশু প্রভৃতির মত তাঁহার নিকট প্রথমে জ্ঞানবাক্য প্রতিভাত হইয়াছিল। তদবধি মহম্মদ প্যাগম্বররূপে গণ্য হইলেন।

৪০ বৎসর বয়সে মহম্মদ জ্ঞান-বিতরণার্থ পুনরায় জনসমাজে আগমন করিলেন। প্রথমে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি স্বীয় পরিবারস্থ সকলকেই আপন ধর্মমতে দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী খলীজা, বরকা, আবুত্বব্ব ও খলতাত-পুত্র আলী বেন্‌ আবু-তালেব প্রভৃতি সকলে তাঁহার দীক্ষিত হইয়াই বাঁচিয়া থাকেন। তাঁহাকেই আলার দূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

অতঃপর প্রায় ৩ বৎসর ধরিয়া তাঁহার ধর্মমত ও পূর্ব-প্রচলিত পৌত্তলিক মত সম্বন্ধে যোড়তর তর্কবিতর্ক চলিতে থাকে। মহম্মদ একদিন তাহা সম্বন্ধীয় গণ্যমান্য সকলকে সম্মুখে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—‘আমি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের প্রোক্ত মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যে পরম রহস্য লাভ করিয়াছি, অত্ৰ আপনাদিগকে তাহারই অংশভাগী করিবার নিমিত্ত এখানে সারের আহ্বান করিয়াছি, আপনারা সকলে এই পৌত্তলিকাচার ছাড়িয়া সেই সর্বনিরস্তা একমাত্র সত্যপিতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হউন। বৃথা আড়ম্বর করিয়া, বহু দেবতার উপাসনা করিবার আবশ্যক নাই। অনেকে তাঁহার একেশ্বরবাদিতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার বুদ্ধ ও জ্ঞানী খলতাত আবু-তালেব, তাঁহাকে ঈরুপ পাগলামী ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারই সচিব খেজর জাফরান পুত্র আলী তাঁহারই সমক্ষে মহম্মদের পদ-

প্রান্তে নিপতিত হইয়া তাঁহার শিষ্য স্বীকার করেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারে ত্রী হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

অপরূপ আশ্চর্যগণ মহম্মদকে এইরূপ ভিন্নমত-প্রচারে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে তদীয় পিতৃব্যের মত বাতুল প্রভৃতি বাক্যে তিরস্কৃত করিতে লাগিলেন। এবং বিধ অসম্বন্ধ বাক্যে জর্জরিত হইয়া মহম্মদ ক্রোধদগ্ধ সিংহের মত বলিয়া উঠিলেন,—‘যদি সূর্য্যদেব দক্ষিণহস্তে এবং চন্দ্র বামহস্তে আসিয়া উদ্ভিত হন, তথাপিও আমি পথভ্রষ্ট হইতে পারিব না।’

এইরূপে গুরুজন কর্তৃক ভৎসিত ও লাঞ্চিত হইয়া মহম্মদ বিশেষ উত্তেজনার সহিত মক্কা নগরের প্রধান প্রধান স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ধর্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের একত্বই সত্য এবং পৌত্তলিকতার বাহ্যভঙ্গের মিথ্যা এই প্রচার করাই তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ ছিল। কখন কখন তিনি কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া, কাঁবা-মন্দিরের দ্বারদেশে তাহা লিখিয়া দিতেন। বিখ্যাত আরবী কবি লেবিস তাঁহার এই বাক্যরচনার মোহিত এবং তাঁহার অমামুলিক জ্ঞানের প্রতিভার মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্য গ্রহণপূর্বক ইস্লামধর্ম-প্রচারে মনোনিবেশ করেন।

মহম্মদের মত নীতিবিশারদের উপদেশ এবং বাগ্মিতার মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহার আধ্যাত্মিক মতের পক্ষপাতী হইয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা চিরপোষিত পৌত্তলিক মত বিসর্জন দিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বকীয় মত প্রকৃত কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত সকলেই তাঁহাকে কোনরূপ অলৌকিক ক্রিয়াপ্রদর্শনের জন্ত অস্বীকার করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ‘কোন অনৈসর্গিক কাব্য-কলাপ দ্বারা তিনি তাঁহার সত্যধর্মের অপলাপ করিতে চাহেন না। তাঁহার সত্যধর্ম সত্যপথেই বিস্তার লাভ করিবে, বৃথা আড়ম্বরে ধর্মের হ্রাস হইতে পারে।’ শুনা যায় মহম্মদ তাঁহার জীবনে একটীমাত্র অলৌকিক ক্রিয়াপ্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এই ঘটনাকে অতি রঞ্জিত করিয়া সাধারণে প্রকট করিল। কিংবদন্তী এইরূপ যে, একদা মহম্মদ রাতিযোগে মক্কা নগর হইতে জেরুসালেমে গমন করেন এবং তথা হইতে স্বর্গপুরী আরোহণ করিয়া রাত্রি থাকিতেই প্রত্যাবৃত্ত হন। মহম্মদ গর্ভভাক্তি বোরক (বিহাং) নামক জন্তুপুষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বর্গযাত্রা করিয়াছিলেন। কোরাণের এই বর্ণনা কেহ কেহ স্বপ্নবাক্য বলিয়া অস্বীকার করিয়া থাকেন।

এই সময়ে আবু ওবিদা, মহম্মদের মাতুল হাম্ভা, ওসমান, ওমার প্রভৃতি মকানগরবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আবুবকরের প্ররোচনার মহম্মদীয় মতের প্রতিপোষক হইয়াছিলেন। খদীজার মৃত্যুর পর, মহম্মদ আবু কত্তা আরেসার পাণিগ্রহণ করেন। আবুবকর আজীবন জামাতার পক্ষ হইয়া ইসলাম্‌ই ধর্মপ্রচারে ত্রুতী হন।

খল্লমাত্র লোকে মহম্মদীয় মতের প্রতিপোষক হইলেও, মকানগরে ১০ বৎসরের মধ্যে ইসলামধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। কোরেশবংশীয় মকাবাসিগণ যদি হাসেম-বংশাবতঃ মহম্মদের বিরুদ্ধাচারী ও তংশিয়-প্রশিষামণ্ডলীর প্রতি বৈরনির্ধাতনপর না হইতেন, তাহা হইলে কখনও মহম্মদীয় ইসলামধর্ম আরবদেশে স্থানলাভ করিতে পারিত না।

পৌত্তলিকগণ এই মোক্ষকাম মহম্মদ-শিষ্যসম্প্রদায়ের উপর উপর্যুপরি অসহনীয় অত্যাচার আরম্ভ করিলে, তাহার্যু দলে দলে আবিসিনিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পলাইয়া আশ্রয় লভিল, কিন্তু এই সাম্প্রদায়িকবিরোধ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ঘোর বিরোধ ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষে ঘোরতর বিবাদ বিসংবাদের পর, ক্রমে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হইতে লাগিল। পৌত্তলিকদল মহম্মদকে নিধন করিতে কৃতসংকল্প হইল। বিজোহিদলের এই যড়যন্ত্র চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইলে, মকানগরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পৌত্তলিক ও ইসলাম-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। এই অবসরে মহম্মদ যত্রৈব নগরে পলায়ন করেন। তাহারই নামানুসারে এই নগর মেদিনা বা মেদিনাৎ-অল-নবি নামে পরিচিত। ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই মহম্মদ মেদিনায় আসিয়াছিলেন। ঐ দিন হইতে মুসলমানদিগের হিজিরা অব গণিত হইতেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মকানগরেই হানিফদিগের সংখ্যা অধিক ছিল। পূর্বে হইতেই তাহাদের দ্বন্দ্বের ইসলাম-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাহার্যু অগ্রাই মহম্মদকে মেদিনায় আনিবার জন্ত লোক পাঠাইয়া ছিল। এক্ষণে স্বয়ং মহম্মদকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহার্যু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং দলে দলে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিল। সকলেই একবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহার শত্রুদিগকে সম্মুখে নিহত করিয়া তাহার্যু মহম্মদের চিরসহচর হইবে।

তদনুসারে তাহার্যু মহাসমারোহের সহিত অগ্রসর হইয়া মহম্মদকে আনয়নপূর্বক তাঁহাকে রাজকীয় ও ধর্মসম্বন্ধীয় সমুদায় কার্য্যভার অর্পণ করিলেন এবং বাহাতে তাহার নব-

ধর্মমতগুলি সাধারণে গ্রহণ করে ও ইসলাম ধর্ম সর্বত্র প্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে সকলেই আগ্রহ জানাইল। তৎকালে সমগ্র মেদিনাবাসী মহম্মদীয় ধর্মমত বিস্তারের জন্ত অগ্রগৃহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

মেদিনাবাসীর এরূপ আকাজ্ঞা ও আগ্রহ দেখিয়া মহম্মদের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি এক্ষণে বৃদ্ধিতে পারিলেন যে, তাহার সনাতন ধর্ম আচরে উচ্চাসন লাভ করিবে, তজ্জন্ত তিনি কাকেরদ্বিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মোক্ষধর্ম বিস্তারের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। তাহার বাল্যকালের সেই যুদ্ধলালসা আজ তাহার ধর্মবলের সহায় হইল। তিনি ঈশ্বরের আদেশানুসারে কোব-মুক্ত তরবারি হস্তে দলবল সমভিব্যাহারে বিশ্বস্ত্রীর প্রতি ধর্মবল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে কোরাণ তদবধি মহম্মদীয় ধর্মের মূলমন্ত্র হইল। যত দিন না আরব ও তাহার পার্শ্ববর্তী দেশবাসী একমাত্র আল্লাকেই ঈশ্বর বলিয়া এবং মহম্মদকে ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, তদবধি মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের উন্মুক্ত-কৃপাণ পুনরায় কোষবদ্ধ হয় নাই।

কএকটা খণ্ডযুদ্ধে ও লুণ্ঠন ব্যাপারে সকলকাম হইয়া মহম্মদীয় শিষ্যসম্প্রদায় স্পর্ধিত হইয়াছিল। অতঃপর পৌত্তলিক কোরেশসাইত দলের নেতা আবু সেকিফার সহিত হাসেম-বংশীয় মহম্মদীয় দলের ৩টা ঘোরতর যুদ্ধ হয়। আবু তালেবের মৃত্যুর পর মক্কার অধিকার পুনরায় হাসেম-বংশাবতঃ মহম্মদের করতলগত হয়। হাসেমবংশের চিরশত্রু আবু সফিয়া, লুণ্ঠনকারী মহম্মদীয় দস্যুসম্প্রদায়ের হস্ত হইতে সিরোরাগমী বণিকসম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্ত সহস্র সৈন্তসহ অগ্রসর হন। মেদিনা নগরের ১০ কোশ দূরে বেদার উপত্যকার মহম্মদীয় দল লুণ্ঠনাশয় লুকাইয়া ছিল। এখানে আবুসোফিয়ান সদলে উপনীত হইলে, তাহার্যু বিজাতীয় ক্রোধে আসিয়া আক্রমণ করিল, তিনশত মুসলমান প্রায় সহস্রাধিক কোরেশসাইতকে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল।

এই অপমানজনক পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া আবু সফিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্ত তিন সহস্র সৈন্তসংগ্রহপূর্বক মেদিনা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন (হিঃ৩)। মেদিনার সন্নিকটবর্তী ওহোদ-পর্বতবক্ষে উভয় সৈন্তে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মহম্মদীয় রক্তে পার্শ্বত্যাগে দেশ ভাসমান হইয়াছিল। কোরাইস্ দল জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকদিন তাহার্যু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। মোসলেমগণ পুনরুৎসাহে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই তৃতীয় যুদ্ধে আবু সেকিফান

মেদিনা অবরোধ করেন। আলী বীরোচিত সাহসে ভর করিয়া এ অবরোধ উন্মোচন করিলেন। মুসলমানগণের উপস্থিতি আক্রমণে নিপীড়িত ও সেনাক্ষেপে বিশেষ বিপর্যস্ত হইয়া পৌত্তলিকগণ সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ১০ বৎসরের নিমিত্ত আরব-রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

মহম্মদ এই সময়ের মধ্যে কৈনোকাও, কোরাইধ, নাদির ও খাইবার প্রভৃতি নিরীহ গ্রামকে পরাজিত করিয়া ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তাহাদের নগর ও দুর্গাদি লুণ্ঠিত হইল। নগর ও দুর্গাদি অধিকার করিয়া মুসলমানগণ তত্ত্বনগরবাসী গ্রিহদীদিগকে বিশেষ নির্যাতন করিতে লাগিল। বাহারা ইচ্ছাপূর্বক ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইল, তাহারা মোস্লেমদিগের কঠোর অভ্যাসের হইতে পরিত্রাণ পাইল; কিন্তু যে সকল হতভাগ্য লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ পাপ মনে করিয়া স্বধর্ম্মভ্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তাল্ল-রাই নগর হইতে বিতাড়িত ও মহম্মদীয়ের শাপিত কুপাণমুখে পতিত হইয়া বিশেষ নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত হইয়াছিল।

৬২৮ খৃষ্টাব্দে খাইবার যুদ্ধে বিশেষ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেখাইয়া তিনি কিলীন-আবি-অল্-হোকাইক্ ও হোররাজকে পরাজিত এবং নিহত করিয়া হোকাইক্-পত্নী সফিয়া বিন্ হোররকে বিবাহ করেন। এই সময়ে জৈনাব-নামী জনৈক খাইবার-রমণী সাদরে তাঁহাকে বিধ প্ররোগ করে। ঐ বিবের আশা মহম্মদ শেবজীবন পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। খাইবারের পর ফদক্, বদী অল্ কোরা প্রভৃতি গ্রিহদী-উপনিবেশ মহম্মদের অধিকৃত হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত বদর, ওহোদ ও ফোদীর-যুদ্ধের পর কোরাইস্-দের সহিত মহম্মদীয় দলের হোদেবিয় নগরে যে সন্ধি হয়, তাহা হইতেই ইসলামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও মোস্লেমদিগের প্রভাব কল্পনা করা যায়। এই সন্ধির পর উভয় পক্ষেই নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু প্রতিহিংসাবাহিনী দিন দিন প্রজলিত হইতে লাগিল। ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ওম্মাৎ অল্-কড়া উৎসব দিনে দুই সহস্র সেনাদলে পরিবৃত্ত হইয়া মহম্মদের মক্কা-নগরে প্রবেশ এবং খালিদ্ অল্-বালিদ্, অম্-অল্-আস্, ওসমান টাল্হা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মক্কাবাসীকে সশস্ত্র অভ্যর্থনা করার পুন-রায় মোস্লেমদিগের সহিত কোরাইস্ দলের বিবাদের সূত্র-পাত হয়। এই সময়ে বিধেবিধিত বশতঃ তাহারা মহম্মদের তত্ত্ব অতুচর খোজাঝাকে নিহত করে।

খোজাইতগণ এই সংবাদ মহম্মদকে জ্ঞাপন করিলে, মহম্মদ মক্কাবাসীর প্রতি শান্তি প্রতিবিধান জন্ত অগ্রসর হইলেন।

মহম্মদের আগমনে ভীত হইয়া মক্কাবাসিগণ পুনরায় আবু সোফিয়ানকে শান্তিরক্ষার জন্ত মহম্মদ সন্নিবেশে প্রেরণ করিলেন। অনেক কাকুতি মিনতিতেও মহম্মদের ক্রোধ টলিল না। তিনি ৬৩০ খৃষ্টাব্দে (রমযান হিঃ ৮) মক্কাবাসীদিগকে দশ দিবার জন্ত ১০ সহস্র সেনা লইয়া বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে আরও বহুশতলোক তাঁহার সহিত যোগদান করিল। এই বিপুল সেনাগমনের সংবাদে তায়েফবাসী বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল। আবু সোফিয়ানের প্রবঞ্চনার সহ-জ্ঞেই মক্কানগর মহম্মদের কবলিত হইল। মহম্মদ তাঁহার অধী-নস্থ নায়কবৃন্দের প্রতি আদেশ করিলেন, যেন মক্কার নররক্ত প্রবাহিত না হয় এবং কেহ যেন প্রাচীন কাবা-মন্দিরে হস্ত-ক্ষেপ না করে, সকলেই ইসলামধর্ম্ম গ্রহণপূর্বক পূর্বপ্রথা মত ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদায় পালন করিতে পারে। কেবলমাত্র প্রাচীন কাবা-মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ও অভ্যন্তরে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাহাই নষ্ট করিতে হইবে। সনাতন ইসলাম-ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার চিত্রমাত্র থাকিবে না। প্রত্যেক গৃহস্থের কুলদেবতার মূর্ত্তি এবং মক্কানগরের বহিঃস্থ দেবতীর্থসমূহ ধ্বংস করিতে হইবে।

অচিরে মহম্মদের আদেশ প্রতিপালিত হইতে চলিল। দেখিতে দেখিতে মক্কার পূর্ব সমুদ্রি বিলোপ হইল এবং নুতন শোভায় ও নবভাবে মক্কা নগরীর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপসমূহ পরিচালিত হইতে লাগিল। জোসিয়া জেরুসালেম নগরের জন্ত বেরূপ সংস্কার করিয়াছিলেন, মহম্মদও মক্কার জন্ত তাহাই করিলেন।

মক্কা আসিয়া মহম্মদ ইসলামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সহিত কাবামন্দিরের প্রাচীন উৎসবদিগের সংস্কার করিয়া লইলেন। ৬০২ খৃষ্টাব্দের হুজ্-অল্-হিজ্জের ভোজনোৎসবে স্বয়ং যোগ-দান করিয়া মহাসমারোহের সহিত তাহা সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে তিনি আত্রাহামের প্রবর্ত্তিত প্রথার অনেকাংশে পরিবর্ত্তন করিয়া সুপ্রাচীন প্রথাবলম্বনপূর্বক তৎসমুদায় প্রচলনে এবং পূর্ব-প্রবর্ত্তিত মলমাস গণনার পরিবর্ত্তে চান্দ্রমাস ধরিয়া বৎসর গণনাপূর্বক নবপঞ্জিকা প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন।

মক্কাবিজয়ের পর কোরাইস্দিগের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অপরাপর ভ্রমণশীল জাতিগণও মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু তাইক্-বাসী তকীফ্-গণ ও হবাজিন্ জাতি উক্ত মুসলমানগণের বিরুদ্ধাচারী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মক্কা ও তাইকের মধ্যবর্তী ওটাস্ নগরে তাহারা সন্মিলে হাউনি করিয়া রহিল। হোনাইন্ উগতাকার উভয় সৈন্তে ঘোরতর

যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে মহম্মদীয় সেনাদল বিপর্যস্ত এবং স্বয়ং মহম্মদই বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তদদর্শনে খাজরাজগণ ভীমবেগে শত্রুসৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল, ক্ষণকাল মধ্যেই হবাজিন্গণ অস্থির হইয়া পশ্চাদ্গত হইল, স্বয়ং মহম্মদ হবাজিন্গের পশ্চাদ্গত হইয়া জীরাণা অতিক্রমপূর্বক তাইফ-নগর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ১৪ দিন অবরোধের পর, তাইফ অধিকৃত হইল না দেখিয়া, তিনি জীরাণায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই যুদ্ধ-লব্ধ অধিকাংশ দ্রব্যই বেদোইন্ জাতি এবং মক্কার সম্ভ্রান্তলোকদিগকে উপঢৌকন-স্বরূপ প্রদত্ত হইল। যাহাদের রক্তে ও বলবোধে মহম্মদ রণ-ভয় করিলেন, তাহারা কিছুই পাইল না। মহম্মদ এইরূপ মক্কার গণ্যমান্য লোকদিগকে এবং দুর্দ্ধর্ষ বেদোইন্ জাতিকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

কোরাইস্দিগের অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইসলামধর্মের উন্নতি ও ভিত্তি প্রসারিত হইতেছিল। মহম্মদ মক্কাতে ইসলাম-ধর্মের ক্ষেত্রসাধন করিতে চেষ্টা পান। তিনি কাবা মন্দিরের অনেকগুলি পৌত্তলিকাচার ও মহাভোজের উচ্ছেদ না করিলেও, তৎসম্পর্কে আব্রাহামের নাম বিলোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সনাতন ইসলাম-ধর্মে পৌত্তলিকতার প্রস্রাব দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ধর্ম ব্যতীত অস্ত্রাশ্রয় বিষয়েও প্রস্রাব দিয়া মহম্মদ কোরাইস্-সদস্যগণকে হস্তগত করিতে অগ্রসর হন।

কোরাইস্দিগকে হস্তগত করিবার জন্য তিনি অত্যন্তম সন্দার আবু-সোফিয়ানকে মক্কার দাক্ষিণবর্তী একটা বিস্তৃত প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যে সকল কোরাইস্ ইসলামধর্মে পক্ষপাতী হইবে এবং তদ্বর্ণের উন্নতিকামনায় জীবন উৎসর্গ করিবে, তাহারাই অবশ্য তাঁহার কৃপাপাত্র হইবে। তাঁহার বাক্যে ও উদ্যোগে মুক্ত হইয়া ক্রমে কোরাইস্গণ ইসলাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মক্কা-বাসীর প্রতি মহম্মদের এতাদৃশ অমুগ্রহ দেখিয়া মদিনার আধিবাসিন্দা বিশেষ দুঃখিত হইল এবং মহম্মদকে নিবেদন করিল যে, ‘আমরা প্যাগম্বরের কার্যে আত্মোৎসর্গ করিলাম; আর অস্ত্রে তাহার ফলভোগী হইবো।’ মহম্মদ তাহার প্রধান সহায়ভূত এই ধর্মরক্ষকদিগের জয়প্রার্থনা বাক্যে দয়াক্ষয় হইয়া বলিলেন,—‘তোমরা সেই মহা-দিনে আমার সাহচর্য্য করিয়া একমাত্র সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের বাক্য পালন করিয়াছিলে, ইহা ঈশ্বরের অভি-প্রায় জানিবে।’ ঈশ্বরের কৃতকার্য্যের জন্য তোমরা তাঁহার

নিকট শেষ দিনে পুরস্কৃত হইবে। আমার সঙ্গী হইয়া যেমন তোমরা ঈশ্বরের কার্য্য সংসাধিত করিয়াছ, আমিও তদ্রূপ আজীবন তোমাদের সহিত একত্র থাকিতে কৃতসংকল্প হইলাম। আমার বাসভূমি মদিনা নগরেই রহিল। অস্ত্র হইতে মদিনা নগরী ইসলামধর্মের কেন্দ্রস্থল (মদীরাৎ-অল্-ইসলাম্) হইল।’ মহম্মদের এরূপ সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া তাহার আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল এবং মনে মনে এই ঈশ্বরামুগ্ধীত ব্যক্তির সুখ-দুঃখের অংশভাগী হইতে সংকল্প করিল। এইরূপে তাহার কোরাইস্দিগের অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিক অমুগ্ধীত বোধে সানন্দমনে বিদায় হইল।

জীরাণায় লুণ্ঠন দ্রব্য বণ্টন হইতেই অনেকে মহম্মদের প্রতি বীতরাগ হইয়াছিল। মদিনাবাসী মুসলমানগণ মক্কাবাসীর প্রতি অমুগ্রহদর্শনে ক্ষোভ; প্রকাশ করিলে খাজিরিগণ মহম্মদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে। মহম্মদ পৌত্তলিকাচার লোপ করিয়া একেশ্বরবাদী ইসলামধর্ম প্রবর্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে সাংসারিক সুখলালসা কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। এরূপ ধর্মের প্রবর্তক হইয়া ধনৈশ্বর্য্যের প্রত্যাশী হওয়া তাঁহার মত জ্ঞানীর পক্ষে চিহ্নিত হয় নাই। এই সুখলালসা তাহার মৃত্যুর পর, ইসলাম-ধর্মকে পাপ-ক্লিষ্ট করিয়াছিল।

মহম্মদ ধর্মরাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য কর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আবু সোফিয়ানকে রাজ্যদান, স্বীয় ওমিয়দবংশে রাজশক্তির আরোপ এবং কোরাইস্ জাতির প্রতি ইসলাম ধর্মের রক্ষাভার সমর্পণ করিয়া যে পক্ষপাতী প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাহাতে সহজেই খাজিরিদিগের বিদ্বেষ-বহি প্রদীপ্ত হইতে পারে। তাঁহার কার্য্যাবলী আদৌ তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের অমুকুল ছিল না। ইসলাম ধর্মে যে পবিত্র জীবনের আবশ্যক হইত, রাজস্বাপহরণকারী গার্সিত ব্যক্তির পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ অভাবই পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

মক্কাবিজয়ের পর ক্রমে ক্রমে সমগ্র আরববাসী ইসলাম-ধর্মে দাক্ষিত হয়। কেবলমাত্র নাজরানবাসী খৃষ্টান্গণ, বহরয়িন্দাসী মগীগণ এবং রিহদীগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, হোনাইন যুদ্ধের পর হবাজিন্গণ মহম্মদীয় মতে দাক্ষিত হয়। এইবার তাহার মহম্মদের সহচর হইয়া তাইফবাসী শতকীদিগকে দমন করিবার জন্য আক্রমণ করিল। তকীফগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মহম্মদের চরণে শরণাপন্ন হইল।

তাইফ-দূতগণ মহম্মদের সমীপে উপনীত হইয়া প্রার্থনা জানাইল যে, তদেবদাসিগণ পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকারে

নিম্ন রহিয়াছে। সেই নির্যাসে ছোটসম্প্রদায়কে অল-লাট-দেবীর পূজা ও মন্ত্রপানাদি অসংক্রিয় প্রশ্রম না দিলে তাহারা সহজে মনকে প্রবোধ দিতে পারিবে না, সুতরাং নূতন মত গ্রহণ তাহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এইরূপ উক্তি ক্রমে কোপাধিত হইয়া মহম্মদ উত্তর করিলেন যে, তাঁহার মতে বিশ্বাসকারী ব্যক্তিমাঝেই মদ্যপানাদি ব্যসনক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। পৌত্তলিকতা বিসর্জন দিয়া সকলে একমাত্র সেই ভগবানে আশ্রয়প্রাপ্ত মন সমর্পণ করিয়া থাকিবে, প্রত্যেকেই প্রত্যহ ৫ বার ভগবানের ভজনায় রত হইবে। যিনি নৈমাজ করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি অন্ততঃ মোতক্কিনের ছায় আভান দিবেন। মোসলেম-স্বত্তি অনুসারে সকলেই ধর্ম কর্ম পালন করিবে। তবে আমি তাকদিগের জন্ত এই মাত্র করিতে পারি যে, তাহারা রব্বা-মন্দিরের অল-লাট দেবীমূর্তি স্বহস্তে না ভাঙ্গিয়া অপর কাহারও দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে।'

দূতগণ এই কথা শুনিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। প্রথমে দেবীর রব্বা-মন্দিরে প্রবেষ্ট হইয়া তাহারা মানমুখে বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া স্বদেশবাসিগণকে মনোব্যথা জানাইল, সাধারণের পরামর্শ মতে মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বাত্তা করাই স্থির হইল, কিন্তু মহম্মদীয় সেনার প্রচণ্ড প্রতাপ স্মরণ করিয়া তাহারা এ উত্তম হইতে বিরত হইল। পরে আতীয় সমিতির সম্মতিক্রমে তাহারা পুনরায় মহম্মদের নিকট সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল এবং প্রার্থনা জানাইল যে, তাহার ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইবে, মহম্মদীয় সেনা বা দূত আসিয়া যেন রব্বা-মন্দির ধ্বংস করিয়া যায়।

মহম্মদের এই ধর্মবাত্তা এতদিনে সুকল লাভ করিল। গ্রীস ও পারস্যের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া আরবীয় সামন্ত-বর্গ এক্ষণে মহম্মদের পদে শরণ লইল। মহম্মদ এখন সমগ্র আরবের একচ্ছত্র রাজা হইলেন। তাঁহার জীবনের এই শেষ সময়ে (অর্থাৎ ৬২৪ খৃঃ অঃ) তিনি স্বীয় ধর্মরাজ্য বিস্তৃতিমানসে গ্রীসের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। হোটে-বিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর হইতেই তিনি বিশেষরূপে স্পর্ধিত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে বহুলোক তাঁহার পক্ষাবলম্বন করায় তাঁহার বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, প্রায় সমুদায় মহম্মদীয় অমুচরগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিবৃত্ত হইয়া দীক্ষাদাতার অমুচরণ করিতেছিল।

মহম্মদ স্বীয় প্রভূত শক্তি অমুত্ব করিয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্য-গণকে ইসলামধর্মে অমুচরু থাকিবার জন্ত পত্র পাঠাইলেন। এইরূপে প্রেরিত একটি পত্রবাহক বেলকা (প্রাচীন মোআব)

প্রদেশে নিহত হয়। মহম্মদ এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তদদেশ-বাসী আরবদিগকে আক্রমণ করেন। বেলকা রাজ্য গ্রীক-দিগের অধিকারভুক্ত থাকায় এই ক্ষেত্রে গ্রীকদিগের সহিত মহম্মদীয় সেনার যুদ্ধ ঘটে (৬১৯ খৃঃ অঃ)। মূতা নগরে মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, কিন্তু খালিদ অসীম বীরত্ব দেখাইয়া মুসলমান সেনা শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। পর বৎসর গ্রীষ্মকালে মহম্মদ পুনরায় ৩০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্তা করেন। তাবুক এদোম সীমান্ত পর্যন্ত আসিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে, গ্রীকগণ কেহই যুদ্ধার্থে আগমন করে নাই; তখন তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন; কিন্তু তাহার এই অভিযানও বৃথা নষ্ট হয় নাই। প্রত্যা-বর্তনকালে তিনি উত্তর-আরবস্থ কতকগুলি খৃষ্টান ও যিহুদী সম্প্রদায়কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ৬৩১ খৃঃ অঃ মার্চ মাসে তিনি শেষ তীর্থবাত্তা হইতে প্রত্যাগত হইয়া গ্রীকজাতির বিরুদ্ধে পুনরায় সৈন্যসজ্জা করেন। এই অভিযানের উদ্ভোগ করিতে করিতে (৮ই জুন ৬৩২ খৃঃ অঃ) তাঁহার জীবনীলা শেষ হইল।

মহম্মদ একজন মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইলেও তাঁহার জীবনীতে কএকটি কলঙ্ক রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। কোরাণ মধ্যে তিনি ৪টির অধিক দারপরিগ্রহ নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি স্বয়ং সেই সাধুবাক্যে অপলাপ করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, মহম্মদ ১৫টি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কএকজন পরাধিকার লাভ করে নাই। নিম্নে তাঁহার দ্বাদশটি পত্নীর নাম উদ্ধৃত করা গেল।

#### মহম্মদের পত্নীগণ।

নাম	খৃষ্টাব্দ
১। খুদিয়া (খয়ালিদের কন্যা, ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন) ... ..	৬১৯
২। শুদা (জমাখার কন্যা) ... ..	৬৭৪
৩। আয়েশা (আবু বকরের কন্যা) ৬৬ বৎসর বয়ঃক্রম	৬৭৭
৪। হাফসা (উমর খতার কন্যা) ... ..	৬৬৫
৫। উম্ম শালমা (আবু উম্ময়ের কন্যা ইনি মহম্মদের অগ্রাভ পত্নী অপেক্ষা দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন) ... ..	৬৭৯
৬। উম্ম হাবিবা (আবু সোফিয়ান-কন্যা) ... ..	৬৬৪
৭। জৈনব (জহশের কন্যা, মহম্মদের দাস জৈয়দের বিধবা পত্নী) ... ..	৬৪১



নাম	খৃষ্টাব্দ
৮। জৈনব (খুজীমার কস্তা) ...	৬৪১
৯। মৈয়ুনা (হরিতের কস্তা) ...	৬৭১
১০। জবারিরা (ইরিক্তা) ...	৬৭৭-৭৫ মাস
১১। সফিয়া (হোরবিন্-আধতারের কস্তা) ...	৬৭০
১২। মরিয়ম কোণী (ইজিপ্টদেশবাসিনী ইহার গর্ভে ইব্রাহিমের জন্ম হয়) ...	৬৪৭

মহম্মদের এই বহুপত্নীকত্ব সমর্থন করিতে গিয়া অনেক ভক্তসুখী তাঁহার অবতারত্বের হুচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, দেবদত্তগণ সামান্য মহম্মদের জ্ঞান কোন পাখিব নিয়মের বশীভূত নহেন।

জগতের ইতিহাসে অসামান্য প্রভুত্ব-লাভকারী মহম্মদের জীবনী আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, একমাত্র সাংসারিক ব্যাপার ব্যতীত তিনি অপর কোন বিষয়ে বিশেষ দোষাবিত হন নাই। সমস্ত আরবের রাজ্যের হইয়াও তিনি সাধু-জীবনের অমুখিত ব্রহ্মচর্যের বাবতীর কাঠিন্দই অবলম্বন করিয়াছিলেন। খাদ্য, পান ও পরিধের কোন বিষয়ে তাঁহার লুপ্ত ছিল না। পার্থিব ধনরসাদি ও ঐশ্বর্যের উপর তাঁহার কখনো আসক্তি দেখা বাইত। তিনি তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য উপাসনার কঠোরনিয়মাদি পালন করিয়া গিয়াছেন। এক মাত্র নরলোকের মুক্তির জন্যই তিনি প্যাগধররূপে ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছেন, এই কথাই তিনি প্রচার করিতে বাধ্য হন। মদিনাবাসীকে প্যাগধর নিজ ঐশ্বর্য প্রদর্শন না করিলে কখনই তাঁহার ইসলামধর্ম প্রচার হইত না। তিনি পুরুষের জ্ঞান জীলোকদিগকেও তাঁহার ধর্মব্রতের অধিকারিত্ব করিতে ছাড়েন নাই। এই কারণে তিনি পরবর্তী মুসলমান-সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দাভাজন হইয়াছেন।

মহম্মদ যে ঐশ্বর-প্রেমিত ব্যক্তি এ কথা তিনি কখনও নিজ মুখে স্বীকার করেন নাই, তাঁহার কার্যকলাপ তাঁহাকে দেবদূত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ তাঁহার সেই প্রতিভাকে অনেকাংশে মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছে। তৎপ্রবর্তিত ইসলামধর্মে প্রকৃত ধর্ম-তত্ত্বের বিশেষ গভীরতা না থাকিলেও তাহাতে সামাজিক প্রতিপত্তির পূর্ণ শক্তি বিরাজমান রহিয়াছে।

মদিনার তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত এবং সফলতা তাঁহার পরিপূর্ণ ও অবসান হইয়াছিল। এই দুই ক্ষেত্রের কার্যপন্থার ঐতিহাসিকগণের আলোচ্য বিষয় হইলেও তাঁহার ধর্মপ্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ কোন ইষ্টসাধক হয় নাই। কোরাণে যে সকল নিয়ম তিনি ঐশ্বরের আন্তরিক

বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্যাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিবাদ্য। প্রকণা ও প্রতিহিংসা তাঁহার জীবনে যে কালিমা অর্পণ করিয়াছে, তাহা কিছুতে অপনোদিত হইবার নহে।

নখ্লামার যুদ্ধে ভীষণ নরহত্যা এবং ফোসির যুদ্ধে ৬ শত নিরপরাধী রিহীনীর আগবিনাশ তাঁহার জীবনকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি একজন প্রকৃত প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আকাজ্ঞা-পূরণের জন্যই তিনি তাদূশ কঠোর কর্মসমূহ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

[ বিবৃত বিবরণ কোরাণ ও মুসলমান শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

মহম্মদ ১ম, তুর্কের জনৈক স্থলতান। ইনি স্থলতান বরাজিদের পুত্র। বরাজিদের মৃত্যুর পর পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ার তুর্কসিংহাসন ১১ বৎসর অরাজক থাকে। তৎপরে ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি বিশেষ সাহসিক ছিলেন। নিজ ভুলবলে ইনি কাপা-দোকিয়া, সার্ডিয়া, ওয়ালচিয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া ছিলেন। কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট মায়ুএল পালিও-লোগসের সহিত বন্ধুত্বহুদে আবদ্ধ হইয়া ইনি তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের কএকটি প্রদেশ প্রদান করেন। ১৪২২ খৃষ্টাব্দে এড্রিনোপল নগরে ৪৭ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। তৎপরে ইহার পুত্র ২য় মুরাদ (আমুদাধ) রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

মহম্মদ ২য়, তুর্কজাতির জনৈক সম্রাট। ইনি স্বীয় বল-বীর্ষের জন্য 'মহম্মদ' উপাধি লাভ করেন। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে পিতার (২য় মুরাদের) মৃত্যুর পর, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ইনি পুত্রনির্কিশেষে প্রজাপালন করিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজ্যাধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। কনস্টান্টিনোপল অবরোধকালে ইহাকে গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগর ইহার করতলগত হয়।

কনস্টান্টিনোপলের অধঃপতনের পর হইতে মহম্মদের সুশাসনে ও যত্নে তথাকার দার্শনিক ও বিজ্ঞলোকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। দুইটি তুর্ক-সাম্রাজ্য, যাদশটি মিত্ররাজ্য ও ২ শত নগর অধিকার করিয়া ইনি গ্রেট ও গ্রাণ্ড সিগুনর আখ্যায় ভূষিত হন। এই উপাধি ইহার বংশধরগণও গর্বে সহিত বহন করিয়াছিলেন।

অতঃপর মহম্মদ ইতালী-বিজয়ে কৃতসমর হইয়া যুদ্ধারোহণ করেন, কিন্তু দৈবাৎ শুলরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।



তিনি খৃষ্টধর্মের ঘোর বিবেচী ছিলেন। খৃষ্টধর্মের উচ্ছেদ-  
কামনার তিনি খৃষ্টানদিগকে বহুবার নির্ধ্যাতন করেন।  
খৃষ্টানদিগকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করণই তাঁহার এই অত্যা-  
চারের প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্ত তিনি প্রায় ৮০ হাজার  
খৃষ্টান নরনারীকে শমনভবনে প্রেরণ করেন। তিনি বিশেষ  
সাহসী, বলবান, প্রথরবুদ্ধি ও অদৃষ্টবান পুরুষ ছিলেন।  
তিনি এরূপ গুণাবলীতে ভূষিত হইলেও, কঠোরতা নিষ্ঠুরতা  
ও অবিষমতা প্রভৃতি অদৃষ্ট গুণ তাঁহার জীবনকে কলঙ্কিত  
করিয়াছিল।

হুম্মাদ ৩য়, তুর্কদিগের জনৈক সম্রাট। পিতার (৩য় মুরাদের)  
মৃত্যুর পর, তিনি ১৫২৫ কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে অভি-  
ষিক্ত হন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি খ্রীঃ ১৯ জন  
ভ্রাতার প্রাণ সংহার এবং গর্ভবতী ১০ জন বিমাতাকে জল-  
মগ্ন করিয়া খ্রীঃ রাজপদ কণ্ঠকমুক্ত করেন। তিনি অশ্বপণ  
সম্রাট ২য় বড়লুৎসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।  
হাঙ্গেরীরাজকে পরাজয় করিবার মানসে তিনি প্রায় ২ লক্ষ  
সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে সম্রাট ভ্রাতা মাক্সিমিলিয়ান  
তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভ না  
হইলেও, মহম্মদীয় সেনার নিকট হাঙ্গেরী সৈন্য বিশেষরূপে  
বিপর্যস্ত হইয়াছিল।

হাঙ্গেরী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ঐশ্বর্য্যস্বখে মগ্ন  
হইয়া পড়েন। এই সময়ে অধিকাংশ সময় তিনি অন্তঃপুরে  
থাকিয়া বেগমদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে রত থাকিতেন।  
১৬০৪ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। মোগল-  
সম্রাট অরঙ্গজেব ভারতভূমে যেরূপ দোর্দণ্ডপ্রতাপে  
ইসলাম-ধর্মবিস্তারে বহুপরিকর হইয়াছিলেন, তজ্জপ উদ্দে-  
শের সহিত মহম্মদ প্রাচ্য জগতে ইসলাম ধর্মের বিজয়-  
পতাকা উড্ডীন করিতে যত্নবান হন।

হুম্মাদ ৪র্থ, তুর্কের জনৈক সম্রাট, ইব্রাহিমের পুত্র। ১৬৪২  
খৃষ্টাব্দে তিনি কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে অধিরোধন  
করেন। ইসলামধর্ম ও মুসলমান-রাজ্যবিস্তারের জন্ত তিনি  
ভিনিসীয় জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। প্রায় ২ লক্ষ  
সৈন্যকে নিহত করিয়া কাণ্ডিয়া অধিকারপূর্বক পোলও  
আক্রমণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হয়। কিন্তু  
তাহাকে তথায় মহম্মদীয় শাসনবিধি স্থাপন করিতে হয় নাই।  
৩৩ বৎসর পোলওয়াজ সোবেকি চোরজিমের যুদ্ধে তাঁহাকে  
পরাজিত করিয়া পরাজ্য উদ্ধার করেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে  
রাণ্যচ্যুত হইয়া কারাবদ্ধ হন। এখানে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে  
তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ, জনৈক মুসলমান চাকার। ইহার চলিত নাম  
বরাণ-উল শাহরিজত। হিজরা ৭ম শতাব্দীতে ইনি বর্তমান  
ছিলেন। ইনি 'বকারা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত  
বকারা গ্রন্থ "হিদায়া" নামক পুস্তকের প্রত্যাবলম্বন।  
উবেদ উল্লা বিল্ মশায়ুদের 'সয়ার-উল-বকার' নামক  
চাকার মূল গ্রন্থানিকে অতিক্রম করিয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থে মূল  
শ্লোক ও তাহার বিশদ ব্যাখ্যা এবং দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।  
এছাড়া উক্ত "বকারের" আরও অনেক চাকার আছে।

মহম্মদ, কান্দাহারের জনৈক রাজা। তিনি খিলজাই জাতীর  
আক্গান।

১৭১৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতা মীর বসের মৃত্যু হইলে,  
তিনি তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। ১৭২২ খৃঃ অব্দে  
তিনি ইস্পাহান নগর অবরোধ করিয়াছিলেন। পারস্যরাজ  
নূরতান হোসেন স্বকীয় তৎকর্তৃক পরাভূত হইয়া এমন কি  
প্রধান প্রধান সামন্তগণ সহ অশ্রুপূর্ণ নয়নে মহম্মদের নিকট  
আত্মসমর্পণ পূর্বক সিজ হস্তে তাঁহার মন্তকোপরি রাজমুকুট  
ধারণ করেন। এই ঘটনার ২ বৎসর পরে মহম্মদ বন্দী  
সফীরান সুবরাজগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। সর্বমুখ  
৩০ জন রাজবংশধর নিষ্ঠুরভাবে নির্দয় বিজ্ঞেত্বকরে নিহত  
হন। এই সকল রাজপুত্রের মধ্যে কেহ পূর্ণবয়স্ক এবং কেহ  
বা শৈশবাবস্থায় ছিল। কথিত আছে যে, মহম্মদ সেই  
রক্তপ্রিত্তেই উগ্ৰত হইয়া খ্রীঃ মাংস ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আহার  
করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ১৭২৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রাণ  
বিরোগ হয়। মহম্মদের মৃত্যুর পূর্বে নূরতান হোসেনের পুত্র  
তহমাস্প মীর্জা, যিনি ইস্পাহান হইতে পলায়ন করিয়া আশ্রয়  
করিয়াছিলেন, সুযোগ পাইয়া এই সময় মহম্মদের রাজ্য আক্র-  
মণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎদর্শনে সকলেই  
ভয়ান্ত হইয়া মহম্মদের ভ্রাতৃপুত্র আশরফকে শাসনকর্তা  
মনোনীত করিলেন। মতান্তরে আশরফ ১৭২৫ খৃঃ অব্দে  
মহম্মদকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

মহম্মদ অকবর, মোগল-সম্রাট অকবর শাহের নামান্তর।

[ অকবর দেখ। ]

মহম্মদ অকবর, সম্রাট অরঙ্গজেব আলমগীরের কনিষ্ঠ পুত্র।  
ইনি পিতার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। পরিশেষে পারস্যে  
পলায়ন করেন। এখানে ১১১৫ হিজরার তাঁহার জীবলীলা  
শেষ হয়।

মহম্মদ অকবর, জনৈক মুসলমান গ্রন্থকার। কুলবর্গাবাসী  
মহম্মদ গেরু দরাজের পুত্র। ইনি পারস্যী ভাষায় 'আকবরদ্  
অকবরী' নামক একখানি ধর্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ আল্-মহদী, বর্ধমানরাজ্যের প্রথম খলিফা বা রাজা। ১০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। আলি ও ফতি-  
মার পুত্র হোসেনের বংশধর বলিয়া মুসলমান-সমাজে তাঁহার  
বখেটে প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার বংশধরগণ মিসর রাজ্য  
জয় করিয়াছিলেন। ১৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার  
মৃত্যুর পর, তৎপুত্র কাএম বিয়ামন্ উল্লা ১৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত  
রাজ্য শাসন করেন।

মহম্মদ আবদু, জনৈক পারসিক গ্রন্থকার। ইমি অসাস উল্-  
ইসলাম ও কিখা সুনাতক্ বা জমারৎ নামে দুইখানি মহম্মদীয়  
স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ আজিমু, জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। ইনি  
হায়দার মালিককৃত কান্দীর ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনা  
অবলম্বনে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে  
তিনি মোগল-সম্রাট্ আলমগীরের বিশেষ স্তুতিয়াতি করিয়া  
গিয়াছেন।

মহম্মদ আদিল শাহ, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর-রাজ্যের  
জনৈক রাজা। ২য় ইব্রাহিম আদিল শাহের পুত্র। ১৬২৬  
খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার রাজ্যকালে  
দিল্লীর মোগল-সম্রাট্ শাহ-জহান্ দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন।  
আকবরনগর মোগলের করতলগত হইলে, তাঁহার রাজধানী  
মোগলসৈন্য কর্তৃক লুণ্ঠিত হইতে পারে ভাবিয়া, তিনি নিজাম  
শাহের সহায় হইয়া মোগলরাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।  
মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে এইরূপে কএকবার যুদ্ধযাত্রা করিয়া  
তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এমন কি, এক  
লম্বে তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বহু অর্থ প্রদান করিয়া  
শান্তিক্রয় করিতে হয়।

১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য পুনরায় দাক্ষিণাত্যবিজয়ে  
অগ্রসর হইল। বিজাপুর রাজ্য এই সময় তিন দিচ্ হইতে  
আক্রান্ত হইলে, বিজাপুররাজ আকবরক্ষ্য অসমর্থ হইলেন।  
দুর্দান্ত মোগলসৈন্য বিশেষ নিষ্ঠুরতার সহিত বিজাপুর রাজ্য  
ও নগর উৎসাদিত করিতেছিল। দৌলতাবাদ প্রভৃতি গিরি-  
দুর্গ ও রাজধানী এবং নিজাম রাজ্যের অধিকাংশস্থান মোগ-  
লের হস্তগত হইল দেখিয়া, মহম্মদ মোগল-সম্রাটের শরণাপন্ন  
হন এবং মোগলরাজ সরকারে প্রভূত রাজস্ব প্রদান করিয়া  
জীবাহতি পান।

প্রকৃতপক্ষে ইনিই বিজাপুর-রাজ্যের শেষ রাজা। ইনি  
স্বনামে মুদ্রাপ্রচলন করেন। ইহার পরবর্ত্তি-রাজগণ নামে  
মাত্র রাজা ছিলেন।

মহম্মদের রাজত্বের শেষভাগে প্রধান সামন্তরাজ শাহজী

ভৌসলের পুত্র শিবাজী ছিল, বলে ও কৌশলে বিজাপুর রাজ-  
সরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সামন্তের  
অত্যাচার হইতেই বিজাপুর-রাজশক্তির হাস হইতে থাকে।

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে মহম্মদের মৃত্যু ঘটে। বিজা-  
পুরস্থ গোল-গম্বজ নামক সমাধিমন্দিরে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ  
হয়। পিতার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আলি আদিল শাহ রাজ্যা-  
ধিকার প্রাপ্ত হন। [ আদিলশাহ বংশ ও বিজাপুর দেখ। ]

মহম্মদ আফজল, মদীনাৎ উল্-ওরিয়া নামক গ্রন্থরচয়িতা।  
গ্রন্থকার খ্বয় গ্রন্থে জগৎ-সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া ইসলাম  
ধর্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের পূর্ববর্ত্তী প্যাগম্বরগণের ইতিহাস  
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ আফজল (শেখ), জনৈক মুসলমান কবি। গাজি-  
পুরনিবাসী পীরজাদা শেখ আবদুর রহিমের পুত্র। ইনি খ্বয়  
দীক্ষাশুর কাল্পীনিবাসী মীর সৈয়দ মহম্মদের অল্পমতিক্রমে  
আলাহাবাদ (প্রয়োগ) নগরে বাইয়া বাস করেন। এখানে  
তিনি একটা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালকদিগকে আরবী ও  
পারস্যভাষা শিক্ষা দিতেন। তাঁহার রচিত অনেক কাব্য  
পাওয়া যায়। এই কবিত্ব শক্তির জন্য তিনি “আফজল” আখ্যা  
লাভ করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ আনসুর, জনৈক মুসলমান-জীবনীলেখক। ইনি  
শুজরাতবাসী বিখ্যাত সুফি শেখ আকবর খট্টর জীবনী অবলম্বন  
করিয়া ১৩৪৫ খৃঃ অঃ ‘মলফুজাৎ শেখ’ আকবর যবাবি’ নামক  
গ্রন্থ রচনা করেন। এখনও আকবরনগরে উক্ত সুফি-সাধকের  
সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

মহম্মদ আমীনু, আকবরনগরবাসী জনৈক মুসলমান ঐতি-  
হাসিক। দৌলত মহম্মদ আল্-হসেনী আল্-বালখীর পুত্র।  
ইনি নবাব সিপাদার খাঁর আশ্রয়ে থাকিয়া ‘আনকা উল্-অখ-  
বার’ নামে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। ১০৩৬ হিজরায়  
গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় বলিয়া গ্রন্থকার খ্বয় গ্রন্থের এই নাম রাখিয়া  
দেন। গ্রন্থশেষে নবাবের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে।

মহম্মদ আমীনু, জনৈক মুসলমান কবি। সম্রাট্ আলম-  
গীরের যুদ্ধবিজয় এবং দাক্ষিণাত্যের নগরশোভা সন্দর্শন  
করিয়া তিনি যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই একত্রে  
সংগৃহীত করিয়া তিনি ‘অস্ফার-উল্-মআনী’ নামে প্রকাশ  
করেন। নগরগুলির বর্ণনায় তিনি মোগল-অধিকারের পূর্ব-  
বর্ত্তী সৌন্দর্যের বিষয়ই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ-  
খানি এককথায় ‘ভারতীয় উত্তানের প্রাচীন শোভা’ বলিয়া  
গৃহীত হইয়া থাকে। যেহেতু মোগল-অত্যাচারে অনেকানেক  
নগর একবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

এতদ্বিধা 'হকিম ইলম্ ইলাহী' নামে তাঁহার রচিত আর একখানি ধর্মতত্ত্ববিবরণ গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মহম্মদ আমীন খাঁ, জনৈক মোগল সেমাপতি। মহম্মদ সৈয়দ মীর জুন্নার পুত্র। ইনি সম্রাট শাহ জহান ও আলমগীরের অধীন পাঁচ হাজারী সেনানায়ক ছিলেন। গুজরাত-প্রদেশের আকদাবাদ নগরে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মহম্মদ আমীন খাঁ, জনৈক মোগল-সচিব। নিজাম উল মুলক আসফ-জার ভ্রাতা মীর বহাউদ্দীনের পুত্র। সম্রাট আলমগীরের রাজ্যকালে ইনি জম্মুখিম পরিত্যাগপুস্তক ভারতে আগমন করেন এবং উক্ত সম্রাটের অধীনে কর্মচারিপদে নিযুক্ত হন। বিচক্ষণ ও কূটবুদ্ধি দেখিয়া সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁহাকে স্বীয় প্রধান পরামর্শদাতা করিয়াছিলেন। অবশেষে সৈয়দ হোসেন আলী খাঁর মৃত্যু এবং ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লা খাঁর কারারোধের পর তিনি সম্রাটের অমুগ্রহে 'ইতিমদ উদ্দৌলা' উপাধির সহিত উজিরীপদ লাভ করেন (১৭২০ খৃঃ অঃ)। কিন্তু পর বৎসরেই রোগগ্রস্ত হইয়া তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

মহম্মদ আমীন রজী, হফ্ত আলিম নামক জীবনীকোষ-রচয়িতা। আমীন আকদ নামে প্রসিদ্ধ। সম্রাট অকবর শাহের রাজত্বকালে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থে তিনি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলস্থ সপ্ত ঋতুর বর্ণনা, প্রধান প্রধান নগরের বিবরণ এবং তৎকালীন প্রতিভাবান ব্যক্তি ও কবিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ আমীর খাঁ, মোলুদ নামির নামক উর্দুগ্রন্থ-প্রণেতা। আগ্রানগরে তাঁহার জন্ম হয়। আবদুল কাদের গীলানী নামক মুসলমান সাধুর জীবনী অবলম্বনে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন।

মহম্মদ আলী উদ্দান বিন্ শেখ আলি অল্ হিষ্কাফি, ফতাবা দ্বী অন্ মুখতার নামক আইনগ্রন্থরচয়িতা। ইহা তন্বীর-উল্ আব্দার নামক গ্রন্থের টীকা। এতদ্বিধা ইহাতে কতকগুলি নৌকদমার বিচারনিষ্পত্তি লিখিত হইয়াছে।

মহম্মদ আলী খাঁ (আনসরি), তারিখ-ই-মুজাফরী ও বহরুল মবাজ্ নামক ইতিহাস-প্রণেতা। ইনি হাজিপুর ও ব্রিহত্তের ফৌজদারী আদালতের দারোগা ছিলেন।

মহম্মদ আলী খাঁ, জনৈক রোহিলা-সর্দার। রামপুরের রোহিলা-সর্দার ফৈজউল্লা খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৭২৪ খৃঃ অঃ পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা গোলাম মহম্মদ তাঁহাকে কাপাক্ষক করিয়া

শুণ্ডভাবে নিহত করেন। ইংরাজ গবর্নেন্ট মুক্ত নাজির নাবালক পুত্র আকদ খাঁর পক্ষাবলম্বন করিয়া গোলাম মহম্মদকে বিধোয়ার বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করেন। কিন্তু তিনি মক্কাযাত্রা করিবার ভাণে দাক্ষিণাত্যে টিপু-সুলতানের সহিত মিলিত হন এবং তথা হইতে ১৭৯৭ খৃঃ অঃ কাবুলে পলাইয়া যান। এখান হইতে তিনি জমান শাহের সহযোগে ভারত-আক্রমণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

আকদ আলী খাঁর মৃত্যুর পর মহম্মদ সৈয়দ খাঁ ১৮৫০ খৃঃ অঃ এবং মহম্মদ যুসুফ আলী খাঁ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রামপুর-মসনদে আরোহণ করেন।

মহম্মদ আলী খাঁ, কর্ণাটকের জনৈক নবাব। আনবর উদ্দীন খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর, ইনি নবাব নাসির জঙ্গের ও ইংরাজের সহযোগিতায় ১৭৫০ খৃঃ অঃ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, ১৭৯৫ খৃঃ অঃ তাহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ আলি-বিন্ হামিদ, 'তারিখ-ই-হিন্দ-ব-সিক্' বা চাচ নামক ইতিহাস প্রণেতা।

মহম্মদ আলী খাঁ, তোকের জনৈক নবাব। পেছারি-সর্দার আমীর খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর, তিনি ১৮৩৪ খৃঃ অঃ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। লাবার হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় তাঁহাকে ১৮৬৭ খৃঃ অঃ ইংরাজ গবর্নেন্ট রাজ্যচ্যুত করেন। ১৮৭০ খৃঃ অঃ ইংরাজরাজের রাজনৈতিক বিভাগ হইতে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম আলী খাঁকে নবাবপদে অভিষিক্ত করা হয়।

মহম্মদ আলী মীর, মিরট্ উল্-সফা নামক গ্রন্থপ্রণেতা। বুহানপুরে ইহার বাস ছিল।

মহম্মদ আলী মীর্জা, আগ্রাবাসী জনৈক মুসলমান-কবি, তিনি কাব্যরচনার জন্ত 'মাহির' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পিতা হিন্দু ছিলেন। মীর্জা জাকর মুআম্মাই নামক জনৈক ভাড়ের নিকট তাঁহার পিতা কর্ম করিতেন। উক্ত মীর্জা জাকরের কোন পুত্র সন্তানাদি না থাকায় তিনি এই হিন্দু ভৃত্যের বালকপুত্রকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিয়া আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। জাকরের অধীনে থাকিয়া ধর্মত্যাগী বালক মহম্মদ আলী উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন। মীর্জা জাকরের মৃত্যুর পর ইনি দানেশমন্দ খাঁর আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। দানেশমন্দের মৃত্যুর পর, তিনি কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জনেই কালাতিপাত করেন, এই সময়ে ১৬৭৮ খৃঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত

অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'উল্-ই-উরুদু' নামক কাব্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি সম্রাট অরুণ-জৈবের রাজ্যাভিষেক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

হুম্মদ আলী শাহ, অবোধার জটনক নবাব। নবাব নাসির উদ্দৌলা নামে প্রসিদ্ধ। নবাব সন্ন্যাস আলী খাঁর পুত্র। সুলতান জা নাসির-উদ্দৌলার মৃত্যুর পর, ১৮৩৭ খৃঃ অঃ ইনি ইংরাজরাজ কর্তৃক লক্কৌ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি 'আবুল ফতে মোইয়ুদ্দীন সুলতান জহান মহম্মদ আলী শাহ' নাম গ্রহণ করেন। ৫ বৎসর রাজত্বের পর ১৮৪২ খৃঃ অঃ লক্কৌ নগরে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার পর তৎপুত্র সূর্য্য জা আব্জাদ আলী শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

হুম্মদ আবুল কাকী, মখাসির-ই-রহীমী নামক ইতিহাস প্রণেতা।

হুম্মদ আবুল কাশিম, বোগদাদবাসী জটনক প্রাচীন ভৌগোলিক। ইনি ৯৪৩ খৃষ্টাব্দে অম্বতুমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আফ্রিকা, পারস্য, পশ্চিমভারত প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান।

হুম্মদ আসলাম, ফরহুন্-নাজিরীন্ নামক ইতিহাস প্রণেতা। মহম্মদ হাকিমুল আনসারির পুত্র। ইনি ১৭৭০-১১ খৃষ্টাব্দে বীর গ্রন্থ সমাপন করেন।

হুম্মদ-ই-বখ্তিয়ার, বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম মুসলমান-শাসন-কর্ত্তা। তাঁহার প্রকৃত নাম মালিক উল্ গাজি ইখ্তিয়ার উদ্দীন মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার। তাঁহারা বিলিজাজাতীয় ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে তাঁহার পিতার নামে (মহম্মদ বখ্তিয়ার খিলিজি) পরিচিত করিয়া বড়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞা, বুদ্ধি, সহিষ্ণুতা, সাহস, বীর্য ও ওদার্যাদি সমুপে বিভূষিত ছিলেন।

অম্বতুমি পরিত্যাগ করিয়া তিনি গজনীরাজ-সরকারে কার্য্যগ্রহণের জন্ত আসিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু এখানে উপযুক্ত বেতন না পাওয়ার, হিন্দুস্থানে আগমন করেন। দিল্লীরাজ-ধানীতেও ইহার মনের আশা পূর্ণ না হওয়ার, বদাউনে যাইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা সিপা-সাগর হিজাবর উদ্দীন হনন-ই-আদিবের নিকট উপযুক্ত বেতনে কর্ম্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতৃব্য মহম্মদ-ই-মালুদ পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং বীর বীরত্বের পারি-ভৌবিক স্বরূপ কাঠিন্দী জায়গীর প্রাপ্ত হন। পরে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে তিনি অবোধ্যাক্ষিমে অগ্রসর হইয়া

চৌগণ, ভীবনী (ভৈলী), বুকের ও বিহার প্রদেশ জয় করেন। এই সময়ে তাঁহার গুণগ্রামের ও তাঁহার সূক্ষ্ম সেনাগণের বীরত্বের পরিচয় সুলতান কুতব উদ্দৌলার কর্ণ-গোচর হয়। তিনি বখ্তিয়ারকে রাজযোগ্য পরিচ্ছাদি প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াছিলেন। এইরূপে দিল্লীর কর্ত্তক অম্বগৃহীত বোধে তিনি ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে বেহার-রাজধানী লুণ্ঠন করেন। ঐ সময়ে বহুসংখ্যক নিরীহ ব্রাহ্মণসন্তান বিজেতা মুসলমানের হস্তে নিগৃহীত ও নিহত হইয়াছিল।

বিহার লুণ্ঠনপূর্ব্বক মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার বহু ধনরত্ন লাভ করিয়া সুলতান কুতব উদ্দৌলকে নজর দেন। সুলতান তাহার এই প্রভুত্বভিতে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় রাজপরিচ্ছাদি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তদ-নস্তর বখ্তিয়ার পুনর্বার বেহার প্রদেশে প্রস্থান করেন।

এই সময়ে বঙ্গদেশে সেনবংশীর রাজা লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষ্মণাবতী বা গোড়নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। বুদ্ধরাজা মুসলমানগণের এইরূপ অমাব্যবিক অত্যা-চারে বিশেষ মর্মান্বিত হইলেন, পাছে তাঁহার অধিকারে পুনরায় ব্রাহ্মত্ব হয়, এই ভয়েও বিশেষ শঙ্কিত রহিলেন। এক কথায় কামরূপ, বঙ্গ, লক্ষ্মণাবতী ও বিহার প্রদেশ মুসল-মানের অত্যাচার-ভয়ে অত্যন্ত হইয়া থাকিল।

মুসলমান-ইতিহাস পাঠে জানা যায়, নদীরানগরে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। তিনি ৮০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিকগণের হিসাবে তাঁহার রাজ্যকাল ৮০ বৎসর ধরিলে তাঁহার জন্মকাল ও সেনবংশীরগণের রাজত্ব বড় অসংলগ্ন হইয়া পড়ে, এই ভ্রম নিরাকরণের জন্ত কোন কোন ঐতি-হাসিক লক্ষ্মণ সেনকে আজম্ম রাজা অর্থাৎ সূতিকাগৃহ হইতেই সিংহাসনে বসাইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

রাজা লক্ষ্মণ সেন বখ্তিয়ারের বঙ্গে আগমন বার্তা শুনিয়া জ্যোতির্কিঙ্গগণকে যুদ্ধের ফলাফল গণনা করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে তাঁহার গণনা করিয়া বলেন যে, 'তুর্কগণ ভবিষ্যতে এখানকার রাজা হইবে'। অনেক বাক্যবিত্তার পর বিনা যুদ্ধে তুর্ককে বঙ্গ সমর্পণ করাই প্রেরঃ বিবেচিত হইলে, তখন দলে দলে তথাকার ব্রাহ্মণ ও অপরাপর হিন্দু অধিবাসী, কামরূপ ও অঙ্গরাজ্য তীর্থে এবং বঙ্গরাজ্যের অপরাপর নগরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু বুদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের তাহা অভিপ্রেত ছিল না।

পর বৎসরে বখ্তিয়ার পুনরায় বেহার লুণ্ঠনপূর্ব্বক নদীর-নগরের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হন। সেখানকার সাধারণ

নগরবাসিগণ আদৌ তাঁহাকে আততায়ী বলিয়া জানিতে পারে নাই। তিনি অশ্ববাসারী ছদ্মবেশী বণিক সাজিয়া অটোদগ্ধ জন মাত্র সৈনিক সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করেন। অবশিষ্ট সেনাদল অদূরে লুক্কায়িত ছিল।

অশ্ববিক্রয়ের ভাগ করিয়া তাহারা ক্রমে রাজ প্রাসাদে উপনীত হয়। এই বিগ্রহর বেলার সকলে খাড়াবির আরোহনে ব্যস্ত ছিল। পরে রাজা ভোজনে বসিয়াছিলেন। এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। নিরাহ বীররক্তিগণ মুদলমানহস্ত নিহত হইল। রাজ-প্রাসাদ ঘটির কাল মধ্যে আওনাদ ও কোলাহলে পূর্ণ হইয়া গেল। রাজা বনপশ্চের আশঙ্কায় অন্তঃপুরবার দিয়া প্রস্থান করিলেন। কেহ কেহ বলেন, বুরু লক্ষ্য দেন অগম্য ধামে এবং তাঁহার বংশধরগণ বিক্রমপুরে পলায়ন করেন।

[ চন্দ্রখোপ রাজবংশ দেখ। ]

ক্রমে মহম্মদ বখতিয়ারের অপরায়ণ সেনাগণ আদির নগর বেটন করিল। লক্ষ্মাবতীতে মহম্মদ বখতিয়ার রাজপাট স্থাপন করিলেন। তাঁহার নামে খুঁবা পাঠ ও মুদ্রাঙ্কন হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার বন্ধে বাঙ্গালার মসজিদ, বিত্তামন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কএক বৎসর পরে তিনি কোচ ও মেচজাতিকে পরাজয় করিয়া তুর্কিহান ও চান বিজয়পূর্বক নেপাল হইয়া পুনরায় লক্ষ্মাবতীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তবকাত-ই-নাসিরি পাঠে জানা যায় যে, তিনি ভূটান, বাঙ্গালা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া সমুদ্রতীর পাশ্চাত্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামরূপ আক্রমণকালে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এই সময় মহম্মদ ব্যতীত অপর মুদলমান সৈন্যগণ নদীগর্ভে বিনষ্ট হয়। [ বঙ্গবংশ দেখ। ]

ইম্মদ ইমাদ, (ফকি কিম্বাণি খাজা), অনেক মুদলমান হাকিম ও কবি। দিরাঙ্গরাজ শাহ-জুজার রাজ্যকালে ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিত্তমান ছিলেন। তিনি মিস্কা-উল-হিদায়ত, মুনিস্ উল-আদার, মসনবি-কস্তিরত, মহক্বানায়া, মেনাত-নামা, পরগল্প প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। কবিবর ইলাহী ও দৌলত শাহের লেখনানুসারে ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, কিন্তু অপরায়ণ গ্রন্থের প্রমাণ-দৃষ্টে ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল অবগারিত হইয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান কিম্বাণেই তাঁহাকে সমাধি করা হয়।

ইম্মদ ইমাম, অনেক মুদলমান মুফতী। খলিফা হাক্বন অল-রসীদের রাজ্যকালে তিনি বিত্তমান ছিলেন। ইহার একত নাম আবু আবদুল্লাহ মহম্মদ বিন্ হুসেন অল সহবানি।

হরাক্ আরবের অন্তর্গত বাসত নগরে ৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে আবু হানিফা ও পরে আবু যুহুকের নিকট ইনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইনি খীর অধ্যাপক ইমাম আবু যুহুকের টিম্ননীগুলি একত্র করিয়া খীর গ্রন্থে মণিবেশ করিয়াছেন। শুনা যায়, ইনি সর্বসমেত ৯৯৯ খান গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে জামি-উল্ কবীর, জামি-উল-সবীর, মব্খুত ফি কুফ ইল হানিফিয়া, জিন্নাদাত ফি কুফ ইল হানিফিয়া, শিয়ার উল্ কবীর বন্ সখার প্রভৃতি ছয়খানি গ্রন্থ মুদলমান-সমাজে বিশেষ আদরীয় এবং জাহির উল্ রিবার নামে খ্যাত। খোরাসান রাজ্যের রাজধানী রাই (রাহ) নগরে ৮০২ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। মতান্তরে বোগদাদ নগরে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মহম্মদ ইস্‌মাইল বুখারি, সখা উল্ বুখারি নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। তাঁহার প্রকৃত নাম আবু আবদুল্লাহ বিন্ ইস্‌মাইল অল্ বুখারি। বুখারা নগরে জন্ম ও বাসহেতু অল্ বুখারি নামে খ্যাত হন। আইন ব্যবসারের জন্ত তিনি মহম্মদ ইস্‌মাইল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত গ্রন্থ মুদলমান সমাজে দ্বিতীয় কোরাণ বলিয়া গৃহীত। ৮৭০ খৃষ্টাব্দে বুখারা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ ইস্‌মাইল, (মোলবী), নিরাং উল মুতাক্বিম নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। মুদলমানদিগের ভিন্ন সম্প্রদায়-প্রবণক বেরোদৌ-বাণী নৈরুদ আক্বদের মতব্যাখ্যা করিয়া তিনি খীর গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ ইস্‌হক্, শিয়ার উল্ নবি ব-আবাট সহাব নামক গ্রন্থ-প্রণেতা।

মহম্মদ ইখতিয়ার, (মালিক), সুলতান মাক্কুদ বিগাফার অনেক বন্ধ। সুলতান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহাকে পাঁচহাজারী পদ প্রদান করেন। একসময় আক্বদাবাদ হইতে মণিপুরে গমনকালে তিনি পথিমধ্যে মধ্যাহ্নিক নেমাত সমাপনের নিমিত্ত এক মোল্লার মসজিদে উপনীত হন। মোল্লার সহিত আগাগে তাঁহার সাংসারিক স্মৃৎস্মরণের স্মৃৎস্মরণ হইয়া যায়। অতঃপর ধনরত্ন পরিত্যাগপূর্বক তিনি সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া খীর বিরাগবিষয়ক বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। সুলতান প্রথমে উন্মাদ জানিয়া তাঁহার মনস্তত্ত্বের বিশেষ চেষ্টা করেন। পরিশেষে অনন্তোপায় হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

মহম্মদ পত্নী সমভিব্যাহারে মোল্লার নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত থাকিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। মোল্লার বন্ধ ও শিক্ষাগণে মালিকের দিন দিন

মানসিক বৃদ্ধিসমূহ পরিচুতি হতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার সাধু-তার পরিচয় চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। প্রবাহ, আমুকম্বাসী ঘানিয়া জাতির জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে নিহত করে। সৌরাষ্ট্র নগরে তাঁহার সমাধিসন্দির বিদ্যমান আছে। দানিগাত্যাবী বহু শত লোক তাঁহার সমাধিসন্দির সন্মুখনে আসিয়া থাকেন।

মহম্মদ ইব্ন আলহ মুর, যুরোপের স্পেন রাজ্যের আগ্রা প্রদেশের জনৈক মুর (মুসলমান) রাজা। তিনি আলহাথুর বিখ্যাত দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত দুর্গের একখানি শিলাফলকে তাঁহার আবু আব্দুল নাম পাওয়া যায়। অর্জুন নগরে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে বনিন-সরের সম্রাটকূলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি অর্জুন ও আরেনের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি স্রী দয়া দাক্ষিণ্য ও ভায়পরতাগুণে সাধারণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ইব্ন হদার মুতার পর স্পেনীয় মুররাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। এই অবসরে মহম্মদ কএকটি প্রদেশ অধিকার করেন। এতদ্বির আরও কএকটি প্রদেশের অধিবাসিগণ তাঁহার উপস্থিতি মাত্রেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

তাঁহার অধিকারকালে স্পেন-রাজ্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। তিনি সর্বপ্রথমে স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দির মধ্যভাগে তিনি আলহাথুর-দুর্গ-নিৰ্মাণে ব্রতী হন। ৭৯ বৎসর বয়সেও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ হ্রাস হয় নাই। তিনি স্বয়ং ঐ সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে আক্ৰোহণ করিয়া সেনাচালনা করিয়াছিলেন। হৃৎকের বিষয়, তিনি আলহাথুরদুর্গের নিৰ্মাণকাব্য সমাধা করিয়া বাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্তী মুরগাজ যুৎফ আবুল হাজী ঐ দুর্গের নিৰ্মাণকাব্য সমাধা করিয়া গমন।

মহম্মদ ইব্ন-মশাউদ, জনৈক মুসলমান কবি। ইঁহার রচিত গ্রন্থ “জিনাত উ-জমান।”

মহম্মদ কশিমু, মোগলসম্রাট বাহাদুর শাহের পৌত্র ও হুমরাজ আজিম উস-সানের পুত্র। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে হিন স্রী পিতৃব্যসম্রাট জাহান্দার শাহ কর্তৃক নিহত হন।

মহম্মদ কাশিম (মৌজা), জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। সম্রাট আলমগীরের মুন্সি মাজা মহম্মদ আমীরের পুত্র। তিনি আলমগীর-নামা নাম দিয়া সম্রাট আলমগীরের রাজত্বের প্রথম ৩০ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া তিনি দ্বিতীয়বারে উপহাস-প্রদান করিলে, সম্রাট তাঁহাকে এবং তৎকালীন অপরায়িত ঐতিহাসিকগণকে

তাঁহার জীবনী লিপিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এতদ্বির মহম্মদ শাহনামা, রোজনামা ও অখবর-হসনিয়া নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ কালা, গুজরাতের প্রসিদ্ধ সুলতান মাকদুদ বিগাড়ার পুত্র। ইঁহার মাতার নাম রাণী রূপমঞ্জরী। অশ্বকদাবাদ নগরের মাণকচকে এখনও রূপমঞ্জরীর সুপ্রসিদ্ধ সমাধি-সন্দির বিদ্যমান আছে।

মহম্মদ কাশিম, বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক ফিরিয়ার নামান্তর। [ফিরিয়া দেখ।]

মহম্মদ কাশিম, ফজল-সুজারী নামক পারসী অভিধান-প্রণেতা। চম্বকারপুর প্রসিদ্ধ কবি হাজিমহম্মদ সুজারী-কাশানীর পুত্র। হিন ১৪৯৯ খৃঃ অঃ উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া পারস্তরাজ শাহ আব্বাস বাহাদুর খাঁর করকমলে সম-র্পণ করেন।

মহম্মদ কাশিম, সিন্ধু-প্রদেশের জনৈক মুসলমান-শাসনকর্তা। হিন নাশির উদৌন্ কবচ বা ফতা নামে প্রসিদ্ধ। সিন্ধু-প্রদেশে কোন্ সময়ে হিন রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সাধারণের অবগতির জ্ঞাত এই স্থানে খুল-সং-উল্ হিকায়ৎ, হাজনামা ও হাজিমহম্মদ কান্দাহারীর ইতিহাস হইতে সিন্ধু-প্রদেশের প্রাচীন মুসলমান-শাসন-বিষয়ক ঘটনাবলী উদ্ধৃত করা গেল।

ইরাকরাজ খলিফা আবদুল মালিকের পুত্র বলৌদের রাজ্য-কালে বঙ্গাধিপতি হিজ্জাৎ বিন্ যুৎফ ৭০৬ খৃষ্টাব্দে মেকান্ অধিকারের জ্ঞাত মাকদুদ হোমেনকে সৈন্তে প্রেরণ করেন। মেকান্ অধিকৃত ও তদেশবাসী বলুচাগণ হসলামত্বে দীক্ষিত হইলে পর, তিনি পুনরায় বুখামন্ নামা জনৈক সেনানীকে দেবল রাজ্য (বর্তমান ঠাট-প্রদেশ) জয় করিতে পাঠান। হিন্দুরানের সাহিত যুদ্ধে বুখামনের প্রাণবিয়োগ হয়। পরা-জয়ে ক্ষুব্ধ না হইয়া, হিজ্জাৎ পুনরায় অভিযানের উদ্যোগ করেন। তদনুসারে ৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা বৈকল্ কর-ক্ষীর পুত্র ইমাদ্ উদৌন্ মহম্মদ বিন্ কাশিম ছয় সহস্র সেনা লইয়া দেবল অক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে দেবলরাজ দাহির নিহত হন এবং তদ্রাজ্য মুসলমানের অধিকার-ভুক্ত হয়।

মহম্মদ বিন্ কাশিমের মুতার পর আনসারিবংশীয়গণ সিন্ধু-প্রদেশে শাসন বিস্তার করেন। তৎপরে সুমার-রাজগণ প্রায় ৫ শতাব্দ কাল এই প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। সুমার-রাজবংশের ঋণপতনের পর, মুদনারাণীর ভ্রাম উপাধিধারী রাজপুত-সর্দারগণ সিন্ধুরাজ্যে বিজয়পতাকা উত্তীর্ণ করিয়া



ছিলেন। তাঁহাদের অধিকারকালে খানা, ঘোড়া ও দিল্লীর পাঠানরাঙ্গণ নিম্নপ্রদেয় আক্রমণ করেন। উপর্যুপরি মুসলমান আক্রমণে সিন্ধুরাজ্য বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। মুসলমান-গণ কএকটি নগর অধিকৃত করিয়া তাহার শাসনের জন্ত এখানে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। উক্ত শাসনকর্তৃগণের মধ্যে মহম্মদ কাশিম একজন।

তিনি তুর্কজাতীয় এবং সিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর ক্রীত-দাস ছিলেন। উক্ত ঘোরীরাজের অমুগ্রহে তিনি ১২০৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত (বা মুলতান) প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইনি দিল্লীর পাঠানরাজ-প্রতিনিধি মুলতান কুতবউদ্দীন আইবকের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে সীর শতরের মৃত্যুর পর, তিনি সীর ডকবলে সিন্ধু-দেশের কএকটি নগর অধিকার করিয়া লন। এইরূপে সুনানরাজবংশের শক্তি ধ্বংস করিয়া তিনি ক্রমশঃই স্পষ্টিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে দিল্লীর পাঠানরাজবংশের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

ক্রমে সিন্ধু, মুলতান, কোরাম ও সরস্বতী পর্যন্ত তাহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সময়ে তিনি ধনবলে ও জনবলে বিশেষরূপে বলিয়ান হইয়াছিলেন। স্বয়ং গজনী পুত্র তাজউদ্দীন মল্লুজ তাহাকে দুইবার আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি দুই বারই পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর শামস উদ্দীন আলতমিশ তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্ত সসৈন্তে অগ্রসর হন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি সীর মহামুলা রত্নাদি ও স্ত্রীপুত্র লইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করেন, বৈবাত ভীষণ ঝটিকায় তাঁহাদের তরি ডুবিয়া যায়। মহম্মদ কাশিম সরস্বতীর ২২ বৎসর কাগ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহম্মদ কাশিম খাঁ, (বদাক্বানী), জটনৈক মুসলমান কবি। মোগলসম্রাট হুমায়ুন ও অকবর শাহের অধীনে সেনা-নায়কের কাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি জোসেফ ও পতি-কার প্রেমকাহিনী স্বরচিত যুসুফ-জেলেশা কাব্যে বিবৃত করিয়াছেন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে আগ্রানগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ কাশিম খাঁ, (মীর), বঙ্গেশ্বর মীরজাফরের জামাতা। সিরাজ-উদ্দৌলার ভগবানগোলায় পলায়নকালে ইনি চৌকিঘাটে সিরাজকে আক্রমণ করেন এবং তাহার প্রিয়তমা পত্নী লুৎফ উল্লিসার অলঙ্কারাদি পাঠিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া যান। [মীর কাশিম দেখ।]

মহম্মদ কাশিম খাঁ, নিশাপুরের জটনৈক ধনাঢ্য ভূমি-স্বামী। উজবর জাতির আক্রমণে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ-

পূর্বক ভারতে আত্মপন এবং বৈরাম খাঁর অধীনে সেনা-নায়কের পদে নিযুক্ত হন। সিকেন্দর শুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তদনন্তর চিমুর সহিত যুদ্ধে তিনি খানু জমানের অধীনে 'হরাবল' হইয়া যান। ইহার অবাবহিত পরে, অখাৎ সম্রাট অকবর শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরে তিনি মেবাররাজ রাণা উদয় সিংহের শত্রু হাজি খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মোগলবিদ্রোহী শের খাঁর সেনাপতি বীরবর হাজি খাঁ উক্ত রাণাকে পরাজিত করিয়া নাগর ও আজমীর অধিকার করেন। মোগলসৈন্ত তাঁহাকে শাস্তিবিধানে অগ্রসর হইলে, তিনি গুজরাত-অভিমুখে পলাইয়া যান। সেই সময় আমীরমহম্মদ কাশিম নাগর ও আজমীর অধিকার করিয়া মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

সম্রাটের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে তিনি বৈরামের পক্ষ পরি-ত্যাগ করিয়া চাগতাই সামন্তদিগের দলভুক্ত হন এবং শামস উদ্দীন আংগার পক্ষে থাকিয়া বৈরাম খাঁকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধের পরিতোষিক স্বরূপ তিনি মুলতান প্রদেশ জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি মালবের অন্তর্গত শারঙ্গপুরে গমন করেন। এখানে সম্রাট অকবরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। এখানে উভয়ে মিলিত হইয়া আবদুল্লা খাঁ উজবকে বন্দী করিতে অগ্রসর হন। ইহার অনতিকাল পরেই শারঙ্গপুরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ কাশিম খাঁ, (মীর আতিশ), জটনৈক মোগল-সেনানী। হাসিগবেগের পুত্র। সম্রাট শাহ জহানের রাজ্য-কালে ইনি সেনাধ্যক্ষ, তোপখানার দারোগা ও কোটালপদে নিযুক্ত ছিলেন। বাহ্লিক ও আকখুদের যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেখাইয়া তিনি মুতামিদ খাঁ ও আখতা বেগী উপাধি লাভ করেন। যুবরাজ অরঙ্গজেবের কান্দাহার অভিযানকালে তিনি ৪ হাজার পদাতিক ও ২৫০০ অশ্বরোহী সেনার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীনগররাজের অধিকৃত সাত্তর দুর্গ আক্রমণপূর্বক বিধ্বস্ত করেন। যুবরাজ দারাসিকো তাহাকে ৫০০০ অশ্বরোহী ও ৫০০০ পদাতিকের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত করেন। তা'পর তিনি আবদাবাদের (গুজরাত) শাসনকর্তৃপদ ও ১ লক্ষ টাকা পারিতোষিক পান। তিনি দারাসিকোর হইয়া অরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সমগ্রে যুদ্ধ করেন, কিন্তু অবশেষে অরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হওয়ার নিমিত্ত পাইয়াছিলেন। অরঙ্গজেব তাহাকে মথুরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পশ্চিমধ্যে সীর ভ্রাতা কর্তৃক তিনি নিহত হন।

মহম্মদ কাশিম (মীর), জটনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। ইনি



নাদের শাহের ভারত আক্রমণ প্রসঙ্গে 'হুতবশাহ' নামে একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

মহম্মদ কাশিম, (সৈয়দ), 'ইজাজ্জোদিয়া' নামক উর্দু-গ্রন্থপ্রণেতা। বোগদাদবাসী বিখ্যাত মুসলমান সাধু আবদুল কাবের গিলানীর ইতিবৃত্ত অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। ইনি দানাপুরে থাকিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

মহম্মদ কুলী খাঁ, আলাহাবাদের জনৈক মুসলমান শাসনকর্তা, আবোধার নবাব সফ্ফর জঙ্গের ভাতা মার্জা মহম্মদের পুত্র। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ আলি গোহর (পরে সম্রাট শাহ আলম) পিতা ২য় আলমগীরের নিকট হইতে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। এই সময়ে যুবরাজের সহকারী হইয়া কুলী খাঁকে পাটনা আক্রমণে মনন করিতে হয়।

কুলী খাঁ পাটনার উপনীত হইয়াই নগর অবরোধ করিলেন। কএকদিন অপরোধের পর শুনিতে পাইলেন যে, তাহার পিতৃব্যপুত্র সুজা উদৌলা বিবাসঘাতকতাপূর্বক আলাহাবাদ আক্রমণ করিয়াছেন। তদনুসারে তিনি পাটনা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদ রাজধানীতে আশ্রয় উপস্থিত হন। সুজা উদৌলা তাহাকে আলাহাবাদ-দুর্গে কারাবদ্ধ করিয়া নিহত করেন।

মহম্মদ কুলী কুতবশাহ, (২য়), গোলকোণ্ডার জনৈক মুসলমান শাসনকর্তা। পিতা ইব্রাহিম কুতব শাহের মৃত্যুর পর, ইনি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ষাটশব্দ বয়সে সিংহাসনে আরুঢ় হন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই, তাহাকে বিজাপুরের আদিলশাহীবাংশীর রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু অচিরে যুদ্ধ পরাজিত হওয়ার বিজাপুর-রাজকরে স্বীয় ভগিনীকে সমর্পণ করিয়া ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তর রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করেন।

গোলকোণ্ডা নগরের জলবায়ু তাহার পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ না হওয়ায়, তিনি উক্ত নগরের ৪ ক্রোশ দূরে তাহার বিখ্যাতা বীরবধু ভাগ্যমতীর নামানুসারে ভাগ্যনগর স্থাপন করেন; কিন্তু পুনরায় সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া হারদরাবাদে রাজপাট স্থাপন করিতে বাধ্য হন।

পারস্তরাজ শাহ আবদুল স্বীয় পুত্রের বিবাহের চক্ষু কুলী কুতবের কস্তার করপ্রার্থনা করেন। এরূপ সম্ভ্রান্ত রাজবংশে কস্তাদান করিয়া বাস্তবিকই তিনি আপনাকে বিশেষ রূপ সম্মানিত বোধ করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের কুতবশাহী বংশের তিনি ৪র্থ সুলতান, রাজ্যশাসনকাণ্ডে তাহার অপাধ্যায় ক্ষমতা ছিল, এতদ্বিধি বিবিধ সদৃশ্যে তিনি সমলভূত ছিলেন। তাহার ৩০ বৎসর

রাজত্বকালে তা কালিক সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। স্বয়ং সুলতান 'কুতবশাহ' নামে একখানি সুবৃহৎ কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। চন্দ্রি, দক্ষিণী ও পারসী ভাষার লিখিত অমৃতময়ী বিবিধ-বিবরণী কবিতা উক্ত গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্টব্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর, রাজভ্রাতা মহম্মদ কুতব শাহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। [কুতবশাহীবংশ দেখ।]

মহম্মদ কুতব শাহ, গোলকোণ্ডার কুতবশাহী-রাজবংশের ৫ন সুলতান। [কুতবশাহীবংশ দেখ।]

মহম্মদ কুলী খাঁ, সম্রাট অকবর শাহের জনৈক তুর্কভাষী সেনাপতি। ইনি প্রথমে বাঙ্গালা প্রদেশের মোগল-সেনানায়ক ছিলেন। বাঙ্গালার সেনা বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্রোহিনীকে যোগদান করেন। কিন্তু অচিরে তাহাকে বিদ্রোহাদিপের দল পরিত্যাগপূর্বক অকবর শাহের শরণাগত হইতে হয়। ইনি কএকবার কাশ্মীরপ্রদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ভোটরাজ আলী রায় তাহার হস্তে পরাজিত হন।

মহম্মদ কুলী তোক্তবাই, জনৈক মোগল-সেনাপতি। ইনি সম্রাট অকবর শাহের রাজ্যকালে মালবযুদ্ধে এবং তকরোই ও তদ্রক-যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

মহম্মদ খারিজমী, (মোলানা) খারিজমীর জনৈক কবি। মহম্মদ খালিল উল্লা খাঁ, জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক, ইনি গজনাপতি মাজুদের আদেশে আমীর হুমায়ূর জীবনী রচনা করেন।

মহম্মদ খাঁ, জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। আবদুল খাঁ ফিরোজীর পুত্র। "মালীর কুতবশাহী" নামক ইতিহাস ও "তারিখ্‌জমা-উল্-হিন্দ" ইহার রচিত। ইনি ২০ বৎসর কাল ২য় কুলীকুতব শাহের অধীনে চাকুরী করেন। উক্ত বাদশাহের মৃত্যুসময়ে ১৬১২ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন।

মহম্মদ খাঁ, বিজপুরের নবাব। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি বিদ্রোহিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইন বাবিতব্যের প্রণোক্ত।

মহম্মদ খাঁ গকর (খোপার), জনৈক গকর সৈন্য। সুলতান অকবর খাঁর পুত্র। ইনি বিশেষ যুদ্ধকুশল ছিলেন।

মহম্মদ খাঁ আশীরা, শুক্লরপাত সুলতান বাহাদুর শাহের ভাগ্যনয় ও খান্দেলরাজ আদিল খাঁ যক্ষপীর পুত্র। ১৫২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি গায়েলী দুর্গাধিপ ইমাদ উলমুলকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সুলতান বাহাদুর শাহকে বিশেষ অমূল্য বিনয়ের সহিত দুইটির দণ্ডদাতা হইতে অমুরোধ করিলেন। এই সময়ে ইমাদ উলমুলক একখানি পত্র দ্বারা শত্রু কতৃক পাথরা হুগের অবরোধবাত্তি লিখিয়া জানান। তদনুসারে

সুলতান সদলে আগ্রসর হন। নন্দাবাদে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। সুলতান ভাগিনের মহম্মদ খাঁর সহিত গালনা দুর্গাভি-মুখে প্রেরণ করেন এবং তথা হইতে দৌলতাবাদে যাইয়া ছাউনী করেন।

বাহাদুর শাহের সেনাবল নিরীক্ষণ করিয়া দুর্গস্থ নিজাম উলমুলকের সৈন্তগণ ভীত হইয়া নিকটবর্তী গিরিদেশে গিয়া লুপ্তাশ্রিত রহিল। গুজরাত-সৈন্ত এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া পর্দত প্রেরিয়া ফেলিল এবং নির্দয়রূপে তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিল। এই যুদ্ধে দাক্ষিণাত্য-সেনাদলের বিশেষ ক্ষতি হয়।

উক্ত যুদ্ধের সন্ধির পর পুনরায় নিজাম উলমুলক চুক্তিভঙ্গ করিলে, ১৫২০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ খাঁ মাতুলের সহিত দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে গমন করেন। এই সময়ে উভয়ে মূল দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তথাকার অধিপতি বাগলানারাজ বাহরজীউ সুলতানের অভিনন্দনার্থ আগ্রসর হইলেন এবং সুলতান ও তদীয় ভাগিনের মহম্মদ খাঁ আশিরীকে স্বীয় ভগিনীদয় সমর্পণ করিয়া সম্বন্ধস্থাপন করিলেন।

অতঃপর তিনি মাতুলের সঙ্গী হইয়া বর্হানপুর যুদ্ধে, মালববিজয়ে ও মাণ্ডুদুর্গ-অধিকারে গমন করেন। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি সুলতানের কার্য্য হইতে অবসর প্রার্থনা করেন। মহম্মদ খাঁ সুলতান কর্তৃক মহম্মদ শাহ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ খাঁ তলপুর (মীর), সিদ্ধপ্রদেশের জটনৈক রাজ্য-চ্যুত আদীশ। ইনি তলপুরের বিখ্যাত মীর-বংশের শেষ রাজা। ইংরাজ-রাজ কর্তৃক সিদ্ধবিজয়ের পর ইনি ইংরাজের নজরবন্দী ছিলেন। বোম্বাই-প্রদেশের ব্যবস্থাপক-সমিতির সদস্যরূপে ইনি অনেক মঙ্গলজনক কার্য্য করিয়া যান। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে হায়দরাবাদ নগরে ইহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ খাঁ ধারী, সম্রাট অকবর শাহের জটনৈক সভাসদ ও প্রসিদ্ধ গায়ক।

মহম্মদ খাঁ নিয়াজী, জটনৈক মোগল-সেনাপতি। সম্রাট অকবর শাহ ইহাকে ৫ শত সৈন্তের অধ্যক্ষতা অর্পণ করেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর কর্তৃক ইনি হু-জাঙ্গারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইনি শাহবাজ খাঁর অধীনে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের যুদ্ধে ইনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শাহবাজ তাঁহাকে কণ্ঠে নিযুক্ত রাধিবীর জন্ত বার্ষিক লক্ষ টাকা দান করেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি খানখানানের সহিত ঠাইযুদ্ধে গমনপূর্ব্বক মীর্জা জানীবেরগকে আহত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

খানখানান্ তাঁহার বীরত্ব ও প্রতিভার মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য-বিজয়কালে তিনি প্রধান সেনানায়ক হইয়া গমন করেন। বিখ্যাত খর্কির যুদ্ধে মালিক অবরকে পরাভূত করিয়া তিনি সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। যুদ্ধা-বহাও তিনি যুদ্ধব্যবসা পরিত্যাগ করেন নাই। ১০০৭ হিজ-রায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিনি একজন সাধুচেতা ব্যক্তি ছিলেন। দীনদুঃখীর প্রতি তাঁহার অসীম দয়া ছিল। দিবারাত্রি তিনি ৪টা মাত্র কার্য্য করিতেন,—দিবাভাগে ধর্ম্মকর্ম্ম, কোরাণপাঠ ও ভোজন এবং রাত্রিকালে নিদ্রাবাপন্ন ভিন্ন তাঁহার আর অন্য কার্য্য ছিল না। তিনি প্রত্যহই ‘বুজু’ উপহার না দিয়া অন্নগ্রহণ করিতেন না। ধর্ম্মাশ্রয় সাধুর জায় কালান্তিপাত করিতেন বলিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে ফকীর বলিত। দরিদ্রের সেবায় তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন।

দাক্ষিণাত্য-অভিযানে গমন করিয়া তাঁহাকে অধিককাল দক্ষিণ-ভারতে অতিবাহিত করিতে হয় বলিয়া তিনি সম্রাটের নিকট হইতে বর্দ্ধাজেলার আটটি বিভাগ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তজ্জন্ত তিনি সেই স্থানেই আপন বাসভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং নগরের শোভাবৃদ্ধিকল্পে প্রায় শতাধিক প্রাসাদ, মসজিদ ও উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ স্থান জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আটটি নগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তাঁহার সমাধিমন্দিরে অনেকে যাইয়া নেমাজ করিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আক্কাদ খাঁ সম্রাট শাহজহান কর্তৃক ২৯০ হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ খাঁ (মীর), পঞ্জাবের জটনৈক মুসলমান শাসনকর্তা। তিনি সম্রাট হুমায়ুন ও অকবর শাহের অনুরূপে অনেকদিন পঞ্জাবপ্রদেশে রাজত্ব করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

জীবিতাবস্থায় তিনি পারস্ত ও তুর্কভাষায় দুইখানি দিবান্ লিখিয়া যান। গজলীবাদী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে ‘গজলীবীকবি বলিয়া সম্বোধন করিত। ‘বর্হান্ উল ইমান্ নামা’ নামক সুফীসম্প্রদায়ের গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। তিনি খাঁ কলান্ নামেও পরিচিত ছিলেন।

মহম্মদ খাঁ বঙ্গসু (নবাব), জটনৈক রোহিলা-সর্দার, ফরুখা-বাদের বঙ্গসু নবাববংশের প্রতিষ্ঠাতা; গজনফার-জঙ্গ নামে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজ্যকালে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি মালবের

শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, কিন্তু মহারাষ্ট্রদিগের সহিত প্রতি-  
পক্ষতাচরণে অসমর্থ হওয়ায় ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে  
আলাহাবাদের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিবার জ্ঞতা স্থা-  
নান্তরিত করা হয়। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে বৃন্দেলা-জাতিতে দমন  
করিবার জ্ঞতা তিনি সৈন্যে রাজা ছত্রশালকে আক্রমণ  
করেন। এই সময়ে পেশবা বাজীরাওর মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য  
আসিয়া বৃন্দেলাপক্ষে যোগদান করে। মহম্মদ প্রথম কয়েকটি  
যুদ্ধে জয়ী হইরাছিলেন বটে, কিন্তু শেষে মিলিত হিন্দুসৈন্যের  
সম্মুখে দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া পলায়নপূর্বক কৈতগড়-  
দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। ছত্রশাল সদলে আসিয়া দুর্গ  
আক্রমণপূর্বক কএক দিন গোলাবৃষ্টি করেন। নবাবপুত্র  
কাএম্-জঙ্গ আফগান-সৈন্য-সাহায্যে পিতার উদ্ধার সাধন  
করিতে সমর্থ হন।

মহম্মদ খাঁর এইরূপ বিপর্যয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া মোগল-সচিব  
তাঁহাকে পীড়িতের ভাণে কার্যচ্যুত করিয়া তৎপুত্র কাএম্  
খাঁকে জারগীরদারী অর্পণ করেন।

মহম্মদ খাঁ শৈবানী, কৃষ-সীমান্তবাসী অনেক তাতার-বীর,  
চঙ্গস্ খাঁর পুত্র শৈবানীর বংশধর। তিনি শাহী বেগ খাঁ  
উজ্জব নামেও পরিচিত ছিলেন। স্বীয় বীর্যবলে তিনি  
অজস্র নদীর পরপারস্থ সমগ্র ভূভাগ, এমন কি, খুরাসান এবং  
১৫০৬ খৃষ্টাব্দে হিরাত পর্যন্ত অধিকার করেন। তিনি রণ-  
ক্ষেত্রে তৈমুরবংশের প্রধান শাখার বংশধরদিগকে উচ্ছেদ  
করেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি ১৫১০ খৃষ্টাব্দে  
১ম শাহ ইসমাইল সফারির হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।  
উক্ত শাহরাজ তাঁহার করোটি স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া তাহাতে  
সুরাপানপাত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

মহম্মদ খাঁ (সুলতান), দিল্লীস্থ সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন  
বুলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহম্মদ কায়ান বা খাঁ সাহিদ নামেও  
প্রসিদ্ধ। পিতার আদেশানুসারে তিনি প্রথমে পশ্চিম-  
সীমান্ত প্রদেশের (মুলতান, লাহোর, দীপালপুর প্রভৃতি  
স্থানের) শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি বিশেষ বিদ্যোৎসাহী  
ছিলেন। কাব্যে তাঁহার বিশেষ অহুরাগ ছিল। তিনি  
স্বয়ং ২০ হাজার স্তম্ভর ও শোভাবর্ণনবিষয়ক কবিতা সংগ্রহ  
করিয়াছিলেন।

তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রসিদ্ধ কবি আমীর খস্র ও  
খাজা হলুন কাব্যকলায় বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

পারস্তাধিপতি অঘূর্ণ খাঁর কালাহারস্থ বীর্যবান সামন্ত  
তৈমুর খাঁ চঙ্গজী এই সময়ে ২০ সহস্র অশ্বারোহী সেনা  
লইয়া ভারত আক্রমণ করে। দীপালপুর ও লাহোর-দুর্গের

পর তাহারা মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হইলে, মহম্মদ খাঁ  
সদলে লাহোরের সম্মুখস্থ ইরাবতীতীরে অভিযান করিলেন।  
দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর শত্রুহস্তে মহম্মদ নিহত হন।  
তাঁহার অবশিষ্ট সেনা প্রাণ লইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন  
করে। পলাতকের মধ্যে কবি আমীর খস্র একজন। তিনি  
স্বীয় 'খিজির খানী' নামক কাব্যে এই বিষাদগাথা বিশদভাবে  
বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ খাঁর তাঁড়ো, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর হায়দরাবাদ  
জেলায় অন্তর্ভুক্ত একটা উপবিভাগ। অক্ষা° ২৪° ১৪' হইতে  
২৫° ১৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ১৯' হইতে ৬৯° ২২' পূঃ মধ্য।  
ভূপরিমাণ ৩১৭ বর্গ মাইল। সমগ্র উপবিভাগটি গুণি, বদীন,  
তাঁড়ো বাগে ও ডেরো মহল্ল নামক ৪টা তালুক ও ২৭টা  
তল্লার বিভক্ত।

এই জেলার প্রায় সকল স্থানই সমতল, মধ্যে মধ্যে কএকটি  
মাত্র উপবনাকার বনরাজি স্থানীয় শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।  
মধ্যে মধ্যে কতকগুলি খাল বিস্তৃত থাকায় এখানে আদৌ  
জলাভাব অনুভূত হয় না। এখানকার মৃত্তিকা সাধারণতঃ  
৫ ভাগে বিভক্ত, যথা,—১ পাঙ্কি বা উর্করাভূমি, ২ কুমারী  
বা কর্দমাক্ত ভূমি, ৩ দোসর বা কর্দম ও বালুমিশ্রিত ভূমি, ৪  
বালিয়াসি বা বেলে মাটি এবং ৫ কালরাখী বা লোপাভূমি।

উপরোক্ত অধিকাংশ স্থানেই চাষাবাস হয়। খাল প্রভৃতি  
দ্বারা স্থানীয় কৃষিকার্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।  
বদীন তালুকের অন্তর্গত লুয়ারী দুর্গ এখানকার একটা প্রাচীন  
স্থিতি। মীর গোলাম আলীর রাজ্যকালে পীর মহম্মদ জুমা  
কর্তৃক এই দুর্গ নিশ্চিত হয়। পাঠানগণের আক্রমণ হইতে  
দেশরক্ষা করাই এই দুর্গনির্ম্মাণের উদ্দেশ্য। মীর গোলাম  
আলী উহার একাংশ নষ্ট করিয়া ফেলেন। পরে উহা মৃত্তিকা  
দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। গুণি-খালের দক্ষিণ-  
কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ৫৫' পূঃ।  
বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই স্থানের বিশেষ সমৃদ্ধি দৃষ্টি-  
গোচর হয়। খাল ও পাকারান্তা দিয়া নিকটবর্তী নগরসমূহে  
স্থানীয় বাণিজ্যের আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

মীর ফতে আলী খাঁর রাজত্বের অষ্টমবর্ষে মীর মহম্মদ  
খাঁ তলপুর শাহবাগী কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃ-  
পর মীর মহম্মদ ইহার চতুর্দশবর্ষ প্রদেশ জারগীর স্বরূপ প্রাপ্ত  
হন। বিপ্লবিকার প্রাচুর্য্যবহেতু এই নগরের ক্রিয়াক্রান্তি অনেক  
হ্রাস হইয়া পড়ে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মীর মহম্মদ খাঁর মৃত্যু  
হয়। তৎপরে যথাক্রমে মীর করম খাঁ, ও মীর গোলাম খাঁ;

রাষ্ট্র করেন। ইংরাজের সিদ্ধ-অধিকারকালে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মীর গোলামের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার পৌত্র আলাবক্স মীরপদে অভিষিক্ত হন।

মহম্মদ খাঁ লক্ষা, মুলতানের চতুর্থ রাজা। যুবরাজ ফিরোজের পুত্র। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে তদীয় পিতামহ হোসেন লক্ষার মৃত্যু হইলে মহম্মদ খাঁ লক্ষা রাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনি ২৩ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। খৃষ্টীয় ১৫২৪ অব্দে মহম্মদের মৃত্যুর অন্তকাল পূর্বে সন্ধ্যা বাবর শাহ পঞ্জাব জয় করিয়া দিল্লীধার্য করেন। তথা হইতে তিনি ঠাটের শাসনকর্তা হোসেন অর্ধুণের প্রতি এক্রপ আদেশ করেন যে, অল্প হইতে “তোমার প্রতি মুলতানের যুদ্ধের ভার অর্পিত হইল।” তদনুসারে তিনিও বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সিদ্ধনদী পার হইয়া মুলতানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইহার পূর্বেই মহম্মদ খাঁ পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র (২য়) হোসেন লক্ষা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

মহম্মদ খাঁ সরফুদ্দীন ওগলু তকলু, হিরাতের জৈনক মুসলমান শাসনকর্তা। ইনি হুমায়ূনের পলায়নকালে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

মহম্মদ খুদাবন্দ (মুলতান), পারস্তরাজ ১ম শাহ তহমাস্পের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইতিহাসে তিনি মুলতান সিকেন্দর শাহ নামে পরিচিত। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতা ২য় শাহ ইসমাইলের মৃত্যুর পর তিনি পারস্ত-রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। হ্রদৃষ্টবশতঃ দৃষ্টিশক্তির অল্পতা হেতু তিনি রাজকাৰ্য্য-পরিচালনে অক্ষম হইয়া পড়েন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হামজা মাজা পিতার প্রতিনিধি হইয়া রাজকাৰ্য্য পরিদর্শন করিতেন।

পুত্রের মৃত্যুর পর, রাজশক্তির বিশৃঙ্খলতা ঘটে এবং জৈনক গুপ্তচরের হস্তে তিনি ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। তৎপরে খোরাসানের সর্দারগণ তাহার দ্বিতীয় পুত্র আব্বাসকে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পারস্ত-রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহম্মদ খুদাবন্দ (মুলতান), পারস্তের জৈনক রাজা। ইনি চক্কেস খাঁর বংশধর অর্ধুণ খাঁর পুত্র। ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতা মুলতান গজানু খাঁর মৃত্যুর পর ইনি পারস্ত-রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

ইনি বিশেষ স্মরণীয় ছিলেন। পারস্ত-রাজগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম আলী-প্রবর্তিত মতের অমুসরণ করেন। ইনি যে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য ইনি খনামাকিত সূত্রায় দ্বাদশ ইমামের নাম অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। ইনি মিডিয়া রাজ্যের

মুপ্রসিদ্ধ মুলতানিয়া নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। মৃত্যুর পর ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে এই নগরে ইহার সমাধি হয়। উক্ত সমাধিমন্দিরের গম্বুজের ব্যাস ৪১ ফিট।

মহম্মদগড়, মধ্যভারতের ভোপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটা সামন্ত রাজ্য। বিদিশা ও রহংগড়ের মধ্যে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২৩ বর্গ মাইল।

এই স্থান পূর্বে কুর্দাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুর্দাই-পতি নবাব মহম্মদ দলিল খাঁর মৃত্যুর পর উক্ত রাজ্য তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। কনিষ্ঠ আসান্ উল্লা খাঁর অংশ মহম্মদপুর ও বাসোদা নামে খ্যাত। আসান্ উল্লার মৃত্যুর পর তৎপুত্র বখৎ খাঁ বাসোদা গ্রহণ করেন এবং মহম্মদ খাঁ মহম্মদগড়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সিগড়রাজ ইহার কতকাংশ কাড়িয়া লন। কিন্তু ইংরাজ-রাজের মধ্যস্থতায় ইহা পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এখানকার নবাববংশ পাঠানজাতীয় আফগান। বর্তমান রাজা হাকিরা উল্লা খাঁও নবাব উপাধিতে পরিচিত।

মহম্মদ-গড় ইহার প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩°৩৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১২' পূঃ। এখানে অহিফেন ও বিভিন্ন শস্তাদির বিস্তৃত কারবার আছে।

মহম্মদ গিয়াসউদ্দীন, লক্ষোনগরনিবাসী জৈনক প্রসিদ্ধ আভিধানিক। ইনি ১৪ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে একখানি সুবহুৎ অভিধান প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন মিত্তাহউল্ কুনুজ, সারা সিকেন্দরনামা, নস্রাবাগ ও বাহার প্রভৃতি বিবিধ কাব্য এবং কাশীদাসকৃত মহাভারতের পারসী অনুবাদ রচনা করেন। লক্ষৌ জেলার মুস্তফাবাদ বা রামপুর নগরে তাঁহার জন্ম হয়।

মহম্মদ ঘজ্জালী (ইমাম) জৈনক প্রসিদ্ধ মুসলমান-ধর্ম্মাচাৰ্য্য ও হাকিম। তিনি আবু হামিদ মহম্মদ জৈন উদ্দীন-অল্-তুঘী ও হুজ্জৎ-উল্-ইসলাম নামে প্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম, আয়ুর্বেদ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কএকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া যান; তন্মধ্যে কীমিয়াএ সআদৎ, যাকুৎ-উল্-তাবীব বা তক্দ্দীর জবাহির উল্-কোরান, আকাএ ঘজ্জালী, অহিয়া-উল্ উলুম ও তুহফৎ-উল্-ফিলসফা প্রভৃতি প্রধান। তুঘ-প্রদেশের ঘজ্জাল গ্রামে ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মহেতু তিনি ঘজ্জালী নামে খ্যাত হন। ১১১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। আরবী ও পারস্তভাষায় তিনি সর্বসমেত ৯৯ খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ ঘোস্ত দরাজ (সৈয়দ), দাক্ষিণাত্যের কুলবর্গ

রাজ্যের দৌলতাবাদ নগরবাসী জনৈক মুসলমান সাধু। তিনি দিল্লীনিবাসী শেখ নাসির উদ্দীন চিরাগের শিষ্য। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম সদর উদ্দীন মহম্মদ হুসেনী, কিন্তু তিনি পরবর্তিকালে শেখ-দরাজ নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন।

• দ্বাদশ শতাব্দীর সুলতানগণের রাজ্যকালে তিনি দাক্ষিণাত্যের কুলবর্গী নগরে আসিয়া উপনীত হন। যুবরাজ আক্কাশাহ তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বাসের জন্ত একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়া দেন।

১৪২২ খৃষ্টাব্দে আক্কাশাহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে সাধুর গুণগ্রামের পরিচয় সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। এমন কি, স্বয়ং রাজা হইতে দীনহুঃখী প্রজামণ্ডলী সকলেই তাঁহার ধর্মোপদেশ পালন করিয়া চলিত। ক্রমে তাঁহার উপর সাধারণের ভক্তি একরূপ গাঢ় হইয়া পড়িল যে, সমগ্র দাক্ষিণাত্য-বাসী তাঁহাকে সম্মানের সহিত পূজা করিত। আক্কাশাহের রাজ্যান্তের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। হাসানাবাদ (কুলবর্গী) নগরে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাধিস্থ হইয়াছে। এখনও বহুশত লোকে ঐ সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইয়া পূজা দিয়া থাকে।

যেহুদরাজের এই সমাধিমন্দির দাক্ষিণাত্যের একটি মেখিবার জিনিস। দ্বাদশ শতাব্দীর সুলতান ও স্থানীয় অত্যাচারী রাজগণ এই মন্দিরের ব্যয়ভারবহনের জন্ত সময় সময় প্রভূত অর্থ ও ভূদান দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণ উক্ত সমাধিমন্দিরের সেবাইতরূপে নিযুক্ত থাকিয়া মন্দিরসংস্কারাদি নানাবিধ ব্যয়ে ঐ অর্থের সার্থকতা করিয়া থাকেন।

তিনি সূফী-সম্প্রদায়ের কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিয়া বতু-উল-অশিকী নামে একখানি ধর্মগ্রন্থ এবং অস্কার-উল-অস্কার নামে পারসীভাষায় একখানি হিতোপদেশ গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ ঘোরী, ঘোর বা ঘুর রাজ্যে জন্ম ও উৎপত্তি চলিত ভাষায় মহম্মদ বা আক্কাশ নামে পরিচিত থাকায় পরবর্তী ঐতিহাসিকের নিকট ‘মহম্মদ ঘোরী’ নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম মালিক সিহাব উদ্দীন, পরে ‘সুলতান মুইজ্জুউদ্দীন’ উপাধি লাভ করেন।

মিন্‌হাজের ‘তবকাৎ-ই-নাসির’ নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে,—

সুলতান গিয়াস-উদ্দীন ও মুইজ্জু উদ্দীন দুই সহোদর, মহরানের পুত্র বজীর বংশোদ্ভব, বহা উদ্দীন সাম (কাসিম-ই-আমীর উল-মুমিনিনের) পুত্র, শনসবানীর বীজে জন্ম।

তাঁহাদের মাতা কিদানী মালিক বদর উদ্দীনের কন্যা। মাতা আদর করিয়া গিয়াস উদ্দীনকে হাবসী ও মুইজ্জু-উদ্দীনকে ‘জান্গী’ বলিয়া ডাকিতেন।

সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন ফিরোজকোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই গিয়াস উদ্দীন ও মুইজ্জু উদ্দীনকে ওয়া-জিরিহানের দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর সুলতান সৈফ-উদ্দীন রাজা হইলেন। তিনি উভয় ভ্রাতাকে কারামুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। গিয়াস উদ্দীন ফিরোজকোর সভার গিয়াস সৈফ-উদ্দীনের আদর বড়ে কায় কাটাইতে লাগিলেন, আর তাঁহার ভ্রাতা মুইজ্জু উদ্দীন বামিয়ানে তাঁহার খুলতাত মালিক ফখর-উদ্দীনের নিকট আসিলেন।

সৈফ-উদ্দীনের মৃত্যুর পর আমীর ওমরাহগণ সকলে মিলিয়া গিয়াস-উদ্দীনকেই অধিপতি করিলেন। পূর্বে তাঁহার শামশুদ্দীন নাম ছিল, এখন আধিপত্য লাভ করিয়া ‘সুলতান গিয়াস উদ্দীন’ নামে পরিচিত হইলেন।

ভ্রাতার সৌভাগ্যোদয় অবগত হইয়া মুইজ্জু-উদ্দীন খুলতাতের অমুমতিগ্রহণপূর্বক ফিরোজকোতে আগমন করিলেন, এখানে তিনি প্রথমে ‘সব-ই-জাদার’ অর্থাৎ প্রধান রাজচিহ্নবাহকের পদ এবং পরে ইন্দ্ৰিয় ও কজুরান-প্রদেশের শাসনকর্ত্ব পাইলেন। গিয়াস ঘুরের আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন, তাহাতে আবুল আকাস-প্রমুখ কতিপয় সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে আবুল আকাসের মৃত্যু হইল ও সেই সঙ্গে সুলতান গিয়াস-উদ্দীনের সমুদ্র ও রাজ্যসীমা বর্ধিত হইল। গিয়াস ভ্রাতাকে গরমশিরের সর্বপ্রধান ও সমুদ্রশালী তিগিনাবাদ মগরের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

ভ্রাতৃপুত্রগণের সমুদ্রিতে মালিক ফখর উদ্দীনের জন্মে জঁবা জন্মিল, তিনি আপনাকেই প্রকৃত রাজ্যাধিকারী বলিয়া স্থির করিলেন। ঘুরের বহু আমীরই তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। এখন তিনি ভ্রাতৃপুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধবোধনা করিলেন। এই সুযোগে মালিক তাজ উদ্দীন যল্‌জু ফিরোজকো অধিকার করিবার জন্ত সৈন্তে অগ্রসর হইলেন। জরীর-ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইল। যল্‌জু বিপুল বাহিনী লইয়া মনে করিয়াছিলেন,—নিশ্চয়ই তিনি ঘোরী-সৈন্ত বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু বিধিবাদী, তিনি কি করিবেন। অকস্মাৎ কএকজন ঘোরী বীর ভীমবিক্রমে অগ্র-প্রয়োগে তাঁহার শরীর ধও বিধও করিয়া ফেলিল। অতাব-নীতিক্রমে ঘোরী-রাজের বিজয় বিধোক্ত হইল।

পরদিন ঘোররাজ্যের বালুকের শাসনকর্তার মুণ্ডও বিধৃত হইয়া ঈর্ষাপরায়ণ খুলতাতের নিকট প্রেরিত হইল। কথু উদ্দীন্ পলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্ ও মুইজ্জ্ উদ্দীন্ সসৈন্তে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। আর তিনি কোথায় বাইবেন। তখন উভয় সুলতান খুলতাতকে পরম সমাদরে শিবির মধ্যে আনিয়া সিংহাসনে বসাইলেন ও আত্মগত্যা প্রকাশ স্বরূপ মেঘলাশ্পর্শ করিয়া উভয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই অজ্ঞাত পূর্ক আতিথেয়তার কথু উদ্দীন্ মরমে মরিয়া গেলেন, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'তোমরা আমাকে কি বিক্রপ করিতেছ।' কিন্তু আত্মপুণ্য যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক খুলতাতের সন্মুখ দূর করিলেন এবং সম্মানে তাহাকে বাম্মিয়ানে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর হিরাত, পারস্ত, কিবার, বঘলার প্রভৃতি বহু জনপদ গিয়াস্ উদ্দীনের অধিকারভুক্ত হইল। এই সময়ে সুলতান্ আলা উদ্দীন্ হুসেনের কন্ঠার সহিত গিয়াসের বিবাহ হইয়া গেল। এখন মহম্মদ ঘোরী তাঁহার যেন দক্ষিণহস্ত।

অন্যদিন পরেই গজজাতীয় আমীরগণ কৌশলক্রমে ঘোরী-সৈন্তকে অকস্মাৎ পরাজয় করিলেন। মহম্মদ ঘোরী সসৈন্তে আসিয়া তাঁহাদের নিকট পরাজিত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া গিয়াস্ উদ্দীন্ গজধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৬৯ হিজরায় তাঁহারই জয় হইল।

গজনী অধিকার হইলে গিয়াস্ উদ্দীন্ মহম্মদ ঘোরীকে গজনীর সিংহাসনে বসাইলেন। মহম্মদ ঘোরী গজনীপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। এখন মহম্মদ-ঘোরী 'সুলতান্ উল্ আজম্ মুইজ্জ্ উল্-হুনিয়া আবুল-মুজফ্ফর-মহম্মদ' নামে প্রথিত হইলেন। ৫৭০ হিজরায় তিনি সমস্ত গজনী-প্রদেশ ও গরদেজ অধিকার করিলেন। পর বর্ষে তিনি সসৈন্ত সুলতানে আসিলেন ও করামিতার হস্ত হইতে ঐস্থান উদ্ধার করিয়া লইলেন। ৫৭৪ হিজরায় আবার তাঁহার ভারতাদিকারে অভিলাষ হইল।

ফিরিঙ্গী লিখিয়াছেন,—সিহাবউদ্দীন্ উচ্চা অধিকার করিতে আসিলেন। উচ্চরাজ হুর্গে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সুলতান হুর্গের নিকটেই শিবির স্থাপন করিয়া হুর্গাধিকারের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, সম্মুখসমরে বিশেষ ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি আনিলেন, রাজা রাণীর বশীভূত। ঘোরীরাজ রাণীর নিকট লোক পাঠাইয়া জানাইলেন যে, যদি তিনি নগর ছাড়িয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া বিধের অধীশ্বরী করিবেন। গজনীপতির বিজয়-বিশ্বাসেই

হউক বা ভয়েই হউক, রাণী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ছটা রমণী হইতেই উচ্চরাজ্য গ্রাণ হারাইলেন। রাজ্য মুসলমানের হস্তে গেল। রাণী ও রাজকুমারী ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইল। কিন্তু সিহাবউদ্দীন্ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন নাই। ভয়ঙ্কর অন্ন দিন পরে রাণী ও তৎপরে উচ্চরাজকুমারী প্রাণত্যাগ করিলেন।

মিন্হাজ্ লিখিয়াছেন,—উচ্চা ও সুলতান হইয়া সুলতান নহরবালা (অনহলবাড়পত্তন) আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। তৎকালে নহরবালার রাণী যুবক ভীমদেব বহুসংখ্যক নিষাদী ও দলবল লইয়া সুলতানের সম্মুখীন হইলেন। এই মহাগুদ্ধে মুসলমানেরাই পরাজয়স্বীকার ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সুলতান ৬৭৪ হিজরায় পুনরায় একবার নটগৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই।

পর বর্ষে সুলতান পুর্ধোর (পুরুষপুর বা পেশাবর) অধিকার করেন। ইহার দুই বর্ষ পরে তিনি লাহোরাভিমুখে বিজয়-যাত্রা করিয়াছিলেন। এই সময়ে মাক্দ্দী সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি অন্তাচলচূড়াবলম্বী, খুস্ক মালিক নিজপুত্র ও একটা মহামূল্য হস্তী পাঠাইয়া সুলতানের আহুত্যা স্বীকার করেন।

৫৭৪ হিজরায় সুলতান দেবল ও তৎসমিহিত সমুদয় স্থান অধিকার ও বিপুল ধনসঞ্চয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

৫৮১ হিজরায়, তিনি লাহোরাভিমুখে সৈন্ত চালাইলেন। সমস্ত প্রদেশ উপক্রান্ত ও বিলুপ্ত হইল। প্রত্যাগমনকালে তিনি শিয়ালকোট-হুর্গসংস্কারের বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন।

তাঁহার লাহোর-প্রদেশাধিকারের কারণ জম্মুরাজগণের ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত আছে;—

১১৫১ বিক্রমাব্দে চক্রদেব জম্মুর পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বের মধ্যবর্তিকালে ৫৫৫ হিজরায় মাক্দ্দ-গজনীর বংশধর খুস্ক মালিক গজনী ছাড়িয়া লাহেন্নেরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। এই বংশের সহিত জম্মু-রাজগণের বরাবর বিবেচ ছিল, কিন্তু তাঁহার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। খুস্ক মালিক ক্রমে ক্রমে সমস্ত উত্তর-পঞ্জাব অধিকার করিয়া বসিলেন। মঙ্গলানবাসী খোখর-জাতি জম্মুরাজের প্রজা হইলেও খুস্কর উৎসাহে জম্মুরাজের অধীনতা পাশ উচ্ছেদ করিল। এই সময় (৫৭৯ হিজরায়) সুলতান্ মুইজ্জ্-উদ্দীন্ ঘোরী গজনী জয় করিয়া রাজ্য-বিস্তার করিতেছিলেন। রাজা চক্রদেব নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামদেবকে বহু উপঢৌকন সহ সুলতানের নিকট পাঠাইয়া নিজ রাজ্যের অবস্থা জানাইলেন এবং তাঁহার আগমনে লাহমোর-



এদেশ সহজেই তাঁহার করায়ত্ত হইবে, একথাও অবগত করাইলেন। সুলতান জম্মুরাজ-প্রতিনিধিকে বথেষ্ট আদর দেখাইলেন এবং তাঁহার অমরোধ্য মত পর বর্ষে আসিয়া লাহনোর নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু সহজে এই এদেশ বণীভূত হইল না দেখিয়া সুলতান লাহনোরের চতু-পার্শ্ববর্তী স্থান লুণ্ঠিত ও ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সুলতান প্রত্যাভর্তন করিবার পরই খুসরু মালিক খোখর-জাতির সাহায্যে আবার শিরালকোট অবরোধ করিলেন, কিন্তু রাজা চক্রদেব দুর্গবাসীদিগকে সাহায্য করার খুসরু-মালিক ঐ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। এই ঘটনার অনতিপরেই অশীতিপর বৃদ্ধ চক্রদেবের মৃত্যু হয় ও তৎপুত্র বিজয়দেব ১২২১ বিক্রমাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ বর্ষে সুলতান সিদ্ধপার হইয়া পঞ্চদশে আসিলেন। বিহাত নদীতীরে রাজপুত্র নরসিং দেব আসিয়া সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি সুলতানের সহিত লাহনোর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ঐ স্থান পুনরায় অধিকৃত হইল। নরসিং দেব সুলতানের নিকট উপযুক্ত খেলাত পাইয়া স্বদেশে ফিরিলেন। খুসরু মালিক বন্দী হইয়া গজনীতে আনা হইলেন। (৫৮৭ হিজরার গরজীতানের বলরবান দুর্গে তিনি নিহত হন।)

তবকাত-ই-নাসিরিতে (সাময়িক ইতিহাসে) লিখিত আছে,—উক্ত ঘটনার পরই সুলতান বহু সৈন্ত সামন্ত লইয়া তবরহিন্দ (ভাটিন্দা)-দুর্গজয়ে অগ্রসর হইলেন। বুদাউন লিখিয়াছেন, উক্ত দুর্গেই জয়পালের রাজধানী ছিল।

মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন, সুলতান উক্ত দুর্গ জয় করিলেন ও মালিক জীয়াউদ্দীন দুর্গাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন। এখানে তুলা-জাতীয় ১২ শত অঝারোহী দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত হইল। সুলতান গজনী ফিরিবার আয়োজন করিলেন, এমন সময় শুনি-লেন, যে পৃথ্বীরাজ দুর্গ উদ্ধারের জন্য সৈন্যে আসিতেছেন। ভারতীয় প্রায় সকল হিন্দুরাজ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছেন। সুলতান তরাই (তিরোরি) ক্ষেত্রে আসিয়া সম্মুখীন হইলেন। [পৃথ্বীরাজ শব্দে বিবৃত্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

যুদ্ধে সুলতানের পরাজয় হইল। এমন কি, শত্রুর পরাঘাতে আহত হইয়া তিনি নিজ অশ্ব হইতে পাতত হইতে-ছিলেন, এমন সময় একজন খালুজ-বীর তাহাকে ধ্বংস লইয়া সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে হততে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল।

মুসলমান-সৈন্যগণ রণস্থলে সুলতানকে না পাইয়া সকলে ব্যাকুল হইয়াছিল। তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বহুদূর গেলে পর, তাহারা সেই বীর যুবকের স্বন্ধে সুলতানকে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য হইল। সুলতান সৈন্যে গজনীতে ফিরিলেন।

আবার পরবর্ষে তিনি প্রতিশোধ দিবার জন্য তারতে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে এক লক্ষ বিশ হাজার মুসলমান অঝারোহী চলিল। জম্মুরাজ-কুমার নরসিং দেব ও কনোজ-পতি জয়চন্দ্র সৈন্যে সুলতানের সহিত মিলিত হইলেন। সুলতান তবরহিন্দ দুর্গ জয় করিয়া তিরোরী রণক্ষেত্রে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

এখানে ভীষণ যুদ্ধের পর যেরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হিন্দুগণ পরাজিত হইয়াছিলেন, পৃথ্বীরাজ শব্দে তাহা সবিস্তার-বর্ণিত হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন।

পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর আজমীর, হাঁসী, সরস্বতী প্রভৃতি লইয়া সমগ্র শিবালিক প্রদেশ সুলতানের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। তিনি কুতব-উদ্দীন আইবককে ঐ সমস্ত প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া গজনী প্রত্যা-গমন করিলেন। কুতবের চেষ্টায় অল্প দিন মধ্যেই কনোজ, বারাণসী, গোরালিয়র, বুদাউন, অনহলবাড় প্রভৃতি স্থান গজনীপতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

অনন্তর ঘুর বা ঘোরপতি গয়াসউদ্দীন মহম্মদ হিরাতে ইহ-লোক পরিত্যাগ করিলেন। তখন সুলতান মুইজউদ্দীন খোরা-সনের প্রাস্তসীমায় তুস ও সরাকের নিকট অবস্থান করিতে-ছিলেন। তিনি জ্যোষ্ঠের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য অবিলম্বে হিরাতের বাদগৈস্ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। জ্যোষ্ঠ ভ্রাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া তিনি জ্যোষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র গয়াসউদ্দীন মাক্দুদকে ফরা, ইস্ফিহার প্রদেশ ও বস্তা নগরী, তাঁহার খুলতাত-পুত্র ও সুলতান গয়াসের জামাতা মালিক জিয়া-উদ্দীনকে ঘোর, গরমুসরু প্রদেশ, ফিরোজকোর সিংহাসন ও দাবর রাজ্য, এবং ভাগিনের মালিক নাসিরউদ্দীনকে হিরাত প্রদেশ অর্পণ করিলেন। অতঃপর তিনি ঘোরের কএকজন আমীর ও মালিককে লইয়া খারিজম্ প্রদেশ জয় করিবার জন্য ৬০১ হিজরায় যাত্রা করেন। খারিজমপতি শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য সৈন্যে সুলতানের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু সে প্রচণ্ড গতি-রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে নিজ রাজধানীতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। মহম্মদ ঘোরী নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু জয়ের সুবিধা ঘটিল না। নগরবাসী জইহনু নদী হইতে খাল কাটিয়া জল আনিয়া নগরের পূর্বাংশে প্রণালী করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাতেই ঘোরের অনেক আমীর নিহত ও ধৃত হইলেন। এদিকে উপযুক্ত রসদের অভাবেও সুলতান নগর-অধিকারে সমর্থ হইলেন না, শেষে বাধ্য হইয়া বাল্খ অভিমুখে প্রত্যাভর্তন করিলেন।



আলখুদে পৌছিয়া সফা বন্দনা করিতেছেন, এমন সময় তুর্কি-স্থানের বিধর্মিগণ আসিয়া সুলতানকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার সেনাপতি হসেন-ই-খরমিলের তৎপরতার বিধর্মিগণ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেনাপতি তাহাদের অহুসরণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সুলতান বলিয়াছিলেন, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আমি বিধর্মিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইব, ধর্মরাজ্য স্থাপন করিব। সেনাপতি নিজ দল বল লইয়া জুজরবান্ অভিমুখে চলিয়া গেলেন। পথপ্রবেশ ক্রান্ত ও দুর্বল সৈন্তগণ অনেকেরই সুলতানকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে অল্পমাত্র সৈন্ত লইয়া সুলতান অগ্রসর হইলেন। বহু সংখ্যক বিধর্মি-সৈন্ত আসিয়া সুলতানকে ঘিরিয়া ফেলিল। সুলতানের প্রিয় ক্রীতদাসগণ সকলেই বলিতে লাগিল যে, ইসলামের সৈন্ত-লংঘ্য নিত্য অন্ত, এ সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র-পরিভ্রমণ করাই সঙ্গত। মহম্মদ ঘোরী সে কথার কর্ণপাত করিলেন না। অসংখ্য বিধর্মী মোগলসৈন্তের নিকট কতক্ষণ আর মুষ্টিমেয় মুসলমান সৈন্ত তিষ্ঠিবে একে একে প্রধান বীরগণ জীবন উৎসর্গ করিলেন। সুলতানও মোগলের তীব্র শরাঘাতে অর্জরীভূত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার তুর্কী ক্রীতদাসগণ তাঁহাকে আলখুদে দুর্গ মধ্যে লইয়া উপস্থিত না হইলে সে যাত্রা আর তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইত না।

পরদিন সমরকন্দের সুলতান ওসমান ও তুর্কিস্থানের মালিকগণ সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন, বিধর্মিগণও তদর্শনে পুনরায় ফিরিয়া গেল। সুলতানও গজনীতে চলিয়া আসিলেন এবং তুর্কিস্থানে গিয়া তিন বর্ষ যুদ্ধ চালাইতে পারেন, তাহার আরোজন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কতকগুলি দ্রবৃত্ত খোখর এবং লাহোর ও জুধ শৈলবাসী পার্শ্বজাতি বিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান শীতকালে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করিয়া কোরাণসম্মত ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বিদ্রোহীরা সকলেই উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিল।

৬০২ হিজরায় তিনি গজনীযাত্রার উদ্ভোগ করিলেন। কিন্তু আর তাঁহাকে গজনীতে ফিরিতে হইল না, দম্‌য়াক নামক বিশ্রামস্থানে এক মূলাহিদা (বিধর্মী) র শিষ্যহস্তে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। (তবকাত-ই নাসির)

তারিখ-ই অলফির মতে প্রতিহিংসাসাধনেছু খোখর- (গোকর)-গণের হস্তেই মহম্মদ ঘোরী নিহত হন।

আবার আবুল কজল ও জমু-ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন, যে যদিও তবকাত-ই অকবরী ও ফিরিতা খোখর-হস্তে ঘোরী-

রাজের মৃত্যু ঘটাইয়াছেন, কিন্তু বংশপরম্পরাগত ভাটের কাহিনী হইতে জানা যায় যে, পৃথ্বীরাজ বন্দী হইয়া গজনীতে নীত হইলে, চাঁদ ভাটও পরে তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, ক্রমে তিনি সুলতান মুইজ্ উদ্দীনের বিশ্বাসের পাত্র হন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে চাঁদ কবি সুলতানকে পৃথ্বীরাজের অপূর্ণ শরভ্যাগের কোশলের কথা জানাইলেন। সুলতানের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। পৃথ্বীরাজ প্রয়োগ কালে সুলতানকে লক্ষ্য করিয়া শরভ্যাগ করিলেন। তাহাতেই সুলতানের জীবনীলা শেষ হইল। অবশেষে চাঁদ ভাট ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই মুসলমান রাজপুরুষহস্তে জীবন উৎসর্গ করিল।

শেষোক্ত প্রবাদটী প্রকৃত বলিয়া গণ্য নহে। মিন্‌হাজ্ মহম্মদ ঘোরীর সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, এবং তিনি সুলতানের সন্ধিগণের মুখ হইতে শুনিয়া তাঁহার জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এক্ষণ স্থলে মিন্‌হাজের তবকাত-ই-নাসির উক্তিই প্রকৃত ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার্য।

মহম্মদ ঘোষজিলানী, (হজরৎ শেখ), প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু। সুলতান জেলার উচ্চা নগরে ইহার সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে। উহা গিলানী জাতির পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। ইনি বোগদাদ-নগরবাসী প্রসিদ্ধ সাধু শেখ আব্দুল কাদের জিলানী বোগদাদীর বংশধর। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বীয় জন্মভূমি পরিভ্রমণপূর্বক উচ্চা নগরে আগমন করেন। দাউদ-পুত্রগণ সকলেই ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ ঘোষ, (শেখ) গোয়ালিয়ারবাসী জনৈক বিখ্যাত মুসলমান সাধু। তাঁহার প্রকৃত নাম হাজি হামিদ উদ্দীন, ফকীরাদ্বয় গ্রহণের পর তিনি গোষ উল্-আলম নামে সাধারণে পরিচিত হন। প্রবাদ, চুনার-গরিগুহার তিনি দ্বাদশ বর্ষ কাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে জৈশ্বর্য্যধানে নিরত ছিলেন। ঐ সময়ে একমাত্র বস্ত্র ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। যোগসিদ্ধ হইয়া তিনি লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন, সাধারণে তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। এমন কি, নিকটবর্তী স্থানের রাজভ্রমণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য অনেকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। প্রায় সকল সময়েই হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিবর্গ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন।

ইহার পর তিনি গোয়ালিয়রে আগমন করেন। এখানে

থাকিয়া তিনি সাধারণকে জ্ঞানবিস্তরণ ও ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য যত্নবান হন। তাঁহার ভূসম্পত্তি হইতে তাঁহার বাবতীর ব্যয় নিৰ্বাহ হইত। তিনি গুজরাতিয়াসী বিখ্যাত মুসলমানদ্বারা বাজী উদ্দীন্ আবেদর গুরু ছিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

তিনি জবাহির উল্-খমসা, গুলজার অত্রার প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সৈয়দ ফজলউল্লাহুত মুনকিব-ঘোদিয়া গ্রন্থে তাঁহার জীবনী বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

**মহম্মদঘোষ খাঁ** (সিরাজ উদ্দৌলা) কৰ্ণাটকের জনৈক নবাব। ইনি যৌবন কবিত্বশক্তির জন্য 'আদিম' উপাধি লাভ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইনি তক্তকিয়া শুভ-বতান নামে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন কবিদিগের একখানি জীবনী সংগ্রহ করেন।

**মহম্মদঘোষ**, (জারিন), চাহার-দরবেশ নামক প্রসিদ্ধ পারসী-উপন্যাসগ্রন্থের লেখক। বিজাপুরে ইহার জন্ম হয়। লক্ষ্মী-নবাব আদম উদ্দৌলার রাজ্যকালে ইনি জীবিত ছিলেন।

**মহম্মদজান**, বঙ্গেশ্বর মুর্শিদ কুলী খাঁর নাএব ফৌজদার। ইনি কাঁটোয়া (মুর্শিদগঞ্জ) মৌজার প্রথম থানাদার বা নাএব-ফৌজদার নিযুক্ত হন। পূর্বতন নবাবের বিশেষ অমুগত ছিলেন বলিয়া মুর্শিদকুলী খাঁও তাঁহাকে বিশেষ অমুগত করিতেন। তাঁহার স্বভাব নৃশংসবৎ ছিল। তিনি এরূপ কঠোর ভাবে অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেন যে, মহম্মা মাত্রেই তদর্শনে হৃদয় বিকীর্ণ হইত। কথিত আছে, যে দূত দম্ভাগণকে চিরিয়া দিখও করিয়া তিনি সদররাস্তার পার্শ্ববর্তী বৃক্ষশাখায় লটকাইয়া দিতেন; এইজন্য তিনি 'কুড়ালিয়া' নামে খ্যাত হন। দম্ভাহত্যার জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কুঠারধারী ঘাতক-গণ গমন করিত। এইরূপ কঠোর অত্যাচারের পর কাঁটোয়া-নগরী দম্ভাভীতিশূন্য হইয়াছিল।

তিনি মুর্শিদকুলীর প্রতিনিধি হইয়া একবার পাবনার স্ববাদার ফকরু শিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্তপরিচালনা করিয়াছিলেন। রাজশাহীতে উদয়নারায়ণের বড়বস্ত্র প্রকাশ পাইলে, প্রিয় সেনানী মহম্মদ জান ও লাহরী মল নবাব মুর্শিদকুলীর আদেশে রাজশাহী অভিমুখেই যাত্রা করেন। এই যুদ্ধের পরিণাম পরাজয় হইবে জানিয়া উদয়নারায়ণ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

**মহম্মদজানি**, আসর-আসাদী নামক গ্রন্থগ্রন্থের লেখক। এই গ্রন্থে ইসলামধর্মপ্রবর্তক মহম্মদ ও হাদিশ ইমামের জীবনী বিবৃত হইয়াছে।

**মহম্মদ তকি**, (ইমাম), আলীর বংশসম্বৃত খ্যাতনামা ১ম ইমাম। ৮ম ইমাম আলী মুসি রজার পুত্র। ইনি মহম্মদ অল্-জবাব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৮১১ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইনি খলিফা মামুনের কন্যা উম্ম-উল্-ফজলকে বিবাহ করেন। ৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বিব-প্ররোগে ইহার প্রাণবিরোগ হয়। বোগদাদ নগরে শিতামহ ইমাম মুনী কালিমের সমাধিপার্শ্বে ইহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল।

**মহম্মদ তকি** (মীর), জনৈক প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি। ইনি পারস্ত ও উর্দুভাষার কএকখানি কাব্য লিখিয়া যান। অক-বরাবাদ নগরে ইহার জন্ম হয়। একজন ইনি সাধারণে হিন্দুস্থানী কবি নামে পরিচিত ছিলেন। কবিত্বশক্তির জন্য ইনি মীর উপাধি লাভ করেন। মোগল-সম্রাট শাহ আলম ইহাকে বিশেষ অমুগত করিতেন। তাই দিল্লীনগরে ইহাকে সপুত্রক বাস করিতে হয়। ইহার রচিত ৬৪ খানি দিবান্ ও একখানি তক্তকিয়া (কবিতামালা) সাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে লাক্কো নগরে ইহার জীবলীলা শেষ হয়। ইহার পুত্র ফৈজ আলীও একজন কবি ছিলেন।

**মহম্মদ তকি খাঁ**, বঙ্গের নবাব মীর কাসিমের অধীনস্থ জনৈক সেনানী। তিনি তাম্রিজ নগর হইতেই বঙ্গ আগমন করেন। বঙ্গেশ্বর তাঁহার সাহস ও কার্যদক্ষতা নিরীক্ষণ করিয়া বিশেষরূপে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি, বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে বীরভূমের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের ভারও সমর্পণ করিয়াছিলেন।

বীরভূমের যুদ্ধে দেশীয় সেনাদলের অকর্মণ্যতা লক্ষ্য করিয়া নবাব মীর কাসিম মহম্মদ তকিখাঁকে একদল উপযুক্ত সেনা সংগঠনের আদেশ করিলেন। তদনুসারে তকি খাঁ প্রাণপণ-মত্রে প্রভুর কার্যে বিশেষ উৎসাহ ও সহায়-ভূতি প্রদর্শন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই নবাবের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন।

ইতিহাসপাঠকমাজেই অবগত আছেন যে, মীর কাসিমের সহিত ইংরাজ-বণিকগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই হেতু ইংরাজদিগকে তাড়াইবার জন্য তিনি বড়-বস্ত্র করিয়াছিলেন। যুদ্ধ আসন্নপ্রায় ভাবিয়া তিনি সেনাপতি গুগিন্ খাঁর পরামর্শে জগৎশেঠ জাতীয় মহাত্মা রায় ও রাজা স্বরূপচাঁদকে ক্রায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদনু-সারে তিনি বীরভূমের ফৌজদার মহম্মদ তকি খাঁকে আদেশ পাঠাইলেন যে, পত্রপাঠ সদলে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়া জগৎশেঠের বাসভবন অবরোধ করিবেন এবং যুদ্ধের হইতে

প্রেরিত সৈন্তদল সহ শেঠবরকে তথায় পাঠাইয়া দিবেন। তকি খাঁ আদেশপ্রাপ্তিমাত্র মুর্শিদাবাদে আগমনপূর্বক শেঠবরন বেঠন করিলেন এবং ছলপূর্বক তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, নবাবের আদেশ মত তাঁহাদিগকে যুদ্ধেরে গিয়া বাস করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা নবাবের অভিপ্রেত নহে। তকি খাঁর কথার তাঁহারা যুদ্ধেরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎপূর্বক তথায় রাজা রাম-নারায়ণ, রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি দেশীয় প্রভাবশালী লোকদিগকে বন্দী অবস্থায় দেখিয়া তাঁহারা প্রকৃত বিষয় জ্ঞদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। নবাব তাঁহাদিগকে সুখ সম্পদে রাখিয়া কার্যসাধনসকলে ব্রতী হইলেন।

ক্রমে ইংরাজের সহিত মীর কাসিমের যুদ্ধ বাধিল। মুসল-মান সৈন্ত ও সেনাপতিগণের পরিচালনবিশৃঙ্খলতা হেতু পাটনায়ুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত ও বিতাড়িত হইল। প্রত্যা-বৃত্ত মুসলমান সেনাদল ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া পলাশীর দক্ষিণভাগে মহম্মদ তকি খাঁর শিবিরে সমবেত হইল। তকি খাঁ এই পলায়িত সেনাদলকে স্বীয় শিবির মধ্যে আশ্রয় দিলেন না, পাছে এই দৃষ্টান্তে তাঁহার শিক্ষিত সেনাদলও কর্তব্যকার্য্য বিস্মৃত হয়। কিন্তু ইহাতে সফল না কলিয়া বরং উভয়ের মধ্যেই ঈর্ষা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা বহুদূরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিল।

সমগ্র ইংরাজসৈন্ত ১২শে জুলাই ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অগ্রগামী হইয়া অসংসাহসিক তকি খাঁর অশ্রান্তদলের অপেক্ষা না করিয়াই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। তাঁহার নিজ হস্তে শিক্ষিত অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্ত নায়কের উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া অমিত বিক্রমে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। সেনাপতি স্বয়ং অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র উপস্থিত থাকিয়া সৈন্তচালনা করিতে লাগিলেন। ইংরাজের স্তুতি অধিবৃষ্টিতে বারংবার আহত হইলেও সেনাগণ কিছুতেই নিরস্ত হইল না। ইহাং ইংরাজ-দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল, কিন্তু তকি খাঁর অশ্ব নিহত হইল এবং সেই একই গোলায় তাঁহার পাদদেশ আহত হইল, তথাপি তিনি ভ্রক্ষেপ না করিয়া পুনরায় অশ্বে আরো-হণ করিয়া স্বীয় মনোমত অশ্বারোহী সেনাদলকে সঙ্গে লইয়া ইংরাজের দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। স্বল্পদেশ বিদীর্ণ হইলেও মুসলমানবীর স্বীয় সৈন্তগণের ভয়নিবৃত্তির জন্ত বজ্রাকলে ঐ ক্ষতস্থান আবৃত করিয়া রণসমূহে সন্তরণার্থ অগ্র-সর হইলেন। এই আক্রমণেই তিনি যুদ্ধকার্য্য শেষ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্য তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিফল। সমগ্র সেনাদল সবগে অগ্রসর হইবামাত্র দক্ষিণ পার্শ্বের

খালের নিম্নে লুকায়িত ইংরাজের সিপাহীদল একযোগে অধিবৃষ্টি করিল। অগ্রগামী সৈন্তের অনেকেই ইহাতে নিহত হইয়াছিল। একটা গুলি আসিয়া তকি খাঁর অন্তর ভেদ করিয়া তাঁহার বীরকীর্তির অবসান করিল। তকি খাঁ লহ-যোগী সেনাপতিগণের কর্তব্য কার্য্যের অবহেলাহেতু হৃৎ-প্রকাশ করিতে করিতে স্বর্গগত হইলেন। তৎপরে তাঁহার সেনাদলও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

মহম্মদ তাহির, (ইনায়েৎ খাঁ), জনৈক মুসলমান কবি। ইনি সম্রাট শাহজহানের জীবনী অবলম্বন করিয়া শাহজহান-নামা রচনা করেন। ইহার পিতার নাম জাকর খাঁ। উক্ত অন্ধের কবিতা লিখিয়া ইনি ‘আনুনা’ উপাধি লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি একখানি দিবান ও একখানি মসনবি লিখিয়া ছিলেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ তাহির (নশিরাবাদী), তজ্জিয়া মহম্মদ-তাহির নামক জীবনী-রচয়িতা। ইনি পারস্তরাজ ১ম শাহ আব্বাস-সের রাজ্যকালে জীবিত ছিলেন।

মহম্মদ পার্শী (খোজা) যুবরাজ আলাউদ্দীনের সমসাময়িক জনৈক কবি। ইনি ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

মহম্মদপুর, বাঙ্গালার সারন জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। এখানে স্থানীয় শস্তের ও খাদ্যাদির বিতৃত কারবার আছে।

মহম্মদপুর, পাটনা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা. ২৫° ৩০' উঃ এবং দ্রাঘি. ৮৫° ৪৬' পূঃ।

মহম্মদপুর, বাঙ্গালার যশোর জেলার অন্তর্গত একটি গও-গ্রাম। মধুমতী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা. ২৩° ২৩' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি. ৮৯° ৩৮' ৩০" পূঃ। এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ইহার বর্তমান নাম মামুদপুর। ১৮৩৬ ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের অরে এস্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে।

প্রবাদ, ভূষণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারী রাজা সাতারাম রায় খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই নগর স্থাপন করিয়া দুর্গ প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন। এখনও ঐ দুর্গের ধ্বংসা-বশেষ, প্রাচীন মন্দির ও গুফরিণ্যাদির নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। [ নীতারাম রায় দেখ। ]

মহম্মদপুর, অযোধ্যা-প্রদেশের বারবাকি জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা।

মহম্মদপুর, অযোধ্যা-প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি নগর।

মহম্মদ ফিক্রি, অকবর শাহের জনৈক সভাসদ। রুরাজি কবিতা-রচনার জন্ত ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি হিরাতবাসী জনৈক তত্ত্বাবগতান।

মহম্মদ মজ্রাবি (শেখ), জটনৈক মুসলমান কবি। ইহার প্রকৃত নাম মহম্মদ নীরৌ। ইনি গোড়া সূফী-মতাবলম্বী ছিলেন। এই জ্ঞান কমল খুজান্দীর সহিত ইহার বিশেষ সৌহার্দ্য হয়। ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে তাম্রিজ নগরে ইহার মৃত্যু হইলে, সুরখাব নগরে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। ইনি সাধারণ মুসলমানের নিকট একজন সাধু বলিয়া পরিচিত। ইহার রচিত ‘কসাদ মজ্রাবী’ নামক একখানি দিবানু ও কয়খানি অপর গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মহম্মদ মসুম নামী (আমীর), সম্রাট অকবর শাহের জটনৈক সম্রাস্ত সভাসদ। ডক্কর ইহার জন্মস্থান। ইনি বৃহৎ জেলাধার অধিকরণে হুম-ব-নাজ, লৈলী মজমুর অধিকরণে পরিভ্রমিত এবং মখজুন উল আশ্রায়, হুশৈকর ও সিকেন্দরনামা প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে ১০ হাজার শ্লোকে এক খানি মসনবি রচনা করেন। এতদ্বিন্ন ইহার রচিত দুইখানি দিবানু ও দুইখানি শাকি-নামা পাওয়া যায়। ইনি এক সময়ে এক সহস্র সঙ্গী সঙ্গে লইয়া পারস্তরাজ শাহ আব্বাসের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ মহসীন (মোস্তা), কাশানবাসী জটনৈক কবি। ইনি তফসীর সূফী নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ মহসীন, পৈলানীর জটনৈক বিদ্রোহী তহসীলদার। ইনি ইম্বাদ আলীর সহিত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিরোধে বোগদান করায় ইংরাজ কর্তৃক ধৃত হন। বান্দা নগরে পর বৎসরে ইহার ফাঁসি হয়।

মহম্মদ মহসীন (হাজি), হুগলীনবাসী জটনৈক বিখ্যাত মুসলমান ফকীর। ইনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন। স্বজাতীয় দীনদুঃখীর প্রতি অমুরাগ ও নিঃস্বার্থ দানহেতু সকলেই ইহাকে ভক্তি করিত। তখনকার হুগলীর প্রসিদ্ধ ধনী নবাব খাঁ জাহান খাঁ বিশেষ বিখ্যাত হইলেও এই মহাপুরুষের তায় সমধিক খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন নাই।

হাজি মহম্মদ যে সম্রাস্ত মুসলমানবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার বংশাধ্যায়িকা এইরূপ পাওয়া যায়—

আগা ফজল উল্লা নামক জটনৈক পারস্তবাসী ধনী বাণিজ্য উপলক্ষে ১৮শ শতাব্দির আরম্ভে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তৎপুত্র হাজি ফৈজুল্লা হুগলী ও মুর্শিদাবাদে বাণিজ্যবিস্তার করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। কিন্তু কার্য-গতিকে তাঁহার ধনরসের হ্রাসহেতু তিনি দরিদ্র হইয়া পড়েন। স্মরণ্যঃ তাঁহাকে হুগলীতেই বাস করিতে হয়। এই সময়ে একটা ধনশালিনী রমণীর সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে।

ঐ রমণী ক্রিপে হুগলীতে আসিয়া বাস করে এবং কোন্ বংশে তাহার জন্ম হয়, তাহা প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিয়া রাখা কর্তব্য। ইম্পাহান নগরের বিখ্যাত মতাহারবংশের প্রসিদ্ধ ধার্মিক আগা মতাহার অরঙ্গজেব বাদশাহের খাজান্দী ছিলেন। তিনি সম্রাটের একরূপ বিশ্বাসী ছিলেন যে, খাজনা-খানার চাবি তাঁহার নিকট থাকিত এবং তিনি সপরিবারে দিল্লীপ্রাসাদেই বাস করিবার আদেশ পাইয়া ছিলেন।

কালক্রমে পত্নীর অভিপ্রায় অনুসারে মরমের তাজিয়া সম্পন্ন করণার্থ আগা মতাহার বাদশাহের আদেশ মতে হুগলী নগরে বাসস্থাপন করিলেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে যশোহর, চিৎপুর ও অপরাপর স্থান জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন \*। মোগল-সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতে বাস-কালে তাঁহাদের মনে একটা ইমামবাড়া নিৰ্মাণের সঙ্কল্প উদ্ভিত হয়। তদনুসারে আগা মতাহার জাকর পদ্মা নামক জটনৈক তুলা-বাবসারীর নিকট হইতে বর্তমান ইমামবাড়ার জমি ক্রয় করেন। পূর্বে এই জমিতে জাকরের কুঠি ও আনুগো বিবিয় ইমামবাড়া ছিল। আগবাব সহ ঐ সকল অট্টালিকা ক্রয় করিয়া আগা মতাহার ১১০৪ হিজরার নাজির গাজি হোসেনের নামে ইমামবাড়া নিৰ্মাণ করেন। এখনও এখানে ইমাম হোসেনের অর্চনা দি হইয়া থাকে।

আগা মতাহার শেষজীবনে সূফী হইতে পারেন নাই। তিনি মৃত্যুর পূর্বে প্রিয়তমা কস্তা মজমুনকে একখানি তাবিজ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই তাহা না ভাঙা হয়। আগা মতাহারের মৃত্যু হইলে ঐ অলঙ্কার ভাঙিয়া দানপাত্র বাহির করা হয়। ঐ দানপাত্রে কস্তাই একমাত্র অধিকারিনী জানিয়া আগাপত্নী পূর্বোক্ত হাজি ফৈজুল্লাকে পুনরায় বিবাহ করেন। এই দম্পতী হইতে হাজি মহম্মদ মহসীনের জন্ম হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, মুর্শিদাবাদ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর, তাঁহার মাতা হুগলীতে আসিয়া আগা মতাহারের পার্শ্বগ্রহণ করেন।

আবার শুনা যায়, ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। যৌবনে তিনি সিরোজি নামক জটনৈক মোলবির নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। গুরুর নিকট দেশভ্রমণরুত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সূক্ষ্ম-মার হৃদয়ে ভ্রমণবাসনা জন্মিয়াছিল। কিছুকাল মুর্শিদাবাদে থাকিয়া আরব ও পারস্তরাজ্যে গমন করেন। আরবী ও পারস্তভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অতঃপর বয়ঃ-

\* কেহ কেহ বলেন, আগা মতাহার কাশীরাজের অধীনে কর্ম করিতেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি যশোহর ও চিৎপুর জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই দুইটি অবদবাকের দ্বাৰা নিৰ্মাণ করা হুকটিন।

প্রাপ্ত হইয়াও তিনি একবার দেশভ্রমণে বহির্গত হন। ভারত, আরব, তুরক, মিসর ও পারস্যদেশের নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বিভিন্নজাতীয় ও বিভিন্ন-ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে মঙ্গুজান খানমের আমিবিয়োগ হয়। মঙ্গুজানের আগ্রহে তাঁহাকে বাটীতে ফিরিতে হইল। তিনি হুগলীতে প্রত্যাগত হইলে মঙ্গুজান মহসীনকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করেন।

এই সময় হইতে মহম্মদ সাধারণের নয়নগোচর হন। দরিদ্রকে অন্নদান তাঁহার জীবনের মহাব্রত হইয়াছিল। হুগলীর ইমামবাড়াগৃহে বড় বড় অক্ষরে লিখিত দানপত্র অমুসারে জানা যায় যে, তিনি গবর্মেন্টের খাজনা বাদে সমগ্র সম্পত্তিই দরিদ্রদিগের জন্য ব্যয় করিয়াছেন।

মহম্মদ মীর্জা, জটনক সংসার-বিরাগী যুবরাজ। ইনি আমীর তৈমুরের পৌত্র এবং মীরানু শাহের পুত্র। সংসারে উদাসীন থাকিয়া ইনি স্বীয় ভ্রাতা সমরকন্দাধিপতি খলিল উল্লা খাঁর সহিত বাস করেন। ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে মীর্জা শাহরুখ সমরবন্দ অধিকার করিয়া স্বীয় পুত্র মীর্জা উলঘ বেগকে সিংহাসন দান করিলে যুবরাজ মীর্জা মহম্মদ ইহারই অধীনে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ মুকিম, তবকাত-ই অকবরী বা তারিখ্ নিজামী নামক ভারত-ইতিহাসপ্রণেতা। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত গ্রন্থ সমাপন করিয়া সম্রাট অকবর শাহকে উৎসর্গ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম খাজা নিজাম উদ্দীন আশ্ফদ। তিনি হিরাতবাসী খাজা মহম্মদ মুকিমের পুত্র। তাঁহার পিতা মোগলরাজ বাবর শাহের অধীনে দেওয়ানের কাধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ সজ্জতিপন্ন হন। বাবর শাহের মৃত্যুর পর তিনি আশ্ফদবাদের অধিপতি মীর্জা আশ্ফরির উজীর হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি অকবর শাহের অধীনে কন্ম করেন।

তাঁহার পুত্র মহম্মদ অকবর শাহের অধীনে গুজরাতে বসিয়া হইয়াছিলেন। ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। লাহোর নগরের ইরাকবতীতীরে তাঁহার গোর আছে।

মহম্মদ মুজফ্ফর, ফার রাজ্যের মুজফ্ফরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার প্রকৃত নাম মুবারিজ্ উদ্দীন। পারস্তরাজ জুলতান আবু সৈয়দ খাঁর অধীনে ইনি উচ্চ-পদাভিষিক্ত ছিলেন। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজার মৃত্যুর পর পারস্ত-রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা ঘটিলে, ইনি ষেজ্দ্ অধিকার করেন।

১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ইনি শাহ শেখ আবু ইস্হাকের নিকট হইতে সিরাজ কাড়িয়া লন এবং তাঁহাকে নিহত করিয়া ফার রাজ্যের অধীশ্বর হন। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র শাহসুজা বিজোহী হইয়া স্বীয় পিতৃচক্ৰ উৎপাটিত করিয়া সিরাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে মুজফ্ফরের মৃত্যু হয়।

১ মুবারিজ্ উদ্দীন মহম্মদ মুজফ্ফর, ২ শাহ সুজা, ৩ শাহ আশ্ফদ, ৪ জুলতান আশ্ফদ, ৫ শাহ মনসুর, ৬ শাহ অহিয়া, ৭ শাহ জৈন্ উল্ আবিদীন।

এই ৭ জন ৭৭ বৎসর কাল প্রবলপ্রভাবে ফাররাজ্যে আধিপত্য করিয়াছিলেন। পরবর্তী দুইজন কএক মাস রাজ্য করিলে পর ফার রাজ্য হস্তান্তরিত হয়।

মহম্মদ (মোম্বা), “শামস-বাঞ্জিগা” এবং হবাসী-ফরিদ-ফিশারা-উলফয়েদ নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইহার জন্মস্থান জোমপুর। মহম্মদ ফারুকীর পুত্র। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ রজা, অসরাকৎ অল্‌বিয়া ও ইন্দিখার উল্-অহ-কাম্ নামক আরবীয় ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা।

মহম্মদ রফিয়া বায়েজ্জ, ইম্পাহানবাসী জটনক ধর্মপ্রচারক। ইনি মীর্জা সাএব ও তাহির বহিদের সমসাময়িক। ইহার রচিত পারসী ভাষার একখানি দিবান্ ও আরবার্-উল্ জনান্ নামে ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তক পাওয়া যায়। এতদ্বির শাহ আব্বাস্ ও তুরাণরাজ এলান্ খানের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া আর একখানি কাব্য রচনা করেন।

মহম্মদ রফিউদ্দীন, (মুহাজিস্), দাক্ষিণাত্যবাসী জটনক মুসলমান কবি। ইনি প্রথমে সম্রাট অকবর শাহের অধীনে সেনানায়কের কন্ম করিতেন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে ইনি কান্দাহারগুহে গমন করেন। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইহার দিবান্ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। সম্রাট তাহার কবিতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

মহম্মদ রেজা খাঁ, বঙ্গের জটনক নাএব সুবাদার। নবাব জাকর আলা খাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র নজম্ উদ্দৌলা নবাবী পদ পাইলে, রেজা খাঁ ইংরাজরাজ কর্তৃক মুশিদ্‌বাদের প্রধান সচিব নিযুক্ত হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির পরামর্শমতে রেজা খাঁকে কারাবদ্ধ করিয়া কলিকাতার আনা হয়। ইহার চারি বৎসর পরে বিচারবিভাগের বিশৃঙ্খলতা ঘটিলে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের যত্নে মহম্মদ রেজা খাঁ পুনরায় স্বপদে স্থাপিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ লারী, (মোম্বা) তালিফ্-মোম্বা-মহম্মদ-লারী নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মহম্মদলাদ, মুবিয়দ্ উল্ ফজলা নামক অভিধানপ্রণেতা।

মহম্মদ বকি (খাজা), জনৈক মুসলমান সাধু। দিল্লী-নগরের কহম-রজুলের নিকটে তাঁহার সমাধিস্থির বিস্তারিত আছে। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।  
মহম্মদ বক্স, নৌরতন (নবরত্ন) নামক উর্দু কাব্যপ্রণেতা। ১২৩০ হিজরী, লক্ষ্মীগতি গাজি উদ্দীন হারদারের রাজত্বকালে তিনি উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। কবিত্ব-প্রতিভার জ্ঞাত তিনি মহম্মদ-আখ্যা লাভ করেন। এতদ্বিধ গুলস্ন নোবাহার ও চারচমাল নামে তাঁহার রচিত আরও দুইখানি কাব্য পাওয়া যায়।

মহম্মদ বকির, ইম্পাহান নগরের জনৈক প্রধান ধর্মযাজক (শেখ-উল-ইসলাম)। মহম্মদ বকির পুত্র। দেবতত্ত্ব, নীতি ও নৃতিশাস্ত্র এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জ্ঞানবান পণ্ডিত পারস্তরাজ্যে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। দিয়ারিগের ধর্মমতমৌলানাংর তিনি অধিতীর ও বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

তাঁহার বংশোদ্ভূত সমগ্র পারস্ত-রাজ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। শরৎ শাহ সুলেমান তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কন্ডাদান করিতে উত্তত হন। কিন্তু তিনি সংসারী হইতে অনিচ্ছুক এই মত প্রকাশ করিয়া শাহকে উক্ত প্রস্তাব হইতে নিরস্ত করেন। তৎকৃত 'হক্ক-উল-যেকীন্' সিরাসম্প্রদায়ের একখানি উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র। তাহাতে বিভিন্নবাদিগণের মত বিচার দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। এতদ্বিধ বহর-উল-আনবার প্রভৃতি তৎকৃত কএকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাওয়া যায়। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ বকির দমদ্ (মীর), আত্মবাদবাসী জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত, সৈয়দ মাস্কুদ দমড়ের পুত্র। ইনি পারস্তাধিপতি ১ম শাহ আব্বাসের কন্যাকে বিবাহ করায় দমড় আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইম্পাহাননগরে থাকিয়া তিনি কএকখানি গ্রন্থ সংকলন করেন; তন্মধ্যে উক্ক-উল-মুবীন ও সারা মুখত-সরের চীকা উল্লেখযোগ্য। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বকির (ইমাম), আলীবংশীয় ৫ম ইমাম। ইমাম জৈনউল্ আবেদিনের পুত্র। ৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম এবং ৭৩১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু ঘটে। মদিনানগরে ইহার সমাধি হয়।

মহম্মদ বিন আবুতুল আজিজ, সাহিদ-ব-মানি নামক প্রসিদ্ধ তুর্ক-গ্রন্থপ্রণেতা। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বিন আবদর রহমন্, কুফানগরবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ হাকিম ও কাজি। ৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বিন আবু বখর, ইসলামধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদের জালক ও প্রথম খলিফা আবু বকরের পুত্র। খলিফা আলী

কর্তৃক ইনি মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সামন্তরাজ অমর ইবন্ উল্ আশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া ইনি রাজা ১ম মুয়াবিয়ার সমীপে নীত হন। রাজ্যদেশে ইহার প্রাণদণ্ড হইলে গর্দভচর্মে সেই দেহ আবৃত করিয়া (৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) পোড়াইয়া দেওয়া হয়।

মহম্মদ বিন আব্দাদ, তর্জমা কতুহ আরবী নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। তিনি ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে একখানি আরবী গ্রন্থ হইতে মহম্মদের গৃহ-বিচ্ছেদ, আরবজাতির পরাজয় ও মহম্মদের অবনতি-স্বীকার প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করিয়া আবুবকরের (৬৩২ খৃঃ অঃ) খলিফা-পদপ্রাপ্তি হইতে কার্বালা যুদ্ধে হোসেনের মৃত্যু (৬৮০ খৃঃ অঃ) পর্যন্ত মহম্মদীয় ইতিবৃত্ত তর্জমা করেন।

মহম্মদ বিন আলী, আবুনাই উল্ জনান নামক আরবী গ্রন্থপ্রণেতা। গ্রন্থখানি ইসলামধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদ ও তৎপারিষদগণের ইতিবৃত্তপূর্ণ।

মহম্মদ বিন অমর (অৎ-তিমি), প্রধান প্রধান সিরাসিগের এক জীবনীচরিত।

মহম্মদ বিন ইসা তিশ্মিজি, জমা-তিশ্মিজি নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। ইনি অল্ বুখারির শিষ্য, ৮২২ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বিন ইস্, রিশালা আল্ মুয়াজ্জন্ কি অশাআর অল্ আজম্ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মহম্মদ বিন ইব্রাহিম, (সদর সিরাজী কপি উল্ কুজাৎ) উল্ হিয়াৎ নামক গ্রন্থের চীকাকর্তা। ইনি মোল্লা সদর নামেও প্রসিদ্ধ।

মহম্মদ বিন ইদ্রিস, (ইমাম), জনৈক মুসলমান গ্রন্থকার। ইনি ইসলাম-ধর্মের তৃতীয় সম্প্রদায়ের স্থাপনিত। ইনি প্রবাদমালা সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

মহম্মদ বিন ইস্হাক্ উনুনাতিম, কিতাব উল্ ফিরিস্ত নামক সুপ্রাচীন আরবী গ্রন্থপ্রণেতা। ৯৮৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থে আলেক-লরলা বা 'একাধিক সহস্র রজনী'-নামধের আরব্যোপজ্ঞাসের উল্লেখ আছে এবং উহা পারস্ত হইতে সংগৃহীত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মহম্মদ বিন কাসিম, প্রসিদ্ধ সিদ্ধবিজ্ঞেতা। খলিফা ১ম খালিদের ভ্রাতা এবং হিজ্জাজ বিন যুহফের জামাতা। তিনি ৭১১ খৃষ্টাব্দে উক্ত খলিফার আদেশে মুসলমান সেনা লইয়া সিদ্ধপ্রদেশ আক্রমণ করেন। প্রথমে দেবল-বন্দরে (মতান্তরে মনোরা বা ঠেটে) গদ্যর্পণ করিয়া তিনি নারায়ণকোট (নারায়ণকোট) অভিযুগে অগ্রসর হন। এখানকার



শাসনকর্তাকে কোশলে বন্দীভূত করিয়া তিনি শেবান (শিব-স্থান) দুর্গ জয় করেন। তদনন্তর পুনরায় নারাগকোটে আসিয়া সিদ্ধনদ পার হইয়া হিন্দুরাজ ডাহিরকে (৭১২ খৃঃ) আক্রমণ করেন। রাবলদুর্গে ডাহির নিহত হইলে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ মুসলমানের নিকট বন্দী হয়। একমাত্র ডাহিরপুত্র জয়সিংহ কাশ্মীরে পলাইয়া আশ্রয়লাভ করেন। অতঃপর কাসিম ব্রাহ্মণবাদ অধিকারপূর্বক আলোর-দুর্গজয়ে অভিলাষী হন।

৭১৩ খৃষ্টাব্দে আলোর জয় করিয়া তিনি ডাহির-রাজ-কন্যারকে দামাঙ্গাস্ নগরে প্রেরণ করেন। থলিকা খলিমান্ তাঁহাদিগকে শোকাপনোদনের জন্য অন্তঃপুরে রাখিয়া দেন। কিছু দিন পরে একদিন থলিকা ঐ কুমারীদ্বয়কে স্বীয় প্রকোষ্ঠমধ্যে আনাইয়া রূপলালসায় কামমুগ্ধ হন। রাজ-কন্যাদ্বয়কে স্বীয় মনোবাধ্য জানাইলে, কন্যাদ্বয় উত্তর করিল,— আমরা শাহজাদার উপযুক্ত নহি, যে হেতু মহম্মদ কাসিম প্রথমে আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া পরে আপনার উপভোগার্থ প্রেরণ করিয়াছে। থলিকা এবংবিধ বাক্যে ক্রোধাদীপ্ত সিংহের ত্রায় গর্জ্জন করিয়া অমৃচরুর্গের প্রতি আদেশ করিলেন যে, আজই মহম্মদ কাসিমকে টাটকা গোচর্মে বেঠন করিয়া দৃঢ়রূপে শিলাই করা হউক। অচিরে রাজ্যদেশ প্রতিপালিত হইল। তিন দিন এইরূপে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে করিতে কাসিমের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

কাসিমের মৃত দেহ থলিকার সম্মুখে আনীত হইলে, ঐ রাজবালাগণ প্রকৃত ঘটনা ও কাসিমের নির্দোষিতা ব্যক্ত করিল। তখন থলিকা ক্রুদ্ধ হইয়া রমণীদ্বয়ের কেশ অশ্বপুচ্ছে বাঁধিয়া রাস্তায় বোড় দৌড় করাইতে আদেশ দিলেন। এই-রূপে পঞ্চবর্ষে ও অশ্বের পদাঘাতে তাহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। রমণীদ্বয়ের দেহ নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত এবং বিন্ কাসিমের শরীর দামাঙ্গাস্ নগরে আনিয়া সমাধিস্থ করা হয়।

মহম্মদ বিন্ করম্ উদ্দীন, বহর উল্ ফজাএল নামক পারসী-অভিধানপ্রণেতা।

মহম্মদবিন্ খবন্দ শাহ (বিন্ মাক্দুদ), জটৈক বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক। ইনি পারস্যভাষায় রোজ্ উস্ সফা নামে একখানি মহম্মদীয় ইতিবৃত্ত রচনা করেন। সাধারণের নিকট ইনি মীর খবন্দ, আমীর খান্ বা মীর খোন্দ নামে পরিচিত। ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে ইনি মাবরুরহর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম দৈয়দ বুহান্ উদ্দীন খবন্দ শাহ। পিতার মৃত্যুর পর ইনি হিরাত-রাজ সুলতান হোসেন মীর্জার প্রধান মন্ত্রী আমীর আলী শেরের সহিত সুপরিচিত হন এবং

উক্ত মন্ত্রিবরের যত্নে, দয়ার ও উৎসাহে ইনি স্বীয় ইতিহাস-খানি সমাপন করেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে বালখ নগরে বহদিন রোগে ভুগিয়া ইহার মৃত্যু হয়। ইনি উক্ত ইতিহাসের ৬৪ অংশ পর্য্যন্ত লিখিয়া শয্যাশায়ী হন। তৎপরে ইহার পুত্র খোন্দামীর ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে তাহার ৭ম ভাগ সমাধা করেন। মহম্মদীয় ইতিহাসের মধ্যে এই গ্রন্থখানি নীৰ্ব্বাহনীয়।

মহম্মদ বিন্ তাহির ২য়, খোরাসানের তাহিরী জাতির শেষ নরপতি। ৮৭৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ইনি যাকুব বিন্ লাইস্ কর্তৃক ধৃত ও বন্দী হন; তদবধি খোরাসান-রাজ্য যাকুবের হস্তগত হয়।

মহম্মদ বিন্ তুনিশ (অল্ বুখারি), আবহুলা-নামা নামক কাশ্মীর সাগরোপকূলবর্তী উজ্জ্বল তাতার জাতির ইতিহাস-প্রণেতা। গ্রন্থখানি তিনি নিজাম উদ্দীন কোকল্-তামকে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে শাহবেগ খাঁ কর্তৃক অক্সস পরপারস্থ দেশ আক্রমণ, তৈমুর-বংশধরগণের পরাক্রম এবং সম্রাট্ অকবর শাহের সমসাময়িক রাজা আবহুলাহর ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

মহম্মদ বিন্-ফরাজ্, জটৈক মুসলমান ভণ্ড সাধু। আপ-নাকে কবরোখিত মুসা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া থলিক্ মৃত্যুকালের আদেশানুসারে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে করিতে তাহার প্রাণ সংহার করা হয়।

মহম্মদ বিন্ মাক্দাদ, (অল্-ইস্-করুদী) ফুজুল-অ-ইষ্ট্রুদী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। গ্রন্থখানি বাণিজ্য-ব্যাপারের বিশেষ উপযোগী।

মহম্মদ বিন্ মুসা, অল্-জরর বল-মুকাবিলা নামক বীজ-গণিতপ্রণেতা।

মহম্মদ বিন্ মুর্তাজা, মুফতিহ নামক সিয়াসুস্ত্রাদারের ধর্মশাস্ত্ররচয়িতা।

মহম্মদ বিন্ যাকুব, (অল্-কুলিনি), কাকি নামক আরবী গ্রন্থপ্রণেতা। কাকি সিয়াসুস্ত্রাদারের নিকট বিশেষ আদৃত।

মহম্মদ বিন্ যাকুব, (ফিরোজাবাদী) জটৈক প্রসিদ্ধ আভিধানিক। ইনি কমুল্-উল্-লুঘাট্ বহর উল্-মুহিং নামে একখানি আরবী অভিধান প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি আরবী সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন। আরবী ভাষাবিদ মাভেই তাঁহার বিভাবুদ্ধি দেখিয়া মোহিত হইয়া থাকেন। গ্রন্থখানি আরবরাজ বিন্ আব্বাসের করে উৎসর্গ করা হয়। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মহম্মদ বিন্ যাকুব (অল্-কলিমি অব্-রাজি), জমা উল্-কাকি-প্রণেতা। ইনি এই গল্পগ্রন্থ রচনা করিয়া রাইস্-উল্-



মুহম্মদীন উপাধি লাভ করেন। এই গ্রন্থখানি ৩০ অংশে বিভক্ত। গ্রন্থখানি সমাপন করিতে প্রায় ২০ বৎসর লাগিয়াছিল। এতদ্বিন্ন ইহার রচিত আরও একখানি খণ্ডগ্রন্থ পাওয়া যায়। ১৩৯ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ নগরে ইহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বিন্ যুযুফ, হিরাতবাসী জনৈক হাকিম। ইনি বহর উল্জবাহির নামে একখানি আরবী অভিধান প্রণয়ন করেন। প্রকৃতপক্ষে উহা শিল্প ও বিজ্ঞানবিষয়ক একখানি বিস্তৃত কোষগ্রন্থ।

মহম্মদ বিন্ যুযুফ, তারিখ-ই-হিন্দ নামক ইতিহাস-প্রণেতা। ইনি দিল্লীবাসী খাজা হসনের সমসাময়িক ছিলেন।

মহম্মদ বিন্ হুসেন, বদার উল্ হিদায়া নামক আরবী আইন-গ্রন্থ-প্রণেতা। এতদ্বিন্ন ইনি হযাৎ-উল্ কবান্দ নামে আরবী ও পারস্যী ভাষার মিশ্রণে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বুখারি, (সৈয়দ) জনৈক মুসলমান সাধু। সম্রাট শাহ জহান্ বাদশাহের রাজত্বকালে ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। তাজগঞ্জ রোজার পশ্চিমদ্বারে ইহার সমাধি-মন্দির অবস্থিত।

মহম্মদ-ই-বুখারি (সেখ), মোগল-সম্রাট্ অকবরশাহের জনৈক সেনাপতি। ইনি মীর্জা আজিজের সহকারী হইয়া গুজরাতে যুদ্ধ করেন। পতনের যুদ্ধে ইনি সদলে নিহত হন। সম্রাট্ অকবর শাহ ইহার বিদ্যাবত্তা ও বিশ্বাসিতায় প্রীত হইয়া ইহার ভরণ-পোষণের জন্ত আজমীড় প্রদেশে একখানি তুজুল এবং শেখ মুইন্-ই ফিত্তির সমাধিমন্দিরের খাদিম-পদ প্রদান করেন।

মহম্মদ-ই-বেগ, মীরণের অমুরক্ত জনৈক ছুরাচার। এই ছুরায়া বাল্যে আলৌবর্দী-মহিবীর অমুগ্রহে প্রতিপালিত হইলেও বদেখর সিরাজ উদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের ভার গ্রহণ করে। তদুদ্দেশ্যে সেহ নরপিশাচ তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে সিরাজের কারাগৃহে প্রবেশপূরক তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছিল।

মহম্মদ বেগ খাঁ (হাজি), অবোধা-প্রদেশের জনৈক সহকারী শাসনকর্তা। ইনি মালীর তালিবী প্রণেতা মীর্জা আবু তালিব খাঁর পিতা। ইস্পাহানের নিকটবর্তী আব্বাসাবাদ ইহার জন্মস্থান। ইহার তুর্কবংশোদ্ভব।

পারস্তরাজ নাদির শাহের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া হাজি জম্মুভূমি হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। গুণগ্রাহী নবাব আবুল মনসুর খাঁ সফদর জঙ্গ ইহার গুণের পরিচয় পাইয়া ইহাকে আশ্রয় দেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে অবোধার সহ-

কারী শাসনকর্তা রাজা লবণ রায়ের মৃত্যু ঘটিলে নবাব-ভ্রাতৃ-পুত্র মহম্মদ কুলী খাঁ তৎপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে নবাবের আদেশে হাজি সাহেব তাঁহার প্রধান সহায় হইয়া গমন করেন। সূজা উদ্দৌলার বিদ্রোহে মহম্মদ কুলী নিহত হইলে ইনি মুর্শিদাবাদে পলাইয়া আইগেন। এখানে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ শফিয়া, মীরাট্-উল্-বাদিয়াৎ নামক ইতিহাস-প্রণেতা। দিল্লীনগরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে তিনি সম্রাট্ অকবর শাহ হইতে নাদির শাহ কর্তৃক ভারত-ক্রমণ পর্যন্ত মোগল-সাম্রাজ্যের যাবতীয় ঘটনা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মোগল-সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে জনৈক সম্রাট্ ওমরাহের এরোচনায় এই গ্রন্থ রচিত হয়।

মহম্মদ শরফ, বাঙ্গালার জনৈক মুসলমান কাজী। ইনি পাণ্ডিত্য, ধর্মজ্ঞান ও সাধুতার জন্ত বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেব ইহার সদৃশগাবলী নির্দীক্ষণ করিয়া ইহাকে কাজী পদে নিযুক্ত করেন। বিচারকার্যে মুর্শিদকুলী খাঁ সফদাই ইহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

কোন এক সময়ে জনৈক মুসলমান ফকীর চুণাখালির ভূমিদার বৃন্দাবনের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করে। ফকীরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বৃন্দাবন তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর, সে কতকগুলি ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনের বাটীর সম্মুখের পথে এক প্রাচীর নির্মাণ-পূর্বক তাহাই আপনার মসজিদ বলিয়া ঘোষণা করিয়া লোক-দিগকে তথায় উপাসনা করিবার জন্ত আহ্বান করে। বৃন্দাবন পথে বাহির হইলেই, সে বিধম চীৎকারপূর্বক আজান দিত।

বৃন্দাবন তাহার এই ব্যবহারে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেন। ভক্ত ফকীর মুর্শিদকুলীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। মুসলমান-পণ্ডিত-সভাধিষ্ঠিত প্রধান কাজী শরফ বিচার করিয়া বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। এতলে কুলীখাঁর প্রাণদণ্ড দিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি নির্দোষ হিন্দুর প্রাণরক্ষার জন্ত কাজী সাহেবকে বিস্তর অমুনপূর্বক কোন উপায়ে এই কঠোর শাস্তির প্রতিবিধান করা যায় কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্মাবতার কাজী তদুত্তরে বলিলেন যে, উহার জন্ত অমুরক্ত ব্যক্তির প্রাণবধ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু মাত্র সময় অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

কুলী খানের সমস্ত বস্ত্রই বিকল হইল। সুলতান আজিম-উসমানাবাদশাহের নিকট বৃন্দাবনের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনার অমু-

রোধ করিলেও কোন ফল হইল না। কারণ কাজী স্বহস্তে বাণনিষ্ক্ষেপপূর্বক পূর্বেই অভাগার প্রাণবধ করিলেন। এই হত্যাসংবাদ আজি মুসলমান বাদশাহ অরঙ্গজেবের নিকট পাঠাইলেন এবং শরফুদ্দিন হইয়া স্বয়ং বৃন্দাবনকে নিহত করিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। বাদশাহ ঐ পত্রের উপর স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, “কাজী শরফ খোদাকান্তরফ”। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কাজী শরফ কন্সত্যাগ করেন, কুলী খানের শত অশ্বিনয়েও তাঁহার মন টলে নাই।

মহম্মদশরিফ হুসাইন, আয়নক-এদিল নামক রসময় কাব্য-প্রণেতা। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়।

মহম্মদশরিফ (খাজা), পারস্তরাজ ১ম শাহ তহমাস্প সফাবির মন্ত্রী। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ শাকী, জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক।

[ মৃত্যুইদ খাঁ দেখ। ]

মহম্মদ শালা (শেখ), বেহার-চমানে নামক গ্রন্থরচয়িতা।

মহম্মদ শালা (মীর কাশফী), জনৈক মুসলমান কবি। ইনি সম্রাট শাহজাদার ও শাহজাদার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইহার রচিত মজমুয়া-রাজ নামক তর্জিমান গ্রন্থ ১৬২১ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে আগ্রা নগরে ইহার মৃত্যু ও কবর হইয়াছিল।

মহম্মদশালা কনু, অমলশালা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মহম্মদশালা (মীর্জা) তাজিকবাসী জনৈক ওমরাহ। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি পারস্ত পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে আসিলেন। দিল্লীতে আসিয়া ইনি সম্রাট অকবর শাহের সাক্ষাৎ লাভ করেন। উক্ত সম্রাট ইহার সম্মানস্বরূপ প্রথমে মনসবি-পদ ও পরে গুজরাতের শাসনকর্তৃপদ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি সিপাহীদার খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ মুরাদের মৃত্যুর পর, যুবরাজ দানিয়েল নিজামশাহী রাজগণের নিকট হইতে আকদনগর অধিকার করিলে সিপাহীদার খাঁ এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মহম্মদশালা, (মীর্জা), লতাএফ-খায়াব নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। এই গ্রন্থে তিনি পূর্ববর্তী মহাকবিগণের উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

মহম্মদশাহ, দিল্লীর জনৈক মুসলমান রাজা। ইনি খিজির খাঁর পৌত্র ও ফরিদ উদ্দীনের পুত্র। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র-তাত যুবরাজ শাহকে হত্যা করিয়া ইনি সিংহাসন অধিকার করেন। দ্বাদশ বর্ষ রাজত্বের পর ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদশাহ, গুজরাতের জনৈক নরপতি। ইনি ১৪৪৩

খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পত্নী কর্তৃক বিষপ্রয়োগে ইহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ শাহ, মালবাধিপতি হোসঙ্গ শাহের পুত্র। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃ-সিংহাসনের অধিকারী হন। নয় মাস রাজত্বের পর, রাজমন্ত্রী মালিক মুবীশের পুত্র মহম্মদ খাঁ ইহাকে বিষ খাওয়াইয়া শমনসদনে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং মাক্কদ শাহ খিলজি নাম গ্রহণ করিয়া রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

মহম্মদশাহ, পারস্তের জনৈক রাজা, আকাস মীর্জার পুত্র ও কথু আবুশাহের পৌত্র। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধি-রোহণ করিয়া ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা শেষ করেন।

মহম্মদশাহ, (আদিল বা আদিলী), ১ শূরবংশীয় জনৈক আফগান বীর। ইনি শের শাহের ভ্রাতা ও নিজাম খাঁ শূরের পুত্র, ইহার প্রকৃত নাম যুবরাজ খান। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সেলিম শাহের নাবালক পুত্র ফিরোজকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিয়া ইনি মহম্মদ শাহ আদিল নাম লইয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

মহম্মদ নিজে মূর্থ ছিলেন, সুতরাং বিধানের সংসর্গে ইহার আদৌ ভাল লাগিত না। অজ্ঞ লোকেরই ক্রমে রাজ-সরকারে প্রতিপত্তি বিস্তার করিল। তাহাদের মধ্যে হিন্দু একজন। এই ব্যক্তি জাতিতে হিন্দু বটে, কিন্তু বিশেষ কদা-চারী। সেলিম শাহ তাহাকে বাজারের অধ্যক্ষ করিয়া যান। মহম্মদ তাহাকেই রাজকাষের সর্বস্বস্বীকার করিলেন, মহ-ম্মদের প্রায় পাইয়া হিন্দুক্ষমতা দিন দিন পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ক্রমে আফগান সামন্তগণ মহম্মদের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্রোহি-দল রাজকামাতা ইব্রাহিম খাঁ শূরকে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিল।

মহম্মদ উপায়ান্তর না দেখিয়া চুপারে পলায়ন করিলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে বদেখের বাহাদুর শাহের সহিত মুন্সের-যুদ্ধে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। তিনি ১১ মাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহম্মদশাহ, (সৈয়দ)-জমা-উল-দস্তুর নামক আইন গ্রন্থ-প্রণেতা। পাণ্ডুয়াবাসী সৈয়দ বাণীর পুত্র। ইনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় গ্রন্থ সমাপন করেন।

মহম্মদশাহ, তৈমুর শাহের পুত্র এবং আকদ শাহ আবদালির পৌত্র। তিনি দোস্ত মহম্মদ খাঁ কর্তৃক কাবুল হইতে তাড়িত হইয়া হিরাত অধিকার করেন। কয়েক বৎসর এই নগরী শাসন করিবার পর ১৮২৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তদীয় পুত্র কামরান সিংহাসন গ্রহণ করেন।

মহম্মদ শাহ, (বাক্কাগী ১ম), দাক্ষিণাত্যের বাক্কাগীবংশীয় ৫ম সুলতান। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৩৭৮ খৃঃ অঃ খ্রীঃ ভ্রাতা দাউদ শাহকে নিহত করিয়া ‘কুলবর্গা’ নগরে তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। প্রায় বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৩৯৭ খৃঃ অঃ জ্বররোগে প্রাণ-ত্যাগ করেন। অনন্তর তদীয় পুত্র গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সাহিত্যের বিশেষ আদর করিতেন এবং সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। পঞ্চ তাঁহার অধিকৃতর প্রিয় জিনিস ছিল এবং তিনি নিজেও সুলতান সুলতান করেকটা পঞ্চ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে আরব ও পারস্য দেশ হইতে অনেক কবি দাক্ষিণাত্যে আসিয়া তাঁহার উদারতার বিশেষরূপ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। বিচারপতি মীর ফৈজুল্লা আনজু একদিন তাঁহাকে একটা ক্ষুদ্র কবিতা উপহার দিয়াছিলেন। এই কবিতা শ্রবণে বাদশাহ এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দানে বধাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া দেশে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার শাসনকালে বিখ্যাত কবিবর হাফেজ দাক্ষিণাত্য দর্শনের মানস করেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার সে কামনা অর্পণ থাকিয়া যায়।

মহম্মদ শাহ (২য়) বাক্কাগীবংশের ১৩শ সুলতান। হুমায়ুন শাহের পুত্র। ১৪৬৩ খৃঃ অঃ ভ্রাতা নিজাম শাহের মৃত্যুর পর তিনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে মহম্মদ শাহ বয়ঃক্রম নবম বর্ষ মাত্র। তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু এ সময়েও রাণীমাতার আদেশানুসারে খাজা জহান ও খাজা মাক্কুদ গবান্ন রাজকার্য্যপধ্যালোচনা করিতেন। ইনি ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৮২ খৃঃ অঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মহম্মদ শাহ দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজত্বসময়ে নানারূপ আত্মকলহ ও বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্কাগীবংশের গৌরবরবি অন্তমিত হইয়া যায়। তৎপূর্বে যে সমস্ত রাজগণ বাক্কাগী-রাজকে যৎসামান্য কর প্রদান করিতেন, মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর, তাহারাই সে সমস্ত কর বন্ধ করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর তৎপুত্র সুলতান (২য়) মাক্কুদশাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

মহম্মদ শাহ (১ম), গুজরাতের জনৈক অধিপতি। ইঁহার আসল নাম বৈকার। মহম্মদ শাহের পুত্র এবং কুতব উদ্দীন বা কুতব শাহের ভ্রাতা। ইঁহার যুগ্মভ্রাতা দাউদ শাহের মৃত্যুর পর ১৪৫৯ খৃঃ অঃ গুজরাতের সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৪৮৭ খৃঃ অঃ আন্ধ্রাবাদ নগরের চতুঃপার্শ্বে প্রাচীর ও বুরুজ নির্মাণ করেন। নগরটি সূক্ষ্মরূপে প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া ফটকের উপরে শিলাকলকে লিখিয়া রাখিলেন, “ইঁহার মধ্যস্থ ব্যক্তির কোন বিপদের আশঙ্কা নাই”। তিনি দাক্ষিণাত্য-বিজয়াকাজী হইয়া দুইটা অভিযান করিয়াছিলেন। ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১১ খৃঃ অঃ পরলোক গমন করেন। আন্ধ্রাবাদের নিকটে মরকিজ নামক স্থানে তাঁহার কবর হয়। অনন্তর তদীয় পুত্র ২য় মুজফ্ফর শাহ সিংহাসন অধিকার করেন।

মহম্মদ শাহ (২য়), গুজরাতের জনৈক মুসলমান রাজা। ইঁহার নামির খাঁ নাম ছিল। ইনি ২য় মুজফ্ফর শাহ তৃতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেকন্দর শাহকে নিহত করিয়া ১৫২৬ খৃঃ অঃ গুজরাতের সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি কেবলমাত্র ৩ মাস কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর শাহ জৌনপুর হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। ১৫২৭ খৃঃ অঃ মহম্মদ শাহের মৃত্যু হয়।

মহম্মদ শাহ (৩য়), গুজরাতের জনৈক রাজা। বাহাদুর শাহের ভ্রাতা লতিক খাঁর পুত্র। ১৭৩৭ খৃঃ অঃ মিরান্ন মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তিনি গুজরাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পঠীগুজরা সমুদ্রতীরবাসী মুসলমানদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিত; এই নিমিত্ত তিনি ১৭৪০ খৃঃ অঃ সুরাট-দুর্গ নির্মাণ করেন। মহম্মদ শাহ ১৮ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করেন। ১৫৫৩ খৃঃ অঃ বাদশাহের খ্রীঃ ধর্মোপদেশক বর্হান জনৈক দৌলতকে নিযুক্ত করিয়া নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। এই বৎসরেই দিল্লীর রাজা সলিম শাহ এবং আন্ধ্রনগরের সুলতান নিজাম শাহ বড়ীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনা অতাপিও মুসলমানগণের মধ্যে “জবাল খুসরোয়াল” অর্থাৎ “রাজ-সংহার” বলিয়া অভিহিত হয়। অতঃপর ২য় আন্ধ্র শাহ তাঁহার স্থান অধিকার করেন।

মহম্মদ শাহ (২য়), মালবের জনৈক সুলতান, নাসিরুদ্দীনের তৃতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর মহম্মদ শাহ ১৫১১ খৃঃ অঃ মালবের সিংহাসন অধিকার করেন। ১৫৩১ খৃঃ অঃ গুজরাতের রাজা বাহাদুর শাহ মালবরাজ্য অধিকারপূর্বক মহম্মদ শাহ এবং তাঁহার ৭টা পুত্রকে বন্দী করিয়া স্বীয় কারাগারে আবদ্ধ করেন। অবশেষে তাঁহাকে চাম্পারণ দুর্গে প্রেরণ করিবার সময় পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণ বিরোগ হয়। বাতাবিক অবস্থায়, কি গুপ্তঘাতক কর্তৃক তিনি নিহত হন, এ

বিষয়ে স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার পর মালব ওজরাতপতির রাজ্যভুক্ত হয়। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর কাদের খাঁ ও শুজা খাঁ ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর মালবে রাজত্ব করেন। শুজা খাঁর পর তদীয় পুত্র রাজা বাহাদুর ১৫৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় সম্রাট অকবর সম্পূর্ণরূপে মালব দখল করিয়া লইলেন।

মহম্মদ শাহ, একজন দিল্লীসম্রাট, অরঙ্গজেবের পৌত্র ও জাহান্ন শাহের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম মহম্মদ রোশন অখ্-তর। জাহান্নদার শাহের মৃত্যুর পর বালক রোশন অখ্-তর মাতা মরিয়াম মুকানীর সহিত দিল্লীহুর্গে অবস্থান করিতেন। বাল্যকালে রূপে ও গুণে ইনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

রফি-উদ্দৌলা ৩ মাস ২ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া জীবলীলা শেষ করিলেন। তখন আবদুল্লা ও হুসেন আলী নামক সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মোগল-সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা। সৈয়দ আবদুল্লা অবিলম্বে মহম্মদকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। ১৫ই জিল-তদা ১১৩১ হিজরী ( ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ১৮শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ) মহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ‘আবুল মুজফ্ফর নাসিরুদ্দীন মহম্মদ শাহ বাদশাহ-ই-গাজী’ নামে তাঁহার মুদ্রা প্রচারিত হইল।

তাঁহার মাতা বুদ্ধিমতী ও রাজকার্য্যে দক্ষা ছিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে স্থির হইল যে, ফরখ-সিরারের রাজ্যচ্যুতি হইতে মহম্মদ শাহের অভিষেক গণিত হইবে। সম্রাট-মাতার জন্ম মাসিক ১৫ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল।

পূর্ববৎ সৈয়দ আবদুল্লার লোকেরাই নাকির ও অপরা-পর রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত রহিল। এমন কি, সম্রাট যখনই বাহির হইতেন, সকল সময়েই সৈয়দের বিখাসী অমুচরবর্গ তাঁহার সহিত থাকিত। সৈয়দের অমুমতি ভিন্ন কোন কার্য্যেই তাঁহার আদেশ দিবার অধিকার ছিল না।

মীর জুমলা প্রধান বিচারপতি হইলেন। আর সৈয়দের প্রিয়পাত্র রতনচাঁদ দেওয়ানী, রাজস্ব ও ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় সকল কর্ম্মে প্রধান রহিলেন। সহরের কাজী প্রভৃতি উচ্চ রাজকীয় পদ-নিয়োগের ভারও রতনচাঁদের হাতে ছিল। এমন কি, তাঁহার শীঘ্রমোহর ভিন্ন কেহ কোন কাজ করিতে পারিত না।

ছবিলারাম নাগর আলাহাবাদের সুবাদার ছিলেন। তিনি সৈয়দের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। সৈয়দ হুসেন আলী তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্তচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র গিরিধর সৈন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিল্লীখয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ অবগত

হইয়া সৈয়দদ্বয় মহম্মদ শাহকে কতেপুর হইতে আগ্রা আনি-লেন এবং যমুনার সেতু বাধিয়া আলাহাবাদ অবরোধের আয়োজন করিলেন।

গিরিধর সংবাদ প্রাপ্তিমাাত্র লোক পাঠাইয়া গোল মিটা-ইয়া ফেলিলেন। সৈয়দেরা তাঁহাকে অযোধ্যার সুবাদারী ও “বাহাদুর” উপাধি দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু গিরিধর তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি উপযুক্ত রসদ ও দলবল সংগ্রহ করিয়া আলাহাবাদ দুর্গ অদৃষ্ট করিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়ে পাছে অপরাপর সুবাদার ও জায়গীরদারগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে ও রাজস্ব আদায়ের ব্যাঘাত ঘটে, সে ভয় দরবার চিন্তিত হইলেন। সৈয়দেরা গিরিধরকে অভয় দান করিলে তিনিও দুর্গ সমর্পণ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। সম্রাট অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া দিল্লীতে ফিরিলেন, কিন্তু অবিলম্বে শুনিলেন যে, গিরিধর তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছেন না। তখন আবার তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিলেন। গিরিধর সম্রাটকে জানাইলেন যে, রতনচাঁদ যদি তাঁহার নিকট আসিয়া সকল বিষয় মীমাংসা করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি সম্রাটের আজ্ঞাপালনে সম্মত আছেন। তদনুসারে সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় রতনচাঁদকে পাঠাইয়া দিলেন। রতনচাঁদ গিরিধরের নিকট উপস্থিত হইলে, ‘উভয়ে উভয়ের অনিষ্ট করিবেন না’ গজাজল স্পর্শ করিয়া উভয়ে এইরূপ শপথ করিলেন। স্থির হইল যে, গিরিধর অযোধ্যার সুবাদারী ব্যতীত আরও এককটি কোজ-দারী পাইবেন। অতঃপর গিরিধর আলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় আগমন করিলেন। মহম্মদ শাহের রাজ্য-রস্ত্রে গিরিধরের বিদ্রোহ ও তাঁহার সহিত সন্ধিই প্রধান ঘটনা।

সৈয়দদ্বয়ের প্রভাব সম্রাটের ক্রমেই অসহ্য হইতে লাগিল। তাঁহার মাতাও কিসে সৈয়দদ্বয়ের হস্ত হইতে রাজ্য ও পুত্রকে রক্ষা করিবেন, সর্ব্বদাই তাহার চিন্তা করিতেন। মাতা ও পুত্র উভয়েই ইতিমাদ উদ্দৌলার সাহায্যে নিজাম উলমুলুকে জানাইলেন যে, তাঁহারা রাজশক্তি হারাইয়াছেন। ওজবাবের ভজনা ভিন্ন আর কোন কার্য্যে তাহাদের স্বাধীনতা নাট। নিজাম পুরুষাত্মক্রে মোগলসাম্রাজ্যের হিতৈষী। এখন তিনি উপযুক্ত রাজভক্তিপ্রদর্শন করিতে কখনই বিমুখ হইবেন না, ইহাই তাঁহাদের আশা।

নিজাম উল্ মুল্ক সৈয়দদ্বয়ের আচরণে বুঝিলেন যে, ধর্ম্ম-রাজ্য ও মোগলশাসন লোপ করিবার জন্ত তাহাদের চেষ্টা। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎপরে দক্ষিণপথে আদিয়া নানা স্থান অধিকার-পূর্ব্বক শক্তিসঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

নিজাম্ উল্ মুল্কেয় প্রতাপ ও ক্ষমতাবৃদ্ধির সংবাদে সৈয়দদ্বার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। এখন উভয় ভ্রাতা স্থির করিলেন যে, জ্যেষ্ঠ আব্দুল্লা খাঁ দিল্লীতে গিয়া থাকিবেন ও হুসেন আলী খাঁ সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া নিজাম্ উল্ মুল্কেয় শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিবেন। এই অভিযানে প্রভুত সৈন্য প্রয়োজন, কিন্তু সাধারণে সৈয়দের উপর এতই বিরক্ত হইয়াছিল যে, অনেক চেষ্টায় পকাশ হাজারের অধিক সৈন্য মিলিল না। হুসেন তাহা লইয়াই দক্ষিণদেশে ধাবিত হইলেন।

এই সময়ে হুসেনের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। ইতিমাদ্ উদৌলা মহম্মদ ও সাদত খাঁ এই ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক। হুসেন খাঁ সসৈন্তে কতেপুরের ৩৫ কোশ দূরে তোরী নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইতিমাদ্ উদৌলা অশুস্থতায় ভাণ করিয়া সম্রাটের শিবির হইতে চলিয়া গেলেন। সম্রাট নিজ বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলে, হুসেন আলী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন। রাজশিবিরের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলে, মীর হারদর খাঁ একখানি দরখাস্ত লইয়া তাঁহার হস্তে দিয়া ইতিমাদ্ উদৌলার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। হুসেন আলী সেই দরখাস্ত পড়িতে লাগিলেন, তাঁহার শরীররক্ষিণগণও সেই সময়ে একটু তফাতে ছিল। এই সুযোগে হারদর খাঁ অকস্মাৎ খড়্গ বাহির করিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ভায়া হুসেনকে আক্রমণ করিল, এক আঘাতেই সৈয়দ হুসেনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

হুসেনের ভাগিনের নুরুজা খাঁ সঙ্গে যাইতে ছিলেন, তাঁহার অস্ত্রাবাতে হারদর খাঁ অবিলম্বে পরলোকে প্রেরিত হইল। এই সময়ে চারিদিকে গোলমাল হইয়া উঠিল। মোগলেরা সৈয়দের পক্ষীয় লোকদিগের উপর তীব্র ও গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। এই দারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র হুসেনের ভ্রাতৃপুত্র ইজ্জত খাঁ অবিলম্বে আপন হস্তীর উপর চড়িয়া ৪৫ শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সম্রাটের বাসগৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সম্রাটের বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া সাদত খাঁ ইতিমাদ্-উদৌলার পরামর্শে অবিলম্বে সম্রাটের বিশ্রামগৃহে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের মাতা সাদত খাঁকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি সেই নিষেধ অগ্রাহ করিয়া মুখে শাল ঢাকা দিয়া সম্রাটের কাছে উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া ইতিমাদ্-উদৌলার হস্তীর উপর বসাইলেন। বিখাসী ও প্রভুতত্ত্ব ভৃত্যের ভায়া ইতিমাদ্ উদৌলা সম্রাটের শরীররক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। বাড়ার সৈয়দপক্ষীয় আত্মীয় স্বজন ইজ্জত খাঁর পক্ষে থাকিয়া মোগলসৈন্য আক্রমণ করিল। সম্রাটের

বিখাসী অল্পচর ও মোগলসৈন্যগণ আসন্ন বিপদ্ হইতে প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর গুলির আঘাতে ইজ্জত খাঁ শমনসদনে প্রেরিত হইলেন, সেই সঙ্গে সৈয়দপক্ষীয় সৈন্যবল সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। মহম্মদ শাহেরই জয় বিঘোষিত হইল।

সম্রাট নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমাদ্ উদৌলা উদারতা প্রকাশপূর্বক রতনচাঁদকে আহ্বান করিলেন। পথে দ্রুত মোগলহস্তে তিনি যথেষ্ট নিগৃহীত হইলেন। বাহা হউক, ইতিমাদ্ উদৌলা তাঁহাকে আর প্রাণে মারিলেন না, তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন। রায় শিরোমণি দাস নামে কায়স্থ-জাতীয় সৈয়দ আব্দুল্লায় একজন বিখাসী নাএব কেশমুণ্ডন করিয়া সরাসী সাজিয়া সে যাত্রা মোগলের কবালকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ইতিমাদ্ উদৌলা এখন আট হাজারী মনসবদার, আট হাজারী দোআম্প ও উজীরপদ লাভ করিলেন। আর আর বাহারী সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই পদবৃদ্ধি হইল।

সৈয়দ আব্দুল্লা ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদে মর্মান্বিত হইলেন। এখন দিল্লীস্থ আমীরদিগকে হাত করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। হুসেন আলীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মেবাতি ও অপরপর কমিদারগণ আব্দুল্লায় বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিল। তাহার সৈয়দের বাহা পাইল, লুঠিয়া অথবা কাড়িয়া লইতে লাগিল। বাহা হউক, সৈয়দ তাহাতে দমিবার লোক নহেন। তিনি অবিলম্বে দিল্লীর সুবদার নজমুদ্দীন আলী খাঁকে উপযুক্ত সৈন্যসংগ্রহ করিবার জন্য আদেশ পাঠাইলেন। নজম্ উদ্দীন রাজকাধোয় একটা নিষ্পত্তি করিবার জন্য আব্দুল্লায় দূতগণকে জাহান্দার শাহের পুত্রগণের নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈয়দের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে রক্ষি উম্ম শানের পুত্র সুলতান ইব্রাহিম রাজপদগ্রহণে ও সৈয়দদিগকে রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। ১১৩২ হিজরা (১৭২০ খৃষ্টাব্দ) ৯ জিল-হজ্জ সুলতান ইব্রাহিম “আবুল কতে জহীরুদ্দীন মহম্মদ ইব্রাহিম” নাম ধারণপূর্বক দিল্লীসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ইহার দুই দিন পরে সৈয়দ আব্দুল্লা আসিয়া ইব্রাহিমের আত্মগত্য স্বীকার করিলেন। ইব্রাহিম তাঁহাকে আমীর উল্ ওমরা ও আট হাজারী মনসবদার, নজমুদ্দীন খাঁকে ২২ বকসী, সলাবৎ খাঁকে ৩২ বকসী ও বৈরাম খাঁকে ৪র্থ বকসী করিলেন। রফিউদ্দারজাতের সময় বে সকল অমাত্য ও আমীর বন্দী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তি পাইলেন এবং

নতুন সম্রাটের আদেশমতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মাসিক ৮০ টাকা বেতনে অখারোহী সৈন্ত নিযুক্ত হইতে লাগিল। বহু সৈন্ত সংগ্রহ করিবার জন্য ৪০৫০ হাজার টাকা দান দেওয়া হইল।

সম্রাট মহম্মদ শাহ যথাসময়ে রণসজ্জার সংবাদ পাইলেন। তিনিও দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সৈয়দ আব্দুল্লাপক্ষীর সৈন্তগণের মধ্যে অনেকেই মহম্মদের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, এখন আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে সুলতান ইব্রাহিমের অভ্যুদয়-সংবাদ পাইয়া তাহার। মহম্মদ শাহের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আবার দলে দলে আসিয়া সৈয়দ আব্দুল্লাহর সেনাদলে মিলিত হইল।

১২ই মহরম দিবস আব্দুল্লাহ সৈয়দে আসিয়া হুসেনপুরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে মহম্মদ শাহ সদলে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় সম্রাটের সৈন্ত অপেক্ষা আব্দুল্লাহর সৈন্তসংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক। আব্দুল্লাহর পক্ষেই জয়শার অধিক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ধর্মের জয় চিরকাল। আব্দুল্লাহর পক্ষে বহু সৈন্ত পাকিলেও সৈন্তচালনা ও অধিনেতৃত্বের অশৃঙ্খলা ছিল না। সুলতান সেনাপতিই স্ব স্ব প্রধান, যে যেখানে মনে করিল স্ব স্ব স্বতন্ত্রপতাকা লইয়া যুদ্ধার্থে উঠিল।

সম্রাট নিজে গজারোহণে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সৈন্ত পরিচালনা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধারম্ভে মঙ্গল চিহ্নস্বরূপ সম্রাটের আদেশে রতনচাঁদের মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া হস্তিপদ-তলে নিক্ষিপ্ত হইল। ভীমগর্জনে চারিদিকে মহাধুম আচ্ছন্ন করিয়া শত্রুর উপর গোলা-বর্ষণ চলিতে লাগিল। সেই মহানলের সন্মুখে দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া কত শত প্রবীণ সৈন্ত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। বাড়ার সৈয়দগণ জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। দিব্যবাসনে তাহাদেরই জয় হয় হয়, কিন্তু হঠাৎ সম্রাট-পক্ষীয় একজন মহাবীর ভীমবিক্রমে সৈয়দদিগের কামান দখল করিয়া বসিল, সুতরাং তাহাদের আশা ভরসা ফুরাইল। সে রাত্রিতে বাড়ার সৈয়দগণ অনাহারে, তৃষ্ণার ও অনিদ্রায় যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিল। পরদিন উভয়পক্ষ মহোৎসাহে আবার যুদ্ধ চালাইল। আজও সম্রাট নিজে সৈন্তগণকে উৎসাহিত করিয়া শত্রু প্রতি অন্ত্রনির্ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এরূপ মহাযুদ্ধ অনেক দিন হয় নাই।

অবশেষে সৈয়দ আব্দুল্লাহ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। মহম্মদ শাহ জয়োন্মাদে দিল্লীতে ফিরিলেন এবং তাঁহার পক্ষীয় বীরগণকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়া সম্মানিত করিলেন।

নিজাম্ উল মুল্ক দক্ষিণ হইতে আহুত হইলেন। তিনিই প্রধান উজীরপদ পাইলেন। তিনি সাম্রাজ্যের স্বশাসনের জন্ত ও রাজস্ববিভাগে অশৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য নতুন নিয়ম চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষগণের কুপরামর্শে সম্রাট তাঁহার সংপরাশর্শে কর্ণপাত করিতেন না।

সম্রাটের বয়স অল্প, বয়সের উপযুক্ত অনেক অসং সঙ্গীও ছুটিয়া ছিল। সম্রাট তাঁহাদের তোষামোদে ভুলিতেন। কিন্তু সাধারণের প্রকৃত হিতকর কার্যে মন দিতেন না। অনেক সময় তিনি তাঁহার এক বেথোর কথামত অবৈধ কাজ করিয়া বসিতেন। যতকাল সৈয়দদ্বয় প্রবল ছিলেন, তত কাল তাঁহার সাধ্যায়ত্ত না হইলেও হিতকথা শুনিতেন ও তদ-নুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেন। এখন সেদিন গিয়াছে, তাঁহার মাথার উপর কেহ নাই। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কথা কর সাধ্য কার? তাঁহার হৃদয় উদার হইলেও, তিনি প্রজার বিষয় ভাবিবার সময় পাইতেন না।

তাঁহার রাজত্বের ৫ম বর্ষে আজমীরপতি অজিতসিংহ বশতা স্বীকার করেন। ৬ষ্ঠ বর্ষে নিজাম্ উল মুল্ক সম্রাটের ব্যবহারে মনঃক্ষুব্ধ হইয়া দক্ষিণপথে আসিয়া (মুমারিজ উল মুল্ককে নিহত করিয়া) দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। ৭ম বর্ষে রোহিলাবিদ্রোহ-দমন, ১০ম বর্ষে বুন্দেলাপতি ছত্রশালকে দমন করিবার জন্য মহম্মদ খাঁ বঙ্গের অশীতি সহস্র অখারোহীসহ গমন, ১২শ বর্ষে মহারাত্রিনারক বাজীরাও কর্তৃক মালবের স্ববাদারী রাজা গিরিধরের পরাভব ও রাজা ছত্রশালের পক্ষসমর্থন, ১৪ বর্ষে রাজা সবাই জয়সিংহের মালবের স্ববাদারী পদলাভ, ১৭শ ও ১৮শ বর্ষে মহারাত্রীগণের অত্যাচার ও মহারাত্রী কর্তৃক জয়পুর, উদয়পুর, মাড়বার প্রভৃতি রাজ্য লুণ্ঠন ও তাহাদের সহিত মধ্যে মধ্যে মোগল সৈন্তের ঋণযুক্ত সংঘটিত হয়।

[ পেশবা ও মহারাত্রী দেখ। ]

ইহার পর মহারাত্রী-প্রভাবে দিল্লী সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। (১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে) বাজীরাও দিল্লীধরের নিকট মালব ও গুজরাত ছাড়িয়া দিবার সন্দেহ চাহিয়া পাঠাইলেন। সম্রাটের ইচ্ছা থাকিলেও তিনি অমাত্য-বর্গের পরামর্শানুসারে পেশবার আকাজক্ষা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু অমাত্যবর্গের মন্ত্রণামত তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজত্বের মধ্য হইতে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে আদায় করিয়া লইতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। দিল্লীদরবারের বিশ্বাস ছিল যে, দাক্ষিণাত্যের আয় হইতে চৌথবাদে আবার শতকরা ২৫ টাকা লইতে গেলেই নিজাম্ উল-মুল্কের সহিত পেশবার



বুদ্ধ অবশ্রম্ভাবী, অথবা নিজাম উলমুলুকে দিল্লীর সাহায্য লইতে হইবে। কিন্তু বাজীরাও সম্রাটের প্রস্তাবে সন্মত না হইয়া পূৰ্ব্বে জেদ্দ বজায় রাখিলেন। অবশেষে সম্রাট মরাঠাদিগকে মালব হইতে বিতাড়িত করিবার আয়োজন করিলেন। খাঁ দৌরান্ ও কয়াম উদ্দীন খাঁ নামক দুইজন বিচক্ষণ সেনাপতি সৈন্তে বাজীরাওর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। এই সময় অবোধার সুবাদার সাদত আলী হোলকরকে পরাজয় করিয়া মথুরায় আসিয়া খাঁ দৌরানের সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে বাজীরাও সংবাদ পাইয়া ভীষবেগে দিনে ২০ ক্রোশ চলিয়া অতি শীঘ্র দিল্লীর নিকট আসিয়া পড়িলেন। তখন সম্রাটের অধিকাংশ সৈন্তই দিল্লী ছাড়িয়া গিয়াছে। সম্রাট ক্ষুণ্ণিত হইলেন, মুজফ্ফর খাঁর অধীনে ৮০০০ সৈন্ত প্রেরিত হইল। কিন্তু সেই বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্রবাহিনীর নিকট তাহার অবিলম্বে পরাজিত হইল। এখন খাঁ দৌরান্ মালব-রাজ্য ছাড়িয়া দিতে এবং বুদ্ধব্যয় স্বরূপ ১৩ লক্ষ টাকা দিতে সন্মত হইলেন।

সম্রাট নিজাম্ উল-মুলুকে দাক্ষিণ্য হইতে আহ্বান করিলেন। নিজাম এখন অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি নিজে সেনাপতিত্ব গ্রহণ না করিয়া তাহার পরামর্শমত অপরাপর সেনাপতিগণ চলিবেন, এইরূপ স্থির হইল। (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি সৈন্তে মালবভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সাতারায় এ সংবাদ পৌছিল। বাজীরাও ৮০ হাজার অশ্বারোহী লইয়া ভোপালের নিকট শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। পেশবার কোশলে অবশেষে মোগল-সৈন্য পরাস্ত হইল। নিজাম্ উল-মুলু (১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী) দরহই-সরাই-নামক স্থানে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

মহারাষ্ট্র-সরকার মোগল সম্রাটের নিকট হইতে সমস্ত মালব এবং নর্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্তী সমুদয় প্রদেশ এবং বুদ্ধব্যয় স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইলেন। মহম্মদ শাহ মহারাষ্ট্রের হস্ত হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু এতদপেক্ষা গুরুতর বিপদে আবার তিনি নিপতিত হইলেন। পারস্তপতি নাদির শাহ (১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে) সিন্ধু-পার হইয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণালে আসিয়া মোগলসৈন্ত আক্রমণ করিলেন। ভীষিক্রম পারস্ত-সৈন্তের নিকট মোগলসৈন্ত বৃষ্টিতে সমর্থ হইল না। মহম্মদ শাহ নাদির শাহের বশতা স্বীকার করিলেন ও নাদিরের শিবিরে আশীত হইলেন। কিন্তু নাদির সম্রাটকে উপযুক্ত সম্মান করিলেন না। তৎপরে নাদির শাহের লুণ্ঠনপ্রিয় সৈন্তগণের কঠোর উৎপীড়নে কতশত লোক প্রাণ বিসর্জন

করিয়াছিল, রক্তভাণ্ডার দিল্লীনগর শত্রু-করে কোটা কোটা সুত্রার মহার্ঘ্য রত্ন সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার সবিস্তার বিবরণ নাদির শাহ শব্দে বিবৃত হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিশ্চয়োজন। [নাদির শাহ দেখ।]

(১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মে) নাদির শাহ যে পথে আসিয়া ছিলেন, সেই পথে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি দিল্লী নগরীর যে শোচনীয় অবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার করিতে বহু বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল।

এখন বাজীরাও রাজপুতানা ও বৃন্দেলখণ্ডের রাজত্ব-বর্গের সহিত সন্মিলিত হইয়া মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংসের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে না হইতেই (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ২৮এ এপ্রেল) তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বালাজী রাও পেশবা হইলেন।

[পেশবা দেখ।]

বালাজী পিতার জায় সম্রাটের নিকট মালবরাজ্য দাবি করিয়া বসিলেন, কিন্তু সম্রাট শোকবাক্য দিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বঙ্গ বর্গীর হান্সামা চলিতেছিল।

এদিকে সম্রাট আবার অভিনব বিপদের সংবাদ পাইলেন। নাদির শাহের মৃত্যুর পর আকবদ খাঁ আবদালী আফগান-নেতৃত্ব গ্রহণপূর্বক ভারতবিজয়ে অভিনবী হইলেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাবে আসিলেন। তথাকার মোগল সুবাদার আবদালীর পক্ষাবলম্বন করিলেন। লাহোর ও মুলতান আফগানদিগের অধিকারভুক্ত হইল।

সম্রাট মহম্মদ শাহ ১২০০০ সৈন্তসহ স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা আকবদকে পাঠাইলেন। আকবদ সর্হিন্দে আসিয়া ছাউনি করিলেন। এখানে (১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে) আফগানেরা আসিয়া চারিদিক্ হইতে সম্রাটপুত্রকে আক্রমণ করিল। বাঁহাউক এ যুদ্ধে আফগানেরা পরাজিত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পৃষ্ঠ দেখাইয়াছিল। এই সময়ে মহম্মদ শাহ কঠিন রোগে শয্যাগত হইলেন এবং ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে সর্হিন্দে ক্ষেত্রে জয়লাভের এক মাস পরে ২৮ বর্ষ সাম্রাজ্য ভোগের পর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবদ শাহই সম্রাট হইলেন।

মহম্মদশাহ তোগলক, (তুঘলক) (১ম) দিল্লীর পাঠানবংশীয় জনৈক রাজা, সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন তোগলক শাহের পুত্র। তাঁহার প্রকৃত নাম মালিক কথুর্ উদ্দীন জুনান। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে তোগলকবাদে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি "সুলতানুল মুজাহিদ আবুল কথু মহম্মদ শাহ ইব্ন তুঘলক শাহ" নামে পরিচিত হন।



ইহার ৪০ দিন পরে, তিনি দিল্লী-রাজধানীতে আসিয়া পূর্ববর্তী সুলতানগণের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। দিল্লীর প্রাচীন রাজপ্রাসাদে তাঁহার বাসভবন নির্দিষ্ট হইল। তিনি বাল্যকালে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনাদি বিজ্ঞানশাস্ত্রসমূহ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এমন কি, কোন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, হাকিম বা জানী ব্যক্তি কখনও তাঁহাকে তর্কে বা রহস্যে পরাভব করিতে পারেন নাই। তাঁহার হস্তলিপি সাতিশয় সুন্দর ছিল; তিনি মনে মনে চিত্র কল্পনা করিয়া নূতন নূতন ধরণের অক্ষরমালা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে তৎকালে সকল প্রকার বিজ্ঞান বিদ্যার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

তিনি পূর্বনির্দিষ্টপথে প্রজাপালন করিতেন। হিন্দু ও মুসলমানকে ভিন্ন মনে করিতেন না। দার্শনিক মতে তাঁহার বিশ্বাস অস্বল্প ছিল; সুতরাং তর্ক ও মীমাংসায় যাহা যুক্তিবৃত্ত হইত, তাহাই তিনি গ্রাহ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এইরূপে ক্রমে তাঁহার জন্মকালিষ্ঠের আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ইসলামধর্ম-শাস্ত্রোন্নিবিষ্ট অর্থোদিক দ্বা ও বিনয়ের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। এই কারণে অনেক সাধুচেতা মুসলমানও তাঁহার খেয়ালে পড়িয়া কখন কখন কার্যিক দণ্ড ভোগ করিতেন, কখন বা প্রাণহরণে দণ্ডিত হইতেন। তাঁহার অধীনস্থ প্রসিদ্ধ হাকিম, ধর্মযাজক, সৈয়দ, সুফী, কলান্দার, কেরাণী ও সেনানীবৃন্দ সামান্য অপরাধেও তাঁহার নিকট দণ্ডিত হইতেন। এমন কি, তাঁহার শাসনকালে এমন দিন বা সপ্তাহ অতিবাহিত হয় নাই, যাহাতে মুসলমানরক্তে তাঁহার প্রাসাদদ্বার না বিধৌত হইয়াছিল।

তাঁহার ২৭ বর্ষকালে রাজত্বের মধ্যে এরূপ অনেক অত্যাচারের কথা শুনা যায়। এক সময়ে অবাধ্যতার জন্ত তিনি বীর জনৈক সেনানীর জীবন্তে ছাল ছাড়াইয়া লইতে আদেশ দিয়া ছিলেন। বিজ্ঞাদি নানা সদগুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং একজন সাধুচেতা মুসলমান ও সামাজিক রাজপুরুষ হইলেও তাঁহার এই অত্যাচারকাহিনী তাঁহাকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার চরিত্র অসুধাবন করিলে বুঝা যায় যে, অধিক পরিমাণে দর্শনাদি পাঠ করার তাঁহার মস্তিষ্কর ক্রিয়াকলাপ বিকৃতি ঘটয়াছিল। অস্ত্রের কণ্ঠে তাঁহার হৃদয়ে আদৌ সহানুভূতির উদ্বেক হইত না।

এরূপ অত্যাচার ও কঠোর শাসন করিয়াও তিনি হিন্দু-হান, গুজরাত, মালব, মহারাষ্ট্র, ঠৈলঙ্গ, কাম্পিল, দার-সুন্দ, মাবর, লক্ষণাবতী, চাটিগাঁও, সোণার গাঁও ও ত্রিহত

প্রভৃতি প্রদেশে বীর রাজশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে নিজের জ্ঞানগরিমা ও আত্মসত্ত্বিতা তাঁহার কাল হইল। রাষ্ট্রকর্মণ্যে উন্মত্ত হইয়া তিনি আপনার বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি রাজ্যসংস্থারসম্বন্ধে কএকটি নূতন নিয়ম প্রবর্তিত করিতে প্রয়াস পান। নিয়ম-বধিত চারিটি মন্তবাহি পাঠানসাম্রাজ্যধ্বংসের কারণ হইয়াছিল।

১ম, তিনি গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশের প্রজাবর্গের উপর অত্যধিক কর নির্দেশ করিয়া ছিলেন। প্রজাবর্গ রাজস্ব-প্রদানে অশক্ত হওয়ার বনাস্তরাল প্রদেশে বাইরা আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্তর্ভুক্ত মধ্য আদৌ চাস বাস না হওয়ার, দিল্লী ও তৎসমীপবর্তী স্থানে শত্রুভাব ঘটে। লক্ষ লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া অন্নকষ্টে প্রাণত্যাগ করে এবং অনেক পরিবার অন্নদ্বারা দেশত্যাগ করে। সুলতান প্রজাবর্গের এই বিদ্বেষবিস্তারগাথ সদলে ঐ সকল জঙ্গল খরিয়া প্রজা-দিগকে বস্ত্র অস্ত্র ত্রায় নিহত করিয়া প্রজাক্ষয় করিয়া ছিলেন। ইহাতে পাঠানসাম্রাজ্য ক্ষীণ হইয়া পড়ে এক বহু পরিমাণে রাজস্বও হ্রাস হইয়াছিল।

২য়, এক সময়ে তিনি দেবগিরি পরিদর্শনে আসিয়া তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হন। তাঁহার মনে মনে তখন এই স্থানে রাজধানী পরিবর্তন করিবার বাসনা জন্মে। তদনুসারে তিনি সেই প্রাচীন হিন্দুগরীর ‘দৌলতাবাদ’ নামকরণ করিয়া তথায় দিল্লীবাসী প্রত্যেক নরনারীকেই বাইতে আদেশ করিলেন। হকুম হইল,—যে ব্যক্তি রাজাদেশ পালন না করিবে, অবিলম্বে তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দিল্লীবাসী মাত্রই দৌলতাবাদ অভিমুখে বাইতে তৎপর হইল। আমীর ও মরহগন বানারোহণে বাইতে লাগিলেন। কিন্তু দীন দুঃখী প্রজামণ্ডলী অর্থাভাবে পথপথ্যটন ক্রেশ সহ করিয়া অবশেষে হাঁটিয়া চলিল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অনাহারে দারুণ আতপতাপ সহ করিতে করিতে অনেকেই পথি মধ্যে প্রাণ বিসর্জন করিল। যাহারা দেবগিরিতে আসিয়া উপনীত হইল, তাহারাও বিদেশে অপরিচিত স্থানে বাসহেতু নিরাশ্রিতের ত্রায় হতাশ হইয়া যুত্মুখে পতিত হইতে লাগিল। সুলতানের দুর্ভিক্ষিতাবশতঃ অনেকে প্রাণ হারাইল। সম্রাট দিল্লীবাসীদিগকে লইয়া দৌলতাবাদ জনাকীর্ণ করিবার জন্ত প্রভূত অর্থ ব্যয় করিলেও তাঁহার মনসামনা পূর্ণ হয় নাই। মুসলমানগণের এইরূপে ক্ষয়সাধন হইতেছে দেখিয়া এবং এই হিন্দুপ্রধান জনপদে স্বল্পমাত্র মুসলমান সৈন্য দ্বারা বীর প্রাধান্য রক্ষা হইবে না বুঝিতে পারিয়া সুলতান তাহাদিগকে লইয়া পুনরায় দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। বহু ধন-জন-পুণ্য দিল্লী

নগরী তাঁহার এই বিসমৃদ্ধ বুদ্ধির ফলে এক কালে লোকশুভ হইয়া পড়িল। সুলতান তখন বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিল্পী, পণ্ডিতমণ্ডলী, বণিক প্রভৃতি আনাইয়া দিল্লীর পূর্বদক্ষিণ বজার করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার এ চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বাহারা সুলতানের ভয়ে ভীত হইয়া দিল্লীতে আসিয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ এখানেই জীবনীলা শেষ করিল, কেহ বা স্বদেশ দর্শনার্থ দেশে প্রত্যাপন করিল।

৩য়, তাঁহার তৃতীয় খেলাস কার্যে পরিণত করিতে গিয়া তিনি রাজকোষ শুদ্ধ করিয়া ফেলেন। প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তাম্রতকার প্রচলন তাঁহার রাজ্যবিধ্বংসের অন্ততম কারণ। বাণিজ্যবাণারে তাম্র-মুদ্রা প্রচলন করিয়া তিনি শেষে দেখিতে পাইলেন যে, হিন্দু প্রজাবর্গই তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া অধিক ধনশালী হইতেছে এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য-মুদ্রার অপ্ৰচলন-হেতু পূর্বতন মুসলমান বণিক-সমিতির কার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটতেছে। সুতরাং আদেশ প্রত্যাখ্যান ভিন্ন আর উপায় নাই। হুকুম হইল, বাহার নিকট বত তাম্র মুদ্রা আছে, তৎসমুদায়ই তাঁহার রাজকোষাধ্যক্ষের নিকট অর্চিতে উপস্থিত করিবে। এইরূপে রাশিরাশি তাম্রমুদ্রা তোগলকবাদে আনীত হইল। পর্ত্তপ্রমাণ তাম্রখণ্ড জড় হইল, ভবিষ্যৎকালে রাজকোষ হইতে স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইয়া গেল। রাজকোষ শুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণ সোভাগ্যবান্ ও বলশালী হইতে লাগিল এবং মুসলমানগণ অর্থহীনতাগ্রস্ত তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া রহিল।

৪র্থ, একত্রিংশ খোরাসান্ ও চীনরাজ্য-জয়ান্তিলাঘে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতের রাজকোষ শুদ্ধ করিয়া ছিলেন। সুলতান তাঁহার ঐরূপ জয়ান্তিপ্রায় আনাইয়া রাজকর্ণচারিমাঝেই রণোন্মাদে উন্মত্ত করিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন অনেকে তাঁহাকে প্রতারণাবাক্যে প্রলোভিত করিয়া ফাঁকি দিয়া বহু অর্থ আত্মসাৎ করে। সৈন্ত-সংগ্রহের জন্য ও তিনি বিপুল অর্থ নষ্ট করিয়াছিলেন। চীনরাজ্য আক্রমণকালে তাঁহার সেনাদল আসামের পার্বত্যপথে হিন্দু সৈন্তের হস্তে বিপর্যস্ত হয়। তখন কেবল মাত্র ১০টা অশ্বারোহী প্রাণ লইয়া এই সংবাদ-প্রদানের জন্য দিল্লীধামে উপস্থিত হইয়াছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সুলতানের শাসন ও পীড়নে উন্মত্ত হইয়া মুসলমান সামন্তগণ ক্রমশঃই তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার দেবগিরিতে অবস্থানকালে সুলতানের শাসনকর্তা বহরাম আখিরা ক্রোধিত হন। সুল-

তান এই সংবাদে ক্রোধোদ্বীগিত হইয়া দিল্লীতে পুনরাগমন-পূর্বক সদলে সুলতান-অভিমুখে যাত্রা করেন। সুলতান সৈন্তের সহিত যুদ্ধে বহরামের পরাজয় হয়। বহরামের মৃত্যু তোগলকের চরণতলে অর্পিত হইল। তাহাতেও তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল না, শেষে বহরামের সেনাদলও তাঁহার সমক্ষে খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল।

ইহার পর দুই বৎসর কাল তিনি দিল্লীতেই অবস্থান করেন, কাজে কাজেই ওমরাহগণকে বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে হইল; কিন্তু তাহাদের পরিবারবর্গ অরক্ষিত অবস্থায় দেবগিরিতে পড়িয়া থাকিল। এই সময়ে করভারে প্রলীড়িত অস্ত্রকৌদিবাসী হিন্দু প্রজাগণ শস্যভাণ্ডার জ্বালাইয়া দিয়া আপনাপন পালিত গো-মেঘ-মহিষাদি ছাড়িয়া দিল। কেহই কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করিল না। সুলতান প্রজাবর্গকে এইরূপ রাজদ্রোহী দেখিয়া কাজীদিগের প্রতি তত্তদগ্রাম জ্বালাইয়া ভয়সাৎ করিতে আদেশ দিলেন। মুসলমানগণ-কর্তৃক এইরূপে উত্তাক্ত হইয়া তাহারা বনভঙ্গলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুলতান শিকারের ভাণ করিয়া বারণের চতুর্পার্শ্ববর্তী জঙ্গল ঘিরিয়া পশুবাং প্রজাবর্গের বিনাশ সাধন করেন, বারণের দুর্গমধ্যে গণ্যমান্য হিন্দুমাঝে কেই কাঁসি দেওয়া হয়।

এই সময়ে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা বহরাম খাঁর মৃত্যু হইলে ফক্করা নামক জনৈক ব্যক্তি বাজালায় বিদ্রোহী হয়। পরে সুলতানী সৈন্ত তাহাদের সহিত যোগদান করিয়া লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা কাদের খাঁকে সপরিবারে নিহত করে। লক্ষণাবতীর রাজকোষ শত্রুদল কর্তৃক লুণ্ঠিত এবং লক্ষণাবতী, চট্টগ্রাম ও সোণারগাঁও শত্রু-কবলিত হয়। এই সকল স্থান সুলতানের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইলে, সুলতান ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি অনতিকাল মধ্যেই কনোজ হইতে দালদউ পর্যন্ত সকল স্থান উৎসাদিত করিতে লাগিলেন। অত্যাচারপীড়িত প্রজাবৃন্দ বহুপ্রদেশে যাইয়া আশ্রয় লইল। সুলতান অরণ্য মধ্যে তাহাদিগকে ঘিরিয়া প্রত্যেকের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন।

সুলতান বর্ধন কনোজের সমীপবর্তী প্রদেশে এইরূপ কঠোরতার সহিত বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে মাবরে সৈয়দ হোসেন বিদ্রোহী হইয়া রাজকুজ ধারণ করে। সুলতান এই সংবাদ পাইয়া সৈন্তে মাবর আক্রমণ করিলেন। হোসেনের পুত্র ইব্রাহিম ও অপরাপর আত্মীয়-স্বজন তাঁহার হস্তে বন্দী হইল।

দিল্লী হইতে বাজাকালে জিনি রাজ্যরাজ্যে দুর্ভিক্ষের ঘটনা

দেখিতে পান। দেবগিরিতে উপনাত হইয়া উত্তরোত্তর শস্যের দর বাড়িতেছে দেখিয়া তিনি খীর অধীনস্থ সামন্ত ও কর-সংগ্রাহকগণের প্রতি অত্যধিক আব্রাব্ গ্রহণের আদেশ দিলেন। মহারাষ্ট্ররাজ্যে আব্রাব্ আদারের সময় অধিক অত্যাচার হইয়াছিল। এমন কি, লোকে রাজকর দিতে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা দ্বারা অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। এতদ্বিন্ন দস্তাগণের লুণ্ঠনে রাজ্যমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল।

অতঃপর তিনি আন্দ্র আরাক্কে দিল্লীতে রাখিয়া স্বয়ং তৈলঙ্গরাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হন। অরঙ্গলে (বরঙ্গল) আসিলে তাঁহার সেনাদলের মধ্যে ওরাবা (বিশুচিকা) রোগ দেখা দেয়। এই সময়ে অনেক সামন্ত, ওমরাহ ও সেনার বিনাশ হইয়াছিল। সুলতান্ বিপদ-কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হইল। তিনি নাএব উজীর মালিক কাবুলকে তৈলঙ্গাবীশ্বরপদে অভিষিক্ত করিয়া দৌলতাবাদ অভিযুগে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এখানে কএকদিন রোগ ভোগ করিয়া তিনি দিল্লীরাজধানীতে মাইতে ইচ্ছা করিলেন। তজ্জন্ত তিনি মসরু খাঁ সাহেব সুলতানীকে বিদায় ও কংলব্ খাঁকে মহারাষ্ট্ররাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিলেন। দিল্লীযাত্রাকালে তিনি দিল্লীবাসী সামন্ত ও ওমরাহ সকলকে দিল্লীতে প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন। তিনটা বাজিদল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। অল্পমাত্র লোকে জীপুত্র লইয়া দেবগিরিতে রহিয়া গেল।

সুলতান ধারা ও মালবরাজ্য হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে তিনি ছুভিক্কের প্রবল প্রকোপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রাজ্যমধ্যে প্রায় সর্বত্রই অনাচার ও অত্যাচারের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল।

দিল্লীতে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, সহস্রাংশের একাংশ লোকও জীবিত নাই। শস্যভাবে ও মহামারীতে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কতক লোক বা প্রাণের দ্বারে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। সুলতান রাজকোষ মুক্ত করিয়া চাঁসবাসের আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। বৃষ্টির অভাবে শস্যক্ষেত্র সমুদায় শুকাইয়া গেল। অনাহারে ও কার্যিক পরিশ্রমে দুর্বল অবশিষ্ট প্রজাবৃন্দ হতাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

সুলতানকে কৃষিকার্যের উন্নতিকল্পে ব্যাবৃত্ত দেখিয়া সুলতানবাসী শাহ আক্ফান্ বিদ্রোহী হয় এবং নাএব বিহবাহকে হত্যা করিয়া সুলতাননগরী অধিকার করে। সুলতান শাহকে বন্দি রাখিয়া অতঃপর হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার

স্বাস্থ্য মৎস্না-ই-জহানের মৃত্যু হয়। মাতৃশোকে অভিভূত হইয়াও তিনি শত্রুর প্রতিহিংসা ভুলিতে পারিলেন না। পুনরায় তিনি সফলে মুলতান যাত্রা করিলেন। শাহ তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিল এবং সফলে আক্ফানহানে পলায়ন-পূর্বক রক্ষা পাইল।

এখান হইতে সুলতান সন্ধ্যা ও অগ্রোহা হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখনও ছুভিক্কের পূর্ণ প্রকোপ। সুলতান নিজ ব্যয়ে কুপাদি খমল করিয়াও কৃষিকার্যের কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিলেন না। প্রজাবর্গ রাজ-অত্যাচারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কোন ব্যক্তি ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। সুলতান বারংবার আদেশ দিয়াও তাহাদিগকে কাণ্ডে বাধ্য করাইতে পারিলেন না, সুতরাং রাজ্যদেশে পুনরায় সকলকেই দণ্ডভোগ করিতে হইল।

অতঃপর সুলতান পুনরায় সন্ধ্যা ও সামান্য বিদ্রোহ-দমনে গমন করেন। তিনি বিদ্রোহীদের চূর্ণ সমুদায় ধ্বংস করিয়া বন্দীরাপে তাহাদিগকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। ঐ সময়ে সামান্যবাসী অধিকাংশ লোকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। দিল্লীতে আসিয়া ওমরাহদিগের নিকট তাহার কার্য গ্রহণ করিল।

যখন সামান্য এইরূপ বিপ্লব চলিতেছিল, তখন দাক্ষিণাত্যের ওরঙ্গল রাজ্যে কানাই নামক জনৈক হিন্দু সর্দার বিদ্রোহী হইয়া তথাকার নাএব-উজীর মালিক মক্-বুলকে বিতাড়িত করেন এবং স্বয়ং রাজস্ব গ্রহণ করিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ঐ সময়েই কানাই নামকের ভ্রাতা সুলতানের বিপদ হইয়া কয়লা প্রদেশ অধিকার করেন। এইরূপে দেবগিরি ও গুজরাত ব্যতীত প্রায় সমুদায় প্রদেশ সুলতানের অধিক রূঢ় হইয়াছিল। সুলতান সামন্তগণের একরূপ আচরণে ক্রমশঃই উত্তাক্ত হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে তিনি আরও কাঠিভের সহিত প্রজাবর্গের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এদিকে ছুভিক্ক ও তাঁহাকে বিশেষরূপে উত্তাক্ত করিতে লাগিল; তিনি নানা উপায়ে রাজ্যমধ্যে কৃষিকার্য-প্রবর্তনের চেষ্টা করিলেও কোন ক্রমেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। এই সময়ে প্রজার মৃত্যু, অরকট ও রাজবিদ্রোহ প্রভৃতি কারণে তাঁহার নৃশংস একরূপ বিকৃত হইয়াছিল যে, রাজকীর কোন কার্যই তাঁহার ভাল লাগিত না।

অবশেষে শত্রু উপদ্রব হতাশ হইয়া সুলতান দিল্লীবাসী রাজকেই সগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে বাহিয়া পলায়ন করিতে

আদেশ দিলেন, তদনুসারে দিল্লীবাসীগণ দলে দলে নগর ছাড়িয়া অস্ত্র গমন করিল। যয়ং সুলতান সামন্ত ও ওয়রাহ-দলে পরিবৃত্ত হইয়া পাটয়ালী ও কাম্পিল্য অতিক্রমপূর্বক খোর নগরে (এই স্থানের প্রাচীন নাম স্বর্গবারী) গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি কাড়া ও অবোধ্যা-প্রদেশজাত শস্য সম্বল্যে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহারই অমুগ্ধীত ভৃত্য অবোধ্যা ও জাকরাবাদের শাসনকর্তা আইন্ উলমুল্ক সুলতানের মনস্তত্ত্বের জ্ঞাত স্বর্গবারীতে ও দিল্লীনগরে প্রভূত শস্য ও অর্থ নজর পাঠাইলেন। সুলতান ইহার এই কৃতজ্ঞতার সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কংলুখ খাঁর পদে অভিষিক্ত করিতে সম্মত করিলেন। কারণ পরবর্তিকালে কংলুখ খাঁ দেবগিরির রাজস্ব অধিকাংশই আত্মসাৎ করিতে ছিল।

সুলতান বারংবার এই সংবাদ আইন্-উল-মুলককে জানাইলেন। আইন্-উলমুল্ক ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন,—‘সম্ভবতঃ এতৎপ্রদেশের শস্ত প্রাচুর্য্য দেখিয়া সুলতান কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছাচিত হইয়াছেন। অবোধ্যা হস্তগত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই কারণেই তিনি আমাকে দেবগিরি পাঠাইতে সম্মত করিয়াছেন। আর যদি, আমি এই প্রদেশ ছাড়িয়া গমন করি, তাহা হইলে আমার আত্মীয়বর্গকেও ভূমিচ্যুত হইয়া কষ্ট পাইতে হইবে। সুতরাং যাহাতে আত্মীয় স্বজনদের কোন কষ্ট না হয়, সেইরূপ পন্থাই অবলম্বন করা সম্ভবতঃ তাহা বিধেয়।’

বিলম্ব দেখিয়া সুলতানের ক্রোধ হইল, তিনি আর দ্বিতীয় কথা উত্থাপন না করিয়াই আদেশ করিলেন যে ‘অচিরে যেন অবোধ্যা প্রবাসী দিল্লীবাসীগণকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ইহার অন্তথা করিলে বিশেষ দণ্ড পাইতে হইবে।’ আইন্ উলমুল্ক পূর্ব হইতেই সুলতানের কঠোর অত্যাচারিতার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং তিনি বৃত্তিতে পারিলেন যে, কেবল তাঁহাদেরই স্বংগের জন্ত এরূপ আদেশ হইয়াছে। কাজে কাজেই সুলতানের প্রতি তাঁহাদের যে শ্রদ্ধা, রাজশ্রদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সন্তুষ্ট ছিল, তাহা ক্রমশঃই অপনোদিত হইতে লাগিল। তাঁহারাও আত্মরক্ষার জন্ত রাজদ্রোহী হইয়া উঠিল।

স্বর্গবারীতে অবস্থানকালে, কাড়ানগরে নিজাম মাইন্ বিদ্রোহী হয়। আইন্ উলমুল্ক তখন সুলতানের পক্ষ ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীকে বন্দী করিয়া জীবন্ত অবস্থায় তাহার গাঃচর্ম উন্মোচন করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর বিদ্রোহিত নগরঃ খাঁ রাজত্বহবিল তক্ষুপ করিয়া সুলতানের

হস্ত হইতে মুক্তিলাভের আশায় বিদ্রোহী হইলেন। বিদ্রোহের অবরোধের সময় তিনি ধৃত হইয়া বন্দীরূপে দিল্লীনগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই জাকর খাঁর ভ্রাতৃমুখ আলিশা কুলবর্গী নগরে বিদ্রোহবলি প্রজ্বলন করেন। ইনি সুলতানের অমুগ্ধ হইয়া কুলবর্গী নগরে রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখানে রাজসৈন্য রক্ষিত না থাকায় এবং উপস্থিত কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ইনি কুলবর্গীর সর্দার ভৈরবকে ও বিদ্রোহের নাৎবকে হত্যা করিয়া স্বয়ং তৎপাকার আধিপত্য গ্রহণ করেন। ইহার এই রাজদ্রোহিতার জ্ঞক হইয়া সুলতান কংলুখ খাঁকে সমলে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। আলিশা বিদ্রোহ-নগরে বন্দী হইয়া বিচারার্থ দিল্লীনগরে প্রেরিত হইলেন।

পূর্বেরই উল্লেখ করিয়াছি, আইন্ উলমুল্ক আত্মরক্ষার সুলতানের বিরুদ্ধে সেনা সংগ্রহ করিতে আগ্রহ হন। এই সময়ে সুলতানের জনৈক প্রিয় অমুচর মালিক সুলতান কর্তৃক নিগৃহীত হইবার ভয়ে ভ্রাতা ও অধীনস্থ সেনাদল সঙ্গে লইয়া স্বর্গবারীতে আসিয়া উপনীত হন। একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে কুচিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইল, তিনি ভাবিলেন,—সুলতান বেক্রপ ক্রুর ও হঠচোতা তাহাতে অচিরে তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে পারেন। এইরূপ চিন্তার পর, তিনি আইন্ উলমুল্ককে সহিত যোগদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সমলে রজনীযোগে পলাইয়া উলমুল্কের সহিত মিলিত হইলেন।

একদা সকলের অজ্ঞাতসারে মালিক-ভ্রাতৃগণ নদী পার হইয়া সুলতানের হস্তী ও অশ্বশালা আক্রমণ করিল। এই স্ত্রে উভয় দলে যুদ্ধের হুচনা হইল। দুর্লবুদ্ধিতাবশতঃ আইন্ ও মালিক বাগডমউর সন্নিকটে গঙ্গা পার হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধে মালিক-ভ্রাতৃগণ নিহত এবং আইন্ উলমুল্ক কারারুদ্ধ হইলেন। অনেকে সুলতানের অত্যাচারের ভয়ে নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জন করিল, সুলতান আইন্ উলমুল্ককে অভয় দিয়া উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

এইরূপে বিদ্রোহ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সুলতান বরাইচ অভিযুগে যাত্রা করিলেন। এখানে সিপা-সালর মসাদউদের সমাধিক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সমারোহের সহিত পূজোপহার প্রদান করেন। ইহার পর দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি আব্বাসবংশীয় খলিফার নিকট হইতে রাজসনম্ব আনাইবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার বিখ্যাত, আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের অভিমত ব্যতীত কোন মুসলমান-মতাই প্রকৃত রাজশ্রদ্ধি-বহনে অক্ষম। তদনুসারে যুগি-

বর্গের পরামর্শমতে মিসর-রাজ্যে লোক প্রেরিত হইল। তিনি স্বনামাক্ত মুদ্রার খলিকার নামাঙ্কন করিয়া তোষামোদের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে মিসর হইতে হাজী সৈয়দ সর্শারি খলিকার সনন্দ ও সুলতানের জ্ঞাত সম্মানার্থ পরিচ্ছদ লইয়া আসিলেন। পক্ষান্তরে তিনিও খলিকার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া হাজী রাজব বর্কাইকে মিসর রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার এই বশ্ততা স্বাকারের জ্ঞাত তিনি খলিকার নিকট হইতে ‘খলিকার সহকারী’ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

স্বর্গদ্বারা হইতে দিল্লীতে আসিয়া পুনরায় তিনি কৃষি-কাণ্ডের উন্নতিস্থানে বদ্ধপরিকর হন। অতঃপর তিনি রাজ্য-মধ্যস্থ শোপলদিগকে বণীভূত করিতে চেষ্টা পাইলেন। এই উত্তর কার্যে তাঁহাকে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। ইহাতে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ায় তিনি আয়বৃদ্ধির জ্ঞাত বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেনা-বিভাগের অনেক সংস্কার করিলেন। হুবুহুর দণ্ডবিধান জ্ঞাত তিনি বিভিন্ন আইন বিধিবদ্ধ করিতে লাগিলেন, পুনরায় তাঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইহাতে তাঁহাকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

দেবগিরির শাসনকর্তা কংলুখ খাঁ রাজস্বের অপব্যয় করিতেছেন শুনিয়া সুলতান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আজিজ্ হিমার নামক জনৈক নীচকুলোদ্ভবকে সমগ্র মাল-বের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি কংলুখ খাঁর পরিবর্তে তাঁহার অত্যন্ত ভ্রাতা মোলানা নিজাম উদ্দীনকে ভরোচ হইতে আনাইয়া দেবগিরির রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদে উন্নীত করিলেন। অপরিণামদর্শী নিজামের ও নীচকুলোদ্ভব আজিজ্ হিমারের শাসনে প্রজা-মণ্ডলী উৎপীড়িত হইয়া রাজ্য মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলতা ঘটাইয়াছিল। ধারা-নগরে আজিজ্ বিদেশীয় আমীরগণকে বিনা অপরাধে হত্যা করিয়াও সুলতানের নিকট পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জায়া-উদান বরগী সুলতানের এই ব্যবহারে বিশেষ কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

আজিজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অবশিষ্ট আমীর-গণ গুজরাত অভিমুখে পলায়ন করেন। এই সময়ে গুজরাতের নাএব উজীর মক্বেল সুলতানকে উপচোকন দিবার জ্ঞাত কতকগুলি অশ্ব ও মণিমাণিক্য লইয়া বড়োদাপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। সুবিধা বুঝিয়া আমীরগণ অত্যাচারের প্রতি-শোধ লইলেন। মক্বেল পরাজিত এবং তাঁহার বধাসর্বস্ব লুপ্ত হইল। আমীরগণ এইরূপে কতকগুলি অশ্ব ও ধনরত্ন

লাভ করিয়া স্পষ্টিত হইলেন। অর্থবলে আপনাদের শক্তিপুঞ্জ স্ফূট করিয়া তাঁহারা কাশে (খখাত) অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে এই সংবাদ সুলতানের নিকট পৌঁছিলে তিনি সঙ্গে গুজরাত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

দিল্লীরাজধানীতে সুলতান ফিরোজ, মালিক কবীর ও আক্কাদ আয়াজ্কে প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া সুলতানপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার বিনামূল্যে আজিজ্ হিমার বিদ্রোহ-দমনে অগ্রসর হইয়া আমীরদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

সুলতান এই বিদ্রোহের প্রতিবিধান জ্ঞাত গুজরাত অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নহরবালায় (অনহিলবাড়) উপস্থিত হইয়াই তিনি শেখ মুইজ্ উদ্দীনকে কএকজন সেনানীর সহিত নগরভিমুখে পাঠাইলেন এবং স্বয়ং বড়োদা আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে আবুপর্সতের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি আমীরদিগের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। পাঠানসেনার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ না হইয়া আমীর-সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অনন্তর তাহারা রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্বক দেবগিরি অভিমুখে পলায়ন করিল।

সুলতান পলায়মান শত্রুসেনাদলের পতিরোধকরণার্থ নাএব উজীর-ই-মমালিক মালিক মক্বেলকে তাহাদের অনুসরণার্থ প্রেরণ করিলেন। নর্থদাতীর পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার সহিত পলাতক সেনাদলের একটা ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিপক্ষদল বিধ্বস্ত এবং তাহাদের সর্বস্ব মালিক মক্বেলের হস্তগত হইয়াছিল। রণক্ষেত্রে যে সকল আমীর ধৃত হইয়াছিলেন, সুলতানের আদেশে তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইল। কেবলমাত্র কএকজন দেবগিরি ও গুজরাতের হিন্দু সামন্তদিগের আশ্রয়ে লুকাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন।

কএকদিনমাত্র তথায় অবস্থান করিয়া সুলতান ভরোচ, খখাত ও গুজরাতের যাবতীয় বাকী রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া লইলেন। যে কেহ কর দিবার কালে সুলতানের বিরুদ্ধে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহারা অচিরে দণ্ডিত হইল। যাহারা মালিক মক্বেলের সহিত বিবাদ করিয়াছিল, তাহারাও সুলতানের কোপে পড়িয়া শমনসদনে প্রেরিত হইল।

অতঃপর সুলতান দেবগিরি পলাতক আমীরদিগকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইয়া পিসার ধানেশ্বরী ও মুজ্জ্ উল্ মুলককে প্রেরণ করিলেন। এদিকে তিনি স্বয়ং পত্র দ্বারা তথাকার শাসনকর্তা মোলানা নিজাম উদ্দীনকে লিখিয়া

পাঠাইলেন যে, স্বয়ং ১৫ শত অশ্বারোহী সেনা দলসহ আমীর-দিগকে আমার নিকট প্রেরণ করিবে। তদনুসারে হুইজন বিশিষ্ট ওমরাহের তত্বাবধানে তাঁহারা সেনাবলে পরিবৃত্ত হইয়া প্রেরিত হইল। পথিমধ্যে সহসা তাঁহাদের মনে সুলতানের অত্যাচারের কথা উদ্ভিত হইল। তাঁহারা প্রাণরক্ষার নিমিত্ত উদ্ধৃত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন। অচিরে ওমরাহের নিহত হইলেন। অয়োদ্ধানে স্পষ্টিত হইয়া তাঁহারা দেবগিরি আক্রমণ-পূর্বক নিজামকে বন্দী করিলেন। ধানেশ্বরী ও মজ্জ উল্ মুলক প্রভৃতি ও নিহত হইল। অনন্তর তাঁহারা ধারাগিরি-দুর্গ লুণ্ঠনপূর্বক দলমধ্যস্থ মালিক মখ্ আফগান নামক জনৈক সন্ত্রাস্ত ব্যক্তিকে আপনাদের রাজ্য বলিয়া দেবগিরি-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে সুলতানের বিরুদ্ধাচারী অনেকই তাঁহাদের দলভুক্ত হইয়াছিল। আমীর মালিক বাহু সকলকেই অর্থদানে বশীভূত করিয়াছিলেন।

সুলতান সংবাদ পাইয়াই সদলে দেবগিরিতে উপনীত হইলেন। বিদ্রোহী আমীর-দলের পরাভব হইল। আমীর সর্দার মখ্ আফগান, হসন গঙ্গো ও বিদরের বিদ্রোহিদল স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে বাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুলতান ইমাদ্ উল্ মুলক প্রভৃতি বন্দী আমীরদিগকে কুলবর্গীয় পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা সুলতানের নিকট হইতে পলাইয়া ছিল, তাহারা বিশেষ শান্তি ভোগ করিল।

সুলতান এইরূপে মহারাষ্ট্র দেশে সুব্যবস্থা স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু পুনরায় গুজরাত-প্রদেশে তথ্য নামক জনৈক চণ্ডকার বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। ঐ ব্যক্তি মালিক মুজফর নামক জনৈক রাজকর্মচারীকে হত্যা করিয়া শেখ মুইজ্জ্ উদ্দীনকে কারারুদ্ধ করিয়াছিল। তৎপরে সে খণ্ডাত লুণ্ঠনপূর্বক ভরোচ দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। সুলতান দেবগিরিতে থাকিয়া এই সংবাদ অবগত হইলেন। দেবগিরি-শাসনের কোন সুবন্দোবস্ত না করিয়াই তিনি সদলে বহির্গত হইলেন, এমন কি সেইস্থান রক্ষার্থ তথায় একটাও রাজসৈন্ত রাখা হইল না।

সুলতান ভরোচে আসিয়া নর্মদাতীরে ছাউনি করিলেন। তিনি ও তাঁহার সেনানী মালিক যুগ্মক বয়া দুইদিক্ হইতে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিল। বিদ্রোহিনেতা তথ্য বধাক্রমে খণ্ডাত, নহরবালা, অশাবল ও কাড়া হইয়া কর্ণুলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুলতানও তাহার পশ্চাদ্ভাবিত হইলেন। নহরবালায় সন্নিহিত উভয়পক্ষে একটা যুদ্ধ হয়। তদ্বি সর্দার স্বেই অবসরে কাণ্ড বরাহী, কর্ণুল ও ঠট্ট পরিভ্রমণ করিয়া দাম্বরীলে আসিয়া আশ্রয় লাভ করে।

যখন সুলতান তথ্যকে দমন করিবার জন্য নহরবালায় অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া হসন-গঙ্গো সকলে দেবগিরি আক্রমণ করিল। যুদ্ধে ইমাদ্ উল্ মুলক পরাভূত ও নিহত হন এবং রাজসৈন্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই সময়ে সুলতানের ধারাগিরিহ শত্রুদল আসিয়া বিপক্ষদলে যোগদান করে।

সুলতান নহরবালায় থাকিয়া আক্ষদ আজিজকে দেবগিরি পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু আলাউদ্দীনের সেনাসংখ্যা অধিক জানিয়া তিনি সে প্রস্তাব হইতে ক্ষান্ত হইলেন। সুলতান দেবগিরি চিরদিনের মত আলাউদ্দীন্ হসন গঙ্গোর অধিকৃত হইল।

দেবগিরি হস্তচ্যুত হওয়ার সুলতান বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু কর্ণাল ও কাণ্ডাহুর্গ জয় এবং গুজরাতে শাসন-বিস্তার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল। সুলতান কর্ণালদুর্গের সম্মুখীন হইলে, তথাকার সামন্তবর্গ তাঁহার চরণে শরণ লইল। তথ্য তাঁহার সেনাবল অধিক দেখিয়া এবং আপনাকে আশ্রয়-রক্ষার অসমর্থ ভাবিয়া জামরাজগণের নিকট আশ্রয়ভিক্ষা করিল। সুলতান কর্ণাল ও কাণ্ডা অধিকার করিয়া আশ্রয়দাতা জামরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কোণালে আসিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। এই সময়ে দিল্লীনগরে মালিক কবীরের মৃত্যু হয়। সুলতান এই সংবাদে বিশেষ শোকার্ত হইয়া আক্ষদ আরাজ্ ও মালিক্ মক্ বুলকে রাজকাব্য-পরিদর্শনের জন্য রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে সুলতানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া নানা স্থান হইতে তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিগণ দেখিতে আসিল। কোণাল লোকে লোকারণ্য হইল।

সুলতান আরোগ্য লাভ করিয়াই যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধনদী পার হইবার জন্য দেবলপুর, মুলতান, উজ্জ, শিবস্থান প্রভৃতি নগর হইতে রণপোত সকল আনীত হইল। বিদ্রোহী তথ্য আশ্রয়দাতা স্মরাধিপতিকে বশীভূত করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে ফরগ-গার আমীর আল্ তুগ বাহাছরের প্রেরিত ৫ হাজার মোগল অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করে।

এই বিপুল বাহিনী লইয়া সুলতান ঠট্ট অভিযুগে অগ্রসর হইলেন। এখানে মহরমের জন্য উপবাসহেতু এবং পারগদিবসে ভোজনাবিহীন তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধনদী-তীরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

মহম্মদ শাহ ভোগলক (২য়), দিল্লীর জনৈক সুলতান,



ফিরোজ শাহ তোগলকের পুত্র। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম নাসিরুদ্দীন। ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতার আবদশাতেই দিল্লীসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার এই অসম্ভাবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া সামন্তগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। তদনন্তর তিনি নগরকোটে গিয়া বাস করিতে থাকেন। এখানে আবুবকর শাহের রাজ্যকালে প্রভূত সেনা সঙ্গে লইয়া তিনি ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ ও সিংহাসন অধিকার করেন। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩ বৎসর ৭ মাস রাজত্বের পর দিল্লীনগরে তাঁহার মৃত্যু ও সমাধি হয়। তিনি অলেশ্বরের গিরিধ্বং নির্মাণ করিয়া বান।

তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৩৯৪ খৃঃ অঃ তাঁহার পুত্র হুমায়ুন শাহ আলা উদ্দীন সিকেন্দর শাহ নামধারণপূর্বক রাজা হন। ৪৫ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। অনন্তর তাঁহার ভ্রাতা মাক্কুদ (মহম্মদ) শাহ তোগলক ১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সুলতান নাবালক, তাহাতে আবার বড় বড় অমিদারগণের মধ্যে নানারূপ বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় নিকটবর্তী রাজগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে আমীর তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক এই মাক্কুদ শাহকে সুলতান মহম্মদ শাহ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্বিবন্ধন জীবনী-লেখকগণ পিতৃব্য ও ভ্রাতৃপুত্রের জীবনী একত্র লিখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ফিরোজ শাহ মতে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে এবং সরাফ উদ্দীন বেজবীর মতে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ শাহের রাজত্ব কালে তৈমুর ভারতে আগমন করেন। মহম্মদ শাহ পরাভূত হইয়া গুজরাতে পলায়ন করেন এবং তৈমুর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দিল্লী জয় করিয়া তৈমুর অসংখ্য ধনরত্ন সংগ্রহপূর্বক পারস্তদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পারস্ত-গমনের পর ফিরোজ শাহের (ফতে খাঁর) পৌত্র নসরৎ খাঁ দিল্লী নগরী অধিকার করিয়া ‘নসরৎ শাহ’ উপাধি ধারণপূর্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তাঁহার পর ১৪০০ খৃঃ অব্দে ইক্বাল খাঁ সম্রাট হইলেন। তদনন্তর মহম্মদ শাহ ১৪০৫ খৃঃ অব্দে কান্ধুজ হইতে আসিয়া পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। নাসিরুদ্দীন বিত্তীয় বার দিল্লীর সম্রাট হইলেন ষ্টে; কিন্তু পূর্বে যে সমস্ত রাজগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া ছিলেন, তাঁহারা আর সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করিলেন না। ১৪১৩ খৃঃ অব্দে মহম্মদ তোগলক পরলোক গমন করিলেন পর, যোদ্ধা খাঁ লোদী তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন।

মহম্মদ তোগলকের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী হইতে তুর্কসাম্রাজ্যের অবসান হইয়াছিল।

মহম্মদ শাহ পুরবী, ফিরোজ শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৪২৪ খৃঃ অঃ মহম্মদ শাহ পুরবী বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি এক বৎসর ও কয়েক মাস কাল রাজ্যশাসন করিলে পর সিদ্ধি বদর নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত এবং ১৪২৫ খৃঃ অব্দে ‘মুজাফ্ফর শাহ’ উপাধি গ্রহণ করেন।

মহম্মদ শাহ শর্কি সুলতান, জোনপুরের একজন রাজা, ইব্রাহিম শাহ শর্কির পুত্র। পিতা সুলতান ইব্রাহিম শাহ শর্কির মৃত্যুর পর ১৪৪০ খৃঃ অব্দে তিনি জোনপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭ বৎসর রাজ্যভোগের পর ১৪৫৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অনন্তর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধান খাঁ ‘মহম্মদ শাহ শর্কি’ উপাধি ধারণপূর্বক পিতৃরাজ্য অধিকার করিলেন।

মহম্মদ শাহী, বাকালার অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি, নবাব মুশিফ কুলী খাঁর সময়ে চাকলা ভূষণা নামে প্রথিত ছিল। মীতারাং রায়ের উচ্ছেদের পর নলদী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পরগণা রাজশাহী অমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশ বর্তমান নলডাঙ্গার রাজবংশের পূর্বপুরুষ রামদেবের সহিত বন্দোবস্ত হয়। আরগীর ভিন্ন ইহাতে ২২টা পরগণা ছিল।

মহম্মদ শেখ, আমি জহান নামা ও নক্স-রহমাণী এবং চিহাল রেদালা নামক ধর্মগ্রন্থপ্রণেতা।

মহম্মদ সদর উদ্দীন, তুর্ক-জাতির সর্বপ্রথম কবি। ইনি আরবী ও পারস্ত ভাষায় কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১২৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ সুফি, (মোস্তা), জটনক প্রাচীন কবি। সুফী-সাম্প্রদায়িক মতে ইহার বিশেষ বিশ্বাস ছিল। আকদনগর-বাগী সৈয়দ জলাল-ই-বুখারি তাঁহার শিষ্য হন। ইহার রচিত শাকিনামার প্রোকাবলী অতি মনোরম।

মহম্মদ সুলতান, (১ম)—কনটাক্টিনোপলের জটনক সম্রাট। ইহার পিতার নাম মুস্তাফা (২য়) এবং খুলজাত আকদ (৩য়)। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে ইনি খুলজাতের রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইহার বলবিক্রম দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল যে, ইনি বিজিত রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করিবেন। কিন্তু নাদির শাহের যুদ্ধে ইনি জর্জিয়া ও আরমেনিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হইলে ইহার ভ্রাতা ২য় ওসমান অধিকার লাভ করেন।

মহম্মদ সুলতান, (২য়) কনটাক্টিনোপলের সম্রাট। তাঁহার



পিতার নাম আবদুল হামিদ (আজাদ ৪র্থ)। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ওয় সলিম এবং ৪র্থ মুস্তাফা নামক তাঁহার পিতৃব্যব্বর সিংহাসন-চ্যুত হইলে তিনি সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ওসমান (১ম) এই বংশের আদিপুরুষ। মহম্মদ ওসমানের আটাদশ পুরুষ অধস্তন এবং উল্লিখিত বংশের ত্রিশ রাজা।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর তৃতীয় পুত্র আবদুল মজিদ তুর্কদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদের রাজত্বকালের অনেক ঘটনাই উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ১৮২১ অব্দে গ্রীকগণ তুর্কদের বাদশাহের অধীনতা অস্বীকার করায় ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়, অবশেষে গ্রীকগণ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রুশদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়; এই যুদ্ধে মহম্মদের সৈন্ত-দল সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। রুশরাজ সসৈন্তে কন-ষ্টাণ্টিনোপলভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তুর্কগণ রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দেওয়ার এবং যুরোপের অন্তঃস্থ রাজগণ রুশগণের প্রতিকূল হওয়ার, রুশসৈন্য ক্রিয়া যায়।

মহম্মদ সুস্তারী, হাকুল-বেকিন্ নামক ধর্মগ্রন্থপ্রণেতা। সুস্তার নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গ্রন্থখানি পারস্ত-বাদীদের নিকট আদরীয়।

মহম্মদ সৈয়দ (এরচি) 'তহফ-উল-মজালিস্' নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। তিনি শেখ আফ্রাদ খাঁর সমসাময়িক।

মহম্মদ হকিম (মীর্জা), সম্রাট হুমায়ূনের পুত্র এবং সম্রাট অকবর শাহের বৈমায়েয় ভ্রাতা। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে কাবুল নগরে তাঁহার জন্ম হয়। সম্রাট অকবর হকিমকে কাবুলের শাসনকর্তা করিয়া রাখেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মন সন্তুষ্ট ছিল না। তিনি ভ্রাতৃদেবী হইয়া ১৫৬৬ ও ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে দুইবার পঞ্জাব আক্রমণ করেন। তাঁহার অপরাধের প্রতিবিধান জন্ত স্বয়ং সম্রাট যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। মোগল-সেনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে অক্ষম হইয়া হকিম পলাইয়া যান। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে কাবুল নগরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইহার পর রাজ্য তগবান্দাস ও তৎপুত্র মানসিংহ কিছুকালের জন্ত কাবুলের অধীশ্বর হন।

মহম্মদ হাসন, দিল্লীবাগী জনৈক কবি। ইনি সম্রাট অকবর শাহের রাজত্বকালে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ও তৎপত্নীগণের বিবরণ এবং মুসলমান মহাপুরুষগণের জীবনী লিখিয়া কবিত্ব-শক্তির বশেষ্টে পরিচর দিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ হসন বুহান্, কুর্দান-ই-কাটা নামক পারস্যী অভিধান-

প্রণেতা। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত গ্রন্থ সম্বলন করিয়া হারদরাবাদপতি আবদুল্লা কুতব শাহের নামে উৎসর্গ করেন।

মহম্মদ হাদী, সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতিপালিত জনৈক সম্রাট ওমরাহ। ইনি তুর্ক জাহাঙ্গীর নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের শেষ অংশ সমাপন করিয়াছিলেন। উহার প্রথম অংশ স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং মধ্যাংশ মংঘিক খাঁ রচনা করেন।

মহম্মদ হানিফ, আলীর তৃতীয় পুত্র। কতিমা-গর্ভজাত। হাসন ও হোসেনের বৈমায়েয় ভ্রাতা, একজ্ঞ তিনি ইমাম-পদ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু হোসেনের মৃত্যুর পর অনেকে ইহাকে খলিফা বা ইমাম বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। ইহার অপর নাম মহম্মদ বিনালী। ৮১ হিজরায় ইহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ হাসিম, (কালী খাঁ), জনৈক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইনি তারীখ-কাফী-খান্ ও মুস্তথব-উল্ লুবাব নামে দুই খানি ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন। সম্রাট আলমগীরের রাজত্বের অবসানকালে তিনি দিল্লীনগরে থাকিয়া মোগল-রাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে বাবর শাহের আক্রমণ হইতে সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজ্যারোহণ পর্যন্ত ঘটনাবলি উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

মহম্মদ হুসেন, আকাএদ-হুসেন নামক ধর্মগ্রন্থপ্রণেতা।

মহম্মদ হুসেন, (মীর্জা), তৈমুরবংশোদ্ভব মহম্মদ সুলতান মীর্জার পুত্র। তিনি স্বায় ভ্রাতৃবর্গের সহিত একত্র হইয়া সম্রাট অকবর শাহের বিরোধী হন। মীর্জা ও তৎভ্রাতৃগণের অসদ্ব্যবহারে ক্রোধান্বিত হইয়া সম্রাট তাঁহাদিগকে শস্ত্রযুদ্ধে অব-রুদ্ধ করেন। তাঁহার যত্নেয় করিয়া তথা হইতে পলাইয়া গিয়া চম্পানের, সুরাত ও ভরোচ অধিকার করেন। সম্রাট ইহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ অগ্রসর হন। কণালের নিকট মাহেন্দ্রা নদীতীরে ভ্রাতা ইব্রাহিমের পরাভব শুনিয়া হুসেন দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। পরে তথা হইতে পুনরায় আসিয়া গুজরাত ও পার্শ্ববর্তী কএকটা নগর অধিকার করিয়া বসেন। নৌরাজ খাঁর অধীনস্থ মোগলসৈন্য দ্বারা তঁাহাকে পরাভূত করে। অতঃপর তিনি ইখতিয়ার উল্ সুলতানের সহিত যোগদান করেন। প্রতিহিংসাপূর্ণ অকুবরের হস্তে তিনি নিস্তার পান নাই। রায়সিংহনামা জনৈক হিন্দু হস্তে তাঁহার নিধনশাধন হয়।

মহম্মদ হুসেন (শেখ), আরবদেশীয় জনৈক মুসলমান কবি। কাব্যশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিহেতু তিনি শব্দরং উপাধি লাভ করেন। সিরাজনগরে তাঁহার বিভাশিক্ষা হয়। তিনি জ্ঞানোপার্জননের পর ভারতবর্ষে আগমন করেন। সুবরাজ

আজিম শাহ কর্তৃক তিনি রাজহকিম-পদে নিযুক্ত হন।  
অসামান্য পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া সম্রাট ফরুখসিয়ার তাঁহাকে  
হকিম উলমুলক উপাধিতে ভূষিত করেন।

মহম্মদ শাহ রাজত্বকালে তিনি মক্কা নগরীতে তীর্থযাত্রা  
করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দিল্লী নগরীতে মানব-  
লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তদ্রূপে ৫০০০ শ্লোকপূর্ণ  
একখানি দিবানু গ্রন্থ পাওয়া যায়।

**মহম্মদ হুসেন,\*** (লস্কর খাঁ) সম্রাট অকবর শাহের  
জ্যৈষ্ঠ সন্তান। ইনি মীর বখ্সা ও মীর আজ্জপদে নিযুক্ত  
ছিলেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে মুজফ্ফর খানের পরোচনায় ইহার  
পদচ্যুতি ঘটে। এক সময়ে মত্থপানে বিভোর হইয়া ইনি সম্রাট  
অকবর শাহের দরবারে উপনীত হন এবং সভাসদবর্গকে  
যথেষ্টা অবমাননা করেন। সম্রাট এই অপরাধের জন্ত ইহাকে  
অশ্বপুচ্ছে বন্ধনপূর্বক বিশেষ শাস্তি প্রদান করিয়া তাঁহাকে  
কিছুকালের জন্ত কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে  
মুনাইমের বখ্সীয় সেনাদলের অধিনায়কতার ভার অর্পণ করেন  
তক্রাই যুদ্ধে আহত হইয়া উড়িষ্যায় তাহার প্রাণ বিয়োগ  
হয়। ঐ সময়ে তিনি ২ হাজারী মুন্সবদার ছিলেন।

**মহম্মদাবাদ,** যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের গাজিপুর জেলার  
অন্তর্গত একটি তহসীল। গঙ্গা নদীতীরে অবস্থিত।

**মহম্মদাবাদ,** যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের আজমগড় জেলার  
একটি তহসীল। ভূপরিমাণ ৪৭০ বর্গ মাইল। তৌস ও  
ছোটসরযু তিন এখানে কতকগুলি বিস্তারিত জলা আছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি নগর এবং মহম্মদাবাদ  
তহসীলের বিচার সদর।

**মহম্মদী,** অযোধ্যাপ্রদেশে ঘোঁরী জেলার একটি তহসীল।  
ভূপরিমাণ ৬৬৬ বর্গমাইল। ২ উক্ত তহসীলের গোমতীতীর-  
বর্তী একটি পরগণা। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দির শেষভাগে বর্বারের  
সৈয়দগণ এই স্থানে শাসন বিস্তার করিয়াছিল। মোগল-  
সাম্রাজ্যের এই অবনতি সময়ে তাঁহারা একরূপ স্বাধীনভাবেই  
রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিত। ইহাদের জ্যৈষ্ঠ পুরুষ  
হাইদেই রাজ্যের সোমবংশীয় রাজপুত্র-রাজ্যের নিকট পরাজিত  
হয়। পরে ঐ সোমবংশীয় রাজপুত্ররাজকে পরাস্ত করিয়া  
সৈয়দগণ ইসলামধর্মে দীক্ষিত করে এবং এক দাসীকন্তার  
সহিত বিবাহ দেয়। ধর্ম্মত্যাগী ঐ রাজপুত্র পরিশেষে যৌর  
প্রতিপালকের বংশধরকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়া ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে  
উহার অধিকারী হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা এই  
সম্পত্তি ভোগদখল করে। পরে বিদ্রোহী বিবেচনায় ঐ  
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি নগর ও তহসীলের বিচার  
সদর। গোমতীনদীর পশ্চিমকূলে লখিমপুর হইতে শাহ-  
জহানপুর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৫৭' ১৫" উঃ  
এবং দ্রাঘি° ৮০°১৫' পূঃ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ-  
বলি এখানেও প্রজলিত হইয়াছিল।

**মহাযাথ্য (পুং) পূজা।** “স্বাং দেবা মহাযাথ্যায় বাবুধুরাজা-  
ময়ে” (অঙ্ক ১০।১২২।৭) ‘মহাযাথ্যায় পূজায়ৈ, মহ-পূজায়াং  
অশ্বাদোগাদিকো ভাবে যাথাপ্রত্যয়ঃ’ (সায়ণ)

**মহায্য (ত্রি) পূজনীয়।** “আত্মৈবেহ মহায্য আত্মা পরিচর্য্যঃ”  
(ছান্দোগ্যোপা° ৮।৮।৪) ‘মহায্যঃ পূজনীয়ঃ’ (শব্দর)

**মহরম,** ১ মুসলমানদিগের প্রথম মাস। হিন্দুদিগের নিকট  
বৈশাখ মাস যেরূপ পূণ্যপ্রদ বলিয়া গণ্য, মুসলমানদিগের  
মহরমও সেইরূপ। তজ্জন্ত এই মাসকে মুসলমানেরা মহরম-  
উল-হারাম্ বলিয়া থাকেন। ২ উক্ত মাসে অষ্টমৈয় মুসলমান  
পবিত্রত। এই পবিত্র প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত,—১ম মহ-  
রম-কি-ইদ, ২য় হাসন হোসেনের আশ্বাৎসর্গ, ৩য় আশুরা  
বা মহরম মাসের আশ্ব দশাহায্য অষ্টাদশ।

১ম মহরম কি ইদ।

মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন, মহম্মদ মুস্তাফার বহু পূর্ব  
হইতেই মহরম উৎসব প্রচলিত। প্যাগম্বর মহম্মদ আপনায়  
শিয়ামণ্ডলীকে এই সন্দেশে (আশুরার সময়) ১০টি কার্য্য  
করিতে অমুমতি করেন—১ম স্নান, ২য় নববস্ত্রপরিধান, ৩য়  
নেত্রে অঞ্জন বা সুরমা প্রদান, ৪র্থ উপবাস, ৫ম ভজনা, ৬ষ্ঠ  
ভূরি-ভোগ্যরক্ষণ, ৭ম শত্রু-মিঞে সমভাব অর্থাৎ শত্রুর  
সহিত সন্ধিস্থাপন, ৮ম সাধু ও পণ্ডিতগণের সহিত সহবাস,  
৯ম অনাথের প্রতি দয়া ও তাহাদিগকে ভিক্ষাদান, ১০ম  
সাধারণ দরিদ্রকে ভিক্ষাদান।

মুসলমানদিগের বহু ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মহরমের  
১০ম দিবস এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।—১ প্রথম সৃষ্টিপাত,  
২ আদম ও হবার মর্ত্যলোকে অবতরণ, এবং প্রজা সৃষ্টি-  
আরম্ভ, ৩ দশ সহস্র প্যাগম্বরের পবিত্র আত্মার ভগবদ্যোত্য-  
লাভ, ৪ আধা বা নবম স্বর্গ, ৫ কুর্শি বা ক্ষেত্রের ক্ষটিকনির্ম্মিত  
বিচারাসন, ৬ বিহিস্ত বা সপ্তম স্বর্গ, ৭ দেজাক বা নরক,  
৮ লোভ্‌হ বা বিচারফলনির্দেশক ফলক, ৯ কলম অর্থাৎ  
বিচার লিখিবার লেখনী, ১০ তরাদীর অর্থাৎ অদৃষ্ট বা  
ভাগ্য, ১১ হযাৎ বা প্রাণ, ও ১২ মামৎ বা মৃত্যুর উৎপত্তি।

২য় হাসন-হোসেনের আশ্বাৎসর্গ।

রৌজাৎ-উস-সোহাদা, কান্‌জুল গরাইব্ প্রভৃতি গ্রন্থে  
হাসন ও হোসেনের আত্মবিসর্জনের নানা প্রকার আখ্যা-

রিকা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সচরাচর ঐতিহাসিকগণ প্রামাণিক বলিয়া বেসকল বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইল।

ওসমান নিজ আধিপত্য কালে আখীর মরাবিয়াকে সিরীরাজ্য প্রদান করেন। মরাবিয়ার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আয়জিদ সিরীরাজ্যে রাজ্যসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎকালে মহম্মদের বংশধর ইমাম্ হাসন্ উত্তরাধিকারহুত্রে\* মদিনার সিংহাসনে আরবের খলিফারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দুই প্রজাদিগের উত্তেজনার আরজিদের সহিত হাসনের শত্রুতা জন্মিল। আয়জিদও অহঙ্কারে উন্নত হইলেন। তিনি হাসনকে সামান্য ফকীরের পুত্র ও দুর্বল মনে করিয়া তাহার বশতাব্যকারের জন্ত আদেশ পাঠাইলেন।

হাসন সিরীয়াপতির অস্ত্র আদেশ শুনিয়া জানাইলেন, “কি আশ্চর্য্য! কে কার পূজা করিবে! কোথা হইতে ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপিত হইল? নিরপেক্ষভাবে একবার ভাবিয়া দেখ। ধনলোভে ও রিপূর বশবর্তী হইয়া এরূপ অস্ত্রার কাজ করিও না; জান না কি! কালই তোমাকে দৈবের কাছে জবাবদিহি হইতে হইবে!” হাসনের কথায় আয়জিদ বিচলিত হইলেন না।

আবুহুস্রা জুবের নামে এক মদিনাবাসী আয়জিদের অধীনে কর্ত্তব্য করিত। তাহার এক অতিরূপবতী ভার্য্যা ছিল। সেই ভার্য্যার উপর আয়জিদের লোভ পড়িল। এক দিন আয়জিদ কৌশল করিয়া জুবেরকে প্রাসাদমধ্যে ডাকিয়া বলিলেন, ‘দেখ মদিনাবাসী! আমার এক চতুরা রূপসী ভগিনী আছে, তুমি কি তাহাকে বিবাহ করিতে চাও? আমি মনে করি, তুমি তাহার উপযুক্ত পাত্র’ আবুহুস্রার মাথা ঘুরিয়া গেল; আশায় উৎসাহিত হইয়া বলিল, ‘হে নরনাথ! কায়মনোবাক্যে আপনার আদেশপালনে এ দাস প্রস্তুত।’ আয়জিদ তাহাকে রাজাস্তম্ভপুরে আনিয়া বসিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। এক ঘণ্টা পরে আবার তথায় আসিয়া বলিলেন, ‘দেখ আবুহুস্রা! কস্তার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তোমার বিবাহ করে, কিন্তু তুমি বিবাহিত, সুতরাং তোমার বর্ত্তমান পত্নীকে ত্যাগ করিতে না পারিলে, সে তোমায় বিবাহ করিবে না।’ হুস্রাতি আবুহুস্রা তৎক্ষণাৎ আপন পত্নীকে তালাক-মুতালাক নিয়ম-মাহম্মদারে পরিত্যাগ করিল। আয়জিদ আবার একবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন, ‘রাজকন্যা এখন সম্মত হইয়াছে,

তাহার ইচ্ছা যে বিবাহের যৌতুক অগ্রেই যেন দেওয়া হয়।’ জুবের বলিল, আমি দরিদ্র, রাজকন্যাকে দিবার উপযুক্ত যৌতুক কোথায় পাইব? আয়জিদ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, তার ভক্ত চিন্তা কি, আমি তোমাকে সুবাদার করিয়া পাঠাইতেছি। এই বলিয়া তিনি জুবেরকে বহু দূর দেশে পাঠাইয়া দিলেন, সেই সঙ্গে পূর্ব্বতন সুবাদারকে লিখিয়া পাঠাইলেন, জুবেরকে প্রথমে সুবাদারী পদ দিয়া যে কোন কোশলে হউক তাহার প্রাণ সংহার করিবে। রাজ্য-দেশ অচিরে প্রতাপালিত হইল।

এদিকে আয়জিদ আপন রাজদূত মুসা আসরীকে দিয়া জুবের পত্নীকে বলিয়া পাঠাইলেন, দেখ, বিনা অপরাধে তোমার স্বামী তোমাকে পরিত্যাগ করিল, সে জন্ত দৈবেরও তাহাকে উপযুক্ত সাজা দিয়াছেন। এখন যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার মহিষী হইতে পার।

দূত মদিনায় আসিলে ইমাম্ হাসন তাহাকে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত উপযুক্ত উত্তর করিলে ইমাম্ও তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, যদি সে রমণী আয়জিদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়, তাহা হইলে বলিও, আমি তাহার পাণি-গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

মুসা আসিয়া জুবেরপত্নীকে প্রথমে সিরীরাজ্যের ধন-ঐশ্ব্যের যথেষ্ট পরিচয় দিল, রাজ্যদেশও জানাইল। দূতের মুখে সমস্ত শুনিয়া শেষে জুবেরভার্য্যা কহিল, তোমার স্বামী কিছু বলিবার আছে? তখন দূত বলিল, এই সহরের খলিফা আলীর পুত্র ও মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম্ হাসনও আপনার পাণিগ্রহণ প্রার্থী। তখন রমণী ধীরভাবে উত্তর করিল, ধন জন ঐশ্ব্য এ সকল ক্ষণিক, জোয়ারের জলের মত; সুতরাং আমি ধনৈশ্ব্য চাই না। তবে যে ধন পাইলে ভগবানের কাছে জবাব দিতে পারিব, আমি সেই হাসনের ধনে ধনী হইতে চাই।

যথাকালে দূতমুখে হাসন সকল কথা শুনিলেন, তিনি সেই রমণীগৃহে আসিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। দূত ফিরিয়া গিয়া আয়জিদকে আহুপূরিক সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সেই দিন হইতে আয়জিদ হাসনের চিরশত্রু হইলেন। তিনি বিষপ্রয়োগে হাসনের প্রাণবধের জন্ত কত কৌশল খাটাইলেন; কিন্তু সতর্ক হাসনের নিকট তাহার সে সকলই বার্থ হইল। আয়জিদ কুফীর প্রজাদিগকে জানাইলেন যে, তাহার কোন মতে হাসনকে তাহাদের রাজ্যে আনিয়া যে তাহার প্রাণবধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকে তিনি আপন ‘উজীর’ পদ দিবেন।

\* মহম্মদের পর আবু বকর, তৎপরে ওমার, তৎপরে ওসমান, তৎপরে মহম্মদের জামাতা আলী খলিফা হইয়াছিলেন। এই আলীর পুত্র হাসন ও হোসেন।

কুফির প্রজারা লোভে আকৃষ্ট হইল। তাহারা মিছামিছি হাসনকে সংবাদ পাঠাইল যে, আয়জিদের উৎপীড়নে তাহারা ব্যতিব্যস্ত। এ সময় তিনি যদি দয়া করিয়া কুফা-রাজ্যে আগমন করেন, তাহা হইলে প্রজাবৃন্দ সকলেই তাঁহার হইয়া অস্ত্র ধারণ করিবে! হাসন মিষ্ট কথায় ভুলিয়া কুফিদেশে চলিলেন। এই সময় আয়জিদ নিজ মন্ত্রী মারবানকে মদিনায় পাঠাইলেন।

হাসন মোবল নগরে আসিয়া এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া এক গৃহস্থের অতিথি হইলেন। সেই দিনই গৃহস্থ হাসনের খাণ্ডে বিব মিশাইয়া দিল, কিন্তু তাহাতে হাসনের কিছু ক্ষতি হইল না দেখিয়া আবার বিবপ্রয়োগ করিল, এবার হাসন অতিশয় পীড়িত হইল। আয়জিদের কাছে এ সংবাদ গেল। আয়জিদ গৃহস্থকে লিখিলেন, 'বেরূপে পার, হাসনকে সরাইবে। উজীর পদ তোমারই।' ঘটনাক্রমে সে পর হাসনের হস্তে পড়িল। তিনি আর কাহাকে কিছু বলিলেন না, স্থির করিলেন যে, গৃহপরিভ্যাগ করাই উচিত।

একদিন এক দুষ্ট বর্ষাধারী বর্ষার ঘূষে বিব মাখাইয়া অন্ধ সাজিয়া হাসনের নিকট আসিল ও করজোড়ে জানাইল,— আমার চক্ষু নাই, আমি ঐ শ্রীপদে চক্ষু দুইটা ঘষিতে চাই, তাহা হইলেই আবার পূর্ণচক্ষু লাভ করিব। এই বলিয়া সে হাসনের সায়ে আসিয়া পড়িল, বর্ষাঘাতে ইমামের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। কএক ব্যক্তি সেই দুষ্টকে আঁরিতে উভত হইল। হাসন তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, দেখ রক্তের পরিবর্তে রক্ত লইবার ব্যবস্থা, কিন্তু এখনও আমি জাঁবিত; অতএব কেন তোমরা অাগার প্রাণ লইবে? নিশ্চয় জানও, ভগবান্ এই ভাগ্যকারীকে প্রকৃত অন্ধ করিয়া উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিবেন। এইরূপে দুর্বৃত্তকে ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু নিজে বহুদিন বিধের আলায় কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন।

আর সেই শত্রুপুরাতে না থাকিয়া তিনি মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। এখান আয়জিদের মন্ত্রী মারবান্ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি জোয়াদা নামে এক রমণীকে প্রতৃত্ত অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহার হস্তে তাঁত্রি বিব অর্পণ করিলেন। সেই দুষ্টা নারী ধনলোভের আশায় গভীর নিশায় তাঁত্রি বিব লইয়া হাসনের শয়নমন্দিরে উপস্থিত হইল; দেখিল, হাসনের শিয়রে মদলিনে ঢাকা জলপাত্র রাখিয়াছে, আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই জল মধ্যে বিব মিশাইয়া দিয়া দুষ্টা সরিয়া পড়িল। তখনও হাসন পীড়িত

ছিলেন, তিনি তৃষ্ণাক্ত হইয়া ভগিনী কুলসুমের কাছে জল চাহিলেন। কুলসুম না আনিয়া সেই বিবাক্ত জলপাত্র ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই জল পান করিয়া হাসন অন্ধকার দেখিলেন, বিষের যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বুঝিলেন এ যাত্রা আর তাঁহার রক্ষা নাই। কনিষ্ঠ সহোদর হোসেনকে ডাকিয়া অনেক হিতোপদেশ দিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জন্মাণ্ড-উল্‌বকিয়া নামক কবরে তাঁহার গোর হইল।

হোসেন ভ্রাতার জন্ত অনেক বিলাপ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। এখন তিনিই খলিকা হইলেন। কুফির অধিবাসিবৃন্দ হোসেনের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানাইল, 'ভগবানের নামে শপথ করিয়া আমরা বলিতেছি, যদি আপনি এ দরিদ্রদিগের দেশে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে এবার আমরা নিশ্চয়ই ধর্ম্মের জন্ত আপনাকে হইয়া প্রাণপণে দ্বন্দ্ব করিব।'

সরলহৃদয় হোসেন কুফিদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রিয় ভ্রাতৃপুত্র মুসলিমকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। মুসলিম কুফিতে আসিলে ত্রিশ হাজার লোক আসিয়া তাঁহার পূজা করিল ও দিব্যরাত্র তাঁহার আদেশপালনে তৎপর থাকিল। তাঁহাদের আত্মগতোর সংবাদ মুসলিম হোসেনকে লিখিয়া জানাইলেন। এ সংবাদে হোসেন নিতান্ত প্রীত ও উৎসাহিত হইয়া নিজ পরিবার ও ভ্রাতৃপরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া কুফি-রাজ্যে চলিলেন।

এদিকে আয়জিদ কুফিদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, সাবধান যে হোসেনের পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহার আর নিস্তার নাই, সে সবংশে প্রাণে মরিবে। মুসলিমকে সকলেই ভাল বাসিত, অবিলম্বে সকলে আসিয়া আয়জিদের কঠোর সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সকলেই পরামর্শ দিল যে, আর এ রাজ্যে তাঁহার একদণ্ড থাকা উচিত নহে।

মুসলিম্‌ হানি নামক এক ব্যক্তির গৃহে লুকাইয়া রহিলেন। আয়জিদের অসুগত সুবাদার আবহুলা সে খবর পাইলেন। তিনি মুসলিম্‌কে হাজির করিবার জন্ত হানিকে হুকুম করিলেন। ভক্ত হানি সে কথা শুনিলা না। সুবানারের আদেশে হানির প্রাণবধ করা হইল। ইহার পর মুসলিম্‌ গৃহ ও নিষ্ঠুর উৎপীড়নে নিহত হইলেন। তাঁহার ৬৭ বর্ষের দুইটা অনাথ শিশু কারাগারে বন্দী হইল। শিশু দুইটার মলিন মুখ দেখিয়া কারাধ্যক্ষের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল। সে শিশু দুইটিকে বাচাইবার আশায় ছাড়িয়া দিল। তাহারা সুরা নামে এক কাজির ঘরে গিয়া লুকাইল।

সুবাদার বালক দুইটিকে ধরিবার জন্য চারিদিকে ঘোষণা দিলেন। সূরা সেই অনাথ দুইটির প্রাণরক্ষার জন্য কফিলা বা পর্যটক দলের সহিত পাঠাইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় তাহারা সন্ধ্যা ও পথ হারাইল। তখন উভয়ে একটি খেজুর গাছের তলে বসিয়া কাদিতে লাগিল। এমন সময় হারিসের এক ক্রীতদাসী জল লইয়া সে পথ দিয়া বাইতে ছিল। সে বালকদ্বয়ের চান্দমুখ দেখিয়া বলিল, ‘তোমরাই কি মুসলিমের পুত্র।’ বালকদ্বয় পিতার নাম শুনিয়া আরও চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিল। ক্রীতদাসী ছেলে দুটিকে নিজ প্রভু-পত্নীর নিকট আনিла। হারিসপত্নী তাহাদের মুখ দেখিয়া মাড়মেহে অভিভূত হইলেন, কোলে লইয়া কতই কাদিলেন ও তাহাদিগকে পুত্রনির্ধিষে পালন করিতে লাগিলেন। হারিসের উপরই তাহাদের ধরিবার ভার ছিল। কিন্তু তাহার পত্নী স্বামীকে কোন কথা না জানাইয়া পার্শ্বের ঘরে ছেলে দুটিকে লুকাইয়া রাখিল। রাত্রিকালে বালকদ্বয় স্বপ্ন দেখিল যেন, তাহাদের পিতা মুসলিম আসিয়া তাহাদিগকে খুঁজিতেছে। তাহারা চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল। সে স্বর পার্শ্বের ঘরে হারিসের কণে পৌঁছিল। ধৃত হারিস তাড়াতাড়ি আসিয়া ছেলে দুটিকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। উভয়ের কেশগুচ্ছে উভয়কে বাধিয়া লইল। তাহার পত্নী দাসদাসী আশ্রয় স্বজন সকলেই কত নিবেদন করিল, কিন্তু হারিস কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। পথে এক নদীতীরে বালক দুইটিকে হত্যা করিল। তাহাদের মূণ্ড লইয়া সুবাদারের নিকট হাজির হইল এবং পুরস্কারের প্রার্থনা জানাইল। কিন্তু কেহই হারিসের ব্যবহারে প্রীত হইল না, সকলেই এই স্বয়ংবিদারক ব্যাপার দর্শন করিয়া বিচলিত হইল। সুবাদার আবহুলা অতি অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ‘তোমাকে আমি বধ করিবার আদেশ দিই নাই, ধরিয়া আনিতে বলিয়াছি, তবে কেন এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলে? যে, নদীতীরে অনাথ বালকদ্বয়ের শিরশ্ছেদ করিয়াছ, সেখানে তোমারও শিরশ্ছেদ হউক।’ সুবাদারের আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল।

অনন্তর ইমাম্ হোসেন কুফিরাঙ্কো আসিলেন। মুসলিম ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের হত্যাসংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। ইহারই অত্যন্তকাল পরে সিরীয়া হইতে আরবিদের দুইজন উজ্জীর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, ‘হোসেন, যদি জীবনে মমতা থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র আসিয়া আরবিদের অধীনতা স্বীকার কর। নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।’ তদন্তরে হোসেন জানাইলেন, ‘তোমরা কি মুসলমান? তোমাদের

কি জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই নাই। খিলাফ্ কার? কার পিতা, কার মাতামহ হইতে ইসলামধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে? যদি তোমরা আমার বিপক্ষে ‘জহাদ’ (ধর্ম্মযুদ্ধ) করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরচরণে প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত আছি।’

সিরীয়াপতি যুদ্ধ চালাইতে আদেশ দিলেন। আরবিদের সৈন্তগণ ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর নিকট ছাউনি করিল। নদীর অপর পারে ‘মারিয়া’ নামক জঙ্গলে হোসেন সদলে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানই ‘কারবালা’ বলিয়া পরিচিত। কারবালায় হোসেন উপস্থিত হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—‘ভাই মুসলমান, ইসলাম-ধর্ম্মিগণ! যদি কাহারও জ্ঞাপুত্রপরিবারের প্রতি মমতা থাকে, তাহা হইলে কায়মনোবাক্যে তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা এই কারবালা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া যাও। কারণ, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এই কারবালায় আমি ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিব। তবে কেন তোমরা বুঝা আমার জন্য কষ্ট ও বিপদ ভোগ করিবে। এইরূপে হোসেনের আদেশে কেহ মক্কায়, কেহ বা মদিনায় চলিয়া গেল। তাঁহাকে লইয়া কেবল ৭২ জন মাত্র রহিল। অবশেষে ওমার ও আবহুলায় অধীনে কয়েক দল আরবিদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া হোসেনের পক্ষাবলম্বন করিল। শত্রু-পক্ষে ৩০ হাজার লোক। হোসেন মুষ্টিমেয় সৈন্ত লইয়া আর কতক্ষণ যুঝিবেন। তাহার প্রিয় অমৃতবর্গ ধর্ম্মের জন্য শত শত শত্রুসৈন্তবিমদনপূর্ব্বক জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হর, আবহুলা, আওবন্, হাশ্বালা, হায়ালাল, আব্বাস, অকবর ও কাসিমই প্রধান।

ধর্ম্মযুদ্ধে সকলেই যখন একে একে প্রাণ দিতেছেন, তৎকালে হোসেনের প্রিয় পুত্র জৈন্-উল্-আবেদীন্ কঠোর অরে শয্যাগত থাকিলেও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া হোসেন পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, ‘আমার নয়নের জ্যোতিঃ, এমন কথা মুখে আনও না, তুমি আমার বংশরক্ষা করিবে। আমার পিতা, পিতামহ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার যে দৈব রহস্য কাণে কাণে শিখাইয়া গিয়াছেন, আমি সেই অমূল্য রত্ন তোমায় দিতেছি, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত আমার বংশপরম্পরায় এই রহস্যের আধিকারী থাকিবে।’

জৈন্-উল্-আবেদীন পিতার নিকট রহস্য অবগত হইয়া তাঁহার আদেশে রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন। পুত্রকে বিদায় দিয়া হোসেন জুল-জালা নামক আপনার প্রিয়তম অশ্বে

আরোহণ করিয়া রণস্থলে দেখা দিলেন। তিনি তখন তৃষ্ণায় বড় কাতর, কোথাও জল পাইতেছেন না; তিনি শত্রুবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ মুসলমানগণ! তোমরা কি জান না, আমার মাতামহের যে মূলমন্ত্র দিবারাত্র তোমরা উচ্চারণ করিয়া থাক, আমি সেই প্যাগধরের দৌহিত্র, এবং আলীর পুত্র। ঈশ্বরকে অথবা তাঁহার প্যাগধরকে কি তোমরা ভয় কর না, সেই শেষ-বিচারের দিন আমার মাতামহকে কি তোমরা চাও না, সেই শেষ দিন ভাবিয়া কি ভীত ও কম্পিত হইতেছ না। তোমাদের করে ধর্মের জন্ত আমার আত্মীয় কুটুম বন্ধুবান্ধব অনেকেই প্রাণ বিসর্জন করিতেছে। সে সব যাক্, এখন আমার একটা অমুরোধ—পরিবার সহ আমাকে এই আরব দেশ ছাড়িয়া আজম (পারস্ত) দেশে যাইতে দাও। যদি তাতেও বাধা হও, তাহা হইলে ভগবানের দোহাই, একটু জল দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। দেখ, তোমাদের হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গবাদি সকলেই প্রচুর পরিমাণে জল পাইতেছে, কিন্তু আমি কি হতভাগ্য, আমার পরিবারবর্গ জলের জন্ত হাহাকার করিতেছে! জলাভাবে মাতৃভ্রমণেও দুঃখ নাই, শিশুগণের কষ্ট শুদ্ধ!

হোসেনের কাতরবশে সকলের হৃদয় বিচলিত হইল। অনেকেই তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়িল, কিছুকালের জন্ত শান্তিবাণ্ড বাজিয়া উঠিল। কিন্তু শান্তি কোথায়? তাঁহার পরিবার মধ্যে সর্বত্রই ‘জল’ ‘জল’ রবে হৃদয়ভেদী আর্তনাদ উঠিতেছে।

পরদিন আবার রণবাণ্ড বাজিল। আজ হোসেন জীবন-উৎসর্গ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। আজ তিনি আত্মীয় স্বজনকে আলিঙ্গন করিয়া জানাইলেন, যে তাঁহার আত্মোৎসর্গের পর কেহই যেন আত্মীয়তাকেশে বন্ধে করাঘাত বা রোদন না করে, বিলাপ মুখের সাজে, জ্ঞানার পক্ষে নহে। বিপদে ও বিরহে ধৈর্য্যাবলম্বনই কর্তব্য। এইরূপে আত্মীয় স্বজনকে উপদেশ দিয়া ধর্মবীর একবারে রুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এবার তাঁহার প্রবল আক্রমণ শত্রুসৈন্য সহ করিতে পারিল না, ইউফ্রেডিসের পরপার পযাস্ত তাহারা বিতাড়িত হইল। কিন্তু হায়! হোসেন রণক্ষেত্রে দারুণ পিপাসায় কাতর, জল পাইলেন বটে, কিন্তু তখনই তৃষ্ণার্ত্ত পরিবারবর্গের মুখ মনে পড়িল, আর তিনি জল পান করিতে পারিলেন না, অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িলেন। এই সময় পরীরাজপুত্র জাফর তাঁহার সাহাবার্থ উপস্থিত হইলেন। তিনি অলক্ষ্যে যুদ্ধ করিয়া শত্রুকুল নির্মূল করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হোসেন ধীরভাবে কহিলেন, যাও জাফর, আমি তোমার

সাহায্য চাই না। তুমি অমামুদ, তোমার সহিত মামুদের যুদ্ধ সাজে না। আমি অধর্ম যুদ্ধ করিব না। যুদ্ধ করিয়াই বা কাজ কি! মুহর্ত্তের জন্ত এ সংসারে আসিয়াছি,—আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই চলিয়া গিয়াছে। আমি আর কেন থাকি? যাও, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন। জাফর আর কি করিবেন, কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। এখন হোসেন নিরস্ত্র, প্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্ত প্রস্তুত! কিন্তু কি আশ্চর্য্য,—শত্রুগণ কেহই সম্মুখীন হইতে পারিতেছে না, যে তাহার মুখ দেখে, সেই ফিরিয়া যায়। অবশেষে আরজিদের অমুগত স্মার-জিল-জোসানকে সঙ্গে লইয়া নরপিশাচ সিনান কাব্যাজে উপস্থিত হইল। আরজিদের লোভে উভয়েই লুপ্ত। কিন্তু তাহারাও সাদা চোখে হোসেনের নিকট আসিতে সাহসী হইল না। স্মার মুখে ঢাকা দিয়া হোসেনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। হোসেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—কে তুমি, তোমার আবরণ উন্মোচন কর! স্মার আবরণ খুলিল, কিন্তু একি! তাহার মুখে দুইটা বৃহৎ বরাহমস্ত, বক্ষঃস্থল কৃষ্ণবর্ণে চিহ্নিত! হোসেন তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—‘ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। আজ ইদবার (শুক্রবার) মহরমের দশমী, জহরের প্রকৃত কাল, ফরজ-রফৎ-ভজনা শেষ করিয়া লই।’ এই বলিয়া হোসেন প্রথম নমাজ করিয়া উঠিয়া যেমন দ্বিতীয়বার জামুপাতিবার উপক্রম করিবেন, সেই মুহর্ত্তেই স্মারের স্ত্রী শত্রুঘাতে হোসেনের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্যুত হইল।

হোসেনের দেহত্যাগের পর ওমার ও আবু হুজ্জা আত্মীয় স্বজনের মৃত দেহ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর নমাজ-ই-জনায পাঠ করিয়া সকলকে গোর দিয়া ফেলিলেন।

পর দিন, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল খুলি নামক এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে হোসেনের মুণ্ড রাখিয়া, প্রত্যেকে স্ব স্ব পেটিকা মধ্যে দুই একটা মুণ্ড আবদ্ধ করিয়া সিরীয়া অভিমুখে ধাবিত হইল। দ্রুত খুলি, বর্ষার মাথায় মুণ্ড রাখিয়া প্রতি সফরে দেখাইতে দেখাইতে চলিল।

যেখানে রক্তাক্ত-কলেবরে মুণ্ডহীন হোসেনের দল বল নিপতিত, কতকগুলি সৈন্য হোসেনের পরিবারবর্গকে সেই রুধির-ক্ষেত্রের উপর টানিয়া আনিয়া। হায় সে মর্শ্বেদী দৃশ্য দেখিলে পাশাণও দবীভূত হয়। হোসেনের প্রিয়পত্নী সহরবাণো ও তাঁহার ভগিনী জৈনাব ও কুলম্ম সে দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হইলেন, চীৎকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—‘দাদা মহম্মদ তুমি কোথায় তুমি, তোমার প্রিয় দৌহিত্র হোসেনের হৃদয় দেখে যাও। যে গড়স্থলে তুমি কত



আমাদের চুখন করতে, সেখানে কথিরোদগারী ভীষণ খড়াচিহ্ন! দেখে বাও, তোমারই আত্মীয় পরিজন গৃহপুত্র, বান্ধবপুত্র নিরাশ্রয়—অনাথ হইয়া হাহাকার করিতেছে। জৈনাব ও কুল-স্বমের সেই বিলাপোক্তি শুনিয়া তাঁহাদের শত্রুরও চক্ষে জল আসিয়াছিল। এইরূপে বন্দিভাবে তাঁহার সিরীয়ায় আনীত হইলেন।

হোসেনের মুণ্ড আনিবার সময় তাহা হইতে পথে নানা প্রকার অভূতপূৰ্ব দৃশ্য ঘটিয়াছিল। ইমাম্ হুসাইন লিখিয়াছেন যে, মোসল সহরে মুণ্ডগুলি আসিয়া পৌঁছিলে, রাত্রিকালে জালাবদ্ধ করিয়া এক মসজিদ মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। একজন প্রহরী বাতায়ন-পথে দেখিয়াছিল যে, এক খেত-শ্রমধারী অতি দীর্ঘকায় পুরুষ পেটিকা হইতে হোসেনের মুণ্ড বাহির করিয়া কাদিতে কাদিতে কতবার চুখন করিলেন। এইরূপে একে একে সকল পিতৃপুরুষ আসিয়া মুণ্ড লইয়া চুখন ও অশ্রুজলে অভিষেক করিয়াছিলেন। পাছে তাহার মুণ্ড লইয়া চলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় প্রহরী দ্বার খুলিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, কিন্তু ‘প্যাগবরেরা উবালোকে মুণ্ড ধর্শন করিতে আসিয়াছেন। কি সাহসে তুই তাঁহাদের অসম্মান করিলি’ এই বলিয়া এক ব্যক্তি তাহার গালে চপেটাঘাত করিলেন, সে চড়ে তাহার গালে কালশিরা পড়িয়া গেল। প্রাতঃকালে প্রহরী আসিয়া নায়কের নিকট নিজ দুঃবস্থা ও পূর্বঘটনা প্রকাশ করিয়াছিল।

বধাকালে মুণ্ডগুলি সিরীয়ায় আসিল। আরজিদ্ হর্ষাৎ-কুল স্বমের সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, ‘সুফিয়ান্ ও ওময়ার বংশ নাশ যাহার উদ্দেশ্য ছিল, আরব ও আজমের খলিফা হইবার উচ্চাশায় যে উন্নত হইয়াছিল, দেখ ভগবান্ তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিলেন।’ হোসেনের বালকপুত্র জৈন্ উল্ আবেদীনের এক কষ্টী কথা অসহ্য মনে হইল। তিনি উঠিয়া বলিলেন, ‘সিরীয়াবাসী আরজিদের পক্ষাবলম্বী লোভী আমীর-গণ, জিজ্ঞাসা করি,—তোমরা আমার দাদার ধর্ম মতনা আবি সুফিয়ানের মত অভ্যাস কর। তোমাদের কি ঈশ্বরে ভর নাই।’ বালকের কথা শুনিয়া আরজিদ্ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বালকের মাথা কাটিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু বালকের চাঁদমুখ দেখিয়া আমীর ও ওমরাহগণের বড় দয়া হইল। তাহাদের কাকুতি মিনতিতে পাষণ্ডজন্য আরজিদেরও রক্ত ফিরিল। সিরীয়াপতি জৈন্-উল্ আবেদীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বালক, নির্ভয়ে বল, তোমার মনোগত ইচ্ছা কি?’ বালক সোৎসাহে উত্তর করিলেন, ‘আমি তিনটি চাই,—১ম আমার পিতার হত্যাকারীকে অর্পণ করুন। ২য়, পরিবার

বর্ণ ও মুণ্ডগুলি ছাড়িয়া দিয়া আমার মাদিনায় পাঠাইয়া দিন। ৩য়, কল্যা শুক্রবার, আমার খুত্বা পাঠ করিতে দিন।’

আরজিদ্ বালকের প্রত্যবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে গোপনে নিজ সিরীয় খতিবকে তাহার পিতৃপুরুষের স্বতি-মূলক খুত্বা পাঠ করিতেও পরামর্শ দিলেন। পরদিন সিরীয়-খতিব রাজাভিলাষমত মহম্মদের এবং আলীর বংশধরগণের নিন্দা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আবি সুফিয়ান্ ও ওময়ার স্মৃতি-কীর্তন করিল। তাহাতে বালক মর্ম্মাহত হইয়া আরজিদ্কে বলিলেন, ‘এই কি রাজাদেশ। আপনি না আমাকে খুত্বা পাঠের আদেশ করিয়াছেন?’ উপস্থিত সভ্যগণও বালকের কথা শুনিতে চাহিল। তখন রাজাদেশ পাইয়া জৈন্ উল্ আবেদীন মহম্মদ ও আলীর বংশধরগণের স্মৃতি-গান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে খুত্বা পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার মিষ্ট কথায় সিরীয়বাসী প্রেমাত্মক বর্ণন করিতে লাগিল। সিরীয়পতি দেখিলেন তাহার অমুগত সকলেই বালকের কথায় বিচলিত হইয়াছে। পাছে তাহার তাহারই বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে, এই আশঙ্কায় তাহার মোবাজানকে কামাত পাঠ অর্থাৎ ধর্মোপদেশ দান করিতে আদেশ করিলেন। ভজনা শেষ হইলে সমস্ত মুণ্ড ও উপযুক্ত পাথের দিয়া জৈন্ উল্ আবেদীনকে মাদিনায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ৪০ দিন পরে আবেদীন্ কারবালা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং আত্মীয় স্বজনদের মৃত দেহে মুণ্ডযোজনা করিয়া তাঁহাদের সমাধিক্ষেত্র সম্পন্ন করিলেন। মাদিনায় আসিয়া সকলে মহম্মদের ও হোসেনের গোরস্থানে গিয়া কতই কাদিলেন। পরে সমস্ত মাদিনারাজ্য জৈন্-উল্ আবেদীনের অধিকারভুক্ত হইল।

৪৬ হিজরার হোসেন জীবনোৎসর্গ করেন। সেই দিন হইতে ইদ্ উৎসবের আমোদ-পমোদ উঠিয়া যায়, তাহার স্থানে শোকচিকিৎসার ও সর্বত্র বিলাপ প্রচলিত হইল।

৩য় আশুরা অর্থাৎ মহরমের প্রথম ১০ দিনের অনুষ্ঠান।

প্রথম চন্দ্রদর্শনের সুফ্যাকাল হইতে মহরম উৎসব আরম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু তৎপর দিনের প্রাতঃকাল হইতে মহরম মাসের ১ম দিন গণিত হয়।

জিয়ারাত লইয়া মহরম ১২ দিন অর্থাৎ ১৩শ খন বা। ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত থাকে, কিন্তু প্রথম দশ দিনই আশুরা বা পুরুদিন বলিয়া গণ্য।

পক্ষের অন্ত গৃহ নির্দিষ্ট আছে, তাহা আলম, তাবুৎ, শাহ-নদীন, বুলাক, টাটিয়া প্রভৃতি দিয়া সাজান হয়। ঐ সকল গৃহ আশুরখানা (দশাহের গৃহ), তাজিয়াখানা (শোকাগার) ও আতানা (ককীরের স্থান) বলিয়া গণ্য। মহরমের ১৬



দিন পূর্বে আগুরখানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। চন্দ্রদর্শন হইলেই হোসেনের নামে খানিকটা সর্করার উপর 'ফতিহা' দিয়া বাতখনি করিতে করিতে 'আলোয়া' করিবার জমিতে কোদালি আঘাত করা হয়। অনেকে দুই তিন দিন পরে তথায় গর্ত খোঁড়ে। আগুরখানার সম্মুখেই চতুর্দশ গর্ত করিতে হয়। ইহারই নাম 'আলোয়া'। প্রতিবর্ষে এক হানেই 'আলোয়া' করা কর্তব্য। সন্ধ্যাকালে উৎসবের কয়দিন তন্মধ্যে আলো দিতে হয় এবং তাহার বেড়ার বাহিরে বালয়কুশুবা সকলে একত্র হইয়া লাগী অথবা তরবারিক্রীড়া করিয়া থাকে। তৎকালে 'ইয়া আলী ইয়া আলী, শাহ্ হাসন শাহ্ হাসন, শাহ্ হোসেন, শাহ্ হোসেন, হুলা হুলা, হায় দোস্ত, হায় দোস্ত, রহিও রহিও' সকলে এইরূপ বারংবার বলিতে বলিতে চীৎকার করিতে থাকে। এই সময় কেহ প্রজ্জলিত মশালের উপর দিয়া লাকাইয়া যায়, কেহবা বারংবার আগুন ঘুরাইতে থাকে।

আলোয়ার ধারে রাজিকালে খেলাই বিধি, দিনে বড় একটা খেলা হয় না। জ্বালোকেরা আগুরখানা ভিন্ন কেবল আলোয়া প্রস্তুত করে এবং মরসিয়া বা আলীর বংশধরগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে স্তুতি গান করিতে থাকে। তাহারও 'শাহ্ জবান শাহ্ জবান, তিনো তিনো, লুহ্ সন লুহ্ সন, ডুবা ডুবা, গিরা গিরা, মরা মরা, পড়া পড়া,' এইরূপ বলিতে বলিতে শতাব্দিক বার বৃক্ষ চাপড়াইতে থাকে। অবশেষে 'ইয়া আলী' একবার বলিয়া অন্ন বিগ্রাম লইয়া আনা থাকিলে আবার 'মরসিয়া' গান করিতে থাকে। কোন কোন রমণী কাঠের পেষণী অথবা মাটির দেয়ালের উপর বাতি আলিয়া তাহারই পার্শ্বে শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। ১ম, ৩য় ও ৪র্থ ঘন বা তিথিতে আগুরখানা গালিচা, চাঁদোয়া, পরদা, ঝাড়, লঠন প্রভৃতি নানা আসবাব দিয়া যথাযথ সাজান হয়।

এদেখে আলম্ বা ধবল গুল সাদা, পাঞ্জা, ইমাম্ জাদা, পীরান্, সাহিবান্, হামামিন্ প্রভৃতি নামেও খ্যাত। হুলা জয়-পতাকার স্বরূপ। সাধারণতঃ দুই প্রকার আলম্ দেখা যায়। মহী ও মুরাতিব। মহা মংস্তচিহ্নযুক্ত, আর মুরাতিবগুল জরি, লাল, বা সাদা কাপড় দিয়া সাজান হয়।

হোসেনের পতাকা স্বরূপই সমস্ত আলমের ব্যবহার, কিন্তু ভারতবর্ষে বিভিন্ন পীর, সাধু বা ধর্ম্মের জন্ত শ্রাণত্যাগকারীর নামেও আলম্ হুতে দেখা যায়। যেমন পাঞ্জা-ই হায়দার, পাঞ্জা-ই-মুর্জুজা আলী, পাঞ্জা-মুসকিল্ কুশা, আলম্-ই-আবাস, আলম্-ই-কানিম, আলম্-ই-আলা অকবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

আলম্ গুল সচরাচর তামা, পতল বা লৌহে নির্মিত হয়। থাকে, স্থানবিশেষে স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মণিমাণিক্যজড়িত আলম্

প্রস্তুত হয়। স্বর্ণকারের গৃহে আলম্ প্রস্তুত হইলে মহাসমারোহে বাজ সহ তাহা আগুরখানায় আনা হয় এবং লাগী বা দণ্ডের উপর আঁটিয়া দেওয়া হয়। প্রতিপদ, চতুর্থী বা পঞ্চমীর দিন গর্ত মধ্যে অথবা কোন ঠেস দিয়া রাখা হয়। কোন কোন স্থলে তাহার পার্শ্বে কদম রম্মলের পদচিহ্নও অঙ্কিত হয়। আলম্ স্থাপন কালে ধূপ ধূনা জালান এবং হাসন-হোসেনের নামে সরবতের উপর ফতিহা দেওয়া হয়। সেই সরবৎ পরে ধনী দীন সকলেই বণ্টন করিয়া লয়। এইরূপে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ফতিহা ও কোরাণ পাঠ এবং জুল দিয়া পাঞ্জা সাজান হয়। এখানে নানাজাতীয় ফকীর উপস্থিত থাকেন, দিবাভাগে কেবল তাহার কোরাণ পাঠ করেন, কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রোজা-উস-সোহাদা অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্ত আত্মোৎসর্গকারিগণের জীবনী পাঠ ও মরসিয়া গান হইয়া থাকে। গৃহস্থগণের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহার সাকালে সন্ধ্যায় মাংসহীন খিচড়া ও সরবৎ প্রস্তুত করেন এবং ইমাম্ হোসেনের নামে ফতিহা দিয়া তাহাই খাইয়া থাকেন ও দীন দরিদ্রদিগকেও বিতরণ করেন।

কাহারও কাহার আগুরখানার প্রতি রাত্রিই মরসিয়া ধুনী (শোকসঙ্গীত) হইয়া থাকে। তজ্জন্ত একজন মধুরকণ্ঠ বালক শিক্ষিত হয়। শোকসঙ্গীত শুনিবার জন্ত বন্ধুবান্ধব, ফকীর ও বহু লোক উপস্থিত হইয়া থাকে।

সপ্তমীর দিন আগুরখানা হুতে বিভিন্ন আলম্ বাহির করা হয় এবং একজন অথারোহী তাহা লইয়া বেড়ায়। এক আলম্ লইয়া যাইবার সময় পথে যদি অপর কোন আলম্ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আলম্ জন-ছলে পরস্পরকে স্পর্শ করান হয়। আলম্ বাহির হইবার সময় 'মরসিয়া' গান হইয়া থাকে, সম্মুখে ধূপ ধূনা জালান হয় এবং স্ব স্ব আগুরখানার ফিরিয়া আসিলে, ২৩ পাত্র সরবৎ প্রস্তুত করিয়া ফতিহা দেওয়া হয়। সপ্তমীর দিন পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে সহর-ভ্রমণের জন্ত নিজ (বলম) বাহির করা হয়। তাহা কাপড় দিয়া জড়াইয়া দুই পাশে সামলা বাঁধিয়া দেওয়া হয়, যেন সামলা বায়ুতে উড়িতে থাকে, তাহার মাথায় হোসেনের মুণ্ড স্বরূপ একটা নেবু রাখা হয়। কেহ কেহ বলমের পরিবর্তে বংশদণ্ড ব্যবহার করে। সেই দণ্ড লইয়া অনেকে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। গৃহস্থ চচ্ছামত ভিক্ষা দেয়। ভিক্ষা পাইলে মুজাবীর (আগুরখানার পরিচারক) গৃহস্থকে কিছু ডান্ন দিয়া আসে।

ঐ দিন সন্ধ্যাকালে নলসাহেব ও জুল-ফকর বাহির হয়। নলসাহেব অবস্থানস্বারে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহাদি নান্দা খাড়িতে

নির্ধিত হইয়া থাকে। ইহা হোসেনের ঘোড়ার খুর বলিয়া পূজা। নলসাহেবকে বহু দ্রুতগতিতে বাহির করা হয়, সে সময় বৃদ্ধ, নারী ও বালকগণকে দূরে থাকিতে হয়, নচেৎ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অষ্টমীর দিন সন্ধ্যাকালে বরজ্জি বা কুদরতি আলম্ ও সবনীর দিন আব্বাস-ই আলম্ ও হোসেনী আলম্ বাহির হইয়া থাকে।

দশমীর রাত্রিকালে (আলম্-ই-কাসিম ভিন্ন) সমস্ত আলম্ বা পতাকা ও তাবু বা তাজিয়া লইয়া সকলে 'সবগুস্ত' বা রাত্রিপৰ্যাটন-উৎসব সম্পন্ন করেন। এই সময় ভারি ধুম হয়, সমস্ত রাত্তার আলোকমালা জ্বলিতে থাকে। সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ চলিতে থাকে। নিম্নশ্রেণী প্রথম রাত্রিতে এবং উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা মধ্যরাত্রিকালে বাহির হয়। সকল প্রকার বৃদ্ধ সজ্জা, এমন কি রণকীড়াও প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কারবালাক্ষেত্রে বেক্রপ হোসেনের সমাধিমন্দির আছে, তাহারই আদর্শে, কেহ বা মদিনার নব্বা ধরিয়া, কেহ বা মহম্মদের গোরস্থানের অমুকরণে তাবু (তাজিয়া) প্রস্তুত করেন এবং নানা বর্ণের কাগজ ও ঝালর দিয়া তাহা সাজান হইয়া থাকে। অবস্থাভূমারে তাজিয়ার ও ভারতম্য আছে। কেহ কেহ তাবু বা তাজিয়ার পরিবর্তে শাহনদীন বা দাদমহল (রাজসভা) প্রস্তুত করিয়া থাকে। ভগবান্ মহম্মদকে সর্গে যাঁহবার ক্রত দেবদূত জব্রিলকে দিয়া যে বুরাক্ (অশ্ব) পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন, অনেকে আবার সেইরূপ কাঠের বুরাক্ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে যথাযথ সাজাইয়া পথে বাহির করিয়া থাকে।

হিন্দুদের যেমন গাঞ্জে সন্ন্যাসী বা সং বাহির হয়, সেই রূপ সেই দশমী রাত্রিতে নানাসাজে মহরমের নানা ফকির বাহির হইয়া থাকে, ঐ সকল ফকিরের নির্দিষ্ট সাজ সজ্জা অমুসারে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা আছে। যথা ১ মহালীবালা, ২ বানাবা, ৩ লয়লা, ৪ মজ্জু, ৫ ভারাদ, ৬ মলজ, ৭ আঙ্গা-টীশা, ৮ সিজি বা কাফ্রি ফকীর, ৯ বাগোল, ১০ কাওয়াশা, ১১ হাতকঠোরাবালা, ১২ নক্‌সাবন্দী, ১৩ হাজি আহম্মক ও হাজি বেক্রক, ১৪ বুড়াবুড়ি, ১৫ জল্লিলিয়া ও থাকিয়া, ১৬ বাঘশা, ১৭ মটকি শাহ, ১৮ চাটুনিশাহ, ১৯ হাকিম, ২০-মুসাফির শা, ২১ মোগল, ২২ ব্যাজখোরা, ২৩ মুজা করম, ২৪ আড়শা, ২৫ যোগিয়া, ২৬ বকাল, ২৭ নক্‌লিশা, ৩০ কখলশা এইরূপ বহুতর সং বাহির হয়। পূর্বে বঙ্গদেশেও ঐ সকল সং বাহির হইত, এখন আর সেরূপ উৎসাহ দেখা যায় না।

এই সময় হোসেনের নামে পোলাও, খিচুড়ী, সরবত প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া দীন দরিদ্রকে বিতরণ করা হইয়া থাকে। সকলে সমস্ত সুর পর্যটন করিয়া শেষে আশুরখানার ফিরিয়া আসে।

তৎপর দিন মহরমের ১০ই তারিখ, একাদশী তিথি, শাহ-দৎ-কা রোজ—অর্থাৎ জীবনোৎসর্গের দিন বলিয়া গণ্য। এই দিন প্রাতঃকাল হইতে পূর্ব রাত্রিমত মহাসমারোহে সকলে তাজিয়া, আলম্, প্রভৃতি লইয়া কারবালা অভিমুখে ধাবিত হয়। এই দিন কারবালায় অতিশয় জনতা হইয়া থাকে। তাজিয়া, আলম্ প্রভৃতি সরোবরের কিনারায় রাখিয়া ঝুটি, সরবত, বুটী, খিচুড়ী, পোলাও, ও মিষ্টান্নাদির উপর হোসেন ও অপরাপর শত্ৰুবীরের নামে ফতিহা দিয়া তাহা উপস্থিত সকলকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার কতকাংশ অতি পবিত্র প্রসাদ ভাবিয়া গৃহে আনা হয়। এই প্রসাদের অতি সামান্য অংশও পাইলে মুসলমানেরা আপনাকে ধন্য মনে করে এবং পরম ভক্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে।

ফতিহার পর তাজিয়া হইতে আস্‌বাব ও আলম্গুলি খুলিয়া লইয়া তন্মধ্য হইতে গোয়ের অমুকরণ দুইটা অংশ বাহির করিয়া জলে ডুবাইয়া দেয়। কেহ কেহ জলে স্পর্শ করিয়া তাজিয়া ফিরাইয়া আনে, অনেকে আবার জলে ফেলিয়া আনে। বাহারা তাজিয়া ঘরে ফিরিয়া আনে, তাহারা তিন দিন পরে ফতিহা দিয়া তাজিয়া হইতে ঝালরদার কাগজাদি খুলিয়া লয় ও পরবর্ষের জন্ত তুলিয়া রাখে। আলম্ হইতে ধূতি ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইয়া তাহা অনাবৃতভাবে জলে ধুইয়া পেটরায় আবদ্ধ করে। পরে পূর্বোক্ত খাদ্যাদির উপর ফতিহা দিয়া কতকাংশ বিলাইয়া দেয় ও কতকাংশ লইয়া আসে।

বুরাক ও নলসাহেবগুলিও শেষে জলে ডুবাইয়া গৃহে আনা হয়। বুরাকে আবার নতুন করিয়া রঙ দেওয়া হয়। নলসাহেব চন্দন-চর্চিত করিয়া রাখে।

ফকিরেরা ও সকলে স্নান করিয়া বেশ পরিবর্তন করে ও মরসিয়া গান করিতে করিতে ঘরে আসে।

ঐ দিন প্রায় সকল মুসলমান গৃহে পোলাও, খিচুড়ী, ব্যঞ্জনাদি রান্না হয় এবং মোলাআলী ও হোসেনের নামে উৎসর্গ করিয়া বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া আহার করে ও দরিদ্রকেও দান করে।

দ্বাদশী রাত্রিতেও মসিয়া গান এবং কোরাণ ও হোসেনের স্তোত্র পাঠ হইয়া থাকে। তৎপর দিন প্রাতে পোলাও বা খিচুড়ী রান্না হয়, সকলে হোসেনের উদ্দেশে পূর্ববৎ ফতিহা দিয়া

তাহা খার ও বিতরণ করে। এই জরোনগর রাত্রিকালে আলম্গুলির সমুখে পান স্পারি, কল ফুণ ও আতরাদি উৎসর্গ করা হইয়া থাকে। তৎপর দিন সকলে আগুৱানার সমুখস্থ অহায়া মণ্ডপাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে ও আলম্গুলি বাজের মধ্যে রাখে। এইরূপে মহরম উৎসব সম্পন্ন হয়।

উৎসবের করাদিন মাংস, চৈথুন, কদাচার ও অসংস্ক পরিবর্জনার। এই সময় সকলে অতি পবিত্র ভাবে থাকিয়া অশৌচ-নিরম প্রতিপালন করে।

মহবোর (আরবী) মুহা, কেরানী, লেখক।

মহবীরো (আরবী) মুহাৱ কাব্য, মুহাৱগিরি করা, লেখা।

মহরেণু (ক্কা) দেপভেদ।

মহহিঙ্গ (পুং) ঋষিকৃৎন, যজ্ঞ অধ্বযুঁ, ব্রহ্মন, হোতা উৎগাতা এই চাণ্ডিন মহহিঙ্গ পদবাচ্য। (শতব্রাং ১৩১১১৪)

মহর্কি (রি) ১ বিপুল ধনসম্পন্ন। (জী) ২ অধিক ধন, অধিক উন্নতি।

মহর্কিক (জি) ১ বিপুল ধনশালী। ২ দৈবশক্তিসম্পন্ন।

মহর্কি প্রাপ্ত (পুং) ১ গারুড়দেশের রাজা। (জি) ২ বিপুল বিত্তসম্পত্তিশালী।

মহর্কিমৎ (জি) দৈবশক্তি দ্বারা ধনশালী।

মহর্ } (পুং) মহাশালী লোকশ্রেষ্ঠি কর্ণধারয়ঃ।

মহর্লোক } ভূমাদি সপ্তলোকের অন্তর্গত চতুর্থ লোক।

"তুর্হুববনহঁচঃ জনশ্চ তপ এব চ।

সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকান্ত পরিকোষ্ঠিতাঃ ॥" (অগ্নিপুং)

কল্পবাসী লোক সকল এই লোকে অবস্থান করে।

"চতুর্থে তু মহর্লোকে তিষ্ঠন্তে কল্পবাসিনঃ ॥" (দেবীপুং)

মহর্ষভ (পুং) মহাশালী ঋষিশ্রেষ্ঠি কর্ণধাঃ। ১ বৃহৎ বণ্ড, বড় ষাড়া। (জি) ২ অতি শ্রেষ্ঠ।

মহর্ষভো (জী) মহাশালী ঋষিশ্রেষ্ঠি কর্ণধাঃ। কপিকজু।

মহর্ষি (পুং) মহাশালী ঋষিশ্রেষ্ঠি, কর্ণধাঃ। বাগাদি।

মহর্ষিকা (জী) গুরুটকারী। (বৈষ্ণবকনিং)

মহল্ (আরবী) ১ ধর, বাসস্থান। ২ প্রকোষ্ঠ।

মহলত (আরবী) অবকাশ বা সময় লওয়া।

মহলদার (পারসী) জলকর, বনকর, কলকর ইত্যাদি সায়রাং মহল বে ব্যক্তি বন্দোবস্ত করিয়া রাজস্ব আদায় করিয়া ভোগ করে।

মহলদারী (পারসী) মহলদারের কার্য।

মহলা (আরবী) তালা, এক মহলা, একতলা ইত্যাদি।

মহল্লক (পুং) মহতঃ স্রীরক্ষাদিক্রপান্ বিপুলান্ তারান্ লাতি গুহ্যতি লা। (আতোহুশপর্নো কঃ। পা ৫২১০) ইতি কঃ, ততঃ

যাথে কনু, যবা মহাতঃ চরিত্রগুণং লভতি আশ্রয়ভাতি লক আশ্রয়ানে অচু। অতঃপূররক্ষক, পর্যায়—গৌবিল্ল, কজুকী, হাপতা, গৌবিল, বিদাক, গৌবিল্লক, অন্তর্বাণিক।

(শব্দমালা)

মহল্ল (পুং) বৃহলোক। (দিব্যাং ৩২৯৪)

মহল্লা (আরবী) নগর বা মহরের এক অংশ, চলিত পল্লি বা পাড়া।

মহাল্লাদার (আরবী) পুলিশ কর্ণচারীর অনীনহ তদাবধায়ক।

মহাল্লক (পুং) মহাতঃ চরিত্রগুণং লিখতীবতি মহৎ লিখক পুৰোদরাদিহাং সাবুঃ। অতঃপূররক্ষক, খোলা।

"মুহপুত্রোহুশপর্নো যঃ স্রীষভাবো মহল্লকঃ।"

(শব্দমালা)

মহল্লক মুক ও উপহ নাই এবং জীলোকের ভার স্বত্ব, তাহাকে মহল্লক বা হিজড়া কহে।

মহবল ৩১, অনেক বিখ্যাত মোগল-সেনানী। জাহাঙ্গীর বাদশাহের অহুহে উচ্চাসন-লাভে স্পর্ধিত হইয়া অবশেষে তাহারই বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। এমন কি, রাজশক্তি গ্রহণ করিবার উচ্চাশা তাহার জবরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যে রাজনৈতিক মন্ত্রকূহকে তিনি পরিচালিত হইয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর ও নূরজহান শব্দে তাহা সুস্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে। [জাহাঙ্গীর ও নূরজহান দেখ।]

কাবুল নগরে মহবলের জন্ম হয়। তাহার পিতা খোজি বেগ খীর পুত্রের জমানাবেগ নাম রাখিয়াছিলেন। সম্রাট অকবর শাহের অধীনে জমানা বেগ ৫ শত মনসবদার ছিলেন। এই সময়ে তিনি কএকটি খণ্ডকে খীর বীরের পরিত্র দিতে যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলেন। ক্রমে তাহার বলদীপ্যাকাহিনী চারিদিকে বাপ্ত হইয়া পড়ে। এতদ্বির তাহার অত্যন্ত সন্তোষে তাহাকে সাধারণ লোকের অখ্যাতি ভাজন করিয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধতা ও বিলাসিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজকাণ্ড-পরিচালনশক্তির ঘোর অন্তরায় হইয়াছিল। উপহৃত কর্ণচারীর অভাবে এবং পরিদর্শনভাবে মোগল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইবে ভাবিয়া তিনি রাজকাণ্ডপটু নানা মন্ত্রণ-মণ্ডিত মহবলের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। উত্তরোত্তর পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মর্গাদা ও উৎসর্গের রক্তি হইতে লাগিল, ক্রমে মোগলসাম্রাজ্য মধ্যে তিনিই একমাত্র গণ্য মানা হইয়া পড়িলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর মহবলের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া অনেক স্থলেই তাহার প্রিয়তমা পত্নী নূরজহানের পরামর্শে

পরিচালিত হইতেন। নূরজহান রাজ্যের সর্বমন্ত্রী কর্তা হইয়া উঠিলেন দেখিয়া মহব্বতের দ্বৈধ দিন দিন পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটকে করতলগত করিবার জন্য, সর্বোচ্চ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করেন এবং কিছু দিনের জন্য বন্দিভাবে খীর তাহ্ম মধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট নূরজহান এই সংবাদ পাইয়া খীর সেনাদল লইয়া সম্রাটকে উদ্ধার মানসে আগ্রসর হইলেন। উত্তর পক্ষে ঘোর-তর যুদ্ধ হইল। কিন্তু তাহাতেও নূরজহান সম্রাটকে মোচন করিতে পারিলেন না। পরে কোশলে সম্রাটকে উদ্ধার করেন।

মহব্বত নূরজহানের প্রাণনাশের জন্য সম্রাটকে বৈরুপ প্ররোচিত করিয়াছিলেন, নূরজহান তদনুরূপ প্রতিহিংসাপর হইয়া, তাঁহার নির্ঘাতন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি উত্তমহীন হইলেন না। কুকুরের স্থায় নানা স্থানে বিতাড়িত হইয়াও তাঁহার জিহ্বাসাবুতি অটুট ছিল। তিনি মলিনবেশে আসক্ খাঁর শিবিরে উপনীত হইয়া শাহ-জহানকে মোগলসিংহাসন দিতে প্রতিক্ষিত হইলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর, তাঁহারই উত্তমহে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শাহজহান ভারত-সম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন।

শাহ-জহানের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে মহব্বত দিল্লীর শাসন-কর্তৃপদে নিযুক্ত হন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান-কালে তাঁহার জীবনীলা শেষ হয়। দাক্ষিণাত্য হইতে তাঁহার স্মৃতিদেহ দিল্লী নগরে আনাইয়া গোর দেওয়া হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর্জা আমান্ উল্লা খানজহান ও কনিষ্ঠ লুহরাঙ্গ 'মহব্বত খাঁ' উপাধি লাভ করেন।

আগ্রা নগরে যমুনাকূলে মহব্বতের প্রাসাদের ধ্বংসা-বশিষ্ট নিদর্শন অত্যাগ ও নয়নগোচর হইয়া থাকে।

মহব্বৎ খাঁ, বিখ্যাত মোগল-সেনানী মহব্বৎ খাঁর পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম লুহরাঙ্গ। সম্রাট শাহজহানের রাজত্ব-কালে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর বাদশাহের অমুগ্রাহে ইনি ছহবার কাবুলের শাসনকর্তৃপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আলমগীর ইহাকে কাবুল হইতে আনাইয়া মহারাজ বশোবন্ত সিংহের পরিবর্তে ইহাকেই দাক্ষিণাত্য-অভিধানের সেনানায়ক করিয়া পাঠান। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সম্রাটের আদেশে কাবুল হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে ইহার মৃত্যু হয়।

মহব্বৎ উল্লা খাঁ, (নবাব), লক্ষ্মীবাসী জনৈক মুসলমান কবি। হাকিম রহমৎ খাঁর পুত্র। ইনি মীর্জা জাকর আলী হুজুর ও মকীনের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। ইহার রচিত অস্ত্রার 'মহব্বৎ' নামক মস্মবি সাধারণের কাছে বিশেষ আদৃত।

মহব্বৎগাজী, বঙ্গের আলীবর্দী খাঁ। [আলীবর্দী খাঁ দেখ।]

মহশূল (আরবী) মাসূল, দেয় কর।

মহস (ক্ৰী) মহতে পূজাতে হিম্মতি মহ (সর্বধাতুভ্যোহম্ভূন্।

উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অম্ভূন্। ১ উৎসব। ২ তেজঃ। ৩ বজ্র।

(শব্দরত্না) ৪ উদক, জল। (নিষটু ১।১২) (ত্রি) ৫

পূজ্যমান। "জিহ্বামে তদ্রং বাধ্যহো মনো মন্যুঃ" (শুক্রবজ্জু-

২০।৬) 'বাক্ বাগিহ্মিঃ মহঃ পূজ্যমানঃ' (বেদদীপ) ৬ মহৎ।

"মহো রায়ে তমুখা সমীধীমহি" (ঋক্ ৮।২৩।১৬)

'মহো মহতে রায়ে ধনায়' (সায়ণ)

মহস (ক্ৰী) মহতে পূজাতেহেনেনতি মহ (অত্যবিচমিতমি-

নমীতি। উণ্ ৩।১১৭) ইতি অসচ্। ১ জ্ঞান। ২ প্রকার।

মহসোন (পুং) অর্হদ্ভেদ।

মহস্বৎ (ত্রি) মহস্ মতৃপ্। ১ আনন্দবর্দ্ধক। ২ মহৎ।

৩ জ্যোতিবিশিষ্ট। (পুং) ৪ রাজভেদ। (ভাগ০ ২।১২।৭)

মহা (স্ত্রী) মহতে পূজাতে ইতি মহ-ঘ জিহ্বাং টাপ্। ১ গোপ-

বনী, চলিত গোয়ালচাকুলিয়া। ২ জীর্গবী। (শব্দরত্না) ৩

মহাকঙ্কর (পুং) বৌদ্ধমতে অত্যাধিক সংখ্যাবিশেষ।

মহাকচ্ছ (পুং) মহান্ বিপুলঃ কচ্ছো জলপ্রায়ো দেশোহুত।

১ সমুদ্র। ২ বরুণ। (মেদিনী) ৩ পর্বত। ৪ জনপদভেদ।

মহাকটভী (স্ত্রী) যেত কটভীকৃৎ। (রাজনি) ১

মহাকটকিনী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ কটকিনী চেতি কর্মধাৎ।

বিষসারক, চলিত ফণিমনসা। (শব্দচ) ১

মহাকণ্টা (স্ত্রী) শেবস্তীকৃৎ, গোলাপ। (বৈদ্যকনি) ১

মহাকথহচ্চক্র (ক্ৰী) চক্রভেদ, উত্তমারে এই চক্রের বিবরণ

লিখিত আছে, মন্ত্র লইবার সময় এই চক্রে মন্ত্র উচ্চার করিয়া

লওয়া হয়। [মন্ত্র ও অকথহ চক্র দেখ।]

মহাকদম্ব (পুং) কেলিকদম্ব। (পর্যায়মুক্তা) ১

মহাকনকতৈল, শিরোরোগাধিকারে মর্দনীয় তৈলৌষধ-

বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, ধূতুরা-

পত্রের রস ৪ সের, পুনর্নবার রস ৪ সের, নিম্বিপত্ররস

৪ সের, দশমুলের কাথ ৪ সের, পালিধার রস ৪ সের, বরুণ

ছালের রস ৪ সের। ককাদি শুটু, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্নবা,

কাঁকড়াশুকী, বহুবীর ছাল, পিপুল, ও গজপিপুল প্রত্যেকে

৪ তোলা। তৈল প্রস্তুত করিবার প্রণালী অমুসারে যথা-

রীতি তৈল পাক করিতে হইবে। ইহা দ্বারা শোথ ও

শিরঃশূল প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

মহাকন্দ (পুং) মহাংসাদৌ কন্দশ্চেতি। ১ রসোনক।

২ মূলক। (শব্দরত্না) ৩ চাপকামূলক। ৪ রক্ত লণ্ডন।

৫ রাজপলাশু। (রাজনি) ১

মহাকন্ড (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধায়)

মহাকপাল (পুং) ১ রাজসভেদ। ২ শিবাহুচরবিশেষ।

মহাকপি (পুং) ১ রাজভেদ। ২ শিবাহুচর বিশেষ।  
৩ বুদ্ধের অবতারভেদ।

মহাকপিথ (পুং) মহাংচ্চাসৌ কপিথশ্চেতি। বিষবৃক্ষ।  
মহাকপিল পক্ষরাত্র, একখানি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। স্মার্ত  
রথুনন্দন ও বিটঠল দীক্ষিত ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহাকপোত (পুং) দক্ষাকর সর্পবিশেষ। কৃষ্ণসর্প, মহা-  
কৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেতকপোত প্রভৃতি ২৬ প্রকার দক্ষী-  
কর সর্প, এই সকল সর্প অতি ভীকরবিধ।

(সুশ্রুত কল্প ৪ অং.)

মহাকপোল (পুং) ১ শিবাহুচরভেদ।

মহাকশু (ত্রি) মহান্ কশু গ্রীবা যন্ত। শিব।

মহাকর (পুং) ১ বৃহৎ হস্ত। ২ অধিক খাজনা। ৩ বুদ্ধভেদ।  
(ত্রি) ৪ বৃহৎ হস্তযুক্ত। ৫ মহারশ্মি।

মহাকরঞ্জ (পুং) মহাংচ্চাসৌ করঞ্জশ্চেতি। করঞ্জবিশেষ,  
বড় করঞ্জ। পর্যায়—বড় গ্রন্থা, হস্তিচারিণী, উদকীর্ণ, বিষয়ী,  
কাকয়ী, মদহস্তিনী, শারঙ্গেষ্টা, মধুগতী, রসায়নী, হস্তিরোহ-  
ণক, হস্তিকরঞ্জক, সুমনস, কাকভাণ্ডী, মধুমতী। ইহার গুণ—  
ভীক, উষ্ণ, কটু, বিষ, কণ্ডু, বিচলিকা, কুষ্ঠ, ষগ্দ্দোষ ও  
ব্রণনাশক। (রাজনিং.)

মহাকরভ (পুং) বৌদ্ধমতে অভ্যর্ক সংখ্যা বিশেষ।

মহাকরন্ত (পুং) তন্মামক পত্রবিশেষ। (সুশ্রুত কল্প ২ অং.)

মহাকরণ (ত্রি) মহতী করুণা যন্ত। অতিশয় দয়ালু।

মহাকরণ পুণ্ডরীক (ক্লী) বৌদ্ধমতগ্রন্থভেদ।

মহাকরণচন্দ্রি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মহাকর্করু (পুং) গুণভেদ।

মহাকর্ণ (পুং) ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩৩) ২ নাগভেদ।

(ত্রি) ৩ বৃহৎ কর্ণযুক্ত। দ্বিগ্নাং ভীষ্। ৪ স্বন্দাহুচর মাতৃভেদ।

মহাকর্ণিকার (পুং) মহাংচ্চাসৌ কর্ণিকারশ্চেতি। আর-  
থধ বৃক্ষ। (রাজনিং.)

মহাকর্ণিন্ (ক্লী) ১ বৃহৎ কর্ণ। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত  
১৩।১৪।৮৫) (ত্রি) মহৎ কর্ণ যন্ত। ৩ মহৎ কর্ণযুক্ত।

মহাকলা (ক্লী) অমা নামক কলা। এই দিনে পিতৃকণ  
প্রশস্ত।

মহাকলোপ (পুং) কোন বিশেষ মতানুসারী সম্প্রদায়ভেদ।

মহাকল্প (পুং) ১ সময়ভেদ, কল্পান্তর। ২ শিব।

(ভারত ১৩।১৭।১২৩)

মহাকল্পতরু নাথ, জনৈক জৈন ঋষি। (আদিপুং.)

মহাকল্যাণগুড় (পুং) শুভৌষধবিশেষ। ইহার প্রভুতপ্রণালী—

পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, ধনে, বিড়ঙ্গ, যমানী,  
মরিচ, জিকলা, বমযমানী, নীলীবৃক্ষ, জীরা, সৈন্ধব, শাশ্বর-  
লবণ, সামুদ্র লবণ, সৌবর্জল, বিট লবণ, সোঁদাল, দারুচিনি,  
তেজপত্র, ছোট এলাচি, কৃষ্ণজীরা, তুঁঠ ও ইন্দ্রযব এই সকল  
প্রত্যেকে ২ তোলা, ত্রাফা ৪ পল, তেউড়ী ৮ পল, শুড় ১২।০  
সের, তিলতৈল ৮ পল, আমলকীর রস ৮ পল, এই সকল  
দ্রব্য তিন প্রহ্ন লইয়া যথাবিধানে মুহু অগ্নির উত্তাপে পাক  
করিতে হইবে। যজ্ঞদুগুর ফলের জ্বায় এই ঔষধের পরিমাণ।  
আমলকী বা কুণের মতও করা যাইতে পারে। অথবা  
চিকিৎসক রোগীর বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবেন।  
যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার গ্রহণীরোগ,  
বিংশতি প্রকার প্রমেহ, উরোধাত, প্রতিঘাত, দুর্জলতা, অগ্নি-  
মান্দ্য এবং সকলপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়। বিশেষতঃ শরীরের  
কাস্তি, মতি ও বলবৃদ্ধি, পাণ্ডুরোগ, রক্তপিত্ত ও মলরুদ্ধতা  
নষ্ট হইয়া থাকে। ধাতুকীর্ণ, বৃদ্ধ দ্রৌণসদৃশ দ্বারা ক্ষীণ, ক্ষ-  
রোগী ও বক্ষ্যানারোগের পক্ষেও বিশেষ হিতকারক।  
গ্রহণীরোগাধিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ভাবপ্রকাশ গ্রহণীরোগাধিং.)

মহাকল্যাণঘৃত (ক্লী) শুভৌষধ বিশেষ। প্রভুত প্রণালী—

ঘৃত ৪ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, ককাদ  
জীরা, শ্বেতবেড়োলা, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, কাকোলী,  
ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, ঞ্জি, বৃদ্ধি, ও দেব-  
দারু এই সকল প্রত্যেকে ৮ তোলা, পরে ঘৃতপাকের নিয়মানু-  
সারে ইহা পাক করিতে হইবে। দাহাধিকারে এই ঘৃত অতি  
উৎকৃষ্ট। (রসেন্দ্রং.)

মহাকাবি (পুং) মহাকাব্যপ্রণেতা, বাহারি মহাকাব্য প্রণ-  
য়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহারাই মহাকবি নামে  
বিখ্যাত। বাস্কীকি, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি  
মহাকবি বলিয়া খ্যাত।

মহাকাব্যায়ন (পুং) গৌতমবুদ্ধের শিষ্যভেদ।

মহাকান্ত (পুং) ১ শিব। (ত্রি) ২ অতীব রমণীয়। দ্বিগ্নাং  
টাপ্। ৩ পৃথিবী।

মহাকান্তার, প্রাচীন জনপদভেদ। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত  
এখানকার অধিপতি ব্যাসরাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

মহাকায় (পুং) মহান্ কায়োহস্ত। ১ নদী, শিবের দ্বার-  
পাল। “নদীশরো মহাকায়ো গ্রামণীবৃষভধ্বজঃ।” (ভারত  
১৩।১৫০।২৪) ২ হস্তী। মহান্ কায়ঃ শরীরমিতি। ৩ বৃহৎ  
শরীর। (ত্রি) ৪ বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট, মহাকায়যুক্ত।

“মহাজবঃ মহাকালঃ মহামায়ামরনম্।” (ভারত ১।৪৬।৩২)

ত্রিরাং টাপ্। মহাকাল—৪ কুমার সূচর মাতৃবিশেষ।

( ভারত ২.৪৭।৪ )

মহাকাব (ত্রি) ১ সুরবৎ। ২ বৃহদাকার।

মহাকারণ (পুং) সর্গকর্ণের নিরস্ত্র বা কারণভূত পরমেশ্বর।

মহাকার্ত্তিকী (স্ত্রী) মহতী চান্দো কার্ত্তিকী চেতি। রোহিণী-  
নক্ষত্রজু কাক্তিকী পূর্ণিমা।

“প্রাপ্যপত্যাং বদা ঋকং তপৈত্তত্যাং নরাধিপ।

মা মহাকার্ত্তিকী প্রোক্তা দেবানামপি চূর্ণভা ॥”

( পদ্মপু. ২।৩ অ. )

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হইলে  
মহাকার্ত্তিকা হয়। এই দিন দেবতাদিগেরও চূর্ণভ, এই  
দিনে দানদানাদি করিলে অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে।

মহাকাল (পুং) মহাশ্যাদো কালশ্চেতি কথং। বিষ্ণুরূপ  
অথও দণ্ডায়মান কাল। বর্ণা—

“কালো বটবান্ মহাকালস্যং।” (সিদ্ধান্তলক্ষণ)

২ মহাদেব। সর্গভূতের কলন অর্থাৎ সংহার করেন  
বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল।

“কলনাং সর্গভূতানাং মহাকালঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।

মহাকালস্ত কলনাং ত্রয়ান্তা কালিকা পরা ॥” (মহানির্ঘা. ৪।৩১)

৩ প্রমথগণ-বিশেষ। (মেদিনী) ৪ উজ্জয়িনীস্থিত শিব-  
লিঙ্গভেদ। কথাসরিংসাগরে লিখিত আছে,—উজ্জয়িনী  
নগর পৃথিবীর ভূষণ। এখানকার স্নানধবলিত সৌম্য সৌধা-  
বলী সৌন্দর্য্য গর্বে যেন ইন্দ্রের অমরাবতীকে উপহাস  
করিতেছে। অধিক কি, ভগবান্ কৈলাসনাথ কৈলাস বাস  
ভুলিয়া গিয়া স্বয়ং এই স্থানে মহাকালরূপে বাস করিতেছেন।

“অতীহোজ্জয়িনী নাম নগরী ভূষণং ভুবঃ।

হনতী ব স্রুগা গোঁঠৈঃ প্রাসাদৈরনরাবর্তনং ॥

বস্ত্রাং বগতি বিশেষো মহাকালবপুঃ পরম্।

শিখিনীকু তৈকলাসনিবাসবাসনো বপুঃ ॥”

( কথাসরিং ১।১।৩১-৩২ )

প্রাচীন নাট্যাদি মধ্যে অনেক স্থলে এই উজ্জয়িনীস্থিত  
শিবলিঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস  
তাঁহার ষণ্ড কাব্য মেঘভূত গ্রন্থে প্রিয়ারিহ-বিধুর যক্ষকে  
দিয়া তৎপত্নীর সংবাদ সংগ্রহার্থ যক্ষকে অলকাপুরে পাঠাই  
বার সময় উজ্জয়িনীস্থিত এই প্রসিদ্ধ মহাবাল নামক শিব  
লিঙ্গকে দর্শন ও অভিষেক করিয়া বাহবার কথা উল্লেখ  
করিয়াছেন।

কাব্য নাট্যাদিতে এই শিবলিঙ্গভূত মহাকাল, মহা

কালনাথ, মহাকালানকৈতন, মহাকালবপু ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন  
নামে অভিহিত হইয়াছে। [ উজ্জয়িনী দেখ। ]

মহাকবি ভবভূতি তাঁহার উত্তররাসরচিত নাটকের  
প্রস্তাবনার কালপ্রিয়নাথ নামে সম্ভবতঃ এই মহাকালেরই  
উল্লেখ করিয়াছেন—“অন্ত যন্ ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথত  
বাত্তাধামার্থ্যমিপ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামঃ” (উত্তররাস. ১ম অঙ্ক)  
উজ্জয়িনী নগরীতে শিশুনাথার পুণ্ডরীকস্থিত শিশুভক্তেশ্বর-  
ঘাটের পূর্ব-দক্ষিণাংশে এই মহাকালের প্রকাণ্ড মন্দির অব-  
স্থিত। ৫ মহাভারতোক্ত তথ্যবিশেষ। এই তথ্যে উপনীত  
হইয়া সংঘত ভাবে অবস্থানপূর্বক কোটিতাপ স্পর্শ করিলে  
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

“মহাকালং ততো গচ্ছন্ত নিরতো নিরতানশঃ।

কোটিতাপমুপপ্তস্ত হরমেধফলং লভন্ত ॥”

( মহাভারত অ. ৮২।৪৭ )

৬ লতা বিশেষ। চলিত মাকাল। ইহার পত্রাং,—উষ্ণ-  
কাল, কিল্পাক, কাকমর্দক, কাকমর্দ, নেবদালিকা, মালা,  
দলিকা, জলঙ্গ, ঘোষকাক্তি।

“অন্তর্মালিনদেহে ন বহিরাঙ্কলানকারিণা।

মহাকালফলেনৈব কঃ খলেন ন বঞ্চিতঃ ॥” (উদ্ভট)

৭ শিবপুত্রভেদ। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে  
লিখিত আছে,—দেবগণ শঙ্করের বীণাধারণের জন্য অগ্নিকে  
আদেশ করেন। অগ্নি সম্মত হন। যথাকালে শিববীণা  
অগ্নি মধ্যে নিমিষ্ট হইল। কিন্তু অগ্নিতে সমস্ত বীণা নিক্ষেপ-  
কালে উহার বিন্দু পরিমাণ দুই ফোঁটা বীণা গিরিপ্রবে-  
শিয়া পড়ে। এই দুই বিন্দুপরিমিত বীণা হইতে শঙ্করের দুইটি  
পুত্র উৎপন্ন হয়। পুরুষ উৎপন্ন হইলে ত্রিকা একজনকে  
মহাকাল অপরকে ভৃঙ্গা নামে অভিহিত করেন। ভৃঙ্গা ও  
মহাকাল ঘোর ক্রোধবর্ণ ছিল। ভগবান্ শঙ্কর এই পুত্রদ্বয়ের  
রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

একদিন কোন এক নিভৃত স্থানে থাকিয়া শঙ্কর শঙ্করী-  
সহ সন্তোষে আসক্ত ছিলেন, এই সময় ভৃঙ্গী ও মহাকাল সেই  
শুণ্ড স্থানের দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত থাকে। সন্তোষান্তে শঙ্করী  
যখন বাহির হইবেন, তখন হঠাৎ রক্ষিত্ব তাঁহাকে দেখিয়া  
ফেলে। এইরূপ দর্শনে শঙ্করী বড় লজ্জিত হইলেন। রক্ষি-  
ত্ব ভৃঙ্গী ও মহাকালও জননীকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া  
লজ্জার অগোবদন হইল। এইরূপ নিভৃত সময়ে শঙ্করীকে  
দেখিবার কাহারও অধিকার ছিল না, সুতরাং এ ঘটনায়  
তিনি প্রথমে লজ্জিত হইয়া শেষে ক্রোধিত হইলেন। তাঁহার  
কোপ দেখিয়া রক্ষিত্ব ভীত হইল। শঙ্করী তাহারিগকে

অবিলম্বে অভিশাপ দিলেন। তাঁহার অভিশাপ-কালে ভূদ্বী ও মহাকাল মাহুধী ঘোনি আশ্রয় করিল এবং বানরের ঞায় বধনবিশিষ্ট হইয়া ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিল।

ভূদ্বী ও মহাকালের মাহুধী মাতার নাম তারাবতী। তারাবতী রূপবতী। সে একদিন একটা সমুদ্র সৌধশিখরে দণ্ডায়মানা, যেন বাসন্তী প্রতিমা ভূতলে অবতীর্ণা! শব্দর শব্দরীমহ শূন্য পথে বাইতেছেন। এই সময় শব্দর তারাবতীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি শব্দরকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার এই মাহুধী মূর্তি তারাবতী সেই ভূদ্বী ও মহাকালের জননী। আমি তোমা বাতীত আর কাহাকেও অকুশায়িনী করিতে ইচ্ছা কার না, অতএব তুমি এই তারাবতীতেও প্রবেশ কর, আমি আবার ভূদ্বী ও মহাকালকে উৎপাদন করি। ভবের কথায় ভবানী সন্মত হইয়া তারাবতী-দেহে প্রবেশ করিলেন। শিবের সংসর্গে তারাবতী গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে ভূদ্বী ও মহাকাল আবার উৎপন্ন হইল। কিন্তু তাহাদের বানরাননয় আর ঘুচিল না। বাহা পূর্বে ছিল, তাহাই রহিয়া গেল।

কালিকাপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—মহাকাল ও ভূদ্বী মর্ত্যে আসিয়া বেতাল ও ভৈরব নামে জন্ম লইয়াছিল। মহা-দেব স্নেহবশতঃ মহাকালকে তাঁহার ভক্ত বলিসুত বাণরূপে উৎপাদন করেন।

কালিকাদেবীর পূজাস্থে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে এই মহা-কালের পূজা করিতে হয়। ইহার তিনটা নেত্র, আকৃতি ধূস্রবর্ণ। হস্তবয়ে দণ্ড এবং খটাঙ্গ। মুখ দংষ্ট্রাযুক্ত ভয়ঙ্কর, কটি ব্যাঘ্রচন্দ্ৰে আবৃত। দেহাকৃতি স্থূল। পরিধান রক্ত-বস্ত্র। কেশকলাপ উজ্জ্বল উখিত। গলদেশ মুণ্ডমালায় সজ্জিত। কপালে জটাতার লম্বিত এবং চক্রখণ্ড ধক্ ধক্ উজ্জলিত। এই মহাকালের ধ্যান যথা—

“মহাকালঃ যজ্ঞদেব্যো দক্ষিণে ধূস্রবর্ণকং।

বিভ্রতং দণ্ডখটাঙ্গো দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং ॥

ব্যাঘ্রচন্দ্ৰাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।

ত্রিনেত্রমূৰ্দ্ধং দশক মুণ্ডমালাবিভূষিতম্।

জটাতারলগচ্ছক্ৰখণ্ডমুগ্ধং জলগ্নিতং ॥”

কুমারিকল্পে মহাকালের মন্ত্র এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—  
হঁ ক্ষৌ কাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকাল ভৈরব সৰ্ববিঘ্নান্  
নাশয় নাশয় হ্রাঁ ফটু বাহা।

উক্ত প্রকার মন্ত্রোচ্চারণপূৰ্ব্বক পাণ্ডাদি দ্বারা মহাকালের পূজা সমাপনান্তে মূলমন্ত্রে দেবীকে তিনবার তর্পণ করিয়া পরে পঞ্চোপচারে পুনরায় তাঁহার পূজা করিবে।

XIV

কালান্তরে লিখিত আছে,—মন্ত্রে মহাকালের পূজা করিয়া পশ্চাৎ দেবীর পূজা নিরূহ করিবে।

“মহাকালঃ যজ্ঞেদ যজ্ঞাং পশ্চাদ্দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥” (কালীতন্ত্র)

তদ্ব্যসারে মহাকালের মন্ত্রোচ্চারণ-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

“কবচং ক্ষৌঃ সমুজ্জ্বল্য বাং রাং লাংবাঞ্চ ক্রোন্ততঃ।

মহাকাল ভৈরবেতি সৰ্ববিঘ্নানাশয়েতি চ ॥

নাশয়েতি পুনঃ প্রোচ্য মংয়াং লক্ষ্মাং সমুজ্জয়েৎ।

ফটু বাহয়া সমাপ্তো মন্ত্রঃ সৰ্বার্থসাধকঃ ॥” (তন্ত্রসার)

মহাকালের উক্ত প্রকার মন্ত্ররূপে সৰ্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। কোন ব্যাধি, ভয় বা অজ্ঞ কোন বাধা বিঘ্ন আপদ উৎপাত উপস্থিত হইলে এই তন্ত্রোক্ত মহাকাল-মন্ত্র বিধিপূৰ্ব্বক রূপে তাহার শাস্তি-বিধান হয়।

৩ শিবাহুচরভেদ। ৪ আচাধ্যভেদ। ৫ ভৃগুভেদ।

৬ আত্মবুদ্ধভেদ।

মহাকালবেয় (পুং) সম্প্রদায়ভেদ।

মহাকালী (স্ত্রী) মহাকাল পত্নার্থে স্ত্রিয়াং ভীষ্। মহাকালের পত্নী। এই দেবী পঞ্চবক্তা এবং অষ্টভুজা কালী। দেবীভাগবতে লিখিত আছে,—এই দেবী পরাশক্তির তামসীশক্তি।

“তস্মাত্ত সাক্ষীণী শক্তি রাজসী তামসী তথা।

মহালক্ষ্মাঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়াঃ ॥”

(দেবীভাগবত ১২।২০)

২ ভূগীর মূর্তিভেদ। ৩ শক্তি মূর্তির অহুচরী বিশেষ।

৪ জৈন মতে ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্তর্গত একটা। অবসর্পি-  
ণীর ৫ম অর্হতের আজ্ঞামুকারী দেবীভেদ।

মহাকালেয় (ক্লা) নামভেদ।

মহাকালেধর (পুং) উজ্জয়িনীস্থ শিবলিঙ্গভেদ।

মহাকালেশ্বর রস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত  
প্রণালী—লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, অস্ত্র, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক,  
হিসুল, বিষ, জায়ফল, লবঙ্গ, শুভ্রবক্, এলাইচ, নাগেশ্বর-  
রস, ধূতুরাবীজ ও জয়পাল বীজ প্রত্যেককে ১ তোলা, মরিচ  
৩ তোলা, সিদ্ধিপত্ররসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ  
বটিকা করিবে। অহুপান আদার রস। বাল্য ও বৃদ্ধাবস্থায়  
অর্দ্ধ রতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে কাস,  
যক্ষ্মা ও কঠরোগ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাং কাশাধিকাং)

মহাকালোপ (পুং) সম্প্রদায়-বিশেষ।

মহাকাব্য (স্ত্রী) মহচ্চ তৎ কাব্যকৌতি কথং। কাব্যশাস্ত্র-  
বিশেষ। পদ্যায়—স্বর্গবন্ধ।



রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। ক্ষতিহুঁটে ও পুটোখাদি দোষ দেহের কাণ্ড-খল্লাদির ভায় এই কাব্যের অপকর্ষ-সাধক। আর মাধুর্য্যাদি গুণ, পৌড়ী, পাঞ্চালী প্রভৃতি স্বীতি এবং অহুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দ ও অর্থালঙ্কার ইহার উৎকর্ষ বিধারক।

“কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং দোষান্তাপকর্ষকাঃ।

উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কাররীতয়ঃ।”

(সাহিত্যদর্পণ ২।৫)

রসগন্ধাধরের মতে আনন্দ বিশেষ অনেক যে বাক্য, তাহাই কাব্য।

“আনন্দবিশেষ-জনকবাক্যং কাব্যম্” (রসগন্ধাধর)

কৌশভের মতে—“কবি বাত্-নিমিত্তিঃ কাব্যঃ।

স। চ মনোহর-চমৎকারকারিণী রচনা।”

অর্থাৎ যাহা কবির কবিত্বপূর্ণ কথার বিরচিত হইয়া মনোহর অথচ চমৎকার-কর হয়, সেই রচনাই কাব্য।

কাব্যের প্রয়োজন, স্বরূপ ও যে সকল অলঙ্কার গ্রন্থে কাব্যের লক্ষণাদি বিবৃত আছে, সেই সকল গ্রন্থের নাম কাব্য শব্দে দ্রষ্টব্য।

উক্ত লক্ষণাবিত কাব্য সাধারণতঃ দুই প্রকার—দৃশ্য-কাব্য ও শ্রব্যকাব্য। যে সকল কাব্য গুলি কেবল অতিনয়ের উপযোগী, তাহা দৃশ্য, আর যাহা কেবল মাত্র শ্রবণ করিবার উপযোগী, তাহাই শ্রব্য কাব্য বলিয়া কথিত।

এই শ্রব্য কাব্যগুলি প্রকারান্তরে দ্বিবিধ। কতকগুলি শব্দ কাব্য এবং কতকগুলি মহাকাব্য। এখন এই মহাকাব্যের কথাই বলিব। মহাকাব্য কি, তাহা কিরূপ ভাবে রচিত হইবে, এবং ইহাতে কি কি বিষয়ের বর্ণনা থাকিবে?

যে সকল কাব্য এক একটা সর্গ দ্বারা গ্রথিত এবং অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে বাহার সমস্ত অবয়ব গঠিত, তাহাই মহাকাব্য বলিয়া নির্দিষ্ট।

সাহিত্যদর্পণের মতে মহাকাব্য সর্গ দ্বারা গ্রথিত বা আবদ্ধ হইবে। কিন্তু এই সর্গের বিস্তার অতি যত্ন বা ক্ষতি দীর্ঘ হওয়া অবধি। ইহার সংখ্যা আটটার কম হইবে না, বরং আট হইতে অধিক সংখ্যক সর্গ দ্বারা মহাকাব্যের বিভাগ করাই বিধি। কবি ইচ্ছানুসারে সর্গের অন্তর্গত কাবতগুলি যে কোন একটি ছন্দে রচনা করিয়া অবশেষে বৃত্তান্তর যোজনা করিবেন। সর্গগুলির মধ্যে কোন একটি সর্গ অধিকাংশ স্থলে মানা রকমের ছন্দ বা বৃত্ত দ্বারা বিরচিত দেখা যায়। প্রত্যেক সর্গেরই অবসানে ভাবী সর্গে যাহা বর্ণনা করা বাইবে, তাহার আভাস থাকা চাই।

মহাকাব্যে শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত এই রসত্রয়ের মধ্যে একটি রস অঙ্গী থাকিবে। এতদ্বির হস্ত, কল্পণ, বীতংস প্রভৃতি রস ইহাতে অঙ্গরূপে বর্ণিত হইবে। কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা অন্ত কোন সাধুজনচরিত অবলম্বনে ইহার প্রণয়ন-কাণ্ড মির্কাহ করিতে হয়। ইহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি বর্গেরই আবশ্যক মত সমাবেশ থাকা আবশ্যক; তবে ইহার মধ্যে একটি সর্গে ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনা হইবে। ইহাতে নাটকোক্ত সন্ধি অর্থাৎ সুখাদিপঞ্চকের প্রয়োগ করিতে হয়।

মহাকাব্যের আদিতে নমস্কার, আশীর্বাদ অথবা বস্তু-নির্দেশ থাকিবে। কোথাও কোথাও বা খলজনাদির নিন্দা, ও সাধুজনের গুণকীর্তন দেখা যায়। মহাকাব্যের বর্ণনীর বিষয় অনেক। তন্মধ্যে এই কয়টা বর্ণন করা সাধারণতঃ বিশেষ আবশ্যক; যথা—সন্ধ্যা, হুয়া, চন্দ্র, প্রদোষ, রাত্রি, পথ, দিবস, প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকাল, যুগ্মা, পর্কত, ঋতু, বন, সাগর, সমুদ্রাগ, বিপ্রলন্ত, মুনী, স্বর্গ, পুরী, যজ্ঞ, যুদ্ধ, প্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্রণা ও পুত্রোৎপত্তি প্রভৃতি। এতদ্বির জল-কেলি ও মধুপান প্রভৃতিও ইহার বর্ণনীর বিষয়।

যিনি কাব্য রচনা করেন, তাহার নামানুসারে অথবা যে ঘটনা অবলম্বনে কাব্য বিরচিত হয়, সেই ঘটনা কিংবা কাব্যের নায়ক অথবা অন্য কোন নামে মহাকাব্যের নামকরণ করিতে হয়। কবির নামে যথা—মাঘ, ভারবি প্রভৃতি। ঘটনা বা বৃত্তান্তের নামে যথা—কুমারসম্ভবাদি। নায়কের নামে যথা—রঘুবংশ প্রভৃতি। অন্য নামে যথা—ভট্ট ইত্যাদি। কিন্তু কাব্যের অন্তর্গত সর্গগুলির নামকরণ করিতে হইলে সর্গের মধ্যে যাহা উপাদেয় কথা, তদনুসারেই করা বিধি।

মহাকাব্যের নায়ক কোন দেব অথবা ধীরোদাত্ত গুণ-সম্পন্ন সদ্বংশজাত কোন ক্ষত্রিয় হওয়া প্রয়োজন। ধীরোদাত্ত কে? যিনি হর্ষশোকাদিতে অভিজুত হন না। বাহার গরু বিনয়ে আচ্ছন্ন, যিনি অঙ্গীকৃত বিষয় পালন করিতে বদ্ধ-পরিকর, বাহার আত্মপ্রাণ নাই, যিনি ক্ষয়শীল ও অতি গভীরস্বভাব ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই ধীরোদাত্ত বলিয়া বর্ণিত; যথা—রাম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি।

এইরূপ নায়ক ব্যতীত এক বংশীয় কুলজন্মগত বহুতর-নরপতিকে মহাকাব্যের নায়করূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।

মহাকাশ (পুং) ১ পর্কতভেদ। (ত্রি) ২ মহাদীপ্তযুক্ত।

মহাকাশী (ত্রি) মতলজাদিগের দেবতাভেদ।

মহাকাশ্যপ (পুং) গোতর বৃদ্ধের শিষ্যভেদ।

মহাকীটপর্কত (পুং) পক্ষ্যাদনের অন্তর্ভুক্ত পর্কতভেদ।

মহাকুণ্ড (পুং) শিবাজুচরভেদ।

মহাকুমার (পুং) সুবরাজ। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মহাকুমুদা, (স্ত্রী) মহতী চাসৌ কুমুদা চেতি কর্ণধাং।  
কাশ্মরী, গম্ভারী।

মহাকুস্তী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ কুস্তী চেতি। কট্ফল।

মহাকুকুটমাংসতৈল (স্ত্রী) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার  
প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ মাষকলাই  
৪ সের, দশমূল ৬০ সের, বেড়েলামূল ২৫ পল, কেতকী-  
মূল ২৫ পল, কুকুটমাংস ৩০ পল, বাটিমূল ২৫ পল,  
পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। ককার্থ জীবকাদি  
অষ্টবর্ণ, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলায়, আলকুশী-  
বীজ, এরণ্ডমূল, শুণ্ফা, বিটু, মৈন্ধব এবং শান্তর লবণ,  
পিপুল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, বমানা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, শটা, শুঠ,  
পিপুল, মুখা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শতমূলী, বৃহতী,  
ও কণ্টকারী প্রত্যেকে ২ তোলা। পরে তৈলপাকের বিধানা-  
নুসারে ইহা পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে  
পক্ষাঘাত, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অজ্ঞতা, হস্তকম্প, শিরঃ-  
কম্প, বধিরতা, কর্ণনাদ, দণ্ডাপতনক, মজ্জাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ,  
হৃতিকারোগ, অন্নরুদ্ধি ও বাতরক্ত প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া  
আণ্ড উপশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং বাতব্যাদিরোগাধিঃ)

মহাকুল (ত্রি) মহৎ কুলং বংশোচ্চ। ১ উত্তমকুল-  
জাত। পর্ধ্যায়—কুলীন, আৰ্য্য, সভ্য, সজ্জন, সাধু, কুলা,  
অভিজাত, কোলেকর, জাত্য, মাহাকুল, কোলেক, কোলেকর,  
কুলজ, সাধুজ, কুলশ্রেষ্ঠ। (শব্দরত্নাং)

(স্ত্রী) ২ উত্তম কুল, উত্তম বংশ।

“ধর্ম্মোলোকিতং চিত্রং জট্মৈকশিন্ম মহাকূলে।” (রাজতবং ৩৬১)

মহাকুলীন (ত্রি) মহাকুলন্ত অপত্যং মহাকুল (মহাকুলা-  
ন্থং) থেকে। পা ৪।১।১৪১) ইতি পক্ষে খ। মহাকুল।

“মহাকুলীন ঈক্ষাকে বংশে দাশরথিমর্ম।

পিতুঃ প্রিধকরো তত্তা ক্ষেমকারন্তপশ্বিনাম্॥” (ভট্ট ৫।৭৭)

স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাকুলীনা।

“সীতে মহাকুলানাসি ধর্ম্মে চ নিরতা সদা।” (রামাং ২।২৮.৩)

মহাকুষ্ঠ (স্ত্রী) মহচ্চ তৎ কুষ্ঠক্ষেতি। বৃহৎ কুষ্ঠরোগ। এই  
কুষ্ঠ মাত প্রকার। “পূর্নত্রিকঃ তথা সিদ্ধঃ ততঃ কাকগণঃ তথা।

পুণ্ডরীককজিহ্বের তু মহাকুষ্ঠানি সপ্ত চ॥” (ভাবপ্রঃ)

কাপাল, উদ্বার, মণ্ডল, সিদ্ধ, কাকগণ, পুণ্ডরীক এবং  
কজিহ্ব এই ৭টি মহাকুষ্ঠ।

কাপাল-কুষ্ঠলক্ষণ—চর্ম্মের উপরি খাপরার জ্বর কিঞ্চিৎ  
কৃষ্ণ ও জৈব অরুণ বর্ণ, কৃষ্ণ, কর্কশ এবং অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত

চর্ম্মের উৎপত্তি হইলে তাহাকে কাপাল কুষ্ঠ কহে। এই  
রোগ ছষ্টিকিৎস।

উদ্বার—যে কুষ্ঠ বজ্রভূতের জ্বর রক্তবর্ণ, দাঁহ, বেদনা  
ও কণ্ডুযুক্ত এবং উহার উপরিহ লোম কপিল বর্ণ হয়, তাহার  
নাম উদ্বার।

মণ্ডল—যে কুষ্ঠ কিঞ্চিৎ শ্বেত ও জৈব রক্তবর্ণ; স্থির,  
আর্দ্রতাবাপন্ন ও ঘির্ন হয় এবং উচ্চ মণ্ডলাকারে উত্থিত  
হইয়া পরস্পর মিলিত থাকে, তাহাকে মণ্ডলকুষ্ঠ কহে।

পিথ—যে কুষ্ঠের চর্ম্ম অলাবুপ্পের জ্বর শ্বেত ও তাম্রবর্ণ  
এবং বর্ণ করিলে বাহ্য হইতে ঘূলীর জ্বর বাহির হয়, তাহার  
নাম সিদ্ধকুষ্ঠ। এই রোগ প্রায়ই বন্ধঃস্থলে হইয়া থাকে।

কাকগণ—যে কুষ্ঠের বর্ণ শুভ্রাকলের জ্বর, মধ্যে রক্ত  
ও পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ বা মধ্যে কৃষ্ণ ও পার্শ্বে রক্তবর্ণ এবং অত্যন্ত  
বেদনায়ুক্ত হয় বা পাকে, তাহাকে কাকগণ কুষ্ঠ কহে। এই  
কুষ্ঠ ত্রিদোষের অতিশয় প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুণ্ডরীক—যে কুষ্ঠে উৎপত্ত মণ্ডলসমূহ রক্তপদ্মের পাতার  
জ্বর শ্বেত ও রক্তবর্ণ হয়, তাহার নাম পুণ্ডরীক-কুষ্ঠ।

কজিহ্ব—যে কুষ্ঠের মণ্ডলসমূহ তক্ষকের জিহ্বার আকৃতির  
জ্বর কর্কশ, বেদনায়ুক্ত এবং অস্ত্রে রক্ত ও মধ্যে শ্রামবর্ণ হয়,  
তাহাকে কজিহ্ব কহে। এই সপ্তপ্রকার মহাকুষ্ঠ। (ভাবপ্রঃ)

[ বিশেষ বিবরণ কুষ্ঠরোগ শব্দে দেখ। ]

কুষ্ঠরোগ ছষ্টিকিৎস। তাহাতে মহাকুষ্ঠ একরূপ অসাধ্য  
বলা বাইতে পারে। এই রোগ মহাপাতকজ। যাহার এই  
রোগ হয়, সে প্রথমে শাস্ত্রানুসারে প্রারম্ভিত কারয়া ত্রু-  
চর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক এই রোগের চিকিৎসা করিবে। দৈব  
দ্বারা যদি এই রোগের প্রতিকার হয় ভালই, নচেৎ চিকিৎসা  
দ্বারা আরোগ্যের আশা কম। যদি কাহারও এই রোগে  
মৃত্যু হয় এবং তাহার প্রারম্ভিত না করা হইয়া থাকে, তাহা  
হইলে তাহার প্রারম্ভিত করিয়া দাহাদি করিতে হইবে। যদি  
না হয়, তবে যাহারা এই শব্দদাহাদি কারবেন, তাঁহাদিগকেও  
প্রারম্ভিত করিতে হইবে।

মহাকুট, প্রাচীন জনপদভেদ। (হিমবংখং)

মহাকুটেশ্বর, শিলালিপি-বর্ণিত একটা প্রাচীন নগর।

মহাকুপ (পুং) মহাংচাসৌ কুপশ্চেতি। বৃহৎ কুপ, পর্ধ্যায়—  
অরথট। (অট্যধর)

মহাকূর্ম্ম (পুং) নরপাতভেদ। (হরিবংশ)

মহাকুল (ত্রি) উচ্চ-বেলাভূমি-সমাবৃত। (নিরুক্ত ৯২৬)

মহাকুচ্ছু (স্ত্রী) ১ কুচ্ছাতিকুচ্ছ, ২ বহুয় নামান্তর।

(ভারত শাস্ত্রিণঃ)

মহাকৃত্যাপারিমল (পুং) মজ্জবিশেষ।

মহাকৃষ্ণ (পুং) ১ দর্শকর সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থাঃ ৪ অং)

২ মুখিকবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থাঃ ৬ অং) ত্রিমাং টাপ্।

৩ কৃষ্ণাপরাজিতা। (বৈজ্ঞকনিং)

মহাকৈতু (ত্রি) ১ দীর্ঘপতাকাযুক্ত। ২ শিব। (ভারত ১৩৬১৬)

মহাকেশ (ত্রি) ১ সুরহং কেশশালী। ২ শিব। (ভারত ১৩৬০১)

মহাকেশরী, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বর্ণ, বঙ্গ, কান্ত-  
গৌহ, পারদ, মুক্তা, দারুচিনি, ছোট এলাচি, তেজপত্র, ও  
নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া  
তৎপরিমাণ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া দুই মাষা পরিমাণে  
বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে তিন দিনে  
চক্রমেহ এবং পুরাতন মধুমেহ নষ্ট হয়। ইহাতে পথ্য দ্রব্য  
ও অন্ন। (রসেন্সারসং সোমরোগাধিঃ)

মহাকোট, একটা প্রাচীন নগর। (বুং নীল)

মহাকোণ (পুং) ১ সুরহং কোণযুক্ত (Scrotum) ২ শিব।

ত্রিমাং ভীষ্। ৩ নদীভেদ। ৪ মতঙ্গজগণের দেবতাভেদ।

মহাকোশফলা (স্ত্রী) মহান্ কোশঃ ফলে যতঃ। দেব-  
শালী লতা। (রাধনিং) চলিত দেয়াড়া।

মহাকোশাতকী (স্ত্রী) (Luffa aegyptiaca, syn. Pen-  
tandra) মহতা চামো কোশাতকা চোত। হস্তিঘোষা,  
হস্তিকোশাতকী, চলিত ধুন্দুল। হিন্দী—নেমুয়া, তৈলঙ্গ—  
এমুগবীর, উৎকল—তরতি। গুণ—মিষ্ণু, রক্ত-পিত্ত ও বায়ু-  
দোষনাশক। পথ্যায়—

“মহাকোশাতকী প্রোক্তা হস্তিঘোষা মহাফলা।

ধার্মার্বা ঘোষকশ্চ হস্তিপর্ণশ্চ সংস্থতঃ ॥” (ভাবপ্রং)

মহাকৌম্বীতক (স্ত্রী) আখলায়নগৃহস্থদ্রোক্ত বৈদিক গ্রন্থ-  
বিশেষ। মহাকৌম্বীতকা নামে প্রচলিত।

মহাকৌম্বীল (পুং) গৌতম বুদ্ধের শিষ্যভেদ।

মহাক্রতু (পুং) রাজস্রব, অশমেখাদি মহাবিজ্ঞ।

মহাক্রম (ত্রি) বিষ্ণুর নামান্তর।

মহাক্রোধ (ত্রি) ১ মূর্ত্তমান্ ক্রোধের সদৃশ। ২ শিব,  
ধ্বজট।

মহাক্লোতন (পুং) শালপর্নী, চলিত শালপাণি। (বৈজ্ঞকনিং)

মহাক্লোতনিকা (স্ত্রী) শালপর্নী। (বৈজ্ঞকনিং)

মহাকৃ (পুং) ১ মহাদেব। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩১৪৯১১)

মহাক্ষত্রেপ (পুং) ১ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রেপ। রাজোপাধিবিশেষ।

[ ক্ষত্রেপ-রাজবংশ দেখ। ]

মহাক্ষার (পুং) তেজস্বর ক্ষারবিশেষ।

মহাক্ষীর (পুং) হস্তযুক্ত।

মহাক্ষপণক, কার্দ্দারবাগী জনৈক পণ্ডিত। ইনি অনেকাধ-  
ধ্বন মঞ্জরী ও একাক্ষরকোষ নামে দুই খানি অভিধান  
প্রণয়ন করেন।

মহাক্ষেত্র, কালিকাপুরাণ-বর্ণিত তীর্থভেদ। স্রমদনা নদীর  
পূর্বে এবং ব্রহ্মক্ষেত্র তীরের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে  
আদিত্য নামে ভৈরবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবমন্দিরের  
পূর্বদিকে ত্রিশ্রোতা নামে নদী এবং কপোত ও কল্পণ নামে  
দুইটা কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডদ্বয়ে স্নান করিয়া নিকটবর্ত্তী বিভ্রাট  
পক্ষিতে আরোহণপূর্বক সূর্য্যপূজা করিলে অশেষবিধ পুণ্য-  
লাভ ও স্বর্গলোকে গতি হয়। (কালিকাপুং)

মহাক্ষোভ, (ত্রি) বৌদ্ধমতে অত্যাধঃ সংখ্যাভেদ।

মহাখদির ঘৃত (স্ত্রী) ঘৃতৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-  
প্রণালী—ঘৃত ১৬ সের, কাথার্থ খদিরছাল ৫০০ পল, শিণ্ড  
গাছের ছাল ১০০ পল, আগুন ছাল ১০০ পল, করঞ্জছাল,  
নিমছাল, বেতগছাল, ক্ষেত্রপর্পটী, কুড়চীছাল, বাসকছাল,  
বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহারদ্রা, শোণালুফল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা,  
তেউড়ী, ও ছাতিমছাল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৫০ পল ও  
জল ৬৪০ সের, শেষ ৮০ সের; ককাদ্রা ছাতিমছাল, আতাইচ,  
সোন্দাল, কটুকী, আক্কাদিমূল, মুতা, বেগারমূল, ত্রিফলা,  
পলতা, নিমছাল, ক্ষেত্রপাপড়া, ছুরালতা, রক্তচন্দন, পিপুল,  
গজপিপুল, পদ্মকণ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহারদ্রা, বচ, রাধাকণ্ঠা, শত-  
মূলী, শ্রামালতা, অনন্তমূল, হস্তযব, বাসকছাল, মুর্খামূল,  
গুলঞ্চ, চিরেতা, ষষ্টিমধু, ও বলাড়ুমুর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক  
এক পল। পরে ঘৃতপাকের নিয়মামুসারে এই ঘৃত পাক  
করিতে হইবে। এই ঘৃতসেবনে কুষ্ঠরোগ নিরাকৃত হয়।

(চরক চিকিৎসা ৭ অং)

মহাখর্ক (পুং) সংখ্যাভেদ। শত খর্কে এক মহাখর্ক হয়।

মহাখল্লল (পুং) সম্প্রদায়ভেদ। মহাখল্লব পাঠও দৃষ্ট হয়।

মহাখাত (ত্রি) ১ বিস্তৃত খাতযুক্ত। ২ সুপ্রাচীন খাতাদি।

মহাখ্যাত (ত্রি) বিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ।

মহাগ (ত্রি) মহান্ উচ্চগতিবন্ত। উন্নত। বর্দ্ধনশীল।

মহাগঙ্গা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত)

মহাগজ (পুং) পৃথিবীর আশ্রয়ভূত হস্তিভেদ। দিক্করী।  
(ভাগবত ৮। ৩৪৬)

মহাগণ (পুং) ১ মহাসমুদ্র। ২ লোকসম্বল। ভিড়, দলল।  
৩ অতিথিপুঞ্জ।

“জ্যেষ্ঠে নরেন্দ্রে বিজয়াজপত্নাঃ শতানি বৃষ্টিশ্চ মহাগণাশ্চ।

ঐশ্বর্য্যসমায়ান্তি নরান্চ সৌম্যাঃ সাতৈবঃ সমেতাশ্চ নিষাদসম্বাঃ ॥”

(বৃহৎসং ৫। ৭৬)

মহাগণপতি (পুং) ১ গণেশের নামান্তর। ২ শিবহুচর, শিবের পরিচারক।

মহাগণেশ (পুং) গণেশের নামান্তর। গণনারক।

মহাগতি (ত্রি) ১ উৎকৃষ্ট গতি বা গমনযোগ্য পদ। ২ মহাপথ। (স্ত্রী) ৩ বৌদ্ধমতে অতীত সংখ্যাত্তম।

মহাগদ (পুং) মহাশাস্ত্রসৌ গদশ্চেতি। ১ অর। (রাজনিং) ২ মহারোগ, বাতব্যাদি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মরী, মূত্রগর্ভ এবং উদরী এই ৮টি রোগ মহাগদ এবং ইহা দৃষ্টিকিংশ।

“বাতব্যাদিঃ প্রমেহশ্চ কুষ্ঠমর্শো ভগন্দরঃ।

অশ্মরী মূত্রগর্ভশ্চ তথৈবোদরমূত্রম্।

অষ্টোবেতে প্রকৃষ্টোব্য দৃষ্টিকিংশ। মহাগদাঃ ॥” (সুশ্রুত ১।৩৩অং)

২ ঔষধবিশেষ। তেউড়ী, গুলক, যষ্টিমধু, রক্তা (কুঁচের মূল), লবণবর্গ, শুষ্কী, পিঙ্গলী, ও মরিচ, এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত একত্র গোশূলের মধ্যে রাখিবে। এই অগদ পান, অজ্ঞান, অভ্যঙ্গ ও নস্ত্রে ব্যবহার করিলে বিষদোষ নষ্ট হয়। ইহার নাম মহাগদ। ইহার বীৰ্য অপ্রতিহত ও বিষরোগনাশক। \* (ত্রি) মহতী গদা অস্ত্র। ৩ মহাগদাবিশিষ্ট।

“পরামুখন্তঃ তপনীরকল্পং মহাগদং কাঞ্চনচিত্রদংশম্।”

(ভাগবত ৩।১৮।২)

মহাগদমহীরুহ (পুং) বৃক্ষভেদ, চালগুমুরার গাছ। (অত্রি)

মহাগন্ধ (পুং) মহান্ গন্ধোহস্ত। ১ কুটজবৃক্ষ। (রাজনিং)

২ জলবেতস। (শব্দচং) (স্ত্রী) মহান্ গন্ধোহস্ত। ৩ হরিচন্দন। ৪ বোল। (রাজনিং) (ত্রি) ৫ গন্ধযুক্ত।

“তচ্চ কঠে সমাসজ্য মহাগন্ধং নরাধিপ।

আযবাংকো যত্র হুঁরায়া বলদর্পিতঃ ॥” (হরিবং ১৪৩।৪৪১)

মহাগন্ধক (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—

পারদ ২ তোলা, ও গন্ধক ২ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কজলী প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ কজলী কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া কাদার মত করিয়া লোহপাত্রে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিবে, পরে তাহার সহিত জায়ফল, অরিত্রী, লবঙ্গ ও নিমপাতা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে। পশ্চাৎ এই ঔষধ একখানি ঝিল্লকের মধ্যে স্থাপিত ও অপর আর এক খানি ঝিল্লক উহার উপরিভাগে আচ্ছাদিত করিয়া কলাপাতে

\* “ত্রিবিদ্য বিশল্যে মধুকং হরিদ্রে রক্তা নরেন্দ্রে। লবণশ্চ বর্ণঃ।

কটুত্রিকং চৈব বিচূর্ণিতানি শৃঙ্গে নিধায়াশ্বখংযুতানি।

এষো হগদো হস্তি বিধঃ প্রযুক্তঃ পানাজ্ঞাত্যজ্ঞানতত্ত্বযোগাৎ।

অবাধ্যবীথ্যো বিষবেগহন্তা মহাগদো নাম মহাপ্রভাবঃ ॥”

(সুশ্রুত কল্পহাং ৫ অং)

জড়াইয়া ও কাদা দিয়া লেপন করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পুটপাকে পাক করিতে হইবে। ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে উহা তুলিয়া লইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া লইতে হইবে। ইহার মাত্রা ৬ রতি। রোগের অবস্থা অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতীশার, স্তৃতিকা রোগ এবং অর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শাস্তি হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রহণী-রোগাধিকারঃ)

মহাগন্ধা (স্ত্রী) মহান্ গন্ধো যন্তাঃ ত্রিবাং টাপ্। ১ নাগবলা।

২ কেবিকাপুপ। (রাজনিং) ৩ চামুণ্ডা।

“চামুণ্ডা চব্বিকা চর্ম্মমুণ্ডা মাঞ্চারকর্দিকা।

কর্ণমোটা মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী ॥” (হেম ২।১২০)

মহাগয় (ত্রি) মহদেবতা কর্তৃক গের বা যজ্ঞগৃহযুক্ত (অগ্নি)।

“পাঞ্চজন্মঃ পুরোহিতঃ তমীমহে মহাগয়ং” (শব্দ ২।৬৩২০)

‘মহাগয়ং মহন্তির্দেবাদিভিরপি-গীতিগীতব্যং মহাস্তি প্রভুতানি যজ্ঞগৃহাণি বা যন্ত স তথোক্তঃ তং অয়িং’ (সারণ)

মহাগর্ত (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪২।২২)

মহাগর্ভ (পুং) ১ শিব। ২ মহোদর। ৩ দানবভেদ।

মহাগল (ত্রি) দীর্ঘগ্রীব। বাহার গলা উষ্ট্র বকাদির দ্বার লব।

মহাগব (পুং) মহাশাস্ত্রসৌ গোশ্চেতি (গোরতচ্ছিতলুকি।

পা ৫।৪।২২) ইতি সমাপান্তঃ, গোশদৃশদ্বাদস্ত তথ্যং। গবয়, গলকথলশূত্র গোশদৃশ পশু। [গবয় দেখ]

“বনগৌর্গবয়ঃ প্রোক্তো বলভজো মহাগবঃ ॥” (রাজনিং)

মহাগিরি (পুং) মহান্ গিরিত্বদাত্যোপাধিযন্ত, বহা মহান্ গিরিবিব। জৈনদিগের দশপুর্বিভেদ।

“মহাগিরি স্তব্ধাত্মা বজ্রাত্মা দশপুর্বিগঃ ॥” (হেম)

মহান্ গিরিঃ। ২ বৃহৎপর্বত। ৩ দানববিশেষ। (হরিবং ৩।৮৬)

মহাগীত (ত্রি) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৮১)

মহাগুণ (ত্রি) ১ শ্রেষ্ঠগুণ। ২ উত্তম গুণবিশিষ্ট। ৩ আচাৰ্য্যভেদ।

মহাগুদ (পুং) ককজ কুমিবিশেষ। (চরক চিকিৎসা ৭ অং)

মহাগুরু (পুং) মহাশাস্ত্রসৌ গুরুশ্চেতি। অতিগুরু। পুরুষের পিতা, মাতা এবং আচাৰ্য্য, অদভা কস্তার পিতা ও মাতা, এবং দতাকস্তার স্বামীই কেবল মহাগুরু।

মহাগুরু-নিপাতে অর্থাৎ মহাগুরুর মৃত্যু হইলে অক্ষার-লবণভোজন ও অঙ্গাস্পর্শ এই দুই বিষয়ে অশোচের গুরুত্ব হইয়া থাকে, অর্থাৎ কাহাকেও স্পর্শ না করা এবং অক্ষারলবণ ভোজন এই দুইটা বিষয়রূপে পালনীয়। আচাৰ্য্য, মহাগুরু হইলেও তাঁহার মৃত্যুতে ত্রিরাত্রাশোচ হয়, এতদন্ত পূর্বোক্ত। বিধান আচাৰ্য্য সম্বন্ধে নহে। পিতা, মাতা ও দতাকস্তার স্বামিসম্বন্ধেই পূর্বোক্ত নিয়ম।

“ত্রয়ং পুরুষত্বাতিশুকবো ভবন্তি, মাতা পিতা আচাৰ্য-  
শ্চেতি, ইতি বিহুং ত্রয়ং” পত্নীমহাশূর্ণমাহ—

“নাতো বিশিষ্টং পত্নীমি বাহুবং বৈ কুলদ্বিজাঃ।

পতিবদ্ধগতিৰ্ত্তা দৈবতং গুরুরেব চ ॥”

শাতা তপঃ—“গুরুমিহি জাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

পতিরেকো গুরুঃ জ্ঞীণাং সৰ্বভাভ্যাগতো গুরুঃ ॥”

একদমেন দত্তজ্ঞীণাং পিতৃমাতৃব্যাবৃতিঃ। সপিণ্ডমরণঃ  
প্রকৃত্য-আখ্যলারনঃ—ত্রিরাত্রঃ অক্ষারলবণাদ্রাশিনঃ স্ত্রীর্বাশ-  
রাত্রঃ মহাগুরুশু। আচাৰ্য্যশ্চ—

উপনীয় দদদেবদমাচাৰ্য্যঃ স উদাহৃতঃ। ইতি বাজবল্ক্যোক্তঃ,  
তদ্বরণে ত্রিরাত্রাশৌচেন নৈতাদৃগ্ নিরমঃ।” ( শুক্লিতম্ )

মহাগুরুর মৃত্যুর পর এক বৎসর পর্য্যন্ত কালাশৌচ হয়।  
সপিণ্ডীকরণ হইলে এই অশৌচ নিবৃত্তি হয়। যদি এক বৎ-  
সরে সপিণ্ডীকরণ না হয়, তাহা হইলে যতদিন না সপিণ্ডী-  
করণ হইবে, ততদিনই অশৌচ থাকিবে। যদি কাহারও এক  
বৎসর মধ্যে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ হয়, তাহা হইলে সপিণ্ডী-  
করণের পরই কালাশৌচ নিবৃত্তি হইবে। ‘যাবৎ পুণো ন  
বৎসরঃ’ শাস্ত্রোক্ত এই বাক্য দ্বারা ইহা বুঝায় যে, এক  
বৎসরই বিহিত কাল, এই অজ্ঞাই বৎসর অভিহিত হইয়াছে।  
বিশেষ বিধানানুসারে যখন সপিণ্ডীকরণ হইবে, তখনই অশৌচ  
বাইবে। মহাগুরুনিপাতে কোন কাম্যকন্দের অমুষ্ঠান করিবে  
না। ইহা ভিন্ন আৰ্হি জ্য, অর্থাৎ ঋষিকের কার্য্য, পৌরোহিত্য,  
ব্রহ্মচর্য্য, অজ্ঞবাক্তির শ্রাদ্ধ, পরামতোজন, গন্ধ, মালা, মৈথুন,  
তীর্থযাত্রা, বিবাহ, অধ্যাপন, তর্পণ, শিবপূজা, ব্রহ্মযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ  
এবং দৈবকর্মা এই সকল কন্দের অমুষ্ঠান বিশেষ নিষিদ্ধ।

“মহাগুরুনিপাতে চ কাম্যং কিঞ্চিদ্ চাচরেৎ।

আৰ্হি জ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ ॥

অজ্ঞশ্রাদ্ধং পরায়ণঞ্চ গন্ধং মালাঞ্চ মৈথুনং।

বজ্রেন্দ্র গুরুপাতে চ যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ ॥

তীর্থযাত্রাং বিবাহকাধ্যাপনং তপঃস্তুত্বা।

সংবৎসরং ন কুরীত মহাগুরুনিপাতনে ॥

অপিচ—বিশেষতঃ শিবপূজাং প্রমুখতাপত্বে দ্বিজঃ।

যাবদ্ বৎসরপর্য্যন্তং মনসাপি ন চাচরেৎ ॥

মহাগুরুনিপাতে তু কাম্যং কিঞ্চিদ্ চাচরেৎ।

আৰ্হি জ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ শ্রাদ্ধং দেবযুক্তঞ্চ বৎ ॥” ( শুক্লিতম্ )

মহাগুপ্তা ( জী ) মহান্ গুপ্তো যন্তাঃ। দোমবনী। ( রাজনিং )

মহাগুহা ( জী ) মহতী গুহা যন্তাঃ। পুন্নিপী। ( রাজনিং )

মহাগৃষ্টি ( জী ) উচ্চ ককুদযুক্তা গাভী।

মহাগোধুম ( পং ) মহান্ দাসো গোধুমশ্চেতি। বৃহৎ গোধুম।

“গোধুমঃ স্ত্রীমোহপি ভাজিবিধঃ স চ কীৰ্ত্তিতঃ।

মহাগোধুম ইত্যাখ্যঃ পশ্চাদেশাৎ সমাগতঃ ॥” ( ভাবপ্রঃ )

গোধুমের অপরা নাম স্ত্রীমহা। গোধুম তিন প্রকার, বাহা  
বড় বড়, তাহাকে মহাগোধুম কহে, ইহা পশ্চিমদেশে উৎপন্ন হয়।  
ইহার গুণ—মধুর রস, শীতবীৰ্য্য, বাতহর, পিত্তনাশক, গুরু,  
ককজনক, গুরুবর্দ্ধক, বলকারক, শিথ, ভয়সন্ধানকারক,  
সারক, ওজোগুণবর্দ্ধক, শরীরের উপচরকারক, বর্ণপ্রসাদক,  
ব্রণের হিতকর, রুচিজনক এবং শরীরের স্থিরতাসম্পাদক।  
গোধুমকে যে ককজনক বলা হইল, সেই কককারিতা-যুক্ত  
নূতন গোধুমে আছে, পুরাতন গমে নাই। ( ভাবপ্রঃ )

[ গোধুম ও গম দেখ ]

মহাগোপা ( জী ) শারিবা, চলিত অনন্তমূলা। ( বৈজ্ঞানিক )

মহাগোরী ( জী ) ১ নদীভেদ, এই নদী বিজ্ঞানি হইতে  
বাহির হইয়াছে।

“করতোয়া মহাগোরী দুর্গা চান্দ্রশিরা তথা।

বিজ্ঞাপাদপ্রত্যস্তা নতঃ পূণ্যজলাঃ শুভাঃ ॥”

( মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫৬/২৫ ) ২ দুর্গা।

মহাগ্রন্থিক ( জি ) দৃঢ়বন্ধনকারী। যে সকল ঔষধ সেবন  
করাইলে রোগ গ্রন্থিবন্ধনবৎ আটকাইয়া যায়, আর প্রবেশ  
করিতে পারে না। ২ শতগ্রন্থিযুক্ত কীটভেদ ( কেম্বো প্রভৃতি )।

মহাগ্রহ ( পং ) রাহুগ্রহ।

মহাগ্রাম ( পং ) ১ মহাজনসঙ্ঘ। ( ঋক্ ১০/৭৮/৩ )

২ কান্দীরস্থ গ্রামভেদ। ( রাজতরং ২/১৩৩ ) ৩ সিংহল-  
দ্বীপের প্রধান রাজধানী।

মহাগ্রীব ( পং ) মহতী দীর্ঘা গ্রীবা ককরা যন্ত। ১ উষ্ট্র।

২ শিব, মহাদেব।

“মহানাসো মহাকর্ম্মহাগ্রীবঃ শশানভাক্ ॥” ( ভারত ১৩/১৭/৮৩ )

৩ শিবাহুচর ভূতবিশেষ। ( হরিবং ১৪৩ ) ৪ দেশবিশেষ  
ও তদ্রূপবাসী লোক।

“ব্যাঘ্রগ্রীবা মহাগ্রীবা বৈষ্ণুপুংসঃ শ্রদ্ধাধারিণঃ ॥” ( মার্কপুঃ ৫৮/১৭ )

( জি ) ৫ বৃহৎ গ্রীবাস্কৃত।

মহাগ্রীবিন্ ( পং ) উষ্ট্র।

মহাগুট ( পং ) জলপাত্রবিশেষ। “বৎ জাবা মুঢ়লোকশ্চ  
প্রবিশন্তি মহাগুটে ॥” ( রুদ্রযামল )

মহাগুস ( পং ) ভোজনপটু শিবাহুচরভেদ।

মহাগুস ( পং ) মহতো দেশত মহত্যা ভূমের্বা ঘাসঃ মহৎ  
দেশ বা। মহতীভূমির ঘাস।

মহাশূর্ণা ( জী ) মহতী শূর্ণা শরীরভ্রমণঃ যন্তাঃ। স্ত্রী।

( শব্দচং ) মহতী চাসৌ শূর্ণা চেতি। ২ অতিশয় জমি।

মহাস্বত (ক্লী) পুরাতন স্বত, এক শত এগার বৎসরের পুরাতন স্বতকে মহাস্বত কহে। এই স্বত বিশেষ উপকারী বলিয়া ইহার নাম মহাস্বত হইয়াছে। (নকুল ১৩ অ০) ইহার গুণ—কফনাশক, বলকর, পবিত্র, মেধ্য, তিসিরনাশক এবং সর্ষভূতহর।

“পেরং মহাস্বতং ভূতৈঃ কফয়ং পবনাধিকৈঃ।

বলাং পবিত্রং মেধ্যঞ্চ বিশেষাতিমিরাপহম্।

সর্ষভূতহরকৈব স্বতম্বেতৎ প্রশস্যতে॥” (সুশ্রুত ২০ ৪৫ অ০)

মহাঘোর (ত্রি) মহাংশানো ঘোরশ্চেতি। অতিশয় ভয়ানক।

“যমঘারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।

“তাক তর্জুং দদামোনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীক গাম্॥”

মহাঘোষ (ক্লী) মহান্ ঘোষঃ কোলাহলো যমিন্। ১ হট্ট, হাট। (মেদিনী) (ত্রি) ২ বৃহচ্ছলযুক্ত।

“তেবাং শ্রমা সভাপালো ভেরীং সারাহিকীং তথা।

সমাজয়ে মহাঘোষাং জাষুনদপরিবৃত্তাম্॥” (ভারত ১২২১১১)

(পুং) ৩ অতিশয় ঘোষণ।

মহাঘোষা (ক্লী) মহাঘোষ-টাপ্। ১ কর্কটপৃষ্ঠী। (শব্দচক্রিকা)।

মহাঘোষস্বরাজ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মহাঘোষানুগা (ক্লী) তত্ত্বোক্ত দেবভাভেদ।

মহাঘোষেশ্বর (পুং) বক্ষরাজভেদ।

মহাঙ্গ (পুং) মহান্তি দীর্ঘাণি অঙ্গাভ্যন্ত। ১ উষ্ট্রী। ২ গোমূরক।

৩ রক্তচিত্রক। (রাজনিং) (ত্রি) ৪ বৃহদঙ্গবস্তুক।

“অস্তিহঃ অস্তিতাবশ্চ ভাগী ভাগবরো লঘুঃ।

উৎসঙ্গশ্চ মহাঙ্গশ্চ মহাঙ্গপরাঙ্গঃ॥” (ভারত ১৩১৭৮৩)

মহাচক্র (ক্লী) ১ বৃহৎ চক্র। ২ ভবচক্র। (পুং) ৩ দানবভেদ।

মহাচক্রপ্রবেশজ্ঞানমুদ্রা (ক্লী) মুদ্রাবিশেষ।

মহাচক্রবর্তিতা (ক্লী) সঙ্গাগরা ধরার অধীশ্বরত্ব। রাজচক্র-বর্তীর কাব্য।

মহাচক্রবর্তিন্ (পুং) সম্রাট।

মহাচক্রবাড়[ল] (পুং) পর্কতভেদ। (ললিতবিস্তর)

মহাচক্রী (পুং) ১ কুচক্রী। অসদভিপ্রায়ে চক্রান্ত বা মন্ত্রণাকারী। ২ বিষ্ণু।

মহাচক্ষু (ক্লী) মহতী চক্ষুরগ্রঃ বস্তাঃ। শাকবিশেষ। পর্যায়—বৃহচ্ছক, বিবারি, স্রুচক্ষুকা, স্রুগচ্ছক, দীর্ঘপত্রী, দিব্যগন্ধা, ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, কষায়, মলশোধন, শুষ্ক, শূল, উদর, অর্শ ও বিষনাশক এবং রসায়ন। (পুং) ২ বৃহচ্ছকযুক্ত পক্ষী।

মহাচণ্ড (পুং) মহাংশানো চণ্ডশ্চেতি। ১ বমভূত। বমভূত।

(ত্রিকা০) (ত্রি) ২ প্রচণ্ড, ভয়ানক। (পুং) ৩ শিবাহুচর-

ভেদ। ত্রিমাং টাপ্। ৪ চামুণ্ডা।

মহাচতুরক (পুং) চতুর চূড়ামণি।

মহাচন্দনাদি তৈল, বঙ্গাদি কাশরোগে ব্যবহার্য তৈলো-  
যথ-বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ভিল তৈল ১৬ সের। কাথার্থ  
রক্তচন্দন, শালপানি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর,  
মৃগানি, মাংগানি, ভূমিকুম্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, আমলা, শিরীষছাল,  
পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, সরলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভেদালে, মুর্ক্ষা-  
মূল, প্রিয়ঙ্গু, উৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, পদ্মমূল,  
পদ্মনাল, শালুক প্রভৃতি মিলিত ৫০ পল, খেতবেড়েলা ৫০ পল,  
পাকার্থ জল ৬৩ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগছত্ৰ, শতমূলীর  
রস, লাক্ষারস, কঁজি ও দধির মাত প্রত্যেকে ১৬ সের এবং  
হরিণ, ছাগ ও শশক মাংস প্রত্যেক ৮ সের, প্রত্যেকের  
পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের (কাথ পৃথক্ পৃথক্  
হইবে)। পরে কক্কার্থ খেতচন্দন, অশুর, কাকলা, নখী,  
শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, শুড়ষক, মৃগাল, হরিজ্ঞা, দারু-  
হরিজ্ঞা, জামালতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাছকা, কুড়,  
ত্রিকলা, পরবক্ষল, মুর্ক্ষামূল, গোটেলো, নালুকা, দেবদারু,  
সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, ধাঁইফুল, বেলভট্ট, রসায়ন,  
মুখা, শিলারস, বালা, মজিষ্ঠা, লোধ, মোরী, জীবন্তী, প্রিয়ঙ্গু,  
শর্টা, এলাইচ, কুঙ্কুম, খাটালো, পদ্মকেশর, রামা, জৈত্রী,  
শুট ও ধজা প্রত্যেক ৪ তোলা। অতঃপর (বাতরোগোক্ত)  
মহাসুগন্ধি (লক্ষ্মীবিলাস) তৈলের গন্ধদ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে  
এই তৈল পাক করিবে। পাকান্তে তৈল নামাইয়া পাত্রে  
ছাকিরা রাখিবে এবং যথাসময়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কুঙ্কুম,  
মৃগনাভি ও কর্পূর মিশাইয়া দিবে। এই তৈল বাত ও পিত্তহর,  
বুযা এবং ধাতুপুষ্টিকর। রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও ধাতুদৌর্বল্য-  
জনিত রোগে এই তৈলমর্দন বিশেষ উপকারক।

মহাচপলা (ক্লী) আখ্যা ছন্দোভেদ।

মহাচমু (ক্লী) সেনাদল। বাহিনী।

মহাচম্পা (ক্লী) জনপদভেদ।

মহাচর্য্য (ক্লী) বোধিসত্ত্বের অবলম্বনীয় জীবনপথ।

মহাচল (পুং) মহান্ অচলঃ। মহাপর্কত, বৃহৎ পর্কত।

“মৌলকমোজনা যানৌ মধ্যে তত্র মহাচলৌ।

তয়ো দক্ষিণতো যৌ তু যৌ তথোত্তরতো গিরী॥”

(মার্কণ্ডেয়পুং ৫৪।১০)

মহাচার্য্য (পুং) ১ আচার্য্যোত্তম। ২ শিব। ৩ অদ্বৈতবিভা-  
বজয় ও চণ্ডমারুতপ্রণেতা।

মহাচিত্তা (ক্লী) অপ্সরোভেদ।

মহাচিত্রপাটল (ক্লী) শুষ্কভেদ।

মহাচীন, চীনমাত্রাজ্যের অংশ বিশেষ। ২ তদদেশের অধিবাসী।

মহাচুড়ু (পুং) বৃহচ্চুড়ু কুপ। চলিত বড় চৈচকো। (রাজনিং)

মহাচুন্দ (পুং) বৌদ্ধসন্ন্যাসিভেদ।

মহাচুড়া (স্ত্রী) কন্দামুচর-মাতৃভেদ।

মহাচূত (পুং) মহারাজাস্বক। (রাজনিং)

মহাচৈতন্যত (স্ত্রী) স্বভৌবধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত  
প্রণালী—কাথার্থ শণবাজ, তেউড়ী মূল, এরঙমূল, দশমূল,  
রাশ্মি, পিপুল, ও সজিনামূল প্রত্যেক ২ পল, পার্কার্থ জল ৬৪  
সের, শেষ ১৬ সের, কদার্ব ভূমিকুম্ভাও, বট্টিমধু, মেদ, মহা-  
মেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, খেজুরমাতী, জাকা,  
শতমূলী, তালের মাতী, গোক্ষুর এবং স্বল্প চৈতন্যতোক  
রাখালশসার মূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শাল-  
পানি, ভগরপাছকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্রামালতা, অনন্ত-  
মূল, প্রিয়ঙ্গু, মীলোংল (নীলমুঁদি), এলাইচ, মজিঠা, দন্তী-  
মূল, দাড়িম্ববীজ, নাগেশ্বর, তালিশপত্র, বৃহতী, মালতীর নব-  
পুশ, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, ও পদ্মকাঠ, এই ২৮ খনি  
দ্রব্যের মিলিত কক ১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিতে  
হইবে। ইহাতে সর্ষ প্রকার অপস্মার, ও উন্মাদ রোগ উপ-  
শমিত হয়। ইহা শ্বাসকাশহর এবং শুক্রার্জবিশোধক।  
প্রত্যহ আবশ্যক মত ২ তোলা পর্যন্ত মাত্রায় ইক্ষুসর্করা  
ও উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন বিধি।

মহাচ্ছদ (পুং) মহান্ ছদঃ পত্রমস্ত। ১ দেবতাড় বৃক্ষ।  
২ বৃহৎ পত্র।

মহাচ্ছায় (পুং) মহতী ছায়ামস্ত। ১ বটবৃক্ষ। (ত্রি) ২ বৃহ-  
চ্ছায়বৃক্ষ।

মহাচ্ছিদ্রা (স্ত্রী) মহাচ্ছিদ্রমস্তাঃ। ১ মহামেঘ। (রাজনিং)  
(ত্রি) ২ বৃহচ্ছিদ্রবৃক্ষ। (স্ত্রী) ৩ কায়প্রত্যঙ্গরূপ নব-  
দার, শরীরের নবদার। (চরক শারীরস্থ। ৭অং)

মহাজ (পুং) মহাংশাসৌ অজশ্চেতি। ১ বৃহচ্ছাগ। (ত্রি)  
২ মহতী জায়তে ইতি মহৎ জন কর্তরি ড পৃথোদরাদিত্যাং  
সাধু। ২ মহাকুলোদ্ভব।

মহাজটা (স্ত্রী) মহতী জটামস্তাঃ। ১ রুদ্রজটা। (রাজনিং)  
মহতী জটা। ২ বৃহৎ জটা।

মহাজত্র (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১০২)

মহাজন (পুং) মহাংশাসৌ জনশ্চেতি। ১ সাধু।

“বেদা বিভিন্নঃ স্বতরো বিভিন্না নাসৌ মুনির্নশ্ব মতং নভিন্নং।  
ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং ওহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পশাঃ॥”  
(ভারত ৩।৩২।১১২)

ধার্মিক, বেদ বাক্যে শ্রদ্ধালু ও খ্যাতাপন্ন ব্যক্তি। ২ মহাদি।  
৩ ধনী, ব্যবসায়ী। ৪ উত্তমর্ণ, বাহারা টাকা ধার দেয়।

“সঙ্গং নৈব হি কশ্চিদস্ত কুরুতে সত্ত্বাভ্যতে নাদরাং  
সংপ্রাপ্তৌ গৃহমুৎসবেষু ধনিনাং সাবজ্ঞমালোকাতে।

দুরাদেব মহাজনস্ত বিহরত্যরচ্ছদো লক্ষ্মরা

মস্ত্রে নিধনতা প্রকামমপন্নং বর্ষং মহাপাতকম্॥”

(মুচ্চকটিক ১অং)

মহাজনীয় (ত্রি) বাণিজ্যোপযোগী। মহাজন-সম্পর্কীয়।

মহাজম্বীর (পুং) বৃহজ্জম্বীর বৃক্ষ, চলিত করুণালেবু, হিন্দী  
বড় নিম্বু। ইহার স্বক্—দীপন ও বাতনাশক; তৈল—বাত-  
নাশক; ঘৃষ—উদরামরনাশক, রক্তাতীসার এবং পামাদি  
রোগে হিতকর।

মহাজম্বু (স্ত্রী) মহতী চাসৌ অজশ্চেতি। বৃহজ্জম্বু।

মহাজম্বু (স্ত্রী) মহতী চাসৌ অজশ্চেতি। বৃহজ্জম্বু, বড়জাম  
গাছ। পর্যায় রাজজম্বু, স্বর্ণমাতা, মহাফলা, পিকপ্রিয়া,  
কোকিলেঠা, মহালীলা, বৃহৎফলা। ইহার গুণ উষ্ণ, মধুররস,  
কষায়, প্রমনাশক, ঝটিতি আন্তজড়তানাশক, স্বরকর,  
বিষ্টম্ভী, শোষণমন, ত্রম ও অতীসারবর্জক, শ্বাস, কফ এবং  
কাসনাশক। (রাজনিং)

মহাজন্তু (পুং) শিবামুচরভেদ।

মহাজয় (পুং) ১ নাগভেদ। (ত্রি) ২ জয়শীল। ত্রিরাং  
টাপু। দুর্গা।

মহাজয়রাজ, মধ্যভারতের জনৈক সামন্তরাজ।

মহাজব (পুং) মহান্ জবো বেগো যন্ত। ১ গবয়। ২ প্রীকারী  
মৃগ। (রাজনিং) (ত্রি) ৩ অতিবেগবৃক্ষ।

(ভাগবত ৭।৮।২৮)

ত্রিরাং টাপু, মহাজবা ৪ নদীভেদ। ৫ কুমারামুচর মাতৃভেদ।

“শশোলুকমুখী কৃষ্ণা থরজন্বা মহাজবা।” (ভারত ৯।৪৬।২২)

মহাজাতি (স্ত্রী) মহতী জাতিরস্তা ইতি যদা মহতী জাতি-  
রিব তদাক্রতিত্যাং। ১ বাসন্তীপুষ্পলতা। (রাজনিং)  
মহতী জাতিরিতি। ২ শ্রেষ্ঠবর্ণ।

মহাজাতীয় (ত্রি) মহৎ (প্রকারবচনজাতীয়স্ব। পা ৫।৩।৯২)  
ততঃ (আনু মহতঃ সমানাদিকরণজাতীয়স্বোঃ। পা ৬।৩।৪৬)  
ইতি মহত আকারাদেশ। মহৎ প্রকার।

মহাজানু (পুং) ১ মহাভারতের ত্র্যক্ষণভেদ। (আদিপর্ক)  
২ শিবামুচর ভেদ।

মহাজাবাল, উপনিষদ্ভেদ।

মহাজালী (স্ত্রী) জালয়তি আচ্ছাদয়তীতি জাল আচ্ছাদনে  
পচাভচ, ত্রিরাং জীব, মহাংশাসৌ জালশ্চেতি স জস্তা অর্ধ  
অর্ধ আভচ, ততঃ জীব। ১ পীতবর্ণ ঘোষা। (অমর)  
২ আবর্তকী লতা। ৩ রাজকোশাতকী। (রাজনিং)



মহাঈজ্যোষ্ঠী (পুং) ১ মহাদেব। ২ দৈত্যভেদ। (হরিবংশ)

মহাঈজ্যোষ্ঠী (স্ত্রী) পরম জ্ঞান।

মহাঈজ্যোষ্ঠীগীতা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবতাভেদ।

মহাঈজ্যোষ্ঠীযুতা (স্ত্রী) মনসা দেবীর নামান্তর।

মহাঈজ্যোষ্ঠী (পুং) ১ সাধু। ২ ভবিষ্যকৃত্য। ৩ শিব।

মহাঈজ্যোষ্ঠী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ জ্যোষ্ঠী চেতি। পূর্ণিমাভেদ।

নক্ষত্র বিশেষাদিগুরু জ্যোষ্ঠের পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রের যোগ হইলে মহাঈজ্যোষ্ঠী হয়। তিথিতত্ত্বে এইরূপ আছে, এই মহাঈজ্যোষ্ঠী ৫ প্রকার যথা—

১। “ঐন্দ্রে গুরু শনীচৈব প্রাজাপত্যে রবিস্থতা।

পূর্ণিমা গুরুবারেণ মহাঈজ্যোষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা।

ঐন্দ্রে জ্যোষ্ঠায়াং প্রাজাপত্যে রোহিণ্যাং।” (তিথিতঃ)

যদি জ্যোষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতি বা চন্দ্র এবং রোহিণী নক্ষত্রে রবি থাকেন এবং ঐ দিনই বৃহস্পতিবার হয়, তাহা হইলে মহাঈজ্যোষ্ঠী হইবে। গুরুবার না হইলেও হয়। “বিনা গুরুবারেণাপি।”

২। “ঐন্দ্রে গুরু শনীচৈব প্রাজাপত্যে রবিস্থতা।

পূর্ণিমা জ্যোষ্ঠমাসস্ত মহাঈজ্যোষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা।”

অমুরাধা নক্ষত্রে যদি বৃহস্পতি বা চন্দ্র থাকে, আর রোহিণী নক্ষত্রে রবি থাকিতে থাকিতে যদি জ্যোষ্ঠী পূর্ণিমা হয়, তাহা হইলেও মহাঈজ্যোষ্ঠী হয়। ইহাতে বৃহস্পতি বারের কোন আবশ্যক নহে।

৩। “ঐন্দ্রে মৈত্রে বদা জীবন্তং পঞ্চদশকে রবিঃ।

পূর্ণিমা শক্রচন্দ্রেণ মহাঈজ্যোষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা।” (তিথিতঃ)

জ্যোষ্ঠা ও অমুরাধা নক্ষত্রে যদি বৃহস্পতি থাকেন, ও তাহা হইতে পঞ্চদশ নক্ষত্রে যদি রবি থাকেন, এবং ইন্দ্র-দৈবত নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিলে যদি জ্যোষ্ঠ-পূর্ণিমা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে মহাঈজ্যোষ্ঠী কহে।

৪। “ঐন্দ্রে তথবা মৈত্রে গুরুচন্দ্রৌ বদা স্থিতৌ।

পূর্ণিমা জ্যোষ্ঠমাসস্ত মহাঈজ্যোষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা।” (তিথিতঃ)

ঐন্দ্র নক্ষত্র অথবা অমুরাধা নক্ষত্রে গুরু ও চন্দ্র থাকিলে, সেইদিন জ্যোষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা হইলে মহাঈজ্যোষ্ঠী হয়।

৫। “জ্যোষ্ঠে সংবৎসরে চৈব জ্যোষ্ঠমাসস্ত পূর্ণিমা।

জ্যোষ্ঠাভেন সমাযুক্তা মহাঈজ্যোষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা।” (তিথিতঃ)

যে বৎসর ষষ্ঠ সংবৎসরের মধ্যে জ্যোষ্ঠী পূর্ণিমাতে জ্যোষ্ঠা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকেও মহাঈজ্যোষ্ঠী বলা যায়।

এই মহাঈজ্যোষ্ঠী অতিশয় পুণ্য দিন, এই দিনে তীর্থাদিতে স্নান দানাদি করিলে অশেষ পুণ্য-সঞ্চয় হয়।

বিশেষতঃ এই দিনে ভগবান্ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে বিফুলোকে গতি এবং গঙ্গানানে মোক্ষ লাভ হয়।

“মহাঈজ্যোষ্ঠীয়াস্ত বঃ পশ্চৎ পুরুষঃ পুরুষোত্তমম্।

বিফুলোকমবাপ্নোতি মোক্ষং গঙ্গানুস্রজনাং॥” (তিথিতত্ত্ব)

মহাঈজ্যোষ্ঠীয়াস্ত্রী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ জ্যোষ্ঠীয়াস্ত্রী চেতি।

স্বনামখ্যাতলতা, চলিত বড় লতা-ফটুকী, হিন্দী—বড়ী মাল-কাণী, সংস্কৃত পর্যায়—ভেজোবতী, বহরসা, কনকপ্রভা, তীক্ষা, সুবর্ণনকুলী, লবণা, অগ্নিদীপ্তা, তেজস্বিনী, সুরলতা, অগ্নিফলা, অগ্নিগর্ভা, কদ্বুনী, শৈলমুতা, সুতৈলা, সুবেগা, বারসী, তীত্রা, কাকাডী, বারসাদনী, গীলতা, শ্রীলতা, মোম্যা, ব্রাক্ষী, লবণ-কিন্তকা, পারাবতগদী, পীতা, পীততৈলা, বশস্বিনী, মেধ্যা, মেধাবতী, ও ধীরা। ইহার গুণ—তিক্ততর, রূক্ষ, কিকিৎ কটু, বাতকফাপহ, দাহপ্রদ, দীপন, মেধা ও প্রজ্ঞাকারক। (রাজনিঃ)

মহাঈজ্যোষ্ঠীয়াস্ত্রী (পুং) ১ শিব। (ত্রি) ২ জ্যোষ্ঠীয়াস্ত্রী।

মহাজ্বরাকুল (পুং) বিবম অরাদিকারে রসৌষধবিশেষ ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—শোধিত পারা ১০ তোলা, শোধিত বিষ ১০ তোলা, শোধিত গন্ধক ১০, শোধিত ধূতুরবীজ ১১০ তোলা, বর্ণজীবন্তী ৬ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অমুপান গোড়ালেবুর বীজ ও আদার রস। এই ঔষধ সেবন করিলে ত্রিদোষজ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক এবং চাতুর্থািক প্রভৃতি সমস্ত বিবম জ্বর ও জীর্ণ জ্বর নষ্ট হয়।

(ভাবপ্রকাশ অরাদিকার)

২ অত্রবিধ—পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিন্দুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাস্কিক, স্বর্ণর, মনঃশিলা, অঙ্গ, গেরিমাটি, সোহাগা ও দস্তিবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মর্দন করিয়া গোড়ালেবুর রস, তুলসীপত্ররস, চিতাপত্র রস, সিদ্ধিপত্র রস এবং তেঁতুল পত্র রস এই সকল রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া পরে ছায়ায় শুকাইতে হইবে। এই ঔষধের বটিকা ছোলার তায় হইবে। চিকিৎসক দোষের বলাবল দেখিয়া অমুপান স্থির করিবেন। এই ঔষধ সেবন করিলে নানা প্রকার জ্বর আশু নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাঃ অরাদিঃ)

মহাঙ্কাল (পুং) মহতী জ্ঞান পিথা অস্ত্র। ১ হোমায়ি। (হেম)

২ নরক বিশেষ।

“স্বপ্নাং স্ত্রতাকাপি গঙ্গা মহাঙ্কালে নিপাতাতে।” (বিষ্ণুপুঃ ২।৩।১২)

পুত্রবধু বা কন্যাগমন করিলে এই ভয়ঙ্কর জ্ঞানবিশিষ্ট নরকে পাত্ত হইয়া থাকে। ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।২।৭।৮১)

মহাঙ্কাল (স্ত্রী) মহতী জ্ঞান দীপ্তিযুক্তাঃ। ১ জৈনদিগের বিভাদেবী বিশেষ। (হেম) মহতী জ্ঞান। ২ বৃহদগ্নিশিখা।

মহাঞ্জি (ত্রি) মহদঞ্জি যন্ত। বৃহৎ পুণ্ড্রযুক্ত। “কৃষ্ণাঞ্জি-  
রম্যজির্মহাঞ্জিঃ” (তরুণকৃৎ ২৪৪) ‘কৃষ্ণাঞ্জিঃ কৃষ্ণপুণ্ড্রঃ  
মহাঞ্জি মহদঞ্জি যন্ত, স তথা’ (বেদদীপ)

মহাটিবি (পুং ত্রী) ১ দেশভেদ। (বৃহৎসং ১৪১৩) ২ তদ্বেশ-  
বাসী লোক।

মহাড়, (যহাদ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাবাজেলার অন্তর্গত  
একটি উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৫২ বর্গ মাইল। এখানকার  
অধিকাংশ স্থানই পার্বত্য উপত্যকা ও বস্ত্র বিতাগে পূর্ণ।  
একমাত্র মহাবলেশ্বর গিরি শৃঙ্গের শোভা সাধারণের নয়ন  
আকৃষ্ট করিতে সমর্থ। সাবিট্রী নদী একটি স্রোতস্বিনী  
এখানে প্রবাহিত থাকিয়া, শতক্ষেত্র ও উদ্ভানাদির উৎপাদিকা  
শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর, অক্ষা° ১৮°৬' উঃ এবং  
দ্রাঘি° ৭৩°২২' পূঃ। সাবিট্রী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত।  
এই নগরের ১ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে পালের বিখ্যাত বৌদ্ধ-  
জ্ঞান-মন্দির অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ উহাকে খ্রীষ্ট ১ম  
শতাব্দে নিখিত বলিয়া মনে করেন। পশ্চিমীকপ্রবর  
ডি-ক্যান্স্টে। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থানের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির উল্লেখ  
করিয়া বান। মহারাষ্ট্র-রাজধানী রায়গড়ের নিকটে থাকার  
এই নগরে সকল সময়েই মহারাষ্ট্র-সদ্বারগণের গতিবিধি  
হইত। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মহাড়-নগর দুর্গাদিতে সুরোভিত ও  
ধন জনে পূর্ণ থাকে। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এখানে নানাকড়-  
নবিশ, বাজিরাও ও ইংরাজের যে সন্ধি হয়, তদনুসারে  
বাজিরাও পেশবা পদ এবং নানা তাহার মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া-  
ছিলেন, ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হোলকর কর্তৃক পুণা আক্রান্ত হইলে,  
পেশবা মহাড়ে আসিয়া আশ্রয়লাভ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে  
এই নগর ইংরাজাধিকারে আইসে।

এখানে সমুদ্রোপকূল-বাণিজ্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।  
মণবার, গোয়া, কোঙ্কণ ও বোম্বাই প্রদেশের খাবতীয় পণ্য  
জব্য সমুদ্রপথে আসিয়া সাবিট্রী-মুখে পতিত হয়। আমদানী  
জব্যের কতকাংশ গরিপথ বাহিয়া দক্ষিণ ভারতেও প্রেরিত  
হইয়া থাকে। মহাবলেশ্বরে বাইবার জন্ত এখান দিয়া একটা  
প্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে।

মহাড়কর, জনৈক প্রাচীন টাকাকার।

মহাট্য (পুং) মহান্ আঢ্যঃ শোভাসম্পন্নঃ। ১ কদম্ব।  
(রাজনিঃ) (ত্রি) ২ অতিশয় ধনযুক্ত, ধনী।

“ভক্তঃ প্রভৃতি চৈতন্ত্যং বারাগন্ত্যমুদাসমঃ।

অভ্যর্থিতো মহাট্যস্ত তন্ত্ৰৈব বণিজো গৃহে ॥”

(কথাসরিংসাগর ২৫১১৮)

মহাতত্ত্ব (ক্ৰী) জ্ঞানতত্ত্ব। সাংখ্যোক্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব।

মহাতত্ত্বা (ক্ৰী) দুর্গাদেবীর অমুচরী বিশেষ।

মহাতপঃসপ্তমী, ১ কৃষ্ণসাধ্য সপ্তমী ষাণ্মভেদ। ২ উৎসবভেদ।

মহাতপন (পুং) নরকভেদ।

মহাতপস্ (ত্রি) ১ ঘোর তপস্কারী। ২ বিষ্ণু। ৩ মূনি-  
বিশেষ। ৪ সহ্যাদ্রিবার্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রি° ৩৪২০)

মহাতমঃপ্রভা (ক্ৰী) মহতী তমসাং প্রভা একাশো হস্তাং।  
নরকবিশেষ, এই নরক ঘোর তমসাক্ষর।

‘ধনোদধিধনবাততমূবাতনভঃস্থিতাঃ।

রত্নশর্করাবালুকা পঞ্চমুতমঃপ্রভাঃ।

মহাতমঃপ্রভা বেত্যথোহথো নরকভূময়ঃ ॥’ (হেম)

মহাতমস্ (ক্ৰী) অবিজ্ঞা, অবিজ্ঞা হইতেই তামিস্র, অন্ধতামিস্র,  
মহাতমঃ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

“সোহমুবিষ্টো ভগবতা যঃ শেতে সলিলাশরে।

লোকসংস্থাং যথাপূর্ণং নির্মমে সংস্থায়া স্বয়া ॥

সসঙ্ক ছারয়া বিজ্ঞাং পঞ্চপঞ্চাশমগ্রতঃ।

তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ ॥” (ভাগ ৩২.১১৮)

মহাতরু (পুং) মহাশ্যাদো তরুশ্চেতি। ১ স্নহীবৃক্ষ।  
মহাকবি কালিদাস স্নহীবৃক্ষের এইরূপ বক্তোক্তি প্রয়োগ  
করিয়াছিলেন—“তরবঃ পারিজাতাদ্যাঃ স্নহীবৃক্ষো মহাতরুঃ।”  
২ বৃহদ্রক্ষ, বড়গাছ।

মহাতল (ক্ৰী) মহত তৎ তলশ্চেতি। পাতাল বিশেষ। সপ্তম  
পাতালের মধ্যে পঞ্চম পাতাল।

‘অতলং বিতলশ্চৈব নিতলঞ্চ তলাতলম্।

মহাতলঞ্চ স্ততলং সপ্তমঞ্চ রসাতলম্ ॥’ (শঙ্কমালা)

“পাতালমেতত্ত্ব হি পাদমূলং পঠন্তি পাক্ষি প্রপদে-রসাতলম্।

মহাতলং বিশ্বস্থজোহথ গুল্ফৌ তলাতলং বৈ পুরুষস্ত জজ্বে ॥”

(ভাগবত ২।১২৬) [পাতাল দেখ।]

মহাতপশ্চিত (ক্ৰী) সজ্জভেদ। (কাত্য° ২৪।৫।৬)

মহাতারা (ক্ৰী) তারায়তি সংসারাদিতি তু-গিচ্-অচ্-  
স্ত্রিয়াং টাপ্, ততঃ মহতী চান্দো তারা চেতি কথ্যম্। জৈন-  
দিগের দেবী বিশেষ। পথ্যায়—তারা, মহাত্রী, ওকারা, বাহা,  
ত্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরী,  
আম্বজা, ষড়বাসিনী, ভদ্রা, বৈশ্রা, নীলসরস্বতী, শ্যামিনী,  
বসুধারা, ধনদদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (হেম)

মহাতালী (ক্ৰী) মহান্ অনেকঃ তালঃ যত্র স্ত্রিয়াং ভীষ্।  
আবর্তকীলতা। (রাজনিঃ)

মহাতালিকেশ্বর (পুং) কুষ্ঠাধিকারে ঔষধবিশেষ। ইহার  
প্রস্তুত প্রণালী—যংশপত্র ও হরিতাল চূর্ণ করিয়া কুমড়ার

জলে ও ঘৃতকুমারীর রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। পরে কাঁধি, অন্নদধি ও পুনর্বার রসে তিন দিন মর্দন করিয়া খড়ির জ্বার করিবে। পরে একটা হাঁড়ীর মধ্যে পলাশের ক্ষার পূর্ণ করিয়া ঐ হরিতালকে ক্ষারের মধ্যে রাখিয়া লরা দিয়া হাঁড়ীর মুখ আবৃত ও লিপ্ত করিয়া ৩২ প্রহর পর্যন্ত পাক করিতে হইবে, পশ্চাৎ ঐ হরিতাল একভাগ, শোধিত গন্ধক একভাগ ও শোধিত তাম্র ২ ভাগ একত্র থল করিয়া বালুকায়ত্তে বখানিরমে এই ঔষধ পাক করিবে। চিকিৎসক রোগের অবস্থা এবং শরীরের বলাবল বিবেচনা করিয়া চর্চার অনুপান ও মাত্রা স্থির করিবেন। এই ঔষধ সেবনে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বিসর্প প্রভৃতি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। (ভৈবঙ্গ্যরত্নাং কুষ্ঠচিৎ)

মহাতিক্ত (পুং) মহানতিশয়তীক্ষ্ণস্তিক্তরসো যত্র। ১ মহা-নিষ। চলিত ঘোড়ানিম। ২ অতিশয় তিক্তরসযুক্ত। ৩ ক্রিয়াতিক্তক, চলিত চিরেতা। (বৈদ্যকনিং)

মহাতিক্তকমৃত (ক্লী) কুষ্ঠাধিকারের ঘৃতৌষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—সপ্তপর্ণ, আরণ্য, অতিবিষা, পাঠা, কটুকী, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, পটোল, নিষ, পর্পটক, দুর্লাভা, মুতা, চন্দন, ত্র্যম্বাণা, পদ্মকাঠ, হরিদ্রা, উপকূল্যা, বিশালা, মুর্শী, শতাবরী, শ্রামালতা, ইন্দ্রযব, বাসক, বচ, যষ্টিমধু, ভূনিষ, ও গুটিকা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কক প্রস্তুত করিতে হইবে। এই কল্কের চতুর্গণ ঘৃত, ঘৃতের ত্রিগুণ আমলকীরস ও রসের চতুর্গণ জল একত্র আলোড়ন করিয়া ঘৃত পাকের নিয়মামুসারে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত-সেবনে কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, রক্তপিত্ত, উন্মাদ, অপস্মার, শুষ্ক, পীড়কা, অহৃদর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্রীগদ, পাণুরোগ, বিসর্প প্রভৃতি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। কুষ্ঠরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। (সুশ্রুত চিকিৎসিৎ কুষ্ঠচিৎ ৭২০)

মহাতিক্তা (স্ত্রী) মহতী গুরুতর তিক্তা। ১ যবতিক্তা। (রাজনিং) ২ পাঠা। (শব্দচং)

মহাতিটিভ (পুং) বৌদ্ধ মতে অতীক্ষ্ণ সংখ্যাভেদ।

মহাতিধি (পুং) যজ্ঞীতিগিভেদ। (ভারত বনপর্ব)

মহাতীক্ষ্ণ (ত্রি) ১ অতিশয় তীক্ষ্ণ। জিহ্বাং টাপ্। মহাতীক্ষ্ণা, ভ্রাতৃক বৃক্ষ।

মহাতীর্থ, প্রাচীন তীর্থ বিশেষ। বর্তমান কালে মহেতো নামে পরিচিত। (বৃ-নী-২১)

মহাতুঙ্গী (স্ত্রী) মহালাবু। (বৈদ্যকনিং)

মহাতুষ্টিজ্ঞানযুদ্ধা (স্ত্রী) যুদ্ধাভেদ।

মহাতেজস্ (ক্লী) মহদতিশয়ং তেজোহিত। ১ পাদম।

(পুং) ২ কাটিকের। (ইঙ্গাযুধ) ৩ অগ্নি। (শব্দচং) ৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৮।৫৬) (ত্রি) ৫ অতিশয় তেজস্বী।

“বারোচিষশ্চৌত্তমিচ্চ তামসো রৈবতন্তুখা।

চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎ সূত এব চ ॥” (মহু ১।৩২)

৬ সহাদ্রিখণ্ড বর্ণিত দুই জন রাজা। (সহ্য-৩৩।৬৪, ৩৪।২৪)

মহাতেজোগর্ভ (পুং) তপস্কার প্রকারভেদ।

মহাতৈল (ক্লী) তৈল বিশেষ। তৈল শব্দের উত্তর মহৎ শব্দ যোগে নিকটার্থ জ্ঞাপিত হয়।

মহাতোদ্য (ক্লী) গভীর নিনাদকারী বৃহৎ আনাহবয়।

মহাত্মান্ (ত্রি) মহানাত্মা স্বভাবো যত। ১ উত্তম স্বভাবযুক্ত, পর্যায় মহেচ্ছ, উড়ট, উদার, উদাত্ত, উদীর্ণ, মহাপর, মহামনস্। (হেম) (পুং) ২ পরমাত্মা।

“যুগপত্ত্ব প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্ মহাত্মনি।

তদায়ং সর্বভূতাত্মা স্ত্বং ন পিতি নির্ভূতঃ ॥” (মহু ১।৫৫)

‘তস্মিন্ মহাত্মনি পরমাত্মনি’ (কুল্লুক) ৩ মহত্ত্ব।

“মনঃ পৃথিব্যাং তামত্তিস্তেজসাপোহনিলেন তৎ।

থে বায়ুঃ ধারয়ন্তচ্চ ত্বতানো তৎ মহাত্মনি ॥”

(ভাগবত ৯।৭।২৫)

‘মহাত্মনি মহত্তবে’ (স্বামী) ৪ পিতৃগণবিশেষ।

“মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ ॥” (মার্ক-পুং-৯।৪৬) ৫ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৪)

মহাত্রিফলা (স্ত্রী) পথ্যা, বিভীতক ও ধাত্রী।

“পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী মহতী ত্রিফলা মতা।”

মহাত্যয় (পুং) ঘোর বিপদ। ২ মহানান্দ বা ধ্বংস।

মহাত্যাগ (পুং) ১ বদান্ততা। ২ দান। ৩ সংসারে নিস্পৃহতা।

মহাদশমূলতৈল, শিরোরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈল ১৬ সের। কাথার্থ দশমূল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোঁড়া নেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতুরার রস ১৬ সের, ককার্থ পিপুল, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, তুলসা, পুনর্বা, সজিনাছাল, পিঙ্গলিকা, কটুকী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণ-জীরা, খেতসর্ষপ, বচ, শুট, পিঙ্গল, চিতামূল, শটী, দেব-দারু, বেড়োলা, রাস্না, হড়হড়, কটুফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গেরিমাটি, পিপুলমূল, শুষ্কমূল, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিষ্ণুড়ক মূল প্রত্যেকে ১ পল। এই সকল দ্রব্য তৈলে পাক করিয়া পরে রোগামুসারে তাহার প্রয়োগব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ব্যবহার করিলে কফ, কাশ ও শিরোরোগ প্রভৃতি গীড়ার উপশম হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। (ভৈব-শিরোরোগ) মহাত্রিফলাদ্যমৃত, নেত্ররোগে ব্যবহার্য ঘৃতৌষধ বিশেষ।

প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা বাসক-  
রস ৪ সের অথবা বাসকমূল ২ সের। জল ১৬ সের শেষ  
৪ সের, ভৃঙ্গরাজরস ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের,  
ছাগছত্ৰ ৪ সের, গুলঞ্চ রস ৪ সের অথবা পূর্ববৎ  
উহাদের কাথ ৪ সের লইয়া পুনঃ পুনঃ ঐ সকলের  
সহিত ঝুড়ি পাক করিবে। পরে কঙ্কার্থ—পিপুল, চিনি,  
ড্রাক্সা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকলা, গাছারী-  
ছাল, ও কণ্টকারী এই সমুদারে মিলিত ১ সের। ইহা সেবন  
করিলে অদৃষ্টি, মন্দদৃষ্টি প্রভৃতি যাবতীর নেত্ররোগ ভাল হয়।

মহাত্যাগময় (ত্রি) বৈরাগ্যযুক্ত। সর্বত্যাগী।

মহাত্যাগিন্ (ত্রি) ১ ত্যাগীশীল। যিনি জগৎ সংসারের  
মায়া মমতাাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ২ শিব।

মহাত্রিককুদ্ (পুং) স্তোমভেদ। (শাংখ্যারনশ্রোঃ ১৬২৯১৫)  
আখ্যায়ন শ্রোতস্থিত 'মহাত্রিককুত' পাঠ লিখিত আছে।

মহাত্রিপুরস্বন্দরীকৃষচ (ক্ৰী) মস্তযুক্ত ধারণী বিশেষ।

মহাত্রিশূল (ক্ৰী) ত্রিশূলবিশেষ। (রাজতরং ২১১৩৩)

মহাদংষ্ট্র (ত্রি) ১ বৃহৎ দন্তযুক্ত। (পুং) ২ রাক্ষসভেদ। ৩ বিদ্যাধর।

মহাদণ্ড (পুং) মহান্ দণ্ডস্তাডিনসাধনমস্ত। ১ বমদূতভেদ।  
(বৃহৎসংখ্যং ৫৬ অঃ) মহান্ দণ্ডঃ। ২ বৃহদণ্ড।

“যস্মাজ্জাননু স মন্দাস্তা মামসৌ নোপসপতি।

তস্মাত্তস্মৈ মহাদণ্ডো ধার্যঃ স্তাদিতি মে মতিঃ ॥”

(ভারত ৫।১২৪।৩৭)

মহাদন্ত (পুং) মহাংস্তাসৌ দন্তশ্চেতি। ১ গজদন্ত, পর্যায়  
ঈশদণ্ড। (ত্রিকাঃ) ২ বৃহদণ্ডমাত্র। ৩ মহাদেব।

“মহাদণ্ডো মহাদংষ্ট্রো মহাজিহ্বো মহাস্থঃ।” (ভা ১৩।১৭।৮৭)

মহাদাড়িষাদ্যমৃত, প্রমেহরোগনাশক ঘৃতৌষধভেদ।

প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ দাড়িষ বীজ ২ সের,  
জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। যবতণ্ডুল ২ সের, জল ১৬ সের  
শেষ ৪ সের। কুলথকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ  
৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের, গব্য হৃৎ ৪ সের। কঙ্কার্থ  
ড্রাক্সা, পিণ্ডথর্জুর, ত্রিফলা, রেণুক, জীবক, ঋষভক,  
কাকলা, ক্ষীরকাকলা, মেদ, মহামেদ, ঋজি, বৃজি, দেব-  
দারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাইচ, ভূমি-  
কুম্মাণ্ড, বেড়েলা, শিলাভূত, গুড়ভূক, বেণার মূল ও  
কুম্মাত্র, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তোলা। ঘৃত  
পাকের ত্রিষমাংশারে এই ঘৃতও পাক করিতে হইবে। রোগের  
ভারতম্যাংশারে ইহা অম্মাধিক মাত্রায় সেবনীয়। ইহা পান  
করিলে যাবতীর স্নেহজ ও স্নিগ্ধপাতক বিংশতি প্রকার প্রমেহ  
রোগ বিদূরিত হয়। (ঔষধ্যং প্রমেহাধিকাঃ)

মহাদন্তা (ক্ৰী) নাগবলা। (রাজনিঃ)

মহাদান (ক্ৰী) মহচ্চ তৎদানঞ্চৈতি কথ্যং। তুলাপুরুষাদি  
ষোড়শ দান। হেমাতির দানখণ্ডে এই মহাদানের বিবৃতি  
বিবরণ লিখিত আছে। এই ষোড়শ দান যথা—

“আত্মস্ব সর্বদানানাং তুলাপুরুষসংজ্ঞিতম্।

হিরণ্যগর্ভদানঞ্চ ত্র্যক্ষাণ্ডঃ তদনন্তরম্।

কল্পপাদপদানঞ্চ গোগহস্তদানঞ্চ পঞ্চমম্।

হিরণ্যকামধেয়শ্চ হিরণ্যাস্থতথৈব চ ॥

পঞ্চলাঙ্গলকং তদ্বন্ধরাদানস্তথৈব চ।

হিরণ্যাস্থতথৈব চ হেমহস্তিরথ ॥

দ্বাদশং বিষ্ণুচক্রঞ্চ ততঃ কল্পলতাশ্রকম্।

সপ্তসাগরদানঞ্চ রত্নধেমুস্তথৈব চ।

মহাতুতঘটস্তথং ষোড়শং পরিকীর্তিতঃ ॥”

(মলমাসতত্ত্বম্ মন্ত্রপুঃ)

ষোড়শ মহাদানের মধ্যে তুলাপুরুষ দান প্রথম, ২ হিরণ্য-  
গর্ভ, ৩ ত্র্যক্ষাণ্ডদান, ৪ কল্পপাদপদান, ৫ গোগহস্তদান, ৬ হিরণ্য  
কামধেয়, ৭ হিরণ্যাস্থ, ৮ পঞ্চলাঙ্গলক, ৯ ধরাদান, ১০ হির-  
ণ্যাস্থতথ, ১১ হেমহস্তিরথ, ১২ বিষ্ণুচক্র, ১৩ কল্পলতা, ১৪  
সপ্তসাগরদান, ১৫ রত্নধেমু, ও ১৬ মহাতুতঘটদান এই ষোড়শ  
প্রকার দানই মহাদান।

ইহার এক একটি দানই মহাদান, যিনি এই ষোড়শ  
প্রকার মহাদান করিতে সমর্থ, তাঁহার অনন্ত স্বর্গ লাভ হয়।

[এই সকল দানের বিশেষ বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য]

কুর্খপুরাণ মতে মহাদান দশ প্রকার।

“কনকাস্তিলা গাবো দাসীরথমহীগৃহাঃ।

কস্তা চ কপিলা ধেমুর্মহাদানানি বৈ দশ ॥”

(মলমাসতত্ত্বম্ কুর্খপুঃ)

১ কনকাস্থ, ২ তিল, ৩ গো, ৪ দাসী, ৫ রথ, ৬ মহী,  
৭ গৃহ, ৮ কস্তা, ও ৯ কপিলা ধেমু এই দশদানও মহাদান।

মহাদানপুর, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর জিটীনপল্লী জেলার  
অন্তর্গত একটি নগর। এখানে জৈন ও শৈবকীর্তির প্রভূত  
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মহাদারু (ক্ৰী) মহৎ দারু বস্ত। ১ দেবদারু। (জটায়রঃ)  
মহৎ দারু। ২ বৃহৎকাষ্ঠ।

মহাদিকটভী (ক্ৰী) শ্বেতকিণিহী লতা।

মহাদিবাকীর্ত্য (ক্ৰী) সামভেদ।

মহাদিত্য, মোঘরিংবংশের জনৈক রাজা।

মহাহিন্দু (পুং) রণবাত্ত বিশেষ। মহাশব্দ পাঠঃ  
দেখা যায়।

মহাভূগ (ক্লী) ১ মহাবিপদ্। ২ বাহা অতিকষ্টেও অতিক্রম করা যায় না।

মহাভূগালোক, দেবলোক বিশেষ। (মহাভাগবত)

মহাদূত (ক্লী) যমদূত।

মহাদূষক (পুং) শালিধাতু বিশেষ। (সুশ্রুত)

মহাদৃতি (পুং) চন্দ্রনির্মিত খলি বিশেষ (ব্যাগ)। “মহাদৃতি-রিবান্নাতঃ পাপো ভবতি নিত্যদা।” (ভারত বনপর্ব)

মহাদেব (পুং) মহাশ্যামসৌ দেবশ্চেতি কথ্যং অথবা মহতাঃ দেবাদীনাং দেবঃ ৩তং। শিব। ইহা অষ্ট মূর্তির অন্তর্গত সোমমূর্তি। যথা—“মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ।”

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মহামায়া ব্রহ্মবাদী মুনিগণেরও যিনি দেব, তাঁহারই নাম মহাদেব। মহতী মূলপ্রকৃতি দেবী জগতে পূজিত হইয়া থাকেন, কিন্তু ইনি তাঁহা অপেক্ষাও পূজনীয়, তাই ইনি মহাদেব বলিয়া খ্যাত।

“ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাং

তেষাঞ্চ মহতাঃ দেবো মহাদেবঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।

মহতী পূজিতা বিধে মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।

তত্ত্বা দেবঃ পূজিতশ্চ মহাদেবঃ স চ স্মৃতঃ ॥”

মহাদেব পঞ্চবক্তৃ। ইহার পঞ্চবক্তৃ হইবার কারণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে এইরূপ জানিতে পারি,—পূর্বে বিষ্ণু অতি চমৎকার কিশোররূপধারণ করেন। ব্রহ্মা অনন্ত প্রভৃতি অনেক বক্তৃগুরু দেবগণ সেই চমৎকার রূপ বহু নেত্রে সাধ মিটাইয়া দেখেন, আর তাঁহার স্তব করেন; কিন্তু একবক্তৃ বিনেত্র মহাদেব তাহা হইলনয়নে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন না, তখন তাঁহার মনে বহুনেত্র ও বক্তৃ লাভের বাসনা হইল, বাসনার উদয় মাত্রেই তাহা সিদ্ধ হইল। তাঁহার আর চারি খানি মুখ ও প্রত্যেক মুখে তিন তিনটি করিয়া নয়ন উন্মীলিত হইল। সর্বসমেত তখন তাঁহার পাঁচ খানি মুখ ও এক এক মুখে তিনটি করিয়া নেত্র লইয়া সমুদায় মুখমণ্ডলে পঞ্চদশটি নেত্র সমুদ্ভাসিত হইল এবং এই সময় হইতেই তাঁহার পঞ্চবক্তৃ ও ত্রিলোচনাদি নাম ভক্তকণ্ঠে গীত হইয়াছিল।

মহাদেব পরব্রহ্মস্বরূপ। তাঁহার সেই তিন নয়ন সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ে ভাসমান। তিনি স্বর্গাশ্রময় নেত্রপাতে সাত্বিকদিগের, রাজসে রাজসদিগের এবং তামসে তামসদিগের পালন করিয়া থাকেন। পরে এই বিশ্ব ব্রহ্মাও প্রলয়ের সময় তাঁহারই ললাটফলকস্থ তৃতীয় তামস নয়ন হইতে ক্রোধাগ্নি সন্নিপিত হইয়া সমগ্র বিশ্বসংসার দগ্ধ করে।

মহাদেব সতীর সংকার-ভঙ্গ গায় করেন, প্রেমবশে

তাঁহার অস্থিমালা গলায় পরেন। তিনি আত্মারাম হইয়া ও সম্পূর্ণ বৎসর পর্য্যন্ত সতীর শব্দেই লইয়া কাদিতে কাদিতে পাগলের ছায়া সকল স্থানে ঘুরিয়া ছিলেন। সেই অবধিই তাঁহার অঙ্গ বিভূতিভূষিত হইতে থাকে। মহাদেব সদাই যোগমগ্ন, তাই তিনি দিগন্তর, মাথায় তাঁহার জটা, গিরিকুন্দের তাঁহার প্রিয়; চন্দন, পঙ্ক, লোহু ও কাঞ্চনে তাঁহার সমজ্ঞান। এক দিন গরুড়ভীত কয়েকটি সর্প আসিয়া তাঁহার শরণ লয়, মহাদেব তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া আপন অঙ্গে আশ্রয় দেন। তাহ তিনি নাগালঙ্কারে অলঙ্কৃত। সেই বিশ্বসংসারের আধার ভগবান্ ভূতভাবনকে বহন করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই, তাই স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহার বাহনরূপে বৃষভ হইয়া অবস্থিত। তিনি ভোগসুখ সকলে নিবৃত্ত হইয়া পরম স্নেহময়মনে শ্মশানে বাস করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত) [শিবদেখ।]

মহাদেব, ১ অমৃতদর্পণনামক নাটকপ্রণেতা। ২ বৃহ-মনোহরানামক ‘মুক্তবোধটীকা’-রচয়িতা। ইনি স্বয়ংপ্রকাশ তার্কের নিকট বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ৩ অব্যয়কোষ নামক ব্যাকরণাভিধান-প্রণেতা। উক্ত গ্রন্থে তিনি সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ও তত্ত্ববোধিনীর মতানুসরণ করিয়াছেন। ৪ আশ্ব-লায়নশ্রোতহৃতব্যাক্ষ্য-রচয়িতা। ৫ মল্লমল্লকৃত উদার-রাঘব গ্রন্থের টীকাকার। ৬ কাদম্বরীটীকাপ্রণেতা। ৭ চন্দ্রা-লোক নামে অলঙ্কার ও রসোদধি নামে রসতরঙ্গিনী-টীকা-রচয়িতা। ৮ তিথিনির্ণয়, তিথিরত্ন ও নির্ণয়সিদ্ধান্ত নামে তিন খানি গ্রন্থপ্রণেতা। ৯ ধর্ম্মতত্ত্বসংগ্রহরচয়িতা। ১০ নিবন্ধসর্গস্বপ্রণেতা। ১১ মহারসায়নবিধিনামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা। ১২ যজ্ঞমানবৈজয়ন্তীপ্রণেতা। ১৩ যোগ-সুত্রটীকা ও হঠযোগপ্রদীপিকা-টীকা প্রণয়নকর্তা। ১৪ রাজ-সিংহ-সুধাসিদ্ধ নামক কাব্যরচয়িতা। গ্রন্থকার স্বীয় প্রতি-পালক রাজসিংহের নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করেন। ১৫ সম্ভানদীপিকা নামক জ্যোতিঃশাস্ত্ররচয়িতা। ১৬ সুবো-ধিনী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ১৭ স্বাশ্বপ্রবোধরচয়িতা। ১৮ হোরাপ্রদীপ-রচয়িতা। ১৯ জনৈক জ্যোতির্বিদ। কাছ-জিতের পুত্র। ইনি কুঞ্জপ্রদীপ, মহাদেবী, মুহূর্তপ্রদীপ, মুহূর্তসিদ্ধি, মেঘমালা ও সারসংগ্রহ নামে কয়খানি জ্যোতি-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বরচিত মুহূর্ত-প্রদীপের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ২০ ধ্রুবকের পুত্র, ইনি দূর্গসিংহকৃত কাতন্ত্র্যবৃত্তির শব্দসিদ্ধি নামক একখানি টিপ্পনী করেন। ২১ নারায়ণের পুত্র। ইনি কাশ্যোষ্টিপ্রয়োগ-হিরণ্যক নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ২২ লুণিগের পুত্র। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি শ্রীপতিকৃত জ্যোতিষরত্নমালায় একখানি

টাকা প্রণয়ন করেন। ২৩ সোমনাথের পুত্র। ইনি উজ্জল হিরণ্যকেশিস্থটীকা, প্রয়োগবৈজয়ন্তী নামে হিরণ্যকেশি-কল্পস্থটীকা, শ্রোতচন্দ্রিকা ও হিরণ্যকেশিস্থপ্রয়োগরত্ন নামে কএকখানি টাকা প্রণয়ন করেন। ইনি সোমনাথী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

মহাদেব, ওরঙ্গাবাদের কাকতীয়া বংশীয় জনৈক রাজা। গণ-পতিস্বপিতা।

মহাদেব, বেড়ভেলে ও পলিগারের জনৈক মণ্ডনায়ক (শাসন-কর্তা) ইনি পশ্চিম চালুক্যরাজ ৩য় সোমেশ্বরের সামন্ত ছিলেন।

মহাদেব, আসাম প্রদেশের গারো পার্বত্য জেলার দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত একটি নদী। নদীপথে কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে।

মহাদেব উগ্রসার্বভৌম, দেবগিরির যাদববংশীয় জনৈক রাজা (১২৬০-৭২ খৃঃ)। জৈত্রপালের পুত্র। তিনি স্বীয় ভ্রাতা কৃষ্ণের পর দেবগিরির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। শিলা-লিপি পাঠে জানা যায় যে, তিনি কোঙ্কণরাজ সোমেশ্বরকে পরাভূত করিয়া কোঙ্কণরাজ্য জয় করেন। এতদ্বিধি তিনি কর্ণাটরাজ ও গুজরপতি বীশলদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তৈলিঙ্গের কাকতীয়াবংশীয়া বীরনারী মহারানী রুদ্রমা তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন।

চতুর্দশচিন্তামণি-প্রণেতা হেমাদ্রি তাঁহার শ্রীকরণাধিপ ও মন্ত্রণাধাতা ছিলেন।

মহাদেব কবীশাচায়াসরস্বতী, দানকলিকৌমুদীরচয়িতা।

মহাদেব কোলি, সহাদ্রির উপত্যকাবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতি-বিশেষ। পুণা হইতে থুসা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মাঝি, খোড়া, নাহির, দল প্রভৃতি উপত্যকায় ইহাদের বাস দেখা যায়। ইহারা সর্ব সময়ে ২৪টা থাকে বিভক্ত। প্রত্যেক থাকের মধ্যে আবার স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ আছে। আপনাপন থাকের মধ্যে ইহারা আদান প্রদান করে না। গ্রাম্য ও পালিত গো ও শূকর ব্যতীত ইহারা অত্যাশ্রয় জন্তর মাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইহারা দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, ইহাদের রমণী-গণ কখন দ্বিচারিণী হয় না। তাহারা বড় অলঙ্কারপ্রিয়।

মহাদেব জোনী, অগ্নেবাশান্তিবিধান-রচয়িতা।

মহাদেবতীর্থ, জনৈক যোগী। শ্রীকর্তৃত্বের গুরু।

মহাদেব দ্বিবেদিন্, জনৈক বিখ্যাত টীকাকর্তা। ইনি কাত্যায়ন-শ্রোতস্থত্রের টীকা, শ্রোতপদ্ধতি, বাজিকদেবকৃত কাত্যায়নশ্রোতস্থত্রপদ্ধতির টীকা এবং ত্রিকণ্ডিকাশ্রুতি-বিবরণ নামে কয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মহাদেব দীক্ষিত, বোধায়নসোমপ্রয়োগপ্রণেতা।

মহাদেবদৈবজ্ঞ, গোত্রনির্ণয়রচয়িতা।

মহাদেব পণ্ডিত, ১ হরিবংশোক্তোত্তরচয়িতা। ২ হিক্-মংপ্রকাশ ও হিক্‌মংপ্রদীপ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ৩ রস-পদ্ধতি নামী বৈদ্যকগ্রন্থের টীকা-রচয়িতা।

মহাদেব পাহাড়, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি গিরিশ্রেণী। সাতপুরা গিরিমালার মূল্যংশ হইতে বিভিন্ন হইয়া উহা স্বতন্ত্র নামে পরিচিত হইয়াছে। পূর্ণতরু ও শোভদ্রা নামক নদীদ্বয় এই পর্বতটিকে বেষ্টিত করিয়া আছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিতান্ত মন্দ নহে। পাঁচমড়ীর বাহ্যাবাস প্রায় হাজার ফিট উচ্চ একটি শৃঙ্খল-পরি স্থাপিত। এখানকার বেলেপাথরের চাপড়া স্থানে স্থানে ২ হাজার ফিটের অধিক বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাদেব পুণ্যাস্তম্ভকর, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক, যুক্তম্বের পুত্র ও শ্রীকর্তা দীক্ষিতের শিষ্য, তিনি ত্রায়কোত্তম নামে চিন্তামণির প্রত্যক্ষপুত্রের একখানি বিবৃতি প্রণয়ন করেন। এতদ্বিধি ভবানন্দীপ্রকাশ, সর্বোপকারিণী ভবানন্দী টীকা, লোগাক্ষী ভাস্কর কৃত পদার্থপ্রকাশের পদার্থপ্রকাশভাষ্য ও মিতভাষিণী নামী ত্রায়বৃত্তি রচনা করেন।

মহাদেবমণি (পুং) মহামেধা। (বৈদ্যকনিঃ)

মহাদেব পোখরা, নেপালস্থ একটি গিরিশৃঙ্গ।

মহাদেবভট্ট দিনকর, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক, বাল-কৃষ্ণের পুত্র ও নীলকণ্ঠের শিষ্য, ইনি স্বীয় পিতার সহযোগে ত্রায়সিদ্ধান্তমূল্যবলিপ্রকাশ বা দিনকরী (টীকা) প্রণয়ন করেন।

মহাদেব ভট্ট পট্টবর্দ্ধন, কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়োক্ত জনৈক কবি।

মহাদেব-মঙ্গলম্, উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। পোলুর তালুক সদর হইতে ৩০ ক্রোশ পূর্বে স্থিত। এখানে পাণ্ডা ও চোল-রাজগণের নিৰ্ম্মিত কএকটি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে।

২ উক্ত তালুকের ৪৮ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটি গওগ্রাম।

মহাদেবরস, বনবাসিরাজ বিজ্ঞানের অধীনস্থ জনৈক সামন্ত।

মহাদেব বাজপেয়িন্, সুবোধিনী নামী বোধায়ন-কল্পস্থ-ভাষ্যপ্রণেতা। ইনি ভবশাস্ত্রীর মতাম্বলয়ণ করিয়া উক্ত গ্রন্থ সম্বলন করেন। ত্র্যম্বকাম্বর-যজ্ঞে ইনি অধ্বর্যু ছিলেন।

মহাদেব বাদীন্দ্র, রসসারগুণকিরণাবলী-টীকা-রচয়িতা। শব্দের দ্বন্দ্ব

মহাবেদবিদ, পিরণারের (রৈবতচল) জনৈক হিন্দু নর-  
পতি। কালজিভের পুত্র। ইনি কালনিগমসিদ্ধান্তপ্রণেতা  
রঘুরামের প্রতিপালক ছিলেন।

মহাদেব বিদ্যাবাগীশ, আনন্দলহরীটীকা ও নৈষধচরিত-  
টীকা-প্রণেতা।

মহাদেব বেদান্তবাগীশ, বিপরীতপ্রত্যঙ্গিস্তোত্রপ্রণেতা।

মহাদেব বেদান্তিনু, নিজবিনোদ নামক টীকা রচয়িতা।

মহাদেবশশ্মনু, অদ্বুতসারপ্রণেতা।

মহাদেব শাস্ত্রী, ১ উন্নতরাধব নাটক-রচয়িতা। ২ তৎ-  
মানস-স্তোত্র-প্রণেতা।

মহাদেব সরস্বতী বেদান্তিনু, স্বরস্রকাশানন্দ সরস্বতীর  
শিষ্য। ইনি তত্ত্বচক্রিকা, তত্ত্বমুদ্রাকান ও তট্টীকা, সাংখ্য-  
স্বত্ববৃত্তি, সাংখ্যপ্রবচনবৃত্তিসার এবং ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণু-  
সহস্রনামটীকা প্রণয়ন করেন।

মহাদেব সর্বস্বজ্ঞ বাদীন্দ্র, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত।  
ভায়সারবিচারপ্রণেতা রাধব-ভট্টের গুরু। ইনি সম্ভবতঃ  
১২৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

মহাদেব হারিবংশ, বৃহজ্জাতকপ্রকাশরচয়িতা। ইনি ১৫২১  
খৃষ্টাব্দে রাজা রামভদ্রের সভায় বিদ্যমান থাকিয়া উক্ত গ্রন্থ  
সমাপন করেন।

মহাদেবানন্দ, অষ্টমতচিন্তাকৌস্তভ-প্রণেতা।

মহাদেবাপ্রম, ১ জনৈক যোগী। তর্কদীপিকা-প্রণেতা  
বিষ্ণনাথপ্রমের গুরু।

২ সাংখ্যকারিকাবৃত্তিপ্রণেতা।

মহাদেবী (স্ত্রী) মহাদেবস্ত পত্নীতি, পত্নার্থে ভীষ্ম যদা  
মহতী চাসৌ চেতি। দুর্গা।

‘অপর্ণা স্ত্রামহাদেবী গিরিজা মেমকাশ্রজা।’ (হলায়ুধ)

ইহার নামের ব্যুৎপত্তি—

“পূজ্যতে বা স্ত্রৈঃ সর্বেষাং হাংশৈশ্চ প্রশংসিতঃ।

খাতুর্মহতি পূজ্যারঃ মহাদেবী ততঃ স্তূতাঃ ॥” (দেবীপু.)

মহাভারত অর্থ পূজা, সকল দেবগণ ইহাকে পূজা করেন  
বলিয়া ইনি মহাদেবী নামে খ্যাত।

মহাদেবীজ (স্ত্রী) রাজার পাটমহিষীর কর্ণ বা ভাব।

মহাদেবীয় (ত্রি) মহাদেব সম্পর্কীয়, মহাদেবরচিত।

মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী, পরমামৃতরচয়িতা, ইনি প্রজ্ঞা-  
নেত্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাদৈত্য (পুং) মহাংশাসো দৈত্যশ্চেতি। ১ ভোতা  
বসন্তের দৈত্য বিশেষ। (গুরুড়পু. ৭৮ অ.)

২ ষষ্ঠীয় চন্দ্রশেখর পিতামহ জনৈক রাজা।

মহাদৈর্ঘ্যতমস (স্ত্রী) সামভেদ।

মহাদ্রুত (ত্রি) অত্যদ্রুত। (ভারত ১ পর্ব)

মহাদ্রুতি (ত্রি) ১ উচ্ছল আলোক। ২ চন্দ্রমণ্ডলাদির দ্বারা  
অত্যচ্ছল জ্যোতিঃপ্রকাশ।

মহাদ্রোত (স্ত্রী) তদ্ব্যাক্ত দেবীবিশেষ।

মহাদ্রাবক (পুং) দ্রাবয়ী রোগানিতি জ-গিচ্-খুল, মহাংশ-  
শাসো দ্রাবকশ্চেতি। ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বাসক,  
চিতামূল, অপাদ, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তাল-  
জটা, পুনর্নবা ও বেতবৃক্ষ, এই সকলের ভস্ম পাতিলেবুর রসে  
মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে, পরে ঐ দ্রব্য দ্রব্য প্রচণ্ড  
রোড়ে শুকাইবে, তদনন্তর এই শুক দ্রব্য ২ পল, যবকার  
২ পল, ফটুকিরি ১ পল, নিসাদল ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা,  
সোহাগা ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশ ১ তোলা,  
সৈঁকো ২ তোলা, সমুদ্রফেনা ১ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র  
চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চৌয়াইয়া আরক প্রস্তুত করিতে হইবে।  
ইহার নাম মহাদ্রাবক, ইহা দ্বারা ক্রুশাদির জারণ হয়। এই  
আরক ৪ বা ৫ কোঁটা জলে মিশ্রাইয়া সেবন করিলে বকুৎ,  
গ্রীহা ও গুল্মাদি নানারোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

অন্তবিধ—শুক স্বর্ণমাক্ষিক, কাংশুমাক্ষিক, সৈন্ধব, রসা-  
ঞ্জন, সমুদ্রফেন, সাজিমাটী, ও সম্ভলকার এই সকল দ্রব্য  
প্রত্যেকে ১ তোলা, সোহাগা ৭ তোলা, নিসাদল ও ফটুকিরী  
প্রত্যেকে ৩০ তোলা, যবকার ১৪ তোলা, কালীষ, পুষ্প-  
কাশীষ, ধাতুকাশীষ, মিলিত ১৪ তোলা (ইহার অভাবে হীরাক-  
স ১৪ তোলা) এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে  
চৌয়াইয়া লইলে মহাদ্রাবক হয়। ইহা গ্রীহা ও বকুৎরোগে  
বিশেষ উপকারী। (রত্নমালাসংগ্রহ)

মহাদ্রাবক রস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—  
যবকার ২ ভাগ, ফটুকিরি ৩ ভাগ এই উভয় দ্রব্য শিশু গো-  
বৎসের মূত্রে পেষণ করিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে কোন  
সীসকনির্মিত স্থালীতে কুড়িত বস্ত্র ও মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া  
তন্মধ্যে উহা স্থাপন করিবে এবং ঐরূপ আর একটি সীসার  
হাঁড়ির উপর অধোমুখে বসাইয়া উভয়ের মুখে লেপ দিতে  
হইবে, নিম্নস্থিত হাড়ীর তলার একটি ছিদ্র থাকিবে এবং  
ঐ স্থালীযুগ্ম একটি গর্তের উপর রাখিয়া দিবে। গর্তের  
মধ্যে আর একটি পাজ রাখিবে। এইরূপে সমুদ্রার স্থাপন  
করিয়া উপরিভাগে অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে। অগ্নিসত্তাপে  
স্থালীর অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য দ্রবীভূত হইয়া তাহার রস গর্তস্থিত  
পাজে চূঁয়াইয়া পড়িবে। অনন্তর ঐ রস গ্রহণ করিয়া লবঙ্গ-  
চূর্ণ বা আরিত তাম্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ



বটি করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রীহা ও যকৃৎ দ্রবীভূত হইয়া যায়। প্রীহা ও যকৃৎরোগে ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্বিত্র ও দৃঢ় প্রভৃতি রোগে ইহার স্থানিক প্রয়োগও করা যায়। কিন্তু ইহাতে অগ্নির জ্বালা জ্বালা উপস্থিত হয়, অতএব ঐ সকল রোগে প্রলেপ দিতে হইলে দধির সহিত একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দেওয়া উচিত।

**অস্ত্রবিধ**—স্বর্ণমাসিক, কাঁদা, সৈন্ধব লবণ, রসাজন, সমুদ্রফেন, যবক্ষার, সোহাগা, সাতিকার, সাস্তলক্ষার, ধাতুকালীষ, পদ্মকালীষ, ও কালীষ (হারাকস) এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া কুণ্ডিত বস্ত্র ও মুক্তিকা দ্বারা লিপ্ত কাচনিম্বিত পাতে রাখিয়া বকবয়ে ক্রমশঃ অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিয়া যথাবিধানে পাক করিয়া উহাদের রস চুঁয়াইয়া লইবে। ইহার নাম মহাদ্রাবক। ইহা স্বল্প, মধ্য ও মহৎ ভেদে তিন প্রকার। ফটুকিরি, সোহাগা, যবক্ষার ও হীরাকস, এই চারি দ্রব্যের সমভাগে চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যে আরক প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে স্বল্প দ্রাবক, এইরূপ সোহাগা, নিশাদল, ফটুকিরি, যবক্ষার, কাতুকালীষ, পদ্মকালীষ, ও কালীষ, এই সপ্তদ্রব্যের আরককে মধ্যম দ্রাবক, আর স্বর্ণমাসিক প্রভৃতি পুরোক্ত দ্রব্যের আরকের নাম মহাদ্রাবক। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে সুবিক্ত চিকিৎসকের নিকট শিক্ষা করা আবশ্যিক। এই মহাদ্রাবক শুট বা লবঙ্গ চূর্ণের সহিত ৭ বা ৮ ফোঁটা করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি ও যকৃৎ প্রীহাদি নানারোগের শাস্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং)

**মহাক্রম** (পুং) মহাংসানো ক্রমশ্চেতি। ১ অশ্বখবৃক্ষ। (শব্দচং) ২ বৃহৎ, বড়গাছ। ৩ শাকদ্বীপপতি ভব্যের সপ্তম পুত্র।

(মার্কণ্ডেয়পুং ৫৩২১)

৪ তালবৃক্ষ। ৫ মধুক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনিং) ৬ বর্ষভেদ।

(লিঙ্গপুং ৪৬২২)

**মহাদ্রোণা**, (স্ত্রী) মহতী চান্দো দ্রোণা চেতি। ১ দ্রোণপুষ্ণী। ২ শিব। ৩ মেরুপর্বত।

**মহাধিপতি** (পুং) তত্ত্বোক্ত দেবতাবিশেষ।

**মহাধী** (ত্রি) ১ মহাজ্ঞানী। ২ বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন।

**মহাধীর**, সহ্যাদ্রিধীর রাজধর। (সহ্যাদ্রি ৩১২১, ৩১৭৬)

**মহাধ্বতি** (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।১৩।১৬)

**মহাধ্বনি** (পুং) ১ দানবভেদ। (হরিবংশ) (স্ত্রী) ২ অত্যুচ্চ শব্দ।

**মহাধ্বনিক** (পুং) অধ্বনি গচ্ছতীতি অধ্বন-ঠক্; মহাংসানো অধ্বনিকশ্চেতি। পুণ্যার্থ হিমালয়াবধি মহাপথ গমন দ্বারা সম্পাদিত মৃত্যু। যিনি পুণ্য কাণ্ডের জন্ত হিমালয় পথান্ত মহাপথ গমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাকে মহা-

ধ্বনিক কহে। “ভূগয়িজলসংগ্রামদেশান্তরস্থসংগ্রাসানশনাশনিমহাধ্বনিকানামদকক্রিয়া কাণ্ডা সপ্তঃশৌচং ভবতীতি” (শুদ্ধিতত্ত্ব) ইহাদের মৃত্যু হইলে উদকক্রিয়া এবং সপ্তঃশৌচ হইবে।

**মহাধ্বর** (পুং) শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

**মহানক** (পুং) আনন্দধ্বনিবিশেষ। (ভারত ৭ পর্ব)

**মহানদ** (ত্রি) ১ দীর্ঘনদ। ২ শিব। (ভারত ১৩ পর্ব)

**মহানগর** (স্ত্রী) ১ সাধারণ নগর অপেক্ষা বৃহৎ নগর। ২ নগরভেদ। (পাং ৬২।৮২)

**মহানগ্ন** (পুং) ১ সর্বতোভাবে উলঙ্গ। ২ অনাচ্ছাদিত। ৩ প্রণয়ী। ৪ উপপতি। ৫ উচ্চপদস্থ রাজকর্ণচারিভেদ। স্ত্রিয়াং ভীষ্ম মহানগ্নী—গৃহকর্ত্তী।

**মহানট** (পুং) মহাংসানো নটঃ নর্তকশ্চেতি, উক্তনর্তক-দ্বাদস্য তথাত্মক। শিব। (ত্রিকাং)

**মহামদ** (পুং) ১ নদবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫৭।২১)

১ ভীর্থভেদ। (বৃহদ্রীলং ২।১২৩)

**মহানদী** (স্ত্রী) মহতী চান্দো নদী চেতি। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের অন্তর্গত কটকের উত্তরাংশে প্রবাহিত নদীবিশেষ। ইহার নামান্তর চিত্রোৎপলা হইলেও কটক জেলায় চিত্রোৎপলা নামে একটা স্তম্ভ নদীও আছে। এই মহানদী বিষ্ণুপর্বত হইতে নিৰ্গত হইয়াছে, ইহাতে স্নান করিলে সকল পাতক ধ্বংস হয়।

“নদী তত্র মহাপুণ্য বিষ্ণুপাদনিৰ্গতা।

চিত্রোৎপলেতি বিখ্যাতা সৰ্বপাপহরা শুভা॥” (পুরুষোত্তমতত্ত্ব) ২ গঙ্গা।

“অধ্বজমধুনি জাতং জাহ্ন ন জায়তে অধ্বজাদম্।

মুরহর তব বিপরীতং পাদাধ্বজামহানদী জাতা॥” (উট্ট)

**মহানদী**, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার সামন্তরাজ্য দিয়া প্রবাহিত একটা নদী। রায়পুর জেলার অক্ষাং ২০°১০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° পূঃ হইতে উদ্ভূত হইয়া ৫২০ মাইল পথ অতিবাহনপূর্বক বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

রায়গড়ের ২৫ মাইল দক্ষিণে ছত্রিশগড়ের পার্শ্বত্যা অধিত্যকা ভূমি ভেদ করিয়া শিহোয়া গ্রামের সন্নিকটে ইহা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করিয়াছে। শিবনারায়ণ গ্রামের নিকট আসিয়া শিবনাদ, জোন্ধ ও তাসছ নামক শাখানদীগুলি ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। অতঃপর মলহার নগর অতিক্রম করিয়া মান্দ ও কেলুনদীগুলি ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। পদ্মপুরের নিকট পর্বতমালায় প্রতিহত হওয়ার ইহার জল-স্রোত ভীমবেগ ধারণ করিয়াছে। এখানে নৌকাযোগে গমনা-

পমন করা হুঃসাধ্য। ইবা নামক জলধারার সংশ্বে ইহার গতি বিগুণিত হওয়ার, ইহা পাকিস্তানপ্রদেশ অতিক্রমপূর্বক সবেলপুরের দক্ষিণে শোণপুরের নিকট তেল নামক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

অতঃপর মহানদী বক্রগতিতে পাকিস্তানপ্রদেশ উল্লেখ্যনপূর্বক ঢোলপুর হইয়া উড়িষ্যার সামান্তরাজ্যসমূহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে দীর্ঘ ও উচ্চ প্রপাতনিবন্ধন জলের গতি এতাদৃশ বেগবান হইয়াছে যে, নৌকাযোগে তদুপরি যাতায়াত একরূপ অসম্ভব। পার্শ্ববর্তী উন্নতশিরঃ পর্বতশৃঙ্গ এবং বনমালা মহানদীর প্রশান্ত বিশালবক্রকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপে মধ্যপ্রদেশ হইতে ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে আসিয়া ৭ মাইল পশ্চিমে নরাজ নামক স্থানের দূরিকটে গিরিকন্দের ভেদ করিয়া ইহার প্রভূত জলরাশি অবিশ্রান্ত গতিতে পতিত হইয়া ক্রমাগত পূর্বাভিমুখে কটক জেলা ভেদ করিয়া বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ফল্গু-পরেণ্টের নিকট বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

মহানদীর মোহানায় যে সকল বৃহৎ বৃহৎ নদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কাটজুরি, জোতদার, পাইকা, বিরূপা ও চিতরতলা প্রধান। ঐ সমস্ত নদী হইতে আবার কোয়াখাই, বড় ও ছোট দেবী, কেলো, ব্রাহ্মণী ও নুন নামক শাখানদী উল্লেখযোগ্য। এতদ্বিন্ন কেন্দ্রাপাড়া, গোবরী, পটামুণ্ডী, তালদণ্ডা, মাছগাঁও, হাইলেভল্ প্রভৃতি কতকগুলি ষাল ইহার উপর দিয়া বাণিজ্য-সুবিধার জন্ত কাটা হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কাণ্ডেন থারিস ইহার জলগতি অবধারণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, নরাজ-কন্দের হইতে প্রতি সেকেন্ডে ১৮০০০০ ঘন ফিট জল পতিত হইয়া থাকে। ঐ প্রপাতবেগের অধিকাংশই পূর্বোক্ত শাখানদীসমূহ দিয়া ক্ষয়িত হইয়া থাকে।

মহানদীর আনিকট ও বি, এন্ রেল কোম্পানীর পুল বর্তমান স্থাপত্যবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মহানদীর জলবেগ একরূপ অধিক হওয়ায় ইহার মোহানায় বিস্তীর্ণ 'ব' দ্বাপসমূহ সংগঠিত হইয়াছে।

২ দশপাল্লী সামন্তরাজ্যের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নদী। মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার আন্দা নগরের নিকটে ইহা ঋষিকুল্য নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। রাসেলকোণ্ডা ও গুমদর নগর ইহার তীরে অবস্থিত।

মহানদী, (ছোট) মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলা হইতে নিঃসৃত একটি নদী। অক্ষা° ২৩° ৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮° ৪১' পূঃ। জবলপুর ও রেবার সীমান্ত দিয়া প্রায় ৫০ ক্রোশ পথ বাহিয়া

শোণ নদে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই নদীর দুই পাশে বিস্তীর্ণ শালবন। নদীতীরে দেওরীর নিকট একটি কয়লা খনি ও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

মহানান (জি) ১ বৃহৎ মূখ। ২ শ্রেষ্ঠ বা স্নানর মূখ।

মহানন্দ (পুঃ) মহান্ আনন্দো হত্ব। ১ মুক্তি, সংসারদুঃখ মোচনই আনন্দের শেষ সীমা, এইজন্ত মহানন্দ অর্থে মুক্তি (হলায়ুধ) মহান্ আনন্দঃ কণ্ঠধা°। ২ অতিশয় আনন্দ ৩ নৃপতিবিশেষ। (মাকণ্ডেয়পু° ১৩৪।৪০) ৪ বেণুবিশেষ এই বেণুগণ্ডে অতিশয় আনন্দ হয়, এইজন্ত ইহার নাম মহানন্দ। “মহানন্দ স্তথা নন্দো বিজয়োহথ জয়স্তথা।

চম্বার উত্তরবংশা মাতঙ্গমুনিসম্মতাঃ।” (সঙ্গীতধামো°)

মহানন্দ, ১ নক্ষত্রোপযোগ্যরচয়িতা। ২ বিশ্বনাথের পুত্র। ইনি বাসিষ্ঠীশাস্তি নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহানন্দধার, কাব্যকলাপটম্পূরচয়িতা।

মহানন্দা (স্ত্রী) মহান্ আনন্দোহস্যঃ। ১ সুরা। (রাজনি°)

২ মাঘ শুক্লানবমী।

“মাঘমাসস্ত যা শুক্লা নবমী লোকপূজিতা।

মহানন্দেতি সা প্রোক্তা সদানন্দকরী নুনাম্ ॥

স্নানং দানং জপো হোমো দেবার্চনমুপাষণম্।

সর্বং তদক্ষয়ং প্রোক্তং যদন্তাং ক্রিয়তে নরৈঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব°)

চান্দ্র মাঘ মাসের শুক্লা নবমীর নাম মহানন্দা, এই তিথি মানবদিগের আনন্দবন্ধক, এই তিথিতে স্নান, দান, জপ, হোম, দেবপূজা ও উপবাস প্রভৃতি যাঁহা কিছু সদমুষ্ঠান করা যায়, তাঁহা অক্ষয় হইয়া থাকে এবং এই তিথিতে যে কিছু পাপকর্মের অমুষ্ঠান করা যায়, তাঁহাও অক্ষয় হয়। অতএব এই তিথিতে কখন পাপামুষ্ঠান করিবে না।

মহানন্দা, বাঙ্গালার প্রবাহিত একটি নদী। দার্জিলিং জেলার মহালদিরাম নামক হিমালয়শৈলতট হইতে উদ্ভূত হইয়া জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার মধ্য দিয়া সিলিগুড়ির নিকট নব-বলাসন নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর তিতলিয়া গ্রাম পর্যন্ত আসিয়া দক্ষ, পীতাম্বু, নাগর, মেছাঁ ও ককাই প্রভৃতি শ্রোতস্বিনীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কালিয়াগঞ্জ, হলদিবাড়ী, কৃষ্ণগঞ্জ ও বর্সোই নামক চারিটি প্রধান হাট মহানন্দাতীরে অবস্থিত।

পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া বক্রগতিতে এই নদী মাগদহ জেলায় আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে পুনরায় টালন, পুনর্ভবা ও কালিন্দী ইহার সহিত আসিয়া মিশিয়াছে। বর্ষা ভিন্ন অপর সকল ঋতুতেই ইহার জল শুকাইয়া যায়, তখন নৌকাযোগে গমনাগমন একবারে কষ্টকর হইয়া পড়ে।

অবশেষে এই নদী মালদহ জেলার দক্ষিণে এবং রাজশাহী জেলার গোদাগড়ী থানার উত্তরে ( অক্ষা° ২৪°২৮'৩০" এবং দ্রাঘি° ৮৮°২০'৩০" পূঃ) পদ্মায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। নদীর উপত্যস্থান হইতে পার্বত্য উচ্চ বন্ধ হইতে অবতরণ-হেতু ইহার জলপাত একরূপ ক্ষত অক্ষত হয় যে, পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকা লইয়া উত্তরাভিমুখে গতিবিধি করা একান্ত অসম্ভব। পূর্বে এই নদী পূর্ণিমা নগরের নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে গতি পরিবর্তিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছে।

মহানন্দ (ক্ৰী) আ সম্যক্ নন্দতীতি আ-নন্দ (সর্ব বাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। নন্দবর্দ্ধন-রাজপুত্র, রঘুনন্দন শুদ্ধিতবে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কলিতে মহানন্দ পৃথান্ত ক্ষত্রিয় রাজা থাকিবে, তৎপরে শূত্র রাজা হইবে।\* কিন্তু এই মত সর্ববাদিসম্মত নহে, কারণ এখনও ভারতের নানা স্থানে ক্ষত্রিয়বংশ বিদ্যমান।

২ অজ্ঞাতশত্রুর পুত্রভেদ।

মহানরক (ক্ৰী) মহান্ অতিশয়-বাতনাপ্রদো নরকঃ।

অতিশয় বাতনাগ্রদ নরক। [নরক দেখ।]

"তাম্রিসমকৃত্যামিস্রং মহারৌরবরৌরবৌ।

নরকং কালশূত্রঞ্চ মহানরকমেব চ।" (মহু ৪।৮৮)

মহানল (ক্ৰী) মহাশ্চাসৌ নলশ্চেতি। দেবনল।

(রাজনি°) মহাশ্চাসৌ অনলশ্চেতি। ১ বৃহদগ্নি, ভয়ানক আগুন। ৩ তীর্থভেদ। (বৃ°নীল° ২১)

মহানবমী (ক্ৰী) মহতীচাসৌ নবমীচেতি। চাত্র আশ্বিনের তুলা নবমী।

"প্রাবৃত্তকালে বিশেষণ আশ্বিনে হ্যষ্টমীযুতঃ।

মহাশকো নবম্যত্র লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি।" (তিথিতত্ত্ব)

আশ্বিন মাসের শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথি মহাষ্টমী ও মহানবমী নামে খ্যাত হইবে। ইহাকে দুর্গানবমীও কহে। এই তিথিতে দুর্গাতন্ত্রমন্ত্র দ্বারা দেবী ভগবতী দুর্গার পূজা ও বিবিধ বলিদান দিয়া উৎসব করিতে হয়। এই তিথি দেবীর অতিশয় প্রীতিদায়িনী।

\* "চত্রারিশস্তথা ভাব্যো রাজা বৈ নন্দিবর্দ্ধনঃ।

চত্রারিশস্ত্রশ্চৈব মহানন্দির্ভবিষ্যতি।

মহানন্দিস্তত্শচাপি শূর্য্যঃ কলিকাংশজঃ।

উৎপৎস্বতে মহাপদ্মঃ সর্বকজ্জাক্কো নৃপঃ।

ততঃ প্রভৃতি রাজানৌ ভবিষ্যাঃ শূত্রযোনয়ঃ। (মৎস্রপু° ২৪৬ অ-।

অপি মহানন্দিস্ততঃ শূর্য্যগর্ভোভবো ইতি লুকো মহাপদ্মনলঃ পরশুরাম ইবাগুরোহিলকজ্জিয়াস্তকারী ভবিষ্যতঃ প্রভৃতি পূজা হুশালা ভবিষ্যতি।

ভেন মহানন্দিপার্ণকঃ কজ্জির আসীৎ।" (শুদ্বিতত্ত্ব)

"দুর্গাতন্ত্রেণ যন্ত্রেণ কুর্ব্বা দুর্গামহোৎসবম্।

মহানবম্যাং শরদি বলিদানং নৃপাদয়ঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

মহানবমীর দিন সকলেরই দুর্গাপূজা অবশ্যকর্তব্য।

বাহারা নবম্যাদি কল্প ও প্রতিপদাদি কল্লাহুসারে দুর্গা পূজা করিতে সমর্থ, তাহারা এই তিথিতে বিবিধোপচারে পূজা করিবেন; বিনি অসমর্থ তিনি অন্ততঃ পুষ্প ও বিষ্ণপত্র দ্বারা ও দেবীপূজা করিবেন। পূজা করিতেই হইবে, ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। মহানবমীর দিন পূজা হইলে তাহাকে মহানবমীকল্প বলা যায়। এই তিথি যে দিন ঘটিকা-ব্যাপিনী হয়, সেই দিনই মহানবমী বিহিত পূজা হইবে। ঘটিকা শব্দের অর্থ মুহূর্ত্তপত্র, মুহূর্ত্তকাল গাইলে সেই দিন পূজা হইবে। পূর্ণদিন হইবে না।

"যদ্বৈকস্তাঃ মহাষ্টম্যাং নবম্যাং বাথ সাধকঃ।

পূজয়েৎস্বয়ং দেবীং সর্বকামফলপ্রদাম্॥

ব্রতোপবাসস্নানাদৌ ঘটিকৈকা যদা ভবেৎ।

তামেব তিথিমাপ্রিত্য কুর্ঘ্যাৎ কৰ্ম্মণ্যতঃ।

অত্র ঘটিকাশব্দং মুহূর্ত্তপত্রং" (তিথিতত্ত্ব) [দুর্গাপূজা দেখ]

মহানস (ক্ৰী) মহচ্চ তৎ জ্ঞানশ্চেতি (অনোহম্মারঃ সরলাং জাতিসংজ্ঞায়োঃ। পা ৪।৪।২৪) ইতি সংজ্ঞায়াং ট্চ। (আন-মহতঃ সমানাধিকরণজাতীরয়োঃ। পা ৩।৩।৪৬) ইতি মহত আকারাদেশঃ। রক্তনগুহ, পাকশালা, চলিত রান্নাঘর, পর্যায় রসবতী, পাকস্থান। (অমর) সূত্রতে মহানসের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—প্রশস্ত দিকে ও প্রশস্ত দেশে গবাঙ্কযুক্ত রক্তনশালা নিয়োগ করিবে। রক্তনের পাত্র পবিত্র এবং আত্মায়লোক দ্বারা রক্তনকায্য সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আহারই প্রাণিগণের স্থিতির মূল, এইজন্ত রাজা মহানসে কুলীন, ধান্মিক, ব্রহ্ম, সর্বদা কায্যতৎপর, নিলোভ, সরল, কৃতজ্ঞ, প্রিয়দর্শন; ক্রোধ, কার্কশ্য, মাৎস্য, মত্ততা ও আলস্ত-বিক্ষিত, ভিত্তিহীন, ক্ষমাশীল প্রভৃতি সদৃশগুণযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবেন। যাহারা মহানসে পরিচর্যা করিবে, তাহারাও শুচি, দয়ালু, দক্ষ, বিনীত, প্রিয়দর্শন ও পবিত্রমনা, নথ ও কেশহীন, স্নান, দৃঢ়, সংযমী প্রভৃতি সদৃশগুণশালী হইবে। (সূত্রত কল্পহা° ১অ°)

পাকরাজেশ্বরে লিখিত আছে—বাটীর অগ্নিকোণে পাক-শালা প্রস্তুত করিবে, ইহাতে জালালা থাকিবে ও আয়ত চুল্লী (উম্মন) প্রস্তুত করিতে হইবে। মুদ্রাদি পাত্র উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে পাক করিবে। পাকে মৃৎপাত্রই শ্রেষ্ঠ, মৃৎপাত্রাভাবে লৌহপাত্রে পাক করিবে, লৌহপাত্রে পক জব্য ভোজন করিবে চক্ষুরোগ এবং অর্শবিকার প্রশমিত হয়।

কাঃতপাত্রে পাক ও হিতকর, ভাত্রপাত্রে পক-বস্ত অকচি-  
কর এবং অন্নপিত্তবর্জক; স্ববর্ণ ও রৌপ্যপাত্র শ্রেষ্ঠগুণবৃত্ত  
এবং সকল দোষনাশক।

• মহানসে রক্ষণীয় উপকরণ।—মহানসে ভোজনমর্হি বিবিধ  
দ্রব্য রাখিয়া দিবে, পাক বা ভোজন করিতে যে সকল দ্রব্যের  
আবশ্যক, তাহা যথানিয়মে ঐ গৃহে সাজাইয়া রাখিতে হইবে।  
আপ্তমার্জ্জুনী, বাঢ়া, পুতহণ্ডী, স্কুর্জিকা, কর্ণী, বৈনবপাত্র,  
জলপূর্ণ অলিঙ্গর, বহিসংজননপ্রস্তর, কুন্দাল, স্কুঠারক,  
শুক দারুণ্ড, চালনী, পীঠী, মুঘল, উদুখল, স্বর্ণ, লোষ্ট্র,  
শিলা, দক্কী, চতুরঙ্গ অবপটিকা, সংদশক যুগল, নালিকা,  
ছুরিকা প্রভৃতি দ্রব্যই মহানসে রাখিতে হয়।\*

মহানসাধ্যক্ষ (পুং) মহানসস্ত্র অধ্যক্ষঃ। রসবত্যাধিকারী  
পুং, রক্ষণশালার অধ্যক্ষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা. ১ অ.)

মহানসিকাবোচ্চ (ত্রি) রাজশালাধিকৃত পুরুষ।

(সুশ্রুত কল্পস্থা. ১ অ.)

মহানাগ (পুং) সুরপুঙ্গব বৃক্ষ। (বৈজ্ঞানিকনি.)

মহানটক (ক্লী) মহচ্চ তৎ নাটকক্ষেতি। নাটকবিশেষ।

\* “আগ্নেয়াঃ দিগি কর্তব্যমাবাসন্ত মহানসম্।

পবাকলালমার্গায় মুর্জিত্ত্বপুলেপিতম্।

চুন্নী তত্র একত্বব্যা পূর্ণশান্তমমায়তা।

বৃহদ্রাধীনি ভাতানি কালিতানি চ বারিণা।

তেষু বৎ পচ্যাতে দ্রব্যং গুণবৎ সর্বসম্মতম্।

বৃণভাবো পচোমোহে চক্ষুর্ণোবিকারজিং।

কাঃস্ত্রে পাচিতং যচ্চি তচ্চিৎ মতিদং শুচি।

যচ্চ তাত্মময়ে সিদ্ধং ন কচ্যৎ ঘন্নপিত্তকং।

সৌবর্ণে রাজতে পাচ্যমাচ্যতুমিতুতাং গৃহে।

তৎ পাত্রং সর্বদোষহং ধিখণ্ডোৎসবদারকম্।

অথ মহানসোপযোগ্যোপকরণানি—

বস্তুনি ভোজনমর্হানি বিবিধানি পুনঃ পুনঃ।

সক্যাং গুণযুক্তানি স্থাপিতানি মহানসে।

লাস্তাপ্তমার্জ্জুনী বাঢ়া পুতহণ্ডী স্কুর্জিকা।

কর্ণগং বৈনবং পাত্রং জলপূর্ণালিঙ্গরঃ।

বহিসংজননো এবঃ কুন্দালঃ স্কুঠারকঃ।

দারুণ্ডানি শুক্কানি হস্তমাত্রানি চেকনম্।

স্বর্ণলোষ্ট্রশিলা দক্কী চতুরঙ্গাবপটিকা।

সংদশক যুগলং বজ্রখণ্ডচতুষ্টিম্।

নালিকা ছুরিকা চৈব মুঘলং স্কুটাহকম্।

বাহুসকালনার্থায় দক্কী দারুণী স্কলোহজা।

তন্মূর কব্জা প্রাণা তন্মূরঃ দুঢ়বটনী।

ইত্যাদি বস্ত্রভাতঃ হি যুক্তান্তে চ মহানসে।” (পাকরাজেশ্বর)

ইহার লক্ষণ—

“এতদেব বদ্য সর্কৈঃ পতাকাহানকৈবৃতম্।

অকৈশ্চ দশভিধীরা মহানটকমূচিরে ॥”

এতদেব নাটকং যথা বালরামায়ণং (সাহিত্যদ.)

নাটকের লক্ষণাক্রান্ত এবং সকল প্রকার পতাকা-স্থানাদি  
যুক্ত ও দশ অঙ্কে সমাপ্ত হইলে তাহাকে মহানটক কহে।  
বালরামায়ণ মহানটক-পদবাচ্য।

২ স্বনামখ্যাত হনুমদ্রচিত রামচরিতগ্রন্থবিশেষ। এই  
গ্রন্থ অতি সুশ্লিষ্ট।

“এষ শ্রীহনুমতা বিরচিতো শ্রীমন্ মহানটকে

বীরশ্রীভূতরামচন্দ্রচরিতে প্রত্যাঙ্ক্যে বিক্রেমঃ।

মিশ্র শ্রীমদুদ্ভটনেন কবিনা সন্দর্ভসজ্জীকৃতে

স্বর্ণারোহণনামকোহত্র নবমো বাতোহঙ্ক্য এবোত্যসৌ ॥”

(মহানটক শেষ শ্লোক)

মহানাড়ী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ নাড়ীচেতি। কণ্ডুরা। (রাজনি.)

মহানাদ (পুং) মহাদ্ নাদোহস্ত। ১ হস্তী। ২ বর্ষক মেঘ।

মহাংশাদৌ নামশ্চেতি। ৩ মহাশক। ৪ সিংহ। ৫ কর্ণ। (হেম)

৬ উষ্ট্র। ৭ শম্ব। (রাজনি.) ৮ কাহলবাত্ত। (হার্যবলী)

৯ মহাদেব। (ভারত ১৩।১।৪৮) (ত্রি) ১০ মহাশকযুক্ত।

“তৎকালমেব প্রতিমং মহোরগনিষেবিতম্।

অভিগম্য মহানাদং তীর্থে নৈব মহোদধিম্ ॥” (রামা. ৪।৪০।৩৮)

মহানাদ, বক্ষে ত্রিবেণীর ৪ কোশ পশ্চিমদিগবর্তী একটি গন্ত-

গ্রাম। এখানে জটেশ্বর শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গা নামে একটি পুণ্য-

সলিলা পুষ্করিণী আছে। সাধারণ লোক ঐ কুণ্ডকে গঙ্গার

শ্রায় তত্ত্বি করে। বশিষ্ঠগঙ্গা ও শিবস্থাপনাদি বিষয়ে

এখানে একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কোন সময়ে

এই গ্রামে একটি দক্ষিণাবর্ত শম্ব পতিত হয়, বায়ু লাগিয়া

তাহা হইতে মহানাদ উৎথিত হয়। দেবগণ তাহা শুনিয়া তথায়

আসিয়া সমুপস্থিত হন এবং জটেশ্বর শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গা

প্রতিষ্ঠা করিয়া মহানাদ হইতে এই স্থানের নামকরণ করেন।

এখানে কএক ঘর কন্ডুট যোগীর বাস আছে। বৌদ্ধদিগের

সময়ে এখানে অনেক বৌদ্ধ শ্রমণের বাস ছিল। আজও

এখানে ধর্মঠাকুরের ‘জাত’ হইয়া থাকে।

মহানানাত্ত (ক্লী) যজ্ঞ-প্রক্রিয়ার প্রকরণভেদ।

(লাটায়ন ১০।৭।৩)

মহানাত (পুং) ১ হিরণ্যাক্ষের পুত্রভেদ। (ইরিবংশ)

২ দানবভেদ। ৩ অস্ত্রাদি মন্ত্রপুতকরণার্থ মন্ত্রবিশেষ।

মহানামন্ (পুং) ১ শাক্যমুনির আত্মীয় বিশেষ। (ললিতবিস্তর)

২ মহাবংশরচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ জনৈক বৌদ্ধ। ত্রিমাং ভীষ্ম।

মহানান্নিক (ত্রি) মহানান্নী পরিশিষ্ট সঞ্চকীয়। “ত্রৈশ্চো-  
পনিষদান্নান্নিকাদিভিঃ” (মম্ব ২।১৩৫ টাকার কুল্লুক)

মহানান্নী, সামবেদপরিশিষ্টভেদ। ইহা শকরীছন্দে লিখিত।  
মহানান্নীত্রত (ক্লী) বেদোক্ত ত্রতবিশেষ, ইহাতে মহানান্নী  
হুকের মন্ত্র সমুদায় পাঠ করিতে হয়।

মহানারায়ণ (পুং) পারা, তাম্র, গন্ধক, জয়পাল, ও ত্রিফলা  
প্রত্যেকে একতোলা, কটকী ক্ষারত্রয়, প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা,  
এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া বটী করিবে। বটীর পরি-  
মাণ দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। অনুপাম  
উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে গুণ্ড ও জ্বর আশু বিনষ্ট হয়।  
অত্রবিধ প্রস্তুত প্রণালী—পারা, মোহাগা, ও মরিচ প্রত্যেকে  
একভাগ, গন্ধক, পিপুল, তুঁঠ, প্রত্যেকে ২ ভাগ, সমুদায়ের  
সমান নিম্বষ দস্তীবীজ মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটী  
করিতে হইবে। ইহা সিদ্ধ বিরেচক, ইহা সেবনে গুণ্ডাদি  
রোগ আশু নিরাকৃত হয়। (রসেন্দ্রসারসং গুণ্যাদিঃ)

মহানারায়ণ (পুং) বিষ্ণু। (ললিতবিস্তর)

মহানারায়ণতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত  
প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ শতমূলী, শালপাণি,  
চাকুলিয়া, শর্টা, বচ, এরণ্ডমূল, কণ্টকারীমূল, নাট্যকরঞ্জমূল  
গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝাঁটিমূল প্রত্যেকে ১০ পল, পাকার্থ জল  
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্যাহু ও ছাগাহু প্রত্যেকে ৮ সের,  
শতমূলীর রস ৪ সের, ককার্থ পুনর্গবা, বচ, দেবদারু, শুল্ফা,  
রক্তচন্দন, অশুর, শৈলজ, তগরপাহুকা, কুড়, এলাইচ, জটা-  
মাংগী, শালপাণি, বেড়োলা, অম্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রান্না প্রত্যেক  
৪ তোলা। তৈলপাকের নিয়মানুসারে এই তৈল পাক  
করিতে হইবে। এই তৈলমর্দনে মল্লুখা, অম্ব এবং হস্তীর  
সকল প্রকার বাত, জঙ্ঘূল, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, বাতরক্ত,  
হনুগ্রহ, কামলা, পাণ্ডু ও অশ্মরী প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত  
হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং বাতব্যাধিরোগার্থিঃ)

মহানারায়ণোপনিষৎ (ক্লী) উপনিষদ্ভেদ।

মহানাস (পুং) ১ শিব। (ত্রি) ২ বৃহৎনাসাযুক্ত।

মহানিদ্ৰ (ত্রি) গাঢ়নিদ্রাভিভূত।

মহানিদ্রা (ক্লী) মহতী সুদীর্ঘা চাসৌ নিদ্রা চেতি। মরণ।

মহানিনাদ (পুং) নাগভেদ।

মহানিমিত্ত (ক্লী) মহৎকারণ।

মহানিষ (পুং) মহাংচাসৌ নিষন্দেতি। নিষবৃক্ষ বিশেষ,  
(*Melia azadirachta*, Syn *Melia Sempervirens*) চলিত  
ঝোড়ানিষ, মহানিষ, বননিষ। হিন্দী—বাহান, মহারাষ্ট্র—  
ডোংরাচা, নিষাচাওঁড়, তৈলজ—গন্ধরাবিচট্ট, তুরকবেণ,

কণ্ডবেণ; তামিল—মালাইবেতু বাপেপাম্। সংস্কৃত পথ্যায়—  
কৈটধ্য, পবনেট, পক্ষত। (রত্নমালা) ইহার গুণ—গ্রাহী,  
কষায়, অম্ল, শীতল, রুক্ষ, তিক্ত, গ্রাহী, কফ, পিত্ত, ভ্রম,  
ছর্দি, কুষ্ঠ, ফল্লাস, রক্তদোষ, প্রমেহ, বাস, গুণ্ডা, অর্শ এবং  
মূষিকবিষনাশক। (ভাবপ্রঃ)

মহানিয়ম (পুং) বিষ্ণু। (ভারত শাস্তিপর্ক)

মহানিযুত (ক্লী) বৌদ্ধমতে অত্যাধিক সংখ্যাত্তেদ।

মহানিরয় (পুং) নরকভেদ।

মহানিরক্ট (পুং) কোষহীন বৃষ, দামড়া। “স্বতন্ত্র গৃহে মহা-  
নিরক্টো দক্ষিণা” (তৈত্তিঃ সং ১।৮।১২।)

মহানির্বাণ (ক্লী) ১ মোক্ষ বা নির্যাসমুক্তি। ২ আধুনিক  
তত্ত্বভেদ।

মহানিশা (ক্লী) মহতী ঘোরা নিশা। নিশামধ্যভাগ, রাত্রির  
মধ্যভাগ। পথ্যায়—নিশাধি, নিশীথ। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে দেড়  
প্রহরের পর আর দুই প্রহর পর্যন্ত মহানিশা।

“মহানিশাতু বিজ্ঞেয়া মধ্যমং প্রহরদ্বয়ম্।

তত্র স্নানং ন কুর্বাতি কাম্য নৈমিত্তিকাদৃতে ॥” (তিথিতত্ত্ব)

মধ্যম প্রহরদ্বয়কে মহানিশা কহে, কাম্য এবং নৈমিত্তিক  
কাণ্ড ভিন্ন এই মহানিশিতে স্নান করিতে নাই। এই সময়ে  
কোন বস্ত্র ভোজন করিবে না। একালে ভোজন করিলে  
ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। মহানিশিতে পারণও নিষিদ্ধ। \*

দেবলের মতে—রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের পর শেষদন্ত  
এবং তৃতীয় প্রহরের প্রথম দণ্ড এই দুই দণ্ড কালই মহানিশা।  
“মহানিশা রাত্রিমধ্যমদণ্ডদ্বয়ান্নিকা সা দ্বিতীয়প্রহরশেষ-  
দণ্ড তৃতীয়প্রহরপ্রথমদণ্ডরূপা।

“মহানিশা দে ঘটিকে কোটি স্বর্গাসমপ্রভঃ।” ইতি  
দেবলোক্তা মহানিশা” (তিথিতত্ত্ব)

মাঘমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে মহানিশাকালে ভগবান্ মহা-  
দেব কোটি স্বর্গের আশ্রয় প্রভাযুক্ত শিবলিঙ্গরূপে উদ্ভূত  
হইয়াছিলেন।

\* “বসুহুগ্ধে ব্যতীতে তু রাত্রাবেব মহানিশা।

লভতে ব্রহ্মহত্যাক তত্র ভুক্ত্য চ নারদ।

গোমাসাবিন্দ্রসমং তাম্ব লুক ফলং জলম্।

পুংসামভক্ষ্যং শুদ্ধান্নমোদনস্তাপি কা কথ্য।” ইতি ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণঃ।

তত্র পারণনিষেধঃ—

ন রাত্রৌ পারণং কুর্বাৎসু বৈ রোহিণীত্রতাং।

নিশায়াং পারণং কুর্বাৎসু রুদ্রাঃ মহানিশাম্।

মহানিশায়াং প্রাপ্তায়াং তিথিতত্ত্বং বদ্য ভবেৎ।

দ্বিতীয়ঃ ক্লে মুনিস্রেষ্ঠ পারণং কৃন্তে তত্রী।” (তিথিতত্ত্ব)

“মাষকৃষ্ণ-চতুর্দশাদিদিবো মহানিশি।

শিবলিঙ্গতয়োদ্ধূতঃ কোটিস্থ্যাসমপ্রভঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

তাস্ত্রিকদিগের মতে গণম প্রহরের পর তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত মহানিশা। কিন্তু এক প্রহরের পর দুই ঘণ্টা অতীত হইলে তাহাকে অতিনিশা কহে। এই মহানিশাকালে তাস্ত্রিকদিগের পূজা ও জপ প্রশস্ত। এই মহানিশা-কালেই কালাপূজা হইয়া থাকে।

“গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়প্রহরাবধি।

মহানিশায়াং জপ্তবাং রাত্রিশেষে জপেন্নত ॥

অপিচ—নিশা তু পরমেশানি স্থ্যো চাস্তমুপাগতে।

প্রহরে চ গতে রাত্রৌ ঘটিকে দ্বৈ পরে চ য়ে ॥

মহানিশা সমাখ্যাতা তত্চাতিমহানিশা।

অর্দ্ধরাত্রৌ গতে দেবি পশুভাবেন পূজয়েৎ।

দশদণ্ডে তু যা পূজা তৎ সর্গমক্ষয়ং ভবেৎ ॥”

(তত্ত্বসার, গুপ্তসাধনত. ৬ অ.)

মহানিশীথ (পুং) জৈন-সম্প্রদায়ভেদ।

মহানীচ (পুং) মহানতিশয়ঃ নীচঃ। ১ রজক। (শব্দমাং)

(ত্রি) ২ অতিশয় হীনবর্ণ।

মহানীল (পুং) মহান নীলঃ নীলবর্ণঃ। ১ ভঙ্গরাজ। ২ নাগ-বিশেষ। ৩ মণিবিশেষ। (মেদিনী)

“মহামহানীলশিলাকূটঃ পুরো নিষেদিবান্ কংসকৃষ্ণঃ স বিষ্টরে।”

(শিশুপাল ১।১৬)

“সিংহলস্তাকরাষ্ট্রতা মহানীলাস্ত তে স্থতাঃ।

হাত ভগবানগন্তাঃ” (মল্লিনাথ)

সিংহলদ্বীপের ঋনিতে যে নীলমাণ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মহানীল। ইহার লক্ষণ—

“যন্ত বর্ণান্ত ভূয়স্বাং ক্ষীরে শতগুণে স্থিতঃ।

নীলতাং তদুয্যং সপং মহানাং স উচ্যতে ॥”(গরুড়পু. ৭২অ.)

ইহাকে নালকাপ্তমণিও কহে।

যে নীলমাণি বর্ণের প্রাশস্ত্যাহেতু শতগুণ ক্ষীরে রাখিলে সমস্তই নীলরঙ করে, তাহাকে মহানীল কহে।

• ৪ গুণগুলুর জাঃভেদ। (ভাবপ্র. ১৫ সর্পভেদ। (বৈষ্ণবকনিং)

৬ মেরু মল্লিকটস্থ পর্বতভেদ।

মহানীলকণ্ঠরস (পুং) রসোষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—তামি পিণ্ডে ভাবিত সাসক এক তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রসসিন্দুর ১৬ তোলা, অত্র ২৪ তোলা, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া স্বতকুমারী, ব্রাক্ষীশাক, নিসিন্দা, শঠী, মুণ্ডিরী, শতমূলী, শুভ্রুলী, তালমাধ্বনা, তালমূলী, বৃদ্ধদারক ও চিতা ইহাদের ভাবনা দিয়া একটু, মূতা,

চিতা, এলাইচ, লবঙ্গ, ও জাতিফল এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটা করিবে। এই ঔষধ-সেবনে বিবিধ বাতরোগ, ৪০ প্রকার পিত্তরোগ এবং অজ্ঞাত সকল রোগ বিনষ্ট হইয়া শত কামিনী-রমণে শক্তি হয়। যথেষ্ট আহারে সমর্থ কন্দর্পের ত্রায় রূপ-বান্, মেধাবী ও ভীষ্মের ত্রায় বিক্রম জন্মে। এই ঔষধ-সেবনে বক্ষ্যানারীর বক্ষ্যাত্ম দোষ নিরাকৃত হয়। ঔষধ সেবনের পর ২১ দিন মৈথুন বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। (রসেন্দ্রসারসং)

মহানীলতৈল (কৌ) তৈলোষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—তিলতৈল ১৬ সের, বহেড়ার রস ৬৪ সের, আমলকীর রস ৬৪ সের, ককার্থ ঘোষালতার মূল, কাল কাঁটির মূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণশেণের ফল, ভীমরাজ, কাকমাচী, বটমধু, ও দেবদারু, প্রত্যেকে ১০ পল, পিপুল, ত্রিফলা, রসাজন, প্রোপোণ্ডরীক, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাণ্ডুর, নীলোৎপল, আত্র-কেনী, কৃষ্ণমর্দন, মৃণাল, রক্তচন্দন, নীলকাঠ, ভেলার মূত্র, হীরাকস, মল্লিকাপুষ্প, সোমরাজী, অশনছাল, শস্ত্র, মদন-ছাল, চিতামূল, অর্জুনপুষ্প, গান্তারীপুষ্প, আত্রফল ও জামফল, প্রত্যেক ৫ পল, পরে তৈলপাকের বিধানানুসারে পাক করিবে। অথবা সমুদয় রস শোষণ পর্যন্ত স্থাপক করিয়া লইতে হইবে। এই তৈল পান, নস্ত্র ও মস্তকে মর্দনাধ প্রযোজ্য, ইহাতে সকল প্রকার শিরোরোগ ও কেশের অকাল-পকতা নিবারণ হইয়া চক্ষুর তেজ ও আয়ুর্জি হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী কুদ্রোগাধিকার)

মহানীল (কৌ) মহতী চাসৌ নীলা নীলবর্ণা চেতি। মহাভূষ। মহানীলী (কৌ) নীল (নীলাদোষধো)। পা ৪।১।৪২) ইতি বাস্তিকোক্ত্যা ভাষ্য। ততঃ মহতী চাসৌ নীলা চেতি। নীলা-পরাজিতা, বৃহন্নীলী, পয়্যায়—অমরা, জননীলিকা, তুখা, ত্রীফলিকা, মেলা, কেশার্হা, ভৎসপত্রিকা, ইহার গুণ—গুণাঢ়া, রসশ্রেষ্ঠ, স্ববর্ণদায়ক এবং সকল কশ্মে সঞ্চণ।

মহানীলোৎপল (পুং) ইন্দ্রনীল মণি।

মহানুভাব (ত্রি) মহান্ অনুভাবো মাহাশ্ব্যঃ যন্ত। মহাশর, মহাশ্বা।

“স্বকৃতী পুণ্যবান্ ধন্তো ধর্ম্মী চ ধর্ম্মবানপি।

মহাশমো মহেচ্ছঃ শ্রাম্মহানুভাব ইত্যপি ॥” (শব্দরত্নাং)

মহানুরাগ (ত্রি) ঐকান্তিক প্রেম বা আসক্তি।

মহানুশংসব (ত্রি) অত্যধিক স্বচ্ছন্দতা বা সুযোগসম্পন্ন।

(দিব্যাবদান ২৩।১১৪)

মহানৃত্য (পুং) মহান্ নৃত্যঃ যন্ত। ১ শিব। (ভারত ১৩।১।১১৫)

২ অতিশয় নৃত্য। ৩ (ত্রি) অতিশয় নৃত্যাত্মক।

মহানেত্র (ত্রি) ১ প্রশস্ত চক্ষুযুক্ত। (পুং) ২ শিব।  
 মহানেমি (পুং) কাক। (বৈজ্ঞানিকনিঃ)  
 মহাস্তক (পুং) ১ বৃত্ত। ২ অন্তকারী শিব।  
 মহাস্তকার (পুং) ১ অবিভাগ্য অস্ত্রকার। ২ বোম্ব অস্ত্রকার।  
 মহাস্ত্র (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী লোক।  
 মহাস্ত্রক (পুং) এক বিদেহাধিপতি।  
 মহাস্ত্রায় (পুং) ১ মূখ্য নিয়ম। ২ শ্রেষ্ঠ বিধি।  
 মহাস্ত্রয় (ত্রি) সস্ত্রাস্তবংশসম্বৃত। উচ্চকুলোদ্ভূত।  
 মহাপক্ষ (পুং) রাজহংস-বিশেষ। স্ত্রিয়াং ভীষু। ২ পেচক, পেচা। ৩ গরুড়। (ত্রি) ৪ বৃহৎ পরিবার বা বহু সঙ্গীযুক্ত।  
 মহাপগা (স্ত্রী) নদীভেদ।  
 মহাপঙ্ক (স্ত্রী) মহত তৎ পঙ্কজেনি। অতিশয় পাক, গাঢ়-কর্ম্ম। “অহং! মহাপঙ্কে পতিতোহসি” (হিতোপঃ)  
 মহাপঙ্কজ (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ। (ঋক্ প্রাতিঃ ১৬৪২)  
 মহাপঙ্কমূল (স্ত্রী) পঞ্চানং বিবাদি মূলানাং সমাহারঃ, ততঃ মহত তৎ পঙ্কমূলজেনি। বৃহৎপঙ্কমূল। বিষ্ণু, অগ্নিমহ, জোনাক, কান্দুরী ও পাটলা এই পঙ্কমূলের মূল মহাপঙ্কমূল নামে খ্যাত।  
 “বিবোধগ্নিমহঃ শ্রোনাং কান্দুর্যাঃ পাটলা তথা।  
 সৈবৈব মিলিতৈরেতৈঃ স্ত্রীমহাপঙ্কমূলকম্ ॥”  
 (রাজনিঃ)  
 মহাপঙ্কবিষ (স্ত্রী) পঞ্চানং বিবাণাং সমাহারঃ ততঃ মহত তৎ পঙ্কবিষজেনি। বৃহৎবিষপঙ্কক, এই বিষ যথা—শূদ্রা, কালকূট, মৃতক, বৎসনাভক ও শম্বকগণী এই পাঁচপ্রকারের বিশেষ নাম মহাপঙ্কবিষ।  
 “শূদ্রী চ কালকূটক মৃতকো বৎসনাভকঃ।  
 শম্বকগণীতি যোগোহয়ঃ মহাপঙ্কবিষাভিধঃ ॥” (রাজনিঃ)  
 মহাপঙ্কাস্ত্রল (পুং) রক্তৈরশুভ্রক। (রাজনিঃ)  
 মহাপাণ্ডিত (পুং) দার্শনিক বা নৈয়ায়িক পণ্ডিতচূড়ামণি।  
 মহাপাত্র (পুং) বৃহৎ পত্রযুক্ত শুভ্রভেদ।  
 মহাপাত্রা (স্ত্রী) মহান্তি পত্রাণ্যস্তাঃ। মহাপত্র। (রত্নমালা)  
 (ত্রি) ২ বৃহৎ পত্রযুক্ত।  
 মহাপথ (পুং) মহাংশসমৌ পথ্যশ্চেতি (আনুহত ইতি।  
 পা ৬৩৪৬) ইতি মহত আকারাদেশঃ, (ঋক্ পুরাণঃ পথ্য-  
 মানকে। পা ৪১৪১৪) ইতি সমাসাত্ত্ব্যকারঃ। প্রধান  
 পথ, পর্যায় বস্ত্রপথ, সংসরণ, স্রীপথ, রাজবস্ত্র, উপনিষদমণ,  
 উপনিষদ। (হেম) ২ বৃত্তাপথ।  
 পথিন পঙ্কের পূর্বে মহৎ শব্দ প্রয়োগ করিতে নাই।  
 (ভট্টটিকা) ৩ হুয়ু।

“হুয়ু শূদ্রপদবী ত্র্যক্ষরকুং মহাপথঃ।

অশানঃ শান্তিবী মধ্য মার্কশ্চেত্যেকবাচকঃ ॥”

(হঠযোগদীপিকা ৩৪)

৪ নগরের প্রধান পথ। ৫ শিব। ৬ ত্র্যক্ষরকু নামক  
 নরকভেদ। ৭ হিমালয়স্থ ভীর্থভেদ।

মহাপথগম (পুং) মহাপথস্ত মহাপথে বা গমঃ গমনঃ। মরণ,  
 মহাপথে গমন। (জটধর)

মহাপথিক (পুং) মহাপ্রস্থানকারী। মহাপ্রস্থানকার নিমিত্ত  
 হিমালয় দেশে তাৎ অথবা তপস্বী উদ্দেশে গমনকারী ব্যক্তি।

মহাপদ (পুং) মহাপ্রজ্ঞ। “অভীভূতেব তা মহাপদেন” (ঋক্  
 ১০।১৩২) ‘অথ মহাপদেন মহতা ঐজেনাভীভূতেব’ (সারণ)

মহাপদপঙ্ক্তি (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ। (ঋক্ প্রাতিঃ ১৬২২)

মহাপদ্ম (পুং) মহৎ পদ্মং তাদৃশং চিত্রং শিরসি যন্ত। ১ অষ্ট  
 নাগের অন্তর্গত নাগভেদ, পর্যায় অতিশুল্ক, দশবিন্দুক  
 মস্তক। (হেম) মনসা পূজার সময় এই নাগের পূজা করিতে  
 হয়। ২ দাবীকর জাতীয় সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থাঃ ৪ অ)

৩ কুবেরের নববিধ নিধির অন্তর্গত নিধিবিশেষ। পদ্মিনী  
 বিস্তার অন্তর্গত অষ্টবিধ নিধির অন্তর্গত নিধি বিশেষ।

“যস্তা বংসে! প্রভাবেন বিস্তার্যস্তাঃ গৃহাণ মে।

পদ্মিনী নাম বিদ্যেয়ং মহাপদ্মভিপূজিতা ॥ (মার্ক ৩।১৫)

৪ গজাতীরবত্তী নগরভেদ। (ভারত ১২।৩৫৩)

৫ দৈত্যভেদ। (হরিবং ২৩।৩৩) ৬ দিক্করীভেদ। (ভারত ৬।১১)

(স্ত্রী) ৭ লক্ষ কোটি সংখ্যা। (লীলাবতী)

“অযুতং প্রযুতং চৈব পদ্মং ধর্ম্মমথার্ক্যুদম্।

শম্বকৈব মহাপদ্মং নিখর্যং কোটিরেব চ ॥” (মহাভারত)

৮ শুক্লপদ্ম। (রত্নমালা) ৯ নরকভেদ।

১০ জৈন মতে নাগদিগের অধিকৃত নিধি বিশেষ। ১১ নন্দ-  
 রাজের নামান্তর। (বিক্রপুঃ) ১২ নন্দপুত্রভেদ। ১৩ কুবের-  
 রাজের কল্পভেদ।

মহাপদ্মপতি (পুং) নন্দরাজের নামান্তর। (বিক্রপুঃ)

মহাপদ্মসরস (স্ত্রী) কান্দীরস্থ হ্রদবিশেষ। বর্তমান নাম  
 উলর। (রাজতরঃ ৫।৬৮)

মহাপদ্মনলি (স্ত্রী) কান্দীরদেশীয় উল্লর হ্রদ। (রাজতঃ ৫।১১৮)

মহাপদ্মনন্দি, মহানন্দির উরসে পূজাশীলভক্ত কুমারভেদ।

মহাপদ্ম (পুং) মহাকাব্য।

মহাপদ্মঘটক, কালিদাসকৃত ভোজরাজের গুণবর্ণনমূলক  
 ঘটনোক্তক কবিতাবিশেষ।

মহাপঙ্ক (পুং) বৌদ্ধশিষ্যভেদ।

মহাপনস (পুং) মণ্ডলিসর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থাঃ ৪ অঃ)



মহাপরাক্রম (ত্রি) অত্যন্ত দাক্ষী। মহাবীৰ্যবান।  
 মহাপরাহু (পুং) অপরাহুর শেষভাগ।  
 মহাপরিনির্বাণ (ক্লী) নির্বাণবিশেষ। মহামোক্ষ।  
 মহাপর্ণ (পুং) ব্রহ্মরাক্ষস, রৌহীতক, ভূমিশাল। (বৈষ্ণবকনিং)  
 মহাপবিত্র (ত্রি) ১ অত্যন্ত পবিত্র। ২ বিষ্ণু।  
 মহাপশু (পুং) গবাদি পশু।  
 মহাপাকজ্ঞানি, স্বর্ধ্যাক্ষণশতকপ্রণেতা। জগন্নাথ পণ্ডিত-  
 রাক্ষের শিষ্য।  
 মহাপাটল (পুং) বৃক্ষভেদ।  
 মহাপাত (পুং) তীরাদির দূরবে পতন।  
 মহাপাতক (ক্লী) বহুদতিশরিতঃ পাতকঃ। পাপবিশেষ।  
 এই পাপ পাঁচ প্রকার। যথা—ব্রহ্মহত্যা, সুরপান, স্তের, গুরু-  
 পত্নী-গমন এবং এই সকল পাপচারাদিগের সহিত সংসর্গ।  
 “ব্রহ্মহত্যা সুরপানং স্তেরং গুরুজগাগমঃ।  
 মহান্তি পাতকাত্মকঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥” (মমু ১১৫৪)  
 বাহারা উল্লিখিত মহাপাতক-কর পাপাত্মকান করে, তাহা-  
 দের নরক হয়, পরে নরকভোগান্তে তাহাদের উৎকট ব্যাধি  
 জন্মে। ক্রমান্বয়ে সপ্তজন্ম পৰ্য্যন্ত এই উৎকট ব্যাধির ভোগ হইয়া  
 থাকে। এইরূপ ভোগের পর মহাপাতকের শাস্তি হয়।  
 “মহাপাতকজঃ চিহ্নঃ সপ্তজন্মস্থ জায়তে।  
 বাধতে ব্যাধিরূপেণ তত্ত কৃচ্ছাদিভিঃ সমঃ ॥”  
 (শাতাতপীর কৰ্মবিং)  
 মহাপাতকজ চিহ্ন সপ্তজন্ম বিভ্রমণ থাকে, এবং এই  
 পাতক ব্যাধিরূপে পীড়া দেয়। তপ্তকৃচ্ছাদি চাত্তারণের অনু-  
 ঠান করিলে হহার শাস্তি হয়। তুলা, মকর ও মেঘ অর্থাৎ  
 কান্তিক, বৈশাখ এবং মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া হবিষ্য-  
 ভোজন ও ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিলেও মহাপাতক বিনষ্ট হয়।  
 “তুলামকরমেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।  
 হবিষ্যং ব্রহ্মচর্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥”  
 (মলমাসতত্ত্ব)  
 পুরাণে লিখিত আছে,—“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” এই মলময় নাম  
 বাহার যুখে সদা বিরাজিত থাকে, তাহার সকল মহাপাতক  
 তন্মীভূত হয়।  
 “কৃষ্ণেতি মলমঃ নাম বস্ত্র বাচি প্রবর্ততে।  
 তন্মীভবতি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥” (পুরাণ)  
 রোগমাত্রাই পাপজ। পাপ ভিন্ন রোগভোগ হয় না। মহা-  
 পাতকজ রোগের বিষয় এতরূপ লিখিত আছে—  
 “পূর্বজন্মকৃতং পাপং নরকস্ত পরিধরে।  
 বাধতে ব্যাধিরূপেণ তত্ত কৃচ্ছাদিভিঃ সমঃ ॥

কৃষ্ণ রাজবন্দ্য চ প্রমেহো গ্রহণী তথা।  
 মূত্রকৃচ্ছাদিগ্রীকাসা অতীসারভগ্নরো ॥  
 ছটত্রয়ং গণমালা পক্ষাঘাতোহকিনাশনং।  
 ইত্যেবমানরো রোগা মহাপাতোক্তবাঃ সূতাঃ ॥”  
 পূর্বজন্মায়ুষ্টিত পাপ নরকভোগের পর ব্যাধিরূপে পীড়া  
 দেয়। মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, কাস, অতীসার, ভগ্নর, ছট  
 ত্রয়, গণমালা, পক্ষাঘাত ও অকিনাশন, এই সকল রোগ মহা-  
 পাতকের ফলে উৎপন্ন, অর্থাৎ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিলে  
 এই সকল রোগ হইয়া থাকে। ধর্মশাস্ত্রানুসারে প্রথমে এই  
 রোগের প্রারম্ভিত, তৎপরে তাহার চিকিৎসা করিবে।  
 মহাপাতকিন্ (ত্রি) মহাপাতকমন্ত্যক্ৰেতি মহাপাতক-  
 ইনি। পক্ষপ্রকার মহাপাতকযুক্ত, বাহারা মহাপাতক করে।  
 মহাপাতকী মাত্রই পতিত, এই জন্ত ইহাদের মৃত্যু হইলে  
 ইহাদের দাহাদি ক্রিয়া হইবে না, এমন কি ইহাদের মৃত্যুতে  
 অশ্রুপাত করাও বিধেয় নহে। মহাপাতকীর শ্রাদ্ধাদি কিছুই  
 হইবে না। যদি কেহ মোহবশতঃ এই মহাপাতকীদিগের  
 অগ্নিকার্য্য, অশৌচগ্রহণ ও শ্রাদ্ধাদি কাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন,  
 তাহারও প্রারম্ভিত করিতে হইবে।  
 “মহাপাতকিনো বে চ পতিতান্তে প্রকীর্তিতাঃ।  
 পতিতানাং ন দাহঃ শ্রাদ্ধান্ত্যেষ্টির্নান্বিসঙ্করঃ।  
 ন চাত্মপাতঃ পিণ্ডো বা কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং কচিৎ।  
 এতানি পতিতানাত্ত যঃ কুরোতি বিমোহিতঃ।  
 তপ্তকৃচ্ছদয়েনৈব তস্ত স্তুত্বিন চাত্তথা ॥”  
 বিশেষ কথা এই যে, যদি মহাপাতকী তাহার পাপের  
 প্রারম্ভিত করে, তাহা হইলে তাহার দাহ, অশৌচ ও শ্রাদ্ধাদি  
 হইবে। যদি মরণের পূর্বে এই প্রারম্ভিত না হয়, তাহা হইলে  
 মৃত্যুর পর করিয়া তাহার দাহাদি হইবে। ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা।  
 পারিভাষিক মহাপাতকী।—  
 পিতরং মাতরং ভার্য্যাং গুরুপত্নীং গুরুং পরম্।  
 যো ন পুষ্কতি কাপট্যাং স মহাপাতকী শিবঃ ॥”  
 (ব্রহ্মবৈবর্তপুং গণপতিতঃ ৪৪ অং)  
 পিতা, মাতা, ভার্য্যা, গুরুপত্নী, ও গুরু ইহাদিগকে  
 ছলরূপে যে ব্যক্তি ভরণপোষণ করে না, সে মহাপাতকী।  
 অন্তবিধ—  
 “কৃতপ্রাণপ্রতিজ্ঞাঞ্চ নীচৈর্বাং প্রতিমাং দ্বিজঃ।  
 দুর্গাং ন প্রণমেদ্বস্ত স মহাপাতকী সূতাঃ ॥”  
 (দেবীপুং ব্যাসনারায়ণসং)  
 নীচ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমা এবং ভগবতী দুর্গাকে  
 যে প্রণাম না করে, সে মহাপাতকী।

মহানির্দোষতন্ত্রে লিখিত আছে—

“জাতিভেদো ন কর্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ ।

যোহন্তু বুদ্ধিঃ কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ ॥” (মহানিঃ ৩২২)

পরমাত্মার প্রসাদে জাতিভেদ করনা করা উচিত নহে, যে ভেদবুদ্ধি করে, সে মহাপাতকী ।

মহাপাত্র ( পুং ) ১ প্রধান মন্ত্রী । ২ উপাধি বিশেষ । ৩ জনৈক বিখ্যাত গায়ক । ইনি সত্ৰাট্ অকবর শাহের দূতরূপে উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেবের সভায় আগমন করেন ।

মহাপাদ ( ত্রি ) ১ বৃহৎ পদযুক্ত । ( পুং ) ২ শিব ।

মহাপাপ ( ক্রী ) মহচ্চ তৎ পাপক্ষেতি । মহাপাতক ।

“মহাপাপেষু সর্বং স্ত্র্যং তদধিক্তূপপাতকে ।

দ্ব্যং পাপেষু বর্গাংশং জ্ঞাত্বা ব্যাধবলাবলম্ ॥” (মলমাসতঃ)

মহাপাপানু ( ত্রি ) অতিশয় পাপাত্মা ।

মহাপারগিক ( পুং ) বুদ্ধিশিষ্যভেদ ।

মহাপারুষক ( পুং ) বৃক্ষভেদ ।

মহাপারেবত ( ক্রী ) মহচ্চ তৎ পারেবতক্ষেতি । ফলবৃক্ষ বিশেষ, হিন্দী বড়া পারেবত । পর্যায়—স্বর্ণপারেবত, সাত্রা-  
পিজ, খারিক, রক্তরৈবতক, বৃহৎপারেবত, দীপজ, দীপ-  
খজুর । ইহার গুণ মধুর, বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, বৃষ্য, মুচ্ছা ও  
দ্রমনাশক । ( রাজনিঃ )

মহাপার্শ্ব ( পুং ) ১ দানবভেদ । ( ভারত বনপর্ব ) ২ রাক্ষস-  
ভেদ । ( রামাঃ ৫।১২।৭ )

মহাপাল ( পুং ) রাজপুত্রভেদ ।

মহাপাশ ( পুং ) মহান্ পাশোহস্ত । ১ সমদূত বিশেষ ।  
( বৃহদ্রথপুঃ ৫৬ অঃ ) মহাঃশাস্ত্রো পাশক্ষেতি । ২ বৃহৎ পাশ ।

মহাপাশুপত ( পুং ) ১ বকুল বৃক্ষ । ( বৈজ্ঞানিক )

১ পশুপতিব উপাসক শৈবসম্প্রদায় বিশেষ । স্বন্দপুরাণে  
লিখিত আছে যে, শিবভক্তুমাত্রই মহাপাশুপত বলিয়া  
উক্ত হইয়া থাকে ।

“হরোশ্চাব্যোভেদং ন করোতি মহামতিঃ ।

শিবভক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো মহাপাশুপতশ্চ সঃ ॥” ( স্বন্দপুঃ )

কিন্তু বামনপুরাণে ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিং প্রভেদ প্রদ-  
শিত হইয়াছে । তাহা এই,—

“আত্মং শৈবং পরিখ্যাতমন্তঃপাশুপতং মুনৈঃ ।

তৃতীয়ে কালবদনং চতুর্থং চ কপালিনঃ ॥

১ শৈবশাস্ত্রাণ্যং স্বয়ং শক্তি বশিষ্ঠস্ত প্রিয়ঃ স্তুতঃ ।

তস্ত শিষ্যো বভূবধ গোপায়ন ইতি স্তুতঃ ॥

মহাপাশুপতশাস্ত্রাদীন্তরদ্বাভ্যো তপোধনঃ ।

তস্ত শিষ্যোহ্যপ্যভূদ্রাজা ঋষতঃ সোমকেশ্বরঃ ॥

কালান্তো ভগবানাসীদাপস্তম্বস্তপোধনঃ ।

তস্ত শিষ্যো বকো বৈশ্রো নাম্না ক্রাথেশ্বরো মুনৈঃ ॥

মহাব্রতী চ ধনদস্তস্ত শিষ্যশ্চ বীষ্যবান্ ।

উণোধর ইতি খ্যাতো জ্ঞাত্য শূদ্রো মহাতপাঃ ॥”

উক্ত প্রকারভেদ সপ্রমাণকরণার্থ বশিষ্ঠাদিকেও তন্তম্ব-  
তের বিশিষ্ট উপাসক বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে ।

মহাপাশুপততন্ত্র, শিবতন্ত্র বিশেষ ।

মহাপাসক ( পুং ) পসতি বাধতে নিরাকরোতি পরিকালে-  
ষ্মাদিকমিতি, পস-ধূল, ততঃ মহাঃশাস্ত্রো পাসকক্ষেতি ।  
বুদ্ধিভ্রুক, পথ্যায়—চেলুক, শ্রামণের, প্রব্রজিত, গোমীন ।  
( ত্রিকাঃ ) কেহ কেহ ইহার পাঠান্তর ‘মহোপাসক’ বলিয়া  
নির্দেশ করেন ।

মহাপিচুমর্দ ( পুং ) পর্কতনিষ, নিষসদৃশ বৃহৎপত্রবৃক্ষ,  
চলিত মহানিষ । কাহারও কাহারও মতে এই নিমই পর্কতে  
হইলে পর্কতনিষ নামে অভিহিত হয় । ঔষধে ইহার বৃক্ই  
গ্রহণীয় ।

মহাপিত্তযজ্ঞ, শ্রাদ্ধকৃত্যরূপ যজ্ঞবিশেষ; শাকমেধপর্কের  
বিভীষ দিনে অমুষ্ঠেয় ।

মহাপিণ্ডতৈল, বাতরক্তাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ ।  
প্রস্তুত প্রণালী,—কটুতৈল ৪ সের, কাথার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজী,  
গন্ধভাঙ্গলে প্রত্যেক ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ।  
কাথ পৃথক্ পৃথক্ হইবে । দুগ্ধ ১৬ সের । কন্ধার্থ শিলারস,  
ধূনা, নিমিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, বৃহতী, দস্তীমূল, কঁকলা, পুনর্নবা,  
চিতামূল, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চন্দন, রক্ত-  
চন্দন, খাটাশী, করঞ্জ, শ্বেতস্বপ, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দাবীজ,  
বাকসছাল, নিমছাল, পটোলপত্র, আলকুনীবীজ, অম্বগন্ধা ও  
সরলকাষ্ঠ, প্রত্যেকে ২ তোলা । যথানিয়মে এই তৈল মর্দন  
করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি বিবিধ পীড়ার উপশম হয় ।

মহাপিণ্ডীতক ( পুং ) পিণ্ডীং তনোতীতি তন-ড, সংজ্ঞার্থে  
কন্, ততঃ মহাঃশাস্ত্রো পিণ্ডীতকক্ষেতি, পিণ্ডীকারফলদ্যা-  
দস্ত তথাহং । কৃষ্ণবর্ণ মহামদনবৃক্ষ । পথ্যায়—বারাহ ।  
ইহার গুণ শ্রেষ্ঠ, কটু ও তিক্তরস, কফ, ক্লেদ্রোগ, ও আমাশয়-  
রোগনাশক । ( রাজনিঃ )

মহাপিণ্ডীতর ( পুং ) মহাঃশাস্ত্রো পিণ্ডীতরক্ষেতি । বৃক্ষ  
বিশেষ, শ্বেত পিণ্ডীতর । হিন্দী পেড়িরা, বড় ময়না গাছ,  
কাল ময়না, পর্যায়—শ্বেত পিণ্ডীতর, করহাট, কুর, শত্রুকোষ-  
তর, শর, পিণ্ডীতর । ইহার গুণ কষায়, উষ্ণ, ত্রিদোষশমন,  
চন্দ্ররোগ ও রক্তদোষনাশক । ( রাজনিঃ )

মহাপিত্তাস্তকরস ( পুং ) রসৌষধ বিশেষ । ইহার প্রস্তুত

প্রণালী—ঈদ্রী, জায়ফল, জটামাংসৌ, তালীশ, মাক্কিক, লৌহ, অন্ন ও মনঃশিলা, প্রত্যেকে সমভাগ এবং সমুদায়ের সমান রৌপ্যতাম্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অল্পপান রোগীর বলাবল অল্পসারে হির করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে পিত্তরোগ মাত্র, শূল, অন্ন-পিত্ত, পাণ্ডু, হলীমক, অর্শ, ভ্রম, বমন ও ক্ষিপ্তরোগ নাশ হয়।

( রসেন্দ্রসারসং বাতরক্তরোগাধি )

মহাপীঠ ( ক্রী ) সতী অঙ্গের প্রসিদ্ধ ৫১ পীঠ। [ পীঠ দেখ ]

মহাপীলু ( পুং ) পীলতি প্রতিভতে বিষপিত্তাদিকমিতি পীল ( মৃগযাদরস্ )। উণ্ ১।৩৮ ইতি কু, ততো মহান্ পীল-রিতিকর্মধাং। পীলুর্লক্ষ্য বিশেষ, পীলু ফলের গাছ, পথ্যায় বৃহৎপীলু, মহাফল, রাজপীলু, মহাবৃক্ষ, মধুপীলু, ইহার ফল-গুণ—মধুর, বৃষ্য, বিষনাশক, পিত্তপ্রশমন, রুচিকর, আম-নাশক ও প্রদীপক। ( রাজনিং )

মহাপীলুপতি ( পুং ) ইন্দ্র। ( উজ্জলদত্ত )

মহাপুংস ( পুং ) মহাত্মা ব্যক্তি।

মহাপুট ( ক্রী ) ঔষধপাকার্থ পুটবিশেষ। ভাবপ্রকাশে মহাপুটপাকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। দীর্ঘ, প্রস্থ এবং গভীর প্রত্যেকে দুই হস্ত পরিমাণ অথচ চতুষ্কোণ একটি কুণ্ড ( গর্ভ ) প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে এক হাজার বনঘুটে সাজাইতে হইবে। তৎপরে একটি মাতীর পাত্রে ঔষধ পুরিয়া উত্তম-রূপে মুখবদ্ধ করিয়া ঐ কুণ্ডনিক্ষিপ্ত ঘুটের উপরি স্থাপন করিবে। তৎপরে আর পাঁচশত ঘুটে তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি দিবে। ইহাকে মহাপুট কহে। ( ভাবপ্রং )

মহাপুণ্য ( পুং ) ১ পবিত্র, পুণ্যময়। ২ বোধিসত্ত্বভেদ। দ্বিগুণ টাপ্। মহাপুণ্য—নদীবিশেষ। ( বামনপুং )

মহাপুত্র ( পুং ) পৌত্র।

মহাপুমান্, পরতভেদ। ( ভারত ভীষ্মপর্ব )

মহাপুর ( ক্রী ) ১ হুর্গারি সুরক্ষিত নগরী। ২ তীর্থবিশেষ। এখানে স্নান করিলে মোক্ষলাভ হয়। ( ভারত ১৩ পর্ব ) ( ক্রী ) মহাপুরী, রাজধানী।

মহাপুরাণ ( ক্রী ) মহা তং পুরাণক্ষেতি। বিশেষ লক্ষণযুক্ত ব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশসংখ্যক পুরাণবিশেষ।

[ ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ। ]

মহাপুরুষ ( পুং ) মহাশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি। শ্রেষ্ঠ নর। ( যোগী ঋষি প্রভৃতি ) বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ স্বক্ষেত্রে, উচ্চগৃহে অথবা কেন্দ্রে থাকিলে ৫ প্রকার মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ( বৃং সং ৬৯ অধ্যায় )

২ নারায়ণ, ভগবান্ ।

“যোরং সদা পরিভবয়মভীষ্টমোহং

তীর্থাস্পদং শিববিরিক্ষিমুতং শরৈগাম্।

ভৃত্যাক্তিহং প্রণতপালভবাক্ষিপোতং

বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণারবিন্দম্ ॥” ( আক্ষিকতত্ত্ব )

৩ মহামেদা। ( বৈষ্ণবকনিং ) ৪ পরমাত্মা।

মহাপুরুষদন্তা ( ক্রী ) মহাপুরুষত দন্তা ইব মূলানি যন্তাঃ। শতমূলী ( Asparagus Racemosus ) ( রত্নমালা )

মহাপুরুষদন্তিকা ( ক্রী ) মহাপুরুষদন্তা স্বার্থে কন দ্বিগুণ টাপ্ অত ইতং। মহাশতাবরী। ( রাজনিং )

মহাপুরুষবিদ্যা ( ক্রী ) মন্ত্রবিশেষ।

মহাপুরুষীয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। শঙ্করদেবনামক জনৈক মহাপুরুষ কর্তৃক প্রবর্তিত বলিয়া ইহার নাম মহাপুরুষীয় ধর্মসম্প্রদায় হইয়াছে। ১৩৭০ শকে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত আলাপুখুরি গ্রামে শিরোমণি-ভূঁয়া-কুসুমবরনামক জনৈক কারস্থের গৃহে শঙ্করদেব জন্ম গ্রহণ করেন। স্তনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার পিতা ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় লোক ছিলেন। পিতার বহু লালিত পালিত হইয়া তিনি অতি শৈশব হইতেই সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে তীর্থপর্যটনে প্রবৃত্ত হইয়া কাশী, উৎকল, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্বক নবদ্বীপে ত্রিচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। হরি-নামগ্রহণ তাঁহার মূলমন্ত্র হইয়াছিল। অনন্তর গৃহে প্রত্য-গত হইয়া আসাম প্রদেশে তিনি বৈষ্ণবধর্মপ্রচারে অগ্রসর হন। এখনও ঐ প্রদেশীয় ইতরভদ্র অনেক লোকেই তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমত অনুসরণ করিয়া চলে।

শঙ্করদেব সাকার দেবতার উপাসক ছিলেন না; প্রতিমা পূজার, এমন কি প্রতিমা-দর্শনেরও তিনি খোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—

“অন্ত দেবী দেব, না করিও সেব,  
না খাইবা প্রসাদ তার।

গৃহে না পশিবা, মৃত্তিকো না চাহিবা,  
ভক্তি হবে ব্যাভিচার ॥”

তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। সকলকেই হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। এক সময়ে তিনি একজন মুসলমানকে ‘জয় হরি নাম’ মন্ত্র দিয়া শিষ্যে গ্রহণ করেন। বলাই নামে এক মিকিরকে ও গোবর্দ্ধন নামে এক নাগাজাতীয়কেও তিনি নিম্ন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

কোচবিহারের অনেক লোক তাঁহার ধর্ম্মমতের অনু-বর্তন করিয়াছিল। তাঁহার প্রধান শিষ্যের নাম মাধবদেব।

তিনি এবং তাঁহার সহযোগী শঙ্করদেবের পুত্রবোন্তম, দামোদর প্রভৃতি অপরাপর প্রিয় শিষ্যেরা এই ধর্মপ্রচারে বিশেষ অমুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষীয় শূদ্র মহাস্ত ও ব্রাহ্মণকে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিতে পারে।

শঙ্করদেবের দুইটি প্রধান সত্র বা আশুড়া আছে। নওগাঁও-জেলার বড়দাওয়া গ্রামে একটি এবং গোহাটি জেলার অন্তঃপাতী বড়পেটা গ্রামে অপরটি। উভয় সত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নাম-ঘর ও ভাওনাঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। নাম-ঘরে প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও রাত্রিকালে, চল্লিশ, কখন কখন বা শত শত লোক একত্র হইয়া নামকীর্তনাদি করে। তথায় মধ্যে মধ্যে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সকলও পঠিত হয়। অন্তান্ত বৈষ্ণবদেবালয়ের স্তায় নামঘরে বিগ্রহপূজা হয় না, কিন্তু তথায় বৈষ্ণবদিগের পরম পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং সকলে তৎসম্মিথানে উপবিষ্ট হইয়া রাম, কৃষ্ণ, হরিনাম প্রভৃতি গান ও কীর্তন করে।

ভাওনাঘর অশ্বদেবীর রঙ্গালয়ের অনুরূপ। সাধারণ লোককে আমোদপ্রমোদে অমুরক্ত দেখিয়া শঙ্করদেব তন্মতাবলম্বিগণের ধর্ম্মানুরাগ-স্ফূর্তি ও আমোদউদ্রেকের জন্ত এই ভাওনাঘরের উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন। তিনি কৌশলের সহিত একুশ নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিলে ও শুনিলে সাধারণের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও কৌতুহল জন্ম আমোদ যুগপৎ পরিবর্দ্ধিত হইত। শিষ্যমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণের জন্ত ভাওনাঘরে প্রায়ই ঐ সকল নাটক অভিনীত হইত।

ইহাদের মধ্যে যাহারা সংসারভাগী, তাহারা কেবলিয়া-ভক্ত নামে প্রসিদ্ধ। বড়পেটা সত্রে নুনানিধিক দেড়শত কেবলিয়া ভক্ত বাস করে। বড়পেটা সত্রেও অনেকগুলি কেবলিয়ার বাস আছে। তাহারা প্রতিদিন চারিবার ভক্তিসহকারে নামকীর্তন করিয়া থাকে। এই সত্রে স্ত্রীলোকও আছে। কীর্তনাদির সময় তাহারা পুরুষদিগের সহিত মিলিত না হইয়া বাহিরে অবস্থান করে। এই সত্রে শঙ্করদেবের ও তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মাধবদেবের সমাধি আছে। এতদ্বিন্ন অল্প অল্প অনেক গ্রামেও নামঘর দেখা যায়; কিন্তু তথায় তাদৃশ ধর্ম্মোৎসাহের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কখন কখন লোকে তথায় পুস্তকত মানসিক বা বিশেষ কোন শঙ্করনিবন্ধন নামকীর্তনাদি করিয়া থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শঙ্কর সাকারবাদী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সাম্প্রদায়িকগণ সাকার উপাসক নয়, একুশ বলা যায় না। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে দেবাবতার

বলিয়া স্বীকার করে। প্রত্যেক সত্রে এক একখণ্ড প্রস্তরে শঙ্করদেবের চরণচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রতি তাহারা বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং বিগ্রহপূজার স্তায় তাঁহার বংশাবলী নামক চরিত্র-গ্রন্থের পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের মতে দেবপ্রতিমাদির দর্শন অর্চনাদি নিষিদ্ধ হইলেও বিষ্ণুবিগ্রহবিষয়ে সেরূপ প্রতিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক মহাপুরুষীয় গৃহস্থের বাটিতে দোলদুর্গোৎসবাদিও হইয়া থাকে।

শঙ্করদেব সাধুভাষা ও ব্রজভাষা-মিশ্রিত আসামদেশীয় ভাষায় কীর্তন, নামমালা ও ভাগবতাদি পুস্তকরচনা, লঙ্কন ও অনুবাদ করিয়া যান। পুস্তকলিখিত বড়দাওয়া-সত্রে একটি পুরাতন হরিতকী বৃক্ষ আছে। তথাকার লোকেরা বলে, তিনি প্রতিদিন সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেন। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মাধবদেব নামঘোষা, রত্নাবলী প্রভৃতি কএকখানি পুস্তক লিখিয়া যান। অনেকে বলেন, নামঘোষার প্রথমংশ শঙ্করদেবের সঙ্কলিত। তাঁহার মৃত্যু হইলে মাধবদেব সেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।

নামঘোষার বচন বা শ্লোকসমূহ লোকে সঙ্গীতের স্তায় গান করিয়া থাকে। পুস্তকের প্রথমমাংশে অল্প অল্প গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি সংস্কৃত বচন বিদ্যমান দেখা যায়, তাহাতে হরিনামের অপার মহিমা পরিকীর্তিত হইয়াছে।

“তদ্ভিনং দুর্ভিনং মন্ত্রে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্ভিনম্।

যদ্বিনং হরিসংলাপকথা-পীযুষবজ্রতম্॥” (নামঘোষা)

মহাপুষ্প (পুং) ১ কুন্দবৃক্ষ, কুন্দগাছ। ২ কৃষ্ণমূল্য, কালমূল্য। ৩ রক্তকাকুন। ৪ লবণবৃক্ষ। (বৈজ্ঞকনিং) ৫ কীটভেদ। (সুশ্রুত) (ত্রি) ৬ মহাপুষ্পবিশিষ্ট।

মহাপুষ্পা (স্ত্রী) মহৎ প্রশস্তং পুষ্পমন্তাঃ। ১ অপরাজিতা। (শব্দচং) ২ মহাকোশাতকী, চলিত ধুঁতুল। (বৈজ্ঞকনিং)

মহাপূজা (স্ত্রী) বিশিষ্ট প্রকারের পূজা। শরৎকালের দুর্গোৎসবই মহাপূজা বলিয়া গণ্য।

“শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।

তস্মিন্ পক্ষে বিশেষণ পূরশ্চরণতৎপরঃ॥”

(শাক্তানন্দতরঙ্গিনী)

মহাপুত (ত্রি) অতি পবিত্র।

মহাপুরুষ (পুং) ১ মহাপুরুষ, শ্রেষ্ঠ মনুষ্য। ২ নারায়ণ।

মহাপূর্ণ (ত্রি) ১ সম্পূর্ণ। (পুং) ২ গারুড়গণের অধিপতিভেদ।

মহাপৃষ্ঠ (পুং) মহৎ বিপুলং পৃষ্ঠং বস্ত্র। ১ উট্ট, উট। (রাজনিং) (ত্রি) ২ বৃহৎ পৃষ্ঠ। ৩ ঋষেদের ৪র্থ অষ্টকের অষ্টমেধ যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় ৬ষ্ঠ অম্ব্যাক।

মহাপৈঙ্গা (ক্ৰী) আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রোক্ত বৈদিকগ্রন্থবিশেষ।  
মহাপৈণীনদি (পুং) একজন প্রাচীন স্থতিকাৰ।

- মহাপৈশাচিকসূত্র (ক্ৰী) ঘৃতৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত  
প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, ককার্থ জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেন্দী,  
জলপদ্ম, (মতান্তরে ত্র্যক্ষীশাক), আলকুনীবীজ, ষট, বলা-  
ডুমুর, জয়িত্রী, কাকোলী, চোরকাঁচকী, কটুকী, ছোট এলাইচ,  
বারাহীকন্দ, মউরি, শুল্ফা, গুগ্গুল, অপরাঞ্জিতা, আমলকী,  
রাশা, গন্ধরাশা, গন্ধভাঙ্গুলিরা, বিছটী, ও শালপাশি, এ সকল  
মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের, পরে ঘৃতপাক  
বিধানানুসারে ইহা পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত পান  
করিলে উন্মাদ ও অপম্মারাদি নানারোগ নষ্ট হয় এবং বুদ্ধি  
ও স্থিতি প্রকৃতি হইয়া থাকে। (তৈষজ্যরত্নাঃ উন্মাদাধিকাঃ)

মহাপোটিগল (পুং) শরতৃণবিশেষ। (হেম)

মহাপ্রকাশ (পুং) অবতারাদির আবির্ভাব বা বিকাশ।

মহাপ্রকৃতি (স্ত্রী) মহতী শ্রেষ্ঠা প্রকৃতিৰ্জগন্মূলকারণঃ।  
ভগবতী ঈশা। ইহাই জগতের মূলকারণ।

“চিতিশ্চৈতন্যভাবাঘা চেতনা বা চিতিঃ স্মৃতি।

মহং ব্যাপ্য হিতা সৰ্বং মহা বা প্রকৃতস্বতা ॥”

(দেবীপুরাণ ৪৫ অধ্যায়)

মহাপ্রজাপতি (পুং) ১ বিষ্ণু।

মহাপ্রজাপতী, শাক্যমুনির পিতৃব্যপত্নী গৌতমী। ইনি শাক্য  
সিংহকে লালনপালন করেন।

মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র (ক্ৰী) বৌদ্ধগ্রন্থ বিশেষ।

মহাপ্রণাদ (পুং) চক্রবর্তী ভেদ।

মহাপ্রতাপ (ত্রি) অতিশয় প্রভাবযুক্ত।

মহাপ্রতিভান (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মহাপ্রতিহার (পুং) উচ্চপদস্থ রক্ষিবিশেষ।

মহাপ্রদান (ক্ৰী) বৃহৎ দান।

মহাপ্রপঞ্চ (পুং) পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ।

মহাপ্রভ (ত্রি) মহতী প্রভা যথেষ্ট। অতিশয় দীপ্তিযুক্ত।

“ততশ্চক্রং মহাঘোরং সহস্রারং মহাপ্রভম্ ॥”

(হরিবং ভবিষ্যৎ ২৯।১২)

মহাপ্রভা (স্ত্রী) মহতী চান্দ্রো প্রভা চেতি। ১ মহতী দাপ্তি।

২ বস্তিকালোক। ৩ নদী বিশেষ। (হিমবংখঃ ৪০।৬২)

মহাপ্রভাব (পুং) অত্যধিক বীৰ্যশালী।

মহাপ্রভু (পুং) মহাং শাস্ত্রো প্রভুশ্চেতি। ১ পরমেশ্বর। ২ চৈতন্য।

“বন্দেহনন্তাত্মতৈশ্বৰ্য্যং ত্রীচৈতন্যং মহাপ্রভম্ ॥

নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ ত্বাৎ সদাচারপ্রবর্তকঃ ॥”

• (হরিতত্ত্ববিঃ ৩ বিঃ)

৩ রাজা। ৪ সন্ন্যাসী বা সাধুব্যক্তি। ৫ ইন্দ্র।

৬ শিব। ৭ বিষ্ণু।

মহাপ্রলয় (পুং) মহাশাস্ত্রো প্রলয়ো জগতামবসান-  
ধেতি। ত্রিলোকনাশ, পর্যায়—সংহার। (হ্যায়ুধ)

কালিকাপুরাণে এই প্রলয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত  
আছে—মহন্তর শব্দে মহুর অধিকার কাল। একজন মহু  
যতদিন প্রজাপালন করেন, ততদিন তাঁহারই নামে মহন্তর  
প্রচলিত হয়। একসপ্ততি দৈবযুগে এক এক মহন্তর।  
চতুর্দশ মহন্তরে এক কল্প, এই কল্পই বিধাতার দিন। ব্রহ্মার  
দিবাসানে জগতে অত্যন্ত উৎপাত হইতে থাকে। মহামারা  
যোগনিদ্রা ব্রহ্মাকে আশ্রয় করেন। সেই লোকপিতামহ  
ব্রহ্মাও অমিততেজা বিষ্ণুর নাভিকমলে প্রবিষ্ট হইয়া স্বপ্নে  
নিদ্রা যান। অনন্তর বিষ্ণু স্বপ্নঃ ত্রৈলোক্যসংহর্তা রুদ্ররূপী  
হইয়া পুষ্কর ত্রায় সমস্ত ভুবনমণ্ডল বিনষ্ট করিতে থাকেন।  
তিনি বায়ু ও বহির সাহায্যে ত্রিলোক দাহ করিতে প্রবৃত্ত  
হইলে ক্রশাহুতাপ-পীড়িত মহলোকবাসিগণ তাপান্ত হইয়া  
জনলোকে গমন করেন। অনন্তর রুদ্র প্রলয়কালীন  
জলদজাল দ্বারা মহাবৃষ্টি করিয়া প্রলোক পর্যন্তব্যাপী  
উত্তীর্ণ তরঙ্গাকুল জলরাশি দ্বারা ভুবনমণ্ডল পরিপূর্ণ  
করেন। পরে তিনি ত্রৈলোক্যকে নিজ জঠরাভ্যন্তরে রাখিয়া  
নাগপর্ধ্যাকে শয়ন করেন। যখন কালানলে সমস্ত ভুবন  
মণ্ডল দগ্ধ হয়, এবং ত্রৈলোক্যাগ্রে পরিভূত পরমেশ্বর যোগ-  
নিদ্রার বশবর্তী হন, তখন অনন্ত পৃথিবী ছাড়িয়া তাঁহার  
নিকট গমন করেন। অনন্ত ত্যাগ করিলে পৃথিবী স্বর্ণমধ্যে  
অধোগত হইতে হইতে কৃষ্ণপৃষ্ঠে পতিত হইয়া যেন খণ্ড বিখণ্ড  
হইয়া পড়ে। তখন কৃষ্ণ পদনিকর দ্বারা ব্রহ্মাওনিম্ন অব-  
লম্বনপূর্বক জলোপরি ভাসমানা পৃথিবীকে পুষ্টোপরি ধারণ  
করেন। এই পৃথিবী ব্রহ্মাও খণ্ডে পতিত হইলে একেবারে  
চূর্ণ হইয়া বাইবে ভাবিয়া কৃষ্ণরূপী নারায়ণ তাহাকে ধারণ  
করেন। পৃথিবী চঞ্চল জলরাশি-সংসর্গে দোহলামান হইলে  
কৃষ্ণ নিজ পৃষ্ঠকে বহুতর ব্রহ্মাও ধারণার্থ বিস্তৃত করেন।

পরে যথার কীরোদসমুদ্রে নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত নিদ্রা-  
ভিলাষী, অনন্ত তথায় বাইয়া ত্রৈলোক্য-গ্রাসভূত পরমে-  
শ্বরকে মধ্যমফণা দ্বারা ধারণ করেন। পূর্বফণা পদ্মাকারে  
উর্দ্ধে বিস্তৃত করিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করেন, দক্ষিণ ফণা  
তাহার উপাধান হয়, উত্তরফণা পাদোপাধান (পায়ের বালিশ)  
এবং পশ্চিম ফণা তালভূত স্বরূপ হয়, ইহা দ্বারা অনন্ত সঞ্চাদ  
বাজন করিতে থাকেন। অনন্ত এইরূপে নিজ দেহকে  
বিষ্ণুর শয্যা করিয়া দেন। তৎকালে নারায়ণের নাভিকমলে

ব্রহ্মা এবং জঠরভাস্তরে বৈরলোকা বিরাজিত থাকেন। ইহাই  
মহাপ্রলয়। (কালিকাপু. ২৭ অ.) [প্রলয় শব্দ দেখ।]

মহাপ্রবুদ্ধ (পুং) বুদ্ধিতারতন।

মহাপ্রসাদ (পুং) মহাশাস্ত্রসৌ প্রসাদশ্চেতি। বিষ্ণু নৈবেদ্যাদি।

“পাদোদকঞ্চ নির্দ্রাণ্য নৈবেদ্যঞ্চ বিশেষতঃ।

মহাপ্রসাদ ইত্যুক্তা গ্রাহ্যঃ বিষ্ণোঃ প্রযত্নতঃ॥” (একাদশীত.)

বিষ্ণুর পাদোদক, নির্দ্রাণ্য ও নৈবেদ্য মহাপ্রসাদ  
বলিয়া খ্যাত।

জগদ্রাধ দেবের অন্নপ্রসাদকে মহাপ্রসাদ কহে। ২ অতি  
শয় প্রসন্নতা। মহান্ প্রসাদোহস্ত। ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩৬)

মহাপ্রসূত, অতীর্ক সংখ্যাত্তেদ।

মহাপ্রস্থান (স্ত্রী) প্রস্থায়তেহস্মিন্গতি প্র-স্থান-লুট্। মহৎ  
প্রস্থানং, মহাপথঃ তত্র গমনং। মহাপথ-গমন, মরণ  
উদ্দেশ্য করিয়া হিমালয় পর্য্যন্ত গমন। কলিতে ইহা নির্দিষ্ট।  
কোন ব্যক্তি মরণ ইচ্ছা করিয়া মহাপ্রস্থান করিবে না,  
মোহ-বশতঃ যদি কেহ করে, তাহা ইহিলে তাহার প্রারশ্চিত্ত  
করিতে হইবে।

“সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।

দ্বিজানামসবর্ণাসু কত্বাহুপবসন্তথা॥

দেবরোণ স্ততোংপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।

মাংসাদনং তথা শ্রাঙ্কে বানপ্রস্থাপ্রমত্তথা॥

দত্তার্যশ্চৈব কত্বায়াঃ পুনর্দানং বরস্ত চ।

দীর্ঘকালঃ ব্রহ্মচর্য্যং নবমেধাংখমেধকৌ॥

মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মথং।

ইমান্ ধর্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহর্মণীষিণঃ॥” (উদ্ধাহতঃ)

মহাপ্রস্থানিক (ত্রি) ১ মহাপ্রস্থান-সম্বন্ধীয়। ২ মহাভারতের  
১৭শ পর্ক।

মহাপ্রাক্ত (পুং) অতিশয় জ্ঞানী।

মহাপ্রাণ (পুং) মহাস্তো দীর্ঘকালস্থায়িনঃ প্রাণা যন্ত।

১ দ্রোণকাক। (রাজনিং) ২ বর্ণ বিশেষ। এই বর্ণ যথা—খ, ঘ,

ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ঞ, ণ, ত, থ, দ, ধ, স ও হ এই সকল বর্ণ মহা-

প্রাণ। “বর্ণাণাং প্রথমতৃতীয়পঞ্চমাঃ প্রথমতৃতীয়বমো য র

ল বা শচলপ্রাণাঃ অন্তে মহাপ্রাণাঃ” (সিদ্ধান্তকৌ.) (ত্রি)

৩ মহাবল। (ভাগবত ৬।১১।৬)।

মহাপ্রীতিবেগসংভবমুদ্রা (স্ত্রী) মুদ্রাবিশেষ।

মহাপ্রীতির্হা (স্ত্রী) তত্ত্বোক্ত দেবভাভেদ।

মহাফলক (পুং) নাগভেদ।

মহাফল (পুং) মহৎ পুজাদৌ প্রশস্তং পুজাং বা ফলমন্ত।

১ বিদ্যবৃক্ষ। ২ নারিকেল বৃক্ষ। ৩ তালবৃক্ষ। ৪ পীলুবৃক্ষ।

মহচ্চ তৎফলশ্চেতি। (স্ত্রী) ৫ বৃহৎ ফল।

“শ্রোত্রিয়ান্যৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি দাতৃভিঃ।

অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্॥” (মহু ৩।২৮) •

স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাফলা—৩ ইন্দ্রবারুণী। (জটায়র) ৪

রাজজম্বু। ৫ কটুতৃণী। ৬ মহাকোশাতকী। ৭ মধুর মাতুলঙ্গ,

মিঠলেবু, কমলালেবু। ৮ বনবীজপূরক। ৯ নীলী। ১০ নাগ-

বলা। (রাজনিং)

মহাফেজ খাঁ, গুজরাতের অধিপতি সুলতান মাক্দুদ বিগাড়ার  
অধীনস্থ আফগানবাদ প্রদেশের জৈনিক ফৌজদার। প্রকৃত  
নাম জমাল-উদ্দীন-শিলাদার। সুলতান ২য় মুজাফর ও  
বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ  
করিয়াছিলেন।

মহাফেজখানা, মুসলমানদিগের বিচারদালতের নির্দিষ্ট  
গৃহবিশেষ। এখানে পুণ্ডরী মকদ্দমাদির নথিপত্র রক্ষিত  
থাকে।

মহাফেণা (স্ত্রী) মহতী ফেণা। ১ হিণ্ডীর, সমুদ্রফেণা। (শব-  
চক্ষিকা) ২ কাটল নামক মংস্ত্রাণ্ডি (Osso sepiæ)

মহাবনিজ্ (পুং) শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী।

মহাবন্ধ (পুং) যোগপ্রকরণে হস্তপদাদির বন্ধবিশেষ।

মহাবন্ধ্যা (স্ত্রী) চিরবন্ধা রমণী।

মহাবন্ধ্র (পুং) গুহাশায়ী লঙ্কবিশেষ।

মহাবল (স্ত্রী) মহদতিশয়িতং বলং সামর্থ্যমন্ত্যং মহৎ বল-  
মন্ত্বেতি বা। ১ সৌসক। (হেম) (পুং) মহদ্ উৎকৃষ্টং বলং  
ঐশ্বর্য্যং যন্ত। ২ বুদ্ধ। (ত্রিকাং) ৩ পিতৃগণবিশেষ।

“মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমান্ মহাবলঃ।

গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৃণাং পাপনাশনাঃ॥”

(মার্কণ্ডেয়পু. ৯৬।৪৬)

৪ বায়ু। (ত্রি) ৫ বলীয়ান্, অতিশয় বলবান্। (পুং)

৬ তামস ও রৌচ্য মনুষ্যের ইন্দ্র। ৭ শিবাহুচরভেদ।

৮ নাগভেদ।

মহাবল, ১ জৈনিক জৈন রাজা। ২ জৈনিক কবি। শাস্ত্র-  
কৃত কোষের শেষ ভাগে ইহার নামোল্লেখ আছে।

মহাবলশাক্য (পুং) রাজভেদ।

মহাবলা (স্ত্রী) বলাভেদ, পীতবাটালক, পর্যায়—শ্যামাপ্রোক্তা,  
অতিবলা, পীতপুষ্পী। (রত্নমালা) ২ পেটকা, চলিত পেটারি।

৩ পিল্লা। ৪ নাগাবৃক্ষ। ৫ ধামন বৃক্ষ, ধাতুরা গাছ।

(বৈজ্ঞানিকনিং) ৬ স্কন্দাহুচরমাতৃভেদ। ৭ অতীর্ক সংখ্যাত্তেদ।

৮ শিবলিঙ্গভেদ।

মহাবলাফ (স্ত্রী) অতীর্ক সংখ্যাত্তেদ।

মহাবলাতৈল (স্রী) তৈলোষধি বিশেষ। ইহার প্রস্তুত-  
প্রণালী,—তিলতৈল ৪ সের, বেড়েলামুলের কাথ ৩২ সের,  
মিলিত দশমুলের কাথ ৩২ সের, যব, কুলুণ্ড ও কুলুখ কলায়ের  
কাথ মিলিত ৩২ সের, হুপ্ত ৩২ সের, ককার্থ জীবক, শ্বষভক,  
মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, মুগানি, মাষানি,  
জীবন্তী, ষষ্টিমধু, সৈন্ধব, অগুরু, শ্বেতধুনা, সপলকাঠ, দেবদারু,  
মজ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, পীতচন্দন, জটামাংসা,  
শৈলগু, তেজপত্র, তগরপাছকা, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ-  
পদ্ধা, ও পুনর্বা মিলিত ১ সের, এই সকল দ্রব্যো তৈলপাকের  
বিধানানুসারে ইহা পাক করিতে হইবে। এই তৈল মর্দন  
করিলে সকল প্রকার বাতব্যাধি আন্ত প্রশমিত হয়।

( ভৈষজ্যরত্নাঃ বাতব্যাধিরোগাধিকার )

মহাবলাদি (পুং) পাতনবিশেষ, গোরক্ষ চাকুলে ৭ মূল ১ তোলা,  
শুঙ্গী ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, কাঠের জালে দিহ্ন করিয়া  
৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। এই পাতন দুই বা তিন দিন  
সেবন করিলে শীত, কল্ম, দাহ ও বিধমজ্বর নষ্ট হয়।

( ভৈষজ্যরত্নাঃ অরাদিকার )

মহাবলি ( পুং ) দৈত্যপতি বলি।

মহাবলিন্ ( ত্রি ) অতিশয় বলশালী।

মহাবলিপুর, মাজার-প্রদেশের চেন্দ্রলপট জেলার অন্তর্গত  
একটি অতি প্রাচীন গ্রাম, মাজার সহর হইতে ৩২ মাইল  
দক্ষিণে এবং চেন্দ্রলপট হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।  
অক্ষা° ১২°৩৬'৫৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°১৩'৫৫" পূঃ। স্থানীয়  
লোকের নিকট মহাবলিপুর, মাংলিপুর, মামলপুর ও মলপুর  
প্রভৃতি নামেও পরিচিত। ইংরাজগণ The Seven Pagodas  
নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণরথ, ধর্মরাজ বা  
ধর্মরথ, ভীমরথ, অর্জুনরথ ও দ্রৌপদীরথ এই পঞ্চ নামে অভি-  
হিত সুবৃহৎ একস্তুম্ভে নিখিত প্রস্তরগৃহ এবং সমুদ্রতীরবর্তী  
বিষ্ণু ও শিবমন্দির হইতে এই স্থান ইংরাজগণের নিকট The  
Seven Pagodas বা সপ্ত মন্দির নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতে ঐ সকল রথাদি সর্বপ্রধান দ্রষ্টব্য স্থান  
বলিয়া পরিগণিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্য মাত্রেই এই স্থান একবার  
দর্শন করা উচিত। এখানে দেখিবার ও আলোচনা করিবার  
অনেক স্মৃতিস্মারক আছে।

এখানকার প্রত্নতত্ত্বগুলি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত  
হইতে পারে :—১ম, গ্রামের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ৫টি রথ ;  
২য়, গ্রামের পশ্চিমাংশে বিস্তৃত শুকা, ও একস্তুম্ভগঠিত মূর্তি  
প্রভৃতি ; ৩য়, সমুদ্রতীরস্থ বিষ্ণু ও শিবমন্দির, ইহার মধ্যে  
শেষোক্ত মন্দিরটি সমুদ্রগর্ভশায়ী হইয়াছে।

এখানকার ভাস্কর ও শিল্প-নৈপুণ্যের মধ্যে কৃষ্ণমণ্ডপ সর্ব-  
শ্রেষ্ঠ ও সুদৃশ্য। এই মণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ, ইন্দ্ৰের  
ক্রোধ হইতে ব্রহ্মহু গো ও গোপাদির রক্ষাচিত্র অতিসুন্দর।  
কৃষ্ণের নিকট গাভীগণ বৎসকে স্তম্ভদান করিতেছে, তাহার  
দক্ষিণ পার্শ্বে একটি জীবন্ত বৃষমূর্তি রহিয়াছে, দেখিলে বাস্ত-  
বিক চমৎকৃত হইতে হয়, এমন সুঠাম সজীব বৃষমূর্তি আর  
কোথাও দেখা যায় না। ইংরাজদর্শকগণ শ্রীকৃষ্ণের স্থানে  
ইন্দ্ৰকে এবং ইন্দ্্রের ক্রোধের স্থানে বলের প্রতি মরুদৃগুণের  
ক্রোধের উল্লেখ করিয়া ক্রমে পতিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণমণ্ডপের উত্তরে অনতিদূরে অর্জুনের 'তপোমণ্ডপ',  
ইহা দৈর্ঘ্যে ২৬ ফিট ও উচ্চে ৪৩ ফিট এক সুবৃহৎ প্রস্তরে  
নিখিত। ইহার ভাস্করকাণ্ড অপূর্ণ, ভারতে এমন ভাবের  
কাণ্ড আর নাই। স্থাপত্য ও শিল্পবিদ্য কালগুপ্ত সাহেব এই  
গঠন দেখিয়া লিখিয়াছেন, এখানকার স্থাপত্যো নানাপ্রকার  
প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইহার আলোচনায় ভারতীয় দেবতত্ত্বের  
এক অভিনব অধ্যায় বাহির হইতে পারে। ঠিক কোন সময়ে  
এই পুরাকীর্তি সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই,  
তবে যে খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীরও দুই এক শত বর্ষ পূর্বে  
গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।  
পথের ধারে পাথরের স্তম্ভের নিকট একদল বানরের মূর্তি আছে।  
পাথরে বানরের স্বভাবোচিত কি চমৎকার হাব ভাব খোদিত  
হইয়াছে! ইহার নিকট দক্ষিণ দিকে যেখানে সারি সারি  
গুহা খোদিত হইয়াছে, তাহারই মধ্যে এক ধ্যানস্থ বিরাট  
পুরুষের মূর্তি রহিয়াছে, মূর্তিটি হেলান। এই মূর্তি লম্বে  
প্রায় দেড় হাজার ফিট হইবে। এত বড় ধ্যানস্থ মূর্তি  
ভারতে কেহ কি কোথায় দেখিয়াছে? ইহাকে অনেকে  
দৈত্যপতি বলির মূর্তি বলিয়া জানে। আবার কেহ কেহ  
ইহাকে জৈনকীর্তি ভাবেন।

ঐ বিরাট মূর্তির নিকট ১৪১৫টি গুহা ও মন্দির আছে,  
প্রত্যেক গুহা এক একটি শ্মশির আশ্রম বলিয়া গণ্য। ইহাতে  
কারিকরী ও আধুনিক শিল্পনৈপুণ্যের অভাব নাই।

ফাগুগন্ সাহেব লিখিয়াছেন, এখানকার সমুদ্রতীরবর্তী  
পঞ্চরথই সর্ব প্রাচীন ও পুরাকীর্তির জলন্ত নিদর্শন। এই পঞ্চ  
রথের মধ্যে একটি রথ অপর চারিটি হইতে কতকটা দূরে  
আছে, তাহার চারিদিকে শৈলমালা, তাহাই অর্জুনরথ নামে  
খ্যাত। এই অর্জুনরথ ছাড়া অপর চারিটি রথ পাশাপাশি  
উত্তরদক্ষিণমুখে দাঁড়াইয়া আছে, যেন একখানি বৃহৎ পাথর  
বা পাছাড় কাটিয়া এই রথ চারিটি প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তর-  
দিকে প্রথম রথটি বেণী বড় নয়, ইহা একটি পর্ণশালা মাত্র।



ইহার বহিরাবর্তন ১১ বর্গফিট ও উচ্চ ১৬ ফিট। এটি সম্পূর্ণ হইলেও ইহার মধ্যস্থলে সিংহাসন বা কোন দেব-মূর্তি নাই। তাহার দক্ষিণাংশে তাহার অমুকেরণে আর একটি রথ রহিয়াছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ১৬ ফিট, প্রস্থে ১১ ফিট এবং উচ্চ ২০ ফিট। তৃতীয়টির আকার ভিন্ন প্রকার, তাহার ছাদ রেলের মালগাড়ীর খাঁজে, তাহা দৈর্ঘ্যে ৪২ ফিট, প্রস্থে ২৫ ফিট এবং উচ্চ ২৫ ফিট। ইহার বহির্ভাগে যথেষ্ট কাজ আছে, কিন্তু অন্তর্ভাগে কেবল এক স্থানে যেন কোন দৈব-চূর্ণটনার সমস্ত অংশ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ভূমিকম্পে অথবা অপর কোন কারণে ইহা ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার মধ্য দিয়া ভিতরে আলো গিয়া থাকে। সূর্য শেষের রথটি দেখিতে কোতুকপ্রদ। ইহা ২৭ ফিট দীর্ঘ, ২৫ ফিট বিস্তৃত এবং ৩৪ ফিট উচ্চ। ইহার বহির্ভাগে যথেষ্ট স্থাপত্য রহিয়াছে। কিন্তু ভিতরের দিকে তেমন কাণ্ড নাই। কেহ কেহ মনে করেন, উপরিভাগ সমাধা হইলে পাছে ফাটিয়া পড়ে, এই ভয়ে কেহ ভিতরে গিয়া কাজ করিতে সাহসী হয় নাই।

উক্ত চারিটি রথ ছাড়াইয়া কিছু দূরে অর্জুনরথ অবস্থিত। এই রথের গঠন অপর চারিটি হইতে ভিন্ন। ইহার কুটুরী পশ্চালার মত। এই রথটি মাত্র কি গোপুর কি ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন যে, চতুরঙ্গ রথগুলি বৌদ্ধদিগের বিহারের অমু-করণে গঠিত।

উক্ত অপূর্ণ রথগুলির স্থাপনিতা কে? তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। এই সকল রথ হইতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কি ৭ম শতাব্দের অন্ধরে খোদিত বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে রথনিষ্ঠাতার কোন পরিচয় নাই। এখানে প্রবাদ আছে, কুরুধরগণ এই সকল রথ প্রস্তুত করিয়াছে। তাহারা প্রথমে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মাবলম্বী ছিল, চালুক্য-রাজগণের প্রভাবে তাহারা শৈব বা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে চালুক্য-রাজ-গণের যত্নে এবং উক্ত কুরুধরগণের হস্তে এই সকল রথ প্রস্তুত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, কুরুধরেরা পূর্বে যে প্রণালীতে স্ব স্ব গৃহাদি নিষ্কাণ করিত, সেই ধরণেই এই সকল রথ প্রস্তুত হইয়াছিল। নীলগিরির পাহাড়ীগণ এখনও যে ধরণে ঘর করিয়া থাকে, ভীমরথটি যেন সেই ধরণে নিৰ্ম্মিত। দ্রোণদীরথ দেখিলেই মনে হয় যে, দক্ষিণ ভারতে বেক্রপ আটচালা প্রস্তুত হয়, ইহা যেন সেইরূপ খড় দিয়া ছাইবার ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল। শাক্তিপাত্রে এখনও

বেক্রপ দেবালয় প্রস্তুত হইয়া থাকে, অর্জুন ও ধর্মরাজরথ সেই ধরণের। বাহাই হউক সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে যে এই সকল কীর্তি সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, উক্ত রথগুলি বাতীত এখানে কতকগুলি খোদিত-গুহা আছে, উত্তরভারতীয় গুহামন্দিরগুলির মত এগুলি তেমন শিল্পসৌষ্ঠবসম্পন্ন নহে, তবে ছ একটি মন্দ নহে, গাড়াপুরী ও বাণামির অমুকেরণে গঠিত। এগুলি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

বলিরাঙ্গের মহামূর্তির নিকট তাহার অমুকের বামন পঞ্চরাক্ষসমূর্তি, তাহাদের রাণীগণের মূর্তি, চারিজন বীর, পাঁচজন সন্ন্যাসী এবং গুহামন্দির মধ্যে ঋষিমূর্তি বিরাজিত। তাহার চারিদিকে সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতা, হরিণ প্রভৃতির মূর্তিও আছে।

এখানকার শৈলমালার মধ্যভাগে বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্য-গণের মূর্তি, তাহার নিকটে নাগরাজ বামুণী এবং মর্পচক্র রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণদিকে কতকগুলি রাজা, রাণী, গুরু ও নানা পশুপক্ষীর মূর্তি আছে।

বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যমূর্তির নিকট কতকগুলি হস্তী ও অগঠিত মূর্তি আছে। এই সকল মূর্তিতে নিষ্ঠাতার যথেষ্ট শিল্পকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। ফাগুসন সাহেবের মতে এখানকার মন্দিরাদি খৃষ্টীয় ১১শ ও খোদিত-গুহাগুলি তাহার কিছু পরে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।

এখানকার সমুদ্রতীরবর্তী শিবমন্দির এখন সমুদ্রগর্ভে গেলেও বরাহস্বামী মন্দির এখনও অভীতকীর্তি ঘোষণা করিতেছে। এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও নারায়ণ-মূর্তি একত্র থাকায় শৈব ও বৈষ্ণবের মিলন-চিত্র দেখিতে পাইবে। মহাবলিপুর হইতে রোমক, চান, পারস্ত প্রভৃতি স্থানের অতি প্রাচীন মুদ্রা সকল বাহির হইয়াছে। ইহার এক ক্রোশ উত্তরে শালুবাড়ুপ্পং নামক গ্রামেও কতকগুলি গুহা, শিলা-লিপি ও স্থাপত্যের নিদর্শন রহিয়াছে।

মহাবলেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গভেদ। গোকর্ণেশলিঙ্গ।

মহাবলেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার জৌলী উপবিভাগের অন্তর্গত একটি স্বাধীনবাস। পশ্চিম-ঘাট পর্বতের মহাবলেশ্বর-শাখার উপরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ৫৮' ৫" এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪২' ৩৫" পূঃ।

পশ্চিমঘাট পর্বতের বিস্তীর্ণ সমতল ৪৭০০ ফিট উচ্চ অধিতাকোণরি স্থাপিত হওয়ার, এই স্থান সাধারণের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। গিরিশঙ্করের নিম্নলিখিত বায়ু, নিম্নলিখিত নিম্নলিখিত সলিলময়, প্রশান্ত প্রকৃতির অপূর্ণ সৌন্দর্য ও

সাক্ষ্য বিহারোপযোগী প্রস্তুত মরমান বা পলসমূহ এই স্থানের রক্ষণীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। স্বাস্থ্যাবেদী দুর্ধ্বলকার ব্যক্তিবর্গ এই স্থানে স্থখে শকটায়োহণে ভ্রমণ করিতে পারে। এই অধিত্যকাক্ষ্মে আরোহণ করিবার পরিষ্কার পথ থাকার পীড়িতদিগের আগমনপক্ষে বিশেষ কষ্ট হয় না। বোম্বাই হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা-রেলপথে পুণার আসিয়া অথ বা বানারোহণে এখানে উপস্থিত হওয়া যায়। দুর্ধ্বল রোগীদিগের হহাতেও কষ্ট হয় দেখিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সার্বিক নদী মুখে দাসগাঁও পর্যন্ত বাষ্পীয় পোতারোহণে আসিবার পন্থা আবিস্কৃত হইয়াছে। দাসগাঁও হইতে সমতল ক্ষেত্র ও ঘাটশ্রেণী উন্নয়ন করিয়া ৩৫ মাইল পথ অতিবাহন করিলে মহাবলেশ্বরে উপনীত হওয়া যায়।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্তা সর্ জন্ ম্যাকম সাতারা-রাজ্যের নিকট হইতে অল্প সম্পত্তির বিনিময়ে এই স্বাস্থ্যপ্রদ গিরিপ্রদেশ হস্তগত করেন। এখনও ম্যাকম-পেট নামক গ্রাম তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। এই স্থানের উচ্চতা ঠানা জেলার মাথেরান্ (২৪৬০ ফিট) হইতে অধিক হওয়ায় এখানকার আদর দিন দিন পরিবর্তিত হইতেছে। বর্ষাকালে অধিক পরিমাণে বারিধারা পতিত হওয়ায় এই স্থান তৎকালে বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। বসন্ত ও শরৎ কালে এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ হয়। ঐ সময়ে বোম্বাই গবর্নমেন্টের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী এই শৈল্যবাসে আসিয়া রাজকাব্য পথ্যালোচনা করিয়া থাকেন।

মিউনিসিপালটির অধীনে থাকিয়া এই নগর বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এখানে গির্জা, পাঠাগার, ওষদালয়, হোটেল ও নানাবিনতিগৃহ বিরাজিত আছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার বিখ্যাত ফেরী ইন্ ও পাঠাগার স্থাপিত হয়। এত-  
ত্তির যুরোপীয়দের বান্ধিত শতাব্দিক বাঙ্গালা নির্মিত হইয়াছে।

মহাবলেশ্বর বর্তমান কালে একটা প্রধান শৈবতীর্থ বলিয়া গণ্য। রুদ্রপ্রাণে সছাদ্রিথও মহাবলেশ্বর-মাহাত্ম্যে, কুমারমাহাত্ম্যে ও পদ্মপুরাণের কান্তিকমাহাত্ম্যে এই স্থানের মাহাত্ম্য সাবস্তার বর্ণিত আছে।

• মহাবলেশ্বর-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে,—

‘পান্ডবকলে মহাবল ও অতিবল নামে দুই জন মহাবলশালী দৈত্য ছিল, তাহাদের উৎপাতে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হরিহর ব্রহ্মাদ সকল দেবতা তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য মূরু করিতে আসেন। অবশেষে ভীষণ যুদ্ধের পর বিষ্ণুর হস্তে অতিবল নিহত হইল। আত্মার নিধনে মহাবল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ষোড়শতর মারাত্মক আরম্ভ করিল। দেবতাগণ

বার আর কি? সকলে মহামার্যর শরণ লইলেন। মহামার্য দেবগণের রক্ষার জন্য মহাবলকে মোহিত করিলেন। তখন মহাবল দেবগণকে সযোজন করিয়া বলিল যে, দেবগণ আমি লুপ্ত হইয়াছি। বর প্রার্থনা কর। দেবগণও চাহিলেন, আমাদের বধ্য হও। দৈত্য তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আনা-ইল, ‘দেখ শিব এই সছাদ্রির উপর আপনাকে আমার নামে লিঙ্গরূপে থাকিতে হইবে। এখানে আপনায় মন্তকে পঞ্চ-গঙ্গার উৎপত্তি হইবে। বিষ্ণু, আপনিও আমার ভ্রাতার নামে লিঙ্গরূপ ধারণ করিবেন। পদ্মযোনি, আমার কোটি মৈত্রেয় নামে কোটীশ নামধারণপূর্ব্বক এই ক্ষেত্রে অব-স্থান করুন। দেব ও বেদগণও সকলে থাকিয়া লোকের ভোগ ও মোক্ষদায়ক হউন। বৃহস্পতি কন্ডারশিতে গেলে যে ব্যক্তি এই তীর্থ যাত্রা করিবে, তাহার আর কখন দারিদ্র্য-দুঃখ থাকিবে না’\*। মহাবলের প্রার্থনামুসারে মহাবলেশ্বর, অতিবলেশ্বর ও কোটীশ্বর এই তিন লিঙ্গ আবিস্কৃত হইলেন।

ব্রহ্মা নিকটবর্তী ব্রহ্মারণ্যে আসিয়া যজ্ঞমণ্ডপ নির্মাণ করিলেন ও দেব ঋষি প্রভৃতি সকলকে আহ্বান করিয়া এক

\* “আসীং পাণ্ডে পুরাকল্পে মৈত্রেয়ঃ নাম মহাবলঃ।

তস্তানুরোধপাতিবলো মহাবলপরাক্রমঃ ১১১

ভাভ্যাং বিশ্বমিদং কুংসং পরিপূর্ণমুদ্রতম্।

তদা ব্রহ্মহরীশানা যোক্তুং ভাভ্যাং সমাধয়ুঃ ১১২

ততোঃ ভাবনামানন্তং দৃষ্টুং দেবতাঃ সমাসবাসঃ।

ভ্রমেন বেগমানান্ দৈত্যদর্পপরাজিতাঃ ১১৩

ততঃ শস্ত্রৈর্মহাক্রৌণৈর্বিহুনাতিবলো রণে।

পাতিতোহরিত্তিরস্তৈশ্চ পুষ্পবৃন্তিতদাহতবৎ ১১৪

ততো হাহাকৃতং বীক্ষ্য শস্ত্রৈঃ সৈন্তং মহাবলঃ।

আতুর্হস্তাপচিহ্নং সমিচ্ছন্ রোষচুর্ধ্বরঃ ১১৫

তস্তানুগচ্ছতঃ শঙ্কুবিধুবো চতুরাননঃ।

অনীশাঃ সংমুচে স্বাতুং ততো মার্যং প্রসম্মকঃ ১১৬

দেবা উচুঃ—ইতি স্মৃতিমতিশ্রীতাং ব্রহ্মা মায়া বিমোহনী।

সংঘো দৈত্যং যোহরিদ্ভা বারমামাস সঙ্গরাৎ ১১৭

তদা মহাবলো দৈত্যঃ প্রতাপানলচুর্ধ্বরঃ।

রণে প্রসারয়মুখং প্রোবাচোজমাধবান্ ১১৮

যরান্ বৃণত ভজ্যং বঃ প্রসরোহর্ষম্ হরোজ্যবাঃ।

করোমি যদন্তীষ্টং বো মা স্পেহঃ পদে মমঃ ১১৯

ব্রহ্মার উচুঃ—ভবান্ প্রসন্নো যাং নঃ সন্দেহো বচনে ন তে।

তহি বধ্যম্ভম্মাভিরেবং নোহীষ্টকো বধ্যম্ভম্মাভিরেবং।

মহাবল উবাচ—যতোহস্মি কৃতকৃত্যোহস্মি জন্ম মে সঙ্কটং হৃদয়ং।

কৃত্যং বচন-সঙ্কটং বধ্যম্ভম্মাভিরেবং বৈ বধ্যম্ভম্মাভিরেবং।

LIBRARY

মহাভক্তের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই বস্ত্রপ্রভাবে কৃষ্ণা, বেণী, কক্কুদ্বী, গারগ্রী ও সাবিত্রী এই পঞ্চগঙ্গার উৎপত্তি হইল। এত পঞ্চগঙ্গার সন্ধানে মান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়।

প্রথম নদী তিনটী পূর্বসমুদ্রে এবং শেষোক্ত দুইটী নদী পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এতদ্বির লোকমুক্তিদ আরও ৮টী তীর্থ উৎপন্ন হইল। এই অষ্ট তীর্থের নাম ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, চক্র, হংস, আরণ্য, মলাপহ, ও শিবমুক্তিদ।\*

এখানে কোন স্তম্ভ লিঙ্গমূর্তি নাই। পর্তুগিজের যে যে অংশ দিয়া ধারা বাহির হইয়াছে, সেই সেই স্থান লিঙ্গ বলিয়া কল্পিত। সেই স্থানে আধুনিক কালে একটা বৃহৎ মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

বর্তমান কালে মহারাষ্ট্রদিগের নিকট এই একটা প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইলেও কোন প্রাচীন পুরাণে এমন কি জ্যোতিষ্মতসমূহের মধ্যেও এই মহাবলেশ্বরের উল্লেখ নাই। শিবাজী ও তাঁহার বংশধরগণের চেষ্টায় এখানকার মন্দিরসংস্কার ও দেবদেবার জন্ত বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হয়। সেই সময় হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে।

ব্রহ্মার উচ্চ:—তো ভো অহরবর্ষা ত্বং বরযোগোহসি নোইর্ভকে।

বৃণু বরমিষ্টং তে দান্তামো ভূবনেশ্বরঃ ৥২০

প্রসন্নোহসি যদা শক্তো তপাশ্চিন্ সগ্ধমন্তকে।

মল্লারা লিঙ্গরপংখং স্থষ্টাদৌ ভব শঙ্কর ৥২১

মন্তকে পঞ্চগঙ্গানামুৎপত্তিস্থান্ সন্ততম্।

মদ্ভ্রাতৃনামা বিষ্ণুঃ দিবালিঙ্গং ভব প্রভো ৥২২

সৈন্তস্ত মম কোটীনাং কোটীণো ভব পদ্মজ।

মল্লারা খ্যাতিমাগত্য ক্ষেত্রং চাশ্চ ভূবি প্রভো ৥২৩

সর্বের দেবান্তথা ক্ষেত্রে সর্বের বেদাওধৈব চ।

ভিত্তস্ত সর্বদা লোকভোগমোক্ষপ্রদারকঃ ৥২৪

শ্রমো কল্যাণতে জ্ঞাতে যাত্রাঃ কুলপ্তি যে জনাঃ।

তেষাং দারিত্র্যাহুঃখঞ্চ নাশমায়াতু নিতালঃ ৥২৫

অশ্বিন্ ক্ষেত্রে তু যাত্রার্থমাগচ্ছন্তি চ যে জনাঃ।

তেষাং স্নানেন দানেন পূজনেনাযগজ্ঞঃ ৥২৬

\* “ব্রহ্মারণো মহাবোরে চকার বজ্রমণ্ডপম্।

বিতীর্ণং ভূমিতং বর্ণমুক্তাভিবিজ্জিমৈরিপি ৥২৭ ( ১ অঃ )

অন্য উবাচ ৥—তথা চাষখমূলত্যাঃ পঞ্চগঙ্গাঃ পরাঃ শুভাঃ।

ব্রহ্মতীর্থসবীপস্থাঃ প্রকটীগোমূপে বহুঃ ৥২৮

কৃষ্ণা কৃষ্ণা শিবে বর্ণে ব্রহ্মা চৈব কক্কুদ্বী।

সাবিত্রী সা তু সাবিত্রী গারগ্রী চার্পি ভাদ্রনী ৥২৯

পরশুরং সঙ্গমেঃ কুং সরিতাঃ পাপমুক্তকঃ।

সঙ্গমে পঞ্চগঙ্গানাং স্থানোমোক্ষোভিজ্যতে ৥৩০ ( ২ অঃ )

মহাবাধ ( ত্রি ) অভ্যাস্ত ব্যাধা বা যন্ত্রণাদায়ক।

মহাবাহত ( ত্রি ) মহাবাহতী-সম্বন্ধীয়।

মহাবাহু ( ত্রি ) মহাত্তো বাহু যন্ত। ১ দীর্ঘ বাহু, আত্মমূলধিত ভূজ। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ৩ বিষ্ণু। ৪ দানবভেদ। ৫ রাক্ষসভেদ।

মহাবলি ( ক্রী ) ১ আকাশ। ২ জলপাত্র। ৩ গুহা, গর্ভ। ৪ মন, হৃদয়।

মহাবীজ ( ত্রি ) ১ উৎপত্তির প্রধান কারণ। ২ মূলবীজ। ৩ শিব।

মহাবীজ্য ( ক্রী ) বস্ত্রদেশ।

মহাবুদ্ধ ( পুং ) শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ। বুদ্ধভেদ।

মহাবুদ্ধ ( ত্রি ) ১ অতিশয় বুদ্ধিমান। ২ ধূর্ত। ৩ চাতুর্য্য-বুদ্ধি-যুক্ত। ( পুং ) ৪ রাক্ষসভেদ।

মহাবুদ্ধ ( ত্রি ) বিস্তৃত তলযুক্ত। ( পর্তুগিজ )

মহাবাহতী ( ক্রী ) ১ ছন্দোভেদ। ইহার চারি পাদ ৮ ও এক পদ ১২ অক্ষরাঙ্কিত। ২ গুল্মভেদ ( Solanum melongena. )

মহাবোধি ( পুং ) বুদ্ধিতে সর্বত্র জ্ঞানাতীতি বুদ্ধি-সম্প্রদায়ভা ইন্। উৎ ৪১১৭ ) ইতি ইন্, মহাংশাদৌ বোধিধেতি। বুদ্ধদেব। ( হেম )

মহাবোধিসজ্জারাম ( পুং ) বৌদ্ধ সজ্জারামভেদ। [ বোধগয়া দেখ ]

মহাবোধ্যঙ্গবতী ( ক্রী ) তত্ত্বোক্ত দেবতাভেদ।

মহাব্রাহ্মণ ( পুং ) পরম ব্রহ্ম।

মহাব্রাহ্মণ ( পুং ) মহানতিশয়নির্মিতঃ ব্রাহ্মণঃ। নির্মিত ব্রাহ্মণ, নিকট ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ নির্মিত হইয়াছে, এইজন্ত মহাব্রাহ্মণ শব্দে নির্মিত অর্থ বোধ হয়। অনেক স্থানে মহাব্রাহ্মণ শব্দে ‘অগ্রদানী’ ব্রাহ্মণকে বুঝায়।

মহাভট ( পুং ) মহাংশাদৌ তট্টেতি। অতিশয় যোদ্ধা।

“তদ্বোজসা দৈতামহাভটাপিতং চকাসদন্তঃ উদীর্ণদাঁধিতি ॥”

( ভাগবত ১১৯ অঃ )

মহাভক্ত-পাকবটী ( ক্রী ) বটিকোষধিবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণমাসিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃ-শিলা, অভ্র, কান্তলোহ, তেউড়ী, দস্তীমূল, মুখা, চিতা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, কটুকী, কালাকড়া, সৈন্ধবলবণ, যমানী, জায়ফল, ও যবক্ষার, প্রত্যেক ২ তোলা, এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মর্দন করিবে। পরে আদা, নিসিন্দা, সূর্য্যাবর্ত ও লতাকটুকী ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাত বারভাবনা দিয়া এক রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুষ্ঠান লবঙ্গচূর্ণ। অধিক আহারের পর আমরোগ, চিরান্নিমাত্ম্য, কোষ্ঠবদ্ধ,

শোথ, উদররোগ, অজীর্ণ, শূল ও ত্রিদোষজরে এই ঔষধ  
বিশেষ প্রশস্ত। ( রসেন্সসারসং অজীর্ণাধিঃ )

মহাভদ্র ( পুং ) ১ পর্তভেদ। ( মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫৫।১২ )

২ হৃদভেদ। ( মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫৫।৩ )

মহাভদ্র ( স্ত্রী ) ১ মেরুর উত্তর পার্শ্বস্থ সরোবর।

“অরুণোদঃ সরঃ পূর্নং মানসং দক্ষিণে তথা।

ঈতোদং পশ্চিমে মেরোর্মহাভদ্রং তথোত্তরে ॥” ( মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫৫।৩ )

( স্ত্রী ) মহৎ ভদ্রং মঙ্গলং যন্তাঃ টাপ্। মহাভদ্রা। ২ গঙ্গা।

৩ কাশ্মরী। ( রাজনিঃ )

মহাভদ্র ( স্ত্রী ) ১ অতিশয় ভয়। ( পুং ) ২ অধর্ম হইতে  
নিষ্কৃতির গর্ভজাত পুত্র। ( ভারত ১।২৬।২ )

মহাভদ্রা ( স্ত্রী ) নদীভেদ। ( মহাভাঃ ১।৩৬ )

মহাভদ্রাতকগুড়, ( পুং ) ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত  
প্রণালী—নিম্নহাল, জামালতা, আতাইচ, কটকী, বলাড়মুর,  
ত্রিফলা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, হাকুচবীজ, অনন্তমূল, বচ, ধদির-  
কাঠ, রক্তচন্দন, আকনাদি, শুঠ, শটী, বামুনহাটী, বাসকমূলের  
ছাল, চিরাতা, শুড়টীমূলের ছাল, বিড়ড়ক, রাখালশস্যর মূল,  
মুরগামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, বিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণ, পলাসের  
ছাল, গুলঞ্চ, ঘোড়া নিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারু-  
হরিদ্রা, পিঙ্গল, সৌদালফলের মজ্জা, ছাতিমহাল, কালিরা-  
লতা, ওকড়াকল, ওল, চিনাবাস, মজ্জিষ্ঠা, চাকুন্দেবীজ, তাল-  
মুলী, প্রিরঙ্গ, কটকল, শরপুষ্ণ, ও শিরীষছাল প্রত্যেকে ২ পল,  
পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, তেলা তিন হাজার, জল  
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এই উভয় কাথ উত্তমরূপে ছাকিয়া  
লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে ইহাতে পুরাতন শুড় ১২।০  
সের এবং এক হাজার তেলার মজ্জা দিয়া পাক করিতে  
হইবে। পরে প্রক্ষেপার্থ ত্রিফল, ত্রিফলা, মুতা, সৈন্ধব, ও  
বমানী, প্রত্যেকে এক পল, শুড়ডক, তেলপত্র, এলাইচ, ও  
নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ তোলা, গন্ধক ৪ পল, পরে শুড়পাকের  
বিধানানুসারে পাক করিয়া উহা ঘৃতভাণ্ডে রাখিতে হইবে।  
অনুপান গুলঞ্চের কাথ ও দুগ্ধ, পথ্য উষ্ণ অন্ন। চিকিৎসক  
রোগীর বলাবল দেখিয়া মাত্রা স্থির করিবেন। এই শুড়  
সেবন করিলে সকল প্রকার কৃষ্ঠ, বাতরক্ত, উদারবর্ত, অর্শ,  
পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগ আত্ম প্রশমিত হয়। কৃষ্ঠাধিকারে  
ইহা একটা অভ্যুত্তম ঔষধ। ( ভৈষজ্যরত্নাঃ কৃষ্ঠাধিঃ )

মহাভাগ ( ত্রি ) মহান্ ভাগঃ যন্ত। ১ অতিশয় ভাগ্যবান্।

( পুং ) ২ অতিশয় ভাগ্য। ত্রিমাং টাপ্। ৩ দাক্ষায়ণীর নামভেদ।

মহাভাগবত ( পুং ) ১ পরম বৈকুণ্ঠ। ( স্ত্রী ) ২ উপপুরাণ-  
ভেদ। মহাভাগবত পুরাণ।

মহাভাগিন্ ( ত্রি ) সোভাগ্যশালী।

মহাভাগ্য ( স্ত্রী ) মহত্ তং ভাগ্যকৃতি। প্রবল ভাগ্য,  
ভদ্রাশুচি।

মহাভার ( পুং ) মহান্ ভারঃ। অতিশয় ভার।

মহাভারত ( স্ত্রী ) মহৎ ভারতঃ, যথা মহাত্তং ভারং তনোতীতি  
মহাভার-তন-ড। ব্যাসপ্রণীত ইতিহাসশাস্ত্র। ইহার নাম-  
নিকৃতি যথা—

“একতচ্চতুরো বেনা ভারতকেতদেকতঃ।

পুরা কিল স্মরৈঃ সর্গৈঃ সমস্ত তুলরা ধৃতম্ ॥

চতুর্ভাঃ সরহস্তেত্যো বেদেভ্যোহিত্যধিকং যথা।

তদা প্রভৃতি লোকৈঃ স্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।

মহাবাহু ভারতম্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে ॥”

( ভারত আদিপর্ব ১ অধ্যায় )

পূর্বকালে সমুদ্র দেবগণ মিলিত হইয়া একদিকে চারি  
বেদ ও একদিকে এই ভারত রাখিয়া তুল্যদণ্ডে ওজন করেন,  
তাহাতে এই ভারত সরহস্ত চতুর্ভেদ হইতে ওজনে ভারী  
হয়, তদবধি লোকে ইহাকে মহাভারত কহে। ইহা মহাশ্ব  
ও গুরুষে বেদ অপেক্ষা অধিক ; স্মরণ্যঃ মহাশ্ব ও গুরুষহেতু  
মহাভারত নাম হইরাছে।

পর্বাধ্যায়।

প্রচলিত মহাভারতের অমুক্তমণিকামতে,—মহাভারত  
প্রধানতঃ অষ্টাদশ পর্কে সমাপ্ত, আবার এই অষ্টাদশ পর্কের  
মধ্যে এক শত পর্কাদ্যায় আছে। যথা—

১ প্রথম অমুক্তমণিকা পর্ক, ২ পর্ক-সংগ্রহপর্ক,  
৩ পৌষপর্ক, ৪ পৌলোমপর্ক, ৫ আত্মীক পর্ক, ৬  
আদিবংশাবতরণ পর্ক, ৭ বিচিত্র সন্তবপর্ক, ৮ জতুগৃহ-  
দাহপর্ক, ৯ হিড়িম্ব পর্ক, ১০ বকবধপর্ক, ১১ চৈত্ররথ-  
পর্ক, ১২ পাকালীর শ্রয়শর পর্ক, ১৩ ক্ষত্রিয়যুদ্ধে জয়পূর্বক  
পাণ্ডবগণের বৈবাহিক পর্ক, ১৪ বিদ্রোহগমনপর্ক, ১৫ রাজ্য-  
লাভ পর্ক, ১৬ অর্জুনের বনবাস পর্ক, ১৭ স্ত্রভদ্রাহরণ  
পর্ক, ১৮ স্ত্রভদ্রাহরণের পর যৌতুকাহরণপর্ক, ১৯ ধাওবদাহ-  
পর্ক, ২০ সভাক্রিয়া পর্ক, ২১ মন্ত্রণাপর্ক, ২২ অরাসন্ধবধপর্ক,  
২৩ দিগ্বিজয়পর্ক, ২৪ রাজসুয়িকপর্ক, ২৫ অর্ঘ্যোতিহরণপর্ক,  
২৬ শিশুপালবধপর্ক, ২৭ দ্রুতপর্ক, ২৮ অমৃত্যুতপর্ক, ২৯ অরণ্য-  
বাতাপর্ক, ৩০ কির্দারবধপর্ক, ৩১ অর্জুনোতিগমনপর্ক, ৩২  
ঈশ্বরার্জুনের যুদ্ধবিষয়ক কৈরাতপর্ক, ৩৩ ইন্দ্রলোকাভিগমন-  
পর্ক, ৩৪ ধর্ম ও করুণারসম্বন্ধ নলোপাখ্যানপর্ক, ৩৫ কুরুরাজ  
যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রাপর্ক, ৩৬ বক্ষুযুদ্ধপর্ক, ৩৭ নিবাতকবচযুদ্ধ-  
পর্ক, ৩৮ আজগরপর্ক, ৩৯ মার্কণ্ডেয়-সমস্তাপর্ক, ৪০ দ্রৌপদী-

সত্যভামা-সংবাদপর্ক, ৪১ ঘোষযাত্রাপর্ক, ৪২ দ্রোণদীহরণপর্ক (ইহাতে জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ, পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য ও রামোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে), ৪৩ কুণ্ডলাহরণপর্ক, ৪৪ আরণ্য পর্ক, ৪৫ বিরাটপর্কাস্তর্গত পাণ্ডবগণের প্রবেশ ও সমরপালনপর্ক, ৪৬ কীচকবধপর্ক, ৪৭ গোহরণপর্ক, ৪৮ অভিমুখ্য ও উত্তরার বৈবাহিকপর্ক, ৪৯ অনন্তর অতি অদ্ভুত সৈন্তোদ্ধোগপর্ক, ৫০ সঞ্জয়বানপর্ক, ৫১ চিন্তাশ্রিত ধৃতরাষ্ট্রের প্রজ্ঞাগরণপর্ক, ৫২ অনন্তর গুহ্যতম অধ্যাত্মজ্ঞানবিষয়ক সনৎ সুজাতপর্ক, ৫৩ বানসন্ধিপর্ক, ৫৪ ভগবদ্দানপর্ক (যাহাতে মাতলির উপাখ্যান, গালবচরিত, কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ ও বিহ্বলা-পুত্রশাসন বর্ণিত আছে), ৫৫ কৃষ্ণ ও মহামুভাব কর্ণের বাদামুভাব পর্ক, ৫৬ কুরুশাওবের সৈন্তনির্ক্সাপর্ক, ৫৭ রথাতিরথসংখ্যা-পর্ক, ৫৮ কোপবর্ধন উলুকদূতভিগমনপর্ক, ৫৯ অষোপাখ্যান পর্ক, ৬০ অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেক পর্ক, ৬১ জম্বুদ্বীপ-সম্মিলনপর্ক, ৬২ দ্বীপবিস্তার-কীর্তনাম্বক ভূমিপর্ক, ৬৩ ভগবদ্গীতাপর্ক, ৬৪ ভীষ্মবধপর্ক, ৬৫ দ্রোণাভিষেকপর্ক, ৬৬ সংস্পৃকবধপর্ক, ৬৭ অভিনম্যবধপর্ক, ৬৮ প্রতিজ্ঞাপর্ক, ৬৯ জয়দ্রথবধপর্ক, ৭০ ঘটোৎকচবধপর্ক, ৭১ লোমহর্ষণ দ্রোণবধপর্ক, ৭২ নারায়ণাস্ত্র ত্যাগপর্ক, ৭৩ কর্ণপর্ক, ৭৪ শল্যবধপর্ক, ৭৫ হৃদপ্রবেশপর্ক, ৭৬ গদাঘ্নপর্ক, ৭৭ সারস্বততীর্থ বংশাম্বকীর্তনপর্ক, ৭৮ অতি-বীভৎস সৌপ্তিকপর্ক, ৭৯ সুদারুণ ঐর্ষীকপর্ক, ৮০ অলপ্রাদানিক পর্ক, ৮১ দ্রাবিলাপপর্ক, ৮২ কুরুদিগের ঔর্জ্জ্বেদহিক শ্রাঙ্গপর্ক, ৮৩ ব্রাহ্মণ বৈশ্যধারী চার্ল্যাক রাক্ষসের বধপর্ক, ৮৪ ধীমদ্রক্ষ-রাজের আভিষেচনিকপর্ক, ৮৫ গৃহপ্রবিভাগপর্ক, ৮৬ শান্তি-পর্ক, ৮৭ রাজধর্ম্মামুশাসনপর্ক, ৮৮ আপদ্রক্ষপর্ক, ৮৯ মোক্ষধর্ম্ম পর্ক, যাহাতে শুভপ্রজ্ঞাভিগমন, ব্রহ্মপ্রজ্ঞামুশাসন, দুঃসাম-প্রার্হভাব, ও মায়ার সহিত কথোপকথন বর্ণিত আছে। ৯০ আমুশাসনিকপর্ক, ইহাতে ধীমদ্ভীষ্মের স্বর্গারোহণ বর্ণিত হইয়াছে, ৯১ পরে সর্কপাপপ্রণাশক আশ্বমেধিক পর্ক, ৯২ অধ্যাত্মবিষয়ক অমুগীতাপর্ক, ৯৩ আশ্রমবাসপর্ক, ৯৪ পুরুদর্শন-পর্ক, ৯৫ নারদাগমনপর্ক, ৯৬ মহাপ্রাস্তানিকপর্ক, ৯৭ স্বর্গা-রোহণিকপর্ক, ৯৮ খিল নামক হরিবংশ পর্কাস্তর্গত হরিবংশপর্ক, ৯৯ বিষ্ণুপর্ক যাহাতে শিবচর্য্যা ও কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধ উক্ত হই-য়াছে, ১০০ পরে অতি অদ্ভুত ভবিষ্যপর্ক। মহামতি ব্যাসদেব এই শত পর্ক কীর্তন করিয়াছিলেন। স্তত্বলোভব লোম-হর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে সংক্ষেপে ষথাক্রমে অষ্টাদশ পর্ক কীর্তন করেন। সেই মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পর্কসংগ্রহ কথিত হইল।

পৌষ্য, পৌলোম্য আত্মীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতু-

গৃহদাহ, হিড়িম্ববধ, চৈত্ররথ, দ্রোণদীর স্বয়ংবর, বৈবাহিক, বিহ্বরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জুনের বনবাস, শ্রুভদ্রাহরণ, যৌতুকাহরণ, ঋগুবেদান, ও ময়দর্শন এই সকল আদি পর্কের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

পর্কের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পৌষ্যপর্কে—উত্তরের মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। পৌলোম্য পর্কে ভৃগুবংশের বিস্তার কীর্তিত হইয়াছে। আত্মীকপর্কে—গরুড় ও সমুদ্র সর্পের উৎপত্তি ও সমুদ্রমন্থন, উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি এবং মহারাজ পরিক্রান্তনয়ের সর্পসত্রাস্তান কালে ভরত-বংশীয় মহামুগগণসংক্রান্ত মহাভারতীয় কথা বর্ণিত হইয়াছে।

সম্ভবপর্কে রাজগণ ও অত্যাচার শূরগণ এবং মহর্ষি দৈপ্যায়নের উৎপত্তি, দেবতাদিগের অংশাবতার, দৈত্য, দানব, নাগ, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ক, পক্ষী ও অত্যাচার বিবিধ প্রাণীর উৎপত্তি, এবং ভরতের নামামুসারে ভারতবংশখ্যাতি, শকুন্তলার রত্নান্ত, শান্তমুরাজের গৃহে গন্ধার গর্ভে বসুদিগের উৎপত্তি ও স্বর্গা-রোহণ, ভীষ্মের জন্ম এবং তাহার রাজ্যত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন ও প্রতিজ্ঞাপালন, ভীষ্মকর্তৃক চিত্রাঙ্গদের রক্ষা ও চিত্রাঙ্গদ হত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিচিত্রবীর্ষের রক্ষা এবং রাজ্যে স্থাপন, অগ্নিমাণ্ডব্যের শাপে ধর্ম্মের নরায়ণিতে উৎপত্তি, বরদান-বলে কৃষ্ণদৈপ্যায়ন হইতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম এবং পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি, পাণ্ডবদিগের বারণাবত যাত্রাবিষয়ে দুর্ঘোষনের মন্ত্রণা ও তৎকর্তৃক পাণ্ডবগণের নিকট পুরোচনের প্রেরণ, হিতামুষ্ঠানের নিমিত্ত পথিমধ্যে বিহ্বর কর্তৃক স্নেহ-ভাষায় ধীমদ্রক্ষরাজের প্রতি হিতোপদেশপ্রদান, বিহ্বরের বাক্যে সুরঙ্গ-নির্মাণ, পঞ্চপুত্রের সহিত নিদ্রিতা নিষাদী ও পুরোচনের জতুগৃহে দাহ, বোর অরণ্যে পাণ্ডবগণ কর্তৃক হিড়িম্বা রাক্ষসীদর্শন, মহাবল ভীমকর্তৃক হিড়িম্ববধ, ঘটোৎকচের উৎপত্তি, পাণ্ডবগণের ব্যাসদর্শন ও ব্যাসাজ্ঞামুসারে একচক্রানগরীতে ব্রাহ্মণালয়ে অজ্ঞাতবাস, বক্রাক্ষসবধ এবং তদধ্বনে নগরবাসীদিগের বিস্ময়, দ্রোণদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, ব্রাহ্মণমুখে দ্রোণদীর স্বয়ংবরব্রতান্ত্রবর্ণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাসের আদেশামুসারে পাণ্ডবগণের দ্রোণদীপ্রার্থনায় স্বয়ংবর-দর্শনার্থ পাঞ্চালদেশাভিমুখে গমন, গন্ধারীতে অঙ্গারপর্ণ-নামক গন্ধর্ব্বকে জয় করিয়া তাহার সহিত অর্জুনের সখ্য এবং তাহার মুখে তপতী, বসিষ্ঠ ও ঔরব্রহ্মের আখ্যান-শ্রবণ, পাণ্ডবগণের পাঞ্চাল-নগরে গমন, তথায় সমস্ত রাজগণের মধ্যে লক্ষ্যভেদ করিয়া অর্জুনের দ্রোণদীলাভ এবং তথায় যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভীমসেন ও অর্জুন কর্তৃক শল্য, কর্ণ ও আর আর সমস্ত ক্রোধাক্রান্ত ভূপতিগণের পরাজয়, ভীমার্জুনের

অলোকসামান্য পরাক্রম-দর্শনে পাণ্ডব বোধ করিয়া তাহা-  
দিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য বলরাম ও কৃষ্ণের ভার্গব-  
গৃহে গমন, দ্রোপদীর পঞ্চ স্বামী হইবে বলিয়া ক্রপদ রাজার  
বিনম্র, তাহাতে পরমাত্মত পঞ্চেশ্বরের উপাখ্যান, দ্রোপদীর  
দেবকৃত অমাহুয বিবাহ, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পাণ্ডবগণ সমীপে  
বিহুরকে প্রেরণ, বিহুরের উপস্থিতি ও কৃষ্ণদর্শন, পাণ্ডবগণের  
খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও অন্ধরাজ্যশাসন, নারদের আজ্ঞানুসারে  
দ্রোপদীর নিকটে গমন, পঞ্চভ্রাতার নিয়ম-করণ, স্কন্দোপ-  
স্কন্দের আখ্যান, দ্রোপদীর সহিত যুধিষ্ঠির যে নিষ্ঠূর্ণ গৃহে  
ছিলেন সেই গৃহে ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য অর্জুনের প্রবেশ ও  
তৎকর্তৃক অশ্ব শত্রু আনয়ন করিয়া বিপ্রেয় গোধন প্রত্যাহরণ,  
পরে নারদের নিয়মরক্ষার্থ বারবর অর্জুনের বনগমন, পাণ্ডবের  
বনবাসকালে নাগকন্যা উলূপীর সহিত পথিমধ্যে সমাগম ও  
পুণ্যার্থগমন, বক্রবাহনের জন্ম, অর্জুন কর্তৃক তপস্বী-ব্রাহ্ম-  
ণের শাপে গ্রাহ্যোনিতে জাত পঞ্চমূরুপা অঙ্গরার শাপ-  
বিমোচন, প্রভাসতীর্থে কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবের সমাগম, কৃষ্ণের  
অমৃতক্রমে বারকাতে অর্জুন কর্তৃক কামধান দ্বারা স্তব্ধ-  
হরণ, কৃষ্ণের ঘোতুক লহয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গমন, অভিমহ্যার  
জন্ম, দ্রোপদার পুত্রোৎপত্তি, কৃষ্ণ ও অর্জুনের জলবিহারের  
জন্তু যমুনায় গমন এবং তথায় চক্র ও ধনুঃপ্রাপ্তি, খাণ্ডব-  
দাহ, ময়দানব ও ভূজঙ্গের অগ্নি হইতে রক্ষা, শাক্যীর গর্ভে  
মন্দপাল নামক মহর্ষির তনয়োৎপত্তি। আদিপর্বে এই সকল  
বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্বে ২২৭ অধ্যায় এবং  
শ্লোক-সংখ্যা ৮৮৮।

২ সভাপর্ক। বহু বৃত্তান্তযুক্ত দ্বিতীয় পর্কের নাম সভা-  
পর্ক। পাণ্ডবদিগের সভানিষ্পাদ, কিল্করদর্শন, নারদকর্তৃক  
লোকপাল-সভাবর্ণন, রাজস্বয়যজ্ঞারম্ভ, জরানকবধ, কৃষ্ণ-  
কর্তৃক গিরিহুগে নিকর রাজগণের মোচন, পাণ্ডবদিগের  
দিশিভ্রম, রাজস্বয়-যজ্ঞে উপটোকন লইয়া ভূপালগণের সমাগম,  
অর্থদান নিমিত্ত বাদানুবাদকালে শিশুপালবধ, যজ্ঞের ঐশ্বর্য  
দর্শন করিয়া হুঃখ ও অস্বাস্থ্যকৃত দুর্ঘোষনের প্রতি সভামধ্যে  
ভীমকর্তৃক উপহাস, তাহাতে দুর্ঘোষনের ক্রোধোদয়, তজ্জন্ত  
দ্যুতক্রীড়ার অন্তর্গত, ধৃষ্ট শকুনিকর্তৃক পাশক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের  
পরাজয়, দ্যুতার্ণবে নিমগ্না সূৰ্য্য দ্রোপদীর মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র  
কর্তৃক উদ্ধার, পুনরায় দ্যুতক্রীড়ার নিমিত্ত দুর্ঘোষন  
কর্তৃক পাণ্ডবগণের আহ্বান, তাহাতে জয়ী দুর্ঘোষন কর্তৃক  
পাণ্ডবগণের বনবাসার্থপ্রেরণ, সভাপর্কে এই সকল বিষয়  
বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্কে ৭৮ অধ্যায় এবং শ্লোক-  
সংখ্যা ২৫১১।

৩ বনপর্ক। এই পর্ক অতি বিস্তীর্ণ। মহামতি পাণ্ডবগণ  
বনগমন করিলে ধর্মপুত্রের পশ্চাতে পুরবাসিগণের গমন,  
ধোম্যমুনির উপদেশানুসারে অমুগত ব্রাহ্মণগণের ভরণার্থ  
অন্ন ও ওষধির নিমিত্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক স্বর্ঘ্যের আরাধনা,  
স্বর্ঘ্যপ্রসাদে অন্নপ্রাপ্তি, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক হিতবাদী বিহুরের  
পরিত্যাগ, বিহুরের পাণ্ডব সমীপে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্রের  
আজ্ঞানুসারে পুনরায় প্রত্যাগমন, কর্ণের উপহাসবাক্য,  
বনবাসী পাণ্ডবগণকে বধ করিবার নিমিত্ত দুর্ঘাত হুঘোষনেব  
মন্ত্রণা, ইহা জানিতে পারিয়া ব্যাসদেবের আগমন এবং দুর্ঘো-  
ষনের প্রতি বনগমন-নিষেধ, সুরভির উপাখ্যান, মৈত্রেয়ের  
হস্তিনাপুরে আগমন, ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি শাপপ্রদান, ভাম-  
সেন কর্তৃক সংগ্রামে কিল্করবধ, শকুনি শততা করিয়া পাণ্ডব-  
দিগকে জয় করিয়াছে, ইহা শুনিয়া যুধি ও পাঞ্চালগণের  
যুধিষ্ঠির সমীপে আগমন, অর্জুন কর্তৃক ক্রোধায়িত কৃষ্ণের  
দোষশাস্তি, কৃষ্ণের নিকট দ্রোপদীর বিলাপ, কৃষ্ণকর্তৃক  
পাঞ্চালীর আশ্বাসন, সৌভবধাখ্যান, কৃষ্ণ কর্তৃক পুত্র সহিত  
স্তব্ধদ্রার বারকাপূরাপ্রাপণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দ্রোপদী-তনয়-  
গণের পাঞ্চালদেশে নয়ন, পাণ্ডবগণের রমণীর দৈতবনে প্রবেশ,  
যুধিষ্ঠির ভীম ও বেদব্যাসের আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিশ্রুতি  
নামক বিজ্ঞানদান, ব্যাস গমন করিলে পাণ্ডবগণের কাম্যক-  
বনে প্রবেশ, দিব্যাস্ত্রলাভের জন্ত অর্জুনের প্রবাস, কিরাতকপী  
মহাদেবের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, অর্জুনের লোকপালদর্শন  
ও অন্নপ্রাপ্তি এবং অন্ত্রশিক্ষার্থ মহেন্দ্রলোকে গমন, তৎপ্রবেশে  
ধৃতরাষ্ট্রের অতিশয় চিন্তা, যুধিষ্ঠিরের পরমতরুণ বৃহদশ্বনামক  
মহর্ষিদর্শন, তাহার নিকটে অতি কাতর হইয়া যুধিষ্ঠিরের পারি-  
তাপ ও বিলাপ, নলোপাখ্যান, ইহাতে নলের চরিত ও দময়-  
ন্তীর বিপদকালে ও মর্যাদাপালন বর্ণিত আছে। মহর্ষি বৃহদশ্ব  
হইতে যুধিষ্ঠিরের অগস্ত্যনামক বিজ্ঞাপ্রাপ্তি, স্বর্গ হইতে  
পাণ্ডবগণের নিকট লোমশ ঋষির আগমন এবং তাহাদিগের  
নিকট স্বর্গস্থ অর্জুনের বৃত্তান্ত কথন, অর্জুনের সমাচার  
পাইয়া পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা, তীর্থযাত্রায় কল ও পুণ্যকীর্তন,  
মহর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থযাত্রা, ও পাণ্ডবগণের তীর্থগমন,  
ইন্দ্রের প্রার্থনায় কর্ণের কুণ্ডল প্রদান, গয়াস্থরের যজ্ঞ,  
অগস্ত্যের আখ্যান এবং বাতাপিতৃকণ, সন্তানের নিমিত্ত  
অগস্ত্য ঋষির লোপামুদ্রা নামী স্ত্রীপরিগ্রহ, কৌমার এক-  
চারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র, জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের চরিত্র,  
কার্তবীর্ষ্যবধ, হৈহয়বধ, প্রভাসতীর্থে যুধিষ্ঠিরের সহিত  
পাণ্ডবগণের সমাগম, স্কন্ধার উপাখ্যান, শর্যাতীর যজ্ঞে  
চাবন মুনি কর্তৃক অশ্বিনীকুমারযুগলকে যজ্ঞীয় সোমরস-



প্রদান, অশ্বিনীকুমার কর্তৃক চাবন মুনিকে যৌবনাবস্থার স্থাপন, শাক্যতার উপাখ্যান, জন্মনামক রাজপুত্রের উপাখ্যান, সৌম্যক রাজ কর্তৃক বহুপুত্র লাভার্থ পুত্র বিনাশবারা বাগ ও শতপুত্র প্রাপ্তি, অত্যাংকুটে শ্বেনকপোতখ্যান, ইন্দ্র, অগ্নি ও ধর্ম কর্তৃক শিবিরাজের পরীক্ষা, অষ্টাবক্রীর উপাখ্যান, জনক রাজার যজ্ঞে নৈরায়িকশ্রেষ্ঠ বরুণাশ্রম বন্দীর সহিত বিপ্রার্থি অষ্টাবক্রের বাদ্যস্থবাদ, অষ্টাবক্রের সহিত বিবাদে বন্দীর পরাজয়, পরাজয় করিয়া অষ্টাবক্র কর্তৃক সাগরমধ্য কহোড় নামক বশিতার উদ্ধার, ববক্রীতের উপাখ্যান, মহাহুতব রৈভোর আখ্যান, পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন-যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস, তথায় বাসকালে শৌগন্ধিক আহরণার্থ জৌগমী কর্তৃক নিযুক্ত ভীমের পথিমধ্যে কন্দলীধন মধ্যস্থিত হনুমদর্শন, ভীম কর্তৃক পদ্মবন ভ্রম ও তথায় রাক্ষসগণ ও মণিমৎ প্রভৃতি মহাবীরা বন্ধগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ, ভীম কর্তৃক জটাসুর নামক রাক্ষস বধ, বৃষপক্ষী নামক রাক্ষসের নিকটে পাণ্ডবদিগের গমন, পাণ্ডবগণের আট্টীসেনাপ্রমে গমন ও বাস, পাকালী কর্তৃক মহাহুতব ভীমের উৎসাহপ্রদান, ভীমের কৈলাসারোহণ ও মহাবল মণিমৎ প্রভৃতি বন্ধগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ, পাণ্ডবদিগের সহিত কুবেরের সমাগম, ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জুনের সমাগম, সব্যসাচি অর্জুনের দিব্যাত্মপ্রাপ্তি, ইন্দ্রকাধ্যার্থ হিরণ্যপুরবাসী নিবাত কবচ নামক দানবগণ ও পুলোমপুত্র কালকেয়গণের সহিত পার্থের মহাযুদ্ধ ও তৎকর্তৃক তাহাদিগের বধ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের অস্ত্রপ্রদর্শনোত্তোগ ও দেবর্ষি নারদ কর্তৃক অস্ত্রপ্রদর্শননিষেধ, পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন হইতে অবরোহণ, এই মহারণ্যে পর্ত্তাকার শরীর-বিশিষ্ট প্রবল ভূজ কর্তৃক ভীমগ্রহণ, যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রশ্নার্থ কখনপূর্বক ভীমের উদ্ধার, পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে পুনরাগমন, পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে পুনরুদার দর্শন করিবার নিমিত্ত কাম্যকবনে বহুদেবের আগমন, মার্কণ্ডেয়-সমস্তা-বটিত নানা উপাখ্যান, ঐ সকল মহর্ষি কর্তৃক বেণপুত্র পৃথু রাজার উপাখ্যান, মহাহুতব তার্ক্য ঋষি ও সরস্বতীর সংবাদ, মন্ত্রোপাখ্যান, মার্কণ্ডেয়-সমস্তা ও পুরাতন কীর্তন, ইন্দ্রদ্রোণ-পাখ্যান, ধুন্ধুমারের উপাখ্যান, পতিব্রতোপাখ্যান, অঙ্গিরার উপাখ্যান, জৌগমী ও সত্যভামার সংবাদকীর্তন, পাণ্ডবগণের পুনরুদার বৈতবনে প্রবেশ, ঘোষবাড়া, তাহাতে গন্ধর্ষকর্তৃক দ্রুপদ্যোনের বন্ধন, অর্জুন কর্তৃক গন্ধর্ষক হইতে লজ্জাভিত্ত মন্দবুদ্ধি দ্রুপদ্যোনের মোচন, যুধিষ্ঠিরের যুগধ্বদর্শন ও কাম্যক বান পুনরাগমন, শ্রুতিবিত্ত ব্রীহিঙ্গোপিক উপাখ্যান,

দুর্কাসার উপাখ্যান, আশ্রমের মধ্য হইতে ভয়ত্রথ কর্তৃক জৌগমীহরণ, ও ভীমসেনের বায়ুবেগে তৎপক্ষাৎ গমন, ভীম কর্তৃক ভয়ত্রথের পক্ষশিবীকরণ, রামোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যানকথন, ইন্দ্রোদ্যেপে কর্ণের কুণ্ডলঘর পরিত্যাগ ও তাহাতে তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণকে একপুরুষবাভিনী শক্তিপ্রদান, আরণ্যের উপাখ্যান, ধর্ম কর্তৃক শূন্যত্রের অনুশাসন, বরলাভানন্তর পাণ্ডবদিগের পশ্চিমদিকে গমন, বনপর্কে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্কে ২৬৯ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ১১৮৬৪।

#### ৪ বিরাট পর্ক।

বিরাট নগরে গমনানন্তর দ্রুপদ্যোনের মধ্য অতি বৃহৎ শমী বৃক্ষ দর্শন করিয়া তাহাতে পাণ্ডবগণের আশ্রয়স্থাপন, পুরপ্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের ছদ্মবেশে বাস, কাম্যভিত্ত হস্তাত্ত কীচকের পাকালীর প্রতি সন্তোষপ্রার্থনা ও বৃকোদর কর্তৃক তাহার বধ, পাণ্ডবদিগের অব্যবহার্য দ্রুপদ্যোনের কর্তৃক চতুর্দিকে সূচতুর দূতপ্রেরণ, সেই দূতগণ কর্তৃক পাণ্ডবদিগের অনুদ্যেশ, প্রথমতঃ ত্রিগর্ত্তীর সৈন্ত কর্তৃক বিরাটরাজের গোধন-হরণ ও তাহাদিগের সহিত বিরাটের লোমাক্কর মহাসংগ্রাম, ভীম কর্তৃক ত্রিগর্ত্তীকৃত বিরাটের মোচন, পাণ্ডবগণ কর্তৃক গোধন প্রত্যাহরণ, কোরবগণ কর্তৃক গোগ্রহণ, অর্জুনের যুদ্ধে সমুদয় কোরবের পরাজয়, কীরীটী কর্তৃক বিক্রম প্রদর্শনপূর্বক গোধন প্রত্যাহরণ, সূতদ্রাপুত্র অভিমহ্যার পত্নী ও পাথের সূতা হইবে বলিয়া বিরাটকর্তৃক অর্জুনকে উত্তরানারী কস্তাদান। বিরাট পর্কে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই পর্কে ৬৭ অধ্যায় এবং শ্লোক সংখ্যা ২০৫০।

#### ৫ উত্তোগ পর্ক।

পাণ্ডবগণ জিগীষাবশে উপদ্রব্য নামক স্থানে অবস্থিত করিলে দ্রুপদ্যোনের বাহুদেবসমীপে গমন, ও ‘আপনি উপস্থিত যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করুন’ এই প্রার্থনা এবং তাহাতে যুদ্ধবিষয় মন্ত্রণাকার্যে নিযুক্ত আশ্বি এবং এক অক্ষৌহিণী সেনা এতদ্রুতের মধ্যে কাহাকে কি দিব, কৃষ্ণের এই উক্তি, মন্দভাগ্য দ্রুপদ্যোনের সৈন্তবরপ্রার্থনা, অর্জুন কর্তৃক অসুখ্যমান কৃষ্ণের মন্ত্রিষে বরণ, মন্ত্ররাজ পাণ্ডবগণের নিকটে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে দ্রুপদ্যোনের সন্ধান পাইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বন্ধনাপূর্বক উপহার দিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলে তিনি বধন বর প্রদানে উদ্বৃত্ত হইলেন। তখন দ্রুপদ্যোনের উপস্থিত সময়ে সাহায্য প্রার্থনা করিলে সাহায্যদানে অঙ্গীকার করিয়া মন্ত্ররাজ শল্যের পাণ্ডব সমীপে গমন, শল্য কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের সাধনা ও ইন্দ্রবিজয়বধন,



পাণ্ডবগণ কর্তৃক কৌরব সমীপে পুরোহিত-প্রেরণ, পাণ্ডব-প্রেরিত পুরোহিতমুখে ইন্দ্রবিজয়বিবরণক বাক্য শ্রবণ করিয়া বিহ্বলের মত্ৰণা অশ্রুসারে শাস্তিহাপনমানসে ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক সজয় নামক দূত-প্রেরণ, বাসুদেব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিত্তার ধৃতরাষ্ট্রের নিজাত্যাগ, বিহ্বরমুখে ধৃতরাষ্ট্রের বিচিত্র ও হিতবাক্য শ্রবণ, সনৎকুমার ও ধৃষ্মণ্যুশ্রেয়সে পৌকাকুল ধৃতরাষ্ট্রের অত্যাচার অধ্যাত্মবিবরণক শাস্তিশ্রবণ, প্রাতঃকালে রাজসভায় সজয় কর্তৃক বাসুদেব ও অর্জুনের একান্তভাবকথন, মহামতি কৃষ্ণের সন্ধিহাপন করিবার জন্য দুর্যোধনের নিকট আগমন, উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষার কৃষ্ণ সন্ধিহাপনের প্রস্তাব করিলে দুর্যোধন কর্তৃক তৎপ্রত্যাখ্যান, দুর্যোধনের আখ্যান, মাতলি কর্তৃক স্বীয় ছহিতার নিমিত্ত বরাহবেষণ, মহর্ষি গালবেয় চরিত্রবর্ণন, বিহ্বলাপুত্রের অশ্রুশাসন, কর্ণ ও দুর্যোধন প্রভৃতির ছষ্ট মত্ৰণা জানিতে পারিয়া রাজগণ সমীপে কৃষ্ণের স্বীয় যোগেশ্বরত্বপ্রদর্শন, কৃষ্ণ কর্তৃক কর্ণকে স্বীয় রথে আরোহণ ও সংসারামর্শদান, মদগর্ষিত কর্ণ কর্তৃক কোশলপুর্ষক কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান, হস্তিনাপুর হইতে উগ্ৰসেন্যে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের নিকটে কৃষ্ণ কর্তৃক সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন, কৃষ্ণবাক্য শ্রবণাতর হিত কার্যের মত্ৰণা স্থির করিয়া পাণ্ডবগণের সংগ্রামসজ্জা, হস্তিনাপুর হইতে যুদ্ধের নিমিত্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের নির্বাণ, সৈন্তসংখ্যা, মহাযুদ্ধের পূর্ক দিবসে দুর্যোধন কর্তৃক উলূক নামক ব্যক্তিকে দোতাকাণ্ডে নিযুক্ত করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরণ, রথান্তিরথসংখ্যা, অবশোপাখ্যান। উভোগপর্কে এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৮৬ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ৬৬৯৮।

#### ৬ তীয়পর্ক।

সজয় কর্তৃক জম্বুও নির্মাণ-বর্ণন, যুধিষ্ঠিরের সৈন্তগণের অতিশয় বিবাদ, দশাহব্যাণী ঘোরতর হুমারুণ যুদ্ধকালে যোগবিবরণক নানা হেতুবাদ দ্বারা মহারতি বাসুদেব কর্তৃক অর্জুনের মোহজনিত বিবাহ-নিবারণ, কৃষ্ণের রথ হইতে অবতরণপূর্ক নির্ভর চিত্তে প্রতৌদহতে ভীষ্মবধার্থ গমন, বাক্যরূপ দণ্ড দ্বারা কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের অভিঘাত, অর্জুন কর্তৃক শিখণ্ডীকে সমুখে স্থাপন করিয়া নিশ্চিত শরাঘাতে ভীষ্মকে ছুতলে পাতিতকরণ, ভীষ্মের শরশয্যার শরন; এই সকল বিষয় এই তীয় পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্কে ১১৭ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ৪৮৮৪।

#### ৭ দ্রোণ-পর্ক।

প্রতাপশালী দ্রোণাচার্যের সেনাপতিপদে অভিষেক,

দুর্যোধনের ক্রীতির নিমিত্ত দ্রোণাচার্যের যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা, সংশ্লুক কর্তৃক যুদ্ধস্থল হইতে অর্জুনের অপসারণ, মহারাজ ভগদত্তের গুপ্রতীক নামক স্বীয় হস্তীর সহিত রণস্থলে ইন্দ্রতুলা অশ্বাধা বিক্রমপ্রকাশ, অর্জুন কর্তৃক ভগদত্তবধ, অরুণ প্রভৃতি মহারথ কর্তৃক অপ্রাপ্ত-ঘোবন বালক ও একাকী অতিমহারথ বধ, অতিমহারথ হইলে ক্রোধাতিভূত অর্জুন কর্তৃক রণভূমিতে সপ্ত অশ্ব-হিনী সৈন্ত এবং পরে মদ্ররাজ অরুণ-বধ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞামুসারে মহাবাহু ভীম ও সাত্যকি কর্তৃক দেবগণের অলঙ্ঘনীয় কুরুসৈন্ত মধ্যে প্রবেশ, হতাবশিষ্ট সংশ্লুক-দিগের যুদ্ধে বিনাশ, অলবুধ, শ্রদ্ধাহীন, জলসক, তুরিপ্রবা, বিরাট, ক্রপদ ও বটোৎকচ প্রভৃতি অনেক স্বীকৃতকবের নিপাত, দ্রোণাচার্যের বধ, দ্রোণাচার্য যুদ্ধে নিপতিত হইলে কুরু অশ্বখামার ভয়ঙ্কর আগের নারায়ণ-প্রয়োগ, কুরু-মাহাত্ম্যকীর্তন, ব্যাসদেবের আগমন এবং কৃষ্ণ ও অর্জুনের মাহাত্ম্য-বর্ণন, এই সকল বিশেষ ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্কে অনেক পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূপালগণের নিধনবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। এই পর্কে ১৭০ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ৮২০০।

#### ৮ কর্ণ-পর্ক।

স্বীয় মদ্ররাজের সারথিকার্যে নিয়োগ, পৌরাণিক ত্রিপুর-নিপাত-কীর্তন, যুদ্ধযাত্রাকালে কর্ণ ও মদ্ররাজের পরস্পর বাক্কলহ, কর্ণের তিরস্কারার্থ শল্য কর্তৃক হংস-কাকীর আখ্যান-কীর্তন, অশ্বখামা কর্তৃক পাণ্ডারাজের বিনাশ, দণ্ডসেনবধ ও দণ্ডবধ, সর্কধহুর্দারি ব্যক্তির সমক্ষে দৈরথ যুদ্ধে কর্ণ কর্তৃক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জীবন-সংশয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের পরস্পর কোপ, কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের অশ্রুশাসন, বৃকোদর কর্তৃক রণস্থলে পূর্ক প্রতিজ্ঞাত দুর্যোধনের বধঃস্থল ভেদপূর্ক শোণিতপান, দৈরথ যুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক মহারথ কর্ণের নিপাত, এই পর্কে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৬২ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ৪২৬৪।

#### ৯ শল্যপর্ক।

কর্ণবধ হইলে মদ্রেশ্বর শল্যের সেনাপতিত্বে বরণ, নানারথীর পৃথক পৃথকরূপে রথযুদ্ধবর্ণন, কৌরব পক্ষীয় প্রধান বোদ্ধগণের বিনাশ, ধর্মরাজ কর্তৃক শল্যবধ, বহু-সংখ্যক সৈন্ত হত হইলে বৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে দুর্যোধনের হ্রদপ্রবেশ ও জলতত্ত্ব করিয়া অবস্থিতি, ব্যাধগণ কর্তৃক ভীষ্মের নিকট দুর্যোধনের সংবাদ-প্রদান, ধর্মরাজের তিরস্কার বাক্যে দুর্যোধনের হ্রদ মধ্য হইতে উত্থান, যে স্থানে ভীষ্মের সহিত গদা যুদ্ধ হয়, তথায় সকলে সমবেত হইলে

বলরামের আগমন, সরবতীতীর্থ ও অত্যাশ্রিত নানা তীর্থের পূণ্য-  
বর্ণন, সেই রণভূমিতে হৃষ্যোধনের সহিত ভীমের তুমুল  
গলাযুদ্ধ, যুদ্ধস্থলে ভীমের গদা দ্বারা হৃষ্যোধনের উল্লঙ্ঘন ভঙ্গ,  
এই পর্বে এই সকল বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৫৯ অধ্যায় এবং  
শ্লোক সংখ্যা ৩২২০।

#### ১০ সৌপ্তিকপর্ব।

পাণ্ডবগণ রণক্ষেত্রে হইতে গমন করিলে অমর্ষণ হৃষ্যোধন  
ভয়ানক হইয়া যে স্থলে পতিত ছিলেন, সেই স্থলে সারংকালে  
কৃতবর্ষা, কৃপ ও অশ্বখামা, এই মহারথদ্বয় উপস্থিত হইয়া  
দেখিলেন যে, রাজা হৃষ্যোধন ভয়ানক হইয়া রণভূমিতে  
পতিত আছেন, তাহাতে মহারথ দ্বোণপুত্র ক্রোধাভিভূত  
হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পঞ্চালগণ ও  
অত্যাশ্রিত অমাত্য সমেত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ না করিয়া তত্ক্ষণ  
বিমোচন করিব না। তদনন্তর ঐ মহারথদ্বয় রাজাকে ঐ  
প্রতিজ্ঞা বাক্য কহিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সূর্য্যা-  
স্তের পর এক মহাবনে প্রবেশপূর্বক সেই স্থলে এক বৃহৎ  
বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, এক বৃহৎ পেচক  
রাত্রিকালে বহু সংখ্যক কাক বিনাশ করিতেছে। তাহা  
দেখিয়া অশ্বখামা পিতৃবধু শ্রবণ করিয়া ক্রোধপূর্বক মনে মনে  
এই কল্পনা করিলেন যে, পঞ্চালগণ সিদ্ধাভিভূত হইলে সকল-  
কেই সংহার করিব। অনন্তর তিনি পাণ্ডবদিগের শিবির-  
দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক গগনপত্নী প্রকাণ্ড  
হৃদয়নীর ঘোররূপ রাক্ষস দ্বারে অবস্থিত আছে। ঐ রাক্ষস অশ্র-  
সঞ্চালনের প্রতিবন্ধকতা করে দেখিয়া দ্বোণপুত্র তৎক্ষণাৎ  
বিক্রপাক্ষর দ্বারের আরাধনা করিয়া কৃপ ও কৃতবর্ষার সহিত  
শিবিরে প্রবেশপূর্বক নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সপরিবার সমস্ত  
পাঞ্চাল ও দ্রোণদীপ্তনয়নগণকে সংহার করিলেন। কৃষ্ণের  
কৌশলে তাহাতে সাত্যকি ও পঞ্চ পাণ্ডবমাত্র রক্ষিত  
হইয়াছিলেন, অবশিষ্ট সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বখামা  
স্বহস্তে পঞ্চালদিগকে বধ করেন; ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি এই  
সমস্ত ভরস্কর ব্যাপার পাণ্ডবগণের নিকটে নিবেদন করিল।  
দ্রোণদীপ্ত পুত্রশোকাক্ত ও পুত্রভাতৃবধকাতরা হইয়া অনশন  
দ্বারা প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া ভর্গুগণকে উপরোধ করি-  
লেন। ভীমপরাক্রম ভীমসৈন্য দ্রোণদীপ্ত বচনামুসারে  
তাহার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া ক্রোধপূর্বক গদা গ্রহণ করিয়া  
অশ্বখামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। দ্বোণপুত্র ভীম-  
ভয়ে অভিভূত ও দৈবপ্রেরিত হইয়া ক্রোধপূর্বক পৃথিবী  
অপাণ্ডব হটক এই বলিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন, তাহাতে  
কৃষ্ণ একপ করিও না বলিয়া অশ্বখামাকে নিবারণ করি-

লেন। অশ্বখামার বিদ্রোহাচরণ দেখিয়া অর্জুন সেই অস্ত্র  
দ্বারা তাহা নিবারণ করেন। অশ্বখামা ও বৈপায়ন প্রভৃতি  
পরস্পর শাপ প্রদান করিলেন। জয়শ্রীপ্রাপ্ত পাণ্ডবগণ দ্রোণ-  
পুত্র হইতে মণিগ্রহণ করিয়া দ্রষ্টব্যঃকরণে তাহা দ্রোণদীপ্তকে  
প্রদান করিলেন। এই পর্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত হই-  
য়াছে। ইহাতে অষ্টাদশ অধ্যায় এবং শ্লোক সংখ্যা ৮৭০।

#### ১১ দ্রীপর্ব।

পঞ্চাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া ভীমের বিনাশ-  
কামনার ক্রুদ্ধদত্ত লোহময়ী ভীমপ্রতিমূর্ত্তি তথ্য করিলেন।  
পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় শোকে সন্তপ্ত হইলে বুদ্ধিমান  
বিদুর মোক্ষবিষয়ক নানা হেতুবাদ দ্বারা তাহার সংসার-মায়ার  
দূর করিয়া আশ্বাস প্রদান করিলে ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর-  
বাসিনী সীমন্তিনীগণের সহিত শোকাকুল হইয়া রণভূমি-  
দর্শনার্থ গমন করেন। তথায় বীরপত্নীগণ অতি করুণ স্বরে  
বিলাপ করিতে লাগিলে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের অতিশয়  
ক্রোধ ও মোহ উপস্থিত হয়। ক্ষত্রিয়-মহিলাগণ সংগ্রামে  
অপরানুগ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে রণে হত ও পতিত  
দেখিতে নাগিলেন। গান্ধারী পুত্র ও পৌত্রশোকে কাতরা  
হইয়া শোকাভিভূত হইলে কৃষ্ণ তাহার ক্রোধ শাস্তি করেন।  
ধাত্মিকবর মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির শাস্ত্রামুসারে যুদ্ধে হত  
রাজগণের শরীর দাহ করাইলেন। পরে তাহাদের জল-  
প্রোদানিক তর্পণ ক্রিয়া আরম্ভ হইলে কুন্তী কর্ণকে গূঢ়োৎপন্ন  
স্বপুত্র বলিয়া প্রকাশ করেন। এই পর্বে এই সকল বিষয়  
বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব অতিশয় করুণাপ্রবর্তক এবং  
মনোবৈকল্যকারক, ইহাতে সপ্তবিংশ অধ্যায় এবং শ্লোক  
সংখ্যা ৭৭০।

#### ১২ শান্তিপর্ব।

এই পর্ব স্তানগর্ভ নানাবিধ উপদেশ ও বিবিধ উপা-  
খ্যানে পরিপূর্ণ। ইহাতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতা, ভ্রাতা, পুত্র,  
সখদ্বী ও মাতুল প্রভৃতি সমুদয় সংহার করাইয়া নিকৈদ প্রাপ্ত  
হন। ভীমদেব শরশয্যার পতিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট  
ভক্তভানোপার্জনাভিলাষী রাজগণের বাহা অবশ্য জেয় সেই  
রাজধন্যের ব্যাখ্যা করেন, এবং তৎকর্তৃক হেতুপ্রদর্শী আপ-  
দ্য ও প্রকাশিত হইয়াছে, মানবগণ বাহা জানিয়া সর্বজ্ঞতা  
লাভ করিতে পারে।

এই পর্বে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।  
নারদের নিকট যুধিষ্ঠিরের কর্ণের অন্তঃসত্ত্বকথন, কর্ণের প্রতি  
অভিশাপ, কর্ণের অস্ত্রপ্রাপ্তি, শরস্বরে হৃষ্যোধন কর্ণক  
কর্ত্তাহরণ, কর্ণের পরাক্রমপ্রকাশ, দ্রীপাত্তির প্রতি যুধি-

ষ্টিরের অতিশাশন, যুধিষ্টির বিলাপ, ঋষিকুনিংসংবাদ, মকুলবাণী, সহদেববাণী, জৌপদীবাণী, অর্জুনবাণী, ভীমসেনবাণী, যুধিষ্টির প্রতি দেবদ্বানের উপদেশ, যুধিষ্টির প্রতি ব্যাসের উপদেশ, শ্রেনজিৎ উপাখ্যান, বোড়শ রাজিক উপাখ্যান, নারদপর্কোপাখ্যান, সুবর্ণজীবীর উপাখ্যান, প্রায়শ্চিত্তবর্ণন, যুধিষ্টির প্রতি ব্যাসের উপদেশ, যুধিষ্টির পুরপ্রবেশ, চার্লীকের ধর্ম্মানন্দা, চার্লীক-বধোপারকীর্তন, যুধিষ্টির রাজ্যাভিষেক, ভীমের বৌবরাজ্যাভিষেক, শ্রীকাক্যকথন, কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্টির স্তব, গৃহবিভাগ, যুধিষ্টির প্রসন্ন, যুধিষ্টির কৃত মহাপুরুষস্তব, পরশুরামোপাখ্যান, কৃষ্ণযুধিষ্টিরাদির ভীমের নিকট গমন, যুধিষ্টিরাদির বিদায়গ্রহণ, হস্তাধায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন, ঐলকশূপ-সংবাদ, সুচুক্ক উপাখ্যান, কৈকেয়োপাখ্যান, বাহুদেব নারদ-সংবাদ, কালকবৃক্ষীয় উপাখ্যান, যুধিষ্টির প্রতি ভীমের মন্ত্রগাহন-কীর্তন, দুর্গপরীক্ষা, রাষ্ট্রশান্তিকীর্তন, উত্তর্যগীতা-কীর্তন, বান্দেবগীতা, ইন্দ্রাধরীষসংবাদ, শক্রসমাজাত ব্যক্তির কর্তব্য কীর্তন, সেনাপতিকীর্তন, ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদ, সত্যান্তকীর্তন, ব্যাস-গোমায়ুসংবাদ, উদ্ভৃগীত্বোপাখ্যান, সরিৎসাগরসংবাদ, ঋষিকুন্সংবাদ, দন্তকীর্তন, দন্তোৎপত্তিকীর্তন, প্রহ্লাদবিপ্রবৃত্তাকীর্তন, ঋষভগীতা-কথন।

আপদ্রুপ পর্কোপাখ্যান—

রাজধি-বৃত্তান্ত-কীর্তন, কায়বাস্তাসংবাদ, শাকুলোপাখ্যান, মার্জারমূষিকসংবাদ, ত্রন্দন্ত-পূজনীসংবাদ, কণিক উপদেশ, বিখ্যামিত্র-নিষাদসংবাদ, কপোতসূরকসংবাদ, ভাষ্যাপ্রশংসাকীর্তন, ইন্দ্রোত-পারিষিত সংবাদ, গৃহগোমায়ু-সংবাদ, পবন শাস্ত্রালি সংবাদ, আত্মজ্ঞানকীর্তন, দমশূপবর্ণন, তপঃকীর্তন, সত্যকথন, লোভোপাখ্যান, নৃশংস-প্রায়শ্চিত্ত-কথন, ঋজোৎপত্তিকীর্তন, ষড়ঙ্গগীতা ও দ্বাত্তোপাখ্যান।

মোক্ষধর্ম্ম-পর্কোপাখ্যান—

পিঙ্গলাগীতা, পিতাপুত্রসংবাদ, সম্পাকগীতা, মন্দিগীতা, বোধ্যগীতা, প্রহ্লাদ ও অজগরসংবাদ, শৃগালকাশূপসংবাদ, ভৃগুভরদ্বাজসংবাদ, আচারবিধি, আপকোপাখ্যান, মহুবৃহস্পতি-সংবাদ, সর্ষভূতোৎপত্তি, গুরুশিষ্যসংবাদ, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন, পঞ্চশিষ্যজনকসংবাদ, ইন্দ্রপ্রহ্লাদসংবাদ, বলিবাসব-সংবাদ, ইন্দ্রনমুচিসংবাদ, বলিদানসংবাদ, লক্ষ্মীবাসবসংবাদ, দেবল-দৈর্ঘ্যবাস্যসংবাদ, বাহুদেব উগ্রসেনসংবাদ, শুকাশুপ্রসন্ন, মুত্যাগ্রজাপতিসংবাদ, ধন্যলক্ষণ, তুল্যদার-জাজলিৎসংবাদ, চিরকালিক উপাখ্যান, ছামৎলেন-সত্যবৎসংবাদ, ছামরশ্মি-কপিলসংবাদ, কুণ্ডার উপাখ্যান, বজ্রনিন্দা, প্রসন্নচুড়ীকীর্তন,

যোগাচারকথন, নারদদেবল-সংবাদ, মাণ্ডব্য-জনকসংবাদ, শিতাপুত্রসংবাদ, হারীতগীতা, বৃজগীতা, বৃজবধ, অরোৎপত্তি, দক্ষধজ্বিনাশ, দক্ষ কর্তৃক মহাদেবের সহস্রনামকীর্তন, পঞ্চভূতকীর্তন, সমদনারদসংবাদ, সগরারিষ্টেনেমিসংবাদ, ভবভার্গবসংবাদ, পরাশরগীতা, হংসগীতা, যোগবিধিকীর্তন, সাংখ্যযোগকথন, বশিষ্ঠ-করাগজনক-সংবাদ, রাজবক্ষ্য-জনক-সংবাদ, জনক-পঞ্চশিষ্যসংবাদ, শূলভাজনকসংবাদ, বেদব্যাস-শুকসংবাদ, ধর্ম্মমূলকথন, শুকোৎপত্তি, শুকজনকসংবাদ, শুকনারদসংবাদ, শুকাভিপতন, নারায়ণমাহাত্ম্যকীর্তন, ব্যাসোৎপত্তিকথন, উল্লুপুতাপাখ্যান।

এই সকল বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্কে ৩৩৯ অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা ১৪৭০৭।

১৩ অশ্বশাসন পর্ক।

কুরুরাজ যুধিষ্টির ভীম হইতে ধর্ম্মবিনির্দেশ প্রবণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই পর্কে ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যবহার, বিবিধ দানের পৃথক পৃথক কল, পাত্রবিশেষে দানের উৎকর্ষবিধি, আচার-ব্যবহার-নিরূপণ, সত্যের পরাকাষ্ঠা, গোত্রাঙ্গণের মাহাত্ম্য, দেশকালভেদে ধর্ম্মরহস্ত এবং ভীমের স্বর্গপ্রাপ্তি কীর্তিত হইয়াছে। এই ত্রয়োদশ পর্কে ১৪৬ অধ্যায় এবং ৮০০০ আট হাজার শ্লোক আছে।

১৪ আশ্বমেধিক পর্ক।

সমর্ষ ও সন্নতের উত্তম উপাখ্যান, সুবর্ণকোষসম্প্রাপ্তি, পূর্বে অদ্রাঘি দ্বারা দত্ত ও কৃষ্ণ কর্তৃক পুনঃসজীবিত পরীক্ষিতের জন্ম, যজ্ঞে অধমোচন করিয়া তদনুগামী অর্জুনের সহিত স্থানে স্থানে অমর্ষণ রাজগণের যুদ্ধ, চিত্রবাহন রাজার পুত্রিকা চিত্রাঙ্গদার গর্ভসম্বৃত ঋষি তনয় বক্রবাহন কর্তৃক অর্জুনের দ্বীবনসংশয়, অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ সময়ে নকুলোপাখ্যান, এই সকল বিষয় মহাকৃত আশ্বমেধিক পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্কে অধ্যায় ১০৩ এবং শ্লোকসংখ্যা ৩৩২০।

১৫ আশ্রমবাসিক পর্ক।

এই পর্কে গান্ধারীর সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিহর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমবাসার্থ অরণ্যে গমন করেন। ইহা দোষিয়া গুরুশ্রুশ্রবাপরায়ণা দার্ষা কুন্তী পুত্রের রাজ্যপরি-ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামিনী হন। তথায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ হত ও লোকান্তরগত পুত্র, পৌত্র ও অন্ত্যস্ত বীর রাজগণকে পুনরাগত দেখেন। ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণ-দৈপারনের প্রসাদে এই উত্তম ও আশ্রম ব্যাপার অবলো-কাতে গান্ধারীর সহিত শোকপরিত্যাগ করিয়া পরমা-সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ঐতিহাসিক সঙ্গ ও বিহর ধর্ম্মকে আশ্রম

করিয়া সঙ্গতি লাভ করেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদের মুখে বৃষ্ণিগণের কুলক্ষয়বার্তা শ্রবণ করেন। এই সকল বৃত্তান্ত আশ্রমবাসাধ্য পর্বে উক্ত হইয়াছে। এই পর্বে ৪২ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ১৫০৬।

১৬ মৌঘলপর্ক।—বাহার্য রণস্থলে অনার্যসে অস্রাবাত সহ করিতে, সেই বাদবগণ ব্রহ্মশাপরূপ দণ্ডে নিগৃহীত হইয়া দৈবনির্ধেয়ে সাগরকূলে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া এরূপ ভূগুণী শরাঘাতে আহত হন। এইরূপে রামকৃষ্ণ উভয়ে সমুদ্র বহুবংশের উচ্ছেদ করিয়া আপনারাও সর্বসংহারকারী উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। পরে নর-শ্রেষ্ঠ অর্জুন আসিয়া বাদবশূন্য দারকাদর্শনে অতিশয় নিবেদ প্রাপ্ত হন, তিনি স্বীয় মাতুল নরশ্রেষ্ঠ বাহুবল্লভের সৎকার করিয়া সুরাপানসভার বহুবংশীর বীরগণের আত্যন্তিক বিনাশ দর্শন করেন। অর্জুন রাম এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বহুবংশীরদিগের শরীর-সৎকার করিয়া দারকা হইতে আবাল-বৃদ্ধবিনিতা সকলকে লইয়া আসিবার সময় পশ্চিমধ্যে ঘোরতর বিপদে পতিত হন। তখন তিনি গাণ্ডীব ধনুর পরাভব এবং দিব্যাস্ত্র সকলের অপ্রসন্নতা দর্শন করেন। পরে বাদব-যোধ্যা-গণের অপহরণ ও পরাক্রমের অনিত্যতা-দর্শনে অত্যন্ত নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া ব্যাসের বাক্যানুসারে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনের অভিলাষ করেন। এই মৌঘলপর্কে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৮ অধ্যায় এবং ৩২০ শ্লোক।

১৭ মহাপ্রোস্থানিক পর্ক।

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান অবলম্বন করেন। পরে ইহার লোহিত-সাগরকূলে গমন করিয়া অগ্নিকে দর্শন করিলেন। সেইস্থলে অগ্নির আদেশানুসারে অর্জুন সেই মহাপ্রভাব অগ্নিকে পূজা করিয়া নিজ গাণ্ডীবধনু প্রদান করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির, প্রথমে দ্রৌপদী ও ক্রমে পর পর সমুদ্র ভ্রাতৃগণকে নিপতিত দেখিয়া মারামমতা পরিত্যাগ করিয়া একাকী প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এই পর্কে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৩ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ৩২৩।

১৮ স্বর্গারোহণ-পর্ক।

মহাপ্রাজ্ঞ ধর্মরাজ স্বর্গ হইতে দেবদান উপস্থিত হইলে স্বমতিবাহারী কুতূরকে ত্যাগ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে সক্ষম হইলেন না। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা অবলোকন করিয়া ধর্ম কুতূররূপ পরিত্যাগ-পূর্বক যুধিষ্ঠিরকে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। যুধিষ্ঠির ধর্মের

সহিত স্বর্গারোহণ করিলে দেবদূত ছলক্রমে তাঁহাকে নরক দর্শন করান। এই সময় তাঁহার উৎকট ব্রতগা হ্র। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই নরকে বন্দের বশবর্তী স্বীয় ভ্রাতৃগণের করুণ ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ইহা ও ধর্ম উভয়ে যুধিষ্ঠিরকে 'ঐশ্বর্য' ভোগের এই কল' ইহা বলিয়া ঐ সমস্ত বিষয় দেখাইলেন। যুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গার সলিলে স্নানপূর্বক মানবদেহ পরি-ত্যাগ করিয়া দেবলোকে স্বধর্মোপার্জিত জ্ঞান পাইয়া দেব-রাজ ও অস্ত্রান্ত দেবগণের সহিত পূজিত হইয়া পরমানন্দ-সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এই পর্কে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্কে ৫ অধ্যায় এবং দুই শত নর শ্লোক।

এইরূপে সমুদ্র অষ্টাদশ পর্ক কথিত আছে। ইহার খিল হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্ক কীর্ণিত হইয়াছে। মহাভাষ্য তাহাতে দাদশ সহস্র শ্লোক রচনা করিয়াছেন। মহাভারতের পর্ক-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী বৃদ্ধ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইলে অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত দারুণ বৃদ্ধ হইয়াছিল।

মহাভারতের অমুক্রমণিকার বৈরণ প্রতি পর্কে শ্লোকসংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে, বৃত্তিত মহাভারতের আবার তাহার মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এমন কি এনিমিটিক সোসাইটি ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত মহাভারতও পরস্পর শ্লোকসংখ্যা একরূপ নহে। নিম্নে একটা তালিকা দিলাম, দেখিবেন

কত প্রভেদ।	পর্কসংখ্যে উক্ত পর্ক	সোসাইটির শ্লোকসংখ্যা	বোম্বাই বৃত্তিতের শ্লোক
১। আদি	৮৮৪	৮৪১৫	৮৬২৩
২। সভা	২৫১	২৭০২	২৭১২
৩। বন	১১৮৪	১১৪১৮	১০৮৫২
৪। বিরাট	২০৫	২৩৭৬	২২৩২
৫। উদ্যোগ	৬৬২৮	৭৬৫৬	৬৬১৪
৬। ভীষ্ম	৫৮৮৪	৫৮৫৬	৫৮৬২
৭। দ্রোণ	৮২০০	৯৬৪২	৯৬৪৪
৮। কর্ণ	৪২৬৪	৫০৪৬	৫০১৫
৯। শল্য	৩২২০	৩৭৬১	৩৬৪৮
১০। সৌতিক	৮৭০	৮১১	৮০৩
১১। শ্রী	৭৭০	৮২৭৪	৮২৫
১২। শান্তি	১৪৭০৭	১৩২৪৩	১৩৭৭৪
১৩। অশ্বমেধ	৮০০০	৭৭২৬	৭৭০১
১৪। আশ্বমেধিক	৩৩২০	২২০০	১০৮৮
১৫। আশ্রমবাস	১৫০৬	১১০৫	১০৮৮
১৬। দৌল	৩২০	২২২	২৮৭
১৭। মহাপ্রোস্থানিক	৩২০	১০২	১১০
১৮। স্বর্গারোহণ	২০২	৩২২	৩২০
১৯। খিল হরিবংশ	১২০০০	১৩৭৭৪	১৩৬৪৪

মহাভারতের অহরুক্ষমণিকায় অশ্বমেধপর্বে যে শ্লোক সংখ্যা আছে, প্রচলিত অশ্বমেধ পর্বে তদপেক্ষা অনেক কম। এজন্য অনেকেই জানিতেন যে ভারতীয় অশ্বমেধ পর্কের শেষ ২৩০টি অধ্যায় লুপ্ত হইয়াছে। কিছুদিন হইল, বোম্বাই হইতে পণ্ডিত বামন শাস্ত্রী ইসলামপুরকর যে পরাশরসংহিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মুখবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে মলয়ালম্ অক্ষরে লিখিত একখানি অতিপ্রাচীন মহাভারতের পুথিতে ২৩০টি অধ্যায় আছে এবং বৃদ্ধ শোভামত্মি নামে অতি-হিত ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেও তিনি ঐ বিরল প্রচার অধ্যায়গুলি দেখিয়াছেন।

ভারত-পাঠবিধি।

মহাভারতেই লিখিত আছে, যে ব্রাহ্মণ চতুর্বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ সমুদয় বিজ্ঞাত আছেন, অথচ এই মহাভারতীয় আখ্যান জানেন না, তাহাকে কখনই বিচক্ষণ বলা যায় না। অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন বাগদেবকর্তৃক এই মহাভারত অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও অতি বিস্তৃত ধর্মশাস্ত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন পুংস্কো-কিলের কুজনশ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকশব্দশ্রবণে স্পৃহা হয় না, সেইরূপ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে ছাত্র কিছু শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মে না। এক মহাভারত হইতেই সকল প্রকার কবিত্ব-লাভ হইয়া থাকে। যে রূপ জরায়ুজ, যেদজ, অশুভ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ প্রজ্ঞা অন্তরীক্ষের মধ্যেই অবস্থিতি করে, সেইরূপ সমুদায় পুরাণ এই আখ্যানের অন্তর্গত। যে রূপ মনের ক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্বরূপ, সেইরূপ এই আখ্যান দানাদায়নাদি ক্রিয়ার এবং শমদমাদি গুণের আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছে। যে রূপ আহার বাতীত শরীর-ধারণের উপায়ান্তর নাই, তদ্রূপ এই আখ্যানের আশ্রয় বাতীত ভূমণ্ডলে কোন আখ্যানেরই বিত্তমানতা নাই। অবহিতচিত্তে মহাভারতশ্রবণ করিলে সকল তীর্থের ফল লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দ্বিভা-ভাগে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল পাপাচরণ করেন, সায়াংকালে মহাভারত নাম কীর্তন করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। আর রজনীতে কায়মনোবাক্য দ্বারা যে পাপ করেন, প্রাতঃ-কালে মহাভারত নামকীর্তনে সেইপাপ হইতে মুক্ত হন। যিনি বহুশ্রুত ও বেদবিদ ব্রাহ্মণকে স্তবর্ণশৃঙ্গবৃক্ষ শত গো দান করেন, এবং নিরন্তর পবিত্র ভারতকথা শ্রবণ করেন, সেই দুই জনেরই তুল্য ফল হয়। (ভারত আদিপর্ব ২ অ.)

কিরূপ প্রণালীতে মহাভারত পাঠ এবং শ্রবণাদি করিতে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। জনমেজয় বৈশ-ম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! কিরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করিতে হয় এবং উহা শ্রবণে কি ফল হয়?

পারণ সময়ে কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করা আবশ্যক, প্রত্যেক পর্কের সমাপ্তিতে কোন্ কোন্ দ্রব্য প্রদান করা বিধেয় এবং কিরূপ ব্যক্তিকেই বা বক্তা করিতে হয়, এই সকল বিষয় কীর্তন করুন।

স্বর্গীয় দেবগণ ক্রৌড়া করিবার জন্য অবনীতে অবতরণ করিয়া কাষ্যপেয়ে পুনরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। কল্প-গণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, আদিত্যগণ প্রভৃতি সকলই এবং অস্ত্রাঙ্ক হাবরজ্জন্ম ও সুরাসুর সমস্ত জগৎ এই মহাভারতে একাধারে লক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের প্রতিষ্ঠা শ্রবণ এবং নাম ও কীর্তন করিলে তৎক্ষণাৎ মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ-প্রাপ্ত হওয়া যায়। আশ্বমৎসম-সহকারে যথাবিধানে এই ভারত ইতিহাস শ্রবণ করিলে পুনরায় ভারতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ভারতশ্রবণ করিয়া ভীষ্মাদি মহাপুরুষ-গণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিলে পরম পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে।

সাধ্যাহুসারে সরলচিত্তে সন্তোষসহকারে অবিচলিতভাবে শুক্রযাপারণ, সত্যরত, দান্ত, শুচি প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া মহাভারত শ্রবণ করিতে হয়। শ্রবণ-কালে যেন কোনরূপ মনোমালিন্য না ঘটে। শুচি, স্নান, শুক্রবস্ত্রপরিধারী, সংস্কার-সম্পন্ন, সর্বশাস্ত্রে জ্ঞানবান্, শ্রদ্ধাশীল, অসুরাহীন, জিতেন্দ্রিয়, রূপবান্, সৌভাগ্যবান্, সমগুণবিশিষ্ট, সত্যবাদী, দাতা ও মান্ত ঈদৃশ ব্যক্তিকে ভারতের পাঠক বা বক্তা করা কঠব্য।

ভারতপাঠের নিয়ম।—পাঠক কুশাসনে আসীন হুষ্টিচিহ্ন ও সমাহিত হইয়া ত্রিষাষ্ট বর্ণযোগ সহকারে মুক্তা প্রভৃতি অষ্টবিধ উচ্চারণ-স্থান হইতে সমাক্রমে উচ্চারিত করিয়া রস ও ভাব সকলের সমন্বয় বিধান এবং পদ সকলের সুস্পষ্ট বিজ্ঞাপনপূর্বক পাঠ করিবেন। পাঠ-সময়ে বিলম্ব, আয়াস, সত্ত্বরতা, অধৈর্য্য, অহুংসাহ ইত্যাদি পাঠ-দোষ সকল পরিহার করা আবশ্যক। পাঠের সময় প্রথমে নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে ছয় উচ্চারণ করিবে। যিনি উল্লিখিত নিয়মাহুসারে ভারত পাঠ করেন, তাহার নিকট নিয়মস্থ ও শুচি হইয়া ভারত শ্রবণ করিলে বিশিষ্টরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

মহাভারতে পাঠের সময়ে কঠব্য,—মহাভারত পাঠ কালে প্রতি পর্কে জাতি, দেশ, সন্ত, মাহাত্ম্য এবং ধর্ম প্রবৃত্তি অহুসারে ব্রাহ্মণদিগকে বাহ্য দান করিতে হয়, তাহার বিধান এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। প্রথমে ব্রাহ্মণকে যন্তিবাচন করাইয়া কার্য আরম্ভ করিবে। পরে সমাপ্ত হইলে স্বীয় সাধ্যাহুসারে তাহাদিগের পূজা করা কঠব্য। আদি পর্ব

সমাপ্ত হইলে পাঠককে যথাবিধি বস্ত্র ও গন্ধ সমেত মধু পায়স ভোজন করাইবে। আত্মীক পর্কের পাঠ সমাপ্ত হইলে কল, মূল, স্বত ও মধুমিশ্রিত পায়সভোজন এবং গুড়োদক-দান, সভাপর্ক শেষ হইলে অপূর্ণ ও মোদক সহিত হবিষ্য ভোজন, বন পর্কের শেষে বিবিধ বস্ত্র ফলমূলাদি দান, বিরটিপর্কের শেষে বিবিধবস্ত্র, উত্তোগে সর্সপ্রকার অভীষ্ট ও গন্ধমাণ্যাদি, ভীষ্ম পর্কে উৎকৃষ্ট বান ও অন্নদান, দ্রোণ পর্কে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া শর, ধনু ও খড়্গাদান, কর্ণপর্কে উত্তমরূপে ব্রাহ্মণভোজন, শল্য পর্কে মোদক, গুড়োদন ও অপূর্ণ সমেত আহার, গদাপর্কে মৃদুমিশ্রিত অন্ন, দ্রুপ পর্কে রত্ন, ঐষিক পর্কে স্বতোদান, হবিষ্য ভোজন, আশ্বমেধিক পর্কে অতিলাভ্যরূপ আহার, আশ্রমবাসে হবিষ্য ভোজন, শান্তি পর্কে মৌবল ও মহাপ্রস্থানিক পর্কে গন্ধমাণ্য ও অমূল্যদান দান এবং বর্গ পর্কে হবিষ্যভোজন করাইবে। পরে হরিবংশ পাঠ সমাপ্তি হইলে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান আবশ্যক। পাঠককে নিম্নলিখিত বিবরণ দিতে হয়।

শ্রেয়স্কাম পুরুষ ব্রাহ্মাণ্ড ও যন্ত্র সহকারে ভারত প্রবণ করিবেন। যাহার গৃহে মহাভারত আছে, সে ব্যক্তি নিত্য জয়শীল। মহাভারত সুদায় শাস্ত্রের প্রধান এবং মোক্ষ ও তত্ত্ব-প্রাপ্তির নিদান। পৃথিবী, গো, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু ও ভারতসংহিতা এই সকলের নাম করিলে অবসাদ উপস্থিত হয় না। বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের আদি ও অন্ত সর্বত্রই নারায়ণের বর্ণনা আছে। ( হরিবংশ পর্বসংগ্রহাধ্যায় )

যুরোপীয় মত।

মহাভারত সম্বন্ধে যুরোপীয় সংস্কৃতবিদগণ যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অপূর্ণ মতসমূহ এদেশীয় পাণ্ডিত্যগণের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অভি-প্রায়ের সার মর্ম প্রকাশ করিতেছি।

প্রসিদ্ধ জর্মণ-পণ্ডিত বেবের (Weber) সাহেবের মতে— ‘মহাভারতকে প্রাচীন গ্রন্থ বাল্যে মনে করা যায় না। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে লিখিত ডিওন ক্রিসোস্টোমের গ্রন্থ ভিন্ন তৎপূর্ব-বর্তী অপর কোন গ্রন্থে মহাভারতের স্পষ্ট প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। এমন কি পাণিনির সময়েও মহাভারত রচিত হয় নাই, কারণ পাণিনি যুধিষ্ঠির, হস্তিনাপুর, বাসুদেব প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই। আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন-গৃহসূত্রে ভারত ও মহাভারতের উল্লেখ থাকিলেও এ অংশ প্রসিদ্ধি খুঁজিয়াই মনে হইবে। বাজসনেয়সংহিতায় ইহাই ‘অজুন’ আখ্যায়িক্তিহিত। বজ্রকোষে আলোচনা করিলে মনে হইবে

যে কুরু ও পাঞ্চালে কোন বিরোধ নাই, উভয়ে শান্তভাবে মিত্রভাবে পালন। শতপথব্রাহ্মণ দেখিলেই মনে হইবে, পরিকল্পিত জনমেজয়ের চরিত্র তখনও সাধারণের স্বত্তিগণে সমুজ্জল রহিয়াছে, তাঁহার অভ্যাস ও অধঃপতন তখনও সাধারণে বিস্তৃত হয় নাই। সমস্ত মহাভারত তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—১ম মূল অংশ মহাসমরবর্ণনা। ২য় অংশ প্রাচীন আখ্যান ও উপাখ্যান-সংগ্রহ। ৩য় আধুনিক অংশে ক্ষত্রিয়দিগের কর্তব্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠতা-প্রসঙ্গ। এই অংশেই শক, যবন, পল্লবদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাসমর-বর্ণনাই মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু এ সম্বন্ধে ২০০০০-এর অধিক শ্লোক নাই। এ অংশ রামায়ণের মূল অংশের সমকালের রচনা। কিন্তু রামায়ণের রূপকাংশ ইহারও অনেক পরে বিরচিত। বেবের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে যে ইতিহাসের উল্লেখ আছে, সেই সকল বিপুল আখ্যায়িকার সারসংগ্রহই মহাভারতের দ্বিতীয় অংশ। তৃতীয়াংশে পল্লব প্রভৃতি আধুনিক নামের উল্লেখদ্বারা বেবের-সাহেব নোল্ডকে-সাহেবের মতানুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ‘পার্শ্ব শব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে ‘পল্লব’ শব্দের উৎপত্তি। খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে এই শব্দ ভারতবাসী গ্রহণ করিয়া থাকিবে। মোটের উপর যখন মেগাস্থেনিস মহাভারতের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নাই এবং খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে ডিওন-ক্রিসোস্টোম যখন ইহার প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তখন খৃষ্ট পূর্ব ৩য় হইতে ১ম শতাব্দীর মধ্যে মূল মহাভারত সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার তৃতীয় অংশ তাহারও অনেক পরে (ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যাস কালে) খৃষ্টীয় ৩য় ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।’

স্রোডার (Schroeder) সবিস্তার মহাভারত আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

‘বংকালে ব্রাহ্মা সূর্যপ্রধান দেবতা বলিয়া পূজিত হইতে-ছিলেন, সেই সময় (খৃঃ পূঃ ৭০০—৫০০ বা ৪০০ অব্দে) (মহাভারতের) আদি কবি জন্মগ্রহণ করেন। সেই গায়ক কুরুভূমির সন্তান। তিনি লোকমুখে কুরুবংশের প্রভাব ও অজ্ঞাতপূর্ব এক জাতির হস্তে তাঁহাদের পরাজয়-কাহিনী শুনিয়াছিলেন। সেই বিরোপাস্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়া তিনি দেশীয় বীরগণকে ক্ষত্রিয়ধর্মের আদর্শ এবং বাদ্যবীর কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য প্রভৃতি বিদ্রোহাদিগকে নীচজাত ও অস্তায়রূপে অস্বাকারী বলিয়াই চিত্রিত করিয়া-ছিলেন। সেই পুরাতন ভারতবাসী আশ্বলায়ন-গৃহসূত্রে উক্ত হইয়াছে। তাহার বহুকাল পরে কুরু যবন অবতার



বলিয়া গৃহীত হইলেন, তখন পাণ্ডুবংশীয়গণের সাহায্যে কুরুভক্ত পুরোহিতগণ বৃদ্ধের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে বিষ্ণুই প্রধান দেব হইলেন, তাঁহার অমুরক্ত পুরোহিতগণ ‘ভারত’ কাব্য লইয়া তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের প্রধান সহায় পাণ্ডবংশধরগণ। সুতরাং আদি ভারতে যেখানে যেখানে তাঁহাদের অপকীর্তি বর্ণিত ছিল, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের উজ্জল যশোভাতি প্রকাশিত হইল এবং তাঁহাদের বিপক্ষ কুরুগণ নিন্দিত হইলেন। পাণ্ডবংশ প্রকৃত প্রস্তাবে দাক্ষিণাত্যবংশসম্ভব হইলেও এই সময়ে কুরুবংশের এক শাখা বলিয়াই পরিচিত হইলেন।\*

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার প্রাচ্য-সভার পত্রিকার অধ্যাপক হফকিন্স (E. W. Hopkins) “Position of Ruling Caste in Ancient India” নামে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি অধ্যাপক লাসেন ও শ্রোডারের মত-বিরুদ্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রোডার দেখাইয়াছেন যে ষড়্ভূর্বেদেরও পূর্বে ভারতকাব্যের ঘটনা সংগঠিত হইয়াছিল, কারণ ষড়্ভূর্বেদেই কুরুপঞ্চালের কুটুম্বিকার কথা পাওয়া যায়, এবং সেই কুটুম্বিকা হইতেই মহাসমর ঘটে। অধ্যাপক লাসেনও বহু পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে কুরুপঞ্চালের যুদ্ধকীর্তন করাই আদি ভারতকাব্যের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই সকল মত এখন আর নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। ‘শ্রোডারের বিপর্যয়-সিদ্ধান্তও অতিপন্ন হয় নাই। এক পক্ষ একবার শুভ্রবর্ণে চিত্রিত হইয়া আবার পরবর্তী কবির হস্ত কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণাভাব। পরবর্তী কবিগণের যদি পাণ্ডুবংশকে বাড়াইবার সঙ্কল্প থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা পাণ্ডুবংশের দোষগুলি উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু উত্তর পক্ষ কেহই দোষমুক্ত হন নাই, কবি কোন পক্ষকেই ছাড়েন না, প্রকৃত পক্ষে আদিভারতের বিপর্যয়-সাধন-পূর্বক বর্তমান মহাভারতের সৃষ্টি স্বীকার না করিয়া আদি ভারতের বিবর্তনে বর্তমান ভারতের পরিপুষ্টি স্বীকার করা বাইতে পারে। আদি সমাজ-চিত্র ও পরবর্তী সমাজচিত্র আলোচনা করিলেই কতকটা জানা যাহতে পারিবে। ধর্মের নিয়মতির সহিত নীতিজ্ঞানের উচ্চ গতি ঘটে। পরবর্তী ধর্মজ্ঞান পূর্বতন অপেক্ষা অন্ন সরল ও অন্ন বিস্তৃত বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু পরবর্তী নীতি পূর্বতন হইতে অনেকটা

উচ্চ তাবাপন্ন ও কঠোর নিয়মবদ্ধ। আদিভারতের গল্প সর্বত্র বিদিত, সে গল্পে প্রাচীন নীতিজড়িত, পরিবর্তিত নীতি-জ্ঞানের সহিত তাহা বিভিন্ন। কাজেই প্রাচীন আখ্যায়িকা তুলিয়া দেওয়া যেমন সহজ নহে, সেইরূপ পূর্বতন ধর্মচিত্র উঠাইয়া ফেলাও অসম্ভব হইয়াছিল। সেইজন্য পরবর্তী কবি পূর্ব কথগুলি তুলিয়া না দিয়া নিজ সময়োপযোগী পরিবর্তিত নীতি পূর্বের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন, তাহাতেই মহাভারতের পরিপুষ্টি। কিন্তু পূর্বতন লোকের নিকট যাহা সরল ও ধর্ম্য বলিয়া বিবেচিত হইত, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন আধুনিকের চক্ষে হয়ত সজ্জেই তাহা যশস্বর বলিয়া গণ্য হইবার নহে। যেমন আদি গল্পে আছে, অর্জুন নিরাশ্রয় অবস্থায় কর্ণের প্রাণ বিনাশ করেন। পূর্বনীতির কাঁচে হয়ত এটা দোষের বলিয়া গণ্য না হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান নীতি কখনই ইহার সমর্থন করিবে না। “সমানে সমানে জ্ঞায় যুদ্ধ করিবে” ইহাই হইল পরবর্তী কবিগণের কথা। কিন্তু অর্জুনের মত ধর্ম্মাত্মা যে নিরাশ্রয়ের প্রাণবধরূপ অন্যায় কাব্য করিতে পারে, তাহা পরবর্তী নৈতিক উচিত মনে করেন না, সেইজন্য প্রকাশ করিলেন যে স্রং ভগবানের আদেশ, তাহার আবার ভাল মন্দ কি? পরবর্তী কবির ইচ্ছা, পাণ্ডুবংশের কীর্তিঘোষণা ও সন্ন্যাসের প্রবর্তন। কোন কোন স্থলে কবি কীর্তিকে নীতির কাঁচে বলি দিয়াছেন। এমন কি কুরুগণ পাণ্ডুদিগকে ভীষণভাবে গালি দিয়া বলিতেছেন, ‘যখন হুই ব্যক্তি যুদ্ধ করিতেছে, তখন কি বজ্রের হইয়া তৃতীয় ব্যক্তি কতৃক শত্রুনিধন কর্তব্য, এই কি ধর্ম্ম?’ অর্জুন তখন হাসিয়া উত্তর দিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! ‘কি জন্ত তোমরা আমার দোষী করিতেছ! যখন দেখিলাম আমার বান্ধব শত্রু করে নিগৃহীত হইতেছে, তখন কি শত্রুকে আঘাত করা কর্তব্য নয়? যদি এতদ্ব্যতীত স্রং যুদ্ধ করে, তাহা হইলে আর বিবাদ কি জন্ত? একপক্ষ যুদ্ধনীতি নহে।’ বাস্তবিক যেন মনে হইতেছে, কুরুদিগের অভিপ্রায় কোন্টি ভাল বা কোন্টি মন্দ তাহা পৃথক্ করিয়া লইবার জন্ত গঠিত হয় নাই। কিন্তু পাণ্ডুবংশে নীতির পরিপুষ্টি হুচনা করিয়া দিতেছে।\* অধ্যাপক হফকিন্স শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মহাসমরের গল্পে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত অভিজাত কুরুবংশে উচ্চতর সভ্যতার লক্ষণ পরি-ক্ষুণ্ণ, কিন্তু নবোদিত ইতর পাণ্ডুবংশে সেই প্রাচীনতার অভাব। অবশ্য অনেক পরে ইহারা আবার সভ্যসমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গল্প ও চরিত্রসমূহের সম্যক পরিবর্তন করা পরবর্তী কবিগণের অভি-

\* Schroeder's Indien Literatur und Cultur, p. 457-479.



প্রেত ছিল না। সমীতিপ্রচারোদ্দেশ্যেই পরবর্তী কবিগণ বিবর্তন ও পরিবর্তন করিয়াছেন। কেহ কেহ যে বলেন, কুরুপাকাল-যুদ্ধই মূল কথা, পরে পাণ্ডুপ্রসঙ্গ প্রবেশ করিয়াছে, ইহারও কোন ভিত্তি নাই। পাণ্ডুপাকাল-কুটুস্থিতা যে মহাসমরের কারণ, তাহা বরং বলা যাইতে পারে। কেহ আবার ভারতের ধৃতরাষ্ট্রকে বৈদিক ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাও সমীচীন নহে। কারণ বজ্রবীজের ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃত, কিন্তু পাণ্ডুবংশ সে সময়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভারত-কাব্যের পাণ্ডুবংশই প্রকৃত, কুরু নৃপতির ছায়ামাত্র যেন চিত্রিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সময়ের কুরুরাজ দুর্য়োধন। এ সময়ে কুরুবংশের প্রভাব গিয়াছে, নামমাত্র আছে। পাণ্ডুবংশের পুরোহিতগণ পাণ্ডুবংশের বিজয়বোধনাকালে তাঁহাদের গৌরব বুদ্ধির জন্তই অবসর কুরুবংশকে বেদের প্রভাবশালী কুরুগণ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্তই তাঁহারা বেদের ধৃতরাষ্ট্রকে আনাইয়া কুরুনৃপস্থলে বসাইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে বেদোক্ত ধৃতরাষ্ট্রের বহুকাল পরে পাণ্ডুবংশের অভ্যুদয়। এইরূপে তাঁহারা ব্রাহ্মণোক্ত জনমেজয়কে বর্তমান ভারত নামকের পুত্র বলিয়া প্রচার করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে যত প্রাচীন, ততই সম্মানিত, আর যতই সম্মানিত, ততই উত্তরোত্তর গৌরবপ্রাপক। এই মহাকাব্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে দুই কারণে এই মহাকাব্য বিপুলায়তন লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ মহাকাব্যের মধ্যে মধ্যে উপাখ্যানাদি পূর্বতন বিষয়ের সন্নিবেশ এবং দ্বিতীয়তঃ অস্বাভাবিকরূপ অভিনব ঘটনার সংযোজন। শাস্ত্র-পক্ষে প্রথমের পরিপোষক অনেক বিষয় রহিয়াছে, আবার স্বর্গারোহণপক্ষে শেষোক্ত প্রসঙ্গের যথেষ্ট পারচয় পাইবে। বলিতে কি মূল মহাকাব্যের বিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, বার্থতঃ ইহা কেবল বোঝা বহিতেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক আরও বলিয়াছেন যে এই মহাকাব্য হইতে ভারতের দুইটি সামাজিক চিত্র দেখা যায়, এক সার্কি দ্বিসহস্র বর্ষের পূর্ববর্তী অর্ধপুষ্ট অবস্থা, অপরটি তাহার সহস্রবর্ষের পরবর্তী অবস্থা।\*

অধ্যাপক ডঃ বুহলার (Dr Buhler) মহাভারতের ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান স্থতিগ্রন্থগুলির ভিত্তি মহাভারত খানিও একখানি উৎকৃষ্ট সন্দৃষ্টপূর্ণ স্থতিগ্রন্থরূপে প্রচারিত ছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক লাড-উইগ্‌ বিশেষ আলোচনা করিয়া প্রকাশ করেন যে, মহা-

ভারতকে বাহারা ইতিহাস (History) বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, সন্দেহ নাই। মহাভারতে ঐতিহাসিকতার যথেষ্ট অভাব। অধ্যাপক হোল্‌জম্যান (Prof. Holtzman) অনেকাংশে লাড-উইগের মত সমর্থন করিয়া “মহাভারত—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য” দেশে এই নাম দিয়া চারিখণ্ডে বিভক্ত এক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ডাহলম্যান (Dr. Dahlmann) Das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch অর্থাৎ “মহাভারত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ” এই নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি আশ্চর্য্যজনক গৃহস্থর, পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, অশ্বঘোষের বৃহচরিত, এবং বৌদ্ধদিগের জাতক ও জৈনদিগের ধর্মকথার উপাখ্যানগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া ও অন্তর্ভুক্ত করার আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্তমান মহাভারতের কাব্যংশ খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীরও পূর্বে অতি সামান্য পরিবর্তিত আকারে বর্তমান ছিল। তিনি মহাভারতের ত্রয়োদশটি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, মহাভারতের উপাখ্যানাংশ বহুকাল হইতে একটি নীতিকথারূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে অপরাপর কথার সহিত মিশিয়া একরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহার মধ্য হইতে উপাখ্যানাংশ বাহ দিয়া নীতি কথাটুকু বাছিয়া লওয়া এক প্রকার অসম্ভব। পিতৃ-হীন পাণ্ডবগণ দুষ্টবুদ্ধি দুর্য়োধন-হস্তে যথেষ্ট উৎপীড়িত হইয়া শেষে মহাসমরে স্বার্থ সাধন করেন। অশ্বয় কর্তৃক ধর্মের উৎপীড়ন, পরে ধর্মের জয়বোধনা করাই নীতি-কথার উদ্দেশ্য। ক্রমে এই সন্দৃষ্টাংশটী অলঙ্কার দিয়া সাজাইবার জন্ত ইহাতে উত্তরকালে নানাগল্প প্রবেশ করিয়াছে। নামক যুধিষ্ঠির দুর্দশায় অধীর হইয়া না পড়েন, এজন্য কোন কবি নলোপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে কোন কবি গান্ধারবিশ্বাসে বিবাহের বৈধতা প্রমাণার্থ শকুন্তলোপাখ্যান, আহুর-বিবাহের উদাহরণ স্বরূপ মাদ্রী, লক্ষণা, সুভদ্রা, অশ্বা ও অশ্বালিকা-হরণ প্রকাশ করিলেন। হয়ত এইরূপে নিরোগপ্রথা দ্বারা সন্তানোৎপাদনের দৃষ্টান্তস্বরূপ পরাশর কর্তৃক সত্যবতার, ব্যাস কর্তৃক অশ্বালিকার ও দেবগণ কর্তৃক কুন্তিমাত্রীর পুত্র-লাভের বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। এছাড়া বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের প্রাধান্য বোধনা করিবার জন্ত দার্শনিক তত্ত্ব ও নানাবিধ উপাখ্যানাদির সৃষ্টি হইল। ডাক্তার ডাহলম্যান আরও লিখিয়াছেন যে, জ্যোতিষীরা স্বতন্ত্র সত্যই ছিল না। অবিভক্ত সম্পত্তি অবিসম্বাদে কিরূপে ভাগ্যগণ ভোগ করিতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্তই পত্নীকূলে জ্যোতিষীর চিত্র কল্পিত

\* Journal of the American Oriental Society for 1884.

হইয়াছে। অধ্যাপক হোল্জমান দুর্ঘোষন শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থে ভ্রম দেখাইয়া এক সিদ্ধান্ত করেন যে, কৌরব-বিদ্রোহীরা অত্যধিক পাণ্ডবপ্রীতিহেতু মহাভারতের ইতি-হাস্যাংশে বিস্তার জটিলতা ঘটাইয়াছেন। তাঁহার মতে পাণ্ডব-ভক্ত কবি দুর্ঘোষন শব্দের ছুট বা কুংসিত বোঝা অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহার অর্থ দুঃখে বা বহু আয়াসেও বাহ্যিক যুদ্ধে জয় করা যায় না। পাণ্ডবপ্রীতি হইতেই পাণ্ডব-পক্ষের অতিমাত্র সত্যতা ও নানাবিধ জটিল বিধি নিষে-ধাদি প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার ডাল্জমান অধ্যাপক হোল্জমানের এই মত অস্বীকার করিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। তিনিও মহাভারতের ঐতিহাসিকতার অভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক লাডউইগের মতামত গ্রহণ করিয়াছেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক লাডউইগ মহাভারত সম্বন্ধে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, পঞ্চ পাণ্ডব গ্ৰীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত এই পঞ্চ ঋতুর মূর্তি, দুর্ঘোষন শীত ঋতু, দ্রোণদী পৃথিবী, যুদ্ধাদি ঋতু-পরিবর্তন-হ্রত পার্থিব পরিবর্তন, পাশাক্রীড়ার অক্ষপাটীগুলি শীত ঋতু-সঞ্চারক নাস্ত্রিক অবস্থান এবং খেলার জয়ই পৃথিবীতে শীতাবির্ভাব ইত্যাদি।

অল্লদিন হইল, অধ্যাপক জাকোবি বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি-বিষয়ক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গতঃ মহাভারত-রচনা-কালের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মহাভারতকে যতই কেন প্রাচীন বলিয়া কল্পনা করা হউক না, কিন্তু কিছুতেই ইহাকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহার সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন যে, মহাভারত মধ্যে শক বা যবন-জাতি কেহই পঞ্জাববাসী বলিয়া বর্ণিত হয় নাই, অথবা পঞ্জাবে বুদ্ধ অথবা পারসিক প্রভাবের কোন উল্লেখও নাই।

ভারতালোচনা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাভারত সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, তাহার সহিত আমা-দের সম্পূর্ণ একমত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে তাঁহাদের আলোচনা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক, তাহাও একবারে বলা যায় না। আদি মহাভারত নানাস্থানে নানা লোকের হাতে পড়িয়া যে বিপুলায়তন লাভ করিয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। মহাভারতে লিখিত আছে—

“মহাদি ভারতঃ কেচিদান্তিকাদি তথাপরে।

তত্তোপরিচরাত্তন্ত্রে বিপ্রাঃ সন্মগধীরতঃ।

XIV

বিবিধঃ সংহিতাজ্ঞানং দীপয়ন্তি মনোবিগঃ।

ব্যাখ্যাতুঃ কুশলাঃ কেচিদ্ গ্রহান্ ধারয়িতুঃ পরে ॥”

(আদি ১।৫২-৫৩)

কোন কোন ব্রাহ্মণ ‘নারায়ণঃ নমস্কৃত্য’ ঈত্যাদি প্রথম মন্ত্র হইতে, কেহ কেহ আন্তিক পক্ষ হইতে, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে এই ভারতের আরম্ভ মনে করিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এইরূপে পণ্ডিতেরা নানা প্রকারে সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করেন। কেহ কেহ গ্রন্থব্যাখ্যায় পটু, আবার কেহ বা গ্রন্থার্থ ধারণা করিতে নিপুণ।

কাহ্নেই বলিতে হইবে যে, বহুকাল হইতেই মহাভারতের কোন্ অংশ আদি ও কোন্ অংশ অন্ত তাহা ঠিক ছিল না।

আদিপর্কের ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

“ইদং শতসহস্রং লোকানাং পুণ্যকর্ণণাম্ ॥১০১

চতুর্বিংশতিসহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।

উপাখ্যানৈবিনা তাবদ্বারতঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥১০২

ততোহধার্কশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানুবিঃ।

অমুক্ৰমণিকাখ্যায়ঃ বৃত্তান্তানাং সপর্কণাম্ ॥” ১০৩

পুণ্যকর্ণা লোকদিগের জন্য এই শতসহস্র (লক্ষ) শ্লোক-স্বরূপ মহাভারত প্রণীত হইয়াছে, কিন্তু ব্যাসদেব প্রথমে ২৪০০০ শ্লোকময়ী ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, উপাখ্যান ভাগ পরিত্যাগ করিলে ভারতের সংখ্যা এই রূপই হয়। পরে সংক্ষেপে সর্কার সঙ্কলনপূর্বক তিনি ১৫০ শ্লোকবিশিষ্ট অমুক্ৰমণিকাখ্যায় রচনা করেন।

উক্ত চতুর্বিংশতিসহস্র-শ্লোকস্বরূপ গ্রন্থের নামই ভারত-সংহিতা। এই ভারতসংহিতাকেই আমরা আদি মহাভারত বলিয়া মনে করি। এই সংহিতাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচনা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ—আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন-গৃহসূত্রে ইহাই “ভারত” নামে উক্ত হইয়াছে—

“সুমন্তজৈমিনিবৈশম্পায়নপৈলসূত্রভাষ্যভারতধর্ম্মাচার্যাঃ...

যে চাত্রে আচার্য্যাস্তে সর্কে তৃপ্যন্তি।” (আশ্বগৃহ ৩৪)

অর্থাৎ উপনয়নকালে—(যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার সময়ে) সুমন্ত, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈল, সূত্রভাষ্য ও ভারত-ধর্ম্মাচার্য্য ও অন্তান্ত যত আচার্য্য, সকলে তৃপ্ত হউন (এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়)।

আশ্বলায়ন অন্তর্ভুক্ত শ্রীকাদি পিতৃকার্য্যেও ইতিহাস পুরাণাদি পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

“আয়ুস্মতাং কথাঃ কীর্তয়ন্তো মাদ্রল্যানীতিহাসপুরাণা-নীত্যাখ্যাপয়মানাঃ।” (আশ্বগৃহ ৪৬)

বহু পণ্ডিতের মতে সেই আদিভারতসংহিতাই আশ্ব-

লারন-গৃহস্থে 'ইতিহাস' নামে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতেও লিখিত আছে—

“ইতিহাসাঃ সৰ্বৈষাণ্য বিবিধাঃ স্তুতিয়োহপি চ।

ইহ সৰ্বমমুক্রান্তমুক্তং গ্রন্থস্ত লক্ষণং ॥” ( ১১১৫০ )

ব্যাখ্যার সহিত সমুদয় ইতিহাস ও বিবিধ স্তুতি বথাক্রমে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই এই গ্রন্থের লক্ষণ।\*

বৰ্তমান মহাভারত হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, এই ইতিহাসরূপ ভারতকাব্য মুখে মুখেই প্রকাশিত হইয়াছিল।† প্রচলিত মহাভারতে আছে,—

“ক্ষেত্রে বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত কৃষ্ণদৈপায়নঃ পুরা।

উৎপাত্ত ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঃ বিদুরমেব চ ॥১৫

জগাম তপসে ধীমান্ পুনরেবাশ্রমং প্রতি।

তেষু জাতেষু বৃক্ষেষু গতেষু পরমাং গতিং ॥১৬

অব্রবীত্তারতং লোকে মাধুষেহস্মিন্ মহানৃষিঃ।

জনমেজয়েন দৃষ্টে সন্ ব্রাহ্মণৈশ্চ সহস্রশঃ ॥১৭

শশাস শিষ্যমাসীনঃ বৈশম্পায়নমস্তিকে।

স সদন্তেঃ সহাসীনঃ শ্রাব্যমাস ভারতম্ ॥১৮

কৰ্ম্মান্তরেষু যজ্ঞস্ত চোত্তমানঃ পুনঃ পুনঃ।

বিত্তং কুরুবংশস্ত গান্ধার্যা ধর্ম্মশীলতাং ॥১৯

ক্ষতুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কৃন্ত্যাঃ সম্যগুদৈপায়নোব্রবীৎ।

বাহুদেবস্ত মাহাশ্ম্য পাণ্ডবানাঞ্চ সত্যতাং ॥২০

দ্রুপ্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রানামুক্তবান্ ভগবানৃষিঃ।” ( ১১১৫১ )

পুরাকালে ধীমান্ কৃষ্ণদৈপায়ন বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে উপাদান করিয়া তপস্কার্থ নিজ আশ্রমে পুনরায় গমন করেন। ঐ জাতপুত্রের বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে সেই মহানতি মনুষ্যালোকে এই 'ভারত' বলিয়াছিলেন। অনন্তর জনমেজয়ের সর্পসত্রে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও বর জনমেজয় সাগ্রহে জিজ্ঞাসু হইলে বেদ-ব্যাস নিকটস্থ অশিষ্য বৈশম্পায়নকে তাহা শুনাইতে আদেশ করেন। প্রত্যহ যজ্ঞকর্ম্মসম্পন্ন হইবার পর বৈশম্পায়ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া সভা মধ্যে সভ্যগণের সহিত বসিয়া সকলকে সেই ভারতকথা শুনাইয়া ছিলেন। কুরু-বংশের বিবরণ, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কৃত্তীর বৈদ্য, কৃষ্ণের মাহাশ্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যনিষ্ঠা এবং ধৃতরাষ্ট্র-

পুত্রগণের দ্রুপ্ততা দৈপায়ন ঋষি সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কুরুপাণ্ডব-প্রসঙ্গ লইয়াই প্রথমে ভারতসংহিতা রচিত হইয়াছিল। মহাভারত-মতে তাহাই ২৪০০০ শ্লোকায়ক। বাস্তবিক প্রচলিত মহাভারতের উপাখ্যানাংশ বাদ দিলে ও কুরুপাণ্ডবের বিবরণ ধরিলে ২০০০০ শ্লোক হইতে পারে। তাহাকেই আমরা আদি ও অতিপ্রাচীন ভারত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, জনমেজয়ের সর্পসত্রে সেই আদি ভারতই প্রথম সঙ্গ-সমক্ষে গীত হইয়াছিল। তৎপরে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকেয় দ্বাদশ বাধিক সত্রে স্তব লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা দ্বিতীয়বার এই ভারতসংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। জনমেজয়ের সর্পসত্রে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, সুতরাং এ সময়ে সদ্ভক্তগণের চিত্তবিনোদনার্থ ২৪০০০ শ্লোকায়ক ভারতসংহিতাগানট বথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দ্বাদশবর্ষব্যাপী দীর্ঘ সত্রে বহুকাল ধরিয়া কাহারও মনোরঞ্জন করিতে হইলে ভারতসংহিতার কুলার না, এ সময়ে এক বিরাট ব্যাপারের আয়োজন করিতে হইয়াছিল। যেমন আজকাল অল্প দিনের ভ্রম কথকতা বা রামায়ণ-গান-স্থলে বেশী আড়ম্বর হয় না, কথক বা গায়ক অনেকটা মূল্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু দীর্ঘকাল কথকতা বা রামায়ণ-গানাদি স্থলে নানা আড়ম্বর ও নান-আনুসঙ্গিক পালার অবতারণা করিয়া মূল বিষয়কে বথেষ্ট বাড়াইয়া লওয়া হয়। দীর্ঘকালব্যাপী দ্বাদশ বাধিক সত্রে ঋষিগণের চিত্তবিনোদনার্থ উগ্রশ্রবাও ভারত-গান-কালে সেইরূপ নানা উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া এই ভারত মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া ছিলেন। মহাভারতের প্রারম্ভে উগ্রশ্রবা বলিতেছেন,—

কুরু, পুরু, যদু, শূর, বিষগব, অগুহ, যুবনাথ, কুরুংহ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, খেত, বৃহৎগুরু, উদীনর, শতরথ, কঙ্ক, হ্রলিহুহ, ক্রম, দন্তোত্তব, বেন, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবুধ, দেবাস্বর, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, স্ক্রুতু, নিষধাপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভর, স্মিত্র, সুবল, জাম্বজন্ম, অনরণ্য, অর্ক, প্রিয়ভূতা, বলবন্ধু, নিরামর্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, অবিকিৎ, চপল, ধৃষ্ট, কৃতবন্ধু, ধৃষ্টেবুধি, মহাপুরাণসম্ভাবা, প্রত্যঙ্গ, প্রবহা, স্তুতি ইত্যাদি সহস্র সহস্র নরপতির কন্ম, বিক্রম, দান, মাহাশ্ম্য, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ, দয়া ও আর্জ-বাদির বিবরণ বিদ্বান্ সংকবিগণ কর্তৃক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

( আদি পর্ব ১অঃ, ২৩২ হইতে ২৪২ শ্লোক )

অধিক সম্ভব, উগ্রশ্রবা সেই পুরাতন আখ্যায়িকা সমূহ ভারতসংহিতাপ্রসঙ্গে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে

\* “ভারতস্ত ইতিহাসস্ত পুণ্যঃ গ্রন্থার্থসংযুতঃ।” ( ১১১৫০ )

“আখ্যায়িক্যি তথৈবান্যে ইতিহাসনিম্নঃ ভূবি।” ( ১১১৫১ )

ইত্যাদি শ্লোকও ভারতের ইতিহাসের স্মৃতি হইয়াছে।

† আদিপর্ব ১ম অধ্যায়, ১০, ১১, ১৭, ২০ ও ২১ শ্লোক রষ্টম্য।

যেখানে বহু প্রাচীন আখ্যান ও উপাখ্যানাদি প্রচলিত ছিল, সে সমস্তই ভারতসংহিতা মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। এইরূপে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া সেই সত্রে সুসুপস্থিত সহস্র সহস্র ঋষি-বৃন্দের নিকট ইহা ‘মহাভারত’ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছিল। এমন কি উগ্রশ্রবার মহাভারত-গানে ঋষিগণ এতই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ইহাকে পঞ্চম বেদ বলিয়া গ্রহণ করিতে কৃত্তিত হন নাই। ক্রমে এই মহাভারতে পরবর্তী কালে যিনি যে যে বিষয় ভাল মনে করিতেন, তাহা মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। আদি পর্বেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে, এই মহাভারত অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র বলিয়া নিষ্কিষ্ট। কতিপয়কর উপাখ্যান, শ্রেষ্ঠতম ইতিহাস, সুন্দর পুরাণ ও আখ্যান ইহার অন্তর্গত। ইহা সর্বপ্রধান কাব্য, কোন কাব্যই ইহার সদৃশ হইতে পারে না।\*

এই শ্বেদোক্ত বিবরণ হইতে মনে হয়, প্রাচীন কবিগণ যেখানে বাহা কিছু ভাল রচনা পাইয়াছেন, সে সমস্তই অথবা তাহার সারসংগ্রহ এই মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এমন কি অনেক কবি নিজ নিজ রচনা বেদব্যাসের নামে প্রচার করিয়া ধৃত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতের পরবর্তী কালে নানা কবির রচনা প্রস্তুত হওয়ার এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (যেমন আদি পর্বে ১৩শ হইতে ১৫শ অধ্যায় এবং ৪৫ হইতে ৪৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত অরবাকার উপাখ্যান), এক উপাখ্যান বলিতে বলিতে বিনা কারণে অত্র উপাখ্যানের প্রসঙ্গ (যেমন পৌষ পর্বে আকুণি ও উপমহা উপাখ্যান), পুঙ্ক-সূচনা ব্যতিরেকে সহস্র

ব্যক্তিবিশেষের বাক্যসমাবেশ (যেমন আদি পর্বে ২৪শ অধ্যায়ে কুরু ও প্রমত্তির কথোপকথন। ১২শ অধ্যায়ের শেষে আছে, কুরু কহেন যে নিজ পিতা প্রমত্তির নিকট আত্মীকোপাখ্যান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই, কিন্তু পরে ১৩শ অধ্যায়ে উগ্রশ্রবা বলিতেছেন যে, আমি পিতার নিকট আত্মীকোপাখ্যান বেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ বলিতেছি।) এ ছাড়া নানা স্থানে পরস্পর অসম্বন্ধ উপাখ্যান ও একত্র বর্ণিত হইয়াছে (যেমন পৌষ পর্বে সর্পসত্রাস্ত্রাভ্যন্তান সূচনার পরেই পৌলম পর্বে ভৃগুবংশের বর্ণনা)।

এইরূপে বিপুলায়তন লাভ করিলে পরবর্তী ব্যাস বা সঙ্ক-লয়িতারা বেদব্যাস-গণেশ-সংবাদ প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সাধারণকে বুঝাইলেন যে, এরূপ মহাগ্রন্থ সামান্য লেখকের হস্তে লিখিত হইতে পারে না, গ্রন্থমাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশ্যে গণপতি মহাভারত-লেখকরূপে কীর্তিত হইলেন; কিন্তু আদি ভারতসংহিতা লিখিত হয় নাই, মুখে মুখেই প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল, পুঙ্কেই তাহার আভাস দিয়াছি।

অনেকের বিশ্বাস, মহাভারত নিত্যস্থ আধুনিক সময়ে এরূপ বিরাট কলেবর লাভ করিয়াছে। এমন কি অনেকে এই মহাভারত নামটী পর্য্যন্ত নিত্যস্থ আধুনিক মনে করেন। তাহার কারণ, বালিবীপে কবিভাষায় মহাভারতের যে প্রাচীন অনুবাদ আছে, তাহা ‘বারত যুদ্ধ’ নামে খ্যাত, তাহাতে মহাভারতের উল্লেখ নাই। এমন কি বেবের প্রভৃতির বিশ্বাস যে, পাণিনির সময়েও ‘মহাভারত’ এই নাম-যুক্ত কোন গ্রন্থ ছিল না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই লক্ষ প্রোকার্যক বিরাট মহাভারত নিত্যস্থ আধুনিক গ্রন্থ নহে। বুদ্ধাবিত্তাবের বহু পুঙ্কেই যে এই মহাগ্রন্থ প্রচলিত ছিল, ললিত-বিস্তর ও আদিপাল ভাষায় লিখিত বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

“মহান্ ব্রাহ্মপরাক্রুগ্ধীষাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরোরব-প্রবুদ্ধেযু” (পা ৬২১৩৮)

অথাৎ ব্রাহ্ম, অপরাহু, গৃহী, খাস, জাবাল, ভার, ভারত, হৈলিহিল, রোরব, প্রবুদ্ধ এই দশশব্দ পরে থাকিলে তাহাদের পুঙ্কে মহৎ শব্দ সংযুক্ত হয়; যেমন মহাব্রাহ্ম, মহাভারত।

উক্ত সূত্রে পাণিনি স্পষ্ট মহাভারতের নাম করিয়াছেন। তিনি যে মহাভারতপ্রতিপাদ্য বিষয় অবগত ছিলেন, তাহা অষ্টাধ্যায়ীর ৪১১৪৫, ৪১১২৮, ৬১১১৫, ৮১১৩৫ প্রভৃতি সূত্র-পাঠ করিলেই জানা যায়।

খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে ভারত হইতে হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ যব-

\* “অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।

কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনাস্মিতবুদ্ধিনা। ৩৮৩

শ্রদ্ধা দ্বিদমুপাখ্যানং শ্রাব্যমন্ত্ররোচতে।

পুংস্বাকলিগিরং শ্রদ্ধা রক্ষা ধ্বজস্ত বাগিব। ৩৮৪

ইতিহাসোত্তমাদম্মাক্ষায়ন্তে কবিবুদ্ধয়ঃ।

পঞ্চভা ইব ভূতেভ্যো লোকসংবিধয়স্তয়ঃ। ৩৮৫

অত্রাখ্যানস্য বিষয়ে পুরাণং বর্ততে দ্বিজাঃ।

অন্তরিক্ষস্ত বিষয়ে প্রজা ইব চতুর্বিধাঃ। ৩৮৬

অন্যত্রিভ্যন্তরাখ্যানং কথা ভূবি ন বিদ্যতে।

আহারমনপাশ্রিত্য শরীরস্যেব ধারণং। ৩৮৮

ইদং কবিরৈঃ সর্বেসরাখ্যানমুপজীবতে।

উদয়প্রোপ্পুভৃত্তৈরভিজাত ইবেষয়ঃ। ৩৮৯

অন্য কাব্যস্য কথ্যো ন সমর্থ্য বিশেষণে।

সাধোরিব গৃহস্থস্য শেবাশ্রয় ইবাশ্রমাঃ। ৩৯০

(মহাভারত আদি ২য় অঃ)

দীপে গিয়াছিল, সেই সকল ধর্মগ্রন্থ এখনও বালিবীপে মূল ও অনূদিত আকারে রহিয়াছে। তথায় মহাভারতের সম্পূর্ণ অমূল্য নাই, তবে মহাসমর অবলম্বনে কবিভাষার 'ভারত যুদ্ধ' নামক কাব্য রচিত হইয়াছে—ইহাই তথাকার হিন্দু সমাজে সর্বত্র আদৃত। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্বে লইয়া এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বিশেষ প্রচলিত থাকায় মহাভারতের নাম সাধারণে জানে না। তবে বাহাদের ঘরে সংস্কৃত মহাভারত আছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। এ পর্যন্ত বালিবীপে আদি, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, আশ্রমবাস, মোঘল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্বের সংস্কৃত অংশ পাওয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ সভা, বন, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, অশ্বখাম, দৌশ্তিক, দ্রাবিলাপ ও অশ্বমেধযজ্ঞ পর্বের নামও অবগত আছে\*। আমাদের বিশ্বাস, অনুসন্ধান করিলে বালিবীপে সমস্ত মূল মহাভারতই বাহির হইতে পারে। ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে আমরা মহাভারতকে আধুনিক গ্রন্থ বলিতে প্রস্তুত নহি। বুদ্ধাবিভাবের পর এই মহাভারতের বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পুরাবিদগণের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধবিপ্লবে অপর সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রের পর ত্রায় মহাভারতও নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনেকে বলেন, মালবিকামিহ্মিত্র-নাটকের নামক বিদিশাধিপতি অমিহ্মিত্র হইতেই মহাভারতের উদ্ধার-কার্য সাধিত হয়। এই সুদৃশ্যটি হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা-কল্পে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে মহাভারত পাঠ আবশ্যক হইয়াছিল। তজ্জন্ত তিনি নানা দিগদেশ হইতে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া মহাভারত সংগ্রহ করেন। এই সময়ে যে মহাভারত হইতে অনেক প্রাচীন আখ্যান পরিত্যক্ত, সময়োপযোগী ভাষার প্রচলন, এবং অতি সামান্যভাবে নূতন কথা প্রক্ষিপ্ত না হইয়াছে, তাহা নহে। তবে মূল মহাভারতের তুলনার এক্ষণে দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত কথা ধর্তব্য নহে। এই দুই চারিটা প্রাক্কের জন্ত যে মহাভারতের প্রাচীনত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে, গহা মনে করি না। প্রক্ষিপ্ত অংশ সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়; যেমন শাস্তিপর্বের ২১৮ অধ্যায়ে নাস্তিক মত খণ্ডন পলক্ষে 'ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগতদিগের নিন্দা' এবং দ্রুশাসন পর্বে ১৪২ অধ্যায়ে মুণ্ডিতমস্তক কাষারবাস বোদ্ধ) ভিক্ষুদিগকে স্বেচ্ছাচারী তপস্বী বলিয়া উল্লেখ।

রাজা অমিহ্মিত্র বৌদ্ধবিপ্লবী একজন গোড়া ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তৎকর্তৃক মহাভারত সংগ্রহীত হইবার সময় তাহার প্রীতিকর বৌদ্ধনিন্দাত্মক দুই একটা শ্লোক যে মহাভারত-মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, মহাভারত এই সময়ের জিনিষ। ভারতে এমন অনেক পুরাণাখ্যান প্রবেশ করিয়াছে, যে গুলি প্রচলিত রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন। আবার মহাসমর উপলক্ষে রচিত ভারতসংহিতা রামায়ণের বহু পরে রচিত, কারণ রামায়ণের সময়ে সংস্কৃত ভাষাই সাধারণের চলিত ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল। আখ্যাসভ্যতা তখনও দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র বিস্তৃত হয় নাই, কিন্তু মহাভারতে পাণ্ডবগণের বারণাবতে অবস্থান-কালে বিদূর কর্তৃক স্নেহভাষায় কথা ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যে আখ্যাসভ্যতা আলোচনা করিলে রামায়ণের বহু পরে যে ভারত-সংহিতা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়-রাজগণের উপদেশমূলক রাজনীতি ও ধর্মশাস্ত্রীর নানা কথা তাহারও পরে রচিত হয়, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

শেষোক্ত অংশে শক যবনাদির উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ এই অংশ নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে করিলেও ঐ সকল জাতি যখন পঞ্জাবাদী বলিয়া বর্ণিত হয় নাই, তখন ভারতে শকযবনাদিকারের বহু পূর্বে যে ঐ অংশ রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাভারতে সকল শাস্ত্রের সমাবেশ থাকায় যে যে ভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই ভাবে লইয়া থাকেন। তাই মহাভারতসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এত মতভেদ। এমন কি কুরুক্ষেত্রের মহাসমর পর্যন্ত অনেকে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু এই মহাসমর প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া যখন দেড় হাজার বর্ষেরও পূর্বে হইতে চলিয়া আসিতেছে, তখন কি করিয়া উড়াইয়া দিব। এমন কি ৫৫৬ শকে ২য় পুলিকেশির শিলাফলকে ভারতযুদ্ধ হইতে একটা স্বতন্ত্র অক্ষ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। এই শিলাফলক-মতে ৫৫৬ শকের ৩৭৩৫ বর্ষ পূর্বে ভারতযুদ্ধ ঘটে। এক্ষণে স্থলে এখন হইতে ৫০০৪ বর্ষ পূর্বে ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।†

মহাভারত যেমন প্রাচীন, ইহার খিল বা পরিশিষ্ট স্বরূপ হরিবংশ সেরূপ প্রাচীন নহে। মহাভারতে বৈষ্ণব ধর্মের সূচনা থাকিলেও হরিবংশে তাহার পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়, এই সময়ে শাক্তগণও মাথা তুলিতেছিলেন, 'হ্রীং শ্রীং গার্লীং

\* Journal of the Royal Asiatic Society, N. S. Vol. VIII, P. 177.

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম অংশ ৫৬-৫৮ পৃষ্ঠা বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গান্ধারী যোগিণীঃ যোগদাং সদা” ইত্যাদি উক্তি তাহার পোষক। বিশেষতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত মুচ্ছকটিকে হরিবংশের আভান এবং ইহার মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন না থাকায় হরিবংশও বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্ববর্তী গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে ইহাতেও প্রকৃষ্ট শ্লোকের অভাব নাই।

মহাভারতের টীকা।

মহাভারতের বহু টীকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দেবদামী, বৈশম্পায়ন ও বিমলবোধের টীকা অতি প্রাচীন, ইহাতে ব্যাসকৃষ্ণের অর্থ ও দুঃস্বপ্ন স্থানের অর্থ লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অর্জুনমিশ্রের ভারতার্থদীপিকা, আনন্দপূর্ণ মুনি বিজ্ঞানাগরের ব্যাখ্যারহাবলী, চতুর্ভূজ মিশ্রের টীকা, দেববোধের জ্ঞানদীপিকা, নন্দকিশোরের গূঢ়ার্থপ্রকাশিকা, নন্দনাচাধ্যায়ের ভারতদীপিকা, নারায়ণসর্গজের ভারতার্থ-প্রকাশ, নীলকণ্ঠ চাকুর্ভূজের ভারতভাবদীপ, পরমানন্দ ভট্টাচার্যের মোক্ষধর্মটীকা, যজ্ঞনারায়ণের ভারতটীকা, রত্নগর্ভের টীকা, লক্ষ্মণভট্টের ভারতদীপিকা, শ্রীনিবাসাচার্য-রচিত টীকা, রামানুজের ব্যাখ্যাগ্রন্থদীপ, আনন্দভীষ্মের মহাভারতত্যাগপর্ণ্যনির্ণয়, এ ছাড়া মহাভারততিলক ও মহাভারত-নির্দেশন নামে অজ্ঞাতগ্রন্থকার-রচিত দুই খানি টীকা পাওয়া যায়।

মহাভারতের অনুবাদ।

পূর্বেই লিখিয়াছি, স্ববদীপে কবি ভাষায় বহু দিন হইল, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্বে ‘বারত বা ভারত বুদ্ধ’ নামে অনুদিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও সকল ভাষাতেই মহাভারতের অনুবাদ বা মর্ম্মানুবাদ দৃষ্ট হয়। হালকাগাড়ায় কুমারবাসের অনুবাদ পাওয়া যায়, এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে বল্লালবংশীয় বিষ্ণুবর্দনের সময় অনুবাদিত হয়। বল্লিপুলে অলবার নামক রামানুজ-মতাবলম্বী একজন মহান্ত্র জাবিড়-ভাষায় মহাভারতের কোন কোন পর্বে অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে মরাঠী ভাষাতেও ভারতানুবাদ হইয়াছিল। উৎকল ভাষায় কএক খানি প্রাচীন অনুবাদ বর্তমান আছে।

বাঙ্গালা ভাষাতেও মহাভারতের ভাবানুবাদ প্রকাশ করিয়া অনেক কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইংরাজ-শাসনের পূর্বে ঐ সকল মহাভারত বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। এই সকল অনুবাদের মধ্যে বিজয়পণ্ডিতের “বিজয়পাণ্ডবকথা” সর্ব প্রাচীন, চারিশ বর্ষেরও পূর্বে রচিত হইয়াছিল। ইহার পর সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন। তৎপরে কৃষ্ণানন্দ বসু, অনন্তমিশ্র, নিত্যানন্দ

ঘোষ, দ্বিজ কবিচন্দ্র, উৎকলকবি সারথ, বটীবর, গঙ্গাদাস-সেন, রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত, রাজারাম দত্ত প্রভৃতি ভারতকথা প্রকাশ করেন। ইহার অনেক কাশীরামদাসের পূর্ববর্তী। কাশীরামের মহাভারত প্রকাশিত হইলে পূর্বতন কবিগণের নাম অনেকটা লোপ পায়। কাশীরামের পর তৎপুত্র নন্দরাম দাস, বৈপায়ন দাস, নিমাই পণ্ডিত, ত্রিলোচন চক্রবর্তী, বল্লভদেব, লোকনাথ দত্ত, মধুসূদন নাপিত, শিবচন্দ্র সেন, ভৃগুরাম দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য, ইহার ইংরাজ আমলের পূর্ববর্তী। ইংরাজ আমলে ইদানীন্তন যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কাশীপ্রসন্ন-সিংহ ও বর্দ্ধমান-রাজবাটী হইতে প্রকাশিত গঙ্গানুবাদই সর্বপ্রধান।

জৈমিনি-ভারতকে অনেকেই আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। জৈমিনি-রচিত সম্পূর্ণ মহাভারতের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেবল অশ্বমেধ পর্বে পাওয়া যায়। মহাভারতে ও জৈমিনীর আশ্রমেধিক প্রকাশ পাতাল প্রভেদ। সম্যক আলোচনা করিলে কখনই ইহা প্রাচীন বলিয়া মনে হইবে না। তবে মহাভারতের নিকট অপ্রাচীন হইলেও নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীরও পূর্বে এই গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বীর-বল্লালদেবের আশ্রমে লক্ষ্মীনাথ কবি কণাড়ী ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন, ইহা একখানি প্রধান গ্রন্থ বলিয়া গণ্য। দাক্ষিণাত্যের নানা ভাষায় এই অশ্বমেধের অনুবাদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এগুলি তেমন প্রাচীন নহে। বাঙ্গালায় সঞ্জয়ের অনুবাদই সর্ব প্রাচীন। সঞ্জয় আদি পর্বে হইতেই জৈমিনির দোহাই দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অশ্বমেধপর্বে ব্যতীত অপর পর্বেগুলি জৈমিনির বলিয়া বোধ হয় না। জৈমিনিভারত কোতুলজনক গল্পময়, সেজন্ত সহজেই সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে। এই কারণেই গল্পপ্রিয় বঙ্গদেশে এক সময়ে জৈমিনি-ভারতের যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। সঞ্জয় ব্যতীত ছুঁটিয়ার আদেশে শ্রীকরনন্দী, দ্বিজ অভিরাম, অনন্তরাম, দ্বিজ রামচন্দ্রখান, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ কৃষ্ণরাম, দ্বিজরঘুনাথ, দ্বিজ রামকৃষ্ণ ও ভরত পণ্ডিত প্রভৃতি অশ্বমেধ পর্বে প্রকাশ করিয়াছেন, এ পঞ্চানুবাদগুলি ইংরাজশাসনের পূর্ববর্তী। আধুনিক সময়ে বঙ্গভাষায় কএকখানি গদ্যানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাভারতিক (পুং) মহাভারতভিজ্ঞ। যিনি সম্পূর্ণরূপে মহাভারত-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন।

মহাভাষ্য (স্ত্রী) পতঞ্জলি-কৃত পাণিনি ব্যাকরণের সিদ্ধ-

ভাষা। ভর্জহরি, কৈয়ট প্রভৃতি এই ভাবেরও আবার টীকা রচনা করিয়াছেন। [ পতঞ্জলি দেখ। ]

মহাভাস্কর (পুং) ১ বিষ্ণু। (ত্রি) ২ অতিশয় দীপ্তিবৃদ্ধ।

মহাভিক্ষু (পুং) ১ ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ। ২ শাক্যমুনি, যিনি জগতের সকল কামনা বিসর্জন দিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন।

মহাভিক্তন (পুং) উচ্চবংশ, সম্ভ্রান্ত-বংশ।

মহাভিক্তনজাত (ত্রি) সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত।

মহাভিক্তা-জ্ঞানাভিভূ (পুং) বৃদ্ধ।

মহাভিমান (পুং) অতিশয় অভিমান।

মহাভিষ (পুং) ইক্ষাকুবংশীয় রাজপুত্রভেদ। (ভাগ০ ৯২২২২)

মহাভিষব (পুং) মহা আড়ম্বরে সোমরস চোয়ান বা নিকাসন।

(কাব্য০ শ্রৌ০ ৭৪৯৮)

মহাভিষেক (পুং) প্রধান অভিষেক-ক্রিয়া।

মহাভিষ্যন্নি (ত্রি) অত্যন্ত আর্দ্রতাকারক। (সুক্রত)

মহাভীত (ত্রি) মহান্ অতিশয়ো ভীতঃ। ১ অতিশয় ভয়বৃত্ত।

দ্বিরাং টাপ্, মহত্যাধিকা ভীতের। ২ লজ্জালুরূপ।

“স্পর্শলজ্জা মহাভীতা বশিনী চ মহৌষধিঃ।” (শকচ০)

মহাভীতি (স্ত্রী) মহতী ভীতিঃ। ১ অতিশয় ভয়। (ত্রি) ২ মহা-ভয়গ্রস্ত।

মহাভীম (পুং) মহান্ অতিশয়ো ভীমঃ, ভীষণকৃতিত্বাৎ শিবাংশ-সম্ভূতত্বাচ্চ তথাৎ। ১ শাস্ত্রমুরাজ। (জটধর) ২ ভূমিনামক শিবদ্বারপাল। (ত্রিকা০) (ত্রি) ৩ অতিশয় ভয়ানক।

মহাভীক (পুং) মহান্ অতিশয়ো ভীকঃ। ১ গোপালিকাখ্য কীটবিশেষ। (হেম) (ত্রি) ২ অতিশয় ভয়শীল।

মহাভীষণক (ত্রি) অতিশয় ভয়বহ। ভীতিকর।

মহাভীশ্ব (পুং) মহান্ অতিশয়ো ভীশ্বঃ। শাস্ত্রমুরাজ। (ত্রিকা০)

মহাভূজ (ত্রি) মহাত্তো ভূজো বস্ত্র। মহাবাহু, আভ্যাহুলধিত বাহু। (রামা০ ২৪২১২০)

মহাত্ত (স্ত্রী) মহচ্চ তৎ ভূতক্ষেতি কণ্ঠাং, পঞ্চতন্মাত্রভেদাঃ হোল্যাদস্ত তথাৎ। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত--ক্ষিত, তেজ, মরুৎ ও বায়ম্। ২ স্থাবর জঙ্গমাংশই মহাত্ত।

মহাত্তদান (স্ত্রী) শাস্ত্রোক্ত দান বিশেষ।

মহাত্তমি (স্ত্রী) মহতী ভূমিঃ। ১ বিপুলভূমি। ২ মহাদেশ।

মহাত্তমণ (স্ত্রী) মূল্যবান্ অলঙ্কার।

মহাত্তঙ্গ (পুং) মহাংশাদৌ ভূঙ্গশ্চেতি। নীল ভূঙ্গরাজ।

মহাত্তঙ্গরাজতৈল (স্ত্রী) তৈলৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুত 'প্রণালী';—তিলতৈল ৪ সের, আনুপদেশোংপর সুধোক্ত ভূঙ্গ-রাজের রস ১৬ সের, কক্কার মজিষ্ঠা, পদ্মকাঠ, লোধ, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, বেড়েলা, হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু,

বহুমধু, প্রপৌণ্ডরীক, ও শ্রামালতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ পল। কক্ক দ্রব্য সকল দুধের সহিত কুটিয়া পাক করিবে। পরে তৈলপাকের বিধানানুসারে ইহা পাক করিতে হইবে। এই তৈল মাথার মাথিলে কেশপতন নিবারিত হয় এবং মস্তা-স্তম্ভ, গলগ্রহ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে নস্ত্র ও অভ্যঙ্গে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা মর্দনে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) প্রভৃতি উপশমিত হইয়া কেশের সৌষ্ঠব সাধিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাং কুদ্রোগাধি০)

মহাভৈরব (পুং) মহান্ ভৈরবঃ। শরভরূপী হয়।

“বোহসৌ মহাভৈরবাত্মাঃ সকারঃ শারভো হয়ঃ।

ভৈরবঃ পৃথগেবাং গণাধ্যক্ষো হরাস্বজঃ॥”

(কালিকাপুরাণ ৪৬ অধ্যায়)

দ্বিরাং ভীষ্। ১ বিভ্রান্তভেদ।

মহাভোগ (ত্রি) মহান্ আভোগঃ বিশালতা বস্ত্র। মহা-বিশালতাবিশিষ্ট, অতিশয় বিশাল।

“ততস্তত্র মহাভোগং সম্ভারক্কম্বল্লম্।

গুহচক্রো দদর্শাসাবেকং ত্রয়োদশপাদপদ্মং॥”

(কথাসরিংসাগর ১৭২০৬)

দ্বিরাং টাপ্। মহান্ আভোগঃ পরিপূর্ণতাত্ত্বাঃ বা মহান্ ভোগঃ সুখরূপমত্বাঃ। ২ হুগী।

“মহার্থসাধনী দেবী মহাভোগা ততঃ স্তুতা।” (দেবীপু০ ৪৫অঃ)

ভগবতী হুগাদেবী মহার্থ সকল সাধন করেন বলিয়া মহাভোগা নামে খ্যাত। (পুং) ৩ সর্প। ৪ বৃহৎ পরিধিবিশিষ্ট।

মহাভোগিন্ (ত্রি) মহৎ চক্র বা ফণাধর। (সর্প)

মহাভোজ (পুং) ১ রাজভেদ। (ভাগ০ ৯২৪৭) ২ রাজ-চক্রবর্তী। ৩ ভোজনরূপ বৃহদ্ব্যাপার।

মহাভোট (পুং) ভোট বা তিব্বত রাজ্য।

মহাভোম (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদিপর্ব)

মহাভ্র (স্ত্রী) ঘনমেঘ।

মহাভ্রবটী (স্ত্রী) বটিকৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—অন্ন, তাত্র, লোহ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগা, যবকার, ও ত্রিফলা প্রত্যেকে ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য শোধিত হওয়া আবশ্যক। বিষ ১০ তোলা, একত্র মর্দন করিয়া সিদ্ধি-পত্র, কেণ্ডুরিয়া, সোমরাজ, ভূঙ্গরাজ, বিষ্ণুপত্র, পাশিধাপত্র, গনিয়ারি, বিষ্ণুদ্রক, ভূষুক, থলুহুড়ি, নিম্বা, নাটা, ধুতুরা-পত্র, শেত অপরাজিতা, জয়ন্তী, আঁদা, গিমাশাক, বাসক ও পান এই সকল দ্রব্যের ৮ তোলা রসে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ দ্রবাংশ থাকিতে মরিচচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ১ রতিপ্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অম্ল-



পান দোষের অবহাঙ্গসারে বৈষ্ণু হিরু করিবেন। এই ঔষধ-সেবনে সকল প্রকার গ্রহণী, অতীদার ও সূতিকা প্রভৃতি রোগ আত্ম প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রহণী•)

অন্তবিধ প্রস্তুত প্রণালী।—অন্ন, লৌহ, তাম্র, রাজপট্ট, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ, ধবক্ষার, হরিতাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও বিষ প্রত্যেকে এক ভাগ, পরে ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গীমা ও পানের রসে সাত বার ভাবনা দিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে সূতিকাক্ষর, কাস, ও শোথাদি ত্রীরোগ সকল আত্ম প্রশমিত হয়। (রসেশ্বরসংগ্রহ, সূতিকারোগাধিকা•)

মহামথ (পুং) মহান্ মথঃ। মহাযজ্ঞ। মানবদিগের ঐতি-দিন অবশ্যকর্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

“বলিকর্ণ স্বধাহোম-স্বাধ্যায়ান্তিথিসংক্রিয়াঃ।

ভূতপিত্রমরত্নকমলমুখ্যাণাং মহামথাঃ॥” (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১০২)

মহামঞ্জুষক (পুং) বগৌষ পুষ্পভেদ।

মহামণি (পুং) মূল্যবান্ রত্ন। (হীরকাদি)

মহামণিচূড় (পুং) নাগভেদ।

মহামণ্ডল (পুং) রাজভেদ।

মহামণ্ডলিক (পুং) নাগভেদ।

মহামণ্ডুক (পুং) মহান্ মণ্ডুকঃ। পীতমণ্ডুক। সোণা বেঙ।

মহামণ্ডলেশ্বর (পুং) রাজোপাধি বিশেষ।

মহামত (ত্রি) সম্মানার্থ।

মহামতি (ত্রি) মহতা মতির্থত্ব। ১ অতি বুদ্ধিমান্, চতুর।

“কিনেতরাতিজ্ঞানামি জানরপি মহামতে।

যৎপ্রেমপ্রবণং চিত্তং বিজ্ঞপেষপি বন্ধুযু॥” (চণ্ডী)

২ গণেশ। ৩ বৃহস্পতিগ্রহ। ৪ যক্ষরাজভেদ। ৫ বোধি-

স্বভেদ। (স্ত্রী) ৬ করুণাকরের পত্নী ও পদ্মনাতের মাতা।

মহামত্ৰ (ত্রি) অতিশয় মত্ৰ। প্রমত্ত।

মহামত্ৰ্য (পুং) তিমি প্রভৃতি বৃহদাকার সামুদ্রিক মত্ৰ্য।

মহামদ (পুং) মহান্ মদো যত্। ১ মত্তহন্তী। (শকরত্না•)

মহান্ মদঃ। ২ অতিশয় হর্ষ, অত্যধিক মত্ততা। (ত্রি)

৩ তদ্ব্যক্ত মদবিশিষ্ট।

মহামনস্ (ত্রি) মহৎ প্রশস্তং মনো যত্। মহাশয়, মহামতি, উদার মনোযুক্ত।

“ইজ্ঞস্ত বৃক্ষো বরুণস্ত রাজ্ঞ আদিত্যানাং শর্ঘ্ উগ্রম্।

মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং যোষো বেদানাং জয়তামুদস্থ্যৎ॥”

(ঋক্ ১০।১০৩৯)

‘মহামনসাং উদারমনসাং’ (সায়ণ)

২ মহাশাল-পুত্র। (হরিশংখ ৩।১২০)

মহামনস্ক (ত্রি) উচ্চাত্তঃকরণবিশিষ্ট। ২ রাজভেদ। ৩ শরত-জাতীয় জীববিশেষ।

মহামনুষ্য (পুং) জনৈক প্রাচীন কবি।

মহামন্ত্র (পুং) ১ ইষ্ট মন্ত্র। ২ মন্ত্রসম্বলিত প্রসিদ্ধ বেদগ্রন্থ।

মহামন্ত্রানুসারিণী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবতা ভেদ।

মহামন্ত্রিন্ (পুং) ১ প্রধান মন্ত্রগাদাতা। রাজার প্রধান সচিব।

মহামন্দার (পুং) বৃক্ষভেদ।

মহাময়ুরী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ।

মহামরকত (পুং) ১ শ্রেষ্ঠ মরকতমণি। উৎকৃষ্ট পান্না।

২ মরকতমণিশোভিত অলঙ্কার।

মহামলয়পুর (স্ত্রী) মাদ্রাজের সন্নিকটস্থ একটা প্রাচীন জনস্থান। এখানে পঞ্চত কাটিয়া ৭টা পাগোদা কঙ্কিত হইয়াছে। [মহাবলিপুত্র দেখ]

মহামহ (পুং) মহোৎসব।

মহামহাবারুণী (স্ত্রী) মহতী চান্দো মহাবারুণী চেতি। গঙ্গা-স্রোতের যোগবিশেষ। গোণ চান্দ্র চৈত্রের কৃষ্ণাঙ্গমোদনীর দিন শনিবার, শতভিষা নক্ষত্র এবং শুভযোগ হইলে মহামহাবারুণী হয়। এই দিন গঙ্গায় স্নান করিলে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার হয় এবং স্নানদানাদিতে বিশেষ শুভ ফল ফলে। দোলপূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাঙ্গমোদনী, ঐ দিনই বারুণী, উহাতে পূজোক্ত যোগ ঘটিলে মহাবারুণী হয়।

“শুভযোগসমায়ুক্তা শনৌ শতভিষা যদি।

মহামহেতি বিখ্যাতা ত্রিকোটীকুলমুদরেৎ॥” (তিথিতত্ত্ব)

মহামহিমন্ (ত্রি) মহান্ মহিমা যত্। ১ অতিশয় মহিমাধিত, অতি মহাব্যক্ত। (পুং) ২ অতিশয় মহিমা। ৩ আশ্চর্য্যপ্রভাব।

মহামাহত্ৰত (ত্রি) প্রতুত শক্তিসম্পন্ন।

মহামাহেশ্বর কবি, একাংলী নামক অলঙ্কারশাস্ত্র-প্রণেতা।

মহামাহেশ্বরায়তন (স্ত্রী) দেবলোকভেদ।

মহামহোপাধ্যায় (পুং) শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। বর্তমানে উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত মাজেই ইরোজরাজপ্রদত্ত এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

মহামাংস (স্ত্রী) মহৎ গহিতং মাংসং, অত্র মাংসশব্দস্ত পূর্ব-প্রযুক্ততয়া মহচ্ছবস্ত গহিতার্থত্বং। নরাদির মাংসই মহা-মাংসের অভিধেয়। শস্য, তৈল, মাংস প্রভৃতি শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ নির্বিক, এইজন্ত মাংস শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ হওয়ার প্রেষাধ না বুঝা হয় গহিতার্থ বুঝাইল।

“শস্যে তৈলে তথা মাংসে বৈভে জ্যোতির্ভিকি বিজে।

বাভ্রায়াং পাণি নিভ্রায়াং মহচ্ছবো ন দীয়তে॥” (ভট্টটীকা)

২ নরাদি মাংস, গো, নর, হস্তী, অশ্ব, মহিষ, বরাহ, উষ্ট্র,

উরগ এই অষ্টবিধ জন্তুর মাংসকেও মহামাংস কহে। মহাষ্টবী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীকে এই অষ্টবিধ মহামাংস দ্বারা অর্চনা করিলে তাঁহার পরমাপ্রীতি লাভ এবং সাধকের নানা মনোরথ সিদ্ধি হয়।

“অষ্টমাংস কৃষিরৈর্মাসংসৈর্মহামাংসৈঃ স্নগন্ধিভিঃ।

পূজয়েৎস্বজ্ঞাতীর্ষৈর্ঘনিভির্ভোজনৈঃ শিবাম্ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

“গৌনৈরৈভাষ্মহিষ-বারাহোষ্ট্রোরগোডবন্ম।

মহামাংসাস্টিকং দেবি দেবতাপ্রীতিকারণম্ ॥”

(কোলার্জনদীপিকা)

মহামাংসবিক্রয় (পুং) নরমাংস-বিনিময়।

মহামাত্য (পুং) প্রধান রাজসভাসদ বা মন্ত্রী।

মহামাত্র (পুং) মহতী মাতা মর্যাদাপরিমাণঃ বস্ত্র। ১ প্রধান।

২ সমৃদ্ধ। ৩ প্রধান অমাত্য। ৪ রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তা,

প্রধান ব্যক্তি। রাজ্যের সমস্ত কার্যে বাহার মাতা অর্থাৎ ক্রমতা অধিক তাহাকে মহামাত্র কহে।

“দূরিতে হি মহামাত্রৈ রিপুরুগ্রোহপি ধীমতা।

স্বপক্ষে বস্ত্র বিশ্বাস ইৎস্তুতচ্চ নিক্ষিঃ ॥” (কামন্দকী ৯৬৯)

৫ ধনাঢ্য ব্যক্তি। ৬ হস্তিপকারিণ। (মেদিনী) ৭ মহাদেব।

(ভারত ১৩১৭৮৭)

মহামাত্রী (স্ত্রী) মহামাত্র-স্ত্রী। ১ আচার্য্যপত্নী। (জটধর)

২ মহামাত্রপত্নী।

মহামানসিকা (স্ত্রী) মহামানসী, জিনদিগের বিজ্ঞাদেবীভেদ।

মহামানসী (স্ত্রী) মহৎ মানসঃ ভক্তান্ প্রীতি সদয়ঃ চেতো বস্ত্র। জিনদিগের বিজ্ঞাদেবীভেদ। (হেম)

মহামানিন্ (ত্রি) অতিশয় অভিমাত্রী।

মহামায়ী (ত্রি) মহতী মায়ী বস্ত্র। ১ অতিশয় মায়ারী, মহা-

মায়াবুদ্ধ। ২ বিষ্ণু। ৩ শিব। ৪ অম্বরভেদ। ৫ বিজ্ঞাধরভেদ।

মহামায়ী (স্ত্রী) অঘটন ঘটন-পটীরূপে বিন্দুদৃশ্যপ্রীতিসাধনঃ

মায়ী মহতী চাসৌ মায়ীচেতি যদা মহতী মায়ী বিশ্বনির্মাণ-

শক্তির্গন্তাঃ। দুর্গা। (রাজনিঃ) ইহার লক্ষণ—

“গর্তান্তজ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং স্ততিমাক্রুতৈঃ।

উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে বা নিরন্তরম্ ॥

পূর্বাতিপূর্বসংবন্ধ-সংস্কারেণ নিষোজ্য চ।

আহারাণৌ ততো মোহঃ সমস্তং জ্ঞানসংশয়ম্ ॥

ক্লেদোপরোধলোভেবু ক্লিপ্তাঃ। পুনঃ পুনঃ।

পশ্চাৎ কামে নিষোজ্যন্ত চিত্তাবুদ্ধমহর্ষিশম্ ॥

আমোদবুদ্ধঃ ব্যসনাসক্তঃ জন্তঃ করোতি বা।

মহামায়ৈতি সা প্রোক্তা ভেন সা জগদীশ্বরী ॥”

(কালিকাপুরাণ ৬ অধ্যায়)

গর্তমধ্যে জীবের তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলেও পরে যখন জীব প্রবল স্ততিমাক্রুত কর্তৃক উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে যিনি তত্ত্বজ্ঞানশূন্য করেন, আর পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার-বলে আহারাণি কার্যে সতত প্রবৃত্ত হইয়া মোহ, মমতা ও সংশয় উৎপাদন করিয়া থাকেন, যিনি জীবকে পুনঃ পুনঃ ক্লেদ, লোভ ও মোহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সেই চিত্তাকুল জীবকে নিরন্তর কামসাগরে নিক্ষেপ এবং আমোদবুদ্ধ ও ব্যসনাসক্ত করেন, তাহারই নাম মহামায়ী। মহামায়ী এই মায়াবলেই জগদীশ্বরী।

জগতে মায়ার প্রভাব অতি আশ্চর্য্য, অঘটন ঘটনা-বিষয়ে যিনি পটু, তাহারই নাম মায়ী। এই পরিদৃশ্যমান জগতে সূত্র, দুঃখ ও মোহ প্রভৃতি বাহ্য কিছু দেখিতে পাই, তাহা সকলই এই মহামায়ার প্রভাব। এই মহামায়াপ্রভাবে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি হইতেছে।

“মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারণঃ।

তন্মাত্র বিষয়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ ॥” (চণ্ডী)

জগৎকারণভূতা অবিত্যই মায়াপদবাচ্যা, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী দুর্গাই মহামায়ী। এই দেবীই জগৎকে মোহিত করেন।

“মহামায়ী হরৈশ্চৈতৎ তয়া সংমোহতে জগৎ ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৮১।৪১) [বিশেষ বিবরণ মায়ী দেখ।]

২ গন্ধাদেবী। (কালীখণ্ড ২৯।১৩৯) ৩ মহতী মায়ী।

৪ রাজা স্কন্দোদনের পত্নী। শাক্যসিংহের মাতা।

মহামায়াদ্বর (পুং) বিষ্ণু।

মহামায়ীশম্বর (স্ত্রী) তত্ত্বভেদ।

মহামায়ুরী (স্ত্রী) বোদ্ধ দেবীভেদ। [মহাময়ুরী দেখ।]

মহামারকত (ত্রি) মরকতবিমণ্ডিত অলঙ্কারাদি।

মহামারী (স্ত্রী) মহতঃ দুর্দান্তান্ দানবাদীন্ মারয়তি ইতি যুজ্-গিচ্-অণ্-তীপ্। মহাকালী।

“ব্যাপ্তং তন্নৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মহাজেশ্বর।

মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী স্বরূপয়া ॥

সৈব কালে মহামারী সৈব স্তির্ভবত্যজা।

স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুঃ চণ্ডী)

দ্বিরস্তে প্রাণিনো বস্তা ইতি-যুজ্-অণ্-তীপ্। মহতী-মারী।

২ অতিশয় মরকত। মহামারী উপস্থিত হইলে সেই স্থান পরি-

ত্যাগ করা আবশ্যক এবং মহামারী-প্রশমনের জন্ত দেবী-

মাহামা চণ্ডীপাঠ, শান্তিস্তোত্রন ও হোমাদি করা বিধেয়।

ইহাতে মহামারী আত প্রশমিত হয়।

মহামাল (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৪২।৩১)

মহামালিকা (ক্লী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৮টা করিয়া অক্ষর থাকে। তন্মধ্যে ৬, ৮, ১১, ১৪ ও ১৭ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু।

মহামাষ (পুং) মহাশাস্ত্রসৌ মাষশ্চেতি। রাজমাষ। রাজনিং।  
[ রাজমাষ দেখ। ]

মহামাষতৈল (ক্লী) তৈলৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—  
তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ প্রথ পোট্টলীবদ্ধ মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৬০ সের, প্রথ পোট্টলীবদ্ধ ছাগমাংস ৩০ পল এই সকল একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিবে, শেষ ১৬ সের থাকিতে নামাইতে হইবে। দুধ ১৬ সের, ককার্থ আলকুশী-মূল, এরওমূল, শুল্কা, সৈন্ধব, বিটু, শান্তার-লবণ, জীবনীয় বর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামূল, কটুকল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রাস্না, বটুমুখ সৈন্ধব, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ, ও শটা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, পরে তৈলপাকের বিধানা-নুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত, অর্দিত, বধিরতা, হস্তগ্রহ ও সর্বপ্রকার বাতব্যাধি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। বাতব্যাধিতে এই তৈল মহোপকারক।

মাংস না দিয়াও আর এক প্রকার মহামাষ তৈল প্রস্তুত করা যায়। তাহাকে নিরামিষ মহামাষ তৈল কহে। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ দশমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, মাষকলাই ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুধ ১৬ সের, ককার্থ অশ্বগন্ধা, শটা, দেবদারু, বেড়োলা, রাস্না, গন্ধভাঙ্গলে, কুড়, পরুষকল, বাগুনহাটা, কুম্বাণ্ড, ভূমিকুম্বাণ্ড, পুনর্নবা, ছোলঙ্গকল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, শুল্কা, শতমূলী, গোক্ষুর, পিপুলমূল, চিতামূল, জীবনীয়-গণ ও সৈন্ধব মিলিত সমপরিমাণে এক সের। পরে তৈল-পাকের বিধানানুসারে ইহা পাক করিতে হইবে। ইহা ব্যবহারে পক্ষাঘাত, হস্তগ্রহ, অর্দিত, অববাহক, বিখটী, খঞ্জতা, পঙ্গু প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা নিরামিষ মহামাষ তৈল। (ভৈষজ্যরত্নাবলী বাতব্যাধিঃ)

মহামাহেশ্বর (পুং) শিবোপাসকভেদ।

মহামীন (পুং) মন্ত্রবিশেষ।

মহামুখ (পুং) মহৎ মুখমন্ত্র। ১ কুন্তীর। (হেম) (ক্লী)  
মহৎ মুখঃ। ২ বৃহৎ মুখঃ। ৩ নদীর মোহানা।

“বক্তং সৌমাং সংবৃতমমলং স্কন্ধং সমঞ্চ ভূপানাম্।

বিপরীতং রেশভূজং মহামুখং হৃৎগনাক্ষং ॥”

(বৃহৎসংহিতা ৬।৭।৫৪)

(ত্রি) মহৎ মুখঃ যন্ত। মহৎ মুখবিশিষ্ট। (পুং) ৪ মহা-  
দেব। (ভারত ১৩।১৭।৮৭) ৫ সিদ্ধরাজের সৈনিকভেদ  
(ভারত ৩২।৩০।২৬)

মহামুদগলাচার্য্য, ত্রিরাশচক্রাধ্যাটোত্তরশতপ্রণেতা।

মহামুচিলিন্দ (পুং) বৃক্ষভেদ।

মহামুচিলিন্দপর্বত (পুং) পর্বতভেদ।

মহামুগু (ক্লী) বোল নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনিং)

মহামুণ্ডিনিকা (ক্লী) মহাপ্রাণিকা, মহামুণ্ডী, চলিত গোরক্ষ-  
মুণ্ডী। মহামুণ্ডিনিকা স্থলে ‘মহামুণ্ডিতিকা’ এইরূপও শব্দ  
দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সাধারণতঃ ‘মহামুণ্ডিনিকা’ পাঠই  
অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হয়।

মহামুদ্রা (ক্লী) ১ যোগপ্রকরণোক্ত মুদ্রাভেদ। ২ অতুর্ক  
সংখ্যাভেদ।

মহামুনি (পুং) মহাশাস্ত্রসৌ মুনিশ্চেতি। ১ অগস্ত্য। ২ বৃদ্ধ।  
(শব্দরত্নাং) ৩ কৃপাচার্য্য। ৪ কাল। (অজয়পাল)  
৫ ব্যাসদেব।

“শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিরূপে কিংবা পট্টময়ীশ্বরঃ।

সংখ্যোক্তবাক্যতেহৈব কৃতিভিঃ স্তব্ধভূক্তিস্তৎকণাৎ ॥”

(ভাগবত ১।১।২)

৬ ভূষুকবৃক্ষ। (রাজনিং) ৭ জিনভেদ।

মহামূঢ় (ত্রি) মহান্ মূঢ়ঃ। অতিশয় মূঢ়, মূর্থ।

মহামূর্থ (পুং) অতিশয় অজ্ঞ, অত্যন্ত নির্বোধ।

মহামূর্ত্তি (পুং) মহতী মূর্ত্তির্গন্ত। বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪২।৯)

মহামূর্দ্ধন (পুং) মহান্ মূর্দ্ধা যন্ত, ব্যাধকত্বাৎ তথাহং।  
১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৮৫) (ত্রি) ২ বৃহৎশক্তকমূর্ত্তা।  
৩ ঋকি। ৪ বৃকি। (বৈজ্ঞকনিং)

মহামূল (পুং) মহৎ মূলং যন্ত। ১ রাজপলাশু। (রাজনিং)  
২ ছিলিহিণ্ড।

“ছিলিহিণ্ডো মহামূলঃ পাতালগন্ধদ্বারয়ঃ ॥” (ভাবপ্রঃ)

মহামূল্য (ক্লী) মহচ্ছতং মূল্যং চেতি কর্ম্মধাং। ১ মহাধ, বহুমূল্য, অধিক দর। (ত্রি) ২ মহৎ মূল্যং যন্ত। ৩ বহুমূল্য-  
বিশিষ্ট, যাহার দর অধিক। ৪ মাণিক (চুনি), মণি।

মহামূষক (পুং) মহান্ মূষিকঃ। বৃহৎশুক, বড় ইন্দুর, পর্যায়—  
মূষী, বিষেশবাহন, মহাশুক, শতমারী, ভূকল, ভিত্তিপাতন।  
(রাজনিং)

মহামুগ (পুং) মহান্ মুগঃ পশুঃ। ১ হস্তী। (হেম)  
২ শরভ। (রাজনিং)

মহামুগাঙ্করস (পুং) রসৌষধিবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-  
প্রণালী—অণ ১ ভাগ, রসসিন্দুর ২ ভাগ, সূর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ,

প্রণালী ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, এই সকল একত্র উত্তম-  
রূপে চূর্ণ করিয়া লবঙ্গের কাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া  
ডেলার জ্বায় করিতে হইবে, পরে উহা লবণপূর্ণ ভাণ্ড মধ্যে  
রাখিয়া মুখ লেপনপূর্বক চারিপ্রহর পাক করিয়া নামাইতে  
হইবে। তৎপরে ইহাতে ৬৪ অংশ শোধিত হীরক, অভাবে  
১৬ অংশ বৈজ্ঞানিক মিশ্রিত করিবে। ইহার অমুপান সূত,  
মরিচ ও পিঙ্গলীচূর্ণ। ইহা দেবনে ক্রকাস, যক্ষা, বিবিধ  
প্রকার জ্বর, গুণ্ড, বিজ্রি, মন্দাঘি, শরভেদ, অরুচি, বমি,  
মূছা, ভ্রম, বিষদোষ, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি রোগ নাশ হয়।  
(রসেন্সসারসং যক্ষারোগাধি।)

মহামৃত্যু (পুং) ১ বম। ২ শিব।

মহামৃত্যুঞ্জয় (পুং) মহামৃত্যুঃ যমং জয়তীতি জি-ষচ্-মুচ্ চ।  
শিবের মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্র মানবের আয়ুর্বাঞ্ছিকর। মহা-  
মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র সিদ্ধ হইলে মানব নিরাময় হইয়া চিরজীবন লাভ  
করে। মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রে ইহার মন্ত্রাদির বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

“যদি তে মহতী প্রীতিস্তবাস্তি কুলভৈরব।

কথয়স্ব বিশেষেণ মহামৃত্যুঞ্জয়ান্ধিম্ ॥

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মহামৃত্যুঞ্জয়ান্ধিম্।

আয়ুর্বাঞ্ছিকরং পুংসাং মৃত্যোর্মৃত্যুকরং পরম্ ॥

যত্র বিজ্ঞানমাত্রেণ চিরজীবী নিরাময়ঃ।

নিত্যমষ্টশতং জপ্ত্বা মৃত্যুং মৃত্যুপথং নঘেৎ ॥” (মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র)

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র প্রতিদিন অষ্টশতবার জপ করিলে মৃত্যু  
জয় হইয়া থাকে।

দুঃসাহ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানব মহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা করিলে  
আশু তাহার রোগমুক্তি হয়। মহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা অপেক্ষা  
রোগমুক্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র্যন আর নাই। ইহা আশু ও  
প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ। বিধিপূর্বক ইহা অনুষ্ঠিত হইলে প্রায় বিফল  
হয় না। [মৃত্যুঞ্জয় দেখ।]

মহামৃত্যুঞ্জয়রস (পুং) রসোষণবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-  
প্রণালী—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, তাম্র, মনঃশিলা, বিষ্ণু-  
মুষ্টি, কড়ি, তুঁতে, শঙ্খ, রসাজন, জায়ফল, কটুকী, সাচিকার,  
যবক্ষার, জয়পাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, এই  
সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া স্বর্ঘ্যাবর্তরস ও বিষপত্র-  
রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পরে আবার স্বর্ঘ্যাবর্তরসে মর্দন  
করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অমুপান  
দোষের বশাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। ইহা সেবনে  
দ্রীহা, বক্কা, গুণ্ড, অঞ্জীলা, অগ্রহাস, শোথ, উদরী, বাতরক্ত  
ও বিজ্রি রোগের শাস্তি হয়। (রসেন্সসারসং দ্রীহাধিকা।)  
মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-

প্রণালী—পারদ, গন্ধক, ও অত্র প্রত্যেকে ৪ মাষা, লৌহ  
১ তোলা, তাম্র ২ তোলা, যবক্ষার, সৈন্ধব, বিট, কড়িতম্ব,  
শঙ্খতম্ব, চিতামূল, মনঃশিলা, হরিতাল, হিঙ্গু, কটুকী, রৌহীতক-  
ছাল, তেউড়ী, তেঁতুলছাল-তম্ব, রাখালশসার মূল, ধলা আঁক-  
ড়ার মূল, অপাকতম্ব, তালকটাতম্ব, অম্লবেতস, হরিত্রা, দারু-  
হরিত্রা, প্রিয়দ্ব, ইন্দ্রযব, তরীতকী, বনযবানী, যবানী, তুঁতিয়া,  
শরপুষ্ণ, রৌহীতকছাল ও রসাজন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে  
৪ মাষা। এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিয়া আদা  
ও গুলকের রসে ভাবনা দিতে হইবে। পরে ২ পল মধুর সহিত  
মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা  
করিয়া চিকিৎসক অমুপান স্থির করিবেন। ইহা প্রাতঃকালে  
সেবনীয়। এই ঔষধসেবনে দ্রীহা, জ্বর, কাস, বিষমজ্বর  
গুণ্ড, শোথ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শাস্তি হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী দ্রীহাবন্ধধি।)

মহামুখ (পুং) ভীষণ মুখ।

মহামেষ (পুং) মহান্ মেঘ ইব। ১ শিব। মহান্ মেঘঃ।

২ অতিশয় মেঘ, গাঢ় মেঘ।

“মহামেষনিভঃ দৃষ্ট্বা স তীতো জ্বতবৎ গজঃ।”

(ভারত ১২।১১।১৪)

৩ ক্ষত্রিয়রাজ-বিশেষ। (ভারত ৭।৪৭।১৫) ৪ শিব।

মহামেষ(নিভ)স্থান (ত্রি) বজ্রপাতের জ্বায় নিদারুণ শব্দ।

মহামেষদৌর্ঘ্যনির্ঘোষ (ত্রি) জীমুতমস্ত্রের গভীর শব্দ-  
পরম্পরা বিশিষ্ট।

মহামেষনিবাসিন্ (পুং) শিব, যিনি চির তুষারাবৃত ফৈলাস-  
শিখরে অবস্থান করেন।

মহামেদ (পুং) মেদয়তি দ্বিতীকরোতীতি মিদ্-গিচ্-অচ্,  
মহান্ মেদঃ। অষ্টবর্ণে প্রসিদ্ধৌষধবিশেষ, পর্যায় পুরোক্তব।  
(রত্নমালা) ২ বৃহৎ মেদ।

মহামেদা (ক্লী) মেদয়তীতি মিদ্-গিচ্-ঘঞ্ টাপ, মহতী-  
মেদা। অষ্টবর্ণে প্রসিদ্ধৌষধবিশেষ, স্বনামখ্যাত কন্দশাক।  
পর্যায়—বস্ত্রচ্ছিদ্ৰা, জীবনী, পাণ্ডুরাগিনী, দেবেষ্টা, সুরামেদা,  
দিব্যী, দেবমণি, দেবগন্ধা, মহাচ্ছিদ্ৰা, বৃক্ষার্হা। ইহার গুণ—  
হিম, কটিকর, কক ও শুক্রবৃদ্ধিকারক, দাহ, অলু, পিত্ত,  
ক্লম, বাত ও জরনাশক। (রাজনি।)

ভাবপ্রকাশ-মতে—মহামেদাখ্যকন্দ মোরঙ্গাদি প্রদেশে  
জন্মে, প্রধান প্রধান মুনিগণ ইহাকে মহামেদ ও বনোমেদ  
কহিয়া থাকেন। এই কন্দ লতাভাত এবং শুক্লবর্ণ আভ্যন্তর  
জার ধবলবর্ণ। ইহা নথ দ্বারা ছেদন করিলে মেদোদাত্তর  
জার রস বিনির্গত হয়। স্বপর্ণী, মণিচ্ছিদ্ৰা, মেদা, মেদোভাব

ও অধ্বর। এই কএকটি মেদের এমিদ্ধ নাম। মহামেদা, বহুচ্ছিত্রা, ত্রিভূতী ও দেবভামণি এই কএকটি মহামেদ। মেঘ ও মহামেদ এই উভয়ই গুরু, মধুর রস, শুক্রজনক, স্তন-হৃৎবর্জক, কফকারক, শরীরের উপচয়কর, শীতল এবং রক্তপিত্ত, বায়ু ও জরনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

মহামেধা, মহাদ্রিবিধিত জনৈক রাজা। (মহা- ৩৩।১২৬)

মহামেরু (পুং) শ্রেষ্ঠ মেরু।

মহামৈত্র (পুং) মিত্রস্ত ভাবঃ মিত্র-অণ্-মৈত্রঃ, মহদ্ভিঃ সহ মহদ্ বা দ্বি মৈত্রমন্ত্ৰেতি। বৃক্ভেদ। (হেম)

মহামৈত্রী (স্ত্রী) প্রগাঢ় বন্ধুতা। সাতিশয় অম্বরক্তি।

মহামৈত্রীসমাধি (পুং) বৌদ্ধমতে সমাধি অবলম্বনের দ্বিত্ব যোগপ্রকরণবিশেষ।

মহামোহ (পুং) মোহঃ ভ্রান্তিজ্ঞানঃ অতথাক্রমে বন্ধনি তথা-জ্ঞানমিত্যর্থঃ মহান্ মোহঃ। ১ ভোগেচ্ছারূপ জ্ঞান। ২ সংসার-মূলকারণ রাগরূপ মোহ। মহান্ মোহো যস্মাদিতি। ৩ মহা-মোহজনক কামরাজবীজ।

“সসর্জ্যাগ্রে হৃদতামিশ্রমথ তামিশ্রমাদিকৃৎ।

মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ ॥” (ভাগবত ৩।১২।২)

ভোগাভিলাষের নাম মহামোহ, ইহ জগতে নিরন্তর পাখি স্বথভোগের অভিলাষকেই মহামোহ কহে, ইহা অবিচার রূপান্তর।

পঞ্চপর্কী অবিচার মধ্যে ইহা এক প্রকার। প্রথমে ব্রহ্মা স্ব সৃষ্টিতে অবিদ্যার সৃষ্টি করেন, পরে এই অবিজ্ঞা হইতে তমঃ, মোহ, মহামোহ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়।

পূর্বোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “ব্রহ্মা স্বসৃষ্টৌ অবিদ্যাস্বষ্টীঃ সসর্জ, তত্র তমোনাম স্বরূপা প্রকাশঃ, মোহো দেহাদ্যহং-বুদ্ধিঃ, মহামোহঃ ভোগেচ্ছা।

“তমোহবিবেকো মোহঃ শ্রাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ।

মহামোহশ্চ বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা ॥”

(ভাগবতটীকা স্বামী ৩।১২।২)

মহামোহা (স্ত্রী) হর্গা।

• মহামোহন (ত্রি) অতিশয় মহামোহবিশিষ্ট।

মহামৌদালায়ন (পুং) বৃদ্ধ-শিষ্যভেদ।

মহামুক (পুং) শিব।

মহামুজ (পুং) অত্যাধিক সংখ্যাভেদ।

মহামুদ (পুং) শিব।

মহান্ন (স্ত্রী) মহৎ অন্নঃ অন্নরসযুক্তং, যদা মহান্ অন্নঃ অন্ন-রসো যস্মিন্। ১ তিষ্ঠিত্বীক। (ত্রি) ২ অতিশয় অন্নরসবিশিষ্ট।

মহাযক্ষ (পুং) যক্ষয়তে পুজয়তি ইতি যক্ষ-অচ, মহান্ যক্ষঃ। ১ অর্হুপাসকবিশেষ। (হেম) ২ যক্ষপতি। ৩ বৌদ্ধ-দেবগণভেদ। ত্রিবাং ভীপ্। মহাযক্ষী—বক্ষরাণী।

মহাযক্ষ-সেনাপতি (পুং) তস্যোক দেবমূর্তিবিশেষ।

মহাযজ্ঞ (পুং) মহান্ যজ্ঞঃ। ১ বিষ্ণু। ২ বেদপাঠাদিরূপ পঞ্চ প্রকার যজ্ঞ, বেদপাঠ, হোম, অতিথিপূজা, তর্পণ ও বলি এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ।

“পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্ঘ্যাতর্পণং বলিঃ।

এতৈঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামটৈঃ ॥” (অমর ২।৭।১৪)

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রতিদিন অমুষ্ঠান করা কর্তব্য।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে—দিব্য, ভোম্য, পৈত্র, মাহুষ ও ব্রাহ্ম এই পাঁচপ্রকার যজ্ঞের নাম মহাযজ্ঞ। এই পঞ্চ যজ্ঞের অমুষ্ঠানে মানব বিগৃহীতা লাভ করে।

“দিব্যো ভোমণ্ডথা পৈত্রো মাহুষো ব্রাহ্ম এব চ।

এতৈঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মণ্য নিম্নিতাঃ পুরা ॥

ইতরেযাঙ্ক বর্ণানাং ব্রাহ্মণৈঃ কারিতা শুভাঃ।

এবং কৃত্বা নরো ভুক্তা শ্রাদ্ধারিত্রী বিগৃহীতে ॥” (বরাহপুং)

প্রতিদিন যে সকল পাপ অমুষ্ঠিত হয়, তাহা এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অমুষ্ঠানে নিরাকৃত হয়। এইজন্য সকলেরই প্রতি-দিন এই মহাযজ্ঞের অমুষ্ঠান করা কর্তব্য।

[ বিশেষ বিবরণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ শব্দে দেখ ]

মহাযজ্ঞভাগহর (পুং) বিষ্ণু।

মহাযজ্ঞ (স্ত্রী) যজ্ঞবিশেষ।

মহাযম (পুং) যমরাজ।

মহাযমক (স্ত্রী) শ্লোকভেদ। ইহার প্রত্যেক চারি পাদেই একরূপ শব্দাত্মক বর্ণমালা প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদের অখান্তরও উপলব্ধি হয়।

মহাযশস্ (পুং) মহৎ যশো যন্ত, বিভাষাগ্রহণাৎ ন কপ্।

১ ভূতাহং বিশেষ। (হেম) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩৪)

(ত্রি) ৩ অতিশয় যশোযুক্ত।

“এবং স সংক্রমস্তত্র স্বর্গলোকে মহাযশাঃ।

ততো দদর্শ শক্রস্ত পুরাস্তামমরাবতীম্ ॥” (ভারত ৩।৪২।৪১)

(স্ত্রী) ৪ স্বন্দমাতৃগণবিশেষ। (ভারত ২।৪৬।২৮)

মহাযশস্, গোতিলীয়শ্রাদ্ধকল্পভাষ্যপ্রণেতা। রঘুনন্দন ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহাযশস্ক (ত্রি) মহৎ যশো যন্ত, (শেষাধিভাষা ১।১ পা ৫।৪।১৫৪)

ইতি সমাসান্ত কপ্ প্রত্যয়ঃ। অতিশয় যশোবিশিষ্ট।

মহাযস (ত্রি) ১ মহাফলক। ২ মহালোহযুক্ত।

মহাযাত্রা (ত্রি) ১ মহাতীর্থে যাত্রা, কাশীযাত্রা। ২ মহাপ্রস্থান।

মহাযান (ক্লী) ১ বিদ্যাধরম্ভেদ। ২ বৃহৎ যান। ৩ শ্রেষ্ঠ শব্দট।  
মহাযান, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়বিশেষ। শুদ্ধোদন-তনয় শাক্যবুদ্ধ  
নির্দোষবাদরূপ প্রকৃষ্ট মোক্ষোপায় জনসমাজে প্রবর্তন করিয়া  
যান, তাহার পরবর্তিকালে পরম্পর মতবৈধ উপস্থিত হইলে  
তাহা হইতেই মহাযান-মতোৎপত্তি ঘটে।

মহাযান শব্দের প্রকৃত অর্থ শ্রেষ্ঠ বাহন। অর্থাৎ সংসার ও  
পরলোকযাত্রার প্রকৃষ্ট উপায় মিরূপণ করে বলিয়া এই সম্প্র-  
দায়ের মত মহাযান নামে খ্যাত হইয়াছে, সুতরাং মহাযান  
বলিলে পরাগতিকের বুদ্ধ। সেই পরাগতির উপায়নির্দেশক  
বৌদ্ধমতিগণ, মহাযানী বা মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরি-  
চিত হইয়া থাকেন।

প্রাচীন অর্থাৎ শাক্যবুদ্ধ-প্রবর্তিত আদিম বৌদ্ধধর্ম-রক্ষার  
বহুশীল বৌদ্ধসম্প্রদায় একমাত্র সঙ্ঘাচারানুরিত শ্রাবক-  
গণকেই জীবমুক্তিলাভের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া  
থাকেন। এবং বিধি মতে বিশ্বাসবান ব্যক্তিমাট্রই পরে হীনযান-  
মতাবলম্বী বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।\* পক্ষান্তরে মহাযান-মতাব-  
লম্বিগণ সর্বজীবের মুক্তি ও বোধিসত্ত্বপদপ্রাপ্তির বিষয়  
স্থির করিয়া গিয়াছেন। এককথায় আমরা এই মহাযান-সম্প্র-  
দায়কে বোধিসত্ত্ববান বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। প্রকৃত  
বুদ্ধমার্গসেবীর মুক্তি অনিবার্য। তাহাদিগকে আর কখনও  
ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে আমরা দেবযান ও পিতৃযান  
নামে দুইটা পারলৌকিক গতির উল্লেখ দেখিতে পাই।  
কিরূপে জীবাশ্মার দেবলোকে বা পিতৃলোকে গতি হয়, অর্থাৎ  
পরব্রহ্মে লীন হয়, তাহাই উক্ত পন্থাঘরে বিবৃত হইয়াছে; সেই-  
রূপে তাহারই অনুকরণে আমরা বৌদ্ধযুগে মহাযান, হীন-  
যান, তন্ত্রযান ও বজ্রযান কালচক্রযান নামে আরও কএকটা  
যানের উল্লেখ দেখিতে পাই। [ দেবযান ও পিতৃযান দেখ। ]

মহাযানগণ প্রকৃতিস্বভাব পূর্ণবিকাশরূপে জীবাশ্মার ত্রিকায়  
কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। ১ ধর্মকায়—নিরাকার ও অন্তঃস্থ,  
ধ্যানী, আদি বা বিরোচন-বুদ্ধরূপ। ২ সন্তোষকায়—ধ্যানী  
বোধিসত্ত্ব বা লোচন এবং ৩ নিম্মাণকায়—মামুখী বুদ্ধ অর্থাৎ  
যাহারা প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনপূর্বক মমুষ্যশরীরে বুদ্ধত্ব লাভ  
করিয়াছেন, যেমন শাক্যমুনি। ওরাডেল সাহেব বলেন, মহাযান  
বা বোধিসত্ত্ববানে তজ্জপ সাধারণের উন্নতিকল্পে যে ত্রিযানের

উল্লেখ হইয়াছে, তাহার ১মটা শ্রাবকযান, অর্থাৎ কেবল মাত্র  
পুণ্যবান ধর্মপ্রোতাগণ ছাগরূপ যানারোহণে ভবনদী উত্তীর্ণ  
হইতে পারেন। ২য়টা প্রত্যেক বুদ্ধবান অর্থাৎ নির্দোষবাসী  
ধ্যানী বুদ্ধগণ হরিণরূপী যানে আরোহণ করিয়া ভবসাগর  
অতিক্রম করিয়া থাকেন এবং ৩য় বোধিসত্ত্বযান—বোধিসত্ত্বগণ  
হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভবসমুদ্রের অন্তলম্পর্শী তলদেশ  
বিলোড়নপূর্বক পূর্ণপ্রজ্ঞাধিষ্ঠিত হইয়া জীবনযাত্রা অতিক্রম  
করিতে সমর্থ হন। বাস্তবিক জ্ঞানালোকে সর্ব জীবের মুক্তিই  
মহাযানের উদ্দেশ্য।

হীনযানেরা শ্রাবক বা যাহারা বুদ্ধমুখে ধর্মোপদেশ শুনি-  
য়াছেন, তদ্ব্যতীত আর কাহারও নির্দোষমুক্তি স্বীকার করেন  
না, কিন্তু মহাযানেরা কি বতি, কি গৃহী, সকলেরই মুক্তি  
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

জীবাশ্মার মঙ্গলকামনার মহাযান-সম্প্রদায় জীবগতির  
মুখ্য উপায় স্বরূপ এই সর্ব মানবের উপযুক্ত মত বিশদরূপে  
জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে এবং কোন্  
মনীষী বৌদ্ধ যতি দ্বারা এই অভিনব পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছিল,  
বৌদ্ধপ্রাধাত্যের ইতিহাসে তাহার কোন প্রকৃত প্রমাণ  
পাওয়া যায় না।

অনেকে অনুমান করেন যে, শাক্যবুদ্ধের তিরোধানের  
এক শতাব্দী পরে বৈশালীতে মহাসাঙ্ঘিক নামে মতান্তরা-  
বলম্বী যে এক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, তাহার স্ববি-  
গণ পূর্বতন মতের সংস্কার-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।  
ক্রমে সেই সংস্কারসম্পন্ন মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায় হইতে ‘মহা-  
যান’ মত সমুদ্ভূত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী অশ্বঘোষ-রচিত  
“মহাযান-শ্রদ্ধোত্তমশাস্ত্র” নামক মহাযান মতের উৎপত্তি-  
বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে আমরা মহাযানের প্রাচীনত্বের আভাস  
পাই। ৭০ খৃষ্টাব্দে অশ্বঘোষ বিরচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ  
চীনদেশে নীত হয়। সুতরাং তাহারও পূর্বে অশ্বঘোষের  
আবির্ভাবকাল কল্পনা করিলে, খৃষ্ট পূর্বীকেই মহাযান-  
মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার কল্পনা করা যায়।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী মহাযান-মতের বিস্তার সূচিত হইলেও  
প্রকৃত পক্ষে মাধ্যমিক মতের প্রবর্তনিতা নাগার্জুন হইতেই।  
ইহার প্রচার ও প্রসার নিরূপিত হইয়া থাকে। নাগা-  
র্জুনের পূর্বে বৌদ্ধ-যতিদিগের মধ্যে বস্তুসত্তা ও সত্তাভাস  
এবং স্থিতি ও ধ্বংস এই মত লইয়া বাদবিসম্বাদ চলিতেছিল।  
তিনি মধ্যমত অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সিদ্ধান্তাত্যাস দ্বারা  
উহার পূর্বপক্ষ সীমাংসা ও অর্ধ-বৈপরীত্য সংঘটন করাইয়া  
উভয় মত ধ্বংস করেন, এই জন্ত তৎপ্রবর্তিত মত মাধ্যমিক

\* ‘হীনযান’ শব্দ কোন প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে নাই। উত্তরদেশীয় মহাযান-  
মতাবলম্বিগণ আপনাদের জ্যেষ্ঠতা ঘোষণা করিবার জন্ত ‘মহাযান’ নামে এবং  
দক্ষিণদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধমতকে হীনজ্ঞানে ‘হীনযান’ নামে প্রচার করিয়াছেন।

নাথে খ্যাত হয়। তৎকৃত প্রজ্ঞাপারমিতা এই সম্প্রদায়ের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এতদ্বিধ বুদ্ধাবতঃসক, সমাধিরাজ ও ব্রহ্মকুটুস্ত্র নামে তিনি আরও তিনখানি গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রজ্ঞাপারমিতার কতকগুলি স্বর্গীয় বা আধ্যাত্মিক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের উল্লেখ আছে। বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের বহু মহাযান সম্প্রদায়ের প্রবর্তিত মতের বিশেষ অঙ্গুল। [ মাধ্যমিক দেখ। ]

কাহারও বিশ্বাস, নাগার্জুন মহাযান-মতাবলম্বী অর্থবোধের শিষ্য। তাঁহার মাধ্যমিক মত মহাযান মতের প্রধান সহায়ভূত হইয়াছিল। মতান্তরে প্রকাশ, তিনি রাজলভজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদান পূর্বে ব্রাহ্মণের ধর্মশাস্ত্রে অভ্যস্ত ছিলেন। পরে তিনি মহাযান বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন। সাধুতম কৃষ্ণের ও গণেশের অঙ্গগ্রন্থে তাহার ধর্মীতিব্যক্তি হইয়াছিল। এই অশ্বত্থ ঐতিহাসিক তত্ত্বের রূপক আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত ভগবদ্গীতা ও শৈবমত অনুসরণ করিয়া মহাযান মতের কলবর গুটি করিয়াছিলেন। সুতরাং নাগার্জুন-প্রবর্তিত মতে যে মতঃই ব্রাহ্মণ্যাতাস প্রতিপাদিত হইবে, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

নানারূপ কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, নাগার্জুন ৬০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া সুখাবতী নামক স্বর্গে আরোহণ করেন। অপরাপর প্রবাদ মতে তিনি ৫ শতাব্দী কাল বিদ্যমান ছিলেন। রাজতরঙ্গিনীর উপাখ্যান স্বীকার করিলে, নাগার্জুন তুরঙ্গ রাজগণের অবাবহিত পরবর্তিকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

[ নাগার্জুন দেখ। ]

মহাযানমতের উৎপত্তি ও পরিবর্তির প্রকৃত ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, শকরাজ কনিক সাম্প্রদায়িক ধর্মবিরোধ অপনোদনে সন্মুখ হইয়া ৩য় মহাসভার অনুষ্ঠান করেন। তদবধি এই সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। জালন্ধরের নিকটবর্তী কুবন সন্ধ্যারামে, মতান্তরে কাশীরের অন্তর্গত কুণ্ডলবন-বিহারে এই মহতী ধর্মসভার অধিবেশন হয়।

সাম্প্রদায়িক মতভেদ হেতু বৌদ্ধ-শাস্ত্রসমূহের বিশৃঙ্খলতা নিরীক্ষণ করিয়া সংস্কারাভিলাষী রাজা কনিক যে মহাসভার আহ্বান করেন, তাহার কালনির্ণয়াদি সম্বন্ধে বিভিন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং গত কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া

যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বেশী আশা করা যায় না। তিব্বতীয় ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাজা সাম্প্রদায়িক ধর্মশাস্ত্রসমূহ সংগ্রহার্থ একটা মহাসভা আহ্বান করিলেন। সভার কার্যনির্বাহের জন্য পার্শ্ব বা পার্শ্বিকের অধীনে পাঁচ শত বোধিসত্ত্ব ব্যাপ্ত রহিলেন। এই মহাসভা হইতে ক্রমে সৌত্রান্তিকটীকা, বিনয়-বিভাষা ও অভিধর্ম-বিভাষা সঙ্কলিত হইয়া আঠারটা বৌদ্ধসমিতির সম্মতি-ক্রমে সাধারণে প্রচারিত হয়। ঐ সময়ে বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম নামক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সংগৃহীত, পরিশোধিত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

উক্ত মহাসভা যে কেবলমাত্র শাস্ত্র ও তর্কীক রচনার ব্যাপ্ত ছিলেন, একথা সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। তবে বৌদ্ধধর্মের মূল সত্যরক্ষার্থ ১৮টা বিভিন্ন সমিতি যে একমত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাহ বা আভ্যন্তর ঘটনা পর পর অনুশীলন করিলে অনুমান করা যায় যে, শ্রাবক বা হীনযান মত এই সভার বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মহাযান মত আদৌ পরিগৃহীত হয় নাই।

এই মহাসভার কার্যপরম্পরা অবিস্মৃত থাকিলেও নিশ্চয় বলা যায় যে, সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ এই সভার পরিগৃহীত ধর্মপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিল। একথা মহাযান প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায় এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সভার প্রধান লক্ষণ এই যে, এই সময় হইতে বিভিন্ন বৌদ্ধ-ধর্মসভার মধ্যে যে বহুকালস্থায়ী মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল, তাহা সাম্যতা প্রাপ্ত হয়। যে মহাযান সম্প্রদায় এতদিন ক্ষীণ জ্যোতীরূপে বিদ্যমান ছিল, অল্পকাল মধ্যেই তাহা পরিপূর্ণ হইয়া বৌদ্ধ-সমাজে মস্তকোত্তোলন করে।

মাধ্যমিক-মত-প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন মহাযান-মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজ মতে হিন্দুধর্মশাস্ত্র ও হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বিবর্তিত করিয়াছিলেন, সে কথাও পূর্বে বলিয়াছি।

এই নবোদ্ভিত সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় সূত্রসমূহ ধর্মশাস্ত্রসমূহ সঙ্কলিত হয়। তাঁহার বৌদ্ধ ত্রিপিটক হইতে সম্যক বা আংশিক ভাবে কোন মত গ্রহণ না করিলেও একবারে প্রাচীন বৌদ্ধ সূত্রসমূহ পরিভ্রাণ অথবা সেই পবিত্র গাথাসমূহের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করেন নাই। তাঁহার কেবলমাত্র বুদ্ধপ্রকটিত সত্যসমূহের টীকা-টিপ্সনী সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে বাইরা, সেই বিতর্কিত সত্যপথকে অন্ধকারায়িত



করিয়া ফেলিয়াছেন। হীনযানগণ এই নূতন মতের প্রতি-  
পোষকতা না করিয়া বরং নিন্দাবাদই করিয়া থাকেন, যে  
হেতু নবীন মতাবলম্বিগণ অর্হংগণকে নিম্নাসন দান করিয়া  
বোধিসত্ত্বদিগকে উচ্চাসনে বসাইয়াছেন।

শূন্যবাদই মহাযান মতের প্রধান লক্ষণ। এই শূন্যতা বা  
'সর্গঃ শূন্যঃ' অভিব্যক্তিই তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্মের মূলসত্তা বলিয়া  
স্বীকার করেন। বস্তুতঃ এই শূন্যবাদ প্রাচীন ত্রৈবিধ্য-  
সূত্রোক্ত অনান্যবাদের বিবৃতিমাত্র। তাহারা বলেন যে, শাক্য-  
বুদ্ধ বলিয়াছেন—বস্তুসত্তার প্রকৃতি নাই, স্তত্রাং তাহা আত্মত-  
পরিচ্ছিন্ন। এই হেতু অনন্তকাল তাহা পূর্ণ শান্তিতে বির-  
জিত ও সম্পূর্ণরূপে নির্মাণে নিমগ্ন। বিরুদ্ধবাদিগণ এই  
সত্যবাক্যের অবহেলা করিয়া বিশেষরূপে বিশ্বাসহস্তা  
হইয়াছেন।

এই শূন্যতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস বা বিনাশ নহে। বৌদ্ধ-  
শাস্ত্রে শূন্যতা, মহাশূন্যতাভেদে অষ্টাদশ প্রকার ভেদ নির্ণীত  
হইয়াছে। আবার তিব্বতীয় বৌদ্ধ লামাগণ ৭০ প্রকার ভেদ  
নির্ণয় করিয়া থাকেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, নাগার্জুন হইতেই মহাযান-  
মত মধ্যে যোগ ও ভক্তিমার্গ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।  
এই ভক্তিতে অমুপ্রাণিত হইয়া মহাযানীরা লক্ষ লক্ষ লোককে  
বিহ্বল করিয়া স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।  
এইরূপে বৌদ্ধেতিহাসে প্রাচীন ধর্মমতাপেক্ষা মহাযান মতের  
গুরুত্ব অধিক হইয়া পড়ে। মহাযান-সম্প্রদায় ক্রমে অত্যন্ত  
বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে গ্রাস করিয়া আপনার কলেবর পুষ্ট করে;  
এবং দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধগণ চিরকাল একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-  
রূপে পরিগণিত হয়, তাঁহারা আদৌ পূর্বতন সত্যপথ  
পরিতাগ করেন নাই।

নাগার্জুনের পর বস্তুবদ্ধই মহাযান মত পুনঃপ্রচারে  
বহুপরিকর হন। [গ্রন্থ শব্দ ৪৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

যাহাই হউক, মহাযানদিগকে বৌদ্ধ ধর্মের শীর্ষ স্থান  
অধিকার করিতে কএক শতাব্দী ধরিয়া বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধ-  
সম্প্রদায়ের সহিত বাকবিতণ্ডা করিতে হইয়াছিল। ভক্তি ও  
যোগধর্মের অভ্যুত্থান এবং হিন্দুদর্শনভিজ্ঞ মহাযানদিগের মত-  
ধ্বংসার্থ হীনযানদিগকে ও হিন্দুদর্শন শিক্ষা করিতে হইয়াছিল।

যে যেতু দর্শনশাস্ত্রমূলত গ্রন্থ, মীমাংসা বা যুক্তির ষণ্ডন  
তত্ত্ব শাস্ত্রমূলত জ্ঞানের সাপেক্ষ ছিল। এইরূপে পরস্পরের  
মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকারের চেষ্টায় বৌদ্ধদিগের মধ্যে চারিটা  
দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। যথা—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক,  
যোগাচার ও মাধ্যমিক।

তন্মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ হীনযান-মতাপেক্ষ  
এবং যোগাচার ও মাধ্যমিকগণ মহাযান-মতের প্রতিপোষক  
ছিলেন।

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ ভূত, ভৌতিক, চিত্ত ও  
চৈতন্য এই চারিটা স্বীকার করিতেন। বৈভাষিকদিগের মতে,  
অভিধর্ম ব্যতীত সূত্রের কোন বলবত্তা নাই। স্বয়ং শাক্য-  
মুনিই মানুষসত্তা লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি স্বীয় সাধন-  
বলে বুদ্ধত্ব ও নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় স্বভাবজ  
জ্ঞান দ্বারা সত্যশাস্ত্রই বুদ্ধত্বের স্বর্গীয় লক্ষণ। সৌত্রান্তিকগণ  
তদ্বিপরীতে অভিধর্মকে উপেক্ষা করিয়া সূত্রকেই প্রামাণ্য  
বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বুদ্ধকে দশবল, চাতুর্বৈশারদ্য ও  
ত্রিমুতুপস্থান সমন্বিত এবং সর্বভূতে সমদয়ীবান্ বলিয়া স্বীকার  
করেন। এতদ্বিন্ন তাঁহারা বুদ্ধশরীরে ধর্মকায় ও সন্তোষ-  
কায় আরোপ করিয়া গিয়াছেন।

পক্ষান্তরে যোগাচার ও মাধ্যমিকগণ বিজ্ঞানবাদী ছিলেন।  
তাঁহারা আদৌ বস্তুসত্তা স্বীকার করিতেন না। তাঁহাদের  
মতে জড়জগৎ প্রকৃত ভ্রমাত্মক এবং নামরূপের বিকার মাত্র।  
বেদান্তবাদীর পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্যের ত্রায়  
তাঁহারাও পরমার্থ ও সংবৃতি নামক দুইটা সত্য স্বীকার  
করেন। সংবৃতি প্রজ্ঞাপ্রাপ্তি (বুদ্ধি) ভিন্ন আর কিছুই নহে।  
এই কারণে সমস্তই মায়ী ভ্রমাত্মক বা স্বপ্ন সৃষ্ট। তাঁহাদের  
মতে বস্তুসত্তার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই; স্তত্রাং আত্মার জন্ম  
বা নির্বাণলাভও অসম্ভব। যাহারা নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন  
এবং যাহারা প্রাপ্ত হন নাই, এতদ্ব্যতিরেকে বিশেষ কোন  
পার্থক্য থাকিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জীবদেহ ও ভোগ  
দেহের সকল অবস্থাই স্বপ্নবৎ। (১)

মাধ্যমিকগণ মায়াবাদ পরিত্যাগপূর্বক সাংখ্যাচার্যের  
প্রধান ও প্রকৃতির অমুহুরণে প্রজ্ঞা ও উপায়ের ব্যবস্থা  
করিয়াছেন। যুক্তি ও অহুমান দ্বারা তাহারা বস্তুসত্তার  
অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের নৈতিক-  
মার্গ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

(১) "সংবৃতিঃ পরমার্থা চ সত্যধর্মসিদ্ধঃ মতম্।

বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিসংবৃত্তিকচ্যতে ॥

এবং ন চ নিরোধোহস্তি ন চ ভাবোহস্তি সর্বদা।

অজাতমনিরুদ্ধং চ তন্মাং সর্বসিদ্ধং জগৎ ॥

অদোপমান্য গত্যো বিচারে কদলীসমাঃ।

নিবৃত্তানিবৃত্তানাক্ষ বিশেষো নাস্তি বস্তুতঃ ॥

(শাস্তিসংবৃত্ত বোধিচর্যাবতায়)

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, নাগার্জুন মাধ্যমিক মত প্রচার করেন। তাঁহার সমসাময়িক কুমারলঙ্ক সৌত্রান্তিক মত প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্ববর্ণিত অশ্বঘোষ ও মহাযান সম্প্রদায়ের একজন মহারথি ছিলেন। নাগার্জুনের পর আর্যদেবের নাম প্রসিদ্ধ। তিনি মহাযান-মত প্রচারকল্পে অনেক দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপরে নালন্দা-বিহারে আমরা নাগার্জুন (তথাগত-ভদ্র) নামে আর একজন বৌদ্ধ স্থবিরের নাম দেখিতে পাই।

উত্তর ও দক্ষিণ বৌদ্ধ-সমাজের অবস্থা ও পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া ফাহিয়ান খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দির প্রারম্ভে লিখিয়া গিয়াছেন যে, অভিধর্ম ও বিনয়-সেবকমণ্ডলী অভিধর্ম ও বিনয়-পিটকের পূজা করিয়া থাকেন এবং মহাযান-মতাবলম্বীরা প্রজ্ঞাপারমিতা, মজ্জীম ও অবলোকিতেশ্বরের উপাসনা করেন। তিনি পাটলীপুত্রনগরে আসিয়া দুইটা বৃহৎ সজ্জারাম দেখিতে পান, উহার একটা হীনযান ও অপরটা মহাযান-মতাবলম্বীদিগের বাসস্থান। মহাযান-সজ্জারামে অবস্থান-কালে তিনি মহা-নাট্যিকমতে সংস্কৃত একখানি সম্পূর্ণ বিনয়-গ্রন্থ দেখিতে পান। মঠবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়া ছিলেন যে, মহাসাংঘিক মতের সহিত মহাযান মতের বিশেষ সাদৃশ্য ও নৈকট্য বিদ্যমান আছে। এখানকার মহাযানগণ স্বকীয় ধর্মমতের পুস্তকগুলি ব্যতীত সন্ন্যাস্তিবাদ এবং সংযুক্তাভিধর্ম-জদয়, পরিনির্বাণ, বৈপুল্যসূত্র, অভিধর্ম প্রভৃতি মহাসাংঘিক মতপোষক গ্রন্থেরও আলোচনা করিতেন।

খৃষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দি হইতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৌদ্ধদর্শন প্রচারিত হইতে থাকে। এই সময়ে গান্ধারবাসী আয্য অসঙ্গ ও বসুবন্ধু নামক খ্যাতনামা দুই বৌদ্ধভ্রাতার অভ্যুত্থান হয়।

অসঙ্গ প্রথমে মহাশাসক মতচারী ছিলেন। ক্রমে তিনি মহাযান-মতে দীক্ষিত হন। খৃষ্ট-পূর্বাব্দে প্রচারিত পতঞ্জলি-কৃত যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার মনে যোগের প্রাধান্য উপচিত হয়। তদনুসারে তিনি যোগাচার বা যোগাচার্য্য নামে একটা স্বতন্ত্র মহাযান-শাখার উদ্ভব করিয়া যান। তিনি অযোধ্যা ও মগধে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। রাজগৃহ রাজধানীতে তাঁহার মৃত্যু হয়! তিনি একখানি যোগশাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন। চান-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াংএর মতে অসঙ্গই মহাযান মধ্যে তত্ত্ব প্রচার করেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু বাণ্যকালে সজ্জভদ্রনামা কান্দীরবাসী জনৈক হীনযানের নিকট বিজ্ঞা শিক্ষা করেন। পরে তিনি কান্দীর হইতে অযোধ্যায় আইসেন এবং একজন গোঁড়া সন্ন্যাস্তিবাদী হইয়া পড়েন। প্রথমে তিনি ষাট ভ্রাতার

যোগশাস্ত্রের বিশেষ নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি মহাযানমত অবলম্বনপূর্বক নালন্দা-মঠের আচার্য্য হইয়া কিছুকাল অবস্থানের পর বৃদ্ধবয়সে নেপালে (মতান্তরে অযোধ্যায়) যাইয়া দেহরক্ষা করেন। তাঁহার অভিধর্মকোষ বৌদ্ধ-দর্শনের একখানি প্রধান গ্রন্থ। এতদ্বিত্ত তিনি অনেকগুলি মহাযান-গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর পর, আমরা দিওনাগ, শুগপ্রভ, স্থির-মতি, সজ্জদাগ, বুদ্ধদাস, ধর্মপাল, শীলভদ্র, জয়সেন, চন্দ্র-গোমিনী, চন্দ্রকীর্তি, শুগমতি, বসুমিত্র, যশোমিত্র, ভব্য, বুদ্ধ-পালিত, রবিগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের নাম পাই, ইহারা মহাযান-সম্প্রদায়ের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। ইহাদের রচিত ধর্মশাস্ত্র ও টীকা বৌদ্ধ সমাজের বিশেষ আদরের জিনিস।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দি বৌদ্ধবিজ্ঞানের উন্নতির পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়। ঐ সময়ে উত্তর সম্প্রদায় ধর্মচর্চার উপর অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দির শেষভাগে পরিব্রাজক ইং-সিং তদীয় ভারত-ভ্রমণ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বে মহামতি ধর্মকীর্তি বৌদ্ধধর্ম-সংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান হইয়া ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ হিন্দুদার্শনিক কুমারিল ভট্টের সম-সাময়িক ছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দিই উত্তরদেশীয় বৌদ্ধসমাজে অর্থাৎ মহা-যানদিগের মধ্যে তান্ত্রিকতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকতার সংমিশ্রণহেতু বৌদ্ধ-সমাজে প্রকৃতি (শক্তি), মাতৃ, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতির উৎসব প্রচলিত হয়। এই স্বর্গীয় মাতৃকাগণ হিন্দু-দেবদেবীর পদ্বীকূলে গৃহীত না হইয়া স্বর্গস্থ বোধিসত্ত্বগণের পদ্বীকূলে নিদ্ধারিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভৌতিকপ্রক্রিয়া, চক্র, ধারণী প্রভৃতির অমুষ্ঠানেরও অভাব হয় নাই। তাঁহারাও দুই গ্রন্থের প্রকোপ-প্রশমন জন্য মন্ত্রগুক্ত কবচাদি ধারণ করাইতে শিখিয়াছিলেন। অবশেষে ইহাই মন্ত্রযান রূপে পরিকীর্ণিত হয়।

আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, এক সময়ে মথুরা, কাবুল, কান্দীর, কার্গি, নাসিক, অমরাবতী, উজ্জয়িনী, পঞ্জাব, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে মহাযান-ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিলা-ফলক ও বৌদ্ধ-সজ্জারাম প্রভৃতি এখনও তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দি কনোজরাজ হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) মহাযান-মতের পৃষ্ঠপোষক ও হীনযানদিগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। হর্ষচরিতপাঠে জানা যায় যে, তাঁহার বিধবা ভগিনী রাজ্যশ্রী বৌদ্ধভিক্ষুণী হইয়াছিলেন।

এই সময় হইতেই হিন্দুপ্রাধান্যের পুনঃ সূচনা হয়। কর্ণ-

স্বর্ণরাজ শশাঙ্ক ও কাশীররাজ ছলভবর্কনের সময় হইতেই হিন্দুধর্মের ক্রমোন্নতি ও বৌদ্ধধর্মের অবনতি হইতে থাকে। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দির মধ্যভাগ হইতেই প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধদিগের অধঃপতন ঘটে।

প্রায় ৬৪০ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে যে মহাযান-মত প্রচারিত হয়, তাহাতেও তাত্ত্বিকতার অভাব দৃষ্ট হয়। এই তাত্ত্বিকতা-পূর্ণ মহাযান মতই ‘মন্ত্রযান’ নামে পরবর্তী কালে অভিহিত হইয়াছিল। বঙ্গের পালরাজগণ সকলেই এই মন্ত্রযান-মিশ্রিত মহাযানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে সমস্ত বঙ্গ-বেহার এই মন্ত্রযান মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, শূন্যবাদ ব্যতীত মহাযানদিগের আর সকল অমুঠান হিন্দুধর্মের অমুরূপ, সুতরাং এই মতাবলম্বী তাত্ত্বিক ও হিন্দু তাত্ত্বিকে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এই কারণ বঙ্গ সেন-রাজগণের অভ্যুদয় ঘটিলে ও তাঁহাদের হিন্দুধর্মামুরাগ প্রকাশিত হইলে সাধারণেও অতি সহজেই তাত্ত্বিকপন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের বিশেষ অগ্রবিধা হয় নাই। এইরূপে মন্ত্রযান মতাবলম্বী বহুতর বঙ্গবাসী হিন্দুরাজার প্রভাবে হিন্দু তাত্ত্বিক বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মগধের নালন্দায় তখনও যে সমস্ত বৌদ্ধ তাত্ত্বিকগণ ছিলেন, তাঁহারা মুসলমানের অত্যাচারে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অনেকে নেপালে গিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই মুসলমানের করাল ক্রপাণে প্রাণ বিসর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে বুদ্ধের জন্মভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম তিরোহিত হইয়াছিল। নেপালে যাহারা আশ্রয় লইলেন, তাহারা আবার কালবশে তাত্ত্বিক আচার্য্যগণের শিষ্য হইয়া পড়িলেন, সেই সকল তাত্ত্বিক আচার্য্যগণ বজ্রাচার্য্য নামে খ্যাত। ইহারা স্ব স্ব প্রাধান্ত রক্ষার জন্ত যে মত প্রচার করিলেন, তাহাই বজ্রযান নামে খ্যাত। এখনও নেপালে বজ্রযান এবং তিব্বতে কালচক্রযান প্রচলিত রহিয়াছে।

[ হীনযান ও বৌদ্ধ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

মহাযানদেব (পুং) চীন-পরিগ্রাহক হিউএন্ সিয়াঙ্গের উপাধি।

মহাযানপরিগ্রাহক (পুং) মহাযান-মতাবলম্বী।

মহাযানপ্রভাস (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মহাযানসূত্র (ক্লী) মহাযানদিগের কএকখানি সূত্রগ্রন্থভেদ।

মহাযান্য (ক্লী) সামভেদ।

মহাযান্য (পুং) বিষ্ণু।

মহাযুগ (ক্লী) দেবগণের যুগ; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি।

মানবদিগের এই চারি যুগে দেবগণের এক যুগ। [ যুগ দেখ। ]

মহাযুত (পুং) অযুতের উর্দ্ধসংখ্যা।

মহাযুধ (পুং) মহান্ আয়ুধো যজ্ঞ। শিব।

( ভারত ১৩, ১৪২। ১০০ )

(ত্রি) ২ মহা আয়ুধযুক্ত।

মহাযোগিন্ (পুং) ১ শ্রেষ্ঠযোগী। ২ বিষ্ণু। ৩ শিব।

মহাযোগেশ্বর (পুং) পিতামহ ও পুলস্ত্য প্রভৃতি ঋষি।

“পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠঃ পুলহস্তথা।

অঙ্গিরাস্চ ক্রতুশ্চৈব কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ।

এতে...মহাযোগেশ্বরাঃ স্মৃতাঃ ॥” (ভারত ১৩, ৪৩২৩ শ্লোক)

পিতামহ, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু ও কশ্যপ, এই সকল ঋষি মহাযোগেশ্বর বলিয়া অভিহিত।

মহাযোগেশ্বরী (স্ত্রী) ১ নাগদমনী, চলিত নাগদনা। ২ হুর্গা।

মহাযোনি (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ। যোনিদেশ অতিশয় বিবৃত হইলে মহাযোনি কহে। এই রোগ অতিশয় কষ্টকর।

ইহার লক্ষণ—

“ছুষ্টো বিষ্টভ্য বোভ্যন্তঃ গর্ভকোষ্টঞ্চ মারুতঃ।

কুরুতে বিবৃতাং স্রুতাং বাতিকীমিব হ্রঃখিতাম্।

উৎসন্নমাংসাঃ তামাহর্ষহাযোনিং মহারুজাম্ ॥”

( বাতট উত্তরতঃ ৩৩ অং ) [ যোনিরোগ দেখ। ]

মহাযৌধাজয় (স্ত্রী) সামভেদ।

মহায্য (ত্রি) পূজ্য। (ঋক্ ৮, ৫০। ৮)

মহারক্ষস্ (ক্লী) ভীষণ রাক্ষস।

মহারক্ষা (স্ত্রী) বৌদ্ধ-কুলদেবীভেদ। মহাপ্রতিসরা, মহামায়ুরী, মহাসহস্রপ্রমর্দিনী, মহাশীতবতী ও মহামন্ত্রাম্বারিণী, এই পঞ্চ মহারক্ষা।

মহারক্ষিত (পুং) বৌদ্ধ-আচার্য্যভেদ।

মহারক্ত (ক্লী) প্রবাল। (বৈষ্ণবকনিং)

মহারক্তত (ক্লী) মহচ্ছ তৎ রক্ততক্ষেতি। স্বর্ণ। (রাজনিং)

“মহারক্ততস্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।” (মার্কং পুং ৬. ১৪)

২ ধুতুর, ধুতুরা। ৩ বৃহদ্ রৌপ্য।

মহারজন (ক্লী) রাজ্যতেহনেনেতি রজ্জ কল্পণে লুট (অনিমিত-মিতি। পা ৬। ৪২৪ ইত্যত্র ‘রজ্জকরজনরজঃস্পংখ্যানং কর্তব্যং’ ইতি কাশিকোক্ত্য ন লোপঃ, মহচ্ছ তৎ রজনক্কেতি কর্ণধাং। ১ কুসুমপুষ্প। ২ স্বর্ণ। (মেদিনী)

মহারণ (পুং) মহাযুদ্ধ।

মহারণ্য (ক্লী) মহৎ অরণ্যং। বৃহদন, পর্যায়—অরণ্যানী, কান্তার। (মেদিনী)

“প্রবিশ্ত তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাম্ববান্।

রামো দদর্শ হৃদ্বর্ষতাপসাপ্রমমত্তলম্ ॥” (রামায়ণ ৩। ১১)

মহারতিবল্লভমোদক (পুং) মোদকোষধিবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৫ পল, দ্রুত ৪ পল, শর্করা ১৬ পল, শতাবরীরস ৩২ পল, দুগ্ধ ৩২ পল, সিদ্ধিরস বা তাহার কাথ ৩২ পল, ছাগদুগ্ধ ৩২ পল, প্রক্ষেপার্থ আমলকী, জীরক, কৃষ্ণজীরক, মৃত্তক, গুড়ত্বক, এলা, তেজপত্র, নাগ-কেশর, বানরীবীজ (আলকুশীর বীজ), গোরক্ষতণ্ডুলা, তাল-ছুর, কেশরাজ, শৃঙ্গাটক, ত্রিকটু, ধাত্তক, অত্র, বঙ্গ, হরীতকী, ত্রাশা, কাকোলা, ক্ষীরকাকোলা, পিণ্ডীখর্জুর, কোকিলাক্ষবীজ, কটুকী, বষ্টিমধু, কুষ্ঠ, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বন-যমানী, জীবন্তী ৯ গজপিপ্পলী এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, পরে যথা-বিধানে এই মোদক প্রস্তুত করিয়া নীতল হইলে মধু ২ পল এবং মৃগমদ ও কর্পূরচূর্ণ দ্বারা ইহা অধিবাসিত করিবে। এই মোদক সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শাস্তি এবং বল, বায়ু ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাং বাজীকরণাদিঃ)

মহারত্ন (স্ত্রী) মহচ্চ তৎ রত্নক্ষেতি। মুক্তাদি নবরত্ন, মৌক্তিক, হীরক, বৈদ্য, পদ্মরাগ, গোমেদ, পুষ্পরাগ, মরকত, প্রবাল ও নীলরত্ন এই নববিধ রত্ন মহারত্ন।

মহারত্নপ্রতিমণ্ডিত (পুং) কল্পভেদ।

মহারত্নময় (ত্রি) মহার্য্য-রত্নবিশিষ্ট।

মহারত্নবৎ (ত্রি) মহার্য্য রত্নসম্পন্ন।

মহারত্নবর্ষা (ত্রি) তাত্ত্বিকদেবীভেদ।

মহারথ (পুং) রমস্তে লোকা বস্মিন্নিতি রম (হিনকুযি-নীরমিকশিভাঃ ক্থন্। উণ্ ২।২) ইতি ক্থন্, মহাংশানো রথশ্চেতি। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১২১) মহান্ রথোহস্ত। ২ অশ্বত্থবীর সহিত অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ যোদ্ধা।

“একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্ত ধর্মিনাম্।

অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥” (গীতাটীকায় শ্রীমদে)

যিনি একাকী দশহাজার ধর্মুধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে নিপুণ তাহাকে মহারথ কহে। মহান্ রথঃ। ৩ বৃহদ্ রথ।

(ভারত ৩৪।১৭) ৪ রাজ্যবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুং ১২৮।২৬)

মহারথত্ব (স্ত্রী) মহারথত্ব ভাবত্ব। মহারথের ভাব বা ধর্ম, মহারথের কার্য্য।

মহারথ্যা (স্ত্রী) রাজপথ। প্রশস্ত রাস্তা।

মহারত্ন (স্ত্রী) মহান্ আরম্ভো প্রস্তুতকরণে যত্রো যত্ন। গড় লবণ। (রাজনিঃ) (ত্রি) ২ মহারত্নবিশিষ্ট।

“বাজীব্যো ভূগৈর্ঘৃক্তঃ স্বারূপঃ পর্বতপ্রয়ঃ।

শূদ্রকাক্ষবণিক্ প্রায়ো মহারত্নকুবীবলঃ ॥” (কামন্দকী ৪।৫৪)

মহারব (পুং) মহান্ রবো যত্ন। ভেক। (বৈজ্ঞকনিঃ)

মহারশ্মিজালাবভাসগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মহারস (স্ত্রী) মহান্ অধিকো রসোহস্ত কচিপ্রদদ্যৎ তথাশ্বঃ।

১ কাক্ষিক। (অটোথর) (ত্রি) ২ মহারসবিশিষ্ট। (পুং)

৩ খর্জুর। ৪ কোষকার। ৫ কশেক। (মেদিনী)

৬ ইক্ষু। (জটোথর) মহান্ রসঃ ধাতুদ্রবঃ। ৭ পারদ।

৮ কান্তলোহ। ৯ হিঙ্গুল। ১০ স্বর্ণমাক্ষিক। ১১ অত্রক।

১২ রৌপ্যমাক্ষিক।

“পারদো রসধাতুশ্চ রসেন্দ্রশ্চ মহারসঃ।” (ভাবপ্রঃ)

১৮ জম্বুবৃক্ষ। (বৈজ্ঞকনিঃ)

মহারসবৎ (ত্রি) ১ উৎকৃষ্ট আশ্বাদবিশিষ্ট। (পুং) ২ ধাত্যবিশেষ।

মহারসশার্দূল (পুং) রসৌষধিবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—শৌধিত অত্র, তাত্র, স্বর্ণ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগা, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই সকল প্রত্যেকে ৮ তোলা; দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, জৈত্রী, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালিশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও রসজ্ঞান, প্রত্যেকে ৪ তোলা; পান ও গীমায় সাত বার ভাবনা দিয়া পরে ইহাতে মরিচ ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে। ইহার অম্ল-পান ও মাত্রা দোষের বলাবল অমুসারে চিকিৎসক স্থির করিবেন। এই ঔষধসেবনে বিবিধ হৃতিকারোগ, জ্বর, দাহ, বমি, ভ্রম, অতীসার, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ আত্মপ্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহে হৃতিকারোগাধিকার)

মহারসার্কট (স্ত্রী) মহারসানাং অষ্টকম্। অষ্টধাতুবিশেষ, যথা পারদ, অত্রক, হিঙ্গুল, বৈক্রান্ত, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, শম্ব ও কান্তলোহ এই অষ্ট ধাতু।

“দরদঃ পারদঃ সস্ত্রো বৈক্রান্তঃ কান্তমত্রকম্।

মাক্ষিকং বিমলক্ষেতি স্ম্যরেতেহষ্টৌ মহারসঃ ॥” (রাজনিঃ)

মহারসোনপিণ্ড (স্ত্রী) আমবাতরোগে সেবনীয় ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রসোন ১০০ পল, তুষরহিত তিলকণা ৫০ পল, গব্য দুগ্ধ ১৬ সের তজের সহিত পিষিয়া, তাহাতে ত্রিকটু, ধনিয়া, চই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, গুড়ত্বক, এলাইচ ও পিপুলমূল, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, চিনি ৮ পল, মরিচ ৮ পল, কুড় ৪ পল, কৃষ্ণ জীর ৪ পল, মধু ৪ পল, আদা ৪ পল, দ্রুত ৮ পল, তিলতৈল ৮ পল, শুভক ১০ পল, খেত সর্ষপ ৪ পল, রাইসর্ষপ ৪ পল, হিঙ্গু দুই তোলা ও পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ২ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রোত্তাপে শুকাইয়া লইয়া ত্বতের কুণ্ডে স্থাপনপূর্বক ১২ দিন কাল ধাত্ত রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। প্রাতঃকালে শরীরের বলাহুসারে যথাযোগ্যমাত্রায় সেবন করা কর্তব্য। অমুপান সুরা, সৌবীরক, সীধু বা দুগ্ধ; দধি ও পিষ্টক

ভিন্ন বাহা জীর্ণ করিতে পারে, তাহাই খাওয়া উচিত। এক মাসকাল এই মহৌষধ সেবন করিলে বাতজ, কফজ ও পিত্তজ নানা প্রকার ব্যাধি অর্থাৎ প্রমেহ, অর্শ, শুষ্ক, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বশু, যোনিশূল প্রভৃতি দূর হয়। ইহা তয়াহিসন্ধানকর ও আমবাত-কুলাস্তক।

মহারাজ (পুং) মহাংশাসৌ রাজা প্রভাবিশেষবানিতি।  
১ পূর্বজনিবিশেষ। মহত্যা দীপ্ত্যা রাজতে অঙ্গলিসু শোভতে ইতি রাজ-মচ। ২ নথ। (হেম) মহান্ রাজা, (রাজাহ-সম্বিত্যচ। পা ৫৪৯১) ইতি সমাসান্তষ্টচ। ৩ শ্রেষ্ঠরাজা।  
মুগ্র রাজোচিত গুণসম্পন্ন, সম্রাট, প্রধান রাজা।

“অথ পুরুষো দাসো দাসত্বার্থো ন কথ্যচিৎ।

ইতি নতঃ মহারাজ! বন্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥”

(ভারত উদ্বোধনঃ)

৪ পশ্চিমাঞ্চলস্থ ইতর সাধারণ তাহাদের সাম্প্রদায়িক গুরুকে মহারাজ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে। ৫ ক্রত-সম্প্রদায়ী, বলভাচারী ও ধোঁকুলহ গোঁসাই প্রভৃতি হিন্দু-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ শিষ্যমণ্ডলী কতক ‘মহারাজ’ উপাধিতে সম্মানিত হইয়া থাকেন। মথুরা, বৃন্দাবন, গুজরাত, মালব, বোম্বাই, উদয়পুর ও তদ্রিকটস্থ ত্রিজাগ্রামে আচার্য মহারাজদিগের বাস আছে। এই সকল স্থানের মহারাজদিগের মধ্যে ত্রিজীর মহারাজই সর্বাঙ্গাঙ্গী শ্রেষ্ঠ। ইহার বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী, ত্রিক্ষের বালগোপাল-মূর্তির উপাসক।

এই সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ কখন কখন তাহাদের দীক্ষাগুরু মহারাজকে পূজা করিবার মানসে গৃহে আহ্বান করিয়া থাকেন। ত্রিক্ষের রামদাতা ও হোলী পক্ষে প্রায়ই মহারাজ দোলায় ছলিতে ছলিতে শিষ্যাদিগের গাত্রে কাগ ছড়িয়া মারেন।

বলভাচারী সাম্প্রদায়িকের মতে মহারাজগণ সকল শিষ্যাদির পতিস্বরূপ। পূর্বে উৎসবের সময় রমণীগণ মহারাজের গৃহে উপস্থিত হইত। অনেক রমণী এইরূপে গুরুর কুহকে পড়িয়া কুললজ্জা হারাষ্ট। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বলভাচারীগণ একটি সভা করিয়া গুরুসকাশে স্বীয় কুলবতী ভার্যা প্রেরণের একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ঐ সময়ে সম্ভবতঃ মহারাজগণ দেবমন্দিরাদিতে পূজাকর্মে লিপ্ত থাকিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহারাজের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া ঐরূপ দুর্ঘটনা-মূলক একটা মকদ্দমার সূত্রপাত হয়। উক্ত বর্ষে সন্ন্যাসীরা অন্নলন্ডের বিচারে যত্নাধিকী ব্রহ্মরতনজী মহারাজের মকদ্দমার নিষ্পত্তিকালে বলভাচার্য-সম্প্রদায়ের কিছা বাহির হইয়া পড়ে। [বলভাচার্য দেখ।]

মহারাজ, মহাদ্বি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য ৩৪২৫)  
মহারাজক (পুং) রাজতে ইতি রাজ-বুন, মহাংশাসৌ রাজকশ্চেতি। মহারাজিকগণ। (অমরটীকায় রামাশ্রম)  
মহারাজগঞ্জ, বাঙ্গালার সারণ জেলার অন্তর্গত একটি নগর। ছাপরা হইতে ১২৪০ ফ্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৬’ ৩৫” উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ২’ ৩৬” পূঃ। রাবেলগঞ্জের জ্বায় এখানেও বিস্তৃত বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

মহারাজগঞ্জ, পাটনা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। এখানে পাটনা, গয়া ও সাহাবাদ জেলার যাবতীর শস্ত বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। পাটনা নগরের হহাই বাণিজ্য-ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত।

মহারাজগঞ্জ, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটি তহসীল। তালপুর, বিনায়কপুর ও হাবেলী পরগণার কতকাংশ লইয়া এই উপবিভাগ সংগঠিত। উক্ত তরাই (পাক্ত্য) প্রদেশে একমাত্র গোঁরা, নেপালী ও থারু জাতির বাস দেখা যায়।

২ উক্ত জেলার একটি নগর এবং মহারাজগঞ্জ তহসীলের বিচার-নদর। এ স্থানের স্বাস্থ্য ভাল নহে। বর্ষান্তরূতে তরাইপ্রদেশ জলসিক্ত হইয়া একরূপ রোগের আকর হইয়া পড়ে যে, পকতবাসী গোঁরা জাতি ভিন্ন তথায় অন্য কোন লোক বাস করিতে পারে না। এখানকার তহসীলী কাছারী একরূপ সূদৃঢ় ভাবে প্রস্তুত যে, শত্রুপক্ষ সেনাদল লইয়া লুণ্ঠন করিতে আসিলেও আশ্রয়ক্ষম সমর্থ।

মহারাজগঞ্জ, অযোধ্যা প্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটি নগর।

মহারাজচূত (পুং) মহতা মিষ্টাদিগুণেন রাজতে আজিয়তে ইত্যচ, ততঃ কশ্মধারয়ঃ। উক্তমাত্র, পর্যায়ঃ,—মহারাজাত্মক, স্থলাত্র, মন্থানন্দ, কঙ্ক, নীলকপিথক, কামায়ুধ, কামফল, রাজপুত্র, নৃপাত্মজ, মহারাজকল, কাম, মহাচূত। ইহার কোমলগুণ—কটু, অম্ল, পিত্ত ও দাহবর্জক। পকগুণ—বাহ, মধুর, পুষ্টি, বীৰ্য ও বলপ্রদ। (রাজনিঃ)

মহারাজক্রম (পুং) মহারাজোহতিশ্রেষ্ঠো ক্রমঃ। আর-গবধ বৃক্ষ, চলিত বড় সোণালুগাছ। (রাজনিঃ)

মহারাজনগর, অযোধ্যা-প্রদেশের দীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। লাহারপুর হইতে থেরী ঘাইবার পথে, দীতাপুর নগর হইতে ৮ ফ্রোশ পূর্বে অবস্থিত। মুসলমান-রাজগণের অধিকারকালে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইহা ইসলামপুর নামেই খ্যাত ছিল। তৎপরে রাজা তেজ-সিংহ নামা জনৈক গোড়ীয় রাজপুত্র এই নগর অধিকারপূর্বক

মহারাজপুর নামে ঘোষণা করেন। এখনও গোড়ারগণ এখানকার ভূমাদি অধিকার করিতেছে।

মহারাজনগর, মধ্যভারতের বুদ্ধলবণের অন্তর্গত চরখাড়ি নামক রাজ্যের একটি নগর।

মহারাজনৃপতিবল্লভরস (পুং) রসৌষধিবেশ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—কান্তলৌহ ৬ তোলা, অত্র, ভাত্র, মুক্তা, ও স্বর্ণমাসিক প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগা, কাকড়াশূকী, গজপিপ্পলী, দন্তমূল, মরিচ, তেজপত্র, যমানী, বালা, মুতা, শুঠ, ধনে, সৈন্ধবলবণ, কপূর, বিড়ঙ্গ, চিতা, বিষ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ তোলা, ভেড়ুড়া চূর্ণ ২ তোলা, লবঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রী, দারুচিনি প্রত্যেকে ৪ তোলা, সমুদয় চূর্ণের অর্ধেক বিটলবণ এবং সকলের সমান এলাচ মিশাইয়া ছাগছন্ধে ৭ বার ও টা বা লেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ১০ রতি প্রমাণ বটা করিয়া ছায়ার শুকাইতে হইবে। এই ঔষধসেবনে মন্দাধি, সংগ্রহণী, আম, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি, পাণ্ডু, ছদ্মি, অগ্নিপিত্ত, ক্লদ্রোগ, গুল্ম, উদরী, ভগন্ধর, অশ, পিত্তরোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

অন্ত্রবিধ—ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—মাসিক, লৌহ, অত্র, বঙ্গ, রক্ত, স্বর্ণ, সোহাগা, শুঠ, ভাত্র, পিপুলমূল, দারুচিনি, যমানী, সৈন্ধবলবণ, বালা, মুতা, ধনে, গন্ধক, পারা, কপূর, ও কাকড়াশূকী প্রত্যেকে এক এক মাষা; হিঙ্গু ২ মাষা, মরিচ ৪ মাষা, জৈত্রী, লবঙ্গ ও তেজপাতা, প্রত্যেকে ১ তোলা, নাতিশম্ম, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে অদ্ধতোলা, বিষ ২ মাষা, ছোট এলাচ ১২ তোলা ৩ মাষা, বিটলবণ ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য ছাগছন্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৪ রতি পরিমাণে বটা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে আনাহ, গ্রহণী এবং পূর্কোক্ত রোগ সকল আশু নিরাকৃত হয়।

(রসেন্দ্রসারসং গ্রহণীরোগাধিঃ)

মহারাজপুর, মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম; নর্মদা ও বঙ্গরা নদীর সঙ্গমস্থলে মণ্ডলা-নগরের অপর পার্শ্বে অবস্থিত। অক্ষাং ২২°৩৫' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮০°২৪' পূঃ। পূর্বে এই স্থান একপুত্র নামে খ্যাত ছিল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজা মহারাজ শাহ অনামে এই গ্রাম স্থাপন করেন। প্রতি বৎসর এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে।

মহারাজপুর, বাঙ্গালার দাঁওতাল পরগণার রাজমহল উপ-বিভাগের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। অক্ষাং ২৫°১১' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮৭°৪৭' পূঃ। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পা-নীর একটি ষ্টেশন আছে।

মহারাজপুর, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত

একটি গওগ্রাম। অক্ষাং ২৬°২২' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭৮°৫' পূঃ। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২২ শে ডিসেম্বর ইংরাজ-সেনানী সর্-হিউগাক এখানে মহারাষ্ট্রদিগকে পরাভূত করেন। মহারাষ্ট্র-গণ রণক্ষেত্রে ৫৬টি কামান ও বারুদ এবং গোলাগুলি পরি-ভাগ করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই যুদ্ধের বিজয়কীর্ত্তি ঘোষণার জন্ত ঐ সকল কামানের খাতু হইতে কলিকাতায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ নিখিত হইয়াছে।

মহারাজপ্রসারিণীতৈল (ক্ৰী) তৈলৌষধিবেশ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৬৮ সের, কাথার্থ গন্ধতাহুলিয়া ৩০০ পল, পীতকঁটা ২০০ পল, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, বেড়োলা, শতমূলী, রায়, পুনর্গবা, কেরামূল এবং দশমূল প্রত্যেক দ্রব্য ও পালিধার ছাল এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১০০ পল, দেবদারু ৫০ পল, শিরীষছাল ৫০ পল, লাক্ষা ২৫ পল, লোধ ২৫ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৮৪০০ সের জলে পাক করিয়া ১২৮ সের থাকিতে নামাইবে। পরে ইহাতে কাঁজি ৬৪ সের (যদিও কাঁজির পরিমাণ ২৬ আড়ক লিখিত আছে, তথাপি ইহার ৬৪ সের মাত্র দেওয়া রীতি, নতুবা তৈলে কেবল কাঁজির গন্ধই অম্লভূত হয়,) দ্রব ৪০ সের, দধি ৪০ সের, দধির মাত ১৬ সের, হিঙ্গুরস ৩২ সের, ছাগমাংস ৩০০ পল, পাকার্থ জল ১৮০ সের, শেষ ৬৮ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৬০ পল, জল ৬০ সের, শেষ ১৫ সের প্রথমে এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। পরে আবার ইহাতে ককের জন্ত ভেলার মুটী, (ইহা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন দেওয়া ব্যবস্থা,) পিপুল, শুঠ, মরিচ, হহাদের প্রত্যেকের ৬ পল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাঠ, তুলকা, কাকড়াশূকী, বচ, চোরখড়িকা, শটী, মুতা, নাগরমুতা, পদ্ম-পুষ্প, হুঁদি, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্গবা, দশমূল, চাকন্দমূল, রসায়ন, গন্ধতূণ, হরিজা ও জীবনায়গণ ইহাদের প্রত্যেকে ২ পল, প্রথমে এই সকল কক দ্বারা তৈল পাক করিবে। লবঙ্গ, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধূনা, শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, মউরী, জটামাংসী, দেবদারু, লবণখোটি (চলিত লোবান), নালুকা, কাঠখোটি, ছোট এলাচি, কন্দুরখোটি, মুরামাংসী, ত্রিবিধ নর্বা, (এক প্রকার ডুধর পত্রের স্নায়, দ্বিতীয় উৎপল সদৃশ, তৃতীয় অশ্বখুরবৎ), শুড়তুক, তেজপত্র, চই, খাটাশী, চাঁপার কলি, দনাফুল, রেণুক, চোর কাকলী ও ঝাঁটি, ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল এই সকল কক ও গন্ধাদকের সহিত দ্বিতীয় বার পাক করিতে হইবে। গন্ধো-দকসাধনের নিয়ম,—তেজপত্র, পত্রক, বেণার মূল, মুতা, বালামূল, প্রত্যেকে ২৫ পল, কুড় ১২০ পল, জল ১০০

শত সের শেষ ৫০ সের, এই গন্ধজলের সহিত উপরি লিখিত দ্বিতীয় পাক হইবে।

পুনর্বার এই গন্ধজল ও চন্দন জলের সহিত পঞ্চাশ্লিখিত কন্ধ পাক করিতে হইবে। চন্দনাষু প্রস্তুত করিবার নিয়ম,— চন্দন ৫০ পল, ৫০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইলেও হয়। অথবা ঘুট চন্দনজলে মিশ্রিত করিয়া লইলেও চলিতে পারে। পূর্বোক্ত গন্ধজল ৫০ সের ও এই চন্দনজল ২৫ সেরের সহিত নাগেশ্বর, কুড়, গুড়যক, কালিয়ারাকঠ, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গেঁটেলা, লতাকতুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কাঁকলা, জয়ন্তী, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল, মৃগনাতি ৬ পল, কপূর ১১০ পল, এই সকল দ্রব্য তৈলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। পচাং মৃগনাতি ৬ পল ও কপূর ১১০ পল প্রক্ষেপ দিবে।

মহারাজ-প্রসারিণী তৈলে যে কাঁজি দিবার বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা এই নিম্নোক্ত শুক লক্ষ্য করিয়া নির্দিষ্ট। শুক প্রস্তুতপ্রণালীর নিয়ম—অন্নমণ্ড ৪ সের, কাঁজি ৮০ সের, দধি ২ সের, গুড় ২ সের, অন্নমূলক (কাঁজির অধঃস্থিত অন্ন) ১ সের, আদা ২ সের, পিপুল, জীরা, সৈন্ধব, হরিদ্রা ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া স্বতভাণ্ড মধ্যে ৮ দিন রাখিতে হইবে। পরে ইহার সহিত গুড়যক, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে শুক কহে।

এই শুক দিয়াই তৈল পাক করিবে। বিশেষ অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের যত্নসহকারে এবং শুচি হইয়া এই তৈলপাক প্রস্তুত করিবেন। এই মহারাজপ্রসারিণীতৈল রাজসেবা। ইহার শক্তি ও অত্যন্ত প্রসারিণীতৈল অপেক্ষা অত্যধিক প্রবল। ইহা মর্দনে সকল প্রকার বাতব্যাধি একেবারে নিরাকৃত হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাঃ বাতব্যাধিরোগাধিঃ)

মহারাজবটী (জী) বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—পারা, গন্ধক ও অন্ন প্রত্যেকে ২তোলা; বৃদ্ধদারক, বঙ্গ, লৌহ প্রত্যেকে ১ তোলা; স্বর্ণ, কপূর ও তাম্র প্রত্যেকে ৮ তোলা; গাজা, শতমূলী, শ্বেতধূপ, লবঙ্গ, তালমাখনা, ভূমিকুয়াণ্ড, তালমূলী, শুকশিখী, জাতিফল, জৈত্রী, বেড়োলা, ও গোরক্ষচাকুলা প্রত্যেকে ২ মাষা, তালমূলীর রসে পেষণ করিবে। পরে যথাবিধানে ইহা প্রস্তুত করিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অস্থপান মধু। এই ঔষধ-সেবনে সর্কবিধ ধাতুস্থ বাতিক, পৈত্তিক, স্নৈয়িক ও সাদ্রিপাতিক জ্বর, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, কামলা, প্রমেহ ও রক্তপিত্ত

প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। ইহা বল ও পুষ্টিকর। এই ঔষধ সেবন করিয়া নিত্য স্ত্রী-সংসর্গ করিলে শুক্র ও বলের হ্রাস হয় না। ইহা রাজসেবনযোগ্য বলিয়া ইহার নাম মহারাজবটী হইয়াছে। (রসসংসারসং জ্বররোগাধিঃ)

মহারাজিক (পুং) মহতী রাজিঃ পঙ্ক্তিরন্ত (শেবাধিভাষা। পা ৫।৪।১৫৪) ইতি কপু। গণদেবতা বিশেষ, এই গণের সংখ্যা দুই শত কুড়ি। (অমর ১।১।১০) মতান্তরে ২৩৬ জন।

মহারাজোপচার (পুং) মহারাজার্হ উপচারঃ, মহারাজানা-মুপচারো বা। রাজার্হপূজাপকরণ, মহারাজের উপযুক্ত পূজাসামগ্রী, চামর, ছত্র ও পাইকা প্রভৃতি।

“ততশ্চ চামরচ্ছত্রপাঙ্কাদীনু পরানপি।

মহারাজোপচারান্শ্চ দদ্যদর্শং প্রদর্শয়েৎ ॥” (বিষ্ণুধর্মোত্তরঃ)

দেবপূজা স্থলে মহারাজোচিত উপচার সামগ্রী দিয়া পূজা করিতে হয়। দেবতাকে ঐ সকল উপচার প্রদানে অশেষ পুণ্যলাভ হয়।

হরিভক্তিবিলাসের অষ্টম বিলাসে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

মহারাজী (স্ত্রী) ২ হুর্গা।

মহারাজ্য (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠ রাজ্য, বিপুল রাজ্য, সাম্রাজ্য।

মহারাগা, উদয়পুর বা চিতোর-রাজবংশের উপাধি।

[মেবার, চিতোর ও উদয়পুর দেখ]

মহারাত্র (স্ত্রী) দ্বিপ্রহর রাত্রি ॥

মহারাত্রি (স্ত্রী) মহত্যাং প্রলম্বাবস্থায়াঃ রাত্রি আত্মস্বরূপং দদাতি স্পৃশ্যকৃত্য সর্কানু জীবানু আত্মরূপেণ অবস্থাপন্নতি ত্রায়তে পঞ্চপর্কলক্ষণায়া অবিত্যয়াঃ সর্কশাং রক্ষতীতি ত্রৈ-ই। ব্রহ্মলয়োপলক্ষিতা মহাপ্রলয়-রাত্রি। (চণ্ডীটীকা নাগোজীভট্ট) মহত দ্বৈপ্রহর রাত্রিঃ। ২ ব্রহ্মমরণোপলক্ষিতা রাত্রি, ব্রহ্মার লয় হইলে যখন মহাকল্প হয়, তাকে মহারাত্রি কহে।

“ব্রহ্মলয়ঃ নিপাতে চ মহাকলো ভবেরূপ।

প্রকীর্তিতা মহারাত্রিঃ সা এষ চ পুরাতনৈঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ প্রকৃতিখঃ ৫ অঃ)

৩ হুর্গা। (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৮।১২০) ৪ তন্ত্রমতে অর্দ্ধরাত্রের পর মুহূর্ত্তধরের নাম মহারাত্রি, এই কাল অতি পুণ্যকাল। এই কালে বাহা কিছু দানাদি করা যায়, তাহা অক্ষর হয়।

“অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং যচ্চ মুহূর্ত্তধরমুচ্যতে।

সা মহারাত্রিরূপিতা তদন্তমক্ষরং ভবেৎ ॥” (তন্ত্রসাম্বতঃ)

৫ আশ্বিনের শুক্লাষ্টমী, হুর্গাষ্টমী, নবরাত্রি।

“শুক্লাষ্টমী চাশ্বিনস্ত নবরাত্রঃ তু তত্র বৈ।

মহারাত্রির্মহেশানি কালরাত্রিঃ শৃণু প্রিয়ে ॥” (শক্তিসংকলনঃ)



মহারাম, আগাম-প্রদেশের খাসিরা পার্শ্বত্যা প্রদেশের অন্তর্গত একটি সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দারগণ সিরেম নামে খ্যাত। রাজা উকিসেন সিংহ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানকার অধিবাসিগণ খনিজ লৌহ হইতে অস্ত্র শস্ত প্রস্তুত করিতে জানে।

২ উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত অপর একটি সামন্তরাজ্য। আর ১০৪০ টাকা। সর্দার সিরেম অনার সিংহ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। এই পর্শ্বত্যাগে নানা প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মহারামায়ণ (কৌ) বৃহৎ রামায়ণ। [ রামায়ণ দেখ। ]

মহারাবল, রাজপুতানার অরশালমীর ও ছন্দপুর রাজবংশের উপাধি। [ মারবাড়, জয়পুর, বোধপুর দেখ। ]

মহারাষ্ট্র, ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় এক বিস্তীর্ণ জনপদ। ইহার উত্তরদিকে সুরাতপ্রদেশ ও সাতপুরা গিরিশ্রেণী, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, দক্ষিণদিকে কর্ণাট প্রদেশ ও পূর্বদিকে গোওন ও তৈলঙ্গ। পূর্বদিকের সীমা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয়, গঙ্গা ও ওয়ার্কা (বরদা) নদী, মাণিকচূর্ণ, বাহুর নগর, নান্দেড়, বিদর ও তালিকোট নগর মহারাষ্ট্রদেশের পূর্বসীমায় অবস্থিত। কৃষ্ণা ও মালপ্রভা নদী এবং বেলগাঁও জিলার দক্ষিণাংশ ও সদাশিবগড় (করবাড়) এই দেশের দক্ষিণসীমারূপে পরিগণিত। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরবর্তী যে ভূমিখণ্ডকে দেশীয় ভাষায় “দক্ষিণ মহারাষ্ট্র” বলে, ইংরাজ ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডক সাহেব তাহা মহারাষ্ট্রদেশের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। এই বিশাল দেশের পরিমাণ প্রায় একলক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র বর্গ মাইল। এই দেশের লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটি। মহারাষ্ট্রদেশ সাধারণতঃ পর্শ্বতবহল ও অপেক্ষাকৃত অসুর্ক্ষর। এখানকার জলবায়ু ভারতবর্ষের অনেক স্থানের জলবায়ুর অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।

সহপর্শ্বত মহারাষ্ট্রদেশকে পূর্ব-পশ্চিমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলের নাম ‘দেশ’ ও পশ্চিম অংশের নাম ‘কোঙ্কণ’। এই শেষোক্ত প্রদেশের দৈর্ঘ্য উত্তরে দমনগঙ্গা হইতে দক্ষিণে সদাশিবগড় পর্য্যন্ত প্রায় ৪শত মাইল। ইহার সর্বাপেক্ষা আরত অংশের বিস্তার প্রায় ৫০ মাইল। এই প্রদেশ অতিশয় বহুতর, অসুর্ক্ষর ও গিরিকাননাদিতে পরিপূর্ণ। কোঙ্কণের যে অংশ পশ্চিমঘাট-গিরিমালার সাহু-দেশে অবস্থিত, তাহাকে “কোঙ্কণ-ঘাটমাথা” বলে। ঘাট-

মাথার পাদদেশস্থিত ভূমিভাগ দেশীয় ভাষায় ‘তল-কোঙ্কণ’ বা নিম্ন কোঙ্কণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোঙ্কণের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ সরলহৃদয়, কষ্টসহিষ্ণু, উদ্ভমনীল, যুগ্মপ্রিয় ও শাস্ত্রপ্রকৃতি। [ এই প্রদেশের বিস্তারিত বিবরণ কোঙ্কণ শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

কোঙ্কণের পূর্বদিকে পশ্চিমঘাট-পর্শ্বত্যাগী বিশাল দেহ উন্নত করিয়া প্রাচীরাকারে অবস্থিত। এই পর্শ্বতের দৃশ্য অতি গভীর, অতি ভয়ানক ও অনির্জন্যের স্তম্ভর। কোথাও ওষধিভূষিত শৈলশ্রেণী, কোথাও সপ্তমাসব্যাপিনী বর্ষা ও ঝটিকার দ্বারা প্রণীড়িত, কোনও স্থান বস্ত্রজন্তর ভীষণ গর্জনে নিয়ত প্রতিধ্বনিত। এই প্রাচীরবৎ শৈলশ্রেণীর স্থানে স্থানে মহুবাগণের গমনাগমনের জন্ত কয়েকটি অতি সঙ্কীর্ণ পথ আছে। এই সকল পথকে “ঘাট” বলে। এই সকল পার্শ্বত্যা-পথ অতীব বিষমকুল ও দুসারোহ। স্থানীয় লোক ভিন্ন অপর কেহ এই পথে বিচরণ করিতে পারে না। এই সঙ্কটময় পথ অতিক্রম করিয়া সহ্যাদ্রির সাহুদেশে উপস্থিত হইলে শৈলশৃঙ্গনিকরে পরিবেষ্টিত বহু জনপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লিগ্রাম পরিদৃষ্ট হয়। এই পল্লিনিচয়সম্বিত ভূমিখণ্ডকে কোঙ্কণ-ঘাটমাথা বলে। ইহারই এক অংশ “মাবল” নামে কথিত। মহাত্মা শিবাজীর মাবলী সৈন্যগণ এই প্রদেশ হইতেই সংগৃহীত হইত। ঘাটমাথার পরিসর কোনও স্থানেই ২০২৫ মাইলের অধিক নহে। এই প্রদেশের অধিকাংশ বহুতর, অরণ্যময় ও হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ। বর্ষাকালে এই প্রদেশ অতীব ভীষণমুষ্টি ধারণ করে ও বৎসরের অধিকাংশ সময়েই কুজঝটিকার আবৃত থাকে। এখানকার গিরিশিখর-মালা একপভাবে অবস্থিত যে, স্বরাস্যসেই সেন্তুলিকে অতি দুর্ভেদ্যদুর্গে পরিণত করিতে পারা যায়। ঘাটমাথার শিখর-বলীতে অত্যাধি ছত্রপতি শিবাজীর নির্মিত সিংহগড়, রায়গড় প্রভৃতি শতাধিক দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। একপ স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র প্রদেশ পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রদেশের লোকেরা যে স্বভাবতঃ যুগ্ম-কুশল, লক্ষ্যবেধে নিপুণ, বলশালী, সাহসসম্পন্ন ও ধর্ম্মে গভীর বিশ্বাসযুক্ত, একথা বলাই বাহুল্য।

কোঙ্কণ-ঘাটমাথা হইতে অবতরণ করিয়া পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ শৈলবিরল, নদনদীসম্বিত, সুবিশাল অপেক্ষাকৃত সমতলক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায়। এই প্রদেশকে মহারাষ্ট্রীয়গণ ‘দেশ’ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। দেশ বা পূর্ব মহারাষ্ট্রদেশ কোঙ্কণের ভার অসুর্ক্ষর নহে। তাপ্তী, গোদাবরী ও কৃষ্ণানদী এবং বেণগঙ্গা, নীরা, ভীমা, মঞ্জিরা

প্রভৃতি উপনদীসমূহ পূর্ব-মহারাষ্ট্রদেশের অপেক্ষাকৃত উর্বরতা-  
বিধান করিয়াছে, তথাপি বর্ষা ভিন্ন অপর কালে ঐ প্রদেশ-  
শের অধিকাংশ ভূমি মরুবং উষ্ণকশ্মত্র থাকে। এই অঞ্চলে  
লাঁত, গ্রীষ্ম ও ঝড়বাতের প্রকোপও অপেক্ষাকৃত অল্প। ধাতু,  
গোধূম, জোয়ারি ও বাজরী এদেশের প্রধান শস্য। ইক্ষু,  
কাপাস, চীনাবাদাম ও তামাক এখানকার প্রধান  
কৃষি ও পণ্য।

পূর্ব-মহারাষ্ট্রপ্রদেশও একেবারে পুরুতন্ত্র নহে।  
“চান্দোর গিরিশ্রেণী” “আঙ্গদনগর শৈলমালা” “শঙ্কুশিখরা-  
বলী” ও পুণার দক্ষিণস্থিত শৈলপঙ্ক্তি চারিটি সুদৃঢ় প্রাক-  
রের দ্বারা মহারাষ্ট্রদেশের দুর্ভেদ্যতা সম্পাদন করিতেছে।  
এই প্রদেশ দশটি জেলায় বিভক্ত। গোদাবরী, ভীমা, নীরা  
ও মাননদীর তীরবর্তী প্রদেশসমূহ উৎকৃষ্ট মহারাষ্ট্রীয় অখের  
জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এহ সকল প্রদেশজাত অশ্ব খর-  
কায়, উগ্রপ্রকৃতি, অতীব কষ্টসহিষ্ণু এবং প্রভূত ভারবহনে  
ও শৈলময় প্রদেশে দ্রুতগমনে সমর্থ। ইহারা মহারাষ্ট্রীয়-  
দিগের অভ্যাসের পক্ষে বিশেষ আবহুকূল্য করিয়াছিল।

অধিবাসী।

মহারাষ্ট্রদেশের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ মরাঠা বা মার-  
হাট্টা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে  
“মরাঠা” বলিলে পূর্বমহারাষ্ট্রবাসী ক্ষত্রিয় ও কৃষকদিগকেই  
বুঝায়। উত্তর-ভারতের দক্ষিণাংশেও চাতুর্ক্য ব্যবস্থা  
আছে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা পঞ্চদ্রাবিড়ের অন্তর্ভুক্ত।  
ইহারা প্রধানতঃ দেশস্থ, কোঙ্কণস্থ, কহাড় ও দেবদক্ষ এই  
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এহ চারিশ্রেণীর মধ্যে কত্ভার আদান  
প্রদান শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও অতাব বিরল হইলেও ইহারা পর-  
স্পরের গৃহে অবাধে অন্নগ্রহণ করিয়া থাকেন। বাঁহারা মত্ত,  
মাংস ও মংস্ত্র এই মকারত্রয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, মহা-  
রাষ্ট্রে তাঁহারা ই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। এই কারণে  
মংস্ত্রাহারা শেবণী বা সারস্বত ব্রাহ্মণদিগকে মহারাষ্ট্রের  
ব্রাহ্মণশ্রেণী কেহই উচ্চাসন প্রদান করেন না। মহারাষ্ট্রীয়  
ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত ও কার্যদক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা  
শাস্ত্রোক্ত ষোড়শবিধ সংস্কারই বস্তুর সহিত অমুষ্ঠান করেন।  
শিবাজীর উচ্চপদস্থ কংচারাদিগের মধ্যে অনেকেই দেশস্থ  
ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহাত্মা রামদাস স্বামী, একনাথ স্বামী,  
জ্ঞানেশ্বর, মুকুন্দরাম প্রভৃতি বড় বড় কবি, পণ্ডিত ও ধর্মো-  
পদেশক সাধুপুরুষেরা দেশস্থ ব্রাহ্মণশ্রেণীভূক্ত ছিলেন। মহা-  
রাজ শাহুর রাজত্বকাল হইতে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তি  
বাড়িতে থাকে। পুণার পেশওয়গণ ও দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের

আসিদ্ধ সর্দারগণ কোঙ্কণস্থ ছিলেন। বৃন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারত  
অঞ্চলে কহাড়দিগের বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। বাস্কীর  
রাণী লক্ষ্মাবাদী কহাড়-ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশের  
অতি প্রসিদ্ধ কবি মরোপান্ত ও এই কহাড়-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ  
ছিলেন। গোয়ালিয়রে মহারাজ সিদ্ধির দরবারে শেণবী-  
দিগের প্রতিপত্তি অধিকতর। মহারাষ্ট্রে হাজার করা প্রায়  
৩৫০ জন ব্রাহ্মণ লেখাপড়া জানেন। তন্মধ্যে শতকরা ৬ জনের  
অধিক ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-  
রমণীগণের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত নাই। ইহারা অতীব  
শ্রমশীলা ও গৃহস্থশ্রমে সুনিপুণ। ইহাদের মধ্যে হাজার করা  
২৭ জন লিখিতে পড়িতে পারেন।

মহারাষ্ট্রবাসী কার্যহগণ প্রভু নামে পরিচিত। শিবাজীর  
সময়ে ইহারা কার্যদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও স্বদেশহিতৈষিতা-  
গুণে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের দ্বারা মহারাষ্ট্রে  
ইহারা মসিজীবী। পূর্বে অসিজীবী কার্যস্থের সংখ্যা অধিক  
ছিল। এই কারণে ইহারা বহুদিন হইতে ক্ষত্রিয় বলিয়া  
গণ্য। পুরাকালে অনেক স্থানে ইহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব লইয়া  
দলাদলি, দালা হাঙ্গামা নিত্যন্ত অল্প হয় নাই। বর্তমানকালে  
ইহাদিগের মধ্যে হাজার করা প্রায় ১৬০ জন ইংরাজী এবং  
৩৩০ জন মরাঠীভাষা লিখিতে পড়িতে সমর্থ। প্রভু-  
রমণীদিগের মধ্যে শতকরা ৯ জন লেখাপড়া জানেন। ইহা-  
দিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষারও বিশেষ বিস্তার হইয়াছে।  
হাজার করা ৮ জন প্রভুরমণী ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ।  
ইহারা অবরোধপ্রথা মানিয়া চলেন।

মহারাষ্ট্রে মরাঠাদিগের সংখ্যা (বেরার ভিন্ন) প্রায় ৮ লক্ষ।  
ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে বাঁহারা আপনাদিগকে  
কেবল মরাঠা বা কুলীন-মরাঠা বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন,  
তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করেন। পূর্ব ইতিহাসের আলোচনা  
করিলে অনেক মরাঠা-পরিবারকেই ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার  
করিতে হয়। ইহারা খসকার, বলিষ্ঠ, সমরপ্রিয়, বুদ্ধিমান ও  
স্বাধীনতাপ্রিয়। শ্রদ্ধালুতা, দৃঢ়চিত্ততা, অনালস্ত, আতি-  
শেয়তা ও কলহপ্রিয়তা ইহাদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব বলিয়া  
পরিগণিত হইতে পারে। ইহারা বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ও  
বিধবা-বিবাহের বিরোধী। ইহারা উপবাস ধারণ করেন।  
মরাঠারা ২৬ কুলে বিভক্ত,—এই ২৬ কুলের নামানুসারে  
তাঁহাদিগের উগাধি হইয়া থাকে। এগুলে ৯৬ কুলের  
একটা তালিকা প্রদত্ত হইল,—সুরওয়ার, পওয়ার (প্রমার),  
ভৌসলে, বোরপড়ে, রাণে, শিন্দে, সালুকে, মিসোদে,  
জগতাপ, মোরে, মোহিতে, চোহান, দাতাড়ে, গায়কোরাড়,

সাবন্ত, মহাড়ীক, তাওড়ে, ধূলপ, (ধূমাল, ধূলে), বাগওরে, শিরুকে, তোরার, ঘাদব, দলবী, সালবে, মুলীক, পালবে, কদম, নলোড়ে, বাঘ, রাউত, নিসীম, পারবে, কাসরে, মালী, মানে, মরাড়ে, কাঠে, কাসলে, নিখালকর, ধড়ম, বারজে, দলপতে, গওলা, নবসে, ঘরত, নাইক, ঘোর, বিচারে, দিতোল, ধাড়, গবসে, সূকপাল, নকাসে, রাও, ছুখে, পাটক, সাগবন, ঘাটগে, পাতাড়ে, বাধমারে, আপরাধে, ভোবর, জোশী, কলপাতে, দরবারে, কেশরকর, কামরে, কাঠে, কাঠবটে, রণদিব (রণদীপ), নিকম, ভাতে, কবলে, ঠাকুর, ভোইর, ভোগলে, সাজল, নামজাদে, কাবলে, চির-কুলে, ধুরে, পরব, দিওটে, ফাঁকড়ে, শেলকে, বাগবান, গাঁবড়, মোকল, তামটে, বুলকে, ধাওড়ে, জালিঙ্করে, জসবন্ত, জগপাল, পাটেল, জাগলে, ধুমক, সীরগোরে, ঘরত ও অহিরাও। তন্মধ্যে ভোঁসলে, সাবন্ত, খানবিলকর, সুরবে, ঘোরপড়ে, চোহান, শিরকে, মোরে, মোহিতে, নিখালকর, অহিরাও, শালোকে, মানে, ঘাদব, মহাড়াক, পওয়ার, দলবী, ঘাটগে প্রভৃতি কতিপয় পরিবার বংশমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। মরাঠা ক্ষত্রিয়-গণের মধ্যে অবরোধপ্রথা সম্পূর্ণরূপে পালিত হইয়া থাকে।

যে সকল মরাঠা কৃষিকারী, ব্রাত্য-ভাবাপন্ন অথবা সঙ্কর তাহারা কুণবী নামে পরিচিত। ইহারা যৌবনপ্রাপ্তি না ঘটিলে রমণীদিগের বিবাহ দেয় না এবং নিম্নশ্রেণীর কুণবীর বিধবারও বিবাহ দিয়া থাকে। কুণবীরা ক্ষত্রিয়ের দাবী করে না। শূদ্র বলিয়াই আপনাদের পরিচয় দেয়। মরাঠা ক্ষত্রিয়েরা ইহাদিগের কস্তার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু ইহারা কোনও কুলীন-মরাঠার জামাতৃ-পদ গ্রহণ করিতে পারে না। দেশস্থ ও কোঙ্কণস্থ কুণবীদিগের মধ্যে কস্তার আদান প্রদান হয় না। এরূপ বিবাহ তাহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে, তবে বরকস্তার বাসস্থানের দূরত্বহেতু এরূপ বিবাহ তাহারা অসুবিধাজনক বলিয়া মনে করে। কুণবীরা ধনবান্ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হইলে প্রায়ই মরাঠা বলিয়া পরিচয় দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ইহারাও শ্রমশীল, আতিথেয়, স্বল্পসঙ্কট ও শ্রদ্ধালু। কুণবী রমণীদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা বড় বেশী নাই। সুরাপান মরাঠা ও কুণবীদিগের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু গিটা-চারবিরুদ্ধ বটে। জোয়ারা ও বাজরী শস্ত হইতে প্রস্তুত অতি মোটা রুটি (ভাকরী) মরাঠা ও কুণবীদিগের প্রধান খাদ্য।

ধর্ম ও দেবদেবী।

উল্লিখিত তিন প্রধান জাতিই তেলোমর শৈব-ধর্মের উপাসক। মরাঠা নামক অসিধারী ভয়ঙ্কর শিবই অধি-

কাংশ মহারাষ্ট্রের কুলদেবতা। মরাঠাগণ শিবপূজার রাজপুত্রগণের স্তায় সুরা ও শোণিত উৎসর্গ করিয়া থাকেন। অষ্টভূজা, ষোড়শভূজা, ও অষ্টাদশভূজা মহিষমর্দিনীর পূজাও সর্বত্র প্রচলিত। তুলজাপুরের ভবানীদেবী সকল মহারাষ্ট্র-বাসীরই আরাধ্য। কোহলাপুরের মহালক্ষ্মীর উপাসকসংখ্যাও কম নহে। কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা যোগেশ্বরী দেবী। ইহারা গণপতিরও উপাসক। ভূত, প্রেত ও বেতা-লোরা গণেশের আজ্ঞাকারী বলিয়া মহারাষ্ট্রবাসীর বিশ্বাস। ভবানী গ্রাম-রক্ষয়িত্রী বলিয়া সকল গ্রামেই তৎপ্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত। সপ্ত মাতৃকাগণ মহামারী প্রভৃতির উপশনাথ পূজিত হইয়া থাকেন। খেওবা দেশরক্ষক দেব। ইনি ঈশ্বর নামে ও মহাদেবের অবতাররূপে পরিচিত। জেজুরী নামক স্থানে ইহার প্রধান মন্দির অবস্থিত, তথায় লিঙ্গ-মূর্তিতে ইনি বিরাজমান। অন্ত্র ইহার অস্বাক্ষর অসিধারী অস্ত্র মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। মহালক্ষ্মীদেবী ইহার সহধর্মিণী। ইনি স্বামীর সহিত যুদ্ধবেশে একাসনে অশ্ব-পৃষ্ঠে সমাসীন থাকেন। কহাড়-ব্রাহ্মণগণ ইহার ধাতুনির্মিত মূর্তির পূজা করে। ধাতুরোপণ ও শস্ত্রচ্ছেদনের পূর্বে ভৈরবের পূজা হয়, তিনি গ্রামরক্ষক বটে। মারুতি বা হনুমানের পূজা দক্ষিণাপথে বহু প্রচলিত। প্রায় প্রতি গ্রামের বহির্ভাগেই মারুতির মন্দির থাকে। ইনি বড় সদয় দেবতা বলিয়া পরিচিত। নারিকেল ইহার অতিশয় প্রিয় বস্তু। মারুতি রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবক ও আদর্শ ব্রহ্মচারী বলিয়া সম্মানিত। জীলোকেরা ইহাকে স্পর্শ করিয়া পূজা করে না। কার্তিকের পূজা ও দর্শন জীলোকের বৈধব্যের কারণ বলিয়া বিবেচিত। বল্লের স্তায় মহারাষ্ট্রেও বগীদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। বেতাল মন্দির ও ব্যায়াম-প্রিয়দিগের দেবতা। শিব-রাত্রির দিনে ইহার পূজা হয়। বেতালদেও বেতালের অধিষ্ঠান।

মহারাষ্ট্রদেশে বিষ্ণুভক্তিও বিরল নহে। এই দেশের বৈষ্ণবগণ প্রধানতঃ বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী। প্রসিদ্ধ ভক্তকবি তুকারাম বৈষ্ণবজাতীয়ই ছিলেন। ব্রাহ্মণকবি ও ধর্মোপ-দেশক জ্ঞানেশ্বরও বিষ্ণুভক্তি প্রবর্তিত করেন। নামদেব, বামনপণ্ডিত, মোরোপান্ত প্রভৃতি বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত গ্রন্থকার বিষ্ণু ও কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন। এই মহাদেশের সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র পন্ডরপুরে কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রাধার উপাসনা মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে অতি বিরল। শৈবশাক্ত প্রভৃতি সকল মহারাষ্ট্রীয়েরই পক্ষে পন্ডরপুর অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। জগন্নাথের স্তায় রাধার আতিথেয়ত্বের বন্ধনও বহু পরিমাণে প্রবল। গোদাবরীর

তীরবর্তী প্রদেশে একনাথস্বামীর প্রবর্তিত দত্তাজেয়-উপাসনা ও কৃষ্ণাতীরে রামদাস স্বামীর প্রচারিত রামোপাসনার প্রভাব সমধিক লক্ষিত হয়। উপাসক-সম্প্রদায় একাধিক হইলেও অষ্টভৈরব মহারাষ্ট্রদেশের সর্বত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবদ্বী মহারাষ্ট্রের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানবশতঃ সর্বজীব সমদর্শিতা অপেক্ষাকৃত অধিকমাত্রায় মহারাষ্ট্র-সমাজে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে জাতীয় একতা ও রাষ্ট্রোন্নতি-সাধনে অষ্টভৈরবদের বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন হইয়াছিল।

চৈত্র মাসে নববর্ষোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে সাবিত্রীব্রত, আঘাড়ে শরনৈকাদশী, শ্রাবণে নাগপঞ্চমী, তাত্র মাসে গণেশচতুর্থী, আশ্বিনে দশরা (বিজয়াদশমী), কার্তিকে দীপাবলী, অগ্রহারণে চম্পাবলী, পৌষে মকরসংক্রান্তি ও ফাল্গুনে দোল—এ কয়েকটি এদেশের প্রধান ধর্মোৎসব। পটুরপুর, কোল্হাপুর, গোবর্ধন, জেজুরী, আলন্দী, তুলজাপুর প্রভৃতি স্থান মহারাষ্ট্র দেশের তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য।

এই সকল ধর্ম-সম্প্রদায় ভিন্ন মহারাষ্ট্রে আর একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় আছে। ইহার লিঙ্গায়ৎ নামে প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্রীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকে এই ধর্মাবলম্বী। জৈন ধর্মাবলম্বী বৈষ্ণব মহারাষ্ট্রে আছে। লিঙ্গায়তেরা বীরশৈব নামে আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহার ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই গলদেশে ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ ধারণ করেন। ইহাদিগের গুরুকে “জঙ্গম” বলে। জঙ্গম বা গুরু ইষ্টদেবতা শিবের অপেক্ষা এই সম্প্রদায়ের লোকের নিকট অধিক পূজনীয়। ইহাদিগের ক্রিয়া-কর্ম-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এই সম্প্রদায়েও ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ আছে।

অজ্ঞাত জাতি।

মহারাষ্ট্রের বৈষ্ণব বাণী (বণিক্)-গণ ১২ শাখায় বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে হাজার করা ৪৪৪ জন লিখিতে ও পড়িতে পারে। খ্রীলোকের মধ্যে হাজার করা ৮৫ জন প্রায় শিক্ষিত। খৃস্টজাতি মহারাষ্ট্রদেশে কোলী (মৎস্যজীবী), ভাওয়ারী (খজুরমধ্যপ্রস্তুতকারী), মহার (ডোম), খেড় (কসাই), রামোশী (আরণ্য দস্য) প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার বহুপরিমাণে অনার্য্যভাবাপন্ন। [ইহাদিগের বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।] মহারাষ্ট্রে ভিলজাতির সংখ্যাও অল্প নহে। খাশেন্দ্র অঞ্চলেই ইহাদিগের বাস অধিক। ইহার মরাঠী ভাষায় কথা কয়। ইহার লক্ষ্যভেদে সুপটু, অনার্য্যসে অর্দ্ধক্রোশ দ্রব্ধ ব্রাহ্মণ ও ধর্মুশ্বরের সাহায্যে বিদ্ধ করিতে পারে।

পল্লিসমাজ।

মহারাষ্ট্র দেশে গণ্ডগ্রামকে সাধারণতঃ ‘গাঁও’ বলে। গ্রামকে বড় হাট বা বাজার না থাকিলে তাহাকে মৌজা বলা হয়। বিপণীশ্রেণীতে শোভিত গ্রাম ‘কসবা’ নামে অভিহিত। এই সকল গ্রাম ও পল্লীর অধিবাসিগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ইহার সাধারণতঃ ‘উপরী’ ও ‘মীরাসদার’ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মীরাসদারেরা পুরুষানুক্রমে জমির ভোগ দখল করে। বাহার ইচ্ছা করিলেই জমি বিক্রয় করিতে পারে না ও অল্প দিনের জন্য জমী বন্দোবস্ত পায়, তাহারাই ‘উপরি’। মীরাসদারেরা স্বৈচ্ছাক্রমে জমির দান বিক্রয় করিতে পারিত। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেন্ট প্রজার সে স্বত্ব সম্বুচিত করিয়াছেন।

গ্রামের মধ্যে বিনি মণ্ডল বা প্রধান, তাঁহার নাম পাটিল বা গ্রামরক্ষক। তাঁহার সহকারী চৌগুলা নামে খ্যাত। ইহার সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর, প্রধানতঃ মরাঠাজাতীয়। পাটিলের অন্ততম সহকারীর নাম কুলকরণী বা গ্রামলেখক। গ্রামের সমস্ত ভূমির হিসাব রাখা তাঁহার কার্য্য। এ জন্য তিনি গ্রামের ২৫ ভাগের এক ভাগ জমি নিহর ভোগ করিতে পান। মহকুমার অধিকারীকে দেশমুখ বা ‘দেশাই’ বলে। দেশলেখকের অপর নাম দেশপাণ্ডে বা কাছুনগো।

কুলকরণী প্রভৃতি পঞ্চাশত কর্মচারিগণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-জাতীয় হইয়া থাকেন। মহারাষ্ট্রে জমিদার নাই। পুরোক্ত কর্মচারিগণ দেশের রাজশক্তির নিয়োগক্রমে রাজস্ব-সংগ্রহ করিয়া রাজসরকারে পাঠাইয়া দেন এবং বেতনের পরিবর্তে “কমিশন” প্রাপ্ত হন।

মহারাষ্ট্রের পল্লিসমাজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে। তথায় সাধারণতঃ স্ত্রীতর (স্বত্বধর), লোহার (কর্মকার), মহার (ডোম), মাজ (ইহার হিন্দুদিগের মধ্যে সর্বনিম্নশ্রেণীস্থ ও চর্মব্যবসারী), কুম্ভার (কুম্ভকার), চান্দার (চর্মকার), পরীট (রজক), হাবী (নাপিত), ভট (পুরোহিত), মুলাণা (মোদা), গুরব\*, কোলি (জল-বাহক)—এই দ্বাদশ শ্রেণীর লোক পল্লিসমাজের প্রধান অঙ্গ। ইহার গ্রামবাসী কৃষকদিগকে বণাসাধ্য সহায়তা

\* গুরব শব্দ গুরু-শব্দজাত। গুরবেরা বজ্রোপবীতধারী, নিরামিমতোজী ও হুগারক। ইহার মরাঠা কজিরদের দ্বারা বেশভূষা করে। শিবমন্দিরে ইহারাই পূজক, শিবনৈবেদ্যাদি থাইয়া জীবন ধারণ করে। (মহারাষ্ট্রে উক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা স্থাপিত শিবের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না।) ইহার পাতার টোকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

+ এই দ্বাদশ শ্রেণীর লোকেরা গ্রামের বস্তুতদার বা কৃষকদিগের উৎপাদিত শস্যের অংশী বলিয়া পরিগণিত। মহারাষ্ট্রেরা, সমগ্র গ্রামটিকে গোতনের সহিত জুলিত করিয়া ইহাদিগকে গ্রামের ‘বৎস’ বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন।

করে এবং বৎসরের শেষে বা শস্তক্ষেদনের সময় কৃষকদিগের লক্ষণতের একাংশ প্রাপ্ত হয়। সূতার ও লোহার কৃষকদিগের কৃষিযন্ত্রাদির বিনাবায়ে সংস্থার করিয়া দেয়। মহারেরা গ্রামরক্ষক বা চৌকিদারের কাজ করে। মাদেরা কৃষকদিগকে প্রয়োজনমত চর্শনিম্নিত রজু ও জল তুলিবার মোটা প্রভৃতি সরবরাহ করে। এই সকল কার্যের বিনিময়ে ইহারা প্রত্যেক কৃষকের নিকট ২০ আঁটি সামান্য খাত্তবৃত্ত খড় পায়। কেবল “মহার” ইহার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক লাভ করে। পল্লিনমাজে ইহাদের স্থান প্রথম।

কুস্তকার, চর্শকার, রজক ও নাপিত—ইহারা মৃৎপাত্র, পাছকা-সংস্থার, বস্ত্রপরিষ্কার, ও ক্ষৌরকার্য প্রভৃতি দ্বারা গ্রামবাসী কৃষকগণকে সহায়তা করিয়া শস্তক্ষেদনকালে ১৫ আঁটি করিয়া খাত্তবিরল শস্তস্তব প্রাপ্ত হয়।

ভটের কাজ হিন্দুর পৌরোহিত্য। এখানে সোণার বেণের বামুন, ধোপার বামুন প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নাই। মূল্যে মূল্যমানদিগের বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। কৃণবীরা ক্ষেত্রদেবতাকে কোনও পশু বলি স্বরূপ উৎসর্গ করিলে উহার শিরচ্ছেদকার্য মূল্যে-কেই সম্পন্ন করিতে হয়। তজ্জন্ত সে পশু প্রতি দুই পয়সা ও নিহত পশুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। মূল্যে মস্তপাঠপুস্তক বলির মাংস শুদ্ধ করিয়া না দিলে প্রায় কোনও মরাঠা উহা মেধ্যবলিয়া মনে করে না। শুরব পাতা ও ঠোঙ্গা প্রভৃতি সংবৎসর সরবরাহ করে। কোলি মহিষপুষ্ঠে জলবাহন করিয়া গ্রামের কৃষকদিগের জলকষ্ট দূর করে। এই চারি শ্রেণীর লোক মাহার প্রভৃতির প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের অর্ধাংশমাত্র পায়।

ইতিহাস।

মহারাষ্ট্রদেশের অধিকাংশ প্রাচীন কালে দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত ছিল। সর্বপ্রথম অগস্ত্য মুনি বিদ্যাদি উন্নত করিয়া ঐ ভয়ঙ্কর অরণ্য প্রদেশে প্রবেশপুস্তক তথায় আপনার আশ্রম স্থাপন করেন। তিনি দেবানকার কয়েকজন প্রধান নিশাচরকে নিগৃহীত করিয়া ঐ প্রদেশকে বহু পরিমাণ নির্যাস করিলে, অস্ত্রাশ্রয় স্থান তথায় আসিয়া বাস করেন। অতঃপর একবিশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহাবীর পরশুরাম বীরহত্যা-পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্ত অশ-ভেলী, ভাঙ্গলী, মালী, স্বর্কর প্রভৃতিরও কৃষকদিগের উৎপাদিত শস্তে

সামান্য অংশ পাকে। এই কারণে ইহারা অলুতদার নামে পরিচিত। ইহাদের প্রাপ্ত অংশ সকল স্থানে সমান নহে, এ কারণে তাহার বিশেষ বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল না। অলুতদারদিগের প্রাপ্য অংশ সবচেয়ে বেশি হইলে তাহদের পরিতোষিত হয়। এই ১২ বসুতে ও ১২ বসুতে লইয়া মহারাষ্ট্রের পল্লিনমাজ গঠিত।

মেঘবজ্রের অচ্ছাদন ও মহাবি কস্ত্রপকে সমস্ত পৃথিবী প্রদামপুস্তক স্বয়ং ভগবন্তর জন্ত পশ্চিম-সমুদ্রের তীরবর্তী কোঙ্কণ প্রদেশে গিয়া বসতি করেন। তাঁহার চেষ্টায় ক্রমশঃ ঐ অঞ্চল আর্ঘ্য-গণের বাসোপযোগী হয়। তিনি আর্ঘ্যবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া কোঙ্কণে প্রতিষ্ঠিত করেন। ত্রেতাযুগের অবসান-কালে রঘুকুলজিত রামচন্দ্র দক্ষিণপথে অশেষ রাক্ষসের বিনাশ করিয়া উক্ত প্রদেশকে নির্যাস করিলেন। কথিত আছে, তাঁহার রাজত্বকালে অযোধ্যা-প্রদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দক্ষিণদেশে গমনপুস্তক ক্রমশঃ বসতি করিতে থাকেন।

মহারাষ্ট্র শব্দের উৎপত্তি প্রথম কোন সময়ে হইল, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর। রামায়ণে এই দেশ সর্বত্র দণ্ডকারণ্য ও মহাভারতে দণ্ডদেশ বা দণ্ডকরাষ্ট্র নামে অভিহিত হইয়াছে। কোঙ্কণ প্রদেশ মহাভারতের সময়ে অপরাজিত (উত্তর-কোঙ্কণ) ও গোবর্গ (দক্ষিণ-কোঙ্কণ) নামে পরিচিত ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, শান্তিসঙ্গমতন্ত্র, রত্নকোষ, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থে মহারাষ্ট্র ও তদন্তর্গত কোঙ্কণ, নাসিক, কোহ্লাপুর, বনবাসী প্রভৃতি প্রদেশের নাম পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্রদেশের নানাস্থানে যে সকল শিলাশাসন ও প্রাচীন মূর্তিাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই সমুদয়ের লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রথী, রথী, রাষ্টিক ও ভোজ উপাধিদারী ক্ষত্রিয়গণ মহারাষ্ট্রদেশে বাস ও আধিপত্য করিতেন। এই জাতিত্রয় কালক্রমে সাহস ও পরাক্রমগুণে উত্তরমহারাষ্ট্র প্রদেশে ‘মহারথী’, ‘মহারাষ্টিক’ ও ‘মহাভোজ’ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহারা আপনাদিগকে শিনিপ্রবর সাত্যকির বংশধর বলিয়া মনে করিতেন। শিলালিপিসমূহে তাঁহাদিগের রমণীগণকে “মহারঠিনী” ও “মহাভোজী” বলা হইয়াছে। মহারথী জাতির সহিত মহাভোজজাতির কত্ভার আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল। এই প্রাচীন মহারথী ও মহারাষ্টিক শব্দ হইতে অধুনাতন কালের মহারাষ্ট্র, মরাঠা ও মাহাট্রা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই রথী জাতির অন্তর্গত কতিপয় পরিবার বা কুল একত্র হইয়া কালক্রমে এক একটা “কুড়” (সংস্কৃত কূট) বা সংস্কৃত কূলে পরিণত হইয়াছিল, এই সংস্কৃত কূলে যাহারা জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহারা প্রথমে “রথীকুড়” (সংস্কৃত রাষ্ট্রকূট) ও পরে আর্ঘ্যবর্ষে গিয়া “রাঠোড়” নামে পরিচিত হইয়াছিল।

মরাঠাগণের প্রাচীন নামানুসারে তাঁহাদিগের অধুষিত

আদেশ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মহারঠ দেশ নামে পরিচিত ছিল। মহারঠ দেশের আয়তন বর্তমান মহারাষ্ট্রের তায় বিশাল ছিল না। পুণা, যাতারা ও আন্ধদনগর এই তিনটি জেলা এবং গোলাপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চল প্রাচীন কালে “মহারঠ” দেশ নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে মহারাষ্ট্র-জাতির বংশবিস্তার ও ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত কোঙ্কণ, কোল-বন, গোণ্ডবন, খানদেশ, বিদর্ভ, উত্তর-কণাট প্রভৃতি প্রদেশও মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্ভুক্ত হইল।

অশোকের পঞ্চম অম্রশাসনে এবং দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ-ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহারাজ প্রিয়-দর্শী অশোকের আদেশে মহারঠ, অপরাস্ত (উত্তরকোঙ্কণ) ও বনবাসী (দক্ষিণ মহারাষ্ট্র) প্রদেশে ভোজ ও রাষ্ট্রিক জাতির এবং ঐতিহ্যপূর্ববাসিগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মপ্রচারের জন্য বহু সংখ্যক বৌদ্ধ-রাজক প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বর্তমান মহারাষ্ট্র দেশ তগর, আশীর, ঐতিহ্য, বিদর্ভ, কুন্তল, অপরাস্ত ও বনবাসী প্রভৃতি বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তৎপরে খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে মিসরদেশীয় বণিকগণ এখানে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেন। তগরের অধিপতি রাজাধিরাজ উপাধিধারী ও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার প্রভাব বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আশীর নামক স্থানেও একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। কথিত আছে, খৃঃ পূঃ ১৬০০ অব্দে কোশলদেশ হইতে কতিপয় ক্ষত্রিয়-পরিবার মহারাষ্ট্রে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। আশীরের রান-বংশ পুরোক্ত কোশল-দেশাগত ক্ষত্রবংশসমূহ। বিদর্ভ দেশে যজ্ঞসেন নামক রাজার রাজত্ব ছিল। মগধপতি শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্রের সহিত তাঁহার যে সংগ্রাম সংঘটিত হয়, তাহার বিবরণ কালিদাস-প্রণীত মালবিকামিমিত্র নাটকে বর্ণিত হইয়াছে।

সাতবাহন-বংশ।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সাতবাহন-(শালিবাহন) বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশীয় নরপতিগণ পুন্সকথিত রাজ্যগুলি বিনষ্ট করিয়া রঠ, মহারঠ, ভোজ ও রঠকুড় প্রভৃতি জাতির পরাজয় সাধনপূর্বক সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের সার্বভৌম আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, শালিবাহন আশীরপতিকেও সর্বাঙ্গবে নিহত করিলে উক্ত রাজবংশীয় একটি মহিলা রাজার অপোগণ্ড শিশুকে লইয়া পলায়ন ও সাতপুরা পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। এই শিশুই পরিশেষে চিতোরে রণাবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত হন।

নাসিক ও কোঙ্কাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা ও শিলাশাসনাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ৭৩ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ২১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শালিবাহন বা সাতবাহন-বংশীয়েরা মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তৈলঙ্গের বা আন্ধ্র দেশের অন্তর্গত ধনকটক (গন্টু-রের নিকটবর্তী বর্তমান ধরলীকোট) নগরে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। তরুণ রাজকুমারগণ মহারাষ্ট্রদেশে ঐতিহ্যি শাসনকর্ত্ত্বরূপে প্রেরিত হইতেন। পোদাবরী-তীরবর্তী ঐতিহ্যনপুরে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। তাঁহাদিগের শাসনসময়ে মহারাষ্ট্র দেশ শকজাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সময়ে সাতবাহনবংশীয় ভূপতিগণ কিয়ৎ পরিমাণে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে শকজাতি মহারাষ্ট্রের নানাহান অধিকার করিয়া প্রায় ৫৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। [ভারতবর্ষ শব্দে ইহাদের বিবরণ দ্রষ্টব্য] পরিশেষে ১৩৩ খৃষ্টাব্দে গোটমৌপ্ত্র শাতকর্ণি নামক সাতবাহনবংশীয় জনৈক পরাক্রান্ত নরপতি ও তাঁহার পুত্র শ্রীপুলোমবি (টলেমির সিরি-পেলেমিওস) শকজাতিকে পরাভূত ও মহারাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। শিলাশাসনে গোটমৌপ্ত্র শাতকর্ণি দক্ষিণাঞ্চলধাশ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই বংশে তাঁহার পরবর্তী নরপতিদিগের মধ্যে শ্রীপুলোমবি, বজ্রশ্রী, চতুর্ণ ও মটরীপুত্র শকসেন এই চারি জনই বিশেষ পরাক্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। [বিস্তারিত বিবরণ সাতবাহন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয় ধর্মেরই সমান প্রাধান্য ছিল। সাতবাহনবংশীয় রাজত্বগণ বেদপাঠ ও বেদাধ্যাপনের জন্য যেমন পাঠশালা স্থাপন করিতেন, বেদাধ্যাপক ব্রাহ্মণগণের জন্য ধর্মগুরু প্রচুর বৃত্তিনির্ধারণ করিতেন, বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্যও তাঁহারা সেহরূপ বহু অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিতেন। তাঁহাদিগের আমলে দেশে বাণিজ্য-ব্যবসায়েরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশ হইতে বিবিধ পণ্য মহারাষ্ট্র দেশে আসিত, আবার মহারাষ্ট্র-দেশজাত বিবিধ পণ্য জব্যাদি অর্ণবপোতের সাহায্যে পাশ্চাত্য-দেশসমূহে প্রেরিত হইত। ভরুচ্ছ বা ভডোচ (Broach) সে সময়কার প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। মহারাষ্ট্র-রাজধানী ঐতিহ্যন হইতে কার্ণাস বন্দর, মলমল, উৎকৃষ্ট প্রস্তর, প্রভৃতি পণ্য বিদেশে বাহিত। ঐতিহ্যনের কল্যাণ, তগর, চৌল, মণ্ডগোয়া (বর্তমান মান্দাড), পাল (বর্তমান মহাড়ের নিকটবর্তী), নাসিক, কহাড়, কোঙ্কাপুর, তরুগড় প্রভৃতি স্থান ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।



নাসিকের একটি প্রস্তরলিপিতে নিগম-সভার বৈধি উল্লেখ আছে, তাহাতে উহা কতকটা বর্তমান কালের মিউনিসিপালিটির মত ছিল বলিয়া বোধ হয়। সাতবাহনবংশীয় রাজগণ প্রজাগণের কল্যাণসাধনে যেরূপ তৎপর থাকিতেন, প্রজাবর্গও সেইরূপ লোকহিতকর কার্যের অহুতানে আনন্দের সহিত যোগদান করিতেন। সেকালে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হইতে ৭০০ টাকা সুদে টাকা ধার পাওয়া যাইত।

সাতবাহনবংশীয় নরপতিগণ “কবিবংশল” ও বিদ্যোৎসাহী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের আদেশে ও আনুকূল্যে সংস্কৃত, মরাঠী ও পৈশাচী প্রভৃতি ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের রাজত্বকালে কাব্যায়ন বরকৃষ্ণ প্রাকৃত ভাষানিচয়ের এক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই আদেশে সর্ববন্দ্যার কাভজ-ব্যাকরণ রচিত হয়। শুণাচ্য নামক আর এক কবি ও রাজমন্ত্রী বৃহৎকথা নামক এক কথা-গ্রন্থ রচনা করেন। সাতবাহনবংশীয় রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং সরস্বতীর উপাসনায় সেকালে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়।

সাতবাহনবংশের অধঃপতনের পর দেশের কোনও কোনও স্থানে আতীত জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রঠ্ঠ, রাষ্ট্রিক, মহারঠ্ঠ ও রঠ্ঠকুড় জাতিগণ প্রাধান্য লাভ করিয়া দেশের সর্বত্র আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করেন। অনূন সাদ্বিশত বর্ষকাল ইহাদিগের রাজত্ব প্রবর্তিত ছিল। এই সময়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায় না।

#### চালুক্যবংশ।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রদেশে চালুক্যবংশীয় নরপতিগণের শাসন প্রবর্তিত হয়। ইহারা অধোধ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়া মহারাষ্ট্রদেশে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রকূট বা রঠ্ঠকুড়বংশীয় রাজগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইহারা বাতাপিপুর বা বাদামি নগরে রাজধানীস্থাপন করেন। চালুক্য বা চালুক্যগণ ১১শ পুরুষ মহারাষ্ট্রদেশে রাজ্য করিয়াছিলেন। [ চালুক্য শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ ]

চালুক্যবংশীয় রাজগণের শাসনকালে সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মহারাষ্ট্র-পরিভ্রমণের সময় ( ৬৩৯ খৃঃ অঃ ) সত্যপ্রয় শ্রীপৃথিবীবরজ দ্বিতীয় পুলকেশী মহারাষ্ট্র-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াংএর মহারাষ্ট্র-বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত হইল,—

‘এই রাজ্যের পরিধি ছয় সহস্র লি (প্রায় ১২ শত মাইল)

উহার রাজধানীর পরিধি ৩০ লি বা ৬ মাইল। এই প্রদেশের ভূমি অতিশয় উর্বরা ও শস্যশালিনী। এই রাজ্যের রাজধানী একটি বৃহৎ নদীর পশ্চিমতীরে সংস্থাপিত। এখানকার রাজ্য ক্ষয়িবংশসম্বৃত। বর্তমান মহারাষ্ট্রপতি হিরবুদ্ধি, গুপ্তীর-প্রকৃতি ও অতিশয় পরদুঃখকাতর। ইহার বদান্ততা ও পরোপকারের ক্ষেত্র অতিশয় বিস্তৃত। প্রজাগণ ইহাকে আন্তরিক ভক্তি করে। কান্তকুজাধিপতি হর্যবর্দ্ধন শিলাদিত্য সমগ্র আখ্যাবর্ত্ত জয় করিয়া পুনঃ পুনঃ মহারাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসী তাহার শরণাগত হয় নাই।’

মহারাজ্যদিগের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এই,—

‘এই দেশের অধিবাসীরা সাধারণতঃ ধীর্ঘকায়, সবল, সাহসী ও কৃতজ্ঞ; কিন্তু স্বভাবতঃ কিছু দৃষ্ট। ইহাদের আচার ব্যবহার সরল ও কপটতাবিহীন। ইহারা উপকারকের সহায়তার কখনই বিমুখ নহেন। অপকারকারীকে ইহারা সহজে ক্ষমা করেন না। অবমাননার শাস্তির জন্য ইহারা প্রাণবিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকেন। বিপদে পড়িয়া কেহ ইহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইলে, ইহারা স্বীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের সাহায্যার্থ ধাবিত হন। শত্রুকে শাস্তি দিবার পূর্বে তদ্বিষয় তাহাকে না জানাইয়া ইহারা তাহার অপকারসাধনে অগ্রসর হন না। ইহারা বর্ষ পরিধান করিয়া ও হস্তে বস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করেন, পলায়িত শত্রুর পশ্চাৎদান করেন, কিন্তু শরণাগতের প্রাণরক্ষায় বিমুখ হন না। সেনাপতিগণ যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহাদিগকে ত্রোলোকের পরিচ্ছদধারণে বাধ্য করা হয়। এই অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা প্রায়ই আত্মহত্যা করিয়া চিরশাস্তি লাভ করেন। এদেশে মৃত্যুভয়শূন্য শত শত বীর আছেন। তাঁহারা রণসজ্জাকালে মদিরাপানে উদ্ব্যস্ত হন। এই অবস্থায় বস্ত্রম হস্তে লইয়া এই সকল বীরপুরুষের প্রত্যেকে শত্রুপক্ষীয় দশ সহস্র অস্ত্রধারীর সম্মুখীন হইতে পারেন। যুদ্ধোপযোগী হস্তীদিগকেও মদিরা পান করাইয়া উদ্ব্যস্ত করিয়া লওয়া হয়। কোন শত্রু মহারাষ্ট্র বীরদের সহিত যুদ্ধে হির থাকিতে পারেন না।’

এই সময়ে মহারাষ্ট্র তিনভাগে বিভক্ত ছিল। উহাতে ৯৯ সহস্র গ্রাম ছিল। এই সময়ে দেশে বৈদিক যাগ যজ্ঞাদির প্রচলন অল্প ছিল না। রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, মন্দিরনিৰ্ম্মাণ ও ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি কার্য্য পুণ্যকর বলিয়া পরিগণিত ছিল। এ সময় হইতেই বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। জৈন-ধর্ম দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রে প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। চালুক্যবংশীয় নরপতিগণ ধর্মসম্বন্ধে অসমদর্শী ছিলেন না।



## রাষ্ট্রকূটবংশ।

চালুক্যবংশের অধঃপতনের পর রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতি-দিগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই রাষ্ট্রকূটরাই মহারাষ্ট্রদেশের প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয়দিগের বংশধর। অযোধ্যা-প্রদেশ-গত চালুক্যগণ ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়া মহারাষ্ট্রদেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহার স্বদেশের স্বাভাব্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। রাষ্ট্রকূটরা চালুক্যবংশীয় বিত্তীয় কাণ্ডিবর্ষাকে পরাভূত করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দস্তিহর্গ ও কৃষ্ণ নামক রাষ্ট্রকূটবংশীয় দুইজন বীর পৃথক্‌র বয়ে চালুক্যদিগের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত হয়। রাষ্ট্রকূটদিগের বংশতালিকা এই,—

১ দস্তিহর্গ, ২ ইন্দ্ররাজ, ৩ গোবিন্দ (প্রথম), ৪ কর্ক (প্রথম), ৫ ইন্দ্ররাজ (দ্বিতীয়), ৬ দস্তিহর্গ, (৭৫৩—৭৭৫ খৃঃ), ৭ কৃষ্ণ (প্রথম), অপর নাম অকালবর্ষ ও শুভভূজ, ৮ গোবিন্দ (দ্বিতীয়, বল্লভ) ৯ ধ্রুব (নিরুপম, ধারাবর্ষ, কলিবল্লভ), ১০ গোবিন্দ (তৃতীয়, অগস্ত্য, প্রভূতবর্ষ), ১১ অমোঘবর্ষ, ১২ কৃষ্ণ (দ্বিতীয় অকালবর্ষ), ১৩ ইন্দ্ররাজ (তৃতীয়), ১৪ অমোঘবর্ষ (দ্বিতীয়), ১৫ গোবিন্দ (চতুর্থ), ১৬ বদ্বিগ বা অমোঘবর্ষ (তৃতীয়), ১৭ কৃষ্ণ (তৃতীয়), ১৮ খোটিক, ১৯ ককল বা কর্ক দ্বিতীয়।

ইহাদিগের মধ্যে প্রথম কর্ক বৈদিক ধর্মের উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি অনেক যাগযজ্ঞের অগুষ্ঠানও করিয়াছিলেন। দস্তিহর্গ বিশেষ পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। যে কণাটক-রাজের সৈন্তদল এতদিন কাঞ্চী, কেরল, চোল, পাণ্ডা প্রভৃতি দক্ষিণাপথের ও উত্তরভারতের সার্কসভৌম নরপতি ত্রিহর্ষকে সমরে পরাজিত করিয়া অক্ষয়-কাণ্ডি সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাদিগকে এই দস্তিহর্গ স্বয়ংসংখ্যক সৈন্তসহ সমুখসংগ্রামে পরাভূত করিয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের সার্কসভৌম পদলাভ করেন। অবশেষে তিনি কাঞ্চী, কলিঙ্গ, কোশল, ত্রিগুণ, মালব, লাট, টক প্রভৃতি প্রদেশের রাজাদিগের পরাভব সাধন ও চালুক্যদিগের শক্তিহরণ করেন। ইহার ভার ইহার পুত্র কৃষ্ণরাজ ও চালুক্যদিগের বিনাশকাণ্ডী অচ্যুতরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইলোরার প্রসিদ্ধ গুহামন্দিরসমূহের মধ্যে কৈলাস নামক যে অদৃশ্য শিবমন্দির আছে, এই কৃষ্ণরাজ উহা নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নবম নরপতি ধ্রুব বাহুবলে কাঞ্চী, চের, কোশাধী, গৌড় ও কোশালাদিদেশের রাজাদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার তাম্রশাসনে লিখিত আছে।—গোবিন্দ (তৃতীয়) (৮০৮ খৃষ্টাব্দে) উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কাঞ্চীপুর পর্যন্ত প্রদেশের রাজচক্র-

বর্তী ছিলেন। নাসিক জিলার অন্তর্গত মোরখণ্ড নামক গিরিভূগে তাঁহার রাজধানী ছিল। কথিত আছে, ইহার রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটরা পুরাণোক্ত বহুবংশের ভার অজ্ঞেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ষাট জন নরপতির সমবেত সৈন্তকে অসাধারণ শৌর্য্যবলে পরাভূত করেন। তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে লাটদেশের (গুজরাতের) রাজপদ প্রদান করিয়াছিলেন। অমোঘবর্ষের সময়ে মাক্ষেট (বর্তমান মালখেড়) নগরে রাষ্ট্রকূটদিগের রাজধানী স্থাপিত হয়। দিগম্বর-মতাবলম্বী জৈন-গণের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বয়ং জৈন-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র কৃষ্ণ অকালবর্ষ চেদি-দেশের হৈহয়বংশীয় রাজকন্ডার পাদিপীড়ন করেন। তৎপুত্র অগস্ত্য স্বীয় মাতুলানীকন্ডার সহিত পরিণয়হুত্রে আবদ্ধ হন। ইনি কখনই সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র ইন্দ্ররাজ ৯১৪ খৃঃ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ২০ লক্ষ মুদ্রা ধর্মার্থ দান করেন। ইহার কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমোঘবর্ষকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠান ও “সাহসাক” উপাধি লাভ করেন। ইহার প্রভূতবর্ষ ও সুবর্ষ উপাধিও ছিল। বদ্বিগ অতীব সদাচারসম্পন্ন রাজা ছিলেন। তৃতীয় কৃষ্ণরাজ পাণ্ডা, সিংহল, চোল, চের ও অন্যান্য দেশ জয়পূরক সদর্পে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

ইহার কিছু দিন পূর্ব হইতে চালুক্যদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছিল। রাষ্ট্রকূটরা ইহাদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়া এতদিন আপনাদিগের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পরিশেষে ককল বা দ্বিতীয় কর্কের আমলে চালুক্যদিগের ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, মহারাষ্ট্র-রাজলক্ষ্মীকে তাঁহাদিগেরই অঙ্গগামিনী হইতে হয়। চালুক্যবংশীয় তৈলপ নামক এক পরাক্রমশালী ব্যক্তি ককলকে সমরে পরাভূত করিয়া মহারাষ্ট্র-সিংহাসন অধিকার করেন। (৯৭৫ খৃঃ)

রাষ্ট্রকূটবংশ ২২৫ বৎসর কাল দক্ষিণাপথে আপনাদিগের সার্কসভৌম শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইলোরার প্রসিদ্ধ গুহামন্দিরগুলিও এই বংশীয় রাজাদিগেরই ঐশ্বর্য্য ও শিল্প-দৌল্যবাহুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহাদিগের আমলে মহারাষ্ট্র দেশে পুরাণপ্রসিদ্ধ দেবদেবীর উপাসনার সর্বত্র বহুলপ্রচার হয়। বৌদ্ধধর্ম ইহাদিগের শাসনকালে একবারে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। জৈনধর্মের প্রতিপত্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই সময়ে দেশে সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ প্রসার হইয়াছিল। অনেক সংস্কৃত ভাষাবিৎ কবি ও পণ্ডিত তাঁহাদিগের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই বংশের কৃষ্ণ নামক জনৈক নরপতি পণ্ডিতপ্রবর হলায়

প্রণীত কবিরহস্য নামক কাব্যের নামকরূপে কল্পিত হইয়া ছিলেন। রাষ্ট্রকূট নরপতিরা চালুক্যদিগের জায় বসন্ত, পৃথিবী-বসন্ত ও বসন্তনরেন্দ্র প্রভৃতি উপাধির ব্যবহার করিতেন।

এই রাষ্ট্রকূটরাই বাজপুতনার রাঠোর উপাধিদারী রাজ-পুতগণের পূর্বপুরুষ। তৃতীয় গোবিন্দের সময় দক্ষিণাপথ হইতে রাষ্ট্রকূটরা বিজয়প্রসঙ্গে উত্তর ভারতে গিয়া বসতি করেন, এইরূপ অনেকের অনুমান।

উত্তর চালুক্য।

তৈলপ নামক যে চালুক্যবংশীয় বীরপুরুষ রাষ্ট্রকূটদিগের সিংহাসন হরণ করেন, তাঁহার সহিত পূর্বকালীন চালুক্য-রাজবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল না। এই নিমিত্ত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ উত্তরকালীন চালুক্য বংশ নামে পরিচিত। [ এই রাজবংশের নরপতিগণের তালিকা ও তাঁহাদের কার্য-কলাপের বিবরণ চালুক্য শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

এই চালুক্য রাজবংশ ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। কল্যাণনগরে ইহাদিগের রাজধানী ছিল। ইহাদিগের আমলে দক্ষিণাপথে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রাবল্য বৃদ্ধি হয়। বৌদ্ধধর্ম একেবারে বিলুপ্ত ও জৈনধর্ম হীনপ্রভ হইয়া যায়। পুরাণ ও স্মৃতি-শাস্ত্রসমূহের ঐক্যসম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণেরা এই সময়ে নিবন্ধ ও মীমাংসাগ্রন্থসমূহ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই বংশীয় নরপতিরা অতীব বিদ্যাবরাগী ছিলেন। কাশ্মীর-দেশীয় বিহ্লগ কবি এই বংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের (১০৭৬-১১২৬ খৃঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্য ইহাকে বিদ্যাপতি উপাধি প্রদান করেন। বিহ্লগও স্বীয় আশ্রয়-দাতার গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া “বিক্রমাদেবচরিত” নামক সপ্তদশসর্গাঙ্ক এক কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে নৈষধের জায় পদবিজ্ঞাস দৃষ্ট হয়। ইহার আত্মোপাস্ত রচনায় গ্রন্থ-কার বিশেষ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালেই পরমহংস পরিব্রাজকাচাণ্য বিজ্ঞানেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা নামক গ্রন্থ রচিত হয়। বিজ্ঞানেশ্বর উক্ত নর-পতির অগ্রতম মন্ত্রী ছিলেন। এই বংশীয় তৃতীয় সোমেশ্বর স্বয়ং সংস্কৃত ভাষার ‘অভিলষিতার্থ-চিন্তামণি’ বা মানসোল্লাস নামক এক রহং গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ কত-কটা এনসাইক্লোপিডিয়া বা সর্বসংগ্রহের জায়। এই গ্রন্থে রাজনীতি, জ্যোতিষ, কলিত জ্যোতিষ, জায়শাস্ত্র, অলঙ্কার-শাস্ত্র, ছন্দ-শাস্ত্র, গাঙ্কর্ষবিজ্ঞা, চিত্রকলা, শিল্প, বৈদ্যক, অশিক্ষা, গজশিক্ষা, স্থানশিক্ষা, মৃগয়া, যুদ্ধবিজ্ঞা, ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতি বহু বিষয়ের সমাবেশ আছে।

XIV

চালুক্যবংশ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। ইহাদের বংশধরগণ অতাপি চালুকে ও শিরকে উপাধিতে পরিচিত।

কলচুরি।

হৈহয়বংশীয় যে রাজকুল চেদিদেশে বা বর্তমান অকলপুত্র প্রদেশের চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীন কালে আধিপত্য করিতেছিলেন, তাঁহারা কলচুরি-রাজবংশ নামে পরিচিত। রাষ্ট্রকূট রাজ-বংশে ইহারা কতাদান করিয়াছিলেন। এই বংশীয় বিজল নামক জনৈক নরপতি চালুক্য সোমেশ্বরের সেনাপতি ও সামন্ত রাজা ছিলেন। চালুক্যদিগকে ক্ষীণবল দেখিয়া বিজল উক্ত বংশীয় দশম নরপতি তৈলপকে পদচ্যুত করিয়া মহারাষ্ট্র-সিংহাসন অধিকার করেন। বিজলের শাসন-কালে মহারাষ্ট্রে এক ভয়ঙ্কর ধর্মবিপ্লব সংঘটিত হয়। সেই ধর্মবিপ্লবের ফলে লিঙ্গায়ত নামক ধর্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। অধুনা কর্ণাট প্রদেশে লিঙ্গায়তদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরোক্ত বিপ্লবের অল্প দিন পরেই আবার চালুক্যেরা সেনাসংগ্রহপূর্বক কলচুরি নৃপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বরাজ্যের একাংশের উদ্ধার সাধন করেন। এই সময়ে উত্তর-মহারাষ্ট্রে যাদববংশীয় মরাঠারাও প্রাধাত্য লাভ করিয়া দেশের বহুলাংশ করায়ত্ত করিতে সমর্থ হন। কালে কলচুরি-রাজবংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল। ১১৬৫—১১৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বংশ রাজত্ব করিয়াছিল।

শিলাহার।

মহারাষ্ট্রদেশে শিলাহার বা শিলাহার নামে পরিচিত তিনটি অতি প্রসিদ্ধ সামন্ত-রাজবংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজ-ধানী স্থাপন করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। ত্রিহর্ষকৃত ‘নাগানন্দ’ নামক নাটকে জীমূতকেতু নামক যে রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাকেই এই শিলাহার-বংশী-য়েরা আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতেন। রাজা জীমূতকেতু বিদ্যাবরাগদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই মহাশ্বাই শঙ্কুচূড় নামক নাগকে রক্ষা করিবার জন্য পক্ষিরাজ গরুড়কে আশ্রয়দেহ দান করিয়াছিলেন। শিলাহার-বংশীয়েরা সকলেই আপনাদিগকে তগরপুরা-ধীশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইহা হইতে পুরাতত্ত্ব-বিদেরা অনুমান করেন যে, প্রাচীন তগরের রাজবংশ হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি সূচিত হইতেছে। তগুর নামক নগরটি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বেক্রপ প্রসিদ্ধ ছিল, পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত সে প্রসিদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইয়া নাট, কিন্তু তত্ত্ব্য প্রাচীন রাজা-দিগের কোনও বিবরণ অতাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

আমাদিগের আলোচ্য শিলাহার-বংশের প্রথম উল্লেখ আমরা রাষ্ট্রকূটদিগের আমলে দেখিতে পাই। সেই সময়ে ইহাদিগের মধ্যে একটা বংশ উত্তর-কোঙ্কণে, দ্বিতীয়টা দক্ষিণ-কোঙ্কণে ও তৃতীয়টা দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে রাজ্য করিতেছিল। ইহার। মহামণ্ডলেশ্বর বা সামন্ত রাজা নামেই আপনাদিগকে পরিচিত করিয়াছেন। প্রথম বংশটা উত্তর কোঙ্কণের প্রায় ১৪ শত প্রানের অধিকারী ছিলেন এবং পুরী নামক স্থানে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। দ্বিতীয় বংশের প্রথম নরপতি শব্দকুল রাষ্ট্রকূটবংশীয় কৃষ্ণরাজের (৭৫৩—৭৭৬ খৃঃ) বিশেষ অঙ্গগৃহীত ছিলেন। ইহার। রাষ্ট্রকূটদিগের অধীনতায় সহ-পার্বত্য ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপ ভূমিভাগে শাসনকার্য সম্পাদন করিতেন। খারে-পাটনের নিকটে ইহাদিগের রাজধানী ছিল। ৯৩০ শককে এই বংশের অধঃপতন হয়।

শিলাহারদিগের তৃতীয় বংশ কোঙ্কাপুর, মিরজ ও কড়াড প্রদেশে রাজত্ব করিত। রাষ্ট্রকূটদিগের বিনাশকালে ৮৭১ শককে এই বংশের উদয় হয়। ইহাদিগের প্রথম রাজার নাম জটিগ। এই বংশে গণ্ডরাদিত্য নামে এক জন অতি প্রসিদ্ধ ও বীর্যবান নরপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার। রাজ্যকাল ১০৩২—১০৫৮ শক। ইনি প্রয়াগক্ষেত্রে লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা আছে। কোঙ্কাপুরের দুই ক্রোশ দূরে প্রয়াগ নামে এক অতি পবিত্র তীর্থ আছে—করবীরমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। গণ্ডরাদিত্যের লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনকার্য বোধ হয় এই প্রয়াগেই অঙ্গীকৃত হইয়াছিল। এই রাজার অর্থব্যয়ে বুদ্ধ, জিনেশ্বর, অর্হৎ ও মহাদেব শিবের মন্দির নিৰ্মিত ও তদ্বন্দেগ্রে ভূমিদানাদিও হইয়াছে। উদার ও সচ্চরিত্র বলিয়াও ইহার খ্যাতি ছিল।

১০৬৫ শককে গণ্ডরাদিত্যের পুত্র বিজয়র্ক সিংহাসনে আরোহণ করেন। খ্রীষ্টানক (চীনা) ও গোপকপুরের (গোয়ার) নরপতিগণ শত্রুহস্তে জর্জরিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইলে বিজয়র্ক তাঁহাদিগকে সহায়তা করিয়া পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১০৭৯ শককে বিজয়রাজের চেষ্টায় কল্যাণের চালুক্য-রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হয়, তখন এই শিলাহার রাজা বিজয়রাজকে সহায়তা করিয়াছিলেন। বিজয়র্কের পুত্র ভোজের সময়ে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে যাদবদিগের বীর্যবলে এই রাজবংশের বিলোপ হয়।

শেবোক্ত শিলাহারের। স্বাধীন নরপতি ছিলেন বলিয়া অনুমানিত হয়। ইহার। হিন্দু-ধর্মাবলম্বী হইয়াও অল্প ধর্মের প্রতি বিবেচনাধাপন্ন ছিলেন না। খ্রীমদ্রামায়ী ইহাদিগের

কুলদেবতা ছিলেন। অধুনা শিলাহ বা শেলার উপাধিধারী যে সকল দরিদ্র মরাঠা-পরিবার মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে পরিদৃষ্ট হয়, তাহার। পুরোক্ত শিলাহার-বংশোদ্ভূত।

যাদববংশ।

এই রাজবংশের ঐতিহাসিক বিবরণ হেমাদ্রির রচিত “ব্রতখণ্ড” নামক গ্রন্থের ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার সেই অংশের নাম “রাজপ্রশস্তি” রাখিয়াছেন। এই রাজ-প্রশস্তিতে সমুদ্রমহনোৎপন্ন চন্দ্রকে যাদবদিগের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। হেমাদ্রি চন্দ্র হইতে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে প্রোতুভূত মহাদেব রাও নামক নরপতি পর্যন্ত যাদববংশীয় সমস্ত রাজাদিগের নামের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এই বংশাবলীর কতটুকু পৌরাণিক ও কতটুকু ঐতিহাসিক তাহা পাঠমাত্র উপলব্ধি হয়।

এই প্রশস্তি অনুসারে পুরাকালে যাদববংশে সুবাহ নামে এক রাজচক্রবর্তী ছিলেন। তাঁহার চারিপুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র দৃঢ়প্রহারকে তিনি দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যংশ প্রদান করেন, যাদবের। প্রথমতঃ মথুরার রাজা ছিলেন। খ্রীষ্টিয় দ্বারকায় রাজধানী স্থাপন করিলে, তৎপরে সুবাহর পুত্র দৃঢ়-প্রহার দক্ষিণাপথের আধিপত্য লাভ করেন। ত্রীনগরে দৃঢ়-প্রহারের রাজধানী ছিল। একখানি তাম্রশাসনে চন্দ্রাদিত্য-পুরে তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া লিখিত আছে। চন্দ্রাদিত্য-পুরকে বর্তমানকালে চান্দোড় বলে। এই চান্দোড় নগর নাসিক জেলার অন্তর্ভুক্ত। দৃঢ়-প্রহারের পর তদীয় বংশধরের। চান্দোড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শিলাহার, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিবাহাদি সম্বন্ধ ঘটাইয়াছিল। ৯৮৮ শককে এই বংশীয় সেউণ নামক জনৈক রাজা চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ-কালে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। সেউণ-রাজের অধস্তন পুরুষদিগের মধ্যে মল্লগীর পুত্র পঞ্চম ভিলম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১১৩৯ শককে তিনি চালুক্যরাজাদিগের হস্ত হইতে প্রায় সমস্ত রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হন। দৃঢ়প্রহার হইতে ভিলম পর্যন্ত ২৩ পুরুষ অতিবাহিত হয় এবং তাঁহার। ৪৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। রাষ্ট্রকূটের। যে সময়ে প্রাচীন চালুক্যদিগের হস্ত হইতে মহারাষ্ট্রদেশের উদ্ধার সাধন করেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বা তৎকালে এই যাদবরাজকুলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য জিজুবন-বলভের রাজত্ব-কালে মহিমুর অঞ্চলে একদল যাদব-ছিলেন। তাঁহার। প্রবলতা লাভ করিয়া গেই সময়ে দক্ষিণাপথের সার্কভোম

নরপতি হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বিষ্ণুবর্দ্ধন নামক বাদববংশীয় জনৈক বীরপুরুষ চালুক্যরাজাদিগের অধিকৃত প্রদেশে অভিযান করিয়া কৃষ্ণানদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিভুবনমল্ল অতীব বলশালী রাজা ছিলেন বলিয়া বিষ্ণুবর্দ্ধনের চেষ্টা সেবার ফলবতী হয় নাই। শেষ চালুক্য নরপতি চতুর্থ সোমেশ্বরের রাজ্যকালে তাঁহার সেনাপতি বিজ্জণ বিদ্রোহী হইয়া রাজ্য অধিকার করিলেও লিঙ্গাদয় ধর্ম্মের উত্তর উপলক্ষে দেশে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং এই বিপ্লবে সুযোগ বুঝিয়া বিষ্ণুবর্দ্ধনের পৌত্র বীর-বল্লভ বাদব চালুক্যদিগের রাজ্যের অনেক অংশ অধিকার করিয়া লন। দক্ষিণে মহিমুর অঞ্চলের বাদববংশীয় মরাঠারা এইরূপে চালুক্য-দ্বিগকে দমন করিয়া যখন আত্মপ্রাধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিতে ছিলেন, সে সময়ে উত্তর অঞ্চলের বাদবেরা নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এই সময়ে সেউগ রাজ্যের (খানদেশের) বাদব-দিগের মধ্যে ভিন্নম নামক একজন মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্তল নামক রাজার নিকট হইতে ত্রিভুবনপুর গ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যন্তক নগরের রাজ্যকে যুদ্ধে পরাস্ত, মঙ্গলবেটক নামক প্রদেশের বিল্লণ নামক রাজ্যকে নিহত এবং কল্যাণপ্রদেশ অধিকার করিয়া দক্ষিণ প্রদেশের বাদবদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। এইরূপে কৃষ্ণানদীর উত্তরতীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে তিনি বাদব-দিগের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১১০৯ শকাবে দেবগিরিতে দুর্গ নির্মাণ করেন। ঐ অঞ্চলে তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার অভিষেক সুসম্পন্ন হয়। ইহার পর ভিন্নম কৃষ্ণার দক্ষিণতীরেও আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু মহিমুরের বীরবল্লভ বাদব তাহাকে বাধা দান করেন। ধারবাড় জেলায় লোকিগুড়ি নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে বীরবল্লভ জয়লাভ করায় দক্ষিণ-মহারাজ্জ তাহারই আধিপত্য অক্ষুণ্ণ হইল। (১০১৩ শকাবে বা ১১৯১ খৃঃ।)

ভিন্নমের পর তৎপুত্র জৈত্রপাল ১১১৩ শকাবে দেবগিরির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আন্ধ্রদেশে অভিযান করিয়া তথাকার কাকতেশ্বরবংশীয় রুদ্ধ নামা নরপতিকে যুদ্ধে বিনাশ করেন। গণিত ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত ভাস্করাচার্যের পুত্র লক্ষ্মীধর তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন।

জৈত্রপালের পুত্র সিংঘ ১১৩২ শকাবে পৈতৃক সিংহাসন লাভ করেন। ইহার ঞ্চয় প্রতাপশালী রাজা বাদববংশে আর কেহ হন নাই। মালবের রাজা অর্জুনকে তিনি

পরাস্ত করেন। মধুরা ও বারাণসীর রাজারা তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সিংঘের একজন অল্পবয়স্ক সেনাপতি যুদ্ধে হারীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি পাকালার শিলাহারবংশীয় ভোজরাজকে বন্দী করিতে এবং চেদিবংশীয় জাজল নামক নরপতিকে, গুজ্জররাজকে ও রম্ভাগিরির সিংহ-কল্প লক্ষ্মীধর রাজ্যকে সমরে পরাস্ত করেন। আতীর জাতীয় নরপতিগণ তাঁহার হস্তে নিকৃশ হইয়াছিলেন, এরূপ কথাও পাওয়া যায়। তাঁহার অধীনতার ব্রাহ্মণেরাও সেনাপত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ সেনানীরা বহুবার গুজ-রাত জয় করেন। দক্ষিণ-মহারাজ্জ-বিজয়কার্য্য সিংঘের সময়ে পুনরারম্ভ হয় ও বহু পরিমাণে সুসিদ্ধ হয়। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্যের পৌত্র চন্দ্রদেব ইহার সভা-পণ্ডিত ছিলেন।

১১৬৯ শকাবে সিংঘের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিলে তৎপুত্র জয়সিংহ দেবগিরিতে থাকিয়া রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু ইহার ভাগ্যে দীর্ঘকাল রাজ্যস্থ থাট্টে নাই। ঐ অঞ্চলে ইহার পুত্র কৃষ্ণরাজ রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনি বহু যত্ন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার আমলে বৈদিক ধর্ম্মের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। ইনি চোলদেশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং মালব, গুজরাত, কোঙ্কণ, তৈলঙ্গ, প্রভৃতি দেশের রাজাদিগকে সর্বদা ভয়কম্পিত রাখিয়াছিলেন।

১১৮২ শকাবে কৃষ্ণরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব রাজ্যাভি-ষিক্ত হন। তাঁহার আমলে কোঙ্কণ দেশ বাদব-রাজ্যভুক্ত হয়। তিনি তৈলঙ্গ, কণাট, লাট, গুজ্জর ও মালবাদি দেশের রাজস্ববর্ণের বিশেষভাবে দর্প হরণ করিয়াছিলেন। শিলা-শাসনাদিতে তিনি “প্রৌঢ়প্রতাপচক্রবর্তী” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার জনৈক ব্রাহ্মণ-সেনাপতি “আশ্বোত্তম” বজ্রের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন, বলিয়া বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

মহাদেবের মৃত্যুর পর ১২৭১ খৃষ্টাব্দে তদীয় ভ্রাতৃপুত্র রামচন্দ্র রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। এই নরপতি রামদেব রাও বা রামরাজ নামেও পরিচিত ছিলেন। এই রামরাজের শিলাশাসন দক্ষিণে মহিমুর দেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত সর্বত্র উৎকর্ণ দেখা যায়। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি দক্ষিণপথে সার্কসডোম-প্রভৃৎ ভোগ করিয়াছিলেন। মালব-দেশের নরপতির সহিত যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং তৈলঙ্গদেশের নরপতিও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করি-তেন, এরূপ বর্ণনা তাঁহার শাসনাদিতে দৃষ্ট হয়। পুণার ডেকান-কলেজে এই রামচন্দ্র রাওয়ের রাজত্বকালে (৪৩৯৮ কল্যাক) লিখিত অমরকোষের একখানি পুঁথি আছে। তাঁহার সময়েও

ব্রাহ্মণেরা সেনাপতিত্ব ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থকার হেমাদ্রি যাদব-বংশীয় মহাদেব ও রামচন্দ্র রাওয়ের সময়েই প্রোত্খিত হইয়াছিলেন। তিনি এই উভয় নরপতির ত্রীকরণাধিপ বা ত্রীকরণ-প্রভু (বর্তমান কালের চিক্‌সেক্রেটারী) ছিলেন। শিলালিপিতে হেমাদ্রিকে সাধারণভাবে মন্ত্রী ও বলা হইয়াছে। তিনি ব্রতশও নামক গ্রন্থের ভূমিকায় যাদববংশের আত্মোপাস্ত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের ধৃত-বাদভাজন হইয়াছেন।

হেমাদ্রি বংশপোত্রীয় বিজ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কামদেব, পিতামহের নাম বাহুদেব ও অপিতামহের নাম ধামন ছিল। তিনি স্বয়ং বিদ্বান্ ও পণ্ডিতদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারসম্পন্ন ও পরাক্রমশালী সুর ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার চতুর্দশ-চিন্তামণির আঁর বিবিধ ধর্ম্মবিষয়পূর্ণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ সংস্কৃত-ভাষায় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বাগুতের বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের আয়ুর্কেন্দ-রসায়ন নামক একটা প্রসিদ্ধ টীকা আছে। এই হেমাদ্রি উহার রচয়িতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। বোপদেবের মুক্তাফল নামক বৈষ্ণব মত-প্রতিপাদক গ্রন্থেরও একখানি টীকা হেমাদ্রি রচনা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় বখরনিচয়ে ইনি “হরিভক্তিপরায়ণ হেমাদ্র-পন্ত” নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি সিংহল বা ভারতের দক্ষিণ-সীমান্তস্বর্গী প্রদেশ হইতে মোড়ী নামক এক প্রকার বর্ণমালা আনয়ন করিয়া মহারাষ্ট্রদেশে প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই বর্ণমালা অতীব দ্রুত লিখনের বিশেষ উপযোগী। বখরকারগণ ইহাকে রাক্ষসীলিপি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হেমাদ্রি স্বদেশে অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণের এক অভিনব প্রণালীর প্রবর্তন করিয়া স্বদেশবাসীর নিকট চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। শোলাপুর জেলায় ইহার প্রবর্তিত প্রণালী অমুরারে নির্মিত কতিপয় মন্দির অত্যাধি বিদ্যমান আছে।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার বোপদেবও এই সময়েই প্রোত্খিত হন। হেমাদ্রির অধীনতায় যে বহু সংখ্যক পণ্ডিত ছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহাদিগের মধ্যে অত্যন্তম। মুক্তবোধ ও মুক্তাফল নামক গ্রন্থ ভিন্ন হরিলীলা নামক আর একখানি গ্রন্থ বোপদেব রচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থ দুইখানি হেমাদ্রির অমুরোদে রচিত হইয়াছিল বলিয়া গ্রন্থকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। আয়ুর্কেন্দ্র সঙ্কেত তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত আছে। বোপদেবের মুক্তাফলের টীকা হেমাদ্রি গ্রন্থকারের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, “যাহা ব্যাকরণে কীর্তি

অকৃত, ব্যাকরণ বিষয়ে যাহার দশটি প্রবন্ধ, বৈদ্যগ্রন্থের উপর নয়টি প্রবন্ধ, কর্ম্মশাস্ত্র-বিষয়ে তিনিনির্গম নামক একখানি গ্রন্থ, সাহিত্য সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থ, ভাগবতের তিনটি প্রবন্ধ আছে, সেই অষ্টকর্ম্মী “কোবিদ-গর্ক-পর্কতঃ” মহামহোপাধ্যায় বোপদেবের কোন্ কোন্ গুণ না অলৌকিক?” এই মহাপণ্ডিত-প্রণীত পরমহংসপ্রিয়া, শতশ্লোকচক্রিকা, কবিকল্পদ্রুম ও তংটীকা, রামব্যাকরণ ও কাব্যকামধেনু প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখও পাওয়া যায়।

বোপদেব কেশব নামক ভিক্ষুর পুত্র এবং ধনেশ নামক পণ্ডিতের শিষ্য। তাঁহার পিতা ও গুরু বিদর্ভদেশের অন্তর্গত বরদা নদীর তটে সার্থ নামক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি দেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহারাষ্ট্রের আদিকবি ও সাধু পুরুষ জ্ঞানেশ্বর সনাজ্যচ্যুত হইলে, তাহার প্রারম্ভিকাদির পর তাঁহাকে সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজের পক্ষ হইতে যে শুদ্ধিপর প্রদত্ত হয়, তাহা এই বোপদেবই রচনা করিয়াছিলেন। ইহার বংশধরগণ অত্যাধি বেরার অঞ্চলে বিদ্যমান আছেন। কেহ কেহ বোপদেবকে বঙ্গীয় বৈষ্ণববংশজাত বলিয়া অস্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু সে অস্বীকার সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। প্রকৃত-পক্ষে তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৈষ্ণবগুণ মহারাষ্ট্র-দেশে অত্যাধি অতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও অবগম্যন করিতে কুণ্ঠিত হন না। মহারাষ্ট্রে বৈষ্ণবনামক কোন বৃত্ত জাতি নাই।

মহারাষ্ট্রদেশের আদিকবি মুকুন্দরাজ, জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব প্রভৃতি যাদববংশীয়গণের রাজত্বকালে প্রোত্খিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মুকুন্দরাজ পূর্ববর্ণিত জৈত্রপাল রাজার দীক্ষাগুরু ছিলেন। ঐ নরপতিকে শঙ্করাচার্যের অধৈতমত শিক্ষাদিবার জন্ত এই ব্রাহ্মণকবি বিবেকসিদ্ধ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। জ্ঞানেশ্বর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটা বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকার উপসংহারে মহারাজ রামচন্দ্রের রাজধানী দেবগিরির বর্ণনা আছে। এই টীকা জ্ঞানেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ ও ১২১২ শকাব্দে রচিত। নামদেব জ্ঞানেশ্বরের সমকালীন ছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে বোধ হয় তিনি ভক্তিমার্গের প্রথম-প্রবর্তক। অন্ততঃ তিনি সর্বপ্রথম মরাঠী ভাষায় ভক্তিতত্ত্ব গ্রথিত করেন। তাঁহার প্রণীত, **ভক্ত** (গীতি)-মালা অত্যাধি মহারাষ্ট্রবাসী আবাল-বৃদ্ধ বনিতী স্ব মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নামদেবের পরিবারস্থ সকলেই **ভক্ত**কবি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, ভ্রাতা এমন কি জনা নারী বংশীও ভক্তি-মূলক কবিতা রচনা করিয়াছেন।

এই বহুবংশীয় নরপতিদিগের আমলেই আধুনিক মহা-

রাষ্ট্রীয় ভাষার ও সাহিত্যের প্রথম উদয় হয়। ইহাদিগের পূর্বে দেশীয় ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থের বা কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন কালে (খৃঃ ১ম শতাব্দীতে) মহারাষ্ট্রী নামক প্রাকৃত ভাষায় সপ্তশতী নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাহার পর তবত্বতি, রামশেখর, ভারবী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সংস্কৃত-ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধরাজের পূর্বে প্রচলিত দেশীয় ভাষায় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি রচনার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাদববংশীয় নরপতিরা মহারাষ্ট্র দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির বিলোপ সাধনপূর্বক একটি বিশাল মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত একচ্ছত্র সাম্রাজ্য যথোচিত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই সহস্রা উত্তরভারত হইতে মুসলমান-বিপ্লবের স্রোতঃ পুনঃ পুনঃ মহারাষ্ট্র দেশের উপর সবেগে পতিত হইতে লাগিল। সূত্রাং অল্প দিনের মধ্যেই ঐ সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। রামদেব রাওয়ের রাজত্বকালেই (১২৯২ খৃঃ) সুপ্রসিদ্ধ আলাউদ্দীন খিলজি হাজার সৈন্য সহ প্রথমে যুগুয়া ও পরে ওরঙ্গলের রাজার নিকট চাকরির অহুসন্ধান-ব্যপদেশে দেবগিরির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ রামচন্দ্র যুদ্ধার্থে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, এমন কি প্রথমে তিনি আলাউদ্দীনের কোশলও ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। সূত্রাং যখন সহস্রা সৈন্য আলাউদ্দীন দেবগিরি আক্রমণ করিলেন, তখন মহারাজ রামচন্দ্রের পক্ষ হইতে অতীব ব্যস্ততার সহিত কোনরূপে ৪ হাজার সৈন্য সংগ্রহ এবং দুর্গ মধ্যে দীর্ঘ-কালোপযোগী অস্ত্র সামগ্রী সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইল। মুসলমানেরা দুর্গের বহির্ভাগস্থিত সমগ্র সহর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া দুর্গাবরোধ করিল। অচ্যুত আলাউদ্দীন কোশল সহকারে সেই সময়ে এই মর্মে এক গুজব রটাইলেন যে, দিল্লীর বাদশাহ বহুসংখ্যক সৈন্য সহ দেবগিরি আক্রমণ করিতে আসিতেছেন—বর্তমান সৈন্যদল উহার অগ্রাংশ মাত্র। এই সংবাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্র রাও অধিকতর ভীত হইলেন। তাঁহার মনে তখন মুসলমানদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। তিনি সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

সেকালে বর্তমান কালের ষাঠি বারমাস বেতন দিয়া সৈন্যপোষণের ব্যবস্থা ছিল না। সামন্ত নরপতিদিগকে ও জমিদারদিগকে সৈন্যদল গঠনের জন্য ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইত। তাঁহারাও দেশের জ্ঞান সাধারণকে প্রায় নিষ্কর জমি ভোগ করিতে দিতেন। এইরূপে ষাঠি জমি খাইত, তাহাদিগকে

যুদ্ধকালে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক রাজার সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতে হইত। পূর্বাঙ্কে সংবাদ না পাইলে যুদ্ধে উপস্থিত হওয়া সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। সেকালে পূর্বাঙ্কে সংবাদ না দিয়া কেহ কাহারও রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেন না। কারণ গোপন ভাবে বা অকস্মাৎ আক্রমণ তাঁহাদিগের মতে অধর্মকর বলিয়া গণ্য ছিল। মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া অভিনব যুদ্ধনীতির অবলম্বন করিয়াছিল। এদিকে ভারতীয় রাজন্যবর্গও রাজনীতির অশুশাসন লঙ্ঘন করিয়া পররাষ্ট্রে সংবাদ সংগ্রহব্যাপারে অননোযোগিতা প্রকাশ করিতেছিলেন। মুসলমান-দবাবারে তাঁহাদিগের রাজ্যাক্রমণ সম্বন্ধে যে সকল গুপ্ত গবায়শ হইত, সে সকলের সংবাদ রাখিতে পারিলে বোধ হয় তাঁহারা অত্যন্তিক ভাবে আক্রান্ত হইয়া বিপদ হইতেন না। রামদেব রাওয়েরও বর্তমান বিপদ এই সকল কারণে সংঘটিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, রামদেব রাওয়ের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হইলে আলাউদ্দীন স্বীয় দুর্বলতার বিষয় চিন্তা করিয়া সাগ্রহে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি নিভয় স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া অবরোধ পরিত্যাগপূর্বক স্থানে প্রস্থান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এমন সময়ে রামচন্দ্র রাওয়ের পুত্র শঙ্করদেব বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহপূর্বক পিতার উদ্ধার-সাধনের জন্ত দেবগিরির সমীপবর্তী হইলেন। আলাউদ্দীন তখন দুর্গের অবরোধ কার্য অব্যাহত রাখিয়া একদল সৈন্য সহ শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। দেবগিরির অনতিদূরে উভয় পক্ষে যে সংগ্রাম ঘটে, তাহাতে মুসলমানেরা পরাজিত-প্রায় হইয়াছিল। আলাউদ্দীন শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্ত অদূরে একদল সৈন্য রাখিয়াছিলেন। সেই সৈন্যদল এই সময়ে সহস্রা আসিয়া সমরক্রান্ত মুসলমানসৈন্যের সহিত যোগদান করিল। এই সৈন্যদলের অশঙ্করাঘাতোখিত ধূলি-পটল দর্শন করিয়া শঙ্কর রাওয়ের সৈন্যেরা মনে করিল, দিল্লীশ্বরের যে মহতী সেনা দক্ষিণদিক্ জয় করিবার জন্য আসিবে বলিয়া শুনা গিয়াছিল, তাহারাই এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া হিন্দুপক্ষীয় সৈন্যগণ ভয়বস্ত হইয়া পলায়নপর হইল। তখন পূর্বোক্ত নবাগত সৈন্যদলের সাহায্যে আলাউদ্দীনের সূধ্যমান্ সেনা শঙ্কররাওয়ের পরাজয় সাধন করিল।

আবার রামচন্দ্র রাও সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তখন আলাউদ্দীন সুযোগ বুঝিয়া আপনার দাবী বাড়াইলেন। দেশের অস্ত্রাশ্ব হিন্দু নরপতিগণ দেবগিরীশ্বরের সহায়তার জন্ত



সাজ্জিত হইতেছিলেন। রামদেব রাও অবরুদ্ধ অবস্থায় আর কিছুদিন বাপন করিতে পারিলে প্রতিবেশী নরপতিদিগের সহায়তার সহজেই বিপদমুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি দুর্গ-রক্ষার কৃতসঙ্কল্প হইলে জানিতে পারিলেন যে অবরোধের প্রাকালে যে সকল গোণী (বস্ত্র) শস্ত্রপূর্ণ ভাষিয়া ভাঙারে রাখা হইয়াছিল, সেগুলি প্রকৃত গঙ্গে লবণপূর্ণ ছিল। দৈব দুঃসাপকে সহসা রমদেব এইরূপ অভাব ঘটায় তাহাকে আলাউদ্দানের তুষ্টিসাধনে যত্নশীল হইতে হইল। তিনি ছরশত মন মুক্তা, হই মন রত্ন, সহস্র মন রৌপ্য এবং চারি সহস্র থান রেণুমা কাপড় ও অশ্রুত বহু মূল্যবান দ্রব্য দানে আগার্দাঁদের নিকট সন্ধি ক্রয় করলেন। এতদ্বিধা এলিচ-পুর জেলা মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দিতে ও নিয়মিত করদান-পুস্তক দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বাকার করিতে হইল। তখন আলাউদ্দীন অবরোধ পরিত্যাগপুস্তক স্বদেশে প্রস্থিত হইলেন।

হহার পর আলাউদ্দীন স্বীয় বুদ্ধ কুল্লতাত জালাল-উদ্দীন খিলজিকে যেরূপে নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন আধিকার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। তিনি বাদশাহী প্রাপ্ত হইলে রামদেব রাও কয়েক বৎসর দিল্লীতে কর প্রেরণ করেন নাহ। এই কারণে আলাউদ্দীন মালিক কাফুরের অধীনতায় খ্রিষ্ট সহস্র অষ্টারোহী সৈন্য তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে সেনাগণ দেবগিরির নিকট উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধেও রামদেব রাও পরাস্ত হইলেন। মালিক তাহাকে বন্দী পুস্তক দিল্লী প্রেরণ করেন। তথায় ছয় মাস কাল কারাবদ্ধ থাকিবার পর আলাউদ্দীন তাহাকে সম্মানে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অনুমতি দান করিলেন। হহার পর রামদেব রাও আর্জাবন দিল্লীশ্বরের সাহিত গথ্য রাখিয়াছিলেন।

১৩০৯ খৃষ্টাব্দে রামদেব রাওয়ের মৃত্যু হয় ও শঙ্কর রাও তৎপদে অভিষিক্ত হন। তিনি দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করায় মালিক কাফুরের হস্তে ১৩১২ খৃষ্টাব্দে তাহাকে প্রাণ হারা-ইতে হয়।

এই সময় হইতে দেবগিরিতে মুসলমান আধিপত্য প্রতি-ষ্ঠিত হয়। আলাউদ্দানের মৃত্যুর পর দিল্লীর দরবারে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেহ সুযোগে রামদেব রাওয়ের জামাতা হরপাল দেব বিদ্রোহী হইয়া দক্ষিণাপথ হইতে মুসলমান-শাসনকর্তাদিগকে বিভাড়িত করিলেন। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দানের তৃতীয় পুত্র মোবারককে এই বিদ্রোহ দমনের জন্ত স্বয়ং দক্ষিণাপথে আসিতে হয়। হর-

পাল মুসলমানদিগের হস্তে ধৃত হইয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন। এইরূপে মহারাজ্জি দেশ হইতে হিন্দু রাজ্য বিলুপ্ত হইল। মুসলমানেরা দিন দিন প্রবলতা লাভ করিয়া সমগ্র দক্ষিণ-পথে আপনাদিগের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ্জি দেশের প্রাচীন হিন্দু-রাজবংশের ইতিহাস এত-ক্ষণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল। মুসলমানদিগের আগমন পৰ্যন্ত যে সকল প্রধান ঘটনা মহারাজ্জি দেশে সংঘটিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় একত্র সঙ্কলিত হইল।

রামায়ণ-কাল.....মহারাজ্জি দেশে অনাথানিবাণ।

মহাভারত-কাল.....মহারাজ্জি আখ্য উপনিবেশ সুপ্রতিষ্ঠিত।

খৃঃ পূঃ ৩৫০-৭৩—অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার।

দেগায় রঠ, ভোজ, রাটিক, মহারঠ, রঠ, কুড় প্রভৃতি জাতির আধিপত্য।

খৃঃ পূঃ ৭৩ হইতে—খৃষ্টীয় ২১৮ অব্দ পর্যন্ত...সাতবাহন-

বংশের রাজত্ব।

খৃঃ ২১৮ হইতে—খৃঃ ৩০০ অব্দ পর্যন্ত...আভীর, রাট্টি-

কুট প্রভৃতির আধিপত্য।

খৃঃ ৬০৫ হইতে—খৃঃ ৭৪৭ অব্দ পর্যন্ত...পুন্ড চালুক্য।

খৃঃ ৭৪৮ হইতে—খৃঃ ৯৭৩ অব্দ পর্যন্ত...রাট্টিকুট।

খৃঃ ৯৭৩ হইতে—খৃঃ ১১৮৯ অব্দ পর্যন্ত...উত্তরচালুক্য।

খৃঃ ১১৮৭ হইতে—খৃঃ ১৩১৮ অব্দ পর্যন্ত...বাদবংশ।

সে কালের সাহিত্য।

মহারাজ্জি দেশে অতি প্রাচীন কালে পালিভাষা প্রচলিত ছিল। সাতবাহন-বংশের রাজত্ব সময়ে মহারাজ্জি নামক প্রাকৃত ভাষা এই দেশে এবং মালবাদ প্রদেশেও প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতপ্রকাশকার বরকচির মতে এই মহারাজ্জি-ভাষা হইতে শোরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের উৎপত্তি হয়। সাহিত্যদর্পণকার “গাথাসু মহা-রাজ্জি প্রয়োজয়েৎ” অর্থাৎ নাটকে মহারাজ্জীভাষায় সঙ্গীতাদির রচনা করিবার বিধান দিয়াছেন। সাতবাহনের সমুদ্রতী ত্রিংশ সেতুবন্ধ প্রভৃতি ছই একখানি কাব্য গ্রন্থও এই প্রাচীন মহারাজ্জী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। বর্তমান মরাঠী ভাষা সেই প্রাচীন মহারাজ্জীরই হইত। এই ভাষার দশ ভাগের নয় ভাগ শব্দ সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক। ইহাতে বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। বাদবংশীয় নৃপতিদিগের রাজত্বকালে আধুনিক মরাঠী ভাষায় যে সকল জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচিত হয়, তাহার পরিচয় পুঙ্কেই প্রদত্ত হইয়াছে। মুসলমান আমলেও মহারাজ্জি-সাহিত্য ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতেছিল, যথাস্থানে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইবে।



মুসলমান অধিকার—বাক্ষণী রাজবংশ।

মহারাজাধেশের মুসলমান আমলের ইতিহাস বাক্ষণী, গিজামশাহী প্রভৃতি শব্দে পাঠক দৃষ্টিতে পাইবেন। তাহার দিগের শাসনকালের যে সকল ঘটনার সহিত মহারাজারিগের ভাবী উন্নতির সম্বন্ধ ছিল, এস্থলে কেবল সেইগুলি নির্দেশ আবশ্যক।

মুসলমানেরা দেবগিরির হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিলে ১০২০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত দক্ষিণাপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যদিগের গুপ্ত সম্বন্ধ ছিল। কেবল তাহাই নহে, সেই সময়ে দক্ষিণাপথে তাহারও বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। সেই বিদ্রোহদমনের জন্য মহম্মদ তোগলককে দক্ষিণাপথে গমন করিতে হয়। এই ঘটনার পর পঞ্চবিংশতি বর্ষ অর্থাৎ হইতে না হইতেই মহারাজারিগেরা সুযোগ বুঝিয়া ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে আবার পরাশীনতার শৃঙ্খল ছেদন করিতে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে স্থানীয় মুসলমানেরাও দিল্লীর মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। মহম্মদ তোগলক এই বিদ্রোহদমনে অসমর্থ হওয়ার হসেন-গঙ্গো নামক জনৈক মুসলমান দক্ষিণাপথে নূতন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইলেন। এই রাজ্যস্থাপন-কার্যে মহারাজারিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যদিগের বিশেষ সহায়তা ছিল। কিন্তু কাথোদ্ধারের পরহুসেন তাহারদিগের মিত্রতার কথা ভুলিয়া যান। হিন্দুরা ভাবিয়াছিলেন, দিল্লীর সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিতে পারিলেহ তাহার দক্ষিণাপথের মুসলমানগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিতে পারিবেন। সেই ভরসা তাহার হসেন-গঙ্গোর বিদ্রোহে সহায়তা করিয়াছিলেন। হসেনও মাক্দ্দ গজনির স্থায় হিন্দুধর্মব্রো ছিলেন না। তিনি মুসলমানদিগের শিরা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। শিরা সম্প্রদায়ের মতের সহিত হিন্দুমতের অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। সুদী অপেক্ষা শিরা মত বহু পারমাণে উদার। হসেন গঙ্গোর চরিত্রে এ উদারতা বিশেষ ভাবে পরিফুট না হইলে তিনি এত সহজে হিন্দু রাজ্যদিগের সহায়ত্ব লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। হিন্দুদিগের জাতীয় জীবনে তখন অসমাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বাদবংশের রাজত্বকালে বহু দিগিজয় করিয়া তাহার শ্রান্ত ও কিয়ৎ পরিমাণে বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমাজের প্রতিভাও ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে রাজনৈতিকোশলে ও সামরিক অধ্যবসায়ে তাহার দক্ষিণাপথের তরুণ-বাধ্য মুসলমানদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইলেন না। হসেন-গঙ্গো কাথোদ্ধারের পর তাহারদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াও দিন দিন যীর রাজ্যের

উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইলেন। মহারাজারিগের উত্তরে লক্ষ্মী হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা পর্যন্ত ও পশ্চিমে সছাতি হইতে তৈলঙ্গ ও গোওবন পর্যন্ত এই মুসলমান রাজ্য বিস্তৃত হইল। কোঙ্কের হিন্দু রাজারা বহু দিন পর্যন্ত মুসলমানদিগের আধাভ্রমীকার করেন নাই।

হসেনের পর তৎপুত্র মহম্মদ শাহ (১০৫৮—১০৭৫ খৃঃ) বাক্ষণী রাজ্যের অধিপতি হইলেন। ইহার আমলে মহারাজারিগের নূতন রাজমুদ্রা প্রচলিত হয়। হিন্দুগণ এই রাজমুদ্রার প্রচারে বাধা দিতে লাগিলেন। তাহার নূতন মুদ্রাগুলি গলাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মহম্মদ শাহ বহু সংখ্যক হিন্দুকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। এই জুলতানের সহিত হিন্দু রাজারা কয়েক বার যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হওয়ার হিন্দুদিগের চৈতন্য হইল। হসেন গঙ্গোকে দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে সহায়তা করিয়া তাহার গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, বলিয়া তাহারদের মনে হইতে লাগিল। তখন তাহার পুনরায় দিল্লীর ফিরোজ শাহ তোগলককে দক্ষিণাপথ আক্রমণ করিয়া মহম্মদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফিরোজশাহ সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। হিন্দুগণ আর একবার মহম্মদের সহিত বলপরিষ্কার প্রবৃত্ত হইলেন। সে যুদ্ধে হিন্দুরা কানান ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। সত্তর হাজার হিন্দু এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। মুসলমানেরা জয়ী হইলেও বিবাদে শেষ হইল না। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুগণ আবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এবারেও তাহারদিগের পরাজয় ঘটিল। ইহার পর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিপ্লব-নিবারণে জুলতানের কিয়দবস অতিবাহিত হইল।

মহম্মদ শাহের পর যে সকল জুলতান এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারদের বিস্তারিত বিবরণের সহিত বর্তমান ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। তাহারদিগের রাজত্বকালেও দক্ষিণাপথে হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধব্যাপার নিবৃত্ত হয় নাই। শিরা ও সুদী-সম্প্রদায়স্থ মুসলমানেরা পরস্পরের সহিত কলহে সমানভাবেই প্রবৃত্ত ছিলেন। মধ্য-এসিয়া হইতে ধর্ম্মাক্ষ মুসলমানদিগের আমদানী অধিক পরিমাণে হইবার সুবিধা না থাকায় মহারাজারিগের মুসলমানধর্ম্মের উগ্রতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই ইসলামের উপর হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক মুসলমান হিন্দুদেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাক্ষণী বংশের বিলোপ হয়। এই বংশীর জুলতানেরা সর্বশেষ ১৭২ বৎসর মহারাজারিগের রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহাদিগের জায় প্রবলপরা-  
ক্রান্ত রাজবংশ সমগ্র ভারতে আর ছিল না। দিল্লীর বাদশাহে-  
রাও ইহাদিগের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিতে সাহস করিতেন না।  
এই বংশের প্রাচীন নরপতিগণ রাজ্যের বেরূপ অব্যবস্থা  
করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদিগের রাজ্য দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে  
পারিত। কিন্তু পরবর্তী কালের সুলতানেরা সামান্য সামান্য  
কারণে পররাষ্ট্র হরণপূর্বক রাজ্যবিত্তারের চেষ্টা করিতে  
লাগিলেন, অথবা নববিজিত রাজ্যের শাসন কার্য বাহাতে  
সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তাহারা যথোচিত যত্ন  
প্রকাশ করিলেন না। সুবেদারেরা অনেক স্থানেই অসীম  
ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সুলতানেরাও ক্ষীণ-  
শক্তি হইতেছিলেন। মহম্মদ গবানের মন্ত্রিত্বকালে এ সকল  
বিষয়ে একবার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু তৎকৃত ব্যবস্থায়  
রাজকক্ষচারীদিগের অঐবধ প্রাধান্য হ্রাস পাওয়ায় তাহারা  
সকলেই ঐ ব্যবস্থায় ঘোর বিরোধী হইয়া পড়িলেন।  
এই কারণে গবানের মৃত্যুর পর আবার চারিদিকে বিশৃঙ্খলা  
উপস্থিত হইল। যে সালে বাঙ্গালী রাজ্যের বিলোপ ঘটে,  
সেই অঙ্কেই বাবর উত্তর-ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের স্বরূপাত  
করিয়াছিলেন। মোগলেরাই পরিশেষে বাঙ্গালী রাজ্যের  
শেষ শাখাটি ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

প্রজার স্বত্বের প্রতি বাঙ্গালী-বংশীয় সুলতানদিগের দৃষ্টি  
ছিল। অকারণে তাহারা হিন্দুদিগকে কষ্ট দিতেন না।  
হিন্দুরা তাহাদিগের শাসনকালে কখনও উচ্চ রাজপদে প্রতি-  
ষ্ঠিত হয় নাই। সামরিক বিভাগেও হিন্দুর প্রবেশাদিকার  
ছিল না। তাহারা কৃষিকার্যে ও অন্তর বেতনের চাকরী  
করিয়াই জীবিকানির্বাহ করিতেন, তাহাদিগের ধর্ম্মচরণে  
এই বিধর্ম্মী রাজারা কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। সে  
সময়ে রাজ্য মধ্যে যে সকল বিদ্রোহ ঘটয়াছিল,  
তাহাতে হিন্দু প্রজাগণ কখনও প্রকাশ্য ভাবে যোগ-  
দান বা সহানুভূতি-প্রকাশে অগ্রসর হন নাই। এই  
বংশের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রে তুর্কী, ইরাণী, হাবসী, মোগল  
প্রভৃতি বিভিন্ন বংশীয় মুসলমানেরা আসিয়া বসতি করেন।  
ক্রমে ইহাদিগের প্রতিপত্তি এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, নিকটে যদি  
বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য না থাকিত, তাহা হইলে মহারাষ্ট্র-  
দিগের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিত। বাহা  
হউক, মুসলমান ব্যবসায়ীদিগের চেষ্টায় এই সময়ে দেশের  
বৈদেশিক বাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাঙ্গালী রাজ্যে  
চোর ডাকাতের ও রাহাজানির ভয় আদৌ ছিল না বলিয়া  
মুসলমান-লেখকেরা বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলমানদিগের

চেষ্টায় অনেক বড় বড় অট্টালিকাও নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল,  
তাহাতে দেশের স্থাপত্যশিল্পের বহুল উন্নতি সাধিত হয়।  
মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার জন্য বাঙ্গালী সুলতানেরা  
গ্রামে গ্রামে পাঠশালাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। পুর্নকাব্যেও  
তাহাদিগের অনন্যযোগ ছিল না। বিদর ও কুলবর্গার  
রাজধানী ছিল।

বরিশাহী বংশ।

বাঙ্গালী-বংশীয় সুলতানদিগের গৌরবস্বর্ণ যতই অন্ত্যচল-  
মুখী হইতে লাগিলেন, ততই তাহাদের রাজ্যে শিয়া ও সূফী  
সম্প্রদায়স্থ মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাদবিক্ষেপ অধিকতর প্র-  
বলিত হইতে লাগিল। সেই সুযোগে মহম্মদশাহের রাজত্ব  
কালে (১৪৮২—১৫১৮ খৃঃ) মহারাষ্ট্রেরা একবার বিদ্রোহ  
করিয়া মন্তকোত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাসিম  
বরিদ নামক মুসলমান-সদারের যত্নে সে বিদ্রোহ দমিত  
হয়। সুলতান সদারের এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার  
পদোন্নতি করেন। তিনি বিদর অঞ্চলের সুবেদারী পদ  
পাইয়া ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে সুলতানের প্রভুত্ব স্বীকারপূর্বক স্বাধী-  
নতালাভ করেন। এই সদারই বরিশাহী-বংশের আদি-  
পুরুষ। ইহার বংশধরেরা “শাহ” উপাধি গ্রহণ করিয়া  
ছিলেন। আক্কাবদনগর ও বিজাপুরের সুবেদারদিগের সহিত  
কলহে বরিশাহী রাজ্য বহু পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছিল।  
পরিশেষে দক্ষিণাপথে অরঙ্গজেবের সুবেদারীকালে তাহা-  
রই আদেশে মীর জুন্নার চেষ্টায় এই রাজ্যের অস্তিত্ব  
বিলুপ্ত হয়।

ইমাদশাহী বংশ।

এই বংশের আদিপুরুষ একজন তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ। বিজয়-  
নগরের রাজার পক্ষাবলম্বনপূর্বক যুদ্ধকালে এই ব্যক্তি বাঙ্গালী  
বংশীয় সুলতানের সৈন্যদিগের হস্তে ধৃত হন। তাহাকে  
সপরিবারে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। তদবধি  
ফতে-উল্লা নামে তিনি পরিচিত হন। তিনি কার্য্যদক্ষতা-  
ভাবে মহম্মদ গবানের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং ইমাদ  
উলমুলক উপাধিসহ বেয়ার অঞ্চলের সুবেদারী প্রাপ্ত হন।  
১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে ফতে উল্লা “ইমাদ শাহ” নামে আত্মপরিচয়  
ঘোষণাপূর্বক স্বাভিজ্যলাভ করেন। ইহার বংশধরেরা অধিক  
দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। আক্কাবদনগরের সুবেদার-  
রাই এই বংশের ধ্বংসের কারণ স্বরূপ হন। (১৫৭২ খৃঃ)

নিজামশাহী রাজবংশ।

ডিমাপ্পা বহিরু (তৈরব-বহিরু) নামে এক ব্রাহ্মণ বিজয়-  
নগরে বাস করিতেন। ইমাদশাহী বংশের আদিপুরুষের

জায় এই ব্রাহ্মণের সন্তানও যুদ্ধে ধৃত হইয়া মুসলমানহস্তে বন্দী ও ধর্মাস্ত্রগ্রহণে বাধ্য হন। এই ব্রাহ্মণ-সন্তান পরে মালিক নায়েব নিজাম উল-মুলক নামে পরিচিত হন। মহম্মদ গবানের কাব্যকালে ইনি উচ্চ পদ লাভ করেন। মালিক নায়েবের পুত্র মালিক মহম্মদ নিজামশাহী বংশের আদিপুরুষ। ইহার সময়ে বাক্ষগীবংশের অধঃপতনের পূর্বলক্ষণ সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া মরাঠাগণ নানাস্থানে মন্তকোত্তোলনের চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজ্যে শাস্তি স্থাপনের জন্য মন্ত্রী মহম্মদ গবান কোনও কোনও স্থানে দেশরক্ষাকার্য্যে ইহাদিগকেই নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পশ্চিম-মহারাষ্ট্রের নানাস্থানে মরাঠাদিগেরই আংশিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা মুসলমানদিগের প্রতিনিধিকপে দেশের শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। মালিক মহম্মদ দৌলতাবাদ অঞ্চলের সুবেদারী পাইয়াই মরাঠা-দুর্গরক্ষকদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সুলতানের সনন্দসত্ত্বেও তাঁহারা মালিক আহম্মদকে আমল দিলেন না। আহম্মদ তখন একে একে তাঁহাদিগের বিকক্ষে অভিযান আরম্ভ করিলেন। প্রথমে জুম্মের অন্তর্গত শিবনেরী দুর্গ (মহাত্মা শিবাজীর জন্মস্থান) অবরোধ করেন। কয়েক মাস অবরোধেও দুর্গস্থিত মরাঠারা পরাজয় স্বীকার করিল না। মালিক আহম্মদ তখন তাঁহাদিগের বিদ্রোহপরাধে সম্পূর্ণ ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় মরাঠারা বিরোধ পরিত্যাগ করিলেন। পরে পুরন্দর, মনোরঞ্জন, চন্দনবন্দন, লোহগড়, তোরণা প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের প্রধান প্রধান দুর্গগুলিই ইহার হস্তগত হয়। রাজাপুর পর্য্যন্ত কোঙ্কণদেশও হনি জয় করেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে জুম্মের ইহার অধিষ্ঠান ছিল। আহম্মদ স্বীয় শাসনাধীনপ্রদেশে একপুত্রশাসন প্রবর্তিত করেন যে, লোকে ষষ্টির অগ্রভাগে সুবর্ণ ও বকুনপূর্বক প্রকাশ্যভাবে কোনও স্থানে গমনাগমন করিতে পারিত। ১৪৮৯ খৃঃ অঃ তিনি বাক্ষগীবংশীয় সুলতানের অধীনতা অগ্রাহ্য করেন। দৌলতাবাদ ও জুম্মের এতহুভয়ের মধ্যে বিষ্ণুর নামে একটি পল্লী ছিল। ঐ পল্লীকে তিনি 'একটা বিশাল নগরে পরিণত করেন। তাঁহার নামানুসারে ঐ নগর আক্কদনগর আখ্যা লাভ করে (১৪৮৪ খৃঃ অঃ)। মালিক আহম্মদ নিজামশাহ উপাধি লইয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন। ইহার মত সংঘাতক্ৰিয় ব্যক্তি মুসলমানসমাজে সে সময়ে কেহই ছিলেন না। দম্বযুদ্ধের দ্বারা বিবাদের মামাংসা করিবার প্রথা দক্ষিণপথে ইহার সময়েই প্রবর্তিত হয়। ফলে, মহারাষ্ট্রের পল্লীগ্রামে-পর্য্যন্ত তরবারি খেলায় লোকের অহুরাগ

বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় সর্বত্র অসিগ্রীড়ার জন্য রক্তশালা প্রস্টি-  
ষ্ঠিত হয়।

আহম্মদশাহের পর তৎপুত্র সম্ভববর্ষীয় বুহাণশাহ নিজাম-  
শাহী রাজ্যের অধিপতি হন। আদিগশাহী ও ইমাদশাহী  
সুলতানদিগের সহিত যুদ্ধে ইহার পরাজয় ঘটে। কথর সেন  
(কুমারসেন) নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বুহাণ শাহের দরবারে দীর্ঘ  
কাল প্রধানমন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সুলতানের  
সময়ে মরাঠারা রাজনৈতিকক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ  
করেন। সাম্রাজ্যী চিটনৌসকে "প্রতাপ রাও" উপাধি প্রদান  
করিয়া বুহাণশাহ পররাষ্ট্রের দৌত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।  
পার্পত্য প্রদর্শনবাদী মরাঠাগণ বশুতা স্বীকার না করিয়া প্রায়ই  
বিদ্রোহাদি করিতেন। এই কারণে সুলতান পেশবা কথর-  
সেনের পরামর্শক্রমে তাঁহাদিগকে উচ্চ রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত  
করিয়া শাস্ত করিলেন। এই সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিন দিন  
রাজকাৰ্য্যে সমধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের ভাবী  
অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন। বুহাণশাহ  
শিয়ামতের বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ করার সুদী-সম্প্রদায়ের  
মুগলমানেরা ক্ষেপিয়া উঠেন। ফলে রাজ্য মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা  
ও অশান্তি নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়। ৪৭ বৎসর রাজ্য-  
ভোগের পর ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে এই সুলতান প্রাণত্যাগ করেন।

এই বংশের তৃতীয় সুলতান চমেন নিজাম শাহের  
শাসনকালে দক্ষিণপথে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ চরম  
সীমায় উপনীত হয়। দক্ষিণপথের সমস্ত মুসলমান-শক্তি  
সমবেত হইয়া একযোগে একমাত্র হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের  
ধ্বংসসাধন করেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে রাম-  
রাজ নিহত হওয়ায় হিন্দুগণ সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়।  
মুগলমানেরা কুমারিকা অন্তরাপ পর্য্যন্ত অধিকারবিস্তারের  
সুযোগ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে আর্ঘ্যাবর্তে মোগল-সম্রাট  
অকবর একে একে সমস্ত হিন্দুরাজ্য আক্রমণপূর্বক হিন্দু-  
জাতির বিনাশসাধন করিতেছিলেন। বিগত সহস্র বৎসরের  
মধ্যে হিন্দুজাতির পক্ষে একুপ হুঃসময় আর কখনও উপস্থিত  
হয় নাই। এই সময়ে সমগ্র হিন্দুস্তান প্রায় যবনস্থানে পরি-  
ণত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর আশ্রয়গ্রহণের  
স্থান আর রহিল না।

ইহার পর মৃত্যু নিজামশাহের আমল। এই আমলে  
বিজয়নগরের রাজ্য-বিভাগ লইয়া মুসলমানদিগের মধ্যে  
যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত হয়। ফলে মরাঠাগণ মন্তকোত্তোলনের  
সুবিধা প্রাপ্ত হন। এই সময়ে পর্তুগীজেরাও আসিয়া পশ্চিম-  
ভারতে উপজব আরম্ভ করে। নিজামশাহের সর্দারদিগকে

সুৱা উপহার দিয়া ইঁহারা ভারতে উপনিবেশ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। মুক্তজা বোয়ার অধিকারপুষ্টক ইমাদশাহী-বংশের আশ্রয় বিলোপ করেন। ইঁহার আমলে খানদেশ ও নিজাম-শাহী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৫৮৬ হইতে ১৫৯৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মিরন হুসেন, ইস্‌মাইল ও বৃহাদ নিজামশাহ মহারাষ্ট্রের উত্তরভাগ শাসন করেন। ইঁহাদিগের শাসনকালে শিৱা ও সুন্নাদিগের বিবাদ বৃদ্ধি হয়। কাল মীরণকেও প্রাণ হারাতে হয়। ইস্‌মাইলের রাজ্যকাল মুসলমানদিগের ধর্মসংক্রান্ত কলহে অতি-বাহিত হয়। একদল মুসলমান দিৱার বাদশাহ অকবরের সাহায্য প্রার্থনা করে। বৃহাদ ও ধর্মসংক্রান্ত কলহের নিবৃত্তি করিতে পারেন নাহ। ইঁহার নৈশ্চল কুলী নানক স্থানে শত্ৰুগোত্রদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন।

ইঁহার পর হুসেন নিজামশাহের ছুঁহিতা সুলতানা চাঁদ-বিবির শাসনকালই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই অসাদারণ গুণ-শাসিনী রমণী বেক্রমে মোগলদিগের বিরুদ্ধে স্বরাজ্যরক্ষার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের একটা অরূপ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত। [ বিস্তারিত বিবরণ চাঁদবিবির পক্ষে দেখা। ]

চাঁদবিবির পরবর্তিকালের নিজামশাহী ইতিবৃত্ত ঐ রাজ্যের সচিবদিগের কাব্যকলাগেহ পরিপূর্ণ। আক্‌দনগর মোগলদিগের হস্তগত হইলে পারিণত্বগে নিজামশাহী রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে মালিক অধর নানক একজন অতি বুদ্ধিমান বিখ্যাত সদ্‌গতির চেষ্টায় নিজামশাহী-রাজ্যের বিনষ্টপ্রায় গৌরব কিছুদিনের জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের আত্মবিগ্রহের সুযোগে সূচর মরাঠাদিগের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিশেষরূপেই বৃদ্ধি পায়। মরাঠাদিগের সহায়তালাভ করিয়াই মালিক অধর বছদিন ধ্যানস্ত নিজাম-শাহী অস্তিত্বরক্ষার সমর্থ হইয়াছিলেন। শিবাজীর পিতামহ মালোজী ডোমলে ও মাতামহ লুখজী বাদব রাও এই সময়েই কিছু পূর্বে হুঁতে নিজামশাহী-দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া-ছিলেন। বিজাপুরের আদলশাহী দরবারেও মরাঠা সর্দার-গণ আপনাদিগের প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠার পশ্চাত্তপদ হন নাহ।

মোগল-নামাট্ট অকবর আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে নিজামশাহী-রাজ্যের আশ্রয় অচরহ বিলুপ্ত হইত, সন্দেহ নাহ। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ঘটায় ও জাহাঙ্গীর দিৱার সিংহাসন-অধিকার বিষয়ক কলহে লিপ্ত হওয়ায়, মালিক অধর মরাঠা মুসলমান সর্দারদিগকে সংগ্রহপুষ্টক মোগল-প্রতিনিধি ও ক্ষত্রিয় স্বনামধান্যের পরাভবগাথন এবং আক্‌দনগর নুরাধিকার করেন। অতঃপর তিনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ

সংস্কার ও প্রজার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন। প্রজাহিতৈষী বলিয়া অথপি দক্ষিণাপথে তাঁহার নাম বিদ্যোষিত হইয়া থাকে। ভূমিকর সম্বন্ধে তিনি প্রজার হিতকর যে সকল সংস্কারের প্রবর্তন করেন, তাহাতেও মবাজী আনন্দ রাও, শিবাজী পঞ্চ মুংসুদী ও সখারাম মোকাশী প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় কণ্ঠচারীরা তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সহায়তা করিয়া অনর-কীর্তি লাভ করেন। মালিক অধর ইঁহার পদ পদ্ধতির উন্নয়ন করায় প্রজাকুল অতিশয় সুখী হয়। খাজনা আদায়ের ভার এক্ষণে কণ্ঠচারীদিগের হস্তে তুল্য করাই মালিক অধরের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই সকল নূতন ব্যবস্থার ফলে প্রজাগণ সুখী ও সমৃদ্ধ হওয়ায় মালিক অধর অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন।

জাহাঙ্গীর আক্‌দনগর জয় করিবার জন্য আবার সৈন্তপ্রেরণ করেন। এই সময়ে মালিক অধর গুজরাতির মোগল স্বে-দার আবহুয়া থাকে পরাস্ত কবিলেন। মোগলেরা তখন ভেদনাতি অবলম্বন করিয়া বিজাপুরের আদিলশাহী সুল-তানকে ও অনেক মরাঠা-সর্দারকে মালিক অধরের পক্ষত্যাগে সম্মত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিকুপায় মালিক অধরকে কাজেই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল। ফলে মোগলেরা আক্‌দনগর ও তৎসমাপবর্তী প্রদেশসমূহ প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহার পর শাহজাহান সৈন্তে কাশ্মীর অভিযুখে আত্মদান কারয়াছেন দেখিয়া মালিক আধর মোগলদিগকে দাখণ্যাপ হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজামশাহী রাজ্যের উদ্ধার করেন। শাহজাহান আবার দক্ষিণে প্রতা-বৃত্ত হইলে মালিককে পরাজয় স্বাকার করিতে হয়। ইঁহার পর মালিক অধর আর মোগলদিগের সহিত বিগ্রহ করেন নাহ। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে অশ্রুতিবধ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শৌর্য, ওদার্য, জৈথরনিষ্ঠা, সদাচার ও অায়পরতা মহারাষ্ট্রবাসীর চিত্র আকর্ষণ করিয়াছিল।

মালিক অধরের পর তৎপুত্র ফতে খাঁ নিজামশাহী রাজ্যের কণ্ঠধাব হইলেন। তিনি পিতার আয় বুদ্ধিমান ও কাব্যদক্ষ ছিলেন না। তথাপি প্রজার রাজ্যরক্ষাবিষয়ে উঁহার বদ্ধ ছিল। কিন্তু অদূরদর্শী সুলতান অত্যাচার পরামশা-তা-দিগের অধুরোধে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এই ঘটনার নিজামশাহী রাজ্যের অত্যাচার বিখ্যাত সদ্‌গতির ভিত্ত হইলেন। লুখজী বাদবরাও ইঁহার পুর্বে একবার মোগল-দিগের পরাভবগাথন করিলেও এ সময়ে নিজামশাহী রাজ্য-রক্ষার চেষ্টাই করিতেছিলেন। কিন্তু সন্দেহচিত্ত সুলতান

তাঁহাকে গুপ্ত পরামর্শ করিবার ছলে আহ্বান করিয়া ঘাতক-হস্তে নিহত করেন। যাদব বাণেশ্বরের একটা যুবকপুত্র ছিল। সেও এই দৃষ্টিনাম্ব নিহত হয়। এই ব্যাপারে সমস্ত মরাঠা-সৈন্য নিজামশাহের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল। লুণ্ঠজীর ভ্রাতা মোগলদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহার জামাতা শাহজী ভৌঙ্গলে রাজ্যরক্ষাবিষয়ে হতাশ হইয়া পুণার চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রদেশ যথাসম্ভব হস্তগত করিতে লাগিলেন। তিনি নিজাম-শাহী ও আদিলশাহী উভয় রাজ্যেরই শাসনাধীন প্রদেশ-সমূহ দখল করিয়া প্রভু করিতে লাগিলেন। এদিকে মোগলেরা রাজধানী অধিকার করিলেন। এই সময়ে কাম্বজারীদিগের মধ্যে যিনি যে প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই প্রদেশেই স্বাধীনভাবে শাসনপণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মরাঠা-সম্ভারদিগের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে একতার সঞ্চার হইয়া-ছিল। শাহজী ভৌঙ্গলে ইহাদের মধ্যে মুখপাত্র ছিলেন। জুরর নগরে শ্রীনিবাস নারক নামক এক আমলদার ছিলেন। তিনি শাহজীর সাহিত মিলিত হইয়া শামগড় হস্তগত করিলেন। অতঃপর হহারা ক্রমশঃ সৈন্তসংগ্রহ করিয়া সম্রাটের হস্তে আত্মদমনগর ও দৌলতাবাদ পয্যন্ত প্রদেশ আপনাদিগের শাসনাধীন করিয়া লইলেন। শাহজী বিজাপুর রাজ্যের যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার করিবার জন্ত বিজাপুরপতি মুরার রাও নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সেনাপতির অবদানতায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদলের চেষ্টায় পুণা অঞ্চলের বহু ক্ষতি সাধিত হয়।

এই সময়ে খান-জহান লোদী উত্তর-ভারতে দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মহারাষ্ট্রে পলাইয়া আসেন। শাহজী প্রভৃতি মরাঠা সম্ভারেরা লোদীর সাহিত মিলিত হন। কিন্তু বাদশাহী সৈন্য দণিণাপথে উপস্থিত হইলে তাঁহারা লোদীকে পরিত্যাগ করিয়া শাহ-জহানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহজী মোগল সম্রাটের অধীনতায় পঞ্চহাজারী মনসবদারী প্রাপ্ত হইলেন। নিজামশাহ লোদীকে আশ্রয়দান করায় মোগলেরা তাঁহার পরাজয় সাধন করিলেন। ঠিক এই সময়েই (১৬২৯ খৃঃ অঃ) মহারাষ্ট্রে দুই বৎসর-ব্যাপী অনাগুষ্টি হওয়া ঘোর ভূভিক্রপাত হইল। তাহাতে বহু সংখ্যক লোক অনাহারে মরিল, দেশ প্রায় গবাদি শূন্য হইল। অনেকে দেশত্যাগ করিয়া আশ্রয়ক্ষা করিল। যাহারা দেশে রহিল, তাহারা ভয়ঙ্কর মহামারীর প্রকোপে পঞ্চত পাইল। এদিকে মোগলেরাও দেশ উৎসাদন করিতে লাগিল। নিরুপায়

নিজামশাহ ফতেখাকে কারামুক্ত করিয়া পুনরুদ্ধার তাঁহাকে মন্ত্রিস্ব দান করিলেন। ফতেখা মুক্তলাভ করিয়াই সুলতানকে বন্দী করিয়া হত্যা করিলেন। সুলতানের প্রিয়তম সন্দার-দিগের অনেককেই এই প্রসঙ্গে প্রাণ হারাইতে হইল। ফতেখা এইরূপে দুষ্কাণ্ড করিয়াও স্বয়ং রাজ্যভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজামশাহী রাজ্যধন সহ মোগলদিগের শরণাপন্ন হইলেন।

ফতেখার এই সকল কাণ্ডে শাহজীর হৃদয়ে যুগাব উদ্বেক হইল। তিনি নিজামশাহী রাজ্যের জন্ত বিজাপুরের আদিল-শাহী সুলতানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সাহায্য-প্রাপ্তিমাত্র তিনি দৌলতাবাদ দুর্গ মোগলদিগের হস্ত হইতে পুনরায় গ্রহণের জন্ত অভিযান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। মোগলেরা নিজামশাহী-রাজ্যের শেষ উত্তরাধিকারী একটা দশমবর্ষীয় রাজপুত্রকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। (১৬৩৩ খৃঃ অঃ)

তথাপি শাহজী ভৌঙ্গলে নিরস্ত হইলেন না। তিনি ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত মোগলদিগের সহিত কলহ করিয়া নিজামশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি বেকপ আলোকিক শৌর্য ও সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন, সামদানভেদদণ্ডাদি নীতির বৈকল্য দক্ষতার সহিত প্রয়োগ করেন, তাহাই তদীয় অল্পবয়স্ক পুত্র শিবাজীর পক্ষে উদাহরণস্বরূপ হইয়াছিল। শাহজী সহাদির পাদ-দেশাহিত দুর্গম প্রদেশ হস্তগত করিয়া তথা হইতে মোগল-দিগের বিরুদ্ধাচরণের ব্যবস্থা করিলেন। যথাসম্ভব যুদ্ধায়াজন সম্পন্ন হইলে তিনি রাজবংশীয় এক দশম বর্ষীয় বালককে নিজামশাহী রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণাপূর্বক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং বহুসংখ্যক পুত্রিমান ও কাণ্ডাক্ষ বাহিনীর সহায়তায় রাজকাণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। অজ্ঞানদের মধ্যে সমগ্র কোঙ্কণ-প্রদেশ সহ নিজাম-শাহী রাজ্যের অধিকাংশ শাহজীর হস্তগত হইল। মোগল-দিগের পক্ষে আবার দাখিণাত্যবিজয়ের জন্ত বিশেষরূপে সমরায়োজন করা আবশ্যক হইয়া উঠিল।

শাহজীর অব্যবসায় ও কাণ্ডকলাপ-দর্শনে দিল্লী হইতে শাহ জহান স্বয়ং সমরক্ষেত্রে কাণ্ডাক্ষপরিচালন জন্ত দাখিণাত্যে আগমন করিলেন। সাগরপ্রায় মোগলবাহিনীর আগমন-দর্শনে শাহজী বিজাপুরের সুলতানকে মোগলদিগের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধিত করিলেন। সুলতান মুরারপুত্র ও রণদুস্তা খাকে শাহজীর সহায়তার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদিন যুদ্ধের পর দিল্লীস্থর বিজাপুরপতিকে জানাইলেন যে, শাহজীকে

পরিভাগ করিলে মোগলসৈন্য বিজাপুর অধিকার করিবে না। সুলতান প্রথমে সে কথাই কর্ণপাত করেন নাই। শাহজী দ্বার সৈন্যদ্বিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিলেন এবং অব্যবস্থিত যুদ্ধনীতির অবলম্বনে মোগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, পক্ষান্তরে মোগলেরাও শাহজীকে অপদস্থ করিতে ক্রটি করিলেন না। সৈন্যদংখ্যার আধিক্যবশতঃ পরিশেষে মোগলেরাই সর্বত্র বিজয়শ্রী লাভ করিতে লাগিলেন। তাহার বিজাপুর-রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করার আদিলশাহ শাহজীকে পরিভাগপূর্বক শাহ-জাহানের সহিত মিলি করিলেন। শাহজী কোকণে গিয়া আশ্রয় লইলেন। মোগলেরা সেখানেও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি ক্রান্ত হইয়া দিল্লীখরের সহিত বিরোধ পরিভাগ করিলেন। মোগলদিগের অধীনতায় মনসবদারী করিবার তাহার বাসনা ছিল। কিন্তু শাহ-জাহান সে প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে বিজাপুরপতির দরবারে থাকিবার অনুমতি দান করিলেন। মোগলেশ্বর নিজামশাহী-বংশের শেষ বংশধরকে (১৬৩৭ খৃঃ অঃ) বন্দী করিয়া আগ্রায় লইয়া গেলেন। এইরূপে নিজামশাহী-বংশের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

আদিলশাহী-বংশ।

এই বংশের আদিপুরুষ যুসুফ আদিলশাহ কনষ্টানটিনোপুলের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভাগ্যদোষে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত ও দাসদিগের সহিত গোপনে বাস করিতে বাধ্য হন। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সামান্য বৈশে ভারতে উপস্থিত হইয়া বাঙ্গালী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ গবানের অধীনতায় কর্মগ্রহণ করেন। অল্প দিবসের মধ্যে কার্যদক্ষতা-বলে তাঁহার পদোন্নতি ঘটে। ইনি বিজাপুরে সুবাদারী কালে, মহম্মদ শাহ বাঙ্গালীর মৃত্যু ঘটায়, স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। যুসুফ আদিলশাহের চেষ্টায় বিজাপুর নগর সৌধমালায় সুশোভিত হয়। শিয়াপন্থী মুসলমানদিগকে তিনি আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। পণ্ডুগীজদিগেব নিকট হইতে গোয়া নগর তিনি পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। শৌর্য, বিত্তা, ও ব্যবহারচাতুর্য্যগুণে এবং রাজনীতিজ্ঞতায় এক মহম্মদ গবান ভিন্ন সেকালে কেহই যুসুফের সমকক্ষ ছিল না। তিনি মুকুন্দ রাও নামক জনৈক মরাঠা-সদ্বারের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হিন্দু জ্ঞীর প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। ইহারই গর্ভ-জাতপুত্র ইসমাইল পরে সিংহাসনের অধিকার লাভ করেন। মধ্যমবয়সে যুসুফের অনেকটা সমদৃষ্টি ছিল। হিন্দুদিগকে বিশেষতঃ মরাঠাদিগকে তিনি বশেষে প্রিয় দিতেন। যোগ্যতা

দেখাইয়া অনেক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাঁহার রাজ্যে উচ্চপদের অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজদরবারে ও সরকারী কাগজপত্রে পারস্তভাষার পরিবর্তে যুসুফ মরাঠা ভাষা চালাইবার আদেশ করিয়াছিলেন। আন্ধদনগর, শোলাপুর, পারিণ্ডা, মীরজ প্রভৃতি সুদূরদূর অত্যাধি তাঁহারই কীর্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। ১৫১০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইসমাইলের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে মুকুন্দ রাওয়ের ভগিনী বিশেষ দক্ষতাসহকারে রাজ্যশাসন ও বিদ্রোহী মুসলমানদিগের দমন করেন। দক্ষিণাঞ্চলের সকল সুলতানেরা সমবেত হইয়া অভিযান করিয়াও ইসমাইলের পরাজয়সাধনে সমর্থ হন নাই। বিজয়নগরের রাজার সহিত যুদ্ধেও বিজাপুরপতির কিয়দ্বিবস অতিবাহিত হইয়াছিল। ইসমাইল চম্পামহাল ও মুদগলের ভ্রম নিষ্কাশন করিয়াছিলেন। ২৬ বৎসর রাজত্ব ও যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া ইনি ইহধাম পরিভাগ করেন। ত্রায়পরায়ণ, দূরদর্শী ও দয়ালু বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

ইসমাইলের পুত্র ইব্রাহিম ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রাপ্ত হন। শিয়াদিগকে বিভাঙিত করিয়া সুন্নাদিগকে আশ্রয় দান করেন। ইসমাইল পারস্তভাষায় দপ্তর রাখিবার যে আদেশ দিয়াছিলেন, ইব্রাহিম তাহা রহিত করিয়া পুনরায় দরবারে মরাঠা ভাষা প্রবর্তিত করিলেন। কাজেই রাজকর্মচারীদিগের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এই সময় হইতে বিজাপুর-দরবারে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে। নিম্নালকর, ঘাটগে, ঘোরপড়ে, ডফলে, মানে ও সাবস্ত প্রভৃতি মরাঠা-পরিবারগুলির গৌরবরবি এই সময়ে উদ্ভিত হয়। নিজামশাহ, কুতবশাহ, ও বিজয়নগরের রাজার সহিত ইব্রাহিমকেও যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। বিজয়নগরের রামরাজার সহায়তায় নিজামশাহ, ইব্রাহিম আদিল শাহের পরাভবসাধন করিয়াছিলেন। পণ্ডুগীজেরা এই সময়ে গোয়া হইতে মীরজ পর্যন্ত অশেষসমৃদ্ধ উৎসাদন করিতেছিল, তৎকালে ইব্রাহিমের চেষ্টায় তাহাদিগের দমন হয়। শেষবয়সে ছরাচার ও উন্নত হইয়া ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

আলী আদিলশাহ ইহার পর বিজাপুরের সুলতানপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার চেষ্টায় সুপ্রাচীন বলবৈভবপূর্ণ বিজয়নগররাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। আলী সংকার্যে অনেক ধন ব্যয় করেন। গগনমহাল, জুহামসজিদ, শাহবুরুজ, মহাবুরুজ প্রভৃতি বিজাপুরের স্থাপত্য কাব্যগুলি আলী আদিল শাহের যত্নে নির্মিত। ইতিহাস-প্রসিদ্ধা টাদ

বিবি ইহারই সহধর্মিণী। ইহার সময়ে শিরা-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা আবার প্রতিপত্তি লাভ করেন, তথাপি মরাঠা-দিগের শক্তি হ্রাস হয় নাই। ইহার রাজস্ব-বিভাগের সর্বোচ্চ পদে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পর আলৌর ভাতুপুত্র ইব্রাহিম- ( দ্বিতীয় ) শাহ সিংহাসনারোহণ করেন ( ১৬৮০ খৃঃ অঃ )। ইহার রাজ্যকালে প্রজাগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। ইব্রাহিম বিলাসী ও গীতবাত্তপ্রিয় হইয়াও শূর এবং অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন। ধর্মবিষয়ক জ্ঞান ও সমদর্শিতাশূণ্যে ইনি লোকসমাজে “জগদগুরু” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ টোডর-মল্লের প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থা এই সুলতানের চেষ্টায় বিজাপুর-রাজ্যে সর্বত্র প্রচলিত হয়। রাজ্যের সামরিক ও অপর্যাপ্ত বিভাগে মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে ইব্রাহিম বহু পরিমাণে স্থান দান করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্মোপাসকেরাও তাঁহার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হয় নাই। ধর্মবিষয়ে সম্রাট অকবরের অপেক্ষাও অনেকে ইঁহাকে অধিকতর সমদর্শী বলিয়া মনে করেন। সুদৃশ্য সৌধনির্মাণেও তাঁহার বিশেষ যত্ন প্রকাশ পাইয়াছিল। বিজাপুরে ৫২ লক্ষ মুদ্রা-ব্যয়ে তিনি একটি ভাস্করশিল্পের আদর্শস্বরূপ মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার নির্মাণকার্য্য ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই সুলতানের রাজত্বকালে আকবরনগরের নিজামশাহের সহিত আদিলশাহী সৈন্তের একবার সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ইব্রাহিমের জয়লাভ ঘটে।

ইব্রাহিমের পুত্র মহম্মদ আদিল শাহের শাসনকাল ( ১৬২৬—১৬৫৬ খৃঃ ) দক্ষিণাপথের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্রের হিন্দুরাজশক্তিকে বিদলিত করিয়া মুসলমানেরা দেশবাসীকে পরাধীনতাশাশে বদ্ধ করিলে, দীর্ঘকাল বিজাতীয়ের পাছকা বচন করিয়া এই সময়েই মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আরম্ভ করেন। রাজনীতিকুশল মোগলসম্রাট অকবর ও শাহজহানও এক সময়ে মহারাষ্ট্র-বাসীর উপর আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু তথাপি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয় রহিত হয় নাই।

মহম্মদ আদিলশাহের শাসনকালের প্রারম্ভেই বঙ্গাপুরের শাসনকর্ত্তা কদম রাও নামক জনৈক মরাঠা বিদ্রোহবোধণা করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সুলতান তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করিয়া তাঁহার বিনাশসাধন করিলেন। ইহারই আমলে শাহজহান নিজামশাহী রাজ্যের বিনাশসাধন করিয়া আদিলশাহী প্রাসাদের চেষ্টাও করিতেছিলেন। মুরার রাও

প্রভৃতি কয়েকজন মরাঠা-জাগীরদার নিজামশাহী স্বাক্ষর জন্ত চেষ্টা করিতে মহম্মদকে পরামর্শ দেন। শাহজী ভৌঁসলে এই সময়ে নিজামশাহী স্বাক্ষর জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে ছিলেন। নুর-জাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর অধীনতায় মোগল-লেরা বিজাপুর অবরোধ করিলে মুরার রাও তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, মোগলদিগকে বিজাপুরের সীমা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়। মুরার রাও পারিগা হুগে গিয়া “মুন্ড-ই ময়দান” বা রণভূমির রাজা নামক যে প্রসিদ্ধ কামান ছিল, তাহা বিজাপুরে আনয়ন করেন। এই হুগে পুঙ্খ নিজামশাহের অধীন ছিল। নিজামশাহের আদেশেই এই প্রকাণ্ড তোপ আকবরনগরের নিকটে ঢালাই হইয়াছিল। ইহা ওজনে অনানু চারি শত মণ ভারী। তালিকোটের যুদ্ধে এই তোপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা ১৪ ফিট দীর্ঘ ও ঐ পরিমাণ পরিধি বিশিষ্ট। দুই ফিট চারি ইঞ্চি ব্যাসের লোহাগোলক এই তোপের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত। বিজাপুরের লোহা এখনও এই তোপের পূজা করে। কড়কবিজলী নামক আর একটি তোপ বিজাপুরে আনয়ন করিবার ভারও মুরার-রাওয়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু পথি মধ্যে তাহা কৃষ্ণানদীতে নিমজ্জিত হয়। অত্যাধি কৃষ্ণাগর্ভে উহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

আসফ খাঁর পরাভবের পর শাহজহান মহব্বৎ খাঁকে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। মহব্বৎ খাঁ দোলতাবাদ আক্রমণ করিলে আদিল-শাহের পক্ষ হইতে মুরার রাও ও রণজুমা খাঁ নিজামশাহের সহায়তার জন্য প্রেরিত হন। তখন প্রচণ্ড বাদশাহী সেনা বিজাপুর রাজ্য আক্রমণে প্রবৃত্ত হইল। এই বিপত্তিকালে শাহজী ভৌঁসলের স্ত্রায় রাজকায়ধুরন্ধর ও বুদ্ধিমান সর্দারের সহায়তা মহম্মদ আদিলশাহের নিকট আবেদন করিয়া মনে হইল। শাহজীর নিকট তখন ১২ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্ত ছিল। শাহজীর পক্ষেও একাকী মোগলদিগের বিরুদ্ধে অধিক ক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা সম্ভবপর ছিল না। এই কারণে তিনিও বিজাপুরপতির সহিত সন্ধ্যস্তাপন করিলেন। এতদ্বয়ের সন্মিলনে মহব্বৎ খাঁকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে মুরার রাওয়ের শক্তি বহুপরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া মহম্মদ আদিল শাহ গোপনে তাঁহার বধ সাধন করেন। ইহার পরও শাহজী ও রণজুমা খাঁ মোগলদিগকে কিছু দিন পর্য্যন্ত বিরত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে মোগলেরা শাহজীকে অজয়িত ও নিজামশাহী বিনষ্ট করিলে, মহম্মদ



শাহ মোগলদিগকে করদান করিতে স্বীকৃত হইয়া শাহজহানের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন।

মোগলদিগের সহিত সন্ধির পর আদিলশাহ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবিধানে মনোযোগী হইলেন। কর্ণাটকের বিদ্রোহী জমিদারদিগকে বশীভূত করিবার জন্য তিনি রণভূমি খাঁ ও শাহজী ভৌঁসলেকে প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরে কর্ণাটকের শাসনভার শাহজীর হস্তেই সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়। শাহজী কর্ণাটকে একটি স্বতন্ত্র হিন্দু রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু তাহার কাথোর গতি অতীব দীর্ঘ ও সতর্কতাপূর্ণ ছিল। পঞ্চাশত্রে শাহজীর পুত্র শিবাজী ও ঘাটমাথার মাঝলদিগের সহায়তায় পুণার নিকটবর্তী প্রদেশ হস্তগত করিয়া স্বাধীন মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। তাহার তরুণ জুদয়ের অসীম তেজোবলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই এক একটি করিয়া বহু সংখ্যক দুর্গ জয় করিলেন। পরিশেষে প্রকাশ্য ভাবেই বিজাপুরপতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন, কাজেই বিজাপুরের সুলতান তাহার দমনের চেষ্টা করিতে ছিলেন। এদিকে মুস্তাফা খাঁ নামক জনৈক সন্দারের সহিত শাহজীর মনোমালিঙ্গ ঘটিল। কতকটা সেই কারণে ও কতকটা পুত্রের অপরাধের জন্য তিনি সুলতানের আদেশে তিন বৎসর কাল বন্দীভাবে বাপন করিতে বাধ্য হন। অল্প বয়স্ক শিবাজী মোগলসম্রাটের নিকট হইতে অনুরোধ পত্র আনিয়া পিতার মুক্তি সাধন করিলেন (১৬৫৩ খৃঃ)।

ইহার পরও শিবাজীর দমনের জন্য আদিলশাহের চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু তাহা সফল হইবার পূর্বেই তিনি ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার শাসনকালে বিজাপুর নগর অত্যন্ত বিস্তৃত ও সৌন্দর্য্যভূষিত হইয়াছিল। তিনি বিলাসী হইলেও প্রজারক্ষায় উদাসীন ছিলেন না। আড়াই লক্ষ পদাতি, ৮০ হাজার অশ্বসাদী ও ৫ শত হস্তা ইত্যাদি অশ্বসামগ্রী সর্বদা সজ্জা প্রস্তুত থাকিত। বিংশতি কোটি মুদ্রা ইহার রাজস্ব সময়ে রাজস্ব আদায় হইত। বিজাপুরের একটি মসজিদের গম্বুজ ইহার আদেশে একরূপ বৃহত্ত্বায়ে নিশ্চিত হইয়াছে যে, তাহার ভাষ্য বৃহৎ গম্বুজ পৃথিবীর কোথাও দৃষ্টগোচর হয় না। ইহার নিশ্চয়কুশলতা দর্শনে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফাওসন বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য স্থাপত্য-বিজ্ঞানও ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য।

মহম্মদ শাহের পর তৎপুত্র আলী (দ্বিতীয়) আদিল শাহ বিজাপুরের সিংহাসন লাভ করেন। এই কার্যে তিনি মোগল-সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া রাজকুমার

অরঙ্গজেব দক্ষিণপথে অবেদাররূপে বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধব্যাপার শেষ হইবার পূর্বে দিল্লী হইতে শাহজহানের কঠিন পীড়ার সংবাদ আসায় অরঙ্গজেব সুলতানের সহিত সন্ধি করিয়া দ্রুতপদে উত্তরভারত-অভিমুখে গমন করেন।

এই সময়ে আদিলশাহী-রাজ্যের দুইটি শত্রু বিশেষ প্রবলতা লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথম শিবাজী ভৌঁসলে ও দ্বিতীয় মোগলসম্রাট অরঙ্গজেব। নিজামশাহী রাজ্য মোগলেরা যখন বিনষ্ট করেন, তখন উহার একাংশ বিজাপুরপতিদিগের অংশে পড়িয়াছিল। পুণা ও সুল্লা পরগণা এবং কোঙ্কণের অধিকাংশ হাজার অন্তর্ভুক্ত। প্রথমোক্ত পরগণা দুইটা শাহজী বিজাপুরের সুলতানের নিকট জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন। কর্ণাটকে শাহজীর নিয়োগ হইলে তাহার (পুণা ও সুল্লা) শাসনকার্য্য-পরিচালনের ভার শিবাজীর হস্তেই পতিত হয়। এতদুভয় প্রদেশ নূতন ভাবে নিশ্চিত ও সুরক্ষিত হইল। শিবাজী ক্রমশঃ নূতন প্রদেশ জয়-পুষ্টক স্বাধীন মহারাষ্ট্ররাজ্য-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সময় থাকিতেই শিবাজীর দমন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আলী আদিল শাহ দাদশ সহস্র সৈন্যসহ আফজল খাঁ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ সেনানীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। শিবাজীর হস্তে আফজল খাঁকে প্রাণ হারাইতে ও তাহার সৈন্যদিগকে পরাস্ত হইতে হইল। (১৬৫৯ খৃঃ অঃ) পরবর্তী বর্ষে আদিল সিদ্দিকজোহার নামক আর একজন সেনাপতিকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু শিবাজী কোশলে তাহাকে বশীভূত করায় আলী আদিল শাহ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন। সে অভিযানের ফলে, পাজালা নামক দুর্গটা শিবাজীর অধিকারচ্যুত হইয়া সুলতানের হস্তগত হইল; কিন্তু দুর্গ হইতে শিবাজী পলায়ন করিয়া দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে প্রাণ্য গ্রহণ করায় সুলতানকে নিরুপায় হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল।

ইহার পর সিদ্দিকজোহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। সুলতান তাহাকে শাসন করিতে না করিতে বেদনুর অঞ্চলে তদ্রূপ নামক এক জমিদার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। আলী তাহাকেও দমন করিলেন। কিন্তু এদিকে শিবাজীর শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মোগলেরাও তাহাব কার্য্যকলাপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার বিনাশের জন্য মোগল-পাঠান এক হইল। একবারে একদিক হইতে মোগলপক্ষীয় জয়সিংহ ও অন্নাঙ্গ হইতে বিজাপুরপক্ষীয় খাবাস খাঁ শিবাজীর শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর

হইলেন। শিবাজীর মরাঠা-সৈন্য অসাধারণ শৌর্যপ্রকাশ করিয়াও এই ঘোর সঙ্কটে বিজয়শ্রী লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মোগলদিগকে বিজাপুর অধিকারে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। মোগলসম্রাট শিবাজীর সহায়তায় বিজাপুর রাজ্য বিলুপ্ত করিবার আদেশ দিলেন। মোগলসৈন্য বিজাপুররাজ্য উৎসাদন করিতে লাগিল। আলী আদিল শাহ যথাসম্ভব যুদ্ধসজ্জা করিলেন। সর্জা খাঁ ও খাবাস খাঁ নামক তাঁহার দুই প্রধান সেনাপতি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই বিপৎকালে কুতবশাহ বিজাপুর-পতির সহায়তায় অগ্রসর হইয়া জয়সিংহকে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত ও মোগল-সৈন্যদিগকে নিতান্ত জর্জরিত হইতে হইল। একটা যুদ্ধে সর্জা খাঁ নিহত হইলেও বিজাপুরীসৈন্য মোগল-দিগের পরাজয় সাধন করিল। জয়সিংহ পরবর্তী একটা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ হইতে বহুকষ্টে রক্ষা পাইয়া দিল্লী-অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

এইকপে আলী আদিল শাহ তাঁহার আমলে প্রাণপণ চেষ্টায় রাজ্য রক্ষা করিয়া ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি ভোগবিলাসপরায়ণ হইয়াও প্রজাপালনে অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি স্বয়ং কবি ও বিদ্বানদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন। বিজাপুর-দরবারে সচিবদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘোর ঈর্ষ্যা ছিল। কিন্তু আলীর গুণে সে সমস্ত তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকটিত হইবার অবসর পায় নাই। শিবাজীর বিদ্রোহসত্ত্বেও অনেক মরাঠা-সদর ও বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ-গণ তাঁহার আশ্রয়ে বঞ্চিত হন নাই।

সিকন্দর আলী আদিল শাহ এই বংশের শেষ নরপতি। পিতার মৃত্যুকালে হান ৫ম বর্ষীয় ছিলেন। কাজেই দরবার কন্সচারাদিগের অন্তর্নিপ্পত্ত অতীব বুদ্ধি পাইয়া সর্বত্র গোল-যোগ উপস্থিত হইল। সচিবদিগের আত্মকলহে শত্রুপক্ষের বিশেষ সুবিধা হইল। শিবাজী পাছালা ছুগ পুনরধিকার করিলেন। বহুলোল খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে ক্রিয়ণ পরিমাণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। খাবাস খাঁ মোগলসুবেদার বাহাদুর খাঁর সহিত কৌশলে সন্ধিস্থাপন করিলেন। কিন্তু দরবারী সচিবদিগের আত্মবিগ্রহের ফলে এ অবস্থা অধিকদিন স্থায়ী হইল না। পাঠান-সৈনিকেরা বেতন না পাওয়ায় দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ করিল। মোগল-সদর দিলের খাঁ সময় বুঝিয়া বিজয়পুর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তখনও আদিলশাহী-রাজ্যের কিঞ্চিৎ পরমাণু অবশিষ্ট ছিল। এই কারণে শিবাজী মোগলদিগের কার্যকলাপে

বাধা দেওয়া আবশ্যক বোধে বিজয়পুর-দরবারকে দিলের খাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। ফলে মোগল-সদরকে অপবশের ভাগী হইয়া পলায়ন করিতে হইল।

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অরঙ্গজেব দক্ষিণ-বিজয়ের জন্ত সৈন্যে আগমন করিলেন। শিবাজীর পুত্র সাজাজী তখন পৈতৃক নীতির অনুসরণ করিয়া বিজয়পুরকে সহায়তা করিতে ছিলেন। সিকন্দরের বয়স তখন ১৬ বৎসর। দরবারে বুদ্ধিমান কন্সচারী তখন কেহই ছিলেন না। নগরবাসীরাও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং যখন অরঙ্গজেব নগর অবরোধ করিলেন, তখন চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। সুলতান সিকন্দর নিরুপায় হইয়া মোগল-সম্রাটের শরণাপন্ন হইলেন। অরঙ্গজেব তাঁহাকে বাধিক এক লক্ষ টাকার বৃত্তিদান করিয়া অরঙ্গাবাদের ছুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিজাপুর রাজ্য ১২৭ বৎসর আত্মগোপন রক্ষা করিয়া ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর মোগলরাজ্যভুক্ত হইল। অরঙ্গজেব হতভাগ্য সিকন্দরকে ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বিষপ্রদান করিয়া ইহজগৎ হইতে আদিলশাহীবংশের অন্তিম পর্যন্ত বিলুপ্ত করিলেন।

কুতবশাহী-বংশ।

কুতবশাহী-বংশ গোণকোণ্ডাপ্রদেশে ১৫১২ হইতে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই প্রদেশ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত না হইলেও এখানকার সুলতানগণের অধীন থাকিয়া অনেক মহারাষ্ট্রীয় পরিবার বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয় জাতির যে অভ্যুদয় হয়, তাহার সহিত এই সকল মরাঠা-পরিবারের বহুপরিমাণে সংশ্লিষ্ট ছিল। একারণে সংক্ষেপে এই রাজবংশ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা এতলে বলা আবশ্যক।

কুলী কুতবশাহ এই বংশের আদি পুরুষ। তিনি বান্ধণী সুলতানের সদর ও সুবেদার ছিলেন, পরিশেষে উক্ত সুলতানের ভীকতা অনুভব করিয়া স্বাভাব্য ঘোষণাপূর্বক গোণকোণ্ডায় একটা পৃথক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তৈলঙ্গের হিন্দু-রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের স্বাভাব্যহরণে তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়।

ইহার কনিষ্ঠ পুত্র জমশাদ কুতবশাহের আমলে মহারাষ্ট্রীয়গণ দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন। জমশাদের সহায়তাকারী সেনাপতিদিগের মধ্যে জগদেব রাও নামক এক মরাঠা-সদর বিশেষ অসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সুলতান ইব্রাহিম কুতবশাহের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে যে গোণযোগ উপস্থিত হয়, জগদেব রাও তাহাতে ইব্রাহিমকে

সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনিই ইব্রাহিমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যাধিক হয় না। এই কারণে ইব্রাহিম কুতবশাহ জগদেব রাওকে স্বীয় প্রধান মন্ত্রীর পদ দান করিয়া পুরস্কৃত করেন। এই সময়ে রায় রাও নামক আর একজন মরাঠা-সর্দার স্বীয় কার্যদক্ষতা প্রকাশ করিয়া সুলতানের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। এই দুই জন সর্দারের যত্নে গোলকুণ্ডার দরবারে ও সামরিক বিভাগে বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্রীয়ের প্রবেশ লাভ হয়। মুসলমান-সর্দারেরা তদর্শনে অতীব অসন্তুষ্ট হন এবং সুলতানের নিকট মরাঠা-সর্দারদিগের সর্বদা নিন্দা করিতে থাকেন। সুলতান সে বিষয়ে প্রথমে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। কিন্তু পরিশেষে বিচলিত হইয়া রায় রাওয়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। তখন জগদেব রাও তথা হইতে পলায়নপূর্বক নিজাম শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সেখানেও তাঁহার প্রতিপত্তি এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, স্বয়ং নিজামশাহও ভীত হইলেন। সমগ্র দেশ হস্ত-গত করিয়া মুসলমান-রাজবংশের বিলোপসাধনের যে বাসনা পরবর্ত্তিকালে মহারাষ্ট্র-সমাজে প্রবল হইয়াছিল, এই সময়ে তাঁহার সূচনা হয়। ক্রমশঃ জগদেব রাও এরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, বহুসংখ্যক মরাঠা, মুসলমান, আরব, ইরাণী ও হাবসি সৈন্য লইয়া তিনি কুতবশাহী রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু সে যুদ্ধে জগদেবেরই পরাজয় ঘটে। তখন তিনি আদিল শাহের অধীনতায় কার্য গ্রহণ করেন। তাঁহার পক্ষ অবলম্বনপূর্বক কুতবশাহও নিজামশাহকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে জর্জরিত করিয়া ফেলিলেন। দেশীয় জমিদারদিগের (নারকদিগের) সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি তৈলঙ্গের অন্তর্গত অধিকাংশ দুর্গ অধিকার করিলেন। তখন কুতবশাহ ভীত হইয়া জগদেবের সহিত সন্ধি ও সখ্যস্থাপন করিয়া সকল গোলযোগের নিবৃত্তি করিলেন। শিবাজী ও শাহজীর পূর্বে এই জগদেবের দ্বারা মহাপরাক্রমশালী মরাঠা-সর্দার আর কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে বিজাপুরের সুলতানদিগের আশ্রয়ে যে সকল মরাঠা সর্দার ছিলেন, তাঁহারাও কুতবশাহের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব করিতেন। ইব্রাহিম কুতবশাহের রাজ্যকালের শেষ ভাগে মুরার রাও নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। রাজনীতি-চাতুর্য্যে তিনি দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন।

ইহার পর আবু হসেন কুতবশাহের আমলে (খৃঃ ১৬৫৮-১৬৬৭) মরাঠাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। যখন-

পত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ এই সময়ে মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। মুরার পত্তের চেষ্টায় রাজ্যের বিভাগের সংস্কার ঘটায় প্রজাকুল অধিক স্থখী হইয়াছিলেন। মুসলমান কর্মচারীরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কুতবশাহ পরিশেষে মোগলদিগের হস্ত হইতে আশ্রয়কার ভ্রম শিবাজীর পুত্র সান্ত্বাজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। তাহাতে মোগলেরা অতীব ক্রুদ্ধ হয়। স্বয়ং অরজ্জব তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া গোলকুণ্ডা রাজ্য খাস করিয়া লইলেন।

জাতীয় অভ্যুদয়ের কারণাবলী।

দক্ষিণাপথে মুসলমানদিগের জিশত বৎসর রাজত্বকালের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইবার পরই যেরূপ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়ের বীজ উৎপন্ন হইল, পূর্বোক্ত ইতিহাসের অমুখাবন করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই কালের পূর্বে মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে কোনও প্রকার উচ্চ রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত করিতেন না। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থল বিজয়নগর রাজ্যকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া তাঁহারা হিন্দুশক্তির মূলক্ষয় করিতেছিলেন। তথাপি মহারাষ্ট্রদেশে তাঁহাদের শাসন স্থায়ী হইল না। যে সকল কারণে মুসলমানদিগের অধঃপতন ও মহারাষ্ট্রীয়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা এই,—

১ম, মুসলমান-সভ্যতা হিন্দুসভ্যতার উপর কখনই আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। স্থাপত্যশিল্প প্রভৃতি দুই একটি বিষয় ভিন্ন প্রায় কোনও বিষয়েই হিন্দুসভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি মুসলমানদিগের ছিল না। মুসলমান-সভ্যতা মহারাষ্ট্রের পল্লীসমাজ বা সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি জাতীয়ত্বের ভিত্তিসমূহের বিনাশ সাধন করিতে পারে নাই। মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষে মহারাষ্ট্র-সভ্যতা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া “বোগ্যতমের সংরক্ষণ” বিষয়ক নিয়মের বাধ্যতায় প্রতিপন্ন করিয়াছিল। মুসলমানেরাই বহু পরিমাণে হিন্দু সভ্যতার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

২য়, মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে হিন্দু-রমণীর পাণিগ্রহণ প্রায়শঃ পূর্ববর্ণিত ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে যে, সেকালে, বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন মুসলমানদিগের অনেকেই হিন্দুরমণীদিগের গর্ভজাত ছিলেন। বরং হিন্দু রমণীর গর্ভজাত সন্তানেরা যে পরিমাণে বুদ্ধিমত্তা ও কাব্যদক্ষতা দেখাইতে পারিয়া ছিলেন, দক্ষিণাপথে উপনিবিষ্ট মুসলমানদিগের বিস্তৃত বংশধরেরা ততদূর কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই বলিলেও ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হয় না। অনেক মুসলমান স্বজাতীয়

রমণী অপেক্ষা হিন্দু-রমণীর সহিত দাম্পত্যসম্বন্ধ স্থাপন অধিক-  
তর প্রেরণের বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপে দাম্পত্য-  
সংযোগে উৎপন্ন মুসলমানদিগের ক্ষমতায় হিন্দুবিষেবতার তাদৃশ  
প্রবলতালাভ করিতে পারিত না। অনেক প্রসিদ্ধ মুসলমান-  
সর্দার মূলতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে স্বধর্মত্যাগে বাধ্য হন; কিন্তু  
তখনও ইহাদিগের ক্ষমতায় হইতে হিন্দুজাতির প্রতি অসুযোগ  
একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বাক্ষগী রাজত্বের শেষভাগে এই-  
রূপ ঘটনা-বাহুল্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের মুসলমান-দরবারে প্রবে-  
শের সুবিধা হইল ও তাঁহারা সর্ববিধ রাজকাৰ্য্যে দক্ষতা-  
লাভের সুযোগ পাইলেন।

(৩) হিন্দুরমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া মুসলমানদিগের কয়েক  
পুরুষের মধ্যেই হিন্দুবিষেবতা বহু পরিমাণে বিলুপ্ত হইল।  
কিন্তু হিন্দুদিগের পক্ষে যবনীর পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ থাকার  
তাঁহারা কিছুতেই মুসলমানদিগের সহিত মিলিত হইতে পারি-  
লেন না। মুসলমানের প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক অসুযোগই  
দাম্পত্যসম্বন্ধ স্থাপনের কারণ হয় নাই; কাজেই সুবিধা  
পাইবামাত্র তাঁহারা মুসলমানদিগের উচ্ছেদসাধনে কিছুমাত্র  
দ্বিধাবোধ করিতেন না।

(৪) উত্তর-ভারতে বৈষ্ণব আফগানিস্থান ও ইরান হইতে  
স্বধর্মোন্মত্ত মুসলমানেরা দলে দলে আগমন করিয়া দিল্লীর  
মুসলমানদিগের হিন্দুবিষেব অক্ষুর রাখিতে পারিয়াছিলেন,  
কিন্তু মহারাষ্ট্রে সেরূপ ঘটিতে পারে নাই। উত্তর ভারতের স্তায়  
দাক্ষিণাত্যে ইরান প্রভৃতি দেশ হইতে নিত্য নূতন সৈন্য বা  
কর্ণচাঁদী আমদানি করিবার বিশেষ সুবিধা না থাকায় অল্প-  
দিনের মধ্যেই, বিশেষতঃ উত্তরভারতীয় মুসলমানদিগের সহিত  
রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছেদের অল্পদিন পরেই দাক্ষিণাত্য-মুসল-  
মানদিগকে রাজ্যশাসনব্যাপারে ক্রমশঃ মহারাষ্ট্রবাসীর সহা-  
য়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আদিম নিবাসের সহিত  
অনেকাংশ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুসলমানদিগকে অনেক  
বিষয়েই হিন্দু মরাঠাদিগের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

(৫) মুসলমানদিগের দরবারে উত্তরভারতে সর্বত্র  
পারিতোষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু পূর্বেই কারণে  
দক্ষিণাপথে তাহা হয় নাই—হইলেও উহা অধিক দিন স্থায়ী  
হইতে পারে নাই। দরবারে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রাবল্য লাভ  
করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় ভাব অক্ষুর থাকিবার  
ইহাও একটি প্রধান কারণ।

(৬) বাক্ষগীরাজ্যের প্রারম্ভ হইতে শিয়া ও সূফীদিগের  
বিবাদ, বৈদেশিক মুসলমানদিগের সহিত দাক্ষিণাত্য-মুসলমান-  
দিগের কলহ প্রভৃতি কারণে মুসলমানদিগের একতার বিনাশ।

(৭) বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্যের জন্ম মুসলমানদিগের  
বৈরাচ্যে আংশিক বাধা ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় ভাবের  
সংরক্ষণে আংশিক সহায়তা।

(৮) মহারাষ্ট্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও মরাঠাদিগের  
স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা। মহারাষ্ট্রের পরীসমাজ অনেকাংশে  
কৃত্রিম প্রজাতন্ত্রের স্তায়। যথাসময়ে সরকারি খাজনা প্রদান  
করিলে গ্রামের আভ্যন্তরীণ শাসনকাৰ্য্যে রাজার হস্তক্ষেপ  
করিবার অবসর পরীসমাজের ব্যবস্থাপণে কখনই ঘটিত না।  
এই কারণে দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিনাশহেতু মহা-  
রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য হারাইলেও পরীসমাজের গুণে  
তাঁহাদিগের নৈসর্গিক স্বাতন্ত্র্যোদ্ধার-অক্ষুর কখনই বিনষ্ট হয়  
নাই। কাণ্যদক্ষতা, অধ্যবসায়, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা  
প্রভৃতি গুণেও তাঁহারা ভারতীয় অনেক জাতির অপেক্ষা  
শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই কারণে রাজপুতদিগের স্তায় আপনা-  
দিগের প্রনষ্ট স্বাতন্ত্র্যের উদ্ধার করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন  
নাই, সমগ্র ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর  
হইয়াছিলেন।

এই সকল কারণ অধিকাংশ উত্তর-ভারতেও বিদ্যমান  
ছিল। তথাপি যে সেখানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্তায় আসমুদ্র  
হিমালয়বাপী হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা হয় নাই, শেষোক্ত  
দুইটি কারণের অভাবই তাহার প্রধান হেতু। মরাঠাদিগের  
স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও কাণ্যগুণের পরিচয় মুসলমান রাজ্যকালের  
ইতিহাসে অনেক স্থলেই পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এখানে  
ধর্ম ও সাহিত্যগত উন্নতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলেই  
মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুদয়ের অব্যবহিত কারণ পাঠকের  
হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মহারাষ্ট্র-ধর্মোন্নতি।

রাজপুত ও শিখদিগের স্তায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়  
ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় বা কেবল জাতীয় পৌরুষগুণে সংসাধিত  
হয় নাই। তাঁহারা অভিনব ধর্মামৃতপানে বলীমান হইয়া  
অভ্যুদয়পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগের চেষ্টা  
রাজপুত ও শিখদিগের অপেক্ষা অধিকতর সফলতা লাভ  
করিয়াছিল। ফলতঃ সমগ্র জাতির বহুদিনের শিক্ষা ও  
সাধনা বিভিন্নবর্ণের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্রমিক ধর্মোন্নতি ও  
বহুসংখ্যক অসাধারণ পুরুষের বাহবল ও অতুল বুদ্ধিবৈভব  
প্রভৃতির সমতার ফলে মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।  
এই কারণে তাঁহাদিগের উন্নতি রাজপুত ও শিখদিগের স্তায়  
একদেশীয় না হইয়া জগতের অপরাপর অসংখ্য জাতির  
স্তায় সর্বাঙ্গীণ ভাবে সাধিত হইয়াছিল। সুরোপিত বৃক্ষ

শৈশব পরিত্যাগপূর্বক বোম্বে পদার্পণ করিলে বেক্স জয়ন্তী সর্বভোতাধিব পদবিভিত ও পুণ্যকলে স্থপোষিত হইয়া দর্শকের নরনবিনোদনকর হয় এবং কিছুদিন পরে প্রতিভুল ক্ষুর সমাগমে কলপত্রস্ত হইয়া নিভেজভাবে ধারণ করে, সেইরূপ মহারাষ্ট্রীগণ মুসলমানগণের কবল হইতে উদ্ধার-লাভের পর মহারাষ্ট্রদেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ওড়ু কার্হ ও ধনগর (বৈদ্যপাল) এবং শূদ্রাদি বিবিধ জাতি পর্যায়ক্রমে উন্নতির সোপানে আরোহণপূর্বক অতুল ঐশ্বর্যের ও বহুবিস্তৃত ভূতানের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রায় সকল শ্রেণীতেই অসংখ্য সমরকুশল, দিগ্বিজয়ী বীর, অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন রাজনৈতিক ধর্মসংস্কারক, তগবদ্ভক্ত বোণী, স্বভাবজাত কবি ও সর্বাঙ্গসংস্কারক মহাপুরুষগণ অঙ্গগ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়-সত্যতার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টসাধন করিয়াছিলেন। এই বিশেষত্ব হেতু মহারাষ্ট্রীগণের সৌভাগ্য-গৌরব রাজপুত ও শিখ জাতির অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল। প্রকৃতির অলম্বনীয় নিয়মবশে পূর্ববর্ণিত বুদ্ধের জ্ঞান এক্ষণে উহা নিম্নস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম ভিন্ন কখন কোনও জাতির বা সাহিত্যের এরূপ সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও জীবন্তি হয় না। যে সকল কারণের সমবায়ে মহারাষ্ট্রদেশে আত্মাঙ্গ শূদ্রের এরূপ সর্ববিধগণী উন্নতি ঘটিয়াছিল, মহারাষ্ট্রদেশের ধর্মসংস্কার তাহাদিগের মধ্যে প্রথম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। মহারাষ্ট্রীয় জাতির অজ্ঞানদের ইতিহাস তাঁহাদিগের দেশের ধর্মোপদেষ্টা ভক্ত কবিগণের জীবনের কাব্যাবলীর সহিত অনিষ্টভাবে সম্বন্ধ। ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ হিন্দুজন্মের ধর্মভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন শ্রেণীত ইতিহাস গ্রন্থসমূহেও এসকল বিষয়ের সমাবেশ করিতে পারেন নাই। কাজেই আমরাগিকে এস্থলে যত্নরূপে এই বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইল।

বৌদ্ধগণের অবদানকালে খ্রীষ্ট শতাব্দীর প্রারম্ভে চতুর্ধর্মমূলক প্রাচীন বৈদিক ধর্ম পরিবর্তিত ও অসংস্কৃত হইয়া যে আকারে মহারাষ্ট্রদেশে প্রবর্তিত হয়, তাহাই মহারাষ্ট্রজাতির উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই ধর্মকে মহারাষ্ট্রদেশে 'ভাগবত' ধর্ম বলে। ভাগবত ধর্মে বৈদিক যাগযজ্ঞাদির ও বৌদ্ধগণের শুক জ্ঞানমার্গের মাহাত্ম্য হাস প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি প্রধান হরিসংকীর্ণন, তজম-পূজনাদি কাব্য ও জীবন্তজ্ঞের বিশ্বাস প্রধান অঙ্গরূপে পরিণত হয়। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবে যে জাতিভেদের মূল শিথিল হইয়াছিল, এই সময়ে তাহাও দৃঢ়ীকৃত হওয়ার বৎসরপর্যন্ত শুণকর্মের উন্নতি ঘটিতে লাগিল। ঐ প্রকার কুল নিষেধের অন্ত

এই নবধর্মের প্রবর্তকগণ বর্তমানকালের সংস্কারকগণের জ্ঞান কোথাও ব্রাহ্মণপ্রাধান্ত-লোপের চেষ্টা না করিয়া, কোমল ব্রাহ্মণের জাতির মধ্যদায়স্থির উপায় বিধান করিলেন। পূর্বে ব্রাহ্মণসেবাই শূদ্রগণের পক্ষে মুক্তির একমাত্র উপায়-বরূপ ছিল। এখন তৎপরিবর্তে এই ঐশ্বরীক ভবপূর্ণ সহস্রধর্ম ব্রাহ্মণদিগের জ্ঞান শূদ্রাদিরও অধিকার অঙ্গিল। এই ধর্মের সেবার উৎকর্ষ দেখাইয়া সমাজে সম্মানলাভের পথও পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপ নূতন ব্যবহার কলে মহারাষ্ট্রদেশে রামদাস ও একনাথস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসিপুত্র জ্ঞানেশ্বর, বৈষ্ণবের তুকারাম, শূদ্রজাতীয় নামদেব ও বোধলে বাবা এবং অন্যান্য বোণী প্রভৃতি তগবদ্ভক্তগণ তদপেক্ষা কোনও অংশে অল্প সম্মান লাভ করেন নাই। পরন্তু আজন্ম ব্রাহ্মণ-তনয়া মুক্তাবাদী ও কন্যাবাদীর জ্ঞান জনানাদী ও মীরাবাই প্রভৃতি শূদ্রজাতীয় রমণীগণও ভক্তিপ্রভাবে আবালবৃদ্ধবনিতার প্রজ্ঞাভাজন হইয়াছিলেন।

যতদিন পর্যন্ত এই অশ্বৈতবাদমূলক ভক্তিপ্রধান অসাম্প্রদায়িক ভাগবতধর্ম সংস্কৃতভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহেই আবদ্ধ ছিল, তত দিন সর্বসাধারণের পক্ষে ইহার অমৃতময় সুফল-লাভের সুযোগ ঘটে নাই। খ্রীষ্ট দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আদি কবি মুকুন্দরাজ, জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব প্রভৃতি খ্যাতনামা সাধুপুরুষগণ স্বদেশীয় আপামর জনগণের মধ্যে উদার ভাগবত ধর্মের প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়ার মহারাষ্ট্রদেশে নবজীবনের বীজ রোপিত হয়। সর্বপ্রথম মরাতীভাষায় মুকুন্দরাজ বিবেকসিদ্ধ ও পরমায়ুত নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ব্রহ্ম, মায়া, জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং শরীরচতুষ্টয়, অবস্থাচতুষ্টয় ও মুক্তির চারি প্রকার ভেদের বিষয় দেবতাবাদভিত্তিক জনসাধারণের গোচর করিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার আরম্ভ কার্যও জ্ঞানেশ্বরের চেষ্টায় কিরণপরিমাণে অগ্রসর হয়। জ্ঞানেশ্বরও ব্রাহ্মণ-বৃত্তিবোধ, সোপানমার্গ, অমৃতাহুতব, অমূল্যতার চীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া মামবজীবনের জতি সহ উদ্দেশ্য স্বদেশ-বাসীর গোচর করেন। ইহার আচঞ্চল সকলকে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করিতেন। জ্ঞানেশ্বরের তাবার্থলীপিকা মারী জীম্ব-তগবৎগীতার চীকা অতীব বিস্তৃত। ইহাই ভক্তিমূলক অশ্বৈত-মত-প্রচারের মূল। খ্রীষ্ট দ্বাদশ শতাব্দীতে এই জ্ঞানেশ্বরের পুনঃ প্রচার করিয়াই একনাথস্বামী স্বদেশে ধর্মজীব উদীপিত করিতে সমর্থ হন। বণিকপুত্র 'তুকা' জ্ঞানেশ্বরের এই পাঠ করিয়া "তুকারাম বাবা" নামে সর্বজন পূজা লাভ করেন। এই গ্রন্থ মহারাষ্ট্রবাসীকে আত্মশক্তির প্রতি নির্ভর ও মরাতী

ভাষার প্রতি অমুরাগ প্রকাশ করিতে শিকা দেয়। কাম-  
দেবের কবিতাবলীও এই সকল সভ্যদের পরিণামে সহ-  
নতা করে, কিন্তু আদি কবিগণের এই সকল গ্রন্থ মহারাষ্ট্র-  
সমাজে সর্বত্র প্রচারিত হইবার পূর্বেই—তাহাদিগের উণ্ড  
বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্বেই, উত্তরদিগ্ হইতে মুসলমান-  
আক্রমণের প্রবল তরঙ্গমালা আসিয়া উপস্থাপি মহারাষ্ট্র-  
দেশে পতিত হইল। কাজেই আদি কবিগণের অমহান  
উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটয়া গেল। তথাপি  
তাহাদিগের রোপিত বীজ বিনষ্ট হইল না—দীর্ঘকাল ভূমিগত  
থাকিয়া উহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অঙ্কুরিত হইয়া  
শতশাখা বিস্তারপূর্বক মহারাষ্ট্রবাসীর জিতাপনামের সূচনা  
করিয়াছিল। কিন্তু প্রথম কিছুদিন—প্রায় দ্বাদ্ধশত বৎ-  
সর পর্যন্ত মুসলমানগণের কঠোর শাসনচক্রের পেঘে অর্জ-  
য়িত হইয়া মহারাষ্ট্রদেশ হইতে আত্মাধম্ম ও আত্মবিভা বিলুপ্ত-  
প্রায় এবং মহারাষ্ট্রবাসীগণের জাতীয় জীবন নিষ্কান্ত হইয়া  
গিয়াছিল।

এই দুঃসময়ে একনাথস্বামী, মুক্তেশ্বর, দাসোপস, আনন্দ-  
তনয়, বামনস্বামী, রঘুনাথস্বামী, গঙ্গাধর বাবা, কেশবস্বামী,  
রজননাথস্বামী, মোররাদেব, জয়রামস্বামী, ভূক্যাম ও রামদাস  
প্রভৃতি উদারচরিত ধর্মোপদেষ্টা কবিগণ আবির্ভূত হইয়া মহা-  
রাষ্ট্রসমাজের ও সাহিত্যের যে অশেষ উপকার সাধন করিয়া  
গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে সুবর্ণাকরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

তাঁহারা স্ব স্ব অগ্রদূতের প্রতি দৃকপাত না করিয়া গ্রামে  
গ্রামে পরিভ্রমণপূর্বক কথকতাদির সাহায্যে অতি সরলভাবে  
ভাগবত ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া জন সাধারণের অজ্ঞানাকার  
দূর করিতে লাগিলেন। স্বত্বালাচনাবিরুদ্ধ, পরধন্যবলধন-  
প্রয়াসী, বিপন্ন জাতিকে স্বধর্মের অগম পন্থা প্রদর্শন করিয়া  
ও প্রেমভক্তির শিক্ষা দিয়া তাঁহারা শুকপ্রাণে অমৃত সেচন  
করিতে লাগিলেন। একদিকে বিধবী শাসকসম্প্রদায়ের  
নির্বাসন ও অপর দিকে দেবতাবাদ পক্ষপাতী কুসংস্কারপরা-  
য়ণ, শুককর্মকাণ্ডের উপাসক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিরাগ ও  
সামাজিক উৎপীড়ন সহ করিয়া তাঁহারা স্বদেশবাসীর মঙ্গলের  
জন্য বহুপ্রম স্বীকারপূর্বক বিবিধ অধ্যাত্মগ্রন্থের রচনা করিয়া  
জাতীয় সাহিত্যের গুণীর্ধন ও মহারাষ্ট্রজাতির অমরতা-  
লাভের উপায় বিধান করিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন  
ভাষা হইতে ইংরাজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষার বাইবেলানি  
ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ হওয়ার খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যুরোপে  
যে রূপ দেশব্যাপী ধর্মোন্মোহন আরম্ভ হইয়া, সমগ্র পাক্ষাত্য  
জাতির মোহনিত্রা তদ্রূপে উন্নতির পথ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ;

মহারাত্রিদেশেও সেইরূপ একনাথ, মুক্তেশ্বর প্রভৃতির উদার  
সামর্য, মহাজ্ঞানত, একাক্ষণ স্বত্ব ভাগবত ও জীবন্তদ-  
গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের সর্বজন-বোধন্য ভাষায় অনুবাদ  
প্রচারিত হওয়ার তৎপাঠে মহারাষ্ট্রবাসীগণের স্বধর্মজ্ঞান বিবেক-  
রূপে বর্ধিত হইল। সাধু পুরুষগণের কথকতা, সংকীর্তন  
ও ধর্মোপদেশে সমগ্র জাতির নিস্তেজ প্রাণে অতুল বলের  
সঞ্চার হইল। তখন মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে স্বত্ব-  
রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জনের প্রবৃত্তি বলবতী হইতে লাগিল।  
এই সকল সাধু পুরুষ জন সাধারণকে সংসারে থাকিয়া সদা-  
চার, জ্ঞান, ভক্তি ও সর্বজীবে সহৃদয়ী শিক্ষা দিতে  
ইশ্বরের প্রেরণায় স্বরূপ, সর্বজীবে তাঁহার অধিষ্ঠান, সাধন-  
মার্গের বিভিন্নভাসমূহ ও সাধ্যবিষয়ের আভ্যন্তর সম্বন্ধে শিক্ষা,  
ইহাদিগের উপদেশে মহারাষ্ট্রবাসীর চিত্তে দৃঢ়ভাবে সঞ্চিত  
হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, মহারাষ্ট্রজাতির মধ্যে  
একতা সংস্থাপন পক্ষেও এই সকল সাধু পুরুষের আবির্ভাব  
বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

রাজপুতজাতির মধ্যে যে রূপ সঞ্চিত-শক্তির অভাব  
দৃষ্ট হয়, মহারাষ্ট্রবাসীগণের মধ্যে সে রূপ নহে। শৌধ্য, সাহস,  
সহিষ্ণুতা, সরলতা ও দূরদর্শিতা প্রভৃতি বিবিধ সদগুণের  
জায় সঞ্চিতপ্রবণতাও মহারাষ্ট্রজাতির একটা স্বভাবমি-  
শ্রণ। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে মরাঠা ক্ষত্রিয়গণের বিবাদ-  
প্রিয়তা বা ভ্রাতৃবিরোধিতা অত্যন্ত প্রবল। মুসলমান শাসন  
কর্তারা তাহাদিগের চরিত্রের এই দোষ অবগত হইয়া  
তাহাদিগের মধ্যে বিবিধ কোশলে অনবরত বিবাদ-বাকি  
প্রজ্জলিত এবং তাহাদিগের উপর আপনাদিগের প্রভুত্ব  
অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পুরোক্ত সাধুপুরুষ ও ভক্ত  
কবিগণের উপদেশ ও ধর্মপ্রচারে নিত্যবিবদমান মরাঠা-  
দিগেরও অন্তর্নিহিত একপ্রাণতার বীজ অঙ্কুরিত ও তাহা-  
দিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হইল।

অতিনব ধর্মামৃতের আশাদ পাইয়া এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়  
দিগের ধর্মপিপাসা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সাধু পুরুষ-  
গণের ধর্মোপদেশপূর্ণ কথকতা ও সংকীর্তন শ্রবণ করিবার  
জন্য পরিবাসিগণ কষ্ট স্বীকার করিয়াও দূরদেশ হইতে দলে  
দলে এক স্থানে সমবেত হইতেন। শিবরাত্রি, রামনবমী,  
জন্মাষ্টমী ও প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবাদি  
পক্ষোপলক্ষে যখন এক একজন সাধু পুরুষের আগ্রমে অপর-  
পর সাধু সন্ন্যাসিগণ শিষ্যমণ্ডলী সহ সমবেত হইয়া মধুর বাণী  
ও সুন্দরানি সহযোগে সঞ্জোম তখন সঙ্কীর্তন ও ধর্মতত্ত্ব-  
সম্বলিত কথকতা দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্য প্রচার



করিতেন, তখন সেই সকল স্থানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইত। বৎসরের মধ্যে বহুবার বহু স্থানে একই উদ্দেশ্যে বহু লোকের সম্মিলন সংঘটিত হওয়ার এবং ধর্মোৎসাহপ্রমত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয় হইতে সংকীর্ণতা দূরীভূত হওয়ার, ক্রমে ক্রমে পরস্পরের মধ্যে বিশিষ্ট সহানুভূতির সঞ্চার হইতে লাগিল ও পরিশেষে পন্ডরপুরের সার্বজনিক ধর্মমহোৎসবে ঐ ভাব পরিপুষ্ট হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের স্বাভাবিক সম্মিলন ও শক্তির পূর্ণাবকাশ ঘটিল।

আষাঢ়ী ও কার্তিকী একাদশী উপলক্ষে মহারাষ্ট্রদেশের প্রধানতম জীর্থ পন্ডরপুরে প্রতি বৎসর বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়েও দেশের বাবতীয় সাধু সন্ন্যাসীরা এই প্রসিদ্ধ মেলা উপলক্ষে পন্ডরপুরে সমবেত হইতেন। পরস্পরের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া স্ব স্ব ধর্মমত মার্জিত ও গঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সকল বিভিন্ন দেশাগত সাধু পুরুষদিগের একত্র দর্শনলাভ ও তীর্থার্থিষ্ঠাত্রী দেবতা পূজা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী নবোদীপ্ত ধর্ম্মাহুতাগতরে পন্ডরপুরে গমন করিতেন। মহারাষ্ট্রদেশে বিশেষতঃ পন্ডরপুরে ধর্ম্মোৎসবকালে জাতিভেদের মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইত না। এখনও তথায় প্রাক্রণ চণ্ডাল সকলেরই একস্থানে সমবেত হইয়া সংকীর্তনাদি করা রীতিবিরুদ্ধ নহে। সে কালের নবনীকিত মহারাষ্ট্রীয়গণ জাতিবর্ণনির্কিংশেষে ভীমানদীর সুবিভীর্ণ সিকতাতে সম্মিলিত হইয়া নৃত্যগীত সহকারে হরিসকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতেন। ভক্তহৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাসে চতুর্দিক প্রাবিত হইয়া যাইত। সেই ভক্তিতরঙ্গে অবগাহনপূরক প্রমবিশ্ব চিত্তে প্রাক্রণ চণ্ডাল পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নাম গান করিতে করিতে দেহাভিমানপূত্র হইয়া পড়িতেন। এইরূপ সাংখ্যিকভাবপ্রণোদিত একত্র নৃত্যগীত, সপ্রেম হরিকথালাপ, মহাহুতাব সাধুগণের অভেদতত্ত্বমূলক উদার উপবেশ ও সার্বজনীন সম্মিলনে মহারাষ্ট্রবাসীর জাতীয় ভাব সঞ্চিত হইয়াছিল। আজিকালিকার জাতীয় মহাসমিতি ও প্রাদেশিক সনতির বার্ষিক অধিবেশনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে যে পরিমাণে সহানুভূতির সঞ্চার হইতেছে, মহারাষ্ট্রদেশের তদানীন্তন সাধু পুরুষগণের যত্নে রামনবম্যাদি পক্ষোপলক্ষে ও পন্ডরপুরের বাৎসরিক ধর্ম্মমহোৎসবের সার্বজনিক সম্মিলনে শিক্ষিতাশিক্ষিত আঁচণ্ডাল সর্বজাতির মধ্যে তদপেক্ষা সমধিক সহানুভূতি ও স্বধর্ম্মরক্ষার প্রবলাকাঙ্ক্ষা উজ্জ্বল হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই প্রবল স্বধর্ম্মাহুতাগ অবশেষে তাহাদিগকে

স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য মুসলমানদিগের উচ্ছেদসাধনে উৎসাহিত করিয়াছিল। বাহারা এই মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাদিগের অধিনায়কের নাম মহাত্মা শিবাজী।

মহারাষ্ট্রদেশের জায় এই সময়ে ভারতের অপরাপর প্রদেশেও এইরূপ ভক্তিপ্ৰধান উদার সার্বজনিক ধর্ম ও সার্বজনিক ধর্ম্ম-মহোৎসবাদি প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্ততঃ উহা মহারাষ্ট্রের জায় অভিনব মূলক প্রসব করে নাই। মহারাষ্ট্রীয়ের স্বাভাবিক স্বাধীনতাহুতাগ ও সম্মিলন-প্রবলতাই এইরূপে ফলভেদের এক প্রধান কারণ।

মধ্যযুগের সাহিত্য।

খৃষ্টীয় বোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যোচারণা জ্ঞান-বিস্তার দ্বারা মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়া ছিলেন। বাহারা মনে করেন, একদল অশিক্ষিত কাও-জ্ঞানপুত্র দস্যুর লুণ্ঠনপ্রিয়তার ফলে মহারাষ্ট্রদেশে মুসলমান-শাসন শিথিলমূল হইয়াছিল এবং পরিশেষে সেই দস্যুদেরই শক্তিবর্ধিত হওয়ার উত্তর-ভারতের মোগলসাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্যন্ত উৎখাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহারা অতীব ভ্রান্ত, এই অধ্যায় পাঠে তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। জন সাধারণের মধ্যে ধর্ম ও সাহিত্যের জ্ঞানবিস্তারের ফলেই যে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বে দেখাইয়াছি, মুকুন্দরাজ ও জ্ঞানেশ্বর এই বিভাগের পথপ্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের গ্রন্থ মুসলমানবিপ্লবের কালে বিলুপ্তপ্রায় হওয়ার মহারাষ্ট্র-জাতি সুপ্ত অবস্থায় কালবাগন করিতেছিল। একনাথ স্বামী এই সুপ্ত জাতিকে উজ্জ্বল করিবার জন্য বহুপরিশ্রম হন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয়। তাহার প্রথম কার্য বিলুপ্তপ্রায় জ্ঞানেশ্বরের (তাবার্বাধাপিকার) পাঠ সংশোধনপূর্বক তাহার বহুলপ্রচার। একনাথ ও তাহার গুরু জনার্দিন স্বামী উভয়েই রাজকার্যে সুনিপুণ ও সমরবিজ্ঞার বিশারদ ছিলেন। জনার্দিন স্বামী প্রথমাবস্থায় নিজামশাহের সচিবত্ব পধ্যস্ত করিয়া পরিশেষে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক মহারাষ্ট্রে দণ্ডাত্রেয়োপাসনা প্রবর্তিত করেন। একনাথও কিছুদিন মুসলমান নরপতির সেবার কালবাগন করিয়াছিলেন। উভয়কেই সুলতানের স্বপক্ষে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ইহাদিগের উভয়েরই শেষজীবন স্বদেশসেবায়—জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচারকার্যে নিয়োজিত হয়।

জ্ঞানেশ্বরের উদ্ধারের পর একনাথ মরাঠা ভাবায় কর্ণাট-স্বয়ম্বর (১৭১০ খ্রিঃ), তাবার্বারামারণ (৪০ সহস্র খ্রিঃ)



বায়ুস্বয়ং, চতুঃশ্লোকী ভাগবত, হস্তামলক, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ (২০ সহস্র শ্লোক) প্রভৃতি গ্রন্থ ও বহু সংখ্যক পদাবলী রচনা করিয়া জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন করেন। তাঁহার রচনা অতি সরল, গম্ভীর ও প্রীতিপ্রদ। তাঁহার সর্বাচারপ্রভাব মহারাষ্ট্রসমাজের অন্তর্কলবুদ্ধির সহায় হইয়াছিল। সর্বশ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানবিস্তারের জন্ত তিনি গ্রন্থরচনায় এক অভিনব মনোরম পদ্ধতির প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আচণ্ডাল সকলেই তাঁহার প্রাজ্ঞ রচনা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইত।

এই সময়ে দাসোপস্ত নামক আর একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে অতি বিস্তারিত টীকা রচনা করেন, তাহা “গীতাণব” নামে পরিচিত। গীতাণব প্রকৃতই সাগর সদৃশ বিশাল গ্রন্থ, উহার শ্লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার। এই ব্যাসকল্প প্রতিভাশালী গ্রন্থকার ১৬০৮ খৃঃ অব্দে সমাধি লাভ করেন। মহারাজ শিবাজীর পিতা রাজা শাহজীর গুরু আনন্দতনয় ও এই সময়ের একজন কবি। হংসরাজ নামক জনৈক সাধুপুরুষ এই সময়ে “বাক্যবৃত্তি” ও জ্ঞানেশ্বরপ্রণীত “অমৃতানুভব” নামক গ্রন্থের সরল ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়া জনসাধারণের উপকার করেন। ভক্তচরিতলেখক উদ্ধববিদ্য প্রভৃতি আরও অনেক ছোট বড় কবি এই যুগেই জন্মগ্রহণ করেন।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রামদাস, তুকারাম, মুক্তেশ্বর ও বিট্ঠল কবির জন্ম হয়। ইহার পরবর্তী বর্ষে একনাথ স্বামী সমাধি গ্রহণ করেন। সেকালের রাজনীতি-ক্ষেত্রে রাজা শাহজী এবং ধর্ম ও সাহিত্যক্ষেত্রে একনাথ প্রভৃতি সাধু গ্রন্থকারেরা যে সকল কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, রামদাস, তুকারাম প্রভৃতি সাধুপুরুষগণ ও শিবাজী, তানাজী মালুসরে ও ময়ূরপস্ত প্রভৃতি বীরপ্রাণী রাজনীতিবিদগণ তাহা সুসম্পন্ন করিয়া যান। রামদাস ও তুকারামের আমলে মহারাষ্ট্রীয়গণের সর্বপ্রকার গুণের অপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। ইহার পর এক শতাব্দীর মধ্যে মহারাষ্ট্রদেশে যতগুলি পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, পৃথিবীর কোনও দেশে কখনও এত অল্প কালের মধ্যে ততগুলি নরনারের আবির্ভাব হয় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম কবি বিলাসপ্রিয় রাজবোঙ্গী রজনাত্ম স্বামী। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বৃহদ্বাক্য-বৃত্তি, ভগবদ্গীতার টীকা ও যোগবাশিষ্ঠের ভাষান্তর উল্লেখযোগ্য। মধুর পদবিত্তাসম্পদে তিনখানিই বিশেষতঃ শেবোক্ত গ্রন্থখানি অভিশয় সুপাঠ্য হইয়াছে।

রজনাত্মের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীধর একজন লোকপ্রিয় কবি।

XIV

তাঁহার রচিত পাণ্ডবপ্রতাপ, হরিবিজয়, রামবিজয়, শিবলীলা-মৃত ও জৈমিনীয় অশ্বমেধ এই পাঁচখানি গ্রন্থ অতীব মনোরম, এরূপ গ্রন্থ মহারাষ্ট্রীয় দক্ষিণাপথে অতি বিরল। মহারাষ্ট্র-রমণীসমাজে ও সংস্কৃত-ভাষানিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীতে শ্রীধরের অপেক্ষা অধিকতর সমাদর আর কোনও কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। শ্রীধরের রচিত গ্রন্থসমূহের শ্লোকসংখ্যা ৫০ সহস্রের নূন নহে। একনাথের পৌত্র মুক্তেশ্বর রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে হইখানি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মুক্তেশ্বরের রামায়ণ বিশেষ প্রশংসাযোগ্য না হইলেও মহাভারতে তাঁহার যে কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, সমগ্র মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে তাহা অতি বিরল। সাধকপ্রবর ‘বহিরা পিসা’ এই সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ মরাঠী ভাষায় রূপান্তরিত করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিম প্রেষ্ঠ কবি বামন পণ্ডিত। তিনিও বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। বামন পুস্তক ঘোর বৈত-বাদী, কাম্যকাণ্ডের একান্ত পক্ষপাতী ও গোড়া বৈষ্ণব ছিলেন। দেবভাষা ভিন্ন প্রাকৃত জনকথিত ভাষায় কথোপকথন তিনি পাপজনক বলিয়া মনে করিতেন। নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বহুসংখ্যক বিজয়পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামদাস স্বামীর নিকট তাঁহার দর্প চূর্ণ হয়। তদবধি তিনি অদ্বৈত মত অবলম্বনপূর্বক ভক্তিমার্গের প্রচারকল্পে ত্রীতী হইলেন। রামদাস স্বামীর উপদেশে তিনি সংস্কৃত পরি-ভ্যাগপুস্তক দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। মরাঠী ভাষায় যথার্থদীপিকা নামে তিন খণ্ডে গীতার টীকা রচনা করেন, তাহাতে বিশেষ দক্ষতা সহকারে সাংখ্য, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি মতের খণ্ডন ও অদ্বৈতবাদের সমর্থন করা হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বরের ভাবার্থদীপিকার প্রসাদ-গুণ যেরূপ ওতপ্রোত-ভাবে বিভ্রমিত, যথার্থদীপিকায়ও সেইরূপ পাণ্ডিত্য ও তর্ক-বিচারের বাহ্য দৃষ্ট হয়। ষড়্দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ বামনের করতলগত ছিল। নিগমসার, জীবতত্ত্ব, কাম্য-তত্ত্ব, বেদতত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞতি, নামসমূহ, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মৌলিক গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। যথার্থদীপিকা ভিন্ন তাঁহার অত্যাধ গ্রন্থ প্রসাদগুণ যথেষ্ট পরিচলিত হয়। তাঁহার কৃত ভট্টহরির শতকএয়ের অনুবাদ অনেক স্থলেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর সরস হইয়াছে। মহারাষ্ট্রদেশে বামনের জায় উৎকৃষ্ট কাব্যানুবাদ ও বিদ্বান্ ন ত্রুতো ন ভবিষ্যতি। সরলার্থপূর্ণ বসক রচনার চাতুর্য্য তাঁহার প্রতি-ভার একটা প্রধান গুণ।

বিট্ঠল কবি বামনের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী এবং মহারাষ্ট্রীয়

ভাষার সম্বন্ধ, চিত্রকাব্য ও কুটম্বোক্ত রচনার প্রথম পথ-প্রদর্শক। তিনি বিহ্বল-চরিত, রসমঞ্জরী, বিহ্বলজীবন, সীতা-স্বয়ম্বর, কল্লিঙ্গী-স্বয়ম্বর ও বহু সংখ্যক পদাবলী রচনা করিয়া মহারাষ্ট্রসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। জয়রাম স্বামীর শাস্তিপঙ্কীকরণ এবং কেশব স্বামী, আনন্দস্বামী ও মোরয়া-দেব প্রভৃতি কবির ভক্তিজ্ঞানপূর্ণ কবিতাবলীও উল্লেখযোগ্য।

একুণ্ণে তুকারাম ও রামদাসের নামোল্লেখ করিলেই এই যুগীয় কবিগণের পরিচয় এক প্রকার শেষ হয়। তুকারামের চরিত, ও তাঁহার রচিত অভঙ্গের বিষয় পাঠকবর্গের নিত্যন্ত অবদিত নহে। [ তুকারাম শব্দ দেখ ] তাঁহার অভঙ্গ নামক ভক্তিপূর্ণ কবিতামালা পাঠ করিয়া বোম্বাইয়ের শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর শ্রী আলেকজান্ডার গ্রান্ট মহোদয় বলিয়াছেন, যাহারা তুকারামের অভঙ্গ পাঠ করিয়া-ছেন, তাঁহাদিগের নিকট খৃষ্টীয় নীতিভঙ্গের প্রশংসা করিতে বাওয়া বৃথা। তুকারামের রচিত পদাবলীর মধ্যে প্রায় ১১ হাজার এ পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

গোদাবরীতীরে জম্মুগ্রামে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রামদাসের জন্ম হয়। বালাবধি রামোপাসনায় তাঁহার বিশেষ অমুরাগ ছিল। ক্রম-প্রক্সাদিগের চরিত্র অবগে বাণোই তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরদর্শনলালসা বলবতী হয়। বিবাহের পূর্বেই তিনি গৃহত্যাগপূর্বক পঞ্চবটীতে গিয়া দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপস্তা আরম্ভ করেন। তপস্তা ও যোগসাধনাস্তে দ্বাদশ বর্ষকাল ভারতের নানাভীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার উপ-দেশে ও রচনায় মহারাষ্ট্রে যুগান্তর উপস্থিত হয়। পূর্ববর্তী সাধু পুরুষগণের যন্ত্রে মহারাষ্ট্রে নূতন ধর্মোৎসাহের ও জ্ঞান-মুরাগের সঞ্চার হওয়ায় সমাজে যে নববলের উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি তাহা দেশের হিতসাধনে নিয়োজিত করিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা-বলী রচনা করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে স্বরাজ্যস্থাপনে উৎসাহিত করেন। দাসবোধ নামক গ্রন্থে তিনি জাতীয় শিক্ষার উৎসাহী সমস্ত বিষয়েরই উপদেশ সম্মিলিত করেন। পরমার্থসাধন জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও পার্থিববিষয়ে অমনোবোধ অকর্তব্য। “স্কুল মেনের” অনাবশ্যক জ্ঞানের হস্ত হইতে বেকন যেরূপ যুরোপবাসীর উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহাদিগের চিত্তকে অধিকতর ফলপ্রসূ জ্ঞানের দিকে আক-র্ষণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রামদাসও আধিতৌত্বিক বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনপূর্বক মহারাষ্ট্রবাসীর বৈরাগ্য ও উদাসীনতার নিরীকরণ ও তাহাদিগকে রাষ্ট্রোন্নতির পথ

প্রদর্শন করিলেন। বেকনের Advancement of Learning নামক গ্রন্থ অপেক্ষা রামদাসের দাসবোধ গ্রন্থের যোগ্যতা কোনও অংশে ন্যূন নহে; বরং আধিতৌত্বিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একাধিধানকোশলে ইহাকে উচ্চতর আসন প্রদান করিলেও দোষ হয় না। রামদাসের “পঙ্কীকরণ” “মনোবোধ” ও রামায়ণাদি গ্রন্থও অল্প প্রসিদ্ধ নহে। কিন্তু দাসবোধই তাঁহার সর্বপ্রধান গ্রন্থ। তাঁহার এই গ্রন্থে অক্ষরপরিচয় ও লিপি-পদ্ধতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাপত্যবিজ্ঞা পর্যন্ত প্রায় সমস্ত লৌকিক জ্ঞানের উপদেশ দৃষ্ট হয়। দেশের ছুরবহাদির বর্ণনা, পরাধীন জাতির অবলম্বনীয় নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সহিত ত্রুক্ষনির্মাণলাভের উপায় সমস্তই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তান-রচনা, পণ্যমালা স্থাপন (কারখানা) ও দুর্গনির্মাণ-পদ্ধতি বিষয়েও রামদাস উপদেশ দানে বিরত হন নাই। দেশের ছুরবহা ও তন্নিবারণের উপায় সম্বন্ধে তাঁহার উক্তির একাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, রামদাস সাহিত্যক্ষেত্রে কিরূপ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—‘যখনগণ বহু দিবস হইতে অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগকে শাস্ত দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এমন পুরুষ কেহই নাই। ছুটগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণের উচ্ছেদ ঘটয়াছে, সমস্ত ধর্ম কার্য লুপ্ত হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত, ব্রাহ্মণগণের বাসস্থানসমূহ অপবিত্রীকৃত ও সমস্ত দেশ বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছে। ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছে। পাপিগণের বল বৃদ্ধি হওয়ায় ধার্মিক-গণ দুর্বল হইয়াছেন ও দেবতাগণ অত্যাচারভয়ে লুকাহিত ভাবে রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলকমালা প্রভৃতি পরি-ত্যাগ করিয়া যবনদিগের অহঙ্কারী হইয়াছে। সকলেরই পূর্বসন্মান লোপ পাইয়াছে। যবনগণ দুর্বল প্রজাকুলের প্রতি বিবিধ কটুভাষা প্রয়োগ করে ও তাহাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দেয়। অতএব ধর্মরক্ষার জন্ত সকলে জীবন বিসর্জন কর, দেশের স্বেচ্ছভাবে দুরীভূত কর, বাবতীর মণাঠা একত্র ও এক মতাবলম্বী হও। আপনাদিগের মহারাষ্ট্রধর্মের বিস্তার কর। দেবভ্রোহীদিগকে কুকুরজ্ঞানে তাড়াইয়া দাও। দেবতাগণকে মন্তকে ধারণপূর্বক সকলে একোত্থমে উথিত হইরা তুমুল বিপ্লব উপস্থিত কর। অধ্যবসায় সহকারে সকলে চতুর্দিক হইতে স্বেচ্ছদিগের উপর শতভি হও। স্বদেশ-প্রোহীদিগের বিনাশপূর্বক দেশ রক্ষা কর। ধর্মস্থাপনের জন্ত নূতন দেশ জয় কর এবং চারিদিকে মহারাষ্ট্রধর্ম ও মহারাষ্ট্ররাজ্য বিস্তার কর। এখন সময় থাকিতে যাহারা সতর্ক না হইবে, তাহাদিগকে পরে অহতস্ত হইতে হইবে।’

এই উত্তেজনাঘরী বাণী রামদাসের ওজস্বিনী ভাষায় কবিতাকারে তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক যখন মরাঠাগণের ঘরে ঘরে গীত হইতে লাগিল, তখনই নুতন মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। মহাত্মা শিবাজীর ভ্রাতৃ উত্তমশীল ক্ষত্রিয়-যুবক রামদাসেই শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, স্বধর্ম ও স্বদেশেরক্ষার প্রবলাকাঙ্ক্ষা সমগ্র মহারাষ্ট্র জাতিকে উন্নত করিয়া তুলিল। শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রবাসী দক্ষিণ-গণ হইতে যখন রাজ্যের মূল উৎখাত করিবার জন্ত বন্ধপরিকর হইলেন।

জ্ঞানেশ্বর ও মুকুন্দরাজ পরমার্থজ্ঞান ও ভক্তিসূত্র অবলম্বনে মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের আশ্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পর-ধর্মী কবিগণের চেষ্টায় তাহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া পরিশেষে রামদাসের অসামান্য প্রতিভাবলে অপূর্ণ বিজয়রথীতে বিভূষিত হইল। তদানীন্তন মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের এই পূর্ণ-বিকাশকালে বহুসংখ্যক ভক্তরসমণী সাহিত্যিকতাবর্ণ কবিতা রচনা দ্বারা মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শেখ মহম্মদ নামক এক মুসলমান কবি যোগসংগ্রাম-নামক গ্রন্থের রচনা ও তুকারামের ভ্রাতৃ পঞ্চবপুরের বিট্ঠলদেবের উপা-সনায় দেহমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মরাঠা গণ্ডরচনারও সূত্রপাত হয়। মরাঠাসম্প্রদায়গণের অসুস্থিত যুদ্ধদিগের বিজয়বাস্তা অবলম্বনে গীতিকবিতা রচনার গণ্য ও এই সময়েই প্রবর্তিত হয়। কলতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্বে মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের এইরূপ সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

অভ্যুদয়।

মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়ের উপাদান সামগ্রীগুলি কি-রূপে মুসলমানদিগের শাসনকালেই উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, ধর্ম ও সাহিত্যগত উন্নতির ফলে কিরূপে মহারাষ্ট্র-জনসাধারণের চিত্ত সুসংস্কৃত ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিয়া ছিল, কিরূপেই বা মুসলমানদিগের আত্মকলহ ও ভ্রমলতা-সূত্রে মরাঠাগণ দেওয়ানি, ফৌজদারী ও দেশরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে কাব্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ দ্বারা ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করিয়া, মুসলমানদিগের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিলেন, তাহা এক্ষণে বিবৃত হইল। এইরূপ অবস্থায় রামদাস পার্শ্ববর্তনপূর্ণ অপূর্ণ বীররসপ্রধান সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া কিরূপে স্বদেশবাসীর হৃদয়ে স্বাধীনতার বাঁজ উত্তপ্ত করিলেন, তাহাও পাঠক দেখিয়াছেন। এক্ষণে ধ্যেয়রূপে বিভিন্ন নেতার অধীনে এই মহাজাতি উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিরূপেই বা তাঁহাদিগের পুনরায় অবনতি হইল, তাহা

পাঠকগণ শিবাজী, সাম্ভাজী, রাজারাম, শাহু, পেশবা মাধব রাও, রঘুনাথ রাও, সদাশিব রাও, মাধবরাও নারায়ণ, বাজী রাও, সিন্দে (সিন্ধিয়া), ছোলকর প্রভৃতি শব্দে বিস্তারিত ভাবে দেখিতে পাইবেন। এখানে সংক্ষেপে তৎসংক্রান্ত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্ববর্ণিত ঘটনাপারম্পর্যে পরিচালিত হইয়া গাঁহারী সর্গ প্রথম স্বদেশের উদ্ধারকার্যে ত্রুতী হইলেন, তাঁহাদিগকে বহু বাধাবিষয় অতিক্রম করিতে হয়। স্বদেশে যে সকল মরাঠা মুসলমান জুলতানগণের অধীন থাকিয়া সর্দার জুবেদার প্রভৃতি পদের সম্মান ও জাহাঙ্গীর ভোগ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে শিবাজীপ্রমুখ স্বদেশোদ্ধারকারী মরাঠাগণের বিরোধী হইলেন। কারণ অভ্যুদয়প্রাণীরাই নিগের চেষ্টা কতদূর সফল হইবে, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের ঘোর সন্দেহ ছিল। কাজেই তাহারা নিশ্চিত সুখসম্মান পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত স্বাধীনতার জন্ত বিদ্রোহে যোগদান করা লজ্জত বলিয়া মনে করিলেন না। এই সকল আত্মপ্রাণাভিলাষী সর্দারদিগের মধ্যে মোরে, জুরবে, দলবী, সাবস্ত, শিরকে প্রভৃতিকে বাহুবলে ও মোহিত, মানে, গুজর প্রভৃতি অপর কএক জনকে কোশলে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে হয়। বৈদেশিক শত্রুর মধ্যে বিজাপুরের পাঠানবংশীয় জুলতান ও উত্তর-ভারতের মোগলরা এই স্বাধীনতালোলুপ মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান বিরোধী ছিলেন। উভয় শত্রুর সহিত এককালে যুদ্ধ করা অসম্ভব বিবেচনায় শিবাজীপ্রমুখ মরাঠাগণ প্রথমে বিজাপুরপতির বিরুদ্ধাচরণ ও মোগলদিগের আত্মগত স্বীকারে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিজাপুরের জুলতানের সেনাদলকে কয়েক স্থানে পরাজিত করিয়া আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হওয়ার শিবাজীর দল মোগলদিগকেও অল্পে অল্পে দক্ষিণাংশ হইতে অপসারিত করিতে যত্নবান হইলেন। কিন্তু সে চেষ্টা লম্বে ফলবতী হইল না। শায়েস্তা খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পরাজিত হইলেও মোগলপক্ষীয় সেনানী জয়সিংহের হস্তে তাঁহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। ফলে দলপতি শিবাজী দিল্লী-গমনে বাধ্য হইলেন। সেখানে গিয়া তিনি বেকরূপ বিপদে পড়িলেন, তাহাতে নবপ্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্ররাজ্যের অস্থিরতা বিলোপ ঘটিত। কিন্তু কাম্বোজীদিগের বিশ্বস্ততা ও দেশীয় জনসাধারণের সহায়ভূতি শুণে সেই ঘোর বিপদকালেও স্বাধীন মহারাষ্ট্রে কোনও গোলাবোণ ঘটিল না। কিছু দিন পরে শিবাজীও অসাধারণ চাতুর্য্যবলে দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আবার মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ

হইল। মরাঠারা অলৌকিক উৎসাহ ও বলবীৰ্য্য প্রকাশ করিয়া সিংহগড় আদি বহু সংখ্যক দুর্গ মোগলদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন। দিল্লীর সম্রাট অরঙ্গজেবকেও শিবাজীর স্বাভাব্য স্বীকার করিতে হইল। মহারাষ্ট্রে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের স্বতন্ত্র রাজমুদ্রা প্রচারিত হইল। মরাঠাগণ ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। স্বদেশবাসীদিগের অনেকেই তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করায় ইঁহারা খান্দেশ হইতে মোগলদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সালের ও চান্দোরে মোগলদিগকে অতি ভয়ঙ্কর সম্মুখযুদ্ধে তাঁহারা পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন ( ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে )।

ইহার পর বিজাপুরের শাসন হইতে দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের উদ্ধারে শিবাজীপ্রমুখ মহারাষ্ট্রীয়দিগের যত্ন হইল। কয়েক বৎসর সময়ে পরাস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিজাপুর-দরবার পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বাভাব্য স্বীকার করিলেন। তখন মহাসমারোহে মুসলমানপ্রাবৃত ভারতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য শিবাজীর অভিষেকব্যাপার সন্মপ্পন করা হইল ( ১৬৭৪ খৃঃ ৬ই জুন )। রায়গড় স্বাধীন মহারাষ্ট্রের রাজধানী হইল। মহারাষ্ট্রদেশে গো, ব্রাহ্মণ ও সনাতন ধর্ম নিষ্কণ্টক হইল। এই স্বাধীন রাজ্যকে মহারাষ্ট্রীয়েরা “স্বরাজ্য” বলেন। স্বরাজ্যের অন্তর্গত ভূমিভাগের নির্দেশ পেশবা শব্দে পাঠক দেখিতে পাইবেন।

অভিষেক সময়ে অত্যাশ্চর্য্য পররাষ্ট্রের দূতদিগের আয় ইংরাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দূতও রায়গড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইংরাজ ও পর্তুগীজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিদিগের সহিত

সংস্পর্শ স্থাপন করিয়া তিনি পাশ্চাত্য নৌবাহিনী ও জলযুদ্ধের কৌশল শিক্ষাপূর্ব্বক কোলী নামক ধীবর জাতিকে লইয়া একটি মহারাষ্ট্রীয় নৌসেনাদল গঠন করেন। পরিশেষে এই নৌসেনারই হস্তে ইংরাজ ও পর্তুগীজদিগকে কয়েকবার পরাস্ত হইতে হইয়াছিল।

ইহার পর শিবাজীর সৈন্যদল কর্ণাটক বিজয়পূর্ব্বক স্বরাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করেন। এইরূপে মরাঠাদিগের উৎকর্ষ-দর্শনে হিংসাপরবশ হইয়া মোগলেরা আবার তাঁহাদিগের দমনে সচেষ্ট হইলেন। শিবাজীর সহিত যুদ্ধে মোগলসেনানী দিলের খাঁকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু এই অভিযানে অতিরিক্ত শ্রমস্বীকারে বাধ্য হওয়ায় শিবাজীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিল। তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেই মহাপুরুষের মৃত্যু হইল ( ১৬৮০ খৃঃ ৫ই এপ্রিল )।

শিবাজীর চেষ্টায় মহারাষ্ট্ররাজ্য অতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি মোগল-পাঠানের আয় রাজ্য হস্তে সমস্ত শক্তি ব্যস্ত না করিয়া অষ্ট সচিবের উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। এই অষ্ট সচিব “অষ্ট প্রধান” নামে পরিচিত ছিলেন। রাজা এই অষ্ট প্রধানের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য্য করিবেন না, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই মন্ত্রিসভার সচিবদিগের নামকরণও তিনি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার পদ্ধতিক্রমে করিয়া ছিলেন। নিম্নে তাঁহাদিগের নাম, কার্য্য, ও বেতনাদির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

সংস্কৃত নাম	পারস্য নাম	কাৰ্য্য	কৰ্ম্মচারীর নাম	বেতন
১। পশুপ্রধান	পেশওয়া	প্রধান মন্ত্রি,	মোরোজিমল পিঙ্গলে	বার্ষিক ১৫০০০ হোন,
২। পশু অমাত্য	মুজুমদার	রাজস্ব আদায় ও হিসাব রাখা	নীলো সোমদেব	,, ১২০০০ হোন,
৩। পশু সচিব	সুরনীস	দপ্তরখানার অধ্যক্ষ	অম্বাজী দত্তো	,, ১০০০০ হোন,
৪। মন্ত্রী	বাকানবীস	প্রাইভেট সেক্রেটারী	দভাজী পস্ত	,, ৫
৫। সূক্ষ্ম	দবীর	পররাষ্ট্রসচিব	সোমনাথ পস্ত	,, ৫
৬। সেনাপতি	সরনোবত	সরসেনাধ্যক্ষ	প্রতাপরাও গুজরও হবীররাও মোহিতে	৫
৭। জারাজীশ	—	প্রধান বিচারপতি	বালাজী পস্ত ও নীরাজী রাওজী	৫
৮। পণ্ডিত রাও	—	ধর্ম্মাধ্যক্ষ	রঘুনাথ পণ্ডিত	,, ৫

মোগলদিগের রাজ্য-ব্যবস্থার মূলতন্ত্র সামরিক বিভাগের কর্মচারীদিগেরই হস্তে প্রধানতঃ গৃহীত ছিল। তাহাতে প্রজার

শুভাশুভবিষয়ক-বিচার প্রাধান্যলাভ করিতে পারে নাই। শিবাজীর লক্ষ্য ছিল প্রজার সুখবৃদ্ধি। সেজন্য তিনি সমস্ত

রাজকাষাকে ১৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র পরিদশক কর্মচারী ছিল। শিবাজী কর্মচারীদিগকে নগদ বেতন দিবার প্রথা প্রবর্তন করেন। সেনাপতিদিগের বা সচিবগণেরও জাহাজী পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। সমস্ত রাজকাষ পদগুলিই কর্মচারীর জীবনব্যাপী করা হইয়াছিল। মুসলমান রাজ্যে অত্রাণ পৈতৃক সম্পত্তিও শ্রায় পিতার পদেও পুত্রের অধিকার জন্মিত। ফলে প্রজার প্রতি অত্যাচার ও রাজকাষের উন্নতি ঘটিত না। অষ্ট প্রধানের সহযোগে মন্ত্রিসভা গঠিত করিয়া প্রত্যেক রাজকাষে সকলের পরামর্শ গৃহীত হইত। এই অষ্ট প্রধান-পদ্ধতি পরবর্তী কালে পরিত্যক্ত হওয়ায় মহারাষ্ট্র-রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

শিবাজীর রাজ্য-ব্যবস্থার দ্বিতীয় বিশেষত্ব দুর্গসংস্থানপ্রণালী। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্ত স্বরাজ্যের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমান্তে তিনি প্রায় ৩৪ শত গিরিভূমি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দুর্গগুলি প্রায় মণ্ডলাকারে মহারাষ্ট্র-ভূমিকে বেষ্টিত করিয়া আছে। সমুদ্রতীরে জলমধ্যেও দ্বীপোপরি দুর্গ নির্মাণ করিয়া সিদ্ধি, ইংরাজ, পর্তুগীজ প্রভৃতির আক্রমণ-নিবারণের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। পূর্ব মহারাষ্ট্রের সমতল প্রদেশে প্রসিদ্ধ নগরগুলির রক্ষার জন্ত প্রাচীরাদিও নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক দুর্গে একজন মরাঠা জাতীয় হাবিলদার ও তদধীনভায় একজন ব্রাহ্মণ সর্বনীস (সেনা-লেখক) ও প্রভূকায়স্থ জাতীয় কারখানাবীশ কর্মচারী থাকিতেন। দুর্গরক্ষা, দুর্গসংস্কার, দুর্গাধীন প্রদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা ও দুর্গে রসদের সর্ববরাহ প্রভৃতি কাণ্ডের ভার ইহাদিগের উপর হস্ত থাকিত। প্রত্যেক দুর্গে সকল বর্ণের কর্মচারী সমান সংখ্যায় রাখিবার ব্যবস্থা থাকায় বণগত বিদ্বেষাদি বুদ্ধির পথ বন্ধ হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এই নীতিও লঙ্ঘিত হয়। এক একটা দুর্গে ও প্রদেশে এক এক বর্ণের কর্মচারীদিগকে সর্ব প্রকার প্রাধান্য লাভ করিবার অবসর দেওয়ায় পেশবাদিগের আমলে জাতিভেদ-জনিত মাংসখোর উদয় ও মূল শক্তির প্রভাব ক্রমে ধ্বংস হইতেছিল।

সামরিক বিভাগে স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যে অভিনব সংস্থার প্রবর্তন করেন, তাহাতেই মহারাষ্ট্র জাতির সৌভাগ্য-গর্ভ বহু বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতের সর্বত্র সেনাপতিদিগকে বেতনের বিনিময়ে জাহাজী-প্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। সেনাপতির সৈনিকদিগকে স্বয়ং বেতন দান করিতেন। কাজেই প্রকৃত সেনাদলের

সহিত রাজার বিশেষ পরিচর্য থাকিত না, কাজেই সেনাপতি বিদ্রোহী হইলে সেনাদলও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে রাজার বিদ্রোহচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। মহারাষ্ট্রে সর্ব প্রথম এই কুপ্রথা সংস্কার হয়। সামান্য পদাতি হইতে প্রধান সেনাপতি পর্যন্ত রাজসরকার হইতে নগদ টাকায় বেতন পাইতেন। শতাধি জুয়েদারের বেতন একশত হোন (সাড়ে তিন টাকায় এক হোন), এক হাজারী সর্দার ৫ শত হোন ও পাঁচ হাজারী সেনানী ২০ হাজার হোন বেতন পাইতেন। মহারাষ্ট্রে অশ্বসাদী সেনা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। যাহারা রাজসরকার হইতে অশ্ব ও অস্ত্র শস্ত লইয়া যুদ্ধ করিত, তাহাদিগকে বারগীর বলা হইত। নিজের ঘোড়া, ঢাল, তরবার ও বন্দুক লইয়া যাহারা যুদ্ধ করিত, তাহারা শিলেদার নামে পরিচিত। শিলেদারী করা মরাঠারা অতি গৌরবের কার্য বলিয়া বিবেচনা করিত। ইহাদিগের বেতন মাসিক ৬ হোন হইতে ১২ হোন পর্যন্ত ছিল। বারগীরেরা ২ হোন হইতে ৫ হোন পর্যন্ত বেতন পাইত। বেতন যাহাতে নিয়মিত সময়ে প্রদত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেনাদলে জ্রী, দাসী, শৌণ্ডিক প্রভৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। লুণ্ঠনজাত দ্রব্যাদি সৈনিকদিগের গ্রহণের অধিকার ছিল না, তাহাদিগকে সমস্তই রাজসরকারে জমা দিতে হইত। এই সকল নিয়ম যাহাতে কোনও প্রকারে লঙ্ঘিত না হয়, তজ্জন্ত গুপ্তচরের নিয়োগও হইয়াছিল। যাহারা সমরক্ষেত্রে শৌর্য প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে রাজকোষ হইতে স্রবর্ণবলয়াদি প্রদান দ্বারা পুরস্কৃত করা হইত। শিবাজীর চেষ্টায় মহারাষ্ট্রীয় নোসেনাদল ও যুদ্ধ জাহাজগুলি একরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে, হাবসী, পর্তুগীজ ও ইংরাজ প্রভৃতি জলযুদ্ধকুশল জাতিদিগকেও তাহাদের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর অধীনে ৩০ হইতে ১৫০ টন পর্যন্ত ভারবহনে সমর্থ ৮৫টা ক্ষুদ্র বৃহৎ ও তিনটা অতি বৃহৎ জাহাজ ছিল। ইহার ৬ বৎসর পরে মহারাষ্ট্র রাজ্যের যুদ্ধ ও জাহাজের সংখ্যা ১৬০ টা হইয়াছিল। এই সকল জাহাজের বলে মহারাষ্ট্রীয়েরা সিদ্ধি ও পর্তুগীজদিগকে দমন করিতে ও ইংরাজদিগের হস্ত হইতে বোম্বাইয়ের নিকটস্থিত থালেরী (Kennerly) দ্বীপ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। কাকোজী আঙ্গ্রে, দরিয়াদাগর, মায়নাক ভাণ্ডারী ও ইব্রাহিম খাঁ প্রভৃতির নাম মহারাষ্ট্র এডমিরাল বা নোসেনাধ্যক্ষদিগের মধ্যে ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

নবপ্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র-রাজ্যের রাজস্ব-ব্যবস্থাও প্রজার

পক্ষে সুখকর ছিল। এই সময়ে মহারাষ্ট্রে নগদ টাকার খাজনা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। খাজনা আদায়ের ভার ঠিকাদার-দিগের উপর অর্পণ না করিয়া সরকারী কর্মচারী পাঠাইয়া আদায় করা হইত। উৎপন্ন শস্তের দুই পঞ্চমাংশ রাজার আপ্য বশিরা নির্ধারিত হইয়াছিল। দেওয়ানি বিচারের অধিকাংশ গ্রাম্য পঞ্চায়তের সাহায্যে নির্ধারিত হইত। বিশেষজ্ঞ ইংরাজ-রাজনীতিজ্ঞেরাও বলেন, "In provinces in which the laws of Shivaji remained in force, there was nothing to improve but much to imitate" সমগ্র রাজ্যটি ষাটশ মহালে বিভক্ত হইয়াছিল। মহালের অধ্যক্ষেরা বার্ষিক ৪ শত হোন বেতন পাইতেন। রাজ্যের বার্ষিক আয় ৫০ লক্ষ টাকা ছিল। এতদ্ভিন্ন মোগল রাজ্য হইতে কর (চৌধ) ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও আসিত। মহারাষ্ট্র-দিগের ধর্মোন্মাদকতার ফলে এই নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইসলাম ধর্মে আঘাত করিবার চেষ্টা কখনও মহারাষ্ট্রেরা করেন নাই। মুসলমানদিগের মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহকল্পে এবং মুসলমান প্রজার আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের জন্ত শিবাজী ভূমিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সেই বিপ্লবপূর্ণ কালেও মহারাষ্ট্রপতি দেশে বিজ্ঞার বিস্তার-কাণ্ডে যথাসাধ্য মনোযোগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। টোল পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপনের জন্ত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে রাজকোষ হইতে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি প্রদত্ত হইত। সংস্কৃত ও মরাঠা ভাষায় গ্রন্থ রচনার জন্য গ্রন্থকারেরা রাজার নিকট পুরস্কার পাইতেন।

শিবাজীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্র-সমাজের নেতৃত্ব হুঁত্যা-ক্রমে সাম্রাজ্যীর হস্তগত হয়। একনাথ ও রামদাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের ধর্মভাবের উদ্দীপনায়, তানাজী মালুসরে ও প্রতাপ রাও প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বীরগণের বাহুবলে এবং বালাজী চিটনৌস প্রভৃতি কায়স্থগণের নীতিকৌশলে, শিবাজীর ন্যায় প্রতিভাশালী ধর্মপ্রাণ নরপতির নেতৃত্বাধীনে যে মহারাষ্ট্ররাজ্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা তৎপূর হ্রস্কৃত সাম্রাজ্যীর কর্মদোষে রগতলে বাহঁবার উপক্রম হয়। সাম্রাজ্যী শৌর্য্যে ও সামর্থ্যে হীন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ঘোর বাসনাসক্তি ও প্রকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞানের অভাবে সমগ্র মহারাষ্ট্র-সমাজকে নিতান্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। শাহজাদা অকবরকে তিনি আশ্রয়-দান করার অরক্ষণে স্বয়ং ১২ লক্ষ (কাকি খাঁর মতে ২০ লক্ষ) সৈন্য লইয়া দক্ষিণাঞ্চল-বিজয়ের জন্ত ১৬৮৩ খৃঃ নব্বদা উত্তীর্ণ হন। সাম্রাজ্যীকে বাসনাগত দেখিয়া জঞ্জীরার সিদ্দি ও পোরার পর্ভুগীজেরা মন্তকোত্তোলন করেন। এই সকল

শত্রুর সহিত যুদ্ধে সাম্রাজ্যী অসাধারণ শৌর্য্যপ্রকাশ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বহু সংখ্যক শত্রু উপস্থিত হইলে একজনের সহিত যুদ্ধ ও অপরের সহিত সন্ধি করিতে তিনি জানিতেন না। এ বিষয়ে অষ্ট প্রধানের উপদেশেও তিনি কর্ণপাত করেন নাই। সিদ্দি, পর্ভুগীজ ও ইংরাজ প্রভৃতি শত্রুর সহিত যুগ-পং সমর আরম্ভ করিয়াও তিনি অসাধারণ শৌর্য্যবলে সকলের নিকট হইতে অমুকুল সন্ধিপত্র আদায় করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধপ্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় নৌসেনা অলৌকিক সমরকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল। গোয়ার নিকটে কোণ্ডুর্গে পর্ভু-গীজদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা পর্ভু-গীজদিগের ২ শত যুরোপীয় ও এক হাজার দেশীয় সৈনিকের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সে সময়ে দক্ষিণাঞ্চলে না থাকিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা পর্ভুগীজদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন।

১৬৮৩ খৃঃ, অরঙ্গজেবের মোগল সৈন্তের সহিত বাগলানে মরাঠাদিগের ঘোর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই যুদ্ধে মোগলদিগকে নিতান্ত জর্জরিত করিয়া তুলেন। রামসেজ দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ সেনানী সহ স্রষ্ট্রসিদ্ধ নিজাম উলমুকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পরাভূত হইয়া প্রত্যাভূত হইতে হয়। শিবাজীর শিষ্য হযীর রাও মোহিতে এই সময়ে মরাঠা সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। কোঙ্কণ অধিকার করিবার জন্ত মোগলেরা অগ্রসর হইলে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল অব্যবস্থিত যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে এক্রূপ বিপন্ন করিয়া তুলিল যে, মোগলেরা পলায়নের পথও পাইলেন না। অসংখ্য মোগল-সৈন্য মরাঠা সৈনিকের হস্তে ও রসদের অভাবে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হওয়ায় মোগলেরা মরাঠাদিগের সহিত কলহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা প্রভৃতির অস্তিত্ব বিলোপে মনঃ-সংযোগ করিলেন। ২১৩ বৎসর পর্য্যন্ত মোগল-সৈন্য আর মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। মুর্থ সাম্রাজ্যী এই অবকাশের যথোচিত সদ্ব্যবহার না করিয়া আবার বাসনা-মত্ত হইলেন। তাঁহার বিলাসিতা ও অব্যবস্থা-দোষে রাজ-কোষ অর্থশূন্য হইল, রাজস্ব আদায়ও এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। শিবাজীর প্রবর্তিত নিয়মাবলী উৎক্ষেপিত হইতে লাগিল। দেশে কাজেই অরাজকতা ঘটিল।

১৬৮৭ খৃঃ, অরঙ্গজেব আবার মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বাইর নিকট মোগল সর্দার সর্জে খাঁর সহিত যুদ্ধে সেনাপতি হযীর রাও একটা গোলা লাগার গতাস্ত হইলেন। একদল মোগলসৈন্য এই সময়ে কর্ণাটক

বিজয় করিতে গমন করিল। সাম্রাজ্যী স্বীয় সৈন্তদল তথায় প্রেরণ করিলেন। তাহার। মোগলদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিল; কিন্তু এদিকে মহারাষ্ট্র রক্ষার কোনও উপায় হইল না। কর্ণাটক হইতে প্রধান সেনাদল প্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্বে মোগলেরা মহারাষ্ট্র উৎসাদন করিতে লাগিল। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত সাম্রাজ্যী শৌর্য্যসহকারে মোগল-সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাহার পর সহসা তাহার বিলাসিতা মনে পড়িল। তিনি বুদ্ধাদি ভ্যাগপূরক সঙ্গমেথরে গিয়া ইন্দ্রিয়সেবার নিরত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া মোগল-সেনাপতি তাঁহাকে সহজেই বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। সম্রাটের আদেশে অতি নিষ্ঠুরভাবে তিনি নিহত হইলেন! ( ৬৮৯ আগষ্ট ) এইরূপে মরাঠারা মোগলদিগকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াও সুযোগ্য নেতার অভাবে সুফল লাভ করিতে পারিলেন না। [সাম্রাজ্যীর বিস্তারিত বিবরণ পেশবা ও সাম্রাজ্যী শব্দে দ্রষ্টব্য]

বাধীনতার জন্ত যুদ্ধারম্ভ।

মহারাষ্ট্রা শিবাজীর পুত্রের এই শোচনীয় পরিণাম দর্শনে মহারাষ্ট্রীয়গণ অতীব উত্তেজিত হইলেন। তাহার। তৎপূত্র অন্নবয়স্ক শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হুঁচকাক্রমে অন্নদিনের মধ্যেই জনৈক বিশ্বাসঘাতক মরাঠার দোষে রায়গড় মোগলদিগের হস্তগত হইল। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যীর শিশুপুত্র শাহ জননী এম্বাবঈ সহ মোগলহস্তে বন্দী হইলেন। অষ্ট প্রধানেরা বহুকষ্টে পলায়নপূরক আশ্রয়লাভ করিলেন। তাহার পর একটা একটা করিয়া প্রায় সকল দুর্গ মোগলদিগের হস্তগত হইতে লাগিল। ১২ লক্ষ মোগলসৈন্যে মহারাষ্ট্র চাইয়া ফেলিল। অনেকে মনে করিলেন, মহারাষ্ট্ররাজ্য শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু জ্ঞান ও ধর্ম্মের ভিত্তি উপর যে রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সেই ঘোর সঙ্কটকালেও বিনষ্ট হইল না। পক্ষান্তরে এই দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রকৃত পৌরুষ, স্বদেশপ্রেমীতি ও স্বধর্ম্ম রক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সদগুণের পরিচয় সকলেই লাভ করিল।

• সাম্রাজ্যীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম অতঃপর সিংহাসনারোহণ করিলেন। তিনি বাসনশূন্য, দয়ালু ও পরার্থপরায়ণ ছিলেন। ক্ষত্রিয়জনোচিত প্রথার তেজ তাঁহার চরিত্রে আদৌ ছিল না। রায়গড় শত্রুহস্তগত হওয়ায় অষ্ট প্রধানের পরামর্শে তিনি কর্ণাটকের অন্তর্গত জিজিহর্গে রাজধানী অপসারিত করিলেন। অমাত্য রামচন্দ্র পণ্ডা বিশালগড় ও পাহালা দুর্গের মধ্যে অবস্থানপূরক মহারাষ্ট্ররক্ষার চেষ্টা করিবার

ভার প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাজ্যী ঘোরপড়ে ও ধনাজী যাদব নামক সেনানীহর জিজি ও মহারাষ্ট্রের মধ্যভাগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোগলসেনার রসদ বন্ধ করিবার ভার লইলেন। রাজারাম জিজিতে গিয়া নতুন অষ্টপ্রধান নির্বাচন করিলেন এবং শিবাজীর প্রণীত নিয়মাবলীর পুনঃপ্রচার করিলেন। এদিকে মোগলসম্রাট অরঙ্গজেব সাম্রাজ্যীর বিনাশ এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের বিলোপসাধনে সফলপ্রযত্ন হওয়ায় জয়লাভে অতীব উৎফুল্ল হন, এবং হিন্দুধর্ম্মীদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে, বিজয়োন্মত্ত হইয়া তিনি স্বীয় অধীন হিন্দুসৈন্তদলেরও ধর্মানাশে উত্তত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ বিপরীত ফলের সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হয়। সে বাহা হউক, মোগলদিগের হস্তে স্বধর্ম্মের নিগ্রহ হইতেছে দেখিয়া, তেজস্বী মহারাষ্ট্রীয়গণের কোধানল প্রবল হইল। তাঁহাদিগের নরপতি রাজারাম ( শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র ) তখন স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া যবনদিগের ভয়ে সাম্রাজ্য অঞ্চলে “জিজি” হর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়গড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দুর্গসমূহ মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে অশিক্ষিত সৈনিকের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। সমাজে দুই চারি জন বিশ্বাসঘাতক দেশবৈরীও অভাব ছিল না। কিন্তু এই সকল প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও তাঁহার স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্যের রক্ষার জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন; ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত হইয়া প্রচণ্ড সাগর-তরঙ্গসদৃশ মোগলসেনার গতিরোধে অগ্রসর হইলেন। যিনি কোনরূপে একখানি বল্লম সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তিনিই মোগলদিগের পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগকে অধিকতর উৎসাহিত করিবার জন্ত রাজারাম জিজি হইতে বিবিধ প্রকার পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। তখন তাঁহাদিগের ভীষণ রণোন্মত্ততা দেখিয়া সম্রাটকেও ভীত চকিত হইতে হইল। মরাঠারা স্বধর্ম্মের ও সমধর্ম্মগণের রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জনে কৃতসংকল্প হওয়ায় বাদশাহীসৈন্তের নানা স্থানে পরাজয় ঘটিতে লাগিল। দ্বাদশ লক্ষ অশিক্ষিত ও অসজ্জিত সৈন্ত লইয়া মুষ্টিমেয় মরাঠাগণের সহিত সপ্তদশ বর্ষ কাল অনবরত যুদ্ধ করিয়াও অরঙ্গজেব জয়লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না।

এই সময়ে সম্রাজ্যী ঘোরপড়ে ও ধনাজী যাদব এত দুই জন সেনানী অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার। শিবাজীর সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয় সামরিক বিভাগে, কার্য্য করিতেছিলেন। ইহাদিগকে কর্ণাজ্জনের সহিত তুলিত করিলেও অত্যাক্তি হয় না। মুসলমান ইতিহাসলেখক কাফি



খাঁ বলেন—“সম্রাজী মোগল সর্দারদিগকে অতীব জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার সম্মুখীন হইয়া কোনও মোগল-সৈনিক জীবিত অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিতেন না। বড় বড় মোগল যোদ্ধাও তাহার সম্মুখীন হইতে ভীত হইতেন। তাহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে, এমন সর্দার মোগল পক্ষে কেহ ছিল না।” সম্রাজী একবার গ্লেনবং বেঙ্গে আসিয়া মোগল-সম্রাটের বন্দাবাস আক্রমণ ও তত্পরি-স্থিত সুবর্ণ-কলস হরণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে অরঙ্গজেব তাহাতে ছিলেন না বলিয়া রক্ষা পাইয়া-ছিলেন। ধনাজীও সামান্য বীরত্ব প্রকাশ করেন নাই। তাহার নাম মোগল তুরঙ্গদলেরও ভীতির স্থল হইয়া উঠিয়া-ছিল। এমন কি, কথিত আছে, তাহার নাম কর্ণগোচর হইলে মোগল অশ্ব চমকিয়া জলপান পরিত্যাগ করিত।

এদিকে ভীমাতীরে বাদশাহী সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলে ধনাজী ও সম্রাজী প্রভৃতি মহারাজী বীরেরা দক্ষিণে কর্ণাট হইতে উত্তরে খানদেশ পর্যন্ত সমস্ত দেশে বিপ্লব উপস্থিত করিয়া একে একে সমস্ত মোগল-খানাসুলি অধিকার করিতে লাগিলেন। বিশাল মোগল-সৈন্য ক্ষিপ্ৰগতিতে ইহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে না পারিয়া কর্ণাটকে রাজারামকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তত্পক্ষে ডভেরী নামক স্থানে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে ধোরতর সংগ্রাম ঘটে। সম্রাজীর সহিত যুদ্ধে মোগল সর্দার কাসম খাঁকে প্রাণ হারাইতে হয়।

অন্যদিকে বাদশাহী সৈন্য জুলফকার খাঁর অধীনতায় জিজি হুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। পাঁচ বৎসর কাল অবরুদ্ধ অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াও রাজারাম ও তাহার সহচরগণ পরাভব স্বীকার করিলেন না। পরিশেষে বাদশাহ জিজি অধিকার বিষয়ে অতি কঠোর আদেশ প্রেরণ করিলে মোগল-সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া জিজি অধিকার করিল। কিন্তু হুর্গে প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিল, রাজারাম ও তদীয় সচিবগণ তৎপূর্বেই হুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। (১৬৯৮খৃঃ)

রাজারাম জিজি হইতে পলায়নপূর্বক মহারাজী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাতারায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। তথা হইতে সকল সর্দারকে সঙ্গে লইয়া তিনি মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই অভিযানের ফলে উত্তর মহারাজীর যে সকল প্রদেশ মোগলদিগের শাসনাধীন ছিল, তাহা হইতে মহারাজী-দিগের প্রাপ্য চোখ ও সরদেশমুখী আদায় হইল।

এই সময়ে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু ঘটিল। কিন্তু এই হৃদয়বিচলিত ও মহারাজীগণ বিচলিত হইলেন না। খৃষ্টীয়

১৬৮০ অব্দ হইতে ১৭০০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত বিংশ বৎসরের মধ্যে একে একে শিবাজী, সম্রাজী ও রাজারাম লোকান্তরিত হইলেন; তথাপি মরাঠাগণের উৎসাহ ও উৎকর্ষের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না।

“ছিন্নোহপি রোহিত তরুশ্চক্ৰঃ ক্ষীণোহপি বর্জতে।”

এই ত্রায়াস্ত্রসারে মরাঠাগণের অধ্যবসায় ও বিক্রম দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ধনাজী ও রামচন্দ্র পশ্চপ্রমুখ মহারাজীগণ মোগলদিগকে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে দিলেন না। তাহাদিগের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব, শীতগ্ৰীষ্ম-বর্ষায় সমান উৎসাহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিশ্রামের প্রতি অমনোযোগ ও হুর্কার সমরোত্তম প্রভৃতি দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া মোগল সেনানীগণ বলিতে লাগিলেন, “মরহটে লোগ আদমি নেহি হয়—এতো ভূতখানা হয়!” ইহার পর বাদশাহ স্বয়ং কিছুদিন মরাঠাদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোনও ফললাভ হইল না।

মহারাজীদিগের কালান্তক মূর্তির সংহার হইতেছে না দেখিয়া মোগলগণ অগত্যা পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু মরাঠাদিগের বিক্রমে পলায়নও তাহাদিগের পক্ষে অতীব বিষকর হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ সম্রাট নিরুপায় হইয়া হতাশহৃদয়ে পথিমধ্যে “বৃথায় জন্ম গেল” বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন (খৃঃ ১৭০৭ ফেব্রুয়ারি)। দক্ষিণাপথে হিন্দুধর্ম প্রায় নিশ্চল হইল। স্বদেশের ও স্বদেশের রক্ষার জন্ত প্রবল পরাক্রান্ত মোগল-সম্রাটের সহিত এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় ভারতের আর কোনও জাতি ঈদৃশ দীর্ঘকালব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় নাই। অকৃত্রিম ধর্মেৎসাহে ও গভীর স্বদেশভক্তিতে সমগ্র জাতির হৃদয় পূর্ণ না হইলে এরূপ অসাধ্যসাধন সুদূরপর্যন্ত হইত, সন্দেহ নাই। ফলতঃ এ সময়ে মহারাজীদেশে স্বধর্মামুসার ও স্বদেশপ্রেমের অপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল, স্বয়ং শিবাজীর সময়েও সেরূপ হয় নাই। ফলতঃ শিবাজী যে রাষ্ট্রীয় ভাবের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, এই সময়ে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া হৃদ্বর্ষ মোগলদিগকে চমকিত করিয়াছিল।

সম্রাজীর হত্যার পর তাহার জীপুত্রকে মোগলেরা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহাদিগের উদ্ধারসাধনের জন্ত মরাঠাগণ পঞ্চদশ বৎসর কাল বিবিধ চেষ্টা করিয়াও সে বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মহারাজীদিগের বল, দর্প ও সাহস এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, নবীন সম্রাট ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাজীর পুত্র মুক্তিদান

করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, শাহ দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজারামের পুত্রের সহিত রাজ্যের বিভাগ লইয়া তাঁহার কলহ উপস্থিত হইবে, এবং সেই বিবাদান্তিতে নবপ্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্ররাজ্য ভঙ্গীভূত হইলে দাক্ষিণাত্যে আবার মোগল-সাম্রাজ্যবিস্তারের সুযোগ ঘটিবে। অরঙ্গজেবেরও এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কারণ, তরুণ সম্রাটের স্থায় তিনিও মহারাষ্ট্রশক্তির মূলতত্ত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মহামতি রামদাস মহারাষ্ট্রসমাজে যে স্বধর্ম্মমুরাগের বীজ নিহিত করিয়াছিলেন, তাহা এত শীঘ্র বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

চারি বৎসরের মধ্যেই মরাঠাগণ নিজ নিজ গৃহবিবাদের সীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। পরবর্তী চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহারা দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার বিধান ও যথোপযুক্ত বল-সংগ্রহ করিলেন। [ পেশবা শব্দ দেখ। ]

অতঃপর সমগ্র ভারতে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরকে করতলগত করিয়া পেশবা বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের দেশমুখী ও চৌথের সনন্দ আদায় করিলেন। এই সনন্দই মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্যবিস্তারের প্রধান উপায়স্বরূপ হইল। হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য “হিন্দুপং বাদশাহী” বা স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য-স্থাপনের আবশ্যকতা ইতঃপূর্বেই অনুভূত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের নিগ্রহ করিয়া মুসলমানেরা স্বধর্ম্মমুরাগী মরাঠাগণের অতীব বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। এই কারণেও এ সময়ে “মোগল-শাহী”র স্থানে ভারতবর্ষে “হিন্দুশাহী” স্থাপন তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হইল।

চৌথ।

মোগলদিগের আমলে দেশের শান্তিরক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার আয়োজনে সাধারণতঃ রাজস্বের চতুর্থাংশ ব্যয়িত হইত। মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টায় মহারাষ্ট্রশক্তি যখন দেশ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিল, তখন মহারাষ্ট্র-নরপতিগণ হুসল প্রতিবেশি-রাজ্যের শান্তি-রক্ষার ও শত্রুর আক্রমণ-নিবারণের ভার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কাজেই সেই আশ্রিত রাজ্যের রাজস্বের চতুর্থাংশ বা “চৌথ” তাঁহাদিগের প্রাপ্য হইল। ফলতঃ “চৌথ” অপরের রাজ্যরক্ষার্থ সৈন্তপোষণের বেতন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ বেতন লাভ করিয়া স্বকীয় সৈন্ত-পোষণের ব্যয়-ভার লাঘব করিবার কল্পনা প্রথমে শিবাজীই উদ্ভাবিত করেন। তিনি বহুদিন হইতে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানদিগের

এবং মোগল বাদশাহের নিকট তাঁহাদিগের রাজ্য বা রাজ্যাংশ রক্ষার ভার-গ্রহণ ও তাহার বেতনস্বরূপ “চৌথ” স্বত্বের প্রার্থনা করিতেছিলেন। পরিশেষে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগের আক্রমণের ভয়ে বিপন্ন হইয়া দক্ষিণপথের সুলতানেরা শিবাজীকে চৌথ-স্বরূপ বার্ষিক আট লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন ও তাঁহার সৈন্ত-সাহায্য লাভ করেন। সে সময়ে কেবল শিবাজীর সহায়তার ফলেই বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা রাজ্য মোগল-সম্রাটের সর্বনাশ-কর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এইরূপে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সর্বপ্রথম দক্ষিণ-ভারতে “চৌথ” প্রথার প্রবর্তন হয়।

বলা বাহুল্য, আত্মরক্ষণী নীতির বশবর্তী হইয়াই রাজনীতি-বিৎ শিবাজী এই চৌথ পদ্ধতির উদ্ভাবন ও অমূল্যরূপ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পর রাজ্য-রক্ষার দায়িত্ব লইয়া তদ্বিনিময়ে তত্রত্য রাজস্বের চতুর্থাংশ লাভ করিতে না পারিলে ভারতে মহারাষ্ট্রশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। কারণ, ইহার দ্বারা প্রথমতঃ পররাষ্ট্রের ব্যয়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সৈন্ত সংখ্যা ও সামরিক বলের বৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল রাজ্য মহারাষ্ট্র-সৈন্ত কর্তৃক রক্ষিত হইবে, সে সকল রাজ্য হইতে মহারাষ্ট্র-রাজশক্তির বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, “চৌথ” নামে শাস্ত্ররক্ষার বেতন হইলেও কার্যতঃ উহা সামন্তের নিকট প্রধান রাজশক্তির প্রাপ্য করেরই নামান্তর। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবদিত নাই যে, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মাকুইস অব ওয়েলেসলি মহোদয়ের প্রবর্তিত “সব্‌গিডিয়ারি সিস্টেম”ও এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর ইহলোক পরিত্যাগের পূর্বেই দক্ষিণ-ভারতের যাবতীয় হিন্দু ও মুসলমান রাজশক্তির সম্মতিক্রমেই তাঁহাদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ ও তাহার বিনিময়ে চৌথ আদায় করিবার প্রথা মহারাষ্ট্র-সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্রাট অরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বাধীনতা হরণ-পূর্বক তাঁহাদের শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় মহারাষ্ট্রীয় বীর-গণের অসাধারণ শৌর্যগুণে তাঁহার সমস্ত স্বপ্নই বিফল হয়। বিংশতি বৎসর যুদ্ধের পর খৃষ্টীয় ১৭০৫ অব্দে সম্রাট তাঁহাদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে এক সনন্দপত্র দান করেন। অধিকন্তু দেশের অশান্তি নিবারণের স্তানসে তিনি তাঁহাদিগকে দক্ষিণ-ভারতস্থিত মোগল-শাসিত প্রদেশের ‘সরদেশমুখী’ স্বত্ব বা সমগ্র রাজস্বের দশমাংশ—বার্ষিক এক কোটি অশীতি লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। এজন্য

অবশ্য সরদেশমুখের দ্বারা স্বকীয় সৈন্তের দ্বারা দক্ষিণাংশের বাদশাহী প্রদেশের শাস্তিরক্ষার ভার তাঁহাদিগকে লইতে বলা হইল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহাতে সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা বাদশাহের নিকট সরদেশমুখীর সহিত শিবাজীর উদ্ভাবিত চৌথপদ্ধতির প্রবর্তনাধিকারও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কারণ, সে সময়ে দেশে ধেরূপ অসংখ্য রাজ্যের ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় রাজ-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাতে পররাষ্ট্রে যথোপযুক্ত পরিমাণে সৈন্ত-রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে দেশে শান্তিস্থাপনের ও মহারাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সম্রাট সে স্বপ্নদানে অসম্মত হওয়ার পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। পরিশেষে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের পুত্র ফরুখশিয়র আংশিকভাবে ও তৎপরবর্তী সম্রাট মহম্মদশাহ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণভাবে মহারাষ্ট্রদিগকে সরদেশমুখী স্বত্বের ও চৌথপদ্ধতি প্রবর্তনের সনন্দ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। বাজী রাওয়ের পিতা বালাজী বিশ্বনাথ স্বয়ং দিল্লী গমন করিয়া শেখোক্ত সনন্দ পত্র লইয়া আসেন।

সনন্দ লাভ করিয়াও মহারাষ্ট্রীয়েরা সর্বত্র চৌথপদ্ধতির প্রবর্তন করিতে পারিলেন না। দিল্লীশ্বরের সুবেদারেরা ও অপর স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় রাজত্ববর্গ বিনা যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-শক্তির রক্ষণাধীন হইতে অসম্মত হইলেন। নিজাম উল-মুল্ক এ বিষয়ে প্রধান প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। এজন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ২০ বৎসর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। বাজী রাও এই যুদ্ধের নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া নিজামকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রক্ষণাধীনতা স্বীকার ও তাঁহাদিগকে চৌথ দান করিতে হয়। দক্ষিণাংশের অপর ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজারাও ক্রমে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ফলতঃ বালাজী বিশ্বনাথ মোগল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাঁহার স্বদেশবাসীর জন্য যে স্বত্বের সনন্দ আনয়ন করেন, বাজী রাওয়ের জীবনব্যাপী চেষ্টাতেই মহারাষ্ট্রবাসিগণ তাহার প্রকৃত ফলভোগের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

কেবল তাহাই নহে। বাদশাহী সনন্দ অনুসারে উত্তর-ভারতে চৌথ আদায়ের অধিকার মহারাষ্ট্রীয় জাতির ছিল না। এই কারণে আর্থাভাবে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারপূর্বক চৌথ পদ্ধতির প্রবর্তন করিবার কল্পনা বাজী রাওয়ের পূর্বে কাহারও মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। বীরশ্রেষ্ঠ বাজীরাওয়ের বিশাল চিত্রক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষকে চৌথপদ্ধতিতে আবদ্ধ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ হইতে

হিমাচলের শিখরদেশস্থিত “আটক” নগর পর্য্যন্ত বিশাল প্রদেশের শাস্তিরক্ষার বা শাসন ও পালনের ভার গ্রহণ করিবার মহনীর আকাঙ্ক্ষা সমুদিত হয়। মহারাজ শাহর মজিদমাজ ও সেনানীগণ বাজীরাওয়ের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা দর্শনে তৃপ্তিত হইয়া তাঁহাকে এই কার্যে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দুশক্তির ও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিধর্মীর শাসনপাশ হইতে সমগ্র ভারতবাসীর উদ্ধার সাধন প্রত্যেক মহারাষ্ট্রমুসলমানের কর্তব্য—এই কথা বলিয়া বাজীরাও সকলের উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করেন। এই প্রসঙ্গে মহারাজ শাহর দরবারে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণে সমস্ত মহারাষ্ট্র সর্দারেরা একমত হইয়া ভারতে হিন্দু-প্রাধান্য-স্থাপনে অগ্রসর হওয়াই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। শিবাজীর প্রবর্তিত চৌথপদ্ধতির সাহায্যে ভারতবর্ষে হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনের জন্য অগ্রগমন-নীতির (Forward policy) প্রচারই বাজী রাওয়ের চরিত্রের বিশেষত্ব। ঐ নীতির অনুসরণে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়কে সমবেতভাবে নিয়োজিত করাই তাহার চরিত্রের প্রধান মহত্ব। সেই মহত্বের প্রভাবে হিন্দুস্থানে শতবর্ষ পর্য্যন্ত হিন্দুর প্রাধান্য পরিরক্ষিত হইয়াছিল।

মহারাজ শাহর আদেশে বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বাজীরাও দিল্লীপতির প্রদত্ত সনন্দ হস্তে লইয়া কাগ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। উত্তরে আটক হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য তিনি স্বদেশবাসীকে উৎসাহিত করিলেন। এই সময়ে দক্ষিণাংশে নিজাম-উল-মুল্ক অতিশয় প্রতাপাশ্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার কুটিলতায় মহারাষ্ট্রসমাজে কয়েকবার গৃহবিবাদ বাধিবার উপক্রম হইল। কিন্তু বাজীরাও কতিপয় যুদ্ধে তাঁহার ও দিল্লীশ্বরের দর্পচূর্ণ করিয়া উত্তরে যমুনা হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ হইতে চৌথ আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। দিল্লীদরবারেও নিজামের সমস্ত উত্তম বিফল হইল।

[ পেশবা শব্দ দেখ। ]

মহারাষ্ট্র সামন্তমণ্ডল।

বাজীরাও যে নীতির অবলম্বন করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে মহারাষ্ট্ররাজ্যে একটি অভিনব সামন্তমণ্ডলের সৃষ্টি হইল। এই সামন্তমণ্ডলকে ইংরাজীতে The Maratha Confederacy বলে। কনফিডারেসী বলিলে সামন্তের ভাব আদৌ বুঝায় না। কিন্তু প্রথম বখান এই মণ্ডল স্থাপিত হয়, তখন উহাতে রাজমণ্ডল অপেক্ষা সামন্তমণ্ডলের ভাবই প্রবল ছিল। মহারাষ্ট্ররাজ্যের ছত্রপতির প্রধান

মন্ত্রিকপে মণ্ডলাভ্যন্তরিত যে কোনও সামন্তকে পদচ্যুত করিবার অধিকার পেশবার ছিল। পরে কেন্দ্রশক্তির দুর্বলতা ঘটিলে সামন্তেরা অনেকটা স্বাধীনভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। শিবাজীর অষ্ট প্রধানের পরিবর্তে বৈকুণ্ঠ এই নূতন মণ্ডলের স্রষ্টা হয়, তাহা ইতিহাসপ্রিয় পাঠকের অবশ্য জ্ঞাতব্য। মহারাষ্ট্র ইতিহাসের এই অংশ বুঝিবার পূর্বে পাঠকে একবার শাহর দরবারে বাজী রাও যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিতে হইবে।

[ পেশবা শব্দ সেই বক্তৃতা উদ্ধৃত হইয়াছে। ]

অরঙ্গজেবের সহিত বিংশতি বর্ষকাল অনবরত যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদিগের স্বাভাব্য রক্ষায় কৃতকাব্য হন ও বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় রাজ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর মহারাষ্ট্রীয়দিগের উন্নতির জন্য কিরূপ পন্থা অবলম্বনীয় এই সমস্যা বাজী রাওয়ের সময়ে উপস্থিত হয়। শিবাজীর প্রবর্তিত নিয়মাবলীর অমূল্য স্মরণ করিয়া এত দিন মহারাষ্ট্রীয়েরা ঘোর বিপৎকালেও আত্মসংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহারা দেখিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বদেশে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে তাঁহাদিগের মঙ্গল ঘটবে না। মুসলমান-শক্তির কেন্দ্রস্থল দিল্লী হস্তগত করিতে না পারিলে যখনদিগের প্রভাব—দেশের স্বেচ্ছাভাব দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। দিল্লীতে যতদিন মুসলমানশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন মহারাষ্ট্রীয়েরা নিশ্চিন্ত মনে স্বদেশের শান্তিরক্ষা করিতে পারিবেন না। কারণ, দিল্লীর কেন্দ্রশক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকিলেও উহার অসংখ্য শাখা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই শাখাশক্তিসমূহ ক্রমশঃ স্বাভাব্য অবলম্বন করিলেও আপনাদিগকে মুসলমান-সাম্রাজ্যের প্রধান অবয়ব বলিয়া মনে করিতেন। সেই স্বত্রে ভারতবর্ষ শাসনের অধিকারও তাঁহাদিগেরই আয়াহুসারে প্রাপ্য বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা হইয়াছিল। কেন্দ্রশক্তির হ্রাস হইলেও তাঁহারা নিজ বাহুবলে ভারতের বিভিন্ন অংশে মুসলমান গৌরব অপ্রতিহত রাখিবেন, সংকল্প করিয়াছিলেন। কারণেই বাদশাহী শক্তি বিনষ্ট হইলেও তাঁহারা আপনাদিগের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিরত হইলেন না।

মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাবিলেন, শিবাজীর সময় হইতে প্রায় ৫০ বৎসর অবিখ্যাত চেষ্টা করিয়া যখন তাঁহারা মুসলমানদিগের প্রধান শক্তিকে দমিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, স্বদেশের স্বাভাব্য বহু কষ্টে লাভ করিয়াছেন, তখন সুবেদারদিগকে অকারণে প্রভুত্ব করিতে দিবেন কেন? দ্বিতীয়তঃ মুসলমান-

দিগের কেন্দ্রশক্তি বিনষ্ট হওয়ার ভারতবর্ষ এক প্রকার রাজশূন্য হইয়াছিল। সকলেই বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে মোগল-সম্রাটের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াই, অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাঁহাদিগের চেষ্টাতেই মোগলসিংহাসন শক্তিহীন বা শূন্যপ্রায় হইয়াছিল, তখন তাঁহারা থাকিতে অপর মুসলমানেরা আসিয়া উহা অধিকার করিবেন, ইহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট অসম্ভব বোধ হইবে কেন? কাজেই যে সকল মুসলমান আমলদার বা সুবেদার সমগ্র ভারতবর্ষকে লতাগুচ্ছের জ্ঞায় পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উচ্ছেদ সাধনপূর্বক সর্বত্র মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের বিস্তার করাই মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদিগের কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর সময়েই এই নীতির সূত্রপাত হইয়াছিল। তিনি মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা সম্পাদনের পর দক্ষিণে কর্ণাটক প্রদেশও বিজয় করিয়াছিলেন। তদবধি দক্ষিণ ভারতে প্রায় কুমারিকা পর্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়ে উত্তরে নন্দা পার হইয়া দিল্লীর রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার বাসনা মহারাষ্ট্রবীরগণের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল।

বালাজী বিশ্বনাথ ও তদীয় বংশধরগণের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। বাজীরাও শাহর দরবারে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারও মর্ম্ম এইরূপ ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার না করিলেও যখন অথো উহা অধিকার করিবার সুযোগ পরিভাগ করিবে না, তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগেরই উহা হস্তগত কারতে ক্ষতি কি?—পেশবাগণের মনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই ভাব প্রবল ছিল। সমগ্র ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্যসংস্থাপন কতদূর সম্ভবপর হইবে, তাহা শিবাজীর সময়ে নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা সহজ ছিল না। কিন্তু পেশবাদিগের পক্ষে উহা বহু পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ দিল্লীর প্রতি সমগ্র জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিলে স্বদেশে যে সকল ক্ষুদ্র দলাদলি ছিল, তাহা সত্ত্বরই বিলুপ্ত হইবে ভাবিয়া তাঁহারা এই অগ্রগমন-নীতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। প্রতি-নিধি পরশুরাম ত্রিষক প্রভৃতি কয়েক জন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ বাজীরাওয়ের উৎকর্ষ দর্শনে অসমর্থ হইয়াই হউক, অথবা অথ যে কোন কারণেই হউক, ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্য-বিস্তারকল্পনায় ঘোর বিরোধী ছিলেন।

পরিণাম দেখিয়া বিচার করিলে, বলিতে হয়,—প্রতিনিধির অপেক্ষা পেশবার নীতিই অধিকতর প্রেরণকর ছিল। কারণ দিল্লীর শক্তি ক্ষীণ হইবা মাত্র ভারতীয় ক্ষমতাসাহী ব্যক্তিগণ

সকলেই বাদশাহী গৌরবের উত্তরাধিকার বা সমগ্র ভারতের প্রভু লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এরূপ সময়ে সে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকা মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে সম্ভবই ছিল না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুৰাকাঙ্ক্ষার অপেক্ষা আত্মরক্ষণী নীতির বশবর্তী হইয়া তাঁহাদিগকে এই পন্থার অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসরের পরে বৃটিশ রাজ্য-সংস্থাপক ক্লাইবও এইরূপ বিচার ও কার্যপ্রণালীর অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বালাজী বিখনাথ সৈয়দদিগের সাহায্যে দুর্গল বাদশাহের নিকট হইতে যেক্ষেপে চৌথ ও সর-দেশ-মুখীর সনন্দ আদায় করিয়াছিলেন, ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইবও সেইরূপ শাহ আলমের নিকট হইতে দেওয়ানি সনন্দ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাজীরাও শাহর দরবারে বক্তৃতা করিয়া মহারাষ্ট্রবাসীর ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে যে নীতিমার্গ স্থির করিয়াছিলেন, তাহার ফলে মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যে সামন্তমণ্ডলের সৃষ্টি হইল। তাঁহার তিরীকৃত নীতিমার্গের অনুসরণ কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইলে, পেশবাকে তদুপযোগী আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। মহারাজ শাহ শিবাজীর ত্রায় প্রতিভাশালী না হইলেও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি পেশবার-নীতির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া উহার সমর্থন করিলেন। কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। সময়কুশলতা বা শৌর্যগুণ তাঁহার আদৌ ছিল না। অথচ সে সময়ে দেশের অবস্থা যেক্ষেপ ছিল, তাহাতে শৌর্য ভিন্ন অপর গুণের তাদৃশ আদর ছিল না। বাজীরাও শৌর্যগুণের আধার ছিলেন বলিয়া মহারাজ শাহ তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রীর পদ বা প্রকারান্তরে মহারাষ্ট্রসমাজের নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতিনিধির পক্ষীয় কতিপয় সদ্যর তাঁহার অধীন ভাবে কার্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মহারাজ শাহ যদি স্বয়ং এই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেই মহারাষ্ট্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের বীরেরাই তাঁহার আদেশ পালনে সাগ্রহে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু শাহ প্রকৃত নেতৃত্বগ্রহণে অসমর্থ ছিলেন। কাজেই প্রতিনিধি, আংগে, দাভাড়ে, গায়কোয়াড় প্রভৃতি প্রাচীন সর্দারেরা নূতন পেশবার অধীনতায় কার্য করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। মহারাজ শাহর আদেশ সে সময়ে কেহ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ না হইলেও পুরোহিত সর্দারদিগের সহিত পেশবাগণের কোন কালেই সৌহার্দ্য রহিল না। প্রাচীন সর্দারদিগের সহায়ত্বের অভাবে পেশবাকে কার্যসিদ্ধির জন্ত নূতন সামন্তমণ্ডল রচনা করিয়া লইতে হইল। এইরূপে পেশবার চেষ্ঠায় শিন্দে, হোলকর, পবার ও পটবর্দন প্রভৃতি নূতন সর্দার-

দলের সৃষ্টি হইল। এই নূতন সামন্তদলের সৃষ্টি আর একটা কারণে অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। দিল্লী ভিন্ন মধ্যভারত, মালব, বঙ্গদেশ, গুজরাৎ, কোঙ্কণ (জজিরা), দক্ষিণকর্ণাট প্রভৃতি স্থানে মুসলমান শক্তির কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র ছিল। সেগুলির উচ্ছেদসাধন ভিন্ন মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের নির্দিষ্টতা ও উদ্দেশ্য সুসাধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই কারণে ঐ সকল কেন্দ্রের মুসলমান শক্তিকে দমন করিবার জন্ত, প্রত্যেক স্থানে এক একজন মহারাষ্ট্রীয় সর্দারের স্থাপনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে হইয়াছিল। কাজেই এই সকল সর্দারকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাব্য দান করিয়া মুসলমান-শক্তি-কেন্দ্রের বক্ষের উপর নূতন মহারাষ্ট্র রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ দেওয়া হইল। এইরূপে মধ্যভারতে শিন্দে, মালবে পবার ও হোলকরকে রাখা হইল। ভৌমসলেকে নাগপুরে রাখিয়া বঙ্গীয় মুসলমান-শক্তির উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছিল। সেনাপতি দাভাড়ে গুজরাতের ভার প্রাপ্ত হইলেন। কোঙ্কণে আংগে সিদ্ধি, পঠুগীজ ও উদীয়মান পাশ্চাত্য দম্পাদিগের দমনে নিযুক্ত হইলেন। নিজাম সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের সুবেদার ছিলেন, পেশবা তাঁহার দমনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। ভারতের অতি দক্ষিণাংশে প্রথম কিছু দিন ভৌমসলে, পরে ঘোরপড়ে ও শেষে পটবর্দন সর্দারেরা হিন্দুপ্রাধান্য রক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্তিত করিবার এই অভিনব উপায় পেশবা বাজীরাও ও তৎপুত্র বালাজী বাজীরাওয়ের চেষ্ঠায় উদ্ভাবিত হইল। ফলে গোয়ালিয়ার, ধার, ইন্দোর, নাগপুর, পুণা, কোলাবা, মিরজ প্রভৃতি নগরে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানীনিচয় স্থাপিত হইল। ক্রমে শিবাজীর সঙ্গী মহারাষ্ট্রসমাজের স্থান এইরূপে এক বিশাল মহারাষ্ট্রসমাজ অধিকার করিল। পেশবা এই মহারাষ্ট্রসমাজের নেতা হইলেন। ছর্ভাগ্যের বিষয় মহারাজ শাহর স্বয়ং এই নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সামর্থ্য ছিল না। কাজেই যিনি এই নূতন সাম্রাজ্যকল্পনার উদ্ভাবন করিলেন, তাঁহার উপরেই উহা কার্যে পরিণত করিবার ভার অর্পণ করা তাঁহার নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। ফলে শাহরই আদেশে ও ইচ্ছা-ক্রমে উদীয়মান মহারাষ্ট্রসমাজের নেতৃত্ব পেশবার হস্তগত হইল। বাজীরাওয়ের পর এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার তৎপুত্র বালাজীর হস্তে ব্রজ হইল। আংগে, দাভাড়ে, ভৌমসলে ও গায়কোয়াড় প্রভৃতি বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত সর্দারদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাহ বালাজীকে নেতৃত্বপ্রদানে বাধ্য

হইয়াছিলেন। কারণ, সে সময়ে শাহর বিবেচনার বালাজী অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি মহারাষ্ট্রসমাজে কেহই বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু তদানীন্তন মহারাষ্ট্রসমাজের নেতৃত্ব করিবার জ্ঞান তদপেক্ষা অধিক যোগ্য ব্যক্তির আবশ্যক ছিল। বালাজী বাজীরাও স্বীয় ক্ষমতায় যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিয়া মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রাচীন ও নবমুঠ সামন্তমণ্ডলের উপর যথোচিত প্রভুত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। কাজেই একদিকে নব-দেশবিজয়ের দ্বারা মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যের উন্নতি ও অপর দিকে সর্দারদিগের অসন্তোষে ও উদ্দামব্যবহারে সাম্রাজ্যের মূল ক্ষয়িত হইতেছিল।

ফলতঃ পরবর্তী পেশবাদিগের দুর্বলতাবশে সামন্তমণ্ডল ক্রমশঃ স্বাধীন প্রায় হইয়া উঠিলেও ভারতে মুসলমান-শক্তির দমন কাহা বহু পরিমাণে সুসিদ্ধ করিতে পারিয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে অসন্তোষের সূত্রপাত না হইলে এ দেশ হইতে বৈদেশিক শক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই। তথাপি মহারাষ্ট্রীয়েরা বাহা করিয়াছিলেন, ভারতে সহস্র বৎসরের ইতিহাসে আর কেহ সেরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারেন নাই। যখনময় ভারতবর্ষের বহুভাগ যে তাঁহাদিগেরই চেষ্টায় বৈদেশিক শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছিল, একথা স্বীকার করা যায় না। বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে মহারাষ্ট্র-য়েরাই সর্বপ্রথম এইরূপ উত্তম কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে একরূপ একচ্ছত্র সাম্রাজ্যস্থাপনের উত্তম আর কখনও হয় নাই। তাই এই প্রথম উত্তম সর্বাংশে সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

যাহাই হউক, এই সামন্তমণ্ডলের সৃষ্টি হওয়া অবধি গুজরাত, কটক, বেরার, মধ্যপ্রদেশ, মালব, বৃন্দেলখণ্ড, দিল্লী, আগ্রা, দোয়াব, রোহিলখণ্ড, বঙ্গদেশ, কর্ণাটক, মহিসুর, পঞ্জাব, তাজোর, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে মুসলমানশক্তির সহিত মহারাষ্ট্রীয়েরা পঞ্চাশবর্ষব্যাপী মহাসমর আরম্ভ করিলেন। এই সকল স্থানের মুসলমান শক্তি ভিন্ন আরও কয়েকটি দেশীয় ও বৈদেশিক শক্তির সহিত তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কোল্হাপুরের সাম্রাজ্যের পক্ষীয় সর্দারেরা মহারাজ শাহর সহিত শত্রুতাবশে ও সেনাপতি দাভাড়ে প্রভৃতি সর্দারেরা পেশবার প্রতি ঈর্ষ্যাবশে কখনও কখনও তাঁহাদিগের শত্রুপক্ষের সহিত গিয়া মিলিত হইতেন। শাহ ও পেশবার পরিচালিত মহারাষ্ট্রসমাজকে সময়ে সময়ে এই সকল স্বজাতীয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। রাজপুতানার ক্ষত্রিয় নরপতিরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের চক্রবর্তিত

স্বীকার না করায় ও দিল্লীখরের আদেশসম্মত বাদশাহী করের চতুর্থাংশ মরাঠাদিগকে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধেও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল। তত্ত্বিন্ন আত্মবিগ্রহকালেও রাজপুত-নরপতিরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সৈন্ত সাহায্য ক্রয় করিতেন। বৈদেশিক শত্রুর মধ্যে গোয়ার পর্তুগীজেরা পশ্চিম-সমুদ্রতীরে মহারাষ্ট্র-শাসনে সময়ে সময়ে বাধাত উৎপাদন করিতেন। দিল্লীর সিংহাসন মহারাষ্ট্রীয়দিগের করতলগত হইতেছে দেখিয়া বাহারা বিশেষ অমুতপ্ত হইতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নাদিরশাহ ও আকবরশাহ আকালী প্রভৃতি সাহসী বীর-পুরুষেরা ভারতলুণ্ঠনপূর্বক তাঁহাদিগের ক্ষোভের আংশিক নিবারণে যত্নশীল হইতেছিলেন। এই সকল বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে ভারতবাসীর রক্ষাবিধানের ভারও মহারাষ্ট্রীয়দিগকেই লইতে হইয়াছিল। ফলতঃ এই সকল বহুসংখ্যক শত্রুকে যুগপৎ বাধা দিতে মহারাষ্ট্রীয় সামন্তমণ্ডলের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর তাঁহারা সে সংঘর্ষে জয়লাভ করায় ভারতের মুসলমানশক্তি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া গেল। তখন উপস্থিত বিপদ উপলব্ধি করিয়া ভারতীয় বৈদেশিক মুসলমানেরা একমত হইয়া আত্মরক্ষার জ্ঞান পাণিপথে শেষ উত্তম প্রকাশ করিলেন। তথায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমরে পরাজয় ঘটিলেও মুসলমানদিগের প্রমুখ-গৌরবের পুনরুদ্ধার-আশা চিরকালের জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। মাধবরাওয়ের আমলে মরাঠাগণ পুনরায় নব বল লাভ করিলেন। হর্ভাগ্যক্রমে অকালে মাধবরাওয়ের মৃত্যু হইল। এই সময়ে ধীরে ধীরে আর একটি শক্তি কৌশলক্রমে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিল। অসাধারণ নীতিকৌশলে সেই শক্তি এক্ষণে ভারতে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

বাজীরাও নূতন সামন্তমণ্ডল রচনা করিয়া দেশবিজয় কার্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সামন্তদিগের চেষ্টায় নিত্য নূতন নূতন দেশ বিজিত হইতে লাগিল। এই সময়ে শাহর অষ্ট প্রধানেরা যদি সেই সকল নববিজিত দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনসংস্কার দ্বারা তথায় রাজ্যের ভিত্তিমূল দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের বিলোপ ঘটত না। কিন্তু তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে ওদাম ও অকর্মণ্যতাবশে এবং কতকটা বাজীরাওয়ের প্রতি বিদ্বেষ হেতু সে কার্যে যত্ন প্রকাশ করিলেন না। মহারাজ শাহরও দৃষ্টি এদিকে পতিত হইল না। বাজীরাও যেরূপ সময়কুশল ছিলেন, রাজনৈতিক অগ্রাগ্র ব্যাপারে তাঁহার সেরূপ নৈপুণ্য ছিল না। কাজেই দেশের পর দেশ বিজিত হইয়া মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যে



সংযুক্ত হইতে লাগিল। ২৪টি প্রদেশ তিন অস্ত্র শাসন-শৃঙ্খলতার বিশেষ কোনও চেষ্টা হইল না। পক্ষান্তরে বাজীরাওয়ের রণপাণ্ডিত্যদর্শনে অনেকের হিংসানল অধিক-তর প্রজ্জ্বলিত হওয়ার সমাজে অনৈক্যের বীজ উগ্ৰ হইল।

বাজীরাওয়ের পুত্র বালাজী আত্মসম্মতি শৃঙ্খলাবিধানে বহু পরিমাণে দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথাপি দুই এক স্থলে ভ্রান্তনীর অহুসরণ করিয়া তিনি সমাজের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছিলেন। রাজ্যের অস্তঃশত্রু স্বরূপ প্রতী-পক্ষদিগের অন্ততম রঘুজী ভৌসলে তাঁহার কার্যপথে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছিলেন। তাঁহাকে অত্যাচারে বশীভূত না করিয়া বালাজী বাজীরাও বজীর সুবেদার আলিবন্দী খাঁর পক্ষাবলম্বনপূর্বক তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাকে জর্জরিত করিলেন। অস্তঃশত্রুর দমন জন্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাধারণ শত্রুর সাহায্যগ্রহণ বালাজীর পক্ষে গহিত কার্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিছু দিন পরে হোলকর প্রভৃতি সর্দারেরা পেশবার শক্তি দমন করিবার জন্ত বালাজীরই প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অহুসরণ করিয়া মহারাষ্ট্র-সমাজের ঘোর শত্রু রোহিলা-সর্দার নজীবখানকে কোশলে পেশবার রোধানল হইতে মুক্ত করিয়া পাণিপথে স্বজাতির সর্বনাশের পথ পরিত্যক্ত করেন। [পেশবা শব্দে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] প্রাচীন সামন্তদিগের মধ্যে আংশে প্রতিনিধি ও গায়কোয়াড় প্রভৃতি পেশবা বিরোধী ছিলেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। পেশবাগণ বাহুবলে ইহাদিগকে অনেকবার বশী-ভূত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহারা কখনই সম্পূর্ণ বশতা স্বীকার করেন নাই। গৃহবিবাদে মত হওয়ার আশ্রয়ের জন্য পেশবাকে অধিকদিন অহুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। প্রতিনিধি বংশীয়েরা দিন দিন ক্ষীণতর হওয়ার পেশবাকে বাধা দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। গায়কোয়াড় ও নাগপুরের ভৌসলেগণ শেষ পর্যন্ত পেশবাদিগের অনিষ্ট করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। হোলকর প্রভৃতি নূতন সামন্তগণ ক্রমশঃ পেশবার অধীনতাপাশ ছেদন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা শেষ পেশবা বাজী-রাওয়ের পূর্ব পর্যন্ত কখনও এ বিষয়ে প্রকাশভাবে কোনও কার্য করিতে সাহসী হন নাই। তথাপি সুবিধা পাইলে গোপনে পেশবার বিরুদ্ধাচরণ করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। মুল্লার রাও হোলকর সর্বপ্রথম এ বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন। পরে অপর সর্দারেরা সেই অসদৃষ্টান্তের অহুসরণ করেন। ফলে পাণিপথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাভব ঘটে। মাধব রাও সর্দারদিগের অসন্তোষ নিরাকরণের চেষ্টা

করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্ররাজ্যের উন্নতিসাধন-বিষয়ে সর্ক-লেই সমান অধিকার ও কর্তব্য একথা তিনি সকলকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার উদার ব্যবহারে পেশবাংশের সর্দারগণের মনে যে মাংসখোর স্ফূর্তি হইয়াছিল, তাহা বহু পরিমাণে দূরীভূত হয়। এই কারণে পাণিপথের ক্ষতি অতি অল্পদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা পূরণ করিতে সমর্থ হন। দৃষ্টান্তক্রমে মাধব রাও দীর্ঘজীবী হইলেন না। ইহার পর নানাকড়নৌসের মন্ত্রিত্বকালেও সর্দারেরা পেশবাদিগের প্রতি মাংসখোরবশ হইবার অবকাশ পান নাই। শেষ রাজীরাওয়ের সময়ে সমস্ত মহারাষ্ট্ররাজ্যই অরাজকতা ঘটিল। অব্যবহিত-চিত্ত সামন্তগণ পেশবার পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না। সামন্তদিগের শক্তি হ্রাস করিবার জন্ত বাজী রাও বৈদেশিক ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তৎকালে সামন্তদিগের শক্তির লাঘব হইল বটে; কিন্তু সামন্তদিগের সঙ্গে সঙ্গেই বাজী রাওয়ের দোভাগ্যাত্মক অন্তিমিত হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্ররাজ্যও বিলীন হইল। তাঁহার শাখাস্থানীয় সামন্তমণ্ডল অত্যাধি বৃষ্টি-শাসনকালেও আপনাদিগের স্বাভাবিক অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া হিন্দুধর্মকে আশ্রয় দান করিতেছেন।

মহারাষ্ট্রজাতির চরিত্রোত্তি।

সামন্তদিগের এই সকল অস্ত্রক্ষিপণের চিত্র ত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রসমাজের বাহুচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্রজাতির অসাধারণ উৎসাহের পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়।

১৭৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে বাজী রাওয়ের পুত্র বালাজী বাজীরাও মহারাষ্ট্রীয়গণের নেতৃত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবলে মহারাষ্ট্র-সমাজের বিভিন্নমুখ শক্তিনিচয় কিয়ৎকালের জন্ত বহু পরিমাণে একাগ্র হইয়াছিল। রামদাস ও শিবাজীর জীবনের প্রধান ত্রুটি এই সময়ে উদ্ঘাপিত হয়। বালাজী বাজীরাওই যাবতীয় মরাঠাকে একত্র করিয়া সর্বত্র মহারাষ্ট্রধর্মের বিস্তার করিতে বহুপরিমাণে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় দেশে প্রাচীন আধ্যাত্মিক বহুল-চর্চা আরম্ভ হয়। তিনি বেদ, স্মৃতি, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের প্রতিবর্ষে পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এতদুপলক্ষে তিনি সময়ে সময়ে বৎসরে ১৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিতেন। কাশী, রামেশ্বর, মিথিলা প্রভৃতির দূর দেশ হইতেও বর্ষে বর্ষে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পরীক্ষাপ্রদান-পূর্বক পুরস্কার-গ্রহণের জন্ত পুণ্য সমবেত হইতেন। সমাগত ব্রাহ্মণদিগের পরীক্ষাগ্রহণ ও



পুরস্কারদানের জন্ত একটি স্বতন্ত্র আবাসমণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। পুরস্কারলোভে দেশের ব্রাহ্মণসন্তানেরা শাস্ত্রজ্ঞানলাভে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমশঃ প্রতি বৎসর পুণ্যায় ৩০৪০ সহস্র বিবান্ ব্রাহ্মণের সমাবেশ হইতে লাগিল। দেশে শাস্ত্রচর্চার শ্রোত সবেগে প্রবাহিত হইল। কবি, শিল্পী, চিত্রকর ও গীতবাহ্যবিশারদ ব্যক্তিগণও রাজ্যশ্রয়লাভে বঞ্চিত হন নাই। দেশের কৃষি বাণিজ্যের উন্নতির দিকেও বালাজী বাজীরাওরের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে মহারাষ্ট্ররাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনশৃঙ্খলা ও মহারাষ্ট্রশক্তির দৃঢ়তা সম্পাদিত করিয়া বালাজী হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনের সম্বন্ধে সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে যত্নশীল হন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে একাধারে রাজনীতি-কুশল শাসনকর্তা ও স্বদক্ষ দেনানায়করূপে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের অলৌকিক ক্ষমতায় সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। বালাজীর উপদেশ অনুসারে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একাদশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অন্যান্য ৪২টি যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। এই সকল অভিযানের অধিকাংশই বালাজীর প্রত্যক্ষনেতৃত্বাধীনে সম্পাদিত হইয়াছিল। অযোধ্যা, বেহার ও বঙ্গদেশ হইতে মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদসাধনপূর্বক উত্তরে আটক হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত আসমুদ্র-হিমালয়ব্যাপী “হিন্দুপং বাদশাহী” (হিন্দু সাম্রাজ্য)-স্থাপনের জন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ অতীব ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এই কারণে তাহার দক্ষিণ ও উত্তর-ভারতের হিন্দুধর্মী রাজত্ববর্গের বিলোপসাধনে যত্নশীল হন নাই—কেবল তাঁহাদিগকে ছত্রপতির সাক্ষভৌমত্বস্বীকারে ও করদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের হস্ত হইতে মুক্তিপুরী অযোধ্যা, ক্রীক্ষেত্র, বারাণসী ও পবিত্র প্রয়াগক্ষেত্রের উদ্ধার-সাধনার্থ মহারাষ্ট্রীয়গণ বিবিধ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এমন কি, পরিশেষে বিনিময়স্বরূপ অত্র প্রদেশ দান করিয়াও ঐ তীর্থস্থানগুলি হিন্দুশাসনকর্তার অধীনতায় রাখিবার চেষ্টা করিতেও তাঁহার বিব্রত হন নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা অপ্রতিবিধেয় কারণে এ বিষয়ে তাহাদিগের চেষ্টা ফলবতী না হইলেও, প্রত্যেক হিন্দুসন্তানকেই তাঁহাদিগের উত্তমের প্রশংসা করিতে হইবে। এক্ষণে পবিত্র উত্তম “হিন্দুধর্ম” আধ্যাত্মিক রাগাণ্ড ও কথন প্রকাশ করেন নাই।

১৭৫০ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৬১ অঃ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহাদিগের পূর্বকথিত সংকল্পনিচয় কার্যে পরিণত করিবার জন্ত প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রয়াস বহুপরিমাণে সফল হইয়াছিল। তাঁহাদিগের এই সময়ের অধ্যবসায় ও উদ্ধার

জ্ঞান পরিচয় ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বালাজীর পিতৃব্য-পুত্র শ্রীমন্ত ভাউসাহেব সমুদ্র-বলরাক্ষিতা ভারতভূমি অতিক্রম-পূর্বক কন্ঠাণ্টিনোপলে মহারাষ্ট্র-বিজয়-কেতু উড্ডীন করিবরে ইচ্ছা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই! পাণিপথের সমরক্ষেত্রে আক্কেদশাহ আকালীর সহিত বলপরাধায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভাগ্যবিপর্যয় ও পরবর্তী দৈববিড়ম্বনাসমূহ না ঘটিলে ভাউ সাহেবের অভিলাষ পূর্ণ হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত ছিল না বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বালাজী বাজীরাওরের চেষ্টায় ভারতবর্ষে মরাঠাগণের চক্রবর্ত্তি সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল। পঞ্জাব, আজমীর, মালব, নাগপুর, বেরার (বিদর্ভ), মহারাষ্ট্র, কর্ণাট ও গুজরাত প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদিগের অধিপত্য বহুস্থল হইয়াছিল। বঙ্গদেশ, রাজপুতানা ও অখ্যাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে নিয়মিতরূপে তাঁহাদিগের চৌথ আদায় হইত। মহিশ্বর, হায়দ্রাবাদ, মারবাড় ও অযোধ্যাদি প্রদেশের অধিপতিগণ তাহাদিগকে করপ্রদান করিতেন। দিল্লীর সিংহাসনে মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনাদিগের মনোনীত ব্যক্তিকে সম্রাটরূপে স্থাপিত করিয়া তাঁহাকে আপনাদিগের ক্রীড়া-পুত্তলীস্বরূপ করিয়াছিলেন। ভাব্যুতে তাঁহাদিগের আর কেহই ভীতিপ্রদ শত্রু রহিল না। মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক প্রকার শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই শান্তি কিছু দিন অক্ষুণ্ণ থাকিলে, দেশের অন্তর্ভুক্ত নিজা ও বহির্ভাগিগণের বিস্তার এবং কলাবিদ্যার বিশিষ্ট সংস্কারে মহারাষ্ট্রীয়গণের দৃষ্টি নিপতিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় তাহাদিগের সে অবকাশ ঘটিল না।

ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান-শাসনের প্রভাব তিরোহিত হইয়া সর্বত্র হিন্দুধর্মীদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায়, মুসলমান-সমাজের অধিনায়কগণ বিশেষ উদ্বেগ হইলেন। যে দিল্লীশ্বরের প্রত্যাপে এক দিন সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়াছিল, যাহার আদেশে মহারাষ্ট্রপতি সাম্বাজী নিহত ও তৎপুত্র শাহু সপরিবারে বন্দী হইয়াছিলেন, কালচক্রের অস্বস্ত পশ্চিবর্ত্তনে তাঁহারই বংশধরগণকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের করায়ত্ত হইতে হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাদিগের ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। তাহারাই মহারাষ্ট্রশক্তির সর্বপ্রাণিনা মুক্তিদশনে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্ত একতাসূত্রে বদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তাহারাই ক্ষণকালের জন্ত গৃহবিবাদ ভুলিয়া গিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে সমবেত হইতে লাগিলেন। আক্কেদশাহ আকালীর নিকট ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্ত গোপনে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইল। পুনরায় বাদশাহী-স্থাপনের দ্বয়াকাঙ্ক্ষা তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র অধিকার

করিল। অল্পদিনের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের বিস্তৃত সমরপ্রাঙ্গণে, আক্কেদশাহ, নজীব-খান রোহিলা, সূজাউদৌলা, কুতবশাহ, আক্কেদখান, ছন্দেখান প্রভৃতি রোহিলা, পাঠান ও ছরাণী সর্দারগণ আপন আপন চতুরঙ্গবল সহ যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণও বিপুল বাহিনীসহ যথাসময়ে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন, উভয় পক্ষে প্রায় সার্বদিক বীরপুরুষ ভারতের ভাগ্যান্বিতের জন্ত সমরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হুঃধের বিষয়, রাজপুতানার হিন্দু রাজগৃহগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের বৈভবোন্নতি-দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া ও দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি বহুদিনের অভ্যস্ত ভক্তিবশতঃ গোপনে মুসলমানপক্ষের সহায়তা করিতে লাগিলেন। সূজাউদৌলার সহিত মিত্রতা-হেতু ও তাহার ভেদনীতিগুণে জাঠ-সর্দার সুরক্ষমল যুদ্ধারম্ভের আব্যাহতি পূর্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানপক্ষে মিলিত হইলেন। দিল্লীর আধিপত্যলাভে অসমর্থ হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত তাহার স্বার্থসম্বন্ধও ঘটিয়াছিল। এই সকল কারণে মহারাষ্ট্রীয়গণকে একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই বৈদেশিক শক্তির গতিরোধে অগ্রসর হইতে হইল। স্বধর্ম্মরক্ষার জন্ত এক লক্ষ সত্তর হাজার মহারাষ্ট্রীয় প্রাণবিসর্জনে উত্তম হইলেন। যুদ্ধের পূর্বে তাঁহাদিগের উৎসাহ, বিধর্ম্মাদিগের প্রতি বিদ্বেষ, হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্ত প্রাণবিসর্জনে অমুরাগ ও আগ্রহ, যুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম প্রভৃতি বিষয় মহলাররাও হোলকরের আদেশে লিখিত পত্রে অতীব মনোমুগ্ধশীল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরিণামবিষয়ে উভয় পক্ষের মনে সংশয় থাকায় মধ্যে একবার সন্ধির প্রস্তাবও উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানগণ সন্ধির বিনিময়ে যে সকল স্বত্বের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে বাহুবলদৃষ্ট মহারাষ্ট্রীয়গণ কোনও ক্রমে সম্মতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সেই সর্বলোকক্ষয়কর আপংকালে মহারাষ্ট্র-সেনানী যদি শত্রুপক্ষের যে কোনও সর্ত্তে সম্মতিদান করিয়া সেই ভীষণ লোকক্ষয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন এবং পরে অবসর বুঝিয়া প্রথম মরাঠা যুদ্ধে পরাজিত ইংরাজদিগের ঠায় “সন্ধিপত্রে কলিকাতার (মহারাষ্ট্রীয় পক্ষে পুণার) কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সম্মতি ছিল না” প্রভৃতি আপত্তি করিয়া সন্ধিভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এত অল্পদিনের মধ্যে অজ্ঞান মূর্ত্তি ধারণ করিত না, সন্দেহ। কিন্তু, পূর্বোক্ত বখরলেখক বলেন, কুরুপাণ্ডবের লীলাক্ষেত্রে, কৃষ্ণসহায় ধর্ম্মরাজের (যুধিষ্ঠিরের) বিজয়ভূমিতে পদার্পণ করায় স্বধর্ম্মাহুতাগী মহারাষ্ট্রীয়দিগের যবনবিদ্বেষ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার সন্ধি-

স্থাপনে সম্মত হইলেন না। সে যাহা হউক, যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পাণিপথের সমরযজ্ঞে মহারাষ্ট্রবৈভবের পূর্ণাঙ্গ হইল! ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছুদিনের জন্ত বিলীন হইল!

যুদ্ধাবসানে মুসলমানেরা বন্দীকৃত সৈন্যদের শিরশ্ছেদ করিয়া বীরধর্ম্মে অবহেলা প্রকাশ করিল। কেবল তাহাই নহে, যে সকল দ্রব্যসম্ভারবাহক পলায়নে অসমর্থ হইয়া দস্তে তৃণগ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের শরণাগত হইয়াছিল, তাহার। তাহাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ করে নাই। তাহাদিগের আদেশে হতভাগ্যদিগের ছিন্নশীর্ষসমূহ পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত হইয়া নিষ্ঠুর আফগানদিগের আনন্দবর্ধন করিল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও আকালীর অতিশয় ক্ষতি হইয়াছিল। উত্তরভারতের মুসলমানগণও এই যুদ্ধের পরিণামে কোনও সফললাভ করিতে পারেন নাই। দিল্লীর গোরব পুনরুদ্ধীপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বাদশাহগণের অবস্থা দিন দিন হীনতর হইতে লাগিল। পূর্বাঞ্চলে ইংরাজ ও দক্ষিণভারতে হায়দর আলি এবং পঞ্জাবে শিখজাতির অভ্যুদয় হইল।

এই দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অসীম ক্ষতি হইল। তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও লক্ষাধিক সৈনিক এই সংগ্রামানলে ভয়ীভূত হন। মহারাষ্ট্রদেশের প্রায় সমস্ত সর্দার ও সম্ভ্রান্ত জায়গীরদার পাণিপথযুদ্ধে প্রাণবিসর্জনে বহুসংখ্যক মরাঠা-পরিবারের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। মহারাষ্ট্রের একটা পরিবারও এই ঘটনায় আত্মীয়বিয়োগ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। স্মরণ্য গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বাল্যকী বাজীরাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাসরাও ও তাহার পিতৃব্যপুত্র ভাউ সাহেব যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। তাহার বিশাল দিগ্বিজয়ী সৈন্যদের একপুত্র শোচনীয় পরিণামের বিষয় শ্রবণ করিয়া বাল্যধীর হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। ভাউ সাহেবের শোকে ও বিয়োগবিধুর অসংখ্য প্রজার হাহাকার শ্রবণে তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই গতাস্ব হইলেন। তাহার ঠায় দূরদর্শী নেতার অভাবে মহারাষ্ট্র-সমাজের মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় হইল।

এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বেরূপ অপার ধনসম্পত্তি, অসংখ্য বীরপুরুষ ও অপরিমেয় যুদ্ধসামগ্রী বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা চিত্তা করিলেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া যায়। ভারতের অপার কোন জাতির এরূপ বিপৎপাত হইলে তাহার। অচিরে ধরাশায়ী হইতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্রসমাজের মূলে যে ভারতব্যাপী হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন ও স্বধর্ম্মের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ

করিবার পবিত্র বাসনা-বীজ নিহিত ছিল, তাহাই এই ঘোর বিপৎকালেও তাহার প্রাণরক্ষা করিল। পাণিপথের ভাগ্য-বিপর্ষ্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের অগ্রগতি কিছুদিনের জন্য নিবারিত হইল বটে, কিন্তু ইহাতে মরাঠাদিগের অধঃপতন হইবে বলিয়া ধাহারা মনে করিয়াছিলেন, তাহার যুদ্ধের পাঁচ মাস পরেই অসাধারণ অধ্যবসায়সম্পন্ন মহারাষ্ট্র-সেনাকে দিল্লীর চতুর্পার্শ্বে আপনাদিগের আধিপত্যস্থাপনে পুনঃপ্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন !

বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যু সংঘটিত হওয়ায় মহারাষ্ট্র-সমাজের অধিনায়কত্ব লইয়া পুণায় গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল। বালাজীর অন্যতম পিতৃব্যপুত্র রঘুনাথ রাও (দাদা সাহেব) দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া তাহার সুলক্ষ্মী স্ত্রী আনন্দীবাসীয়েস সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জীর পরামর্শাছুসারে তিনি রাজ্যের অর্দ্ধাংশের প্রার্থনা করায় নূতন বিভাগের সূচনা হইল। বালাজীর পুত্র মাধবরাও তরুণবয়স্ক হইয়াও পিতৃব্যের হস্তে আয়সমর্পণপূর্বক অন্তঃকল্পবের শাস্তি করিলেন। বিবেক-ভ্রষ্ট রঘুনাথ ভ্রাতৃপুত্রকে বন্দী করিয়া স্বয়ং কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পাণিপথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শক্তিস্থান হইয়াছে দেখিয়া, হায়দ্রাবাদের নিজাম আপনার ক্ষমতাবিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। রঘুনাথরাও তাহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলেন; কিন্তু পেশবার হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করিতে জানিত না বলিয়া রাধবের সহস্র চেষ্টা-সত্ত্বেও সে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে সম্মত হইল না! কাজেই দাদাসাহেবকে শত্রুহস্তে বন্দী হইতে হইল। যুবক মাধবরাও যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিবেশে পিতৃব্যের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতৃব্যের হৃদশাদর্শনে বিচলিত হইয়া স্বীয় রক্ষিবর্গ সহ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বৃদ্ধ মল্লাররাও হোলকর, এ সময়ে নিজামকে আক্রমণ না করিয়া পুণায় সিংহাসন তুস্তগত করিবার জন্য মাধবরাওকে পরামর্শ দান করিলেন। মাধবরাও বলিলেন, “কাকাকে শত্রুর হস্তে ফেলিয়া কোন্ মুখে পুণায় ফিরিব?” যুবকের এই মহৎপূর্ণ উত্তরে বৃদ্ধ মল্লার রাও লজ্জিত হইলেন। মাধবরাও শৌর্য্য-বলে অচিরে নিজামকে পরাস্ত করিয়া পিতৃব্যের মক্তিসাধন করিলেন। এই ঘটনায় ভ্রাতৃপুত্রের প্রতি দাদাসাহেবের স্নেহ বর্ধিত হইল। তিনি সন্তোষে মাধবরাওকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন !

মাধবরাও তেজস্বী, কোপনস্বভাব ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি কাহারও অন্তর্য আচরণে ক্ষমাপ্রদর্শন করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, একদা তাহার মাতুল কোনও

অনাথা বৃবতীর প্রতি পাপদৃষ্টি করিয়াছিলেন। মাধবরাও তাহা অবগত হইলে মাতুলের প্রতি কঠোর বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া অপক্ষপাতিত্বের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। তাহার জননী ভ্রাতাকে ক্ষমা করিবার জন্য অহুরোধ করিয়াও তাহাকে রাজধর্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। তাহার মতে “বেগার”ধরিবার প্রথা অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাহার প্রধান সেনাপতি একদা “বেগার”সম্বন্ধে তাহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের লঙ্ঘন করিয়া তাহার বিরগভাজন হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রজাদিগকে সুখী করিবার জন্য মাধবরাও বিবিধ হিতকর ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ত্রায়পরায়ণ পণ্ডিত রামশাস্ত্রী তাহার শাসনসময়ে মহারাষ্ট্রদেশের প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মল্লাররাও হোলকরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রবধু প্রাতঃস্মরণীয় অহল্যাবাসীকে অত্যাচারপূর্বক অধিকারচ্যুত করিয়া হোলকর রাজ্য খাস করিবার জন্য অথলুঙ্গ দাদাসাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রায়পরায়ণ মাধবরাও বিরুদ্ধমতাবলম্বী হওয়ায় তাহার পাপচেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

এই সময়ে হায়দ্রাবাদের নিজামের দেওয়ান রুখমতউদৌলা স্বীয় প্রাসাদ-নির্মাণের জন্য এক ব্রাহ্মণের অধিকৃত ভূমি বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ নিজামের দরবারে বহু চেষ্টা করিয়াও কোন প্রতীকার পাইলেন না। তখন অনুরোধে হইয়া তিনি পেশবার শরণাপন্ন হইলেন। পুণ্য-দরবার হইতে এ বিষয়ের প্রতীকার করিবার জন্য নিজাম-সরকারে কয়েকবার পত্রাদি প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য, নিজাম তৎপ্রতি মনোযোগ করিলেন না। তখন মাধবরাও নবাবের চৈতন্ত্যোৎপাদনের জন্য সেনাসম্বা করিলেন। মরাঠা-ফৌজ রাজধানীর নিকটবর্তী হইলে নবাবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সন্ধিপ্রার্থী হইলে মাধবরাও বলিলেন,—ব্রাহ্মণের ভূমি ব্রাহ্মণকে প্রত্যাৰ্পিত হইলেই আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইব। এই অভিযানের বায়স্বরূপ নিজাম স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদের কাছে বাহা দিবে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু নবাবকে কোরাণস্পর্শপূর্বক বংশপরম্পরাক্রমে ঐ ব্রাহ্মণকে তাহার ভূমির উপস্থ হোগ করিবার সনদ লিখিয়া দিতে হইবে। নবাব সে প্রস্তাবে সম্মত হইলে মহারাষ্ট্র সৈন্ত-গণ পুণায় পুনরাবৃত্ত হইল।

মাধবরাওয়ের চেষ্টায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে পুনরায় নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সর্বনাশ হইয়াছে মনে করিয়া ধাহারা মন্তকোত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় ভূজবলে স্বল্পদিনের মধ্যে

তাহাদিগকে দমন করিলেন। নাগপুরের ভৌসলেগণ এই সময়ে একটা অস্ত্রবিপ্লবে স্বেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাধব-রাওয়ের নীতিকৌশলে পুনরায় মহারাজ্জিদিগের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হইল। দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ হায়দার আলি, নিজাম আলি, আরকটের নবাব ও কুটিলনীতিকুশল ইংরাজগণ মহারাজ্জিগণের নিকট বিনত হইলেন। মধ্যভারতের ও রাজ-পুতানার নরপতিগণ মহারাজ্জি-বিক্রমে স্তুতিত হইয়া পুনরায় পেশবাগণকে করপ্রদান করিতে লাগিলেন। জাঠেরাও পরাভাব স্বীকার করিলেন। কেবল তাহাই নহে, খৃষ্টীয় ১৭৭০ অব্দে দিল্লীর দ্বারদেশ মহারাজ্জিদিগের সিংহনাদে কম্পিত হইতে লাগিল। পাণিপথে পরাজয়ের পর মরাঠাগণ যে এত অল্পকালের মধ্যে চমৎগুতী (চাখেল) নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা রোহিলাদিগের স্বপ্নেরও অতীত। শৌর্যশালী শিখগণ আফগান-দমনে নিবিষ্ট হওয়ায় রোহিলা-গণ, দিল্লী, আগ্রা ও গঙ্গা-যমুনার অন্তর্দেশীতে আপনাদিগের প্রভুত্বস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদিগের স্পর্ধা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহারা পার্শ্ববর্তী দিল্লীর শাহ আলমের বৃত্তি রহিত করিয়া বেগমদিগের প্রতি নানারূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ দিকে দিল্লীস্থর ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাহাদিগের আশ্রয়ে আলাহাবাদে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহারাজ্জিগণ রোহিলাদিগের দমনপূর্বক মোগলবংশের শাহ আলমকে তাহার পৈতৃক-সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। ১৭৭১ খৃঃ অঃ ২৫ মে ডিসেম্বর মহারাজ্জিগণের সহায়তায় দিল্লীতে মহাসমারোহে তাহার অভিষেককাণ্ড সুসম্পন্ন হইল। দিল্লীবাসিগণ রোহিলাদিগের উদ্ধৃত ব্যবহারে অতীব মন্থাহত হইয়াছিলেন। তাহারা আপনাদিগের প্রকৃত বাদশাহকে সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন; উত্তর-ভারতে মহারাজ্জিদিগের ক্ষমতা পূর্ববৎ অপ্রতিহত হইল।

ইহার পর মহারাজ্জিগণ মুসলমানদিগের হস্ত হইতে অযোধ্যা, বারাণসী ও প্রয়াগের উদ্ধারসাধন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এমন সময় দাক্ষিণাত্য হইতে পেশবা মাধবরাওয়ের অসুস্থতার সংবাদ আসিল। মহারাজ্জিদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে ২৮ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাধবরাও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। তাহার প্রধান সেনাপতিগণকে উত্তরভারতে প্রভুত্ববিস্তার কার্যে ব্যাপৃত দেখিয়া দাক্ষিণাত্যে হায়দার আলি উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই কারণে শ্রীর সেনাপতিগণকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্ত হইবার জন্ত মাধবরাওকে আদেশ প্রেরণ করিতে হইল। সেনানীগণ

দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইবার পূর্বেই মহারাজ্জিপতি মাধব-রাওয়ের জীবন-প্রদীপ নির্ক্ষাপিত হইল। সেই সঙ্গে মহারাজ্জিদিগের সমস্ত আশা ভরসা নিমূল হইয়া গেল। একচ্ছত্র হিন্দু-সাম্রাজ্যস্থাপনের স্বযোগ চিরকালের জন্ত অন্তর্হিত হইল। ইংরাজগণ আপনাদিগের ক্ষমতাবিস্তারে অবকাশ পাইলেন। অকালে মাধবরাওয়ের মৃত্যু না ঘটিলে মহারাজ্জি-শক্তির বিলোপ ঘটিত কি না সন্দেহ।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মাধবরাওয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘোড়শব্দবরদ নারায়ণরাও স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, দাদাসাহেব (রঘুনাথ-রাও) তাহার নামে রাজকাণ্ড নিকাহ করিতে লাগিলেন। আনন্দী বাঈয়ের কুমন্ত্রণায় তাহার মতিভ্রংশ ঘটিল। পাণীয়সীর প্ররোচনায় ১৭৭৩ খৃঃ অব্দের ভাদ্রমাসে নারায়ণ রাও অতি-শোচনীয়রূপে নিহত হইলেন। আবার পুণায় অস্ত্র-বিপ্লবের স্বেচনা হইল। সূচতুর ইংরাজগণ সেই সুযোগে পূনরুত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নারায়ণ রাওয়ের সন্তোজাত ঔরঙ্গপুর্কে অধিকারচ্যুত করিয়া হু-চাচর রঘুনাথকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ইংরাজেরা বহুপরিচর্য হইলেন। নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুতে পুণায় যখন গোলযোগ উপস্থিত হইল, সেই সময়েই তাহার মহারাজ্জি-রাজ্যের একটা বন্দর অস্ত্রায়পুর্ক অধিকার করিয়া লইয়া-ছিলেন। মহারাজ্জিদের এ পণ্যস্ত তাহাদিগের সহিত সন্ধি-প্রকারে সম্ভাবহার করিয়া আসিতোছিলেন। কিন্তু এ সময়ে ইংরাজদিগের রাজ্যলোভ এরূপ ছনিবার হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্ত পুণা-দরবারে উৎকোচপ্রদান, বিদ্রো-হের উত্তেজনা, রাজপুত্ৰদিগের মধ্যে বিদ্বেষ-সঞ্চারণ প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ রাওকে লইয়া মহারাজ্জিসমাজে বিপ্লবের স্বেচনা হইলে তাহাদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা প্রতীক্ষিত-হস্তা রঘুনাথের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কালক্রমে মহারাজ্জিদিগের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ছয় বৎসর পরে এহ যুদ্ধের অবসান হয়। ইংরাজেরা এরূপ অস্ত্রায় যুদ্ধে আর কখনও লিপ্ত হন নাই। বোধ হয়, পুণাবার কোনও সুসভা-জাতি কখনও এরূপ অশান্তি প্রবৃত্ত হন নাই।

এ সময়ে পুণায় মহারাজ্জিদিগের মধ্যে কেহহ নেতা ছিলেন না। মাত্রমণ্ডলের মধ্যে মতভেদ ও স্বার্থসাধনেচ্ছার উদ্ভব হইয়াছিল। রাজকোষে অর্থ ছিল না এবং জাতীয় ঞ্ণের পরিমাণ বৃদ্ধিত হওয়ায় পুণা-দরবারের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আর এক বিস্মৃতি উপস্থিত হয়;— ডাউসাহেব পাণিপথের যুদ্ধে নিহত হইলে তাহার শবদেহ

পাওয়া যায় নাই। এই কারণে তিনি পলায়নপূর্বক আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, অনেকের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এই কথা অবগত হইয়া বাজী গোবিন্দ নামক এক ব্যক্তি সহসা ভাউ-সাহেব বলিয়া পরিচয়প্রদানপূর্বক মহারাষ্ট্র-সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ইংরাজেরা তাহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু স্বল্পদিনের মধ্যেই সেই প্রবন্ধক ধৃত হইল। পুণার দরবার তাহার বিচারের জন্য পঞ্চায়েৎ বা কমিশন নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদিগের বিচারে বাজী গোবিন্দ প্রবন্ধক (pretender) প্রতিপন্ন হইল। ভাউসাহেবের দ্বী তাহাকে দেখিয়া সর্বজনসমক্ষে প্রবন্ধক বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তখন তাহার প্রাণদণ্ড হইল। এই ঘটনার অবসান হইতে না হইতে কোম্পানীর পতি পেশবার রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, এইরূপ দুঃসময়েও মহারাষ্ট্র-রাজমন্ত্রী নানাকড়নবীসের মন্ত্রণাকোশলে ও মহারাষ্ট্রীয়গণের অধ্যবসায়গুণে কয়েকবার ইংরাজদিগের পরাভব হইল। তাঁহারা দুইবার ক্ষমা চাহিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দুইবার সন্ধি করিলেন। তথাপি ইংরাজ-কোম্পানীর অবাধ্যতা কমিল না। তাঁহারা বিলাতের ও কলিকাতার কর্তৃপক্ষের অসম্মতির উল্লেখ করিয়া আবার সন্ধি-ভঙ্গ করিলেন! সুতরাং আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। এ দিকে হায়দার আলি ও দাক্ষিণাত্যের অপর সামন্তগণ মহারাষ্ট্রদেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হোলকরও এই সময়ে বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজরক্ষিত রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মহারাষ্ট্রদেশের একরূপ ছরদুট অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আর কখনও হয় নাই। কিন্তু নানাকড়নবীসের নীতিকৌশলে শীঘ্রই এ দুদিন ঘুটিল। ইংরাজগণ মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধে নিতান্ত জর্জরিত হইয়া পরাভব স্বীকার করিলেন। তাঁহাদিগের দর্প চূর্ণ হইল! রঘুনাথরাও ও আনন্দীবাজী বন্দিভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

নারায়ণ রাওয়ের অল্পবয়স্ক পুত্র সবাই মাধব রাওকে (মাধবরাও নারায়ণকে) রাজা করিয়া নানাকড়নবীস মহারাষ্ট্রবাসীকে শাসনে সুখী করিলেন। নিজাম ও টিপুসুলতান মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাণাভ্যর্থীকারে বাধ্য হইলেন। মাধোজী শিন্দে উত্তরভারতেশমনপূর্বক গোলাম কাদেরের পৈশাচিক অত্যাচার হইতে দিল্লীর ও তাঁহার পুরমহিলাদিগকে রক্ষা করিয়া ঐ অঞ্চলের বিদ্রোহী মুসলমানদিগকে বাদশাহের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে (১৭৮৯ খৃঃ অঃ) “আলিজা বাহাদুর” উপাধি সহ তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা-জিবারণের সনন্দ প্রদান করিলেন।

রাজপুতানাতেও মহারাষ্ট্রীয়দিগের আধিপত্য নিকটক হইল। কাশী, প্রয়াগ ও অধোধ্যার উদ্ধারসাধন-চেষ্টা ঐ সময়েও একবার হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। সে যাহা হউক, মহারাষ্ট্ররাজ্যের একরূপ বৈভবোন্নতি ইতঃপূর্বে কখনও হয় নাই। সাম্রাজ্যের সমস্ত একরূপ শান্তি বোধ হয় বাজী বাজীরাজ্যের সময়েও স্থাপিত হয় নাই। পেশবা মাধবরাও অল্পবয়স্ক হইলেও সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় সর্দারমণ্ডলী তাঁহার আদেশপালনে প্রস্তুত থাকিতেন। উত্তরে শতদ্রু হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য অন্তঃশক্ত-বিহীন হইয়াছিল। প্রান্তঃসরলীয়া অহল্যাবাজীর শাসনে মালবের প্রজারা যেরূপ সুখী হইয়াছিল, বেরার, নাগপুর, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, কোঙ্কণ প্রভৃতি প্রদেশেও প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না।

অধঃপতন।

দুর্ভাগ্যক্রমে একরূপ অবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। নিয়তিচক্রের পরিবর্তনে নানা প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশে মহারাষ্ট্রীয়গণের দৌভাগ্যস্থল্য ক্রমশঃ অন্তাচলপথের পথিক হইতে চলিল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ অব্দের মধ্যে মাধোজী শিন্দে প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনানীগণ ও নানাকড়নবীস প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একে একে লোকাগুরিত হইলেন। পেশবা সবাই মাধবরাও-ও একবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে (১৭৯৫ খৃঃ) ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপ দুর্ঘটনা পরম্পরায় অল্পদিনের মধ্যে রাজকাৰ্য্যধুরন্ধর বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের ও সমরকুশল সেনাপতিদিগের অভাবে মহারাষ্ট্রসমাজ শক্তিহীন হইল। অনেক স্থানেই

“অবলা যত্র প্রবলা বালো রাজা নিরক্ষরো মন্ত্রী”

হইয়া উঠিল। কাজেই স্বকর্ণধারের অভাবে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাষ্ট্রপোতা কালসাগরে বিপন্ন হইল।

এই সময়ে গণ্ডোপরি বিস্ফোটকসদৃশ তরুণবয়স্ক বাজীরাও মহারাষ্ট্রসিংহাসনে অধিবেশন করিলেন। ইনি রঘুনাথরাও ও আনন্দীবাজীর পুত্র। জনক-জননীর সমস্ত দোষহ তাহাতে মুক্তিধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহার গুণে কপটাতার ও দুষ্কৃততা, বাকলী ও বারান্দা রাজসভায় প্রবেশলাভ করিল। শৌর্য্য, সাধুতা ও স্বদেশপ্ৰীতি ক্রমশঃ বিলীন হইতে লাগিল। সামরিক ব্যয়ের হ্রাস করিয়া তিনি বিলাসব্যসনে রাজস্বের অধিকাংশ ব্যয়িত করিতে লাগিলেন। অমূলক সন্মেলনবশবর্তী হইয়া তিনি রাজভক্ত কণ্ঠচাৰীদিগের হত্যায় ও নিগ্রহে এবং প্রজাদিগের লুণ্ঠনেও পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার দ্বার অব্যবহিতচিত্ত কাপুরুষ মহারাষ্ট্র-সমাজ

ইতঃপূর্বে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইংরাজদিগের কুটিল-নীতির মর্মগ্রহণ করিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। তিনি সেনাপতিদিগের চাইগীর বাজেয়াপ্ত করিবার জন্ত ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। একরূপ ব্যক্তির হস্তে রাজ্যনাশ না হওয়াই বিচিত্র! যশোবন্ত রাও হোলকর একবার ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্র-ভেজ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হোলকররাজ্য বালকের ক্রীড়াভূমি হইল। তরুণবয়স্ক শিন্দে অশ্রুপূরবিহাররূপে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। নাগপুরে ভৌস্লেগণ আত্মকণ্ঠে মত্ত হইলেন। রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের ইতিহাস পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় একরূপ।

যে নানাকড়নবীস দীর্ঘকাল রাজ্যরক্ষা করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্র-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বন্দী করাই বাজীরাওয়ের প্রথম কার্য্য হইল। এই কাণ্ডের জন্ত তিনি শিন্দেকে দুই কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। শিন্দে নানাকে বন্দী করিয়া বাজীরাওয়ের হস্তে সমর্পণপূর্বক প্রতিশ্রুত পারিতোষিক চাহিলে, পেশবা পুণা লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করিলেন। শিন্দে নগরের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদিগের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া দুই কোটি টাকা আদায় করিলেন। ইহার অন্তর্নিহিত পরেই বাজীরাও যেরূপ স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন, তাহাতে শিন্দেই আবার বাধ্য হইয়া নানাকড়নবীসকে কারামুক্ত করিলেন। কিন্তু নানা অধিক দিন জীবিত থাকিয়া রাজকার্য্যের সংস্কার করিবার অবসর পাইলেন না।

বাজীরাওয়ের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মরাঠাদিগের শত্রুগণ একবারে মস্তকোত্তোলন করিলেন। নিজামের দেওয়ান মশ্রুফুল্লমূলক খর্ডার যুদ্ধে বন্দী হইয়া পুণায় বাস করিতেছিলেন, বাজীরাও তাঁহাকে মুক্তি দান করিয়া ঐ যুদ্ধে প্রাপ্ত সমস্ত প্রদেশ নিজামকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। শিন্দে হোলকরের মধ্যে এই সময়ে মনোমালিঞ্জ উপস্থিত হয়। বাজীরাও কলহনিবৃত্তির চেষ্টা না করিয়া যাহাতে অধিকতর বুদ্ধি পায়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহা অবগত হইয়া সদারেরা তাঁহার প্রতি ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইলেন। যশোবন্তরাও হোলকর বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্ত বাজীরাওকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না। পঞ্চাঙ্করে হোলকরের ভ্রাতাকে অকারণে রাজবিদ্ৰোহের অপবাদে হস্তীর পদতলে নিগ্ধেপ করিয়া নিহত করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া যশোবন্তরাও সসৈন্তে পুণা আক্রমণ করিলেন। পুণার নিকটবর্তী হইয়া তিনি বাজীরাওকে জানাইলেন যে, আমি প্রভুর চরণে প্রতীকার প্রার্থনা

করিতে আসিয়াছি, যুদ্ধ আমার উদ্দেশ্য নহে। মূর্থ বাজীরাও তখনও সাম্যনীতির অনুসরণ না করিয়া হোলকরের বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং পলায়নপূর্বক সিংহগড়ে গিয়া আশ্রয় লইলেন। ইংরাজদিগের নিকটে সহায় প্রার্থনা করিতেও তিনি বিরত হন নাই। এদিকে যশোবন্তরাও যুদ্ধে পেশবার সৈন্তকে পরাভূত করিয়া পুণা লুণ্ঠন ও দাদা-সাহেবের দত্তক পুত্র অমৃতরাওকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বাজীরাও ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৮০২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইংরাজের সহিত তাঁহার এইরূপে সন্ধি হইল,— (১) ইংরাজেরা বাজীরাওয়ের রক্ষার জন্ত পুণায় দশ হাজার সৈন্ত সর্বদা সজ্জিত রাখিবেন। ইহার ব্যয়নিবাহের জন্ত পেশবা বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ ইংরাজদিগকে দান করিবেন। (২) ইংরাজের যুরোপীয় শত্রুদিগকে স্বীয় রাজ্যে আশ্রয় দান করিবেন না। (৩) ভারতীয় অপর রাজ্যভবগের সহিত কলহ উপস্থিত হইলে, ইংরাজেব অনুমতি ব্যতীত বাজীরাও তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিতে পারিবেন না।

এইরূপে ইংরাজের সহায়তায় বাজীরাও পুণায় প্রবেশ করিলেন। ইংরাজেরা মরাঠা সর্দারদিগকে জানাইলেন যে, আপনাদিগের অধিনায়ক যে সন্ধিসূত্রে আমাদিগের নিকট আবদ্ধ হইয়াছেন, অত্ৰ হইতে আপনাদিগের উক্ত সন্ধি সত্ত্বে আবদ্ধ হইলেন। সদারেরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বলিলেন,—‘আমাদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া যখন এই সন্ধি করা হইয়াছে, তখন আমরা ইহাতে বাধ্য হইতে পারি না।’ ফলে ইংরাজদিগের সঙ্গে মরাঠা সর্দারদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে দ্বিতীয়-মরাঠাযুদ্ধ নামে পরিচিত।

সহসা যে এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে সর্দারগণ প্রথমে তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ইংরাজকে সমরলিপ্ত দেখিয়া তাঁহারা সকলে সমবেতভাবে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ভাবিয়া সূচতুর ইংরাজেরা তাহাদিগকে কিছুতেই সে সুবিধা দান করিলেন না। তাঁহারা পূর্বাধি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। কর্ণেল মালকম ও ডিউক অব ওয়েলিংটন প্রভৃতি ইংরাজ-সেনানীরা এককালে একক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্দারদিগকে আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। এদিকে শিন্দের সহিত বিবাদবশতঃ হোলকর এই যুদ্ধে প্রথম যোগদান করেন নাই। গায়কোয়াড় পূর্বেই সামন্তমণ্ডলের সহিত সন্ধি ছিন্ন করিয়া ইংরাজের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিয়াছিলেন। কাজেই শিন্দে ও ভৌস্লেগের সমবেত



সৈন্তের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইল। বেরারে আড়গাঁও নামক স্থানে ওয়েলিংটন উভয় সৈন্তের পরাভব সাধন করেন। ইংরাজেরা হোলকরের সম্মুখীন হন। হোলকরকেও কয়েকটা যুদ্ধে ইংরাজের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হয়। ফলে এই কয়েকজন সর্দারই ইংরাজের সার্কভৌমত্ব স্বীকার করেন। (১৮০৫ খৃষ্টাব্দ) [ বিস্তৃত বিবরণ শিল্পে ও হোলকর শব্দে দ্রষ্টব্য ]

এই সার্কভৌমত্ব-স্বীকার তাঁহাদের আন্তরিক নহে। বাজীরাওয়েরও ইংরাজের প্রতি প্রীতি ছিল না। তিনি শিল্পে, হোলকর ও ভৌস্লেকে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিবার জন্ত গোপনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। নিজেরও সমরায়োজন করিলেন। ইংরাজেরা এই সকল বিষয়ের সংবাদ পূন্যাহ্নে সংগ্রহ করিয়া মরাঠা সর্দারদিগের সম্মিলন ঘটবার পূর্বেই স্বতন্ত্রভাবে সকলকে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধকেই তৃতীয় মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ বলে। স্বয়ং বাজীরাও এই যুদ্ধের প্রারম্ভ করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ষড়কী (Kirkee) নামক স্থানে ইংরাজ রেসিডেন্টের ঘে ছাওনৌ ছিল, তাহা আক্রমণ করেন। তাহাতে তাঁহারই পরাজয় ঘটে। ইহার পর পেশবা পলায়নপর হইলেও তাঁহার সেনাপতি বাপু গোখলের সহিত কয়েক স্থানে ইংরাজদিগের যুদ্ধ ও জয়লাভ হয়। বেরারে বাজীরাও ধৃত হন এবং স্বেচ্ছায় ইংরাজকে রাজ্যদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে বার্ষিক আট লক্ষ মূদ্রা বৃত্তি দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। সাতারার ছত্রপতি প্রতাপসিংহ বাজীরাওয়ের সঙ্গেই ছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা বৃত্তি দান করিয়া সাতারার সিংহাসনে সাক্ষিগোপালস্বরূপ স্থাপন করেন। এই সময়ে পেকারীদিগের সহিত ইংরাজ-কোম্পানীর যে যুদ্ধ হয়, তাহার বিবরণ পেকারী শব্দে দেখুন। মরাঠা সর্দারেরা পেকারীদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা শিবাজী যে স্বরাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নবাবম বাজীরাও তাহা ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরমার্থসাধনের জন্ত বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া একাবর্তে গমন করিলেন। তাঁহার পরমার্থ কত দূর সিদ্ধ হইয়াছিল, অন্তর্ধানীই তাহা বলিতে পারেন।

ফলতঃ পরমার্থসাধন সম্বন্ধে রামদাস স্বামীর উপদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়াই মহারাষ্ট্রীয়গণ অবনতির সোপানে পদা-র্পণ করিয়াছিলেন। পবিত্র মহারাষ্ট্রধর্মের পালনে পরাশ্রুত হওয়ার তাঁহাদিগের অধঃপতনের আরম্ভ হয়। সদাচার,

নিম্পৃহতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সাংঘিক নীতি যে জানেশ্বর ও রামদাস প্রবর্তিত মহারাষ্ট্রধর্মের ভিত্তিস্বরূপ ছিল, এ কথা সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সহিত মহারাষ্ট্রসমাজের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের প্রবর্তিত ধর্ম হিন্দু-সাম্রাজ্যস্থাপনের পক্ষপাতী হইয়াও পরমার্থমার্গের অন্তরায়-স্বরূপ ছিল না। সেই কারণেই গীতোক্ত কর্মযোগের জায় উহা অতীব কষ্টসাধ্য ছিল। কোনও সমাজই বহুদিন একরূপ কঠোর ধর্মের পালনে সমর্থ হন রাই। মহারাষ্ট্রীয়গণও কিছুদিন পরে ঐ ধর্ম হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিকাম কর্তব্য-নিষ্ঠার হ্রাস হওয়ার “মহারাত্রী ধর্ম” (মহান্ রাত্রের উপযোগী স্বতন্ত্র প্রধান হিন্দুধর্ম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পালনীয় ধর্ম) এই গৌরবকর পবিত্র সংজ্ঞাটিও পরবর্তী মহারাষ্ট্র সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হইল এবং কর্মকাণ্ডবল্ল রাজস হিন্দুধর্ম তাহার স্থান অধিকার করিল। চিত্তশুদ্ধি অপেক্ষা সোপচার পূজার্কনা সমধিক পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। একরূপ অবস্থায় সমাজে দীর্ঘা, বিদেহ, কপটতা ও স্বার্থসাধনেচ্ছা বলবতী হওয়া অস্বাভাবিক নহে। নিকাম ধর্মের নিগড় শিথিল হওয়ার মহারাষ্ট্রসমাজেও এই সকল দোষ লক্ষ্যপ্রবেশ হইয়াছিল। মফ্লাররাও হোলকরের অবৈধ স্বার্থপরতায় পাণিপথে মহারাষ্ট্রগণের ভাগ্য বিপর্যস্ত হয়। রোহিলাদিগের দমনে হোলকরই মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধকালেও তিনি স্বাধীনরূপে পাপিষ্ঠ রঘুনথের ও ইংরাজ কোম্পানীর সহায়তা করিয়াছিলেন। নাগপুরের ভৌস্লেদিগের দুর্ভাবহারেও মহারাষ্ট্র সমাজের অঙ্গ ক্ষতি হয় নাই। নারায়ণ রাওয়ের হত্যার জন্ত আন্দী বাঙ্গির অপেক্ষা নাগপুরের ভৌস্লেগণ কোনও অংশে অঙ্গ দায়ী ছিলেন না। তাঁহাদিগের স্বার্থপরতা ও ক্রুরতার জন্ত সমগ্র মহারাষ্ট্র-সমাজ বিপন্ন হইয়াছিল। বঙ্গো তাঁহারাই মহারাষ্ট্র-নাম ঘৃণিত করিয়া তুলিবার প্রধান কারণ। প্রথম মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে ইঁহারা ইংরাজদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের অনিষ্ট সাধনে বিরত হন নাই। শিল্পে (সিদ্ধিয়া)-পরিবার বহুদিন পর্যন্ত বিশ্বস্তভাবে কাণ্ড করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহারাও ক্রিয়ণপরিমাণে স্বার্থের অমুদ্বর্তী হওয়ার দেশের অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। স্বয়ং পেশবাগণও সর্বত্র নিকাম কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ফলতঃ সাংঘিক মহারাষ্ট্রধর্ম উপেক্ষিত ও মহারাষ্ট্র-সমাজ অন্তঃসারশূন্য হইতেছিল। তথাপি হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপনপূর্বক হিন্দুধর্মকে নিকটক করিবার পবিত্র বাসনাবশতঃ উভা বহুদিন সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। ভারতে আর কোনও জাতির ক্ষমতায় সেই মহনীয় বাসনার



উত্তর হয় নাই বলিয়া একরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ উচ্চাশার স্বয়ং পূর্ণ না থাকিলে তাহার পুনঃ পুনঃ ব্যত্যাহত হইয়াও একরূপ দীর্ঘকাল আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন না।

শাসনপদ্ধতি।

মহারাজ্জিদিগের রাজস্বনির্ধারণের ব্যবস্থা, খাজনা আদায় করিবার নিয়মাবলী এবং লবণ, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্রাস্ত্র পদার্থের তুল্য-আদায়-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, বিদেশ হইতে করাদানকালে কিরূপ নীতি অবলম্বিত হইত, কৰ্মচারীদিগের বেতনপ্রদান, জাতীয় ঋণগ্রহণ এবং তাহার ব্যয় ও পরিশোধের ব্যবস্থা, দেওয়ানি ফৌজদারী মামলার বিচারপদ্ধতি, সৈন্তসংগ্রহ, দুর্গরক্ষার প্রণালী, নৌবিভাগের সৈনিক নিয়ন্ত্রণ, পুলিশবিভাগ, ডাকবিভাগ, টকশালা, কারাগার, পুর্নকার্য্য, ধর্ম্মার্থদান, স্থিতিনির্ধারণ, চিকিৎসাবিভাগ ও ঔষধক্রিয়ার রাজসাহায্য, পরীক্ষাধর্ম্মের স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহদান, শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিবিধান প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য কিরূপভাবে সম্পাদিত হইত, তাহা জানিবার জন্ত সকলেরই কৌতূহল হয়। অথচ বর্তমান ইতিহাসনিচয়ে এ সকল বিষয়ের কোনও সংবাদই পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সকল বিষয়েই যে সে কালের মহারাজ্জিসমাজের অধিনায়ক পেশবাগণের যথোচিত লক্ষ্য ছিল এবং তাঁহারা যে বিশেষ দক্ষতাসহকারে এই সকল বিভাগের কার্য্যেই সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সম্প্রতি পুণার রাজদপ্তরে যে সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে উপলব্ধি হয়।

প্রজাপালনবিষয়ে পেশবাগণ কখন অমনোযোগিতা প্রকাশ করেন নাই। শেষদশায় নানা বিষয়ে পূর্বব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলেও রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে পূর্বনিয়ম অক্ষুণ্ণ ছিল। মহারাজ্জিরাষ্ট্রে খাজনার জন্ত কখনও প্রজার উপর জুলুম হয় নাই, খাজনার পরিমাণও প্রজার পক্ষে দুর্ব্বল ছিল না। বরং মহারাজ্জিগণের রাজস্ব ব্যবস্থা প্রজাগণের পক্ষে বিশেষ সুখকর ছিল বলিয়াই বোধ হয়। এই কারণে এ বিষয়ে পেশবাগণের প্রশংসা সকলকেই করিতে হইবে। জমীর খাজনার জ্ঞান শুধু আদায়ের ব্যবস্থাও লোকের পক্ষে আদৌ কষ্টকর ছিল না। দোকানদারদিগের ও সমুদ্রতীর-বর্তী স্থানসমূহে তামাক ও লবণব্যবসায়িগণের নিকট হইতে স্বল্প পরিমাণে কর গৃহীত হইত। লবণের শুধু কোনও স্থানেই প্রতি খণ্ডিতে বা বিংশতি মণে দুই টাকা দশ আনার অধিক ছিল না। কোনও কোনও স্থানে এক টাকা ছয় আনা দিয়াই ব্যবসায়ীরা নিষ্কৃতি লাভ করিত। সে কালের

তুলনায় এখন আমাদেরকে ২০ গুণ হইতে ৩০ গুণ শুধু দিয়া লবণ ভক্ষণ করিতে হয়। তদ্বিত্ত লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবসার পেশবাগণের একাধিকৃত ছিল না বলিয়াও সে বিষয়ে লোকের উপর অবিচার অত্যাচার ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তাল খন্ডুরাদির রস প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর যে কর নির্ধারিত ছিল, তাহার পরিমাণও নিত্যন্ত সযত্ন ছিল। তথাপি দেশের লোক যাহাতে মাদকসেবী না হয়, তৎপ্রতি পেশবাগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। অবাধ বাণিজ্য-নীতি এদেশবাসীর নিকট অবিদিত থাকায় মহারাজ্জি-ভূপতিগণ বিদেশাগত সর্বপ্রকার মালের উপর আমদানি মাসুল আদায় করিতেন। কিন্তু তাহার পরিমাণও যে অধিক ছিল, তাহা বোধ হয় না। এতদ্বিত্ত আর কোনও বিষয়ে রাজা শুধু গ্রহণ করিতেন না।

বর্তমানকালের জ্ঞানসকালেও সাময়িক বিভাগের ব্যয়-বাহুল্যে রাজকোষের অবস্থা অতীব শোচনীয় ও জাতীয় ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইত। গত শতাব্দীর প্রারম্ভকালে আপনাদিগের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবার জন্ত মহারাজ্জিদিগকে অনবরত যুদ্ধকাণ্ডে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া রাজকোষে প্রায়ই অর্থের বিশেষ অনাটন ঘটিত। প্রথম বাজীরাও প্রভৃতি মহারাজ্জি-নেতৃবর্গও উত্তর-ভারতে অভিযান করিবার সময় ঋণ গ্রহণে বাধ্য হইতেন। ১৭৪০ খৃঃ হইতে ১৭৫৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বাণাজী বাজীরাওকে শতকরা বাষক ১২ টাকা হইতে ১৮ টাকা পর্য্যন্ত সুদে দেড়কোটি টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল। পাণপথের যুদ্ধে মহারাজ্জিদিগের বিশেষ ক্ষতি ঘটায় প্রথম মাধবরাও জাতীয় ঋণপরি-শোধের কোনও প্রকার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। বরং তিনি যখন অস্তিম শয্যায় শয়ান, সেই সময়ে মহাজনদিগের উৎপীড়নে মস্ত্রি-সমাজকে ২৫ কোটি টাকা পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর নানাকড়নবীসের ব্যবস্থাপ্তিও প্রায় সমস্ত জাতীয় ঋণ পরিশোধিত হইয়া কয়েক লক্ষ টাকার মাত্র দাঁড়াইয়াছিল। শেষ বাজীরাও যে কেবল ঋণশূন্য হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার সময়ে রাজকোষে বহু পরিমাণে অর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল।

বিদ্যালিক্ষার লোকের উৎসাহ ও অতুরাগবর্দ্ধনের জন্ত পেশবাগণ প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। বেদ-শাস্ত্রের অধ্যয়নকারীরা রাজকোষ হইতে বাষিক বৃত্তি পাইতেন। বেদ, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত-গণ ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ হইতে বৃত্তিগ্রহণের জন্ত মহারাজ্জি সমাগত হইতেন। পুণার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া

বাহার পুরস্কার লাভ করিতেন, ভারতের সর্বত্রই তাঁহাদিগের বিশেষ খ্যাতি হইত। এই কারণে পুণা-পরীকার পুরস্কার পাইবার জন্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যৌর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। এই পুরস্কারদানকাণ্ডে মহারাজপতিগণ বার্ষিক ৬০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেন। শেষ রাজী রাওয়ের সময়ে সর্বপ্রকার দানধর্মের জন্য বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইত। সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভিন্ন যদিও আর কাহার এই বৃত্তি-লাভের অধিকার ছিল না, তথাপি পুরাণপাঠক, কথক, সঙ্গীত-বিশারদ ও আয়ুর্বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণও যথোচিত পুরস্কার ও বার্ষিক বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হইতেন না। ফলতঃ গুণিমাণ্ডেরই পেশাদিগের দরবারে আদর ছিল। মরাঠা কবিগণও আপনাদিগের কাব্যগ্রন্থ প্রচারের জন্য রাজসাহায্য লাভ করিতেন। ঘটকস্মরণিত ব্রাহ্মণগণ যাহাতে অমিহোত্রাদি শাস্ত্রবিহিত অমুষ্ঠান নির্মিমে সম্পন্ন করিতে পারেন, তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে জারগীর ও বৃত্তি প্রদান করা হইত। ঐতিহাসিক গ্রাম্যগীতি-গায়কেরাও রাজার নিকট উৎসাহ পাইত। পেশবা-গণ বেদ-বিভ্যালয় ও কাব্য-দর্শনাদির অধ্যাপনার্থ পাঠশালাদির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনকল্পে আবশ্যকীয় অর্থ ব্যয় করিতেন। বাহার স্বীয় ব্যয়ে ঐরূপ বিভ্যালয়াদির স্থাপন করিতেন, তাঁহাদিগকে রাজকোষ হইতে ‘গ্রান্ট’ বা সাহায্য দেওয়া হইত। মরিত্র বালকদিগের শিক্ষার ও ভোজনাদির সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতে দিবার ব্যবস্থা ছিল। শিল্পিকুলের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য ‘মহারাজ-ভূপতিরা’ তাহাদিগের নিম্নিত শিল্পজাত বহুমূল্যদানে ক্রয় ও তাহাদিগকে অর্থদানে পুরস্কৃত করিতেন।

বিচারবিভাগের কার্য বিশেষ দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সহিত যাহাতে সমাহিত হয়, পেশবাগণ তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে ক্রটি করেন নাই। বিচারকের পদে প্রায়ই ব্যবহার-বিশারদ বুদ্ধিমান পাণ্ডীকর ও সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তির নিয়োগ হইত। দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদী ও প্রতিবাদীর মনোনীত পক্ষায়ত লইয়া বিচারক বিচারকাণ্ড সম্পন্ন করিতেন। এইরূপ বিচারে কোনও পক্ষেরই অসন্তোষের কারণ থাকিত না। তথাপি রাজ্যের সর্বস্থানের মোকদ্দমার আপীল শুনিবার জন্য পুণার বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামীর নিকট অর্থদণ্ড ও ফরিয়ারদীর নিকট পুরস্কার গৃহীত হইত। নানানুদনবাসের মন্ত্রিপদ প্রাপ্তি পর্যন্ত মহারাজরাজ্যে আসামীদিগের প্রতি প্রায়ই কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত না। ফাঁসী, শুলারোপ, শিরশ্ছেদ প্রভৃতি কোনও প্রকার প্রাণান্তকর দণ্ড মহারাজে আদৌ

প্রচলিত ছিল না। দুর্গোপরি দীর্ঘকাল কারাবদ্ধ করিয়া রাখাই সে কালে চরম দণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইত। কারাগারেও বন্দীদিগের প্রতি লম্ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার পর মহারাজপতিগণ অবনতির সহিত দেশে যে পরিমাণে অস্বাভাবিকতা বাড়িতে লাগিল, সেই পরিমাণে দণ্ডের কঠোরতার বৃদ্ধি পাইল। কালক্রমে দস্যুতার বাহুল্য ঘটায় দস্যুদিগের দণ্ডস্বরূপ হস্তক্ষেপনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ফাঁসীর বিধান ও বন্দীদিগের প্রতি কঠোরতা প্রচলিত হইল। রাজদ্রোহীকে হস্তীর পদে বন্ধনপূর্বক নিহত করা হইত। [তবে সেকালে বিদ্রোহ-বিধির ব্যাপ্তি এখনকার মত প্রসারবিশিষ্ট ছিল না। সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা না করিলে কেহ রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইত না।] মন্তপায়ী রাজবিধি অমুষ্ঠানে দণ্ডনীয় ছিল। কেবল ইতর শ্রেণীর লোকেরা সুরাপানের অমুষ্ঠান পাইত। গোবধকারীর প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। জীলোক ও ব্রাহ্মণ-আসামীদিগের অপেক্ষাকৃত লম্বদণ্ডে অণ্য-হতি পাইবার ব্যবস্থা ছিল। ব্যভিচারদোষে রমণীগণ দাসী-রূপে বিক্রীত হইত। তাহাদিগের সমস্ত সন্ততিগণও দাস-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইত। দাস ব্যবসায়ীরা ইহাদিগকে লইয়া ব্যবসায় চালাইত। এতদ্ব্যতীত আর কাহাকেও দাস-রূপে ক্রয়বিক্রয় করিবার আদেশ ছিল না।

বাহার রাজকাণ্ডসাধনে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিতেন, তাহাদিগকে বিবিধ সম্মানকর উপাধিতে বিভূষিত করা হইত। মহারাজ শাহ প্রথমে এই প্রথা প্রবর্তন করেন। মহারাজ-রাজ্যে শেষ পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে অধুনাতন কালের ছায় বাহার তাহার ভাগ্যে উপাধিলাভ ঘটত না, বিশেষ কার্যাকুশলতা দেখাইতে না পারিলে সেকালে সহজে কেহই উপাধি পাইত না। সমরাজ্যে দেশের কাণ্ডে বাহার জীবন বিসর্জন করিত, তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র ও আত্মীয়গণকে প্রভূত বৃত্তিদানে মহারাজ ভূপতিগণ কখনও রূপণতা প্রকাশ করিতেন না। সহরে কোতোয়াল ও পুঞ্জীগ্রামে পাটিল প্রভৃতির উপর শাস্তিরক্ষার ভার অর্পিত ছিল। পেশবাগণ বহবার বহুপ্রকারে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। দেবোদ্দেশ্যেও বহু ভূদানপুঞ্জি উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

মহারাজের টঙ্কশালা।

মহাত্মা শিবাজী দক্ষিণাপথে স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য-স্থাপনকল্পে প্রায়সী হইয়া ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম স্বনামাঙ্কিত পতঙ্গ খাত্মুদার প্রচার করেন। তৎপক্ষে, মুসলমান-আমলে

মহারাত্রিরে কখনও টঙ্কশালা স্থাপনপূর্বক স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিবাজীর পিতা রাজা শাহজীর সময়ে মহারাত্রিদেশের সর্বত্র ‘আদিলশাহী’ মুদ্রারই প্রচলন ছিল। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তাহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটলে শিবাজী পৈতৃক রাজা উপাধি গ্রহণপূর্বক স্বনামাঙ্কিত মুদ্রার প্রবর্তন করেন। সেই নূতন মুদ্রা ‘শিবরাজ হোন’ (শিবরাজের হোন) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই হোন শব্দ কর্ণটকী ‘হোমু’ শব্দের অপভ্রংশ। হোমু অর্থে সুবর্ণ। এই শব্দ পারস্ত-ভাষায় ‘হোন’-রূপে উচ্চারিত হয় এবং সেই নামেই সর্বত্র পরিচিত হইয়াছে।

কর্ণটকের প্রাচীন হিন্দুরাজ্যসমূহে পূর্বে কেবল সুবর্ণ-মুদ্রারই প্রচলন ছিল। দেশীয় রাজাদিগের নামানুসারে যে সকল সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, অত্য়াপি দুই এক স্থলে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই সকল মুদ্রা ‘অখ-পতি হোন,’ ‘গজপতি হোন’ প্রভৃতি নামে খ্যাত। বিজয়-নগর-রাজ্যে হোনের প্রচার সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তথায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের তপঃপ্রভাবে একদা হোনের বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহাও উক্ত মুদ্রার বিপুলতা-সূচক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সেকালে দক্ষিণাঞ্চলের সর্বত্র হোনের জায় মোহরেরও প্রচার ছিল। মুসলমানদিগের আমলেই ঐ অঞ্চলে রৌপ্যমুদ্রার প্রথম প্রবর্তন হয়, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে বলিতে হইবে যে, মহারাত্রি ও কর্ণটক দেশের অধিকাংশ সুবর্ণ লুণ্ঠিত হইয়া দিল্লীতে নীত হওয়ার স্থানীয় শাসনকর্তারা দেশমধ্যে রৌপ্যমুদ্রার প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, শিবাজীর সময়ে মহারাত্রিদেশে অনেক প্রকারের হোন প্রচলিত ছিল। শিবাজীর অন্ততম কর্ণ-চারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ মহোদয় স্বপ্রণীত ‘শিবছত্রপতির চরিত্র’ নামক গ্রন্থে যে ষড়্বিংশ প্রকার হোনের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি এই,— ১ পাতশাহী; ২ শিবরাজ; ৩ কাবেরী পাকী; ৪ ত্রিশূলী; ৫ অচ্যুতরাজ; ৬ দেবরাজ; ৭ রামচন্দ্র রাজ; ৮ গুণ্ডী; ৯ ধারবাড়ী; ১০ তাড়পত্রী; ১১ পাকনাইকী; ১২ তাজোরী; ১৩ জড়মাল; ১৪ বেলুরী; ১৫ মহম্মদশাহী; ১৬ রমানাথ-পুরী। এই সকল হোন বহুদিন পর্যন্ত মহারাত্রি প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে হায়দর ও টিপু ‘বাহাদুরী’ ও ‘মুল-তানা হোন’ নামক বিবিধ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন।

এতদ্বিধ দিল্লীর বাদশাহদিগের ‘আলমগিরী’ নামক হোনের আদান প্রদান সর্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। সেকালের এক হোন বর্ত্তমান কালের প্রায় ৩০ টাকার সমান।

শিবাজী স্বর্ণমুদ্রার জায় রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রারও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সেগুলি ‘শিবরাজ রূপেরা’ ও ‘শিবরাজ পরস’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শিবরাজ পরস এখনও মহা-রাত্রের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; কিন্তু শিবাজীর প্রবর্ত্তিত সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অধুনা নিতান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। অত্বে সকল প্রাচীন হোন বহুপরিমাণে নানা স্থানে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশের উপর অস্পষ্ট পারস্ত-অক্ষর উৎকীর্ণ রহিয়াছে, পরিদৃষ্ট হয়। কোনও কোনও হোনের উপর শ্রীকৃষ্ণ ও বরাহ অবতারের চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, শিবাজীর সময়ে সম্মনগড় নামক দুর্গে অসংখ্য হোন ছিল। অত্য়াপি ঐ অঞ্চলে ক্ষেত্র-কর্ষণকালে কেহ কেহ কদাচিৎ দুই একটা হোন লাভ করিয়া থাকে। এই হোনের আকার ছোলায় দাড়লের জায়। স্থানীয় লোকেও সেই জন্ত উহাকে সাধারণতঃ ‘নোনার দাউল’ নামেই অভিহিত করিয়া থাকে।

রায়গড় সেকালে মহারাত্রিদেশের রাজধানী ছিল বলিয়া শিবাজী তথায় টঙ্কশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তি-কালের রাজধানী সাতারা সে সময়ে একটা ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। শিবাজীর মৃত্যুর পর সাতাজী ও রাজারামের রাজ্যকাল মোগলদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধবিগ্রহেহেতু ঘোর বিপ্লবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অশান্তির সময়ে নূতন মুদ্রা-প্রচারের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, টাকশালের কার্য অব্যাহত ছিল কি না, তাহার কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, সে সময়ে নূতন টাকা প্রস্তুত হয় নাই। রাজারাম মোগলদিগের দৌরাত্ম্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণাটের অন্তর্গত জিজী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহারাত্রি-রাজসিংহাসনও বহুদিন পর্যন্ত তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সেখানে কখনও টাকশালা স্থাপিত হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। পরাস্তরে, মহারাজ রাজারাম জিজী হইতে মহারাত্রি-দেশের বহুসংখ্যক দেবস্থানের ও ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে যে সকল দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভূ-সম্পত্তি ভিন্ন নগদ টাকা কড়ির উল্লেখ কোথাপি পাওয়া যায় না। কিন্তু শিবাজীর সময়ে যে সকল দানপত্র রচিত হইয়া-ছিল, তাহাতে সুবর্ণমুদ্রাদির ভুরি ভুরি উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মোগলশক্তিকে বহুপরিমাণে পরাভূত করিয়া রাজারাম সাতারায় মহারাত্রিরাজ্যের নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু তিনি তথায় টাকশাল স্থাপিত করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ্জ-রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। মহারাজ্জ শাহ সাতারায় ও রাজারামের পুত্র সাম্ভাজী কোঙ্লাপুরে থাকিয়া শাসনও পরিচালন করিতেছিলেন। এই উভয় রাজধানীতেই স্বতন্ত্র টাকশালা স্থাপিত হইয়াছিল। শাহর নামান্বিত রোপ্য ও তাম্রমুদ্রাগুলি ‘শাহ-শিকা’ ও সাম্ভাজীর টাকশালের মুদ্রাগুলি ‘শজু-শিকা’ নামে পরিচিত হইয়াছিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোঙ্লাপুরের নরপতিদিগের সিংহাসন প্রধানতঃ ‘শাহালা’ দুর্গেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোঙ্লাপুরে স্থানিতাবে সেই রাজসিংহাসন আনীত হইবার পূর্বে পর্যন্ত ঐ দুর্গেই কোঙ্লাপুর-পতিদিগের টাকশাল ছিল। এই কারণে ‘শজু-শিকা’ ‘পাহলী রূপেয়া’ নামেও অভিহিত হইত। শজু-শিকা কোনও কোনও স্থানে ‘শজুপীর রূপেয়া’ এই আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। রাজা শজুর (সাম্ভাজীর) নামের সহিত মুসলমানদিগের ‘পীরখানা’ কল্পে সংযুক্ত হইল, তাহা বলিতে পারি না। বাহা হউক, মহারাজ্জ সাম্ভাজীর মৃত্যুর পরও কোঙ্লাপুরের টাকশালে শজু-শিকাই মুদ্রিত হইত। পরবর্তী কোনও রাজা যনামে মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ অত্যাধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মহারাজ্জ শাহর শাসনকালে সাতারায় ভিকাজী নায়ক, পরশুরাম নায়ক প্রভৃতি অনেক ধনশালী ‘সাকার’ বা মহাজন ছিলেন। ছত্রপতি শাহ আয়ই তাঁহাদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতেন। সরকারী টাকশালে ‘টঙ্ক’ মুদ্রিত করাইয়া সময়ে সময়ে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধিত হইত। ক্রমে যেমন মহারাজ্জশাহের বিস্তার হইতে লাগিল, তেমনই রাজ্যের নানা স্থানে টাকশালা-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও অস্বত্ব হইতে লাগিল, পেশবা বালাজী বাজী রাওয়ের মন্ত্রিকালে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মহাজন ও অপর লোকদিগকে টাকশালা-স্থাপনের অমুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ২১৫ হইতে ২৭০ টাকা পর্যন্ত ‘দর্শনী’ (নজর) প্রদান করিয়া অনেকে তিন বৎসরের জন্য টাকশাল খুলিবার অমুমতি লাভ করিতেন। কেহ কেহ ১২০ টাকা দিয়া এক বৎসরের জন্য টাকশাল খুলিবার সনন্দ লইতেন। এই দর্শনী ভিন্ন তাঁহাদিগকে মুদ্রিতব্য টাকার পরিমাণ অমুমারে একটা নির্দিষ্ট করণ রাজসরকারে প্রদান করিতে হইত।

মহারাজ্জদেবার বহির্ভাগে মহারাজ্জপতির আদেশে যে সকল টাকশালা স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ধারবাড়ের টাকশালই বোধ হয় প্রথম। উহা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত

হয়। বাঘলকোট আদিলশাহী সুলতানগণের আমল হইতে যে টাকশাল চলিতেছিল, তাহা উক্ত সুলতানগণের রাজত্ব-লোপের পর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বালাজী বাজীরাও পেশবা-পদ লাভ করিয়া উহা পুনর্বার খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ফলতঃ মুদ্রার অভাবে লোকের যাহাতে অসুবিধা না ঘটে, তৎপ্রতি সর্বপ্রথম সেই পেশবারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

মাধব রাও পেশবার সময়ে রাজ্যের নানা স্থানে টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী পেশবাদিগের আমলেও এ বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধির ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবল মহাজন ও ব্যবসায়ীদিগের উপর নির্ভর না করিয়া পেশবাগণ সরকারী সর্দার ও জায়গীরদারদিগের প্রতিও টাকশাল খুলিয়া টাকা প্রস্তুত করাইবার আদেশ দান করিতেন। ঝান্দেশের অন্তর্গত বান্দবড়ে তুকেজী হোলকরকে টাকশাল খুলিতে বলা হইয়াছিল। বুরহানপুর প্রভৃতি স্থানে শিন্দের (সিন্দিয়ার) টাকশাল ছিল। উত্তর-ভারতে উজ্জয়িনী, ইন্দোর, ভূপাল, প্রতাপগড়, ভিল্লা, সিরোজ, গজবগোদা প্রভৃতি স্থানে পেশবার আদেশে টাকশালা স্থাপিত হইয়াছিল। ভড়োচে শিন্দে, কুলাবায় আংগ্রে, নাগপুরে তেঁম্লে প্রভৃতি সর্দারেরা টাকশাল স্থাপিত করিয়াছিলেন। আংগ্রে টাকশালে যে টাকা প্রস্তুত হইত, তাহা ‘শ্রীশিকা’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হাবসীদিগের জজীরায় ‘হাবশানী বা নিশাদী’ শিকা প্রস্তুত হইত। ঐ মুদ্রার উপর ‘জ’ অক্ষরটা অঙ্কিত থাকিত। বলা বাহুল্য, উহা ‘জজারা’ শব্দের ত্রুতক বলিয়া পরিগণিত হইত। কঙ্কোণ, নাসিক ও দৌলতাবাদ অঞ্চলে পেশবাদিগের সর্দার বা অমুমতিপ্রাপ্ত মহাজনেরা টাকা মুদ্রিত করিতেন।

কর্ণাটকের অধিকাংশ জায়গীরদারই নির্দিষ্ট দর্শনী ও কর দিয়া স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশে টাকশাল খুলিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকলের অধিকাংশে কৃত্রিম ও অশুদ্ধ মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়ায়, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মাধব রাও পেশবা ঐ অঞ্চলের টাকশালগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া ধারবাড় পাণ্ডুরঙ্গ মুরার নামক জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে একটা সরকারী টাকশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যে একুশটা টাকশাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পেশবাদিগের পুনঃস্থিত দপ্তরে তাঁহাদিগের নামের তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন পরে এই সকল টাকশালের মধ্যে কয়েকটা আবার খুলিবার অমুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল।

সকল প্রদেশে এক প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত বলিয়া বোধ হয় না। বাঘলকোট অঞ্চলে মহারাজ্জ ভিকাজী রাও পেশবা-

দিগের প্রধান স্বেদকার ছিলেন। বাদামী, বাগলকোট, হনগুন্দ প্রভৃতি মহাল তাঁহার শাগনাধীন ছিল। তাঁহার আদেশে প্রস্তুত মুদ্রা ‘মল্লারশাহী রূপের’ নামে অভিহিত হইত। এই মুদ্রার মূল্য পনের আনা ছিল। পেশবাগ এই মুদ্রা রাজ্যের সর্বত্র চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে ক্ষত শতকরা দুই টাকা পর্যন্ত বাটা দিতেও তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে রাজকোষের বিশেষ ক্ষতি ঘটিতে লাগিল দেখিয়া তাঁহাদিগকে সে অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইল।

মহারাজ্জ-সাম্রাজ্যে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সে সকলের নাম ও মূল্যাদির বিষয় পেশবাগণের দপ্তরের কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষ বাজী রাওয়ের সময়ে এক পুণাতেই বিবিধ রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। ধাতুর বিশুদ্ধতা-অমুসারে সেগুলির নাম ও মূল্যের প্রভেদ ছিল। মিষ্টার চাম্বলিনের রিপোর্টে প্রকাশ, পুণার টাকশাল ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে বাজারে ধাতুমুদ্রার অভাব হওয়ায় পুনরায় উহা খুলিতে হইয়াছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পুণার টাকশালা চিরকালের জন্য বন্ধ হইল। বাগলকোট, কোল্হাপুর, কুলাবা প্রভৃতি প্রদেশের টাকশালগুলিও এই সময়ে বন্ধ হয়।

তদানীন্তন অধিকাংশ রাজমুদ্রার উপরেই পারস্ত অক্ষর মুদ্রিত হইত, দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল শিবাজীর ও শাহর মুদ্রায় মহারাজ্জ বা দেবনাগরী অক্ষর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কুলাবার আংগেরা তাঁহাদিগের রৌপ্যমুদ্রার উপর ‘শ্রী’ এই অক্ষরটি মুদ্রিত করাইতেন। যশোবন্ত রাও হোলকরের মুদ্রাতেও মরাঠী অক্ষরযুক্ত ছাপ থাকিত। পেশবা-দিগের মুদ্রায় হিজ্রী সনের সংখ্যাটি মরাঠী অক্ষরে ও অপরাপর বিষয় পারস্ত অক্ষরে অঙ্কিত হইত। অবশিষ্ট সকল মুদ্রাই পারস্ত অক্ষরে অঙ্কিত ছিল। গায়কোবাড় প্রভৃতি হিন্দু শাসনকর্তারাও পারস্ত-অক্ষরযুক্ত মুদ্রারই পক্ষপাতী ছিলেন।

পেশবাদিগের আমলে টাকার ভায় আধুলি, দিকি, ছয়ানি প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল। তাম্রমুদ্রার প্রচারও অল্প ছিল না। পরন্তু রৌপ্যমুদ্রার ভায় প্রদেশভেদে তাম্রমুদ্রার প্রকারভেদ কখনও ঘটে নাই। উত্তরে নর্মদা হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রাতীর পর্যন্ত সর্বত্র এক ‘শিবরাজ্জ’ পয়সাই প্রচলিত ছিল। কুলাবা, পনবেল, ধারবার প্রভৃতি সকল টাকশালেই ‘শিবরাজ্জ’ পয়সা প্রস্তুত হইত। এই পয়সার এক পৃষ্ঠে তিন পংক্তিতে ‘শ্রীরাজা শিব’ ও অপর পৃষ্ঠে ‘ছত্রপতি’ এই অক্ষরগুলি বা তাহাদের একাংশ মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া

যায়। মহারাজ শাহ স্বনামযুক্ত পয়সা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই; ইহা যে শিবাজীর প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধার ত্রোতক, তাহা বলাই বাহুল্য। এখনও মহারাজ্জ বহু স্থলে ‘শিবরাজ্জ’ পয়সার প্রভূত প্রচলন আছে। ‘শিবরাজ্জ’ পয়সার প্রচলন বন্ধ হইবে—গত বৎসর পুণায় সহসা এইরূপ একটা গুপ্ত উঠায় নগরমধ্যে মহা হলহুল পড়িয়া গিয়াছিল। পরিশেষে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা সেই জনবহুল অলীকতা প্রতিপন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পেশবাদিগের আমলে সাহিত্য।

পেশবাগণের অভ্যুদয়কালে, মহারাজ্জদেশের প্রেষ্ঠ সংকীর্তনকার “অমৃত রায়” (১৬৯৮—১৭৫৩ খৃঃ) অবতীর্ণ হন। তিনি “ব্রাহ্মবিজ্ঞানভরণ” নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা, বারাণসী-নিবাসী অবেতানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাহার রচিত বিবিধ উপাখ্যান, পদাবলী ও নীতা প্রভৃতির স্বয়ং কথ্য (পালা) সংকীর্তনকারীদিগের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। অমৃত-রায়ের কাবিতায় যথেষ্ট মাধুর্য আছে। রঘুনাথ পণ্ডিত অমৃত রায়ের সমসাময়িক। নলোপাখ্যান নামক তাহার একখানি মাত্র কাব্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কি মনোহারিতার, কি অশ্রুতকাব্যগুণে, এই গ্রন্থখানি মহারাজ্জীয় ভাষায় অদ্বিতীয়। সুন্দর বর্ণনাকৌশল, শ্রুতিমধুর পদবিন্যাস, অলঙ্কারপ্রাচুর্য, অন্তঃকরণবৃত্তির বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে যেরূপ দৃষ্ট হয়, মহারাজ্জ-সাহিত্যে অত্র তাহা দ্রুত। মুক্তেশ্বর ভিন্ন অত্র কোনও কবি কাব্যকলায় রঘুনাথ পণ্ডিতের নিকটবর্তী হইতে সমর্থ নহেন। “বলিদান” ও “রাবণগঙ্গাপরিহার”-রচয়িতা চতুর সবাঙ্গীও এই সময়ে প্রস্তুত হইয়াছেন।

তাহার পর মহীপতি। তিনি মহারাজ্জদেশের সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থকার। শ্রীধরের ভ্রায় মহীপতির গ্রন্থাবলীও মহারাজ্জ আবাগবুদ্ধবনিতা ভক্তি ও আদরসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। তত্ত্ব-বিজয়, মন্ত্র-বিজয়, ভক্তলীলামৃত, ও মন্ত্রলীলামৃত নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থচতুষ্টয়ে মহীপতি ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভক্তের জীবনী অতি সরস ভাষায় ও সরলভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। তাঁহাকে মহারাজ্জ দেশের ধর্মোতিহাসপ্রণেতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কথাসারামৃত নামে তাঁহার আর একখানি বৃহৎগ্রন্থ আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মহীপতির মৃত্যু হয়। মহীপতির সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ্জ-সাহিত্যের বল, দর্প ও নৌভাগ্য-শোভাদিরও বিলোপের স্বরূপাত হয়। মহারাজ্জ-দিগের শক্তিসাধন তখন ভাঁটা আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদিগের রাষ্ট্রীয় গৌরব-রবি শেষ পেশবা বাজী রাওয়ের জঘন্য

কার্যকলাপ বর্ধনে অধোমুখ হইয়াছেন। সমাজে বিলাসিতা ও পার্থক্যের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। স্বাধীন-প্রধান ভাগ-বত ধর্মের হ্রাস হইয়া তামসিক শাক্ত-সম্প্রদায়ের প্রাচুর্য্য হইয়াছে। এই সময় যে সমস্ত কবি জন্ম গ্রহণ করেন, শাক্ত-প্রবর “রামজোশী” তাঁহাদের অগ্রগণ্য। তাঁহার ছড়া, ছন্দ, লাওনী, ৪টা কুঁকুর, ৪টা বানর, ২টা মরনা, একটা অবিভা ও তাহার জন্ত রচিত বেশনী দোলা এবং নৃত্যকুশল বালক ও খঞ্জনী প্রভৃতি বাস্তব তিনি রাও বাজীর সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলীর মাধ্যমে মুখ হইয়া অনেকেই তাঁহার তত্ত্ব হইয়া উঠেন। তিনি সুপণ্ডিত, অসাধারণ ধীমান ও সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপন্ন ছিলেন। “ছেকাপঙ্কতি” গ্রন্থে তাঁহার সংস্কৃত কাব্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মোরোপন্ত সেই যুগের আর এক জন প্রসিদ্ধ কবি। রামজোশী ভিন্ন সেকালে মোরোপন্তের আর কেহ সমকক্ষ ছিল না। মোরোপন্তের ধর্মনীতিমূলক কবিতা বিবেকভ্রষ্ট কুপখাচারী রামজোশীকে সংপথে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। কালক্রমে রামজোশী মোরোপন্তের একজন গোঁড়া ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মোরোপন্তের সাহায্যে তাঁহার কবিতার গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল। মূর্খ বাজীরাওএর হস্তে নিগৃহীত, তৎকর্তৃক তাঁহার কবিতা অক্ষিকঙ্কর ও অশাঠ্য বলিয়া নির্দোষিত হইলে রামজোশী উহা সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করেন।

রামজোশীর পর অনন্ত ফন্দীর নাম লাওনীকার কবিদিগের অগ্রগণ্য। উপস্থিত ক্ষেত্রে কবিতা-রচনার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। তাঁহার কবিতা শুনিবার জন্ত ২০ কোশ দূর হইতে লোকসমাগম হইত। তাঁহার সরস কবিতা শ্রবণ করিয়া ক্রোধসম্পূর্ণ অহল্যা বান্ধে প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহাকে এক জোড়া শাল উপহার দিয়াছিলেন। অনন্তফন্দী অতিশয় স্পৃষ্টবাদী ছিলেন। তিনি একদা প্রকাশ সভায় বাজীরাওএর কার্য্যপ্রণালীর তীব্রনিন্দাপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন। তিনি “মাধবনিধন” নামক কাব্যে মাধব রাওএর মৃত্যুকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। এই সময় লাওনীকার কবিদিগের মধ্যে হোনাজী, সনগডাউ প্রভৃতি আরো অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল কবিতায় অধিকাংশ আদিরসের ও অসারতার বাহ্য দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত নাটকাদির ও মণ্ডট প্রভৃতির রচিত কবিতাদি অশ্লীলতা এই সময় রাওজীর কল্যাণে মরাঠা-সাহিত্যে প্রবেশলাভ করে। এই সময় বীররসপরিপ্লুত সময়গীতিকল্পিত ও বড় অন্ন রচিত হয় নাই। পাণিপথের যুদ্ধ, খর্ডার যুদ্ধ, পেশবাদিগের সৈন্যবল

ও মরাঠা-সর্দারদিগের বীর্য এই সকল গীতিকার সংবল হইত। এই গীতিকা-রচয়িতাদিগের মধ্যে ‘প্রভাকরদাতা’ সকলের শীর্ষস্থানীয়, পুণ্য নিকটস্থ পার্শ্বত, শৈলের বর্ণনা, পেশবাদিগের দানসাগরের বর্ণনা, দ্বিতীয় মাধব রাওএর হোলিখেলা, তাঁহার বৃত্ত, পেশবাদিগের ঐশ্বর্য্য, সন্তান, তাঁহাদের অধঃপতন, শেষ বাজীরাওএর হরাচার, নানাকড়-নবীস ও ইংরাজদিগের বর্ণন, পুণ্যবাসীর নিগ্রহ, রাও বাজীর পলায়ন ও দুর্দশা, ইংরাজদের লুণ্ঠন, সামান্য বণিকজাতির হস্তে মরাঠাদিগের জায় বীর জাতির পরাজয়জনিত খেদ, বাজীরাওএর প্রত্যাযুক্তনের আশা ও পরিশেষে গভীরতত্ত্বজ্ঞান-মূলক উপদেশ প্রভৃতির বিষয়-বর্ণনার প্রভাকরদাতা যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা অন্যত্র দুর্বল। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৮০টা এইরূপ গীতি-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১২টা প্রভাকরের রচিত। কৃষ্ণাজী জনস্ব সভাসদ-রচিত শিবাজীর জীবনমূলক বখর ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। কৃষ্ণাজীর গ্রন্থের পর শিবদীক্ষিত, শিবাজী-প্রতাপ, পাণিপথের বখর, ভাউ সাহেবের বখর, মরাঠা সাম্রাজ্যের সংশ্লিষ্ট বখর, চিত্রগুপ্তকৃত বখর ও পেশবাদিগের বখর প্রভৃতি বিবিধ গদ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়।

সাতারাদিপতি মহারাষ্ট্রের আদেশে, মল্লারাম রাও চিটনবীশ প্রাচীন সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে শিবাজী, সাম্বাজী, রাজারাম ও শাহর বিবরণ সংক্রান্ত বখরগুলির ঐতিহাসিক যোগ্যতা সন্ধানপক্ষে অধিক। মল্লারাম রাও রাজনীতি মঞ্চের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অধিকাংশ বখরের ভাষা ওজস্বিনী ও জদয়ের আনন্দবাহিনী। বখরের ভাষায় *Compactness* ও পারিপাট্য আছে, আজ কালিকার গল্প ভাষায় তাহার সম্ভাব দৃষ্ট হয় না।

পেশবাদিগের অধঃপতনকালে যে সকল কবির উদয় হয়, মোরোপন্ত তাহাদিগের শিরোভূষণস্বরূপ। তিনি আখ্যা-চ্ছন্দে প্রায় তিন লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। মোরোপন্তের অমরলেখনাস্পর্শে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আখ্যাচ্ছন্দের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে বলিলে দোষ হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাভারত (২০ সহস্র আখ্যা), কৃষ্ণবিজয়, বৃহদশম, মন্ত্রভাগ-বত, মন্ত্ররামায়ণ (সংস্কৃত), অষ্টোত্তরশত প্রকারের রামায়ণ, সন্ন্যাসমালা, কেকাবলী, প্রেমোত্তরমালা, সংসঙ্গ, পঞ্চরত্ন-মাহাত্ম্য, নামসুধা, সন্ন্যাসরথরাজ, সংশয়রত্নমালা প্রভৃতি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন দেবতা ও সাধুপুরুষগণের স্তুতিমূলক যে তাঁহার কত কবিতা আছে, তাহার হয়তা নাই। যমক, অলঙ্কার ও অল্পপ্রাসের



জন্ম তাহার কবিতা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ দেড়শত পর্য্যন্ত কবিতা আখ্যানেন্দ্রে রচনা করিতেন। তথাপি তাঁহার রচনায় মধুরতা, বিচিত্রতা ও কল্পনায় কোতুক-ক্রীড়া বহুরূপ পরিলক্ষিত হয়। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় রচনার ভাষায় ব্যাকরণগত দোষসমূহ পরিহারপূর্ব্বক ভাষার সংস্কারের বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে কবিজনসুলভ সাধারণ দোষ-সমূহও অধিকমাত্রায় বিদ্যমান নাই। তাঁহার চিত্তসংযম ও তেজ-স্থিতি যথেষ্ট ছিল। রাণী অহল্যা বাঈ ও পেশবা বাজীরাও তাঁহাকে নিজের ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা মোরোপান্ত তাহা গ্রহণ করেন নাই। মোরোপান্তের কবিতা এখনও মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।

মহারাষ্ট্রক (পুং) মহারাষ্ট্র-দেশজাত।

মহারাষ্ট্রী (স্ত্রী) মহারাষ্ট্রদেশ উৎপত্তিস্থানসেনোপাত্তা ইত্যচ, গোরাতিয়াং, ভীষ্। ১ জলপিপ্লী। (রাজনিং) ২ শাকভেদ, চলিত মারাটি, ইহার গুণ,—কফ ও বায়ুনাশক। (রাজবং) মহারাষ্ট্রাণারিয়ং অণ্ ভীপ্। ৩ অষ্টাদশ প্রকার ভাষার অন্তর্গত ভাষাবিশেষ। [প্রাকৃত দেখ।]

“আসামেব তু গাথাং মহারাষ্ট্রং প্রয়োজয়েৎ।

অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজাস্তঃপুরচারিণাম্॥”

(সাহিত্যদর্পণ ৬ পরিং)

মহারিক্ত (পুং) মহান্ অরিষ্টঃ। মহানিষবিশেষ। পর্য্যায়—কৈটর্ঘ্য, বামন, রমণ, গিরিনিষ, গুরুসাল। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, নীতল, লঘু, সস্তাপ, শোষ, কুষ্ঠ, অস্ত্র, ক্রমি ও বিষনাশক। (রাজনিং)

মহান্ রিষ্টঃ। ২ জ্যোতিষোক্ত মঙ্গলমঙ্গলসূচক চিহ্ন। জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে—বালক জন্মগ্রহণ করিলে প্রথমে উক্তমন্ত্রে রিষ্ট বিচার করিবে। জাতবালকের ২৪ বৎসর রিষ্টকাল, ২৪ বৎসরের পর তাহার আয়ুর্দায় অর্থাৎ আয়ুর্গণনা করিবে। এই সময় পর্য্যন্ত কেবল রিষ্টের বিচার করিয়া তাহার শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে। মহারিষ্টযোগ বা তাহার ভঙ্গযোগ হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া ফলাফল নির্ণয় করা আবশ্যিক। [রিষ্ট দেখ।]

মহারুজ্জ (ত্রি) অতিশয় পীড়া।

মহারুজ্জ (ত্রি) মহতী রুগ্ যন্ত। নিরতিশয় পীড়িত।

মহারুদ্র (পুং) রুদ্রাণাং মহান্ স্বরং ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। মহাদেব।

“মহাকাজ্য মহাকালশৃণ্ণাকাররূপতঃ।

• মায়রাজ্যাদিত্য ৮ তন্মধ্যে সমভাগতঃ।

মহারুদ্রঃ স এবাম্মা মহাবিষ্ণুঃ স এব হি ॥” (নির্ঝাণভক্ত)

মহারুদ্র, কালজ্ঞান নামক বৈষ্ণব-গ্রন্থপ্রণেতা।

মহারুদ্র, হিমালয় পর্ব্বতস্থিত শিবলিঙ্গভেদ।

মহারুদ্রসিংহ, বিজ্ঞানভরদ্বীপ-প্রণেতা।

মহারুদ্রতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, বাসকপত্র-রস ৪ সের, কাথের জল গুলফ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কঁকার্থ পুনর্গবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, দাড়িমফলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, বাসকছাল, নিশিন্দা, পটোলপত্র, ধুতুরা, অপাঙ্গমূল, জয়ন্তী, দস্তা ও ত্রিফলা প্রত্যেকে ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেকে ৩ পল, জল ৪ সের। পরে তৈল পাকের নিয়মানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি রোগ নিরাকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং বাতরক্তাধিং)

মহারুদ্রগুড়চীতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—কটুতৈল ৪ সের। কঁকার্থ গুলফ ১২১০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র ৪ সের। কঁকার্থ গুলফ, সোমরাজীবীজ, দস্তিমূল, করবীমূল, ত্রিফলা, দাড়িমবাজ, নিমবীজ, হরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষ-চাকুলে, ত্রিকটু, তেজপত্র, জটামাংসী, পুনর্গবা, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অখণ্ডকা, গুল্ফা, রক্তচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ছাতিমছাল ও গোময়রস প্রত্যেকে ২ তোলা। এই তৈল মর্দন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিসর্প ও ব্রণাদি বিনষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাং বাতরক্তরোগাধিং)

মহারুপ (পুং) মৃগবিশেষ।

মহারূপ (পুং) মহৎ মহত্ত্বাদিরূপং যুক্ত। ১ মহাদেব।

(ভারত ১৩।১৭।৩৪)

(ত্রি) মহরূপং যন্ত। ২ অতিশয় রূপযুক্ত। অতি রূপবান্।

মহারূপক (ক্লী) মহৎ রূপকং যন্ত। নাটক। (ত্রিকা)

মহারেতস্ (ত্রি) ১ সাত্ত্বিক বীৰ্য্যবান্। ২ শিব।

মহারোগ (পুং) মহান্ ঘোরানিষ্টকারকঃ রোগঃ যদ্বা মহান্ জন্মাস্তরীণ-ভুক্তাবশিষ্টাতিশয়পাতকেন জনিতো রোগঃ। পাপ-রোগ। এই মহারোগ অষ্টবিধ,—উন্মাদ, বৃক্কদোষ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস, মধুমহে, ভগন্দর, উদর ও অশ্মরী। (শুদ্ধিতত্ত্বে নারদ)

“মহারোগেণ বাতিতপ্তঃ প্রান্নীয়াত্ততরাং গতিং গচ্ছতি”

(আখ্যায়ন ২।৭।১৭)

রসজ্ঞসারসংগ্রহ-টীকার মতে ৮টি মহারোগ, যথা—বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেদ, উদর, ভগন্দর, অর্শ ও গ্রহণী।

“বাতব্যাধ্যাশ্মরীকুষ্ঠমেদোদরভগন্দরাঃ।

অর্শাসি গ্রহণীভ্যৌ মহারোগাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥”



২ মহাব্যাধিমাত্র।

মহারোগিন্ (ত্রি) মহারোগঃ ক্ষয়াদিরন্ত্যন্তেতি ইনি।  
মহারোগযুক্ত, মহারোগবিশিষ্ট, যাহাদের মহারোগ আছে,  
তাহারা মহাপাতকী এবং চিরজীবন অন্ততি। যত দিন তাহারা  
ঐ সকল রোগের প্রায়শ্চিত্তাদি না করে, ততকাল তাহার ধর্ম-  
কর্মাদিতে অধিকার থাকে না।

“ক্রিয়াহীনস্ত মুখস্ত মহারোগিণ এব চ।

যথেষ্টাচরণস্তাহমরণান্তমশৌচকম্ ॥”

( শুদ্ধিতত্ত্বত কুর্ষপূরণ-বচন )

মহারোচ (পুং) বৃক্ষভেদ।

মহারোমন্ (পুং) মহাস্তি রোমাণি বৃক্ষাদিরূপাণি বিরাট-  
রূপে যন্ত। ১ শিব। ( ভারত ১৩।১৭।৮৮ ) মহাস্তি রোমাণি  
যন্ত। ( ত্রি ) ২ বৃহদ্ রোমযুক্ত। ৩ কৃতিরাতে পুত্রভেদ।

( ভাগবত ৯।৩।১৭ )

মহারোহীতক সূত (ক্লী) সূতৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-  
প্রণালী,—সূত ৪ সের, কাথার্থ রোহীতক ছাল ১২০ সের,  
কুলশুঠা ৮ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের, ছাগহু ১৬  
সের, ককার্থ ত্রিকটু, ত্রিকলা, হিঙ্গু, যমানী, ধনিয়া, বিটলবণ,  
জীরা, কৃষ্ণলবণ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, পুনর্নবা, রাখালশসার  
মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুয়া, চই ও বচ প্রত্যেক  
২ তোলা। পাকের জল ১৬ সের। মাত্রা ২ হইতে ৩ তোলা,  
অস্থপান মাংস-যুষ ও দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্রীহা প্রভৃতি  
নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং প্রীহারোগাধি°)

মহারৌদ্র (ত্রি) ১ অত্যন্ত রৌদ্র। (পুং) ২ শিব। ত্রিযাঃ  
ভীষ্। ৩ হর্গা।

মহারৌরব (পুং) করুণাময়ঃ ইতি রু-অণ্, মহান্ রৌরবঃ  
তত্র গতা জীবাঃ ক্রব্যান্ নামকৈ রুক্রভিঃ পীড়্যন্তে অতএবাস্ত  
তথাহং। নরকবিশেষ। যাহারা এই নরকে গমন করে,  
ক্রব্যান্ নামক রুক্র (কুকুর)গণ তাঁহাদিগকে অতিশয় পীড়া দেয়,  
এই জন্ত এই নরকের নাম মহারৌরব হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে  
লিখিত আছে, যাহারা দেবতার দ্রব্য অপহরণ এবং গুরুপত্নী  
গমন করে, তাহাদের মহারৌরব নরক হয়। (অগ্নিপু°)

(ক্লী) ২ সামভেদ।

মহারৌহিণ (পুং) দানবভেদ।

মহার্ঘ (ত্রি) মহান্ অধিকঃ অর্থো মূল্যমন্ত। ১ মহামূল্য।  
(মেদিনী) (পুং) মহান্ অর্থো মূল্যং বাস্ত। ২ লাভক-  
লক্ষী। (বিশ্ব) ৩ মহাসৌমলতা। (বৈজ্ঞকনি°)

মহার্ঘতা (ক্লী) মহার্ঘস্ত ভাবঃ তন্-টাপ্। মহামূল্যত্ব, মহা-  
মূল্যের ভাব বা ধর্ম।

XIV

“করোতি নির্মলাধারস্তচ্ছতাপি মহার্ঘতাম্ ॥” (বৃহৎসং ১৪।১।১১)

মহার্ঘ্য (ত্রি) ১ মহামূল্য। (পুং) ২ লাভকজাতীয় পক্ষিবিশেষ।

মহার্জিস্ (ত্রি) মহদ্ অর্জিযন্ত। অগ্নি।

মহার্ণব (পুং) মহান্ অবিশালঃ অর্ণবঃ। মহাসমুদ্র।

“আবুর্গিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে ॥” (চণ্ডী)

মহান্ অর্ণব ইব প্রসাদাদি-গুণবাহুলাৎ তথাহং। ২ শিব।

৩ কৃষ্ণকপী ভগবন্নারায়ণের দক্ষপাদোক্ত জনপদ।

“সৌরাস্ত্রী দরদাশ্চৈব দ্রাবিড়াস্চ মহার্ণবাঃ।

এতে জনপদাঃ পাদে স্থিতা বৈ দক্ষিণেহপরে ॥”

(মার্কণ্ডেয় পু° ৫৮।৩২)

মহার্ঘ (পুং) ১ দানবভেদ। (ক্লী) ২ মহাভাব্য।

মহার্ঘক (ত্রি) অতিশয় মূল্যবান্।

মহার্ঘবৎ (ত্রি) মহার্ঘ অস্ত্যর্থ মতুপ্ মন্ত ব। মহার্ঘযুক্ত।

মহাদ্রুক (ক্লী) মহদ্ আদ্রুকম্। বনাদ্রুক, বুনো আদ্র।

ইহার গুণ,—অগ্নিদীপন, ধারক, রুক্ষ, বায়ু ও কফনাশক।

(রাজবল্লভ) ২ শুষ্কী। (বৈজ্ঞকনি°)

মহার্দ্ধ (পুং) মহান্ বিপুলো হৃদোহস্ত। বৃক্ষবিশেষ। চলিত  
মহাজা। (শব্দচ°)

মহার্কবুদ (ক্লী) মহদ্ অর্কবুদম্। দশার্কবুদ, শতকোটিসংখ্যা।

মহার্হ (ক্লী) মহান্ অর্হঃ মূল্যং মধ্যাদা যন্ত। ১ ষেতচন্দন।

(রাজনি°) (ত্রি) ২ মহামূল্যবান্। ৩ মহাপূজাযোগ্য।

“যস্মাদ্ভাগার্থিনো ভাগান্ নাকল্পয়ত মে হুঃ।

বরাস্তাণি মহার্হাণি ধনুয়া শাতয়ামি বঃ ॥” (রামা° ১।৬৬।১০)

‘মহার্হাণি মহাপূজাযোগ্যানি’ (রামাহুজ)

মহাল (আরবী) ভূমিসম্পত্তি, যে ভূখণ্ড বা ভূখণ্ডসমূহের  
রাজকর স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট থাকে।

মহালক্ষ্মী (ক্লী) মহতী লক্ষ্মীঃ। রাধা, নারায়ণের পত্নি।

“যস্মায়স্মা মোহিতাশ্চ একবিকুশিবাধয়ঃ।

বৈষ্ণবাস্তাং মহালক্ষ্মীঃ পরারাধাঃ বদন্তি তে।

যদক্সা মহালক্ষ্মীঃ প্রিয়া নারায়ণস্ত চ ॥”

(একবৈবর্তপু° প্রকৃতিখ° ৫১ অ°)

মহালক্ষ্মীপুর, প্রাচীন নগরভেদ। (বৃ° নীল° ২৬)

মহালয়, পুরাণবর্ণিত রৌদ্রতীর্থভেদ। এখানে দেবাদিদেব  
মহাদেবের উদ্দেশে স্নান ও পূজাদি করিলে সর্ব পাপ মোচন  
হয়। স্বন্দপুরাণান্তর্গত মহালয়-মাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃতবিবরণ  
প্রদত্ত হইয়াছে।

মহালয় (পুং) মহতাং জৈনানামালয়ঃ, মহান্ আলয় ইতি বা।

১ বিহার। মহতাং বৌদ্ধ-প্রভৃতীনাং আলয়ঃ। ২ তীর্থ। মহা-  
দীনাং লগ্নো যস্মিন্। ৩ পরমায়া। (মেদিনী) ৪ সৌর

মাখিনের কৃষ্ণপক্ষ, সৌর আখিনের কৃষ্ণপক্ষের নাম মহালয়।

“যেয় দীপাষিতা রাজন্ খ্যাতা পঞ্চদশী ভূবি।

তত্যাং দত্তান চেন্দ্রতং পিতৃণাং বৈ মহালয়ে ॥

মহালয়ে কল্পাগতাপরপক্ষে ॥” (তিথিতত্ত্ব)

২ বৃহদালয়, বড় বাটী।

মহালয়া (স্ত্রী) মহালয় স্ত্রিয়াং টাপ্। আখিন মাসের অমাবস্তা। এই অমাবস্তার দিন পিতৃগণের উদ্দেশে পাক্ষণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়, কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে বেতপর্ণ আরম্ভ হয়, এই মহালয়ার দিন তাহা শেষ হয়। মহালয়া অমাবস্তাকে চলিত ‘কলাকাটা’ অমাবস্তা কহে।

মহালস (পুং) অতিশয় অলস। স্ত্রিয়াং টাপ্। মহালসা—প্রসিদ্ধ টীকাকার নারায়ণের মাতা।

মহালিকটভী (স্ত্রী) মহান্তঃ অলয়ঃ তেষাং কটভী আশ্রয়ী-ভূতবৃক্ষঃ। যেতকিণিহী বৃক্ষ। (রাজনিং)

মহালিঙ্গ (পুং) মহান্ পূজ্যতমো বিপুলো বা লিঙ্গোহস্ত। ১ শিব। “অকরোং স মহাহৈম্যমহালিঙ্গৈর্মহাবৃষঃ।

মহাজিগুৈলমহীতীং মহামাহেযরো মহীম্ ॥” (রাজতং ২।১৩৭)  
২ হিমালয়স্থিত শিবলিঙ্গভেদ।

(ত্রি) ৩ বহুলিঙ্গবৃক্ষ। (হিমালয়-সং)

মহালিঙ্গ যোগিন্, লিঙ্গলীলা-বিলাস চরিত্র-রচয়িতা।

মহালিঙ্গশাস্ত্রিন্, উপাদিক্রপাবলী-প্রণেতা।

মহালীঙ্গসরস্বতী (স্ত্রী) লীলয়া সরস্বতী, মহতী লীলসর-স্বতী কাম্বধাং। তত্ত্বোক্ত তায়ো দেবীভেদ।

“লীলয়া বাক্ প্রদা চেতি তেন লীলসরস্বতী।

তারাস্তরহিতা ত্র্যাণী মহালীলসরস্বতী ॥” (তত্ত্বসার)

মহালুগি, জনৈক বিখ্যাত জ্যোতিষিৎ। নারায়ণকৃত-মার্ত্তণ্ড-শ্লোক-গ্রন্থে নামোল্লেখ আছে।

মহালোধ (পুং) মহান্ লোধঃ। লোধবিশেষ, চলিত পাটয়া লোধ। (রত্নমালা)

মহালোভ (পুং) মহান্ লোভো যন্ত। ১ কাক। (রাজনিং)  
(ত্রি) ২ অতিশয় লোভী।

মহালোমন্ (পুং) ১ শিব। (ত্রি) ২ বৃহদ্রোমযুক্ত, মহারোম।

মহালোল (পুং) মহদতিশয়ঃ লোলঃ লোল্যমন্ত। ১ কাক।  
(ত্রি) ২ অতি চঞ্চল।

মহালোহ (স্ত্রী) মহদতিশয়গুণবৎ লোহঃ। ১ অরক্ষান্ত, চূষক পাথর। (রাজনিং)

মহাবংশ (পুং) - প্রসিদ্ধ বংশ। ২ পালিভাষার লিখিত প্রসিদ্ধ সিংহলীর রাজত্ববংশ। এই গ্রন্থে ৫৪০ খৃষ্টাব্দ পূর্বাব্দ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থ বিভিন্ন গ্রন্থকার-রচিত। প্রথমংশ মহানাম রচনা করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সিংহলে বৌদ্ধপ্রাধান্যবিস্তারের এবং ধাতুসেন বুদ্ধদাস প্রভৃতি রাজত্বগণের আত্মরালয়-স্থাপনাদি ও রাজনৈতিক উন্নতির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহাবংশাবলী, দ্রবানন্দমিশ্রবিরচিত বঙ্গের বঙ্গালী কোলী-ন্যের একখানি সামাজিক ইতিবৃত্ত।

মহাবংশ্য (ত্রি) মহৎশোংপন্ন, মহাবংশসমুদ্ভব।

মহাবকাশ (পুং) অতিশয় অবকাশ।

মহাবাক্ত (ত্রি) ১ বৃহৎ মুখবিশিষ্ট। (পুং) ২ দানবভেদ।

মহাবক্ষস্ (পুং) মহৎ বক্ষঃ বিরাড়্-দেহো যন্ত। ১ মহাদেব।  
(ভারত ১৩।১৭।৮৬)

(ত্রি) ২ বৃহৎ বক্ষোযুক্ত।

মহাবজ্রকতৈল (স্ত্রী) তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—যেতমর্ষপ, করঞ্জ, পুতিকরঞ্জ, হিরদ্রা, দারহিরদ্রা, রসাজন, কুটজ, চক্রমর্দ, সপ্তপর্ণা, মৃগাদনী, (রাখালশা) লাক্ষা, সজ্জরস, অর্ক, অপরাধিতা, আরগুব, মূহী, শিরীষ, তুবর, অরুণ্ড, বচ, কুষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষণী, চিত্রক, মালতী, কটুতুষা, গন্ধালী, মূলক, সৈন্ধব, করবীর, গৃহধূম, বিষ, কম্পিল, সিন্দূর, তুথ ও গজাপর্ণনা এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র দ্বিগুণ গোমূত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। তৎসংযোগে চতুর্গুণ করঞ্জতৈল বা মর্ষপতৈল পাক করিবে। হহাকে মহাবজ্রকতৈল কহে। এই তৈল অগ্নি মদন কারলে সকল প্রকার কুষ্ঠ, গণ্ডমালা, ভগন্দর, ও নাড়ীত্রণ আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত কৃষ্ণাচিকিৎসা)

মহাবাণিজ্ (পুং) মহতা বাণিক্। শ্রেষ্ঠ বাণিক্।

মহাবদ (পুং) ব্রহ্মবাদী। “তদাহমহাবদাঃ” (ঐতংব্রা° ৫।৩৩) ‘মহাবদাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ মহান্তং প্রৌঢ়ং বেদং বদন্তি স্মৃতিস্তেষাং প্রশংসাথাঃ’ (সায়ণ)

মহাবধ (পুং) বজ্র। (অঙ্ক ৫।৩৪।২)

মহাবন (স্ত্রী) মহৎ বিপুলং বনং। বৃহদ্বন, পথ্যায়—অরণ্যানী, মহারণ্য, মহাটবী। (রাজানং)

মহাবন, ১ মথুরাজেলার অন্তর্গত মহাবন-তহসীলের একটি প্রাচীন নগর ও তীর্থক্ষেত্র। মথুরানগরের ৩ কোশ দক্ষিণে যমুনার অপর পারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৫' ৩৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪৭' ৩০" পূঃ।

বহু প্রাচীন কাল হইতে এই বনভূমি ব্রীহদ্রক্ষের লীলাক্ষেত্র বলিয়া পুঙ্খিত হইয়া আসিতেছে। সুপ্রাচীন জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দু-ধর্মসম্প্রদায়ের পুরা-

কীর্তির নিদর্শন ইত্যন্তঃ বিকির্ণ থাকিয়া তত্তৎ সাম্প্রদায়িক প্রভাবের অস্তিত্ব স্থচনা করিতেছে। [মথুরা দেখ।]

কোন সমসাময়িক ইতিবৃত্ত-লেখকের বৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে, ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে কালিঙ্গর-বিজয়ার্থ দিল্লীর সুলতান শামস উদ্দানের প্রেরিত সেনাদল মহাবনে আসিয়া অবস্থান করে। রূপ গোবিন্দীর বৃন্দাবন উদ্ধারকালে ইহা ৮৪ বনের অন্তর্গত বলিয়া কীর্তিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাত্রীরাজ বশোবন্ত রাও হোলকর কক্ষাবাদ-রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া এই স্থানের সন্নিকট দিয়া যমুনা পার হইয়াছিলেন। উহার পূর্ব বৎসরেই প্রসিদ্ধ পাঠান-দস্যু আমীর খাঁ এখান দিয়া যমুনা উত্তরণপূর্বক স্বীয় দস্যুস্বত্তি চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

কালসহকারে এই প্রাচীন স্থান মহারণ্যে পণ্যবসিত হইয়াছিল। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, মোগল-সম্রাট শাহজাহান এই বনভূমি শিকারে আসিয়া ৪টা ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গোকুলনগরী হার উপকণ্ঠে অবস্থিত। মহাবন ধ্বংস ও গ্রীহীন হইলে লোক সকল অন্ধকোশ সরিয়া আসিয়া যমুনাতীরস্থ গোকুলে পুনরায় নূতন বাসস্থান নির্মাণ করে। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ক্ষেত্র গোকুলেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এখনও তথাকার লোকে মহাবনের ধ্বংসাবশেষকেই কৃষ্ণলীলার অঙ্গি স্থান বলিয়া নির্দেশ করে। সম্ভবতঃ পূর্বে ঐ সমগ্র স্থানই গোকুল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ক্রমে বর্তমান জনসমাকীর্ণ নদীতটবর্তী উপকণ্ঠই গোকুল নামে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই মহাবনের মধ্যে নন্দালয়ই সাধারণের দেখিবার জিনিস। সম্রাট অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুসলমানগণ সেই প্রাচীন নন্দ-প্রাসাদের চতুর্দিক প্রাচীর-পারবেষ্টিত করিয়া তথায় এক মসজিদ নির্মাণ করেন। এখনও হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্তির বহুশত নিদর্শন ঐ মসজিদগাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ স্থান আশী-খাখা নামে পরিচিত। ৮০টা স্তম্ভের মধ্যে সত্যযুগ, দ্বাপরযুগ, ত্রেতাযুগ, ও কলিযুগ নামক স্তম্ভগাত্রে কাণ-বৈচিত্র্যজ্ঞাপক চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্বিন্ন অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য স্তম্ভেও বহুতর হিন্দুচিত্র খোদিত আছে। কাদার টিফেন্থালর ১৮শ শতাব্দির মধ্যভাগে মহাবন পরিদর্শনে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐ স্তম্ভস্থ অট্টালিকার একাংশ হিন্দুর মন্দির ও অপরাংশ মুসলমানদিগের মসজিদ-রূপে ব্যবহৃত হইত।

পুর্বেই বলিয়াছি, নদীতীরবর্তী গোকুলগ্রাম মহাবন-ধ্বংসের পর গঠিত হইয়াছে। এখানে অতি অল্পই প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন দেখা যায়। অধিকাংশ অট্টালিকা ও মন্দি-

রাদি বাহা শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলরূপে বর্ণিত হইয়া তীর্থমাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে, তাহাও নিত্যন্ত আধুনিক কালের কল্পনা বলিয়া অস্বীকৃত হয়। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে এখানে বলভাচার্য্য নামে একজন জ্ঞানী বৈষ্ণবের আবির্ভাব হয়। তিনি স্বনামে বলভাচার্য্য মত স্থাপন করেন। এই স্থানে বলভাচার্য্য মথুরার বা গোকুলস্থ গৌসাইদিগের প্রধান আড্ডা বলিয়া ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গুজরাত বা বোম্বাইবাসী যাবতীয় হিন্দু বণিক এই সম্প্রদায়ের শিষ্য। সুতরাং তাহাদের দ্বারা নবপ্রতিষ্ঠিত গোকুল নগরীর শোভাবৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? একুশতাব্দে বলভাচার্য্যের অভ্যুদয় হইতে গোকুলনগরের সমৃদ্ধির কল্পনা করা যায়।

[গোকুল ও বলভাচার্য্য দেখ।]

মহাবন, হাজারা জেলার পেশবার সীমান্তবর্তী বাগিনান নামক প্রদেশের অন্তর্গত একটা পর্বত। ইলাম-শৈলশৃঙ্গের পূর্বে ও সিদ্ধনদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪০০ ফিট উচ্চ। ইহার দক্ষিণভাগ গভীর জঙ্গলে আবৃত বাগরা এই পর্বতের মহাবন নাম হইয়াছে।

এই গিরিশৃঙ্গ বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। কিন্তু এখানে হুজুর আফগান জাতির বাস থাকায় কেহই এই শিখরভূমি নিরাপদ মনে করেন না।

মহাবন্ধ (ক্ৰী) যোগপ্রক্রিয়ায় হস্তপদাদির বন্ধনীবিশেষ।

মহাবপ (পুং) মহামেধ। (শব্দচং)

মহাবর, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটা গিরিশ্রেণী। ইহা পূর্বপশ্চিমে প্রায় ১৪ মাইল। পর্বত-গাত্র দূরারোহ, কিন্তু উপরের অধিত্যকাত্মি প্রায় ১ মাইল প্রশস্ত। শত্রুঈর্দী এই পর্বতের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে কোকলহাট নামে একটা ৯০ ফিট উচ্চ জলপ্রপাত আছে। ঐ প্রপাতের সম্মুখে প্রতি বৎসর একটা মেলা বসে।

মহাবরা (ক্ৰী) ত্রিযুগে হসৌ দেবাদিভিরিতি বৃ-অচ্, টাপ্, মহতী বরা। দূর্গা। (শব্দরত্নাং)

মহাবরাহ (পুং) মহান্ ঈশ্বরোহপি সন্ বরাহঃ, মহাশ্যাসৌ বরাহশ্চেতি বা। বরাহরূপী ভগবান্।

“মহাবরাহো গোবিন্দঃ সূদেনঃ কনকাজদী।” (ভারত ১৩।১৭।১৯)

২ শুরপুরের এক রাজা।

“অন্ত শুরপুং নাম যথার্থং নগরং ভূবি।

মহাবরাহ ইত্যাদীং রাজা তজ্জাতি হৃদয়ঃ॥” (কথাসূরিং ৫২।২২)

মহাবরোহ (পুং) মহান্ অমরোহঃ শিকানাং অথোৎপত্তরণঃ যন্ত। প্রবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। (রাজনিং)

মহাবল, জনৈক জৈনরাজ।

মহাবল, গির্গর প্রদেশের অন্তর্গত একটি গিরিকন্দর। গির্গর দুর্গের ৮ কোশ দূরে অবস্থিত। শুজুরাধিপ সুলতান মাক্দুদ বিগড়া জুনাগড় ও গির্গর দুর্গ-জয়ান্তিলাবে সটেন্ত্রে এখানে আসিলে তথাকার হিন্দু নরপতি রাও মণ্ডলিক উপায়ান্তর না দেখিয়া খ্রীষ দলবল সমভিব্যাহারে মহাবল পর্বতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করেন। এখানে যুবরাজ তোগলক খাঁ তাঁহাকে সদলে পরাভূত করেন। ইহার চারিদিকে উচ্চ শিখর, বেন স্বভাবতঃ দৃঢ় দুর্গরূপে গঠিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য নিত্য মন্দ নহে। স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ।

মহাবল্লী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ বলী চেতি। মাধবী লতা। (শব্দচ.) ২ উত্তমালতা।

“উপায়রসংসিন্তা দেশকালোপবৃংহিতা।

সেয়ং নাতিমহাবল্লী কিং নাম ন ফলেং ফলম্ ॥”

(কথাসরিংসাগর ৩৩৮৫)

মহাবস (পুং) মহতী বসা বপান্ত। ভ্রষঃ। শিশুমার। (হেম)

মহাবস্তু (ত্রি) ১ প্রভূতধনশালী। (পুং) ২ ইন্দ্রাবরুণ।

(ঋকৃ ৭।৮২।২)

মহাবাক্য (স্ত্রী) মহদ্বাক্যং। যোগ্যতাকাক্ষাসক্তিসুত্ব বাক্যসমূহ (মাহিত্যদর্পণ) নৈমারিকদিগের মতে স্বঘটকানেক-লভ্য তাদৃশার্থক বাক্য, অথবা প্রকৃত্যর্থমাত্রাবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ার্থ-বোধ বা প্রত্যয়যোগ্য বাক্যই মহাবাক্য। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা) মহং মহদর্থপ্রকাশকং বাক্যং। ২ তবমসি, অহং ব্রহ্মসি প্রভৃতি বাক্য। ৩ প্রতিষ্ঠা ও দানাদিকার্যে উৎসর্গ বাক্য, সঙ্কল্পবাক্য।

মহাবাত (পুং) অতিশয় বায়ু, প্রবল ঝড়।

মহাবাতব্যাদি (পুং) রোগভেদ।

মহাবাৎসপ্র (স্ত্রী) সামভেদ।

মহাবাদিন্ (পুং) বিরুদ্ধবাদী।

মহাবামদেব্য (স্ত্রী) সামভেদ। শাস্তিকর্মে এই সাম পঠিত হইয়া থাকে।

মহাবায়ু (পুং) ১ প্রবল ঝটিকা। ২ বায়ুভূত।

মহাবারুণী (স্ত্রী) বরুণো দেবতাহস্তা বরুণ-অণু ভীপ্, মহতী বারুণী। গঙ্গানানের যোগবিশেষ। গৌণচাত্র চৈত্রমাসের কৃষ্ণায়ায়দলীর দিন বারুণী যোগ হয়। এই দিনে শনিবার ও শতভিষা নক্ষত্র হইলে মহাবারুণী হয়। কোটি সূর্য্যগ্রহণে গঙ্গানানে যে ফল হয়, মহাবারুণীতে গঙ্গানান করিলে তদুপাই ফল হইয়া থাকে।

“বারুণেন সমাবৃত্তা মধৌ কৃষ্ণা জয়োদলী।

গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা ॥

শনিবারসমাবৃত্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।

গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ ॥” (তিষ্মিতক)

এই দিন স্নান দান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যমাত্রই অনন্ত-ফলদায়ক।

মহাবার্ত্তাকিনী (স্ত্রী) মহাবার্ত্তাকু বৃক্ষ, বনবেগুণ। (বৈদ্যকনি.)

মহাবার্ত্তিক (স্ত্রী) কাত্যায়নকৃত পাণিনি-স্বত্রের ব্যক্তিক।

মহাবার্ষিক্য (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ।

মহাবালভিদ (ত্রি) স্তোত্রভেদ। (আশ্বঃগৃ. ৭।২।১৬)

মহাবাহন (স্ত্রী) অত্যাধিক সংখ্যাবিশেষ।

মহাবালু, সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য. ৩৩।৫)

মহাবিক্রম (ত্রি) মহান বিক্রমো যন্ত। ১ প্রবল পরাক্রমশালী।

(পুং) ২ সিংহ। ৩ নাগভেদ।

মহাবিক্রমিন্ (পুং) ১ বোধিসত্ত্বভেদ। (ত্রি) ২ মহা-বিক্রম যুক্ত।

মহাবিন্ন (পুং) প্রবল বিঘ্ন, প্রবল বাধা।

মহাবিন্দ্ৰ (ত্রি) মহান্ বিজ্ঞঃ। অতিশয় জ্ঞানী।

মহাবিদেহ (স্ত্রী) ১ পুণ্যক্ষেত্রভেদ। দ্বিত্যং টাপ্। মহা-বিদেহা। ২ যোগশাস্ত্রোক্ত মনের বহির্বৃত্তিবিশেষ।

মহাবিদ্যা (স্ত্রী) বিদ্যাতে জায়তে ইতি বিদ্য-ক্র্যপ্ টাপ্, মহতী বিদ্যাভ্যাসং তত্ত্বদাক্ষ্যংকারো বা যন্তাঃ। দেবী-বিশেষ, এই মহাবিদ্যার সংখ্যা দশ। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলাগ্নিকা এই দশজন মহাবিদ্যা, এবং ইহাদিগকে সিদ্ধ-বিদ্যাও কহে। এই মহাবিদ্যার মন্ত্রদানে নক্ষত্রবিচার, কালাদি-শোধন, মন্ত্রের শত্রু ও মিত্র প্রভৃতি দোষ কিছুই নাই। ইহা-দের মন্ত্রমাত্রও দেওয়া যাইতে পারে।

“কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধুমাবতী তথা ॥

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাগ্নিকা।

এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

নাত্র সিদ্ধান্তপেক্ষান্তি ন নক্ষত্রবিচারণা।

কালাদিশোধনং নাতি ন চার্মমাত্রাদিবৃণম্ ॥

সিদ্ধবিদ্যাতয়া নাত্র যুগসেবা পরিশ্রমঃ।

নাতি কিঞ্চিন্নহাদেব হুঃখসাধ্যং কথঞ্চন ॥” (চামুণ্ডাতন্ত্র)

তন্ত্রসারে লিখিত আছে—কালী, নীলা, মহাহুগা, ত্রিভা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যা, বাসলী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী এই সকল দেবীও মহাবিদ্যা।

“অথ বক্ষ্যাম্যহং বা বা মহাবিদ্যা মহীতলে।

দোষজালৈরসংস্পৃষ্টা স্তাঃ সর্বা হি ফলৈঃ সহ ॥

কালী নীলা মহার্ঘ্য ত্রিতা ছিন্নমস্তকা ।  
বাগবাদিনী চান্দ্রপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ ॥  
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী ।  
ইত্যাত্মাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥  
সিদ্ধমন্ত্রতরা নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ ।

অথ চৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন বাধিতাঃ ॥” (তন্ত্রসার)  
[ বিশেষ বিবরণ তত্ত্ব শব্দে ও দশমহাবিদ্যা শব্দে দ্রষ্টব্য ]

মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে—এই মহাবিদ্যা সকলেই  
দশাবতার হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কালী কৃষ্ণরূপে,  
তারিণী রামরূপে, কালী কৃষ্ণ, ধূমাবতী মীন, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ,  
ভৈরবী বরাহ, হুন্দরী জামদগ্ন্য, ভুবনেশ্বরী বামন, কমলা  
বৌদ্ধ ও হর্গা কঙ্কিরূপে অবতীর্ণা হন।\* ২ গঙ্গা।

(কাশীখণ্ড ২৯।১৩৯)

মহাবিদ্যাংপ্রভ (পুং) নাগভেদ ।

মহাবিদ্যেশ্বরী (স্ত্রী) হর্গামূর্তিভেদ ।

মহাবিনায়ক, উড়িষ্যার কটক জেলার অন্তর্গত বারুণীবস্ত  
শৈলের একটি শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গ দেবতার ভায় পবিত্র ও পূণ্য-  
তীর্থ বলিয়া গণ্য। কটক নগর হইতে এই শৈলশোভা  
সাধারণের নয়নগোচর হয়।

মহাবিপুল (স্ত্রী) আখ্যাচ্ছন্দোভেদ ।

মহাবিভূত (ত্রি) উচ্চ সংখ্যা বিশেষ ।

মহাবিভূতি (ত্রি) ১ মহৈশ্বর্যযুক্ত । (পুং) ২ বিষ্ণু ।

মহাবিরাজ (পুং) বিশেষণ রাজ্যতে প্রকাশতে ইতি বিরাজ্  
কিপ্ মহাংশাদৌ বিরাজেতি । মহাবিষ্ণু ।

(ব্রহ্মবৈবর্তপুং প্রকৃতিখণ্ড ৫১ অ০)

মহাবিল (স্ত্রী) মহচ্চ তৎ বিলঙ্ঘেতি । ১ আকাশ । ২ বৃহ-  
চ্ছিত্র । ৩ অন্তঃকরণ । (বৈষ্ণবকনিঃ)

মহাবিবাহ (পুং) অত্যাচ্ছ সংখ্যাভেদ ।

মহাবিশিষ্ট (ত্রি) অতি প্রসিদ্ধ ।

মহাবিষ (পুং) মহৎ অত্যাৎকটং বিষমন্ত । কালসর্প ।

\* “প্রকৃতিবিষ্ণুরূপা চ পুংরূপা মহেশ্বরঃ ।

এবং প্রকৃতিভেদেন ভেদান্ত প্রকৃতিভেদঃ ॥

কৃষ্ণরূপা কালিকা শ্রীং রামরূপা চ তারিণী ।

কালী শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিঃ শ্রীমদ্বীনা ধূমাবতী ভবেৎ ॥

ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃ শ্রীমদ্বীনাভৈরবী ভবেৎ ॥

হুন্দরী জামদগ্ন্যঃ শ্রীমদ্বীনাভুবনেশ্বরী ।

কমলা বৌদ্ধরূপা স্যাৎ হর্গা স্যাৎ কঙ্কিরূপা ॥

ধরঃ ভগবতী কালী কৃষ্ণা ভগবান্ ধরঃ ।

ধরক ভগবান্ কৃষ্ণঃ কালীরাণো ভবেৎ ব্রজে ॥” (মুণ্ডমালা তন্ত্র)

“মহাবিষঃ কালসর্পো রাজাহির্বিষ্মখোরগঃ ॥” (জটাম্বর)

(ত্রি) ২ মহাবিষবিশিষ্ট । (স্ত্রী) মহদ্ বিষম্ । ৩ মহা-  
বিষ, তন্মামক কন্দবিষ । (অশ্রুত কল্পস্থা ৮ অ০)

মহাবিশুব (স্ত্রী) বিষ্ণুসাম্যমন্ত্যাজেতি বিষ্ণু ‘বপ্রকল্পে-  
হত্বেভ্যোহপি দৃশ্যত ইতি বক্তব্যঃ’ (পা ৫।২।১০৮)  
ইত্যন্ত বার্তিকাতঃ ব প্রত্যয়ঃ মহচ্চ তদ্ বিষুবলঙ্ঘেতি অগ্নিন্  
সময়ে দিব্যারাজ্যোঃ সমভ্যাং তথাৎ ॥ মেঘসংক্রান্তি, সূর্য্য মীন-  
রাশি হইতে যে সময় মেঘরাশিতে সংক্রান্ত হন, সেই সংক্রান্তিকে  
মহাবিশুব সংক্রান্তি কহে। এই সময় দিব্যারাত্র সমান বলিয়া  
ইহার নাম মহাবিশুব। ইহার অপর নাম চৈত্রসংক্রান্তি।  
চৈত্রমাসের যে সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে বৈশাখ মাসে  
যে সময় সূর্য্য সংক্রম হয়, তাহাকেই মহাবিশুবসংক্রান্তি  
কহে। এই সংক্রমণ-দিন অতিশয় পুণ্যাহ বলিয়া গণ্য। এই  
দিনে মন্থর ও নিধপত্র ভোজন করিতে হয়, ইহাতে সর্পভয়  
নিবারিত হইয়া থাকে।

“মহাবিশুবমাখ্যাং কৃতিভিষ্টৈচ্ছিত্তিম্ ॥”

তস্মিন্ মন্থরনিধপত্রভক্ষণং, যথা কৃত্যচিন্ত্যামণে ॥

“মন্থরং নিধপত্রভ্যাং যোহহিতি মেঘগতে রবৌ ॥

অপি রোষান্বিতস্তত্ত্ব তৎকঃ কিং করিষ্যতি ॥” (তিথিতত্ত্ব)

এই দিন শক্তু এবং বারিগুণ খট দান করিতে হয়। যিনি  
এইরূপ দান করেন, তাহার পরমা গতি লাভ হয়। বারিগুণ  
ঘটদানের মন্ত্ৰ—

“এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো একবিষ্ণুশিবায়কঃ ।

অশ্রু প্রদানাতঃ সফলা মম সন্ত মনোরথাঃ ॥

বৈশাখে যো ঘটং পূর্ণং সভোজ্যং বৈ দ্বিজম্মনে ।

দদাতি সুররাজেন্দ্র ! স যাতি পরমাং গতিম্ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

পিতৃ প্রভৃতির উদ্দেশে জলপূর্ণ ঘট এবং ছত্র-পাছুকাদি  
দান মহাপুণ্যজনক। যিনি এই সংক্রান্তির দিন কথিত প্রকার  
দান করেন, তিনি সকল পাতক হইতে মুক্ত হন।

“যো দদাতি হি মেঘাদৌ শক্তুনুঘটাবিতান্ ।

পিতৃভূদ্ভিঃ বিপ্রোভ্য সন্ধপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥”

তত্র ছত্রপাছুকাদিনাং—

“বিপ্রোভ্যঃ পাছুকাচ্ছত্রং পিতৃভ্যো বিষুবৈ শুভম্ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

মহাবিশুবচক্র (স্ত্রী) মহাবিশুবস্ত চক্রম্ । নক্ষত্রঘটিন  
নরাকারচক্র । একটি মনুষ্যদেহ অঙ্কিত করিয়া তাহার মস্তকে  
৭টা নক্ষত্র, মুখে তিন, হৃদয়ে ৫ এবং দুই হস্ত ও দুই পদে  
তিনটি করিয়া ১২টি নক্ষত্র বিভাজ্য করিতে হইবে, তাহা হইলে  
এই চক্র হয়। নক্ষত্র সকল ১, ২ ইত্যাদিরূপ যথাক্রমে  
বিভাজ্য করিতে হয়। পরে এই নয়ের কোন্ অঙ্গে কোন্

নক্ষত্র পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া ফল নির্ণয় করিতে হইবে।  
ফল বধা—মন্তকে রাজহুং, মুখে পটুতা, হৃদয়ে ধনাধ্যক্ষতা,  
দক্ষিণ করে অর্ধলাভ, বামকরে মহাহুং, দক্ষিণপাদে  
হুং এবং বামপাদে ভ্রমণ। এইরূপে খীর ২ নক্ষত্র দ্বারা ফল  
জানিা যাইবে। যে কোন নক্ষত্রের এই চক্রাঙ্কসারে ফল  
জানিতে হইলে, প্রথমে সেই নক্ষত্র এই পুরুষের কোণার  
পড়িয়াছে, প্রথমে তাহা স্থির করিয়া পরে তাহার সেই  
অক্ষের হুংখুংখাদি বেক্রপ ফল লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বাৰাই  
ফল নির্ণয় হইবে।

“মুর্দ্ধি সপ্ত মুখে ত্রীণি হৃদয়ে পঞ্চ বিস্তসেৎ।

ত্রিতমং হস্তপাদে দুঃ মহাবিশুবতক্রমাৎ ॥

মন্তকে ভূপতেঃ সৌখ্যং বদনে পটুতা স্বভেৎ।

হৃদয়ে চ ধনাধ্যক্ষার্থপ্রাপ্তি দক্ষিণে করে ॥

বামে করে মহদুঃখং সুখং পাদে চ দক্ষিণে।

ভ্রমণং বামপাদে চ কথিতং বিষুবৎ ফলম্ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

মহাবিন্দুযুত, যুতোবধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—যুত ২ সের।  
কদ্বার্ব সিজের আটা ২ পল, কমলাঙড়ি ১ পল, সৈন্ধব  
৪ তোলা, তেউড়ী ১ পল, আমলকীর রস ১০ সের। জল  
৪ সের। যথানিয়মে মুহু অগ্নিতে পাক করিয়া এই ঔষধ  
প্রস্তুত করিবে। গ্ৰীহা, গুল্ম প্রভৃতি উদর রোগে ইহা বিশেষ  
উপকারী। পুষ্কোক্ত রোগদ্বয়ে ২ তোলা মাত্রায় সেবনীয়।  
সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রোগের অবস্থানুসারে এই ঔষধ প্রয়োগ  
করিতে পারেন।

মহাবিশু (পুং) মহাশ্চাসৌ বিশুঃ সর্বব্যাপকশ্চেতি। মহা-  
বিরাহি। (ভাগবতামৃতকণিকা)

মহাবিহার (পুং) সিংহলদ্বীপের অমুরাধাপুরস্থ বৌদ্ধসভা-  
রামভেদ। এখানে বোধিবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত।

মহাবীচি (পুং) ন বিন্যতে বীচিঃ সুখং যত্র, মহান্ বীচিরত্র।  
নরকবিশেষ।

“নরকং কালহুত্রঞ্চ মহানরকমেব চ।

সঞ্জীবনং মহাবীচিং তপনং সংপ্রতাপনম্ ॥”

(মহু ৪৮৭) [নরক দেখ।]

মহাবীজ্য (ক্লী) বীজায় সাধু ইতি যৎ, মহৎ বীজ্যং। বিটপ,  
ইহা মুক ও বজ্রগণের মধ্য। (হেম)

মহাবীত (পুং) পুরুষবীপস্থ পর্বতভেদ। (লিঙ্গপুং ৫৩২৬)

মহাবীর (পুং) বীন্ পক্ষিণ ঈরয়তীতি ঈর-ক, ততো  
মহাশ্চাসৌ বীরশ্চেতি কর্মধাৎ। ১ গরুড়। বীরয়তীতি বীর-  
ক, মহান্ বীর ইতি কর্মধাৎ। ২ হর। ৩ সিংহ। ৪ মথানল।  
ইনি একজন মহাপুরুষ।

“অগ্নীশ্রেয়স্জিহ্মবাক্যবাহমহাবীরহিরণ্যশ্বেতো-  
যুতপৃষ্ঠসবনমেধাভিধিবীতিহোত্রকবর ইতি ॥”

(ভাগবত ৫।১২৫)

৫ বজ্র। ৬ শ্বেত তুরঙ্গ। ৭ সকান পক্ষী।

মহাবীর (পুং) একজন জিন। জিনগণের মধ্যে ইনিই  
শ্রেষ্ঠ। রাজা সিদ্ধার্থের ঔরসে ত্রিশলার গর্ভে ইহার জন্ম  
হয়। অরিস্টেনেসিপুত্রাণের অন্তর্গত জৈনহরিবংশে লিখিত  
আছে,—সিদ্ধার্থ নামে একজন প্রবলপরাক্রম প্রজাপ্রিয়  
রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ত্রিশলা। ত্রিশলা রূপে  
শ্রুণে সর্কাসশেই প্রবীণা ও গভির অতিশয় প্রণয়পাজী।  
তিনি স্বদক্ষিত পুণ্যবলেই বোধ হয়, মহাবীরের জ্ঞান পুত্র  
প্রসব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ত্রিশলা এক দিন নিমিত্তা,  
এই নিমিত্তবাহার তিনি ষোলটি শুভ স্বপ্ন সন্দর্শন করিলেন।  
এই শুভ স্বপ্নের ফলে তাঁহার গর্ভ হইল। ধরাবাসীর হুংখ  
ঘুচাইবার জন্য মহাবীর সেই গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন।

ত্রিশলার গর্ভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গর্ভের  
প্রভাবিধে তাঁহার সর্কাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আষাঢ়ের  
শুক্রা যজীর দিন মহাবীর গর্ভে অবতরণ করেন। ক্রমে নবম  
মাস অতীত হইয়া আট দিনের ‘দন গর্ভ হইতে তিনি ভূমিষ্ঠ  
হইলেন। মহাবীরের জন্ম হইবারাত্র চারিদিকে ঋতু-  
ঘটাদি বিবিধ বায়ু ধ্বনি হইয়া উঠিল। স্তম্ভরী সহ পুর-  
ন্দরাদি দেবেজগণ সানন্দে জিনেন্দ্রের জন্মভূমি কুণ্ডপুরে উপ-  
নীত হইলেন।

অতঃপর ইন্দ্র জিনেন্দ্রকে ঐরাবতোপরি আরোহণ করা-  
ইয়া বিবিধ সৌন্দর্য্যামণ্ডিত মন্দরচলে লইয়া গেলেন, এই  
খানে আনিয়া তাঁহাকে রমণীয় পাণ্ডুকাবনে প্রসিদ্ধ পাণ্ডুকা-  
শিলাস্থিত সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া দেবগণানীত স্বর্ণ-  
কুণ্ডল ক্ষীরসাগরজলে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সমাহিত  
করিলেন। অভিষেকান্তে দেবগণ কর্তৃক বস্ত্র, অলঙ্কার ও  
মালা চন্দনে জিনেন্দ্রের সর্কাস অলঙ্কৃত হইল। অনন্তর  
বিবিধ স্তুতি নাট দ্বারা তাঁহার পূজা সাধনপূর্বক তাঁহাকে  
তাঁহার মাতার কোলে রাখিয়া আনিয়া স্বয়ং স্বপুত্র প্রস্থান  
করিলেন। পিতা মাতা পুত্র পাইয়া আমনিত হইলেন  
এবং অধিজনকে অর্থ দ্বারা তুষ্ট করিলেন। ইন্দ্র জিনেন্দ্রকে  
বর্দ্ধমান নামে স্তব করিয়াছিলেন, তাই কৈশোরে তাঁহার  
বর্দ্ধমান নামও প্রচলিত হইয়াছিল। তিনি দিন দিন বৈদ্য  
বাড়িতে লাগিলেন, পিতৃবন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের  
অমুরাগও তাঁহার প্রতি ওদম্বরূপ উপচিত হইতে লাগিল।  
সুর, অসুর, নর, রাজা, মহারাজ, ধনী, দরিদ্র সকলেই

সমান বয়ে সমান অক্লান্তে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমে জিনেন্দ্র বীর ত্রিশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। তিনি রাজার পুত্র, ভোগের সামগ্রী তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সে সকল ভোগে তাঁহার পবিত্র চিত্ত আদৌ লিপ্ত হইল না। তিনি শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও শান্ত চিত্তে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই পবিত্রতার এক সময় বয়ঃ বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার করিয়া দিলেন। জিনেন্দ্র বীরের জ্ঞানোদয় হইল। সূর, অসূর ও নরী সকলেরই তিনি প্রণামার্থ, পূজা ও ধ্যেয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সংসারের লুপ্ত শক্তি আর তাঁহার নিকট ভাল লাগিল না। তিনি অবিলম্বেই বনবাসী হইতে মনস্থ করিলেন। আশা পূর্ণ হইল। দেবগণ-বাহিত শিবিকারোহণে অগ্রহারণের কৃষ্ণ-পক্ষীর দশমীর দিন তিনি বনে আসিলেন। এইখানে আসিয়া তাঁহার শরীরশোভক বসন ভূষণ প্রভৃতি এক এক করিয়া তিনি সমস্তই অঙ্গ হইতে খুলিয়া ফেলিলেন। কমনীর কেশ-কণাপও কাটিয়া ফেলিলেন।

জিনেন্দ্র ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত তপস্তা করিলেন। এই দ্বাদশ বর্ষ তপস্তার পর তিনি সন্ধ্যা গুণবান হইয়া দেশ-পথাটে প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময় তিনি ঋজুকূলা নদীর তীরস্থিত ভূক্তিকগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে আসিয়া অনশনবোগ অবলম্বনপূর্বক বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমীর দিন তিনি ঘাতিকন্দকে সংহার করিয়া কেবলজ্ঞান লাভ করেন। এই কেবলজ্ঞান-প্রভাবে তৎকালে সুরাসুরগণের আসন টলিল। তাঁহার আসিয়া সকলেই তাঁহার মহিমা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর জিনেন্দ্র মৌনাবলম্বনে থাকিয়া পুনর্বার বটবটী দিবস বিচরণ করিতে করিতে জগদ্বিখ্যাত রাজগৃহপুত্রে আগমন করিলেন। এইখানে আসিয়া তিনি একটি শৈলো-পরিবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শৈলবাসের সংবাদ পাইয়া চারিদিক হইতে সূর অসূর নরাদি বহু ব্যক্তি তাঁহার দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তখন দেবগণকর্তৃক তিনটা রত্ন-ময় প্রাচীর ও এক যোজন বিস্তীর্ণ একটি গৃহ তথায় নির্মিত হইল। এই রত্নখচিত গৃহ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ও ইহার ভিত্তিগুলি স্বটিক দ্বারা গঠিত। জিনেন্দ্র এই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হস্তপ্রেরিত অগ্নি-বায়ু-গ্রন্থ দেবগণ তাঁহার চারিদিকে রহিলেন। জিনেন্দ্রের দর্শনলভার্থ যে সকল ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে পাঁচ শত করিয়া শিষ্য ছিল। এই সমবেত গুরু-শিষ্য-সম্মানারের মধ্যে কাহারও বজ্রাদির সহিত সম্পর্ক ছিল না। ইহারা সে

সকল ত্যাগ করিয়া মাত্র সংসারবলম্বনেই অবস্থান করিতে-হিলেন। তখন শুক্লাবরণপরিধান চটকরাঙ্গ-কড়া কুমারী চন্দনা বহুর আর্ধ্য সাধুগণের অগ্রবর্তিনী হইয়া সেই স্থানে আসিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ চতুরঙ্গ সেনার পরিবৃত্ত হইয়া প্রেণিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সকল জিনদর্শনাধীরা তথায় উপস্থিত হইয়াই সিংহা-সনোগবিষ্ট জিনেন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। তখন সে স্থান এক অপূর্ণ শোভার শোভিত হইল। জিনেন্দ্র-মন্দিরের অমুরে মানস্তুস্ত প ও চারিটা মহাবল বিরাজমান। একটা স্বচ্ছ-তোয়া দীর্ঘিকার সলিলোপরি প্রাকৃষ্টিত কমলকুল ভাসমান এবং স্থানে স্থানে বল্লীবল ও পুঞ্জ পুঞ্জ সিকুঞ্জশ্রেণী বিস্তারিত। কি সুন্দর দৃশ্য! যেন স্বর্গের নন্দন-কানন! সর্বত্রই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; ফুল ফলে লতায় পাতায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন। জিনেন্দ্রের মন্দিরের সম্মুখে বিস্তৃতবেশ বহুসংখ্যক দর্শক পরিচারক। এই সকল সমবেত দর্শক-পরিচারকমণ্ডলী প্রত্যেকই হস্তে ছত্র, চামর, তুঙ্গার, কলস, ধ্বজ, দর্পণ ও ব্যজন লইয়া দণ্ডায়মান এবং অনেকেরই হস্তে বিবিধ চিহ্নযুক্ত আট প্রকার বহুসংখ্যক মহাধ্বজ পত পত রবে উড়ত। মহাসমা-রোহ, বিপুল আনন্দ! পৃথিবীর বহু স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভিজ বহুবিধ নর নারী বিস্তৃতবেশে জিনদর্শনে উপস্থিত।

সকলেই জিনদর্শনে ধ্যস্ত হইল এবং কিছু কাল পরে অনেকেই তাঁহার চারিদিকে উপবেশন করিল। উপবিষ্ট ব্যক্তি-বৃন্দ দ্বাদশভাগে বিভক্ত হইল। তখন গৌতম জিনেন্দ্রের নিকট বিস্তৃত তীর্থার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌতমের প্রশ্নে ভগবান্ শেষ জিন তাঁহার যথাযথ উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অভিজিৎ নক্ষত্রযুক্ত দিনে জিনেন্দ্র শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। তিনি ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য, সূত্র-কৃত্তান্ত, তত্ত্বার্থ, সংস্থান ও সমবাস্তবের ব্যাখ্যা, জাতধর্মকথা, প্রজ্ঞপ্তিহৃদয়, শ্রাবকাদ্যয়ন, প্রশ্নবাকরণ, বিপাকসূত্র ও দৃষ্টিবাদ প্রভৃতির বিস্তৃত অর্থ বিবৃত করিলেন। এতদ্বিত্ত প্রারম্ভিকাদির ব্যবস্থা, অপরোক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের কথা, মার্গগান্ধানভেদ, গুণস্থানবিকর, জীবস্থানপ্রভেদ, দ্বিবিধ কর্ম বন্ধ, সহেতুক সূত্র দুঃখ, মোক্ষ ও মোক্ষের হেতু, ত্রিধা-কৃত বন্ধমোক্ষ ফলভাগ ও অন্যান্য অনেক বিষয় জিন কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইল।

জিনেন্দ্রের মুখে এই সকল অপূর্ণ শাস্ত্রীয় বিষয় শ্রবণ করিয়া জনমণ্ডলীর মোহনিদ্রা তাকিয়া গেল, সকলেই সুপ্রোথিতের ভ্রায় রহিল। তথ্যক, দেব ও মনুষ্যাদি সকলেরই দৃষ্টিমোহ অশনীয় হইল। তৎপরে, উপস্থিত সকলেই শাস্ত্র-



জ্ঞানে কার, ইঞ্জির, গুণস্থান, জীবস্থান, কুল, আয়ু প্রভৃতির ভেদাদি নিরূপণপূর্বক বখাদিবর্জিত ক্রিয়া ও অহিংসাদি মহাব্রত, ইয়াসমিতি, ভাষাসমিতি, এষণাসমিতি, নিক্কেপদান-সমিতি ও প্রতিষ্ঠাননিকা-সমিতি বিষয়ে বিস্তৃতরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পঞ্চবিধ সমিতির তিনটি যে একান্তই গোপনীয়, তাহাও জানিতে পারিল। এতদিন জিনেন্দ্র তৎকালে চিত্তেন্দ্রিয়নিরোধ, আবশ্যকীয় ছয়টি সংক্রিয়া, বাক্য মন ও দেহাদির বিস্তৃত প্রযুক্তি, শৌচ, দান, একতন্ত্র, নয়তা, কুশ্যাব্রত, দস্তমল-অমার্জন, তপস্তা, সংযম, সচ্চরিত্রতা, অমুপ্রেক্ষা, কুমাদি দশলক্ষণাবিত ধর্ম, জ্ঞান, দর্শন ও অস্ত্রাত্ত জপোনিয়মাদির অমুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্ত শ্রমণ-ধর্ম ব্যক্ত করিলেন।

কর্ণনির্দোষের হেতুভূত এই জিনোক্ত ধর্মশ্রবণে তখন সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশজাত এক শত ব্যক্তি সংসারভয়ে সর্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক জিনধর্ম গ্রহণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত এক সহস্র রমণী তখন শুদ্ধ বসন পরিধানপূর্বক আর্থিকাব্রত ধারণ করিলেন। তখন অধিকাংশ নরনারী শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক নিয়ম-ভেদে চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। তথাকার পণ্ড-পক্ষীরাও যেন জিনোক্ত ধর্মশ্রবণে আশ্চর্য্য হইয়া নিয়মাবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিল। দেবগণ মিলিত হইয়া তখন সেই গভীর জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন জিনেন্দ্রের পূজাস্তে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তখন ঘরে ঘরে জিনপূজা প্রবর্তিত হইল। শ্রেণিক জিনেন্দ্রকে স্তুতিনতি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই জিনপুত্রী জৈনধর্মপরায়ণ জনগণের প্রবেশ-নিগমের কল্লোল কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। জিনেন্দ্র শ্রেণিকের দ্বারা সেবিত হইয়া সেই স্থানে ধর্মব্যাখ্যায় নিরত রহিলেন। রাজা গৌতম সেই জিনপুত্রের আসিয়া জিনেন্দ্রের উপদেশে প্রীত হইয়া সর্বদা তদীয় আদেশপালনে প্রস্তুত থাকিলেন। গৌতমের যত্নে জিনেন্দ্রের বাসস্থান রাজগৃহপুর বৃহৎ বৃহৎ জৈনমন্দিরে পরিপূর্ণ হইল। সর্বদাই আমোদ উৎসবের অমুষ্ঠান হইতে লাগিল। মহামন্ত্রী, পুরোহিত, সামন্ত রাজগণ ও অস্ত্রাত্ত প্রজামণ্ডলী-সহযোগে সমস্ত মগধরাজ্য জৈন-মন্দিরে পরিব্যাপ্ত হইল। গ্রাম, নগর, পর্বতাগ্র, নদীতট, বনান্ত, সকল স্থানেই তখন জিনমুণ্ডিত মন্দিরশ্রেণী দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে সেই মিথ্যাজ্ঞানরূপ-হিমরাশিবিনাশী জিনেন্দ্ররূপী প্রভাকর, নিজ প্রভাপটলে তখন মোহাকার-রাশি বিদূরিত করিয়া সমগ্র মগধবাসীকে জৈনধর্মে প্রবৃত্ত করিলেন।

(অরিষ্টনেমিপুং জৈনং হরিবং)

জৈন-ধর্মশাস্ত্রমতে—৫২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে মহাবীর নির্দোষ লাভ করেন, সেই সময় হইতে জৈনদিগের বীরগত্য প্রচলিত।

[ জৈন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ]

মহাবীরচরিত (ক্ৰী) মহাবীর ভবভূতি-প্রণীত গ্রন্থিক স্মারক-চরিতাখ্যান।

মহাবীরচরিত্র (ক্ৰী) জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীরের জীবনী।

মহাবীরবর্দ্ধনজাতপুত্র, বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

মহাবীরা (ক্ৰী) মহাবীর-টাপ্। কীর-কাকোনী।

মহাবীর্ঘ্য (পুং) মহৎ বিশ্বস্ত্যে বিপুলং বীর্ঘ্যমস্ত। ১ ব্রহ্মা। (শব্দরত্নাং) মহাবীর্ঘ্যং তপোবলমস্ত। ২ বৃকভেদ। (ত্রিকাং) ৩ বারাহীকন্দ। (রাজনিং) ৪ বিতথের পুত্রভেদ। (ভাগবতঃ ২।১১)

৫ বিরাজপুত্র। (বিষ্ণুপুং ২।১।৩৯) ৬ বৌদ্ধভিক্ষুভেদ।

৭ জৈন অর্হভেদ। ৮ তামস রৌচ্য মনস্ত্বয়ের ইন্দ্রভেদ। ৯ বৃহ-

দ্রথ বা বৃহদ্রথের পুত্রভেদ। ১০ ভবনমহা-রাজপুত্র। (ত্রি)

১১ অতিশয় বলযুক্ত, অত্যন্ত বীর্ঘ্যশালী। (ভারত ৫।১৭৬।৪৬,

মহাবীর্ঘ্য। (ক্ৰী) মহাবীর্ঘ্য-টাপ্। ১ সংজ্ঞা, ইনি স্বর্ঘ্যপত্নী।

(ত্রিকাং) ২ বনকর্ণাঙ্গী। ৩ মহাশতাবরী। (রাজনিং)

মহাবুদ্ধ, নেপালস্থ বুদ্ধমূর্তিভেদ।

মহাবুদ্ধ (পুং) মহান্ বুদ্ধঃ। ১ স্নুহীবুদ্ধ। চলিত সিদ্ধগাছ।

(হলায়ুধ) ২ সেহুগুবুদ্ধ। ৩ করঞ্জবুদ্ধ। (সুশ্রুত স্তত্র্যং ৩৯অঃ)

৪ তালবুদ্ধ। ৫ মহাপীলুবুদ্ধ। ৬ বৃহদ বুদ্ধ, বড় গাছ।

মহাবুদ্ধ (ত্রি) অতিশয় বুদ্ধ।

মহাবুদ্ধ (ক্ৰী) সংখ্যাভেদ। লক্ষ বৃন্দে এক মহাবুদ্ধ।

মহাবৃষ, ১ সুরম্য পর্বতের নিকটস্থ তীর্থভেদ। (কালিকাপুং ৭৮।৯) ২ জাতিভেদ।

মহাবৃহতী (ক্ৰী) মহতী বৃহতী। বার্তাকী। (হেম)

মহাবেগ (পুং) মহান্ অমোঘো দুর্কারো বা বেগো যস্ত।

১ শিব। মহান্ বেগঃ। ২ অতিশয় জব, অতিশয় বেগ।

৩ গুরুড়পক্ষী। ৪ মর্কট বিশেষ। (ত্রি) ৫ অতিশয় বেগযুক্ত,

প্রবল বেগশালী।

“বিকর্ষন্তো মহাবেগো গর্জমানো পরস্পরম্।

পশু স্বং যুধি বিক্রান্তাবতো চ নররাক্ষসৌ ॥” (ভারত ১।১৫।১২

স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাবেগা—স্কন্দাঙ্কুর মাতৃভেদ।

মহাবেগলক্কাহান, গারুড়দিগের রাজভেদ।

মহাবেগবতী (ক্ৰী) মহাবেগ অন্ত্যর্থ মতুপ্ মস্ত ব, স্ত্রিয়াং ভীষ্। ১ অতিবেগবিশিষ্ট। ২ বৃক্ষবিশেষ।

মহাবেদী (ক্ৰী) শ্রেষ্ঠ বেদী। পীঠরূপ উচ্চস্থান।

মহাবেধ (পুং) বোগপ্রক্রিয়াক্ত হস্তপাদির সংস্থানভেদ।

মহাবেল (ত্রি) ১ মহাতরঙ্গ বা শ্রোতযুক্ত। ২ বিস্তৃত তীরযুক্ত।

মহাবৈপুল্য (ক্লী) অতিশয় বিপুলতা।  
 মহাবৈর (ক্লী) চিরশত্রু। ঘোরশত্রু।  
 মহাবৈরাজি (ক্লী) সামভেদ।  
 মহাবৈশ্বদেব (ক্লী) গ্রহভেদ। (শুক্রবঙ্ক ১৮২০)  
 মহাবৈশ্বানরভ্রত (ক্লী) সামভেদ।  
 মহাবৈশ্বামিত্র (ক্লী) সামভেদ।  
 মহাবৈষ্ণবভ্রত (ক্লী) সামভেদ।  
 মহাব্যাধি (পুং) মহাঃশাস্ত্রো ব্যাধিঃশেতি। মহারোগ কুষ্ঠাদি।  
 “সর্বব্যাপির্নির্মুক্তো মহাব্যাধির্কিংশেষতঃ।  
 পঠনাং সংপ্রগ্ধেভু জীবন্তো ভবেন্নরঃ ॥”  
 (ব্রহ্মসামল গায়ত্রীকবচ) [মহারোগ দেখ।]  
 মহাব্যাহতি (ক্লী) মহতা চাসৌ ব্যাহতিশেতি। প্রশব ও  
 শাহাযুক্ত ব্যাহতিভ্রত। হোম করিতে হইলে মহাব্যাহতি হোম  
 করিতে হয়। “ঐ ভূঃ স্বাহা, ঐ ভূবঃ স্বাহা, ঐ পঃ স্বাহা”  
 (ভবদেবভট্ট) এই ব্যাহতিভ্রতকে মহাব্যাহতি কহে। বৈদিক  
 হোম করিতে হইলে এই মহাব্যাহতি হোম করিতেই  
 হইবে। কেবল তান্ত্রিক হোমে মহাব্যাহতি হোম নাই।  
 “ঐকারপুষ্কিকান্তিস্রঃ মহাব্যাহতিমোহব্যাসঃ।  
 ত্রিগদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেরো ব্রহ্মণো মুখম্ ॥” (মধু ২৮১)  
 মহাব্যুৎপত্তি (ক্লী) ভোটভাষায় রচিত একখানি সংস্কৃত  
 অভিধান।  
 মহাব্যুহ (পুং) ১ সমাধিভেদ। ২ দেবপুত্রভেদ।  
 মহাব্রণ (ক্লী) মহচ্ছ তৎ ব্রণশেতি। দুষ্টব্রণ, নালীঘা। এই  
 রোগ মহাপাতকজ। এই ব্রণ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা  
 আবশ্যক। [দুষ্টব্রণ দেখ।]  
 “কুর্ধ্যাং সপ্তদশাবৃত্তং তথাষ্টাদশকং প্রিয়ে।  
 মহাব্রণবিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেন্নরঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)  
 মহাব্রত (ক্লী) মহচ্ছ তৎ ব্রতশেতি। ১ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত।  
 (ভবদেবভট্ট) ২ শরৎকালীন দুর্গাপূজা।  
 “মহাব্রতং মহাপুণ্যং শঙ্করাগ্নৈরমুষ্টিতম্।  
 কর্তব্যং সুররাজেন্দ্রে দেবীভক্তিসমম্বিতৈঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)  
 ৩ অরুণোদয়কালে মাঘমাসে গঙ্গান্নান।  
 “বাসুদেবং হরিং কৃষ্ণং ত্রীধরঞ্চ স্মরন্ততঃ।  
 দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোহস্ত তে ॥”  
 পরিপূর্ণং কুরুষ্বেদং মাঘমাসং মহাব্রতম্ ॥” (মলমাসতত্ত্ব)  
 (ত্রি) ৪ মহাব্রতধারী। (ভারত ১৩।৫৪।২১)  
 ৫ প্রেষ্ঠব্রতমাত্র, পাণ্ডপতাদি ব্রত।  
 মহাব্রতবৎ (ত্রি) মহাব্রত অন্ত্যর্থো মতুপ্ মত্ ব। মহাব্রত-  
 নামক সামবিশিষ্ট।

মহাব্রতিক (ত্রি) ১ মহাব্রতপালনকারী। ২ পাণ্ডপত  
 ব্রতাবলম্বী।  
 মহাব্রতিন্ (পুং) মহাব্রতঃ যোগনিয়মাত্মচর্যাদিক-  
 মহাব্রতীতি ব্রত-ইনি। ১ শিব। (হেম) ২ উরুষ্টি। (ত্রিকা)  
 (ত্রি) ৩ মহাব্রতযুক্ত।

“এতচ্ছূষাপি সাবজ্ঞান্তে মহাব্রতিনস্তদা।

উচুনিশ্চয়দত্তং তে চম্বারঃ সহস্রারিনঃ ॥”

(কথাসরিৎ ৩৭।৫৯)

মহাব্রতীয় (ত্রি) মহাব্রতসম্বন্ধীয়।

মহাব্রাত (ত্রি) বহুলোকযুক্ত। ‘মক্ভি ব্রাতোঃসমুহোহিত’  
 (সারণ)

মহাব্রীহি (পুং) ব্রীহিধাতু বিশেষ, বটিকথান, চলিত  
 ঘেটোধান। (বৈজ্ঞকনিং)

মহাশকুনি (পুং) চক্রবর্তিভেদ।

মহাশক্তি (পুং) মহত্যঃ শক্তয়ঃ মাতৃগণাদয়ো মহন্ বা  
 সামর্থ্যঞ্চ যন্ত। ১ কান্তিকের। মহতী শক্তিঃ। ২ অতিশয়  
 পরাক্রম। (ত্রি) ৩ মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় শক্তিযুক্ত।  
 (পুং) ৪ শিব। ৫ কৃষ্ণপুত্রভেদ।

মহাশঙ্খ (পুং) মহান্ শঙ্খ ইব বৃহচ্ছূলবাৎ। ১ সংখ্যা-  
 বিশেষ, দশ নিখরো এক মহাশঙ্খ হয়। ২ লগাট। (মেদিনী)  
 মহান্ মহার্হঃ শঙ্খঃ। ৩ নিধি বিশেষ। (বিষ্ণু) ৪ কর্ণ  
 ও নেত্রের মধ্যগত অস্থি।

“কর্ণনেত্রান্তরালস্থি মহাশঙ্খঃ প্রাকীর্ষিতঃ।” (তন্ত্রসার)

কর্ণ ও নেত্রের মধ্যস্থিত অস্থিকে মহাশঙ্খ কহে, এই  
 মহাশঙ্খের মালা প্রস্তুত করিয়া ইহা দ্বারা জপ করিতে হয়।  
 তন্ত্র-মতে এই মহাশঙ্খের মালা জপবিশেষে প্রশস্ত।

“মহাশঙ্খময়ী মালা নীলসারস্বতে বিধৌ।

নৃলগাটাস্থিখণ্ডেন রচিতা জপমালিকা।

মহাশঙ্খময়ী মালা তারাবিষ্টাজপে প্রিয়ে ॥” (তন্ত্রসার)

মহান্ শঙ্খঃ। ৫ বৃহচ্ছঙ্খ।

“পৌণ্ড্রং দদৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ণা বৃকোদরঃ।”

(গীতা ১ অং) ৬ সর্পভেদ। (ভাগ০ ৫।২৪ ৩১)

মহাশঙ্খদ্রাবক, দ্রীহা ও বক্রং রোগনাশক ঔষধভেদ।  
 প্রস্তুত-প্রণালী—তেঁতুলছাল, অম্বলছাল, সিজের ছাল,  
 আকন্দছাল ও অণামার্গ, ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক  
 ক্ষার-জল প্রস্তুত করিয়া লবণ করিয়া লইবে। পরে সোহাগা,  
 ববক্ষার, সাচিকার, পঞ্চলবণ, হিন্দু, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল,  
 জায়ফল, গোদন্তী, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিব,  
 সমুদ্রফেন, সোরা, কটুকিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ,

মনহাল (মনঃশিলা) ও হীরাকস এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া বেতসের রসে ভাবনা দিয়া কাচকুপিতে স্থাপন করিবে। পরে বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাকে সপ্তাহ কাল উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিবে। পরে শুষ্ক অগ্নিতে বারুণীযন্ত্রে পাক করিয়া সহপাতন (উদ্ধার) করিয়া লইবে, কোন কাচপাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে ঐ দ্রব্যংশ যতপূৰ্ণক রক্ষা করিবে। পাণেন সহিত ইহার ১ রতি প্রত্যাহ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, প্রীহা, অজীর্ণ, গ্রহণী, রক্ত পিত্ত, গুল্ম, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ, অষ্টবিধ শূল, আমবাত, বাতরক্ত, খঞ্জবাত, ধনুঃকর, উদরাময়, আমাশয়, ক্রিমিকোষ্ঠতা প্রভৃতি রোগ দূর হয়। ইহা একরূপ অগ্নিবর্দ্ধক যে, আকর্ষ ভোজন করিয়া এক রতি পরিমাণ এই ঔষধ সেবন করিলে অনলে তৃণরাশি ভস্মের ত্রায় ইহা ভক্ষ্যদ্রব্যকে পরিপাক করিয়া ফেলে। (ভৈষজ্যরত্নাং)

মহাশঙ্খবটী, উদররোগে উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুলছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিন্দু, বিষ, পারা ও গন্ধক এই দ্রব্য সমুদায় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অপাঙ্গ ও চিতামুলের কাথে, লেবুর রসে এবং অন্নবর্ণ দ্বারা ভাবনা দিবে। ঔষধে অন্নরস উৎপন্ন হইলে আর ভাবনা দিবার আবশ্যকতা নাই। এই ঔষধে লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে মহাশঙ্খবটী প্রস্তুত হয়। প্রাতে ২ রতি প্রমাণ ৭টি উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। আকর্ষ ভোজন করিয়া ইহার এক গুড়িকা সেবন করিলে উদরস্থ ভক্ষ্য দ্রব্য সমুদায় তৎক্ষণাৎ জীর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, পাণ্ডু, প্রমেহ, শূল, বাতরক্ত, মহাশোথ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

অষ্টবিধ—উপরি উক্ত দ্রব্য সমুদায় পূর্কোক্ত রূপে পাক করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রণের প্রয়োজন নাই। ভোজনান্তে সেব্য। ইহাতে অর্শ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নাশ এবং অগ্নি সাত্বিক উদ্ধীপ্ত হইয়া থাকে।

সারকলিকাপ্ত মহাশঙ্খবটীর প্রস্তুতপ্রণালী অন্তরূপ যথা,—পিপুলমূল, চিতামূল, দাণ্ডিমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, বৎসার, সাতিকার, মোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঠ, বিষ, বনযমানী, গুলঞ্চ, হিন্দু, ও তেঁতুলছালভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য অন্নবর্ণের রসে ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ত্রায় বাড়ি রাখিবে। অন্ন দাড়িমের রস, নেবুর রস, তক্ত, দধির মাত, সুরা, সাধু, কাঁজি অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে খুব অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং অর্শ, গ্রহণী, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। পথ্য—শৃঙ্খ ও এণাদ মাংসের যুগ। (ভৈষজ্যরত্নাং)

মহাশঠ (পুং) রাজধুত্ব, পীতধুত্ব। (রাজনিং) মহাশ্চাসৌ শঠশ্চেতি। (ত্রি) ২ অতিশয় ধূর্ত, অত্যন্ত প্রতারণক।

মহাশণ (পুং) বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। (পর্যায়বৃক্ষাং) শণবীজ। (বৈজ্ঞকনিং)

মহাশণপুষ্পিকা (স্ত্রী) শণপুষ্পী নামক ক্ষুণ্ণবিশেষ। আতুলী ফুলের গাছ, শ্বেত অরণ্যশণ। মহারাষ্ট্র—সাহী কিলিহিলা, কলিঙ্গ—পাটবী কিলিহিলা, হিন্দী—ছগছগ। ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ এবং রসনিয়ামক। (রাজনিং)

মহাশণা (স্ত্রী) আরণ্যশণ। (বৈজ্ঞকনিং)

মহাশতা (স্ত্রী) মহৎ শতক মূলানি বস্তাঃ, টাপ। মহাশতা-বরী। (রাজনিং)

মহাশতাবরী (স্ত্রী) মহতী চানৌ শতাবরী চেতি। বৃহচ্ছতা-বরী, সহস্রমূলী শতাবরী, হিন্দী—কজ্জলীমূল। পর্যায়—শত-বীয়া, সহস্রবীয়া, সুরসা, মহাপুরুষদন্তিকা, বীয়া, তুঙ্গিনী, বহুপত্রিকা, উর্জুকী, মহাবীয়া, ফণিজহবা, মহাশতা, সুরবীয়া। ইহার গুণ—মধুর, পিত্তনাশক, শীতল, তিক্ত, মেহ, কফ ও বাতঘ্ন, রসায়ন এবং বস্ত্রতাকর। (রাজনিং)

ভাবপ্রকাশ মতে—মেধ্য, হৃদ, বৃষ্য, রসায়ন, অশ এবং গ্রহণীরোগনাশক।

মহাশন (পুং) ১ অন্নরভেদ। (ত্রি) ২ বহুভোজী, পেটুক।

মহাশব্দ (পুং) মহাশ্চাসৌ শব্দশ্চেতি। বৃহচ্ছব্দ, ভয়ানক শব্দ। (ত্রি) ২ মহাশব্দযুক্ত।

“প্রাবৃত্তিকালে বিশেষণে আশ্বিনে হষ্টমীষু চ।

মহাশব্দো নবম্যাস্ত লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥” (তিথিতত্ত্ব)

মহাশমী (স্ত্রী) বড় শমীগাছ। (A large Acacia soma)

মহাশমু (পুং) মহাশিব।

মহাশয় (ত্রি) মহান্ আশঃ অভিপ্রায়ঃ মনো বা যন্ত।

১ মহামুভাব। পর্যায়—মহেচ্ছ, উদ্ভাত, মহামনাঃ, উদ্ভট, উদার, উদীর্ণ, মহাম্মা। (হেম)

(পুং) মহান্ আশয়ঃ জ্ঞানামাধারঃ। ২ সমুদ্র। (শব্দরত্নাং)

মহাশয়ন (স্ত্রী) মহাশযা।

মহাশযা (স্ত্রী) মহতী চানৌ শয্যা চেতি। রাজশয্যা।

সিংহাসন। (হেম) বৃহৎ শয্যা।

মহাশর (পুং) মহাশ্চাসৌ শরশ্চেতি। স্থলশর, রামশর।

মহাশঙ্ক (পুং) মহান্ বৃহৎ শঙ্কো যন্ত। চিট্ট মন্ত, চলিত মোচাচণ্ডি মাছ।

“কালশাকং মহাশঙ্কাঃ খড়্গাগোহামিষং মধু।

আনন্ত্যট্টৈব কল্পন্তে মুন্যমানি চ সর্গশঃ ॥” (মহু ৩২৭২)

মহান্ শঙ্কঃ। ২ বৃহচ্ছব্দ। (ত্রি) ৩ তদুৎকৃষ্ট, বৃহচ্ছব্দযুক্ত।

মহাশাল (ক্ৰী) ভীষণ বা ভীষণ শব্দ।  
 মহাশাক (ক্ৰী) মহচ্ছ তৎ শাকক্ষেতি। বৃহৎ শাকবিশেষ।  
 মহাশাক্য (পুং) শ্রেষ্ঠ শাক্যবংশ।  
 মহাশাখ (ত্রি) বৃহৎ শাখাব্যুক্ত।  
 মহাশাখা (ক্ৰী) মহতী শাখা যন্তাঃ। নাগবলা। (রাজনিং)  
 মহাশাস্তি (ক্ৰী) বিঘ্ননাশের অস্ত্র সত্ত্বাস্তান।  
 মহাশাল (পুং) ১ বড় ঘর। ২ মহাগৃহস্থ। (ত্রি) ৩ বৃহৎ গৃহযুক্ত।  
 মহাশালি (পুং) মহাশাল্যসৌ শালিষ্ঠেতি। স্থলশালি,  
 চলিত মোটাধান। পর্যায়—সুগন্ধিক। ইহার গুণ—গুরু,  
 বলকর, চক্ষুর হিতকর এবং বলবর্ধক। (অত্রিসং ১৫ অং)  
 মহাশালীন (ত্রি) অতিবিনোদ। “পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা  
 মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কৰ্মবিভক্তা ব্রাহ্মণা বভূবুঃ”  
 (ভাগবত ৪।৪।১০) ‘মহাশালিনাঃ অতিবিনোদাঃ’ (খানী)  
 মহাশাল্লগ (ক্ৰী) রোগ-প্রতিকারের উপারভেদ।  
 মহাশামন (ক্ৰী) ১ রাজ্যদেশ। (পুং) ২ সচিবভেদ, যিনি  
 রাজশাসন বা দানপত্র প্রচার করিয়া থাকে। (ত্রি) ৩ মহা  
 শক্তিযুক্ত।  
 মহাশির, স্নানমগ্নপ্রসিদ্ধ মংস্ত্রবিশেষ (Barbus macrocephalus)।  
 মন্তকদেশে দেহখণ্ডিত হইতে সাধারণতঃ বৃহদাকৃতি হয়  
 বলিয়া ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। কোথাও  
 কোথাও মহাশোল বা মহাশোল নামে খ্যাত।  
 উত্তর-ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, কান্দারহু তোহী নদী, যমুনা ও পঞ্জা-  
 বের অপরাপর নদী এবং উপত্যকাগর্ভস্থ নদী বা হ্রদাকার  
 বিলাদিতে এই মংস্ত্র জন্মিতে দেখা যায়।  
 এই মাছের মাংস খাইতে উত্তম। এ কারণ অনেকে প্রপাত-  
 ময় পার্বত্য নদীবেঙ্গে আসিয়া এই মংস্ত্রশিকারে প্রবৃত্ত হয়।  
 এক একটা মংস্ত্র প্রায় আধ মণ হইতে এক মণ পর্যন্ত ওজ-  
 নের হইয়া থাকে। ইহাদের দন্ত অভ্যন্ত দারাল। শব্দক,  
 কাকড়া ও নানা জাতীয় মংস্ত্র ইহাদের প্রধান আহাৰ্য্য।  
 ইহারা প্রজাপতি, পতঙ্গ, বনফল ও পিটুলীবাটা প্রভৃতি বড়  
 আশ্রয়ে ভোজন করে। হরিবারের স্নানবাটে পিণ্ডপূজার  
 সময় ইহারা পিণ্ডভক্ষণ করিতে আইসে।  
 ইহাদের পটপটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। দেশীয় লোকে বিশেষ  
 আদরের সহিত উহা ক্রয় করিয়া থাকে। পেট কামড়ান,  
 বিষচিকা ও স্থতিকাজরে ইহা বিশেষ উপকারী।  
 মহাশিরস্ (পুং) মংস্ত্রভেদ। (বৈজ্ঞকনিং) ২ দক্ষীকর  
 জাতীয় সর্পভেদ। গোপেয়ক জাতিভেদ। (সুশ্রুত কর্ণসং ৪০ অং)  
 মহাশোল, মংস্ত্রজাতি বিশেষ। এহ মাছ উৎকৃষ্ট আশ্বাদ-  
 যুক্ত ও বলকর।

মহাশিরঃসমুদ্ভব (পুং) জৈনদিগের ষষ্ঠ বাহুদেব।  
 মহাশিরোধর (ত্রি) বৃহৎ জীবা।  
 মহাশিলা (ক্ৰী) শস্ত্রভেদ।  
 মহাশিব (পুং) মহাশাল্যসৌ শিবঃ কল্যাণরূপী চ। মহাদেব।  
 মহাশীতবর্তী (ক্ৰী) বৌদ্ধদিগের পঞ্চ মহাদেবীর অন্তর্গত  
 দেবীভেদ।  
 মহাশীতা (ক্ৰী) মহত্যাধিকা শীতা শীতবীৰ্যা। ১ শত-  
 শ্রী। (শব্দচং) (ত্রি) মহৎ শীতঃ শীতগুণোহস্ত।  
 ২ অতিশীতবীৰ্য্যযুক্ত। ৩ বনস্পতিবিশেষ। (বৈজ্ঞকনিং)  
 মহাশীর্ষ (পুং) শিবাজুরভেদ।  
 মহাশীল (পুং) জনমেজয়ের পুত্রভেদ।  
 মহাশক্তি (ক্ৰী) মহতী শক্তিঃ সূক্তাকরতেনাত্মা মহত্বঃ।  
 সূক্তামাতা, সূক্তাপ্রসবিনী শক্তি, সূক্তাগৃহ। ঋত্বক। (রাজনিং)  
 মহতী স্থলা শক্তিঃ। ২ বৃহৎ শক্তি।  
 মহাশুক্রা (ক্ৰী) মহতী চান্দো শুক্রা শুক্রবর্ণী চ। ১ সরস্বতী।  
 (ভূরিপ্রং) (ত্রি) ২ অতি শুভ্রবর্ণযুক্ত।  
 মহাশুণ্ডী (ক্ৰী) হস্তিশুণ্ডী নামক মহাশূপ। চলিত হাফ-  
 শুড়। (রাজনিং)  
 মহাশুভ্র (ক্ৰী) মহান্ শুভ্রো বর্ণোহস্ত। ১ রক্তত। (রাজনিং)  
 (ত্রি) ২ অতিশয় শুভ্রবর্ণযুক্ত।  
 মহাশূদ্র (পুং) মহান্ শূদ্রঃ। আভীর, গোপ।  
 “দানঃ পাদৌ প্রক্ষালয়তি মহাশূদ্রউপসিকতি।” (কৌশিকসং ২।১৬)  
 ৩ শূদ্রের মধ্যে গোপ ও নাপিত।  
 মহাশূদ্রী (ক্ৰী) মহাশূদ্রস্ত ভাৰ্গ্যা ইতি (অজাততট্টাপ্।  
 পা ৪।১।৪) ইত্যত্র মহৎ পুংস্ত্র প্রতিষেধঃ ইতি কাশিকোক্ত্যা  
 পুংযোগলক্ষণা ভীষ্ম। আভীরী। (অমর)  
 মহাশূন্য (ক্ৰী) আকাশ, ব্যোম।  
 মহাশূন্যতা (ক্ৰী) মহাশূন্যত্ব ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ ব্যোমের  
 ভাব। ২ ঘোষীদিগের নিরুদ্ধাবস্থা।  
 মহাশৈরীষ (ক্ৰী) সামভেদ।  
 মহাশৈল (পুং) পর্বতভেদ।  
 মহাশোণ (পুং) নদীভেদ। শোণ।  
 মহাশৌণ্ডী (ক্ৰী) মহতী চান্দো শৌণ্ডী চেতি। শ্বেতকির্ণিহী  
 বৃক্ষ। কটভীষ্মক। (রাজনিং)  
 মহাশৌমির (পুং) মুখক্ষতরোগভেদ।  
 মহাশ্যাম্ (পুং) পদ্মরাগ মণি।  
 মহাশ্যশান (ক্ৰী) মহচ্ছ তৎ শ্যশানক্ষেতি, অত্র হি জীবানিঃ  
 মরণে সমূলকর্ম্মনাশকঃ পুনর্জন্মমরণাভাবাদস্ত তথাহঃ।  
 কাশী, এই স্থলে মানবের মৃত্যু হইলে সমুদয় কর্ম্ম বিনষ্ট হয়,

( कानिकापु. ५२अ. )

এই মহাষ্টমী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীকে নানাবিধ উপহার এবং মাংসাদি দ্বারা পূজা করা আবশ্যক। এই তিথিতে পূজা ও উপবাস উভয়ই করিতে হয়। বালক, বৃদ্ধ ও রোগী ব্যতীত উপবাস সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু উপবাসে একটু বিশেষত্ব এই যে, পুত্রবান্ ব্যক্তি এই অষ্টমী তিথিতে নিরম্ব উপবাস করিবেন না। তদ্বিন্ন সকলেই নিরম্ব উপবাস করিবেন। মহাষ্টমীর উপবাস করিলে পাপ বিনষ্ট হইয়া অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে।

“পাগ্লার চৌদ, পাগলীর আট,

এ করিয়ে জনম্ কাটু” (খনা)

পাগ্লার চৌদ বা শিবচতুর্দশী এবং পাগলীর আট বা মহাষ্টমী করিয়া জনম কাটাও, অর্থাৎ ইহার অহুষ্ঠানে সকল পাপরাশি নষ্ট হইবে। অষ্টমীর উপবাস করিয়া নবমীর দিন পারণ করিতে হয়। এই মহাষ্টমী তিথিতে দেবীর উদ্দেশে বিভাবাস্ত্রসার অর্করাত্রিকালে পূজা অবশ্যকর্তব্য। এই সময়ে পূজা অনন্তফলজনক। \*

মহাসংখ্যা (স্ত্রী) বহুসংখ্যা। অত্যধিক সংখ্যা।

মহাসংজ্ঞা (স্ত্রী) অতীর্ক সংখ্যাভেদ।

মহাসতী (স্ত্রী) নির্মলচরিত্রা পতিব্রতা ভার্যা।

মহাসতোব্রতী (স্ত্রী) বৈদিক চন্দোভেদ।

মহাসতোমুখা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ।

মহাসত্তা (স্ত্রী) বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব।

মহাসত্ত্ব (স্ত্রী) সোমবাগভেদ।

মহাসত্ত্ব (স্ত্রী) ১ মহাবল বা মহাশক্তি। (ত্রি) ২ সমগুণশালী, উচ্চাঙ্ক:করণবিশিষ্ট। (পুং) ৩ বৃহদাকার জীব। ৪ বোধিসত্ত্বভেদ। ৫ কুবের। ৬ শাক্যমুনি।

মহাসত্য (পুং) সমরাজ।

\* “অষ্টম্যাং কৃষিরৈম্যাসৈর্মহামাংসৈঃ স্থগন্ধিভিঃ।

পুঞ্জয়েষহজাতীরৈবলিভির্ভোজ্যনৈঃ শিবান্ ॥

সিন্দুরৈঃ পটুবােসক নানাবিধবিলেপনৈঃ।

পুষ্পৈরনেকজাতীয়ৈঃ ফলৈর্বহুবিধৈরপি ॥

উপবাসং মহাষ্টম্যাং পুত্রবান্ ন সমাচরেৎ।

যথা তথৈব পুতাস্তা ব্রতী দেবীং প্রপুঞ্জয়েৎ ॥

পুঞ্জয়িত্বা মহাষ্টম্যাং নবম্যাং বলিভিত্ত্বা।

বিসর্জয়েদশম্যাক্ত্র প্রবেণে সাংকোৎসবৈঃ ॥

তস্যা অর্করাত্রিপূজা যথা—

কস্তাসংস্থে রবাবীশে শুক্লাষ্টম্যাং প্রপুঞ্জয়েৎ।

সোপবাসো নিশার্কে তু মহাবিভববিস্তরৈঃ ॥

পূজাং সমারভেদেব্য নক্সে বারবেংশি বা।

পশুখাতক কর্তব্যো পবলাজবধতথা ॥” (তিথিতত্ত্ব)

মহাসন (স্ত্রী) সিংহাসন।

মহাসন্ধিবিশ্রহ (পুং) শান্তিহাপন ও যুদ্ধ সজ্জটনাদি কার্যের প্রধান সাচিবা।

মহাসন্ন (পুং) মহান্ অতিশয়ঃ সন্নো বিষয়ঃ, কুদেহবৎ, যদা মহতো হিমাংসৈর্মহাদেবজ বা আসন্নঃ নিকটবর্তী।

১ কুবের। (শব্দমালা) মহদতীব আসন্নঃ। ২ অতি নিকট।

মহাসপ্তমী (স্ত্রী) আখিনের শুক্লা সপ্তমী।

মহাসফর (পুং) মহাংস্চাসৌ সফরশ্চেতি। বৃহৎ প্রোজী-মংত্র, বড় পুটীমাছ। ইহার গুণ—তিক্ত ও কফনাশক, শীতল, মধুর, রুচিকর এবং বায়ুবর্ধক। (ভাবপ্র.) ২ পার্শ্বতা মংত্র, চলিত পাক্সা মাছ।

মহাসমজ্ঞা (স্ত্রী) মহতী চাসৌ সমজ্ঞা চ। বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী—কগছিয়া, খিড়িহিটরা; বেষে—খোরচিকণা, ভেজ। পথ্যায়—ওদনিকা, ওদনাছবা, বৃক্সা, কুহা, বৃদ্ধবলা, তণ্ডুলা, ভৃগুজিহ্বা, শীতপাকিনী, শীতবলা, শীতাবলা, বলোত্তরা, বলা, থিরহিট্টী, ব্যালজিহ্বা। ইহার গুণ—মধুর, অম, দোষত্রয়নাশক। (রাজনি.)

মহাসমাপ্ত (পুং) অতীর্ক সংখ্যাভেদ।

মহাসমুদ্র (পুং) মহাসাগর।

মহাসম্ভব (পুং) জগদ্ভেদ।

মহাসম্মত (ত্রি) ১ অতিশয় সম্মানিত। ২ বৌদ্ধমতে—বর্তমানগুণের প্রথম ধরনীধর।

মহাসম্মতীয় (পুং) বৌদ্ধসম্প্রদায় ভেদ।

মহাসম্মোহন (ত্রি) ১ অতিশয় মুগ্ধতাকর। (স্ত্রী) ২ তত্ত্বভেদ।

মহাসরস্বতী (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠা সরস্বতী।

মহাসরোজ (স্ত্রী) অতীর্ক সংখ্যাবিশেষ, মহাপদ্ম। দশ নিধকে এক পদ্ম, দশ পদ্মে এক মহাপদ্ম।

মহাসর্গ (পুং) মহাংস্চাসৌ সর্গশ্চেতি। প্রলয়ের পর জগতের পুনরায় সৃষ্টি।

মহাসর্জ (পুং) মহাংস্চাসৌ সর্জশ্চ। ১ অসন বৃক্ষভেদ। (Terminalia Tomentosa) ২ পনস বৃক্ষ, (Artocarpus Integrifolia) কাঠালগাছ। (রাজনি.)

মহাসর্প (স্ত্রী) সামভেদ।

মহাসহ (পুং) সহতে ইতি সহ-অচ, মহান্ সহঃ। কুঞ্জক বৃক্ষ। গোড়াদিতে চলিত নাম বাগপুষ্প। পর্যায়—

“অম্লতোহম্লটনঃ প্রৌকুস্তথাম্লাতক ইত্যপি।

কুরটকো বর্ণপুষ্পঃ স এবোক্তো মহাসহঃ ॥” (ভাবপ্র.)

মহাসহস্রপ্রম(দ্)দ্দিনী (স্ত্রী) ১ বৌদ্ধদেবতাবভেদ। ২ বৌদ্ধসহস্রভেদ।

মহাসহা (স্ত্রী) মহাসহ—স্ত্রিয়াঃ টাপ্। ১ বাবর্ণী।  
 (বৈথক রুহমালা) ২ অন্নানবৃক্ষ, কুজক। (ভাবপ্রাণ)  
 মহাসাগর প্রভাগস্ত্রীরধর (পুং) গরুড়দিগের রাজতেন্দ।  
 মহাসাংখ্যায়ন (পুং) মহাসাংখ্যের গোহাপত্য।  
 মহাসাক্ষিক (পুং) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ।  
 মহাসাধনভাগ (পুং) ১ রাজকাব্যের প্রধান (Executive  
 minister or officer) ২ প্রধান মন্ত্রী। (রাজতরং ৪। ১৪৩)  
 মহানাদু (ত্রি) অতিশয় শাধু।  
 মহাসাধ্বী (স্ত্রী) মহাসতী।  
 মহাসান্তপন (স্ত্রী) মহৎ সান্তপনং। ব্রতবিশেষ। জাগাল-  
 মতে এই ব্রত সপ্তাহসাধ্য। এই ব্রতের অমুষ্ঠান করিতে হইলে  
 প্রথম দিন গোমূত্র ভোজন, দ্বিতীয় দিন গোময়, তৃতীয় দিন  
 ছত্র, চতুর্থ দিন দধি, পঞ্চম দিন দ্বত ও ষষ্ঠ দিন কুশোদক পান  
 এবং সপ্তম দিনে নিরম্ব উপবাস করিতে হয়। এই ব্রত  
 অতিশয় কষ্ট সাধ্য। প্রারম্ভিকবিবেকে লিখিত আছে, এই  
 সপ্তাহসাধ্য ব্রতের নাম সান্তপন, ইহার তিন গুণ অধিক  
 হইলে মহাসান্তপন হয়, এই মতে এই ব্রত ২১ দিন ধরিয়া  
 করিতে হয়। যে স্থলে সপ্তাহসাধ্য মহাসান্তপন তথায় সান্ত-  
 পন ব্রত দুই দিনে হয়। সপ্তাহসাধ্য সান্তপন স্থলে একবিংশতি  
 দিনে মহাসান্তপন হইবে। এই মহাসান্তপন ব্রতামুষ্ঠান  
 করিলে মহাপাতক বিনষ্ট হয়। ইহাতে অশক্ত হইলে ৬টা  
 খেয় দান করিলে ইহার সমান হয়। অর্থাৎ যিনি এই বহু-  
 ক্লেশকর ব্রত করিতে অপারগ, তিনি ৬টা খেয় দান করিলে  
 মহাসান্তপন ব্রতের ফল প্রাপ্ত হইবেন।\* [সান্তপন দেখ]  
 মহাসাক্ষিবিগ্রহিক (পুং) মহাশাস্ত্রসৌ সাক্ষিবিগ্রহিকশ্চেতি।  
 রাজ্যের শাস্ত্রস্থাপক ও যুদ্ধাদি বিষয়ের ব্যবস্থাপক সচিব।

\* পৃথক সান্তপনৈর্ভব্যঃ যদুহঃ সোপবাসকঃ।

সপ্তাহেনৈব ব্রজেৎ। ইয়ং মহাসান্তপনঃ স্তুতঃ।

এতৎ সপ্তাহসাধ্যং জাগালঃ—

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।

একৈকং ক্রমশোহস্রীযাদহোরাত্রমভোজনম্ ॥

কৃচ্ছঃ সান্তপনো নাম সৰ্পপাপপ্রণাশনঃ।

একৈকমেতদেবং হি ত্রিরাত্রমুপযোজয়েৎ।

আহরণ্যোপবসনস্তাং মহাসান্তপনে বিধিঃ ॥

এব সপ্তাহসাধ্যং সান্তপনমুক্তা একবিংশতিদিনসাধ্যং মহাসান্তপনমুক্তম্।  
 মহাসান্তপনঃ খেয়বটকদানসমম্। জাগালোক্তমহাসান্তপনং একবিংশতি-  
 দিনসাধ্যায়েন সপ্তাহসাধ্যাসান্তপনাং মহাসান্তপনে খেয়বটকং দেয়ম্।"

(আমন্ত্রিত্ত্ব বিবেক)

(Prime-minister of Peace and war and the  
 Secretary.)

মহাসামন্ (স্ত্রী) সামভেদ।

মহাসামন্ত (পুং) সীমান্তপ্রদেশের অধীন রাজা।

মহাসামরাজ (স্ত্রী) সামভেদ।

মহাসার (পুং) মহান সারঃ স্ত্রিয়াংশো বস্ত্র। হৃষ্মদির।  
 বিট্খদির। (রাজনিঃ)

মহাসারথি (পুং) ১ অরুণ। (হেম) ২ শ্রেষ্ঠসারথি।

মহাসার্থ (পুং) দলবদ্ধ যাত্রী।

মহাসাবেতস (স্ত্রী) সামভেদ।

মহাসাহস (স্ত্রী) মহচ্চ তৎ সাহসশ্চেতি। ১ অতি বলাৎকার-  
 কৃত কাণ্ড। ২ অতিশয় দম্ভ। (মেদিনী) মহৎ সাহসমজ্ঞ,  
 ৩ অতি দ্রুত কৰ্ম্ম। ৪ অতিশয় দৈব। (হেম) ৫ মহাবল।

মহাসাহসিক (ত্রি) মহানতিশয়ঃ সাহসিকঃ। ১ চৌর।  
 ২ অত্যন্ত সাহসযুক্ত। ৩ বলপূৰ্ব্বকপহারক।

"চাটতত্ত্বরত্নকৃতমহাসাহসিকাদিতিঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যসং ১অঃ)

"মহাসাহসিকাঃ সহোবলং মহসা বলেন কৃতং সাহসং মহচ্চ  
 তৎ সাহসক মহাসাহসং তেন বর্ত্তন্ত ইতি মহাসাহসিকাঃ  
 প্রমহাপহারিণঃ" (মিতাক্ষরা)

মহাসাহসিকতা (স্ত্রী) মহাসাহসিকত্ব ভাবঃ তন্ টাপ্।  
 মহাসাহসিকের ভাব বা ধর্ম্ম। মহাসাহসিকের কাণ্ড।

মহাসিংহ (পুং) মহান সিংহ ইব। ১ শরভ। (রাজনিঃ)

মহাশাস্ত্রসৌ সিংহশ্চেতি। ২ বৃহৎ সিংহ, ভগবতী  
 হৃগদেবীর বাহন মহাসিংহ।

"উখায় চ মহাসিংহং দেবী চণ্ডমধাবত।" (চণ্ডী)

মহাসিংহতেজস্ (পুং) বুদ্ধভেদ। (ললিতবিস্তর ৫। ১৫)

মহাসিদ্ধ (ত্রি) যোগসিদ্ধ, যোগ দ্বারা যিনি সিদ্ধি লাভ  
 করিয়াছেন।

মহাসিদ্ধি (স্ত্রী) মহতী সিদ্ধিঃ। অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত সিদ্ধিভেদ।  
 [সিদ্ধি দেখ।]

মহাসুখ (স্ত্রী) মহৎ সুখমস্মিন্। ১ শৃঙ্গার। (ত্রিকাঃ)

মহচ্চ তৎ সুখক। ২ অতিশয় আনন্দ। (ত্রি) মহৎ সুখমস্ত্র।

৩ অতিশয় সুখযুক্ত। (পুং) মহৎ সুখং লেখরানন্দোহস্ত  
 অস্বাদ্ভা। ৪ বুদ্ধদেব। (ত্রিকাঃ)

মহাসুগন্ধ (ত্রি) মহান্ সুগন্ধোহস্ত। ১ অতি সুগন্ধযুক্ত।  
 স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাসুগন্ধা—গন্ধনাকুলী। (রাজনিঃ)

মহাসুগন্ধযটক (স্ত্রী) মহাসুগন্ধানাম্ যটকং। ছয়প্রকার  
 মহাসুগন্ধি জব্য, যথা—চন্দন, কতুয়া, কর্পূর, কৃষ্ণাণ্ডক,  
 মূর্খা ও কুঙ্কুম। (বৈথকনিঃ)



মহাস্থগন্ধি (জী) বিষয় ঔষধভেদ। (সুশ্রুত)

মহাস্থগন্ধিতৈল (জী) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-  
প্রণালী,—তিলতৈল ৪ সের। কক্কার রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, বেণার  
মূল, প্রিয়ঙ্গু, ছোটএলাচ, গোরোচনা, শিলায়স, অগুরু,  
মৃগনাভি, কর্পূর, জয়িত্রী, জাতিফল, কাকোলীফল, শুবাক-  
ফল, লবঙ্গ, লালুকা, মাংসৌ, কুড়, রেণুকা, তগরপাদিকা,  
কৈবর্তমূলক, নখী, ব্যাঘ্রনখা, পূকা, বোল, দমনক, গাঠিয়ান,  
চোরক, শিলাজতু, এলবালুক, সরলকাঠ, ছাতিয়ান, লাঙ্গা,  
ভূম্যামলকী, বীরণমূল, পদ্মকাঠ, ধাইফুল, পুণ্ডরায় ও শঠী  
এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, জল ১৬সের পরে তৈল-  
পাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল গাত্রে  
মর্দন করিলে শারীরিক ঘন, মল ও দুর্গন্ধ, কণ্ঠ ও কুষ্ঠরোগ  
নষ্ট হয়। সপ্ততি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিও এই তৈল ব্যবহারে  
স্বাভাবিক অসুস্থ হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় কামিনীগণের  
পিয় হইয়া থাকে। ইহাতে বন্ধ্যাজার বন্ধ্যাহ দোষ দূর হয়  
এবং বণ্ডব্যক্তিরও পুরুষত্ব শক্তির বৃদ্ধি হইয়া দীর্ঘজীবন  
লাভ হয়। (ভাবপ্রং শ্লোকোপযোগিঃ)

মহাস্থগন্ধিতৈল, তৈলৌষধভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী,—  
তিলতৈল ৪সের, মঞ্জিষ্ঠা, চোর কাঁচকাঁ, দেবদারু, সরল কাঠ,  
ব্যাগ্রী (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), বচ, শুবাকবৃক্ষের ছাল, শুড়ত্বক্,  
গন্ধতণ, শঠী, হরাতকী, বহেড়া, আমলা ও মুতা। এই  
সকল গন্ধকক প্রত্যেক ২ পল ওজনে গ্রহণ করিয়া প্রথমে  
পাক করিবে। পরে জটামাংসৌ, মুরামাংসৌ, দনা, চম্পক-  
পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, শুড়ত্বক্, গোটোলা, বালা, কুড়, মরবক পুষ্প ও  
পিড়িং শাক প্রত্যেক ২ পল। গন্ধবিরাঙ্গা, কুন্দরথোটা, নখী,  
নালুকা ও শুল্কা প্রত্যেক ১ পল। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় কক  
পাক করিবে। এলাইচ, লবঙ্গ, শিলায়স, শ্বেতচন্দন, জাতি-  
পুষ্প, খাটোশী, কাঁকলা, অগুরু, লতাকান্তুরী ও কুঙ্কুম প্রত্যেক  
৪ তোলা। মৃগনাভি ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা বা ৬ মাষা  
৪ রতি, এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৃতীয় কক পাক করিবে।  
পাক সাজ হইলে তৈল হইতে খাটোশী উদ্ধৃত করিয়া উত্তম-  
রূপে শিলাতে পেয়ণপূর্বক পুনরায় তৈলে মিশাইয়া দিবে।  
বিষাদি পক্ষ পল্লবের কাথ দ্বারা প্রথম কক পাক করিবে।  
গন্ধাধু দ্বারা দ্বিতীয় কক এবং অগুরুধূপিত গন্ধবারি দ্বারা  
তৃতীয় কক পাক করিবে। মহারাজগন্ধপ্রসারিণী তৈলের  
দ্বারা ইহাতেও গন্ধদ্রব্য সকল শোধন করিয়া লইতে হইবে।  
ইহা ব্যবহার করিলে বিবিধ বাতব্যাধি প্রশমিত হয়।

উল্লিখিত কক সমুদায় বিগুণ পরিমাণে লইয়া তৈলে  
দিয়া পাক করিলে উহাকে লক্ষ্মীবিলাস তৈল কহে।

মহাস্থদর্শন (পুং) চক্রবর্তী রাজভেদ।

মহাস্থপর্ণ (পুং) পক্ষিভেদ। (শতপথব্রাং ১২।২।৩।৭)

মহাস্থর (পুং) দানবভেদ।

মহাস্থনী (জী) মহাদেবী দুর্গা।

মহাস্থহয় (পুং) শ্রেষ্ঠ অশ্ব। (শতব্রাং ১৪।২।১৩)

(পুং) ১ স্বর্গবেদের দশমমণ্ডলের এক স্বর্ষ।

মহাসূত্র (জী) ২ বৈদিক মহাস্তোত্র। (ঐতব্রাং ৬।২৫)

৩ স্বর্গবেদের দশম মণ্ডলের ১—১২৮ সূত্র।

মহাসূক্ষ্ম (ত্রি) মহাশর্চাসৌ সূক্ষ্মশ্চ। অতিশয় সূক্ষ্ম।

মহাসূক্ষ্মা (জী) মহদতীৰ সূক্ষ্মা। বালুকা। (রাজনিঃ)

মহাসূচিবাহ (পুং) বাহভেদ, যুদ্ধকালে সৈন্যসংস্থাপন-  
প্রক্রিয়া বিশেষ।

মহাসূত (পুং) রণবাত্তভেদ।

মহাসেতু (পুং) ১ বৃহৎ সেতু। ২ মন্ত্রভেদ।

মহাসেন (পুং) মহতী সেনা যন্ত। ১ কাণ্ডিকের। (অমর)

মহতী সেনা অমুচরোহন্ত। ২ শিব। ৩ মহাসেনাপতি।

(মেদিনী) ৪ বৃত্তার্হৎ পিতৃবিশেষ। (হেম) ৫ রাজবিশেষ।

(ত্রি) ৬ বিপুলসৈন্যবিশিষ্ট। (কথাসরিংসাং ১।১।৩৪)

মহাসেননরেশ্বর (পুং) অষ্টম অর্হতের পিতা। (হেম)

মহাসেনা (জী) বিপুল সৈন্য।

মহাসেনাব্যুহপরাক্রম (পুং) যক্ষরাজভেদ।

মহাসোম (পুং) সোমভেদ।

মহাসৌমির (পুং) দস্তবেষ্টগত রোগবিশেষ। এই রোগে  
দন্তচালন, তালুদারণ, দন্তমাংসপুতিত্ব এবং মুখে অতিশয়  
দুর্গন্ধ হয়। ভোজ্যমতে এই রোগ হইলে ৭ দিনের মধ্যে  
মৃত্যু ঘটে। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর, সপুষ্ট রুধিরস্রাব এবং দস্ত-  
বন্ধন সকল শিথিল হয়।

“মহাসৌমির ঈতোবং সপ্তরাজ্যান্নহন্ত্যস্মন।

সন্নিপাতজ্বরবান্ সপুষ্টরুধিরজ্জ্বতিঃ ॥

মহাসৌমির ইত্যাক্তো বিশাণ্ণবিজবন্ধনঃ ॥” (বাভট উৎ ২।১অঃ)

এই রোগের নামান্তর মহাসৌমির এইরূপও দেখিতে  
পাওয়া যায়। [মুখরোগ দেখ।]

মহাস্কন্ধ (ত্রি) মহান্ স্বকোহন্ত। ১ বৃহৎ স্বক্য়ুক্ত। (পুং) ২ উষ্ট্র।

দ্বিযাং টাপ্। মহাস্কন্ধা—জম্বুবৃক্ষ, জামগাছ। (রাজনিঃ)

মহাস্কন্ধিন্ (পুং) অষ্টপদবিশিষ্ট জন্তুভেদ, শরভ।

মহাস্তপ (পুং) বোদ্ধ স্বতিরিক্ত মন্দিরাকার উচ্চ স্তূপ।

মহাস্তোম (ত্রি) স্তোমযুক্ত। (ঐতব্রাং ৯।১১)

মহাস্ত্র (জী) অস্ত্রবিশেষ। প্রধান অস্ত্র, শ্রেষ্ঠ অস্ত্র।

মহাস্থলী (স্ত্রী) স্থল (জানপদকুণ্ডগোলেত্যাदि। পা ৪।১।৪২)

ইতি ভীষ, মহতী স্থলী। ১ পৃথিবী। ২ শ্রেষ্ঠস্থান, অত্যন্তম স্থান।

মহাস্থবির (পুং) বৃদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষু।

মহাস্থান (স্ত্রী) উচ্চ স্থান।

মহাস্থানপ্রাপ্ত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মহাস্থাল (পুং) বৃক্ষভেদ।

মহাস্থায়ু (পুং) মহতী ঋষিঃ। অস্থিবন্ধননাড়ী। কণ্ডুরা, রক্তবহা মহানাড়ী। (হেম)

মহাস্নেহ (পুং) ছদ্মরোগে স্নেহোষধবিশেষ।

প্রস্তুত-প্রণালী,—স্বত ৪ সের, কন্ধার্ব রাস্না, জীরক, জীবন্তী, বেড়োলা, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, বামনহাটা, শালপাণি, বচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ ৫।০ সওয়া পাঁচ তোলা, দধিমাত ১ সের এবং অন্নবর্গ গ্রহণ করিয়া যথাবিধানে এই স্নেহোষধ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার ছদ্মরোগ প্রশমিত হয়। (বাভট চিকিৎসা ৬ অং) ২ স্বত, তৈল, বসা ও মজ্জা। (চরকসংগ্রহ ১ অং)

মহাস্পদ (ত্রি) মহান্ আস্পদো যন্ত। মহাপ্রভাবশালী, মহাশক্তিসম্পন্ন।

মহাস্মৃতি (স্ত্রী) ১ চিরপ্রচলিত বাক্য, কিংবদন্তী। ২ হুগী।

মহাস্মিণ্ (পুং) মহতী অক্ষু অস্থিমালা সা অন্ত্যস্তেতি বিনি। মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১৩৪)

মহাস্বন (পুং) মহান্ স্বনঃ শব্দো যন্ত। ১ মল্লভূগ্য। (ত্রিকাং)

মহান্ স্বনঃ। ২ বৃহচ্ছব্দ। (ত্রি) ৩ তদ্ব্যুৎ, বৃহৎশব্দবিশিষ্ট।

“অনর্থহানী সোন্মাদস্তিধ্যাক্ষপ্ৰেক্ষা মহাস্বনঃ।” (ভারত ৫।১৫।৫)

৪ অস্বরভেদ।

মহাস্বর (ত্রি) ১ উচ্চস্বরযুক্ত। (পুং) ২ উচ্চস্বর।

মহাস্বাদ (পুং) স্বাদ্, স্মিষ্ট।

মহাস্বাস (পুং) ১ হংসভেদ। ২ বিষ্ণু। (ভাগ ৬।৫।২৮)

মহাস্বনু (পুং) মহতী হুম্বন্ত। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩৪)

২ সর্পবিশেষ, এই সর্প তক্ষকজাতীয়।

“মৃদগরঃ শিশুরোমা চ স্নয়োমা চ মহাস্বনঃ।

এতে তক্ষকজা নাগাঃ প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্।”

(মহাভারত ১।৫।৭।১০)

(ত্রি) ৩ বৃহৎ হুম্বন্ত। ৪ দানবভেদ।

মহাস্বয় (পুং) রাজভেদ। (ভাগ ৯।২।২১) ২ মহান্ অশ্ব।

মহাস্ব্য্য, (স্ত্রী) রাজপাসাদ। (রাজতরং ২।১৩৩)

মহাস্বব (পুং) মহান্ স্বাব্যঃ। বোরতর যুক্ত।

মহাহবিস্ (স্ত্রী) মহৎ স্প্রশস্তং হবিঃ। ১ গব্যস্বত, স্বতের মধ্যে গব্যস্বত প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ।

“গয়ান্নামথবা পিণ্ডং খজ্ঞামাংসং মহাহবিঃ।

কালশাকং তিলাজ্যং বা কুশরং মাসভূষ্মে॥” (মার্ক ৩।২।৩০)

২ বিষ্ণু। মহাস্তি হবীংসি অত্র। ৩ বৃহদ্ বাগবিশেষ, শাক-

মেধ যজ্ঞ। “অথাতো মহাহবিষ এব তদ্ব্যথা মহাবিষন্তথো তন্ত্ৰ” (শত ৩।১০।২।১০২০)

মহাহস্ত (পুং) ১ শিব। (ত্রি) ২ বৃহদ্ হস্তযুক্ত।

মহাহস্তিন্ (ত্রি) বৃহদ্ হস্তযুক্ত। (ঋক্ ৮।৭।১১)

মহাহাস (পুং) মহান্ উচ্চহাসঃ। অট্টহাস্ত। (শব্দরত্নাং)

মহাহি (পুং) মহান্ অহিঃ। বৃহৎ গর্প, অনন্তনাগ। বাসুকি।

মহাহিকা (স্ত্রী) মহতী হিকা। তন্মামক হিকারোগবিশেষ।

“মর্দ্যাপুংপীড়য়ন্তীব সততং যা প্রবর্ততে।

মহাহিকৈতি সা জ্ঞেয়া সর্ষগাত্রপ্রকম্পিনী॥” (মাধবনিদান)

এই রোগে মর্দ্য সকল অতিশয় উৎপীড়িত হয় এবং হিকা-কালে সর্ষাঙ্গ কাঁপিতে থাকে। [হিকা শব্দ দেখ]

মহাহিগন্ধা (স্ত্রী) গন্ধনাকুলী। (রাজনিং)

মহাহিমবৎ (পুং) মহাহিম অন্ত্যার্থে মতুপ্ মন্ত্ৰ ব। হিমালয় পর্বত।

মহাহিবলয় (ত্রি) মহাসর্প দ্বারা বেষ্টিত।

মহাহিশয়ন (স্ত্রী) বিষ্ণুর অনন্তশয্যা।

“নগ্নতঃ নীলকণ্ঠস্ত মহাহিশয়নং হরঃ” (উদ্ভট)

মহাহেতু (পুং) অত্যাধিক সংখ্যা।

মহাহু (পুং) মধ্যাহ্ন, মধ্যদিন।

মহাহ্রদ (পুং) ১ বৃহৎ পুষ্করিণী। (মহু ১।১।২৬৩) ২ তীর্থভেদ। ৩ শিব।

মহাহ্রস্ব (ত্রি) অতি ধর্ম। দ্বিগাং টাপ্, মহাহ্রস্বা কপিকচ্ছ।

মহি (স্ত্রী) মহতে ইতি মহ-পূজায়াং অদন্ত চুরাদি, (সর্ষধাতুভ্য ইন্। ঊণ্ ৪।১।১৩) ইতি ইন্। ১ পৃথিবী। (শব্দমালা)

২ মহৎ। “সত্যোমন্তমহি কৰ্ম করিষ্যতঃ” (ঋক্ ২।২৪।১৪)

‘মহি মহৎকৰ্ম করিষ্যতঃ’ (সায়ণ) ৩ মহিমা।

“দন্তেচ্চতুর্ভিঃ খেঁতাজেহঁরন্ ভগবতো মহিম্॥” (ভাগ ৮।৮।৪)

‘মহিঃ মহিমানং’ (স্বামী) ৪ মহত্ত্ব। “বিজ্ঞানশক্তিঃ মহি-মামনস্তি” (ভাগ ২।১।৩৫) ‘মহিঃ মহত্ত্বং’ (স্বামী)

মহিকা (স্ত্রী) মহ (কুন্ শিল্লিসংজ্ঞায়োরপূরুতাপি। উণ্ ২।৩২) ইতি কুন্ টাপ্, অত ইৎ। হিম। (অমর)

মহিকেরু (ত্রি) প্রৌঢ়কণ্ঠা। “মহিকেরব উতয়ে প্রিয়মেধা অহুযত” (ঋক্ ১।৪।৫৪) ‘মহিকেরবঃ প্রৌঢ়কণ্ঠাঃ, মহ-

পূজায়াঃ ঔণাদিক ইন্ প্রত্যয়ঃ, ডুক্-করণে কণাবাজীত্যাণ্, মহয়ো মহাস্তঃ কারবো ঘেবাং তে তথোক্তাঃ, আকারন্তৈকারা-দেশজ্ঞানসঃ, বহুতীহো পূরুপদপ্রকৃতিস্বরং’ (সায়ণ)

মহিষ্কত্র (ত্রি) প্রভূত বল, অতিশয় পরাক্রমশালী।

“বরুণায় বিপাগিরা মহিষ্কত্রাবৃতং বৃহৎ” (ঋক্ ৫।৫৮।১)

‘মহিষ্কত্রো প্রভূতবলো যুবাং’ (সায়ণ)

মহিঞ্জক (পুং) মৃষিক। (বৈজ্ঞকনিঃ)

মহিত (ত্রি) মহতে স্নেহিত মহ-পূজায়াং (মতিবুদ্ধিপূজার্থে-  
ভাশ্চ। পা ৩।২।১৮৮) ইতি ক্র। ১ পুজিত। ২ পিতৃগণবিশেষ।

“মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমান্ মহাবলঃ।”

(মার্কণ্ডেয়পুঃ ৯৬।৪৩)

স্নিগ্ধাং টাপ্। মহিতা, নদীভেদ। (ভারত ৬।৯।২১) ৪ মহব্।

“সখ্যঃ সখেব পিতৃবৎ তনয়স্ত সৰ্ব্বং

সেহে মহান্ মহিতয়া কুমতেরথং মে।” (ভাগ ১।১৫।১২)

‘মহিতয়া মহেশ্বন’ (স্বামী)

মহিত্রী (স্ত্রী) ঋগ্বেদের ১০।১৮৫ স্তকের মন্ত্রভেদ।

মহিত্ব (ক্লী) আধিক্য, প্রভূতত্ব, মহব্। “ইন্দ্রঃ পরশ্চ সু  
মহিত্বমন্ত বজ্রিণে” (ঋক্—১।৮।৫) ‘মহিত্বং পুরোক্তং দ্বিবিধং  
আধিক্যং, মহোরিন্ (উণ্ ৪।১।১৭) ইত্যোণাদিক ইন্, মহে-  
ভাবঃ মহিত্বং, ত্ব ইতি প্রত্যয়স্বরণোদাত্তঃ’ (সায়ণ)

মহিত্বন (ক্লী) মহদ। “তবঃ সৃজাতা মকতো মহিত্বনঃ”

(ঋক্ ১।১৬৬।১২) ‘মহিত্বনং মহত্বং’ (সায়ণ)

মহিদাস (পুং) ইতরার পুত্রভেদ। (ছান্দোগ্য উপঃ ৩।১৬।৭)

মহিন্ (ত্রি) মহ ‘প্রেক্ষাদিভ্য ইনিঃ’ ইতি ইনিঃ। মহৎ।

“ভূমিঃ প্রবর্ততিমহা জিনোষি মহিনি” (ঋক্ ৫।৮।১১)

‘মহিনি মহতি’ (সায়ণ)

মহিন (ক্লী) মহতি মহতে বা মহ-পূজায়াং, (মহোরিন্ চ।

উণ্ ২।৫৬) ইতি চকারাদিত্যুক্তেঃ ইনন্। ১ রাজ্য। (উজ্জল)

(ত্রি) ২ পূজনীয়। “প্রায় হুতো সখ্যঃ শ্রাম মহিন! প্রেষ্টাঃ”

(ঋক্ ৬।২৬।৮) মহিন পূজনায় ইন্দ্র’ (সায়ণ)

মহিনস (পুং) শিবের মূর্তিভেদ। (ভাগবত ৩।২।১২)

মহিষ্কক (পুং) ১ ইন্দ্র। ২ নকুল, বেজী। ৩ ভারবহনার্থ  
দন্তসংলগ্ন রজ্জু।

মহিমথ (ত্রি) দেবসত্ত্ব। “অস্ত স্তবে মহিমথস্ত রাধঃ”

(ঋক্ ১।১২২।৮) ‘মহিমথস্ত মহি মহৎ পূজ্যং মথোধনমসং

বা যন্ত দেবসংযন্ত’ (সায়ণ)

মহিমন্ (পুং) মহতে, ভাবঃ মহৎ (পৃথাদিভ্য ইমনিজ্, বা।

উণ্ ৫।১।২২) ইতি ইমনিচ্ ততঃ (টেঃ। পা ৬।৪।১৫৫)

ইতি টিলোপঃ। মহত্ব, অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্যবিশেষ।

“অগিমা লবিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।

ঐশিষ্যক বশিষ্যক তথা কামবাসায়িতা।” (অমরটীকা ভারত)

মহিমা ঐশ্বর্য লাভ হইলে তাহার প্রভাব এত বর্ধিত

হয় যে, তিনি ষাধা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে সমর্থ হইয়া  
থাকেন। যোগ দ্বারাই অগিমাাদি অষ্টৈশ্বর্য লাভ হইয়া  
থাকে। [যোগ শব্দ দেখ।]

২ মাহাত্ম্য। (ভাগবত ৮।৫।১৩) ৩ উৎকর্ষ। ৪ রাজতন্ত্র-  
দ্বিগুণিত একজন মন্ত্রিপুত্র।

“সন্তুষ্ট চক্রদৈরাজ্যং মহিমঃ পক্ষমাপ্রিতঃ।” (রাজতঃ ৬।২২০)

মহিমৎ (ত্রি) প্রচুর অধিক।

“যদ্ যদ্ গৃহে বরং কিঞ্চিৎ যদন্তি মহিমদ্বয়।” (ভারত ১৮।২২৫)

মহিমভট্ট (পুং) মন্মটভট্টের নামান্তর।

মহিমসুন্দর (পুং) জৈন গ্রন্থকারভেদ।

মহিমা (স্ত্রী) মহব্, মহিমন্।

মহিমাবৎ (ত্রি) পিতৃগণভেদ। (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৯৬।৪৬)

মহিম্নার (পুং) জনৈক রাজা। (হরিবং)

মহির (পুং) মহতে পূজ্যতে ইতি মহ-পূজায়াং সলিকল্যানি  
মহীতি। উণ্ ১।৫৫ ইতি ইলচ্ লস্ত রথঃ। সূর্য্য। (ত্রিকাঃ)

মহিরকুল (পুং) জনৈক রাজা। [মহিরকুল দেখ]

মহিলা (স্ত্রী) মহত ইতি-মহ-পূজায়াং (সলিকল্যানিমহীতি।

উণ্ ১।৫৫ ইতি ইলচ্ টাপ্। ১ স্ত্রীমাত্র। ২ প্রিয়সুলতা।

• (অমর) ৩ রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনিঃ) ৪ মদমত্তা।

(শব্দরত্নাঃ)

মহিলাখ্যা (স্ত্রী) মহিলা ইতি আখ্যা যন্তাঃ সা। মহিলা।

মহিলারোপ্য (ক্লী) দক্ষিণদেশস্থ একটা নগর।

মহিলাস্বয়া (স্ত্রী) মহিলা ইতি আস্বয়ো যন্তাঃ সা। মহিলা,  
প্রিয়সুলতা। পথ্যায়—

“প্রিয়সুঃ ফলিনী কাস্তা লতা চ মহিলাস্বয়া।

গুজ্জা গুজ্জফলা শ্রামা বিশ্বক্সেনান্দ্রানাপ্রিয়া।” (ভাবপ্রঃ)

মহিলি, ছোট নাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গবাসী পার্শ্বত জাতিবিশেষ।

পালকীবহন ও ক্ষেত্রকর্ষণই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

কেহ কেহ বাঁশের খুড়ী প্রভৃতিও প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ইহার সাধারণতঃ বাঁশফোঁড়, পাতর, সূলাকী, তাণ্ডি ও

মুণ্ডা নামক পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই পাঁচ শ্রেণীতে

আবার ৩৪টা স্বতন্ত্র থাক দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বিভিন্ন বংশের

নামের সহিত সাঁওতালদিগের শ্রেণীবিশেষের নামের সাদৃশ্য

আছে। মহিলি-মুণ্ডাদিগকে কেহ কেহ মুণ্ডাজাতির অপর

একটা শাখা বলিয়া মনে করেন।

মানভূমের পাতর-মহিলিগণ অনেকাংশে হিন্দু-আচরণ

গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে গোশূকরাতির মাংস ভোজন

নিষিদ্ধ। তাহারা এক থাকের মধ্যে অথবা মাতৃকুলে বিবাহাদি

করে না। কিন্তু সপ্তম পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিতে কোন

দোষ নাই। প্রকৃত বিবাহ হইবার পূর্বে বরগৃহে একটি আত্ম-বৃক্ষের সহিত বরের এবং কস্তাগৃহে একটি মহারবৃক্ষের সহিত কস্তার বিবাহ হয়। সিন্দূরদান ও লোহবলয়ধারণই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই।

হিন্দু পূজাপদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপ অনেকাংশে অমুকরণ করিলেও তাহাদের মধ্যে এখনও বড় পার্থক্য ও মনসাদেবীর পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার কুম্মী, ভূমিজ ও দেশওয়ালী সাঁওতালদিগের হস্তে অঙ্গগ্রহণ করে না। মানভূমের উত্তরের মহিলিগণ শব সমাধিস্থ করে, কিন্তু পাতর-মহিলা ও সাঁওতালপরগণাবাসী মহিলিগণ শব দাহ করিয়া থাকে। ১১শ দিনে তাহার মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে এবং পিও দেয়। এতদ্বিধি প্রতিবর্ষের কাষ্টিক ও চৈত্রমাসে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে ইহার এক একটি যাম্মাসিক শ্রাদ্ধের (পিওদানের) আয়োজন করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি বিশেষের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ কেহই করে না।

প্রায়ই মিতাক্ষরা ও দারভাগের ব্যবস্থানুসারে ইহাদের উত্তরাধিকারীরা পিতৃসম্পত্তির ভাগ পাইয়া থাকে।

**মহিবৃধ্** (ত্রি) ধনবর্দ্ধক। (ঋক ৭৩১।১০)

**মহিব্রত** (ত্রি) মহাব্রত। “অয়ং য উবর্ষী মহিনা মহিব্রতঃ”

(ঋক ১১৫।৩) ‘মহিব্রতঃ মহাব্রতঃ’ (সায়ণ)

**মহিষ** (পুং) মংহতি পূজয়তি দেবাননেতি, মহি (অধি) • মহোষ্টিষচ্। উৎ ১১৬ ইতি টিষচ্। স্বনামখ্যাত পশু-বিশেষ। পর্যায়,—লুপাণ, বাহদ্বিষন, কাসর, সৈরিভ, ধমবাহন, বিষজরন, বংশভীক, রজ্জ্বল, আনুপ, রক্তাক, অম্বারি, ক্রোধী, কলুষ, মত্ত, বিষাগী, গবলী, বলী। (জটধর)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজভেদে মহিষ পাঁচ প্রকার।

ব্রাহ্মণজাতি—অতিশয় ক্রোধবর্ণ, পবিত্র, ঘোণ ও বৃষণ, অতিবৃহৎ, বহুবোজী ও মারক। ক্ষত্রিয়জাতি—কেকরবৃত্ত, কামল, স্থল, অতিক্রোধ, মারক, বহুবোজী ও প্রভূতবলশালী। বৈশ্যজাতি—শিথিলাঙ্গ, ক্ষীণশৃঙ্গ, অতিক্রোধ, ভারবাহনক্ষম, অমারক ও প্রভূত বলশালী। শূদ্রজাতি—ক্ষীণাঙ্গ, ক্ষীণবল, ক্ষীণশৃঙ্গ, ক্ষীণঘোণ, অল্পক্রোধ, অল্পবোজী এবং ভারসহিষ্ণু।

অন্ত্যজজাতি—যে সকল মহিষ সর্বদা জলাভিলাষী, অন্ন-স্ব, মহাতেজস্বী, ভারসহিষ্ণু ও কুশ্ল, তাহাদিগকে অন্ত্যজ-জাতি কহে। \*

বনমহিষমাংসগুণ—দোষকারক, লঘু, দীপন, বলদায়ক। গ্রাম্য মহিষমাংসগুণ,—দ্রিগ্ধ, মলিনকর, পিত্তহর। (রাজনিং) রাজবল্লভমতে—তর্পণ, দ্রিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, গুরু, নিদ্রা, পুংস্ব ও স্তম্ভবর্দ্ধক এবং মাংসদার্যকার। ভাবপ্রকাশমতে পর্যায়—ঘোটকারি, কাসর, পীনস্বদ, কৃষ্ণকায়। মাংস গুণ—উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ুনাশক, নিদ্রাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, শরীরের দৃঢ়তা-জনক, গুরু, পুষ্টিকারক, মলমূত্রনিঃসারক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্রং)

দেবী ভগবতীর উদ্দেশে মহিষ বলি দিলে তাহার পরম-তৃপ্তি হয়। ইহার ফলে সাধকের শতবর্ষ স্বর্গ হইয়া থাকে।

(কালিকাপুং)

মহিষের স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ ও স্থলকায়, ভারবহনে পটু এবং জলময় কর্দমাক্ত স্থানই ইহাদের প্রিয়। কপালদেশ কুজ, শূলদ্রব বৃহৎ ও বক্র। শিরঃসংলগ্ন স্থান অপেক্ষাকৃত স্থল ও চেন্টা, পদদ্বয় সরু এবং ক্ষুর দ্বিখণ্ডিত, গাত্রে বিরল লোম, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড, মুখদেশ ও উদরের মধ্যস্থল এবং পদ-গ্রন্থিসমূহ অপেক্ষাকৃত অধিক লোমযুক্ত; অবশিষ্ট গাত্রচর্ম লোমহীন ও মন্থণ। ইহাদের ছাল পাতলা হইলেও চর্ম তেমন পাতলা নহে। নিতম্বদ্বয়ের চর্ম শরীরের অপরাপর স্থানাপেক্ষা স্থল। ইহাতে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী জুতার তলা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মহিষগণ ক্রোধের প্রতিমূর্তি। অত্যন্ত পশু অপেক্ষা ইহাদের বলবৎ ক্রোধের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। নদী-বক্ষে সম্ভরণকালে যদি কোন কুস্তীর দৈবাৎ অলক্ষ্যে কোন মহিষশাবক অথবা ইহাদের দলন্ত গো-শাবক প্রভৃতিকে ধরে, তাহা হইলে মহিষের হস্তে পরিজ্ঞান পাইবার আর কোন উপায় নাই। মহিষগণ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নদীবক্ষ উদেলিত করে। কুস্তীর যেখানে সেই শাবক লইয়া গিয়াছে, জলাভ্যন্তরে সেই স্থানে তাহার অহুঁসরণ করিয়া শূল দ্বারা

কেকরা: কামলা: স্থলা ভৃশং ক্রুদ্ধাশ মারকা:।

বহ্মাশিনো বহবলা মহিষা: ক্ষত্রজাতয়:।

রথাকা: ক্ষীণশূল্য হকৃদ্ধা ভারবাহিন:।

অমারকা বহবলা মহিষা বৈশ্যজাতয়:।

ক্ষীণা: ক্ষীণবলা: ক্ষীণশূল্যঘোণারবণ্ড যে:।

অন্নশিনো ভারসহা মহিষা: শূদ্রজাতয়:।

সর্বদা জলমিচ্ছন্তি বেহজস্বা মহৌজস:।

ভারসহা: কুশূল্যাক্ত তেহস্ত্যজা মহিষা মতা:।

এবাং দোষা গুণা বাপি বৃষবল্লভয়েষু ধ:।

পৌষণকাপি সংহানং বৃষভূল্যা তথা মতম্।” (যুক্তিকল্পতরু)

\* “ভৃশং ক্রুদ্ধা: পবিত্রাশ বৃহদ্বৃষণযোগকা:।

বহ্মাশিনো মারকাস্ত মহিষা ব্রহ্মজাতয়:।

বিক্র করে এবং তৎপরে সেই মৃত কুস্তীরকে লইয়া জলগর্ভ হইতে তুলিয়া ফেলে। এই জন্তই ‘মবের সিং বেকা, ঘোমবার বেলা একা’ প্রবাদ বাক্য রচিত হইয়াছে।

ইহাদের স্বভাবজ্ঞানও অপর সকল পশু অপেক্ষা অধিক। কিংবদন্তী এইরূপ যে, কোন পুত্রস্থানীয় মহিষের দ্বারা মাতৃ-সম্পর্কার মহিষীর সন্তানোৎপাদন করাইতে গেলে, ইহারা স্বভাবজ্ঞানে সেই বিরুদ্ধ-সম্পর্ক-সঙ্গম করে না। কখন কখন তাহার এই ঘৃণিতকার্য্যে এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, স্বীয় পালকের প্রাণসংহার করিতেও কুষ্ঠিত হয় না।

সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেত অথবা ধূসর বর্ণের মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহপালিত ও বন্যভেদে ইহা দুই প্রকার। গৃহপালিতগুলি প্রধানতঃ মহিষ বা ভটস (Bos Buffalus) এবং বন্যগুলি আর্গা (Bos Arna) নামে খ্যাত। বন্য মহিষ-গুলি এরূপ দুর্দ্বর্ষ যে তাহাদের বশ্যতার চিহ্ন বা ভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। ইহারা কুপিত হইয়া সময় সময় মনুষ্যকে আক্রমণ করে। যদি মনুষ্য জীবনরক্ষার্থ নিকটবর্তী কোন বৃক্ষে আরোহণ করে, তাহা হইলেও বন্য মহিষের ক্রোধ হইতে তাহার নিস্তার নাই। উন্নত মহিষ তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষের গোড়ায় আসিয়া শৃঙ্গ দ্বারা বৃক্ষমূল উৎপাটিত করিতে চেষ্টা পায়। বৈরনির্যাতনপর এরূপ জীব জগতে বিরল।\*

ইহাদের শৃঙ্গ সাধারণতঃ সরল ও লম্বা (macrocerus) এবং ধনুকাকার (Spirocerus) হইতে দেখা যায়। আর্গা মহিষগুলি বন্যপ্রদেশে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহারা প্রায় ১০।০ ফিট পর্যন্ত লম্বা ও ৬ ফিট উচ্চ হয়। গৃহপালিত মহিষগুলির অপেক্ষা ইহারা অধিক বলবান্। এমন কি, কোন কোন সময়ে ইহারা ক্রোধবশে অধিক বলশালী হস্তীকেও গুঁতাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

শরৎ কালে ইহারা সঙ্গম করে। ঐ সময় মৈথুনক্ষুর্তি পরবশ পুংমহিষগুলি কতকগুলি মহিষী লইয়া এক একটা স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হয়। তৎকালে প্রণয়যুগলের প্রেমোন্মাদ ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। মহিষী ১০ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া অবশেষে ১টা কিংবা দুইটা সন্তান প্রসব করে। গৃহপালিত মহিষগুলি আর্গা অপেক্ষা একতৃতীয়াংশ ক্ষুদ্র হয়। উত্তর জাতীয় মহিষই তৃণশূন্যস্থানে থাকিতে ভাল বাসে। পশ্চিম জলাভূমিই ইহাদের মনোরম আবাসভূমি। মেলিরিয়া-প্রধান মশকবহুল কদম্ব ভূমিতে বাস হেতু ইহাদের শারীরিক কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। মেনিলা (Manilla)

দেশীয় মহিষকে একটা স্বতন্ত্রধাকের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার Bubalus caffer ভারতীয় মহিষ অপেক্ষা ভিন্নাকৃতি। ইহাদের শৃঙ্গদ্বয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং করোটীর ঠিক মধ্যস্থল হইতে—চিহ্নের দ্বারা দুই দিকে প্রধাবিত। ইহারা প্রায় ৫ বা ৬ শত একত্র দলবদ্ধ হইয়া বনান্তরালস্থ সমতল ক্ষেত্রে বিচরণ করে। মনুষ্য ও শত হাতের মধ্যে না আসিলে ইহারা দেখিতে পায় না। শত্রুকে নিকটে আসিতে দেখিলে প্রথমে ইহারা সদলে একবার নিরীক্ষণ করে, পরে পুনরায় ইহারা পূর্ববৎ তৃণচর্ষণে নিযুক্ত হয়। শত্রু কর্তৃক আহত মহিষ উচ্চঃস্বরে চীৎকার করিয়া শত্রুকে আক্রমণার্থ ভীমবেগে ধাবিত হইয়া থাকে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির ও চীৎকারপর মহিষের ভীষণ আক্রোশ দেখিলে স্বভাবতঃ হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। পুনর্বর্ণের ভ্রমণবৃত্তান্ত-পাঠে জানা যায় যে, এইরূপ আঘাতোন্মত্ত একটা মহিষ বলবদবেগে আসিয়া আক্রমণকারীর অশ্বকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার অস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ ও মাংসপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া-ছিল।

মহিষের মাংস খাইতে উত্তম ও সদাক্ষয়কৃত। বৃদ্ধ মহিষ অপেক্ষা অল্প বয়স্ক শাবকের মাংস বিশেষ উপাদেয়। ইহাদের শৃঙ্গে নানারূপ কারুকার্য্যযুক্ত খেলনা ও চিত্রণী প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২ অশ্বধারা স্নেহজ্ঞাতবিশেষ। এই জাতি পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে সগররাজ ইহাদিগকে বেদাদিতে অধিকার না দেওয়ায় ইহারা অস্ত্র বেশ ধারণ করিয়া স্নেহ হয়।

“সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ।

ধর্ম্যং জঘান তেষাং বৈ বেশাভ্যং চকার হ ॥

অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসজ্জয়ৎ।

জবনানাং শিরঃ সর্কং কাশোজানাং তথৈব চ ॥

পারদা মুক্তকেশাশ্চ পঙ্কবাঃ শশ্রুধারিণঃ।

নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতান্তেন মহাত্মনা ॥

কোলিসর্পাঃ সমহিয়া দার্কাস্চোলাঃ সকেরলাঃ।

বশিষ্ঠবচনাদ্রাজন্ সগরেন মহাত্মনা ॥” (প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব)

গবাদি জন্তুর সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণিতত্ত্ববিদগণ এই স্বনামপ্রসিদ্ধ চতুষ্পদ পশুকে Bovidae শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে, বাসহেতু ইহাদের শরীরগঠনেরও নানারূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই আবাসবিক বৈলক্ষ্যনিবন্ধন তাহারাই মহিষ জাতির মধ্যে কএকটা স্বতন্ত্র ধাক নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

৩ অর্ঘ্যভের ধবজবিশেষ। (হেম) ৪ মহিষ্যস্তুর।

\* Sparrmann's Voyage to the cape, Vol. II.

“মহিষেঃসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ।

তত্রাস্তুরৈর্মহাবীর্যৈর্দেবসৈস্তং পরাজিতম্ ॥”

( মার্কণ্ডেয়পুঃ চণ্ডী ৮২১ )

৫ দেবগণভেদ, নিরুক্তমতে মাধ্যমিক দেবগণ। “অপামু-  
পশ্বে মহিষা অগৃভ্ণং বিশো রাজানমুপতনুঃ” ( নিরুক্ত ৭১২৬ )

‘মহিষা মাধ্যমিকা দেবগণাঃ অথবা মহিষাঃ ত এব মহাস্তঃ’  
( টীকায় দ্রুগাচার্য ) ৬ কুশদ্বীপস্থিত পর্বতবিশেষ। ( মৎস্রপুঃ  
১২১৫৯ ) ৭ অগ্নিবিশেষ। ( মৎস্রপুঃ ১২১৬০ ) ৮ কুশদ্বীপের  
বর্ষবিশেষ। ( মৎস্রপুঃ ১২১৬৮ ) ৯ কৃত্যভিষেক ভূপাল,  
যে রাজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

“কৃত্যভিষেকে ভূপালে লুলাপে মহিষঃ স্বতঃ ॥”

( অমরটীকায় ক্রদ ) ১০ দেশভেদ। ( বৃহৎসং ৯১০ )

১১ অমরত্বের পুত্রভেদ। ( ভাগবত ৬১৮১৬ ) ১২ সাধ্যা-  
পুত্র। ( হরিবংশ ১৯৬৪৫ )

মহিষক ( পুং ) জাতিবিশেষ।

মহিষকন্দ ( পুং ) মহিষাখ্যায় প্রসিদ্ধ কন্দঃ। মহাকন্দ বিশেষ।  
পর্যায়—শুভ্রানু, লুলাপকন্দ, শুক্লকন্দ, মহিষীকন্দ। ইহার  
গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বাতনাশক, মুখজাড্যহর, রুচিকর,  
ইহা কৃষ্ণ হইলে মহাসিদ্ধিকর হইয়া থাকে।

মহিষদ্বী ( স্ত্রী ) মহিষঃ মহিষাসুরঃ হস্তীতি হন-বাহুলক্য  
টক্ ভীপ্। ভগবতী দ্রুগা।

“মহিষদ্বী মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।

আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্ত তে ॥”

( দ্রুগোৎসবপদ্ধতি )

মহিষত্ব ( স্ত্রী ) মহিষস্ত ভাবঃ ত্ব। মহিষের ভাব বা ধর্ম।

মহিষধ্বজ ( পুং ) মহিষো ধ্বজশ্চিহ্নঃ বাহনভেন যন্ত। ১ যম।  
২ অর্হদ্বিশেষ। ( হেম )

মহিষপাল ( পুং ) মহিষঃ পালয়তি পালি-অচ্। মহিষপালক।

মহিষবাহন ( পুং ) মহিষঃ বাহনং যন্ত। যমরাজ।

“মহিষ ঙ্ং মহাবীর যমরাজস্ত বাহন !” ( দ্রুগোৎসবপদ্ধতি )

মহিষমর্দিনী ( স্ত্রী ) মহিষঃ মহিষাখ্যমসুরঃ মৃদনাভীতি মৃদ-  
নি-ভীপ্। দ্রুগা। এই মহিষমর্দিনী দেবীর অষ্টাঙ্গুরী মন্ত্র  
দ্বারা পূজা করিতে হয়।

“ভাণ্ডং বিয়ং সনয়নং ষ্ঠেতো মর্দিনী ঠধ্বয়ম্।

অষ্টাঙ্গুরী সমাখ্যাতা বিজ্ঞা মহিষমর্দিনী ॥” ( তন্ত্রসার )

তন্ত্রসারে ইহার পূজাদির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

ইহার ধ্যান—

“গাক্রোড়োপলসমিভাং মণিস্বকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ

নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাজনিষেহুদ্বীম্।

শম্ভচক্রকুপাগথৈটকবাণকামুকশূলকান্

তজ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহতিঃ শশিশেখরাম্ ॥” ( তন্ত্রসার )

এই ধ্যানেই মহিষমর্দিনীর পূজা হইয়া থাকে।

মহিষমৎস্র ( পুং ) মৎস্রবিশেষ। এই মৎস্য কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ-  
কায়, বলবান ও মহাশক, ইহার গুণ দীপন ও বলবীর্ঘ্যকর।

মহিষমস্তক ( পুং ) শালিধাতু বিশেষ, শালিধান। ( ভাবপ্র° )

মহিষবল্লী ( স্ত্রী ) মহিষশব্দবাচ্য বল্লী, শাকপাখিবাতিবৎ  
সমাসঃ। লতাবিশেষ। হিন্দী—ফিরফিট; মহারাষ্ট্র—মহিষ-  
বেলী; কলিঙ্গ—গ্রাম্যবল্লী। সংস্কৃত পর্যায়—সোম্য,  
প্রতিসোম্য, অম্রবল্লিকা, খণ্ডশাখা, ইহার গুণ—  
সোমবল্লী সদৃশ। ( রাজনি° )

মহিষার্দ্রন ( পুং ) স্বদের নামান্তর।

মহিষাসুর ( পুং ) মহিষ এব মহিষাখ্যোবা অসুর। অসুর-  
ভেদ, রম্ভাসুরের পুত্র।

মহিষাসুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে লিখিত  
আছে,—রম্ভ নামক ঋনৈক দৈত্য বহুকাল পর্য্যন্ত মহাদেবের  
আরাধনা করিয়া অবশেষে তাহার প্রসন্নতা লাভ করে।  
মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাকে বরদানে উত্তত হইলে অপুত্রক  
রম্ভাসুর মহাদেবকে বলে—দেব ! আমি আপনার নিকট অত্র-  
বর চাহিনা, আগনি জন্মত্রয় পর্য্যন্ত আমার পুত্ররূপে উৎপন্ন  
হইয়া ত্রিলোকে অজেয়, চিরায়ু, বশস্বী, শ্রীমান্ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ  
হউন, মাত্র ইহাই আমার প্রার্থনা। মহাদেব দৈত্যকে বর-  
দানে পরাযুগ হইলেন না। তিনি তথাস্ত বলিয়া অঙ্গীকার  
করিলেন।

রম্ভাসুর বরলাভে হর্ষোৎকুল হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান  
করিতে লাগিল। পথে যাইতে যাইতে এক অন্নবরষা ঋতু-  
মতী মহিষী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। বিধির বিধানে  
কামের তাড়নে মহিষীর সহিত রম্ভাসুরের সঙ্গম ঘটিল। সঙ্গম-  
ফলে মহাদেব মহিষাসুররূপে মহিষীর গর্ভ আশ্রয় করিলেন।  
মহিষাসুর ভূমিষ্ঠ হইল। রম্ভের প্রার্থিতপূর্ব বর অমুসারে  
তাহার পুত্র সর্বপ্রকারে বরীয়ান হইয়া অবাধে সুরাসুর  
রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল।

মহিষাসুর ঘোর মায়াবী ছিল। সে এক সময় এক  
মনোমোহিনী রমণীরূপে কাত্যায়ন মুনির শিষ্যদিগকে ভুলাইয়া  
তাঁহাদিগের তপোবিষের চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া হিমালয়-  
শিখরবাসী মুনিবর কাত্যায়ন ক্রোধে তাকে জীলোকের  
হস্তে নিহত হইবার জ্ঞপ্তি অভিষাপ প্রদান করেন এবং এই  
অভিষাপের ফলেই শেষে তাকে ভগবতী দ্রুগাদেবীর হস্তে  
নিহত হইতে হয়।

মহিষাসুর তিনবার জন্ম গ্রহণ করে, তিন বারই দেবী ত্রিবিধরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। মহিষাসুরকে বধ করিবার অন্ত ভগবতী প্রথমে উগ্রচণ্ডা, দ্বিতীয়বার ভদ্র-কালী এবং তৃতীয়বার দুর্গারূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

বরপ্রাপ্ত রক্তাসুরতনয় মহিষাসুর যখন দেব ও অসুর-গণের উপর পূর্ণপ্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, তখন সে এক দিন হিমালয়শ্রেণীে নিমজ্জিত থাকিয়া এইরূপ এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিল,—যেন ভগবতী ভদ্রকালীরূপ ধারণ করিয়া করাল আস্ত্র বিস্তারপূর্বক তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া লোল-রসনার রক্তপান করিতেছেন। স্বপ্নদর্শনান্তে মহিষাসুর তদবধি একাগ্রমনে ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিল। ভগবতী হঠাৎ হইয়া সাফাং আবির্ভূত হইলেন। তখন মহিষাসুর নতকন্ডরে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিল,—দেবি! আমি স্বপ্নে যেমন দেখিয়াছি, তাহা অস্ত্রা হইবার নহে এবং তাহাতে আমি ক্রুদ্ধও নহি। আমি তিন মনস্তর কাল পয্যন্ত নিশ্চিন্তেই স্বপ্নাভ্যাস করিয়াছি, ভোগস্বপ্নের কিছুই আমার অবশিষ্ট নাই। তবে তোমার নিকট আমার অন্তিম প্রার্থনা এই যে তুমি আমাকে সর্বস্বজ্ঞে পূজার্হ করিয়া দাও, আর চিরদিন যেন তোমার পদসেবায় অতি-বাহিত করিতে পারি, আমি এই ভিক্ষাও প্রার্থনা করি। দেবী বলিলেন,—মহিষাসুর, যজ্ঞভাগ আর অবশিষ্ট নাই, উহা দেবগণের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে আমার পদসেবায় নিযুক্ত রাখিব এবং যে যেখানে আমার পূজা হইবে, তুমি সেই সেই স্থানেই পূজা প্রাপ্ত হইবে। ভগবতী এই বলিয়া উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গা এই ত্রিবিধ নিজ মূর্ত্তির সহিতই মহিষাসুরের পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বামনপুরাণে লিখিত আছে—রক্ত ও করমুক্ত নামক দুই প্রবল পরাক্রম অসুর পূর্বকালে পঞ্চ নদের জলে নিমগ্ন হইয়া পুত্রলাভলাভস্বরূপ বহুদিন পর্য্যন্ত কঠোর তপস্তা করে। ইন্দ্র তপস্তায় ভীত হইয়া কুন্তীর রূপ ধারণপূর্বক করমুক্তে বিনাশ করেন। রক্ত দুঃসহ ভ্রাতৃবিয়োগে কাতর হইয়া নিজ মস্তকচ্ছেদনপূর্বক বহ্নিতে হোম করিতে উত্তত হয়। বহ্নি এই ব্যাপার দেখিয়া রক্তকে সেই দারুণ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করেন এবং তাহাকে অভিমত বর প্রদানে প্রতিশ্রুত হন। তখন রক্ত আত্মহত্যা হইতে বিরত হইয়া অগ্নির নিকট এক টেরলোকাবিজ্ঞায়ী পুত্র প্রার্থনা করে। অগ্নিদেব ‘তথাস্ত’ বলিয়া অন্তর্হিত হন। রক্ত বৎসাতে উৎফুল্ল হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল; কিন্তু ভবিষ্যতানিবন্ধন পথি মধ্যে এক সুবতী মহিষা দেখিয়া কাম্পকুলমনে তাহাতেই সমাসক্ত

হইল। রক্তের সংসর্গফলে মহিষীর গর্ভ হয় এবং সেই গর্ভ হইতেই যথাকালে দৈবাসুরবিজয়ী মারাবী মহিষাসুর জন্ম লাভ করে। (বামনপুঃ ১৭ অঃ)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবী বৈষ্ণবী কতৃক মন্দরপর্বতে দৈত্য মহিষাসুর নিহত হয়। অতঃপর ঐ মহিষাসুরই পুনরায় চৈত্রাসুর নামে খ্যাতি লাভ করিলে দেবী নন্দা বিক্র্যাচলে থাকিয়া পরে তাহাকেও বিনাশ করেন। অথবা জ্ঞানশক্তির হস্তে অজ্ঞানমূর্ত্তি মহিষাসুর নিধনপ্রাপ্ত হয়।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—পূর্বকালে এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত দেব ও অসুরগণের সংগ্রাম হয়, এই দীর্ঘকালব্যাপী ঘোর সংগ্রামে দেবগণ অসুরগণের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে অসুরাধিপতি মহিষ স্বর্গ হইতে সুরগণকে তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গই ইন্দ্র হইয়া অমরপুরে আধিপত্য করিতে থাকে। দেবগণ মহিষাসুরের হস্তে পরাজিত ও নিগৃহীত হইয়া ভয়ে স্বর্গভূমি পবিত্রাঙ্গ-পূর্বক মঠে মঠবাসীর জায় বিচরণ করিতে থাকেন। পরে ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া যথায় হরি ও হর অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হন। এইখানে আসিয়া তাঁহার সকলেই তাঁহাদিগের উপর মহিষাসুরের অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করেন। মহিষাসুর নিজ ভূজবলে ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও অগ্নি ঐভূতি দেবধিপগণের স্ব স্ব অধিকার-ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে, এই কথা শুনিয়া এবং দেবগণকে শরণাপন্ন দেখিয়া হরি ও হর উভয়েই সাকোপে জ্রম্মী করিলেন। তখন কোপ-কষায়ত-নয়ন হরি, হর ও ব্রহ্মা এই তিনজনই বদনমণ্ডল হইতে এক এক মহাতেজ নির্গত হইল। ক্রমে সমস্ত দেব-গণেরই শরীর হইতে স্ব স্ব সূক্ষ্ম তেজ নির্গত হইয়া সেই ত্রীশূলচলসম্মিত তেজঃপুঞ্জ একত্র হওয়ার তাহা হইতে এক অদ্ভুত নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তখন সেই অচিন্তিত-পূর্ব ভূজলহস্রবিভূষিত ভীষণ অথচ প্রশান্তাকৃতি দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া দেবগণ তাঁহাকে স্ব স্ব আয়ুধাদিদানে সম্মানিত করিলেন। এই সময় দেবীর আস্ত্র অট্টহাস্তে পূর্ণ হইল। হস্তের প্রতিশব্দে যাবতীয় জল, স্থল, শৈল, কান্নন কাঁপিল এবং বসুন্ধরা ঘন ঘন টালিল। দেবগণের আশার সঞ্চার হইল, তাহার ভক্তিতরে সিংহবাহিনীর স্তুতিপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

হঠাৎ অদূরে ঘোরগর্জন শ্রুত হইল। মহিষাসুর সদল-বলে বিপুলবিক্রমে বিবিধ আয়ুধসহ যুদ্ধার্থে দেবীসম্মুখে আসিল। তখন দেবীসহ মহিষাসুরের ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ



হইল। বহুক্ষণ বহুবিধ যুদ্ধের পর সংহারিণী দেবীর হস্তে বাকুল, অসিলোমা ও বিড়ালাক প্রভৃতি মহিষাসুরের সেনাপতিগণ-পরিচালিত সৈন্তদল স্ব স্ব জীবন বিসর্জন করিল। দেবগণ তুষ্ট হইলেন। আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল। অতঃপর সৈন্তদল ও সেনানীদিগকে একে একে দেবীহস্তে নিহত ও নিগৃহীত হইতে দেখিয়া চিকুর ও চামর প্রভৃতি মহিষাসুরের প্রধান প্রধান সেনানীগণ দেবীসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘোর যুদ্ধ হয়, হস্তা, রথ, শকট ও অস্ত্রাস্ত্র যুদ্ধোপকরণ সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সেনাপতিগণ সকলেই নিহত হইল। অবশেষে মহিষাসুর স্বয়ং বিপুলবায়ু আশ্রয় করিয়া নানা মায়ায় নানা মূর্তি ধরিয়া দেবী অধিকার সহিত অত্যন্ত ভীষণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোপাক্রম-নয়না দেবী চণ্ডিকা মহিষাসুরের দৌরাস্ত্রো ব্যতিব্যস্ত হইয়া খড়্গাবাতে সহসা তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন। ছুর্ত্ত মহিষাসুর নিহত হইলে অসুর-সৈন্ত মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। দেবগণ হৃষ্ট হইয়া প্রকৃষ্ট স্তবে চণ্ডিকার তুষ্টি করিলেন।

মহিষাসুরসম্ভব (পুং) ভূমিজ গুণ্ডলু। (রাজনিং)

মহিষাসুরহস্তী (স্ত্রী) দুর্গা।

“মহিষাসুরহস্ত্যাশ্চ প্রতিষ্ঠা দক্ষিণায়নে।” (প্রতিষ্ঠাতং)

মহিষাক্ষ (পুং) মহিষস্ত অক্ষীবেতি (অক্সোহদর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ইতি সমাসাস্তোহচ্। গুণ্ডগুলু, মহিষাক্ষ গুণ্ডগুলু।

“ঐতায়ুঃ কালনিবাসঃ কোশিকো গুণ্ডগুলুঃ পুরঃ।

দেবধূপঃ সন্নসহো মাহিষাক্ষঃ পলঙ্কযা ॥” (বৈতক রত্নমালা)

মহিষাক্ষক (পুং) মহিষাক্ষ স্বার্থে কন্। গুণ্ডগুলু। (রাজনিং)

মহিষী (স্ত্রী) মহিষস্ত কৃত্যভিষেকস্ত নৃপস্ত পত্নী (পুংযোগাদা-  
খ্যায়াৎ। পা ৪।১।৪৮) ইতি ঙীষ্। কৃত্যভিষেকা রাজপত্নী, রাজার মহিষী, যে পত্নীর সহিত রাজা রাজ্য্যভিষিক্ত হন, তাকে মহিষী কহে। রাজার স্ত্রী মাত্রই মহিষীপদ-  
বাচ্য নহে।

“ইখং ব্রতং ধারয়তঃ প্রজার্থং সমুং মহিষ্যা মহনীয়কীর্ত্তেঃ।

সপ্ত ব্যতায়ুস্তিগুণানি তস্ত দানানি দীনোদ্ধরণোচিতস্ত ॥”

(বনু ২।২৫) ২ সৈরিক্কী। ৩ গুণ্ডিভেদ। (মোদনী)

মহিষপত্নী, মাদৌ মহিষ। পথ্যায়—মন্দগমনা, মহাক্ষারী, পয়স্বিনী, লুলাপকাস্তা, কলুষা, তুরঙ্গদ্বয়ী। ইহার হৃৎগুণ—মধুর, বিপাকে শীতল, গুরু, বল ও পুষ্টপ্রদ, বৃষা, পিত্ত, দাহ ও অপ্রনাশক। দধির গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকারক, রক্তপিত্ত-

নাশক, বল ও অস্ববদ্ধক, বলকর, শ্রময়। নবনীতগুণ—  
কষায়, মধুররস, শীতল, বলকর, পিত্তয়, ও হৌল্যকারক।  
দুতগুণ—ধৃতিকর, সুখদ, কাস্তবদ্ধক, বাতশ্লেষ্মনাশক,

বলকর, বর্ণবদ্ধক, গ্রহণীবিকারনাশক, মন্দানলোদীপক, চক্ষুর  
দীপ্তিবদ্ধক, হৃৎ ও মনোহারক। (ভাবপ্রকাশ) ইহার মূত্র-  
গুণ—আনাহ, শোফ, ও গুল্মদোষনাশক, কটু, উষ্ণ, কুষ্ঠ,  
কণ্ডুতি, শূল ও উদররোগনাশক। (রাজনিং)

মহিষীকন্দ (পুং) স্বনামখ্যাত মহাকন্দ বিশেষ। (রাজনিং)  
মহিষীদুত (ক্লী) মহিষী-হৃৎগুণে দ্ব্যত, চলিত ভৈঁসা ঘি।

“সবাতপিত্তশমনং স্নোভং মাহিষং দ্ব্যতম্।

মধুরং গুরু বিষ্টম্ভি বলাৎ শ্রেষ্ঠগুণায়কম্ ॥” (অত্রিসং ৮ অং)

ইহার গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক, শীতল, মধুর, শুক,  
বিষ্টম্ভী, বলকর এবং শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত।

মহিষীতক্র (ক্লী) মহিষী-হৃৎগুণে ঘোল। ইহার গুণ—কফ-  
বদ্ধক, কক্ষিৎ ঘন এবং গ্লীহা, অশ্ল, গ্রহণীদোষ ও অর্ভাসার  
রোগে প্রশস্ত। (অত্রিসং ৮ অং)

মহিষাদধি (ক্লী) মহিষীহৃৎগুণে দধি, চলিত মৈঁষে দধি। গব্য-  
দধি অপেক্ষা মহিষের দধি অতি সুখাদ ও উপাদেয়। গুণ—  
মধুর, রক্তদোষকর, কফ ও শোফহর, পিত্ত ও বাতবদ্ধক।

মহিষীদান (ক্লী) মহিষ-বলিদানরূপ প্রক্রিয়াভেদ।

মহিষীদুগ্ধ (ক্লী) মহিষীক্ষীর, ক্ষয়ের দুধ। গুণ—স্নিগ্ধ, বায়ু,  
শীতকর, তন্দ্রা ও নিদ্রাকর, বৃষ্যতম, শ্রময়, বলপ্রদ ও পুষ্টিকর।

মহিষীপাল (পুং) মহিষপালনকারী। যাহারা হৃৎগুণে জ্ঞাত  
মহিষী পোষে।

মহিষীপ্রিয়া (স্ত্রী) মহিষীগাং প্রিয়া। শুলীতৃণ। (রাজনিং)

মহিষীভাব (পুং) মাহিষা ভাবঃ। মহিষার ভাব।

মহিষীমূত্র (ক্লী) মহিষীর মূত্র, মেষের মূত্র। গুণ—তিক্ত,  
কটু, কষায়, ভেদক, বাতনাশক, পিত্তবদ্ধক, কুষ্ঠ, অশ্ল, পাণ্ডু,  
উদররোগ ও শূলনাশক।

মহিষোৎসর্গ (পুং) যাগভেদ।

মহিষ্ঠ (ত্রি) আতশর মহান্, অত্যন্ত বৃহৎ।

“স বৈ মহাভাগবতো মহাত্মা মহাত্মভাবো মহত্যং মহিষ্ঠঃ।”

(ভাগবত ৩।১৪।৪৬) ‘মহিষ্ঠঃ আতশয়েন মহান্’ (স্বামী)

মহিষ্টাৎ (ত্রি) ১ মহিষযুক্ত, অর্থাৎ যাহার মহিষ আছে।

(পুং) ২ জনৈক রাজা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৩ অঙ্গিরার কন্যা।

মহিষ্টানি (ত্রি) প্রভূত ধনশালী। (সায়ণ)

মহিষ্টাৎ (ত্রি) ১ মহনীয়। ২ মহোৎসব-যুক্ত।

মহিসুর, দক্ষিণভারতের অন্তর্গত একটা প্রাচীন হিন্দুরাজ্য।

এক্ষণে ইংরাজরাজের অধীনে একটা মিত্ররাজ্য বলিয়া গণ্য।

এই সামন্তরাজ্যের নামনিরুক্তি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী শুনা

যায়। কেহ কেহ ‘মহিষ উরু’ বা মহিষ-নগর নাম হইতে এবং

কেহ কেহ মহিষ-অসুর নামের অপভ্রংশ হইতে প্রাচীন মহিসুর

জনপদের নামোৎপত্তি স্বীকার করেন। অক্ষাঃ ১১° ৪০' হইতে ১৫° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪০' হইতে ৭৮° ৩০' পূঃ মধ্যে। মহিসূর-নগরে এই সামন্তরাজ্যের রাজধানী, কিন্তু বিচার-বিভাগ বঙ্গলুরে প্রতিষ্ঠিত। মহিসূররাজ্য ইংরাজাধিকারে আসিবার পর বঙ্গলুরের শ্রীযুক্তি সাধিত হয়। এখানে ইংরাজরাজের একটি সেনাবাস স্থাপিত আছে। সমগ্র মহিসূর-রাজ্য ৯৮টা নগর এবং ১৬৭৮৪টা গ্রামে বিভক্ত। ভূপরিমাণ আনুমানিক ২৭৯৩৬ বর্গ মাইল।

সমগ্র মহিসূর রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমঘাট-পর্বতমালা এবং নীলগিরির অধিত্যকায় সাহুদেশপূর্ণ দেশভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ফিট উচ্চ। কেবলমাত্র কৃষ্ণা ও কাবেরী অববাহিকার মধ্যবর্তী অধিত্যকাদেশ ৩ হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চ দেখা যায়। অধিত্যকাত্বের মধ্যে মধ্যে দাড়া দি শস্তপরিপূর্ণ অসংখ্য উপত্যকা বিরাজিত আছে।

উপরোক্ত অধিত্যকাত্বের একটা গিরিশৃঙ্গ উন্নতমস্তকে মহিসূর রাজ্যের বিশাল সমতল ক্ষেত্রকে রক্ষা করিতেছে। এই শৃঙ্গসমূহের মধ্যে নন্দিহর্গ (৪৮১০ ফিট) ও সর্বনহর্গ (৪০২৪ ফিট), রাজ্যরক্ষার জন্য হিন্দুপ্রাধিকালে কবল হর্গ, শিবগঙ্গা, চিত্তলহর্গ ও কোলিহর্গ প্রভৃতি স্মৃষ্টি গিরি-হর্গ স্থাপিত হইয়াছিল। বিপক্ষের সহিত বহুবার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় সর্বনহর্গ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কবল-হর্গ কেবলমাত্র হর্গের বন্দাদিগের চরমস্থানরূপে নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্বিধা মূলানগিরি (৬৩১৭ ফিট), কুহুরামুখ (৬২১৫ ফিট), বাবা বৃন্দনগিরি (৬২১৪ ফিট) কালহস্তী (৬১৫৫ ফিট), রুদ্রগিরি (৫৬৯২ ফিট) পুষ্পগিরি (৫৬২৬ ফিট), মের্তিগুদ (৫৪৫১ ফিট) ও বোদ্দিনগুদ (৫০০৬ ফিট) নামক কয়েকটা উচ্চশৃঙ্গ মহিসূর-রাজ্যে অবস্থিত। বাবাবৃন্দন বা চন্দ্র-দ্রোণ গিরিমালার মধ্যে জাগরনামে অত্যন্ত অধিত্যকা আছে।

মহিসূর রাজ্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, পশ্চিমভাগ পর্বতমালার সাহুদেশাংশ মলনাড় এবং পূর্বাংশের দাঙ্গ-জলাদিপরিপূর্ণ সমতলক্ষেত্রসমূহ ময়দান নামে খ্যাত। এই সকল বিস্তীর্ণ শস্তক্ষেত্রে জল সরবরাহের জন্য স্থানে স্থানে খাল কাটা আছে। নদীসমূহের মধ্যে কৃষ্ণা, কাবেরী, উত্তর ও দক্ষিণ-পেন্নার, পালার, গজ্জিতা, নেত্রবতী, তুঙ্গ ও ভদ্রা, বেদ-বতী, হেমবতী, বগচি, লোকপাবনী, শরাবতী, সিম্‌সা, অর্ক-বতী, লক্ষ্মণতীর্থ, গুন্দল, কব্বনী, হোম্মুহোলে, চিত্রবতী, পাগরা প্রভৃতি নদী ও শাখানদী প্রধান। এতদ্বিধা পার্শ্বত্যা চান্দ্রদেশ বাহিয়া আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পুঙ্খানুপুঙ্খ নদীসমূহের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে।

নদীসমূহের অববাহিকা-ভূমি পর্বত-গহ্বরগত এবং তীর-ভূমি পার্শ্ববর্তী সমতল ক্ষেত্র অপেক্ষা উচ্চ হওয়ার উহার জলে চান্দ্রবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। বন্যার সময় ব্যতীত নদীধারে অধিক জল থাকে না। সুতরাং উহা পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাদির গমনাগমনের বিশেষ অসুযোগী। একমাত্র তুঙ্গভদ্রা ও কব্বনী নদীতে কাঠবহনোপযোগী জল থাকে। কাবেরী প্রভৃতি বৃহৎ নদীতে বাণিজ্যোপাতপরিচালনার বিশেষ সুবিধা না হইলেও উহার জলে কৃষিকাণ্ডের সমধিক উপকারিতা দৃষ্ট হয়। আনিকট (বীথবিশেষের) দ্বারা এই নদীর স্রোতোবেগ উন্ন-মিত করিয়া কাটা খালে ইহার জল পরিচালিত করা হইয়াছে।

মহিসূরে প্রাকৃতিক শোভাময় কোন হ্রদ নাই। অনেক স্থলে পর্বতগাত্রবাহী জলরাশি সঞ্চিত হইয়া এক একটা স্তম্ভের দীর্ঘাকার পারণত হইয়াছে। উচ্চভূমিস্থ দীর্ঘিকা জলপূর্ণ হইলে, সেই জল বাধ উপস্থিত হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন-ভূমিস্থ কৃত্রিম হ্রদে আসিয়া নিপতিত হয়। সমগ্র রাজ্যমধ্যে এইরূপ প্রায় ৩৭৬৮২টা পুষ্করিণী আছে। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সুলেকড়ে নামক দীর্ঘিকার পরিধি প্রায় ৪০ মাইল।

কোষ্ঠাগিরি হইতে হিরিয়ুর ও মোলকলমুরু নামক স্থানেব সমস্ত্রে কতকগুলি প্রস্তর দৃষ্ট হয়। এই স্থানের দক্ষিণভাগে পার্শ্বত্যা মৃত্তিকা খনন করিলে ভূগর্ভ হইতে প্রস্তরগন্ধারে জলরাশি সমুখিত হইতে থাকে। এই কারণে এখানে খাত অথবা কূপ করিয়া ক্ষেত্রে জলদান করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। পার্শ্বত্যা কূপখাত স্রুগভীর হওয়ায় যণ্ডমহিষা-দির দ্বারা জলোত্তোলনের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পশ্চিমঘাট পর্বতের সমীপদেশে নানারূপ বৃক্ষ লতা ও জন্তুপরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ বনরাজ্য বিরাজিত। পর্বতসমূহে নানা-জাতীয় প্রস্তর ও অত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়। সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে কোথাও কঁকর এবং কোথাও বা তুলা উৎ-পাদনকারী কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা নয়নগোচর হয়। এতদ্বিধা খনিজ লৌহ ও স্বর্ণাদি ধাতু প্রচুর পাওয়া যায়।

এহ রাজ্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তত্তৎ লিপিবর্ণিত স্থানগুলি রামায়ণ ও মহাভারতের সময় হইতেই প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পৌরাণিক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এহ স্থানে ত্রিগ্রাম-সহচর বালিন্দ্রাতা সুর্য্যাবের রাজ্য ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকগণ এখানে প্রাধিকার বিস্তার করে। তৎপরে এখানকার জৈনপ্রভাব বিস্তৃত হয়। এখনও নানা শিল্পবৃত্ত অসংখ্য জৈন ও বৌদ্ধকীর্তি সেই সেই যুগের প্রাধিকার সূচনা করিতেছে।

শিলালিপি, তাম্রশাসন, রাজবংশচরিত্রাখ্যান, পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমীর বৃত্তান্ত ও মুসলমান ইতিহাস পাঠে আমরা দাক্ষিণাত্যের রাজবংশসমূহের যে ইতিবৃত্ত সংগঠন করিয়াছি, তাহার আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে কাদম্ববংশীয় নরপতিগণ ১৪শ শতাব্দী কাল উত্তর মহিস্থরে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। বনবাসিনগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এই সুদীর্ঘ শাসনে তাঁহারা মহিস্থর রাজ্যকে কিরূপ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করিয়াছিলেন তাহার কোন সন্নিবেশ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তিকালে তাঁহারা চালুক্যরাজগণের অধীনতা স্বীকার করেন।

[ কাদম্বরাজবংশ দেখ। ]

যে সময়ে কাদম্বগণ মহিস্থরে রাজ্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে কোয়ম্বাতোর ও সমগ্র দক্ষিণ-মহিস্থরে গঙ্গ বা কোঙ্গু-মতান্তরে চের)-বংশীয় রাজভগণ রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রথমে কড়ুর নগরে ও তৎপরে কাবেন্নীতীরবর্ত্তী তালকড় নগরে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে চালুক্যরাজগণের অভ্যুদয়ে কোঙ্গুবংশের অধঃপতন ঘটে। শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, গঙ্গবংশীয় পূৰ্ব্ব নরপতিগণ জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। খৃষ্টীয় ২য় অর্ধে জৈনধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা সনাতন হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পূৰ্ব্ব-মহিস্থরে সুপ্রাচীন পল্লববংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চালুক্যরাজগণের নিকট পরাভূত হইলেও খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত শত্রুপুঞ্জের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে বিরত হন নাই।

চালুক্যগণ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে এখানে আসিয়া প্রভাব বিস্তার করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত তাহারা এখানে পূর্ণপ্রভাবে রাজ্য শাসন করিয়া একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত শতাব্দীতে বল্লালবংশীয় সর্দারগণ চালুক্যরাজকে পরাভূত করিয়া তাঁহারা রাজ্য অধিকার করিয়া লন। চাল ও কলচুরিবংশীয় নরপতিগণ এখানে অতি মল্লকালই রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই হোয়শাল বল্লালবংশীয় নরপতিগণ জৈনধর্মাবলম্বী, বীর ও উন্নতচেতা ছিলেন। তাহারা বর্ত্তমান সীমান্তভূক্ত সমগ্র মহিস্থর প্রদেশ এবং কোয়ম্বাতোর, মালেম, ধারবাড় প্রভৃতি রাজ্যের কতকংশ অধিকারপূর্বক শাসনকাব্য পরিচালনা করিতেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহারা দ্বারসমুদ্রে (দ্বারকাবতীপত্তন বর্ত্তমান হলবৌড়) রাজপতাকা উড্ডান করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে দিল্লীর আলাউদ্দৌল

বিখ্যাত মুসলমান-সেনানী মালিক কাবুর দাক্ষিণাত্যবিজয়ে আসিয়া বল্লালরাজকে পরাভূত ও বন্দী এবং তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করেন। উহার ১৬ বর্ষ পরে মহম্মদ তোগলক-প্রেরিত মুসলমান সেনাদল দ্বারসমুদ্রে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। এখনও হোয়শালেখরের শিল্পমণ্ডিত দেবমন্দির প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। এতদ্ভিন্ন কএকটি জৈন ও হিন্দুমন্দির প্রাচীন জৈন ও হিন্দুযুগের প্রাধান্য প্রমাণ করিতেছে।

হোয়শাল-বল্লালবংশের অন্তরিতর সঙ্গে সঙ্গেই দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রাভীরবর্ত্তী বিজয়নগরে আর একটি হিন্দু রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গলরাজের হৃক ও বৃক নামা দুই জন প্রধান কর্মচারী বিজয়নগরে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করে। হৃক হরিশ্বর নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তৎপ্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশ 'নরসিংহ'-বংশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মুসলমান বান্ধবী রাজবংশ এই হিন্দু রাজবংশের চিরবিরোধী ছিল। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ শাহী-বংশচতুষ্টয় একত্র হইয়া বিজয়নগরাদিপ রামরাজকে তালিকোটের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁহার বংশধরগণ হীনপ্রভ হইলেও দক্ষিণে পলাইয়া গিয়া পেছুকোণ্ডা ও পরে চঞ্জগিরিতে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। এখানে থাকিয়া তাঁহারা কিছুকালের জন্য বিজেতা মুঘলমান রাজগণের প্রতিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন।

পেছুকোণ্ডার নরসিংহ-বংশের শেষ নরপতির শাসনপ্রভাব হ্রাস হইয়া আসিলে, স্থানীয় পলিগার-সর্দারগণ বিদ্রোহাচরণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বনে প্রয়াসী হয়। এই সময়ে দক্ষিণ-মহিস্থরের উদৈয়ারগণ, উত্তরে কেলডীর নায়কগণ, পশ্চিম বলমের (মঞ্জরাবাদ) নায়কগণ এবং চিত্তলহুর্গ ও তারি-কেরের বেদর-সর্দারগণ এক যোগে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে নরসিংহ-রাজপ্রতিনিধি তিরুমলের ছুরলতায় উৎসাহিত হইয়া রাজ্য উদৈয়ারের অধিনায়কতায় ত্রীরঙ্গপত্তনদুর্গ আক্রমণ ও জয় করেন। তদবধি মহিস্থরে উদৈয়ার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। [ পূর্ব পূর্ব রাজবংশের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

উক্ত উদৈয়ার (বোদৈয়ার)-রাজ বিজয়রাজ হইতে নবম পুরুষ অব্যস্ত। প্রবাদ এইরূপ, ভ্রাতা কৃষ্ণরাজের সহিত বিজয়রাজ স্বীয় জন্মভূমি সোরাষ্ট্রাস্থিত দ্বারকা হইতে ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। ইহারা যাদববংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন।

বিজয়নগর-রাজবংশের যশোরবি দাক্ষিণাত্য-গগনে পূর্ণপ্রভায় প্রতিভাত হইলে, এই যাদববংশ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। তদনুসারে রাজ্যভূমিই তাহারা হৃদয়াক

নামক স্থানের সামন্তপদ প্রাপ্ত হন। রাজা উদৈয়ার-কর্তৃক শ্রীরঙ্গপত্তন অবরুদ্ধ হইবার পূর্বে যাদব সর্দারগণ পুরগড় নগরে একটা দুর্গ নিৰ্মাণ করিয়া মহিষাসুর বা মহিসুর নাম প্রদান করেন। মহিষমর্দিনীকে মহিসুর-রাজবংশের কুলদেবী দেখিয়া অশ্রুমান হয়, যে যাদবগণ মহিষাসুর-নিধন-কারিণী চামুণ্ডাদেবীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। দেবীর প্রতি ভক্তিবশতঃই তাঁহারা দেবী নামের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গপত্তনে উদৈয়ার-রাজগণের রাজধানী স্থাপিত হইলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মহিসুরের রাজা বলিয়া ইতি-হাসবর্ণিত হইয়াছেন। রাজা উদৈয়ার কর্তৃক শ্রীরঙ্গপত্তন-বিজয়ের পর তৎপুত্র চামরাজ ও কঞ্জীরাজ কর্তৃক মহিসুর রাজ্যের সীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৬৩৮-১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কঞ্জীরাজ দোদীও প্রতাপের সহিত মহিসুর রাজ্য শাসন করেন। ঐ সময়ে তিনি নিরন্তর বুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকিলেও স্বযোগ মত রাজধানী সুরক্ষার জন্য দুর্গ ও পরিখাদি নির্মাণ, টঙ্কশালাপ্রতিষ্ঠা, রাজস্বনির্দারণ প্রভৃতি গুরুতর রাজকীয় কার্য সমাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নানীয় হোণমুদ্রা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্তৃক মহিসুর অধিকার পর্য্যন্ত এখানকার প্রচলিত জাতীয় মুদ্রারূপে গণ্য ছিল।

কঞ্জীরাজের পৌত্রস্থানীয় চিক্ দেবরায় প্রবল প্রতাপে ৩৪ বৎসর কাল দক্ষিণভারত শাসন করেন। তাঁহার রাজ্য-কালে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মহিসুরবাসী শৈবধর্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে চিক্ দেব-রায় পরলোক গমন করেন। দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া তিনি যে বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিয়া যান, তাহার রাজস্ব প্রায় এক কোটি টাকা।

চিক্ রাজ্যের পর তৎপুত্র হই জন রাজপুত্র ১৭৩১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে প্রকৃত বংশের বিলোপ ঘটিলে, তৎপুত্রসমূহ ভিন্নশাখাভূত রামরাজনামা জনৈক রাজবংশ-ধরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। রাজ্যশাসনে অক্ষম আনিয়া দলবাহী (সেনাপতি) ও দেওয়ান তাঁহাকে রাজ্য-চ্যুত করিয়া কবল দুর্গে আবদ্ধ করেন। এই অস্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তদনন্তর চিক্ কৃষ্ণরাজ নামা জনৈক রাজকুটুম্বকে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের রাজত্ব প্রদান করা হয়।

সামন্তপ্রধান চিক্ কৃষ্ণরাজের অধিকারকালে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-সেনানী হায়দার আলী স্বীয় বীরত্ব ও রণকৌশলে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বেদনুর বুদ্ধ মহিসুর-রাজকে পরাভূত করিয়া রাজসিংহাসন অপহরণ ও রাজকোষ

লুণ্ঠন করেন। হায়দার অসাধারণ প্রতিভাবলে দক্ষিণ-ভারতে যে মুসলমান-শক্তির বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সুধৈর্য্য তাঁহার বংশধর টিপু সুলতানকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। [ হায়দার ও টিপু সুলতান দেখ। ]

১৭২৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধকালে টিপু সুল-তানের মৃত্যু ঘটে। এই সময় ইংরাজরাজ মহিসুর অধি-কারপূর্ব্বক অরুণচ-বাসী প্রাচীন হিন্দুরাজবংশধর রাম-রাজের পুত্র কৃষ্ণরাজকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। উক্ত বর্ষ হইতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাবালক রাজার রাজ্য শাসন করিবার জন্য পূর্ণাহিয়া নামক জনৈক মরাঠা ব্রাহ্মণ রাজমন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হন। ইনি স্বীয় অমিতভেজে ও অধ্যবসারে রাজ-কার্য্য নির্বাহ করিয়া রাজকোষপূর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন। মন্ত্রি-বর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, নবীন রাজা স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং শাসনবিশৃঙ্খলতা হেতু সঞ্চিত সমুদয় অর্থই নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া তাঁহার পক্ষে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর বেতড়-কোট-রাজবংশীয় চিক্ কৃষ্ণ অরসুর পুত্র চামরাজেন্দ্র উদৈয়ারকে তিনি দত্তক গ্রহণ করিয়া যান। কৃষ্ণরাজের হস্ত হইতে মহিসুরের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ইংরাজরাজ শাসন সুব্যবস্থা স্থাপনের জন্য দুই জন কমিসনার নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইহাতে রাজকাৰ্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইলে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মরিসন্ একমাত্র কমিসনার নিয়োজিত হন। তাঁহার পর সর মার্ক কুবোন্ রাজকাৰ্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনকালে মহিসুর রাজ্যে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হয় না।

উক্ত বর্ষে ইংরাজরাজের শাসনপ্রণালীতে রাজ্যশাসন করিবার জন্য ইংরাজ-গবর্নমেন্ট সুব্যবস্থা করেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরের অমুমতানুসারে দেশীয় রাজার হস্তে শাসন-বিধি অর্পণ করিয়া রাজ্যের সুশৃঙ্খলতার বন্দোবস্ত হয়। রাজ-কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ হইতেছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণের জন্য তিন জন বিভাগীয় ইংরাজ পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ক্রমে শাসনকাৰ্য্যের সুবন্দোবস্তের জন্য আরও কতকগুলি ইংরাজ কর্মচারীকে রাজকাৰ্য্যে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। এই সময়ে দত্তকের স্বাধিকার-রক্ষার জন্য এবং বালক রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে শাসনবিধির অনেক সংস্কার করা হইল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যথারীতি মহারাজ চামরাজেন্দ্র উদৈয়ারের অভিষেক

সম্পন্ন হয়। ভারত-রাজপ্রতিনিধিরূপে মাদ্রাজের শাসনকর্তা তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। মহিসুরের চিক্ কমিশনর দেওয়ানের হস্তে কার্য তার বুঝাইয়া দিলেন। ঐ সময়ে চিক্ কমিশনর ও সাধারণ সচিবের কার্যালোপ ব্যতীত শাসন-বিষয়ে আরও কয়েকটা পরিবর্তন ঘটয়াছিল।

উক্ত বর্ষে মহারাজের উপর রাজ্যশাসনভার অর্পিত হইলেও রাজকাৰ্য্য বিধির কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। মহারাজ ব্যবস্থাপক সভা লইয়া সকল কাণ্ডের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কোন নতুন বিধি প্রবর্তন করিতে হইলে তাঁহাকে ভারতগবর্ণমেন্টের অভিমত লইতে হইত। তিনি রাজ্যের অপব্যয় করিতে পারিতেন না। মহারাজের নিজস্ব সম্পত্তি রাজস্ব হইতে পৃথক্ থাকিত। এখানেও শাসন-বিভাগ ও বিচারবিভাগ স্বতন্ত্র। একজন যুরোপীয় ও দুই জন দেশীয় বিচারক হাইকোর্টের প্রণালী অনুসারে বিচার-কার্য্য করিয়া থাকেন। মহিসুর ও সিমোগা নগরে একজন সিভিল ও পেনন জজ অধিষ্ঠিত আছেন। বঙ্গলুরের বিচার-কার্য্য চিফ্ কোর্টের প্রধান বিচারপতিকেই করিতে হয়। প্রত্যেক জেলার শাসনকার্য্য একজন জেপুটী কমিশনরের হস্তে সম্বৃত আছে। এতদ্ভিন্ন একজন জুডিসিয়াল এসিষ্ট্যান্ট, সুন্দেফ ও আরিলহার স্থানীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার-কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। প্রত্যেক জেলার বাজিষ্টারের অধীনে পুলিশ নিযুক্ত আছে। প্রত্যেক থানা এক এক জন অধস্তন সহকারী পুলিশ কর্মচারীর উপর তত্ত্ব।

রাজ্যের অপরাপর সংস্থারের মধ্যে জেলখানা, পুর্ন-বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, রাজস্ববিভাগ, জরিপবিভাগ প্রভৃতির বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক স্থলে দেশীয় লোকের পরিবর্তে যুরোপীয়কে আসন দেওয়া হইয়াছে।

প্রতিবৎসর 'দশেরা' উৎসবের পর প্রত্যেক তালুক হইতে দুই বা তিনটা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া একটা সভা আহুত হয়। বিচারবিভাগের অধ্যক্ষ 'দেওয়ান' মহাশয় সর্বসমক্ষে রাজ্যের বিচার-বিবরণী পাঠ করেন এবং পরবর্তী বৎসরের রাজকাৰ্য্যের হিতকর ফি কি সদুপায় প্রবর্তন করিতে শাসন-সমিতি বাধ্য হইয়াছেন, তাহাও তিনি সাধারণ সমক্ষে জ্ঞাপন করিতে থাকেন। অবশেষে স্থানীয় প্রতিনিধিবর্গের নিকট হইতে তত্ত্বদেশবাসীর অভাব ও অভিযোগ শ্রবণ করা হইয়া থাকে। ফরা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর বিচারে নিষ্পন্ন হইতে পারে, এক্ষণে বিষয়সমূহ সভাতেই নিষ্পত্তি হইয়া যায়, আর বিচার্য্য ব্যাকাগুলি অমূল্যকানের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই প্রতিনিধি-সভায় বাহা পঠিত ও গৃহীত হয়, প্রথমে তাহাই

ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিয়া পরে তাহা সাধারণের জ্ঞানবার জ্ঞান দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত করা হইয়া থাকে।

এখানে প্রথমে ৪টা পদাতিক সেনাদল ছিল। উহার একটিকে বিদায় দিয়া, ৩টা সিলাদার অখারোহী সেনাদল ভাঙ্গিয়া ২টা দল গঠিত করিয়া সেনাবিভাগের অনেক বায়-সংক্ষেপ করা হইয়াছিল।

এখানকার আদিম অধিবাসীর মধ্যে পার্কত্য কুদবদিগের সংখ্যাই অধিক। ইহার বন মধ্যে হাসি নামক ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করে। ইহার কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্রকায়, মাথায় চুল রাখে ও খোপা বাঁধে। রমণীগণ প্রায়ই বনের অন্তরাল হইতে বাহির হয় না। জেহু-কুরুবগণ উহাদের অল্প-তম শাখা। এতদ্ভিন্ন ইরলিগার, সোলিগার প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতি আছে, ইহার নিরুজ্জন প্রদেশে থাকিয়া বহু পশু ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

মলনাদ-প্রদেশে হোলিয়ার মালু ও হোয়ালু নামে কএকটা আদিম জাতির বাস আছে। ইহার প্রায় কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। ইহার সকলেই প্রায় ভূম্যধিকারীর অধীনে দাসত্বস্থিত অবস্থ থাকে। বোকলিগ-জাতি ৫০টা শাখায় বিভক্ত। ইহারও কৃষিজীবী। এই জাতির সংখ্যা মহিসুর রাজ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার ব্রাহ্মণ-গণ পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত।

এখানকার হিন্দু-সম্প্রদায় প্রধানতঃ তিন ধর্মাবলম্বী— ১ স্মার্ত, ২ মাধব ও ৩ ত্রীবৈষ্ণব। স্মার্তগণ অধৈত, মাধবগণ দ্বৈত এবং ত্রীবৈষ্ণবগণ বিশিষ্টাদ্বৈতমতপোষক। বর্ণিকসম্প্র-দায়ের অধিকাংশই লিঙ্গায়ৎ। ইহার ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান প্রদর্শন করে না। এতদ্ভিন্ন শ্রাবণবেলগোলে কতকগুলি পুরো-হিত আছে। তথায় গোমতেশ্বর নামক প্রকাণ্ড একটা দেব-মূর্ত্তি অত্যাশি বিদ্যমান দেখা যায়। বস্তি বা জৈনমন্দিরসমূহও তীর্থঙ্করাদির প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে এই রাজ্যে বৌদ্ধ ও জৈনপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ধ্বংসাব-শিষ্ট নিদর্শনসমূহ সেই স্মৃতি জাপাইয়া রাখিয়াছে। চালুক্য-বংশের অধিকারকালে স্থাপত্য-শিল্পবিজ্ঞা উন্নতির চরম স্থান অধিকার করে। হোরশাল বজ্রালবংশীয় রাজগণের শাসন-সময়ে (১০০০-১৩০০ খৃঃ মধ্যে) কতকগুলি চারুশিল্পময় মন্দির নির্মিত হয়। তন্মধ্যে গোমনাথপুরের বিখ্যাত মন্দির রাজা বিনরাহিত্য বজ্রাল কর্তৃক, বেঙ্গলুরের বিষ্ণুমন্দির ১১১৪ খৃষ্টাব্দে রাজা বিষ্ণুবর্দন কর্তৃক এবং বারসবুজের কাইতেশ্বর শিবমন্দির রাজাবিজয়নরসিংহ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

শেখোজ শিবমন্দিরটির নির্মাণ-কার্য সমাধা হইতে না হইতেই ১৩১০-১১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি মালিক কাফুর আসিয়া মহিসূর আক্রমণ করেন; স্ততরাং এরূপ সূত্রহীন মন্দিরটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া যায়।

এখানকার অধিবাসিবৃন্দ প্রাধান্যে কণাড়ী ভাষায় কথা কয়। স্থানবিশেষে ঐ ভাষারও তারতম্য দেখা যায়। কোথাও পূর্বাড়া-হালে-কণাড়ী অর্থাৎ ৭ম শতাব্দির শিলালিপি লিখিত কণাড়ী ভাষা। কোথাও হালে-কণাড়ী বা ১৪শ শতাব্দির শেষভাগে প্রবর্তিত প্রাচীন কণাড়ী ভাষা, এই ভাষায় বাব-তীয় প্রাচীন জৈনধর্মশাস্ত্র ও মহিসূরের অধিকাংশ শিলা-ফলকই লিখিত হয় এবং ৩য় হোসকন্নড় অর্থাৎ বর্তমান প্রচলিত কণাড়ী ভাষা প্রচলিত।

পূর্বে লিখিয়াছি যে, এখানকার অধিবাসীরা সাধারণ কৃষি-কার্য দ্বারা জীবিকার্জন করিয়া থাকে। মহুয়ার স্তরণ-পোষণোপযোগী বাবতীয় ভ্রব্যই এখানকার প্রজাবর্গের যত্নে উৎপন্ন হয়। রাগী শস্যই অধিবাসিগণের প্রধান আহাৰ্য। এতদ্ভিন্ন যুরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়ের বস্ত্রে ইক্ষু, নারিকেল, সিন্ধুনোনা, তুলা, তামাক, দারুচিনি, কাফি, কোকোয়া প্রভৃতির প্রভূত চাস হইয়া থাকে।

১৮৭৫-৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত না হওয়ার হুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। ঐ সময়ে প্রজাবর্গের ক্লেশ অপনোদনের জন্ত রাজকোষ হইতে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। রাজা নিজামুগ্রহে হুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগকে ২৮ লক্ষ টাকার খাজনা ছাড়িয়া দেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজরাজের নিকট হইতে ৫০ লক্ষ টাকা ধার করিয়া এবং ম্যানসন হাউস রিলিফ ফণ্ড হইতে ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লইয়া খরচ করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কএক বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ৪৬২০০০০ টাকা ব্যয়িত হইলেও প্রজার দুঃখ দূর হয় নাই।

শস্ত্রাদি বাণিজ্য ভিন্ন এখানে কাগজ, কাচের চুড়ি, লাল মরকচী চর্ম, কবল ও পশমী বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। কার্পাসবস্ত্র-বরনও বিলক্ষণ প্রচলিত। নৌকাপথে বাণিজ্য ভিন্ন রেলপথেও প্রভূত বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। মাস্ত্রাজ ও মরাঠা-রেলপথ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গমনাগমন করায় নজরগড়, মহিসূর, তুমকুড়, তিপ্তুর, অজ্জমপুর, দেবনগর, বঙ্গলুর প্রভৃতি নগরে পণ্য ভ্রব্যের আমদানী রপ্তানী অপ্রতিহত গতিতে পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন গরমোশা, কোলুর, হায়দারগড়, অন্তর্বিঘাউ বাঁধ বা কোড়েকল, সেন ও মজরাবাদ গিরিসঙ্কট দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-কণাড়ায় নানাবিধ গতিবিধি হইয়া থাকে।

২ উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটা জেলা। অক্ষা° ১১°৬' হইতে ১২°৪৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৬' হইতে ৭৭°২৪' পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ২৯৮৯ বর্গ মাইল। মহিসূর নগরে এই জেলার বিচার-সদর ও রাজপ্রাসাদ অবস্থিত।

এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বড়ই মনোরম। পার্ব-তীয় অধিত্যকা ও উপত্যকাভূমি নিবিড় বনমালা, সুজলা শস্ত্রামলা বহুধরা ও প্রধরনিঃসৃত পাকৃত্য জলধারা স্থানে স্থানে বিরাজিত থাকিয়া নিত্য অভিনব শোভা সম্পাদন করিতেছে। পশ্চিমঘাট পর্বতের মলনাদ প্রদেশ হইতে ক্রমশঃ এই জেলা পূর্বাভিমুখে নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে অবতরণ করিয়াছে। যেখানে কাবেরী নদী ঘাটপঙ্কত উল্লম্বন করিয়া প্রপাতাকারে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে, সেহ স্থান শিবসমুদ্র নামে খ্যাত। এখানে কাবেরী শিবসমুদ্র নামক ক্ষুদ্র দ্বীপ বেঠন কারখা সমুদ্রতীরে নদীমুখে শ্রীরঙ্গ-তীর্থ নামক পবিত্র 'ব' দ্বীপ অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর বামভাগে হেমবর্তী, লোক-পাবনা ও সিমুদা এবং দক্ষিণে লক্ষণতীর্থ, ককানী ও হোগু-হোলে নামক শাখা নদী সমগ্র জেলার জল সরবরাহ করিয়া থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই স্থান পর্বতসঙ্কুল। এখানে স্লেট, দানাদার, বেলে প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। পর্বত-গহবরে লোহের অভাব নাই। পর্বতগাত্রবাহী স্রোতস্বিনীসমূহেও অল্প পরিমাণে সোণা পাওয়া যায়। জলভাগে চন্দন, শাল প্রভৃতি কাঠই অধিক। ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু ব্যতীত এখানকার জঙ্গলে অসংখ্য বন্য হস্তী আছে। খেদা করিয়া ঐ হস্তী ধরিয়া বিক্রয় করা হয়।

মহাভারতের সময়ে এই কাবেরী নদী ও তৎসংলগ্ন তীর্থ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস সন্মত অশো-কের পরবর্তী সময় হইতে আরম্ভ হয়। গাজবংশের অব-সানের পর বথাক্রমে চোল, চালুক্য, হোয়শালবল্লাল, বিজয়-নগর-রাজবংশ ও উদৈয়ারগণ এখানে শাসন বিস্তার করেন। [ তৎকাল রাজবংশের বিবরণ তৎকালে দ্রষ্টব্য। ]

এই উদৈয়ার-রাজগণ বিজয়নগর-রাজপ্রতিনিধি শ্রীরঙ্গ-রায়লুকে পরাজিত করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহারা পূর্বাগর মুসলমানদিগের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহারা অরঙ্গজেব-সেনানী কাসিম খাঁর নিকট হইতে ৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বঙ্গলুর চূর্ণ ক্রয় করেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট উদৈয়ার-রাজকে হস্তিদন্তনির্মিত সিংহাসনে



উপবেশন করিতে রাজসনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে চিক দেবরাজের মৃত্যুর পর, উদৈয়াররাজ সম্পূর্ণরূপে দলবাহির করতলগত হন। এই সুযোগ বুঝিয়া হায়দার মহি-সূররাজ্য অধিকার করেন। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস ইংরাজের সৈন্যপত্যা গ্রহণ করিয়া বঙ্গলুর অধিকার করেন। পর বৎসরে তিনি আরও কএকটি দুর্গ টিপু সুলতানের অধিকার-বিজিত করিয়া লন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে টিপু মৃত্যুর পর মাকুইন্স অব ওয়েলেসলি একটি ৪ বৎসরের নাবালক রাজ-পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া হিন্দুরাজ্যের প্রবর্তন করেন।

এই জেলার মধ্যে মহিসূর, শ্রীরঙ্গপত্তন, মলবল্লী ও হুনসুর নগর প্রধান। এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপালিটির তত্বাধীনে আরও ৭টি নগর আছে। ঐ নগরগুলির জনসংখ্যা ৫ হাজারেরও কম। প্রাচীন নগরের মধ্যে তালকড়, তীরকনবী ও হিরোড় বা ফরা-সীন পর্বত এবং চামুণ্ডাশৈল ও শিবসমুদ্র উল্লেখযোগ্য স্থান।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি তালুক বা উপবিভাগ। ভূ-প্রতিমাণ ৩৯৪ বর্গ মাইল।

৪ মহিসূর রাজ্যের রাজধানী। শ্রীরঙ্গপত্তনের ৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১২°১৮'২৪" উঃ এবং ৭৬°-৪১'৪৮" পূঃ।

চামুণ্ডাশৈলের সামুদ্রোচ্চ বিন্দুর্গ উপত্যকা মধ্যে এই নগর স্থাপিত। পর্বতের উপর চামুণ্ডা দেবীর মন্দির নির্মিত আছে। চামুণ্ডা দেবী মহিষাসুরকে নিধন করিয়া এই পর্বতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই পর্বতের সন্নিকটে পুরোহিতদিগের বাস ও মহারাজের বিশ্রামভবন দৃষ্ট হয়।

এই দেবীমূর্তি মহিসূররাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ও রাজাদিগের কুলদেবী। মন্দিরটি উচ্চ প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। গোপুর নামক সিংহদ্বারের চারি পার্শ্বে নানা দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

রাজবংশের নিয়মানুসারে এই মন্দিরে রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের নামকরণ হয়। দেবী প্রস্তরময়ী অষ্টভূজা ও সিংহবাহিনী। অশ্বরের মহিষাকৃতি দেহ, সিংহের দিকে পৃষ্ঠ হইলেও নরাকৃতি, মস্তক ঘুরাইয়া দেবীর দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে। দেবী দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল দ্বারা অশ্বরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ ও বাম হস্তে নাগপাশ দ্বারা উহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছেন। তাঁহার অন্ত্রাশ্র হস্তে নানা আয়ুধ বিস্ত-মান। এখানে বঙ্গদেশের দশভূজা মূর্তির স্থায় গণপতি, লক্ষ্মী, ষড়ানন ও সরস্বতী মূর্তি নাই। দেবীর উভয় পদই সিংহোপরি, সিংহের পৃষ্ঠদেশ অশ্বরের দিকে হইলেও মস্তক ঘুরাইয়া অশ্বরকে ধরিয়াছে।

প্রতি বৎসর শারদীয় দুর্গা পূজার সময় এখানে শতাব্দিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া নয় দিন যাগ, হোম, ত্রীহুত, ভূহুত, মংস্তহুত, পুরুষহুত ও পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। প্রত্যহ চণ্ডীপাঠও হইয়া থাকে। দেবীসমক্ষে বলি দিবার নিয়ম নাই। নিরস্ত্রেণীর লোকে পর্বতের পাদদেশে পশুবলি দেয়।

উক্ত শারদীয় পূজাকে এখানকার লোকে নবরাত্রব্রত কহে। মহারাজের ভবনেও যে নবরাত্রব্রত হয়, তাহাও সম্পূর্ণ-রূপে সাংখ্যিকপূজা। দেবীর মন্দিরের সন্নিকটে নরসিং দেবের মন্দির। চিক দেবরাজ বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর এই মন্দির নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। মন্দিরের গঠনকার্য্য অতীব সুন্দর।

রাজার বিশ্রামাগার পর্বতের অত্যাচ্চশৃঙ্গে স্থাপিত। রাজপরিবারবর্গ দেবীপূজা করিতে আসিয়া এই স্থানে অবস্থান করেন। পাহাড়ের অদূরে দেবরাজ নামক হ্রদ, উহার অপর পার্শ্বে স্বর্গীয় রাজাদিগের সমাধিস্থান। ভূতপূর্ব মহা-রাজ কৃষ্ণরায়ের সমাধির উপর যে অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। মহারাজ যে বৃহৎ কুন্ডাসনের উপর বসিয়া জপ করিতেন, তাহা তাঁহার সমাধির উপর রাখিয়া তৎপরে মহারাজের প্রস্তরপ্রতিমূর্তি রক্ষিত হইয়াছে। অপরা-পর রাজগণেরও ঐ স্থানে সমাধিমন্দির দেখা যায়। তাঁহারা যে যে প্রস্তরাসনে বসিয়া জপ করিতেন, প্রত্যেকের সমাধির উপর সেই সেই প্রস্তর রহিয়াছে।

এখানকার 'দেশেরা' উৎসব সাধারণের দেখিবার জিনিস। ঐ সময়ে দেশদেশান্তর হইতে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। তৎকালে রাজবাটীর সমুখস্থ বৃহৎ প্রাঙ্গণে অশারোহী সেনা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তৎপরে চক্চকে সজীন হাতে পাইক, তাহাদের পশ্চাতে পদাতিক সেনা এবং সর্বশেষে নকীব ও ধ্বজাবাহকেরা দণ্ডায়মান থাকে, তৎপরে মহারাজ বহু-মূল্যমণিমুক্তাদি খচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কৃষ্ণরায় উদৈয়া-রের হস্তিদন্তনির্মিত সূচারু কারুকায়িত সিংহাসনে উপবেশন করিলে সমুখের আবরণ তুলিয়া দেওয়া হয়। তখন ভোপধ্বনি হইতে থাকে। তদনন্তর বৈদিক ব্রাহ্মণগণ রাজার চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বৈদগান করিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিলে বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে; সেনাগণ জয়োচ্চারণ করে। ঐ সময়ে ইংরাজরাজপ্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মা-নার্থ ভোপধ্বনি হয়। সম্রাট ব্যক্তিবর্গকে সম্মানার্থ প্রধান সেনাপতি ভোরণের সমুখে উপস্থিত থাকেন এবং তিনিই অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে সমাদরে দরবার মহলে আনয়ন করেন।



ইংরাজ-প্রতিনিধি হইতে অধস্তন সকল রাজকর্মচারীকেই রাজসম্মান-প্রদর্শনার্থ রাজসিংহাসনের সম্মুখে আসিয় মস্তক নত করিতে হয়। রাজাও প্রতিদম্ভারস্বরূপ জয়মস্তক নত এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা চিবুক স্পর্শ করিয়া সম্মান গ্রহণ করেন। অতঃপর হস্তী প্রভৃতির নানারূপ ক্রীড়া আরম্ভ হয়। তৎপরে মহারাজ স্বয়ং সমরবেশে সেনা-পরিবেষ্টিত হইয়া এক নির্দিষ্ট স্থানে বাইরা একটা শরীরকে শর-ভাগ করিলে ভোপধ্বনি হয়, তদনন্তর সকলে বিজয়োন্মাদে মত্ত হইয়া রাজত্ববনে প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রথামুদারে পাণ ও প্রপারি বিতরণের পর সভা তল হইলে মহারাজ উক্ত সিংহাসন প্রদক্ষিণ, পূজা এবং প্রণাম করণান্তর অন্তঃপুরে গমন করেন। ইহাই মহারাজের নবরাত্রি।

নগরের দক্ষিণভাগে এখানকার দুর্গ অবস্থিত। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে উদৈয়ার রাজাদিগের যত্নে ঐ দুর্গ নির্মিত হয়। দুর্গের অন্তরে দলবাই-কৃত বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহারাজের যত্নে এবং যুরোপীয় কারিগরদিগের শিল্পকৌশলে দুর্গ ও তদভ্যন্তরস্থ রাজপ্রাসাদের অঙ্গসৌধব বর্দ্ধিত হয়। প্রাসাদের সম্মুখে ‘সেজ্জ’ বা দশেরা উৎসবের বৈঠক-গৃহ। ইহা শিল্পনৈপুণ্যবৃত্ত কাষ্ট্রভূষে সুসজ্জিত। এখানকার হস্তিদন্তনির্মিত সিংহাসন দেখিবার জিনিস। শুনা যায়,—সম্রাট অরঙ্গজেব রাজা চিত্র দেবরাজের শৌর্য্যে প্রীত হইয়া ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তাহাকে এই সিংহাসন দান করেন। এক্ষণে ঐ সিংহাসন স্বর্ণ ও রৌপ্যপত্রে বিভূষিত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদের মধ্যে ‘অম্বাবিলাস’ নামক দরবারগৃহ এবং ‘চিত্রশালা’ সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রশালা প্রাচীন রাজপ্রাসাদ বলিয়া বিদিত ছিল। টিপু সুলতান ইহার যুগপ্রাচীরাদি ভাঙ্গিয়া দেন। এখন এই প্রাসাদের একরূপ সর্বাঙ্গ সংস্কার-সম্পন্ন হইয়াছে।

দুর্গের পশ্চিমদ্বারের অপর পার্শ্বে জগন্মোহন-মহল নামক সুবৃহৎ অট্টালিকা। যুরোপীয় রাজকর্মচারাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ভূতপূর্ব মহারাজ এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ইহা তাহার বিশ্রামভবন বলিয়াও গণ্য ছিল। প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলিতে অত্যাশ্চর্য্য ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বলিত উত্তম চিত্র সমুদায় সাজান আছে। এতদ্বিধ রাজ-উপভোগ-যোগ্য নানা আসবাবও সজ্জিত দেখা যায়। ইহার পার্শ্বস্থ উদ্যান ও কুঞ্জবন সকল বিশেষ মনোহারী। নগরের পূর্বভাগে প্রাচীন রেসিডেন্সী অট্টালিকা। উহাতে এক্ষণে সেনাকোট হইয়াছে। উহার দক্ষিণপূর্বে সর জেমস্ গার্ডন নির্মিত বর্তমান রেসিডেন্সী প্রাসাদ। উক্ত ভূমির উপর স্থাপিত হওয়ায় এই প্রাসাদ

হইতে সমগ্র নগরভাগ পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। কর্ণেল ওয়েলসলি (ডিউক অব ওয়েলিংটন) আপন বাসের জন্য যে ভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে দেওয়ানী বিচারালয়ে পরিণত হইয়াছে।

মহী (মহে বা মাহি), মাজাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলায় ফরাসিদিগের একমাত্র উপনিবেশ। তেলীচেরী হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১১°৪১′৫০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৪′২৫″ পূঃ। এই স্থান বাণিজ্যের বিশেষ উপযোগী দেখিয়া, ফরাসী বণিকসম্প্রদায় মরিশের বাণিজ্য পরিচালনের জন্য কোদত্তনাড়ের রাজার নিকট হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটা কুঠী স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে কালিকটে সামরাজ্যের নিকট হইতেও তাহার পণ্যদ্রব্য রক্ষার্থ প্রায় ২১ বিঘ ভূমি লাভ করেন। এখনও ঐ ভূমি ফরাসীদিগের অধিকারে রহিয়াছে। পূর্বে এই স্থান বাণিজ্য সম্বন্ধিতে পূর্ণ ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে হ্রাস হইয়াছে।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বণিকসম্প্রদায় চিরাকলের অধিপতির নিকট হইতে রামাভূতি, কবাই, নীলেশ্বরম্ ও মণ্ডলাবন্দর এবং ১৭৫৪ খৃঃ অঃ ডিলি পক্ষত ক্রয় করেন। এক সময়ে এই সকল স্থান মহীর এলাকাভুক্ত ছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মহী ইংরাজহস্তে সমর্পিত হয়। সেই সঙ্গে ঐ সকল স্থানও ইংরাজের করায়ত্ত হইয়াছিল। ইংরাজরাজ ডিলিগিরিহুর্গ ব্যতীত অপর সকলস্থানের দুর্গাদি ভূতলশরী করিয়াছেন। ডিলিহুর্গে তৎকালে একজন ইংরাজ সেনানী থাকিত। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মহী ফরাসী-করে প্রত্যর্পিত হয়, কিন্তু ফরাসীগণের ঔক্কেতো ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজগণ পুনরায় ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মহী ও তদন্তর্গত স্থানসমূহ অধিকার করেন। সন্ধি-যুদ্ধে বাধ্য হইয়া পুনরায় ইংরাজগণ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে উহা ফরাসী-দিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মহী তৃতীয়বার ইংরাজের হস্তগত হয়। ইংরাজরাজ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কালিকটের বাণিজ্যকুঠী সহ মহীনগর ফরাসীহস্তে পুনঃ সমর্পণ করেন। পূর্বে মহীর বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি ছিল। ইংরাজের সহিত তিনবার ঙ্কে হস্তান্তরিত হওয়ায় এবং ত্রি-বন্দন রাজ্যমধ্যে বিপ্লবহেতু এখানকার বাণিজ্যপ্রভাবের বিশেষ লাঘবতা ঘটে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ যে কেবলমাত্র এখানকার দুর্গ, পরিখা ও বন্দরাদি নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; তাহার বিশেষ আক্রোশেব সহিত এই উপনিবেশটিকে অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া বৈরনিগাত্যন্ত-প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

মহী নগর শ্রীদ্রষ্ট হইলেও এখনও নদীতীরে তাহার

সৌধমালা অপূর্ণ শোভার দণ্ডারমান রহিয়াছে। ইহার চতুর্পার্শ্ববর্তী গণ্ডশৈলমালা ও তৃপ্তপরিহৃত উন্নত মস্তক নারিকেলকুঞ্জসমূহ দূরবর্তী দর্শকের চক্ষে সৌন্দর্য্যপূর্ণ বলিয়াই অমূল্যমিত হয়।

এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর ও সমধিক উর্বরা। পুঁদিচেরীর অধীনস্থ জনৈক ফরাসী কৰ্মচারী (Chef de service) এখানকার শাসনবিধি পরিচালন করিয়া থাকেন। বেপূর রেল সীমান্ত হইতে একটি রাস্তা তেলিচেরী হইয়া কন্নামুর হইতে মহীনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

মহী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীতে প্রবাহিত একটি নদী। মালব প্রদেশের আমঝেরা রাজ্যের অন্তর্গত আমঝেরা ও ভোপাবর নগরবয়ের মধ্যবর্তী মেহাদ হ্রদ (অক্ষা° ২২°৫২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫' পূঃ) হইতে উদ্ভূত হইয়া কাথে নগরের ৮০ ক্রোশ পূর্ব দিয়া পশ্চিমাভিমুখে বক্রগতিতে অক্ষা° ২২°১৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৩৮' পূর্বের কাথে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

প্রথমে ৭ মাইল পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া ভোপাবর প্রদক্ষিণপূর্বক বিক্ষিপ্তরূপের উত্তর দিয়া নগর গিরিমালা পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় মেবাড়ের পার্বত্য উপত্যকা ভেদ করিয়া দক্ষিণপশ্চিম গতিতে কাথে উপসাগরে মিলিত হইয়াছে। সমগ্র নদীর গতি প্রায় ৩৫০ মাইল এবং উহার অববাহিকা ভূমি প্রায় ১৭ হাজার বর্গমাইল হইবে। গুজরাতে প্রবেশ করিয়াই ইহা মহীকাহ্না ও রেবাকাহ্না-প্রদেশ বিধৌত করিয়া দক্ষিণে থৈরা ও বামে বড়োদাকে রাখিয়া কাথে সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছে।

জুলাইর সময় বস্তার জল তুলার ঞায় ঞ্বেত প্রাচীরবৎ ক্ষীত হইয়া ২০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্বক দেহবনের বালুকাচরে বিলীন হইয়া যায়। বর্ষার সময় ইহার স্রোতোবেগ অত্যন্ত প্রবল হয়। বস্তার উত্তাল তরঙ্গে তখন নদী পার হওয়া সুকঠিন। অশ্রান্ত সময়ে দেহবান, গাজনা, খানপুর ও মেতা প্রভৃতি স্থানে নৌকাযোগে নদী পার হওয়া যায়।

শ্রাব্দ, উজ্জয়িনীরাজ ইন্দ্রদ্রায়ের ঘন্য পূর্ণাবক্ষে পতিত হইয়া এই নদীর উৎপত্তি হয়। স্মৃতরাং ইনি পৃথ্বীকন্ডা বলিয়া সাধারণে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন ভয়ানক বস্তা দেখিয়া লোকে ইহার দেবশক্তির কল্পনা করিয়া থাকে। এই নদীতে স্নান বিশেষ পুণ্যজনক। এতদ্দেশে গঙ্গাপূজার বৈধি দেখা যায়, গুজরাত-প্রদেশে তজ্জগৎ মহীনদীর পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। নদীতীরবর্তী মিকরাড়, ফজিলপুর, অজুড় ও বনঃপুর নামক স্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ সকল

পবিত্র তীর্থে বৎসর বৎসর বহু যাত্রীর সমাগম হয়। স্বন্দ-পুরাণে কুমারিকাখণ্ডে এই মহীনদীর মাহাত্ম্য সনিস্তার বর্ণিত আছে।

মহী (স্রী) মন্ত্রে ইতি—মহ-অচ্ (গৌরাদিত্যচ্। পা ৪।১।৪১) ইতি ভীষ্মা মহি-কৃদিকারাদিতি ভীষ্ম। ১ পৃথিবী। (অমর) ২ নদীবিশেষ, এই নদী মালবদেশে বিস্তারিত। ইহার জলগুণ—সুস্বাদু, বলকর, পিত্তহর ও শুষ্ক। (রাজনি°) ২ গাতী। (জটায়ু) ৩ হিলমোচিকা। (ত্রিকা°) ৪ লোক। “তিস্রো মহীরূপরাতনুঃ” (ঋক্ ৩।৫৬২) ‘মহী লোকাঃ’ (সারণ)

মহীকম্প (পুঃ) ভূমিকম্প। (বৃহৎসং ৩।১০)

মহীকাহ্না, বোম্বাই-গবর্মেণ্টের পলিটিকাল এজেন্সীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কতকগুলি দেশীয় সামন্তরাজ্য। ইহার উত্তরপূর্বের উদয়পুর ও দ্বন্দপুত্রনামক রাজপুত্ররাজ্যের, দক্ষিণ-পূর্বের রেবাকাহ্না, দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত থৈরা-জেলা এবং পশ্চিমে বড়োদারাজ্য, আন্ধ্রপ্রদেশ জেলা ও পাহলনপুর এজেন্সী। অক্ষা° ২৩°১৪' হইতে ২৪°২৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৪' হইতে ৭৪°৫' পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ১১০৪৯ বর্গমাইল।

এই সামন্ত-রাজ্যসমূহের সর্দারগণ বিভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের অধিকার নিরূপণ করিয়া ৭টি বিভাগ নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ বিভাগসমূহের ইদরের রাজাই প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ইনি স্বরাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। কেবলমাত্র ইংরাজ-প্রজার বিচারসময়ে পলিটিকাল এজেন্টের অমুমতি লইতে বাধ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্দারগণ ২০ হাজার টাকা ভায়দাদের দেওয়ানী ও সর্বপ্রকার ফৌজদারী মকদ্দমা চালাইতে সমর্থ। প্রাণদণ্ডের আদেশ কেবলমাত্র এজেন্টের আদেশসাপেক্ষ। ৩য় শ্রেণীর সর্দারগণ ৫ হাজার টাকার দেওয়ানী, ২ মাসের মেহাদ ও ১০০০ জরিমাণ এবং ফৌজদারী মকদ্দমা করিতে পারেন। কিন্তু ইংরাজ-প্রজার মকদ্দমা অথবা প্রাণদণ্ডের আদেশ পলিটিকাল এজেন্টের অমুমতানুসারেই সাধিত হইয়া থাকে। ৪র্থ শ্রেণীর সর্দারগণের রাজ্যশাসনশক্তি ঐরূপেই হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। নিম্নে উক্ত সপ্ত শ্রেণীর একটা তালিকা প্রদত্ত হইল—

১ম শ্রেণীর—ইদর।

২য়—পোল ও দণ্ডা।

৩য়—মালপুর, মানসা, মোহনপুর।

৪র্থ—বজেরা, পিঠাপুর, রগালন, পুণাজী, খরাল, ঘোড়া-সর, কতোসান, ইলোল ও অমল্যারা।

৫ম—বলাসনা, দাভা, বাসনা, স্বেদক্ষা, রূপাল, দখাল্য, মগোরী, বরাগী ও সাখয়া।

৬৪—রমাল, দেবোল, খেরাবাড়া, করোলী, রক্তাপুর, প্রেম-পুর, দেখোতা, তাজপুরী, হাপা, সাতলাসনা, ভালুকা, নিখি ও হরোল।

৭ম—মণ্ডনা, বোলছা, তেজপুর, বিশ্রোয়া, পালেজ, দেহলৌলী, কঙ্গলপুরা, মাক্দুদপুরা, ইকপুরা, রামপুরা, রাণী-পুরা, গাবট, তিখা, উষু, মোতকোটর্ণা।

এই সামন্তরাজ্যসমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার। উত্তর ও পূর্বদিক বনমালা-পরিবেষ্টিত পর্বত-শৃঙ্গসমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভূভাগ সমতল উর্বর ক্ষেত্র-সমূহে পরিপূর্ণ, তবে কোথাও কোথাও নিবিড় বনরাজি বিরাজিত দেখা যায়।

এখানকার মুক্তিকা বালুকা-মিশ্রিত হইলেও শস্তোৎপাদন-শক্তিসম্পন্ন। কোথাও কোথাও সমধিক উর্বর কৃষ্ণবর্ণ ক্ষেত্র-সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। এই প্রদেশ উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম চানু হইয়া আসিয়াছে। সরস্বতী, শাবরমতী, হাতমতী, ঞারি, মেঘবা, মাজম, বাএক প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী এই ভূভাগে প্রবাহিত থাকায় স্থানীয় উর্বর ক্ষেত্র সমূহে জলসিঞ্চনের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাণীতলাও, কন্দাবাপী তলাও, বাবুহর তলাও প্রভৃতি কএকটি পুষ্করিণী ও ইন্দারা এখানকার অধিবাসীদিগের জলকষ্ট মোচন করিয়া থাকে। শেখোক্ত তলাওটির পরিমাণ ৬০৭ বিঘা।

ভাল ও কোলি নামক অনার্য্য জাতিই এখানকার আদিম অধিবাসী। মুসলমানগণের আক্রমণে উৎপীড়িত হইয়া সিন্ধুবাসী রাজপুতগণ বাসভূমি পরিত্যাগপূর্বক এই প্রদেশে আসিয়া তথাকার বহু অধিবাসীদিগকে পরাভবপূর্বক বসবাস আরম্ভ করেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে এই প্রদেশ আফগানবাদ-রাজবংশের অধিকারে আইসে। উক্ত রাজবংশের অধঃপতনের পর, মোগল-সম্রাটগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু দেশের শাসনকাৰ্য্য দেশীয় নরপতিবর্গের উপরই ব্রত ছিল। তাহার সৈন্তপ্রেরণ দ্বারা মধ্যে মধ্যে করসংগ্রহ করিয়া লইতেন। মোগল-রাজবংশের পর, মহারাষ্ট্রীয়গণ এই স্থান অধিকার করেন। ঐ সময়ে তাহার মূলকগিরি-সেনা পাঠাইয়া রাজস্ব আদায় করিতেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রশক্তির অবসানপ্রায় দেখিয়া ইংরাজরাজ এখানকার রাজকর আদায় করিয়া গাইকোবাড়-রাজকরে সমর্পণ করিতেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ এই রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

ইংরাজরাজ নিজব্যয়ে এখানকার কর সংগ্রহ করিয়া বড়োদা-রাজকে প্রদান করিবেন, কিন্তু বড়োদাপতি এই প্রদেশে সেনা-প্রেরণ বা শাসনসম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না—এ সূত্রে বড়োদাপতির সহিত ইংরাজরাজের একটা সন্ধি হয়। ইংরাজাধিকারে আসিবার পরেও এখানে ১৮৩৩-৩৬ এবং ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে দুইবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। শেখোক্ত বিপ্লবে তরিকা শৈলে একটা ক্ষুদ্র বৃদ্ধ হয়। এই বৃদ্ধে ইংরাজসৈন্ত মোকোটীনগর অধিকার করে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পোসিনার আর একটা বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পোলবাসী ভীলগণ সর্দারগণের বিরুদ্ধাচারী হইয়া স্বাধিকার ঘোষণা করে।

উপরোক্ত সীমান্তসংক্রান্ত ভীল ও রাজপুতগণের বৃথা রক্তপাত ও বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইবার জন্য সর্ জেমস্ আউটরাম ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে একটা পঞ্চায়ৎপ্রথা প্রবর্তিত করেন। এই উপায়ে সামন্তদেশের বিদ্বেষ-বলি নির্মূলাপিত হইয়া দোষী লোকদিগের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রভূত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই নিয়মের অনেক সংস্কার হয়। ঐ সময়ে একজন ইংরাজ-সেনাপতি পঞ্চায়ৎবিচার-সভার সভাপতি এবং অপর দুইজন ব্যক্তি সদস্য হইয়া বিচারকার্য্যে সহায়তা করিতেন। ভীল ব্যতীত অপর দোষী ব্যক্তিদিগকে সাজা দিবার ব্যবস্থা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মহীকাহ্না রাজ্যে প্রচলিত হয়। তদবধি ভীল ও কোলি ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই এখানে স্বেচ্ছামত মহা হঠতে মৃত্যু প্রাপ্ত করিতে পারে না।

এখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে ভীলগণই দুর্জয়। ইহাদের মধ্যে অপহরণ করিয়া বিবাহ করিবার পদ্ধতি আছে। কিন্তু কতাহরণকালে যদি কেহ তাহাকে দেখিতে বা ধরিতে পায়, তাহা হইলে কতাহর পিতার নিকট সে বিশেষ-রূপে নিগৃহীত হইয়া থাকে। ইহারা স্বাভাবিক বিশদ্রোহ দেখিয়া তখনও নিশ্চেষ্ট থাকে না।

এই ভীল-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই ভগৎ বা ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ভীলসর্দার খেরাভী মুরমলের শিষ্য এবং রামোপাসক। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ছাত্র ইহারা সদা-চারসম্পন্ন, মত্তমাংসপরিভোজী এবং কপালে সিন্দূর-রেখা ও মস্তকে হরিদ্রাক্ত বস্ত্রের উষ্ণীষধারী। বহু ভীলগণ এক সময়ে এই নিরীহ সম্প্রদায়কে সমাজচ্যুত করিয়া টহা-দিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিল। অবশেষে ইংরাজ-রাজের মধ্যস্থতায় ইহারা পরিত্রাণ পায়।

মহীক্ষিৎ (পুং) মহাঃ ক্ষমতে ইষ্টে ক্ষি-ক্ষিপ্ তৃচ্ চ। রাজা, পৃথিবীপতি।

“রথচর্যাস্ত্রমার্যাস্ত্রমৌহরিত্বা পরস্তপঃ ।

বিভেদ শতধা রাজন শরীরানি মহীক্ষিতাম্ ॥” (ভারত ৭।৪৪।২৪)

মহীগঞ্জ, বাদালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। রঙ্গপুর নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৪৩’৩০’’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°২০’। পূর্বে এই স্থান পাট ও অগ্রান্ত্র ব্যবসার বাণিজ্যক্ষেত্র ছিল, কিন্তু এক্ষণে নবাবগঞ্জের বাজারে এ সকল ব্যবসার আমদানী রপ্তানী হওয়ার এখানকার বাণিজ্য স্থান হইয়া আসিতেছে।

মহীষংঘ ন, সিংহপুরাধিপ রাজা দিবাকরবংশের বিরূদ।

মহীচন্দ্র (পুং) কনোজের জনৈক রাজা।

মহীচর (ত্রি) চরভীতি চর-অচ, মহাঃ চরঃ। পৃথিবীচারী, বাহারা পৃথিবীতে বিচরণ করে।

মহীচারিন্ (ত্রি) ১ পৃথিবীতে বিচরণকারী। (পুং) ২ মহাদেব। (ভারত ১০।১৭।৫২)

মহীজ (ক্লী) মহাঃ জায়তে ইতি জন-ড। ১ আত্মক, আদা। (রাজনিং) (ত্রি) ২ ভূমিজাত মাত্র। (পুং) ৩ মঙ্গলগ্রহ।

“রবৌ রসাকৌ সিতগৌ হ্যাকৌ ধ্বং মহীজে বিধুজে শরাষ্টৌ।

গুরৌ শরাষ্টৌ ভৃগুজে তৃতীয়ঃ শনৌ রসাত্তমমিতি কপায়াম্ ॥”

(সময়প্রদীপ)

মহীতট (ক্লী) জনপদভেদ। (বৃহৎসং ১৯।৩২)

মহীতপতন (ক্লী) স্থানভেদ। নগরভেদ।

মহীতল (ক্লী) মহাঃ তলম্। ভূতল, পৃথিবী।

“মহীতলস্পর্শনমাবভিরমুকং হি রাজ্যং পদমৈল্লমাহঃ ॥” (রঘু ৩অঃ)

মহী(হি)দন্ত, বাণবিবেক নামক জ্যোতির্গ্রন্থের চরিত্র।

মহীদাস, ১ ভাষ্যকার মহীধরের নামান্তর। ২ চরণবৃত্তভাষ্য-প্রণেতা। ৩ তাজকমণি, মণিখ, বর্ষফলপদ্ধতি ও লীলাবতী-টীকারচরিত্র। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি লীলাবতীটীকা রচনা করিয়াছিলেন।

মহীদাসভট্ট (পুং) ভাষ্যকার মহীধরের নামান্তর।

মহীদেব, হুয়াবংশীয় জনৈক রাজা। পুষ্পপুরে তাহাদের রাজধানী ছিল।

মহীধর (পুং) ১ বিষ্ণু। (ভারত ১০।১৪৯।৫৩)

মহীধর, ১ জনৈক প্রাচীন কবি। ২ বৃহজ্জাতক-বিবরণপ্রণেতা।

৩ মগধবাসী জনৈক প্রাচীন কবি। রাজা বর্ণমান ও কল্প-মানের রাজত্বকালে ১০৫৯ শকে বিদ্যমান ছিলেন। ৪ বিখ্যাত দীপিকাকার। ইনি বাজসনেরসংহিতার ‘বেদদীপ’ নামে ভাষ্য রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি রত্নাকরের পৌত্র এবং রামভক্তের পুত্র। বারাণসীধামে থাকিয়া ইনি কেশবমিশ্রের পুত্র রত্নেশ্বর মিশ্রের নিকট

বিদ্যাশিক্ষা করেন। অকুতবিবেক, জৈশাবাস্যোপনিষদা, একাক্ষরকোষ, কাত্যায়নগৃহসূত্রভাষ্য, কাত্যায়নশব্দসূত্রভাষ্য, নৃসিংহপটল, পুরুষসূক্তটীকা, মাতৃকাক্ষরনিঘণ্টু বা মাতৃকা-নিঘণ্টু, বোগবাশিষ্ট-সারবিত্তি, রামগীতাটীকা, রত্নজপভাষ্য, বড়কল্পভাষ্য, সারস্বতপ্রজিহ্বাটীকা, ও সৌত্রামণিনির্মোগ-সূত্রার্থ নামক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন তৎকর্তৃক ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে বিকৃতভিক্ষকল্পলতা-প্রকাশ এবং ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রমহোদধি ও নোকা নারী তটীকা রচিত হয়। ৫ মহাদ্রিখওবর্ণিত জনৈক রাজা। (সম্বাদি-৩৩৯৭)

মহীধ্র (পুং) মহীঃ ধরভীতি ধু-ক। পকৃত। (অমর) ২ পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা।

“পুরাহতাত্ত্বঃ সিতদন্তু জৈকাজ্যোতির্বর্তাসে ভগবান্ মহীধঃ ॥”

(ভাগবত ৩।১৩২৬) ‘মহীধঃ পৃথিব্যা উদ্ধর্তা’ (বামী)

মহীধ্রক (পুং) জনৈক রাজা। মহীধ্র-স্বার্থে কন্। মহীধ্র শব্দার্থ।

মহীন (পুং) রাজা, মহীপতি।

মহীনগর, মহানদী-তীরস্থ একটি প্রাচীন নগর। (কুমারিকাংখ)

মহীনাথ (পুং) মহাঃ নাথঃ। পৃথিবীপতি, রাজা।

মহীপ (পুং) মহীঃ পাতি পা-ক। ১ পৃথিবীপতি, রাজা ২ জনৈক আভিধানিক।

মহীপ, ১ অনেকার্থতিলক বা নানার্থরত্নতিলক ও শব্দরত্নাকর নামক গ্রন্থদ্বয়প্রণেতা। ইনি গোমপের পুত্র। বাসবদত্তায় শিবরাম ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২ বাঘেলবংশীয় জনৈক নরপতি।

মহীপনারায়ণ, ১ বারাণসীজ জনৈক রাজা। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট তাহাকে এক সনন্দ প্রদান করেন।

মহীপতন (ক্লী) মহাঃ পতনং। সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত।

মহীপতি (পুং) মহাঃ পতিঃ। রাজা, পৃথিবীপতি।

মহীপতি, ১ পঞ্চসায়করচরিত্র। ২ বনখলীর জনৈক চুড়াসম-বংশীয় সামন্তরাজ।

মহীপতি উপাধিপায়, জনৈক প্রাচীন কবি। কবীন্দ্র-চন্দ্রোদয়ে ইহার নামোল্লেখ আছে।

মহীপতি মণ্ডলিক, জনৈক প্রাচীন কবি।

মহীপাল (পুং) মহীঃ পালয়ভীতি পালি-অণ। ১ রাজা।

“নীরক্তশ্চ মহাপাল! রক্তবীজো মহাজয়ঃ ॥” (মার্কণ্ডেয়-৮৮।৬১)

২ রাজবিশেষ। (কথাসরিংসাং ৫৬।৭)

মহীপাল, ১ পালবংশীয় কএকজন গোড়াধিপতি।

[ পালরাজবংশ দেখ। ]

২ মহাদ্রিধওবর্ষিত দুইজন রাজা। (মহাদ্রিঃ ৩৩।১৯, ৩১।৪)  
৩ রাজপুতনার অনেক সামন্তরাজ। ৪ চূড়াসমাবংশীয় দুইজন  
(১ম ও ২য়) নরপতি। ৫ কচ্ছপঘাতবংশীয় অনেক রাজা।  
৬ অনেক কনোজাধিপতি। তিনি ১১৭০ সংবতে বিজয়মান  
ছিলেন।

মহীপালদেব, অনেক হিন্দুরাজা। কতেপুর জেলার অধি-  
নগরের শিলালিপি অনুসারে তিনি ৯৭৪ সংবতে রাজত্ব  
করিয়াছিলেন।

মহীপালপুর, প্রাচীন বিল্লীনগরীর উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠে  
স্থিত একখানি সুপ্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম, কুতব-মসজিদ হইতে  
৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে সুলতান খাজি, সুলতান  
ককন্ উদান্ ফিরোজ ও সুলতান মুয়াজ উদ্দীন বহ্রামের  
সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। সম্রাট ফিরোজ শাহ খ্বয়  
কতুংহু-ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে এই গ্রামের পার্শ্ববর্তী  
মালিকপুর গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। মালিকপুর জনশ্রুত  
হইলে এই গ্রামের স্মৃতি হয়।

মহীপুত্র (পুং) মহাঃ পুত্রঃ। ১ মঙ্গলগ্রহ।

মহাপুর, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। রাজা মহী-  
পালের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মহীপ্রকম্প (পুং) মহাঃ প্রকম্পঃ। ভূমিকম্প। (বৃহৎসং ২৪।২৫)

মহীপ্ররোহ (পুং) বৃক্ষ, মহীকৃহ।

মহীপ্রাচীর (ক্ৰী) মহাঃ প্রাচীরমিব, সর্কদিক্ স্থিতবাৎ  
তথ্যঃ। সমুদ্র। (ত্রিকাঃ)

মহীপ্রাবর (পুং) সমুদ্র। (হেম)

মহীভট্ট (পুং) অনেক বৈয়াকরণ।

মহীভর্তৃ (পুং) মহা ভর্তৃ। ১ রাজা। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩০)

মহীভার (পুং) মহা ভারঃ। পৃথিবীর ভার, ভূভার।

মহীভুজ্ (পুং) মহীঃ ভূজি ভূজ্-কিপ্। রাজা।

মহীভুজি কুতিন্, যজ্ঞমঞ্জরী নামক তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা।

মহীভুৎ (পুং) মহীঃ বিভক্তি ধরতীতি ভূ-কিপ্। (ব্রহ্মস্ম  
পিতৃকৃতি ভূক্। পা ৬।১।৭১) ইতি ভূগাগমশ্চ।

১ পর্তত। মহীঃ বিভক্তি পালয়তীতি কিপ্। ২ রাজা।

“যে সমামুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ।

• অনুবৃত্তিঃ ক্রবৎ তেহু কুরুত্যান্তমহীভূতাম্॥” (মার্কপুঃ ৮।১।১০)

মহীমঘবন্ (পুং) মহা মঘবা। পৃথিবীর ইন্দ্র, পৃথি-  
বীর রাজা।

মহীমণ্ডল (ক্ৰী) মহা মণ্ডলঃ। পৃথিবী, ভূমণ্ডল।

মহীমণ্ডল, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার  
চিন্তুর তালুকের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। এখানে পলত-

শ্রোপরি একটি দুর্গ স্থাপিত আছে। ঐ দুর্গ মহারাষ্ট্রবিগের  
নিযুক্ত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। মুসলমানগণ মহারাষ্ট্র-  
দিগের হস্ত হইতে ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া লন। পর্তুগো-  
পরি একটি প্রাচীন দেবমন্দিরও দৃষ্টিগোচর হয়।

মহীময় (ত্রি) মহা বিকারো হবয়বো বেতি মহী-ময়ট্।  
মৃত্তিকানির্মিত, মৃত্তিকাস্বরূপ, মৃত্তিকাবিকার।

“তো তস্মিন্ পুতিনে দেব্যাঃ কৃষা মূর্তিঃ মহীময়ীম্।

অর্হণাক্রতুস্তথাঃ পুষ্পধূপায়িতপণৈঃ॥” (মার্কপুঃ ৯৩।৭)

মহীমহেন্দ্র (পুং) মহাঃ মহেন্দ্রঃ। পৃথিবীর রাজা।

মহীমূত, গুজরাধিপতি মাক্খুদ বিকাড়ার শিলালিপি-  
লিখিত নাম।

মহীমুগ (পুং) মুগভেদ। (রামায়ণ ৩।৪৯।৪৫)

মহীয়াস্ (ত্রি) মহ-ঈয়স্। অত্যন্ত মহৎ।

মহীয়ত্ (ক্ৰী) মহী-ত্। শ্রেষ্ঠত্ব।

মহীয়া (ক্ৰী) সুখ, আনন্দ। (তৈত্তিরীয়সং ৭।৫।১০।১)

মহীয়াস্, গাছড়বালবংশীয় অনেক রাজা।

মহীয়া (ত্রি) সুখী। (অক্.৯।৬৫।১)

মহীর, মৌরজা মহম্মদ আলির নামান্তর। ইহার বাসস্থান আগ্রা।

ইহার পিতা হিন্দু ছিলেন এবং মৌর জাফর মুমাইর সভায়  
শ্রেণবক্তার কার্য করিতেন। মৌরজাফরের সন্তানদি না  
থাকায় মহারকে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিয়া পোষাপুত্র  
স্বরূপ গ্রহণ করেন।

মহীর মৌরজাফর কর্তৃক সুশিক্ষিত হইয়া নানারূপ গ্রন্থ  
রচনায় “মহীর” খেতাব লাভ করেন। সম্রাট অরঙ্গজেবের  
গুণকীর্তনপুস্তক তাঁহার রাজ্যাভিষেকসময়ে “গুল-আই-  
আওরঙ্গ” গ্রন্থ রচনা করেন।

মহীরজস্ (ক্ৰী) মহা রজঃ। পৃথিবীর রেখ, ধূলি। (মার্কপুঃ ৪৯।৩৯)

মহীরণ (পুং) বিশ্বার গর্ভে ধর্মের ঔরসজাত পুত্রভেদ।  
(হরিবংশ)

মহীরত (পুং) অনেক রাজা। ইহার পাঠান্তর বহীনর। (হেম)

মহীরন্ধ (ক্ৰী) মহা রন্ধঃ। পৃথিবীর ছিদ্র, ভূগর্ভ।

মহীরাবণ, রাবণের এক পুত্র। মহীরাবণ পাতালপুরে রাম-  
লক্ষণকে হরণ করিয়া লইয়া যায় ও তথায় হনুমানের হস্তে  
নিহত হয়। (অনুভূতরাম।)

মহীকৃহ (পুং) মহাঃ রোহতি জায়তে ইতি কৃহ-ক।  
বৃক্ষ, পাদপ।

“তপশ্চরন্ত পৃথিবীং প্রচেতঃ সুমহীকৃহাঃ।” (বিষ্ণুপুঃ ১।১৫।১)

মহীলতা (ক্ৰী) মহা লতেব। কিসলুক, চলিত কেঁচো।

মহীলা (ক্ৰী) মহিলা, স্ত্রীমাত।

মহীশ, জটনক প্রাচীন হিন্দু রাজা।

মহীশাসক (পুং) মহা শাসকঃ। ১ পৃথিবীপতি, রাজা।

মহীশাসক, হীনবান-মতাবলম্বী বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ। সর্কাস্ত্রবাদ বা বৈভাষিক মতের পঞ্চ শাখার অন্তর্ভুক্ত।

মহীশ্বর (পুং) মহা ঈশ্বরঃ। পৃথিবীপতি, রাজা।

মহীসন্তোষ, একটি প্রাচীন গওগ্রাম।

মহীসুত (পুং) মহা: সুতঃ। ১ মঙ্গল, পৃথিবীর পুত্র। (বৃহৎসং ১০৪।১৪)

মহীসুর (পুং) মহা: সুরো দেবতা ইব। ১ ভূদেবতা, ব্রাহ্মণ। ২ রাজ্যবিশেষ, মহীসুররাজ্য। [মহীসুর দেখ।]

মহীসূনু (পুং) মহা: সূনু: পুত্রঃ। মঙ্গলগ্রহ।

মহুদি, হাজারিবাগ জেলার কর্ণপুর পরগণার অন্তর্গত একটি শৈল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪৩৭ ফিট উচ্চ। হাজারিবাগ অধিত্যকার ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে চা গাছের বৃক্ষ বিস্তৃত বাগান আছে।

মহুধ, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঐরাজ্যের নরিয়াদ উপবিভাগের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২২°৪৮'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১' পূঃ। প্রবাদ, প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে মাকাতা নানে জটনক হিন্দু নরপতি এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহুয়া, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষভেদ। [মউয়া দেখ।]

মহুয়াগড়ি, সাঁওতাল-পরগণার নয়াহুমকা উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গিরিশৃঙ্গ। ইহার অধিত্যকাত্তান স্বাস্থ্যাবাসের উপযোগী। এখানকার বহুবিভাগ হংরাজ গবর্মেণ্টের রাফত।

মহুরিগাঁও, বৈতরণী উপবর্তী একটি বন্দর। কটক জেলার চাঁদবালা বন্দরের ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

মহুবা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাটিয়াবাড় রাজ্যের হালার বিভাগের অন্তর্গত একটি সামন্তরাজ্য। এখানকার সদায়গণ হংরাজরাজকে ১২০ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ৩৮ টাকা কর দিয়া থাকেন।

মহুবা (মহোবা), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাটিয়াবাড়ের ভাবনগর রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২১°৫'১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৮'৪৫" পূঃ। সমুদ্রকূল হইতে ভূগ ২ মাইল দূরে অবস্থিত। নগরভাগ বন্দরাংশ হইতে ২ মাইল উত্তরে স্থাপিত। এখানে অসংখ্য অট্টালিকা ও দেবমন্দির আছে।

সমুদ্রকূলের পূর্বাংশে জেগ্রী দ্বীপ। এই দ্বীপে ৯৯ ফিট উচ্চ আলোকস্তম্ভ স্থাপিত, প্রায় ১৩ মাইল দূর হইতে উহার আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হয়। মহুবার প্রাচীন নাম মোহেরক। মালন নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত।

মহেচ্ছ (পুং) মহতী ইচ্ছা বশ্ত, হুস্মচ সামাসিকঃ। মহাশয়।

মহেথ, প্রাচীন জনপদভেদ। রাজসূয়-যজ্ঞকালে নকুল এই স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। (মহাভারত)

মহেন্দ্র (পুং) মহাশাস্ত্রসাবিজ্ঞাৎ ঐশ্বর্যবানিতি। ১ বিষ্ণু। ২ শক্র, ইন্দ্র। (ভাগবত ৬।১৩৬) ৩ ভারতবর্ষের অন্তর্গত পুরুতবিশেষ, এই পুরুত সপ্ত কুলপুরুতের অন্যতম।

“মহেন্দ্রে। মলয়ঃ সহঃ হুজ্জিমানুস্কপকতঃ।

বিক্যাস্ত পারিপাত্রশ্চ সশৈবাত্র কুলাচলাঃ॥” (মার্ক'পুং ৫৭।১০)

মহেন্দ্র, ১ জটনক বিখ্যাত পণ্ডিত। ত্রায়সারদীপিকা প্রণেতা জয়সিংহের গুরু। ২ জটনক প্রাচীন কবি।

মহেন্দ্র, ১ চাহমানবংশীয় নড়ুলার জটনক নরপতি। বিগ্রহ-পালের পুত্র। ২ হস্তিকুণ্ডার জটনক রাষ্ট্রকূটরাজ। ৩ জটনক কোশলাধিপতি। ৪ পিষ্টপুত্রাধিপতি। ইহার দুই জনই গুপ্তবংশীয় বিখ্যাত নরপতি সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ৫ গুহাদিত্যবংশীয় দুইজন গোয়ালিয়রপতি।

মহেন্দ্র, বৌদ্ধসম্রাট অশোকের পুত্র। ইনি অশোকরাজ-প্রতিষ্ঠিত মহাবোধিগজ কঙ্কু সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ প্রেরিত হন (খৃঃ পূঃ ২৪১)। সিংহলেই ইহার মৃত্যু ঘটে।

মহেন্দ্র আচার্য, কৈলাসসামুদ্রী নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

মহেন্দ্রকদলী (স্ত্রী) মহেন্দ্রসম্ভবা তদ্বর্ণা বা কদলী। কদলীভেদ, বুনো কলা, ইহার গুণ—বাত, অস্বপ্ন ও পিত্তরোগনাশক।

মহেন্দ্রগিরি, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর গজাম জেলার অন্তর্গত পুণ্ড্রপট পুরুতের একটি শৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৯২৩ ফিট উচ্চ। অক্ষা° ১৮°৫৮'১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°২৬'৪" পূঃ। এই গিরিশৃঙ্গে ৪টা প্রাচীন ও সুবৃহৎ শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এক সময়ে এই স্থান তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার গোকর্ণস্বামী মহাশয় গাঙ্গের রাজগণের শিলালিপিতে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

রামায়ণে এই পুরুতের উল্লেখ পাওয়া যায়। হনুমান এই গিরিদেশ হইতে লক্ষ্মপ্রদানপুরুত লঙ্কারাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। ত্রিবেণী নদী এই পুরুতপ্রান্তে ত্রিচেন-গুড্ডী নগর গোপুরযুক্ত সুন্দর মন্দিরে পরিশোভিত রহিয়াছে এবং পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কোড়ের দিকে লণ্ডন-মিসনারি সোসাইটির প্রাচীন আবাস নগরকোএল নগর অবস্থিত। পুরুতোপরি অনেকগুলি কাকবাগান হওয়ায় এখান বহুবিভাগ ক্রমশঃই শূন্য হইয়া পাড়িয়াছে।

২।সংহলস্থ গিরি।

মহেন্দ্রগুপ্ত (পুং) রাজভেদ।

মহেন্দ্রচন্দ্র, গোয়ালিয়রের জটনক হিন্দু নরপতি। মাধব রাজের পুত্র। ইনি ৯৫৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহিত ছিলেন।

মহেন্দ্রচাপ (পুং) মহেন্দ্রস্ত চাপঃ। ইন্দ্রচাপ, ইন্দ্রধনুঃ।

মহেন্দ্রতনয়া, মাজ্জাজ-প্রেসিডেন্সীর মহেন্দ্রপঞ্চত বিনিঃস্থত হইতী ক্ষুদ্র শ্রোতবিনী। উহার একটি বৃন্দরসিকী, মন্দাস ও জলদ্রা তালুকের মধ্য দিয়া বার্বানগরের সন্নিকটে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে এবং অপরটি পার্শ্ব-কিম্বাদি ভূমিভাগের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বংশধারা নদীর সহিত মিশিয়াছে। পার্শ্ব-কিম্বাদি নগর এই শৈবোক্ত শাখার কূলে অবস্থিত।

মহেন্দ্র (ক্লী) মহেন্দ্রস্ত ভাবঃ স্ব। ইন্দ্রের ভাব বা শক্তি।

মহেন্দ্রদেব, উৎকলরাজবংশের জটনৈক রাজা। গোতম দেবের পুত্র। ইনি রাজমহেন্দ্রী নগর স্থাপন করেন।

মহেন্দ্রনগরী (ক্লী) মহেন্দ্রস্ত নগরী। অমরাবতী। (শব্দরত্নাং)

মহেন্দ্রনাথ, হাত্কার্ণব্যাখ্যাগ্রন্থতা।

মহেন্দ্রনারায়ণ, বঙ্গের রাঢ়দেশের জটনৈক রাজা। ইনি স্বরাজ্য স্বদৃঢ়করণার্থে দুর্গ নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রপালদেব, কনোজের (মহোদয়) জটনৈক মহারাজ। ভোজদেবের পুত্র। ইনি ৯৬০ সম্বতে বিজয়মান ছিলেন।

মহেন্দ্রপাল, পালবংশীয় জটনৈক গোড়াধিপ।

মহেন্দ্রপাল নির্ভয়রাজ, পণ্ডিতপ্রবর রাজশেখরের শিষ্য ও প্রতিপালক জটনৈক নরপতি।

মহেন্দ্রপুর, প্রাচীন নগরভেদ। (বৃন্দীলং ২৬)

মহেন্দ্রবর্ষদেব, গঙ্গবংশীয় জটনৈক কলিঙ্গাধীশ্বর।

মহেন্দ্রবাড়া, মাজ্জাজ-প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। বালাজাপেট হটতে ৬ ক্রোশ পূর্বোত্তরে অবস্থিত। এখানে একটি দীর্ঘিকাভীরে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কুরুম্বরাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। উহা জৈন বা বৌদ্ধকীর্তি বলিয়া অনুমিত হয়।

মহেন্দ্রমল্লিন্ (পুং) মহেন্দ্রস্ত মল্লী। দেবরাজের মল্লী, বৃহস্পতি।

মহেন্দ্রমল্ল, নেপালের জটনৈক রাজা। নরেন্দ্রমলের পুত্র।

[ নেপাল দেখ। ]

মহেন্দ্রমহাদেব (রঘুদেব), রাজমহেন্দ্রীর জটনৈক নরপতি।

• মহেন্দ্রবর্ষম্ (১ম), পল্লববংশীয় জটনৈক নরপতি, রাজা সিংহ-বিষ্ণুর পুত্র। কাঞ্চীপুরে ইহার রাজধানী ছিল। চালুক্য-রাজ ২য় পুলিকেশা ইহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রবর্ষম্, (২য়), উক্ত পল্লবরাজের পুত্র ও রাজা নর-সিংহ-বিষ্ণুর পুত্র।

মহেন্দ্রবর্ষম্, (৩য়), পল্লবরাজ ২য় নরসিংহবর্ষার পুত্র।

মহেন্দ্রবারুণী (ক্লী) মহেন্দ্রবর্ষায়োরিরং প্রিয়তাম্ অণ্ ভীষ্।

গতাবিশেষ, চলিত বড় মাকাল। মহারাষ্ট্র—বড়িল, ইন্দ্রবারুণী;

কালঙ্গ—হিরিয়হামেক। পর্যায়—চিত্রবল্লী, মহাফলা, মহেন্দ্রী,

চিত্রফলা, ত্রপুসী, ত্রপুসা, আশ্বরক্ষা, বিশালা, দীর্ঘবল্লী, মহৎ-

ফলা, মহাবারুণী, বৃহৎফলা বৃহদ্রাক্ষী, শোম্যা, গজচিভিটা,

চিত্রদেবী, ধনুঃশ্রেণী, স্থাগুকণী, মরুসম্ভবা। গুণ—ইন্দ্রবারুণী

তুল্য, কেবল রস, বায়ু ও বিপাকে কিঞ্চিৎ অধিক গুণবিশিষ্ট।

(রাজনিং) ২ ইন্দ্রবারুণী। চলিত রাখালশশা। (বৈজ্ঞানিকনিং)

মহেন্দ্রসিংহ (রাজা), জটনৈক হিন্দুরাজা। ইনি ১১৭০

ফসালিতে ফরিদনগর ও দুর্গ স্থাপন করেন।

মহেন্দ্রসিংহ, কুমায়ূনের চাঁদবংশীয় জটনৈক রাজা (১৪৮৮-৯০

খৃঃ অবঃ)।

মহেন্দ্রসিংহ, ধর্মঘোষকৃত শতপদিকার টীকাকার। ইনি

১২৯৪ বিক্রম সম্বতে উক্ত গ্রন্থখানির রচনাকার্য সমাপন করেন।

মহেন্দ্রসূরী, জটনৈক জৈনসূরী। ইনি অনেকার্থ-কৈরবা-

করকোমুদী নামে হেমচন্দ্রকৃত অনেকার্থসংগ্রহের টীকা,

যত্ররাজ ও তত্ত্বটীকা এবং শিবভাণ্ডব নামে কয়েকখানি গ্রন্থ

রচনা করেন। ২ অক্ষাণকমতাবলম্বী জটনৈক জৈনাচার্য।

ইনি শতপদা নামে একখানিগ্রন্থ রচনা করেন। (প্রবচনপরীক্ষা)

মহেন্দ্রাচার্যশিষ্য, বিজয়ভৈরব নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

মহেন্দ্রাণী (ক্লী) মহেন্দ্রস্ত ভাষ্যাত মহেন্দ্র (পুং) ভাষ্যাদা-

খ্যায়ং। পা ৪।১।৪৮) হাত ভাব্ (ইন্দ্রবর্ষগোত। পা ৪।১।৪৯)

হতি আহুগাগমঃ। হস্তভাষ্য, মহেন্দ্রপদী। ২ হস্ত-

চিভটী। (শব্দরত্নাং)

মহেন্দ্রাধিরাজ, পল্লবরাজ নোড়ুখাধিরাজের পুত্র। ইনি

রাজা বীরমহেন্দ্র নামেও পরিচিত ছিলেন। ৯৩০-৮০ খৃষ্টাব্দের

মধ্যে ইনি পাশ্চাত্য গঙ্গা এডুপ্রসাদগকে পরাভূত করেন।

মহেন্দ্রী, গুজরাত-প্রদেশের খানপুর নগরেব সারকটে প্রবা-

হিত একটি নদী।

মহেন্দ্রী (ক্লী) মহেন্দ্রবারুণীলতা। (রাজনিং)

মহেন্দ্রীয় (ত্রি) মহেন্দ্রস্তথাকার, ইন্দ্রস্তথাকার।

মহেমতি (ত্রি) মহামতি, আত্মশয় স্তুতি। “মহেমতেহমোতি”

(অক্ ৮।১।১৩) ‘মহেমতে! মহতে ফলার মাংস্কৃতিকাল-

যশাসো মহেমতিঃ’ (সারণ)

মহের, গুজরাতের অন্তর্গত একটি পঞ্চত।

মহেরণা (ক্লী) মহৎ স্রবণং প্রেরণমস্যাঃ যদা মহৎ গজোৎসব-

মারয়তীতি স্র-লু-টাপ্। পঞ্চকীবৃক্ষ। (অমর)

ইহার পাঠান্তর ‘মহেরণা’ অরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

মহেলা (ক্লী) মহতে পূজ্যতে ইতি মহ- (গাণকল্যানিনহাতি।



উন্ ১৮৫৫) ইতি ইলচ, পূর্বোদয়াদিষাদিকারৈক্যকরঃ  
যথা মহন্ত উৎসবস্ত ইলা ভূমিঃ। নারী, মহিলা।

“সঙ্গমুদ্রমহেলাভিকুরিতগুণাভিস্ততস্বয়মহেলাভি-

ত্রিঃ প্রবরমহেলাভিস্তথৈব স্বপংক্তিভিঃ পরমহেলাভিঃ।”

(নলোদয় ২৫৮)

মহেলিকা (স্ত্রী) মহেল-স্বার্থে কন্, টাপ্, অকারস্যেৎ।

১ নারী, মহিলা। (শব্দরত্নাং) ২ স্থূল এলা, বড় এলাচ।

মহেশ (পুং) মহান্ ঈশঃ। শিব, মহাদেব। (শব্দরত্নাং)

“ধ্যায়ৈরিত্যং মহেশং রক্তগরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং”

(শিবধ্যান) [ শিবপূজা শব্দ দেখ। ]

মহেশ, (মাহেশ) বাঙ্গালার হুগলীজেলার অন্তর্গত একটি গও-  
গ্রাম। ঈরামপুর নগরের উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। অক্ষা-  
২২°৪৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৩'৪৫" পূঃ। এখানকার  
জগন্নাথদেবের মন্দির বিশেষ বিখ্যাত। প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে  
বানধাত্রা ও আষাঢ়মাসে রথযাত্রার সময় এখানে একটি  
মহামেলা হয় এবং তদুপলক্ষে মহা উৎসব হইয়া থাকে। রথ-  
যাত্রার সময় জগন্নাথদেব অষ্টাহকাল বসন্তপুত্রের রাধাবল্লভজীর  
মন্দিরে আসিয়া অবস্থান করেন। এই আটদিনের মেলায় প্রায়  
লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

মহেশ, ১ জনৈক আভিধানিক। ২ প্রয়োগচিন্তামণি নামক  
ব্যাকরণগ্রন্থে। ৩ সুবর্ণমুক্তাবিবাদ-রচয়িতা। ৪ স্মৃতিসার ও  
ব্যবহাসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থরচয়িতা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি  
তিনি তাঁহার পিতার স্মৃতিসারসংগ্রহ হইতে সংকলন করেন।  
৫ জনৈক প্রাচীন কবি। অত্রির পুত্র জ্যোতির্দিকেশরের পৌত্র।  
ইনি গুহিলবংশীয় মিবাররাজ রাজমন্ডের সভাসদ ছিলেন।

মহেশকবি, সদাচারচন্দ্রোদয়গ্রন্থে। সারস্বত হর্গশম্বার  
পুত্র এবং মিথিলাবাসী পুরুষোত্তমের শিষ্য।

মহেশখাল, বঙ্গদেশে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপার্শ্বে একটি  
দ্বীপ। অক্ষা° ২১° ৩৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৫৭' পূঃ।  
এই দ্বীপের মধ্য ও পূর্বপ্রান্তে সামান্ত উচ্চ শৈলশ্রেণী রহি-  
য়াছে। উক্ত শৈলমালায় মধ্যে গ্রামচৌরী সর্বপ্রান্তে;  
চহাব উচ্চতা প্রায় ২৮৮ ফিট। মহেশখাল নামক খালে  
গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে থেয়ার বন্দোবস্ত আছে। মহেশ-  
খাল ও কুতবদিয়াদ্বীপ মহেশখাল-খানার অধীন।

মহেশচন্দ্র, বৈদ্যকসংগ্রহরচয়িতা।

মহেশচক্র, ১ ভাবচিন্তামণ্যালোকদর্পণগ্রন্থে। ২ তিথি-  
ভাবচিন্তামণি, মলমাসসারিণী ও সর্বদেশবৃত্তাস্তসংগ্রহরচয়িতা।

মহেশনন্দিন্, ঘটকারক নামক ব্যাকরণগ্রন্থে।

মহেশনারায়ণ, দাস্তাচারবাদার্থ বা ভক্তিবিলাসতত্ব-

দীপিকা ও হৈমাবতী গৌরান্দেবজ্ঞান-রচয়িতা। ইনি  
পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রাধারমণদাসের নিকট বিত্তা শিক্ষা করেন।

মহেশপাল, গৌরালিরের জনৈক প্রাচীন রাজা।

মহেশপুর, তৈরভূক্তের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গওগ্রাম।

মহেশপুর, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের জলৌন জেলার অন্ত-  
র্গত একটি গওগ্রাম।

মহেশপুর, বাঙ্গালার বশোহর জেলায় অন্তর্গত একটি নগর।

অক্ষা° ২২°৫৫'৫৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৫৬'৫০" পূঃ।

মহেশভট্ট, স্মার্তপ্রয়োগরত্নহিরণ্যকগ্রন্থে। মহাদেব  
ভট্টের পুত্র।

মহেশমিশ্র, নির্দোষকুলপঞ্জিকা নামে রাণীর কুলগ্রহ-  
গ্রন্থে।

মহেশবন্ধু (পুং) মহেশো বধ্যতে বশীকৃত্যে যেন লক্ষী-  
স্বনজ্ঞত্বাৎ। ত্রীকলরূপ, বেলগাছ। (শব্দচঞ্জিকা)

মহেশাধ্য (ত্রি) ১ অতি প্রসিদ্ধ, সুবিখ্যাত। (পু) ২ মহেশ।

মহেশান (পুং) ১ শিব। জিয়ারা ভীষ্ম। ২ মহেশানী, হর্গা।

মহেশিত (পুং) শিব।

মহেশ্বর (পুং) মহাংশাসাবীশ্বরঃ কর্তৃমকর্তৃমন্তথা কর্তৃ-  
বা সমর্থঃ যদা মহত্যা মহামায়য়া ঈশ্বরঃ। শিব, মহাদেব।

ইহার ব্যুৎপত্তি—

“বিশ্বস্থানাঞ্চ সর্পেযাং মহতামীশ্বরঃ শ্বরম্।

মহেশ্বরকং তেনেমং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুং প্রকৃতিখণ্ডে ৫৩ অং)

বিশ্বস্থিত সকল বস্তুর প্রভু বলিয়া, তিনি মহেশ্বর নামে  
খ্যাত। ২ পরমেশ্বর।

“বায়োনবৈকাদশ তেজসো গুণা জলক্ষিতপ্রাগভূতাঃ চতুর্দশ।

দিক্কালায়োঃ পঞ্চ যডেব চামরে মহেশ্বরোহষ্টৌ মনসস্তথৈব॥”

(ভায়শাস্ত্র) মহান্ ঈশ্বরঃ প্রজানাং প্রভুঃ। ৩ ঐশ্বর্যশালী

রাজা। (ভারত ১১২৮১২৯) ৪ শ্বেত মল্লার (বিশ্ব) (ক্লী)

৫ স্বর্ণ। (রসকোং)

মহেশ্বর, মধ্যভারত-এজেন্দীর ইন্দোর-রাজ্যের অন্তর্গত একটি  
নগর। নর্মদানদীর দক্ষিণকূলে পূর্বতময় ভূমির উপর অব-  
স্থিত। অক্ষা° ২২°১১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৭' পূঃ। নগর-  
সম্মুখে নর্মদানদী প্রায় ২ হাজার ফিট বিস্তীর্ণ।

এই নগর মহেশ্বর জেলার সদর। হোলকরের অধীনস্থ  
নিমারের শাসনকর্তার এলাকাধীন। মহারাজ মল্লার রাওর  
পুত্রবধু খণ্ডোরাওর পত্নী অহল্যাবাই এখানে প্রাসাদ নির্মাণ-  
পূর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন।

এই নগরের প্রাচীনত্ব সন্দেহও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া

যায়। অনেকে ইহাকে চক্রবংশের প্রথম রাজধানী বা সহস্রার্জুন-প্রতিষ্ঠিত মাহিমতী পুরী বলিয়া অস্বীকার করেন। ভূমিকম্পাদি দৈবকারণে বর্তমান কালে এই নগর শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। এখনও নগরভাগের মুস্তিকা খনন করিলে স্থানে স্থানে অনেক ভগ্নগৃহ ও গৃহসজ্জাদি উন্টাভাবে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। এখানকার প্রস্তরভগ্ন ও রাজপ্রাসাদ সংস্কার-অভাবে ভগ্নপ্রায় হইয়া বহিয়াছে। মিঃ গরগটন ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এই নগরে ১৭৫০০ জন লোক দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কালের করাল কবলে পড়িয়া এই সমৃদ্ধিশালী নগর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হয়, ঐ সময়ে এখানকার লোকসংখ্যা ৫ হাজার মাত্র ছিল।

এখানে কার্পাস ও রেশমের উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়। দাক্ষিণাত্যে ঐ সকল বস্ত্র এবং সল্‌মালুস্কীর পাড়দার ধুতি ও সাটী বিশেষ আদৃত। বারাণসীর জরি ও বুটাদার সাড়ী এবং ধুতি অপেক্ষা এখানকার বস্ত্রাদি উৎকৃষ্ট ও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

**মহেশ্বর,** ১ মহাভাষা-টীকাকার কৈয়টের গুরু। ২ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিকার ভাস্করাচার্য্যের পিতা। ৩ ভোজপ্রবন্ধগ্রন্থের জটনৈক প্রাচীন কবি। ৪ জটনৈক বৈদ্যকগ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা। হেরম্ব সেন ইহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৫ অমরকোষবিবেক-রচয়িতা। ৬ একজন কামদাস প্রণেতা। ৭ কেশবীবাণনা-ভাষ্য, যন্ত্ররাজ ও তট্টীকা, লঘুজাতকটীকা ও সিদ্ধান্তশিরো মণিভাষ্য প্রভৃতি জ্যোতির্গর্ভরচয়িতা। ৮ চিত্রাপনিষদ্ভাষ্য ও সহবৈ উপনিষদ্ভাষ্য প্রণেতা। ৯ চৌরপঞ্চাশিকা টীকা ও প্রবেশচন্দ্রোদয়টীকারচয়িতা। ১০ জীবমুক্তিপ্ৰকরণ-প্রণেতা। ১১ তত্ত্বচিন্তামণিটীকা ও তত্ত্বচিন্তামণিদীপ্তি-টীকারচয়িতা। ১২ দায়ভাগটীকা প্রণেতা। ১৩ ভূত-বিভূষণ প্রসেন প্রণয়নকর্তা। ১৪ ভূত-হরিকৃত নীতিশত-কের টীকাকর্তা। ১৫ মহাভারতসঙ্কলয়িতা। ১৬ মুদ্রা-রাক্ষসটীকা-প্রণেতা। ১৭ রঘুবংশটীকা-রচয়িতা। ১৮ রসার্ণব নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণেতা। ১৯ জটনৈক বিখ্যাত আভি-ধানিক, ব্রহ্মার পুত্র এবং কৃষ্ণের (কেশব) পৌত্র। ইনি ১১১১ খৃষ্টাব্দে বিশ্বপ্রকাশ নামক একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে তিনি শব্দভেদপ্রকাশ বা শব্দভেদনামমালা নামে অপর একখানি গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন। এতদ্বিন্ন তাঁহার রচিত সাহসাক্ষরিত নামে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ২০ পুরুষোত্তমকৃত বিশ্বভক্তি-কল্ললতা-গ্রন্থের টীকাকার। ইনি ১৫২০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন।

XIV

**মহেশ্বর,** নন্দদানদীর উত্তরকূলস্থ একটা নগর। এই নগরের নদী গরবর্তী ঘাটের শোভা অনেকাংশে বারাণসীধামের তুল্য। মিরট-ই-সিকেন্দরী পাঠে জানা যায় যে, সুলতান আব্দুল শাহ ১৪২০ খৃষ্টাব্দে এই নগর ও দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। **মহেশ্বর,** জটনৈক হিন্দুরাজ। শ্রীপালের পুত্র। ইনি দখৌচি-গোত্রীয় ছিলেন।

**মহেশ্বরকরচ্যুতা** (জী) মহেশ্বরপ্রভুর চ্যুতা। করতোয়া নদী। প্রবাদ আছে যে, পবনতরাজহুহিতা গৌরীর বিবাহকালে গির্বারাজ প্রদত্ত জল মহাদেবের কর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া এত নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। (ভরত) [করতোয়া দেখ] **মহেশ্বরতীর্থ,** রামায়ণতত্ত্বদীপিকা-প্রণেতা। ইনি নারায়ণ তাঁথের নিকট বিজ্ঞা লাভ করেন, সাধারণে মহেশ নামেও পরিচিত।

**মহেশ্বরতীর্থ,** জটনৈক বিখ্যাত বৈদ্যাস্তিক। ইনি বার্ষিকসার নামে একখানি বেদান্তগ্রন্থ রচনা করেন।

**মহেশ্বরদেবরায়,** দাক্ষিণাত্যের কলচুরি রাজবংশের অধীনস্থ এক সামন্তরাজ।

**মহেশ্বরনাগ,** জটনৈক হিন্দু মহারাজ। নাগভট্টের পুত্র।

**মহেশ্বর ন্যায়াগজ্ঞার ভট্টাচার্য্য,** কাব্যপ্রকাশদর্শ নামক অলঙ্কারগ্রন্থ-রচয়িতা।

**মহেশ্বরভট্ট,** অষ্টোষ্টপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণেতা।

**মহেশ্বরভট্টাচার্য্য,** সিদ্ধান্তদীপ নামক ভাষ্যগ্রন্থরচয়িতা।

**মহেশ্বরমিশ্র,** ১ প্রাক্কাদর্শরচয়িতা। ২ পর্যায়রত্নমালা-প্রণেতা।

**মহেশ্বরমিশ্র,** (স্বক্ৰি), বামনালঙ্কারতত্ত্বটীকারচয়িতা।

**মহেশ্বরশর্ম্মন,** শুদ্ধিকৌমুদী প্রণেতা।

**মহেশ্বরসিংহ,** মিথিলার জটনৈক নরপতি। রুদ্রসিংহের পুত্র এবং ছত্রসিংহের পৌত্র। ইনি ব্রতচারপ্রণেতা রত্ন-পাণির প্রতিপালক ছিলেন।

**মহেশ্বরসিদ্ধান্ত** (পুং) পাণ্ডপতন্ত্র।

**মহেশ্বরচার্য্য,** বৃহৎশতক-নামক জ্যোতির্গর্ভ-প্রণেতা।

মনোরথের পুত্র। ইনি জ্যোতির্কিত্তিলক ও কবীন্দ্র উপা-দিতে ভূষিত ছিলেন। ইহার শাণ্ডিল্যগোত্রীয়। বিজ্জল-পুরে ইহার বাস ছিল। তৎপুত্র লক্ষ্মীধর রাজা জৈরপাল-কর্তৃক সভাপতিত্বপদে নিযুক্ত হন। [ভাস্করাচার্য্য দেখ]

**মহেশ্বরানন্দ,** মহার্থনঞ্জরী ও তট্টীকা প্রণেতা।

**মহেশ্বরী** (জী) মহেশ্বরপ্রভুর জী, মহেশ্বর-ভীষ্ম মহতী চান্দো জৈম্বরী চ নন্দাদীন্য নিয়ন্ত্রীতি বা। মহেশ্বরপত্নী, শিবানী।

“ঐং পাতু দক্ষনেন্দ্রং মে হ্রীং পাতু বামলোচনম্।

ঐং পাতু দক্ষকর্ণং মে ত্রিবর্ণায়া মহেশ্বরী ॥” (তন্ত্রসার)  
২ অপরাধিতা। (শব্দচো) ৩ কাংস্ত। (হেম) ৪ রাজ-  
রীতি। পিতল। ৫ যবতিষ্ঠ লতা।

মহেশ্বরী (মাহেশ্বরী) পশ্চিমভারতবাসী বণিকজাতির একটি  
শাখা। জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত দিদ্‌বানা নামক স্থানে ইহাদের  
আদিবাস। কিন্তু এক্ষণে প্রায় যুক্ত-(উঃ পঃ) প্রদেশের  
সবত্রই এই শ্রেণীর বণিগদিগকে বাস করিতে দেখা যায়।

ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, একদা  
খণ্ডোলা (জয়পুরের অন্তর্গত) রাজা সুজাতসিংহ পণ্ডিত-  
গণের পরামর্শানুসারে পুত্রোৎপাদনমানসে বান-প্রস্থ অবলম্বন  
করেন। অপরূক রাজা বনমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবকে আরা-  
ধনায় তুষ্ট করিয়া পুত্রবরপ্রার্থী হইলে মহেশ্বরের বরে রাজার  
এক পুত্র জন্মে। কিছুদিন পরে নাবালক পুত্র রাখিয়া সুজাত  
সিংহ ভবলীলা সম্বরণ করেন। অনন্তর যুবরাজ একদা সদলে  
মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া বনমধ্যে যজ্ঞের তীর্থদিগের সম্মুখে  
উপনীত হন। তখন ঋষিগণ সশস্ত্র এই বীরমণ্ডলীকে যজ্ঞবিঘ্ন-  
কারী রাক্ষসজ্ঞানে ভীত হইয়া তপঃপ্রভাবে একটা লৌহদুর্গ  
নিৰ্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। অতাপিও লোহাগড়  
নামক স্থানে ঐ দুর্গ বিদ্যমান আছে।

রাজসহচরগণ বনমধ্যে হঠাৎ এইরূপে দুর্গের অধিষ্ঠান  
দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কারণাহুসন্ধানে অগ্রসর  
হইলে ঋষিগণের অভিশাপে প্রস্তরমূর্তি হইয়া গেলেন। রাজ-  
রাণী ও তাহার সঙ্গিনীগণ এই অশুভবাস্তা শ্রবণ করিয়া চিতা-  
নলে আত্মজীবন উৎসর্গকরণার্থ বনগমন করিলে, স্বয়ং মহেশ্বর  
ঋষিরা তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন।  
মহেশ্বরের বরে রাজকুলললনাগণ পুনরায় নিজ নিজ স্বামিগুণ  
দর্শন করিলেন। মতান্তরে সহস্ররূপকামা সতীরমণীগণের প্রার্থ-  
নায় তুষ্ট হইয়া সত্যশিরোমণি-পাক্ষতী-দেবীর অমুরোধে  
মহাদেব কতক পুস্তকখিত প্রস্তরমূর্তি সমুদায়রূপে পরিণত  
হইয়াছিল। মহেশ্বরের অমুরগে জীবনলাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার  
চিহ্নস্বরূপ তাহারা আপন বংশকে ‘মহেশ্বরী’ বা ‘মাহেশ্বরী’  
বলিয়া প্রচার করিল। ঐ সময় হইতেই শিবের আদেশে  
তাহারা অস্ত্রত্যাগ করিয়া বাণিজ্যমুখি অবলম্বন করিয়াছিল।  
যে ৭২ জন সপ্তা রাজকুমারের সঙ্গে বনমধ্যে পাষণ হইরা-  
ছিল, তাহাদিগের নামানুসারে ৭২ ঘর বা গোত্র প্রবর্তিত  
হয় এবং রাজা মহেশ্বরী-সম্প্রদায়ের ভাট বা জাগ বলিয়া গণ্য  
হইলেন।

উক্ত ৭২ গোত্রের মধ্যে এখন আজমীড়ী, অণ্ডড়, বহরী,

বলদ্রা, ভাঙ্গড়, বরিয়াল, বেগী, ভাঙারী, ভূতড়া, বিহানী,  
বিমানি, চণ্ডক, চেংলিঙ্গিয়া, ডাণা, দম্মারি, দোরাগী, ধূত,  
হেরিয়া, জগু, ঝরকং, কবর, কল্যাণী, কঙ্কণী, কর্ণাগী, খান্‌গাং,  
খোখতা, খালিয়া, কোঠারী, লঙ্ক, লখোতিয়া, লোহিয়া,  
মল, মলপার্ণে, মানু, মজী, মরদ, মরুধরান, মজুর, নাখরী,  
নিফলক, পর্ভাণী, পুণ্ডপালিয়া, পকাল, রাঠী, সাবু, সধর,  
সোধানী, সিক্‌চি, সোমনী, সোণী, তপরিয়া, তোবালিবাণ ও  
তোতল প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়।

ইহারা হিন্দু ও ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত। গোড় ব্রাহ্মণগণ  
ইহাদের পৌরাহিত্য করেন। দেববিজে ইহাদের বিশেষ  
ভক্তি আছে। ত্রিক্ষণীকে নিবেদন না করিয়া ইহারা  
তুলসীকণাও গ্রহণ করে না।

রাজপুতানার মহেশ্বরীদিগের বিবাহ-প্রথা স্বতন্ত্র। বর  
কন্যা গৃহে প্রবেশ করিলে, কন্যার মাতুল কন্যাকে কোলে  
লইয়া বরের চারিদিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে।

বোথাই-প্রদেশের মহেশ্বরী বণিগগণ মোধ (মোথেরা-  
বাসী), দশ ও বিশ গোয়ুয়া, দশ ও বিশ অদালিয়া এবং  
দশ ও বিশ মণ্ডালিয়া প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। দশ ও বিশ  
গোয়ুয়া এবং দশ ও বিশ অদালিয়াগণ কচ্ছ ও বাটগাঁবাড়ী  
মহেশ্বরীদিগের সহিত আদানপ্রদান করে। মোথেরা-  
(পরান্দিজের অন্তর্গত) নগরে ইহাদের কুলদেবী ভদ্রারিকার  
মন্দির অবস্থিত। সকলে বিশেষ ভক্তিসহকারে ঐ দেবতীর্থ  
সন্দর্শন আগমন করিয়া থাকে। ইহারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত  
এবং উপনয়নসংস্কারে আধিকারী হইলেও কাহাকে যজ্ঞোপবীত  
ধারণ করিতে দেখা যায় না।

মণ্ডালিয়া ব্যতীত মোধ প্রভৃতি মহেশ্বরীগণ বিবাহকালে  
তরবারি ধারণ করে। ইহাদের বিধবাবিবাহ সম্বতোভাবে  
নিষিদ্ধ, কিন্তু বহুবিবাহে কোন বাধা নাই।

এখানকার মহেশ্বরীগণ নাগর ও পর-নগরকেই আপনা-  
দের আদি বাসস্থান বলিয়া মনে করে। ব্রহ্মসম্প্রদায়গণ  
বৈষ্ণবমতাবলম্বী হইলেও তাহারা আপনাপন কুলদেবী ও  
অত্যাশ্রিত দেবতার পূজা করিয়া থাকে। পালিবাণ ব্রাহ্মণগণই  
ইহাদের কুলপৌরোহিত, কিন্তু এতদ্ভিন্ন অনেক পোকর্ণ ব্রাহ্মণও  
ইহাদের পৌরোহিত্য করিতেছে। বিবাহকালে কুলবধূগণ  
কন্যাবধূ প্রভৃতি স্ত্রী-আচার করে না।

মহেশু (পুং) মহান্ হ্রস্বঃ। বক্তৃতা। (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৮৮।৩০)  
(ত্রি) ২ মহাদিশুযুক্ত।

মহেশুধি (পুং) মহান্ হ্রস্বদিঃ যজ্ঞ। ধাতুক, ধনুধারী।

মহেশ্বাস (পুং) ধাতুক, মহাধনুধারী।

মহৈকোদিক্ট (পুং) আত্মশাক্, আটিকোদিক্ট। যুত-  
ব্যক্তির অশৌচান্ত দিনে যে শাক্ হয়।

মহৈতরেয় (ক্লী) বৈদিকগ্রন্থবিশেষ।

মহৈরশু (পুং) মহাশাস্ত্রাবেরশুচ। স্থূল এরশু। (রাজনিং)

মহৈলা (ক্লী) মহতী চাসাবেলা চ। স্থূল এলা, বড় এলাচ।

মহৈশ্বর্য (ক্লী) ১ বিপুল ঐশ্বর্য, রাজপদ। ২ মহাশক্তি।

মহোক্ষ (পুং) মহান্ উক্ষা (অচতুরবিচতুরেতি। পা ৪।৪।৭৭)

ইতি সমাসান্তঃ অচ্ নিপাতিতঃ। বৃহৎ বৃষ। পর্যায়—বৃষত,  
বৃষ, পুঙ্গব, বলা, গোনাথ, ঋষভ, গোশ্রিয়, উক্ষা, গোপতি।

“মহোক্ষঃ স ত্বয়া দৃষ্টঃ সংস্রবন্ত কৃত্তো যদি।

তদ্বিহানয় তং যুক্তা তাবৎ পশ্চামি কৌদৃশঃ ॥” (কথাসরিৎ ৬।৩৬)

মহোটিকা (ক্লী) মহান্তঃ ফলেভ্যঃ স্থূলা উটা পত্রাণ্যন্তাঃ

ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ অকারতৎস্বঃ। বৃহতী। কুড়গাছ।

মহোৎকা (ক্লী) মহতী উৎকা। মহোক্ষা।

মহোৎপল (ক্লী) মহচ্চ তৎ উৎপলক। ১ পদ্ম। ২ মারসপক্ষী।

মহোৎসঙ্গ (পুং) অতুর্জ সংখ্যাত্তেদ।

মহোৎসব (পুং) মহাশাস্ত্রাব্যুৎসবচ। অতিশয়-সুখ-  
জনক কর্ম, অতিশয় উৎসব।

“সদৈর্দেহ জন্মদিবসে স্নাতৈর্মঙ্গলপাণিভিঃ।

গুরুদেবাগ্নিবিপ্রাশ পূজনীয়াঃ প্রব্রুতঃ ॥

স্বনকব্রহ্ম পিতবো তথা দেবপ্রজাপতিঃ।

প্রতিসংবৎসরং কৰ্তব্যশ্চ মহোৎসবঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

মহোৎসাহ (ত্রি) মহান্ উৎসাহো যন্ত। ১ অতিশয় উৎসাহ-  
যুক্ত। পর্যায়—মহোত্তম। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯৩১)

৩ রাজ্যাদ্যপ্রাপ্ত রাজপুরুষ।

“সম্পন্নস্ত প্রকৃতির্মহোৎসাহঃ কৃতশ্রমঃ।” (শব্দমালা)

৪ অতিশয় উত্তম।

মহোদধি (পুং) মহাশাস্ত্রাব্যুদধিশ্চেতি। ১ সমুদ্র, সাগর।

• “লঙ্কা দক্ষা বনং ভগ্নং লজ্জিতশ্চ মহোদধিঃ।

যং কৃতং রামদূতেন স রামঃ কিং করিষ্যতি ॥” (মহানাং)

মহোদধি, জনৈক প্রাচীন কবি।

মহোদধি, ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী,—বিষ ১ তোলা, রস-  
সিন্দূর ১ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা,  
পিপুল ৩ তোলা, শুটু ৬ তোলা ও লবঙ্গ ৫ তোলা, ফলে  
একত্র মদন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে।  
ইহা সেবন করিলে মান্য অগ্নি পুনরায় দীপ্ত হয়।

(ভৈবজ্যং অগ্নিমান্দ্যাধিকার)

মহোদয় (ক্লী) মহান্ উদয়ঃ উন্নতিযশ্চিন্। পুরবিশেষ,  
কাঞ্চকুজ, গাধিপুর, কোশ, কুশস্থল। (হেম) [কাঞ্চকুজ দেখ।]

(পুং) ২ কাঞ্চকুজদেশ। ৩ আধিপত্য। মহান্ উদয় উৎকর্ষো  
যশ্চিন্। ৪ অপবর্ণ। (মেদিনী) ৫ স্বামী। (হেম) (ত্রি)  
মহান্ উদয়ঃ ফলঃ যশ্চিন্ যশ্বাধা। ৬ মহাফল।

“অপি যৎ স্ককরং কন্ম তদপোকেন দৃক্ষরম্।

বিশেষযতোহসহায়েন কিঞ্চ রাজ্যং মহোদয়ম্ ॥” (মহু ৭।৫৫)

‘মহোদয়ং মহাফলং’ (কুস্তুক)

মহোদয়া (ক্লী) মহামুদয়ো যন্তাঃ টাপ্। নাগবলা। (রাজনিং)

মহোদয়া, (ক্লী) ১ নদীভেদ। (লিঙ্গপুং ৪৩।১৮)

২ গঙ্গার দক্ষিণদিকস্থ অঙ্গদেশে প্রবাহিত নদী।

মহোদর (ত্রি) মহদ্রদরমন্ত। ১ বৃহদ্রদরযুক্ত। (ক্লী) ২ বৃহ-

দ্রদর। (পুং) ৩ নাগবিশেষ। (ভারত ১।২৫।১৬) ৪ দানব-

বিশেষ। (ভারত ১।৬৫।২৫) ৫ যুতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত

১।৬৭।২৭) দ্বিযাং টাপ্। মহোদরী, মহাশতাবরী। (ভাবপ্রং)

মহোদরমুখ (পুং) শিবামুচরবিশেষ।

মহোদরেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গভেদ।

মহোদ্যম (ত্রি) মহান্ উদ্যমো যন্ত। মহোৎসাহ। অতিশয়  
উৎসাহবিশিষ্ট।

“অথ নিচ্ছিত্য দাদাদদৈল্লকু লক্ষ্মীং দ্বিতীশ্বরঃ।

জিহ্বুর্দিগ্ধিরং কর্তুং শ্রীমানাদীমহোদ্যমঃ ॥” (রাজতং ৫।১৪১)

(পুং) ২ অতিশয় উত্তোগ।

মহোদ্যোগ (ত্রি) মহান্ উদ্যোগো যন্ত। ১ উত্তমশীল, অতিশয়  
উত্তোগী। (পুং) ২ অতিশয় উত্তোগ।

মহোনা, লক্ষ্মীক্ষেত্রের মলিহাবাদ তহসীলের অন্তর্গত একটি  
পরগণা। গোমতীনদীর বামকূলে অবস্থিত। ভূপরিমাণ  
১৪৭০ বর্গ মাইল। এখানকার ইতোজা ও মণ্ডিয়াওন্  
নগরের জনসংখ্যা সমাপেক্ষা অধিক। এই গ্রাম পূর্বে ভর-  
জাতির আধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে কুম্মীগণ তাহাদের  
নিকট হইতে এই স্থান জয় করিয়া লয়। তদনন্তর পৌবার  
ও চোহান রাজপুত্রগণ এখানে আসিয়া কুম্মীগণকে তাড়াইয়া  
দেয়, এখনও পৌবারগণ এখানকার প্রধান তালুকদার।

২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর, লক্ষ্মী হইতে  
নীতাপুর বাইবার পথের পূর্বাধিকে লক্ষ্মী নগর হইতে ৭৫  
ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্বে এই নগরে বিচার সদর ও  
গবর্মেণ্টের কমচারীদিগের বাস এবং একটি দুর্গ ছিল।  
পার্শ্ববর্তী গোবিন্দপুর-গ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে  
খাজনার দায় ঐ দুর্গে আবদ্ধ রাখায় সমগ্র গ্রামবাসী দুর্গ-  
রক্ষকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া দুর্গ আক্রমণ করে। তদ-  
নন্তর আমিল বাহাদুরগঞ্জে নুতন দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন।  
এই নগরের পূর্বসমুদ্রের অনেক হ্রাস হইয়াছে।

মহোন্নত ( পুং ) মহানতিশয় উন্নত : ১ তালবৃক্ষ । ( ভাবপ্রঃ )

২ নারিকেল বৃক্ষ । ৩ ধারাকদম্ব । ( ত্রি ) ৪ অত্যাশ্ৰিত্যুক্ত ।

মহোন্নতি ( স্ত্রী ) মহতী চাসাবুন্নতি । অতিশয় বৃদ্ধি, অতিশয় উন্নতি, অত্যাশ্ৰিত্য ।

“ভূমতে মহদৈশ্বৰ্য্যং পুত্রাদীনাং মহোন্নতিঃ ।

অব্যাদিনা শরীরেণ চিরং জীব সুখী ভব ॥” ( উদ্ভট )

মহোন্মদ ( পুং ) ১ মস্তবিশেষ, চলিত ফলুই মাদ ।

“রাজগ্রীবশ্চিহ্নতলঃ ফলকো চ মহোন্মদঃ ।” ( শঙ্করদ্বাঃ )

( ত্রি ) ২ অত্যাশ্ৰিত্য, অতিশয় মত্ত ।

মহোন্মান ( ত্রি ) ১ বিস্তৃত, বিপুল । ২ ভারযুক্ত, ভারবিশিষ্ট ।

মহোপনিষদ্ ( স্ত্রী ) ১ উপনিষদ্বিশেষ । এই উপনিষদের ভাস্করাচার্য্য, শঙ্করানন্দ ও নাবায়ণকৃত টীকা দেখিতে পাওয়া যায় । ( স্ত্রী ) ২ গুপ্ত মন্ত্ৰভেদ ।

মহোপমা ( স্ত্রী ) নদীভেদ । ইহার পাঠান্তর মহাপমা ।

মহোপাধ্যায় ( পুং ) মহান্ উপাধ্যায় । প্রধান আচার্য্য । বিদ্বান্ ও ভারবি কবির উপাধিবিশেষ ।

মহোরগ ( পুং ) মহাংসচাসাবুন্নগ । সর্পগণ বিশেষ । ( হেম )  
বৃহৎ সর্পসত্ত্ব ।

“মহোরগাঃ সমুৎপেতুঃ দন্দগুকাঃ সর্বশ্চিকাঃ ।” ( ভাগঃ ৮।১০।৪৭ )

( স্ত্রী ) ২ তগরপাদিক । ( পর্যায়মুক্তাঃ )

মহোরক্ষ ( ত্রি ) মহৎ উরঃ যন্ত । বিশালবক্ষঃ ।

মহোলা, যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর জেলার মিশ্রিখ তহসীলের অন্তর্গত একটা পরগণা । ভূপরিমাণ ৮০ বর্গ মাইল । পশ্চিম-সীমান্তলগ্নী কাঠমানদার বালুকাময় পাক্কা-তটভূমি ব্যতীত এখানকার অধিকাংশ স্থানই সমধিক উৎকরা । এই স্থান যথাক্রমে পাশী, আহ্লন ( অভিন ) ও গোড়জাতির অধিকারে ছিল । বিখ্যাত সিপাহী-বিদ্রোহের সময় জনৈক আহ্লন রাজা এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন । বিদ্রোহে যোগদান করায় ইংরাজরাজ তাহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়া জনৈক রাজভক্তকে এই সম্প্রদায় সমর্পণ করেন ।

মহোন্ধা ( স্ত্রী ) মহতী চাসাবুন্ধা চ । উদ্ধাবিশেষ । জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে লিখিত আছে, মহোন্ধাপাতে অনধ্যায় হইয়া থাকে ।

“বিদ্যাস্তনিতিনিধাতমহোন্ধানাক্ষ সংপ্লেবে ।

আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মধুরএবীং ॥” ( তিথিতত্ত্ব )

মহোবা, (মহোৎসব) যুক্ত-উঃ পঃ) প্রদেশের হামীরপুর জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম । ভূপরিমাণ ৩২৯ বর্গমাইল । এখানকার অধিকাংশ স্থানই পাক্কা অধিতাক্কাভূমে পূর্ণ । ঐ পরকত-বক্ষে অসংখ্য হুদাকার পুষ্করিণী চন্দেলরাজগণের প্রাচীন কীর্তি ঘোষণা করিতেছে ।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর এবং মহোবা তহসীলের সদর । অক্ষা° ২৫°১৭'৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৫৪' ৪০" পূঃ । মদনসাগর নামক একটা সুবৃহৎ হ্রদের তীরে পর্তুগীজের এই নগর অবস্থিত । ঐ মদনসাগর হ্রদ প্রাচীন চন্দেল-রাজবংশের অক্ষয়কীর্তিস্বরূপ ।

নগরটা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত । মধ্য-শৈলের উত্তরাংশ প্রাচীন দুর্গ, শৈলশিখরদেশ মধ্য দুর্গ এবং উহার দক্ষিণভাগ দরিবা নামে পরিচিত । খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে রাজা চন্দ্রবর্ম্মা এখানে একটা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । তদনুসারে ইহা মহোৎসব বা মহোবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে ।

এখানকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে চন্দেল-রাজগণের অপূর্ণ কীর্তির বহুশত নিদর্শন পড়িয়া আছে । রামকুণ্ড নামক সরোবরতীর এখনও চন্দ্রবর্ম্মার অস্ফোটিত্বল বলিয়া পরিচিত । সাধারণের বিশ্বাস,—এই বিস্তীর্ণ হ্রদে পুণ্যসলিলা নদীসমূহের জল ভিতরে ভিতরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে । উপরোক্ত গিরিদুর্গ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে উহা দর্শক মাত্রকেই মোহিত করিয়া থাকে । মুনিয়া দেবীমন্দিরের প্রবেশদ্বারে রাজা মদনবর্ম্মার সময়ে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক দেখিতে পাওয়া যায় ।

হ্রদজল ১১শ ও ১২শ শতাব্দে প্রস্তুত হইয়াছিল । কিরত ( কীর্তি ) ও মদনসাগর নামক হ্রদদ্বয় ব্যতীত অপর দু'একটা মজিয়া উঠিয়াছে । মদনসাগরের মধ্যস্থলে একটা ক্ষুদ্র দ্বীপাকার স্থানের সহিত মুলনগরের সংযোগ রাখিবার জন্য কাক্কাধা-সমন্বিত স্তম্ভরাজি-পারশোভিত সেতু বিরাজিত আছে । এতদ্ভিন্ন হ্রদের তীরভূমে পক্ষতট্টে অসংখ্য অট্টালিকা ধ্বংসাবস্থায় পতিত দেখা যায় । প্রাচীন রাজগণ কর্তৃক গ্রীষ্মকালীন নীতল-সাক্ষ্যসমারগসেবনার্থ পক্ষতোপরি শৈতাবাস নিশ্চিত হইয়াছিল । মদনসাগরের উত্তরকূলস্থ নগরভাগ হইতে একটা সোপান-শ্রেণী সাগরতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে । উহার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য দেবমন্দির নিশ্চিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে কএকটা জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় ।

চন্দেলরাজবংশ এখানে প্রায় ২০ পুরুষ রাজত্ব করেন । পৃথুরাজ কর্তৃক রাজা পরমালের বিজয়ের পর হইতে এখানকার চন্দেলপ্রভাবের অবসান ঘটে । ১১৯৫ খৃষ্টাব্দের সম-কালে এই নগর দিল্লীর মুসলমানাধিপতি কুতবউদ্দীনের করতলগত হয় । মুসলমানবিজয়ের আধিকারকালে এখানে যে সমস্ত মুসলমান-কীর্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে জলহন খাঁর কবর প্রভৃতি কএকটা অট্টালিকা তথাকার শিবমন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ হইতে নিশ্চিত হয় । এতদ্ভিন্ন গয়াস্ উদ্দীন

ভোগলকের রাজ্যকালে ১৩২২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত মসজিদ অত্য়পি শিলালিপি-প্রতিষ্ঠাতার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

পরবর্তিকালে বজারাজ্যে এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে। তাহার মধ্যভাগে শতাব্দীপ্রেরণের জন্ত এইখানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। উক্ত প্রাচীন নগরের পার্শ্বে বর্তমানকালে একটি নূতন নগর স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে তহসিলী কাছারী, থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয়, ঔষধালয়, সরাই, বাজার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত।

মহোবিশীয় (ক্ৰী) সামভেদ।

মহোষ্ঠ (পুং) ১ শিব। (ত্রি) মহদোষ্ঠযুক্ত, যাহার ঠোঁট পুরু।

মহোষ (পুং) ষষ্ঠার পুত্রভেদ। (কথাসরিংসাং ৮।১৬)

মহোজস্ (ত্রি) মহদোজো যন্ত। অতিশয় ওজোযুক্ত, অতিশয় তেজস্বী।

“স্বষ্টেবস্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাশ্বানো মহোজসঃ ॥” (মহু১৩১)

২ কালের পুত্র অহরবিশেষ। (ভারত ১।৬৭।৫৩)

৩ রাজভেদ। ৪ জাতিবিশেষ। (ভারত)

মহোজস্ক (ত্রি) মহৎ ওজো যন্ত। অতিতেজস্বী।

মহোদবাহি (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (আখং গৃং ৩।৪।৪)

মহোষধ (ক্ৰী) মহৎ ঔষধং। ১ ভূম্যাহল্য। ২ শুষ্কী।

৩ লগুন। (ভাবপ্রং) ৪ বারাহীকন্দ। ৫ বংশনাত। (রাজনিং)

৬ পিঙ্গলী। ৭ অতিবিষ। ৮ মহাভেদজ।

“ষভর্ত্বনুপ্রার্থ্য তেবাঞ্চ মহাস্বাসামহোষধৈঃ ॥” (কথাসরিং ৭।৩।৩৮)

মহোষধাদি কাথ, অরোগে হিতকর কাথবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শুষ্কী, গুলঞ্চ, মুখা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধনিয়া মিলিত ২ তোলা। পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা ও মধু ২ মাষা। ইহা সেবন করিলে তৃতীয়ক অরু নষ্ট হয়।

মহোষধি (ক্ৰী) মহতী ঔষধিঃ। ১ দূর্কা। ২ লজ্জালু স্কূপ। (শব্দচং) ৩ মহানানীয় দ্রব্যবিশেষ। ভগবতী দুর্গাদেবীর মহান্নানে সন্ধ্যোষধি ও মহোষধি দিতে হয়। মহান্নানমাত্রেই মহোষধির বিশেষ আবশ্যক।

“সহদেবী তথা ব্যাঘ্রী বলা চাতিবলা তথা।

শম্পুঙ্গী তথা সিংহী অষ্টমী চ সুবর্জলা ॥

মহোষধাষ্টক প্রোক্তং মহান্নানে নিষোজয়েৎ ॥”

(গোবিন্দানন্দদ্বত মংস্তপুরাণবচন)

বেড়োলা, ব্যাঘ্রী, বলা, অতিলা, শম্পুঙ্গী, বৃহতী অষ্টমী (কীরকাকোলী), ও সুবর্জলা এই আটটি দ্রব্য একত্র সম-ভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হইবে।

মতান্তরে—

“পুন্নিপর্গী গ্রামলতা ভৃঙ্গরাজঃ শতাবরী।

শুড়ুচী সহদেবী চ মহোষধিগণঃ স্বভঃ ॥ (শব্দচক্রিকা)

পুন্নিপর্গী, গ্রামলতা, ভৃঙ্গরাজ, শতাবরী, শুড়ুচী ও সহদেবী এই সকল দ্রব্যকে মহোষধিগণ কহে। ২ শ্রেষ্ঠোষধি।

(ভারত ৩২৮।৬) ৩ সঞ্জীবনী।

“দৃষ্ট্বা বিচিস্ততা তেন লঙ্কায়ং রাক্ষসীযুতা।

জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহোষধিঃ ॥” (রঘু)

‘মহোষধিঃ সঞ্জীবনী লতেব’ (মল্লিনাথ)

মহোষধী (ক্ৰী) মহোষধি-ভীপ্। ১ খেতকণ্টকারী।

২ ব্রাহ্মী। (ভাবপ্রং) ৩ কটুকা। ৪ অতিবিষ। (রাজনিং)

৫ হিলমোচিকা। (ত্রিকাং)

মহু (পুং) বিবস্বতের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপং)

নীলকণ্ঠ ইহার পাঠান্তর ‘সহু’ করিয়াছেন।

মহুত্তর (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপর্ব)

মহ্লন (পুং) রাজভেদ। ইনি মহ্লনবামী নামে এক দেবমূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪)

মহ্লনপুর (ক্ৰী) মহ্লনরাজ-প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। (রাজতং ৪।৮৩)

মা, মান। অদাদিৎ পরৈশ্চং স্কং অনিট্। লট্ মাতি, মাতঃ,

মাত্তি। লোট্ মাতু মাতাং মাত্ব। লৃট্ মাততি মাত্ততঃ মাত্তন্তি

লুট্ মাতা। লিট্ মমৌ, মমতুঃ, মমুঃ। মমিথ, মমাথ। লঙ্ অমাং

অমাতাং, অমান্, অমুঃ। লুঙ্ অমাসীৎ, অমাসিঠাং, অমাসিধুঃ।

লৃঙ্ অমাত্তং। লিঙ্ মেয়াৎ। কণ্মণি মীয়তে। অমারি,

অমারিষাতাম্, অমাসাতাম্। গিচ্ মাণয়তি-তে, অমীমণৎ-ত।

সন্ মিস্তি। যঙ্ মেমীয়তে। যঙ্-লুক্ মামেতি, মামতি।

কৃৎপ্রত্যয়ে ক্তা—মিতা। ক্ত—মিতম্। তুম্—মাতুম্। তব্য-

মাতব্য। উপসর্গপূর্বক ক্তা-যপ্ সংমায়, প্রমায়, পরিমায়,

ইত্যাদি। অনীয়ব্—মানীয়ম্। ক্রিচ্—মিতিঃ। যৎ মেয়।

উপসর্গ পূর্বে থাকিলে ধাতুর অর্থ বিভিন্ন প্রকার প্রভৃতি

হইয়া থাকে। প্র-মা—প্রমাণ, অহু-মা—অহুমান, অপ-মা-

অপমান, উৎ-মা—উন্নান, বি-মা বিমান, পরি-মা—পরিমাণ।

এই ধাতুর সাক্ষর্যক ও অকক্ষর্যক উভয় প্রকার প্রয়োগই

দেখিতে পাওয়া যায়। সাক্ষর্যক যথা—“ন মাস্তি মানিনো

যন্ত যশস্ত্রিভুবনোদরে।” (হলায়ুধ)

অকক্ষর্যক যথা—“তনৌ মমুত্তস্ত ন কৈটভদ্বিষন্তপোধনাত্যাগব-

সম্ভবা মুদঃ।” (মাঘ ১।২৩)

এই ধাতু বাহারা অকক্ষর্যক বলেন, তাহারা উপসর্গপূর্বক

ইহার সাক্ষর্যক কল্পনা করিয়া থাকেন। যথা—

“উদরং পরিমাতি মুষ্টিনা।” (নৈষধ ২।৩৫)

মা, ১ শব্দ। ২ মান। হ্রাদি। আশ্রম। সৰ্গ। অনিট্। লট্।  
মিসীতে মিমিতে মিমিতে। লোট্ মিসীতাম্। লিট্ মমে।  
লুট্ মাতা। লুট্ মাততে। লঙ্ অমিসীত। লুঙ্ অমাত।  
লন্ মিসতে। “প্রত্য্য ধর্মে মিসীতে যঃ।” (হলায়ুধ)

মা(ঙ) মান। দিবাदि। আশ্রমেনে। সৰ্গ। অনিট্। লট্।  
মায়তে। লুঙ্ অমাত।

মা (অব্য) দৈবাদিক বা আদাদিক মা-কিপ্। ১ বারগ।

“মা নো বধারিষ্ণু মা পরাদাঃ।” (শব্দ ১।১০৪৮)

মা ধাতুর ণ্ডি ব্যবহারহেতু “ন মাঙ্ যোগে” ইত্যাদি  
পাণিনি যুজ্ঞে ও শব্দে ণ্ডি ব্যবহার হইয়াছে। এই তিদনুবন্ধ-  
ধাতু-নিপন্ন মাঙ্ শব্দেও মা-শব্দেরই অর্থ বুঝাইবে। পাণিনি-  
যুজ্ঞে এই মাঙ্ যোগে অভ্যাসের নিষেধ করা হইয়াছে। যথা—

“মা নিবাধ প্রতিষ্ঠাঃ স্বপদমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।” (রামায়ণ)  
২ বিকর। (মেদিনী) ৩ নিম্। ৪ পশ্চাৎ।

“ধর্ম এব হতো হস্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

তদ্বাক্ষ্যে ন হস্তব্যো মা নো ধর্মো হতোহবধীঃ।”

(মহু ৮।৫)

মা—কিপ্ অথবা মা-ক, ততটাপ্। ৫ লক্ষ্মী। ৬ মাতা।

“মারমা স্তবমা চাকরুচা মারবধুতমা।

মাতধুততমাবাসা সা বামা মেহন্ত মা রমাঃ।”

(সাহিত্যদ ১০ অ০)

মা—ভাবে কিপ্ ৭ মান। (শব্দরত্না০) ৮ জ্ঞান।

৯ দীপ্তি। ১০ অশ্বৎশনের দ্বিতীয়কবচননিপাত্ত বৈকল্পিক  
রূপ। পদের উত্তর বিকরে ‘মাং’ স্থানে মা আদেশ হয়।  
ইহাতে মদীর কন্ধ্যতা বুঝায়। অর্থাৎ চলিত আমাকে। যথা—

“কন্ধ্যতে স্বাংগজাতপরাধে।

ব্যুত্থাপ্যনং মোহিতাং মা কুরুষ।” (দেবীভা০ ১।৫।৬৪)

মাই (দেশজ), ১ স্তন। ২ স্তন্য দ্রব্য।

মাইকেলমধুসূদন দত্ত, বাঙ্গালার একজন প্রধান ও  
অধিতীয় কাব্য। কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের  
প্রসিদ্ধ উকিল ৬রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র। তাঁহার মাতা  
জাহ্নবা দাসী যশোরের কাটিপাড়ার জমিদার ৬গৌরীচরণ  
যশোরের হুঁহিতা ছিলেন। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৫ শে জাহ্নবারী  
শনিবার (১২৩০ সাল ১২ই মাঘ) যশোর জেলার অন্তর্গত  
কপোতাক্ষ নদীতীরবর্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবিবরের জন্ম হয়।  
এস্থান তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের আদি বাসভূমি নয়। তাহার  
প্রপিতামহ রামকিশোর দত্ত খুলনা জেলার অন্তর্গত তালাগ্রামে  
বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামনিধি, পিতৃবিরোধের  
পর জন্মভূমি তালাগ্রাম পরিত্যাগপূর্বক কনিষ্ঠ দয়্যারাম ও

মাণিকরামকে সঙ্গে লইয়া সাগরদাঁড়িতে মাতুলপ্রসন্ন আসিয়া  
বাস করেন। এখানে তাঁহার রাখানোহন, মদনমোহন, দেবী-  
প্রসাদ ও রাজনারায়ণ নামে চারিটা পুত্র হয়। শেখোক্ত  
রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ মধুসূদন।

মধুসূদনের পিতা ও জ্যেষ্ঠভাতগণ সকলেই উপাধীনকম  
ছিলেন। জাতীর ধর্মে একান্ত অহুস্কৃতি, দানশীলতা, আতিথ্য  
প্রভৃতি সঙ্গুণে তাঁহাদের সাগরদাঁড়িহ দত্তপরিবার স্বদেশীয়  
সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই দত্তবংশের  
মিতব্যয়িতা ও ইন্দ্রিয়-সংযম সম্বন্ধে দৃষ্টি ছিল না।

রাজনারায়ণ প্রথমাপরী জাহ্নবা দাসীর জীবদ্দশাতেই  
আর তিনটা দারপরিগ্রহ করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সোপা-  
কৃত অর্থেও তাঁহার কোন মমতা বা মিতব্যয়িতার পরিচয়  
পাওয়া যায় না। মধুসূদনের জন্মকালে দত্তবংশের সোভাগ্য  
দিন দিন পরিবর্তিত হইয়াছিল। তাঁহার জাতকাদি  
বিশেষ সমারোহের সহিত স্তম্ভপন্ন হয়। সর্বকনিষ্ঠ রাজনারা-  
য়ণের পুত্র বলিয়া জ্যেষ্ঠভাতগণ মধ্যে তাঁহার আদরের পরি-  
মীমা ছিল না। তাঁহার ভ্রাতৃত্বের অকাল মৃত্যুতে এবং  
অপর ভ্রাতাভগিনীর অভাবে তাহাকে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ-  
ভাত ও আত্মীয় স্বজনের একান্ত স্নেহভাজন করিয়াছিল।  
বাল্যের এই স্মৃতিভোগ ও আদর ঘোবনে তাঁহাকে অমিত-  
ব্যয়িতা ও উচ্ছ্রান্ততানোবে কলুষিত করিয়াছিল। অভ্যাস-  
বশে এই দোষগুলি স্বতঃই তাঁহার চরিত্রে প্রতিকলিত  
হইয়াছিল।

মধুসূদনের ৭বৎসর বয়সের সময় রাজনারায়ণ কলিকাতার  
ওকালতীর জজ খিদিরপুরে বাটিক্রয়পূর্বক অবস্থান করেন।  
ঐ সময়ে মধুসূদন গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন আরম্ভ করি-  
লেন। পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইলে, তিনি যথাসময়ে হিন্দু-  
কলেজে বিভাগশিক্ষার্থ কলিকাতায় আনীত হন। এখানে  
কএকদিন খিদিরপুরস্থ একটা ইংরাজী বিভাগলয়ে অধ্যয়নের  
পর, আহুমানিক ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ  
করেন। খ্রীঃ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমগুণে মধুসূদন কলেজের  
একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বাল্যগণ্য হইলেন। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে  
৫ম শ্রেণীতে পঠদশায় জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া তিনি বৃত্তি  
লাভ করেন। প্রথমতঃ গণিত শাস্ত্র তাঁহার ভাল লাগিত  
না। তাঁহার সহাধ্যায়ী গণিতপ্রিয় ৬ভূদেব-প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ  
সেকপীর অপেক্ষা নিউটনের প্রতি অহুস্রাগ দেখাইতেন,  
কিন্তু মধুসূদন সেকপীরার পক্ষ সমর্থন করিয়া সর্বদাই  
বলিতেন যে, ‘সেকপীরার ভ্রষ্টা করিলে নিউটন হইতে  
পারিতেন। কিন্তু নিউটন সেকপীরার হইতে পারিতেন না।’



এই কথার পর তিনি গোপনে অকস্মাত্ত অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতেও অল্পদিন মধ্যেই কৃতকাৰ্য্য হইয়া ছিলেন। একদিন অধ্যাপক রিজ সাহেব বোর্ডে একটা কঠিন অঙ্ক কথিতে দিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়িগণ সে কঠিন অঙ্ক কথিতে না পারিয়া অধোমুখ হইলেন, তখন মধুসূদন সূচাক্রমে ও সুলভর প্রণালীতে অঙ্ক সম্পন্ন করিয়া ভূদেব বাবুর গা টিপিয়া বলিয়াছিলেন, “কেমন সে কপীয়ার চেষ্টা করিলে যে নিউটন হইতে পারিতেন, তাহা দেখিলে ত ? কিন্তু আমার গণিত শেখা এই পর্য্যন্ত শেষ।”

৮রাজনারায়ণ বসু-সম্পাদিত হস্তলিখিত সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখার পর, তিনি ৮রসিককৃষ্ণ মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত ‘জ্ঞানাম্বষণ’ পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এইরূপে ১৭শ বর্ষ বয়সে হিন্দু-কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় মুদ্রাবস্তুর সঙ্গে মধুসূদনের সম্বন্ধ আরম্ভ হয়।

মধুসূদনের স্বাভাবিক প্রেমপ্রবণতা ও পরহৃৎখ্যকাতরতা, ছাত্রাবস্থা হইতেই তাঁহার প্রকৃতিতে প্রতিভাত হইয়াছিল। পিতামাতার অনুগ্রহে তাঁহার অর্থাতাব ঘটে নাই, বিপদের সেবার তিনি অর্থব্যয় করিয়া পিতৃদত্ত ধনের সার্থকতা করিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী সুপ্রসিদ্ধ Travels of a Hindu-প্রণেতা ভোলানাথ চন্দ্র বলিয়াছেন—“Madhu fully justified his name—he is all মধু—all that endeared one to another.”

তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে কাপ্তেন রিচার্ডসন বিদ্যায় গ্রহণ করিলে কার (Kerr) সাহেব কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি কোন কারণে মধুসূদনকে তিরস্কার করিলে উক্তপ্রকৃতি মধু অভিমানে কলেজের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে কৃতপঙ্কজ হইলেন।

কলেজে অধ্যয়ন-কালে মধুসূদনের বিলাসপ্রিয়তা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুলভ বেশভূষা পরিধান ও গন্ধদ্রব্য না হইলে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না। অতি অকিঞ্চিৎকর কার্য্যেও তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতেন। এইরূপ বিলাসপ্রিয়তা অপেক্ষা শতগুণ গুরুতর আরও একটা দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। ডিরোজিওর ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে পানদোষ ও হিন্দুধর্মনিষিদ্ধ দ্রব্যভক্ষণ তৎকালে একটা অনুকরণীয় সত্যতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। পানদোষের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতাও ছাত্রাবস্থায় মধুসূদনের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিল। শৈশব হইতে পিতামাতার শাসনশৈথিল্যে ও অন্ত্যাদরে প্রতিপালিত হইয়া সেই তরুণ বয়সের উদ্যম ভাবগুলি সংযত করা তাঁহার পক্ষে

অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কোমল ও প্রেমপিপাসু হৃদয় লইয়া তিনি ইংরাজ কবি বার্লথকে আপনার আদর্শ করিতে বাইরা শেষে হুঁসীতি ও মিডাটারের প্রতি অবজ্ঞা করিতে শিখিলেন। ক্রমেই তিনি হুঁসীতপরাণ হইয়া উঠিলেন। একবার তিনি অছতপ্ত-হৃদয়ে স্বকাথ্যের পরিণাম তাবিয়া, বালাসুন্দর পৌরহাস বসাককে লিখিয়াছিলেন, “you see from an anchorite and monk, I am becoming a decided rake.” কিন্তু হৃৎথের বিষয়, মেণ্টের জ্ঞান তাঁহার মন্থণাকাকী কোন সুদৃঢ়, তাঁহার স্বকায় অস্ত তৎকালে আবিস্কৃত করেন নাই। মধুসূদন ভালবাসিয়া পরকে আপন করিতে পারিতেন, কিন্তু আপনাকে পরের হস্তে সমর্পণ করিতে জানিতেন না। নিজের ইচ্ছা, অন্যর কাছারও ইচ্ছার বিসর্জন দিবার শিক্ষা তাঁহার হয় নাই। এই কারণে হত-ভাগ্য কবি চিরজীবনের জন্ত, হুঁসীতির ভ্রমোন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

মহাশয় রামগোপাল ঘোষের জীবন বেঘন ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তদুপ মধুসূদনের জীবন রিচার্ডসনের প্রভাবে সংগঠিত হইয়াছিল। রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল, কৃষ্ণমোহন, দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতি ডিরোজিওর ছাত্রগণ যেরূপ সকলেই রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজসংস্কারক হইয়া সংসারের কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে জীবন অতিবাহিত করিয়া ছিলেন, তদুপ ৮প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, ভোগানাথ চন্দ্র প্রভৃতি রিচার্ডসনের ছাত্র-বৃন্দ সুলেখক ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পণ্ডিত রিচার্ডসনের জ্ঞান সুলেখক হইবার বাসনা অত্যন্ত ছাত্রগণের জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ও আধার করিয়াছিল, এমন কি, তিনি তাঁহার দোষগুলির অনুকরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একদা কলেজের প্রধান শিক্ষক জোন্স সাহেব, তাঁহাকে রিচার্ডসনের বাঁকা বাঁকা হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “মধু, তুমি কি মনে কর কাপ্তেন সাহেবের জ্ঞান বাঁকা বাঁকা হাতের লেখা হইলে তুমি একজন বড়লোক হইবে।”

মধুসূদন যখন পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন রিচার্ডসন সাহেবের “সারসংগ্রহপুস্তক” প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত হইবার পূর্বে তিনি উহা পাঠ করিয়া মনের আবেগে সর্বজনসমক্ষে বলিয়াছিলেন, “I wish, I had been the author of it.” এই সুকুমার বয়সে তাঁহার মনে কিরূপ উচ্চাভিলাষ জন্মিয়াছিল, তাহা তাঁহার উপরোক্ত মন্তব্যে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে।

মধুসূদন ৮১০ বৎসর বয়সের সময় মাতা ও বাণীর অন্ত্য প্রাচীনা মহিলাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত, কবিকর্ণাটী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিয়া যে কবিতা-বীজ মধুসূদনের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, রিচার্ড-সনের শিক্ষার ও আদর্শে তাহা উদ্ভিন্ন হইবার অবসর প্রাপ্ত হইল। কলেজের অতি নিয়ন্ত্রণী হইতেই তিনি ইংরাজীতে গল্প ও গল্প রচনা করিতে আরম্ভ করেন। যদিও তাঁহার পূর্ণবয়সের রচনার সহিত তাঁহার বাল্য-জীবনের রচনায় কোন সখ্য নাই, তথাপি তাঁহার সাহিত্যগত জীবন কিরূপে আবহ ও বিকাশ পাইয়াছিল, তাহা জ্ঞাতকারণ নিয়ে তাঁহার বাল্যকালের রচিত কএকটি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল।

পঠদশায় বায়রণই তাঁহার আদর্শ ছিল, কিন্তু প্রাপ্তবয়সে তিনি অল্প কবি মিন্টনকেই আপনায় আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচনায় বায়রণ, স্কট ও মুরের লালিত্য ও কবিত্বের আভাস পাওয়া যায়। তিনি ইহাদিগের অনুকরণে কতদূর কৃতকাব্য হইয়াছিলেন, তাঁহার ‘ক্যাপ্টিভ লেডী’ ও উদ্ধৃত কবিতাগুলি পাঠ করিলে সর্বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। উক্ত তিন জন কবি এবং ডিরোজিওর প্রতিভা শৈশব জীবনে তাঁহার হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া অনেকে তাঁহাকে ‘Eurasian Byron’ বলিয়া ডাকিত।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে হিন্দু-কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ-কালে মধুসূদন কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবিতালেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি এবং ডিরোজিও উভয়েই বায়রণের শিষ্য, সুতরাং উভয়ের কবিতায় এক আদর্শের ছায়াপাত দেখা যায়; কিন্তু তাই বলিয়া মধুসূদনকে ডিরোজিওর অনুকরণী বলিতে বাসনা হয় না। একই মন্ত্রের উপাসক এবং একই আদেশে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিব্যয়ের প্রবীণতা ও নবীনতা সখ্যে যে প্রভেদ, এখানে ডিরোজিওর সহিত তাঁহারও সেইরূপ পার্থক্যসম্বন্ধ উপলব্ধি করা যায়।

নিয়ে মধুসূদন-রচিত কএকটি ইংরাজী কবিতার উদ্ধৃতি-তাংশ দেখিলে স্বতঃই বুঝা যায় যে প্রথম যৌবনেই তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের তুফান কিরূপ বহিত।

‘I love thee’ নামক কবিতায়—

But 'tis past—what is past?—Can it be that fond breast.  
Is now cold as the sod it hath silently prest—

Can it be that those eyes—so soft and so bright—  
Are now quenched with grave's eternal-dark night !

‘They ask me why I fade and pine’ নামক কবিতায়—

That cruel—that relentless maid,  
Of heart more hard than stone,  
Cares not why thus I pine and fade,  
And why oft thus I moan !  
When fondly turn my ravished eyes  
On her sweet cheeks I gaze,  
What life embittering frowns arise  
And cloud that heavenly face !  
O ! thus abandoned to despair  
I've not but grief for me ;  
My life a wilderness appear  
Overgrown with misery !”

‘The fortunate rainy day’ নামক কবিতায়—

“There I kissed and embraced her.—and oh ! who can tell  
What passions tumultuous did in my bosom swell !  
What tears joy-speaking rushed forth from my eyes !  
They bathed her snowy hands while I warmed them  
with my sighs”

‘My fond sweet blue-eyed maid’ নামক কবিতায়—

“I dream—I steal the silent kiss,  
Tho' tremble while I take,  
Like am'rous moon beams that embrace  
And kiss yon silvery lake:  
I dream—I see those azure eyes  
Dance star-like in that face,  
That face the better Paradise,  
Where Ang'ls sigh t' pass their days !

এই শ্রেণীর আরও অনেক কবিতা পাওয়া যায়, কিন্তু বাহ্যভায়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। এতদ্ভিন্ন এই অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি ‘Literary Gleaner’ নামক পত্রিকায় “King Porus—A legend of old” নামক কবিতা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অল্প বয়সে স্বদেশের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া বালক মধুর হৃদয়ে কিরূপ উচ্ছুক উঠিয়াছিল, তাহা কবিতা-পাঠক সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন।

প্রতিভাবান কবির স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি কিরূপে বিকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাঁহার বাল্যকালের কবিতা-কৌড়া হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি স্বীয় কল্পনাদেবীকে বিদায় দিয়া যে কবিতা লিখিয়াছেন,—তাহা বিশেষ মনো-হার। বাণ্যরচনা বলিয়া উপেক্ষার বিষয় নহে।

On Granting "Leave of Absence" to my Muse.  
 "Needst thou a testimonial  
 Of my affection, Love! for thee?  
 This Single fact,—ma'am! will suffice  
 That all I Sacrifice for thee!  
 Farewell! But oh! remember me,  
 Return, before our "Monthlies" all,  
 The "Gleaner"—"Blossom" "Comet" tempt  
 Me, to scribble for them all."

তিনি তাহার প্রিয়সুহৃৎ গৌরদাস বসাককেও এইরূপে  
 কবিতায় কতকগুলি পত্র লিখিয়া যান, উহাতে তাঁহার কবিত্ব-  
 শক্তির বিকাশ স্পষ্টই বুঝা যায় :—

Gour, Excuse me that in verse  
 My Muse desireth to rehearse;  
 The gratitude she oweth thee;—  
 I thank you most heartily :—

ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষার তেমন অশুশীলন  
 করেন নাই। সে সময়ে উহা অশিক্ষিত ও বর্ষবের ভাষা মনে  
 করিয়া তিনি মাতৃভাষা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু  
 একবার গৌরদাস বাবুর অহুরোধে তিনি বর্ষবর্ণনচ্ছলে ইংরাজী  
 acrostic শ্রেণীর কবিতায় গৌরদাস বাবুর নাম সংযোগে  
 একটা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, উহা নানাদোষযুক্ত  
 হইলেও মেঘনাদবধরচরিতার প্রথম রচনা বলিয়া উদ্ধৃত  
 করা গেল—

"গভীর গর্জন সদা করে জলধর,  
 উথলিল নদ নদী ধরণী উপর।  
 রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে  
 দানবাদি দেব যক্ষ স্মৃতিত অস্তরে।  
 সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,  
 বরুণ প্রলয় দেখি প্রবল প্রভাব।  
 স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়।  
 কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয় ॥"

ঐ শ্রেণীর আর একটা কবিতা "হিমগত" সম্বন্ধে—

"হিমস্তের আগমনে সকলে কম্পিত,  
 রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।  
 মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,  
 নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জলে আর।  
 ফুরারেছে সব আশা মদন রাজার,  
 আসিবে বসন্ত আশা এই আশা সার।  
 আশার আশ্রিত জনে নিরাশা করিলে,  
 আশাতে আশার বস আশায় মারিলে।  
 সজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,

নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।

যে জন করয়ে আশা আশার আশাসে,

নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে।"

এই সময়ে বঙ্গসাহিত্যে গুপ্তকবির রাজত্বকাল; সুতরাং  
 মধুসূদনের কবিতায় একরূপ শব্দালঙ্কারের আড়ম্বর ঘটিবে, তাহা  
 বিচিত্র নহে। অর্থ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন কি  
 না তাহা উক্ত কবিতাদ্বয়পাঠে স্পষ্টই অনুমান করা যায়।  
 তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তির জ্ঞান তিনি ইংরাজী সাহিত্যের  
 অনুশীলনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ইংরাজী ভাষায়  
 গ্রন্থরচনা করিয়া তিনি যশঃ ও প্রতিপত্তি লাভ করিবেন তাহার  
 মনে একরূপ উচ্চ আশা স্থান লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায়  
 হুবহু লেখিয়া তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা  
 ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।"

বালায়বদি এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া এবং সহাধ্যায়ি  
 সঙ্গীদিগের জ্ঞান আজীবন ইংরাজী সাহিত্যানুশীলনে ব্যাপৃত  
 থাকিয়া তিনি প্রথম জীবনে ইংরাজী ভাষারই চরণসেবা  
 করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও প্রিয়সুহৃৎ ৮রাজনারায়ণ বসু  
 ও ৮ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত পূর্ণবয়সে বাঙ্গালার সাহিত্য  
 আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজ হইতে তাঁহার বাঙ্গালাভাষা-শিক্ষা শেষ হয়।  
 তিনি স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভাবলে নিজের ভাষা-প্রকাশের  
 প্রণালীর পথ আবিষ্কার করিয়া লন। ক্রমে বাঙ্গালা ভাষায়  
 তাঁহার অধিকার হয়। এদেশীয় কোন গ্রন্থকারের নিকট  
 যদি তিনি ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে স্বর্ণী থাকেন, তবে তাহা দরিদ্র  
 কাশীদাস ও কুড়িবাসের নিকট। স্বর্ণ ও রোপ্য-পদ্যাদি  
 পুরস্কার এবং বৃত্তিলাভ তৎকালের শিক্ষালাভ ও রচনা-  
 শক্তি-পরিবর্দ্ধনের বিশেষ অঙ্গুল ছিল। মধুসূদন যখন  
 সিনিয়ার বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন  
 স্বর্ণীয় রামগোপাল ঘোষ মহাশয় স্ত্রীশিক্ষাবিবয়ক সম্বোধ-  
 ক্ত রচনার জন্য দুইখানি পদ্য দিতে প্রতিশ্রুত হন। হিন্দু-  
 কলেজের মধ্যে যে দুই জন ছাত্র প্রতিযোগিতায় উচ্চ স্থান  
 অধিকার করিবেন, তাঁহারা দুই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। এই  
 পরীক্ষায় মধুসূদন প্রথম ও ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার  
 করেন। গুণাভাসারে মধুসূদনই স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

রিচার্ডসনের যন্ত্রে মধুসূদনের বাঙ্গালার রচিত অনেক  
 কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছাত্রাবস্থা হইতে  
 তিনি ভাবী সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অনেকে  
 তাঁহাকে তখন হইতেই কবি বাঙ্গালা ডাকিতেন, তাঁহার  
 দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, একদিন জগৎ তাঁহার কবিত্বের

গৌরবে বিম্বিত হইবে। তিনি বায়রনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া গৌরদাস বাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন ;—

"I am reading Tom Moor's life of my favorite Byron.—A splendid book upon my word. Oh ! How should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which, I am almost sure, I should be if I can go to England."

বালক মধুসূদনের মনে ইংলণ্ড-গমনের যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, তাহা তাঁহার এই পত্রে, তৎসম্পর্ক দর্শন-কালীন গৌরদাস বাবুকে লিখিত পত্রে এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের 'লিটারারী মীনার' নামক পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান। নিয়ে তাঁহার সেই হৃদয়-ভাবব্যঞ্জক কবিতা উদ্ধৃত করা গেল ;—

"Oft like a sad bird I sigh  
To leave this land, though mine own land it be;  
Its green robed meads,—gay flowers and cloudless sky  
Though passing fair, have but few charms for me.  
For I have dreamed of climes more bright and free  
Where virtue dwells and heaven-born liberty  
Makes e'en the lowest happy;—where the eye  
Doth sicken not to see man bend the knee  
To sordid interest :—climes where science thrives  
And genius doth receive her guerdon meet ;  
Where man in all his truest glory lives  
And nature's face is exquisitely sweet :  
For those fair climes I heave the impatient sigh,  
There let me live and there let me die."

ইহার এক বৎসর পূর্বে লিখিত "Extemporary song" নামক কবিতায়ও তিনি ইংলণ্ড-গমনের হৃদমণীয় বাসনা-প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইংলণ্ডে গমন করিতে না পারিলে তাঁহার কবিতা-শক্তি পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু সে অবকাশ আসিবার পূর্বেই তিনি মেঘনাদ, বীরভাগা, ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সর্বোচ্চ সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। যুরোপীয় আচার ব্যবহার, হাবভাষ, সাহিত্য ও সমাজের বিশেষ অনু-করণপ্রিয় হইলেও তিনি একবারে স্ব-সমাজের ও স্বদেশের প্রতি অহুরাগশূন্য হইয়া নাই। তাঁহার লিখিত ;—"Written at the Hindu College by a young native student," নামক কবিতা—

"Oh ! how my heart exulteth while I see

These future flow'rs to deck my country's brow"

—পাঠ করিলে তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়। এই অষ্টাদশ

বর্ষ বয়সেই তিনি ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত Bentley's Miscellany এবং Blackwood's Magazine প্রভৃতি পত্রে কবিতা প্রেরণ করিতেন।

হিন্দু-কলেজে শিক্ষা-কালে মধুসূদন উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত-দ্রিয়, অমিতব্যয়ী, বিলাসী এবং ধর্মশূন্য-সম্পন্ন উদাসীন ছিলেন। পক্ষান্তরে অধ্যয়নশীলতা, কাব্যাহুরাগ, প্রেম-পিপাসা, পরহুঃখকাতরতা, উত্তেজনাধানে দৃঢ়তা প্রভৃতি সদগুণ তাঁহাকে সমলঙ্ঘিত করিয়াছিল। এতদ্বিধ নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে অটলবিশ্বাস তাঁহাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু অকস্মাৎ এই সময় হইতে কোন অভাবনীয় ঘটনাস্রোত তাঁহার জীবনপ্রবাহকে অন্য পথে লইয়া গেল।

ঐ ঘটনাটি তাঁহার খুঁট-ধর্ম গ্রহণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন মধুসূদন ধর্মাস্তর অবলম্বন করিলেন, তদ্বিষয়ে কোন প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি হিউম, টমাস্ পেন, থিওডোর পার্কার প্রভৃতির গ্রন্থ সাধারণে পাঠ করিতেন। সেই সময়ে সহাধ্যায়ীদিগের মত তিনিও সকল মতই উপেক্ষা করিতেন। এতদ্ব্যতীত ডিরো-জিও, রিচার্ডসন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতিরও ছাত্রবৃত্তের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এরূপ অবস্থায় হিন্দুকলেজের শিক্ষা যে মধুসূদনের ধর্ম-মত পরিবর্তনের অন্তর্কূল হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

শুনা যায়, এই সময়ে তাঁহার পিতামাতা স্বদেশীয় এক জমিদার-কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ সন্ধি স্থির করেন, বিবাহ করিলে তাঁহার ইংলণ্ডগমনের ব্যাঘাত ঘটবে ভাবিয়া তিনি বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ কন্যাটি আদৌ তাঁহার মনোমত ছিল না। সে কথা তিনি তাঁহার এক পিতৃব্য-পুত্রকে জানাইয়াছিলেন ;—"বাবা এক কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না। আমি এমন কাজ করিব, যে সেজন্ত বাবাকে চিরকাল দুঃখ করিতে হইবে।"

পিতামাতাকে ইহাতেও বিবাহ দিতে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া তিনি মনের আবেগে গৌরদাসবাবুকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবগুলি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—*"My betrothed is the daughter of a rich zemindar ;—poor girl ! What a deal of misery is in store for her in the ever inexorable womb of Futurity !"* নাবাংলিকার দুঃখবহ জীবনের উল্লেখ করিয়াই তিনি অল্প স্থলে আপনায় বিশ্ববিজয়িনী

এবাস-বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন,—“Depend upon it—  
in the course of a year or two more,—I must either  
be in E—D or cease “to be” at all ;—one of these  
must be done !”

পিতামাতার সম্মিলিত কষ্টাবিবাহে তাঁহার বিরাগের  
একটা কারণ ছিল। কোন স্ত্রী-পুত্র-বালিকার রূপ-  
শুণের তিনি বিশেষ গুরুপাতী হইয়া পড়েন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ  
করিলে, এই কুমারীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ বটবার সম্ভাবনা  
এবং তাহাতে তাঁহার ইংলণ্ড-গমনের বিশেষ সুবিধা হইতে  
পারে তাহারা তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের  
নিকট বাইয়া স্বীয় খৃষ্টধর্ম-গ্রহণাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন।  
এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উক্ত রেভারেণ্ড তাঁহাকে বাদ্যালার  
সহকারী শাসনকর্তা মিঃ বার্ডের নিকট লইয়া গেলেন এবং  
তৎসময়ে এই নবীন যুবকের ধর্মাস্ত্রের প্রয়াস ব্যক্ত করি-  
লেন। তদনুসারে তিনি এই শিক্ষিত যুবককে দীক্ষা দিবার  
নিমিত্ত খৃষ্টান-বাজকমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ করেন। পাছে  
মধুসূদনের আত্মীয়গণ তাঁহাকে বাজকদিগের হস্ত হইতে  
বলপূর্বক উদ্ধার করিয়া লন, সেই ভয়ে তাঁহার মধুসূদনকে  
অন্ত স্থানে না রাখিয়া একবারে ফোর্টউইলিয়মের ছুর্গে আবদ্ধ  
রাখেন। বৃথা চেষ্টা করিয়াও রাজনারায়ণ পুত্র মধুসূদনকে  
উদ্ধার করিতে পারিলেন না। ছই চারি দিন কেল্লার বন্দীর  
স্তায় অবস্থানের পর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২ই ফেব্রুয়ারী, মধুসূদন  
আর্চার্ডিকন্ ডিস্ট্রীক্টের নিকট ওল্ড মিসন চার্চ ধর্ম-মন্দিরে  
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার নামের  
সঙ্গে “মাইকেল” নাম সংযুক্ত হইল।

কুসংস্কার ও উপধর্মের অন্ধকার হইতে খৃষ্টধর্ম-গ্রহণ করিয়া  
তিনি যে আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দীক্ষা-  
কালে রচিত ধর্মসঙ্গীতে পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

দীক্ষাগ্রহণের পর মধুসূদন পিতৃগৃহত্যাগ করিতে বাধ্য  
হন। তিনি বাটীতে আসিলে, স্নেহময়ী মাতা তাঁহাকে  
পূর্ববৎ আহারাদি করাইতেন, কিন্তু সমাজচ্যুতিভয়ে তাঁহাকে  
গৃহে স্থান দিতেন না। অনেক অমূল্য বিনয়সম্বোধেও মধুসূদন  
শাস্ত্রানুমোদিত-প্রারম্ভিক দ্বারা পুনর্বার হিন্দুসমাজভুক্ত  
হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে জীবিকার  
জন্ত তাঁহাকে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষা হইতে হয়।  
তাঁহার স্নেহময় পিতামাতা, তাঁহার অবাধ্যতা এবং অকৃতজ্ঞতা  
বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার আর্থিক অভাব দূর করিয়া দিলেন।  
বিধর্মী হইলেও, মধুসূদন বাহ্যতে সুশিক্ষিত এবং যশস্বী  
হইয়া, পরিণামে স্ত্রী হইতে পারেন, তজ্জন্ত তাঁহাদিগের

যত্নের ক্রটি ছিল না। হিন্দু কলেজে খৃষ্টান বালকদিগের  
পাঠের নিয়ম ছিল না বলিয়া, মধুসূদনের পক্ষে সেখানে আর  
অধ্যয়নের সম্ভাবনা ছিল না। বেশীখ খৃষ্টান এবং ইংরাজ,  
বালকদিগের শিক্ষার জন্ত, শিবপুরে বিশপ্‌কলেজ নামে  
একটা উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।  
মধুসূদন সেইখানে বিদ্যাধ্যয়নের অভিমত প্রকাশ করিলে  
তাঁহার পিতা আনন্দের সহিত সে ব্যয়ভার বহন  
করিয়াছিলেন।

খৃষ্টধর্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের গুরুতর  
পরিবর্তন ঘটয়াছিল। তাঁহার মাসাজগমন, যুরোপীয় মহিলার  
পাণিগ্রহণ, সাংসারিক অভাব, আত্মীয় স্বজনদের মেহবিচ্যুতি  
এবং অবশেষে অনাথের জ্ঞান দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু  
প্রভৃতি তাঁহার ধর্মাস্ত্র-গ্রহণের ফল। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করায়  
পিতৃদত্ত সাহায্যে বঞ্চিত ও স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া  
তিনি সাহিত্যকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু বলিয়া  
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজি-সাহিত্যে তাঁহার অর্থাভাব  
বিদূরিত অথবা যশোলিপ্সা পরিতৃপ্ত হইল না দেখিয়া তিনি  
মাতৃভাষার ক্ষেত্রে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে  
এই সময়ে রাজা প্রতাপচন্দ্র, পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র ও মহারাজ  
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির সাহায্য ও উৎসাহলাভে পুরস্কৃত  
হইয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবার জীবন উৎসর্গ করিয়া-  
ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে জাতীয়-ভাবে অভাব এবং বিজাতীয়-  
ভাবে প্রাধান্য, তাঁহার ধর্মমতপরিবর্তনের ফলেই সাধিত  
হইয়াছিল।

যুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি পাশ্চাত্য-  
সমাজের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিশপ্‌-  
কলেজে গ্রীকভাষা অধ্যয়ন করিয়া গ্রীকসাহিত্যে তাঁহার  
বিশেষ অমুরাগ জন্মে। তাই তিনি গ্রীকসাহিত্যের অমূল্য  
রত্ন হোমার-প্রণীত কাব্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া-  
ছিলেন। সংস্কৃতভাষায় তাঁহার অধিকার না থাকায় তাঁহার  
মেঘনাদবধের রামচন্দ্র হিন্দুভাষায় প্রাণিত হয় নাই। তিনি  
বাস্তবিকপক্ষে পরিত্যাগপূর্বক হোমারকেই অমুরাগ করিয়া-  
ছিলেন।

মধুসূদন চারি বৎসর কাল বিশপ্‌কলেজে অধ্যয়ন করেন।  
এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ  
করিয়াছিলেন। ইংরাজী তাঁহার মাতৃভাষারই স্তায়, হিন্দু-  
কলেজে কবিতারচনাকালে আমরা তাহার যথেষ্ট পরিচয়  
পাইয়াছি। লাতিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ইতালিয়ান  
ভাষায় তিনি অক্রেপে কথোপকথন করিতে ও পত্রাদি লিখিতে

পারিতেন। উক্ত ছয়টি যুরোপীয় ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত, পারসিক, হিব্রু, তেলগু, তামিল ও হিন্দুস্তানী ভাষায় তাঁহার অসংখ্য অভিজ্ঞতা ছিল, সুতরাং মাতৃভাষা বাঙ্গালা ছাড়া বারটি বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার অধিকার হইয়াছিল। ভাষা-শিক্ষা ও কবিতানুশীলন সম্বন্ধে এই কয় বৎসর মধ্যে তিনি যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, হৃৎকেন্দ্র বিষয়, সেই বিস্তারিতরূপে সঙ্গ সঙ্গ উচ্ছৃঙ্খলতাও তাঁহাকে সেই পরিমাণে আশ্রয় করিয়াছিল। অদ্যতঃচিত ও অপরিণামদর্শী মধুসূদনের হৃদয়ের শান্তি দিন দিন অন্তর্হিত হইতে লাগিল। জননীর অমুরোধে তিনি কখন কখন পিতৃগৃহে আগমন করিতেন, কিন্তু ধর্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারসম্বন্ধীয় বৃথা বাদানুবাদে পিতার সহিত তাঁহার কলহ উপস্থিত হইত। তাঁহার পিতা অবশেষে বিরক্ত হইয়া মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়াছিলেন। যদি মধুসূদন এই সময়ে পিতার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভবিষ্যৎ জীবনে ক্লেশ পাইতে হইত না।

মধুসূদনের অশান্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। অর্থাভাবে তাঁহার কষ্ট দ্বিগুণতর হইল। খুঁটখুঁটি গ্রহণ করিয়াও তাঁহার মনোমত পূরীলাভ ও ইংলণ্ডগমন অদৃষ্টে ঘটিল না। খুঁটখুঁটি-প্রচারকগণ ও রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি যাহারা তাঁহাকে দীক্ষার সময় আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহারা এবং তাঁহার বাল্যসুহৃদগণ তাঁহার ধর্মাস্তরগ্রহণের জন্ত ক্রমশঃই দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বদেশ তাঁহার নিকট প্রবাস এবং পিতৃগৃহ অরণ্যসম বোধ হইল। সহানুভূতি লাভ দুরাকাঙ্ক্ষা। বুঝিয়া তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া অত্র শান্তিলাভের চেষ্টায় অগ্রসর হইলেন। বিশপ-কলেজে অনেকগুলি মাস্ত্রাজ-প্রেসিডেন্সীর ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তাঁহাদের মুখে তথাকার সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তিনি মাস্ত্রাজে যাওয়াই স্থির করিলেন। অবশেষে তিনি একদিন গোপনে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন (১৮৪৭-৪৮ খৃঃ)।

যখন তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার নিকট এক কপর্দকও ছিল না। পাঠ্য পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া সামান্য যাহা কিছু সঙ্গে লইয়াছিলেন, পাথের প্রভৃতিতে তাহা অল্পদিন মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গেল। এই নিঃস্বল অবস্থায় আবার কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাহার জীবন যাপন যে কিরূপ দুঃসহ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যত দিন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, ততদিন তাঁহার বৈধর্ম্য মাতা তাঁহাকে গোপনে অর্থ সাহায্য করিতেন, সুতরাং হৃদয়বিদারক দারিদ্র্যকষ্ট তাঁহাকে একদিনের জন্তও অনু-

ভব করিতে হয় নাই। এই সময় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে দরিদ্রতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে হয়। নিক-পায় হইয়া তিনি মাস্ত্রাজের দেশীয় খুঁটান-সম্প্রদায়ের সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। তাঁহার মধুসূদনের হৃৎকেন্দ্র কাতর হইয়া তাঁহাকে অনাথ ফিরিঙ্গী-বালকদিগের জন্ত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞালয়ের শিক্ষকতা-কাৰ্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

উপায়ান্তরের অভাবে তিনি অর্থাগমের জন্ত সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন। এত দিন তিনি অমুশীলন ও বিনোদনের জন্ত সাহিত্য সেবা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রাণধারণার্থ সাহিত্যের পূজা করিতে হইল। তিনি মাস্ত্রাজের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সুখ্যাতি মাস্ত্রাজের কৃতবিশ্ব সমাজে পরিব্যাপ্ত হইল। এখানেও তিনি একজন মূললেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

Madras Circular & General Chronicle, Madras Spectator ও Athæneum নামক পত্রিকাভয়ে তাঁহার Captive Lady ও Visions of the Past প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হয়।

উক্ত ক্যাপটিভ্ লেডী উপক্রমণিকায় তিনি আপনার কষ্টকর ভারবহ জীবনের পরিচয় নিম্নলিখিত ছন্দে জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন, "Want and Poverty with the 'battalions' of 'Sorrows' which they bring, leave but little inspiration for their victim."

ক্যাপটিভলেডী প্রকাশের পূর্বে তিনি মাস্ত্রাজের এডভোকেট জেনারেল জর্জ নটনের অনুমতিক্রমে ও মধ্যবর্তিতায় তথাকার এক নীলকর স্বৈতান্ত্রের কত্মার পাণি-গ্রহণ করেন। ক্যাপটিভ্ লেডীর প্রারম্ভে তিনি এই নব পরিণীতা বধূকে উল্লেখ করিয়া অমুরাগ ভরে যে প্রীতি সোধোদন করিয়াছিলেন, ভাবীজীবনে সে প্রেম-ভাব আর স্থান পায় নাই। বিবাহের কএক বৎসর পরে, তাহার সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তদনন্তর মাস্ত্রাজ-প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের ছহিতার প্রতি তাঁহার অমুরাগ সঞ্চার হয়। এই কত্মাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমপত্নী ও তদগর্ভজাত পুত্র-কত্মাগণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের উল্লেখ নিম্নয়োজন। শেষোক্ত মহিলার গর্ভজাত পুত্র কত্মাকে আমরা মধুসূদনের প্রকৃত সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিব।

যে প্রেমময়ী পত্নীর সংসর্গে তিনি শ্রীতিপূর্ণ উন্মাদ-কবিতা

ক্যাপটিভ লেডীর প্রারম্ভে গাইয়া গিয়াছেন ; সেই অসংযত-  
চিত্ত পুরুষ স্রুতের আশায় বঞ্চিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ পরে আত্ম-  
বিলাপে সেই নিদারুণ যন্ত্রণাময় বিবাহিত-জীবন সম্বন্ধে  
লিখিয়াছেন,—

“প্রেমের নিগড় গড়ি, পরিলি যতনে সাধে, কি ফল লভিলি ?  
অলস্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-কাঁদে উড়িয়া পড়িলি !

পতঙ্গ যে রঙ্গের ধার, ধাইলি অবোধ হায়,

না দেখিলি না শুনিলা, এবে রে পরাণ কাঁদে।”

অপরিণামদশী মধুসূদন প্রগাঢ় কলঙ্ককালিমার মর্মভেদী  
যাতনায় অস্থির হইয়া আত্মমনোভাব বাক্য করিয়া গিয়া-  
ছেন। হতভাগ্য কবি বায়রণের ভ্রায় হতভাগ্য কবি মধু-  
সূদনের জীবনও অশান্তিময় ও কলঙ্কময় হইয়াছিল।

তাহার ক্যাপটিভ লেডীর প্রশংসা কৃতবিশ্ব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-  
মাত্রেরই করিয়া গিয়াছেন। আধিনীয়ম পত্রিকার জনৈক  
ইংরাজ পত্রপ্রেমক উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া লিখিয়া-  
ছেন ;—“What I believe neither Scott nor Byron  
would have been ashamed to own.” পঞ্চবিংশ বর্ষে  
বিদেশীয় ভাষায় পুস্তকরচনা করিয়া একুশ প্রশংসা লাভ করা  
কম শ্লাঘার বিষয় নহে।

মাত্রাজে তিনি সুলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন  
বটে, কিন্তু তাহার অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা হইল না। কলি-  
কাতাবাসিগণ প্রবাসী মধুসূদনের প্রতি সহানুভূতি করা  
দূরে থাকুক, বরং তাঁর সমালোচনা দ্বারা তাহার ও তাহার  
সুহৃদগণের হৃদয়ে নৈরাশ্রের ভীষণ তরঙ্গ উত্তোলিত করিয়া-  
ছিলেন। Bengal Hurkara নামক পত্রিকায় (১৯শে  
মে শনিবার ১৮৪৯ খৃঃ) তাহার গ্রন্থের শ্লেষোক্তিপূর্ণ সমা-  
লোচনা বাহির হইয়াছিল। হরকরা-সম্পাদক তাঁহাকে ইংরাজী  
গ্রন্থ লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভের হ্রাশা ত্যাগ করিতে উপদেশ  
দেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্পাদক এই উপলক্ষে তাহার  
দরিদ্রাবস্থার প্রতিও ক্রভঙ্গী করিতে ক্রটি করেন নাই।  
তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমণিকার শেষ চরণ উল্লেখ করিয়া  
সম্পাদক লিখিয়াছেন, “Possibly had our poet looked  
the ugly realities of life manfully in the face,  
instead of trying to abstract his thoughts from  
them, he might not have been dependent on  
Want, Poverty & Co., for his inspiration.”

চঞ্চল ও অস্থিরচিত্ত হইলেও একুশ সমালোচনায় তাহার  
মতিভ্রম উপস্থিত হয় নাই। তিনি সাহিত্যসেবার লক্ষ্য স্থির  
রাখিয়া অক্ষয়কীর্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ক্যাপটিভ লেডী

প্রকাশিত হইবার পূর্বে পর্যন্ত তাহার মনে ধারণা ছিল যে,  
ইংরাজী সাহিত্যের অমূল্যলন দ্বারা তিনি সুখশলাভ  
করিতে পারিবেন, কিন্তু অচিরে তাহার সে ভ্রম দূরীভূত  
হইল। হরকরা-সম্পাদকের ভ্রায় কঠোর তিরস্কারে গ্রন্থ-  
কারকে প্রসিদ্ধিত না করিয়া শিক্ষাবিভাগের সভাপতি  
মহাত্মা ডিক্‌ওয়ার্টার বেথুন (J. E. D. Bethune) উপহার-  
প্রাপ্ত একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রতিভাবান নবীন লেখক  
মধুসূদনকে বাঙ্গালা ভাষায় অমূল্যলনার্থ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ  
দেন। মহাত্মা বেথুন গৌরদাস বাবুকে পত্র লিখিয়া  
জানান,—“But he could render far greater  
service to his country and have a better chance  
of achieving a lasting reputation for himself, if  
he will employ the taste and talents which he  
cultivated by the study of English in improving  
the standards and adding to the stock of the poems  
of his own language, if poetry at all events he  
must write.”

মহাত্মা বেথুনের এই সম্বন্ধে উপদেশ এবং কলিকাতার  
শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্য মধুসূদনের পক্ষে পরিণাম-মঙ্গল-  
জনক হইল। তিনি বেশ বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন যে, বিদেশীয়  
ভাষায় যতই অধিকার থাকুক না কেন, তাহাতে কবিতা  
রচনা করিয়া কখনই তিনি মিলটন প্রভৃতিকে অতিক্রম  
করিতে পারিবেন না। শুভকণ্ঠেই তিনি খীর ভ্রম বৃষ্টিতে  
পারিলেন। মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি  
এই সময় হইতে নানা ভাষা ও গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ  
করিলেন। মধুসূদন আলস্তে সময়ক্ষেপ করিতে ছন ভাবিয়া  
গৌরদাস বাবু লিখিলেন, ‘একপভাবে সময়ক্ষেপ করা তোমার  
কর্তব্য নহে, তুমি যদি তোমার শক্তি ও সামর্থ্য মাতৃভাষার  
সেবার নিয়োজিত করিতে, তাহা হইলে তাহা কতই ফলপ্রদ  
হইত।’ মধুসূদন প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, “আমার জীবন  
এখন বিদ্যালয়ের বালক অপেক্ষা অধিক কার্যে ব্যস্ত। আমার  
কার্য্যপ্রণালী এইরূপ—৬টা হইতে ৮টা পর্যন্ত হিব্রু, ৮টা হইতে  
১২টা স্কুলের কার্য্য, ১২টা হইতে ২টা পর্যন্ত গ্রীক, ২টা হইতে  
৫টা পর্যন্ত সংস্কৃত ও তেলুগু, ৫টা হইতে ৭টা পর্যন্ত লাতিন,  
৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত ইংরাজী। ইহার পুরও কি তুমি  
বলিবে, আমি মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তুত  
হইতেছি না ?”

দীর্ঘ-প্রবাসের ফলে তাহার বাঙ্গালা ভাষার সামান্য জ্ঞান  
ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছিল। পাছে এই সম্বন্ধ একবারে বিলুপ্ত



হয়, এই আশঙ্কায় তিনি কলিকাতা হইতে কাশীদাসী মহা-ভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ আনাইয়া পাঠ করিতে থাকেন। ঘটনাক্রমে কতকগুলি কারণে তাঁহার মাস্ত্রাজ পরিত্যাগ অনিবার্য হইয়া উঠিল। তিনি বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার ভাবী জীবনের পথও পরিষ্কার হইয়া আসিল।

মাস্ত্রাজে তিন বৎসর বাসের পর তাঁহার মাতৃবিয়োগ এবং তাহার চারি বৎসর পরে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মধুসূদনের আত্মীয়গণ মধুসূদনকে পরলোকগত জানিয়া তাঁহার পিতৃসম্পত্তি গ্রাস করিয়া বসিল। এই সংবাদ গৌরদাস বাবু অল্পকিষ্টে মধুসূদনকে জানাইলেন। এই সময় তিনি মাস্ত্রাজের দৈনিক পত্রিকা Spectatorএর সহকারী সম্পাদক ও প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। চিরান্তে অপরিমিতব্যয়িতা-দোষে তিনি তখন অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। গৌরদাস বাবুর আহ্বান বড়ই সমরোপযোগী হইল। তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৮বৎসর কাল প্রবাস-বাসের পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

আটবৎসরব্যাপী প্রবাসের ফলে তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল। তিনি পূর্বাশ্রম-মূলকায় হইয়াছিলেন। যুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ ও বিজ্ঞাতীয় সংসর্গে বাসহেতু তাঁহার কঠোর ও অন্তরূপ হইয়াছিল। তিনি আহায়ে, পরিচ্ছদে এবং আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি একেবারে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ সমাজ ও ধর্মত্যাগীকে আশ্রয় দিলেন না। একমাত্র প্রিয় সুহৃদ গৌরদাস বাবু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে তৎকালীন পুলিশ মাজিষ্ট্রেট ৮ কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে কেরানীগিরি কাধ্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তথাকার দিভাষিক পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এ সময় সংবাদপত্রে লিখিয়াও তাঁহার কিছু আয় হইত।

বঙ্গালায় আসিয়া তাঁহার বঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিশেষ সুযোগ ঘটিল। পূর্বে বঙ্গালাভাষা ধ্বংস ছিল, এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতির প্রতিভাশ্রমে তাঁহার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইল। মধুসূদন এই সুযোগে মার্জিত বঙ্গালা শিক্ষার অবসর লাভ করেন। ঈশ্বরগুপ্তের রঙ্গরসপূর্ণ মুখরোচক চাটনী আশ্বাদনের পর আমরা প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের মধুচক্রের আশ্রয়

পাইয়াছি। ঈশ্বরচন্দ্র একযুগের শেষ, মধুসূদন অপর যুগের আরম্ভ।

কলিকাতায় সামান্ত আয় হইলেও, জ্ঞাতিগণের হস্ত হইতে আপনার গৈতুক সম্পত্তির উদ্ধার এবং আদালতের কার্য সুচারুরূপে সম্পাদন তাঁহার প্রধান কতব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গে তাঁহার অদৃষ্টা-কাশ পরিষ্কার করিবার জন্ত আর একটি ঘটনা সমুপস্থিত হয়। হোরেস হিমেস উইলসন সাহেবের তত্ত্বাবধানে পরি-চালিত “Sans-Soci” নাট্যশালার অধুকেরণে ঐ সময়ে কলি-কাতার মাতৃগণ্য ব্যক্তিমায়েত্রই গৃহে নাট্যকাভিনয় হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে ছাত্তু বাবুর বাটীতে শকুন্তলার অভিনয় দেখিয়া পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র এবং বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর হায়িভাবে একটি নাট্যশালা স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হন। ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং নাট্যশালা নির্মাণের ও আহু-সঙ্গিক সমস্ত আয়োজনের ভারগ্রহণ করেন। ৮ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার যে উত্তান পাইকপাড়ার রাজার ক্রয় করিয়াছিলেন, তথায় ঐ নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছিল।

রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত রত্নাবলী এই নাট্যশালার অভিনীত হইতেছিল। রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করা হইর হইলে, গৌরদাস বাবুর প্রস্তাবে রাজারা ধ্যাননাশা কবি মধুসূদনের হস্তে রত্নাবলীর অনুবাদের ভার অর্পণ করেন। এই সময় হইতে পাইকপাড়ার উত্তর রাজভাড়া এবং মহারাজ বতীন্দ্রমোহনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার অধুষ্ঠাতাদিগের প্রীতি-ভাজন হইলেন। তৎকৃত অনুবাদ সকলের মনোনিীত হইলে রাজারা মধুসূদনকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

রত্নাবলীর অভিনয়-প্রশংসার সন্দেশে সন্দেশে অনুবাদকের নামও চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বঙ্গের ছোটলাট ও তাঁহার সহধর্মিণী হইতে হরকরা পত্রের সম্পাদক পর্যন্তও তাঁহার অনুবাদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ হইতে মধুসূদন তাঁহার জীবনের গন্তব্যপথ প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন রত্নাবলীর অভিনয়ভাষ্যস-দর্শনকালে মধুসূদন ও গৌরদাস বাবুর মধ্যে নূতন নাটকের আবশ্যকতার কথা উত্থাপিত হয়। তাহাতে মধুসূদন বলিয়াছিলেন, “ভাল নাটক! আচ্ছা আমি রচনা করিব।” গৌরদাস বাবু হাসিয়া মনোভাব গোপনপূর্বক বলিলেন, “আপত্তি কি? ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিতে পার।” গৌরদাস বাবুর সহিত কথোপকথনের পর দিনই তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় হইতে সে

সময়কার প্রচলিত কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ আরম্ভ করিলেন। ইহার কএকদিন পরেই তিনি শর্শিষ্ঠা নাটকের পাণ্ডুলিপি ক্রয়দংশ গৌরদাস বাবুকে দেখান। যে মধুসূদন হুগলী নর্থাল স্কুলের শিক্ষকতার জন্য প্রতিযোগী পরীক্ষার পূর্ববীহলে ‘প্রথিবী’ লিখিয়া ছিলেন, আজ সেই হংরাজী-নবিশ মাস্ত্রাজী সাহেবকে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থরচনা করিতে দেখিয়া প্রতাপচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন বিস্মিত হইলেন। ইহাদিগের উৎসাহে কএক সপ্তাহ মধ্যে শর্শিষ্ঠার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ হইল। শর্শিষ্ঠায় মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যত্যয় ঘটাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে হংরাজী-রীতি প্রবর্তন করিয়া যান।

শর্শিষ্ঠার পর তাঁহার পদ্মাবতী ঐক্যপুরাণের ছায়াবল-ধনে রচিত হয়। প্রথম রচনা শর্শিষ্ঠা হইতে তাঁহার পদ্মাবতীর ভাষা নাটকরচনার অধিক উপযোগী হয়। ইহাতে তিনি গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন। ঐ পদ্যগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শর্শিষ্ঠানাটক প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে বাঙ্গালা কবিতার অমিত্রাক্ষরছন্দ-ব্যবহার লইয়া মধুসূদনের সহিত মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের বাদানুবাদ হয়। মধুসূদন বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরছন্দে পদ্মাবতীর কলিদেবের অংশমাত্র রচনা করিয়াছিলেন। শর্শিষ্ঠার পর তিনি ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বথাক্রমে “একেই কি বলে সত্যতা,” “বুড়ো শালিকের বাড়ি রোঁয়া” নামক প্রহসন দ্বয়, ‘পদ্মাবতী’ নাটক এবং ‘তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য’ প্রণয়ন করেন। এ সকল গ্রন্থেও তিনি প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী না হইয়া বরং পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদিগের প্রবর্তিত রীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গ সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন। ভাষার লালিত্য, ভাবের উৎকর্ষ ও পাস্তীর্ঘ্য এবং চরিত্রসমূহের পূর্ণতা গুণে এই গ্রন্থ খানি সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই সময়ে একদিকে যেমন তাঁহার প্রতিভার পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনই তাঁহার পাশ্চাত্য ভাবপ্রবণতাও সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। মেঘনাদবধে রাসচন্দ্রের সমাল দর্শন, প্রমিলার বিক্রম প্রভৃতি বর্ণনা যুরোপীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। সমালোচনা-ভাগে তাহার কতকংশ উদাহরণস্বরূপ বিবৃত করা গিয়াছে।

পাশ্চাত্য মহাকাব্যগণের কাব্যের আদর্শ, স্বদেশীয়দিগের সম্মুখে উপস্থিত করা ভিন্ন, বিদেশীয় ভাবের অনুকরণ বা

সাম্যতাসম্পাদন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনারায়ণ বসু ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন বলিয়াছিলেন,

“Whatever passes through the crucible of the author's mind receive an original shape” বাস্তবিকই মধুসূদন মেঘনাদ রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে এক নতুন আলোক প্রদান করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও মেঘনাদবধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“Will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived like Vyas, Valmiki or Kalidas, Homer, Dante or Shakespeare.”

মধুমক্ষিকার মায় নানাদেশীয় কাব্যকুসুম হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি যে অপূর্ণ মধুচক্র নিৰ্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন বঙ্গবাসী সত্য সত্যই তাহা—

“আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।”

মেঘনাদবধের পর তাঁহার প্রস্তুত কাব্যকুসুম ‘ব্রজাঙ্গনা’ কণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। খুঁটখুঁটিবলয়ী হইয়াও মধুসূদন যে বৈষ্ণব মহাজনোচিত উচ্চভাবের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহারই অসামান্য প্রতিভার পরিচয়-স্থল বলিতে হইবে। তদনন্তর তিনি টডের রাজস্থান হইতে বিরোগান্ত কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রণয়ন করেন।

রাজকাব্য, পুস্তক বিক্রয়ের আয় এবং পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে পত্নী পুত্র ও কন্যা লইয়া তাঁহার সংসারযাত্রা কণ্ঠে নিকাহ হইলেও তিনি হৃদয়ের বিষম যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেন। এই সময়ের (১৮৬১ খৃঃ অঃ আশ্বিন মাসের) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি সত্যোজ্জনাথ ঠাকুরের অনুরোধে ‘আত্মবিলাপ’ লিখিয়া সে ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের বীরপত্রাবলী (Heroic Epistles) অবলম্বনে বীরঙ্গনা কাব্য প্রণয়ন করেন। বীরঙ্গনা কাব্য মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের দৃষ্টান্তস্থল। ইহার পর হইতে তাঁহার প্রতিভার অধোগতি আরম্ভ হয়। মধুসূদনের পত্রপাঠে জানা যায় যে, তিনি যতীন্দ্রমোহনের অনুরোধে মহাভারতীয় এবং রাজনারায়ণ বাবুর অনুরোধে সিংহল-বিজয় বৃত্তান্ত অবলম্বনে দুই খানি কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করেন। ঐ দুইখানি গ্রন্থই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। গ্রন্থদ্বয়ের প্রারম্ভক কবিতায় কএক চরণ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

সিংহল-বিজয়ে—

“অর্ণসোধে সুধাধরা যক্ষ্মমোহিনী—  
দুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকানগরে,  
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি দেখিলা,  
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে  
পতাকা, মঙ্গলবাণ্ড বাজিছে চৌদিকে।”

হুয়োথনের উদ্ধৃত্তে—

“দেখ দেব, দেখ চেয়ে” কাতরে কহিলা  
কুরুরাজ রূপাচার্য্যে, “আসিছেন ধীরে  
নিশীথিনী; নাহি তারা কবরী বন্ধনে,  
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি;  
শিবির বাহিরে মোরে লহ রূপা করি  
মহারথ, রাখ লয়ে যথার ঝরিতে  
এ ভূনত শিরে এবে শিশিরের ধারা,  
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি  
জনীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে  
সে শিশু” লইলা সবে ধরা ধরি করি  
শিবির বাহিরে শূরে—ভয় উরু রণে।”

অর্থাভাব হেতু শাস্তিশূন্যতাই তাঁহার প্রতিভা-হ্রাসের কারণ। বীরাঙ্গনাকাব্যে জনার পত্রিকা শেষ করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন, “The Epistle of poor জনা must be revised and printed along with the Second set. I am very unpoetical just now. God knows in what all this trouble, anxiety and vexation will end.”

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিনের জন্য ‘হিন্দুপেট্রিট’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক হইয়াছিলেন। হংলণ্ডে বাইয়া বারিষ্টার হইয়া আসিলে তাঁহার অর্থাভাব দূর হইতে পারে ভাবিয়া তিনি ইংলণ্ড-গমনে স্থিরসংকল্প হইলেন। তদনুসারে তিনি মহাদেব চটোপাধ্যায় নামক পিতার প্রতিপালিত কঠিনক ব্রাহ্মণকে সমস্ত পিতৃসম্পত্তি পত্তনী দিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ২ই জুন, কাণ্ডিয়া নামক জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এই সময় মধুসূদন স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধব ও জন্ম-ভূমির নিকট বিদায় লইয়া তিনখানি পত্র লিখেন। বায়রণের “My Native Land Good Night” বাক্যের সার্থকতা বজায় রাখিয়া তিনি বঙ্গভূমির উদ্দেশে নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন,—

“রেখো মা দাসের মনে, এ মিনতি করি পদে  
সাধিতে মনের সাধ,                      ঘটে যদি পরমাদ,  
মধুহীন করোনা পো তব মনঃকোকনদে। ১

প্রবাসে দৈবের বশে,                      জীবিতারা যদি খসে  
এ দেহ আকাশ হ’তে, নাহি খেদ তাহে।  
অস্থিরে মরিতে হবে,                      অমর কে কোথা কবে,  
চিরস্থির কবে নীর, হার রে জীবন-নদে ? ২।  
কিন্তু যদি রাখ মনে,                      নাহি, মা, ডরি শমনে  
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃতহৃদে।  
সেই ধন্ত মরকুলে,                      লোক যারে নাহি ভুলে,  
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;—৩।  
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,                      যাচিব যে তব কাছে,  
হেন অমরতা আমি কহগো শ্রামা জন্মদে।  
তবে যদি দয়া কর,                      ভুল দোষ গুণ ধর,  
অমর করিয়া বর দেহ দাসে স্ববরদে ৪।  
ফুটি যেন স্মৃতি জলে,                      মানসে, মা, যথা ফলে  
মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে। ৫।’

Here you are, old Raj !—All that I can say is—

“মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে।”

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই শেষভাগে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া Gray’s Inn প্রবেশপূর্বক বারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। এ সময়েও অর্থাভাবে তাঁহাকে নিরতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। “দয়ার সাগর বিভাগাগর” মহাশয় না থাকিলে কখনই তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া ঘটত না। তাঁহার অর্থাভাবের কথা মনে হইলে অশ্রুসংবরণ করিতে পারা যায় না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ২রা জুন ভার্ভেসলিস্ নগর হইতে বিভাগাগর মহাশয়কে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, দেনার দ্বারে তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হইতেছে এবং তজ্জন্তই বা তাঁহাকে ফরাসী-কারাগারে গমন করিতে হয়। তাঁহার সম্পত্তি হইতে প্রাপ্য ৪ হাজার টাকার কিয়দংশ পাইলেও তিনি প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। অথবা স্বয়ং বিভাগাগর মহাশয় মধ্যস্থ থাকিয়া তাঁহার সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ১৫ হাজার টাকা কর্জ লইলে তিনি দেনা পরিশোধপূর্বক বর্তমান আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন ;—

“There is due to me Rs 4000 in Calcutta. As soon as you get this letter, I hope you will send me a part of this money to save me from starvation. Out of the 15000 ( ল্যাণ্ডমর্টগেজ সোসাইটির নিকট সম্পত্তি বন্ধক দিয়া তিনি যে টাকা পাইবার আশা পাইয়াছিলেন ) you will be pleased to pay the following debts.

Mathoor mohan Kundu	1700
Saugore Dutt ( about )	800
Yourself	1000
Madhu Sudan Mazumder	500
	4000

\*\*\*\* If you do this before October next, I shall go back to Gray's Inn and returned to India in time. If not, I must perish and I do not think you will suffer me to do so."

উপন্যূপরি হতাশ হইয়া তিনি অপর পত্রেও লিখিয়াছিলেন, "I hope, I shall not have to cry out with 'Ram in my poem of Meghanad, 'বৃথা এ জলপি আমি বাধিছ তোমারে।' যুরোপ-প্রবাসকালে পত্নীপুত্র লইয়া তাঁহাকে কি দারুণ দুর্দশায় পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পত্রগুলিতে বিশেষরূপে বিবৃত আছে। অর্থাভাবে তিনি আপনার পুত্র কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন নাই।

ইংলণ্ড-প্রবাসকালে সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ ও খ্যাতনামা সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মধুসূদনের বিশেষ সঙ্গীতি হয়। এই সময়ে তিনি চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রণয়ন করেন। এই সময়ে ইংরাজীতে গীতাচরিত ভিন্ন তিনি কতকগুলি ঈশ্বরাজী খণ্ড-কবিতা এবং বাঙ্গালায় 'শুভদ্রাহরণ' ও 'দ্রোপদী-স্বয়ম্বর' নামে দুইখানি গ্রন্থের কিয়দংশ রচনা করিয়া যান।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মার্চ মাসে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

পাঁচ বৎসর প্রবাসের পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে স্বদেশ প্রত্যগত হইয়া তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে বারিষ্টারি আরম্ভ করেন। বারিষ্টারী ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বিশেষ লাভবান হন নাই, বরং তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্ৰস্ত হইয়াছিল। তিনি, কবির গ্রাম, জগৎকে কল্পনা-চক্ষে দেখিতেন, গ্রামের উচ্ছ্বাসে তাঁহার নিকট যুক্তি ও প্রমাণ নিমগ্ন হইয়া যাইত। ব্যবহারশাস্ত্রের কূটক তাঁহার স্বভাব-সরল চরিত্রের উপযুক্ত ছিল না। তৎকালীন বিচারপতি লুইস ব্যাকসনের সহিত তাঁহার বিবাদ এবং তাঁহার বিকটকণ্ঠস্বর তাঁহার অকৃতকাফ্যতার প্রধান কারণ। বাস্তবিক পক্ষে তিনি যে একবারেই কৃতকাফ্য হইতে পারেন নাই এমন নহে। প্রথম প্রথম তিনি মাসিক প্রায় ১১০ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করিয়াছিলেন।

XIV

শেখাবস্থায় তাঁহার প্রথমার্জিত প্রতিপত্তি ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার ব্যবসায় সর্বদা হিন্দু পেট্রিয়ার্ট লিখিয়াছিলেন, "nursed on the lap of poesy he was not the man to suck the moisture of life from the dry bones of law." (Hindu Patriot, 30th July 1873)

চকলা ধনদার প্রসাদ লাভাশায় তাঁহাকে বাগ্বেদীর আরাধনা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্বপন্নীর সেবা করিতে দেখিয়া ভারতী একবারেই তাঁহার হৃদয়-মন্দির হইতে অন্তর্ধান করিলেন, তথাপি কমলা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না।

যুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর, মধুসূদন ছয় বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য নূতন কিছু করিয়া বাইতে পারেন নাই। এই সময়ের মধ্যে তিনি নীতিমূলক কবিতামালা, হেক্টর-বধ ও মায়াকানন রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি উহার কোনখানিই সম্পূর্ণ করিয়া বাইতে পারেন নাই।

নীতিকবিতাগুলি তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন। ঐ বর্ষে তাঁহার হেক্টর-বধ প্রকাশিত হয়। উহা তাঁহার গ্রীক ভাষা ও হোমরের কবিতা-পাঠের ফল। যুরোপ-প্রবাসকালে তিনি অগদ্যেও জড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও সে অণু পরিশোধ করিতে পারেন নাই। অগ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মানসিক অশান্তিও দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল। কেবল যে উচ্ছ্বাসলতা ও বিলাসিতার জন্য তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা নহে, অনেক সদহুষ্ঠানেও তিনি মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও মমতা ছিল না। এমন কি, নিজের সংসারনিস্বাহের জন্য তিনি যে অণু করিয়া আসিয়াছেন, দারিদ্র্যপীড়িত কোন পরিচিত ব্যক্তির কষ্ট জানিতে পারিলে তিনি সেই অর্থ দ্বারাও তাহার কষ্ট বা দুঃখমোচন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন নাই। দারকানাথ মিত্রের জজিয়তী লাভ উপলক্ষে তিনি এই দায়ের উপর প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া একটা ভোজ দিয়াছিলেন।

একবার তাঁহার কোন বাগ্যসুহৃদ এক ব্যক্তিকে লইয়া মধুসূদনের নিকট একটি মকদ্দমার পরামর্শ গ্রহণ করিতে যান। মধুসূদনের পরামর্শ প্রাপ্তে আশ্লাদিত হইয়া ঐ ভদ্র লোকটা পারিশ্রমিক দিতে উত্তম হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। পরে ঐ ভদ্র লোকটা বিদায় হইলে তিনি বাগ্যসুহৃদকে বলিলেন, তাই! তুমি যখন উহাকে আশ্রয় বোধে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, তখন আমি উহার নিকট হইতে কিছুতেই পারিশ্রমিক লইতে পারি না। কিন্তু আমার

গৃহে আর এক কপর্দকও নাই, যদি তোমার নিজের সঙ্গে টাকা থাকে, তবে আমার দ্বীকে পাঁচটা টাকা ঋণ স্বরূপ দিয়া বলিয়া আইস, যেন উপযুক্ত সময়ে আহার্য প্রস্তুত হয়। তাঁহার এই উদারতা আনন্দের বিষয় হইলেও, তাঁহার ঋণ-পরিশোধে ওদাদীত্ব বড়ই পরিণাম-ক্লেশকর।

এই ঋণজনিত যন্ত্রণা যখন অসহ্য বোধ হইত, তখন তিনি অবিবর্তন মদিরা পান দ্বারা তাহা প্রশমনের চেষ্টা করিতেন। মধুসূদন নিজে বৃত্তিতে পারিতেন যে, সূর্য স্থলে তিনি বিষপান করিতেছেন। এইরূপ আত্মহত্যা ভিন্ন ঋণদায় ও মানসিক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভের আর উপায় ছিল না। মনো-মোহনের সাক্ষাতে সুরাপানের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, “কণ্ঠে নিজে অদ্বাধাত করা অপেক্ষা এইরূপে মৃত্যু প্রেরণকর।” ইত্যাদি কবির শেষজীবন ক্লেশ নিদারুণ যন্ত্রণায় অতি-বাহিত হইয়াছিল, তাহা উপরোক্ত কথাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ক্রমে এইরূপ অত্যাচার ও শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের জন্ত তিনি অচিরে নানারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। উদরী, কর্ণনালীব প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-ব্যতিক্রম প্রভৃতি নানাবিধ দুষ্টিক্রিয়া ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করে।

শেষ জীবনে তিনি বারিষ্টারী ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকৌশলের অনুবাদকের কার্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে তিনি মানভূমের অন্তর্গত পঞ্চকোটের রাজার আইন-উপদেষ্টা (Legal Adviser) পদ গ্রহণ করেন। রাজার চপলতার অসম্বল হইয়া তিনি উক্ত কাৰ্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মানভূম হইতে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়েই তাঁহার শরীরে নানাবিধ রোগেব সূচনা দেখা যায়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার পীড়া সাংবাদিক আকার ধারণ করে। তাঁহার পত্নীর শরীর পূর্ণ হইতে নানাকষ্টে ভগ্ন হইয়াছিল। এই সময়ে তিনিও কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। পত্নীর এইরূপ অবস্থা, চিকিৎসা ও পথ্যের অভাব, দুই অপোগণ্ড শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ-ভার, তাহার উপর ঋণদাতা-দিগের নিপীড়ন, সত্য সত্যই মধুসূদনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এতদিন বন্ধুবান্ধবগণের প্রদত্ত সাহায্য ও ঋণের উপর তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ভর হইতেছিল। এক্ষণে তাহা ছুপ্রাণ হওয়ার, তিনি গৃহসামগ্রী ও পরিচ্ছদাদি বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল। সত্য সত্যই অন্নভাব উপস্থিত হইল। শিশুদিগের কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া, পতিপত্নী উভয়েই অনাহারে দিনপাত করিতে হইল। শরীর

স্বয়ং থাকিলে তিনি উপার্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু শয্যাশায়ী হওয়ার আর উপায়ান্তর রহিল না।

এই সময়ে বঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষগণ তাঁহাদের নাট্যালাপের জন্ত তাঁহাকে একখানি নাটক রচনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্য প্রত্যাশায় মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি তাঁহার শেষ গ্রন্থ মায়াকানন রচনা করিয়াছিলেন। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে তিনি উহা সম্পূর্ণ করিয়া বাইতে পারেন নাই। বঙ্গরাজ্যের অধ্যক্ষগণ সেই ঋণিত অংশসকল খেঁজাহুঁকুপে সংযোজিত করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর উহা প্রকাশ করেন।

রোগশয্যায় বারিষ্টারপ্রবর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। মধুসূদন ও তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত স্ক্রুতকণ্ঠে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

রোগের যন্ত্রণা হইতে ঋণের যন্ত্রণাই তাঁহার অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। ঋণদাতাদিগের নিকট হইতে অন্তত বাস করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে উত্তরপাড়ায় প্রসিদ্ধ জমিদার তাঁহার হৃদশা অবগত হইয়া তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় বাইয়া অবস্থিতি করিতে আহ্বান করেন, তদনুসারে তিনি দুই তিন মাস কাল গঙ্গাজীর্নবর্তী বিখ্যাত লাইভেরী গৃহে বাইয়া বাস করেন। উত্তরপাড়ায় একরূপ মধুসূদনের মৃত্যুশয্যা রচিত হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় শয়ন থাকিয়াও তিনি কাব্যানুশীলনে বিরত হন নাই।

একদিন গৌরদাসবাবু উত্তরপাড়ায় বাইয়া দেখেন, মলিন শয্যার উপর শয়ন করিয়া মধুসূদন মুহূহু রক্তবমন করিতে ছেন, আর তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা নিম্নগৃহতলে মুচ্ছিতপ্রায় পতিত হইয়া রোগের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছেন। নিজের রোগের যন্ত্রণা হইতে স্বামীর অবস্থা হেনরিয়েটার বিশেষ ক্লেশকর হইয়াছিল। তিনি গৌরদাস বাবুকে নিকটে দেখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, “আমার জন্ত চিন্তা নাই, আমি মরিতে ভয় করিনা, যদি পারেন, আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।”

উত্তরপাড়ায় পীড়ার ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিয়া মধুসূদন মৃত্যুর ৭৮ দিন পূর্বে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার বন্ধুগণ, তাহার পত্নীকে তাঁহার হৃদিতা শর্মিষ্ঠার আশ্রয়ে রাখিয়া তাঁহাকে আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করেন। এই সময়ে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অর্থব্যয় করিয়া যদি তাঁহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে না

রাখিয়া অল্পই স্থানদানের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশের একটি গুরুতর লজ্জা রক্ষা হইত।

মধুসূদনের মৃত্যুর তিন দিবস পূর্বে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী পরলোক গমন করেন। এই সংবাদে তিনি, লেডী ম্যাক-বেথের মৃত্যুসংবাদে ম্যাকবেথ 'To-morrow and to-morrow, and to-morrow' বে পংক্তি কর্তী উচ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহাই পাঠ করিয়া মনোমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'আমার বিন্দুপ্রায় স্মৃতিশক্তিতে আমিও আত্মতৃপ্তি করিলাম তাহা ঠিক হইয়াছে কি ?'

তাঁহার অভিমতে মনোমোহন তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী অল্প চিকিৎসালয়ের পরিচরক ও ধাত্রীদিগকে প্রত্যহ একটি করিয়া টাকা পারিতোষিক দিবার বন্দোবস্ত করেন। মধুসূদন শেষ সময়ে মনোমোহনকে বলিয়াছিলেন, "মনোমোহন, তোমায় আর অধিক কি বলিব ? আমার শিশুগুলি যেন অন্নভাবে প্রাণত্যাগ না করে, এই দেখিও"। তদন্তরে তিনি বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যদি আমার নিজের সন্তানগণের অন্নভাব না হয়, তবে আপনার শিশুগুলিরও হইবে না" \*। সময়ে মনোমোহন বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া তিনি "মনোমোহন, অগদীষর তোমার মঙ্গল করুন।" এই বলিয়া মনোমোহনকে বিদায় দিলেন।

ইহার পর মধুসূদন তিন দিন মাত্র জীবিত থাকিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন রবিবার বেলা দুইটার সময় জীবলীলা শেষ করেন। মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি রেভারেণ্ড ক্লকমোহন বন্দোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া অনেকক্ষণ ধর্মালোচনা করিয়াছিলেন। শিয়ালদহের নিকটবর্তী খুঁটানসেমিট্রীতে তাঁহার সমাধি হয়। হৃৎপের বিষয় তৎকালে তাঁহার সমাধি-স্তম্ভে স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার ব্যবস্থাও হয় নাই। ইহার বহু বর্ষ পরে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর কতকগুলি সাহিত্যামুরাগীর যত্নে তাঁহার সমাধির উপর স্মৃতি-স্তম্ভ উৎকীর্ণ হইয়াছে:—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব  
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে  
( জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি  
বিরাম ) মহীর পদে মহানিদ্ৰাহৃত  
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !

\* মনোমোহন বাবু এ সভা বিমুগ্ধ হন নাই। তিনি পূজবৎয়ে মধুসূদনের পুত্র আলবার্ট নেপোলিয়নকে প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে আলবার্ট অহিফেন বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Deputy Opium Agent এর কার্য করিতেছেন।

বংশের সাগরদীপ্তী ককতক-তীরে

জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি

রাজনারায়ণ ন্যাস, জননী জাহ্নবী।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মাইকেলের কাব্যসমালোচনা।

মধুসূদনের বিবেচিগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, তিনি অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যরাজ্যে খেচাপরতন্ত্র সম্রাট; বাহারা তাঁহার কাব্য-প্রিয় নহেন, তাহাদিগকেও বলিতে হইবে, তাঁহার শক্তি অসামান্য। যিনি মেঘনাদবধ রচনা করিবার কয়েক বৎসর পূর্বে "পূর্ববী" লিখিতে "প্রথিবী" লিখিতেন,—তিনি সহসা সংস্কৃত শব্দের উপর এরূপ অসীম আধিপত্য স্থাপন করিলেন কিরূপে?—সহসা যেন বঙ্গসাহিত্যরাজ্যে এক রণভূমী বাকিয়া উঠিল,—"কলকলগুণ", "কলকলকল", "চলোচ্ছ্বাস-আবাস" "হরহর" প্রভৃতি শত শত গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দ বঙ্গসাহিত্যে এক নবহৃদয়নিদান করিয়া উঠিল। ভারতচন্দ্র, কাশীদাস, ও আলোয়াল সংস্কৃত শব্দ-চয়ন করিয়া বঙ্গীয় কাব্যে যোজন্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল "চল শখি কুঞ্জ সতিমিরপুঞ্জ" কিংবা "অলিকুলসুহৃৎকুমুদমুহুরিকুলবকুলকলাপে" প্রভৃতি-জাতীয় শব্দ-যোজন্য। সেই সকল শব্দ কুঞ্জবনের মুগ্ধকান্তি মুগ্ধ-গন্ধি-কুমুদের জ্বর কোমলপ্রাণ। কিন্তু মধুসূদনের শব্দ-সম্পদ অত্র প্রকারের—"ভেরব-কল্লোলে কল্লোলিল্য ত্রিপথগা" প্রভৃতি ভাবের উচ্চ ভেরী-মস্ত্র বঙ্গসাহিত্যে তৎপূর্বে আর শোনা যায় নাই। "মহারত্নরূপে মহাদেব গাজে, বহুভম্ব ববভম্বাশঙ্ক ঘোর বাজে" প্রভৃতি ভাবের ভারতচন্দ্রের বর্ণনায়ও যেন নুপুর নিকণের জ্বায় নন্তনশাল পদের একটা ধ্বনি কর্ণে বাজিয়া উঠে, তাহা সংগীত হিসাবে উপাদেয়, কিন্তু ওজস্বিতার ক্ষতিকর। রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়" প্রভৃতি-রচনা শব্দ ও ছন্দের চপলতার জন্য একান্তরূপে বীররসের খাতকর হইয়াছে। এই কোমল-বীণা-নির্কণ-মুখারত কুঞ্জবনের মুগ্ধকণ্ঠ পক্ষীর কাকলী অকস্মাৎ নিঃশব্দ করিয়া সহসা যেন মধুসূদন 'বিস্তল' নিনাদ করিয়া দাঁড়াইলেন। সংস্কৃতভাষানীভজ্ঞ কবি সংস্কৃত সাহিত্যের পুরুষোচিত শব্দসম্ভার মুহূর্তের মধ্যে অগ্রসর করিয়া লইলেন,—সংস্কৃত-পণ্ডিতগণ চমৎকৃত হইয়া এই অসামান্য প্রতিভার ললাটে রাজ-চক্রবর্তীর লক্ষণ দোখিয়া মস্তক অবনত করিলেন। এই ক্ষীণ ও মুগ্ধ-ভাষায় নবশক্তি সঞ্চার করিতে যাহা মাইকেল বঙ্গভাষা স্বীয় স্বলকরে পরিবর্তিত করিয়া স্বয়ং গড়িয়া পিটিয়া লইলেন। ক্রিয়াপদ-

গুলি ইচ্ছামুসারে সঙ্কচিত করিয়া,—নব প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর-  
ছন্দে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তিনি জন্মভরিতা যুরোপীয়  
সাহিত্য ও ভাষা পাঠ করিয়াছিলেন; তিনি দেশীয় পরিচ্ছদ ও  
দেশীয় ধর্মের সঙ্গে দেশীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—  
তাঁহার কথা শুনিতে, তাঁহার অপূর্ণ অমিত্রাক্ষরছন্দো-গ্রন্থিত  
কাব্য পাঠ করিতে আমরা এত উৎসুক হইয়াছিলাম কেন ?  
প্রকৃতি তাঁহার মস্তকে রাজতীকা অঙ্কিত করিয়া পাঠাইয়া-  
ছিলেন, তাই বিনি জাতীয় স্বপ্নার পাত্র, তিনি আজ জাতীয়  
পূজার পাত্র হইয়াছেন। মেঘনাদবধরূপ পৌরুষব্যঞ্জক মহাকাব্য-  
রচনা করিলেও তিনি যে মনে মনে বাঙ্গালী কবি ছিলেন  
তাহা ব্রজাঙ্গনা-কাব্য-রচনা করিয়া আমাদের কাছে জানাইয়া-  
দিয়াছেন। এই অপূর্ণশক্তিসম্পন্ন কবি যেরূপ কবিত্বের গাণ্ডীব  
ধারণ করিয়া মহাকাব্যের রহস্য তেদ করিতে পারিতেন,  
সেইরূপ আবার কুঞ্জবনে জয়দেবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাধবের  
কেলি-বিলাস গাহিতে শিখিয়াছিলেন। এই দুই বিরুদ্ধ গুণের  
সমাবেশ সাহিত্যে বিরল দৃশ্য। ইহাতেও মধুসূদনের অসাধারণ  
শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য লিখিবার সময় অমিত্রাক্ষরছন্দ  
তাঁহার হস্তে পরিপক্ব হয় নাই, উহা তাঁহার নব-ছন্দের নব  
উদ্যম। অথারোহীর হস্তে যেন অশ্বের রশ্মি তখনও ঠিক  
আয়ত্ত্ব হয় নাই, তিনি স্বীয় প্রবর্তিত ছন্দটি সম্পূর্ণরূপে বণীভূত  
করিতে পারেন নাই। কিন্তু মেঘনাদবধে তিনি আর ছন্দের  
হস্তে পড়িয়া রহেন নাই,—ছন্দ সম্যক্রূপে তাঁহার হস্তে  
আয়ত্ত্ব হইয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্য বঙ্গীয় ললিতলবঙ্গলতার  
উদ্যানে এক বিশাল নয়নাভিরাম বিটলী—ইহার শাখায়  
শাখায় প্রতিভা-কুসুম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—অথবা ইহা  
বঙ্গীয় সাহিত্যের স্তিমিত জলসঞ্চয়শোভি-পুষ্পবাটিকায় যেন  
ধরশ্রোতাঃ তরঙ্গিণী। বিচিত্র পুষ্প ও লতার ঐশ্বর্যপূর্ণ উপ-  
কূলে মধ্যে যেন ইহা ধরশ্রোতে নাচিয়া গাওয়া অবিরাম  
কীড়া করিয়া ছুটিতেছে। পাঠক ইহার সৌন্দর্যের শক্তি  
প্রতিরোধ করিতে পারিবেন কি ?

কিন্তু এই কাব্যের সম্বন্ধে যে কয়েকটি অভিযোগ উত্থা-  
পিত হইয়াছে, এস্থলে তাহা আলোচ্য। তন্মধ্যে প্রধান এই  
যে, তিনি রামাঙ্গণের বিষয় লইয়া কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া  
রামাঙ্গণখানি পাঠ করিবার আবধা পান নাই; পরন্তু  
ইলিয়াড ও ইনিয়ড কাব্যের অনুকরণ করিয়া ঐহিকস্থানের  
চরিত্রাধা দেবচরিত্রগুলিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন।  
তাঁহার মেঘনাদ বধের অনেক স্থলেই হোমার ও ভার্জিলের  
আজ্ঞাপ্রদায়ক অনুকৃতি দৃষ্ট হয়, অথচ তিনি কুত্রাপি বাঙ্গালিকর

কোন সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। পেট্র-  
ক্লাস বধে একিলিসের বিলাপ হইতে লক্ষণের শক্তিশেলে  
রামের বিলাপ, মৃত্যুকালে পেট্রক্লাসের গর্জিত উক্তি হইতে  
ইন্ড্রজিতের মৃত্যুকালের উক্তি, একিলিসের প্রতি গ্রীক-  
সেনাপতিদিগের অভিযোগ ও খেদপূর্ণ উক্তি হইতে বিভী-  
ষণের প্রতি ইন্ড্রজিতের বাক্যাবলী স্পষ্ট গৃহীত হইয়াছে।  
ইনিয়ডের ষষ্ঠ অধ্যায়টির প্রায় স্বাধীন অনুবাদ করিয়া যেন  
নরকের চিত্রটি মেঘনাদবধে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহা  
ছাড়া তিনি কবিত্ব-পূর্ণ উপমা ও বর্ণনাগুলিও যুরোপীয়  
স্বরিবর্গের রচনা হইতে অজস্র ভাবে সঙ্কলন করিয়াছেন,  
আমরা ছই একটি স্থল তুলনা করিয়া দেখাইতেছি।

( ১ ) মেঘনাদ বধ, ৬ষ্ঠ সর্গ,—

“হানিলা রথচূড়, রথচক্র

ছিন্ন চন্দ্ৰ ছিন্ন বর্ষ বা পাইলা হাতে।

কিন্তু মারাময়ী মায়া, বাছ প্রসারণে

ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি

খেদান মশকবৃন্দে স্তম্ভ স্তম্ভ হ’তে ॥”

Illiad Bk. IV. ( Pope ) Lines 159-163.

Pallas assists, and ( weakened in its force )

Diverts the weapon from its destined course

So from her babe, who slumber seals his eye

The watchful mother wafts the envenomed fly”

( ২ ) মেঘনাদ বধ ; ৯ম সর্গ—

“দুঃখধারে নিবাইল উজ্জল পাবকে

রাফস, পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে

ভস্ম, অমুরাশি জলে বিসর্জিলা তাহা

ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে

লক্ষ রক্ষঃ শিল্পী আশু নিখিল মিলিয়া

স্বর্ণ পাটিকেলে নহুঁ চিতার উপরে

ভেদি অত্র মঠচূড়া উঠিল আকাশে ॥”

Illiad Bk. XXIV.

Again the mournful crowd surround the pyre

And quench with wine the yet remaining fire.

The snowy bones his friends and brothers place

( with tears collected ) in a golden case

Last over urn the sacred earth they spread

And raised the tomb-memorial of the dead”

নরকের দারদ্র্যে উজ্জল ফলকে মেঘনাদ বধ প্রণেতা “হে  
প্রবোধ! তাজ স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে” বলিয়া যে নৈরাজ্য



ব্যঙ্গক উক্তি অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ডাক্তার ডিভাইন কমিডিয়ার "All hopes abandon ye who enter here" কথা অধিকল অনুবাদ।

পরদেশীয় কবিগণের ভাণ্ডার-লুণ্ঠন করিয়া আমাদের কাব্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করায় তিনি যে কোন অপরাধ করিয়াছেন, তাহা বলা উচিত নহে। অভিযোগ এই, স্বজাতির চিরায়ত চরিত্রসমূহকে তিনি বিকৃত করিলেন কেন? তিনি রামায়ণরূপ অক্ষয় অমর চিরস্থায়ী দেবমন্দিরের ইষ্টক দ্বারা মন্দির নির্মাণ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যে স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতা ও অত্যাচারের ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এ দেশীয় ব্যক্তিদিগের নিকট অরঙ্গজের স্থায় অতিযুক্ত। রামায়ণ-পাঠে জানিতে পাই, রাম-রাবণের যুদ্ধে রাম সর্বদা ত্রায়পথাবলম্বী ও রাবণ সর্বদা ত্রায়পথভ্রষ্ট। রাবণ গুপ্তচর পাঠাইয়া স্ত্রীকে রামের পক্ষ হইতে স্বীয় পক্ষে আকর্ষণ করিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল, তরত রামের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য পাঠাইয়াছেন, এই বলিয়া কতকগুলি রাক্ষস-সৈন্য মনুষ্যবেশে রামসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে ও তাহাদিগকে অন্যায়রূপে বধ করিবে, রাবণের সভায় এই সকল চক্রান্ত হইতেছিল। রাবণ-নিযুক্ত গুপ্তচরগণ সর্বদা রামের শিবিরে প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিতেছিল। বনের ফলমূলগুলি রাক্ষসেরা বিধাত করিয়া রাখিয়াছে, এই আশঙ্কায় রাম স্বীয় সৈন্যদিগকে ফলমূল খাইবার জন্ত সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মায়ানীতা-বধ, রামের মায়ামুণ্ড সীতাকে প্রদর্শন প্রভৃতি শত শতরূপ অত্যাচার অবলম্বন করিয়া রাবণ রামকে পরাজিত ও তাহার উদ্দেশ্য বার্থ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল। ইজ্রাজিমে নিজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অলক্ষিতভাবে রামসৈন্য বিনষ্ট করিতে বিশেষ পটু ছিল, এই মায়াবী ক্রুর-কন্যা রাক্ষসের সাহস ও ত্রায়পথত বীরত্ব কিছুই ছিল না, গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া বাণ ও লোষ্ট্র নিক্ষেপপূর্বক রাম-সৈন্য বধ করাই ইহার কার্য ছিল। লক্ষণ ইহার গৃহে প্রকাশ্য ভাবে উপস্থিত হইয়া সমুখ-সমরে ইহাকে বধ করেন। কিন্তু 'মেঘনাদবধে' সকলেই বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। রাক্ষসগণের গুপ্তচরেরা বন্দী হইয়া রামের নিকট নীত হইলে বিভীষণ ও স্ত্রী বলিয়াছিলেন, ইহার চর বা দূত নহে,—বিবাসয় গুপ্তচর; স্ত্রীর বধার্থ। রাম উত্তরে কহিলেন, "ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও, ইহার আমাদের বৃহৎ-সংস্থান কিংবা অন্য কোন গোপনীয় তথ্য জানিতে চাহিলে, আমার প্রজ্ঞাক্রমে বিভীষণ স্বয়ং ইহাদিগকে তাহা জানাইবেন।

যে রাবণ রামের সঙ্গে এত চলনা করিতেছিল, অত্যাচারপূর্ণ শত সহস্র বড়-বস্ত্র করিয়া রামকে বিধবস্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছিল, সেই রাবণ একদিন রামের বহুসংখ্যক সৈন্য সংহার করিয়া অবশেষে রামের বাণে বিদ্ধ হইয়া পলাইবার পথ পাইতেছিল না, তাহার কিরীট ভ্রষ্ট ও কুণ্ডল জিন্ন হইয়া গিয়াছিল,—রামের মৃত্যুকর্ম শর-রাশি তাহাকে নিদারুণরূপে ব্যথিত করিয়া তুলিয়া ছিল, তদবস্থায় রাবণকে দেখিয়া রাম উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "রাক্ষস! তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আমি পরিশ্রান্ত-শত্রুর সহিত যুদ্ধ করি না। অস্ত্র যাইয়া বিশ্রাম কর, কল্যাণ সবল হইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিও।"

এই ক্ষমা—স্বন্দর ক্ষান্তভেজের জীবন্ত মূর্তি,—বৈরাগ্য ও সত্যের অবতারকে মধুসূদন একান্ত গোবেচারি "ভিখারী রাঘবে" পরিণত করিয়াছেন, তিনি প্রমীলার ধনু শব্দ শুনিয়া মুচ্ছা যাইতেছেন। এদিকে অতুল্য পরাক্রমশালী সত্যনিষ্ঠ নীতি-পরায়ণ লক্ষণের চরিত্রে ভীকৃত্য ও কুনীতিপরায়ণ-কুদ্রুৎ আরোপিত হইয়াছে, এই দেবতা-বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া তিনি হিন্দুস্থানে চিরনিবাসী হইয়াছেন। এই অপরাধে হিন্দুস্থান তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না।

হিন্দুস্থানে যদি ধর্মকথার অপূর্ণ জীবন না থাকিত, তবে আমরা কাব্য-বিচারে ধর্মকথার ভুলদণ্ড উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক হইতাম না। কিন্তু কাব্যের সমালোচনার ইহাও বক্তব্য যে, আলঙ্কারিকগণ—একবাক্যে কাব্যের নায়কের যে সকল মহৎ গুণ-নির্দেশ করিয়াছেন, লক্ষ্যপূরিতে তাহার সংঘটন হয় না। কিন্তু কবির লক্ষ্যপূরীর সঙ্গে এমনই একটা আন্তরিক সহানুভূতি দৃষ্ট হয় যে, তিনি বীরাক্ষনা-কাব্যে শূর্ণ-গথার স্থায় চরিত্রকেও নাগিকার শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছেন। স্ত্রীর কাব্যের নিরপেক্ষ গুণাগুণের হিসাবে এই অপরাধও মার্জনীয় নহে। সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে তিনি শব্দ চয়ন করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে কালিদাস কিংবা ভবভূতির রচনা হইতে দু একটা ছত্রের অনুবাদ করিয়া স্বীয় কাব্যে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন। উত্তর-চরিত্রের সুবিখ্যাত "পুরোঃপীড়ে তড়াগস্ত পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া। শোকে ক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপেয়েব ধার্যতে।" এবং শকুন্তলার—"নুনং স নীলোং-পলপত্রধারয়া। শরীলতাং ছেত্তুমিবিব্যবত্তি" এই দুইটা শ্লোকের অনুবাদ মেঘনাদবধে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে কবির সম্পর্ক শুধু এই প্রকারের—সংস্কৃত-সাহিত্যের গুঢ়ভাবে তিনি অনুপ্রাণিত হন নাই। সংস্কৃতের পটু বস্ত্র দ্বারা যখন রেচের শরীর পরিশোভিত করিয়া তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ সম্বন্ধে অপর একটি অভিযোগ এই যে, ইহাতে ঘটটা প্রতিচার পরিচয় আছে, ততটা প্রাণ নাই, ইহার বর্ণনাগ্ন সর্বত্র একটা সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য বিস্তারিত, কিন্তু মানব-চিত্তের নিগূঢ় কথার আপাত অভাব পরিলক্ষিত হয়, যেন ঘটা করিয়া বজ্রনাদা বিদ্যুৎস্রবণশীল মেঘখানি আসিল, কিন্তু একবিন্দুও বৃষ্টি পড়িল না! কোথাকার বায়ুর আবর্ত আসিয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গেল! মন করুণ-রসে অভিযুক্ত হইল না। এক কথার উত্তরে আমরা বলিব, সমস্ত স্থানেই সমগ্র কবিত্ব-সম্পদ আশা করিতে পারা যায় না। মিল্টনের মহাকাব্য-সম্বন্ধেও এই অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারে। এডাম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণানন্তর ইতকে যে ভাবে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ও ইভ যে স্নিগ্ধ অন্তঃপাশ্চক বাক্যে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানটা বাদ দিলে প্যারাডাইস লস্টে করুণরসাত্মক আর কোন স্থান পাওয়া যায় না।

মধুসূদনের কাব্যে শত শত দোষ থাকি সত্ত্বেও তিনি আধুনিক বঙ্গ-কবিকুল-শিরোমণি। তিনি যাহা আমাদের দিয়াছেন, তাহাই পরম ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে আমরা গ্রহণ করিব। শিক্ষার দোষে কিংবা জাতীয় বিশ্বাসের প্রতি মর্যাদার অভাবে তাঁহার যে সকল ভ্রুটি হইয়াছে, সে কথা লইয়া যাহারা বেশী অমূল্যলন করিবেন, তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মধুসূদনের মত কোন কবি নব্যযুগে এরূপ সাহিত্যের মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছেন কি? সমালোচকগণ খুঁত ধরিতে পারিবেন, কিন্তু নির্মাণ-শক্তি—কবির। সে শক্তি মধুসূদনের যথেষ্ট ছিল।

বীরাজনা-কাব্যে তাঁহার অমিত্রাকর-রচনায় পরিণত-সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়, কাব্য হিসাবে কোন কোন বিষয়ে মেঘনাদ বধ হইতেও ইহার স্থান উচৈ।

“এজাঙ্গনা”র মধুর বঙ্গার আমরা তুলিব না, বৈষ্ণবগণ আমাদের দিগকে যে মিষ্ট আহারীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায় পাইব! তথাপি এজাঙ্গনার নিষ্টনষ্টারের পরিবেশন আমাদের মনে থাকিবে,—চক্রে পার্শ্বে বেক্রপ নক্ষত্র শোভা পায়, রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী সম্বন্ধে বিখ্যাত-চণ্ডী-দাস-গোবিন্দদাসের পার্শ্বে মধুসূদন সেইরূপভাবে থাকিবেন ও তাঁহার “এজাঙ্গনা” সাহিত্যাকাশের বিচিত্রতা-সম্পাদন করিবে।

কিন্তু মাইকেল এক বিষয়ে নিতান্ত অপটুতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, “হেষ্টির-বধ” নামক উৎকট গল্প-পুস্তক লিখিয়া উপহাস্যম্পদ-অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতি তাঁহাকে বীণা হস্তে দিয়া শুধু গান গাইতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ছাড়িয়া গল্পের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তিনি শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছেন, হেষ্টির-বধে ইহাই সর্বত্র দৃষ্ট হয়।

মাইজ (দেশজ) ১ মধ্য, বৃক্ষাদির অভ্যন্তর। ২ অগ্রভাগ।

মাইজকাঠ (দেশজ) মধ্যকাঠ।

মাইটকুয়া (দেশজ) অগধার, কুপ।

মাইনপুরী, যুক্ত-(উঃ পঃ) প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন একটি জেলা। [মৈনপুরী দেখ।]

মাইয়া (দেশজ) স্থালোক, বালিকা।

মাইয়ামর্দ (পার্সী) ১ জীপুরুষ। ২ যে জীর পুরুষোচিত ব্যবহার।

মাইয়ামুখ (আরবি) জীর মুখাপেক্ষী।

মাইল (ইংরাজী Mile) পথাদির দূরত্ববোধক চিহ্নবিশেষ, প্রায় অর্ধক্রোশ।

মাইলোক, সিমলা শৈলের একটি সামন্তরাজ্য। পঞ্জাব গবর্নমেন্টের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ৪৮ বর্গ মাইল। খৃষ্টীয় ১৯ শতাব্দির প্রারম্ভে এখানকার ঠাকুর সর্দারগণ গোষ্ঠী-দিগের হস্তে পরাজিত ও বিতাড়িত হন। অবশেষে ইংরাজ-কর্তৃক গোষ্ঠাদল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, ইংরাজ-প্রতিনিধি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পূর্বতন ঠাকুরদিগকে সনন্দ দিয়া এখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সর্দারগণ রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কেবল মাত্র কাসির হকুম দিতে হইলে তাঁহাদিগকে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের পরিচালকের (Superintendent of the Hill State) আদেশ গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার সৈন্তসংখ্যা ৭৫ জন মাত্র।

মাংস (ক্ৰী) মস্ততে ইতি জ্ঞানার্থ মন্-সঃ দীর্ঘশ্চ। (মনে-দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩৬৪) রক্তজাত ধাতুবিশেষ। ইহা তৃতীয় ধাতু বলিয়া উল্লিখিত। চলিত মাংস। স্নেহবোধের মতে গর্ভস্থ বালকের অষ্টম মাসে মাংস উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভাগবতের মত অগ্ররূপ। তন্মতে গর্ভস্থ বালকের চারি মাসে মাংসোৎপত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পয়্যায়—পিপিত। তরস পালল, ক্রব্য, আমিশ, পল, অম্লজ, জাঙ্গল, কার।

মাংসের স্বরূপ কি, কাহাকে মাংস নামে অভিহিত করা যায়, তৎসম্বন্ধে ভাবপ্রকাশ বলেন—

“শোণিতং স্বাঘ্নিনা পকং বায়ুনা চ বনাকৃতম্।

তদেব মাংসং জানীয়াৎ তত্ত্ব ভেদানাপ ক্রবে ॥” (ভাবপ্রঃ)

অর্থাৎ স্বকীয় অগ্নি দ্বারা রক্ত পরিপাক হইয়া বায়ু কর্তৃক বনীভূত হইলে তাহাই মাংস নামে অভিহিত হয়। এই স্বকীয় অগ্নি অর্থে রক্তধাতুগত ধাতু-অগ্নি বুঝিতে হইবে। মাংসের ভেদ অনেক। রস শোণিত-স্থানে যায়, সেখানে গিয়া রক্তসংজ্ঞা লাভ করে। আবার রক্ত মাংসস্থানে যাইয়া মাংসসংজ্ঞা পায়।

এইরূপে একই রস মেদ অস্থি প্রভৃতি সমস্ত ধাতুস্থানে

গমন করিয়া তত্ত্বসূচ্য হইয়া যায় এবং সেই সেই নাম প্রাপ্ত হয়। এজন্ত প্রথমে আহারজাত রসকেই মাংসাদি বলা যাইতে পারে। কারণ মাংসাদির অংশ যদি রসে না থাকিত, তবে মাংসাদিকপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

“শোণিতমিতি শোণিতস্থানগতত্বাদ্রস এব শোণিতসংজ্ঞাঃ লভতে। এবমগ্রে রসশ্রেণে মাংসাদিবা পদেশঃ ॥” (ভাবপ্র০)

এই মাংস আবার ক্রমে পেশীরূপে বিভক্ত হয়। মনুষ্য-শরীরে শিরাপথ দিয়া বায়ু, বেগে মাংস মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রয়োজন অনুসারে মাংসকে পেশীরূপে বিভাগ করিয়া দেয়। এই মাংসপেশীর সংখ্যা পাঁচ শত। শরীরের নানাস্থানে সংখ্যানুসারে মাংসপেশীর অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে। [পেশী দেখ]

“যথাখমুদ্রায় যুক্তো বায়ুঃ শ্রোতাংসি দারয়েৎ।

অমুপ্রবিষ্ট পিশিতং পেশীকৃতভজতে তথা ॥

মাংসপেশ্যঃ সমাখ্যাতা নুণাং পঞ্চশতানি হি।

তাংসং শতানি চত্বারি শাখানু কথিতান্তু ॥” (ভাবপ্র০)

সাধারণতঃ সকল প্রকার মাংসেরই গুণ বায়ুনাশক, শরীরের উপচয়কারক, বলকর, পুষ্টিজনক, প্রীতিকর, গুরু, হৃদয়গ্রাহী, মধুররস ও মধুরবিপাক।

“সর্বং মাংসং বাতবিক্ষয়ং বুধ্যং

বল্যং কৃত্যং বৃংহণং তচ্চ মাংসং।

দেশস্থানাচ্চান্নসংস্থং স্বভাবৈব-

ভূয়ো নানারূপতাং যাতি নুনম্ ॥” (রাজনি০)

মাংস দুই প্রকার। জাঙ্গল মাংস ও অনুপ মাংস। জঙ্ঘাল, বিলস্ত, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্য এই আট প্রকার জাঙ্গলজাতের মাংস জাঙ্গল মাংস বলিয়া কথিত। ইহার গুণ,—মধুর, কষায়, রুক্ষ, লঘু, বলকারক, শরীরের উপচয়কর, শুক্রবদ্ধক, আয়ুপ্রদীপক, দোষয় এবং মুকতা, মিন্মিনতা, গদগদতা, অদ্বিত, বদ্বিত, অবর্চি, বমি, প্রমেহ, মুখরোগ, স্নীপদ, গলগণ্ড ও বাতরোগনাশক।

“মাংসবগো দ্বিধা জ্ঞেয়ো জাঙ্গলগোহনূপসংজ্ঞকঃ।

মাংসবগোহত্র জঙ্ঘালা বিলহাশ্চ গুহাশয়াঃ ॥

তথা পর্ণমৃগা জ্ঞেয়া বিষ্কিরাঃ প্রতুদা অপি।

প্রসহা অথ চ গ্রাম্যা অষ্টৌ জাঙ্গলজাতয়াঃ ॥

জঙ্ঘালা মধুরা কক্ষান্তবরা লঘবস্তথা।

বল্যাস্তে বৃংহণা বুধ্যা দীপনা দোষহারিণাঃ ॥

মুকতাং মিন্মিনত্বক গদগদবাদ্বিত্তে তথা।

বাদ্বিত্যমরুচিচ্ছর্দি প্রমেহং মুগজান্ গদান্।

স্নীপদং গলগণ্ডক নাশয়ত্বনিলায়মান্ ॥” (ভাবপ্র০)

এই আট প্রকার জাঙ্গলজাতের মধ্যে হরিণ, এণ, কুরঙ্গ,

ঋষ্য, পৃষত, হ্যাকু, সধর, রাজীব ও মুণ্ডী প্রভৃতিকে জঙ্ঘাল বলে। হরিণ অর্থে তাম্রবর্ণ মৃগ। এণ কৃষ্ণহরিণ। কুরঙ্গ অর্থাৎ যে মৃগ আকারে বৃহৎ ও দ্বিধং তাম্রবর্ণ এবং যাহার আকৃতি দেখিতে কৃষ্ণহরিণের ত্রায়। ঋষ্য নীলাঙ্গ হরিণ। ইহা সরোহ নামেও প্রসিদ্ধ। যে মৃগ হরিণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট এবং শরচ্ছত্রের ত্রায় ছাতিযুক্ত, তাহার নাম পৃষত। যাহার শিং বড়, তাহা হ্যাকু। বৃহদাকার মৃগ সধর, উহা গবয় নামে খ্যাত। যাহার সর্ক্সাঙ্গ বিবিধ রেখায় রঞ্জিত, তাহার নাম রাজীব এবং যে মৃগের শিং নাই, তাহা মুণ্ডী। এই সকল জঙ্ঘালদিগের মাংসগুণ—প্রায়ই পিত্ত ও কফনাশক এবং বায়ু-বদ্ধক, লঘু ও বলবদ্ধক।

বিলেশয়—গোসাপ, শশক, মর্প, ইন্দুর ও শজ্জাক প্রভৃতিকে বিলেশয় বলে। ইহাদিগের মাংস বায়ুনাশক, মধুরবিপাক, শরীরের উপচয়কারক, মল-মূত্ররোধক এবং উষ্ণবীণ্য।

গুহাশয়—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, ঋক্ষ, তরঙ্গু, দ্বীপী, বক্র, জম্বুক ও বিড়াল এই সকলকে গুহাশয় বলে। তরঙ্গু নেকড়ে বাঘ, দ্বীপী চিতা বাঘ এবং যাহার পুচ্ছ স্থূল ও চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহা বক্র এবং কোথাও কোথাও বা নকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের মাংস বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণবীণ্য, মধুররস, সিদ্ধ এবং বলকারক। এই মাংস চক্ষুরোগী ও গুহরোগীর পক্ষে হিতকর।

পর্ণমৃগ—বানর, কাঠ-বিড়াল ও বৃক্ষমর্কটিকা প্রভৃতিকে সূক্ষ্মতাদি মহর্ষিগণ পর্ণমৃগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদিগের মাংসগুণ,—শুক্রজনক, চক্ষু ও শোষরোগীর পক্ষে হিতকর। মলমূত্রনিঃসারক এবং শ্বাস অর্শ ও কাসরোগনাশক।

বিষ্কিব—বর্ষক, লাব, বত্তীর কপিঞ্জল, তিভির, কুলিঙ্গ, ও বৃক্কট পণ্ডিত বিষ্কির নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ঠোঁট দিয়া ছড়াইয়া ছড়াইয়া আহাণ করে বলিয়া ইহাদিগকে বিষ্কির কহে। ইহাদিগের মাংস—মধুর কষায়রস, শীতবীণ্য, কটুবিপাক, বলকর, শুক্রবদ্ধক ও ত্রিদোষনাশক। ইহা হৃৎপথ্য ও লঘু।

প্রতুদ—হারিত, দবল ও পাণ্ডুবর্ণ চিত্রপক্ষ, বৃহচ্ছক, পাবাবত, গজপীট এবং পিক প্রভৃতিকে প্রতুদ বলে। ইহারা ভক্ষ্য বস্তু ঠোঁট দিয়া আঘাত করিয়া খায়, এজন্ত ইহাদিগের নাম প্রতুদ। ইহাদিগের মাংস—মধুর-কষায়রস, পিত্তয়, কফনাশক, শীতবীণ্য, লঘু, মলরোধক ও কিঞ্চিৎ বায়ুবদ্ধক।

প্রসহ—কাক, গৃধ্র, উল্লুক, চিল্ল, শশ্যাতক, চাষ, ভাস্ক, ও কুরর প্রভৃতি প্রসহ নামে খ্যাত। ইহাবাও ভক্ষ্যবস্তুর

উপর আঘাত দিয়া খার বলিয়া প্রসূহ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদিগের মাংস—উষ্ণবীৰ্য্য। এই সকল মাংস ভক্ষণ করিলে শোথ, ভ্রমক ও উন্মাদরোগগ্রস্ত হইতে হয় এবং শুক্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

গ্রাম্য—ছাগ, মেঘ, বুঘ, ও অশ্ব প্রভৃতিকে গ্রাম্য বলে। সমুদায় গ্রাম্য মাংসই বায়ুনাশক, অগ্নিপ্রদীপক, কফ ও পিত্ত-বর্দ্ধক, মধুররস, মধুরবিপাক, শরীরের উপচরকারক এবং বলবর্দ্ধক।

পূর্বে যে অনুপ মাংসের উল্লেখ করিয়াছি, উহা পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। যথা—কুলেচর, প্রব, কোশস্থ, পাদী ও মংস্ত মাংস। উহাদিগের মাংস সাধারণতঃ মধুররস, স্নিগ্ধ, শুষ্ক, অগ্নিমান্বজনক, কফকারক, অত্যন্ত মাংসপোষক ও অভিযান্ধী। ইহা প্রায়ই হিতকর।

“কুলেচরাঃ প্রবাশ্চাপি কোশস্থাঃ পাদিনস্তথা।

মংস্তা এতে সমাখ্যাতাঃ পঞ্চধানুপজাতয়ঃ ॥

অনুপা মধুরাঃ স্নিগ্ধা গুরবো বহিসাদনাঃ।

প্লেয়লাঃ পিচ্ছলাশ্চাপি মাংসগুণিপ্রদা ভৃশম্।

তথাভিযান্নিনস্তে হি প্রায়ঃ পঞ্চাতমাঃ স্মৃতাঃ ॥” (ভাবপ্রঃ)

কুলেচর—মহিষ, খড়্গ, শূকর, চমরী ও হস্তী প্রভৃতিকে কুলেচর বলে। ইহাদিগের মাংস বায়ু ও পিত্তজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, মধুররস, শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক এবং কফবর্দ্ধক।

প্রব—হংস, সারস, কারণ্ডব, বক, শরারিকা, নন্দীমুখী, কাদম্ব (করণা) ও বলাকা (বগুলা) প্রভৃতিকে প্রব কহে। এই সকল পাখী জলে ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া ইহাদিগের নাম হইয়াছে প্রব। যে পাখীর ঠোঁটের উপর স্থূল, কঠিন, ও গোলাকার জামের জার গুটিকা থাকে, তাহাকে নন্দীমুখী বলে। উহাদিগের মাংস—পিত্ত, স্নিগ্ধ, মধুররস, শুষ্ক, শীত-বীৰ্য্য, সারক এবং বায়ু, কফ, বল ও শুক্রবর্দ্ধক।

কোশস্থ—শম্ভ, শম্ভানথ, শুক্রি, শবুক, কর্কট এবং এই রূপ অগ্রান্ত্র জীব কোশস্থ নামে খ্যাত। ইহাদিগের মাংস মধুররস, স্নিগ্ধ, বাতন্ত্র, পিত্তনাশক, শীতবীৰ্য্য, দেহের উপচর-কারক, মলবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং বলকারক।

পাদী—কুষ্ঠীর, কুর্শ, নক্স, গোখা, মকর, শবু, ঘণ্টিক ও শিশুমার প্রভৃতিকে পাদী কহে। পাদীসমূহের মাংসগুণ—পূর্কোক্ত কেশস্থ মাংসের জায়।

মংস্ত—মংস্ত, মীন, বিসার, ঝষ, বৈসারিণ, অণ্ডজ, শকলী, পুথুরোমা ও স্তম্ভর্শন এই কয়েকটি এক-পর্যায়ক শব্দ। রোহিত প্রভৃতি জীবকে মংস্ত বলা যায়। ইহাদিগের মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, মধুররস, শুষ্ক, কফবর্দ্ধক, পিত্তজনক, বায়ু-

নাশক, দেহের উপচরকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিজনক ও বল-বর্দ্ধক। মস্তপারী এবং মৈথুনাসক্তাদির পক্ষে মংস্ত মাংস হিতকর।

জাক্সল এবং অনুপমাংসের সাধারণতঃ গুণাগুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রত্যেকের মাংসগুণ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাউক।

হরিণমাংস—শীতবীৰ্য্য, মলমূত্ররোধক, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নগ্ধী ও সন্নিপাতনাশক।

এণ অর্থাৎ কৃষ্ণমার হরিণের মাংস—কষায় মধুররস, ধারক, রুচিকারক, বলকর এবং পিত্ত, রক্ত, কফ, বায়ু ও জরনাশক।

কুরঙ্গমাংস—দেহের উপচরকারক, বলকর, শীতবীৰ্য্য, পিত্ত, শুষ্ক, মধুররস, বায়ুনাশক, ধারক এবং কিঞ্চিং কফকারক।

ঋষ্য-মাংস—মধুররস, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কফ ও পিত্তবর্দ্ধক। গবয় ও যোথ এই কয়েকটিও ঋষ্যেরই নামান্তর।

পৃষত অর্থাৎ চিতাবাঘের মাংস—মধুর রুচিজনক, এবং ঋস, জর, ত্রিদোষ ও রক্তনাশক। ত্রুহু-মাংস—মধুররস, লঘু, বলকর, শুক্রজনক এবং ত্রিদোষনাশক। সাবর-মাংস—স্নিগ্ধ, শীতবীৰ্য্য, শুষ্ক, মধুররস, মধুরবিপাক, কফকারক এবং রক্ত পিত্তনাশক। রাজিব মাংস পূর্কোক্ত পৃষত মাংসের জায় গুণকারক। মুণ্ডীমাংস—জর, কাস, রক্ত, ক্ষয় ও ঋস-রোগনাশক। ইহা শীতবীৰ্য্য। লম্বকর্ণ, লোমকর্ণ, শুলী, বিলেখর, শশ বা শশক এই কয়েকটি এক-পর্যায়ক শব্দ। ইহার মাংস—শীতবীৰ্য্য, লঘু, ধারক, রুক্ষ, মধুররস, অগ্নি-বর্দ্ধক, বায়ুর স্বধর্ম-সংস্থাপক, অর্থাৎ বায়ুর বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস ঘটায় না এবং জর, অতীসার, শোথ, রক্তদোষ, ঋস, কফ ও পিত্তনাশক। ইহা সকল প্রকারেই হিতকর। সেধা, শল্যক ও ঋষিৎ এই কয়েকটি শজারুর নাম। ইহার মাংস—ঋস, কাস, রক্তদোষ ও ত্রিদোষনাশক।

পক্ষিমাংস—কুলচর ও অনুপ-দেশজভেদে পক্ষী দুই প্রকার। কুলচর পাখীর মাংস—বলকারক, স্নিগ্ধ এবং শুষ্ক। পক্ষিসমূহের মধ্যে লাব চারি প্রকার। যথা—পাংগুল, গোরক, পৌণ্ড্রক ও দর্ভর। এই চারি প্রকার লাব পাখীর সাধারণতঃ মাংসগুণ—অগ্নিকারক, স্নিগ্ধ, সংযোগ-বিষ-নাশক, ধারক ও হিতজনক। ইহাদিগের মধ্যে পাংগুল—কফকারক, উষ্ণবীৰ্য্য ও বায়ুনাশক। গোরক—লঘুতর, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক। পৌণ্ড্রক—পিত্তবর্দ্ধক, কিঞ্চিং

লঘু এবং বায়ু ও কফনাশক। দর্ভর—রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগ-নাশক এবং শীতবীৰ্য্য। বটীক পক্ষী—মধুররস, শীতবীৰ্য্য, রক্ত এবং কফ ও পিত্তনাশক। তিতিরি পক্ষী হই প্রকার—কৃষ্ণতিতিরি ও গোরতিতিরি। কৃষ্ণতিতিরি—বলকারক, ধারক এবং হিকা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জরনাশক। গোর-তিতিরি কৃষ্ণতিতিরি অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। চটক—শীত-বীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, কফপ্রদায়ক, এবং সন্নিপাত-নাশক। গৃহ-চটকের মাংস অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

কুক্কট হই প্রকার—বনকুক্কট ও স্থলকুক্কট। বন-কুক্কট মাংসের গুণ—স্নিগ্ধ, শরীরের উপচরকারক, কফজনক, গুরু এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষম জরনাশক। স্থল-কুক্কট বা কুক্কড়ার মাংস—দেহের উপচরকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ-বীৰ্য্য, বায়ুনাশক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, শুক্রজনক, কফকারক, বলকর, বৃদ্ধ এবং কষায় রস। হারীত পক্ষী রক্ত ও পীতবর্ণ। উহার মাংস—রক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, রক্তপিত্তর, কফনাশক, স্বেদ-জনক, স্বরবর্দ্ধক এবং কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক। পাণ্ডু পক্ষী হই প্রকার, তন্মধ্যে এক প্রকারকে চিত্রপক্ষ ও কলধ্বনি বলে। দ্বিতীয়কে ধবল, কপোত ও ফুটবন কহে। চিত্রপক্ষ—কফ, বায়ু ও গ্রহণীরোগনাশক। ধবল—রক্তপিত্তনাশক ও শীত-বীৰ্য্য। পারাবত বা পারব্রার মাংস—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তর, বায়ুনাশক, ধারক, শীতবীৰ্য্য, এবং বীৰ্য্যবর্দ্ধক। পক্ষীর ডিম্বেরও অনেক গুণ আছে। উহা কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, মধুররস, মধুরবিপাক, বায়ুনাশক, গুরু এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

ছাগমাংস—লঘু, স্নিগ্ধ, মধুরবিপাক, ত্রিদোষনাশক, মধুররস, পীনস নাশক, বলকর, রক্তিকারক, শিরের উপচরকর এবং বীৰ্য্যবর্দ্ধক। ইহা অতি শীতল বা অতি দাহজনক নহে। অগ্রহতা ছাগীর মাংস—পীনসবিনাশক, শুষ্ককাসে, অরুচি ও শোষরোগে হিতকর এবং অগ্নিপ্রদায়ক। অন্নবয়স্ক ছাগমাংস—লঘুতর, হৃদয়গ্রাহী, জরনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ, স্তন্যপ্রদায়ক এবং অত্যন্ত বলকর। অন্ত্রনিষ্কাশিত ছাগ- (খাগীর) মাংস—কফকর, গুরু, স্রোতঃশোধক, বলকারক, মাংসবর্দ্ধক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। বৃদ্ধ ছাগলের ও ব্যাধি দ্বারা মৃত ছাগলের মাংস—বায়ুবর্দ্ধক এবং রক্ত। ছাগ-মস্তক—উর্দ্ধ জরগত ব্যাধিনাশক এবং রক্তজনক।

মেঘমাংস—পুষ্টিকারক, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক এবং গুরু। অণুবিহীন মেঘমাংস—কিঞ্চিৎ লঘু। এড়ক বা হুয়ার মাংস মেঘমাংস তুল্য গুণকর। উহার গৃহ্মদেশের মাংস হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিহর, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক এবং কিঞ্চিৎ বাত-রোগনাশক। গোমাংস—অত্যন্ত গুরু, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক,

শরীরের উপচরকারক, বাতর, বলকর, অপথা এবং প্রেতি-ভারনাশক। ঘোটকমাংস—লবণ, মধুর রস, অগ্নি, কফ, পিত্ত ও বলকর, বায়ুনাশক, উপচরকর, চক্ষুর হিতকর এবং লঘু। মহিষমাংস—মধুর রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ুনাশক, নিদ্রাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, শরীরের দৃঢ়তাজনক, গুরু, পুষ্টিকর, মলমূত্রনিঃসারক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষ-নাশক। মণ্ডুকমাংস—কফবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক এবং বলকর। কচ্ছপমাংস—বলকর, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং পুংসুবর্দ্ধক।

সত্তোহিত প্রাণীর মাংস অমৃতের ভার যোগবিনাশে সমর্থ হইয়া থাকে। উহা বয়ঃস্থাপক এবং দেহের উপচর ও হিতকর। সত্তোহিত মাংস ব্যতীত অন্য মাংস পরিভোগ করা কর্তব্য। যে সকল প্রাণী আপনা আপনি মরিয়া যায়, তাহাদিগের মাংস ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। উহা বলনাশক, অতীসারজনক এবং গুরু। বৃদ্ধ প্রাণীর মাংস—ত্রিদোষজনক। অন্নবয়স্ক প্রাণীর মাংস—বলকর ও লঘু। সর্পাদি হিংস্র জন্তু দ্বারা যে সকল প্রাণী বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের মাংস ছুটে, ত্রিদোষ ও শূলরোগনাশক এবং গুরু। শুক্রমাংসের গুণও ঐরূপ। এই উভয়বিধ মাংসই পরিভোজ্য।

বিষ, জল ও ব্যাধি দ্বারা যে সকল প্রাণী মরিয়া যায়, তাহাদিগের মাংস—ত্রিদোষ, ব্যাধি ও মৃত্যু-উৎপাদক। ক্লিন্ন মাংস—উৎক্লেশজনক। ক্লিশ প্রাণীর মাংস—বায়ু-প্রকোপকারক। যে সকল প্রাণী জলে ডুবিয়া মরে, তাহা-দিগের শিরাসমূহ জলে পূর্ণ থাকে; একান্ত উহাদের মাংস ত্রিদোষনাশক।

পক্ষিমূহের মধ্যে পুরুষজাতীয় পক্ষীর মাংস উত্তম। চতুষ্পাদ জাতীর মধ্যে দ্বী জাতীর মাংস প্রশস্ত।

পুরুষজাতীর পশ্চাৎ অর্দ্ধভাগ লঘু এবং ত্রীর পূর্বাধ লঘু। সমস্ত প্রাণীরই শরীরের মধ্যভাগ গুরু। পক্ষিগণ পক্ষ চালনা করে বলিয়া তাহাদিগের মাংস লঘু। সকল পাখীরই ডিম্ব ও গ্রীবাংশে গুরু। বকঃ, রক্ত, উদর, মস্তক, পাদদ্বয়, হস্তবয়, কটি, পৃষ্ঠ, চর্ম, যক্ৰ ও অন্ত্র ইহা যথাক্রমে গুরু অর্থাৎ বন্ধ হইতে রক্ত গুরু, রক্ত হইতে উদর গুরু ইত্যাদি। যে সকল পক্ষী দান্ত তক্ষণ করে, তাহাদিগের মাংস লঘু ও বায়ুনাশক। বাহারি মন্ত খায়, তাহাদিগের মাংস পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং গুরু বলিয়া কথিত হইয়াছে। এতদ্বির যে সকল পাখী মাংস খাইরা জীবন ধারণ করে, তাহাদের মাংস কফকর, লঘু এবং রক্ত বলিয়া কথিত।

তুলা জাতীর মধ্যে বাহাদের শরীর বৃহৎ, তাহাদের মাংস

অপেক্ষা ক্ষুদ্র শরীরদিগের মাংস উৎকৃষ্ট। ক্ষুদ্র শরীরদিগের মধ্যে আকার বাহাদের শরীর ক্ষুদ্রপুষ্টি, তাহাদেরই মাংস প্রশস্ত।

ভাবপ্রকাশে মৎস্ত মাংসের গুণাগুণ সম্বন্ধেও সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এই স্থানে প্রদত্ত হইল না। মৎস্তের সাধারণতঃ গুণাদি মৎস্ত শব্দে লিখিত হইয়াছে।

মাংস দ্বারা প্রস্তুত ঘৃষের গুণ—চক্ষুর বৃংহণ, প্রাণবর্দ্ধন, বৃষা, বাতবিকারক এবং কৃমি, ওজঃ ও শরবর্দ্ধক। তন্ত্ৰিহ বাহাদের অঙ্গসন্ধি ভগ্ন, বা বিলিষ্ট এবং বাহারা ক্ষত বা ত্রণ-রোগগ্রস্ত, তাহাদিগের পক্ষে মাংসযুষ্য হিতকর।

তৈলপক্ক-মাংসগুণ—উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, কটু, অম্ল-উদ্দীপন, রুচিকর, দৃষ্টি ও পুষ্টিপ্রদ এবং গুরু।

স্বতপক্ক মাংসগুণ—দৃষ্টি ও পুষ্টিপ্রদ, লঘু, সর্ষধাতুর গ্রীণন, এবং মুখশোষণ রোগদিগের বিশেষতঃ তৃপ্তিজনক।

পরিপক্ক ও প্রদিগ্ধ মাংস—অধিক পরিমাণ স্বত দিয়া মাংস ভাজিয়া লইয়া উষ্ণ জল দ্বারা বারংবার সেক প্রদান-পূর্ব্বক জীরকাদি মসলার সহিত মিশাইয়া লইলে উহা পরি-তক্ষমাংস হয়। ইহার গুণ—স্থির, মিষ্ট, হর্ষণ, গ্রীণন, গুরু, পিত্তর, এবং বল, মেধা, অম্লি, মাংস, ওজঃ ও শুক্রবর্দ্ধক। উক্ত পরিপক্ক মাংসই যদি গাঢ় তক্রের সহিত মিশান হয়, তবে তাহাকে প্রদিগ্ধ ব্যঞ্জনবিশেষ বলা যায়, ইহার গুণ—বল, মাংস ও অম্লিবর্দ্ধক এবং বাত ও পিত্তনাশক।

শূলিকা-পক্কমাংস—মাংস শূলে ছুঁড়িয়া অলস্ত জ্বারে পাক করিতে হয়, ইহার গুণ—অত্যন্ত গুরু, বৃষা এবং দীপ্ত ও অম্লি সম্বন্ধে সর্ষধা হিতকর। চলিত কথায় ইহা শিক্-কাবাব নামে পরিচিত।

বেশবার মাংস।—মাংস বেশ করিয়া পিষিয়া লইয়া উহার মধ্য হইতে হাড় ফেলিয়া দিতে হয়। পরে ঐ নিষ্পিষ্ট মাংসে শুড়, স্বত ও ক্রুমরিচ মিশাইয়া লইলে তাহাকে বেশবার মাংস বলা যায়। ইহার গুণ—গুরু, মিষ্ট, বল ও উপচয়বর্দ্ধক। এই বেশবার মাংস যে কোন দ্রব্য বা মৎস্তমাংসাদির ব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করা হইবে, তাহারও দোষ গুণ এইরূপই জানিবে। এক সঙ্গে সকল রকম মাংস ভোজন করা বৈজ্ঞক শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এইরূপ ভোজনে উপকার অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই অধিক। শাস্ত্রানুসারে যথোক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা যদি রিখিমত মাংস পাক করিয়া ভোজন করা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত উপকারিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈজ্ঞক শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—অন্ন হইতে অষ্টগুণ পিষ্টক, পিষ্টক হইতে অষ্টগুণ ছদ্ম এবং ছদ্ম হইতে অষ্টগুণবিশিষ্ট মাংস।

“অন্নাদষ্টগুণং পিষ্টং পিষ্টাদষ্টগুণং পরং।

পর্যসোহষ্টগুণং মাংসং মাংসাদষ্টগুণং স্নাতম্ ॥

স্বতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দনার তু ভোজনায় ॥” (রাজবল্লভ)

বর্দ্ধনীয় মাংস।—গুরুত্বপূর্ণাণে লিখিত আছে—ক্রবাদ, দাত্যাহ, শুক, সারস, একশফ, হংস, বলাক, বক, টিটিভ, কুরর, জলপাদ, খঞ্জরীট ও মৃগ প্রভৃতির মাংস বর্দ্ধন করিতে হয়। এই সমুদায়ের মাংসভোজন নিষিদ্ধ।\*

ত্র্যক্ষবৈবর্তপূর্ণাণের প্রকৃতিগুণে উল্লিখিত হইয়াছে, যে মানব নিজ উদরপূরণের জন্য লোভে পড়িয়া পরের জীবন নষ্ট করে, দেহান্তে লক্ষ বর্ষ পর্যন্ত তাহাকে মজ্জাকুণ্ডে বাস করিতে হয়। এই দীর্ঘকাল তাহার আর কোন আহার মিলিবার উপায় নাই। সেই মজ্জা পান করিয়াই তাহাকে জীবনধারণ করিতে হয়। অতঃপর ক্রমে সপ্তজন্ম পর্যন্ত শশক, মীন ও তৃণাদি হইয়া জন্মলাভপূর্ব্বক অবশেষে বিসর্জিত প্রাপ্ত হইতে পারে।†

কৃষ্ণপূর্ণাণের উপবিভাগে লিখিত আছে—বলাক, হংস, দাত্যাহ, কলবিষ্ণ, শুক, কক্কর, চকোর, জলপাদ, কোকিল, খঞ্জরীট, শ্রেন, গৃধ্র, উলূক, চক্রবাক, ভাষ, পারাবত, কপোত, টিটিভ, গ্রামটিটিভ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মার্জার, কুক্কর, শূকর, শৃগাল, মর্কট, গর্দভ, সমস্ত মৃগ ও অন্তান্ত বনেচর পক্ষী প্রভৃতির মাংস ভোজন করা নিষিদ্ধ।

পূর্ণাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে মাংসভোজনের বিধি নিষেধ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈধ মাংসভোজন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

\* “ক্রবাদপক্ষিদাত্যাহশুকমাংসানি বর্জয়েৎ।

সারসৈকশফান্ হংসান্ বলাকাবকটিটান্।

কুররং জলপাদঞ্চ খঞ্জরীটমৃগমিহান্।

চাসান্ মৎস্যান্ রজপাদান্ জঙ্ঘ। বৈ কামতো নরঃ।

বহুয়ং কামতো জঙ্ঘ। সোপবাসস্ত্যাহং বসেৎ ॥” (গুরুপু. ১৩ অঃ)

† “লোভাৎ স্বতক্ষণার্থায় জীবিনং হন্তি বো নরঃ।

মজ্জাকুণ্ডে বসেৎ সোহপি তস্তোজী লক্ষবর্ষকম্।

ততো ভবেৎ স শশকো মীনস্ত সপ্তজন্মহ্।

তৃণাদয়শ্চ কৰ্ম্মভোগতঃ শুদ্ধিং ভবেৎ ব্রহ্ম ॥” (ত্র্যক্ষবৈ. পু.)

“বলাকং হংসাদাত্যাহং কলবিষ্ণং শুকং ভগা।

কুররঞ্চ চকোরঞ্চ জলপাদঞ্চ কোকিলম্।

চাবঞ্চ খঞ্জরীটঞ্চ শ্রেনং গৃধ্রং তৈষেব চ।

উলূকং চক্রবাকঞ্চ ভাষং পারাবতঞ্চপি।

কপোতং টিটিভট্টৈষ গ্রামটিটিভমৈষ চ।

সিংহব্যাঘ্রঞ্চ মার্জারং বাণং শূকরমৈষ চ।

শৃগালং মর্কটিকঞ্চ গর্দভঞ্চ ন ভক্ষয়েৎ ॥

অভক্ষয়েৎ সর্ব্বমৃগান পক্ষিণোহস্তান্ বনেচরান্ ॥” (কুরুপু. ১৩ অঃ)

তগবান্ মহু বলিয়াছেন,—বিধিজন ব্রাহ্মণ কখন অবৈধ মাংস ভক্ষণ করিবেন না। ইহজন্মে অবৈধভাবে যাহার মাংস ভোজন করা যায়, জন্মান্তরে তৎকর্তৃক স্বয়ং ভক্ষিত হইতে হয়। বুধা মাংসভোজনে জন্মান্তরে বেক্লপ পাগভোগ হইয়া থাকে, ধনলোভে মৃগহননকারী নির্ভূর ব্যাধেরও সেক্লপ পাগ হয় না। পশু-আহারে যদি একান্তই আসক্তি থাকে, তবে অন্ততঃ ঘৃতময়ী বা পিষ্টকময়ী পশু-প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহা ভোজন করিবে। তথাপি অবৈধভাবে পশুহিংসা করিতে ইচ্ছা করিবে না। যে ব্যক্তি অবিধিপূর্বক নিজের তৃপ্তির জন্য পশু হনন করে, অন্য জন্ম তাহাকে পশুরোমের সংখ্যাহুসারে নিধনপ্রাপ্ত হইতে হয়। প্রাণিগণের হিংসা ব্যতীত কখন মাংস উৎপন্ন হয় না এবং প্রাণিবধেও স্বর্ণফল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়; অতএব মাংসত্যাগ করাই বিধেয়। কিরূপে মাংসের উৎপত্তি হয় এবং সেই মাংসভক্ষণে দেহী-দিগকে কিরূপ বধবন্ধনাবস্থায় পতিত হইতে হয়, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সর্বপ্রকার মাংসভক্ষণ হইতেই বিরত হওয়া উচিত। যে অবৈধ মাংস ভক্ষণ করে না, সে লোক-প্রিয়তা ও নারোগিতা লাভ করিতে পারে। দেব ও পিতৃ-পণকে পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা নিজ মাংসের উপচয় করিতে চায়, তাহার ভায় অপুণ্যভাগ্য ব্যক্তি আর নাই। যিনি মাংস ত্যাগ করেন, আর যিনি শত বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই উভয়বিধ ব্যক্তিরই পুণ্যফল ভুল্য, মাংসত্যাগে বেক্লপ ফললাভ করা যায়, মুনিজনোচিত ফলমূল্যাদি পবিত্র আহার-পরিহারেও সেক্লপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। ‘ইহকালে যাহার মাংস আমি ভোজন করিলাম, পরলোকে সে আবার আমাকে ভক্ষণ করিবে’ ইহাই মাংস শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণ বলেন,—নিহত পশুর মাংস কদাচ গ্রহণ করিতে নাই।

“পশোন্ত মাংমাগন্ত ন মাংসং গ্রাহয়েৎ কচিৎ।

পৃষ্ঠমাংসং গর্ভম্যাং শুকমাংসমথাপি বা ॥” (ব্রহ্মপু.)

মহাভারতে লিখিত আছে,—যে গোভের বশবর্তী না হইয়া রোগান্ত কিংবা অশুভক হইয়াও, মাংসভক্ষণে বিরত হয়, সে ব্যক্তি অনার্যসে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে।

“যোগার্থোহভার্থিতো বাপি যো মাংসং নাভ্যলোলুপঃ।

ফলমাপ্নোত্যবদ্বেন সোহশ্বমেধশতশ্চ চ ॥” (মহাভারত)

নন্দিপু্রাণ বলেন,—যিনি পরকে মাংসভক্ষণে নিবেদন করেন, তিনিও অমাংসান্নী ব্যক্তির পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকেন।

“বশ্যোপদেশং কুরুতে পরন্ত তু মহাত্মনঃ।

মাংসস্ত বর্জনফলং সোহমাংসাদকলং লভেৎ ॥” (নন্দিপু.)

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—যে মানব রবিবার রক্তশাক কিংবা যে কোন আমিষ ভোজন করে, সপ্তজন্ম পর্যন্ত তাহাকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া থাকিতে হয়।

“আমিষং রক্তশাকঞ্চ যো ভুক্ত্বৈ চ রবেদিনে।

সপ্তজন্ম ভবেৎ কুষ্ঠী দরিদ্রশ্যোপজারতে ॥” (ভবিষ্যপু.)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি এই সকল পর্কদিনে যে মানব স্ত্রী, তৈল ও মাংস সংযোগ করে, মরণান্তে বিষ্মত ভোজন নামক নরকে তাহার স্থান হয়।

“চতুর্দশীষ্টমী চৈব অমাবস্তাথ পূর্ণিমা।

পর্কণ্যোতানি রাজেন্দ্র ! রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥

স্ত্রীতৈলমাংসসংযোগী পর্কশ্বেতেষু বৈ পুমান্।

বিষ্মতভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ ॥”

(তিথ্যাদিতত্ত্বত বিষ্ণুপু.)

শ্রীমদ্ভাগবত কোন প্রকার মাংসভক্ষণেরই ব্যবস্থা দেন নাই। ভাগবত-মতে বৈধ অবৈধ সকল রকম মাংসই নিষিদ্ধ। পঞ্চমস্কন্ধে লিখিত আছে—যে সকল পুরুষেরা পুরুষমেধে যজ্ঞ করে, আর যে সকল স্ত্রীলোকেরা নর-পশুমাংস ভোজন করে, তাহাদিগের স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই মৃত্যুভবনে গিয়া যাতনা ভোগ করিতে হয়।

“যে যিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষমেধেন যজন্তে যাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃপশূন্ খাদন্তি, তাশ্চ তাশ্চ তে পশব ইব নিহতা যমসদনে যাতয়ন্তো রক্ষোগণাঃ, \* \* \* \* \*।”

(ভাগবত ৫২৩৩১)

পূর্বেই বলিয়াছি, মাংসভক্ষণের বিধিনিষেধ উভয়ই দেখা যায়। শাস্ত্রীয় নিষেধবচনাদি উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে মাংসভক্ষণের বিধিবোধক বচনাদির উল্লেখ করা যাইতেছে।

গুরুড়পুরাণে লিখিত আছে—শ্রাদ্ধোপলক্ষে দেব ও পিতৃ-গণের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া যদি মাংস ভক্ষণ করে, তবে সেক্লপ মাংসভোজনে কোনরূপ দোষের ভাগী হইতে হয় না। কিন্তু উক্ত বিধির ব্যতিক্রম করিয়া যদি মাংসার্থ কোন পশুর হিংসা করা হয়, তবে নিজের সেই দ্রুত কন্দের ফলে নিহত পশুর লোম-সংখ্যাহুসারে অনন্তকাল নরকযাতনা ভোগ করিতে হয়।

“শ্রাদ্ধে দেবান্ পিতৃন্ প্রাচ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্।

বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ ॥

সম্মিতানি ছরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্ ॥” (গুরুড়পু. ৯৬অ.)



কৃষ্ণপুরাণে উক্ত হইয়াছে—গোধা, কৃষ্ণ, শশ, খজী ও লম্বাক এই পঞ্চনখ ময়ুর মতে ভক্ষ্য। মশক মংস্ত, কক-  
বৃগের মাংস এই দুইটা বস্ত্র দেব ব্রাহ্মণে নিবেদন করিয়া  
ভোজন করিতে পারা যায়। ময়ুর, তৈত্তিরি, কপোত, কপি-  
জল, বার্কীনস, বক ও নীল হংস এই সকল পক্ষিমাংস এবং  
মকর, সিংহকুণ্ড, পাঠীন ও রোহিত প্রভৃতি মংস্ত মাংস এই  
উভয়বিধ মাংসই প্রোক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণকামনার ভোজন  
করা বাইতে পারে। বৈধভাবে মাংস ভোজন করিলে  
তাহাতে পাণে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ বা  
কোন দৈবকার্যে নিমন্ত্রিত হইয়া মাংসভোজনে পরাশুথ  
হয়, পশুর রোমসংখ্যাদ্বারা ততকাল তাহার নরকে বাস  
হইয়া থাকে।

মাংসের ভক্ষণ ও বর্জনবিষয়ে ভগবান্ ময়ুর বে বিধান  
করিয়াছেন, তাহা এই;—তাহার মতে প্রোক্ষিত মাংস ভোজন  
করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণগণের কামনার আহারাত্তরের অসম্ভাবে  
এবং প্রাণসকট পীড়ার বথানিয়মে মাংস ভোজন করা বাইতে  
পারে। প্রজাপতি জীবের আহারের জন্ত হাবর জঙ্গমাদি  
সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। হাবর ত্রীহি ঘবাধি এবং জঙ্গম  
পশু প্রভৃতি সমস্তই প্রাণ বা জীবের আহাৰ্য্য সামগ্রী।  
সুতরাং প্রাণধারণের জন্ত জীব মাংস ভোজন করিতে পারে।  
জঙ্গম হরিণাদি ও অজঙ্গম তৃণাদি আহার করিবে। ব্যাঘ্র  
প্রভৃতি দংশীরা অদংশী হরিণ প্রভৃতিকে ভক্ষণ করিবে। এই  
রূপে হস্তশালী ময়ূরোরা হস্তহীন মংস্ত প্রভৃতিকে এবং শূর-  
প্রকৃতি সিংহাদি ভীরুস্বভাব হস্তী প্রভৃতিকে ভক্ষণ করিবে।  
এইরূপই বিধাতার সৃষ্টি। প্রজাপতি ভক্ষ্য ও ভক্ষক উভয়েরই  
সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন। সুতরাং ভক্ষ্য প্রাণীদিগকে প্রত্যহ  
ভোজন করিলে কাহাকেও দোষের ভাগী হইতে হয় না।  
যজ্ঞনিমিত্তক যে পশুহিংসা করা হয়, তাহার মাংসভক্ষণ  
দৈববিধি বলিয়া নির্দিষ্ট। এতদ্বিধি আশ্বোদর-পরিপূরণের  
জন্ত পশুহিংসা করিয়া যদি তন্মাংসভোজনে প্রবৃত্তি করা হয়,  
তবে সেরূপ প্রবৃত্তি ব্রাহ্মসোচিত অজ্ঞান বলিয়াই কথিত।  
এইরূপ প্রবৃত্তিবশে বৃথা মাংস ভক্ষণ করা নিজান্ত গর্হিত।  
ক্রয় করিয়া কিংবা স্বয়ং বত্পূৰ্ণক সংগ্রহ করিয়া অথবা  
অন্ত কাহারও দ্বারা আনয়ন করিয়া যদি দেব ও পিতৃ-পুরুষ-  
দিগকে মাংস নিবেদনপূৰ্ব্বক ভক্ষণ করে, তবে সেরূপ মাংস-  
ভক্ষণে দোষের ভাগী হইতে হয় না। শ্রাদ্ধ কিংবা মধুপৰ্ক-  
ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া ময়ূর যদি মাংসভোজন না করে,  
তবে মরণোত্তর একবিশতি জন্ম পর্যন্ত তাহাকে পশু হইয়া  
থাকিতে হয়। বৈদ্যবিহিত মত্রে যে সকল পশু প্রোক্ষণাদি-

সংস্কারসম্পন্ন হয় নাই, সেরূপ পশুর মাংস ব্রাহ্মণাদির  
ভক্ষণ করা একেবারেই নিকিৎ। ফলে ময়ূরসংস্কৃত মাংস-  
ভোজনই ব্রাহ্মণাদির পক্ষে বিহিত হইয়াছে।\*

মাংসভক্ষণের বিধিনিষেধের বিষয় বিবৃত করিয়া উপ-  
সংহারে ময়ুর বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি কণের অধিকারাহীন্যের  
মাংসভক্ষণে কোন দোষ নাই। কারণ ভক্ষণ, পান ও মৈথু-  
নাদি-ব্যাপারে প্রবৃত্তিই প্রাণিগণের নৈসর্গিক ধর্ম। মাংস-  
ভক্ষণ, স্বল্পপান ও স্ত্রীসম্বোগ এই সকল ব্যাপারে প্রাণিগণ  
স্বভাবতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তবে কণা হইতেছে, এই সকল  
ব্যাপারে প্রবৃত্তি না করাই মহাফলজনক।

“ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যো ন চ মৈথুনে।

প্রবৃত্তিরেবা ভূতানাং নিবৃত্তিঞ্চ মহাকণা ॥” (ময়ূ ৫০৭)

দেবীপুরাণে লিখিত হইয়াছে—অষ্টমীর দিন উপবাস  
করিয়া পরদিন নবমী তিথিতে মংস্ত মাংস উপহার দ্বারা  
নৈবেদ্য প্রদানপূৰ্ব্বক স্বয়ং তাহা ভোজন করিবে।

“অষ্টমীং ময়ূপোষ্যেব নবম্যামপরেহহনি।

মংস্তমাংসোপহারেণ দত্তান্নৈবেত্তমুত্তমম্ ॥

তেনৈব বিশিনামস্ত স্বয়ং ভুঞ্জীত নান্ধবা ॥” (দেবীপুঃ)

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—প্রাণসকটকালে, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে,  
অথবা ব্রাহ্মণকামনার দেব-পিতৃদিগের অর্চনাপূৰ্ব্বক যদি  
প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করা হয়, তবে তাহাতে দোষহই  
হইতে হয় না।

\* “মাংসমাত্যঃ অবক্ষ্যামি বিধিঃ ভক্ষণবর্জনে।

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাক কাম্যম্ ॥

যথাবিধি নিযুক্তান্ত প্রাণানামেব চাত্যে ॥

প্রাণস্যায়মিদং সর্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ ॥

হাবরঃ জঙ্গমকৈব সর্বং প্রাণস্য ভোজনম্ ॥

চরাণামন্নমচরা দংশিণামপ্যদংশিণঃ ॥

অহস্তাক সহস্তাশাং শূরাণ্যকৈব ভীরবঃ ॥

নান্ধা ছযাতাদন্নাদ্যন্ প্রাণিনোহহস্তহস্তপি ॥

ধাত্রেব স্ত্রী হাশ্যাক প্রাণিনোহস্তার এব চ ॥

কজার জকিমাংস্যস্যোত্যেব বৈবে বিধিঃ শ্রুতঃ ॥

অতোহস্তথা প্রবৃত্তিস্ত ব্রাহ্মসো বিধিক্রান্তে ॥

ক্রীড়া স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা ॥

দেবান্ পিতৃনর্জয়িত্বা খাদন্ মাংসং ন ছযতি ॥

নিযুক্তক বখাত্যায় যো মাংসং নাতি মানবঃ ॥

স প্রোত্য পশুতাং বাতি সত্ত্বাদেকবিংশতিঃ ॥

অসংস্কৃতান্ পশূন্ মদ্রৈর্মাংসাদিখ্যঃ কহাচন ॥

মদ্রৈস্ত সন্ন্যস্তান্যাহাযতঃ বিশিরাহিতঃ ॥” (ময়ূ ৫ অধ্যায়ঃ)

“প্রাণাত্ময়ে তথা প্রাক্তে প্রোক্ষিতং বিজ্ঞকাময়া।

দেবান্ পিতৃন সমভ্যর্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্ ॥” (যাজ্ঞবল্ক্য)

ধর্মশাস্ত্রকার যমও ব্রাহ্মণকামনার প্রোক্ষিত মাংস ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

“তক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সর্কৃৎ ব্রাহ্মণকাময়া।

দৈবে নিযুক্তঃ প্রাক্তে বা নিষমে চ বিবর্জয়েৎ ॥”

(তিথিতত্ত্বত যমবচন)

তন্ত্রশাস্ত্রে বৈষ্ণবাচারনির্ণয়স্থলে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। নিত্যাতন্ত্রের প্রথম পটলে লিখিত আছে—বৈষ্ণবাচারপরায়ণ ব্যক্তি মৈথুন, মৈথুনালাপ, হিংসা, নিন্দা, কোটিল্য ও মাংসভক্ষণ পরিত্যাগ করিবেন।

“মৈথুনং তৎকথলাপং কদাচিত্তৈব কারয়েৎ।

হিংসাং নিন্দাঞ্চ কোটিল্যং বর্জয়েন্মাংসভোজনং ॥”

(প্রাণভোষিণীধৃত নিত্যাং)

তন্ত্রে মাংস পঞ্চমকারের দ্বিতীয় মকাররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। [পঞ্চমকার দেখ]

তন্ত্রে লিখিত আছে—

“মাংসস্ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং জলথেরতুচরম্।

ত্রিবিধং মাংসং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারণম্ ॥” (তন্ত্রসার)

মাংস তিন প্রকার, জলচর, ভূচর ও খেচর। এই তিন প্রকার মাংসই দেবতার প্রীতিকর।

গোমাংস, মেঘ, অম্ব, মহিষ, গোধা, ছাগ, উষ্ট্র ও মৃগ এই সকল মাংস ভূচরমাংস। এই অষ্টবিধ ভূচর মাংসকে মহামাংস কহে।

“গোমেঘাম্বমহিষকগোধাছাগুষ্ট্রমৃগোত্তমম্।

মহামাংসপ্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারকম্ ॥” (তন্ত্রসার)

মাংস দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হয়, যদি কোন গতিকে মাংস না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধি দিবারও ব্যবস্থা আছে।

মাংস-প্রতিনিধি—লবণ, আজক, পিণ্যাক, তিল, গোধূম, মাষকলাই ও লণ্ডন এই সকল দ্রব্য মাংসের অনুকরণ অর্থাৎ মাংসোভাবে এই সকল দ্রব্য দেওয়া উচিত।

“লবণাজকপিণ্যাকতিলগোধূমমাষকম্।

লণ্ডনঞ্চ মহাদেবি মাংসপ্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ ॥” (তন্ত্রসার)

মাংস শোধন করিয়া ব্যবহার করা আবশ্যিক। “ঐ প্রতদ্-বিকৃত্যন্তে” ইত্যাদি মন্ত্রে মাংস শোধন করিতে হয়। পঞ্চমকার-শোধনস্থলে লিখিত আছে, মস্ত ও মাংস বলিলে সাধারণতঃ বাহা বুঝায়, বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিই স্মরা, পরম শিবই মাংস, স্বয়ং ভৈরব তাহার

ভোক্তা, যে সময় শিবশক্তির যোগ হয়, সেই সময় মোক্ষ-মূল আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। আনন্দই ত্রৈলোক্যের স্বরূপ। এই আনন্দ সাধকের দেহেই অবস্থিত। স্মরা ইহার ব্যঞ্জক, এই জন্ত যোগীরা স্মরাপান করেন। যিনি ষট্চক্র ভেদ করিতে সমর্থ, যিনি পীঠস্থান সমুদয় অতিক্রমপূর্বক মহাপদ্মবনে বিহার করিতে পারেন, যিনি মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া চিন্ময় পরম শিবের সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির সামরস্ত সম্পাদনপূর্বক সহস্রদল কমলমধ্যগত চন্দ্রমণ্ডল হইতে পীযুষধারা পান করেন, তিনিই প্রকৃত মস্তপান করেন, অপর যে লৌকিক মস্ত তাহা পাপজনক।

যে যোগী জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা পুণ্য ও পাপরূপ পশু বলিদানপূর্বক পরমব্রহ্মে চিত্ত লয় করেন, তাহারই মাংস ভক্ষণ করা হয়। অথবা যে ব্যক্তি মনঃপ্রসূত সমুদয় ইন্দ্রিয়গণকে সংযমপূর্বক আত্মাতে যোজন করেন, তিনিই প্রকৃত মাংসাশী, অপরে প্রাণিঘাতক।

“স্মরা শক্তিঃ শিবো মাংসং ততোক্তা ভৈরবঃ স্বয়ম্।

তয়োরৈক্যে সমুৎপন্নে আনন্দো মোক্ষ উচ্যতে ॥

আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।

তত্ত্বাভিযাজকং দ্রব্যং যোগিসিদ্ধিতে ন পীরতে ॥

লিঙ্গত্রয়বিশেষজ্ঞঃ ষট্চক্রপদ্মভেদকঃ।

পীঠস্থানানি চাগত্য মহাপদ্মবনং ব্রজেৎ ॥

আমূলাধারমাত্রৈরন্ধ্রং গতা পুনঃ পুনঃ।

চিচ্চক্রকুণ্ডলীশক্তিসামরস্তমহোদয়ঃ ॥

ব্যোমপঙ্কজনিতশুদ্ধাধাপানরতো নরঃ।

মধুপানমিদং দেবি চেতরং মস্তপানকম্ ॥

পুণ্যাপুণ্যপশুং হস্তা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ।

পরে লয়ং নরৈচ্ছিতং পলাশীতি নিগচ্ছতে ॥

মানসাদৌন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।

মাংসাশী স ভবেদেবি ইতরে প্রাণনাশকঃ ॥” (তন্ত্রসার)

ব্যাকরণমতে—পাক শব্দ ও পচন শব্দ পরে থাকিলে

মাংস শব্দের অন্ত্যলোপ হয়। যথা—

“মাংসপচন্ত্যা উথায়ঃ।” (মহাভাষ্য)

মন—সঃ, দীর্ঘশ্চ। (পুং) ৫ কাল। ৬ কীট। ৭ রণসঙ্কর-

জাতিবিশেষ।

“চতুরো ভাগধী স্ততে কুরাণ্মোপজীবিনঃ।

মাংসং স্বাহকরং ক্ষোভ্রং সৌগন্ধমিতি বিপ্রতম্ ॥”

(মহা. ১০৪৮।২২)

মাংসকচ্ছপ (পুং) তানুগত মুখরোগভেদ। (স্কন্ধ. ১।৩০।৯২)

মাংসকলী (স্ত্রী) অর্কুদবিশেষ। চলিত জাব।

মাংসকর্ণী (জী) ১ বরটাদি কীট। ২ বক্রতণ্ড। (বৈদ্যক)  
 মাংসকার (ত্রি) মাংসপ্রিয়, যে ব্যক্তি মাংস খাইতে ভালবাসে।  
 মাংসকারিন্ (ক্লী) মাংস করোতীতি কৃ-ণিনি। রক্ত।  
 মাংসকীলক (পুং) স্বনামখ্যাত গুরুরোগবিশেষ। এই  
 রোগকে অর্শোভেদ বলিয়াও অভিহিত করা যায়।

(বাগ্ভট ৩৩ অধ্যায়)

মাংসকেশিন্ (পুং) পাদরোগভেদযুক্ত অশ্ব। যে অশ্বের  
 পদতলে কেশাকার মাংস সকল জন্মে, তাহাকে মাংস-  
 কেশী বলে।

“কেশাকারানি মাংসানি যন্ত স্ত্যন্তলজানি চ।

মাংসকেশীতি তং বিদ্যাৎ \* \* \* ।” (জয়দত্ত ৩৯ অং)

মাংসকোথ (পুং) মাংসগলন। (বাভট-উ, ২৮ অং)

মাংসখণ্ড (ক্লী) মাংসের টুকরা।

মাংসধুর (পুং) পাদরোগবিশেষযুক্ত অশ্ব, যে অশ্বের খুরে  
 বহু মাংস থাকে, তাহাকে মাংসধুর কহে।

“বহুমাংসধুরৈব জ্ঞেয়ো মাংসধুরো হয়ঃ।” (জয়দত্ত ৩৯ অং)

মাংসগজ্জর (পুং) জ্বরবিশেষ। এই জ্বর হইলে জাহ্নর  
 অধোভাগস্থ মাংসপিণ্ডে বেদনা, পিপাসা, উন্মাদ, অন্তর্দাহ,  
 বিক্ষেপ ও মানি প্রভৃতি হইয়া থাকে।

“পিণ্ডিকোদেষ্টেনং তৃণাস্তষ্টমূত্রপুরীষতা।

উন্মাদদাহবিক্ষেপো মানিঃ স্ত্যাস্ত্যাসগজ্জরে ॥” (নিদান)

মাংসগ্রস্থি (পুং) মাংসজাত গ্রন্থিরোগ। (বাভট উ ২৯ অং)

মাংসচ্ছদা (জী) মাংসং ছাদয়তি ছদ-গিচ্-অচ্ হ্রস্ব,  
 অথবা মাংস ইব ছদঃ পৰ্ণমস্তাঃ তত্পরি লোমোৎপত্তেরস্তা-  
 স্তথাৎ। মাংসরোহিণী লতা। পর্যায়—মাংসী, মাংসরোহী,  
 রসায়নী, স্থলোমা, লোমকারিণী। (রাজনিং)

মাংসচ্ছেদ (পুং জী) মাংসবিক্রয়ী। যাহারা মাংস কাটিয়া  
 বিক্রয় করে।

মাংসচ্ছেদিন্ (পুং) মাংসবিক্রয়কারী জাতিবিশেষ।

মাংসজ (ক্লী) মাংসাজ্জায়তে জন-ড। দেহস্থিত মাংসজন্ত  
 মেদ। (হেম) (ত্রি) ২ মাংসজাতমাত্র।

মাংসজাতি (জী) যুগ, বিক্রি, প্রভূদ, প্রসহ, বিলেশয়,  
 মহাযুগ, জলচর ও মৎস্ত প্রভৃতি অষ্টবিধ মাংসজাতি।

(পর্যায়মুক্তাবলী)

মাংসজাল, (ক্লী) জালবদ্যাস। চলিত মাংসঝিলি বা  
 জাল। মাংসজাল, শিরাজাল, মাংসজাল ও অস্থিজাল ইহার  
 প্রত্যেকে চারিটা। ইহার পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও পরস্পরের ছিদ্রে  
 মিলিত হইয়া মণিবদ্ধ হইতে গুল্ক পর্যন্ত অবস্থিতি করে।

“চত্বারি .মাংসজালানি, তানি মণিগুল্কসংশ্লিষ্টানি

পরস্পর সম্মিবদ্ধানি পরস্পর-সংশ্লিষ্টানি পরস্পরগবাক্ষিতানি  
 চেতি বৈগবাক্ষিতমিহং শরীরম্।” (সুশ্রুত শারীরস্থি ৫ অং)

মাংসতান (পুং) কর্ণগত মুখরোগভেদ। গলদেশের ফুলা  
 ক্রমে ক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া যদি গলনালী প্রায় রোধ  
 করিয়া ফেলে এবং গলদেশের ফুলা লম্বিত হইয়া পড়ে, তবে  
 তাহাকে মাংসতান রোগ বলে, এই রোগ ত্রিদোষ হইতে  
 জন্মে। ইহা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ও প্রাণসংহারকর।

“প্রতানবান্ যঃ স্বয়থুঃ শুকটৌ

গলোগরোধঃ কুরুতে ক্রমেণ।

স মাংসতানঃ কথিতোহবলয়ী

প্রাণপ্রপূংসক্কৃতো বিকারঃ ॥” (সুশ্রুত নিং ১৬ অং)

মাংসতেজস্ (ক্লী) মাংসাং তেজোহস্ত, বহুব্রী। মেদ। (হেম)

মাংসদলন (পুং) মাংসং প্রীহাশ্বকং দলয়তি ক্লীকরোতীতি  
 দল-গিচ্-ল্য। প্রীহয় বৃক্ষ, রক্ত রোহিতক বৃক্ষ। (শব্দচং)

মাংসদ্রাবিন্ (পুং) মাংসং দ্রাবয়তি পিচ্-ণিনি। অন্ন-  
 বেতস। (রাজনিং)

মাংসধরা (জী) ১ তন্মাক প্রথম কলা। ২ ফুলাপর নামক  
 মৃগমত্বক। (সুশ্রুত শারীঃ ৪ অং)

মাংসপচন (ক্লী) মাংসস্ত পচনম্। মাংসপাক, ব্যাকরণ-  
 মতে পচন শব্দ পরে থাকিলে মাংস শব্দের অকারের লোপ  
 হইয়া মাংসপচন এইরূপ পদও হয়।

মাংসপাক (পুং) ১ মাংসপাককরণ। ব্যাকরণানুসারে  
 এই শব্দেরও মাংসপাক এইরূপ আর একটা রূপ হইবে।  
 ২ শূকররোগভেদ। শূকদোষজনিত ত্রণ উৎপন্ন হইলে  
 যাহার মাংস সকল বিশীর্ণ হইয়া যায় এবং শরীরে অতিশয়  
 বেদনা জন্মে, তাহাকে মাংসপাক ব্যাধি বলে। এই ব্যাধি  
 ত্রিদোষ কুপিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

“শীর্ষ্যন্তে যত্র মাংসানি যত্র সর্বাশ্চ বেদনাঃ।

বিজ্ঞাতং মাংসপাকস্ত সৰ্বদোষকৃতং ভিষক্ ॥”

(সুশ্রুত নিদাঃ ১৫ অং)

মাংসপিণ্ড (ক্লী) অস্থি, হাড়।

মাংসপুষ্টিকা (জী) ভ্রমরারি পুষ্পবৃক্ষভেদ। মালব-  
 দেশে এই বৃক্ষ ‘ভ্রমরারি’ নামে প্রসিদ্ধ। (রাজনিং)

মাংসপেশী (জী) মাংসস্ত পেশী ৬ তৎ। গর্ভস্থাবয়বভেদ।

“ততো জঞ্জো মাংসপেশী লোহাঞ্জীলেব সংহতা।”

(মহাভারত ১১১৫১২)

প্রথমে বৃদ্ধ, তৎপরে শিশুরাজে মাংসপেশী হয়। ক্রমে  
 ছই সপ্তাহ পরে উহা রক্ত মাংসে পরিব্যাপ্ত হইয়া দৃঢ় হইতে  
 থাকে।

“বৃহৎ: সপ্তরাশ্রেণ মাংসপেশী ভবেত্ততঃ।

বিসপ্তাহাং ভবেৎ পেশী রক্তমাংসচিহ্না দৃঢ়া ॥” (সুখবোধ)

মাংসপেশী সযন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ভাবপ্রকাশে লিখিত  
হইয়াছে। [ পেশী দেখ। ]

মাংসফল (পুং) তরঙ্গবল্লী, চলিত তরমুজ।

মাংসফলা (স্ত্রী) মাংসমিব কোমলমতঃ। বার্তাকী। (রাজনিং)

মাংসভক্ষ (পুং) মাংসং ভক্ষয়তীতি ভক্ষ-অণ্ (কৰ্মণ্যণ্।

পা ৩।২।৪) মাংসভক্ষণকর্তা। মাংসং ভক্ষয়তীতি কর্তরি  
ষণ্। ২ দানববিশেষ। (হরিবং ২৩২।৯)

মাংসভিক্ষা (স্ত্রী) হতাবশেষ মাংসঘাচন। “যে চার্কতো

মাংসভিক্ষামুপাসত” (শ্লক ১।১৬২।১২) ‘মাংসভিক্ষাং হতশিষ্ট-

মাংসঘাচনাম্ (সায়ণ)

মাংসভেতৃ (ত্রি) মাংস-ভি-ভৃচ্। মাংস-ভেদকারী।

মাংসময় (ত্রি) মাংস স্বরূপার্থে ময়ট্। মাংস স্বরূপ।

মাংসমাসা (স্ত্রী) মস-পরিণামে ঘঞ, মাংসস্ত পরিণামো-  
হত্যাঃ বৈহতী। মাংসপণী। (রাজনিং)

মাংসযোনি (ত্রি) রক্ত-মাংস হইতে উৎপন্ন জীব, (মহুয)।

“প্রবর্ষতঃ শরতাতানক্ষুনশ্চ শিতান্ বহুন্।

অপ্যর্ণবা বিশ্বেষ্যুঃ কিং পুনর্মংসযোনয়ঃ ॥”

(মহাভা° ৫।৫৪।১১)

মাংসরক্তা (স্ত্রী) রোহিণী। চলিত মাংসরোহিণী।

(বৈথকনিং)

মাংসরজ্জু (স্ত্রী) মাংসনিবন্ধন দ্বায়। এই মাংসরজ্জুর  
সংখ্যা চারিট। পৃষ্ঠ বংশের উভয় দিকে পেশী নিবন্ধনার্থ  
দুইটি এবং বাহ্যে ও অভ্যন্তরে দুইটি। “মহত্যো মাংসরজ্জব্ধ  
তত্রঃ পৃষ্ঠবংশমুভয়তঃ পেশানিবন্ধনার্থং দ্বৈ, বাহ্যে অভ্যন্তরে  
চ দ্বৈ।” (সুশ্রুত শারী° ৫ অঃ)

মাংসের যুগ, চলিত মাংসের কোল। ইহার গুণ—চক্ষুষ্য,  
বৃহৎ, প্রাণবর্দ্ধন, বৃষ্য, বাতবিনাশক এবং স্নতিবল ও স্বর-  
বর্দ্ধন। সন্ধিস্থল ভগ্ন বা বিল্লিষ্ট হইয়া গেলে এবং ক্লশ ও  
ব্রণাক্রান্ত হইলে ইহার ব্যবহার হিতজনক।

“রসো মাংসস্ত চক্ষুষ্যো বৃহৎ: প্রাণবর্দ্ধনঃ।

বুষ্যো বাতবিকারয়ঃ স্ত্যোজঃ স্বরবর্দ্ধনঃ ॥

ভগ্নবিল্লিষ্টসন্ধীনাম্ কৃশানাম্ প্রাণিনাম্ হিতঃ।”

মাংসরস (স্ত্রী) মাংসস্ত রসঃ ৬তং। মাংসের রস।

মাংসরুহা (হী) (স্ত্রী) মাংসরোহিণী। (রাজনিং)

মাংসরোহা (স্ত্রী) [ মাংসরুহা দেখ। ]

মাংসরোহিকা (স্ত্রী) মাংসরোহিণী বিশেষ।

মাংসরোহিণী (স্ত্রী) মাংসং রোহয়তীতি রহ-গিচ্-গিনি

গীপ্, বিকস্মে গুণাভাবঃ স্নানামধ্যাত স্তম্ভক্ দ্রব্য। পধ্যায়—

অমিক্কা, বৃত্তা, চর্মকবা, বসা, বিকবা, মাংসরোহী। ইহার

গুণ—বৃষ্য, সারক ও দোষদ্রয়নাশক। (ভাবপ্র° পৃঃ ১অঃ)

মাংসল (স্ত্রী) মাংসং তৎপুষ্টিকরো গুণোহন্ত্যস্ত্যস্মিন্ বা  
মাংস-লচ্ (শিদ্ভাদিত্যন্ত। পা ৫।২।৯৩) কাব্যের গোড়ী  
রীতির অন্তর্গত ওজোগুণের অঙ্গবিশেষ।

“ওজঃসমাসত্বয়ঃ মাংসলং পদভঙ্গং।” (কাব্যচ°)

অতিশয়-মাংসমতাত্তীতি বলবত্বার্থে লচ্। ২ বলবান্।  
৩ স্থল, পুষ্ট।

‘নিষাশ বহুরেখাঃ স্মারির্জব্যাস্চিবৃকৈঃ কৃশৈঃ।

মাংসলৈশ্চ ধনোপেতৈরবক্রৈরধৈরনৃপাঃ ॥”

(গুরুড়পুং ৬৬অঃ)

৫ মাংসযুক্ত। নরপতিগণের বক্ষঃস্থল উন্নত, পৃথু অকম্পন  
ও মাংসল হইয়া থাকে।

“ক্লদয়ং সমুন্নতং পৃথু ন বেপনং মাংসলঞ্চ নৃপতীনাম্।”

(বৃহৎসংহিতা) ৬৮।২৮)

৫ অতিবহল। “হুত্রস্ত হংসাবলিমাংসলপ্রিয়ো বলাকয়েব  
প্রবলা বিড়ঘনা।” (নৈষধ ৯।২৭) ৬ মাংসময় শিথীধাতু,  
চলিত মাংসলাই। (রাজনিং)

মাংসলতা (স্ত্রী) মাংসলের ভাব, স্থলতা, পুষ্ট।

মাংসলফলা (স্ত্রী) মাংসলং পুষ্টং ফলমত্যাঃ। ১ বার্তাকী।

২ তরমুজ। (বৈথকনিং)

মাংসলিপ্ত (স্ত্রী) অস্থি, হাড়। (বৈথকনিং)

মাংসবর্গ (পুং) জলচর, সজলদেশচর, গ্রামবাসী, মাংসভোজী,  
একশক (এক খুরবিশিষ্ট জন্তুমাত্র) এবং জাঙ্গল, এই ছয়  
প্রকার মাংসবর্গ। ইহাদিগকে উত্তরোত্তর প্রধান বলিয়া  
জানিবে। অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল-দেশবাসী প্রধান,  
তদপেক্ষা গ্রামবাসী প্রধান ইত্যাদি। ইহারা দুই প্রকার  
জাঙ্গল ও আনৃপ। এতৎ সযন্ধে বিবরণ ভাবপ্রকাশের মাংসবর্গ  
ও সুশ্রুত ৪৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ২ মাংসসমূহ।

মাংসবহ্শ্রোতস্ (স্ত্রী) মাংসনায়কনাড়ী। এই নাড়ীব  
মূল—দ্রায়ু ও ত্বক্। (চরক বিমানস্থান)

মাংসবারুণী (স্ত্রী) হরিণাদি মাংস হইতে উৎপন্ন বারুণী মত।  
ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—হরিণ প্রভৃতির মাংস টুকরা টুকরা  
করিয়া তক্রাদি দ্রব্যে নিক্ষেপান্তে ৪৮দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া পরে  
তাহা হইতে ক্রমে এক একটু রস বাহির করিয়া লইতে হয়।

“এষাং মাংসস্ত কণশঃ কৃষা পূর্কদ্রবে তসেৎ।

সংস্থাপ্য মণ্ডলাং পশ্চাদর্কং নিষ্কাশয়েত্ততঃ।

এবং সর্কজ মাংসস্ত বারুণীকরণক্রিয়া ॥” (রাবণ)

মাংসবিক্রয় (পুং) মাংসে বিক্রয় করা। মাংসে বেচা।

মাংসবিক্রয়িন্ (ত্রি) মাংসবিক্রয়োহস্তাতীতি বা মাংস-  
বিক্রয়েণ জীবতীতি ইনি। আমিসবিক্রয়কর্তা। পর্যায়,—  
বৈভাসিক, কোটিক, মাংসিক, শৌনিক, কোটিকিক। দৈব  
ও পৈত্র কার্যে মাংসবিক্রয়কারীদিগের সংশ্রব পরিভ্যাগ  
করিতে হয়।

“চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।

বিপণেন চ জীবন্তো বৰ্জ্যাঃ স্মার্যব্যকব্যয়োঃ ॥” (মহু ৩।১৫১)

২ পুত্র-কন্তা-বিক্রয়কারী।

মাংসবিক্রেতৃ (ত্রি) মাংস-বিক্রয়ী।

মাংসবুদ্ধি (স্ত্রী) মাংসস্ত বুদ্ধিঃ। ১ অর্জুদ। ২ গলগণ্ড।  
৩ স্ত্রীপদ। ৪ কোরগু।

মাংসলীল (ত্রি) ১ মাংসল। ২ মাংসপ্রিয়।

মাংসসঙ্কেচ (পুং) মাংসের সঞ্চিত ভাব। (ভাবপ্র. বিক্ষো. চি.)

মাংসসজ্জাত (পুং) তালুরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—  
কক্ষুষ্ঠ মাংসোজ্জ্বল তালুমূলে থাকিয়া যদি বেদনাবিহীন হয়,  
তবে তাহাকে মাংসসজ্জাত নামক তালুরোগ বলে।

“দৃষ্টং মাংসং প্রৈয়গা নীরুজক

তাবস্তঃ মাংসসজ্জাতমাহঃ ॥” (ভাবপ্র. মুখরোগাধিকার)

মাংসসমুদ্ভবা (স্ত্রী) বসা। (বৈত্কনি.)

মাংসসর্পিঃ (পুং) রাজবক্ষারোগে স্তূতোষধ ভেদ। ইহার  
প্রস্তুত-প্রণালী—বিলেশয়প্রসহ-মাংস ১২৥ সের, জল ১২৮  
সের, শেষ ১৬ সের। স্তূত ৪ সের। কক্ষার্থ জীবনীময়গণ  
প্রত্যেক ১ পল। এই সকল একত্র পাক করিয়া লইতে  
হয়। (বাভট চি. ৫ অঃ)

মাংসসার (পুং) মাংসস্ত সারঃ ৬তৎ। ১ মেদোদাতৃ।

(রাজনি.) মাংসেষ্ণপি সারো বলমস্ত বহবীঃ। ২ স্থলকার,  
সবল ব্যক্তি। মাংসসার মানবের দেহ পরিপুষ্ট হইলে বিধান,  
পনৌ ও স্থলর হয়।

“উপচিতমেহো বিধান্ ধনী সুরূপশ মাংসসারো যঃ”

(বৃহৎসং. ৬৮।১০০)

মাংসস্নেহ (পুং) মাংসানাং স্নেহঃ ৬তৎ। মেদোদাতৃ।

(রাজনি.) ২ বসা। (বৈত্কনি.)

মাংসহাসা (স্ত্রী) মাংসেন হাসঃ প্রকাশো বস্তাঃ। চন্দ্র।

(শব্দরত্না.)

মাংসাদ্ (ত্রি) মাংসমতীতি মাংস-অদ-ক্ষিপ্। ১ মাংস-  
ভক্ষক। ২ রাক্ষস।

“অন্ত তর্প্যন্তি মাংসাদা ভূঃ পাত্ত্যরিদৌগিতম্।”

(ভট্ট. ১৬।২২)

মাংসাদ্ (ত্রি) মাংসাণী, মাংসভক্ষক। যে যাহার মাংস  
খায়, সে তাহার ‘মাংসাদ্’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

“যো যন্ত মাংসমশ্নতি স তন্মাংসাদ্ উচ্যতে।

মৎস্তাদঃ সর্কমাংসাদস্তন্মাংসাত্মান্ বিবর্জয়েৎ ॥” (মহু ৫।১৫)

মাংসাদিন্ (ত্রি) মাংসাণী, মাংসভোজী। (হিলাজদীপ.)

মাংসাকুর (পুং) ১ অক্ষুরবৎ মাংসমূহ। ২ অর্শের বলি।

মাংসারি (পুং) অগ্নবেতস। (বৈত্কনি.)

মাংসার্বীদ (স্ত্রী) শূকরোগভেদ। শূকরোগোন্নতর মাংস  
দূষিত হইয়া তাহাতে যে ত্রণ জন্মে, তাহাকে মাংসার্বীদ  
কহে। এই রোগ অসাধ্য।

“মাংসদোষেণ জানীয়াদর্কুদং মাংসসম্ভবম্।”

(সুশ্রুত নি. ১৪ অঃ)

২ অর্জুদবিশেষ। ইহার লক্ষণ,—মুষ্টি প্রভৃতি দ্বারা

অঙ্গ আহত হইলে মাংস দূষিত হইয়া শোফ জন্মে। সেই  
শোফ বেদনারহিত, স্নিগ্ধ, শরীরের যেকোন বর্ণ সেইরূপ বর্ণ-  
বিশিষ্ট, এবং পাণাণ্ডবৎ কঠিন ও অবিচলিত হইলে  
তাহাকে মাংসার্বীদ কহে। ইহা পাকে না। এই রোগ মাংসা-  
ণীর শরীরের মাংস দূষিত হইয়া শীঘ্রই উৎপন্ন হয়। এই  
রোগ অসাধ্য।

“অবেদনং স্নিগ্ধমনস্তবর্ণমপাকমশোণমমপ্রচাল্যম্।

প্রহৃষ্টমাংসস্ত নরস্ত বাচ্যমেতত্তবেমাংসপন্নায়ণস্ত ॥

মাংসার্বীদং ত্বেতদসাধ্যমুক্তম্ \* \* \* (সুশ্রুত নি. ১১ অঃ)

মাংসাবদা(দ)রণ (স্ত্রী) মাংসভেদন।

মাংসাশন (স্ত্রী) মাংসশাশনম্। মাংসভোজন, মাংসাহার।

“মাংসাশনঞ্চ নাম্নীযুঃ শরীরাংস্ত পৃথক্ কিতৌ।”

(মহু ৫।৭৩)

(ত্রি) ২ মাংসাণী, মাংসভক্ষক। ৩ রাক্ষস।

মাংসাশিন্ (ত্রি) ১ মাংসভোজী, মাংসভক্ষণশীল। ২ রাক্ষস।

মাংসাক্টকা (স্ত্রী) মাংসেন সম্পাদ্য অষ্টকা মাংসপ্রধানা  
অষ্টকা বা। গোপচাক্স গাবকৃষ্ণাষ্টমী। এই দিন মাংসোপ-  
করণ দ্বারা শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। অষ্টকা তিন প্রকার—  
অপূপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা এবং শাকাষ্টকা। বথাক্রমে অপূপ, মাংস  
ও শাক এই ত্রিবিধ দ্রব্য দ্বারা উক্ত অষ্টকাত্তর সমাহিত হয়।  
বলিয়া উহাদিগের ঐরূপ আখ্যা হইয়াছে। [ অষ্টকা দেখ ]  
“আদ্যাপুটৈঃ লদা কার্য্যা মাংসৈরন্যা ভবেত্তথা।

শাকৈঃ কার্য্যা তৃতীয়া জ্ঞাদেয দ্রব্যগতো বিধিঃ ॥” (অষ্টকাশ্রাদ্ধ)

মাংসিক (পুং) মাংসার প্রভবতি বা মাংসেন জীবতীতি মাংস-  
ঠঞ্ (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১১) মাংস-  
পণ্যমন্ত এই অর্থে (তদন্ত পণ্যম্। পা ৪।৪।৫১) এই স্ত্রীত্ব-

সারে মাংস শব্দের উত্তর ঠক্, অথবা মাংসং নিযুক্তমৈ  
দীয়তে এই অর্থে (শ্রাবণমাংসোদনাট্টিন্। পা ৪৪।৬৭) এই  
হ্রস্বমতে 'ট্টিন্' প্রত্যয়েও 'মাংসিক' পদ নিষ্পন্ন হয়।  
মাংসবিক্রয়ী।

মাংসিকা (স্ত্রী) জটামাংসী।

মাংসিনী (স্ত্রী) মাংসবৎ পদার্থমস্ত্রীতি মাংস-ইনি ঙীপ্।  
জটামাংসী (রাজনিং)।

মাংসী (স্ত্রী) মাংসমস্ত্রীতি মাংস-অর্শ আদিহাদচ্ ততো  
গৌরাং ঙীব্। ১ জটামাংসী। ২ কক্কোলী। ৩ মাংসচ্ছদা।

“নগদং নন্দিনী পেশী মাংসী কৃষ্ণজটা জটী।” (বৈথকরত্নাং)

৪ মুরামাংসী। ৫ চন্দনাদি তৈল। ৬ বাট্টোলক। চলিত  
বেড়োলা। ৭ অঙ্গারক তৈল। (বাতটং হ্রস্বাং ১৫ অঃ)  
৮ এলাদি। ৯ মাংসরোহিতভেদ। ১০ রুদন্তী।

মাংসীয় (ত্রি) মাংসেচ্ছ।

মাংসেপাদ্ (ত্রি) মাংসপাদযুক্ত (পত্)। “বৃষ্টে মাংসপাদ-  
বালভেত পশুকামো মিথুনো বা এষ মাংসপাৎ” (কাঠক ১৩৬)

মাংসেফা (স্ত্রী) মাংসমিষ্টং প্রিয়মস্ত্রাঃ বহুব্রীং। বল্গুণা।

মাংসোন্নতি (স্ত্রী) মাংসের ক্ষৌভতা।

মাংসোপজীবিন্ (পুং) ১ মাংসবিক্রয়ী। ২ তদ্বারা জীবিকা-  
নির্বাহকারক।

মাংসোদন (পুং) মাংসসিক্ত ওদন (তণুল)। ইহার  
গুণ ধাতুরক্তিকর, স্নিগ্ধ ও গুরু। (বৈথকনিং)

মাংসোদনিক (ত্রি) মাংসোদন-সম্বন্ধীয়।

মাংস্পাচন (ত্রি) মাংসরক্ষনকার্য।

মাংস্পাক (পুং) মাংসপাক।

মাকড় (দেশজ) মাকড়সা, লতা। (spider) [উর্গা দেখ]

মাকড়গিলা (দেশজ) গুল্মভেদ।

মাকড়জাল (দেশজ) ১ লতাতন্ত, মাকড়সার জাল। ২ গুল্ম-  
ভেদ। (Gordonia integrifolia)

মাকড়জালা (দেশজ) তণ্ডভেদ।

মাকড়সা (দেশজ) লতা।

মাকড়সারজাল (দেশজ) লতাতন্ত।

মাকন্দ (পুং) মাতীতি মা কিপ্ মাঃ পরিমিতঃ হ্রস্বটিতঃ  
কন্দ ইব ফলমন্ত। আম্রবৃক্ষ। (মেদিনী)

“মাকন্দ কন্দ কান্তাপরধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাবদ্-

তাবৎ শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্ত বিষগ্ণবচাংসি।” (গীতগোবিন্দ)

মাকন্দী (স্ত্রী) মাকন্দ-ঙীব্। ১ আমলকী। ২ নগর-  
ভেদ। রাজা যুধিষ্ঠির হৃদ্যোধনের নিকট যে পাঁচখানি গ্রাম  
প্রার্থমা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাকন্দী একখানি।

“অবিশ্বলং বৃকস্থলং মাকন্দীং বারণাবতম্।

অবমানক গোবিন্দ! কঞ্চিদেবাত্ত পঞ্চমম্ ॥” (ভারৱ ৫।৭২।২৫)

৩ পীতচন্দন। (শব্দমালা) ৪ মাজাগী, হিন্দী মাকন্দী।

পথ্যায় বহুমূলী, মাননী, গন্ধমূলিকা; ইহার গুণ কটু, তিক্ত,  
মধুর, দীপন, রুচিকর, অগ্ন্যবাতকারক, পথ্য। (রাজনিং)

মাকর (ত্রি) মকর-অণ্। মকরসম্বন্ধীয়।

মাকরী (স্ত্রী) মকরযুক্তা পৌর্ণমাস্ত্রীতি মকর-অণ্ ঙীব্।

মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী, মাকরী সপ্তমী।\* এই তিথি অতিশয়  
পুণ্যজনক, কোটি হুয়াগ্রহণে স্নান করিলে যে ফল হয়, এই  
তিথিযুক্ত দিনে গঙ্গাস্নান করিলে তাদৃশ ফললাভ হইয়া  
থাকে। স্নান অরুণোদয়কালে করিতে হয়। এই দিনে সপ্ত  
বদরপত্র ও সপ্ত অর্কপত্র মন্তকে করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ  
পূর্বক স্নান কর্তব্য। মন্ত্র যথা—

“ও যদ্বজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তমু জন্মতু।

তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হস্ত সপ্তমী ॥” (তিথিতত্ত্ব)

এই দিন স্নানের পর হুয়াদেবকে অর্ঘ্য দান করিবে। সবদর  
অর্কপত্র, দুর্কা, অক্ষত এবং চন্দন দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া  
নিম্নোক্ত মন্ত্রে দিতে হয়,—

“জননী সর্গভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।

সপ্তব্যাছতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে ॥” (তিথিতত্ত্ব)

অর্ঘ্যপ্রদানের পর নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

মন্ত্র যথা—“সপ্তসপ্তি বহুপ্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন।

সপ্তম্যাক্ষ নমস্তভ্যং নমোহনন্তায় বেধসে ॥” (তিথিতত্ত্ব)

এই তিথিতে স্নান ও অর্ঘ্যাদিদানে পরলোকে পুণ্য এবং  
ইহলোকে আয়ু, আরোগ্য ও সম্পদ লাভ হইয়া থাকে।

\* “হুয়াগ্রহণতুল্যা হি শুক্লা মাঘস্ত সপ্তমী।

অরুণোদয়বেলায়াং তস্যায় স্নানং মহাকলম্ ॥

মাঘে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তমী কোটিভাস্করা।

দদ্যাত্ স্নানার্হানান্ভ্যামাঘুরারোগ্যসম্পদঃ ॥

অরুণোদয়বেলায়াং শুক্লা মাঘস্য সপ্তমী।

গঙ্গায় যদি লভ্যত হুয়াগ্রহণতঃ সমাঃ ॥

কোটিভাস্করা কোটিসপ্তমীতুল্যা সপ্তম্যা ভাস্করদেবতাক্রান্তাং, হুয়াগ্রহণ  
ফলং স্নানজং।

যম্মাদ্বিশ্বস্তরাদৌ তু রথমাপুর্দিবাকরাঃ।

মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং তস্মাৎ সা রথসপ্তমী।

অরুণোদয়বেলায়াং তস্যায় স্নানং মহাকলম্ ॥

অর্ঘ্যদানপরিপাটী যথা—

অর্কপত্রৈঃ সবদরৈর্দুর্কাঙ্কতসচন্দনৈঃ।

অষ্টাঙ্গবিধিনাচাধ্যং দদ্যাদিতীতুহুয়ে।

অষ্টাঙ্গমর্ঘ্যমাপুর্ধ্য ভানৌমুচ্ছিত্ব নিবেদয়েৎ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

এই তিথিতে সূর্য্যোদয়ের উদ্দেশে রথযাত্রা করিলে মহা-  
পাতক নিনষ্ট হয় ।\*

মাকরন্দ (ত্রি) মকরন্দ পুষ্পের নির্ধাসদৃশকীর।

মাকরা (ত্রি) মকরক বৃক্ষ। মকরা ফলগাছ। (রত্নমাং)

মাকলি (পুং) ১ চন্দ্ৰ। ২ ইজের সারথি মাতলি।

মাক্ষেয় (পুং) মকটুর গোত্রাপত্য।

মাকাটা (দেশজ) তুলার বীজ।

মাকাটা, মাকাটিয়া (দেশজ) ১ অর্থগৃহু। ২ নির্দয়।

মাকারধান (ক্লী) দৈবরচিত্তার প্রকারভেদ।

মাকারপলা (দেশজ) প্রবালবিশেষ।

মাকাল (দেশজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ লতাকিশেষ (Cucumis  
Colocynthis) ইহার ফলগুলি গোলাকায় ও স্তম্ভা-  
কিন্তু ইহার অভ্যন্তর সুবীজ বিভাগবিহীন ভ্রূয়। পার্শ্বগণ  
বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে এই ফল লইয়া গৃহ সাজায়।

মাকিস্ (অব্যং) মা, নিষেধ, না। “স্ববস্তময়ে মাকিনোহরি-  
তারধারীঃ” (ঋক্ ১১৪৭।৫) ‘মাকিধারীঃ মা স্থাপয়, ছরিত-  
ভাজনং মাকারীঃ’ (সায়ণ)

মাকী (ত্রি) নির্মাত্রী, ভূতজাতের নির্ধাণকত্রী। “উত  
সুতো পয়োব্রূধা মাকীরণত” (ঋক্ ৮২।৪২) ‘মাকী নির্মাত্রো  
ভূতজাতত’ (সায়ণ)

মাকু (দেশজ) নাল, তুরি। তত্ত্ববারগণ যাহাতে স্ত্রী জড়াইয়া  
বস্ত্রবরনকালে টানার মধ্যে ঢালাইয়া পোড়েন গাথে।

মাকুন্দ (দেশজ) শুষ্কপ্রাণবিহীন ব্যক্তি।

মাকুম, আগারের লখিমপুর জেলার অন্তর্গত একটি পণ্ডগ্রাম,  
বুড়িডিহি নদীর কূলে জয়পুর হইতে ১০ ক্রোশ পূর্বে অব-  
স্থিত। এখানে একটি বিস্তৃত করলা ও কেরোসিনের খনি  
আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মাকুর্তি, মাক্রাজ-প্রেসিডেন্সীর নীলগিরিটেশলের কুড়া-  
মালার একটি শৃঙ্গ। অক্ষাং ১১°২২’১৫” উঃ এবং দ্রাঘি°  
৭৬°৩৩’৩০” পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৪০৩ ফিট উচ্চ। এই  
স্থান বিনোদ-বিহারের বিশেষ উপযোগী। এই শৃঙ্গের  
পশ্চিম পার্শ্ব সরল ও সুগভীর খাতযুক্ত দেখিয়া এখানকার  
তোড়ারা মনে করে যে, মনুষ্য ও মহিষের প্রেতাশ্মা ঐ পথ  
দিয়াই বমণোকে গমন করে।

\* “মাক্যমানস্য সপ্তম্যাং দেবঃ শাশ্বতং বরাঃ।

রথযাত্রাঃ প্রকৃষ্ণস্তি সর্ব্বদ্যববিক্রিতঃ।

গচ্ছন্তি তৎপদং শান্তং সূর্য্যমণ্ডলভঙ্গকং।

এতন্তে কথিতং দেবি শাশ্বতং সপ্তম্যং।

পাশপ্রশমনাখ্যানং মহাপাতকনাশনম্।” (বরাহপুরাণ)

মাকুলী (পুং) সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পসং ৪ অং)

মাকুল্ (আরবী) ১ ধর্ম্মযোগ্য। ২ নিয়মিত।

মাকোট (ক্লী) তীর্থভেদ। এখানে দাক্ষারণীর পূজা করিলে  
দেবলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

মাক্তা (দেশজ) মৃগ শব্দের অপভ্রংশ। একত্র মিশ্রিত।  
২ মিশ্রভাবে সংরক্ষিত। ৩ গৃহের মটকা শব্দের নামান্তর।

মাক্তার (দেশজ) ১ সম্পূর্ণরূপে। ২ মোট মাটে।

মাক্ষ, ল্হা। ভাদ্রিৎ পরশ্মৈৎ সফৎ সেট্। লট্ মাক্ষতি।  
লোট্ মাক্ষতু। লুঙ্ অমাক্ষ্যৎ।

মাক্ষব্য (ক্লী) ১ মক্ষুর গোত্রাপত্য। ২ আচাধ্যভেদ।

মাক্ষিক (ক্লী) মক্ষিকাতিঃ কৃতং মক্ষিকা (গংজারায়ঃ।  
পা ৪৩।১১) ইতি ঠক্। ১ মধু, নীলবর্ণ মধ্যম মক্ষিকাত্ত  
তৈলবর্ণ মধু, ইহার গুণ—ক্ষোভমধু হইতে লঘুতর, রক্ষ,  
শ্রেষ্ঠ, বিশেষ শ্বাসাদিরোগে অতিপ্রস্তুত। (রাজবল্লভ)

২ ধাতুবিশেষ। হিন্দী—ধাতুমারী। এই মাক্ষিকধাতু  
দ্বিবিধ—স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক, পর্য্যায়—মাক্ষীক,  
পীতক, ধাতুমাক্ষিক, তাপিক, তাপ্যক, তাপ্য, তাপীত,  
পীতমাক্ষিক, আবর্ত, মধুধাতু, ক্ষোভধাতু, মাক্ষিকধাতু,  
কলষ, চক্রনাম, অজ্ঞানামক। ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত, অন্ন,  
কফ, ভ্রম, জলাস, মুচ্ছা, শ্বাস, কাস ও বিষদোষনাশক।

তাবপ্রকাশে লিখিত আছে—স্বর্ণাদি ধাতুর এক একটা  
করিয়া উপধাতু আছে। তন্মধ্যে স্বর্ণ ধাতুর উপধাতু স্বর্ণ-  
মাক্ষিক। ইহার পর্য্যায়—তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য,  
মাক্ষিক ধাতু ও মধুধাতু। ইহাতে স্বর্ণের কিঞ্চিৎ অংশ  
মিশ্রিত আছে বলিয়া উহাকে স্বর্ণমাক্ষিক কহে। এই উপ-  
ধাতুতে স্বর্ণের কিছু গুণ আছে বলিয়া ইহা স্বর্ণের অভাবে  
ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা স্বর্ণ অপেক্ষা অপ্রধান,  
সুতরাং অন্ন গুণবিশিষ্ট। কিন্তু স্বর্ণমাক্ষিকে মাত্র স্বর্ণের গুণ  
থাকে, এরূপ নহে, অস্তান্ত দ্রব্যের সংশ্লেষ থাকায় অস্তান্ত  
গুণও ইহাতে বিস্তারিত। এই ধাতু শোধন করিয়া ব্যব-  
হার করিতে হয়। ইহা শোধিত হইলেই গুণদায়ক হইয়া  
থাকে। অশোধিত হইলে অনিষ্টকর প্রদ হয়। শোধিতের  
গুণ—মধুর, তিক্তরস, শুক্রবর্জক, রসায়ন, চক্ষুর হিত-  
কারক এবং বস্ত্রবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর,  
অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও জিহোষনাশক। অশোধিতের গুণ—  
মনোদ্বিকারক, অত্যন্ত বলনাশক, বিষ্টভী, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ,  
গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদন করে।

রৌপ্যধাতুর উপধাতুর নাম রৌপ্যমাক্ষিক, ইহাতে কিঞ্চিৎ  
রৌপ্য থাকায় গুণ রৌপ্যের ত্রায় এবং অস্তান্ত দ্রব্য মিশ্রিত।



খাকার অন্ত্র গুণও আছে। এই ধাতুকে তারমাকিকও কহে। এই মাকিকও শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শোধিত রোপ্য মাকিকের গুণ—কিঞ্চিৎ তিক্তমধুরস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন।

রসেজসারসংগ্রহের মতে ইহার শোধনপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—ওলের মধ্যে মাকিক ধাতু রাখিয়া গোমূত্র, কাঁজি, তৈল, গোহুৎ, কদলীরস, কুলখ কলারের কাথ ও কোদধাতুর কাথ ইহাদের স্বেদ দিয়া কার, অল্পবর্গ, লবণপকক, তৈল ও স্তনের সহিত তিনবার পুট দিলে ইহা বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তর—মাকিক তিনভাগ, সৈন্ধবলবণ একভাগ, জব্বীর কিংবা টাৰা লেবুর রসে লোহপাত্রে পাক করিয়া রক্ত-বর্ণ হইলে মাকিক বিশুদ্ধ হয়। (রসেজসারসংগ্রহে)

মাকিকজ (ক্লী) মাকিকাং জায়তে জন-ড। শিক্ধক, মোম। মাকিকফল (পুং) মাকিকবৎ মধুরং ফলং যত। মধুনালিকেরিক, মধু নারিকেল বৃক্ষ। (রাজনিং)

মাকিকশর্করা (ক্লী) মিছরির জায় দাসা বাধা চিনি। সিতাখণ্ড।

মাকিকস্বামী (পুং) প্রাচীন নগরভেদ। (রাজতরং ৪৮৮)

মাকিকশ্রেষ্ঠা (ক্লী) রোপ্যমাকিক। (পর্যায়মুক্তাং)

মাকিকান্ত (ক্লী) মাধবী মত্ত। (বৈদ্যকনিং)

মাকিকান্ত্র (ক্লী) মাকিকানামান্ত্রঃ অভিধানাং ক্লীবৎ।

শিক্ধক, চলিত মোম। (রাজনিং)

মাক্কীক (ক্লী) মাকিকান্তিঃ কৃতমিত্যণ্ সিপাতনাকীর্ষম্।

১ মধু। (রাজনিং) ২ ধাতু বিশেষ, মাকিকধাতু।

মাক্কীকশর্করা (ক্লী) মাক্কীককৃত শর্করা শাকপাণিবিদ-বৎ সমাসঃ। সিতাখণ্ড, মধুশর্করা। (রাজনিং)

মাক্কীকশ্রেষ্ঠা (ক্লী) রোপ্যমাকিক। (পর্যায়মুক্তাং)

মাক্কীকান্ত (ক্লী) মাধবী মত্ত। (বৈদ্যকনিং)

মাখন (দেশজ) নবনীত, ননী।

মাখনমাল, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। ইনি জাতকপদ্ধতি ও মকরন্দদীপিকা নামে জ্যোতিষ ও সিদ্ধান্তলব নামে এক-খানি ধর্মসংগ্রহ রচনা করেন।

\* মাখনশির্ম (দেশজ) শিরীষভেদ। (*Dolichos gladiatus*)

মাখনি (দেশজ) ব্রক্ষণ।

মাখা (দেশজ) মর্দন। যথা তেল মাখা।

মাখান (দেশজ) মর্দন করা।

মাখামাখি (দেশজ) ১ পরস্পর মর্দন। ২ অত্যন্ত ভাব।

মাখাল (দেশজ) লতাভেদ, মাকালফল। (*Trichosanthes Palmata*)

মাখালঠাকুর (দেশজ) দেবতাভেদ। খেলেরা এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

মাগধ (পুং) মগধস্য তৎশতাপত্যং (যেঞ্ মগধকলিঙ্গ-স্বরমসাদণ্। পা ৪।১।১৭০) ইতি অণ্। পাণিননক, বংশ-পরম্পরাক্রমে রাজাদিগের অগ্রে স্তিতকারী, পর্যায়—মধুক, বন্দী, স্ততিপাঠক। ২ বর্ষসঙ্কর জাতিবিশেষ, মধুর মতে এই জাতি ক্ষত্রিয়কণ্ডার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে। চলিত ভাট জাতি, রাজা ও বড়লোকদিগের স্ততি পাঠই ইহাদিগের জীবিকা।

“ক্ষত্রিয়াদিপ্রকল্যাণং সূতো ভবতি জাতিতঃ।

বৈশ্যাদ্যাগধবৈবৈবৈহৌ রাজবিপ্রাদ্যনামুভৌ।” (মহু ১০।১১)

[ ভট্ট দেখ। ]

মগধেযু তবঃ অণ্। ৩ জরাসন্ধরাজ। ৪ শুক্রজীরক।

৫ মগধদেশোভব (মেদিনী) (ক্লী) ৬ পিল্লীমূল। ৭ দৌবর্দ্ধল লবণ। (বৈদ্যকনিং) ৮ স্থলজীরক। (পর্যায়মুক্তাং)

৯ জীরক। (রাজনিং) (জি) ১০ তদ্রদেশোভব, মগধদেশজাত, মগধদেশোৎপন্ন।

মাগধক (পুং) ১ স্ততিপাঠক। ২ মগধের লোক।

মাগধপুত্র (ক্লী) মগধের রাজধানী, রাজগৃহ।

মাগধমাধব, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

মাগধাদেবী (ক্লী) রাধিকা।

“তানান্ত মাগধা দেবী তপ্তচামীকরপ্রভা।

বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা নামা ধাত্তার্থকারণাং।” (পদ্মপুং-পাতাল ২অং)

মাগধিক (পুং) মগধদেশীয়। (বৃহৎসংহিতা ১৪।৩২)

মাগধিকা (ক্লী) পিল্লী। (বৈদ্যকনিং)

মাগধী (ক্লী) মাগধে জাতা মগধ-অণ্ ভীষ্। ১ বৃত্তিকা।

২ পিল্লী। ৩ ক্রটি, চলিত গুজরাতি এলাচ। ৪ শর্করা।

৫ ভাষা-বিশেষ। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে—রাজান্তঃ-পুরচারীরা মাগধী ভাষায় কথোপকথন করিবেন।

“অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্।”

(সাহিত্যদর্পণ ৬।৩০) [ পালি দেখ ]

মাগনেসিয়া (Magnesia), কারমুক্তিকাভেদ। এই কার মাটিতে বারাইটা (Baryta), ষ্ট্রন্টীয়া (Strontia), ও চূণ (Lime) প্রভৃতির অংশ রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। লিডিয়া রাজ্যের মাগনেসিয়া নগরে প্রথমে এই মৃত্তিকা দৃষ্টি-গোচর হয় বলিয়া, ইহা মাগনেসিয়া নামে অভিহিত হইয়াছে।

মাগনেসিয়ম্ নামক ধাতু ভস্মতা প্রাপ্ত (Oxide) হইয়া বর্তমান আকারে পরিবর্তিত হয়। সাধারণতঃ প্রচণ্ড উত্তাপে কার্বনেটকে দহ করিলে মাগনেসিয়া পাওয়া যায়। দহকালে

কার্বনেট জলিয়া এক প্রকার আলোক বাহির হয়। ঔষধা-  
লয় প্রভৃতিতে উহা ক্যালসিন্ড্ মাগনেসিয়া নামে ব্যবহৃত  
হইয়া থাকে। লেবোরটোরিতে বিদ্যুৎ নাইট্রেটকে অগ্নি  
দগ্ধ করিয়াও পরিকৃত মাগনেসিয়া উৎপন্ন করিতে দেখা  
গিয়াছে।

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য হইতে যে মাগনেসিয়া  
পাওয়া যায়, তাহা খেত চূর্ণ হইলেও, উহাদের ঘনত্ব পরস্পর  
অপেক্ষা বিভিন্ন হইয়া থাকে। অগ্নির উত্তাপে এই ভিন্নের  
আর কোন রূপান্তর ঘটে না অথবা ইহা দ্রব হয় না। বায়ু  
হইতে ইহা কার্বনেটাম ও জল শোষণ করিয়া থাকে। জলে  
লিপ্ত হইবার পর উহা ক্রমশঃ তাপসহ এবং hydrate of  
magnesia অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। স্বভাবজ Crystallized  
hydrate of magnesiaতে পার্থিব ব্রুসাইট্ (brucite)  
মিশ্রিত থাকে। ইহা খেত চূর্ণে রূপান্তরিত হইয়াও জল  
এবং অক্সিজেনশোষণে সমর্থ। জলে ভিজাইয়া রাখিলে  
উহার অতি সামান্যই গলিয়া থাকে। ইহা অম্লনাশক ও  
বিরেচক গুণবিশিষ্ট হওয়ায় চিকিৎসকগণ অত্যন্ত ঔষধের  
সহিত ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অত্যন্ত পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাকে স্বতন্ত্র  
গুণবিশিষ্ট করা হইয়াছে। এলোপাথিক্ মতে—কার্বনযোগে  
ইহা হইতে বাইকার্বনেট, মনোক্যার্বনেট ও সর্বকার্বনেট  
অব্ মাগনেসিয়া প্রস্তুত হয়। ইহাও অম্লনাশক এবং বিরেচক।  
এতদ্বিন্ন সাইট্রিক্ এসিড্ সহযোগে ইহা হইতে যে Citrate  
of magnesia প্রস্তুত হয়, তাহা অম্লমধুর পানীয়রূপে  
ব্যবহার করা যাইতে পারে। উহা মুহূর্বিরেচক ও জ্বরা।  
এইরূপে নাইট্রিক্ এসিড্ সহযোগে nitrate of magnesia,  
ফস্ফেট অব সোডা সহযোগে Phosphate or hypo-phos-  
phate of magnesia, সিলিকেট সহযোগে Silicates ও  
hydrated Silicate of magnesia এবং গন্ধকসহযোগে  
Sulphate of Magnesia পার্থিব পদার্থে মিশ্রিতাবস্থায়  
উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

মাগনেসিয়াম্ (Magnesium), স্বনামপ্রসিদ্ধ ধাতব পদার্থ-  
বিশেষ। ইহা হইতেই প্রকৃত মাগলিসিয়া-ক্ষার উৎপন্ন হয়।  
১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব হামফ্রে ডেভিস্ পটাসিয়াম ও ক্লোরাইড্  
বিশ্লেষকরূপকালে এই ধাতুর অস্তিত্ব অবগত হন। ইহা  
কপার ভ্রায় খেত, পিটলে বাড়ে। শুষ্ক বায়ুতে রাখিলে  
কোনরূপ রূপান্তর ঘটে না, কিন্তু জলীয় বায়ুযুক্ত স্থানে রাখিলে  
উহার উপরিভাগে অত্যন্ত কালমধ্যে মাগনেসিয়ার সাদা সর  
পড়িয়া যায়। উপর্যুক্ত উত্তাপে (Boiling point) ইহা হইতে

hydrogen বাষ্প নির্গত হয় এবং ততোধিক উত্তাপে পুড়িয়া  
লাল হইলে ইহা হইতে এক প্রকার উজ্জল আলোকরশ্মি  
বাহির হইতে থাকে। এই আলোক বিশেষ সমুজ্জ্বল হওয়ার  
অগ্নিক্রীড়া-প্রদর্শনী এবং ফটোগ্রাফি-কার্যে ইহার প্রস্তুত  
ফিতা বা তার জ্বলাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধি-  
কাংশ বিষয়ে ইহা দস্তার অমুরূপ। যে সকল ধাতু সাধারণ  
উত্তাপে (ordinary temperature) কোনরূপ পরিবর্তিত হয়  
না, এই জাতীয় ধাতুর মধ্যে ইহার আগবিক গুরুত্ব অনেকাংশে  
লঘু। অধিক উত্তাপে ইহা গলিয়া যায় এবং বায়ুর সংস্পর্শ  
বাতিরেকে ঢালা যাইতে পারে। ইহার অক্সিদই ঔষধার্থে  
ব্যবহারযোগ্য মাগনেসিয়া।

কার্বনেট অব মাগনেসিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড্  
হইতে Chloride of Magnesium এবং সল্ফেট অব্ মাগনে-  
সিয়া ও সাল্ফাইড্ অব্ বারিয়াম্ (Sulphide of barium)  
সহযোগে Sulphide of Magnesium প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মাগুর (দেশজ) ১ মগুর মন্ত (Clarius magur)  
[ মগুর দেখ ]

মাগুরা, বাক্সালার ঘণ্ডার জেলার অন্তর্গত একটা মহকুমা।  
মাগুরা, মহম্মদপুর ও শালিখা থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত উপবিভাগের বিচার-সদর ও জেলার একটা নগর।  
মুচীখালি ও নবগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°২৯'  
২৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°২৮'৫" পূঃ। এখানে চাউল ও  
চিনির বিস্তৃত কারবার আছে। পটপটির মাছরের জন্ত  
এই স্থান বিখ্যাত। এখানে উৎকৃষ্ট সরিষার তৈল পাওয়া  
যায়। নগরংশ দুই ভাগে বিভক্ত,—১ বাজার মাগুরা,  
২ দারি মাগুরা।

মাগেলন, (ফার্দিনান্দ), পর্তুগালবাসী জনৈক বিখ্যাত  
নাবিক, তিনি জল-পথে ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া অক্ষয় নাম অর্জন  
করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া মহামতি  
কলম্বস যেরূপ নাবিক-জগতে শীর্ষস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,  
তদ্রূপ তিনিও মাগেলন-প্রণালী অতিক্রম করিয়া ফিলিপাইন  
দ্বীপ-পুঞ্জ আবিষ্কারপূর্বক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।  
মাগেলন-প্রণালী দিয়া দ্বীপ অর্ণবপোতের সুগম পথ বাহির  
করায়, উক্ত প্রণালী তাঁহার নামেই সাধারণে পরিচিত হইয়াছে।

১৪৭০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের আলেমুটেজো প্রদেশে তাঁহার  
জন্ম হয়। তিনি ৫ বৎসর কাল ভারতে কর্ম করিয়া আল-  
ফোকা আলবোকার্কের সহিত মলাক্কা আক্রমণে অগ্রসর হন।  
মলাক্কায় আসিয়া তিনি তদদেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন।  
পর্তুগালপতি ডন মাহুএল তাঁহার বেতন বৃদ্ধি না করার

তিনি রাজকাৰ্য্যে বীতশ্ৰু হন। এই সময়ে ডন মাহুএল ভূপ্রশাসন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া তিনি উন্নতির আশায় গোপনে স্পেনযাত্রা করেন। স্পেনরাজ ৫ম চার্লস তৎকালে বল্লদোলিডে অবস্থান করিতেছিলেন। মাগেলন তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজা তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ ভূবেত্তা রায় ডি টলেয়ের (Ruiz de Talleo) সহিত গমনের আদেশ দেন। ঐ সময় পিগাফেট প্রভৃতি বিখ্যাত নাবিক ও তাঁহার সঙ্গে ছিল।

এই যাত্রায় তিনি ৫ খানি জাহাজ ও ২৩৪ জন লোক এবং খাদ্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে সেভিল নগর পারত্যাগপূর্বক সমুদ্রযাত্রা করেন। ২০ সেপ্টেম্বর, মানলুকার অভিক্রমপূর্বক সকলে এই বিখ্যাত নাবিকের নামে পরিচিত প্রণালীর মধ্য দিয়া ২৮ শে নবেম্বর ১৫২০ খৃঃ অঃ প্রশান্ত মহাসাগরে উপনীত হন। পর বৎসর ৬ই মার্চ তাঁহারা লদ্রোন্ দ্বীপে, ১৮ই সমরে এবং ২৮ শে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সুবুহং লিটেদ্বীপের সমুদ্রস্থ লিমসাপুয়া দ্বীপে অবতরণপূর্বক তদেশবাসীকে মিষ্টালাপে পরিভূষ্ট করেন। উক্ত বর্ষের ৭ই এপ্রিল তারিখে তিনি শেবুদ্বীপের একটা বন্দরে উপনীত হন। তথায় কএকদিন অবস্থানের পর তিনি ২৭শে এপ্রিল শেবুর পূর্ব উপকূলস্থ মাক্তান্ দ্বীপে আইসেন। এখানকার অসভ্য অধিবাসীদিগের সহিত একটা যুদ্ধ ঘটে। ঐ যুদ্ধে মাগেলনের মৃত্যু হয়।

মাঘ (পুং) ভারতের একজন প্রধান কবি। শিশুপালবধ নামক মহাকাব্যগ্রন্থে। ইহার পিতার নাম ত্রিধন্বক সর্বাশ্রয়, পিতামহের নাম সুপ্রভ দেব। সুপ্রভ ত্রিধন্বদেব নামক এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। মাঘ শিশুপালবধকাব্য লিখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যজগতে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন। শিশুপালবধের ৪২০ শ্লোক হইতে তাঁহার ‘ঘণ্টামাঘ’ নাম পাওয়া যায়। ক্ষেমেজের ঔচিত্যবিচারচর্কা ও সরস্বতীকণ্ঠভরণ প্রভৃতি কবিতা-সংগ্রহে মাঘের কবিতাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য সিজিবি মাঘের জ্ঞাতিব্রাতা ছিলেন, এরূপ স্থলে

• শিশুপালবধের কবিকে ৫৩৬ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া ধরা যায়।

২ স্বনামখ্যাত মহাকাব্য, মাঘ কবি এই গ্রন্থপ্রণয়ন করেন বলিয়া ইহা মাঘ নামে খ্যাত হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এই মহাকাব্য অত্যুজ্জল-রত্নস্বরূপ, এই কাব্যসম্বন্ধে প্রাচীনদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে—

‘পুষ্পেযু জাতা নগরেষু কাঞ্চা নারীষু রত্না পুরুষেষু বিকুঃ।  
নদীষু গঙ্গা নৃপতো চ রামঃ কাব্যেযু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ॥’

যেদ্রুপ পুষ্পের মধ্যে জাতি, নগরের মধ্যে কাকী, নারীর মধ্যে রত্না, পুরুষের মধ্যে বিকু, নদীর মধ্যে গঙ্গা এবং রাজার মধ্যে রাম তদ্রূপ কাব্যের মধ্যে মাঘ। মহাকাব্যের মধ্যে ‘মাঘ’ কাব্যই সর্বোৎকৃষ্ট, ইহাই প্রাচীনদিগের অতিপ্রাণ। আরও প্রচলিত আছে—

‘উপমা কালিদাসস্ত ভারবেরর্থগোরবম্।

নৈবধে পদলালিতাঃ মাঘে সন্তি ত্রয়োমুখাঃ॥’ (উক্তট)

কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগোরব ও নৈবধের পদলালিতা সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু এক মাঘে এই তিন গুণই বিস্তারিত আছে।

মহানকত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অণু-ভীপ, মাঘী সাত মাসে পূনরণ্। ৩ বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত দশম মাস। এই মাস ত্রিবিধ, মুখ্যচাত্র মাঘ, গৌণচাত্র মাঘ এবং সৌর মাঘ। মকরস্থিত রবি হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লা প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে মুখ্যচাত্র মাঘ কহে এবং মকরস্থিত রবিতে কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত গৌণচাত্র মাঘ। মকর রাশিতে যতদিন রবি থাকেন, ততদিন সৌর মাঘ। রবির এক রাশি হইতে অষ্ট এক রাশিতে যাইতে প্রায় ন্যূনাধিক ত্রিশ দিন সময় লাগে। ধনু-রাশি হইতে যে দিন সূর্য্য মকররাশিতে সংক্রান্ত হন, সেই দিন সৌর মাঘের প্রথম দিন, পরে সমস্ত মকররাশি ভোগ করিয়া কুম্ভরাশিতে সংক্রান্ত হইলে মকরসংক্রান্তি হয়। এই দিনই সৌর মাঘের শেষ। প্রায়ই এই মাস ২৯ বা ৩০ দিনে হইয়া থাকে, ৩০ দিনের অধিক হয় না। (মলমাং)

মাঘকৃত্য সখকে কৃত্যতবে এইরূপ লিখিত আছে,—  
এই মাস অতিশয় পুণ্য মাস। ইহাতে সকলেরই প্রাতঃ-স্নান কর্তব্য। এই মাসে অরুণোদয় কালে গঙ্গাস্নান করিলে স্বর্গভোগ হইয়া থাকে।

“স্বর্গলোকে চিরং বাসো যেষাং মনসি বর্ততে।

এএ কাপি জলে তৈস্ত স্নাতব্যঃ যুগভাস্বরে॥” (কৃত্যতবে)

সংক্রান্তির দিন সঙ্কল্প করিয়া প্রতিদিন স্নান করিবে। সংকল্প এক মাসের অথবা প্রতিদিনের জন্ত করা যাইতে পারে। ষাঁহাদের গঙ্গাতীরে বাস, তাঁহারা প্রত্যহ অরুণোদয় কালে গঙ্গাস্নান করিবেন। ষাঁহাদের নিকটে গঙ্গা নাই, অন্য নদী আছে, তাহারা তাহাতেই স্নান করিবেন। ফলতঃ সকলেরই মাঘমাসে অরুণোদয়কালে স্নান অবশ্যকর্তব্য। •

কৃত্যতবে সঙ্কল্পের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—অরুণোদয়-কালে জলে মজ্জন করিয়া উত্তরাভিমুখে আচমনের পর সঙ্কল্প করিবে। কুশলিলাদি লইয়া “ঐশ্বর্য্য মাঘে মাসি অমুক-

তিথাবারতা মকরসংক্রান্তি বাবৎ প্রত্যাহং অমুকগোত্রঃ অমুক-  
দেবশব্দ স্বর্গলোকে চিরকালবাসকামঃ বিষ্ণুপ্রীতিকামো বা  
প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে” (কৃত্যতত্ত্ব) এইরূপে সংকল্প করিবে।

গঙ্গায় স্নান করিতে হইলে সংকল্প এইরূপ—পূর্বোক্তরূপে  
নামাদি বলিয়া—“প্রতিদিনসহস্রস্রবর্ণদানজ্ঞফলসমফলপ্রাপ্তি-  
কামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা মাঘমাসং বাবৎ প্রত্যাহং গঙ্গায়াং  
প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে” (কৃত্যতত্ত্ব) যাহাদের স্নানের বিষয়  
ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাঁহারা প্রতিদিন সংকল্প করিয়া স্নান  
করিতে পারেন। ফলতঃ স্নান সংকল্প করিয়া করিতে হইবে,  
নচেৎ তাহা বৃথা। মন্ত্র বর্ণা—

“ঐং হ্রঃখদারিজনশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।

প্রাতঃস্নানং করোম্যস্ত মাঘে পাপপ্রণাশনম্ ॥

মকরসংক্রান্তি মাঘে গোবিন্দাচ্যুতমাধব।

স্নানেনানেন যে দেব যথোক্তফলদো ভব ॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

স্নানের পর কৃষ্ণাদিয় নাম স্মরণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র  
পড়িতে হইবে,—

“ঐং দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোহস্ত তে।

পরিপূর্ণং কুরুষেদং মাঘস্নানং মহাব্রতম্ ॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

গঙ্গাদি তীর্থে স্নান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িতে হয়।

“ঐ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব।

তীর্থশ্রান্ত জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে ॥”

পরে পূর্বোক্ত “ঐং হ্রঃখদারিজনশায়” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠও বিধেয়।

বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত অপর সকলের এই মাঘস্নান  
অবশ্যকর্তব্য।

মাঘমাসে মূলক-ভক্ষণ নিষেধ। ইহা সৌর ও চান্দ্র  
উভয় পক্ষেই জানিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, সৌর মাসে  
ইহা নিষিদ্ধ, চান্দ্র মাসে নহে, কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় তাহা  
নহে, সৌর ও চান্দ্র উভয় মাসেই মূলকভোজন নিষিদ্ধ। যদি  
কেহ ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার মদিরাপানের ঞ্চায়  
পাতক হয়।

মাঘমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ছাগ মাংস দ্বারা পিতৃদিগের  
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মাংসের অভাবে পায়স দ্বারা  
শ্রাদ্ধের অস্থান আবশ্যক। ফলতঃ এই শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্তব্য।  
মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর নাম রটন্তী চতুর্দশী, এই দিনও  
অরুণোদয় কালে স্নান আরও বিশেষ পুণ্যজনক। এই দিনে  
স্নান করিয়া চতুর্দশ ঘন্টার উদ্দেশে তর্পণ করা আবশ্যক।

[ রটন্তী দেখ ]

শ্রীপঞ্চমী—চান্দ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী কহে।  
এই দিনে সরস্বতী লেখনী ও মস্তাধারপ্রভৃতির পূজা করিতে

হয়, যাহারা ঘটপঞ্চমীর ব্রত করেন, তাঁহারাও এই দিনে  
ব্রতরক্ষা করিবেন। [ সরস্বতী পূজা ও পঞ্চমী দেখ ]

মাঘসপ্তমী—চান্দ্রমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথির নাম মাঘ-  
সপ্তমী। এই তিথি অরুণোদয় কাল পাইলে তাহাতে তিথি-  
কৃত্য হইয়া থাকে। এই তিথি যদি উভয় দিনই অরুণোদয়  
কাল প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব দিনে হইবে। “তত্র উভয়  
দিনে অরুণোদয়কালে সপ্তমীলাভে পূর্বদিনে। একদিনে  
তন্নাভে তদ্দিনে” (কৃত্যতত্ত্ব) এই তিথিকে মাকরী সপ্তমীও  
কহে। এই দিন অরুণোদয়কালে গঙ্গাস্নানে সংকল্পের একটু  
বিশেষ আছে। বর্ণা—

“ঐম্ অজ্ঞেত্যাদি সূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নান-জ্ঞ-ফল-  
সমফলপ্রাপ্তিকাম আয়ুরারোগ্যসম্পৎকামো বারুণোদয়বেলায়াং  
স্নানমহং করিষ্যে” (কৃত্যতত্ত্ব)

এইরূপ সংকল্প করিয়া সপ্ত বদন ও সপ্ত অর্কপত্র মন্তকের  
উপর রাখিয়া স্নান করিবে। সূদগণ এই দিন তুষ্ণীভাব  
স্নান করিয়া অর্ঘ্য-মন্ত্র ও প্রণাম-মন্ত্র পাঠ করিবে।

“শূদ্রেণাপি স্নানে তুষ্ণীংবিধানাং স্নানমন্ত্রঃ বিনা অর্ঘ্য-  
প্রণামমন্ত্রাঃ পাঠাঃ” (কৃত্যতত্ত্ব) [ মাকরী দেখ ]

এই সপ্তমী তিথিতে বিধান-সপ্তমী-ব্রত করিতে হয়।

[ ইহার বিশেষ বিবরণ বিধান-সপ্তমী দেখ। ]

আরোগ্যসপ্তমীব্রত—এই সপ্তমী তিথিতে আরোগ্য-ব্রত  
বিহিত হইয়াছে। আরোগ্য-কামনায় এই ব্রত অগৃহীত  
হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে আরোগ্যসপ্তমী কহে। এই  
ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। মাঘী সপ্তমী হইতে আরম্ভ  
করিয়া পুনরায় এই সপ্তমীর দিন এই ব্রত উদ্ভাপন করা  
বিধি। প্রতি মাসের শুক্লাসপ্তমীতে এই ব্রত কর্তব্য।  
“আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছং” ভগবান্ সূর্য্যের নিকট আরোগ্য  
কামনা করিতে হয়। এইজন্ত ইহা সূর্য্যব্রত নামে খ্যাত।  
নিম্নোক্ত রূপে এই ব্রতের সংকল্প করিতে হয়।

সংকল্প বর্ণা—

“মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবারতা ঐহিকারোগ্য  
ধনধাত্তপারলৌকিকশুভস্থান-প্রাপ্তিকামঃ .সংবৎসরং বাবৎ  
আরোগ্যসপ্তমীব্রতমহং করিষ্যে” (কৃত্যতত্ত্ব)

এইরূপে সংকল্প করিয়া শালগ্রাম-শিলা বা ঘটাদি স্থাপন-  
পূর্বক নিম্নোক্তমন্ত্রে শ্রীসূর্য্যের তিনবার পূজা করিতে হইবে।

পূজামন্ত্র বর্ণা—

“আদিত্য ভাস্করবর তানো সূর্য্য দিবাকর।

প্রভাকর নমস্তেহস্ত রোগাদস্বাধিমোচয় ॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

ভীষ্মাষ্টমী—চান্দ্রমাসের শুক্লা অষ্টমীর নাম ভীষ্মাষ্টমী,

এই দিন পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া ভীষ্মকে তর্পণ করিতে হইবে। এই তর্পণ সকলেরই অবশ্য কর্তব্য।

চাত্রমাসের শুক্লা একাদশীর নাম ভীম-একাদশী। বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত সকলেরই এই একাদশীর উপবাস অবশ্য কর্তব্য। মাঘমাসের পূর্ণিমা যুগাদ্যা। [ মাঘী দেখ ]

মাঘমাসে জন্মগ্রহণ করিলে মানব বিধান, স্বকুলপ্রধান, সদাচারসম্পন্ন, প্রবীণ, বিষয়বিরক্ত ও যোগরত হইয়া থাকে।

“বিজ্ঞাবিনোতঃ স্বকুলপ্রধানঃ সদা সদাচারযুতঃ প্রধানঃ।

যোগাহুরকো বিষয়েষসক্তো মাঘেহথ মাসে মঘবানিবেশঃ ॥”

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

পদ্মপুরাণে মাঘমাসের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে—

“ব্রতদানৈস্তপোভিচ্চ ন তথা প্রীরতে হরিঃ।

মাঘমজ্জনমাত্রেণ যথা প্রীণাতি কেশবঃ ॥

ন সমং বিদ্যাতে কিঞ্চিৎ তেজঃ সৌরেন তেজসা।

তদ্বৎ নানেন মাঘস্ত ন সমাঃ ক্রতুজাঃ ক্রিয়াঃ ॥”

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৪ অং)

মাঘমাসে প্রাতঃমানে বিষ্ণু বেক্রপ প্রীতি হন, ব্রত, দান ও তপস্বাদি দ্বারা তাঁহার তাদৃশ প্রীতি উৎপাদন করা যায় না। বেক্রপ সৌর তেজের সহিত জগতের কোনও তেজের তুলনা হয় না, সেই প্রকার যজ্ঞাদি কোন কার্যই মাঘ-মাসের তুল্য নহে।

মাঘচৈতন্য (পুং) কল্পলতা নামক গাছের অষ্টম ভাগপ্রণেতা।

মাঘপাক্ষিক (ত্রি) মাঘমাসের পক্ষস্বক্ষীয়।

মাঘমা (স্ত্রী) কর্কট। (বৈত্তকনিং)

মাঘবতী (স্ত্রী) মঘবান্ দেবতাহস্তাঃ যদা মঘবত ইয়মিতি মঘবৎ-অণ্ (মঘবা বহুলম্। প ৬৪।২৮) ইতি আদেশঃ ভীপ্। পূর্বদিক্। (রাজনিং)

মাঘবন (স্ত্রী) মঘবত ইদং ষ, বা মঘবন্-অণ্ (মঘবা বহুলং। প ৬৪।২৮) ইতি বিকল্পান আদেশঃ। ১ ইন্দ্রস্বক্ষি বস্ত। (ত্রি) ২ ইন্দ্রস্বক্ষীয়।

“সুরদং শুভ্রালমথ শীতরুচঃ ককুভং সমস্কুরত মাঘবনীম্।”

(শিশুপালবধ ৯২৫)

মাঘী (স্ত্রী) মঘয়া যুক্তঃ কালঃ অশ্রামিতি মঘা (নক্ষত্রং যুক্তঃ কালঃ। প ৪২।১৩) ইত্যণ্ ভীপ্। মঘাযুক্তা পৌর্ণমাসী, মাঘীপূর্ণিমা। মাঘমাসের পূর্ণিমার দিন মঘা নক্ষত্রের যোগ হয়, এইজন্য ঐ পূর্ণিমাতে মাঘীপূর্ণিমা কহে। এই তিথি কলি-যুগান্ত। মাঘী পূর্ণিমার দিন প্রথম কলিযুগ প্রবৃত্ত হয়।

“অথ ভাদ্রপদে কৃষ্ণে ত্রয়োদশ্যাং দ্বাপরম্।

মাঘে চ পৌর্ণমাস্তাং বৈ যোরং কলিযুগ স্তবম্ ॥” (মলমাসতত্ত্ব)

এই তিথিতে পুণ্য কর্ণের অমুঠানে অনন্ত ফল হয়। এই দিনে তীর্থস্থান ও দানাদি অবশ্য কর্তব্য।

“শতবিন্দুক্ষেপে পুণ্যং সহস্রস্ত দিনক্ষেপে।

বিষুবে শতসাহস্রমাকামাবৈষ্মনস্তকম্ ॥

আ কা মা বৈবু—আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মাঘীবৈশাখীষু”(রঘুনন্দন)

এই পূর্ণিমা তিথিতে পার্শ্ব-বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। অতএব সকলেরই এই তিথিতে পার্শ্ব শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক।

“পৌর্ণমাসী তথা মাঘী শ্রাবণী চ নরোত্তম।

প্রোষ্ঠপত্তামতীতায়ঃ তথা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।

এতাংস্ত শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ ॥”

(মলমাসতত্ত্ব)

মাঘী পূর্ণিমার দিন যদি মঘা নক্ষত্রের যোগ না হয়, এবং সিংহ রাশিতে যদি বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে এই গুরু নিষ্ফল। ইহা অকাল প্রতিশ্রুত স্বপ্নকে জানিতে হইবে।

“মাঘ্যাং যদি মঘা নাস্তি সিংহে গুরুরকারণম্।” (মলমাং)

হারীত, গর্গ প্রভৃতি মুনীগণ বলেন, মাঘমাসে বৃহস্পতি যদি সিংহরাশিতে থাকেন, তাহা হইলে অকাল হয়; সুতরাং উদ্যতে বিবাহাদি কর্ম নিষিদ্ধ। ইহাতে একটু বিশেষ এই যে, মাঘা অর্থাৎ মাঘমাসের পূর্ণিমা তিথিতে যদি মঘা নক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলেই নিষিদ্ধ, নচেৎ নহে। এই জন্তই পূর্বে “সিংহে গুরুরকারণং” বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

“গুরো হরিস্থে ন বিবাহমাহারীতগর্গপ্রমুখা মুনীজ্ঞাঃ।

যদা ন মাঘী মঘসংযুতা শ্রাৎ তদা চ কস্তোহহনং বদন্তি ॥”

মাঘোন (ত্রি) মঘবন্-অণ্। ১ ইন্দ্রস্বক্ষী।

“মাঘোনে যজ্ঞং জনয়ন্ত সুরয়ঃ” (ঋক ১০।৬৩২)

‘মাঘোনে মঘবত ইন্দ্রস্য সধ্বন্ধিনি মরুদগণে’ (সায়ণ)

(স্ত্রী) মঘবান্ দেবতাহস্তাঃ মাঘোন ইয়মিতি বা মঘবন্-অণ্ ভীপ্। মাঘোনী—পূর্বদিক্, ইন্দ্রস্বক্ষিদিক্, ইন্দ্র এই দিকের অধিপতি, এইজন্য ইহার নাম মাঘোনী।

মাঘ্য (স্ত্রী) মাঘে জাতমিতি মাঘঃ (তত্র জাতঃ। প ৪২।১৫)

ইতি ষৎ। কুন্দপুষ্প। (অমর)

মাক্কাপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের উণ্ডাও জেলার অন্তর্গত একটা নগর। মানকেবলধাসনামক জনৈক বাঙ্গ-সদার-কড়ক ছয় শত বর্ষ পূর্বে এই নগর স্থাপিত হয়।

মাক্কা, দাক্ষিণাত্যবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। আন্ধ্রদেশের জেলায় ইহাদের মধ্যে চপলসাড়ে, গারুড়ী, হোলার, জিরাতত, থাস’মাক্কা ও থোকরফোড়ে প্রভৃতি কয়েকটা থাক দৃষ্ট হয়। বেলগাম জেলায় মাদিগেরু, মোচি মাদিগেরু ও মাক্কেরোত

নামেও কয়েকটি স্বতন্ত্র থাক আছে; ঐ শ্রেণিমধ্যগত ব্যক্তি-  
বর্গের অবলম্বনীয় কার্যকলাপের ভারতম্যানুসারে ইহাদের  
মধ্যেও সমাজগত পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে।

খোকর-কোড়েগণ কাহারও সহিত একত্র আহায়াদি করে  
না বা অপর শ্রেণীর মধ্যে আপনাদের পুত্রকন্ডার বিবাহ  
দেয় না। অন্ত্যস্ত শ্রেণীর এক পদবীবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেও  
বিবাহাদি প্রচলিত নাই। সকলেই মরাঠী ভাষায় কথা কয়।  
বহিরোবা, ষেওবা, মহামারী ও মহসোবা ইহাদের কুলদেবতা।

ইহারা দৃঢ়কার, বলিষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ। আকৃতিগত সাদৃশ্য  
দৃষ্ট্য করিলে সহজেই ইহাদিগকে কুণবি ও মালি হইতে  
পৃথক্ শ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। ইহারা বহর জাতি হইতে  
আপনাদের উৎপত্তি করিয়া করে। প্রবাদ,—অশ্ব ঋষিনামক  
জটনক ঋষির একজন মহার ভৃত্য ছিল। সে ঋষির প্রতি-  
পালিত গাভীগণের রক্ষাবৎকণ করিত। একদিন ঐ ভৃত্য  
প্রচুর গাভীদল বনে চরাইতে যায়। বনমধ্যে ক্ষুধার কাতর  
হইয়া সে ঋষি প্রভুর একটা গাভীকে হননপূর্বক তন্মাস  
ভক্ষণ করে। তাহার এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্ত ঋষি মাস্ক  
(নিষ্ঠুর) বলিয়া অভিসম্পাত করেন। তদবধি তাহার  
বংশধরগণ ‘মাস্ক’ নামে পরিচিত হয়। গোত্র ব্যতীত ইহারা  
সকল পশুমাংসই ভোজন করে। মৃত জীবমাংস ভক্ষণেও  
ইহাদের আগ্রহ দেখা যায়। মদ, তাম্র, গাঁজা, তামাকু প্রভৃতি  
মাৎসকজব্য সেবনে ইহারা বিশেষ পটু। নিরন্তর মাদকাদি  
সেবন জন্ত ইহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ উক্কত, নিষ্ঠুর ও প্রতি-  
হিংসাপরায়ণ। উল্লেখ্য কাহাকে বলে, তাহা ইহারা শিক্ষা  
করে নাই।

ইহারা স্বভাবতঃ অলসপ্রকৃতির হইলেও স্ব স্ব জীবিক-  
নিরূপণে সকলেই সমর্থ। ভিক্ষা, কৃষি, দোতা (পত্রবাহন)  
প্রভৃতি কাৰ্য্যে ইহারা প্রধানতঃ ব্যাপৃত থাকে। খুন্সী  
আদানীকে ফাঁসী কাঠে ঝুলাইয়া দিতে,—দাক্ষিণাত্যে  
একমাত্র মাস্ক জাতিকেই দেখা যায়। হোলার মাস্কগণ  
সঙ্গীতাদি এবং গারুড়ীগণ ভোজবিজ্ঞা দ্বারা জীবিকা অর্জন  
করে। মাস্করোভগণ চর্ম্ম হইতে রজু প্রস্তুত ও জুতাশেলাই  
করিয়া এবং বাঁশের টুকরী বুনিয়া কালাতিপাত করে।

ইহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং ‘অন্ত্যস্ত’ বলিয়া পরিচিত।  
ইহারা মানসিক করিয়া হিন্দু দেবদেবীর পূজা দিয়া  
থাকে। গুরুপক্ষীর একাদশী, শিবরাত্রি এবং শ্রাবণ মাসের  
দোমবার ঐ শনিবারে ইহারা উপবাস করে। বিশ্বচিকার  
প্রাবল্য হইলে ইহারা মরিয়াই দেবীর পূজা দিয়া থাকে।  
কিন্তু দেবমন্দিরে কেহ প্রবেশ করিতে পার না। দূরে দাঁড়া-

ইয়া দেবমূর্তি দর্শনে করে ও পুরোহিতের হস্তে পূজা দেয়।  
দেশস্থ জাক্‌গেরা বিবাহাদি কক্ষে ইহাদের পোরোহিত্য করেন।  
দেশে বিশ্বচিকা ও মহামারী উপস্থিত হইলে ইহারা মুখে সিন্দূর  
মাখিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। রমণীগণের বিশ্বাস,  
ঐরূপ সিন্দূরলিপ্ত মুখ দর্শন করিয়া প্রচুর ভিক্ষা না দিলে,  
ইহারা বিশ্বচিকা দেবীকে আহ্বান করিয়া দেশ ছাড়খার  
করিয়া দিবে। কারণ, দক্ষিণ ভারতে ইহারা এক মাত্র  
ওলাবিবির উপাসক।

মাস্কেরা ডাইনে বা ভূতে পাওয়া এবং ভবিষ্যদ্বাক্যে বিশ্বাস  
রাখে না। শনের দৃষ্টি জন্ত অবস্থান্তর ঘটিলে এই জাতির  
একজনকে আনিয়া গৃহে ভোজন করাইলে গ্রহকোপ নিবা-  
রিত হয়। ওলাউঠার সময় গ্রামবাসিগণ ইহাদিগকে ডাকাইয়া  
গ্রামের সীমান্তে মহামারী-দেবীর পূজা দেয়। গ্রামের সীমান্তে  
এক খণ্ড প্রস্তরে সিন্দূর লেপন করিয়া দেবীমূর্তি গঠিত  
হইয়া থাকে।

স্বতিকাগৃহে পাঁচ দিনের দিন ইহারা ষট্‌বাই দেবীর  
প্রতিমূর্তি স্থাপন করে। মূর্তির অভাবে কখন কখন এক-  
খানি টুলের উপর পাঁচখানি প্রস্তর স্থাপন করিয়া দেবীর  
পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। দাদশাহে অশৌচান্ত হইলে  
ইহাদের প্রস্থতি স্বতিকাগৃহ হইতে বাহিরে আইসে। ঐ  
দিন ব্রাহ্মণ আসিয়া জাতবালকের নামকরণ করে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রশস্ত নহে। সাধারণতঃ  
পাত্রে ২৫ বৎসরে ও বালিকা বয়স্কা হইলে বিবাহ হয়।  
বিবাহের সময় বর ও কস্তাকে ছইটী ঝুড়িতে পরস্পরের  
সম্মুখীনভাবে দাঁড় করাইয়া তাগাদের মধ্যস্থলে একখানি  
দরমার বেড়া দেওয়া হয়। পুরোহিত ঐ সময় দূরে দাঁড়াইয়া  
মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে। পরে হরিদ্রারঞ্জিত চাউল উভয়কে  
ছুঁড়িয়া মারিলে ঐ বেড়া সরাইয়া লওয়া হয়। তদবধি  
উভয়ে পতিপত্ন্যরূপে গণ্য হইয়া থাকে। তৎপরে উভয়  
পক্ষের ভোজ। বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহে তাহা-  
দের কোন বিধিনিষেধ নাই। তাহারা শব গোর দেয়  
এবং ১৩শ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে। ঐ দিন মৃতের  
পুত্র বা পিতৃাধিকারী কোন ব্যক্তি জাতিবর্গকে সঙ্গে লইয়া  
সমাধি স্থানে উপনীত হয়। সেখানে ক্ষোরাদি কৰ্ম্ম সমাপ-  
নান্তে পিতৃাধিকারী ১৩খানি দ্রোণ (পাত্রবিশেষ) সমাধি-  
সম্মুখে স্থাপন করিয়া তত্পরি জল ঢালিয়া ঢালিয়া আইসে  
ও মহাসমারোহে জাতিভোজ সম্পন্ন করে। মেহতরগণ  
ইহাদের দলপতি।

মাস্কন (দেশজ) ঘটন, ভিক্ষাকরণ। জমীদারগণ প্রজাদিগের

নিকট হইতে খাজনার অতিরিক্ত যে টাকা আদায় করেন, তাহাকেও মঙ্গলন কহে। শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি কর্তব্যপালকে ইহা প্রজাদিগের উপর ধরা হইয়া থাকে।

মঙ্গলস্তোড়িয়া (দেশজ) ভিক্ষুক, বাহারী মঙ্গিয়া খায়।

মঙ্গলব্য (পুং) মঙ্গুর গোত্রাপত্য।

মঙ্গল (স্ত্রী) ১ অধিনীকুমারধরের উদ্দেশে মঙ্গলজনক স্ততিমন্ত্র।

মঙ্গল, পজাব গবর্মেন্টের অধীন একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ১২ বর্গমাইল। পূর্বে কহলুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গোখাঁর এখান হইতে বিভাজিত হইবার পর, এই রাজ্য স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। এখানকার সর্দার জিতসিংহ অত্রিংশীয় রাজপুত। ইহার পূর্বপুরুষগণ মারবাড় হইতে এখানে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন।

মঙ্গলি (পুং) ধর্ম্মচার্যভেদ।

মঙ্গলিক (ত্রি) মঙ্গলজনক শুভাহুতান স্বাক্ষরীয়।

মঙ্গলিকা (স্ত্রী) দশকুমার চরিত বর্ণিত নারিকাতভেদ।

মঙ্গল্য (ত্রি) মঙ্গলার হিত-মিতি মঙ্গল-যাঞ। শুভজনক, মঙ্গলকর, মঙ্গলজনক।

“মঙ্গল্যোবু বিবাহেষু কল্যাণংবরণেষু চ।

দশমাঙ্গাঃ প্রশস্তস্তে চৈত্রপৌষবিবর্জিতাঃ ॥” (উদাহতম্)

মঙ্গল্য ভাবঃ (মঙ্গলভেরলচ। উণ্ ৫৭০) ইত্যন্ত বৃত্তে

‘ভাবে যাঞ মঙ্গল্যম্’ ইতি যাঞ। ২ মঙ্গলের ভাব।

মঙ্গল্যাকায়ী (স্ত্রী) ১ দুর্গা। ২ হরিদ্রা। ৩ ক্ষুদ্রি। ৪ মাষপণী। ৫ গোরোচনা। ৬ হরীতকী। (বৈজ্ঞকনিং)

মঙ্গল্যকুন্তা (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী। (বৈজ্ঞকনিং)

মঙ্গল্যপ্রবরা (স্ত্রী) বচা, বচ। (বৈজ্ঞকনিং)

মঙ্গল্যা (স্ত্রী) ১ গোরোচনা। ২ শমীবৃক্ষ। ৩ জীবন্তী।

মঙ্গল্যাপ্তর (পুং) অশুভভেদ, ইহা কেদারক্ষেত্রে প্রসিক্ত।

ইহার গুণ—শীতল, স্নিগ্ধ, শোণবাহ ও শ্রেষ্ঠ। (রাজনিং)

মঙ্গল্যাহী (স্ত্রী) মঙ্গল্যস্ত অর্থাৎ ত্রায়মাণা লতা। (রাজনিং)

মঙ্গা (দেশজ) ভিক্ষা করা, চাইয়া লওয়া।

মঙ্গানিজ (Manganese), ধনিজ পদার্থবিশেষ। রসায়ন-শাস্ত্রে ইহা অধাতু (non-metal) বলিয়া গৃহীত। প্রায় সকল ধনিতেই ইহা কাণ অক্সিদের Black oxide আকারে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ খেতাত্ত্বগর বর্ণের ক্ষণভঙ্গুর ও কঠিন হইয়া থাকে। এমন কি, ইস্পাতের উপর ইহা দ্বারা আঁচড় কাটিলে দাগ পড়িয়া যায়। ইহাতে সামান্য চুম্বকাকর্ষণশক্তি আছে। একমাত্র সাদা আলোর ইহা গলিতে দেখা গিয়াছে।

অধিকক্ষণ অনাবৃত স্থানে রাখিয়া দিলে, বায়ুসংস্পর্শে ইহা অক্সিডাইজড হয়। উদ্ভাঞ্জনসংগঠিত লৌহে অধিক পরিমাণে এই পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আণবিক গুরুত্ব ৫৫ ও আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮.৭৩। অত্যধিক উত্তাপে কার্বনসহযোগে উক্ত প্রস্তরজ লৌহের সার্ক অক্সিড বিদূরিত করিলে এই পদার্থ পাওয়া যায়। অল্প কোন রূপে প্রকৃত মঙ্গানিজ লাভের উপায় নাই। লৌহের সহিত মিশ্রণে ইহা উক্ত ধাতুকে অতিশয় দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা প্রদায়ক করে। কাচ ও এনামেল রং করিবার জন্য ইহার অধিক ব্যবহার দেখা যায়।

কার্বনযোগে ইহা হইতে Carbonate of magnesia ও হাইড্রোক্সিক্লোরিক এসিড ও স্নাক-অক্সিডযোগে Chlorides of Manganese উৎপন্ন হয়। ইহা Proto-chloride, per-chloride ও sesquichloride ভেদে তিন প্রকার। এতদ্ভিন্ন Protioxide, sesquioxide, bioxide, peroxide, manganic acid ও permanganic acid এবং Sulphate of manganese ও Sulphides of Manganese প্রভৃতি বিভিন্ন মিশ্র-পদার্থ ইহার সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উপরোক্ত বিভিন্ন পদার্থ সমূহের গুণ ও স্বভাব।

মাসু (পুং) মঙ্গুর গোত্রাপত্য।

মাচ (পুং) মা অক্ষতীতি অনুচ ক। পহা, পধ। (শব্দরত্নাং)

মাচল (পুং) মা চলতি ভোগমদনাদিচিরেণৈব স্থানং ন মুক-তীতি চল-অচ্। ১ গ্রহ। ২ রোগ। মা চলতি বহুদ্যং ন প্রসরতীতি চল-অচ্। ৩ বন্দী। ৪ চোর। (শব্দরত্নাং)

মাচা (দেশজ মঞ্চশব্দের অপভ্রংশ) মঞ্চ, বংশরচিত উচ্চস্থান। দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য ইহা ঘরের মধ্যে বংশ বা কাঠাদি দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

মাচাকীয় (পুং) জনৈক বৈয়াকরণ।

মাচিকা (স্ত্রী) মা অক্ষতি ক্ষতাদিকং তাত্কা ন গচ্ছতীতি অনুচ ক, ততঃ কন্ টাপ্ অত ইৎ। ১ মক্ষিকা। (ত্রিকাং) ২ অম্বষ্ঠা। (রাজনিং) ৩ পাঠা, চলিত আকনাদি। ৪ আত্মাতক বৃক্ষ। (ভাবপ্রং)

মাচিয়া (দেশজ) মৎস্তবিক্রয়ী।

মাচির (অব্য) মা চিরং। শীঘ্র।

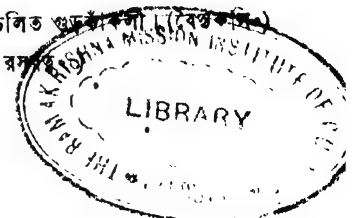
“অথাএবীং তদা মৎস্তস্তানুবীন্ প্রহসন্ শনৈঃ।

অস্মিন্ হিমবতঃ শূদ্রে নাবং বরীত মা চিরম্ ॥”

(ভারত বনপং মৎস্তোপাং ৭)

মাচী (স্ত্রী) কাকমাচী পক্ষ, চলিত কাকমাচী। (বৈজ্ঞকনিং)

মাচীক (স্ত্রী) দেবদারু। (রসায়ন-শাস্ত্রে)





মাচীপত্র (ক্ৰী) সুরপর্ণ নামক পত্রশাক।  
 মাছি (দেশজ) মৎস্ত, মীন। মৎস্ত শব্দের অপভ্রংশ।  
 মাছরাঙ্গা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, মৎস্তরঙ্গ পক্ষী।  
 মাছী (দেশজ) মক্ষিকা। মক্ষিকা শব্দের অপভ্রংশ।  
 মাছীটোপা (দেশজ) কৃপণ, অর্থগুরু।  
 মাছুয়া (দেশজ) জেলে, মৎস্তবিক্রেতা।  
 মাছুয়ানী (দেশজ) ১ মেছনী, মৎস্তবিক্রেতা, মাছওয়ালী।  
 ২ ধীরপত্নী।  
 মাছেতা (দেশজ) জীলোকের ঘোবন অপগত হইলে  
 তাহাদের মুখে যে কৃষ্ণবর্ণ দাগ হয়, তাহাকে মেছেতা কহে।  
 এই চিহ্ন পুরুষের অতি অন্নই হইয়া থাকে।  
 মাছের ডিম (দেশজ) মৎস্তাণ্ড। শুণ—অতি সুস্বাদু  
 ও বলকর।  
 মাছের ডেনা (দেশজ) মৎস্তের পাখা, মৎস্তপক্ষ, যাহা  
 দ্বারা তাহার জলে সন্নিবেশ করে।  
 মাজ (দেশজ) ১ মধ্য, মধ্যস্থল, মাঝখান। ২ চকোর  
 কাঠাদির গ্রহিতলের ছিদ্র বা কুটা।  
 মাজখান (দেশজ) মধ্যস্থান।  
 মাজড়া (দেশজ) ঘটনা।  
 মাজড়াস্থান (দেশজ) ঘটনাস্থান।  
 মাজন (দেশজ) রগড়ান, ঘর্ষণ, পরিষ্কার করণ।  
 মাজনা (দেশজ) মাজিবার যোগ্য পাত্রাদি, যাহা মাজা যায়।  
 মাজবাড়ী, ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড় পরগণার অন্তর্গত  
 একটি বিখ্যাত গ্রাম। এই গ্রামস্থ জনৈক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্ম-  
 ণের আশ্রয়ে একখানি প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভ, সূর্যহং ও ভক্তি-  
 ভাবোদ্দীপক বাহুব্ধবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রায় তিন শত  
 বৎসর পূর্বে একটি পুষ্করিণী খননকালে মূর্তিকা মধ্য হইতে  
 এই পদ্মশোভিত ও পার্শ্বে মূর্তিবেষ্টিত মূর্তি উখিত হয়।  
 মাজমরা (দেশজ) ১ মধ্যস্থল শুষ্ক, (কাঠাদি)। ২ প্রমেহাদি  
 জন্ত অস্থি মজ্জার ক্ষরণ।  
 মাজল (পুং) মাজলমিত্যভিপ্রায়োহস্ত, বর্ষণবারিভ্যোহস্ত  
 পক্ষ্যোভারজড়ত্বাৎ তথাহং। চাসপক্ষী।  
 ‘মাজলশাসকঃ কুজো বিহারো বিদুরেধকঃ।’ (শব্দচক্রিকা)  
 মাজলপুর (ক্ৰী) নগরভেদ।  
 মাজা (দেশজ) ১ মধ্যস্থান। ২ কটদেশ। ৩ পরিষ্কার-  
 করণ, ঘর্ষণ, যথা—বাসন মাজা।  
 মাজার (দেশজ) ১ মধ্যস্থান। ২ কটদেশ।  
 মাজি (দেশজ) বুদ্ধিনির্ঘাস।  
 মাজিক (পুং) রাজতরঙ্গিণীবিশিষ্ট মন্তব্যভেদ। (রাজতরং)

মাজিরক (পুং) মজিরকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১২)  
 মাজী (দেশজ) নাবিক, যে নৌকার হাল ধরে।  
 মাজীজ (ক্ৰী) জনপদভেদ। ইহার পাঠান্তর মাজুজ।  
 মাজুফল (দেশজ) ফলভেদ (Gallnut) ইহা দস্তুরোগে  
 বিশেষ উপকারী।  
 মাজুর্বা (দেশজ) মাহুর।  
 মাজুন (আরবী) ১ মিষ্টার বিশেষ। ২ সিক্তি, ক্ষীর ও চিনি  
 দ্বারা বরফির আকারে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যবিশেষ।  
 মাজুল (আরবী) কক্ষচ্যুত।  
 মাঝ (দেশজ) মধ্যস্থল, ভিতর। মধ্যস্থলের অপভ্রংশ।  
 মাঝা (দেশজ) মধ্যস্থল, কটি, কোমর।  
 মাঝখান (দেশজ) ১ মধ্যস্থল, মধ্যদেশ। ২ কটদেশ।  
 মাঝাধরা (দেশজ) রোগভেদ, ইহাতে কোমর ধরিয়া যায়।  
 মাঝামাঝি (দেশজ) মধ্য প্রকার।  
 মাঝার (দেশজ) মধ্যস্থান, কেন্দ্র।  
 মাঝারী (দেশজ) মধ্যপ্রকার।  
 মাঝি (দেশজ) ১ নাবিক। যাহারা নৌকার হাল ধরে।  
 ২ সাঁওতাল পরগণার পল্লীর প্রধান প্রজা বা চকদার অথবা  
 প্রধানব্যক্তিকে মাঝি বলে।  
 মাঝে (দেশজ) মধ্য।  
 মাঝেমাঝে (দেশজ) মধ্য মধ্য। দুই চারি দিন অন্তর।  
 মাঞ্জা (দেশজ) ঘুড়ি উড়াইবার জন্ত সজাদিতে যে মণ্ড ও  
 লোহ চূর্ণ মাথান হয়। ইহাকে মাজনও কহে। ২ লকের ফেট।  
 মাজিষ্ঠ (ক্ৰী) মজিষ্ঠয়া রক্তং (তেন রক্তং রাগাৎ। পা ৪।২।৪)  
 ইত্যণ্। ১ লোহিতবর্ণ। (ত্রি) ২ তদ্যুক্ত, লোহিতবর্ণ-  
 বিশিষ্ট। (হেম)  
 মাজিষ্ঠক (ত্রি) লোহিতবর্ণ। মজিষ্ঠার দ্বার রক্তবর্ণ।  
 মাজিষ্ঠিক (ত্রি) লোহিতবর্ণ।  
 মাজীরক (পুং) মজীরকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১২)  
 মাট্ (দেশজ) ১ অলস, কুড়ে। ২ মন্দ। ৩ ময়দান। ৪ মৃত্তিকা।  
 যেমন মেরে মাট্ করে দেন।  
 মাট, যুক্ত (উঃপঃ) প্রদেশের মথুরা জেলার উত্তরপূর্ব  
 তহসীল। যমুনা নদীর পূর্বকূলে অবস্থিত। ভূপরিমাণ  
 ২২১ বর্গ মাইল। এখানে নোহিল ও মতিঝিল নামে  
 দুইটা বিস্তীর্ণ হ্রদ বিদ্যমান আছে।  
 ২ মথুরা জেলার অন্তর্গত একটি নগর ও তন্নামীর তহ-  
 সীলের বিচার সদর। অক্ষা° ১৭°৩৫′৪২″ উঃ এবং দ্রাঘি°  
 ৭৭°৪৪′৫৬″ পূঃ। ইহা হিন্দুর একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র।  
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকীড়ারত হইয়া এখানে দুধের মাট

(তাও) ভাঙ্গিয়াছিলেন, তজ্জন্ত এই স্থান মাটি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানকার প্রাচীন মুক্তিকানির্মিত কেরার পুলিশ ও তহসীলী কাছারী স্থাপিত আছে।

মাটকোট। (দেশজ) মুক্তিকানির্মিত দ্বিতল গৃহ।

মাটগুদাম (দেশজ) মাটকোট।

মাটাত্রক (পুং) মাটাত্রাঃ আত্রঃ ততঃ কন্। বৃক্ষভেদ।

‘বৃক্ষী ককটীকাকঃ সেটুমাটাত্রকৌ সমৌ।’ (ভূরিপ্রয়োগ)

মাটি (দেশজ) মুক্তিকা, ভূমি। ২ অপদার্থ, সারহীনতা।

যথা—অমুক মাটি হয়ে গেল।

মাটিঘরা (দেশজ) মাটির ভিতর প্রস্তুত ঘর।

মাটিয়ারি (স্ত্রী) হুগলীজেলাস্থ নগরভেদ।

মাটী (স্ত্রী) পর্ণফলশিরা, পাণের শির। (বৈজ্ঞানিক।)

মাটীয়া (দেশজ) মুক্তিকাজাত।

মাটিয়াখাড়, (মাতাই খার) কামরূপ জেলার অন্তর্গত খসিয়া পর্বতের একটি রক্তিত বনভাগ। কুলসী নদীর তীরে কুকুরমারা গ্রামে এখানকার কাঠের আড়ৎ আছে।

মাটীয়াচিল (দেশজ) পক্ষিভেদ, চলিত গোদাচিল।

মাটীয়াতৈল (দেশজ) হুগলীসমুদ্র তৈল।

মাঠ (দেশজ) ময়দান।

মাঠর (পুং) ১ স্বর্ঘ্যের পারিপার্শ্বিকভেদ। ইনি যম। ২ ব্যাস। (মেদিনী) ৩ বিশ্র, ব্রাহ্মণ। (হেম) ৪ শৌণ্ডিক, ৩’ড়ি। (উজ্জল) ৫ জাতিভেদ।

মাঠর (মাতর), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর থেরা জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২১৭ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২°৪২’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫৯’ পূঃ। এখানে শ্রাবক বা জৈনদিগের একটি প্রসিদ্ধ মঠ বিদ্যমান আছে।

মাঠর আচার্য্য, সাম্ব্যকারিকাবৃত্তিপ্রণেতা।

মাঠরক (ত্রি) মাঠরসমক্ষীয়।

মাঠরায়ণ (পুং) মাঠর গোত্রাপত্য।

মাঠব্য (পুং) শকুন্তলানাটকবর্ণিত বিদূষক মাধব্যের নামান্তর।

মাঠর্য্য (পুং) মঠর গোত্রাপত্য। (উণ্ ৫।৩৯)

মাঠা (দেশজ) ছন্ধের সারাংশ, নবনীত।

মাঠান (দেশজ) ময়দান।

মাঠানজমি (দেশজ) মাঠের মধ্যস্থিত জমি।

মাঠী (স্ত্রী) লোহবর্ণ।

মাঠে (দেশজ) বাহরে। ২ ময়দানে।

মাঠেয়াওয়া (দেশজ) মলভ্যাগার্থ ময়দানে গমন।

মাঠেরান্, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটি পার্শ্বত্যা বাহ্যাবাস। বোম্বাই নগর হইতে ১৫ কোশ পূর্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪৬০ ফিট উচ্চ একটি গড়শৈলের উপর স্থাপিত। অক্ষা° ১৮°৫৮’৫০” উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৮’২০” পূঃ। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মিঃ হিট্, মালেক্ এই স্থান বাহ্যের বিশেষ উপযোগী দেখিয়া তথায় বাহ্যাবাস স্থাপনে মনোযোগী হন।

পশ্চিমঘাট পর্বতের একদেশে অবস্থিত থাকায় এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশেষ মনোহর হইয়াছে। সমুখে ভ্রামল শতক্রেত্র, তদন্তে উর্গিসমুদ্র সমুদ্রতরঙ্গ, স্ব্যাকিরণে প্রতিভাত হইয়া দর্শকের নরনে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য প্রকটিত করে। এতদ্বিধি প্রাতঃসমীরণে বিচরণকারী দর্শক, সেই উচ্চ স্থান হইতে নিম্নভাগে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রথমে সেই সমতল প্রান্তর, ঘোর কুস্মটিকাচ্ছন্ন দেখিতে পাইবেন; কিন্তু যতই স্ব্যাদেব উর্দ্ধে উখিত হইয়া স্ব্যাকিরণমালা পর্বতবক্ষে ঢালিয়া দিবে, ততই পার্শ্ববর্তী পর্বতস্থানে অতুলনীয় শোভা তাঁহার নয়নগোচর হইবে এবং সেই নিম্নস্থ মেঘমালাসম কুস্মটিকারূপি ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া ধীরে ধীরে দর্শকের চক্ষে এক একটি করিয়া প্রান্তরস্থ গ্রামগুলি যেন অপূর্ণ চিত্রাবলীর আয় আনিয়া দিবে।

এই বাহ্যাবাসের চতুর্পার্শ্বে কএকটি গিরিসাথ (Points or headlands) প্রসারিত আছে।

এখানে প্রভূত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইলেও পোষমাসে পর্বতগাত্রবাহী কোন স্রোতঃস্রোতে জল থাকে না। কেবলমাত্র পূর্ণভাগের হারিসন ও পশ্চিমের মালেক নামক করণায় সারা বৎসর জল থাকে। ঐ করণায় জল এখানকার জনসাধারণের পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে ম্যালেরিয়া অর আদৌ প্রবেশ করিতে পারে নাই। অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে এবং এপ্রিল হইতে জুন মাসের অধিক পর্য্যন্ত এখানকার জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। জটনৈক মিডিলসার্কনের উপর এখানকার যাবতীয় বন্দোবস্তের ভার অর্পিত। তিনি এখানে তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের শক্তিতে বিচারকার্য্যও করিয়া থাকেন। এখানে হংরাঙ্গের বাসোপযোগী হোটেল, লাইব্রেরী, জিমখানা, গীর্জা, ডাকবাঙ্গলা প্রভৃতি আছে। এখানে লুইসা পয়েন্টের নিকট বর্ষাকালে প্রায় হাজার ফিট নিম্নগামী একটি প্রপাত দৃষ্ট হয়। এখানে, দাঙ্গড়, ঠাকুর ও কাঠকাড়ি নামক অনাথ্য বস্ত্র জাতির বাস আছে।

মাঠো (দেশজ) ১ শক্ত, কঠিন। ২ অব্যবহার্য্য। ৩ মল, অমুজ্জল।

মাড় (পুং) কন্দবিশেষ। কোকণদেশপ্রসিদ্ধ কন্দ। বথে—  
ভেলীমাড়। মহারাষ্ট্র—মাড়ু। কলিঙ্গ—বৈনো। পর্যায়—  
.মাড়াফ্রম, দীর্ঘ, ধ্বজবৃক্ষ, বিতানক, মত্তফ্রম। ইহার গুণ—  
মোহকারী, শ্রমনাশক ও স্নেহকারক। (রাজনিং)

মাড় (দেশজ) ১ মণ্ড। ২ ছইখানি নৌকা একত্র বন্ধন  
কালে যে কাঠখণ্ডের দ্বারা আবদ্ধ করা হয়, তাহাকে মাড়  
কহে। ৩ ধাত্ত মন্তের অসংরাম্প, চলিত থাক্রা।

মাড়, ছোট নাগপুরবাসী কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। মালবা-  
রাজপুত নামেও পরিচিত। প্রবাদ আছে যে, তাহাদের  
পূর্বপুরুষগণ মালব-কজিয় ছিলেন। উপনয়নাদি সংস্কারও  
ছিল। এই পার্শ্ব্যতা বস্ত্র প্রদেশে আসিয়া তাঁহারা জীবিকা  
নির্বাহের উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করে।  
নিম্নবৃত্তি অবলম্বন হেতু তাহারা ক্রমে সংস্কারাদিবর্জিত  
হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি দেখিলে, আখ্যাবংশোদ্ভব বলিয়া  
মনে হয়। কিন্তু এই বনান্তরালে বাসহেতু ইহাদের মধ্যে  
অনার্য্য-রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। অনেকে অনার্য্য  
উপাধি গ্রহণ করিয়াছে।

ইহারা হিন্দুর সকল দেবদেবীকেই ভক্তিভরে পূজা  
করিয়া থাকে। পূজা এবং বিবাহাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণেরাই  
ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। খন্ড জাতির জায় ইহাদের  
মধ্যেও সতীপূজার বড়ই আদর। পূর্বকালে ইহাদের মধ্যে  
যে সকল ‘সতী’ রমণী জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বামীর সহগমন  
করিয়াছেন, তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত দেবীরূপে পূজিত হইয়া  
থাকেন।

এক্ষণে ইহাদের সামাজিক অবস্থা অনেকাংশে নিকৃষ্ট  
হইয়া পড়িয়াছে। বিধবাবিবাহ এবং সাগাই প্রথা প্রভৃতি  
গ্রহণেরও ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

মাড়ন (দেশজ) ১ পদদলন। ২ ধাত্তাদির মলন।

মাড়ব (পুং) বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ। লেটের ঔরসে তীবর-  
কঙ্কার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

“লেটভাঁবরকঙ্কারাং জনরামাস যধরান্।

মলং মলং মাড়বঞ্চ ভড়ং কোলঞ্চ কন্দরম্।”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুং ব্রহ্মখণ্ডঃ ১০ অং)

কোন কোন পুস্তকে ‘মাড়ব’ স্থানে ‘মাতর’ এইরূপ  
পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

মাড়বাড়, রাজপুতনার অন্তর্গত একটি সামন্তরাজ্য। বর্জ-  
মান বোধপুর নামে পরিচিত। [মারবাড় ও বোধপুর দেখ]

মাড়াই (দেশজ) মলন, পদদলন।

মাড়ার্য্য (ত্রি) মড়ার সম্বন্ধীয়।

মাড়ি (দেশজ) ১ দস্তমূল। ২ দস্তভেদ। ৩ ঔষধের খল।

মাড়িয়া (দেশজ) শস্তভেদ। (Eleusine Corrocana)

মাড়িয়াবাদী (দেশজ) ১ পশ্চিমাঞ্চলবাসী লোক। ২ মাড়-  
বারবাসী শব্দের অপভ্রংশ।

মাড়ুক (পুং) মড়ুকবাদনং শিল্পমন্ত্ৰেতি (মড়ুকবর্করা-  
দগন্ততরস্তাং। পা ৪।৪।৫৬) ইতি অণ্। মড়ুনামক বাত্-  
বাদক, মাড়ুকিক।

মাড়ুকিক (পুং) মড়ুনামক বাত্ভবাদক।

মাড়ি (ত্রি) মাহতীতি-মাহ (অন্ত্ৰেভ্যোহপি দৃষ্টান্তে। উণ্  
৪।১০৫) ইতি ক্রিণ্। ১ দেশভেদ। ২ পত্রশিরা। (রত্নকোষ)  
৩ দস্তভেদ। চলিত মাড়ির দাঁত। (অমরটীকা ভরত) ৪ পত্র-  
ভঙ্গ। ৫ দৈন্তপ্রকাশ। (মেদিনী)

‘মাড়ি দৈন্তং পত্রশিরার্জ্যং মূঢ়স্তজ্জিহ্বে জড়ো।’ (হেম)

মাটী (ত্রি) মাড়ি-কৃদিকারাদিতি ভীষ্। দস্তশিরা, দাঁতের  
মূল। (শব্দরত্নাং)

মাণ (পুং) কন্দবিশেষ, মাগকচু।

মাণক (পুং) মীষতে পূজ্যতে পরিমীষতে বেতি মান-মা বা  
ঘঞ্ স্বার্থে কন্, নিপাতনান্নৎ। স্বনামখ্যাত কন্দবিশেষ।  
(Arum Indicum) চলিত মানকচু, হিন্দী ও বথে—মাকন্দ।  
মাণকের পর্যায়—স্থলপদ্ম, মাণ, বৃহচ্ছদ, ছত্রপত্র। গুণ স্বাদু,  
শীতল, গুরু, শোথহর, কটু। (রাজবং)

“মাণকং স্বাদু শীতঞ্চ গুরু চাপি প্রকীর্ত্তিতম্।”

(সুশ্রুত সুত্রস্থাং ৪৬ অং)

মাণকমূল (ত্রি) শোথাদিকারে দ্ব্যতোষধবিশেষ। প্রস্তুত-  
প্রণালী—দ্রুত চারি সের, কষার্থ মানকচু একসের, কাথার্থ  
মাণ সাড়ে বারসের। জল একমন ২৪ সের, শেষ ১৬ সের।  
পরে দ্রুতপাকের নিয়মানুসারে এই দ্রুত প্রস্তুত করিতে হইবে।  
এই দ্রুত যথানিয়মে সেবন করিলে একদোষজ, দ্বিদোষজ,  
এবং ত্রিদোষজ শোথ নষ্ট হয়। (ভাবপ্রং শোথরোগাধিঃ)

মাণকচু, স্বনামপ্রসিদ্ধ কন্দবিশেষ (Alocasia indica)।

হিন্দি—মানকন্দ, বাঙ্গালা ও আসামী মাণকচু, সংস্কৃত—  
মাণক। মরাঠী—অলু। বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্রই মাণকচু  
জন্মে। ইহা বঙ্গবাসীর একটা উপাধের খাত্ত। প্রত্যেক  
গৃহস্থই আপনাপন স্নবিধার জন্য অঙ্গনমধ্যে মাণকচুর চারা  
বুনিয়া রাখে। অনেকে ইহার চাশও করে। প্রথমে মৃত্তিকা  
খনন করিয়া সেই উত্তোলিত মৃৎস্থূপের মধ্যে মাণকাছ পুঁতিয়া  
দেয়। ইহাতে ছাই ভিন্ন অল্প সারের আবশ্যক করে না।  
একত্র এই স্নমিষ্ট মূলে পোকা ধরে না। কখন কখন মৃত্তি-

কার দোষে মাগকচু কুটকুটে হয়। চাসের গুণে মাগকচু ৪।৫ ফিট পর্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

এই কন্দ অরের সহিত সিদ্ধ করিয়া অথবা ব্যঞ্জনাদিতে বিদ্ধ খাইতে উত্তম লাগে। অন্ন সময়ের মধ্যে ইহা পরিপাক হইয়া যায়। এই দ্রব্য উদরী রোগগ্রস্ত ও হারবিক দুর্বল রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। শুষ্ক মাগকচু শুঁড়ী করিয়া সফেদার (চাউল চূর্ণ) সহিত একত্র সিদ্ধ করিয়া বে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহা অকৌর্ণ অথবা অভ্যন্ত দুর্বল রোগীকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আরাকট বা শাকুর পরিবর্তে মাগকচূর্ণ ব্যবহার করা বাইতে পারে।

আধুনিক চিকিৎসকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ইহা মূত্রকারক, মূত্র বিরোধক, অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধরোগে বিশেষ কলপ্রদ।

মাগকাদিগুড়িকা, প্রীহবন্ধুরোগে উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী,—সংবৎসরাতীত মাগ, অপান্ধমূলভঙ্গ, গুলক, বালকমূল, শালপাণি, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুট, তালজটীর ক্ষার। প্রত্যেক ৬ তোলা। বিট, সচল লবণ, ববক্ষার ও পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ ১৬ সের পোমুত্রে পাক করিবে। পরে ঘন হইয়া আসিলে উহাকে শীতল করণার্থ নামাইয়া রাখিবে। অনন্তর ৩ পল মধু মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিরোচন হইয়া বক্রং ও প্রীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট এবং অর্শরোগ সন্নিপিত হয়।

অন্তপ্রকার—পুরাতন মাগ, অপান্ধমূলভঙ্গ, শালপাণি, চিতামূল, সিজমূল, শুট, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, ববক্ষার, বিটলবণ, তালজটীভঙ্গ, বিড়ঙ্গ, হবু, চই, বচ, পিপুল, শর-পুষ্ক, জীরা, ও পালিগা মাদারের মূল প্রত্যেকে ৪ তোলা। পোমুত্রে ২৪ সের। এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে, জীরা, ত্রিকটু, হিজ, বমানী, কুড়, শুটী, তেউড়ী, দন্তী-মূল ও রাখালশসার মূল প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে ৩ পল মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। অগ্নিবল ও দোষাদি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক মাত্রা ও অস্থপান ব্যবস্থা করিবেন। ইহা সেবনে প্রীহা ও গুণ্ড প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়। ইহাকে বৃহমাগকাদিগুড়িকাও বলা হইয়া থাকে।

মাগস্তুত, শোথাদিকারোক্ত দ্রব্যভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—মুত ৪ সের। কাথার্থ মুকুট মাগমূল ৮ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্ক মাগমূল ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। ইহা সেবন করিলে নানা প্রকারের শোথ বিনষ্ট হয়।

মাগতুণ্ডিক (পুং) বলতর পক্ষিবিধেব।

(চরকসংগ্রহঃ ২৭ অধ্যায়ঃ)

মাগমণ্ড, শোথাদিকারোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী,—পুরাতন মাগ ১ ভাগ, আতপতুলচূর্ণ ২ ভাগ, সজল দুধ ৪২ ভাগ একত্র পাক করিবে। ইহা প্রত্যহ পান করিলে বাতোধর, শোথ, ও পাণ্ডুরোগ উপশমিত হয়।

মাগব (পুং) মনোরপত্যাং পুমান্, ময় অপত্যবিধকারাং অণু, ভতো নকারত গৎ।

“অপত্যো কুংসিতে মুদে মনোরৌংসর্গিকঃ স্বভঃ।

নকারত চ মুদুভন্তেন সিদ্ধ্যতি মানবঃ ॥” (পা ৪।১।১৩১)

ইতি কাশিকাসুত্রভূতিঃ। ১ মহাব্য। ২ বালক। (শব্দরত্নাং)

৩ বোড়শ বটিক হার, বোল লহর হার। (হেম)

মাগবক (পুং) অন্নো মানবঃ (অন্নো। পা ৪।৩।৮৫) ইতি কন্। বালক, বোড়শ বর্ষ পর্যন্ত বয়স্ক মানবকে মাগবক কহে। উপনয়নহলে উপনীত বালক ‘মাগবক’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ২ হারভেদ, বিংশতিবটিক হার, কুড়িলহর হার। (অমর ভরত) বৃহৎসংহিতা-মতে ১৬ লহর হার।

“মাজিংশতা শুদ্ধো বিংশত্যা কীৰ্ত্তিতোহর্কগুচ্ছাখ্যঃ।

বোড়শতিমাগবকো দ্বাদশতিশ্চাৰ্দ্ধমাগবকঃ ॥”

(বৃহৎসংহিতা ৮।১।৩০)

৩ কুপুরুব, নিম্নিত পুরুষ। (মেদিনী) ৪ বটু। (হেম)

মাগবকক্রৌড় (ক্লী) ছন্দোভেদ। ইহার চারিটা চরণ।

প্রত্যেক চরণে ৮টি অক্ষর থাকে। উহার ১, ৩, ৪, ৮ বর্ণ গুরু,

তদ্বির লঘু।

মাগবীন (ত্রি) মানবভেদমিত্যৰ্থে নীন, বা মাগবার হিতঃ (মাগবচরকাভ্যায়ঃ ৬। পা ৪।১।১১) ইতি ৬। মাগব-সম্বন্ধী। মাগবের হিত।

মাগব্য (ক্লী) মাগবানাং সমূহঃ মাগব্যং বিকারসংঘেতি-ক্য,

মাগবানাং সমূহঃ (ত্রীক্ষণমাগববাৎসবান্ বন্। পা ৪।২।৪২)

ইতি বন্। শিশুসমূহ।

মাগশূরগাদ্যলৌহ, অর্শরোগাদিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ।

প্রস্তুত প্রণালী,—মাগ, গুল, ভেলার মুটি, তেউড়ী, দন্তী,

ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমল অর্থাৎ চিতা, মুখা ও বিড়ঙ্গ, ইহা-

দিগের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। সর্কচূর্ণ সমান লৌহভঙ্গ।

মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হয়।

মাগহল (পুং) জাতিবিশেষ। (বৃৎসং ১৪।২৭)

মাগিকগঞ্জ, ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। কু-

পরিমাণ ৪৮৯ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার-সভার। বলেশ্বর

নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৫২'৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০°৪'১৫" পূঃ। এখানে স্থানীয় শত্ৰুদি বিরুদ্ধার্থে বিদ্যুত হাট আছে। প্রতিবৎসর এখানে একটা মেলা হয়।

মাণিক গাঙ্গুলি, ধর্মমঙ্গলপ্রণেতা জনৈক বঙ্গকবি।

মাণিকচন্দ্র, উত্তর বঙ্গের একজন ধর্মশীল প্রসিদ্ধ রাজা। রঙ্গপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে এই রাজার ও তৎপুত্র গোপীচন্দ্রের স্বার্থভাগের গান দীন হৃৎখীর মুখেও শুনা যায়। সেই গান 'মাণিকচাঁদের গান' বলিয়া পরিচিত। এতদ্ভিন্ন ছন্দমল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রগীত হইতেও এই রাজার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

দুর্লভ মল্লিক লিখিয়াছেন—

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা খাড়িচন্দ্র পিতা।

তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা ॥"

মাণিকচাঁদের গান হইতেও জানিতে পারি—মাণিকচন্দ্র বড় সং রাজা ছিলেন। প্রজাদের উপর তাঁহার কোনরূপ অত্যাচার ছিল না। প্রতি ক্রমকের নিকট এক এক খানি হালে দেড় বুদ্ধি (দেড়পয়সা) মাত্র মাসে আদায় হইত। যে যে দ্রব্যের ব্যবসা করিত, খাজনার পরিবর্তে সে সেই দ্রব্য বোগাইত। প্রজাদের হুঁত্যাগক্রমে এক লম্বাদাড়ী বাঙ্গাল আসিয়া রাজার রাজস্বসচিব হইল, তাহার অত্যাচারে দেড়-বুদ্ধি স্থানে ১৫ গুণা কর ধাওয়া হইল। প্রজারা ক্রুদ্ধ কর স্বীকার করিল না। সকলে মিলিয়া প্রধানের পরামর্শে বিদ্রোহী হইল ও অবশেষে রাজার প্রাণনাশের জন্য আভিচারিক ক্রিয়া অবলম্বন করিল।

মাণিকচন্দ্রের ভাৰ্য্যা রাণী ময়নামতী সিন্ধা ছিলেন। গোরক্ষনাথের নিকট তিনি যোগজ্ঞান লাভ করেন। তিনি ধ্যানে পতির বিপদ জানিতে পারিলেন এবং পতিকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ধর্মরাজের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পতির মৃত্যুতে তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জলিয়া উঠিল। ধর্মরাজ তাহার সে প্রতাপ সহ্য করিতে পারিলেন না। ধর্মরাজ প্রাণভয়ে প্রথমে বৈষ্ণবগণের আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার নিস্তার নাই, তাহাকে প্রাণ লইয়া দূর দেশে পলাইতে হইল। পতীবিরহে ময়নামতীর জীবন ছর্ব্ব হইল। তিনি গোরক্ষনাথের চরণে গিয়া পড়িলেন। রাণী সাত মাস গর্ভবতী ছিলেন, এখন গোরক্ষনাথের বরে আঠার মাসে তাহার এক পরম সুন্দর পুত্র জন্মিল, তাহার নাম হইল গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র। ময়না জানিতেন যে, প্রিয় পুত্রের জীবনকাল

অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। গোপীচন্দ্রের আর এক ছোট ভাই ছিল, তাহার নাম খেতুয়া-লঙ্কেশ্বর\*।

অকালে পতিবিরোগ, আবার অষ্টাদশ বর্ষে পুত্রবিরোগ হইবে, চিন্তা করিয়া ময়না অস্থির হইলেন। বাহ্যিক তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া হরিচন্দ্র বা হরিশচন্দ্র রাজার কন্যা উজ্জনা পুছনার সহিত পুত্রের পরিণয় কার্য সমাধা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে ১৮শ বর্ষ দেখা দিল। ময়না আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন, পুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণ ভিন্ন আর রক্ষা নাই। তাই প্রিয় পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, 'দেখ বৎস, এ অগণ্য মায়ার খেলা, সমুদ্র কণিক, আজ আছে কাল নাই, অতএব যদি চির শান্তি চাও, তবে অবিলম্বে সন্ন্যাস আশ্রয় লও। রাজধানীর পশুশালায় হাড়িপা সিদ্ধ আছে, তাহারই চেলা হও।' প্রথমে রাজা গোবিন্দচন্দ্র স্নেহবোধে পরিত্যাগ করিয়া যোগী হইতে চান নাই। শেষে মাতার উৎসাহ ও উপদেশে যুদ্ধ হইয়া হাড়ী সিন্ধের শরণাপন্ন হইলেন। সংসার পরিত্যাগকালে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের ভোগ্যা রাণীগণ বেক্রপ বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা অতি মন্থলশী, মাণিকচাঁদের গানে সেই বিলাপের প্রতিধ্বনি যেন বিধাদের গাধায় বিরচিত হইয়াছে। সংসারত্যাগকালে তিনি কাণফাটা যোগীদের দ্বারা কাণ ফাড়িয়া কর্ণে কুণ্ডল পরিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রগীতে লিখিত আছে, প্রথমেই হাড়িপা শিষ্যের পরীক্ষা লইবার জন্য ভিক্ষায় পাঠাইলেন, কিন্তু তাহার ভিক্ষা গমনের পূর্বেই হাড়িপা দৈবজ্ঞ সাজিয়া প্রতি পাড়ায় গিয়া গৃহস্থকে ডাকিয়া বলিয়া আসিলেন, যে আজ এক নবীন সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিতে আসিবে, সে বাহার দিকে চাহিবে, তাহার ধন ধাত্ত সব উড়িয়া যাইবে। অতএব সকলে ঘরে কাটা দিয়া রাখ, যেন সে গৃহে প্রবেশ করিতে না পায়। গৃহস্থেরা তাহাই করিল, গোবিন্দচন্দ্রের সে দিন ভিক্ষা মিলিল না। হাড়িপা কহিলেন, 'গেও যোগীর ভিক্ষা মেলে না। আর এখানে থাকিতে নাই।' গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়া হাড়িপা দক্ষিণে চলিলেন। হাড়িপা হৌরাদারী নামে এক বেস্তার ভবনে আসিয়া রাজাকে বন্ধক দিয়া চলিয়া গেলেন। কথা রহিল যে

\* "মাণিকচন্দ্র রাজার বেটা গোবিন্দচন্দ্র থুইল।

তাহার ছোট ভাইয়ের নাম খেতুয়া লঙ্কেশ্বর ॥" (মাণিকচাঁদের গান)

+ এই হাড়ীসিদ্ধ জালন্ধর সিদ্ধ নামে বৌদ্ধগ্রন্থে প্রসিদ্ধ। ভিক্ষাজী বৌদ্ধ গ্রন্থেও হাড়িপা নাম পাওয়া যায়। তিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য, হুইযোগী বলিয়া হিন্দুর নিকট পরিচিত ছিলেন।

১২ বর্ষ পরে আসিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যকে উদ্ধার করিয়া লইবেন।

হীরা যুবক রাজার অপূর্ণ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল। তাহাকে পাইবার আশায় কত সাধ্য সাধনা করিল। কিন্তু রাজকুমার মোহিনীর কথায় তুলিলেন না, তাহাকে মাফসোধন করিলেন। তখন হীরা মর্ম্মাহত হইয়া রাজকুমারকে কঠিন পরিশ্রমের ভার দিলেন। দিবারাত্র তাহাকে বড় বড় কষ্টগী করিয়া জল তুলিতে হইত, তিনি ক্রমেই ক্লিষ্ট ও অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আহারে বিহারে কিছুতেই সুখ নাই, অনবরত বেঞ্চার তাড়নার অস্থির। এইরূপ প্রায় ১২ বর্ষ কাটিয়া গেল। এদিকে গোবিন্দচন্দ্রের রাণীদ্বয় দীর্ঘকাল রাজার কোন সংবাদ না পাইয়া পোষা সারীশুককে রাজার সংবাদ আনিবার জন্ত ছাড়িয়া দিলেন। পাখী নানা দেশ দেখিয়া শেষে হীরার বাড়ীর নিকট রাজার সদান পাইল,—দেখিল গোবিন্দচন্দ্রের আর সে মুখশ্রী নাই, সে কাস্তি সে জ্যোতিঃ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজা ক্ষীণ দেহে অতি ধীরে করতোয়া হইতে জল লইতে আসিয়াছেন, কিন্তু এত ক্লান্ত ও প্রান্ত যে এখানে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই সময় সারীশুক তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার হাতে আসিয়া বসিল ও রাণীদের বিরহকাহিনী প্রকাশ করিল। রাজা অশ্রুচিহ্নিত সেই রক্তে পত্র লিখিয়া সারীশুককে বিদায় করিলেন, হীরার দাসীগণ তাহা দেখিতে পাইল ও তাহাকে গিয়া লাগাইল যে ‘বেটা পালাইবার যোগাড় করিতেছে।’ তখন হীরা গোবিন্দচন্দ্রকে আনিয়া ভেড়া করিয়া বাধিয়া রাখিল। রাজকুমার মর্ম্মবেদনায় কাতর হইলেন, তাঁহার মনোক্রম হাড়িপা ধ্যানে জানিতে পারিলেন। শিষ্যকে উদ্ধার করিবার জন্ত অবিলম্বে তিনি হীরার নিকট উপস্থিত হইলেন। হীরা বলিল, তোমার লোক মরিয়া গিয়াছে, আর তাহাকে পাইবে না। হাড়িপা তাহা বিশ্বাস করিলেন না, হুঙ্কার ছাড়িলেন। তাঁহার হুঙ্কারে লোহজিঞ্জীর ছিন্ন ভিন্ন হইল, গোবিন্দচন্দ্র মুক্তি লাভ করিয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

শিষ্যকে লইয়া হাড়িপা রাজধানীতে আসিলেন। ময়নামতী সমাদরে পুত্রকে কোলে লইলেন। আবার গোবিন্দচন্দ্র রাজসিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তিনি বিলাসিনী নারীগণের সেবায় গুরুর উপদেশ বিস্মৃত হইলেন, এতদিনের সাধনা পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। উহ্না পুহ্নার কথার রাজা এক গভীর খাত মধ্যে গুরুকে নিক্ষেপ করিয়া মাটি ঢাপা দিতে আদেশ করিলেন। সিদ্ধযোগী সেই গহ্বরে

ধ্যানমগ্ন রহিলেন। কিছুদিন পরে গোরক্ষনাথের আদেশে কাহুকা যোগী বহু যোগী সঙ্গে লইয়া হাড়িপাকে উদ্ধার করিতে আসিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইল। ‘রাজা বুঝিলেন যে, ইহারা সামান্য লোক নহেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার রাজ্য ছারখার করিতে পারেন, কাহুকার মুখে আরও শুনি-লেন যে হাড়িপা গহ্বর মধ্যে এখনও জীবিত আছেন। যাহা-হউক রাজা যোগীগণকে সন্তুষ্ট করিলেন, যোগীগণের একান্ত অনুরোধে হাড়িপা গোবিন্দচন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। শুভদিনে শুভরূপে রাজা মন্তক মুগুন করিয়া আবার সন্ন্যাসী হইলেন, আর সংসারে ফিরিলেন না। এতদিনে ময়নামতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

মাণিকচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর কাহিনী তিব্বত ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধগ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে। পিতা, পুত্র ও মাতার চরিত্র লইয়া বঙ্গভাষায় বহুতর কাব্য রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত মাণিকচন্দ্রের গান ও হুল্লভ-মল্লিক-রচিত গোবিন্দচন্দ্রগীত মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নানাস্থান হইতে যে বহুতর ধর্ম্মমঙ্গল বাহ্যক হইয়াছে, উক্ত চরিত্রত্রয়ের আদর্শ লইয়া গ্রথিত। মাণিকচন্দ্রের গান ও গোবিন্দচন্দ্রগীত যদিও আধুনিক কবির হাতে কতকটা মার্জিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার অস্থি মজ্জায় প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে, তাহা সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। ময়নামতী যোগিবেশধারী গোবিন্দচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

“কোথায় উৎপত্তি হইল পৃথিবী সংসার।

কোথায় রহিবা পুন কহ সমাচার ॥

মরণ কিবা হেতু জীবন কিরূপ।

ইহার উত্তর যোগী কহিবা স্বরূপ ॥”

হাড়িপার প্রশ্নাদে গোবিন্দচন্দ্র উত্তর দিতেছেন—

“শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি ॥

আপনি জল স্থল আপনি আকাশ।

আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগত প্রকাশ ॥” ৩৫১

আবার হাড়িপা গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন—

“কেহ কার নয়, সোদর তনয়, সকলি শূন্যের মায়া।

এ ভবসংসারে যত দেখ আর মাত্র আপনার কায়া ॥

রাজা বলে কোন্ ধর্ম্মে সব লোক তরে।

ইহার উত্তর গুরু আজ্ঞা কর মোরে ॥ ৩৫২

হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম যার পর নাই ॥” ৫০০ (গোবিন্দচন্দ্রগীত)

উক্ত কবিতা কল্পটীতে গ্রাম্যকবির লেখনী হইতে



বৌদ্ধ ধর্মের শ্রদ্ধাবান, নাতিকতা এবং বুদ্ধদেবের মূল উপ-  
দেশ-বাক্য প্রকটিত হইরাছে।

রঙ্গপুরের উত্তরপশ্চিমাংশে ভিমনা থানার ধর্মপালের  
রাজধানী ধর্মপুরের ধ্বংসাবশেষ এবং তাহারই এক কোণ  
পশ্চিমে “মরনামতীর কোট” নামে প্রসিদ্ধ মাণিকচন্দ্রের  
রাজধানী দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ কোটবেহারের পাটগাঁওকে  
গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী পাটিকা-নগর মনে করেন। ধর্ম-  
পাল মাণিকচন্দ্রের এক আত্মীয়। তাঁহার হস্তে মাণিকচন্দ্রের  
পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে এবং অবশেষে রাণী মরনামতীর হস্তে  
ধর্মপাল প্রতিকূল পাইরাছিলেন। মাণিকচন্দ্রের আত্মগীত  
তাহাই রূপক ভাবে বর্ণিত হইরাছে। উক্ত ধর্মপুরের প্রায়  
সাড়ে তিন কোশ দূরে চরচরা গ্রামে হরিশ্চন্দ্র রাজার পাট  
নামে একটি বৃহৎ স্থাপত্য রহিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, এই  
সময়ে গোবিন্দচন্দ্রের স্বপুত্র রাণা হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিতেন।  
অনেকের বিশ্বাস যে, করতোয়ার অদূরে যেখানে দিনাজপুর ও  
রঙ্গপুর রাস্তা নদীতে আসিয়া মিলিয়াছে, এই স্থানে খোলহাটি  
গ্রামে হীরার বাড়ী ছিল। কোন সময়ে মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দ  
চন্দ্র রাজত্ব করিতেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। গ্রিয়ার-  
সন সাহেব তাঁহাকে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী, আবার কেহ খৃষ্টীয়  
১১শ শতাব্দী গোবিন্দচন্দ্রের অভ্যুদয় স্বীকার করেন।

মাণিকজোড় (দেশজ) পক্ষিভেদ। *Ciconia leucocephala*  
মাণিকপুর, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত  
একটি পরগণা, ভূপরিমাণ ১২৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত পরগণার প্রধান গ্রাম। পূর্বে এই স্থানে থাক-  
জাতির অধিকার ছিল। তৎপরে ভর জাতি এখানে আধি-  
পত্য বিস্তার করে। তরসর্দার মক্ত মাণিকপুর নগর স্থাপন  
করেন। তর-সর্দারগণ ৬৪ পুরুষ এখানে রাজত্ব করিলে  
পর নেবাল শাহ নামক জনৈক চন্দ্রবংশী (বন্দলখোটা) রাজ-  
পুত্র এই নগর অধিকার করেন। তৎপরে পরগণা এখানে দ্বাদশ  
পুরুষ রাজ্য করিয়াছিলেন। শেষ রাজা অপুত্রক হওয়ার,  
তৎপরে গোণ্ডার বিশেষ রাজপুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন।  
তদবধি এই স্থান বিশেষ-বংশের অধিকারে রহিয়াছে।

মাণিকপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত  
একটি পরগণা। গঙ্গানদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ  
৮৩০ বর্গ মাইল।

ঐতিহাসিক ঘটনা সমাপ্রতি হওয়ার এই স্থান সাধা-  
রণের নরন আকৃষ্ট করিয়াছে। কনোজরাজ বলদেবের

কনিষ্ঠ পুত্র মানদেব এই নগর স্থাপন করেন। মতান্তরে  
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কনোজরাজ জয়চাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাণিক-  
চাঁদ কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হইরাছিল। এখানকার  
মুসলমান শেখগণ বলেন যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ সৈরন  
সালয়ের আক্রমণকালে (১০৩২-৩৩ খৃঃ) এখানে আসিয়া  
বাসু করেন। ১১৯০-৯৪ খৃষ্টাব্দে কনোজ-রাজবংশের অধঃ-  
পতনের পর এইস্থান প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের অধিকার-  
ভুক্ত হয়। কিন্তু তৎকালে এখানে মুসলমানপ্রভাব পূর্ণরূপে  
প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার পার্শ্ববর্তী রাজবংশের সহিত এখানকার  
মুসলমানের যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইত। দিল্লীখর বহলোল  
লোদী কর্তৃক জোনপুর অধিকারের পর এই স্থান দিল্লী-  
সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর অন্তর্বিগ্নে দিল্লী-  
রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়িলে পুনরায় এই স্থান নররক্তপ্রোভে  
প্রাণিত হইরাছিল। মোগল-সম্রাট অকবর শাহের হুশাসনে  
পুনরায় এই স্থানে শান্তি স্থাপিত হয়। উক্ত সম্রাট এই  
স্থানকে আলাহাবাদ স্থবার একটি সরকারভুক্ত করিয়া শাসন-  
শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী মোগল-  
সম্রাটজয়ের অধিকারে মাণিকপুর নগর সমৃদ্ধির উচ্চ সীমায়  
আরোহণ করে। ঐ সময়ে সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য ওমরাহগণ  
এখানে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া মগরের শ্রী সম্পাদন করিয়া  
ছিলেন। সম্রাট অরঙ্গজেব আগ্রাগমনকালে একবার এই  
নগরে পর্যটন করেন। তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার প্রাচ্য-  
কালীন ভজনায় জন্ত একরাত্রি মধ্যে এখানে একটি সুন্দর  
মসজিদ নির্মিত হইরাছিল।

মোগলশক্তির অবসানের পর হইতেই এই নগরের  
শ্রীবৃদ্ধির হ্রাস হইতে থাকে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রোহিলাগণ  
এবং ১৭৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় দল এই নগর ও ভূভাগ  
লুণ্ঠন করিয়া শ্রীহীন করে। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার  
নবাব উজীর সুলতা উদ্দৌলা কর্তৃক মরাঠা-সৈন্তের পরাভবের  
পর, এই স্থানে আর কোন বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই।

২ উক্ত প্রতাপগড় জেলার একটি নগর এবং মাণিকপুর  
পরগণার বিচার সদর। গঙ্গানদীর উত্তরতীরে অবস্থিত।  
অক্ষা° ২৫° ৪৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ২৬' পূঃ। এখানকার,  
মোগলশক্তির কালে নির্মিত রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা,  
মসজিদ, সমাধিমন্দির ও পুষ্পবাটিকা প্রভৃতি এক্ষণে ধ্বংস-  
প্রায় ও কতক মালমসলা হানান্তরিত।

মাণিকপুরে প্রতিবৎসর হুইবার ধর্মমেলা হইয়া থাকে।  
আবারমাসে জবালাদেবীর উৎসবোপলক্ষে এবং কাশ্মিরমাগে  
গঙ্গানদীপার্শ্বে এখানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

\* Journal Asiatic Society of Bengal for 1878, pt. I.

+ শ্রীবৃদ্ধ গীর্দেশ চন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য় খণ্ড) ৫৮ পৃঃ।



হিন্দুকীর্তির মধ্যে রাজা অরচন্ডের ভ্রাতা মাণিক্যচন্ডের গঙ্গাতীরবর্তী হুগুবাটিকা, বিলখারনাথের মন্দির, কএকটি খংসপ্রার বৌদ্ধতুপ এবং গঙ্গাতীরবর্তী জালামুখী প্রভৃতির আধুনিক শৈব ও শাক্তমন্দির প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। কাড়া হুগের পূর্বদ্বারস্থ বংশপালের শিলাফলকপাঠে জানা যায় যে, এই স্থান প্রাচীন কোশাধী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মাণিকপুর, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের বান্দাজেলার একটি নগর। অক্ষা° ২৫° ৩' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৮' ২০" পূঃ। এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের জবলপুর শাখার একটি ষ্টেশন থাকার এক্ষেপে বান্দাজেলার বাণিজ্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

মাণিকা (জী) মাণক-টাপ্ অকারভেদঃ। অষ্টদলপরিমাণ।

মাণিক্য (জী) মণিপ্রকারঃ মণি-(তুলাদিভাঃ) প্রকারবচনে কন্। পা ৫৪৮৩ ইতি প্রশংসারঃ কন্ ততো মণিকমেবেতি মণিক (চতুর্দশগাণীনাশুপসংখ্যানঃ। পা ৫৪৮৩) ইতি বার্তিক-খাং ব্যঞ্। রক্তবর্ণ রত্নবিশেষ, চলিত মাণিক। পর্যায়—শোণ-রত্ন, রত্নরাট, রবিরত্নক, শৃঙ্গারী, রত্নমাণিক্য, তরুণ, রত্ননামক, রামযুক্ত, পদ্মরাগ, রত্ন, শোণোপল, দৌগন্ধিক, লোহিতক, কুরুবিন্দ। গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তনাশক, রত্নপ্রয়োগে প্রধান। শ্রেষ্ঠ রমায়ন। (রাজনিঃ) [ বিশেষ বিবরণ চুপী ও পদ্মরাগ দেখ ] ২ কদম্বীবিশেষ। (ভাবপ্রঃ)

মাণিক্য, রাজপুতনার অনেক শাক্তস্বরীয়াজ।

মাণিক্যচন্দ্র (পুং) তীরভূক্তির জনৈক রাজা। ধর্মচন্ডের পুত্র এবং রামচন্ডের পৌত্র। ইনি অলঙ্কারশেখরপ্রণেতা কেশবের প্রতিপালক ছিলেন।

মাণিক্যচন্দ্র সূরি, জনৈক জৈন পণ্ডিত। সাগরেন্দ্র শিষ্য। ইনি সঙ্কেতকাব্যপ্রকাশটীকা, নগায়ন বা কুবেরপুরাণ এবং ১২৭৬ সংবতে পার্শ্বনাথ-চরিত্র রচনা করেন।

মাণিক্যদেব, উগাদি স্মৃতিদশপাদীপ্রণেতা। ভট্টোজী এই টীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

মাণিক্যময় (ত্রি) পদ্মরাগমণ্ডিত।

মাণিক্যমল্ল (পুং) জনৈক হিন্দুরাজা। কীরাতাঙ্গুণীর টীকা ও প্রত্নবোধটীকাপ্রণেতা বনোহর শর্মা ইহার সভাপণ্ডিত ছিলেন।

মাণিক্যবন্দ্যন, পদ্মাবের জনৈক হিন্দুরাজা।

মাণিক্যস্থলর আচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য, ইনি মলয়স্থলরচরিত্র, ধর্মোদয়চরিত্র, পৃথ্বীচন্দ্রচরিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। শীলরত্নস্মৃতি মেকতুঙ্গরচিত মেঘদূতের যে টীকা করেন, ১৫২১ সংবতে মাণিক্যস্থলর তাহার সংশোধন প্রকাশিত হইয়াছিল।

মাণিক্যসূরি (পুং) শকুনসারোজারচরিতা।

মাণিক্য (জী) মাণিক্য টাপ্। জোড়ী। পর্যায়—মুঘলী, গৃহ-গোদিকা, গৃহগোলিকা, তিত্তিকা, পলী, কুডুমংড, গৃহগোলিকা।

মাণিক্যালী, রাবলপিণ্ডিজেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম।

অক্ষা° ৩০° ২৭' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৭' ১৫" পূঃ। এখানে

কএকটি বৌদ্ধতুপ, ১৪টি মঠবাটিকা, ১৫টি সন্ধ্যারাম এবং

কতকগুলি গৃহস্থ প্রভৃতির প্রাচীর ইত্যদ্যতঃ দেখিতে পাওয়া

যায়। একটি তুপ মধ্য হইতে খুঁটপূর্ব ৩৩ অশ্বের রোমক-

মুদ্রা এবং রাজা কনিঙ্কের নামাক্রিত একটি কোটা পাওয়া

গিয়াছে। ঐ তুপটি রাজা কনিঙ্কের। ১ম খৃষ্টাব্দে ক্ষত্রপ

রাজ জিহনিসের স্থাপিত আর একটি তুপও ঐ স্থানে দৃষ্টি-

গোচর হয়। স্থানীয় প্রবাদ, রাজা মাণিক এখনকার সর্ব

বৃহৎ তুপটি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

এই স্থানের প্রাচীন নাম মাণিকপুর। বৌদ্ধপ্রাধিক

সময়ে এই নগর মহাসমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন গাছার রাজ্যের

মধ্যে এক্ষণে প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

প্রবাদ, এই নগর সপ্ত রাক্ষসের অধিকৃত ছিল। শিয়াল-

কোটরাজ শালিবাহনের পুত্র রসালু রাক্ষসদিগকে নিহত

করিয়া এই স্থান অধিকার করেন।

এক্ষণে কএকটি মঠের চিহ্ন ব্যতীত এখানে প্রাচীন নগর

বা হুগের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। এখানে মাণি-

দনপতি আলেকসান্দারের প্রিয়তম অশ্ব বৃহৎকলার কবর

হওয়ার এই স্থান গ্রীক ইতিহাসেও এসিকি লাভ করিয়াছে।

মাণিচর (পুং) রথাস্ত্রের পরিচালকশক্তিভেদ। (পারস্করপুং ৩১৪)

মাণিপার (পুং) মণিপারের গোত্রাপত্য, জনৈক ঋষি।

মাণিপাল (ত্রি) মণিপাল সম্বন্ধীয়।

মাণিবন্ধ (জী) মণিবন্ধে গিরোভবঃ মণিবন্ধ-অণ্। সৈন্ধব

লবণ। (অমরটীকার ভ্রতত)

মাণিভদ্র (পুং) মণিভদ্রাঙ্কজ। জনৈক বন্ধরাজ।

মাণিমহ (জী) মণিমহে গিরোভবঃ মণিমহ-অণ্। সিদ্ধজ

লবণ, সৈন্ধব লবণ।

"সৈন্ধবোহজী শীতশিবঃ মাণিমহঃ সিদ্ধজম্।" (ভাবপ্রঃ)

মাণিরূপ্যক (ত্রি) মণিরূপ্যসম্বন্ধীয়। (পা ৪২১১০৪)

মাণি (পুং) বৈদিক আচাধ্যাতেন। (শকভাঃ ১৪৫৫১২২)

মাণ্ডকর্ণি (পুং) মণ্ডকর্ণের গোত্রাপত্য, মুনিবিশেষ।

মাণ্ডপ (ত্রি) মণ্ডপ-অণ্। মণ্ডপসম্বন্ধীয়।

মাণ্ডরিক (ত্রি) মণ্ডরের গোত্রাপত্য। (পা ৫৩৩১০৮)

মাণ্ডলিক (ত্রি) মণ্ডলং রক্ষতি মণ্ডলটক্। ১ মণ্ডলরক্ষক,

শাসনকর্তা (magistrate)। ২ শাসন-কাণ্ড।

মাণ্ডব (ক্লী) সামভেদ।

মাণ্ডবা, বেদাকাহার সংখ্যক-সেবাসের অন্তর্গত একটি মায়ম্বরাজ্য।

মাণ্ডবা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাবা জেলার আলিবাগ উপবিভাগের অন্তর্গত একটি বন্দর।

মাণ্ডবী (ক্লী) কুশলজের কন্যা ভরতের পত্নী। (রামাং ১।৭৫।২২)  
২ মাণ্ডবা নগরস্থিত দাক্ষারণী মূর্তি।

মাণ্ডবী, বোম্বাই প্রদেশের কচ্ছ রাজ্যের অন্তর্গত একটি বন্দর।  
অক্ষা° ২২° ১৫' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩১' ৪৫" পূঃ।  
কচ্ছোপসাগরকূলে অবস্থিত। ইহার প্রধান রাণিক্যহান মঞ্চ-  
মাণ্ডবী নামে খ্যাত। উহার প্রাচীন নাম রারপুর।

মাণ্ডবী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সুরাটজেলার একটি উপবিভাগ,  
ভূপরিমাণ ২৮০ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ১৮' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২২' ৩০" পূঃ। ৩ রেবানদীতীরস্থ  
এক প্রাচীন তীর্থ। (রেবাখণ্ড)

মাণ্ডব্য (পুং) বৈদিক আচার্যভেদ, মাণ্ডবীপুত্র। (শতব্রাং ১০।৬।৫।৭) ২ মণ্ডুর গোত্রাপত্য। ৩ জাতিভেদ। ৪ নগরভেদ।  
মাণ্ডব্য, কনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। ইনি মাণ্ডব্যসংহিতা  
ও কার্তিকবিবাহপটল নামে দুইখানি জ্যোতির্গ্রন্থগ্রনয়ন  
করেন। রঘুনন্দন, নারায়ণ, হেমাদ্রি প্রভৃতি এবং বৃহৎসং-  
হিতায় ইহার নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।

মাণ্ডব্যাপুর (ক্লী) গোদানদীতটবর্তী নগরভেদ। বর্তমান  
নাম মাণ্ডবী।

মাণ্ডব্যায়ন (পুং) মাণ্ডব্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

মাণ্ডব্যেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গ ভেদ। ২ তীর্থভেদ।

মাণ্ডু, মধ্যভারতের ধার-রাজ্যের অন্তর্গত একটি পরিত্যক্ত  
নগর। [মাণ্ডোগড় দেখ]

মাণ্ডুক (পুং) বৈদিক মণ্ডুক শাখাস্তর্গত ব্রাহ্মণ।

মাণ্ডুকায়ন (পুং) বৈদিক মণ্ডুক শাখাস্তর্গত ব্রাহ্মণ।

(শতব্রাং ১৪।২।৪।৩২)

মাণ্ডুকায়নি (পুং) বৈদিক আচার্যভেদ। (শতব্রাং ১০।৬।৫।৯)

মাণ্ডুকি (পুং) মণ্ডুকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১২)

মাণ্ডুকীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্যভেদ। (শতব্রাং ১৪।৪।৩২)

মাণ্ডুকেয় (পুং) মণ্ডুকের গোত্রাপত্য, বৈদিক আচার্যভেদ।

মাণ্ডুকেয়ী (ক্লী) ১ মাণ্ডুকেয় সম্বন্ধীয়। ২ মাণ্ডুকেয়ের মত।

মাণ্ডুক্য (ক্লী) মণ্ডুক সম্বন্ধীয়।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ (ক্লী) উপনিষদভেদ।

মাণ্ডোগড়, মধ্যভারতের ধার-রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর।

মুসলমান অধিকারে ইহা মালব রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী  
ছিল। নব্বদানদীর তীরে ১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি অধিত্য-  
কার উপর স্থাপিত। অক্ষা° ২২° ২১' উঃ এবং দ্রাঘি°  
৭৪° ২৬' পূঃ। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে এই নগর ৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে  
স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং ৩৭  
মাইল লম্বা প্রকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

এখানকার ক্ষ-সাম্রাজ্যের মধ্যে জামিন-মসজিদ, মালববাসী  
হোসল ঘোরির মন্দির-মসজিদ ও বাজ বাহাদুরের প্রাসাদ  
এখানকার অতীত আকর্ষণ-কীর্তির পরিচয় দিতেছে। রাজা  
হোসলঘোরি ১৫শ শতাব্দীতে এই নগর গড়খাই দ্বারা সুরক্ষিত  
করেন। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর শাহ এই নগর  
জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন। ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্  
অকবর ইহা অধিকার করিয়া লন। [মালব দেখ।]

মাণ্ড (দেশজ) ১ মন্ত। ২ গুড়ভেদ, গুড়ের তরল অংশ।  
(আরব্য) ৩ মন্তরক খেলার শরাজ (mate)।

মাতঙ্গ (পুং) মতঙ্গভেদঃ মতঙ্গতাপত্যঃ পুমান্ বা। মতঙ্গ-  
অণ্। ১ হস্তী। (অমর) ২ অশ্বখরুক্ষ। ৩ কিরাত জাতি-  
বিশেষ। ৪ ঋগ্ভট। (মেদিনী) ৫ সংবর্তক মেঘের নাম।  
৬ জ্যোতিষোক্ত চতুর্বিংশতিযোগ। ৭ প্রত্যেকবৃক্কভেদ।  
৮ নাগভেদ। ৯ অর্ধচন্দ্রশাসকভেদ। (হেম)

মাতঙ্গজ (ক্লী) মাতঙ্গজায়াতে জন-ড। মাতঙ্গজাত। হস্তিশিঙ।

মাতঙ্গদিবাকর (পুং) সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনে সভাহ কনৈক কবি।

মাতঙ্গনক্র (পুং) বৃহদাকার কুন্তীরভেদ।

মাতঙ্গমকর (পুং) মাতঙ্গাকারো মকরঃ। মহামংগভেদ।

মাতঙ্গসূত্র (ক্লী) বৌদ্ধসূত্রভেদ।

মাতঙ্গবন, কামরূপস্থ পুণ্যস্থানভেদ। (যোগিনীতং)

মাতঙ্গবাপী, তন্ত্রোক্ত প্রাচীন তীর্থভেদ। (বৃ-নীলত্তর)

মাতঙ্গী (ক্লী) মতঙ্গত মুনৈয়গত্যঃ ক্লী, মতঙ্গ-অণ্-তীব্।  
দশমহাবিষ্ণুর অন্তর্গত নবম মহাবিষ্ণু। তন্ত্রসারে এই বিষ্ণুর  
পূজা ও মন্ত্রাদি বিষয়ে এইরূপ আছে—

“অথ বক্ষ্যে মহাদেবীঃ মাতঙ্গীং সর্গসিদ্ধিদাম্।

অস্ত্রোপাসনমাত্রেন বাক্সিদ্ধিং লভতে ঐবম্ ॥” (তন্ত্রসার)

সর্গসিদ্ধিদায়িনী মাতঙ্গী দেবীর মন্ত্রাদির বিষয় বলিতেছি,  
ইহার উপাসনা মাত্রেই সাধক অচিরে বাক্সিদ্ধি লাভ করে।

‘ও হ্রীং ক্লীং হুং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা’ ইহাই মাতঙ্গী  
দেবীর মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি দক্ষিণামূর্তি, ছন্দঃ ক্রিষ্টাট্  
এবং দেবতা মাতঙ্গী দেবী। এই দেবতা সাধকের সর্গসাক্ষ্যে  
সিদ্ধি প্রদান করেন। ইহার পূজাপদ্ধতি তন্ত্রসারে উল্লিখ্য।  
এই মহাবিষ্ণুর পূজার যন্ত্র অঙ্কিত করা আবশ্যক। যথা—

প্রথমে বটুকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহ্যে অষ্টকল পদ অঙ্কিত করিবে। এই বটুকোণ মধ্যে দেবীর মূলমন্ত্র লিখিতে হইবে। এইরূপে বয় প্রস্তুত করিয়া জবাগুণ দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হয়। মন্ত্রস্থিত পদের অষ্টকলে বিবিধ উপহার দ্বারা মনোভবা, রতি, প্রীতি, ক্রিয়া, শ্রদ্ধা, অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমহনা ও অনঙ্গলালসা এই অষ্ট শক্তির পূজা ও জপ আবশ্যক। অন্তঃপদ দেবীর ধ্যান ও পূজা করিতে হয়। ধ্যান বধা—

‘শ্রামাঙ্গীঃ শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।

বেদৈর্কাহদৈঃ সপ্তশ্রেণীকপাশাঙ্কুশধরাম্ ॥’ (তন্ত্রমার)

এইরূপে ধ্যানে দেবীরূপ চিত্তা করিয়া মনোহর গন্ধ-পুষ্পাদি উপহার দ্বারা দেবীর পূজা এবং শর্করা-মিশ্রিত পায়স-নৈবেদ্য দিতে হইবে।

মাতঙ্গী মন্ত্রের পুরস্করণ করিতে হইলে ছয় ছাঁজার জপ করিতে হয়। জপান্তে সাধক দশাংশ সংখ্যায় দ্বুতশর্করা ও মধুমিশ্রিত ত্র্যম্বকমন্ত্রের সমিধ দ্বারা হোম করিবে। হোম কালে ঐ অষ্টশক্তির আস্থিত দিতে হয়।

এই দেবতার পূজার একটী বিশেষ নিয়ম এই যে, সাধক পূজান্তে কোন চতুষ্পদস্থলে অথবা শ্মশানে সিন্ধা মংজ ও মাংস প্রদানপূর্বক গুগ্গল দ্বারা ধূপ দিবেন। রাত্রিকালে এই ধূপ প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপে দেবীর আরাধনা করিলে সাধক পূর্ণমনোরথ এবং কবিত্বশক্তিশূন্য হন। এই প্রয়োগ দ্বারা সাধকের শক্রনাশ, অসিত্তন্তন ও বাক্যশক্তির শক্তি হয়। অধিক কি মাতঙ্গী দেবীর পূজা করিয়া সাধক কোন অভীষ্ট লাভেই বঞ্চিত হন না। [দশমহাবিদ্যা দেখ]

মাতরপিতরৌ (পুং) মাতা চ পিতা চ (মাতরপিতরা-বৃদ্ধীচাম্। পা ৬।৩৩২) ইত্যার ভা-বেশো মাতৃশব্দস্ত নিপা-ত্যতে। তাত ও জনরিত্রী, মাধাপ। এই শব্দ নিত্য বিবচনান্ত। পিতরৌ, মাতাপিতরৌ এবং মাতরপিতরৌ এই তিনটী পদ হইয়া থাকে।

মাতরিপুরুষ (পুং) যিনি মাতার নিকট বীরত্ব প্রকাশ করেন, কিন্তু অপরের নিকট ভীক।

মাতরিশ্ব (পুং) অগ্নিতেজ, মাতরিশ্ব। (সাংখ্যাংগু ১৩।১১২৬)

মাতরিশ্ব (পুং) মাতরি অন্তরীক্ষে স্থরতি বর্ধতে ইতি-যবা মাতরি জনভ্যাং স্থরতি বর্ধতে সপ্তসপ্তকবাদিতি শি (শ্বন্ উক্লম্বিত। উণ ১।১৫৮) ইতি কণিন্ নাস্তি সপ্তম্যা অনুক্, ধাতোরিকারলোপশ্চ নিপাতিতঃ। ১ বায়ু। “আজ্ঞং দিবো মাতরিশ্বাজভারমপ্রাং” (ঋক্ ১।১২৬) ‘মাতরিশ্বা বায়ুঃ’ (সারণ) মাতরি অন্তরীক্ষে স্থিতি চেষ্টেতে ইতি শ্বন্-কনি।

২ অগ্নিতেজ। “মাতরিশ্বা যদমিত্যেত মাতরি বাতন্ত পর্গো অতবং সন্নামনি” (ঋক্ ৩২।১১) ‘যবা মাতরিশ্বীন্ পর্গ-রূপতয়া বর্ধতে তদন্তমপারামকো ভবতি যবা অন্তরীক্ষে বিদ্যোততে তদা মাতরিশ্বা নামকো ভবতি’ (সারণ)

মাতলা (দেশজ) ১ ধানের মাধা (An arch)। ২ দরিদ্রের ব্যবহারোপযোগী শোলা বা ককির টুকী।

মাতলা (রায়সাহা), ২৪ পরগণা জেলার প্রবাহিত একটা নদী। বিজ্ঞানী, করতোয়া ও আঠারবাঁকা নামক নদীজের একত্র মিলিত হইয়া এই নামে সুন্দরবনের মধ্য দিয়া বঙ্গো-সাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর মোহানা সাগরতীর হইতে ১৫ ক্রোশ পূর্বে এবং কলিকাতা হইতে ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। নদীর মোহানা বিস্তৃত এবং খাত জগতীর হওয়ার এখানে নৌকাযোগে গণ্য দ্রব্য লইয়া গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা আছে।

মাতলা বা পোর্টক্যানিং নগর এই নদীতীরে অবস্থিত। এখান হইতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইবে তাহিয়া রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাদুর অন্যে এখানে রাজধানী স্থাপনে প্রয়াস পান। এক্ষণে উহার গৃহ-বাটিকাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মাতলা, তন্নামক নদীতীরবর্তী একটি গড়গ্রাম।

[পোর্টক্যানিং দেখ।]

মাতলাম (দেশজ) মাতালের কাধ।

মাতলি (পুং) মতিং মাতীতি মা-ক, পৃথোদরাদিত্যং সাধু বা মতলতাপত্যং পুমান্ মতল (অত ইঞ্। পা ৪।১।১৪) ইতি ইঞ্। ইত্সমারথি।

“মতল্লিলোকরাজন্ত মাতলিনাম সারথিঃ।

ততৈকৈব কুলে কথ্য রূপতো লোকবিশ্রুতা ॥”

(ভারত ৫।১৭।১১)

মাতলী (পুং) বেদোক্ত যম ও পিতৃ সহ উদ্ভব দেবভেদ।

মাতলায় (জি) মাতলা সম্বন্ধীয়।

মাতবচস (পুং) মতবচার গোত্রাপত্য।

মাতবর (দেশজ) প্রধান, মাতৃগণ্যব্যক্তি, প্রজা বা গ্রামের মধ্যে বাহ্যিক সম্বন্ধ, তাহাদিগকে মোড়ল বা মাতবর কহে।

মাতা (স্ত্রী) মান্যতে পূজ্যতে ইতি মান পূজায়াং তন্ ততটাপি নিপাতনাং সাধুঃ। জননী। [মাতৃ দেখ।]

“বিশেষতঃ বিশেষমাভ্যাং চতিকাং প্রণমামহেম্।”

(শিবরহস্তে দুর্গাত্তব্)

মাতান (দেশজ) ১ মতকরণ। ২ মতকোভোলন।

মাতান (মার্ত্তণ্ড), কান্দীর রাজ্যের অন্তর্গত একটি ভগ্ন

মন্দির। কান্দীর উপত্যকার অপরবর্তী একটি শৈলশৃঙ্গের অধিত্যকাদেশে স্থাপিত। অক্ষা° ৩৩°৪২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২১' পূঃ। প্রবাদ, এই মন্দির-মন্দিরকে পূর্বকালে একটি ধনজনপূর্ণ মহানমুন্দিশালী নগরী বিদ্যমান ছিল। ইহাই রাজতরঙ্গিনীবর্ণিত (অঃ।৪৩২) রামপুরস্বামীর মন্দির।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই মন্দিরের গঠন ও শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইরাছেন। ডাঃ কানিংহামের মতে ৩৭০ খৃষ্টাব্দে উহার নির্মাণকার্য সমাধা হয়। এই মন্দিরমন্দির স্বর্গা-উপাসনার প্রধান স্থান। হুগেল সাহেব বলেন, উহা পাণ্ডু-বংশধরগণের অক্ষরকীর্তি এবং উহা খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্বে নির্মিত হইরাছে। কাণ্ডেন বেটিসের অসুমান, একুপ সূচক-কীর্তি সত্যজাতির বিদিত পৃথিবীর অপর কোন অংশেই দেখা যায় না।

মন্দিরী কান্দীর সৌন্দর্য্য পূর্ণ। ইসলামাবাদ নগর ও কান্দীর উপত্যকার সীমান্তশৈলের মধ্যবর্তী অধিত্যকা-কূলের পশ্চিম সীমার এখনও এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টি-গোচর হয়। ইহার মধ্যস্থিত সূচক অট্টালিকা বাতীত চতু-শার্শে স্তম্ভশ্রেণীসম্বিত ২২০ x ১৪২ ফিট বারাগা আছে। এখনও সেই প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনস্বরূপ এখানে কষ্টি পাথরের বৃহৎ প্রতিমূর্তি ও কারুকার্যযুক্ত প্রস্তরস্তম্ভাদি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরপার্শ্বে একটি বিখ্যাত ও পবিত্র সলিলবাহী প্রস্তবণ আছে।

মাতাপিতরৌ (পুং) মাতা চ পিতা চ (আনন্ড-স্বতো দ্বন্দ্ব)। পা ৬।৩২৫) ইত্যনুগাদেশঃ। জননী ও জনক, মা ও বাপ। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। পর্যায়—পিতরৌ, মাতরপিতরৌ তাতজনরিত্রৌ। (অমর ভরত)

মাতাপুত্র (পুং) মা ও ছেলে, চলিত পো-পোয়াতি।

মাতাভাঙ্গা, (হাউলী), গঙ্গানদীর একটি শাখা। জলঙ্গী নদীর ৫ কোশ দক্ষিণে দক্ষিণপূর্বাভিমুখে কৃষ্ণগঙ্গা ও কৃষ্ণ-নগরের মন্দির দিয়া প্রবাহিত হইরাছে।

ভৈরবনদের মুখ হইতে ২০ কোশ দক্ষিণে মহেশকুণ্ড নামক স্থান হইতে মাতাভাঙ্গার একটি শাখা ৪০ মাইল পর্যন্ত হাউলী বা কুমারনদ নামে প্রবাহিত হইয়া পাক্সাগী নাম ধারণপূর্বক পূর্বমুখে স্বন্দরবনভিমুখে গিয়াছে এবং অপর একটি শাখা চূর্ণী নামে চাকদহের (চক্রদহ) নিকট ভাগীরথীগর্ভে মিলিত হইরাছে।

এই নদী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গত বৎসরের মধ্যে ইহার গতি অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কাটিকাটা নদী ইহার জলে পুষ্টকলেবরা হইয়া গড়াই নদীতে

মিলিত হইত। কাটিকাটা মন্দির আসিলে কুমারনদের পাক্সাগী শাখার মুখ বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গেই জলরাশি তদন্ত দিয়া নিঃসৃত হইতে থাকে। বর্ষাকালে ইহার কলেবর বর্ধিত হয়, তখন পণ্যব্যবাহী বড় বড় নৌকা ও টীমার ইহার বক্ষ দিয়া গমনাগমন করিতে পারে।

মাতামহ (পুং) মাতুঃ পিতা (পিতৃব্যমাতুলমাতামহপিতা-মহাঃ। পা ৪।২।৩৩) ইতি ডামহচ্ নিপাতিতচ। মাতার পিতা। মাতামহের মৃত্যু হইলে দৌহিত্রের তিন দিন অশৌচ হয়।

“মাতামহানাং মরণে ত্রিরাত্রঃ শ্রাদশৌচকম্ ॥” (তুচ্ছিতব্য)

যে স্থলে পুত্রাদি না থাকে, সেখানে শ্রাদ্ধাধিকার-নিয়মাসু-সারে দ্বিহিতা শ্রাদ্ধাধিকারিণী হয়। তথায় দৌহিত্র ধনাধিকারী। কিন্তু বতদিন দ্বিহিতা জীবিতা থাকে, ততদিন ধন বিভাগ হইবে না। অস্বাধিকারে দ্বিহিতাই অধিকারিণী থাকে, দ্বিহিতার অভাব হইলে দৌহিত্র শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়া থাকে।\*

মাতামহী (স্ত্রী) মাতামহস্ত পত্নীতি (পুংবোগাদাধ্যায়াঃ। পা ৪।১।৪৮) ইতি ভীষ্। মাতামহপত্নী, মাতৃমাতা, চলিত আই। মাতামহী মাতৃতুল্য-পুত্রনীয়া।

“মাতামহী মাতৃমাতা মাতৃতুল্যা চ পুঞ্জিতা।

প্রমাতামহীতি বিখ্যাতা প্রমাতামহকামিনী ॥

বৃদ্ধপ্রমাতামহী জ্ঞেয়া তৎপিতৃঃ কামিনী তথা ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুং ব্রহ্ম ৭০ ১০ অ০)

মাতামহীর মৃত্যু হইলে দৌহিত্রের পক্ষিণী অশৌচ হয়। দুই দিন ও একরাত্রির নাম পক্ষিণী।

“মাতুলে যন্তরে মৈত্রে শুরৌ গুরুজনাসু চ।

অশৌচঃ পক্ষিণীং রাজিঃ মৃত্যু মাতামহী বদি ॥”

(তুচ্ছিতব্য)

মাতামহী ও দ্বিহিতার অভাবে দৌহিত্র শ্রাদ্ধাধিকারী। মাতামহীর যৌতুক ভিন্ন ধনে পৌত্র পর্যন্তের অভাবে দৌহিত্রের অধিকার, অর্থাৎ পুত্র বা পৌত্র না থাকিলে দৌহিত্র অধিকারী হইবে। মাতামহীর যৌতুকধন হইলে পুত্রভাবেই দৌহিত্র প্রাপ্ত হইবে।

“মাতামহা অবৌতুকধনে পৌত্রপর্যন্তভাবে দৌহিত্রাভা-ধিকারঃ, যৌতুকধনে তু পুত্রপর্যন্তভাবে দৌহিত্রাধিকারঃ,

\* “মাতামহানাং দৌহিত্রাঃ গুরুভ্যহমি চাপরে।

তে চ তেবাঃ একুর্কন্তি যিত্যেহহনি সর্বণা ॥” (তুচ্ছিতব্য)

“দ্বিহিতৃপর্যন্তভাবে তস্য ধনে দৌহিত্রাধিকারঃ—

পৌত্রদৌহিত্রয়ো লোকে বিশেষোনাতি ধর্মতঃ।

তয়োহি মাতাপিতরৌ সঙ্কতো তস্য বেহন্তঃ ॥” (দায়ভাগ)

যথা—

‘দৌহিত্রোহপি হমুদ্রেনঃ সস্তারয়তি পৌত্রবৎ’ ইতি মমু-  
বচনে দৌহিত্রে পৌত্রধর্ম্মাভিদেশাৎ পুত্রেন পরিণীত হুহিতু-  
বর্ধাদ্ বাধকপুত্রেন বাধ্যহুহিতুপুত্রবাধ্যস্ত্রায্যাত্যৎ” (দায়তত্ত্ব)

মাতামহীয় (ত্রি) মাতামহসম্বন্ধীয়।

মাতামুড়া, চট্টগ্রামের পার্বত্যপ্রদেশে প্রবাহিত একটি নদী।  
আরাকান ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী পর্বতমালার সঙ্কু (শঙ্কু?)  
নদীর উৎপত্তিস্থানের সন্নিহিত হইতে উৎখিত হইয়া উভয়ে  
পরস্পরের সমান্তরাল ভাবে পর্বততট বিধৌত করিয়া বঙ্গোপ-  
সাগরে মিলিত হইয়াছে।

মাতাল (দেশজ) মত্ত, বাহার। মদ খাইয়া মত্ত হয়।  
মত্তপায়ী, মত্ততাবিশিষ্ট। ২ প্রদান, প্রেষ্ঠ।

“এত বলি তাড়াতাড়ি চলিল বাহির বাড়ী  
মাগী যেন মাতাল মহিষী।” (অন্নদামঙ্গল)

মাতালী (স্ত্রী) মাতৃ: আলী পৃষোদরাদিহাং ঋকারলোপ:  
যদা মাতায়া: আলী। মাতার সখী। (শব্দমালা)

মাতি (স্ত্রী) ১ পরিমাণ। ২ প্রকৃত অবগতি।

মাতুর (মাতৃশব্দজ) মাতা।

মাতুল (পুং) মাতুল্লাতা (পিতৃব্যমাতুলেতি। পা ৪। ২। ৩৬)  
ইতি নিপাতাতে তত্র ‘মাতুল্ল’ ইতি ব্যক্তিকাং ডুলচ্।  
মাতুল্লাতা, পিতৃশালক, চলিত মামা। মাতুলের মরণে ভাগি-  
নেয়ের পক্ষিণী অশোচ হয়।

“মাতুলে পক্ষিণীং রাজিঃ শিষ্যত্ৰিধাঙ্কবেষু চ।” (শুক্ৰিতত্ত্ব)

মাতাতে খায়াদিনা মীয়তে মাত-বাহলকাং ডুলচ্।  
২ ব্রীহিভেদ। ৩ মদনক্রম। মাদয়তীতি মদ-গিচ্ বাহ-  
লকাং ডলচ্, পৃষোদরাদিহাদস্ত তকারতঃ। ৩ ধুস্তুর।  
(মেদিনী) মা বিজ্ঞতে তুলা তুলনা যন্ত। ৪ সর্পবিশেষ। (হেম)

মাতুলক (পুং) মাতুল-স্বার্থে কন্। ১ ধুস্তুরবৃক্ষ। (রাজনিং)  
২ মাতুল।

মাতুলক্রম (পুং) ১ ধুস্তুরবৃক্ষ। ২ শাল্মলী বৃক্ষ। (বৈজ্ঞকনিং)

মাতুলপুত্রক (পুং) মাতুলস্ত পুত্রকঃ। ১ ধুস্তুরফল।  
(অমর) ২ মাতুলতনয়। (মেদিনী)

মাতুলপুষ্প (স্ত্রী) ধুস্তুরপুষ্প। (বৈজ্ঞকনিং)

মাতুলা, মাতুলানী (স্ত্রী) মাতুল-টাপ্, মাতুলস্ত স্ত্রী  
(ইন্দ্রবরুণেতি। পা ৪। ১। ৪২) ইতি ভীষ্ আহুচ্ চ।  
মাতুলপত্নী, চলিত মামী। মাতুলানী-মরণে ভাগিনেয়ের  
পক্ষিণী অশোচ হয়।

“সন্তরয়োর্ভগিনীঞ্চ মাতুলাভ্যঞ্চ মাতুলে।

পিত্রোঃ স্বসরি তবচ্চ পক্ষিণীঃ কপরেম্মিশাম্॥” (শুক্ৰিতত্ত্ব)

XIV

মা—নিষেধে তুলাং নয়তি প্রাপ্নোতীতি নী-কিপ্ ভীষ্।  
১ মাতুলানী। ২ কলার। ৩ ভঙ্গ। (ভাবপ্রাণ) ৪ শল। (হেম)  
৫ প্রিয়স্ববৃক্ষ। (শব্দচো)

মাতুলাহি (পুং) মা তুলাতেহসৌ ইতি তুল-মূলবিভূ-  
জাদিহাং ক, মাতুলশাসৌ অহিচ্। ১ সর্পবিশেষ, চলিত  
মানুয়াপ বা কয়ুয়াটী। পর্যায়—মানুধান। (অমর) এই  
সর্প খট্টাকৃতি, আরতদেহ, দীর্ঘলানুল ও চতুষ্পাদ। (মধু-  
মাধবাদি)

মাতুলি (পুং) মাতলি।

মাতুলী (স্ত্রী) মাতুলস্ত স্ত্রী মাতুল-(ইন্দ্রবরুণভবেতি। পা  
৪। ১। ৪২) ইতি ভীষ্, ‘মাতুলোপাধ্যায়রোরাহুগ্’ ইতি  
বারিকোভে: পক্ষে আহুগভাবঃ। মাতুলপত্নী, মামী। ২ ভঙ্গ।

মাতুলুঙ্গ (ক) (পুং) মাতুলুঙ্গ-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্।  
(Citrus medica) ছোলঙ্গবৃক্ষ, চলিত টাবালবুর গাছ।  
হিন্দী—বীজোরা। মহারাষ্ট্র—মাহলিঙ্গ। কলিঙ্গ—মালধা।  
তেলগু—মাদোপল পুট্টেহ। উৎকল—কলবা। পর্যায়—ফলপুর,  
বীজপুর, রুচক, মাতুলুঙ্গ, স্বফল, ফলপুরক, লুঙ্গ, পুরক,  
পুর, বীজপূর্ণ, অম্বুকেশর। (রত্নমালা) গুণ—কৃদ্য, অন্ন,  
লঘু, অগ্নিদীপক, আখ্যান, গুণ্য, প্রীহা, ক্রোধোপ ও উদাবর্ত-  
নাশক। বিবন্ধ, হিকা, শূল ও ছদ্মিরোগে প্রশস্ত। ইহার  
কণ্ডুপিত্ত, বৃজ্জর, কফপিত্তনাশক। ইহার মাংসগুণ শ্বা-  
শতল, গুরু ও বায়ুপিত্তনাশক। (রাজবং)

মাতুলুঙ্গশিফা (স্ত্রী) মাতুলুঙ্গমূল, ছোলঙ্গ লেবুর মূল।

মাতুলুঙ্গা (স্ত্রী) মাতুলুঙ্গ-টাপ্। মধুকুটী।

“মাতুলুঙ্গা স্নগন্ধাঢ্যা গিরিজা পুতিপুঞ্জিকা।

অতান্না দেবদত্তী চ সা কচিন্নধুকুটী॥”

(রত্নমালা)

মাতুলুঙ্গিকা (স্ত্রী) মাতুলুঙ্গ-সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্, অকার-  
স্তোতঃ। বনবীজপুর। (রাজনিং)

মাতুলেয় (পুং) মাতুল-পুত্র, মামাত ভাই। (স্ত্রী) মাতুলেয়ী,  
মামাত ভগিনী।

মাতুল্য (স্ত্রী) মাতুলালয়।

মাতুলস্ব (স্ত্রী) মাতৃ: স্বসা। মাতার ভগিনী। [মাতৃস্ব দেখ]

মাতৃ (স্ত্রী) মাতৃতে পূজ্যতে যা সা মান-পূজ্যায়াং নার্মীতি ভাতৃ  
ইতি ভরতঃ, যদা (নপুংনেষ্ট্ৰে বৃষ্টেহোতৃপোতৃভাতৃজামাতৃমাতৃ-  
পিতৃহুহিতু। উপ্ ২। ৯৬) ইতি তৃচ্ নিপাতিতশ্চ, স্বস্রা-  
দিহাং টাপ্ নিষেধঃ। জননী, চলিত মা, পর্য়ায়—জনয়িত্রী,  
প্রম, সবিত্রী, জনি, জনী, জনিত্রী, অকা, অধা, অধিকা,  
অঘালিকা, মাতৃকা। (জটোথর) বোড়শ প্রকার মাতা—

“স্বনদাত্রী গৰ্ভদাত্রী ভক্ষ্যদাত্রী গুরুপ্রিয়া ।  
অভীষ্টদেবপত্নী চ পিতৃঃ পত্নী চ কল্পক্সা ॥  
মার্তজা বা ভগিনী পুত্রপত্নী প্রিয়া প্রমুঃ ।  
মাতৃমাতা পিতৃমাতা সোদরস্ত প্রিয়া তথা ॥  
মাতুঃ পিতৃশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈব চ ।  
জনানাং বেদবিহিতা মাতরঃ ষোড়শ সূতাঃ ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্তপুং গণপতিখণ্ডঃ ১৫ অং )

ভক্তদায়িনী, গৰ্ভদায়িনী, ভক্ষ্যদায়িনী, গুরুপত্নী, অভীষ্ট-  
দেবপত্নী, পিতৃপত্নী, পিতৃক্সা, সোদরা ভগিনী, পুত্রপত্নী,  
প্রিয়াপ্রমু ( শাশুড়ী ), মাতৃমাতা, পিতৃমাতা, সোদর ভ্রাতৃবধূ,  
মাতা ও পিতার ভগিনী এবং মাতুলানী এই ষোলজন মাতৃ-  
পদবাচ্য।

পিতা অপেক্ষা মাতা পূজনীয়, মাতা গৰ্ভধারণ ও পোষণ  
করেন বলিয়া তিনি অতিশয় গুরু।

“জনকো জন্মদাতৃষ্ণাং পালনাক্ত পিতা সূতঃ ।  
গরীয়ান্ জন্মদাতৃশ্চ যোহন্নদাতা পিতা মুনৈ ! ॥  
বিনারায়ণরো দেহো ন মিত্যঃ পিতুরুত্তমঃ ॥  
তয়োঃ শতশুভে মাতা পূজ্যা মাতা চ বন্দিতা ।  
গৰ্ভধারণপোষণাত্যাং সা চ ভাত্যাং পরীক্ষণী ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্তপুং গণপতিখণ্ডঃ ৪০ অং )

ঐহিকে মাতৃসম্বোধন করা যায়, তিনিও মাতার তায়  
পূজনীয়। তাঁহার সহিত শূদ্রেরে কালসুত্নরক হয়।

“মাতরিত্যেব শব্দেন যাক্ সন্তাষতে নরঃ ।  
স। মাতৃতুল্যা সত্যেন ধর্ম্মসাক্ষী সতামপি ॥  
তয়া সহিতশূদ্রে কাণস্যত্রঃ প্রয়াতি সঃ ।  
তত্র ঘোরৈ বসত্যেব যাবদৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ।  
প্রারশ্চিত্তং পাপিনশ্চ তত্ত্ব নৈব শ্রুতো শ্রুতম্ ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্তপুং ব্রহ্মখণ্ডঃ ১০ অং )

২ শিবের পরিবারবিশেষ। দেবগণ যখন অম্বরনিধন  
করেন, তখন একাদির স্বেদ হইতে এই সকল মাতৃগণের  
উৎপত্তি হয়। অষ্টমাতৃগণ যথা—

“ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী বারাহী বৈষ্ণবী তথা ।  
কৌমারী চৈব চামুণ্ডা চর্কিকেত্যষ্টমাতরঃ ॥”  
সমুবিধা যথা—  
“ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী চৈন্দ্রী রৌদ্রী বারাহিকী তথা ।  
কৌবেরী চৈব কৌমারী মাতরঃ সমু কীর্তিতাঃ ॥”

( অমরটীকা ভরত )

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা,  
ও চর্কিকা এই অষ্টমাতা। ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, রৌদ্রী,

বারাহিকা, কৌবেরী ও কৌমারী এই সাতজন সমুদ্রমাতৃকা  
এবং ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নরসিংহিকা, কৌমারী,  
মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা ও চর্কিকা এই নয়জনও মাতৃকা নামে  
কথিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মী, ব্রহ্মার স্বেদনির্গমে উৎপন্ন হন।  
এইরূপে তত্ত্বনামীয় দেবতাগণের স্বেদ হইতে ঐ সকল  
মাতৃকার উৎপত্তি হইয়াছে। দুর্গাপূজার সময় এই সকল  
মাতৃকার পূজা করা হইয়া থাকে।

গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ দেবতাকে ষোড়শমাতৃকা কহে।  
আত্মাদয়িক শ্রদ্ধ ও বষ্টীপূজার এই ষোড়শ মাতৃকার পূজা  
করিতে হয়। ষোড়শমাতৃকা যথা—

“গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া ।

দেবদেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ ॥

শান্তিঃ পুষ্টিশ্চ তিস্তিষ্টিরাশ্চ দেবতয়া সহ ।

আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যোহন্তে চ কুলদেবতা ॥”

( শ্রাদ্ধতত্ত্বত বহুচর্চগৃহপরিশিষ্ট )

গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা,  
স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, তিস্তি, তৃষ্টি, আশ্বদেবতা ও কুলদেবতা  
এই ষোড়শ মাতৃকা। এই ষোড়শ মাতৃকাপূজার প্রথমে  
বিনায়ক এবং অন্তে কুলদেবতার পূজা করিতে হয়।

বৈষ্ণবপূজা-মাতৃগণ—

“বদ্র মাতৃগণাঃ পূজ্যাত্তত্র ছেতাঃ প্রপূজয়েৎ ।

সদা ভাগবতী পৌর্ণমাসী পদ্মাস্তরঙ্গিকা ॥

গঙ্গা কলিন্দভনয়া গোপী বৃন্দাবতী তথা ।

গায়ত্রী তুলসী বাণী পৃথিবী গোশ্চ বৈষ্ণবী ॥

ত্রীশশোদা দেবহুতী দৈবকী রোহিণীমুখাঃ ।

ত্রীসতা দ্রোপদী কুন্তী হপরে যে মহর্ষয়ঃ ।

কল্মষাদ্যাত্তথা চাষ্ট মহিষ্যোযাশ্চ তা অপি ॥”

( পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডঃ ৭৮ অং )

ভাগবতী পৌর্ণমাসী, পদ্মা, অন্তরঙ্গিকা, গঙ্গা, কলিন্দভনয়া,  
গোপী, বৃন্দাবতী, গায়ত্রী, তুলসী, পৃথিবী, গো, বৈষ্ণবী,  
ত্রীশশোদা, দেবহুতী, রোহিণী, ত্রীসতা, দ্রোপদী, কুন্তী এবং  
কল্মষী প্রভৃতি অষ্টমহিষা ইহারা সকলেই বৈষ্ণবীমাতৃগণ।

আশ্বমাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী এবং  
পৃথিবী এই সাতজনকে মাতা কহে। মাতা মহাগুরু।

২ গাভী। ৩ ভূমি। ( মেদিনী )

“বদ্রকৃষ্ণিষ্ঠাদ্রবিশেষে ধতাদ্ধবাক্ষ্যো মাতুরম্যা উপস্থে”  
( নিরুক্ত ৮। ৩ ) ‘মাতুঃ অন্তাঃ পৃথিব্যাঃ’ ( টীকা দুর্গাচাৰ্য্য )  
৪ বিভূতি। ( শব্দরং ) ৫ লক্ষ্মী ( হেম ) ৬ দেবতী। ( অজয়-  
পাল ) ৭ আধুকণী। ৮ ইন্দ্রবাক্ষী। ৯ মহাপ্রাণী।

১০ কটামাংসী। (রাজনি.) (ত্রি) ১১ পরিমাণকর্তা।

১২ নির্মাণকর্তা।

“অভেদ মাতৃঃ সর্বনেষু সন্তোমহঃ” (শুক ১।৩১।৭)

‘মাতৃঃ বৃষ্টিধারেণ সকলতঃ জগতো নির্মাতৃঃ’ (সারণ)

মাতৃক (ত্রি) ১ মাতাসম্বন্ধীয়। ২ মাতুল।

মাতৃকচ্ছিদ (পুং) মাতৃঃ কং শিরস্চিন্তীতি ছিদ-ক, পিত্রাদেশাৎ মাতৃশিরস্ছদনাদত্ব তথাৎ। পরশুরাম।

মাতৃকা (স্ত্রী) মাতের মাতৃ (ইবে প্রতিকৃতি)। পা ৫।৩। ৯৬) ইতি কন-টাপ্। ১ মাতৃকা।

“রজ্জুংসঙ্গ-চ্ছদনে বালপীড়। রাজোমাতৃঃ পীড়নং মাতৃকায়াঃ।” (বৃহৎসংহিতা ৪৩।৬৬) মাতৈব মাতৃ-স্বার্থে কনু। ২ মাতা। ৩ দেবাত্তেদ।

মাতৃকাগণের উৎপত্তি লক্ষ্মে বরাহপুরাণে লিখিত আছে— পূর্বে রুদ্রদেব স্বীয় ত্রিশূলাঘাতে অন্ধকাসুরের দেহ ভেদ করেন। কিন্তু তাহাতে তাহার জীবন বিনষ্ট হয় নাই। অধিকন্তু তদীয় দেহ হইতে যে সকল রক্ত ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল, সেই রক্তরাশি হইতে তখন অসংখ্য অন্ধকাসুরের সৃষ্টি হইল। রুদ্রদেব এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া নিজ ত্রিশূলাগ্র দ্বারা অবিলম্বে অন্ধকাসুরকে গ্রহণপূর্বক রণাঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অত্যাশ্চর্য্য যে সকল অন্ধকাসুর সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাহাদিগকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অজস্র দৈত্যদেহ নিপাতিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও অসুরবংশ সমূলে নির্মূল হইল না। ক্রমাগত তাহাদিগের নূতন নূতন দেহ সৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন রুদ্র অত্যধিক রুষ্ট হইলেন। ক্রোধবশতঃ তাহার বদনমণ্ডল হইতে এক বহিঃশিখা বহির্গত হইল। ঐ বহিঃশিখা তখন এক দেবীৰূপে পরিণত হইলেন। দেবীর নাম হইল যোগেশ্বরী। এই যোগেশ্বরী প্রথম ও প্রধান মাতৃকারূপে অভিহিতা। ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কার্তিকেশ্বর, যম ও বরাহরূপী বিষ্ণু ইহার প্রত্যেকে এক একজন মাতৃকা-মূর্তি সৃষ্টি করিলেন। সর্বসমেত আটটি মাতৃকার উৎপত্তি হইল।

দেহের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, পৈশুণ্ড ও অহুয়া এই আটটি অষ্ট-মাতৃকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কাম যোগেশ্বরী, ক্রোধ মাহেশ্বরী, লোভ বৈষ্ণবী, মদ ব্রাহ্মণী, মোহ কোমারী, মাৎসর্য্য ঐশ্রাণী, পৈশুণ্ড দণ্ডধারিণী এবং অহুয়া বারাহী নামে খ্যাত। এই অষ্ট মাতৃকার উৎপত্তি হইলে, তখন ইহাদিগেরই সমবেত চেষ্টায় অবশিষ্ট অসুরদল নিপাতিত হইল। এই মাতৃকাগণ তখন হইতে দেব মনুষ্য উভয় লোকেই পূজা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

বিষ আহার করিয়া এই মাতৃকাগণের পূজা করিলে নরগণ অন্যাসে সর্বাভীষ্ট লাভ করিতে পারে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে, দৈত্যপতি ভর্তুকির সেনানীগণের সহিত যখন চণ্ডিকা দেবীর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন ব্রহ্মা, মাহেশ্বর, কার্তিকেশ্বর, বিষ্ণু ও ইন্দ্র ইহাদিগের স্ব স্ব শক্তি সমবেত হইয়া নিজ নিজ বাহন, ভূষণ ও আয়ুধাদিসহ অসুর-বিনাশার্থ সমরক্ষেত্রে যোগদান করেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী মাহেশ্বর-শক্তি, মাহেশ্বরী কার্তিকেশ্বর-শক্তি কোমারী, বিষ্ণুশক্তি বারাহী এবং ইন্দ্রশক্তি ঐশ্রাণী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই সমবেত শক্তিপুঞ্জ ও মাতৃকা-নামে প্রসিদ্ধ।

৪ বর্ণমালা। (মেদিনী) ৫ করণ। ৬ ঐবাদেরশব্দ ৮টি শিরাভেদ। ৭ স্বর। ৮ উপমাতা। (হেম)

মাতৃকাকুল (পুং) শিশুদিগের শুভজ ব্রণবিশেষ। (বাডট উত্তরত ২ অ.)

মাতৃকা-শ্রাস, ময় প্রয়োগরূপ শ্রাসভেদ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, ‘মাতৃকাভ্যাসের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর, যাহার অমুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য দেবদ্ব্যপ্রাপ্ত হয় যাক্। ব্রহ্মাণী, আদি দেবী মাতৃকা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত সমুদ্র স্বর ও ব্যঞ্জন তাহাদের মন্ত্র, ইহার সর্লকাম প্রদান করেন। মাতৃকাদিগের খবি একা, হৃদঃ গায়ত্রী এবং দেবতা সরস্বতী। শরীর শুদ্ধি আদি সকল প্রকার কাম, অর্থের সাধন-কায্যে এবং মন্ত্রদিগের ন্যূনতাপ্রবণে ইহার প্রয়োগ। অকারের সহিত ককারাদি বে প্রথম বর্ণ, তাহার অন্তর্গত অক্ষর সকলকে চন্দ্রবিন্দুর সাহিত যুক্ত করিয়া তদনন্তর আকার উচ্চারণপূর্বক ‘অমুষ্ঠাভ্যাং নমঃ’ এই বলিয়া প্রথম অমুষ্ঠদ্বয়ে মাতৃকাশ্রাস করিবে। অনন্তর অপর অপর বর্ণ স্বরের সাহিত সমাক্ প্রকারে চন্দ্রবিন্দুযোগ করিয়া শ্রাস করিবে। অর্থাৎ তজ্জনী দ্বয়ে প্রথম হ্রস্ব হংকার, তাহার পর চবর্ণ এবং অন্তে দীর্ঘ ঙ্কার চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত করিয়া ‘তজ্জনীভ্যাং স্বাহা’ বলিয়া পূর্বের মত শ্রাস করিবে। মধ্যমাদ্বয়ে হ্রস্ব উকার, তবর্ণ ও দীর্ঘ উকার যথাক্রমে চন্দ্রবিন্দুযোগে উচ্চারণ করিয়া ‘মধ্যমভ্যাং বযট্’ এই বলিয়া শ্রাস করিবে। অনামিকায্যে এ, টবর্ণ এবং ঐকার যথাক্রমে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিয়া ‘অনামিকাভ্যাং হ্রঃ ফট্’ উচ্চারণপূর্বক শ্রাস করিবে। কনিষ্ঠায্যে ওকার, পবর্ণ এবং ঔকার ঐরূপ বিন্দুযুক্ত করিয়া ‘কনিষ্ঠাভ্যাং বোষট্’ এই উচ্চারণপূর্বক কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিজ্ঞাস করিবে। করতল ও তাহার পৃষ্ঠদ্বয়ে অং, য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ, অবশেষে অঃ পূর্ববৎ উচ্চারণ করিয়া ‘অঙ্গার ফট্’ বলিয়া শ্রাস করিবে। অঙ্গভ্যাসের শেষভাগে ‘বযট্’ এই শব্দের প্রয়োগ করিবে। স্বম্বাদি



বড়কে পূর্ববৎ যথাক্রমে অঙ্কুষ্ঠাদিতে উক্ত ছয় ছয়টি অক্ষর দ্বারা স্থাস করিবে। এইরূপ পাদ, জাহ্নু, সর্পি, গুহ, পার্শ্ব এবং বস্তিতে পূর্বোক্ত ক্রমে স্থাস করিবে তৎপরে বাহুদ্বয়, কর-তলদ্বয়, কোটিদ্বয়, নাভি, জঠর ও স্তনদ্বয়ে পূর্বোক্ত রীতিতে স্থাস করিবে। বক্তৃ, চিবুক, গণ্ড, কর্ণদ্বয়, ললাট, অঙ্গ এবং কক্ষ এই সকল অঙ্গেও পূর্বের মত স্থাস করিবে রোমকূপে, এক্ষরকে, অপানদেশে, জম্বাযুগলে, নখে, পাদে এবং কর তলেও পূর্বের মত স্থাস করিবে। যে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সকল প্রকার যজ্ঞকার্যে ও পূজার এইরূপ মাতৃকাবর্ণের স্থাস করে, সে পবিত্র এবং কর্মক্ষম হয়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর কোন স্থানে মিলে না। ইহা সকল প্রকার কামদ, পবিত্র, চতুর্ভুজ-প্রদ ও শুভ। যে ব্যক্তি হৃদয়ে বাগ্বেদভার, ও মন্তকে সমুদায় অক্ষরের ধ্যান করিয়া ক্রমান্বয়ে মাতৃকামন্ত্র সকল তিনবার উচ্চারণ করিয়া জল পান করে, সে বায়ী, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং কবি হয়। পণ্ডিত মনুষ্য প্রথমে চতুর্বিম্বুক্ত স্বর সকলের উচ্চারণ করিবে, তাহার পর কেবল ব্যঞ্জনগুলির পাঠ করিবে। অকারাদি-ক্ষকারান্ত বর্ণের এই-রূপে স্থাস করিয়া করতলে জলগ্রহণপূর্বক অক্ষরসমূহ পাঠ ও ঐ জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রথমে পুরক মন্ত্র দ্বারা ঐ জল পান করিবে, তাহার পর রেচক দ্বারা পান করিবে। এইরূপে একবার বা তিনবার পুরক, কুস্তক ও রেচক দ্বারা জল পান করিলে দৃঢ়াঙ্গ, পণ্ডিত এবং পুত্র-পৌত্রযুক্ত হয়। মাতৃকা-মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ত্রিসন্ধা পান করিলে কবিত্ব এবং সকল প্রকার কামনা সিদ্ধ হয়। যে পুরক, কুস্তক ও রেচক দ্বারা মাতৃকামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল সর্বদা পান করে, সে সকল প্রকার কাম, পুত্র, পৌত্র এবং সমৃদ্ধি লাভ করে এবং ইহলোকে মহাকবি, বলবান্ এবং সত্যবিক্রম হয়। এমন কি সর্বত্র ছলিত হইয়া অস্ত্রে মোক্ষ লাভ করে। মাতৃকা-মন্ত্রের সাধনা করিলে রাজা, রাজপুত্র বা রাজভাৰ্য্যা বশীভূত হয়। স্থাস ক্রমে যে বর্ণক্রম উক্ত হইয়াছে, ইরূপ অক্ষর ক্রমে জলপান করিবে। দেবতা, ঋষি বা রাক্ষসদিগের যে সকল মন্ত্র, ঐ সকল মন্ত্রই মাতৃকামন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা সর্বমন্ত্রময়, সর্বদেবময় এবং চতুর্ভুজপ্রদায়ক।

( কালিকাপুরাণ ৭৩ অধ্যায় )

মাতৃকাস্থাসের প্রয়োগ—“অস্ত্র মাতৃকামন্ত্রস্ত্র একাধ্বনি গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাস্বরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ” শব্দেয়া মাতৃকাস্থাসে বিনিয়োগঃ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্তকে ও ত্র্যক্ষে ঋষয়ে নমঃ। মুখে ও গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে ও মাতৃকাস্বরস্বতৌ দেবতাতৈ নমঃ। শুভে ও

ব্যঞ্জনেভ্যো বীজভ্যো নমঃ। পাদদ্বয়ে ও স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঙং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং জম্। ঔং পং ফং বং ভং মং ঐং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং নং যং অং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই প্রকারে করস্থাস করিয়া পরে অং কং ঐ আং হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গস্থাস করিবে।

“অং আং মধ্যে কবর্গস্ত ইং ঙং মধ্যে চ বর্গকম্।

উং উং মধ্যে টবর্গস্ত এং ঐং মধ্যে তবর্গকম্ ॥

ঔং ঐং মধ্যে পবর্গস্ত বিম্বুক্তং ঋসেং প্রিয়ে।

অনুস্বারবিসর্গান্তবর্ণবর্ণৌ সলক্ষকৌ ॥

হৃদয়ঞ্চ শিরোদেবী! শিখা কবচকং তথা।

নেত্রমন্ত্রং ঋসেং ডেহস্তং নমঃ স্বাহা ক্রমেণতু ॥

বষট্ হং বৌষড়ন্তঞ্চ ফড়ন্তং যোজয়েৎ প্রিয়ে ॥” (জানার্ণব)

অস্ত্রমাতৃকাস্থাস—বিম্বুক্ত অকারাদি বোড়শ স্বর, কঠ-মূলস্থিত বোড়শদল কমলে স্থাস করিবে। বিম্বুক্ত ককারাদি দ্বাদশ বর্ণ সবিম্বু দ্বাদশদল জুংপদ্যে স্থাস করিবে। সবিম্বু উকারাদি দশ বর্ণ, নাভিস্থিত দশদল পদ্যে স্থাস করিবে। বকারাদি ষড়্ বর্ণ, বিম্বুসংযুক্ত করিয়া লিঙ্গমূলে ষড়্ দল কমলে স্থাস করিবে। বিম্বুক্ত বকারাদি চারি বর্ণ, মূলধারে চতুর্দল পদ্যে স্থাস করিবে। হ ক এই বর্ণদ্বয় বিম্বুক্ত করিয়া ক্র মধ্যস্থ দ্বিদলপদ্য মধ্যে স্থাস করিবে।

বাহ্যমাতৃকাস্থাস—

“পঞ্চাশ্লিপিভির্কিতভক্তমুখদোঃপদ্মধ্য বক্ষঃস্থলাং,

ভাস্বম্মৌলিনিবদ্ধচক্রসকলামাপীনতুঙ্গন্তনীম্।

মুদ্রামক্ষণং স্নধ্যাচ্যকলসং বিভ্রাঞ্চ হস্তাশুজৈ-

বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্বেদেবতামাশ্রয়ে ॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া স্থাস করিবে। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে, যথা—ললাটে অং নমঃ, মুখ বৃত্তে আং নমঃ, চক্ষুঃদ্বয়ে ইং ঙং, কর্ণদ্বয়ে উং উং, নাসিকাধ্বয়ে ঋং ঋং, গণ্ডদ্বয়ে ঐং ঐং, ওষ্ঠে এং, অধরে ঐং, উর্দ্ধদন্তে ওং, অধোদন্তে ঔং, ত্র্যক্ষরকে, অং, মুখে অং, দক্ষিণবাহুমূলে কং, কূর্ণরে থং, মণিবন্ধে গং, অঙ্গুলি মূলে ঘং, অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঙং, এইরূপে চকারাদি পঞ্চবর্ণ বামবাহু, বাহুমূল, বাহুসন্ধি ও সন্ধির অগ্রভাগে, ট প্রভৃতি পঞ্চবর্ণ দক্ষিণপাদমূল, পাদসন্ধি ও পাদাগ্রে প্রভৃতি পঞ্চবর্ণ বামপাদ, পাদমূল, সাদসন্ধি ও বামপাদাগ্রে, দক্ষিণপার্শ্বে পং, বাম পার্শ্বে ফং, পৃষ্ঠে বং,

নাভিতে ভং, জঠরে মং, হৃদয়ে বং, দক্ষিণবাহুসূলে রং, কঙ্কে  
লং, বামবাহুসূলে বং, হৃদাদি দক্ষিণহস্তে শং, হৃদাদি বাম-  
হস্তে বং, হৃদাদি দক্ষিণপাদে সং, হৃদাদি বামপাদে হং,  
হৃদাদি উদরে লং, হৃদাদি মুখে ক্ষং। এইরূপে সর্ববর্ণের অন্তে  
নমঃ শব্দ উচ্চারণপূর্বক ভ্রাস করিবে।

ভ্রাসে অঙ্গুলিনিয়ম—

অনামিকা এবং মধ্যমা একত্র করিয়া ললাট, তর্জনী,  
মধ্যমা ও অনামিকা মিলিত করিয়া মুখ, বুদ্ধা ও অনামা একত্র  
করিয়া নেত্রদ্বয়, অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণযুগল, কনিষ্ঠা এবং অঙ্গুলি সংহত-  
পূর্বক নাসিকাধর, মধ্যের তিন অঙ্গুলি দ্বারা কণোলদ্বয়, মধ্যমা  
দ্বারা ওষ্ঠদ্বয়, অনামিকা দ্বারা দন্তপংক্তিদ্বয়, মধ্যমা দ্বারা মস্তক,  
অনামিকা ও মধ্যমা একত্র করিয়া মুখ, কনিষ্ঠা অনামিকা  
এবং মধ্যমা মিলিত করিয়া হস্ত, পাদ, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠ ও অঙ্গু-  
লের সহিত উক্ত কনিষ্ঠা অনামিকা এবং মধ্যমা সঞ্চ করিয়া  
নাভিদেশ ও কুক্ষিস্পর্শ করিবে। হৃদয়, অংসদ্বয়, ককূদ,  
হৃদয়ের পূর্বভাগ হইতে হস্ত, পাদ, কৃক্ষি, মুখ, এ সকল হস্ত-  
তলদ্বারা স্পর্শ করিয়া ভ্রাস করিতে হইবে।

“ললাটেহনামিকা মধ্যো বিজ্ঞপ্তমুখপঙ্কজে।

তর্জনী মধ্যমাহনামা বুদ্ধাহনামে চ নেত্রয়োঃ।

অঙ্গুলি কর্ণয়োস্তত্র কনিষ্ঠাঙ্গুলীকো নদোঃ।

মধ্যান্ত্রিঙ্গোণ্ডয়োস্ত মধ্যমাঞ্চোষ্ঠয়োঃসং।

অনামাং দন্তয়োস্তত্র মধ্যমামুত্তমাজ্জকে।

মুখেহনামাঃ মধ্যমাঞ্চ হস্তপাদে চ পার্শ্বয়োঃ।

কনিষ্ঠাহনামিকামধ্যাত্তাত্র পৃষ্ঠে চ বিজ্ঞপ্তেং।

তাঃ সাক্ষীভ্যো নাভিদেহে সর্বাঃ কৃক্ষৌ চ বিজ্ঞপ্তেং॥

হৃদয়ে চ তলং সর্গং অংসয়োস্ত ককূৎস্থলে।

হৃৎপূর্বং হস্তপংক্টিমুখেশু তলমেব চ॥”

বিজ্ঞপ্তের তন্ত্রে লিখিত আছে—বাক্‌সিদ্ধির জন্ত বাগ্-  
ভবাভা, শ্রীবুদ্ধির জন্ত রমাভা, সর্গসিদ্ধির জন্ত হ্রস্বেভা,  
লোক-বশীকরণে কামাভা, এইরূপে ঐকঠাদি ভ্রাস করিলে  
সর্বমন্ত্র প্রসন্ন হয়। (তন্ত্রসার)

মাতৃকাময় (ত্রি) ষোড়শমাতৃকার বীজমন্ত্রযুক্ত।

• মাতৃকায়ন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রোক্ত যন্ত্রবিশেষ।

মাতৃকাবহ (পুং) পটকীট, চলিত পেদো পোকা। (চক্রদত্ত)

মাতৃকেশট (পুং) মাতৃকে কুলে শটতি পুত্ররূপেণ গচ্ছতীতি  
পট-অচ্। মাতুল। (ত্রিকাং)

মাতৃগণ (পুং) শিবের পরিবারবর্গ। [মাতৃশব্দ দেখ।]

মাতৃগন্ধিনী (স্ত্রী) ১ মাতৃনামধারিণী। ২ বিমাতা। ৩ পিতার  
উপপত্নী।

মাতৃগর্ভ (পুং) মাতৃগর্ভঃ। মাতার গর্ভ।

মাতৃগামিন্ (ত্রি) মাতৃ-গম্-গিনি। যে মাতৃগমন করে।

মাতৃগুপ্ত (পুং) রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত একজন কবি।

“নানা দিগন্তরাখ্যাতং গুণবৎসুলভং নৃপম্।

তং কবির্মাতৃগুপ্তাখ্যঃ সত্যাহানহুমাগদং॥”

(রাজতরঙ্গিণী ৩। ১২২)

ইনি রাজা হর্ষবিজয়মাদিত্যের প্রতিপালিত ছিলেন।

পরে কান্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। (রাজতরঙ্গিণী)

ঔচিত্যবিচারচর্চার ইহার রচিত শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাহুদেবকৃত কর্ণরমণরীতে ইনি অলঙ্কারশাস্ত্রের রচয়িতা

বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এতদ্বির ইনি ভরতকৃত নাট্য-

শাস্ত্রের একখানি টীকা রচনা করেন।

মাতৃগ্রাম (পুং) ১ রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত একটা নগর। (রাজ-

তরঙ্গিণী ৮। ২৮৭৭) ২ মাতৃরূপা ক্রীড়াতি গ্রাম।

মাতৃঘাত (পুং) মাতৃহত্যাকারী।

মাতৃঘাতিন্ (ত্রি) মাতরং হন্তি হন-গিনি, হস্ত ঘ।

মাতৃহন্তা, যে মাতাকে হনন করে।

মাতৃঘত্বাক (পুং) ১ মাতৃহন্তা। ২ ইজ্ঞ।

মাতৃঘ্ন (ত্রি) মাতরং হন্তি হন-ক। মাতৃঘাতক।

মাতৃচক্র (ক্লী) ১ জ্যোতিষোক্ত চক্রভেদ। মাতৃগাং চক্রং।

২ মাতৃগণসমূহ, দেবমাতৃগণের একত্রাবস্থান।

মাতৃচেট, গোরালিয়ারয় গোপগিরির সূর্য্যামন্দির-প্রতি-

ষ্ঠাতা। ইনি রাজা মিহিরকুলের রাজত্বের ১৫শ বর্ষে উক্ত

মন্দির নিগ্ৰাণ করেন।

মাতৃতম (ত্রি) মাতৃতুল্য, মাতার সদৃশ। “ন সাগররম্ভো

মাতৃতমাঃ” (শুক ১। ১৫৮। ৫) ‘মাতৃতমা মাতৃবজ্জগতাং হিত-

কারিণ্যঃ আপঃ’ (সায়ণ)

মাতৃতস্ (অব্যং) মাতৃ-পঞ্চমার্থে তসিন্। মাতা হইতে।

“মাতৃতঃ পঞ্চমাদৃক্ পিতৃতঃ সপ্তমাদপি।” (উদাহতৎ)

মাতৃতীর্থ (ক্লী) করতলহিত কনিষ্ঠাঙ্গুলের নিম্নস্থান।

মাতৃতীর্থ, প্রাচীন তীর্থভেদ। ঐরূপস্তনের সন্নিকটে

অবস্থিত। (সহাদ্রিঃ রেণুং ১। ২)

মাতৃদন্ত, ময়মালা-টাকানামে হিরণ্যকেশীহৃদয়ভূতিপ্রণেতা।

কমলাকর ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মাতৃদেবী (স্ত্রী) শক্তিমূর্তিভেদ। (হান্দে পাং মাতৃদেবীমাং)

মাতৃনন্দন (পুং) মাতৃগাং নন্দনঃ পুত্র আনন্দবন্ধনো বা।

১ কান্তিকের। ২ মহাকরজ বৃক্ষ। (বৈজ্ঞকনিং) ৩ গুজ্জবৃক্ষ

বৃক্ষ। (রাজনিং)

মাতৃনন্দা, শক্তিমূর্তিভেদ। (সহাং ৩৫। ১০৫)

মাতৃনন্দিন্ (পুং) মাতৃনন্দন।

মাতৃনাশন (স্ত্রী) ১ অধর্মবোধক হস্তভেদ। (পুং) ২ উক্ত  
হস্তের বর্ণিত দেবতাত্ত্বিক।

মাতৃনিন্দক (ত্রি) মাতৃনিন্দকঃ। ১ জননীর নিন্দাকারী।  
(পুং) ২ প্রত্নব্রাহ্মণীয় পক্ষী। (সুপ্রভ হৃদয়ঃ ৪৬ অ°)

মাতৃপালিত (পুং) দানবভেদ।

মাতৃপুত্রন (স্ত্রী) মাতৃপুত্রম্। মাতৃপুত্রা, মাতার পুত্র।

মাতৃবন্ধু (পুং) মাতৃবন্ধুঃ। মাতৃবান্ধব। বন্ধু ত্রিবিধ,—আত্ম-  
বন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু।

“মাতৃঃ পিতৃবন্ধুঃপুত্রা মাতৃমাতৃবন্ধুঃ স্ত্রীভাঃ।

মাতৃমাতৃপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥” (মিতাকর)

মাতৃবান্ধব (পুং) মাতৃবান্ধবঃ। মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়।

মাতৃভেদতন্ত্র (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ।

মাতৃভোগীন (ত্রি) মাতৃভোগঃ মাতৃভোগঃ, তন্মৈ হিতঃ  
(মাণ্ডু্য বিশ্বজনভোগোত্তরপদাং খ। পা ৫।১।১৮) ইতি খ।

মাতৃভোগের নিমিত্ত হিতকর।

মাতৃমণ্ডল (স্ত্রী) মাতৃমাণ্ডলম্। নেত্রদ্বয়ের মধ্য,  
আগ্নয়নমুখ্য বাকি মাতৃমণ্ডল দেখিতে পায় না।

“অরুদ্রভীং প্রবৈকব বিকোদ্রীপি পদানি চ।

আগ্নয়নমুখ্যোপশ্রেষ্ঠচতুর্থঃ মাতৃমণ্ডলম্ ॥

অরুদ্রভী ভবেজ্জিহ্বা এবো নাশাগ্রমুচ্যতে।

বিষ্ণোঃ পদানি ক্রম্যে নেত্রয়োর্মাতৃমণ্ডলম্ ॥” (কানীখ°৪২অ°)

মাতৃমৎ (ত্রি) মাতা বিভক্তেঃস্ত্র-মতৃপ্। মাতৃযুক্ত।

মাতৃমাতৃ (স্ত্রী) মাতৃমাতা। মাতার মাতা, চলিত দিদিমা।  
মাতৃসমূহের মাতা, জর্গা।

মাতৃমুখ (পুং) অড়। (হেম)

মাতৃমুক্ত (ত্রি) জননী কর্তৃক বিমুক্তকৃত। “স্বসঙ্কশা মাতৃ-  
মুঠেব ঘোষা” (শৃঙ্খ ১।১২৩।১১) ‘মাতৃমুঠা মাতৃভিঃ জননীভিঃ  
শুক্লকৃতা ঘোষেব’ (সারণ)

মাতৃযুক্ত (পুং) মাতৃগণের উদ্দেশে অমুঠের যাগভেদ।

মাতৃরিফ, জ্যোতিষক দোষবিশেষ। কুলের পুত্র বা কন্যা  
সন্তান জন্মিলে মাতৃরিফ হয়। ইহাতে মাতার রোগ বা প্রাণ-  
হানির সম্ভাবনা থাকে।

দিবসে প্রসব হইলে, শুক্রগ্রহ বালকের মাতা আর  
রাত্রিতে প্রসব হইলে চন্দ্রমা মাতা হইয়া থাকেন। যদি  
দিবাভাগে বালকের জন্ম হয়, আর শুক্রগ্রহ পাপগ্রহের সহিত  
মিলিত থাকে অথবা পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে  
নিশ্চয়ই বালকের মাতার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যদি শুক্র পাপ-  
গ্রহের সহিত স্থিতি করে এবং সেই পাপগ্রহ স্বীয় গৃহে থাকে,

অথচ তাহাতে কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে  
জাতবালকের মাতার মৃত্যু অবশ্যিকৃত জানিতে হইবে।  
রাত্রিকালে বালকের জন্ম সময়ে যদি চন্দ্র পাপগ্রহের গৃহে থাকে  
এবং অন্যান্য পাপগ্রহ কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়  
মাতার মৃত্যু ঘটিবে। যদি পাপগ্রহগণ সর্বদা ক্ষীণচন্দ্রকে  
নিরীক্ষণ করে ও তাহাতে শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা  
হইলে বালকের মাতার মৃত্যু হয়। জাতবালকের জন্মলগ্নের  
অষ্টম কিংবা ষষ্ঠস্থানে চন্দ্র, আর সপ্তম স্থানে মঙ্গল যদি  
অন্যান্য পাপগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, তবে মাতার জীবন-  
নাশ অবশ্যিকারী। চন্দ্রের অষ্টমস্থানে যদি মঙ্গল থাকে,  
আর মঙ্গলের শত্রু যদি মঙ্গলকে দৃষ্টি করে এবং ঐ স্থান যদি  
জাতবালকের জন্মলগ্নের ষষ্ঠস্থান হয়, তাহা হইলে তাহার  
মাতৃহানি ও পিতা বিদেশগত ছিল জানিতে হইবে। জন্ম  
লগ্নের চতুর্থস্থানে যদি বলবান্ পাপগ্রহ থাকে, তবে ঐ  
পাপগ্রহ নিশ্চয়ই বালকের মাতার প্রাণবিনাশ করে।  
ইহাতে বিশেষ এই যে, চন্দ্ররাশি হইতে চতুর্থস্থানে বলবান্  
পাপগ্রহ থাকিলেও মাতার মৃত্যু হইবে। বালকের জন্মকালে  
চন্দ্র যদি শনি ও মঙ্গলের মধ্যবর্তী হয়, অথবা মঙ্গল ও  
সূর্যের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেও বালকের মাতার  
মৃত্যু ঘটে। জন্মলগ্নে কিংবা তাহার চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম,  
নবম, দশম ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে মাতার মৃত্যু  
নিশ্চয়। ঐ পাপগ্রহের সহিত চন্দ্র মিলিত হইয়া অবস্থান  
করিলে সপ্তাহ মধ্যেই মাতার মৃত্যু হইবে। জাতবালকের  
লগ্নের সপ্তমস্থানে যদি সূর্য থাকে এবং ঐ স্থান সূর্যের  
উচ্চস্থান—মেঘরাশি হয় অথবা নীচস্থান তুলারশির কোনও  
একস্থান হয়, তাহা হইলে জাতবালকের মাতার অতি শীঘ্রই  
মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মাতৃবৎ (অব্য°) মাতরীষ ইবার্থে বতি। মাতার তুল্য,  
মাতৃসদৃশ, পরস্পর উপর মাতৃবৎ ব্যবহার করিতে হয়।

“মাতৃবৎ পরস্পরেষু পরস্পরোবু লোষ্ট্রবৎ।

আত্মবৎ সর্গভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥” (চাপক্য)

মাতৃবৎসল (ত্রি) মাতরি বৎসলঃ। ১ মাতার প্রতি ভক্তি-  
যুক্ত। ২ কার্তিকের।

মাতৃবধ (পুং) মাতৃবধঃ। মাতার হনন।

মাতৃবর্তিন্ (ত্রি) মাতার আত্মকারী।

মাতৃবহিণী (স্ত্রী) মাতরং বহতাতি বহঃগিনি। বল্গুলা পক্ষী।

মাতৃশশ্বিন্, অনেক প্রাচীন কবি।

মাতৃশাসিত (পুং) মাতা শাসিতঃ, মেধাধিক্যং কেবলং  
মাত্রেব শাসিতঃ, নতু, পিতাচার্যাদিতিরিত। মূর্খ। (হেম)

মাতৃষেণ, জনৈক প্রাচীন কবি।

মাতৃষস্ব (স্ত্রী) মাতৃ: স্বস্ব (মাতৃপিতৃভ্যাং স্বস্ব। পা ৮.২।৮৪)  
ইতি স্বস্ব। মাতৃভগিনী, চলিত মাসী। মাসী মাতার স্তায়  
সমধিক-পূজনীয়।

“মাতৃষস্বা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃষস্বা।

ঋজু: পূৰ্ণজপত্নী চ মাতৃকুল্যা: প্রকীৰ্ত্তিতা: ॥” (দায়ভাগ)

মাতৃষসেন্ন (পুং) মাতৃষস্বরপভাং পুমান্ মাতৃষস্ব (মাতৃষস্বশ্চ।  
পা ৪।১।১৩৪) ইত্যত্র ‘ছণ্’ প্রত্যয়ো চকি লোপশ্চ’ ইতি কানি-  
কোক্তে: চক্। মাতৃষস্বপুত্র, মাসতুতোভাই। পণ্যায়—মাতৃষ-  
স্ত্রীঃ। (হেব) স্ত্রিয়াং ত্রীষ্। মাতৃষসেন্নী মাতৃভগিনী-কন্যা,  
মাসতুতা বোন। এই শব্দ জীলিঙ্গে টাবস্তও দেখিতে  
পাওয়া যায়।

“মম মাতৃষসেন্না স্বঃ মাতা নান্দারগী মম।” (ভারত২২৩৪)

মাতৃষস্ত্রীয়া (পুং) মাতৃষস্বরপভাং পুমান্ মাতৃষস্ব-ছণ্ (পা  
৪।১।১৩৪) মাতৃভগিনীপুত্র, মাসতুতা ভাই। স্ত্রিয়াং টাপ্।  
মাতৃষসেন্না মাসতুতাভগিনী।

মাতৃসপত্নী (স্ত্রী) সমান: পতিবৃত্তা: সপত্নী, মাতৃ:সপত্নী।  
মাতার সতিন, বিমাতা।

মাতৃসিংহী (স্ত্রী) বাসকবৃক্ষ। (শব্দরত্নাঃ)

মাতৃসূনু, স্ত্রীবাধপক্ষিকা নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

মাতৃস্থান, প্রভাসের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। এখানে বিনায়কের  
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

মাতৃহন (পুং) মাতরং হন্তি (বহলং ছন্দসি। পা ৪।২।৮৮)  
‘ইতি হন-কিপ্। মাতৃহন্তা, যে মাতাকে হনন করে।

মাত্র (ক্ৰী) মীয়েতে ইতি মা-জন্। ১ কাংক্ষ্য, সাফল্য,  
সমগ্র। ২ কেবল। ৩ অবধারণ।

‘কাংক্ষ্যো যথা জীবমাত্রং ন হিংসেত, অবধারণে যথা  
পরোমাত্রং ভুক্ত্যে’ (ভরত)

মাত্ররাজ (অনঙ্গহর্ষ) তাপস-বৎসরাজ নামক নাটকপ্রণেতা।  
মাত্রা (স্ত্রী) মীয়েতেহনয়া মা (হযামাত্রতসিত্যজন্। উণ্.  
৪।১৬৮) ইতি জন্ টাপ্। ১ পরিচ্ছদ, অর্থাৎ হস্তী অথ  
প্রভৃতি। ২ অন্ন। ৩ পরিমাণ। ৪ কর্ণভূষা। ৫ বিত।  
৬ অক্ষরাবয়ব। (মেদিনী) ৭ কালবিশেষ, হ্রস্ববর্ণের  
উচ্চারণ-কাল।

“কালেন বাবতা পাণি: পর্যেতি আনুসংগে।

মা মাত্রা কবিত্তি: প্রোক্তা হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতা মতা ॥” (প্রাচীনাঃ)  
বতকণ সময়ের মধ্যে হস্ত একবার আনুসংগে পতিত হয়,  
তৎপরিমিত কালের নাম মাত্রা।

তন্ত্রসারে লিখিত আছে—

“বামজাহ্নমি তন্ত্রস্তত্রবর্ণং বাবতা ভবেৎ।

কালেন মাত্রা সা জেয়া মুনিভিরেব পারগৈঃ ॥” (তন্ত্রসার)

বাম জাহ্নতে বামহস্ত ভ্রমণ করিতে যে সময় লাগে,  
তৎপরিমিত কালে একমাত্রা হয়। শব্দের উচ্চারণে স্বাক্ষর-  
জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। মাত্রা হারাই হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত  
উচ্চারণ হুস্থিতে পারা যায়।

“একমাত্রো ভবেচ্ছবো বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।

ত্রিমাত্রস্ত প্লুতো জেয়ো ব্যক্তনং চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥” (বাংকরণ)  
হ্রস্বের একমাত্র, যথা অ, ই, উ ইত্যাদি। দীর্ঘের ত্রিমাত্র,  
প্লুত ত্রিমাত্র, বাঞ্জন অর্দ্ধ মাত্র। হ্রস্ব একটি অক্ষর অর্থাৎ ‘অ’  
এই শব্দটি উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে মাত্রা-  
পরিমিত কাল কহে। বিস্তৃত উচ্চারণ করিতে হইলে—  
মাত্রাজ্ঞান ব্যতীত হয় না। সঙ্গীতেও মাত্রাজ্ঞানের বিশেষ  
আবশ্যক। সঠিক সঙ্গীতের তাল বোধ হয় না। ৮ হ্রস্বের  
হ্রস্বদ্বয়াদি প্রভেদ।

“বতা: পাদে প্রথমে বাবশমাত্রা তথা তৃতীয়েহপি।” (শব্দরত্নাঃ)  
৯ ইন্দ্রিয়বৃত্তি।

“মাত্রাপ্পর্শাত্ কৌন্তের শীতোক্ষুণ্ণহঃখদাঃ।

আগমাপারিনোহনিত্যাত্মাত্তিষ্ঠিক্ষণ ভারত ॥” (গীতা)

‘মীয়েতে আভিবিবরা: মাত্রা: ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ’ (বাঈ)

১০ ইন্দ্রিয়। (গীতাটীকার মধুসূদনসরস্বতী) ইন্দ্রিয় দ্বারা বিবর  
সকল অনুভব করা যায়, এইজন্য উহাকে মাত্রা কহে।  
১১ অংশ, ভাগ।

“ন যোবিভ্যা: পৃথগ্ভাষাদবসানদিনাসূতে।

স্বত্বপিত্তমাত্রাভ্যন্তরীণাং যত: স্থিতা ॥” (শ্রীকৃতব)

১২ শিলোচ্চর “প্রমাত্রাত্তী রিরিচে” (ঋক্ ৩।৪।৬) ‘মাত্রাতি:  
মীয়েতে পরিচ্ছিত্ত্যে ইতি মাত্রা: শিলোচ্চরা:’ (সারৎ)  
১৩ শক্তি। ১৪ অবয়ব।

“চন্দ্রবিত্তেশয়েশ্চৈব মাত্রা নিরুত্যা শাস্বতী:।” (মহু ৭।৪)

‘মাত্রা অবয়বা:’ (মেধাতিথি) ১৫ রূপ। (ভাগবত ২।৫।২৫)

মাত্রাচ্ছন্দসু (ক্ৰী) মাত্রাবৃত্ত, ছন্দোভেদ। ছন্দ: হই প্রকার,  
বৃত্ত ও জাতি। যে স্থলে অক্ষরের সংখ্যা অনুসারে হয়,  
তথায় বৃত্ত, আর মাত্রাবারা যেখানে হয়, তাহাকে জাতি  
অর্থাৎ উহাকে মাত্রাবৃত্ত বা মাত্রাচ্ছন্দসু কহে। এই বৃত্তে  
অক্ষরের সংখ্যার সহিত কোন সঙ্ঘর্ষ নাই। মাত্রা অনুসারেই  
ইহা নিরূপিত হয়। যেক্রপ আখ্যানজাতি, ইহা মাত্রাবৃত্ত।  
যাহার প্রথম পাদে ১২ মাত্রা, দ্বিতীয় পাদে ১৮ মাত্রা, তৃতীয়  
পাদে ১২ এবং চতুর্থ পাদে ১৫ তাহাকে আখ্যা জাতি কহে।  
ইহা মাত্রাচ্ছন্দসু। [ বিশেষ বিবরণ ছন্দসু দেখা। ]

মাত্রাপতাকা (ত্রী) ছন্দোগ্রন্থোক্ত মাত্রাবৃত্তস্থ লঘু-গুরু-জানাহুগণ পতাকাকার চক্র।

মাত্রাভঙ্গা (ত্রী) পেটলী, চলিত পুটলী, থলে।

মাত্রামর্কটী (ত্রী) ছন্দোগ্রন্থোক্ত মাত্রাবৃত্তস্থ লঘু-গুরু-জানাহুগণ আলচক্রভেদ।

মাত্রামেরু (পুং) ছন্দোগ্রন্থোক্ত মাত্রাবৃত্তস্থ লঘু-গুরু-জানাহু-গণ মেরুচক্র।

মাত্রাবৎ (ত্রি) মাত্রা বিস্তৃতত্বস্ত মতৃপ্ মত্ৰ ব। মাত্রায়ুক্ত।

মাত্রাবস্তি (পুং) বৈষ্ণবকোক্ত অহুবাসনভেদ, রেচনক্রিয়ার জন্ত বলদ্বারে তৈলাক্ত দ্রব্যপ্রয়োগ, ইহা পিত্তকারী দেওয়ার মত।

“অহুবাসনভেদস্ত মাত্রাবস্তিকীরিতঃ।” (শাঙ্গধরসং.)

মাত্রাবৃত্ত (স্ত্রী) মাত্রার কৃতঃ বৃত্তঃ। আর্ধ্যাদি ছন্দোভেদ, মাত্রাক্ষম্।

মাত্রাশিত (স্ত্রী) পরিমিতভোজন, পরিমিতাহার।

মাত্রাশিন্ (ত্রি) মাত্রা-অশ-শিনি। পরিমিতভোজী।

মাত্রাসমক (স্ত্রী) ছন্দোভেদ, যে ছন্দে মাত্রা সকল সমান।

মাত্রাস্পর্শ (পুং) ভৌতিক পদার্থসমূহের একত্র সমন্বয়।

মাত্রাস্বরচক্র, তন্ত্রোক্ত চক্রবিশেষ। (প্রাণভোঃ)

মাত্রিক (ত্রি) মাত্রাসম্বন্ধীয়।

মাৎসর (ত্রি) মৎসরযুক্ত, স্বার্থপর। ২ হিংস্রক, পরজীকাতর।

মাৎসরিক (পুং) মৎসরযুক্ত। স্বার্থপর।

মাৎসর্য (স্ত্রী) মৎসর-ব্যঞ্। মৎসরের ভাব, পর শুভ-দেষ, অস্ত্রের ভাল দেখিয়া তাহাতে ঈর্ষা প্রকাশ।

“মাগাশ্চিরায়ৈকতরঃ প্রমাদং বসন্তসাম্বলিবেহপি দেশে।

মাৎসর্যারাগোপহতাস্তন্যং হি স্থলন্তি সাধুশপি মানসানি ॥”

(ভারবি ৩ সং.)

মাৎস্ত্র (ত্রি) ১ মৎস্ততুল্য। ২ মৎস্তদেশের রাজা। ৩ ঋষি-ভেদ। (স্ত্রী) ৪ গুরাপভেদ।

মাৎস্ত্রক (ত্রি) মৎস্তসম্বন্ধীয়।

মাৎস্ত্রগন্ধ (পুং) জাতিবিশেষ।

মাৎস্ত্রিক (পুং) মৎস্ত হস্তি (পক্ষিমৎস্তমৃগান্ হস্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি চক্। জালিক, মৎস্তঘাতক।

মাৎস্ত্রয় (পুং) মৎস্তদেবদাসী জাতিবিশেষ।

মাথ, কুহ, অর্থাৎ বধ ও ক্লেশ। ভাদিৎ পরমৈঃ সকং সেট্। এধ খাতু ইদিৎ। লট্ মাহতি। লুঙ্ অমাহৌৎ। বধাথে স্ক-স্বক এবং ক্লেশার্থে অকম্বক।

মাথ (পুং) মাহাতে পীড়িতে জনঃ অশ্বিন্ মাথ-ব্যঞ্, জলা-মিহাৎ গোবা, নিপাতনাৎ হুমতাবঃ। ১ পহা। (ত্রিকাং) মথ-ভাবে ব্যঞ্। ২ মদন। (শব্দরত্নাং)

মাথট (দেশজ) রাজস্বের ন্যূনতা পূরণের জন্ত যে স্বতন্ত্র রাজস্ব আদায় করা যায়। ২ খাজনা। ৩ টাণা।

মাথন (দেশজ) ১ খোল। ২ মর্দন।

মাথব (পুং) মথুর গোত্রাপত্য। (শতপথব্রাং)

মাথা (দেশজ) মস্তক। শীর্ষস্থান, চূড়াদেশ।

মাথাঘোরণ (দেশজ) শিরোবর্গন।

মাথাটানা (দেশজ) অবাধ্য। একগুঁয়ে।

মাথান (দেশজ) ১ অস্ত্রের বিষয়ে উপহাতিত ভাবে নিজের বুদ্ধিপ্রকাশ। ২ প্রসবকালে গর্ভস্থ শিশুর শিরঃনির্গম।

মাথাপাগলা (দেশজ) বাহার মাথা ভাল নয়, একগুঁয়ে।

মাথাব্যথা (দেশজ) মস্তকবেদনা। শিরঃপীড়া।

মাথাভারী (দেশজ) ভারবিশিষ্ট চূড়াদেশ।

মাথাল (মাথুল) (দেশজ) ১ স্তম্ভের স্বক। ২ শিরো-রক্ষার্থ পত্রনির্মিত শিরস্ত্রাণ বিশেষ।

মাথালড়া (দেশজ) ১ বলপ্রকাশ। ২ আত্মস্তুতি প্রকাশ।

মাথিতিক (ত্রি) মথিত ভাবযুক্ত।

মাথুর (পুং) মথুরায়াঃ আগতঃ অণ্। ১ মথুরা হইতে আগত ‘তত্র জাতঃ’ ইত্যণ্। ২ মথুরাজাত।

“ততঃ স দৃষ্টো বহলক্লেশস্তাং পুরুষোহব্রবীৎ।

মুখে পবনসেনাথ্যো বণিক্ পুত্রোহস্মি মাথুরঃ ॥”

(কথাসরিৎসং ৩৬।৭৩)

৩ মথুরা কর্তৃক উক্ত। (ভেন প্রোক্তং। পা ৪।৩।১০৪)

ইতি অণ্ ভীপ্। মাথুরী বৃত্তি। মথুরানাথকৃত বৃত্তি। ৪ ব্রাহ্মণ-ভেদ, মথুরার চোবে। প্রবাদ, যে বরাহ অবতারের স্বর্গ হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

“সক্রে দ্বিজা কাশ্যকুজা মাথুরং মাগধং বিনা।

বরাহস্ত তু ঘর্ষণে মাথুরো জায়তে ভূবি ॥” [মথুরা দেখ।]

মাথুরক (পুং) ১ মথুরাদেশসম্বন্ধীয়। ২ মথুরার অধিবাসী।

মাথুরদেশ্য (ত্রি) মথুরাদেশভব।

মাথুরী, মথুরানাথকৃত তত্ত্বচিন্তামণিদীপ্তি নামক ভ্রাণগ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা।

মাদ (পুং) মাদ্যত ইতি মদ-ব্যঞ্, হুমতাবঃ। ১দর্প। (অমর) ২ হর্ষ। (ভরত) ৩ মত্ততা। (শব্দরত্নাং)

মাদক (পুং) মাদ্যতি বর্ধগমে দ্ব্যতীতি মদ-বুল্। ১ দাত্য হ পক্ষী। (শব্দমালা) মাদয়তি স্বপুণেন ভূতানীতি মদ-গিচ্-বুল্। ২ মাদক দ্রব্য।

“ইন্দ্রিয়ানি মহাভাগ মাদকানি স্থনিশ্চিতম্।

অদারস্ত দুরন্তানি পটেকব মনসা সহ ॥”

(দেবীভাগ ১।২৪।৬৪)

৩ অহিকেশ, আকিঙ্। (পর্যায়মুক্তা, ৪ ভঙ্গা, ভাঙ্।  
৫ হরিণভেদ। (বৈশ্বকনি।)

মাদন (কৌ) মাদয়তি বিরহিণঃ মদ-পিচ্-লুট্। ১ লবঙ্গ।  
(শব্দচ)। মাদয়তীতি লু। (জি) ২ হর্ষকারয়িতা। (পুং)  
মাদয়তি চিত্তবিকারমুৎপাদয়তীতি মদ-পিচ্-লু। ৩ কাম-  
দেব। ৪ মদনবৃক্ষ। ৫ ধুস্তুর বৃক্ষ।

মাদনী (জী) মাদন-ক্রিয়াং ভীপ্। ১ মাকন্দী। (রাজনি)।  
২ বিজয়া। (ভাবপ্র)।

মাদনীয়া (জি) মত্তভাজনক।

মাদয়িত্ত্ব (জি) অত্যন্ত মদকর। (শব্দ ১১১০১১) 'মাদ-  
য়িত্ত্বং হত্যন্তঃ মদকরায় রসায়' (সায়ণ)

মাদয়িসু (জি) হর্ষোৎপাদক। হর্ষের হেতু। 'মাদয়িসুবে  
হর্ষহেতুবে' (সায়ণ)

মাদল (দেশজ) বায়বস্ত্রভেদ। ছোট লোকেরা মত্তপান  
করিয়া এই বায় বাজাইতে থাকে।

মাদা (পারসী) ১ স্ত্রীলজ্জ। ২ স্ত্রীলোকের জায় বুদ্ধিহীন।

মাদাগাস্কার, ভারতমহাসাগরস্থ একটা স্বরহৎ দ্বীপ। আফ্রিকা  
মহাদেশের মোজাম্বিক উপকূল হইতে ২৪০ মাইল পূর্বে অব-  
স্থিত। অক্ষা° ১২° হইতে ২৫° ৪৫' দঃ এবং দ্রাঘি° ৪৩°  
হইতে ৫১° পূঃ মধ্য। ইহা উত্তরদক্ষিণে কেপ এয়ার  
হইতে কেপ সেন্ট-মেরি পর্যন্ত ৯৬০ মাইল লম্বা এবং  
কেপ ইষ্ট হইতে কেপ ফেলিক্স পর্যন্ত ৫০০ মাইল বিস্তৃত।  
স্থানবিশেষে ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃতিও আছে।

ইহার পূর্ব-উপকূল পূর্বোত্তরমুখী একটা সরল-রেখায়  
প্রসারিত। কেবল মধ্যস্থলে এণ্টোজিল উপসাগর সেই  
সমতা ভঙ্গ করিয়াছে। উত্তরপশ্চিম উপকূলে প্রধার হইতে  
সেন্ট আন্দ্রে অস্ত্রদ্বীপ মধ্যে টিম্পাইকি, নরিনা, মজামো  
ও বেথাকোটা এবং দক্ষিণপূর্বে কর্কটদ্বীপ হইতে বারাকোটা  
দ্বীপ মধ্যে মার্ভারার ও সেন্ট অগাষ্টিন উপসাগর। এতদ্ভিন্ন  
ইহার নিকটে কমেরো কোয়েরিয়া, জোয়ান্-ডিনোভা,  
বুরোপা ও ফরাসীদিগের অধিকৃত সেন্টমেরি প্রভৃতি কতক  
গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

এই দ্বীপের উত্তরদক্ষিণে একটা গিরিশ্রেণী বিস্তারিত।  
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তাহার শৃঙ্গগুলি ১০ হইতে ১২ হাজার ফিট  
উচ্চ। এই পর্বতগাত্র বাহিয়া অসংখ্য নদী সমুদ্রে পতিত  
হইয়াছে। কেপ-সেন্ট আন্দ্রে ও কেপ পাসাদাবার মধ্যবর্তী  
স্থানটা অসংখ্য নদীবৈষ্টিত একটা জলাভূমি। সমুদ্রোপকূল  
হইতে প্রায় ৮০ মাইল দেশভাগ অধিকার করিয়া আছে।

সেন্ট আগাষ্টাইন উপসাগরের ওজলহে নদীর মোহানায়

মাণ্ডিবীপ। এখানে যুরোপীয় অর্গবপোতসমূহ লঙ্গর করিয়া  
দেশীয় দেবতার পরিবর্তে তথাকার গবাদি ক্রয় করিয়া থাকে।  
এই নদীতে অসংখ্য কুস্তুর বিচরণ করিতে দেখা যায়।  
বেথাকোটা উপসাগরের ও বেথাকোটা অস্ত্রদ্বীপের উত্তরে বেথাকো-  
টো নগর অবস্থিত। এই নগর ও তৎপার্শ্ববর্তী মাছুন্দা বন্দর  
এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র। ফরাসী-বণিকগণ এখানে বড়  
ক্রয় করিয়া ডকিণ দুর্গে লইয়া যায়। মন্তবাসী আরবগণ  
এ স্থান হইতে ভূত্যা ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া বাহঁত।  
এখানকার 'ওভা' অধিবাসিগণ বিশেষ বলশালী, পরিশ্রমী  
ও অত্যন্ত দ্বীপবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে সুসভ্য। ইহার  
সম্মিকটবর্তী ধানান-অরিত্ নামক গ্রামসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে  
৪০০০ ফিট উচ্চ একটা অধিত্যকা-ভূমির উপর স্থাপিত।  
রাজা রদামের রাজত্বকালে এখানে যুরোপীয় ধরণের অনেক-  
গুলি অট্টালিকা নির্মিত হয়।

পূর্বোপকূলে টামাটেভ বন্দর। ফরাসিগণ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে  
এই নগর ধ্বংস করেন। ইহার উত্তরে ফাউল পয়েন্ট।  
এখানে বাণিজ্যপোতসমূহের একটা আড্ডা আছে।

এণ্টোজিল উপসাগরে কএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্ট হয়।  
ঐ সকল দ্বীপে বিদেশীয় অর্গবপোতসমূহ আড্ডা করিয়া  
থাকিবার উপযুক্ত স্থান আছে। উপকূলস্থ একটা নদীর  
মোহানায় ফরাসীদিগের অধিকৃত চৈতলবন্দর ও তৎপার্শ্বে  
ডকিন্‌হুর্গ। ১৭৪০ ও ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে সেন্টমেরি ফরাসীদিগের  
অধিকৃত হয়, কিন্তু ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাহার এই দ্বীপ  
ছাড়িয়া দেন।

সমগ্র মাদাগাস্কার ২২টা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। সেই ২২টা  
জনপদে ২২ জন রাজা রাজত্ব করেন। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দির  
প্রারম্ভে ওভারাজ রদামা কতকগুলি রাজ্য অধিকারপূর্বক স্বীয়  
রাজ্যসীমা পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। তাহার যত্নে এখানে  
খৃষ্টান মিসনারিগণ প্রতিষ্ঠালাভ করেন, এই সময়ে বিজা-  
লবাদি স্থাপন করিয়া দেশীয় লোকের শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়।  
১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রদামা গুপ্তভাবে নিহত হইলে, রাজা রণবল  
মজোক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের  
অমুশাসনবলে খৃষ্টধর্মপ্রচার রহিত করিয়া পৌত্তলিক উপা-  
সনার প্রসার বৃদ্ধি করেন, কিন্তু এরূপ রাজেনিবেধ সবেও  
ফরাসিগণ ধর্মপ্রচারে বিরত হন নাই।

এখানকার প্রচলিত ভাষার সহিত মলয়দ্বীপের ভাষার  
অনেক শব্দ-সাদৃশ্য দেখিয়া ভাষাতত্ত্ববিদগণ অমুমান  
করেন যে, বহুপূর্বে মলয়বাসী দহাগণ নৌকাযোগে প্রবল  
ঝটিকা দ্বারা এখানে আনীত হইয়া থাকিবে অথবা তাহার

পোতে আয়োজন করিয়া এই দেশে গমনাগমন করিত। ভূতবের আলোচনায় জানা যায় যে, এক সময়ে মলয়বীপের সহিত মাদাগাস্কারের সংযোগ ছিল। কালপ্রবাহে ও সমুদ্র জলের প্রথরস্রোতে উভয়ের মধ্যবর্তী বীপসমূহ জলগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ একটা প্রবাদ আছে যে, রাবণের লঙ্কারাজ্য এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালে তাহা লয় পাইয়াছে।

এখানে দোদো নামে এক প্রকার বৃহদাকার পক্ষী দেখা বাইত। ভিন্নদেশীয় শিকারপ্রিয় ব্যক্তিগণের উপদ্রবে এবং দেশবাসীর তাড়নায় ঐ পক্ষীজাতি এক্ষণে লোপ পাইয়াছে।

মাদায়ন (পুং) মদের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকোষত)

মাদার (দেশজ) মদারক বৃক্ষ। (Sroy therine felgens) ২ মুসলমানদিগের দেবতাভেদ। অনেক বক্ষ্য জীলোক সন্তানকামনায় মাদার-পীরের বাহুলি লইয়া হস্তে ধারণ করে। পরে সন্তান হইলে জাতপুত্রের 'মাদার' এই নামকরণ করিয়া থাকে।

মাদারিপুর (মাদারিপুর), বাঙ্গালার ফরিদপুর জেলার একটি উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯৭৯ বর্গ মাইল। মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ, কোতরাণীপাড়া (কোটালিপাড়), পালক ও শিবচরখানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার একটি নগর এবং উক্ত উপবিভাগের বিচার সদর। আড়িয়াল খাঁ ও কুমার নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখানে স্থানীয় শস্য, পাট, চিনি, চাউল প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে।

মাদারিয়া (গোলা), যুক্ত- (উঃ পঃ) প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। কুয়ানা (ঘর্ষরা) নদাতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২০' ৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২৩' ৪০" পূঃ। এই নগরে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বিস্তৃত কারবার আছে। নদীতীরবর্তী দেবমন্দিরাদির শোভা অতি সুন্দর।

মাদারী, ২৪পরগণা জেলায় প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র নদী। চৈতল ও বাঁশড়ার বিস্তৃত শস্যভাণ্ডার (হাট) ইহার তীরে অবস্থিত।

মাদিন্ (ত্রি) মদকারিন্। মত্ততাজনক।

মাদুঘ (ত্রি) মদুঘ বৃক্ষসম্বন্ধীয়।

মাডুয়ের (দেশজ) গুণাবিশেষ। (Volkameria madocera)

মাদুর (দেশজ) সপ্। মুক্তিকায় বিছাইবার জন্য তৃণনির্মিত আসনবিশেষ। ইহা দুই প্রকার, কাটা ও পাটা।

মাদুরকাঠী (দেশজ) কাঠের মাদুরপ্রস্তুতকরণোপযোগী

মাদুরপাতী (দেশজ) পটুপটুর মাদুরী নির্মাণোপযোগী পত্রবিশেষ। (Scirpus tegetns)

মাদুর্ণা (ত্রি) প্রাচীন গ্রামভেদ। (ক্ষিতীশবংশ)

মাদুলী (দেশজ) ঔষধ ও কবচাদি রাখিবার জন্য খাতুনির্মিত ধারণী বিশেষ।

মাদুশ্ (ত্রি) অহমিব দৃশ্ততে ইতি দৃশ্-কিপ্। মংসদৃশ্।

মাদুশ (ত্রি) অহমিব দৃশ্ততে ইতি (তাদাদিষু দৃশোহনা-লোচনে কঞ্চ। পা ২২।৬০) ইতি কঞ্। মংসদৃশ্, মত্তুল্য। ত্রিগাং ভীষ্। মাদুশী।

"তস্ত তং পদবীঃ গচ্ছ গচ্ছয়ুস্বাদুশা বথা।

তাদৃশস্তেদৃশে কালে মাদৃশৈরতিচোদিতঃ ॥

কথং হু ভাষ্যা পার্থানাং তব কৃষ্ণসখা বিভো।

ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী সভাং কুষ্যেত মাদুশী ॥" (ভার০ ৭।১০।৮৩-৮৪)

এই অর্থে 'মাদুশ্' এইরূপ পদও হইয়া থাকে।

মাদোয়ান (পারসী) ঘোটকী।

মাদ্য (পুং) মদনীয়। মদভাবযুক্ত।

মাদ্রক (পুং) মদ্রদেশের রাজপুত্র। ত্রিগাং ভীষ্। মাদ্রকী, মদ্ররাজী।

মাদ্রকুলক (ত্রি) মদ্রকুলসম্বন্ধীয়।

মাদ্রনগর (ত্রি) মদ্ররাজধানী।

মাদ্রবতী (ত্রি) পরীক্ষিতের পত্নী।

মাদ্রী (ত্রি) মদ্রে জাতা মদ্র-অণ-ত্ৰীপ্, তর্গাদিত্যাং ন প্রত্যয় লুক্। পাণ্ডুরাজপত্নী। ইনি মদ্ররাজকন্যা। নকুল ও সহদেব নামে ইহার দুই পুত্র হয়। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ইনি সহমৃত্যু হন। [বিশেষ বিবরণ পাণ্ডু শব্দ দেখ।] ২ অতিবিধা। (রাজনি)

মাদ্রীনন্দন (পুং) নকুল ও সহদেব।

মাদ্রাপতি (পুং) মাদ্রাঃ পতিঃ। পাণ্ডুরাজ। (শকরত্না০)

মাদ্রকস্থলক (ত্রি) মদ্রকস্থলী নামক জনপদ জাত।

মাদ্রেয় (পুং) মাদ্রীগর্ভজাত পুত্র—নকুল ও সহদেব।

মাধব (পুং) যদুপুত্রস্ত মধোরপত্যং পুমান্ ইতি মধু-অণ্, মা লক্ষ্মীস্তম্যাঃ ধবঃ, মায়া বিদ্যায়া ধব ইতি বা। বিষ্ণু, নারায়ণ।

"মা চ ব্রহ্মস্বরূপা বা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।

নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়ী সনাতনী ॥

মহালক্ষ্মীস্বরূপা চ বেদমাতা সরস্বতী।

রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামী চ মাধবঃ ॥"

(ব্রহ্মবৈ০ ত্রীকণ্ ১১০ অ০)

মা শব্দে ব্রহ্মস্বরূপা, এবং মূলপ্রকৃতি, নারায়ণী, সনাতনী বিষ্ণুমায়ী, মহালক্ষ্মী, বেদমাতা সরস্বতী, রাধা, বসুন্ধরা, গঙ্গা,



মহাভারতে লিখিত আছে—মৌন, ধ্যান এবং যোগহেতু ‘মাধব’ এই নাম হইয়াছে।

“মোনাক্যানাচ্চ যোগাচ্চ বিজ্ঞি ভারত মাধবম্।”

( ভারত ৫।৭।১৪ )

মাধব নাম উচ্চারণে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

“ঐ মিত্যেকান্মরে ময়ে স্থিতঃ সর্গগতো হরিঃ।

মাধগয়েতি বৈ নাম ধর্মকামার্থমোক্ষদম্॥” (অগ্নিপুরাণ)

মধোর্বসন্ততায়ঃ মধুনি মধুমন্তি কুসুমনি অগ্নিন্ বা  
(মধোঋ ৮। পা ৪।৪।১২৯) ইতি ঋ। ২ বৈশাখমাস।

“ন তেন সখ্যা সহিতো জগামাত্রবণং বনম্।

পত্নাভিঃ স সমং রত্নং মাধবে মাসি পার্থিব॥” (মার্কণ্ডেয় ১।১৭।২৭)

মধু স্বার্থে অণ্। ৩ বসন্তকাল। (বিষ্ণু) ৪ মধুকবুক্ষ।

৫ কৃষ্ণমূল্য। (রাজনি) ৬ জীরকবুক্ষ, মধুকভেদ। (বৈষ্ণবকনি)

মাধব, জনৈক বিখ্যাত যোগী। মধুসূদন সরস্বতীর গুরু।

মাধব, কএকজন প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থকারের নাম। ১ একা-

ক্ষরকোষপ্রণেতা। ২ কিরাতার্জুনের টীকারচয়িতা। ৩ ছন্দদী-

ভাষ্য ও সামবেদসংহিতাভাষ্যপ্রণেতা। ইনি বিখ্যাত

পণ্ডিত নারায়ণের পুত্র। ৪ জাতকদর্পণপ্রণয়নকর্তা।

৫ জ্যোতিষরত্নমালাটীকারচয়িতা। ৬ ভূগতজিতরঙ্গী-

প্রণেতা। ৭ দ্রব্যগুণরত্নমালা নামক বৈজ্ঞানিকগ্রন্থরচয়িতা।

৮ নারায়ণবলিবিধিপ্রণেতা। ৯ মাধবী শাস্তিরচয়িতা।

১০ রত্নমালা নামক অভিধানপ্রণেতা। ১১ নীলকণ্ঠকৃত বর্ষ-

ফল নামক গ্রন্থের জনৈক টীকারকার। ১২ বিবেকদীপিকা-

রচয়িতা। ১৩ বেদান্তসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ১৪ শক্তি-

বাদ-টীকারচয়িতা। ১৫ সারদাতিলকটীকাকর্তা। ১৬ জনৈক

জ্যোতির্বিদ। ইনি সিদ্ধান্তচূড়ামণি নামে গ্রন্থ রচনা

করেন। ১৭ সূর্য্যার্য্যদানপদ্ধতিপ্রণেতা, রামেশ্বর ভট্টের

পুত্র। ১৮ দানলীলাকাব্যরচয়িতা, লক্ষ্মণের পুত্র, বাচি-

দেবের পৌত্র, যজ্ঞেশ্বরের প্রপৌত্র ও বিষ্ণুশর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

১৯ বেঙ্কটচাণ্যের পুত্র। ইনি বেদভাষ্য, মাধবাহুক্রমণি,

আখ্যাতাহুক্রমণি, স্বরাহুক্রমণি, নিপাতাহুক্রমণি, নির্ব্বাকাহু-

ক্রমণি ও তাহার ভাষ্য এবং নামনিঘণ্টু রচনা করেন।

দেবরাজ নিঘণ্টুভাষ্যে ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

২০ পদ্মাবলীধৃত কএকজন কবি।

মাধব, এই নামে কএকজন জ্যোতির্বিদদের নাম পাওয়া যায়।

১ ভাস্করীকরণের টীকারকার। তাহার টীকা ১৪৫২ শকে

রচিত হয়। ২ গোবিন্দের পুত্র। তাহার পিতামহ নীল-

কণ্ঠ টোডরমল্লের অতি প্রিয় জ্যোতির্বিদ ছিলেন, তিনি

টোডরানন্দ প্রভৃতি বহু জ্যোতির্বিদ রচনা করেন। মাধব-  
শিঙবোধিনী সমাবিবেকবৃত্তি নামে ১৫৫৫ শকে পিতামহ-  
কৃত তাম্রিকভূষণের টীকা ও উদাহরণ প্রকাশ করেন। তিনি  
লিখিয়াছেন যে, তাহার পিতা পীষুধারারচয়িতা গোবিন্দ  
জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।  
৩ কান্দিবাসী এক চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ, ইনি সামুদ্রিক-চিত্তামণি  
রচনা করেন। ইহার অমূল্য দ্বাধা তাই ১৬৪১ শকে সূর্য্য-  
সিদ্ধান্তের কিরণাবলি নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

মাধব, মহাদ্রাবিড়জ জনৈক রাজা। (সহ্য ৩।৩৬২)

২ জনৈক প্রাচীন কবি। দেবের পুত্র। ইনি চন্দ্রল-  
রাজ ধনেশ্বরী ও ধর্ম্মের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ৩ রাজা দ্রুশান  
দেবের সভাস্থকবি। ইনি দাসবংশীয় ছিলেন। ৪ কুটুম্বর-  
রচয়িতা। ৫ বিহারবাসী প্রণেতা। সূত্রকর্ণের পুত্র।

মাধবক (পুং) মাধব (কুলাদিত্যো বৃঞ্। পা ৪।৩।১১৮)  
ইতি বৃঞ্। মধুজাত মন্তবিশেষ।

মাধবকর, জনৈক সূত্রসিদ্ধ চিকিৎসক, ইন্দুকরের পুত্র।  
ইনি আয়ুর্বেদপ্রকাশ আয়ুর্বেদরসশাস্ত্র, কুটুম্বকার ও তত্ত্বীকা,  
পথ্যায়রত্নমালা রসকৌমুদী এবং রোগবিন্যাস বা মাধব  
নিদান নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

মাধবকবিবরাজ, জনৈক বৈজ্ঞানিকগ্রন্থকার। ইনি মুদ্রাবোধী  
জরাদিরোগচিকিৎসা নামে একখানি বৈজ্ঞানিকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মাধবকবীন্দ্র, উচ্চবদন্তরচয়িতা।

মাধবগুপ্ত (পুং) ১ বাসবদত্তাবর্ণিত নায়কভেদ। ২ গুপ্ত-  
বংশীয় জনৈক রাজকুমার। ইনি কনোজরাজ শ্রীহর্ষের সম-  
সাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। (শ্রীহর্ষচণ্ড)

মাধব ঘোষ, উত্তররাষ্ট্রীয় কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীগোবিন্দ্রের  
পাশ্চদত্ত। তিনি একজন সম্ভ্রাতবিশারদ ও পদকর্তা  
ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃ তাহার গানে নৃত্য করিতেন।  
চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

“শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্তনীয়াগণে।

নিত্যানন্দ প্রভৃ নৃত্য করে যার গানে॥”

মাধব ঘোষ প্রসিদ্ধ গৌরগীতিরচয়িতা বাসুদেব ঘোষের  
ভ্রাতা। বৈষ্ণবগণ ইহাকে ব্রজের গুণতুলা সখী বলিয়া মান্য  
করিয়া থাকেন। মাধব অধিকাংশ কালই গৌরনিতাইএব  
সহবাসে কীর্তন করিতেন, এইজন্য গৌরনিতাই-সম্বন্ধীয়  
তদ্রচিত পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

মাধব চক্রবর্তিন্, পদ্মাবলীধৃত জনৈক কবি।

মাধব জ্যোতির্বিদ, জনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। গোবিন্দ  
জ্যোতির্বিদের পুত্র। ইনি শ্রীগীতিকৃত জাতকপদ্ধতির জন-

বোধিনী মারী টীকা, ভাষ্যতীবরণ, মহাধেবী টীকা, বিজ্ঞা-  
নাথবীর ব্যাখ্যান ও ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে জ্যোৎস্নানারী স্তব্ধবোধ-  
টীকা প্রণয়ন করেন।

মাধবভর্কসিদ্ধান্ত, রঘুনাথকৃত পদার্থতত্ত্বের টীকারচরিতা।  
মাধবতীর্থ, মধ্যসম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। ইনি নরহরি  
তীর্থের (বিজ্ঞানাজী) মৃত্যুর পর পদিত্তে আরোহণ করেন।  
১২৩১ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

মাধবদেব, ১ ভাষ্যভাবনামক বৈজ্ঞানিকগ্রন্থেরচরিতা। ২ বেদ-  
ভাষ্যপ্রণেতা। ৩ কালীবাসী জনৈক বিখ্যাত নৈমারিক।  
লক্ষ্মণদেবের পৌত্র। ইনি রামভট্টকৃত গুণরহস্যের গুণরহস্য-  
প্রকাশ নামে টীকা, ভ্রামরায়, প্রমাণাদিপ্রকাশিকা ও তর্ক-  
ভাষ্যসারমঞ্জরী নামে কয়েকখানি ভ্রামরায় রচনা করেন।  
শেখোক্ত গ্রন্থে তিনি গৌরীকান্ত ও শোভনেন্দ্রের মত উদ্ধৃত  
করিয়াছেন।

মাধবভিজ্ঞ, নবদ্বীপের জমীদার শুভানন্দের ছই পুত্র, রঘুনাথ  
ও জমদর্শন। ইঁহারা 'রাজা' নামে সাধারণে পরিচিত ছিলেন।  
তন্মধ্যে রঘুনাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ এবং জমদর্শনের  
পুত্রের নাম মাধব। এই মাধব ও জগন্নাথই কলাই মাধাই  
নামে সর্বত্র পরিচিত। মাধাইর ধর্মপরিবর্তনকাহিনী  
বিচিত্র। কথিত আছে, প্রথমে ইঁহারা মন্ত্যমাংসপরদারনিরত  
ছিলেন। বস্তুতঃ এমন কুকার্য ছিল না, বরং ইঁহাদের  
ধারা হয় নাই; ইঁহারা গোবধ-ব্রহ্মবধ করিতেও অধর্ম  
মনে করিতেন না। শ্রীমহাপ্রভু, নিতাই আর হরিদাসের উপর  
হরিনাম প্রচারের ভার দিয়াছিলেন। নামপ্রচার করিতে  
করিতে নিতাই একবার জগাই মাধাইর সম্মুখে পড়েন। মাধাই  
নিতাইকে দেখিয়া জুড় হইয়া এক ভয় কলমীখণ্ড লইয়া  
ছুড়িয়া মারেন। তাহা নিতাই চাঁদের মস্তকে লাগে ও  
রক্তপাত হইতে থাকে; কিন্তু নিতাইচাঁদ তৎপ্রতি ক্রোধান  
না করিয়া পাণীকে করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন—

“মাধাই আর! মাধাই!

মাধাই! মেরেছিস কলসীর কানা,

তাই ব'লে কি প্রেম দিব না।”

নিতাইর এই করুণ আস্থানে পাষণ গলিয়া গেল। অক-  
স্মে ধান ডাকিল, মাধাই নিতাইর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া  
তাঁহার শিষ্য স্বীকার করিলেন।

মাধবনন্দন, অশৌচদশকপ্রণেতা রামেশ্বর হরির পুত্র।

মাধবপণ্ডিত, ১ জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি পণ্ডিত-  
শ্রেষ্ঠ বিবেকের গুরু ছিলেন। ২ দত্তদর্শ-রচয়িতা।

মাধবপদাভিরাম, তর্কসংগ্রহব্যাক্যার্থনিরুক্তিনামক গ্রন্থেরচরিতা।

মাধবপাঠক, পুরস্চরণচক্রিকাপ্রণেতা।

মাধবপার্শ্ব, চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটা এসিক স্থান। মাধব-  
পাশা নামে খ্যাত।

মাধবপুর, ১ রাজগৃহের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম।  
২ নাটোরের দক্ষিণে ভাটুড়ীতিটার নিকটে অবস্থিত একটা  
এসিক গ্রাম।

মাধবপুরী, গভাবলীকৃত জনৈক প্রাচীন কবি।

মাধবভট্ট, ১ নিম্বার্কসম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য। ভূরি-  
ভট্টের শিষ্য ও শ্রামভট্টের গুরু।

২ অপর তিনজন এসিক পণ্ডিত। ৩ কবীজ্ঞচন্দ্রোদয়ধৃত  
জনৈক কবি। ৪ সিদ্ধান্তস্বরাবলী নামে মারস্বত প্রক্রিয়া-টীকা-  
রচয়িতা। ৫ প্রণয়ী মাধবচন্দ্র ও স্বভদ্রাহরণ শ্রীগদিতনামক  
গ্রন্থেরপ্রণেতা। মণ্ডলেশ্বর ভট্টের পুত্র এবং হরিশরের ভ্রাতা।

মাধব আগধ (পুং) জনৈক প্রাচীন কবি। [মাগধমাধব দেখ]

মাধবমিশ্র, অমুমানালোকদীপিকা নামী তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক-  
টীকার ব্যাখ্যাপ্রণেতা। ২ গদাধরের পুত্র। ইনি ভেদ-  
দীপিকা নামে একখানি বেদান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মাধবমুনি, বাগবতভট্টীয় ব্যাখ্যাপ্রণেতা।

মাধবযতীন্দ্র, (সরস্বতী), সুরাষ্ট্রবাসী জনৈক পণ্ডিত।  
ইনি মিতভাবিনী নামে শিবাদিত্যকৃত সপ্তপদার্থীর টীকা  
রচনা করেন।

মাধবযোগিন্, জনৈক সাধুপুরুষ। ইনি মীমাংসানববিবেকা-  
লঙ্কারপ্রণেতা দামোদরের গুরু ছিলেন।

মাধবরাও (প্রকৃত নাম মাধবরাও বজাল), মহারাষ্ট্রের  
চতুর্থ পেশবা। পেশবা বাণাজী বাজীরাওর দ্বিতীয় পুত্র।  
পিতার মৃত্যুকালে মাধবরাওর বয়স সপ্তদশ বর্ষমাত্র। তখনও  
মহারাষ্ট্রপতি সাতারায় শক্তিশালী ও নামমাত্র রাজা ছিলেন।  
মাধবরাও তাঁহার নিকট আসিয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর  
মাসে পেশবার খেলাত লইলেন।

এ সময় ইংরাজের সাহায্যে জঞ্জিরার সিদ্দি কোকণের  
অনেক স্থান পুনরুদ্ধার করিতেছিলেন। ইংরাজেরাও সাল-  
শেট প্রভৃতি দ্বীপ অধিকার করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত  
হইয়াছিলেন। তখন পেশবার তহবিলে অর্থাভাবও ঘটিয়া-  
ছিল। এক্ষণে দুঃসময়ে মাধবরাও পেশবা হইলেন। তিনি  
পিতৃব্য রঘুনাথ রাওর উপর সমুদয় কর্তৃত্ব অর্পণ করিলেন।  
তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে ইংরাজেরা সালশেট অধিকার করিতে  
পারেন নাই। এই সময়ে মোগলবাহিনী আন্ধ্রপ্রদেশগণাভি-  
মুখে আগ্রসর হইতেছিল। তাহারাতোকা গ্রামে আসিয়া  
কএকটা হিন্দু-দেবমন্দির ভাঙিয়া ফেলে, তাহাতে মোগল-

সৈন্তকৃত মহারাষ্ট্রগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজাম উল-  
খলকের কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া পেশবার দলে আসিয়া  
যোগদান করিল, তাহাতে নিজাম পেশবার সহিত ১৭৬২  
খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধি অনুসারে  
মহারাজার ২৭ লক্ষ টাকা আয়ের আরজাবাদ ও  
বিদররাজ্য লাভ করেন। উক্ত সন্ধির অল্প দিন পরেই  
পিতৃব্যের সহিত মাধবরাওর বিবাদের সূত্রপাত হইল।  
রঘুনাথরাও তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আনন্দীবাজির প্রয়ো-  
চনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ চাহিয়া বসেন। এ সময়ে রঘুনাথরাও,  
সখারাম বাপু ও অপর কএকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন।  
মাধবরাও অবিলম্বে তাঁহার মাতুল ত্রিখকরাওকে দেওয়ান  
নিযুক্ত করেন, মিরজের জায়গীরদার গোপালরাও গোবিন্দ  
পটবর্ধন তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে হরিপত্ত  
ফড়কে ও বালাজী জনাধিন তাহু পরে (নানাকড়নবীশ) কার-  
কুণপদ পাইলেন। এদিকে রঘুনাথরাওর স্ত্রী আনন্দীবাজি  
উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ার মাধবরাওর মাতা গোপিকাবাজির  
সহিত আরও কলহ আরম্ভ করেন। রঘুনাথের ক্ষয়  
অনেকটা উন্নত হইলেও স্ত্রীর বশে এখন তিনিও উত্তেজিত  
হইয়া নাসিক হইতে আরজাবাদে চলিয়া আসিলেন। মোগল-  
দিগকে ৫১ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি এবং দৌলতাবাদ,  
আসীরগড়, আক্কননগর ও শিবনেরি দুর্গ ছাড়িয়া দিবার  
লোভ দেখাইয়া তিনি মোগলসাহায্য গ্রহণ করিলেন। পুণা  
ও আক্কননগরের মধ্যস্থলে যুদ্ধ হইল। মাধবরাও পিতৃব্যের  
নিকট পরাজিত হইলেন। পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া  
স্বজাতি ও স্বরাজ্যের অনিষ্ট সাধন করা কর্তব্য নহে, কিছু-  
দিন এক্রপ বিবাদ চলিলে মহারাষ্ট্ররাজ্য হারবার হহবে,  
হত্যা দি তাবিয়া রাজ্যের মঙ্গলের জন্য মাধবরাও পিতৃব্যের হস্তে  
আত্মসমর্পণ করিলেন। এখন রঘুনাথ অশ্রুতিক্ষিত-প্রভুতালত  
করিয়া সখারামবাপুকে ২ লক্ষ টাকার জায়গীর ও নীলকণ্ঠ  
পুরন্দরকে পুরন্দর-দুর্গের অধিনায়কতা প্রদানপূর্বক উভয়কে  
আপনার প্রধান মন্ত্রী করিয়া লইলেন। তাঁহার শিশু পুত্র  
ভাস্কররাও প্রতিনিধি ও নারোশঙ্কর তাঁহার সহকারী নিযুক্ত  
হইলেন। এমন কি তিনি স্বার্থক হইয়া গোপালরাও  
পটবর্ধনের নিকট হইতে মিরজ দুর্গ কাড়িয়া লইলেন।  
তাহাতে বিরক্ত হইয়া গোপালরাও ও অনেক সম্ভ্রান্ত মরাঠা-  
সদার নিজামের দলে মিলিত হইলেন। অনতিবিলম্বেই  
নিজামের সহিত যুদ্ধ বাধিল। নিজাম আলী ভীমবেগে  
পুণা আক্রমণ করেন, সেই আক্রমণে পুণার সমুদয় গৃহ বিধ্বস্ত  
হয়। নিজাম বিপুল ধন লাভ করিয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যে

(১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে) বর্ষা দেখা দিল, মোগলেরা পুণা ছাড়িয়া  
আরজাবাদে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল। সাতারার  
কর্তৃক পাইবার লোভে আনন্দী তোনসু নিজামের পক্ষ অব-  
লম্বন করিয়াছিলেন, নিজামকে প্রতিকাশপালনে বিশ্বস্ত  
দেখিয়া আবার তিনি পেশবার সহিত যোগদান করিলেন।  
যুবক মাধবরাও স্বজাতির গৌরবরক্ষামানসে যত্ন সহকারে  
আবার মহাসমরে প্রযুক্ত হইলেন। তাঁহার রণকৌশলে ও  
বুদ্ধিমত্তায় তান্দুলজা নামক রণক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রগণ সম্পূর্ণ জয়-  
লাভ করেন।

অনতিকাল পরেই রঘুনাথরাওর প্রিয় পুত্র ভাস্কররাও কাল-  
গ্রাসে পতিত হইলেন। এখন ভবানরাও প্রতিনিধি হইলেন।  
গোপালরাও পটবর্ধন মিরজ ফিরিয়া পাইলেন। বালাজী  
জনাধিন তাহুও এই সময়ে ফড়নবীশ পদ লাভ করিলেন।  
পরে ইনিই নানাকড়নবীশ নামে খ্যাত হন।

মহিম্বরে হিন্দুপ্রভাবের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে হায়দার  
আলী মন্তকোত্তোলন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড বিরুদ্ধ  
বর্ধন করিবার জন্য মাধবরাও বিপুলবাহিনী সমবেত করিলেন।  
বৈশাখমাসে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ও তদনুরূপ পদাতিক  
লইয়া যুবকবীর কর্ণাটকে পদার্পণ করিলেন।

হায়দারের বিরুদ্ধে অভিযানকালে মাধবরাও পিতৃব্যকে  
রাজ্যশাসনকল্পে পুণার থাকিতে অহুরোধ করেন। সখা-  
রাম বাপুও পেশবার পক্ষ সমর্থন করিলেন। রঘুনাথরাও  
অনিচ্ছায় পেশবার কথা রাখিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে মনে  
ক্রুদ্ধ হইয়া নাসিকের নিকটবর্তী আনন্দবোল নামক স্থানে  
চলিয়া আসিলেন। পিতৃব্যের সম্মতি-অপেক্ষায় পেশবার  
যুদ্ধপ্রায় কিছু বিলম্ব পড়িয়াছিল। তাঁহার কর্ণাটক আস-  
বার পূর্বেই হায়দরের সেনাপতি ফজলখান গোপাল রাও  
পটবর্ধনকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু মাধবরাওর  
অদৃষ্ট সুরাসন, তিনি কর্ণাটকে আসিয়াই আনন্দবোল নামক  
স্থানে হায়দরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন। এমন কি,  
হায়দর নগদ ৩২ লক্ষ টাকা, সুরার রাও ঘোরপড়ের সন্মুখ  
সম্পত্তি ও সাবনুরের নবাবের পাওনার টাকা ছাড়িয়া দিতে  
বাধ্য হইলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মাধবরাও এইরূপে জয়ন্তী  
অর্জন করিয়া কৃষ্ণানদী পার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।  
এদিকে গোপিকাবাজি ও আনন্দীবাজির পরস্পরের ঈর্ষার  
মাধবরাও ও রঘুনাথ রাওর মধ্যে বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইবার  
সূত্রপাত হইতেছিল। মাধবরাও জানিতেন যে, তাঁহার  
পিতৃব্য সুযোগমত আনন্দী তোনসু অথবা নিজাম আলীর  
সাহায্য লইতে পারেন। এই আশঙ্কায় তিনি (১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে)

নিজাম আলীর সহিত গোপনে সন্ধি করিয়া কেলিলেন। সেই বর্ষে নিজাম আলীও হায়দার ও মহারাত্রীগণের প্রভাব খর্ব করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন। সে সংবাদ অবিলম্বে মাধবরাওর কর্ণগোচর হইল। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে, এ সম্মিলনে মহারাত্রীর বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আর কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি কর্ণাটক প্রদেশে আসিয়া পড়িলেন। হায়দারের নিকট হইতে ৩০ লক্ষ ও কর্ণাটকের অপরাপর সামন্তগণের নিকট হইতেও প্রায় ১৭লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইয়া নিজামের রণক্ষেত্রে উপস্থিতির পূর্বেই তিনি দক্ষিণাংশে ফিরিলেন। নিজাম ও ইংরাজগণ মাধবরাওর নিকট হইতে উক্ত টাকার ভাগ চাহিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি উভয়ের প্রস্তাবই ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এই সময় রঘুনাথরাও আপনায় প্রভাববিস্তারের আশায় বহু সৈন্ত লইয়া গোয়ালিয়র অভিযুগে যাত্রা করেন। রাণা ছত্রপালের সহিত তাঁহার দীর্ঘকাল যুদ্ধ হয়। মাধবরাওর নিকট উৎসাহ পাইয়া ছত্রপাল পরাজয় স্বীকার করেন নাই। বহুদিন যুদ্ধ ব্যয় চালাইয়া রঘুনাথ প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা অর্থগ্রস্ত হইলেন। অবশেষে ঘৃণা, লজ্জা ও মনঃকষ্টে তিনি নাসিকে ফিরিলেন। এই সময়ে মাধবরাও আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রঘুনাথ রাও ক্রমেই ভ্রাতৃপুত্রের উপর উত্তরোত্তর বিরক্ত হইতেছিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি অবতরণও নামে এক ব্রাহ্মণপুত্রকে দত্তক লইয়া উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন।

মাধবরাও পুণায় আসিয়া শুনিলেন যে, বোম্বাই-গবর্নমেন্ট মোস্তিন নামক একজন সাহেবকে তাঁহার নিকট দৌত্যকার্যে পাঠাইরাছেন। ইংরাজগণের অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি যেন হায়দার অথবা নিজামের সহিত কোনরূপ সন্ধিহুত্রে আবদ্ধ না হন। কিন্তু মাধবরাও সে প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া ইংরাজদূতকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অবস্থা অমুসারে ব্যবস্থা করিবেন। আবার তিনি শুনিলেন যে, রঘুনাথরাও তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছেন। এখন তাহার প্রতিবিধান হওয়া উচিত মনে করিয়া ২৫০০০ অশ্বারোহী লইয়া নাসিকে আগমনপূর্বক রঘুনাথ রাওকে আক্রমণ করিলেন। রঘুনাথরাওও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদ্যাগ্রমে এই সময়ে তাহার প্রিয় সঙ্গী কুছুম তাঁতিয়া ও তুকাভী হোলকর তাঁহাকে ছাড়িয়া পেশবার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রঘুনাথ পরাজিত হইয়া ধোরাপ বা দ্বহাট নামক দুর্গে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় লইলেন। মাধবরাও নাসিক লুণ্ঠন ও রঘুনাথের অমুচরণকে বন্দী করিয়া উক্ত দুর্গের পাদদেশে

গোলাবর্ষণ করিতে থাকেন। দুই তিন দিন অনবরত গোলাবর্ষণে চারিদিক যেন অগ্নিময় হইয়া উঠিল, রঘুনাথ আর দুর্গ মধ্যে থাকিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি বাহির হইয়া মাধবরাওর নিকট আসিলেন। ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের পাদস্পর্শ করিয়া অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে তিনি রঘুনাথকে নিজ হস্তের উপর বসাইয়া অবিলম্বে তাহাকে লইয়া পুণায় আসিলেন ও এখানে সমাদরের সহিত পিতৃব্যকে একটা বৃহৎ গৃহ মধ্যে এক প্রকার নজরবন্দী করিয়া ফেলিলেন।

নাগপুরের জানোজী ভোঁসলে রঘুনাথরাওকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পিতৃব্যকে বন্দী করিয়া পেশবা জানোজীকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। নাগপুরপতি পেশবার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। তিনি তিন মাস কাল নামাহানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে পেশবাকে ১৫ লক্ষ টাকা নজর দিয়া তিনি অব্যাহতি পাইলেন।\* নাগপুরজয়ের পর মাধবরাও মহাসমারোহে পুণায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। শুনিলেন,—হায়দার আলী আবার প্রবল হইয়া মহারাত্রীগণের উপর অত্যাচার করিয়াছে। এমন কি, অনেক মহারাত্রী-সামন্তগণের নিকট কর ও আদায় করিতেছে।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কার্তিক মাসে তিনি গোপালরাও পটবর্দন ও মলহররাও রাস্তায় অধীনে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী পাঠাইয়া দিয়া ভৎপরে নিজেও বিশ হাজার অশ্বারোহী ও ১৫ হাজার পদাতিক সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। লক্ষ্য হইয়া তাঁহার জয়পতাকাশোভিত হইল, বহুমান তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু হৃদ্যাগ্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি যম্মারোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার বিশ্বাস যে, কোল্‌হাপুর-সুন্দারের মাতার অভিশাপেই তান এরূপ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। বাহা ইউক, তিনি মাতুল আশ্বকরাওর উপর যুদ্ধভার দিয়া পুণায় ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া আবার তিনি মাতুলের সহিত যোগদান করিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এবার তিনি আপা বলবন্তের উপর সৈন্তপরিচালনের ভার দিয়া ফিরিয়া আসেন। আপা বলবন্তের কোশলে হায়দার পরাস্ত ও বশতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ষাকালে তিনি বেশ সুস্থ হইলেন, সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন এরূপও তাঁহার আশা হইয়াছিল।

\* মুসলমান ঐতিহাসিক তারখ-ই-ইব্রাহিম খাঁ পেশবার বিজয়বোধনা করিলেও বখরে অন্তরূপ লিখিত হইয়াছে। বখরের মতে, গোপালরাও জানোজীর পক্ষ অবলম্বন করেন। মাধবরাও বাধ্য হইয়া অবশেষে জানোজীর সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

চৈত্র মাসে আবার রোগ দেখা দিল, এবার ছারারোগ্য বলিয়া সকলেই স্থির করিলেন। এখন পেশবা মরিবার অল্প প্রস্তুত হইলেন। তিনি রঘুনাথ রাওকে আনাইয়া তাঁহার পাছপার্শ্ব পূর্বক পূর্ব-অপরোধের জন্য কথা প্রার্থনা করিলেন। বাস্তবিক মাধবরাওর অবস্থা দেখিয়া রঘুনাথ রাও অশ্রু স্রবণ করিতে পারলেন না। তিনি নানা দেশ হইতে বৈদ্য ও সাধু সম্যাদী আনাইয়া ভ্রাতৃশুভ্রের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু আর কাহারও চিকিৎসার ফল হইল না। মৃত্যুর পূর্বে মাধবরাও অশ্রু মারায়ণ রাওকে পিতৃব্যের করে সঁপিয়া গেলেন। খেউর নামক গ্রামে অষ্টাবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হিন্দুকুলভিলক মহারাষ্ট্রের একটা উচ্চল রক্ত ইহলোক পরিভ্রমণ করিলেন (১৮ই নবেম্বর ১৭৭২ খৃঃ অঃ)। তাঁহার তিরোভাবের সহিত মহারাষ্ট্রের ভাবী আশা ভরসা অন্তল-পলিলে নিমজ্জিত হইল। [ মহারাষ্ট্রের ৪৪৯ পৃষ্ঠায় মাধবরাওর চরিত্র ও অপরাধের কথা দ্রষ্টব্য। ]

মাধবরাও নারায়ণ, মহারাষ্ট্রের ৭ম পেশবা। পেশবা মারায়ণ রাওর পুত্র ও মাধবরাওর ভ্রাতৃপুত্র। ১৭৭৪ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পেশবাপদ ভোগ করিয়াছিলেন। নারায়ণ রাওর মৃত্যুকালে মাধবরাও-নারায়ণ মাতৃগর্ভে। তাঁহার জন্মের পূর্ব পর্যন্ত রঘুনাথ রাও পেশবা ছিলেন। তাঁহার জন্মের পর সর্দার ও অসাত্যগণের চেষ্টায় তিনি পেশবা হইলেন এবং তাঁহার মাজা গলাবাই পেশবা ও মহারাষ্ট্র-রাজ্যের স্বকসিদ্দী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। [ তাঁহার সময়ের বিস্তৃত বিবরণ রঘুনাথরাও ও নানা-ফড়নবীশ শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

মাধব রামানন্দ সরস্বতী (পুং) জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। মাধববর্ষ্যন দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণুকুণ্ডিনবংশীয় জনৈক প্রাচীন রাজা।

মাধববল্লী (স্ত্রী) লতাবিশেষ (Gærtnera Racemosa)

মাধববৈদ্য, আনন্দলহরীটীকাপ্রণেতা।

মাধবশাস্ত্রী, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর রামচন্দ্র তীর্থ নামে পরিচিত হন। ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

মাধবশঙ্কর, জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। কৃষ্ণের পুত্র ও ব্যাস নারায়ণের পৌত্র। ইনি ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কুণ্ডলকল্পক্রম নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মাধবজী (স্ত্রী) বলন্তশোভা।

মাধবজীগ্রামকর, সামুদ্রিকচিকিৎসামনি নামক গ্রন্থরচয়িতা।

মাধবজীজগমাধী, জনৈক বৈষ্ণব সাধু। নীলগিরি-ধামে সন্ন্যস্তীয়ে তাঁহার বাস ছিল। তিনি সংসারধর্মপরি-

ভ্যাগপূর্বক হরিধামে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ক্রমে ভোগপূহা ত্যাগ করিবার জন্য তিনি বিবর ভোগ পরিত্যাগ করেন। তিনদিন উপবাসে কাল কাটাইলেন দেখিয়া জগমাধ মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাক্ষসে স্বর্ণধালে করিয়া তাঁহাকে নিত্য যে ভোগ দেওয়া হইত, তাহাই তিনি লক্ষ্মীঠাকুরাণীকে দিয়া মাধবের কুটার মধ্যে পাঠাইয়া দেন। এদিকে স্বর্ণধাল দেখিতে না পাইয়া শ্রীমন্দিরের পাণ্ডাগণ ইতস্ততঃ চোরের অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে মাধবদাসের ঘরে সেই খাল দেখিয়া তাঁহাকেই চোর-জ্ঞানে বেত্রপ্রহার করিতে লাগিল। এই সময় মহাপ্রভু সেবকগণকে প্রত্যাদেশ করেন যে, আমি ঐ খাল ভোজ্য সহ মাধবের কুটারে পাঠাইয়া দিয়াছি।

আর এক সময় তিনি আশ্রমে পীড়িত হইয়া জলাভাবে বালির উপর পড়িয়া থাকিলে, দীনদয়াল ভবহার হাত ধোয়াইবার জল আনিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্বিন্ন শীত-ক্লিষ্ট মাধবকে স্বীয় শীতবস্ত্র দান, তাঁহাকে লইয়া গোপালের বাগানে কাঁঠাল চুরি, তৎসঙ্গে জগমাধ দেবের বৃন্দাবনধামে প্রভৃতি অনেক অলৌকিক ঘটনা স্মৃত হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে তিনি বিহারীজীকে ছোলাভোজ্য ভোগ দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি আপনাবার তিনটা শিষ্যের অতীষ্ট পূর্ণ করিয়া মাতৃদর্শনার্থ পুর্নাক্রমে আগমন করেন। পরে তথা হইতে পুণ্যময় পুরীধামে উপনীত হন। জগমাধদেবের সহিত তাঁহার সখ্যতা অস্মিতাছিল। (ভক্তমাংসা) মাধবসরস্বতী, ১ পঞ্চাবলীপুত্র জনৈক কবি। ২ ভ্রায়চূড়ামণি নামক বেদান্ত-গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি চণ্ডীশ্বরের স্বরূপ এবং বিবেচকের শিষ্য ছিলেন। ৩ পদচক্রিকা নামী যোগবিশিষ্ট-টীকারচয়িতা।

মাধবসিংহ, জয়পুরের জনৈক রাজা। মহারাজ মানসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার পাটরাণী কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ছিলেন। রাজা মাধবসিংহ জ্যেষ্ঠের সহিত কাবুলরাজ্যশাসনে গমন করিলে, দেওয়ান রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজকাব্য চালাইতে থাকেন। এই সময় একদিন রাণী পর্ষদে শয়ান আছেন, দাসী তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে কৃষ্ণবিষয়ী প্রেমগীতি আনন্দে গান করিতে থাকে। ঐ অপূর্ণ গানে রাণীর হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। সেই দিন হইতে তিনি কৃষ্ণপ্রেমধনু পাইবার প্রত্যাশায় আত্মজীবন উৎসর্গ করেন।

বিষয়বাসনা ও ভোগমুখ বর্জন করিয়া তিনি কৃষ্ণের সেবার মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র প্রণেতা

কৃষ্ণসদৃশ অলুতব করিতেন। বৈষ্ণবসেবার কৃষ্ণে প্রীতি জন্মিবে তাবিয়া তিনি বৈষ্ণবসেবা আরম্ভ করিলেন। বৈষ্ণব-গণ তাঁহার আদেশক্রমে সর্বদাই রাজাসংগ্রে বাতায়ত করিত। তিনি বহুতে মালাচন্দন দিয়া বৈষ্ণবের সেবা করিতেন। রাণীমাতাকে এইরূপ বেষণা দেখিয়া দেওয়ান ক্রুদ্ধ-চিত্তে এই সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। প্রত্যুত্তরে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচরণে আমি পর্দাসহ এই অকিঞ্চিৎকর দেহ সমর্পণ করিয়াছি। তজ্জন্ত সেই বৃগলকিশোরের প্রেমে আমি লজ্জা, ধর্ম, মান, ধন, আত্মজন, এমন কি নিজ প্রাণও ত্যাগ করিতেছি।

দেওয়ান এই সংবাদ রাজা মাধবসিংহের নিকট কাবুলে প্রেরণ করেন। মাধবসিংহ দেওয়ানের পত্রের মর্ম পূত্র প্রেমসিংহকে জানাইলেন। পুত্রও মাতার জ্ঞান কৃষ্ণভক্ত। তিনি পিতাকে বলিলেন যে, 'তিনি শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপদ লাভ করিয়াছেন। মাতার এই ভগবদ্ভক্তি হইতেই আমাদের তিন কুল উজ্জল হইল।' পুত্রের এরূপ বাক্যে ক্রোধোদীপ্ত হইয়া, রাজা পুত্রকে ভৎসনা করিলেন এবং রাণীর শির-শ্বেদের আদেশ দিলেন। ইহাতে পিতাপুত্রে সমর বাধিবার উপক্রম হয়। পরে অপরাপর লোকের মধ্যস্থতায় উভয়েই শাস্তভাব ধারণ করেন।

রাজা রাণীকে শান্তি দিবার জন্ত ক্রতগমনে গৃহে প্রত্যা-গত হইলেন। স্বীয় পরামর্শে জীহত্য না করিয়া রাণীকে ব্যাঘ্রকবলে ফেলিয়া দেওয়াই হির হইল। তদনুসারে রাজপুত্রালাহ একটা ব্যাঘ্র আনিয়া রাণীর গৃহে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

রাণী তখন কৃষ্ণপূজা করিতেছেন। ব্যাঘ্রের সাধ্য হইল না—কৃষ্ণভক্তের প্রতি অন্তায় অত্যাচার করে, অধিকন্তু সেও নম্র হইয়া রাণীর চরণ লেহন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রকে কাছে দেখিয়া রাণী তাহাকে সাপটিয়া ধরিলেন এবং কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিবার জন্ত বার বার বলিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্রও পুলকে লাজ নাড়িতে লাগিল।

ভক্তির এতাদৃশ মাহাত্ম্য দেখিয়া রাজা ভয়বিহ্বল হইলেন। তিনি পাত্র মিত্র সমভিষাহারে রাণীর নিকট আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। আর একদিন নদীবেগে বিচরণকালে রাজা মাধবসিংহ ও মানসিংহ রাণীর অলৌকিক প্রভাব স্মরণ করিয়া প্রবল কটিকা হইতে রক্ষা পান। (ভক্তমাং) মাধবসিংহ, কোটারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বুনৌর হররাজবংশীয় নরপতি রাও রত্নসিংহের মধ্যমপুত্র। সম্রাট্ শাহজহানের রাজত্বকালে বূহীনপুর-সমরে বিশেষ বীরত্ব

দেখাইয়া মাধব সম্রাটপুত্রের অগ্রশ্রী অর্জন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার কৃতকার্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে কোটা-প্রদেশ ও তদধীনস্থ কতকগুলি গ্রাম দান করেন। সেই স্থানে মাধবসিংহ পিতৃরাজ্য বুনৌ পরিভাগপূর্বক স্বাধীনভাবে কোটারাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এই সময় হইতে বুনৌ ও কোটা দুইটা বিভিন্ন রাজ্যে পরিণত হয়। পূর্বে কোটা-রাজ্য বুনৌরাজ্যের সামন্তশাসিত প্রদেশরূপে গণ্য ছিল।

হররাজবংশের ইতিবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে মাধবসিংহের জন্ম হয়। তিনি স্বীয় বীরত্বে পারিতোষিক স্বরূপ সম্রাটের নিকট হইতে কোটারাজ্য এবং রাজোপাধি প্রাপ্ত হন।

পূর্বে কোটার ভীলদিগের বিশেষ প্রভাব ছিল। তখনকার সামন্তগণ অতি অল্পমাত্র স্থান লইয়াই রাজত্ব করিতেন। কোটার প্রথম স্বাধীন চোহান-নরপতি মাধবসিংহ দিল্লীখরের অমুগ্রহে ও বলে বখীবান্ হইয়া স্বীয় রাজ্যসীমা পরিবর্তিত করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে কোটারাজ্যের সীমা মালব ও হরবতীর সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৬৮৭ সন্থতে মুকুনসিংহ, মোহনসিংহ, জুঝাউসিংহ, কুনিরামসিংহ ও কিশোরসিংহ নামে পাঁচটা পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

মাধবসিংহ, গঢ়াদেশের জনৈক নরপতি।

মাধবসিংহ, জনৈক হিন্দুরাজা। যবনপারিপাট্য-রাজনীতি নামক গ্রন্থপ্রণেতা দলপতিয়ারের অতিপালক।

মাধবসিংহ, ১ খেচরপদ্ধতিরচরিত। ২ শব্দকোমুদীনামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মাধবসিংহ, জয়পুরের কচ্ছবাহবংশীয় নরপতি সবাই জয়-সিংহের পুত্র। ইনি স্বীয় মাতুল মিবারের রাণার সাহায্যে স্বীয় ভ্রাতা জয়সীংহকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া অধরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে স্বর্ঘ্যমল্ল জাটের প্রথম পুত্র জবাহিরসিংহ ভরতপুর-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। তিনি মাধবসিংহের বিরুদ্ধাচারী হইয়া, বিনামুমতিতে জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া সসৈন্তে পুঙ্কর তীর্থে উপনীত হন। এইখানে মারবারপতি বিজয়সিংহের সহিত তাঁহার সখ্যতা স্থাপিত হয়। রাজার নিবেদনসম্বন্ধে এইরূপে বলীবান্ হইয়া রাজাজ্ঞার অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার পুনরায় জয়পুর-রাজ্য মধ্য দিয়া প্রত্যাগত হন। এই স্থানে উভয়পক্ষে ঘোর-তর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জবাহির পলায়ন করেন।

রাজ্যাধিকারকালে তিনি মহারাষ্ট্রনেতা আপাজি সিদ্ধিয়া ও মলহর হোলকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ



খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শেষে হোলকরের আত্মহুল্যে তাঁহার সিংহাসনাধিকার ঘটে। অতঃপর রাজ্যরক্ষাক্রমেও তিনি কএকটা যুদ্ধ করিয়া স্বীয় বীরত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন। যে দিন অধরসৈন্তের সহিত আটসেনানলের মহাসমর উপস্থিত হয়, সেই দিন মাচেরীর সামন্তরাজ—যিনি মাধবসিংহ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন,—স্বজাতির অবমাননাবোধে সসৈন্তে অধরপতির পক্ষে যোগদান করেন। জাটরাজ পরাস্ত হইলে পর, মাচেরীর সর্দার প্রতাপসিংহ বিশেষ সম্মানের সহিত অধররাজ কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধের চারিদিন পরে আমাশয় রোগে মাধবসিংহের মৃত্যু ঘটে। তিনি সপ্তদশ বর্ষকাল মাত্র রাজ্যাশাসন করিয়াছিলেন। সমরাসনানের পর যদি তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শিশু পুত্রগণের রাজ্যাশাসনকালে অরাজকতাহেতু কচ্ছবাহরাজ্যের শাসনশক্তি এতাদৃশ ক্ষীণ হইত না। তিনি পিতার জ্ঞান বিজ্ঞানসাহী এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। তাঁহার শাসনসময়ে জয়পুররাজ্যে নানা দিগেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

তাঁহার দুই পুত্রের গর্ভে যথাক্রমে পৃথ্বীসিংহ ও প্রতাপসিংহ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

মাধবসিংহ রাজ্য, দেববিলাসার্থ্য্য নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মাধবসেন, জনৈক প্রাচীন কবি।

মাধবসেন, বাঙ্গালার সেনবংশীয় জনৈক রাজা।

[ সেনরাজবংশ দেখ। ]

মাধবসোমযাজিন্ ( পুং ) জনৈক পণ্ডিত। [মাধবাচার্য্য দেখ] মাধবাচার্য্য, ( বিজ্ঞানরত্নাশ্রম ) ভারতবর্ষের একজন অসাধারণ পণ্ডিত। মায়ণের পুত্র ও সায়ণাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিজয়নগরাধিপ হরিহরের প্রধান মন্ত্রী। হালকাগাড়া ভাষায় রচিত ‘বিজ্ঞানরত্ন-কালজ্ঞান’ নামক পুস্তকপাঠে জানা যায়,—

মাধব ভুবনেশ্বরের প্রসাদলাভের আশায় বিজ্ঞানরত্নে আসিয়া কঠোর তপস্তা করেন। মহামায়া তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই বনে গুপ্তধন দেখাইয়া দেন। মাধব সেই অপর্যাপ্ত ধন দ্বারা বন কাটাইয়া এখানে নগর পত্তন করেন। তখন হইতে বিজ্ঞানরত্ন ‘বিজ্ঞানগর’ ( পরে চলিত ভাষায় বিজয়নগর ) নামে খ্যাত হইল, তাপস মাধবও বিজ্ঞানরত্নাশ্রমী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এইরূপে ১২৫৮ শকে বিজ্ঞানগরের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি হরিহর ও বুদ্ধরাজকে আনিয়া বিজ্ঞানগরে স্থাপন করেন। নানা-

স্থানের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, পণ্ডিতপ্রবর মাধবাচার্য্য কম্পরাজপুত্র সঙ্গমরাজের প্রথমভ্রাতৃ মন্ত্রী ছিলেন। এই সময়েই পুত্র হরিহর ও বুদ্ধরাজ। মাধবের অরণ্য-উপাধি দৃষ্টে মনে হয় যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের দলভুক্ত ছিলেন। শঙ্করমঠের সন্ন্যাসিগণ কেবল বিজ্ঞানগরবে নহে, ধনগোরবেও সর্বত্র প্রসিদ্ধ। অধিক সম্ভব, উদীয়মান মুসলমান-প্রভাব ধ্বংস করিবার জন্ত তিনি ঐরূপে কোন মঠের টাকা লইয়া সঙ্কন বা তৎপুত্র হরিহরকে হিন্দুধর্মরক্ষায় নিযুক্ত করেন। তিনি যে এই দারুণ দুর্দিনেও বেদমার্গপ্রবর্তনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বিজ্ঞানগরের রাজগণও যে তাঁহার অমুদ্বর্তী হইয়াছিলেন, তাঁহার বিরাট বেদভাষ্য হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। [ সায়ণাচার্য্য দেখ। ] বলিতে কি, মাধবাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক পরম তাপস এবং জাতি ও স্বধর্মরক্ষায় তৎপর ছিলেন। তিনি এক হস্তে শাস্ত্র ও অপর হস্তে শস্ত্র লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যিনি গোম্মার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী মুসলমানেরা গোমস্ত ( গোম্মা ) অধিকার করিয়া হিন্দুদেবালয় ধ্বংস ও হিন্দুনিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে মাধবাচার্য্যের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্ত লইয়া ১৩১৩ শকে মুসলমানদিগের করাল কবল হইতে গোয়ানগরী উদ্ধার করেন। তাঁহার বংশধরেরা শতবর্ষ পর্যন্ত এই স্থানে আধিপত্য করিয়াছিলেন।

[ গোম্মা দেখ। ]

বেদভাষ্য ভিন্ন তিনি বহুগ্রন্থ রচনা করেন, যথা—অধিকরণমালা, জৈমিনীয় ত্রায়মালাবিত্তর নামে মীমাংসাগ্রন্থ, অতুত্তিপ্রকাশ, অপরোক্ষাতুত্তিটীকা, অভিনব মাধবীয় নামক ধর্মশাস্ত্র, আত্মানাত্মবিবেক, আশীর্বাদপদ্ধতি, কর্মবিপাক, কালনির্ণয় বা কালমাধবীয়, কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, কুরুচরণপরিচর্য্যাবিভূতি, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, জাতিবিবেক, শতপ্রশ্ন, জীবমুক্তিবিবেক, জ্ঞানযোগখণ্ডভাষ্য, গজভেদ, ত্রাশ্বকভাষ্য, দক্ষিণামূর্ত্তাষ্টকটীকা, দত্তকমীমাংসা, দর্শপূর্ণমাসপ্রয়োগ, দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞতন্ত্র, ধাতুতত্ত্ব, পঞ্চদশী, পঞ্চসারব্যাখ্যা, পরাশরমাধব ( পরাশর-স্মৃতির আচার ও ব্যবহারাদি ) বিন্যস্ত ব্যাখ্যা, পানিনিয় শিক্ষাভাষ্য, পুরাণসার, পুরুষার্থসুধানিধি, প্রমেন্দ-সারসংগ্রহ, ব্রহ্মগীতাটীকা, ভগবদ্গীতাভাষ্য, মহাবাক্যনির্ণয়, মাধবীয় বেদান্তভাষ্য, মুক্তিখণ্ডটীকা, মুহূর্ত্তমাধবীয়, যজ্ঞতন্ত্র-সুধানিধি, যজ্ঞবেদভবখণ্ডটীকা, যোগবাশিষ্ঠসারসংগ্রহ, রামতন্ত্র-প্রকাশ, লঘুজাতকটীকা, ব্যাসদর্শনপ্রকার, শঙ্করবিলাস, শিব-খণ্ডভাষ্য, শিবমাহাত্ম্যভাষ্য, সর্বদর্শনসংগ্রহ, সহস্রনামকারিকা,



সিদ্ধান্তবিন্দু, স্বল্পপূরণীয় স্তবসংহিতাতাৎপর্য্যদীপিকা, স্মৃতি-  
সংগ্রহ, স্বরবিগ্রহশিক্ষাভাষ্য, হরিস্ততিটীকা।

[ তিহি যে সকল বেদভাষ্য প্রণয়ন করেন, সে সমুদায়ের  
নাম সায়াগাচার্য্য শব্দে দেখ। ]

মাধবাচার্য্য, বিশ্বেশ্বরচার্য্য ও ভগীরথচার্য্য একগ্রামবাসী ও  
পরস্পর বন্ধু ছিলেন। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—ইহাদের  
পত্নীদ্বয়ও একে অন্তর্ভুক্ত ভগিনীর স্থায় দেখিতেন। বিশ্বেশ্বরের  
পত্নীর নাম মহালক্ষ্মী। একদা মহালক্ষ্মীর অর হয়, অর ক্রমে  
সাংঘাতিক হইয়া উঠে। সখীকে দেখিবার জন্ত জয়হুগা বিশ্বে-  
শ্বরালয়ে গমন করিলেন। মহালক্ষ্মীকে পাইয়া জয়হুগা  
আশ্বস্তা হইলেন ও আপন পুত্র মাধবকে সখীর করে সঁপিয়া  
দিলেন। ইহার পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। বিশ্বেশ্বর  
কাশ্যপগোত্রীয় বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভগীরথ চট্টগাঁই রাঢ়ীয়  
ব্রাহ্মণ। ভগীরথপত্নী মাধবকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগি-  
লেন। বিশ্বেশ্বর গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন;  
সুতরাং মাধব ভগীরথেরই তৃতীয় পুত্ররূপে ( ইহার শ্রীনাথ ও  
শ্রীপতি নামে আরও দুই পুত্র ছিল ) পরিচিত হইলেন। এই  
মাধবই অতঃপর নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া আচার্য্য উপাধিতে  
পরিশোভিত হন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর কণ্ঠা গঙ্গাদেবীর পাণি-  
গ্রহণ করেন। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—

“মাধব আচার্য্য হৈলা নিত্যানন্দ-ভক্ত।

নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে সদা অহুরক্ত ॥

পরম কুলীন মাধব আচার্য্য মহাশয়।

নিত্যানন্দ গঙ্গাকণ্ঠা তাঁহাকে অর্পয় ॥

ভগীরথপুত্ররূপে গ্রহণ করাতে।

আরও নিত্যানন্দ প্রভুর রূপা বহু তাতে ॥

এই সে কারণে মাধব গুণের নিধান।

চট্টবংশে হইলেন কুলীনপ্রধান ॥

এই ত কহিল বারেন্দ্র মাধবের বিবরণ।

যেছে হইলেন রাঢ়া তাহার কারণ ॥”

বৈষ্ণব-নস্প্রদায়ে এই মাধবাচার্য্য শান্তনু রাজার অবতার-  
স্বরূপে কীর্তিত। “মাধবঃ শান্তনুঃ” গৌরগণোদ্দেশ-  
দীপিকায়ও এই শ্লোক পাওয়া যায়।

মাধবাচার্য্য, চট্টগ্রামের চক্রশালা-গ্রামবাসী পুণ্ডরীক বিষ্ণা-  
নিধির বাণ্যস্থ। দুই জনে একত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং  
দুইজনই শেষে ত্রিগোরাঙ্গের ভক্ত হইয়াছিলেন।

প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—

“পুণ্ডরীক মাধবের একত্র অধ্যয়ন।

এক স্নানান্তা কেবল হয় দেহ মাত্র তিন ॥

পুণ্ডরীক মাধব মহাপ্রভুর অতি ভক্ত।

দৌহে মহাপ্রভুর শাখা আছে যে বিখ্যাত ॥”

ত্রিগোরাঙ্গের প্রিয়পাশ্বদ অমুচর প্রসিদ্ধ গদাধর পাণ্ডুর  
গোস্বামী এই মাধবাচার্য্যের পুত্র। বৈষ্ণবগণ গদাধরকে  
শ্রীমতীর অবতার স্বরূপে মান্য করিয়া থাকেন।

মাধবাচার্য্য, নবদ্বীপবাসী বৈদিক দুর্গাদাস মিশ্রের দুই পুত্র,  
সনাতন ও কালিদাস। সনাতনের একপুত্র ও এক কণ্ঠা। এই  
কণ্ঠার নামই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। ইনিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর  
দ্বিতীয়া স্ত্রী। কালিদাসেরও একটা পুত্র হয়, ইহারই নাম  
মাধব। সনাতন পিতৃহীন মাধবকে যত্নের সহিত প্রতিপালন  
করেন। প্রেমবিলাস বলেন,—

“নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি হইলা পণ্ডিত।

আচার্য্য উপাধিতে তিহঁ হইলা বিদিত ॥”

একদা ত্রিবাঙ্গালয়ে শ্রীমহাপ্রভুর অভিষেক হইতেছে।  
সকলভক্তই উপস্থিত। এমন সময় মাধবাচার্য্য তথায় গমন  
করিলেন; তখন তিনি শ্রীমহাপ্রভুর রূপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ  
করেন। এই মাধবকে তখন মহাপ্রভু ত্রিগোরাঙ্গ অদ্বৈত-প্রভুর  
নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। মাধব অদ্বৈত প্রভু  
হইতে দীক্ষিত হন। মাধব একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন,  
ত্রিগোরাঙ্গের আদেশে তিনি কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্য রচনা করেন।

প্রেমবিলাসে—

“শ্রীচৈতন্য প্রভু তারে অমুগ্রহ করি।

চরণ তুলিয়া দিলা মন্তক-উপরি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ।

গীতে বর্ণন তিহঁ করি নানা ছন্দ ॥

রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

শ্রীচৈতন্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল ॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভু-আজ্ঞামতে।

মাধবের দীক্ষামন্ত্র করে উপদেশে ॥

মাধব আচার্য্য শ্রীমাধবা সখী হন।” ইতি

চরিতামৃতে অদ্বৈত-শাখাবর্ণনপরিচ্ছেদে ইহার নাম  
প্রাপ্ত হওয়া যায়। নবদ্বীপের অনেক ভক্ত-সঙ্গে এই মাধব  
থেতুরীর উৎসবেও গমন করিয়াছিলেন; ভক্তরত্নাকরে ঐ  
উৎসববর্ণনপ্রসঙ্গে ইহার নামোল্লেখ আছে।

কেবল কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্য রচনাই মাধবের একমাত্র কীর্তি  
নহে। মাধবদাস-ভণিতায়ুক্ত যে সকল পদ পদকল্পতরু  
প্রভৃতিতে পাওয়া যায়, সেই প্রসিদ্ধ পদকর্তা এই মাধবা-  
চার্য্য। কৃষ্ণমঙ্গলের অনেক গীত ও পদগ্রন্থে উদ্ধৃত দৃষ্ট  
হয়। কৃষ্ণমঙ্গলের রচনা অতি মধুর ও প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট।

এই কৃষ্ণমণ্ডল প্রচারিত হইলে গুণরাজখাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের আদর কমিয়া যায়।

মাধবাচার্য্য, রাঢ়ীয় বল্লভীমেলভুক্ত ধরণীধরের তৃতীয় পুত্র পরাশর। পরাশরের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নামই মাধব আচার্য্য। হনিও একজন কবি ছিলেন। চণ্ডীকাব্য ইহার লেখনাপ্রসূত। চণ্ডীকাব্য ব্যতীত তিনি দক্ষিণরায়ের উপাখ্যান ও সংস্কৃত প্রেমরত্নাকর রচনা করেন। পরাশর-পুত্র সঙ্গীতব্যবসায়ী ছিলেন অর্থাৎ আসরে গান গাইতেন। তিনি চণ্ডীকাব্যে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন ;—

“পঞ্চগোড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।

একাব্রর নামে রাজা অর্জুন অবতার ॥

সেই পঞ্চগোড় মধ্যে সপ্তগ্রামস্থল।

ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল ॥

সেই মহানদীতটবাসী পরাশর।

যাগ যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ॥

তঁাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।

ভক্তিভরে বিরচিত্ত দেবীর মাহাত্ম্য ॥

আমার আসরে বত অনুরূপ গায় গান।

তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান ॥”

“ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শকনিয়োজিত। (১৫০১ শকাব্দ)

বিজ্ঞ মাধবে গায় সারদাচরিত ॥”

ইহাতে মাধবের বংশপরিচয় এবং ব্যবসায়াদি সমস্তই অবগত হওয়া যাইতেছে। মাধবের চণ্ডীকাব্যে আর একটা বিশেষত্ব আছে। তিনি শক্তি-উপাসক হইলেও এবং স্বীয় উপাশ্রয় দেবীর গুণগান করিতে বসিলেও অবসরক্রমে শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর গুণগান করিতে ভুলেন নাই। চণ্ডীকাব্যের মধ্যে “দেখ না গোরাক্ষচাঁদের বাজার” ইত্যাদি পদই তাহার উদাহরণ। ইহাতে তখনকার বৈষ্ণবধর্মের সর্জীবতার লক্ষণই দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবধর্মের উদারতা ও শ্রীগোরাঙ্গের প্রেম—তখন শাক্তগণের মনেও কতক পরিমাণে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বাহা ইউক, শাক্ত হইলেও মাধব বৈষ্ণবধর্মের প্রতি এত প্রলোভিত হইয়াছিলেন যে, শেষে তাঁহা হইতে বৈষ্ণবগণের মধ্যে চূড়াধারী নামে একটা বৈষ্ণবদলের সৃষ্টি হয়। চূড়াধারী বৈষ্ণবগণের মধ্যে এখন অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আছেন; ইহাদের প্রধান গাঁদ ময়মনসিংহ জেলার দেশদল গ্রামে। ওদ্যাতীত উক্ত জেলার সমুদ্র, বাজুড়ী ও শ্রীহট্টের মুরাকৈর এবং ত্রিপুরার পত্তন গ্রামে চূড়াধারী বৈষ্ণবদিগের বাস আছে।

প্রবাদ, পুরুষানুপরিচয় মাধবাচার্য্য ময়মন-

সিংহের বড়আঙুর সন্নিকটে কোন গোয়ালার বাগানে, আসিয়া উপস্থিত হন এবং স্বীয় মন্তকে চূড়া ধারণপূর্বক তাহাদিগের নিকট আপনাকে অবতাররূপে প্রকাশ করেন। গোয়ালাগণ মাধবের সঙ্গীত ও বাজ্যাহায়ে ভুলিয়া গিয়া দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। মাধব এইরূপে পুরুষ-বঙ্গে আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইলেন। এই চূড়াধারীগণ সঙ্গীত করিবার সময়ে আপন আপন প্রধান-গণের মন্তকে চূড়া বাধিয়া দিয়া থাকে। চূড়াধারীগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-মতাবলম্বী হইলেও বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হয় নাই। তাহার কারণ তাঁহাদের প্রবর্তক মাধবাচার্য্য (বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিলেও) স্বয়ং বৈষ্ণবমত্রে দাক্ষিত্য হন নাই; বরাবর শাক্তমত্রেই দাক্ষিত্য ছিলেন।

মাধবাচার্য্য, নিধার্ক-সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। স্বরূপাচার্য্যের শিষ্য এবং বলভদ্রাচার্য্যের গুরু।

মাধবানন্দ, শান্তব-কল্পদ্রুম-রচয়িতা।

মাধবানল (পুং) মাধবনলাখ্যানরচয়িতা। জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত।

মাধবাচার্য্য, নরকাসুর-বিজয় নামক নাটকপ্রণেতা। হনি মাধবেন্দ্র নামেও সাধারণে পরিচিত।

মাধবানন্দ, জনৈক সাধুপুরুষ। নারায়ণাশ্রমের শিষ্য। স্বাতন্ত্র্যবাদর্শ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার অপর নাম মাধবভিক্ষু।

মাধবিকা (স্ত্রী) মাধবী-কন্ টাপ, পূর্ব্বদ্বন্দ্ব। মাধবা-লতা। (অমরটীকাঃ ভরত)

মাধবী (স্ত্রী) মধৌ সাধু পুষ্পাতি মধু- (কালঃ সাধুপুষ্পাৎ পচ্যমানেশু। পা ৩।৩।৪৩) ইত্যং, ভীপ্। স্বনামগ্যাত পুষ্পলতা, পর্যায়—অতিমুক্ত, পুণ্ড্রক, বাসন্তীলতা, অতিমুক্তক, মাধবিকা, মাধবালতা, চন্দ্রবল্লী, সুগন্ধা, ভ্রমরোৎসব, ভূপ্রিয়, ভদ্রলতা, ভূমিগুপভূষণা, বাসন্তী দ্বীপ, লতামাধবী। (শব্দরত্নঃ)

ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, মদগন্ধা, পিত্ত, কাস, ব্রণ, দাহ ও শোণনাশক। (রাজনিঃ) ভাবপ্রকাশমতে পর্যায়—বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক, ভ্রমরোৎসব। গুণ—মধুর, শীতল, লঘু, এবং দোষগ্রন্যনাশক।

২ মিসি। ৩ মধুশকরা। ৪ কুটনী। মধুনো বিকারঃ ইত্যং ভীপ্। ৫ মদিরা।

“অস্তি মে শয়নং দিব্যং স্বদর্শনপুণ্ড্রকমিতম্।

এহি তত্র ময়া সাক্ষিঃ পিবস্ব মধুমাধবীম্॥”

(মহাভারত ৪।১৫৩)

মাধবস্ত্যেমিত্যং ভীপ্, তৎপ্রিয়ত্বাৎ তথাহং। ৬ ভূমদী।

(শকমালা) মধো বসন্তে সেব্যাহর্জুনীরেতি অণ্ । ৭ দুর্গা ।  
(শব্দরত্নাঃ) ৮মাধবপত্নী । ৯মধুবংশজা কছা । (ভারত ১১৫১১২)  
মাধবী, ঐনৈক বৈষ্ণবী-কবি । ইনি নীলাচল (উড়িষ্যার  
অন্তর্গত)-মিবাসিনী ছিলেন । শিখি মাইতির ও মুরারি  
মাইতির কনিষ্ঠা ভগিনী হইলেও, বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহাদিগকে  
“তিন ভ্রাতা” বলা হইয়াছে ।

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পর্যটন করিয়া নীলাচলে অবস্থিত  
হইলে, মাধবী অন্তরাল হইতে তাঁহার রূপমাধুর্য্য সন্দর্শন  
করিতেন । মহাপ্রভুকে প্রথম দর্শনমাত্রই মাধবীর ভগবদবতার  
বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল । তিনি তখন হইতেই তাঁহার ‘ভক্ত’  
হইয়া পড়িয়াছিলেন ।

মাধবীদেবীর গৌরবিস্ময়ক পদগুলি ঐতিহাসিকতবে পূর্ণ ।  
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডভাঙ্গার কলহ, জগদানন্দের নবদীপ-  
বাত্রা, দোললীলা উপলক্ষে ত্রিগোবতের কীর্তন প্রভৃতি অনেক  
বিষয় তাঁহার রচিত-পদে পাওয়া যায় ।

জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দৈনন্দিন বিবরণ লিপিবদ্ধ  
করিয়া রাখিবার জন্য একজন লেখনাধিকারীর আবশ্যক  
হইত । মাধবীর হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল । তাঁহার স্বাক্ষর-  
গ্রথিত রচনামাধুর্য্য, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিগৌরবে মোহিত হইয়া  
রাজা প্রতাপরুদ্র জীলোক হইলেও তাঁহাকে ঐ পদে সম্মানিত  
করিয়াছিলেন । চৈতন্যচরিতামৃত লিখিত আছে—

“শিখি মাইতির ভগ্নী শ্রীমাধবীদেবী ।  
বৃদ্ধ তপস্বিনী তেঁহো পরমা বৈষ্ণবী ॥  
প্রভু লেখা করে যেই রাধিকার গণ ।  
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনজন ॥  
স্বরূপ দামোদর আর রামানন্দ ।  
শিখি মাইতি আর ভগিনী অর্দ্ধ ॥”

এই সাড়ে তিনজন—স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ,  
শিখি মাইতি এবং মাধবীদেবী । জীলোক বলিয়া তাঁহাকে  
‘অরূপাত্ম’ বলা হইয়াছে । মহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম  
জদয়ঙ্গম ও উপভোগ করিতে ইহারাই একমাত্র সমর্থ  
হইয়াছিলেন ।

মাধবীর কবিত্বশক্তি বলরামদাস, গোবিন্দ ও বাসু ঘোষ  
অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না । উড়িষ্যা-রমণী হইলেও  
তাঁহার ভাষা, ভাব ও লিখনভঙ্গী সুন্দর ও মনোরম ছিল ।  
তাঁহার রচনায় সারল্য ও মধুরতার ছন্দ নিদর্শনসমূহ গ্রথিত  
হইয়াছিল । যদিও তাঁহার রচনায় ‘ভেল, ডালি, উকালি,  
বিলসই, কাঁপই, কহই’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে,  
তথাপি অস্ত্রান্ত্র কবির তুলনায় তাঁহার রচনায় তৎকাল-

প্রচলিত গ্রাম্যশব্দের অতি অল্পই ব্যবহার দেখা যায় । নিম্নে  
তাঁহার রচনার নমুনার স্বরূপ একটি কবিতাংশ ও একটি পদ  
উদ্ধৃত করা গেল ;—

“নিতাই-বিরহ অনলে তেল অন্ধ ।

আঠারনালাতে হৈতে, কান্দিতে কান্দিতে পথে,  
যায় নিতাই অবধৌত চন্দ্র ॥

সিংহ-হুম্মারে গিয়া, মরমে বেদনা পাইয়া,  
কাঁড়াইলা নিত্যামল রায় ।

হরেকৃষ্ণ হরি বলে, দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে,  
নীলাচলবাসীরে সুধার ॥

জাঘুনদ হেম জিনি, গোরাক-বরণখানি,  
অরুণ-বসন শোভে গায় ।

প্রেমভরে গরগর, আঁখিযুগ করঝর,  
হরি হরি বোল বলি ধায় ॥

ছাড়ি নাগরালীবেশ, ‘এমে পহ’ দেশে দেশ,  
এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ ।

মাধবী দাসীতে কয়, অপরূপ গোরাকরায়,  
ভক্তগৃহে করল প্রবেশ ॥

( পদ )

রাধামাধব বিলসই কৃষ্ণকমাধে ।

তমু তমু সরস, পরশ-রস পিবই, কমলিনী মধুকররাজে ॥৫॥

সচকিত নাগর, কাঁপই থর থর, শিখিল করল সব অঙ্গ ।

গদগদ কহয়ে, রাই ভেল অনরশ, কবে হোয়ব তছু সঙ্গ ॥

সো ধনী চাঁদ, বদন কিরে হেরব, শুনব অমিয়ময় বোল ।

ইহ মঝু জদয়, তাপ কিরে মিটব, সেই করব কিরে কোল ॥

ঐছনে কতহুঁ বিলপই মাধব, সহচরী দূরহি হাস ।

অপরূপ-প্রেমে, বিষাদিত মাধব, কহতহি মাধবী দাস ॥”

অনেকে আবার উক্ত পদদ্বয় কৃষ্ণমঙ্গলপ্রণেতা মাধবা-  
চার্য্যের রচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন ।

মাধবীবন, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন তীর্থ ।  
মাত্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাজোর জেলার তিরুস্করকাবুর নামক  
স্থানে অবস্থিত । স্বন্দপুরাণের অন্তর্গত মাধবীবন-মাহাত্ম্যে  
ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ।

মাধবীয় ( জি ) ১ মাধবাচার্য্যগ্রন্থীত । ২ বসন্তসম্পর্কীয় ।

মাধবীলতা ( জী ) স্বনামখ্যাত পুস্তকলতা ।

মাধবেন্দ্রপুত্রী, পদ্যাবলীস্থিত ঐনৈক কবি । [কুমারহট্ট দেখ ।]

মাধবেন্দ্র সরস্বতী, শাকর সম্প্রদায়ের ঐনৈক আচার্য্য ।

মাধবেষ্টা ( জী ) মাধবস্ত ইষ্টা । ১ বারাহীকন্দ । ২ দুর্গা ।

মাধবোচিত ( জী ) ককোলক । ( রাজনিঃ )

মাধবোত্তব (পং) মাধবোত্তবোত্তব। রাজাদনী, চলিত  
খাঁদীগাছ। (রাজনিং)

মাধব্য (পং) মধোগোত্রাপত্যং মধু (মধুব্রজোত্রাঙ্গণ-  
কৌশিকয়োঃ। পা ৪।১।১০৬) ইতি ষঞ্। মধুর গোত্রাপত্য  
ব্রাহ্মণ। পানিনির ঐ স্বত্রানুসারে ব্রাহ্মণ অর্থ না বুঝাইলে  
'ষঞ্' হইবে না, অন্তর্ভলে অণ্ হইয়া 'মাধব' এইরূপ পদ  
হইবে। শকুন্তলানাটিকে রাজা দুশস্তের বিদুষকের নাম মাধব্য।

মাধুক (পং) ১ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ। মৈত্রৈয়ক।  
"মৈত্রৈয়কশ্চ বৈদেহঃ প্রপুত্রেহ মাধুকম্।" (ভারত ১৩।৪৮।২০)

২ মধুক-পুষ্পজাত মদিরা। ৩ মধুরভাষিন্। (কুল্লক)  
মাধুকর (ত্রি) ১ মধুকর স্বত্বকীয়। ২ মক্ষিকার ভ্রায়  
সংগ্রহকারী। ৩ মধুক-মত্ত।

মাধুকরী (স্ত্রী) বৃন্দাবনতীর্থপ্রসিদ্ধ ভিক্ষাবৃত্তি বিশেষ। মধু-  
মক্ষিকার ভ্রায় মৌনভাবে ঘারে ঘারে ভিক্ষা করার জন্ত  
ইহা মাধুকরী বৃত্তি বলিয়া কথিত। ২ তৃতীয়াশ্রমচারি-ভিক্ষু-  
দিগের পঞ্চগৃহীত ভিক্ষা।

মাধুকর্ণিক (ত্রি) মধুকর্ণ স্বত্বকীয়।

মাধুগড়, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের জেলোন জেলার একটি  
তহসীল। পহাড় ও বমুনা নদীর মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ  
২৮২ বর্গ মাইল। এই তহসীলের পশ্চিমসীমান্তবর্তী রাম-  
পুর, জগমোহনপুর ও গোপালপুরের রাজা উপাধিধারী ভূম্য-  
ধিকারিগণ ইংরাজ গবর্নেন্টকে কোনরূপ কর দেন না।  
তাহারা স্ব স্ব ভূসম্পত্তির শাসনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্ত  
স্বতন্ত্র বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিন্তু সকল  
বিষয়ই জেলার ডেপুটি কমিসনারের অনুমতিসাপেক্ষ। এখানে  
প্রভূত পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হয়।

২ উক্ত জেলার একটি নগর এবং তন্নামক তহসীলের  
বিচার সদর। সাধারণে ইহাকে রাণীজু নগর বলিয়া থাকে।

মাধুকি (পং) অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

মাধুচ্ছন্দস (ত্রি) ১ মধুচ্ছন্দাসমুত। ২ অবসর্গ ও জেতুর  
গোত্রাপত্য।

মাধুপার্কিক (ত্রি) মধুপর্কদানকালে পূজ্য ব্যক্তিকে পাণ্ড,  
অর্ঘ্য ও মধুপর্কাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়। মধুপর্ক দিবার  
সময় যে অর্ঘ্যাদি দেওয়া হয়, তাহাকে মাধুপার্কিক কহে।

"বিজ্ঞা ধনন্ত যদ্ব্যস্ত তৎ তত্শিব ধনং ভবেৎ।

মৈত্র্যমৌষাহিকৈব মাধুপার্কিকমেব বা।" (মহু ৯।২০৬)

'মাধুপার্কিকং মধুপর্কদানকালে পূজ্যতয়া যজ্ঞকং তত্শিব  
তৎ শ্রাৎ' (কুল্লক) এই মাধুপার্কিক ধনের ভ্রাতৃ-প্রভৃতির  
সহিত বিভাগ হয় না, ইহা যিনি প্রাপ্ত হন, তাহারই থাকে।

মাধুমত (পং) মধুমৎস্ত ভবঃ মধুমৎ (কচ্ছাদিত্যশ্চ। পা  
৪।১।৩৩) ইত্যণ্। কাশ্মীরদেশভব। (হেম)

মাধুমতক (ত্রি) মধুমৎ-(মহুযাতংস্থয়োবুঞ্। পা ৪।১।১৩৪)  
ইতি বুঞ্। কাশ্মীরদেশভব, মধুমতভব (মহুযা)।

মাধুর (স্ত্রী) মধু যন্তি অস্ত্র অগ্নিন্ বেতি মধু (উষস্বিমুক্ষু  
মধোঃ রঃ। পা ৫।২।১০৭) ইতি র,ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ মল্লিকা।  
(এ) ২ মধুরসম্ভব।

মাধুরী (স্ত্রী) মাধুর-গৌরাদিত্যং ত্রীষ্। ১ মত্ত। (ভূরিপ্রং)  
২ মাধুর্ঘ্য, মধুরত্ব।

"তানি স্পর্শস্থানি তে চ তরলাঃ স্নিদ্ধা দৃশোবিভ্রমা-  
শ্চ ব্রহ্মাণ্ডসৌরভঃ স চ সুখাতন্দ্রা গিরাং বক্রিমা।  
স। বিষাধরমাধুরীতি বিষয়া সজ্জহপি চেম্মানসঃ

তস্তাং লগ্নসমাদিহস্তবিরহব্যাদিঃ কথং বদ্ধতে।" (পীতগোং ৩৩ সর্গ)

মাধুর্ঘ্য (স্ত্রী) মধুরত্ব ভাবঃ মধুর-(বর্ণদৃঢ়াদিত্যঃ ষাঞচ।  
পা ৫।১।২২০) ইতি-ষাঞ্। মধুরের ভাব, মধুরত্ব। লাবণ্য।

"রূপং কিমপ্যনির্বচ্যং তনোমাদুর্ঘ্যমুচ্যতে।" (উজ্জলনীলমণি)  
শরীরের কোন অনির্দিষ্টময় রূপবিশেষের নাম মাধুর্ঘ্য।

যে কোন বিষয়েরই অনির্দিষ্টময় রূপবিশেষকেই মাধুর্ঘ্য  
বলা যায়। ২ পাকালীরীতিবিশিষ্ট কাব্যশৃঙ্গ। সাহিত্যদর্পণে  
লিখিত আছে,—যে রচনায় চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং অত্যন্ত  
আহ্লাদ জন্মে, তাহাকে মাধুর্ঘ্য কহে। ইহা সন্তোষ, করণ,  
বিপ্রলভ ও শাস্ত-রসেই অধিক হইয়া থাকে। ইহাতে অবাণ্ড  
বা অন্তরুতি এবং রচনা মধুর হইবে। এই রচনায় অস্তাবণ,  
যুক্তবর্ণ এবং ট, ঠ, ড ও ঢ প্রভৃতি বর্ণপ্রয়োগ দোষাবহ।

"চিত্তদ্রবীভাবময়োহ্লাদো মাধুর্ঘ্যমুচ্যতে।  
সন্তোষে করুণে বিপ্রলভে শাস্তেহধিকং ক্রমাৎ।

মুন্ধি বগাত্ত্যাবর্ণেণ যুক্তাষ্ট্য-ড-ঢান্ বিনা।  
রণৌ লঘু চ তদ্যাকৌ বর্ণাঃ কারণতাং গতাঃ।

অবুত্তিরজ্জবুত্তির্বা মধুরা রচনা তথা।" (সাহিত্যদর্পণ ৮ পরিঃ)  
৩ নায়িকাদিগের অবতরণ অলঙ্কারবিশেষ।

"সজ্জোভেষপ্যাহুবেগো মাধুর্ঘ্যং পরিকার্তিতম্।"  
(সাহিত্যদর্পণ ৩।২২২)

সজ্জোভকালেও যে চিত্তের অনুবেগ, তাহাকে মাধুর্ঘ্য  
কহে। ৪ সাহিত্যিক নায়ক ভগভেদ।

"সক্যাবস্থাবিশেষেষু মাধুর্ঘ্যং রমণীয়তা।" (সাহিত্যদর্পণ ৩।২২২)

সকল অবস্থাতেই রমণীয়ত্বের নাম মাধুর্ঘ্য। অভ্যুৎপন্ন  
রমণীয়ত্বের নাম মাধুর্ঘ্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কোন  
প্রকার বেশভূষা ও অলঙ্কারাদির পারিপাট্য না থাকিলেও  
যে সৌন্দর্য্য, তাহাকে মাধুর্ঘ্য কহে।

“অভ্যুৎপাদ্যেপি রম্যং মাধ্যমমিতি কথ্যতে।” (প্রতাপরুদ্র)  
স্বেবার্থক বাক্যকেও মাধ্যম্য কহে, বাক্যের যে পৃথক্পদতা,  
‘তাহার নামও মাধ্যম্য।

“যা পৃথক্পদতা বাক্যে তন্মাধ্যম্যং প্রকীৰ্ত্যতে।”

মাধ্যম (পুং) বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, ইহারা মধুরভাবী বলিয়া  
ইহাদের নাম মাধ্যম্য হইয়াছে। মনুষ্যদিগের অজস্র প্রশংসা  
করাই ইহাদিগের বৃত্তি।

“মৈত্রেয়কন্তু বৈদেহো মাধ্যম্যং সম্প্রস্রতে।

নূন প্রশংসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতাড়োহরুণোদয়ে॥” (মহু ১০।৩৩)

‘মাধ্যম্যঃ মধুকুসুমতুল্যং মধুরভাবিহাং অথবা মধু  
কায়ভাতি ‘অন্ত্রেভোহপি দৃশ্যতে’ ইতি ড, অন্ত্রেভামপীতি দীর্ঘঃ,  
বাধিকৈন আদিবুদ্ধিঃ, তন্তু বৃত্তিঃ নূন প্রশংসতি, বন্দীতি  
যঃ কথ্যতে’ (মেঘাতিথি)

ইহাদিগকে বন্দীও কহে, ইহারা প্রাতঃকালে ঘণ্টাবাদ্য  
করিয়া রাজাদিগের অজস্র প্রশংসা করিতে থাকে, ইহাতে  
তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়।

মাধ্যম্যকর (ত্রি) মক্ষিকার দ্বায় সংগ্রহকারী।

মাধ্যম্যটী (স্ত্রী) মধু ব্রাহ্মণপুত্রক। “বাং দেবপুত্রীতয়ে মধুমাধ্বী-  
ভ্যাং মধুমাধ্বীভ্যাং” (শুক্রযজু ৩৭।১৮) ‘মাধ্যম্যটীভ্যাং মধুব্রাহ্মণ-  
মক্ষয়তঃ পুত্রয়তঃ তো মধ্বকৌ তাত্যাং মধ্বগ্ভ্যামিতি প্রাপ্তে  
ঊপি অশোপে মধ্বটীভ্যামিতি লিজব্যত্যায়ঃ আদিদীর্ঘহ্রস্বসঃ’  
(বেদদীপ)

মাধ্যম (পুং) মধুল গোত্রাপত্য।

মাধ্যম্মিন (ত্রি) মধ্যো ভবঃ, মধ্য- (অন্তঃপূর্ণপদাৎ ঠঞ।  
পা ৪।৩।৬০) ইত্যত্র কাশিকাস্থত্রয়তো ‘মধ্যো মধ্যঃ দিনপ্  
চান্ম্যং’ ইতি দিনপ্। ১ মধ্যম। মধ্যমদিন, মধ্যাহ্ন। (হেম)

২ মধ্যম্মিনসম্বন্ধি। “মাধ্যম্মিনে সর্বনে জাতবেদঃ”  
(ঋক অ২৮।৪) ‘মাধ্যম্মিনে মধ্যম্মিনসম্বন্ধিনি, মাধ্যম্মিনে মধ্যঃ  
দিনস্তেদমিত্যর্থ—উৎসাদিহাদিঞ্ ক্রিষ্টাদাদিবুদ্ধি ক্রিষ্টা-  
দেবাত্মাদাত্ত্বং’ (সায়ণ) মধ্যম্মিনেন প্রোক্তা—প্রোক্তা  
অদীতা বা অণ্ ভীপ্ মাধ্যম্মিনী—শুক্রযজুর্বেদের শাখাভেদ।

[যজুর্বেদ দেখ।]

মাধ্যম্মিনশাখা (স্ত্রী) শুক্রযজুর্বেদের শাখাবিশেষ।

মাধ্যম্মিনায়ন (পুং) মাধ্যম্মিন শাখীর অপত্য।

মাধ্যম্মিনি (পুং) মাধ্যম্মিনের গোত্রাপত্য। ২ জ্ঞানক বৈয়াকরণ।

মাধ্যম্মিনীয় (ত্রি) মাধ্যম্মিন শাখাসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ নারায়ণ।

মাধ্যম্মিনীয়ক (স্ত্রী) মাধ্যম্মিন তীর্থ।

মাধ্যম্মিনেয় (পুং) ১ মধ্যম্মিন সম্বন্ধী যজ্ঞ। ২ মধ্য।

মাধ্যম (ত্রি) মধ্যো ভবঃ মধ্য- (অন্তঃপূর্ণপদাৎ ঠঞ। পা

৪।৩।৬০) ইত্যত্র কাশিকাস্থত্রয়তো ‘মণ্মীয়ো চ প্রত্যায়ো  
বক্তব্যো’ ইতি মণ্। মধ্যো ভব, মধ্যম।

“মধ্যমঃ মাধ্যমঃ মধ্যমীরং মাধ্যম্মিনঞ্চ তৎ।” (হেম)

মাধ্যম্যক (ত্রি) কাঠকের অন্তর্গত মধ্যশাখা।

মাধ্যম্যকেয় (পুং) জাতিবিশেষ।

মাধ্যম্যস্থ্য (স্ত্রী) মধ্যভাগে অবস্থিতি।

মাধ্যমিক (ত্রি) ১ মধ্যম সম্বন্ধীয়। ২ মধ্যভারতবাসী  
জাতিবিশেষ

মাধ্যমিক, বৌদ্ধসম্প্রদায়-বিশেষের দার্শনিক মতভেদ। বৌদ্ধ-  
দিগের চারিটা মত বিশেষ প্রবল হইয়াছিল, তন্মধ্যে বৈভাষিক  
ও সৌত্রান্তিক হীনযানমতানুবর্তী এবং যোগাচার ও মাধ্যমিক  
মহাযানসমর্থক। [মহাযান দেখ]

মাধ্যমিকদিগকে অনেকটা শূন্যবাদী বা পূর্ণ নাস্তিক বলিয়া  
মনে হয়। অনেকের বিশ্বাস যে, অস্মদিক নাগার্জুনই আদি  
বুদ্ধমতের সারসংগ্রহপুস্তক এই মত প্রচার করেন। সাংখ্য-  
প্রবচনভাষ্যে (১।২২) বিজ্ঞানভিক্ষু যে নামরূপের খণ্ডন  
করিয়াছেন, মাধ্যমিকেরাও বৈদান্তিকের দ্বায় সেই চূড়ান্ত  
নামরূপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বৈদান্তিকেরাও  
শব্দর বৈরূপ ‘পারমার্থিক’ ও ‘ব্যবহারিক’ দুই হুল সত্য স্বীকার  
করিয়াছেন, মাধ্যমিকেরাও সেইরূপ ‘পরমার্থ’ ও ‘সংবৃতি’  
স্বীকার করিয়াছেন। বোধিচর্য্যাবতারে শান্তিদেব লিখিয়াছেন,—

“সংবৃতিঃ পরমার্থঃ সত্যত্বমিদং মতম্।

বুদ্ধেরগোচরস্তব্ধঃ বুদ্ধিঃ সংবৃতিকৃত্যতে ॥২

এবং ন চ নিরোধোহস্তি ন চ ভাবোহস্তি সর্বদা।

অজ্ঞাতমনিরুদ্ধস্ত তন্মাৎ সর্বমিদং জগৎ ॥১৫০

স্বপ্নোপমান্ত গতয়ো বিচারে কদলীসমাঃ।

নিবৃত্তানিবৃত্ত তানাক্ত বিশেষো নাস্তি বস্ততঃ ॥” ১৫১

তত্ত্ববুদ্ধির অগোচর এই বুদ্ধিই সংবৃতি। এই সমস্ত  
জগৎ কখন উৎপন্ন হয় নাই অথবা রুদ্ধও নহে, ইহার বিরোধ  
বা ভাব নাই। সকলই স্বপ্নবৎ। বাস্তবিক স্বীকার্য্য  
লাভ করিয়াছেন অথবা নির্কাণলাভ করেন নাই, উভয়েই  
সমান, কিছুই বিশেষ নাই। মাধ্যম্যচার্য্য সর্বদর্শন সংগ্রহেও  
ঠিক এই ভাবে মাধ্যমিক-মত প্রকাশ করিয়াছেন—“মাধ্যমিক  
মতে কিছুই নাই, সকলই শূন্য। যে সকল বস্তু স্বপ্নাবস্থায়  
দেখা যায়, জাগ্রদবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না, আবার  
যে সকল বস্তু জাগ্রদবস্থায় নয়নগোচর হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহার  
কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, সুস্থিতি-অবস্থায় কোন বস্তু  
দেখা যায় না। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, বস্ত্ততঃ  
কিছুই নাই। সকলই স্বপ্নবৎ।’

মাধ্যমিকেরা 'মায়া' শব্দ প্রয়োগে রাজী নহেন, সাধারণ প্রধান ও প্রকৃতির জ্ঞান তাঁহারা 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়' ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মতে মূল যে ন্যতা, তাহাতে ভাল মন্দ কিছুই নাই। মায়া হইতেই পাপপুণ্যসমুদ্ভব—

“মায়াপুরুষবাভাদৌ চিত্তাভাবানপাপকান্।

চিত্তে মায়াসমেতে তু পাপপুণ্যসমুদ্ভবঃ ॥” (শান্তিদেব)

মাধ্যমিনেয় (পুং) মধ্যমার অপত্য। (পা০৪।১।২৬)

মাধ্যস্থ (ত্রি) ১ মধ্যবর্তী। ২ পক্ষপাতশূন্য, নিরপেক্ষ। পক্ষপাতিশূন্য।

মাধ্যস্থ্য (ক্রা) মধ্যস্থ-ব্যঞ্। ১ মধ্যস্থের ভাব, মধ্যস্থতা, সালিসী। ২ ওদাদীভ্য।

“অবাচিতাং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সূতাং গ্রাহয়িতুং শশাক।

অত্যাধনাতঙ্গভয়েন সাধু মাধ্যস্থ্যমিষ্টেহশ্যবলবতের্থে ॥”

(কুমারসম্ভব ১।৫২)

মাধ্যাকর্ষণ (ক্রী) ভূপৃষ্ঠে পতিত বস্তুর কেন্দ্রাতিগ আকৃষ্টি-শক্তি-বিশেষ। প্রত্যক্ষপ্রমাণে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, পৃথ্বী-পৃষ্ঠের উপরিদেশ হইতে পতিত কোন বস্তু স্বভাবতঃ ভূ-কেন্দ্রের অভিমুখে একটি সরল রেখায় নিপতিত হইয়া থাকে। যুরোপীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ মহামতি নিউটন বৃন্তচ্যুত একটা আভা ফলের ভূপৃষ্ঠসংলগ্নতা নিরীক্ষণ করিয়াই চিন্তায় মগ্ন হন। কি কারণে এইরূপ শূন্য উৎক্লিষ্ট বস্তু পুনরায় ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। উহার ফলে, একটি বস্তুগত আকৃষ্টিশক্তিই মূল কারণ বলিয়া অবধারণিত হয়। যেমন চুম্বকের অয়স্কর্ষণশক্তি স্বভাব-সিদ্ধ, তেমনি লৌহেরও চুম্বকে আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। শৈবোক্ত এই শক্তি প্রত্যক্ষমুদ্রিত না হইলেও উহার বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায়। লৌহব্যতীত অপর কোন জাত পদার্থে চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তি যেরূপ স্পষ্ট অমুদ্রিত হয় না, তদ্রূপ জাগতিক বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে পরস্পরে যে একটি অনমুদ্রিত আকর্ষণশক্তি বিদ্যমান আছে, তাহা সহজে জানিবার উপায় নাই।

সান্ আইজাক্ নিউটন গভীর গবেষণা দ্বারা যে আণবিক বা পারমাণবিক আকর্ষণ-শক্তির বিদ্যমানতা স্থির করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশে তাঁহার জন্মের বহুশতবর্ষ পূর্বে জ্যোতির্বিদ-প্রবর ভাস্করাচার্য্য স্বকৃত গোলাধায়ে “আকৃষ্টিশক্তিঃ মহীতয়া যৎ \* \* \*” শ্লোকে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। সূত্রগাং আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভাস্করাচার্য্যের এই বস্তুর স্ব-শক্তি, আইজাক্ নিউটন কর্তৃক বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যুরোপ এই শক্তি-

তত্ত্বের উদ্ভাবিতা নহে। আধ্যপ্রধান ভারতভূমিই এই মহাতত্ত্বের প্রথম উদ্ভাবক।

পণ্ডিত নিউটন বলিয়াছেন, মাধ্যাকর্ষণ ভৌতিক পদার্থ-নিষ্ট, অনিমিত্তক বা সহজদর্শ্য। এই ধর্মবশতঃ একটি জড়বস্তুর মধ্যবর্তী কোনরূপ সংযোগক-আলম্বনের সাহায্য ব্যতিরেকে দূরস্থিত অল্প একটি জড়বস্তুর উপর ক্রিয়া করিতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট নিয়মালুসারে ক্রিয়াকাণ্ড-শক্তিবিশেষ দ্বারা প্রবর্তিত হয়। এই শক্তি ভৌতিক, কি অভৌতিক, তাহা বিবেচনালাপেক্ষ।

উক্ত পণ্ডিতের তাহার গ্রন্থের অপর একস্থলে অভিধাত বা আপীড়নকেই মাধ্যাকর্ষণের কারণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক ইলার (Euler) মাধ্যাকর্ষণকে কোন চৈতন পদার্থের অথবা কোন সূক্ষ্ম-অতীন্দ্রিয় শক্তি-বিশেষের কার্য্য বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক চালিস (Prof. Challis) মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কারার্থ একক বৎসর গভীর গবেষণা করিয়া, শেষে জড়বস্তুর পৰস্পর সংযোগ-জনিত আপীড়নকেই ইহার মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, বস্তুসত্ত্বের সংযোগ ভিন্ন মাধ্যাকর্ষণের অল্পবিধ কারণ থাকিতে পারে না।

মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বনির্ধারণার্থ প্রবৃত্ত হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনটাই অস্ত্রাশি সমীচীন ও সর্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। লর্ড কেলবিনের আবর্তবাদ হইতে মাধ্যাকর্ষণের উপপত্তি হইবার আশা অনেকেই পোষণ করিতেছেন। অধ্যাপক টেট (Taite) ও স্টুয়ার্টের (Stewart) মতে তৈজস ইথারের (Luminiferous Ether) সহিত মাধ্যাকর্ষণের সম্বন্ধস্থাপন সর্বতোভাবে নিষ্ফল।

মাধ্যাকর্ষণ বলিলে, বাস্তবিকই, প্রত্যেক বস্তুর সহিত ভিন্ন জাতীয় প্রত্যেক অপরাপর বস্তুর আকর্ষণকেই বুঝায়। ইহা (attraction of gravitation) চৌম্বক আকর্ষণ (magnetic attraction) হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্। এই দুইটা আকর্ষণী শক্তির গুরুত্বের (intensities) বিভিন্নতা অমুধাবন করিলে, স্বতঃই মনে বিস্ময় উৎপাদিত হয়। কিন্তু অমুদ্রালন দ্বারা সেই সূক্ষ্মতম তত্ত্বের উপলব্ধি হইলে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে চুম্বকে দুইটা পৃথক্ জাতীয় আকর্ষণের বিদ্যমানতা অমুদ্রিত হয়। উহার একটি চুম্বকাদারস্থিত চৌম্বক আকর্ষণ—যদ্বারা উহা লৌহকে নিকটে আকর্ষণ করিতে সমর্থ। পক্ষান্তরে বর্তমান-প্রতিপাদিত মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির

অনুবলে উহা লৌহ কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে বলা যাইতে পারে। সুতরাং এক চুম্বকধারে যুগপৎ চৌম্বক ও বাস্তব আকর্ষণ বিরাজমান। এইজন্য চৌম্বক আকর্ষণ পাদার্থিক আকর্ষণ হইতে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন। ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও, বস্তুর আকৃতিগত বিভিন্নতানুসারে আকর্ষণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ পদার্থমাত্রের ঘনত্ব (intensity) ও আকৃতির পরিমাণ যতই বৃহৎ হউক না কেন, চৌম্বক আকর্ষণের তুলনায় মাধ্যাকর্ষণশক্তি একের এক কোটি অংশেরও কম হইবে।

এইরূপে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন মতের পোষকতা করিলেও যখন তাহাতে কোন প্রকৃত সত্য উপনীত হওয়া যায় না, তখন অবশ্যই দ্রব্যসমূহের অজ্ঞাতঅভিঘাত বা আপীড়নকেই মাধ্যাকর্ষণ-ক্রিয়ার নিস্পত্তিসূচক বলিয়া, আমরা সেই প্রাচীন সিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি।

বাস্তবিক বস্তুমাত্রে অবস্থিত মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আধিক্য এতই অল্প যে, দুই একটি বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত এবং সুপ্রণালীবদ্ধ গভীর আলোচনা ব্যতিরেকে আমরা উহার অস্তিত্ব অবগত হইতে পারি না। একখানি মেজের উপর দুইখানি পুস্তক রাখিলে বলিতে হইবে যে, উহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। যেহেতু ভৌতিক পদার্থের আকর্ষণ অবশ্যস্বাবী। কিন্তু ঐ আকর্ষণের প্রভাব এতই কম যে, মেজে সম্পৃষ্টতা-হেতু মেজের আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। বাহ্যিক পদার্থ দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, জড়পিণ্ডের আকৃতির পরিমাণানুসারে উহাদের আণবিক সঞ্চরণেরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। জড় পদার্থের স্বরূপের হইলে, উহাদের শক্তিও এতদূর স্বল্প হয় যে, তাহা পরীক্ষা ব্যতীত মানবের বোধগম্য হইতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ জড়পিণ্ডের বৃহদাকার বা উহার একটি অপরটি হইতে আকারে বৃহৎ হয়, তাহা হইলে আকর্ষণ-শক্তির আধিক্য সহজে অনুভূত হয়।

এইরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জাগতিক মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে শিখিয়াছি। আমরা ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন যাবৎ জড় ও চেতন বস্তুর অবস্থিতি দেখিয়া এই শক্তির প্রকৃত সম্বন্ধানুগুণে সমর্থ হইয়াছি। এই পৃথিবী-পিণ্ডের আকৃতি বৃহৎ হওয়ায়, ইহার উপরিস্থ বা তৎসম্মিকটস্থ পদার্থ মাত্রের উপরে এই বৃহৎ জড়পিণ্ডের আকর্ষণী শক্তি যে বলবতী রহিয়াছে, তাহা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

বস্তু বিশেষের গুরুত্বানুসারে তত্ত্ব বস্তুর সহিত পৃথিবীর

আকৃষ্ট-শক্তির সামঞ্জস্য আছে। এই আকর্ষণ জন্তই উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত বস্তু সকল ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পতিত হয়। বস্তু মাত্রেরই নিম্নাভিমুখে পতন একমাত্র পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণ জন্ত অথবা পতিত বস্তু ও পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণ জন্তই ঘটিয়া থাকে। যদি তাহা না হইত, তাহাহইলে উর্দ্ধনিক্ষিপ্ত বস্তু মাত্রই উপরে স্থান অবলম্বন করিয়াই উর্দ্ধে থাকিয়া যাইত।

স্বভাবতঃ উর্দ্ধ-নিক্ষিপ্ত বস্তু মাত্রই নিম্নে পতিত হয়। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্ত বিজ্ঞানবিদগণ পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল,—

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, নির্ধাত স্থানে একটা ভারী সীসকপিণ্ড ও হালকা শোলা কোন উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষেপ করিলে উভয়েই একসময়ে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছে। কিন্তু একটা পালক ও এক খণ্ড প্রস্তর সমোচ্চ স্থান হইতে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় যে, পালকের অগ্রেই প্রস্তরখণ্ড আসিয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, শেখোক্ত বস্তুদ্বয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আকৃতি-মান সমান নহে। তত্ত্ব ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ু প্রস্তরোপেক্ষা পালকের নিম্নাভিমুখ গতির অধিক প্রতিবন্ধক হওয়ায় আকর্ষণশক্তির এইরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে।

যদি কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ু অপসারিত করিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা-শক্তির হ্রাস করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত প্রস্তর ও পালক এক সময়ের মধ্যে একই নির্দিষ্ট উচ্চস্থান হইতে ভূমিতে পতিত হইতেছে।

বস্তুর আকর্ষণী শক্তি-নিরূপণের জন্ত বৈজ্ঞানিকগণ পতন-শীল বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাহার আবায়বিক পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া পতন-কালের পার্থক্য ও আকর্ষণ-প্রভাব নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি ভূপৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহ না থাকিত, তাহা হইলে সেই বায়ুশূন্য অন্তরীক্ষ হইতে একটি বেলুন বা পক্ষী ভূপৃষ্ঠে আকৃষ্ট হইতে যে সময় লাগিত, একটা ৬৬ পাউণ্ড ওজনের জড়পিণ্ডও সেই সমোচ্চ স্থান হইতে একই সময়ে ভূমে পতিত হইত।

কেবল যে বস্তুর ঘনত্ব ও গুরুত্বের উপরে বস্তুর পতন-সময় নির্ভর করে, তাহা নহে। ভূপৃষ্ঠের স্থানবিশেষে বায়ু-স্তরের বিভিন্নতা এবং ভূ-পৃষ্ঠের তরঙ্গতম্যানুসারেও এই পতন বা আকর্ষণ-শক্তিরও পার্থক্য কতক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে।

কোন বস্তু উপর হইতে নিম্নে পতিত হইলে, প্রথম মুহূর্তে সে যে স্থান অতিক্রম করে, দ্বিতীয় মুহূর্তে সে



তদপেক্ষা আরও অধিক স্থান অতিক্রম করিয়া থাকে। এই রূপে তৃতীয় মুহূর্ত্তে সে আরও অধিকতর বেগে গমন করে। ইহার কারণ এই যে উৎক্ষিপ্ত বস্তু পতনকালে যতই ভূ-কেন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাঁহার আকর্ষণী শক্তির প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। আকর্ষণী শক্তির এই বিশেষত্ব হেতু ঘটিকায়ন্ত্রের দোলকের (pendulum) গতিপার্থক্য নিরূপিত হইয়াছে।

উপরোক্ত দোলক হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বস্তু মাত্রই এক কেন্দ্রাভিগ-আকর্ষণপ্রভাবে পরস্পরে নিবদ্ধ। জাগতিক সমস্ত পদার্থ যেরূপ ভূ-কেন্দ্রের অভিমুখে একটা সরল রেখায় আকর্ষিত হইতেছে, সেইরূপ তাহারও স্ব স্ব কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণী শক্তিতে ভূকেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

এইরূপে নক্ষত্রাদির গতি লক্ষ্য করিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক গ্রহ স্ব স্ব দূরত্বের ব্যবধানানুসারে স্বর্গ্যকেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষিত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে এই, একই নিয়ম ও শক্তিবশে উপগ্রহ-মণ্ডলীও স্ব স্ব মুখ্য গ্রহের পার্শ্বে পরস্পরের আকর্ষণে নিলিপ্ত থাকিয়া স্ব স্ব কক্ষপথে বিচরণ করিতেছে। সর্ব আইজাক নিউটন জাগতিক বস্তুবস্তুর পরস্পরের আকর্ষণ-শক্তি নিরূপণ করিয়া সাধারণে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বর্তমান যুগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিককর্তৃক তাহা বিভিন্ন-রূপে প্রতীপাদিত হইলেও উহাই সাধারণে একমাত্র সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি নক্ষত্রগতি বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, "Any two masses in the Universe attract each other with a force which varies according to the inverse-square of the distance," ইহাই বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে "The law of Universal gravitation between Two Masses" নামে পরিচিত হইয়াছে।

মাধ্যাত্মিক (ত্রি) মধ্যাকালসম্বন্ধী, মধ্যাকালীন-ব্যপার, মধ্যাক্ষময়ে বাহ্য অস্থান করিতে হয়।

মাধব (ত্রি) ১ মধ্যাচার্যের মতাবলম্বিমাত্র।

[ মধ্যাচার্য, মধ্যাচার্য ও পূর্ণপ্রজ্ঞ দেখ। ]

২ তৎশিষ্যসম্প্রদায়। ৩ মাধবী মন্ত। ৪ মনুরকণ্টক মন্ত।

মাধবক (ত্রি) মাধবী পৃথোদরাদিবাং ঐকরতাকারঃ।

মাধবী, মধুক পুংকৃত মন্ত। (অমরটীকায় ভাষ্যলীকিত)

মাধবব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণশ্রেণীভেদ। মধ্যাচার্যের মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ মাধবব্রাহ্মণ অথবা বৈকব নামে অভিহিত।

এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অষ্টাদশ থাকে বিভক্ত। বোম্বাইপ্রদেশে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণের সংখ্যা বড় কম নহে। ধারবার জেলার প্রায় সর্বত্র বড় বড় নগরে এবং গ্রামে এই শ্রেণীর বাস আছে। সমাজে তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সহস্র বৎসরের অধিককাল এক স্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস করিতেছেন।

তাঁহারা কখনই সহস্রে হলচালনা করেন না। পর্বমর্মেট সংক্রান্ত কার্য, ব্যবসার, বাজকতা অথবা ভূম্যধিকারিতা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা জীবিকা নির্বাহ করেন। কণাটা তাঁহাদের মাতৃভাষা। কোন কোন থাক আবার মরাঠী অথবা মরাঠী-মিশ্রিত কণাড়া ভাষার কথাবার্তা কহিয়া থাকেন। পুঙ্খদিগের নামের পূর্বে দেব এবং জীলোকদিগের নামের পূর্বে দেবী ও নদীবাচক-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

প্রতিবর্ষেই তাঁহাদের গৃহের বহির্ভাগ একবার চূণ-কাম করিয়া লাল রঙ করা হইয়া থাকে। ঘরের মেজে, পাক খালা এবং তুলনীতলায় প্রত্যাহ সোময় লেপ দেওয়া হয়। ধনাদিগের চাকরেরা এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে জীলোকেরাই সমস্ত গৃহকার্য্য করে। সকলেরই গো, অশ্ব ও মহিষাদি পশু আছে। তাঁহাদের উপাস্ত দেবতা—মঙ্গলুরের অন্তর্গত উদপীর কৃষ্ণ, মাজ্রাজের অন্তর্গত অহোবলের এবং নিজাম রাজ্যান্তর্গত কপ্রার নুসিংহ, খীরসপত্তনের রঙ্গনাথ, তিরুপতির বেষ্টটরমণ এবং পণ্ডরপুরের বিঠোবা।

অষ্টাদশ থাকের মাধবব্রাহ্মণগণই একত্র আহ্বারাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে সগোত্র-বিবাহ প্রচলিত নাই। সাধারণতঃ কি পুঙ্খ কি জীলোক উভয়েই দেখিতে সূত্রী, শরীর সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ পুঙ্খাঞ্চলবাসি-গণ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবর্ণ।

তাঁহারা ললাটে শ্রীমুদ্রা অথবা জাতীর চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। তদ্বারা তাঁহাদিগকে সহজেই চিনিতে পারা যায়। বিবাহিতা জীলোকগণ ললাটে লম্বা সিন্দূরের রেখা এবং বিধবারা কপালে ক্ষুদ্রাকৃতি শ্রীমুদ্রা ও কৃষ্ণরেখা অঙ্কিত করেন। অধিকাংশ লোকেই একতলা বাটিতে বাস করেন। তাঁহাদিগের পুরোহিত অপরিমিতভোজী, কিন্তু তাঁহারা দিবারাত্র মধ্যে একবার মাত্র আহ্বার করিয়া থাকেন।

সাধারণ ব্রাহ্মণগণ মিতাহারী এবং দিবাভাগে একবার এবং রাত্রিতে একবার মাত্র ভোজন করেন। দৈনিক খাতের মধ্যে সকলেই প্রধানতঃ ভাত ও নানাবিধ নিরামিষ স্নান আহার করেন। কেহ পেরোজ বা রঙন ব্যবহার করেন না। উৎসবাদিতে খিচুড়ী প্রভৃতি মুখরোচক নানাবিধ অন্নও

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে ফলাহারের প্রচলনই বেশী। ফলাহারে চিড়া ও ঠৈ প্রভৃতি চলে। লুচি ও রুটি অবস্থাবিশেষে দেওয়া হয়।

তাঁহারা মাধক দ্রব্য একেবারেই স্পর্শ করেন না। উৎসব স্থলে তাঁহারা সুগন্ধি, কপূর ও অস্ত্রাঙ্গ সুগন্ধি দ্রব্য-সংযোগে সুবাসিত পানীয় প্রস্তুত করিয়া থাকেন। শুভ কার্যোপক্ষে প্রস্তুত পিষ্টকাদির শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহার এবং শ্রাদ্ধার্থে প্রস্তুত পিষ্টকাদির বিবাহাদিতে ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইলে পুরোহিতকে তৎসমস্ত বিষু, লক্ষী এবং হনুমানকে উৎসর্গ করিয়া দিতে হয়, তৎপরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে খাইতে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ নিমন্ত্রণাদি স্থলে এদেশের স্ত্রীর সেখানেও কদলীপত্র ব্যবহৃত হয়। শুভকার্যাদি উপলক্ষে ভোজনকালে কদলীপত্রের যে অংশ বামভাগে থাকে, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ভোজনসময়ে সেই অংশ দক্ষিণভাগে রাখিতে হয়।

বালক ব্যতীত স্ত্রীস্বামী ও স্ত্রীস্বামীর মধ্যে ত্ৰাঙ্গণেরা দুইবার আহার করিতে পারেন না। বিধবারা দিবাভাগে একবার মাত্র অন্নভোজন করেন এবং রাত্রিতে সামান্য জল যোগ করিতে পারেন। পক্ষী, পক্ষান্ত, মকরসংক্রান্তি, বিবুসংক্রান্তি প্রভৃতি দিবসে ত্ৰাঙ্গণমাত্রকেই একাহারী থাকিতে হয়।

মাধবত্ৰাঙ্গণগণের ধারণা এই যে, রাত্রিতে ত্ৰাঙ্গণভোজন করাইলে অত্যন্ত পুণ্য হয়। আহারান্তে তাঁহারা তাচ্চলচর্চণ, ধূমপান অথবা নশ্তগ্রহণ করিয়া থাকেন।

তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা সকলেই জামা ব্যবহার করেন। বিধবারা সাদাধুতি পরেন এবং উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখেন। ত্ৰাঙ্গণগণ শিখামাত্র রাখিয়া মস্তকমুণ্ডন করিয়া থাকেন। উপনয়নের পূর্বে বালকদিগের মস্তকমুণ্ডনের নিয়ম নাই। পুরুষমাত্রেরই প্রায় গৌফ রাখেন। তবে পুরোহিতেরা গৌফ কামাইয়া ফেলেন। কোন কোন পুরুষ শিখাশ্রে ফুল বাধিয়া রাখেন। বালিকারা এবং বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা কবরীবন্ধন করেন এবং নানাবিধ পুষ্পমালা দিয়া কবরী অলঙ্কৃত করেন। স্বামী কিংবা পুত্রের কোন মঙ্গলোপসর্গ পীড়া হইলে স্ত্রীলোকেরা তিরুপতির বেক্টরমণের নিকট মস্তকের কেশ মানদিক করিয়া থাকেন। অনেক স্ত্রীলোক আবার পরচুলা ব্যবহার করেন। স্ত্রীলোকের পতির মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকমুণ্ডন করিতে হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রাচীণভাবে ইংরাজি-শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে অনেকেই বিলাতী পরিচ্ছদের অনুকরণ

করিতেছেন। মাধবসন্ন্যাসীদিগের বেশ কিছু স্বতন্ত্র। গৈরিক কোপীনমাত্র তাঁহাদের পরিধান। তাঁহাদের উপবীত অথবা অন্য কোন অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিতে নাই। কিন্তু সকলেই ললাটে জাতীয় তিলক ধারণ করেন। তাঁহাদের হস্তে বাঁটি এবং পদে কাঠপাছুকা থাকে। মাধবত্ৰাঙ্গণদিগের মধ্যে বাল-বিধবাগণও কোন অলঙ্কারাদি ধারণ করিতে পারেন না।

পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই অঙ্গে অলঙ্কার শোভা পায়। ধনিগণের চরণভূষণ ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কারই মণিমুক্তাখচিত ও সুবর্ণনির্মিত। কেবল রাজা এবং রাণী পদতলে স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিতে পারেন, কারণ তাঁহারা দেবতা বলিয়া সাধারণের নিকট গৃহীত।

এই ত্ৰাঙ্গণগণ সাধারণতঃ কার্যদক্ষ, বিনীত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং অতিথিবৎসল। শাস্ত্রানুসৃত ক্রিয়াকলাপ এবং নানাবিধ ব্রতনিয়মাদির অমুষ্ঠানে সকলেই তৎপর। শিব-রাত্র এবং দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষে সকলেই উৎসব করিয়া থাকেন। একাদশী এবং জন্মাষ্টমীতে সকলেই উপবাস করেন। বিষ্ণুপঞ্চমী এবং চান্দ্রায়ণদিগের অমুষ্ঠানও সর্বত্র দৃষ্ট হয়। অনেক সময়ে তাঁহারা কালী, বদরী প্রভৃতি সমুদায় প্রধান প্রধান তীর্থ দর্শনে গিয়া থাকেন। প্রত্যেককেই দীক্ষাগুরু নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। বিবাহিত ব্যক্তিও দীক্ষাগুরু হইতে পারেন, কিন্তু দীক্ষাগুরু হইবার পর আর তিনি স্ত্রীর মুখদর্শন অথবা অস্ত্র কস্তার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন না। গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার সংস্কার প্রচলিত। প্রথম প্রসবের সময় কন্ডাকে পিতৃগৃহে ষাইতে হয়। প্রসববেদনার অধিক কষ্ট হইলে পুরাতন মোহর জলে ধুইয়া গর্ভিণীকে খাইতে দেওয়া হয়। তাহাতেই সন্তান জন্মে। সন্তান প্রসব করিতে পারে। শিশু ভূমিষ্ট হইবামাত্র একটা বহুপুরাতন স্বর্ণাঙ্গুরীয় মধুতে ফেলিয়া কয়েক ফোঁটা সেই মধু শিশুর মুখে দেওয়া হয়। জাতকর্ম্ম হইতে স্ত্রীস্বামী এবং অন্নপ্রাশন হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার স্থানীয়মতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিশুর পিতৃমহাই নামকরণ করিয়া থাকেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে নূতন বস্ত্র দিতে হয়।

বালকের উপনয়নসংস্কার সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। উপনীত বালকগণ তিনবার সন্ধ্যাপাঠনা করে।

তাঁহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। বালকগণের ৮ হইতে ২০ বৎসর মধ্যে এবং বালিকাগণের ৬ হইতে ১১ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। অর্থলোভে পিতামাতা ৩০-৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের সহিত কস্তার বিবাহ দিতেও কুণ্ঠিত হন না।

কন্তার পিতাই প্রথমে পাত্র অঙ্গলদান করেন। পাত্র স্থির হইলে কন্তার পিতা বরের পিতার নিকটে কন্তার কোষ্ঠী প্রেরণ করেন। বরকন্তার কোষ্ঠী পরস্পর বিবাহযোগ্য মেলক হইলে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা সন্মতি দিয়া থাকেন। পরে বরদক্ষিণা ঠিক হইলে, বিবাহলগ্ন স্থির হইয়া থাকে। বরদেশের গ্রাম মহারাষ্ট্রের মাধবব্রাহ্মণদিগকেও কন্তাদায়ে বিব্রত হইতে হয়, বরের পিতা যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন, কন্তার পিতাকে তাহার দ্বিগুণ ব্যয় করিতে হয়।

বিবাহে আনন্দোৎসবের পরিসীমা থাকে না। সম্প্রদান হইতে সপ্তপদীগমন পর্যন্ত সমস্ত কার্যই বেদান্তমোদিত শাস্ত্রানুশাসনেই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইবে পূর্বে জানিতে পারিলে যথা-সময়ে মুমূর্ষুর মন্তকমুণ্ডনপূর্বক স্নান করাইয়া দেয় এবং শুক বস্ত্রে সর্বাঙ্গ মুছাইয়া দেওয়া হয়। গোপীচন্দন দ্বারা ত্রিমুদ্রার ভায়ে তিলকের ছাপ, চক্র ও শঙ্খচিহ্ন দিতে হয়। পরে পরিকৃত স্থানে গোময় লেপন করিয়া, কুশ ছড়াইয়া দেয়। কয়েক বিন্দু পঞ্চগব্য মুমূর্ষুর মুখে দেওয়া হয়। সময় থাকিলে অবস্থাবিশেষে বৈতরণীকৃত্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মুমূর্ষুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে বিষ্ণু নাম শুনান হয় এবং ধর্ম গ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে। দেহ জীবনহীন হইলে, পুনর্স্নান স্নান করাইয়া লগাটে, বন্ধঃস্থলে এবং বাহুতে ত্রিমুদ্রার চিহ্ন দেওয়া হয়। পরে স্থানে শব আনীত হইয়া যথাবিধি স্নিক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়। তিন বৎসরের অনধিক বালকের এবং সন্ন্যাসীর শব সমাধিস্থ করা হয়। শবদাহ শেষ হইলে কান পুতলিলা নদীর জলে নিক্ষেপ করিতে হয়। দশম দিনে ব্রহ্মোৎসর্গাদি দ্বারা শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রাতাশোচ ও মৃতশোচ কাল উভয়ই দশদিন। অর্শোচ কালে কেহ কোনরূপ মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করিতে পারেন না। শাস্ত্রানুশাসনের কঠোরতা সর্ববিষয়েই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

তাঁহাদের মধ্যে জীলোকের অবরোধপ্রথা বড়ই প্রবল। নবোঢ়া জী কোন জীলোকের সঙ্গে পর্য্যস্ত কথা কহিতে পারেন না।

প্রতি শ্রাবণ মাসেই সকল মাধবব্রাহ্মণ কন্তাদিগকে শস্ত্রালগ্ন হইতে পিত্রালয়ে আনয়ন করেন।

শিশুদিগের বসন্ত, কিংবা হাম হইলে পিতামাতা নয়দিন অগ্নত থাকিয়া নিরুদ্বিগ্নে নিদ্রা যান। নয়দিনের পরে তাঁহাদিগকে ওলাদেবীর মন্দিরে এবং দুর্গা বা শীতলাদেবীর

মন্দিরদ্বারে কয়েক কলসী জল ঢালিতে হয়। পরে পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মাধবসমাজে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। কুলপুরোহিতই অনেক সময় মোকদ্দমাদির মীমাংসা করিয়া থাকেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা মাধবসমাজে সর্ববিষয়ে শাস্ত্রানুশাসনের সমন্বিত কঠোরতা দৃষ্ট হয়। ২৫ বৎসর পূর্বে তাহা দেয় মধ্যে কেহ ইংরাজি শিক্ষা করেন নাই। ক্রমে পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও শিক্ষার আলোক সমাজে প্রতিকলিত হইতেছে। এখন অনেকে পাশ্চাত্য ধরণে চলিতে ততটা পরাশ্রয় নহেন।

মাধবিক (পুং) মধুসংগ্রহকারী।

মাধ্বী (স্ত্রী) মধুনো বিকারঃ, মধু-অণ্-তীপ্ (ঋত্যা বাস্তা বাস্তমাধ্বীতি। পা ৬।৪।১৭৫) ইতি নিপাতাতে। ১ মত্ত। (ত্রিকাং) ২ মধ্বাদিকৃত সুরা। (মহু ১।১।১৫) মধু মধুর-রসোহন্ত্যস্ত কণ্টকাবচ্ছন্দে অণ্। ৩ মধুরকণ্টক মন্ত। (শব্দরত্নাং) (ত্রি) ৪ মধুমৎ, মধুযুক্ত। “দিবানক্তং মাধ্বী জাদীথাং নঃ” (ঋক্ ৭।৭।১২) ‘হে মাধ্বী মধুমত্তো’ (সায়ণ) ৫ নদীভেদ।

“তেভ্যঃ শাস্তা চ মাধ্বী চ বে নভো সম্প্রসূরাতাম্।”

(মন্তপুরণ ১২.০।৭১)

মাধ্বীক (স্ত্রী) মাধ্বী স্বার্থে কন্। ১ মধুকপ্পকৃত মত্ত, চলিত মৌয়া ফুলের মদ, পর্যায়—মধ্বাসব, মাধবক, মধু। [মত্ত দেখ।] ২ মধু, মকরন্দ। ৩ দ্রাক্ষাকৃত মত্ত। (পুং) ৪ নিম্পাব, চলিত শিম্। (পর্যায়-মুক্তাবলী)

মাধ্বীকফল (পুং) মাধ্বীকং মধুমৎ ফলমন্ত। মধুনারিকেল-বৃক্ষ। (রাজনিং)

মাধ্বীকা (স্ত্রী) খেত নিম্পাপ, সাদা শিম্। (রাজনিং)

মাধ্বীমধুরা (স্ত্রী) মাধ্বীমদ তএব মধুরা। মধুরথজ্জুরিকা।

মাধ্বীশর্করা (স্ত্রী) মধুশর্করা, মধুর চিনি, মধু আট প্রকার, এই অস্ত্র এই শর্করা ৩৮ প্রকার। গুণ মধুত্বা।

মাধ্বীসিতা (স্ত্রী) মধুশর্করা। (রাজনিং)

মান, অর্জনা, পূজা। চুরাদি, উভয়পক্ষে ভাদিৎ পরশ্মৈ-সকং সেট্। লট্ মানয়তি-তে। লুঙ্ অমীমনৎ-ত। ভাদি-পক্ষে মানতি। লুঙ্ অমানীৎ। কশ্বগি বাচ্যে মাশ্বতে, লুঙ্ অমানি।

মান, ১ বিচারণ। ২ অর্জা, পূজা। ভাদিৎ আশ্বনে-সকং সেট্। লট্ মীমাংসতে। লুঙ্ অমীমাংসিষ্ট। কশ্ববাচ্যে লুঙ্ অমীমাংসি।

গান (ক্লী) মীয়তেহনেনেতি মা-করণে জ্যুট্। পরিমাণ, পণ্যায়—যৌতব, দ্রবয়, পায়, পৌতব।

তুলা, অঙ্গুলি ও প্রস্থ দ্বারা ইহা ত্রিবিধ। তুলা দ্বারা উদ্ভানাদি, অঙ্গুলি দ্বারা হস্তাদি এবং প্রস্থ দ্বারা জব্যাদির মান বুঝা যায়। (অমর তরত)

“ন মানেন বিনা যুক্তির্জব্যানাং জায়তে কচিৎ।

অতঃ প্রয়োগকাৰ্যার্থঃ মানমত্রোচ্যতে মরা ॥” (শাক্তধর)

ভাবপ্রকাশে মানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,— পরিমাণ ভিন্ন কোন দ্রব্যেরই প্রয়োগ হইতে পারে না, এই জন্ত সর্বত্রই মানপরিভাষা জানা আবশ্যক। আয়ুর্বেদমতে মান দুই প্রকার, মাগধ ও কালিদ। অত্র মান সকল পরিমিত্যগ করিয়া মাগধ-মানেরই শ্রেষ্ঠতা অভিহিত হইয়াছে।

মান।—ত্রিশ পরমাণুতে এক অঙ্গেরণ, ইহার পর্যায়—ধ্বংসী। গবাক্ষাদি দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে যে সূর্য্যাকিরণ পতিত হয়, ঐ কিরণের অন্তর্ভুক্তি যে অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ দৃষ্ট হয়, উহাকে ধ্বংসী কহে। ছয় ধ্বংসীতে এক মরীচি, ছয় মরীচিতে এক রাজিকা, তিন রাজিকায় এক সর্ষপ, আট সর্ষপে এক বব, চারি ববে এক গুঞ্জা (রতি)। ছয় রতিতে একমাষা, ইহার পর্যায়—হেম ও ধানক। চারি মাষায় এক শান, ইহার নামান্তর ধরণ ও টঙ্ক। দুই শানে এক কোল, ইহার পর্যায়—ক্ষুদ্র, বটক ও দ্রাক্ষণ। দুই কোলে এক কর্ষ; পাণিমানিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিক্ষিপাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ঘোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, স্বর্ণ, কবড়গ্রহ ও উড়ুধর এই সকল উহার পর্যায়। দুই কর্ষে এক অর্দ্ধপল, শুক্লি ও অষ্টমিকা উহার নামান্তর। দুই শুক্লিতে এক পল, মুষ্টিমাত্র চতুর্থা, প্রকৃষ্ণ, ঘোড়শী ও বিষ্ণ এই কয়েকটা পলের নামান্তর। দুই পলে এক প্রস্থতি, দুই প্রস্থতিতে এক অঞ্জলি। পণ্যায়—কুড়ব, অর্দ্ধশরাব ও অষ্টমান। দুই কুড়বে এক মাণিকা, শবাব ও অষ্টপল উহার নামান্তর। দুই শরাবে এক প্রস্থ, চারি প্রস্থে এক আটক, পর্যায়—ভাজন, কংস ও পাত্র। চতুঃষষ্টি পলে এক আটক হইয়া থাকে। চারি আটকে এক দ্রোণ। পর্যায়—কলশ, লবণ, অর্ধণ, উদ্ভান, ঘট ও রাশি।

দুই দ্রোণে এক হর্প, কুণ্ড ইহার পর্যায়। চতুঃষষ্টি শরাবে এক হর্প, ছয় হর্পে এক ঘোণী, চারি ঘোণীতে এক খারী, ৪০৯৬ পলে (৫১২ সেরে) এক খারী হইয়া থাকে। দুই হাজার পলে এক ভার এবং এক শত পলে এক তুলা হয়।

মাষা, টঙ্ক, অক্ষ, বিব, কুড়ব, প্রস্থ, আটক, রাশি, ঘোণী ও খারী, ইহার উত্তরোত্তর যথাক্রমে চতুঃগুণ। অর্থাৎ মাষা হইতে টঙ্ক চতুঃগুণ, টঙ্ক হইতে অক্ষ চতুঃগুণ ইত্যাদি।

মাগধ-পরিভাষাতে ৬ রতিতে এক মাষা, চতুর্বিংশতি রতিতে এক টঙ্ক, ৯৬ রতিতে এক কর্ষ, ইহা চরকের মত। ক্ষুদ্রতমতে ৫ রতিতে এক মাষা, ২০ রতিতে এক টঙ্ক, ৮০ রতিতে এক কর্ষ।

কালিদ-পরিভাষাতে ৮ রতিতে এক মাষা, ৩২ রতিতে ১ টঙ্ক, আড়াই টঙ্কে অর্থাৎ ৮০ রতিতে এক কর্ষ হয়। গুঞ্জাদি করিয়া অর্থাৎ এক রতি হইতে কুড়ব পর্যন্ত দ্রব, আর্দ্র ও শুষ্ক এই সমস্ত দ্রব্যেরই তুলা পরিমাণ গ্রহণ করিবে। প্রস্থ অবধি যাবতীয় দ্রব ও আর্দ্র দ্রব্য প্রকৃত মানের দ্বিগুণ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তুলামানের দ্বিগুণ গ্রহণ বিধেয় নহে। মুক্তিকা, বৃক্ষ, বংশ ও লৌহ প্রভৃতির পাত্র চারি অঙ্গুলি প্রশস্ত, চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ, এবং চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধ হইলে ঐ পাত্রে যে পরিমাণ জল প্রভৃতি দ্রব পদার্থ ধরিয়া থাকে, তাহাই কুড়বমান।

কালিদমান।—কলিকালে মানবগণ মনোমুগ্ধ, ধর্ম্মকায় ও সম্বলগণবিহীন হইয়া থাকে। অতএব তদনুসারে মান-প্রয়োগ করা বিধেয়। দ্বাদশ গৌরসর্ষপে এক বব, দুই ববে এক গুঞ্জা, তিন গুঞ্জায় এক বল, ৮ রতিতে এক মাষা, কোন কোন স্থলে ৭ রতিতেও মাষা হয়। ৪ মাষায় এক শান, ৬ মাষায় এক গজান, ১০ মাষায় এক কর্ষ। ৪ কর্ষে এক পল এবং ১০ শানে একপল, চারি পলে এক কুড়র। প্রস্থাদি করিয়া অন্তান্ত সমস্ত মান পূর্ববৎ। মান শব্দে আত্মাকেও বুঝায়। মাত্রার নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই। কাল, অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, প্রকৃতি, দোষ এবং দেশ প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া মাত্রা প্রয়োগ করিতে হয়। উপযুক্ত মাত্রা হইতে অল্প পরিমাণে কিংবা অধিক পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ হইলে উভয়ই নিফল হয়। যেমন অত্যন্ত প্রজ্বলিত অগ্নির উপর কিয়ৎ পরিমাণে জল দিলে নির্ঝাঁপ হয় না, তজ্জপ মনুষ্য রোগে অল্প ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ শাস্তি হয় না এবং ক্ষেত্রে অপরিমিত জল হইলে যেমন শস্তের হানি হয়, তজ্জপ সামান্য রোগে বহুমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম না হইয়া অত্র বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(ভাবপ্রঃ মানপরিভাষা) [পরিমাণ শব্দে বিজ্ঞান বিবরণ দ্রষ্টব্য]

২ সঙ্গীত-শাস্ত্রানুসারে যেখানে তালের বিরাম হয়, তাহাকে মান কহে। ইহা চারি প্রকার, সম, বিসম, অতীত ও অনাগত। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

(পুং) মন্ত্রতে বৃক্ষ্যতেহনেন ইতি মন-ঘঞ্। ৩ চিত্ত-সমুন্নতি, অভিমান, অহঙ্কার, ধনানিহেতু চিত্তের উন্নতি, আমার তুলা কেহ নাই এইরূপ বিবেচনা।

“দেবং দন্তক মানক ক্রোধং তৈজসক বজ্রয়েৎ।” (মহু ৪।১৬৩)

দেব, দন্ত, মান এবং ক্রোধাদি পরিবর্তন করাই বিধেয়।  
“আত্মনি পূজাতা বুদ্ধিমানঃ” (নীলকণ্ঠ) আপনাতে পূজাতা  
বুদ্ধির নাম মান, আমি সকলের পূজনীয়, আমি সর্বাপেক্ষা  
শ্রেষ্ঠ এইরূপ বিবেচনা করার নাম মান।

“অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কোরবাঃ।” (চাণক্য)

অত্যন্ত মানে কোরবগণ বিনষ্ট হইয়াছিল। ৪ পূজাতা।

“অধমাস্তি কলিমিচ্ছন্তি সন্ধিমিচ্ছন্তি মধ্যমাস্তি।

উত্তমাস্তি মানিমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্ ॥

মানো হি মূলমর্থস্তা মানে মানে ধনেন কিম্।

প্রভেদমানদর্পস্ত কিং ধনেন কিমায়ুধা ॥”

(পরুড়পুঃ ১১৫ অঃ)

উত্তম ব্যক্তি সকল সম্মান ইচ্ছা করেন, যে হেতু মহৎ-  
দিগের মানই একমাত্র ধন। মান অর্থের মূল, যাহাদের  
মান নষ্ট হয়, তাহাদের ধন এবং আঃ নিশ্চয়রাজন অর্থাৎ  
মানহীন হইয়া জীবিত থাকি অতিশয় ক্লেশকর।

৫ অমূল্য দম্পতীর ভাববিশেষের নাম মান।

“দম্পত্যোর্ভাব একত্র মতোরপাধুরকুরোঃ।

স্বাভীষ্টাশ্চৈববোকা দি নিরোধী মান উচ্যতে ॥” (উজ্জলনীলমণি)

প্রিয় ব্যক্তির অপরাধসূচক চেষ্টার নাম মান, প্রিয়  
ব্যক্তি কোনরূপ অপরাধ করিলে সেই অপরাধের অমূল্য যে  
মানসিক বিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে মান কহে। রস-  
মঞ্জরীতে লিখিত আছে, ইহা লঘু, মধ্যম ও গুরুভেদে তিন  
প্রকার। ‘যে স্থলে অল্প চেষ্টা দ্বারা ইহা অপনীত হয়, তাহাকে  
লঘু, কষ্ট করিয়া অপনয় করিলে মধ্যম এবং অতিশয় কষ্ট  
দ্বারা যাহা অপনয়, তাহাকে গুরু কহে। যে স্থলে অসাধ্য  
তথায় রসভাস হয়।

নাট্যিকা নায়ককে যদি আসক্তির সহিত অল্প ক্রীদর্শন  
করিতে দেখে, তাহাতে নায়িকার যে মান হয়, তাহার নাম  
লঘু, নায়ক নায়িকার সহিত কথোপকথন কবিবাব সময় যদি  
অল্প নায়িকার নাম করে, তাহাতে যে মান হয়, তাহার নাম  
মধ্যম এবং নায়কের অল্প নায়িকার সহিত সন্তোষাদি চিহ্ন  
দর্শন করিয়া নায়কের যে মান হয়, তাহাকে গুরু কহে।

নানাপ্রকার কৌতুকাদি দ্বারা লঘুমান অপনীত হয়,  
শপথাদি দ্বারা মধ্যম মান, চরণধারণ ও ভূষণাদি দান প্রভৃতি  
দ্বারা গুরুমান অপনীত হইয়া থাকে। \* (রসমঞ্জরী)

\* অপর-ক্রীদর্শনাদি অল্প যথা—

“স্বৈদ্যযুতিঃ কচন শিচ্ছিলমস্তুমৌ

কসোদরিকচন কটকিতককান্তি।

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে মানের বিষয় এইরূপ লি  
আছে।

“যেই ক্রোধে দম্পতীর রসের বিচ্ছেদ।

সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ ॥

অহেতু যে মান সেই অনায়াসে বধ্য।

সহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য ॥

অস্তার সহিত পতি যদি কথা কয়।

তাহে জন্মে লঘুমান বাক্যে দূর হয় ॥

অন্ত নামগুণ পতি যদি কাছে কয়।

তাহে জন্মে মধ্যমান পরীক্ষায় ক্ষয় ॥

অন্তভোগচিহ্ন যদি দেখে পতি গায়।

তাহে জন্মে গুরুমান প্রমাণেতে যায় ॥

সাম ভেদ ক্রিয়া দান নতি ভাগ রোষ।

এই সাত্তে মান ভাগে হয় পরিতোষ ॥

প্রিয়বাক্যে স্তব করে তারে বলি সাম।

আত্মগুণ তার দোষ ভেদ তার নাম ॥

সখী দ্বারা ভয় প্রদর্শনে সেই ক্রিয়া।

দান যাহে বস্ত্র মালা ভূষণাদি দিয়া ॥

নতি সেই যাহে পায় ধরা নমস্কার।

ঐদৃশ্য প্রকাশ সেই ভাগ নাম যায় ॥

রোষ সেই যাহে ভয় কষ্টের নিস্তার।

মান শাস্তি চিহ্ন অশ্রু লোমাঞ্চ সৌন্দর্য ॥

অবশ্য এসব রূপে মানের বিনাশ।

অসাধ্য হইলে তারে বলি রসভাস ॥

প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তার।

অমূল্যবে বুকে লবে নাগরী নাগর ॥” (ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী)

৬ ওহ। (মেদিনী) ৭ পরিচ্ছেদক। “বৃহস্পতিঃ মানং

বরণ স্বধা বঃ সহস্রধারং” (শব্দ ৭।৮৮।৫) ‘মান্যামিন্ সপ্তাপি

ভূতানি ইতি মানঃ সর্বস্ত ভূতজাতস্ত পরিচ্ছেদকঃ’ (সারণ)

৮ মন্ত্ৰ।

অস্তাং বিনোদয়তি ভাবয়তি গিরেহপি

মানঃ ক বাস্তবতি পদং তব তন্ন বিদ্যাঃ ॥

গোত্রস্থলনাদিঅস্তো যথা—

বদগোত্রস্থলনং তন্তু জমো যদি ন মজ্ঞতে। ৯

রোমালিঙ্গালসংস্পর্শঃ শপথং তন্ত্রিকারযঃ ॥

অপরক্রীদর্শনাদিঅস্তো যথা—

পরিত্য্য নিবীক্ষ্য ভালদেশং চরণালক রূপিতং সপত্নাঃ। ১০

স্বদূর্শো নরনর্য কোণভাসঃ অতিমুখ্যঃ শিখবোপনা পটুঃ ॥” (রসমঞ্জরী)

“অবোচাম নিবচনাশ্রয়ানন্ত যঃ ॥” ( ঋক্ ২।৮৯।৮ )

‘নীলতে ইতি মানো ময়ঃ’ ( সায়ণ )

“পদাভরদ্রুণং মানমন্ধসঃ” ( ঋক্ ১০।১৪৪।৫ )

‘মানঃ বাগধারা নির্মাতারং’ ( সায়ণ )

মান, বোধাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ, ভূপরিমাণ ৬৪৯ বর্গমাইল। মাননদীর দক্ষিণকূলে দহিবাড়ী গ্রামে ইহার বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত।

মানক ( পুং স্ত্রী ) মানং বৃহৎপরিমাণমশ্রু ( শেবাৎ বিভাষা। পা ৫।৪।১৫৪ ) ইতি কপ্। মাণক, চলিত মাণকচু।

“স্থলকন্দো গ্রাম্যকন্দঃ স্থলপদ্মস্ত মানকঃ।” ( রত্নমালা )

২ শরাব, ( ১ সের )। ৩ মালাকন্দ। ( বৈজ্ঞকনিং )

মানকক্ষার ( পুং ) মানকশ্রু ক্ষারঃ। মানকদণ্ড-পত্রক্ষার, মানকচুর ডাঁটা ও পাতা পোড়াইলে যে ক্ষার হয়, তাহাকে মানকক্ষার কহে।

মানকর, বর্ধমানজেলার একটি নগর। অক্ষা° ২৩°২৫’৪০” উঃ, দ্রাঘি° ৮৭°৩৭’৩০” পূঃ। কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। একটি প্রধান বাণিজ্যস্থল বলিয়া বিখ্যাত। এখানে ই, আই, আর কোম্পানীর ষ্টেশন আছে।

মানকলহ ( পুং ) ১ ঈর্ষা। ২ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

মানকলি ( পুং ) অভিমানজ কলহ।

মানকুৎ ( ত্রি ) সম্মানজনক।

মানকোট, শিবালিক পর্বতের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য। সম্রাট অকবর শাহ ১৬৪৪ হিঃ এই নগর অবরোধ করিয়া রাজা ভক্তমলকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

মানক্ষতি ( স্ত্রী ) মানহানি।

মানগাঁও, ১ বোধাই প্রদেশের কোলাবা জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৫৩ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গও গ্রাম। প্রসিদ্ধ রায়গড়দুর্গের ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ডাকঘর, মহ-কুমার কাছারী প্রভৃতি আছে।

মানগ্রস্থি ( পুং ) মানশ্রু গ্রস্থিরিব বাধকত্বাৎ। ১ অপরাধ।

( হারাবলী ) মানশ্রু গ্রস্থিঃ। ২ অভিমানবর্দ্ধন।

“কেশববংশজগীর্ভলৌকমনোমুগ্ধহারিণী জয়তি।

গোপীমানগ্রস্থিবিমোচনী দিব্যগায়নাশ্চর্যা ॥”

( ছন্দোমঞ্জরী )

মানতরু ( পুং ) পর্পটক, ক্ষেৎপাপড়া। ( বৈজ্ঞকনিং )

মানতস্ ( অব্য ) মান পঞ্চমাঃ সপ্তম্যা বা তসিল্। মান হইতে বা মানবিধয়ে।

মানতুঙ্গ ( পুং ) এই নামে একাধিক জৈনাচার্য ও জৈন-

গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে—১ শাতবাহন-রাজের সমসাময়িক জনৈক আচার্য। ২ মানবের চৌলুকারাজ বয়র-সিংহের জনৈক প্রধান অমাত্য। জৈন-ঋতাস্বরদিগের তপা-গচ্ছ-কুলোত্তব। তপাগচ্ছ-পট্টাবলী হইতে জানা যায় যে, তিনি বারাণসীধামে বাণ ও ময়ূরের কুহকে মুগ্ধ মালব-রাজকে “ভক্তামর-স্তবন” শুনাইয়া উৎফুল্ল করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়হরস্তবন শুনিয়া নাগরাজ ও কিম্বু হইয়াছিলেন। ‘ভট্টভর’ আরম্ভসূচক স্তোত্রও তিনি রচনা করেন। প্রভাবক-চরিতে মানতুঙ্গের চরিত্র সবিস্তর বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহা অনেকটা কিংবদন্তী ও অনৈতিহাসিক কথায় পূর্ণ। বারাণসীতে হর্ষরাজ-সভায় বাণ ও ময়ূরের সহিত মানতুঙ্গের তর্ক যুদ্ধ চলিয়াছিল, এই বিবরণই বিশেষভাবে প্রভাবকচরিতে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষ্যকল্পসূত্রের মতে মানতুঙ্গের ভক্তা-মরস্তবন ৮০০ বিক্রম সম্বতে রচিত হয়। কিন্তু উজ্জয়িনী হইতে ১০৩৬ সম্বতে উৎকীর্ণ মালবরাজ বাকপতির যে শিলা-লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মালবরাজগণের এইরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়,—১ম কৃষ্ণরাজ, ২য় বইরসিংহ, ৩য় দিয়ক, ৪র্থ অমোঘ-বর্ষ বা বাকপতি ( ১০৩৬ সং )।

মানতুঙ্গরচিত পরিগ্রহপ্রমাণপ্রকরণ ও দাদশব্রত-নিরূপণ নামে দুই খানি মাগধীগ্রন্থ পাওয়া যায়। বাহা ইউক, তাঁহার ভক্তামরস্তোত্র ও ভয়হরস্তোত্র জৈন-পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদৃত। ১৩৬৫ সম্বতে জিনপ্রভসুরি ভয়হরস্তোত্রের এবং শান্তিসুরি ভক্তামরস্তোত্রের এক একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

৩ সিদ্ধজয়ন্তীচরিত্র-রচয়িতা। তাঁহার শিষ্য মলয়প্রভ ১২৬০ সংবতে সিদ্ধজয়ন্তীচরিত্রের টীকা রচনা করেন। মলয়-প্রভ তাঁহার গুরু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, প্রাখাট (পোবার)-বংশে বট বা বৃহদগচ্ছ উৎপন্ন হয়। এই গচ্ছ সর্বদেব আচার্য্যপদ লাভ করেন, তাঁহার শিষ্য জয়সিংহ, জয়সিংহের শিষ্য চন্দ্রপ্রভ, ধর্মঘোষ ও শীলগণ। এই তিন ব্যক্তি হইতেই পূর্ণিমাগচ্ছ উৎপন্ন হয়। মানতুঙ্গ সুরি শীলগণের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁহার আর এক শিষ্যের নাম প্রহ্লাদসুরি, এই প্রহ্লাদ কর্তৃক ১২৯২ সংবতে লিখিত হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্র বিবরণ-পুথির শেষে বিবৃত হইয়াছে যে, মানদেব, মানতুঙ্গ ও বুদ্ধিসাগর এই তিন জনেই চন্দ্রকূলে প্রধান আচার্য্য ছিলেন। উক্ত পুথির শেষে ২য় মানতুঙ্গের গুরুপরম্পরা এইরূপ লিখিত আছে,—

বুদ্ধিসাগর, তৎপরে প্রহ্লাদ সুরি, তৎপরে দেবচন্দ্র, তৎপরে মানদেব ও পূর্ণচন্দ্র, মানদেবের শিষ্য মানতুঙ্গ।

মানদ (ত্রি) মানঃ দদাতীতি দা-ক। ১ মানদারী, যিনি মান প্রদান করেন। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৩।২২)

মানদণ্ড (পুং) মানার্থঃ দণ্ডঃ। পরিমাপার্থঃ দণ্ড।

“পূৰ্ণাপৰো তোন্নিনিধাবগাহু

স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥” (কুমার স. ১।১)

মানদেব, এই নামেও একজন জৈনাচার্যের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি লঘুশাস্তিস্তোত্র রচনা করেন।

মানদেব (পুং) লিচ্ছবিবংশীয় জনৈক রাজা। [লিচ্ছবিবংশ দেখ]

মানদ্রুম (পুং) শাল্মলী বৃক্ষ। (বাতট স্ত্র. স্থা. ১৫ অ. ০)

মানধন (ত্রি) মানমেব ধনং যন্ত। মানই বাহাদের এক মাত্র ধন, অতিশয় মানী।

মানধানিকা (স্ত্রী) কর্কটী। (শব্দমালা)

মানন (ক্ৰী) সম্মান-প্রদর্শন। (দেশজ) মানিয়া চলা।

মাননীয় (ত্রি) মাত্ততে পূজাতে ইতি মান-অনীয়ন্। পূজনীয়।

“নানো মন্তোহসি বৃক্ষেশু মাননীয়ঃ সুরাসুরঃ।

সাপরামি মহাদেবীঃ মানং দেহি গৃহে মম ॥”

(হুর্গোৎসবপূজাপদ্ধতি)

মানসুবাড়ী, (মানসোজ্জী) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা. ১১°৪৮' উঃ এবং দ্রাঘি. ৭৬°২৫' পূঃ। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এখানে কাকির চাস আরম্ভ হয়। ক্রমে এই স্থান বৈনাড় জেলার কাকি-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়ে। এখানে গবর্নমেন্টের বিচারসদর ও কাকিব্যবসার জন্য অত্যন্ত কায্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে ইংরাজরাজ এখানে একটা ছাউনী করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের কোটিওট-বিদ্রোহে ঐ সেনাদল ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়।

মানপুর (ত্রি) মান এব পরং প্রধানং যন্ত। অতিশয়মানী, মানধন।

মানপরিখণ্ডন (ক্ৰী) মানহানি, অবমাননা।

মানপাল, জনৈক রাজা। দেবপালের পুত্র।

মানপুর, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত একটা পরগণা। বিদ্যাপর্যটকশ্রেণীর শিখরদেশে অবস্থিত। বিদ্য উপত্যকার অনতিদূরবর্তী অধিত্যকা দেশে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সাধারণের মনোহারী হইয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র-রাজের সহিত সন্ধির পর এই স্থান ইংরাজের অধিকারে আইসে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মানপুর নগরে এখানকার বিচার সদর ছিল। তদনন্তর উহা ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ভীলগণই এখানকার প্রধান অধিবাসী।

মানপ্রাণ (ত্রি) মানকীবন। যাহার মানই প্রাণ।

মানভঙ্গ (পুং) মানস্ত ভঙ্গঃ। মানভাঙ্গা, ক্রোধ অপনয়ন।

মানভাব, (মহামুভাব শব্দের অপভ্রংশ) বোম্বাই প্রদেশবাসী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটা মত প্রচলিত আছে। সাতারার মানভাবেরা বলিয়া থাকেন যে,—পাঁচশত বর্ষ পূর্বে এক ধর্মপরায়েণের মুনীজ্ঞ, ডা. দিবাকর নামে দুইটা শিষ্য ছিলেন। মুনীজ্ঞ মাংস ভক্ষণ করিতেন, তজ্জন্ত ভট্টাচার্য্য নামে দিবাকরের এক শিষ্যের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। ভট্টাচার্য্য মুনীজ্ঞের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া আলেন, সেই সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের বহুতর লোক ভট্টাচার্য্যের অনুবর্তী হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য নিজ পার্শ্বদগণকে গৈরিক বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিতে আদেশ করেন ও তাঁহাদিগকে ‘মহামুভাব’ বলিয়া আহ্বান করেন, তদনুসারে তাঁহারা সকলে ‘মানভাব’ আখ্যা লাভ করিলেন।

বেরারে অপর একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কৃষ্ণভট্ট জোষী নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। কৃষ্ণভট্ট বেতালসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ হইতে সাধ হয়। বেতাল তাঁহাকে এক মুকুট দিয়া বলিয়া দেন যে, এই মুকুট মাথায় দিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার কোন দুরভিসন্ধি থাকিলে নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন। যাহা হউক, কৃষ্ণভট্ট সেই মুকুট মাথায় দিয়া কৃষ্ণ সাজিয়া অনেক যুবতীর সঙ্গনাশ করিলেন। তাঁহার এই অসদাচরণের সংবাদ দেবগিরির রাজ-মন্ত্রী কর্ণগোচর হইল। তিনি কৌশলক্রমে কৃষ্ণকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার মুকুটটা খুলিয়া লইলেন, সেই সঙ্গে কৃষ্ণভট্টের কৃষ্ণমুষ্টিও পারিবারিত হইল। রাজা রামচন্দ্রদেবের আদেশে কৃষ্ণ নিরাসিত হইলেন। কিন্তু মানভাবেরা এ কথা অস্বীকার করেন, তাহারা বলেন, বলরাম কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিতেন, সে জন্য তাঁহারাও কৃষ্ণবস্ত্র পরিয়া থাকেন।

উক্ত প্রবাদ অনুসারে রাজা রামচন্দ্রের সময়ে অর্থাৎ প্রায় ৭০০ বর্ষ পূর্বে মানভাবের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়।

মানভাব দ্বিবিধ,—ঘরবাসী ও বৈরাগী। ঘরবাসীর আবার দুই প্রকার—গৃহস্থ ও ভোলে। গৃহস্থ বা সংসারী মানভাবেরা জাতিবিচার করেনা, কিন্তু ভোলেরা মানভাব বলিয়া পরিচিত হইলেও স্ব স্ব জাতিধর্ম পালন করিয়া চলে। অন্ত্যজ ব্যতীত আর সকল হিন্দুই মানভাব হইতে পারে। বৈরাগী মানভাবের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই আছে। তাহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই মন্তক মুণ্ডন করিতে হয়। উভয়েই হইজীবনে বিবাহ করিতে পারে না। তাহারা হয় মঠে বাস



করে, না হয় মানান্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। বৈরাগীদের মধ্যে পুরুষ গুরু বা মহন্তের নিকট এবং জীলোক হইলে গুরুমার নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে। বৈরাগী অথবা বৈরাগিনীরা মধ্যে কোন সংস্রব থাকে না, উভয়ের মধ্যে কেহ কাহারও মুখ দর্শন করিবার অধিকারী নহে। এমন কি বৈরাগিণীর মৃত্যু হইলে তাহাকে সমাধিস্থ করিবার অধিকারও বৈরাগীর নাই। বৈরাগীরা বৈরাগিণীর শবদেহ লইয়া সমাধিস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। তদনন্তর তাহারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইলে, অপর বৈরাগিনীগণ শবের বস্ত্রমোচন করিয়া ও তাহাকে উত্তর-শিরসী করিয়া বৃহৎ গর্ভ মধ্যে সমাধিস্থ করিয়া চলিয়া আসে।

বৈরাগীর মৃত্যু হইলেও স্বশ্রেণী দ্বারা পূর্ববৎ সমাধি দেওয়া হইয়া থাকে। সমাধিস্থ করিবার সময় মৃতের উপর রাশিকৃত লবণ ছড়াইয়া দেয়। গৃহস্থেরা শব দাহ করে। দত্তাত্রেয় ও কৃষ্ণ ইহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা। নিজাম রাজ্যভূক্ত মাহুর গ্রামে যে দত্তাত্রেয় ও কৃষ্ণ-মন্দির আছে, তাহাই মানভাবদিগের সর্বপ্রধান তীর্থস্থান। ভগবদ্গীতা তাহাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। যে যে ধর্মগ্রন্থে দত্তাত্রেয় বা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, সেই সেই গ্রন্থই মানভাবসমাজে আদৃত। তাহারা দত্তাত্রেয় বা কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন দেবদেবীর পূজা করিতে অভিলাষী নয়। বেরারে মানভাবদিগের পাঁচটা প্রধান মঠ আছে, নরমঠ, নারায়ণমঠ, ঋষিমঠ প্রবরমঠ ও প্রকাশমঠ, অপরপূর ক্ষুদ্র মঠগুলি ঐ পাঁচটার অন্তর্গত। তাহাদের সর্বপ্রধান একজন গুরু আছেন, তিনি 'মহন্ত', বেরারের অন্তর্গত ঋষপুর গ্রামে মহন্তের গদি আছে। মানভাবদিগের মধ্যে সেই মহন্তদর্শন ও তাহার পাদপূজা অতি পুণ্যদায়ক বলিয়া গণ্য।

কি গৃহস্থ কি বৈরাগী সকলেই অতিমাত্র অহিংসাপরায়ণ। পক্ষি-জীবহিংসা হয়, এই ভয়ে সন্ধ্যাহে সতর্ক থাকে। কেহ প্রাণী-হিংসা করে না। ইহারা যদি জানিতে পারে যে, কোথাও বলিষ্ঠ হইবে, তাহা হইলে তিন দিন পূর্বে সে স্থান পরিত্যাগ করে, এমন কি একপন্থলে বৈরাগীদিগকে জঙ্গলে আশ্রয় লইতে হয়।

মানভাবেরা ১০দিন অশৌচ পালন করে। একাদশ দিবসে বৈরাগীভোজ দিতে হয়। কোন মঠাধ্যক্ষের মৃত্যু হইলে তাহার বে প্রধান চেলা থাকেন, তাহাকে আশ্রমনগর-জেলার অন্তর্গত পৈঠনের মঠে আসিয়া পণ্ডিতগণের নিকট পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে তিনি মঠাধ্যক্ষের উচ্চাসনে অভিষিক্ত ও পূজিত হইয়া থাকেন। কার্যভার গ্রহণ

করিবার পূর্বে তাহাকে নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত পাকালেখর-মন্দিরে গিয়া দত্তাত্রেয়ের পূজা করিতে হয়। অনন্তর মানভাবদিগকে ভোজ ও ভিখারীদিগকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন। কোন বৈরাগিণী অপরাধী হইলে গুরুম তাহার বিচার করিয়া থাকেন। যোগ্যা হইলে কোন শূদ্রকন্ডাও গুরুম হইতে পারেন, এবং বৈরাগিণী হইবার সময় ব্রাহ্মণকন্ডা পর্যন্ত তাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে বাধ্য। কি বৈরাগী বা বৈরাগিণী ব্রহ্মচর্য পালন করিতে না পারিলে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হয়। যে এই কঠিন নিয়ম পালনে অক্ষম, সে বিবাহ করিয়া ঘরবাড়ী মানভাব হইতে পারে।

মানভূম, পশ্চিম-বঙ্গালার ছোট নাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। ভূপরিমাণ ৪৯১৪ বর্গ মাইল। পুরুলিয়া নগর ইহার বিচার-সদর। অক্ষা° ২৩°২০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°২৬' পূঃ।

ইহার উত্তর-সীমায় হাজারীবাগ ও বীরভূম জেলা, পূর্বে বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা, দক্ষিণে সিংহভূম ও মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে লোহারডাঙ্গা ও হাজারীবাগ। এতদ্ভিন্ন বরাকর ও দামোদর নদ ইহার উত্তর ও উত্তরপূর্ব এবং সুবর্ণরেখা নদী ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিমসীমান্তে প্রবাহিত।

এই জেলার মধ্যে বাঘমুণ্ডী, দালুমা, পাঁচোট, বিহারনাথ ও পার্শ্বনাথ প্রভৃতি কএকটা পর্বতশ্রেণী বিরাজিত থাকায় স্থানীয় বস্ত্রবিভাগের শোভাবর্দ্ধক হইয়াছে। অধিত্যকা ও উপত্যকাগুলি বনরাজিতে বিভূষিত হইলেও, মধ্যে মধ্যে খরস্রোতা পার্কত্য-নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেই বিস্তৃত বনভূমির নির্জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। পর্বতশ্রেণীর মধ্যে বারোখা, বন্দী, বাঁগা, বন্দীপাল, ভাঙারী, চরণীনাথ, দাবো, কারান্টি, কল্যাণপুর, লাকাইলিন, দাবাহ ও কোলাবী নামক কএকটা শৃঙ্গ উন্নতমস্তকে স্বভাবশোভার নিত্যস্থান নির্দেশ করিতেছে। এই সকল শৃঙ্গের কোন কোনটীতে দেব-মন্দিরাদিও প্রতিষ্ঠিত আছে।

বরাকর, খুদিয়া, দামোদর, ইজুরী, গুয়াই, ধলকিশোর বা দারকেশ্বর, শিলাই, কাঁদাই, কুমারী, টেটকা ও সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদী এবং কতকগুলি গিরিগাত্রবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোত-স্থানীয় জলই এখানকার লোকের প্রধান পানীয়। এতদ্ভিন্ন পুরুলিয়ার সাহেববাঁধ, জয়পুরের রাণীবাঁধ ও পাণ্ডুর পোন্ধর-ডিহিবাঁধ নামক প্রসিদ্ধ হ্রদাকার ধাঁধিকা এবং উপত্যকা-বক্ষে বিরাজিত কতকগুলি জলাশয় এখানকার প্রায় সর্বত্রই দেশীয় লোকের পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কৃষিকার্যেও ঐ সকল জল প্রভূত পরিমাণে গৃহীত হইয়া থাকে।

পাকতা বনবিভাগে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জীব বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শাল, অশন ও মহুয়া নামক বৃক্ষই এখানকার বনসমূহের প্রধান উপকরণ। ইংরাজ-গবর্নমেন্ট শালবৃক্ষের বাণিজ্যের জন্য ঐ সকল বনভাগ রক্ষা করিয়া থাকেন। মহুয়া বৃক্ষের ফুল এতদেশবাসী দরিদ্র অনার্য্য জাতির প্রধান আহাণ্য। উহাতে এক প্রকার মত্তও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সুবর্ণরেখা নদীর ধরস্রোতে অনেক সময় স্রলপরিমাণে স্রল ভাসিয়া আইসে। দেশীয় লোকে বহু পরিশ্রমে উহা হইতে স্রল সংগ্রহ করিয়া থাকে। অনেক স্থানেই লৌহ, তাম্র ও কয়লায় খনি পাওয়া গিয়াছে। উহা হইতে স্রলমাত্রায় ঐ সকল ধাতু উত্তোলিত হইয়া থাকে।

পূর্বভা দিতে নানা বর্ণের প্রস্তর হইতে দেবমূর্তি, দেবমন্দির, পাথরের বাসন, বাসগৃহ প্রভৃতি নির্মিত হইয়া থাকে। পাতকুমের অন্তর্গত চৈতন্তপুরে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। তাহার জল স্বাস্থ্যের বিশেষ উপযোগী।

শাল প্রভৃতি কাঠের বাণিজ্য ব্যতীত এখানকার বন-বিভাগ হইতে লাঙ্গা, তসর, মোম ও ধূনা প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া বিক্রয়ার্থ নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ইংরাজরাজের অধুগৃহে এবং রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় এই দ্বীপপ্রদ স্থানে নানাদেশীয় লোক আসিয়া বাস করিয়াছে। বাণিজ্য উপলক্ষে এখানে অনেক মহাজনের সমাগম হইয়াছে। জেলার প্রধান নগর পুরুলিয়া এখন অসম্মা সোধমালায় বিভূষিত হইয়া ধনজনপূর্ণ নগররূপে শোভিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অনার্য্য জাতিই এখানকার আদিম অধিবাসী। অস্র, শবর, ভর, ভূমিজ, ধাঙ্গড়, খড়িয়া, মুণ্ডা, নাএক, নাইয়া, নাট, পাহাড়িয়া, পুরাণ, সর্দার ও সাঁওতালগণ অনার্য্য মধ্যে গণ্য। কুম্বী, বাগদা, বাউরী প্রভৃতি জাতি অনার্য্যভাবাপন্ন হইলেও অনেকাংশে হিন্দুর অধিকরণ করিতে অভ্যাস করিয়াছে। দলমাগিরিবাসী পাহাড়িয়াগণ সিনানঘাটি গিরিগুহায় দেবীসমক্ষে নরবলি দিত। অতীত অনার্য্যজাতির মধ্যেও এ কুপ্রথার অজ্ঞাধিক প্রচলন ছিল। ভূমিজগণ পঞ্চকোটের রক্ষিণী দেবীর সমক্ষে নরবলি দিত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা-নারায়ণের অধিনায়কতায় এখানে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তাহা চিতিহাসে ‘চুয়াড়-বিদ্রোহ’ নামে খ্যাত। এখানকার অনেক রাজাও অনার্য্যবংশোদ্ভূত। [বরাহভূম দেখ]

পুরুলিয়া, ঝালিদা, রঘুনাথপুর, কাশীপুর ও মানবাজার এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। প্রকৃত নগর অপেক্ষা এগুলিকে গ্রামসম্ব্য বলা যায়। মিউনিসিপালিটির তত্তাবধানে

থাকায় উহাদের দিন দিন উন্নতি দেখা যায়। পুরুলিয়া নগরে জেলাধি বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত।

পুরুলিয়ার দক্ষিণে চাকুলতোর গ্রামে প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে একটি মেলা হয়। ঐ উৎসবের নাম ‘ছাতাপরব’, প্রায় মাসাধিক ধরিয়া ঐ মেলা বসে। পুরুলিয়া হইতে বরাকর যাত্রাবার পথমধ্যবর্তী আনাড়া গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপর্ষ উপলক্ষে একটি মেলা হয় এবং প্রায় ২০ দিন থাকে। পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ হইতে বণিক্গণ নানাদ্রব্য লইয়া এখানে বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে।

এখানে কাঁসাই, দামোদর, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীতীরে স্থানে স্থানে হিন্দু ও জৈন-দেবালয়সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ দেবমন্দিরাদি বসন্তান এবং মন্দিরসমিহিত প্রাচীন বস্তি-সমূহের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করিলে অসুমান হয় যে, এক সময়ে হিন্দু ও জৈন বণিক্গণ নদীবক্ষে ভাসিয়া এখানকার নদীতীরে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। কালে পুরুলিয়া নগর প্রাধান্য লাভ করিলে ঐ সকল স্থান ত্রীহীন ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

পুরুলিয়া ঠেসনের অদূরে, কাঁসাই-তীরবর্তী পালমা বর্তিতে একটি ধ্বংসপ্রায় জৈনমন্দিরের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। ঐ মন্দিরে কএকটি জৈনতীর্থঙ্করের প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

এতদ্বিধ পুরুলিয়ার নিকটবর্তী চাড়াগ্রামে শ্রাবকদিগের একটি দেবালয়, দামোদর-তীরবর্তী তেলকুপীতে বিরূপদেবের একটি এবং কাঁসাই নদীতীরস্থ বোরমগ্রামে কএকটি জৈন ও হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁসাই ও পার্শ্বা শৈলের সমাপ্তিত বৃধপুরগ্রামে ৪টি দেবমন্দির এবং কতকগুলি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ইত্যন্ত: বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখানকার চড়কপূজার মেলায় নানাস্থান হইতে দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

বেথানে গ্রাণ্ডট্রাকেরোড বরাকর নদী অতিক্রম করিয়াছে, তাহারই অনতিদূরস্থ একটি পণ্ডশৈলের উপর ৪টি চারুশিল্প-ময় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উহার সন্মাপেক্ষা নূতন-টেতে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত ১৩৮০ শকে উৎকীর্ণ রাণী হরিপ্রিয়া দেবীর একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। বৃধপুরের কাঁসাইতীরে প্রায় ১ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া এবং তাহার ২ ঘোশ উত্তরে পাক্কাড়া গ্রামে ২ ফিট উচ্চ বুদ্ধমূর্তি সহ কতকগুলি মন্দির দেখা যায়।

সুবর্ণরেখা ও কর্করা নদীর সঙ্গমস্থানস্থিত দাল্মি গ্রামে কতকগুলি হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। ঐ সকল ধ্বংসের মধ্যে একটি প্রাচীন দুর্গ এবং শিব, পার্শ্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, গণেশ, কালী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর পঞ্চকোট বা পাঁচটে রাজবংশের কীর্তিই উল্লেখযোগ্য। ইহাদের রাজপ্রাসাদ ও দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই প্রাচীন কীর্তির গোরব ঘোষণা করিতেছে। রাজা রঘুনাথ-নারায়ণ সিংহদেব পঞ্চকোট হইতে কেশরগড়ে রাজপাট উঠাইয়া লওয়ার প্রাচীন প্রাসাদ ও তৎসম্বন্ধিত অট্টালিকাদি জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। তৎপরে রাজা নীলমণি সিংহ দেবের পিতা পুনরায় কাশীপুরে নূতন প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাইরা বাস করেন। [পাঁচটে দেখ।]

পূর্বে সমগ্র মানভূম প্রদেশ দেশীয় সামন্তরাজগণের স্বাধীনে ঘাটবাগদিগের দ্বারা শাসিত হইত। ঘাটবাগগণ পার্শ্ববর্তী রাজগণের আক্রমণ হইতে স্ব স্ব অধিকৃত জায়গীর-রক্ষার জন্য ঘাট বা গিরিপথে অবস্থিত থাকিত। বিপক্ষ-গণ হইতে দেশরক্ষা এবং স্বদেশের দস্যুভূতি প্রভৃতি উপজব-দমন তাহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। এই কার্য্যের জন্যই তাহারা জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূমিজসদ্বারপণ এবং মুণ্ডা ও মান্ধিক প্রভৃতি অনার্য্য সর্দারেরাও রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিত বলিয়া ভূমিভূতি লাভ করে।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর, মানভূমজেলা ইংরাজের শাসনাধীন হয়। তদবধি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার কতকগুলি সামন্তরাজ্য বীরভূমের ও কতকগুলি মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া বিচারকার্য্য পরিচালিত করা হয়। পরে শেখোক্ত বৎসরে ঐ রাজ্যগুলি একত্র করিয়া ইংরাজ কোম্পানী ইহাকে “জঙ্গল-মহল” নাম দিয়া একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের চুয়াড়-বিদ্রোহের পর, এই স্থানের শাসন-শৃঙ্খলা দৃঢ়ীকরণের জন্য কোম্পানী বাহাদুর সেনপাহাড়ী, শেরগড় ও বিষ্ণুপুর রাজ্য ব্যতীত, অসংখ্য রাজ্যগুলি এবং মেদিনীপুর হইতে খল-ভূম বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি মানভূম জেলা গঠিত করেন। গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক দক্ষিণপশ্চিম-সীমান্ত রক্ষার জন্য জটনৈক এজেন্টের উপর এখানকার শাসনকার্য্য-পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এখানে ফৌজদারী হাজিরা বটায় খলভূম পুনরায় সিংহভূমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সীমান্তপরিচালকের পরিবর্তে কমিসনর-পদস্থ রাজক-র-চারীরাই এখানকার রাজকার্য্যসমূহের পর্য্যবেক্ষক হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জেলার সীমা নির্দিষ্ট হইয়া দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতাদি স্থাপিত হইয়াছে।

মানমণ্ড (কী) মানকচুর সহযোগে প্রস্তুত ঔষধবিশেষ।

[ মানমণ্ড দেখ। ]

মানমন্দির, জ্যোতিষমণ্ডলীর গতিবিধি-নিরূপণের জন্য

বৈজ্ঞানিক বস্তুগত অট্টালিকা (Observatory)।

[ বেধ ও বেধশালা দেখ। ]

মানময় (ত্রি) গর্ভযুক্ত। “তদাগতাভিন্বেদরাক্তান্ত কৃষ্ণেন্দ্রা মানময়াস্তথৈব।” (হরিবংশ ৮৫৫৫)

মানমহৎ (ত্রি) অত্যন্ত মানোন্নত।

মানমোড়া, বোম্বাই প্রদেশের পুণা জেলার অন্তর্গত জুনর-সম্বন্ধিত গিরিমালা। এখানকার অধিকাংশের ১১শ সংখ্যক গুহা হইতে আবিস্কৃত শিলালিপিতে ‘মানমুকুট’ (মানমুকুট) নামক পুরের উল্লেখ পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ এই মানমুকুট শব্দের অপভ্রংশে মানমোড়া হইয়াছে। এই গিরিমালার পাদদেশে বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজগণের সময়ে খোদিত বহুতর ‘গুফা’ দৃষ্ট হয়। এই গুহা-গুলির অন্য এই গিরিমালা প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভীমশঙ্কর :

মানমোড়ার দক্ষিণপূর্বসীমান্তে সমতল হইতে প্রায় দুই শত ফিট উচ্চে ‘চৈত্যা’ নামে খ্যাত বহুতর বৌদ্ধ-গুহা আছে। তাহা সাধারণতঃ ভীমশঙ্করের অংশ বলিয়া গণ্য। ভীমশঙ্কর গুহাগুলি জুনরের অর্ধকোশ দক্ষিণপূর্ব হইতে পুণারাতার অর্ধকোশ পশ্চিমাবধি প্রায় অর্ধকোশ বিস্তৃত।

অতি সংক্ষেপে উক্ত গুহাবলির পরিচয় দিলাম :—

১ম গুহাটা লয়না (লেনা) বা বানরবাস বলিয়া গণ্য। ইহার এক অংশে বারান্দা, অপরাংশে কুঠারী। ইহার মধ্যবর্তী স্তম্ভাবলি প্রাচীন আকৃষ্ণরণের। ২য়টা চৈত্যা। ইহার মধ্যে দাবোব (দেহগোপ)-রূপ পাথর আছে। এই চৈত্যের দ্বারদেশে তিন ছাত্র “সিদ্ধং উপাসকস নপমস, সতমলপুতস, পুত বীরভূতিন” এই শিলালিপি আছে। ৩য়টা একটি সত্র। এই গুহার দক্ষিণে জলের চৌবাচ্চা রহিয়াছে। ৪র্থ ও ৫ম গুহাতেও বৃহদাকার চারিটা জলাধার দৃষ্ট হয়। ৬ম গুহার প্রাচীরের উপর “সিবসমপুতস নিবভূতিনো দেয়দম্ম পোঢ়ি” এই লিপি উৎকীর্ণ আছে। ৬ষ্ঠ গুহাটা “মণ্ডপ” বা বিশ্রামমণ্ডপ বলিয়া গণ্য। ইহার ছাদের দক্ষিণপ্রাচীরে উৎকীর্ণ “রাণো মহাথতপস সামি নহপানস অমাত্যাস বচস গোতস অয়মস দেয়দম্ম পঢ়ি মতপোচ পুনথব্বস ৪৬ কতো” এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মহাশঙ্কর স্বামী নহপানের প্রধান মন্ত্রী বৎসগোত্রীয় অয়ম কর্তৃক এই মণ্ডপ ও এতৎসং-লগ্ন জলাধার উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। ৭ম ও ৮ম গুহাদ্বারে কএকটা ছোট ছোট কুটারি আছে। ৮ম গুহার প্রায় ৩ ফিট নিম্নে ৯ম গুহার একটি বৃহৎ সত্র বা ভোজমণ্ডপ, ইহার ছাদ ভাঙ্গিয়া পড় পড় হইয়াছে। ৮ম ও ৯ম গুহার

ব্যবধানে অনেকগুলি জলাধার আছে, গিরির শিরোদেশ হইতে উদ্ভূত উৎসের জল এই জলাধারে পড়িতেছে। উক্ত জলাধারগুলির দক্ষিণে ৮০ গজ দূরে ১০ম বা ভীমশঙ্করের শেষ গুহা অবস্থিত।

অধিকা।

ভীমশঙ্করের ৩০০ গজ দূরে অধিকা নামক গুহাশ্রেণী আরম্ভ। পূর্বদক্ষিণ হইতে পশ্চিমোত্তর দিকে বিস্তৃত উত্তরপূর্ব-মুখী ১২টা গুহা লইয়া এই অধিকাশ্রেণী। অধিকার অধিকাংশ গুহা ভগ্ন, বিধ্বস্ত অথবা পূর্বস্রীবর্জিত। ইহার চতুর্থ গুহার ছাদের নীচে ও দ্বারের উপরে “গহপতিপুতানং দোনক স চোগতং দেয়ধম” এইরূপ উৎকীর্ণ আছে। ইহার ষষ্ঠ গুহার ‘অধিকা’ নামী জৈন দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, তজ্জন্ত এই গুহার নাম ‘অধিকালেনে’ হইয়াছে। নানা স্থান হইতে জৈনগণ ও জুমরবাসী হিন্দুগণ ঐ দেবীর পূজা করিতে আসেন। এই গুহার দ্বারদেশের বামাংশে জৈন ক্ষেত্রপাল-মূর্তি এবং দক্ষিণদিকের একটা গবাক্ষে ‘চক্রেস্বরী’ মূর্তি রহিয়াছে। এই গুহার ২য় কুটারিতে নেমিনাথ, আদিনাথ, অধিকা এবং অধিকাপুত্র সিদ্ধ ও বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত; মুগলমানগণের হস্তে অধিকাংশ-মূর্তিই ভগ্ন বা অঙ্গহীন।

এখানকার ১১শ গুহা একটা অসম্পূর্ণ চৈত্য। ইহাই জৈনদিগের প্রধান পূজার স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দির অন্তরে উৎকীর্ণ এখানকার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বানদ-গ্রামবাসী পলপ এঠ চৈত্য দান করেন, অপরাজিতগণের পরোগক (প্রয়োগক) নামক এক ব্যক্তি ইহার পরিচালনভার গ্রাপ্ত হন\*। ইহার অপর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে এই গুহা তৎকালে “গিধাবহার” (গুপ্তবিহার) নামে খ্যাত ছিল। কোণাটিক শ্রেণীভুক্ত “আদুথুম” নামে এক শক উপাসক এই বিহারের উদ্দেশে দান করিয়াছিলেন†। এই বিহারস্থ ১০ম শিলালিপি হইতেই মানমুকুদ (মানমুকুট) নামক পুরের সন্ধান পাই। এখানকার ১৮শ শিলালিপিতে ভদন্ত স্ববির-সুদর্শের শিষ্য ত্রৈবিদ্য-চৈত্যক স্ববিরের প্রসঙ্গ আছে।‡

\* “গামেধু বানদেধু নিবতনানি পনরসস পলপস দেয়ধম অপজিতেশ্ব গনে পরোগকহে দান।”

† “কোনাটিকে সেনিয়ে উবসকো আদুথুম সকো বদালিকায় করগ্রমুল-নিবতনানি বিস কতপুতকে বদমুলে নিবতনানি দে” (Bombay Gazetteer, vol. XVIII. pt. ii. p. 175.)

‡ “গনাচারিয়ানং ধেরানং ভরন্ত হলদানং তেবিজানং অন্তেবাসিনঃ ধেরানং ভরন্ত চেতিয়ানং তেবিজানং নন্দনেকন।”

ভূতলিঙ্গ।

অধিকার ২০০ গজ দূরে পুরোক্ত উত্তর শ্রেণির গুহা-মালা হইতে উক্ত স্থানে আরও ১৬টা গুহা দৃষ্ট হয়। সাধারণের নিকট এই গুহাবলি “ভূতলিঙ্গ” নামে পরিচিত। এই গুহা-গুলি অতি প্রাচীন হইলেও তেমন ভাস্কর্য্য বা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক নহে। এই গুহাবলির নিকট ও আশে পাশে বহু জলাধার দৃষ্ট হয়। এ গুলি বৌদ্ধগুহা বলিয়া স্থিরীকৃত। ইহার ৭ম ও ৯মটা একটা বৌদ্ধ ‘দাবোব’ বলিয়া গণ্য। ৯ম গুহাশ্র “যবনস চন্দানং দেয়ধম গভদার” এই শিলালিপি হইতে জানা যায়, ইহার গর্ভগৃহ ‘চন্দ্র’ নামক এক যবনের ব্যয়ে নিৰ্ম্মিত হয়। এখানে গরুড় ও নাগরাজমূর্তি এবং ছত্রসংলগ্ন ক্ষুদ্র চৈত্য আছে, ঐ ক্ষুদ্র চৈত্যগুলি লিঙ্গরূপ ও এখানকার মূর্তিগুলি ভূতরূপে কল্পিত, তাই এখানকার লিঙ্গ-রূপ চৈত্যগুলিও ‘ভূতলিঙ্গ’ নামে খ্যাত, তাহা হইতেই এই স্থানের ভূতলিঙ্গ নাম হইয়াছে।

মানয়িতব্য (ত্রি) সম্মাননাই, সম্মানযোগ্য।

মানয়িত্ব (ত্রি) সম্মানকারী।

মানরক্ষা (ক্রী) মানার্থে সময়পরিণামজ্ঞাপকং রক্ষমত্যা। তাস্মী, চলিত তাঁবী। পূর্বে যখন ঘড়ী ছিল না, তখন সময় জানিবার জন্ত ইহা ব্যবহৃত হইত। তাম্রনির্ম্মিত একটা পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে একটা ছিদ্র রাখিতে হইত, ঐ পাত্র জলে ফেলিয়া রাখিলে ক্রমে বিন্দু বিন্দু করিয়া জল উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যখন উহা পূর্ণ হইত, তখন দণ্ড-পরিমিত কাল হইয়াছে, ইহা জানা যায়। স্বয়োদিয় হইতে আরম্ভ করিয়া এই যন্ত্র দ্বারা সময় নিরূপণ করা হইত।

মানরাজ, মিবারের মৌরী-কুলোদ্ভূত জনৈক রাজা। চিতোর-নগরে ইহার রাজধানী ছিল। ইনি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দি মুসল-মানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

মানব (পুং) মনোরপত্যং মনোর্বোজাপত্যং পুমান্ মনু-অণ্। মনুর অপত্য, মনুষ্য। মনু-হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনুষ্যদিগকে মানব কহে।

“মনোবংশো মানবানাং ততোহয়ং প্রথিতোহভবৎ।

ব্রহ্মকত্রাদয়স্তস্মান্ননোজাতাস্ত মানবাঃ ॥” (ভারত ১।৭।১২)

মনুনা প্রোক্তং মনু-অণ্। ২ উপপুরাণবিশেষ।

“সনৎকুমারং প্রথমং নারসিংহং ততঃ পরম্।

নারদীয়ং শিবদৈব দৌর্বাসদমমুত্তমম্।

কাপিলং মানবদৈবং তথা চৌশনসং স্বতম্ ॥” (দেবীতা ১।৩।১৩)

মানবৎ (ত্রি) মান-অন্ত্যার্থে মতৃপ্ মস্ত ব। মানী, মান-যুক্ত, মানবিশিষ্ট।

মানবতত্ত্ব, ( Anthropology ) মানবজাতির প্রাকৃতিক ইতিহাসকে মানবতত্ত্ব বলা যায়। মানব-প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ যথার্থরূপে জানিতে হইলে—সন্ধ্যা, পশু, পক্ষী, কীট, উদ্ভিদ এবং জড় প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেরই তত্ত্বাধ্বষণ করিতে হয়। সুতরাং মানবপ্রকৃতির যথার্থতত্ত্ব জানিবার জন্য পদার্থবিজ্ঞান ( Physics ), রসায়ন ( Chemistry ), জীববিজ্ঞান ( Biology ), এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান ( Botany ), শারীরবিজ্ঞান ( Anatomy and Physiology ), মনোবিজ্ঞান ( Psychology ), ভূবিজ্ঞান ( Geology ), বাগ্‌বিজ্ঞান বা শব্দবিজ্ঞান ( Science of language ), নীতিবিজ্ঞান ( Ethics ), সমাজবিজ্ঞান ( Sociology ), ধর্মবিজ্ঞান ( Religion or Theology ) এই সকল বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মানবতত্ত্ব ( Anthropology ) উক্ত বিজ্ঞান সকলের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং ঐ সমূহায়ের তত্ত্ব মানবতত্ত্ব-নির্ণয়ের পথপ্রদর্শক। বিবিধ বিজ্ঞানে অভিজ্ঞান না থাকিলে মানবতত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে জয়জয় করা যায় না।

প্রথমতঃ পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের প্রকৃষ্ট জ্ঞান ব্যতীত ভূত ও ভৌতিক পদার্থের স্বরূপনির্ণয় হইতে পারে না। কি সৃষ্টিবাদ, কি ক্রমাভিব্যক্তিবাদ উভয় মতই বলিতেছেন—মানবের শরীর ভূতবিকার—ভৌতিক পদার্থের বিপর্যায়, অতএব ভূতপদার্থের ( Matter ) স্বরূপনির্ণয়বিষয়ক শাস্ত্র মানবতত্ত্বাবোধের প্রথম অবলম্বন। ভৌতিকশক্তি ও জীবনীশক্তি অভিন্ন হউক বা ভিন্ন হউক, ইহা স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয় যে, ভৌতিক দেহে জীবনীশক্তির স্ফূরণ হইলে সাধারণ জীবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কি প্রকারে দেহে চৈতন্তের সমাবেশ হয়, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও—উভয়ের যে একটি উজ্জয় কি অজ্ঞের সম্বন্ধ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভূত বা পদার্থবিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের সোপান-মার্গ।

প্রাচ্য মতে—প্রকৃতি ও তদ্বিকার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূত ইহারা দৃশ্য ও ভোগ্য। প্রকৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষকে জ্ঞান সম্ভব নহে। প্রকৃতির উপাসনা দ্বারাই পুরুষের অমূল্যজ্ঞান করিতে হইবে—জড়বিজ্ঞানেই জীববিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই জন্তই সাংখ্যিকার কপিল মুক্তকণ্ঠে প্রকৃতি দেবীর স্তুতি করিয়াছেন। কারণ প্রকৃতি কখনও পুরুষবিরহিতা হইয়া অবস্থান করেন না। বিশ্বজগৎ কেবল জড়প্রকৃতির কাণ্ড নহে—জগতের প্রত্যেক অণুতে—জড়পদার্থের আপাতদৃশ্য অচেতন দেহে পুরুষ-প্রকৃতির যুগলরূপ বিরাজমান। পুরুষ ও প্রকৃতি এক ব্রহ্মেরই রূপদ্বয়মাত্র, ইহাই বেদে উক্ত হইয়াছে। বর্তমান

বৈজ্ঞানিকগণ জড়দেহে চৈতন্তের অক্ষুট স্ফূরণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং জড়বিজ্ঞানের সাহায্য-গ্রহণ ব্যতিরেকে জীববিজ্ঞানের উচ্চতম শ্রেণীতে সমারূঢ় মানবতত্ত্বের স্বরূপ কিরূপে নির্ণীত হইবে। [ প্রাচ্য মতের বিস্তৃত বিবরণ স্থিতিতবে দেখ। ]

পাশ্চাত্য-মতে ক্রমাভিব্যক্তিবাদের ভিত্তি নৈসর্গিক নিয়মের উপর স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমতঃ—শারীরবিজ্ঞানে মনুষ্যশরীরের গঠন ও ক্রিয়ার কথা জানিতে পারা যায়; মনোবিজ্ঞানে মানবের মানসিক ক্রিয়া এবং শারীরিক ক্রিয়ার সহিত মানসিক ক্রিয়ার সম্বন্ধ জানা যায়। বাগ্‌বিজ্ঞানে বা শব্দবিজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতত্ত্বের গূঢ়রহস্য অবগত হওয়া যায়। নীতিবিজ্ঞানে মনুষ্যের ইচ্ছাপ্রণোদিত কার্যাবলীর সমালোচনা দ্বারা মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের কর্তব্য অবধারিত হয়। সমাজবিজ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মনুষ্য-জাতির সামাজিক প্রতিষ্ঠা, শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, তত্ত্ববিষয়ে বিষদ্বর্গের বিধি ও মন্তব্য এবং বিভিন্ন সমাজের রীতিনীতি পর্যালোচিত হয়। ভূবিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ব ভূস্তরনিহিত প্রত্নরীতৃত জীবকঙ্কাল ও অস্ত্রাস্ত্র চিহ্ন পরিদর্শন করিয়া অত্মমানের অনধিগম্য অব্যুতসহস্র বৎসরের পূর্ববর্তী পৃথিবীর বিবরণ বিজ্ঞাপন করে। পৃথিবীর প্রাচীনতম অধিবাসীর বিবরণসংগ্রহে অতীতসাক্ষী ইতিহাস যেখানে নির্বাক, ভূতত্ত্ববিজ্ঞান সেখানে অমূল্যসঙ্কেতে দেখাইতেছে যে, অতিকায় সরীসৃপ, মস্ত কুর্শের আদি লীলাক্ষেত্র বহুসংখ্যক বিশালবক্ষে মানবশিশুর পদচিহ্ন মাত্র নাই। ভিন্ন ভিন্ন যুগে যে সমস্ত জীব ধরিদ্রীর রক্তভূমি হইতে বিদায় লইয়া জীবলীলা সমরণ করিয়াছে, ভূতপাত্রী ধরিদ্রী মাতৃস্নেহের অপূর্বপ্রেরণায় তাহাদিগকে সযত্নে কুণ্ডিগত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সমস্ত তত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া এবং ভূগর্ভ-নিহিত মনুষ্যের আদিমাবস্থায় ব্যবহৃত দ্রব্যাদির নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া পাশ্চাত্য প্রত্যঙ্গবাদী বৈজ্ঞানিক উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, বিবর্তের অনন্ত আবর্তে পরিবর্তিত হইয়া, এবং ক্রমাভিব্যক্তির শক্তিতে মার্জিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নত প্রকৃতির জীব ও পরিশেষে মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে। এই অনন্ত গতিময়-জীবশৃঙ্খলের মনুষ্যই উচ্চতম গ্রন্থি। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া মানবের যথার্থতত্ত্ব অবগত হওয়াই মানবতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

শারীর-বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ।

বিভিন্ন জীবের শরীর-ব্যবচ্ছেদক পণ্ডিতগণ, মনুষ্যের সহিত ইতরজীবের সাদৃশ্য-নিরূপণের জন্য অগ্রসর হইয়া তদ্রূপ

তর করিয়া অস্থিসংস্থান পরীক্ষাপূরক সোপানে স্বীকার করিয়াছেন যে ককাল-সাদৃশ্যে মনুষ্য অন্তঃশৃঙ্খলাবদ্ধ জীব-জগতের উর্দ্ধতন শৃঙ্খলগৃহি। এ বিষয়ে মনুষ্যের সহিত তির্থাগ্ জাতির সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। কেবল অস্থিসংস্থানের সাদৃশ্যে পরিভূত না হইয়া তাঁহারা শারীর-বস্ত্রের ক্রিয়াকলাপ ও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাহাতেও দেখিয়াছেন, মনুষ্যের সহিত ইতরজীবের তুলনায় অধিক নহে। অধ্যাপক ওয়েন (Owen) বলিতেছেন,—বানরের সম্মুখের পদদ্বয়ে মনুষ্য-হস্তের প্রাথমিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মর্কটদিগের হস্ত অপেক্ষা গরিলার হস্ত অনেকটা কোশলসম্পন্ন। বানরগণের ঘনলোমাবলি থাকায় মনুষ্যের সহিত এত বাহ্য বৈষম্য হইয়াছে। তথাপি মনুষ্যের সহিত মর্কটের বাহ্য-বৈষম্য অনধিক হইলেও উভয়ের অন্তর্ভুক্তিতে, উভয়ের মানস-ক্ষেত্রে যে বিষয় বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা কল্পনা-পথে আনয়ন করিলে উভয়কে একজীবের তিন শাখা বলিতেও প্রযুক্তি হয় না। তদ্বত্তরে হাক্সলী বলেন, বর্ষের মনুষ্য-সমাজের সহিত অধুনাতন সভ্য-সমাজের পার্থক্য অবলোকন করিলেই সে বিষয়ের স্পষ্ট মীমাংসা হইতে পারে। মনুষ্য-শরীরের অস্থি-সংস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা (ওয়েন এবং হাক্সলী) স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্য বানরের অতি নিকটবর্তী। কোন কোন বিষয়ে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও নর-বানরের অস্থিসংস্থানে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অত্যন্ত বদ্ধিতায়তন গরিলার মস্তিষ্ক নূনকল্পে ২০ আউন্স এবং অনতিবিকশিত মনুষ্যের মস্তিষ্ক ৩২ আউন্স হইয়া থাকে। কিন্তু গরিলার আয়তন মনুষ্য অপেক্ষা বৃহত্তর। শারীরিক প্রকৃতিভেদে গরিলা যে মনুষ্যের নিকটতম জীব, তাহা নিয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক শ্রেণী-বিভাগ।

কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্য শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে তির্থাগ্ জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জীব। কিন্তু বর্তমান প্রাণিবিৎ পণ্ডিতগণ সম্মুখেই ঐ বাক্যের সমর্থন করিতেছেন—তাঁহারা বলিতেছেন যে, বিভিন্ন জাতীর বানরদিগের মধ্যে পরস্পরের যে বিষয় বিভেদ দৃষ্ট হয়—অপূর্ণ মনুষ্য হইতে পূর্ণ গরিলার তত ভেদ লক্ষিত হয় না। তাহা সবেও মর্কটদিগকেও প্রাণিতত্ত্ব পণ্ডিতগণ বানরশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিবিষ্ট করিয়াছেন। হাক্সলী এই যুক্তিতে প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক বিভাগে মনুষ্যকে উচ্চতম সোপানের জীব বলিতে পারেন। তির্থাগ্ জাতিদিগের মধ্যে বুদ্ধি-বৃত্তি এবং

সমাজ-প্রীতি অপরিমিত ভাবে বিস্তারিত থাকিলেও মনুষ্যই উহা প্রকৃষ্ট বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

মানসিক উৎকর্ষ বিষয়ে তির্থাগ্ জাতির সহিত মনুষ্যের যে বিষয়-পার্থক্য দৃষ্ট হয়, শারীর-বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে ততটা পার্থক্য মনে হয় না।

বাছাইউক তিন তিন স্বতন্ত্র বিজ্ঞানকে মানবতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করিলেও এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানে মনুষ্যসম্পর্কীয় বাবতীর ভেদের উপাদান থাকিলেও মানবতত্ত্বের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। মনুষ্যের শারীরিক এবং মানসিক প্রকৃতি এবং বহুধরার বিশালবক্ষে মানবের প্রথম আবির্ভাব হইতে অস্তাবধি মানব জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করাই মানবতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

তির্থাগ্ জাতির সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

মানবতত্ত্ব-শাস্ত্রের প্রথম পাণ্ডিত্য ডাক্তার শিকার্ড মনুষ্যের সহিত ইতর প্রাণিদিগের শরীরগত সাদৃশ্য এবং প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, মনুষ্য যে সাধারণ জীবের দেহ মাত্র ধারণ করিয়া বিশ্বস্থিতির গুণ রহিত অমুসন্ধান করে, তাহা অতীত বিশ্বের বিষয়।

মনোবিজ্ঞান-ঘটিত সাদৃশ্য।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনোবিজ্ঞানের বিভাগে অমুসন্ধানে মনুষ্যকে জীব জগতের সহিত তুলনা করিতে গিয়া বড়ই গোলে পড়িয়াছেন।—কি প্রকারে জীবস্থিতির উর্দ্ধতন জীব গরিলা হইতে মনুষ্যের মানসিক উন্নতির অনন্ত-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইল, তাহা তাহিলে মনুষ্যকে কখনই জীবস্থিতির বিকাশশৃঙ্খলার উচ্চতম জীব না বসিয়া সম্পূর্ণতর নূতন প্রকারের প্রাণী বলিতে হয়। এই অনন্ত-বৈষম্য সামান্য দৈহিক গঠনের উপরে স্তম্ভ, ইহা বলিতে কখনই প্রযুক্তি হয় না। ইন্দ্রিয়ের অমুভব শক্তিতে কোন কোন বিষয়ে মনুষ্য তির্থাগ্ জাতির নিকট পরাজুত; ঈগলপক্ষীর দূরদর্শিনী দৃষ্টি এবং কুকুরের ভ্রাণশক্তি মনুষ্যের পূর্ণ বিকশিত ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষা শক্তিশালিনী হইলেও মনুষ্যের অমুভব বিষয়ে অনেকাংশে তীক্ষ্ণতা আছে—তাহা সন্দেহভাবে স্বীকার করিতে হইবে।

মানসিক শক্তি।

মনুষ্য অতিক্রম হস্তীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্রতর জীব ও সিংহ কিংবা ব্যাঘ্রের তুলনায় অতি দুর্বল জীব হইলেও কেবল বুদ্ধি-বলে প্রকৃতির প্রতিফল আচরণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মনুষ্য কোন সময়ে পরাজুত হইলেও—



প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। মনুষ্যের বুদ্ধি-কলা ও কৌশলেই শত সহস্র মতহতী কিম্বা ক্ষুধার্ত শাদ্দুল পরাক্রান্ত হইতেছে। কপোতের ক্রতপদ ও কিংগুটি মনুষ্যের অগ্নিগোলকের নিকট হইতে মানিয়াছে। কতকগুলি সংস্কারে সীমাবদ্ধ হইলেও মনুষ্যের মানসিক উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে মনুষ্যকে পৃথিবীর জীবসৃষ্টির সহিত এক পর্ধ্যায়ে স্থাপিত করিতে ইচ্ছা হয় না। তিথ্যগ্ জাতি-দিগের মধ্যে স্মারকতাপশক্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি এবং নূতন বিষয় শিখিবার শক্তি ন্যূনাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও এবং অভ্যাসবশে প্রকৃতি পরিবর্তন ঘটিলেও, সে তুলনায় মনুষ্যকে স্বর্গরাজ্যের জীব বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। ওয়ালেস্ সাহেব বথার্থই বলিয়াছেন,—যখন বিশাল বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য পশুচর্মে লক্ষ্য নিবারণ করিতে শিখিল,—যখন যুদ্ধাশ্রয় প্রদত্তবশে বৃক্ক কর্তন করিল,—অগ্নি-সংযোগে নিবিড় অরণ্য মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদন করিল,—যে দিন অধঃ-সমুদ্র শতের বাজ কুঠে ক্ষেত্রে বপন করিল—সেই দিন নিসর্গ রাজ্যে মহাপরিবর্তনের স্বরূপাত হইল। নৈসর্গিক পরিবর্তনের প্রতি বাধা প্রদানে সমর্থ হইয়া যে দিন মনুষ্য প্রকৃতির বিকক্ষে অস্ত্র ধারণ করিল,—সে দিন এক স্মরণীয় দিন। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর পৃষ্ঠে মনুষ্য যে দিন প্রতিবন্ধিতা করিতে শিক্ষা করিল,—সেই দিন মনুষ্যসৃষ্টির মধ্যে অভিনব সৃষ্টির স্বরূপাত করিয়াছে।

আজি যে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানসমুদ্রের রত্নসকলে নিমগ্ন, সত্য, ভ্রান্ত ও ধর্মের উপরে যে নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত,—যে, ধর্মশাস্ত্র বিশেষণের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধনির্ণয়ে অগ্রসর,—তৎসমস্ত সম্পূর্ণভাবে মানবীয় শাস্ত্র হইলেও তিথ্যগ্ জাতি-দিগের মধ্যে তাহাদের প্রাথমিক অস্তুর পরিদৃষ্ট হয়।

ওয়ালেস্ বলিয়াছেন, মনুষ্য সম্পূর্ণভাবে নূতনতর জীব। তিনি অভিব্যক্তিবাদের প্রতি আবার তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—মনুষ্য বিবর্তবাদের উচ্চ সোপানে সমাধীন হইলেও—কোন অদৃশ্যমান প্রাচীন জীবের সহোদর, কোন কল্পকল্প প্রজাপতিসত্ত্বির অধস্তন বংশ। যে ঔরসে উৎপত্তি ও বিহঙ্গম জন্মিয়াছে, হয়ত মানবও তাহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

মনুষ্য সম্বন্ধে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ।

জার্মান এবং হাংগলী-প্রমুখ প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক-পন্থ মনুষ্যকে জীবজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্ত জীব বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। জড়বাদীবৈজ্ঞানিক অনন্ত বৈচিত্র্যময় মানব মস্তিষ্কের বিশ্বরকর বিকাশ দেখিয়াও নরবানরের মধ্যে অধিক প্রভেদ দেখিতে পান না।

অধ্যাত্মবাদিগণ বলিতেছেন,—মনুষ্যজাতি পশুপক্ষী হইতে উদ্ধৃত জীব নহে। মনুষ্য বিধাতার ঐশী শক্তিসম্পন্ন, নূতন সৃষ্টি।—জীবাত্মাই মনুষ্যের বুদ্ধাদি মানসিক গুণনিচয়ের মূলোদ্ধৃত কারণ। এই আত্মাই ঐশী শক্তি। মনুষ্য আত্মার শক্তিতে জীবজগৎ হইতে সম্পূর্ণ নূতনতর জীব। মনুষ্যের কশেককামজ্ঞা প্রকৃতি শারীরিক যন্ত্র ও দ্রাব্যমণ্ডলীর সহিত জড়দিগের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও মনুষ্যের ইচ্ছার স্বতন্ত্রতা আছে—অদৃষ্ট ও পুরুষকার আছে। অজ্ঞাত তিথ্যগ্ জাতির ভিতরে তাহার প্রাথমিক বিকাশও দৃষ্ট হয় না। আত্মা মনুষ্যের জাতক শরীরে রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন ক্রিয়াশীল নহে। বর্তমান কালের বড় বড় বৈজ্ঞানিক ডাক্তারদের মতের প্রতি আর ততদূর প্রভা প্রদর্শন করেন না। মনুষ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুদিগের দার্শনিক তত্ত্বালোচনা পাশ্চাত্য মানবতত্ত্বের সংস্কার বহির্ভূত। শিকার্ড সাহেব বলিয়াছেন,—মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন যথীন মত প্রকাশ মানবতত্ত্বালোচনার অন্তর্গত নহে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণেরও ঐকমত্য নাই।

মনুষ্যের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি।

মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত দৃষ্ট হয়। কিন্তু অধুনাতন মতগুলি সমস্তই জীব-বিজ্ঞানের (Biology) উপর নির্ভর করিতেছে। মনুষ্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে দুইটি সম্প্রদায়ের মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি সৃষ্টিবিষয়ক, অপরটি বিবর্ত বা অভিব্যক্তিবিষয়ক। উভয়মতবাদীই সমস্বরে বলিতেছেন—মনুষ্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হইলেও মাতুরূপা বস্তু-করার সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান। তাহার ভূতরের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তথায় মৎস্ত কিম্বা কুণ্ডের প্রকাণ্ড শরীর অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান আছে, কিন্তু সিংহ কিংবা শাদ্দুলের পদচিহ্নমাত্র নাই। আবার তৎপরিবর্তী ভূতরে অতিকার সন্ন্যাসের বিরূপ শরীর সর্বসংহা সমস্তে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অতীত শতাব্দী পরে ভূপৃষ্ঠে মনুষ্য শিল্প ভূমিষ্ট হয় নাই—ভূতত্ত্ব ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। জীবসৃষ্টির ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়—ইহার মধ্যে একটি পৃথিব্যাবস্থা পদ্ধতি আছে।

এগাসিজ্ (Agassiz) প্রাণীতত্ত্বের পর্য্যালোচনা-গ্রন্থকে বলিয়াছেন,—বিভিন্ন জাতীয় জীবসৃষ্টি-বিষয়ে বিধাতার বিচিত্র বিধান বিজ্ঞানবাদের বাস্তবপরীক্ষার বহুদূরে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতিসৃষ্টির সমগ্র ইতিহাস অস্বীকার না করিলে মনুষ্যসৃষ্টির ক্রমবিকাশ স্বয়ংসিদ্ধ করা কঠিন। [সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ]



এতদ্বিষয়ের দার্শনিকতত্ত্বগুলিও পরস্পর বিরোধী। পাশ্চাত্য মানবতত্ত্বগণ্য গভীর গবেষণা দ্বারা মনুষ্যের নিকটতম পূর্বপুরুষের অঙ্গসন্ধানে এখনও কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সুতরাং এ উত্তর পক্ষের যুক্তিই বীর তাবে আলোচনা করাই প্রেরণ্য।

পণ্ডিত টাইলর (E. B. Tylor) মনুষ্যোৎপত্তি প্রবন্ধে মনুষ্যজাতির আত্মাংগতির বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন, ক্রমবিকাশবাদে অঙ্গ পরমাণুর আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ ব্যতীত সৃষ্টির অন্ত কোন প্রবর্তক কারণ নির্দিষ্ট হয় নাই। তাহাতে বুঝা বাইতেছে, সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদির অঙ্গীকার না করিলে পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদকে আকস্মিক সৃষ্টিবাদ অথবা অঙ্গকারণবাদ বলিতে হয়। মনুষ্য-সম্পন্ন পাশ্চাত্য যুগল অভিযুক্ত অর্থাৎ মূলরূপে প্রকৃতিত জীবজগতের সাম্য ও বৈবচন্য লইয়া বাতুল ব্যত, মূলকারণ অঙ্গসন্ধানে তাৎপর্য তৎপর নহেন।

সৃষ্টিবাদী ও ক্রমাভিব্যক্তিবাদী উত্তরদ্বয়ই এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন—পৃথিবীতে সর্বজাতীয় জীবের যুগপৎ আবির্ভাব হয় নাই। কারণ ভূতত্ত্ববিদগণের অব্যর্থ প্রমাণে এ বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে উত্তর পক্ষই জীবজগতের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে বলিতেছেন,—এক জাতীয় জীবের সহিত অন্য জাতীয় জীবের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য থাকিলেও—সেই জাতীয় জীব সাক্ষাৎসম্পর্কে অস্ত্রের বংশোদ্ভব নহে। বানর হইতে মনুষ্যের বা মৎস্য হইতে সরীসৃপের সাক্ষাৎ জন্ম হয় না। তবে স্তম্ভপায়ীজীববর্ণ মনুষ্য-জাতির পূর্ববংশ হইতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া পূর্বপুরুষ নহে।

ডারবিন ও হেল্মহোল্জ (Helmholtz) প্রকৃতি ক্রম-বিকাশবাদিরা বলেন যে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ঈশ্বরসংকল্প বা চৈতন্ত্যের অপেক্ষা করে না, অচেতন প্রকৃতির অঙ্গ নিয়মে অকস্মাৎ ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টিবাদিরা বলেন, প্রত্যেক পত্রের বৃন্ত খলনেও যখন বিধাতার নিয়মের ব্যতিচার দৃষ্ট হয় না, তখন চৈতন্ত্যের অনির্দিষ্ট অচেতন দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি হইতে পারে না। প্রকৃতির কোন একটা অনির্দিষ্ট নীতি শক্তিমত্তা স্বীকার না করিলে প্রকৃতির অসিদ্ধ হইয়া উঠে। চৈতন্ত্যনিরপেক্ষ নৈসর্গিক নিয়মের অঙ্গ চেষ্টা বা ক্রিয়া দ্বারা জীবের শরীর-যন্ত্র-সমূহের বথাবোগ্য সংবিধান হইতে পারে না। পণ্ডিত বীল (Béale) বর্ষাধী বলিয়াছেন যে, ডারবিন বা হেল্মহোল্জ সহস্র চেষ্টা করিয়াও মনুষ্যের আত্মাংগতি বিষয়ক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

জীবজাতির মধ্যে নির্দিষ্ট পৈতৃকতা (hereditary varieties.)

সম্মানে পিতামাতার গুণাবলী কি পরিমাণে বিভবমান থাকে, তাহা নির্ণয় করা মানবতত্ত্ব-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পূর্বপুরুষের গুণাবলী—সম্মানে সংক্রামিত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত তিথ্যগ্ জাতির মধ্যে বিরল নহে। কতকগুলি পিতৃবর্ষ শারীরিক, কতকগুলি কিয়ৎ পরিমাণে মানসিক। উল্লেখ্য, জাতিবিভাগের ১ম ধর্ম্ব বর্ষের বর্ণঃ—

জাতি চিত্রের মধ্যে বর্ণের বিশেষত্ব প্রথমে দেখা যায়। প্রাচীন মিশরের তিন তিন জাতির যে সুরঞ্জিত চিত্রপট আছে, বহু সহস্র বৎসরেও কোনজাতির তদপেক্ষা বর্ণের বিভিন্নতা অধিক হয় নাই। সন্ধ্যাপেক্ষা সূর্য্য সূর্য্যোদয়বাসি-গণ হইতে হটেট্ট পর্য্যন্ত, কিম্বা পাটল বর্ণ মোরিকোবাসী হইতে পশ্চিম আফ্রিকার মসীকবর্ণ কাকি পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণের জাতিবিভাগের বর্ণবৈচিত্র্য ব্রোকার (Broca) জাতিচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতির বর্ণবৈচিত্র্য সুন্দর রূপে পরীক্ষা করা যায়।

২য়, কেশের গঠন—কেশের বর্ণ অপেক্ষা গঠনপ্রণালী ও সজ্জা অনেকস্থলে জাতির বিভিন্নতা নির্দেশ করে। অহ-বাক্ষণ যথেষ্ট কেশের কতিতাংশ পরীক্ষা করিলে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩য়, অবয়ব ও অঙ্গসৌষ্ঠব—গঠনপ্রণালী ও অঙ্গসৌষ্ঠব জাতি চিত্রের একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু অবয়বসংস্থান-বিষয়ে কোন সার্বভৌমিক নিয়ম নাই।

৪র্থ, কপালের আকৃতি বা মস্তকের গঠন জাতিবিভাগের ৪র্থ অঙ্গ। বর্ণ-বৈচিত্র্যের নিয়মেই কপালগঠনকে স্থান দেওয়া উচিত। কপাল-গঠনের সূক্ষ্মতত্ত্ব-নির্ধারণে বহুসংখ্যক শারীর-তত্ত্বজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্লুমেনবাক্ (Blumenbach), রেজিয়াস্ (Regius), ভনবেয়ার (Von Bear), ওয়েলকার (Welkar), ডেভিস্ (Davis), ব্রোকা (Broca), বাস্ (Busk), লুকে (Lucæ), প্রকৃতি মনীষিগণের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এবস্ত্র-কারে অষ্ট্রেলিয়াবাসিগণের ও নিগ্রোদিগের সূচ্যগ্র-চিবুকাংশি যুগোপীয়দিগের চিবুক অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। কপাল-বিৎ পণ্ডিতেরা কপাল-গঠনের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচ্য হিন্দুশাস্ত্রেও কপালগঠনের তারতম্য-নির্ধারণের ৫২ প্রকার উপায় নির্দিষ্ট আছে।

৫ম, মুখাকৃতি—মনুষ্যের সমস্ত শরীর বিচ্ছিন্ন করিলেও একমাত্র মুখাবয়ব দেখিয়াই জাতিবিচার করিতে পারা যায়। মুখাকৃতির সাধারণ ও বৈখণ্ড্য দর্শন করিয়া মনুষ্যের

জাতিনির্মাণ সহজেই হইতে পারে। অন্তর্গত আদিকার গঠন ও চিত্রকের সংস্থান, ওষ্ঠাধরের আকৃতি, এবং নরনের গঠনই বিশেষভাবে মনোহর। মুখের পাখিকাই জাতীয় চিত্রে প্রদান উপাদান।

৬ষ্ঠ, খাড়াবৈচিত্র্য বা প্রকৃতি—(Constitution) এবং চরিত্র।—মল্লযাজীবনের দৈনন্দিন জীবন-বৃত্ত জলবায়ুর প্রভাবে এবং দেশের প্রভাবে অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। দেশভেদে শারীর-সামর্থ্যেরও ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। কোন কোন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া বাইতেছে, আবার কোন কোন জাতি বিপুল বংশবিস্তারে পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া কেলিতেছে। দেশের প্রকৃতি বা নৈ-মণ্ডিক নিয়মের সহিত তদ্বিশেষ জাতির সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি না থাকিলে সে সমস্ত জাতি অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এইরূপে পৃথিবীর অনেক অতীতজাতি বিরলপ্রায় হইয়াছে। কোন জাতি উদ্ভমশীল, কোন জাতি ক্রোধপ্রবণ, কোন জাতি লজ্জাশীল, কোন জাতি সমাজপ্রিয়, কোন জাতি নির্জ্ঞানতা-প্রিয়, ইত্যাদি জাতীয়বৈচিত্র্য জাতিবিশেষের তারতম্য নির্ধারণের পক্ষে উপায়-নির্দেশক। এতদ্ভিন্ন জাতীয় চরিত্রের অনেক চিহ্ন অবলম্বন করিয়া জাতি নিরূপিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংঘর্ষ অনেক সময়ে বিজিত জাতিদ্বয়ের নানা অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

জাতিবিভাগের সাধারণ নিয়ম।

সকল জাতিরই কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। তদুপরি তাহাদ্বয়ের আবাসভেদে নির্ণয় করতে পারা যায় আকৃতি বা প্রকৃতিগত বৈষম্যই জাতি-নির্ণয়ের মূলমন্ত্র।

কুইটেলেট (Quetelet) সাহেব জীবজাতির সংজ্ঞানির্দেশ করতে যাইয়া অনেকটা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক জাতির মধ্যে একটা গড় উচ্চতা নিরূপণ করিয়া তাহাকেই সেই জাতির উচ্চতার আদর্শ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অল্প কোন বিশেষ গুণ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ আকৃতি, বর্ণ, তার প্রভৃতিরও গড় ধারিয়া আদর্শ স্থির করিয়াছেন।

জাতির সঙ্করতা।

বিভিন্ন জাতির পরস্পর সংমিশ্রণে যে কত প্রকার নতুন জাতির উৎপত্তি হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। দুইটা বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে যে কত প্রকার বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়, হাক্সল সাহেব তাহা নিরূপণ করতে স্বেচ্ছা আশঙ্কিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, হট্টেট্ট জাতি মূল-জাতি নহে।

বুশ্মেন (Bushmen) এবং নিগ্রো জাতির মিশ্রণে এই নতুন-জাতি এবং দক্ষিণ ইউরোপবাসী মিশ্রবর্ণের (ধবল ও কৃষ্ণ বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণ) লোক সকল ভূবারম্বল উত্তর-ইউরোপবাসী ও দক্ষিণএসিয়াখণ্ডবাসী-জাতিগণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

কি প্রকার মূল-জাতি হইতে বহুবিধ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা মানবতত্ত্ব-শাস্ত্রের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এসময়ে বড় বড় মানব-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর বাদামূল্যবাদ চলিতেছে। ইহাদের মধ্যে দুইটা সম্প্রদায় আছে, কেহ কেহ একজাতি-বাদী এবং অপর পক্ষ বহুজাতিবাদী। প্রথমপক্ষ বলিতেছেন, একমাত্র মানবদম্পতী হইতে এই বিশাল মানববংশের সৃষ্টি হইয়াছে। অপর পক্ষ বলিতেছেন যে, বিভিন্ন মানবদম্পতী হইতে এই বিশাল মানববংশের উৎপত্তি হইয়াছে। ষ্টু-ধর্মাবলম্বী লোকগণ শেষে কেহ কেহ বাইবেলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকগণ বাইবেল-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে কল্পনার কমনীয় কক্ষে বিশ্রাম করিতে দিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে অরিস্টটল প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের জাতি-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা ছিল,—একমাত্র মানবদম্পতী হইতে যাবতীয় জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। একের সহিত অত্রের বৈষম্যের কারণ—প্রাকৃতিক পরিবর্তন। দেশ-ভেদে ও জলবায়ুর বৈচিত্র্যেই জাতিবৈচিত্র্য সংঘটিত হইয়াছে। ইপিওপিয়-বাসিগণ সমগ্রভূমির প্রথম স্থা-কিরণে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং মেরুসন্নিহিত দেশবাসিগণ শীতা-ধিক্যে ও স্থায়ের মুহূর্ত্তে ক্রিয়ণে শ্বেতবর্ণ হয়। কোণাও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। বর্তমানকালের প্রসিদ্ধ জাতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কোয়ার্টেলেট (M. de Quetelet) একজাতিবাদের স্বপক্ষে বহুবিধ অল্পকূল-যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বাসস্থান ও জলবায়ুর প্রভাবে যে জাতীয় ভাবের পরিবর্তন হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পার্শ্বত্যা-জাতি ও সমতলক্ষেত্রের অধিবাসিগণের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে এবিষয়ের সত্যতা নিরূপিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিকগণ বহুজাতিবাদের স্বপক্ষে অনেক বাদামূল্যবাদ করিতেছেন। কেহ কেহ অভি-ব্যক্তিবাদের সাহায্যে জাতিবৈচিত্র্যের কারণ দেখাইতেছেন। ডার্বিন বলিয়াছেন যে, একজাতীয় মনুষ্যের সহিত অল্প জাতীয় মনুষ্যের বিস্তার বহুবৈষম্য ও পরস্পর শারীর বস্তুর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ওয়ালেস (A. R. Wallace) সাহেব

অভিযাত্রির দৃষ্টিভঙ্গির উপরে একজাতিবাদের যুক্তি সং-  
স্থাপিত করিয়া বলিতেছেন,—অতি প্রাচীনতম কালে এক  
জাতি হটেই বিবিধ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যে যুগে  
নিম্নো জাতির পিতা শ্বেতকারদিগের পিতার সহোদর ছিলেন,  
তৎকালে তাঁহার প্রাকৃতিক বিপ্লবের সহিত সংগ্রাম করিতে  
লক্ষ্য হইত না। প্রকৃতির অভ্যুত্থান হইতে আশ্রয় লইয়া  
যা শক্তি তাঁহারিগের মধ্যে পরিস্ফুট ছিল না। সেইজন্য  
জলবায়ু ও বায়ু-শক্তি তাঁহারিগের উপরে অধিকতর প্রভাব  
বিস্তার করিয়াছিল। বর্তমানকালে মানব শিক্ষা ও সভ্য-  
তার উৎকর্ষ সংস্থাপন করিয়া প্রকৃতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা  
জয়লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতির শক্তি  
মহুযের পরিবর্তন ঘটাইতে তত কাণ্ডকারিণী নহে। এই  
হেতু শ্বেতকার মহুয বহুতর বৎসর নিম্নো কিংবা হটেট্ট-  
দিগের জন্মভূমিতে বাস করিলেও তাহারিগের সাজাত্য  
প্রাপ্ত হয় না। যে যুগে উল্লঙ্গ মহুয নৈদাঘ রৌদ্রের প্রথর  
উত্তাপে আতপত্রহীন হইয়া অরণ্যে দিগ্‌বিদিক্ হারায়ে  
ঘুরিয়া বেড়াইত—বর্ষার মূলধার মস্তকের উপর দিয়া  
চলিয়া যাইত—তৎকালেই সেই নীতাতপক্লিষ্ট মহুয-জাতির  
উপরেই প্রকৃতি প্রভূর বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন  
মহুয সভ্যতার প্রাথমিক যুগে আশ্রয় লইয়া শিক্ষা  
করিল, পশু-চর্মে ও বৃক্ষকে শরীর আচ্ছাদন করিল,—পৰ্ণ-  
কুটার নির্মাণ করিয়া সমাজশৃঙ্খলার স্বরূপ লাভ করিল, তখন  
হইতে প্রকৃতির আধিপত্য কমিতে লাগিল।

বর্তমানযুগে শিক্ষাপ্রভাবে যে সভ্যতাগমিত মানবজাতি  
৫০০০ চণ্ডাল চাকলা দূর করিয়া অক্ষয়ব্রহ্ম নক্ষত্রসংস্পর্শে  
তাঁহাকে বাজীমঙ্গলনে নিযুক্ত করিয়াছে এবং তাঁহারই রূপ-  
প্রভার রাজপথ ও সৌধমালা আলোকিত করিতেছে—ইঙ্গের  
অবস্থা অশনি-সম্পাত যে মানবের পক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট, সেই সভ্য  
মানবজাতির প্রতি প্রকৃতিদেবী আর কি অস্ত্র নিক্ষেপ করি-  
বেন? অচিরেই যে তাঁহার রহস্যময় দুর্গ মহুয অধিকার করিবে,  
তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি! সুতরাং ওয়ালেস্ সাহেব যথার্থই  
বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি বাহ্য করিবার তাঁহাই করিয়াছেন—  
আর তাঁহার প্রভূর খাতিবে না, এখন মহুয প্রকৃতির সহিত  
সংগ্রামে সমর্থ। ওয়ালেসের যুক্তিপূর্ণসম্প্রদায় একজাতিবাদকে  
দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছে।

মহুযের প্রভুত্ব।

কিছুকাল পূর্বে শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস ছিল যে, মহুয-  
জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। কারণ  
ইংলণ্ডের প্রধান বিশপ আশার (Usher) গণনা করিয়া দেখিয়া-

ছিলেন যে, ৪০০৪ খৃঃ পূঃ অব্দে পৃথিবী ও মহুয যুগশব্দে  
হইয়াছে। সর্বসাধারণের ইহাই বিশ্বাস ছিল। বাহ্য হুউক,  
সে সব বিশ্বাস এখন কল্পনাকক্ষে বিশ্রাম করিতেছে। কু-  
ত্বের প্রামাণিক সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিকগণ এক বাক্যে বলিতে-  
ছেন,—পৃথিবীর সৃষ্টি যে কত কোটি বৎসর পূর্বে হইয়াছে—  
তাঁহা গণনার অনধিগম্য। পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ মহুযশব্দ  
বয়স গণনা করিয়াও তাঁহার বয়সের “গাছ পাতর” পান  
নাই। তবে ভয়ে অসুস্থমানের আশ্রয় লইয়া তাঁহার বলিতেছেন,  
মহুযজাতির বয়স একলক্ষ বিশশত সহস্র বৎসরের অধিক।

প্রভুত্ববিৎ পণ্ডিতগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রভুত্ব অস্ব-  
স্বন্দান করিয়া এ বিষয়ের মৌলিকত্ব নির্দেশ করিয়াছেন।

গত শতাব্দীতে ভূতত্ত্ববিদ্যার উন্নতি দ্বারা মহুযের  
ইতিহাস অনেকাংশে পরিষ্কৃত হইয়াছে। ভূতত্ত্বের যে অংশে  
প্রস্তরীভূত হস্তী, গজ, হায়েনা, ভল্লুক প্রভৃতি জীবের  
কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সেই অংশেই মহুযের অস্তিত্ব, মহুয-  
কঙ্কাল, মহুযানির্মিত প্রস্তরাদির অস্তিত্ব ও অব্যবস্থিত পরিদৃষ্ট  
হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয়, যে সমস্ত শুভপাণি-  
জীব ধরণীর পৃষ্ঠে হইতে অদৃষ্ট হইয়াছে, মহুয তাঁহারিগের  
সমকালে বিদ্যমান ছিল। ডাক্তার স্মারলিং (Dr. Schmer-  
ling) বলেন,—যে সমস্ত গুহাভল্লুক (Cave-bear) অতি পূর্ব  
কালে পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিত, তাঁহাদের কঙ্কালের নিকটেই  
মহুযকঙ্কাল বিদ্যমান রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ  
বুচার (Boucher de Perthes), রিগলোঁ (Rigollot)  
ফকনার (Falconer), প্রেটউইচ্ এবং ইভান্স প্রভৃতি  
সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ব পণ্ডিতগণ ১৮৫০ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের  
মধ্যে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, ডাক্তার  
স্মারলিংএর বাক্য যথার্থ ও পরীক্ষাসিদ্ধ। তাঁহারিগের  
দেখাইলেন যে, মহুয Quaternary বা Drift যুগে  
প্রস্তরনির্মিত কুঠার ব্যবহার করিত। অতিকায় হস্তি-  
জাতির কঙ্কাল-পার্শ্বে মহুযের তদানীন্তন প্রস্তরনির্মিত  
বিদ্যমান রহিয়াছে। মিঃ গডউইন অষ্টিন (Mr. Godwin Austin)  
বহু পরীক্ষা দ্বারা উহা প্রমাণিত করিতে গিয়া বলিয়াছেন,  
‘যখন প্রস্তরীভূত ভিন্ন ভিন্ন প্রাথমিক জীবের কঙ্কাল ভূতত্ত্বের  
নিম্নে অবিকৃতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই মহু-  
যেরও প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া যাইবে।’ তৎপরে ইংলণ্ডের  
অন্তর্গত কেট-প্রদেশের শুভা এবং মধ্য-ফ্রান্সের কোন কোন  
স্থান খনন করিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা দেখিলেন যে, বন্য-  
জীবের কঙ্কালের পরেই সামান্যজাতীয় হস্তীর কঙ্কাল বিদ্যমান  
আছে। ঐ সময়ের মহুযগণ এসকুইমো জাতির অস্বরূপ

আচারব্যবহারসম্পন্ন ছিল। হস্তিদন্তে খোদিত বিভিন্ন চিত্রের আদর্শ অনেক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বুঝা যায় যে, তদানীন্তন যুগেও মনুষ্য ভাষ্করবিজ্ঞার রসাবাদনে সমর্থ হইরাছিল।

মনুষ্য সম্বন্ধে ইহার পূর্বে আর কোন তথ্য অবগত হওয়া যায় না। তবে ইহা নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত যে, যে যুগে অতিকার হস্তী দলে দলে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিত, বরাহরিণ ভূমার-নেত্রে ছুটিয়া বেড়াইত, সেই অকৃতম শৈলযুগেও মনুষ্য প্রস্তরাদ্বে সজ্জিত হইয়া যুগ্মা করিত, চিত্তবিনোদনের জন্য হস্তিদন্তে চিত্রের আদর্শ খোদিত করিত। এ বিষয়ে সার্ সি. লায়েল (Sir. C. Lyell's Antiquity of man) প্রণীত মনুষ্যের প্রত্নতত্ত্ব এবং সার্ জন লাবক্ (Sir John Lubbock's Prehistoric Times) প্রণীত প্রাগৈতিহাসিক কাল নামক পুস্তকদ্বয়ে সবিস্তার বর্ণনা আছে।

Quaternary যুগের মনুষ্যজাতির প্রত্নতত্ত্ব।

ইদানীন্তনকালে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ Quaternary যুগ পৃষ্ঠা মনুষ্যের ইতিহাস নির্ণয় করিয়াছেন। যে যুগে গণ্ড-শৈলদ্বারা ভূমারময়ী প্রবাহিণী সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ড ভাসাইয়া লইয়া দিগ্দিগন্তে প্রবাহিত হইত, তাহার পূর্বে আর ভূত্বরে মানবের পদচিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। সামান্যতঃ সে যুগের ইতিহাস দশ সহস্র বৎসরের পূর্বেও নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের আলোক সে যুগে প্রবেশ করিতে অক্ষম, কীণ অনুমানালোকে সেই প্রত্যেকের অনধিগত বিবরণ সমুদার নিরূপিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তিসময়ের মনুষ্য-ব্যবহৃত ভূগর্ভনিহিত দ্রব্যাদির অস্তিত্ব অধিকতর স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যায়। ইহার পরবর্ত্তী প্রাচীন শৈলযুগে (Palaeolithic) মনুষ্য প্রস্তরাদ্বে আদৌ লক্ষিত হয় না। তৎপরে নবশৈলযুগে (Neolithic) মনুষ্য এবং বিবিধ কারুকার্য্যসম্পন্ন প্রস্তরাদ্বে পরিলাক্ষিত হইয়াছে।

তাহার পরবর্ত্তিকাল অর্থাৎ প্রাথমিক লৌহযুগ (Bronze Iron Age) হইতেই যুরোপের ঐতিহাসিক কাল আরম্ভ হইয়াছে। মনুষ্যের প্রস্তরাদ্বে যে স্তরে বিদ্যমান, সেই Quaternary যুগের জীবদৈর্ঘ্যের মধ্যে অনেক স্তম্ভপায়ীজীবের প্রস্তর-ভূত কঙ্কাল দৃষ্ট হয়, তাহাদের অনেক জাতিই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সামথ বা অতিকার হস্তী, ঘনকেশবিশিষ্ট গজুর এবং আর্লওয়েলীয় এল্ক (Irish elk) আর পুণ্ড-বীতে নাই। কস্তুরীব (Musk-ox) এবং বরাহরিণ (Reindeer) প্রভৃতি কোন কোন জাতি অনেক দূরবর্ত্তী প্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, তৎকালে

আফ্রিকাদেশে অতি কঠোরতর জলবায়ু বিদ্যমান ছিল। প্রস্তর-রাজধানী মনুষ্য হইতে ঐতিহাসিকযুগের আরম্ভ পয্যন্ত যে কাল গত হইয়াছে, আফ্রিকার ইতিহাসের দুই সহস্র বৎসর, তাহার তুলনায় অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

এতদ্বির নদী সকলের পূর্বাংশে এবং উপত্যকা সকলের ভৌগোলিক সংস্থান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান নদীপৃষ্ঠ হইতে তাৎকালিক নদীপৃষ্ঠসমূহ ২০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চে অবস্থিত ছিল।

মনুষ্য-নির্মিত ইষ্টকাদির চিহ্ন।

মিঃ হর্নার (Mr. Horner) নীলনদের তীরবর্ত্তী ভূভাগ খনন করিয়া ৬০ ফিট নিম্নে ইষ্টকাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য যুগ্মপাতের তদ্ব্যবশ্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতে অনুমিত হয়, নীল-নদের পূর্বাংশে ৬০ ফিট মুক্তিকার নিম্নে প্রোথিত রহিয়াছে। সেই অতিপ্রাচীনকালেও তদ্রূপবাসী মনুষ্যেরা ইষ্টকাদির ব্যবহার অবগত ছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, বহু শতাব্দীতে ভূভাগে কএক ইঞ্চিমাত্র মুক্তিকা সঞ্চিত হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, নীলনদের তীর-ভূমিতে ৬০ ফিট মুক্তিকা-সঞ্চয় হইতে বহু শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে। অধ্যাপক মর্লো (Mr. Morlot) জেনিবা হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্তরাবলী পরীক্ষা করিয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ১৫০০ বৎসরে ভূমির উন্নতি ৪ ফিটের অধিক হয় না। গণনা করিলে দেখা যাইবে, যে কত প্রাচীনকালে-নীল-নদের তীরে মনুষ্যের প্রাথমিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল।

প্রত্যেক দেশের ভূ-স্তরাবলী পরীক্ষা করিলে তত্তৎ দেশের প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারা যায়। কলিকাতার গড়ের মাঠে একটা কুপ খনন-কালে ৩০০ ফিট মুক্তিকার নিম্ন হইতে মনুষ্য-ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং বড় বড় স্থলরী বৃক্ষের কাণ্ড সমূলে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে, আজি যেখানে সহস্র সহস্র বিচিত্র সৌধমালিনী চিত্র চমৎকারিণী পণ্যপরিপূর্ণা আপগম্যে সমলভ্যতা ভার-তের রাজধানী, সেই স্থানের ৩০০ ফিট নিম্নে পূর্বে কলিকাতার স্তরাবলী ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে। বঙ্গের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের নিকট আধুনিক হইলেও বহু সহস্র বৎসর পূর্বে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে।

ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব।

পূর্বে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ভূতত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু মনুষ্যের লিখিত ইতিহাসেও খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ একটিত হইয়াছে। মিসরের 'পিরামিড' বা পয়াম-দ-

তুপ-নিহিত বিবরণ হইতে তথাকার বাবতীর প্রাচীন তথ্য জানিতে পারা যায়।

প্রাচীন কালদীর রাজ্যের ইতিহাস এবং রলিন্সন (Rawlinson) সাহেবের লিখিত “প্রাচ্য অগস্তের প্রাচীন পঞ্চসাম্রাজ্য” নামক পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টের অগ্গের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে কালদীর এবং মিসর রাজ্যে জাতীয় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। সার্স জন ডেভিস (Sir John Davis) প্রণীত চীনদেশের বিবরণ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তপায় খৃষ্টের অগ্গের দুই সহস্র বৎসর পূর্বে তদেদীয় রাজবংশ সিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজদণ্ড পরিচালন করিতেন। ভারতবর্ষের জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ পয়ালোচনা করিয়া প্রতীচ্য বৃহ-মণ্ডলী সভরে এবং আশঙ্কিত কঠে বলিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের অন্ততঃ ৪৫৫ সহস্র বৎসর পূর্বে বেদ বিরচিত হইয়াছে। ভারত-বর্ষের ভূতরাবলী নিম্নমিতরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। কেবল প্রত্নতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেবা ক্রিয়ং পরিমাণে অনুমান করিতেছেন মাত্র। তথাপি ‘ভার-তীয় ভূত’ নামক পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। তাঁহারা বলিয়াছেন, বিদ্যা পরকৃত একটা অতি প্রাচীনতম অগ্নি-গিরি। যে দিন সজীব আগ্নেয়গিরি বিদ্যা অগ্নিহীন হইল, যে দিন বোবনের উদ্যম উচ্ছ্বলতার শান্তিরূপে ইন্দ্রকর্ষক বিদ্যার পক্ষ ছিল হইল, যে দিন নিস্তেজ এবং দুর্বলসম্ব বিদ্যাগিরি অগস্তের পদে চিরপ্রণত হইল, সে দিনের ইতিহাস বিংশতি-সহস্র বৎসরের পূর্বে অবস্থিত। ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত দাক্ষিণাত্যের শৈলধণ্ড পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, সে গুলি আগ্নেয়গিরি হইতে উৎক্লিষ্ট প্রস্তরধণ্ডমাত্র। সুতরাং কতকাল পূর্বে ভারতের পূর্বাংশে সভ্যতার প্রথম অরুণকিরণ দৃষ্ট হইয়াছিল, কে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবে?

ভাষা ও শিক্ষার প্রথম বিকাশ।

প্রতীচ্য বৃহমণ্ডলী বলিতেছেন,—প্রাচীন শৈলধণ্ড হইতেই মানবসমাজে সভ্যতার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন মিসর, বাবিলন ও চীনদেশের পুরাত্ত্ব পাঠ করিয়া তাঁহারা উক্ত সিদ্ধান্ত পরীক্ষিত ও সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত গণ পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা সমুদয় পরীক্ষা করিয়া বলি-তেছেন যে, হিব্রু সহিত আরবী ভাষার নৈকট্য অধিক,—ইহাতে অনুমান করা যায় যে, উক্ত ভাষাধর এক পিতার দুই সহোদর। কালধর্মে পিতৃভাষা অন্তর্হিত। সেই লুপ্ত ভাষাই সেমিতিক সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা ছিল। তাঁহারা ঐ প্রাচীন

ভাষার অধিকাংশ শব্দের সাদৃশ্য ও উচ্চারণগত সন্ধর্ভ নির্দেশ করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন যে, সমস্ত ভাষাগুলিই এক বিলুপ্ত সাধারণ পিতৃভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সকল হইতে মানবতত্ত্ব পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ইতিহাসের সীমাবদ্ধ বিবরণ ভাষাতত্ত্বের প্রথমকালে সংঘটিত হইয়াছে। তৎপূর্বে ইতিহাসের অনধিগম্যকালে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল,—ভূতসাক্ষী ইতিহাস তদ্বিষয়ে নিরুত্তর। [ কি প্রকারে পত্নপক্ষীর আকার হইতে সাত্তিক চিহ্ন অবলম্বন করিয়া ভাষার সৃষ্টি হইল তৎবিবরণ বাগ্‌বিজ্ঞান ও বণমালা শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

ভাষাবিজ্ঞান।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—অতি প্রাচীন কালে সকল জাতিরই বাক্যকথনপ্রণালী একরূপ ছিল। পরে দেশভেদে যখন জাতি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইল, তখন হইতেই উচ্চারণের বৈষম্য উপস্থিত হইয়া জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ ভাবে ভাষার বিভিন্নতা হইতে থাকিল। ব্যাকরণ এবং অভিধানাদির গঠনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক অভিনব বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হইতেই সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে।

মুকেরা যেমন সঙ্কেত দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, সেইরূপ মানবজাতি প্রথমাবস্থায় সঙ্কেত এবং বিভিন্ন চিহ্নদ্বারা অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিত। পরে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্কেত যে ভাষার প্রাথমিক সোপান, তাহা প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। মনের আবেগ, দুঃখ, বিষময়, এবং ক্রোধপ্রকাশক ভাষাগুলি সমস্ত জাতি-রই প্রায় একরূপ।

গত অর্দ্ধ শতাব্দীমাত্র ভাষাবিজ্ঞানের বা বাগ্‌বিজ্ঞানের (Philology) সৃষ্টি হইয়াছে। এই অল্প সময় মধ্যে উক্ত শাস্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাদির বংশপরম্পরা এবং উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি প্রভৃতি নির্ণয়ে অনেক কৃতকার্য হইয়াছে।

কোন কোন সম্প্রদায়ের ভাষাবিজ্ঞানবিদেরা বলিয়া থাকেন, সংস্কৃত কিংবা আরবী, চীন, কিংবা পেরুভিয়ান—কোন কালেই এক ভাষা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন নিরপেক্ষ-ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। উভয় মতের বিস্তার বাদানুবাদ চলিতেছে, অতাপি কোন মতেরই প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যায় নাই।

ভাষা ও সভ্যতা।

ভাষার প্রাধাত্রে জাতীয় চরিত্র কিরূপ ভাবে পরিবর্তিত

হয়, তাহা চিন্তাশীল মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়া গিয়াছেন। যে সমস্ত রাজনৈতিক কারণে জাতীয় চরিত্র পরিবর্তিত হয়,—তাহাই তাহার প্রধান মন্ত্র। কারণ ভাষাতেই জাতীয় চিন্তাশীল অস্থূহ্যত থাকে। তাহা অধ্যয়ন কালে সেই সমস্ত ভাবরাশি জাতীয় চরিত্রে প্রবেশ করিয়া বিশেষ পরিবর্তন সাধন করে। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। যখন ল্যাটিন ভাষা যুরোপখণ্ডে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তখন সমস্ত যুরোপ ইতালীয় ভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়াছিল। যখন এক জাতি অন্য জাতীয় ভাবে গ্রহণ করিতে থাকে, তখন তাহার সঙ্গেই ভাবপ্রকাশক বাক্যগুলিও যত্ন ভাষার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লয়। যখন পারসিক জাতির সৌভাগ্যময় মধ্যগগনে বিরাজমান ছিল—যখন তাহাদিগের বিজয়বৈজয়ন্তী হিন্দুস্থান হইতে আটলান্টিকের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল—তখন সমস্ত ভাষাই আদরের সহিত পারস্যভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার শৈশব-দেহে পারস্য ভাষার করলেখা বিরাজিত রহিয়াছে এবং জাতীয় চরিত্রে যে ধাবনিক ভাবের সংক্রমণ না হইয়াছে, তাহা কে বলিবে?

দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ী ভাষা সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সম্পত্তিতে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। এইজন্ত তামিল ভাষায় এক্ষণে সংস্কৃতের অনেক ভাব প্রবেশ করিয়াছে। বর্তমান কালে ইংরাজি ভাষার অশুশীলন-প্রাচুর্য্যাবে—ভাষায়, সমাজে, সাহিত্যে এবং জাতীয় চরিত্রে যে সমস্ত পান্চাত্য ভাব প্রবেশ করিয়াছে,—মানবতত্ত্ব চিন্তাশীল ব্যক্তির তাহা ভাবিবার বিষয়। কেবল ভারতে নহে, সমস্ত ইংরাজিকৃত স্থান হইতে এইরূপ বিজাতীয় ভাব ও ভাষার সংঘর্ষে বাঙ্গালী প্রভৃতি জাতির জাতীয় চরিত্রে যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে,—ভাষাশিক্ষাই তাহার মূল কারণ। আবার অশ্রদ্ধা প্রভৃতি সুশিক্ষিত পান্চাত্য জাতি সংস্কৃতালোচনে বহুপরিচর্য হইয়া জাতীয় অভিধানের মধ্যে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিতেছেন। কিয়ৎ পরিমাণে প্রাচীন ঋষিগণের উদ্ভাবিত চিন্তাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তাহারা দার্শনিক তত্ত্বাদিতে অনেকাংশে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছেন। তাহাদের ভবিষ্য চরিত্র কি ভাবে গঠিত হইবে, কে বলিবে? জ্ঞানের উজ্জ্বললোকে আর্ঘ্য ঋষি-প্রবর্তিত চিন্তামার্গ এবং হিন্দুদর্শনের অবলম্বিত পন্থাই যদি সভ্যতাগমিত পান্চাত্য জাতির নিষ্কট বথার্থ বলিয়া সিদ্ধ হয়—তবে প্রভীচ্য বিধৎ-সমাজ প্রাচ্য ভাবের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবেন না। ভাষাশিক্ষায় জাতীয় চরিত্রের যে কতদূর পরিবর্তন ঘটে,

বর্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালীর আচারব্যবহার পথ্যালোচনা করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সভ্যতার বিকাশ ও পরিপূর্ণতা।

অসভ্যাবস্থার মনুষ্য বেদিন প্রকৃতির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গিরিপঙ্কজে ও বৃক্ষকোউরে মথক রক্ষা করিত, সেই দিন হইতে সভ্যতালোকিত বংশ শতাব্দীর মনুষ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য পথ্যালোচনা করিলে বিশ্বাস-পূর্ববে নিম্ন হইতে হয়। ইংরাজ জাতির ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে এই বাক্যের গোবকতাও প্রমাণ করিতেছে। বাহারা দুই সহস্র বৎসর পূর্বে রোমের শৃঙ্খলাবদ্ধ দাস ছিল—আজ সেই জাতি সাগরাধরা বসুন্ধরার অধিকাংশ স্থানের রাজ-রাজেশ্বর। তাঁহাদিগের বিজয়বৈজয়ন্তী—অস্ত্রির তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে জলধির উন্নত কমল কোলাহলে—সমভাবে উড়িয়ায়মান। বাহাদিগের দেশে সূর্য্য ছয় মাসেও দেখা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন—আজি দিবাংকর তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্যে অস্ত গমন করেন না। তাঁহাদিগের ইতিহাস পাঠ করা ও সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করা একই কথা। বাহারা মন্তকের অবৈধবদ্ধ কেশপুচ্ছে ডুইডদিগের চরণরেণু মুছাইয়া দিত—আজি তাহাদের বংশধরগণ বিধাতাকেও সৃষ্টিকার্য্যে অক্ষম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ববান। তাহারা যেন তপস্বীলক আর্ঘ্য বলে বলীয়ান হইয়া অভিমান-বদ্ধ বিশ্বাসিত্রের ত্রায় জগতে নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত করিতে অগ্রসর। এই সমস্ত বিষয় পথ্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্যের সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস আছে এবং সেই সভ্যতার সোপানপরম্পরা বিবর্তের ও বিকাশের উন্নতিশীল মনাতন-নিয়মে পরিবর্তিত হইতেছে। যে মনুষ্য একদিন অশিক্ষিত ফলমূল রন্ধন করিতে জানিত না, যুগলশব্দ পশুমাংস অপক ভক্ষণ করিত—আজি যন্ত্রমধ্যস্ত তীক্ষ্ণ তৃতাশনের তীক্ষ্ণ উত্তাপে ভক্ষীভূত না হইতেছে—এমন পদার্থই মাই।

মানবতত্ত্ব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরপরীক্ষা করিয়া বিকাশ-পদ্ধতির কারণাবলী প্রদর্শন করে। ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে অতীতের দৃষ্টান্তাবলী ঘোষণা করিয়া বলিতেছে—জ্ঞানের বিস্তার ঘরাই সভ্যতার বিকাশ, অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন, অজাত-তত্ত্বের আবিষ্কার, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি এবং মানব জাতির সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। আর্চবিংশপ হোয়েটলী (Whately) 'সভ্যতার উৎপত্তি' (Origin of Civilisation) নামক গ্রন্থে এবং টাইলর (Tylor) 'মনুষ্যোতিহাস' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, যেমন এক জাতীয় মনুষ্য বিবর্তের উচ্চ অবস্থায়—উন্নতির সোপানে উঠিতেছে, অন্য জাতীয় মনুষ্য সেইরূপ অধঃপতনের



পিচ্ছিলপথে পড়িয়া যাইতেছে। জাতির উন্নতি ও অবনতি অনেকাংশে বিভিন্ন জাতির সহিত সংঘর্ষের ফল।

প্রায় সমস্ত দেশের পৌরাণিক গ্রন্থ ও ধর্মশাস্ত্র বলিতেছেন,—যে একমাত্র মানবদম্পতী হইতে এই পরিদৃষ্টমান বিরাট মনুষ্যসমাজ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই আদিম মনুষ্যদম্পতী বনে বনে যুগ্ম করিতেন, স্বহস্তে হলচালনা করিতেন। ইহা দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, মনুষ্য অভিব্যক্তিবাদের ক্রতপদক্রমে উন্নতির স্বীকৃতিতে আরোহণ করিয়াছে। কেবল হেসিয়ড্ (Hesiod) গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, সর্বপ্রথম জাত মনুষ্যদম্পতী সভ্যতার সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ে সত্য অথবা স্ববর্ণযুগ বিদ্যমান ছিল। হিন্দুশাস্ত্রের মানবতত্ত্ব এইরূপ সিদ্ধান্তে সংস্থাপিত।

বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, পশুপ্রায় একুইমো জাতি অভিব্যক্তির অনন্ত আবর্তেও সুসভ্য মনুষ্য হইতে পারে না। কিন্তু মিশর, গ্রীস, আসিরিয়া, বাবিলন, চীন প্রভৃতি দেশসমূহের ভূতরাবলীর আলোচনা করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, সর্বদেশেই এক সময়ে শৈলযুগ বিরাজমান ছিল। সেইকালেব মনুষ্যগণ প্রস্তরাল লইয়া যুগ্ম করিত। এই সমস্ত যুক্তিতে মানবতত্ত্ব অভিব্যক্তিবাদের সুদূর ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে।

যাহা হউক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধমণ্ডলী এখন এক বাক্যেই স্বীকার করিতেছেন যে, প্রাথমিক সভ্যতার ক্ষুদ্রাকুর হইতে আজি বিজ্ঞানের বিচিত্র বৈভবসম্পন্ন বহুবিস্তীর্ণ সভ্যতাপাদনের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবীতে জাতি বিশেষের অবনতি হইলেও সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সভ্যসমাজে আদিম রীতিনীতির অমুজীবিত।

টাইলার সাহেব ‘প্রাথমিক শিক্ষা’ নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্য এক্ষণে শিক্ষা ও সভ্যতার উচ্চোপাধানে অধিক্রুত হইলেও প্রাথমিক বস্ত্রসমাজের আচারব্যবহারের কতকগুলি সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ইংরাজ পাদ্রীর সামরিক চিহ্নবস্ত্রবেশ (Coat of Arm) ধারণ প্রাথমিক যুদ্ধপ্রধানযুগের পরিচয়স্থল। বর্তমান হিন্দুজাতি ইংরাজি সভ্যতায় সুসভ্য হইলেও যজ্ঞীয় পাবত্র অগ্নি উৎপাদনের জন্য দেশলাই ব্যবহার না করিয়া অরবিসংযোগে পবিত্রাগ্নি উৎপাদন করেন। ইংরাজেরা অতি সভ্য এবং বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলেও বাইবেলের কুসংস্কার ভুলিতে পারেন না, দেহজঙ্ঘ্র এখনও তাঁহাদের মধ্যে পরলোক-

গত আত্মীয়বর্গের প্রেতাশ্মার পরিতর্পণের জন্য অসভ্য শাস্তিদিগের অশ্রুক্ষেপে পিণ্ডতর্পণাদির (All Soul's Supper) ব্যবস্থা আছে। বাহুবিক্রা প্রভৃতিতেও অর্ধভ্য সমাজের সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহারা কোন কোন পশুপক্ষীর রবে ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব সূচনা মনে করে—তাঁহাদের ভিতরেও আদিম অবস্থার চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায়।

টাইলার সাহেবের সিদ্ধান্ত যে সর্ববাদিসম্মত, তাহা নহে। বিজ্ঞান মূর্খতার পরপারে যাইতে অক্ষম। রসায়ন বিশ্লেষণের অনন্ত পরীক্ষার চেষ্টনশক্তির উপাদানসংগ্রহে অক্ষম। সুতরাং অজ্ঞেয়তত্ত্বের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে টাইলারের বাক্য গ্রহণীয় নহে। হিন্দুজাতি যোগবলে সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়া ছিলেন, বর্তমানেও যোগবলের প্রভূত অমূল্যলন হইতেছে—তাহা যে কেবল বিজ্ঞানের গভীর রেখায় সীমাবদ্ধ তাহা কে বলিল?

অভিব্যক্তি ও সাধারণ বিভাগ।

সভ্যতার ইতিহাসের স্তরাবলী পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, সর্ব প্রথমে শৈলযুগ (Stone-Age) সর্বদেশেই বিদ্যমান ছিল। তখন মনুষ্যসমাজে ধাতুর ব্যবহারের নাম মাত্র ছিল না। পরে পিত্তল-যুগের (Bronze-Age) প্রাভূর্ত্য হয়। তৎপরে লৌহযুগ। কিন্তু কোন কোন দেশে শৈলযুগের পরেই লৌহ-যুগের আবির্ভাব। মনুষ্য লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়া ভূমি কর্ষণ করিল, অরণ্যে বৃক্ষ কর্তন করিল, গিরিগহ্বর ত্যাগ করিয়া পর্বশালায় বাস করিল, ক্রমে আপন সমাজের পরিপুষ্টি করিয়া লইল। দীরে দীরে শিল্প ও বাণিজ্যের অকুর উদ্ভূত হইল। ক্রমে ক্রমে শিক্ষার উৎকর্ষে মনুষ্য লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময় হইতে মনুষ্য-সমাজে পরিবর্তন-শ্রোত প্রবলবেগে বহিয়াছিল।

পুন্সোক্ত পরিবর্তন-শৃঙ্খল হৃদয়ভাবে পর্যালোচনা করাই মানবতত্ত্বের উদ্দেশ্য। বিংশ শতাব্দির সভ্যতার বিশাল ইতিহাসও মানবের ভাবী উন্নতির নোপান মাত্র। তিরভাবে অভিব্যক্তির স্তরাবলী পরীক্ষা করিলে প্রতীতি হইবে যে, উন্নতির বিরাম নাই। যে মনুষ্য একদিন ঘণ্টায় দুই ক্রোশ মাত্র ভ্রমণ করিয়া প্রাপ্ত হইত—আজি সেট মানব ঘণ্টায় অনায়াসে ৫০ ক্রোশ অতিক্রম করিতেছে। যাহার দৃষ্টি এক দিন হৃদয় আবরণের অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিত না, আজি সেট দৃষ্টি আলোকবিজ্ঞানের ধুমল-রশ্মির (X. Rays) সাহায্যে ছুঁড়িয়া কাঠপ্রাচীরের ভিতর দিয়া দেখিতে পাওঁতেছে, বহু যোজনান্তে অবস্থিত গ্রহনক্ষত্র প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিতেছে,—চন্দ্রক্লঃ মাংসের ভিতর দিয়া অস্থি সংস্থান অবলোকন করিতেছে। যে,



‘একদিন গ্রামান্তরে সংবাদ পাঠাইতে আকুল হইত, আশি সেই মানব পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুহূর্তে সংবাদ প্রেরণ করিতেছে এবং অনন্ত অন্তরীক্ষে ভ্রাম্যমাণ মঙ্গলবাদী জীবগণের সহিত সৎসংস্পর্শে অগ্রসর হইয়াছে। মনুষ্য যন্ত্রশক্তির উৎকর্ষ-সংস্থাপন করিয়া চক্ৰাঙ্গা সোদামিনীকে কিকরী করিয়া অভূতপূর্ব পরিবর্তনের স্বরূপাত করিয়াছে।

এই অনন্ত উন্নতির লক্ষ্যস্থল কোথায়? মানবতত্ত্ব তাহা বলিতে পারে। মানবতত্ত্ব মনুষ্যের ভূত লইয়া এত ব্যস্ত থাকিলেও ভবিষ্যৎ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, কত উন্নত এবং সুসভ্য প্রাচীন জাতি ধরা-পৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে—কত শত জাতির ভাগ্যাকাশ অমানিশীথিনীর হৃৎভেদে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, কত কত জাতি আশানের সমীপে নীত হইয়াছে, কিন্তু মানব জাতিরূপ বিরাট বিগ্রহের অবনতি নাই। উন্নতিই তাহার নিয়ম-বদ্ধ পদ্ধতি—অভিব্যক্তিই তাহার সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তিভূমি। কোথায় এবং কতদূর যাইয়া এই উন্নতির গতি ক্ষান্ত হইবে— তাহা কে বলিতে পারে। মনুষ্যের অতীত যেমন প্রহেলিকা-প্রচ্ছন্ন, ভবিষ্যৎ সেইরূপ অসুমানের অনধিগম্য। সৃষ্টিপ্রবাহ সাধি কি অনাদি, সান্ত কি অনন্ত, সে বিষয়ের মীমাংসা সম্বন্ধে সীমাবদ্ধজ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্য কখনই সমর্থ হইবে না।

মানবপতি (পুং) রাজা। (বৃহৎসং ১১৩)

মানবর্জক (পুং) জাতিবিশেষ।

মানবর্জিত (ত্রি) মানেন বর্জিতঃ। মানরহিত, মানহীন।

“তস্মাৎ ত্বং নর্তনঃ পার্থ ক্রীমধ্যে মানবর্জিতঃ।” (ভা০ ৩।৪৬ ৮)

২ নীচ। (ধরণি)

মানবর্জিত (পুং) প্রাচ্য জনপদবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫৭৪৩)

জৈন হরিবংশমতে এই স্থান মানভূমের অন্তর্গত। ২ তদেশ-বাদী লোক।

মানবলক (পুং) জাতিভেদ। ইহার পাঠান্তর মানবর্জক।

মানবাচল (পুং) পর্বতভেদ।

মানবাদ্য (ক্ৰী) সামভেদ।

মানবী (ক্ৰী) মানব ক্রীড়াং ভীপ্। মনুষ্য-ক্রীড়া, ক্রীড়াতি।

পর্যায়—মানুষী, মানুষী, নারী। (শব্দরত্নাং)

“দিবৌকসং কাময়তে ন মানবী নবীনমশ্রাবি তবাননাদিদং।”

(নৈষধ ৯৪২)

• ২ শাসন-দেবতাবিশেষ। (হেম) ৩ স্বায়ত্ত্ব মনুসম্রাট।

(ভাগ ৩।১৩৩)

মানবীয় (ত্রি) ১ মনুষ্যকীয়। (ক্ৰী) ১ দণ্ডভেদ।

মানবেন্দ্র (পুং) মানবানাং ইন্দ্রঃ। রাজা।

মানবেয় (পুং) মনুর গোত্রাপত্য।

মানবোত্তর (ক্ৰী) সামভেদ।

মানবৌষ (পুং) মানবানাং ওষঃ বস্মিন্। তারাবিষ্ঠা-পীঠের উত্তরে বায়ু হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত পূজ্য গুরু-পণ্ডিত বিশেষ। তন্ত্রমতে তারাদেবীর পূজনে মানবৌষ পূজনীয়। ভাস্কর্য্য, জয়ায়া, বিষ্ঠায়া, মহোদর্য্য, স্থা-নন্দনাথ, পরানন্দনাথ, পারিজাতানন্দনাথ, কুলেশ্বরানন্দনাথ, বিরূপাক্ষানন্দনাথ এবং ফেরব্যাস এই সকল দেবতা তারাদেবীর গুরুপণ্ডিত। ইহাদিগকে মানবৌষ কহে।\* মানবানাং ওষঃ। ২ মানবসমূহ। মনুষ্যসমূহ।

মানব্য (ক্ৰী) মানবানাং সমূহ ইতি (ব্রাহ্মণমাণব-বাড়বাদ্ যন্। পা ৪।২।৪২) ইতি যন্। ১ মানবসমূহ। পাণিনির ঐ শ্রে মুক্চন্ত মধ্যমানব শব্দের উত্তর যন্ হয়, কিন্তু কাহার কাহারও মতে দন্ত্য ‘ন’ মধ্য মানব শব্দের উত্তর যন্ হইয়া এইস্থলে মানব্য পদ হইয়াছে। মনোগোত্রাপত্যং (গোত্রাদিভ্যো ষঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি মনু-ষঞ্। (ত্রি) ২ মনুর গোত্রাপত্য, মনুবংশীয়।

মানব্যায়না (ক্ৰী) ১ বালকসমূহ। ২ যুবকসমিতি।

মানঃশিল (ত্রি) মনঃশিলাসম্বন্ধীয়।

মানস (ক্ৰী) মন এব মনস্ (প্রজাদিভ্যশ্চ। পা ৫।৪।৩৮)

ইতি স্বার্থে অণ্। ১ মনঃ। [হিহার বিশেষ বিবরণ মনস্ শব্দে দেখ]

মনপি ভবঃ জাতো বা মনস্-অণ্। (ত্রি) ২ মনোভব, সঙ্কল্প।

মানসকল—

“বিষয়েষ্যতি সংরাগো মানসো মল উচ্যতে।” (একাদশীতন্ত্র)

মন অতিশয় বিষয়াসক্ত হইলে তাকে মানস মল কহে।

মনে যাহা কিছু হয়, তাহারই নাম মানস। মন বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইলে চিত্ত মলিন হয়। এইজন্য উহাকে মানস-মল কহে। মুমুকু ব্যক্তির মানস মল পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

\* তারাবতাস্তামনুসম্রাটমজয়াধিবিদ্যামহোদর্য্যস্থানন্দনাথপরানন্দনাথ-পারিজাতানন্দনাথকুলেশ্বরানন্দনাথ-বিরূপাক্ষানন্দনাথফেরব্যাসঃ পূজয়েৎ। এতে মানবৌষাঃ। তথা চ তন্ত্রে—

“হরিনাথো মানবৌষান্ শৃণু বক্ষ্যামি তৎপুণ্ড্রম্।

তারাবতী ভাস্কর্য্য জয়াবিদ্যা মহোদরী।

স্থানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতঃ কুলেশ্বরঃ।

বিরূপাক্ষঃ ফেরব্য চ কথিতং তদ্রিগীকুলম্ ॥

আনন্দনাথশঙ্করা গুরবঃ সর্বসিদ্ধিধাঃ।

ত্রিগোহপি গুরুপাশে অঘাত্তাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥” (তন্ত্রসার তারাবতঃ)

মানস তাপ—

“কামক্রোধভয়দেবলোভমোহবিষাদঃ।

শোকাহুয়াভমানের্যা-মাংস্যাতিভয়ত্বা।

মানসোহপি বিজ্ঞেষ্ঠ তাপো ভবতি নৈকধা॥” (বিষ্ণুপুঃ৩৬৫)

কাম, ক্রোধ, ভয়, দেহ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অহুয়া, অপমান, ঈর্ষা ও মাংস্যা প্রভৃতি মানস তাপ। ‘মনোগ্রাহং সূখং হুঃখং’ সূখ বা হুঃখ এই দুইই মনোগ্রাহ, অর্থাৎ মনেই এই সকলের অনুভব হইয়া থাকে। কাম-ক্রোধাদি দ্বারা মনে হুঃখোৎপত্তি হয়, এইজন্ত উহাদিগকে মানস তাপ কহে। সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে “হুঃখঃ দেহা শারীরং মানসঞ্চ কামক্রোধাদিনিমিত্তং মানসং” (সাংখ্যতত্ত্বকৌঃ)

প্রথমতঃ হুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। তাহার মধ্যে আবার আধ্যাত্মিক হুঃখ দুই প্রকার, শারীর এবং মানস।

বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার বৈষম্য জন্ত শারীর এবং কাম-ক্রোধাদি নিবন্ধন মানস হুঃখ হইয়া থাকে। [ হুঃখ শব্দ দেখ ]  
ত্রিবিধ মানসকর্ম—

“পরদ্রব্যোষভিধানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।

বিতথাভিনিবেশচ্চ ত্রিবিধং কর্ম মানসম্॥” (তিথিতত্ত্ব)

পরদ্রব্যবিষয়ে অভিধান, মনঃ দ্বাণ অনিষ্টচিন্তা এবং মিথ্যাভিনিবেশ এই ত্রিবিধ মানস কর্ম। মানস রোগ “কাম-ক্রোধলোভ-মোহ-ভয়ভিমানদৈন্ত্র্যপৈশুণ্ড্যবিষাদেহায়ামাংস্যা-প্রভৃতয়ঃ, অথবা উন্মাদাপস্মারমূর্ছা লমতমঃ সংশ্রাস-প্রভৃতয়ঃ” (ভাবপ্রঃ)

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, দৈন্ত্র্য, পৈশুণ্য-বিষাদ, ঈর্ষা, অহুয়া, মাংস্যা প্রভৃতি মানস রোগ অথবা উন্মাদ, অপস্মার, মূর্ছা, লম, তমঃ ও সংশ্রাস প্রভৃতি রোগকে মানস রোগ কহে।

মনসা সঙ্কল্লেন কৃতমিত্যাণ্। ৩ সরোবরবিশেষ।

“কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নিশ্চিন্তং পরম্।

ব্রহ্মণা নরশাদূল তেনেদং মানসং সরঃ।” (রামাঃ ১১২৪)

কৈলাসপর্বতে ব্রহ্মা মনঃসঙ্কল দ্বারা যে সরোবরনির্মাণ করেন, তাহার নাম মানস সরোবর। [ মানসরোবর দেখ। ]

(পুং) ৪ নাগবিশেষ। (ভারত ১৫৭১৩৬) ৫ শাখালী দ্বীপের বর্ষাবিশেষ। (মৎস্যপুঃ ৫০২৭) ৬ পুষ্করদ্বীপস্থ পর্বতবিশেষ।

“দ্বাপার্কস্ত পরিক্রান্তঃ পশ্চিমে মানসো গিরিঃ” (মৎস্যপুঃ ৫৩অ)

৭ সহ্যাদ্রিগণিত জনৈক রাজা। (সহ্যঃ ৩৩৫০)

মানস, আসাম-প্রদেশে প্রবাহিত একটা নদী। ভোটানের গিরিমালার মধ্য হইতে উৎখিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে (অক্ষাঃ

২৬°১৫' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৯০°১৪' পূর্বে) গোয়ালপাড়া নগরের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদে আসিয়া মিশিয়াছে। গোয়ালপাড়ার অপর পারে অর্থাৎ নদীর পূর্বকূলে প্রসিদ্ধ কারুরাণ রাজ্য ও তীর্থ। যোগিনীতন্ত্রে এই নদীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

আই, বুড়িআই, গব্বর, কাণামাক্ড়া, দোলানী ও চাউল-খোয়া নামক কএকটা শাখা-নদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। সকল সময়েই এই নদীর বক্ষ দিয়া নোকাযোগে যাতায়াত করা যায়। সমতলক্ষেত্রে ইহার গতি নিয়তই পরিবর্তনশীল।

মানসচারিন্ (ত্রি) মানস-চর-গিনি। মানস-সরোবরে বিচরণকারী হংসভেদ।

মানসজপ (পুং) মানসেন কৃতো জপঃ। বুদ্ধি দ্বারা বর্ণমালায় উচ্চারণ। মনে মনে জপ। এইরূপ জপ অন্তর্বিধ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ অন্তর্জপে শুচি হইয়া জপ করিতে হয়, কিন্তু মানসজপে তাদৃশ কোন নিয়ম নাই। এই জপে বর্ণ, স্বর, পদাঙ্কিকা অক্ষর-শ্রেণী অর্থাৎ মন্ত্রস্বরূপ বর্ণসকল মনে মনে মন্ত্রার্থ সকল উপলব্ধি করিয়া যথাস্থরূপে বুদ্ধি দ্বারা উচ্চারণ করিয়া যে জপ করা হয়, তাহাকে মানসজপ কহে। এই জপ শয়ন, উপবেশন, গমন প্রভৃতি সকল সময়ই করা যাইতে পারে। [ জপ দেখ ]

“দ্বিগ্না যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাঙ্কিকাম্।

উচ্চরেদর্থমুদ্ভিশ্চ মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ। তজ্জপে নিয়মো নাস্ত্যেব, তথা চ—

অন্তর্চিবা শুচির্বাপি গচ্ছন্তিষ্ঠন্ত স্বপন্নপি।

মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সমভ্যাসেৎ।

ন দোষো মানসে জাপ্যে সর্বদেশেহপি সর্বদা॥” (তন্ত্রসার)

মানসতীর্থ (ক্ৰী) মানসং তীর্থমিব, রাগাত্তভাবাত্ত্যাহং।

রাগাদিরহিত মন, যে মন হইতে রাগ দ্বৈষ প্রভৃতি অসদ্গুণ অপনীত হইয়াছে, যে মনের সৎগুণ বৃদ্ধি হইয়া রজঃ এবং তমোগুণ অতিভূত হওয়ায় রাগদ্বৈষাদির উৎপত্তি হয় না, তাদৃশ মনই তীর্থ স্বরূপ, ইহাই মানসতীর্থ।

“তীর্থানি কথিতান্তেব ভৌমানি মুনিস্তম।

মানসানীহ তীর্থানি কলদানি বিশেষতঃ।

মনো নিয়ন্ততীর্থং হি রাগাদিভিরনাবিলম্বা” (নারসিংহপুঃ ৪৬অঃ)

তত্ত্বদর্শিগণ এই মানসতীর্থে সর্বদা অবগাহন করিয়া থাকেন।\*

\* “অগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতরে ধুতিভূমে।

স্নাতব্যাং মানসে তীর্থে সত্যমালম্ব্য শাশ্বতম্।

মনসা চ প্রলীপ্তেন ব্রহ্মজ্ঞানজলেন চ।

স্নাতি যো মানসে তীর্থে তৎ স্নানং তত্ত্বদর্শিনাম্॥” (ভারত শাস্তিপর্ব)

মানসজ্ঞ (স্রী) মানস-ভাবে স্ব। চিন্তাশীলতা, আধ্যাত্মিকতা।  
মানসনয়ন (স্রী) মানসমেব নয়নম্। ১ মনোরূপ চক্ষুঃ।  
২ জীবনকৃত্য ভায়গ্রহ।

মানসপূজা (স্রী) মানসকৃতা পূজা শাকপার্শ্ববৎ সমাসঃ।  
মবোরতিত ব্রব্যকরণক সপর্ধ্য। দেবপূজা দুই প্রকারে করিতে  
হয়, বাহ্য ও মানস। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প প্রভৃতি  
বাহ্যোপকরণ দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহাকে বাহ্য এবং অন্ত-  
র্যোপকরণ দ্বারা মনে মনে যে পূজা করা হয়, তাহাকে মানস-  
পূজা কহে। তন্ত্রসারে এই মানসপূজার বিষয় এইরূপ লিখিত  
আছে, যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, পূজক প্রথমে  
হৃদয়পদ্ম-মধ্যে সেই দেবতার মূর্তি ভাবনা করিবেন। পরে  
কুণ্ডলীপাশসংস্থ সহস্রধারামৃত দ্বারা পাদ্য, মনকে অর্ঘ্য,  
সহস্রদলপদ্মরূপ-ভ্রুঙ্গারহ জল দ্বারা আচমনীয়, প্রকৃতি, মহৎ,  
অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাত্ম্য এই  
পঞ্চ বিংশতিতত্ত্ব গন্ধ, অহিংসা, বিজ্ঞান, ক্ষমা, দয়া, অলোভ,  
অমোহ, অমাংসর্ঘ্য, অমায়ী, অনহঙ্কার, অরাগ, অদ্বेष, এবং  
ইন্দ্রিয় সকল এই দ্বাদশ পুষ্প, তেজোরূপ দীপ, বায়ুরূপ ধূপ,  
অম্বররূপ চামর, সূর্য্যরূপ দর্পণ, চন্দ্ররূপ ছত্র, পদ্মরূপা মেখলা,  
আনন্দরূপ উত্তম হার প্রভৃতি মনে মনে কল্পনা করিয়া প্রদান  
করিবেন। পূজার পর ঘণ্টাদি বাজ্য বাজাইতে হয়, এই মানস  
পূজাতেও অনাহত-ধ্বনিময়ী ঘণ্টা হইবে। এই সূধারসময়  
অনুধি, মাংসপর্কত, ও ব্রহ্মাণ্ডপূরিত পায়স উপচার স্বরূপ  
দিতে হইবে। এইরূপে কল্পনা করিয়া মনে মনে পূজা করিতে  
হয়, এইজন্ত ইহার নাম মানসপূজা। মানসপূজা ব্যতীত  
বাহ্যপূজা হয় না। (তন্ত্রসার ঐপুরা প্রকরণ)

মানস পূজা—“মুলাধারঃ কুলকুণ্ডলিনীং উখাপ্য হৃদয়া-  
দকমণ্ডলঃ নীচা সহস্রদলকমলাত্তর্গতচন্দ্রামৃতধারয়া মূলমন্ত্রঃ  
স্বরন্থ সিক্তেং।

“অর্চয়ন বিষয়ৈঃ পুষ্পৈস্তংক্ষণাত্মন্যো ভবেৎ।

ত্ৰাসত্ত্বময়তাসিক্তিঃ সোহহং-ভাবেন পূজয়েৎ ॥

তন্ময়েতি তদেকত্বজ্ঞানং সোহহমিতি—

মন্ত্রাঙ্করাণি চিচ্ছকৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ।

তামেব পরমবোদ্ধি পরমানন্দবৃংহিতে।

দর্শয়িত্বাঘ্নসম্ভাবঃ পূজাহোমাদিভিগ্নিনা ॥ বিষয়পুষ্পাণি যথা—

অমায়ীমহঙ্কারমরাগমমদস্তথা।

অমোহকমদন্তঞ্চ অনিন্দাকোভকৌ তথা ॥

অমাংসর্ঘ্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পঃ বিহবুধাঃ।

অহিংসা পরমঃ পুষ্পঃ পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

দয়াপুষ্পঃ ক্ষমাপুষ্পঃ জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্ ॥”

মানসপূজার প্রথমে কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে মুলাধার  
হইতে উখাপনপূর্ব্বক হৃদয়ের নিম্নে সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া  
যাইবে। পরে সহস্রদলকমলের অন্তর্গত চন্দ্র হইতে গলিত-  
অমৃতধারা দ্বারা মূলমন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক অভিষেক করিতে  
হইবে। অনন্তর বিবিধ বিষয়রূপ-কুসুমসমূহ দ্বারা অর্চনা-  
পূর্ব্বক তংক্ষণাতঃ তন্ময় হইয়া যাইবে। এখানে তন্ময়তা  
বুঝি ত্রাস এবং তন্ময়তার অর্থ একত্বজ্ঞান। এই পূজা  
সোহহংভাবেই করিতে হয়। সোহহংভাবে অর্থে কুল-  
কুণ্ডলিনী শক্তিতে মন্ত্রাঙ্কর সমুদায় গ্রথিত আছে, ঐ কুণ্ড-  
লিনী শক্তি পরমানন্দময়ী, পরমাকাশে অবস্থান করিতেছেন,  
তিনি সাধকের আত্মা হইতে অভিন্ন, এইরূপ ভাবনা করিতে  
হইবে। পূর্ব্ব উল্লিখিত হইয়াছে, বিষয়পুষ্প দ্বারা পূজা  
করিতে হইবে, বিষয়পুষ্প যথা—অমায়ী, অর্থাৎ মায়ার  
অভাব, অনহঙ্কার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদন্ত, অনিন্দা,  
অকোভ, অমাংসর্ঘ্য, অলোভ এই দশবিধ পুষ্প, ইহা ভিন্ন  
অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান এই পাঁচটি পরম-  
পুষ্প। এই পঞ্চদশ পুষ্প দ্বারাই মানসপূজা করিতে  
হইবে। (তন্ত্রসার)

পূজার সময়ে প্রথমে পুষ্প দ্বারা যে দেবতার পূজা করিতে  
হয়, সেই দেবতার ধ্যান করিয়া এইরূপে মানসপূজা করা বিশেষ।  
মানসপূজা শেষ হইলে পরে আবার ধ্যান করিয়া বাহ্যপূজা  
করিতে হয়। সকল পূজাতেই মানসপূজা আবশ্যক। গুরু-  
পূজা প্রভৃতিতেও মানসপূজা করিতে হয়। [পূজা দেখ।]

মানসরূজ্ (স্রী) মানসী রূক্। মনঃপীড়া।

মানসরোবর, হিমালয়ের উত্তরগাত্রে অবস্থিত একটি  
পুণ্ড্রোত্তর হ্রদ। অক্ষা° ৩০°৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৫৩' পূঃ।  
ইহা পুরাণবর্ণিত কৈলাস-পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বস্থ অজনা নামক  
পর্ব্বতের সন্নিহিত বৈহ্যত-পর্ব্বতের পাদদেশে বিরাজিত।  
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে, ইহা সিদ্ধসেবিত। ইহা  
হইতে সর্কলোক-পবিত্রকারিণী পূতসলিলা সরস্ব নদী  
উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার তীরে বৈভাজ নামক উপবন  
অবস্থিত। প্রহেতুতনয় ব্রহ্মপাতনামক রাক্ষস সানুচর  
এখানে বাস করে।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, সমুদ্র স্বর্গ হইতে মেরু-  
শৃঙ্গে নিপতিত হয়। তদনন্তর সেই জলধারা চারি বার উক্ত  
পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া চারিটি নদীরূপে পর্ব্বতপাদ-বিনিঃসৃত  
হইয়া হ্রদাকারে পরিণত হয়। এইরূপে যথাক্রমে পূর্ব্বধারা  
হইতে মানস, পশ্চিমধারা হইতে শীলোদ এবং উত্তরধারা  
হইতে মহাভদ্র হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই গৌরীগিকী

বিবরণী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কৈলাসপর্বতের পাদভূমি পুণ্যসলিলা নদী ও হৃদসমূহের প্রত্যেকক্ষেত্র ছিল, বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধ, শতদ্রু ও মান-পু (ত্রক্ষপুত্র নদ) এই স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া পশ্চিম ও পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। অনেকে গঙ্গা ও শতদ্রুর উৎপত্তিস্থান মানস হৃদ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন, কিন্তু বর্তমান অমুসন্ধান মানসরোবরের পার্শ্বস্থিত রাবণহৃদ হইতে শতদ্রুর উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শিবনিকेतন কৈলাসশৃঙ্গের পাদদেশস্থ মানস-সরের বিবরণ স্বল্পপ্রাণের হিমবংশেও (১৫ অঃ) বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

হিমবংশের মতে—

“সসর্জ মনসা রক্ষা মুদা যত্নে শেখরে।

ত্রিশদ্ব যোজনবিস্তারং তদেবাগ্রে চ বিস্তব” (১৫ অঃ)

ত্রক্ষা পরম যত্নে হিমালয় শিখরের অগ্রভাগে মন হইতে ৩০ যোজন বিস্তার (মানস হৃদ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ঋষিগণ এই স্থানের অতুলনীয় স্বভাব-শোভা সন্দর্শন করিয়া এই স্থানকে স্বর্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মানসবল, পঞ্জাবের কাশ্মীরবাজ্যে অবস্থিত একটি হৃদ। শ্রীনগর বাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪°১৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৮' পূঃ। ইহা লম্বে ৩ ও প্রস্থে প্রায় ১ মাইল হইবে। প্রকৃতির নিষ্কলক্ষে থাকিয়া এই স্থান নানা মৌল্যবায়ু দৃষ্টে বিভূষিত রহিয়াছে। দিল্লীর প্রসিদ্ধ মোগল-সম্রাজ্ঞী নূরজহান ইহার তাঁরে একটি প্রাদাদ নির্মাণ করান। এখনও সেই ভগ্নপ্রাদাদের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এই হৃদের জলরাশি একটা খাত বহিয়া ঝেলাম নদীতে আসিয়া পতিত হইতেছে।

মানসবেগ (পুঃ) ১ মনের বেগ, চিন্তা। ২ জনৈক রাজা।

মানসব্রত (ক্ৰী) মানসকৃতঃ ব্রতম্ শাকপার্বিবৎ সমাসঃ। অহিংসাদি।

“অহিংসা মতামন্তেষং ব্রহ্মচর্যমককতা।

এতানি মানসাত্মাহুঃ তানি তু ধরাদরে” (বরাহপুঃ)

অহিংসা, মত্যা, অস্ত্রের, ব্রহ্মচর্য এবং অককতা (দন্তহীনতা)

এই সকল মানসব্রত।

মানসশুচ্ (ক্ৰী) মানসী শুক্। আন্তরিক পীড়া, মনঃপীড়া।

মানসসম্ভাপ (পুঃ) মানসস্ত সম্ভাপঃ। মনঃপীড়া।

মানসসম্রাসী, সম্রাসিতেদ। ইহার দশনামীর অন্তর্ভুক্ত।

যিনি মনে মনে সম্রাস অবলম্বন করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন এবং তদ্বিহীন অস্থানে প্রবৃত্ত হন, অথচ গৈরিক বস্ত্রাদি

সম্রাস-চিহ্ন ধারণ করেন না, তাহারাই মানসসম্রাসী নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

মানসা, কালিকাপুরাণবর্ণিত নদীভেদ। তৃণবিন্দু ঋষি এই নদীকে মানসসরোবর হইতে অবতারণা করেন। সমস্ত বৈশাখমাস এই নদীতে স্নান করিলে মানবের স্বর্গে গতি হয়। তাহার পর বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি ও মোক্ষ ঘটে। (কালিকাপুঃ ৭৮ অঃ),

মানসাক্ষ (ক্ৰী) গণিতবিশেষ। (Mental arithmetic)

মানসায়ন (পুঃ) মনসের গোত্রাপত্য।

মানসার (পুঃ) মালবরাজপুত্রভেদ (দশকুমারচঃ)

মানমালয় (পুঃ) মানসে আশ্রয়ো যন্ত। হংস। (রাজনিঃ)

মানসিংহ, কএকজন প্রাচীন সংস্কৃত গুরুকারের নাম। ১ আচার-বিবেকপ্রণেতা। ২ বুদ্ধাবনমজ্জরী-বচয়িতা। ৩ সাহিত্যসার-প্রণয়ন কর্তা।

মানসিংহ, গোয়ালিয়রের জনৈক রাজা। তিনি সম্রাট শাহ-জহানের অধীনে থাকিয়া চম্বারাজ পৃথীচাঁদের সহযোগে তারাগড়াপিপ জগৎসিংহকে পরাজিত করেন এবং তাহার অধিকৃত ভূগাদি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া দেন।

মানসিংহ, গোয়ালিয়রের অপর একজন রাজা। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দির শেষভাগে অথবা ১৬শ শতাব্দির প্রথমে তিনি রাজদ্রোহদমনে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মানসিংহ, গুজরাতে অস্তর্গত সালের ও মতের নামক পাকিস্তান-প্রদেশের জনৈক সামন্ত রাজা। গুজরাতে আমীরান-উ-সদা যে বিদ্রোহবলি সন্দীপিত করেন মালিক মক্বুল কব্বক বিদ্রোহদল পরাজিত হইবার পর, অবশিষ্ট সর্দারদিগকে প্রত ও বন্দী করিয়া ইনিই গুজরাতেব সেই বিদ্রোহবলি নিব্বাপিত করিয়াছিলেন।

মানসিংহ, গুজরাতে অস্তর্গত আলাবার পদেশের জনৈক সামন্তরাজ। ইনি সুলতান বাহাদুর শাহের বিরোধী হইয়া বিরামগাঁও, মণ্ডল ও পড়বান পতিত স্থান লুণ্ঠন এবং শিলাদার শাহ জীউকে নিহত করেন।

মানসিংহ, বোধপুরের রাঠোরবংশীয় জনৈক রাজা। যশোমন্ত সিংহের পুত্র ও উদয়সিংহের পৌত্র। তিনি মানপুরাবাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বংশধরগণ মানপুরা-বোধ নামে খ্যাত।

মানসিংহ, মোগল-সম্রাট অকবর শাহের বিখ্যাত সেনাপতি। কছবাহবংশীয় অধরাধিপ রাজা ভগবান্ দাসের পুত্র এবং রাজা বোহরিমলের পৌত্র। পিতার জীবিতাবস্থায় তিনি কুম্ভার মানসিংহ নামেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পর সম্রাট অকবর তাহাকে রাজা উপাধিতে অলঙ্কৃত করেন। দিল্লীর তাহার বলদীর্ঘ্যে পরিতুষ্ট হইয়া,

তাহাকে সুবা বাঙ্গালার শাসনকর্তৃপদে সম্মানিত করেন। সম্রাট অকবর তাহাকে এতাদৃশ ভাল বাসিতেন যে, তিনি স্বেচ্ছক স্বরাজ্য (পুত্র) উপাধিতে তাহাকে সম্বোধন করিতেন। দিল্লীদরবারে তিনি 'মীরজা রাজা' নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন।

অধ্বরাজধানীতে তাহার জন্ম হয়। কর্ণেল টড সাহেবের মতে, তিনি ভগবান্দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগৎসিংহের পুত্র। ভগবান্দ তাহাকে দত্তক গইয়া পুত্রবৎ স্নেহে প্রতিপালন করেন এবং পরিশেষে তাহাকে স্বীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। মুসলমান-ইতিহাসে তাহার এই পুত্রত্ব সথ্যকে কোনরূপ বিভিন্ন মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে দত্তক ও ঔরসজাত পুত্রের অধিকারিত্ব সথ্যকে বিশেষ কোন প্রভেদ না থাকায় আমরা মানসিংহকে ভগবান্দাসের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

বীর ও উন্নতচেতা ভগবানের যত্নে লালিত হইয়া মানসিংহ বশোচিত বীরব্রত অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাল্যাবস্থা হইতেই যুদ্ধবিজ্ঞাদি উচ্চশিক্ষায় তিনি পূর্ণকাম হইয়াছিলেন। সেই প্রতিভাবলে অতি অল্পবয়সেই তিনি মোগলরাজসভায় উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের সহকারীরূপে এককটি গুরুতর কার্য সম্পন্ন করিয়া সম্রাটের বিশেষ শ্রীতিভাজন হন। তিনি নিজ ভুজবলে খোতেন হইতে সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া সাধারণের সুখ্যাতি লাভ করেন। বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, আগাম ও কাবুল অধিকারপুঙ্ক মোগলসাম্রাজ্যবিস্তার তাহারই ভাগ্যকালে ঘটিয়াছিল। ভাগ্যলক্ষ্য প্রসন্নতায় তাহার অদৃষ্টে ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও কাবুলের শাসনকর্তৃত্ব লাভ ঘটে। কিরিত্তা লিপিয়াছেন যে, মানসিংহ যে সময়ে কুমার উপাধিদারী ছিলেন, সেই সময়ে তিনি বিহার, হাজীপুর এবং পাটনায় শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।

সম্রাট অকবর শাহ তাহার রাজত্বের ৬ষ্ঠ বৎসরে (১৬১১ হিঃ), মুইন্-ই-চিত্তির সমাধিমন্দির-সন্দেশনাথ আজমীঢ়ে আগমন করেন। বেহারীমল্ল সপরিবারে শঙ্কানীরে আসিয়া সম্রাটের সহিত দাক্ষিণ্যপুঙ্ক তাহার সঞ্চর্জন করিলেন। রাজকক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া সম্রাট তাহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সম্রাটের অমুরোধে বেহারীমল্ল স্বীয় কস্তা মোগলরাজকরে সমর্পণ করেন। অতঃপর পুত্র ভগবান্দ ও পৌত্র কুমার মানসিংহকে সঙ্গে লইয়া রাজা বেহারী মল্ল রতননগরে 'সম্রাটসকাশে' উপনীত হন। তদনন্তর

তাঁহার তিন জনেই আগ্রা-রাজধানী অভিমুখে সম্রাটের অমুগমন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সম্রাটের সহিত পরিচিত হইয়া, মানসিংহও পিতৃপিতামহের ভ্রাতৃ সেনানায়কের কর্ণে ব্রতী হন। তবৎ-ই-অকবরী পাঠে জামা যায় যে, সম্রাট ১৮৪ হিজিরায়, সুদক্ষ সেনাপতি কুমার মানসিংহকে রাণা কীকার (কমলমেরু-পতি) বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মীরবন্দী আসফ খাঁ তাহার সহকারী ছিলেন। গোণ্ডগায় উভয়পক্ষীয় রাজপুত-সেনাদলে ঘোর যুদ্ধ হয়। সমুখযুদ্ধে রাণা কীকা শত্রু কর্তৃক আহত হইয়া, রণভূমি পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করেন। যুদ্ধের পর মানসিংহ হলদেও-(হলদীঘাট) সঙ্কট অতিক্রমপুঙ্ক গোণ্ডগা-রাজপ্রাসাদে উপনীত হন। রাণার পরিত্যক্ত প্রাসাদে থাকিয়া তিনি সম্রাটকে যুদ্ধবাস্তা জ্ঞাপন করেন। গোয়ালিয়রের রাজা রামশাহ এই যুদ্ধে সপুত্রে নিহত হন। এই বিজয়বাস্তা শুনিয়া সম্রাট কুমারকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। আইন-ই-অকবরীতে প্রকাশ, তিনি বিজয়কার্য সমাধা করিতে পারেন নাই বলিয়া সম্রাট তাহাকে লালিত করিয়াছিলেন। [প্রতাপসিংহ দেখ]

সম্রাট অকবর শাহের রাজত্বের ২৩শ বর্ষে ভগবান্দ দাস পঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। ঐ সময়ে মানসিংহ সিন্ধু-তীরবর্তী প্রদেশসমূহ শাসন করিতেছিলেন। ১৯৩ হিঃ যুবরাজ মহম্মদ হাকিমের মৃত্যু হওয়ার, সম্রাটের আদেশে তাহাকে কাবুলে শাস্তিস্থাপনের জন্ত গমন করিতে হয়। এখানে তাহার কঠোর শাসনে দুর্দ্ধি রোশানি আফগানগণ শাস্ত্যাবধারণ করে। অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্রে জাতিতে দমনাথাতন মোগল-সেনার সেনাপতা গ্রহণপুঙ্ক আর একবার কাবুলে গমন করেন। অকবরের রাজত্বের ২৯শ বর্ষে মানসিংহের ভগিনীর সহিত যুবরাজ সেলিমের (জাহাঙ্গীর)বিবাহ হয়। পরবর্ত্তিবর্ষে জাবুলীস্থানের শাসনকর্তৃত্বলাভের পর, তৎপিতা ভগবান্দ-উম্মাদরোগ-গ্রস্ত হইলে, পুনরায় মানসিংহের প্রতি তৎপ্রদেশের শাসনভার আপত্ত হইয়াছিল। ৩২শ বর্ষে রাজপুতজাতির ঔদ্ধত্যনিবারণের জন্ত তাহাকে পুনরায় ভারতে আসিতে হয়। অতঃপর তিনি বেহারপ্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯৮ হিজিরায় রাজা ভগবান্দ দাস স্বগারোহণ করিলে, কুমার মানসিংহই জয়পুর-সিংহাসনে সমাসীন হন। সম্রাট অকবর রাজা উপাধি ও পাঁচহাজারী সেনানায়কের পদ প্রদান করিয়া তাহাকে বিশেষ সম্মানিত করেন। মহাবীর ও গভীর রাজনীতিজ্ঞ এই মানসিংহের শাসনে অধ্বরাজ্য ভারতে সমৃদ্ধক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

বংশধর উজীর খাঁর মৃত্যুসংবাদ দিল্লীধরবারে পৌঁছিলে, সম্রাট অকবর শাহ মানসিংহকেই বঙ্গরাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে পাটনাস্থ মোগল-সেনাপতি মানসিংহের অস্থপস্থিতি পর্যন্ত বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে মানসিংহ পেশাবর প্রদেশস্থ রাজদ্রোহী আফগানগণকে দমনার্থ ব্যাপ্ত ছিলেন। আফগানদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া রাজা মানসিংহ ১১৭ হিজিরার (১৫৮৯ খৃঃ অঃ) পাটনানগরে উপনীত হন। এখানে আসিয়া তিনি অবগত হইলেন যে, হাজীপুরের রাজা পূর্ণমল খেদরার, বাঙ্গালা অরাজক দেখিয়া রাজদ্রোহিতা-চরণে বক্রপরিকর হইয়াছেন। তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়াই সন্মুখে তদ্রাজ্যভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মোগল-সৈন্তের সংখ্যা অধিক দেখিয়া পূর্ণমল মানসিংহের শরণাপন্ন হন এবং সম্রাটকে হস্তী ও নানা রত্ন উপঢৌকন দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

অতঃপর মানসিংহ ষোড়শাটস্থ মোগল-কর্মচারীদিগের অত্যাচার-দমনে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে কএকজন মোগল-কর্মচারী বশোর জেলা পধ্যস্ত অথবা করসংগ্রহ করিতে-ছিলেন। মানসিংহ নিজ পুত্র জগৎসিংহকে তাহাদের শাস্তি-বিধান জন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মোগল-সদারগণ বনভূমি প্রাশ্রয় করে।

বাঙ্গালার জলবায়ু মানসিংহের পক্ষে অধিক অস্বাস্থ্যকর হওয়ায়, তিনি বেহারে নিজ বাসস্থান মনোনীত করিয়া লন। সৈয়দ খাঁ তাঁহার সহকারিরূপে তৌড়ায় থাকিয়া পূর্ববাঙ্গালার শাসনকাব্য নির্বাহ করিতেন।

বেহারে অবস্থানকালে মানসিংহ রোহতাসের পার্শ্বভাগে দুর্গের জর্জরসংস্কার করেন। এখনও দুর্গসমূহ প্রস্তরনির্মিত যে সিংহদ্বার ও পদ্মদলপরিশোভী যে স্তূপহং জলাশয় দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা রাজা মানসিংহেরই কীর্ত্তি। এই প্রীতিপ্রদ পার্শ্বভাগ উপত্যকায় স্তম্ভস্পর্শ বায়ুসেবনের জন্য তিনি একটি প্রাসাদ ও পূর্ণ পারসিক-প্রণালীতে একটি পুষ্পবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

১১৮ হিজিরার মানসিংহ আফগান-কবল হইতে উড়িষ্যার উদ্ধারমানসে কৃতদল হইয়া সৈন্তসংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। ভাগলপুরে স্বীয় গঠিত সেনাদল একত্র করিয়া তিনি বর্ধমানের পশ্চিমদিকস্থ পার্শ্বভাগে অগ্রসর হইতে থাকেন, এদিকে সৈয়দ খাঁকে কাঁটোয়ার পথে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিতে আদেশ করিয়া পাঠান। ঐ সময় বাঙ্গালার বর্ষার দাক্ষণ প্রভাব। অবিপ্রান্ত জলধারার সমস্ত পূর্ববঙ্গ একরূপ জল-

প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই মহাকষ্টের সময় সৈন্তসংগ্রহে দুরূহ বুদ্ধিমা ছর্ভাগ্য সৈয়দ রাজা মানসিংহকে সে ঝড়ো সেনাপরিচালন কাব্য হইতে বিরত থাকিতে প্রার্থনা জানাইলেন। কারণ 'সেই জলে সেনাদল লইয়া উড়িষ্যা গমন করিতে হইলে পথে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া সেনাক্ষয় ঘটবার অধিক সম্ভাবনা। রাজা মানসিংহ এই সংবাদে হতাশ হইয়া সেই ক্ষত্রে সেনাদলের অবস্থানের জন্য ষারিকেশ্বর নদী-তীরবর্তী জাহানাবাদ গ্রামে একটি ছাউনী স্থাপন করিলেন।

যখন মোগলগণ এইরূপে জাহানাবাদে থাকিয়া সহকারী শাসনকর্তা সৈয়দের শুভাগমন আকাঙ্ক্ষা করিতে ছিল, তিক সেই সময়ে কুংলু খাঁ ধারপুর ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ লুণ্ঠনের জন্য স্বীয় সেনাদল প্রেরণ করেন। জাহানাবাদ ছাউনীর ২৫ ক্রোশ দূরে আফগান-সেনাদলকৃত উপদ্রবের কথা শুনিয়া, রাজা মানসিংহ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি দুর্বৃত্তদিগের অভিপ্রায় বার্থ করিবার মানসে তদগোঁই স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে সেনাদলসহ প্রেরণ করিলেন। জগৎসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আফগানগণ দুর্গ মধ্যে পলাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করিল এবং বালকরাজ জগৎসিংহের নিকট ছল-সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। এদিকে কুংলু খাঁর প্রেরিত নূতন সেনাদল আসিয়া পৌঁছিলে, তাহার। সেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া রাত্রিতে গোপনে জগৎসিংহের শিবির আক্রমণ করিল। অচিরে শত্রুদল কর্তৃক মোগলশিবির তন্দ্রীভূত হইল। রাত্রিতে এইরূপ সমূহ বিপদ দেখিয়া মোগল-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। রাজপুত্র জগৎসিংহকে বন্দী করিয়া আফগানগণ বসন্তপুরে পলায়ন করে। এই অবমাননা-হতক পরাতবে এবং শত্রুহস্তে পুত্রের মৃত্যু আশঙ্কায় রাজা মানসিংহ কিছুকালের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন।

দিল্লীধরের শোভাগ্যবশতঃ এই ঘটনার কএকদিন পরে, কুংলু খাঁর মৃত্যু হয়। সর্দারের উপযুক্ত পুত্রের অভাবে আফগান-সেনাদল আর যুদ্ধপ্রয়াসী না হইয়া রাজকুমারকে মুক্তিদানপূর্বক সন্ধির প্রার্থী হইল। এ সময়েও সমগ্র বঙ্গ বর্ষার প্রবল জলধারাপাতে নদী, জলা প্রভৃতি পরিপ্লাবিত হইতেছিল। সুতরাং তিনিও সেনাপরিচালনে অক্ষম বুদ্ধিমা সেই প্রস্তাবেই সায় দিলেন। নবাব কুংলুখাঁর সন্তানগণ এই সময়ে দিল্লীধরের বশতা স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের অভিনন্দনার্থ মন্ত্রী হাজার সজ্জ রাজসকাশে উপনীত হইলেন এবং দিল্লীধরকে নজর দিবার জন্য ১৫০ হস্তী ও কতকগুলি বহুমূল্য ধনরত্ন প্রদান করিলেন।

এই সময় যে সন্ধি হয়, তাহাতে আফগান রাজকুমারগণ

শান্তভাবে উড়িষ্যা-শাসন করিবার অমুমতি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সম্রাট অকবর শাহের নামে মুদ্রাঙ্কণ ও সকল প্রকার রাজকীয় নুখি-পত্র সুনন্দাদিতে তাহার নামায় মোহর ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হইলে, রাজা তাহাদিগকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদাদি পরিধান করাইয়া উড়িষ্যার মসনদে উপবেশন করিতে আদেশ করেন। কুংলুখাঁর পুত্রগণ বাজার এই সদয় ব্যবহারে প্রীত হইয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে হিন্দুর পবিত্রতীর্থ পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির ও তদধিকৃত ভূসম্পত্তি প্রভৃতি রাজা মানসিংহের করে সমর্পণ করেন।

সম্রাটের ৩৫শ বর্ষ রাজত্বকালে রাজা মানসিংহ সৌভাগ্যবলে আফগানযুদ্ধজয় ও পুরী হস্তগত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্ভাসমানতা ও কার্যকারিতাপ্রতির অভাব দেখিয়া সম্রাট তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। যতদিন খাজা সৈফা জীবিত ছিলেন, ততদিন আর মোগল পাঠানে কোনরূপ মনোমানিষ্ট ঘটে নাই। কিন্তু সফির দুই বর্ষ পরে, এক মধ্য ভবদাম পরিভাগ করিলে, আফগানগণ খাজা সুলমান ও খাজা ওসমানের অধিনায়কতায় বিদ্রোহী হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে।

আফগানগণের এই সত্য্যচাৰ্বে ক্রুদ্ধ হইয়া ধার্মিক রাজা মানসিংহ উগ্রমুখি ধারণ করিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের অবমাননাকারীদিগকে সমূলে উচ্ছেদ কবিবার জন্ত সম্রাটকে প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাটের আদেশপ্রাপ্ত হইয়া তিনি আফগানদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্ত স্বীয় বেহারত সেনাদলকে ধারখণ্ড-পথে (ছোটনাগপুর) অগ্রসর হইয়া মেদিনীপুরে উপনীত হইতে আদেশ করিলেন, এবং স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্ত সহ গঙ্গাবক্ষে আসিয়া সৈয়দ খাঁর সহিত বোণ দিলেন। আফগানগণ এই আয়োজনে ভীত হইয়া সুবর্ণরেখা অতিক্রম-পুষক পার্বত্য প্রদেশে লুক্কায়িত থাকিয়া শত্রুসৈন্যের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়পক্ষীয় সৈন্ত সম্মুখীন হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আফগানগণ নদী অতিক্রম করিয়া মোগলসৈন্যনাশে কৃতদক্ষ হইল। এই সময়ে মোগলসেনার কমান্ডের গোলায় অসংখ্য আফগান নদীগর্ভে ও হস্তিপদ-পৌড়নে স্থলপথে জীবন বিসর্জন করিল। পরাজিত আফগানদিগকে পলায়নপত্র দেখিয়া রাজা মানসিংহ তাহাদিগের পশ্চাদ্গমন করিলেন। জলেশ্বর নগর তাঁহার অধিকৃত হইল। মোগলসেনানী সৈয়দ খাঁ যুদ্ধে ক্লান্ত এবং উপরিতন কন্ঠচরীর জ্বরস্পন্দায় ঈর্ষান্বিত হইয়া মানসিংহের অমুমতি গ্রহণ না করিয়া সমরক্ষেত্রে পরিভাগপুষক ঠোড়ার প্রত্যারম্ভ হইলেন।

এইরূপে সহায়তান হইয়াও রাজা মানসিংহ শত্রুনির্যাতনে

পরাজুথ হন নাই। পলায়মান আফগানগণ কটকস্থ রাজা রামচন্দ্রের দুর্গে আশ্রয় লাভ করে। রাজা মানসিংহ এই দুর্গ অবরোধ করিয়া জগন্নাথ মূর্তিসন্মর্শনাথ পুরীধামে অগ্রসর হন।

যুদ্ধে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া রাজা রামচন্দ্র ও আফগানগণ মানসিংহের শরণাপন্ন হইলেন। উড়িষ্যা-মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কুংলুখাঁর পুত্রগণ খলিয়াবাদ জায়গীর-স্বরূপ লাভ করিলেন এবং রামচন্দ্র কটকপ্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন (১০০০ হিঃ)।

যুদ্ধজয়ে স্পষ্টিত হইয়া মানসিংহ সদলে বেহারে প্রত্যাগত হন। বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশ একত্র শাসন করিবার মানসে তিনি রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার যত্নে প্রাচীন হিন্দুরাজধানী পুনরায় সৌখ্যমাল্য বিভূষিত ও সুদৃঢ় দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত হয়। মুসলমান-ইতিহাসে এই স্থান অকবর-নগর নামে খ্যাত হইয়াছে। এই সময়ে তিনি ভাটী প্রদেশ জয় করিয়া ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম কূল পর্য্যন্ত সমস্ত পূর্ব-বঙ্গ অধিকার করেন। বেহারে প্রত্যাগমনকালে তিনি আপন পুত্র জগৎসিংহকে সসৈন্তে উড়িষ্যা-সীমান্তে রাখিয়া আইসেন।

পর বৎসর রাজা রামচন্দ্র পুনরায় মোগলরাজের বিরুদ্ধাচারী হন এবং আফগানগণ ও সাতগাঁও বন্দর আক্রমণ করে। রাজা মানসিংহ তাহাদের এই অসদ্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, কিন্তু উভয়েই ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি তাহাদিগকে আব নির্যাতন না করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং পুষকপ্রদত্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে অমুমতি প্রদান করেন।

১০০২ হিজরায়, সম্রাটের পৌত্র সুলতান খসরু উড়িষ্যার শাসনকর্তা হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন। রাজা মানসিংহ সম্রাটের আদেশে যুবরাজ পুত্রের সাহায্যকাবী হইয়া রাজকার্য্য পযাবেক্ষণ করিতে থাকেন। এই বৎসরেই তিনি সম্রাট দর্শনাথ দিল্লীযাত্রা করেন। দিল্লীদরবারে তিনি যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিয়া পুনরায় বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন।

১০০৪ হিজরায় কোচবিহারাধিপ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের সমীপে উপস্থিত হন। তাহার আত্মীয়বর্গ এবং বাঙ্গালার অন্যান্য রাজবর্গ লক্ষ্মীনারায়ণের এই হীনতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করেন। কোচবিহারপতি উপায়ান্তর না দেখিয়া মানসিংহের শরণাপন্ন হন এবং আত্মরক্ষার্থ তাহার নিকট গৈল-সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠান। এই স্ত্রে মোগলসেনা কোচবিহার প্রবেশ



করে। মোগলসেনানী জেহাজ খাঁ এই বিদ্রোহদমনকালে প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেন।

এই কুতোপকারের পুরস্কারস্বরূপ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ স্বীয় ভগিনীকে রাজা মানসিংহের করে সমর্পণ করেন। উক্ত বর্ষে ঘোড়াঘাটে রাজা মানসিংহ বিশেষরূপে পীড়িত হন। আফগানগণ অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা করিলে, তাঁহার অগ্রতম পুত্র হিম্মৎসিংহ পাঠানদিগকে সুলতরবন পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দেন। পরবৎসরে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্ত পুনরায় একটি ষড়্‌যন্ত্র হয়। মানসিংহ স্বীয় শালককে রক্ষা করিবার জন্ত হাজিজ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে কোচবিহারে পাঠান। মোগলসৈন্তের সমাগমে বিদ্রোহিদল ভীত হইয়া ছয়ভঙ্গ হইয়া পড়ে।

১০০৭ হিজরায় সম্রাট দাক্ষিণাত্যবিজয়ে অভিলাষী হইয়া রাজা মানসিংহকে লিখিয়া পাঠান যে, ‘বাঙ্গালার একজন সহকারী রাখিয়া তুমি সমুদ্র যথাসম্ভব বঙ্গীয় সেনাদল সঙ্গে লইয়া দাক্ষিণাত্যে গমনপূর্ব্বক রাজ্যদেশ পালন করিবে।’ আদেশানুসারে মানসিংহ স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে বাঙ্গালার সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত রাখিয়া আজমীঢ়ে কুমার সেগিমের সহিত মিলিত হন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যখন ঘোড়াঘাটের শাসনকর্তা দৈশা লোকান্তর গমন করিয়াছে, তখন আর আফগান-অভ্যুত্থানের কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু অনতিকাল পরেই তাঁহার পুত্র জগৎসিংহের মৃত্যু হওয়ায়, বাঙ্গালারাজ্য নিকটক জানিয়া, ওসমানের অধীনস্থ পাঠানগণ বিদ্রোহবহি প্রজ্জালিত করিল। এই সময়ে মোহনসিংহ ও প্রতাপসিংহ (আইন-ই-অকবরীতে মহাসিংহ নাম পাওয়া যায়) বেহার ও বাঙ্গালার শাসন-কার্য্য নিকাশ করিতেছিলেন। তাঁহারা এই সংবাদে ত্রস্ত হইয়া আপনাপন সেনাদল লইয়া উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তদ্রকের সন্নিকটে মোগল ও পাঠানসৈন্তে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে মোগলসৈন্ত পরাভূত হইলে পাঠানেরা বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লয়।

সম্রাট এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া শীঘ্রই মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দেন। রাজা মানসিংহ ঐ সময়ে আজমীঢ়ে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজ্যদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই তিনি রোহতস দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হন। সরকার সন্নিকটবর্ত্তিত সেরপুর-আটাই নগর সন্নিধানে মানসিংহের সহিত যুদ্ধে আফগানদিগের পরাভব ঘটে। পাঠানসর্দার ওসমান পরাভূত সেনাদল লইয়া উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করেন। মোগলগণ শত্রুদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। পশ্চিমধ্যে তাহার মীরবন্দী আবদুল রেজাক্কে হস্তিপৃষ্ঠে

দেখিতে পায়। আবদুল রেজাক্ মোগলকর্ণচারী ছিলেন। পুষ্পযুদ্ধে তিনি পাঠানহস্তে বন্দী হন। এবার মানসিংহের কৃপায় তিনি উদ্ধার লাভ করিলেন। মানসিংহ তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া হৃদয়ের ভালভাসা জানাইয়াছিলেন।

মানসিংহের আকস্মিক উপস্থিতিতে পাঠানগণ প্রথমেই হতাশ হইয়াছিল। পরে পরাজিত হইয়া তাহার একবারেই স্বাধীনতালাভের আশায় জলাঞ্জলি দিল বটে, কিন্তু কিরূপে পুনরায় মোগলদিগকে বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করিবে, তাহার তখনও তাহার ছিদ্রাশেষে উদাসীন রহিল না।

পাঠানদিগকে সমূলে নিমূল করিয়া মানসিংহ সম্রাটের অভিনন্দনার্থ দিল্লীযাত্রা করিলেন। সম্রাট এইবার তাঁহাকে ৭ হাজারী সেনানায়কের পদ দান করিয়া বিশেষ মর্য্যাদাষিত করিলেন। তাঁহার পূর্বে মোগলসরকারে এক্ষণ সম্মান-সূচক পদ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। হিন্দু হইয়া তিনি মুসলমান-সেনানীগণের অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে শাহরুখ ও আজিজকোকা উক্ত পদ লাভ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল দরবারে থাকিয়া পুনরায় তিনি বাঙ্গালার প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজনীতিকুশলতা ও ত্রায়পরতার সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাট অকবর পীড়িত হইলে, তিনি রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়া আগ্রায় উপনীত হন। তিনি সম্রাটকে ৯শত হস্তী ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি উপঢৌকন দিয়া সম্রাটের বিশেষ সম্মানভাজন হইয়াছিলেন।

রাজা মানসিংহ তাঁহার এত সাধের বঙ্গরাজ্য কেন স্ব-ইচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের মৃত্যুসময়ে আগ্রায় আসিলেন? এ কথাই মীমাংসা করিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন যে, সম্রাট পীড়িতাবস্থায় রাজকার্য্যে লক্ষ্য রাখিতে না পারিয়া উজ্জীর খান আজিমের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর পূর্ব্ব হইতেই পিতার অপ্রিয় হইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের ভাগিনের সুলতান খুশ জাহাঙ্গীরের পুত্র। খুশ উজ্জীরপ্রধান খান আজিমের কন্যাকে বিবাহ করেন। মাতুল মানসিংহ ও খুশ আজিম ভাগিনের ও জামাতার সিংহাসনলাভে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রাজ্যের এই দুই প্রধান ব্যক্তিকে এইরূপ ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত দেখিয়া যুবরাজ জাহাঙ্গীর পিতৃসদনে উপস্থিত হইয়া রাজা মানসিংহের ও খান আজিমের বাক্তা জ্ঞাপন করিলেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী বৃদ্ধ সম্রাট তাঁহাদিগকে সম্মুখে ডাকাইয়া এই আচরণের জন্ত বিশেষ তিরস্কার করেন এবং জাহাঙ্গীরকেই দিল্লীসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া

স্বীকার করিতে আদেশ করেন ও যাহাতে তাঁহার সন্ত্রাটের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের পক্ষাবলম্বন করিয়া দিল্লীসিংহাসনের রক্ষায় অংগর হন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের নিকট বারংবার অহুরোধ করিলেন। ইতিহাসে প্রকাশ,—রাজা মানসিংহ স্বাধীনজির লোভে বুদ্ধ সন্ত্রাটের শেষ দিনে যে ষড়্‌যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

[ অকবর দেখ। ]

অকবর শাহের মৃত্যুর পর, ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে, রাজা মানসিংহ ও খান আজিম পূর্ণপ্রতিশ্রুতি বিষ্মত হইয়া পুনরায় খৃষ্টকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ জাহাঙ্গীরের সিংহাসন-প্রাপ্তির কথা বিভিন্নরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—রাজা মানসিংহ বিংশতি সহস্র রাজপুত-সৈন্তের অধিনায়ক ও প্রবল ক্ষমতাসালী হইলেও প্রকাশ্যে সন্ত্রাটকে দমন করিতে পারেন নাই। তিনি যে গুপ্তভাবে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর কর্তৃক তাহা বিচ্ছিন্ন হইলে তিনি নৌকাযোগে গোপনে ভাগিনেয়কে লইয়া আগ্রা হইতে পলায়ন করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, সন্ত্রাট জাহাঙ্গীরপ্রদত্ত ১০ কোটি মুদ্রা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াই তিনি এই অমঙ্গলকর ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হন।

বাহা হউক, জাহাঙ্গীর স্বীয় পথ মুক্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। খালক মানসিংহ ও পুত্র খৃষ্টকে রক্তকর্ষের জন্ত কোনরূপ নিষেধন না করিয়া তিনি তাঁহাদের দোষ মার্জনপূর্বক মানসিংহকে পুনরায় বাঙ্গালার আফগানদিগকে শাসন করিবার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন। এখানে ৮ মাস অস্থানব পর ১০১৫ হিজরার প্রথমে তাঁহাকে পুনরায় সন্ত্রাটের আদেশ মত রোহতসের বিদ্রোহদমনার্থ গমন করিতে হয়। তদনন্তর তিনি জাহাঙ্গীরের সকাশে উপস্থিত হন (১৬০৭ খৃঃ অঃ)। জাহাঙ্গীরের আদেশ মত তিনি কিছুকাল পিতৃরাজ্যে থাকিয়া শান্তি সুখ ভোগ করেন। অতঃপর তাঁহাকে স্বরাজ্য হইতে সেনা ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া আবদর রহিমের সহিত দাক্ষিণাত্যবিজয়ে গমন করিতে হয়। সন্ত্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ২ম বর্ষে দাক্ষিণাত্যে রাজা মানসিংহ পরলোক গমন করেন।

কোন কোন মুসলমান-ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১০২৪ হিজরায় রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যাচার ইতিবৃত্তে প্রকাশ যে, উত্তরাঞ্চলে খিলজী জাতির বিরুদ্ধে সময় করিতে গিয়া মানসিংহ তাহার দুই বর্ষ পূর্বে নিহত হন। জয়পুরে মান-

সিংহের জীবনী সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, তাঁহার সম্বলন করিলে একখানি স্মরণ গ্রন্থ হইতে পারে। Tado Rojsthan,

তাঁহার ১৫ শত পত্নীর মধ্যে ৬০ জন তাঁহার অমুগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৫০০ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র ভাউসিংহ (ভবসিংহ) পিতৃরাজ্যে অধিকারী হন। অপর সকলেই পিতার মৃত্যুর পূর্বে জীবলীলা সম্বরণ করেন।

আগ্রার যে স্থলে তাজবিবির বিখ্যাত মন্দির 'তাজমহল' বিদ্যমান, তাহা রাজা মানসিংহের অধিকারভূক্ত ছিল।

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালা-জয় ও বঙ্গের শেষ স্বাধীন নৃপতি কায়স্থকুলোদ্ভব রাজা প্রতাপাদিত্যের পরাভব ইতিহাস-পাঠক মাত্রেরই অবদিত নাই। দুঃখের বিষয়, কোনও মুসলমান ঐতিহাসিক বাঙ্গালীর এই বীরত্বকথার উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, যে সময়ে ঘোড়াঘাটের পাঠান-সর্দার জৈশার(ইনিই সম্ভবতঃ বারভূঁয়ার একজন জৈশাখী মসনদআলী) মৃত্যু হয়, সেই সময়ের নিকটবর্তী কোন এক সময়ে তিনি প্রতাপাদিত্যকেও শাসন করিয়া বাঙ্গালা নিষ্কটক করেন এবং সন্ত্রাটের আদেশে একমাত্র পুত্র জগৎসিংহকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্বপদে রাখিয়া যুবরাজ সেলিমের সহিত আজমীরে যোগদান করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, জাহাঙ্গীরের সিংহাসনাধিকারের পর, যখন তিনি শেষবার বাঙ্গালায় আফগান-বিদ্রোহদমনে আগমন করেন, তৎকালে তিনি প্রতাপাদিত্যকে যশোহরে পরাভূত করিয়াছিলেন। [ প্রতাপাদিত্য দেখ। ]

মানসিংহ, মারবাড়ের অপর একজন রাজা। ইনি রাজা বিজয়সিংহের পোত্র ও গুমানসিংহের পুত্র। রাজা বিজয়সিংহ স্বীয় অশ্ববালজাতীয়া এক বারবিলাসিনীর অহুরোধে মানসিংহকে সেই যুবতীর দত্তকপুত্র ও আপনার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে সামন্ত-মণ্ডলী ক্রুদ্ধ হইয়া ভূমসিংহের পুত্র ভীমসিংহকে রাজ্য প্রদান করিতে উদ্বৃত্ত হইলে, রাজা বিজয়সিংহ বিরক্ত হইয়া তাহাকে আপন দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু সামন্তগণ মালকাশোনী নামক স্থানে সমবেত হইয়া ষড়্‌যন্ত্রপূর্বক বারবিলাসিনীকে নিধন করিয়া ভীমসিংহকেই মারবাড় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু বিজয়সিংহের কৌশলে তিনি সিবান ভূগে প্রেরিত হন।

বিজয়সিংহের মৃত্যুর পর প্রবাসিত ভীমসিংহ বোধপুরে উপনীত হইয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি স্বীয় রাজ-পদ নিষ্কটক করিবার জন্ত পিতৃব্য ও পিতৃব্য-পুত্রদিগকে অচিরে

শমনভবনে প্রেরণ করেন। একমাত্র মানসিংহই তাঁহার কলুষিত হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। [ ভীমসিংহ দেখ। ]

ভীমসিংহের মৃত্যুসংবাদে উৎফুল্ল হইয়া মানসিংহ কালোর-দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। রাঠোর সেনাগণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্মানে সন্মিলন করিল। ১৮৬০ সন্থে মাঘমাসের পঞ্চম দিনে তাঁহার ললাটে রাজ্যটীকা প্রদত্ত হইল। তাঁহার শাসনকাল হইতে মারবাড়-ইতিহাসের শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়।

রাজা মানসিংহের শিরোদেশে রাজচ্ছত্র শোভিত হইবার অল্পদিন পরেই পোকর্ণের মহাতেজস্বী সামন্ত সবাই সিংহ পূর্ব প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহার শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মৃত রাজা ভীমসিংহের একমাত্র পুত্র ধনকুলসিংহকে মারবাড়-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া সামন্তগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সামন্তগণ মানসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ধনকুলকে সিংহাসনে উপবেশন করান, তাহারই ষড়্‌যন্ত্র করিলেন।

রাজা মানসিংহের কঠোর শাসনে এবং বিদেহভাবে মৃত রাজা ভীমসিংহের অমুগ্ধহীত সামন্তগণ তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ অমুগ্ধ সামন্তবৃন্দের প্রতি সবিশেষ অমুগ্ধ প্রকাশ করায় ভট্টজাতীয় রাজপুত-সেনাদল এবং বোহস্ত কায়ম দাসের অধীনস্থ বিষ্ণুস্বামী নামক সেনাদল চিরদিন তাঁহার সহায় হইয়াছিল।

এই পক্ষপাতিত্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সবাই সিংহ ভীমসিংহের পুত্র ধনকুলের পক্ষ হইয়া অত্যাচার সামন্তবর্গের সহযোগে রাজা মানসিংহের সমীপে উপনীত হইলেন এবং জাতবালকের ভরণপোষণস্বরূপ নাগর ও শিবানো প্রদেশ পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। এদিকে রাজরোষে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভীমসিংহমহিষী সর্বদমক্ষে প্রকাশ করিলেন যে, ধনকুল আমার গর্ভজাত পুত্র নহে। ইহাতে বার্থমনোরথ হইয়া সবাইসিংহ পুনরায় ষড়্‌যন্ত্রজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন, এবারও তিনি অকৃতকায্য হইয়া রাজা মানসিংহের আত্মগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং গোপনে ভীমসিংহের নন্দিনী কৃষ্ণকুমারীর পরিণয়ব্যাপার লইয়া জয়পুর-রাজের সহিত বিভাট বাধাইয়া দিলেন। পূর্বে মিবার-রাজের সহিত কৃষ্ণকুমারীর পরিণয় হইবার কথা ছিল। মানসিংহ জয়পুর-রাজের এই অবমানকর প্রস্তাবে উত্তেজিত হইয়া জয়পুর-রাজের শত্রু উপহার লুণ্ঠন ও সেনাদলকে পরাস্ত করিলেন।

এই যুদ্ধে উভয়পক্ষে ষোল্ল যুদ্ধ বাধিল, সবাইসিংহ এইরূপ শততা দ্বারা জয়পুর ও মিবারের নরপতির সহিত

মানসিংহের বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত করাইয়া মনোরথসিদ্ধির উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ধনকুলকে লইয়া অনতিবিলম্বে জয়পুরশিবিরে মিলিত হইলেন। জয়পুররাজ জগৎসিংহের যে ভগিনীকে ভীমসিংহ বিবাহ করেন, তাহারই গর্ভে ধনকুল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজা জগৎসিংহ ভাগিনেয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজা মানসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সামন্ত তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। তিনি লর্ড লেকের যুদ্ধে যে হোলকরপতিকে আশ্রয়দানে রক্ষা করিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার শরণাগত হইলেন। কিন্তু সবাইসিংহ লক্ষ মুদ্রাদানে হোলকরকে বশীভূত করিয়া মানসিংহের ক্ষমতা হ্রাস করিলেন। অতঃপর জয়পুরসৈন্য তাঁহাকে পিন্ডোলী নামক স্থানে আক্রমণ করে। যুদ্ধের প্রারম্ভে তাহার অধীনস্থ রাঠোর সামন্তগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর, রাজা মানসিংহ মৈরতা হইতে যোধপুরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জগৎসিংহের বিজয়ী সেনাদল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

মানসিংহ যোধপুর-দুর্গ দৃঢ়বদ্ধ এবং কালোর ও অমরকোট সৈন্যপ্রেরণ দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। জয়পুরপতি জগৎসিংহ পাঁচ মাস অবরোধ করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। মানসিংহ অনীম বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জয়পুরসৈন্য মধ্যে বেতনভোগী আমীর খাঁর সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহিদল জগৎসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। তিনি প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সবাইসিংহও স্বনগরে পলাইলেন।

যুদ্ধশেষে আমীর খাঁ ও হিন্দুরাজ রাজা মানসিংহের বিশেষ সহায়তা করেন। ইহারা দুই জনেই রাজা মানসিংহের নিকট হইতে উচ্চপদ ও ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর মারবাড় রাজ্যে আমীর খাঁর প্রভুত্ববিস্তার, নাগরদুর্গ ও নওয়া দুর্গে সৈন্যস্থাপন এবং মৈরাত ও শাস্তরপ্রদেশে অধিকার বিস্তার দেখিয়া রাজা মানসিংহ বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে তিনি হিন্দুরাজকে ও রাজগুরু দেবনাথকে গুপ্তভাবে নিহত করিয়া একবারে উন্মাদ হইয়া পড়েন। তৎপরে তাহার পুত্র ছত্রসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ছত্রসিংহের দুর্চারিত্রতা-নিবন্ধন সামন্তগণ বিদ্রোহী হইলেন। রাজা মানসিংহ প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ই'রাজশাহায্যে সামন্তগণের ভূমিসম্পত্তি আত্মসাৎ করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত তাঁহার সন্ধি

হয়। ইংরাজসেনা মারবাড়েশ্বরের পক্ষ হইয়া সামন্তদিগকে সমুচিত দণ্ডদান করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে 'মে: ওয়াইটার' ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতিনিধি স্বরূপে আজমীর প্রদেশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইয়া ঘোষণার রাজ্যে গমন করেন। তিনি মারবাড়ের রাজনৈতিক অবস্থার সংস্কার জন্য গোপনে রাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হন; কিন্তু তাহাতে সমর্থ না হইয়া তিনি প্রত্যাশা করিলে পর লে: কার্ণেল টড্‌মাহেব কোম্পানীর পক্ষে মারবাড় রাজ্যের এক্সেস্ট হইয়া আইসেন। রাজা মানসিংহের সহিত কার্ণেলের বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছিল। এই সময়ে মারবাড় প্রান্তে মন্ত্রী অফিসীদের হৃদয়ভেদী অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। যুদ্ধে অক্ষয় চাঁদ, কিল্লাদর নাগোজী, মূলজী, দক্ষল, জীবরাজ, বিহারী খিচী, ব্যাস শিবদাস ও শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতিষী প্রভৃতি অত্যাচারী সন্দারগণ ধৃত ও বন্দী হন। রাজা মানসিংহ তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রাণসংহার করিয়া নিষ্কটক হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পোকণের সলিমসিংহের বংশ উৎসাদন করিতে চেষ্টিত হইলেন। সামন্তবর্গ এই সংবাদে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু মানসিংহ প্রতিহিংসাবৃত্তি সফল করিবার জন্য যেন সংহার-মুর্তিধারণ করিলেন। তাঁহার আদেশে ৮ সহস্র বেতনভোগী কামানবাহী সৈন্য রজনীযোগে নিমাজের সামন্ত সুরতান সিংহকে আক্রমণ করিল। যুদ্ধে সুরতান নিহত হইলেন, কিন্তু সলিম সিংহ পলাইয়া আশ্রয়লাভ করিলেন। এতদিনের পর রাজপুত বীর মানসিংহ প্রকৃত বীরতেজে মারবাড়রাজ্য ধ্বংস করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন।

১৮৫০ সম্বতে ইংরাজ কোম্পানীর সহিত মহারাজাধিরাজ মানসিংহের সন্ধি হয়। জয়পুরাধিপ স্বীয় ভাগিনেয় ধনকুল সিংহকে সিংহাসন দান করিতে অভিলাষী হইয়া পুনরায় মারবাড় আক্রমণ করেন। প্রথমে মানসিংহ ইংরাজের সাহায্য পান নাট। অবশেষে ইংরাজসৈন্য রণক্ষেত্রে উপনীত হওয়ায় ধনকুল সৈন্যে পলাইয়া যান। এই সময়ে জয়পুররাজ ইংরাজ গবর্নমেন্ট কর্তৃক বিশেষ রূপে লালিত হইয়াছিলেন।

১৮৯২ সম্বতের সন্ধি অনুসারে ঘোষণারাজ সৈন্যসাহায্যের পরিবর্তে এক লক্ষ পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রাজা মানসিংহের অধিকারভুক্ত মহারাজা প্রদেশের অন্তর্গত ২৮ খানি গ্রাম নয় বংশের জন্য ইজারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহার উপসত্ত্ব হইতে তাঁহার বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা লইতেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত সম্পত্তির মেয়াদ অন্ত হয়। উক্ত বর্ষেই রাজা মানসিংহ কলিকতায় পরিত্যাগ করেন। তিনি ইংরাজ-

রাজের সহায়তায় মারবাড়রাজ্যের বিশেষ সংস্কার করিয়া গিয়াছিলেন।

মানসিক (ত্রি) মানস-ঐচ্ছ। মনোভাব, মানস। কোন বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য দেবতার নিকট পূজাদি মানসিক করিতে হয়। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১২।৩৩।৪)

মানসী (স্ত্রী) মানস-স্ত্রীহাং ঙীপ্ ১ বিভাদেবীবিশেষ। ২ মনোভাব।

“ততোহতিথ্যায়তন্তস্ত জজিরে মানসী: প্রজা:।”

(বিষ্ণুপুরাণ ১।৭।১)

মানসীব্যাথা (স্ত্রী) হৃদয়জাত শোকদুঃখাদি।

মানসূত্র (স্ত্রী) মানস গাত্রপ্রমাণস্ত তন্মানার্থং বা সূত্রং। স্বর্ণাদিনির্মিত কটিসূত্র, চলিত গোট, রেট। (ধনঞ্জয়)

মানসোত্তর (পুং) পরতশ্রেণীভেদ।

মানসৌকস্ (পুং) মানসং সরঃ ওকো বাসস্থানং যত্। হংস।

মানস্কৃত (পুং) পূজা বা অভিমানের কর্তা। (শুক্রযজু: ৩০।১৪)

মানস্বলী (স্ত্রী) দেশজ।

মানস্ম (পুং) মনসের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১০৫)

মানহন্ (ত্রি) মানং হস্তি হন-কিপ্। মানহন্তা, মাননাশক।

মানহানি (স্ত্রী) মানস্ম হানিঃ। মানের হানি। অবমাননা।

মানহীন (ত্রি) মানেন হীনঃ। মানরহিত, মানব্রষ্ট, বাহার মান নষ্ট হইয়াছে।

মানা (দেশজ) নিষেধ, বারণ।

মানা, যুক্তপ্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটি গিরি-সঙ্কট। হিমালয়শিখরে চীন ও ভারত-সাম্রাজ্যের ব্যবধানে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৫৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩৫' পূঃ। বিষ্ণুগঙ্গা নদীকূল দিয়া মানা উপত্যকাহ মানাগ্রামে উপনীত হওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই পথ ১৮ হাজার ফিট উচ্চে স্থাপিত হইলেও পুর্বে ভারতবাসিগণ এই সঙ্কট দিয়া চীনতাত্ত্ব্যে গমনাগমন করিত। হিন্দুতীর্থযাত্রিগণ এই পথেই মানস-সরোবর তীর্থসন্ধাননে আসিয়া থাকে।

মানাই (দেশজ) মনোমত সাজান।

মানাস্ক (পুং) গীতগোবিন্দটীকা, ভূর্গমাত্তোবোধিনী নামে মালতীমাধবটীকা, মেঘাভ্যাসকব্য, বৃন্দাবনযমক ও বৃন্দাবন-কাব্যরচয়িতা। ইনি মালাস্ক নামেও পরিচিত ছিলেন।

মানাস্ক, রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক রাজা।

মানাস্কুলমহাতন্ত্র (স্ত্রী) প্রাচীন তন্ত্রভেদ।

মানান (দেশজ) ১ গুণভাবে কৃত কার্যাদি স্বীকার করান ২ লওয়ান। ৩ কর্তৃত্বস্থাপন। ৪ মনোমত গঠন সম্পাদন। ৫ যথাস্থানে সন্নিবেশকরণ বা সাজান।

মানানন্দ (পুং) জনৈক যোগাচার্য। শক্তিরজ্ঞাকরে ইহার নামোল্লেখ আছে।

মানানয়ন (ক্ৰী) মানস্ত পরিমাণস্ত আনয়নম্। পরিমাণ-আনয়ন, গণনা করিয়া পরিমাণ স্থির করা। জ্যোতিষে রবি প্রভৃতি গ্রহের মানানয়ন স্থির করিয়া গণনা করিতে হয়। বিশেষতঃ গ্রহগণনাকালে রবি ও চন্দ্রের মানানয়ন বিশেষ আবশ্যক।

মানানি (দেশজ) ১ সজ্জিত করণ। ২ বীকার করা।

মানায়ন (পুং) মনায়নের গোত্রাপত্য।

মানায়া (পুং) মনায়োর গোত্রাপত্য।

মানায়ায়নী (স্ত্রী) মনায়োর স্ত্রী অপত্য।

মানার উপসাগর, ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত ভারত-মহাসাগরের অংশবিশেষ। ইহার পশ্চিমে তিরেবল্লী ও মহারা-জেল্লা, উত্তরে আদামস্ ব্রিজ (সেতুবন্ধরূপ) ও কুমারিকা প্রভৃতি পর্বতমালা এবং পূর্বে সিংহলদ্বীপ। কুমারিকা হইতে দি-গল অন্তরীপ পর্যন্ত ইহার বাবধান ২ শত মাইল। দক্ষিণ-পশ্চিম মনুমবায়ু প্রবাহিত হইলে, ইহার স্রোতাবেগের আধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহার পরিবর্তন সময়েও অর্থাৎ উত্তরপূর্ব মনুমবায়ুর প্রবাহকালে এখানে পশ্চিম-বাতাস বহিতে থাকে এবং স্রোতোগতিও ভিন্নাকার ধারণ করে। ঐ সময়ে জলস্রোতে মলবার উপকূলস্থ বালুকারাশি কুমারিকা-অন্তরীপের দক্ষিণে আসিয়া সঞ্চিত হয়। তখন ঐ বালুকাপূর্ণ বেলাভূমি প্রায় ৪৫ মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকে।

এখানে মুক্তা পাওয়া যায়। মুসলমান ও তামিল ভুবরী-গণ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া শব্দ ও মুক্তাপর্ক শব্দকাদি উত্তোলন করে। ইংরাজরাজ এই মুক্তারক্ষার জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। সমুদ্রজলে ভয়াবহ হাঙ্গর বিচরণ করে।

মানাবাও, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাড়ের সোরাট্র-বিভাগের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার রাজা বড়োদারাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

মানাসক্ত (ত্রি) ১ অভিমানী। ২ মানরক্ষাই বাহার মূলমন্ত্র।

মানিক্জোড় (হিন্দী) পক্ষিভেদ।

মানিকপীর (দেশজ) মুসলমানদিগের উপাস্ত জনৈক পীর। ইহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। বড় বড় নদীতে নাবিকগণ যখন নৌকা ছাড়ে, তখন মানিক-পীরের নাম স্মরণ করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে হিন্দুরা গবাদির অস্থূহ হইলে মানিকপীরের উদ্দেশে মুরগী উপহার দেয় এবং গাভী প্রসব হইলে ২১ দিনের দিন মানিকপীরকে

দ্রব্য দিয়া পরে ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। এতদ্বিধা আয়-ধের দোশে ‘মাণিকপীরের গান’ নামক ক্ততিবাদ প্রচলিত আছে। নিম্নশ্রেণীর লোকে সমাধারে ঐ গীত গায়।

মানিক (ক্ৰী) অষ্টপলমিত মান, শরাব, এক সের।

মানিকা (স্ত্রী) মানয়তি পক্ষীকরোত্তীতি মন-গিচ্-খুল্, টাপ্ অকারন্তেৎ। ১ মত্। মানে প্রভবতীতি টক্। ২ শরাব; অষ্টপলমিত মান, ৬০ তোলা পরিমাণ, বৈজ্ঞক মতে ৬০ তোলায় এক সের।

মানিত (ত্রি) মানোহৃত্যর্থো তারকাদিষাভিতচ্। সম্মানিত, পূজিত, আদৃত।

মানিতসেন (পুং) রাজপুত্রভেদ।

মানিতা (স্ত্রী) মানিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। মানীয় ভাব বা ধর্ম, মানিত, সম্মান, গৌরব, অহংকার।

মানিন্ (ত্রি) ১ মানোহৃত্যত্তীতি মান-ইনি। মানবিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত। ২ সিংহ। (রাজনি০)

মানিনী (স্ত্রী) ফলিয়ক্। (মেঘিনী) মানিন্ স্রিয়াং ভীপ্। ২ মানবতী, অভিমানযুক্তা স্ত্রী।

“হরিরভিলসতি বহতি মুহু পবনে।

কিমপরমধিকসুখং সখি! ভবনে

মাধবে মা কুরু মানিনি! মানময়ে ॥”

(গীতগোবিন্দ ৯।২)

৩ রাজা রাজাবর্দ্ধনের পত্নী। (মার্কণ্ডেয়পুং ১০)

৪ শরাব পরিমাণ, এক সের। (ভৈষজ্যরত্না০)

মানিক (পুং) জনৈক প্রাচীন জ্যোতিষিৎ। [মনিখ দেখ।]

মানী (ত্রি) ১ অভিমানী। ২ মনোযোগী। ৩ সম্মানিত।

মানুতন্তব্য (পুং) মনুতন্তর গোত্রাপত্য। ঐকাদশাক্ষের অপত্য।

মানুষ (পুং) মনোজাতঃ মনু (মনোজাতাবজ্ঞ যতো যুক্ চ।

পা ৪।১।১৬১) ইত্যঞ্ ষ্ণাগমচ্। মনুষ্য, মানব। মনুষ্য-

স্তেদং অণ্। (ত্রি) ২ মনুষ্যসম্বন্ধী।

“অকুত্বা মানুষঃ কস্ম যো দৈবমনুর্বর্ততে।

বৃথা প্রাম্যতি সংগ্রাপ্য পতিং ক্রীষমিবাঙ্গনা ॥”

(মহাভারত ১৩।৬।২০)

মানুষক (ত্রি) মনুষ্যসম্বন্ধীয়।

মানুষতা (স্ত্রী) মানুষত্ব ভাবঃ তল্-টাপ্। মনুষ্যত্ব, মানুষত্ব, মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম।

মানুষপ্রধান (ত্রি) মনুষ্যের হিতজন্য সংগ্রাম।

“যন্মানুষপ্রধান ইন্দ্রমুত্তমঃ” (ঋক্ ১।৫২।৯) ‘মানুষপ্রধানঃ

প্রকীর্ত্তস্মিন্ ধনানি ভবতীতি নৈকত্বব্যুৎপত্ত্যা প্রধানমিতি সংগ্রামনাম, মনুষ্যহিতসংগ্রামাঃ’ (সায়ণ)

মানুষসংবাদ (ত্রি) ১ নরমাংসী। ২ রাকস।

মানুষরাকস (পুং) ১ রাকসের প্রকৃতিযুক্ত মনুষ্যশরীর।  
২ মনুষ্যের শত্রু। নিষ্ঠুরপ্রকৃতি দৃষ্ট্য প্রকৃতি।

মানুষলৌকিক (ত্রি) ১ নরলোকসম্বন্ধীয়। ২ মনুষ্যজাতির  
উপযোগী।

মানুষিক (ত্রি) মনুষ্যত্ব ভাবঃ কর্ণ বা মনুষ্য-ঐক্য। মনুষ্যের  
কর্মাধি। ২ মনুষ্যসম্বন্ধীয়।

মানুষবুদ্ধ (পুং) নরশরীরধারী বুদ্ধত্ব (শাক্যবুদ্ধ প্রভৃতি)।  
ইহার ধ্যানীবুদ্ধ হইতে ভতর।

মানুষী (স্ত্রী) মানুষ্য স্ত্রী, মানুষ্যজাতিস্বাং স্ত্রী। মনুষ্য  
স্ত্রীজাতি।

‘মনুষ্যী মানুষী সারী মানবী মানুষজিন্নাম্।’ (শব্দরত্নাং)  
মনুষ্য-অণু-ভাব। ২ চিকিৎসাবিশেষ।

‘আনুষরী মানুষী দেবী চিকিৎসা সা ত্রিধা মতা।’ (শব্দচং)

মানুষ্য (স্ত্রী) মনুষ্যত্ব ভাবঃ মনুষ্যত্বজনিত বা মনুষ্য-অণু।  
১ মনুষ্যত্ব। ২ মনুষ্যসম্বন্ধীয়।

‘মানুষ্যো কদলীভুক্তে নিঃসারে সারমর্গণম্।

বঃ করোতি স সংসৃজো জলবুদ্বদসমিতে ॥’ (শুক্লিতব)  
(ত্রি) ৩ মনুষ্যসম্বন্ধী।

মানুষ্যক (স্ত্রী) মনুষ্যগাং মনুষ্যঃ মনুষ্য (গোত্রাকোষ্ট্রো-  
জ্ঞেতি। পা ৪।২।৩৯) ইতি বুঞ্। ১ মনুষ্যসমূহ। (অমর)

মানুষ্য-বৎ, স্বার্থে কন্। (ত্রি) ২ মনুষ্যসম্বন্ধী।

‘সুমন্ত্রিতং সুনীতকং ভারতশোপপাদিতম্।

কৃতং মানুষ্যকং কর্ষ দৈবেনাপি বিরূধ্যতে ॥’

(ভারত ৫।৭।৭।৮)

মানৈ (আরবী) শব্দার্থ, শব্দের তাৎপৰ্য্য।

মানৈ মানৈ (অব্য) সম্মানের সহিত।

মানোজ্ঞক (স্ত্রী) মনোজ্ঞত্ব ভাবঃ কর্ষ বেতি (দ্বন্দ্বমনো-  
জ্ঞাতিভ্যচ্। পা ৫।১।১৩৩) ইতি বুঞ্। মনোজ্ঞতা,  
মনোজ্ঞের ভাব।

মানুষ্য (পুং) মনুষ্য-বৎ (পা ৪।১।১০৫) মনুষ্য গোত্রাপত্য।

মানুষ (ত্রি) বৈদিক মন্ত্রসম্বন্ধীয়।

মানুষবর্ণিক (ত্রি) বৈদিকস্তোত্রাদি লিখিত মন্ত্রবর্ণের সংজ্ঞাভেদ।

মানুষিক (পুং) ১ মন্ত্রবেদী। যিনি বেদমন্ত্রপাঠে বিশেষ পার-  
দনী। ২ যোবা, ভেদ্যবানীকর প্রভৃতি।

মানুষিত (পুং) মন্ত্রিত্বের বংশধর।

মানুষিতা (পুং) মন্ত্রিত্বের গোত্রাপত্য।

মানুষ্যেরশি (পুং) মন্ত্রবর্ণের গোত্রাপত্য।

মানুষ্য (স্ত্রী) মনুষ্যত্ব। মনুষ্য বা মনুষ্যের ভাব।

মান্দাল (পুং) মূষিকজাতীর জীবন্তেদ। (বহুবচন)

মান্দ্য (ত্রি) মন্থন বা মর্দনযোগ্য।

মান্দ (ত্রি) ১ তড়াগতব জল। (শুক্ল বৃহৎ ১০।৪) ‘তড়াগ-  
তবৎমান্দু হোমদানে। হে আপ! মূষঃ মান্দাঃ হি। মন্থতে-  
মৌলনার্থত্ব রূপং মন্থতে মৌলন্তে তৃতানি যত্র বহুবক্কাভা  
মান্দাঃ ভবৎ।’ (বেদদীপ) ২ তৌমাদিগ্রহের স্রবি বা  
চন্দ্রসম্বন্ধীয় নীচোচ্চ বা মন্দোচ্চ গতি। মান্দকল Equation  
of the apsis, মাক্কর্ষ process of correction for  
the apsis।

মান্দগাঁও, মধ্যভারতের বর্ধাজেলার অন্তর্গত একটি নগর।  
বনানদীর সন্নিকটে অবস্থিত।

মান্দার (পুং) মন্দারসম্বন্ধী।

মান্দারব (পুং) মন্দারবসম্বন্ধীয়।

মান্দার্য (ত্রি) বীতরাগ, মমত্বাতিমানশূন্য, বিধারহারাগরহিত।  
‘এব বতোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যাত’ (শুক্লবৃহৎ: ৩।৪।৮)  
‘মান্দার্যত্ব মাং মমেতি স্বামিসম্বন্ধঃ দায়রতি ইতি মান্দার্য-  
ত্বত্ব বীতরাগত্ব ইত্যর্থঃ’ (বেদদীপ)।

মান্দালয়, উত্তর-ব্রহ্মের রাজধানী। অক্ষাঃ ২১°৫২’ উঃ  
এবং দ্রাঘিঃ ৯৬°৮’ পূঃ। ইহা ৬০০ শত কিট্ উচ্চ একটি পাহা-  
ড়ের পাদদেশে ইরাবতী নদী হইতে ১ ক্রোশ দূরে সমতল ভূমির  
উপর অবস্থিত। সিংহাসনচ্যুত রাজা থিবোর পিতা ১৮৬০  
খৃঃ পূর্বাব্দে রাজধানী অমরপুর ত্যাগ করিয়া মান্দালয়ে নূতন  
রাজধানী স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের  
১লা জানুয়ারী পর্যন্ত এখানে স্বাধীন ব্রহ্মদেশের রাজধানী  
ছিল। পরে ঐ সময়ে এই স্থান হংকোংকিংগের অধিকারভুক্ত  
হইয়াছে।

রাজধানীর আয়তন সমচতুর্ভুজের ভায়ে এবং ইহার  
প্রত্যেক বাহু ক্রিষ্টমণ্ডিত অর্ধক্রোশ মাত্র। রাজধানীর  
চতুর্দিক ২৬ কিট্ উচ্চ এবং ৩ কিট্ প্রস্থ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।  
বাহির্ভাগে প্রাচীর ক্রমশঃ স্থল হইয়া ভিত্তির নিকটে  
৩০- কিট্ প্রস্থে পরিণত হইয়াছে।

নগরে প্রবেশ কারবার দ্বাদশটী দ্বার আছে। প্রত্যেক  
পার্শ্বে ৩টী করিয়া দ্বার। তোরণদ্বারগুলির উপরিভাগ  
গম্বুজাকার কাঠখণ্ডে নির্মিত। দ্বিতল এবং ত্রিতলে দুর্গ-  
রক্ষার স্থলর ব্যবস্থা আছে। ১০০ ফিট্ দীর্ঘ এবং ৬২ ফিট্  
বিশূত একটি পরিখা রাজধানী বেটন করিয়া গঠিত।  
পরিখা সর্বদা পতিতজলে পূর্ণ থাকে। ৫টী সেতু দুর্গপরিখাকে  
অপরোপকণ্ঠের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু এই সেতু-  
গুলি বহু কালের কোন উপায় নাই। তবে সেতুগুলি



কাঠনির্মিত বলিয়া শক্তিসেতের আকর্ষক আগমনে সহজেই ধ্বংস করা যায়। দুর্গপরিখার বহির্দিক হইতে দুর্গরক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই।

রাজপ্রাসাদ নগরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের বহির্ভিত্তি দুর্গপ্রাকারের সহিত সমান্তরালভাবে নির্মিত এবং প্রত্যেক পার্শ্ব ৩৭০ গজ দীর্ঘ।

অষ্টালিকার বহির্ভাগ ২০ ফিট উচ্চ সেগুন কাঠের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার পূর্বদিকে অবস্থিত। কাঠময় প্রাচীরের অভ্যন্তরদিকে ইষ্টকনির্মিত কয়েকটি প্রাচীরের পরে রাজভবন নির্মিত হইয়াছে।

রাজভবন পূর্বমুখে অবস্থিত। রাজভবনের দরবারপ্রকোষ্ঠ বা সভাগৃহ ১০ ফিট উচ্চ ইষ্টকের ছাদের উপর ২৬০ ফিট দীর্ঘ এবং কারুকার্যবচিত্ত অরঞ্জিত সেগুন কাঠে নির্মিত। প্রাসাদশিখর স্তম্ভাবলীর উপর অবস্থিত। দরবারপ্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে রাজসিংহাসন। সিংহাসনের উপর সুবর্ণমণ্ডিত মুকুটকর একটি সমুচ্চ চূড়া। চূড়াটা নগরের সমস্ত অংশ হইতে পরিদৃষ্ট হয়। সভাগৃহের পশ্চাদ্ভাগে মন্ত্রণাগৃহ এবং অন্তান্ত রাজ্যসংক্রান্ত কর্মচারীদিগের কর্মস্থান। পশ্চিমভাগে রাজার অন্তঃপুর এবং প্রমোদকানন। রাজপ্রাসাদের সীমার মধ্যে কোবাগার, অস্ত্রাগার, গোলাগুলি এবং বাকদের ভাণ্ডার, টুকশালা (mint) ও ষেতহস্তিসমূহের আলায়। একটি উচ্চ স্তম্ভের উপর সমরনিরূপক জলঘড়ি স্থাপিত। ইষ্টকময় প্রাচীরের বহির্ভাগে ধর্মাবিকরণ ও সেনানিবাস। রাজপ্রাসাদ সর্বপ্রকারে রাজোচিত শোভাসম্পদে অলঙ্কৃত। প্রাসাদতল সকল নানাপ্রকার কারুকার্যবচিত্ত বংশনির্মিত মাছুরে আচ্ছাদিত। রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগে বিভিন্ন জাতীর লোকের বাস। নগরের অভ্যন্তরস্থ রাজপথ সকল বিস্তৃত এবং পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভিত্তিহীন বৃক্ষ অবস্থিত। আর্দ্রেনির, মোগল এবং যুরোপীয়গণ নগরের মধ্যে বাস করে। নগরের মধ্যে ন্যূনাধিক দ্বাদশ সহস্র গৃহ আছে। লোকসংখ্যা প্রায় হই লক্ষ। নগরের বহির্ভাগে এবং অভ্যন্তরে অসংখ্য মঠ এবং মন্দির ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মন্দিরগুলি সাধারণতঃ চতুরশ্র ভিত্তির উপর বৃত্তচৌরীর অনুরূপে নির্মিত এবং বুদ্ধধর্মের ত্রিমূর্তি মন্দিরের অগ্রভাগে অনেক স্থলে খোদিত আছে।

প্রধানতঃ ইরাবতী নদীর জলপথে এখানকার বাণিজ্যকার্য সম্পন্ন হয়। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে তুলা, সেগুন কাঠ, কেরোসিন তৈল, চর্ক, শুক, হস্তিদন্ত, লাক্ষা, শূঙ্গ, গম, তামাক, ষেত-শীতাদি নানাপ্রকার বর্ণ এবং চা প্রভৃতি। প্রধানতঃ চীনেদেশের

সহিত স্থলপথে বাণিজ্য চলে। ব্রহ্মদেশের সহিত চীনের বাণিজ্যই উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্ম ইংরাজদিগের শাসনাধীনে আসিয়া, নানা বিস্তরে বিশেষ পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। নগরের অভ্যন্তরে এবং উপকণ্ঠে অনেকগুলি বাজার আছে। বহুসংখ্যক শিল্পী রেশমের বস্ত্র বরন করে। মাক্কালায়ের প্রতিযোগিতায় বস্ত্রশিল্পের অবনতি ঘটাইয়াছে। তবে দেশজ বস্ত্র ব্রহ্মবাসিগণের রুচি অনুসারে প্রস্তুত হয় বলিয়া লোকে দেশজ বস্ত্রই অধিক গ্রহণ করে। স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার ও অন্তান্ত দ্রব্যাদি নানা স্থানে নির্মিত হয়। ব্রহ্মবাসীর কল্মুকজীড়ার অতি নিপুণ। থিবো রাজার পিতা কামান-নিষ্ঠাণের শিল্পশালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু কামানগুলি উৎকৃষ্ট না হওয়ার, তাহা প্রচলিত হয় নাই।

থিবো ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি উক্ত রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা আলম্প্রা হইতে একাদশ রাজা। ব্রহ্মবাসীরা বলিয়া থাকেন, যে বংশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—তাহারা সেই শাকা-বংশে সমুচ্চ। যখন খৃঃ পূঃ ৬৯১ অব্দে অর্জুন-নৃপতি কপিলা-বাস্ততে রাজত্ব করিতেন, সেই সময় হইতে ব্রহ্মদেশের ইতিহাস আরম্ভ। আলম্প্রা পুন্ডরাজগণকে বিতাড়িত করিয়া এক শতাব্দী পূর্বে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাদের শাসনপ্রণালী যথেষ্টাচার-তাবাপন্ন ছিল। রাজগণ কেবল বুদ্ধ ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা করেন না। পশ্চাত্তরে তাহারা প্রকৃতিপুঞ্জের জীবন ও সম্পত্তির বিধাতা। থিবো অশ্রুশ্রুতাবে রাজ্যশাসন করেন নাই। ইংরাজ-প্রজাগণের সহিত অসদ্ব্যবহার করায়, তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া বন্দিতাবে ভারতে আনীত হন। তদবধি ব্রহ্মদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

মাক্কালায় ( প্রেসিডেন্সী ), ফোর্ট সেন্ট জর্জ নামক দুর্গের শাসনভুক্ত সমগ্র দক্ষিণভারত মাক্কালায়-প্রেসিডেন্সী নামে কথিত। মাক্কালায়নগরে ইংরাজ-বণিকগণ প্রথমে উক্ত দুর্গ নিষ্ঠাণ-পূর্বক কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের বাণিজ্যকার্য রক্ষার জন্য এখানে একজন গবর্নর থাকিতেন। তদবধি দক্ষিণভারতের ইংরাজেতিহাসে মাক্কালায়নগরের খ্যাতির প্রথম সূত্রপাত হয়। সমগ্র ভারত ইংরাজরাজের করাগত হইলে, দক্ষিণাত্যের অধিকার অক্ষুর রাখিবার এবং বিচার-কাণ্ড পরিচালন জন্য তাহারা এখানে দক্ষিণাত্যের রাজপাট স্থাপন করেন। মহিমুর প্রভৃতি কতকগুলি সামন্তরাজ্য, জেলা ও বস্ত্রবিভাগ লইয়া এই প্রেসিডেন্সী গঠিত।

ইহার উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিম দৈর্ঘ্যে ৯৫০ মাইল এবং প্রস্থে ৪৫০ মাইল। এই প্রেসিডেন্সীতে ইংরাজ-গবর্নমেন্টের



খাস-খাসনে ২২টী জেলা, স্বতন্ত্র বন্দোবস্তে গঞ্জাম, বিশাখ-পত্তন ও গোদাবরীর এজেন্সী বিভাগ এবং ত্রিবাঙ্কোড়, কোচিন, পুছুকোটা, বঙ্গনপল্লী ও সন্দুর নামক পাঁচটা সামন্ত-রাজ্য মাস্ত্রাজ-গবর্মেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়া থাকে।

উত্তরদিক্ বাতীত ইহার অপর দিক্‌ত্রে সমুদ্র বিরাজমান। উত্তরপূর্বে চিকা হইতে সমগ্র পূর্বোপকূলে পোপসাগর। দক্ষিণপূর্বে ইংরাজের সিংহল-উপনিবেশ, সেতুবন্ধ ও পক্-প্রাণালী, দক্ষিণে ও পশ্চিমে যথাক্রমে ভারত-মহাসাগর ও আরব্যোপসাগর। উত্তরসীমা উত্তরপূর্বে হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে নিম্নাতিমুখে আসিয়াছে। ইহার পূর্বোত্তর হইতে উড়িষ্যা, মধ্যভারতের পার্শ্বত্যাগদেশ, নিজামরাজ্য এবং ধার-বাড় ও উত্তরকাণাড়া জেলা যথাক্রমে পশ্চিমসীমা ঘিরিয়া রাখিয়াছে। মহিষুরের মিদ্রাধ্য মাস্ত্রাজ গবর্মেণ্টের শাসন-বহির্ভূত হইলেও ভৌগোলিক অবস্থানানুসারে উহা এই প্রেসি-ডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্বিধা লাফাণাপুঞ্জ ও মলবার ও দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার শাসনসম্পৃক্ত হওয়ায়, উহাও মাস্ত্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অংশবিশেষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

দক্ষিণভারতের মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, পক্ষত, নদ, নদী ও বনমালাসমাকুল এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-স্থান বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। পূর্বে ও পশ্চিমঘাট পক্ষতমালার বনময় দৃশ্যাবলি স্বভাব-সৌন্দর্য্যের রঙ্গভূমি। উহার পার্শ্ববর্তী সমতল সমুদ্রোপকূল নদীসঙ্কুল থাকিয়া শ্রামল শস্তে পারিপূর্ণ রহিয়াছে। নীলগিরির অধি-ত্যকা ও উপত্যকাভূমি নিরন্তরপ্রবাহিণী স্রোতাস্বিনীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া মানবজীবনের বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়াছে। মহিষুর, ত্রিবাঙ্কোড়, ত্রিচীনপল্লী প্রভৃতি শব্দে এখানকার স্থান বিশেষের প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; স্বতরাং অনাবশ্যক বোধে তৎসমুদায় আর উদ্ধৃত হইল না।

নদীসমূহের মধ্যে গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, পিনাকিনী (উত্তর ও দক্ষিণ পেন্নার), পালার, কৈগ, বেল্লুর ও তাম্র-পণী নদাই প্রধান। এতদ্বিধা ঘাটগিরিমালা ও অন্যান্য পক্ষতসমূহ হইতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ইত-স্ততঃ প্রবাহিত রহিয়াছে। পক্ষতসমূহের মধ্যে পূর্বে ও পশ্চিমঘাটশ্রেণী, নীলগিরি, আনমলয়, পলনি, পালঘাট ও সেবরার গিরিমালা উল্লেখযোগ্য। আনমলয় শৈলশ্রেণীর আনমুড়া শৃঙ্গ (৮৮৫০ ফিট) এবং নীলগিরির দোদবেট্টা শিখর (৮৭৬০ ফিট) দক্ষিণভারতের পক্ষতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

পলিকাট হ্রদই এখানকার সর্ববৃহৎ হ্রদ। উহা উত্তর-দক্ষিণে ৩৭ মাইল বিস্তৃত। মধ্যদেশভাগের যাবতীয় বাণিজ্যব্যব- এই হ্রদ দিয়া মাস্ত্রাজ নগরে ও উত্তরদিগন্তী প্রদেশসমূহে আনীত হইয়া থাকে। কাণাড়া, মলবার ও ত্রিবাঙ্কোড়ের সমুদ্রোপকূলে গিরিগাজ্জবাহী প্রথরস্রোত। নদীসমূহের সহিত সমুদ্রস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোচিনের হ্রদ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই হ্রদের দক্ষিণ হইতে একটা কাটাখাল দক্ষিণাতি-মুখে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

[ বিস্তৃত বিবরণ ততৎশব্দে দেখ। ]

শাতবর্ণদার্থের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় প্রস্তর, কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতির খনি এখানকার বিভিন্ন জেলায় পাওয়া যায়। সালেম জেলার উৎকৃষ্ট লৌহ, বৈনাড় ও কোলারে স্বর্ণ, ভদ্রাচলে ও দমণ্ডেডেম নামক স্থানে কয়লার খনি আছে। এতদ্বিধা নীলগিরি ও বেল্লুরীতে মাস্ত্রাজ, পুষ্কণাট পক্ষতে তাম্র, মহুরায় রৌপ্য ও রসায়ন, কাবেরী নদীর উপত্যকায় পান্না এবং উত্তর সরকারের স্থানবিশেষে হীরক ও অকীক মণি পাওয়া গিয়া থাকে। বস্ত্রবিভাগে শাল ও সেগুন বৃক্ষই অধিক। উক্ত কাঠের ব্যবসারে লাভবান হইবার জন্ত ইংরাজ গবর্মেণ্ট বনসমূহরক্ষায় যত্নশীল।

মাস্ত্রাজবিভাগের ইতিহাস সমগ্র দাক্ষিণাত্যের ইতি-হাসের সহিত সন্নিবদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে, দ্রাবিড় জাতির প্রকৃত ইতিহাস লইয়াই এই প্রদেশের ইতিবৃত্ত গঠিত হইয়াছে, কিন্তু উপরুক্ত ইতিবৃত্ত-লেখকের অভাবে সেই সমস্ত ঘটনা ধারা-বাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই জাতি কোন্ প্রাচীন সময়ে এখানে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং অপর কোন্ জাতির সহিত ইহা-দের নৈকট্য অধিক, তাহাও অত্মাপি নির্ণীত হয় নাই।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, রামায়ণোক্ত রাক্ষস-রাজ রাবণের পরাভব জন্ত রামচন্দ্র যে বানরকুলের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ দ্রাবিড়েরাই সেই বানরজাতি-রূপে কল্পিত হইয়াছে। এই অনাথ্য জাতিকে—তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া—বানরবংশসম্ভূত বলিয়া শ্লেষোক্তি করা অসঙ্গত বোধ হইলেও সভ্যতম রামচন্দ্রের অশুচরবর্ণের নিকট তাহাদের নিকৃষ্টতা-সম্পাদন করাই উদ্দেশ্য ছিল। বাহা হউক, রামচন্দ্রের শুভাগমনে এতদ্দেশবাসী অনাথ্য দ্রাবিড় জাতি যে হিন্দুধর্মে দীক্ষা লাভ করে, এরূপ অনুমান করা যায়। ইহা ভিন্ন দ্রাবিড়-জাতির প্রাচীনত্বের আর কোনই প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় না।

অতঃপর এখানে বৌদ্ধধর্মস্রোতঃ প্রবাহিত হয়। বৌদ্ধ-পরিব্রাজকগণ দাক্ষিণাত্যে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, স্থানান্তরে তাহা নিপিবদ্ধ হইয়াছে। [ বৌদ্ধধর্ম দেখ। ]

বর্তমান ঐতিহাসিকযুগে মুসলমান-রাজবংশের আধিপত্যের পর, এখানে মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে এখানে ধর্ম ও শাসনকার্যের পরিবর্তন ঘটিলেও এখানকার প্রচলিত তামিল ও তেলুগু ভাষার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দ্রাবিড়জাতি এখানে বহুপূর্বকাল হইতে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে।

যদিও এখানকার রাজকীয় ঘটনাবলীর কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না, তথাপি বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বহুতর ঘটনা দক্ষিণভারত-ই সংঘটিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকের আলোচনার ঐ ঘটনাসমূহ বিশেষ কোতূহলোদ্দীপক। [ দাক্ষিণাত্য দেখ। ]

বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, মলবার উপকূল দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্যভাণ্ডাররূপে গণ্য ছিল। রাজা সলোমনের রাজ্যকালে ও তাহার পরবর্ত্তিসময়ে তামিল নামধেয় ভারতীয় পণ্যবাস্যমূহ যুরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সিরিয়ারবাসী খৃষ্টান ও আরবদেশীয় মুসলমানগণ বাণিজ্যভিলাষে বহু পূর্বকাল হইতেই দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে আসিয়া বাস করিয়াছে। ঐ সকলের বংশধরগণ এক্ষণে মিশ্রধর্মী হইয়া মলবার ও ত্রিবাঙ্কোড় প্রদেশে বাস করিতেছে। কোচিনে রিহদীঘণের উপনিবেশ-স্থাপনও বহুশতাব্দী পূর্বে ঘটয়াছিল।

ভারতীয় বাণিজ্যালোচনাপুস্তকগীজ বণিকদল এই মলবার উপকূলে আসিয়া প্রথমেই আণাধুরূপ পণ্যবাস্যগ্রহে সমর্থ হইয়াছিল। [ পুস্তকগীজ শব্দে দেখ। ]

ইহার পরবর্ত্তিকালে, দক্ষিণভারতের ঐতিহাসিক সন্দর্ভ পশ্চিমদিক্ ছাড়িয়া পূর্বের কর্ণাটক-উপকূলে আসিয়া সন্নিবদ্ধ হয়। ফল কথা, নানা বিগ্রহ ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইংরাজগণ করমণ্ডল-উপকূলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানে ক্রাইবের বুদ্ধিকৌশলে করাসী-প্রতিনিধি ডু'প্লের রাজ্য-লাভাশা ব্যর্থ হইয়াছিল। আরও সর্বস্বার্থের কুটের অব্যর্থ কুটনীতি, হারদারের স্নদম্য বীরত্ব, টিপু সুলতানের জিঘাংসা ও বীরবর ওয়েলিংটনের জয়প্রবণজীবনের কার্য্যপরম্পরা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল ঘটনা সমাশ্রয়েই ইংরাজের দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮০৬ খৃঃ বছরবিস্ত্রোহের পর মাস্ত্রাজে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই।

ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, ইংলণ্ডের সর্বদমন রাজ-শক্তি বিস্তার দ্বারা মাস্ত্রাজে শান্তি স্থাপিত হইবার পূর্বে, দক্ষিণভারতে আর কখনও একচ্ছত্রাধিপতির শাসনদণ্ড বিস্তৃত হয় নাই। কিছুকালের জন্য একমাত্র বিজয়নগরের হিন্দু নর-পতিগণ এখানে সার্বভৌমত্বীয় রাজশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু চুরারোহ শিরিসঙ্কট এবং সেই পরাজয়বাসী দুর্ভিক্ষ জাতির আক্রমণ তাহাদিগের সাম্রাজ্যবৃত্তির অন্তরায় হইয়াছিল।

দক্ষিণভারতের প্রাচীনতম ইতিহাসের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই প্রেসিডেন্সী কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদের একের অভ্যুত্থানে অপরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ যে তামিলপ্রদেশকে দ্রাবিড় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাও এক সময়ে পাণ্ডা, চের ও চোলরাজ্যে বিভক্ত ছিল। [ তত্ত্ব শব্দে বিশেষ্যাবরণ দ্রষ্টব্য। ]

মেগেস্থেনিস (খৃঃ পূঃ ৩০০) প্রভৃতি ভারতভ্রমণকারী গ্রীকবাসীর ভ্রমণাখ্যান হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গ, অন্ধ্র ও পাণ্ড্যরাজ্য তৎকালে দক্ষিণভারতে বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অন্ধ্র রাজ্য বর্ত্তমান মাস্ত্রাজ-প্রেসিডেন্সীর উত্তরে এবং কলিঙ্গরাজ্য সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত, কিন্তু ঐ প্রভাবশালী রাজ্যদ্বয় কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। [ অন্ধ্র, কলিঙ্গ ও পাণ্ড্য দেখ। ]

বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের রাজ্যকালে আমরা চোল ও চের- (কেরল) রাজ্যের প্রভাব অবগত হই। সম্ভবতঃ ঐ সামন্ত-রাজ্যদ্বয় পাণ্ড্যরাজ্যের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতাস্বপ্না উদ্ভান করিয়াছিল। [ চোল ও কেরল দেখ। ]

তাহার পর পল্লবরাজবংশের অভ্যুদয় হয়। তাহার মাস্ত্রাজের সন্নিকটে রাজধানী স্থাপন করিয়া মহাপ্রভাবশালী একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। প্রবল-প্রভাপ পল্লবগণের হস্তে কলিঙ্গ ও অন্ধ্ররাজবংশের অধঃপতন ঘটে। পল্লববংশের অবসানে ভারতের পূর্বোপকূল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। [ পল্লব দেখ। ]

পল্লবরাজবংশের সৌভাগ্য্যার্থ্য যখন মধ্যাহ্নগগনে সমুদিত, তখন পশ্চিম চালুক্যরাজ চোল ও পল্লবরাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু চালুক্য-সেনার প্রবলপরাক্রমে ঐ রাজ্যদ্বয় বিপর্য্যস্ত হয় নাই, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পল্লবরাজবংশের অদৃষ্টাকাশ ঘনীভূত হইয়া আইসে। চালুক্যরাজবংশের নিকট পল্লবজাতি পরাজিত হয়। তদবধি ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে পূর্ব-চালুক্যরাজবংশ আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে কাঞ্চী-পুরের পল্লবগণও চালুক্যদিগের হস্তে পরাজিত হয়। শেষোক্ত

চালুক্যরাজবংশীগণ দাক্ষিণাত্যে সাতটি পাগোদা নির্মাণ করাইয়া আপনাদের বংশকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরে এই দাক্ষিণাত্যবাসী পল্লবগণ পুনরায় চালুক্যাদিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনাদের রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১১শ শতকে চোলরাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়ে। চোলরাজ স্বীয় বাহুবলে দক্ষিণ পাণ্ড্যরাজবংশ, কেরলের গঙ্গবংশ এবং সিংহলরাজকে আপনায় অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা পূর্বচালুক্যবংশের অধিকৃত উড়িষ্যা পর্য্যন্ত এবং পল্লবরাজ্যের কতকাংশ স্বীয় রাজ্যসীমায়ুক্ত করিয়া লয়েন।

এইরূপে চালুক্যবংশের অধিকৃত বিস্তৃত রাজ্য ধীরে ধীরে হস্তান্তৃত হইয়াছিল। পঞ্চদশে খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে মাস্ত্রাজের উত্তরস্থিত সমগ্র চোলরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঐ সামন্তরাজগণ একরূপ স্বাধীনভাবেই রাজ্য-শাসন করিতেন। তাঁহারা অহিনিশ পরম্পরে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। মুসলমান-রাজত্ববর্ণ অবস্থা ও স্বেচ্ছাপ বৃদ্ধি দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অগ্রসর হন। একদিকে যেমন মুসলমানগণ দক্ষিণভারতে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি বন্ধপত্রিকর হইয়াছিলেন, অপর দিকে সেইরূপ হোয়সাল বল্লালবংশীয় নরপতিগণ চোল ও কেরল-রাজগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পাণ্ড্য ও গঙ্গরাজ্যে প্রসার বৃদ্ধি করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমে আমরা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজবংশের এইরূপ পরিচয় পাই :— ভারতের সমুদ্রদক্ষিণে একমাত্র পাণ্ড্যরাজবংশের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাছাড়া ও মাস্ত্রাজপ্রদেশে চোলরাজবংশের অন্তিমিত-প্রায় গৌরবরক্ষা ক্ষীণজ্যোতিঃ কিতরণ করিতেছিল। প্রায়ো-দ্বীপের মধ্যাংশে প্রতাপবিশিষ্ট হোয়সাল বল্লালগণ রাজশক্তি দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যসীমার উত্তর-প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। [বল্লাল দেখ।]

এই সকল প্রাচীন রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে তথাকার রাজোপাখ্যানে অলৌকিক প্রবাদ আরোপিত হইয়াছে। সেই সকল আখ্যান বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, তত্ত্ব রাজগণের উৎকীর্ণ শিলালিপি, তাম্রশাসন ও দেবমন্দিরাদিতে ভাস্কর-কীর্ত্তির অপূর্ণ নিদর্শনসমূহ সেই অতীত রাজবংশধরগণের কার্যকলাপের প্রকৃত ইতিহাস জ্ঞাপন করিতেছে।

মুসলমানগণের অভ্যুদয় হইতেই এখানকার ধার্মাবাহিক ইতিহাসের পত্তন হয়। দিল্লীর খিলিজিবংশীয় ২য় সম্রাট আল্লাউল্লার বিখ্যাত সেনানী মালিক কাকুর হোয়সাল বজ্রাশ্বকুলী রাজাকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্য জয় করেন।

তিনি স্বীয় তুজবলে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ দখল এবং পুর্বেপকূলস্থ বাবতীর সামন্তরাজকে পরাজিত করিয়া মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করাইয়া ছিলেন।

[মালিক কাকুর দেখ।]

মুসলমান-সৈন্য দাক্ষিণাত্য হইতে অপহৃত হইলে, বিজয়নগরের হিন্দুরাজবংশ মতকোটোলন করেন। তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের অপরাপর হিন্দুরাজগণকে পরাজিত করিয়া তুঙ্গভদ্রা-তীরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের সৌভাগ্য-মধ্যাগমে সমুদিত ছিল, তখন তাঁহারা প্রায় সমগ্র মাস্ত্রাজপ্রদেশিডেন্দ্ৰীই শাসন করিয়াছিলেন।

[বিজয়নগর দেখ।]

বিজয়নগররাজবংশ ছই শতাব্দী কাল প্রবল প্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়া অবশেষে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের চারিটি মুসলমানরাজবংশের সমবেত চেষ্টায় বিপর্য্যস্ত হয়।

[আদিলশাহী প্রভৃতি মুসলমান রাজবংশ দেখ।]

আফগান মুসলমানগণের পর, মোগল ও মহারাষ্ট্রশক্তি দাক্ষিণাত্যে বিজয়বাহিনী পরিচালিত করে। এই সময় হইতে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীয় রাজবংশসমূহের জাতীয় জীবনের অবসান ঘটে।

মোগল-সম্রাট অরঙ্গজেব কুমারিকা পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই বিজিত-প্রদেশ স্বীয় শাসনভুক্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে, দাক্ষিণাত্যের রাজত্ববর্ণ একে একে স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া উঠেন। সম্রাটের দোদীপ্তপ্রভাবে ভীত হইয়াও তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশে স্বাধীনভাবেই রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি, সম্রাট-প্রতিনিধি নিজামও স্বাধীনতা অবলম্বনে বুদ্ধিত হন নাই। সামন্ত-প্রধান কর্ণাটকের নবাব আর্কট রাজধানীতে থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। তাছাড়া শিবাজী জৈনক বংশধর রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। পাণ্ড্যরাজ্যে মহারাজ নায়কবংশ প্রভূত বিস্তার করিয়াছিল। মধ্য-অধিত্যকাভূমে জৈনক হিন্দুসদর ধীরে ধীরে আপন প্রতিপত্তিবিস্তারে বহুবান্ হইয়াছিলেন। ইহাই পরে মহি-সুররাজ নামে খ্যাত হয়। দাক্ষিণাত্যের রাজত্ববর্ণকে মোগলশক্তির অধীনতাস্বীকারে পরাজুখ দেখিয়া রাজনীতি-কুশল ডুঁগ্রে দাক্ষিণাত্যে ঘুরোপীয় প্রভাব বিস্তারের কল্পনা করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ নাবিক-প্রধান ভান্ডো-দা-গামা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে কালিকটে আসিয়া উপনীত হন। প্রায় শতাব্দের

অধিক কাল পর্তুগীজগণ বলবার উপকূলের বাণিজ্য-প্রবাহ স্ব-হস্তে পরিচালিত করিয়াছিলেন। পর্তুগীজ-প্রভাব তিরোহিত হইলে ১৭শ শতাব্দির আরম্ভে ওলন্দাজগণ পর্তুগীজদিগের তৎকালীন প্রভূত লইয়া বাণিজ্য চালাইবার চেষ্টা পান। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় কালিকটে ও ক্রান্তনুরে আসিয়া বাণিজ্যপরিচালন জন্ত কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তেন্নীচেরীতে ইংরাজের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যভাণ্ডার স্থাপিত হয়। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ঐ কুঠীরক্ষার জন্ত ভূমিলাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজের প্রভাববিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজগণ গোয়া-প্রদেশে এবং ওলন্দাজগণ স্পাইসবীশে গমন করিয়া সাংসারিক বিপ্লব হইতে অবসর গ্রহণ করে।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ মছলীপত্তন বন্দরে এবং কৃষ্ণা-জেলার পেট্রিপোলী (নিজামপত্তন) নগরে আসিয়া করমওল-উপকূলের বাণিজ্যাংশ গ্রহণ করেন। পরে তাঁহারা নেদুর জেলার আর্ম্যাগাঁও বন্দরে কুঠী নির্মাণ করেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে চঙ্গগিরির হিন্দুনরপতির অমুমত্যানুসারে ইংরাজগণ মাস্কাজে আর একটি কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণ পুঁদিচেরী ক্রয় করিয়া লয়। উহার দুইবর্ষ পরে তাহারা এখানে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-ছিল। করমওল-উপকূলের এক্ষণে সন্নিহিত দুইটি বিভিন্ন বণিক-সম্প্রদায় পরস্পরে শান্তভাবে বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বহুকাল বাণিজ্যকাণ্ড পরিচালনা করিয়াছিল। তৎকালে তাহাদের কাহারও মনে রাজ্যভাষা বলবতী হয় নাই।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে যুরোপে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসন লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীতে বিবাদ বাধে। সেই সূত্রে ভারতেও ইংরাজ-ফরাসীতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লা-বোর্দনে মাস্কাজের সেনাবাস আক্রমণ ও অধিকার করেন। সেন্ট-ডেভিড্‌স্‌ দুর্গ ব্যতীত অপর সকল স্থানই ইংরাজের করচ্যুত হয়। কর্ণাটকের নবাব ইংরাজের পক্ষ হইয়া ফরাসীবিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু সেন্ট থোমির যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আরলাশাপেলের (Aix-la-chapelle) সন্ধি অনুসারে ভারতে ফরাসী-ইংরাজের বিসম্বাদ মিটিয়া যায়। মাস্কাজ ইংরাজদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয়, কিন্তু এখান হইতেই এই উত্তম জাতির মধ্যে জাতীয় বিবেকের সূত্রপাত ঘটে। পরস্পরে পরস্পরের হিত্রাঘেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ৭০রাজ্যগুলির সিংহাসনাধিকার লইয়া বিভিন্ন ব্যক্তিকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী সন্ধ্যাত করিয়া উত্তরপক্ষে যুদ্ধবিগ্রহাদি

চলিতে থাকে। ইংরাজগণ কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর সহায়তা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অপর পক্ষে ফরাসীগণও আপনাদের নির্জীভিত জনৈক যুদ্ধপুরুষকে হায়দরাবাদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া ফরাসীপক্ষে বলসংকর করিয়াছিলেন।

এইরূপে অসংখ্য বিপ্লব ও যুদ্ধের দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস বিশেষরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। অবশেষে ফরাসী-রাজ-নৈতিক ডুঁপ্লের অভ্যুদয় হয়। ইনি কিছুদিনের জন্ত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলির রাজকীয় মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহার আদেশ বা পরামর্শ ব্যতীত দেশীয় রাজনামগণ খেজার কোন কাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। যখন তাঁহার সামর্থ্য ও মৌভাগ্য শীর্ণহানে আরোহণ করে, সেই সময়ে ইংলণ্ডের বীরপুত্র ক্লাইব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিরূপে মাস্কাজে অবস্থান করিতে-ছিলেন। আর্কটের ভীষণ যুদ্ধে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি ধ্বংসপূর্ণ বীর্যে ইংরাজপক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম ইতিহাসে অক্ষর রহিবে।

ক্লাইবের এই বিজয়ই ভারতীয় ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। ডুঁপ্লের কূটনীতিকৌশলে দাক্ষিণাত্যে এতদিন ফরাসীর ইজিতে পরিচালিত হইত, এই যুদ্ধাবসানের পর হইতেই তাহা ইংরাজ-কৌশলে পরিবর্তিত হইয়াছিল। ডুঁপ্লের বুদ্ধিবিপর্যয়ই এই অনিষ্টের মূল জানিয়া ফরাসীসভা তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে অমুমতি করেন। শালী ও বুসি নামক সেনানীহয় তাঁহার পদ লাভ করিয়া ভারতে উপনীত হইলেন। তাঁহারা যুদ্ধবিজ্ঞান বিশেষ পারদর্শী হইলেও ডুঁপ্লের ন্যায় নীতিজ্ঞ ছিলেন না। কাজেই তাঁহারা বিশেষ সন্দেহভার সহিত রাজকাণ্ডে পর্যালোচনা করিতে পারেন নাই।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল কুট বন্দিবাসের যুদ্ধে লালীকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে ইংরাজপ্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া-ছিলেন। এই যুদ্ধের পর হইতেই ফরাসীশক্তি হতবল হইতে থাকে। পরবর্তিবৎসরে মহিমুররাজের সাহায্য ব্যতিরেকে ইংরাজগণ পুঁদিচেরী অধিকার করেন। তদবধি দেশীয় রাজত্ব-গণের ক্ষয় হইতে ফরাসীর বিরক্তিকর অনধিকারচর্চার ভয় অপসারিত হয়।

অতঃপর যদিও ইংরাজগণকে আর যুরোপীয় শক্তির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয় নাই, তথাপি মহিমুরের উন্মত্ত মুসলমানগণের সংঘর্ষে তাঁহাদের বিশেষরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। মহিমুররাজ হায়দার ও তৎপুত্র টিপুসুলতানের যুদ্ধে ইংরাজগণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎকালে

তাহার মহিসুর হইতে কর্ণাটক পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ এবং ইংরাজদুর্গের সমুখপ্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হায়দারের সহিত ইংরাজের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ২য় যুদ্ধে ইংরাজ-সেনানী বেলী হায়দার কর্তৃক কাকীপুরের নিকট বন্দলে নিহত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে টিপু মলবার-প্রদেশ হইতে ইংরাজদিগকে কিছুদিনের জন্ত তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

কাকীপুরের সেই বিপদবার্তা শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালার শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস সেনানী কুটিলে সদলে মাস্ত্রাজে প্রেরণ করেন। পোটেনভোর যুদ্ধে উভয়পক্ষে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। অবশেষে হায়দার পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। তদবধি হায়দার আর ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ তাহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র টিপু সিংহাসন লাভ করেন। ইহার দুই বর্ষ পরে মঙ্গলুরের সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষে আপনাপন অধিকৃত স্থান পুনঃপ্রাপ্ত হন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উভয়পক্ষ কোন-রূপ শান্তিভঙ্গ করেন নাই। অতঃপর টিপুহলতান ত্রিবাঙ্কোড় লুণ্ঠন করিলে, লর্ড কর্ণওয়ালিস সসৈন্তে তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গলুর দুর্গ অধিকার করেন। পরবর্ষে টিপু পুনরায় পরাজিত হইয়া অন্ধ্ররাজ্য হারাইতে বাধ্য হন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তিনি ইংরাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ত্রীয়ঙ্গপত্তন অবরোধকালে স্থলতানের মৃত্যু ঘটে। ইহাই ইতিহাসে ৪র্থ মহিসুরযুদ্ধ নামে খ্যাত।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ১৯শ শতাব্দির প্রারম্ভ হইতে এখানে আর প্রকৃত যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। এতৎপ্রদেশ ইংরাজরাজ্যের অধিকৃত হইলেও পলিগার-সদ্বারগণ স্বাধীনতারক্ষায় যত্নবান্ হন। পশ্চিম-উপকূলে দুর্দ্বার নারর ও মাপিলা জাতির বিদ্রোহে উভয়পক্ষে অসংখ্য নরহত্যা সাধিত হইয়াছিল। উত্তরসীমান্তবর্তী গঞ্জাম ও বিশাখপত্তনের পার্শ্বপ্রদেশবাসিগণও বিদ্রোহিতাচরণ করে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গুম্ফুরের সর্দার বিদ্রোহী হইলে, তদ্রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হয়। এই ঘটনার তদানুসন্ধানে নিযুক্ত ইংরাজ কর্মচারিগণ খন্দজাতির মধ্যে নরবলিপ্রথা দেখিতে পান। ইংরাজ-রাজ্যের যত্নে সেই 'মেরিয়া' উৎসব নিবারিত হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরসীমান্তবর্তী রামপা প্রদেশের অধিবাসিগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ইংরাজ-সৈন্তের গুলির আঘাতে অসংখ্য বিদ্রোহিদল শমনের শাস্তিময় ক্রোড়ে চির নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল।

ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় কিরূপে ধীরে ধীরে মাস্ত্রাজ-প্রেসি-ডেন্সার স্থানগুলি অধিকার করিয়াছিল, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।—১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর্কটের নবাবের নিকট হইতে মাস্ত্রাজনগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ প্রাপ্ত হন। উহা এক্ষণে চেন্নলপং জেলা বা কোম্পানীর জায়গীর নামে খ্যাত। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর মোগল-সম্রাটের নিকট হইতে গঞ্জাম, বিশাখপত্তন, গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেলা (বাহা তৎকালে উত্তরসরকার নামে প্রসিদ্ধ ছিল) প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইংরাজরাজ আপনার রাজশক্তি অবিচলিত রাখিবার জন্ত নিজামের নিকট হইতে ৭ লক্ষ টাকা করদানে ঐ সম্পত্তির আর একটি ছাড় লিখিয়া লন। ইংরাজের চেষ্টায় ফরাসীগণ এস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজেরা এখানকার পূর্ণাধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপুহলতান বড়ামহল, মলবার, ডিওগল, পল্লি ও কঙ্গুণ্ডী তালুক ইংরাজ করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুর মৃত্যুর পর, মহিসুর রাজ্যের পুনর্গঠনসময়ে, কোয়খাতোর, নীলগিরি-মালা, মালেম (বড়মহল ব্যতীত) ও দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার কতকাংশ ইংরাজরাজ্যের হস্তগত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষে তাঞ্জোররাজ্য রাজ্যশাসন-ভার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার বংশধরগণ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নামমাত্র রাজা ছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সাহায্যকারী সেনাদলরক্ষার জন্ত হায়দরাবাদের নিজাম অনন্তপুর, কর্ণুল, বেল্লারী ও কড়াপা জেলা ইংরাজরাজকে দান করেন। পরবৎসরে তিনি নেল্লুর হইতে তিনেবল্লী পর্য্যন্ত কর-মণ্ডল উপকূলস্থ কর্ণাটক নবাবের অধিকৃত রাজ্য ইংরাজ করে প্রত্যর্পণ করেন। তৎকালের শেষ নবাব ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন, কিন্তু রাজ্যশাসনে তাহার কোন ক্ষমতাই ছিল না, তিনি নামে মাত্র নবাব উপাধিধারী ছিলেন। তৎকালীয় প্রধান ব্যক্তি নবাব অব-আর্কট উপাধিতে ভূষিত এবং মাস্ত্রাজ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণুলের নবাব স্বীয় উচ্চ-শাসনদোষে রাজ্যচ্যুত হন এবং তদ্রাজ্য ইংরাজরাজ্যের খাস শাসনভুক্ত হয়।

দেশীয় সামন্তরাজগণের মধ্যে মহিসুররাজ সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ স্বহস্তে মহিসুরের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এই জনপদ দেশীয় হিন্দুরাজার হস্তে সমর্পিত হয়, কিন্তু ইংরাজ রাজকর্মচারীর পরামর্শ ব্যতীত শাসনসম্পর্কীয় কোন কার্যই নির্বাহ করিবার ক্ষমতা নাই। ত্রিবাঙ্কোড় ও কোচিনের হিন্দুরাজ্য ইংরাজের কর্তৃত্বধীনে

সিদ্ধান্তিত। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজ্যের সামন্তবর বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহবশবশতের পর আর এখানে কোনরূপ উপদ্রব সংঘটিত হয় নাই। পটুকোটীর ভৌগোলিক-সম্ভার দাক্ষিণাত্যের সুদূরপ্রসারিত ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তৎপরে এই রাজ্য ইংরাজের সহিত মিত্রতাবন্ধে আবদ্ধ আছে। রঙ্গনগরী ও সন্দুররাজ্যও ইংরাজরাজের তত্ত্বাবধানে চালিত হইয়া থাকে। জয়পুর, বিজয়নগর, পারলা কিমেদি, পিটু-পুর, বেড়টগিরি, রামনাথ ও শিবগঙ্গা প্রভৃতি স্বাধীন সামন্তরাজ্য না হইলেও এক একটা বিস্তৃত জমিদারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এই প্রেসিডেন্সী মধ্যে গঙ্গাম, বিশাখপত্তন, গোদাবরী, কৃষ্ণা, নেল্লুর, কড়াপা, কর্ণুল, বেল্লরী, অনন্তপুর, চেন্নলপৎ, উত্তর ও দক্ষিণ আর্কট, তাজোর, ত্রিচীনপল্লী, মদুরা, তিম্মে-বল্লী, সালেম, কোয়ম্বাতোর, নীলগিরি, মলবার, দক্ষিণ-কাণাড়া ও মাদ্রাজ সহর নামক ২২টা জেলা, ত্রিবাঙ্কোড়, কোচীন, বঙ্গনপল্লী, পটুকোটী ও সন্দুর নামক ৫টা সামন্তরাজ্য এবং গঙ্গাম, বিশাখপত্তন ও গোদাবরীর এজেন্সী বিভাগ আছে। ঐ সকল স্থানের হু-পরিমাণ ১৪৯০৯২ বর্গ মাইল।

[ বিস্তৃত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

এই বিস্তীর্ণ রাজ্যখণ্ডে নানা জাতীয় লোকের বাস আছে, তন্মধ্যে নম্বুরীজাতি ও ক্ষত্রিয়গণ উচ্চ শ্রেণী, শেঠী, মারবাড়ী প্রভৃতি বৈশ্যগণ মধ্যশ্রেণী এবং বেলমা, বেল্ললর, নায়র, নডুবর, ইন্দোয়ার, গোলা, নায়ক, কোনকন, কুশাবন, মালা (পরিষা), হোলিরা, পলিয়ার, মাপিলা, শবর, তোড়া, করুচর, বুজ্জার, লম্বড়ি প্রভৃতি নানা শূদ্র ও অনার্যজাতির বাস আছে। উহারা সাধারণতঃ তামিল, তেলগু, মলয়ালম্, কণাড়ী, তুলু ও মরাঠী প্রভৃতি ভাষায় কথা বলে। দ্রাবিড়ীয় অনার্যজাতির মধ্যে অনেকেই হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কতকাংশে হিন্দুর জায় আচারসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-মাত্রেরই শৈব বা বৈষ্ণব। পার্শ্বতাজাতির অধিকাংশই লিঙ্গায়ত। এখানে বহু প্রাচীন কাল হইতেই খৃষ্টানধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এখানকার সিরীর মিসনরীগণ বলেন যে, এপসল্ সেন্ট টমাস্ হইতে এখানে খৃষ্টধর্মের প্রচার হয়। কোচীন হইতে প্রাপ্ত একখানি আদিরসীয় ভাষায় লিখিত ৮ম শতাব্দির বাইবেল-গ্রন্থ কেথ্রুজের ফিট্জ উইলিয়ম্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। লিটল্ মাউন্ট নামক 'শৈলোপরিষদ' প্রাচীন সীজ্জার পল্লবী-ভঙ্গার উৎকর্ষ একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সন্ধিকীর বা নেটোরির খৃষ্টানগণ বহু শতাব্দী পূর্বে হইতে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

মহাত্মা ক্রািস্ জেভিয়ার, নবিলিয়ার, দেলকি, কোম্বাটুর্, জিনিজি, সুলটুর্, সটোরিয়ার, ওকাত্রিকাস প্রভৃতি এলিফা ধর্মপ্রচারকদিগের যত্নে এখানে খৃষ্টধর্মের বিস্তৃতি হইয়াছিল। লুথার মতামুসারী দিনেমারগণ ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে এবং ইংরাজগণ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথমে এখানে ধর্মপ্রচারার্থ উপনীত হন। তৎপরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খৃচ্, আমেরিকান ও ইংরাজ-মিসনারীগণ এখানে ধর্মপ্রচারকমে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন।

খাভোপযোগী খাদ্যাদি এবং ব্যবহারোপযোগী সরিষাদি শস্য ব্যতীত এখানে ইংরাজ-কর্মচারীদিগের যত্নে প্রভূত পরিমাণে কফি, চা, তামাক (দোক্তা), সিন্কেনা প্রভৃতির চাষ হইতেছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সৈদাপেট নগরে রবমেন্টের গোলাবাড়ী স্থাপিত হয়। বিশেষ যত্নের সহিত ঐ স্থানে কেরোলিনার খাদ্য হইতে উৎপন্ন তেল, নিউওলিঙ্গের তুলা এবং বিহারের ইক্ষু প্রভৃতির চাষ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য ঐ বাগিচায় কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে জলাভাবপ্রযুক্ত এখানে শস্তের হানি হয়। ক্রমে রাষ্ট্রসর হুর্ভিক্ষের হুচনা দেখা যায়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণানদীতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমগ্র জেলাগুলিতেই হুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপ লক্ষিত হইয়াছিল। তুলভঙ্গার দক্ষিণস্থ বেল্লরী, অনন্তপুর, কর্ণুল, কড়াপা, নেল্লুর, উত্তর আর্কট ও সালেম জেলায় হুর্ভিক্ষ রাকসী শৈশাচিক প্রতিমূর্তিতে বীভৎস নৃত্য করিয়া ছিল। এই হুর্ভিক্ষপীড়নে শত শত লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

জলাভাব নিবারণের জন্য ইংরাজগণ নদী প্রভৃতি হইতে খাল কাটিবার ব্যবস্থা করেন। ক্রমে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে গোদাবরীর 'ব' দ্বীপাংশে আনিকট প্রস্তুত করিয়া তথাকার খালসমূহে জল দিবার ব্যবস্থা হয়। তৎপরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পেল্লুর আনিকট ত্রিবৈকুণ্ঠ আনিকট, সঙ্গম আনিকট, পালার আনিকট, পেল-স্তোরই আনিকট এবং কৃষ্ণা, কাবেরী ও কর্ণুলের বিস্তীর্ণ খাল-সমূহ নিশ্চিত হয়। এতদ্বির ডেম্‌ব্রকম ও বরুড়ের দীর্ঘিকাও স্থানীয় লোকের কৃষি ও বাগিচার উপকারার্থ কাটা হইয়াছিল।

শস্তাদি ব্যতীত, এখানে নীল, কফি, সিনকোনা, আত্ম-চিনি, লবণ এবং মছলীপত্তন, মাদ্রাজ ও মঙ্গুরে কাপাস বস্ত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাগিচার সুবিধার ভিত্তি এখানে রেলপথ বিস্তৃত আছে। পূর্বে জাহাজ করিয়া বাঙ্গালার সহিত মাদ্রাজের বাণিজ্যকার্য্য মিকাহ হইত। এক্ষণে ইষ্ট-কোষ্ট, সাউথ ইণ্ডিয়ান, মহিন্দুর ষ্টেট, নীলগিরি রিভি, মরাঠা সিস্টেম, বঙ্গলুর-গুজি প্রভৃতি রেলপথের বিস্তার হওয়ার



এখানকার পণ্যস্রব্য কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন রাজধানীতে আনীত হইতেছে।

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-বণিকৃদিগের কুঠী স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত মাস্ত্রাজ ব্যবসায়ের বাণ্টায়ের কার্যাব্যাহারগণের অধীন ছিল। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ আরণ্ণ বেকার এখানকার কুমির এজেন্ট ছিলেন। উক্ত বর্ষে ইহা প্রেসিডেন্সীরূপে পরিগণিত হওয়ার তিনি মাস্ত্রাজের প্রথম গবর্নর হইয়াছিলেন। ১৬৫৮ হইতে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার ইংরাজ-কুঠী মাস্ত্রাজের অধীন ছিল। নবাব সিরাজের অকল্পিত্যার সময় ক্লাইব ও ওয়াটসন মাস্ত্রাজ হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন।

মাস্ত্রাজ ইংরাজাধিকারে আসিবার পর যে সকল ইংরাজ-প্রতিনিধি এখানকার শাসনকার্য নিরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ আরণ্ণ বেকার	...	...	১৬৫৩ খৃঃ অঃ
২ টমাস্ চেম্বার	...	...	১৬৫২ "
৩ এডওয়ার্ড উইন্টার	...	...	১৬৬১ "
৪ জর্জ ফক্সক্রফট	...	...	১৬৬৮ "
৫ উইলিয়ম ল্যাংহরণ	...	...	১৬৭০ "
৬ জন্সনাম মাঠার	...	...	১৬৭৮ "
৭ উইলিয়ম গিফোর্ড	...	...	১৬৮১ "
৮ এলিছ ইয়েল	...	...	১৬৮৭ "
৯ নাথানিএল হিগিন্সন্	...	...	১৬৯২ "
১০ টমাস্ পিট্	...	...	১৬৯৮ "
১১ গলষ্টন্ এডিসন	...	...	১৭০৯ "
১২ এডমন্ড মন্টেগ্	...	...	১৭০৯ "
১৩ উইলিয়ম ফ্রেডার	...	...	১৭০৯ "
১৪ এডওয়ার্ড হারিসন	...	...	১৭১১ "
১৫ যোসেফ কোলেট	...	...	১৭১৭ "
১৬ ফ্রান্সিস্ হেষ্টিংস	...	...	১৭২০ "
১৭ নাথানিএল ওলবিচ	...	...	১৭২১ "
১৮ জেমস্ ম্যাক্রে	...	...	১৭২৫ "
১৯ জর্জ মর্টন পিট্	...	...	১৭৩০ "
২০ রিচার্ড বেন্‌মোন্	...	...	১৭৩৫ "
২১ নিকোলাস্ মন্	...	...	১৭৪৩ "

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর মাস্ত্রাজ ফরাসীদিগের অধিকৃত হওয়ার, ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের সহকারী শাসনকর্তা মিঃ জন্ হিওে কিছুকালের জন্য এখানকার ইংরাজগণের শাসনকার্য গ্রহণ করেন।

২২ টমাস্ ক্লোয়ার	...	...	১৭৪৭ খৃঃ অঃ
-------------------	-----	-----	-------------

২৩ টমাস্ সওাস' ... ... ১৭৫০ খৃঃ অঃ

আইলা-সাপেলের সন্ধির পর, মাস্ত্রাজ ইংরাজহস্তে প্রত্যর্পিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহার চারি বৎসর পরে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল, মাস্ত্রাজনগরে ইংরাজ গবর্নমেন্টের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

২৪ লর্ড পিগট	...	...	১৭৫৫ খৃঃ অঃ
২৫ রবার্ট পক্ষ	...	...	১৭৬৩ "
২৬ চার্লস বুক্‌রার	...	...	১৭৬৭ "
২৭ জোসিয়া ডু প্রোঁ	...	...	১৭৭০ "
২৮ আলেকসান্দার বিঞ্চ	...	...	১৭৭৩ "
২৯ লর্ড পিগট (২য় বার)	...	...	১৭৭৫ "
৩০ জর্জ ট্রাটন	...	...	১৭৭৬ "
৩১ জনহোয়াইহিল	...	...	১৭৭৭ "
৩২ টমাস্ রাফোর্ট	...	...	১৭৭৮ "
৩৩ জন হোয়াইহিল (২য় বার)	...	...	১৭৮০ "
৩৪ চার্লস স্মিথ	...	...	১৭৮০ "
৩৫ লর্ড মার্টিনে	...	...	১৭৮১ "
৩৬ আলেকসান্দার ডেভিড্‌সন	...	...	১৭৮৫ "
৩৭ আর্কিবল্ড কাষেল K. B.	...	...	১৭৮৬ "
৩৮ জন হল্ড	...	...	১৭৮৯ "
৩৯ এডওয়ার্ড হল্ড	...	...	১৭৯০ "
৪০ মেজর জেনারল উইলিয়ম মিডোজ্	...	...	১৭৯০ "
৪১ চার্লস্ ও কেলি	...	...	১৭৯২ "
৪২ লর্ড হোবার্ট	...	...	১৭৯৪ "
৪৩ সেনাধ্যক্ষ জর্জ হারিস্	...	...	১৭৯৮ "
৪৪ লর্ড ক্লাইব	...	...	১৭৯৮ "
৪৫ লর্ড উইলিয়ম বেক্টক	...	...	১৮০৩ "
৪৬ উইলিয়ম পেট্রি	...	...	১৮০৭ "
৪৭ জর্জ হিলারো বালোঁ K. B.	...	...	১৮০৭ "
৪৮ সেনাধ্যক্ষ জন এবারক্রফ্	...	...	১৮১৩ "
৪৯ রাইট অনারবল হুগ এলিয়ট	...	...	১৮১৪ "
৫০ টমাস্ মনরো K. C. B.	...	...	১৮২০ "
৫১ হেন্রি সুলতান গ্রীমি	...	...	১৮২৭ "
৫২ টিফেন্ রাফোর্ট লুসিংটন	...	...	১৮২৭ "
৫৩ ফ্রেড্রিক্ এডাম K. C. B.	...	...	১৮৩২ "
৫৪ জর্জ এডওয়ার্ড রামেল	...	...	১৮৩৭ "
৫৫ লর্ড এলকিংটোন্	...	...	১৮৩৭ "
৫৬ মাইক্‌ইস্ অব্ টুইডডেল C. B.	...	...	১৮৪২ "
৫৭ হেন্রি ডিকিন্সন	...	...	১৮৪৮ "



৫৮ হেনরি পটিলার G.C.B. ...	... ১৮৪৮ খৃঃ অব্দ
৫৯ দানিয়েল এলিয়ট ...	... ১৮৫৪ "
৬০ লর্ড হেরিস ..	... ১৮৫৪ "
৬১ চার্লস এডওয়ার্ড ট্রিলেয়ার K.C.B. ...	... ১৮৫২ "
৬২ উইলিয়ম আন্ড্রুজ মোরহেড্ ...	... ১৮৬০ "
৬৩ হেনরি জর্জ ওয়ার্ড G.C.M.G. ...	... ১৮৬০ "
৬৪ উইলিয়ম আন্ড্রুজ মোরহেড্ (২য় বার) ...	... ১৮৬০ "
৬৫ উইলিয়ম টমাস ডেনিসন K.C.B. ...	... ১৮৬১ "
৬৬ এডওয়ার্ড মন্টেবি ...	... ১৮৬৩ "
৬৭ লর্ড নেপিয়ার অব মার্চিষ্টোন ...	... ১৮৬৬ "
৬৮ আলেকসান্ডার জন আবুধনাট C.S.I. ...	... ১৮৭২ "
৬৯ লর্ড হোবার্ট ...	... ১৮৭২ "
৭০ উইলিয়ম রোজ রবিন্সন ...	... ১৮৭৫ "
৭১ ডিউক অব বাকিংহাম ও চান্সাস্ ...	... ১৮৭৫ "
৭২ রাইট অনারেবল উইলিয়ম পাট্রিক আদম ...	... ১৮৮০ "
৭৩ উইলিয়ম হাড্‌লটন C.S.I. ...	... ১৮৮১ "
৭৪ মনটুয়ার্ট এলকিটোন গ্রাণ্ডিডাক্ C.I.E. ...	... ১৮৮১ "
৭৫ আর বর্ক ..	... ১৮৮৬ "
৭৬ গার্ডিন্ C.S.I. ...	... ১৮৯০ "
৭৭ লর্ড ওয়েনলক ...	... ১৮৯১ "
৭৮ স্যর এ, ই, হাবলক্ ...	... ১৮৯৬ "
৭৯ লর্ড এমথিল ...	... ১৯০০ "

মাস্ত্রাজ (নগর), তদানীন্তন প্রেসিডেন্সীর রাজধানী। অক্ষা-  
১০°৪'৬" উঃ এবং দ্রাঘি-৮০°১৭'২২" পূঃ। সমুদ্রোপকূলে  
প্রায় ২৭ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই নগর অবস্থিত। এই  
নগরের নামনিরুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত প্রকাশ  
করিয়াছেন। কেহ কেহ মওরাজ বা মওলরাজ শব্দ  
হইতে, কেহ বা মাস্ত্রাঙ্গা শব্দ হইতে মাস্ত্রাজ-নামের উৎপত্তি  
করনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ মহাত্মারত্ন  
মদ্র বা মাস্ত্রদেশ হইতে এই রাজ্যের নামাঙ্করণ স্বীকার  
করিয়াছেন। নায়কসদার চেরম্পোর নামে উহার চেরপত্তন  
নাম হয়। ঐ সময়ে ইহার মাস্ত্রাজপত্তন নামও পাওয়া যায়।

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে আর্মিগাও কুঠীর অধ্যক্ষ মিঃ জ্যাকিন্স ডে  
বিজয়নগররাজ-বংশাবতংস চন্দ্রগিরির অধিপতি ত্রীশরায়-  
লুর নিকট হইতে বাণিজ্য করিবার অতিপ্রায়ে বে ভূমিলাভ  
করেন, তদুপরেই বর্তমান মাস্ত্রাজ সহর গঠিত হইয়াছে।  
ভূমিদান পাইয়া ইংরাজ-বণিকগণ গড়পরিখাদি দ্বারা  
সুরক্ষিত একটা কুঠী নির্মাণ করান। তদবধি ইহার প্রাচীর-  
বহির্ভাগে দেশীয় লোকের বসবাস আরম্ভ হয়।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা বাণ্টাঘের অধ্যক্ষের কুঠীন  
আঁকে। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অরঙ্গজেবের সেনাদ্বী দাউদ খাঁ  
ক একবৎসর এই নগর অবরোধ করিয়া রাখে। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে  
মহারাষ্ট্ররগণ মাস্ত্রাজ আক্রমণ করে বটে, কিন্তু বিজিত  
প্রদেশ অধিকদিন রক্ষা করিতে পারে নাই। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে  
মাস্ত্রাজদুর্গের সংস্কার ও আরতন পরিবর্তিত করা হয়।

দাউদ খাঁর আগমনের পূর্বাঙ্কেই ইংরাজ-বণিকগণ ১৬৮৪  
খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রাচীর-বেষ্টনীর দ্বারা সুরক্ষিত করিবার  
জন্ত প্রজাবর্গের নিকট হইতে করসংগ্রহে চেষ্টা পান। এই  
অবস্থা করনির্দ্ধারণে তদদেশবাসিগণ বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী  
হয়। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে প্রজাবর্গকে মোগলসেনানীর আগম-  
নাশকা জানাইয়া পুনঃ করসংগ্রহপূর্বক ব্রাক টাউন নগরের  
বহির্ভাগ মুংপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে  
মোগলসৈন্তের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত ঐ  
প্রাচীর সূদৃঢ় করণার্থ পুনরায় কর আদায় করা হয়। তাহার  
ফলে, নগরের উত্তর ও পশ্চিমপার্শ্ব ১১টী বুরুজযুক্ত পাকা  
প্রাচীর দ্বারা ঘেরা হইয়াছিল। এখনও সেই ধ্বংসাবশিষ্ট  
প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হয়। বুরুজগুলিতে পুলিশের এক একটা  
খানা আছে।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-সেনানী লা-বোর্ডোনে' মাস্ত্রাজদুর্গে  
গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গাধিকার করে। উহার দুই বৎসর পরে  
আইলাসাপেলের সন্ধি-অনুসারে মাস্ত্রাজদুর্গ ইংরাজকরে সম-  
র্পিত হইলেও ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহারা এখানকার শাসন-  
ভার প্রাপ্ত হন নাই। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-সেনানী লালী  
পুনরায় ব্রাকটাউন ও দুর্গ অবরোধ করেন। ঐতিহাসিক অর্থে  
এই অবরোধের প্রকৃত বিবরণ স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া  
গিয়াছেন। ১৭৬৯ ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দার-সৈন্তের মাস্ত্রাজ  
আক্রমণ বাতীত' ফরাসী-অবরোধের পর এ নগরে আর কোন  
বহিঃশত্রু প্রবেশ করিতে পারে নাই।

সেন্টথোমি নগর এক্ষণে মাস্ত্রাজনগরের সীমাত্ত  
হইয়াছে, তাহা, ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ বণিকদিগের দ্বারা  
স্থাপিত ও দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত হয়। ১৬৭২—৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত  
উহা ফরাসীর অধিকারে থাকে। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে জুলফকার  
খাঁ এই স্থান লুণ্ঠন করেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিক-  
সমিতি উহা অধিকার করিয়া ফরাসী-ধর্মযাজকদিগকে এখান  
হইতে তাড়াইয়া দেন।

মাস্ত্রাজনগর প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম ব্রাক টাউন  
বা দেশীয় লোকের বাসভূমি, কুউম নদীর উত্তরতীরে অব-  
স্থিত। এই নগরভাগের সমুদ্রতীরে বাণিজ্যপোতরক্ষার

জন্ম একটি বন্দর নির্মিত হইয়াছে। এখানে বাক, কাঠাম হাউস, হাই-কোর্ট ও নওবাগরী আফিসসমূহ বিদ্যমান আছে। ২৪ হোরাইট, টাউন—১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সিং ডে কর্তৃক কোর্ট সেন্ট জর্জ, ইংরাজবণিকবিশেষ কুঠী এবং বাসভবনসমূহ বেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সেই ইংরাজবালাংশ হোরাইট-টাউন নামে পরিচিত হয়।

এখানকার অটালিকার মধ্যে ক্যাথিড্রাল, স্কুল, কাক, গবর্ণমেন্ট-প্রাসাদ, পটচিপা হল, মেমোরিয়াল হল, সেনেট হাউস, কর্ণটক মন্দির চেপাক প্রাসাদ প্রভৃতি দেখিবার জিনিস। মাক্কাভের সেন্ট মেরী গির্জা ভারতে খৃষ্টান-ধর্ম-মন্দিরের প্রথম প্রতিষ্ঠা। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে উহার নির্মাণকায সমাধা হয়। এই সর্বপ্রধান খৃষ্টধর্ম-মন্দিরে ধর্মবাক্য কোয়ার্টার এবং সন্টমাস মন্দির, সুরহেন্দী ওয়াড, লড হোবার্ট প্রভৃতি শাসনকর্তৃগণের সমাধি হইয়াছে।

এখানে ১৭৪৬, ১৭৮২, ১৮০৭, ১৮১১, ১৮৭২, ১৮৭৪, ১৮৭৭ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্নানক বড় হয়। ঐ বড় অসংখ্য জাহাজ, নৌকা ও লোকসংখ্য হইয়াছিল। শেষোক্ত বড় মাক্কাভের নতুন বন্দর নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মান্দ্য (ক্কা) মন্দ্য ভাবঃ কর্ম বা মন্দ- (পতাস্তপুরোহিতা-দিভ্যো যক্। পা ৪।১।১২৮) ইতি যক্। ১ রোগ। ২ মন্দতা।

“বিশ্বে চ ততস্তস্মিন্ পুরোধসি চকার সঃ।

মান্দ্যমন্তরারাহারকৃণীকৃতততস্মৃষা ॥” (কথাসরিৎ ২৪।১৩৫)

মাক্কাতাপুর (ক্কা) প্রাচীন নগরভেদ।

মাক্কাত্ (পুং) মাং ধাতুতীতি ধেট-ত্। যুবনাখ-রাজপুত্র।

ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—স্ব্যং-বংশীয় রাজা যুবনাখের পুত্র না হওয়ারতিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া মুনিগণের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে মুনিগণ দয়াপরবণ হইয়া তদীয় পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞারম্ভ করেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞ নিবৃত্ত হইলে মুনিগণ মন্ত্রপূত জলকলস বেদীমধ্যে রাখিয়া শয়ন করেন। ঋষিগণ মিশ্রিত হইলে রাজা যুবনাখ অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া জলপানের জন্য মুনিগণকে না আগাইয়া ঋষিগণ কর্তৃক রক্ষিত সেই মন্ত্রপূত জল পান করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ জাগ্রিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে এই মন্ত্রপূত জল পান করিয়াছে, এই জল পান করিলে যুবনাখপত্নী পুত্র প্রসব করিবেন, এই জল তাঁহারই জন্য ছিল।” রাজা যুবনাখ ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি না জানি। শিলাসাকুর হইয়া এই জল পান করিয়াছি।

এই মন্ত্রপূত জলপ্রভাবে রাজা যুবনাখের গর্ভ হইল।

কালক্রমেই গর্ভ প্রতিদিন বর্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞসময়ে নৃপতির দক্ষিণকৃকি ভেদ করিয়া রালক নিষ্কাশিত হইল। কিন্তু ইহাতে রাজার কোনরূপ অনিষ্ট হইল না। কৃকিভেদ করিয়া এই বালক মিষ্ণাক্ত হইলে, ঋষিগণ বলিলেন, কাহার শুভাদি পান করিয়া এই বালক জীবিত থাকিবে। অবশ্য দেবরাজ ইন্দ্র তথায় আগমন করিয়া কহিলেন, এই বালক আমাকে ধারণ করিবে, অর্থাৎ আমার সাহায্যে জীবিত থাকিবে, এই কারণে ইহার নাম ‘মাক্কাত্’ হইবে।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ঐ বালকের মুখে প্রদেখিনী অমূল্য প্রদান করিলেন। বালক ঐ অমূল্য চুষিতে লাগিল। ঐ অমৃতস্রাবিণী অমূল্য প্রাপ্ত হইয়া বালক এক দিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বালক মাক্কাত্ চক্রবর্তী ভূপাল হইয়া সমুদ্রীপা পৃথিবী ভোগ করেন। এই মাক্কাত্ লব্ধ একটা শ্লোক আছে, তাহা এই—

“বাবৎ সূধ্য উদেতি স্র বাবচ্চ প্রতিভিষ্ঠতি।

সর্বং তৎ যোবনাখম্ মাক্কাত্ঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥” (বিষ্ণুপুঃ ৪।২ অঃ)

সূধ্যদেব বেধান হইতে উদিত ও বেখানে অন্তর্মিত হন, তাহার অন্তর্গত সমুদ্র স্থলই যুবনাখবংশীয় রাজা মাক্কাতার ক্ষেত্র।

মাক্কাত্ শশবিন্দুকন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে পুরুকুংস, অশ্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র ও পঞ্চাশ কন্যা হয়। (বিষ্ণুপুঃ ৪।২ অঃ)

মাক্কাত্ (ত্রি) মাক্কাত্-সম্বন্ধীয়। (পুং) মাক্কাতার বংশধর।

মাক্কাদ (পুং) মাক্কাদের গোত্রাপত্য।

মান্দ্য (ত্রি) মন্দ্যসম্বন্ধীয়।

মান্দ্য (ত্রি) মান্দ্য হি মান-কন্মণি গ্যৎ। ১ অর্জ্য, পূজনীয়, সম্মানের বোধ্য। পর্যায়—পূজ্য, প্রতীক্য, ভগবান, ভট্টারক। ২ প্রার্থনীয়।

“যথা বৈ তরতো মান্দ্যতথা ভূয়োহপি রাঘবঃ।

কৌশল্যাভোহতিরিক্তক মম স্ত্রলবতে বহু ॥” (রামায়ণ)

‘মান্দ্যঃ প্রার্থনীয়ঃ জ্ঞেয়করঃ’ (রামায়ণ) ৩ বিষ্ণু।

(ভারত ১৩।১৭।১০৪) ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭৯)

মান্দ্য (ক্কা) মান্দ্য ভাবঃ য। পূজ্য, সন্তের ভাব বা ধর্ম, সম্মান, পূজা।

মান্দ্যমান (পুং) মন্দ্যমানের গোত্রাপত্য। (যক্ ৭।১৮।২০)

“মান্দ্যমানঃ মন্দ্যমানস্ত পুত্রঃ” (সায়ণ)

(দেশজ) ২ অতিশয় সম্মানবোধ্য।

মান্দ্যব (ত্রি) মন্দ্যবসম্বন্ধীয়।

মাগুবতী (ত্রী) ১ মানমীয়া। ২ রাজকম্পাত্তদ।

মাগুবহান (ত্রী) মাগুবহানং। পূজারকারণ।

“বিত্তং বহুবধঃ কৰ্ম বিত্তা ভবতি পঞ্চমী।

এতানি মাগুবহানানি গরীয়ে বদ্বহন্তরম্ ॥

পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবতি চ।

যত্র স্ত্র্যঃ দোহত্র মানার্থঃ শূদ্রোহপি দশমীঃ গভঃ ॥”

(মহু ২ অ০)

ধন, ব্রহ্মদ, বয়স, কৰ্ম এবং বিত্তা এই পাঁচটা পূজ্যহান অর্থাৎ পূজার প্রতি কারণ, বীহাদের এই সকল আছে, তাঁহাই পূজ্যমীয়া। এই পাঁচটার মধ্যে পর পর গুণ প্রধান, ইহাদের মধ্যে একমাত্র বিত্তাই সর্বাঙ্গেক্ষেপ্ত।

মাগু (ত্রী) মাগু-ত্রিয়াং টাপ্। ১ পূজ্যমীয়া। ২ মরুগালা।

“ঐনির্মাত্তা ভু মাগু চ মরুগালা চ মোহমা।” (শকমালা)

মাগু (দেশজ) ১ ওজন, পরিমাণ। ২ ক্ষমাকরণ।

মাগুজোক (দেশজ) জরিপকরণ।

মাগুত্যা (পুং) মা বিত্ততে অপত্যমন্ত। কামদেব। (হলায়ুধ)

মাগুন (পুং) মাগুয়তি স্বর্ণাদিকমনেনেনি মা-গিচ্-করণে

লুট্। ১ তুল। (শকচজিকা) (ত্রী) ২ পরিমাণ। পরিমাণ-

করণ, ভোলকরণ। ত্রিয়াং টাপ্।

“বসিন্ দেশে চ কালে চ মাগুনেরং প্রবর্তিতা।”

(ভারত ১৫১১৫)

মাগু (দেশজ) ওজন করা, পরিমাণ স্থির করা।

মাগুন (দেশজ) মাগুইয়া দেওয়া, ওজন করিয়া দেওয়া।

মাগিল্লা, মলবার উপকূলবাসী মুসলমানধর্মাবলম্বী জাতি-বিশেষ। মলয়ালম্ প্রদেশের অধিবাসিগণ মুসলমানসংস্রবে আসিয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ করে, ক্রমে সেই সকল লোক হই-তেই এই হিন্দুভাবাপন্ন মুসলমান-সমাজ গঠিত হয়। কোম-নুরের রাজা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং মাগিল্লাসমাজের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য।

মলবার, ত্রিবাঙ্কোড়, এবং কানাড়া প্রদেশেই ইহাদের সংখ্যা অধিক। ইহারা অধ্যবসায়শীল, কৰ্মক্ষম, এবং বুদ্ধি। ইহাদের অবয়ব সুগঠিত এবং বলিষ্ঠ। ইহারা দেখিতে সুশ্রী। ইহাদের মধ্যে এখন অনেকে শিক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের জ্ঞান পরিশ্রমী দ্বিতীয় জাতি ভারতবর্ষের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

মাগিল্লা শব্দের অর্থ মার পিল্লা বা মাতার পুত্র। ১১৬খৃষ্টাব্দে আবুজৈফ লিখিয়াছেন যে, মলবার-উপকূলবাসিনী খেচ্ছাবিহা-রগী উচ্ছা-প্রকৃতির রমণীগণের গর্ভে আরবীর নাবিক-দিগের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলেন

যে, আরবীর রমণীর গর্ভে সমুদ্রগামী মুসলমান বণিকগণের ঔরসে এই জাতি উদ্ভূত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধীবরজাতীয়। বহু কোম-নুর-রাজ এই ধীবরবংশোদ্ভব। সমুদ্রপথে লুণ্ঠন, আরবের সহিত বাণিজ্য এবং স্বদেশীয় ধীবরদিগকে আরবীর ধর্মমতে দীক্ষাদানই ইহাদের প্রধান কৰ্ম। যুরোপীয় বণিকসম্প্রদায় কয়মঙল-উপকূলে আসিয়া পৌছিলে, কলিকাতার সামরিক বিদেশীর নিকট হইতে উপকূলভাগ-রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সহস্র সহস্র লোককে এই ধর্মে দীক্ষিত করেন। টিপুসুলতানও স্বীয় সেনাবল-বৃদ্ধি করিবার জন্ত লক্ষাধিক হিন্দুকে মহি-মুরে আনাইয়া ইসলামধর্মে দীক্ষা দেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজ্যদেশে বলপূর্বক গোমাংসসেবন এবং বৃক্ছেদ করার তাহারা আর হিন্দুসমাজে পুনরায় গৃহীত না হইলেও খেচ্ছীয় কেহ আপনার পূর্বাচরিত-হিন্দুধর্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। এক্ষণে তাহারা সম্পূর্ণরূপে মুসলমান না হইয়া বরং হিন্দু-জাতিরই একটা পরিত্যক্ত থাকরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

ইহারা স্বভাবতঃ মূর্থ, বলিষ্ঠ ও কৰ্মঠ। সাহসিকতার জন্ত ইহারা চিরপ্রসিদ্ধ।

উত্তর মলবারের মপ্লাগণ হিন্দু অভ্যাসের সময় হইতে কোন কোন অংশে হিন্দুভাব অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা বিধবা ভ্রাতৃবধূকে নিকা করে। ইহাদের মধ্যে যোনাকেন বা যবন-মাগিল্লা এবং নম্বুরিন্ বা নায়রিন্ মাগিল্লা নামে দুইটা বিভাগ দৃষ্ট হয়। প্রথমটা গ্রীক প্রভৃতি জাতির সংস্রবে উৎপন্ন; দ্বিতীয়টা দেশীয় খৃষ্টান প্রভৃতি নানাজাতির সংস্রবে জাত। দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে, ইহারা আরবী ভাষায় কথাবার্তা কহে।

ইহারা শ্রমধারণ করে এবং কেশকটন করে। সকলেই মস্তকে টুপী দেয়। ধনিগণ স্বর্ণরোপাখচিত কারুকার্যালঙ্কৃত উক্ষীষ ধারণ করে। ইহারা স্বভাবতঃ পরিকার পরিক্ষর। জীলোকেরা খেত এবং নীলবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে। উৎসবা-দিতে জীলোকেরা আড়ম্বর সহকারে সাজসজ্জা করিয়া থাকে এবং পিত্তল তাম্র এবং রোপ্যানিষ্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করে।

উত্তর-মলবারে ইহাদিগের মধ্যে আরবী ভাষার এবং দক্ষিণ-মলবারে প্রাচীন তামিলভাষার প্রচলন দৃষ্ট হয়। ধর্ম-বিষয়ে ইহাদের উৎসাহ অত্যন্ত প্রবল। সময়ে সময়ে ভূমি-সংক্রান্ত বিবাদ লইয়া ইহারা হিন্দুদিগের সহিত অনেক দাঙ্গা হাদাঙ্গা করিয়া থাকে। ইহারা প্রধানতঃ ছুরিকা লইয়া যুদ্ধ করে।

তহফৎ-মুজাহিদীন নামক ১৬শ শতাব্দে লিখিত-গ্রন্থে প্রকাশ,—“রাজা চেরমান্ পেরুমাল ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া

মকা যাত্রা করেন, আরবের সফ্রাই নগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি মৃত্যুর পূর্বে দেশীয় সর্দারগণকে ইসলামধর্মের প্রকৃষ্টতা উল্লেখ করিয়া কএকখানি পত্র লিখিয়া যান। এই পত্র লইয়া মালিক ইবন্ দিনাই মলবার-উপকূলে উপনীত হন। দেশীয় সর্দারগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। সর্দারগণের সহায়তায় উৎসাহিত মুসলমানগণ প্রথমে পেরুমলের রাজধানী কোড়নুরে (ক্রান্নুর) মসজিদ নির্মাণ করে। এইরূপে যথাক্রমে ত্রিবাঙ্কোড়ের অন্তর্গত কোল্লম্ (কুইলন্) নগরে, ডিল্লিপকুতে, দক্ষিণ-কাণ্ডার অন্তর্গত বকুর ও মঙ্গলুর নগরে, জৈকন্তন (বর্তমান নাম সুরকুণ্ডপুরম্, ইবন্ বতুতা, খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে এই মসজিদের উল্লেখ করিয়াছেন) নগরে, তেল্লিচেরীর অন্তর্গত ধর্মপত্তন নগরে এবং পহারিগী ও বেপুর রেল-টামিনাসের সন্নিকটবর্তী চালিয়াম্ নগরে কএকটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে এতদেশে মুসলমানপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল মসজিদের ব্যয়ভার-বহনের জন্ত অনেক সম্পত্তিও প্রদত্ত হইয়াছিল।

বিদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সামরিরাজ মুসলমান-দিগের প্রতি বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করেন। এই সময়ে উপকূলবাসী মুসলমানগণের এবং ইসলামধর্মে-দীক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সংখ্যার পরিবৃদ্ধি হইয়াছিল। ক্রমে তাহারাজ্যমধ্যে প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই সময় বাণিজ্য-প্রয়াসী অনেক হিন্দু সমুদ্রপথটানে লাভবান হইবার আশায় হিন্দুশাস্ত্রের কঠোর নিয়ম পরিত্যাগপূর্বক ইসলামধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

ওলন্দাজ বণিকগণের ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর ইতিবৃত্তে প্রকাশ,—পর্তুগীজ নাবিকগণের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে সম-কক্ষতা করিবার জন্ত সামরিরাজ দেশীয় লোকদিগের ইসলাম-ধর্মে দীক্ষাবিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমশঃই মাপিলাজাতি মলবার-উপকূলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারাকারিক পরিশ্রমে দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছিল।

ধর্মীকতার উন্নত হইয়া ইহার ১৮৪২ খৃঃ মাজরীর মন্দির অবরোধপূর্বক ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকে নিহত করে। ইহাদের দমনের জন্ত মাজাজ হইতে পদাতিক সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার অকৃতকার্য হওয়ায় পুনরায় কগানুর হইতে কুই-নের ২৪ সংখ্যক সৈন্তদল যাইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করে। ১৪ জন মাত্র মপ্লা অদম্য উৎসাহে বৃদ্ধ করিয়া অতুলবিক্রম এবং রণনৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্বক রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করিয়াছিল। পুনরায় ১৮৫১ খৃঃ ধর্মীকতার উন্নত হইয়া তাহার

হিন্দুদিগকে নিহত করে। পরে মাজাজ হইতে সিপাহীরা বাইরা তাহাদিগকে দমন করে। তৎপরে মধ্যে মধ্যে হিন্দু-দিগের সহিত ইহাদের অনেকবার বিবাদ হইয়াছে।

মাপুরিবেত (দেশজ) বেজবিশেষ। (Calamus gracilis)।

মাক্ (আরবী) কমা।

মাক্জল খাঁ, (সৈয়দ) জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক।

ইনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজয়মান ছিলেন। তৎপ্রণীত “তারিখ-ই-মাক্জলি” নামক ইতিহাসে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ১৬৬৬ খৃঃ পর্যন্ত ঘটনাবলি বর্ণিত হইয়াছে। কোন হস্তলিখিত পুস্তকে ফরুক-শিয়রের রাজত্বকাল পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে। সমগ্র পুস্তক সাত ভাগে বিভক্ত। ৬ষ্ঠ এবং ৭ম ভাগে ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ আছে।

মাকুজ খাঁ, কণাটক নবাবের একপুত্র। ১৭৪৬ খৃঃ বাণিজ্যের প্রতিবন্ধিতা লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল। তখন ফরাসীদিগের ক্ষমতা ইংরাজদিগের অপেক্ষা অনেক ছিল।

১৭৪৬ খৃঃ, ফরাসীরা মাজাজ অধিকার করেন। ইহা শুনিবামাত্র নবাব স্বীয় পুত্র মাকুজ খাঁকে ১০০০০ সৈন্তসহ মাজাজ উদ্ধার করিতে পাঠাইলেন। ফরাসীরা মিথ্যা ওজর করিয়া চারি সপ্তাহ সময় লইল। অবশেষে ফরাসীদিগের অধ্যক্ষ ডুপ্লে যে কোন উপায়ে মাজাজ রক্ষা করিতে সংকল্প করিলেন। তখন নবাবের আদেশে মাকুজ মাজাজ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাকুজ প্রথমে নগরের সমুখ ভাগে আসিয়া পানীয় পয়ঃপ্রণালীর পথ বন্ধ করিলেন। ফরাসীরা গোণভাবে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে মাকুজ ফরাসীসৈন্তের চতুর্দিকে মুংপ্রাচীর দ্বারা ঘূহনিষ্কাশন করিতে আরম্ভ করিলেন। জলপ্রণালী সকল অবরুদ্ধ হওয়ার সমুহ বিপদের আশঙ্কা করিয়া ফরাসী-সেনাপতি একদিন রাত্রিতে অতর্কিতভাবে মাকুজের সৈন্তের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নবাবের সৈন্তগণ কামান-পরিচালনে তত অভ্যস্ত ছিলনা। স্তবরাং তাহার পশ্চাতে হটিয়া আসিল।

মাকুজ তথা হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে পুন্দিচেরী ও মাজাজের মধ্যবর্তী স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া বৃদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাজাজস্থ ফরাসীদিগের সাহা-য্যার্থ পুন্দিচেরী হইতে ৭০০ সিপাহী পারাডিস নামক সেনানীর অধীনে প্রেরিত হইয়াছিল। মধ্যস্থলে মাকুজ তাহাদের পথ অবরোধ করিয়াছিলেন।

মাজাজের প্রসিদ্ধ সেনাপতি ডি-ইন্সিমেনিল পারাডিসের

আগমনবার্তা অবগত হইয়া তিন দিক দিয়া মাহুজকে আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আদিয়ার নদীর তীরে সেন্টে-থোমির নিকট মাহুজের সহিত পারাডিসের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। মাহুজ কামান, অখারোহী, পদাতিক প্রভৃতিতে ১০০০০ সহস্র সৈন্য লইয়া পারাডিসের মাজাজ-গরনের পথ বন্ধ করিলেন। সেন্টে থোমির নিকট তরফর যুদ্ধ হইল। মাহুজের সৈন্যবাহ উপযুক্ত পরিচালক অভাবে শত্রুদিগের গোলাবর্ষণে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। তাহার হাট্টা পিরানগরে আশ্রয় লইল এবং ফরাসীদিগের দ্বিতীয়বার আক্রমণে পলায়ন করিল। মাহুজ হস্তিপুষ্ঠে আরোহণপূর্বক পলায়ন করিলেন। এইরূপে স্ট্রিমের ফরাসী-সৈন্য হুশিকা এবং সাহস প্রভাবে বহুসংখ্যক নবাবসৈন্যকে পরাস্ত করিল। এই যুদ্ধে সাধারণের মনে বিশেষ ভয়ের সঞ্চার হইল। ইহার পূর্বে কোন যুরোপীয় জাতি ভারতীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারেন নাই। ফরাসীরা যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতসাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

মাফিক্ ( আরবী ) পরিমাণমুযায়ী।

মাম ( পুং ) ১ মাতুল। ২ কপণ। ( ত্রি ) ৩ মৎসধকীয়।

মামক ( ত্রি ) মমেদং অস্বদ্ ( তবকমমকাবেকবচনে। পা ৪৩৩ ) ইতি অণ্, মমকাদেশচ। ১ মদীয়, মৎসধকীয়। ২ মমতায়ুক্ত। ( শব্দমালা )

“অত্র বা মামিকা বৃদ্ধিঃ প্রয়তঃ যদি রোচতে।”

( ভারত ১৫১১৫ )

মাম-স্বার্থে কন্। ( পুং ) ৩ মাতুল। ( মেদিনী )

মমায়ং মমেদং বা বৃদ্ধির্যন্ত কপ্। ৪ কপণ। ( শব্দমালা )

মামকীন ( ত্রি ) মমেদং অস্বদ্ ( তবকমমকাবেকবচনে। পা ৪৩৩ ) ইতি ঋক্, মমকাদেশচ। মদীয়, মৎসধকীয়।

“এতচ্চ মে কিয়ং কিং হি ন বুদ্ধ্যা সাধয়াম্যহম্।

প্রজ্ঞানং মামকীনঞ্চ প্রয়তঃ বর্ণয়ামি তে ॥”

( কথাসরিংসাগর ৩২১৪৫ )

মামডী ( দেশজ ) ক্ষতস্থানের শুষ্ক চর্মবিশেষ।

মামতেয় ( পুং ) ১ মমতা-পুত্র। “যে পায়রোমামতেয়ং তে অগ্রে” ( শব্দ ১১৪৭৩ ) ‘মামতেয়ং মমতাপুত্রং দীর্ঘতমসং’ ( সায়ণ ) ২ মমতাসধকীয়।

মামন্দ, আফগান জাতির একটি শাখা।

মামলং ( আরবী ) ১ কার্য। ২ কার্যসধকীয় কথাবার্তা। ৩ মকদ্দমা।

মামলতী ( আরবী ) কার্যকর্ম।

মামলা ( দেশজ ) মোকদ্দমা।

মামলদেবী ( জী ) নৈমধরচরিত্রা ত্রিহর্ষের মাতা।

মামলপুর, প্রাচীন নগরভেদ। [ মহাবলিপুর দেখ। ]

মামা ( দেশজ ) মাতুল, মাম।

মামাগুয় ( দেশজ ) মৎসভেদ, মৎসুর মৎস।

মামাতুয়া ( দেশজ ) মাতুলকন্ডা, মামাতো বুন।

মামাতুয়াভগিনী ( দেশজ ) মাতুলকন্ডা, মামাতো বুন।

মামাতুয়াভাই ( দেশজ ) মাতুলপুত্র, মামাতো ভাই।

মামারি ( দেশজ ) লতাবিশেষ।

মামিড়ি ( পুং ) জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার।

মামী ( দেশজ ) মাতুলপত্নী, মাতুলানী।

মামুখী ( জী ) বৌদ্ধ-দেবতাভেদ।

মামুর ( আরবী ) ১ শেষ, অন্ত। ২ কবিত।

মামুল্ ( আরবী ) প্রস্তুত।

মামুলী ( দেশজ ) চিরপ্রচলিত প্রথামত। ( Customary )

মায়্ ( আরবী ) সহিত একত্রে।

মায় ( পুং ) মায়াহস্তান্ত্রীতি মায়-অশ্বাদিহাদচ। ১ পীতাম্বর।

“নমো বিশ্বায় মায়ায় চিত্ত্যাচিত্ত্যায় বৈ নমঃ।”

( ভারত ১৩২৪১১১ )

ময়তাপত্যং পুমান্ মত্-অণ্। ২ অম্বর। ( মেদিনী )

মায়ণ ( পুং ) বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের পিতা।

মায়দাস, গ্রন্থকোস্তভপ্রণেতা।

মায়নী ( মৈনী ), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১৭°২৯’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩৪’ পূঃ। মিউনিসিপালিটির অধীনে থাকার এই নগরের দিন দিন উন্নতি হইতেছে।

মায়ব ( পুং ) মায়ুর গোত্রাপত্য।

মায়বৎ ( ত্রি ) মায়ায়ুক্ত।

মায়ী ( জী ) মীয়েতে অপরোক্ষবৎ প্রদর্শাতেহনয়া ইতি মা ( মাচ্ছাসিস্থভ্যো যঃ। উণ্ ৪১০০ ) ইতি ষ, টাপ্।

১ ইজ্জালাদি, ইজ্জাল, কুহক, ছয়বেশ, ভূমিকা। পর্যায়—শাধরী, সাধরী। ( শব্দরত্নাং ) ২ বুদ্ধি। ( মেদিনী )

মীমীতে জানাতি সংখ্যাতানয়েতি মা-ঘ-টাপ্। ৩ কপা। ৪ দম্ব। ( হেম ) ৫ শঠতা। ৬ প্রজ্ঞা। “অন্তভূন মায়রা

ত্বামব্রসঃ” ( শব্দ ২১৭১৫ ) ‘অন্তভূন মায়রা প্রজ্ঞা’ ( সায়ণ ) ৭ রাজাদিগের ক্ষুদ্রোপায়বিশেষ।

‘মারোপেক্ষেজ্জালানি ক্ষুদ্রোপায়া ইমে’ত্রয়ঃ।’ ( হেম )

মায়ী, উপেক্ষা ও ইজ্জাল এই তিনটী রাজাদিগের সানাত্ত উপায়।

৮ চূর্ণাদেবী। ইহার নাম নিরুক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে,

বিনা ব্যাপারে যেচ্ছা যারা জগৎ সৃষ্টি করেন। তাহার তাদৃশী ইচ্ছা-শক্তিই মায়া নামে অভিহিত। গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে প্রভিন্ন। উৎকৃষ্ট স্বপ্নপ্রাবল্যে মায়া, এবং মলিনস্বপ্নপ্রাবল্যে অবিদ্যা। মায়ার উপহিত ঈশ্বর এবং অবিদ্যার উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বস্তুর বটে। মায়া এক—সেই জন্ত ঈশ্বরও এক। মলিন্তের অস্বাভাবিক অজ্ঞানসারে অবিদ্যা নানা, তদনুসারে জীবও নানা। মায়ার জ্ঞান শক্তির চরমোৎকর্ষ, সেই জন্ত তদুপহিত ঈশ্বরও সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সত্ত্ব ও সর্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞানশক্তির অন্নতাবশতঃ সেরূপ নহে। যেমন একই আকাশ বটরূপ উপাধিতে বটাকাশ, তৎত্যাগে মহাকাশ, সেই রূপ ব্রহ্ম মনুজাদি উপাধিতে (আধারে) জীব ও তদুপগতে ব্রহ্ম।

অজ্ঞানই সংসার। সংসার অন্ত কিছুই নহে। অথও চেতন অবয়বের পার্শ্বচর-শক্তি অজ্ঞান, তাহার প্রাচুর্য্যবে অস্ত্রঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অস্ত্রঃকরণাদি পরি-চ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে তিনি অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। ব্রহ্মের এই শক্তি-বিশেষই শাস্ত্রে ঐশীশক্তি, জগৎধোনি, অজ্ঞানশক্তি, মায়াসৃষ্টিশক্তি, ও মূলপ্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিভাষিত হইয়াছে। কি অস্ত্রঃপ্রপঞ্চ কি বাহ্য-প্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞান বা মায়ায় বিলাস, সেইজন্ত তাহা ত্রাস্তির বিজুস্তন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখা-ইতেছে; সেজন্ত জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাবভাসে ভাসিত। অজ্ঞান বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে, এই জন্তই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে,—জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।

ব্রহ্ম নিজেই নিজ মায়ায় আকাশাদি রূপে বিবর্তিত হই-য়াছেন। সুতরাং অভিন্ন নিমিত্তোপাদান তিনিই ইহার বিবর্ত-কারণ। অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানের দৃষ্টান্ত লুতা (মাক-ড়শা)। লুতা স্বজ্ঞামান স্বত্রের প্রতি স্বচৈতন্ত-প্রকাশের নিমিত্ত-কারণ। লুতা যে স্বত্র সৃষ্টি করে, তাহার উপাদান সে অন্ত কোথা হইতে আনে না, তাহা তাহার নিজ শরীরেই আছে। ব্রহ্ম নিজ ইচ্ছাতেই বিবর্তিত হইতেছেন। বিবর্ত-শব্দের অর্থ ঐরূপ, একপ্রকার বস্তুর অন্ত প্রকার হইলে তাহা বিকার, এবং মিথ্যা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, কিন্তু বিবর্ত। সুতরাং পূর্বেই বলিয়াছি, এই জগৎ তাত্ত্বিক-সত্যশূন্য, অর্থাৎ মিথ্যা।

মায়াকে সহজ কথায় অজ্ঞান বলা যাইতে পারে, এই

অজ্ঞান

জ্ঞানবিষয়ে

অজ্ঞান।

রহস্ত। তাহা ১

তৃতীয়া প্রকৃতি অর্থাৎ

সেইরূপ অজ্ঞানও তাহা

জ্ঞান—ব্রহ্ম-পুত্রের জ্ঞান আ

তাহা জীবমাত্রই আছে বলিয়া

ব্রহ্ম পদার্থের জ্ঞান বস্তুর নহে,

আর থাকে না, জ্ঞানোত্তর-কালে ১

প্রতীত হয়। যাহা থাকে না, তাহার এককালিক আন্তর নাই, যাহা মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে কিরূপে বস্তুর বলা যাইবে? অতএব তাহা বস্তুর কি অবস্তুর, সং কি অসং, সারবস্তুর কি নিরবস্তুর কিছুই বলা যায় না, যাহাকে ইহা অমুক বা অমুক প্রকার, বলিয়া অবধারণ করা যায় না, তাহা অনির্লীচ্য।

জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান, ইহাও বলা যায় না, কারণ জ্ঞানের অভাব ‘অজ্ঞান’ এই কথায় অন্তর্গত জ্ঞান শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অভাব পদার্থ নহে। শাস্ত্রে চৈতন্তকে জ্ঞান বলে, আবার বুদ্ধিরূপকেও জ্ঞান কহে। কেহ কেহ জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

অজ্ঞান এই তিন প্রকার জ্ঞানের কোন প্রকার জ্ঞানের অভাব? তদন্তরে বলা হইয়াছে যে, প্রথমোক্ত জ্ঞানটী নিত্য নিরবস্তুর; সুতরাং তাহার অভাব অস্বীকার্য্য। দ্বিতীয়টী বাস্তবিক জ্ঞান নহে, কেন না, তাহা জড়। বুদ্ধিরূপিত্ব স্বয়ং বস্তুর প্রকাশ করে না, চৈতন্ত ব্যাপ্ত হইয়াই বস্তুর প্রকাশ করিয়া থাকে। বুদ্ধিরূপিত্ব যখন চৈতন্ত ছাড়িয়া বস্তুর প্রকাশে সমর্থ নহে, তখন তাহা অবজ্ঞাই জড়। জ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্তের সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া লোকে তাহাকে উপ-চারক্ৰমে জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করে। সুতরাং অজ্ঞান তাহারও অভাব নহে—তৃতীয় পক্ষও নহে। কেননা জ্ঞান নামক আত্ম-গুণের একেবারে অভাব হওয়া অসম্ভব। কারণ যখনই ‘আমি অজ্ঞান ছিলাম, কিছুই জানিতেছিলাম না’ বলিবে, তখনই তোমার জ্ঞানের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইবে। তৎকালে তোমার অন্ত কোন জ্ঞান না থাকুক, অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল। তুমি যে অজ্ঞান ছিলে, এ অশ্রুতবচীও জ্ঞান। অজ্ঞান ছিলাম ‘ইহার অর্থ কি’ না তোমার জ্ঞান (চৈতন্ত) তৎকালে অজ্ঞান ভিন্ন অন্ত বিষয় অবগাহন করিতেছিল না! ইহাই উহার অর্থ। সুতরাং অজ্ঞান অভাব বা শূন্যরূপী নহে।

উহা যৎ-

পদার্থ বুঝিয়া

হইয়াছে, নির্দ্বারিত-

বলিয়া 'সদস্যাম-

পদন নামক আশঙ্ক্য নহে

। জানের সঙ্গে বিরোধ

এান তিরোহিত হয়, দেখিয়া

হইয়াছে। অজ্ঞান পদার্থকে

তাব'বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও ব্রহ্মপদার্থের দ্বার পারমাণ্বিক ভাব নহে। তাহা বুঝাইবার জন্য 'যৎকিঞ্চিৎ' এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ এক প্রকার অস্থির বা অনির্দিষ্ট তুচ্ছ পদার্থ। এইরূপ অজ্ঞান যে আছে, তাহা অসুভবসিদ্ধ। সকল লোকেই 'অহং অজ্ঞঃ' আমি অজ্ঞ অর্থাৎ আমি জানি না, আমি কে, তাহা আমি জানি না, ইহা কি? উহা কি? তাহা আমি জানি না ইত্যাদি কথা বলিয়া থাকেন, প্রত্যেক ব্যক্তির ঐরূপ অসুভব প্রতিব্যক্তিতে অজ্ঞানসত্ত্বাবের প্রমাণ। অজ্ঞান যে অনির্দিষ্টচর পদার্থ, তাহাও উত্তমরূপে অসুভবের দ্বারা সপ্রমাণ হইতে পারে। অজ্ঞান কি? তাহা নির্দ্বারিতরূপে জানা না থাকাতাই আনন্দের গোহে অতিভূত হইয়া থাকি? অতএব অজ্ঞান যে এক প্রকার অনির্দিষ্টচর যৎকিঞ্চিৎ পদার্থ, তাহা অসুভব ও শাস্ত্র উভয় প্রমাণসিদ্ধ। এই বিষয়ে শাস্ত্রের মত এইরূপ যে, স্বয়ং প্রকাশ আশ্রয় শক্তিস্বরূপ অজ্ঞান আপন গুণ-দ্বারা গুপ্ত আছে।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত অজ্ঞান আপাতত নানারূপে ভাসমান হইলেও বস্তুরূপে এক। সেইজন্যই শাস্ত্রে উহার সমষ্টি (সমুদায় বা অপূৰ্ণক ভাব) লক্ষ্য করিয়া এক এবং ব্যষ্টি (ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা বিশেষ বিশেষ অবস্থা) লক্ষ্য করিয়া বহু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের সমষ্টিভাবে এক বন এবং জলের সমষ্টিভাবে এক জলাশয়, সেইরূপ জীবগত নানাপ্রকার অজ্ঞানের সমষ্টিভাবে তাহা এক। কাহারও সৃষ্টি নহে এরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণাত্মক অজ্ঞান এক।\*

\* "ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্টিপ্রায়েণৈকমনেকমিতি চ ব্যবহরিতং, তথা হি, যথা বৃক্ষাণাং সমষ্টিপ্রায়েণ বনমিত্যেকবচ্যপদেশঃ যথা বা জলানাং সমষ্টিপ্রায়েণ জলাশয় ইতি তথানানাদেন প্রতিভাসমান জীবগতজ্ঞানানাং সমষ্টিপ্রায়েণ তদেকবচ্যপদেশঃ। অজ্ঞানেকমিত্যানিচ্ছতে" (বেদান্তসার)

ঐ সমষ্টি অজ্ঞান উৎকৃষ্টের অর্থাৎ অপ্রতিহত স্বভাব-পূর্ণ চৈতন্তের বা ঈশ্বরের উপাধি বলিয়া বিদ্যুৎ সত্ত্বপ্রধান। যাহা নিকটে থাকিয়া আপনায় গুণ সমীপস্থ বস্তুতে আরোপ করে, তাহা উপাধি। জ্বাপুষ্ণ ফটিক নিকটে থাকিয়া আপনায় লৌহিত্য ফটিকে আরোপিত করে বলিয়া জ্বাপুষ্ণ ফটিকের উপাধি। অজ্ঞানও চৈতন্ত সঙ্গিধানে থাকিয়া আপনায় দোষ-গুণ চৈতন্তে আরোপিত করে বলিয়া চৈতন্তের উপাধি। যে যাহার উপাধি, সে তাহার উপহিত। চৈতন্তের উপাধি অজ্ঞান, সেইজন্য চৈতন্ত অজ্ঞানের উপহিত।

উৎকৃষ্ট ও বিদ্যুৎ প্রধান এই শব্দ দ্বারা এইরূপ ভাবার্থ পাওয়া যায় যে, সৃষ্টিকালে মূলপ্রকৃতি ভিন্ন মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্য কোন ক্ষুদ্র উপাধি ছিল না, সেজন্য তাহা উৎকৃষ্ট। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় যখন সমান থাকে, তখন সৃষ্টি হয় না। যখন কোন একটা বুদ্ধি পায়, তখন সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির প্রথমেই প্রকৃতির বা অজ্ঞানের সৰ্ব-প্রকাশক সৰ্বসমর্থাদাকারক সর্ববীজ-স্বরূপ সূক্ষ্মরূপ ও প্রকাশক সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ হইয়া মহত্ত্ব প্রসব করে। ক্রমে তাহা হইতে অহঙ্কার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। অতএব সমষ্টি অজ্ঞানে ও মহত্ত্ব সত্ত্বগুণ প্রবল থাকে, রজঃ ও তমোগুণ বিলুপ্তপ্রায় বা অতিভূতপ্রায় থাকে; কাজেই তাহাকে বিদ্যুৎ-সত্ত্ব বলা যায়।

সমষ্টি অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্ত সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্ব-নিয়ন্তা, অব্যক্ত, অন্তঃকামী, জগৎকারণ প্রভৃতি নাম দ্বারা অভিহিত হন। তাদৃশ সমষ্টি অজ্ঞানের অবতাসক বলিয়া তিনি সর্বজ্ঞ। এ বিষয়ে শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন, যিনি সমষ্টি ও তদন্তঃপাতী ব্যক্তি সমস্তই জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও পরমেশ্বর।

ঈশ্বরের উপাধি স্বরূপ সমষ্টি অজ্ঞান সকল জন্মবস্তুর কারণ, সেইজন্য তাহা ঈশ্বরের কারণ-শরীর।

যে রূপ বনের ব্যষ্টি বৃক্ষ, তাহা অনেক; আর জলাশয়ের ব্যষ্টি জল, তাহাও অনেক; সেইরূপ সমষ্টি অজ্ঞানের ব্যষ্টি অজ্ঞানও অনেক। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর বহু-মায়ী দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

এস্থলে দেখ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি নানা প্রভেদযুক্ত জীবব্যাপী অজ্ঞানকে ব্যষ্টি অজ্ঞান এবং মহত্ত্ব নামক অবি-তৃত ঈশ্বরামুগত মূল-অজ্ঞানকে সমষ্টি অজ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

ব্যষ্টি অজ্ঞান নিকৃষ্টের (অর্থাৎ অসকল ও অল্পশক্তিমাত্র জীবের) উপাধি ও মলিনসত্ত্বপ্রধান। ইহাতে যে চৈতন্ত



প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহাকে জীব কহে, তাহা অজ্ঞ। অজ্ঞতাতেহু উহাকে অনীশ্বরত্বাদিগুণবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ বলা যায় (প্র-অজ্ঞ)। মলিনসমুদ্রপ্রধান ইহার ভাবার্থ এই যে, মহত্ত্ব নামক মূলজ্ঞানের পর, উহার রজঃ ও তমো-অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া অহংকার ও অন্তঃকরণের সৃষ্টি করে। রজঃ ও তমোমিশ্রিত হওয়ায় অন্তঃকরণাদির প্রকাশশক্তি অল্প, সুতরাং তৎপরিহিত চৈতন্য ও অল্পপ্রকাশক, সেইজন্ত জীব অজ্ঞ।

জীবের প্রাজ্ঞ নাম দিবার কারণ এই যে, জীব সমস্ত অজ্ঞানের অবতানক। জীবের উপাধিও অস্পষ্ট অর্থাৎ রজতমোমিশ্রিত হওয়ায় মলিন। কাজেই অল্পপ্রকাশক বা প্রাজ্ঞ, 'প্রায়েণ অজ্ঞঃ' অর্থাৎ প্রায়ই জানে না।

পূর্বে যে ব্যষ্টি-সমষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কল্পনামাত্র। বন আর বৃক্ষ যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন, জলাশয় ও জল যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন, তদ্রূপ পূর্বোক্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই অজ্ঞানই বস্তুতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক। ভিন্নতা কল্পনাব্যবহারিক।

এই অজ্ঞানের দুইটা শক্তি আছে,—একটির নাম আবরণ-শক্তি, অপরটির নাম বিক্ষেপ-শক্তি। আবরণ-শক্তি বুদ্ধিবাদ দৃষ্টান্ত এই যে, অত্যন্ত একথও মেঘ, দর্শকের নয়নমাত্র আচ্ছন্ন করে, কিন্তু দর্শক মনে করে মেঘ স্বর্ধ্যকে ও ঢাকিয়াছে। সেইরূপ অজ্ঞানও নিজে বুদ্ধাদিকপে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও বুদ্ধিপ্রতি-বিম্বিত চৈতন্যকে আবৃত করায় বোদ্ধার আত্মগত সর্বব্যাপক-ত্বাদি অনুভব হয় না। সর্বব্যাপক চৈতন্যের যে অংশে বুদ্ধি সেই অংশ জীব। জীবাত্মা অজ্ঞানে আবৃত হওয়ায় জীব আপনাকে বদ্ধ ও সংসারী বলিয়া অনুভব করে। অজ্ঞান যে শক্তিদ্বারা আত্মার স্বরূপ আবৃত করে, সেই শক্তির নাম আবরণ-শক্তি। স্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে যে, অজ্ঞ মনুষ্য যেক্রমে মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু লইয়া স্বর্ধ্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাশূন্য দেখে, তেমনি অববেকী পুরুষ স্বীয় অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন হইয়াই আপনাকে বদ্ধ দেখে। যিনি মূঢ় বুদ্ধির দৃষ্টিতে বদ্ধের ত্রায় দৃষ্ট হন, সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মা আমি।

জ্ঞাতব্য বস্তু যদি অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়, অর্থাৎ তাহা যদি সন্ধ্যাংশে ক্ষুণ্ণ না পায়, তাহা হইলে তাহাতে কোন এক বিপরীত প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। যেমন রজ্জু কি জলধারা অজ্ঞানাবৃত হইলে তাহাতে সর্প কি তৎসদৃশ অথ এক কল্পিত-দৃশ্য দৃষ্ট হয়। অতএব পরমাত্মার স্বরূপ অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহাতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, স্থিত্ব, স্থাবিত্ব প্রভৃতি সংসারধর্ম সকল কল্পিত হইয়া থাকে। উক্ত অজ্ঞান যে শক্তিতে ঐ সকল কল্পনা করে, সেই শক্তির নাম বিক্ষেপ।

বিক্ষেপ

আবৃত হইলে

অনুভবশক্তি।

যেমন সর্পাদি সৃষ্টি

আত্মায় তুচ্ছ অবস্থায়

যে শক্তি-দ্বারা তাদৃশ সৃষ্টি হয়

শক্তি। ইহাতে স্রুতি বলিয়াছেন—

নখর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকে। লুতা যেমন আত্ম-চৈতন্যের প্রাবল্যে স্রোতপাত তত্ত্বের নিমিত্তকারণ ও শরীর-দ্বারা উপাদানকারণ, তেমনি পরব্রহ্ম ও স্বীয় অজ্ঞান (ময়া) দ্বারা সৃষ্টির উপাদানকারণ ও চৈতন্যের সান্নিধ্যে নিমিত্তকারণ হয়। লুতা চৈতন্যের প্রভাবে ও স্বকীয় শরীরের সন্নিধান-প্রভাবে আপনার অন্তর্যন্তী বিকার (লালা) দ্বারা স্রুতির সৃষ্টি করে, আত্মাও চৈতন্যের সন্নিধানপ্রভাবে সান্নিধ্য বিকার দ্বারা বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করেন।

উৎপত্তির প্রণালী এইরূপ—তমোগুণবাহুল্যে বিক্ষেপ-শক্তিয়ুক্ত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতে প্রথমতঃ আকাশ, পরে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, পরে তাহা হইতে জল, অনন্তর তচ্চতুষ্টয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ক্রমে এইরূপে সৃষ্টি হয়। প্রথমোৎপন্ন আকাশাদি পঞ্চ পদার্থকে পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মভূত, তন্মাত্রা ও অপেক্ষাকৃত মহাভূত বলেন। এই সকল সূক্ষ্মভূত হইতে জীবের সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলভূত সকল উৎপন্ন হয়। যতদিন পর্যন্ত প্রলয় না হয়, ততদিন সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলভূত সকল বিস্তৃমান থাকে।

সপ্তদশ অবয়ব যথা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই সমুদায়ের সমষ্টিকে বিজ্ঞানময় কোষ কহে।

বিজ্ঞানময় কোষকেই ইহপরলোকসংসারী জীব বলিয়া ব্যবহার করা হয়। এই বিজ্ঞানময় কোষই 'অহং কন্ডা' 'অহং কেরামি' 'অহং ভোক্তা' 'অহং স্থখী' এইরূপ অতিমান উখিত হইয়া থাকে। মন আর পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় মিলিত হইলে তাহাকে মনোময় কোষ এবং পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় মিলিত হইলে তাহাকে প্রাণময় কোষ কহে।

এই সকল কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষটি জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন ও কর্তৃরূপ। মনোময় কোষ ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট ও কারণরূপ, প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিয়ুক্ত কার্যরূপ। যোগ্যতা অনুসারে এইরূপ বিভাগ করণ করা হইল। এই সম্মিলিত কোষত্রয়ই সূক্ষ্মশরীর।

এই সূক্ষ্মশরীরেও বন-বৃক্ষের ত্রায় কিংবা জলাশয়-জলের

জ্ঞান সমষ্টি ও ব্যাপ্তি আছে। একত্ব-বুদ্ধির বিষয় হইলে সমষ্টি এবং পৃথক্বুদ্ধির বিষয় হইলে ব্যাপ্তি, স্বাবর জন্ম সমস্ত প্রাণীর স্বাক্ষরীর স্রোত্মা নামক হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির বিষয় হওয়াতে সমষ্টি এবং প্রত্যেক জীবের স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির বিষয় হওয়াতে ব্যাপ্তি।

সমষ্টি স্বাক্ষরীরোপহিত চৈতন্য-স্রোত্মা, হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ নামে ব্যবহৃত হয়। স্রোত্মার প্রত্যেকে অমুমুহ্যত বলিয়া স্রোত্মা এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত স্বাক্ষরীতাত্ত্বানী বলিয়া হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ।

হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ ঐ সমষ্টি কোষত্রয় (স্বাক্ষরীরের সমষ্টি) হুল জগৎ অপেক্ষা স্থল বলিয়া স্থল, বিশাণ হর বলিয়া শরীর ও জাগ্রৎ সংস্কার-রূপতা-হেতু স্বপ্ন ও হুল প্রপঞ্চের প্রলয়-স্থান নামে উক্ত হয়। ব্যাপ্তি স্বাক্ষরীরে উপহিত চৈতন্যের নাম তৈজস। তেজোময় অন্তঃকরণ মাত্র তাহার উপাধি। অর্থাৎ ইনি স্বপ্নকালে কেবল অন্তঃকরণ-করিত বিষয় অনুভব করেন।

এ স্থলেও পূর্বের জ্ঞান সমষ্টি ব্যাপ্তি শরীরের বস্তুগত অভেদ ও তদুপহিত চৈতন্যেরও অভেদ দ্রষ্টব্য। পূর্বোক্ত বন, বৃক্ষ ও তদবচ্ছিন্ন আকাশ এবং জলাশয়, জল ও তদপ্রতিবিম্বিত আকাশ দৃষ্টান্ত স্থলে গণনীয়।

এই সকলই মায়িক অর্থাৎ মায়ী দ্বারাই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞান হইলে আর মায়ার কোনরূপ কার্য থাকে না।

আত্মা হইতে অপৃথক্ব ব্রহ্মচৈতন্যে মায়ার সম্পর্ক ঘটিয়াছে। যে মায়াবশতঃ জীব আপনার নিঃস্বতা জানে না, ব্রহ্মভাব জানে না, আপনাকে স্মৃদ্বঃখভোক্তা জন্ম-মরণবান্ জীব বলিয়া জানে, এই মায়ার ঘোর কাটিয়া গেলে আপনার আনন্দময়ত্ব অনুভব করিয়া থাকে।

এক মায়ী হইতেই ইন্দ্রজালসদৃশ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি কত অঘটন ঘটনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? ইহাই মার্যাবাদ নামে অভিহিত।

যখন জীব জন্মমরণাদি যাতনায় সংসারানলে পরিতপ্ত হইয়া বেদবেদান্তপারগ গুরুর নিকট উপস্থিত হন, তখন গুরু কৃপা করিয়া তাহাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করেন, শিষ্য ক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা এই সকল মায়ার কার্য তাহা বুঝিতে পারেন। অজ্ঞানবশতঃ রক্ষুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ মার্যাবশে এক, অবিভীত, সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্মে যে জগদ্ব্যাপ্তি হইতেছিল, তাহার নিবৃত্তি হয়।

(বেদান্তসার ও বেদান্তদর্শন)

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞান-ভিক্ষু এই মার্যাবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মতে ইহা বৌদ্ধ-দিগেরই একপ্রকার মত, সুতরাং ইহা অসং।

“মার্যাবাদমসচ্ছাত্রঃ প্রচ্ছন্নঃ বৌদ্ধমেব চ।

মর্য়েব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥” (বিজ্ঞানভিক্ষু)

[পূরণ শব্দে পদ্মপুরাণের বিবরণ দেখ।]

কলিকালে ব্রাহ্মণরূপি শঙ্করাচার্য্য এই অসংমার্যাবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে জীবের মিশ্রের লাত সদৃশ-পর্যন্ত। সাংখ্য মতে এই জগৎ সত্ত্বরজতমোগুণাত্মিক। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞান হইলে মুক্তি হইবে।

বেদান্ত-মতেও সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী মায়ী, জীব যখন বুদ্ধিতে পারে, ইহা মায়ী বা অজ্ঞানের কার্য্য, তখন তাহার মোক্ষ হয়। [শঙ্করাচার্য্য ও বেদান্তশব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

ভগবদ্গীতার লিখিত আছে যে,—

“ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরতিঃ সক্ষমিনঃ জগৎ।

মোহিতঃ নাত্তিজানাত্তি মামেভ্যঃ পরমব্যবন্ ॥

দৈবী হ্যেবা গুণময়ী মমমায়ী হুরত্যায়।

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

ন মাং হুস্তিতিনো মুচাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়ীরাপকৃতজ্ঞানা আত্মরং ভাবমিপ্রিতাঃ ॥”

(গীতা ৭।১৩-১৫)

বিবিধ গুণময় ভাবই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাকে (ব্রহ্ম) ইহার অতীত ও অব্যয় বলিয়া জানিবে। আমার সত্যাদি ত্রিগুণময়ী মায়ী নিত্যত্ব ছুরতিক্রম্য, যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া তজ্ঞনা করে, তাহারাই কেবল এই সুহৃৎ মায়ী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যাহারা পাপকন্ধ্যা, মূঢ় ও নরাধম, বাহাদের জ্ঞান মায়ী কর্তৃক অগত হইয়াছে, তাহারাই আমার তজ্ঞনা করে না। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ, ভগবান্ নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বভাব, তবে এই মিথ্যা জ্ঞানময় জগৎ কিরূপে তাহার বিজ্ঞান হইল? অর্জুনের এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, জীব ত্রিগুণময়ী মায়ার মোহিত আত্মান্যবিবেকবিহীন হইয়া আমাকে জানিতে পারে না, যেমন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্জ্ঞের তীব্র তেজের দিকে তাকাইলে তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়, প্রকৃত স্বর্ধ্যাকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ ত্রিগুণ ব্যাপারে বিমোহিত হইয়া জীব বাহাকে আশ্রয় করিয়া এই গুণের প্রকাশ হইয়াছে, সেই ভগবানকে লক্ষ্য করিতে পারে না।

৬. তিনি ত্রিগুণের অতীত ও ত্রিগুণের অধিষ্ঠানভূত। কিন্তু মায়ায় মোহিত জীব তাহাকে দেখিতে পার না। যেমন স্বর্ণকুণ্ডলে ‘হুণ্ডল’ দৃষ্টি সত্বে স্বর্ণদৃষ্টি হয় না, তদ্রূপ ত্রিগুণ-ময়ী দৃষ্টিসত্বে ব্রহ্মদৃষ্টি হয় না।

সনাতনী মায়া বৈরাগ্য দুরতিক্রম্য, তাহাতে তাহা হইতে কোনরূপে মুক্ত হওয়া যায় না, অর্জুনের এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, মায়াকে বিশুদ্ধ চৈতন্যপ্রিতা বিষয়ের মূল প্রসূতি বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহার নাম দেবী মায়া। যেমন অন্ধকারে যে গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকেই আবৃত করিয়া রাখে। বৈরাগ্য তিন গাছি রজ্জুতে দৃঢ়গুণ প্রসূত করিলে তদ্বারা মল্লব্যাকে অতিশয় বন্ধন করা যায়, তদ্রূপ ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়াতেও জীব দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইরাছে। সর্কাবরণ ভেদপূর্বক আত্মার ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ না হইলে মায়া বন্ধন মোচন হয় না। যিনি অনন্তকর্ম্ম হইয়া ভগবানের শরণাগত হন, যাহার ভগবদভক্তি ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য থাকে না, পুণ্যকর্মে সদা অমুগত, তিনিই মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

বাহ্যারূপাপাশ ও মলিন কার্য্যে বাহাদের রতি মতি, তাহারা অতি নরাধম এবং তাহারা নিজ নিজ ইষ্টানিষ্ট বৃত্তিতে অসমর্থ। তাহাদের বিবেক মায়াদোষে দূষিত হওয়া আমার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না, স্মরণ্য মায়া বন্ধন তাহাদের মোচন হয় না।

মায়িক বন্ধন বিষম বন্ধন, সকল প্রকার দুঃখই ইহার মূল। বাহাকে সাধারণ লোকে সুখ বলিয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে তাহা সুখ নহে, তাহা সুখ নামক দুঃখ। যতক্ষণ মায়িক বন্ধন ছেদ না হয়, ততক্ষণ সকলই দুঃখ, কেবল মায়ার বিলাস, ঐচ্ছজালিকের ইচ্ছজালক্রীড়া। লোকে যেমন স্বপ্নে সুখ দুঃখ ভোগ করে, রাজা উজীর হয়, ইহাও তদ্রূপ। স্বপ্নাপগমে উহা যেমন মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, মায়াপগমে তদ্রূপ সংসারেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যোগবিশিষ্টের উপশম-প্রকরণে লিখিত আছে, এই সংসার নারী মায়া অতঃ কিছুতেই পর্য্যবসান হয় না, একমাত্র চিত্ত-জয় করিতে পারিলেই ইহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সর্ব্বদে একটি উপাখ্যান আছে,—

৭. কোশল জনপদে গাধা নামে এক মুনি ছিল, গাধা ভগবানের উদ্দেশ্যে কঠোর তপশ্চরণ করে, ভগবান্ ইহার তপস্যায় প্রীত হইয়া ইহাকে বর গ্রহণ করিতে বলেন। তাহাতে মুনি এই বর প্রার্থনা করেন যে, ভগবান্! আপনি পরমাত্মার

যে এক মায়া রচনা করিয়াছেন, আমি মোহকারিণী সংসার-নারী এই মায়া দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ তাহাকে বলেন, তুমি এই মায়া দেখিতে পাইবে ও পরে ইহা হইতে মুক্ত হইবে। এই বলিয়া তিনি অন্তহিত হন। পরে গাধা মায়া দর্শন করিতে বাইরা বিষম সংসারাবর্তে পতিত হন, এই মায়ার পড়িয়া তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত বিষম দুঃখভোগ করেন, তিনি কখন রাজা, কখন দরিদ্র এইরূপ নানা ঘটনার বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠেন। পরে ভগবান্ তাহাকে এই মায়া হইতে মুক্ত করিয়া দেন। [ যোগবিশিষ্টের উপশম প্রকরণে ৪৫ সর্গ হইতে ৫৫ সর্গ পর্য্যন্ত বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

মায়াবিদ (ত্রি) মায়াং বেতি বিদ-কিপ্। মায়াজ্ঞ, যিনি মায়ার স্বরূপ অবগত আছেন।

মায়াবিন্ (ত্রি) প্রশস্তা মায়া কাপট্যং অন্ত্যাসোক্তি মায়া- (অস্মান্নামেধাশ্রজো বিনি। পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। মায়াকার, পর্য্যায়—ব্যাসক, মায়ী, মায়িক, ঐচ্ছজালিক। (জটায়র) ২ বিভাগ। (রাজনিঃ) ৩ মোহনশক্তিসমুক্ত পরমাত্মা।

“স্বতশ্চিদন্তর্ধামী তু মারাবী স্তম্ভস্থিতিতঃ।

স্বত্যায়া স্তম্ভস্থিতিব্যব বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ ॥” (পঞ্চদশী ৬৪)

মায়াসীতা (ত্রী) মায়াক্রিয়া সীতা। যোগ দ্বারা অগ্রিকৃত সীতাপ্রতিকৃতি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে—রাবণ কর্তৃক সীতাহরণকালে অগ্নিদেব প্রকৃত সীতাকে লইয়া তৎপরিবর্তে মায়াসীতা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা সময়ে পুনরায় প্রত্যর্পণ করেন।

অগ্নিপরীক্ষার সময় মায়াসীতা রাম ও অগ্নিকে বলিয়া-ছিলেন, ‘এখন আমি কি করিব, তাহার উপায় নির্দেশ করিয়া দিন।’ তাহাতে অগ্নি উত্তর করিয়াছিলেন, ‘তুমি পুঙ্কে বাইয়া তপশ্চরণ কর।’ অগ্নির বাক্যানুসারে মায়াসীতা ত্রিলক্ষ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্যা করেন। এই তপোবলে মায়াসীতা স্বর্ণলক্ষ্মী হইয়াছিলেন।

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১৪ অধ্যায়)

অধ্যায়রামরণে লিখিত আছে—মারীচ মায়ামূগরূপ ধারণ করিয়া রাম ও সীতার নিকট সমুপস্থিত হইলে স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র সীতাকে নির্জনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,— ‘জানকি! তিনুকরূপে রাবণ তোমার নিকট আসিবে, এখন তুমি তোমার সদৃশাকৃতি ছায়া-কুটীরে স্থাপন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ কর এবং আমার আজ্ঞাক্রমে তথায় এক বৎসর কাল অবস্থিতি কর। রাবণবধের পর পুনরায় তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। জানকী রামবাক্য শুনিয়া তাহাই করিলেন।

এই মারাসীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল। লক্ষ্মণ মারাসীতার  
বিষয় কিছুই জানিতেন না।

(অধ্যাক্ষরামারণ অরণ্যে ৭-৮ অঃ) [সীতা দেখ]

মারাস্তত (পুং) মারায়ঃ মারাদেব্যঃ স্ততঃ। বৃক্। (হেম)  
মার্মিক (ক্ৰী) মার্য মোহনগুণঃ বিভভেৎস্মিন্ মার্য। (ব্রীহা-  
দিত্যঙ্ক। পা ৫।২।১১৬) ইতি ঠন্। ১ মারাকল। (রাজনিঃ)  
(পুং) ২ মারাকার, ঐত্ৰজালিক।

“যম্মারামোহিতস্তাহং সখা সর্কে পরাশ্রয়ঃ।

পরবান্ দারুপাঞ্চালী মার্মিকস্ত বখা বশে ॥”

(দেবীভাগবত ৪।১৯।৪) (ত্রি) ৩ মার্যাবিশিষ্ট।

মায়ু (পুং) মিনোতি প্রক্ৰিপতি মেহে উদ্রাণমিতি মিঞ্  
প্রক্ৰেপণে (কৃবাপাঞ্জিমিশ্রসিদ্ধাসাধ্যশূভ্য উণ্। উণ্ ১।১) ইতি  
উণ্ (মীনাতি দীভাঃ লপি চ। পা ৬।১।৫০) ইতি আত্ঃ  
ততো বৃক্। ১ পিতৃ। ২ শব্দ। “মিমাতি মায়ু পয়তে পরভিঃ”  
(শব্দ ১।১৬৪।২৮) ‘মায়ুঃ শব্দং মিনোতি’ (সারণ) ৩ বাক্য,  
বাক্। (নিরুক্ত ১।১১)

মায়ুক (ত্রি) শব্দকারী।

মায়ুরাজ (পুং) ১ কুবেরের পুত্রভেদ। ২ জনৈক কবি।

মায়ুক (ত্রি) শব্দকারী।

মায়ুর (ত্রি) ১ ময়ুর সম্বন্ধী। ময়ুর-নিরমান রথ।

মায়ুর (ক্ৰী) ময়ুরাণ্যং সমূহঃ, ময়ুর (প্রাণিরজ্ঞতাদিত্যোহঞ্  
পা ৪।৩।১৫৪) ইত্যঞ্। ১ ময়ুরসমূহ। ময়ুরাণামিহ ইতি-  
অণ্। (ত্রি) ২ ময়ুরসম্বন্ধী।

“আজ্যং গব্যং তথা মাংসং মায়ুরকৈব বজ্জয়েৎ।”

(ভারত ১৩।১০৪।২০)

মায়ুরক (পুং) বাহারা বস্ত্রময়ুর ধরে।

মায়ুরকর্ণ (পুং) ময়ুরকর্ণের গোত্রাপত্য।

মায়ুরকল্প (পুং) কল্পভেদ।

মায়ুরা (ক্ৰী) কাকোহ্মরিক। (বৈষ্ণবকনিঃ)

মায়ুরাদিপক্ষবাজন (ক্ৰী) মায়ুরাদিপক্ষস্ত বাজনং। ময়ুরপক্ষ,  
বস্ত্র ও বেত্রাদি দ্বারা বাজন।—এই বাজন ত্রিদোষনাশক।

• “মায়ুরা বস্ত্রজা বৈত্রা বাতা দোষত্রয়াপহাঃ।” (রাজবঃ)

মায়ুরাজ (পুং) মায়ুরাজ, কুবেরপুত্র।

মায়ুরিক (পুং) ময়ুর ধরিত্তা বিক্রমকারী।

মায়ুরী (ক্ৰী) অজমোদা, চলিত বনমহানী। (ভাবপ্রঃ)

মায়ের (ত্রি) মার্য-জাত।

মায়োভব (ক্ৰী) ১ শুভ। ২ সৌভাগ্য।

মার (পুং) মৃ-ভাবে ঘঞ্। ১ মৃতি। ত্রিযন্তে প্রাণিনো-  
হনেন মৃ-ঘঞ্। ২ কামদেব।

“অমুমহার ন মার কথং হু সা রতিরতিপ্রথিত্যপি পতিব্রতা।  
বিরহিণীশতঘাতনপাতকী দরিত্রমপি ভয়সি কিমুদ্বিত্যঃ ॥”

(নৈবধঃ ৪।৭২ঃ)°

৩ বিষ। ৪ মারণ। (হেম) ৫ ধৃত্বর। (শব্দচঃ)

৬ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত উপদেবতাভেদ। বুদ্ধদেব যখন বোধিতক-  
মূলে যোগমগ্ন, তৎকালে মার অমুচরসহ বুদ্ধকে ছলনা করিতে  
আসিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধের প্রভাবে তাহার সকল ছল-  
চাতুর্য ব্যর্থ হইল। [বুদ্ধ দেখ।] ৭ গণভেদ। বালিকা-  
পুরাণে লিখিত আছে,—

ত্রিকা মহাদেবকে মোহিত করিবার নিমিত্ত কামদেবকে  
অমুমতি করেন, কিন্তু কাম মহাদেবকে ভূলাইতে পারিবেন  
কি না এই বিষয়ে অতিশয় চিন্তাপন্ন হন। ইহা ভাবিতে  
ভাবিতে তখন তাঁহার বারংবার নিঃশ্বাসবায়ু বহিতে লাগিল।  
তৎপরে নানারূপধারী মহাবলপরাক্রান্ত ভীষণাকৃতি চকল-  
স্বভাব গণসমূহ তাহার নিঃশ্বাসবায়ু হইতে উৎপন্ন হইল। এই  
গণসমূহের মধ্যে কেহ তুরঙ্গানন, কেহ গজানন, সিংহানন,  
কেহ বা বরাহ, গর্দভ, ভল্লুক, বিড়াল প্রভৃতি জন্তুর ভ্রায় মুখ-  
বিশিষ্ট। অতিদীর্ঘাকৃতি, অতিধর্মাকৃতি, অতিমূল, অতিক্রুশ,  
পিঙ্গললোচন, ত্রিনয়ন, একনয়ন, ত্রিকর্ণ, চতুর্কর্ণ, মূলকর্ণ,  
মহাকর্ণ, বিম্বতকর্ণ, কর্ণহীন, চতুঃপদ, পঞ্চপদ, ত্রিপদ, এক-  
পদ, একহস্ত, দ্বিহস্ত, ত্রিহস্ত, চতুর্হস্ত, হস্তহীন, গোধ্যাকার,  
মহুয়াকার, বকাকার, হংসাকার প্রভৃতি; অর্দ্ধকৃষ্ণ, অর্দ্ধরক্ত,  
কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, নীলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিতবর্ণ  
প্রভৃতি এইরূপ ভীষণাকৃতি ও ভীষণদর্শন নানাদলে বিভক্ত  
হইয়া গণ সকল উৎপন্ন হইল। উৎপন্ন হইবামাত্রই গণ সকল  
শব্দ, পট্ট ও মৃদঙ্গাদি বাজাইতে লাগিল। এই গণ সকলই  
জটাজুটধারী ও রথারোহী। নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া গণগণ  
‘মাব্কাট্’ ইত্যাদিরূপে ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। কাম-  
দেব এই সকল গণ দেখিয়া ত্রস্তাকে কহিলেন,—ত্রস্তন্! ইহারা  
কি কার্য্য করিবে? থাকিবে কোথায়? ইহাদিগের নামই  
বা কি? বাহা ইহাদিগের প্রকৃত কার্য্য, যে স্থলে ইহারা  
থাকিবে ইত্যাদি সকল বিষয় আগনি নির্দেশ করিয়া দিল।

লোকপিতামহ ত্রিকা মদনের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে  
কহিলেন, ইহারা জন্মিবামাত্র স্পষ্টভাবে ‘মার্ মার্’ এই শব্দ  
করিয়াছিল, এইজন্ত ইহাদিগের নাম মার, এবং তাহারা  
মারাত্মক বলিয়া মার নামে অভিহিত হইবে। ইহা শুনিয়া  
সকল প্রাণিরই বিষয়সাধনে সমর্থ। হে মনোভব!  
তোমার অমুগমন করাই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য। তুমি  
যখন নিজ কার্য্যোদ্দেশে কোন স্থলে গমন করিবে, ইহারাও

তোমার অঙ্গগামী হইয়া তোমার সহায়তা করিবে। তুমি বাহাদিগের প্রাপ্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, ইহার। আবাদিগের মন উচ্চাটন এবং জানীদিগের জ্ঞানপথে সর্বদা বিয় সম্পাদন করিবে। সকল আশিগণ বাহাতে সংসারবন্ধনের অঙ্গুল কাণ্ড করে, বিয় থাকিলেও ইহার। সর্বতোভাবে তাহা করিবে। এই গণগণ মহাবৈগণ্যশীল ও কামরূপী। তুমি এই গণের অধিনায়ক হইবে। এই গণ কর্ম্মদিগের গণ বজ্রাংশ-ভোজী ও উৎকর্ষশীল। এই গণ তপোনিষ্ঠ, ইহার। সকলে সম্যাসী ও উৎকর্ষশীল। (কালিকাপুঃ ৬ অঃ)

মারক (পুং) স্ত্রিয়তে আশিনঃ বসিন্ ধেনেতি বা, হৃ-ঘঞ-তত্তঃ সংজ্ঞায়াঃ কন্। ১ মরক, পর্যায় মারি, উৎপাত। (ত্রিকাঃ) ২ পক্ষিবিষয়ঃ। চলিত বাজপক্ষী। (তুর্বিপ্রঃ) (ত্রি) ৩ মারকপক্ষী। জয়দ্বানাবধি অষ্টমস্থানধিপতি গ্রহভেদ। জ্যোতিষ মতে, মারকগ্রহ স্থির করিতে হইলে আগে মারকস্থান স্থির করিতে হয়, এই মারকস্থানের অধিপতি যে গ্রহ, সেই গ্রহের দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টমধিপতি সাধারণতঃ মারকগ্রহ। কারণ দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টম স্থান মারকস্থান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং তদধিপতি গ্রহই মারকগ্রহ।

“ভাগ্যব্যাপ্তিধিপত্যেন রক্ষুশো মারকঃ স্ততঃ।” (পরশর)

ভাগ্যপতি, ব্যাপ্তি এবং রক্ষুপতিও মারক। মারক-গ্রহ দ্বারা ব্যাপ্তি, মৃত্যু প্রভৃতি চিন্তা করিতে হয়। মারক-গ্রহের বিশেষ যোগ বা দৃষ্টিতে মৃত্যু, সামান্য যোগ বা সামান্য দৃষ্টিতে সামান্য ব্যাপ্তি হইয়া থাকে। মারক-গ্রহের দশা, অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তদর্শাতে উক্ত ফল হইয়া থাকে। অথবা ঐ মারকগ্রহের সহিত অন্য কোন গ্রহের সম্বন্ধ হইলে সেই গ্রহের দশা বা অন্তর্দর্শাভিতে তদন্ত-রূপ ফল হইয়া থাকে। মারকগ্রহের সহিত সম্বন্ধ না হইলে পীড়াদি হয় না।

“অষ্টমং স্থায়ুধঃস্থানং অষ্টমাদষ্টমঞ্চ যৎ।

তরোরপি ব্যরস্থানং মারকস্থানমুচ্যতে॥” (লবুপরাশর)

জয়দ্বানাবধি অষ্টম, সপ্তম ও দ্বিতীয় স্থান মারকস্থান। সুতরাং এই তিনটি স্থান লইয়া মৃত্যু ও পীড়াদির বিষয় অবধারণ করা আবশ্যিক।

পরশর সংহিতার ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

- \* “অথবা সংপ্রবক্ষ্যামি মারকাণাং গ্রহং বিজ।
- অন্তমধ্যমপূর্ণায়ুঃপ্রমাণমিহ যোগজম্।
- বিজার প্রথমং পুংসাং ততো মারকচিন্তনম্।
- সম্বন্ধেং পাপসংযুক্তেন মারকগ্রহযোগতঃ।
- তিরঙ্কতা গ্রহান্ সর্বাণি নিহন্তা পাপকৃৎ সয়া॥

জায়াপতি ও ধনপতি উভয়েই মারক। রবি ও চন্দ্র তিন মারক-স্থানের অধিপতি সমস্ত গ্রহই মারকদোষযুক্ত হইয়া থাকেন, রবি ও চন্দ্র গ্রহরাজ বলিয়া উভয়ের মারকদোষ হয় না।

বিংশোত্তরী-মতে মারকগ্রহ নিম্নোক্তরূপে নিরূপণ করিতে হয়। মারকবিচারের পূর্বে যোগজায়ুঃ বা ক্ষুটায়ুঃ গণনা দ্বারা পরমায়ুঃ স্থির করিয়া পক্ষাৎ মারক-নিরূপণ করিতে হয়। যদি শনি তৃতীয়, বর্ষ বা একাদশাধিপতি হইয়া, অথবা উহাদিগের অন্ততমস্থানের অধিপতির সহিত যুক্ত হইয়া কোন মারকগ্রহের সম্বন্ধী হয়, তবে সেই শনি অন্য সকল মারকগ্রহকে অতিক্রম করিয়া প্রথম মারক হইয়া থাকে।

জায়াপতি, ধনপতি, বর্ষপতি ও অষ্টমপতি ইহারা সকলেই মূখ্যমারক, কিন্তু জায়াপতি অপেক্ষা ধনপতি এবং বর্ষপতি অপেক্ষা অষ্টমপতি প্রবল। অতএব ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ধনপতি প্রথম, জায়াপতি দ্বিতীয়, অষ্টমপতি তৃতীয় এবং বর্ষপতি চতুর্থ শ্রেণীর মারক। পাপ-সম্বন্ধবশে বলবান্ হইয়া কোন স্থলে বা ব্যক্তিবিশেষে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর মারকও প্রথম শ্রেণীর কার্যকারিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়া থাকে। বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্রপতি হইয়া দ্বিতীয় বা সপ্তমস্থ হইলে উভয়েই প্রবল মারক হইয়া থাকে। ঐ সকল মারকগ্রহ দশার অপ্রাপ্তিস্থলে ব্যক্তিবিশেষে পাপগ্রহের সম্বন্ধী ব্যয়পতি ও তৃতীয়পতি উভয়েই মারক হইয়া থাকে। আত্মকারক গ্রহ ও লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, তৃতীয়, বর্ষ, সপ্তম, অষ্টম ও দ্বাদশ এই সকল স্থানস্থিত গ্রহের মধ্যে যে গ্রহই অধিক বলবান্ হইবেন, সেই স্থলে সেই গ্রহই মারক। যদি ঐ সকল গ্রহের মধ্যে পরস্পরের বলের সমতা হয়, তাহা হইলে উহার মারকসংজ্ঞক গ্রহই মারক।

যদি মধ্যায়ুঃ-যোগে জন্ম হয়, এবং বর্ষস্থানে বহু পাপ-গ্রহের যোগাদি সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে বর্ষপতিই মূখ্য-মারক। আর দীর্ঘায়ুঃযোগে জন্ম হইলে বর্ষপতি যে রাশিতে থাকেন, সেই রাশিধিপের দশার অথবা বর্ষস্থান বা বর্ষ হইতে নবম বা পঞ্চমপতির দশার মৃত্যু হইয়া থাকে। বৃত্তিক বা মকরলগ্নজাত ব্যক্তির রাহগ্রহ প্রবল মারক। বলবান্ বহু-গ্রহ মারক হইলে সেই সকল গ্রহের দশা এবং অন্তর্দর্শার

মারকগ্রহসম্বন্ধী পাপকর্ত্তা পশিষ্যতা।

অতিক্রম্যেত্যস্মান্ সর্বাণি নিহন্তা তবতি ত্রয়ম্।

জায়াক্ষুটিকাধীশৌ বাবেতো মূখ্যমারকৌ।

বর্ষাষ্টমেশৌ বৌ মূখ্যৌ প্রবলৌ চোত্তরোত্তরৌ।

এতেনাং সতবে বিপ্র ব্যাধীশোহপি মারকঃ।

পাপসম্বন্ধব্যাধেণ বিক্রমেণোহপি মারকঃ।” ইত্যাদি। (পরশরঃ)

রোগ ও ক্লেশভোগ হয়। উহার মধ্যে যে গ্রহ প্রবল মারক, তাহার দশাধিতে সামাজিক পীড়া, ভয়, শোক, দুঃখাতর, চোর ও অগ্নিতর, অপমান, নিন্দা, ধনহানি ও বৈকল্য এই অষ্ট-প্রকার মুহূর্ত্তলই ঘটয়া থাকে। ( পরামরসংহিতা )

**মারকগণ (ক্লী)** মারকণাং গণঃ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত জ্যোতিষ। নটেশাক, বৃহতী, পাপ, পিণ্ডতর, পুনর্বা, হিঙ্ক-শাক, বজ্রকর্ণী, কটুকী, ইন্দুরকাণি, পানী, মদনকল, আকল ও শতমূলী এই সকল জ্যো মারকগণ। ( রসেন্দ্রসারসং )

**মারকত (জি)** মরকত-অণ্। মরকতসম্বন্ধীয়। জিহাং জীব্। মারকতী, মরকতমণিসম্বন্ধীয়া।

**মারকবর্গ (পুং)** রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত জ্যোতিষ। এই গণ ষা—মৃগা, ষট, চিত্তা, গোক্ষর, তিতলাউ, দন্তী, জাতিপুল, রাসা, শরপুং, বৃতকুমারী, চণ্ডালিনী, ওল, কুচিলা, হারমুচ, লক্ষাদু, ঘোষা, লাক্ষা, দন্তোংল, বালা, পিপুল, নিসিন্দা, বন এলাচি, বিষলাকুলিয়া, শাল, আকল, সোমরাজ, রবিভক্তা, কাকমাচী, খেত-আকল, অপরাজিতা, বারসতুণ্ডী, সিজ, বেড়েলা, শুভী, বরাহক্রান্তা, হাতিতুণ্ডা, কদলী, রাসা, কাঁচা তেঁতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পুনর্বা, খেতপুনর্বা, দুস্তুর, কাকজন্বা, শতমূলী, ক্ষীরীশ, পরগাছা, তিল, ভেকপর্ণী, দুকা, মূর্খা, হর্যোতকী, তুলসী, গোক্ষর, ইন্দুরকাণি, কাঁকড়, বনবর্গ-লতা, তালমূলী, হিঙ, শুড়ুচী, সজিনা, অপরাজিতা, জল-পিপ্পলী, তুঙ্গরাজ, সৈকলবলগ, প্রসারিণী, সোমলতা, খেত-সর্ষপ, অসম, হংসপদী, ব্যাঘ্রপদী, পলাশ, ভেলা ও ইন্দ্রবাকুণী এই জ্যো সকল লইয়া মারকবর্গ। ( রসেন্দ্রসারসং )

**মারকায়িক (জি)** বৌদ্ধমতে মারের অন্তঃচরবর্গ।

**মারকুটিয়া (দেশজ)** যে সকল বালক অভ্যস্ত মারধর করে, যাঁহাদের মারপিট করা স্বভাব।

**মারজা (ক্লী)** মেধা। ( রাজনিং )

**মারজিৎ (পুং)** মারং কামং জিতবান্, জি-কিপ্ তুগাগমঃ।

১ বুদ্ধদেব। ( অমর ) ( জি ) ২ কন্দর্পবিজেতা।

**মারণ (ক্লী)** মাৰ্গাতে ইতি বৃ-ণিচ্ ভাবে লুট্। ১ বধ।

“ধাবন্তি পত্তরোমাণি তাবৎ কৃষেহ মারণম্।

বৃথা পত্তরঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য অম্মনি অম্মনি ॥” ( মম্ব ৫১৩৮ )

২ অভিচারবিশেষ, যে ক্রিমার অন্তঃস্থানে মৃত্যুব্যাধি প্রভৃতি অনিষ্ট ঘটয়া থাকে, তাহাকে মারণ কহে। অপর-বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রে এই মারণক্রিমার বিধান আছে।

শত্রু প্রভৃতির মারণ করিতে হইলে বলবান্ ও চক্ষুর ক্রুর-গ্রহের সহিত ক্রুরগ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থিতকালে যদি বৃষ্টিযোগ হয়, তবে সেই সময় ঐ ক্রিমার অন্তঃস্থান করিবে।

“অভিচারস্ত বিধয়ানাকর্ণয় বদামি তে।

সকুরে ক্রুরবর্গে চক্রে বলিনি শোধনে।

বিষ্টিযোগে চ কৰ্তব্যোহভিচারোহপ্যারিনিধনে ॥” (মটকপুণ্ডলিকা)

পাপিষ্ঠ, নাস্তিক, দেবভ্রান্তাদি, নিন্দক, অজ্ঞ, দাতক, কুংসিতকর্ম্মরত, ক্ষেত্র, বৃত্তি, স্ত্রী ও ধনাপহারী, কুলান্তকারী, সময়নিন্দক, খল, রাজভ্রোহী, বিধায়ি শত্রুদি দ্বারা প্রাণি-গণের প্রাণনাশক, এইরূপ ঘোষাযুক্ত ব্যক্তিকে মারণকর্মে নিযুক্ত করিলে মারক পাপভাগী হয় না। দশাহিত্তি বিবেচনা করিয়া মারণকার্য্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পূর্বলিখিত যোগাদি বিবেচনা না করিয়া মারণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, অচিরেই তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইবে। ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, রাজা, স্ত্রী, বজ্রশীল, দাতা ও দয়ালু এই সকল ব্যক্তির প্রতি মারণাদি কোন অভিচারকর্ম্ম করিবে না।\* যদি শত্রুতাবশতঃ কেহ ঐক্লপ মনুষ্যের প্রতি অভিচার করে, তবে তাহাতে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিচার করে, তাহারই মৃত্যু হয়। বাহার মারণ করিতে হইবে, প্রথমে তাহার আত্ম পরিচয় জানা বিশেষ আবশ্যক। তাহার জন্মলগ্ন, জন্মনক্ষত্র ও জন্মলগ্নাধিপতি গ্রহ এই তিনের অনুকূলে মারণকর্ম্ম করিতে হইবে। এই সকল গ্রহের বলাবল বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে মারণকারীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

দেবতার প্রতি ভক্তি রাখিয়া গুরুর আজ্ঞামুসারে গুরু-দেবের পার্শ্ববর্তী হইয়া কার্য্য করিবে। অভিচারকার্য্যে শত্রুর জন্ত শোক করিবে না। ইহার অভ্যুত্থা হইলে ফল হয় না, বরং অনিষ্টই হইয়া থাকে। বাহার মারণ করিতে হইবে, তাহার জন্মলগ্ন হইতে অষ্টম লগ্নে এবং অষ্টমরাশিতে ক্রুরগ্রহের অবস্থিতকালে মারণকার্য্য করিবে। মারণকার্য্যে

\* “পাপিষ্ঠান্ নাস্তিকান্ দেবভ্রান্তগণনিদ্রকান্।

অজ্ঞান্ দাতকান্ সর্বান্ ক্লেশকর্ম্মহ সংহিতান্।

ক্ষেত্রবৃত্তিধনভীষণাঃ আহর্তারঃ কুলান্তকম্।

নিন্দকঃ সময়ানাক পিশুনঃ রাজদাতকম্।

বিধায়িক্রুরশত্রুদৈর্ঘ্যসংকঃ প্রাণিনাং মৃগা।

যোজয়েন্মারণে কর্ম্মণ্যোত্মর পাতকী ভবেৎ।

দশাহিত্তিক সংবীক্ষ্য সূর্য্যামারণমাজ্ঞবান্।

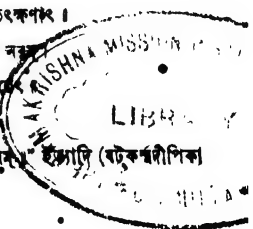
অনবেক্ষ্য কৃতং কর্ম্ম আত্মানং হস্তি তৎকণাৎ।

ব্রাহ্মণং ধার্মিকং কৃপং বনিতাদৈষ্টিকং নরক-  
যদান্তঃ সদয়ঃ নিত্যমভিচারে ন যোজয়েৎ।

রিপোরষ্টমলগ্নে চ ক্রুরে ষষ্টমরাশিগে।

হানে সূর্য্যধনিষ্টানি তথিনাশার সাধনম্।

ইত্যাদি (মটকপুণ্ডলিকা)





নাশি অমুসারে দিক্ নির্ণয় করিয়া পরে কার্যারম্ভ করিবে। মেঘ ও বৃষ পূর্বদিক্, মিথুন অগ্নিকোণ, ককট ও সিংহ দক্ষিণ দিক্, কন্যা নৈঋতকোণ, তুলা ও বৃশ্চিক পশ্চিমদিক্, ধনুঃ বায়ুকোণ, মকর ও কুম্ভ উত্তরদিক্ ও মীন জ্যৈষ্ঠকোণ এই প্রকারে রাশিক্রম জানিয়া কার্য করিবে। দিবসের মধ্যে পাঁচ পাঁচ দণ্ড করিয়া এক এক রাশি হয়। যখন যে দিকে কার্য করিবে, তখন সেই দিকের রাশি জানিয়া মারণকার্য বিধেয়।

লম্বাবধি গোচরে, তৃতীয় ও পঞ্চম স্থানে অন্তত গ্রহ থাকিলে মারণকার্য করিতে হয়।

মারণাদি অভিচারকর্মে কুণ্ড নির্মাণ করিয়া হোম করা আবশ্যক। যদি ইহাতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে স্থগিল করিয়া হোম করিবে। স্থগিলের নিয়ম এই যে, সমভূমিতে উত্তম-রূপে গোময় লেপন করিয়া চতুর্দিক এক হস্ত পরিমিত স্থান চতুর্দিক উচ্ছিন্ন করিয়া বালুকা দ্বারা পূরণ করিবে। পরে ঐ স্থানে হোম করিবে।

ব্যাঘাতযোগ, হর্ষণযোগ, বিষযোগ, মৃত্যুযোগ, নাশযোগ ও ক্রকচযোগ এই সকল যোগে মারণাদি অভিচারকার্য প্রশস্ত।

বলীকরণ, আকর্ষণ, বিধেয়ণ ও মারণ প্রভৃতি অভিচার-কর্মে চারিটা পুতলিকা প্রস্তুত করিবে। পুতলিকা মোম অথবা পিটুলায় হইবে। ঐ পুতলিকা কুণ্ড মধ্যে স্থাপন করিয়া পূজা ও হোম করিতে হয়। সর্পমন্তকক্ষব দ্বারা হোম করা বিধেয়। সাধক দক্ষিণমুখে উপবেশন করিয়া শত্রুর নামোচ্চারণপূর্বক ত্রিকোণকুণ্ডে অর্ধরাত্রিসময়ে হোম করেন।

কোন নির্জনপ্রদেশে বা শ্মশানে মারণাদি অভিচার-কাৰ্য্য প্রশস্ত। যে স্থানে বসিয়া মারণকার্য করিতে হইবে, তাহার চতুর্দিক রাজা রক্ষা করিবেন। সাধক স্বদেশে ও স্বীয় মণ্ডলে অভিচারাদি কাৰ্য্য করিবেন না। যদি কেহ প্রমাদবশতঃ উক্ত কাৰ্য্য করে, তাহাতে অনেক বিপদ হয়।

বহেড়া বৃক্ষের কাঠে অগ্নি জালিয়া বহেড়া ও করঞ্জফল নাগকেশরের রসে অভিষিক্ত করিয়া হোম করিবে। ইহাতে অচিরে শত্রুনাশ হয়। করঞ্জবৃক্ষের কাঠে অগ্নি জালিয়া ঐ বৃক্ষের সমিধ্ কটুটেলমিশ্রিত করিয়া হোম করিলে শত্রুর মারণ হয়। বহেড়া বৃক্ষের কাঠের অগ্নিতে ঐ বৃক্ষের ফল স্তম্ভযুক্ত করিয়া হোম করিলে শত্রু অরাতিভূত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কার্পাসবীজ কাঁজা মিশ্রিত করিয়া তন্দ্রায়া হোম করিলে শত্রুগণ পরস্পর কলহ করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সর্ষপ, গুঞ্জী, পিঙ্গলী ও মরিচ এই সকল দ্রব্য একত্র ঘৃত মিশ্রিত করিয়া হোম করিলে অরুরোগে শত্রুর মৃত্যু হয়। ঋগ্বেদোক্ত লবণমন্ত্রে অভিচারকর্ম ও করা যাইতে পারে।

মারণাদি অভিচারকর্ম বিশেষ কষ্টসাধ্য, এইজন্য ইহা বিশেষ সাবধান হইয়া করা আবশ্যক। ইহাতে কোন প্রকার অঙ্গহানি হইলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। অতএব সুশিক্ষিত জিয়াবান্ তত্ত্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা ইহা সম্পন্ন করা বিধেয়। (ষট্ কর্মদীপিকা)

যোগিনীতন্ত্রে মারণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

মঙ্গলবারে অষ্টমী তিথি হইলে ঐ দিনে রাত্রিকালে খদির-কাঠের অঙ্গার লইয়া লৌহফলকে শত্রু-প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে ঐ অঙ্কিত শত্রুর মন্তক, নেত্র, ললাট, হৃদয়, কর, নাভি, গুহ, কটি, পৃষ্ঠ ও পদদ্বয় প্রভৃতিতে স্বাহস্ত চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র যথাক্রমে লিখিতে হইবে। যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণ সকল লিখিয়া উহার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। তৎপরে সংহারমুক্তা করিয়া অন্নপ্রদা দেবীর ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

“দীর্ঘাক্ষরাং কৃষ্ণবর্ণাং সদাঙ্গিনীমন্তকাম্।

নৃমুণ্ডযুগলং হস্তং চক্ষুরন্তীং দিগম্বরীম্।

শত্রুনাশকরীং দেবীং ধ্যায়ং শত্রুকরায় চ ॥”

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া হরিদ্রাচূর্ণ সহযোগে ইষ্টিকাচূর্ণ দ্বারা বামহস্তে করিয়া ‘ও শত্রুনাশকর্যৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে ধারা দিতে হইবে। যাহার মারণ করিতে হইবে, তাহার নাম করিয়া ‘অমুকস্ত্র শোণিতং পিব পিব, মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীং নমঃ’ এই মন্ত্রে মধ্যরাত্রে পূজা করিয়া ১০৮ বার জপ করিতে হয়। এইরূপ জিয়া করিলে একাদশ দিনে তাহার অন্ন এবং এক বিংশতি দিনে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।\* অগ্নিবিধি বঁড়ের গোবর লইয়া শিব গড়িতে হইবে। ঐ শিব যথাবিধানে পূজা করিলে মারণ হইয়া থাকে।

\* “এবম্ মারণং দেবি। বিশেষান্ কথয়ামি তে।

সান্তং বহিসমায়ুক্তং স্বামনেত্রবিত্ত্বিতম্।

কুর্চযুগ্মং ততো দেবি। অমুকং সারয় মারয়।

চতুর্দশাক্ষরো মন্ত্রঃ স্বাহস্তঃ শত্রুনাশকঃ।

খদিরাক্ষরমাদায় কুজাষ্টম্যাং বিশেষতঃ।

লেখয়েৎ পুতলীঃ শত্রুশরুপাং লৌহপত্রকঃ।

নিশায়াং মন্তকে নেত্রে ললাটে হৃদয়ে করে।

নাভৌ গুহে কটৌ পৃষ্ঠে ক্রমোজেন পদদ্বয়ে।

মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য প্রতিষ্ঠাং তত্র কৃত্বায়ং।

সংহারমুক্তাং বন্ধু। তু ধ্যায়েক্ষেবীঃ অন্নপ্রদাম্।

এবং ধ্যাত্বৈষ্টিকাচূর্ণৈর্ধামহন্তেন শকরি।

ও শত্রুনাশকর্যৈ নমঃ ইতি দক্ষা মহেশ্বরী।

হরিদ্রাচূর্ণসহিতাং ধারাং দদ্যাদনেন তু।



মারণের বহুবিধ উপায় তত্ত্বাদিতে নির্ধারিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে সেই সকল এই স্থলে লিখিত হইল না। গুরু নিকট অভ্যাস না করিলে এই সকল কার্য করা যায় না। এই কার্যে প্রতিপদে বিয়ের সম্ভাবনা, সুতরাং মারণকারী ব্যক্তির বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যিক।

“গৃহস্থিক গবাস্থিক মূত্রনিষ্কাশ্যমেব চ।

অরোর্যো নিখনেৎ দ্বারে পঞ্চমুপবাতি সং ॥”

( গুরুত্বপূরণ ১৮৬ অ০ )

গৃহস্থি, গবাস্থি, মূত্র, এবং নিষ্কাশ্য শব্দর দ্বারদেশে পুতিয়া রাখিলে তাহার মৃত্যু হয়।

৪ তন্ত্রকরণ। আয়ুর্কেন্দ্রে লিখিত আছে, রক্তাদির মারণ করিয়া তবে উহা ব্যবহার করিতে হয়। যে উপায়ে রক্তাদির দোষ বিনষ্ট হয়, তাহাকে মারণ কহে। মারণকে বৈজ্ঞানিকভাবে কহে।

[ ধাতু ও রক্তাদির মারণ বিষয় তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য ]

মারপ ( পুং ) জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত।

মারপেঁচ ( দেশজ ) কোশল, কুটনীতি।

মারফৎ ( আরবী ) সজ্জা, দ্বারা, নিকট।

মারবী ( স্ত্রী ) সপ্তাতের মাত্রাবিশেষ।

মারবীজ ( স্ত্রী ) মন্ত্রবিশেষ।

মারব ( ত্রি ) মরুদেশবত।

মারবৎ ( ত্রি ) প্রেমপূর্ণ।

মারবরাজ্য ( স্ত্রী ) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত জনপদ-বিশেষ।

মারবার, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা সামন্তরাজ্য। পশ্চিম-রাজপুতনা-এজেন্সীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। ইহার উত্তর-সীমায় বিকানীর-রাজ্য ও জয়পুরের শেখাবতী জেলা, পূর্বে জয়পুর ও কৃষ্ণগড়, উত্তরপূর্বে আজমীর-মৈরবার-রাজ্য, দক্ষিণপূর্বে মিবাররাজ্য, দক্ষিণে সিরোহী ও পালন-পুর, পশ্চিমে কচ্ছের রণপ্রদেশ এবং সিন্ধুপ্রদেশের থর ও পার্কর জেলা, উত্তর পশ্চিমকোণে জশলমীর রাজ্য। ভূপরিমাণ আনুমানিক ৩৭ হাজার বর্গমাইল।

অমুকস্ত শোণিতং পিব পিবেতি তৎপরম্।

মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীং নম ইতি মন্ত্রঃ ॥

মধ্যাহ্নে মধ্যরাত্রে তু পূজয়িষ্য শতাহিকম্।

জপেদেকাদশাহে চ রোগঃ স্থান্নাত্রে সংশয়ঃ।

দণ্ডাধিকৈকবিংশাহে মৃত্যুরেব সিপোর্ডবেৎ।

অথবাস্ত্রপ্রকারেণ শত্রুক্ক্ষয়মহং বদে।

পুংগোশকুংসমাধায় পূজয়েদ্রুকারিণা ॥” ইত্যাদি।

( বোদিনীতন্ত্র পূর্বখণ্ড ৪ পটল )

এই রাজ্যে রাজপুতনার বিখ্যাত মরুভূমি অবস্থিত। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে “দাশেরক,” “মরুস্থলী” বা মরুস্থান নামে এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মরুদেশের অপভ্রংশ মরুদেশ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। মরুভূমি মৃত্যুস্থল বলিয়া স্থানীয় লোকে ইহাকে ‘মার-বাড়া’ শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকে। যোধপুর এই রাজ্যের রাজধানী। এই জন্ত বর্তমানকালে সকলেই ইহাকে যোধপুর-রাজ্য বলিয়া থাকেন।

মরুময় হইলেও এই যোধপুররাজ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিশেষ হীন নহে। এখানকার লুনী নদীর তীরবর্তী সমতল ভূভাগসমূহের দৃশ্য অতীব মনোরম। আজমীরের অন্তর্গত একটা হ্রদ হইতে উৎখত হইয়া সাগরমতী নামে একটা নদী গোবিন্দগড়ের নিকট সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সরস্বতী-নদী পুরুরহদ-সমুদ্ভূত। বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে সাগরমতী ও সরস্বতীসঙ্গমস্থল বিশেষ মনোহারী। গোবিন্দগড় হইতে এই মিলিত নদী লুনী নামে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে কচ্ছের রণপ্রদেশের জলাভূমে মিশিয়া গিয়াছে। আরাবল্লী-পর্বতবাহিনী জোজরি, শুকরী, গুয়রালা, পালী, বান্দী প্রভৃতি কএকটা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। নদীর উভয় তীর সমান শস্যশালী নহে। বর্ষার বতায় যে সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া যায়, সেই সকল আর্দ্রভূমিতে উৎকৃষ্ট যব ও গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। নদীর সমীপবর্তী দেশবাগিগণ কুপথনন দ্বারা আপনাদের পানীয় ও কৃষিক্ষেত্রের জল জল সরবরাহ করিয়া থাকে।

যোধপুর ও জয়পুরের মধ্যস্থলে ‘কধর’ (কুমার) নামে একটা বিস্তীর্ণ হ্রদ আছে। উহার এবং দৌদ্বানা ও পাচপাদরা নামক স্থানের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হ্রদসমূহের জল লবণাক্ত। এই তিনটা হ্রদ হইতেই এখানে লবণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নাচোর জেলায় একটা বিস্তীর্ণ জলাভূমি দৃষ্ট হয়। বর্ষার জলপাতে উহা প্রায় ৫০ মাইল স্থান অধিকার করে, কিন্তু গ্রীষ্ম-ঋতুতে জল শুকাইয়া আসিলে যব, ছোলা প্রভৃতি শস্যের চাষ আরম্ভ হয়।

এখানকার পর্বতসমূহে নানা প্রকার প্রস্তর পাওয়া যায়। আরাবল্লী অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে বালুকাময় প্রান্তরের মধ্যে বালুকাপিণ্ড শৈলমালা বিরাজিত দেখা যায়। সুতরাং আরাবল্লী হইতে লুণী নদী পর্যন্ত যোধপুররাজ্য বালুকাময় প্রান্তরে পূর্ণ হইলেও মধ্যে মধ্যে সৌন্দর্যময় শৈলমালায় বিভূষিত আছে। ঐ সকলের মধ্যে নান্দোলাই, পুণাগিরি, স্নজাতশৈল, পালিশৈল,

কনোজশৈল, সান্দরাশৈল, ঝালোর শৈল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল পর্বতে প্রাচীন সামন্তরাজ্যগণের কীৰ্ত্তি বিস্তারিত আছে। সুদীর্ঘ উত্তীর্ণ হইয়া বালুকাপিও-শৈলের সংখ্যা ক্রমশঃই কম দেখা যায়। এদিকের পর্বতগুলি ক্রমশঃ বেলে-পাথরে পরিণত হইয়াছে। বোধপুর নগরের পর, এই পর্বতগুলি আরও তির্যাকারে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বোধপুর নগরের উত্তরাংশ—বিতীর্ণ বালুকাময় ভূভাগ ‘খল’ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুশৈলগুলি ‘টিক্কা’ নামে পরিচিত। এই মরুদৃশ বালুপ্রান্তরের মধ্যে মধ্যে শস্তপ্রাচীর দৃশ্যও দৃষ্ট হয়, কিন্তু ততদ্দেশভাগে জলের বিলম্ব অভাব। উপরিতাগ বালুকাময় হইলেও নিম্নভাগ তজ্জাতীয় প্রস্তরে গঠিত। সুপাদি ধমনিকালে ঐরূপ কঠিন প্রস্তরস্তরের উপলব্ধি হয়। জ্বাভয়ের সন্নিকট দেশে রাং পাওয়া যায়। শবর, পাচপানর, দীর্ঘানা, কলেক্তি, পোকণ, সর্গোত ও কছবান নামক স্থানে অল্পবিস্তর লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মজ্জা ও ঘাপরাও নামক স্থানে মর্গরপ্রস্তর এবং কাপুরিতে সাজিমাটি প্রচুর পাওয়া যায়।

#### ইতিহাস।

মারবারের প্রাচীন ইতিহাস কালের অন্ধতমোচ্চারণে নিমজ্জিত। সেই প্রাচীন যুগে যে সকল রাজস্ববর্গ মারবার-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাটকবিগণের বংশাখ্যানে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত থাকিলেও অধিকাংশ স্থলে তৎসমুদায় কাল্পনিক ও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জ্ঞাত প্রাচীনতম পদ দিয়া ঐতিহাসিক কালের ইতিবৃত্ত অবলম্বনে মারবারের বংশাসম্ভব একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকটিত হইল।

মিবার রাজ্যে যে সময়ে চোহান-রাজবংশের কীৰ্ত্তিগৌরব বিভাসিত হয়, ঠিক সেই সময়ে রাঠোররাজ্যকে আমরা মারবার-সিংহাসনে দেখিতে পাই। এই রাঠোরবংশ কোন সময়ে এখানে আসিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। রাঠোর-রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী আছে। তাঁহারা মিবারের রাণাবংশের দ্বারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত করেন। [রাঠোর দেখ।]

বাহা হউক, দেশীয় ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, রাঠোর-রাজবংশ কাঙ্কজুনগরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রাঠোরজাতির বীরত্ব এবং রাজ্যভাষণা ক্রমে তাহারিগকে বীরচেতা রাজপুত্রজাতির শীর্ষস্থান প্রদান করে। ক্রমে এই বীরপ্রাণ রাঠোরগণের এক একটা শাখা, বিকানীর, কুকাগড়, ইন্দর ও আন্ধদনগরে রাজপাট-স্থাপনে কৃতকার্য হইয়া-

ছিল। রাঠোররাজবংশের মারবার অধিকারের পূর্বে অসুস্থমান করা যায় যে, তৎপূর্বে এই প্রদেশে জাট, মীনা ও ভীলসর্দারগণের প্রাধান্য ছিল। রাঠোরবংশ এই সকল সামন্তকে পরাভূত করিয়া মারবার রাজ্যবিস্তার করে।

একখানি প্রাচীন রাজত্বিহাসে সত্যত্ব হইতে রাঠোর-রাজগণের রাজ্যকাল ক্রমিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের প্রাচীন বংশতালিকার রাজগণের রাজত্বকালীন ঘটনাবলীর কোন উল্লেখ না থাকায়, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক-ভাষ্যের অনুরোধে রাজা নরনপালের রাজ্যাধিকার-ঘটনা হইতে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। রাজা নরনপাল কনোজরাজ অজয়পালকে বুদ্ধে নিহত করিয়া কনোজসিংহাসন অধিকার করেন। তদবধি রাঠোরজাতি কনোজিয়া রাঠোর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ বংশমর্যাদা-স্বত্ব ‘কামধ্বজ’ উপাধি গ্রহণ করেন। রাজা নরনপালের তনয় পদরত (ভরত) এবং তদীয় পুত্রগণ হইতে ত্রয়োদশটা ‘কামধ্বজ’ উপাধিধারী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১ ধর্মবিষ হইতে দানেশ্বর, ২ তাহুদ হইতে অতরপুর, ৩ বীরচন্দ্র হইতে কুপোলিয়া, ৪ অমরবিজয় হইতে কোড়া, ৫ সুনন্দ-বিনোদ হইতে জীরথেরা বা জরথরা, ৬ পদ্ম—টনি উড়িয়া জয় করিয়াছিলেন। ৭ অহিহর হইতে অহিহরবংশ, ৮ বরদেব হইতে পারক কামধ্বজ, ৯ উগ্রপ্রভু হইতে চন্দেলা, ১০ মুক্তমান হইতে বীর কামধ্বজ, ১১ ভারত হইতে ভারতীর, ১২ অলকুল হইতে ক্ষীরোদীর, এবং ১৩ চাঁদ কাশীবাসী হন। এই ত্রয়োদশ বংশ হইতে রাঠোরবংশ ক্রমে শাখামুশাখায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

কনোজরাজ ধর্মবিষের অজয়চাঁদ নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহাদের একবিংশতি পুরুষ অধস্তন পর্য্যন্ত ‘রাও’ উপাধি প্রচলিত থাকে। তৎপরে উদয়চাঁদ, নরপতি, কনকসেন, সাহসপাল, যেশসেন, বীরচন্দ্র, দেবসেন, বিমলসেন, ধনসেন, মুকুন্দ, ভহু, রাজসেন, জিপাল, শ্রীপুঞ্জ, বিজয়চাঁদ প্রভৃতি রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। বিজয়চাঁদের পুত্র জয়চাঁদ দাল-খাম্বা উপাধির সহিত কনোজের প্রথম নারক হন। কিন্তু কনোজ-পতি জয়চাঁদ ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের যে অভিশ্রাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত উক্ত বিবরণের কিছুমাত্র ঐক্য নাই। [কনোজ দেখ।]

উক্ত ইতিবৃত্তিকার এইরূপ সংক্ষিপ্তভাবে রাঠোরপ্রতিষ্ঠার পরিচয় দিয়াই, একবারে জয়চাঁদের রাজ্যকাল হইতেই প্রকৃত ইতিহাসের অমূল্য করিয়াছেন। ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোঁরী কর্তৃক কনোজ-রাজবংশের অধঃপতন ঘটিলে এবং রাজা জয়-

চাঁদ রাজ্যভ্রষ্ট হইলে, তাহার পৌত্র শিবজী ও শেঠরাম ১২১২ খৃষ্টাব্দে জম্মুভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারকাভীর্থে গমন-মানসে পশ্চিম-মরুভূমিতে আসিয়া উপনীত হন। এখানে আসিয়া তিনি কলুমদ-সর্দারের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি ফুলরার বিখ্যাত দস্তাসর্দার লাখা ফুলনাকে জয় করিয়া সাধারণের প্রশংসাজনন হন। এই যুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতা শেঠরাম জীবলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার এই বীরত্বে প্রীত হইয়া কলুমদের শোলাঙ্কি-সর্দার তাঁহাকে স্বীয় কন্ডাদান করেন। অন্তঃপর তিনি দ্বারকাধাত্রা করিয়াছিলেন। এখান হইতে প্রত্যাভ্রতকালে তিনি লাখা-ফুলনাকে স্বহস্তে নিধন করিয়া, পশ্চিমধ্যে মেহবের দাবে ও খরধারের গুলিল-সর্দার মহেশদাসকে নিহত করিয়া তদধিকৃত খরপ্রদেশ অধিকার করেন।

কর্ণেল টড্ লিখিয়াছেন যে, খর-প্রদেশ-জয়ের পর, তিনি পালিপ্রদেশের আক্রমণ কর্তৃক আহূত হইয়া পাকত্যা দস্তা-দিগকে দমনার্থ অগ্রসর হইলেন। দস্তাদল বিভাজিত হইলে আক্রমণদিগের অনুরোধে তিনি তথায় ভূমি লইয়া বসবাস আরম্ভ করেন। এইরূপে পালিপ্রদেশে নিজ রাজশক্তি বিস্তার করিয়া রাঠোর-সর্দার শিবজী ভবিষ্যৎ রাজ্যবিস্তারের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অখথামা পিতৃরাজ্যে, সুনীল ইদরে এবং কনিষ্ঠ অজয়মল ও কমণ্ডল রাজ্য জয় করিয়া তথায় রাজপট স্থাপন করেন। বিভিন্ন ভট্টকবির বংশাখ্যানে শিবজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অখথামা কর্তৃক গুলিলজাতির পরাভব, খররাজ্য পয়ান্ত আপনার রাজ্যসীমা-বিস্তার এবং স্বীয় ভ্রাতা সুনীলকে গুলিলরাজ্যের অন্তর্গত ইদররাজ্যে অভিষেকের কথা বিবৃত হইয়াছে।

রাজ্য অখথামা মৃত্যুকালে দুহর, জগসিংহ, খম্পশাহ, ভূপসিংহ, দণ্ডল, জৈয়মল, বন্দর ও উহর নামে আট পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ দুহর পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পৈতৃক ক্ষনোজরাজ্যবিজয়ে চেষ্টা পান। কিন্তু তাহাতে বিফলকাম হইলে, তিনি পরিহার-নৃপতির অধিকৃত মন্দোরপ্রদেশ আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে রাঠোররক্তে মন্দোরপ্রদেশ প্রাণিত হইয়া-ছিল। মন্দোরের সমরক্ষেত্রে মানবলীলা-সম্বরণকালে দুহর রায়পাল, কীর্তিপাল, বিহার, পিতল, যোগাইল, দলু ও বেগর নামে সাতটি পুত্র রাখিয়া যান।

জ্যেষ্ঠ রায়পাল পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পিতৃহস্তা মন্দোরের পরিহার-সর্দারকে নিহত করেন। তাঁহার ত্রয়োদশ পুত্র মরুদেশের নানাস্থানে সামন্তরাজরূপে অধিষ্ঠিত হন। জ্যেষ্ঠ-পুত্র কণহাল পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া রাজ্যশাসন করিয়া-

ছিলেন। কণহালের পুত্র জাহ্নলন, তৎপুত্র চাঁহ, তৎপুত্র খিছ যথাক্রমে রাজা হন। রাও খিছ শনিগড়াজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ভিন্নমাণ প্রদেশ এবং দেওরা ও বেলেচা জাতির হস্ত হইতে নানাস্থান অধিকার করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা পরিবর্দ্ধিত করেন।

বীরবর খিছর স্বর্গারোহণের পর তৎপুত্র সিলুক সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। সিলুকের বিরোধিতায় তৎপুত্র বিরামদেব স্বর্গগমন করিলে তৎপুত্র মহাবলশালী রাও চণ্ড পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

রাও চণ্ড মারবার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শিবজী হইতে ১১শ পুরুষ অধস্তন। তাঁহারই বীৰ্য্যবলে রাঠোর-রাজত্বী দোভাগ্যভূষণে বিকৃষিত হইয়াছিল। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে চণ্ডের রাজত্বকাল হইতেই রাঠোরজাতির প্রকৃত মারবার-বিজয় স্থির করা যায়। এই সময়ে রণমদে উন্মত্ত রাঠোরগণ মন্দোরনগর অধিকারপূর্ব্বক তথায় রাঠোর-রাজধানী স্থাপন করে। নাদোল ও নাগোর দুই চণ্ডের অধিকৃত হইয়াছিল। তিনি পরিহার-রাজকন্যা ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করেন।

চণ্ডের চতুর্দশ পুত্র ছিল, তন্মধ্যে রণমল, সত্য, অরণ্য-কমল ও কাণের বংশ এখনও মারবারে বিস্তারিত আছে। চণ্ডের হংসানাম্নী এক কস্তার সহিত মিবরপাতি লক্ষ রাণার বিবাহ হয়। ঐ কস্তার গর্ভে রাণা কুন্ত জন্ম গ্রহণ করেন। এই পরিণয়স্থলে মিবর ও মারবারে শত্রুতার ভাষণ পরি-গাম সংঘটিত হইয়াছিল।

১৪০৮ খৃঃ অঃ রাও চণ্ড পরলোক গমন করিলে পর, জ্যেষ্ঠ পুত্র রণমল পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি পিতার ত্রায় বিক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার নিকারিত তুলাদণ্ডের পরিমাণ আজিও মরুভূমিতে প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহার চতুর্দশংশতি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যোধ রাও মারবার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং কন্দল, চম্পা, অখিরাজ, মণ্ডল, পট্ট, লাখা, বালা, জৈয়-মল, কর্ণ, রূপ, নাথ, দুহর, সন্দ, মন্দ, বীর, জগমল, হেম্পু, শত্রু, করমচাঁদ, অরিল, কেতুসিংহ, শত্রুশাল ও তেজমল নামক অপর ২৩টি পুত্র বিভিন্ন প্রদেশের সামন্তাধিপ হইয়া-ছিলেন। এই চতুর্দশংশতি পুত্র হইতে চতুর্দশংশতি শাখার উদ্ভব হইয়াছিল।

যোধরাও রাজ্যসনে আসীন হইয়া স্বীয় ভূজবলে স্বজাত প্রভৃতি দেশ জয় করেন। তিনি মন্দোর-রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান যোধপুর নগর স্থাপনপূর্ব্বক রাজপট উঠাইয়া আনেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র সূর্য্য-মল সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা যোধরাওর শত্রুল,

স্বর্ঘ্য, গুম, দ্রোণ, বিকো, ভীলমল, শিবরাজ, কন্দুসিংহ, রায়মল, সামন্তসিংহ, বিদা, বনহর ও নিম নামক চতুর্দশ পুত্র হইতে ১৪টা শাখা ও সামন্তরাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে।

রাজা স্বর্ঘ্যমলের ভাগ্য, উদয়, স্বর্গ, প্রয়াগ ও বিরামদেব নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। এই পাঁচ পুত্র হইতে পাঁচটা শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল। স্বর্ঘ্যমল রাওর মৃত্যুর পর, ভাগ্যের পুত্র গঙ্গারাও ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। ৬৩ বর্ষে তিনি দৌলত খাঁ লোদীকে পরাভূত করিয়া স্বীয় রাজপদ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাঠোর-সৈন্য প্রবল বিরুদ্ধে উদয়পুরের রাণা সংগ্রামসিংহের (সঙ্গ) পক্ষ হইয়া মোগলসম্রাট বাবর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (মতাক্ষরে খাহুয়া) রণক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে গঙ্গারাওর পৌত্র রায়মল প্রাণ বিসর্জন করেন। এই ঘটনার পর চারি বৎসর কাল গঙ্গারাও জীবিত ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর মারবার-কুলরবি মালদেব ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে রাঠোর-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া নাগোর, আজমীর, ঝালরা-পাটন, শিবনো, ভদ্রাজুন, বিকানীর, বিরূমপুর প্রভৃতি স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তিনি শবর-হৃদের লবণের অময় হইতে রাজ্যস্বার্থ মালকোট ও ভদ্রাজুন দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাঁহার বাহুবলে সূজাত, শবর, মেরতিয়া, খাতা, বেদনুর, লাদহ, রায়পুর, ভদ্রাজুন, নাগোর, শিবানো, লোহগড়, জয়কলগড়, বিকানীর, ভিল্লমাল, পোকর্ণ, বার, কুশলী, রেবাস, জাজাবর, কালোর, বাওলি, মুলার, নাঙ্গোল, ফিলোড়ি, সাকোর, দীদ্বানা, চাত্তর, লোবাহন, মুলারগা, দেওরা, কতেপুর, অনরসর, খবর, বেণিয়াপুর, তোঙ্ক, খোড়া, আজমীর, জহাজপুর ও শেখাবর্তী প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল।

হাজার দশবর্ষ পরে তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরিতে আরম্ভ হইল। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর আকগানরাজ শেরশাহ ৮০ হাজার সৈন্য লইয়া মারবারবিজয়ে অগ্রসর হন। শের-শাহ এই যুদ্ধে জয়ী হইলেও রাঠোর-সৈন্যের হস্তে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

১৫৬১ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট অকবর শাহ মারবার আক্রমণ করেন। মোগলসৈন্য মালকোট বা মৈরতা দুর্গ অবরোধ করিল। ভাষণ যুদ্ধের পর মালকোট মোগল-পদ-নত হয়। অতঃপর জয়োদ্ভূত মুসলমানসৈন্য ভীমবেগে দ্রুত নাগোর দুর্গ জয় করিয়া লইলেন। সম্রাটের অমুগ্ধে শিবজীর ঋতম শাখার বংশধর বিকানীরপতি রায়মল এই প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

মালদেবের ভাগ্যচক্র ক্রমশঃই পরিবর্তিত হইতে লাগিল। এই সময়ে সম্রাট অকবর শাহ ভারতে মোগলপ্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন। মোগলসৈন্য কর্তৃক বারবার পরাজিত হইয়া অগত্যা তিনি ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের আত্মগত্যাঙ্গীকারে বাধ্য হইয়া পড়িলেন। মোগল-সম্রাটের অধীনতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি নিজ পুত্র চন্দ্রসেনকে উপহার সহ আজমীরে সম্রাট-সমীপে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট তাঁহার এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া রায়সিংহকে কেবল বিকানীরের শাসনভার অর্পণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সমগ্র যোধপুররাজ্যের শাসনভার সন্দ্বিধা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর বিপক্ষসৈন্য আসিয়া যোধপুর আক্রমণ করিল। বুদ্ধ বীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুনরায় আত্মগত্যাঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এবার তাঁহার অপর পুত্র উদয়সিংহ সম্রাট সকাশে প্রেরিত হন। এই পুত্রের বিনয় ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া সম্রাট তাঁহাকে মারবারের ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকার করেন; এই সময় জাতীয় স্বাধীনতা হারাইয়া বুদ্ধ রাজা মালদেব মানবলীলা সাক্ষ্য করিলেন।

রাও মালদেবের বারজন পুত্রের মধ্যে একমাত্র উদয়সিংহই সম্রাটের অমুগ্ধে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন। তিনি স্বীয় ভগিনী যোধাবাদেকে সম্রাটকে অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থমন্ত্র জ্ঞান করিয়াছিলেন। সম্রাটের ক্রপায় তিনি মোগল-সেনানায়কের পদ এবং আপন পূর্বপুরুষগণের অধিকৃত সমগ্র মারবাররাজ্য প্রাপ্ত হন। আজমীর-প্রদেশের পরিবর্তে তাঁহাকে মালবের কতকাংশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র সুরসিংহ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিও সম্রাটের পক্ষ হইয়া দাক্ষিণাত্য ও শুজরাতজয়ে রাঠোরবংশের বীরত্বপ্রতি রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'সবাই রাজা' উপাধি দান করেন।

শুজরাতরাজ্যজয় এবং তথাকার পাঠানরাজবংশের বিলোপ সাধন করিয়া রাও সুরসিংহ যোধপুররাজ্যে বিশ্রামার্থ আগমন করেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র গজসিংহ রাঠোর সেনাদল সহ সম্রাট সকাশে অবস্থান করিতেছিলেন। গজ-সিংহ কর্তৃক ঝালোরবিজয়ের পর সম্রাট তাঁহাকে মিবারপতি রাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

পুনরায় সম্রাটের আদেশে সুরসিংহ ১৬২০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। তথায় উক্ত বর্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যুর পর গজসিংহ মারবার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি স্বীয় ভূজবলে ষিকীগড়, গোলকোত্তা,

কিলেনা, পর্ণালা, গাজনগড়, আশীরগড় ও সাতারা প্রভৃতি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সম্রাটের বিশেষ সম্মানভাজন হন। তাঁহার এই অমিতবিক্রম ও বীরত্বের জন্য তিনি 'দাল খামনা' উপাধি লাভ করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী কুমার পরবেজ্ মারবার-রাজকুমারীর এবং দ্বিতীয় কুমার খুরম্ জয়পুর-রাজত্বহিতার গর্ভসম্ভূত ছিলেন। ইহারা দুই জনেই সিংহাসনের লোভে সংসারক্ষেত্রে আপনাপন অভিনয় আরম্ভ করিতে ছিলেন। খুরম্ রাও গজসিংহকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে অসমর্থ দেখিয়া তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে অপস্থত করিবার মানসে, গজসিংহের খুলতাত কৃষ্ণসিংহ দ্বারা তাঁহার বিধ্বস্ত ভক্ত ও সামন্ত গোবিন্দদাসকে নিহত করেন। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া গজসিংহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন।

এই সময়ে খুরম্ ভ্রাতা পরবেজ্কে ইহলোক হইতে এবং জন্মদাতা পিতা জাহাঙ্গীরকে সিংহাসন হইতে অপস্থত করিবার আশায় রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহবৃদ্ধি প্রজালিত করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিনীত প্রার্থনায় গজসিংহ স্বীয় রাঠোর-বাহিনী লইয়া বারাগমীর সন্নিকটে বিদ্রোহিদলের সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে খুরম্-পক্ষে মিবারের রাণা ভীমসিংহ নিহত হন। খুরম্ পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগে পলায়ন করেন।

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে গজসিংহ গুজরাতযুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় পুত্র যশোবন্ত সিংহ মারবার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট শাহজহানের পুত্র-চতুর্ভয়ের অল্পবিস্তর সময়ে অরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কতরাবাদে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি অরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি করিলেন বটে, কিন্তু সম্রাট-পুত্র তাঁহার এই কৃতাপরাধের কথা বিস্মৃত হইলেন না। দিল্লীসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অরঙ্গজেব সেই প্রতিহিংসা-সাধনার্থ তাহাকে সৈন্তে কাবুল-গমন করিতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে পর্কতবাসী হুদাদ আফগানগণ মোগলসম্রাটের বিদ্রোহিতাচরণ করিতে-ছিল। জয়গৌরবাজ্ঞ-অভিলাষী যশোবন্ত স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথ্বী-সিংহকে মারবাড়ে রাখিয়া কাবুলযাত্রা করিলেন। এখানে কাবুল শাসন-কালে তিনি অরঙ্গজেবের বড়বজ্রজালে বদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। শুনা যায়, সম্রাট অরঙ্গজেব তাঁহার বংশধর পৃথ্বীসিংহ, জয়সিংহ ও দালখামনার নিধন সাধন করিয়া আপন প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিলেন। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে রাঠোরদিগের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং অরঙ্গজেব ভীত হইয়া-ছিলেন। তাই তিনি পৃথ্বীরাজকে ডাকাইয়া ছলে হত্যাসাধন করেন। এই সময়ে দিল্লীতে রাঠোর ও যবনরক্তে নদী বহিল।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে অত্যাচারী সম্রাট অরঙ্গজেবের পীড়নে যশোবন্তের ও তাঁহার পুত্রগণের ক্ষয় সাধিত হইলে, তাঁহার মহিবীর গর্ভস্থ শিশু অজিতসিংহ জাতকর্ণের পর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বালক অজিতের শাসনকালে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা উপলব্ধি করিয়া সম্রাট অরঙ্গজেব সমলে মারবার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যোধপুর প্রভৃতি নগর মোগলসৈন্য কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল। সম্রাট রাঠোরদিগকে পরাজিত দেখিয়া তাহাদিগকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। এই সংবাদে মারবারের সামন্তবর্গ এবং রাজপুতনাবাসী সমস্ত রাজপুত সর্দার সম্মিলিত হইয়া মোগলশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুরের রাজত্ববর্গ একটা সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া মোগল-সম্রাটের অধীনতাপাশ ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। এই সন্ধির সর্তাহুসারে উদয়পুর রাণাবংশের সহিত মোগলসম্পৃষ্ট জয়পুর ও যোধপুর-রাজত্ববর্গের পুত্রকন্যা আদানপ্রদানের ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়। তদনুসারে রাণার ভ্রাতা গজসিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সন্ধিবলে এই প্রধানা মহিবীর গর্ভজাত পুত্র অভয়সিংহই মারবার-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

এই সময় হইতে অজিতের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইলেন। সম্রাট অরঙ্গজেব স্বীয় যুবতী পৌত্রীর (অকবর-কন্যা) সতীত্ব-নাশভয়ে অজিতের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সম্রাট স্বীয় পৌত্রীকে পাইয়া অজিতকে পূর্ণহৃত অনেক সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন। শাহজাদা স্বয়ং অজিতকে যোধপুর নগর মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহ আলম দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই নবীন সম্রাটের সহিত তাঁহার বিশেষ বাদ বিসংবাদ ঘটে নাই। শাহ আলমের মৃত্যুর পর আজিম-উদ্দৌল্লাহ সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। তিনি অজিতের ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গুজরাতের রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করেন। অজিত সম্রাট ফরুখসিয়রকে ও ধনরত্ন উপহারে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাকে হস্তগত করিয়া লইলেন। পরে খড়বজ্রপূরক তিনি সৈয়দ খাঁ ও হোসেন আলী খাঁর সহযোগে দিল্লীনগর আক্রমণ করিলেন। নররক্তে দিল্লীর রাজধানী প্রাণিত এবং রাজকোষ লুণ্ঠিত হইল। মোগল আমীর ওমরাহগণ কেহই ফরুখসিয়রকে রক্ষার জন্ত সাহসপূরক, অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ফরুখসিয়রের হত্যাকাণ্ডের পর, মোগল আমীরগণ সমবেত হইয়া নিকো শাহকে আগানগরে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করেন, কিন্তু সৈয়দদ্বয় রাক-উদৌল্লাহকে সম্রাট

মনোনীত করিয়া আগ্রা অভিমুখে সটেন্ডে বাত্মা করিলেন। মেগলগণ ভীত হইয়া নিকো-শাহকে অজিতের হস্তে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে দ্বিতীয় নিকো-শাহকে প্রাণ-ভাগ্য করায়, অজিত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহযোগে মহম্মদ শাহকে ভাঙ্গত-সম্রাট-পদে অভিষিক্ত করেন।

১৭৮০ সংবতের আষাঢ়মাসে শিভুহত্যা অভয়সিংহের প্রেরোচনায় ও রাজ্যলাভলালদায় প্রলোভিত হইয়া তদীয় অমূল্য ভক্তসিংহ বিষপ্রয়োগে বীরকেশরী বৃদ্ধ পিতাকে শমনসদনে প্রেরণ করে।

অজিতসিংহকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়া অভয়সিংহ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াও সুখে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ “মহারাজ-রাজেশ্বর” উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর তাহাকে ভ্রাতা তক্তসিংহের সহিত বিরোধে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। শিব্যর, অম্বর ও মারবার রাজ্যে মিত্রতা-স্থাপনের পর আর তাহাকে সমরান্বেণে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বোধপুরনগরে তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। দিল্লীপতি মহম্মদ শাহের অধীনতাস্থলে আবদ্ধ হওয়ার এবং তাহার আত্মগত্য স্বীকার করায় উক্ত রাজ্য-ত্রয়ের মধ্যে একটি বিবাদচিহ্ন সৃষ্টি হইতে থাকে। এই বিষয়বন্ধি বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছিল।

অভয়সিংহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র রামসিংহ মারবার-সিংহাসনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং ভক্তসিংহ মারবারসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনিও পিতৃহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বিষপ্রয়োগে নিহত হইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতৃ বিজয়সিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে রামসিংহ সিংহাসন লাভাশায় অগ্রসর হইলে উভয় ভ্রাতার বিরোধে মহাসমরানল প্রজ্জলিত হয়। রাও বিজয়সিংহের রাজ্যকালে মারবার-প্রদেশ অন্তর্বিপ্লবে ছারখার হইয়াছিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে, ভীমসিংহ জ্যেষ্ঠতাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন লাভ করেন। ভীমসিংহের মৃত্যুর পর ১৮০৩ খৃঃ অব্দে রাজা মানসিংহ মারবারসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভীমসিংহের অত্যাচার এবং রাজা মানসিংহের রাজ্যশাসন বখাশ্বানে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অভয়সিংহ কর্তৃক উদয়পুর, বোধপুর ও জয়পুর ত্রিভুজত্রয়ের সমন্বয়সন্ধি ভঙ্গ হইলে, রাজত্ববর্গ আর পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী রহিলেন না। সুতরাং রাজ্যাধিকারপ্রসঙ্গে বিভিন্ন সর্দারগণ রাজবংশধর

বিশেষের সিংহাসনাধিকার লইয়া পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকিয়া স্ব স্ব বলক্ষয় করিতে লাগিলেন। রাজ্য মধ্যে অতিষ্ঠা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে তৎকালীন সমুদ্রত মহারাষ্ট্রশক্তির সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। ক্রমেই সমগ্র রাজপুতনা মহারাষ্ট্ররাজধানী পুণার অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িল।

এই ক্ষেত্রে সিন্ধেরাজ বোধপুর জয় করিয়া ৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন এবং আজমীর দুর্গ ও নগর কাড়িয়া লন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মহারাষ্ট্রযুদ্ধের সময় রাজ্য মধ্যে অরাজ-কতার সূচনা দেখিয়া লারস্‌গঞ্জ ভীমসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজা মানসিংহকে বোধপুরসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে মানসিংহের সহিত ইংরাজরাজের সন্ধি হয়, কিন্তু ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হোলকররাজকে আশ্রয় দান করার ইংরাজ গবর্নেন্ট সন্ধি ভঙ্গ করেন।

ইংরাজ-সাহায্যলাভে বঞ্চিত হওয়ার, উপায়বিহীন বোধ-পুররাজকে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এই সময়ে ভীমসিংহের পুত্র ধোকলাসিংহ বা ধনকুলসিংহ রাজ্যা-ধিকার-কামনার সটেন্ড বোধপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে এবং উদয়পুররাজকর্তা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণকালে জয়পুররাজের সহিত যুদ্ধে মানসিংহ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং উভয়েই পেক্ষারি দম্ভ্যসর্দার আমীর খাঁকে স্ব স্ব দলভুক্ত করিতে চেষ্টা পান। আমীর খাঁ প্রথমে জয়পুররাজের পক্ষ এবং পরিশেষে বোধপুররাজের পক্ষ-বলয়ন করেন। তিনি রাজাকে ভয় দেখাইয়া এবং সাধারণ্যে রাজাকে উদ্ভাদগ্রস্ত বলিয়া প্রচার করিয়া স্বয়ং রাজকে ব লুপ্ত করিতে থাকেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে আমীর খাঁ মারবার হইতে চলিয়া আসিলে ছত্রসিংহ তৎপিতা মহারাজ মানসিংহের পক্ষ হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেক্ষারিযুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরাজ-গবর্নেন্ট তাহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। ইংরাজ-রাজ বোধপুররাজ্যের রক্ষাভার গ্রহণ করিয়া সিন্ধেরাজকে দেয় রাজকরের সরবরাহভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং রাজা ইংরাজের সাহায্যার্থ রাজসরকার হইতে আবশ্যক মত ১৫ শত অশ্বারোহী সেনা পাঠাইতে স্বীকৃত হন। সন্ধি শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই ছত্রসিংহ লোকান্তর গমন করেন। এই সুযোগে রাজা মানসিংহ স্বীয় উদ্ভূততার ভাগ করিয়া রাজ্যশাসন গ্রহণ করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে দ্বীনা ও মের-জাতিতে অধীনে আনয়ন করিবার মানসে তিনি ইংরাজ গবর্নেন্টকে মারবারের অন্তর্গত ২১ থানি গ্রাম দান করেন।



১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামগুলির অধিকার-সম্বন্ধের অবসান হয়। কিন্তু উক্ত বর্ষে রাজার মৃত্যু হওয়ার, আর কোল নতুন বন্দোবস্ত হয় নাই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজানী প্রদেশ পলিটিকাল এক্সেকিউটর পরিদর্শনে রক্ষিত হয়। কিন্তু তদবধি ইংরাজগণ উক্ত প্রদেশের রাজস্ব আদায় করিতেছেন।

রাজা মানসিংহের বথেকশাসনে মারবাররাজ্য উচ্চ-লভ্যের চরম লীমার পদার্পণ করিয়াছিল। রাজ্য মধ্যে তীব্র বিদ্রোহবলি প্রকলিত দেখিয়া, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গব-মেন্ট বাধ্য হইয়া মারবারের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করেন। সেই হেতু একদল ইংরাজ-সৈন্য বোধপুরে রক্ষিত হয়। রাজা মানসিংহ বোধপুররাজ্যের স্বেচ্ছায় প্রত্যাগমন করিয়া ইংরাজরাজের সহিত একটি বন্দোবস্ত করেন। উক্ত বন্দো-বস্তের পর চারি বৎসর কাল মানসিংহ জীবিত ছিলেন।

তাহার পুত্র সন্তান না থাকায় এবং স্বয়ং কোল দত্তক গ্রহণ না করিয়া বাওয়ার, ইদর ও আন্ধ্রনগর-সম্ভাবংশ মারবাররাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। বিধবা রাজ-মহিষীগণ সামন্তবর্গের এবং রাজকর্মচারীদিগের অভিপ্রায় মতে রাজা অজিতসিংহের বংশধর আন্ধ্রনগরগণিণ তক্ত-সিংহের উপর মারবারের শাসনভার অর্পণ করেন। মহারাজ তক্তসিংহ মারবার-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় আন্ধ্র-নগর-রাজ্য-শাসনের জন্ত নিজ পুত্র কুমার বশোবন্ত সিংহকে আন্ধ্রনগরে পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় ইদররাজ আন্ধ্র-নগরের সিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করেন। ইংরাজ-গবর্মেন্ট এই আন্দোলনের পর, ভারসমত ও চিৎপ্রচলিত বিবেচনা করিয়া ইদরপতির হস্তে আন্ধ্রনগরের শাসনভার অর্পণ করিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ৬ বর্ষকাল আন্ধ্রনগর শাসন করিয়া কুমার বশোবন্ত মারবারে প্রত্যাগত হইলে আন্ধ্রনগর ইদররাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

মহারাজ মানসিংহের এই স্মরণার্থকালের শাসনে মারবাররাজ্য ছারখারে পিয়াছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধপ্রদেশের তালপুরের ধীরগণ উক্ত দুর্গ ও তদধীনস্থ প্রদেশ জয় করেন। ইংরাজ গবর্মেন্ট সিদ্ধপ্রদেশ জয়কালে উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। তদবধি ইংরাজরাজ উক্ত দুর্গাধিকার পরিত্যাগ করেন নাই। তক্তসিংহ দুর্গ প্রার্থনা করিলে, ইংরাজকর্মচারী মিঃ গ্রেটহেড তক্তের বলিয়া পাঠান যে, তিনি সেলাদলের বেতন-হিসাবে বাৎসরিক দৈন ১ লক্ষ ১৫ সহস্র মুদ্রা হইতে (১৮৪৭ খৃঃ অঃ) ১০ লক্ষ মাত্র রেহাই পাইবেন এবং ইংরাজরাজ চির-দিনের জন্ত অপরকোটি দুর্গের সম্বাদিকার প্রাপ্ত হইবেন। রাজা এ প্রস্তাবে সন্তোষিত হইয়া বাধ্য হইলেন। তাহার শাসন-

সময়ে সামন্তগণের বিদ্রোহশক্তি হয়। তিনি ইংরাজের সন্তোষ-তার মারবাররাজ্য স্বেচ্ছায় আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দমগ্র ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহের প্রকলিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা তক্তসিংহ স্বীয় সেলাদলের সাহায্যে বিদ্রোহীদের দমন এবং রাজধানী মধ্যে ইংরাজদিগকে আশ্রয় দান করিয়া গবর্মেন্টের প্রতি রাজতক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গণোন্মত্ত সামন্তগণ লইয়া সামন্তগণের সহিত তাহার বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরাজ গবর্মেন্টের অনুরোধে তিনি রাজ্যের অশান্তিনিবারণার্থ সামন্তগণের সমস্ত গোল-যোগই মিটাইয়া লইলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারত-রাজপ্রতিনিধি আরল অব্ মেও আজমীরে দরবার করেন। এই দরবারে নিয়ম মত উদরপুরের মহারাজকে প্রথমশাসন দান করার, মহারাজ তক্তসিংহ দর-বারে উপনীত হন নাই। তাহার এই অশিষ্টচরণ ও অব-মাননার ফল হইয়া আরল মেও তাহাকে বিশেষরূপে লাঞ্চিত করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তক্তসিংহ বর্গারোহণ করিলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার বশোবন্ত সিংহ শিক্‌সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলস্ (বর্তমান ভারতসম্রাট এডওয়ার্ড ৭ম) ভারতপরিদর্শনে আগমন করেন। এই সময়ে কলিকাতার গড়ের মাঠে একটি দরবার আহূত হয়। এই দরবারে মহারাজ বশোবন্ত সিংহ যুবরাজ কর্তৃক বিশেষ সম্মানিত হন এবং G. C. B. I. উপাধি লাভ করেন। স্বয়ং যুব-রাজ (বর্তমান ভারত-সম্রাট) তাহার বাসভবনে উপনীত হইয়া প্রতিসাক্ষাৎ দান করিয়াছিলেন।

#### মারবারের রাওবংশ।

নাম	রাজ্যারোহণকাল
রাও শিবজী ... ..	১২১২ খৃঃ অঃ।
„ অম্বখামা ... ..	
„ ছহর বা খোলরায় ... ..	
„ রায়পাল ... ..	
„ কানহাল ... ..	
„ জাঙ্কনসিংহ ... ..	
„ ছদ ... ..	
„ খীল ... ..	
„ ললুখ ... ..	
„ বিরাম দেব ... ..	
„ চণ্ড ... ..	১৩৮১



নাম	রাজ্যোদ্বোধনকাল
রণমল	১৪০৮ খৃঃ অব্দ
দ্যোষ	১৪২৭
স্বর্ধামল	১৪৮৯
গজ	১৫১৬
মলদেব ( মালদেব )	১৫৩২
উদয়সিংহ	১৫৮৪
সুরসিংহ	১৫৯৫
রাজা গজসিংহ	১৬২০
যশোবন্তসিংহ	১৬৩৮
অজিতসিংহ	১৬৮০
মহারাজ অজয়সিংহ	১৭২৪
রামসিংহ	১৭৫০
তরুসিংহ	১৭৫১
বিজয়সিংহ	১৭৫২
ভীমসিংহ	১৭৯২
মানসিংহ	১৮০৩
তরুসিংহ	১৮৪৩
যশোবন্তসিংহ	১৮৭০

মারবারী ( মাড়োয়ারী ) মারবারবাসী বণিকসম্প্রদায়। মারবারী বলিলে এখন দুইশ্রেণীর লোককে বুঝাইয়া থাকে। তন্মধ্যে একশ্রেণী প্রকৃত মাড়োয়ারবাসী স্বনাম-প্রসিদ্ধ জাতি ও অপর শ্রেণী রাজপুতনা ও তরিকটবর্তী স্থানবাসী বণিকসম্প্রদায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আগরবালা, অশ-বাল (অশোয়ার) ও মাহেশ্বরীশাখাত্তর অধিকাংশ জৈন। খাঁটা মারবারীগণ দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে মারবারী শ্রাবক বলিয়া পরিচিত। ব্যবসা, বাণিজ্য ও মহাজনী ইহাদের প্রধানতঃ উপজীবিকা। ইহারা ভারতের নানাস্থানে নানা ব্যবসাদি উপলক্ষে বাস করিতেছে। একরূপ সমুদ্রী ও মিতব্যরী জাতি বোধ হয় জগতে আর নাই। ঋণদান ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইহাদের যথেষ্ট চতুরতা, ধূর্ততা ও কঠিনহৃদয়তা নানাকারণে প্রকাশ পাইলেও ইহারা অপরিচিত স্বজাতিরও প্রতি যেরূপ সহানুভূতি ও দয়াদাক্ষিণ্য দেখাইয়া থাকে, তাহা সাতিশর প্রশংসনীয়। কোন এক নির্ধন নিরাজ্রয় মারবারী শ্রাবক কোন এক ধনী অথবা ব্যঙ্গ্যরী মারবারী-গৃহে আশ্রয় লইলে তিনি তাহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া তাহার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া 'দেন, অবকাশ মত তাহাকে কিছু লেখা পড়া ও হিসাব রাখিবার পদ্ধতি শিখাইয়া লয়েন এবং একটুকু কাজ কর্ম শিখিয়া লইতে পারিলেই ব্যবসা করিবার

জন্ত প্রথমে জতি সামান্য অর্থ দিয়া থাকেন। পাঁচ টাকার অধিক বড় দিতে হয় না। এই সামান্য মূলধন লইয়া সেই সামান্য ব্যক্তি কএক বর্ষ মধ্যে দুই তিন হাজার টাকা জমাইয়া ফেলে। এইরূপে কিছু অর্থলভ্য করিয়া মারবারী ফিরিয়া আসে এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হয়। যে গ্রামে সে পূর্বে ব্যবসা করিত, মিতব্যরিতার গুণে অল্প দিন মধ্যেই সে গ্রামে আসিয়া মহাজন হইয়া বসে, নানাবিধ জিনিস আনিয়া দোকান খোলে এবং কিছুদিন পরেই একজন বড় মহাজন বলিয়া গণ্য হইয়া পড়। অপর স্বজাতীয় মহাজনেরাও তাহাকে নিজের সমান বলিয়া গণ্য করিয়া লয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর মারবারীর মধ্যে পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ নাই হইলেও সকলেই নানা বিবাহসূত্রে ও একতাসূত্রে আবদ্ধ। কাহারও মৃত্যু হইলে নিকটবর্তী চারিদিক হইতে মারবারীর আসিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কালে সাহায্য করিয়া থাকে। বার্ষিক শ্রাদ্ধকালে মৃতের নিকট আত্মীয়গণ বহু দূরদেশ হইতে আসিয়া একত্র হয় ও মারবারী সমাজকে আহ্বান করিয়া ভোজ দিয়া থাকে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মারবারীদিগের মধ্যে গিঅ্যানিয়া, গুন্দকা, সরাপ, সরাগি, খুন-খুন-বালা, বজোরিয়া, ক্ষেমক, বজাজ ও বর্ত্যা এই নয়টা শ্রেণী আছে। প্রত্যেক শ্রেণী ১৭২ থাকে বিভক্ত। সশ্রেণী মধ্যে বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। এ ছাড়া মাতুল, মাতার মাতুল, পিতামহের মাতুল, পিতামহীর মাতুল, মাতার পিতামহের ও মাতার পিতামহীর মাতুল, ইহারা যে যে থাকতুক, সেই সেই থাকেও বিবাহ হয় না। কন্ডাগণের দশবর্ষের অধিক না হইলে প্রায় বিবাহ ঘটে না। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। বরকতার কোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়, বিবাহের দশ দিন পূর্বে জ্বালোকেরা জল লইয়া রাখে, সেই জলের কলসের পাশে গণেশমূর্তি স্থাপিত হয়, বরকে সেই গণেশ ও কলসের পূজা করিতে হয়, কন্ডাগৃহে এইরূপ উৎসব হইয়া থাকে। বিবাহের তিন দিন পূর্বে গাত্রহরিদ্রা দিবার জন্ত বরকতার মাতা ব্যতীত ৭টা এয়েও চাই, তৎপরে বিবাহের দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন গণেশপূজা ও গাত্র-হরিদ্রা হইয়া থাকে।

সন্তান ভূমিষ্ট হইলে চামারিগী আসিয়া নবজাত শিশুর নাড়ী কাটয়া দেয় ও তাহা আঁতুর-বয়ের সমুখভাগে পুতিয়া ফেলে। তৎপরে শিশুর পিতার ঋালক বা ভগিনীপতি আসিয়া যে স্থানে নাড়ি প্রোথিত হইয়াছিল, সেই স্থান স্পর্শ করে, তৎপরে তাহার একখান্য নববস্ত্র প্রাপ্য। তৎপরে পণ্ডিত আসিয়া জন্মপঞ্জিকা টিক করিয়া দেন।

পঞ্চম দিনে প্রস্থতি দান করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করে, এই পাঁচ দিন প্রস্থতির কাছে চামারিণী থাকে, তৎপরে নাপিতানী ও অপর অপর চাকরাণীকে থাকিতে হয়। এক মাস অতীত হইলে প্রস্থতি দান করিয়া শুদ্ধ হন ও স্বর্গের উদ্দেশে তাহাকে তর্পণ করিতে হয়। মিকটে গঙ্গা থাকিলে নবকুমার কোলে লইয়া প্রস্থতি গঙ্গাপূজা দিতে যান। বালকের বর্ষ মাসে অন্নপ্রাশন ও তৎপরে চূড়াকরণ হইয়া থাকে।

বিবাহের দুইদিন পূর্বে আইবড়ভাত ও বরবার হইয়া থাকে। বিবাহের পর ব্রাহ্মণভোজন। শীতলাদেবীর সম্মানার্থ বরকে গাধার চড়িতে হয়, এই অবস্থার বরকে মাতার বৃকে মাথা রাখিতে হয়। গাধার কপালে সিন্দূর ও হরিতার টিপ দিতে হয়। গর্দভ হইতে নামিয়া বর অশ্বে আরোহণ করে। এবারও মাতার ক্রোড়ে মাথা দিতে হয়। তৎপরে বর বিবাহার্থ অগ্রসর হইবার জন্ত প্রস্তুত হয়। তখন একব্যক্তি বরের মাথায় ছত্র ধরে ও চামরব্যঞ্জন করিতে থাকে। তখন বরের ভগিনী আসিয়া পথ আটকাইয়া দাঁড়ায়, কিছু উপহার লইয়া পথ ছাড়িয়া দেয়। অতঃপর বর কস্তাগৃহাভিমুখে সমারোহে যাত্রা করে, কস্তার গৃহসম্মুখে আসিয়া বরকে নিমের ছড়ি দিয়া কস্তার গৃহসম্মুখে স্থাপিত তোরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে কস্তার মাতা আসিয়া বরকে বরণ করিয়া যায়। বরণান্তে বরব্রাহ্মণগণ বিশ্রামভবনে নীত হয়। বিবাহের জন্ত একটা স্বতন্ত্র মণ্ডপ নির্মিত হইয়া থাকে। কস্তা উপস্থিত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে মিষ্টান্ন বিতরণ ও তৎপরে গৌরী ও গণেশের পূজা করিয়া, কুমারের বাড়ী আসিয়া কুমারের চাক্কে পূজা করে। বর বিবাহের স্থলে উপস্থিত হইলে, বরকস্তার বস্ত্রে গাঁইট-ছড়া বান্ধিয়া দেওয়া হয়। উভয়ে গৌরী ও গণেশের পূজা করেন, পুরোহিত কহুক হোম ও বিবাহের মন্ত্রপাঠকাব্য সম্পন্ন হয়, পুরোহিতকে দক্ষিণা দিয়া বরকস্তাকে অন্তঃপুরে আনে। এখানে স্ত্রী-আচার সম্পন্নের পর বরকে নিজ আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরিয়া আসিতে হয়।

পরদিন কস্তার আত্মীয়গণ আসিয়া ক্ষমতা অনুসারে কিছু কিছু দিয়া আশীর্বাদ করিয়া যায়। কস্তাকর্তা বর ও তাহার আত্মীয় স্বজনকে আনিয়া ভোজ দিয়া থাকে। পরদিন বর কস্তা এবং স্বশ্রমদত্ত যৌতুক লইয়া নিজ গৃহে পূর্ববৎ সমারোহে ফিরিয়া আসে। গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে ক্রমে সাতটা পাত্র বরকস্তার সম্মুখে রাখা হয়। বর নিজ তরবার দ্বারা এক একটা করিয়া সরাহয়া ফেলে। তৎপরে গঙ্গা ও শীতলাদেবীর পূজা এবং বরকস্তার ককণ-বিসর্জনের পর উৎসব সম্পন্ন হয়।

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বরের বাহিরে আনিয়া গোমরলিগু দ্বানে রাখে এবং তাহার মুখ মধ্যে পঞ্চরত্ন রক্ষা করে। মৃত্যুর পর তাহার উদ্দেশে পিওদান ও শবদাহ করা হয়। অন্তেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত।

মারবারী ব্রাহ্মণ, মহারাষ্ট্রবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার পঞ্চগোড়ের অন্তর্গত। মারবারে ইহাদের পূর্বপুরুষের বাস ছিল বলিয়া ইহার মারবারী ব্রাহ্মণ বলিয়া এখানে পরিচিত। ইহার বড়জাতি বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকেন। দাবন, গুজর, গোড় সারস্বত, রঙেলবাল, গোড়, পারিক ও শিখাবাল এই ছয় শ্রেণীই বড়গতি। ইহাদের মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও বিবাহ প্রচলিত নাই। ইহাদের ঋগ্বেদের নাম মারবারী বণিক্দিগের মত। মারবারী বণিক্দের পোরোহিত্য করিবার জন্তই ইহার দুই তিনশত বর্ষ পূর্বে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে ভরঘাঙ্গ, কাশ্যপ বশিষ্ঠ ও বৎস এই চারি গোত্র দেখা যায়। সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত নাই।

তিরুপতির বাবাজী, স্থান্যনারায়ণ ও দেবী ইহাদের প্রধান উপাশ্রয় দেবতা। ইহাদের আচার ব্যবহার মারবারী বণিক্দের মত। ইহার একাহারা, সকলেই নিরামিষাণী, কেহ পৈর্যাক বা রসুন এবং জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে কেহই মথ-মাংস গ্রহণ করেন না। গোম বা জনারের রুটি ও ঘৃতসংযুক্ত ডাইল ইহাদের নিত্য আহাৰ্য্য সামগ্রী; কেবল উৎসবের সময় অন্নব্যঞ্জন চলে। ইহার অতি প্রত্যাষে উঠিয়া দান করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবের পূজা সারিয়া নিজ নিজ যজমান বাড়ী পঞ্চাঙ্গ শুনাহতে যান। মধ্যাহ্নে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আইসেন, আবার দান করিয়া বৈশ্বদেব আদি নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়া সমাধা করেন, আহাৰ্য্যান্তে কেহ ২১ ঘণ্টা বিশ্রাম করেন, কেহ বা দেবস্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তৎপরে আবার তাহার যজমানের বাড়ী যান। সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া আইসেন এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করেন।

ইহাদের মধ্যে স্মার্ত্ত ও ভাগবত উভয় মতাবলম্বী দৃষ্ট হয়। শিলাসপ্তমী, অক্ষয়তৃতীয়া, দশহরা, পৌষসংক্রান্তি, বসন্তপঞ্চমী এই কএকটা ইহাদের প্রধান পর্বাহ। ইহার শুক্লা একাদশী, চতুর্দশী, রামনবমী, গোকুলাষ্টমী, গণেশচতুর্থী ও শিবরাত্রি উপলক্ষে উপবাস করিয়া থাকেন। অনেকেই পান্থিক চাক্ষর্য্য ব্রত পালন করেন ও শ্রেণী হইতে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের একজন ব্রাহ্মণ ইহাদের প্রধান আচার্য্য। শূদ্রের-মঠের শঙ্করাচার্য্য ইহাদের ধর্মগুরু।

ইহারা বোড়শ সংস্কারের মধ্যে গর্তাখান ব্যতীত আর সকল সংস্কারই পালন করেন। বালকের অষ্টম বর্ষের মধ্যে উপ-নমন ও একত্রিশতাব্দী বর্ষ মধ্যে বিবাহ ইহারা থাকে। সচরাচর কত্যাগণের অষ্টবর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ মধ্যে বিবাহ হয়। অশৌচ-কাল দশদিন মাত্র। সমাজবিধি লঙ্ঘন করিলে পক্ষারতের বিচারে বণোচিত দণ্ড হইরা থাকে। বালকেরা বিজ্ঞানরে বার ও পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত শিক্ষা পায়। তৎপরে পৈতৃক বন্দনাধি কার্যে নিযুক্ত হয়। বয়স্কমানের পূজাপাক্ষণ করাই ইহাদের উপজীবিকা, কেহ অস্ত্র ব্যবসা করেন না।

আরা (দেশজ) ১ প্রহার করা। ২ মৃত্যু। যথা মারা পড়িয়াছে।  
আরাভ্যাক (জি) মারঃ আরা বস্ত, কপ্। ১ হিংস্র। ২ খল-স্বভাব। ৩ সাংঘাতিক, প্রাণনাশক।

“কথং মারাজ্জকে বসি বিধানঃ” (হিতোপদেশ)

মারাদারা (দেশজ) প্রহার ও ধৃত করা, মারপিট করা, মারামারি করা।

মারাভিভু (পুং) মারঃ অতিভবতি মার-অভি-ভূ-ভু।  
বুদ্ধদেব, মারজিৎ।

মারামারি (দেশজ) পরস্পর মার ধর করা।

মারি (স্ত্রী) মাধ্যতে ইতি মৃ-গিচ্-ইন্। ১ মারণ। ২ বধ।  
(মেদিনী) ৩ জনকর। পর্যায়—মারক, উৎপাত। (জিক।০)  
যখন অত্যন্ত মদক হয়, তাহাকে মারী কহে। মারীভর উপস্থিত হইলে নামকীর্তন, শাস্তিপ্রদায়ন করা আবশ্যক।  
যে স্থলে মারীভর হয়, সেই স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয়।

আরি (দেশজ) মারা, প্রহার।

মারিচিক (জি) মরিচ- (পা ৪৪৪০) ইতি চক্। মরিচ দ্বারা সংস্কৃত। (সিদ্ধান্তকো।)

মারিত (পুং) মাধ্যতে মাশ্রতে ভস্মীকরিতে ইতি মৃ-গিচ্-কপ্গি ক্ত। ১ হত, বিনাশিত। ২ নষ্টীকৃত, ভস্মীকৃত।

“অসম্যক্তমারিতং স্বর্ণং বলং বীৰ্য্যঞ্চ নাশয়েৎ।

করোতি যোগান্ মৃত্যুং তদন্তাৎ বহুতন্তঃ ॥”

(ভাবপ্রকাশ)

মারিন্ (জি) ১ বাতক, হত্যাকারী। ২ মৃত্যুমুখপ্রবেশকারী।

মারিয়া, জাতিবিশেষ। মধ্য-প্রদেশান্তর্গত বস্তার নামক করদরাজ্যে এই জাতি বহু পরিমাণে বৃষ্টি হয়। মারিয়ারা কতিদেশে খ্রীষ্টক, স্বল্পে কুঠার এবং করে ধর্ম্মরক্ষণ ধারণ করে। ধর্ম্ম তাহাদের প্রধান অস্ত্র। তাহারা জ্বরক তীক্ষ্ণদাঁদ। দুই পদ দ্বারা ধর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব দুই হাতে টানিয়া একপ বেগে তাহারা তার ক্ষেপ করে যে, তাঁর সুগের শরীর ভেদ করিয়া বহির্গত হইরা যায়।

মারিয়ারসনবারক (পুং) মারিয়ার কামনং ভগ্নায়তীতি  
মৃ-গিচ্-অপ্। জাতিবিশেষ।

“মুমারপালশৌভক্যে রাজধিঃ পরমার্হতঃ।

মৃত্যুবনোক্তা ধর্ম্মায়া মারিয়ারসনবারকঃ ॥” (হেম)

মারিয (পুং) মর্যতি দৌধানিতি মৃ-অচ্, সিপাতনাৎ  
সিচ্ৎ বধা বা মর্যতি হিনতি কপ্তিদগীতি দ্রিব-ক। নাট্যো-  
ক্তিতে মাশ্রব্যক্তি, মাধ, মাটকে মাশ্রব্যক্তি মারিয নামে অভি-  
হিত। নাটকের মৃত্যুধারকেও মারিয কহে।

“মৃত্যুধারঃ ভবেত্তাব ইতি বৈ পারিপর্য্যিকঃ।

মৃত্যুধারো মারিযেতি হন্তে ইত্যামৈঃ সমাঃ ॥” (সাহিত্যলঃ ৩পরিঃ)

মুরাধাদিতেও মারিয শব্দে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বুঝায়।

“সাহায্যং তে করিষ্যামি মন্ত্রশক্ত্যা মহামতে।

ভবিতা যদি সংগ্রামস্তব চেষ্টেয় মারিয ॥” (দেবীভাগ ৭২৩।১২)

২ পত্রশাকবিশেষ, চলিত কাঁটামটে শাক। হিন্দী—মবড্যা,  
উৎকল মেউটাশাক। এই শাক খেত ও রক্তভেদে দ্বিবিধ।  
সংস্কৃত পর্যায়—করুর, মাধিক। শুণ্—মধুর, মীতল, বিট্ভী,  
পিটনাশক, শুষ্ক, বাউল্লেকর, রক্তশিত ও বিষনশক, অগ্নি-  
বর্জক, রক্তবর্ণ, গুরু, মধুর, স্নেহকর, পাকে গুরুদোষ। (ভাবপ্রঃ)

মারিযা (স্ত্রী) মারিয-টাপ্। দক্ষমাতা। (মৎস্যপুঃ ৪৩৯)

বিষ্ণুপুরাণে ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—  
পুরাকালে বেদবিদ্যার কণ্ঠ মামে এক মুনি গোমতী-  
তীরে তপস্তা করিতেছিলেন। ইহা ইহার তপস্যার ভীত  
হইরা তপোভঙ্গের ভয় প্রস্রোচা নামে এক অশুরকে প্রেরণ  
করেন। প্রস্রোচা নামপ্রকার হাবভাব দ্বারা ইহার তপো-  
ভঙ্গ করেন। তপোভঙ্গের পর কণ্ঠ বহু শতাব্দ ধরিয়া  
প্রস্রোচার সহিত অবস্থান করেন। এক সময় তাহার মোহ  
অপনীত হইলে তিনি প্রস্রোচার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে  
বালরাহিণেম,—রে পাপিনি! শূত্র আমার নিকট হইতে দূর  
হ, তুহু হাব ভাব দেখাইরা আমার কোত উৎপাদনপূর্ব্বক  
হেবরাজের কাথ সাধন করিয়াছ। আরি তোকে ভয়  
করিব। বহুকাল তোর সহিত বাস করিয়াছি। অথবা তোরই  
বা দোষ কি? আমারই নিত্যত দোষ, যে হেতু আমি  
অজিতেন্দ্রিয়।

এইরূপে মুনি কণ্ঠক উৎসিতা প্রস্রোচা তদাশ্রয় হইতে  
বহির্গমনপূর্ব্বক আকাশগামিনী হইয়া তরুপলবে বেদ মার্জনা  
করিলেন, তাহার গাজনিঃসৃত শ্বেদজল একটা বৃক্ষের উপর  
পতিত হইয়া সেই বৃক্ষ হইতে অস্ত্র বৃক্ষে, পুনরায় তাহা হইতে  
অস্ত্র বৃক্ষে চলিয়া গেল। অবি কিত তাহার উদরে যে গড  
সম্বাহিত করেন, তাহার রোমকূপ দিয়া তাহাই শ্বেদরূপে লিঙ্গত

হইল। যেদলিত্ত বৃক্ষ সকল সেই গর্ভ গ্রহণ এবং বায়ু তাহা একত্র করেন। ক্রমে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক কস্তা উদ্ভূত হইল। সেই কস্তা মারিষা নামে অভিহিত। তাঁহার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণুপু. ১।১৫ অ.)

২ দেবমীচপত্নী। (ভাগবত ৯।২৬।২৭)

মারী (স্ত্রী) মারি-(কুদিকারাদিতি) পক্ষে ভীষ্ম। ১ চণ্ডী।

২ জনকর, মারি, মড়ক। ৩ মাহেশ্বরী শক্তি।

“মারী ত্রিশূলেণ জঘান চাত্তান্ খট্টাপাঠৈরপরাংশে কোশিকী।”

(বামনপুরাণ ৫২ অ.)

মারীচ (পুং) রাক্ষসবিশেষ। জন্তুপুত্র জ্বলের ঔরসে তাড়কা রাক্ষসীর গর্ভে ইহার জন্ম। মারীচ নীতাহরণ-কালে সান্নাশুগরূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রকে মোহিত করে, পরে রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়। (রামায়ণ) [রাম দেখ।] ২ কষ্টপ।

“ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মারীচঃ কুলনন্দনঃ।

উবাচ কিঞ্চিৎ কুপিত আত্মানঞ্চ বিগর্হয়ন্ ॥” (ভাগবত ৬।১৮ অ.)

৩ ককোলক। ৪ যাজক-ব্রাহ্মণ। (মেদিনী) ৫ রাজ-হস্তী। (জটায়ু) ৬ মরীচবন, গোলমরিচ গাছ। (ত্রি) ৭ মরীচসদৃশী।

মারীচপত্রক (পুং) সরলবৃক্ষ। (রাজনি.)

মারীচপত্রিকা (স্ত্রী) সরল দেবদারু, সর্জতরু। (বৈদ্যকনিঃ)

মারীচবল্লী (স্ত্রী) মরিচবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিঃ)

মারীষ (পুং) মারিষশাক। (ধিরূপকো.) ইহার পাঠান্তর মারুষ এইরূপও দেখা যায়।

মারীচী (স্ত্রী) মরীচেরিয়ং ইত্যণ্, ভীপ্। দেবতাবৈদ।

ইনি মারাদেবী। পর্যায়—ত্রিমুখা, বজ্রকালিকা, বিকটা, বজ্রবারাহী, গোরী, প্রোত্মিরাণা। (ত্রিকা.)

মারীচ্য (পুং) ১ মরীচির গোত্রাপত্য। ২ অগ্নিঘাতা।

মারীভয় (পুং) মারী জন্ত ভয়, মারী অর্থাৎ মরক উপস্থিত হইলে যে ভয়, তাহাকে মারীভয় কহে।

মারুয়া (দেশজ) তৃণভেদ (Eleusine Corocana) সংস্কৃত রাজিক। হিন্দি—মাড়ুয়া, মারুয়া, মজা, রোটিকা। উঃ পঃ প্রদেশে—মণ্ডল, কালজ, কোজ। গুজরাভী—রাগি। তামিল—রাণ্ডলু। পারস্ত—মাড়োয়া। সিংহলা—কোয়াকনা।

দেখিতে অনেকটা লম্বা ঘাসের মত। প্রতি বৎসরে বর্ষাকালে একবার মাত্র ইহার চাষ হয়। ইহার অনেকগুলি ডাঁটা থাকে এবং প্রত্যেক ডাঁটায় ৪৫টা শীষ থাকে। শীষগুলি জীবৎ বক্র। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বর্ষাকালে ইহার চাষ হইয়া থাকে এবং ইহা দরিদ্র ব্যক্তিদিগের প্রধান

খাদ্য। এই শস্ত বছরদিন পর্য্যন্ত রই হয় না এবং কোন প্রকার কীটেও ইহার কোন ক্ষতি করে না।

উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ গণ্ডিতগণ বলেন যে, ভারতবর্ষেই ইহার আদিম উৎপত্তি। সংস্কৃত লেখকগণ রাজিক নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন মিশরের বৃক্ষলতাদির বর্ণনায় ইহার নাম দৃষ্ট হয় না। বপনের সময় এবং স্থানভেদে ইহার তারভঙ্গ্য দৃষ্ট হয়। অত্যন্ত উর্বরক্ষেত্রে বপন করিলে ইহার শীষগুলি সোজা হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মানা স্থানে ইহার চাষ হইয়া থাকে। হিমালয়প্রদেশে ৮০০০ ফিট্ উচ্চস্থানেও ইহার বহুল পরিমাণে চাষ হয়। ইহা তপাকার কৃষিকীর্তিদিগের প্রধান খাদ্য। সমভল ভূমিতে ইহা গমের সহিত এক সময়ে উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণ ক্ষেত্রে ইহার বীজ বপন করিয়া কৃষকেরা বৃক্ষপত্র দিয়া ক্ষেত্র ঢাকিয়া দেয়। তৎপরে চারা ২।৩ ইঞ্চি হইলে বিদে বা আঁচড়া দ্বারা ক্ষেত্র খুঁড়িয়া দিতে হয়। যে স্থানের চারা উঠিয়া যায়, অল্প স্থানের ঘন চারা আনিয়া সেই স্থানে রোপণ করিতে হয়। আশ্বিন কান্তিক মাসে ইহার শস্ত কর্তন করিতে হয়। বেশী পরিমাণে বৃষ্টি হইলে এই শস্তের ক্ষতি হয়। যে বৎসর অধিক ধাতু জন্মে, সে বৎসর মারুয়া ভাল জন্মে না, যে বৎসর মারুয়া ভাল জন্মে না, পশুস্তরে ভাল ধান জন্মে। অল্প শস্তের স্থায় ইহার ভূঁষাদি বেশী বাদ যায় না। এই হিসাবে মারুয়া শস্তে কৃষকদের অধিক লাভ হইয়া থাকে।

কড়প জেলায় ৩ লক্ষ বিঘার অধিক ভূমিতে মারুয়ার চাষ হইয়া থাকে। যে ভূমিতে কেবল বীজ বপন করা হয়, সে ভূমিতে জল সেচন করিতে হয় না। যে সব ক্ষেত্রে রোপিত হয়, সে সব ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয়। এই শস্তদ্বারা প্রতি বিঘায় ৭ হইতে ১৮ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

মহিসুর প্রদেশে শুষ্ক ভূমিতে ইহার চাষ হয়। বালুকা-পূর্ণ জমিতে ইহার চাষ ভাল হয় না। যে সমস্ত মারুয়া উত্তানাদিতে রোপণ করা হয়, তাহাকে ‘লাটি’ কহে। কোন জমিতে মারুয়ার চাষ করিতে হইলে পোষ মাসে লালঙ্গ দিয়া গোবরাদির সার দিতে হয়। যে ভূমিতে অল্প কোন শস্ত ভালরূপে জন্মে না, সে স্থানেও মারুয়া উৎপন্ন হয়।

চাউল এবং গমের স্থায় মারুয়া সহজে পরিপাক হয় না। এইজন্য ইহা দরিদ্র লোকদিগের প্রধান খাদ্য।

ভারতবর্ষের কত ভূমিতে মারুয়া জন্মে, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে মাদ্রাজ প্রদেশে ৪৫ লক্ষ এবং বোম্বাই প্রদেশে ২৫ লক্ষ বিঘার অধিক ভূমিতে মারুয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইতে ছাতু এবং রুটি প্রস্তুত হয়।

এহ শত্বে তৃণ গবাদি পশুর প্রধান ঋত। দক্ষিণ-ভারতে গবাদি পশু প্রধানতঃ ইহা খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। ঘাস ঐশ্র্যাপ্য হইলে অশ্বাদিগকেও ইহা খাহতে দেওয়া হয়।

মহারাষ্ট্রপ্রদেশে এই শস্ত হইতে বোজ বা বোজালি নামক মত্ত প্রস্তুত হয়। হিমালয় প্রদেশে সেই মত্ত প্রচুর পারমাণে রপ্তানি হয়।

মারীমূত (ত্রি) মারীতে মৃত, বাহাদের মহামারীতে মৃত্যু হয়। সাধারণতঃ ওলাউঠা রোগকে মহামারী কহে।

“অথ পঞ্চমে নৃপভয়ং মারীমূতদর্শনঞ্চ বক্তব্যম্।

যচে তু ভয়ং জেরং গুরুস্বাণং সডোষানাম্ ॥” (বৃহৎসং ৮৭।৩০)

মারীয় (ত্রি) কামদেব-সম্বন্ধীয়।

মারুক (ত্রি) মৃত্যুমুখী, মূমূর্ষু। (তৈত্তিঃ সং ২।৫।১৬)

মারুণ্ড (পুং) ১ সর্পাণ্ড। ২ পদ্ম। ৩ গোময়মণ্ডল।

মারুত (পুং) মরুদেব মরুৎ (প্রজাদিত্যশ্চ। পা ৫।৪। ৩৮) ইতি স্বার্থে অণু। বায়ু। উনপঞ্চাশৎ বায়ু, ইহাদের জন্মবিবরণ ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,—কশ্চপভাষ্য। দিতি সেবাদি দ্বারা কশ্চপের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া তাহার নিকট এই বর প্রার্থনা করেন, যে আমার ইন্দ্রহস্তা একটি পুত্র হউক। কশ্চপ বলিলেন, তুমি যদি সপ্তসর কাল বণানিয়মে ব্রতপালন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার গর্ভে ইন্দ্রহস্তাকারী ও অতিবলবান্ধরূপ একটি পুত্র হইবে। কিন্তু যদি তোমার ব্রতভঙ্গ হয়, তাহা হইলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটবে। কশ্চপের কথাশ্রুত্রে দিতি ‘তাহাই করিব’ এই বলিয়া ব্রতচরণে একমুখ হইলেন; কালে গভ ধারণ করিয়া কশ্চপের আদেশানুসারে ব্রতানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া আশ্রমস্থিতা দিতির সমীপে কপট-সামুবেশ ধারণপূর্বক তাহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল, ইন্দ্র কোন প্রকারে তাহার ছিদ্র পাইলেন না, দৈবাৎ একদিন দিতির মোহ উপস্থিত হইল। এই সময় ইন্দ্র তাহার ছিদ্র পাইয়া যোগমায়া দ্বারা দিতির উদরে প্রবেশ করিলেন। দিতি অট্টে-তস্ত অবস্থায় নিদ্রা যাহতেছিল, কিছুই জানিতে পারিল না। অনন্তর ইন্দ্র উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বজ্র দ্বারা দিতির গর্ভ সাতখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। ক্রুদ্ধিত গভখণ্ড সকল রোদিন আরম্ভ করিলে, তাহাদিগকে ‘ক্রন্দন করিও না,’ এইরূপ সম্বোধন করিয়া পুনরায় তাহাদিগের প্রত্যেককে সাত সাত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন।

ইন্দ্র বধন পুনরায় কন্তন করেন, সেই সময় ঐ খণ্ডগর্ভ সকল কৃতাজলি হইয়া বলিতে লাগিল,—হে ইন্দ্র! কেন তুমি

আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ? আমরা মরুদগণ, তোমার ভ্রাতা। ইন্দ্র কহিলেন, তোমরা ভীত হইও না, তোমরা আমার পার্শ্ব হইবে। ভগবানের প্রসাদে এই মরুদগণ ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া উনপঞ্চাশৎ দেবতা হইলেন। পরে সকলে গর্ভ হইতে নির্গত হইলেন।

দিতি এতরূপ নিদ্রিতা ছিলেন। হঠাৎ সুপ্তোখিত-হইয়া ইন্দ্রের সহিত পঞ্চাশৎ কুমারকে দেখিতে পাইলেন। কিয়ৎকাল পরে ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি আদিত্য-গণের ভয়াবহ অপত্যকামনা করিয়া দুষ্চর ব্রত আচরণ করিতেছিলাম। অদিতির সন্তানদিগের সংহারকারী একটি পুত্র হয়, আমার এইরূপ সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু এক্ষণে উনপঞ্চাশৎ পুত্র কি প্রকারে হইল? হে পুত্র! এ বিষয় যদি তোমার জানা থাকে, তাহা হইলে আমাকে প্রকৃত কথা বল, মিথ্যা বলিও না।

ইন্দ্র দিতির এই কথায় উত্তর করিলেন,—মাত! আমি আপনার ঐরূপ চেষ্টা জানিতে পারিয়াই আপনার নিকটে ছিলাম, অস্ত্র অবকাশ পাইয়া আপনার গর্ভে প্রবেশপূর্বক গভ ছেদন করিয়াছি। আমি প্রথমে আপনার গর্ভ সপ্ত খণ্ড করিয়া কন্তন করি, তাহাতে প্রথমে ৭টি পুত্র হয়। পরে আবার ঐ ৭টিকে সাত সাত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলাম। তাহাতেও এই সকল কুমার মারণ না। সর্বসাকল্যে ৪২ পুত্র হইল। দিতি ইন্দ্রের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া পুত্রগণকে ইন্দ্রের সাহিত যাহতে অনুমতি করিলেন। ইন্দ্র এই উনপঞ্চাশৎ মরুদগণের সাহিত স্বর্গে গমন করিলেন।

(ভাগবত ৬।১৮ অং)

২ দক্ষিণস্থ জনপদবিশেষ।

“মারুতা ধেমুকাশ্চৈব তঙ্গাঃ পরতঙ্গাঃ।” (ভারত ৬।৪৭।৪৯-৫০)

৩ অগ্নিভেদ, গর্ভাধানসংস্কারে যে অগ্নি স্থাপিত হয়, তাহার নাম মারুত।

“অগ্নিস্ত মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে।”

(গৃহ্যপরিশিষ্ট ১২) (ত্রি) ৩ মরুৎসম্বন্ধী।

“রাসি শব্দ ইন্দ্র মারুতং নঃ” (ঋক্ ১।১১।১৪)

‘মারুতং মরুতাং দেববিশাং সম্বন্ধি’ (সায়ণ)

মারুতময় (ত্রি) বায়ুময়।

মারুতব্রত (ক্লী) মারুতস্ত ব্রতমিব ব্রতং নিয়মোহস্ত। রাজ-ধর্মবিশেষ। “প্রবিশ্ত সর্বভূতানি যথা চরতি মারুতঃ।

তথা চরৈঃ প্রবেষ্টব্যং ব্রতমেতচ্চি মারুতম্ ॥” (মৎস্কপুঃ ২০০ অঃ)

মারুতসূনু (পুং) মারুতস্ত সূনুঃ। বায়ুপুত্র, ১ হনুমান্।

(রামায়ণ ৫।৪২।১৮) ২ ভীম।

মারুতাত্মজ (পুং) মারুতস্ত আত্মজঃ। ১ হনুমান্। ২ ভীম।

মার্কতাপহ (পুং) মার্কতং অপহন্তি হন-ড। ১ বরুণবৃক্ষ।  
(রাজনিং) (ত্রি) ২ বায়ুনাশক।

মার্কতান (পুং) মার্কতোহননমন্ত বা অশ্রাভীতি অশ-  
ন্য, মার্কতানাং অশনঃ ভক্ষকঃ। সর্প, পবনাশন।

“ভক্তঃ প্রগৃহ্ম মুদ্ধা। বৈ বাহভ্যাং সংশিতব্রতঃ।”

স্থিতঃ স্থাপুরিবাভ্যাসে নিশ্চেষ্টো মার্কতানঃ। (ভারত ৫।১০।৬।১৩)

(ত্রি) ২ বায়ুমাত্রভক্ষক। (পুং) ৩ কান্তিকেষ। ৪ সৈনিক-  
বিশেষ। (ভারত ৯।৪৫।৬০)

মার্কতান্থ (ত্রি) মার্কত ইব বায়ুরিব বেগবান্ অথো বশ।  
বায়ুগদ্যং বেগগামি-অর্থযুক্ত। “উত্ততো মা মার্কতান্থ  
শোণাঃ” (ঋক্ ৩।৩৯) “মার্কতান্থ মরুৎসদৃশবেগাশ্বান্  
তন্ত।” (সারণ)

মার্কতি (পুং) মরুতস্তাপত্যঃ পুমান্ মরুত (অত ইঞ।  
পা ৪।১।২৫) ইতি ইঞ। ১ হনুমান্। (শব্দরত্নাং) ২ ভাম।

মার্কতেশ্বরতীর্থ (ক্ৰী) তীর্থভেদ।

মার্কদেব (পুং) পর্কতভেদ।

মার্কধ (ক্ৰী) জনপদভেদ।

মার্কবার (ক্ৰী) [ মারবার দেখ ]

মার্ক (পুং) ভৃঙ্গরাজ। (রত্নমালা)

মার্কট (ত্রি) ১ মরুট সঙ্কীর্ণ। ২ মরুটবৎ।

মার্কটাপিপীলিকা (ক্ৰী) ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণপিপীলিকা।

মার্কটপিপ্ললী (ক্ৰী) কপিপিপ্ললী, চলিত আপাং। (রাজনিং)

মার্কটি (পুং) মরুটের গোত্রাপত্য।

মার্কণ্ড (পুং) মরুণ্ডোরপত্যঃ মরুতু-অণ্। মার্কণ্ডেয়  
মুনি। (শব্দরত্নাং)

মার্কণ্ড, (মার্কণ্ডেয়) ১ আর্য জেলাস্থ সৌরতীর্থভেদ, আর্য  
৩৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ২ উক্ত স্থানের নামানু-  
সারে প্রসিদ্ধ বেহারের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের একটি বিভাগ।

মার্কণ্ড, দরভাঙ্গা, পুর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা এবং ভাগলপুর  
প্রভৃতি স্থানবাসী কৃষিকারী জাতিভেদ। ইহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা  
জীবিকা নির্বাহ করে। প্রবাদ এই যে, মার্কণ্ডেয় মুনি হইতে  
ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন  
করিয়া মার্কণ্ডেয়ের জাতিচ্যুতি ঘটে। তদবধি তাঁহার বংশ-  
ধরগণ মার্কণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে বাণ্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রচলিত  
আছে। বিধবারা দ্বিতীয়বারে মনোমত পতি নির্বাচন  
করিয়া বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হইলে  
তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয়।

মার্কণ্ডিগের আচার ব্যবহার গৌড়া হিন্দুর মত নহে।

বড় বড় দেবপুজার তাহার ব্রাহ্মণপুরোহিত নিযুক্ত করে।  
তাহাদের পুরোহিতেরা তজ্জন্তু নিম্নাভাজন হন না।

সামাজিক মর্যাদায় তাহার গোয়াল ও কুশ্মিদিগের  
সমকক্ষ। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের প্রদত্ত জল এবং মিষ্টান্নাদি  
গ্রহণ করেন।

মার্কণ্ড, নাগপুরের ৯০ মাইল দক্ষিণপূর্বে বেগলদানদ্বী-  
তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে বহুসংখ্যক  
মন্দির শৈলভূমিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান আছে। এখান-  
কার সর্কপ্রধান মন্দিরের নাম মার্কণ্ড। মন্দিরের নিম্নে নদীর  
প্ৰতীকতা ২ ফিট মাত্র; স্তম্ভেরা হাঁটরা পার হওয়া যায়। সন্নি-  
হিত গ্রামটির নাম মার্কণ্ডি। পূর্বে এখানে বহুজনাকীর্ণ নগর  
ছিল। পুনঃ পুনঃ জলপ্লাবনে ২৪ ঘর ব্যতীত আর সকল  
অধিবাসী স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় মুনি হইতেই মন্দিরের নাম হইয়াছে। কিন্তু  
মন্দির শিবের নামে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরাভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ  
বিরাজিত। এই মন্দির কোন্ সময়ে নিৰ্ম্মিত হয়, তাহা  
ঠিক বলা যায় না, কারণ এখানে কোন উৎকীর্ণ লিপি নাই।  
নাগপুর এবং বেরার অঞ্চলে মন্দিরাদির সম্বন্ধে যেরূপ গল্প  
শুনা যায়, এখানকার মন্দির সম্বন্ধেও সেইরূপ গল্প আছে। শুনা  
যায়,—ঐ সমস্ত মন্দিরই এক রাজার মধ্যে হেমাড়পঙ্ক দ্বারা  
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ, ভাণ্ডক হইতে কালী পর্য্যন্ত  
ষাবতীয় মন্দিরই তাহা দ্বারা নিৰ্ম্মিত হয়। হেমাড়পঙ্ক এক  
জন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের তনয়। গোড়রাজ লক্ষ্মণসেন এবং তাহার  
জন্মবৃত্তান্ত প্রায় একরূপ। প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে  
হেমাড়পঙ্কের জননী দেখিলেন যে, সে সময়ে পুত্র ভূমি  
হইলে অতি অশুভযোগ হইবে। এজন্ত তিনি পরিচারিকা-  
দিগকে বাহাতে প্রসবের বিলম্ব হয়, তদ্বিষয়ে আদেশ করি-  
লেন। তাহার আদেশ অনুসারে ধাত্রীরা তাহার পদদ্বয়ে  
রজ্জু বদ্ধ করিয়া নিম্নাভিমুখ মস্তক রাখিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া  
রাখিল। শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে, অবিলম্বে তাহাকে  
ভূমিতে নামান হইল।

তিনি হেমাড়পঙ্ককে প্রসব করিয়া কিছুক্ষণ পরেই  
মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। শুভলগ্নজাত হেমাড় (হেমাড়ি)  
শুভরূপের শশিকলার গ্রায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং অল্প  
বয়সে সর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ চিকিৎসা-  
শাস্ত্রে তাহার অগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিল। বিভীষণ পাণ্ডিত  
হইলে, হেমাড় তাহাকে নীরোগ করেন এবং পুরস্কারস্বরূপ  
এক বর প্রাপ্ত হন। সেই বরেই রাক্ষসদিগের সাহায্যে  
গোদাবরীর মধ্যস্থ ষাবতীয় মন্দির সমস্তই নিৰ্ম্মাণ করেন।



মন্দিরগুলি ১২৬ ফিট দীর্ঘ এবং ১১৮ ফিট প্রস্থ চতুর্ভুজ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দিরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। মধ্যস্থলে মার্কণ্ড মন্দির, তাহার চতুঃপার্শ্বে অষ্টাঙ্গ মন্দিরগুলি শ্রেণী-বদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। মন্দিরগুলির নির্মাণপ্রণালী দেখিলে ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। দক্ষিণ দিকে প্রবেশদ্বার এবং পার্শ্বে পূর্ব ও পশ্চিমে আর দুইটা দ্বার আছে। মন্দিরভাস্কর্যে ১২টা বিভিন্ন প্রকারের শিবলিঙ্গ, তদ্ব্যতীত দশাবতার প্রভৃতি দেবমূর্তি আছে।

মার্কণ্ড ঋষির মন্দিরই সর্বাঙ্গপেক্ষা বৃহৎ এবং নানাকার-কাণ্ডে খোদিত। দুই শত বৎসর পূর্বে বজ্রাঘাতে মন্দিরের উচ্চাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

শিবলিঙ্গের মস্তকে পিত্তলময় মুকুট। মুকুটের চতুর্দিকে ৫টা নৃমুণ্ড এবং উপরিভাগে পঞ্চ নাগের কণাশিখিত চক্রাতপ।

অবশিষ্ট মন্দিরগুলির নির্মাণপ্রণালী খজুরাহর মন্দিরাদির জায়। দুই ফুট তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ্যাবিশিষ্ট খোদিত মনুষ্যমূর্তি মন্দিরের চারিদিকে বিরাজিত। প্রত্যেক শ্রেণীতে ৪৫টা করিয়া ৩ শ্রেণীতে ১৩৫টা মনুষ্যমূর্তি আছে। মনুষ্যশ্রেণীর পরে হংসশ্রেণী, পরে বানরশ্রেণী, তৎপরে আবার চারিশ্রেণী মনুষ্যমূর্তি। বস্তুতঃ মন্দিরের সমুখভাগ নানাবিধ ভাস্কর-শিল্পে অলঙ্কৃত। তথায় চারি পাঁচ শতের অধিক প্রতিমূর্তি খোদিত রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে নর্তকী রমণীগণের প্রতিমূর্তি এবং কোথাও বীণাবাদনপরায়ণা অলঙ্কারভূষিণী সৌমন্তিনীগণ শিল্পীর নির্মাণনৈপুণ্য-বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। শিবমূর্তির প্রশান্তভাব সর্বত্রই পরিস্ফুট। কি সমর-ক্ষেত্রে রৌদ্ররসের অভিযান্ত্রিতে, কি বদন্ত-পুষ্পাভরণা বিলোল-নয়না গৌরীর সহিত প্রেমালাপের কমনীয় ভাবে—সর্বত্রই শিবের প্রশান্ত গাভীর্য রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নন্দিকেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, যম, উগামহেশ্বর, রাজরাজেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মার্কণ্ডীয় (ক্লী) ভূম্যাঙ্ক। (রাজনিঃ)

মার্কণ্ডেয় (পুং) মুকণ্ডোরপত্যং, মুকণ্ড (স্ত্রী) দাদিত্য। পা ৪।১।২৩) ইতি চক্। মুকণ্ডুয়ুনির পুত্র। জন্মতিথি ও সংস্কারাদি কার্যে ইহার পূজা করিতে হয়। গর্ভাধানাদি সংস্কারকার্যে ষষ্টিপূজার পর মার্কণ্ডেয়পূজা বিহিত আছে। ইহার ধ্যান—

“দ্বিজং জটিলং সৌম্যং স্তব্ধং চিরজীবিনম্।

মার্কণ্ডেয়ঃ নরো ভক্ত্যা পূজয়েচ্চ চিরায়ুধম্ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

এই ধ্যানে বিধি অনুসারে পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়। \*প্রাথমিকমন্ত্র—

“চিরজীবী যথা স্বং ভো ভবিষ্যসি তথা যুনে।

রূপবান্ বিভবান্শৈব প্রিয়া যুক্তশ্চ সর্বদা ॥

মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।

আয়ুরিষ্টার্ধসিদ্ধার্থসম্মাকং স্বরদো ভব ॥” (তিথিতত্ত্ব)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে মার্কণ্ডেয়ের উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, মহাত্মা তৃণ্ডর ঔরসে ষ্যাতিয় গর্ভে খাতা ও বিখাতা নামে দুই পুত্র হয়। এই দুই জনই দেবতা। নারায়ণের পত্নী ক্লীও এই ষ্যাতিয় গর্ভসম্ভূত। মেরুর দুই কন্তা, আরতি ও নিয়তি। এই দুই কন্তার সহিত খাতা ও বিখাতায় বিবাহ হয়। ইহাদের দুই পুত্র হয়, একের নাম প্রাণ, অপরের নাম মুকণ্ড। মুকণ্ড ঔরসে মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পত্নীর নাম ধূমাবতী, পুত্র বেদশিরাঃ। (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫২ অঃ)

নরসিংহপুরাণে লিখিত আছে, তৃণ্ডর পুত্র মুকণ্ড। মুকণ্ড মার্কণ্ডেয় নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র জন্মিলে মুকণ্ড জানিতে পারিলেন যে, এই পুত্রের ষোড়শ বর্ষকালে মৃত্যু হইবে, তাহাতে ইহার অতিশয় স্নিয়মাণ হইলেন। একদা মার্কণ্ডেয় পিতাকে তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার মৃত্যুর কথা ঘেঁরুপ শুনিয়া ছিলেন, তাহা বলিলেন। মার্কণ্ডেয় এই কথা শুনিয়া পিতাকে কহিলেন, আপনার কিছুমাত্র শোক করিবার আবশ্যক নাই, আমি এইরূপ করিব যে, যাহাতে মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া চিরজীবী হইতে পারি। পরে মার্কণ্ডেয় পিতা ও মাতাকে আশ্বাসিত করিয়া তপস্বার্থ বন গমন করেন। বনে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কঠোর তপোমুঠান করিতে থাকেন। এই তপোবলে তিনি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া চিরজীবী হইলেন। (নরসিংহপুঃ)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, মহামুনি মুকণ্ড সপত্নীক তপো-নিরত ছিলেন, এই সময় তাহাদের মার্কণ্ডেয় নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্রের অষ্টমবর্ষে মৃত্যু হইবে, ইহা তাহার জানিতে পারেন। এই জ্ঞাত পুত্রের উপনয়ন দিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন, তুমি ঋষিদিগকে অভিবাদন কর। মার্কণ্ডেয় তাহাই করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে সপ্তবি তথায় উপস্থিত হইলে মার্কণ্ডেয় তাহাদিগকে অভিবাদন করিলে পর ‘তুমি চিরায়ুঃ হও’ এই বলিয়া তাহার আশীর্বাদ করেন, কিন্তু ইহার অমায়িক বিষয় জানিতে পারিয়া তাহার এই বালককে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মায় পরমায়ুর তুল্য ইহার পরমায়ু হয়। মার্কণ্ডেয় এইরূপে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া স্বর্গেই প্রত্যাগত হন। (পদ্মপুরাণ সৃষ্টিঃ ৩০ অঃ)

মার্কণ্ডেয়েন প্রোক্তং অং। ২ পুরাণবিশেষ, মার্কণ্ডেয়



পুরাণ, ইহা অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে সপ্তম মহাপুরাণ। পূর্বে বয়স্ক মার্কণ্ডেয়কে উপদেশ দিরাছিলেন, তদুপক্রমে এই পুরাণ আরম্ভ। এই পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে আয়ুর্দ্ধি ও সমুদয় কামনা সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং পাপ সকল বিদূরিত হয়। বিপদ উদ্ধার-কামনায় প্রতিপূহে যে চণ্ডী-পাঠ হইয়া থাকে, তাহা এই পুরাণের অন্তর্গত। [পুরাণ দেখ] ৩ নাড়ীপরীকাশ্রমেতা।

মার্কণ্ডেয়কবীন্দ্র, প্রাকৃতসর্বস্ব-রচয়িতা।

মার্কণ্ডেয়চূর্ণ, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগার খই, ত্রিকটু, জায়ফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, চিতামূল, মূতা, গজপিপ্পলী, শুঠ, বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতাইচ, সজিনাবীজ, মোচরস ও আফিং প্রত্যেকে ১ পল পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মদ্বিত করিয়া লইবে। চিনির সহিত ১ মাষা পরিমাণে সেব্য। ইহাতে সংগ্রহ-গ্রহণী রোগ নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং গ্রহণ্যধিকার)

মার্কপলো, একজন সুপ্রসিদ্ধ পর্যাটক। তিনিস্ নগরে কোন সম্রাটবংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। নিকলো এবং মাথু নামক দুই সহোদরের কনষ্টান্টিনোপল এবং ক্রিমিয়ায় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তাঁহারা ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনিস্ পরি-  
ত্যাগ করিয়া পূর্বদিকে যাত্রা করেন। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে কন-  
ষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করিয়া বোথারায় মধ্য দিয়া কুবলাখাঁর  
রাজ্যে উপস্থিত হন। কুবলাখাঁ তাঁহাদিগকে পোপের  
নিকট দোষ্যকার্যে প্রেরণ করেন। তদনুসারে তাঁহারা  
১২৫৯ খৃঃ অব্দে একর নগরে উপস্থিত হন। নিকলো তথায়  
আসিয়া দেখিলেন, বহু পূর্বে তাঁহার স্ত্রী পুত্র মার্কপলোকে  
রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তখন মার্কপলোর বয়স  
১৫ বৎসর। দুই বৎসর পরে মার্কপলোকে এবং একজন  
পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পুরো-  
হিত পোপের নিকট পত্রাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সম্রা  
ত্যাগ করেন। একর হইতে আরম্ভ করিয়া সিরিয়ার উপ-  
কূলভাগে তাঁহারা ৩ বৎসর ভ্রমণ করেন। পরে বোগদাদ  
এবং হর্মুজের মধ্য দিয়া তাঁহারা ফার্মান, খোরাসান, বাল্খ  
এবং বদক্সান পর্যন্ত পর্যটন করিলেন। বদক্সানে মার্ক-  
পলোর সীড়ার জন্ত তাঁহাদিগকে অনেক দিন অবস্থান করিতে  
হইয়াছিল। বদক্সান হইতে তাঁহারা কচ এবং শ্রীকোল  
ব্রহ্ম অভিক্রম করিয়া পামীর উপত্যকার অবতীর্ণ হন। তথা  
হইতে কাশগর, ইয়ারকন্দ এবং খোটানের মধ্য দিয়া মধ্য-  
এসিয়ার গোবী মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া চীনদেশের উত্তর-পশ্চি-  
মাংশে উপস্থিত হন।

চীনদেশের প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে কুবলাখাঁর  
কর্মচারীরা তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। কুবলাখাঁ  
তখন চীনপ্রাচীরের ৫০ মাইল উত্তরে সাংট নগরে রাজত্ব  
করিতেছিলেন। পরে শিতাপুত্রে শিকিনে উপস্থিত হই-  
লেন। মার্কপলোর বয়স তখন ২১ বৎসর। তিনি অবিলম্বে  
চীন-ভাষা শিক্ষা করিয়া চীন-সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া  
উঠিলেন। পরে ২৬ বৎসর কাল সেই রাজ্যে অবস্থান করিয়া  
অনেক রাজকীয় কর্ম নির্বাহ করিয়াছিলেন। রাজ্যের  
মধ্যে অনেক উচ্চ কর্মচারীর কর্মও করিয়াছিলেন। রাজকন্ডার  
সহিত তাতার-বংশীয় পারস্তবাজকুমারের-বিবাহ স্থির হইয়া-  
ছিল—মার্কপলো রাজকন্ডার রক্ষিতরূপে পারস্তে উপস্থিত  
হইলেন। তিনি একবার য়ুনান প্রদেশের মধ্য দিয়া আবার  
সীমাস্ত-প্রদেশে যাত্রা করেন। তৎপরে কোটলাস্বর্গত কারা-  
কোরাম নগরে উপস্থিত হন। পরে ভারতমহাসাগরীয় স্রমাত্রা-  
দ্বীপে জলপথে যাত্রা করেন। কুবলাখাঁর ভ্রাতৃপুত্র অর্গান-  
খাঁর বিবাহের জন্ত এক সর্দারসুন্দরী কন্ডার জন্ত মার্কপ-  
লোকে মোগলজাতির মধ্যেও ভ্রমণ করিতে হয়। তাঁহার  
পূর্বে স্রমাত্রা দ্বীপের কথা সাধারণের অগোচর ছিল।  
মার্কপলো ১২৯৫ খৃঃ অঃ তিনিস্ প্রত্যাগমন করেন। পরে  
তিনি ১২৯৮ খৃঃ অঃ কুর্জলার বুদ্ধি বন্দী হন। বদদেশে প্রত্যা-  
গমন করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হাতে লিখিয়া বন্ধু-  
বর্গের মধ্যে প্রকাশ করেন। জেনোয়ারাবাদী রাষ্ট্রজিলা নামক  
একব্যক্তি সর্বপ্রথম তাঁহার অপূর্ণ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ  
করিয়া জনসমাজে প্রচার করেন। ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত ১৩২০  
খৃষ্টাব্দে লাতিন ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৪০২ খৃষ্টাব্দে  
উহা লিম্বনে প্রচারিত হইয়াছিল। ফরাসী দেশে ১৫৫৬  
খৃষ্টাব্দে উহার সর্বপ্রথম সংস্করণ বাহিব হয়।

মার্কর (পুং) ভৃঙ্গরাজ। (অমর)

মার্কব (পুং) মর্কতি কেশরজন্যার্থঃ গচ্ছতীতি মর্কবঃ, মর্কে সর্পে  
নাম্নীতি অবঃ নিপাতনাদ্ বৃদ্ধিঃ। ভৃঙ্গরাজ। (ভাবপ্রকাশ)

মার্গ (পুং) মার্গ্যতে সংক্রিয়তে পাদেন মুগ্যতে গমনায়  
অস্বিয়াতে ইতি বা মার্গ বা মুগ-ঘঞ্। পস্থা, পথ, রাস্তা।

\*ত্রিশঙ্কনুংবি বিস্তীর্ণো দেশমার্গস্ত তৈঃ কৃতঃ।

বিশঙ্কনুগ্রামমার্গঃ সীমামার্গো দশৈব তু ॥

ধনুংবি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ স্মৃতঃ। (দেবীপুরাণ)

ত্রিশঙ্কনুপরিমাণ দেশমার্গ, ২০ ধনু গ্রামমার্গ, দশধনু  
সীমামার্গ এবং দশধনু বিস্তীর্ণ রাজমার্গ করিতে হয়। তারি  
হস্তে এক ধনু হয়। ২ শুদ, পায়ু। (অমর) ৩ মুগমদ,  
কন্তুরিক। মুগস্তেদং মুগ-অণ্। (ত্রি) ৪ মুগসবন্ধী।

“তদজ্জাং সলিলং তাত ! সতৈব পিতৃ-কণ্ঠসি।

মার্গমাবিকমৌলিক সর্বমেকশফক তং ॥” (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৩২।১৭)

মুগো মুগশিরাস্তদ্বুক্তা পোর্ণমাস্ত্র, মুগ-অণ্। ৫ মার্গ-শীর্ষমাস, অগ্রহায়ণ মাস। ৬ অশ্বষণ। (মেদিনী) ৭ মুগশিরা নক্ষত্র। (হেম) ৮ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৯৩।৫০) ৯ রক্তাপামার্গ।

মার্গিক (পুং) মার্গ-স্বার্থে কন। অগ্রহায়ণ মাস। মার্গ শব্দার্থ।

• মার্গণ (ক্ৰী) মার্গাতে অস্থিযাত ইতি মার্গ ভাবে লুট্।

১ অশ্বষণ, পর্যায়—সবীক্ষণ, বিচয়ন, মুগণা, মুগ। (অমর)

২ বাচক। (মেদিনী) ৩ প্রণয়। (জটধর) মার্গয়তীতি

মুগ-লু। (ত্রি) ৪ বাচক। (পুং) মার্গয়তি লক্ষ্যমিতি-

মার্গ-লু। ৫ শর, বাণ।

“তে সর্গে দৃঢ়ধ্যানঃ সংযুগেষপল্যয়িনঃ।

বহুধা ভীষ্মমানচ্ছ মার্গগণৈঃ কৃতমার্গগণৈঃ ॥” (ভারত ৫।১১৫।৪৪)

মার্গগণক (পুং) মার্গগ-স্বার্থে কন্। বাচক। তিস্ক। (হলায়ুধ)

মার্গগতা (ক্ৰী) ১ মার্গ বা ধানের ভাব। ২ বাচকতা।

মার্গতোরণ (ক্ৰী) পথপার্শ্বে স্থাপিত তোরণ।

মার্গদায়িনী (ক্ৰী) কেদারস্থ দাক্ষায়িনী।

মার্গক্রম (পুং) পথপার্শ্বে বৃক্ষ।

মার্গধেনু (পুং) মার্গস্থ ধেনুঃ পরিমাণং। যোজনপরিমাণ।

মার্গধেনুক (ক্ৰী) মার্গধেনু স্বার্থে কন্। যোজন। (ত্রিকাং)

মার্গপ (পুং)

মার্গপতি (পুং) } রাজকর্ণচারিভেদ (Road-inspector)

মার্গপালী (ক্ৰী) মার্গ পালয়তি হিংস্রভ্যাঃ রক্ষতীতি পাল-

অচ্, গৌরাদিভ্যঃ ঙীর্। শুভ।

“ততোহপরাস্থসনয়ে পূক্সস্তাং দিশি নারদ।

মার্গপালীঃ প্রবদ্যাস্থদুর্গন্তস্তে চ পাদপে ॥” (পদ্মপুঃ উত্তঃ ১২৪অঃ)

মার্গবন্ধন (ক্ৰী) পথরোধ। পথবীধা।

মার্গমান (ত্রি) পথে দাবমান, যোজা।

মার্গমিত্র (পুং) সহযাত্রী।

মার্গরক্ষক (পুং) পথরক্ষক, পাহারাওয়াল।

মার্গরোধিন্ (ত্রি) পথরোধক।

মার্গব (পুং) বর্ণসঙ্করস্বাতিবিশেষ। নিষাদ ও আরোগবী হইতে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

“নিষাদো মার্গবঃ স্ততে দাশং নৌকর্ণজীবিনম্।

কৈবর্তনিতি যঃ প্রাহবাণ্যাবর্তনিবাসিনঃ ॥” (মহু ১০।৩৪)

‘ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়াঃ জাতেঃ নিষাদঃ প্রোক্তঃ, প্রকৃত্যায়-মায়োপস্থ্যায়ঃ মার্গবঃ দাশাশ্বয়নামাণঃ নোবাবহারজীবিনঃ জনয়তি’ (কল্লুক) এই জাতির অপর নাম দাশ। ইহাদের ঐবিকা (নৌকর্ণ)।

মার্গবতী (ক্ৰী) পশ্চিমদিকের রক্ষয়িত্রী দেবীভেদ।

মার্গবশামুগ (ত্রি)

মার্গবশামুগ (ত্রি) } পথামুগতী, পথস্থিত।

মার্গবিদ্যা (ক্ৰী) ১ সঙ্গীতের দেবতা ও প্রাচীন ঋষিপ্রণীত গীতি, বাস্ত ও নৃত্যের প্রকরণবিজ্ঞা। ২ পথনির্দেশাদি বিজ্ঞা।

মার্গবেয় (পুং) ঐতরেয়-ব্রাহ্মণোক্ত ঋষিকুমারভেদ।

[ রাম মার্গবেয় দেখ। ]

মার্গশাখিন্ (পুং) মার্গে যঃ শাখী। মার্গস্থিত বৃক্ষ রাস্তার ধারে যে বৃক্ষ থাকে, তাহাকে মার্গশাখী কহে। (রঘু ১।৪৫)

মার্গশির (পুং) মুগশিরানক্ষত্রযুক্তা পোর্ণমাস্ত্র মুগশিরা-অণ্। মার্গশীর্ষ মাস, অগ্রহায়ণ মাস।

“তুষ্কৈ মার্গশিরে পক্ষে বোধিত্ত্বং রহস্যম্।

আরভেস্ত ত্রতমিদং সঙ্গকামিকমাদিতঃ ॥” (ভাগঃ ৬।১৯২)

মার্গশিরস্ (পুং) মার্গশীর্ষ।

মার্গশীর্ষ (পুং) মার্গশীর্ষী-অণ্, মুগশীর্ষেণ যুক্তা পোর্ণমাসী মার্গশীর্ষী স্যামিন্ মাসে ভবতি মার্গশীর্ষ। অগ্রহায়ণ মাস। এই মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মুগশিরা নক্ষত্রের ষোণ হয় এই জন্ত এই মাসের নাম ‘মার্গশীর্ষ’ হইয়াছে। পর্যায়—সহা, মার্গ, অগ্রহায়ণিক, মার্গশির, সহ। (শব্দরত্নঃ)

এই মাস সৌর, মুখ্যচাত্র ও গোণচাত্রভেদে ত্রিবিধ। যতদিন রবি বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করেন, ততদিন সৌর মার্গশীর্ষ। রবি বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থানকালে শুক্রপ্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত যে মাস, তাহাকে মুখ্যচাত্র মার্গশীর্ষ এবং বৃশ্চিকস্থ রবির কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে মুখ্যচাত্র মার্গশীর্ষের পোর্ণমাসী পর্যন্ত যে মাস, তাহাকে গোণচাত্র মার্গশীর্ষ কহে। কৃত্যতযে মাসকৃত্য স্থলে (অর্থাৎ কোন মাসে কি করা আবশ্যক) অভিহিত হইয়াছে যে, এই মাসে নবান্ন প্রাক্ক করা বিধেয়। চলিত কথায় ইহাকে নুতন-খাওয়া কহে। হৈমন্তিক যাত্র এই সময় পাকে। এই নুতন যাত্র দেবতা ও পিতৃ-গণকে উৎসর্গ করিয়া পরে ব্রাহ্মণ, আত্মীয় ও কুটুম্বকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। নুতন অন্ন দ্বারা পিতৃগণের প্রাজ্ঞ হয়, বলিয়া ইহাকে নবান্ন প্রাক্ক বলে। এই প্রাক্ক পাক্ষণ বিধানামুসারে করিতে হয়। [ নবান্ন দেখ ]

মার্গশীর্ষমাসই নবান্নের মুখ্যকাল। যদি কোন দৈব প্রতি-ফুল্লতা ইহা ঘটিল না উঠে, তাহা হইলে মাঘাদিমাসে নবান্ন করিবে। এই মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে সৌভাগ্য কামনা করিয়া পাষাণাকার পিষ্টক দ্বারা দেবতা পূজাপূজক পরে উহা ভক্ষণ করিতে হয়। পূর্ণিমা তিথিতে পার্শ্ব প্রাক্ক করা অবশ্য কর্তব্য। (কৃত্যত্ব) মার্গশীর্ষমাসে কোন বালকের

কম হইলে ঐ বালক ধার্মিক, পরোপকারী, ভীৰ্ব বা প্রবাস-  
রত, সন্মতিযুক্ত এবং কামুক হইয়া থাকে।

“বস্ত্র প্রসূতিঃ খলু মার্গ্যমাসে ভীৰ্বে প্রবাসে সততঃ মতিঃ স্তাৎ।  
পরোপকারী ধৃতনাধুভিঃ সন্মতিযুক্তো ললনান্তিলাষী ॥”

(কোজীপ্রদীপ)

এই মাস মাসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,  
আমি মাসের মধ্যে মার্গ্যশীর্ষ।

“মানানঃ মার্গ্যশীর্ষোহহমুত্থনাং কুস্ত্রমাকরঃ।” (গীতা ১০ অ°)

জ্যোতিষে লিখিত আছে—এই মাসে জ্যেষ্ঠ পুষ্য বা ক্তার  
বিবাহ বা চূড়াকরণ নিষিদ্ধ।

“মার্গ্যশীর্ষে তথা জ্যেষ্ঠে ফোরং পরিণয়ং ব্রতম্।

জ্যেষ্ঠপুত্রহিরোশ্চ যত্নতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥” (দীপিকা)

জ্যেষ্ঠমাসে কাহারও কাহারও মতে প্রথম দশ দিন বা  
১৮ দিন বাদ দিয়া বিবাহাদি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু  
অগ্রহায়ণ মাস সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম নাই, এই মাস সম-  
স্তই বর্জ্যনীয়। কেহ কেহ বলেন, মার্গ্যশীর্ষ মাসেও এরূপ  
বাদ দিয়া করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা বলেন, তাঁহাদের  
ঐ মত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অশাস্ত্রীয়।

স্ত্রিরাঃ ভীপ্ মার্গ্যশীর্ষী। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা।

“মার্গ্যশীর্ষানভীত্যাং পূষণে প্রযযুস্ততঃ।” (ভারত ৩৯২৮৮)

মার্গ্যশীর্ষক (পুং) মার্গ্যশীর্ষ-স্বার্থে কন্। মার্গ্যশীর্ষ মাস।

মার্গ্যশোধক (পুং) পথ-পরিষ্কারক, বাড়ুদার।

মার্গ্যশোভা (স্ত্রী) সম্মানপ্রদর্শনার্থ পথসজ্জা। (দিব্যা° ৫১৩৯)

মার্গ্যহম্ম্য (ক্লী) পথস্থিত গৃহ।

মার্গ্যগত (ত্রি) পথ হইতে উপস্থিত।

মার্গ্যয়াত (ত্রি) পথ বিস্তৃত।

মার্গ্যার (পুং) মৃগদির অপত্য। “পারারমার্গ্যারসবারায়  
কৈবর্তঃ” (শুক্লযজু° ৩০।১৬) “পারারমার্গ্যারঃ মৃগাদেবপত্যঃ  
মার্গ্যারস্তঃ” (বেদদীপ°)

মার্গ্যিক (ত্রি) মৃগান্ হস্তাতি মৃগ (পক্ষিমংস্তমৃগান্ হস্তি।  
পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। ১ মৃগহস্তা। মার্গ্যে। গম্যদেনাস্ত্যস্ত  
ঠন্। ২ পথিক। (পাণিনি)

মার্গ্যিত (ত্রি) মার্গ্য অবেষণে ক্। ১ অবেষিত। (অমর)

মার্গ্যিতব্য (ত্রি) মার্গ্যতব্য। অবেষণীয়। অবেষণযোগ্য।

মার্গ্যিন্ (পুং) মার্গ্যগামী।

মার্গ্যায়ব (ক্লী) সামভেদ।

মার্গ্যেশ (পুং) মার্গ্যস্ত্রৈশঃ। মার্গ্যপ, মার্গ্যপতি।

মার্গ্যোপদিশ (পুং) উপারোপদেষ্টা।

মার্গ্য (ত্রি) মৃগ্যতে ইতি মৃজ্ (মৃজ্বেবিভাষা) ইতি পক্ষে

ণ্যং বৃদ্ধিশ্চ (চকোঃ কৃষিধাতোঃ। পা ৭।৩।৫২) ইতি কৃৎ।

১ মার্জ্জনীয়। “মহ্যাস্তম্ভা যদা মার্গ্যো

মৃগাঃ শোকশ্চ তেন তে।” (ভট্ট ৬।৫৬) ২ অবেষণীয়।

মার্জ্জ, ১ মার্জ্জন। ২ ধ্বনি। চুরাদি° পরশ্চৈ° সক°  
সেট্। লট্ মার্জ্জয়তি। লোট্ মার্জ্জয়ত্। লিট্ মার্জ্জয়াক-  
কার। অস্, ক্ ও ভূ এই তিনই লিটে অমুপ্রয়োগ হইয়া  
থাকে। লুঙ্ অমমার্জ্জৎ।

মার্জ্জ (পুং) মার্জ্জয়তি পাপমলং প্রক্ষাল্য উদ্ধরতি জনানিতি  
মার্জ্জ-শিচ্-অচ্। ১ বিকৃ। (হেম) মার্জ্জয়তি বসনমল-  
মিতি মার্জ্জ-অচ্। ২ রজক। (শব্দমালা) ৩ মার্জ্জন।

মার্জ্জ (আরবী) মজ্জী, ইচ্ছা, বাসনা।

মার্জ্জক (ত্রি) মার্জ্জনকারী। (পুং) ২ রজক। ৩ সম্ভার্যক,  
যে ঝাঁট দেয়।

মার্জ্জন (ক্লী) মার্জ্জাতে ইতি মার্জ্জ ভাবে লুট্। প্রোক্ষনাদি  
দ্বারা অঙ্গনির্মূলীকরণ, পরিষ্করণ, প্রক্ষালন, মাজা, পোছা।  
পর্যায়—মার্জ্জি, মার্জ্জী, মার্জ্জনা, মৃজ্জা, মার্জ্জ, মার্জ্জা। (অমর)  
মানকালে উত্তমরূপে শরীর মার্জ্জন করা বিশেষ আব-  
শ্যক, ইহাতে শরীরের দৃগন্ধ, গুরুতা, কণ্ডু, কচ্ছ, মল, অরুচি  
ও শ্বেদ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

“দৌর্গন্ধাঃ গোরবঃ কণ্ডুঃ কচ্ছঃ মলমরোচকম্।

শ্বেদঃ বীভৎসতাং হস্তি শরীরপরিমার্জ্জনম্ ॥” (রাজবল্লভ)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—মানানস্তর উত্তমরূপে  
বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিতে হয়, তদ্বারা শরীরের কাণ্ডি  
বৃদ্ধি হয়, কণ্ডু ও তৃগ্গদোষ বিনষ্ট হয়। গাত্রমার্জ্জনের পর  
শরীর নির্মল হইলে বস্ত্র পরিধান করা বিধেয়।

“মানস্তানস্তরং সমাগ্বেদেনাস্তম্ মার্জ্জনম্।

কান্তিপ্রদং শরীরস্ত কণ্ডুতৃগ্গদোষনাশনম্ ॥” (ভাবপ্র°)

দেবগৃহমার্জ্জন বিশেষ পুণ্যজনক, স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন  
ব্যক্তি প্রতিদিন দেবগৃহ মার্জ্জন করে, তাহার সকল পাপ  
বিদূরিত হয় এবং অন্তমে স্বর্গে গতি হইয়া থাকে। সকলেরই  
যত্নপূর্বক দেবগৃহ মার্জ্জন করা আবশ্যক।

“সংমার্জ্জনস্ত যঃ কুর্ঘ্যাৎ পুরুষঃ কেশবালয়ে।

রজস্তুমোভ্যাং নিশ্শুক্তঃ স ভবেন্নাত্ম সংশয়ঃ ॥

পাংশুনাং বাবতাং রাজন্ কুর্ঘ্যাৎ সংমার্জ্জনং নরঃ।

ভাবস্তান্ধানি স স্ত্রী নাকমাসাত্ম মোদতে ॥” (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে দেবগৃহমার্জ্জন অশেষ পুণ্য-  
জনক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, বাহ্যভায়ে সকল বচন  
উদ্ধৃত হইল না। [ হরিভক্তিবিলাসে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

২ স্নান বিশেষ। শারীরিক অম্লতাবশতঃ যে দিন স্নান

করা না হয়, সেই দিন গা রক্তালব, ও তাহাতে অশ্রু  
হইলে আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা সমস্ত গাত্র মার্জন করিবে, ইহা  
গৌণমান।

“মশিরসঃ ভবেৎ দ্বানং দ্বানশক্তৌ তু কশিণাম্।

আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জনং দৈহিকং বিদুঃ ॥

ইতি জাবালবচনাৎ শিরো বিহার গাত্রপ্রক্ষালনং তদশক্তৌ  
‘সর্বগাত্রমার্জনং আর্দ্রেণ বাসসা কুর্ঘ্যাৎ ॥’ (আহিকতত্ত্ব)

[ দ্বান দেখ ]

বৈদিক সন্ধ্যা করিবার সময় মধু পাঠপূর্বক মস্তক ও  
গাত্রাদিতে কুশপত্র দ্বারা জল প্রক্ষেপ করা হয়, তাহাকেও  
মার্জন কহে। মার্জন দ্বারা বিসৃদ্ধিতা লাভ হয়, কিন্তু  
এই বৈদিক সন্ধ্যাপাসনান্তর্গত মার্জন দ্বারা পাপমল বিদূরিত  
এবং দেহ পবিত্র হয়। এইজন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যাপাসনা স্থলে  
প্রথমেই মার্জন বিহিত হইয়াছে।\* (পুং) মার্জাতেহনেনেতি  
মার্জ-লুট্। ৩ লোপ্। (অমর) ৪ খেতলোপ্। (সুভূতি)  
৫ রক্তলোপ্। (স্বামী)

মার্জনা (স্ত্রী) মার্জাতে ইতি মার্জ ভাবে যুচ্-টাপ্। ১  
মার্জন। (অমর) ২ মুরজধ্বনি। (হেম) (দেশজ)  
৩ ক্ষমা। যথা দোষ মার্জনা করা।

মার্জনী (স্ত্রী) মার্জাতেহনয়েতি মার্জ করণে লুট্ দ্বিগা-  
টাপ্। সম্মার্জনী, চলিত ঝাঁটা।

“নমামি শ্রীতলাং দেবীং রাসভব্যাং দিগম্বরীম্।

মার্জনী কলমোপেতাং শূর্ণালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥” (শ্রীতলাস্তব)

হিন্দুশাস্ত্রজেরা বলেন, মার্জনীরজঃ (কঁটার ধূলি) গাত্রে  
লাগাইতে নাই, ইহাতে ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও আশ্রিত হন।

মার্জনীয় (ত্রি) মার্জাতে ইতি মূজ-অনীয়ন্। মার্জনযোগ্য।  
২ অধি। ৩ শোধন। (সংক্ষিপ্তসার-উপাদিবৃত্তি)

মার্জার (পুং) মূজ (কজ্জিমুজিত্যং চিৎ। উপ্ ৩। ১৩৭)  
ইতি আরনুচিং ‘মূজেবৃদ্ধিঃ’ ইত্যুজ্জলদভোক্তে বৃদ্ধিচ।

\* “শিরসো মার্জনং কুর্ঘ্যাৎ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ।

প্রণবো ভূত্বঃ ষষ্ঠ গায়ত্রী চ তৃতীয়িকা ॥

অবদৈবত্যাং ত্র্যচষ্টৈব চতুর্থমিতি মার্জনম্ ॥

ওকারো তুরাদিব্যাহতিত্রয়ং তৃতীয়া চ গায়ত্রী চতুর্থং আপো হি ত্রেতি-কজ্জরম্  
ইতীদং মার্জনং মার্জনক্রিয়াকরণমিত্যর্থঃ।

কজ্জরং মার্জনং কুর্ঘ্যাৎ পাদান্তে বা সমাহিতঃ।

আপো হি ত্রেতীয়া কার্ধ্যং মার্জনন্ত কুশোদকৈঃ ॥

প্রতিপ্রণবসংযুক্তং ক্ষিপেদ্বৃদ্ধি পদে পদে।

ত্র্যচস্তান্তেইথবা কুর্ঘ্যাদুদীপাং মতমীদৃশম্ ॥

আপো হি ত্রেতি স্তব্ধস্ত সিন্ধুরীপবনঃ স্তবঃ।

আপো বৈ দেবতা হস্তো গায়ত্রী মার্জনং স্তবম্ ॥” (আহিকতত্ত্ব)

১ রক্তচিত্রক জুপ, চলিত রাঙাচিত্রে। (রাজনিং) ২ পুতি-  
সারিবা। (বৈজ্ঞকনিং) ৩ খটাস, চলিত খাঁটাস। (হেম)  
৪ বিড়াল। মার্জার স্পর্শ করিতে নাই, দৈবাৎ স্পর্শ করিলে  
দ্বান করিতে হয়।

“অভোজ্যাহৃতিকাবণ্ডমার্জারাপুখকুটান্।

পতিতাপবিদ্ধচণ্ডালবৃত্তহার্যশ্চ ধর্ম্মবিৎ।

সংস্পৃশ্য শুধ্যতে দ্বানাহুদকাগ্রামশুকরৌ ॥” (মার্ক. পুং)

পারিত্যাবিক মার্জার—যাহারা কেবল অহঙ্কারের জন্ত জপ  
তপ করে, এবং যাহাদের কাণ্ড পারমার্থিক নহে, তাহা-  
দিগকে মার্জার কহে, চলিত ইহাদিগকে বিড়ালতপস্বী বলা  
যায়। ইহাদের অন্ন অভোজ্য, অর্থাৎ বিড়ালতপস্বীর অন্ন  
ভোজন করিলে পাপ হয়।

“দম্ভার্থং জপতে যশ্চ তপ্যতে যজতে তথা।

ন পরত্রাথসুদুস্তো মার্জারঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

অভোজ্যাহৃতিকাবণ্ডমার্জারাপুখকুটান্ ॥” (বামনপুং ১৫অ)

মার্জারক (পুং) মার্জার (সংজ্ঞায় কন্। পা ৪। ৩। ১৪৭০)

ইতি কন্। ১ ময়ুর। (ত্রি) মার্জার স্বার্থে কন্।

বিড়াল। (ভারত ১২৩৩২৪)

মার্জারকণ্ঠ (পুং) মার্জারস্তেব কণ্ঠঃ কণ্ঠস্যেব যন্ত যদা  
মার্জারো মন্থণঃ কণ্ঠো যন্ত। ময়ুর। (শব্দরত্নাং)

মার্জারকণিকা (স্ত্রী) মার্জারস্ত কণো ইব কণৌ যন্তাঃ, দ্বিগাং  
ভীপ্, স্বার্থে কন্, টাপ্, পূর্বস্ত হ্রস্বতঃ। চামুণ্ডা।

‘চামুণ্ডা চর্চিকা চর্ম্মমুণ্ডা মার্জারকণিকা।’ (হেম)

মার্জারকণী (স্ত্রী) মার্জারস্তেব কণীবন্তাঃ ভীপ্। চামুণ্ডা।

“মার্জারকণী চামুণ্ডা কণমোটচ চর্চিকা।” (ত্রিকাং)

মার্জারগন্ধা (স্ত্রী) মার্জারস্তেব গন্ধোহন্তাঃ। মুলাপর্ণী,  
চলিত মুগানি। (রত্নমালা)

মার্জারগন্ধিকা (স্ত্রী) মার্জারগন্ধ-কন্-টাপ্, অস্ত ইত্য়ক্।  
মুলাপর্ণী। (রাজনিং)

মার্জারপাদ (পুং) অশ্বভেদ। ইহার লক্ষণ,—যে অশ্বের পাদ  
কুর্চ্চদেশে গাত্রবর্ণ ভিন্ন অস্ত্রবর্ণের রেখা আছে, তাহার নাম  
মার্জারপাদ, এইরূপ অশ্ব ব্যবহার করিতে নাই। ইহাতে  
ব্যবহারের অসম্ভব হইয়া থাকে। (জয়দত্ত ৩ অং)

মার্জারি (পুং) মগধরাজ মহাদেবের পুত্র। (ভাগবত ৯। ২২। ৪৬)

মার্জারী (স্ত্রী) মাটি শোধরতি কেশাদিকমনরা মূজ-আরনু,  
দ্বিগাং ভীপ্। ১ কতুরী। ২ জন্তবিশেষ, গন্ধনাফলা,  
খাটাসী। পর্যায়—পুতিকা, পুতিকজ, গন্ধচেলিকা (রাজনিং)

মার্জারী (পুং) মার্জারস্তাং মার্জার (গহাদিত্যন্ত। পা  
৪। ২। ১৩৮) ইতি হ্র। ১ বিড়াল। ২ শূজ। ৩ কায়শোধন।

মার্ভিল (পুং) মার্ভারলমোরেকদ্বাং রত ল। মার্ভার, বিড়াল।

মার্ভালীয়া (পুং) বৃক্ (হাচতিবুজেরালচ, বালকালীয়াঃ। উপ্ ১১১৫) ইতি আলীয়াচ্। ১ বিড়াল। ২ শূত্র। ৩ কাম-  
দোষন। (চেম) ৪ মহাদেব।

“ললাটাকার সর্কার মীচুবে শুলপাখরে।

পিনাকগোলে, সূর্য্যার মার্ভালীয়ার বেধসে ৪” (ভারত ৩৩২, ৭৭, ৫) অধিত্যে। পাঠান্তর মজ্জালীয়া। (লিঙ্গপুরাণ ৪.৪১)

মার্ভিত (ত্রি) মার্ভিতে বৃক্-গিচ্-কর্মণি ক্র। ১ শোভিত।  
ত্রিয়াং টাপ্। ২ রসালা, ইহা এক প্রকার খাদ্য দ্রব্য। দধি,  
খণ্ড, মধু, সর্পিং ও মরিচ এই সকল দ্রব্যে কপূরবাসিত করিয়া  
এই খাদ্য প্রস্তুত করিতে হয়। [ রসালা দেব ]

মার্ভাকব (পুং) বৃড়াকোর্গোত্রাপত্যঃ (অনুব্যান্তর্ভবে  
বিদ্যাদিত্যোহঙ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি বৃড়াকু অঙ্। বৃড়াকু  
জ্বির গোত্রাপত্য।

মার্ভাকবায়ন (পুং) মার্ভাকব (হরিতাদিত্যোহঙ্। পা  
৪।১।১০) ইতি অঙ্কোহাং ফক্। মার্ভাকবের গোত্রাপত্য।

মার্ভাক (ক্লী) সুখসাধন।

“বদ্যপ্যং মার্ভাকমিচ্ছাবরণা নিষজ্জন্তং” (জক্ ৭।৮২।৮)

“মার্ভাকং বৃড়াকস্ত সুখস্ত সাধনং” (সায়ণ)

মার্ভণ্ড (পুং) মৃতচ্যাসৌ অণুশেতি, মৃত্যুতে তবতীতি  
মৃত্যু (তজ্জ তবঃ। পা ৪।৩।৫০) ইতি অণ্। ১ অর্কবৃক্।  
(অমর) ২ শূকর। (মেদিনী) ৩ স্বর্ণমাক্ষিক। (বৈবস্বকনিঃ)  
৪ সূর্য্য। ইহার উৎপত্তিবিবরণ মার্ভণ্ডেরপুরণে এইরূপ লিখিত  
আছে :—পুরাকালে দানবগণ দেবগণকে পরাজয় করিয়া  
স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে, দেবমাতা অদিতি পুত্রদিগের  
হিতকামনার তগবান্ ভাকরের উদ্দেশে কঠোর তপোহুষ্ঠান  
করেন। ভাকরদেব তপস্যার প্রীত হইয়া অদিতির নিকট  
উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে বর লইতে বলেন। অদিতি  
সূর্য্যকে বলেন, দৈত্য ও দানবগণ প্রবল হইয়া আমার পুত্র  
দেবতাদিগের জিতুবন ও যজ্ঞতাপ হরণ করিয়াছে, যাহাতে  
পুনরায় দেবগণ যজ্ঞতাপভূক্ত এবং স্বর্গাধিপতি হয়, তাহার  
উপায় বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনীর বর। তখন  
ভগবান্ ভাকর অদিতির প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহি-  
লেন, আমি তবীয় গর্ভে সহস্রাংশে সমুৎপন্ন হইয়া তোমার  
পুত্রের শত্রুদিগকে বিনাশ করিব, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত  
হইলেন।

এইরূপে অদিতির অভিলাষ পূর্ণ হইলে তিনি তপস্তা  
হইতে বিরত হইলেন। কিছুদিন পরে রবির সৌকর্য্য নামক

কর অদিতির গর্ভে অবতরণ করিল। দেবজননী অদিতি  
সমাহিত হইয়া শৌচ এবং কচ্ছটাজ্জারণাদি ত্রতাহুষ্ঠান-  
পূরক সেই দিব্য গর্ভ বহন করিতে লাগিলেন। কল্পপ ইহাতে  
অদিতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি প্রতি  
দিন উপবাস করিয়া এই গর্ভাণ্ডকে মারিয়া ফেলিবে কি ?  
অদিতি কহিলেন, তুমি এই যে গর্ভাণ্ড দেখিতেছ, ইহাকে  
আমি মারি নাই, ইহা বিপক্ষগণের মৃত্যুর কারণ স্বরূপ। এই  
বলিয়া দেবী অদিতি আমিবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই গর্ভ তৎক্ষণাৎ  
ত্যাগ করিলেন। ঐ গর্ভ তেলোত্তরে জ্বলিতে লাগিল।  
কল্পপ সেই গর্ভকে উদীয়মান ভাকরের দ্বারা প্রোভাষিষ্ট  
দর্শন করিয়া তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে  
কল্পপকে অন্তরীক্ষ হইতে সম্ভাবণ করিয়া বৈবস্বতী এইরূপ  
বলিতে লাগিলেন, তুমি এই গর্ভাণ্ডকে ‘মারিত’ অর্থাৎ  
মারিয়া ফেলিবে, এইরূপ বলিয়াছিলে, এইজন্ত তোমার এই  
পুত্রের নাম মার্ভণ্ড হইল। এই পুত্র জনতে সূর্য্যের কাণ্ড  
করিবেন এবং যজ্ঞভাগহারী অশুরদিগকে সমূলে বিনাশ  
করিবেন।

দেবগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দভরে মার্ভণ্ডকে  
অগ্রণী করিয়া অশুরদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই  
যুদ্ধে মহাশুর সকল ভগবান্ মার্ভণ্ড কর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া  
মাত্রই তবীয় ভেঙ্গে দহমান হইয়া তমীভূত হইল।

এইরূপে অশুরগণ বিনষ্ট হইলে দেবগণ স্বীয় অধিকার  
প্রাপ্ত হইলেন। মার্ভণ্ডদেব কদম্বকুহুমসমূহ প্রভিতা-  
বিকাশসহকারে অধঃ ও উর্দ্ধে রশ্মিসমূহ বিকীরণ করিতে  
লাগিলেন। তিনি দেখিতে দেখিতে প্রজলিত অগ্নিপিশুর  
স্তায় অতি প্রদীপ্ত কলেবর ধারণ করিলেন।

প্রজাপতি বিশ্বকর্মার কন্যা সংজার সহিত ইহার বিবাহ  
হয়। এই সংজার গর্ভে দুই পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ  
পুত্রের নাম বৈবস্বত ময়ূ, দ্বিতীয় বর, তৃতীয় কন্তার নাম যমী  
বা যমুনা।

সংজা মার্ভণ্ডদেবের সেই গোলাকার রূপ সন্দর্শনপূর্ব্বক  
কোনমতেই তাঁহার সহঃ ভেজ সহ করিতে না পারিয়া স্বীয়  
ছায়াকে নিগ্রীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমার মঙ্গল  
হউক, আমি আমার পিতৃগৃহে গমন করিব, তুমি আমার  
কথামত সূর্য্য সমীপে অবস্থান কর, আমার এই পুত্র-কন্যাকে  
বিশেষরূপে পালন করিও, কিন্তু এই কথা সূর্য্যের নিকট  
কখন প্রকাশ করিও না।

ইহাতে ছায়া কহিলেন, মার্ভণ্ডদেব যে পর্য্যন্ত না আমার  
কেশপ্রাণ অপবাশাপ প্রদান না করেন, তাহাৎ আমি তোমার

জুড়িপ্রেত তাহাকে বলিব না, তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পার।

ছায়া এই প্রকার কহিলে, সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করিয়া কিছুদিন তথায় বাস করিলেন। অনন্তর পিতা বারংবার আমি-সকাশে বাইবার অস্ত্র অহরোধ করিলে, তিনি বড়বাকুপ ধারণ করিয়া উত্তর-কুরুতে গমন করিলেন; এবং তথায় কঠোর তপশ্চরণে নিরত থাকিলেন।

এদিকে সংজ্ঞা পিতৃগৃহে গমন করিলে ছায়া তদীয় বাক্যে তৎপর হইয়া তাঁহার রূপ ধারণ করিয়া সূর্য্যের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। মার্ভণ্ড সংজ্ঞাবোধে তাহার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা সমুৎপাদন করেন। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সাবণি মনু, ইনিও বৈবস্বত মনুর ভ্রাতৃ প্রতাবশালী। দ্বিতীয় শনৈশ্চর, তৃতীয়া কস্তার নাম তপতী, রাজ্য সম্বরণের সহিত এই কস্তার বিবাহ হয়।

পরে, মার্ভণ্ড এই সংবাদ অবগত হইয়া সংজ্ঞার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, ও বিশ্বকর্মা সমীপে গমন করেন। বিশ্বকর্মা বথাবিধি মার্ভণ্ডকে অর্চনা করিয়া কহিলেন, সংজ্ঞা তোমার হৃৎসহ তেজঃ সহ করিতে না পারিয়া কঠোর তপোমুষ্ঠানে রত আছে, সংজ্ঞা তোমার কমনীয় রূপাভিলাষিনী, যদি তোমার অভিকৃতি হয়, তাহা হইলে আমি তোমার এই প্রথর তেজের হ্রাস করিয়া দিই।

সূর্য্যদেব ইহাতে স্মীকৃত হইলে বিশ্বকর্মা শাকদ্বীপে মার্ভণ্ডকে ভ্রমিষয়ে আরোপিত করিয়া তদীয় তেজঃ ক্ষয় করিতে উদ্ভূত হইলেন। ক্রমে বিশ্বকর্মা ধীরে ধীরে ভাস্করের তেজঃ শাতন করিয়া দিলেন। মার্ভণ্ডের তেজঃ ১৫ ভাগ শান্তিত হওয়ার তাঁহার শরীর অতিশয় কমনীয় হইল। বিশ্বকর্মা এই ১৫ ভাগ তেজঃ দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের শূল, ধনু-দের শিবিলা, যমের দণ্ড এবং কার্তিকেয়ের শক্তি নির্মাণ করেন। (মার্কণ্ডেয়পুঃ ১০৫—১০৯ অঃ) [সংজ্ঞা ও সূর্য্য দেখা]।

মার্ভণ্ড, কান্দীরের অন্তর্গত কান্দীরের পূর্ব্বরাজধানী ইসলামাবাদের ৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত একটা প্রাচীন পুণ্যস্থান। এখানকার মন্দির জগদ্বিখ্যাত। এমন সুন্দর সুগঠিত, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যমিতে অবস্থিত অপূর্ণ মন্দির ভারতবর্ষে আর নাই। ইহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া এখানে সমাগত শিল্পশাস্ত্রবিৎ মাত্রই মুগ্ধকণ্ঠে ইহারা প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন ও প্রাচ্য-জগতের অপূর্ণ অতীতকীর্তিসমূহের মধ্যে ইহার প্রেক্ষাহান দান করি য়াছেন। মূলমন্দির কোন্ সময় নির্মিত হয়, তাহাও ঐক জানিবার উপায় নাই। রাজতরঙ্গিনীর প্রমাণ অনুসারে অনেকে কান্দীরানিপতি রূপদিত্যের কীর্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া

থাকেন। আবার কেহ ভারতবিজয়ী সলিতাদিত্যকে এই মন্দিরনির্মাতা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

[ বাতান শব্দে বিবৃত বিবরণ উইব্য। ]

মার্ভণ্ডতিলকস্বামিন্ (পুং) প্রসিদ্ধ দার্শনিক-বাচস্পতি মিশ্রের গুরু। ইনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রণয়ন করেন।

মার্ভণ্ডবল্লভা (স্ত্রী) মার্ভণ্ড বল্লভা, প্রিয়া। ১ সূর্য্যপত্নী, ছায়া, সংজ্ঞা। ২ আদিত্যভক্তা। (রাজনিঃ)

মার্ভণ্ড মিশ্র (পুং) প্রাচীনতমার্ভণ্ড ও সংকারমার্ভণ্ড-রচয়িতা।

মার্ভণ্ড বর্ষ্মন (পুং) কেরলের জনৈক রাজা। ইতি ১০১২ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

মার্ভণ্ডবৎস (স্ত্রী) মৃতবৎসার অপত্য। (অথর্ব্বঃ ৮৩২৬।)

মার্ভণ্ড (পুং) মৃত তিস্র অণু হইতে উৎপত্তমান। “বিষো মার্ভণ্ডো ব্রহ্মণ্য পুতঃ” (শুক্ ২।৩৮) “মার্ভণ্ডঃ ‘মৃত্যুদ্বিরা-দভ্যুৎপত্তমানঃ’ (সারণ)

মার্ভণ্ডিক (পুং) মৃত্তিকার বিকার ইতি মৃত্তিকা (ভক্ত বিকারঃ। পা ৪।৩।১৩৪) ইতি ঠক্। ১ শরাব। (শব্দরত্নাঃ) (ত্রি) ২ মৃত্তিকানির্মিত।

মার্ভণ্ডিকাবত (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। এই নগর চেন্নি-রাজ্যের অন্তর্গত ও লক্ষবানু পর্বতের সন্নিকটে নন্দদাতীরে অবস্থিত। হরিবংশে এই স্থান মৃত্তিকাবর্তী নামে উক্ত হইয়াছে। ২ জন-পদভেদ। ৩ তদেন্দীয় রাজা। ৪ তদেন্দীয় লোক।

মার্ভণ্ডিকাবতক (ত্রি) মার্ভণ্ডিকাবত সম্বন্ধীয় বা তদেশজাত।

মার্ভণ্ড (ত্রি) দৈহিক ধাতুমল।

“তত্ত্বাত্তদ্ব্যোপবিধৃতমার্ভণ্ডঃ মার্ভণ্ডমভূৎ সুরিং।

প্রোতসাং প্রবরাসৌম্যসিদ্ধিমা সিদ্ধসেবিতা ॥”

(ভাগবত ৩।৩৩।৩২)

“ব্যোপবিধৃতমার্ভণ্ডঃ ব্যোগেন বিধূতা বিলৌনা মার্ভণ্ডা দৈহিকা ধাতুমলা যজ্ঞাঃ” (হানী)

মার্ভণ্ড (পুং) মৃত্যু সম্বন্ধীয়। ২ অন্তকের গোত্রাপত্য।

মার্ভণ্ডজয় (ত্রি) মৃত্যুজয়সম্বন্ধীয়।

মার্ভণ্ড (ত্রি) ক্ষুদ্র চূর্ণ।

মার্ভণ্ড (স্ত্রী) মৃত্ত অলম্ব্য, ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ পত্তন, মৃদলবাদনঃ শিল্পমতোতি অণ্। (ত্রি) ২ মৃদলবাদক।

মার্ভণ্ডিক (ত্রি) মৃদলবাদনঃ শিল্পমজ, মৃদল (শিল্পঃ। পা ৪।৪।৫৫) ইতি ঠক্। ১ মৃদলবাদক, পণ্যায়—মৌর্য্যজিক, সাদিক, ঔজিক। (শব্দরত্নাঃ)

মার্ভণ্ড (স্ত্রী) মৃদোক্তাব ইতি মৃহ- (পৃথাদিত্য ইঙ্গিজ বা। পা ৪।১।১২২) ইত্যজ্য ব্যবচনমণাদেঃ সমাবেশার্থঃ ইতি



কানিকোকেরণ। ১ পরের হুং দেখিয়া মানসিক পীড়া।

মুহূতা, ইহা উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ত্রিবিধ।

“মার্দবং কোমলতাপি সম্পর্শসহতোচ্যতে।

উত্তমং মধ্যমং প্রোক্তং কনিষ্ঠকেতি তদ্বিধা ॥” (উজ্জলনীলমণি)

২ অকাঠিত।

“বিললাপ সখ্যাম্পদগুণং সহজাম্প্যপহার ধীরতাম্।

অতিতময়োহপি মার্দবং ভজতে কৈব কথ্যশরীরিবু ॥” (রঘুলাভ্য)

(পুং) মার্দবং মুহূতং অজাতীতি অর্শ-আভচ্। ৩ বর্ণ-

লঙ্ঘন-জাতিবিশেষ। ইহার অতিশয় মুহূ।

‘মার্দুকো মার্দবচক্কাবাহিণিকাদয়ঃ।’ (জটায়ব)

মার্দবায়ন (পুং) মার্দবের গোত্রাপত্য।

মার্দবাকৃত (ত্রি) মুদ্রকৃত, নরম করা। (ভারত ১২)

মার্দেয় (পুং) মৃদের অপত্য।

মার্দেয়পুর (স্ত্রী) প্রাচীননগরভেদ। (পা ৬২ ১০১)

মার্বীক (স্ত্রী) মস্তবিশেষ, দ্রাক্ষাকৃত মস্ত, আঙ্গুরের মদ।

“মুখীকাতিঃ কৃতং মস্তং মার্বীকমিতি চোচ্যতে।

মুখীকানাং স্পৃগকানাং বঃ স্বরং গালিতঃ পটাং ॥” (বৃদ্ধশৌনক)

মার্ব (পুং) মুযতি ক্রমতে জমাতীতি, মুব্ (ইণ্ডপদজ্যাক্রী-

কিরঃ কঃ। পা ৩১১৩৫) ইতি ক, মুব্ স্বার্থে অণ্।

১ নাট্যোক্তিতে শ্রেষ্ঠ। নাটকে শ্রেষ্ঠার্থে এই শব্দের প্রয়োগ

হয়। ২ মারিষ্যাক। (ভাবপ্রাণ)

মার্বিক (পুং) মার্ব-ঠক্। মারিষ্যাক। (রাজনিং)

মার্ব্য (ত্রি) পরিবর্তব্য, পরিষ্কারযোগ্য।

মার্বি (স্ত্রী) মুজ-জিন্ (মুজ্জ্ব-কিঃ। পা ৭। ২। ১১৪) ইতি

বৃজিচ। ১ মার্বিন। ২ তৈলব্রক্ষণ, তেলমাখা।

“তৈলময়ঃ বদন্তেযু ন ভবেৎ বাহুসজতম্।

সা মার্বিঃ পৃথগভ্যাকো মন্তকানৌ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥” (আহিকতব)

মার্বি মং (ত্রি) ১ মার্বিনবিশিষ্ট। ২ (পুং) সারণের পুত্রভেদ।

মার্বিট্টা (দেশজ) মহারাষ্ট্রদেশ। ২ তদ্দেশবাসিন্য।

মাল (স্ত্রী) মাতি মানহেতুর্ভবতীতি মা (খজ্ঞেজ্ঞাগ্রবজ্ঞে-

তাদি। উণ্ ২২৮) ইতি রনৃ, পুষোদরাদিষাৎ রন্ত লঘুঃ।

১ ক্রৈব। “সম্ভঃসৌর্যোৎকর্ষণমুত্তমভিজেত্রমারুহ মালং

কিকিংপশ্চাদ্রজ লঘুগতিভূম এবোত্তরেন।” (মেঘদূত ১৬)

২ কপট। ৩ বন। (হেম) ৪ হরিতাল। (রসেন্দ্রসারং)

(পুং) ৫ স্নেহজাতিবিশেষ।

“মালা ভিন্নাঃ ক্রিয়াত্মক সর্কেহপি স্নেহজাতয়ঃ ॥” (ভা০ ৬২৩৩)

৬ মেদিনীপুরের অন্তর্গত দেশবিশেষ। ইহা মাল-

ভূমি নামে খ্যাত। ৭ জনলোক। মাং লক্ষ্যং লাভীতি

লাক্। ৮ বিহু।

মাল, পশ্চিম এবং মধ্যবঙ্গের কুবিজীবী জাতিবিশেষ। অনেকে বলেন, ইহারা দ্রাবিড়ীয় কৃষকবংশ হইতে উৎপন্ন। ইকরা গ্রাম্য চৌকিদারের কার্য করে। চৌর্য্যকৃত্যে ইহাদের যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে।

পূর্ববঙ্গের মালদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাহ প্রচলিত যে, পূর্বে তাহার চাকর নবাবের সভার মল্লজীড়া করিত, তদবধি তাহার মল বা মাল-আখ্যায় অভিহিত। কিন্তু এ বিষয়ের নিঃসন্দেহ কোন প্রমাণ নাই। বিভারলী (Beverley) সাহেব ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আদমশুমারীর বিবরণে কনিংহাম সাহেবের মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভাগলপুরের দক্ষিণাংশে যে মল্লর পর্ত্ত অবস্থিত আছে, তথাকার Mandei নামক অধিবাসীবর্গের সহিত মহানদীতীরবাসী Manada ও টলেমী কথিত Mandalas জাতি একই শাখাসম্মত।

পাটনার দক্ষিণ-গঙ্গাতীরে যে সমস্ত মল্লী বা মলৈ জাতি বাস করে, বোধ হয়, উহারাই টলেমী-বর্ণিত মণ্ডলীজাতি। বর্ত্তমান মুণ্ডাকোলদিগের সহিত ইহাদের ভেদ অতি অল্প। তামিলভাষায় মল্লর শব্দে পাহাড় বুঝায়। সুতরাং মাল শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ পাহাড়িয়া বা পার্বত্যজাতি। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে এই দ্রাবিড়ীয় জাতি সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিল। পরে অন্ত্যজ জাতির প্রতিযোগিতায় তাহারাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

হুন্টার সাহেব মালভূমি (মানভূম) বা মল্লভূমিকে মল বা বীরদিগের বাসস্থান বলিয়া যে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। মালভূমি অর্থে মাল বা পাহাড়িয়া জাতির নিবাসভূমি। সম্ভবতঃ মালদহ সর্বপ্রথমে মাল জাতিকর্ত্তক উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সমস্ত মালগণ পূর্বাঞ্চলে বিস্তীর্ণ হইয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। অন্ত্যজ আদিম অধিবাসীদিগের জায় মালগণ ৪৫ প্রকার চণ্ডাল জাতির মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় ন্যূনাধিক পরিমাণে চণ্ডাল দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, মাল ও চণ্ডাল অভিন্ন জাতি। কেহ বলেন, তাহার মল্লজীড়ানিপুণ জাতিবিশেষ। অন্ত কেহ বলেন, তাহার সাপুড়িয়া বা মালবৈষ্ঠ। কেহ তাহাদিগকে মুসলমান, আবার কেহ বা বেদিয়া ও বাবাজিয়া বলিয়া থাকেন। এই মালদিগের মধ্যে অনেক মুসলমান আছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাকুড়া জেলার ইহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়। ধাইয়া, গোবরা বা শুরা, খেরা, রাজবংশী এবং সানাগাছা। মেদিনীপুর ও মানভূমে—ধুনকাটা, রাজবংশী, সাপুড়িয়া, বেদিয়া মাল এবং তুলা। বীরভূমে—খাটুয়া, মলিক,



এবং রাজবংশী। সাঁওতাল পরগণায়—দেশবার, মগহিয়া, রাজবংশী বা রাজমাল, রাঢ়ী মাল এবং সিন্দূর।

বাকুড়ার দ্বার সুরনিধাবাদেও বিভিন্ন প্রকার মাল আছে। কেবল 'খাইরা' মাল তথ্য নাই। এই সমস্ত বিভাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কচ্ছজাতির মধ্যে রাজবংশী উপাধি দৃষ্ট হয়, অথচ কচ্ছের মাল নহে। বোধ হয়, কোন স্থানীয় রাজবংশ হইতেই রাজবংশীবিভাগের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। গোবরা মালের বানর ধরিয়া থাকে, আবার বাণ্দিগের মধ্যে এক বিভাগ গোবরা নামে কথিত হয়। বোধ হয়, থেরা হইতে থেরা ডোমজাতির শাখাবিশেষের উৎপত্তি। সানাগাছা—জাঁতিদিগের কাপড় বুনবার সান হইতে উৎপন্ন। ইহারা সানা দ্বারা কাপড় বুনিয়া থাকে। ধুনকাটা মালেরা শালগাছ চিরিয়া ধুনা সংগ্রহ করে। তুঙ্গমালেরা কৃষিকার্য্য করে। সাপুড়িয়া বা বেদিয়া মালেরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাঁবু কেলিয়া ভ্রমণ করে। সাপ ধরা, সর্পাঘাতের চিকিৎসা, ঝাড়ান প্রভৃতি নামা প্রকার মন্ত্র, তন্ত্র ও ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। সাপুড়িয়া মালেরা সাপ ধরিলেও সাপের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে এবং সাপের নাম ধরিয়া ডাকে বা—লতা বলিয়া ডাকিয়া থাকে। সাপুড়িয়া মালদিগের সহিত বেদিয়াদের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। ডাকার ওয়াইজ (Dr Wise) বলেন যে, সাপুড়িয়া ও বেদিয়া পরস্পর বেদিয়া জাতির দুই অবাস্তব শাখা বিশেষ। কেহ বলেন, মালজাতি হইতেই বেদিয়াদের উৎপত্তি হইয়াছে। ইত্যাদি অসুমনে বোধ হয়, মাল ও বেদিয়া জাতিতে বহিষ্ট সম্পর্ক আছে।

ঢাকার মালেরা সাপ ধরে না। তাহারা নিপুণতাসহকারে দাঁতের পোকা বাহির করিতে পারে বলিয়া তাহাদিগকে পকা বলে। তথাকার মালেরা বলিয়া থাকে যে, তাহাদিগের সহিত বেদিয়াদের কোন সংস্রব নাই। শারীরিক গঠনের কিছু তারতম্য অসুসারে মালদিগকে স্পষ্টরূপে চিনিতে পারা যায়। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে মহাজনী কারবার করে। শতকরা ৫০ টাকা সুদে টাকা কর্ত্ত্ব দেয়। ঢাকার মালেরা সর্পাঘাতসম্বন্ধীয় কোন চিকিৎসাই জানে না। তাহাদিগের জীলোকেরা নানা প্রকার গাছগাছড়া টোটকা ঔষধ দ্বারা রমণীসমাজের অনেক পীড়া নিরাময় করিয়া থাকে। অনেক ক্ষমতের তাহারা হস্ত ব্লাইয়া তলপেটের বেদনা এবং অসুস্থ সম্পর্কীয় পীড়ার চিকিৎসা করিয়া থাকে। ঢাকার মালদিগের সহিত বেদিয়াদের বিবাহাদি প্রচলিত নাই। অধিকত

তাহারা সঙ্গোত্রে বিবাহ করে না। ঢাকার মালেরা যদি ভ্রমণকারী মালদিগের কন্ডা বিবাহ করে, তবে তাহাদিগকে পিতৃ-কুলের ব্যবসার ছাড়িয়া স্বত্তরকুলের ব্যবসার অবলম্বন করিতে হয়।

মেদিনীপুরের সাপুড়িয়া মালদিগের সহিত ঢাকার সাপুড়িয়া বেদিয়াদিগের অনেকটা মিল আছে। পশ্চিম এবং মধ্যবর্ত্তের মালদিগের মধ্যে আদিম রাজজাতির অনেক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহারা সঙ্গোত্রে কন্ডা বিবাহ করে না। পিতৃপক্ষে পাঁচপুরুষ এবং মাতৃপক্ষে তিন পুরুষ বান দিয়া বিবাহ করে। যদি অল্প কোন জাতি ইহাদের জাতিভুক্ত হইতে চায়, তাহা হইলে সেই জাতিকে একটা বড় ভোজের আয়োজন করিতে হয় এবং মালদিগের সর্দারের (মাসির) পাদোদক পান করিতে হয়।

বাণ্য ও ঘোবন উভয় প্রকার বিবাহই ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রত্যুষের পূর্বে কন্ডার পিজালয়ে মহরা এবং সিধাবক্ষশাখাধারা নির্মিত কুঙ্গকুটীতে ইহাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। কন্ডাকে সাতবার ঘরের চতুঃপার্শ্বে ঘুরাইতে হয়। অবশেষে বরকন্ডা পাশাপাশি হইয়া পূর্বদিকে মুখ করিয়া বসে। পরে মুণ্ডা জাতির দ্বার ব্রাহ্মণস্ট্রী পবিত্র জল বরকন্ডার মস্তকে ঢালিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে মালা-বদল এবং বরকন্ডার বস্ত্র গ্রহি দ্বারা বন্ধ করা হয়। বহু বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও ইহারা দৈভবশতঃ একাধিক জীৱ ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে পারে না। বিধবারা বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তৎকাল কোন বিশেষ বিধির অঙ্গষ্ঠান করিতে হয় না। কেবল তুলসীর মালা বদল করিলেই বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হয় এবং বিধবার পিতাকেও কিছু অর্থ দিতে হয়। জীৱ ব্যভিচার করিলে স্বামী গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অঙ্গমতি লইয়া বিবাহহস্ত ছেদন করিতে পারে। ব্যভিচারিণী জীৱ পুনর্বার বিধবাদের দ্বার বিবাহ করিতে পারে।

মালগণ এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে আদিম ধর্মের কোন চিহ্নই এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা সাধারণের প্রচলিত স্থানীয় ধর্ম গ্রহণ করে। আবার কোন কোন স্থলে তাহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। জননী মনসা তাহাদিগের কুমদেবতা এবং তাহারা বাণ্দিগের দ্বার মহাসমারোহে মনসা দেবীর পূজা করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গ্রামাদেবগণকে গৃহস্থানী চাঁউল, মিঠান, থৈ প্রভৃতি নৈবেদ্য প্রদান করেন। কোন কোন স্থলে তাহারা ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করে, কোন স্থলে আবার করে না।

কিন্তু বৃদ্ধগণই প্রধানতঃ পূজাদি করিয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণার রাজমালদিগের ত্রাশ্রণ পুরোহিত আছে।

সাধারণতঃ ইহারা স্তব্ধের নদীতীরে গৃহ করে এবং চিত্তাভ্যাসে লিপ্ত থাকিয়া থাকে। একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া হিন্দুদিগের অনুকরণে সম্পন্ন হয়। অগাধে মৃত্যু হইলে, মৃত্যুর চতুর্থ দিবসে তাহাদের শ্রাদ্ধাদি নিৰ্বাহিত হয়। কালীপূজার রাজিতে ইহারা মৃত পুরুষগণের সম্মানার্থ মহাসমারোহে পাটকাটির (প্যাঁকাটি) মশাল জ্বালাইয়া থাকে। চৈত্র মাসের শেষ দিবসে সকলেই জলে গিহুতর্পণাদি করে।

বালিকাদিগের শব অস্থান ভাবে মাটিতে প্রোথিত করে। দরিদ্রদিগের শবও উত্তরশিরক রাখিয়া নদীতীরে সমাহিত করা হয়।

কৃষিকার্যই মালদিগের জীবনোপায়। কেবল ভ্রমণকারী মালগণ ব্যতীত সকলেই এক্ষণে ভূমিকর্ষণ কবিতা নির্দিষ্ট স্থানে সমাজবদ্ধ ইহারা বাস করিতেছে। অনেকেই আবার শ্রমজীবীর কার্য করে। বাকুড়া জেলায় ইহাদের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। যাহাদিগের আদিনিবাস মাল-ভূমিতে (মালভূম), তাহারা পুরুষাঙ্কুরে অনেকভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে। অনেকে গ্রাম্য চৌকিদারের কার্যও করিয়া থাকে। কতকগুলি পুরুষ এবং স্ত্রীলোক মন্ত্র ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, এই জন্ত তাহাদিগকে অনেকে মেছুয়া বলে। ইহাদিগের সামাজিক অবস্থা অতি হীন। ইহারা বাগ্‌দাদের জল এবং পকায় গ্রহণ করে, কিন্তু ইহাদের স্পৃষ্ট খাদ্যাদি কোন জাতিই গ্রহণ করে না। মালেরা শূকর বা গোরুর মাংস খায় না বলিয়া গরু করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা মুরগী, সৰ্পপ্রকার মন্ত্র, ইঁহর এবং গোমাপ ভক্ষণ করিয়া থাকে। রাজমালগণ মুরগী স্পর্শ করে না।

মাল, সিংহভূম জেলার এক প্রকার হুঁইয়া জাতি। কোন কোন কৈবর্তদিগেরও মাল উপাধি আছে।

মাল (সংস্কৃত মল) কুশ্রিজাতির শাখাবিশেষ। আজমগড় জেলায় ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এইরূপ প্রবাদ যে, ময়ূরভট্ট মূনির ঔরসে এবং কোন কুশ্রিরমণীর গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। ময়ূরভট্ট গোরক্ষপুর পরিত্যাগ করিয়া সরযুনদী-তীরস্থ কঙ্করাড়ি নামক স্থানে বাস করিতেন। ঐ স্থান আজমগড় জেলার নাথপুর পরগণায় অবস্থিত। বর্তমান মালগণ কমেজ-রাজ হর্ষবর্দ্ধন হইতে নিজের ভূমি পাইয়াছে বলিয়া দাবী করে। ইহারা গোরক্ষপুরের নাগবংশ কুশ্রিদিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া থাকে। কেহ একাধিক বিবাহ করে না। ইহাদের মধ্যে বালবিবাহ প্রচলিত নাই, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব এবং স্মৃতি মতে পৈতৃক। ইহারা কালী পূজা এবং মানসিধ গ্রাম্যদেবতার পূজা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা কুশ্রিদিগের আচারের অনুকরণ করে।

মাল, নেপালের অন্তর্গত গুরুত্ববিশেষ।

মালক (ক্কা) মলতে ধারমতি শোভামতি, মলধারণে মূল। ১ মলপন্ন। (জটাধর) (পুং) ২ নিম্বক।

মালকা (ক্কা) মল-খুল্ল জিয়াং টাল। মালা। (শব্দরত্নাং) মালকৌশ (পুং) মালস্ত হরঃ কোশাৎ কঠাঙ্গিগতঃ ইতি অণ্। রাগবিশেষ। ইহার নামান্তর কোশিক, হনুমন্তে এত রাগ ছয় রাগের মধ্যে দ্বিতীয় রাগ। মহাদেব বা বিষ্ণুর কণ্ঠ হইতে এই রাগের উৎপত্তি হয়। ইহার জাতি সম্পূর্ণ।

স্বরক্রম—প ঞ গ ম প ধ নি।

ইহার গৃহ ষড়্‌জস্বর। শরৎঋতু ও শেষ রাত্রি ইহার গানসময়।

রাগমাল্যমতে ইহার স্বরূপ যথা—পাটলবর্ণ পুরুষ, পরিচ্ছদ নীলবর্ণ, হস্তে যষ্টি, যৌবনমদমত্ত, স্ত্রীদিগের সহিত হস্তকৌতুকে নিরত, গলদেশে শক্রমস্তকের মালা, অথবা বৃহৎ মুক্তামালা। ইহার রাগিণী পাটলী—টোড়ী, গোবী, শুণকরী, খস্তাবতী, কুকুভা। পুত্র ৮টা যথা—মারু, মেগাড, বড়হংস, প্রবল, চক্রক, নন্দ, ভ্রমর, যুগ্মর। ভরতমতেও ইহার পাঁচ রাগিণী ও ৮ পুত্র। যথা গোবী, দয়াবতী, দেবদালী, খস্তাবতী, কোকভা। পুত্র—গাকার, শুক, মকর, ব্রহ্মন, মহান, শক্রবল্লভ, মালাগোর, কামোদ। এই অষ্ট পুত্রের ভাৰ্য্যা যথা—ধানশ্রী, মালশ্রী, জয়শ্রী, সুধোদারী, দুর্গা, গাকারী, ভীমপলাশী ও কামোদী।

মালখানা (পারসী) বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখিবার ঘর, যেখানে মাল পত্র রাখা যায়।

মালখেড়, রাষ্ট্রকূটরাজগণের রাজধানী, প্রাচীন নাম মালখেট।

মালগুজার (পারসী) যে মাল গুজারী করে, যে জমির কর দেয়।

মালগুজারদার (পারসী) যে মাল গুজারী করে, যিনি জমীদারকে জমির খাজনা দেন।

মালগুজারি (পারসী) ভূমিকর, খাজনা।

মালচক্রক (ক্কা) মালা সমূহঃ অষ্টমাত্ৰাত্তি। অর্শ আদিদ্বাদশ, সচক্রগিবতি কন্। সন্ধি ও উরুপক্ষসন্ধি, চলিত মালাই চাকি। (শব্দচং)

মালজামিন (পারসী) জমী অথবা নগদ টাকা জামিন রাখা।

মালঞ্চ (দেশজ) ফুলবাগান, পুষ্পোদ্যান।

মালিকা, নদীবিশেষ, কপোতাক্ষ নদ যে স্থলে সমুদ্রে পড়িয়াছে, সেই মোহানার নিকটবর্তী প্রবাহকে মালিকা কহে। বিদ্যাধরী নদীর সহিত মালিকার সংযোগ আছে। মালিকা রায়-মঙ্গল মোহানার দুই ফোশ পূর্বে অবস্থিত। বড় পাকাস এবং মালিকার মধ্যবর্তী পাটনী-দ্বীপের নিকটে ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে ফালমাউথ (Falmouth) জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছিল।

২ উক্ত নদীতীরবর্তী একটা গণ্ডগ্রাম। এখানে প্রতি-বৎসর মহাসমারোহে ত্রীকৃষ্ণের রাসোৎসব সম্পন্ন হয়।

মালতট, ত্রিচিনপল্লীর অন্তর্গত নদীভেদ।

মালতিকা। (দ্রী) স্বন্দারুচর-মাতৃভেদ।

মালতী (দ্রী) মলতে শোভাঃ ধারয়তীতি মল (ভৃশ-ষজীত্যাदि। উণ্ ৩।১০) ইত্যত্র বাহুলকাৎ মলতেরলচ্-গৌরাদিনিপাতনানুপধায়। দীর্ঘঃ। ইতি উজ্জলদন্তোক্তে: অতচ্, উপধায়। দীর্ঘঃ ভীষ্ চ বা মাং লক্ষ্মীং লাভীতি মালো বিষ্ণু: তং অততাতি অচ্। স্বনামখ্যাত পুষ্পলতা। (Jasminum Grandiflorum Syn. Echites caryophyllata) মালতী-লতা, পর্যায়—সুমনা, জাতি, সুমঙ্গল, জাতী। (ভরত) হিন্দি—চামেলি, জাতী, দেশজ—জাতি। পঞ্জাব—চাষা, চাষেলী, জাতি, বেষে—চাষেলী। গুজরাতি—চাষেলী, তেলাও, জাত।

এই লতা হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমাংশ ২০০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয় এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র পুষ্পোদ্যানে ইহা সযত্নে রক্ষিত হয়।

অতি প্রাচীন কালেও জাতি পুষ্প হইতে গন্ধতৈল ও পুষ্পসারাদি প্রস্তুত হইত। প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটক মুচ্চ-কটিকে ঐশ্ব্যশালিনী সভ্যতাবিলাসিনী উজ্জয়িনীর অধিবাসী স্বার্থবাহ দ্বিজ চারুদত্তের প্রাবরক জাতিকুসুমজাত পুষ্পসারে সুরভীকৃত হইয়াছিল, তাহা উপলক্ষিত হয়। জাতিকুসুম-মিশ্রিত তৈলে মস্তিষ্ক অত্যন্ত মৃগ থাকে, এজন্ত বিলাসী ভারতবাসিগণ আদরের সহিত ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। যুরোপেও জাতিফুলের আদর অত্যন্ত অধিক। স্পেন দেশে বহু পরিমাণে ইহার চাষ হয়।

এক বিঘা ভূমিতে ৮০ হইতে ১০০ মণ ফুল জন্মে এবং ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

পুষ্পসার, গ্রহণ করিতে হইলে আধফুট কুড়িগুলিকে বসার (চর্কি) উপরে রাখিয়া ২১০ দিন অন্তর পুনঃ পুনঃ ফুল ছড়াইতে হয়। এইরূপে ক্রমে এই চর্কি পুষ্পের সুগন্ধ শোষিয়া লয় এবং মুহু উত্তাপে গলিয়া যায়। তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে একখানি কাপাসানিশ্চিত বস্ত্র জলপাইতৈলে সিক্ত

করিয়া বিস্তৃত করিতে হয়। তদুপরি নবোদ্ভিন্ন পুষ্প সকল বিক্ষিপ্ত করিতে হয়। পরে দেড়পোয়া বিস্তৃত সুরাগারে এক সের পুষ্পতৈল মিশ্রিত করিতে হয় এবং গ্রীষ্মকালের স্রোজে ১৫ দিন শুক করিলেই তৈল প্রস্তুত হয়। উপরের অংশ তৈলরূপে ব্যবহৃত হয় এবং পাত্রের তলদেশে যে ঘন তলানি পড়ে তাহা ‘পমেটম’ বা কেশতৈলরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্নগ্ধ্য যুরোপবাসিগণের পক্ষে জাতিকুসুমবাসিত প্রাবরক সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

মালতীফুল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু এবং মুসলমান লেখকগণ মুক্তকণ্ঠে ভৈষজ্যতত্ত্বে তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শরীরের কোন স্থানে ঐ তৈলের প্রলেপ দিলে সে স্থান অতি শীতল হয়। চর্মরোগ এবং ক্ষতাদিতে ইহার পাতার রস প্রদত্ত হইয়া থাকে।

পায়ের আঙ্গুলে কড়া পড়িলে ইহার রসে উপশমিত হয়। ইহার রস দস্তশুলের মহৌষধ। ইহার পুষ্পসারে হৃদিকিংক্ৰ-শিরঃপীড়ার উপশম হইয়া থাকে। মুখের মধ্যে কোন প্রকার ক্ষত হইলে ইহার পত্র ঘূতে ভাজিয়া চক্ষণ করিলে আরোগ্য হয়। শীতকালে মুখে তৈল মাখিলে কখন মুখ ফাটে না। বৈদ্যক মতে ইহা কফ, পিত্ত, মুখরোগ, ক্রণ, ক্রিমি, ও কুষ্ঠনাশক।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে,—গৌরী, লক্ষ্মী ও স্বধা এই তিন দেবী ধাত্রী, মালতী ও তুলসীস্বরূপে উৎপন্ন হয়। সা অর্থাৎ লক্ষ্মী হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম মালতী হইয়াছে।

“ক্ষিপ্রেভ্যস্তত্র বীজভ্যো বনস্পত্যস্নয়োহিববন্।

ধাত্রী চ মালতী চৈব তুলসী চ নৃপোত্তম ॥

ধাত্র্যুত্তবা স্মৃতা ধাত্রী মা-তবা মালতী স্মৃতা।

গৌরীতবা তু তুলসী রজঃসম্বতমোগুণা ॥”

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ১৪৯ অধ্যায়)

আর একপ্রকার পীতমালতী আছে (Jasminum humile) সংস্কৃত পর্য্যায়—স্বর্ণযুথিকা হেমপুষ্পিকা। হিন্দি—পীত মালতী, দেশজ স্বর্ণজুঁই। হিমালয় প্রদেশে ২০০০ হইতে ৫০০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে কাশ্মীর হইতে নেপাল পর্য্যন্ত সর্বত্র দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থান এবং সিংহলের পুষ্পোদ্যানে এই পুষ্প জন্মিয়া থাকে। হিমালয়-সন্নিহিত কুমায়ুন প্রদেশে ইহার মূল হইতে পীতবর্ণ প্রস্তুত হয়।

অগ্রাশ্র সুগন্ধ ফুলের ঝায় ইহা পুষ্পতৈলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার শিকড়ের রসে দক্ষ প্রভৃতি চর্মরোগ সহজেই নিবারিত হয়। ভগবদ্র প্রভৃতি ক্ষতরোগে ইহার ছালের রসে অনেক উপকার হইতে দেখা যায়।

২ যুবতী। ৩ কাচমালা। ৪ বিশল্যা। ৫ জ্যোৎস্না। ৬ নিশা।  
৭ নদীবিশেষ। (হেম) ৮ পাঠা। (বৈজ্ঞানিক) ৯ ছন্দো-  
ভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর হইবে।  
ইহার ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯ ও ১১ অক্ষর লঘু, তদ্বির গুরু।  
ইহার লক্ষণ—“ভবতি নজাবথ মালতী করৌ”

উদাহরণ;—

“ইহ কলয়া চান্ডকেলি কাননে মধুরসসোরভসারলোলুপঃ।

কুসুমকৃতস্তিতচাকরবিদ্রমা-

মলিরপি চুখতি মালতীঃ মুহঃ॥” (ছন্দোমঃ)

মালতীক্ষারক (পুং) মালতীতীরজ, টঙ্কণ, গোহাগা। (সুশ্রুত)

মালতীজাত (পুং) মালত্যাঃ মালতীনদীতীরে জাতঃ।

টঙ্কণকার। (রসেন্দ্রসারসং)

মালতীতীরজ (পুং) মালতী তথাখ্যা নদী, তত্ৰাতীরে  
জায়তে ইতি জন-ড। টঙ্কণ, মালতী নদীর তীরজাত  
সোহাগা। (হেম)

মালতীতীরসম্ভব (ক্লী) মালত্যাঃ তীরে সম্ভবোহস্ত।  
শ্বেতটঙ্কণ। (রাজনিঃ)

মালতীপত্রিকা (ক্লী) মালত্যাঃ পত্রাব, মালতীপত্র-প্রতি-  
কৃতৌ কন্, টাপ্ অত ইৎ। জাতীপত্রী, জাতীকোষ,  
চলিত জয়িত্রী। (রাজনিঃ)

মালতীপুষ্প (ক্লী) মালত্যাঃ পুষ্পং। মালতী ফুল, জাতী  
পুষ্প। (বৈদ্যকনিঃ)

মালতীফল (ক্লী) মালত্যাঃ ফলং। জাতীফল, চলিত  
জায়ফল। পর্যায়—

‘জাতীফলং জাতিকোশং মালতীফলমিত্যপি।’ (ভাবপ্রঃ)

মালতীমালা (ক্লী) মালতীনাং মালতী-পুষ্পানাং মালা  
ভতং। মালতীপুষ্পের মালা।

“অনধিগতপরিমলাপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা।” (উষ্ণট)

মালদ (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুঃ)

মালদহ, বঙ্গদেশে লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণরের শাসনাধীনে একটি  
জেলা। রাজসাহী এবং ভাগলপুরের ক্রিয়দংশ লইয়া ১৮৭৬  
খৃষ্টাব্দে এই জেলা গঠিত হইয়াছে। অক্ষা° ২৪° ২৯’ ৫০”  
হইতে ২৫° ৩২’ ৩০” উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৮’ হইতে ৮৮°  
৩৩’ ৩০” পূঃ। গঙ্গানদী ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত।  
ভূ-পরিমাণ ১৮৯১ বর্গমাইল। মহানন্দা নদীর দক্ষিণতীরে ইহার  
প্রধান নগর ইংরেজ-বাজার অবস্থিত।

মহানন্দা নদী এই জেলার উত্তরদক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া  
সমগ্র প্রদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার পশ্চি-  
মাংশ পললময়, মুক্তিকাপূর্ণ নিম্নভূমি এবং অত্যন্ত উর্বর।

গঙ্গার পূর্বাংশে সকল প্রাচীন গোড়নগরের ভয়াবশেষের  
চতুর্দিক্ বেটন করিয়া আছে। যে স্থানে বিধবস্তনগর বিষ্ণু-  
মান ছিল, সে স্থান নিবিড় অরণ্যপূর্ণ। পূর্বাংশে অগ্নিকাকুত  
উচ্চ এবং বরিন্দ (বরেন্দ্র) নামে পরিচিত। এই ভাগ মহা-  
নন্দার পূর্বাংশে অবস্থিত। ইহার মধ্য দিয়া টাঙ্গন এবং  
পুনর্ভবা নদী নানা শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত হইয়াছে। এই  
অংশের মুক্তিকা কঠিন এবং জৈবৎ রক্তবর্ণ। এ প্রদেশের ভূমি  
কাঁটাল নামক স্থানীয় একজাতীয় কণ্টকবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন।  
এখানে আমন ধাত্ত প্রচুর পরিমাণে জন্মে। শীতকালে  
ধান কাটিবার জন্য নানা স্থান হইতে শ্রমজীবীরা এখানে  
আসিয়া থাকে।

মহানন্দা নদীর তীরবর্তী ভূভাগ নানাপ্রকার শস্তসম্পদে  
অলঙ্কৃত। নদীর দুই তীরে পকাও প্রকাও আবগাধান  
এবং তুঁতবৃক্ষশ্রেণী নয়নগোচর হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম  
হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত গঙ্গানদী সীমারেখা বেটন করিয়া আছে।

গঙ্গার স্রোতোধৌত রাজমহল পাহাড়ের মুক্তিকারাদি  
প্রতি বৎসর বর্ষাকালে মালদহ অঞ্চলের ভূমিতে পললময়  
স্তরবৃদ্ধি করিতেছে। গঙ্গার পূর্বাংশের অলপ্রাণী-  
গুলিই প্রাচীন গোড়ের পাদপ্রবাহিনী জাগিরখী। নদীর  
অবস্থানদৃষ্টে স্পষ্টই অস্বীকৃত হয় যে, গোড় অত্যন্ত সুরক্ষিত  
নগর ছিল। মহানন্দার প্রধান শাখা কালিন্দী হাওয়াপুর  
নামক বাণিজ্যপ্রধান স্থানের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত  
হইয়াছে। বর্ষাকালে টাঙ্গন এবং পুনর্ভবানদী দিয়া দিনাজ-  
পুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানা বাণিজ্য দ্রব্যপূর্ণ নৌকা সকল  
মালদহে আসিয়া থাকে।

গোড় এবং গোপ্তবন্ধন এই দুই প্রাচীন রাজধানীর  
ভয়াবশেষের উপরেই মালদহ অবস্থিত। গঙ্গা নদীর তীরদেশে  
উক্ত দুই রাজধানীর ধ্বংসচিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।  
বহুশত বৎসর পর্য্যন্ত গোড় ও গোপ্তবন্ধন হিন্দু ও মুসলমান-  
দিগের রাজধানী ছিল। মহানন্দা এবং গঙ্গার মধ্যবর্তী  
ভূভাগে প্রায় ২০ বর্গ মাইল দৃষ্ট হয়। [গোড় ও গোপ্ত দেখ]

মুসলমান-শাসনের বহুকাল পূর্ব হইতে গোড় বাঙ্গালার  
রাজধানী ছিল। অকবর ১৭৭৫ খৃঃ অঃ পাঠানদিগকে পরাজয়  
করেন। সেই বৎসর মহামারী উপস্থিত হইয়া গোড়নগর  
জনশূন্য হয়। তদবধি বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্তাগণ  
রাজনহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পাণ্ডুয়া বা পেডো  
গোড়ের ২০ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। আকবান রাজর্গণ  
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে পাণ্ডুয়া রাজধানী স্থাপন করেন।  
ইহার ভয়াবশেষ হুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন বলিয়া এখনও

অনেকাংশ অবিকৃতভাবে বিস্তারিত আছে। পাণ্ডুর আদিনা মসজিদ, ভারতে পাঠানস্থাপত্য-শিল্পের চরমোৎকর্ষ। পাঠানদিগের নির্মিত অট্টালিকাদিতে ব্যবহৃত মর্ম্মর প্রস্তরগুলি হিন্দুদিগের ভগ্নমন্দির হইতে গৃহীত। কিন্তু গোড়ের ধ্বংস-রাশির মধ্যে ইটকের আধিক্য দৃষ্ট হয়। মালদহ জেলার পশ্চিমাংশে তাঁড়া নগরীর ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার পূর্ব অবস্থান গঙ্গার গতিপরিবর্তনে নষ্ট হইয়াছে। গোড়নগর শূন্য হইলে তাঁড়ার একশত বংসর বাঙ্গালার রাজধানী ছিল।

১৬৮৬ খৃঃ অঃ হইতে মালদহের সহিত ইটহাতিয়া কোম্পানীর (প্রাচ্য বণিকসমিতির) সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। ঐ সময়ে ইংরাজেরা এই স্থানে রেশমের কুঠী নির্মাণ করেন। ১৭৭০ খৃঃ অঃ মালদহেব ইংরাজবাজার প্রধান বাণিজ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। তদানীন্তন প্রণালীতে নির্মিত ইংরাজদিগের কুঠী অত্ৰাপি বিস্তারিত আছে। ১৮১৩ খৃঃ অঃ হইতে বর্তমান মালদহ জেলার সৃষ্টি হইয়াছে। ১৮৩২ খৃঃ অঃ এখানে রাজকোষ স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ খৃঃ অঃ হইতে এই স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর নিযুক্ত হন।

মালদহের জাতিতত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে ইহাকে বাঙ্গালাদেশের সানান্ত জেলা বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। এখানে বাঙ্গালা ও বিহারের অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ এবং হিমালয় ও ছোট নাগপুরের পার্বত্য জাতি সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। এখানে অনেক পার্বত্য জাতি হিন্দুত্বাপন্ন হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া এবং সুন্নি নামক দুইটা বিভাগ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত করানী-সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক মুসলমান আছে। ১৮৬৯ খৃঃ অঃ ওহাবী-বিদ্রোহের সময় মালদহের করাজীরা উৎপীড়িত হইয়াছিল।

মহানন্দার পশ্চিমতীরে কৃষকদিগের অবস্থা অত্যন্ত উন্নত। ভূতপোকার ব্যবসারে এখানকার অধিবাসীরা বিস্তর লাভ করিয়া থাকে। আত্ম এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। শস্তের মধ্যে আমন ধাতাই প্রধান, তদ্ব্যতীত আউস, ভাটাই, বোরো ধানেরও চাষ হইয়া থাকে। রবিশস্তের চাষ অসামান্য পরিমাণে সঞ্চারিত দৃষ্ট হয়। পূর্বে এ স্থানে প্রচুর পরিমাণে নীল জন্মিত।

গত বিশ বংসরের মধ্যে খাচ্চ দ্রব্য এবং শ্রমজীবীর মূল্য বিস্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। অনেক সময়ে অনাবৃষ্টি এবং জলপ্রাধানজনিত উপদ্রবে কৃষকগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। হিমালয় পর্বতে বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে, গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া ভারবর্তী শতক্ষেত্র সকল ডুবিয়া যায়। এই জন্ত

১৮৭৩ খৃঃ অঃ এখানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সুব্যবস্থার অধিবাসিগণের বিশেষ কষ্ট হয় নাই।

রেশম এবং নীল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু বর্তমানকালে নীলের ব্যবসায় একেবারে বিলুপ্ত। প্রাচীন গোড়রাজ্য হইতে এ স্থান রেশম-বরমের জন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বুকানন হ্যামিণ্টন সাহেব গত শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানকার রেশমী বস্ত্র-রঞ্জিত-করণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববাবসায়ের এক্ষণে বথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। কারণ বিলাতের প্রতিযোগিতার দেশীয় তত্ত্বাবগণ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। তবে ভূতের চাষ এবং রেশম-কোটের পরিপালন সম্বন্ধে এক্ষণে শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কুড়িটা রেশমের কুঠী আজিও নিয়মিতভাবে চলিতেছে। অত্ৰাত্ত রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে পিত্তলনির্মিত দ্রব্যাদি, আন ও ততুলই প্রধান। আমদানীর মধ্যে, সূতা, বস্ত্র, লবণ, চিনি, মসলা, নারিকেল ও সুপারীই প্রধান। গবর্ণমেন্ট-সাহায্যকৃত পাঠশালাদির প্রচলনে এখানে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার বাড়িয়াছে।

মালদহের জলবায়ু অত্ৰাত্ত নিকটবর্তী স্থান অপেক্ষা ততঃ অস্বাস্থ্যকর নহে। বংসরে প্রায় ৫৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং বসন্ত পীড়াই অধিক অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। বর্ষার অবসানে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাচুর্য্য হয়।

বাণিজ্য ও শিল্পপ্রভাবে মালদহ জেলার উন্নতি হইয়াছিল। এখন বাণিজ্য নিত্যন্ত স্রিয়মাণ। শিল্প মৃত হইয়াছে। পূর্বের ত্যায় এখন আর সুন্দর সুন্দর রেশমী বস্ত্র আর এখানে প্রস্তুত হয় না। যে গোড়ীয় কাগজ দিল্লীর রাজসরকার পথান্ত সমাদর করিতেন, এখন আর সে কাগজ দেখা যায় না।

সংস্কৃত শিক্ষাবিসয়ে মালদহ জেলা নিত্যন্ত পশ্চাৎপদ। পূর্বে ভাতিয়া পরগণার অনেক স্থান সংস্কৃতালোচনার জন্ত বিখ্যাত ছিল, এখন জেলায় একজনও খ্যাতনামা পণ্ডিত নাই। একটাও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী নাই।

মালদহ জেলার নানা জাতির বাস। এ জেলায় উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা অল্প। যে সকল অনার্য্যজাতি হিন্দু-ধর্মাবলম্বী হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাই বেশী। ব্রাহ্মণদের মধ্যে মৈথিলীব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অল্প। এদেশে বজীর বৈষ্ণব নাই, অন্নমাত্র রাঢ়ীয় বৈষ্ণব আছে। কারহদিগের মধ্যে অধিকাংশই উত্তররাঢ়ীয়। মফঃস্বলে স্থান-বিশেষে দুই এক বর রাজপুত্রের বাস। বাঙ্গালীর সঙ্গে বৈবরিক সম্পর্ক দ্ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন সম্পর্ক রাখেন

না। কয়েক ঘর বাতন জমিদার আছেন। পালিতাবার ব্রাহ্মণকে বাতন বলিত। যে সকল ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাহাদের বাতন নাম হয়। পুনরায় হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিলেও বাতন নাম বদলায় নাই। একবার কোন ব্যক্তি ইহাদিগকে বুদ্ধাভিষিক্ত নামক প্রথম অহুসোম বর্ণ-সঙ্করের মধ্যে ফেলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল তিলী উত্তরাঞ্চলে বাস করে, তাহাদের অবস্থা ভাল। এ জেলার তিলী জাতি আপনাদিগকে বায়েস্ত্র তিলী বলিয়া থাকে। মালী, মোদক ও বারুই জাতি অতি অল্প পরিমাণে বাস করে। তাহাদের কোন বিষয়ে উন্নতি নাই। তাঁতিও অল্প। তাহাদের মধ্যে আবার নানা শ্রেণী আছে। কাপা-নিয়া তাঁতিরা আপনাদিগকে অস্ত্র তাঁতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে। কাপানিয়া তাঁতিরা এখন আর কাপড় বুনে না। আখিনা তাঁতি এ জেলার দক্ষিণাঞ্চলে বাস করে। মোটের উপর নবশাখ ক্রমশঃ কমিয়া বাইতেছে। এখান-কার গন্ধবণিকেরা আপনাদিগকে নবশাখ হইতে উচ্চ জ্ঞান করেন। শাঁথারি অতি অল্প, কাঁসারিও বেশী নাই। কাঁসারি-দের ব্যবসায়ের অধোগতি হওয়াতে তাহাদের সংখ্যা কমি-তেছে। নিদারুণ দারিদ্র্য যে, লোকস্বরের কারণ, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা বাইতেছে।

এ জেলার সঙ্গোপ বেশী নাই। গোয়ালী অনেক আছে, বাঙ্গালী গোয়ালী কম। পশ্চিমা গোয়ালী অধিক। উৎসবো-পক্ষে মজ্ঞ পান ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পশ্চিমা গোয়ালারা বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া পথে পথে গান করিয়া বেড়ায়, তখন দেখিতে মন্দ লাগে না। ইহাদের মধ্যে কানাইয়া গোয়ালাদের বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ উহাদের জাতীয় লোক ছিলেন। নাপিত সচরাচর চারি প্রকার দেখা যায়,—ফুল নাপিত, রাঢ়ী, বায়েস্ত্র ও বাতন-জুগা। বায়েস্ত্র নাপিত ২৮৬ ঘর আছে। ফুলনাপিত ক্ষৌরকার্য করে না, অস্ত্র শ্রেণীর নাপিতেরা তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। নাপিতদের পুরোহিতেরা ভাল ব্রাহ্মণ। নাপিতদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে হুকা চলে, পাকফলারও স্থানবিশেষে চলিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহ হয় না। দোসাদ খুব বেশী নাই। তীওর আছে। এই সকল জাতি সাধারণতঃ মত্তপারী, ইহাদের বদনামও আছে। বীণ জাতি এ জেলার পশ্চিমদিকে বাস করে। মনুসংহিতাতে যে বেণজাতির নাম আছে, বীণ কি সেই জাতি? এখানকার বীণেরা সাধারণতঃ কুবিবাবসারী। ইহারা উগ্রপ্রকৃতিক। চৌধাপরাধে অনেকে দণ্ড পাইয়াছে। ধোপা নানা শ্রেণীর আছে। ধোপা কমিয়া বাইতেছে। এমন কোন

হিন্দুজাতি এ জেলার দেখিতে পাওয়া যায় না, বাঁহীদের লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। চামারদের অবিকার্ম পশ্চিমা-ঞ্চল হইতে আসিয়াছে। ডোর অধিক নাই। বাঁশের মালী-রূপ দ্রব্য প্রস্তুত করা ও শূকর চর্যাণ ইহাদের প্রধান ব্যবসা। সহরের কুকুর সিপাত করাও ইহাদের একটি কার্য। এই জেলার উত্তরপশ্চিমাংশে বিস্তর বাউরি বাস করে। তাহার। আপনাদের আচারব্যবহার ক্রমশঃ ভাল করিতে চেষ্টা করি-তেছে। মাছুয়া নামক জাতি উত্তরপশ্চিমাংশে বাস করে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও কনাকার, দেখিলে ইহাদিগকে কোন আদিম বনজাতির বংশধর বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। এখানে কৈবর্ত নানাবিধ, চাষীকৈবর্ত, জেলে কৈবর্ত ও আদি কৈবর্ত। চাষী কৈবর্ত ও আদি কৈবর্তের আচার ব্যবহারে কোন পার্থক্য নাই, তবে চাষীকৈবর্তেরা আপনাদের পুরোহিতের অন্নভোজন করে না, আদি কৈবর্তেরা তাহা করে। এখন চাষী-কৈবর্ত-গণ, আদি কৈবর্তগণ হইতে পৃথক হইতেছে, পূর্বে কিন্তু আপনাদিগকে তত দূর পৃথক ভাবিত না। আদি কৈবর্ত-গণের পূর্বপুরুষদের অনেকে গোড় রাজসরকারে বড় বড় কার্য্য করিত, এরূপ অনুমান হয়। ভীষর কৈবর্তগণ ও জেলে কৈবর্তগণ, পরস্পর সদৃশ। বোধ হয়, ইহাদিগকে দেখিয়াই ব্রহ্মদৈববর্তের “কলৌ ভীষরসংসর্গাং ধীষরঃ পতিতোবুধি” এই বচন রচিত হইয়াছে।

চামোং বা চামা নামক একটি বড় জাতি এ জেলার কালিয়াচক থানার দিকে বাস করে। ইহারা কৃষিকারী ও অনেকে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। গত সেন্সাসে ইহারা আপনাদের নাম বদলাইয়া হলধর করিয়া লইয়াছে। তাহাদের ধারণা যে বলরাম তাহাদের জাতীয় লোক ছিলেন।

কাণ্ডার নামক একটি অপ্রাচীন জাতি ভোলাহাট অঞ্চলে বাস করে। গত সেন্সাসে অনেক হুইপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ-কার্য্যাদি, ইতর জাতির মনোরঞ্জন্য, তাহাদিগকে উচ্চজাতি হইতে উত্তেজিত করিয়াছে। কাণ্ডারেরা আপনাদিগকে করণজাতির মধ্যে গ্রহণ করিতে আবেদন করিয়াছিল। আচার ব্যবহার বদলাইতে পারিলে পরিণামে কি হইবে বলিতে পারি না, কিন্তু এখন ইহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

পুণ্ড্র জাতি প্রসিদ্ধ জাতি। এই জাতির আদি বাসস্থান পুণ্ড্রদেশ। পূর্বে উত্তর বঙ্গকে পুণ্ড্র বলিত। পুণ্ড্রবর্ধন এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। পুণ্ড্রবর্ধন নামক কোন নগরের তদ্রূপশেষ নাই। পুণ্ড্রনগরের আছে, বর্ধননগরেরও আছে। পুণ্ড্রনগর গঙ্গার তীরবর্তী ও বর্ধননগর করতোয়া-তীরবর্তী ছিল। পুণ্ড্রনগর এখন পাণ্ডুরা ও বর্ধননগর বর্ধন-



কোন্ট নামে পরিচিত। কোন্ট সময়ে এই উত্তর নগরের কোন্টীর নাম পুণ্ড্রবর্ডন হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ সম্ভবতঃ এই উত্তর নগরের কানই পুণ্ড্রবর্ডন হইয়াছিল। অল্পকাল হইতে আধুনিকতম পুণ্ড্র, বহু, ও জুজ-দেশে বিস্তৃত হয়। পুরাতন আছে, একজন কতিব-মালিকের পুণ্ড্রাধ্যক্ষ স্থাপন করে, ইহাও এমন অর্থ নয় যে, পুণ্ড্রদেশ তাহার আগমনের পূর্বে লোকপুত্র ছিল এবং তিনি প্রমাণে অনিচ্ছা নুতন রাজ্যস্থাপন করেন। যে সকল লোক পূর্বে হইতে এতদঞ্চলে বাস করিত, তিনি আদিরা তাহাদের রাজা হন। তখন তাহাদের কি নাম, কোন্ট নাম ছিল, জানা যায় না। রাজকুমারের নান্দ্রাধারের দেশের নাম হইলেও, দেশের লোকের নামও পুণ্ড্র হইয়াছে। আকৃতিবর্ধনে ইহা-বিধকে আধুনিকতা বন্ধিয়া বনে করিতে পায় যায় না। যেমন রাওকাল জাতি, মধ্যভারত হইতে, পশ্চিম-বঙ্গদ্বারা দিয়া উত্তর-বাঙ্গালার আগল হইতেছে, এই জাতিও পূর্বকালে সেইরূপ করিয়াছিল। পরে ইহারা হিন্দু হয়। উত্তরপূর্ববিক হইতে কোচ নামক জাতির আক্রমণে ইহারা কিন্তু দক্ষিণবিক সরিয়া আসিয়াছে। মুসলমানরাজ্য-কালে এই জাতির বিস্তার লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। মহানন্দা-কালিকানন্দনের উত্তরদিকে এই জাতির বাস। এই জাতি মহানন্দার পশ্চিম পারে কখনও বাস করে নাই। এখন পুণ্ড্রবর্ডন-নগরের অনেক দক্ষিণে মহানন্দাজীৱস্থ ভোলাহাট, কালিন্দপুর, মুচিয়া প্রভৃতি স্থানে ও কালিকাতীরবর্তী জোত, আরাপুর, কোতোয়ালি, গণিপুর প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের বাস। ইহাদের মধ্যে ছোটপুঁড়া ও বড়পুঁড়া নামে দুইটা বিভাগ আছে। ভোলাহাট অঞ্চলের পুঁড়াগণ বড়পুঁড়া ও কোত-ওয়ালি অঞ্চলের পুঁড়াগণ ছোটপুঁড়া নামে পরিচিত। রেশম ব্যবসার ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। বোধ হয়, কোতোয়ালি অঞ্চলের সার রেশম ব্যবসায়ের ও রেশমোৎপাদনের স্থান বঙ্গদেশে আর নাই। দক্ষিণবঙ্গের পৌদ ও উত্তরবঙ্গের পুঁড়া এক জাতি কি না সন্দেহ।

মালদহ জেলার চন্দলাই পরগণাকে কেহ কেহ চণ্ডাল-জাতির একটি বাসস্থান মনে করেন। এখন সে পরগণার চণ্ডালের বাস দেখা যায় না। হয় ত এ অঞ্চলের সেই প্রাচীন অধিবাসিগণ মুসলমান হইয়া গিয়াছে।

এবেলার বাণিজ্যব্যবসায়ী নানা বণিকজাতির বাস। তাহাদের মধ্যে গৌড়বণিক ও বঙ্গবণিকজাতি প্রধান। এ দেশীয় লোকে উহাদিগকে গৌড়দেশী ও বঙ্গদেশী বলিয়া থাকে। গৌড়দেশীরাই প্রধান। আর, বোধ হয়

দুই লক্ষ বরের বেশী হইবে না। তাহাদের অধিকাংশ পুরা-জন্ম মালদহে বাস করে। গৌড়বণিকেরা আপনাদিগকে আগরওয়ালা বেশিয়া বকিতেছে। তাহারা যে সকল প্রধান লোকেরা থাকে, তাহা মিতাক্ত অধিকার নয়। পূর্বে মালদহে বাণিজ্যের প্রচুর শ্রীলক্ষি হইয়াছিল। মাঝবহু লোকগণ বাতীক বহু লোকেরই সাহা উপাধি ছিল। গৌড়বণিক ও বঙ্গবণিকের অধিকাংশের সাহা উপাধি রহিয়াছে। এই উপাধিদ্বয়ে কেহ কেহ ইহাদিগকে নিরস্ত্রশীল মনে করেন। এখানকার নবনাথেরা হাস উপাধি ধারণ করে। সাতাশ আটাল বৎসর পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক কলিকাতার তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার সময় আগনাদের মধ্যে শেঠ, বলাক প্রভৃতি উপাধি চালার। গৌড়বণিক ও বঙ্গবণিকদিগের মধ্যেও হাস উপাধি প্রচলিত। ইহাদের বাঙ্গালীর ভাব অপেক্ষা পশ্চিমের ভাব বেশী। বিবাহাদি কাণ্ডে পশ্চিমা-ঞ্চলের ব্যবহার অধিক দৃষ্ট হয়। ইহাদের দায়কর্ম দায়-তাপের ব্যবস্থাসম্বন্ধে সম্পন্ন হইয়া থাকে, মিতাক্তার মতামতের হয় না। বাঙ্গালী গোঁসাইগণ ইহাদের গুরু। ইহাদের অধিকাংশই চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব।

নাগর, ধামুক ও চাই নামক তিনটা জাতি এ জেলার পশ্চিমাঞ্চলে গঙ্গাদিয়াড়ার বাস করে। এহ তিন জাতিই এক মূল হইতে উৎপন্ন। এহ তিন জাতি, কৃষিকর্মের বলে আপনাদের অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের জল মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের গুরু পুরোহিত মৈথিলী ও কনোজিয়া ব্রাহ্মণ। ইহারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের অন্নভোজন করিতে চায় না। ছোট নাগপুর এই জাতির আদিম বাসস্থান। অনেক বুনো জাতি ইহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।

কোচ ও পলিয়া নামক দুইটা জাতি যে কত দিন হইতে এ জেলায় বাস করিতেছে, তাহা জানা যায় নাই। ইহারা এ জেলার উত্তরপূর্বাংশের প্রধান অধিবাসী। এই জাতির অনেক লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কোচদের একটি উপাধি কত, যে সকল কোচ ও পলিয়া মুসলমান হয়, তাহাদের উপাধি নত। ইহাদের প্রার দাড়ি গোঁপ উঠে না। কোচ-দের বর্ণ কাল নয়, কিন্তু পলিয়ারদের বর্ণ একটু কাল। ইহাদের জীজাতি অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে। জীজাতি অরক্ষণা, কৃষিকর্ম ইহাদের প্রধান ব্যবসার। ইহারা পূর্বে হিন্দু ছিল না। মালদহ-জেলার বৈষ্ণবধর্মপ্রচারের পর হইতে ইহারা হিন্দু হইতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। নিত্যানন্দের পুত্র বীজকত মালদহে আসিয়া অনেক লোককে বৈষ্ণব করেন। দীর্ঘ-



ভয়ের ভিন পুত্রের একজন মালদহের নিকটবর্তী গণেশপুরে আসিয়া বাস করেন। এই নিত্যানন্দকর্তার গোবামীরের দ্বারা এ জেলার বৈষ্ণবধর্ম বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্মপ্রচারের পূর্বে পুরাতন মালদহের অধিকাংশ লোক শাক্ত ছিল। এ জেলার এত কালীদেবী আছেন যে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। কিংবদন্তী, মালদহ অঞ্চলের অধিকাংশ হিন্দু শাক্ত ছিল। গোবামিগণ উক্ত জাতির মধ্যে আপনাদ্বারা ধর্মপ্রচার করিতেম এবং আপনাদ্বারা শিবদ্বারা নিরক্ষাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার করাইতেন। শিবেরা অবশ্য শুক্ল নামেই ধর্ম প্রচার করিত। এইরূপে কোচ পলিয়ারদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার হইয়াছে। যে সকল পলিয়া এখনও পুরাতন আচার ব্যবহার এককালে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে বাবু পলিয়া বলে। শুভাচারী পলিয়ারা সাধু পলিয়া নামে খ্যাত। গজার প্রতি কোচ-পলিয়ারদের প্রগাঢ় তক্তি। অমেক দূর হইতে ইহারা গজদান করিতে আইসে। কোন দূর ভাগ্যবান কোচ পলিয়ার মৃত্যু হইলে আত্মীয়গণ সংকীর্তন করিতে করিতে তাহাকে গজায় লইয়া যায়।

২ উক্ত জেলার একটা পুরাতন বিখ্যাত মগর। মহানন্দা ও কালিন্দীর সম্মিলন-স্থানে মহানন্দার পূর্বকূলে অবস্থিত। এই সহর পৌড় নগর হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখান হইতে জলপথে দেবীকোট ও অপরাপর স্থানে যাওয়া যায়।

মালদহনগরের নামানুসারে মালদহ জেলার নামকরণ হইয়াছে। এখন সদর টেসম ইংরাজবাজার নগরকে মালদহ বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত মালদহনগর ইহার তিন ক্রোশ উত্তরে মহানন্দার পূর্বতীরে অবস্থিত। এখন প্রকৃত মালদহকে পুরাতন মালদহ বলা হয়। পুরাতন মালদহের অন্তর্গত একটা স্থানের নাম মালদহ। সেখানে কয়টা কবর আছে। সেই কুজ হাঙ্গের নাম মালদহ কেন, কেহ তাহার সন্তোষ-জনক কারণ দেখাইতে পারেন না। লোকে বলে, এখানে মালদ পীরের কবর আছে। পীরের কোন নামানুসারে মালদহ নাম হইয়াছে কি না, জানি না। মাল জাতি হইতে মালদহ নাম হইয়াছে, এরূপও অনেক অনুমান করেন। বালিক্যের জন্ম এই নগরের বধেই উন্নতি হইয়াছিল। কোন সময়ে মালদহনগর স্থাপিত হয়, তাহা জানা যায় না। সর্বাট ক্রিস্টিয়ান জেনারেল, এই নগরের যে অংশে শিবির স্থাপন করিয়া পাণ্ডুরা আক্রমণের উদ্ভোগ করিতেছিলেন, তাহার নাম পিয়োসপুর। কেহ কেহ বলেন, পাণ্ডুরা খাণ্ডগ্রব্য

নগরদ্বারা জন্ম দে মক্কর স্থাপিত হয়, তাহাই মালদহ; অথবা যে কতক সন্তা, তাহা বলা যায় না। পীরগঞ্জ পাণ্ডুরা নিকটবর্তী, উহা মহানন্দা নদীর তীরবর্তী। পীরগঞ্জের নিকটে নগর একটা শাখাজাত মালদহ নামে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এইস্থান হইতে পাণ্ডুরা প্রমোদনীর দ্বারা নগরবাস হইত। পৌড় বিখ্যাত হইলে, সেখানকার অনেক লোক মালদহে আসিয়া বাস করে। এই নগর প্রথমতঃ মুসলমানপ্রধান নগর ছিল; কি জন্ম মুসলমান কমিয়া গেল, হিন্দু বাড়িয়া উঠিল, তাহা বলা যায় না। এখনও অনেক বাড়ীর মধ্যে কবর বাহির হয়। পুরাতন মালদহের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। লোক কমিয়া যাইতেছে। শাসিক্যের ঐশ্বর্য্য নাই। এখনও এখানে মিউনিসিপালিটি আছে বটে, কিন্তু তাহা বেশী দিন থাকিবে না। মালদহনগরের কিছু উত্তরে বালিয়া নবাবগঞ্জ। উহা যে প্রান্ত নদীর চড়ার উপর স্থাপিত হইয়াছিল, সে নদীর সাধারণ চিহ্নবাত্ত বৃষ্ট হয়।

এই নদীর উত্তরতীর হইতে পাণ্ডুরা উপনগর আরম্ভ। এখন মূল পাণ্ডুরা নগরই অরণ্যাজ্বর, উপনগরগুলির একটাও নাই। তবে বহুলোকের যে বাস ছিল, তাহা বহুলোক পুষ্করিণী ও ইত্যন্ততঃ ইষ্টকরাশি দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। পাণ্ডুরা খুব বড় একটা সহর ছিল। ইহা প্রথমতঃ অংশবশে বিভক্ত, এক অংশের নাম মক্কর সহর, অপরাংশের নাম কুতুব সহর। কুতুব সহরই বড় ছিল। এখানে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে অনেক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে দেবনাগরাকরচিহ্নিত মুদ্রা পাওয়া যায়। সাঁওতালেরা বখন প্রথমতঃ এখানকার জল পরিষ্কার করিতেছিল, তখন এইরূপ মুদ্রা অনেক পাওয়া যায়। পাণ্ডুরা নিকট রাটহোরাগাঁও নামে একটা দেবীস্থান আছে, তিনি এখন হিন্দুদেবী। এদেশীর সীমন্তিনীগণ কর্তৃক সৌভাগ্যদায়িনীরূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

পূর্বে এই নগর নানা শৌখমালায় বিভূষিত ছিল। একগে তাহা ভয়তরূপে পরিণত হইয়া অতীতগৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। স্থানীয় লোকে ঐ সমস্ত ভগ্ন অট্টালিকা হইতে ইষ্টকাদি আনিয়া নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়া থাকে। পুরাতন মসজিদের মধ্যে জুমা মসজিদ অত্যধি বিস্তারিত। ১০০৪ হিজরার অকবর বাদশাহের সময় উন্নীত মসজিদ নির্মিত হয়। জুমা মসজিদ অতি প্রাচীন না হইলেও প্রাচীন উপকরণে নির্মিত। হিন্দু রাজগণ-নির্মিত মন্দিরাদির ধোঁসিও প্রস্তর-সমূহ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জুমা মসজিদের পূর্বভাগে বিচ্ছিন্ন ভাবে ইষ্টকালয় মধ্যে

কয়েকখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বা-  
পেক্ষা প্রাচীনখানি ওয়েষ্টম্যাক্ট সাহেব আবিষ্কার করেন।  
তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হিলাল নামক সুলতান ব্যক্তি  
১৪৫৫ খৃঃ অব্দে (৮৫৯ হিজরার) একটা উজ্জয়ালয় নিৰ্মাণ  
করেন। মালিকদীন মুহম্মদের (১ম) সময় এই মসজিদ  
নিৰ্মিত হয়। ইহার পরবর্তী শিলালিপিখানিও ওয়েষ্ট-  
ম্যাক্ট সাহেব সাক্ষ্যমোহন অথবা শেখমোহন মসজিদে  
আবিষ্কার করেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, শামসুদ্দীন  
মুহম্মদ শাহ রাজত্বকালে উক্ত মসজিদ নিৰ্মিত হয়। শিলালিপির  
অক্ষরগুলি অপরিস্কৃত হওয়ার প্রকৃত বিবরণ নিরূপণ করা  
যায় নাই। তৃতীয় শিলালিপি কাটহার হোসেনি-দালানে  
পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে, সৈফউদ্দীন ফিরোজ-  
শাহ রাজত্বকালে একটা মসজিদ প্রস্তুত হয়। চতুর্থ শিলা-  
লিপি চমিশপাড়ার পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে লিখিত আছে  
যে, ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে (৮৯৯ হিজরার) মল্লিশ-রাহু নিৰ্মিত  
হয়। এই সময় আলাউদ্দীন হোসেন বজের সিংহাসনে  
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চম শিলালিপি কোতি-মসজিদ হইতে  
আনীত। উপরি উক্ত বাদশাহের রাজত্বসময়ে ১৪৯৫ খৃঃ  
অব্দে কোতি নিৰ্মিত হয়। ষষ্ঠ শিলালিপিতে জুমা মসজিদের  
উল্লেখ আছে; আলা উদ্দীন হোসেন স্বয়ং ১৫০৫ খৃঃ অব্দে  
(৯১১ হিজরা) ইহা নিৰ্মাণ করেন। সপ্তম শিলালিপি  
একজন বিধবার সমাধিস্থলে পাওয়া যায়। ইহাতে বর্ণিত  
হইয়াছে যে, নসরৎ শাহের রাজত্বকালে ১৫০১ খৃঃ অব্দে  
(৯০৪ হিজরার) বনমালতী নামী মহিলা একটা কূপ খনন  
করিয়াছিলেন।

মালদেবের সর্বাপেক্ষা মঞ্চ উৎকৃষ্ট প্রাসাদ নিম-শরাই-  
এর মধ্যে মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা দৃষ্টিমঞ্চ  
নামে অভিহিত; এখান হইতে চতুর্দিকে বহুদূর দৃষ্টিগোচর  
হয়। কেহ কেহ বলেন, মিনারে আলোকমঞ্চও ছিল।  
বহুকাল হইল, মিনারের উপরিভাগ তল হইয়াছে; কিন্তু  
মিনারের দুইটা তলা অত্ৰাপি বর্তমান আছে। ইহার উচ্চতা  
৬০ ফিট।

মালদার (আরবী) ধনী, বড়লোক।

মালদেব, বোধপুত্রের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। [মারবার দেখ]  
তিনি রাক্ষসবংশের উজ্জল স্বর্ধাশ্বরূপ। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে রাক্ষ-  
সেরাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা পরাক্রান্ত নর-  
পতি জাহা মারবার-সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। সুপ্রসি-  
দ্ধ সিংহের মৃত্যুতে মারবারে যে বিদ্রোহের নদীর আবির্ভাব হইয়া-  
ছিল, মালদেবের অপ্রতিদ্বন্দ্ব-প্রভাবে রাজস্থানের সৌভাগ্যা-

কাশ আধার প্রভৃতি স্বর্ধোর অকণকিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।  
মুসলমান ঐতিহাসিক কেরিতা তাঁহাকে রাজপুতনার সর্বা-  
পেক্ষা পরাক্রমশালী নরপতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মালদেব লোহিদিগের  
অধিকৃত নগর এবং রাজমোড় পুনরধিকার করিলেন। ১৫৪৩  
খৃঃ অব্দে তিনি দিঙ্গিগণের নিকট হইতে বালোর, শিবানো এবং  
ভদ্রাঙ্গুন অধিকার করিয়া লন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ৪০টা  
প্রদেশ বাহবলে অধিকার করিয়া মারবাররাজ্যকে সমৃদ্ধ  
করিলেন। তাঁহার যত্নে নানাপ্রকার দুর্গ এবং অট্টালিকা  
নিৰ্মিত হইয়া রাজধানী সমলভূত হইয়াছিল। তিনি  
বোধপুত্রের চতুর্দিকে হুর্ডেনা উচ্চ প্রাচীর, আর ৩ লক্ষ  
টাকা ব্যয়ে মৈরতার মালকোট দুর্গ, ভট্টীজাতিকে  
পরাক্রান্ত করিয়া পোকণে সুদৃঢ় দুর্গ এবং ভৌমলোহ পক্ষতে  
ভদ্রাঙ্গুন দুর্গ নিৰ্মাণ করেন। ফলতঃ তাঁহার রাজত্বকালে  
বোধপুর উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। শব্দরত্নদের  
লবণের আয় হইতে ব্যয়বাহ্যল্যসম্বন্ধে তাঁহার খনভাণ্ডার পূর্ণ  
থাকিত।

১৫৪২ খৃঃ অব্দে পর্যন্ত দশ বৎসর রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া মাল-  
দেব রাজ্যরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
রাজপুত-দলপতি অজ্ঞাতনামে প্রাধান্যলাভে চেষ্টা করিতে-  
ছিলেন। মালদেব কোশলে নানাপ্রকার ক্ষমতা দান করিয়া  
তাঁহাদিগের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিতে লাগিলেন।

হুমায়ুন তখন দিল্লীর সম্রাট। কিন্তু অচিরেই আদেশিক  
শাসনকর্তা সেরশাহ বাহবলে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ কার-  
লেন এবং হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সম্রাট হইলেন।  
তখন রাজ্যচ্যুত গলায়নপদ হুমায়ুন মালদেবের সাহায্য চাহি-  
লেন। কিন্তু মালদেব বিশ্বাসঘাতকতাবারা স্বীয় নামে ছুর-  
পনের কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিলেন। বিদ্রোহের প্রসিদ্ধ হুর্দে  
তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায়মল হত হইল। কিন্তু তখন মালদেব  
স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, গলায়নপদ হুমায়ুনের ডাবী বংশধর  
অকবর ভারতের রাজরাজেশ্বর হইবেন। গলায়নকালে  
মক্কাভূমি-মধ্যস্থ অমরকোট নগরে অকবরের জন্ম হয়।  
মালদেব শরণাগত অভিধির প্রতি সন্ধ্যবহার করেন নাই,  
ভবিষ্যতে ইহার জন্য তাঁহাকে বধে অহতাপ করিতে  
হইয়াছিল। [অকবর দেখ] মালদেব শরণাগত হুমায়ুনের  
সাহায্য না করিয়াও সেরশাহের বিবদ্বৃষ্টিতে পতিত হইলেন।

১৫৪৪ খৃঃ অব্দে সেরশাহ ৮০ হাজার সৈন্য লইয়া মালদেবের  
বিরুদ্ধে যুদ্ধব্রাতা করিলেন। মালদেব ৫০ হাজার সৈন্য  
লইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। রাজপুত-সৈন্যগণের

জয়িকা এবং বৃহদ্রথগণনৈপুণ্য দর্শন করিয়া বৃহ-  
বিশারদ সের শাহ ভীত হইয়া আকস্মিক আক্রমণ হইতে  
নিবৃত্ত থাকিলেন এবং অবিস্ময়কারিতার জন্ত মনে মনে অশ্রু-  
তাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পলায়নেরও উপায় নাই  
দেখিয়া শিবির সম্মুখ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।  
উত্তর সৈন্ত সম্মুখীন হইয়া একমাস, কাল অপেক্ষা করিল,  
তথাপি সের শাহ রাজপুত্র-সৈন্ত আক্রমণে সাহসী হইলেন না।  
পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা অত্যন্ত অপমানজনক মনে করিয়া কূটবুদ্ধি  
সেরশাহ বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিলেন। রাজপুত্র-  
সেনাপতিদিগের মধ্যে অবিস্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতে  
লাগিলেন। কোন সেনাপতির সহিত সন্ধির প্রস্তাব চলি-  
তেছে এই মর্মে একখানি পত্র লিখিয়া তিনি দূত প্রেরণ  
করিলেন। সের শাহের কপটতাজাল ছিন্ন হইয়া গেল, দূত  
ইচ্ছাপূর্বক মালদেবের নিকট বাইরা পড়িল। মালদেব  
সেনাপতিদিগের আচরণে সন্দিহান হইয়া তাহাদিগের  
প্রতি অবস্থা ব্যবহার করিলেন। ইহাতে প্রভূতরূপে রাজ-  
পুত্রসেনাপতিগণ অত্যন্ত মর্গাহত হইলেন। একজন সেনা-  
পতি অমূলক সন্দেহে সন্ত করিতে না পারিয়া ১২ হাজার  
সৈন্তসহ প্রবলবেগে সের শাহের সৈন্ত মধ্যে প্রবেশপূর্বক বহু  
সহস্র পাঠানসৈন্তের প্রাণ-সংহার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ  
করিলেন। তাহাদের বিক্রমে সেরশাহের বাহু একবারে ছিন্ন  
ভিন্ন হইয়া গেল। মালদেব বহু বিলম্বে সের শাহের চাতুরী  
বুঝিতে পারিলেন। সেরশাহ অতি কষ্টে সেই বিপদ হইতে  
উদ্ধীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন, “তিনি মরুভূমিতে মুষ্টিগের ভূট্টার  
জন্ত হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য হারাইতে উদ্ভত হইরাছিলেন।”

কিছুদিন পরে হুমায়ূনের অদৃষ্টলক্ষ্মী প্রসন্ন হইলেন।  
দিল্লীর রাজপ্রাসাদে মোগল-পতাকা উড্ডীন হইল। অল্প  
দিন পরেই হুমায়ূনের মৃত্যু হইল। অভ্যাদয়শীল বালক  
আকবর চতুর্দশ বর্ষ বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন হইলেন।

বোধ হয়, আকবরশাহ মালদেবের দুর্জয়বাহারে অমরকোটে  
আলমপ্রসব জননীর হৃৎস্রবণ করিয়াই, সিংহাসনারোহণের  
জনতিকাল পরেই ১৬৬১ খৃঃ অব্দে মারবারবিজয়ে যাত্রা করেন।  
অচিরেই মালদেবের প্রিয় দুর্গ মৈত্রতা বা মালকোট তাঁহার  
অধিকৃত হইল। নববলদৃষ্ট আকবর মালদেবের সুরক্ষিত  
শৈলদুর্গগুলি অধিকার করিয়া বিকানীর-রাজ রায়সিংহকে  
প্রদান করিলেন।

দুর্জয়ী মালদেব সোভাগ্যলক্ষ্মী আকবরের অত্মরক্ষা  
দেখিয়া সন্ন্যাসের আত্মপত্তা বীকার করিয়া ৪র্থ পুত্র চন্দ্রসেনকে  
উপঢৌকন সহ আকবরীয়ে প্রেরণ করিলেন। আকবর তখন

আকবরীয়ে জয় করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী  
আকবর চন্দ্রসেনের উদ্ভূত ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া  
বিকানীররাজ রায়সিংহকে সন্দেহ দ্বারা পুনরায় সমগ্র বোধ-  
পুররাজ্য প্রদান করিলেন।

কিছুদিন পরেই বিপদসৈন্ত বোধপুর আক্রমণ করিল।  
মালদেবের রাজধানী অবরুদ্ধ হইল। বৃহৎ বীর সাহসের  
সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইলেন এবং বস্ততা বীকার  
করিয়া ৩য় পুত্র উদয়সিংহকে উপঢৌকন সহ সন্ন্যাসী সমীপে  
প্রেরণ করিলেন। আকবর উদয়সিংহের বিনয়মাত্র ব্যবহারে  
সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বোধপুরের ভাবী রাজা বলিয়া বীকার  
করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে মালদেব ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে  
মানবলীলা সম্বরণ করেন। মালদেবকে মৃত্যুকালে অশান্তির  
বৃষ্টিক-দংশন সহ করিতে হইরাছিল। তিনি বিপুল পরাক্রমে  
যে বিশাল রাজ্য সংগঠন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই  
মোগলসাম্রাজ্যের অঙ্গপুষ্টি করিল; কিন্তু তাঁহার জীবনকালে  
কোন মুসলমান রাজপুত্র-কুলললনার পমিত্র পাণিগ্রহণ করিতে  
পারেন নাই। তিনি যদি আর কিছুদিন জীবিত থাকিতেন,  
তাহা হইলে উদীরমান চিতোররাজ প্রতাপসিংহের সহযোগি-  
তার রাজপুত্র-বাহীনতা সংস্থাপন করিতে পারিতেন।

মালদেবের দাদা পুত্রের মধ্যে উদয়সিংহই ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে  
পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। উদয়সিংহ আকবরের  
সহিত বীর ভগিনী বোধাবাদীর বিবাহ দেন।

মালদ্বীপ, (মলদ্বীপ) ভারত-মহাদাগরের অন্তর্গত  
সিংহলের সম্মুখিত একটা দ্বীপপুঞ্জ। অক্ষা. ৪২° দক্ষিণ  
হইতে ৭°৬' উত্তর এবং দ্রাঘি. ৭২°৩৩' হইতে ৭৩°৪৪' পূর্ব  
পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রাধারে ১১৩টা দ্বীপপুঞ্জ আছে। দ্বীপগুলি  
দৈর্ঘ্যে ৪৬৬ এবং প্রস্থে ৬০ মাইল। দ্বীপমধ্যভাগে প্রাণালী-  
ভুলিতে জল অত্যন্ত পড়িত। কিন্তু সমুদ্রাধারে তত বেশী  
গভীরতা নাই। এইজন্য শৈলময় উপকূল ভাগে সমুদ্রতরঙ্গ  
প্রবলবেগে আঘাত করিয়া থাকে। প্রাণালীগুলি দিরা অর্ধবগোত  
সমূহ সহজে দ্বীপশ্রেণী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

‘মালদ্বীপ’ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নানা-  
বিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইরাছেন। চারিটা প্রধান দ্বীপ লইয়া  
মালদ্বীপ গঠিত দেখিয়া তাহারা মেলদ্বীপ শব্দ হইতে ইহার  
নামোৎপত্তি বীকার করেন। মলবার ভাষায় মেল শব্দের  
অর্থ চার। মতান্তরে দিবমহল হইতে মালদ্বীপ শব্দ উৎপন্ন  
হইরাছে। মহল অর্থে রাজপ্রাসাদ। কোন একটা দ্বীপে  
সুগভীরতম মহল ছিল, তাহা হইতে দ্বীপপুঞ্জের নাম মলদ্বীপ  
হইরাছে। আবার কেহ বলেন দ্বীপশ্রেণী মালদ্বীপ নামের

স্থিত, এইজন্য মালদ্বীপ বা মালদ্বীপ নাম হইয়াছে; কিন্তু মলবর, মলয়, মালদ্বীপ প্রভৃতি শব্দ মলয়, শব্দ হইতেই উৎপন্ন। ত্রিঈশ্বরপুরাণে মলয়দ্বীপের নাম পাওয়া যায়। তাহাতে এই দ্বীপ বহুবিস্তৃত বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, এই দ্বীপগুলি প্রবালকীট-নির্মিত। আবার কেহ বলেন যে, দ্বীপপুঞ্জগুলির নিকটবর্তী স্থানে এক্ষণে অধিক সংখ্যক প্রবালকীট দৃষ্ট হয় না এবং দ্বীপগুলির অবস্থান দৃষ্টে মনে হয় যে ভারতের দক্ষিণে মলয় হইতে লক্ষা পর্য্যন্ত একটা প্রকাণ্ড ভূখণ্ড ছিল, পরে ভূপঞ্জর চালনার বা পৃথ্বীর অভ্যন্তরস্থ অগ্নির শক্তিতে উক্ত ভূখণ্ড সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। কেবল অভ্যন্তর পর্বতপ্রাঙ্গণগুলি ইতস্ততঃ দ্বীপরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাস্তবিক লক্ষা হইতে মলয়-প্রায়দ্বীপ পর্য্যন্ত স্থানে অধিবাসী এবং উৎপন্ন জব্যাদির বৈরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে উক্ত সিদ্ধান্ত অসমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

মালদ্বীপের ভাষায় দ্বীপের স্থানীয় নাম আটোল। দ্বীপপুঞ্জগুলির মধ্যে ১৬টা প্রধান এবং ইহাদের প্রত্যেকটিতে মনুষ্যের বাস আছে।

১। হিবান্দু কোলো আটোল ১২ মাইল দীর্ঘ ৭ মাইল প্রস্থ। ২৪টা দ্বীপপুঞ্জে ইহা গঠিত। তন্মধ্যে ৭ টিতে লোকের বাস আছে।

২। টিলাড়ু মাটি আটোল, পরিমাণ ৩৫ বর্গ মাইল। ৩৮টা দ্বীপপুঞ্জে গঠিত। সকলগুলিতে লোকের বাস আছে।

৩। মালকম—এখানে বহুসংখ্যক অর্ণবপোত ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। মিলাড়ু মড়ু, ১০১ দ্বীপপুঞ্জে গঠিত। তন্মধ্যে ২৩টাতে লোকের বাস।

৫। ফৈড়ি ফোলো, ১০টা দ্বীপে গঠিত।

৬। মাল্লপ মাড়ো অক্ষা° ৫° হইতে ৬° পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ৪টা দ্বীপপুঞ্জে গঠিত।

৭। অরি আটোল পূর্বদিকে, বহুসংখ্যক দ্বীপে গঠিত।

৮। মালে আটোল, ইহার নিকট মালে দ্বীপ বা রাজদ্বীপ অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা ২০০০। যুরোপীয়দিগের পক্ষে ইহার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর।

৯। খড়দ্বীপ বা কার্ডু।

১০। দক্ষিণ মালেদ্বীপ ২২টা দ্বীপে গঠিত। কেবল ৩টা দ্বীপে লোকের বাস।

১১। ফালে ডো আটোল, অক্ষা° ৩°১২' হইতে ৩°৪১' পর্য্যন্ত বিস্তৃত। . .

১২। মোলোক আটোল, পূর্বপশ্চিমে ১৫ মাইল বিস্তৃত। . . ১৩। নীলাভু আটোল, অক্ষা° ২°৪০' হইতে ৩°২০' পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ২০টা দ্বীপে গঠিত।

১৪। কুলো মণ্ডু আদো মাটি, সুরাদ্বীপ নামক দ্বীপপুঞ্জ।

১৫। কুয়া মোলকু, দক্ষিণপূর্বদিকায় অবস্থিত। এক ক্রোশ দীর্ঘ। অধিবাসীরা অধিকাংশ তক্তবার ও মৎস্যভীষী।

১৬। আদু আটোল মালদ্বীপের দক্ষিণ-সীমান্তবর্তী। ইহা বিষুবরেখার অতি সন্নিহিত। প্রায় ১৭৫টা দ্বীপে লোকের বাস আছে। সর্বসমেত অধিবাসিসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, মালদ্বীপে ১০০০০ ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

ইবন-বতুতা নামক একজন আরবদেশীয় ভ্রমণকারী ১৩৪০ খৃঃ অব্দে সর্বপ্রথমে মালদ্বীপে উপস্থিত হন এবং তথাকার উজীরের কথাকে বিবাহ করেন। তৎপরে ১৬০২ খৃঃ অব্দে পিরার্ড (Pirard) নামক একজন ফরাসী নাবিক জাহাজ জলমগ্ন হওয়ার মালদ্বীপে উপস্থিত হন। দ্বীপবাসীরা তাঁহাকে পাঁচ বৎসর বন্দী করিয়া রাখে।

তাঁহার পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ বণিকগণ মালদ্বীপ আবিষ্কার করেন। বর্তমানকালে লেপ্টেন্যান্ট ক্রিষ্টোফার (Lieutenant Christopher R. N.) ভূমি মাপ করিবার জন্ত মালদ্বীপে উপস্থিত হন। তিনি এক বৎসর কাল তথায় অবস্থান করিয়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার বিবরণ হইতেই এখানকার যাবতীয় তত্ত্ব জানা গিয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মালদ্বীপ সিংহলরাজ্যের শাসনাধীন ছিল। গ্রীক, আরবীয় এবং চীনদেশীয় পর্য্যটকগণ সকলেই মালদ্বীপ সিংহলের শাসনাধীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে পিরার্ডের সময়ে এখানে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, অজ্ঞাপি তাহাই আছে। সিংহলী ভাষাই এখানকার প্রচলিত ভাষা। বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন সর্বত্র দৃষ্ট হয়। ইবন বতুতার বর্ণনামুসারে জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে দ্বীপবাসিগণ মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে পর্তুগীজগণ এই দ্বীপে সাক্ষাৎভাবে আধিপত্য করিয়াছিল।

আলেকজান্দ্রিয়াবাসী পপুস (Pappus) নামক গ্রসিক পর্য্যটক চতুর্থ শতাব্দীতে সিংহলভ্রমণ উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, ১৩৭০ দ্বীপ সিংহলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ৫ম শতাব্দীতে চীনপর্য্যটক ফা-হিয়ানও সিংহলের চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, ঐ সমস্ত দ্বীপে হীরক ও মুক্তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। টলেমী এবং

কসমস্ (Cosmos) ষষ্ঠ শতাব্দীতেও এই সকল দ্বীপবাসীর উল্লেখ করিয়াছেন। সলিমান (Sulliman) ৯ম শতাব্দীতে লিখিয়াছেন যে, এই সমস্ত দ্বীপ তথাকার এক সম্রাজ্ঞীর শাসনাধীনে ছিল। ১১শ শতাব্দীতে আল্ বিরুণি এই সমস্ত দ্বীপের উল্লেখকালে কড়ির ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

মিঃ গ্রে মালদ্বীপবাসিগণের আচারব্যবহার পথ্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, প্রাচীনকালে মালদ্বীপবাসীরা যে দানব-পূজক ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক স্থলে বৌদ্ধধর্মেরও নিদর্শন দেখা গিয়াছে। ৪০০ বৎসর মাত্র তাহারা মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। যে মুসলমান-প্রচারক সর্ব-প্রথমে এখানে ধর্মপ্রচার করেন, তাহার সমাধিস্থান মালি-দ্বীপে বিস্তারিত আছে। অধিবাসীরা ধ্যানস্ত ভক্তির সহিত ঐ স্থান দর্শন করিয়া থাকে। মালদ্বীপে “বুত্” শব্দে প্রতিমা বুঝায়। মন্দিরকে ‘বৌদধানা’ কহে। বোধ হয়, উহা বৌদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ হইবে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একজন সমুদ্রবাসী দৈত্য মালদ্বীপবাসিনী কুমারাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিত এবং তাহা দগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত। মায়েবিন আবুল বেরাকাত নামক এক মুসলমান-প্রচারক কোরাণের ঐশ্বর্যালম্বিক শক্তিতে সেই দৈত্যকে মস্তবুদ্ধ করিয়া বিদূরিত করেন।

মালদ্বীপবাসিগণ অনেকাংশে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে। তাহারা ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, মলবার উপ-কূল এবং সিংহলের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে। তাহারা নাবিকবিদ্যায় সাতিশর নিপুণ। মালদ্বীপে উক্ত শাস্ত্র শিখাইবার জন্য কএকটা বিদ্যালয় আছে। অধিবাসীরা অতি নিরীহ এবং শাস্ত্রপ্রকৃতি। সভ্যজগতে যে দোষ দেখা যায়, এখানে তাহার কিছুই নাই। নরহত্যাাদি এবং তত্বরতাদি অপরাধ তথায় এখনও শ্রুতিতে বিদ্যমান। তাহারা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না। অধিবাসিগণ গাঢ় তাম্রবর্ণ এবং ধবলপ্রকৃতি। কোন কোন স্থলে নিগ্রোজাতির সংস্রবদোষ দৃষ্ট হয়। জ্বালোকেরা স্ত্রী নহে, কিন্তু অতি ভীষণপ্রকৃতি। সভ্যতার শক্তির বহির্ভাগে অনন্তলবণাষুপূর্ণ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে বাস করিয়া তাহারা মধ্যপোত বৈদেশিক নাবিকদিগের প্রতি বেক্রপ অতিথিবাৎসল্য প্রদর্শন করে, তাহা সভ্যতাভিমাত্রী সদাচারগমিত সুসভ্য মনুষ্য মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।

বহুসংখ্যক অর্ণবপোত এই স্থানে জলমগ্ন হইয়াছে। ১৮৭৭ খৃঃ অঃ লিফে (Lefly), ১৮৭৯ খৃঃ অঃ সিগল (Sea-gull) ও ১৮৮০ খৃঃ অঃ কনসেট (Consett) নামক সুপ্রসিদ্ধ অর্ণব-

পোত সকল এই স্থলে জলমগ্ন হয়। এখন নানা কারণে বর্তমান সুলতানের ধারণা হইয়াছে যে, মধ্য জাহাজের উপর জীবিত নাবিকগণের স্বয়ং নাই। এইজন্য সুলতানের অসুস্থতা ব্যতীত কেহ জাহাজ-উদ্ধরণে সাহায্য করিতে পারে না।

এখানকার উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে নারিকেলই সর্বাধিক। প্রধান। পঞ্চপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেলবৃক্ষ রোপিত হয়। তালও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ঐ সমস্ত বৃক্ষ ৬০।৭০ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। অত্রাশ্র ফলও অস্বাভিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ভূট্টা ও তুলা কোন কোন স্থানে উৎপন্ন হয়, অগণিত কড়িত্বপ উপকূল ভাগে দৃষ্ট হয়। কড়িই দ্বীপবাসী-দিগের প্রচলিত মুদ্রা। মস্তাই এখানকার প্রধান খাদ্য এবং বাণিজ্যদ্রব্য। বনিতো নামক মস্ত প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। একজন মস্তজীবী প্রতাহ ১০০০ মস্ত ধরিতে পারে। সমস্ত দ্বীপগুলির উৎপন্ন দ্রব্য মালদ্বীপে প্রেরিত হয়, পরে তথা হইতে ভারতের নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। লোণা ও শুষ্কমস্ত, নারিকেল, নারিকেলতৈল, বিচিত্র কারুকাষ্যযুক্ত মাদুর, প্রবাণ, কচ্ছপের অস্থি, এবং কড়িই প্রধান বাণিজ্য। বৈদেশিক বণিকগণ প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসে এখানে নানা-প্রকার শস্ত, রেশম, তামাক, লবণ, চাউল, বস্ত্র, ঘৃত, চীনের বাসন, লৌহ ও পিত্তলনির্মিত বৈজ্ঞান্যাদি লইয়া আসে এবং আশ্বিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

দ্বীপপুঞ্জগুলি একজন সুলতান দ্বারা শাসিত হয়। তাহার পুত্রপৌত্রাদি উত্তরাধিকারস্থরে রাজ্য প্রাপ্ত হয়। সুলতানের অধীনে ছয় জন মন্ত্রী আছেন। প্রধান মন্ত্রীকে হুরিমন্দ কহে। তিনিই আবার প্রধান সেনাপতি। সুলতানের নিম্নেই প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা, কারণ তিনি ধর্মাদ্যক্ষ এবং প্রধান বিচারপতি। এইরূপে কোষাধ্যক্ষ, বন্দরাধ্যক্ষ প্রভৃতি অত্রাশ্র মন্ত্রী আছেন। এই সমস্ত রাজকর্মচারিবৃন্দ সুলতানের আট্টালিকার নিকটেই বাস করেন। বৈদেশিক বণিকগণ রাজধানী ব্যতীত অত্রাশ্র দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের প্রচলিত মুদ্রা তথায় ব্যবহৃত হয়। এক টাকায় ১২০০০ কড়ি পাওয়া যায়।

১৭৯৬ খৃঃ অঃ হংরাঙ্গেরা সিংহল অধিকার করিয়াছেন। তদবধি মালদ্বীপের সুলতান ইচ্ছাপূর্বক প্রতিবৎসর হংরাঙ্গ-দিগকে কর দিয়া থাকেন। সুলতানের নিকট হইতে রাজদূত উপঢৌকন লইয়া প্রতিবৎসর কলম্বো নগরে আসিয়া থাকেন। উপকূল হইতে গবর্নমেন্ট-প্রাপ্য পণ্যস্ত তাহার অভিনন্দন অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মালদ্বীপের প্রচলিত

পদ্ধতি অনুসারে রাজদূতকে জলতানত্রয়ত পত্র রৌপ্যনির্মিত পথে রাখিয়া দুই হস্তে ধরিয়া মাথায় বহন করিতে হয়। পত্রের আবরণ মকমল এবং প্ররঞ্জিত রেশমে নির্মিত হয়।

মালবীপে তিন প্রকার বর্ণমালা দৃষ্ট হয়। ১ম ডিউহি হাকুরা, ২য় আরবী এবং ৩য় গাবিলি-টানা। শেখোক্ত তাবাই মাল-বীপবাসিগণের মাতৃভাষা। প্রাচীন সম্রাটদের ডিউহি হাকুরা অক্ষরমালা দৃষ্ট হয়। বোধ হয়, আদিম অধিবাসীরা ঐ বর্ণমালা ব্যবহার করিত। কোন কোন দক্ষিণসীমান্ত বীপে উক্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ পুস্তকাদি পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে কোরাণের লিখন পঠন হইয়া থাকে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা নাবিকপঞ্জিকার অনুবাদ করিয়া ব্যবহার করে। বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের সংস্রবে ইহারা ভাষায় অনেক নূতন শব্দ সন্নিবেশ করিয়াছে।

ইহাদিগের মধ্যে সংখ্যাগ্ৰাপক কোন অক্ষ নাই। অক্ষরের দ্বারা সংখ্যা নির্ণয় করে এবং ১ম হইতে ৯ এর পরিবর্তে ১২ পর্যন্ত গণনা করে।

এ স্থানের জলবায়ু তত প্রাচ্যকর নহে। ব্রিবেরি নামক উদ্যানের পীড়ায় দেশীয় অধিকাংশ লোক আক্রান্ত হয়। অর হইলে লোকে প্রায় বাঁচে না। তাপমান বস্তুর পারদ ৭৫° হইতে ৮৫° পর্যন্ত উঠে।

মালপাহাড়িয়া, সাঁওতাল-গরগণার সামগড়-পক্ষতবাসী জাতিবিশেষ। জাতিতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে ড্রাবিড়জাতীয় বলিয়া মনে করেন। এই জাতি বর্তমান কাল পর্যন্ত যুগরা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহারা ‘সুম’ প্রথা চালাইয়া থাকে। উত্তরাংশবাসী মালপাহাড়িয়াগণ দক্ষিণ এদেশবাসী জাতিদিগকে ‘মালের’ কহে এবং তাহাদিগকে সজাতি বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু দক্ষিণের মালপাহাড়ীরা তাহা স্বীকার করে না। ইহারা বরং উত্তরবাসীর নানারূপ দোষ বাহির করিয়া থাকে। ইহারা উত্তরবাসীদিগকে ‘চেট’ এবং আপনাদিগকে ‘মাল’ বা ‘মাড়’ বলে। মালদিগের ৩টা বিভাগ দৃষ্ট হয়,— কুমারপলি, দাক্ষরপলি, ও মারপলি। তাহার উত্তরপক্ষতবাসী থাককে ‘সুমরপলি’ বলে।

এই সমস্ত বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয় যে, ইহারা একই জাতি হইতে উৎপন্ন। প্রথমোক্ত সম্রাটদের আচারব্যবহার প্রায় একরূপ। ইহারা অত্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্তা কহে। ইহাদিগের মধ্যে বাহারা রাজা, তাহাদিগের উপাধি ‘সিংহ’। মধ্যবিত্ত ধনিগণ গৃহী নামে পরিচিত। ইহারা স্বজাতীয় দরিদ্রদিগকে টাকাকড়ি ধার দিয়া সাহায্য করে।

কেহ কোম রাজকীয় কর্ষ করে না। ৩য় সম্রাটকে প্রায়ের ‘মাকি’ বা মোড়ল বলে। ৪র্থ সম্রাট বা আভিগণ কেবল পণ্ড শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে।

কেহ কেহ বলেন যে, মালপাহাড়ীরা আদিম পাহাড়ী জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ মালপাহাড়ীরা হিন্দুজাতির সংসর্গে আসিয়া অনেকাংশে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানকালে পাহাড়ী-জাতির সঙ্গে ইহাদের বিবাহ চলিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, উভয় জাতিই বিভিন্ন।

মালপাহাড়ীরা আবার দুইটা অবাস্তব শাখায় বিভক্ত। মালপাহাড়ীরা ও কুমার বা কোমরভাগিরা। পুরোক্ত কুমারপলি জাতি শেখোক্ত জাতি হইতে অভিন্ন। ইহাদের এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, কোন গাভী হইতে ইহাদের উৎপত্তি। মানভূমের পঞ্চকোটের এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। কানন সাহেব অনুমান করেন যে, পূর্বকালে কোন রাজা হয় ত একজন মালপাহাড়িয়াকে দেওয়ান বা কোজদারপদে অতি বৃত্ত করিয়া থাকিবেন, তাহা হইতে পঞ্চকোটবংশের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ কথাই কোন ভিত্তি নাই।

ইহাদের মধ্যে বাল্য ও যৌবন উভয় বিবাহই প্রচলিত আছে। প্রায়ই ১০-১১ বৎসরের পূর্বে কস্তার বিবাহ হয় না, অনেক স্থলেই কস্তার যৌবনপ্রাপ্তির বহুপরেও বিবাহ হয়। সেরূপ স্থলে কস্তাগণ পুরুষের সংস্রবে পড়িলে তত দোষ হয় না। কারণ বিবাহের পূর্বে কোন কস্তার গর্ভ হইলে, বাহা দ্বারা গর্ভ হইয়াছে, তাহাকেই সেই কস্তা বিবাহ করিতে হয়। কস্তার পিতা কস্তার জন্ত পণ গ্রহণ করে। ঘটকেরাই সম্বন্ধনির্ণয় করিয়া থাকে। ৫, হইতে ২৫ টাকা পর্যন্ত পণের সংখ্যা। যে দিন কস্তার পিতাকে সমস্ত অর্থ শোধ করিতে হইবে, সে দিন কস্তার জন্ত কিছু মন্ত এবং এক-খামি সাড়ী পাঠাইতে হয়। কিন্তু বর্তমান পর্যন্ত বিবাহ না হয়, ততক্ষণ উক্ত দ্রব্য কস্তার মামার নিকট গচ্ছিত থাকে। বিবাহে মাতুলের আশঙ্ক দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, পূর্বে মাতার সম্বন্ধে সকলে পরিচিত হইত। কস্তার পণ দেওয়া হইলে ঘটক পুনর্বার কস্তার গৃহে প্রেরিত হয়। সেই সময়ে ঘটকের হস্তে একটা তীরের আঘাতের চিহ্ন থাকে এবং তাহার চতুর্দিকে হরিদ্রাবর্ণের স্তূপ বদ্ধ করা হয়। বিবাহের যে কয়দিন বাকী থাকে, সেই কয়টা গ্রহি প্রদত্ত হয়। কস্তাপক্ষীয় ব্যক্তিরা প্রত্যহ একটা গ্রহি খুলিয়া লয়। বিবাহের পূর্বদিন বর আসিয়া কন্যার গৃহের নিকট অবস্থান করে। কন্যার পিতাকে বিবাহের দিন পূর্বাহ্নে একটা বড় ভোজ দিতে হয়। শালবৃক্ষের শাখা দ্বারা বেটন করিয়া



যেই দিগন্ত হান প্রদত্ত করে। সেই স্থানে বরকে পূর্ব-  
স্থী বসাইয়া কন্যার সহিত মিলিত করা হয়। কন্যাও  
হস্তপ্রার্থনের সাক্ষী পরিমা থাকে। কন্যার সন্মতিক্রম  
অনুরূপে বেশরচনা করিয়া বরের হস্তে সিন্দূর দেয়। বর  
সেই সিন্দূর লইয়া কন্যার নীলহস্তে লেপন করে। কন্যার  
মুখের কন্যার অঙ্গুলিতে সিন্দূর মাখাইয়া বরের কপালে  
এটা কোটা কাটিয়া দেয়। সেই সময়ে অত্যন্ত আনন্দের  
সহিত বাস্তবানি ও নানাবিধ উৎসব হইয়া থাকে। মর্তকীরা  
মাচে এক প্রকারকীরা উঠেঃবরে গান করে। সন্ধ্যাকালে  
সকলে বরের গৃহাতিমুখে গমন করে। সেখানে সকলে  
নাচগানে পরমানন্দে রাত্রি বাপন করে। ইহাদের মধ্যে  
বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। এক জনে বহু ইচ্ছা বিবাহ  
করিতে পারে। তবে সাধারণতঃ স্ত্রী বহু হইলেই দ্বিতীয়বার  
বিবাহ করে। স্ত্রীর ২৩তম ভগিনী থাকিলে, স্ত্রীর অগ্রজ ভিন্ন  
সকলকেই বিবাহ করিতে পারে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত  
আছে। কিন্তু দেবর থাকিলে আর কাহাকে বিবাহ করিতে  
পারে না, তাহাকেই বিবাহ করিতে হয়। কিন্তু দেবর ভ্রাতৃ-  
পত্নীকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলে তখন সে ইচ্ছামত  
বিবাহ করিতে পারে। কেবল তাহার নূতন স্বামীকে  
পূর্বস্বামীর পরিজনবর্গকে ২৩ টাকা প্রদান করিতে হয়।  
বিধবাবিবাহে কন্ডার কপালে সিন্দূর প্রদান বা অল্প কোন  
বিবাহাঙ্গুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। কেবল বর একখামি নূতন  
কাপড় পরাইয়া বিধবাকে গৃহে লইয়া যায়। স্ত্রী ব্যভিচারিণী  
বা অপরিষাদিনী হইলে গ্রাম্য পক্ষারতের মত লইয়া স্বামী  
তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। অথবা সম্প্রদায়ের সম্মতি  
হইলেই তাহারা গ্রাম্য পক্ষারতের সম্মুখে একটা শালপাতা  
ছড়িয়া বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে। স্বামীর মর্তমাসে স্ত্রী  
উপবাস করিলে উপবাস্তিকে স্বামি-প্রদত্ত বিবাহপণ দিতে  
হয়। কিন্তু পরিত্যক্তা স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রত্যাশিত বিবাহপণ  
সেই স্ত্রীই পাইয়া থাকে।

ইহাদিগের উপাত্ত দেবতার মধ্যে সূর্য্যই প্রধান। প্রাতঃ-  
কালে ও সন্ধ্যাকালে সকলে সূর্য্যোপাসনা করিয়া থাকে। বিশেষ  
রবিবারে গৃহস্থানীকে বিশেষভাবে সূর্য্যপূজা করিতে হয়।  
তৎপরে তাহাকে তরুবারে লবণগ্রহীত মাখাইয়া খাইয়া সংযম  
করিয়া থাকিতে হয় এবং শনিবারে উপবাস করিয়া কেবল  
হুড় ও গুড় খাইতে হয়। সূর্য্যোপাসনের পূর্বে একটা মূগপাত্র,  
মুগ ফুটি, চাউল, তৈল, জুপারি, সিন্দূর ও একটা আত্মপদ-  
বুদ্ধ লসপূর্ণ পিতলের বট লইয়া গৃহের সম্মুখে মুক্ত প্রান্তরে  
উপস্থিত হয়। বধন প্রভাতে সূর্য্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাচীরবার

হইতে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়, তৎকালে গৃহস্থানী পূজা-  
প্রার্থনা লইয়া উঠেঃবরে মস্তকান্ধ করিতে থাকে। তাহার  
সূর্য্যকে পৌসাই বলিয়া সম্বোধন করে। সূর্য্যোপাসনার উপর্য্য  
এই যে, সূর্য্য বেন তাহাদিগকে আদর বিপদ হইতে রক্ষা  
করেন। চাউলগুলি একটা ছাগলিত্তকে দেওয়া হয়। ছাগ-  
লিত্ত চাউল খাইতে আরম্ভ করিলে তাহার এক আঘাতে  
তাহাকে বলি দিয়া থাকে। সেই ছাগের মাংস রন্ধন  
করিয়া পরিজনবর্গ আনন্দস্বকারে ভোজন করে। কেবল  
ছাগমুণ্ড বস্ত্রভাবে রন্ধন করা হয়। কারণ সে প্রসাদ, সেই  
পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ ভক্ষণ করিতে পার না।

সূর্য্যের পরেই তাহার ধরিত্রী মাতার (ধৃতীমাই)  
উপাসনা করিয়া থাকে। ধরিত্রীর কিকরী "গরামী" দেবীরও  
উপাসনা প্রচলিত। তৎপরে সিংহবাহিনীর পূজা। সিংহবাহিনী  
ব্যায়, সর্প ও বৃশ্চিকাদি গ্রাম্য উপর আধিপত্য করেন।  
পৃথিবী মাতার পূজার আচার ও মাংসাদি ছাগ, পুষ্কর ও  
পক্ষী প্রভৃতি বলি প্রদত্ত হয়।

হিন্দুদিগের চূর্ণোৎসবের সময় তাহার ছাগল এবং মহিষ-  
বলি দিয়া সিংহবাহিনীর পূজা করে। মাখি সমস্ত পূজা করিয়া  
থাকে।

মালপাহাড়িয়াগণ সকলেই অতিশয় নৃত্যপ্রিয়। ইহাদের  
মধ্যে একটা কৌতুকজনক প্রথা আছে। বাহার কল্যাণে  
নৃত্যোৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে উৎসবের পূর্ব্বরাজিতে  
তৃণশয্যায় শয়ন করিতে হইবে। পরে মধ্যাহ্নোদত্ত নর্তক-  
নর্তকীজন উঠেঃবরে শয়ন করিতে করিতে নিদ্রিত ব্যক্তির  
চরিত্রকে মাচ গাম করিবে।

পূর্ব্বোক্ত দেবতাদি ব্যতীত ইহারা কতকগুলি দানবের  
পূজা করে। তন্মধ্যে চোরদানো এবং মহাদানাই সর্বাধিক।  
প্রধান। তিথের নৈবেদ্য দিয়া মহাদানার পূজা হয়। হিন্দু  
দেব-দেবীর মধ্যে তাহারা কালী ও লক্ষ্মীর পূজা দিয়া থাকে।

মালী জাতির স্ত্রীর স্ত্রী পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজাও ইহা-  
দের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহারা শালবৃক্ষ সিন্দূরমণ্ডিত  
করিয়া তাহার পূজা করে। সেজন্য কেহ শালবৃক্ষ কাটিতে  
পারে না। মাখি বা গৃহস্থানীই পুরোহিতের কাজ করে।  
ইহারা অতিশয় ত্রাকগতক।

ইহারা বৃত্তদেহ দাঁহ করিয়া থাকে। কেবল দাহান্তে  
অস্থি লইয়া নদীর গভীর জলে ফেলিয়া দেয়।

আশৌচকাল পাঁচদিন, এই সময়ের মধ্যে কেহ লবণব্যবহার  
করিতে পারে না। পরে ৬ষ্ঠ দিনে ক্ষৌরকার্য্য সমাপনাতে  
জ্যেষ্ঠপুত্র জাতিবর্গকে ভোজ দিয়া থাকে। অত্যন্তিক্রম



অন্ত রাজাকে বধোচিত কর দিতে হয়। সেই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া যুদ্ধব্যক্তির যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা পুরস্কারের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হয়। কতারা কিছুই পার না। পরিত্রেরা অর্থাভাবে ক্রতমেহ সমাহিত করে, এবং তাহাদের প্রাণাদি জিহা কিছুই হয় না। কিন্তু কুমারভাগ অকলের ধনী মালপাহাড়িয়ারা প্রতিবেশী হিন্দুগণের অল্পকরণে প্রাণাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইহারা 'মুম্ব' চাব এবং পণ্ড শিকারকে আপনাদের গৈড়ক ব্যবসায় বলিয়া মনে করে। শতাদি ভালরূপ উৎপন্ন না হইলে তাহারা নানাপ্রকার বস্ত্র ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করে। বর্তমান কালে তাহারা ফল মূলদির চাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা শূকর ও মুরগির মাংস খায়। কিন্তু গোমাংস, মর্প ও ইন্দুর খায় না।

মালপুর, বোয়াই প্রদেশের মধ্যে একটি করদরাজ্য, রাজধানীর নাম মালপুর। অক্ষা° ২৩° ২১'২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৪'৩০" পূঃ। ইহা মহীকান্তারাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এই প্রদেশ পর্বত ও জঙ্গলপরিবৃত। বাজরা ও গম এখানকার প্রধান শস্য এবং অন্যান্য শস্যও আছে। ইদররাজের বংশ হইতে বর্তমান মালপুরের রাজগণ উৎপন্ন। কীরাতসিংহজীর কনিষ্ঠপুত্র বিরাজ মল ইদর রাও হইতে ৭ম পুরুষ। তিনি প্রভূত পরিমাণে রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার পৌত্র খানজিমালা নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহার পৌত্র রণধীর সিংহজী মান হইতে মরাণা নামক স্থানে বাস করেন। তৎপরে তাহার প্রপৌত্র রাবল বাগ সিংহজী মালপুরে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালে মালপুর মালোকান্ত নামক একজন ভীল সর্দারের অধীনে ছিল। মালপুরবাসী একটি ব্রাহ্মণের এক পরমাত্মন্দরী কন্যা ছিল। মালোকান্তের সহিত তাহার অত্যন্ত প্রণয় হয়। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাবল সিংহজীর শরণাগত হন। রাবল যুদ্ধে মালোকান্তকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করেন। তদবধি রাবলের বংশধরগণ তথায় রাজত্ব করিতেছেন। রাবল দীপসিংহজী ১৮৮১ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি রাঠোরবংশীয় রাজপুত্র এবং কীরত সিংহ হইতে ২৩ পুরুষ অধস্তন। ইহারা ইংরাজ গবর্ণমেন্ট, ইদরের রাও এবং বরদার গাইকবাড়কে কর প্রদান করেন।

মালভঞ্জিকা, (জী) মালঃ ভজতে (সংজ্ঞায়াং পা। ৭৩।১০২) ইতি বুল্। জীড়াতেন্দ।

মালভারিন্ (জি) মালাঃ বিভক্তি ভূ-গিনি (ইষ্টকেষীকা-মালানাং চিত্তুলভারিনু। পা। ৭৩।৩৫) ইতি পূর্বপদত্। হ্রস্বঃ। মালাধারী।

মালব (পুং) বা শোভা ততঃ গয়ঃ আশ্রয়ঃ। ১ চন্দনবৃক্ষ। (জিকা°) (জি) ২ মলয়বক্ষী।

"তদুচ্ছ্রোতমালরাঃতরা ভুবোত্তমালরা।

অহাশি শ্রীতমালরানিলাবধুতমালরা।" (মলোদয় ২৩৭)

(কী) ৩ অভিসার-হাসভেদ।

"ক্ষেত্রং বাটী তদধেবালরো দ্বীপুং বনম্।

মালবঃ শশানক নভাদীনাং তটী তথা।" (সাহিত্যদ্রঃ ৩ পরি°)

মালব (পুং) মালঃ উন্নতক্ষেত্রমত্যত্র মাল-কেশাদ্বে-  
হস্ততরতাং। পা। ৫২।১০২) ইত্যত্র "অন্তেভ্যোহপি দৃষ্টমন্ত,  
কাশিকোক্তেঃ ব প্রত্যয়ঃ। ১ অবস্থিদেশ।

"অদা বলা মদন্তরকা অন্তর্গিরিবহির্গিরী।

স্বক্ষোত্তরাঃ প্রবিজয়া মার্গবাক্ষেরমালবাঃ।"

(মৎস্রপু° ১১৩।৪৪ অ°)

মালবেরু জাতঃ ইত্যপ্। (জি) ২ মালবদেশজাত।

৩ রাগবিশেষ, বড়রাগের মধ্যে প্রথম রাগ। মতান্তরে ইহাকে  
তৈরব রাগ কহে।

"আদৌ মালবরাগেন্ততো মল্লারসংজিতঃ।

শ্রীরাগন্তত পশ্চাৎ বসন্ততদনন্তরম্।

হিরোষ্টাচাৎ কণ্ঠাট এতে রাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ।" (সঙ্গীতদা°)

এই রাগের স্বরগ্রাম—

সা ঋ গ ম ং ধ নি সা ::

মতান্তরে—নি সা ঋ গ ম প ধ নি ::

মতান্তরে—সা ঋ গ ম প ধ নি সা ::

(সঙ্গীতরসাকর)

এই রাগের স্বরূপ, বধা—

"নিতম্বিনীচূষিতকঙ্কপন্নঃ শুকছাতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ।

সঙ্গীতশালাঃ প্রবিশন্ প্রদোষে মালাধরো মালবরাগরাজঃ।"

(সঙ্গীতদামোদর)

রাজি ১৬ হইতে ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত এই রাগের গান সময়।

মালব্যাং তমামিকারাং সাবিজী মাতরি জাতঃ ইত্যপ্।

৪ অষ্টপতি রাজার মালভীর্গজাত পুজগণ। (ভারত ৩২৯৬)

জিরাং টাপ্ মালবা। ১ নদীভেদ।

"হিরণ্যতী বিততা চ তথা রক্তবতী নদী।

বেদশ্রুতির্বেদবতী মালবাখাশ্বতাপি।" (ভারত ১৩।২৩৫।২৫)

২ উপোদকী, বড়পুঁই শাক, চলিত বাঘা পুঁই।

মালব, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। মধ্যভারত-  
প্রদেশের দক্ষিণসীমান্তে অবস্থিত মালবের ভার শতসমুদ্র-  
শালী প্রদেশ মধ্যভারতে আর নাই। এখানে কোন কালে  
অনাবৃষ্টিঘটিত হুর্জিল হয় নাই। ইন্দোর, ভোপাল, খার,

সুতলাদ, জাতরা, রাজপুত, মুসিংগক এবং গোহালি-  
য়ের মীমত প্রভৃতি রাজ্য মালবের অন্তর্গত। অতি প্রাচীন  
জু প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরী মালবের রাজধানী ছিল। বিক্রমা-  
দিত্যের দাস উজ্জয়িনীর সহিত ইতিহাসে অমরত্ব লাভ  
করিয়াছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।

উক্ত প্রদেশ মতোয়ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী সর্বত্র  
পরিব্যাপ্ত এবং অসংখ্য শৈলসরিং চারিদিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে।  
দেশসমূহ অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ, বাঁশ, কটকবৃক্ষের ঝাড় এবং  
নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম ভূমি নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন। জঙ্গ-  
লের মধ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, ভল্লুক, শূকর, হরিণ প্রভৃতি জন্ত  
বাস করে। কিন্তু এক্ষণে কৃষির প্রসার বৃদ্ধি হইয়া জঙ্গলের  
আরজন কমিতেছে। সমস্ত নদীগুলি দক্ষিণদিকে সমুদ্রের  
সহিত মিশিয়াছে। কেবল একটা নদী উত্তরবাহিনী হইয়া  
বৃহত্তম নদ চমবে পতিত হইয়াছে। লোহ এবং প্রস্তর ব্যতীত  
অল্প কোন খনিজ দ্রব্য উন্মোচিত হয় না। এখানে বৎসরে  
৩৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

ভূত্ব।

পশ্চিম-মালবাংশ দাক্ষিণাত্যের প্রস্থত পর্বতমালা দ্বারা  
সমাজিত। আগ্নেয়গিরি-সমুদ্ভূত দ্রবপদার্থে ইহা গঠিত। সমস্ত  
প্রদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।  
ঐ সকল দেখিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে,  
শৈলযুগে দাক্ষিণাত্য অগ্নিগিরির বিশাল লীলাক্ষেত্র ছিল।  
মালবপ্রদেশের প্রস্তর সকল জলবায়ুতে রূপান্তরিত হয় না।  
মালভূমি-প্রদেশে ঐ সকল প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়।  
মাণুন্যগরীর অট্টালিকা নির্মাণে যে সকল খনিজ প্রস্তর উন্মো-  
চিত হইয়াছিল, তাহা অত্যাধিক বিস্তারিত রহিয়াছে।

মণ্ডলেশ্বর এবং মহেশ্বর নামক স্থানে নন্দ্যাদী নদীর গল-  
নয় স্তরনির্মিত প্রকাণ্ড ভূভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট  
এই স্থানে লোহ গলাইবার কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন,  
দুর্ভাগ্যক্রমে সে কারখানা এক্ষণে দূরীভূত হইয়াছে।

অধিবাসী।

সিন্ধ, রাজপুত, ভীল, কুতুরী, অজনা এবং আহীর  
নামক বহু কৃষিজীবী এখানে বাস করে। মগিরাভাতি মিবার  
হইতে আসিয়া এখানে বহুস্থল হইয়াছে। ইহারা চৌধে  
অত্যন্ত নিপুণ। আহীর ও অজনাভাতিরা ঐর্ধ্যসম্পন্ন। সাধা-  
রণতঃ জোয়ার শস্তনির্মিত ময়দা কৃষিজীবীদের প্রধান খাদ্য।  
ইহারা অহিকেন বৃক্ষের ডাল পাতি দিয়া কুটি খাইয়া থাকে।  
শস্তাদি দুর্ভাগ্য হইলে ইহারা ফরিদা নামক আম খাইয়া

প্রাণধারণ করে। সাধারণ পরিচ্ছন্ন ধৃতি, কোমলবক, জামা এবং  
চাদর। ধনীরা আত্মীয়বৃত্ত জামা গামাচি দেয়। ধনাঢ্য রমণীরা  
কর্ণে স্বর্ণনির্মিত মাকড়ী পরিয়া থাকে। কর্ণের দ্বারা সাধারণতঃ  
গৃহ প্রস্তুত হয়। কোন কোন স্থলে তালগাছের কড়ির  
উপরে তালপাতার ছাউনির গৃহ দেখা যায়। গৃহে এক-  
টার অধিক দুয়ার জামালা থাকে না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের  
মাসিক ১০১২ টাকার স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। ধনী  
কৃষকগণের ৫০ টাকার পরিবারাদির মাসিক খরচা চলে।

জোয়ারই এ স্থানের প্রধান শস্য। তিস্ত গম, বব, ছোলা,  
বাজরা, পাট, ইক্ষু এবং অহিকেন উৎপন্ন হয়। কার্তিক  
অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণক্ষেত্রে অহিকেনের বীজ উৎস হইয়া থাকে।

টাকার চাউল ১২ সের, জোয়ার ১ মণ, গম ২২ সের,  
লবণ ৮ সের। মকা ১ মণ ৫ সের। ইক্ষু একগাছি ১ হইতে  
২ পরমা। মহরামস্ত কোয়াটার ষোতল ৪ আনা হইতে ৬ আনা।  
আদর্শ ওজন কোন স্থলেই ব্যবহৃত হয় না। স্থানবিশেষে  
ওজনপ্রথা বিভিন্ন। ব্রাহ্মণ এবং বেগিয়া ভিন্ন অস্ত্রাস্ত্র জাতির  
জীলোকেরা ক্ষেত্রে কর্ম করিতে যায়। তাহারা দৈনিক  
১ সের কি ২ সের শস্ত পাইয়া থাকে।

বর্তমানকালে মালবের মধ্যে রেলপথ বিস্তৃত হইয়া গমনা-  
গমনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। রেলপথবিন্যাসে ক্রমে  
ক্রমে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইতেছে। মালবের রপ্তানি দ্রব্যের  
মধ্যে অহিকেন ও তুলাই সর্বপ্রধান। জঙ্গলাভের সহিত  
গবাদি পশুর বাণিজ্য বিশেষভাবে উন্নয়নযোগ্য।

তদ্রূপে অধিবাসীরা জীবনে অন্ততঃ একবার নন্দ্যাদীতে  
ভ্রমণবিগ্রহ এবং গজাভীয়ে শরণঘাট দর্শন করে এবং  
পুণ্যসিলা নদীর জলে স্নাত ব্যক্তিগণের অস্থি নিক্ষেপ  
করিয়া থাকে। তীর্থদর্শন হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রত্যেক-  
কেই মহাসমারোহে আত্মীয় স্বজনদিগকে বৃহৎ ভোজ  
দিতে হয়। ভোজনদক্ষিণাস্বরূপ প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে  
স্বনামাক্ত একখানি পিড়লের থালা বিতরণ করে। এখান-  
কার কৃষিজীবীরা অত্যন্ত দরিদ্র। তাহারা বেগিয়াদিগের  
নিকট হইতে শতকরা মাসিক ২৫ টাকা সুদে টাকা ধার  
করিয়া থাকে। গহনা বন্ধক রাখিলে শতকরা মাসিক ১২।৫  
টাকা সুদ। শরীর বন্ধক রাখিলে বা দাসভাবে থাকিলে  
শতকরা ৯ টাকা সুদ।

ইতিহাস।

অতিপূর্বকাল হইতেই মালবের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত।  
এই মালবে রক্তিশেখর রাজত্ব করিতেন, দশগুরে (বর্তমান  
দাস নশোর বা মলশোরে) তাহার রাজধানী ছিল। ইহার

জগদ্রথ রাজধানী উজ্জয়িনী, ইহা কেবল সমুদ্রশালিনী নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধ বহু, এখানকার মহাকাল ও তাঁহার পুত্র-প্রসিদ্ধ দেবতা, তজ্জগৎ অবতী সপ্ত মোক্ষদানের অন্তর্গত এবং একটা প্রধান স্তীর্ণ বলিয়া পরিগণিত।

[ অবতী ও উজ্জয়িনী দেখ। ]

বহু পূর্বকালে মালব বা অম্বতীরাজ্য ভারতের একটা প্রধান অংশ বলিয়া গণ্য ছিল। অতি প্রাচীনকালে ইহার আরম্ভন কত বড় ছিল, স্পষ্ট তাহার প্রমাণ না পাওয়া গেলেও যাকিননবীর দিকন্দরের সময় এই রাজ্য বহুবিভক্ত ছিল, এমন কি, পল্লবের দক্ষিণাংশ পর্যন্ত তৎকালে মালব (মালি) জাতির অধিকারভুক্ত হইরাছিল। আমরা দেখিতে পাই, বৌদ্ধ-প্রাধান্তকালে যিনি ভারতের রাজচক্রবর্তী হইরাছেন, হয় তিনি কিংবা তৎপুত্র কোন সময় মালব শাসন করিয়াছেন। জৈনপুরাবৃত্ত হইতে জানিতে পারি যে, মালব চন্দ্র গুপ্তের সাম্রাজ্য ভুক্ত হইরাছিল। তৎপুত্র বিম্বসার এবং বিম্বসারের পুত্র অশোক উভয়েই কিছুকাল মালব শাসন করিয়াছিলেন। প্রিয়দর্শীর অনুশাসন হইতে জানিতে পারি যে, তিনি যখন মগধের সিংহাসনে রাজচক্রবর্তী-রূপে অধিষ্ঠিত, তখনও তাঁহার এক পুত্র তাঁহার অধীনে মালব শাসন করিতেছিলেন। শিলা-লিপি হইতে জানিতে পারি যে, সম্রাট অশোক নিজ স্ত্রীলক যবন ভূবাশ্পকে স্মরাষ্ট্রপ্রদেশের শাসন ভার প্রদান করেন। নৌর্যবংশের প্রভাব থর হইলে, যবনরাই স্মরাষ্ট্র হইতে ক্রমে মালবে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎপরে মালবে শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই শকেরা ব্রাহ্মণভক্ত ও কত্রির বলিয়া পরিচিত হইরাছিলেন। এ দেশীয় বিজয়গণের সহিতও তাঁহাদের কুটুম্বিতা স্থাপিত হইরাছিল। জৈনদিগের কালকাচাধ্যক্ষপাঠে জানা যায় যে, মালব-রাজধানী উজ্জয়িনীতে ৭৪ খৃঃ পূঃ হইতে ৫৭ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্যন্ত শকাধিকার ছিল। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন-বংশও প্রবল ছিল। অধিক সুসম্ভব, বিক্রমাদিত্য-উপাধিধারী জটমক সাতবাহনবংশীর নৃপতি শকদিগকে পরাজয় করিয়া মালবে সংবৎ প্রচার করেন, তাহাই মালবস্থিত্য বা বিক্রম-সংবৎ নামে প্রচলিত হয়। সেই বিক্রমাদিত্য শক-বিশকে পরাজয়পূর্বক ‘শকারি’ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। [ বিক্রমাদিত্য দেখ। ] তাঁহার বা তৎবংশীর রাজগণের মালবধিকার স্থায়ী হইল না। খৃষ্টীয় ১ম শতকে আবার শকাধিকার বিস্তৃত হইরাছিল। প্রথমে চট্টনের পিতা এখানে একজন সামান্য ক্ষত্রপ ছিলেন। কিন্তু মহাবীর শকাধিপ চট্টন : আত্মবংশকে পরাজয় করিয়া মালবের একজ্ঞাধি-

পতি হইরাছিলেন, তিনি বিক্রম-সংবৎের পরিবর্তে নিজ জাতীয় মৌর্য-ব্যোমক্য করিবায় ক্ষত্র শকাবৎ প্রচার করিলেন। [ শকাবৎ ও সংবৎ দেখ। ] চট্টন সমস্ত দাক্ষিণ-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে সাতবাহনবংশ হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইহলোক পরিত্যাগের পর তাঁহার অধীনস্থ ক্ষত্রপ মহাপান ও তাঁহার জামাতা উষনাত মহাক্ষত্রপ উপাধি ধারণ করিয়া স্মৃৎস্ব রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে উজ্জয়িনীপতি চট্টনের পুত্র জয়দাম হতশ্রী ও তাঁহার কুটুম্ব সাতবাহনগণ হীনপ্রভ হইরাছিলেন। ১৩০ খৃষ্টাব্দে সাতবাহনকুলভিলক গোতরীপুত্র শাতকর্ণি শকদর্প চূর্ণ করিয়া দক্ষিণাংশ হইতে রাজপুতনা পর্যন্ত সমুদ্র স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও স্থায়ী আধিপত্যরক্ষার সমর্থ হন নাই। পরাজিত শকবীরগণ সকলে উজ্জয়িনীতে আশ্রয় লবায়ের পুত্র ক্রদ্রদামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সকল বীর-গণের সাহায্যে শকাধিপ ক্রদ্রদাম শকজাতির প্রেনঠীগৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইরাছিলেন। দক্ষিণাংশ-পতি শাতকর্ণি তাঁহার কুটুম্ব ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই ক্রদ্রদামের সময় মালবে শকসমৃদ্ধির চূড়ান্ত হইরাছিল। ক্রদ্রদামবংশীর রাজত্বগণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহারা ক্ষত্রপ মহারাজ বলিয়া পরিচিত। এই শকবংশের ২৮ জন রাজার নাম ও রাজ্য-কাল জানা যায়। [ ভারতবর্ষ শক ৩৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ]

আর্য্যাবর্তে গুপ্ত এবং দাক্ষিণাত্যে চেরি ও চালুক্যরাজবংশের অভ্যুদয়ে মালবের ক্ষত্রপবংশ বিলুপ্ত হয়। মালবে দেশীয় অধিকারের সূত্রপাতের সহিত আবার মালব বা বিক্রম সংবৎ প্রচলিত হইতে থাকে। পুরাবিৎ কাণ্ডনর সাহেব বহু আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ৫৪৫ খৃষ্টাব্দে বিক্রমসংবৎ উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু মালবের মন্দেশের হইতে আবিষ্কৃত কুমার-গুপ্তের শিলাললকে ৪৯০ মালব সংবৎ অর্থাৎ ৪৩৬ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। পূর্বেই দেখাইয়াছি, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী শকাধিকার বিলুপ্ত হয়। যে পর্যন্ত মালবে শকাধিকার সে পর্যন্ত শকাবৎ প্রচলিত ছিল। পঞ্চম শতাব্দী মালবজাতির অভ্যুদয়, সেই সঙ্গে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে আবার মালব বা বিক্রম-সংবৎ প্রচলিত হইতে থাকে। গুপ্তসম্রাটদিগের অধিকারকালে এখানে গুপ্ত ও মালব উভয় সংবৎ প্রচলিত ছিল, তাহা কুমার-

\* “মালবাসী পণ্ডিতা বাতে শতচতুষ্টয়ে।

তিনবতাবিকাবাদাং কতৌ সেব্যবদধে।”

( কুমারভট্টের কলসৌরদিশি ১১ পক্ষ )

গুপ্তের শিলালিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে গুপ্তসম্রাটগণের অধীনে এখানে বর্ষাবংশীয় রাজত্ব-বর্গের অভ্যুদয় ঘটে, তন্মধ্যে নরবর্মণ, তৎপুত্র বিশ্ববর্মণ (৪২৩ খৃঃ অব্দ) ও তৎপুত্র বজ্রবর্মণ (৪৩৬ খৃঃ অব্দ) এই তিন জনের নাম শিলালিপি হইতে পাওয়া যায়। দশপুরে ইহাদের রাজধানী ছিল। এই করজনের পর কে মালব শাসন করেন, তাঁহার নাম পাওয়া যায় নাই। তবে ৪৮৪ খৃষ্টাব্দে সুরস্রিচন্দ্র নামে রাজার নাম শিলালিপিতে পাই, তিনি সম্রাট বৃহগুপ্তের অধীনে বসুনা হইতে নর্মদা পর্যন্ত সমুদ্র ত্তাগে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহাদের অধীনে আবার মাতৃবিষ্ণু ও তাঁহার কনিষ্ঠ খন্ডবিষ্ণু নামে দুইজন ব্রাহ্মণরাজের নাম পাওয়া যায়। এই সময়ে হুণরাজ তোরমাণ পঞ্চদশ হইতে আসিয়া মালব অধিকার করেন। তাঁহার প্রভাবে গুপ্তসম্রাজ্য প্রকম্পিত হইয়াছিল। তোরমাণের পর তৎপুত্র মিহিরকুল ও হুণ শাসনবিজ্ঞার করিয়াছিলেন। এই মিহিরকুলের সময়ে মালবে বশোদধর্মের অভ্যুদয় ঘটে। তিনি কুলবলে লৌহিত্য হইতে পশ্চিম সমুদ্র এবং হিমালয় হইতে মহেন্দ্রচল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। গুপ্ত ও হুণরাজগণ যে সকল স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, ইনি সেই সমস্ত ভূমি জয় করিয়াছিলেন। হুণপতি মিহিরকুল তাঁহার বশুভাগীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই বশোদধর্মী ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধিলাভ করেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির ও বাসবদত্তারচিত্রিতা সূর্য্য ইহার সত্য উজ্জল করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং প্রভৃতি বহু লোকই এই মালবপতির শৌর্য্য-বীর্যের স্মৃতি কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। এই বশোদধর্মার পর মালবে আবার গুপ্ত-আধিপত্য হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্ব স্থায়ী হয় নাই। স্থায়ীভাবে বর্দ্ধনবংশের অভ্যুদয়ে গুপ্ত-প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে। এই সময় সম্ভবতঃ রাজ্য হারাওয়া মাধবগুপ্ত ও কুমারগুপ্ত এই দুই রাজকুমার বর্দ্ধনরাজসভায় আশ্রয় লাভ করেন। তন্মধ্যে মাধবগুপ্ত সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সখ্যতালাভ করিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মালবে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, মালবরাজ্যের আয়তন প্রায় ৬০০০ লি বা ১০০০ মাইল। ইহার রাজধানী প্রায় ৩০ লি বা ৫ মাইল। রাজধানীর দক্ষিণ ও পূর্বাংশে মহী নদী। এ সময়ে ‘উজ্জয়িনী ও মাহিস্তমী বা মহেশ্বরপুর’ সত্তর রাজ্য বলিয়া গণ্য থাকিলেও মালবাধিপের অধীনে বিভিন্ন ব্রাহ্মণরাজের শাসনে ছিল। কনিংহাম সাহেবের মতে তৎকালে মালবরাজ্য পশ্চিমে কচ্ছ হইতে পূর্বে উজ্জয়িনী,

উত্তরে গুজর ও বৈরাট হইতে দক্ষিণে বলভী ও মহারাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালে বর্তমান খারা-নগরে রাজধানী ছিল।

চীনপরিব্রাজকের মালবে উপস্থিতির ৬০ বর্ষ পূর্বে শিলাদিত্য (যশোদধর্মী ?) বিজয়মান ছিলেন। হিউএন্সিয়াং লিখিয়াছেন, এই শিলাদিত্যরাজ ৫০ বর্ষ প্রবল প্রভাবে রাজত্ব করেন, তিনি নানাশাস্ত্রজ্ঞ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জয় হইতে অস্তিমকাল পর্যন্ত জীবহিংসা করিয়া কখন হস্ত কলুষিত করেন নাই। তিনি আপন প্রাসাদের পার্শ্বেই বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতিবর্ষেই তিনি ‘মোক্ষমহাপরিষদ’ ডাকিয়া সর্গস্থানের আচার্য্যগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন। চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনা অনুসারে ৫৩০ হইতে ৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মালবপতি শিলাদিত্য বিজয়মান ছিলেন। এ সময়ে শিলালিপি অনুসারে আমরা যশোদধর্মী নামক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার নাম পাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মালবে মাতৃবিষ্ণু ও খন্ডবিষ্ণু নামে দুই জন ব্রাহ্মণ জাতীয় সামন্ত-রাজ রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ চীনপরিব্রাজক উজ্জয়িনী ও মহেশ্বরপুরে ঐরূপ ব্রাহ্মণবংশীয় রাজাই দেখিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক মালবে অবস্থানকালে এখানকার অধিবাসিবর্গের পাণ্ডিত্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতে দুই দিকে দুইটা রাজ্য বিস্তার জন্ম প্রসিদ্ধ, তাহার একটা দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত মালব রাজ্য ও অপরটা উত্তরপূর্বে অবস্থিত মগধরাজ্য।

বাস্তবিক শিলাদিত্য বা যশোদধর্মার পর কে মালব শাসন করেন, তাহা জানা যায় নাই। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকর বর্দ্ধন ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মালব জয় করেন। সম্ভবতঃ এই সময় তাঁহার জামাতা মৌখরি-গ্রহবর্মণ কিছুদিনের জন্য মালবের শাসনভার পাইয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর মালবপতি গ্রহবর্মণকে নিহত করিয়া সম্ভবতঃ নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে ভগিনীপতিহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ৬০৯ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ সত্যালয় পুলিকেণী মালব জয় করেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক যখন এখানে আগমন করেন, তখনও এখানে একজন ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতে ছিলেন। চীনপরিব্রাজক তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। তৎকালে মালবপতি শিলাদিত্যের ভ্রাতৃপুত্র ক্ষত্রিয়রাজ এবদট বলভী শাসন করিতেছিলেন। তৎপরে কোন্ বংশ মালব-শাসন করেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় গোবিন্দ মালব জয় করিয়া মারসর্গ নামক রাজের পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল

পরে মালবে পরমার-বংশের অভ্যুদয় হয়। [ পরমার বংশ ]  
এই বংশ আর ৮২৫ হইতে ১২১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রবলপ্রভাবে  
মালব শাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা ভোজ ও  
বাকপতির নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ। [ ভোজ ও বাকপতি দেখ। ]

পরমার-বংশের রাজত্বকালে ১০০২ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্য বলভ-  
রাজ, ১১০০ খৃষ্টাব্দে চন্দেরদাজ নরসিংবর্মা, ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে  
চন্দের বদনবর্মা, ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্য জুমারপাল এবং  
১২২৯ খৃষ্টাব্দে বাহবলিকব্বের সেনাপতি জ্ঞানবীর খোলেখর  
মালব আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ভট্টগ্রহ মতে, ভোজরাজের পর জরচাঁদ মালবের সিংহাসনে  
আরোহণ করেন। তৎপরে জিংপাল নামক একজন রাজপুত  
শাসনকর্ত্তা মালবের অধীশ্বর হন এবং তথার ভোমরবংশের  
প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভোমরবংশ ১৪২ বৎসর রাজত্ব করেন।  
পরে জগদেব নামক এক চৌহানদর্দার মালবের সিংহাসন  
অধিকার করেন। এই বংশের ৪র্থ রাজা বাহদেব 'সম্রাট'  
উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার সময়ে সর্ববিধের রাজ্যের বিপুল  
সমৃদ্ধি এবং শিল্প বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।  
ঐ বংশীয় শেষ রাজা মালদেবের সমর বৈজ্ঞান্যাতীর্ন আনন্দ-  
দেব মালব অধিকার করেন। তাঁহারই সময়ে মালব মুসল-  
মান-করকবলিত হয়।

যখন তৈমুরের আক্রমণে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তোগলক  
ব্যতিব্যস্ত হন, সেই সময়ে দিলার খাঁ মালবে স্বাধীনতাপতাকা  
উড্ডান করেন এবং ধারানগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন।  
তৎপুত্র আলফি খাঁ হোসঙ্গশাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ  
করিয়া মাজুনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরের পরিধি  
৩৭ মাইল এবং বিদ্যাপর্কণের পাদদেশে ৮ মাইল পর্যন্ত  
বিস্তৃত। শাহ হোসঙ্গ হোসঙ্গাবাদ সংস্থাপন করিয়াছিলেন।  
তিনি গৌড়বনের রাজা নরসিংহকে পরাজিত ও নিহত করেন  
এবং তাঁহার রাজধানী স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া ফেলেন। হোসঙ্গ  
৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র গজনি বা  
হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত  
দুর্কলচেতা ও লম্পটপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত  
করিয়া তাঁহার মন্ত্রী মহম্মদ খিজিজি সিংহাসন অধিকার  
করেন। সিংহাসনাধিকৃত হইয়া তিনি উদারতা ও শাসন-  
নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ভূতপূর্ব সম্রা-  
টের নামে বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা ও সুলতান সুলতান অট্টালিকা নির্মাণ  
করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন—তাঁহার তুল্য  
সর্বজনযুক্ত মুসলমান রাজা ভারতের ইতিহাসে অতি কম।  
তাঁহার রাজত্বকালে গুজরাতরাজ আফদ শাহ মালব আক্রমণ

করেন। মহম্মদের রাজত্বকালে প্রজাপুত্র অত্যন্ত দুখে  
ছিল। তিনি মাজুনগরীর ৩ ক্রোশ উত্তরে মালটা নামক  
স্থানে বহুসংখ্যক অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ফেরিস্তা  
বলেন, মহম্মদ হুশিক্ষিত, সাহসী ও জ্ঞানধারণ ছিলেন।  
তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু মুসলমান উভয়ে শান্তিস্থ উপভোগ  
করিয়াছিল। তিনি একবার মতিগণের চক্রান্তে সিংহাসন  
হারাইয়াছিলেন, পরে গুজরাতপতি সুলতান বলফেরের সহা-  
যতায় রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন।

মহম্মদের পরে তৎপুত্র গিরাসুদীন খিজিজি ১৪৬৮ খৃঃ  
অব্দে শিউসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি উজী-  
রের প্রতি রাজ্যভার দিয়া ইন্দ্রিয়মুগ্ধসাধনে মনোনিবেশ  
করেন। মাজুনগরে তাঁহার প্রবেশকক্ষে বিভিন্ন জাতীয়  
এবং বিভিন্ন দেশীয় ৫ সহস্র রূপবতী রমণী বিরাজ করিত।  
গিরাসু এই রমণীগণের মধ্যে দিবানিশি নৃতন নৃতন বিলাস-  
কামনার উদ্ভাবনা করিয়া কালবাণন করিতেন। তাঁহার  
পিতা মহম্মদ রাজ্যের এমন সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন  
যে, গিরাসুর ৩৩ বর্ষকালী অনবধানতার রাজ্যের কোন  
ক্ষতি হয় নাই, গিরাসুর পরে তৎপুত্র হুরউদীন ১৫০১ খৃঃ  
অব্দে মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত  
ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ১১ বৎসর শাসনেও মালব-  
রাজ্যের প্রভাব সর্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। অত্যন্ত পালানক্ষিই  
তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মহম্মদ খিজিজি অসামান্য বাহুবলে  
বুদ্ধিকৌশলে মালবরাজ্য একরূপ ক্ষুদ্র ভিত্তিতে সংস্থাপন  
করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র-পৌত্রের অর্ধশতাব্দ-কালী  
ইন্দ্রিয়পরায়ণতারও মালবের ঐখ্যায় সর্বত্র লোকমুখে  
কীর্তিত হইত। হুরউদীনের পুত্র মাক্দুদ ১৫১২ খৃঃ অব্দে  
রাজ্যভিষিক্ত হন। তাঁহার অভিষেকসময়ে ৭০০ হস্তী মণি-  
মাণিক্য-বিশিষ্ট বকমলাবৃত্ত বহুমূল্য জুহরময় পরিচ্ছদে  
অলঙ্কৃত হইয়া রাজপথে মালবের ঐখ্যার পরিচয় দিয়াছিল।

মাক্দুদের ভ্রাতৃগণের ষড়্‌বন্দে তাঁহার রাজ্যে অবিলম্বে  
অশান্তির বীজ উৎপন্ন হইল। তাঁহার এক ভ্রাতা চন্দেরী  
আক্রমণ করিলে মাক্দুদ বিজোহ-কমের জন্ত রাজপুত-রাজ-  
পুত্রের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং রাজপুত সাদারীরকে  
প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। অচিরেই মাক্দুদ সাদারী-  
রকে সন্দেহের চক্রে ফেঁসিতে লাগিলেন এবং কোশলে  
তাঁহাকে পচ্যুত করিবার জন্ত সচেষ্ট হইলেন। ইহাতে রাজ-  
পুত্রেরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মাক্দুদ গুজরাতে পলায়ন  
করিলেন। গুজরাতরাজ মহম্মদশাহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে  
লাগিলেন। রাজপুত্রেরা মাক্দুদকে ধরিবার জন্ত গুজরাতে অগ্র-

সময় হইতে লাগিল। হিন্দু-মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ১৯০০ রাজপুত-সৈন্য সমুদ্রসময়ে প্রাণবিসর্জন দিয়াছিল। প্রায় লক্ষ মুসলমানসৈন্য হত হইলে মুসলমানেরা জয়লাভ করিল।

এই সময়ে চিতোররাজ রাণা লক্ষ বা সংগ্রামসিংহ চতুর্দিকে প্রাধান্তবিস্তার এবং তৈমুরবংশের যোগল সেনানায়ক বাবরশাহ ও দিল্লীর সিংহাসনে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, বাবরের অভ্যুদয় না হইলে খিজির-বংশের অবসানের সহিত ভারতসাম্রাজ্য রাজপুতদিগের হস্তে পতিত হইত।

১৫২৬ খৃঃ অব্দে মালবকে নিহত করিয়া গুজরাতরাজ বাহাদুর শাহ কিছুদিন মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় হইতে অকবরের জ্যাকাল পর্যন্ত ৩৭ বৎসর মালবে অরাজকতা ও রাষ্ট্রবিপ্লব বিজ্ঞান ছিল।

হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে বিতাড়িত করিয়া মালব অধিকার করেন। পরে মল্লখী 'কাদের মালবী' উপাধি গ্রহণ করিয়া মাণ্ডুনগরে ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে ১৫৪২ খৃঃ অব্দে তিনি সেরশাহের নিকট পরাজিত হইয়া গুজরাতে পলায়ন করেন। এই সময় সুলতানী শেরশাহের অধীনে সামন্ত-রূপে মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে তৎপুত্র মল্লী বায়জিদ 'রাজবাহাদুর' উপাধি ধারণ করিয়া মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনিও অত্যন্ত ইঞ্জিরপরাণ ছিলেন। সাধারণ-পুত্রের রূপমতী নামে অলোকসামান্য-রূপবতী হিন্দুনর্তকী তাঁহার উপরে সর্বস্ব-প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিল। রাজবাহাদুর রূপমতীর প্রণয়ের প্রতিদান স্বরূপ মাণ্ডুনগরে এক সুরম্য হর্য্য নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিলেন। অত্যাধি উহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং ঐ দেশীয় ভাষাতেও রূপমতীর প্রণয়লঙ্কৃত অনেক গীতিপুস্তিকা দৃষ্ট হয়।

রাজবাহাদুর রূপমতীর সহিত বিলাসতরঙ্গে ভাসমান, এমন সময়ে ১৫৬১ খৃঃ অব্দে অকবরের বিজয়কাহিনী মাণ্ডুনগরী অবরোধ করে। ১৫৭০ খৃঃ অব্দে মালব স্বতন্ত্র স্বাধীনতা হারাইয়া দিল্লীশ্বর অকবরের অধীন হয়। মাণ্ডুনগরে রাজত্বকালে মালবের স্বাভাবিক সম্পদের উচ্চসীমায় অধিরোধ করিয়াছিলেন, তাহা মাণ্ডুর ভগ্নাবশেষ পরীক্ষা করিলে প্রতীয়মান হয়। এখানকার স্থাপত্যশিল্প দর্শন করিয়া শিল্পশাস্ত্রবিদগণ মুগ্ধকণ্ঠে এই মগরীর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

মধ্যে মধ্যে বোধপুরের রাজপুত রাজারা মালবের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। মুসলমানগণের প্রতাপ শিথিল হইলে, লালজি মালবের মধ্যে রায়গড় নামক রাজধানী স্থাপন করেন, পরে তাঁহার পৌত্র বলভদ্র সিংহ মালবের রাজা হন।

এই সময়ে মালব আজমীর প্রভৃতি কএকটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের বিভক্ত হয়।

তাঁহার রাজত্বকালে মরাঠাগণ প্রবল হইয়া মালব দখল করিয়া মালবের রাজত্ব করিতে বসে। জয়পুরের ঐতিহাসিক জয়সিংহ রাণী-রাওকে মালব জয় করিতে বসে সাহায্য করিয়াছিলেন। কথিত আছে, জয়সিংহ ও রাণীরাও উভয়ের মধ্যে জনৈক পুত্র লেখানিধি হইয়াছিল। জয়সিংহ ব্রাহ্মণপ্রমুখ মরাঠা-রাজ্যের পুষ্টিকল্পে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। জয়সিংহের সাহায্য ব্যতীত বাজীরাও মালবের হিন্দুস্বাধীন সংস্থাপন করিতে পারিতেন না। ভট্টদিগের গ্রহে এ বিষয়ের বিস্তার বর্ণনা আছে।

মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিষ্টা লিখিয়াছেন যে, ঐশ্বর্যশতাব্দীতে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন হইলে, গুজরাত মরাঠাদিগের অধিকারে আইলে। ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে পেশবা মালব হইতে চৌখ আদায় করেন। তৎপরবর্ত্তি-সময়ে সিন্দে এবং হোলকার মালবের মধ্যে রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণ অত্যাধি তাহা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। মরাঠাগণ কোন সুস্থলভাবে রাজ্যশাসন প্রবর্ত্তিত করিতে পারে নাই, তৎকাল মালব তৎকাল পেশবার প্রভৃতি দক্ষিণাত্যের দুর্ভিক্ষ দস্যুদিগের আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছিল। ইহাদেরই অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্নর জেনারল লর্ড হেলিঙ্গ এর্থ মরাঠাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধে পেশবারিগণ পরাভূত ও বিতাড়িত হয় এবং ভীলগণ লর্ড ম্যালকমের অধীনে শান্ত্যভাব ধারণ করে। তদবধি ঐ স্থানের অরণ্য সকল পরিষ্কৃত হইয়াছে। ভীলগণের অনেকেই ইংরাজাধীনে সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছে। সন্দারপুরে চারিশত মালবদেশীয় ভীলসৈন্য আছে।

বর্ত্তমান কালে মালব অহিংসের দৃষ্ট বিখ্যাত। প্রতি বৎসর প্রায় ৪০০০০ হাজার বাক্স অহিংস বিদেশে রপ্তানি হয়। অনেকগুলি করদরাজ্য লইয়া পশ্চিম মালব একেল্লী গঠিত। একজন ইংরাজ এজেন্ট তৎসমস্ত তত্ত্বাবধান করেন। জাওরা, রংলাম, দিল্লনা, সীতামো প্রভৃতি রাজ্য, উজ্জয়িনী, শাহজাহানপুর, আগর, বন্দশোর, নীমচ, রামপুর, মেহিদপুর, কৈথা, তরাণা, আলোক, পিরাবা, আবর, পাঁচগাহাড়, দগ এবং গাজরার প্রভৃতি জেলা উক্ত একেল্লীর অধীন।

নিম্নলিখিত স্থানের ঠাকুরদিগের স্বত্বাধিকার গবর্নমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে,—

আজরন্দা, বররা, বিচ্ছৌদ, বিলকা, দাভি, দতানী, মুল-তিয়া, জবাসিয়া, কালুখেরা, মালগড়, নরবার, নানগাঁও,



নৌলনা, পদ্মপিন্নোদা পিন্নিরা, পিন্নোদা এবং শিবগড়। উপরোক্ত স্থানসমূহের ক্ষেত্রফল ১২০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ। আগরে ঐ সমস্ত স্থানের বিচারসদর। এখানকার পলিটিকাল এজেন্ট নীমচের দায়রা-জকের কার্য্য করিয়া থাকেন।

মালবক (ত্রি) ১ মালবদেশস্বকীয়। (পুং) মালবদেশবাসী। মালবগুপ্ত (পুং) আচাধ্যতেদ, রজনাত ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মালবরুদ্র (পুং) জনৈক কবি। ক্ষেমেজ্জকৃত কবিকঠাভরণে ইহার উল্লেখ আছে।

মালবর্তি (পুং) জাতিভেদ।

মালবত্ৰী (স্ত্রী) রাগিণীভেদ।

মালবানক (পুং) জাতিভেদ।

মালবিকা (স্ত্রী) মালবেষু জাতা মালব-চক্-টাপ্। ত্রি-বৃং, তেউড়ী। (রাজনিং)

মালবিটপিন্ (পুং) কুস্তীবৃক্ষ। (বৈজ্ঞকনিং)

মালবী (স্ত্রী) পাঠা, আকনাদি। (রাজনিং)

মালবায় (ত্রি) মালবদেশস্বকীয়। ২ মালবদেশবাসী।

মালবী ব্রাহ্মণ, উত্তর-পশ্চিম ভারতবাসী ব্রাহ্মণশ্রেণীর একটি শাখা। বারাগসী প্রভৃতি অঞ্চলে এই শ্রেণীর অনেকের বস-বাস দেখা যায়। তাহারা প্রধানতঃ লেখ্যবৃত্তি ও বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জন করিয়া থাকে। কেহই প্রায় বাজনাদি করে না।

মধ্য-ভারতে বড় জাতি (ছত্রাতি) ব্রাহ্মণ নামে যে ছয়টি বৃত্তর থাক আছে, তাহারাও আপনাদিগকে মালব-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। তাহারা বলেন যে, প্রায় ৩০ পুরুষ হইতে তাহারা জন্মভূমি মালব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের নানা স্থানে বাইরা বাস করিয়াছেন। জাতিতত্ত্ববিৎ মিঃ সেরিং তাহাদিগকে গুজরাতি ব্রাহ্মণের অন্ততম শাখা বলিয়া কল্পনা করেন।

তাঁহাদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, জনৈক মালবরাজ মালববাসী ব্রাহ্মণদিগকে 'কাচা ও পাকা' খাণ্ডদ্রব্য ভোজনের জন্য আদেশ করিলে, এই ব্রাহ্মণগণ অনভিমত প্রকাশ করার, রাজা তাঁহাদিগকে একটি দ্বিতলগৃহে আবদ্ধ রাখেন। রাত্রিকালে তাঁহারা দেখিলেন যে, স্থানীয় অধিবাসিগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত সেই কারাবাসের সন্নিকটস্থ পাড়ে-বাবার পূজা করিতেছে। তদর্শনে তাহারা তপ্তপূরবশ হইয়া সেই দেবতার উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের এই বিপদ হইতে মুক্তিমান করিবার জন্য বারংবার প্রার্থনা জানা-

ইলেন। পাড়ে বাবা তাঁহাদের তবস্ততিতে প্রীত হইয়া গৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেন। রাত্রিতেই এইরূপ সু-বোগ লাভ করিয়া তাহারা বারাগসী অতিমুখে পলাইয়া আইসেন। বাহারা পলাইলেন না এবং রাজদ্রব্য তক্ষণ করিলেন, তাঁহাদের সহিত তদবধি এই শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রহিয়া গেল।

মালবী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সাড়ে তেরটি গোত্র প্রচলিত আছে। ভরবাদ চৌবে, পরানর দৌবে, আঙ্গিরস চৌবে, ভার্গব চৌবে প্রভৃতি গোত্র ও উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ অথেনী। শান্তিয়া দৌবে, কাশ্রপ চৌবে, কোৎস দুবে প্রভৃতি যজুর্বেদী। বৎস, ব্যাস ও গোতম তিবারী, লোহিত তিবারী ও কোণ্ডিয়া-গোত্রধারী ব্রাহ্মণগণ সামবেদী। পরে ইহাদের মধ্যে কাত্যায়ন পাঠকও ও মৈত্রেয় গোত্ররূপে প্রবেশ লাভ করেন। বিবাহাদি ক্রিয়ায় ইহারা অন্ত্যাত্ত ব্রাহ্মণের মত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মথুরার চৌবে ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পোরোহিত্য করেন।

মালব্য (পুং) ১ মালবরাজ-পুত্র। ২ মহাপুরুষভেদ।

"ভজবুধেন বলিনা মালব্যো দৈত্যপুংজ্যো।" (বৃহৎসং ৬৯২)

মালসাট (দেশজ) মল্লদিগের বুদ্ধাড়বর।

মালসিয়ান, পঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধর জেলার একটি নগর। অক্ষা° ৩১°৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৩' ১৫" পূঃ।

মালসিরা, বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত সোলাপুর জেলার একটি মহকুমা। ভূপরিমাণ ৫৭৪ বর্গ মাইল। এই জেলায় ৬৯টি গ্রাম আছে। এখানে জঙ্গল ভাগ অতি কম। নদীর মধ্যে নীরা ও ভীমা প্রধান। জলবায়ু মন্দ নহে। অধিকাংশ ভূমি কৃষ্ণবর্ণ। এখানে নানা প্রকার শস্ত জন্মে।

মালসী (স্ত্রী) মল-স্বার্থে অণু, মলং ত্ততি নাশয়তি সো-ড-টীপ্। কেশপুষ্পবৃক্ষ। (শব্দচক্রিকা) ২ রাগিণীবিশেষ, এই রাগিণী মালবরাগের পত্নী।

"ধামুর্বা মালসী রামকিরী চ সিদ্ধুড়া তথা।

অশ্ববারী ভৈরবী চ মালবস্ত প্রয়া ইমাঃ ॥" (হারীত)

মতান্তরে এই রাগিণী মেঘরাগের পত্নী।

"ললিতা মালসী গোড়ী নাটী দেবকিরী তথা।

মেঘরাগস্ত রাগিণ্যো ভবন্তীমাঃ স্তমধ্যমাঃ ॥" (সঙ্গীতদামাং)

এই রাগিণীর গানসময় শরৎ অর্থাৎ শক্ৰোখান হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গা পূজা পর্য্যন্ত এই রাগিণী গান করা বাইতে পারে। বৃষ্টির জন্য হস্তের উদ্দেশে যে মহোৎসব হয়, তাহাকে শক্ৰোখান কহে। এই উৎসব উপলক্ষে তাজ মাসের শুরুপক্ষের দ্বাদশী হইতে আশ্বিনের তৃতীয়া নবমী পর্য্যন্ত এই রাগিণী-গানের প্রসঙ্গ সমর।



“ইচ্ছোথানাং সমারভ্য যাবদুগামহোংসবম্।  
গেয়া ভবেদ্বুধৈনিত্যাং মালসী সা মনোহরা ॥” (সঙ্গীতদা.)  
আরও লিখিত আছে, সাংকালে এই রাগিণী গান করা  
যাইতে পারে।

“গান্ধারী দীপিকা চৈব কল্যাণী পুরবী তথা।  
অশ্বারী কানড়া চ গোৱী কেন্দারপাহিড়া ॥  
মাধবী মালতী নাটী ভূপালী সিদ্ধুড়া তথা।  
সায়াহ্নে রাগিণীরেতা প্রগায়ন্তি চতুর্দশ ॥” (সঙ্গীতদা.)  
গান্ধারী, দীপিকা, কল্যাণী, পুরবী, অশ্বারী, কানড়া,  
গোৱী, কেন্দার, পাহিড়া, মাধবী, মালতী, নাটী, ভূপালী ও  
সিদ্ধুড়া এই চতুর্দশ রাগিণী সাংকালে গান করিবে।

এই রাগিণীর স্বরূপ—

“নীলারবিন্দু দলানি বালা বিধারয়ন্তী তহুদেহবন্তিঃ।

মালুরবৃক্ষস্য তলে নিষরা শোণা মুহুমালসিকা প্রদীপ্তা ॥”

(সঙ্গীতদামোদর)

মালহায়ন, গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ।

মালা (ত্ৰী) মাতি মানহেতু ঔবতীতি মা (ঋজেক্রাএবজ্ঞে।  
উণ্ ২২৮) ইতি রন, রস্য লভং টাপ্ চ। অথবা মাং  
শোভাং লাভীতি লা-ক-টাপ্। ১ শ্রেণী। পর্যায়—রাজি,  
লেখা, ততী, বীচী, আলী, আবলি, পঙ্ক্তি, ধারণী।

“দ্বিরেকমালা সবিশেষলজ্জা।” (কুমার ১ সং)

২ মন্তকতন্তু পুষ্পদাম। ইহার পর্যায়,—মালা, অক্,  
মালিকা, মালাকা, মালকা, গুণনিকা, গুণন্তিকা।

“অনধিগতপরিমালাপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা।”

(সাহিত্যদ. ১০ অ.)

৩ জপমালা। মন্ত্র জপ করিবার নিমিত্ত মালা ব্যবহৃত হয়।  
এই জপের মালা সাধারণতঃ জপমালা নামে উল্লিখিত হইয়া  
থাকে। কামনাভেদে জপমালা অনেক প্রকার হইতে পারে।  
তন্মধ্যে প্রধানতঃ তিন প্রকার জপমালারই ব্যবহার দেখিতে  
পাওয়া যায়। যথা—করমালা, বর্ণমালা ও অক্ষমালা। এই  
ত্রিবিধ জপমালার ভেদ ও জপক্রমাদির বিবরণ পূর্বেই  
উল্লিখিত হইয়াছে। [জপমালা দেখ।]

পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রে তুলসী, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি মালা-ধারণের  
ব্যবস্থা আছে। মালা ধারণ না করিলে অপরাধী হইতে  
হয়, এমন কি অতীষ্ট দেবের অগ্রসম্মতায় অবশেষে নরকেও  
গমন করিতে হয়।

“ধারণস্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবৃদ্ধয়ঃ।

নরকান্ নিবর্ততে দক্ষাঃ কোপায়িনা হরেঃ ॥” (গরুড়পু.)

ধাত্রীফল, পদ্মাক্ষ, তুলসীকাষ্ঠ বা তুলসীদল দ্বারা মালা

প্রস্তুত করিয়া সর্বাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতে হয়। বৈষ্ণব  
ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামুত্বারে মন্তকে, কর্ণে, বাহুদ্বয়ে এবং স্বয়ং  
করদ্বয়ে তুলসী-কাষ্ঠ-ভূষণ ধারণ করিবেন।

“ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ।

পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাঠৈঃ ফলৈর্ধাত্রীফলৈঃ নির্মিতা।

ধারণয়েত্তুলসীকাষ্ঠ-ভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ।

মন্তকে কর্ণয়োর্বাহোঃ করয়োশ্চ যথাক্রি ॥” (কন্দপু.)

হরির উদ্দেশে মালা নিবেদন না করিয়া ধারণ করিলে  
কোন ফল হয় না। বরং সেরূপ অবৈধভাবে মালাধারণে  
নরকভাগী হইতে হয়। সুতরাং বৈষ্ণব ব্যক্তি তুলসীমালা  
অগ্রে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ তাহা ধারণ করিবেন। মালা-  
ধারণের পূর্বে পঞ্চগব্য দ্বারা তাহা প্রক্ষালিত করিয়া পরে  
তহুপরি ইষ্ট মন্ত্র ও আটবার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। অপান্তে  
মালা ধূপিত করিয়া পরম ভক্তিসহকারে তাহার পূজা ও  
পূজান্তে এইরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। প্রার্থনামন্ত্র যথা—

“তুলসীকাষ্ঠমন্তুতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে!

বিভম্মি ভামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবলভম্ ॥

যথাস্বং বলভা বিষ্ণোনিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ম্।

তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ম্ ॥

দানে মাধাতৃকৃদ্বিষ্টো লাসি মাং হরিবলভে।

ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগন্তসে ॥”

এইরূপ প্রার্থনান্তে বিধিপূর্বক কৃষ্ণগলে মালা সমর্পণ করিয়া  
তৎপরে তাহা স্বয়ং ধারণ করিলে বৈষ্ণব ব্যক্তি বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত  
হইতে পারেন। বৈষ্ণব ব্যক্তির বক্ষে ধাত্রীফলনির্মিত মালা  
কণ্ঠদেশে ধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। মালা ধারণ না  
করিয়া বিষ্ণুপূজায় নিয়ত নিরত থাকিলেও সে ব্যক্তি কখন  
বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য হইবে না।

“ধাত্রীফলকৃতং মালাং কণ্ঠস্থং যো বহেয় হি।

বৈষ্ণবো ন স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুপূজারতো যদি ॥”

কন্দপুরাণ, গৌতমীয় পুরাণচরণপ্রসঙ্গ এবং হরিভক্তি-  
বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে তুলসী ও ধাত্রীধারণে অনন্তফল এমন  
কি মোক্ষ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

তুলসী ও ধাত্রীর ভায় সম্প্রদায়ভেদে রুদ্রাক্ষমালা-ধার-  
ণেরও বিধি আছে। লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—ভস্ম, ত্রিপুণ্ড্র  
এবং রুদ্রাক্ষমালা, এই সকল ধারণ না করিয়া শিবপূজা  
করা যায় না।

“বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালায়া।

পূজিতোহপি মহাদেবো ন শ্রান্তস্ত ফলপ্রদঃ ॥” (লিঙ্গপু.)

রুদ্রাক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে সংবৎসরপ্রদীপে লিখিত

আছে—ত্রিপুরবধের সময় কয়েক নরন হইতে কএকটি অশ্রু-  
বিন্দু ভুতলে পতিত হয়, সেই অশ্রুবিন্দু সকলই শেষে রক্তাক-  
রূপ ধারণ করে।

“ত্রিপুরস্ত বধে কালে রক্তভাক্ষোহপতন্তঃ সো।

অশ্রুণো বিন্ধতে তু রক্তাক্ষা অভবন্ ভূবি ॥” (সংবৎসরপ্রঃ)

রক্তাক অনেক প্রকার আছে। একমুখ, বিমুখ, ত্রিমুখ  
হইতে চতুর্দিশ মুখ পর্যন্ত রক্তাকের উল্লেখ পাওয়া যায়। একমুখ  
বিমুখাদি রক্তাক সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এই কারণে রঘুনন্দন  
ভিখাদিতক্কে শুধু পঞ্চমুখ রক্তাকেরই বাহ্যাদির বিবরণ  
উল্লেখ করিয়াছেন। সকল প্রকার রক্তাক-ধারণেই মানবের  
মকল হয়, পাশ দূরে যায় এবং সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। পঞ্চমুখ  
রক্তাক মূর্তিমান কালারিক্ত। এই রক্তাকধারণে অগম্যা গমন,  
অতক্ষা ভগ্ন প্রভৃতি সর্ব পাশ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

“পঞ্চমুখঃ স্বয়ং রক্তঃ কালারিণীঃ নামভ্যঃ।

অগম্যাগমনাচ্চৈব অতক্ষত চ ভক্ষণাৎ ॥

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ পঞ্চমুখঃ প্রধারণাৎ ॥”

(ভিখাদিতক্কৃত রক্তপুরাণ)

৩ নদীবিশেষ। ৪ বন্যী দূরী। (রাজনি) ৫ ভূম্যাম-  
লকী। (বৈজ্ঞকনিঃ)

মালা আঁকড়া (দেশজ) তৃণবিশেষ। (Eleusine Indica)  
মালাই চাকি (দেশজ) জাহ্নবী নদীর উপরিত্ত চক্রাকার  
অস্থিবিশেষ।

মালাকণ্ঠ (পুং) মালাকারাঃ কণ্ঠাঃ কণ্ঠকাঃ অন্ত।  
অপামার্গ। (রাজনিঃ)

মালাকণ্ঠ (পুং) শুভ্রভেদ। (Achyranthes Aspera)

মালাকন্দ (পুং) মালা গণ্ডমালানাশকঃ কন্দঃ। শাকপাথিব-  
বৎ মধ্যপদলোপী সমাসঃ। ১ মূলবিশেষ। পর্যায়—আবিল-  
কন্দ, ত্রিশিখাদলা, গ্রহিহল, পানিকন্দ, কন্দলতা। ইহার  
গুণ—মৃত্তীকু, গণ্ডমালানাশক, দীপন, শুষ্কহারক এবং বাত-  
শ্লেষ্মাপকর্ষক। (রাজনিঃ)

মালাকা (স্ত্রী) মালা এব মালা স্বার্থে কন্ ততষ্ঠাপ্। মালা।

মালাকার (পুং) মালাং করোতীতি কৃ-অণ্। ১ বর্ণসকল জাতি-  
বিশেষ। ২ মালিক, মালাকারক, চলিত মালী। পর্যায়—  
মালিক, মালাকার, পুষ্পাজীবী, বনাচ্চক, পুষ্পলাব, পুষ্পা-  
বক। (শব্দরত্নাঃ) ব্রহ্মবৈবর্তের মতে মালাকারজাতি শূদ্রার  
গর্ভে বিশ্বকর্মার ঐশ্বরে উৎপন্ন হইয়াছে। পরাশরপদ্ধতিতে  
তৈলিকীর গর্ভে কন্দকার হইতে মালাকারজাতির উৎপত্তি  
নির্দিষ্ট হইয়াছে।

“তৈলিক্যাং কন্দকারাজ মালাকারস্ত সত্যবঃ ॥” (পরাশরপঃ)

মালির গৃহে কি কি ফুল থাকিলে তাহা পর্য্যবিতদোষে  
হুই হয় না, তৎসম্বন্ধে মেকতত্ত্বের বচন এইরূপ,—

“ন পর্য্যবিতদোষোহস্তি তুলসীবিষচম্পকে।

জলজে বকুলেংগতো মালাকারগৃহেষু চ ॥” (মেকতত্ত্ব)

তুলসী, বিষদল, চম্পক, বকুল, অগস্ত্য এবং জলজাত পুষ্প  
এই সকল মালাকার বা মালীর ঘরে থাকিলে তাহা পর্য্যবিত  
দোষে অপবিত্র হয় না।

হস্তানকত্রে শনি থাকিলে মালাকার প্রভৃতি পীড়িত  
হইয়া থাকে।

“হস্তে নাশিতচাক্রিকচৌরভিবৃক্ষচিকীপগ্রাহাঃ।

বদক্যাঃ কোণলকা মালাকারাশ্চ পীড়্যন্তে ॥” (বৃহৎসংঃ ১০।৯)

মালাকার (মালী) পুষ্পবিক্রমকারী জাতিবিশেষ। প্রধা-  
নভঃ পুষ্পমালাগ্রহন এবং দেবপূজা বা বিবাহাদি শুভকর্মে  
ব্যবহারের জন্য বিক্রয়ার্থ চৌপদ, নীতি মনুর প্রভৃতি নির্মাণ  
করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। পুষ্পসজ্জারসংগ্রহের জন্য ইহারা  
আপনাপন বসন্তবনের সন্নিহিতে উদ্যান নির্মাণ করিয়া  
থাকে। ঐ পুষ্পোদ্যান মালক নামে অভিহিত।

এই জাতি কোম কোন গ্রহে অন্তর্জ বলিয়া গৃহীত হই-  
লেও প্রকৃত পক্ষে বঙ্গসমাজে নবশাখ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।  
ইহাদের স্পষ্ট জল ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণও গ্রহণ করিতে পারেন।

বাঙ্গালার মালাকারগণ আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে  
এইরূপ একটি পৌরাণিক আখ্যানিকার আশ্রয় গ্রহণ করি-  
য়াছে। তাহারা বলে, তাহাদের পূর্বপুরুষ মধুরারাজ  
কংসের সভায় ফুল বোগাইত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংসাসুরের  
নিধনার্থ মধুরাধামে উপনীত হইয়া স্বীয় বেশভূষা সম্পাদন  
করিবেন, মানস করিতেছেন, এমন সময়ে এই মালাকার  
কংসের জন্য পুষ্পমালা লইয়া বাইতেছিল। ভগবান্ তাহাকে  
ডাকিয়া স্বীয় চূড়ামুখে পুষ্পমালা জড়াইয়া দিতে বলিলেন,  
সেই বাহ্যিকরতন বিকুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ  
করিবার জন্য মালী তৎক্ষণাৎ মালা লইয়া চূড়া বাধিয়া দিল।  
কিন্তু বন্ধন দৃঢ় হইল না দেখিয়া, ভগবান্ তাহাকে স্ত্রী হারা  
দৃঢ়রূপে বাধিয়া দিতে আদেশ দিলেন। মালাকার তথায়  
অন্ত স্ত্রী না পাইয়া আপনায় যজ্ঞস্বত্র হইতে কএক গাছি  
স্ত্রী ছিঁড়িয়া সেই মালা বাধিয়াছিল। তদন্বয়ে ভগবান্ সেই  
জ্ঞানহীনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ‘যেমন জুই পৈতায়  
মর্শ না বুঝিয়া স্বীয় স্বক হইতে উদ্যোচনপূর্বক ছিঁড়িয়া  
কেলিল, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোকে অতঃপর  
মুক্ত হওয়ার করিতে হইবে।’ উদযবি ভাষায় বংশধরগণ  
উপনয়নসংস্কারবল্লিত হইয়া স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

ইহাদের বিবাহ, অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীর ইহারাও সস্ত্রাট্ জাহাজের বানশাখের রাজত্বকালে বন্ধে আসিয়া বান করিয়াছে। বান্দালার গ্রাম প্রত্যেক গ্রামেই এক বা দুই ঘর মালীর বাস দেখা যায়। ইহারা স্থানীয় অধিবাসিবর্গের আবশ্যক মত ফুল বোগাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটা থাকে চুই হয়। ১ম ফুল-কাটাশালী, ইহারা শোলায় চুপি, পুতুল এবং অলঙ্কার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ২য় দোকানী মালী—ইহারা দোকান করিয়া ফুল, ফুলের মালা এবং টোপের প্রভৃতি শোলায় খেলানো বিক্রয় করে। ফুলকাটা মালীদিগের মধ্যে আবার রাঢ়ী, বারেন্জ ও আটখুরিয়া নামক তিনটা শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ আলবারন, কান্তপ, মৌকল ও শান্তিল্য-গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের মত হইদিগেরও মগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ।

ডাঃ ওয়াইল্ড লিখিয়াছেন—ঢাকাজেলাবাসী মালীদিগের মধ্যে দুইটা বৃত্ত দল আছে। এই দুই দলে প্রকৃত কোন প্রভেদ না থাকিলেও বিবাহাদি ক্রিয়ার উহার পার্থক্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এক দলের লোক যদি অপর দলে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাকে উত্তর দলের লোক-দিগকে ভোজ দিতে হয়। কন্তাপক্ষে অধিক পণ দিতে হয় না। বাণ্যবিবাহই প্রচলিত। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। পত্নীর চরিত্রে দোষ ঘটিলে, তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয় এবং সংস্পর্শদোষহুঁত তাহারা তাহার স্বামীকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

ইহারা সকলেই বৈষ্ণব। গোলাইর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে, কিন্তু অত্যন্ত সকল কার্যে নবশাখের পুরোহিতেরা ইহাদিগের পুরোহিত্য করিয়া থাকে।

ইহারা প্রায় সব্বদে ভূমি কর্ষণ করে না। চাড়া বা উড়িয়া চাকর দিয়া আপনাপন পুস্পোদ্যান খনন করিয়া লয় এবং সময় সময় ঠিকা রোজে কৃষক লাগাইয়া স্ব স্ব জমা জমির চাঙ্গ করিয়া থাকে। পুস্পবিক্রয় ব্যতীত ইহারা বেদের স্ত্রীর গাছ গাছড়া ও ঔষধাদি বিক্রয় করে। বসন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ইহারা রোগীর বাটতে বাইরা টাকা দেয়। কখন কখন বসন্তরোগের চিকিৎসাও করিয়া থাকে।

ঢাকাবাসী মালাকারগণ এখানকার ডোমেদের মত শীতলাদেবীর পূজা করে। বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে ইহারা সস্ত্রের বসন্ত ফুটাইয়া রোগীকে আরোগ্য করিয়া ফেলে। প্রতিবৎসর চৈত্র মাসের ১ম দিবসে ইহারা আপনাপন পুস্পোদ্যানে মহাধুমধামে শীতলাদেবীর পূজা করে। এই

উৎসবকে সাধারণে মালীবাসপর্ক বলে। এই সময়ে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সকলেই নানা উপচারে শীতলাদেবীর পূজা দিয়া থাকে।

বিহারপ্রদেশবাসী মালীগণ সমাজে বিশেষ উন্নত। তথ্য ইহারা জুতার, কোইরি, কাহার প্রভৃতির সমশ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের স্পৃষ্ট জল পান করিয়া থাকেন। বান্দালার মালীদিগের সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে, ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

বান্দালার মালী অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিম ভারতবাসী মালীদিগের উৎপত্তিকাহিনী স্বতন্ত্র। ইহারা বলে যে, এক সময়ে পুস্পচরনকালে পার্শ্বতীর অঙ্গুলিতে কণ্টকবদ্ধ হয়। তিনি সেই রক্তাক্ত অঙ্গুলি লইয়া শিবকে স্বীয় যাতনার বিবরণ অবগত করিলে, শিব স্বীয় বর্ষ দ্বারা সেই কণ্টক স্থানে লেপন করিলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। মতান্তরে দেবাদিদেব স্বীয় জটাধ্য হইতে একখণ্ড চন্দন কাষ্ঠ লইয়া ঐ কণ্টকস্থান স্পর্শ করিলে সেই কণ্টক আরোগ্য হয়। এই সময়ে পার্শ্বতীর অঙ্গুলি হইতে যে রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা হইতে মালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

এই জাতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যখন সমাজে পুষ্পের ও পুস্পমালার সম-ধিক আদর বাড়িয়াছিল, সেই সময় হইতে মালী নামধারী পুস্পব্যবসারী একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর আবশ্যক হয়। বৈদিক যুগে পুষ্পের বিশেষ কোন আদর লক্ষিত হয় নাই। তৎ-কালের আর্থাগণ পুষ্প-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতেন না। পান্ডিত্য কবি হোমরের সমকালে গ্রীকদেশে বিভিন্ন পুষ্পের প্রচলন থাকিলেও পুষ্পের চাঙ্গ বা তাহার ব্যবসার কোনই উল্লেখ দেখা যায় না।

এখানে বহোলিয়া, ভাগীরথী, দিল্লীবাল, গোলে, কপূরী, কনোজিয়া ও ফুলমালী নামে ৮টা প্রধান শ্রেণী আছে। এত-দ্ভিন্ন স্থান বিশেষে দেশবাসী, পনবার, সমরি, বহলিয়ান, ভনোলী, ভবানী, কজি, মোহর, মেঘিয়ান, মুলান, পেমনি-রান, রাজপুরিয়া, খোলিয়া, কোটা, কচ্ছমালী, খটরা, হদিয়া, মাথুর, মেবাভী, দিলবারী, ফুলমালী, সুরাব, সৈনী, কচ্ছি, প্রভৃতি কতকগুলি স্বতন্ত্র থাকে আছে। ইহাদিগের মধ্যেও প্রভৃতি কতকগুলি স্বতন্ত্র থাকে আছে। ইহাদিগের মধ্যেও মগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। এমন কি, কন্তা যদি মাতা, মাতা-মহী বা পিতামহীর সমগোত্রীয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করা সমাজবিষিদ্ধ।

বাণ্যবিবাহ প্রস্তুত। কিন্তু অসমর্থ পক্ষে বর্ষীয়সীরও বিবাহ হইতে দেখা যায়। দ্বা জীবিত থাকিতে শ্রালিকাকে বিবাহ

করিতে পারে। বিধবা এবং পরিত্যক্তা পত্নীর “শাগাই বা ধরীচা” প্রথার পুনর্বিবাহে কোন বাধা নাই। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দেবরবিবাহও প্রচলিত আছে।

এখানকার মালীগণ শাক্ত। দেবী, কালী, মহাকালী প্রভৃতি শক্তির উপাসনা ইহারা বিশেষ ধুমধামের সহিত সমাধা করে। এতদ্বির অধোনাথ, নরসিংদেব ও পাঁচপীরের পূজার ইহাদিগকে বিশেষ ভক্তিমান দেখা যায়। ফকখাবাদের মালীগণ কুরেনা নামক গ্রামদেবতার উপাসনাকালে ছাগাদি উৎসর্গ করে। বিবাহ এবং জাতকর্মে প্রধানতঃ কুরেনার পূজা হইয়া থাকে।

এখানেও ইহারা শীতলা দেবীর পূজারিরূপে কার্য করে। বালক-বালিকার টীকা দেওয়া এবং বসন্তরোগে চিকিৎসা করা ইহাদের অজ্ঞাত কার্য। অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা সন্ন্যাসীর অভাবে ইহারা গ্রামদেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। হিন্দুসমাজে ইহাদের স্থান নিতান্ত হেয় নহে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের নিকট ইহারা পক খাদ্য ভোজন করিয়া থাকে।

প্রাচীন গল্পে মালীপুত্রই অনেক সময়ে নায়করূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সাধারণে এইরূপ একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে—

“মালী চাহে বর্ষাণা ধোঁবোঁ চাহে ধূপ।

সাহ চাহে বোলনা চোর চাহে চূপ ॥”

বোম্বাই প্রদেশেও বিভিন্ন শ্রেণীর মালীর বাস আছে। ইহারা সাধারণতঃ হলুদামালী, জিরেমালী, কহুমালী, লিঙ্গায়ৎ মালী ও ফুলমালী নামে পরিচিত। ফুলমালী ও কহুমালীগণ একত্র আহার করে বটে, কিন্তু পরস্পরে পুত্রকঙ্কার বিবাহাদি দেয় না। ইহারা মরাঠী ভাষায় কথা কয়। মরাঠা-দিগের ছাত্র ইহারা সকল পক্ষেই নিয়ম মত উপবাস ও পারণাদি করিয়া থাকে। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগের পৌরোহিত্য করে।

আলন্দী, জেজুরী, পণ্ডরপুর, তুলজাপুর প্রভৃতি ভীর্থে ইহারা ধন্যকামনায় গমন করিয়া থাকে। ভবিষ্যদ্বাণী ও ভূত প্রেতাদিতে ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

মালাকারী (স্ত্রী) মালাকারপত্নী। প্রেমিকা কামিনীরা প্রেমিকের নিকট আপন অভিপ্রায় জানাইবার উদ্দেশে ভিক্ষুকা, দাসী, ধাত্রী, মালাকারী প্রভৃতিকে দূতীরূপে প্রেরণ করিয়া থাকে।

“ভিক্ষুণিকা প্রব্রজিতা দাসী ধাত্রী কুমারিকা রজিকা।

মালাকারী দুষ্টাঙ্গনা সখী নাপিতী দূতাঃ ॥” (বৃহৎসংহিতা)

মালাকুটদস্তী (স্ত্রী) রাক্ষসী বিশেষ।

মালাকা, ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ।

[ বিস্তৃত বিবরণ মলাকা শব্দে দেখ। ]

মালাগুণ (পুং) মালাগ্রহনস্থত্র। ২ কণ্ঠহার।

মালাগুণা (স্ত্রী) অসাধা লুতাবিশেষ। (সুত্রত কল্প. অঃ)

মালাকাবৈত (দেশজ) বেত্রবিশেষ, মলাকা দ্বীপের বেত্র।

মালাগ্রহি (পুং) মালেন গ্রহিরন্ত। মালাদূর্কা, বল্লীদূর্কা।

মালাক (পুং) জনৈক রাজকবি, ইনি মালতীমাধব ও বৃন্দাবন নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

মালাতৃণ (স্ত্রী) মালাকারঃ তৃণম্। তৃণ।

মালাতৃণক (স্ত্রীং) মালাতৃণ-স্বার্থে কন্। তৃণ। চলিত, গন্ধ-খড়। (রাজনিঃ) স্তূত্যান্মির মতে এই শব্দ স্ত্রীবিদ্য ; কিন্তু

কেহ কেহ ইহাকে পুংলিঙ্গরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। এক-

মতে “মালাতৃণক তৃণে” এবং অন্য মতে “মালাতৃণকতৃণগো”

এইরূপ পাঠপার্থক্যে লিঙ্গব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার

পর্যায়—রোহিষ, ভূতি, ভূমিক, কুটুম্বক, তৃণ, পাল্ল, ছত্রা-

তিচ্ছত্র। ভাবপ্রকাশ-মতে পর্যায়—গুহবীজ, তৃতীক, স্নগন্ধ।

গুণ—জঘুর ছায় উৎকটগন্ধযুক্ত এবং ভূমিলগ্ন। (ভরত)

২ অন্ধদেশপ্রসিদ্ধ রোহিষ তৃণ। (বৈজ্ঞকনিঃ)

মালাদীপক (স্ত্রী) অর্থালঙ্কারভেদ। এক ধর্মের সহিত পক্ষীর যথাযথ পর পর সম্বন্ধ হইলে তথায় এই মালাদীপক অলঙ্কার বলা যায়।

“ধর্ম্মিণামেকধর্ম্মণ সম্বন্ধো যদ্ব্যখ্যোক্তরম্।” (সাহিত্যদঃ ১২২)

উদাহরণ যথা—

“তন্নি সঙ্গরসম্প্রাপ্তে ধনুযাসাদিতাঃ শরাঃ।

শরৈররিশিরন্তেন তুন্তয়া ত্বং ত্বয়া যশঃ ॥” (সাহিত্যদঃ ১০পঃ)

মালাদূর্কা (স্ত্রী) মালা ইব গ্রহিযুক্তা দূর্কা। দূর্কাবিশেষ,

চলিত মালাদূর্কা বা গাঁটিয়া দূর্কা। ইহার পর্যায়—বল্লীদূর্কা,

অলিদূর্কা, মালাগ্রহি, গ্রহিলা, গ্রহিদূর্কা, শূলগ্রহি, বেল্লানী,

গ্রহিমূলা, রোহংপকা, পর্ববল্লী, শিবাখ্যা। ইহার গুণ—সুন্দর,

ভিল, শিশির, পিত্তদোষনাশক এবং কফ বমি ও তৃষ্ণাপহ।

মালাধর (ত্রি) মালাধারক, মালাধারী। জিহ্বাং ভীপ্ মালাধরী।

“মালাধরী ললাটে চ ক্রুবোর্মধ্যে যশস্বিনী।” (অর্গলাস্তব),

মালাধর বহু, ত্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা প্রসিদ্ধ বঙ্গকবি, ইহার

উপাধি গুণরাজ খাঁ। [ গুণরাজ খাঁ দেখ। ]

মালাধার (পুং) দেবতা বিশেষ। (দিব্যাবঃ ২১৮)

মালাপ্রস্থ (পুং) নগরভেদ।

মালাফল (স্ত্রী) কজ্জাল। (বৈদ্যকনিঃ)

মালামনি (পুং) কজ্জাল।

মালামতু (পুং) মালাকারে লিখিত মত্ববিশেষ।

মালামত্ব (পুং) মত্ববিশেষ।

মালাময় (ত্রি) বহু মালাময়ুজ।

মালামল (দেশজ) স্বাবর অস্বাবর সম্পত্তি।

মালামী (দেশজ) মলের কার্য, কোত্তাকৃত্য।

মালারিক্তা (ত্রি) পাণী নামক সুগন্ধ পত্র। (রাজনিং)

মালালিকা (ত্রি) মালাং অলভীতি অল-ধূল, টাপ্ ইবৎ।

পূকা নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনিং)

মালালী (ত্রি) মালামলভীতি অল্ অচ্যুতভ্যে ভীপ্। পূকা।

মালাবৎ (ত্রি) মালাবিত্ততেহস্ত মালা-মত্বপ্। মালাবিশিষ্ট, মালাধারী। স্ত্রিয়াং ভীপ্, মালাবতী।

মালাশ্ৰেষ্ঠতমা (ত্রি) সূন্য পূর্ণ। (বৈত্তকনিং)

মালি (পুং) জনৈক রাজপ। গ্রামণী গন্ধকের কস্তা দেববতীর গর্ভে রাক্ষস স্ত্রুকের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। (রামাং উত্তঃঃমর্গ)

মালিক (পুং) মালান্ত পণ্যং (তদন্ত পণ্যম্ পা। ৪।৪।৫১) মালা-ঠক্। যথা মালাগ্রন্থং শিল্পমন্তেতি মালা-(শিল্পম্ পা। ৪।৪।৫৫) ইতি ঠক্। ১ মালাকার।

“শ্রুত্যাশ্রিতমালিকৈর্দত্তাং সা ক্রীবেদ্ভাটকাদিতি” (রাজতরং ৬।১৯)

২ পক্ষিভেদ। ৩ রজক। (শব্দরত্নাং) ৪ ত্রাক্ষমন্ত।

(বৈত্তকনিং) ৫ মল্লিকাবিশেষ। চত্ৰমল্লিকা। ৬ মত্ব।

৭ মণ্ডলা। ৮ অন্তরী। চলিত মশিনা।

মালিক (মারবী) ১ রাজা। ২ মনোচ্চাশাসনকর্তা। ৩ সম্বাদিকারী।

মালিক অম্বর, আবিসিনিয়া (হাব্‌সি) দেশবাসী জনৈক মুসলমান। ইনি ভারতে আসিয়া দাক্ষিণাত্যের আফদনগর-রাজবংশের (নিজামশাহী) অধীনে কর্তৃ গ্রহণ করেন। স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যের একজন প্রধান কণ্ঠচরী হইয়া উঠেন। তাহার কূটমন্ত্রণাবলে এবং যুদ্ধকৌশলে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মোগল-বাহিনীকেও পশ্চাদ্‌পদ হইতে হইয়াছিল।

আফদনগরের বীররাণী চাঁদবিবির মৃত্যুর পর ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি আফদনগর আক্রমণ করেন, এই সময়ে নিজামশাহী রাজগণ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। মালিক অম্বর উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজধানী পরিত্যাগ-পূর্বক ধিকিঁতে (আরঙ্গাবাদে) রাজপাট পরিবর্তন করেন। এখানে থাকিয়া তিনি স্বীয় ভূজবলে নিজামশাহী বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। তাহার সুশাসনে দাক্ষিণাত্য-বাসী মুসলমানগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজামশাহী বংশের উজ্জ্বল-কামনা এবং মালিক অম্বরের শৌর্য্যে বাধ্য হইয়া গুজরাত,

মালব ও দাক্ষিণাত্য হইতে তিনটা সেনাদল তাহার বিজ্ঞে প্রেরণ করেন। উভয়দিকে ভীষণ যুদ্ধের পর, মোগলবাহিনী-এর তাহার নিকট পরাজিত হইল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় আফদনগর-সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন।

ক্রমে রাজ্যমধ্যে তাহার প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনিই রাজ্যের সর্বস্বত্বা হইয়া পড়িলেন। বিদেশীয়কে রাজশক্তিপরিচালনে বহুপরিকর দেখিয়া দাক্ষিণাত্যবাসী ভারতীয় মুসলমানগণ বিদ্রোহবশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

এইরূপে স্বজাতীয় শক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি হীন-বল হইয়া পড়েন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল-সম্রাটের বশতা স্বীকারপূর্বক সম্রাটপদে আফদনগর প্রত্যর্পণ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় আফদনগর জয় এবং মালবরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের প্রিয়পুত্র খুররমের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি রাজসংসার হইতে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর পিতা বিখ্যাত শাহজী ভৌসলে তাহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

মালিক আফদ, আফদনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম উল্ মুল্কের পুত্র। ইনি ১৪২০ খৃষ্টাব্দে জুররে যাইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। [ নিজামশাহী দেখ। ]

মালিক-উৎ-তুজ্জার (মালিক হাসান,) একজন বসোরা-বাসী প্রসিদ্ধ বণিক্। মালিক-উৎ-তুজ্জার অর্থাৎ বণিকসম্রাট আফদ শাহ বাক্সীর এক জন আত্মীয় ও বন্ধু। তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া মাহিমদ্বীপের শাসনকর্তা কূতবকে পরাজয় করিয়া বলপূর্বক উক্ত স্থান অধিকার করেন। গুজরাতের সুলতান আফদ তাহাকে দমন করিবার জন্য তাহার পুত্র আফরথাকে প্রেরণ করেন এবং দীউ, গোয়া প্রভৃতির নবাবগণকে সাহায্য করিতে পত্র লিখিলেন। সকলে একত্র হইয়া ৭০০ রণতরী লইয়া জলপথে এবং স্থলপথে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। মালিক-উৎ-তুজ্জার বহুসংখ্যক যুদ্ধ-কর্তন করিয়া উপকূল ভাগে সঙ্কীর্ণ করিলেন এবং মাহিম-দ্বীপের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আফরথ ও তাহার সহযোগীগণ জলপথে ও স্থলপথে উভয়দিক্ হইতে মালিককে আক্রমণ করিলেন। আফদশাহ বাক্সী মালিকের সাহায্যের জন্য ১০০০০ হাজার সৈন্ত ও অনেক হস্তাশ্ব পাঠাইয়া দিলেন। এহ সকল যুদ্ধোপকরণ সম্বন্ধে মালিক পরাজিত হইলেন এবং জলপথে পলায়ন করিলেন। আফরথ গুজরাত অধিকার করেন।

মালিক উস্ শর্ক, জোনপুরের শর্কী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ইনি দিল্লীপতি খান্দের ভোজনকেন্দ্র প্রধান বস্ত্রী ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম খাজা জহান।

খান্দের শাসন বিশৃঙ্খলার দিল্লীর অধীনস্থ শাসনকর্তারা বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে খাজা জহান (পূর্বদিকের শাসনকর্তা) মালিক উস শর্ক উপাধি লইয়া পূর্বাঞ্চল শাসন করিতে আসিলেন।

জৌনপুরে আসিয়া ইনি খীর রাজধানী স্থাপন করেন। অচিরেই ইনি আপনাকে স্বাধীন মুগলরূপে ঘোষণা করিয়া দিল্লীর অধীনতাশাসন ছেদন করেন। ইহার দত্তকপুত্র খানরক শাহ হইতেই শরীফশের সৌভাগ্যস্বার্থ সমুদিত হইয়াছিল।

মালিক কাফুর, ষিনিজিকলীর দিল্লীর সম্রাট, আলাউদ্দীনের একজন প্রিয় ও বিখ্যাত সেনাপতি। আলাউদ্দীনের সেনাপতি আলুফ খাঁ ১২২৭ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্গত অন-হলদাড়ার রাজা কর্ণারকে পরাজয় করিয়া বুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ সমৃদ্ধিশালিনী খন্ডাং (কাবে) নগরী প্রাপ্ত হন। আলুফ খাঁ সেই স্থলে হাবসী বণিকৃদিগের নিকট হইতে কাফুর নামক একটা খোজা দাস ক্রয় করেন। এই খোজা দাসই ভবিষ্যতে আলাউদ্দীনের প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুর নামে বিখ্যাত হইয়াছিল এবং আলুফ খাঁ অর্থ দ্বারা বাহাকে ক্রয় করিয়াছিলেন,—কালে সেই ক্রীতদাসই আলুফের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাফুর দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া অচিরেই আলাউদ্দীনের মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিরাজ রামদেব তিন বৎসর পর্যন্ত দিল্লীতে করপ্রদান করেন নাই। আলাউদ্দীন তাহার বিরুদ্ধে মালিক কাফুরকে এক লক্ষ অশ্বারোহী সেনা-সহ প্রেরণ করেন। দেবগিরিরাজ রামদেব কাফুরের সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া নির্দিষ্ট রাজকর এবং ধনরত্ন উপহার দিয়া কাফুরের সহিত দিল্লী গমন করেন।

১৩০২ খৃঃ অঃ মালিক কাফুর ওরঙ্গলের হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্তা করেন। কিন্তু প্রথমবারে কাফুরের সৈন্য সকল পরাজিত হয়, এবং কাফুর অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। সেই বৎসরেই কাফুর ষিঙগ উৎসাহে সৈন্যদল লইয়া পুনরায় ওরঙ্গল আক্রমণ করেন। ওরঙ্গলরাজ লজ্জ প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত এবং বুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া সম্রাটকে নির্দিষ্ট কর দিতে স্বীকার করেন। তৎপরে আলাউদ্দীন কাফুরকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। পরবৎসর ১৩১০ খৃঃ অঃ কাফুর কর্ণাটে দারসমুদ্ররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্তা করেন।

ঐ স্থলে তৎকালে হযরাত বরানসিগের অধীনে ছিল। দাক্ষিণাত্যে ইহার ভার সম্বন্ধ রাজ্য আর ছিল না। মালিক কাফুর মলবার উপকূলে পৌঁছিয়া সেই ঘটনা স্মরণ করিবার জন্য তথার একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। কাফুর অন্নারসে দারসমুদ্র অধিকার করিয়া রাজধানী সূঠন করিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ও অতুল ঐশ্বর্যপূর্ণ শিবমন্দির তাদিয়া তথাকার প্রকাশ্য বসতিভাৱ সূঠন করিলেন। অতাপি উক্ত তত্ত্বমন্দিরের নিদর্শনদৃষ্টে তদানীন্তন হিন্দুস্বাপত্যের উচ্চল সূঠাঙ্গ পাওয়া যায়। কাফুর অপরিসীম ধনরত্ন লইয়া দিল্লী-বাত্তা করেন। ফেরিষ্টা ইতিহাসে দেখা যায় যে, কাফুর ৩১২টি হস্তী, ২০০০ অশ্ব এবং ২৪০০০ মণ স্বর্ণ ও রৌপ্য হইয়াছিলেন। কাফুর দাক্ষিণাত্যের চিরসঞ্চিত অতুল ধন-ভাণ্ডার সূঠন করিয়া দিল্লীর রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। দিল্লী এই সময়ে সৌভাগ্যের চরম সীমার আরোহণ করে। বহু সংখ্যক হস্তী ও অট্টালিকা নির্মিত হয়। আলাউদ্দীনের বার্ককা হেতু প্রিয়তম কাফুর রাজ্যের সমুদয় কার্যভার গ্রহণ করেন।

কাফুর ১৩১২ খৃঃ অঃ দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন এবং ওরঙ্গল হইতে বহু ধন রত্ন লইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসেন। আলাউদ্দীনের অন্তিম সময় আগত দেখিয়া সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র বিজিরখাঁ এবং সাদিখাঁর চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে কারা-রুদ্ধ করেন এবং আলাউদ্দীনের একখানি জাল উইল দেখা-ইয়া সম্রাটের ৭বৎসর বয়স চতুর্থ পুত্র উমুরখাঁকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং সর্বময় কর্তা হইলেন। তিনি সম্রাটের ৩য় পুত্র সবারককে হত্যা করিবার বড়বস্ত্র করিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি মবারকের প্রহরীগণের দ্বারা ১৩১৭ খৃঃ অঃ জাহাঙ্গীরী মাসে স্বীয় প্রকোষ্ঠে নিহত হন। কাফুর ৩৫ দিন মাত্র রাজপ্রতিনিধির কার্য করিয়াছিলেন।

মালিক রাজা কুরুখী, খানেশের ফকরখী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি আপনাকে খলিফা ওমারের কংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রায় ৩০ বৎসরকাল দিল্লীশ্বরের অধীনে ফাকেশের শাসনকর্তৃত্ব পরিচালন করিয়া ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

[ কুরুখী রাজবংশ দেখ। ]

মালিক (জী) মালিক মাল-ক-দ-দ-প, অত ইয়ক। ১ মন্তলা। ২ পুত্রী। ৩ গৌবালদার। ৪ পুশনাগ। ৫ মলী-বিশেষ। (মেলী) ৬ মুরা। (মালবদী) ৭ মুরা (মালব) মালিকানা (আলবী) মালিকের প্রাণ্য বৃত্তি বা খালনা। মালিক (জী) মালিকের পরিবেষ্টিত।



মালিকী ( আরবী ) মালিকের সম্পর্কীয়।

মালিন্ ( পুং ) মালা পণ্যবোধ্যাত্ত মালা ( ত্রীছাদিত্যচ্চ। পা ৫।২।১১৬ ) ইতি ইনি। ১ মালাকার। ১ রাক্ষস কু-  
কেশের পুত্র। ( রামা-উ ৬ অঃ ) মালা অস্থিমালা অস্ত্যন্তেতি  
ইনি। ৩ মহাদেব।

“মালিনপো ওহাবাসী ওহৌ মালী গুরুবিৎ।” (মহাভাঃ ১৩।১৭।৬)  
অন্তি মালান্তেতি ইনি। ( ত্রি ) ৪ মালাবৃক্ষ, মালাধারী।  
“ঐঃ পুটৈঃ কিস্তকান্ পত্ন মালিনঃ শিখিরাভ্যে।”

( রামাঃ ২।৫৬।৬ )

মালিনী ( স্ত্রী ) মালা মুণ্ডমালা অস্ত্যন্ত। অস্ত্যং বা মালা।  
( ত্রীছাদিত্যচ্চ। পা ৫।২।১১৬ ) ইতি ইনি ততো ঊপ্।  
১ মাতৃকান্তেদ। মালিন্ ঊষ্। ২ মালিকপত্নী, মালীর স্ত্রী।  
৩ চম্পানগরী। “স্রীত্যা দনৌ স কণার মালিনীঃ মগরীরধ।  
অঙ্গেশু নরশাঙ্গী। স রাতালীং সপত্নজিহা।” (মহাভাঃ ১২।৫।৬)  
৪ গৌরী। ৫ মল্লিকিনী। ৬ নদীবিশেষ। এই নদী  
হিমালয়প্রস্থের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত। ইহারই তীরে  
মহর্ষি কথের আশ্রম ছিল। এখানে নৈমক্য গর্ভে শকুন্তলার  
জন্ম হয়।

“জনন্যামান স সুনির্মলকায়াং শকুন্তলাম্।

প্রস্থে হিমবতো রমো মালিনীমভিতো নদীম্॥” (মহাভাঃ ১।৭২।৮)

৫ অগ্নিশিখা বৃক্ষ। ৬ ছরলিভা। ৭ বৃত্তভেদ। এই  
ছন্দের প্রত্যেক পাদে পঞ্চদশটি করিয়া অক্ষর থাকে। প্রথম  
ছয়টি এবং ১০ম ও ১৩শ বর্ণ লঘু, তন্নিম্ন দশমন্তই গুরু। ইহার  
লক্ষণ—“ন ন ম ধ ব য়ভেদঃ মালিনী ভোগিলোকৈঃ।”

উদাহরণ যথা—

“মৃগমদকৃতচর্চা পীতকোশের-বাস।

কুচির-শিখি-শিখণ্ডাবক্ষ্যমিঙ্গপাশ।

অমৃজ্জ্বলিতমংসে যঃশমুৎকাণয়ন্তা

মৃতমধুরিপুলীলা মালিনী পাতু রাধা॥” ( ছন্দোমঃ )

৮ অপ্সরোবিশেষ। ( কথাসরিংগাঃ ৪৫।৩৫২ ) ৯ বৃন্দ-

মাতৃগণের অন্ততমা। ইনিই শিশুমাহিগিরের মধ্যে একটি।

“কার্কী চ হলিমা চৈব মালিনী বৃংহিলা তথা।

আখ্যা পলালা বৈমিত্র্য সৈশ্চতাঃ শিশুমাতরঃ।” (মহাঃ ৩।৫২।১০)

১০ জ্যোৎস্নার নামান্তর।

“মালিনীভোব মে নাম স্বয়ং দেবী চকার সা।” (মহাভাঃ ৪।৮২।১)

১১ রাক্ষসী ভেদ। এই রাক্ষসী বিভীষণের মাতা।

“মালিনী জনন্যামান পুত্রমেকং বিভীষণম্।” (মহাভাঃ ৩।২৭৪।১)

১২ রৌচ্য মছর মাতা। ( মার্কণ্ডেয়পুঃ ৯৮।৫-৭ ) ১৩ খেত-

কর্ণের পত্নী। ( ইরিষ্যঃ ১৮৮।৬ )

মালিনীভঙ্গ ( স্ত্রী ) ভঙ্গভেদ।

মালিন্দ্য ( পুং ) পরভেদভেদ।

মালিষ্ঠা ( স্ত্রী ) মলিন- ( বৃঃছঃ ৬।৩৮।১০ ) মলিন- ( বৃঃছঃ ৬।৩৮।১০ ) ইতি  
পা ৪।২।৮০ ) ইতি লক্ষ্যশিক্ষায় গ্যত্র্যভ্যঃ। অথবা মলি-  
নস্ত ভাব ইত্যর্থে মলিন-ভ্য। মলিনতা।

“ভোগ্যবাপেন মালিষ্ঠা মেতুং মধ্যগতংপি লঃ।

ন শকাতে স্ব পক্ষেন প্রতিমেক্ষুরিবামলঃ।”

আকাশ ও পানের বর্ণনাফলে কবিগণ মালিষ্ঠ বর্ণ  
করিয়া থাকেন। অলঙ্কার-শাস্ত্র ইহা “কবিসমরম্যাত্তি”  
বলিয়া উল্লিখিত।

“মালিষ্ঠা বোয়ি পাশে বশনি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্যাঃ।”

( সাহিত্যদর্পণ )

২ ময়লা। ৩ কলুষ। ৪ কুপ্রভাতি।

মালিমগুন, সহ্যদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। ( মহাঃ ৩২।১১ )

মালিম্ ( আরবী ) পোতচালক ( Pilot )।

মালিমুৎ ( আরবী ) ১ ধনসম্পত্তি। ২ ভাগ্য।

মালিয়া, বোম্বাই প্রদেশে গুজরাতের অন্তর্গত কাঠিয়ারাড-  
বিভাগের একটি জমিদারী। ভূপরিমাণ ১০৩ বর্গমাইল। এখানে  
ইক্ষু ও তুলা গচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার বর্তমান  
শাসনকর্তার উপাধি ঠাকুর, তিনি রাজপুতজাতীয়। তিনি  
বীরপুর বিভাগে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং স্বয়ং রাজকাৰ্য্যাদি  
পয়্যালোচনা করেন।

মালিবন্ত, জনৈক ঋষি। ( মহাঃ ৩০।৩৩ )

মালিবন্তক, সহ্যদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। ( মহাঃ ৩১।৪২ )

মালিবান, সহ্যদ্রিবর্ণিত রাজত্ব। ( মহাঃ ৩৩।১১, ১২, ৪ )

মালী ( দেশজ ) মালাকার। পুষ্করিক্রমী। যাহারা ফুল ও  
ফুলগাছ প্রভৃতি বিক্রয় করে।

মালীদ ( ইংরাজী ) ধাতুবিশেষ ( Molybdena )।

মালীনগর, বঙ্গদেশে দরভাঙ্গা জেলায় একটি নগর। অক্ষাঃ  
২৫°৫২'৩০" উঃ, দ্রাঘিঃ এবং ৮৫°৪২'৩০" পূঃ। গঙ্গাকীর্নদীর  
উত্তরতীরে অবস্থিত। এখানে মহাদেবের একটি বড় মন্দির  
আছে, উহা ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে নিশ্চিত হয়। এখানে প্রতিবৎসর  
রামনবমীর সময় একটি বড় মেলা হয় এবং তৎপলক্ষে  
বহুযাত্রীর সমাগম ও প্রভূত বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী হয়।

মালীম ( ত্রি ) ১ মালাসম্বন্ধীয়। ২ মালাকারসম্বন্ধি।

মালু ( পুং ) মৃ ( ত্রো রশ্চ লঃ। উৎ ১।৫ ) ইতি বাহুলকাৎ  
ঞ। ১ পত্রলতা। ২ নারী। ( মেদিনী )

মালুক ( পুং ) কৃষ্ণাঙ্কক, চলিত কালবাহুই। ২ ঈষৎখ্যেত  
রাজহংসঃ। ( বৈজ্ঞকনিঃ )



মালুকাছদ (পুং) অশাস্তক বৃক্ষ। (বৈষ্ণবকনিং)

মালুদ, বৌদ্ধমতে অক্ষার্ক-সংখ্যাত্তেব।

মালুধান (পুং) মালু মরণং বিদধাতীতি ধা লুঃ। মাতুলাহি, চলিত মালুয়াসাপ। অষ্ট নাগাস্তর্গত নাগবিশেষ।

‘মালুধানশ্চিৎসপে মহাপথেহপি দৃষ্টতে ॥’ (হারাবলী)

মালুক (পুং) কৃষ্ণাঙ্কক, কৃষ্ণপত্র তুলসী। (রাজনিং)

মালুধনী (স্ত্রী) লতাবিশেষ। (বৈষ্ণবকনিং)

মালুম্ (আরবী) অবগতি।

মালুর (পুং) মাং পরেবাং বৃক্ষান্তরাণাং ত্রিঃ প্রভাবঃ লুনাভীতি লুঞ-বাহুলক্যং রং। ১ বিষ্ণুবৃক্ষ।

‘স বারনারী-কুচনক্ষিতোপমং

দদর্শ মালুরকলং পচেলিমম্ ॥’ (নৈষধ ১১২৪)

ইহার পর্যায়—বিষ, মহাকপিশ্ব, শ্রীফল, গোহরীতকী, পুতিবাত, মাল্লয়া, মহাকল। (বৈদ্যকরত্নমাং) ভাবপ্রকাশ-মতে বিষ, শাণ্ডিয়া, শৈলু ও শ্রীফল। ২ কপিশ্ববৃক্ষ। (রাজনিং)

মালুর, মহিমুর-রাজ্যে কোলার জেলায় একটা তালুক। ভূ-পরিমাণ ১৫৪ বর্গ মাইল।

২ কোলার জেলার একটা গ্রাম। পূর্বে ইহার নাম মল্লিক-পুর ছিল। ১৬শ শতাব্দে এহ স্থান হরকোটের গৌড় সর্দারের অধিকারে থাকে। পরে বিজাপুরের মুসলমানদিগের শাসনাধীন থাকিয়া মরাঠাদিগের অধিকারে আইসে এবং হায়দার আলীর সময়ে মহিমুরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মালে, (মাল্) রাজমহল-শৈলমালাবানী পার্শ্বত্যা জাতি-বিশেষ। জাতিতত্ত্ববিদগণ ওরাওন জাতির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য নিরীক্ষণ করিয়া, ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় শাখাসম্বৃত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্থানবিশেষে ইহারা মাল, সামারিয়া মালে, শবর পাহাড়িয়া, সোরিয়া, সামিল পাহাড়িয়া, আসল পাহাড়িয়া ও সন্ধি নামে পরিচিত। ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য অনুধাবন করিলে, ইহাদিগকে স্পষ্টতঃই সেহ পণ্ডিতধারী বনবাসী শবর জাতিরই একটা শাখা বলিয়া অনুমান হয়।

ইহারা খর্ষাকৃতি, ঘোর ক্রোধবর্ণ এবং দৃঢ়কায়। বাঙ্গালা এবং তদঙ্গিয় পর্বতবাসী মাল ও মালপাহাড়ী জাতি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাদের নাসিকা অনেকাংশে নিগ্রো-জাতির অনুরূপ। ইহাদের কথিত ভাষায়ও অনুনাসিক স্বরের আধিক্য উপলব্ধি হয়।

• বনমণ্ডিত পর্বতবন্ধে বাসহেতু অত্যন্ত পর্বতবাসী জাতির ভ্রাম্য হইরা দুর্বল ছিল। যখন পাঠান ও মোগল-রাজগণ বাঙ্গালার মুসলমানের বিরুদ্ধ-বৈরত্যা উদ্ভটন করিয়াছিল,—

যখন রাজমহলে মুসলমান নবাবগণের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনও এই মালী জাতি আপনাদের বস্ত্র স্বাধীনতারক্ষার সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা মারা-মমতাপ্রভৃ হইয়া পরস্পরে আত্মবিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাপনিই বলহীন হইয়া পড়িতেছিল।

প্রভূত সতিপত্তিশালী মোগল-শক্তির শাসনশৃঙ্খলার আয়ত্তীভূত না হইলেও, ইহারা সেই বস্ত্র বস্ত্রতার মধ্যেও শাসনকার্যের আবশ্যকতা অনুভব করে। ইহারা আপনাদের পার্শ্বত্যা নিকেতনের সাহুদেয় সমতলক্ষেত্রবাসী জমিদারগণের কার্যপরস্পরা লক্ষ্য করিয়া তদনুকরণে স্ব স্ব অধিকারগত বনরাজ্যের পরিচালনবিধি নির্ধারিত করিয়া লইয়াছিল। প্রত্যেক পর্বতের এক একটা তল্লার (পরগণার) এক বা দুই জন সর্দার নিযুক্ত থাকিত। ঐ সর্দারদিগের অধীনে প্রতিগ্রামে এক এক জন মাঁঝিয়া গ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য নিরূপিত করিত।

সর্দারগণ সাধারণ মালে অপেক্ষা অনেকাংশে সুসভ্য ছিল। পর্বতবাসীরা সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া লুণ্ঠনাদি উপদ্রব না করে, তজ্জন্ত তাহারা পার্শ্ববর্তী জমিদারবর্গের নিকট হইতে আয়গীর প্রাপ্ত হইত। ঐ সকল জায়গীরে বাস করিয়া তাহারা যে অর্থোপার্জন করিত, তদ্বারা তাহারা পার্শ্বত্যা গিরিপথ-সমূহে এক একটা ধান স্থাপিত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে জমিদার বা সামন্ত-রাজগণও পাহাড়ীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ সীমান্তে চৌকী সংরক্ষিত করিতেন।

প্রতিবৎসর দশহরা উৎসবের সময় মালে-সর্দারগণ আপনাপন অধীনস্থ মাঁঝদিগকে সঙ্গে লইয়া সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। জমিদার কর্তৃক পুনর্বার শাস্তিরক্ষার বন্দোবস্ত যথারীতি স্থিরীকৃত হইলে পর জমিদারগণ তাহাদিগকে আকর্ষিতোজন করাইয়া এবং এক একটা নুতন পাগড়ী দিয়া বিদায় দিয়া থাকেন।

বহুকাল হইতে এইরূপে দেশের শাসনকার্য নিরূপিত হওয়ায় পার্শ্বত্যা মালে এবং সমতলদেশবাসী জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও দৌহর্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জমিদারগণ বিখ্যাসম্বাদকতা করিয়া ইহাদিগের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করে। তাহারা বাৎসরিক ভোজের দিন উপস্থিত কতকগুলি সর্দার ও মাঁঝদিগকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া নিহত করে। তদবধি ইহারা জমিদারদিগের উপর বিরক্ত হইয়া গিরিপথকণ্ঠলির রক্ষাতার পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই সময় হইতে মালে-জাতির অত্যন্ত চার আরম্ভ হয়। ইহারা দলে দলে সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইয়া তৎকালকার প্রজাবর্ণের সর্বত্র লুপ্ত করিয়া লইয়া যাইত। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূমিকারিগণ স্ব স্ব প্রজাবর্ণকে ইহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত বর্ষে এখানে দ্রুতিক উপস্থিত হওয়ার চৌকীদারগণ পরিত্যক্তাধি পরিভাগ করিয়া পলায়ন করে। সঙ্গে সঙ্গে মালে-জাতিরও অজ্ঞাতার বিভণ্ড বাড়িয়া উঠে। ইহারা ক্রমে রাজমহলের পার্শ্বভাগে হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সমগ্রস্থানের গ্রামকন্যাদি আশাহীয়া দিয়া লুপ্ত করিতে থাকে। বাঁতিদারগণ লুপ্তনের অংশ পাইবার আশায় ইহাদিগকে সময় সময় সহায়তা করিত। ইহাদের ঔদ্ধত্য-দর্শনে জমিদারগণও শঙ্কিত হইয়াছিলেন। বণিকগণ রাজিকালে গঙ্গাবক্ষে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে পারিত না। একরূপ অবস্থায় তৎপ্রদেশে একরূপ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।

মুসলমান নবাবদিগের জায় ইংরাজ-গবর্নেন্ট ও ইহাদের অত্যাচারদমনে বদ্ধপরিকর হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ক্রকের অধীনে বনবুদ্ধকুলী একটা পদাতিক সেনাদল মালে-দস্যাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। ইংরাজ-সেনাদল সেই দুর-রোহ পর্তুকে আরোহণ করিয়া লুণ্ঠিত মালেদিগের বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারে নাই, বরং ইহাদের বিবাক্ত বাণে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই-রূপে বৃথা সেনাকর দেখিয়া ইংরাজ-সেনানী মালেজাতিকে বণীভূত না করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হন।

এই দারুণ অরাজকতার সময় ইংরাজের পত্রবাহকগণ (Mail-runners) রাজমহল-শৈলমালার সান্নিদেশ দিয়া তেলিয়া-গড়ী-সকটে গমনাগমন করিত। বিদ্রোহী মালেগণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উপযুপরি কএকটা পত্রবাহককে নিহত করিলে, ইংরাজ-গবর্নেন্ট ঘটকদিগের দমনে চেষ্টা পান। এই সময়ে রাজমহলের সেনাধ্যক্ষ কাপ্তেন ব্রাউনের পরামর্শ মতে সর্দার ও মাঁঝদিগকে পূর্ববৎ স্ব স্ব পদে ও শক্তিতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয়। ইংরাজ-গবর্নেন্ট দস্যাবৃত্তিদমনের জন্ত সীমান্তবাসী সর্দারদিগকে অর্থসাহায্য করিতেও স্বীকৃত হন। উক্ত বর্ষে ব্রাউন সাহেবের প্রার্থনা গবর্নেন্টকর্তৃক অমুমোদিত হইলে, স্বাক্ষরীতি কার্য্যারম্ভ হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মালেদিগের অধিকৃত পার্শ্বভাগে ভাগলপুরের তাৎকালিক রাজসংগ্রাহক মিঃ অগাষ্টাস্ ক্রিভলাণ্ডের শাসনাধীনে রক্ষিত হইয়াছিল। ক্রিভলাণ্ডের সদর ব্যবহারে অধিকাংশ সর্দার ও মাঁঝ অল্পকালের মধ্যেই তাহার বণীভূত হয়। তিনি তখনকার বক্তব্য ওয়ারেন হেস্টিংসকে লিখিয়া এই মালেজাতি হইতে একটা সেনাদল সংগঠনে প্রেরণ পান।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সেনাধ্যক্ষের পরামর্শ মতে তীরখারী মালে-সেনাদল গবর্নেন্টের দ্বারা গঠিত হয়। এই সেনাদলের নাম 'দি ভাগলপুর হিল্ রেজিমেন্ট'। লেফটেন্যান্ট লিউটেন্যান্ট (Lieut. Blaw) তাহাদের নায়ক হইয়া কুচকাওয়াজ শিক্ষা দেন। উক্ত বর্ষে এই সেনাদল একটা পার্শ্বভাগেই দমন করিয়া বিশেষ সুখ্যাতিলাভ হইয়াছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের পর এই সেনাদলকে বিদায় দেওয়া হয়।

এই সেনাদলের মধ্যে অপর্যাপ্ত সৈনিকদিগের বিচার জন্ত মিক্রিভলাণ্ড একটা শাসনসমিতি সংগঠন করেন। উহা প্রথমে সামরিক বিচারসভা ও পরে পার্শ্বভাগসমিতি নামে কথিত হয়। ক্রিভলাণ্ডের পরামর্শ-মতে উহা বৎসরে দুইবার আহূত হইত। উহার নিয়মাবলী ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১ ধারায় গঠিত হয়। পরে উহা বৎসরে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ১ ধারা ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২২ আইনে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট সামান্য দোষের জন্ত মালেদিগকে বিচারার্থী করিতে সক্ষম নহেন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্রিভলাণ্ড মালেদিগকে বৎসে রাবিবার জন্ত ভূমিদানের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে তিনি প্রত্যেক মালেসর্দারকে ১ শত হইতে ৩ শত বিঘা পতিত জমি নিষ্কর-রূপে এবং প্রত্যেক সাধারণ মালেকে প্রাথমিক ভূমি ১০ বৎসরের জন্ত বিনা ঋজনার দিয়া যান। তিনি আরও বলেন যে, সর্দারগণ পার্শ্বভাগ-গুহাবাস ছাড়িয়া দুই মাসের মধ্যে সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বাস না করিলে তাহাদের গবর্নেন্ট প্রদত্ত বৃত্তি বন্ধ হইয়া যাইবে। ক্রিভলাণ্ডের এই প্রলোভনেও মালেগণ সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করে নাই। এই সময়ে পশ্চিম হইতে সাঁওতালগণ এখানে আসিয়া পড়ায়, মালেগণ আর পার্শ্বভাগ গহ্বর ছাড়িতে সাহস করে নাই।

মালেজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে—ভগবান্ সাত ভাইকে ধরায় বাস করিবার জন্ত পাঠান। ধরাধামে আসিয়া তাহারা একটা মহাভোজের আয়োজন করিল। তাহারা এক এক জনে এক একটা খাদ্য দ্রব্য লইল, ঐ ভক্ষ্য বস্তু হইতে তাহাদের বংশধরগণের জাতি নির্দিষ্ট হইল। তন্মধ্যে ছাগমাংসাণী হইতে হিন্দু, শূকর ব্যতীত সর্ব-মাংসাণী হইতে মুসলমান, শূকরমাংসাণী হইতে ক্রিভলাণ্ড এবং কদর প্রভৃতি নিষ্কৃত জাতির উদ্ভব হয়। • উহাদিগের মধ্যে বড় ভাই পীড়িত থাকায় কিছুই ভক্ষণ করিতে পারে নাই, তাহার জন্ত একটা বস্ত্র পাতে সর্বপ্রকার মাংস ও খাদ্য দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছিল। অপর সকলে তাহাকে সর্বাঙ্গী

জ্ঞানে পর্তে রাখিয়া স্ব স্ব অভিপ্রেত স্থানে চলিয়া গেল। বড় ভাই এইরূপে জাতিচ্যুত হইয়া পর্তে বাস করিতে থাকে। তাহারই বংশধরগণ ‘মালে’ নামে পরিচিত হয়। হো ও ‘মুণ্ডা’জাতির মধ্যেও এইরূপ একটা প্রবাদ আছে, এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, মালেগণ হিন্দুজাতির সংস্পর্শে আসিয়া সভ্যতাশিক্ষাকরণান্তর আপনাদিগকে হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি অসভ্য জাতির সমকক্ষ ও একপিতার সমান বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইতেছে।

ইহারা ওরাওন্ জাতির জ্ঞান নিবিদ্ধ পথ্যার বাদ দিয়া বিবাহ করে। গোত্র বা থাক নির্দেশে বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। বিবাহের পূর্বে জী ও পুরুষে পরস্পরে স্বচ্ছন্দচিত্তে মনোমত পতিপত্নী পছন্দ করিয়া বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারে। কস্তাপণ সাধারণতঃ যৌবনে পদার্পণ করিয়া আপনাপন বর বাছিয়া লয়। বিবাহের পূর্বে এইরূপ সন্ধান-স্থাপন দোষাবহ নহে। প্রণয়িসুগলের এই অসম্বন্ধ প্রণয়ে যদি বালিকার গর্ভ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাদের কৃত দুষ্টব্রতের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জীববলি দেওয়া হইয়া থাকে এবং অবিলম্বে ঐ কস্তার বিবাহ দেওয়া হয়।

ঘটকে (সিধু) প্রথমে পাত্তপাত্রী নির্ণয় করিয়া বর ও কস্তাপক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করে। উভয় পক্ষের মতামত এবং কস্তাপণ স্থির হইলে, শুভদিনে বিবাহলয় ধাৰ্য্য হয়। ঐ দিন বর স্বজনগণে পরিবৃত্ত হইয়া কস্তাগৃহে যায়। সঙ্গে কস্তাপণ ও বিবাহতোজের অস্ত্র ছাগ লইয়া বাহিতে হয়। কখন কখন কস্তাপক্ষে আবশ্যিক হইলে সিধুর হস্তে পূর্কাক্তে কস্তাপণ পাঠান হইয়া থাকে।

বিবাহ-স্থলে উপনীত হইলে বর পূর্বমুখে এবং কস্তাকে পশ্চিমমুখে বসাইয়া রাখে। ঐ সময়ে সখীগণ আসিয়া কস্তার কবরীবন্ধন ও বেশ পরিবর্তন করিয়া দেয়। তদনন্তর কস্তাকর্তা আসিয়া স্বীয় কস্তার হস্তধারণপূর্বক রূপগুণবর্ণনাসহকারে বরের হস্তে কস্তা সম্ভ্রদান করে এবং কস্তাকেও স্বামীর প্রতি সদয় ও সরল ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকে। অতঃপর সিধু আসিয়া বরের দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি সিন্দুরে ভূবাইয়া কস্তার কপালে পাঁচটা ফোঁটা কাটিয়া দেয়। পরে কস্তার অঙ্গুলি লইয়া বরের কপালেও ঐরূপ পাঁচটা ফোঁটা দিয়া থাকে। শেষে তোপধ্বনি করিয়া বিবাহকাৰ্য্য সম্পন্ন করে। বর ও কস্তার সম্মিলন-পরিচায়ক এক পাত্র ভোজনের পর, উপস্থিত কুটুম্ব-সাধারণকে উত্তমরূপে ভোজ্য দেওয়া হয়।

ইহাদের মধ্যেও বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। জী বন্ধা, দুষ্টচরিত্রা ও গৃহকর্মে অঙ্গমা হইলে অথবা অপর যে

কোন কারণেই হউক বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। পক্ষান্তর যদি জীর কোন দোষ দেখে, তাহা হইলে স্বামী পূর্ব-প্রদত্ত কস্তাপণ কিরিয়া পায়; কিন্তু স্বামী যদি স্বীয় জীর দোষ প্রমাণ করিতে না পারে, তাহা হইলে পনের টাকা বাজে-আপ্ত হয়। জী যদি স্বইচ্ছায় স্বামীকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পিতা টাকা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। বিবাহবন্ধন-চ্ছেদনকালে রমণীকে একটা শালপত্র বা একখণ্ড হুতা ছুই টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। পরে ঐ রমণীর মাথায় এক বড়া জল ঢালিয়া দেয়। সম্বন্ধচ্ছেদ চুকিয়া গেলে ঐ রমণী আবার বিবাহ করিতে পারে।

ইহারা ঘোর পৌত্তলিক। অসভ্য জাতির প্রসিদ্ধ পঞ্চা-চার ব্রতাবলম্বন করিয়া ইহারা নানা দেবদেবতার উপাসনা করে। প্রত্যেক গৃহস্থের বাসভবনের সম্মুখে একটা কাঠ-খণ্ড প্রোথিত থাকে। কৃষিকাণ্ডের সময় এবং কোন বিপৎপাত হইলে ঐ কাঠখণ্ডে সিন্দুর, তৈল প্রভৃতি লেপন করিয়া ছাগ, মুরগী প্রভৃতি বলি দিয়া পূজা করা হয়। পূজার সময় গ্রামের লোক তথায় উপস্থিত হয় এবং সর্দারগণ পৌরো-হিত্য করে। ঐ কাঠপুতলি ধর্মের গোঁসাই (হৃদ্যদেব)-রূপে পূজিত হন। মঙ্গ চোলাই-কালে, অথবা গ্রামে ব্যাত্র, কিংবা সংক্রামক রোগ প্রভৃতির উপদ্রব ঘটিলে একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর বৃক্ষতলে স্থাপন করিয়া ইহারা রক্ষী দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এতদ্বিন্ন ১০ খানি গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে চালনাদেবতার পূজা হয়। উক্ত প্রতিমূর্তিও কৃষ্ণপ্রস্তর-গঠিত। চালনাদের পূজার সময় ছাগ, শূকর ও গোত্রবলি হইয়া থাকে। এইরূপে বাশ, পাথর ও কাঠখণ্ড লইয়া ইহারা পো গোঁসাই, ঘারগোঁসাই (বার বার), কুল গোঁসাই, গুনোগোঁসাই, চাম্দা গোঁসাই প্রভৃতির পূজা করে। সকল পূজার মধ্যে চাম্দা গোঁসাইর পূজার বিশেষ ধুমধাম হয়। এই উৎসবের সময় ইহারা তিনটা সপতাক বংশদণ্ড বাসভবনের সম্মুখে প্রোথিত করিয়া চাম্দার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করে। ১ম বংশদণ্ডে ৯০টা, ২য় টীতে ৬০ এবং ৩য় বংশে ২০টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা সংলগ্ন থাকে। বংশদণ্ডের উপরিদেশ ময়ূবপুচ্ছে আবৃত। এই পূজায় ১২টা শূকর ও ১২টা ছাগলি আবশ্যিক।

গ্রামের মোড়ল ব্যতীত নাইরা, দেমানো ও চেরিগদিগকে কোমকোন কর্ম্মে পৌরোহিত্য করিতে দেখা যায়। ঐ সকলের মধ্যে দেমানোরাই অধিকতর শক্তিশালী এবং সাধারণের পূজার্ত। সাধারণের বিশ্বাস,—ইহারা ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান্। ভূত-তাড়ান, রোগ ঝাড়ান প্রভৃতি বিষয়ে ইহারা বিলক্ষণ পটু। কোন ব্যক্তির নৃপাড়া হইলে, কো দেবতার

একোপে সেই রোগ হইয়াছে এবং কিরূপ পণ্ড উৎসর্গ করিলে তাঁহার জ্বরের উপশম হইবে, দেমানোরা তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়। ইহারা গলায় কড়িয় মালা ধারণ করে এবং হরিদ্রা ভক্ষণ করে না।

মালেকা শব্দেহের সমাধি দেয়। মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত খুঁড়িয়া মৃত ব্যক্তিকে উত্তরশিরে ভেলার পাতার উপর শোয়াইয়া পুতিয়া কেল। সর্পাঘাত বা কোন বীভৎস ব্যাপারে মৃত্যু ঘটিলে এবং দেমানোগণকে মৃত্যুর পর জঙ্গলে নিক্ষেপ করা হয়। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ সকলকে গ্রাম মধ্যে পুতিয়া রাখিলে, তাহাদের প্রেতযোনি আসিয়া গ্রামে উপদ্রব করিতে পারে। মৃত্যুশোচের পক্ষম দিনে ইহারা আত্মীয়বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ার। ইহাদের মধ্যে ঐ বাৎসরিক ও বাৎসরিক আত্মের বিধি আছে। অবশ্যই তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে নহে। এই বাৎসরিক বা বার্ষিক পিণ্ডদান সময়ে দেমানোগণ মৃতব্যক্তির জ্ঞান সাজিয়া, মৃতব্যক্তির আত্মীর নিকট হইতে অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করে। ইহাদের বিশ্বাস, দেমানো স্রীত হইয়া বে সকল দ্রব্য প্রার্থনা করে, তাহাতেই সেই মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মার তৃপ্তিসাধন হইবে। অতঃপর সাধারণের সহিত দেমানোগণকেও খাওয়ান হইয়া থাকে।

পক্ষতের শিখরদেশে প্রায় সমতল স্থান দেখিয়া ইহারা বংশধরের দ্বারা গৃহ নির্মাণ করে। পার্শ্বতীর বহুভাগ পোড়া-ইয়া ইহারা 'খুম' প্রথায় কৃষিকর্ম নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা গো, শূকর প্রভৃতি কোনরূপ নিমিত্ত মাংস ও পরের উচ্ছিন্ন ভক্ষণ করিতে ঘৃণা বোধ করে না। মগ্ধপানে ইহাদের বিশেষ অমুরাগ দেখা যায়।

মালেকগাঁও, বোম্বাই প্রদেশে নাসিকজেলার একটা মহকুমা, ক্ষেত্রফল ৭৭৫ বর্গমাইল। ইহাতে একটা প্রধান নগর ও ১৪৩টা গ্রাম আছে। প্রধান নগরের নাম মালেকগাঁও। উত্তর প্রদেশ পক্ষতময় এবং দক্ষিণপ্রদেশ সমতল। এইস্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। মধ্যস্থলে গির্গা নদী নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এখানে বৎসরে গড়ে ২২ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। পেছারী যুদ্ধের সময়ে মালেকগাঁও আরবসৈন্যদ্বারা অধিকৃত ছিল। ইংরাজ সেনানী কর্ণেল মাক্ ডাউএল ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নগর ও দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু যুদ্ধে ২০০ ইংরাজ সৈন্য হত হয়। আরবেরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জলপথে পলায়ন করে। নরশঙ্কর নামক জনৈক আরব-সর্দার কর্তৃক ১৭৪০ খৃঃ অব্দে এখানকার দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, মিল্লাখরের প্রেরিত কোন স্থপতি দ্বারা উহার নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

মালেকা (দ্রী) মল-টক্ তত্ঠাপ্। মূলেনা। (রসমাং) ইহার বিশেষ বিবরণ মূলেনাশব্দে দ্রষ্টব্য।

মালেকোটলা, পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ একটা করদ রাজ্য। অক্ষা° ৩০°২৪' হইতে ৫০°৪১' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°৪২' হইতে ৭৫°৪২'-১৪' পূঃ। ক্ষেত্রফল ১৬৪ বর্গমাইল।

এই স্থানের নবাব আফগান-বংশীয়। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ মোগল-সম্রাটগণের অধীনে সরহিন্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। পরে ১৮শ শতাব্দীতে মোগল-সম্রাটের অবসানকালে তাঁহার ক্রমে স্বাধীন হইয়াছিলেন। ১৭৩২ খৃঃ মালেকোটলার নবাব জমালখাঁ জালন্ধর দোয়াবে অবস্থিত বাদশাহ- (মোগল) সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া পাতিয়ালায় শিখরাজ আলাসিংহের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, পরে ১৭৬১ খৃঃ অব্দে জমালখাঁ আফগানশাহ ছরাণীর পক্ষ হইয়া শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, ইহাতে আফগানশাহ সন্তুষ্ট হইয়া জমালখাঁকে সরহিন্দে শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকার করেন। ইহার ফলে জমালখাঁর বংশধরগণকে নিকটবর্তী শিখগণের অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবশেষে জমালখাঁও শিখদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। তৎপরে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে ভিখনখাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আফগান শাহ ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলে, পাতিয়ালা-রাজ অমরসিংহ ভিখনখাঁর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ভিখন অমরসিংহের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া সন্ধি করিলেন। সন্ধির পর হইতে ভিখন খাঁ অনেকবার শিখদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহার প্রতাপকার্যে পাতিয়ালাপতি রাজা সাহেবসিংহ মালেকোটলার নবাবকে সাহায্য করিয়া বাহাডুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পরে ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে নানকের বংশধর বেদি সাহেবসিংহ মালেকোটলার নবাবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। পরিশেষে সন্ধি হইলে যুদ্ধ মিটিয়া যায়। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দ হইতে মরাঠাগণ এই প্রদেশে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। যখন ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে হোলকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন মালেকোটলার নবাব ইংরাজগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রণজিৎসিংহ মালেকোটলা অধিকার করিবার উদ্যোগ করিলে ইংরাজ-সৈন্য নবাবের সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজদূত মেটকাক্ সাহেবের সহনয়নসত্ত্বেও রণজিৎসিংহ ১৮০৮ খৃঃ অব্দে মালেকোটলার নবাবের নিকট হইতে ১০০০০ টাকা বলপূর্বক আদায় করেন। পরে কর্ণেল অষ্টরলোনি ১৮০৯

থুঃ অনেক রণজিতের সহিত নক্ষি করিয়া মালোর-কোটগার নবাবের সাহায্য করেন।

তুলা, চিনি, অহিফেন, তিসি, তামাক, রক্তম ও নানাবিধ শস্ত এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য।

এখানকার বর্তমান নবাব ইব্রাহিম আলি খাঁ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। নবাবের রাজত্ব বাণিজ্য শুক উঠাইয়া দেওয়ার ইংরাজেরা নবাবকে ক্ষতিপূরণরূপে বার্ষিক ২৫০০ প্রদান করেন। নবাবের সৈন্যসংখ্যা ৭৬ অশ্বারোহী, ২০০ পদা-তিক, ৮৮১ কামান এবং ১৬ জন গোলন্দাজ। নবাব ইংরাজ-দিগের নিকট সম্মান স্বরূপ ১১১ টি ভোপ পাইয়া থাকেন।

মালো (মালো পাটনী), বাঙ্গালার মোকাবেহী ও মংশ-জীবিজাতি বিশেষ। ইহারা কৈবর্ত বা ভীর (ভীর) জাতি হইতে স্বতন্ত্র। সম্ভবতঃ মার্গব (মোকাবেহী মার্গ) শব্দ হইতে এই মালোজাতির নামকরণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ববিদগণ ইহাদের বোর কৃষ্ণবর্ণ, খর্বাকার এবং বলিষ্ঠ গঠন দেখিয়া ইহাদিগকে ত্রাবিড়ীয়জাতির বংশধর এবং গাঙ্গেয় ববীপের আদিম অধিবাসী বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের কৌকড়ান চুল, সর গৌর ও দাঁড়ি, ওষ্ঠ পুরু ও বিদূত। ক্ষুদ্র নাসা এবং বৃহৎ নাসারন্ধ্র প্রভৃতি উক্ত অনুমানের প্রতিযোগী প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ না থাকার, ইহাদিগকে বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী বলিয়াই মনে হয়।

হিন্দু আচার-ব্যবহার ও ধর্মকর্মাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহারা অনেক পরিমাণে তজ্জাতির অশুভের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিয়াছে। এমন কি, ইহাদের মধ্যে আলিমান (আলখারন), বাণখাষি, বঙ্গশাখি, ভরণখাষি, ধোঁড়াখাষি, কাণ্ডিকখাষি, কুলীনরাশি, মেঘরাশি, পদ্মরাশি, পুরিরাশি, সিংহরাশি, শিবরাশি ও উদখি প্রভৃতি যে সকল গোত্র প্রচলিত আছে, তাহাও এই অনুকরণের ফল বলা যায়।

অনেকে মংশজীবী রাজবংশীয়দিগকে ইহাদের শাখা বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা কোচ-জাতীয়, মালোদিগের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কাটার বা ব্যাপারী মালো নামে আর একটি শ্রেণী আছে। উহারা মাছ ধরে না। কিন্তু মাছ কাটিয়া ওজন করিয়া বিক্রয় করে। উহারা মালো জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বী।

ইহাদের মধ্যে, সগোত্রে বা মাতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত পিতৃপ্রতিবন্ধকতা বাদ করিয়া বিবাহ দিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। কজাপন সাধারণতঃ

এক শত টাকার অধিক হয় না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিবাহ-প্রণালীর অনুকরণে ইহাদেরও বিবাহকাণ্ড সম্পন্ন হইয়া থাকে। বহুবিবাহও প্রচলিত আছে, কিন্তু কলিতা জাতি-ভিন্ন অপর কাহাকেও দ্বিতীয় দাররূপে গ্রহণ করিবার কোন-রূপ বিধিই দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্রমশঃ অসচ্ছরিত হইলে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা এবং জাতিচ্যুতা হইয়া থাকে।

ইহারা প্রধানতঃ বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। গৌসাইয়্য ইহাদের দীক্ষাগুরু। পতিত ভ্রাক্ষণগণ সাধারণতঃ ইহাদের গোত্রোচিতা করিয়া থাকে। যে সকল নদীতে ইহারা নোকা বাহিয়া বা মাছ ধরিয়া জীবিকা অর্জন করে, সেই সকল নদীকে ইহারা বিশেষ ভক্তিসহকারে সময়ে সময়ে পূজা দিয়া থাকে। শ্রাবণমাসের মহোৎসবে মালকুমারীর পূজা দেওয়া হয়। ঐ সময়ে বুড়াবুড়িকে বোড়শোপচারে পরিতুষ্ট করা হইয়া থাকে এবং খাজা খিজিরের উদ্দেশে নদীতে বা পুকুরিগীতে প্রদীপ ভাসান হয়।

নদীতীরেই ইহারা প্রধানতঃ শবদাহ করে। শবের ভস্মরাশি ও নাভিদেশ নদীগর্ভেই নিক্ষেপ হয়। ত্রিশ দিনে শ্রাদ্ধ কার্য সমাধা হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধান্তে জাতিভোজনাদি হয়। তৎপরে এক বৎসর কাল, প্রতি মাসে এক একটা মাসিক এবং বর্ষে বর্ষে বার্ষিক শ্রাদ্ধ সমাহিত হইয়া থাকে। কখন কখন মাসিক শ্রাদ্ধগুলি একত্র বার্ষিক শ্রাদ্ধ-কালেই নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। কোন ব্যক্তির অগম্যতে মৃত্যু হইলে চতুর্থ দিবসে একটা এবং ৩১শ দিনে শেষ শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

হিন্দুসমাজে ইহারা বিশেষ ছেদ। ভ্রাক্ষণগণ ইহাদের স্পৃহ জল গ্রহণ করেন না। ইহারা কৈবর্ত ও ভীর জাতি অপেক্ষা নীচ।

মালোক, জন্মক প্রাচীন কবি।

মালোজি, রেণুকাস্তোত্রপ্রণেতা।

মালোপমা (জী) অলঙ্কারভেদ। যথার এক উপনয়ের বহু উপমান দৃষ্ট হয়, তাহার মালোপমা অলঙ্কার হইয়া থাকে।

ইহার লক্ষণ—“মালোপমা যদেকস্তোপমানং বহু দৃশ্যতে।”

উদাহরণ—“বারিজেনেব সরসী শশিনেব নিশীথিনী।

দৌবনেব বসিতা নরেন জীর্নোহরা ॥” (সাহিত্যম্ ১০)

মাল্য (জী) মালেবেতি মাল্য-চতুর্ল্ল্যাদিবাৎ ব্যঞ্ ১ পুঙ্গ।

“যথা চানেন মাল্যেন বাসিতঃ তিলসর্বপদ্ ॥” (মহাভা ০ ষোড়শ ১০ অঃ) ২ পুঙ্গলক্ষ। ইহার গুণ—

“বুধ্যং দৌলিকমাহুধ্যং কাম্যং পুষ্টিবলপ্রদম্।

দৌমন্তমলক্ষ্মীং গন্ধমাণ্যনিবেষণম্।” (চরক ২ ০ অঃ)

৩ মন্তকতন্ত পুষ্পকান। (অমর) [ইহার পর্যায়াদি মালা শব্দে ব্রহ্মণ্য।]

দেবতাকে মালা পুষ্পাদি দান করিলে অশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। মালাদাতা ভক্তিপূরক দেবতাদিগকে মালা-দানে কুট করিয়া অস্ত্রমে বর্গবাসের অধিকারী হন। পুরাণা-ধিতে মালাদানের বহু ফলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। নারসিংহপুরাণে লিখিত আছে,—বৈষ্ণবগণ মঙ্গল জাতি-পুষ্পদ্বারা স্তব্ধর মালা রচনা করিয়া ভক্তিপূরক বিষ্ণুকে দান করিলে কোটিকল্প পঞ্চাঙ্গ বিষ্ণুলোকে রাস করিতে পারেন। জাতীপুষ্পের সহিত কর্পূরদানে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—ঈশ্বর বিকসিত মালতীমালা হরির মন্তকে দান করিলে বাজিমেষ-ফললাভ হয়। কার্তিক মাসে মালতী-মালা দ্বারা হরির অর্চনা করিলে বৈষ্ণব মৃত্যুভর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।

“মালতা কলিকামালানীষদ্বিকসিতাং হরেঃ।

“বর্গলক্ষাধিক পুষ্পং মালা কোটিগুণাধিকা॥” (হরভক্তিবি.)

“নবা শিরসি বিপ্রেক্ষ! বাজিমেষফলং লভেৎ ॥” (স্কন্দপু.)

হরিতত্ত্ববিলাসে মালার কোটি গুণ আধিক্য বলা হইয়াছে।

স্তব্ধর অগন্ধি কুমুমসমূহ দ্বারা মালা রচনা করিয়া দেব-তাকে সমর্পণ ও স্বয়ং ধারণ করিলে ধর্ম এবং স্বাস্থ্য উভয়েরই উন্নতি হয়। উত্তম মালাধারণে মানবের মানসিক ও শারী-রিক অনেক প্রকার উপকারিতার কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হই-য়াছে। মালা ধারণ করিয়া স্বয়ং তাহা আপনার গলদেশে হইতে ফেলিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ এবং বেশসমূহের বাহিরেও মালা ধারণ করা অবিধেয়।

“নান্দ্রীয়াং সন্ধিবেনায়াং নগচ্ছেন্নাপি সংবিশেৎ।

ন চৈব শ্লিথৈর্ভূমিং নান্দ্রনোহপাহরেৎ সজন্ম ॥”

“ন হি গর্ভ্যকথাং কুর্বাদ্বেহির্মাল্যং ন ধারয়েৎ।

গবাঞ্চ যানং পুঠেন সর্বত্বেষ বিগর্হিতম্ ॥” (মহুঃ ৪ অং.)

‘ন চ মালাং দ্বুতাং স্বয়মেবাপনয়েদখাননোনাপানয়েদিত্য-ভক্তি, কেশকলাপাদ্বেহির্মাল্যং ন ধারয়েদিত্য চ’ (কুম্বুক) নিজে হাতে তুলিয়া মালা ধারণ করিতে নাই। তাহাতে কোন ফল হয় না; অধিকন্তু অচিরেই শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়।

“স্বয়ং মালাং স্বয়ং পুষ্পং স্বয়ং দ্বুটক চন্দনম্।

নাশিতস্ত গৃহে কোঈং শক্রাদপি হরেৎ প্রিয়ম্ ॥” (কর্মলোচন)

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, প্রজ্ঞাসহকারে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া গন্ধকলাদি দ্বারা তাঁহাদিগের শ্রীতি উৎপাদন করিলে স্বয়ং তপস্বানু তাহাতে শ্রীত হইয়া থাকেন।

“আমন্ত্রিয়া যো বিপ্রান্ গন্ধমালৈশ্চ মানবাঃ।

তর্পয়েচ্ছুভ্রা যুক্তঃ স মাসর্জতে সনা ॥” (অগ্নিপু.)

মালা ধারণপূর্বক বহির্ক্ষেপে গমন করিতে নাই।

“বহির্মাল্যং বহির্গত্ব ভার্গবঃ সহ ভোজনম্।

বিদ্বদ্বাদঃ কৃতা বা এবেশক বিবর্জয়েৎ ॥” (কর্মপু.)

মালায়ক (পুং) ১ মদন যুক্ত। (বৈজ্ঞানিক) ২ মালা।

মালাচন্দন (স্ত্রী) সন্মানার্থ ব্যক্তির সন্মানরক্ষার্থ প্রদত্ত মালাচন্দনাদি বস্ত্র।

মালায়ুগল (পুং) মালার গুণ।

মালায়ুজীবক (পুং) মালাকার।

মালায়ুপিক (পুং) মালায়ুজীবক।

মালায়ুপুষ্প (পুং) মালাকারি পুষ্পাণ্ড। শব্দক। (রাজনি.)

মালায়ুপুষ্পিকা (স্ত্রী) মালায়ুপুষ্প-কন্ টাপ, অত ইয়ক।

শব্দপুষ্পী। (রাজনি.) [শব্দপুষ্পী দেখ।]

মালায়বৎ (পুং) মালা-মতৃপ্ মন্ত বঃ। পর্ততবিশেষ।

“সোহয়ং শৈলঃ কুতুম্বভিমাল্যাবারাম যমিন্।

নীলব্রিধঃ শ্রয়তি শিখরং নূতনস্তোরবাঃ।” (উত্তররামচরিত)

‘মালায় মালাকারতা বিভ্রতেহজ মালাবান্ বত্।’

(অমরটীকা তরত)

দিক্কাশিরোমণির মতে এই পর্তত কেতুমাল ও ইলাবৃত-বর্ষের সীমাপর্তরূপে নির্দিষ্ট। নীল ও নিবধ পর্তত পর্যন্ত ইহার বিস্তার। “উপতত্ত্বমহাভাগা মালাবন্তং মহাগিরিম্ ॥”

(মহাভাঃ ১১৫৮৩৫)

২ রাক্ষসবিশেষ। এই রাক্ষস গন্ধর্ষকতা দেববতীর গর্ভে রাক্ষস স্রবশ হইতে জন্ম গ্রহণ করে। ইহার জাতার নাম স্তমালী। এই স্তমালীর কতা নিকষার গর্ভে বিশ্ববিখ্যাত রাবণের জন্ম হয়। (রামায়ণ উঃ ৬ সঃ) ৩ মালা-বিশিষ্ট।

“শিরোরুহেযু জগ্রাহ মালাবৎস্ব ধনজয়ঃ।” (মহাভাঃ ১১৭১৩১)

স্ত্রিয়াং ভীপ্। নদীভেদ।

“স্বয়মামাসাদ্য তু চিত্রকূটং নদীক তাং মালাবতীং স্ত্রীতীর্থং ॥”

মালাবান্ (মালবান), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরি-জেলায় অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ইহার উত্তরে দেবগড় উপবিভাগ, পূর্বে সাবতবাড়ী-সামন্তরায়া, দক্ষিণে কালিখাড়ি এবং পশ্চিমে আরবোপসাগর। ভূপরিমাণ ২৩৮ বর্গমাইল।

রত্নগিরির অধিকায়ক উপকূলভাগ লইয়া এই উপ-বিভাগ গঠিত। ইহার মধ্য দিয়া কোলার ও কালাবলি খাড়ির বিস্তৃত আছে। এই উপবিভাগের মধ্যদেশ বনরাজিবিশিষ্ট নতোন্নত গিরিমালার বিস্তৃত হইলেও অভ্যন্তর ভূমণ্ডল শতক্ষেত্রময় উপত্যাকাত্মক পূর্ণ দেখা



বার। কার্দি ও কালাবলি খাড়ির সরিকটে প্রচুর ধাতু ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। মালবান উপসাগরস্থ রাজকোট অন্তরীপে বাম্পীর পোতাধি রক্ষার নিমিত্ত একটি স্থলর বন্দর আছে। কার্দি ও কালাবলি খাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্যাবাহী নৌকা লইয়া প্রায় ২০ মাইল পর্যন্ত বাওয়া বার। মালবান উপকূলস্থ দেওগড়, আচড়া ও মালাবান বন্দরে প্রভূত বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৩°৩২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩০'১০" পূঃ। মালাবান উপসাগরের সমুদ্রতটে পর্যন্তস্থল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহ বিরাজিত থাকার, পোতাধির প্রবেশের সময় বিশেষ শঙ্কিত হইয়া নৌকা চালনা করিতে হয়। এই পর্যন্তস্থ দ্বীপগুলির সর্বাগ্র-বর্তী একটি বৃহৎ দ্বীপে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সিদ্ধগড় এবং পদ্মগড় নামে অপর একটি দুর্গ বিদ্যমান। পদ্মগড় এখন ত্যাগস্থায় পতিত রহিয়াছে। উহার পশ্চাত্তী আরও একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রাচীন মালবান নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন পলি পড়িয়া এই দ্বীপ ভারত-গাজে মিশিয়া গিয়াছে এবং বর্তমান মালাবান নগরও অনেকাংশে শ্রীহরিসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাচীন নগরংশ এক্ষণে ভালবনে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। নূতন নগরের মধ্যস্থলে একটি উচ্চ ভূমির উপর রাজকোট দুর্গ অবস্থিত। উহার তিনদিকেই সমুদ্রোপকূল। মরাঠা-দস্যুগণ এই দুর্গ দুর্গে থাকিয়া আপনাদের দস্যুত্ব চরিতার্থ করিত। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে করবীরের সন্ধির পর, কোলহাপুররাজ ইংরাজকে এই দুর্গ সমর্পণ করেন। উক্ত বর্ষের শেষভাগে ইংরাজ-সেনানী লিওনেল স্মিথ এখানকার দস্যুদলকে সমূলে নির্মূল করিয়াছিলেন।

এই নগরের অতি নিকটেই লোহের খনি পাওয়া গিয়াছে। এখানে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখন বেলগামের অধিকাংশ বাণিজ্য মালাবানের পরিবর্তে বেনগুরুলা নগরেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মালাবুত্তি (পুং) পুণ্ড ও মালা বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ভাহকারী।

মালা (স্ত্রী) ভূপতি। (বৈদ্যকনিঃ)

মালাপণ (পুং) মালাবিক্রয়স্থান। কুলের দোকান।

মাল্লা (পুং) মল্ল-চাতুর্যকর্তাৎ অঞ্। বর্ষসঙ্করজাতিবিশেষ, এই জাতি লেট হইতে ধীরকন্ডার উৎপন্ন হয়। (ব্রহ্মবৈং-পুঃ)

মাল্লাবাস্তব (ত্রি) মল্ল-বাস্তব-সম্বন্ধীয়।

মাল্লাবী (স্ত্রী) মল্ল পার্শ্বে অণ্। তন্তু বী গমনং যন্ত্।

মল্লাব্রা। মল্লদিগের জীড়াপ্রদর্শনী। (হারাবলী)

মাল্লা (আরবী) ধীর ও নৌকাবাহী জাতিবিশেষের শ্রেণী-গত সংজ্ঞাতম্। বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশে নৌকাবাহী মাল্লাই মালা বা মাল্লা নামে পরিচিত হইলেও, উত্তর-ভারতের কএকটা নিকটজাতি বর্তমান কালে মাল্লা নামের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বিভিন্ন জাতিসমূহ ক্রমে মূল মালা জাতির এক একটি পৃথক্ থাকরূপে গণ্য হইতেছে। জাতিতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সেরিং সাহেব বাঙ্গালার মালাদিগের মধ্যে মাল্লা, মুরিয়া বা মুরিয়ারী, পাণ্ডবী, অথবা বধুরিয়া, চেন বা চৈ, হুরারা, গুরিরা, ভীওর, কুলবং, কেওট প্রভৃতি থাকনির্দেশ করিয়াছেন। উত্তরপশ্চিমভারতেও মাল্লা, কেওট, টোয়ার, কব্বাক, নিবাদ, কচ্ছবাহ, মাকি, কুন্তলীক বা জালক নামক স্বতন্ত্র জাতির লোকেরা নৌকাবহন ও ধীরের ব্যবসা গ্রহণ করিয়া মাল্লা বলিয়া পরিচিত হইতেছে। ইহার দ্রাবিড়ীয় মাকি জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মাল্লাগণ আপনাদিগকে বিদ্যাচলবাসী নিবাদ জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। ঋকসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতের নলোপাখ্যানে এই নিবাদ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। নলরাজের অধিকারকালে এই জাতি বিদ্যা ও ঋক পুর্নবর্তের সাহুদেশ হইতে বিদর্ভ ও কোশল রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বাস করিত। গঙ্গাভীরবর্তী শৃঙ্গবের নগরে এই জাতির বাস ছিল। শ্রীরামচন্দ্র যখন শৃঙ্গবেরপুরে আগমন করেন, তখন নিবাদরাজ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া-ছিল। মল্ল নিবাদমুত্তদিগকে মার্গব নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

বাথ্মা বা শ্রীবাস্তব মাল্লাগণ বলে, যে তাহারা শ্রীবাস্তব কাশ্য ছিল এবং শ্রীনগরে বাস করিত, তথাকার জনৈক নর-পতি তাহাদের একটি সুন্দরী কন্তার পাণিগ্রহণে অভিলষী হইলে তাহারা কন্তাদানে অসম্মতি প্রকাশ করার রাজ্যদেশে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হয়। তদবধি কোন নিবিড় পার্কৃত্য প্রদেশে আসিয়া এই নিকট বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকার্জন করার মাল্লা নামে অভিহিত হইয়াছে।

গাজের উপত্যকার পূর্বাধিবাসী মাল্লারা বলে যে, চিত্র-কূট-পার্শ্বে আদিবার সময়ে তাহাদের পূর্বপুরুষ দশরথতনয় রামচন্দ্রকে নদীপার করিয়া দিয়াছিল। রামচন্দ্র নদী উত্তীর্ণ হইয়া যে পথে অবস্থান করেন, তাহা এক্ষণে রামচৌর্য নামে খ্যাত। এখনও তথায় মাল্লাগণ পূর্ববং নদী পার করিয়া থাকে। মীর্জাপুরবাসী মাল্লাগণ তৌস (তমসা) নদীতীরবর্তী শির্বা গ্রামে থাকিয়া নৌকাবাহীর কার্য করিতেছে। বাঙ্গালীবাসী মাল্লারা বলে যে রামচন্দ্র তাহাদের দলপতির প্রতি শ্রীত হইয়া একটি অশ্ব প্রদান করেন। নিবাদদলপতি অজানতা-



বর্তমানে অধিকার সুখে লাগাম না দিয়া পুঙ্খ নেশে লাগাইয়া দেন। তদবধি তাহাদের মধ্যে নোকর পশ্চাদ্ভাগে হাল ধরিলার নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে।

উপরি উক্ত কিংবদন্তীসমূহের মূলে কোন সত্য নিহিত না থাকিলেও এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন কালে যে অনার্য নিষাদমূলক মার্গবল্যাদি নোকাবাহী কর্ত্তে নিষূক্ত ছিল, তাহারাই মুসলমান অভ্যাসের আরবীয় শব্দে অনুকরণে মাল্লা নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে যে স্বতন্ত্র শ্রেণী বিভাগ ছিল, তাহাও এক্ষণে এক একটা বিশিষ্ট থাকে পরিবর্তিত হইয়াছে। জাতিতত্ত্ববিদগণের এই ক্রমবিকাশ-কল্পনা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহা অনুমান করা যায়। নিষাদাদি নিকৃষ্ট জাতি ব্যতীত মুসলমান প্রভৃতি অপরাপর জাতির মধ্যে মাল্লা ( নাবিক ) সম্ভ্রান্তদের অস্তিত্ব দেখা যায়। বর্তমান সময়ে নিকৃষ্ট শূদ্রবর্ণের অনেক অনার্য জাতিই এই বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গালায় এক্ষণে গোব্রী, চাইন, বিন্দ, কেওট, ভীবর, মুরিয়ারি, সুরাইয়া, মালো ও কৈবর্তগণ মাল্লা নামে অভিহিত হইয়াছে।

বর্তমান আদমশুমারী হইতে জানা গিয়াছে যে, হিন্দু মাল্লাদিগের মধ্যে ৬২৫টী এবং মুসলমান মাল্লাদিগের মধ্যে ২২টী বিভিন্ন শাখা আছে। উহাদিগের মধ্যে আলীগড়ের চৌধুরিয়া, মথুরার বালিয়া, আগ্রা ও জৈনপুরী জেলার জুরিয়া, কানপুরের ভোক, আলাহাবাদের নাথু, বারাণসীর ভারমারে, গাজিপুরের ভীওর, বালিয়ার কুলবস্ত, গোরখপুরের গৌড়িয়া ও কুলবস্ত, বস্তির খেলফৌড়া মহোদর, সোণহার ও তুরৈয়া, গড়বাল জেলার ভৌটিয়া ও মহহার, লক্ষ্মৌ ও বারাণসী জেলার রাজঘাটিয়া, উনাও জেলার ধার, কৈজাবাদের খরোতিয়া এবং মুলতানপুরের খাস ও জলজুরী শাখাই প্রধান। উপরি উক্ত থাক ও শাখা ভিন্ন আলাহাবাদে ঘোষ, খেড়বিন্দ, বাধরি প্রভৃতি আরও কএকটা শাখাজাতির নাম পাওয়া যায়।

উক্ত শ্রেণীসমূহের সকলেই নিষাদজাতি-সমুদ্বৃত্ত নহে। শ্রাবস্তী মগের বাসহেতু বাথবা, শ্রীবাথব বা শ্রীবাস্তব নামে পরিচিত। চাইনগণ চর্ক নামক জাতিচ্যুত বৈশ্য জাতির একটা শাখা হইতে উৎপন্ন। মুবিয়া, কেওট, খেড়বিন্দ, নিষাদ প্রভৃতি নিষাদজাতি হইতে সমুদ্বৃত্ত।

উপরি উক্ত থাক বা শ্রেণী সকলের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। এমন কি, কেহ একত্র আহার বা ভোজন করেন না। বরোবুদ্ধ লোক লইয়া একটা পঞ্চায়ৎ গঠিত হয়। উহারা সামাজিক দোষগুণবিচারে সমর্থ। পঞ্চায়ৎ কর্ত্ত্বক জাতিচ্যুত হইলে, সেই ব্যক্তি স্বজাতি মধ্যে ভোজ দিয়া জাতিতে

উঠিতে পারে। ইহাদের মধ্যে বাল্যা ও যৌবনবিবাহ প্রচলিত আছে। বাহারা সামাজিক অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে, তাহারাই বাল্যবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী। বিবাহের পূর্বে যদি কেহ পরপুরুষে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বসমাজে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সমান জাতিতে আসক্ত হইলে বিশেষ দোষাবহ হয় না, কিন্তু যদি অন্য সমাজ বা জাতীর ব্যক্তির প্রণয়সক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ও তাহার পিতাকে জাতিচ্যুত করা হইয়া থাকে। কিন্তু জাতিবর্গকে একটা ভোজ দিলে সব আপদ চুকিয়া যায়। যুবতী পুনরায় স্বসমাজ মধ্যে বিবাহ করিতে সমর্থ হয়।

তাহাদের মধ্যে বিবাহের কোন বিশিষ্ট নিয়ম নাই। এক বংশের মধ্যে বিবাহ করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। বাহারা আপনাপন বংশানুক্রম জ্ঞাত থাকে, তাহার কখনই একরূপ বিবাহ মনোমত বলিয়া স্বীকার করে না। কিন্তু বাহারা ৪ বা ৫ পুরুষের অতিরিক্ত বংশপর্যায় স্মরণ রাখিতে পারে না, তাহারাই ভিন্ন পরিবারজ্ঞানে স্বপ্নে বিবাহ করিয়া থাকে।

তাহাদের বিবাহপদ্ধতি চহৌবা নামে খ্যাত। প্রথমে বর ও কস্তার দেখাদেখি, তৎপরে কোষ্টীমিলান ( রাশ-বরণ ) তৎপরে বর ও কস্তাকে বস্ত্রাদি উপহার দিয়া বিবাহ সম্বন্ধ দৃঢ় করা হয়। তদনন্তর গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা শুভদিন ধার্য্য করিয়া পাত্র ও পাত্রীর গাত্রে তৈলমর্দন ( তেল অবতোন ) করান হইয়া থাকে। অতঃপর লগ্নপত্র হইলে উভয়পক্ষেই আত্মীয় কুটুম্বের নিমন্ত্রণে বাহির হয়।

বরাত বা বরযাত্র কস্তাগৃহে গমন করিলে গণেশজীর পূজা হয়। ঐ গৃহদেবতা ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে অন্নদান ( দেবতা ও পিতৃপুরুষ নেওতা ) প্রভৃতি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। বর আসিয়া কস্তার গ্রামের কোন নির্দিষ্ট মঞ্চ মধ্যে ( জনবাসে ) অবস্থান করে। এখানে নাপিতানী কস্তাকে লইয়া গাঁটবন্ধন করিয়া যায়। পাঁচবার প্রদক্ষিণের পর সীমন্তে সিন্দূর দান করিয়া বিবাহকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে, বর ও কস্তা কোহাবরে ( বাসরঘর ) গমন করে। এখানে ময়ূর উন্মোচন করিয়া বরকে মিষ্টান্ন ও দধি খাইতে দেয়। এই সময়ে সমবেত কুটুম্বিনীগণ আলাপ পরিহাসাদিতে ব্যাপৃত থাকে। কস্তা স্বামিগৃহে আসিলে গঙ্গামাইর পূজা দেওয়া হয়। তৎপরে কস্তা উন্মোচিত হইলে, বিবাহের মাজলিক কলসাদি জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। সাগাই, ধরোণা ও বৈষ্ণিক ভেদে উহা ত্রিবিধ, অমীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে

পূর্ণপতিবে বরণ করাই দিদি, কিন্তু বদি দেবর অস্ত্র অর  
বরণের হয়, তাহা হইলে ঐ রমণী অপর বামী গ্রহণ  
করিতে পারে।

যদি কোন স্ত্রী বক্ষা বা গুরুত্বের অক্ষতা হয়, তাহা হইলে  
সেই স্ত্রীর সাহায্যার্থে বামী লাগাই-প্রথায় বিধবার পাণিগ্রহণ  
করিতে পারে। কিন্তু প্রথামতঃ স্ত্রীপক্ষীয় ব্যক্তিগণই  
বিধবাবিবাহ করিয়া থাকে। পুরুষগণ নৌক লইয়া দেশ-  
দেশান্তরে কালাতিপাত্ত করার, রমণীদিগের চরিত্র ভ্রষ্ট  
ভাল থাকে না। এই কারণে জাতীয় ভোজের ব্যাপার  
ও স্ত্রীভাগ এবং সাগাই বিবাহ সচরিত্র ঘটিয়া থাকে।

স্ত্রীলোক গর্ভিণী হইলে কোনরূপ ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান  
করা হয় না। পুর জন্মিলে ছয় দিনে এবং কষ্টা হইলে  
অষ্টম দিনে বস্ত্রপূজা হইয়া থাকে। অষ্টম দিনে জাতকের  
অশোচাত্ত হইলে পণ্ডিত আসিয়া বালকের রাশি নাম নির্দ্ধা-  
রণ করিয়া দেয়। আট বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক এবং  
অবিবাহিত যুবকদিগকে সমাধি দেওয়াই নিষম। অপরের  
মৃত্যুতে দাহ করিবার বিধি আছে। পুরুষের দশ দিনে দশ  
পিণ্ড এবং রমণীগণের নব্বয় দিনে নয় পিণ্ড দেওয়া হইয়া  
থাকে। মহাপাত্র বা মহাপ্রাক্ষণগণ প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান-  
কালে বাজকতা করিয়া থাকেন। বার্ষিক শ্রাদ্ধে তাহারা  
ছইটীয়াত্র পিণ্ড দেয়। পুত্রহীন ব্যক্তিদিগকেও একটা  
পিণ্ড দিবার বিধি আছে। কেহ কেহ গয়াধামে  
যাইয়া শ্রাদ্ধাদি করে। দূরদেশে মরিলে 'নারায়ণবল্লরূপ' শ্রাদ্ধ  
করা হয়।

তাহারা মহাদেব, কালী, ভগবতী, মহাবীর, গঙ্গামাই,  
মহালক্ষ্মী, মহামরস্বতী, বাটোইবাবা, মশানদেবী, পাঁচপীর,  
পরিহার, গাজি মিঞা প্রভৃতির পূজা করে। দশহরা উৎসবে  
তাহারা মহাপ্রথমে গঙ্গামাইর পূজা দিয়া থাকে। এতদ্বিধ  
রোগগ্রস্ত হইলে তাহারা বীরভিরা ঘরের পূজা করে। শীতলা  
দেবার পূজায় তাহারা মিষ্টান্ন উপহার দেয়। দূরদেশে  
যাত্রা করিতে হইলে, তাহারা মালা দিয়া নৌকাপূজা ও  
হোম করে।

মাস্ত্র (স্ত্রী) মূর্ত্তা। বিবেকহীনতা। অধৈর্য্য।

মাল্‌সা (দেশজ) মৃৎপাত্র বিশেষ। অশোচকালে এই পাত্রে  
হবিষ্য পাক করিতে হয়।

মাল্‌সাজালী (দেশজ) সরাগিজে লবণ জাল দেওয়া।

মাল্‌সাট (দেশজ) বুদ্ধার্থ আস্তান।

মাবৎ (ত্রি, মৎসঙ্গ, আহার ভূম্য। "এবা হি তে বিভূতয়  
উতয় ইত্র মাবতে।" (ঋক্‌১৮।১) 'মাবতে মৎসঙ্গশাখ।' (সায়ণ)

অমৎসং বতুপু (বতুপু, একরূপে বৃত্তবস্ত্রাঃ... হুঙ্গলি  
মাবতু উপবস্ত্রানম্। পা ৪।২৪৩৯) ভক্তের মাদেশঃ দক্ষার-  
তাকারঃ সর্বদীর্ঘধ্বজ।

মাবল, যোমাই প্রদেশান্তর্গত সাহায্যিক সন্নিহিত পুণাজেলার  
একটা মহকুমা। অব্যং ১৮৩৬- হইতে ১৯° উঃ এবং দ্রাঘিঃ  
৭২°২৬' হইতে ৭৩°৪১' পূঃ। ক্ষেত্রফল ৩৬৫ বর্গমাইল। এই  
স্থানের অধিকাংশ জঙ্গলাকীর্ণ। মুক্তিকা ধূসর ও রক্তবর্ণ, ইন্দ্রায়ণী  
এবং অম্বু। নামক ছইটা প্রধান নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত  
হইয়াছে। খাফড়, কুলী, মালী, মাক, মাক, কুশবী প্রভৃতি  
জাতি এই প্রদেশে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। হাজারদর অবস্থা  
ভত্ত ভাল নহে। সকলে মাটির ঘরে বাস করে এবং পাঁতা  
লতা দিয়া গৃহ আচ্ছাদন করে। এষ্ট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার  
রেলপথ ইহার মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। এখানকার  
পার্বত্য প্রদেশে বিশাপুর এবং লোহনগড় দুর্গের উল্লেখ্য  
দৃষ্ট হয়।

শতের মধ্যে বাজরা, জোয়ারি, নাচনি এবং কয়েক প্রকার  
রবিশস্ত উৎপন্ন হয়। কোন কোন স্থলে খাদ্য প্রচুর পরিমাণে  
জন্মে।

মাবিলম্বম্ (অব্যং) বিলম্ব না করা।

মাবলীকর, রাজ্য-প্রদেশের জিবাকোড় জেলার একটা তালুক  
ও তাহার প্রধান নগর। উক্ত তালুকে ১৪৫ বানি গ্রাম আছে।  
নগরে একটা প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট মনে হয়, এক  
সময়ে ইহা একটা শ্রীকৃষ্ণ স্থান ছিল। উক্ত দুর্গের পরিধি ছই  
মাইল এবং উহাতে ২৪টা বুকজ ও ২৪টা অশেষকার আছে।  
দুর্গের অভ্যন্তর প্রদেশে রথ্যা সকল পরস্পর সমকোণ ভাবে  
বহির্গত হইয়াছে এবং ঐ পথপার্শ্বে নারায়ণদেবের বাসবাটী ও  
উত্তান সকল বিরাজিত রহিয়াছে।

দুর্গের মধ্যস্থলে একটা প্রাচীন পাগোদা বিদ্যমান আছে।  
উহার চতুর্দিক গৃহবাটিকাগুলি রাজকর্মালয়রূপে ব্যবহৃত  
হইতেছে। দক্ষিণভাগের একটা 'কোটারম' মধ্যে রাজমংশধর-  
গণ বাস করে। দুর্গের উত্তরপূর্বকোণে সিন্ধী-খুটানদিগের  
বাসভূমি দৃষ্ট হয়।

মাবলীসৈন্য, শিবাজীর সৈন্যদলের মধ্যে এক পরাক্রান্ত যুব-  
শাসন সেনাদল। ইহাদের অমায় প্রত্যশে অরুণজবের স্থি-  
কিত সুসলমারসেনা অমেকবার রণে তক্ষ দিয়াছিল।  
ইহার শক্ত লক্ষ্য করিয়া তীরক্ষেপ করিতে পারিত। তরবারি-  
যুদ্ধেও ইহারা অপ্রতিদ্বন্দ্ব ছিল। ১৬৭০ খৃঃ দেক্কনরী আসে  
শিবাজীর আদেশ অনুসারে তানোজী মালভী তাঁহার কনিষ্ঠ  
ভ্রাতা-সুযোগীর সহযোগিতায় ১০০০ অশিক্ষিত মাবলীসৈন্য

লইয়া সিংহগড়ের দুর্গে দুর্গ আক্রমণ করিতে বাড়া করেন। স্বর্গ্যাজীর আত্মাধীনে বহুতক সৈন্ত রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট সৈন্ত-সহ সক্ষার অন্ধকারে দুর্গ-অভিমুখে অগ্রসর হন। দুর্গ পর্বতের উচ্চ প্রদেশে অবস্থিত ছিল। তানোজীর মাবলী সৈন্ত রক্ষুনিধিত সোপান দ্বারা একে একে অলঙ্কিত ভাবে পর্বতশিখরে উঠিতে লাগিল। কেবল ৩০০ মাত্র সৈন্ত উপরে আরোহণ করিয়াছে, এমন সময়ে সিংহগড়ের প্রহরিকারা তাহাদিগকে দেখিতে পাইল এবং মশালের আলোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল। তানোজী উশারাস্বর না দেখিয়া ৩০০ মাত্র সৈন্ত লইয়া ভীমবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অবিলম্বে তানোজী হত হইলে মাবলীগণ ভয়ংসাহ হইয়া রক্ষু-সোপানের দিকে পলায়ন করিতেছে, এমন সময়ে স্বর্গ্যাজী অবশিষ্ট সৈন্ত লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সৈন্তদিগকে উৎসাহিত করিয়া কহিলেন যে, পলায়নের পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে। তোমরা যে শিবাজীর পরাক্রান্ত মাবলী সৈন্ত, এক্ষণে তাহার পরিচয় প্রদান কর। ইহাতে মাবলীগণ উত্তেজিত হইয়া “হর হর বোম বোম” শব্দে নৈশনিশ্চিন্ততা বিদীর্ণ করিয়া সিংহগড় দুর্গস্থ সৈন্তগণের অভিমুখে প্রবল বেগে ধাবিত হইল। সে ভরকর বেগে রাজপুতগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। যুদ্ধে ৩০০ মাবলী এবং ৪০০ রাজপুত হত হইল। স্বর্গ্যাজী সিংহগড় অধিকার করিয়া শিবাজীকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সেই যুদ্ধ হইতেই মাবলীসৈন্তের পরাক্রম মহারাষ্ট্রে প্রথিত হইয়াছিল।

মাবেল্ল (পুং) চেরিরাঙ্গ বহুর পুত্রভেদ।

মাবেল্লক (পুং) জাতিবিশেষ।

মাশকিক (ত্রি) মা ইত্যাহতি (প্রাথহতের্ক্। পা ৪।৪।১) ইত্যত্র তদাহতি মাশকাদিভ্য উপসংখ্যানমিতি বার্তিকোকৃত-ত্যাং মাশক-ঠক্। নিবেধকর্তা। পর্যায়—প্রতিষেদ্ধা। (ত্রিকাং)

মাষ (পুং) মাষক ফলম্। মাষ-অণ্ (লুপ্ত পা। ৪।১৩৬) ইত্যস্ত ফলপাকগুণামুপসংখ্যানমিতি কাশিকোক্তেরণোলুপ্। অথবা মস-বঞ্ পূর্বোদরাদিত্যাং সাধুঃ। ১ ত্রীহিতেন্দ। বাঙ্গালা—মাষকলাই, হিন্দী—উরিধ, তেলগু—মিছুমলু, তৃণ-ধাত্তবিশেষমু, সংস্কৃত পর্যায়—কুরুবিল্ব, ধাত্তবীর, বুধাকর, মাংসল, বলাঢ়া, পিডা, পিত্তভোজন। ইহার গুণ—মিথ, বহু-মলকর, শোষণ, প্লেস্ককর, অম্লকরীষা, সহসা রক্ত ও পিত্ত-প্রকোপকর, বাতহর, গুরু, বলকর, রোচক, শ্বাস এবং শ্রম-সুখবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নিত্য সেবনীয়। (রাগনিং) ভাবপ্রকাশ-মতে ইহার গুণ,—গুরু, মধুর বিপাক, মিথ, রক্তিকর, বায়ুনাশক, অংগনগুণযুক্ত, তৃপ্তিকর, বলকর, গুরুবর্দ্ধক, শরীরের উপচর-কারক, মলমূত্রনিঃসারক, স্তম্ভবর্দ্ধক, মেদোজনক, পিত্তবর্দ্ধক,

ককর, এবং জ্বরকীল, অর্দ্রিত, বাস ও পরিণাম শূলনাশক। মাষ বা মাষকলার ডাইলের সহিত মূলকতকণ নিষিদ্ধ।

“মূলকং মাষমুপেন মধুনা চ ম তকরেন্।” (রাশবং) চতুর্দশী এবং রবিবারে মাষ ভক্ষণ করিতে নাই। ইহাতে চিররোগী এবং সপ্তজন্ম পর্যন্ত অপুত্রক হইতে হয়।

“চিররোগী চ মাষকে” ইতি “মাষমাষিষমাংসক মস্বরং নিষ-পত্রকং। তকরেন্দ্বে রবেবারে সপ্ত জন্মপুত্রক ইতি চ।”

(তিথাদিতব্য)

প্রত্যহ মাষকলারের ডাইল ব্যবহার করিতে নাই। ইহাতে স্নেহা বৃদ্ধি হয়, স্নেহা বাড়িলেই বৃদ্ধি মোটা হইয়া কমিয়া যায়। এ সবক্কে প্রবাদ,—

“অশেষশস্যমীনাশমাষমস্মি কেবলম্॥” (উত্তট)

২ পরিমাণবিশেষ। চলিত মাষ। ইহার পর্যায়—মাষক, মাস, (অবর ও তরত) হেম, ধানক। চরক, সূত্রত প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগ্রন্থে দেশভেদে মাষের পরিমাণপার্থক্য উক্ত হইয়াছে। সূত্রত-মতে, ইহার মাগধমান পাঁচ গুণা পরিমাণ। চরকমতে,—মাষমান ৬।৮ গুণা পরিমাণ। প্রুত্রত মতে ইহার কালিক মান ৫, ৭, ৮, গুণা পরিমাণ। চরক ও বৈজ্ঞানিকগ্রন্থে ইহার মান ১০ এবং ১২ গুণাঙ্কক। কোন কোন স্থলে ১২টী ধাত্তমান এবং কোথাও বা ১৮টী মাষ-কলারের মানেও ইহার পরিমাণ উক্ত হইয়াছে। পঞ্চগুণাঙ্কক, বড়গুণাঙ্কক, সপ্তগুণাঙ্কক, অষ্টগুণাঙ্কক, দশগুণাঙ্কক, দ্বাদশগুণাঙ্কক এবং শেবোক্ত বিবিধ পরিমাণ লইয়া সর্ব-সমেত এই অষ্ট প্রকার মাষ-পরিমাণ কথিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পঞ্চগুণাঙ্কক এবং কাহারও কাহারও মতে বড়-গুণাঙ্ককই কালিকমান বলিয়া উল্লিখিত। চরকমতে, দশ রক্তিকার যে মাষমান নির্দিষ্ট আছে, তাহা গোড়মাষক নামে কথিত এবং এই মাষই সর্বত্র ব্যবহৃত।\*

৩ মূর্খ। ৪ তৃণবোষভেদ। (মেঘিনী)

\* “মাষক পঞ্চভুক্তিত্তথা সপ্তকিরীতিঃ।

দশভির্দ্বাদশভিঃ রক্তিকিঃ বড়বিধো মতঃ।

অত্র কালিকমাষক পঞ্চগুণঃ স সৌত্রতঃ।

দশগুণস্ত মাষঃ স্তাৎ মাষকঃ স চ চারকঃ।

সপ্তগুণস্ত কেহপ্যাহর্মানকং মানকোবিদাঃ।

দশরক্তিকমানস্ত সৌড়মাচক্ষতেহত্র তু।

দশরক্তিকমাষেণ ব্যবহারো ভিষগিদান্।

মাবের্দশভির্দ্বাদশভিঃ মাষকঃ পরিকীর্তিতঃ।

কমারাদিনিসিহেন্ ত্রয়ামানবিধাবপি।

ভতোহষ্টাধিশক্তির্মাবৈমাষকঃ পরিকীর্তিতঃ।” (বৈদ্যক)

মাষক (পুং) মাষপ্রকারঃ মাষ-কন্। (স্থলাদিভ্যাঃ প্রকার-বচনে কন্। পা ৫।৪।৩) মাষা, পঞ্চরসিক পরিমাণ। “গুজ্জাঃ গুজ্জামাষকঃ।” (অমর) লীলাবতী গ্রন্থেও এইরূপ পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে—

“দশার্দ্ধগুজ্জং প্রবদন্তি মাষং, মাষাঙ্কৈঃ ষোড়শভিঃ কৰ্মম্।”

ভাবপ্রকাশমতে ছয় রসিকায় এক মাষ।

“ষড়্ভিঃ রসিকভিঃ স্তান্মাষকো হেমধানকো।

মাষো গুজ্জাভিরষ্টাভিঃ সপ্তভিরা ভবেৎ কচিং॥” (ভাবপ্রকাশ)

২ ত্রীহিবিশেষ। “দ্বাত্রিংশমাষকৈর্মাষঃ।” (বৈদ্যকনিঃ)

মাষকলায় (পুং) মাষসংজ্ঞাঃ কলায়ঃ শাকপাণিববৎ সমাসঃ। স্বনামখ্যাত শব্দ। (অমরটীকায় ভরত)

মাষতৈল (স্ত্রী) বাতব্যাধি-চিকিৎসায় তৈলবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ মাষকলায়, বেড়েলা, রান্না, দশমূল, যব, কুল, কুলখ, ছাগ মাংস প্রত্যেকে ১৬ পল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, কঙ্কার্থ রান্না, আলকুণী মূল, সৈন্ধব, গুলফা, এরণ্ডমূল, মুতা, জীবক, অষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বুদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা।

এই তৈল মর্দন করিলে অববাহ, অর্দ্ধাঙ্গশোথ, আক্ষেপক, অপতানক, উরুস্তম্ভ, ভুজ্জকম্প, শিরঃকম্প এবং অন্ত্রাত্ত বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং)

মাষপত্রিকা (স্ত্রী) মাষপণী। (রাজনিঃ)

মাষপণী (স্ত্রী) মাষশ পর্ণমিব পর্ণঃ যন্তাঃ, বহত্রী, ততো ভীষ্। বনমাষ। চলিত মাষাণী। ইহার পর্যায়,—হরপুচ্ছা, কাষোজী, মহানহা, (অমর) সিংহপুচ্ছা, ঋষিপ্রোক্তা, কৃষ্ণবৃন্তা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণিনী, (রত্নমালা) আর্দ্ধমাষা, মাংসমাষা, মঙ্গল্যা, হরপুচ্ছিকা, হংসমাষা, অশ্বপুচ্ছা, পাণ্ডুরা, মাষপর্ণিকা, কল্যাণী, বজ্রমূলী, শালপর্ণী, বিসারিণী, আশ্বোদ্ভবা, বহুল্লা, শরভু, স্থলভা, বনা, সিংহবিম্বা, বিশাচিকা। ইহার গুণ—তিক্তরস, বৃষা, দাহজ্বরনাশক, শুক্রবৃদ্ধিকর, বলকর, শীতল, ও পুষ্টিবদ্ধক। (রাজনিঃ) ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—শীতবীয়া, তিক্তরসধূর রস, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, দারক এবং শোথ, বায়ু, পিত্ত, অর ও রক্তবিনাশক।

মাষভুক্তবলি (পুং) মাষশ ভুক্তশ্চ তদ্ব্যক্তো বলিঃ। মাষ, তণুল ও দধিমিশ্রিত পুঞ্জোপহারবিশেষ। কেহ কেহ উক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে হরিদ্রা, ঘৃত ও মধু এই তিনটি দ্রব্যও মিশ্রিত করিয়া থাকেন। পুঞ্জোপকৃতিতে দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতা-দিগের পূজায় মাষভুক্তবলি প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। কালীকে মাষভুক্তবলিদান করিবার মন্ত্র যথা—

“ও জয়ন্তঃ কালি সর্কেশে সর্কভূতসমাবৃত্তে।

রক্ষ মাং নিজ ভূতেভ্যো বলিং গুরু শিবাগ্নয়ে॥

এষ মাষভুক্তবলিঃ ও কাল্যৈ নমঃ।” প্রার্থনা-মন্ত্র যথা—

“ও মাতর্মাতবরে দুর্গে সর্ককামার্থসাধিনি।

অনেন বলিদানেন সর্কান্ কামান্ প্রযচ্ছ মে॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

দেবতা ব্যতীত ভূতদিগকেও মাষভুক্তবলি দান করিতে হয়।

মাষবটী (স্ত্রী) বটিকৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—তুষহীন মাষকলায়ের দাইল প্রথমতঃ পেষণ করিয়া পরে হিঙ্গু, লবণ ও আদার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। এইরূপ মিশ্রণের পর বড়ী প্রস্তুত করিয়া উহা একখানা বস্ত্রে রাখিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইবে। বড়ীগুলি শুষ্ক হইলে পরে উহা তণ্ডুল তৈলে ভাজিয়া লইবে অথবা জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। এই মাষবটী বটকতুল্য গুণযুক্ত এবং অত্যন্ত রুচিকর। (ভাবপ্রঃ পূর্ব)

মাষবর্দ্ধক (পুং) মাষং বর্দ্ধয়তীতি বৃধ-গিচ-ধূল্। স্বর্ণকার।

মাষযোনি (পুং) খাত্তদ্রব্যভেদ। চলিত পাঁপড়। (বৈদ্যকনিঃ)

মাষরা (স্ত্রী) অন্নমণ্ড। (পণ্যায়মুক্তাবলী)

মাষশরাবি (পুং) মাষশরাবিণের গোত্র।

মাষশরাবিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

মাষশস্ (অব্যয়) মাষং মাষং দদা তীত্যর্থো মাস-শস্। (সিদ্ধান্তকোঃ) প্রতিমাষ, মাষ মাষ।

মাষসূপ (পুং) ভট্টমাষপ্রস্তুত যুষ। চলিত ভট্ট মাষযুষ। ইহার গুণ,—মিষ্ট, বৃষা, বায়ুনাশক, উষ্ণ, সন্তপণ, বলকর, সুবাহু, রুচিকারক। (দ্রব্যশুঃ)

মাষাদ (পুং) মাষমতীতি অদ্-অণ্। ১ কচ্ছপ। (শব্দরত্নাং) (ত্রি) ২ মাষভক্ষক।

মাষাদিক্কাথ (পুং) পক্ষাঘাতরোগপ্রযুক্ত্য কাপবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী,—মাষকলায়, আলকুণী, ভেরেণ্ডার মূল, বেড়েলা ও জটামাংস এই সকলে মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপার্থ হিঙ্গু এক মাষা ও সৈন্ধব এক মাষা। এই কাথ পান করিলে পক্ষাঘাত রোগ প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রঃ)

মাষাদিতৈল (স্ত্রী) তৈলৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—তিলতৈল ৪ সের। কঙ্কার্থ মাষকলায়, আলকুণীর বীজ, আতইচ, ভেরেণ্ডার মূল, রান্না, শতমূলী, এবং সৈন্ধব, এই সকল মিলিত ১ সের। কঙ্কার্থ মাষকলায় ১৬ সের, জল ১ মণ ২৪ সের, শেষ ১৬ সের। বেড়েলা ১৬ সের, জল ১ মণ ২৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া সেবন করিলে পক্ষাঘাত নিবৃত্তি হয়।

মাষাম (স্ত্রী) মাষকৃত অন্ন। ইহার গুণ—তৃষ্ণ, মাংসবৃদ্ধিকর, গুরু, বাতনাশক এবং বৃষা। (বৈদ্যকনিঃ)

মাষিক (পুং) ১ জীবশাক। (বৈজ্ঞানিকনিঃ) (ত্রি) মাষ-  
পরিমিত।

মাষিণ, মাষ্য (ক্লী) মাষাণং ভবনং ক্ষেত্রম্। মাষ-বিভাষা-  
তিলমাষোমভক্ষণাণ্ডাঃ। পা ৫২৮৪ ইতি যং পক্ষে ঋক্।  
মাষক্ষেত্র।

‘তিলাতৈলীনবম্মাষোমাণ্ডভক্ষণপতা।’ (অমর)

‘যথা তিলস্তক্ষেত্রং তিল্যং তৈলীনঞ্চ ভবতি তথা মাষাদীনা-  
মপি বিরূপতা বৈরূপ্যং ভবতি।’ (অমরটীঃ ভরত)

মাষেগুরি (ক্লী) মাষপিষ্টবিকৃতি। (চক্রপাণিসং)

মাষোণ (ন) (ত্রি) মাষেন উনঃ। এক মাষা পরিমাণের কম।

মাস (পুং) মাত্, মানে (সর্বধাতুভ্যোহনু। উণ্ ৪।১৮৮)  
ইত্যনু। ১ চন্দ্র। “স্বযো জ্যোতিরদধুমাস্তকুনু পরিভ্যোতনিং”  
(ঋক্ ১০।১২।৭) ‘মাসি চন্দ্রমসি’ (সারণ) মীরতেহনেনেতি  
মা (চন্দ্রে মো-ডিং। উণ্ ৪।২২৭) ইত্যর বাহুল্যকং কেবলা-  
দপি মোহসি ইত্যঙ্কলদন্তোক্তেরসি। ২ মাস। (মেদিনী)

“চতুর্থ মাসি কর্তব্যং শিশোনিজ্জন্মণং গৃহাৎ।

ষষ্ঠেইদম প্রাশনং মাসি যদেষ্টং মঙ্গলং কুলে ॥” (মহু ২।৩৮)  
(ক্লী) ৩ মাস।

“জীৱচ্ছতা মহিষাণামথো মাস্ত্রীসরাংসি মঘবাসৌম্যাপাঃ”

(ঋক্ ৫।১৯৮) ‘মাসে মাসানি’ (সারণ)

মাস (পুং) মস্ পরিমাণে ভাবে ঋক্। ১ মাস পরিমাণ,  
চলিত মাষা। মস্ততে পরিমায়তে অসৌ অনেন বেতি মস্-  
ঋক্। ১ গুরু কৃষ্ণ পক্ষদ্বয়াকু কাল, ইহা পোষ ও মাঘাদি  
দ্বাদশায়ক। মাস কালের অংশ বিশেষ। যুগ, বৎসর, ঋতু, মাস,  
দিন, দণ্ড প্রভৃতি সমস্তই অথও দণ্ডায়মান কালের অংশ।

মলমাসতবে মাসের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে,  
সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিত হইল। মাসকে প্রথমে  
চারি ভাগে বিভাগ করা যায়,—যথা ১ সৌর মাস, ২ চান্দ্র মাস,  
৩ নাক্ত্র মাস ও ৪ সাবন মাস।

১ সৌরমাস—সূর্য্য যতদিন এক রাশি ভোগ করেন, তত-  
দিন এক ‘সৌরমাস’ মাস হয়, সূর্য্যের গতি এই মাসের নিয়া-  
মক বলিয়া ইহার নাম সৌরমাস। সৌরমাস ২৯, ৩০, ৩১  
ও ৩২ দিনেও হয়। এতদপেক্ষা ন্যূনাধিক হয় না। বঙ্গ-  
দেশে সাধারণতঃ সৌরমাসের ব্যবহার আছে। সাল, শকাব্দা  
প্রভৃতি এই সৌরমাস লইয়া হইয়া থাকে।

২ চান্দ্রমাস—তিথিঘটিত মাসই চান্দ্রমাস। এই চান্দ্র-  
মাস আবার দ্বিবিধ, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র। গুরুপক্ষের  
প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এই ত্রিশ তিথিতে যে চান্দ্র-  
মাস হয়, তাহাই মুখ্যচান্দ্র। আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ

হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ত্রিশ তিথিতে যে মাস হয়, তাহা  
গৌণচান্দ্র। এই চান্দ্রমাসদ্বয়সারে সংবৎসর হইয়া থাকে।

২ নাক্ত্র-মাস—২৭টি নাক্ত্রে এক নাক্ত্র-মাস। অশ্বিনী  
নাক্ত্রের পরিমাণ ৩০ এবং ভরণী নাক্ত্রের পরিমাণ ৬৩ দণ্ড  
ইত্যাদি ক্রমে ২৭টি নাক্ত্রের পরিমাণ মিলাইয়া যে কাল  
পাওয়া যায়, তাহাট নাক্ত্র মাস। অশ্বিনী নাক্ত্র হইতে  
আরম্ভ করিয়া রেবতী নাক্ত্র পর্য্যন্ত যে কাল, তাহাই এক  
নাক্ত্র মাস।

৪ সাবনমাস—সাবনমাসও দ্বিবিধ,—সৌরসাবন ও চান্দ্র-  
সাবন। যে কোন তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশ অহো-  
রাত্রে যে মাস হয়, তাহাই সৌরসাবন। যেমন ১৫ই বৈশাখ  
হইতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ৩০ দিন এক সৌরসাবন মাস। যে  
কোন তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশ তিথিতে এক চান্দ্র-  
সাবন মাস, যেমন গুরুপক্ষের দ্বিতীয়া হইতে পরবর্তী গুরু-  
পক্ষের প্রতিপদ পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে চান্দ্রসাবন কহে।  
ইহা ভিন্ন নাক্ত্র-সাবন-মাসও হয়।\*

শাস্ত্রে যে সকল ধর্ম কন্দ্য়াদি করবার ব্যবস্থা আছে,  
তাহাতে মাস ও তিথি প্রভৃতির উল্লেখ করিতে হয়।  
মাসোল্লেখ হলে সৌর ও চান্দ্রমাসের উল্লেখ করা প্রয়ো-  
জন। এইজন্ত ইহাদের বিশেষ বিশেষ বিধান অভিহিত হই-  
য়াছে। স্নান, দান, শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি কন্দ্বে ইচ্ছামুসারে  
মাসোল্লেখ করিলে চলবে না, শাস্ত্রের নিয়মামুসারে ঐ  
সকল কার্যে মাস উল্লেখ করিতে হইবে। কোন কন্দ্বে  
কোন মাস উল্লেখ করিতে হয়, তাহার বিধান শাস্ত্রে এইরূপ  
নির্দিষ্ট হইয়াছে।

\* “চন্দ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষান্তে সূর্য্যোণ সহ যুক্তান্তে।

সম্নিকষাদধায়ন্ত্য সন্নির্কর্ষমথাপরম্ ॥

চান্দ্রাকরোবু বৈশ্বাসন্দ্রান্ত ইত্যভিধীয়তে।

সাবনে চ তথা মাসি ত্রিশংসূর্য্যোদয়াঃ স্মৃতাঃ ॥

আদিত্যরাশিভোগেন সৌরমাসঃ প্রকীর্তিতঃ।

সর্বকর্ষপরিবর্তেষু নাক্ত্র ইতি চোচ্যতে ॥

চান্দ্রাকরোঃ সন্নির্কর্ষাৎ দশাৎ। অথানন্তরং প্রতিপদমারম্ভ্য অন্তথা সন্নির্ক-  
ষারম্ভাৎ ক্রতাৎ অপরং সন্নির্কর্ষং যাবৎ তাবৎ কালচন্দ্রঃ, এতেন সন্নির্কর্ষাদি-  
সন্নির্কর্ষান্তো মাস ইতি নারায়ণোপাধায়মতং নিরন্তঃ, ত্রিশদন্তোরাজ্যায়কঃ  
সাবনঃ, আদিত্যরাশিভোগাবচ্ছিন্নঃ সৌরঃ, সপ্তবিংশতিনাক্ত্রভোগাবচ্ছিন্নো  
নাক্ত্রঃ, ইতি চতুর্বিধা মাসাঃ। তথা চ ব্রহ্মসিদ্ধান্তে—

চান্দ্রঃ শুক্রাদিন্দ্রান্তঃ সাবনস্ত্রিংশতাং দিনৈঃ।

একরাশৌ রবিধাবৎ কালং মাসঃ সভাস্বরঃ।

সর্বকর্ষপরিবর্তেষু নাক্ত্র ইতি চোচ্যতে।” (মলমাসতবে)

পূর্বেই বলিরাছি, চান্দ্রমাস বিবিধ। কৰ্ম্মবিধেবে কোম কোন স্থলে মূখ্য চান্দ্রমাসের ও কোম কোন স্থলে গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ করিতে হয়। চূড়া, উপনয়ন, বিবাহ, বাবতীর তারিক কৰ্ম্ম, অগস্ত্য উদ্দেশে অৰ্ঘ্যদান, বৈশাখ মাসে দান, দান, হবিষাদি এবং উত্তরায়ণ বিহিত পঞ্চবাগাদি, আর 'স্বর্ঘ্য অমুক রাশিতে গমন করিলে এই কৰ্ম্ম করিবে, অমুক ঋতুতে বা অমুক অরনে এই কৰ্ম্ম কর্তব্য, এইরূপ বিধিবোধিত কৰ্ম্মে সৌরমাসের উল্লেখ করিতে হইবে। সৌরমাস উল্লেখের সময় সেই মাসের নাম, আর অমুক রাশিতে স্বর্ঘ্য বর্তমান এই ভাববোধক শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। যথা "বৈশাখে মাসি মেঘরাশিষে ভাঙ্করে" ইত্যাদি। এতোক সৌর মাসোন্মেষস্থলে রাশি উল্লেখ করিতে হইবে।

স্বর্ঘ্যের মেঘরাশি ভোগ করিবার কাল বৈশাখ মাস। স্বরাশি ভোগ করিবার কাল জ্যৈষ্ঠ। এতদ্বিধি যথুনে স্বর্ঘ্য থাকিলে আষাঢ়, কর্কটে প্রাবণ, সিংহে ভাদ্র, কস্তুর আশ্বিন, তুলায় কার্তিক, বৃশ্চিকে অগ্রহায়ণ, ধনুতে পৌষ, মকরে মঘ, কুন্তে কান্তন এবং মীনে চৈত্র মাস হয়। এই ষাটশ মাসে পূৰ্ব্বোক্ত কৰ্ম্মে ষাটশ রাশির উল্লেখ হইবে।

এতদ্বিধি অস্তান্ত সকল কৰ্ম্মে চান্দ্রমাসের উল্লেখ কর্তব্য, চান্দ্রমাসোন্মেষস্থলেও কখন বা মূখ্যচান্দ্র এবং কখন গৌণ-চান্দ্রের উল্লেখ করিতে হইবে। ইহার নিয়ম এইরূপ, তিথি-বিশেষবিহিতকৰ্ম্মে অর্থাৎ পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা করিবে, 'অষ্টমীতে উপবাস করিবে, এইরূপ বিশেষ বিশেষ তিথির নাম নির্দেশপূৰ্ব্বক যে সকল কৰ্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাতে এবং ব্রহ্মপুত্রাণোক্ত কৰ্ম্ম মাঝেই গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ হইবে। জন্মতিথিপূজা, কৃষ্ণদ্বারষ্টমী, শিবরাত্রি, বারুণী, অপরা পক্ষীয়প্রাঙ্ক (আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নাম অপরা পক্ষ) এবং অষ্টকা প্রাঙ্ক প্রভৃতি কৰ্ম্মেও গৌণচান্দ্র মাস উল্লেখ হইবে। পিতা মাতা প্রভৃতির মৃত তিথিতে প্রাঙ্ক, দান, দান, গর্ভাধান, নামকরণ, পুংসবন, মীষস্তোত্রয়ন ইত্যাদি কৰ্ম্মেই মূখ্যচান্দ্র মাসের উল্লেখ আবশ্যক।

কার্তিক মাসে ও মাঘ মাসে এবং সৌরমাসে, গৌণচান্দ্র-মাসে কিংবা মূখ্যচান্দ্রমাসেও প্রাতঃদান, হবিষ্য, ও ব্রহ্মচর্যাাদি করিবে। মাসোন্মেষও তদনুসারে হইবে। কেহ কেহ বলেন, নবান্ন প্রাঙ্কে মূখ্যচান্দ্র মাসের উল্লেখ করিতে হয়।

সৌরমাসের বৈশাখ প্রভৃতি ষাটশটা নাম আছে, এই সকল মাস নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে জানা যায়। যে মাসের পূর্ণিমার বিশাখা বা অম্বরাধা নক্ষত্র যোগ হয়, তাহার নাম বৈশাখ, বিশাখানক্ষত্র সপ্তমতিত বলিরাই এই মাসের

নাম বৈশাখ। মূখ্যচান্দ্র বৈশাখের উক্ত পূর্ণিমার প্রথম পক্ষ শেষ, আর উক্ত পূর্ণিমার গৌণচান্দ্র বৈশাখের পরিসমাপ্তি। সকল মাস সম্বন্ধেই এই নিয়ম। জ্যৈষ্ঠা অথবা মূলানক্ষত্র যোগ যে মাসের পূর্ণিমার হয়, তাহাই জ্যৈষ্ঠ মাস। জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রের বিশেষ সপ্তম থাকার উক্ত মাসের নাম জ্যৈষ্ঠ। পূর্বা-বাঢ়া বা উত্তরাবাঢ়া নক্ষত্র সপ্তম যে মাসের পূর্ণিমাতে হয়, তাহাই আষাঢ়। শ্রবণা বা ধর্মিষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ যে মাসের পূর্ণিমার হয়, তাহাই শ্রাবণ। শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, অথবা উত্তরভাদ্র পদ নক্ষত্র যে মাসের পূর্ণিমার সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, তাহাই ভাদ্রমাস। রেবতী, অশ্বিনী অথবা তরুণী নক্ষত্রের যোগ যে মাসের পূর্ণিমাতে থাকে, তাহারই নাম আশ্বিন। কৃত্তিকা বা রোহিণীর যোগ যে মাসের পূর্ণিমার হয়, তাহারই নাম কার্তিক। পূর্ণিমার মৃগশিরা বা অর্জা নক্ষত্রের যোগে মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ। পুনর্বসু বা পুষ্যা যে পূর্ণিমাতে হয়, তাহার নাম পৌষ। অশ্লেষা বা মঘা নক্ষত্রযোগ যে মাসের পূর্ণিমাতে হয়, তাহার নাম মঘ। পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী অথবা হস্তা নক্ষত্র যে মাসের পূর্ণিমার মিলিত হয়, সেই মাসই ফাল্গুন। চিত্রা অথবা স্বাতী নক্ষত্র যে মাসের পূর্ণিমাতে সংযুক্ত হয়, সেই মাসই চৈত্র নামে অভিহিত।

স্মার্ত রঘুনন্দন তট্টাচার্য্য চান্দ্রমাসের এই যে নিয়ম করিয়াছেন, সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিকারও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সাধারণতঃ প্রায়ই এই নিয়মেই হইরা থাকে, ইহা বলা বাইতে পারে।

মূখ্যচান্দ্র মাসের আর একটি সাধারণ লক্ষণ এইরূপ করা বাইতে পারে। গুরুপক্ষীয় প্রতিপদের অব্যবহিত পূর্ব-ক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব অমাবস্তার চরম ক্ষণ যে সৌরমাসের মধ্যে পড়িবে, সেই গুরুপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত জিহ্মং তিথি স্বরূপ মাসই সৌরমাসের নামে অভিহিত হইবে। যথা বৈশাখ মাসে একটি অমাবস্তার শেষ হইলে পরবর্তী গুরুপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত যে মাস, তাহা মূখ্যচান্দ্র বৈশাখ। আর উক্ত গুরুপক্ষীয় প্রতিপদের পূর্ববর্তী কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে গৌণচান্দ্র বৈশাখ আরম্ভ।

পঞ্জিকার সহিত এই নিয়ম মিলাইরা দেখিলেই সহজে উহা বুঝা বাইতে পারিবে। দাদারপোপাধ্যায়ের মতে অমাবস্তা পর্যন্ত মূখ্যচান্দ্র মাস। স্মার্ত রঘুনন্দন এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, এইরূপ নিয়ম কারণে বৎসরে ৬টা বৈ চান্দ্রমাস হইতে পারে না।

সৌর এবং চান্দ্র এই বিবিধ মাসের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইল। একপে সাক্তমাস ও সাবন-মাসের প্রয়ো-

জনীয়তা প্রদর্শিত হইতেছে। অম্মনকত্র যদি শনি মঙ্গলবারে পড়ে, তাহা হইলে সেই মাস কল্পব নামে অভিহিত এবং এই মাসে মনোহুঃখভোগ করিতে হয়।

“অম্মন্যাক্রে যদি তাতাং বারৌ ভৌমশনৈশ্চরৌ।

স মাসঃ কল্পবো নাম মনোহুঃখপ্রদায়কঃ ॥” (মলমাসতত্ত্ব)  
এই বচনের মাস শব্দে নাকত্র মাস বুঝিতে হইবে।

“নক্ষত্রসজাগ্যন্নানি চেন্দোর্ম্মানেন কুর্ঘ্যাদ্ভগণাশ্রকেন ॥”

( মলমাসতত্ত্ব )

নক্ষত্রসত্ত্বে যাজ্ঞিকগণের নিকটে প্রসিদ্ধ মাস সংবৎসর-সাধ্য যাগবিশেষে মাসগণনা নাকত্রমাসের হিসাবে হইবে। সোমায়ন যাগেও এই নিয়ম। নাকত্রমাসের নামভেদ নাই অর্থাৎ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি এইরূপ সংজ্ঞা নাই। সংকল্পবাক্যে নাকত্রমাসের উল্লেখ হইবে না; সৌরমাস অথবা গোপচাক্র মাসের উল্লেখ করিবার বিধি থাকিলে তাহাই করিবে, নচেৎ মুখ্যচাক্র মাসের উল্লেখ করিবে। নিম্নলিখিত সাবন মাসের পক্ষেও এই নিয়ম। গণনা হইবে সাবন মাস অল্পমাসে, আর কর্ম্মবিশেষে কোন স্থলে সৌর ও কোন স্থলে চাক্র মাসোল্লেখ হইবে।

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, নামকরণ, চূড়াকরণ এবং উপনয়ন প্রভৃতি এবং অশৌচাদিতে দিন, মাস ও বৎসর-গণনার জ্ঞান সাবন মাসের প্রয়োজনীয়তা।

একটু বিশেষ এই, যে কক্ষের কোন নাম উল্লেখ করিবার বিশেষ কোনরূপ নিয়ম নাই, তথায় মুখ্যচাক্র মাসের উল্লেখ হইবে। কেন না মাস বলিলে মুখ্যচাক্র মাসই বোধ হয়। ‘মাস চক্রঃ তত্ভাং মাসঃ’ চক্রসম্বন্ধী এইটী, এই অর্থবোধক মাস শব্দ। চক্র গুরু ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা (মস্) পরিমাপ করেন, এইজন্য ইহার নাম মাস। অতএব মাস শব্দ চাক্র-মাসেরই বোধক।\*

\* অর্থ কক্ষবিশেষে মাসবিশেষাদিঃ—তত্র পিতামহঃ—

“আনিকৈ পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চাক্রমসঃ স্তুতঃ।

বিবাহাদৌ স্তুতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ ॥

প্রথমাদিপদঃ যাজ্ঞোহুচারপদঃ, যৎকর্ম্ম সূধ্যভোগ্যরাশ্যন্তেথেন যচ্চ বিশিষ্যাদগয়নাদিবিহিতং তৎপারকং, অয়নন্ত সৌরমাসঘটিতত্বাৎ। তচ্চ চূড়োপ-  
নয়নাদি, বিত্তীরাদিপদং সত্রপ্রভৃতিবুদ্ধিপ্রারম্ভিতায়ুর্দ্বার্য্যশৌচগর্ভাধানপুংসবন-  
সীমন্তোন্নয়ননামকরণপ্রাশননিক্তমণচূড়াদিপদং। তথাচ বিশ্বধর্ম্মোক্তরে—

অজ্ঞানকঃ প্রচারকর্ম্ম সৌরেন মাসেন সদাধ্যবস্তেৎ।

সত্রাণুপাত্তাভ্য সাবনেন সৌক্যকঃ বৎস্যাধ্যবহারকর্ম্ম ॥

অজ্ঞাননঃ অজ্ঞপয়নঃ যাত্রেতি যাবৎ। অর্থ সৌরাদিমাসবিহিতকর্ম্মাদি—

বিবাহোৎসবযজ্ঞেবু সৌরঃ মাসঃ প্রশস্যতে।

পার্ষণ্যে ষট্কালাজ্ঞে চাক্রমিষ্টং তথ্যনিকৈ ॥

XIV

বৈশাখাদি বিশেষ বিশেষ নাম করিলেই মুখ্যচাক্র বৈশাখাদি বুঝিতে হয়। সাধারণতঃ বৈশাখ মাস বলিলে লোকে সৌর বৈশাখ বুঝিয়া থাকে, কিন্তু তাহা শাস্ত্রো-  
মোদিত নহে, বৈশাখ বলিলে চাক্রবৈশাখই বুঝিতে হইবে। জীমূতবাহন প্রভৃতি মাস বলিতে সাধারণতঃ সৌরমাস নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু রঘুনন্দন ইহা খণ্ডন করিয়া মাস শব্দ চাক্রমাসেরই বোধক ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সৌর, চাক্র, নাকত্র এবং সাবন এই চারি প্রকার মাস, এই চারি প্রকার মাস দ্বারা চারি প্রকার বৎসর হয়, যথা দ্বাদশ সৌরমাসে এক সৌর বৎসর, দ্বাদশ চাক্রমাসে এক চাক্র বৎসর, দ্বাদশ নাকত্র মাসে এক নাকত্র বৎসর এবং দ্বাদশ সাবন মাসে এক সাবন বৎসর। বৈশাখ মাস প্রথম সৌরমাস। মেঘরাশি রাশির প্রথম, মেঘে সূর্য্য থাকিলে বৈশাখ মাস, তাই বৈশাখ মাস প্রথম সৌরমাস। মাল ও শকাব্দ সৌরবৎসর সংঘটিত, সেইজন্য ইহার আরম্ভ সৌর বৈশাখ মাস হইতেই হইয়া থাকে।

সংবৎ চাক্রমাসঘটিত, তাহার আরম্ভ প্রথম চাক্রমাস হইতে। চৈত্র মুখ্যচাক্রই প্রথম চাক্রমাস।

“চৈত্রে মাসি জগদ্ভ্রক্ষা সসঙ্ক প্রথমমহনি।

গুরুপক্ষে সমগ্রস্ত তদা সূর্য্যোদয়ে সতি।

প্রবর্ত্তয়ামাস তদা কাণ্ডস্ত গণনামপি ॥” (ব্রহ্মপুরাণ)

“চৈত্রসিতাদেকদ্বাদ্বানোর্বর্ষস্তু মাসযুগকল্পাঃ।

সৃষ্টাদৌ লঙ্কারামিহ প্রবৃত্তা দিনৈর্বৎস ॥”

( মলমাসতত্ত্বত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত )

ব্রহ্মা চৈত্রমাসের গুরুপক্ষের প্রথম দিনে অর্থাৎ প্রাতি-  
পৎ তিথিতে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং মাস, ঋতু, বৎসর যুগাদির গণনাও এই সময় হইতে প্রবর্ত্তিত করেন, এইজন্যই বৎসরের আরম্ভ ঐ দিনে। ( মলমাসতত্ত্ব ) [ বৎসর শব্দ দেখ । ]

দ্বাদশ মাসে বৎসর হয়, আবার কোন কোন সময়ে ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হইয়া থাকে। যে বার ত্রয়োদশ হয়, সেই বৎসর ঐ ত্রয়োদশ মাসের মধ্যে একটী মাস মলমাস। ঐ মাস নিম্নিত বলিয়া উহার নাম মলমাস হইয়াছে।

[ বিশেষবিবরণ মলমাস শব্দে দেখ ]

অত্র যজ্ঞপদমুৎসবনাদিবিহিতপণ্ডাগাতিপ্রাঃ পিতামহোক্তস্ত বিশ্বধর্ম্মোক্ত-  
রোক্তসত্রপদং। গর্গঃ—আবুদ্যায়বিভাগস্ত প্রারম্ভিতক্রিয়া তথা।

সাবনেন তু কর্তব্য মত্ৰাণামপ্যুপাসনা ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্তে—সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাংশপঞ্চাংখা।

মধ্যমগ্রহভুক্তিস্ত সাবনেন প্রকীর্ণিতা।

মধ্যমগ্রহভুক্তিজ্যোতির্গণনা প্রসিদ্ধা ॥” ( মলমাসতত্ত্ব )



দুই দুই মাসে এক এক ঋতু হয়, ইহার মধ্যে মাঘ ফাল্গুন শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম। এই তিন ঋতু ঈশ্বরায়ণ, ইহা দেবতাদিগের দিন। শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন কার্তিক শরৎ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত, এই তিন ঋতু দক্ষিণায়ন, ইহা দেবতাদিগের রাত্রি।

“তথা চ ঋতিঃ—তপস্তপস্তৌ শৈশিরারতুঃ, মধুশ্চ মাঘবশ্চ বাসন্তিকারতুঃ শুক্লশ্চ শুচিশ্চ গৈশ্ম্নারতুঃ, অণৈতহ্নগরনং দেবানাং দিনম্। নভশ্চ নভস্তশ্চ বার্ষিকারতুঃ ইষশ্চ উর্জশ্চ শারদারতুঃ, সহশ্চ সহস্তশ্চ হৈমন্তিকারতুঃ, অণৈতদক্ষিণায়নং দেবানাং রাত্রিরিতি।” (মলমাসতত্ত্ব) [ ঋতু শব্দ দেখ ]

কোন মাসে কি কি ধর্ম কর্ম করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিশেষ বিধান শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে মাস-কৃত্যবিধান এইরূপ লিখিত আছে—আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ার রথোৎসব, একাদশীর দিন স্বাপোৎসব (শয়নৈকাদশী), শ্রাবণে শ্রবণবিধি, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনমাসে পার্শ্বপরিবর্তন-একাদশী ও কার্তিকে উৎসান-একাদশী করিতে হয়, বিনি ইহা না করেন, তিনি বিকুলোহী হইয়া থাকেন। কার্তিক মাসে দীপদান, অগ্রহায়ণের শুক্লাষষ্ঠীতে শুভ্র বস্ত্রদ্বারা বঞ্জী-পূজা এবং কার্পাসবস্ত্র দ্বারা বিষ্ণুপূজা, পৌষমাসে পুষ্যাভিষেক, ও মাঘমাসের সংক্রান্তি তিথিতে স্নগন্ধি তণ্ডুল বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

“জীবনং সর্ষভূতানাং জনকস্বং জগৎগুরো।

তন্ময়ালীনতা প্রাপ্তা ত্বয়ৈব জনিতা প্রভো॥”

(পদ্মপুং পাতালখণ্ড ১২অং)

পরে নানাবিধ স্মৃতি দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই দিন এক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হয়। মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতে দোলোৎসব করিবে। (পদ্মপুং পাতালখণ্ড ১২অং) হরিভক্তিবিলাসেও মাসকৃত্যের বিশেষ বিবরণ লিখিত রহিয়াছে।

স্মার্ত রঘুনন্দন কৃত্যতত্ত্বে মাসকৃত্যের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,—

বৈশাখকৃত্য—বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান, সংক্রান্তির দিন ভোজ্য সহিত জলপূর্ণ ঘটদান এবং অক্ষয়্য তৃতীয়ার দিন স্নান, দান ও ব্রতাদির অরুষ্ঠান বিধেয়। এই মাসে মন্থর ও নিষপর ভোজন করিতে হয়। নিষভোজনে সর্পভয় থাকে না। ইহা মাসের মধ্যে যে কোন দিন ভোজন করিলেই হয়।

“মন্থরনিষপরাভ্যাং বোহস্তি মেঘগতে রবৌ।

অপি রোষাধিতস্তস্ত তদ্রকঃ কিং করিয়াতি॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

এই মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শিপীতকদ্বাদশীত্রত ও ধব-শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠকৃত্য—কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সাবিদ্রীত্রত, শুক্লা ষষ্ঠীতে আরণ্য ষষ্ঠী (ইহাকে জামাই ষষ্ঠী কহে) এবং মহাজ্যৈষ্ঠীতে জগন্নাথদর্শন বা গঙ্গাস্নান বিধেয়। আষাঢ়কৃত্য—অষুবাচী কালে সর্পভয়নিবারণের জন্ত দুগ্ধপান, নবোদকশ্রাদ্ধ, চাতু-শ্রীয়া ব্রতান্ত এবং বিষ্ণুর শয়নৈকাদশী করিতে হয়। শ্রাবণ-কৃত্য—শ্রাবণমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে ভবনাগ্নে স্নহীযুক্ত (সিঁজ-গাছ) স্থাপন করিয়া মনসা দেবী ও অষ্টনাগ পূজা করিতে হয়। ইহাতে সর্পভয় নিবারিত হয়।

ভাদ্রকৃত্য—জন্মাষ্টমীত্রত, শুক্লা পঞ্চমীতে তদ্রকাদি সর্প লিখিয়া তাহাদের পূজা করিতে হয়। চলিত ইহাকে নাগ-পঞ্চমী কহে। পার্শ্বপরিবর্তন-একাদশীত্রতও অবশ্যকর্তব্য। এই মাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্দশীতে চন্দ্র দর্শন করিতে নাই। ভাদ্রশুক্লাচতুর্দশীর নাম অঘোরী চতুর্দশী। এই দিন শিবো-দ্দেশে উপবাস ও অনন্তব্রত বিধেয়। এই মাসের শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে কুক্কুটীত্রত, দুর্কাষ্টমীত্রত এবং তালনবমী ব্রতের বিধানও অভিহিত হইয়াছে। অগস্ত্য-পূজা করিয়া তদ্ব্যদেশে অর্ঘ্যদানও বিধেয়।

আশ্বিনকৃত্য—অপর পক্ষে তর্পণ, মহালয়াশ্রাদ্ধ, দুর্গোৎসব এবং কোজাগর লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। কার্তিককৃত্য—এই মাসে প্রাতঃস্নান বিধেয়। মংস্ত্র ও মাংসভোজন নিষিদ্ধ। শুক্লা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত মংস্ত্র ও মাংস ভোজন বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভূতচতুর্দশী, দীপাধিতা অমা-বস্তা, দ্যুতপ্রতিপদ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং বিষ্ণুর উৎসান-একাদশী এই সকলও অবশ্যকর্তব্য।

অগ্রহায়ণকৃত্য—এই মাসে নবান্নশ্রাদ্ধ, শুক্লা চতুর্দশীর দিন সৌভাগ্য কামনা করিয়া পিষ্টক দ্বারা দেবীপূজা এবং পূর্ণিমার দিন পার্শ্বশ্রাদ্ধ অবশ্যকর্তব্য।

পৌষকৃত্য—এই মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে পূণ্যোপকরণ দ্বারা পার্শ্ববিধানে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধকে পূণ্য-ষ্টকা শ্রাদ্ধ বলে।

মাঘকৃত্য—এই মাসে অক্লণোদয়কালে স্নান বিধেয়। মাঘে মূলকভক্ষণ নিষিদ্ধ। কৃষ্ণাষ্টমীতে ছাগমাংস, মাংসোভাবে পায়স এবং পায়সাতাবে কেবল অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ অবশ্য বিধেয়। এতদ্বিন্ন রটন্তী চতুর্দশী, ত্রীপঞ্চমী, মাঘসপ্তমী, বিধানসপ্তমী, আরোগ্যসপ্তমী ও ভীষ্মাষ্টমীবিহিত কার্য্যও অভিহিত হইয়াছে।

ফাল্গুনকৃত্য—এই মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কেবল অন্ন দ্বারা

পার্বণশ্রাদ্ধ এবং শিবরাত্রি ত্রুত বিহিত হইয়াছে। এই মাসের শুক্লা দ্বাদশী ও গোবিন্দদ্বাদশীর দিন গঙ্গানান করিলে মহাপাতক সকল বিমল হয়।

চৈত্রকৃত্য—এই মাসের সংক্রান্তির দিন বসন্তাদি বিষ্ণোটক-ভর-নামের লক্ষ সূত্রীকৃষ্ণে ষট্কার্ণ পূজা করিতে হয়। ইহার পর বারুণী, অশোকাষ্টমী, স্রীরামনবমীত্রুত, মদনত্রয়োদশী এবং মদনচতুর্দশীত্রুতও বিহিত হইয়াছে। [ যে সকল ত্রুত-দির নাম উল্লিখিত হইল, তাহাদের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ] ( কৃতাত্ত্ব )

মাসক ( পুং ) ১ মাসক পরিমাণ। (অমর) অথবা মাস্ততে পরি-মায়তেনেন মাসি ষক্ স্বার্থে কঃ। ২ মুখ্য মাস। মাস শব্দে দস্তা সকারান্তই সর্লত্র পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু জিনেন্দ্র প্রভৃতির হিংসার্থক মষ ধাতুর উত্তর ষক্ প্রত্যয় করিয়া এই শব্দ মুর্দ্ধান্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। ( অমরটী০ ভরত )

মাসকালিক ( ত্রি ) ১ এক মাস কাল পরিমিত। ২ মাসিক।

মাস্কাবর ( দেশজ ) মাস শেষ, মাসান্ত।

মাস্কাবারী ( দেশজ ) মাসকাবারসম্বন্ধীয়, মাসান্তে দেয়।

মাসচারিক ( ত্রি ) মাসান্তেয়।

মাসজাত ( ত্রি ) ১ একমাসের মতন। ২ বাহা মাসমাত্র হইয়াছে।

মাসস্ত ( পুং ) ১ দাড়াহ পক্ষী। (শব্দরত্না০) মাসং জানাতীতি জৈ-ক। (ত্রি) ২ মাসজাত। ৩ হরিণ বিশেষ। (বৈজ্ঞকনি০)

মাস্‌ড়য়া ( দেশজ ) চক্ষুপক্ষের প্রান্তভাগজাত পুষ্পপূর্ণ গুটিকা ভেদ। ২ চক্ষের ছানী। ৩ আহত অঙ্গের ক্ষীতমাংস।

মাসতম ( ত্রি ) ১ মাসিক। ২ পূর্ণ এক মাস।

মাসতাল ( ত্রী ) মাসেন তালো ধ্বনিঃ পরিচ্ছেদো যন্তাঃ। বাস্তবস্বভেদ, করতাল। একমাস অন্তর যাহার ধ্বনি পরিচ্ছেদ হয়। “মহতো হি কাংস্তাদিভাজনশ্চ স্কৃদাহতস্য চিরকালানুবর্তী ধ্বনিরিত্তি প্রসিদ্ধম্। পূর্বে তু মাসশব্দেন দ্বাদশসংখ্যা তালশব্দেন মধ্যমাস্ত্রুপ্রমাণং চোক্তা দ্বাদশতালপ্রমাণাতিব্য-চক্ষতে” (নীলকণ্ঠ)

মাসতুত ভগিনী ( দেশজ ) মাতৃষসার কন্যা। চলিত মাস-তুতো বোন।

মাসতুত ভাই ( দেশজ ) মাতৃষসার পুত্র।

মাসতুল্য ( ত্রি ) মাস সময় পরিমিত।

মাসত্রয় ( ত্রী ) তিনমাস।

মাসত্রয়াবধি ( অব্য০ ) তিনমাস যাবৎ।

মাসদেয় ( ত্রি ) প্রতি মাসে পরিশোধনীয় (ঋণ)।

মাসসংক্রান্ত(বা) ( পুং, ত্রী ) ১ ষট্টিক শলিধাতু। ২ গৌর-ষট্টিক। ( রাজশি০ )

মাসধা ( অব্য০ ) প্রতি মাসে।

মাসন ( ত্রী ) সোমরাজ।

মাসন্দার ( দেশজ ) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। (Callioarpa ipecarpa) .

মাসপর্নী ( ত্রী ) [ মাসপর্নী দেখ। ]

মাসপাক ( ত্রি ) একমাসে পরিপক।

মাসপূর্ব ( ত্রি ) পূর্ব মাসে সংঘটিত। এক মাস পূর্বে।

মাসপ্রায়িত ( ত্রি ) মাসঘটিত। বাহা মাসে একবার ঘটে।

মাসপ্রবেশ ( পুং ) মাসাগম। মাসের প্রথম দিন।

মাসভুক্তি ( ত্রী ) মাসিকগতি (স্থগের)।

মাসমান ( পুং ) মাসেদ্বাদশভির্মানমস্যা। ১ বৎসর। (ত্রিকা০)

মাসজ মানং ( ত্রী ) ২ মাসপরিমাণ। ৩ মাসমান, এক মাস।

মাসমাহিনা ( দেশজ ) মাসিক বেতন।

মাসর ( পুং ) মস-নিচ্ বাহুলকাৎ অরন্। অরসমুত্তর মণ্ড।

পর্যায়—আচাম, নিশ্রাব। (অমর) ২ কাজিক। (বৈজ্ঞকনি০)

মাসবর্তিকা ( ত্রী ) সর্ষপী নামক পক্ষিবিশেষ। (শব্দরত্না০)

মাসবৃত্তি ( ত্রী ) কোরণ্ড। গলগণ্ডাদি।

মাসল ( ত্রি ) মাস সিদ্ধাদিভাৎ লহ্। মাংসল, মাংসযুক্ত, হুটপুট।

মাসশম্ ( অব্যয় ) প্রতি মাস। মাস মাস।

মাসসঞ্চয়িক ( ত্রি ) মাসপরিমিত কালের লক্ষ্য অন্তঃসঞ্চয়কং।

মাসস্তোম ( পুং ) একাহভেদ।

মাসাধিপ ( পুং ) মাসানামধিপঃ। মাসাধিপতি, মাসস্বামী।

চন্দ্র হইতে উর্দ্ধ কক্ষাক্রমে যে সকল গ্রহ অবস্থিত, তাহারাই ত্রিংশদিনাব্যক মাসের অধিপ বা স্বামী বলিয়া কথিত হইয়াছে।

উক্ত ক্রম যথা—চন্দ্র, বুধ, শুক্র, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

“উর্দ্ধক্রমেণ শনিনো মাসানামধিপাঃ সূতাঃ।”

(স্থর্যসিদ্ধান্ত ১২।৭৯)

মাসাধিপতি ( পুং ) মাসস্বামী, গ্রহ।

মাসানুমানিক ( ত্রি ) মাস চইতে মাসান্তরে কার্যকারী।

মাসান্ত ( পুং ) মাসান্ত অন্তঃ। অমাবস্তা। মাসান্তে যাত্রা করিয়া কোথাও বাইতে নাই। এক্রপ যাত্রায় মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

“পক্ষান্তে নিষ্ফলা যাত্রা মাসান্তে মরণং ধ্রুবম্ ॥” (সময়প্রা০)

২ সংক্রান্তি-দিন। এই দিনে বিবাহ হইলে কন্যার মৃত্যু

হইয়া থাকে। স্মরণ্যং বিবাহে এই দিন প্রাপ্ত নহে।

মাসান্তে এক দিন ত্যাগ করিয়া বিবাহদিন স্থির করিতে হয়।

“মাসান্তে ত্রিযতে কন্যা তিথ্যন্তে স্যাদপত্রিণী।

নক্ষত্রান্তে চ বৈধব্যং রিষ্ঠ্যাং মৃত্যুর্দ্যয়োর্বৈ ॥

মাসান্তে দিনমেকস্ত তিথ্যন্তে ঘটিকাষম্।

ঘটিকা ত্রিতরং ভাস্তে বিবাহে পরিধর্জয়েৎ ॥” (রত্নমালা)

মাসাপবর্গ ( ত্রি ) এক মাস পরিমিত কাগ পণ্যস্ত।

মাসাবধিক (ত্রি) মাস পর্য্যন্ত।

মাসাল (দেশজ) মাসযুক্ত।

মাসালর, ভিক্ষাজীবী জাতিবিশেষ। কর্ণাটপ্রদেশে প্রচলিতঃ ইহাদের বাস। মাস্রাজের নানা স্থানে ইহাদিগকে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। পূর্বে পেনাশুণ্ডি এবং হিন্দুপুরে ইহাদের বাস ছিল। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের উন্নয়ন দর্ভিক্ষের সময় ইহারা ধারবার জেলায় আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা তেলগু এবং মিশ্রকণাড়া ভাষায় কথাবার্তা কহে। ইহারা কোন গ্রামে উপস্থিত হইলে, লাদীগার বা মাস্রাজতির গৃহে আশ্রয় লয়। ইহাদের বিশ্বাস, ইহারাও এই মাস্রাবংশসমৃদ্ধ। ইহারা গাধা রাখে। আবশ্যক মত আপনাপন কহাদি গাধার পৃষ্ঠে দিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়। ইহারা প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিতে পারে। মেঘ, মুরগী, মৃত ষাঁড়, গোড়, মহিষ, শূকর প্রভৃতি জন্তুর মাংস ইহারা ভক্ষণ করে। মদ খাওয়াতে অত্যন্ত ভাগবাসে। ইহারা রজ্জুর উপরে নৃত্য দেখাইয়া অর্থোপার্জন করে। কিন্তু স্বর্ণকার, সূত্রদার বা কয়লাকার উপস্থিত থাকিলে দড়িবাঁজি করে না। জাতকর্ণে চারিখানা মাংস থরচ এবং বিবাহে ৩০ টাকার অধিক থরচ হয় না। তন্মধ্যে কত্কার পিতাকে ১৬ দিতে হয়। তিরুপতির বেক্টরমণ ইহাদের উপাশ্রয় দেবতা। তিনি চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী। ওলাউঠার অধিষ্ঠাত্রী হুগাম্মা দেবীরও ইহারা পূজা করে। পূজাকালে ব্রাহ্মণ থাকেন না। ইহাদের কোন দীক্ষাগুরু নাই।

ইহারা জাতবালকের পাশ্বে তপ্তলোহণলাকা দ্বারা চেরা X চিহ্নিত করে। তদন্তে প্রস্তুতি ও বালককে মান করা হয় থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, ইহাতে বালকের ভবিষ্যতে কোন ব্যাধি হইতে পারে না। বিবাহের সময়ে হুগাদেবী ও বেক্টরমণের পূজা হয়। কত্কা ও বরের সন্মানে হলুদ মাখান হয় এবং হস্তে বিগাহস্ত্র বাদিয়া দেওয়া হয়। স্থানলোকদিগকে ঋতুকালে ৪ দিন গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। জনন বা মরণে কোন অশৌচ হয় না। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সে স্ত্রী স্বীয় উপপতিকে বিবাহ করিতে পারে। ইহারা মৃতদেহ গোর দেয়।

মাসামৌ (দেশজ) মাস শাশুড়ী।

মাসাহার (ত্রি) এক মাস অন্তর ভোজনকারী।

মাসিক (ত্রি) মাসি ভব ইতি মাস-কিক্। মাসদ্রব্যকার।

“পণো দেয়োহবকৃষ্টত্ব ষড়্ কৃষ্টত্ব বেতনম্।

বাগ্মাসিকস্তথাচ্ছাদো ধাতুজোগন্ত মাসিকঃ ॥” (মহু ৭।১২৬)

মাসে ভবমিতি মাস (কালটিট্ঠঞ পা ৪।৩।১১) ইতি ঠঞ। মৃতের সজাতীয় কর্তৃক প্রেতের সংবৎসরভাষ্যে প্রতিমাসীয় কৃষ্ণপক্ষ তিথিতে কর্তব্য শ্রাদ্ধ, ইহা নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ। পথ্যার--অস্বাহার্য।

“পিতৃণাং মাসিকং শ্রাদ্ধমস্বাহার্যং বিহুর্কুর্ধাঃ।” (মহু ৩।১২৩)

প্রেতব্যক্তির প্রেতত্ববিমুক্তির জন্ত আত্ম একোদ্বিষ্ট, দ্বাদশ মাসিক, প্রথম ও দ্বিতীয় বাগ্মাসিক এবং সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। প্রতিমাসে নির্দিষ্ট তিথি উপলক্ষে যথাশাস্ত্র মাসিক এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বাগ্মাসিক করা কর্তব্য। যদি কোন কারণবশতঃ মাসে মাসে ঐ সকল শ্রাদ্ধ না হইয়া উঠে, তাহা হইলে প্রকৃত তিথির পূর্ব্বাহ্নে প্রথম ও দ্বিতীয় বাগ্মাসিক করিয়া পর দিন দ্বাদশটি মাসিকই করা যাইতে পারে।

“বাগ্মাসিকাস্থিকে শ্রাদ্ধে আতাং পুন্সহ্যারব তে।

মাসিকানি স্বকীয়ৈ তু দিবসে দ্বাদশপি চ ॥” (পৈঠীনসি)

সপিণ্ডীকরণ করিবার পূর্বে মলমাস উপস্থিত হইলে মাসিক সম্বন্ধে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। মৃত্যু হইতে একাদশ মাসের মধ্যে যদি মলমাস পড়ে, তাহা হইলে একটা মাসিক অধিক করিতে হয়। অর্থাৎ দ্বাদশটির স্থলে ত্রয়োদশটি মাসিক শ্রাদ্ধ করা ব্যবস্থা। ষষ্ঠমাসের মধ্যে মলমাস পড়িলে ষষ্ঠ-মাসিকের পূর্ব্ব তিথিতে প্রথম বাগ্মাসিক এবং ত্রয়োদশ মাসিকের পূর্ব্ব তিথিতে দ্বিতীয় বাগ্মাসিক। ঐ সকল মাসিক শ্রাদ্ধের মধ্যে যদি কোন মাসিক পতিত হয়, তবে কৃষ্ণা একাদশী, অমাবস্তা অথবা মাসিকান্তর তিথিতে তাহা করিয়া, পরে প্রকৃত কাগ্য সম্পাদন করিতে হয়। অশৌচ উপস্থিত হইলে অশৌচান্তে মাসিক করাই ব্যবস্থা। একাদশাহাদি কএকটি শ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধাধিকারীর যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট শ্রাদ্ধ কএকটি অপর শ্রাদ্ধাধিকারীর করিতে হয়। [মাসিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় শ্রাদ্ধ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মাসিক একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধের প্রয়োগ এইরূপ,—শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বদিনে একবার মাত্র নিরামিষ আহার করিয়া পরদিন স্নানাদি নিরাসাহস্তে যথাকালে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া কুশময় ব্রাহ্মণস্নান, বাস্ত-পুরুষাদির পূজা এবং ভূয়ামী পিতৃদিগকে শ্রাদ্ধাগ্রভাগদান করিবেন, অতঃপর দক্ষিণমুখ হইয়া এইরূপ অমুক্তাবাক্য করিবেন যথা—“অম্মানুকে মাসি অমুক্তপক্ষে অমুক্ততিথৌ অমুক্তগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক্তদেবশ্রবণঃ প্রথম-মাসিকৈকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণোহহং করিষ্যে।” পরে পুরোহিত “কুরুষ” এইরূপ উত্তর দিবেন। অনন্তর গায়ত্রী, “দেবত্যা” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ, পুণ্ডরীকান্ধার্য-

প্রাঙ্গণ ও রক্ষার্থ উদক  
 পুষ্পাদি তরলনির্মিত, দ্রাব্য, ক্রীড়া, অর্থাদিদান, অন্ন  
 দান, বিদ্যা, মধুবাতি ও "বজ্রধরো হব্যঃ সমস্ত" ইত্যাদি  
 যজ্ঞাদি পিতৃদান, পিওপূজা, পিওপরি বারিবারা, দক্ষিণা,  
 ত্রীক্ষণবিসর্জন, অছিদ্রাবধারণ, দাপাচ্ছাদন ও বিমুগ্ধরণ  
 প্রভৃতি কঠব্য। প্রাকান্তে শ্রাক্ষীয় পিও, গো, অজ ও ত্রীক্ষণ  
 অগ্নি অথবা জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। নাসিকশ্রাক্ষপ্রয়োগ  
 সম্বন্ধে স্থূল ও এট কএকটা বিসম্মত সাংক্ষেপে বলা হইল।  
 ইহাতে যে সকল বাক্য, মন্ত্র ও অঙ্গাদি ক্রম প্রাক্ষাদিবি উল্লেখ  
 আছে, বাহ্যভারে তৎসমস্ত উক্ত হইল না।

[ নাসিক শ্রীকৈর প্রয়োগাভিলা: শ্রীকৈরপ্রয়োগে তত্ত্ব দ্রষ্টব্য । ]

এইরূপে দ্বিতীয় তৃতীয়াদি মাসিকও চলে। [শাক্তদেখ]

॥ १ ॥  
 ॥ २ ॥  
 ॥ ३ ॥  
 ॥ ४ ॥  
 ॥ ५ ॥  
 ॥ ६ ॥  
 ॥ ७ ॥  
 ॥ ८ ॥  
 ॥ ९ ॥  
 ॥ १० ॥  
 ॥ ११ ॥  
 ॥ १२ ॥  
 ॥ १३ ॥  
 ॥ १४ ॥  
 ॥ १५ ॥  
 ॥ १६ ॥  
 ॥ १७ ॥  
 ॥ १८ ॥  
 ॥ १९ ॥  
 ॥ २० ॥  
 ॥ २१ ॥  
 ॥ २२ ॥  
 ॥ २३ ॥  
 ॥ २४ ॥  
 ॥ २५ ॥  
 ॥ २६ ॥  
 ॥ २७ ॥  
 ॥ २८ ॥  
 ॥ २९ ॥  
 ॥ ३० ॥  
 ॥ ३१ ॥  
 ॥ ३२ ॥  
 ॥ ३३ ॥  
 ॥ ३४ ॥  
 ॥ ३५ ॥  
 ॥ ३६ ॥  
 ॥ ३७ ॥  
 ॥ ३८ ॥  
 ॥ ३९ ॥  
 ॥ ४० ॥  
 ॥ ४१ ॥  
 ॥ ४२ ॥  
 ॥ ४३ ॥  
 ॥ ४४ ॥  
 ॥ ४५ ॥  
 ॥ ४६ ॥  
 ॥ ४७ ॥  
 ॥ ४८ ॥  
 ॥ ४९ ॥  
 ॥ ५० ॥  
 ॥ ५१ ॥  
 ॥ ५२ ॥  
 ॥ ५३ ॥  
 ॥ ५४ ॥  
 ॥ ५५ ॥  
 ॥ ५६ ॥  
 ॥ ५७ ॥  
 ॥ ५८ ॥  
 ॥ ५९ ॥  
 ॥ ६० ॥  
 ॥ ६१ ॥  
 ॥ ६२ ॥  
 ॥ ६३ ॥  
 ॥ ६४ ॥  
 ॥ ६५ ॥  
 ॥ ६६ ॥  
 ॥ ६७ ॥  
 ॥ ६८ ॥  
 ॥ ६९ ॥  
 ॥ ७० ॥  
 ॥ ७१ ॥  
 ॥ ७२ ॥  
 ॥ ७३ ॥  
 ॥ ७४ ॥  
 ॥ ७५ ॥  
 ॥ ७६ ॥  
 ॥ ७७ ॥  
 ॥ ७८ ॥  
 ॥ ७९ ॥  
 ॥ ८० ॥  
 ॥ ८१ ॥  
 ॥ ८२ ॥  
 ॥ ८३ ॥  
 ॥ ८४ ॥  
 ॥ ८५ ॥  
 ॥ ८६ ॥  
 ॥ ८७ ॥  
 ॥ ८८ ॥  
 ॥ ८९ ॥  
 ॥ ९० ॥  
 ॥ ९१ ॥  
 ॥ ९२ ॥  
 ॥ ९३ ॥  
 ॥ ९४ ॥  
 ॥ ९५ ॥  
 ॥ ९६ ॥  
 ॥ ९७ ॥  
 ॥ ९८ ॥  
 ॥ ९९ ॥  
 ॥ १०० ॥

মাস্তুরকৰ্ণ (পুং) মস্তুরকৰ্ণ অথবা চোৰ্ণে অব শিখিতভোহাং।  
 পা ৪।১।১১২ মস্তুরকৰ্ণেব গোবাপিত।

ମାଷ୍ଟ୍ରୀ (ଜା) ମଧ୍ୟ-ସପ୍ତ ଡିଗ୍ : ୨୩୫ । (ହେ)  
 ୧ ମାତୃଭିନୀ । “ପିତୃସଦା ପିତୃଭ୍ୟା ସାତୃଭ୍ୟା ତ ମାଷ୍ଟ୍ରା ।”  
 । ଏକଦଶସ୍କନ୍ଧଂ ୧।୯।୧୪୧ ।

৩ ভেদনযোগা বুদ্ধিগত নথশব্দাদিও ভদ্রাবার্তাশেষ।

( ५५७ ' ५५७ ८ अ० )

মাসোপবাস (পুং) এহমাস কাম অনশন-ভোগ্যব।

মাসোপবাণিনী ( হা ) একমাস উপবাসকালব্যাপী বমণ।  
অনেক সময় বিক্রপ করিয়া অসচ্চাৰিত্ব কান্দোদগমকে এত-  
রূপ শব্দে অভিহিত করা হয়।

**मास्य** ( ऋ ) मासं इति मास-व्योहर्त्थे । मासावमसि वङ्गप्रज्ञेति ।  
 प्रा ५।१।८ इति वङ् । एकमास-प्रथम ।

માત્ર (અર્થ) મા ૬ અ ૬ ત્રયાઃ સમાશ્રયઃ । વાવ, નિષેધ ।  
 પ્રયાગ--મા, અનં । (અમૃત)

“ନାମ୍ନ ତେ ଭବତଃ କାଶୀଃ ପ୍ରେତକୃତ୍ୟଃ ପତାୟମଃ ।” (ବା. ୨। ୧୨। ୧୨)

বাকরণের নিয়মাদ্বারা মা ও মাস্রবোগে এটাগম  
হয় মা ।

মাহ, মান। ভাদিৎ উভৎ সফৎ দেট। লট মাখাত-তে।  
 লোট মাহতু-তাং। নিট মনহ হে। লুঙ্ অমাখাং, অমাহিষ্ট।  
 শিচ্ মাহমতি। লণ্ড্ অনমাং।

ଆହକ୍ଷ୍ଟଳକ ( ଟ୍ର ) ନାହ କହୁ ନୀବାମା, ହୃଦ୍ଦେଶମନ୍ଦକୀୟ ।

মাহকম্বলী (স্ত্রী) প্রাচীন জনপদভেদ ।

মাহকি (পুং) ১ মহকের গোদাশতা । ২ আচাণাভেদ ।

মাহত (ত্রি) মহতের ভাব বা ধর্ম। মহত।

ମାହନୀୟ (ତ୍ରି) ପୃଷ୍ଠନୀୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ । “କ୍ରତୁନା କର୍ମଣା ଶିଷ୍ୟମନ-  
 ନାଦିନମନେନ ମାହନୀୟା ଅନ୍ଧାଃ” (ଶ୍ଳୋ ୧୦୭୦୯ ମାତ୍ର )

ગાઈ ( ઘા ) ગા ઝા ।

મહા ( પાવનો ) નામ ।

মহাকুল (এ) মহাকুলজ্ঞাপনামা (মহাকুলজ্ঞাপন গ্রন্থের) পা  
৪।১১৪১) ইতি অক্ষ। মহাকুলজ্ঞাপন। (অমর্ত্য রায়মুকুট)

ମାହାକୁଳୀନ ( ଯି ) ମହାକୁଳୀନୀ । ଗା. ସାଂଢ଼ ମହାକୁଳୀନୀ ।  
 ( ପା ୫୮୧୧୧ ) ମହାକୁଳୀନୀଦ୍ରବ, ମହାକୁଳୀନୀ ।

ମାହାତ୍ମ୍ୟ (ମୁଂ) ମହାତ୍ମ୍ୟ-ସାଂସ୍ୱାମି । ମହାତ୍ମ୍ୟମେବ ମୋ ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟ ।

ମାହାଚାରିତ୍ର ( ୧ ) ମହାଚିତ୍ର- ( ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ) ଇଞ୍ଚ. ୩  
 ୫.୨.୮୦ ) ଚିତ୍ରିତ ଇଞ୍ଚ. ୧

নাহাজ্জনিক (বি) মহাজনায় হিংস্র মহাজন চক্। মহাজন-  
বিষয়ে হতকব।

মাহাজনান (১) যতানে সাধু মহাজনান প্রাণনাশিত।  
 স্বয়ং । পাঠাচারে কতি স্বয়ং । মহাজনানবশেষে সাধু ।

মাহাত্ম্য (পারসী) চন্দ্রকিরণ ।

মার্শাল্লিক (এ) মহান্নসমস্কায়, মপাধিপতা ন্যন, বজিপদাযা  
 হান। বাজাসন, যে স্থানে বানিয়া বজা বা বাকস্মচাৰী  
 প্রজাপালন কবেন।

“রাজ্ঞো বাহাশ্বিকে স্তানে সদাঃশোচং বিধায়তে ।

प्रक्षानां पवित्रकाथनामनका व कावयम् ॥” ( मनु ५।२४ )

‘महायान उदः शानः नाशान्त्रिकं वाजपदाश्वः मन्त्रादिपत्रा  
पत्रं’ ( कृष्णक )

માહાત્મા (ક્રી) મહાત્માનો ખાવઃ ફીત મહાત્મા-માઈ. મહા-  
 ત્મા, મહાત્માનો ખાવ વા વ્યય, મહિમા ।

“ନାହାନ୍ତ୍ୟାଂ ଭଗବତ୍ୟାଂ ପୁରାଣାଦିଷୁ କୌଞ୍ଚିତମ ।” ( ତିଥିତତ୍ତ୍ୱ )

মাহানদ (বি) মহানদ (উৎসাদিভাঃ)। প। ৪।১৮৬) .  
 ২।৩ অঙ্ক। মহানদমত্মকীয়। তত্ত্বজ্ঞান।

ग्राहानम ( ११ ) महानम-अ० ( पृ ८१-८७ ) महानमसप्रतीक ।

भा.सू.भा.भन (द्वि) मशानात्रो-आग्नेयमप्रकीर्ण । (वि०३०३० ७२४)

মাহানামিক (পূঃ) মহানাম একচয়ানখ (তথ্য প্রকচয়ান।  
 পা ৫০০০) উক্ত ঠেঞ। মাহানামিক, মহানামি নামক  
 মাহানামি লাক্ষণ।

মাহিনান্নিক (পং) মহানামন্ (তদস্য ব্রহ্মচর্যাং। পা  
৫।১।১৪) চতুর্থ 'মহানান্নাদিতাঃ বহ্মাশ্রুতা উপসংখ্যানঃ'  
'মহানান্নো নান্নাদাঃ নমবন্' ইত্যাদ্যাঞ্চঃ তাপাং ব্রহ্মচর্যা-  
নম্য ইতি ১৭। মহানান্নী শ্রাদ্ধাঙ্গং বৈভা ব্রাহ্মণ। •

माहापूत्रि (प्रि) महापूत्रा सुतसमादिता हेअ. पा ८१२८० )  
इति हेअ. महापूत्रा महापूत्रा ।

মাহাপ্রাণ (ত্রি) মহাপ্রাণ- উৎসাদিতোহৎ। পা ৪।১৮৬)  
ইতি অঞ। মহাপ্রাণ বা দীর্ঘশ্বাস সম্বন্ধীয়।

মাহাত্ম্য (ক্লী) মহাত্ম্য। সোভাত্ম্য।

মাহারজন (ত্রি) মহারজনেন রক্তং মহারজন- (তেন রক্তং  
রাগাৎ। পা ৪।২।১) ইতি অণ্। মহারজন (জাকরণ) দ্বারা  
রঞ্জিত। (শত্০ ব্রা ০ ১৪।৫।৩৩)

মাহাবাজিক (ত্রি) মহারাজো দেবতা অস্য মহারাজ (মহা-  
রাজপ্রোষ্ঠিপদাভ্যাং ঠঞ। পা ৪।২।৩৫) ইতি ঠঞ।  
মহারাজ দেবতা মহারাজ।

মাহারাজ্য (ক্লী) মহারাজের পদ বা মধ্যাদা।

মাহারাত্রি (ত্রি) মহারাত্রি-লঞ। মহারাত্রিসম্বন্ধীয়।

মাহাবার্তিক (ত্রি) কাভ্যায়নকৃত পাণিনির বার্তিকজ্ঞ।

মাহাত্রতী (স্ত্রী) ১ পাণ্ডপতপ্রতাবলয়ী। ২ পাণ্ডপতশাস্ত্রসংহতি।  
৩ যজ্ঞমীমাংসা।

মাহাত্রতীয় (ত্রি) মহাত্রতসম্বন্ধীয়।

মাহিক (পুং) জাতবিশেষ। (মহাভা ০ ৬ পর্ক)

মাহিকীপ্রস্থ (ত্রি) উত্তরভারতের নগরভেদ।

মাহিত (পুং) মহিত-অপত্যার্থে (কণাদিত্যো গোত্রো।  
পা ৪।২।১১) ইতি অণ্। মহিতের গোত্রাপত্য।

মাহিথি (পুং) বৈদিক আচাৰ্য্যভেদ। (শতপথ ০ ব্রা ০ ৬।২।১০)

মাহিত্য (পুং) মহিতস্ত গোত্রাপত্যং মহিত (গর্গাদিত্যো  
যঞ। পা ৪।২।১০) ইতি যঞ। মহিতের গোত্রাপত্য।

মাহিত্র (ক্লী) মহিত্র শব্দোহাস্মরস্তি, মহিত্র (বিমুক্তাদি-  
ভ্যোহণ্। পা ৪।২।৬১) স্ক্রভেদে। 'মহিত্রীণামধোহস্ত'  
ইত্যাদি ঋগবেদোক্ত স্ক্রু।

"কৌৎসং প্রপ্তাং হত্যোত্বাসিষ্টক প্রতীহ্যচম্।

মাহিত্রং শুদ্ধবত্যঞ্চ সুরাপোহপি বিপুশ্যতি ॥" (মমু ১।১।৫০)

'মাহিৎ মাহিত্রীণামধোহস্তোত্যং স্ক্রুৎ' (কল্পক)

'মাহিত্রং মাহিত্রীণামুচ্যেব মাহিত্রশব্দোহাস্মন স্ক্রুৎহস্তীতি  
বিমুক্তাদিপ্রক্ষেপাৎ' (মোহর্তিাপ)

মাহিন (ক্লী) মহতে পূজ্যতেহস্মিন্ ইতি মহ্ (মহেতিনণ্ চ।  
উণ্ ২।৫৬) ইতি হনণ্। ১ রাজ্য। (উজ্জল) (ত্রি)

২ মংহনীয়, পূজনীয়। "৩জ্জ! যন্তে মাহিনং দত্তমতি" (ঋক্-  
৩৩৬।৯) 'মাহিনং মংহনীয়ং' (সায়ণ) ৩ প্রবন্ধ। "ইজ্জ!  
সদনেসু মাহিনঃ" (শত্০) 'মাহিনঃ প্রবুদ্ধঃ' (সায়ণ)

মাহিনা, (স্ত্রী) বেতন, মাহিয়ানা, মাসিক বেতন।

মাহিনাদার (পারস্য) যিনি বেতন দেন, যিনি মাসে মাসে  
মাহিয়ানা দেন।

মাহিনাবৎ (পুং) মাহিনোপেত, মাহিমগুক্ত। "ইজ্জ এযাং

দৃংহিতা মাহিনাবান্" (ঋক্ ৩।৩৯।৪) 'মাহিনাবান্ মাহিমো-  
পেতঃ' (সায়ণ)

মাহিম, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঠানা-জেলার অন্তর্গত একটি  
উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪১৯ বর্গ মাইল। এখানে উত্তর-  
দক্ষিণে বিস্তৃত বনমালাবিমণ্ডিত একটি গিরিশ্রেণী বিরাজিত  
দেখা যায়। উহার আশরা ও তকমক শুল্কই সর্বাপেক্ষা উচ্চ।  
এখানকার সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানসমূহ বিশেষ স্বাস্থ্যজনক।  
পক্ষতের মধ্যস্থল এবং খাড়ির উত্তর পার্শ্ববর্তী স্থান বহু  
জলে জলাভূমির আকারে পরিণত হইয়াছে। এখানে বৈত-  
রণী নদী প্রবাহিত। ঐ নদীতে স্থানীয় পণ্যবাহী নৌকাসমূহ  
বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া গত্যাত করিয়া থাকে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও জেলার একটি  
বন্দর। অক্ষা ১৯°১৩' উঃ এবং দ্রাঘি ৭২°৫২' ৫০" পূঃ।  
এই স্থান হইতে ৫৫ মাইল পূর্বে বোম্বাই, বড়োদা ও মধ্য-  
ভারতীয় রেলপথের পালগড় ষ্টেশন বিদ্যমান আছে। রেলপথ  
বিস্তৃত থাকায় স্থানীয় বাণিজ্য দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করি-  
তেছে। এই স্থান তালবনের ক্ষত্র সমধিক বিখ্যাত। একপ  
সুদৃশ্য তালবন দাব কোথাও দেখা যায় না। খাড়ির  
ঠিক অপর পারে কেল্‌বি নামক গণ্ডগ্রাম। উহা মাহিম-  
নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বলিয়া নগরপ্রাশে পবিগণিত  
হইয়াছে। এই কেল্‌বি গ্রামের অদূর একটি ক্ষুদ্র ভূগ বিদ্যমান  
আছে। বন্দরভাগ শৈলসঙ্কুল, এমন কি কোথাও কোথাও  
উপকূল হইতে দুই মাইল পর্যন্ত জলগর্ভে বিস্তৃত দেখা যায়।

১৩১৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর পাঠান-নরপতিগণ এইস্থানের আধি-  
পত্য গ্রহণ করেন। তৎপরে গুজবাতের মুসলমান-শাসনকর্ত্ত-  
গণের হস্তে উহার শাসনভার আঁপিত হয়। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে  
পঠগাঁজগণ মুসলমানদিগের নিকট হইতে উহা অধিকার  
করিয়া লয়। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীর  
বাদশাহের বিবকে মাহিমবাগী ঘোরতর যুদ্ধ কারয়া আত্মরক্ষা  
করিয়াছিল।

মাহিম, (মহিম বা মাহিম), পঞ্জাবপ্রদেশের রোহতক  
জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। এখন ধ্বংসপ্রায়।  
অক্ষা ২৮°৫৮' উঃ এবং দ্রাঘি ৭৬°২০' পূঃ। ধ্বংসাবশিষ্ট  
নিদর্শনসমূহের আলোচনা করিলে উহার পুরসমৃদ্ধির যথেষ্ট  
প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নগর মুসলমান-আক্রমণের বহুপূর্বে  
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাহাবউদ্দীন ঘোরী ভারতাক্রমণ-  
কালে উহা ভূমিসাৎ করিয়া দেন। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে পেশবা  
নামক জনৈক বেগিয়া উহার পুনঃসংস্থার করেন। মোগল-  
সম্রাট অকবর শাহ এই নগর শাহবাগ খাঁ নামক জনৈক

আকগানকে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। তাহার বংশধর-  
গণের মধ্যে এই নগর শ্রীবৃদ্ধিশালী হইয়াছিল।

সম্রাট অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে, তুর্গাদাস নামক জনৈক  
রাজপুতগণের সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এই নগর লুণ্ঠন  
করিয়াছিলেন। অতঃপর এখানে পুনরায় লোকসমাগম  
হইলেও, ইহার বাণিজ্যমুদ্রির তদ্রূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই।

সম্রাট শাহজহানের রাজত্বকালে সৈয়দুল্লাহ কব্বাক  
১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মোপানাবলি সমন্বিত সুবিস্তৃত  
ইন্দ্রা ইহার প্রাচীন কীর্তির অনাতন নিদর্শন। এতদ্বিন্ন  
স্বঃসাবশিষ্ট কতকগুলি সমাধিসম্ভার ও প্রাচীন মসজিদ এবং  
নগরবেষ্টিত প্রাচীর প্রভৃতি সেই অতীতগৌরবের স্মৃতি উদ্ভা-  
সিত করিয়া দিতেছে।

মাহিষানা ( পারস্য ) বেতন, মাসিক বেতন।

মাহির (পুং) মন্ত্রেতে পূজ্যতমো মহ-বাহুলক্য ইরনু। ইন্দ্র।

মাহিষ (পুং স্ত্রী) মাহিষ-স্বার্থে অণ্। মাহিষ। স্ত্রিয়াং  
ঙষ্। মাহিষা। ২ মাহিষস্বার্থী।

মাহিসক (পুং) ১ মাহিষচারী রাখাল। ২ জনপদ (বর্তমান  
মহিসুর) ও ভক্তজনগদবাসী জাতিবিশেষ। (মার্ক ৮৭।৪৬)

মাহিষমূত (স্ত্রী) মাহিষ্যকীৰ্জাত মূত, চলিত ভৈরবাসি।  
এই মূত তাক্ক, ভদ্রকাদি বোগে হিতকর, বাতশ্লেষনাশক, বল-  
কর, বর্ণকর, অশ ও গ্রহবীনাশক, দাপন এবং চক্ষুর হিতকর।

মাহিষদধি (স্ত্রী) মাহিষাভক্ষকত্ব দধি, মেষের দধি। এই দধি  
অতি সুস্বাদু। গুণ—মধুর, তিক্ত, রক্তপিত্ত, শ্লেষ্মবদ্ধক, বল  
ও শোণিতবদ্ধক, বুধা, প্রমর, শোষণ। (রাজনিং)

মাহিষনবনীত (স্ত্রী) মাহিষ্যমুদ্রজাত নবনীত। মাহিষী-  
মুদ্রজাত মাখন। গুণ—কষায়, মধুর, শীত, বুধা, বলকর,  
গ্রাসা, পিত্তনাশক ও প্রাণপ্রদ। (রাজনিং)

মাহিষমূত্র (স্ত্রী) মাহিষজল, মাহিষের মূত্র, গুণ—কটু, উষ্ণ,  
আনাহ, শোষ, শুষ্ক, কণ্ডুত, শূল ও উদররোগনাশক।

মাহিষবল্লরী (স্ত্রী) কৃষ্ণবৃদ্ধাবক। (বৈদ্যকনিং)

মাহিষবল্লিকা (স্ত্রী) শেতবৃদ্ধাবক। (বৈদ্যকনিং)

মাহিষবল্লী (স্ত্রী) মধু সোমগতা। (বৈদ্যকনিং)

মাহিষস্থলী (স্ত্রী) প্রাচীন জনপদভেদ।

মাহিষাক্ষ (পুং) মাহিষাক্ষ গুণ গুলু। (বৈদ্যকনিং)

মাহিষিক (পুং) মাহিষ্য রোচতমসো মাহিষী-ঠকু।  
মাহিষীপতি, ব্যাভিচারিণীর স্বামী, যে স্বামী ব্যাভিচারিণী পত্নীর  
প্রতি অমুরক্ত। "মহিষীভ্যোচতমসো বা চ ব্যাভিচারিণী।

তাং তুভ্যং কাময়তি যঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ" (স্বান্দ কথিতং)

১ মাহিষোপজীবী। মাহিষী নাবী গণমাশ্রয়িত মাহিষী

(তদন্ত পণ্য। পা ৪।৪।৫১) ইতি ঠকু। ভগ্ন দ্বারা উপার্জিত  
দ্রাব্যনোপজীবী। স্ত্রীর বেষ্ঠাশ্রয়িত দ্বারা উপার্জিত ধনে যাহারা  
জীবিকানির্ভর করে, তাহাদিগকে মাহিষিক কহে।

"মহিষীভ্যোচতমসো বা চ ব্যাভিচারিণী।

উপজীবতি যন্তস্তাঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ"।

(বিষ্ণুপুরাণ ২।৬।১৫ শ্লোকের টীকায় স্বামী)।

মাহিষিকা (স্ত্রী) নদীভেদ। (রামা ৬।৪০।২১)

মাহিষ্যেয়, জনৈক প্রাচীন বৈদ্যকরণ। দ্বিভাষ্যের ইহার  
মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ মাহিষীর গভজাত স্ত্রীজাতি।

[মাহিষ্য দেখ।]

মাহিষ্যতী, পুরাণ-ভারতাদি-প্রসিদ্ধ ভারতের এক অতি  
প্রাচীন নগরী। ভাগবতাদিতে লিখিত আছে,—এখানে  
হৈহয়রাজ কান্তিবীর্ষ্যজুন রাজত্ব করতেন। স্বপ্নপুরণে  
নাগরথের মতে এই নগর নন্দ্যাতীরে অবস্থিত। এখানে  
দেবাজলে সহস্রাজুন বহু স্ত্রী লওয়া জলক্রীড়া করতেন।  
রাবণ তাহার বলবীণ্য না জানিয়া তাহার সঙ্গে এখানে যুদ্ধ  
করিতে আসিয়া সহস্রাজুনেব হস্তে বন্দী হন। (ভাগা  
২।১৫।২২০) মহাভারতে সভাপক্ষে লিখিত আছে, বাক  
স্বয়কানে সহদেব এখানে কর আদায়ের জন্ত উপস্থিত  
হইয়াছিলেন, তৎকালে এখানে নীলবাজ (পুরাণোক্ত  
নীলধ্বজ) রাজত্ব করতেন। স্বয়ং অশ্বদেব তাঁর  
জামাতা। অশ্বর সাহায্যে নীলরাজ সহদেবকে পরাজয়  
করেন। অবশেষে অশ্বর পরামর্শে নীলরাজ সহদেবকে পূজা  
করিয়া তাঁহাকে কর দিয়া বিদায় করেন। গন্ধর্ভপুরাণে  
এই স্থান একটা মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (চম।১২)

বৌদ্ধপ্রাধিক্যকালেও মাহিষ্যতী সমৃদ্ধিশালিনী ও বহু  
পণ্ডিতের বাসভূমি বলিয়া সমাদৃত ছিল। সিংহলের মহা-  
বংশে লিখিত আছে, সম্রাট অশোক এই মহেশমণ্ডলে  
(মাহিষ্যতী মণ্ডলে) গেরো মহাদেবকে প্রেরণ করিয়া-  
ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্  
সিরাং এখানে সাগমন করেন। তিনি মো-হি-শ-ফ লো  
পু-লো (মহেশ্বরপুর) নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।  
তৎকালে এই নগরের পরিমাণ ৩০ লি বা ৫ মাইল এবং সমস্ত  
রাজ্যের পরিমাণ ৩০০০ লি বা ৫০০ মাইল। তখনও এই জন-  
পদ একটা স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়াই গণ্য ছিল। চীনপরিব্রাজক  
লিখিয়াছেন, এখানকার অধিবাসিগণের রীতিনীতি এবং উৎপন্ন  
দ্রব্য উচ্চমানের ছায়া, এখানকার আকর্ষণ লোকই পাণ্ড-  
পত নতাবলম্বী, বুদ্ধ মত বড় কেহ মানিত না। এখানকার  
রাজাও তখন ব্রাহ্মণ জাতির। পুরাণ-কলিংহামের মতে, এই

নগরের বর্তমান নাম মণ্ডল। জব্বলপুরের ৬ মাইল দূরে অবস্থিত ত্রিপুরী নামক নগরীর আত্মদেয়ে মাহিষ্যতীর সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয় ৭৬ মহাভারতের সময়ে মাহিষ্যতী ও ত্রৈপুর দুইটা স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়াই গণ্য ছিল। যথা—

“মাত্রীস্বতন্ততঃ প্রায়ঃবিজরী দক্ষিণাং দিশম্।

ত্রৈপুরং স রশে কৃষা রাজানমিতোজসম্।” (২।৩।৬০)

অমন্তর সহদেব (মাহিষ্যতী জয় করিয়া) দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি অমিততেজা ত্রৈপুররাজকে বশে আনিয়াছিলেন।

মাহিষ্যতেয়ক (ত্রি) মাহিষ্যতী (কল্যাণিত্যো চক্ৰঃ। পা ৪।২।১৫) ইতি ঠাঞ্। মাহিষ্যতাদেশতব।

মাহিষ্য (পুং) মাহিষ্যঃ সাধুরিত্তি মাহিষ্য-যাঞ্। জাতিবিশেষ। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যগর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

স্মৃতি ও পুরাণ হইতে বহুবিধ মাহিষ্যজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মনু মাহিষ্যজাতি সখকে কোন কথা বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,—

“বৈশ্যশূদ্রোস্ত রাজতান্মাহিষ্যোগ্রো সূতো সূতো।” (১।১২)

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যগর্ভে মাহিষ্য এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উগ্রজাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

মহাদ্রিথণ্ডে লিখিত আছে—

“বৈশ্যায়ঃ ক্ষত্রিয়াজাতো মাহিষ্যস্বহুলোমজঃ ॥৪৪

অষ্টাধিকারনিরতচতুষ্টয়স্বকোবিদঃ।

ব্রতবন্ধাদিকান্তস্ত ক্রিয়াঃ স্নাঃ সকলা বিশঃ ॥৪৫

জ্যোতিষঃ শাকুনঃ শাস্ত্রং স্বরশাস্ত্রঞ্চ জাবিকা।

সুগন্ধং বনিতা পুস্তং গীতং তাষুণভোজনম্ ॥৪৬

শয্যা বিভূষা সুরতং ভোগাষ্টকমুদাহৃতম্।” (পূর্ব্বাঙ্ক ২৬)

ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যগর্ভে অহুলোম মাহিষ্যজাতির উৎপত্তি, ইহারা অষ্টভোগনিরত, চতুষ্টয় অঙ্গবিৎ, হহাদের উপনয়নাদি সমস্ত ক্রিয়া বৈশ্যের জ্ঞান, জ্যোতিষ, শাকুন ও স্বরশাস্ত্র ইহাদের উপজীবিকা। সুগন্ধ, স্নান, বস্ত্র, গীত, তাষুল, শয্যা, অলঙ্কার ও রতিক্রীড়া এই অষ্টভোগ।

আশ্বলায়ন বলিয়াছেন,—

“বৈশ্যায়ঃ ক্ষত্রিয়াজাতো মাহিষ্যস্বষ্টসংজ্ঞকঃ।

চৌযোগাশ্রামনৈব ভবেদ্বীবরসংজ্ঞকঃ ॥”(আশ্বাং স্মৃতি-২১অঃ)

ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যগর্ভে মাহিষ্য স্বষ্টজাতি এবং গুপ্তভাবে (অবৈধরূপে) ক্ষত্রিয় হইতেই বৈশ্যগর্ভে দ্বীবর নামক জাতি হইয়াছে।

আশ্বলায়ন আরও বলেন,—

“অষ্টায়াং সমুৎপন্নঃ স্তবর্ণেন বিজোতমাঃ।

অগ্নিনয়ন্তকাথো স হতি প্রোক্তঃ মহর্ষিভিঃ ॥

করণায়ান্ত বিপ্রোক্তা মাহিষ্যাতোহভিচার্যতে।

স তক্ষা রণকারশ্চ প্রোক্তঃ শিল্পী চ বান্দুধী।

লোহকারশ্চ কৰ্ম্মারঃ ইতি বেদবিদো বিহঃ ॥” (২১অঃ)

অর্থাৎ স্তবর্ণজাতি কর্তৃক অষ্টাভিতে যে সমুৎপন্ন মহর্ষিগণ তাহাকেই ‘অগ্নিনয়ন্তক’ (৭) বলিয়া থাকেন, আবার স্তবর্ণ হইতে করণকস্তার গর্ভে মাহিষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সেই মাহিষ্যই বেদবিৎ কর্তৃক তক্ষা (সুত্রধার), রণকার, শিল্পী, বান্দুধী, লোহকার ও কৰ্ম্মার বা কামার নামে বিদিত।

আবার আশ্বলায়ন নির্দেশ করিয়াছেন,—

“মহিষী সোচ্যতে ভার্য্যা ভগেনোপার্জিতঃ ধনম্।

তজ্জাং যো জায়তে পুত্রো স মাহিষ্যঃ সূতঃ সূতঃ ॥”

“বার্ষলেশশ্চ বৈ কুণ্ডগোলকঃ শূদ্রযোনিজঃ।

... ... নিন্দ্যাস্ত মাহিষ্যেরোপি বিপ্রজাঃ ॥”

“এতেষাং যাজনং বস্ত্র ব্রাহ্মণঃ কুরুতে যদি।

স যতি নরকং ঘোরং যাবাদিত্রাস্তদুর্দশ ॥

অবিজানান্ জলং চারং যাজনঞ্চ প্রতিগ্রহম্।

ব্রাহ্মণো নৈব গৃহ্নায়াদিতি প্রাহ্মুনাশ্বরাঃ ॥”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বার বৈশ্যাবৃত্তি দ্বারা ধন উপার্জন করে, সেই ভাব্যাকে মাহিষ্য বলে, তাহাতে যে পুত্র জন্মে, সেই মাহিষ্য সূত নামে প্রণীত। বৃষলীপুত্র, কুণ্ডগোলক, ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রাগর্ভজাতপুত্র এবং মাহিষ্য সূত ইহারা নিন্দিত। যে ব্রাহ্মণ ইহাদের যাজন করেন, চতুর্দশ ইন্দ্রের অবস্থান কাল পর্যন্ত তাহার বোর নরকভোগ ঘটে। মুনীশ্বরগণ আদেশ করিয়াছেন যে, কোন ব্রাহ্মণ এই সকল অবিজ্ঞের জল, অন্ন, যাজন ও দান গ্রহণ করিবেন না। যাহা হউক, উক্ত প্রমাণ দ্বারা আমরা তিন প্রকার মাহিষ্য পাইতেছি, ১ম ক্ষত্রিয় বৈশ্য-জাত উচ্চশ্রেণীর মাহিষ্য, ২য় করণীর গর্ভজাত মধ্যম শ্রেণীর মাহিষ্য এবং ৩য় বৈশ্যাবৃত্তি দ্বারা উৎপন্ন অতি জঘন্য মাহিষ্য।

বর্তমান কালে বঙ্গের হালিক-কৈবর্তগণ আপনাদিগকে “মাহিষ্য” বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। এরূপ পরিচয় দিবার কারণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্মধণ্ডে লিখিত আছে—

“ক্ষত্রবায়োগ বৈশ্যায়ঃ কৈবর্তঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ।

কলৌ তীবরসংসর্গাদ্ দ্বীবরঃ পতিতো ভূবি ॥”(ব্রহ্মধণ্ড-১০।১১১)

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যগর্ভে যে জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই কৈবর্ত নামে খ্যাত, কলিকালে তীবরসংসর্গে এই দ্বীবর-কৈবর্ত ধরাতলে পতিত হইয়াছে।



বর্তমান কালে হালিক-কৈবর্তগণ জালিক (ধীবর) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তজ্জাত তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা বিত্তক কৈবর্ত বা মাহিষ্য, পতিত বা ধীবর কৈবর্ত নহেন। কিন্তু আখ্যায়ন এ সন্দেহ তজন করিয়া বলিয়াছেন যে, “চৌর্যোগ” অর্থাৎ গুপ্ত ভাবে অবৈধরূপে যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা ই ধীবর বা কৈবর্ত। কিন্তু কোন শাস্ত্রে মাহিষ্য কৈবর্ত বলিয়া বর্ণিত হয় নাই।

মাহিষ্য ও কৈবর্ত ভিন্ন ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্রাতে আরও কএক জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—

“ক্ষত্রবীর্যোগ বৈশ্রায়ানুভোঃ প্রথম বাসরে।

জাতঃ পুত্রো মহাদম্ভাবলবাংশ ধমুর্জয়ঃ ॥

চকার বাগভীতক ক্ষত্রিয়েণাপি বারিতঃ।

তেন জাত্যা স পুত্রশচ বাগভীতঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্ত ১০১১৭-১১৮ )

অতঃ প্রথম দিনে বৈশ্রাতে ক্ষত্রিয়বীৰ্য্য নিষিক্ত হইয়া যে পুত্র জন্মে, সে মহাদম্ভা, বলবান ও ধমুর্জয়, ক্ষত্রিয় দ্বারা নিবারিত হইয়াও বাগভীত বা অনির্ভীতনীর কণ্ঠ সম্পাদন করিয়াছিল, তজ্জাত সেই পুত্র বাগভীত বা বাগদী নামে খ্যাত হয়।

আবার ঔশনসধর্মশাস্ত্রনামধেয় এক অপ্ৰাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে—

“নৃপাজাতোহথ বৈশ্রায়াঃ গৃহায়াঃ বিধিনা সূতঃ।

বৈশ্রবৃত্ত্য তু জীবতে ক্ষত্রধর্মঃ ন চাচরেৎ ॥”

ক্ষত্রিয় হইতে বিধিপূর্ব্বক গৃহীত বৈশ্রাতে যে পুত্র জন্মে সে সূত, সে বৈশ্রবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে, ক্ষত্রধর্ম আচরণ করিবে না।

যাহা হউক, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্রাতে অগ্নিলেই যে সকলেই মাহিষ্য হইবে, তাহা নহে। মাহিষ্য ব্যতীত ধীবর বা কৈবর্ত, সূত, ও বাগদী ইহারাও ক্ষত্রিয়-বৈশ্রা হইতে উৎপন্ন।

কুন্তুকভট্ট লিখিয়াছেন, যে “নৃত্যঙ্গীতনক্ষত্রজীবনঃ শস্তরক্ষা চ মাহিষ্যাণাং” অর্থাৎ নাচ গান, শুভাশুভ বলা ও শস্তরক্ষা এইগুলি মাহিষ্যগণের বৃত্তি। কিন্তু কোন প্রাচীন স্মৃতি-পুরাণে বা নিবন্ধে মাহিষ্যের শস্তরক্ষাবৃত্তি নির্দিষ্ট হয় নাই।

আখ্যায়ন ও ঔশনসধর্মশাস্ত্রোক্ত সূত মনুজ সূত হইতে ভিন্ন। আখ্যায়ন যাহাকে “ধীবর” বলিয়াছেন, তাহাকেই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকার কৈবর্ত নামে উল্লেখ করিয়াছেন। “কৈবর্তো দাশধীষয়ো” এই কোষবচন এবং ব্রহ্মবৈবর্তের “ক্ষত্রবীর্যোগ” ইত্যাদি সম্পূর্ণ বচনানুসারে ধীবর ও কৈবর্ত একপরিবার-শব্দ ও একজাতি বলিয়া গৃহীত হইতেছে। তবে

ইহাও বলা আবশ্যক যে কৈবর্তজাতি এক প্রকার লুপ্ত। এখন যেমন হালিক ও জালিক এই দুই প্রকার কৈবর্ত দেখা যায়, পূর্ব্বেও মানাপ্রকার কৈবর্ত ছিল। যথা—

ক। “নিষাদো মার্গবঃ সূতে দ্বাশঃ নৌকর্ষজীবিনম্।

কৈবর্তমিতি যঃ প্রাহর্য্যাবর্তনিবাসিনঃ ॥” (মহু ১০১৩৪)

নিষাদ মার্গব বা দাশজাতিতে অল্প দিয়াছে, এই জাতি নৌকারী, আখ্যাবর্তবাসিন্ধ ইহাদিগকে কৈবর্ত বলিয়া থাকেন।

খ। “স্বর্ণকারাজ কৈবর্তঃ কুবেরিণ্যাং বহুব হ ॥”

( পরশুরামীয় জাতিমাণ )

অর্থাৎ স্বর্ণকার হইতে কুবেরিণী বা কোএরিকজাতীয় সূত কৈবর্তের উৎপত্তি।

যাহা হউক, আমরা তিন প্রকার কৈবর্ত পাইতেছি,—

১ম, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্রাতে জাত কৈবর্ত, শস্তরক্ষা উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ ইহারা ই একপে হালিক কৈবর্ত নামে খ্যাত। এই জাতি ও মাহিষ্যের উৎপত্তি ক্ষত্রিয়-বৈশ্রাতে হস্তায়, এবং সময়ে সময়ে দক্ষিণবঙ্গের আনুপ প্রদেশে এই জাতি আধিপত্য বিস্তার করার বিত্তক মাহিষ্যগণের সহিত সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। মেদিনীপুর জেলায় এই জাতি বহু পূর্ব্বকাল হইতে রাজত্ব করিতেছেন এবং এই রাজকীর প্রভাবে তাঁহারা রাজপুতগণের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন \*।

২য়, মনুপ্রোক্ত মার্গব বা দাশ, ইহারা আখ্যাবর্তে কৈবর্তনামে খ্যাত, কিন্তু এদেশে মার্গব বা মালো নামে পরিচিত। ইহারা এখনও এদেশে নৌকা বাহিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে।

৩য়, বেদোক্ত আদি কৈবর্ত বা ধীবর, এখন জালিক কৈবর্ত নামে খ্যাত। ইহাদের আদি উৎপত্তি স্থির করিতে না পারিয়া সম্ভবতঃ আধুনিক জাতিমালাকার পরশুরাম ইহাদিগকে কুবেরিণী বা কোএরি-রমণীর গর্ভজাত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা ই অত্যাধ বলিয়া নানা সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। [ কৈবর্ত দেখা ]

মাহিষ্যের সূত বা নিম্নশ্রেণীর মাহিষ্যগণের বাজন-প্রতিগ্রহাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আখ্যায়নের উক্তি হইতেই জানা গিয়াছে। এ দেশীয় হালিক কৈবর্তদিগকে এইরূপ জঘন্য মাহিষ্য মনে করিয়া সম্ভবতঃ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পোরোহিত্য স্বীকার করেন নাই, সেই জন্যই হালিক কৈবর্তগণ ধনসম্পদে ও পরাক্রমে বহুদিন হইতে দক্ষিণবঙ্গে ও মেদিনীপুর জেলায় প্রাধান্য লাভ করিলেও

\* Risley's Tribes and Castes of Bengal.

কোন অজ্ঞাত কারণে জালিক কৈবর্তের পুরোহিত-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যজনক ভাষায় মাহিষ্যগণের পুরোহিতকে অবিদ্র ও অনাচরণীয় বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ব্রাহ্মণই স্বল্পপুরাণের সহাদ্রিখণ্ডে ‘শূদ্রপ্রায়’ ‘কৈবর্ত ব্রাহ্মণ’ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই কৈবর্ত পুরোহিতগণ ‘পরশর’, ‘ব্যাসোক্ত’, ‘দাক্ষিণাত্য’ ও ‘দ্রাবিড়’প্রণীত বলিয়া পরিচিত। সহাদ্রিখণ্ডে ইহাদের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে,—

“ভগবান্ পরশুরাম সহাদ্রিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, গিরিতট বিধৌত করিয়া কল্লোলময় উত্তালতরঙ্গাকুল সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে। পরশুরাম সমুদ্রকে অবিলম্বে সরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া পরশু নিক্ষেপ করিলেন। যেখানে পরশু গিয়া পড়িল, সেই স্থানে সমুদ্রের সীমা নির্দিষ্ট হইল। জল সরিয়া গেলে সহাদ্রি হইতে নামিয়া দেশ দেখিতে পাইলেন। দক্ষিণে কস্তাকুমারী হইতে উত্তরে নাসিকাভ্রাধক পর্যন্ত তাহার সীমা। ভার্গব সেখানে কৈবর্ত পাঠাইয়া তাহাদের বড়িশে জাল ছিঁড়িয়া বজ্রসূত্র করিয়া দিলেন। এইরূপে ভার্গব সেই কৈবর্তদিগকে বিপ্র করিয়া লইলেন। তাহাদিগকে বর দিলেন এই যে, তোমাদের স্বদেশে কখন দ্রুতগতি হইবে না, এই ভূমি শতশালিনী হইবে। তোমাদের ঘখনই কোন বিপদ ঘটবে, আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিয়া তোমাদের বিপদ নিবারণ করিব। এই বলিয়া ভার্গব চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেই বিপ্ররূপধারী কৈবর্তগণের মনে সন্দেহ হইল। তাহারা পরশুরামের বাক্য পরীক্ষা করিবার জন্য সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে কাদিতে পরশুরামকে ডাকিতে লাগিল। অবিলম্বে পরশুরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নষ্টামি জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিসম্পাত করিলেন, ‘তোরা আজ হইতে কদম্ভভোজী, ছিন্নবস্ত্রধারী ও অপ্রসিদ্ধ স্থানে প্রাণনীর হইয়া থাকিবি।’ ভার্গব এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া সে স্থান হইতে গমন করিলেন। শাপগ্রস্ত ও হুঃখার্ত্ত কৈবর্ত-ব্রাহ্মণগণ শূদ্রপ্রায় হইয়া পড়িল।”\*

\* “কস্তাকুমারী চৈক্স নাসিকাভ্রাধকঃ পরঃ।

সীমাক্ষপেণ বিদ্যোতে দক্ষিণোত্তরতঃ শুভো ॥২৯

শতযোজনায়ামক বিভেদে সপ্তথা তলম্।

অত্রক্ষাণ্য তদা দেশে কৈবর্তান্ প্রেযা ভার্গবঃ ॥৩০

দ্বিষা সবড়িমাং কণ্ঠে বজ্রসূত্রমকরয়ৎ।

দাশানেকং তদা বিপ্রান্ চকার ভূশনন্দনঃ ॥৩১

কৌণ্ডিন্দ্রে বদ্যদন্তি পুনস্তত্র সসজ্জ তৎ।

বরঃ দদৌ স্বদেশেভ্যঃ দ্রুতকং মা ভবদ্বিত্তি ॥৩২

এখনও ঐ সকল ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেছেন। ইহারা পরশর নামে খ্যাত ও উচ্চ ব্রাহ্মণসমাজে নিশ্চিত। কোথাও কোথাও কর্মনিষ্ঠাশ্রমে ও ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে কতকটা উচ্চাঙ্গন লাভ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে জালিককৈবর্ত অপেক্ষা তাঁহাদের পুরোহিতগণ হীন অবস্থাপন্ন। বাস্তবিক আশ্চর্য্যজনক ও সহাদ্রিখণ্ড হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

অনেকের বিশ্বাস, উৎকলে যে গজপতিবংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন গড়-জাতে যে সকল ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্র রাজভ্রমর রাজত্ব করিতেছেন, তাহারা সকলেই মাহিষ্য এবং মেদিনীপুরের বিভিন্ন গড়ের অধিপতি মাহিষ্য-কৈবর্তগণের একজাতীয়। কিন্তু বলিতে কি, এই অমূলক বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। উড়িষ্যা গজবংশীয় ও গজপতিবংশীয় রাজগণের বহুতর শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ময়ূরভঞ্জের রাজবংশও ঐরূপ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। এমন কি, উৎকলের কোন রাজা আপনাকে “মাহিষ্য” বলিয়া পরিচয় দেন না। উৎকল-রাজগণকে “মাহিষ্য” বলিয়া ঘোষণা আধুনিক বঙ্গীয় লেখকগণের কবিকল্পনা মাত্র। সুতরাং উৎকলের রাজবংশ ও মেদিনী-

ইতি দশা বরং ভেভ্যো জামদগ্ন্যঃ কৃপানিধিঃ ॥৩৩

গোকর্ণং প্রযথো রামো মহাবলদ্বিদুম্বরা।

তৎ সত্যমবৃতং বেতি পরীক্ষাং কুর্মহে বরম্।

ইতি সর্বে সমালোচ্য রামেভ্যুচ্চৈঃ প্রচুতুঃ ॥৩৪

অক্রান্তিতং তদা তেবাং শ্রদ্ধা রামঃ কৃপানিধিঃ।

প্রাচুর্য্যসীং পুরোভাগে দেবর্ষিভার্গবঃ স্বয়ম্ ॥৩৫

ভার্গব উবাচ। কিমর্থং ক্রান্তিতং বিপ্রা ভবদ্বিত্তিমিতৈরিহ।

কিং দুঃখং ভবতামব্য নাপর্য্যায়চিত্তিরাহম্ ॥৩৬

ইতি তস্য বচঃ শ্রদ্ধা প্রত্যুত্থুস্তে ভয়াধিতাঃ।

ন কিঞ্চিদপি সংপ্রাপ্তং দুঃখং তৎকৃপয়া বিভো ॥৩৭

জন্মিতং ভবতা সত্যমবৃতং বেতি শব্দিতৈঃ।

কেবলং তু পরীক্ষার্থং ক্রান্তিতং নীলিতৈঃ প্রভো ॥৩৮

ইতি তেবাং বচঃ শ্রদ্ধা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।

নিদংহস্মি নৈত্রাভ্যামালোকয়ত ভূমরান্ ॥৩৯

শশাপ তান্ তদা বিপ্রান্ জমদগ্নিকুমারকঃ।

কদম্ভভোজিনো বৃহৎ চেলখণ্ডধরা ভূবি ॥৪০

অপ্রসিদ্ধাবনীহানে প্রাণনীর ভবিষ্যৎ।

শপেৎ তং ভার্গবো রামো মহেন্দ্রঃ তপসে যথো ॥৪১

গতে তু ভার্গবে রামে তৎক্ষেত্রহা বিজাতয়ঃ।

শাপগ্রস্তাঃ স্বয়ংভার্তাঃ শূদ্রপ্রায়ান্তরাজবন্ ॥৪২

(সহাদ্রিখণ্ড-উত্তরার্ধ ৭ অধ্যায়)

পুরের মাহিষাকৈবর্ত-রাজবংশকে একজাতীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ মাহিষাজাতির এখন আর অস্তিত্ব নাই। সম্ভবতঃ এই জাতি অবস্থা অনুসারে রাজপুত-সমাজে অথবা অপর কোন সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন।

বালিষীপে এখনও মাহিষাজাতির বাস আছে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিবাহিত বৈশ্যকন্ডার গর্ভে তাঁহাদের উৎপত্তি। বালিষীপে এখনও সেই সুপ্রাচীন হিন্দুসমাজের আদর্শ বিদ্যমান। এখানকার মাহিষাগণের আচারব্যবহার ক্ষত্রিয়বৎ। এখানে বহুস্থানে মাহিষার রাজত্ব, তাঁহারা আপনাদিগকে ‘মাহিষাক্ষত্রিয়’ বলিয়া পরিচয় দেন।\*

মাহীন (পুং) মহৎ, উৎকৃষ্ট। “মাহীনানামুপস্তুতঃ অগণ্য বিব্রতো নমঃ” (শুক ১.৩৩.১২) ‘মাহীনানাং মহতাং’ (সারণ)

মাহুং (দেশজ) হস্তচালক।

মাহুগু ক ভট্ট, জনৈক প্রাচীন কবি।

মাহুতী (দেশজ) গজসৈন্য বা গজারোহী সৈন্য।

মাহুরদত্ত (কৌ) নগরভেদ।

মাহুদা, হাজারিবাগ জেলার করণপুর পরগণার একটা গওঠেল।

ইহা হাজারিবাগ হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এই পাহাড় ৮০০ ফিট হইতে ২৪৩৭ ফিট পর্যন্ত উচ্চ। দূর হইতে ইহার দৃশ্য অতীব মনোরম। শৃঙ্গাগভাগ তিকি অর্ধচন্দ্রের স্থায়। ইহার নিম্নদেশে এখন চার চাগ রহিয়াছে।

মাহুল (পুং) মহলের গোত্রাপত্য। (প্রবরাধ্যায়)

মাহুলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। গ্রামের মধ্যভাগে হেমাড়পহাড়িগের সুপ্রসিদ্ধ কদম্বদেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে। মন্দিরটা ৪০'x২০' ফিট। ইহার মণ্ডপাংশ ভাস্করশিল্পে পূর্ণ। উত্তরে পরশুরামকে ক্রোড়ে করিয়া মহিষাসুরীদেবী, পাশ্চমে নরসিংহ মূর্তি এবং দক্ষিণে গজানন, ষড়ানন প্রভৃতি দেবমূর্তি খোদিত আছে। গর্ভগৃহের দেবীমূর্তির পার্শ্বে মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি স্থাপিত।

মাহুলী (সঙ্গম-মাহুলী) বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটা নগর। কৃষ্ণা ও বেথানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহা সঙ্গমমাহুলী নামে খ্যাত। অক্ষাং ১৭°৪২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৬' পূঃ। এই নগর প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। কৃষ্ণানদীর পূর্বতীরভাগ ক্ষেত্রমাহুলী এবং পশ্চিম-কূল বস্তিমাহুলী নামে পরিচিত।

\* Journal of the Royal Asiatic Society, N. S, Vol. IX. p. 116.

মহারাজীয়া সুবিখ্যাত পশুপ্রতিনিধিবংশের অধিকারে থাকিয়া এই নগর খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধির উন্নত সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। ধর্মপ্রাণ সচিববংশের দেবকীর্তি-গুলি অজ্ঞাপিও মাহুলীনগরীর গৌরব রক্ষা করিতেছে। কৃষ্ণা-তীরবর্তী ১০টা দেবমন্দিরই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। ক্ষেত্র-মাহুলীর গিরিবাটস্থ রাধাশঙ্করমন্দির-চত্বর বাপুভট গোবিন্দ-ভট কর্তৃক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নিৰ্মিত হয়। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ত্রীপৎরাও পশুপ্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠিত বিশেষরমন্দির, ১৭০০ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম নারায়ণ অল্লল কর্তৃক নিৰ্মিত রামেশ্বরমন্দির, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ত্রীপৎরাও পশুপ্রতিনিধি স্থাপিত সঙ্গমস্থলের সঙ্গমেশ্বর মহাদেবমন্দির এবং ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে ত্রীপৎরাও স্থাপিত বিশেষর মহাদেবের মন্দির শিরনৈপুণ্যে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। বিশেষরমন্দিরে যে সুবৃহৎ ঘণ্টা ঝুলান আছে, তাহা ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে বসই অধিকারের পর মহারাজীয়াগণ কোন পশুগীজ গির্জা হইতে তুলিয়া আনেন। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে রামচন্দ্রের মন্দির বিদ্যমান। তাহা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সেনানী-প্রবর ত্রিষক বিশ্বনাথ পেটে নিৰ্মাণ করেন। এই পাঁচটা ভিন্ন আরও পাঁচটা ক্ষুদ্রায়তন মন্দির আছে। ঐ সকলের কারুকাৰ্য্য কোল অংশে হীন নহে। এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে চিট্টনেরবাসী জ্যোতিপশু ভাগবতের প্রতিষ্ঠিত বিঠোবার মন্দির, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণভট তালকর-স্থাপিত ভৈরবদেবের মন্দির, ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণাবাসীর মন্দির ও ১৭২০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদীক্ষিত চিপলুনকর কর্তৃক কৃষ্ণেশ্বর মহাদেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ভিন্ন সাতারা রাণীর কান্তিসমর্ষিত আর একটা মন্দির সাতারার প্রশস্ত পথের দ্বারে নিৰ্মিত আছে।

উপরি উক্ত মন্দিরসমূহ ব্যতীত রাস্তার উভয় পার্শ্বেই সমাধিস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সাতারা-রাজ-পরিবারবর্গের স্মৃতিচিহ্নই অধিক। রাজা শাহ (১৭০৮-১৭৪২ খৃঃঅঃ) আপন প্রিয় কুকুরের স্মৃতিরক্ষার জন্ত এখানে একটা স্তম্ভ স্থাপন করেন। ঐ কুকুর তাঁহাকে ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তিনি কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ঐ কুকুরকে বহু মূল্য বস্ত্রে আবৃত রাখিতেন এবং স্বয়ং যেখানে যাইতেন, ঐ কুকুরও স্বতন্ত্র পালঙ্কিতে চড়িয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত।

শুক দেবকীর্তির জন্ত যে এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। চতুর্থ পেশবা মাধব রাওর শুরু ও রাজস্কাযো পরামর্শদাতা দেবপ্রাভম রামশাস্ত্রী পরভোনে এইস্থলে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ পেশবা বাজীরাওর

সহিত ইংরাজরাজের যুদ্ধ বিবোধিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে  
স্বপ্নন মাকম এখানে আসিয়া পেশবার সহিত সাক্ষাৎ  
করেন। যুদ্ধের সময় নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বহু পেশ-  
বাই এখানে কএকবার আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন।

মাহেজি ( চিকখেড় ), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর থাকেশ জেলার  
অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২০°৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°  
৩০' পূঃ। মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে থাকার এবং গ্রেট  
ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলপথের একটি স্টেশন থাকার  
এখানকার উত্তরোত্তর প্রীতি সাধিত হইতেছে।

এখানে প্রতিবৎসর মাঘ হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত মাহেজি  
নামক এক কৃষকরমণীর উদ্দেশে মেলা হইয়া থাকে। থাকেশ  
জেলার এরূপ মহোৎসব আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। মেলার  
সময় এখানে অব-গবাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয় এবং কৃষি-  
প্রদর্শনী হইয়া থাকে।

স্থানীয় প্রবাদ, ঐ রমণী ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিয়া বোগ-  
সিদ্ধি হয়। প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে তিনিসাধারণ্যে যীর অদৌ-  
কিক প্রভাব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চিকখেড় গ্রামের  
মেলা-স্থানের সন্নিকটে মাহেজির জীবন্ত সমাধির স্থান আজিও  
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মাহেন্দ্র ( হ্রি ) মহেন্দ্রো দেবতা। অস্য মহেন্দ্র- ( মহেন্দ্রাদ-  
ঘাগো চ। পা ৪।৮।২২ ) ইতি অণ্। ১ মহেন্দ্রদৈবত্যা,  
বাহার দেবতা ইন্দ্র।

“অবিভক্ততঃ শরৈর্মঘীকং রাকসো রণে।

তদপ্যধ্বপদাদ্যাদ্য মাহেন্দ্রলক্ষণেরিতম্।” ( ভটি ১৫।২০ )

২ মহেন্দ্রসম্বন্ধী, ইন্দ্রসম্বন্ধী। ( পুং ) ৩ মহেন্দ্রস্তায়ঃ অণ্।

শুভদণ্ডবিশেষ। কার্যের ব্যগ্রতাবশতঃ যে সময় শুভ দিন  
দেখিয়া যজ্ঞাদি করা হয় না, তখন শুভক্ষণ দেখিয়া যাত্রা  
আবশ্যক। রবি প্রভৃতি সকল বারে মাহেন্দ্র, বারুণ  
প্রভৃতি দণ্ড আছে, ঐ দণ্ডকে সাধারণতঃ মাহেন্দ্র-  
যোগ বা মাহেন্দ্রক্ষণ কহে। রবি প্রভৃতি সপ্তবারে বায়ু,  
বরুণ, যম ও মাহেন্দ্র এই চারিটি যোগ এক এক দণ্ড  
করিয়া হয়। ইহার মধ্যে বরুণ ও মাহেন্দ্রের দণ্ড শুভ  
বায়ু ও যমের দণ্ড অশুভ। মাহেন্দ্রের দণ্ডে নিত্য বিজয় এবং  
বারুণের দণ্ডে ধনাগম হয়।\*

\* “খ্যাভঃ বাঁ ব ব মা সূর্যো মা বা ব য কলাশিখো।

ব ব মা বা কুজে জ্যোমা মা বা ব জ সূর্যঃশুভে ॥

ভরো বা ব ব মা চৈব মা বা ব ব তথা ভূগো।

সূর্যাপুত্রে চ ব মা বা যটীযুগং শুভাশুভম্ ॥

মাহেন্দ্রে বিজয়ো নিত্যং বারুণে চ ধনাগমঃ।

বাসৌ চ ভ্রমতে নিত্যং যমেহপি মরণং প্রবম্ ॥” ( সারসংগ্রহ )

ধনার বাত্মগ্রকরণ স্থলে লিখিত আছে—

“জ্যোতিষের মতে শুভ দিন নাহি হয়।

শিবজ্ঞান অতএব তার বিনিময় ॥

মাহেন্দ্র অমৃত বক্র শূভ চারি যোগ।

বৎসরেতে প্রতি দিবসাত্তি করে ভোগ ॥

মাহেন্দ্রযোগেতে হয় সর্বদ্রোতে অয়।

অমৃতযোগেতে সর্বকার্য সিদ্ধি হয় ॥” ( খনা )

এই যোগ সকল মাসে সমান নহে, ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন  
ভিন্ন হয় এবং দিবা ও রাত্রিতে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।

“মাঘ কান্তন চৈত্র আর বৈশাখ মাসেতে।

প্রাবণ ভাদ্রেতে রয়ে এক প্রকারেতে ॥

আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসেতে।

একই প্রকার আর পৌষ মাসেতে ॥

জ্যৈষ্ঠ আর আষাঢ়েতে থাকে একভাবে।

উদাহরণেতে তাহা বরুণ জানিবে ॥” ( খনা )

লকল পঞ্জিকাতেই প্রায় ইহার তালিকা দেওয়া আছে,  
তাহা দেখিলেই কোন্ সময় মাহেন্দ্রযোগ, কোন্ সময় অমৃতযোগ,  
তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। বাহুল্যভয়ে তাহা আর এস্থলে  
লিখিত হইল না।

৪ উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষবিশেষ, যে পুরুষের মাহাত্ম্য,  
শৌর্য, আজ্ঞা, সতত শাস্ত্রবুদ্ধি এবং ভৃত্যাদিতে প্রিয়বুদ্ধি  
বিদ্যমান আছে, তাহাকে মাহেন্দ্রপুরুষ কহে।

“মাহাত্ম্যঃ শৌর্যমাজ্ঞা চ সততঃ শাস্ত্রবুদ্ধিতা।

ভৃত্যানাং ভরণ্যাপি মাহেন্দ্রং লক্ষণেরিতম্ ॥” (সুশ্রুত সূত্রঃ ৪ অঃ)

মাহেন্দ্রজ ( পুং ) জৈনদিগের দেবতাজেন্দ।

মাহেন্দ্রবাণী ( স্ত্রী ) নদীবিশেষ। ( ভারত ১৩ পর্ব )

মাহেন্দ্রী ( স্ত্রী ) মহেন্দ্রস্তায়ঃ মহেন্দ্র-অণ্, স্ত্রিয়াং ভীষ্।

১ ইন্দ্রাণী। ( শব্দরত্নাঃ ) ২ গাভী। ৩ ইন্দ্রবারুণীলতা।

৪ সপ্ত মাতৃকাভেদ। ৫ স্বন্দামুচর-মাতৃভেদ। ৬ ঐন্দ্রীশক্তি।

মাহেয় ( হ্রি ) মহী-ঢক্। ১ মহীর অপত্য। ( পুং ) ২ জন-  
পদভেদ। ( ভারত ৬।২।৪৮ ) ৩ মঙ্গলগ্রহ।

“ককপিত্তসমুদ্ভূতাং শিরঃপীড়াং ভয়াবহাম্।

মাহেয়ঃ কুরুতে শৌকং বৃথাস্তদংশাং পতঃ ॥” ( সমরাসূত ) \*

৪ জাতিবিশেষ।

মাহেয়ী ( স্ত্রী ) মহাঃ স্ত্রয়ভ্যাঃ অপত্যমিতি মহী- ( নভাদি-  
ভ্যো ঢক্। পা ৪।২।৯৭ ) ইতি ঢক্, স্ত্রিয়াং ভীষ্। গাভী।

মাহেল ( পুং ) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ। ( প্রবরাধ্যায় )

মাহেশ ( পুং ) মহেশ-অণ্। ১ মহেশসম্বন্ধীয়। ( স্ত্রী ) মহেশেন

কৃতমিত্যাণ্। ২ ব্যাকরণবিশেষ, মাহেশব্যাকরণ।

“বাহ্যজ্জহার মাহেশ্বাদ্যাসো বাচরগণবাৎ ।

কিং তানি পদয়ন্তানি সন্তি পাণিনিগোপদে ॥” (উট্ট)

মাহেশ, হৃগদীপ্তোহু গঙ্গাতীরবতী একখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম ।

এখানে জগন্নাথদেবের স্থান ও রথযাত্রা উপলক্ষে একত্র মেলা হয় । [ মহেশ দেখ । ]

মাহেশী ( স্ত্রী ) মহেশ্বরের মহেশ-অণ্, ভীষ্, হৃগ্ ।

“মহাদেবাং সমুৎপন্ন্য মহাঐত্তরীক্যতে যতঃ ।

মাহেশ্বৰ্য্য। তদুৎপত্তা মাহেশী তেন সা স্মৃতা ॥” (দেবীপুঃ ৩৫অঃ)

মাহেশ্বর ( ত্রি ) মহেশ্বর-অণ্ । ১ মহেশ্বরসম্বন্ধীয় । ( স্ত্রী )

মহেশ্বরেণ কৃতং অণ্ । ২ উপপুরাণবিশেষ । ৩ যজ্ঞভেদ ।

“মাহেশ্বরঃ ভাগবতঃ বাসিষ্ঠক সবিস্তরম্ ।

এতান্যুপপুরাণানি কথিতানি মহাম্ভাতিঃ ॥” (দেবীভাগঃ ১।৩।১৬)

৪ শৈবসম্প্রদায় বিশেষ । ৫ সভানাটক প্রণেতা ।

মাহেশ্বরকবচ, মাহেশ্বাক্ষর সংযুক্ত কবচভেদ । অরতিসার রোগে ইহা বিশেষ উপকারী । ইহা ধারণে দেহে শিবের জ্ঞান বল হয় । ভূত, পিশাচ, বিনায়ক প্রভৃতি শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না । ইহাতে ব্যাধিগ্রস্তেরও রোগমুক্তি হইয়া থাকে । এই কবচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও মন্ত্র নিয়ে লিখিত হইল,—

“ও নমঃ পঞ্চবক্ত্রায় শশিসোমাকর্কনেত্রায় ভগ্নাভানাম-  
ভয়ায় মম সর্বগাত্ররক্ষার্থে বিনিয়োগঃ ।

ও হৌঁ হাঁ হাঁ মন্ত্রনানেন বৃষপোময়ভস্মানামামন্ত্র্য ললাটে  
তিলকমাদায় পর্যেৎ ॥

আহি মাং দেবজ্ঞেস্ক শত্রুগাং ভয়বন্ধন ।

ও স্বচ্ছন্দোভৈরব প্রাচ্যামায়েষাং শিখিলোচনঃ ॥

ভূতেশো দক্ষিণে ভাগে নৈঋত্যাং ভীমদর্শনঃ ।

বরুণে বৃষকেতুশ্চ বায়ো রক্ষতু শকরঃ ॥

দিশ্বাঙ্গাঃ সোমাতো নিত্যমৈশান্তাঃ মদনাস্তকঃ ।

বামদেব উর্দ্ধতো রক্ষেদধো রক্ষেৎ ত্রিলোচনঃ ॥

পুরারিঃ পুরতঃ পাতু কপদী পাতু পৃষ্ঠতঃ ।

বিশ্বেশো দক্ষিণে ভাগে বামে কালীপতিঃ সদা ॥

মহেশ্বরঃ শিরোভাগে ভবো ভাগে সদৈব তু ।

ক্রবোর্মধ্যে মহাতেজাজ্বিনেত্রো নেত্রয়োর্বয়োঃ ॥

পিনাকী নাসিকাদেশে কর্ণয়োগির্জাপতিঃ ।

উগ্রঃ কপালতো রক্ষেদ্বৃষদেশে মহাভূজঃ ॥

জিহ্বারামকধ্বংসী দন্তান্ রক্ষতু যুতাজিৎ ।

নীলকণ্ঠঃ সদা কণ্ঠে পৃষ্ঠে কামান্ধনাশনঃ ॥

ত্রিপুরারিঃ স্বক্কেদেপে বাহ্যেঃ চ চন্দ্রশেখরঃ ।

হস্তিচর্মধরো হস্তে নখাঙ্গুলিষু শূলভং ॥

ভবানীশঃ পাতু জঘনঃ পাতুদরকটীমূর্ধনঃ ।

ওদে লিঙ্গে চ বেদ্রে চ মাতৌ চ প্রমথাদিগঃ ॥

জন্মোচ্চরণে ভীম সন্মানে কেশবদ্রিঃ ॥

রোমকূপে বিরূপাক্ষঃ শঙ্খশর্পে চ যোগবিৎ ॥

রক্তমজ্জবসামাস্ত্রক্রে বহুগণার্চিতঃ ।

প্রাণাপানসমানবুদানব্যানেষু ধূর্জটিঃ ।

রক্ষাহীনস্ত বৎ স্থানং বর্জিতং কবচেন বৎ ॥

তৎ সর্গং রক্ষ মে দেব ব্যাধিহর্গজরাদিতঃ ॥

কাণ্ড্যং কর্ণে দ্বিনং প্রাটৈজদীপং প্রজ্ঞাল্য সর্পিবা ।

মৈবেত্তং শিখিনেত্রায় বারয়েচ্ছোভয়ং মুখম্ ॥

অরদাহপরিভ্রাত্তং তথাষ্টব্যাদিসংযুতম্ ।

কুটৈঃ সংমার্জ্য সংমার্জ্য কিপেৎ দাপশিখে অরম্ ॥

ঐকাহিকং ব্যাহিকং বা তৃতীয়কচতুর্থকম্ ।

ষাতিপিত্তকফোদুতং সান্নিপাতোত্তেজসম্ ॥

অত্রঃ হুঃখং দুঃস্বপ্নং কণ্ঠকণ্ঠাতিচারিকম্ ।

ধাতুহং কফসংমিশ্রং বিষমং কামসম্ভবম্ ॥

ভূতাত্তিষকসংসগং ভূতচেট্টাদিসংস্থিতম্ ।

শিবাজ্ঞাং যোরময়ৈণ পূর্ববৃত্তং অয়ং অর ॥

জাহি দেহং মনুষ্যাত্ম দীপং পঙ্ক মহাজ্বর ।

কৃত্বা তু কবচং দিব্যং সর্বব্যাধিভয়ান্ধনম্ ॥

ন বাধন্তে বাধয়ন্তঃ বালগ্রহভয়ান্ধ বে ।

সুতাবিস্ফোটকং যোরং শিরোস্তিচ্ছদ্বিবিগ্রহম্ ॥

কামলাং ক্ষরকাসক গুণাশ্রয়ীভগন্দরান্ ।

শূলোদ্যানক জ্যোগং যকৃতং পাতুবিভ্রাদিম্ ॥

অভীসারাদয়ো রোগা ডাকিনীগ্রহপীড়িতান্ ।

পামাবিচর্চিকাদ্রুকুষ্ঠব্যাধিবিষান্ধনম্ ॥

অরগাদাশয়ত্যাগ কবচং শূলপাণিনঃ ।

বস্ত্র অরতি নিতাং বৈ যন্ত ধারয়তে নরঃ ॥

স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো বসেৎ শিবপুরে চিরম্ ।

সংখ্যা ত্রুতস্ত দানস্ত যজ্ঞস্তাতৌহ শাস্ততঃ ।

ন সংখ্যা বিদ্যাতে শস্তোঃ কবচস্বরগাদ্ যতঃ ।

তস্মাৎ সম্যগিনং সঠৈঃ সক্ষকামফলপ্রদম্ ।

শ্রোতব্যাং সততং তত্কা কবচঃ সর্বকামিকম্ ॥

লিখিতং তিষ্ঠতে যন্ত গৃহে সগ্যগুহুতমম্ ।

ন তত্র কলহোৎসেগং নাকালমরণং ভবেৎ ॥

নাম প্রজাঃ ত্রিযন্তজ্ঞ নাদোর্ভাগ্যলদাপ্রিতাঃ ।

তস্মান্মাহেশ্বরঃ নাম কবচং অরগণার্চিতম্ ॥”

মাহেশ্বরধূপ, অরাদিকারোক্ত ধূপোষধভেদ । প্রস্তুত প্রণালী—

হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকর্ষ, গব্যামৃত; গোবর হাড়, পঙ্কজ,

শিবনিখালা, কটুকী, খেতসর্ষপ, নিম্বপত্র, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিঠা, গোশূঙ্গ, মদনফল, বৃহত্তী, কণ্টকারী পাকাঠি, ধাত্ত্বক তুঁব, ছাগবিঠা, শূগালের বিঠা ও হস্তিদন্ত, এই সকল দ্রব্য সংগ্রহপূর্বক ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া উদ্বলিত কুটিরায় মূত্রে স্থাপনপূর্বক ধূপিত করিবে। ঐ ধূপ ঐক্য-হিক, দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক প্রভৃতি সকল প্রকার বিষম জরপ্রশমনকারী। যে গৃহে এই ধূপ প্রদান করা যায়, তথায় উহার গন্ধে সর্প পিষাচ প্রভৃতি কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারে না। 'ও নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাপত্যে সম্পন্নায় নন্দিকেশ্বরায়।' মন্ত্রে ধূপের অভিমন্ত্রণ করিবে।

মাহেশ্বরী (স্ত্রী) মহেশ্বরস্তোত্রং অণ্ডীয্। ১ যবতিক্তা। ২ দুর্গা। "ভগদেবাহুজাতায়্য সর্কাসাং বামলোচনা।

মাহেশ্বরী মহাদেবী শোচাতে পার্শ্বতী হি সা ॥" (ভা. ১৪৪৩১৫)

২ মাতৃভেদ। ৩ পীঠস্থানভেদ। (দেবীভাগ. ৩২০।৭২)

৪ নদীবিষেব।

মহোয়ারী (পারসী) মাসোয়ারী। মাস মাস।

মাক্কদ, (সুলতান-উল-আজম মমীন্ উদৌলা, নিজাম-উদ্দীন, আবুল কাশিম, মাক্কদ গাজী)—সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান-শাসক। ইহার পুর্বে কোন মুসলমান শাসনকর্তা বোগদাদের খলিফাগণের দ্বারা সুলতান-বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার পিতার নাম আমীর-উল-গাজী-নাসিরুদ্দীন উল্লা সবক্তগীন। তিনি পারস্তদেশের কোন উচ্চবংশোদ্ভব ব্যক্তি ছিলেন। মাক্কদ ৩৬১ হিজিরার ১০ই মহরম রাত্রিতে জন্ম গ্রহণ করেন। মাক্কদের জন্মের এক ঘণ্টা পুর্বে তাঁহার পিতা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, প্রকোষ্ঠাত্তরস্থ অগ্ন্যধার হইতে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ অতি সত্ত্বর বাড়িয়া উঠিল। পরিশেষে বৃক্ষটি গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া এক উচ্চে উথিত হইল যে, তাহার ছায়া সমস্ত পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া কোলিল। সবক্তগীন তৎক্ষণাৎ জাগিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময় এক জন পরিচারক আসিয়া জ্ঞাপন করিল যে,—তাঁহার পত্নী এক পুত্র রত্ন প্রসব করিয়াছেন,—সবক্তগীন্ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পুত্রের মাক্কদ (প্রশংসাজনক) নাম রাখিলেন। সেইদিন রাত্রিতে দিক্‌ভীষণবর্তী শশাবর বা পুরুষপুরের দেবমন্দির অকস্মাৎ ভূমিসাৎ হইয়া গেল। মহম্মদের জন্মসময়ের ত্রায় মাক্কদের জন্মকালে গ্রহগণ উচ্চসংস্থ ছিলেন। তাহাতে সকলে বিশ্বাস্য ছিলেন, তিনি ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ লোক হইবেন। মাক্কদ অতিশয় ছোট পুত্র ও বলিষ্ঠ থাকিলেও তাঁহার বদনমণ্ডলে ও অস্ত্রাঙ্গ স্থানে গভীর বসন্তের চিহ্ন

ছিল, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কিছুই ছিল না। এমন কি, তিনি নিজে একদিন দর্পণে মুখ দেখিয়া বলিয়াছেন, রাজার আকৃতি দেখিলে দর্শকের চক্ষু বলিয়া যাইবে, কিন্তু ভ্রমর আমার প্রতি এমনই নির্দয় যে, আমার মুখট্রী লোকের অর্তপুজনক।

১১৭ খৃঃ অব্দে সবক্তগীনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে স্বীয় রাজ্য প্রদান করিয়া যান। মাক্কদ ইসমাইল অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাহাতে আবার তিনি ঐ সময় খোরাসানের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত; কিন্তু এ সমস্ত সম্বন্ধে মাক্কদ জারজ সন্তান বলিয়া সবক্তগীন ইসমাইলকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কিন্তু মাক্কদ সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি ইসমাইলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কারাকুদ্ধ করিলেন এবং সুলতান উপাধি গ্রহণপূর্বক গজনির অধীশ্বর হইলেন।

সুলতান মাক্কদ ৩৩ বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মগ্ন-মুক্তা ও অনেক মূল্যবান জিনিস লইয়া গিয়াছিলেন।

১ম আক্রমণ—১০০০ খৃঃ অব্দে তিনি পেশাবরের সন্নিক্‌ষিত ভারতদ্বীপান্তে কএকটি দুর্গ অধিকার করিয়া বহু ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া গজনীতে আনয়ন করেন।

২য় আক্রমণ—১০০২ খৃঃ অব্দে সুলতান দশ সহস্রা অথারোহী সৈন্ত লইয়া পেশাবরে উপস্থিত হন, তথায় মহারাজ জয়পালের সহিত তাঁতার সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে জয়পাল বিশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া অবশেষে ১৫ জন সামন্ত সহ বন্দী হইয়াছিলেন। তুষারপাত না হইলে জয়পাল কখনই পরাজিত হইতেন না। তাহাতে জয়পালের ৫০০০ সৈন্ত রণক্ষেত্রে হত হয়। মাক্কদ অনেক অর্থ ও মগ্ন-মুক্তাখচিত জয়পালের কণ্ঠহার লইয়া ও কংহুয়র লুণ্ঠন করিয়া গজনীতে ফিরিয়া আসেন। তৎকাল-ই-অকবরীতে জয়পালের বীরত্ব-কাহিনী উজ্জলবর্ণে চিত্রিত আছে।

৩য় আক্রমণ—ইন্দুরাজ স্বাকৃত কর না দেওয়ার ১০০৪ খৃঃ অব্দে সুলতান ভারতবর্ষে পুনরায় আগমন করেন; এবং মুলতানের ভিতর দিয়া ভাটিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই নগরের চতুঃপার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর এবং গভীর ও প্রশস্ত খাল থাকায় তথাকার রাজা বিজয়রাজ নিঃশঙ্কচিত ছিলেন। তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত এক্রূপ অকোশলে নগর রক্ষা করিয়া ছিলেন যে, মুসলমানসৈন্ত এক প্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মাক্কদ বিরত হইবার লোক নহেন। তিনি সৈন্তদিগকে 'মস্তের সাধন কিংবা শরীর পতন' উৎসাহবাক্যে যুদ্ধে চালাইলেন এবং তুফুল সংগ্রামের পর জয়লাভ করিলেন।

বিজয়রাজ প্রাণ বিসর্জন করিয়া যবনবন্দিত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। মাক্কা ২৮০টা হস্তী, বহুসংখ্যক সেনা-খাফ এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া ফিরিলেন। ভাটিয়া রাজ্য গজনি-রাজ্যভুক্ত হইল।

৪র্থ আক্রমণ ১০০৬ খৃঃ অব্দ।—মূলতানের শাসনকর্তা আবুল ফতে লোদী মাক্কা দের অধীনতা অস্বীকার করিয়া জয়পালের পুত্র আনন্দপালের সহিত যোগদান করিলেন। আবুল ফতে লোদীকে দমন করাই ৪র্থবার আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। আনন্দপাল অদম্য উৎসাহের সহিত পেশাবরের সন্নিহিত স্থানে মাক্কা দের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিজয়ী সুলতান মূলতান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেখানকার আবুল ফতে লোদীকে দমন করেন।

আবুল ফতে দায়ুদ লোদী গুজরাতসন্নিহিত সরগদীপে পলায়ন করিলেন। মাক্কা রাজভাণ্ডারে ২০০০০০০ সুবর্ণ দিরহাম (মুদ্রা) প্রাপ্ত হইলেন এবং তদ্ব্যতীত বহু নগ্নবস্ত্রসম্ভার পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। দায়ুদ স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক ২০০০০ সুবর্ণ দিরহাম বার্ষিক কর দিতে স্বীকার করিয়া পুনর্বার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

ইহার পরে মাক্কা মূলতানের পথে ২০০ দুর্গ অধিকার করেন। এষ্ট সময়ে মাক্কা সংবাদ পাইলেন যে, তাতাররাজ ঈলাক খাঁ তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিয়াছে। মাক্কা শুকপাল নামক এক জন বিখ্যাত কাম্ভারীর উপর অধিকৃত স্থানসমূহের শাসনভার দিয়া গজনি গমন করিলেন। শুকপাল জয়পালের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পেশাবরের বৃদ্ধ আবু আলি সঞ্জারীর নিকট বন্দী হইয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন।

৫ম আক্রমণ—নবাস শাহের পরাজয়, ১০০৮ খৃঃ। মাক্কা গজনি আক্রমণকারী ইলাক খাঁকে পরাজয় করিয়া সংবাদ পাইলেন যে, কাম্ভারী শুকপাল বা নবাস শাহ তাঁহার অধীনতা ও মুসলমান-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের সহায়তা করিতেছে। তাহাকে শাস্তি দিবার জন্ত মাক্কা ৫ম বার ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি পেশাবরে উপস্থিত হইলে, নবাস শাহ পলায়ন করিল। মাক্কা নবাস শাহের সম্বন্ধিত ধনরাশি আত্মসাৎ করিয়া অল্প শাসনকর্তার হস্তে অধিকৃত প্রদেশসমূহের শাসনভার দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। অনেকে বলেন, নবাস শাহই জয়পালের দৌহিত্র শুকপাল। ইহাকে মাক্কা বলপূর্বক মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ আক্রমণ (১০০৮-৯ খৃঃ) হিন্দু বা সিদ্ধ এবং নগর-কোট বা কোটকাড়া আক্রমণ।

মাক্কা দের অসুপস্থিতিতে জয়পালের পুত্র আনন্দপাল সমস্ত হিন্দু নরপতিদিগকে স্বদেশবাৎসল্যের মধ্যে উত্তেজিত করিতে-ছিলেন। বিতাড়িত শুকপালও তাঁহাদের পক্ষে ছিলেন। আনন্দপালের স্বদেশপ্রেমের সাধু-প্রেরণায় সমস্ত হিন্দুনর-পতি বিধব্রী যবনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অস্বীকারাবদ্ধ হইলেন। উজ্জয়িনী, কালিঙ্গ, গোয়ালিয়র, কনোজ, দিল্লী, আজমীর এবং অন্যান্য স্থানের রাজগণ দলবদ্ধ হইয়া ভারতের পৃষ্ঠ হইতে যবন-কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিবার জন্ত বন্ধপারকর হইলেন। সকলেই অদম্য উৎসাহে নব বলে বলীয়ান হইয়া ধনুর্ভাঙে অগ্রসর হইলেন। প্রতিদিন বহুসংখ্যক সৈন্য তাঁহাদের বল পুষ্ট করিতে লাগিল। ধনশালিগণ উন্মুক্তহস্তে ধন রত্ন প্রদান করিল। কৃষকগণ শস্তাদি লইয়া উপস্থিত হইল, বৃদ্ধগণ উৎসাহবচন প্রয়োগ করিল, ভূষণপ্রিয়া হিন্দুগণনা অকুণ্ঠিতচিত্তে গাত্র অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ও ধনুর্ভাঙের জন্ত শিরঃশোভা কেশজুচ্ছদন করিয়া বৈতবনমধ্যবর্তিনী জ্যোতির্দীর স্তার পতি ও পুত্র-গণকে উদ্দীপনার মহামন্ত্রে উত্তেজিত করিল। হিন্দুস্থানে একতাবদ্ধ হিন্দুরাজগণের মুখে ক্ষুণ্ণের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল।

আনন্দপাল এই বিশাল অনীকনীর অধ্যাক্ষতা গ্রহণ করিয়া পঞ্চদশাবিত পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পেশাবরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাঁহার মাক্কা দের সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন।

মাক্কা লক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক হইলেও হিন্দুদিগের শোণ্যসম্পদ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন এবং বলে কাণ্ড হইবে না বুঝিয়া কোণের আশ্রয় লইলেন। তিনি কিছু পিছাইয়া গড়খাই করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণও শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেড় মাস কাল উভয় সৈন্যই আক্রমণের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিল না। হিন্দুদিগের বিশাল সৈন্যদল প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল এবং ৪০০০০ গব্বখর সৈন্য হিন্দুসৈন্যের সাহিত যোগদান করিয়া মুসলমানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। এই সৈন্যদলের ব্যয়ভার নিব্বাহের জন্ত দেশদেশান্তর হইতে আহারীয় দ্রব্য ও অর্থের সমাগম হইতে লাগিল। দরিদ্র পল্লি বাসিনী চরকা কাটিয়া ও শ্রমজীবগণ পারশ্রম করিয়া যাহা উপার্জন করিয়াছিল, সকলেই তাহা প্রকুলচিত্তে স্বদেশোদ্ধার-মহাযজ্ঞে পূর্ণাহতি দিবার জন্ত আনিয়া দিয়াছিল।



আনন্দপালের পুত্র ব্রাহ্মণপাল বিপক্ষ-পক্ষ আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডারমান হইল। মাক্‌দু বেগতিক দেখিয়া সাবধানে সৈন্ত-গণকে সজ্জিত করিয়া আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ত্রিশ হাজার পদাতিক গধ্বরসৈন্ত ভীষণ বেগে সৈন্তগণকে আক্রমণ করিল এবং মাক্‌দুদের অঝারোহী সৈন্তবলকে ছিন্ন ভিন্ন করিল। ২৪ মিনিটের মধ্যে চারি হাজার মুসলমানসৈন্ত ধরাশায়ী হইল। মাক্‌দু পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এমন সময় সেনাপতি আনন্দপালের হস্তী গোলাদর্শনে ভীত এবং তারাহত হইয়া বৃক্ষদ্বয়ে হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। দূরস্থ হিন্দুসৈন্তগণ তদর্শনে পলায়নের সঙ্কেত মনে করিয়া আনন্দপালের পশ্চাৎবাহমান হইল। তখন আরবীর অঝারোহী সৈন্তগণ তাহাদের পশ্চাৎদুসরণ করিয়া আট হাজার হিন্দুসৈন্তকে নিহত করিল। ৩০টা হস্তী এবং অপরিমিত ধনরত্ন মাক্‌দুদের হস্তগত হইল।

মাক্‌দু পলায়নপর হিন্দু-সৈন্তগণের অগ্রসরণে নগর-কোটের মধ্যবর্তী ভীমনগরের দুর্ভেদ্য দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গের চতুর্দিকে গভীরসলিলা বাগগঙ্গা পরিধাক্রমে প্রবাহিত। ভীমনগর এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত (বর্তমান নাম ভবান)। এই স্থানে ভীম-বেব প্রতিষ্ঠিত শক্তিপ্রতিমা বিরাজিত।

ভীমনগরের অদূরে প্রসিদ্ধ আগামুখী তীর্থ সর্দনা লেলিহান অগ্নিজিহ্বা বিস্তার করিয়া দর্শকদিগের অন্তঃকরণে ভয়মিশ্রিত ভক্তির উদ্বীপন করিতেছে। বহু সহস্র বৎসর পৃথক এই তীর্থস্থানে এত ধনরত্ন মণিমুক্তা ও সুবর্ণরাশি পুঞ্জীভূত হইয়াছিল যে, ইহা কুবেরের অলকা নামেই অভিহিত হইত। দুর্গস্থ সৈন্তগণ বন্ধের জ্ঞান এই ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে রক্ষা করত। মাক্‌দু ইহার সন্ধান পাইয়া শোণিতলিপ্সু শার্দূলের জ্ঞান দুর্গপ্রাচীরের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

#### ভীমনগর আক্রমণ।

মাক্‌দু পুনঃ পুনঃ সৈন্তগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। মাক্‌দুদের সৈন্তগণ বাগগঙ্গার প্রবলপ্রবাহ অতিক্রম করিয়া ভীমনগর-দুর্গের সমীপবর্তী হইল এবং অদম্য উৎসাহে ছুরারোহ পর্কতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। দুর্গস্থ প্রহরীগণ অবিগর্বে দেখিতে পাইল যে, দুর্গের প্রাচীরস্বরূপ পর্কতশ্রেণীর শিরদেশ পঙ্গপালবৎ ধ্বনসৈন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। মুসলমানগণ সেই উচ্চস্থান হইতে মুহলধারার তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। তীর সকল উদ্ধার জ্ঞান ভীমবেগে

দুর্গমধ্যস্থ সৈন্তগণের মস্তকে পড়িতে লাগিল। তখন হিন্দু-গণ স্পষ্টে বুঝিতে পারিল যে, দৈব প্রতিকূল হইয়াছেন,—মৃত্যু আকাশ হইতে অবিভ্রান্ত ধারার তীরবৃষ্টি কেন হইবে? তাহার নিরুপায় হইয়া দুর্গদ্বার উন্মোচনপূর্বক ভূমিতলে লুপ্তিত হইয়া মুসলমানগণকে সমাদরে আহ্বান করিলেন। তখন মাক্‌দু ছট্‌চিটে সসৈন্তে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দুর্গের ধনভাণ্ডার কুবেরের অলকার জ্ঞান অগণিত মণিমুক্তা-মণ্ডিত ও সুবর্ণপূর্ণ ছিল। শত সহস্র বৎসরের সঞ্চিত ধনরাশি খনিগর্ভস্থ উজ্জল-মণিমালা—কত সমুদ্রগর্ভস্থ হুল মুক্তাপুঞ্জ—কত সাম্রাজ্যের লুপ্তিত বৈভব দুর্গমধ্যে স্তূপীকৃত ছিল। অতীত কালের নরপতিগণ শক্তিপ্রতিমার কণ্ঠে ও অস্ত্রান্ত্র অঙ্গে বহু কাল ধরিয়া যে সমস্ত হীরকখচিত মণিমুক্তাগ্রাধিত অলঙ্কারাশি দিয়াছিলেন, তাহা পর্কতের জ্ঞান উচ্চ স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই সমস্ত ধনরত্ন দেখিয়া অতৃপ্তাকাজ্জ মাক্‌দু ও ধনলালসার অবধি প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। মাক্‌দু দুই জন বিশ্বস্ত অমুচরকে সঙ্গে লইয়া ধনভাণ্ডারে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদিগকে স্বর্ণরোপ্য-গ্রহণের ভার দিয়া স্বয়ং মুক্তা ও হীরকাদির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। মাক্‌দুদের শত সহস্র ভারবাহী উষ্ট্র ও সেই যুগ-যুগান্তর-সঞ্চিত স্বর্ণরোপ্যস্তূপ-বহনে সমর্থ হইল না। তখন সৈন্তগণকে বহনকাণ্ডে নিযুক্ত করিলেন। সত্তর কোটি মুদ্রা (দিরহাম), সাতহাজার চারি মণ সুবর্ণখণ্ড এবং তথ্যভীত শত শত বহুমূল্য বেনারসী শাটী মকমল প্রভৃতি অপূর্ণ শিল্পবৈভব কত অদৃষ্টের ও অশ্রুতপূর্ব কত গৃহ-সামগ্রী মুসলমানগণের ধনভাণ্ডার আলোকিত করিয়াছিল। দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে একখানি ৬০ হাত দীর্ঘ ও ৫০ হাত প্রস্থ রোপ্যানিষিত অট্টালিকা ছিল। উহা একরূপ কোশলে নিষ্পিত ছিল যে, উহা ইচ্ছামত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইত এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথক করিয়া পুনরায় সংযুক্ত করা বাইত। একখানি ৪০ হাত দীর্ঘ সুবর্ণময় চক্রাতপ সুবর্ণদণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। উহার উপরিভাগ রোম-নগরের রেশমে নিষ্পিত বহুশিল্প-নৈপুণ্যে ভূষিত। এতদ্বিধ আর কত যে অগণ্য দ্রব্যজাত ছিল, তাহা অবর্ণনীয়।

মাক্‌দু জয়োন্মাসে মত্ত হইয়া গজনী যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া মাক্‌দু বিস্তৃত প্রাক্ষণ আশ্রয়-মণ্ডিত করিয়া মণিমুক্তা হীরকরাশি ছড়াইয়া দিলেন। লক্ষ লক্ষ আমলকীর জ্ঞান হুল মুক্তাকল, কত শত ময়কত, পান্না, মৌলকাত, চন্দ্রকাত, পাড়িধাকার সুবর্ণ বৈভব প্রভৃতি মণিখণ্ড দোরকিরণে অপূর্ব কান্দি ধারণ করিল।

তৎপরে মাক্দ্দ বোগদাদ এবং তুর্কিস্থানের রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐশ্বর্যালিকের জার এই সমস্ত মণিমাণিক্য প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। অতিবৃদ্ধ রহদর্শী মুসলমান-রাজগণ বলিতে লাগিলেন যে, প্রাচীনকালে পারস্ত এবং রোম-সাম্রাজ্যের নরপতিগণ ইহার সহস্রাংশের একাংশও ধনরত্ন সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। এমন কি, যে কারুণকে বিধাতা কল্পিত প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারও এত মণিযুক্তা সংগ্রহ ছিল না।

৭ম আক্রমণ (১০১০ খৃঃঅঃ) নারায়ণ। কেরিজা এই আক্রমণের কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এহঁ স্থানের বর্তমান নাম-নির্ণয় করিতে ঐতিহাসিকেরা বড় গোলে পড়িয়াছেন। কেহ বলেন, ইহা নাদ্বীন, কেহ বলেন, অনহলবাড়। বাহাউক এইস্থান আক্রমণ করিতে মাক্দ্দ বিপুল সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং বহুসংখ্যক হত্যা, অশ্ব ও স্বর্ণ-রৌপ্য পাইয়াছিলেন। এই আক্রমণে তীত হইয়া জয়পাল মাক্দ্দের সহিত সন্ধিহাপন করেন। স্থিরীকৃত হয় যে, জয়পাল মাক্দ্দকে প্রতিবর্ষে বহুমূল্য উপঢৌকন সহ ৫০টা হত্যা ও দুই সহস্র পদাতিক সৈন্ত প্রদান করিবেন।

৮ম মূলতান-আক্রমণ (১০১১ খৃঃঅঃ)—নারায়ণ-জয়ের পর মাক্দ্দ গোররাজ্য জয় করিয়াছিলেন। গোর হহঁতে গজনী প্রত্যাগমন করিরাই তিনি মূলতান আক্রমণ করেন, তথাকার বিধর্মী কর্মমতীয়দিগকে বন্দী করেন, এবং সমস্ত রাজধানী লুণ্ঠনপুলক দাযুদকে বন্দী করিয়া গজনী লইয়া যান।

৯ম আক্রমণ (১০১৩ খৃঃ) নাদ্বীন বা নিন্দন।—মাক্দ্দ ৯ম বারে বিপুল সৈন্ত লইয়া খিলেমের নিকটবর্তী বালনাথ-পর্বতে অবস্থিত নিন্দন দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি শরৎকালের প্রারম্ভে গজনী হহঁতে যাত্রা করিলেন। তিনি ভারতের সীমান্তে মার্গলয় গিরিসঙ্ঘটে উপস্থিত হইলে অত্যন্ত ভূবারপাতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, প্রান্তর, পথ, উপত্যকা, পর্বত, হ্রদ, নদা সমস্তই একাকার ভূষারাজ্যদানে আবৃত হইল। তাহার উষ্ট্র ও অশ্ব সকল অবসর হইয়া পড়িল এবং সৈন্তগণও শৈত্যাধিক্যে অসাড় হইয়া গেল। দ্বিঘণ্টা ঘন কুস্মাটিকাপূর্ণ হওয়ার, কোন ক্রমেই দিগ্‌নির্ণয় হইল না। মাক্দ্দ তথাপি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া অস্ত্র ও পর্বত অতিক্রমপূর্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অস্বা-রোহী সৈন্তগণকে নানাদলে বিভক্ত করিয়া সেনাপতিদিগকে জাহার অধ্যক্ষতা প্রদান করিলেন। নিন্দনরাজ পুরু-অরপাল নির্ভর (নির্ভীক) ভীমপাল নামক অশ্বক সেনানীর হস্তে

দুর্গরক্ষার ভার দিয়া কাম্বীর গমন করিয়াছিলেন। ভীমপাল একটা ক্ষুদ্র দুর্গম শিরিগথে সৈন্ত লইয়া, একাঙ একাঙ হত্যা দ্বারা গিরিসঙ্ঘট বড় করিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে ছিলেন। মাক্দ্দ ভীমের সম্মুখীন হইতে সাঁহল না করিয়া ভীমরাজ্যের আফগানদিগকে লইয়া পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। আফগানগণ পার্শ্বতা ছাগলের জার অনায়াসে ছারোহ পর্বতে উঠিতে লাগিল। তথা হইতে ভীমপালের হত্যা ও সৈন্তের উপর অবলম্বণে ভীম ও প্রস্তর বধন করিতে লাগিল। তথাপি কয়েক দিন পর্যন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আফগানগণ ভীমপালের বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে ভীমপাল মাক্দ্দের কাপুরুষতার বিরুদ্ধে হইয়া সমতল ভূমিতে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। হস্তি-শ্রেণী তাহার সৈন্তগণের পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতে লাগিল। তরফর যুদ্ধ চলিল। মাক্দ্দ পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া আফগানগণকে পর্বতে আরোহণ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে তাহার উপর হইতে ভীমপালের হত্যা ও সৈন্তের উপর তীরবৃষ্টি করিতে লাগিল। মাক্দ্দের প্রধান খোদা আবু আবদুল্লাহ—বিশেষরূপে আহত হইলেন। তাহার জীবন সংশয় দেখিয়া মাক্দ্দ স্বীয় শরীররক্ষক সৈন্ত দ্বারা তাহার উদ্ধারসাধন করিলেন।

সমস্ত দিন তুমুল সংগ্রাম চলিল। অবশেষে বিজয়লক্ষী মাক্দ্দের অকর্ণাশ্রিত হইলেন। হিন্দুসৈন্তের মৃতদেহে পর্বত-উপত্যকা, প্রান্তর ও যুদ্ধক্ষেত্র ঢাকিয়া গেল।

নিন্দনের বুদ্ধ-মন্দিরভাস্কর্য একখান শিলাধাণ্ডে উৎকীর্ণ লিপি ছিল। তদ্বারা মাক্দ্দ জানিলেন যে, ঐ মন্দির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান-ধর্ম অনুসারে ৭০০০ বৎসরমাত্র পৃথিবীর সৃষ্টি। সুতরাং উহা সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া তাহার ধারণা হইল। মন্দিরের মধ্যে বহু সহস্র বৎসরের সঞ্চিত ধনরত্ন স্তুপীকৃত ছিল। মাক্দ্দ মন্দিরটী মসজিদে পরিণত এবং মহামূল্য সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া গজনী প্রত্যাগমন করিলেন।

১০ম আক্রমণ (১০১৪-১৫ খৃঃঅঃ) খানেশ্বর।—মাক্দ্দ পূর্বেই শুনিয়াছিলেন যে, স্থাপত্যের অসিদ্ধ মন্দির ভারত-বর্ষের মধ্যে বিখ্যাত; খানেশ্বররাজের বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত সিংহল দেশীয় হত্যা আছে এবং তাহার ঐশ্ব্যের বর্ণনা করা অসাধ্য। সুতরাং তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না; বিপুল সৈন্ত লইয়া খানেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং করদ রাজা আনন্দপালকে পূর্বে হইতে সৈন্ত ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্ত পত্র লিখিলেন। আনন্দপাল সৈন্তগণের

উপযুক্ত আহারীরের সংস্থান করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে ছই সহস্র সৈন্তসহ মাক্দ্দের নিকট নিম্নলিখিত সংবাদ দিবার জন্য প্রেরণ করিলেন,—

‘আমার ভ্রাতা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে, থানে-  
খরের মন্দির এতদেশস্থ উপাসকবৃন্দের উপাসনাস্থান। যদি  
সুলতান মাক্দ্দ থানেখর আক্রমণ না করেন, তাহা হইলে  
প্রতিবৎসর বহুসংখ্য উপলোকন সহ ৫০টা হস্তী এবং বহু  
মাণুষ্ট্র সুলতানের নিকট প্রেরিত হইবে।’

মাক্দ্দ ইহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, পৃথিবীতে মহম্মদের  
ধর্ম স্থাপনপূর্বক সমস্ত প্রতিমাভঙ্গ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য  
ও ঈশ্বরের আদেশ। ইহার পুরস্কার তিনি স্বর্গে পাইবেন।  
সুতরাং তিনি থানেখর-আক্রমণ-সম্বন্ধ কখনই ত্যাগ করিতে  
পারেন না।

এই সংবাদ দিল্লীপতির নিকট প্রেরিত হইল। তিনি  
হিন্দুস্থানের সমস্ত রাজগণকে মাক্দ্দের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত  
হইবার জন্য উত্তেজিত করিলেন। কিন্তু হিন্দুদিগের যুদ্ধের  
আয়োজন হইবার পূর্বেই সুলতান মাক্দ্দ থানেখরে আসিয়া  
পৌঁছিলেন। থানেখরে বাইবার পথে তিনি যে সমস্ত মরুভূমি  
পার হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্বে কেহই অতিক্রম  
করিতে পারে নাই।

থানেখরের নিকটে একটি নিম্নলিখিত প্রোতস্থানী  
প্রবাহিত ছিল। মাক্দ্দ নদীর উপত্য হ্রদের দিকে অগ্রসর  
হইয়া দেখিলেন, হিন্দুসৈন্তগণ তথায় হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক  
সৈন্ত দ্বারা বাহু নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। মাক্দ্দ  
কতকগুলি হিন্দুসৈন্ত সমুখভাগে স্থাপনপূর্বক অবশিষ্ট সৈন্ত  
তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন দিক দিয়া নদী পার হইয়া  
হিন্দুসৈন্ত আক্রমণের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।  
হিন্দুগণ ২৩দিক হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াও ভীমপরাক্রমে  
বুদ্ধ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন পক্ষই জয়লাভ  
করিতে পারিল না। অবশেষে বিজয়লক্ষী মুসলমানের অঙ্ক-  
শায়িনী হইলেন। একটি ব্যতীত সমস্ত হস্তীই মাক্দ্দের কর-  
তলস্থ হইল।

প্রায় বিশ হাজার হিন্দু ও মুসলমান রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ  
করিল। রক্তস্রোতে নদীর জল রঞ্জিত হইয়া অপেক্ষ হইয়া  
উঠিল। থানেখরের অতুল ধনভাণ্ডার মাক্দ্দের হস্তগত হইল।  
স্বাধীশ্বর-মন্দিরের ‘জগদোম’ প্রতিমূর্তি গজনীতে আনীত হইল।  
তথায় রাজপণের মধ্যস্থলে স্থাপিত হইয়া লোকমাত্রেয়ই  
পদাঘাতে জর্জরিত হইতে থাকিল। পরিশেষে মুসলমানগণ সেই  
প্রতিমূর্তির মাথা ভাঙিয়া দেয়। মন্দিরভাঙের অলংকার সঞ্চিত

রত্নরাজির ভাণ্ডার মহামূল্য লক্ষ লক্ষ মণিসুত্রে ছিল। কান্দাহার-  
বাসী হাজি মহম্মদ বলেন যে, তাহার একটি মণি ৪৫০ মিকাল  
পরিমিত ওজনের। ইহার তুল্য একাও হীরক পৃথিবীতে  
আর কেহ কখনও দেখে নাই। মাক্দ্দ সমস্ত ধনরাশি  
লইয়া থানেখর ত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে তিনি দিল্লী-  
জয়ের সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সেনাপতিগণের পরামর্শে  
তাহা পরিত্যাগ করেন। থানেখর হইতে প্রত্যাগমনকালে  
মাক্দ্দ ছই লক্ষ পুরুষ ও স্ত্রীকে বন্দী করিয়া লইয়া যান।  
ইহাদের আগমনে গজদী নগর ভারতীয় নগরের ভাণ্ডার প্রতী-  
মান হইয়াছিল।

১১শ আক্রমণ (১০১৬ খৃঃঅঃ) লোহকোট।—লোহকোট  
দুর্গ কাশ্মীরের পথে উচ্চ পর্বতশিখরে অবস্থিত। মাক্দ্দ  
এইবারে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ভূবারপাতে এবং  
জলপ্রাবনে তাঁহার বহুসৈন্ত প্রাণত্যাগ করে। ইহার পূর্বে  
মাক্দ্দ কখনও এরূপ বিপদে পড়েন নাই এবং রিক্তহস্তে  
গৃহে ফিরেন নাই। যাহা হউক তিনি ব্যাক্রান্তবস্ত্রেরে জন্তু  
শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

১২শ বারে কনোজ ও মথুরা-আক্রমণ (১০১৮-১২ খৃঃঅঃ)।  
লোহকোটে পরাজিত হইয়া মাক্দ্দ আহারনিগ্রাণিত্যাগ-  
পূর্বক পুনরায় ভারতাক্রমণের অবসর অন্বেষণ করিতে  
লাগিলেন। কান্তকূজ ও মথুরার ঈশ্বরের কথা তাঁহার কণে  
প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিল। এবার তিনি বিশ  
হাজার নূতন সৈন্ত বৃদ্ধি করিয়া অদম্য উৎসাহে ক্ষারভা-  
ভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এবার মাক্দ্দ এক লক্ষ অশ্বরোহী সৈন্ত এবং ২০০০০  
পদাতিক এবং অনেক সুশিক্ষিত সেনাপতি সঙ্গে লইয়াছিলেন।  
৩ মাস কাল অবিশ্রান্ত চলিয়া তিনি দিল্লিনদ পার হইলেন,  
তৎপরে ঝিলম, চম্বড়াগা, রাবি, বিধা এবং শতদ্রু প্রভৃতি  
গতীরসলিলা নদী সকল উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ  
করিলেন। সেই স্থানে কাশ্মীরপ্রবেশের পথে সর্বলী নামক  
একজন শাসনকর্তা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল।  
এইরূপে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত চলিয়া তাহার ১০১৮ খৃঃ  
২রা ডিসেম্বর যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং পথিমধ্যে যে  
সমস্ত শৈল-দুর্গ ছিল একে একে অধিকার করিয়া ধনরত্ন  
লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি হরদত্ত রাজার  
রাজ্যে বরদহর্গের (বর্তমান বুলন্দশহর) সমীপে আসিয়া  
উপস্থিত হইলেন। হরদত্তের মন্ত্রিগণ মুসলমানদিগের সৈন্ত  
দেখিয়া রাজাকে কহিল,—‘স্বর্গীয় দূত পৃথিবীতে ধর্মপ্রচার  
করিবার জন্ত ফেলিল সমুদ্রের ভাণ্ড অর্গল্য সৈন্ত লইয়া

রাজ্য মধ্যে আসিতেছেন, আকাশে বিমানচারিণী দেব-  
বালাগণ বিদ্যাবিনিমিত্ত জ্যোতিতে দিয়মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া  
সৈন্তদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন, আর রক্ষা নাই। ইহা  
শুনিয়া নরপতি ক্লাম্বিত-কলেবরে কহিলেন, তবে জীবন ও  
সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা করিব। তখন বিচক্ষণ সচিবগণ তাঁহাকে  
মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন।

হরনত অবিলম্বে রাজ্যমধ্যস্থ প্রতিমাগুলি নদীর জলে  
নিক্ষেপ করিয়া ১০০০০ সহস্র সহিত কৃতান্তলি হইয়া মাক্কা-  
দের সম্মুখে উপনীত হইয়া অবিলম্বে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত  
হইলেন। এই স্থান হইতে সুলতান কুলচাঁদের প্রসিদ্ধ  
দুর্গাতিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে মাক্কা এক কোটি টাকা  
ও ৩০টী হস্তী লইয়া নিবৃত্ত হইলেন। কুলচাঁদ একজন পরা-  
ক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। সংগ্রামে অজয়ের বলিয়া তাঁহার  
পসিদ্ধি ছিল। তাঁহার রাজধানীর চতুর্দিক দুর্ভেদ্য দুর্গ-  
প্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল। অতিকার হস্তী সকল পর্ত্ত-  
শ্রেণীর ভায় দণ্ডায়মান থাকিয়া শত্রুদিগের অন্তঃকরণে ভয়  
জন্মাইত। তাঁহার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। ধনভাণ্ডার  
মণিমুক্তা মরকতাদি রত্নরাশিতে নগরখচিত নৈশ শারদা-  
কাশের ভায় দিব্যাকান্তি ধারণ করিত। গৃহসম্ভা সমস্তই সুবর্ণ-  
নির্মিত। সহস্র সহস্র সুবর্ণপাত্র ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিত।

কুলচাঁদ বদেশবাৎসল্যের সাধুমনস্ক প্রণোদিত হইয়া  
যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন এবং হস্ত্যখ পদাতিক সৈন্ত সহ একটা  
অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। একটা বেগবতী স্রোত-  
বিনী পরিধার ভায় দুর্গ বেঠেন করিয়াছিল। কেবল এক  
পার্শ্বে অরণ্য ছিল। কুলচাঁদ সেইদিকে সৈন্ত লইয়া মুসলমান-  
সৈন্তের সম্মুখীন হইলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কুলচাঁদের সৈন্তগণ পর্ত্তের ভায় অটলভাবে দণ্ডায়মান  
রহিয়া তরঙ্গর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে মাক্কাদের  
এক লক্ষ অখারোহী সৈন্ত শোণ্যমদে উন্নত হইয়া দুর্গের  
উপর আসিয়া পড়িল। কুলচাঁদের সৈন্তগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন  
করিল না। সম্মুখে ফেনারমান নদীতরঙ্গে লাকাইয়া পড়িল।  
বর্ষাকালীন প্রবল প্লাবনের ভায় মুসলমান-সৈন্ত দুর্গমধ্যে  
প্রবেশ করিতে লাগিল। পঞ্চাশ হাজার হিন্দুসৈন্ত রণক্ষেত্রে  
প্রাণ বিসর্জন করিল। দশ হাজারের অধিক জলমগ্ন হইল এবং  
কতকাংশ অগ্নিতে প্রবেশ করিল।

বিধাতা প্রতিকূল ভাবিয়া কুলচাঁদ ক্রতবেগে দুর্গমধ্যে  
প্রবেশপূর্বক তরবারি আঘাতে তাঁহার প্রীকে নিহত করিয়া  
নিজকণ্ঠে সেই তরবারি বসাইয়া দিলেন।

সুলতান কুলচাঁদের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেন। ভাষায়

সে রত্নরাশির বর্ণনা হয় না। ১৮৫০টী বিশালকার হস্তী ও  
অসংখ্য মহামূল্য সমস্ত সম্পত্তি মাক্কাদের হস্তগত হইল।

মথুরা আক্রমণ।

অনন্তর সুলতান বিজয়োল্লাসে উন্নত হইয়া তীর্থবেগে  
হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ মথুরার দিকে অগ্রসর হইলেন।  
মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিশ্বয়বিমুচচিত্তে ওজস্বিনী ভাষায়  
মথুরার স্থাপত্য-শিল্পের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে  
মনে হয়, তদানীন্তনকালেও মথুরার ত্রীকু-রাজধানীর প্রাচীন  
কীর্তিকলাপের চিহ্ন দেদীপ্যমান ছিল। কলকলনাদিনী  
কালিন্দী বংশীবিনিন্দী স্রমধুর তানে করুণকণ্ঠে কৃষ্ণকাহিনী  
কীর্তন করিয়া যেন সেই সমস্ত অতীত-কীর্তি স্মৃতিপথে  
জাগাইয়া দিতেন।

সুলতান মথুরায় প্রবেশ করিয়া যাত্রা দেখিলেন, তাহা তিনি  
স্বপ্নকল্পনার ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে হইল, যেন  
অমরার অমরাবতী নন্দনকানন ও মন্দাকিনীর সহিত অব-  
নীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। মথুরার চতুর্দিক দুর্ভেদ্য মন্দির  
প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত। দুর্গের দুইটা দ্বার যমুনার সলিল  
হইতে প্রস্তরময় সোপানপরম্পরায় নির্মিত। অসংখ্য দিয়া  
নগরে প্রবেশ করিবার সুবিধা নাই। দুর্গের সম্মুখে একটা  
অশ্বরুচি-মন্দির স্থাপত্যশিল্পের অক্ষরকীর্তি ঘোষণা করি-  
তেছে। সুলতান শুনিলেন যে, উহা স্বয়ং বিখ্যাত  
নির্মাণ করিয়াছেন এবং ইহা যে মনুষ্যানির্মিত নয়, ইহা  
তাঁহারও প্রত্যয় হইল। স্থানীয় লোকে ইহাকে কৃষ্ণের  
প্রমোদপ্রকোষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিত। মন্দিরের বহির্দেশে যে  
সমস্ত খোদিত মন্দির প্রস্তরের প্রতিমূর্তি ছিল, তাহা দেখিয়া  
সুলতান চমৎকৃত হইলেন। দুর্গদ্বার কালিন্দীর অভ্যন্তরে  
একটি কোশলে নির্মিত ছিল যে, ইচ্ছামত নদীর জল তর্গ  
মধ্যে প্রবেশ ও নির্গম করান যাইত। রাজপথের দুই পার্শ্বে  
কালিন্দীতীরে স্নানরশ্মিরনৈপুণ্যে অলঙ্কৃত প্রস্তরনির্মিত দুই  
সহস্র মন্দির দেখিয়া সুলতান বিশ্বয়বিমুচ হইয়াছিলেন।  
প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরে মণিমাণিক্যমণ্ডিত বহুমূল্য  
প্রতিমূর্তি ছিল। তাহার অধিকাংশই স্বর্ণনির্মিত এবং  
হীরকখচিত অলঙ্কারে ভূষিত। মন্দিরের অলিন্দ সকল বহু  
প্রসারিত ও লোহশলাকা দ্বারা বেষ্টিত। মন্দিরের বহির্ভাগ  
ও শৃঙ্গ সকল অপ্রতিম শিল্প-নৈপুণ্যে অলঙ্কৃত ছিল।

নগরের মধ্যভাগে একটা বৃহদায়তন মন্দির ছিল, তাহা  
সর্বাঙ্গোচ্চ ও বহুমূল্য বিচিত্রবর্ণের মন্দিরপ্রস্তরে নির্মিত।  
মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, তাহা বর্ণ কিংবা চিত্র-  
তুলিকার বর্ণনা করা যায় না। স্তম্ভাধি-ই-জামিনীতে

লিখিত আছে, সুলতান শহর মন্দির বেধিয়া বলিয়াছিলেন, যদি কেহ ইহার তুলা সুরমা অট্টালিকা নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি সহস্র সহস্র সুবর্ণ দিরহাম দ্বারা করিলে এবং পৃথিবীর শিল্পনিপুণ স্থপতিদিগকে দুই শত বৎসর অবিক্রান্ত পরিশ্রম করাইলেও এরূপ সৌধ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন কি না, সম্বন্ধে কথ্য। এই মন্দির-মধ্যস্থ প্রতিমূর্ত্তি সকলের বর্ণনা অসম্ভব। তন্মধ্যে ৫৫০ প্রতিমা বিগ্ৰহ রক্তবর্ণ সুবর্ণনির্মিত এবং প্রত্যেকটি ১০ হাত দীর্ঘ এবং অবলম্বন ব্যতীত প্রকৃতলৈক কোশে পুস্ত্রে লব্ধ। এই প্রতিমূর্ত্তিগুলির চক্ষুতারকা সকল এরূপ মহামূল্য হীরকে নির্মিত যে, ৫০০০০ সুবর্ণ দিরহাম দিয়াও তাহার একটা ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। চক্ষুতারকার কয়েকটা নীল-কান্ত সপি এরূপ উজ্জ্বল ছিল যে, নির্মল জল কিংবা নির্মল ফটিকও তাহার উপমাহীন নহে। তাহাদের ওজন প্রত্যেকটি ৫৫০ মিকাল। আর একটা দুই ফিট্‌ লম্বা স্বর্ণনির্মিত ও মণিমণ্ডিত প্রতিমার ওজন ৫ হাজার ৫ শত মিকাল। কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তির ওজন ১৮৩০ মিকাল। প্রতিমার অধিকাংশই স্বর্ণনির্মিত। দুই শত রৌপ্যপ্রতিমাও ছিল। সুলতান ২০ দিন অবিক্রান্ত পরিশ্রমে নগর লুণ্ঠন করিয়া শেষ করিতে পারিলেন না।

নগর লুণ্ঠন শেষ করিয়া সুলতান লণ্ডাধাতে প্রতরময়ী প্রতিমূর্ত্তি সকল চূর্ণ করিলেন এবং অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক সমস্ত মন্দিরগুলি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। সহস্র সহস্র শির-নৈপুণ্যের অক্ষয় কীৰ্ত্তি ভয়াবহভাবে পরিণত হইল। তৎপরে নগরবাসিগণ নৃশংসরূপে নিহত হইল। হুড়িধিনেও হত্যা-কাণ্ড শেষ হইল না। সুনীলসলিলশালিনী কালিন্দীর তরঙ্গমালা শোণিতরঞ্জিত হইয়া অবামালাবিকৃতিয়া রণরঙ্গিণী ভাষার ভাষা ভীষণ দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল।

#### কান্তকূষ আক্রমণ।

মথুরা হইতে মাক্দ্দ কনোজের দিকে অগ্রসর হইলেন। কনোজরাজ জয়পাল (বা রাজ্যপাল) সুলতানের আগমন-বার্তা পাইয়া এবং মথুরার কাহিনী শ্রবণ করিয়া গজার অপার তীরে পলায়ন করিলেন। পথি মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাসিগের যে সমস্ত পার্শ্বতা হুগ ছিল, সুলতান তাহা একে একে অধিকার করিতে লাগিলেন। অনেকে সুলতানমুখ্য গ্রহণ করিল এবং অনেকে বৃদ্ধও করিল। কিন্তু সুলতানের নিকটে সকলেই পরাজিত হইল। তিনি এই সমস্ত হুগ হইতে এত অধিক ধনরত্ন পাইলেন যে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

অনন্তর সুলতান হর্ডেড প্রাচীরবেষ্টিত সপ্ত-দুর্গমোত্তিত

কান্তকূষনগরে উপস্থিত হইলেন। কনোজের সপ্তদুর্গ তাগীরখীর গর্ভ হইতে দৃঢ় শিলাখণ্ডে নির্মিত হইয়াছিল। গজার কনোজমান তরঙ্গমালা দুর্গমধ্যে জীড়াঙ্কে কলকল-ভাবে প্রবাহিত হইত। গজাতীরে বহু বুর বাপিরা দশদশ প্রস্তর-মন্দির বিস্তারিত ছিল। এইসবকে মন্দিরে লিখিত বর্ণনা দ্বারা মাক্দ্দ জানিয়াছিলেন যে, ঐ সকল ৩০০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছে। অধিকাংশ অধিবাসীই পলায়ন করিয়াছিল। বাহারা পলায়ন করে নাই, তাহারা ভূগুষ্ঠিত হইয়া কাতর-কণ্ঠে মাক্দ্দের নিকট মন্দিরগুলি রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহারা সকলেই নিহত হইল।

সুলতান সমস্ত মন্দির ভূমিসাৎ করিয়া তিত্তিলিলা উত্তোলনপূর্ব্বক গজাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। যে সমস্ত স্তম্ভী-কৃত মণিমূর্ত্তা পাইলেন, তাহা বর্ণনাভীত। সমস্ত স্ত্রীলোকেরা বন্দী হইয়া সুলতানের সঙ্গে চলিল। শত সহস্র উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, বন্দিলগ্ন এবং দৈন্তসকল সুলতানের লুণ্ঠিত বৈভব অতি কষ্টে বহন করিয়া চলিল।

তৎপরে সুলতান ব্রাহ্মণাধ্যুষিত মুক্তহর্গের অভিমুখে চলিলেন। কাণপুরের দক্ষিণ পাণ্ডুনদীতীরে ইহার ধ্বংসাবশেষ আছে। ব্রাহ্মণগণ বস্ততা স্বীকার করিলেন না। দুর্গ পর্ব্বতের উচ্চস্থানে অবস্থিত ছিল। রক্তপাতের ভরে অনেকে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য হর্গের গবাক দিয়া নিরে লক্ষপ্রদান করিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলেন না। কেহ কেহ বৃদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সুলতান দুর্গ অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিলেন।

এখান হইতে সুলতান অশ্বী বা আশীর হর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই নগর কতেপুরের দশ মাইল উত্তরপূর্বে গজাতীরে অবস্থিত। ইহার প্রকৃত নাম অশ্বিনী-দুর্গ। কথিত আছে, স্বর্গ্যপুত্র অশ্বিনীকুমার এই স্থানে একটা মহাবজ্রসম্পন্ন করিয়া স্বীয় নামানুসারে এই স্থানের নাম 'অশ্বিনী' রাখেন। এই স্থানের রাজা চন্দেল ভৈরব অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। কান্তকূষরাজ তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। অশ্বিনীদুর্গের চতুর্দিকে গভীর জলপূর্ণ পরিখা ছিল এবং পরিখার চতুর্দিকে নিবিড় অরণ্য বৃহৎ বৃহৎ অজগর সর্পে পূর্ণ ছিল। অরণ্য এরূপ ঘন সরিষিই ছিল যে, দিবাভাগে তথার রাত্রিভ্রম হইত এবং অরণ্যের মধ্যে অসংখ্য সর্প সর্ব্বদা গর্জান করিয়া বেড়াইত। চন্দেলরাজ সুলতানের আগমনবৃত্তা শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ভাবিলেন, যেন ঘন তাঁহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তিনি অরিলবে পলায়ন করিলেন।

সুলতানের আদেশ ক্রমে এটি হুগের অভ্যন্তরস্থ ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইল এবং হুগস্থ সৈন্তগণেব উপরে হুগ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। হতভাগ্যগণ জীবিত-অবস্থায় সমাধিলাভ করিল। ক্রী-লোকগণের অধিকাংশ বন্দী হইল, অবশিষ্ট নিহত হইল।

তৎপরে সুলতান শরকীয়ার (সাহারণপুরের নিকট যমুনানদী তীরে) পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা চাঁদরায়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। চাঁদরায়ের বীরত্ব-গৌরব হিন্দুস্থানে বিখ্যাত ছিল। পুরুষজগতের সহিত অনেকবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরিশেষে চাঁদরায় তাহার সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা করেন এবং তৎপূত্র ভীমপালের সহিত স্মীয় হুহিতার বিবাহ দিতে চাহেন। তচ্ছুবণে জয়পাল স্বীয় পুত্র ভীমপালকে বিবাহ সাজে সজ্জিত করিয়া চাঁদরায়ের রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। চাঁদরায় সুযোগ পাইয়া ভীমপালকে কারারুদ্ধ করিয়া পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিলেন। অগত্যা জয়পাল চাঁদরায়ের প্রার্থিত অর্থাদি প্রদান করিলেন। এই-রূপে তাহাদের মধ্যে পুনঃসন্ধি ননোমালিঙ্কের প্রচেষ্টা বাক্য ঘনীভূত হইতেছিল। অবশেষে ভীমপালের সহিত চাঁদরায়ের কস্তার বিবাহ হয়। পুরুষজগত সুলতানের ভয়ে ভোজদেবের রাজ্যে পলায়ন করেন। চাঁদরায় সুলতানের সহিত বুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাহার জামাতা ভীমপাল তাহাকে পত্র লিখিয়া পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। চাঁদরায় তদনুসারে ধনভাণ্ডার, হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রাস্ত্র সম্পত্তি লইয়া এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে লুকাইয়া লইলেন।

সুলতান চাঁদরায়ের প্রসিদ্ধ পাকত্যা হুগ আক্রমণ করিয়া অপরিমিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু নানাধানে অনুসন্ধান করিয়াও চাঁদরায়ের সন্ধান পাইলেন না। বহুসংখ্যক হস্তা সুলতানের হস্তগত হইল। চাঁদরায়ের একটি প্রকাণ্ড হস্তা ছিল। সেটা স্বয়ং বাহিয়া সুলতানের শিবিরে উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের দান মনে করিয়া সুলতান তাহার নাম খুদাদাদ রাখেন।

চাঁদরায়ের রাজ্যে মাক্কা তিনকোটি সুবর্ণ দিরহাম পাইয়াছিলেন। তন্নিম্ন মণিমুক্তার ত কথাই নাই। এই স্থান হইতে তিনি গজনী যাত্রা করেন। তথায় বাহিয়া গণনা করিয়া দেখিলেন যে, তিনি ২০ কোটি সুবর্ণমুদ্রা, সুপীকৃত মণিমুক্তা হারক, ১৫০০ হস্তী এবং এক লক্ষ বন্দী ভারত হইতে লইয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ ক্রীলোক। বন্দীরা ৪৫ দিরহামে গজনীতে বিক্রীত হইতে লাগিল। ইরাক এবং খোরাসানের বণিকেরা আসিয়া বন্দী ও বন্দিনীগণকে ক্রয় করিয়া লইয়া গেল। মুসলমানভূমি সহস্র সহস্র হিন্দু দাসদাসীতে পূর্ণ হইল।

১৩শ আক্রমণ (১০১২ খৃঃ)—রাহিবের যুদ্ধ। সুলতান তুনিয়াছিলেন যে, কনোজরাজ তাহার অধীনতা স্বীকার করার নন্দরাজ কনোজপতিকে হত্যা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া নন্দরাজকে শান্তি দিবার জন্য তিনি পুনর্বার ভারত-ক্রমণ করিলেন।

পুরুষজগত নন্দরাজের সাহায্যার্থ আশ্রয় করিয়া যমুনায় তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সুলতান পণিমধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধন রত্ন সংগ্রহপূর্বক নন্দরাজার রাজ্যভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পুরুষজগত যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার নাম 'রাহিব'। এই স্থানে নদীর জল অত্যন্ত গভীর ও তীরভূমি কদমাক্ত। পুরুষজগত নন্দরাজেব আসবার পূর্বেই এই স্থানে সুলতানের পথ অবরোধ করিতেছিলেন। সুলতান নদীতীরে উপস্থিত হইয়া সৈন্য-বিগণকে নদী উত্তরণের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সুলতানের ৮ জন স্ত্রীসক সৈন্য সত্তরগ ঘারা নদী পার হইতে আরম্ভ করিল। পুরুষজগত তাহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য হস্তা ও সৈন্যাদিগকে অগ্রসর করিলেন; কিন্তু যুগলগান-গণের তারক্ষেপ-কোশলে হস্তা সকল পশ্চাৎ পিছাইয়া গেল এবং জয়পালের সৈন্যগণও পশ্চাতে হটিয়া গেল। পরে অন্যান্য বহুসংখ্যক সৈন্য নদী পার হইতে লাগিল এবং তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুসৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। পুরুষজগত পুনঃ হস্তে পলায়নের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। ২৭০টি অতিকায় হস্তা সুলতানের হস্তগত হইল।

এস্থান হইতে যাত্রা করিয়া সুলতান বারী নামক একটি নগর লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করিলেন এবং মন্দির-গুলি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে সুলতান নন্দরাজের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। নন্দ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহার ৩৬০০০ অশ্বারোহী, ১০৫০০০ পদাতিক এবং ৬৪০টি শিক্ত হস্তা রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। সুলতান দূত দ্বারা নন্দকে তাহার বশতা স্বীকার করিতে পত্র লিখিলেন, কিন্তু নন্দ অবজ্ঞা সহকারে তাহা অস্বীকার করিয়া বুদ্ধাভি-প্রাণ ব্যক্ত করিলেন। সুলতান নন্দের নির্ভীকতার কারণ জানিবার জন্য পরীক্ষাশিখরে উঠিয়া নন্দরাজের সৈন্য দেখিতে লাগিলেন। নন্দের যুদ্ধ সজ্জা দেখিয়া তাহার হৃৎকম্প হইল। তখন তিনি সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পড়িয়া ঈশ্বরের নিকট বিজয়-প্রার্থনা করিলেন।

রাজিতে মেঘাড়ররে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল। নন্দ



সেই রাত্রিতে দুঃখ দেখিয়া গোপনে গলায়ন করিলেন। মাক্কা প্রাতঃকালেই সে সংবাদ পাইলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরে শুণ্ডচর দ্বারা ঠিক সংবাদ অবগত হইয়া লুঠন আরম্ভ করিলেন। ৫৮০টি হস্তী এবং অপরিমিত ধনরাশি তাঁহার হস্তগত হইল, সে রত্নরাশি ভারবাহী পশুতেও বহন করিতে অক্ষম হইল। জয়জ্ঞাপনে মত্ত হইয়া অপয্যাপ্ত ধনভাণ্ডার লইয়া সুলতান গজনীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৪শ বারে ( ১০১৩ খৃঃ ) কিরাত, নুর, লোহকোট এবং লাহোর আক্রমণ।—গজনী যাইয়া সুলতান শুনিলেন যে, জলালাবাদ ও পেশাবরের উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে প্রতিমাপূজক অধিবাসিগণ বাস করে। অবিলম্বে সৈন্তসংগ্রহ করিয়া কাম্বুকার ও প্রস্তরকর্তৃক কারুদিগকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমপ্রদেশে যাত্রা করিলেন। কিরাতেরা সিংহ এবং সিংহবাহিনীর পূজা করিত। এই স্থানে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কিরাতগণ সুলতানের বশতা স্বীকার করিয়া মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইল। নুরদেশের রাজাও কিরাতদিগের পক্ষাভিমুখ হইলেন।

এই স্থান হইতে সুলতান কাম্বীরসীমান্তে অবস্থিত লোহকোট দুর্গ আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। মাক্কা কাশ্মীরের অতুল ঐশ্বর্য ও ধনসম্পদের কথা শুনিয়া কাম্বীর যাত্রা করেন এবং লোহকোটের দুর্ভেদ্য পার্শ্বতা দুর্গ সমীপে উপস্থিত হন। দুর্গ উচ্চ পর্বতের উপর অবস্থিত ছিল। সুলতান এক মাস চেষ্টা করিয়াও দুর্গের নিকটে পৌছিতে পারিলেন না। পার্শ্বতা ছাগলের ভায় দ্বারোহ শৈল আরোহণে শটু, শিকিত ও কষ্টমহিষু সৈন্ত সকল কোন ক্রমেই লোহকোটের নিকটে যাইতে পারিল না। তখন সুলতান ক্ষুব্ধমনে লাহোরে আসিয়া তত্রত্য ধনরত্ন লুঠন করিয়া গজনীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৫শ বারে ( ১০২৩ খৃঃ ) গোরালিয়র ও কালঞ্জর আক্রমণ। সুলতান নন্দরাভের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ভারতে আইসেন। তিনি প্রথমতঃ গোয়ালিয়রে পৌছিয়াই দুর্গ ও নগর অরোধ করেন। গোয়ালিয়রের রাজা ৩৫টি হস্তী এবং প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন পাঠাইয়া সন্ধি করেন। এই স্থান হইতে সুলতান কালঞ্জরে যাত্রা করেন। কালঞ্জরের ভায় দুর্ভেদ্য ও অজয় দুর্গ সমস্ত ভারতে ছিল না। কালঞ্জরের অধিপতি নব্ব ৩০০ হস্তী উপহার পাঠাইয়া সন্ধিপ্রার্থনা করিলেন এবং হিন্দী কবিতার সুলতানের বিজয়গৌরব শিপি বন্ধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার সভাসদ পণ্ডিতেরা উক্ত কাবিতার চমৎকারিত্বদর্শনে অত্যন্ত প্রশংসা করিল। ইহাতে

সুলতান অত্যন্ত খ্রীত হইয়া নন্দের প্রতি সদর হইলেন এবং কর গ্রহণ করিলেন। নন্দও কৃতার্থ হইয়া রাজকোষের উৎকৃষ্ট মণিমুক্তা সকল সুলতানের পদপ্রান্তে ঢালিয়া দিলেন। সুলতান পরমানন্দে গজনীতে ফিরিয়া আসিলেন।

সোমনাথ আক্রমণ।

১৬শ বারে ( ১০২৪ খৃঃ ) সোমনাথ আক্রমণ।—সংকালে মাক্কা মথুরা ও কাঙ্কজুর সহস্র সহস্র প্রতিমা ভঙ্গ করেন; তৎকালে সোমনাথের ত্রাঙ্কণেরা বলিয়াছিলেন যে, “বিধব্রী এখানে আসিলে সমুচিত শাস্তি পাইবে।” এই কথা সুলতানের কণগোচর হওয়ায় তাঁহার মনে সোমনাথ আক্রমণের ইচ্ছা বলবতা হইয়া উঠিল। তদনুসারে তিনি সুলতানের মধ্য দিয়া আজমীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং আজমীর আক্রমণ ও লুঠন করিয়া অপরিমিত ধন প্রাপ্ত হইলেন। সোমনাথ যাইতে পথে বাইশ কোশ বিস্তীর্ণ মরুভূমি ছিল। সুলতান পূর্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ৩০ ত্রিশ হাজার উষ্ট্রের পৃষ্ঠে পানীয় ও খাদ্যাদি লইয়া সুলতান অনলবাবু অভিমুখে চলিলেন। তথাকার রাজা ভায় সুলতানের আগমনবাস্তা পাইয়া নগরপরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়স্থান জন্ত এক দ্রবর্ভী দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সুলতান অনলবাবু দুর্গ আক্রমণ করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন এবং শতসহস্র প্রাতিমূর্তি চূর্ণ করিয়া অসংখ্য ধনরত্ন লইয়া সোমনাথের অভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে একজন হিন্দু রাজা ২০ হাজার সৈন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু অমর্যাসেই তিনি পরাজিত হইলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সুলতানের হস্তগত হইল। এই স্থান হইতে তিনি দেবলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার রাজা বহুসংখ্যক সৈন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি পরাজিত হইলেন। মাক্কা অধিবাসীদিগকে সমূলে বিনাশ, স্ত্রীলোকগণকে বন্দী, ও ধনরত্ন লুঠন করিয়া সোমনাথের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে যে, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে সোমনাথক কোনরাজ্য সমুদ্রকূলে এই মন্দির নিদ্রাগ করিয়াছিলেন। মন্দির সমুদ্রতীরে প্রকাণ্ড শৈলস্তম্ভের ভায় প্রতীর্ণমান হইত এবং জলধির কেনিল উত্তাল তরঙ্গমালা মন্দিরের পাদদেশ প্রাকালন করিয়া প্রবাহিত হইত। মন্দিরের অলিন্দ সকল সমুদ্রের উপর বিস্তৃত ছিল এবং সীসকমণ্ডিত ৫৫টি কণ্ঠস্তম্ভ অলিন্দ বেটন করিয়া মন্দিরের দৃঢ়তা সম্পাদন করিত। মধ্য প্রকোষ্ঠে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ রিভাজমান ছিলেন। প্রতিমা ১০ হাত দীর্ঘ এবং ৩ হাত প্রস্থ ও শূণ্ডগর্ভ লিঙ্গের উপরিস্থিত ছিল। মন্দিরের মধ্যভাগে চূড়াদেশ হইতে দুই শত



মণ ওজনের একটি স্বর্ণশৃঙ্খল বিলম্বিত ছিল। শত সহস্র ঘণ্টা এই শৃঙ্খলমালায় সংলগ্ন থাকিত। যখন প্রদোষকালে আরত্রিকের সময় ২০০ শত ব্রাহ্মণ ঐ স্বর্ণশৃঙ্খল সকালন করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিত, সেই মধুরনিকণ গভীরনাদী সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে অভিজুত করিয়া দিগ্দিগন্তে ধ্বনিত হইত। মন্দিরের অভ্যন্তর নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও স্বর্ণ-ময় দীপাধারে স্নস্কৃতি ও লিখিত, নীল, রক্ত ও পীতবর্ণের শত শত হীরকখণ্ডের সমুচ্ছলচ্ছটায় বিচিত্রবর্ণের আলোক-মালার স্রুতি হওয়ার—উজ্জল দিবালোকের জায় প্রভাভ হইত। দুই সহস্র ক্রোশ দূর হইতে গজার জল আনিয়া প্রত্যহ লিঙ্গের স্নান সম্পন্ন হইত। মন্দিরের দেবদেবীর জন্ত দশ সহস্র দেবোত্তর গ্রাম নির্দিষ্ট ছিল। এক সহস্র ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন। ৩০০ নাপিত দৈনিক যাত্রী-গণের মস্তক মুণ্ডন করিত। ৩৫০ জন বন্দী প্রতিদিন মন্দির দ্বারে দাঁড়াইয়া মধুরকণ্ঠে স্তুতিপাঠ করিত। ৩০০ পায়ক গীতবাহকের দৈনিক উৎসবে সমাগত যাত্রীগণের শ্রবণ রঞ্জন করিত। ৫০০ লাভণ্যবতী নর্তকী নৃত্যবিভ্রমে সকলের মনোরঞ্জন করিত। দাস দাসীর সংখ্যা ছিল না। সমস্ত লোকের দৈনিক বেতন নির্দিষ্ট ছিল। সহস্র সহস্র লোক মন্দিরের প্রাক্ষণে প্রত্যহ প্রসাদ পাইত। চন্দন-কাষ্ঠনির্মিত সিংহদ্বার শৈলশ্রেণীর জায় দণ্ডায়মান ছিল। চন্দ্র ও সূর্য-এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ যাত্রী নানাদেশ হইতে তীর্থদর্শনে আসিত। তখন সমুদ্রকূলে বিশাল লোকারণ্য ভক্তির মোহন-ময়ে উদ্দীপিত হইয়া শিবসংকীর্তন করিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিমার শিরোদেশে মণিমুক্তামণ্ডিত একখানি চন্দ্রাতপ নক্ষত্রচিত্রিত নীলাবরণের জায় প্রতীক্ষমান হইত।

মাক্দুদ বৃহস্পতিবার বারবেলায় সোমনাথের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের চতুঃসীমা বিস্তৃত শৈলময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সুলতান দূর হইতে দেখিলেন, মন্দিরবাসিগণ প্রাচীর শিখরে আনন্দে নৃত্য গীত করিতেছে। তাহার মুসলমানের অর্ধচন্দ্রাকৃতি পতাকা দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে মন্দিরদ্বার বন্ধ করিয়া ফেলিল। সুলতান সঙ্গেজো মন্দিরের বহির্ভাগে নিশা বাপন করিয়া মন্দিরাক্রমণের সুযোগ অহুমকান করিতে লাগিলেন। মন্দিরপ্রবেশের কোন পথ না পাইয়া কাঠের ‘মই’ প্রস্তুত করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। সুলতান মন্দিরপ্রাক্ষণে উপস্থিত হইলে লোনহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তির রক্তস্রোতে সমুদ্রের নীল সলিল রঞ্জিত হইল ও প্রদোষ-কালীন লোহিতপ্লগনের কান্দি ধারণ করিল। অবশিষ্ট জীবিত

ব্রাহ্মণেরা ভূপতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে সুলতানের কাছে প্রতি-মুখি ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং তদ্বিনিময়ে ২ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাহিল। কিন্তু সুলতান কিছুতেই বিমুত হইলেন না।

রাত্রিতে হত্যাকাণ্ড বন্ধ থাকিল। পরদিন প্রাতঃকালে আবার তরঙ্গর হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। মন্দিরের দ্বারে বৈরুপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। দলে দলে মুসলমানসৈন্য মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল। এক সহস্র পূজক ব্রাহ্মণ কৃতাজলিপুটে ভুলুপ্তিত হইয়া দেবমূর্তি ভিক্ষা চাহিলেন। কিন্তু সুলতান তাহাতে দৃকপাত না করার ব্রাহ্মণগণ অনন্যোপায় হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া একে একে সকলেই নিহত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা দেবমূর্তির বিনিময়ে দুই কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে সুলতানের সচিবগণ সম্মত হইলে সুলতান তাহা-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে,—‘যখন পুনরুত্থানের দিন ঈশ্বর আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, বিশ্বাত্মদিগের সঙ্কোচ প্রতিমা-বিক্রয়কারী মাক্দুদ কোথায়? আমি তখন লজ্জায় স্তম্ভিত হইয়া যাইব। সুতরাং আমি প্রতিমাভঙ্গকারী নামেই পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি।’ কিন্তু সুলতান কুঠারের এক দাক্ষণ আঘাতে প্রতিমা ভঙ্গ করিয়া দেখিলেন যে, প্রতিমূর্তির অভ্যন্তরে যুগযুগান্ত সঞ্চিত উজ্জল অগণ্য মণিমুক্তা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। তিনি দুই কোটির শতগুণ রত্ন প্রাপ্ত হইলেন।

প্রতিমূর্তি ভঙ্গ করিয়া তিনি ধনাগারের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন যে, অমৃত সহস্র স্বর্ণ ও রৌপ্যপ্রতিমাও বহু অকোষ্ঠ পূর্ণ রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত স্বর্ণ মুদ্রা ও মণিমুক্তা কত যে আছে, তাহা কেহ বহু বৎসরেও গণনা শেষ করিতে পারে না। সুলতান ধনাগারে ২০ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়া ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন একত্র করিলেও সোমনাথের ধনভাণ্ডারের সমকক্ষ হয় না।

মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে পঞ্চাশ সহস্র লোক নিহত এবং সুন্দরী নর্তকীগণ দার্দ্র্যরূপে গজনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। হিন্দুস্থানের অতুল ঐশ্বর্য ও বিভবৈভব দেখিয়া সুলতান আর সর্গে যাহতেও ইচ্ছা করেন নাহ। সমুদ্রমেখলালঙ্কৃত শিল্পনৈপুণ্যভূষিত সোমনাথের সুন্দর মন্দিরে তিনি বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, গুজরাতের উত্তর ক্ষেত্রে মণিমুক্তা ও স্বর্ণ শস্ত্রের জায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ গুজরাত মণিপূর্ণ খান এই বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছিল। সুলতান মন্ত্রিগণের পরামর্শে সোমনাথ পরিত্যাগ করেন।

সোমনাথ লুণ্ঠন করিয়া সুলতান শুনিলেন যে, অনহল-  
বাড়ের রাজা ভীম সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের উত্তোগ করিতে  
ছেন। ইহা শুনিয়া তিনি কন্দমার দুর্গাভিমুখে ভীমকে  
আক্রমণ করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। দুর্গের সম্মুখে  
উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, একটা প্রকাণ্ড নদী  
পরিধাক্রমে দুর্গ বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। সৈন্যগণ নদীতে  
অবতরণ করিতে ইতস্ততঃ করায় তিনি অশ্ব আরোহণ  
করিয়া অবলৌল্যক্রমে নদী পার হইলেন। নদীর অপর পার  
হইতে ভীমের সৈন্যগণ এই দৃশ্য দেখিয়া মনে করিল যে,  
বিধাতা প্রতিকূল হইয়াছে—নতুবা জলে অশ্ব অনার্যাসে  
চলিবে কেন? সুলতানের সৈন্যগণ নদী উত্তীর্ণ হইয়া ভীমের  
সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। হিন্দুসৈন্যগণ সকলেই নিহত  
হইল এবং ভীমের সমস্ত সম্পত্তি সুলতানের হস্তগত হইল।

সুলতান সোমনাথের প্রতিমূর্তি চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া-  
ছিলেন। [সোমনাথ দেখ।] একখণ্ড মন্দির, একখণ্ড মন্দির  
এবং দুইখণ্ড গজনাতে প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে প্রতিমার মস্তক  
ও বক্ষঃস্থল গজনীর জামি-মসজিদের সোপানের পাদপীঠরূপে  
ব্যবহৃত হইয়াছিল। শত শত মুসলমান সেই প্রতিমার বক্ষঃ-  
স্থলে দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত পদাঘাত করিত। দাবসিলীম নামক  
একজনকে করদ রাজা করিয়া মাক্কা গজনী যাত্রা করেন।  
যাইবার সময়ে তিনি সোমনাথের চন্দনকাষ্ঠনির্মিত কপাট  
খুলিয়া গইয়া যান।

সোমনাথ হইতে গজনী-যাত্রাকালে সুলতান শুনিলেন  
যে, পরমলদেব নামক একজন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা তাহার  
আগমনপথ প্রতীক্ষা করিয়া যুদ্ধাশ্রিত হইয়া অবস্থান  
করিতেছেন। সুলতান ইহা শুনিয়া এবং লঙ্গে অপরিমিত  
ঐশ্বর্য রহিয়াছে মনে করিয়া সে দিকে না যাইয়া সিদ্ধ ও মূল-  
তানের মধ্য দিয়া গজনীতে প্রত্যাগমন করিলেন (১০২৭ খৃঃ)।  
মক্কাভূমির মধ্য দিয়া যাত্রাকালে পানায় অভাবে সৈন্তের  
তাঁহার প্রাণনাশের উপক্রম হইয়াছিল। একজন হিন্দু  
তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। কিন্তু কোন স্থানে জল না  
পাইয়া তিনি পথপ্রদর্শককে হত্যা করিয়া স্থিরচিত্তে মৃত্যু নিকট  
মনে করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাত্রি  
আগত হইল। অকস্মাৎ উত্তরদিকে মেরুপ্রভার তায় উজ্জ্বল-  
লোক বিকীর্ণ হইল। তদর্শনে সুলতান সটেন্যে সেইদিকে  
চলিলেন। খাজুরলীলা নদী দেখিতে পাইলেন এবং তথা  
হইতে প্রফুল্লচিত্তে অতুল বৈভব লইয়া গজনীতে উপস্থিত  
হইলেন।

১৭শ বারে জাটদেশ আক্রমণ (১০২৭ খৃঃ)।—এই সময়ে

লাহোরের নিকটবর্তী জাটগণ অত্যন্ত এবল হইয়া উঠে এবং  
মানহুরের মুসলমান আর্মীরকে বলপূর্বক ধনত্যাগ করিতে  
বাধ্য করে। ইহাদিগের পরাক্রম ও সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত অধিক  
ছিল। ইহাদিগকে শান্তি দিবার জন্য সুলতান শেষবার ভারত-  
বর্ষে আসিলেন। তিনি মূলতানে আসিয়া ১৪ শত নৌকা  
প্রস্তুত করেন এবং জলযুদ্ধে জাটদিগের ৮০০ রণতরী ধ্বংস  
করিয়া ফেলেন। জাটগণ নিরুপায় হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন  
হয়। সুলতান তাহাদিগের অধিকাংশকেই তরবারি দ্বারা  
নিহত করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য ও স্ত্রীলোকগণকে বন্দী ও  
প্রচুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া চিরতরে গজনীতে প্রস্থান  
করিলেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, মাক্কা দ হিন্দু-  
স্থানে ২০ হাজার প্রতিমূর্তি ভঙ্গ করিয়া ২০ হাজার দেবমন্দির  
মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন। পূর্বে গজনী হইতে গঙ্গা  
পর্যন্ত, পশ্চিমে আফ্রাম, ধোরাগান, তাজিহান, ইরাক, তুর্ক-  
স্থান, ঘোর, নিমরোজের রাজ্য প্রভৃতি, বহুসংখ্যক দেশ করা-  
য়ত করিয়া সর্বত্রই অন্ধচক্রাঙ্কতি বিজয়বৈজয়ন্তী ডঙান  
করিয়াছিলেন। হিন্দুর পাবত্র সোমনাথের দেবপ্রাতমা  
তাঁহার প্রাসাদের পাদপীঠে পারণত হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে  
সৈন্তগণ তাঁহার উদ্দাপনার বাহুমুখে ঐশ্বর্যজালক ক্রিয়া করিতে  
সমর্থ হইয়াছিল। ২৫০০ হস্তা তাঁহার দুর্গ রক্ষা করিত। চারি  
সহস্র তুর্কী শরীররক্ষক রাজসভার চতুর্দিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে  
দণ্ডায়মান থাকিত। দুই সহস্র পরিচারক সূবর্ণহস্ত ও দণ্ড  
ধারণ করিয়া তাহার বিপুল ঐশ্ব্যের গুণগরিমা সর্বত্র জ্ঞাপন  
করিত। তাহার ন্যায় সাহসী ও স্বধর্মনিষ্ঠ রাজা কখনও  
গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।

ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মাক্কা দ ইরাক প্রদেশে  
যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তথা হইতে বোগদাদের খলিফা-  
গণকে সম্মান প্রদর্শন করিতে যাইবার সঙ্কল্প করেন।  
কিন্তু দেববাণী হওয়ায় গজনীতে প্রত্যাগমন করেন। তথায়  
আসিয়া (১০৩০ খৃঃ) ৩১ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি  
৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে মাক্কা দ তাঁহার সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে  
মণি, মুক্তা ও সূবর্ণরাশি সজ্জিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।  
তদনুসারে ভারতীয় কলতরঙ্গ মহামূল্য ফল সকল বিচিত্র  
মকমলের উপর স্তূপীকৃত হইল, নাল পীঠ ও রক্ত বণের হারা-  
খণ্ড সকল অপূর্ণ দিব্যাবতার প্রাঙ্গণ আলোকিত করিল।  
মাক্কা দ সে সকল অনির্মিত লোচনে দেখিতে লাগিলেন—হস্ত-  
ধারা স্পর্শ করিলেন—কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হইল না। তখন

তিনি বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালের কঠোর স্বপ্ন তাঁহার করুণ ক্রন্দনে ভুলিল না। অচিরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার সাত পুত্র ছিল। ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন যে, মাক্কূদ অত্যন্ত ব্যয়বৃত্ত ছিলেন। তাঁহার সভায় আনসারী, আসজাদি, ফরখি প্রভৃতি কবিগণ ছিলেন। মাক্কূদের অভিপ্রায় অনুসারে সুপ্রসিদ্ধ পারসিক কবি ফিরদৌসী তাঁহার সভায় আগমন করেন। [ ফিরদৌসী দেখ ]। ফিরদৌসীর কবিতা মুগ্ধ হইয়া সুলতান তাঁহাকে পারস্যের রাজবংশ বর্ণনা করিয়া একখানি কাব্য লিখিতে বলেন এবং প্রতি-শ্লোকে এক একটা সুবর্ণ দিরহাম দিতে প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ফিরদৌসী ৬০০০ শ্লোকযুক্ত শাহনামা রচনা করেন। কিন্তু কাব্য সম্পূর্ণ হইলেও তিনি প্রতিশ্রুত অর্থ কিছুই দিলেন না—ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত অপবণ হওয়ার ৬০০০ রোপা মুদ্রা কবিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু কবি তাহা মুদ্রাবাহকগণকে বিতরণ করিয়া কয়েকটা ব্যক্ত্যবপূর্ণ কবিতা লিখিয়া সুল-তানের নিকট প্রেরণ করিয়া গজনী পরিত্যাগ করেন। পরে কবিতার কশাবাতে মাক্কূদের চৈতন্ত হইয়াছিল। তখন তিনি লজ্জায় স্ত্রিয়মাণ হইয়া ৬০০০ সুবর্ণমুদ্রা কবিকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই কবির মৃত্যু ঘটে।

মাক্কূদ, বিকায় নামক মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্র প্রণেতা। ইনি বূহানি উল্ সরিয়াং নামেও পরিচিত ছিলেন। [মহম্মদ দেখ।]

মাক্কূদ, কান্দাহারের জনৈক আকগানসদর। ইনি ঘিলজৈ-বংশীয় মৌর বাইসের পুত্র। [মহম্মদ দেখ।]

মাক্কূদ, সুলতান মহম্মদ সলজুকির পুত্র। ইনি সুলতান শাহ-রিয়ারের সহকারীরূপে এক বৎসর ইরাক ও আজরবিজান প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ত্রাতুপুত্রের সরল ব্যবহারে খ্রীত হইয়া খুলতাত সুলতান শাহরিয়ার মাক্কূদকে স্বীয় সিঁথী খাতুন ও মা-মালিক নামক কন্যাদ্বয় সমর্পণ করেন।

মাক্কূদ, মম্বাসির কুতবশাহী নামক মুসলমান-ইতিহাস-প্রণেতা। আবদুল্লা কান্হ ফিরোজীর পুত্র। তিনি তারিখ-জামা উল-হিন্দ নামে আর এক খানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ২য় রাজা কুলী কুতবশাহের রাজত্ব কালে ইনি প্রায় ৩০ বৎসর কাল রাজ্যধানে কর্তব্য করিয়াছিলেন। উক্ত রাজার মৃত্যু-কালে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন।

মাক্কূদ, হক্-উল-ল-যেফিন্ নামক পারসিকবিগের ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা। [মহম্মদ সুলতানী দেখ।]

মাক্কূদ ইবনু ফরাজ, জনৈক ভণ্ড মুসলমান। ইনি আপনাকে মুসা বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা পান। [মহম্মদ দেখ।]

মাক্কূদ ইবনু মসায়ুদ, জিনাংউজ্জমান-প্রণেতা। \* মাক্কূদ খাঁ, সিন্ধদেশের অন্তর্গত তকরের জনৈক শাসনকর্তা। ১৫৬৫ খৃঃ অঃ মীর্জা ইসা তথান্ স্বীয় পুত্র মীর্জা মহম্মদ বাকির সহিত তকর আক্রমণ করেন। তাঁহারা হুসলা নগরের নিকটবর্তী হইলে মাক্কূদ খাঁ সৈন্যে তথায় আগমন করেন। মহম্মদ বাকি মাক্কূদের সৈন্যসংখ্যা ও পরাক্রম দেখিয়া পলায়নের উদ্ভোগ করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন যে, ফিরিজিরা তাঁহার ঐক্য আক্রমণ করিয়াছে। তদনুসারে তিনি সুরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

মাক্কূদ খাঁ খিলিজি, মালবের জনৈক শাসনকর্তা। তিনি মাক্কূদশাহ খিলিজি (১ম) নাম গ্রহণপূর্বক মালব-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার পিতা খানজহান খিলিজি (ইনি মালিক মোগী ও আজিম হুমায়ুন নামে পরিচিত) মালবরাজ সুল-তান হোসঙ্গ শাহের উজীর ছিলেন। সুলতান হোসঙ্গের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র মহম্মদ শাহ (অপর নাম গজনী খাঁ) মালবের রাজা হন। মাক্কূদ স্বীয় পিতার সহিত বড়বয় করিয়া বিব-প্রযোগে গজনীখাঁর নিধনসাধনপূর্বক নিজে ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে মালব সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হোসঙ্গের অন্ততম পুত্র মহম্মদ পিতার রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক গুজরাতে পলায়ন করেন। গুজরপতি সুলতান আকদশাহ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া সদলে মালবাভিমুখে যাত্রা করেন।

গুজরীয় সেনাদল সারঙ্গপুরে (জানপুর) পৌছিলে, আকদশাহ জনৈক বিচক্ষণ সেনাপতির হস্তে সেনাপত্য অর্পণ করিয়া খানজহানের (মালিক মোগী) বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। চোহর, ভিলসা (বিদিশা) ও চন্দ্রৌর হইতে পরি-চালিত মালিক মোগীর সেনাদল মাধুর সৈন্যসংখ্যের সহিত মিলিত না হইয়া পথিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হইলে, অয়ের বিলক্ষণ আশা ছিল। কিন্তু তাঁহার এই কোশল বার্থ হইয়া গেল। খানজহান তাঁহার এই রণচাতুর্য্য অবগত হইয়া পুনরাহুই মাধু-হুর্গে আসিয়া উপনীত হইলেন। গুজরাধিপতি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হুর্গসন্নীপে আসিয়া পৌছিলেন।

খণ্ডগুদে সুবিধা হইবে না ভাবিয়া, মাক্কূদ খিলিজি হুর্গমধ্যে থাকিয়া যুদ্ধের আরোজন করিতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া অতর্কিতভাবে শত্রুদিগের উপরে আক্রমণ করা সহজ ভাবিয়া তিনি সেই উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইলেন। অবশেষে রাত্রিযোগেই আক্রমণের আয়োজন হইল। জ্ঞানদ শাহ গুপ্তচর দ্বারা সংবাদ লইলেন। সেই রজনীর তমসাক-কারে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রজনী প্রভাতে মাক্কূদ সদলে পুনরায় হুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যখন মাক্কুদ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তখন আক্কাদশাহের পুত্র মহম্মদ খাঁ ও হাজার অখারোহী সেনাদল লইয়া সারঙ্গপুর জেলা অধিকার করেন। সে সময়ে হোসঙ্গ খাঁর পলাতক পুত্র উমার খাঁ চন্দ্রেরীতে বিদ্রোহবাহিনী প্রজ্জলিত করিলেন। এইরূপে নানা স্থানে শত্রুপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত হইলেও মাক্কুদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। তিনি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত স্বীয় অধীনস্থ সৈন্যগণের মনস্তত্ত্ব করিতে লাগিলেন। যাহাতে দুর্গমধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গের পাণ্ডাভাব না ঘটে এবং গুজরীয় সেনাদল রসদ না পায়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন।

অধিককাল এইরূপে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ থাকা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া, তিনি ৮৪২ হিজরা তারাপুর দ্বার দিয়া সদলে নিজস্ব হইলেন এবং ধীরে ধীরে সারঙ্গপুর-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কৈতাল (চবল) অতিক্রমকালে গুজর-সেনানী মালিক হাজির সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হাজি পলায়নপূর্বক মাক্কুদ শাহের আগমন-বার্তা স্বীয় প্রভুর সকাশে জ্ঞাপন করেন। তৎক্ষণাত্রে গুজর-রাজ স্বীয় পুত্র মহম্মদ খাঁকে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আদেশ দেন। মহম্মদ উজ্জয়িনীর পথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতৃসকাশে উপনীত হইলে, সারঙ্গপুরের শাসনকর্ত্তা মাক্কুদের সহিত যোগদান করেন। তবৎ-ই আকবরী পাঠে জানা যায় যে, মাক্কুদ মহম্মদ খাঁর পশ্চাৎ পশ্চাদগমন করিয়া উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সুযোগে উমার খাঁ চন্দ্রেরী হইতে সারঙ্গপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। মাক্কুদ এই সংবাদ পাইয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক ক্ষুদ্র শত্রুনাশের উদ্যোগ করিলেন।

উমার খাঁ মাক্কুদের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া স্বীয় বিশিষ্ট সেনাদলের সাহায্যে তাঁহাকে গুপ্তভাবে নিধনকরণ-মানসে পথিমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে মাক্কুদ সেই পথেই সেনাদল চালনা করিয়া উমারের সম্মুখীন হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া কাজে কাজেই উমারকে সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই যুদ্ধে উমার খাঁ নিহত হন।

এই সময়ে গুজরাতি সেনাদলের মধ্যে মড়ক উপস্থিত হওয়ার আক্কাদশাহ সদলে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। তাঁহার রোগগ্রস্ত সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। আক্কাদ শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র সুলতান মহম্মদ গুজর-রাজ্যের অধীশ্বর হন। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে চম্পানের দুর্গ অধিকার মানসে তিনি রাজা ত্রিভুঙ্গবাসের পুত্র গঙ্গাদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গঙ্গাদাস দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। কিছুকাল অবরুদ্ধ থাকায় দুর্গ মধ্যস্থ সেনাদলের অন্ন-ভাবহেতু দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইল। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া

মাধু-নরপতি সুলতান মাক্কুদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মাক্কুদ এই আমন্ত্রণে ক্ষীণ হইয়া গুজরপতির প্রতিহিংসা-প্রতিবিধানার্থ মালবনীমাস্ত্র দাহোড় নগরে উপনীত হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর বিপক্ষদল অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর মাক্কুদ স্বরাজ্যে ফিরিলেন (৮৫৪ হিজরা।)

মহম্মদকে ভীক এবং রাজকাৰ্য্য-পরিচালনে অক্ষম দেখিয়া সুলতান মাক্কুদ গুজরাত আক্রমণের সুবিধা দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে মুসলমান-সাধু শেখ কমলের উত্তেজনার তিনি গুজরাত আক্রমণে অগ্রসর হন। মহম্মদ তাঁহার আগমনসংবাদ পাইয়াই পোতারোহণপূর্বক দীউনগরে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি রাজ্যরক্ষার পরাধু্য হইয়া পলায়ন করিতেছেন শুনিয়া, ওমরাহগণ তাঁহার পশ্চীকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহার দ্বারাই ভীক মহম্মদের খাত্তব্রব্যে বিশ্বাসিত করিয়া দিলেন।

৮৫৫ হিঃ মহম্মদ লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান কুতবউদ্দীন গুজরাতের সিংহাসনে উপবেশন করেন। এই সময়ে সুলতান মাক্কুদ খিলিজি সদলে আসিয়া তরোচ দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গাধিপ মালিক দীজী মর্জ্জান খাঁ তাঁহাকে আত্মসমর্পণ না করিয়া দুর্গরক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর সুলতান তথা হইতে বড়োদা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বড়োদা-লুণ্ঠনের পর তিনি শুনিলেন যে, সুলতান কুতবউদ্দীন আক্কাদবাদের কতিপয় বীরচেতা পুরুষসাহায্যে মাহেজ্জী-ভীরবর্ত্তী খানপুর বাঁকানীরে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই সংবাদে দগ্ধিত সিংহের ত্রায় মাক্কুদ অগ্রসর হইয়া রাত্রিযোগে কুতবের শিবির আক্রমণের উদ্যোগ করেন। দিব্যভাগে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উদ্ধত মাক্কুদ পলায়ন করিলেন, তাঁহার বিখ্যাত সেনানী মুজঃফর খাঁ বন্দী ও পরে নিহত হইলেন।

ইহাতেও ভয়োত্তম না হইয়া সুলতান মাক্কুদ খিলিজি পুনরায় নাগোর আক্রমণে বহির্গত হইলেন। কুতবউদ্দীন তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য সৈয়দআতাউল্লাকে প্রেরণ করেন। শব্বরপ্রদেশে উভয় দলে সাক্ষাৎ হয়। মাক্কুদ প্রথমেই ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে নাগোররাজ ফিরোজ খাঁর মৃত্যু হইলে, মুজাহির খাঁ রাজ্যাধিকারপূর্বক ফিরোজের পুত্র সামস খাঁকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। সামস খাঁ কমলদীরে

আসিয়া রাণাকুন্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, রাণা তাহার হৃৎপথে কাতর হইয়া নাগোরস্থ মুসলমানদিগকে বিপর্যস্ত এবং ভয়গর লুণ্ঠন করেন।

মুসলমানের নির্ধ্যাতনে ক্রুদ্ধ হইয়া, সুলতান কুতব-উদ্দীন ৪৬০ হিঃ রাণার রাজধানী কমলনীর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে রাণা পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পর বৎসর ৮৬১ হিঃ ( ১৪৫৭ খৃঃঅঃ ) কুতবউদ্দীন ও মাক্কূদ খিলজি একযোগে চিতোর আক্রমণ করেন। অবশেষে লক্ষি স্থাপিত হইলে যুদ্ধ নিবৃত্তি হয় ও মাক্কূদ মন্সশোর প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর ৮৬৬ হিঃ ( ১৪৬২ খৃঃ অঃ ) নিজাম উলমুলকের প্ররোচনার উত্তেজিত হইয়া মাক্কূদ খিলজি দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অগ্রসর হন। তিনি হুমায়ুন শাহের পুত্র নিজাম শাহকে বিদরযুদ্ধে পরাজিত করিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই সময়ে নিজামের প্রার্থনামুসারে গুজরপতি মাক্কূদ বিগাড়া মালবরাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মাক্কূদ খিলজি এই সংবাদে গোণ্ডবানার পথে স্রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে গোণ্ডজাতি তাঁহাকে আক্রমণ করায় তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া গোণ্ডবানাপতিকে নিহত করিয়াছিলেন।

১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে মাক্কূদ খিলজি পুনরায় দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। এবারের আক্রমণে তিনি বিশেষরূপে লাভবান হন নাই। কিছুকাল নিকরদেশ থাকিয়া তিনি পুনরায় ৮৭০ হিঃ ইলিচপুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এই যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হইলে, নিজামশাহ তাঁহাকে কেরলা প্রদেশ দান করিয়া অব্যাহতি পান। যাহা হউক, গুজরপতি মাক্কূদের মধ্যস্থতায় এবং তাঁহার শাসনভয়ে মালবপতি দাক্ষিণাত্য আক্রমণে বিরত হইলেন।

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে ( ৮৭৩ হিঃ ) মাক্কূদ খিলজি লোকান্তর গমন করেন। তৎপুত্র সুলতান গিয়াসউদ্দীন মালবসিংহাসনে বসিলেন। গিয়াসের পুত্র সুলতান ২য় মাক্কূদের রাজ্যকালে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে গুজরাতিপতি বাহাদুরশাহ মালব জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

মাক্কূদ খাঁ তোগলক, দিল্লীর তোগলক-( পাঠান ) বংশীয় শেখ সয়্যাদ্। ফিরোজ শাহ তোগলকের পৌত্র এবং মহম্মদ শাহের পুত্র। মহম্মদ বিন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র হুমায়ুন শাহ ১মাস ১৬দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া গতাস্থ হইলে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাক্কূদ খাঁ ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দশম বর্ষে নাশির উদ্দুনিয়ার উদ্দীন মাক্কূদশাহ নাম গ্রহণ-পূর্বক দিল্লীসিংহাসনে আরোহণ করেন।

বালকরাজ্যের রাজত্বকালে শাসনবিশৃঙ্খলতা এবং ওমরাহ-গণের অন্তর্বিদ্বেষবহুত্ব রাজ্য মধ্যে সামন্ত-রাজগণের একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে অনেক সামন্তরাজ দিল্লীর অধীনতাশাসন উন্মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া এই সময়ে মোগলপতি আমীর তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। মোগল-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মাক্কূদশাহ গুজরাতে পতনান্ধিমুখে পলায়ন করেন। ঐতিহাসিক ফিরি-স্তার মতে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী এবং সুরফউদ্দীন বেজলীর মতে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর এই যুদ্ধ ঘটে।

মাক্কূদকে পলায়নপর দেখিয়া তৈমুর শাহ যুদ্ধজয়ের অব্য-বহিত পর দিবসেই দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি জয়লব্ধ প্রভূত ধনরত্ন লইয়া অচিরেই পারস্যান্ধিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সুলতান মাক্কূদশাহ গুজরাতে জাফরখাঁর এবং পরে মালবে আলপ্ খাঁর সাহায্যলাভে ব্যর্থমনোরথ হইয়া কনোজ-রাজধানীতে আগমনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৈমুরের প্রস্থানের পর, ফিরোজশাহের পৌত্র এবং ফতেখাঁর পুত্র নসরুখাঁ নসরু শাহ নামধারণপূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হইতে দিল্লী-দরবারে একবাল খাঁর প্রভুত্ব বাড়িয়া উঠে। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-সিংহাসন একবাল খাঁর হস্তগত হয়। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে আমোব তৈমুরের মৃত্যুর পর একবাল খাঁ সুলতান মাক্কূদকে পরাজয়-মানসে কনোজ আক্রমণ করেন। কনোজদুর্গ অবরোধ ও সুলতানকে পরাজিত করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পর বৎসর ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সুলতানের সাহা-যার্থ সদলে দিল্লী-অন্ধিমুখে অগ্রসর হন। হত্যাবসরে তিনি শুনিলেন যে, খিজির খাঁর সহিত ভীষণ যুদ্ধে একবাল খাঁ নিহত হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই।

একবাল খাঁর মৃত্যুসংবাদে, আশাশ্রিত হইয়া সুলতান মাক্কূদ শাহ দিল্লী-অন্ধিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং উক্ত বর্ষের ডিসেম্বর মাসে তিনি দ্বিতীয়বার দিল্লী-সিংহাসনে আরো-হণ করেন। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ আর তাঁহার অধী-নতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদান করিয়া পরস্পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সুলতান মাক্কূদের মৃত্যু হয়। তাঁহা হইতেই দিল্লীসাম্রাজ্য তুর্কজাতির হস্তচ্যুত হইয়াছিল এবং দৌলতখাঁ লোদী সিংহাসন অধিকার করেন।

মাক্কূদ গবান, জৈনক রাজনৈতিক মুসলমান। সাধারণতঃ মালিক উল্-তজ্জার খাজা জহান নামে প্রসিদ্ধ। ইনি দক্ষিণাত্যে বাক্সীরাজা নিজাম শাহের উজীর ছিলেন। ২য় মহম্মদের রাজত্বকালে বকিল উল্-মুলতানের কার্য ইহার উপর তত্ত্ব হয়। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে রাজার অগ্রীতিভাজন করিবার নিমিত্ত সতত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পরিশেষে বড়বয় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে জালিয়াতের অভিযোগ আনিলেন। রাজা উপযুক্ত অমুসন্ধান না করিয়া তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। মাক্কূদ বিশেষ সুশিক্ষিত লোক ছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই নীতি-কোশলে দক্ষিণাত্যের রাজত্ববর্গ সশক্ত হইয়াছিল। পদ্য ও গল্প রচনায় তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তিনি মহম্মদশাহের গুণাহুজীর্ণ করিয়া একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি রোজাং-উল্-হন্সা এবং অল্প কয়েকটি পদ্য লিখিয়া যান। ইনি মোলানা আবদুল রহমন্ জামীর অল্পরূপ লোক ছিলেন। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চিঠি পত্রাদি বিনিময় হইত। মহম্মদের কয়েক খানি চিঠি তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

মাক্কূদ ঘোরী (গিয়াসউদ্দীন), ভারতবিজ্ঞতা গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর পুত্র ও সহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর ভ্রাতৃপুত্র। ইনি ১২০৬ খৃষ্টাব্দে ঘোর ও গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবশেষে তিনি তাজউদ্দীন এলখজকে গজনীর সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

মাক্কূদ তাজিজী, তাজিজবাসী জৈনক মুসলমান-কবি। ইনি মিস্তাহ-উল্-মাজাজ্ নামক খ্যাত গ্রন্থে স্ফৌমতের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

মাক্কূদ তিস্তুরী (শেখ), গুলশান-এ-রাজ নামক কাব্য-প্রণেতা। জম্মুজমি তিস্তুর নগরেই ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিবার তিন বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মাক্কূদ পার্শী (খাজা) [ মহম্মদ পার্শী দেখ। ]

মাক্কূদ মোল্লা, [ মহম্মদ মোল্লা দেখ। ]

মাক্কূদ মোদী, বিহারের জৈনক পাঠান-শাসনকর্তা (১৫২৯খৃঃ), সিকন্দর লোদীর পুত্র। শুরবংশীয় প্রসিদ্ধ পাঠান-সর্দার ইহার অধীনে কৃষ্য গ্রহণ করেন। বাবরশাহ মাক্কূদকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

মাক্কূদ বিগাড়া, গুজরাতের জৈনক বিখ্যাত মুলতান। মুলতান মহম্মদ শাহের পুত্র। ইনি বিবি মোগলীর গর্ভজাত, সুতরাং মুলতান কুতব উদ্দীন শাহের বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা। ১৪৪৫

খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা আদর করিয়া পুত্রের কণ্ঠে খাঁ নাম রাখিয়া দেন।

মুলতান কুতব উদ্দীন বৈমাত্রেয়ের নিধনসাধনে বড়যন্ত্র করেন। মাতা মোগলী পুত্রের মঙ্গল কামনায় তাঁহাকে লইয়া খ্যাত ভগিনীপতি শাহ আলমের (ইনি গুজরহ প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু বুর্হাণ উদ্দীনের পুত্র) গৃহে লইয়া লুকাইয়া রাখেন। কুতবশাহ এই সংবাদে ক্রূপিত হইয়া শাহ আলমের গৃহ ধ্বংস করণমানসে রংলাবাদ নগর লুণ্ঠন করিতে আদেশ দেন। এই লুণ্ঠনকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি খ্যাত অস্ত্র দ্বারা আহত হন। ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর দাউদশাহ নামক তাঁহার কোন আত্মীয় গুজরাতের মননে আরোহণ করেন। এই ব্যক্তি সপ্তাহ কাল মাত্র গুজরাতের রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাপীড়ন ও ক্রপণতার উদ্ভাস্ত হইয়া ওমরাহগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কণ্ঠে রাখিবে রাজা মনোনীত করেন। তিনি মুলতান নীল পান। মাক্কূদশাহ উপাধি ধারণ করিয়া গুজর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৪৫২খৃঃাব্দ)। বীণা, বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, দয়াপ্রভৃতি সঙ্গুণে অলঙ্কৃত থাকায় তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে রাঙি হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সাধারণে মাক্কূদ বিগাড়া নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি জুনাগড় ও চম্পানের দুর্গ জয় করেন বলিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে বি(দ্বি)গাড়া নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ তাঁহার বুদ্ধির গভীরতা দেখিয়া অথবা তাঁহাকে চর্তুর্ধ্ব জানিয়া 'বিগাড়া' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

তাঁহার রাজ্যারোহণের কএক মাস পরেই, ওমরাহদিগের একটি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক মাক্কূদ রাজ্যারোহণের প্রথমেই এই বিপজ্জনক বিপ্লব সংঘটন দেখিয়া বিচলিত হইলেন। অবশেষে তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই বিদ্রোহ-দমনে সমর্থ হন। এই সময়ে কএকজন প্রসিদ্ধ ওমরাহ নিহত হইয়াছিল।

চতুর্দশ বর্ষীয় বালক অসাধারণ-বুদ্ধিবলে বিগজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া খ্যাত রাজ্যের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় রাজ্যতন্ত্র-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হন। তদনুসারে তিনি আপন বিশ্বস্ত বন্ধু ও অশুচর মালিক হাজি, মালিক তোঘান, মালিক বহাউ-দ্দীন, মালিক আইন, মালিক কাপু ও মালিক সারঙ্গ প্রভৃতিকে রাজকাৰ্য্যের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি রাজশক্তি-বুদ্ধির জন্ত সেনাসংখ্যা পরি-বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার অধিকার কালে গুজরাতরাজ্য



অতুলনীর সম্বন্ধিত ভূমিত হইয়াছিল। পথে ষাটে দল্লভর ছিল না। দরবেশ ও বণিকগণ স্বচ্ছন্দ মনে যথা তথা ভ্রমণ করিতে পারিত। তাঁহার স্মরণে শুভরাত্র-রাত্রা শান্তি-নিকেতন হইয়াছিল।

সেনাদলের বেতন ব্যতীত, যে সকল আরগীর তাহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ আরগীর তাহাদের সন্তানসম্বন্ধিগণ ভোগ দখল করিবে, এক্ষণ নিয়ম নির্দিষ্ট করা হইল। আমীরদিগের পক্ষেও ঐ নিয়ম বাধ্য হইয়াছিল। কোন সেনাই অপর মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে পারিবে না। যে উত্তমর্ণ রাজসৈনিককে টাকা কর্ত্ত দিবেন, তিনি আইনামুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। সৈনিকের কোন টাকার আবশ্যক হইলে, রাজদ্বারে আবেদন করিয়া ৭৭ লিখিয়া টাকা ধার করিতে হইবে। টহাতে দেশের অনেক মজল সাধিত হয়। সৈনিকগণ রাজাহুগ্ৰহে প্রীত থাকিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিত। টহামত টাকা কর্ত্ত করিতেও তাহাদের স্পৃহা হত না। যে হেতু উপরিতন কণ্ঠচরীদিগকে জানাইয়া বিরক্ত করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত রাজ্যের অনর্থকারী উত্তমর্ণগণের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি খোরাসানের সুপ্রসিদ্ধ রাজা সুলতান হুসেন মীর্জা, তাঁহার প্রধান উজীর মীর আলী শের, মোলানা হাজি, দিল্লীর সিকেন্দর বিন্-বহলোল্লাহী ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মিক্রা ভূবাক্স লোহানী, মাজুরাজ মাক্দ্দ খিলজির পুত্র গিয়াস্ উদ্দীন এবং দাক্ষিণাত্যের সুবিখ্যাত রাজা মাক্দ্দ শাহ বাক্ষী ও তাঁহার রাজনীতিকুশল উজীর মালিক নিশান (মালিক গবান্) প্রভৃতির প্রবর্তিত পন্থার অনুসরণ করিয়া শাসনসম্পর্কীয় এবং রাজকীয় যাবৎ কার্য্য করিতেন।

তাঁহার অধিকারকালে ধাত্রাদি শস্ত কখনও মহার্ঘ হয় নাই। যে সকল প্রজা বিভিন্ন দেশজাত বৃক্ষরোগে যত্ন করিত, তিনি তাহাদিগকে অর্থদানে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার উৎসাহে ফির্দৌস ও সাবানের প্রসিদ্ধ উজান নিয়িত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে কুপাদি খনন এবং ভগ্ন অটালিকাদির কীর্ত্তিসংস্কারকল্পে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

সুলতান মাক্দ্দ যদিও ব্যবহার-শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন না, তথাপি সাধুসঙ্গে থাকায় তাঁহার ন্যায়পর-বিচারে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। শেখপুরানগর-প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ মুসলমান-সাধু শেখ সিরাজ উদ্দীন তাঁহার গুরু এবং প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। ইহার অনুমতি ব্যতীত তিনি কোন গুরুতর কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না।

১৪৬০-১৪৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সমলে কঙ্গরবজ্র অভি-

যুধে বাত্ম করেন। শেষোক্ত দুই বর্ষে মাজুরাজ মাক্দ্দ খিলজিকে দমন ও নিজামশাহকে সহায়তাদান ব্যতীত তাঁহার পূর্বোক্ত দুইটা অভিযানে আর কিছুই ঘটে নাই। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তেলিঙ্গনার সেনাদলের সাহায্যে বাভর-পর্বত-বাসী হিন্দুরাজকে পরাজিত করিয়া বাভরচূর্ণ অধিকার করেন।

১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে গির্গর ও জুনাগড়ের রাজা রাও মাওলিককে বিদ্রোহাচারী দেখিয়া তিনি সমলে গির্গর অভিযুধে যাত্রা করেন। জুনাগড় পর্বতমালায় সান্নিধ্যে আসিয়া উপরোক্ত দুর্গস্থলের অধিকারমানসে তিনি শাহজাদা ভোগলকর্থাৎ মহাবল গিরিসঙ্কট দিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। অন্যান্য সেনাদল বিভিন্ন সেনানায়কের অধীনে রক্ষিত হইল। রাও মাওলিক স্বয়ং মাত্র সেনা নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে যখন সুলতান খীর বিশাল-বাহিনী লইয়া বিপক্ষদলের সম্মুখীন হইলেন, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি খীর স্বয়ংসংখ্যক সেনাদল সঙ্গে লইয়া সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কণকাল-মাত্র যুদ্ধ করিয়া তাহার আশ্রয়স্থল অসমর্থ ভাবিয়া বনভূমিতে আশ্রয় লইল। রণে জয়লাভ করিয়া সুলতান নগর অন্বেষণ করিলেন। তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া মাওলিক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। সুলতান তাঁহার কাকুতি মিনতিতে দয়াদ্রুচিত হইয়া অবরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় রাও মাওলিককে পরাজিত করিয়া তাঁহার স্বর্গচ্ছত্র ও রাজ-আভরণাদি লুণ্ঠন করিয়া আনেন।

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় জুনাগড় আক্রমণ করেন। রাও মাওলিক উপায়ান্তর না দেখিয়া সুলতানের হস্তে জুনাগড়-চূর্ণ সমর্পণপূর্ব্বক গির্গরদুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এখানে আসিবার পর, তাঁহার বিখ্যাত অচ্যুত বিশালের (এই ব্যক্তি মাওলিকের পক্ষে রসদাদি সংগ্রহকর্ত্তা এবং সকল বিষয়ে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা) সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে। বিশাল বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোপনে সুলতানকে আশ্রয় করেন। সুলতান এই সংবাদে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া জুনাগড়ে উপস্থিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর এই পার্শ্বতা দুর্গ ও তাঁহার হস্তগত হইল। অবশেষে রাও মাওলিক ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়া খান্ আমাস উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

স্মৃতি জর করিয়া তিনি চম্পানের রাজদ্রোহী নীরপতি গজাদাসের পুত্র জরসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই সময়ে মাজুরাজের সহযোগে তিনি দড়োয়াই ও বড়োয়া প্রদেশে বিদ্রোহ উৎখাপন করিয়াছিলেন। সুলতানের সেনাসংখ্যা-



দশনে ভীত হইয়া বিদ্রোহচরণে বিরত হন। অতঃপর ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুপ্রদেশবাসী স্মারার ও সোড়া রাজগণকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত গমন করেন। ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশের বিদ্রোহিগণ তাঁহার হস্তে বিশেষরূপে নিরুদ্ধিত এবং তাহাদের স্বীয়পুত্রগণ বন্দিভাবে জুনাগড়দুর্গে আনীত হয়। পর বৎসরে তিনি জগৎ (ছারকা) এবং শম্মোধাররাজকে পরাজিত করিয়া সমুচিত দণ্ড বিধান করেন।

১৪৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় চম্পানের-দুর্গ-জয়ান্তিলাবে অগ্রসর হন। প্রথমে মালবরাজ গিয়াস উদ্দীনের সাহায্যে তিনি (রাবল) সুলতান মাক্কূদের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে গিয়াস তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, রাবল-ভূপতি আশ্রয়কার অসমর্থ হইয়া দুর্গ সমর্পণ করিলেন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে দুই বৎসর যুদ্ধের পর চম্পানের-দুর্গ মুসলমানরাজের হস্তগত হইয়াছিল।

চম্পানেরের রাবল রায় পতাই এবং তাঁহার মন্ত্রী ধর্মরসিংহ ইসলামধর্ম গ্রহণ না করায় ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সুলতানের আদেশে বিধগ্নিত হইয়াছিলেন। এখানকার জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ দেখিয়া মাক্কূদ এই নগরের মহম্মদাবাদ নাম দিয়া তথায় রাজত্ববন নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

১৪৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি দতোলের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে জল ও স্থলপথে সেনা প্রেরণ করেন। সুলতান মাক্কূদ বাঙ্গালী এই যুদ্ধে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে মোরাসা-প্রদেশের শাসনকর্তা আল্ফ খাঁ বিদ্রোহী হইলে সুলতান তাহাকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হন। আল্ফ খাঁ মোলাজাদা বশুতা স্বীকার করিলে, তিনি ১০১ হিঃ তাহাকে স্বপদে অধিষ্ঠিত রাখিয়া ইদর ও বাগর-প্রদেশ জয় করিতে গমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি বহু ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে আদিল খাঁ ফরুখী রাজকর দিতে অশক্ত হওয়ায়, তিনি আশীর দুর্গ আক্রমণ করেন। তান্ত্রী নদীতীরে সুলতানের গুভাগমন হইলে, আদিল খাঁ ভীত হইয়া রাজকর প্রদানপূর্বক ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে, মাক্কূদ তাঁহাকে মার্জনা করিয়া মন্দবাড়ে উপন্যত হন। এখান হইতে তিনি খালনীর, ধম্মান প্রভৃতি দুর্গ পরিদর্শন করিয়া মহম্মদাবাদে ফিরিয়া যান।

১৫০৭ খৃষ্টাব্দে য়রোপীয়গণ (পর্্তুগীজ) বসাই ও মহাইম্ (মাহিম) নগরে বিদ্রোহী হইলে তিনি সদলে তাহা-দিগের অত্যাচার-নিবারণার্থ অগ্রসর হন। মুসলমান-সেনানী মালিক আজিজের নিকট পর্্তুগীজগণ বিশেষরূপে নিরুদ্ধিত হইয়াছিলেন। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আশীর দুর্গ জয় করিয়া

স্বীয় দৌহিত্র আলম্ খাঁ বিন্ হাসন খাঁকে তথাকার শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেন।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে (১১৬ হিঃ) তিনি পত্তন-অভিমুখে অগ্রসর হন। এখানে আসিয়া তিনি মৌলানা মুইন্উদ্দীন কাজেরুলী ও মোজনা তাজ উদ্দীন শিবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐশ্বর্যতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা করেন। চারি দিন এখানে থাকিয়া তিনি আক্কাবাদের গমন করিলেন। সরখেজ নগরে আসিয়া তিনি শেখ আক্কদ খাঁতুর সমাধিমন্দির সন্দর্শন করেন।

আক্কাবাদের আসিয়াই তিনি শ্রীড়িত হন। তিন মাস রোগভোগের পর তাঁহার জীবলীলা অবসানপ্রায় দেখিয়া তিনি স্বীয় প্রিয় পুত্র শাহজাদা খলীল খাঁকে রাজকাব্য পরিচালন সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ দিবার জন্ত বড়োদা হইতে ডাকাইয়া পাঠান, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় খলীল উপনীত হইবার পূর্বেই ১১৭ হিঃ রোমজানে ৫৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি ভবলীলা সম্বরণ করেন।

মাক্কূদশাহ, (১ম) বাঙ্গালার জনৈক পাঠান-শাসনকর্তা। ইনি ১৪৪২-৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার মননে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাক্কূদাবাদ নগরের টাঁকশালে নামাঙ্কিত যে সকল মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি বগুড়া নগরের ৭ মাইল উত্তরস্থ মহাস্থানগড়ে পাওয়া গিয়াছে। ইহার পুত্র বার্সাক শাহের কীর্তি দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে অত্যাণ্ডিত বিদ্যমান।

মাক্কূদশাহ, (৩য়) বাঙ্গালার জনৈক পাঠান সুলতান। আলাউদ্দীন হুসেন শাহের পুত্র, সুপ্রসিদ্ধ নসরৎশাহের ভ্রাতা। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে মতান্তরে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শের খাঁর সেনানী খাবাস্ খান বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। মাক্কূদ পলাইয়া চুগার-দুর্গে মোগলপতি হুমায়ুন শাহের আশ্রয় লন। হুমায়ুন সদলে আসিয়া গোড় ও পাটনা অধিকার করেন। হুমায়ুন প্রত্যাবৃত্ত হইলে, শেরশাহ পুনরায় বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন।

মাক্কূদশাহ ২য়, মালবরাজ সুলতান নাসিরউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র। ইতিহাসে তিনি সুলতান মাক্কূদ বিন্ নাসিরউদ্দীন নামে প্রসিদ্ধ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৫১১ খৃষ্টাব্দে মালব-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরে মালবস্থ ওমরাহগণ বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করণান্তর তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা মহম্মদকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

অতঃপর মাক্কূদ সেনাবল সংগ্রহ করিয়া মাণ্ডুদুর্গ অবরোধ-

পুঙ্ক মহম্মদকে তাড়াইয়া দেন। উপরান্তর না দেখিয়া মহম্মদ গুজরপতি ২য় মুজঃফরের শরণাপন্ন হন। সুলতানের সাহায্য পাইবার পূর্বেই মালবের আমীরদিগকে বিদ্রোহী দেখিয়া তিনি সুলতান মুজঃফরের অনভিমতে মালবে আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করেন। মুসলমান আমীরদিগকে এই বিদ্রোহব্যাপারে লিপ্ত দেখিয়া সুলতান মাক্দুদ খ্যৈ বিশ্বস্ত অমুচর মেদিনীরাওর অতি সৈন্তাপত্য প্রদান করিলেন। এমন কি, সেই সময়ে মেদিনীরাও সমগ্র মালবের একরূপ হর্তা কর্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হিন্দুর এইরূপ উন্নতিগত রোধ করিবার জন্য সুলতান মুজঃফর মালব যাত্রা করিলেন। যুবরাজ সিকন্দর খাঁ গুজরী সেনাদলের অধিনায়ক হইলেন, কিন্তু কিছুতেই মেদিনীরাওকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলেন না।

মেদিনীরাওকে মালব রাজ্যে প্রকৃত রাজশক্তি পরিচালন করিতে দেখিয়া সুলতান মাক্দুদ গুজরপতির সাহায্য-প্রার্থনা করেন। অবশেষে তিনি জনৈক বিশ্বস্ত রাজপুত অমুচরের সাহায্যে খ্যৈ মহিষীকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে অস্বারোহণে গুজরাতিমুখে পলাইয়া আসিলেন। গুজরাতিখ তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

চতুর মেদিনীরাওকে দণ্ড দিবার জন্য গুজরাতিপতি সমলে বহির্গত হইলেন। মালবসীমান্তে দেবল নগরে মুজঃফরদৈন্ত উপস্থিত হইলে মেদিনীরাও যুদ্ধ অবগম্ভাবী জানিয়া স্বয়ং ধারা-নগরাতিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সাদোখাঁ, রায় পিণোরা, ভৌমকর্ণ, বদন খাঁ ও উগ্রসেনের হস্তে মাণ্ডুর্গের রক্ষাভার সমপিত হইয়াছিল। শত্রুবল অধিক জানিয়া মেদিনীরাও উজ্জয়িনী অভিমুখে পলায়ন করিয়া রাণার শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে তাঁহার পরামর্শ মতে মাণ্ডুর্গে অবরুদ্ধ সেনামণ্ডলী সুলতান মুজঃফরের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মুজঃফর তাঁহার ষড়যন্ত্র বৃত্তিতে পারিয়া তৎক্ষণেই মাণ্ডুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। যুদ্ধে বহু সংখ্যক হিন্দু প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। মাক্দুদ পুনরায় মালবের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

১০২৫ হিজরায় সুলতান মাক্দুদ খিলিজি সর্দার ভৌমকর্ণকে গাগরোণ সরকারে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ভৌমকর্ণ বন্দী ও নিহত হন। এই যুদ্ধে রাণার সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে। রাণা সঙ্গ তাঁহাকে বন্দী করিয়া চিতোরে লইয়া যান। চিতোরে রণকৃত আরোগ্য হইলে রাণা তাঁহাকে সম্মানে মাণ্ডুর্গে পাঠাইয়া দেন।

১৫২৩ খৃষ্টাব্দে মন্দশোর অবরোধকালে তিনি রাণার

বিরুদ্ধাচারী হইয়া গুজরাতিশের পক্ষে সেনাচালনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি শঠতাপূর্বক ছলে ভুলাইয়া রাণা-সঙ্গের নিকট হইতে খ্যৈ বন্দী পুত্রের উদ্ধার সাধন করেন।

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় মিবার রাজ্যের কতকাংশ লুণ্ঠন করেন। তদনন্তর তিনি শিবাসের ও শিলহারীর শাসন-কর্তা এবং সিকন্দর খাঁর প্রাণসংহারে প্রয়াস পান। তাঁহার এই আচরণে বিরক্ত হইয়া সুলতান বাহাদুর শাহ তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার করেন। ইহাতেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি গুজরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইয়াও আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। সুলতান বাহাদুর শাহ তাঁহার এই অপমানজনক প্রত্যাখ্যানে মন্থপীড়িত হইয়া মাণ্ডুনগর অবরোধ করিলেন। গুজরী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব জানিয়া, তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি সপ্ত বন্দীভাবে গুজরাতে আনীত হন।

তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন ইতিহাসে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ আছে। মিরাত-ই-সিকন্দরী পাঠে জানা যায় যে, মাক্দুদ খিলিজি গুজরী সেনানায়কে পরিবৃত্ত হইয়া গুজরাতে প্রেরিত হইতেছিলেন। তাহার দাছোড়ে উপনীত হইলে ধর্মপুরের রাজা উদয়সিংহ তাঁহাকে উদ্ধারমানসে খ্যৈ কোণী দৈন্ত সঙ্গে লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হন। রফীদল আপনাদিগকে এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত বোধ করিয়া সুলতান মাক্দুদকে নিহত করেন। তারিখ-ই-অকবরী ও তারিখ-ই-অসেকি পাঠে জানা যায় যে, রণে পরাজিত হইয়া তিনি বাহাদুর শাহকে অপমানজনক কটুক্তি করিলে, সুলতান ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করেন। কোন কোন ইতিহাসে লিখিত আছে, তাঁহাকে বন্দীভাবে চম্পানের-দুর্গে প্রেরণকালে পথিমধ্যে গুপ্তভাবে নিহত করা হয় অথবা তিনি স্বভাবতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর মালব-রাজ্য গুজরাতরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর গুজরাতের অধীনস্থ শাসনকর্তা কাদের খাঁ, সুজা খাঁ ও বাজ বাহাদুর মালব রাজ্য শাসন করেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে বাজ বাহাদুরের হস্তচ্যুত হইয়া মালবরাজ্য অকবর শাহের মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

মাক্দুদশাহ, তৈমুরশাহের পুত্র। [মহম্মদ শাহ দেখ।]

মাক্দুদশাহ (১ম ও ২য়) দাক্ষিণাত্যের বাঙ্গালী-বংশের দুই স্তম্ভ মুসলমান সুলতান। [মহম্মদ শাহ ও বাঙ্গালীবংশ দেখ।]

মাক্দুদশাহ (১ম), গুজরাতের জনৈক সুলতান। [মাক্দুদ বিগাড়া দেখ।]

মাক্সদ শাহ (২য়), গুজরাতের মুজঃকরশাহের পুত্র। [২য় মহম্মদ শাহ দেখ।]

মাক্সদ শাহ (৩য়), গুজরাতের অনেক রাজা। সত্যিক খাঁর পুত্র। [মহম্মদ শাহ-৩য় দেখ।]

মাক্সদ শাহ (১ম), মালবের খিলিজিবংশীয় অনেক নরপতি। [মাক্সদ খাঁ খিলিজি দেখ।]

মাক্সদ শাহ (২য়) মালবরাজ মালিরউদ্দীনের পুত্র। [মহম্মদ শাহ-২য় দেখ।]

মাক্সদ শাহ পুরবী, [মহম্মদ শাহ পুরবী দেখ।]

মাক্সদ শাহ শর্কী, কোনপুরের অনেক সুলতান। [মহম্মদ শাহ শর্কী দেখ।]

মাক্সদ শাহ ভোগলক, (সুলতান), [মহম্মদ খাঁ ভোগলক দেখ।]

মাক্সদ, সুলতান (১ম ও ২য়), কমন্ডান্টিনোপলের দুই জন সম্রাট। [মহম্মদ সুলতান ১ম ও ২য় দেখ।]

মাক্সদাবাদ, অধোধ্য-প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। জুগরিমাণ ১৩০ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি নগর। সীতাপুর হইতে বহরাবঘাট বাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°১৭'৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°২'৪৫" পূঃ। এখানে, পিত্তল-নির্মিত বাসনের বিস্তৃত কারবার আছে। ২৫০ শত বৎসর পূর্বে মাক্সদ খাঁ নামক এখানকার অনেক তালুকদার এই নগর স্থাপন করেন।

মাক্সদাবাদ, গুজরাতের অন্তর্গত একটি নগর।

মাক্সদৌ, গুজরাতে এচলিত মুদ্রা বিশেষ। প্রকোটে এই মুদ্রা প্রস্তুত হইত একটি মাক্সদ মুদ্রার মূল্য ১২ পেন্স বা ২৬ পরগা।

মাক্সদ সমরকন্দী, (মোলানা) সমরকন্দবাসী অনেক মুলমান সাধু। কাবাসাফ্রে ইহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। দাক্ষিণাত্য হইতে স্বদেশবাস্ত্রকালে লক্ষোধ্যারের হিন্দু নরপতি ভীম কর্তৃক ইহার পোতাঙ্গি লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সুলতান মাক্সদ বিগাড়া এই অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থ ভীমকে পরাজিত ও নিহত করেন।

মি(এন্) ক্লেপ, হাদিও উভয় স্ক অনিটু। মিনোতি, মিহুতে। লুঙ্ অমসৌৎ অমাস্ত। মি-ডিবাৎ ক্রিমপ্ চ—মিগ্রিম। অহু-মি—ব্যাপ্তি হেঁতুক পরামর্শাধীন জ্ঞান। উগ-মি—সাদৃশ্যহেঁতুক জ্ঞানভেদ। প্র-মি—বর্ণার্থ জ্ঞানবিশেষ।

মিং, চীনদেশের একটি জাতি। এই জাতি ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত চীনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দেশের প্রতিষ্ঠাতা চু-ইয়েন-চাং একজন শ্রমজীবীর পুত্র। বোবনে

তিনি কোন বৌদ্ধমতে একজন ভৃত্য ছিলেন। পরে বৌদ্ধলীয়া-গণ চীন আক্রমণ করিলে, তিনি দলপতি হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অবিলম্বে তিনি একটি বৃহৎ সেনাদলের অধিনায়ক হইলেন এবং তাহাদের সাহায্যে চীন-সাম্রাজ্যের ১৩টি প্রদেশ লইয়া নতুন রাজ্য গঠন করিলেন। তৎকালে তাহার ভার রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধবিশারদ মূল্যে কেহই ছিলেন না।

তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই, প্রাচীন কালের তাংএর ভার এই মর্মে অনুশাসনপত্র বাহির করেন যে, তিনি চীনে রাজ্যশাসন করিবার জন্য স্বর্গ হইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। (তাং ১৭৬৬ খৃঃ পূর্বাব্দে এইরূপ অনুশাসনপত্র বাহির করিয়া হিয়াংশের রাজাকে ভাড়াইয়া দিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।)

তিনি প্রজাপুঞ্জের সহায়ত লাভ করিবার জন্য যে বৈদ্যপ কপ্পের উপবৃত্ত, তাহাকে সেইরূপ কপ্পে নিয়োগ করিয়া ছিলেন। জাতীয় ভাষার ত্রিভুজিলাধনে বন্ধপরিষ্কার হইয়া তিনি অতীত কীর্তিকলাপ ও বিলুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত বিস্তারিত জনসাধারণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্প ও বাণিজ্য চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। চীনের তদানীন্তন শিক্ষাসভ্যতার মুগ্ধ হইয়া দেশদেশান্তর হইতে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ তথায় আগমন করিয়াছিলেন। পর্তুগীজগণ মকাও প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোম হইতে জেসুইট-ধর্মবাস্তবকগণ এখানে আসিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ও কনফুচির মত প্রভৃতির আন্দোলনে চীনে উক্ত দার্শনিক ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

জেসুইট-ধর্মবাস্তবক মাটিও রিসি চীনভাষার দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া তাহাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষানৈপুণ্যে চীনবাসিগণ এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, সি-কুয়াং-টি নামক একজন চীনদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত জেসুইটধর্ম সমর্থন করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে চীনভাষায় সুবৃহৎ অভিধান-গ্রন্থ সম্বলিত হয়। উহা ২২০০০ ভাগে বিভক্ত এবং সমস্ত গ্রন্থের পত্রসংখ্যা ১১ লক্ষ। চীনের সুপ্রসিদ্ধ রাজকীয় গ্রন্থালয়ে ও হার্ভালে এই সময়ে ১০ লক্ষ পুস্তক ছিল। পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রজাবিরোধে মিং-বংশ সিংহাসনচ্যুত হয়, এবং একজন মাক্সদ-সর্দার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মিকাদো, জাপানের সম্রাটদিগের উপাধি বিশেষ।

মিকির (মাকির), আসামের অন্তর্গত নগরী জেলাস্থ পার্বত্যপ্রদেশ। এই স্থান নালা গাছাড়ের উত্তরে অবস্থিত এবং

গায়ে পাহাড় হইতে পাটকাই পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-দিকে এই পাহাড়ের উপত্যকা দিয়া খাত্তাখরী নদী, এবং দক্ষিণপশ্চিমদিক দিয়া দিবং, বহুনা ও কপিলানদী প্রবাহিত হইয়াছে।

২ পার্বত্য-জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্বে জয়ন্তী শৈল হইতে আসামে বাইরা বাস করিয়াছে। নগরী হইতে কাছাড় পর্যন্ত স্থানে ইহারা বাস করে। কিন্তু নগরীয়েই ইহাদের প্রধান আড্ডা। ইহাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইবে। আসামের পার্বত্য জাতিদিগের মধ্যে ইহারা সঙ্গাপেক্ষা শান্ত-প্রকৃতি ও পরিশ্রমী। অল্প কোন জাতির সহিত ইহাদের সংস্রব নাই। ইহারা ৪ সম্প্রদায়ে বিভক্ত,—হুমরাণি, চিত্তং, স্নংকং এবং আমুরি। ইহাদের প্রত্যেকটির আবার ৪টা করিয়া বিভাগ আছে। ইহারা সঘরে বিবাহ করে না। পার্বত্য-ক্ষেত্রে ভূমি ও খাত্তের চাষ করিয়া থাকে। 'কুম' চাষও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

'কুদাল' (কোদাল) ইহাদিগের কর্ণগাত্র। ইহারা গবাদি পশুপালন এমন কি, অত্যন্ত অপবিত্র বোধে তাহার দ্বন্দ্ব পরিত্যক্ত করিয়া না। সভ্যতার কৌশলোকে ইহাদের কুসংস্কারের অন্ধকার কিছু কিছু বিদূরিত হইতেছে। এক্ষণে ইহারা হল-চালনা আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণতঃই এক পরিবারের সমস্ত ব্যক্তিই এক গৃহে বাস করিয়া থাকে।

অরণ্যমধ্যে ইহাদের সর্বপ্রধান দেবতা। পশ্চিমে মিকিরের নিকট ইহার নাম হাজাই। ইহারা দেবতার উদ্দেশে বলি দিবার জন্য শূকর ও মুরগী পুষ্টিয়া থাকে। প্রতিগ্রামেই পূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে। বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘমাসের প্রথম দিনে মহাসমারোহে পূজা হইয়া থাকে। পূজার পূর্বদিনে পূজাস্থান পরিতৃপ্ত এবং বন্য কদলীপত্রের সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন হয়। তাহার উপরে পূজার ফুল এবং চাউল সজ্জিত হইতে থাকে। তৎপরে বধ্যশূকরশিশু সেই স্থলে আনীত হয়। তৎপরে বেজ বা পুরোহিত বধ্য পশু ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—“আমরা সোণকরণ নৈবেদ্য ও পশুবলি দ্বারা আপনার পূজা করিতেছি—আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের জাতীয় কল্যাণ সাধন করুন।” তৎপরে দেবতাকে পক্ষার ও পশুরক্ত উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। শেষে সকলে প্রসাদ পায়। বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিন সমস্ত গ্রামবাসী একত্র হইয়া এই জাতীয় উৎসব সম্পন্ন করে।

এই জাতি অসংখ্য ভূত ও পিশাচ প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। ভূতগণের নানা বিভাগ আছে। পার্বত্য, আরণ্য, জলাধিষ্ঠিতা প্রভৃতি। প্রধান গৃহভূতের নাম মুফ্রাং ও পেং।

প্রত্যেক গৃহস্থকে মাসে দুইবার করিয়া গৃহভূতের পূজা করিতে হয়। বুদ্ধিমান লোকে আবার নানা প্রকার নৃত্য-ভূতের আবিষ্কার করে। ইহাদের মতে সমস্ত পীড়াই ভূত-গণের দ্বারা ঘটয়া থাকে।

মৃত আত্মীয়গণই অনেক সময়ে ভূত হইয়া থাকে। ইহারা মৃতদেহ পোড়ায়। প্রেতাশ্মার উদ্দেশে পশু বলি দেওয়া হয় এবং একক দিন পর্যন্ত মহাসমারোহে পান, ভোজন, নৃত্য, গীতাদি হইয়া থাকে। এইরূপ মহাআনন্দসহকারে ইহারা শোক প্রকাশ করে। ফলতঃ কেহ মরিলে ইহাদের আমোদের সীমা থাকে না। কেহ কেহ মৃতের স্মরণার্থ প্রস্তরস্তম্ভ প্রাধিকৃত করিয়া তদুপরে সময়ে সময়ে অন্নদান প্রদান করে।

ইহাদের মধ্যে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত। যাহার আহারের সংস্থান আছে, সে বহুবিবাহ করিতে পারে। দরিদ্রগণ বিবাহ করে না। পিতামাতা পুত্রকন্তাবি বিবাহ দেয় না। বরকন্ডার পরস্পর প্রণয় হইলেই বিবাহ হয়। বরকন্ডার মনোরঞ্জন করিতে পারিলে কন্ডার পিতাকে কিছু ধেনো মদ উপহার দেয়। বিবাহের পরে বরকে দুই বৎসর কন্ডার গৃহে থাকিতে হয়। পরে সে স্বগৃহে জাকে আনিতে পারে। জ্বীলোকদিগের স্বাধীনতা পুরুষের সমান। যোনিবিচার একেবারেই নাই। ইহারা সম-তলস্থ হিন্দুদিগের সহিত নানা রকম বাণিজ্য করে। লুসাই অভিযানের সময়ে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইহারা কুলীর কাণ্ড করিয়া গবর্মেণ্টের অনেক উপকার করিয়াছিল।

মিজল, পার্বত্য অসভ্যজাতিবিশেষ। দহাহুতিই ইহাদের জীবিকা। ইহারা ঝালবানের দক্ষিণস্থ পরতে খোজলার হইতে বেলা পর্যন্ত বাস করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ২টা বিভাগ আছে,—মাহিজাই ও ফেলবানজাই।

ইহাদের মধ্যে বিজলু নামে আর এক শ্রেণী আছে, তাহাদেরও আমালারা ও তান্নাবারা নামক দুইটী থাক আছে। ইহারা অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও লুণ্ঠনপ্রিয়। নিগার-মিজল ও রক্ষণী লুণ্ঠিতে ইহাদের বাস। ইহাদের নির্দিষ্ট গৃহ নাই। তাবুতে বাস করে। মিচ্ছ, বাধ। তুলাদি, পরম্প্রৈং সকং সেট। লট মিচ্ছতি। লুড্, অমিচ্ছাঁং।

মিচিটা (জী) ১ নদীতট। (দেশজ) ২ অধিক বয়সে গ্যাং যে চিহ্ন হয়।

মিচ্ছক (পুং) বোদ্ধ হবিরভেদ।

মিচনী, পঞ্জাবপ্রদেশের পেশাবর জেলার অন্তর্গত একটা শিরদুর্গ, কাবুল নদীর বামতীরে উহার উৎপত্তিস্থানের দক্ষিণে শৈলশৃঙ্গোপরি স্থাপিত। অক্ষাং ৩৪°১১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৩০' পূঃ। কাবুলনদী অতিক্রমপূর্বক দুর্ভিক্ষ মামল নামক

পার্বত্য আফগানগণ ইংরাজ-সীমান্তে আসিয়া উপদ্বীপ করিত। সেই লুণ্ঠনপ্রিয় দস্যবৃন্দের অত্যাচার-নিবারণের জন্য ইংরাজরাজ ১৮৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে এই গিরিহর্গ নির্মাণ করান। নির্মাণকালে ইংরাজ-সেনানী লেফটেন্যান্ট বোলনোই মামল দস্যবৃন্দ হস্তে নিহত হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এখানকার হর্গাধার নিকটবর্তী পর্বতে ভ্রমণকালে গুপ্ত-শত্রু দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন।

হর্গের সন্নিকটে কোন গ্রাম বা নগর নাই। তরকৈজ মানন্দগণ ইহার চতুর্দিকে আসিয়া বসবাস করায়, এই স্থানের আদর বাড়িয়া উঠিয়াছে। নদীর দক্ষিণ ধারে যে সকল মামল বাস করে, তাহারা ইংরাজের শাসনাধীন, অত্যন্ত স্থানের মামল-গণ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। ইংরাজাধিকৃত সীমান্ত অধিবাসী অনেক দোবী ব্যক্তি দণ্ডপালনভরে এখানে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। পেশাবরহু হর্গাধিণি “ত্রিগেড়িয়ার জেনারলের” অধীন থাকিয়া এখানকার হর্গের প্রয়োজন মত কাৰ্য্য লম্বাঘর সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এখানে বেঙ্গল পদাতিক ও অঝারোহী সেনাদল রক্ষিত আছে।

মিছুরী ( আরবী ) [ মিসুরী দেখ। ]

মিছা ( দেশজ ) মিখা।

মিছাড়ুর ( দেশজ ) বুধা দস্ত।

মিছামিছি ( দেশজ ) অমূলক, ভিত্তিহীন।

মিজাজ্ ( আরবী ) স্বভাব।

মিঞা, মুসলমানদিগের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। সম্রাজ্ঞাপক সম্বোধন-শব্দ।

মিঞাআলী, পঞ্জাবের গুজরাণবালা জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। এখন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসাবস্থায় পতিত। ইহা খান্‌গর অসরুর বা অসরুর নামে পরিচিত। এখানে বহু প্রাচীন কালের ইষ্টকাদির স্তূপ পড়িয়া আছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিৎ কানিংহাম্ ইহাকে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌ সিংয়াং বর্ণিত তসেকিয়া ( তকি ) নগর বলিয়া অনুমান করেন। এক সময়ে এই তকি রাজ্য অসুর বিস্তৃত ছিল। ইহার পশ্চিমে সিন্ধু নদ, উত্তরে হিমালয় পর্বত, পূর্বে বিতস্তা এবং দক্ষিণে সিন্ধু-পঞ্চনদসদৃশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

উপরি উক্ত স্মৃহং স্তূপ পণ্যাবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার অন্তর্নিহিত ইষ্টকাদি নানাচিত্রনৈপুণ্যযুক্ত ও বহু প্রাচীন কালের নির্মিত। এখনও বর্ষার বারিধারাপাতে বিক্ষোভ স্তূপগারে প্রতিবৎসর বর্ষা ঋতুর শেষে অসংখ্য হিন্দু শকজাতির মুদ্রা আবিস্কৃত হইতেছে।

সম্রাট অকবর শাহের রাজত্বকালে উগ্রশাহ নামক জনৈক

দোগ্রাসদর এই স্তূপ হইতে ইষ্টক লইয়া উপরিভাগে একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। হিউএন্‌-সিংয়াং তকি-নগরের দুই মাইল উত্তরপূর্বে সম্রাট অশোক-প্রতিষ্ঠিত যে বুদ্ধমূর্তি-চিহ্নসম্বলিত স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই অসরুর নগরের ধ্বংসাবশেষের ঐ ব্যবধানেও একটা স্তূপ আছে।

মিঞাগঞ্জ, অযোধ্যা-প্রদেশের উগাও জেলার অন্তর্গত একটা গুপ্তগ্রাম। অক্ষা° ২৬°৪৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৪' পূঃ। নবাব আসফুদ্দৌলা এবং সম্রাট আলী খাঁর রাজত্বসিবি মিঞা অনুমস আলী ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন, কিন্তু হর্ভাগ্যবশতঃ উহা এক্ষণে প্রীভট হইয়া পড়িয়াছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ভালেজিয়া ( Valentia ) এই নগরসমুদ্রির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হুঃখের বিষয়, উহার ২০ বৎসর পরে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক হেবার ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে উহার প্রাসাদাদির ধ্বংসপ্রায় অবস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখনও এখানে ২টা পাছনিবাস, ১৩টা মসজিদ ও ৪টা হিন্দু-মন্দিরের নিদর্শন আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহী-দল এখানে পরাজিত হইয়াছিল।

মিঞানী, পঞ্জাব প্রদেশের হাঁসিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। বিতস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১°৪২' ১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৬' ১৫" পূঃ। মামল জাতীয় পাঠানবংশ এই নগরের প্রকৃত স্বাধিকারী, কিন্তু জাট ও আবাইনগণ অধিকাংশ জমির সম্বন্ধে থাকিয়া কৃষিকাৰ্য্য নির্বাহ করিতেছে। এখানে গবাদি, চৰ্ম্ম, গম ও চিনির বিস্তৃত কারবার আছে।

মিঞানী, পঞ্জাবপ্রদেশের শাহপুর-জেলার অন্তর্গত একটা নগর এবং ভেরা জেলার লবণবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। কেলম-নদীর বামকূলে পিণ্ডদাদন খাঁর অপর পারে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২°৩১' ৪৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৭' ৩০" পূঃ। এই স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতে খনিজ লবণের বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এইস্থান পূর্বে শাসনাবাদ নামে পরিচিত ছিল। নদীর প্রবল বস্তার উহা নষ্ট হইয়া গেলে, সম্রাট শাহজহানের খন্তর আসফ-খাঁ সেই স্থানে বর্তমান নগর স্থাপন করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে শাহের সেনানী নূর উদ্দীন এই নগর লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া যান। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ নগর সংস্কার করাইয়া লবণের বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা পান। এখানে উত্তর-পঞ্জাব-ষ্টেট-রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার লবণ বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে উৎকৃষ্ট ঘুতের কারবার আছে। নগরটা মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে থাকিলেও ইহার রাস্তা ঘাট বিশেষ পরিষ্কার নহে।

মিঞানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়-বিভাগের অন্তর্গত একটি প্রাচীন বন্দর। বর্তমানদীর মোহানার অবস্থিত। নদীযুগে চোরাবালির চড়া পড়ার এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অনেকে এই স্থানকে প্রাচীন মীননগর বলিয়া অনুমান করেন।

মিঞানী (মিরানো, মিরানী), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর হাইদরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি গণগ্রাম। হাইদরাবাদ নগর হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইংরাজ সেনানী সর্চালন্দ নেপায়ার ২৮০০ সৈন্য এবং ১২টা মাত্র কামান লইয়া ফুলেলী নদীর তীরে ২২ হাজার বলুচী সৈন্যকে পরাস্ত করেন। বিপক্ষসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার নিহত হইয়াছিল। যে সকল ইংরাজ সৈনিক এই যুদ্ধে নিহত হয়, তাহাদের নাম স্মরণার্থ একটি স্মৃতিস্তম্ভ গঠিত হইয়াছিল। ঐ স্তম্ভের চতুর্দিকে একটি স্মরণ্য উদ্যান নির্মিত হইয়াছে। হাইদরাবাদ নগর হইতে প্রায় সাত মাইল বিস্তৃত ভূগাছাদিত এই রণপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া এই উদ্যানে বিশ্রাম বড়ই সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। এখানে এক সময়ে সিদ্ধপ্রদেশীয় উদ্ভবাহী সেনাদলের ছাউনী ছিল। মংস্ত-ব্যবসার জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত।

মিঞামঞ্জ, মুলতান ইব্রাহিম নিজামশাহের প্রধান মন্ত্রী। ইনি স্বীয় বুদ্ধিবলে নিজামশাহী রাজ্যের অনেক ক্রীড়াক্ষিপণ সম্পাদন করেন।

মিঞামীর (মিরান্মীর), পঞ্জাব-প্রদেশের লাহোর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। এখানে একটি সেনাবাস প্রতিষ্ঠিত আছে। লাহোরের সৈনিকবিভাগের ইহাই সদর। অক্ষাং ৩১°৩১'১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°২৫'১৫" পূঃ। পূর্বে এই সেনাবাস লাহোরনগরের মধ্যে আনারবল্লী নামক স্থানে ছিল। ঐ স্থানের স্বাস্থ্য সেক্ষপ সুবিধাজনক না হওয়ায়, উহার তিন মাইল পূর্বে ১৮৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান সেনাবাস আনীত হইয়াছে। লাহোরের দূর্গে এখান হইতে সেনাদল আনিয়া রাখা হয়।

এই স্থানের প্রাচীন নাম হসলিমপুর ছিল। মুলনশাহ ওরফে মিঞামীর নামক জনৈক মুসলমান গীর এখানে বাস করিতেন। সম্রাট শাহজহানের পুত্র শাহজাদা দারাশিকো হসলিমপুর গ্রাম ক্রয় করিয়া স্বীয় ধর্মগুরুকে প্রদান করেন। তাহারই নামানুসারে পরে এই স্থান মিরান্মীর নামে খ্যাত হয়। এখানে উক্ত সাধুগুরুব্রের সমাধিমন্দির ও একটি মসজিদ বিদ্যমান আছে। উক্ত সমাধিমন্দির ষোল্লমর্দরপ্রস্তর-

বিনির্মিত এবং সুগঠিত। এই সেনাবাসের পূর্বে ও পশ্চিমে দুইটা রেলস্টেশন আছে। একটাতে লাহোর হইতে দিল্লী এবং অপরটাতে লাহোর হইতে মুলতানে যাওয়া যায়।

মিঞারাজু, মালিক অম্বরের সহকারী এক জন সেনাপতি। ইনি মোগলসৈন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজামশাহী রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

মিঞাবালী, পঞ্জাবপ্রদেশের বম্বু জেলার 'একটা তহসীল' ভূপরিমাণ ১৪৭২ বর্গ মাইল। এই তহসীলের দক্ষিণপশ্চিমস্থ 'খল' নামক বিভাগ বালুকাময় ভূগাছাদিত শ্রামল সমতল ক্ষেত্রে পূর্ণ। উহার মধ্যে ১৪৫ বর্গ মাইল স্থানে ইংরাজ গবর্নমেন্টের রক্ষিত বনবিভাগ। সিদ্ধ-সাগর দোয়াব খাল কাটা হইবার পর এই স্থানের কতকংশ চাসবাসের উপযোগী হইয়াছে। এখানে অধিবাসীদিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক।

২ উক্ত বম্বু জেলার একটি নগর এবং তহসীলের বিচার সদর। অক্ষাং ৩২°৩৪'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৩২'৫০" পূঃ। সিদ্ধনদীর বামকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৫৫ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখানকার প্রুপ্রসিদ্ধ সৈয়দবংশ মিঞাবালী মিঞা নামে পরিচিত। ইহারা স্থানীয় কোন মুসলমান সাধুর অশ্রয়। ইহাদিগের পবিত্র দয়্যারুদ্দুন-স্তম্ভে সর্কসাধারণের নিকট ইহারা স্মৃতি অর্জন করিয়াছেন। উক্ত মিঞাবংশ যেখানে বাস করেন, তাহা বম্বোবখেল নামে খ্যাত। বর্তমান মিঞাবালী নগর ঐ বম্বোবখেল নগরের অংশমাত্র। একজন তহসীলদার ও এমিষ্টাণ্ট কমিশনর এখানকার বিচারকাব্য নিরীক্ষা করিয়া থাকেন।

মিঞ্জ, কথন। চুরাদি, পর, সক\* সেট।

মিট্ (দেশজ) নিম্পত্তি।

মিটা (দেশজ) নিম্পত্তি হওয়া।

মিটান (দেশজ) নিম্পত্তি করান।

মিটিতে (দেশজ) নিম্পত্তি হইতে।

মিটমাট (দেশজ) নিম্পত্তি।

মিট্‌মিটিয়া (দেশজ) ১ অপরিস্ফুট। ২ গোপনীয়। ৩ আসন্নকাল।

মিঠ (দেশজ) মিষ্ট।

মিঠা (দেশজ) মিষ্ট।

মিঠাই (দেশজ) মিষ্ট দ্রব্য।

মিঠা তিবানা (মিঠাতানা), পঞ্জাব-প্রদেশের শাহপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। সিদ্ধসাগর দোয়াবের উত্তর ভূমির উপর দেয়া ইলমাইল খান বাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষাং ৩২°১৪'৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৮'৫০" পূঃ। এখান-



কার মালিকবংশ সম্বন্ধে এসিদ্ধ। ইহারা শিখশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন। মূলতানের বিদ্রোহ-দমনকালে ইহারা ইংরাজপক্ষে বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময়ও ইহারা ব্রীটিশ গব-মেন্টের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের জন্য ইংরাজরাজ পরম পরিতুষ্ট হইয়া মালিকবংশের একটি মাস-হার্য নিদিষ্ট করিয়া দেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ মাস্তুলচক খাঁ বাহাদুর উপাধি দান করেন। অশ্বসজ্জা ও বাগিচারেও এই স্থান এসিদ্ধ।

মিঠানকোট (মিথুনকোট), পঞ্জাব-প্রদেশের দেয়া গাজী-খান জেলার অন্তর্গত একটি নগর। রাজনপুরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে পঞ্চনদ-সঙ্গমের অদূরে সিদ্ধনদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°৫৫'২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৫'পূঃ। পূর্বে এই নগরে আসিষ্ট্যান্ট কমিসনর থাকিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহা বস্ত্রার সিদ্ধনদ উখলিয়া উঠিয়া এই নগর গর্ভাঙ্গী করে। তৎপরে নদীকূল হইতে ৫ মাইল দূরে নূতন নগর স্থাপন করা হয়, কিন্তু তাহাতে বাণিজ্যসমৃদ্ধি একবারে হ্রাস হইয়া পড়ে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের বস্ত্রার এই নগর-ধ্বংসের পুনঃস্থচনা হইয়া-ছিল। মিউনিসিপালিটার তত্ত্বাবধানে থাকায় নগরভাগ বেশ পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে।

মিঠ্যা (দেশজ) মিঠ ভাবাপন্ন।

মিডল্টন, (সার হেন্স) ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী। ইনি ১৬১০ খৃঃ অব্দে যাত্রার অধ্যক্ষ হইয়া ভারত-বর্ষে আগমন করেন। লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া আসিবার কালে ইনি বণিকদিগের বাণিজ্যতরী আক্রমণ করিয়া অনেক দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করেন। মলাকাধাপে ইহার মৃত্যু হয়।

মিডিয়া [মিদিয়া দেখ।]

মিণ্টো, (লর্ড) ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল (১৮০৭ হইতে ১৮১৪ খৃঃ অব্দ:)। সার্বভৌম বালোর পরে তিনি ভারতবর্ষের শাসনকর্তা হইয়া আসেন।

স্কটলও তাঁহার জন্মভূমি। পিতার নাম গিলবার্ট ইলি-মট। তিনি একজন সুশিক্ষিত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। মিণ্টো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া ১৭৭৪ খৃঃ পালিয়া মেণ্টের সভ্য হন। ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে তিনি গবর্নমেন্টের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে তিনি অক্সফোর্ড হইতে ডি, সি, এল্ (D. C. L.) উপাধি পান এবং তৎপরে রাজকীয় পক্ষ-সমর্থনের জন্য 'কমিশনর' হইয়া তাহাকে ডুলো নগরে যাইতে হয়। পরবৎসরে তিনি কসিকা-ধোপের শাসনকর্তা হইয়া তথাকার আইন-সংস্কার করেন।

পরে ফরাসীপক্ষ প্রবল হওয়ার তাহাদিগকে উক্ত দ্বীপ ছাড়িয়া দিয়া ১৭৯৭ খৃঃ বদেষে ফিরিয়া আসিতে হয়। এখানে 'ব্যারন' উপাধি পাইলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে তিনি ডিরেনার রাজদূত এবং ১৮০০ খৃঃ বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতি হইয়াছিলেন।

তিনি ওয়ারেন্ হেস্টিংসের একজন প্রধান অভিযোক্তা ও অভ্যুত্থানমূলক ভারতশাসন সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদকারী। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে তাহার স্বল্প উদারমতি বার্কের ভ্রাতৃ ভারতহিতৈষণার পূর্ণ ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে সর্বথা ভারতবাসিগণের ছন্দাধিবর্তন করিয়া শাসন কার-বেন। কিন্তু ভারতে পদার্পণ করিয়াই ভারতীয় অণবায়ুর ঐক্সলানিক শক্তিতে তাহার চিরপোষিত কল্পনার পরিবর্তন হইয়াছিল।

১৮০৭ খৃঃ ৩রা জুলাই, তিনি কলিকাতার পদার্পণ করেন। তাঁহার শাসনকালে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়,— ১ বৃন্দেলখণ্ডের গোলযোগ, ২ নিজামের সহিত বন্দোবস্ত, ৩ সিন্ধ, কাবুল ও পারস্যে দূতপ্রেরণ, ৪ মাস্তাজ-বিদ্রোহ, ৫ ত্রিবাঙ্কোড়ে গোলযোগ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণের অধিকৃত ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ, ৬ অবোধ্যার শাসনবিশৃঙ্খলা, ৭ রাজস্ব ও বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার, ৮ বারাগদীতে গোলযোগ, ও ৯ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ আলোচনা।

লর্ড মিণ্টো এদেশে আসিয়াই অবিরোধমতের পোষক-তার বৃন্দেলখণ্ডের গোলযোগে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল অরাজকতার তখন বৃন্দেলখণ্ডের অবস্থা অতি শোচনীয়। দস্যুতার উপদ্রবে সাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইয়াছিল। অজয়গড়ের অধিপতি লক্ষ্মণ দেব দস্যুদিগের মধ্যে অতি পরাক্রান্ত ও হুঁদস্ত ছিলেন। অজয়গড়ের সুরক্ষিত পাকতা হুর্গ কেহই আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না। লক্ষ্মণ দেব পূর্বে এই স্থানে একাধিপত্য করিতেন। কএক বৎসর পূর্বে নিদিষ্ট কর দিতে স্বীকার করিয়া অজয়গড়ে শাসন করিতে থাকেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ কর না দেওয়ার কর্ণেল মাটিগেল একদল সৈন্ত লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন।

ইংরাজ সেনাপতি বহু পরিশ্রমে কামানের গোলায় হুর্গ প্রাচীরের কিয়ৎংশ ভয় করায় লক্ষ্মণদেব সন্ধি করিতে বাধ্য হন। তিনি ইংরাজ সেনাপতির অসুস্থতাক্রমে সপরিবারে নও-সহর নগরে গমন করেন এবং স্বীয় হুর্গ ফিরিয়া পাইবার জন্য ইংরাজ-প্রতিনিধি মিঃ রিচার্ডসনের নিকট দরখাস্ত করেন। রিচার্ডসন্ তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। ইহাতে অতিশয়



ব্যক্তি চিহ্ন লক্ষণ দেব অকস্মাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাহা জানিতে পারিয়া ইংরাজ-প্রতিনিধি রিচার্ড-সন্ ভবিষ্যৎ গোলযোগের আশঙ্কা করিয়া লক্ষণ দেবের পরিবারবর্গকে বাজীরাওর তত্ত্বাবধানে অজরগড়ভূর্গে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। লক্ষণ দেবের শত্রুর বাজীরাও ইংরাজদিগের এই প্রস্তাবে হঠাৎ সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, কত্কা, আমাতা ও দোহাজের কল্যাণ-কামনায় এবং কৌলিক গৌরবচ্যুতির আশঙ্কায় বহুদিন পর্য্যন্ত নগরহরের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-প্রতিনিধি বাজীরাওর বিলম্বে সন্দিহান হইয়া বাজীরাওর কাষা পধ্যবেক্ষণ করিবার জন্য একজন প্রহরী পাঠাইলেন। প্রহরী তথায় বাইরা দেখিল, যে গৃহে লক্ষণ দেবের জননী, স্ত্রী এবং শিশু পুত্রকন্যা সকল অবস্থান করিতেছিলেন, সেই গৃহের মধ্যে জুড়ুটা বিকৃতমুখে উদ্ভুক্ত তরবারহস্তে বাজীরাও উন্নতের দ্বার পাদচারণা করিতেছেন। তদর্শনে ইংরাজপ্রহরী সেই দিকে অগ্রসর হইল। অগ্রসর হইবার পূর্বেই বাজীরাও দারুণ ক্রন্দন করিয়া দিলেন। যখন ইংরাজপ্রহরী দ্বার ভঙ্গপূর্বক গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি যে লোমহর্ষণ ভাষণ দৃষ্ট দেখিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। বাজীরাও লক্ষণদেবের জননী ও স্ত্রীর প্রাথনা অমুসার্য তরবারির আঘাতে তাঁহাদের ও শিশুপুত্রকন্যাগণের এবং গৃহস্থিত অল্পজন স্ত্রীলোকের শিরশ্ছেদন করিয়া সেই তরবারিতে খরী কণ্ঠ ছেদন করিয়াছেন। গৃহাভ্যন্তর শোণিত-তরঙ্গে ভাষণ দৃষ্ট ধারণ করিয়াছে। এইরূপে লক্ষণদেবের পরিবারবর্গ শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইল। বৃন্দেলখণ্ডবাসীগণ বাজীরাওর এই আচরণে বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিল। ইংরাজগণ গোলযোগ থামাইতে গিয়া বরং আরও বাড়াইয়া দিলেন।

কিছুদিন পর্য্যন্ত লক্ষণ দেবের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পরিশেষে তিনি অকস্মাৎ একদিন কলিকাতার উপত্যত হইলেন এবং মীর রাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য মিণ্টোর নিকট দরখাস্ত করিলেন। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। তখন তিনি নিজে গরবের জেনারলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন— 'হয় আমার রাজ্য ফিরিয়া দিন, নতুবা কামানের মুখে বা থগা গোলা দ্বারা আমাকে উড়াইয়া দিন। আমি রাজ্য, ঐশ্বর্য, ধন-রত্ন, জননী স্ত্রীপুত্র সর্বস্বান্ত হইয়া এ দান জীবন ব্যাপন করিব না।' তথাপি কোন ফল হইল না। তখন তিনি বৃন্দেলখণ্ডে পুনর্বার বাইবার সন্ধান করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। তখন মিণ্টো, লক্ষণ দেব স্বদেশে ফিরিয়া গেলে পাছে আবার কোন গোলযোগ ঘটে, এই ভাবিয়া পশ্চিমধ্যে তাঁহাকে বন্দী

করিয়া কলিকাতার আনয়ন করেন। লক্ষণদেব তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত ইংরাজ-কারাগারে বাস করিয়াছিলেন।

ইংরাজ-সৈন্য বৃন্দেলখণ্ড হইতে ফিরিয়া বাইবার সময় পরাক্রান্ত হুদিয়া খাঁর অধিকৃত কামোনার দুর্গ অধিকার করেন। ইহার পরে নিজাম রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটে। লর্ড ওয়েলেসলীর সময় নিজাম ইংরাজগণের সহিত সন্ধিসন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন নিজাম সিকন্দর শাহ ক্রমে ক্রমে সন্ধিস্থত ছিন্ন করিবার সুযোগ অব্যবহৃত করিতেছিলেন। লর্ড মিণ্টো ইহা জানিতে পারিয়া নিজাম-রাজ্যে ইংরাজ-প্রতিনিধির নিকট সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মীর আলম নামক নিজামের এক মন্ত্রী নিজামকে ইংরাজপ্রতিনিধির আজ্ঞা পালন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু অস্তিত্ব মজিগণ সিকন্দরকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল এবং মীর আলমকে গুপ্তহত্যায় তর দেখাইল। তাহাতে তিনি ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। পরে নিজাম ইংরাজদিগের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার সন্ধি কার্যলেন এবং মীর আলম তাহার দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। ইহার মৃত্যুর পর, ইংরাজদিগের অমুগৃহীত চাঁদলাল নামক একজন হিন্দু নিজামের দেওয়ান নিযুক্ত হইল।

ইংরাজদিগের সহিত বাজীরাওর বসাইএ যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল, তাহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পুনর্বার তিনি পেশবাপদ-প্রাপ্তির অবসর খুঁজিতে ছিলেন। তৎকালীন কুতুব মরঠা-সদ্বারগণ প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য চেষ্টা পাঠিতে-ছিলেন। লর্ড মিণ্টো ভয় দেখাইয়া বাজীরাওকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। তখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বাজীরাও আন্তরিক অনিচ্ছাসঙ্গে বাহিরে বস্তুতা সীকার করিলেন।

বশোবস্ত রাও হোলকর এট সময় প্রাধান্য লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবনের জন্য তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল। সেইজন্য তিনি তাঁহার এক সহোদর ও ভ্রাতৃপুত্রকে নিহত করেন। সেই পাপের ফল স্বরূপ তিনি একেবারে উন্মাদ হইয়া পড়েন। এই উন্মাদ অবস্থায় ১৮১১ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে তাহার প্রিয়তমা পত্নী তুলসীবাই নন্দসিবি বলরাম শেঠের সহায়তায় কিছুদিন রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু বলরামের উচ্ছৃঙ্খলতার রাজ্যে নানা উপদ্রব উপস্থিত হয় এবং বশোবস্তের ভ্রাতৃপুত্র মহীপৎ রাও প্রবল হইয়া হোলকর-রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ণা হইতে কর্ণেল ওয়ালেস ও কর্ণেল ডবল্টন তুলসীবাইএর সাহায্যার্থ আগমন করার মহীপৎ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

এই সময়ে আদীর খাঁর উপায় আরম্ভ হয়। তিনি পূর্বে যশোবন্ত রাওর একজন সাধার্য সেনাপতি ছিলেন, পরে রাহুলে ও বুদ্ধিকৌশলে কুলেশ্বরের অধিকাংশ অধিকারপূর্বক পরাভূত, পেন্ডারি ও মোঙ্গল প্রভৃতি সৈন্যসাহায্যে বেয়ার এবং জাকপুতগণের রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁহার অধীনে সহস্র অশ্বারোহী এবং সহস্র পদাতিক পেন্ডারি সৈন্য ছিল। ১৮৫৯ খৃঃ, কাহ্নারী মাসে তিনি নর্মদা পার হইয়া জবলপুর আক্রমণ করেন। বেয়াররাজের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধিবন্ধন ছিল না। তথাপি আদীর খাঁ পাছে সন্ধিপাতি বৃদ্ধন রাজ্য সংস্থাপন করে, এই ভয়ে বেয়াররাজের সাহায্য আবেদনকৃত বিবেচনা করিয়া কর্ণেল মার্টিণ্ডেল সৈন্যসহ বেয়াররাজের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইলেন। আদীর খাঁ কহিলেন, তিনি হোলকরের সেনাপতি, সুতরাং সন্ধির বিরোধীদের তিনিই বেয়াররাজের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগের সাহায্য পাইবার যোগ্য। ইহা তাবিলম্বিত মিষ্টো উক্ত কথার লজ্জা জানিবার জন্য হোলকরকে পত্র লিখিলেন এবং উত্তরে জানিলেন যে, আদীর খাঁর কথা লঙ্ঘন মিথ্যা। তখন আদীর খাঁ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে হস্তারমান হইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে ২৩ বার পরাজিত হইয়া জোশালে পলায়ন করিলেন। অধিক দিন বেয়ারের সৈন্য রাখা অসম্ভব মনে করিয়া লর্ড মিষ্টো ইংরাজ-সৈন্যগণকে করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন এবং প্রয়োজন মত বেয়াররাজকে সৈন্য সাহায্য করিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন।

এই সময়ে গোপালসিংহ নামে অন্য একজন পরাজিত সর্দার কোডরারাজ তত্ত্বনিহকে বিভাজিত করিয়া রাহুলে বিস্তার করিতেছিলেন। তাহাকে ইংরাজ-সেনাপতি ব্যত হটরা পড়েন। তখন লর্ড মিষ্টো গোপাল সিংহকে ১৮ বানি গ্রামের জমিদারী প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন।

ব্রহ্মেশ্বরের অন্তঃপাতী কালঞ্জর-দুর্গের শাসনকর্তা দিল্লীও সিংহ ইংরাজ-প্রভু অগ্রাহ করিয়া নির্ভীক ভাবে রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। কালঞ্জরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন শৈল-দুর্গে তাঁহার অশ্রয়স্থান ছিল। ইহা ৯০০ ফিট উচ্চ এক পর্বতের সাহস্রদেশে অবস্থিত এবং দুর্ভেদ্য অঙ্গুলে সমাচ্ছন্ন। দিল্লীও দিল্লী দুর্ভেদ্য দুর্গের উপর নির্ভর করিয়া চতুর্দিকে সৈন্ত সংগ্রহ-পূর্বক রাজ্যবিস্তার করিতেছিলেন। ১৮১২ খৃঃ, কর্ণেল মার্টিণ্ডেল একদা ইংরাজ-দুর্গে গিয়া উক্ত দুর্গ আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি অতি ক্রমে অঙ্গুলে-মধ্যে

অবেশ-পূর্ণ প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং দুর্গ হইতে দুর্গপ্রাকারে অবিস্রাভ গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এক মল সৈন্ত দুর্গ-প্রাকারের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রাচীর আরোহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু লঘুভাবে অবস্থিত উক্ত পর্বতে উঠিতে না পারিয়া বিপদের প্রস্তরাকারে অনেক দিনটুকু হইল এবং অবশিষ্ট করিয়া আসিল। মার্টিণ্ডেল দুর্গের কিছু কক্ষিতে না পারিয়া শিবির সরিয়ে। করিয়া অসম্ভব করিতে লাগিলেন। দিল্লীও ভীত হইয়া সন্ধি করিলেন। ইংরাজেরা কিছুকাল হইল উক্ত দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। কালঞ্জরের রাজা দিল্লীও সিংহের সহিত সন্ধি করিয়া এবং বেয়াররাজের সহিত মিত্রতা করিয়া লর্ড মিষ্টো ব্রহ্মেশ্বরে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইহার পর লর্ড মিষ্টো দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম সীমাবিহিত হরিয়ান প্রদেশ ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত করেন। পাণিপথ ইহার রাজধানী। হানীর জাতি অধিবাসিগণ মোঙ্গলদিগের অধীনতা অধীকার করিয়া অধীন ভাবে রাজ্য করিতে থাকে। জর্জ টমাস নামক এক জন আরলওবানী ইংরাজ-সেনাদী ১৭৮১ খৃঃ, ইংরাজদিগের কাব্য ত্যাগ করিয়া উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে যাত্রা করেন এবং জাতিদিগের রাণী বেগম সমকর অধীনে সেনা-দায়ক হইয়া কলীদগজ-ওণে ক্রমে তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র হন। পরে বেগম সমকর রাজ্য অংশ হইলে তিনি অত্র এক জাতি সর্দারের অধীনে সেনাদায়কতা করেন। অতঃপরে উক্ত সর্দারের মৃত্যু হইলে টমাস ১৭৯৭ খৃঃ তদদেশের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। সাধারণে তাহাকে 'আইরি' রাজা বলিত। হাঁসি নামক হামে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে থাকার সিন্ধেরাজ্যের ইংরাজ-সেনাপতি পেরণ (Perron) তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভা করিয়া তাহাকে পরাজিত করেন। টমাস পরাজিত হইয়া রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে বাইবার দানসে ১৮০২ খৃঃ কলিকাতার যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বহরমপুরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার রাজ্য ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হয়।

এই ঘটনার পরে মিষ্টো অশ্বজিৎসিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

মরাঠা-যুদ্ধান্তে রণজিৎ সিংহ ক্রমে ক্রমে মঙ্গলপুর প্রক এবং হইয়া উঠিতেছিলেন এবং কোশলে শত্রুসৈন্য পশ্চিম-ভাগে রাণাসিংহের সুযোগ অবশেষে করিতেছিলেন। এমন সময়ে পশ্চিমাংশের সুত্ব হইল। নানান রাজ্যে পশ্চিমাংশের সুত্ব হইল। নানান রাজ্যে পশ্চিমাংশের সুত্ব হইল। নানান রাজ্যে পশ্চিমাংশের সুত্ব হইল।

পার হইয়া অত্যন্ত লিখ-বাক্য আকর্ষণ করেন। এই সমস্ত লিখ-লিখার পূর্বে বাহুতঃ ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। তাহার দ্বিতীয়বার ইংরাজ রেসিডেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। ইংরাজ রেসিডেন্ট লর্ড মিষ্টোকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মিষ্টো রণজিৎ‌র পক্ষত্বের কথা অবগত ছিলেন, সুতরাং মিত্রভাবে মিঃ মেটকালকে রণজিৎ‌র নিকট হুত প্রেরণ করিলেন। মেটকাল রণজিৎ‌র নিকট উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। রণজিৎ‌ লিংহ বমুনাতীর পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যের সীমা বন্ধিয়া সারী করিলেন। মেটকাল তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শত্রু নদী ইংরাজ-রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তখন রণজিৎ‌ ইংরাজ-রাজ্য আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করিলেন। ইংরাজেরাও অস্ত্রশেলীর অধীনে একদল সৈন্য ও সেন্ট জোজের অধীন আর একদল সৈন্য লইয়া বমুনাতীর হইয়া লুধিয়ানা-রাজ্যে প্রবেশ করিবার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন।

পরে রণজিৎ‌লিংহ ইংরাজদিগের নিকট হইতে এক মানি জুলার ছুতীয়াগারী ও দুইটা বৃহৎ অশ্ব উপহার পাইয়া ১৮১১ খৃঃ ২৫শে এপ্রিল ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন এবং শত্রু-ভীর পর্যন্ত ইংরাজ-রাজ্যের সীমা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহার এক লক্ষ মুশিক্ষিত রণবিশারদ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল।

১৮১৬ খৃঃ মিলার সন্ন্যাসী শাহ আলমের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র অকবর (২য়) নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিলুপ্ত-মোগল-বৈকুণ্ঠের পুত্র স্মৃতি উদিত হওয়ার, তিনি ধীরে ধীরে ইংরাজদিগের প্রতি অসন্তোষের চিহ্ন প্রদর্শন করিতে-ছিলেন। অকবরের তৃতীয় পুত্র মির্জা জাহাঙ্গীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারিণি অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন ভাবে সিংহাসন-লাভের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। অকবরও তৃতীয় সন্ধিমাধ্যম-প্রতি অসন্তোষাধিক্য হেতু তাহার অনুমোদন করিতে-ছিলেন। ইংরাজ রেসিডেন্ট মিঃ মেটন হইতে অকবরকে ভিতরকার কলর অকবর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ার সেনাপতি মেটন পলাইয়া পলাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় ইংরাজ-সৈন্য খাঙ্গারী জাহাঙ্গীর ও অকবরকে বন্দী করিয়া আলাহাবাদ-দরদর দূর্গে প্রেরণ করে। তথায় তাহার মাসিক ১৬৫০০ টাকা পাইয়া কালাতিপাত করেন।

এই সময়ের অসন্তোষিত ফরাসীরাও নেপোলিওন বোনাপার্ট নৌকা প্রত্যয়ে সন্তুষ্ট যুরোপ-ও বিজয় করিয়া ইংরাজদিগের অন্তঃকরণে দ্বন্দ্বভীতির সঞ্চার করিতেছিলেন।

লর্ড মিষ্টো বিশেষ বিচক্ষিত হইয়া সিদ্ধমেন, কাবুল ও

পারতরোহে মিত্রতা স্থাপন করিবার স্বভাব প্রেরণ করেন। মিঃ হাভিমাথ সিদ্ধমেনের আদৌরগণের নিকট কাণ্ডিত্য বিষয়ক মিত্রতাপ্রদর্শন প্রেরিত হন। আদৌরগণ ১৮১২ খৃঃ ১২ই আগষ্ট ইংরাজদিগের সীমান্ত রক্ষা করিবে এবং ফরাসী-দিক্‌তে সাহায্য করিবেন না বলিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তিনি কল্পদেশীয় করিবার ভুল ইংরাজদিগের সারায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজেরা তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়ার আদৌরগণ স্থগা প্রদর্শনপূর্বক সন্ধির নিয়ম পালনে অগম্য হন।

হাউস্টেয়ার্ট এলফিনষ্টোন অনেক বহু মূল্য উপঢৌকন লইয়া কাবুলরাজ জালা-উল-মুলকের নিকট উপস্থিত হন এবং ফরাসীদিগকে সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়া কাবুলরাজের সন্ধি সন্ধি করেন, এ সন্ধি বিশেষ কোন ফল হয় নাই। এলফিনষ্টোন অতি ক্রমে আগ লইয়া কোন পুত্রকে ফিরিয়া আনিয়াছিলেন। কাবুলবাসিন্ধ তাহার পুত্রের নোয়া হইতে মোড়ার সার পর্যন্ত পুত্র লইয়া গিয়াছিল। পুত্র মধ্যে সন্তানদল তাহার সর্ব্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল। এলফিনষ্টোন স্ত্রী-উল-মুলকের ঈরকথচিত পরিচয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

ইংরাজদিগের লিখা করিয়া ফরাসী-দূত জর্জেনে (Gardanne) পারতরাজের স্বতন্ত্র প্রতিপত্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তৎকাল ভীত হইয়া ইংরাজেরা প্রথমে সর্ব্বমূল্য মানকম ও সর হারফোড জেনুগকে মনোপ্রকার উপঢৌকনাদিসহ দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহার উক্ত অত্যাচার হইয়া ফিরিয়া আইবেন।

পরে ১৮১০ খৃঃ জুন মাসে মালকম পুনরায় দৌত্যকার্যে পারতরাজ করেন এবং ইংলণ্ডরাজ ৩য় জর্জ এই সময়ে পারতরাজকে নান্যপ্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এই-বার পারতরাজ সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজদিগকে সারসে গ্রহণ করেন। তিনি মালকমকে বহুমূল্য তরবারি উপহার ও খাঁ টুখাখি দেন। মালকম পারতরাজকে গোলন্দাজ উপহার দিয়াছিলেন। অতাপি পারতরাজ উহা 'মালকমের প্রাণ' বলিয়া কথিত হয়।

এই সময়ে দৌত্যগালন্দী নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করেন। তখন মিষ্টো নিশ্চিন্ত হইয়া দৌত্যকার্য হইতে বিরত হইলেন।

এই সময়ে ত্রিবাঙ্কোড়ের বুদ্ধ সংঘটিত হয়। টিপু সুলতানের পরাভবের পর মহিষের রাজার সহিত ইংরাজদিগের দুইটা সন্ধি হয়। কিন্তু ত্রিবাঙ্কোড়রাজ এতদিন সন্ধির নিয়মামুসারে ইংরাজদিগকে অর্থাদি কিছুই প্রদান করেন নাই। এখন ইংরাজেরা রাজার নিকট নির্দিষ্ট অর্থ চাহিলেন, তখন তিনি

নানারূপ আপত্তি করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া ইংরাজ রেসিডেন্ট বৈলু তাহা নামক রাজার দেওয়ানকে পদচ্যুত করিলেন। দেওয়ান নাররদিগকে উত্তেজিত করিয়া ও ফরাসীদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নানারূপ বড়বড় করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যে ৪০০০০ সৈন্ত এবং ১৮০০ কামান সংগৃহীত হইল। কুইলন নামক স্থানে বৈলু ইংরাজদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ৫ ঘণ্টা বোরতর যুদ্ধের পর তিনি রণে ভক্ত দিয়া পলায়ন করেন। অল্পকাল মধ্যেই ইংরাজদিগের সৈন্তসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বৈলু জিবাকোড়রাজ্যে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু ২ বৎসর পর্যন্ত বহুবার যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। বৈলু বন্দী হইবার পূর্বে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ইংরাজদিগের বিচারে কাসীকাঠে প্রাণভাগ করেন। তৎপরে জিবাকোড় ও কোচিনের রাজা যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় প্রদান করেন এবং তাঁহাদের রাজ্য ইংরাজদিগের বাবাহাঙ্গুসারে শাসিত হইতে থাকে।

এই ঘটনার পরে মাদ্রাজ-সৈন্তগণের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। লর্ড মিষ্টো অনেক কষ্টে সে সকল দমন করিয়া শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে যুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ার ফরাসীরা পর্তুগাল অধিকার করে। তদনুসারে লর্ড মিষ্টো জলপথে সৈন্ত পাঠাইয়া গোয়া, মকাত, মরিশস ও মলাকা প্রভৃতি ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপ সকল অধিকার করেন। তৎপরে তিনি দ্বীপ ও তৎসম্বন্ধিত দ্বীপপুঞ্জের উপরেও প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

এই সময়ে কোম্পানীর সনাক্ত পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ইংলণ্ডে আন্দোলন হয়।

লর্ড মিষ্টো ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। তিনি অতি সক্ষমতা ও শৃঙ্খলার সহিত ভারতশাসন করিয়াছিলেন। তিনি বহুরূপ রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বে কেহই সেরূপ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহার পূর্বে পবমেন্ট যে সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য শতকরা ১২ টাকা মুদ্র দিতে হইত, কিন্তু মিষ্টোর শাসনকালে ১৫০০০০০ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়ার কোম্পানির কাগজের মুদ্র একেবারে শতকরা ৬ টাকা হইয়া যায়। মিষ্টো অত্যন্ত বিজ্ঞতা সহিত ভারত-শাসন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গবাসীর জাতীয় সাহিত্যের গ্রন্থাদির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ওয়েলসলীর সময়ে কোর্ট-উইলিয়াম-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তদুপস্থিত অধ্যাপক-

পূর্বক হিন্দুদর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের আলোচনার বাহাতে জাতীয় ভাব অভিজ্ঞত না হয়, তাহার জন্য নবদ্বীপ ও মিথিলার সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং অস্ত্রান্ত স্থানে মুসলমান-মাদ্রাসা সংস্থাপন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের অভিযোগকালে তিনি বিলাতের মহাসভার হিন্দু-দিগের প্রতি যে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উদার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই।

তিনি গবর্মেন্টের অর্থব্যয়ে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন এবং ত্রিপুরামপুর হইতে বাঙ্গালা ভাষার বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ কাণ্ডেও যথেষ্ট সহায়তা করেন।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ মিষ্টোর চরিত্রে একটা অবস্থা কলঙ্ককালিনা অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তথ্যের সম্পূর্ণরূপে নির্দোষী। তৎকালে ত্রিপুরামপুরের ধর্মপ্রচারকগণ বাঙ্গালা ভাষার খৃষ্ট-ধর্মের জ্ঞান-গরিমা ঘোষণা করিয়া এবং হিন্দু দেবদেবীর কুৎসা করিয়া প্রকাতভাবে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। হিন্দুর ধর্ম ও সম্মান-রক্ষা করা রাজ-ধর্ম মনে করিয়া মিষ্টো মিসনারীগণকে উত্তররূপে ধর্মপ্রচার করিতে এবং হিন্দুদিগের মানিহীন প্রস্তাবাদি মুদ্রিত করিতেও নিষেধ করেন। তাহাতে মিসনারীগণ কলিকাতার আসিতে বাধ্য হন। ইহাতে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, খৃষ্টধর্মের উজ্জল আলোকের প্রদার বন্ধ করিয়া মিষ্টো মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছেন। বাহা ইউক, লর্ড মিষ্টো শাসনকাণ্ডে অকুতোভয়ে যে সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এদেশীয় ইংরাজ-শাসনকর্তাদিগের অনুকরণীয়। স্বীয় শাসন দক্ষতার জন্য তিনি ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট হইতে ধন্যবাদ এবং আরল্ উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি অধিক দিন এই সম্মান ভোগ করিতে পারেন নাহ।

তিনি ১৮১৪ খৃঃ মে মাসে লণ্ডনে উপস্থিত হন। এখানে আসিয়াই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। তখন প্রিয় অধ্যাপক-দর্শনলালসা তাঁহার চিত্তে বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু স্বদেশদর্শন তাঁহার তাপ্যে ঘটিল না। পশ্চিমধ্যে হার্টফোর্ড-সারারে ২১শে জুন তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎকালে তাঁহার ৬৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত শাস্ত্র-প্রকৃতি এবং রহস্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার কথোপকথনে বহুগুণ অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। অতি মাজিত এবং ওষ-ধিনি ভাষায় তিনি সমস্তাধ প্রকাশ করিতেন। স্বদেশ ও স্বজাতি বাৎসল্যে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল।

মিগ্রিণ (ত্রি) নাকি হুয়ে অম্পট কক্ষ্য কওয়া।

মিত (ত্রি) মি বা মা-ক্ত। ১ পরিমিত।

“মিতক সায়ক বটোহি বাগ্গিতা।” (নৈবধ ৯৮)

২ লকিত। ৩ দিষ্ট।

মিতঙ্গম (পুং ক্রী) মিতং পরিমিতং গচ্ছতীতি গম-খট্, মুম্  
চ। ১ গজ। দ্বিগাং ভীষ্। (সিদ্ধান্তকো.) (ত্রি) ২ পরি-  
মিতগামী। দ্বিগাং টাপ্।

মিতজ্জু (ত্রি) ১ স্ফুটিতজাহ্নু, যে জাহ্নুদেশ স্ফোট করে।  
“নবমিতজ্জুতিঃ পুরু কৃষা জিগারঃ।” (ঋক্ ৩।৩২।৩) ‘মিতজ্জু-  
তিঃ স্ফুটিতজাহ্নুতিঃ’ (সারণ)

মিতক্র (পুং) মিতং দ্রব্যতীতি ক্র-কৃ (হরিমিতরোক্রবঃ।  
উণ্ ১।৩৫) ১ সমুদ্র। (হেম) (ত্রি) ২ পরিমিতগামী।  
“পরিমিতানা মিতক্র রেতি হোতা” (ঋক্ ৪।৬৫) ‘মিতক্রঃ  
পরিমিতগতিঃ সন্’ (সারণ) ৩ মিতমার্গ। (ঋক্ ১০।৬৪।৬)

মিতধ্বজ (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ৯।৩।১২)

মিতভামিতৃ (ত্রি) মিতভাষণ, বিবেচনাপূরক বক্তা।

মিতভামিন্ (ত্রি) সন্নভামী “সত্যায় মিতভামিণাং” (রঘু ১)

মিতভুক্ত (ত্রি) পরিমিত ভাবে কৃতাহার।

মিতভূজ্ (ত্রি) মিতাহারী।

মিতমতি (ত্রি) অন্নমতি, সন্ধান বৃদ্ধি।

মিতমেধ (ত্রি) অন্ন বাগযুক্ত।

মিতম্পচ (ত্রি) ১ কুপণ। মিতং পরিমিতং পচতীতি মিত-  
পচ-খশ্ (মিত নথো চ। পা ৩।২।৩৪) ততোমুন্ (অকথিবদল-  
স্তমুন্। পা ৬।৩।৬৩) ২ পরিমিত পাককারী।

মিতরাবিন্ (ত্রি) অন্ন শব্দকারী, পরিমিত ধ্বনিকারী।

মিতরোচিস্ (ত্রি) পরিমিত দীপ্তিশালী।

মিতবাচ্ (ত্রি) ব্রহ্মবাক্য প্রয়োগকারী, পরিমিত কথাযুক্ত।

মিতব্যয়িন্ (ত্রি) পরিমিত ব্যয়কারী।

মিতশায়িন্ (ত্রি) অন্ননিদ্রাশীল।

মিতা (দেশজ) মিত্র, সখা, বন্ধু।

মিতাকর (ত্রি) পরিমিতাকরবিশিষ্ট।

মিতাকরা (ক্রী) স্তুতিগ্রহবিশেষ। বিজ্ঞানেশ্বর-রচিত  
বাজবন্ধোর একখানি টীকা।

মিতাচার (পুং) পরিমিত আচার।

মিতাচারিন্ (ত্রি) পরিমিতাচারবিশিষ্ট।

মিতালি (দেশজ) মিত্রতা, বন্ধুতা।

মিতার্থ (পুং) পরিমিতার্থ, প্রকৃত অর্থ। (ত্রি) পরিমিতার্থযুক্ত।

মিতার্থ (পুং) ত্রিবিধ দ্রুতের অন্তর্গত দ্রুতভেদ। অলঙ্কার  
শাস্ত্রে তিন প্রকার দ্রুতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বধা—“নিহৃষ্টার্থো মিতার্থক্ তথা সন্দেহহারকঃ।

ক’ব্যগ্রন্থায়িত্বা দ্রুতৌদ্ভূতান্চাপিতার্থবিধাঃ।” (সাহিত্যক’৩)

নিহৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও সন্দেহহারক এই ত্রিবিধ দ্রুত।

ইহার মধ্যে যে দ্রুত উত্তর পক্ষের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া  
বরং উত্তর করে এবং সুশৃঙ্খলতার সহিত কার্য্য নির্বাহ  
করিয়া দেয়, তাহার নাম নিহৃষ্টার্থ, আর যে দ্রুত বিবেচনার,  
সহিত অল্প কথা কহিয়া কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহাকে মিতার্থ  
বা মিতার্থক নামে অভিহিত করা যায়। এতদ্বির যে দ্রুত মাত্র  
প্রভূকথিত সন্দেহ বহন করে, তাহার নাম সন্দেহহারক।

(সাহিত্যক’ ৩৮৩-৮৮)

মিতার্থক (পুং) ১ মিতার্থযুক্ত। ২ সতর্কের সহিত বক্তা।  
৩ সতর্ক দ্রুত।

মিতাশন (ক্রী) ১ পরিমিত আহার। মিতমদ্রাতীতি কন্তরি  
ল্য। (ত্রি) ২ পরিমিত-ভোজী।

মিতাশিন্ (ত্রি) পরিমিত ভোজনশীল।

মিতাহার (পুং) ১ পরিমিত ভোজন। (ত্রি) ২ মিতভোজী।

মিতি (ক্রী) মরতে ইতি মা-ভাবে ক্রিন্। ১ মান। ২ বিজ্ঞান।  
৩ অবচ্ছেদন। ৪ পরিচ্ছেদ। “মিতিঃ সম্যক্ পরিচ্ছিত্তিঃ”

(কুশমানজি ৪৬।৪)

মিতৌক্তি (ক্রী) ১ অন্নবাক্য প্রয়োগ। (ত্রি) ২ অন্নবাক্যবক্তা।

মিতৌলি, অযোধ্যাপ্রদেশের খেরী জেলার অন্তর্গত একটি  
নগর। কাঠনা নদীকূল হইতে ১ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত।  
নগরের চতুর্দিকে সুবিশাল আশ্রকানন ও গ্রামল পশুক্ষেত্র-  
সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে রাজা লোণসিংহের প্রাসাদ  
ছিল। বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করার হিংস্র-  
গবর্ণমেণ্ট তাহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া, মাল্লুদরাজের তালুক-  
দার রাজা আমীর হোসেন খাঁকে সমর্পণ করিয়াছেন।

মিতি, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর খর ও পার্করজেলার ১টা তালুক।

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৪° ৪৪’

উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৫১’ পূঃ। এই নগরে স্থানীয় বিচারসদর  
প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় পণ্যপ্রবোয় আমদানী ও রপ্তানী  
লইয়া এই স্থান তথাকার বাণিজ্যক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে।

মিত্রে (ক্রী) মিনোতি মানং কয়োতীতি মি-কৃ (অমিচিমি  
দিশসিত্যঃ ক্রুঃ। উণ্ ৪।২৬২) অথবা মেদ্যতি মিহতীতি  
মিত্রাস্রস্, নিপাতনাং গুণাতাঃ, দ্বিতকরণঃ একতকারকে-  
ত্যোকে। (অমরটীকার ভরত) ১ শত্রু’ ভিন্ন রাজাদিগের  
রাজ্যের পরবর্তী রাজা ভিন্ন অপর রাজা। মধ্যস্থিত  
নরপতির রাজ্যহরণরূপ একই কার্য্যে যোগদান করেন  
বলিয়া উভয়ই উভয়েরই মিত্র।

“রাজা শক্রান্তি খ্যাত একাধীতিনিবেশতঃ।

তুম্যাকান্তরিতো রাজা স মিত্রঃ মিত্রার্থ্যতঃ॥” (শম্বরত্নাং)

“মহাত্মারতের রাজধর্মকথনে উক্ত মিত্র চারি প্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যথা—সহার্থ, ভজমান, সহজ ও কৃত্রিম। ২ অতিবিষলতা (বৈজ্ঞানিক) ৩ বন্ধু, চলিত মিত্র, পর্যায়—সখা, স্নহৎ। বিখ্যাসী সাধুচরিত্র লোকের সহিতই মিত্রতা স্থাপন করা কর্তব্য, নতুবা যাহারা পরোক্ষে সর্বনাশ-সাধনে সচেষ্ট, আর প্রত্যক্ষে দুই একটা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে উদ্ভূত, এ হেন পরোমুখ বিষকৃত্তবৎ মানুষের সহিত কদাচ মিত্রতা করিতে নাই। প্রকৃত বিখ্যাসী ব্যক্তিই মিত্র হইবার যোগ্য। কুমিত্র, কুভাধ্যা, কুরাজা, কুপ্রণয়, কুনদ্ধ, এবং কুদেশ এই সকলের সংশ্লব সর্বাগ্রে পরিত্যাগ করিতে হয়। কুজনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলে সর্বপ্রকার অনর্থই তাহা দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে। সুতরাং সাধুচরিত্র বিখ্যাসী জনের সহিতই মিত্রতা স্থাপন করিবে। সংসারে কেহই কাহারও শত্রু নয়, কেহ কাহার মিত্রও নয়, শুধু কর্তব্যবশতঃ কেহ শত্রু এবং কেহ কেহ বা মিত্র হইয়া থাকে। (পুং) ৪ অর্থ্য।

“যন্তি মিত্রঃ সহাদিত্যৈঃ যন্তি কুদ্রা দিশত্ব তে।”

(গৌড়ীয় রামাং ২২২)

৫ দ্বাদশাদিত্যের অন্ততম।

“ধাতা মিত্রোহ্যমা শক্রো বরুণঃশ এব চ।”

(মহাত্মারত ১৬৫১০)

৬ মরুদগণের অন্ততম। (হরিবং ১২৬৫২) “বশিষ্ঠের উক্তা গর্ভজাত পুত্রভেদ।

“চিত্রকেতুঃ সুরোচ্চিচ বিরজা মিত্র এব চ।

উষণো বহুভূদ্যানো দ্রামান্ শক্রাদয়োহপরে॥”

(ভাগবত ৪।১।৩৭)

মিত্র, আধ্যাত্মিকের এক প্রাচীন দেবতা। ঋকসংহিতায় (১০।৭২৮-৯) আছে—

“অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্ষে জাতান্তবম্পরি।

দেবা উপ প্রৈংসপ্তভিঃ পরা মার্ত্তাণ্ডমাস্যং ॥৮

সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরূপ প্রৈংপূর্য্যং যুগং।

প্রজাটৈর মৃত্যাবে স্বংপুনর্মার্ত্তাণ্ডমভরং ॥৯”

অদিতির তনু হইতে যে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাতটা পুত্র লইয়া তিনি দেবলোকে প্রস্থান করেন, কিন্তু মার্ত্তাণ্ড নামক ঋতুকে দূরে ফেলিয়া দিলেন। (এইরূপে) পূর্বকালে অদিতি সাত পুত্র লইয়া যান। কেবল অম্ম ও মৃত্যুর জন্ত মার্ত্তাণ্ডকে ভরণ করিয়াছিলেন।

সারণ উক্ত ঋকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—‘অষ্টৌ পুত্রাসঃ

পুত্রা মিহাদয়োহদিতের্ষবন্তি। তান্ অহুক্রমিহ্যামো মিত্রশ্চ বরুণশ্চ ধাতা চ অধ্যমা চ অংশশ্চ ভগশ্চ বিবস্বানাদিত্যশ্চেতি।’ অর্থাৎ অদিতি হইতে যে আটটা পুত্র হইয়াছিল, তাহারা মিত্রাদি। তাঁহাদের যথাক্রমে নাম মিত্র, বরুণ, ধাতা, অধ্যমা, অংশ, ভগ, বিবস্বান, ও অদিত্য এই নয় জন।

শতপথ-ব্রাহ্মণে (৩।১।৩৩) আছে—

“অষ্টৌ হ বৈ পুত্রা অদিতৈঃ। যাং যেন্দেদেবা আদিত্যা ইত্যচক্ষতে সপ্ত হ বৈ তে।” অর্থাৎ অদিতির আটটা পুত্র হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সপ্ত দেবই আদিত্য বলিয়া কথিত।

ঋকসংহিতায় এই সপ্ত আদিত্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

“ইমা পির আদিত্যোভ্যো যুতনুঃ সনাড্রাকভ্যোজুহা জুহোমি।

শৃণোতু মিত্রো অধ্যমা ভগোন ভবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ॥”

আমি জুহু দ্বারা সর্কদা শোভমান আদিত্যগণের উচ্চশ্রেণে যুতপ্রাণী স্বত্তি দিতেছি। মিত্র, অধ্যমা, ভগ, ভবিজাত বা ধাতা, বরুণ, দক্ষ \* ও অংশ আমার স্তব শুহুন।

যাহা হউক সর্কপ্রণবে এই ৭টা বা ৮টা আদিত্যই প্রসিদ্ধ ছিলেন। বেদের সংহিতাভাগে ১২শ আদিত্যের উল্লেখ না থাকিলেও শতপথব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যেরও প্রসঙ্গ আছে। যথা—

“কত মে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশমায়াঃ সংবৎসরস্ত এতে আদিত্যাঃ” (শতপথব্রাহ্মণ ১১।৬।৩৮) অর্থাৎ কয়জন আদিত্য, দ্বাদশমাস সংবৎসররূপ দ্বাদশ-আদিত্য। ভারত ও পুরাণে এই-রূপ দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায়—

“ধাতাধ্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোহংশো ভগন্তথা।

ইন্দ্রো বিবস্বান্ পুষাচ যষ্টো চ সবিতা তথা ॥

পর্জন্তশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্তুতাঃ।”

(ভারত আদি ১২১ অঃ)

ধাতা, অধ্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পুষা, সবিতা, পর্জন্ত ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য।

(তথ্য বিষ্ণুপুং ১।১৫।৯০)

মহাত্মারত ও পুরাণে আদিত্যগণের মধ্যে মিত্রের স্থান অনেক পরে হইলেও বেদে মিত্রই আদিত্যগণের প্রথম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

\* ভাষ্যকার দক্ষকে আদিত্য মধ্যে গণ্য করেন নাই, কিন্তু উক্ত ঋক হইতে ও যাকের দিক্কে এই দক্ষও এক জন আদিত্য বলিয়া গণ্য। এ ঋকে যুগের নাম না থাকিলেও ১০।৮৮।১১ ঋকে যুগ আদিত্য বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। [যুগ দেখ।]



যাক নিরুপেক্ষে লিখিয়াছেন,—

“আদিত্যঃ কন্যাদানন্তে রতান্। আদন্তে ভাসং জ্যোতিষায়ী  
দীপ্তো ভাদা ইতি বা। অদন্তে পুত্র ইতি বা। অন্ন-  
প্ররোগন্ত অস্ত্রৈভদার্চ্যায়্যারে হৃত্তাক্ সূর্য্যাদিত্যেয়মদিত্যে:  
পুত্রম্। এবমন্তাসামপি দেবতানামাদিত্যপ্রবাদাঃ স্তব্রে  
ভবন্তি। তদ্বৎ এতদমিত্রস্ত বরুণস্ত অর্ঘ্যয়ো দক্ষস্ত ভগস্ত  
অংশস্ত ইতি।” (২।১৩।)

আদিত্য নাম কেন? রসসমূহ আদান বা গ্রহণ করেন  
বলিয়া। তিনি আলোক আদান করেন, আবার সেই  
আলোকেই দীপ্ত হন। অথবা তিনি অদিতির পুত্র। ঋগ্বেদে  
ইহার অন্নই প্ররোগ দৃষ্ট হয়। অদিতির পুত্র বলিয়া হৃত্তে  
আদিত্যের সূর্য্য নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপে অদিতিপুত্র অপর-  
পর দেবগণও স্তবিকালে আদিত্য নামে অভিহিত। যথা—  
বরুণ, অর্ঘ্যমা, দক্ষ, ভগ ও অংশের সম্বন্ধেও এইরূপ।

ঋগ্বেদের বহু হৃত্তে মিত্র ও মিত্রাবরুণের স্ততি কীৰ্ত্তিত। তাহা  
হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, মিত্র ও বরুণ বৈদিক ঋষিগণের  
এক প্রধান দেবতা। সারণ লিখিয়াছেন, ‘মৈত্রঃ বৈ অহরিতি  
ঋতে...ঋন্তে চ বারুণয়াজীতি’ মিত্র হইতেই দিবা ও বরুণ  
হইতে রাত্রি, তাহা বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ মিত্রই  
আলোকদেব এবং বরুণ আবারণদেব।

বেদে মিত্রাবরুণের যেরূপ প্রভাব ও উজ্জল চিত্র প্রদত্ত  
হইয়াছে, পরবর্তী সংস্কৃতশাস্ত্রে মিত্রদেবের সে সম্মান যেন  
অনেকটা হ্রাস হইয়াছে।

ঋকসংহিতায় (৩।৫৯ হৃত্তে) বিশ্বামিত্র মিত্রদেবকে স্তব  
করিতেছেন,—

“মিত্রো জনান্ বাতরতি ক্রবাণো মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত ত্যাং  
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাতিচটে মিত্রায় হব্যঃ স্তবজুহোত ॥১  
প্র স মিত্র মর্ত্যো অস্ত প্রযস্বান্ যন্ত আদিত্য শিফতি ত্রতেন।  
ন হনাতে ন জীয়তে ত্রতো নৈনমংহো অশ্নোত্যস্তিতো ন দুরাথা  
অনমীবাস ইড়রা মদং তো মিত্রজবো রবিমরা পৃথিব্যাঃ।  
আদিত্যস্ত ব্রতমুণক্ষিয়ন্তো বয়ং মিত্রস্ত সূমতো স্তাম ॥৩  
অয়ং মিত্রো নমস্তঃ সূশেবো রাজা সূক্ষত্রো অজনিষ্ট বেধাঃ।  
তস্ত বয়ং সূমতো যজ্ঞিয়স্তাপি ভদ্রে মোমনাসে স্তাম ॥৪  
মহী আদিত্যো নমসোপসন্তো বাতরজ্জ্বনো গুণতে সূশেবঃ।  
তস্মা এতৎ পণ্যতমায় জুষ্টমমো মিত্রায় হরিরাজুহোত ॥৫  
মিত্রস্ত চর্যণীযতোহবো দেবস্ত সন্মপি।

দ্বায়ং চিত্রপ্রবস্তমং ॥৬

অতি বো মহিনা দিবং মিত্রো বভূব সপ্রথাঃ।

অতি শ্রবোভিঃ পৃথিবীং ॥৭

মিত্রায় পঞ্চ বেদিয়ে জনা অভিধি শবসে।

স দেবান্ বিশ্বান্ বিতন্তি ॥৮

মিত্রো দেবেষায়ুযু জনায় বৃত্তবর্হিবে।

ইষ ইষ্টব্রতা অকঃ ॥৯

মিত্র জনসাধারণকে কার্যে প্রবর্তিত করিতেছেন। মিত্র  
পৃথিবী ও আকাশ ধরিয়া আছেন। মিত্র অনিমেষলোচনে  
সকলের কার্য দেখিতেছেন। মিত্রকে স্তবযুক্ত হব্য নিবেদন  
কর। ১। হে আদিত্য মিত্র! যে মনুষ্য ব্রতনিয়মে তোমাকে  
হব্য নিবেদন করে, সে অন্নবান্ হউক। তুমি যাহাকে রক্ষা  
কর, তাহাকে কেহ মারিতে বা পরাজয় করিতে পারে না।  
আমরা নীরোগে ও অরুণাভে হৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর প্রশস্ত স্থানে  
জাহ্নু পাত্রিয়া স্বর্গগামী আদিত্যব্রতে রহিয়াছি। মিত্র  
যেন আমাদের প্রতি রক্ষা করেন। ৩। এই মিত্র অবতীর্ণ  
হইয়াছেন। ইনি নমস্ত, সূক্ষ্মমুখ, রাজা, অত্যন্ত  
বলযুক্ত, নিখিলের জনয়িতা এবং যজ্ঞার্থী। আমরা যেন  
ইহার অহুকম্পা ও কল্যাণপ্রদ বাৎসল্য লাভ করি। ৪।  
(এই) আদিত্য মহান্, সর্বলোকের প্রবর্তক, নতশিবে  
তাঁহার পূজা করা কর্তব্য। তিনি স্তোতার প্রতি নিরত প্রায়।  
(সেই) স্ততিযোগ্য মিত্রের প্রীত্যর্থ এই হব্য অগ্নিতে প্রদান  
কর। ৫। মানবপালক মিত্রদেবের অন্ন ও তজ্জন্য দান বড়ই  
কীৰ্ত্তিময়। ৬। যে মিত্র আপন মহিমায় ছালোক অভিভূত করি-  
য়াছেন, তিনিই কীৰ্ত্তিমান্ হইয়া পৃথিবীকে যথেষ্ট অন্নশালিনী  
করিয়াছেন। ৭। পঞ্চজন শত্ৰুজয়ক্ষম (এই) বলবান্ মিত্রের  
উদ্দেশে হব্য দিতেছেন, তিনি সকল দেবতাকেই ধারণ  
করিতেছেন। দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে বহি অর্পণ  
করিয়াছেন, মিত্র তাহাকে কল্যাণকর অন্ন দিয়া থাকেন।

কিন্তু মহাসংহিতায় আবার কি বলিতেছেন শুধুন—

“মনসীন্দুঃ দিশঃ প্রোত্তে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং।

বাচায়িৎ মিত্রমুংসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্ ॥” (১২।১২১)

মনে চন্দ্র, কর্ণে দিক্ সকল, গমন কালে বিষ্ণু, বলে হর,  
কথায় অগ্নি, মলে মিত্র, এবং জম্বাইবার কালে প্রজাপতির  
নাম স্মরণ করিবে। এখানে মহাসংহিতাকারের হাতে মিত্রের  
অবস্থা শোচনীয়। তাঁহার এক সময়ে সন্মোহ আসন ছিল।  
তাঁহাকে অবশ্য কেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, শেষে  
কিন্তু উৎসর্গে তাঁহার আশ্রয় স্থান হইল। বেদে মিত্র ও সূর্য্য  
ভিন্ন দেবতা বলিয়া কীৰ্ত্তিত, কিন্তু পৌরাণিক যুগে মিত্র ও  
সূর্য্য অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন।

[ সূর্য্য শব্দে বিবৃত্ত বিষয় ব্রটব্য। ]

\* মিত্র কেবল বৈদিক ঋষিগণের উপাস্ত ছিলেন, তাহা নহে,



তিনি এক সময় সমস্ত সত্যজগতের আর্থাগণের উপাত্ত ছিলেন।

পারসিকগণের পূর্বতন অবস্থানান্ত্রে এই মিত্রদেব 'মিথ্র' নামে এবং তৎপরবর্তী পল্লবী শাস্ত্রে 'মিহির' নামে আখ্যাত। অথেষ্টে যেমন মিত্রের স্তুতি আছে, অবস্থানান্ত্রের অন্তর্গত 'মিহির-বস্তুতেও' মিথ্র দেবের সেইরূপ স্তুতি দেখা যায়। এই মিহির বস্তুতের প্রারম্ভেই আছে—

“এখানে এস, আমাদিগকে সাহায্য কর। আমাদের সমুখে এস, স্তবী কর। অগ্র, অগ্নের, পূজা, প্রশস্ত ও অমিত্র-ঋক্ মিত্র—যিনি বিত্তার্ণ ক্ষেত্রসমূহের শাসনিতা।”

তৎপরে স্থানে স্থানে এইরূপ মন্ত্র আছে—

‘সদা সত্যবাদী মিত্রের সহস্র কর্ণ, সহস্র চক্ষু, তিনি অনিষ্ট ও অনিষিৎ লোচনে জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন।’

‘তিনিই ছালোকের প্রাণে বৈব্রহ্য (হরো-বেয়েজ-ইতি) শৈলের পুঙ্ক দেশ অতিক্রম করেন, বথায় আঙগতি অধগগনহ অমর্ত্য স্বর্গ অবস্থান করিতেছেন। মিথ্র প্রথমেই স্বর্ণভূষিত হইয়া সেই শৈলের শৃঙ্গদেশ হইতে সমস্ত ইরাণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহারই কৃপায় রাজন্যগণ সমুচ্চ হুগ নিষ্ঠাণ করেন; তাহারই প্রভাবে বহু ক্ষেত্রমণ্ডিত সমুচ্চ শৈলোপরি-জীবগণের আহার উপসন্ন হয়। তাহারই কারণে গভীর কূপ মধ্যে প্রচুর জল থাকে এবং তাহা হইতেই বিত্তার্ণ নোবাহা স্রোতস্বতীসমূহ ঐকত, পৌরুত, মরু, হরোয়ু, (নরবু,) গোমুহু, ও কাইরিজেম দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তিনি সন্তলোকে আলোক বিতরণ করেন। যিনি যাগযজ্ঞ ও উপযুক্ত স্তোত্রসমূহ দ্বারা তাহার পূজা করেন, তাহার কর্ণে অরধ্বনি নিনাদিত হয়।’

মিহির-বস্তুতে এই মিত্র বজ্রধর, অমিত্রঋক্ ও অহরমজ্জ হইতে শ্রেষ্ঠরূপে কীৰ্তিত। আবার অবস্তার যন্ত্রে অহর-মজ্জই সর্বপ্রধান সৃষ্টিকর্তারূপে বিবৃত হইয়াছেন। যন্ত্রে দেখা যায়,—

“অহরমজ্জ স্মিতম জরথুষ্ট্রকে বলিলেন, বথন আমি বিত্তার্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি মিথ্রকে সৃষ্টি করি, আমি তাহাকে আমার ভায় যজ্ঞ ও পূজার উপযুক্ত করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলাম।”

বর্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বেদে যেসকল মিত্রা-বর্ণন, অবস্তার সেইরূপ মিথ্র ও অহরমজ্জ। [ বর্ণন দেখ ]

প্রাচীন ইরাণে সর্বত্র এই মিথ্রের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। এই মিত্ররূপ সৌরজ্যোতির উপাসনা শাকদ্বীপেও প্রচলিত ছিল। জরথুষ্ট্র অহরমজ্জকে সর্বশক্তিমান ও সর্ব-

প্রধান বলিয়া প্রচার করিলে মিত্রপূজকগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। জরথুষ্ট্রের বতাবলম্বিগণ অহরমজ্জকে সর্বপ্রধান ও মিথ্রকে তাহার আদি ও পবিত্রতম বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি দিবা ও রাত্রির অধিদেবতা হইলেন। অপর পক্ষ অহরমজ্জদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করিয়া পূর্বাগম মিথ্রকেই সর্বপ্রধান ও সর্বশক্তিমান বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ ভারতবর্ষে আসিয়া শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন।

[ ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ। ]

খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতেও পারস্যের সর্বত্র মিত্রোপাসনা প্রচলিত ছিল। তিনি আদিপ্রকৃতি ও আদি সৃষ্টির কারণ বলিয়াও গণ্য হইতেন। এই মিত্রদেব ‘পারসী’ নামে আলোক ও অগ্নির অধিষ্ঠাতৃ-দেবত্বরূপ ইথিওপীয়, মিসর ও গ্রীসদেশে পূজিত হইতেন। ইথিওপীয়গণ এই অগ্নিদেবকে আদি ধর্ম-শাস্ত্রকার ও ধর্মপ্রবর্তক বলিয়া পূজাও করিতেন। নীলনদকূল-বাসিন্দিগণের এক সময়ে বিশ্বাস ছিল যে, মিত্র, ঠা বা হোলিওপ-লিস্ (সুখ্য নগর) স্থাপিত করেন এবং তাহার সর্বপ্রথম নৃপতি মিত্রঃ (Metres) নামে পরিচিত ছিলেন। তৎবাসের সিংহাসন হইতে যে দিব্যজ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, তাহার চিহ্ন দেখা-ইবার জন্য মিত্রনৃপতি অপূর্ব সূর্য্যশস্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

রোমক-সম্রাটগণের যন্ত্রে মিত্রপূজা সমস্ত রোমসাম্রাজ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। পৌষ মাসে যে দিন এখানে বড়দিন হইয়া থাকে, সেই দিন রোমনগরে মিত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহা ধুমধাম হইত। তাহাতে সর্বত্র নৃত্যগীত ও সমস্ত নগরী আলোকমালায় বিভূষিত হইত। রোমসাম্রাজ্য বিস্তারের সহিত মিত্রপূজা (Mitriaca) ক্রমশঃ প্রচলিত হইয়াছিল। ভূগর্ভ-হইতে আবিষ্কৃত চিত্রলিপির নানা ভ্রমাবশেষ হইতে তাহার নিদর্শন বাহির হইতেছে। ফোটিয়াস্ (Photias) লিখিয়াছেন যে, গ্রীক ও রোমকগণ মিত্রের উদ্দেশে নরবলি দিত। সুইদাস্ (Suidas) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই মিত্রপূজার রহস্যাত্মিকারী হইতে হইলে পূজককে অগ্নিপরাশ্রিত হইতে হইত।

ভারতবর্ষেও এক সময়ে সর্বত্র মিত্রপূজা প্রচলিত হইয়াছিল। এখনও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যরূপে এই মিত্রের পূজা করিয়া থাকেন। পারসিকগণ ‘মিথ্রিওন’ বা মিত্র মন্দিরে তাহার পূজা করিতেন। ভবিষ্য ও বরাহপুরাণে ‘মিত্রবন’ নামে মিত্রের পূজারূপের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। মিত্রের ভায় তৎপরবর্তী মিত্রা (Mithra) দেবীর পূজাও প্রাচীন পারসিক-দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তিনি অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া গণ্য ছিলেন। অগ্নিরায় তিনি মাইলিতা (Mylitta)

নামে এবং প্রাচীন আরবে আলিতা নামে পূজিত হইতেন। তিনি জগজ্জননী ও প্রজাবিক্রিনী বলিয়া গণ্য ছিলেন।

আদি পারসিকগণ মিত্র ও মিত্রাকে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মিত্রা প্রজাপতি অহরমজ্দের সাহায্যে জাগতিক দেহ ধারণ করিয়া সৃষ্টিবীজরূপে বহির্গত ধারণ করিয়াছিলেন।

মিত্রক (পুং) মিত্র বার্থে কন্। মিত্র।

মিত্রকরণ (ক্ৰী) বন্ধুতাপন।

মিত্রকর্ষন (ক্ৰী) বন্ধুর কাৰ্য্য।

মিত্রকাম (ত্রি) বন্ধুসঙ্গলাভেচ্ছ।

মিত্রকর্ষ্য (ক্ৰী) বন্ধুহ। মিত্রতা-স্থাপন।

মিত্রকুং (পুং) ১ দাদশ মম্বর পুত্রভেদ। ২ সহাদিবর্ধিত জনৈক রাজা। (৩০১০০)

মিত্রকৃতি (ক্ৰী) বন্ধুর কাৰ্য্য।

মিত্রকৃত্য (ক্ৰী) মিত্রের কাৰ্য্য।

মিত্রকু (পুং) মিত্রসম্বন্ধে কুরকণ্ঠকারী।

“মিত্রকুবো বচ্ছনেন গাবঃ” (ঋক্ ১০।৮০।১৪)

“মিত্রকুবো মিত্রাণাং কুরন্ত কশ্মণঃ কভারঃ” (সায়ণ)

মিত্রগুপ্ত (ত্রি) মিত্র দ্বারা রক্ষিত। ২ ন্যাকভেদ। (দশকু.)

মিত্রগ্ন (পুং) ১ মিত্রহননকাবী। ২ বিশ্বাসঘাতক। ৩ রাক্ষসভেদ। দ্বিগ্নাং টাপ্। ৪ নদীভেদ।

মিত্রগ্ন (পুং) বজ্রব্যাপহারী রাক্ষসভেদ।

মিত্রতা (ক্ৰী) মিত্রতা ভাবঃ, তন্-টাপ্। মিত্রের ধর্ম।

মিত্রতৃপ্য (ক্ৰী) বন্ধুবর্গের জয়লাভ।

মিত্রত্ব (ক্ৰী) মিত্রতা ভাবঃ হ। সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব।

মিত্রদাত, জনৈক প্রাচীন পার্শ্ব-সম্রাট। ইউক্রেটাইডিসের সাম্রাজ্যে অস্ত্রবিপ্লবে বিচ্ছিন্ন হইলে তিনি (Mithridates I)

তদ্রাজ্যের অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন। ১৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি ভারত-আক্রমণে আগমন করেন। পঞ্জাবপ্রদেশ জয় করিয়া তিনি “ক্ষত্রপ” (ছত্রপতি) শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া

গিয়াছিলেন। এখনও পঞ্জাবে সেই পার্শ্ব রাজন্যবর্গের

স্বভাগমনস্কট মুদ্রাচিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। অত্য়াবধি যে

সকল পার্শ্ব মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার সকল গুলিই ১০ হইতে ৬০ খৃষ্টপূর্বাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল।

মিত্রদেব (পুং) ১ মহাভারত-বর্ণিত জনৈক রাজা। (মহাভা-৮৭) ২ দাদশ মম্বর পুত্রভেদ। ৩ আদিভ্যভেদ।

মিত্রদ্রহ্ (ত্রি) ১ বন্ধুর সহিত শত্রুতাচরণকারী। জন ভাষায় ইহা ‘মিত্রদ্রহ্’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

মিত্রোহ (পুং) বন্ধুর প্রতি শত্রুতাচরণ।

মিত্রোহিন্ (ত্রি) মিত্রঃ ক্রহতীতি মিত্রক্রহ-ণিনি। বন্ধুর শত্রুতাচরণকারী।

মিত্রোহিস্ (ত্রি) মিত্রের হিংসাকারী।

“মিত্রোহী কৃতঘ্নস্ত যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।

তে নরা নরকং যাস্তি যাবচ্ছত্রদ্রিষাকরৌঃ” (বাঈং-শপুতলিকা)

মিত্রধর্ম্যন্ (পুং) বজ্রবিষকারী অম্বরভেদ।

মিত্রধিত (ক্ৰী) মিত্রনিহিত ধন। “যথা তথা মিত্রধিতানি সন্দুঃ।” (ঋক্ ১০।১০০।৪) “মিত্রধিতানি মিত্রনিহিতানি ধনানি” (সায়ণ)

মিত্রধিতি (ক্ৰী) মিত্রজনের ধারণ, বন্ধুজনের রক্ষণ। “হুহীম মিত্রধিতয়ে যুবাকু” (ঋক্ ১।২৮।২) “মিত্রধিতয়ে মিত্রাণাং বন্ধুজনানাং ধারণার্থম্” (সায়ণ)

মিত্রধেয় (ত্রি) বজ্রমানের বাগলক্ষণকাণ্ড। “মিত্রোণাং মিত্রধেয়ে যতষ।” (শুক্ল যজুঃ ২।৭।৫) “ধাতুং ধারয়িতুং যোগ্যং পেরং মিত্রস্ত বজ্রমানস্ত ধেয়ং কাণ্ডাং বাগলক্ষণম্।” (বেদদীপ)

মিত্রদ্রহ্ (ত্রি) মিত্রদ্রোহকারী, মিত্রদেবী।

মিত্রনাড়, সহাদিবর্ধিত জনৈক রাজা (সহাদ্রি-২।৮।৩৫)

মিত্রপাক্ষক (ক্ৰী) রসেজস্যায়সংগ্রহোক্ত গন্ধ দ্রব্য। যথা—

স্বত, মধু, গুজা, টরুণ ও শুগ্-গুন্।

মিত্রপতি (পুং) মিত্রপ্রতিপালক। (ঋক্ ১।১৭।৫)

মিত্রপদ (ক্ৰী) প্রাচীন তীর্থভেদ। (মৎস্যপুঃ ২২।১১)

মিত্রপ্রতীক্ষা (ক্ৰী) বন্ধুর প্রতি সম্মান। ২ বন্ধুর জন্ত অপেক্ষা।

মিত্রবাহু (পুং) দাদশ মম্বর পুত্রভেদ। ২ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র।

মিত্রভানু (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভারত ১৩ পক্ষ)

মিত্রভাব (পুং) বন্ধুর ধর্ম, বন্ধুতা।

মিত্রভূং (ত্রি) মিত্রপোষণকারী।

মিত্রভেদ (পুং) মিত্রের সহিত বিবাহকারী।

মিত্রমহস্ (ত্রি) অম্বকুল-দীপ্তিগুণ। হিতকারী তেজস।

“উত্তরদ্যামিত্রমহ আবোহন্নু তরাং দিব” (ঋক্ ১।৫০।১১)

“মিত্রমহঃ সর্কেবাঃ অম্বকুলঃ দীপ্তিবুকুঃ” (সায়ণ)

মিত্রমিশ্র (পুং) বীরমিত্রোদয় নামে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টকা-রচয়িতা। ইনি পরশুরামমিশ্রের পুত্র ও হংস পণ্ডিতের পৌত্র। রাজা প্রতাপরুদ্রের পৌত্র রাজা বীরসিংহের আদেশে তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ২ আনন্দচম্পুপ্রণেতা।

মিত্রযজ্ঞ (পুং) জনৈক ব্যক্তি। (সংস্কারকোস্তভ)

মিত্রযু (ত্রি) মিত্রঃ যাতীতি যা-উ (ক্যাজ্জসি। পা ৩।২।১৭০)

মিত্রবৎসল। মৃগ-যা-কুঃ নিপাতিতচ্চ (মৃগযাদয়শ্চ। উপ ১।৩৮)

(পুং) ২ লোকযাত্রিক। ৩ লোমহর্ষণ-শিষ্য জনৈক ঋষি।

“সুগতিচায়াবচ্ছান্ত মিত্রযুঃ শাংশপায়নঃ” (বিষ্ণুপুঃ ১।৩।১৮)

মিত্রযুক্ত (ত্রি) মৈত্রীযুক্ত। “রিশাদনো মিত্রযুক্ত ন দেবোঃ।”  
(ঋক্ ১।১৮৬৮) (পুং) ২ উপাধিভেদ। (সংস্কারকোঃ)

মিত্রযুক্ত (ক্ৰী) মিত্রেণ সহ যুক্তম্। সুহৃৎ-সংগ্রাম। পর্যায়—  
মৈত্রৈয়িক।

মিত্ররাজ (পুং) সহ্যাদ্রিবার্ণিত দুই জন রাজা।  
(সহ্যাদ্রি ৩২।১৪, ১৩৫)

মিত্রলন্ধি (ক্ৰী) মিত্রস্ত লন্ধিঃ ভতং। মিত্রপ্রাপ্তি।

মিত্রলাভ (পুং) মিত্রস্ত লাভঃ। ১ মিত্র সহ সম্মিলন, সুহৃৎ-  
প্রাপ্তি। ২ হিতোপদেশের এক অংশ।

“মিত্রলাভঃ সুহৃৎসেবো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব চ ॥” (হিতোপঃ)

মিত্রবংশ, ভারতের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজবংশ। ঔড়্ধর, পঞ্চাল  
প্রভৃতি স্থানে এই বংশ রাজত্ব করিতেন।

কেহ কেহ ইহাদিগকে শুঙ্গ সম্রাটদিগের শাখা বলিয়াই  
মনে করেন। কিন্তু ঔড়্ধর ও পঞ্চালের মিত্রদিগকে স্বতন্ত্র  
বংশ বলিয়াই মনে হয়। এই বংশীয় রাজগণ অধিকাংশই  
হিন্দু। কেহ ইহাদিগকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, আবার শক-  
ক্ষত্রিয় বলিয়া অনুমান করেন। খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দী  
এই বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ঔড়্ধর হইতে অজমিত্র,  
মহীমিত্র, বিখামিত্র, ভানুমিত্র প্রভৃতির মূদ্রা বাহির হইয়াছে।  
পঞ্চাল হইতে ভানুমিত্র, ধ্রুবমিত্র, স্যগমিত্র, ফল্গুনমিত্র,  
ভূমিমিত্র, অগ্নিমিত্র, জয়মিত্র, ইন্দ্রমিত্র, বিষ্ণুমিত্র এবং  
অবোধা হইতে সত্যমিত্র, সত্যমিত্র ও বিজয়মিত্রের স্বর্ণমূদ্রা  
পাওয়া গিয়াছে। মূদ্রার চিহ্ন হইতে কাহাকে শৈব, কাহাকে  
বৈষ্ণব, আবার কাহাকেও দৌর বলিয়া মনে হয়।

মিত্রবংশল (ত্রি) মিত্রস্ত মিত্রে বা বংশলঃ। মিত্রপ্রিয়।  
পর্যায়—মিত্রয়ু। (হেম)

মিত্রবন (ক্ৰী) মিত্রের পূজাস্থান, বর্তমান নাম মুলতান।

মিত্রবৎ (ত্রি) মিত্রমগ্ধ্যাভ্যাসিত মিত্র-মতুপ্, মতু ব। ১ সুহৃৎ-  
যুক্ত। (পুং) ২ অমুর বিশেষ। ৩ দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ।  
৪ ত্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। দ্বিগ্ধ্যাং ভীষ্। ত্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ্যভেদ।

মিত্রবর্চস্ (পুং) ঋষিভেদ।

মিত্রবর্দ্ধন (পুং) ১ মহাভারতাত্ত রাজভেদ। ২ দম্ভভেদ।  
৩ সহ্যাদ্রিবার্ণিত রাজভেদ। ৪ বন্ধুবন্ধিকারী। (অমর ৪।৮২)

মিত্রবর্ষম্ (পুং) জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজ।

মিত্রবাহ (পুং) ১ দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ।

মিত্রবিদ্ (পুং) \*মিত্রঃ বেদীতি মিত্রবিদ্-কিপ্। গুপ্তচর।

মিত্রবিন্দ (ত্রি) ১ বন্ধুলাভ। ২ অগ্নি। ৩ দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ।  
৪ ত্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। ৫ আচার্য্যভেদ। ৬ দ্বিগ্ধ্যাং টাপ্।  
ত্রীকৃষ্ণের পরীভেদঃ

মিত্রবৈর (ক্ৰী) বন্ধুদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী।

মিত্রশর্মন্ (পুং) কয়েকজন পণ্ডিত। (রাজতরঙ্গিনী)

মিত্রশস্ (ত্রি) মিত্রঃ শান্তি ইতি শাস-কিপ্। (শাস-ইনঙ-  
হলোঃ। পা ৩।৪।৩৮) ইত্যত্র কাশিকোক্তেঃ কিপ্ ইতং ততো  
দীর্ঘশচ। সুহৃচ্ছান্তা।

মিত্রসপ্তমী (ক্ৰী) মিত্রায় মিত্রজন্মেন মিত্রস্ত বা সপ্তমী।  
১ মার্গশীর্ষ শুক্লা সপ্তমী। এই দিন কশ্যপের ঔরসে অদিতির  
গর্ভে মিত্র নামক দিবাকরের উৎপত্তি হইয়াছিল বাংলা,  
উহা মিত্রসপ্তমী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই দিন উপবাস  
করিবে অথবা ফলাহার করিয়া থাকিবে।

“অদিতেঃ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মিত্রো নাম দিবাকরঃ।

মার্গশীর্ষস্ত মাসস্ত শুক্রে পক্ষে শুভে তিথৌ ॥

সপ্তমাং তেন সা খ্যাতা লোকেহস্মিন্ মিত্রসপ্তমী।

তত্রোপবাসঃ কন্তব্যো ভক্ষ্যাণ্যথ ফলানি বা ॥”

(সংবৎসরকৌমুদীপুত্র ভবিষ্যপুর্নগ)

মিত্রসম্প্রাপ্তি (ক্ৰী) মিত্রসমাগম। মিত্রলাভ।

মিত্রসহ (পুং) ১ কল্যাণপাদ রাজা। (মহাভারত আদিপর্ব)  
২ হরিবংশবার্ণিত জনৈক ব্রাহ্মণ (ত্রি) ৩ মিত্রের সহিত বাসকারী।

মিত্রসাহ (ত্রি) মিত্রসঙ্গ।

মিত্রসাহস্রয়া (ক্ৰী) স্বর্গস্থ দেবতাভেদ।

“গৌরী বিস্তাথ গান্ধারী কেশিনী মিত্রসাহস্রয়া।

সাবিত্র্যা সহ সর্পান্তাঃ পার্বত্যা যান্তি পৃষ্ঠতঃ ॥”

(মহাভারত বনপর্ব)

মিত্রসেন (পুং) ১ দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ। ২ ত্রীকৃষ্ণের পুত্র-  
ভেদ। ৩ দ্রবিড়রাজভেদ। ৪ বৌদ্ধভেদ।

মিত্রহত্যা (ক্ৰী) বন্ধুবিনাশ।

মিত্রহিংসক (ত্রি) বন্ধুর হিংসাকারী।

মিত্রহন্ (ত্রি) মিত্রঃ হত্বীতি হন্-কিপ্। মিত্রঘ্ন।

মিত্রহু (ত্রি) বন্ধুর আহ্বানকারী।

মিত্রা (ক্ৰী) মিত্র জিগ্মঃ টাপ্। ১ মিত্রদেবের ক্ৰী। ২ স্ত্রিমিত্রা।  
শক্রঘ্নের মাতা। (শব্দরত্নাং) ২ অঙ্গরোভেদ।

“অলম্বা ঘৃতাতী চ মিত্রা মিত্রাঙ্গদা কচিঃ।”

(মহাভারত ১।৭।২৪৪)

৩ পরাশরশিষ্য মৈত্রেয় জননী। (ভাগ০ ৩।৪।৩৫)

মিত্রাকর (ক্ৰী) ছন্দোবদ্ধ পদ।

মিত্রাখ্য (ত্রি) মিত্র নামধেয়। “আখ্যেয়ঃ মিত্রাখ্যঃপদ” (বৃহৎসং)

মিত্রাণবালী, পঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট জেলার অন্ত-  
র্গত একটি নগর। স্থানীয় কার্পাসবস্ত্র এবং শস্তাদির বাণি-  
জ্যের জন্য বিখ্যাত।

মিত্রাতিথি (পুং) জনৈক রাজা। (স্ক ১০১৩৩৭)  
 মিত্রাসুগ্রহণ (ক্ৰী) বন্ধুর প্রতি অসুগ্রহকরণ।  
 মিত্রাভিদ্বেহ (পুং) বন্ধুবিব্রেক।  
 মিত্রায়ু (ত্রি) মিত্রেচ্ছ। (২) পুং (স্ক ১১৭৪১০) দিবোদাসের পুত্রভেদ।  
 মিত্রাবরুণ (পুং) মিত্রচান্দো বরুণশ্চেতি (দেবতাসম্মেচ।  
 পা ৬২।১৪১) মিত্র ও বরুণ। [মিত্র ও বরুণ শব্দ দেখ।]  
 ২ উৎসবভেদ।  
 মিত্রাবরুণবৎ (ত্রি) মিত্রাবরুণযুক্ত। (স্ক ৮৩৫১:৩)  
 মিত্রাবরুণীয় (ক্ৰী) ঋজি মিত্রাবরুণ সম্বন্ধীয়।  
 মিত্রাবহু (পুং) ১ বিশ্বাবহুর পুত্রভেদ। ২ সিদ্ধগণের রাজা।  
 মিত্রিন্ (ত্রি) বন্ধুযুক্ত। (স্ক ১১:৭৮৪)  
 মিত্রিয় (ত্রি) বন্ধু সম্বন্ধীয়। (অথর্ক ২।২৮।১)  
 মিত্রেয়ু (পুং) দিবোদাসের পুত্রভেদ। (ভাগ ৯২২।১)  
 মিত্রেয়ু (ত্রি) যজ্ঞমানগণের ঈরন্যিতাবাদক। “ঋষয়া  
 ইত্রে মিত্রেয়ু” (স্ক ১.১৭৪।৩) “মিত্রেয়ু মিত্রাণাং যজ্ঞমানা-  
 নামীরন্যিতবান্” (সায়ণ)  
 মিত্রেয়ু (পুং) মিত্রশব্দপ্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরস্থ শিবলিঙ্গভেদ।  
 মিত্রোদয় (পুং) ১ সূর্য্যোদয়। ২ বন্ধুবর্গের সৌভাগ্যের উদয়।  
 মিত্র্য (ত্রি) ঐমিদা-স্নেহনে ইতি মিত্র-স্বার্থে যৎ। অমুরভ।  
 (স্ক ৫।৮৫।৭)  
 মিথ, বধ। মেধা। ভাদি। সক। উভয়। সেট্। লট্ মেথতি,  
 মেথতে। লুঙ্ অমেথীং, অমেথিষ্টে।  
 “মেথতি-তে শাস্তার্থঃ শিষ্যঃ পারয়তীত্যর্থঃ” (ভৃগুদাস)  
 মিথস্ (অব্যং) মেথতি ইতি মথ-সম্মে অম্, পুংসদ্রাতি-  
 ভাং হ্রস্বঃ। ১ অতোত্ত, পরস্পর। ২ রহঃ।  
 “বাবহারী মিথস্তেযাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ।” (মহু ১০।৫৩)  
 মিথস্ত্ব (ত্রি) পরস্পর বাধমান বা সংশ্লিষ্টে।  
 “মিথস্ত্ব উত্তরো যত্” (স্ক ৭।২৬।৬)  
 “মিথঃ পরস্পরং তুরো বাধমানা সংশ্লিষ্টা বা।” (সায়ণ)  
 মিথাস্পৃধ্য (ত্রি) পরস্পর স্পর্শাবিষয়। (স্ক ১।১৯৯।৯)  
 মিথি (পুং) মেথতে হিনস্ত শত্রুকুলমিতি মিথ-ইন্। (সর্ক-  
 ধাতুভ্য হন্। উণ্ ৪।১১৭) নিমিরাজতনয়। বিষ্ণুপুরাণে  
 ইনিই জনকরাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। রাজা নিমি  
 অপুত্রক ছিলেন। এহ জন্ত মূনিগণ অবাঞ্ছকতায় তাহার  
 শরীর অরপিতে মন্থন করেন। মন্থনবশতঃ তাহা হইতে  
 একটি কুমার উৎপন্ন হয়। এই কুমারেরই নাম জনক।  
 জনকের পিতা বিদেহ অর্থাৎ বিগত দেহ বলিয়া ইহার  
 অপর নাম বিদেহ। মন্থনবশতঃ ইনি ‘মিথি’ আখ্যা প্রাপ্ত  
 হন। ইহার উদাবজ্ঞ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। (বিষ্ণুপুঃ ৪।৫অ)

রামায়ণে মিথিরাজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—  
 “নিমিঃ পরমদর্শীয়া সকলস্ববতাঃ বরঃ।

তন্ম পুত্রো মিথিনাম জনকো মিথিপুত্রকঃ ॥”

(রামায়ণ ১।৭১।৪৭)

মিথিত (পুং) রাজভেদ।

মিথিল (পুং) রাজর্ষি জনকের নামান্তর।

মিথিলা (ক্ৰী) মথাস্তে শত্রবো যন্তাং। মথ-ইলচ্ (মিথিলা-  
 দয়চ্। উণ্ ১।৫৮)। ততোহকারন্তেৎ নিপাতিতক। স্র-  
 প্রাচীন জনপদভেদ। ইহার রাজধানী মিথিলানগরী ও ইহাই  
 বিখ্যাতকীর্তি রাজর্ষি জনকের পুরী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার  
 অপর নাম বিদেহ। এই জন্ত আমরা মিথিলা-রাজকন্যা সীতা-  
 দেবীকে মৈথিলী ও বৈদেহী শব্দে অভিহিত দেখিতে পাই।

রামায়ণ মহাকাব্যে এই মহাসমৃদ্ধ জনপদের সবিশেষ  
 উল্লেখ আছে। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র তাড়কানিন্দার্থ দশরথ-  
 তনয় রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনপ্রদেশ অতিক্রম  
 করিয়া ক্রমে এই মিথিলায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন।  
 ঐ সময়ে মিথিলাধিপতি জনক এক মহাবজ্রের অমুষ্ঠান  
 করিয়াছিলেন।

এই মিথিলা কোথায়? ইহার সীমানা করিতে নানা  
 লোকে নানাক্রমে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রামায়ণ, পুরাণ ও  
 তন্ত্রাদিতে ইহার অবস্থান সম্বন্ধে যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়,  
 তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে। এখানে দেখা যাউক,  
 মহাকাব্য বাস্মিক মিথিলার অবস্থাননির্ণয়ে কিরূপ পড়া  
 অবলম্বন করিয়াছেন।

তপোধন বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যা  
 হইতে অর্দ্ধ যোজনের অধিক পথ অতিক্রমপূর্ব্বক সরযু  
 দক্ষিণতীরে আসিয়া উপনীত হন। এইখানে তিনি রামচন্দ্র  
 ও লক্ষ্মণকে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্রদ্বয় শিক্ষা দেন।  
 এখানে রাজ্যধাপন করিয়া তাহারা পরদিন প্রভাতে গঙ্গা-  
 সরযুদ্বন্দ্ব সম্মুখীন করেন। এখানে কামদেবের পুণ্যপ্রমে  
 তাহারা সেই রাজ্য অতিবাহন করিয়া পরদিন প্রাত্যহ প্রাতঃ-  
 কৃত্যাদি সমাপনান্তর নৌকাযোগে গঙ্গাবক্ষে দক্ষিণদিকে  
 গমন করিয়া একটি স্থাপদসমূহ বিজন অরণ্য দেখিতে পান।  
 জিজ্ঞাসা করিয়া রামচন্দ্র মূনি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে  
 জানিলেন যে, পূর্বে এই স্থানে মল্ল ও কুরু নামে দুইটি  
 দেব-নির্ম্মিত জনপদ ছিল। তাড়কানাম্নী যক্ষা ও তাহাব  
 পুত্র মারীচ রাক্ষস এই দুই জনপদ ধ্বংস করিয়াছে। নদীতীর  
 হইতে অর্দ্ধ যোজনদূরে তাড়কার বাস। তাহারা তথায়  
 গমন করিয়া তাড়কা রাক্ষসীকে নিধন করেন, তৎপরে

তাহারা মহাশ্মা বামনের সিদ্ধাপ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। এই আশ্রমেই বিশ্বামিত্র অবস্থান করিতেন। তিনি আশ্রমে আসিয়াই যজ্ঞারম্ভ করেন। রাম ও লক্ষ্মণ ৬ রাজি আগিয়া / রাবিসের উপদ্রব হইতে যজ্ঞরক্ষা করিয়াছিলেন।

যজ্ঞসমাপনান্তে বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে জনকরাজার অমুষ্টিত ধর্মবাগ সন্দর্শনার্থ উত্তরদিকে মিথিলাপুরীতে গমন করেন। পথ অতিক্রম করিতে করিতে তাহারা প্রথমে মগধ- (গিরিভূজ) রাজ্যের অন্তর্গত শোণনদী-তীরে আসিয়া সমুপস্থিত হন। এখানে রাজিবাগন করিয়া তাহারা পুনরায় পরদিন প্রাতে পথ হাঁটিতে আরম্ভ করেন। বেলা ত্রিশহরের সময় তাহারা গঙ্গাতীরে আইসেন। আহারাদি সমাপন করিয়া তাহারা নাবিকসাহায্যে গঙ্গার উত্তর-তীরে অবতীর্ণ হইলেন। এখানেই বিশালা নামক মহাপুরী। তাহারা বিশালাধিপতি স্মৃতির আতিথেয় গ্রীত হইয়া সেই রাজি তথায় অতিবাহিত করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা মিথিলায় গৌতমশ্রমে পাষণময়ী অহল্যাকে উদ্ধার করিয়া পূর্বোক্তর-কোণাতিমুখে জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

রামায়ণের বর্ণনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত না হইলেও বিশালায় উত্তর-পূর্বকোণে মিথিলার অবস্থিতি জানিতে পারা যায়। বিশালায় উত্তরেই মিথিলারাজ্য। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াংএর সময়ে গঙ্গার উত্তরস্থ সমুদায় প্রদেশ বৃজ্জি নামে খ্যাত ছিল। এই বৃজ্জি তিনটা ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত ছিল;—১ বৈশালী বা বিশালা, ২ তীরভূক্তি এবং ৩ বৃজ্জি বা মিথ্যার। পৌরাণিক তত্ত্বানুসারে নিমির পুত্র মিথি হইতেই মিথিলারাজ্য স্থাপিত হয়। সুতরাং মিথিলা বে বর্তমান হিত্তের (তীরভূক্তির) কোন অংশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরাণ-প্রসঙ্গে জানা যায়, বৈবস্বত মহুর পুত্র ইক্ষাকু স্বর্গাবংশীয় প্রথম রাজা। তাহার শত পুত্র মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড নামে তিন পুত্র সর্গশ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিকুক্ষি হইতেই রামচন্দ্রাদি স্বর্গাবংশীয় নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন। নিমি মিথিলাধিপতি জনকবংশের আদিপুরুষ।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—

“নিমিঃ পুত্রস্ত তদৈব মিথির্নাম মহান্ স্মৃতঃ।

প্রথমঃ ভূজবলৈর্ধেন তৈরহুতস্ত পার্শ্বতঃ ॥

নিশ্চিতং স্বীর ন্যাসা চ মিথিলাপুরমুত্তমম্।

পূরীজননসামর্থ্যার্জনকঃ স চ কীৰ্ত্তিতঃ ॥”

নিমির পুত্র মিথি, এই মিথি তীরহুতের এক দেশে স্বনামে মিথিলাপুর-নগরী নির্মাণ করেন। পুরীজননের সামর্থ্য-

হেতু তিনি জনক নামে কথিত হন। মিথিল, বৈদেহ ও জনক এই তিনটাই তাহার নামান্তর। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, মৃতদেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া, তাহার নাম জনক। তাহার পিতা বিদেহ (দেহরহিত) হন বলিয়া তাহার নাম বৈদেহ এবং মৃদন দ্বারা তাহার জন্ম হয় বলিয়া তিনি মিথি নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে।\*

বাম্বোক্তি-রামায়ণে নিমির পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

“নিমিঃ পরমধন্যাত্মা সর্গতত্ত্ববতাঃ বরঃ।

তস্ত পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ ॥”

জনকের নামানুসারে তৎপরবর্তী মিথিলাধিপতিগণ বংশ-পরম্পরায় জনক আখ্যা লাভ করিয়াছেন। অযোধ্যাধিপতি দশরথ-তনয় রামচন্দ্রে যে জনকহুতার পাণিগ্রহণ করেন, সেই জনকনন্দিনী সীতাদেবী রাজা দ্রুপদোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজর্ষি সীরধ্বজের যজ্ঞভূমি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিলেন, সেই হেতু ঐ যজ্ঞচত্বর সীতামাড়ী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। রাজা দ্রুপদোমার কনিষ্ঠ পুত্র সাঙ্কশুনগরাদিপ কুশধ্বজের তনয়া মাণ্ডবীকে ভরত এবং শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্ন পরিণয় করেন। সীরধ্বজের অন্যতমা হুহিতা উশ্মিলা লক্ষ্মণের সহধর্মিণী হইয়াছিলেন।

রামায়ণ হইতে চন্দ্রবংশাশ্রিত জনকবংশের এইরূপ একটা তালিকা পাওয়া যায়,—১ নিমি, ২ মিথি, ৩ জনক, ৪ উদাবস্তু, ৫ নন্দিবন্ধন, ৬ স্নকেতু, ৭ দেবরাত, ৮ বৃহদ্রথ, ৯ মহাবীর্ঘ্য, ১০ সুর্য্যতি, ১১ ধৃষ্টকেতু, ১২ হর্যাস্থ, ১৩ মরু, ১৪ প্রসিদ্ধক, ১৫ কুন্তিরথ, ১৬ দেবমীচ, ১৭ বিবুধ, ১৮ অক্ষক, ১৯ কুন্তিরথ, ২০ কুন্তিরোমা, ২১ স্বর্ণরোমা, ২২ দ্রুপদোমা, ২৩ জনক ও কুশ-ধ্বজ। একত্ব বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ৫ অধ্যায়ে উক্ত বংশের একটা বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—১ নিমি (বিদেহ), ২ জনক (বৈদেহ, মিথি), ৩ উদাবস্তু, ৪ নন্দিবন্ধন, ৫ স্নকেতু (কেতু), ৬ দেবরাত, ৭ বৃহদ্রথ (বৃহদ্রথ), ৮ মহাবীর্ঘ্য, ৯ সুর্য্যতি, ১০ ধৃষ্টকেতু, ১১ হর্যাস্থ, ১২ মরু, ১৩ প্রতিবন্ধক,

\* শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে লিখিত আছে,—

“অরাজকভয়ং নৃণাং মন্তমানা মহর্ষয়ঃ।

দেহঃ সমস্তুঃ স নিমিঃ কুমারঃ সমজারতঃ।

জন্মনা জনকং সোহভূষিতদেহস্ত বিদেহজঃ।

মিথিলা মথনাজাতো মিথিলা বেন নির্দিতা ॥” (ভাগবত ৯।১৩।১৩-১৪)

+ উক্ত ভাষায় লিখিত, আইন-তীরহুত প্রদেশে লিখিত আছে যে, একাপালনে পিতৃসদৃশ ছিলেন বলিয়া এই রাজবংশ জনক নামে উক্ত হইয়াছে।

১৪ কৃতরথ (কৃতিরথ), ১৫ কৃতি (দেবীকৃতি), ১৬ বিবুধ, ১৭ মহাধতি, ১৮ কৃতিরাত, ১৯ মহারোমা, ২০ সুবর্ণরোমা, ২১ সুবরোমা (সুবরোমা), ২২ সীরধ্বজ ও কুণ্ডলজ, ২৩ সীর-ধ্বজপুত্র তাহ্মান ও কস্তা সীতাদেবী, ২৪ শতচ্যাম, ২৫ শুচি, ২৬ ঈর্জবহ (উর্জবাহ), ২৭ সত্যধ্বজ (ভারবাহ), ২৮ কুণি, ২৯ অঙ্গন, ৩০ শতুজিৎ (কৃতুজিৎ), ৩১ অরিষ্টনেমি, ৩২ ক্রতায়ু (শতায়ু), ৩৩ ক্রতায়ু, ৩৪ সুপার্ব (সুপার্ব), ৩৫ সঙ্গর (সংসর), ৩৬ কেমারি, ৩৭ অনেনা, ৩৮ মীনরথ (মানরথ), ৩৯ সত্যরথ, সাতারথি, ৪০ উপগু, ৪১ ক্রত (উপগুপ্ত), ৪২ শাশ্বত, ৪৩ সুধা, ৪৪ সুভাস (ভাস বা সুভাষ), ৪৫ সুক্রত, ৪৬ জয়, ৪৭ বিজয়, ৪৮ শত, ৪৯ সুনয়, ৫০ স্বীতহবা, ৫১ সঙ্গর, ৫২ কেমারি, ৫৩ স্বতি, ৫৪ বহলাধ এবং ৫৫ কৃতি। ইহারা সকলেই রাজসি বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

ভায়বর্ননপ্রপেতা মহর্ষি গৌতম এই জনকবংশের পুরো-হিত ছিলেন। এই মিথিলার তাঁহার বাস ছিল। তাঁহার লমর হইতেই মিথিলার বিশেষভাবে ভায়বর্ননের চর্চা চলিয়া আসিতেছে।\*

মহর্ষি গৌতম মিথিলার যেখানে তপশ্চর্যা করিতেন, অত্মপিও সেই স্থান পৌতমাশ্রম নামে কথিত হইয়া থাকে। এই গৌতমাশ্রম বর্তমান তরোরা পরগণার ব্রহ্মপুর মৌজার অবস্থিত। পৌতমগরী অহল্যা যেখানে বায়ুপুত্র ভক্ষণে জীবিতা এবং ভক্ষণপরি বোগনিমগ্না থাকিয়া রামচন্দ্রদর্শনে শাপমুক্ত হন, সেই স্থান আজিও অহল্যাগুহান নামে পরিচিত। ঐ স্থান জাঁটেল পরগণার মহাআরী মৌজার প্রদর্শিত হইতেছে। শিবধর্ম ভক্ত করিয়া যে সময়ে রামচন্দ্র জানকীকে বিবাহ করেন, সেই সময়ে অহল্যাগুহাজাত পৌতমপুত্র লতানন্দ জনক সীরধ্বজের পৌরোহিত্য করিতেছিলেন।

ভবিষ্যপুরাণের ‘তৈরহুতস্ত পার্বতো’ বচনপ্রমাণে অনুমান করা যায় যে, এই রাজ্য তাঁরহুত নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। অস্তান্ত্র সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁরহুত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁরহুত শব্দ দ্বারা নদীকূলান্তর্গত বা নদীতীর-পরিবেষ্টিত রাজ্যকেই বুঝায়। তাঁরহুত ও তাঁরহুত শব্দ একই প্রদেশ, তাহা আনুমানিক প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে। শক্তি-লক্ষ্যমত্রে এই তাঁরহুতরাজ্যের এইরূপ লীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

\* নবদ্বীপের সুখোদ্বলকারী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাহুদেব সার্বভৌম মিথিলা হইতে ভায়বর্নন অধ্যয়ন করেন। খ্যাতনামা রঘুনাথ সিরোমণি, ও অর্জুন রঘুনন্দন দ্বারবর্ননের অন্তর্গত সর্বপ্রাচীন পঞ্চধর্মসিদ্ধের ছাত্র ছিলেন।

“গণ্ডকীতীরমারভ্য চম্পারগ্যাস্তপঃ শিবে।

বিদেহকুঃ সমাখ্যাতা তৈরহুতান্তিথঃ স তু।”

অর্থাৎ বিদেহ বা তাঁরহুত দেশ গণ্ডকীতীর-তীর হইতে আরম্ভ করিয়া চম্পারগের (চম্পারণ) শেষ লীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

পঞ্জীকৃত বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—

“কৌশিকীচ সমারভ্য গণ্ডকীমধিমগা যৈ।

যোজনানি চতুঃসিংহাচারামঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ।

গঙ্গাপ্রবাহমারভ্য বাবট্টৈর্মবতঃ বনদ্।

বিস্তারঃ ষোড়শ প্রোক্তো দেশস্ত কুলনন্দন।

মিথিলা নারনগরী তত্রাক্তে লোকবিশ্রুতাঃ।”

কৌশিকী হইতে গণ্ডকী পর্যন্ত মিথিলার পূর্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ্য ২৪ যোজন এবং গঙ্গা হইতে হৈমবত-বন পর্যন্ত বিস্তার ১৬ যোজন। ইহাতে জানা যায় যে, মিথিলার পশ্চিমে গণ্ডকী, পূর্বে কৌশিকী, দক্ষিণে গঙ্গা এবং উত্তরে হৈমবত-বন বা হিমালয় পর্বত। এতদ্বারা তাঁরহুত নামেরও সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে।

এরূপ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, রামায়ণ বর্ণিত বিশালা পুরী কোথা গেল? অবশ্য স্বীকার্য যে, মিথিলার প্রভাষ বর্ধিত হইলে বিশালা রাজ্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও তাই বিশালপুরকে (সর-কার হাজিপুর) তাঁরহুতের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছে। অথবা বিশালা-রাজবংশ বিলুপ্ত হইলে উক্ত রাজ্য মিথিলেশ্বরের অধীন হইয়াছিল, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

মহাভারতেও এই সম্বন্ধ জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

“ততঃ কোবঃ সমালার বাহনানি চ কুরিণঃ।

পাকুনাং মিথিলাং পশ্চাৎ বিদেহাঃ সমরে জিতাঃ।”

(ভারত ১১১৩১৮)

পাণ্ডবেরা মিথিলার আসিয়া বিদেহরাজকে সমরে পরাভূত করিয়াছিলেন। এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সময়ে মিথিলারাজ্যের সমৃদ্ধির আদৌ হাস্য হয় নাই। ভারতীয় যুদ্ধে বিদেহরাজ কোরবকে বধ করিয়াছিলেন। (ভীষ্মপর্ব)

নিম্ন হইতে ৫৬ পুরুষ অশ্বত্থন মহারাজ কৃতি হইতেই জনকবংশের অবসান হয়। আইন-তাঁরহুতের গ্রন্থকার বলেন যে, জনক শব্দের অপভ্রংশে জন শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, উহা জনকার্থ বোধক।

জনকবংশের অবসানের পর, অমর ১১৪৬ সংবতে

(১০৮৯ খৃষ্টাব্দে) নান্দদেব নামা জটনক ক্ষত্রিয়কে তীরহতে রাজত্ব করিতে দেখিতে পাই। নেপাল তরাইএর দোস্তিয়া পূর্গণার শিমরাওন্ গড় নান্দদেবের কীর্তি। উক্ত দুর্গের শিলাফলকে লিখিত আছে,—

“নন্দেন্দুবিন্দুবিশ্বসম্মিতশাকবর্ষে ১০১৯

তৎশ্রাবণে সিতপলে মুনিসিদ্ধিতিথ্যাম্।

স্বাতিশনৈশ্চরদিনে করিবৈরিলয়ে

ত্রীনান্দদেবনৃপতিবিদ্যত বাস্তুম্ ॥”

নান্দদেব নৃপতি ১০১১ শকে অর্থাৎ ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিহতে আগমন করেন। তৎপরে ১০১৯ শকাল্বে শ্রাবণ মাসে গুরুা সপ্তমী তিথিতে স্বাতিনক্ষত্রাশ্রিত শনিবারে সিংহলয়ে এই কেল্লা নির্মাণ করেন। এখনও তরাইর মধ্যে এ৭ ক্রোশ ব্যাপিয়া ঐ প্রাচীন গড়ের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই নেপাল তরাই-প্রদেশ পূর্ববর্ণিত হিমবদ্বন। তরাই শব্দে বন ও পক্ষতপার্শ্ব বুঝায়।

রাজ্যারোহণের পূর্বে নান্দদেব একটা মর্পের ফণায় নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি দেখিতে পান বলিয়া প্রবাদ আছে।—

“রামো বেত্তি নলো বেত্তি বেত্তি রাজা পুরুবাসঃ।

অলকন্ত ধনং প্রাপ্য নাত্তো রাজা ভবিষ্যতি ॥”

বাহাই হউক, তিনি সীতামাড়ী মহকুমার মামপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই বংশের ছয় জন রাজার রাজত্বের পরই, নান্দদেবের বংশ বিলুপ্ত হয়। নিম্নে তাঁহাদের নাম ও রাজ্যকাল প্রদত্ত হইল।

নাম	খৃষ্টাব্দ
১ নান্দদেব (নানাদেব)—	১০৮৯—১১২৫
২ গঙ্গাদেব	১১২৫—১১৩৯
৩ নবসিংহদেব	১১৩৯—১১৯১
৪ বাসিংহদেব	১১৯১—১২৮৩
৫ শক্তিসিংহদেব	১২৮৩—১২৯৫
৬ হরিসিংহদেব	১২৯৫—১৩২৪

১০১১ শক হইতে এই রাজবংশ ১২৪৫ শক পর্যন্ত অর্থাৎ ১০৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৩৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তৎপরে এখানে রাজা ভবসিংহ-বংশের অভ্যুত্থান হয়।

সুলতান শামসুউদ্দীন আল্‌তমিশের সাম্রাজ্যকালে বাঙ্গালার সুবাদার সুলতান গয়াসুউদ্দীন এছতরাজ নরসিংহদেবকে পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে করগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন বর্ষে রাজা নরসিংহদেব মুসলমানের

করদ হন, তাহার কিছুই জানা যায় না। তবে গয়াসুউদ্দীন যে ১২১২ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন, তাহা মুসলমান-ইতিহাস-পাঠক-মাত্রই অবগত আছেন। সুতরাং উহার কোন সময়ে তিনি সম্ভবতঃ তীরহতে জয় করিয়া থাকিবেন।

গয়াসুউদ্দীন তোগলক দিল্লী-সিংহাসনে আসীন হইয়া ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের বিদ্রোহী সুবাদার বাহাদুর খাঁকে দণ্ড-বিধানার্থ সসৈন্তে সুবর্ণগ্রামাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি বাহাদুর খাঁকে শাসিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া প্রত্যাগত হইবার সময় তীরহতে রাজ্য অক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাজ হরিসিংহদেব তীরহত-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ফিরিয়ার ইনি “রায় তীরহত” নামে উক্ত হইয়াছেন।

হরিসিংহদেবের পরাজয়-সম্বন্ধে পঞ্জীগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

“বাণাক্ষিগুপ্তশিশসম্মিতে শাকবর্ষে

পৌষশু শুক্লনবমী রবিহুস্ববায়ৈ।

তাত্তা সুপট্টনপুরীঃ হরিসিংহদেবো

দুর্দ্দৈবদেশিতপথোখগিরিং বিবেশ ॥”

অর্থাৎ ১২৪৫ শকে (১৩২৪ খৃষ্টাব্দে) হরিসিংহদেব সুপট্টন-পুরী পরিত্যাগপূর্বক পক্ষতে প্রবেশ করিলেন। অতএব উক্ত বৎসর হইতেই তীরহতের মুসলমানাধিকার ধরিতে হইবে। গয়াসুউদ্দীন তীরহতের জঙ্গল কাটিয়া রাজাকে ধৃত করেন। ঐ সময়ে ত্রিহত একটা স্বতন্ত্র সুবাদ বিভক্ত হয় এবং আক্ষদখাঁ তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরিস্কৃত বনাস্তরালসমূহ লোকালয়ে পরিণত হইয়াছিল। আইন-তীরহত বলেন যে, দরভাঙ্গা নগরও ঐরূপে বহুবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পতন হইয়াছিল। ইহার পর ২৪ বৎসর কাল কোন রাজা বা শাসনকর্তা এখানে আধিপত্য করেন নাহ।

সম্ভবতঃ মুসলমান-শাসনের বিশৃঙ্খলতা অথবা অরাজকতা-নিবন্ধনই পূর্বোক্ত রাজা হরিসিংহদেবের সভাপণ্ডিত কামেশ্বর বা (ইনি মৈথিল-ব্রাহ্মণ ছিলেন) দিল্লীস্থর মহম্মদ তোগলকের নিকট হইতে ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে সরকার-তীরহতের বন্দোবস্ত করিয়া লন এবং তাহা খ্যায় মধ্যম পুত্র ভবসিংহদেবকে সমর্পণ করেন। মহারাজ ভবসিংহ ১৩৪৫ হইতে ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৭ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে গোড়াধিপ মালিক-হাজি ইলায়স শামসুউদ্দীন বাঙ্গড় হাজিপুরে রাজধানী নির্মাণ করেন।

ভবসিংহের মৃত্যুর পর, তাহার ছোট পুত্র দেবসিংহ পিতৃ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। দেবসিংহ ১৩৮৫ হইতে ১৪৪৮



খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬১ বর্ষ রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। শাকুরি গ্রামে তাঁহার নিশ্চিত একটা স্মৃৎসং দীঘিকা বিস্তৃমান আছে।

শিবসিংহ ও পদ্মসিংহ নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ তনয় শিবসিংহই রাজপদ প্রাপ্ত হন। পরিস্কার-পুর জঙ্গী পরগণার লহরারাজ গ্রামে তাঁহার রাজপ্রাসাদ ও চূর্ণ জঙ্গল ও ইষ্টকস্তূপে পরিণত রহিয়াছে। ঐ রাজবাটীর সম্মুখে একটা ২ মাইল দীর্ঘ দীর্ঘিকাও তিনি খনন করান।

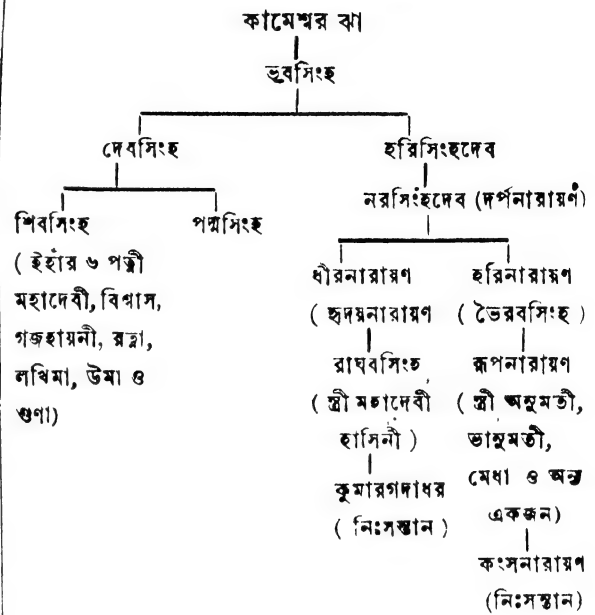
১৪৪৬ হইতে ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩ বর্ষ ৯ মাস কাল রাজ্য ভোগ করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ছয় পত্নীর মধ্যে মহারাণী লক্ষ্মী দেবী ও মহারাণী বিশ্বাস দেবী যথাক্রমে ১৪৪৯ হইতে ১৪৬০ পর্য্যন্ত ১১ বৎসর এবং ১৪৬০ হইতে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২ বৎসর কাল রাজ্য করেন।

বিশ্বাস মহাদেবীর মৃত্যুর পর, দেবসিংহের বৈমাত্রেয় হরিসিংহদেবের পুত্র দর্পনারায়ণ (নরসিংহ) ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হৃদয়নারায়ণ (ধীরনারায়ণ) ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসর রাজত্ব উপবিষ্ট ছিলেন। হৃদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তদীয় সোদর হরিনারায়ণ ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিরাপদে রাজ্যভোগ করিয়া গোড়াধিপ নসরংশাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

নসরংশাহ কেন ত্রিহত আক্রমণ করেন, তৎসম্বন্ধে ইতিহাসে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। ১০৫৬: (১৪৯৯ খৃ:) দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন সিকেন্দর শাহ বিহারপ্রদেশ জয়লাভে অগ্রসর হন। ক্রমে তিনি বাঙ্গালা অধিকার-মানসে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, গোড়াধিপ আলাউদ্দীন হুসেনশাহ সন্ধিপত্র দ্বারা সম্রাটকে বিহার, ত্রিহত ও সারণ প্রদেশ ছাড়িয়া দেন। বাবরশাহের ভারতাক্রমণকালে সুযোগ পাইয়া নসরংশাহ গোড়রাজ্যচ্যুত জেলাগুলি হস্তগত করিবার মানসে ভারত আক্রমণ করিলেন। তিনি যুদ্ধে হরিনারায়ণকে বধ করিয়া স্বীয় জামাতা আলাউদ্দীনকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

অতঃপর রূপনারায়ণ (১৫১২-১৫৪২ খৃ:) এবং তৎপুত্র কংসনারায়ণ (১৫৪২-১৫৪৮ খৃ:) পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষদিগের সিংহাসনে উপবেশন করিলেও প্রকৃতপক্ষে আলাউদ্দীনই তৎকালে ভারতের স্ববাদার ছিলেন। তাঁহার নামে মাত্র রাজ্য ছিলেন। বিজাপতি ঠাকুর তাঁহার পদাবলীতে এই রাজবংশের একজন রাজার গুণানুকীর্ণ করিয়াছেন।

নিম্নে ভবসিংহের বংশাবলী প্রদত্ত হইল।



কামেশ্বর বাবর বংশের পর, কোন বংশ তীরহুতের রাজা হন, তদ্বিষয়ে পঞ্জীগ্রন্থে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন মতে রাজা কংসনারায়ণের কায়স্থ-কায়চারী (মজুমুদার) ১৫৩ হইতে ১৫৪ ফসলি পর্য্যন্ত রাজত্ব চালান এবং তৎপরে ১৫৫ হইতে ১৬৩ ফসলি পর্য্যন্ত ত্রিহতে কোন রাজা ছিলেন না। অত্র পঞ্জীকার বলেন, ১৫৬ ফসলি পর্য্যন্ত মহারাজ ভবসিংহের বংশই এখানকার শাসনভার তত্ত্ব ছিল। অতঃপর মহেশ ঠাকুরের বংশে ত্রিহতের রাজত্ব যায়। অপর একজন পঞ্জীকার লিখিয়াছেন, ১৫৬ হইতে ১৫৯ ফসলি পর্য্যন্ত ৩ বৎসর মজলিস্ খাঁর আদেশে এখানকার রাজকায্য পরিচালিত হইয়াছিল। হান জাতিতে মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুলতানের দরবার হইতে খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। অত্র আর একখানি পঞ্জীতে দৃষ্ট হয় যে, ১৫৬ হইতে ১৬৫ ফসলি পর্য্যন্ত ৯ বৎসর ৮ মাস ৭ দিনকাল বিহোর রাজপুত্রবংশ এখানে রাজত্ব করেন। ঐ পাঁচ জন বিহোর রাজপুত্র রাজার নান নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

নাম	রাজ্যকাল
১ বীরবল ওরফে রূপনারায়ণ	৭ মাস
২ উম্মাদসিংহ	১১ মাস
৩ খজাসিংহ	৩ বৎসর ২ মাস
৪ কোশেশ্বর সিংহ	৫ বৎসর
৫ মন্মথসিংহ	৭ দিন।

সুতরাং দেখা বাইতেছে যে, কংসনারায়ণের মৃত্যুর পর মজলিস খাঁ ও বিহোর রাজপুত্রগণের শাসনকাল আরম্ভ হয়। সত্ৰাট অকবলশাহ এই ত্রিহতের কতকাংশ মহেশ ঠাকুর-নামা জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণের ছাত্র রঘুনন্দন রায়কে তাঁহার বিস্তার পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করেন। রঘুনন্দন আবার ঐ সম্পত্তি গুরুদক্ষিণার স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। ক্রমে মহেশ ঠাকুরের পুত্র গোপাল ঠাকুর ঐ তীরহত সম্পত্তি হস্ত-গত করেন, তাহা দরভাঙ্গা শব্দে বিবৃত হইরাছে।

[ দরভাঙ্গা দেখ। ]

পূর্বোক্ত মিথিলা জনপদ কালে ভীরহত ও দরভাঙ্গার রাজসরকারের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বিভিন্ন বংশীয় পাঠান ও মোগলশাসনকর্তৃগণেরও সময়ে বিভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়।

কিন্তু সেই সুপ্রাচীন মিথিলাপুরী কোথায় গেল? অনেকে বলেন, মুরঃকরপুর জেলার অন্তর্গত সীতামাড়ির প্রায় ১৩১৪ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত জনকপুর গ্রামই মিথিলারাজ জন-কের নামানুসারে মিথিলাপুরের পরিবর্তে বোঝিত হইয়াছে। উহা এক্ষণে নেপালরাজ্যভুক্ত এবং নেপাল-তরায়েয় মধ্যগত। উল্লিসম্ বোর্ডস্কৃত ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার মানচিত্রে উক্ত জনকপুরগ্রাম মঘবান্, মোরাবান্, মোঙ্গল বা মোরঙ্গ রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট দৃষ্ট হয়। জনকপুরের দেবোত্তর সম্পত্তি সখ্যে তথাকার রামচন্দ্রজী মন্দিরের মোহান্ত মহা-শয়ের নিকট ছইখানি দানপত্র দৃষ্ট হয়। উহার প্রথম-খানি মঘবানপুরের রাজা মাণিক কতৃক ১৭৮৪ সংবতে (১৭২৮ খৃঃ অঃ) প্রদত্ত হয়। গোরখা-সৈন্ত মঘবানপুরের রাজাকে দুরীকৃত করিয়া তরাইরাজ্য আত্মসাৎ করিলে গোরখা-রাজ গীর্ষণ বিক্রমশাহ রাজা মাণিকসেনের দান স্বীকার করিয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে অপরখানি প্রদান করেন। গোরখারাজ পুথানারায়ণ শাহের পৌত্র রণবাহাদুর শাহের ঔরসে গীর্ষণ-বিক্রমের জন্ম হয়।

মিথু (অব্য০) মিথ্যা, অসত্য। “গাত্রাপ্যসিনা মিথুঃ।” (ঋক্ ১১৬২২০) “মিথু মিথ্যা বার্থম্” (সারণ)

মিথুন (রা.) মেঘতাতি মিথু- (সুধিপিশিমিথঃ কিং। উণ- ৩৫৫) ইতি উননকিডাবাদ্গণাভাবচ্। জী ও পুরুষের বুয়, জী এবং পুরুষ।

“মা নিবাদ।” প্রতিষ্ঠাঃ স্বমগমঃ শাস্তীঃ সমাঃ।

বং ক্রোঞ্চমিথুনাংদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।”

(রামায়ণ ১২।১৫)

পর্যায়—বৃহৎ, বৃহৎ। (অমর)

২ মেঘাদি ষাদশরাশির অন্তর্গত তৃতীয়রাশি। পর্যায়—মিতুম। মৃগশিরা নক্ষত্রের শেষার্ধ, এবং সমুদয় আদ্রানক্ষত্র এবং পুনর্ব্বজনক্ষত্রের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত এই মিথুনরাশি। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গদাধারী পুরুষ এবং বীণা-ধারিণী স্ত্রী।

এই রাশি শীর্ষোদয়, পশ্চিমদিক্ স্বামী, বায়ুপ্রকৃতি, হরি-বর্ণ, বনস্থিত, শূদ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, মধ্যাত্মীসঙ্গ, মধ্যমসম্মান।

এই রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে, জাতক ত্রৈণ, সূর্যতকুশল, তাত্ত্বদৃষ্ট, শাস্ত্রার্থবেত্তা, দূতকর্মকারী, কৃষিকেশবিশিষ্ট, হস্ত, ইঙ্গিত ও দ্যুতবেত্তা, মনোহর-শরীরসম্পন্ন, প্রিয়ভাবী, অতিশয় তক্ষণকৃতি, গীতপ্রিয়, নৃত্যবেত্তা এবং উন্নতনাগা-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক)

কোষ্ঠীপ্রদীপমতে মিথুনরাশিতে জন্ম হইলে যুগ্মগতি, হিরগাজসম্পন্ন, পরহিতকারী, মলিনপ্রকৃতি ও মলিন বেশ-ধারী, বাতশ্লেষযুক্ত, এবং গীতবাণ্ডে অসুস্থ হইয়া থাকে।

২ মেঘাদি ষাদশ লয়ের তৃতীয়। অরনাংশশোধিত লয়-মান ৫২৮২০, এইমান কলিকাতার নিকটবর্তী স্থলের জানিতে হইবে। এই লয়ের হোরা ২৪৪২০, দ্রেকোণ ১৪২২৬৪০, নবাংশ ৩৩৬২৮৫৩২০, ষাদশাংশ ৩২৬২১৪০, ত্রিংশাংশ ৩১৩৪৬৪০।

এই লয়ে জন্মগ্রহণ করিলে প্রিয়বাক্যযুক্ত, বিশিষ্ট-কর্মকারী, মিশ্রপ্রকৃতি, দ্বিমাতৃক, অল্পমতিমান, শুক্ল ও সাধু-গণের পূজা, অল্পসহোদর ও অল্পচেষ্টাধিত, শত্রুমর্দনকারী, স্ত্রী, ধর্মসাধক, অনেক কর্মে নিযুক্ত এবং সর্বদা রোগযুক্ত হইয়া থাকে, এই লয়ে জাতব্যক্তি মনুষ্য, সর্প, বিঘ, মৃগ, কিংবা সলিল হইতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।

রাশি ও লয়ের মধ্যে যিনি বলবান্, তদনুসারে ফল-গণনা হইয়া থাকে।

রবি প্রকৃতি গ্রহগণ মিথুনরাশিতে থাকিলে নিম্নোক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। মিথুনরাশিতে রবি থাকিলে মেঘাবী, মধুরবাক্যসম্পন্ন, বাৎসল্যগুণযুক্ত, বেদাচারপরায়ণ, বিজ্ঞান-শাস্ত্রকুশল, বহু ধনসম্পন্ন ও উদারচেষ্টাযুক্ত, নিপুণ, জ্যোতি-বেত্তা, সৌভাগ্যসম্পন্ন এবং বিনীত হয়।

ঐ রবি যদি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে রিপু ও বান্ধব দ্বারা পীড়াপ্রাপ্ত, বিদেশগমনে পীড়িত এবং বহু বিলাপ-যুক্ত হয়। মঙ্গল দেখিলে সর্বদা রিপুতর, ও কলহ, দীনতা-যুক্ত এবং সলজ্জ হয়। বুধ দেখিলে রাজার দ্বার বিখ্যাত, নির-স্তর শত্রুসংতাপ, বান্ধবযুক্ত ও জ্ঞানযুক্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি দেখিলে শাস্ত্রদণ্ডী, স্ত্রী, রাজাযুক্ত, বিদেশগমনশীল,

সুহ ও সর্বদা উৎসাহসম্পন্ন হয়। শুক্র দেখিলে ধর্ম, দার্য ও পুত্রযুক্ত, অন্ন মেহবিশিষ্ট, রোগহীন, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও চপল হইয়া থাকে। শনি দেখিলে বহুভ্রাতৃযুক্ত, উদ্বিগ্নচিত্ত, ললনা বিয়োগ এবং মৃত্যু হইয়া থাকে।

মিথুন রাশিতে চন্দ্র থাকিলে সর্বদা সন্তুষ্ট, শৃঙ্গারবিশিষ্ট ও কাব্যকলাবেত্তা, বিষয়সুখপরায়ণ, বৃদ্ধদের স্থায় নয়ন-বিশিষ্ট, শিরায়ুক্ত, সৌভাগ্যশালী, হাস্য ও প্রিয়বচনযুক্ত, জাজ্ঞিত, আরতদেহ এবং দ্বিমাতৃক হইয়া থাকে। ঐ চন্দ্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রাজ্ঞ, ধনহীন, রূপবান্, ধার্মিক এবং দুঃখী হয়। মঙ্গল দেখিলে অতিশয় শূর, অতি প্রাজ্ঞ, সুখবাহন ও বিভবসম্পন্ন হইয়া থাকে। বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অর্থোপার্জনে কুশল, অপরাজিত, ও সুখী হয়। বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে বিত্তা ও শাস্ত্রে গুরু, বিখ্যাত, সত্যবান্, রূপবান্, মাত্ত ও বক্তা হয়। শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্বদা শ্রেষ্ঠ-যুবতী, মালা, বস্ত্র, উত্তম বাহন, এবং ভূষণাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া থাকে। শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে বন্ধুহীন, দরিদ্র এবং লোকদ্বেষ্টা হয়।

মিথুনরাশিতে বুধ থাকিলে গুণবৈশিষ্ট্য, প্রিয়ভাষী, বিখ্যাত মতিমান্, প্রাধান্য, মানা, বিখ্যাত, সুখা, অশ্বের স্থায় ক্রীড়নশীল, স্ত্রী-পুত্রের সহিত বিবাদরত, কাব্যকুশল, কবি, বহুকর্ম, বহুপুত্র এবং অনেক মিত্রযুক্ত হয়। বুধ মিথুনের স্বর্গহ, এইজন্য এই স্থলে শুভফলদায়ী হইয়া থাকে।

এই বুধ রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে যথার্থকথনশীল, মধুর-ভাষী, রাজবল্লভ, প্রভু, সূক্ষ্মর চেষ্টাযুক্ত এবং লোকদয়িত হয়। চন্দ্র দেখিলে সূক্ষ্ম, মধুরভাষা, অতিশয় বাচাল, শত্রুবৎসল, সুদৃঢ়কায়সম্পন্ন এবং সর্বকাণ্ডে মঙ্গলপর হয়। মঙ্গল দেখিলে গুণগাজযুক্ত, মলিনদেহ, প্রাতিভাসম্পন্ন, নরেন্দ্রভ্রাতা ও অত্যাশ্রিতর হয়। বৃহস্পতি দেখিলে রাজমহা, শ্রেষ্ঠ আকৃতিযুক্ত, উদার-প্রকৃতি, বিভবশালী এবং শূর হয়। শুক্র দেখিলে পণ্ডিত, রাজভ্রাতা বা নৃপতি এবং সৌভাগ্যনারত থাকে, শনি দেখিলে সত্যত বুদ্ধিযুক্ত, বিনীত, এবং যে কাব্য আরম্ভ করে, তাহা সফল হইয়া থাকে।

মিথুনরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে অজ্ঞায় উপায়ে ধনসঞ্চয়-শীল, বিজ্ঞ, বাগ্ম্য, সূক্ষ্মর কর্মকারী, শুক্র ও বাক্যবের মাত্ত, লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ, সংকবি ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।

এই বৃহস্পতি যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ, আশ্বের স্ত্রোত্র প্রদান, কুটুম্বযুক্ত, পুত্র দার্য ও ধনসম্পন্ন হয়। চন্দ্র দেখিলে ধনবান্, মাত্তবৎসল, সূক্ষ্মতীক্ষ্ণসম্পন্ন, সুখী এবং ব্যয়হীন হয়। মঙ্গল দেখিলে যুদ্ধজ্ঞতা, বিকতশরীর-বিশিষ্ট, ধনান্বিত ও লোকপূজিত হয়। বুধ দেখিলে জ্যোতিষ-

শাস্ত্রে কুশল, বহুপুত্র ও বিরূপবাক্যসম্পন্ন হয়। শুক্র দেখিলে দেবপ্রাসাদের কর্মকারী, বেজাশক্ত ও স্ত্রীলোকের প্রিয় হয়। শনি দেখিলে গ্রাম-নাগরাদির অধিপতি এবং প্রধান হয়।

মিথুনরাশিতে শুক্র থাকিলে—বিজ্ঞানকলা ও শাস্ত্রে প্রথমবুদ্ধিসম্পন্ন, অতিশয় বিখ্যাত, বাচাল, নৃত্যগীতাদিতে কুশল, বহুযুক্ত, দেবদিক্কাহুরক্ত এবং উত্তমবাক্যসম্পন্ন হয়।

ঐ শুক্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজার স্থায় পুত্রযুক্ত, পতিতধনে ধনবান্ এবং সুখী হয়। চন্দ্র দেখিলে কক্ষ-লোচনবিশিষ্ট, সূক্ষ্মশরীর, কমনীয় মুষ্টি, অতিশয় মুহূর্ত্তভাব, এবং উত্তমভাগ্যসম্পন্ন হয়। মঙ্গল দেখিলে অতিশয় কামী, এবং স্ত্রীলোকের জন্ত সকল অর্থ নষ্ট হয়। বুধ দেখিলে পণ্ডিত, মধুরভাষী, ধনবান্, উত্তম ভাগ্যবান্ ও প্রভু হইয়া থাকে। বৃহস্পতি দেখিলে অতিশয় দুঃখী, এবং প্রাজ্ঞ বা আচার্য্য হয়। শনি দেখিলে দুঃখী, চপল ও মূর্খ হইয়া থাকে। সমস্ত ধন ছুই লোকে হরণ করে। মিথুনরাশিতে শনি থাকিলে বদন-প্রসন্ন, শ্রমাতুর, দাঙ্কিক, শিল্পবেত্তা এবং বাক্যব্যয় হইয়া থাকে।

ঐ শনি যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সুখবিশীন, অতিশয় প্রধান, ধার্মিক, ক্রেশমহিমু এবং ধীরপ্রকৃতি হয়। চন্দ্র দেখিলে ভূপতি তুল্য সিন্ধু দেহযুক্ত এবং স্ত্রীধন দ্বারা ধনবান্ হয়। মঙ্গল দেখিলে বিখ্যাত, মূর্খ, ভারবহনশীল, এবং নিধন হয়। বৃহস্পতি দেখিলে রাজকুলের বিশ্বাসী, সর্গ-গুণসংযুক্ত ও সাধুগণের বাক্যনায়ক হয়। শুক্র দেখিলে স্ত্রীদিগের প্রিয় এবং স্ত্রীলোক হইতে ধনাগম হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক)

এই যে সকল ফল লিখিত হইল, তাহা গ্রহদিগের নৈসর্গিক ফল, গ্রহগণ জাতকের যে ভাবে থাকেন, এবং অভ্যাস গ্রহ-গণের সংস্থাপন প্রভৃতি বিশেষ বিচার করিয়া ফল নিশ্চয় করা আবশ্যক। নামকরণ স্থলে খনার নিয়মামুসারে 'ক' 'ছ' এই দুইটা অক্ষর নামের আশ্রয় হইবে। জ্যোতির্গর্হে নামকরণ স্থলে শতপদচক্রানুসারেই নামকরণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

মিথুনত্ব (রী) মিথুনের ভাব।

মিথুনভাব (পুং) মিথুনাবস্থা।

মিথুনত্রিহিন্ (রি) মৈথুনত্রিহিন্।

মিথুনভাব (পুং) মঙ্গলবাবস্থা।

মিথুনেচর (রি) স্ত্রীপুরুষে বাসকারী।

মিথুনা (অবা.) মিথ্যাভূত, মিথ্যাবরূপ। 'ন কত্রিৎ মিথুনা ধারয়ন্তম।' (অক্ ৭।১০।৩৩) 'মিথুনা মিথ্যাহিত' (সারণ)

মিথুস্ (অব্য০) অস্তোত্র, পরম্পর।

মিথুদৃশ্ (ত্রি) পরম্পর দেখা।

মিথো (অব্য০) মিথুস্, পরম্পর।

মিথোযোধ (পুং) পরম্পর বৃদ্ধকারী।

মিথ্যা (অব্য০) মথ-বিলোড়নে মথতে অথবা মেথতে হিন-  
স্ত্রীতি মথ-ক্যপ্ নিপাতনাৎ সিদ্ধম্। অসত্য। চলিত মিছা,  
উক্তার পণ্যায়—মুখ্য, বিতণ্ড, অনুভ। (শব্দরত্না০) “বদসত্ত্বাসনং  
৩ অধ্যায়, অপ্রগল্ভাদিবং।” (সাংখ্যপ্র০ ভাষ্যভূত)

পুরাণে মিথ্যাকে অধর্মের পত্নীরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।  
একদৈববর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে লিখিত আছে—অধর্মের  
পত্নী মিথ্যা সমগ্র ধর্মদিগের নিকট পূজিত হয়। সত্যযুগে  
ইহাকে কেহ দেখিতে পাইত না। ত্রেতাযুগে মিথ্যা অতি  
হৃদ্যাবরণে ছিল। দ্বাপরেও মিথ্যার সম্পূর্ণ আকার প্রকট  
হয় নাই; তখনও ধর্মভয়ে মাত্র অর্দ্ধাবরণ প্রকাশ করিয়াছিল,  
কিন্তু বৈষ্ণব কলির সমাগমে, মিথ্যা অমনি বিশ্বব্যাপিনী মূর্তি-  
রূপে সর্বত্র সর্বলোকে অবস্থিত। কলির কল্যাণে ইহার প্রসার  
প্রতিপত্তি সর্বত্র অকাঙ্ক্ষিত। মিথ্যার ভ্রাতার নাম কপট।  
মিথ্যা তাহার সেই গুণধর ভ্রাতার সহিত গৃহে গৃহে পরি-  
ভ্রমণ করে \*।

ককিপুরাণে কথিত আছে,—অধর্মের প্রিয়তমা পত্নী  
মিথ্যা। মিথ্যার নেত্র মার্জারবৎ। অতিতেজস্বী দন্ত  
মিথ্যার গভঙ্গাত পুত্র। দন্ত নিজ ভগিনী মায়ার গর্ভে লোভ  
নামক এক পুত্র এবং নিকৃতি নামে এক কন্যা উৎপাদন করে।  
এই লোভ হইতে ভাগিনী নিকৃতির গর্ভে শ্রীমান্ ক্রোধের  
আবর্তাব হয়। †

মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা ব্যবহার করা বড় দোষ।  
উন্নতচেতা, উদারচরিত্র সাধুলোকেরা প্রাণান্তেও মিথ্যা  
কথা মুখে আনেন না, বা মিথ্যা ব্যবহার করেন না। যাহা-  
দিগের অন্তঃকরণ অতি ক্ষুদ্র, সেই সকল দুঃখল্যস্তঃকরণ নীচা-

\* “অধর্মপত্নী মিথ্যা সা সর্বধর্মেণ্ড পূজিতা।

যত্র বিনা জগদুৎসৃষ্টং বিধিনির্দিষ্টম্ ॥

সত্যো চাদশনা যা চ ত্রেতায়াং হৃদ্যরূপিণী।

অর্দ্ধাবরণপা চ দ্বাপরে সংবৃত্তা ভিরা ॥

কলৌ মহাপ্রমত্তা চ সর্বত্র ব্যাপিকা বলাৎ।

কপটেন সমঃ ভ্রাতা জমত্যোব গৃহে গৃহে ॥”

(ব্রহ্মবৈ০ প্রকৃতিখণ্ড ১ অ০)

“অধর্মস্ত্রীমিথ্যা রম্যা মিথ্যা মার্জারলোচনা।

তন্তাঃ পুরোহিতৈজস্বী দন্তঃ পরমকোপনঃ ॥

সঃ মায়ামঃ ভগিনীভ্য লোভঃ পুত্রক কন্তকাম্।

নিকৃতিঃ ক্রোধাশ্রিতঃ ক্রোধঃ পুত্রোহন্তবৎ ॥” (ককিপুরা ১ অ০)

শর লোকেরাই নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত অথবা কণিক প্রতিপত্তি  
পাইবার আশার পদে পদে মিথ্যা ব্যবহার করে। নিজের সামান্য  
স্বার্থে অথবা বিনা স্বার্থেও মিথ্যা কথা কহিয়া বা মিথ্যা ব্যব-  
হার করিয়া পরের মনে পীড়া দিতে বা পরানিষ্ট করিতে  
এই সকল অসৎ লোকেরা কুণ্ঠিত হয় না।

আমাদিগের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই মিথ্যা ব্যবহার নিষিদ্ধ  
হইয়াছে। দৈবাৎ মিথ্যা বলিলে সেজন্য প্রায়শ্চিত্তের  
ব্যবস্থা আছে। ফলে, কোন সম্প্রদায়েরই ধর্ম বা নৈতিক  
শিক্ষায় মিথ্যার প্রসার নাই। মিথ্যা সাধু-সমাজের গর্হিত  
এবং ধর্মপথের অন্তরায়।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—যদি ঘটনাক্রমে একবার  
মিথ্যা কথা বলা হয় এবং তৎক্ষণাৎ অমৃত্তাপ হইতে থাকে, তবে  
কৃষ্ণনামস্মরণেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।

“কৃত্তে পাপেহমৃত্তাপো বৈ যন্ত পুংসঃ প্রজায়তে।

প্রায়শ্চিত্তকৃত্তৈকং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥” (বিষ্ণুপু০)

বিষ্ণুসংহিতার উক্ত হইয়াছে, নিম্নিত প্রাতিগ্রহ, বাগিচা,  
কুসীদবৃদ্ধি, অশতাভাষণ ও শূদ্রসেবন প্রভৃতি পাপে তপ্ত-  
কৃচ্ছ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। “নিম্নিতেভ্যো ধনা-  
দানং বাগিচাঃ কুসীদজীবনং। অশতাভাষণং শূদ্রসেবন-  
মিথ্যাপাত্রীকরণং কৃত্ত তপ্তকৃচ্ছং শুদ্ধাতি ॥” (বিষ্ণুসং)

মহুর মতে মিথ্যাব্যবহারে চারাত্মক করিতে হয়।

“সঙ্করাপাত্তকৃত্ত্যাস্ত মাসঃ শোধনমৈন্দবম্ ॥” (মহু ১১)

চারিবর্ষের প্রাণদণ্ডবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়া মিথ্যা  
বলিলে গুরু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য সে সম্বন্ধে  
লঘুপ্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন—

“বর্গিনাং হি বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যেহনৃতঃ বদেৎ।

তৎপাবনার্য নিক্ষাপ্যশ্চক্ৰঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ ॥ (যাজ্ঞবল্ক্যসং)

হারীতের মতে দোষবিবরণ, কন্যাবিবাহ, ভরণ, মৈথুন,  
বালকহত্যা এবং গোত্রাঙ্গণের হিতসাধন এই কয়েকটি  
বিষয়ে মিথ্যা-ব্যবহার দোষাবহ হয় না। যমও বলিয়াছেন,—  
নর্থকথা, মৈথুনবিষয়, জীলোকের সহিত রহস্য, প্রাণবিনাশ  
এবং সর্বস্ব অপহরণ এই পাঁচটি ব্যাপারে মিথ্যা ব্যবহারে  
কোন পাপ হয় না।

“ন নর্থযুক্তং বচনং হিনস্তি ন শৈবরব্যাক্যং ন চ মৈথুনার্থে।

প্রাণাত্যায়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানুতাত্ত্বাহরণাপাতকানি ॥”

(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত যমবং)

মহাভারতে যযাতি ও শশিষ্ঠার কথোপকথনপ্রসঙ্গে  
মিথ্যা-ব্যবহারের বিধি-নিবেধ বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

মিথ্যাকর্ম (কৌ) অসংকার্য।

মিথ্যাকোপ (পুং) বুঝা ক্রোধ।

মিথ্যাক্রয় (পুং) মিছামিছি কেনা।

মিথ্যাগ্রহ (পুং) বুঝা আগ্রহ, অনর্থক রোধ।

মিথ্যাচর্যা (স্ত্রী) মিথ্যা ব্যবহার, কপটচরণ।

মিথ্যাচার (ত্রি) মিথ্যা আচারো বস্ত্র। কপটচার, দান্তিক।  
(ত্রিধরনামা) যে ব্যক্তি কয়েকজির সকল সংযত করিয়া মনে মনে ইজির বিষয় সকল স্বপ্ন বা ভাবনা করিতে থাকে, ভগবদগীতার তাদৃশ মূঢ় ব্যক্তিও মিথ্যাচার নামে উক্ত হইয়াছে।

“কয়েকজিরাণি সংযমা য আন্তে মনসা স্বরন।

ইজিরার্থান্ বিমূঢ়ান্মি মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥”(গীতা ২ অঃ)

মিথ্যাকল্পিত (ক্লা) মিছা গুজব।

মিথ্যাক্তান (ক্লা) অসত্যবোধ, ভ্রান্তি।

মিথ্যাক্ত (ক্লা) ১ মিথ্যার ভাব। ২ মায়। ৩ জৈন মতে অষ্টা-দশ দোষের মধ্যে একটি।

মিথ্যাভিন্ (ত্রি) মায়াজ্ঞ।

মিথ্যাদর্শন (ক্লা) ১ ভুল দেখা। ২ ভ্রান্তমত। ৩ যে দর্শনে মিথ্যা কথা লিখিত হইয়াছে।

মিথ্যাদৃষ্টি (স্ত্রী) মিথ্যা চ সা দৃষ্টিশ্চেতি কর্মধা। কর্মফলাপ-বাদক জ্ঞান। পর্যায়—নাস্তিকতা, অসত্যদর্শন।

মিথ্যাধ্যবসিতি (স্ত্রী) মিথ্যা অসত্য। চ সা অধ্যবসিতিশ্চেতি।  
১ মিথ্যা অধ্যবসায়। ২ অসত্যোৎসাহ।

মিথ্যানালিশ্ (সং মিথ্যা + আরবী নালিশ) মিথ্যা অভিযোগ।

মিথ্যানিরসন (ক্লা) মিথ্যা অসত্যং নিরস্ততেনেনেতি নিব্-অস-করণে লুট্। শপথ দ্বারা অস্বীকার।

মিথ্যাপণ্ডিত (ত্রি) পণ্ডিত বলিয়া ভাণকারী, মূর্থ।

মিথ্যাপুরুষ (পুং) ১ ছায়াপুরুষ। ২ যে পুরুষের প্রকৃত স্বভাব নাই।

মিথ্যা প্রতিজ্ঞ (ত্রি) মিথ্যাশপথকারী, অ বিশ্বাসী।

মিথ্যাপ্রবাদিন্ (ত্রি) মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাপ্রবৃতি (স্ত্রী) অসদ্বিচ্ছা, মিছা কাজে অগ্রসার।

মিথ্যাফল (ক্লা) কাল্পনিক ফল, মিথ্যা পুরস্কার।

মিথ্যাভিধান (ক্লা) মিছা বলা।

মিথ্যাভিযোগ (ক্লা) মিথ্যা অসত্যমভিযোগঃ। মিথ্যাপবাদ।  
অর্থাৎ অমুকে আমার এত টাকা ধারে, অমুক আমার সর্ব-নাশ করিয়াছে ইত্যাদি মিথ্যা উদ্ভাবন। ইহার পর্যায় অভিযাথান। (অমর ভরত)

মিথ্যাভিশংসন (ক্লা) মিথ্যা অসত্যস্ত অভিশংসনঃ কথনম্।  
মিথ্যা কথাপ্রচার, দুষিত কথা বলা অর্থাৎ অমুকে সোণা

চুরি করিয়াছে, অমুকে অমুক ছকাধা করিয়াছে ইত্যাদি দোষের কথা ব্যাপন। ইহার পর্যায়—অভিশাপ।

মিথ্যাভিশস্তি (স্ত্রী) মিথ্যা অভিযোগ।

মিথ্যাভিশাপ (পুং) মিথ্যা অভিযোগঃ। ১ মিথ্যাবাদ  
তাদ্রমাসের গুরুপক্ষীয় চতুর্থীর রায়ে চন্দ্রদর্শন করিতে  
নাই। এই দিন চন্দ্রদর্শনে অপবাদগ্রস্ত হইতে হয়।

“গুরুপক্ষে চতুর্থাঙ্ক সিংহে চন্দ্রস্ত দর্শনম্।

মিথ্যাভিশাপঃ কুরুতে ন পশ্চেন্দ্র তং ততঃ ॥”

(তিথ্যানিতবধৃত ভোজরাজ)

মিথ্যামতি (স্ত্রী) মিথ্যা চাসৌ মতিশ্চেতি। ১ ভ্রান্তি।  
২ অসত্য বুদ্ধি।

মিথ্যামান (পুং) বুঝা সম্মান, বুঝা দস্ত।

মিথ্যায়োগ (পুং) রূপরসাদির বিরুদ্ধ যোগ। বিষম  
স্থানাভিঘাত অন্তর্নিহিত প্রাণিসংস্পর্শ প্রাকৃতিক রূপ বিরুদ্ধ যোগ।  
যথা—বেগদারপাদি শরীর মিথ্যায়োগ, পরস্ববচনাদি বাত্-  
মিথ্যায়োগ, দুর্গন্ধাদির তীব্র জ্বালাদি দ্ব্যত মিথ্যায়োগ এবং  
স্তনিত্যাদি শব্দের অত্যধিক প্রবণশব্দ মিথ্যায়োগ ইত্যাদি।

(চরক সূ ১৬অঃ)

মিথ্যাবাক্য (ক্লা) মিথ্যাবাদ, মিছা কথা।

মিথ্যাবাচ্ (ত্রি) মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাবাদ (পুং) মিছা কথা।

মিথ্যাবাদিন্ (ত্রি) যে মিছা কথা কয়।

মিথ্যাবিহার (ক্লা) ১ বুঝা অটন। ২ কুব্যবহার।

মিথ্যাব্যহার (পুং) ১ অসৎ কার্য। ২ অসৎকার চর্চা।

মিথ্যাসাকিন্ (ত্রি) মিথ্যাবাদী সাকী, সাক্যদ্রষ্টা  
চেতি কুটসাকী। জালসাকী।

“উক্রেহপ সাকিভিঃ সাক্যো যদন্তে গুণবন্তমাঃ।

দ্বিগুণা বাস্তথা ক্রয়ঃ কুটাঃ শ্র্যঃ পূর্বদাশিগঃ ॥” (যাজ্ঞবল্ক্য)

মিতাক্রয় লিখিত আছে,—পাতকী, মহাপাতকী, অগ্নি-  
দারী এবং দ্বা ও বালকষাত্তাদিগের যে লোকে গতি হয়, মিথ্যা বা  
কুটসাকিদাতারা এই সকল লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মিথ্যা  
সাক্যদাতা জন্মান্তরে যে সুকৃতরাশি অঙ্কন করিয়াছিল,  
যাহার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্য দেওয়া হয়, এই সুকৃত রাশি  
তাহারই হইয়া থাকে।

“যে পাতককৃত্যং লোকা মহাপাতকিনাং তথা।

অগ্নিদানান্ধ যে লোকা যে চ দ্বীবাশ্বাতিনাং ॥

এতান্ সর্লানবাপ্নোতি যঃ সাক্যাননুতং বদেৎ।

সুকৃতং বদন্তা কিঞ্চিৎ জন্মান্তরশতেঃ কৃতম্।

তৎসর্বং তস্ত দ্রাবীহি যং পরাজয়সে বুধা ॥” (মিতাক্রয়)

মিথ্যাচার, (পুং) অহুচিত আহার, প্রকৃতির বিপরীত আহার। (সুশ্রুত নিঃ ৫অঃ)

মিথ্যোত্তর (কৌ) মিথ্যা অনত্যুত্তরম্। চারি প্রকার উত্তরের অন্তর্গত উত্তরবিশেষ। ইহার লক্ষণ—অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অভিযোগবিবরণ গোপন করে, তবে তাহা মিথ্যোত্তর বলিয়া জানিতে হইবে।

“অভিযুক্তোহভিযোগস্ত যদি কুর্ধ্যাদপছবম্।

মিথ্যা তন্তু বিজ্ঞানীষাছুত্তরং ব্যবহা তঃ ॥ (নারদ)

চতুর্বিধ উত্তর যথা—প্রথমে ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দ্বিতীয় আমি ইহা জানি না। তৃতীয় আমি তথ্য উপস্থিত ছিলাম না। চতুর্থ তৎকালে আমার জন্ম হয় নাই।

“মিথ্যোত্তরাভিজ্ঞানামি মম তত্র ন স্মরিধিঃ।

অজাতশাস্ত্রি তৎকালে ইতি মিথ্যা চতুর্বিধম্ ॥” (ব্যবহারতত্ত্ব)

মিথ্যোপচার (পুং) প্রভাতাদিসেবনরূপ অহুচিত আচার। মিদ, বাধ, মেধা। ভাদি উত্তরপদী সকং সেট্। লট্ মেদতি তে। লুঙ্ অমেদীৎ।

মিদ, মেহ, ভাদি আত্মনেং সকং সেট্। লট্ মেদতে ইরিং লুঙ্ অমিদং।

মিদ, মেহ, চুরাদি ইদিং উত্তরপদী ভাদিৎ অকং সেট্। লট্ মিদয়তি-তে, লুঙ্ অমিদং-ত। পক্ষে মিন্দিতি অমিন্দীং।

মিদ, মেহ, দিবাদিৎ পরস্মৈং সকং সেট্। লট্ মেদতি-তি। ইরিং লুঙ্ অমিদং, অমেদীং।

মিদ, মেহ, চুরাদিৎ উত্তরপদী সকং সেট্। লট্ মদয়তি-তে। লুঙ্ অমিদং-ত।

মিদিয়া, এশিয়া খণ্ডের একটি প্রাচীন সাম্রাজ্য (Media)। বেদে এই স্থান উত্তর-মদ্র নামে অভিহিত। এই দেশ দুই-ভাগে বিভক্ত ছিল। বৃহৎ মেডিয়া ও মেডিয়া অত্রোপতীন্। প্রথমোক্ত ভূভাগ স্বাস্থ্য ও উর্বরতার জন্য এশিয়াখণ্ডে বিখ্যাত ছিল। তাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস এই ভূভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং জাগ্রস্ ও পরচ্ছত্র পর্বত মধ্যভাগে অবস্থিত। পশ্চাৎকরণ অত্মাপি মিদিয়ার মনোমোহন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকেন এবং চারি-সহস্র বৎসর পূর্বের মিদিয়ার প্রাচীন গৌরব কিয়ৎপরিমাণে ছন্দয়িত্ব করিতে পারেন। এই সাম্রাজ্যের পূর্বে কাশ্মিয়ান্ পর্বত ও মধ্য এশিয়ার মকছুসি, উত্তর ও পশ্চিমে কাহুসাই পর্বত, অত্রোপতীন্ এবং মাটিনি, দক্ষিণে জাগ্রস্ এবং পরচ্ছত্র পর্বতমালা বিস্তারিত ছিল। সুতরাং বর্তমান ইরাক-প্রদেশের কতকাংশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছে। উহা এক্ষণে বর্তমান পারস্য-সাম্রাজ্যের সীমান্তভাগ।

একবতনা বা অগ্রবতনা মিদিয়াসাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। পরবর্তিকালে উহা পারস্য-সম্রাটগণের গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হয়। বাজিহান ও ইহার একটি প্রধান নগর। মিদিয়াগণ খৃষ্টের ২০০০ ব.স. পূর্বে বাবেক (বাবিলন্) আক্রমণ ও অধিকার করে। বাবিলন জয় করিয়া প্রত্যাগমন-কালে মিদিয়ার সম্রাজ্ঞী সেমিরামিস একবতনা নগরে স্বর্ণের নন্দন-কানন স্বরূপ একটি প্রমোদোদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলেন।

মর্দ (মদ্র) জাতিহ মিদিয়ার আদিম অধিবাসী। প্রাক-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভারতীয় পঞ্চনদ ও সিন্ধুদেশের প্রাচীন মদ্রজাতি মিদিয়াজাতির অবাস্তর শাখামাত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরের মাতুল শল্য মদ্রদেশের রাজা ছিলেন। মদ্ররাজকন্যা মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর পরিণয় হইয়া ছিল। কিন্তু এই মদ্রদেশ বিরাট ও পাণ্ড্যদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মদ্রবাসিগণ এশিয়াখণ্ডে বাহিয়া মিদিয়া রাজ্য-স্থাপন করেন, কি মিদিয়াগণ ভারতে আসিয়া মদ্ররাজ্য স্থাপন করেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ইহার অনেক প্রমাণ আছে যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে মিদগণ প্রবল হইয়া এবং আতুর (আসিরায়) ও বাবেক (বাবিলন) রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ লহয়া সুবিজ্ঞান মিদিয়াসাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন। মিদিয়াগণের পরাক্রমে আতুর ও বাবেক রাজ্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়।

২০০০ খৃঃ পূঃ, মিদিয়াগণ বাবেক জয় করিয়া ২২৪ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে, আসুরীয়গণ নাইনাসের অধ্যক্ষতার প্রবল হইয়া পুনরবার মিদিয়াসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। নাইনাস উক্ত দেশ আক্রমণ করিয়া অশ্বশ্রী রাজার পত্নী সম্রাজ্ঞী সেম-রামিকে বিবাহ করেন। নাইনাসের মুক্তার পর তাঁহার বিধবা সেমিরামিস অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ইউফ্রেটিস্ নদীতীরে বাবেক নগর স্থাপন করেন। তাঁহার স্থাপিত সেমিরামিসগড় অত্মাপি পারস্যদেশে পরিদৃষ্ট হয়।

তাঁহার বংশ ১২০০ বৎসর মিদিয়াসাম্রাজ্যে একাধিপত্য করিয়া-ছিলেন। তৎপরে খৃঃ পূঃ ৯ম শতাব্দীর শেষ ভাগে মিদীয়সম্রাট-ধিক বৎসর দাসত্বের পর পুনরবার প্রবল হইয়া উঠে। ৮৭৬ খৃঃ পূঃ তাহার বাবেক অধিকারপূর্বক মিদিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তত্ত্ব রাজবংশকে কর দিতে বাধ্য করে। পরে পুনরবার ৬০৬ খৃঃ পূঃ মিদিয়াগণ বাবিলন আক্রমণপূর্বক রাজধানী নিনেভ নগর বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। এই সময় হইতে আসুরীয় সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মিদিয়াগণ ১০০ বৎসর রাজ্য করিলে পর পারস্যরাজ কাই-রাস ৫৬১ খৃঃ পূঃ মিদিয়াসাম্রাজ্য অধিকার করেন।

প্রাচীন সিংগণ ৬টা জাতিতে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে মগগণ বর্ণগুরু বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইহাদের অস্ত্র নাম আয়া বা 'আরিয়'(Aia) গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদো-তাসের মতে এই ৪ জন রাজা মিদীয়ার পরবর্তিকালে রাজত্ব করিয়াছিলেন।—

১ দাইওসিস্ (৭১০-৬৫৭ খৃঃ পূঃ) ইনি ৫৩ বৎসর রাজত্ব করেন।

২ ফ্রবতিস্ (৬৫৭-৬৫৩ খৃঃ পূঃ) ইনি ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে মিদীয়ারাজ্য উন্নতির চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩ সিয়াক্সেরাস্ (৬৩৫-৫৯৫ খৃঃ পূঃ) ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি রাজ্যে যুদ্ধবিজ্ঞান বিশেষ উন্নতি করেন। ইনি নিনেত নগরী আক্রমণ করিতে বাইয়া শকজাতি দ্বারা পরাভূত হন এবং সিংহাসনচ্যুত হইয়া ২৮ বৎসর কাল অজ্ঞাতবাস করেন। তৎপরে শকগণকে পুনরায় বিতাড়িত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৪ অষ্টাইজেস (অস্তাগ) (৫৯৫-৫৬০ খৃঃ পূঃ) ইনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে ইহার দৌহিত্র পারস্তরাজ কাষ্টরস্ তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ৫৬১ খৃঃ পূঃ মিদীয়ারাজ্য পারস্তের অন্তর্ভুক্ত করেন।

মিদগণ কাটবসের পুত্র দ্বিতীয় দরায়ুসের রাজত্বকালে ৪০৮ খৃঃ পূঃ বিদ্রোহী হইয়া পারস্তের অধীনতা অস্বীকার করে। পবে পুনরায় পরাজিত হইয়া অধীন হয়। এই সময় হইতেই স্বতন্ত্র মিদীয়ারাজ্য পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া অভ্যাদরনীল পারস্তরাজ্যের রাজ্য মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

একবতানা-নগরে দক্ষিণসীমান্তবর্তী পদন্তমালায় উৎকীর্ণ শিলালিপি আর্জিও দরায়ুসের বিজয়কাহিনীর সংক্ষিপ্ত প্রদান করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ইতিহাসসংগ্রহকাণ্ড কণেল রবিন্সন উক্ত শিলালিপি মূল্য সাহুবাদ বসাল এসিয়াটিক সোসাইটির ১০ম ভাগের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

মিদীয়ার আর্কিমিডবংশীয় নরপতিগণ একসময়ে আট-লাটিক হইতে ভারত-মহাসাগরে ও উত্তরদেশ হইতে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন মিশরদেশও তাহাদের করায়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে শিলালিপি ও ইতিহাসের বিবরণ ভিন্ন সেই জাতির কোন চিহ্নই পৃথিবীতে বিদ্যমান নাই।

মিঙ্ক (ক্লে) ১ আঙ্গা। ২ নিঙ্গাপুতা। ৩ জুডুতা।

মিথ্=মিথ্।

মিনতি (আরবী) বিনতি, নন্দতা স্বীকার।

মিনা, কাচবৎ অলঙ্কার মণ্ডন পদার্থ বিশেষ। ধাতুদ্রব্যের অলঙ্কার (জকোয়া পহনা) ও বাসনাদিতে মানা বর্ণলব্ধবর্ণে ইহা বসান হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার প্রচলিত। জকোয়া পহনায় এইরূপ চিত্র-নৈপুণ্য প্রতিকলিত-করণকে মিনাকারি (Art of enameling) বা মিনা-শিল্প বলে। উক্ত শিল্প এক্ষণে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল জয়পুররাজ্যে উক্ত শিল্পের আজিও সজীব অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার কারুশৈলীপুণ্যে সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতিগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

জয়পুর, আলবার, দিল্লী ও বারাণসীর স্বর্ণমিনা, মূলতান, বহুবর্ণপুর, কান্দার, কাণ্ডা, কুলু, লাহোর, হায়দরাবাদ, করাচী, আকটাবাদ, নুরপুর, লাক্কী, কচ্ছ এবং জয়পুরের রোপ্যামনা এবং কান্দার ও জয়পুর প্রভৃতি স্থানের তাস্তামনা আজিও পৃথিবীর মধ্যে মিনা-শিল্পে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে।

ডাক্তার হাওলা লাহেব ভারতীয় শিল্পশত্রিকার লিখিয়াছেন যে, জয়পুরের শিল্পিগণ এক নৈপুণ্যস্বকারে স্বর্ণমিনার বর্ণোৎকর্ষ সম্পন্ন করে যে, সম্ভবণ বিচিত্র হস্তদৃষ্টিও তাহার উজ্জলতা এবং নিম্নলতার সমকক্ষ হইতে পারে না। মিনার উপরে মনিবচিত্ত করিলেও মিনার বর্ণের অপকর্ষ হয় না।

যে সকল স্বর্ণকার প্রথমে মোগার পাতের উপর প্রাচীন আদর্শ-পুস্তক দেখিয়া চিত্র অঙ্কিত করে, তাহাদিগকে চিত্রেয়া বা চিত্রকর কহে। উহা আমাদের দেশের নকাসিওয়ালার মত। পবে সেই চিত্রে যথাযথ খোদাই করে, তাহাদের খোদাই কার্য সম্পন্ন হইলে ঐ সমস্ত খোদিত গভীর মধ্যে মিনা ঢালিয়া দিতে হয়। তাহাতে মিনা দৃঢ়রূপে আঁগিয়া থাকে এবং বর্ণের উজ্জলতা সম্পাদন করে।

পুঙ্কের কারুকাণ্ডগুলি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি মিনাকর, তিনিই বর্ণদেবচন্দ্র সম্পন্ন করিয়া মিনা ঢালিয়া থাকেন। মিনা প্রয়োগ করিবার পুঙ্কে স্বর্ণের খোদাইগুলি সূক্ষ্মরূপে মণ্ডন করিতে হয়। বর্ণগুলি তুঁতের নানারূপ মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জয়পুরের শিল্পগণ বর্ণ প্রস্তুত করে না।

বর্ণ সকল প্রস্তুত করিবার পুঙ্কে তুঁতে মিশ্রণ আবশ্যক, তদ্ব্যতীত পাকা ও দীর্ঘকালগামী রঙ্গ ক্রমিতে পারে না। পবে লৌহ ও কোবাল্ট ধাতুর 'অক্সিড' (Oxide) দ্বারা বর্ণ প্রস্তুত হয়। জয়পুরের অন্তর্গত ভাগের সামন্তবাজী প্রচুর পরিমাণে কোবাল্ট পাওয়া যায়। এই ধাতু হইতে নালবর্ণের উৎকৃষ্ট মিনা প্রস্তুত হয়। স্বর্ণের উপরে সমস্ত বর্ণের মিনা প্রযুক্ত হইতে পারে। রোপ্যের উপরে হরিৎ, কক্ক, নীল, গাঢ়নীল, ও



লোহিতবর্ণের মিনা প্রযুক্ত হইতে পারে। তাত্ত্বের উপর খেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভিন্ন অল্প কোন বর্ণের সমাবেশ হয় না। কোন দেশের শিল্পীগণ লোহিতবর্ণের মিনা স্থানিভাবে খাতুর উপর প্রয়োগ করিতে পারেন না। কিন্তু মাস্‌গো-নগরের শিল্পপ্রদর্শনীতে জয়পুরের লোহিত-মিনার উজ্জলতা দেখিয়া পাশ্চাত্য শিল্পীগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন।

জয়পুরে নানা প্রকার অলঙ্কার মিনারঞ্জিত হইয়া থাকে। পদক, বালা, বাজু ও হার প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে মিনা-মণ্ডিত হয়। হীরক ও মুক্তাদিখচিত অলঙ্কারের পার্শ্বদেশে অপরংশে মিনা প্রদত্ত হয়। এক ছড়া কুন্তীরমুখো মিনা-মণ্ডিত বালা (bracelet) ১০০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। মণিখচিত হইলে উহার মূল্য ২০০ টাকা হইয়া থাকে। এক জোড়া মাকড়ী ১৮ টাক, মাছ-মাকড়ী ৬ টাকা, মাথার কাটা ১২ টাকা ইত্যাদি নানা প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। আত্মাকৃতি ধুকধুকি অতি নৈপুণ্যের সহিত নিখিত হয়। হিন্দু ও মুসলমানগণ ইহা আদরের সহিত ব্যবহার করেন। মটরমালা ও কণ্ঠহার প্রভৃতির চমৎকারিতার নয়ন কলসিত হয়। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে মিনাকারি দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। পাটনার কিছুদিন প্রচলিত থাকিয়া এখন প্রায় উত্তীর্ণ। গিয়াছে।

মঃ বাদেন পাউরেল (Baden Powel) মিনাশিল্পে বারাগ-সীকে জয়পুরের নিম্নেই স্থান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে বারাগনীতে উহা বিরলপ্রচার। লক্ষ্মী ও রামপুর অঞ্চলে এখনও বাসনে মিনা লাগান হইয়া থাকে।

দিল্লী, কাণ্ডা, মুলতান, বঙ্গ ও হাজারা প্রদেশে মিনা-শিল্প নৈপুণ্যতার সহিত সম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে দিল্লীর শিল্প কেবল কতকাংশে জয়পুরের সমকক্ষ।

বহুবলপুরে বৃহৎ বৃহৎ দ্রব্য মিনামণ্ডিত হইয়া থাকে। কথিত আছে, ৪০০ বৎসর পূর্বে মুলু নামক এক ব্যক্তি মুলতানে মিনাশিল্প প্রবর্তিত করে। তদবধি উহার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এখানে ধাতুবিশেষে মিনা লাগাইতে ত্রি প্রতি ১ টাকা হইতে ২ টাকা পর্যন্ত মজুরী পড়ে। যোধপুরে ‘তিমনিয়া’ নামক এক প্রকার স্বর্ণময় কণ্ঠভূষণ প্রস্তুত হয়। উক্ত ভূষণ ভারতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার মূল্য ২০ হইতে ২০০ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। মারবারের হিন্দুশিল্পীগণ ইহা আনন্দের সহিত ব্যবহার করেন। বিকানীরেও মিনা-শিল্পের প্রচলন আছে। মিনা করিতে ত্রি প্রতি ৩ টাকা বানী (মজুরি) লাগে।

আসামের অন্তর্গত গোড়হাট অঞ্চলে স্বর্ণমিনার প্রচলন আছে। কিন্তু বিক্রয়ব্যয় না থাকায় উহা ক্রমে ক্রমে হঠয়া আসিতেছে। ইন্দোর প্রদেশেও সুন্দররূপে মিনা-কাণ্ড হইয়া থাকে।

১৬শ শতাব্দীতে জয়পুরে মিনাশিল্পের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট অকবরের সভায় মানসিংহের একখানি মিনাশিল্পের যষ্টি ছিল। উহা অকবরের সিংহাসন সমাপে বিভূষিত থাকিত। মানসিংহ উক্ত যষ্টি ধারণ করিয়া অকবরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেন। ৪২ ইখি দীর্ঘ ৩৩টা স্বর্ণমণ্ডিত তাম্রচূড়ি উপদ্বীপের গ্রন্থিত হইয়া উক্ত যষ্টি প্রস্তুত হইয়াছিল। উহার মাঝে মাঝে বিবিধ বর্ণের সহিত হীরকখণ্ড মিনা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। ইহার মিনার কাজের নানারূপ শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। উহার কোন স্থানে শ্রামল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে পশু-পাল চরিতেছে, কোন স্থানে পুষ্পবকমণ্ডিত পুষ্পরক্ষ সকল পুষ্পপল্লবের নৈসর্গিক শোভা ধারণ করিয়াছে। যিনি চিত্র করিয়াছেন, তাহার ত্রায় শিল্পী বর্তমান সভ্যজগতে বিরল। বর্তমানকালে জয়পুরের শিল্পীগণ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স মহোদয়কে মিনালঙ্কৃত যে বৃহৎপাত্র উপহার দিয়াছিল, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা নিৰ্ম্মাণ করিতে ৪ বৎসর লাগিয়া ছিল। উহা দর্শন করিয়া সার জর্জ বার্ড উড বলিয়াছিলেন যে, ইহা ভারতীয় মিনাশিল্পের আদর্শীয় স্মৃতিস্তম্ভ। কথিত আছে, মানসিংহ লাহোর হইতে মিনাশিল্প জয়পুরে প্রবর্তিত করেন। জয়পুরে যে সমস্ত ভূবনবিখ্যাত শিল্পীগণ জন্মিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কয়েক জনের নাম প্রদত্ত হইল,—হরিসিংহ, অমরসিংহ, কৃষ্ণসিংহ প্রভৃতি; তন্মধ্যে হরিসিংহ ও কৃষ্ণসিংহ সমধিক প্রসিদ্ধ।

কাশ্মীরের মিনাশিল্প অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে কাশ্মীরের মিনাশিল্পের দ্রব্য বিক্রীত হয়। কাশ্মীরের মিনা প্রায় নালবণের হইয়া থাকে। এখানে নানা প্রকার জলপাত্র, ডব্বর প্রভৃতি বাস্তব এবং নানা অলঙ্কার মিনামণ্ডিত হইয়া থাকে। মিনাশিল্পের মধ্যে কাশ্মীরী শালের হস্ত হুচীকার্যের শিল্পনৈপুণ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। মিনা-বাসন ওজন-দরে বিক্রয় হয়। রূপার তোলা ১ টাকা ও আনা এবং তামার তোলা আড়াই আনা হইতে চারি আনা।

দিল্লীর মিনাশিল্পের মধ্যে তাৎকালিক ও হুকা সুপ্রসিদ্ধ। স্বর্ণ ও মুলতানের গেলাস প্রসিদ্ধ। জয়পুর-শিল্পপ্রদর্শনীর সময় বহুবলপুর হইতে মিনাশিল্পের একটা বোতল, গেলাস ও

শিশি প্রেরিত হইয়াছিল। উহাদের শিল্পনৈপুণ্য বিশেষ মনোহারী। উহার প্রত্যেকটি যথাক্রমে ৮৫, ৮৭ ও ১৭ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

কলিকাতার আন্তর্জাতিক মহাপ্রদর্শনীতে লক্ষ্য হইতে একটি মিনার হস্তা প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার উপরে যেরূপ কারুকাণ্ড খচিত ছিল, তাহা বিশেষ প্রশংসারযোগ্য। রাজপুতনার মধ্যে প্রতাপগড়ের একরূপ নৌলবণের নকল-মিনা প্রস্তুত হয়। ইহা একপ গোপনীয়ভাবে প্রস্তুত হয় যে, শিল্পিগণের পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন অত্র কেহ ইহার সন্ধান জানে না। এই সমস্ত শিল্পিগণ নকল-মিনার হস্তী অথ প্রকৃতি নানা জীবজন্তু পৌরাণিক চিত্রাবলী এবং নানাবিধ বিচিত্র দ্রব্য অঙ্কিত করিয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। অত্য়াপি কেহই ইহাদের শিল্পবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে নাই।

ব্রহ্মদেশেও মিনাশিল্পের অল্পবিস্তর প্রচার আছে। প্রকৃতভাবে পণ্ডিতগণ অস্বীকার করেন যে, মিনাশিল্প প্রথমে তুবাণ দেশে প্রাকৃত হইয়াছিল। তৎপরে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। উক্ত শিল্প আসিরিয়া হইতে মিশরে প্রচলিত হয় এবং তথা হইতে উহা ক্রমে যুরোপ-খণ্ডে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

মিনাকোপী, আন্দামান দ্বীপবাসী জাতিবিশেষ। সমগ্র মূলভাজাতির বিদিত ভূভাগ মধ্যে একরূপ বস্ত্রজাতির নিদর্শন জগতের আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রকৃতপক্ষে বলিতে কি, ইহারা অত্য়াপিও প্রকৃতির শাস্তিময় বক্ষে যেন চিরনিদ্রিত রহিয়াছে, সভ্যতার কোমল আলোক আজিও যেন ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। গম্বুজাতির মধ্যে একরূপ নিকৃষ্ট ও হেয় অবস্থা আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। শববাদি পদ্যারা নৌচক্রাতি ইহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

ইহাদের বাসস্থানের জন্ত গৃহ নাই। বৃষ্টি ও বোয় হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কোনরূপ আচ্ছাদন নাই। লজ্জারক্ষার জন্ত কোন বস্ত্র নাই। নরনারী উভয়েই বনাস্ত্রায়ে লুক্কায়িত পশুর আয় নম্রবাস হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। একে অপরকে দেখিয়া কোনরূপ লজ্জা করে না। এতদ্ভিন্ন ইহারা আপনাপন ব্যবহার্যবোপযোগী কোনরূপ আবশ্যকীয় শিল্পের বিষয় অবগত নহে। এমন কি, লোহ, পিত্তলাদি ধাতু হইতে কোনরূপ পাত্রাদির নিৰ্মাণ প্রণালীও ইহার জানে না।

কোন প্রাচীন যুগে ইহারা এই সমুদ্রবন্দু নির্জন দ্বীপের বনমধ্যে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহা নিগম করা

স্বকঠিন। ইহাদের ঘোর কৃষ্ণকৃষ্ণ ও পুরুষ-প্রকৃতি দেখিলে অস্বীকার হয় যে, ইহারা দ্বীপোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ কথাই সীমাসীমা নিন্তা সহজ নহে। এই নীলাশ্বরাশি-পরিবেষ্টিত বঙ্গোপসাগর মধ্যে একরূপ বস্ত্রজাতির অবস্থান সম্ভবপর নহে। ভূতত্ত্বের আলো-চনায় জানা যায় যে, এক সময়ে মলয়প্রায়ের দ্বীপ হইতে ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপগুণ লইয়া একটি সুবিস্তৃত রাজ্য গঠিত ছিল। সেই সাগরযাত্রা সুবিশাল রাজধানী রাক্ষসরাজ্য রাবণের লঙ্কাপুরী বলিয়া বিখ্যাত। রামচন্দ্র কতক রাবণ নিহত হইলে, লঙ্কারাজ্যে একটি বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল; তদ্ব্যস্ত সাময়িক পরিবর্তনে ঐ বিস্তৃত সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলীতে পরিণত হয়। সেই অসহায় অবস্থায় যে যেখানে পাইয়াছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তদবধি আর তাহাদের মধ্যে সভ্যতাবীজ উদ্ভূত হয় নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তৎরাজ্যরাজ এই দ্বীপে পদাশ্রয় করেন। তাহারা এখানে আসিয়া এই জাতিকে প্রকৃতির অন্ধশায়িত দেখিলেন। গম্বুজাতির একরূপ হীনাবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই তাহারা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সকলেই প্রায় উল্লস, স্ত্রীলোকেরা সময় সময় কোমরে পট্টাচ্ছাদন দেয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাহারা লজ্জাচ্ছাদন বাতিরেকে গমন করিয়া থাকে। বৈদেশিককে দেখিলেও তাহাদের কোন লজ্জার উদ্বেগ হয় না। বস্ত্রাচ্ছাদন তাহাদের মনে একটি প্রাকৃতিক বিপণ্য ভিন্ন আর কিছু নহে।

পুরুষগণ স্বভাবতঃ চতুর, ধীর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। বিদেশীয় লোক দেখিলে তাহারা ভয়াবহ অত্যাচারের চিংকার করিয়া আপনাদের মনের বিরোধ প্রকাশ করে। সময়ে সময়ে সঙ্কট দ্বারা তাহাদের নিঃশীলতা এবং অপ্রতিকূল দ্বারা মানসিক ঘৃণাভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। কখন কখন তাহারা আবার উচ্চ স্বদেশের পরিচয় দেয়। তখন তাহাদের বিনয় নম্রভাবে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

ইহারা স্বভাবতঃ খন্দাকার। কদাচ ৫ ফিটের অধিক উচ্চ হয়। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ ৪ ফিট ৭ ইঞ্চি প্রমাণ লম্বা হইয়া থাকে। ইহাদের গাত্র নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণের সহিত একটু ময়ূরভারও আভাস পাওয়া যায়। তাহারা চকুমকি পাথর বা কাচখণ্ড দ্বারা গুল্মচয় বিনোদন করিয়া উন্মত্ত পড়ে। মস্তকের ক্ষুদ্রতা ও, গোলাকার ভাব, বাহ-নিম্নার-চক্ষু, চাপা রগ, খেত দস্তপাতি, কৃষ্ণবর্ণের কোঁকড়ান চুল, লম্বোদর, পুরু ওঠক এবং মস্তক হস্তপদাদি দেখিলে ইহাদিগকে নিম্নোক্তাতি বর্ণিত অস্বীকার হয়।

ইহারা নৃত্যগীতপ্রিয়, দিবারাত্র আমোদ উল্লাসে ইহারা কালযাপন করে। অনেক সময়ে তীরধনু লঠরা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। শীকারে ইহারা অব্যর্থলক্ষ্য। মাছ ধরবার জন্ত বকের ছালের আইস্ হইতে ইহারা এক প্রকার সূতা প্রস্তুত করে এবং জলে ভ্রমণের সুবিধার্থ গাছের গুড়ি কাটিয়া ইহারা ক্ষুদ্র নৌকা নির্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের তীরের ফলা সমুদায় চক্ষুর্মকি পাথরে প্রস্তুত হয়।

মিস্ত্রী, মলয়-প্রায়োবোপবাসী আদিম জাতিবিশেষ। ইহারা ভূতপ্রত্যাদিতে বিশ্বাস করে। আমাদের দেশের কুমপ্রথার মত ইহারাও চৈত্রমাসে বন পোড়াইয়া আশ্বিনমাসে সেট তদ্ব্যসারযুক্ত ক্রমিতে চাস করে। তীরধনুক লঠরা ইহারা সজ্জদা ভ্রমণ করে। পশু পক্ষী দেখিলেই ইহারা তীর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া আনে এবং তাহাই ভোজন করিয়া থাকে। শতাধিক ফিট্ উচ্চে অবস্থিত জীবকে তীরবিদ্ধ করিতে ইহারা কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তারের অগ্রভাগস্থ ফলকে ইহারা এলিপো নামক এক প্রকার বস্ত্রাবয় মাখাইয়া রাখে।

মিন্দ = মিন্দ। [ মিন্দ দেখ। ]

মিন্দ। ( দ্রী ) দৈহিক দোষ। লাতিন menda।

মিন্দানাও, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটা দ্বীপ। এখানে পালাবঙ্গ ও মুলুদ্বীপমালা অবস্থিত। ছুমগ, তগবলগ, মালনো, মনাবো, মিন্দানাও প্রভৃতি নিরীহ জাতি এই সন্নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জসমূহে বাস করে। ইহাদের পরস্পরের ভাষা বিভিন্ন হইলেও ইহাদিগকে পাপুয়ান্ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়।

মিন্দী ( দেশজ ) মেন্দীগাছ ( Lawsonia inermis )

মিন্দোরা, বর্ণিও-দ্বীপের সন্নিকটে অবস্থিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ। এতদভয়ের মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র প্রণালী আছে, তাহাতে চংরাজ-নারিকেল তিমিমাছ শীকার করিয়া থাকে। ইহা স্থান বিশেষে ২৭ হইতে ৩৩ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার জল একপ পরিষ্কার যে, ২৫ ফাদম নিম্নে অবস্থিত প্রবাল-কাট-গুলি ও উপর হইতে স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এখানকার বেন্গান্ নামক পাক্ষ্য প্রদেশে নিগ্রিটো জাতির বাস আছে। ইহারা পার্শ্ববর্তী মানগুয়ানিস্ জাতির সহিত বিশেষ সভাবে কালযাপন করিতেছে। কখনও ইহাদের মধ্যে বাদকিলবাদ ঘটে নাই। নিরীহপ্রকৃতি বহু মানগুয়ানিস্গণ বর্তমানে অনেকাংশে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছে।

মিগ ( গ্রি ) মিস।

মিষ্ণু ( আরবী ) মিষতি।

মিগ্মিন ( গ্রি ) সামুদ্রিক বাক্যাবিশিষ্ট। চলিত খোঁনা। বায়ু কক্ষের সহিত মিলিত হইয়া শব্দবাহিনী ধমনী সকল আচ্ছাদিত করিয়া রাখে; এইজন্ত শব্দ অধিক বলিতে অসমর্থ, মুক, গদগদভাবী এবং মিগ্মিন বা খোঁনা হইয়া থাকে।

“আবৃত্ত বায়ু: সক্ষো ধমনী শব্দবাহিনী।

নবান্ করোত্যক্রিয়কান্ মুকমিগ্মিনগদগদান্ ॥”

এই রোগের চিকিৎসা,— ঘৃত ১৪ সের, কক্ষার্থ সজ্জিনার ছাল, বচ, সৈন্ধব, ধাইফুল, লোধ, ও আকনাদি প্রত্যেকে অর্দ্ধ পোয়া, জল ১৬ সের এবং ছাগদুগ্ধ ৪ সের, এই সমস্ত দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করিতে হয়, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে জড়তা, মুকতা ও গদগদ স্বর নষ্ট হয় এবং শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি, মেধা, প্রতিভা ও বাক্যের স্পষ্টতা হইয়া থাকে। এই ঘৃতকে সারস্বতঘৃত কহে।

মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ, তবকঃ-ই-নাসির নামক প্রসিদ্ধ ইসলাম রাজ্যের ইতিহাসগ্রন্থ। জজিয়া তাহার জন্মস্থান। তিনি একজন সুকবি বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। মুসলমান-সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫৯ খৃষ্টাব্দ ( হিঃ ৬৫৮ ) পর্যন্ত বাবতীয় ঘটনা তিনি স্মরণিত ইতিবৃত্ত মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া যান। তাহার প্রকৃত নাম আবু-উমার-মিন্‌হাজ উদ্দান্-ওসমান্ বিন্‌ সিরাজ উদ্দান্ অল্‌ জুজ্জানি ( জজিয়া )। তিনি ৬২৪ হিজিরায় ( ১২২৭ খৃঃ ) ঘোর রাজ্য হইতে সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন। ক্রমে তথা হইতে উচ্চা ও মুলতান পরিভ্রমণ করিয়া দিল্লীখর সুলতান শামস্-উদ্দান্ আলাউদ্দিনের অধীনে রাজকাৰ্য্যে ব্রতা হন। তৎপরে তিনি যথাক্রমে সুলতানারিজিয়া ও বহরমশাহের অধীনে থাকিয়াও রাজকাৰ্য্য নিপাহ করিয়াছিলেন। সম্রাট বাহাউর-শাহের মৃত্যুর পর, ৬৩৯ হিজিরায় তিনি লক্ষণাবতী-পরিদর্শনে আগমন করেন। এখানে ৩ বৎসর অবস্থানের পর ৬৪২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীরাজধানীতে ফিরিয়া যান। তৎপরে তিনি দিল্লীস্থ নাস-রোয়া-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১২৫২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীখর সুলতান নাসির উদ্দান্ মাক্কুদের রাজত্বকালে তিনি উক্ত ইতিহাস গ্রন্থখানি সমাপন করিয়া সম্রাটকেই উপহাৰ দিয়া ছিলেন। দিল্লীতে তিনি সদর-ই-জহান প্রভৃতি বিবিধ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

মিমজ্জফ। ( দ্রী ) মজ্জনেচ্ছা, মজ্জনাথ চেষ্টা।

মিমজ্জফু ( গ্রি ) মস্জ-ইচ্ছাথে সন্ তত উঃ। মজ্জনেচ্ছু।

“বদন্তিনঃ কটকটাহতটামিমজ্জফ।

মজ্জদুপাদিশরিতঃ পটলৈরলীনাম্ ॥” ( মাঘ ৫:৩৭ )

মিমত ( পুং ) অধিত্তদ।

মিমস্থিবা (ত্রী) মছনেছা।

মিমস্থিযু (ত্রি) মছনেছু, বিলোড়নাভিলাষী।

মিমদ্দিযু (ত্রি) মর্দন করা হইতে ইচ্ছুক।

মিমদ্দিযু (ত্রি) মর্দনেছু, দলনাভিলাষী।

মিমিফ (ত্রি) জলসিক্ত। (শব্দ ৬৩৪৪)

মিমিফু (ত্রি) স্তোভগণের অভিমত ফলবর্ণণেছু।

“গোভিমিমিফুঃ দধিরে স্ত পারম্।” (শব্দ ৩৫০৩)

‘মিমফুঃ স্তোভগামভিমতফলঃ বর্ষিতমিচ্ছন্তম্’ (সায়ণ)

মিয়ানা (পারসী) পাল্কী।

মিয়ানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত এক লুণ্ঠনপ্রিয় দস্যুজাতি। মুচানদীর তীরে মুচাকাছা নামক স্থানে মল্লিয়া গ্রামে ইহাদের বাস দেখা যায়। ইহারা আপনাপন চৌহাতিয়া বা সন্দারদিগকে দলপতি বলিয়া স্বীকার করিলেও স্থানীয় ঠাকুর উপাধিদারী সামন্তরাজকে মান্য করে। কিন্তু তাঁহার আদেশ মত কোন কাণ্ডই করে না।

মিয়ানা, সিন্ধুপ্রদেশবাসী মস্তজাবী ও নোকাবাহী জাতি-বিশেষ। মৈ, মোয়ানা বা মিয়ানী নামেও সাধারণে পরিচিত। স্থানীয় কৃষিজীবী জাতি ও বহুচী হইতে ইহারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র জাতি। ইহাদের সংখ্যাও সম্যাপেক্ষা অধিক।

ইহারা কর্ণাটক, বায়ামকৌড়াপটু এবং সরল ও উদার-হৃদয়। ইহারা নদীতীরবর্তী গ্রামসমূহে নোকা ও মাছধরা জাল লইয়া বাস করে। মস্তজাবিক্রয়ই ইহাদের প্রধান উপ-জীবিকা। অনেকানেক নদীতে এবং মধুর নামক হ্রদে ইহারা চীনবাগীর জাল কেবলমাত্র নোকার উপরে বাস করে। তথায় ইহাদের বাসযোগ্য গৃহাদি দেখা যায় না। ত্রীলোকেরাও নোকা বাহিয়া পুরুষদিগের সহায়তা করিয়া থাকে। পুরুষেরা যখন জাল লইয়া সমুদ্রোপকূলের খাঁড়িসমূহে মস্তজা ধরিতে ব্যাপৃত থাকে, তখন রমণীগণ এক এক খানি ক্ষুদ্র নোকার মাস্তুলে ক্ষুদ্র জাল মধ্যে আপনাপন শিশুসন্তানদিগকে বুলাইয়া নিজে নিজে নোকা চালাইয়া যায়। সমুদ্র-প্রণালীর অজ্ঞাত অংশসমূহে ইহারা ই অধিতীয় পোতাচালক।

সিঙ্কুদের প্রসিদ্ধ পুত্র নামক মস্তজাহরণপ্রথা ইহাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা জাল দিয়া মাছধরা হইতে স্বতন্ত্র। ঐ সময়ে ইহারা একটি মস্তপাত্র লইয়া জলে নামিয়া পড়ে। প্রথমে আলার নাম স্মরণপূর্বক ইহারা সেই মস্তপাত্রের মুখে আপনাপন উদর সংস্থাপন করিয়া জলে সন্তরণ করিতে থাকে। ভাণ্ডমুখে উদর সংলগ্ন হওয়ার অভ্যস্তরহ বায়ুর জ্ঞান ইহাদের শরীর ভাসাইয়া রাখিবার কোন আটক থাকে না। তখন ইহারা স্বচ্ছন্দে হস্তপদাদির সঞ্চালন দ্বারা ইচ্ছামত

স্থানে গমনাগমন করিতে পারে। ঐ সময়ে ইহারা ১৫ ফিট লম্বা চিম্টার আকারবিশিষ্ট একটি দণ্ডের মুখে জালবদ্ধ করিয়া জল মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। মস্তজাদি ঐ জালে আসিয়া পড়িলে একটি দড়ির সহযোগে ঐ চিম্টার মুখে আবদ্ধ করিয়া দেয়। তখন মস্তজা আর পলাইতে পারে না। পরে তীরে আসিয়া স্বীয় কোমরস্থ ছুরিকা দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করে।

ইহাদের রমণীগণ ক্রকবর্ণের হইলেও মুখশ্রী নিতান্ত মন্দ নহে। এক একজন সন্ধ্যাভূষিত। অনেকে দাগীরুতি, বেগ্মারুতি ও নঠকীরুতি অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা নদী-কূলজাত শর ও দীর্ঘাকার তৃণ দ্বারা স্নানর স্নানর মাদুর ও বুড়ি বুনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। নগর বা গ্রামাদির মধ্যে সাধারণ অধিবাসী হইতে দূরে স্বতন্ত্র স্থানে পল্লীবদ্ধ হইয়া বাস করে। পুরুষেরা মস্তজা বিক্রয় করে এবং বাস্ত বাজাইয়া গান করিয়া থাকে। রমণীগণ পথের ধারে নৃত্যগীত করিয়া বেড়ায়। যেস্তার ভায় ইহাদের হাবভাব দেখিয়া অনেক পথিক ইহাদের নয়নপথে আকৃষ্ট হয়।

মিয়ানা, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র-রাজ্যের গুণা সব-এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটি জায়গীর।

মিয়েধ (পুং) পশু। (শব্দ ১১৭৭৪) ২ ক্রিয়মাণ বস্তু।

“অগ্নিঃ হোতারঃ প্রবৃণে মিয়েধে” (শব্দ ৩১৯১)

‘মিয়েধেহস্মাভিঃ ক্রিয়মাণেহস্মিন্ যজ্ঞে’ (সায়ণ)

মিয়েধ্য (ত্রি) যজ্ঞের যোগ্য, যজ্ঞার্থ। (শব্দ ১২৬৩)

মিরন-জৈ, আফগান-সীমান্তবর্তী কোহাট উপত্যকার একটি অংশ। কোহাট অতিক্রম করিয়া ২০ মাইল বিস্তীর্ণ হস্তুর উপত্যকায় উপনীত হওয়া যায়। হস্তুর অব্যবহিত পরেই মিরন-জৈর সমতল ক্ষেত্র। উহার ভূপরিমাণ ৯ বর্গমাইল। ইহার দক্ষিণপশ্চিমে কুরম নদী প্রবাহিত। এখানে হুগাদি দ্বারা সুরক্ষিত ৭টি গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ আফগান-জাতীয়। তন্মধ্যে জিলোস্ত আফগানগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও বিশেষ বীণাশালী ও যুদ্ধনিপুণ। ইহাদের মধ্যে অস্বারোহী সেনাদলও আছে। পশ্চিম-মিরন-জৈ হইতে পবার কোথুল পর্বতমালা পর্যন্ত ইহাদের বাস দেখা যায়।

কানুল-অভিধানকালে ইংরাজসেনাপতি লর্ড রবার্টস্ এই স্থান দিয়া ভারতীয় সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মিরফ (স্ত্রী) বৌদ্ধমতে অত্যাধিক সংখ্যাভেদ।

মিরা (স্ত্রী) মুন্সী। (রাজনিঃ)

মিরাজ (বড়), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশের পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটি সামন্তরাজ্য।

ভূপরিমাণ ৩৪০ বর্গ মাইল। ইহা প্রধানতঃ ৩ খণ্ডে বিভক্ত—  
১ কৃষ্ণানদীর উপত্যকাংশ, ২ ধারবাড় জেলার দক্ষিণবিভাগ  
এবং ৩ শোলাপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ।

এই রাজ্যাংশের কৃষ্ণানদীর অববাহিকা-প্রদেশ সর্বাপেক্ষা  
উন্নয় ও সমতল। অত্যন্ত স্থান পাকত্ব নতেন্নত স্থানে  
আচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে গুণ্ডশৈলমালাও দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ-  
স্থানই তুলা উৎপাদনকারী কৃষ্ণমৃত্তিকায়ুক্ত। এখানে  
জলাভাব নাই। খাল, বিল, কূপ ও তড়াগাদি এখানকার  
জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে। দক্ষিণাত্যের অপরাপর স্থান-  
পেক্ষা এই স্থান অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। গ্রীষ্ম ঋতুতে এখানকার  
উত্তাপ অসহ্য বোধ হয়।

মহারাত্রের পেশবা তথাকার প্রসিদ্ধ পটবন্ধনবংশকে এই  
স্থান জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে গবর্নেন্ট  
উক্ত পটবন্ধনবংশের অধিকার স্বীকার করিয়া উহা চারি  
অংশে বিভাগ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকেই ইংরাজরাজকে  
অখারোহী সেনাদল দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন।

১৮৪২ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে পুত্র-সন্তানের অভাবে  
উহার দুইটি অংশ ইংরাজরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। অবশিষ্ট  
দুইটির মধ্যে বড় মিরাজের সর্দার গঙ্গাধর রাও গণপৎ জাতিতে  
ব্রাহ্মণ। ইন্দোরস্থ রাজকুমার-কলেজে তিনি বিজ্ঞানশিক্ষা  
করিতেন। দক্ষিণ মহারাত্র প্রদেশে তিনিই সর্গশ্রেষ্ঠ সর্দার  
বলিয়া গণ্য। হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ডবিধানার্থ  
তাহাকে পলিটিকাল এজেন্টের অভিযন্ত গ্রহণ করিতে হয়  
না। সর্দারবংশের দণ্ডকগ্রহণের অধিকার আছে। ইংরাজ-  
রাজ জ্যেষ্ঠ পুরুষকেই রাজ্যসনের অধিকারী সাব্যস্ত করিয়া  
একখানি সনন্দ দিয়াছেন।

এখানকার মিরাজ ও লক্ষ্মীধর নগর বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন।  
মিরাজ (ছোট), দক্ষিণ মহারাত্র প্রদেশের অপর একটি সামন্ত-  
রাজ্য। ধারবাড় জেলার বঙ্গাপুর উপবিভাগের, সাতারা  
জেলার ভাসগাও উপবিভাগের এবং শোলাপুর জেলার পণ্ডর-  
পুর উপবিভাগের কতকগুলি গ্রামসমষ্টি লইয়া গঠিত। সমগ্র  
জায়গীরের ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গ মাইল। এখানে তুলা প্রচুর  
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কার্পাস বস্ত্রেরও কারবার আছে।

এখানকার সর্দারবংশও বড় মিরাজের সর্দারের ভ্রাতৃ  
ইংরাজরাজের স্নাতৃগ্রহণালিত। সর্দার লক্ষ্মণরাও হরিহর  
ব্রাহ্মণবংশীয়। নবাবুল অবস্থায় পলিটিকাল এজেন্ট শাসন-  
কার্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সর্দারের হত্যাপরাধকে দণ্ড  
দিবার ক্ষমতা আছে। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ২৭০ জন এবং  
গ্রহরীসংখ্যা ১১৯ জন।

মিরাজ, বড় মিরাজ সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। কৃষ্ণানদীর  
তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°৪৯'১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৪১'  
২০" পূঃ। মিউনিসিপালিটি থাকায় নগরের অবস্থা দিন  
দিন উন্নত হইতেছে।

মিরাজ-ই-মহম্মদ, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদিগের উৎসবভেদ।  
ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদের স্বর্গারোহণ-স্মরণার্থ ২৭শে রজব এই  
উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা মুসলমান-সমাজে লজ্জ-ই  
মহম্মদ নামে পরিচিত। কোরাণের ১৭শ পরিচ্ছেদে ইহার  
সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কতিব-অল্ বাকিদ বলেন  
যে, ১৭ই রনজানে এই ঘটনা ঘটে। তৎকালে দৈশ্বর-দূত  
জিব্রাইল ধরাধামে আসিয়া মহম্মদকে বুরফ্ নামক অশ্বে  
আরোহণ করাইয়া স্বর্গধামে লইয়া গিয়াছিলেন।

মিরাজ শব্দ উর্জ্জ্বাধাতু হইতে সন্মুৎপন্ন। উহা সংস্কৃতের  
উর্জ্জ শব্দার্থবোধক। মিরাজ ই-মহম্মদ অর্থে মহম্মদের উর্জ্জ  
বা স্বর্গগমন বুঝায়।

মিরোট্ (মীরোট্), যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের ছোট লাট বাহা-  
দুরের অধীন একটা বিভাগ। জনৈক কমিসনর দ্বারা পরি-  
চালিত। অক্ষা° ২৭°২৮' হইতে ৩০°৫৭' উঃ এবং দ্রাঘি°  
৭৭°৭' হইতে ৭৮°৪২' পূঃ মধ্যে। দেহরাদুন, শাহরাণপুর,  
মুজঃফর-নগর, মিরোট্, বুলন্দসহর ও আলীগড় নামক ৬টা  
জেলা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। [ তত্তৎ জেলা শব্দে বিশেষ  
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ] ইহার উত্তরসীমানা শিবালিক-  
পর্বতমালা, পূর্বে গঙ্গা নদী, দক্ষিণে মথুরা ও এটা জেলা এবং  
পশ্চিমে যমুনা নদী। ভূপরিমাণ ১১৩২০ বর্গ মাইল।

এখানে সর্বসম্মত ৬৮টা নগর এবং ৮২০৬টা গ্রাম আছে।  
নগরের মধ্যে মিরোট্ নগর ও সেনাবাস, আলীগড় (কোইল),  
শাহরাণপুর, খুজ্জা, ও হাতরাস নগর প্রধান। ইহাদের সকল  
গুলিতেই ২২ হাজারের অধিক লোক আছে।

মিরোট্ (মেরট বা মীরোট্) যুক্ত প্রদেশের ছোট লাটের  
শাসনাধীন একটা জেলা। ইহার উত্তরে মুজঃফরনগর, পশ্চিমে  
যমুনা, দক্ষিণে বুলন্দসহর এবং পূর্বে গঙ্গানদী। ভূপরিমাণ  
২৩৭৯ বর্গ মাইল। মিরোট্ নগর ইহার বিচার-সদর।

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সৈকতভূমে অবস্থিত ইওয়ান  
এই সমতল বিভাগের উন্নয়নতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই স্থান  
বহুপ্রাচীন কাল হইতে অন্তর্কেন্দী নামে এবং মুসলমান-  
ধিকারে 'দোয়াব' নামে পরিচিত হইয়াছিল। বিস্তার্ত্ত্র শ্রামল  
শতাব্দীতে ইহার মধ্যে মধ্যে বনমালাও দৃষ্ট হয়।  
অনেক স্থলে অস্বাভাবিক আশ্রয়াননসমূহ প্রকৃতির লীলা-  
কৌশলের পরিচয় দিতেছে। গঙ্গা ও যমুনার বালুকাময়

বেলাভূমে বিশেষরূপ চাসবাস নাই। প্রবল বাত্যা বহিলে, বালুকা-স্তূপ ইত্যন্তঃ সঞ্চালিত হইয়া এক স্থান হইতে অত্র স্থানে আনীত হইয়া থাকে।

গঙ্গা ও যমুনা ব্যতীত এখানে হিন্দন নামে আর একটা নদী আছে। বর্ষা ঋতুতে ঐ নদী দিয়া পণ্যবাহী নৌকা লইয়া গমনাগমন করা যায়। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বালুকা-ময়-অববাহিকা আছে, তাহা বর্ষাকালে জল প্রাপ্ত হয় এবং অপর সময়ে শুষ্ক খাতমাত্র পড়িয়া থাকে। ঐ সকল নদী ও ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী এবং গঙ্গা ও যমুনার কাটাখাল সমূহের জল-রাশি লইয়া এখানকার কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অমূল্যসহরের খাল ঢালু গাঙ্গেয়প্রদেশ জলসিক্ত করায় এ প্রদেশে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বুড়ীগঙ্গা বা গঙ্গার প্রাচীন খাত বর্তমান নদীগর্ভ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত, ইহারই তীরে ভারতীয় পাণ্ডব-রাজ-ধানী হস্তিনাপুর-নগরী অবস্থিত। এখন আর সেই প্রাচীন কীর্ত্তির বিশেষ কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, এই ভারতীয় ট্রয়-নগরীর নিদর্শন মাত্র অবশিষ্ট নাই। যে স্থান হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া সাধারণে কথিত হইয়া থাকে, তাহা খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্বে গঙ্গাগর্ভের পরিবর্তন-হেতু পরিত্যক্ত হইয়াছে।

হস্তিনাপুরের ভায়ু প্রাচীন না হইলেও মিরাট্ নগরের প্রাচীনতা ও প্রাধাত্য ইতিহাসে লক্ষিত হয়। জেলার প্রায় মধ্যস্থলেই এই নগর স্থাপিত। এখান হইতে দিল্লীর রাজ-ধানী পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত আছে। এতদ্ভিন্ন উত্তরপশ্চিম ভারতের প্রায় সমস্ত সমৃদ্ধ নগরে গমনাগমনের সুবিধার্থ এখান হইতে রাস্তা আছে। ইংরাজাধিকারে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এখানে যুরোপীয়দিগের স্তম্ভাগমন হইয়াছে। এই কারণে নগরভাগেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে।

এই মিরাট্ প্রদেশের ভায়ু, ভারতের আর কোথাও একরূপ সুপ্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ অন্তঃসেন্দীতে বাস করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীনতম কাল হইতেই এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি হয়। রামায়ণপাঠে জানা যায় যে, অযোধ্যা, বৈশালী ও মিথিলা জনপদে হৃৎ ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের অধিষ্ঠান হইয়াছিল। ইহাতে স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্য্যগণ প্রথমে দোবাবে অবস্থান করিয়া পরে শক্তিশালী হইয়া পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যে সময়ে মহাভারতীয় যুদ্ধের সংঘটন হয়, সেই সময় মিরাট্ও বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। যে হেতু দিল্লীনগরীর (ইন্দ্র-

প্রস্থ) অদূরবর্তী এই মিরাট্ নগরেই কুরুবংশীয়দিগের রাজ-ধানী হস্তিনাপুর বিদ্যমান ছিল। হস্তিনাপুরীর সেই প্রাচীন স্মৃতির নিদর্শন না থাকিলেও তথাকার অধিবাসিবৃন্দ পুরাতন গঙ্গাখাত-পার্শ্ববর্তী যে সুদীর্ঘ স্তূপকে হস্তিনার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা বাস্তবিকই হস্তিনার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় যুদ্ধের অবসানের পর এখানে রাজা পরাক্রিতের বংশধর কএকজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪২১ অঃ) [হস্তিনাপুর দেখ।]

হস্তিনাপুরকে (মিরাট্) কেন্দ্র করিয়াই ভারতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ পৌরাণিক যুদ্ধের ঘটনাপরম্পরা অতিক্রম করিয়া আমরা প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগে পদার্পণ করিলে দেখিতে পাই যে, খৃষ্টপূর্বের ৩য় শতাব্দীতে এই নগরী বিদ্যমান ছিল। দিল্লীস্থ স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে, তৎকালে মিরাট্ নগর ধনজনপূর্ণ ছিল। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন গুলিও সেই অতীত কালের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর মুসলমান-আক্রমণের পর তৎকালে এখানকার ধারাবাহিক প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎপূর্ববর্তী কালের কোন ঘটনার ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ করিবার বিশেষ উপায় নাই। বিষ্ণুপুরাণের মতে অদিমীন্দ্রকৃষ্ণের পুত্র নিচক্ষুর রাজ্যকালে হস্তিনাপুরী গঙ্গা কড়ক অপসৃত হইলে অর্থাৎ নগর ভাগ গঙ্গা গর্ভে লীন হইলে, রাজা কেশাধী-নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। নিচক্ষুর ২১শ পুত্র অদন্তন রাজা কেমক স্বীয় মন্ত্রী কড়ক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের রাজ্যকালে এখানে বৌদ্ধ কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণিতকৃত দুইটা প্রস্তরস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। তদনুসারে এখানে খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে মৌর্য বংশের আদিপত্য স্থিতি হইতেছে। তৎপরে খৃষ্ট পূর্ব ৫৭ অব্দে হিন্দু রাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্যের আধিপত্য কালে এই স্থান হিন্দু শাসনভুক্ত হয়। অতঃপর শক-রাজবংশের অধিদেয়ে দিল্লী নগরার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানে শাকাদিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার নিদর্শন স্বরূপ অসংখ্য শকমুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে দ্বিতীয়বার পদদর্শনে আসিয়া সেই রাজ্যের যে সৌম্যানিদেশ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, মুজঃকর নগরের কাণ্যাংশ, সমগ্র মিরাট্ জেলা এবং বুলন্দ শহরের উত্তরার্দ্ধ উক্ত রাজ্য সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালে থানেশ্বর নগর কনৌজরাজ হর্ষবর্দ্ধনের অধীন ছিল।

অতঃপর দিল্লীর রাজত্ববৃত্ত অহুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তোমরবংশীর রাজা অনঙ্গপাল আত্মমানিক ৭৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণ মুসলমান আক্রমণে উত্কণ্ট হইয়া কনৌজ পরিত্যাগপূর্বক অযোধ্যার অন্তর্গত বড়ি-নগরে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত বংশের শেষ রাজা ৩য় অনঙ্গপালের রাজ্যকালে চাহমানরাজ বিশগদেব রাজ্যলাভ করেন। চৌহানরাজবংশের পর, এখানে মুসলমান রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে এই প্রদেশ লুঠনশীল জাতি ও ডোর রাজবংশের করতলগত হইয়াছিল। বরগাধিপতি রাজা অহী-বর্ণের বংশধর ডোর-সর্দার হরদত্ত মিরাট নগরে একটা দুর্গ স্থাপন করেন। প্রবাদ, ১০১৬ খৃষ্টাব্দে গজনপতি মাহ্মুদ তাঁহাকে পরাজিত ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া রাজত্ব আদায় করিয়াছিলেন। ইহাই ইতিহাসে সিপাহ-সালার মস-উদের আক্রমণ নামে প্রসিদ্ধ।

১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর বিখ্যাত-সেনানী কুতব-উদ্দীন মিরাট নগর অধিকারপূর্বক তথাকার হিন্দুমন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণ করেন। তৎপরবর্তিকালে পাঠান রাজগণই এখানকার শাসনবিধি পরিদর্শন করিতেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে নোগলরাজ তৈমুরের আক্রমণ পর্যন্ত এখানকার ইতিহাস দিল্লীর ইতিহাসের সহিত সম্বন্ধ ছিল। তৈমুর মিরাট আক্রমণ করিলে, এখানকার রাজপুত্রগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। লোনি দুর্গে আক্রমণকালে রাজপুত্র-গণ হত্যাশাস হইয়া আপনাপন গৃহাদি ভস্মীভূত করে। সেই সঙ্গে দ্রাপুত্র পরিবার একত্র দক্ষীভূত হয়। দুর্গজয়ের পর, তৈমুরের আদেশানুসারে লক্ষাধিক হিন্দু বন্দী মোগলের তরবারমুখে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল। তৈমুর দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া পুনরায় মিরাটে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং তথাকার আফগান-সর্দার ইলয়ানকে পরাজিত করেন।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন দিল্লী সিংহাসনে মোগলপ্রভাব ছিল, তখন প্রকৃতই মিরাটে শাস্তি রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। মোগল সম্রাটগণ যমুনার এই উপত্যকা-ভূমিতে সর্বদাই মুগরা করিয়া বেড়াইতেন।

মোগলসম্রাট অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০২-১৭৭৫খৃঃ পর্যন্ত এখানে পুনরায় রাজ্যলোলুপ শিখ ও মহারাষ্ট্রীয়-দিগের উন্মাদ-নর্ভন্য আরম্ভ হয়। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে উত্তর-দোয়াবে জাট ও রোহিলাদিগের উপদ্রবের বিরাম হয় নাই।

দিল্লীর শোগলপ্রভিত্তি অবসানপ্রায় হইয়া আসিলে,

উত্তরপশ্চিম ভারতে অরাজকতাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। ঠিক ঐ সময়ে ওয়ালটার রীন্হার্ট (Walter Reinhardt) নামক জনৈক যুরোপীয় সৈনিক স্বীয় অদৃষ্টপরীক্ষার্থ উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই রক্তক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হন। তিনি স্বীয় ভূজবলে মিরাটের অন্তর্গত সর্দানা পরগণা অধিকার-পূর্বক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপত্নী বেগম সমস্ত উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হন। এই রমণী আরবদেশীয়া ও নর্তকীকল্পা ছিলেন। রীন্হার্ট তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহ কালে উক্ত রমণী গোমান্ কাথলিক খৃষ্ট-মত গ্রহণ করিয়াছিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর অধঃপতন পর্যন্ত ইহার দক্ষিণাংশ মহারাষ্ট্রীয় দিগের উপদ্রবে অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত বর্ষে সিন্দেরাজ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। উক্ত বেগম সাহেব সিন্দেরাজকে যথাযোগ্য সহায়তা করিয়াছিলেন। ইংরাজাধিকারে আসার পর হইতে ৭৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু কাল পর্যন্ত তিনি ইংরাজরাজকে সাহায্য দানে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মিরাট্ একটা স্বতন্ত্র জেলারূপে নির্দিষ্ট হয়। তৎপরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বুলন্দসহর ও মুজফফরনগর পৃথক্ করিয়া ইহা বর্তমান আকারে সংগঠিত হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এখানে আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

ব্রজমোহন নামক জনৈক সিপাহী সৈনিকের প্ররোচনায় এখানকার দেশীয় সৈনিকগণ টোটাকাটার কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠে। ৯ই মে ৩য় বেঙ্গল অখারোহীদল টোটা কাটিতে অস্বীকার করায় ১০ বর্ষের জন্য কারাবদ্ধ হয়। পর দিন রবিরার প্রাতঃকালে বিদ্রোহের কাণাঘুষা হইতে থাকে এবং ঐ দিন অপরাহ্নে ৫ ঘটিকা হইতে মিরাট্ নগরস্থ যুরো-পীয়গণের হত্যা কাণ্ড আরম্ভ হয়। বিদ্রোহের পর এখানে পুনরায় শাস্তি স্থাপিত হইল। অতঃপর এখানে বুলন্দসহরের মালাগড়ের সর্দার বালিদাৎ খাঁর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিশেষ গুরুতর ভাব ধারণ করে নাই।

[ সিপাহী বিদ্রোহ দেখ।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা তহসীল। কালী নদী, হিন্দন ও গঙ্গাখাল ইহার মধ্যে প্রবাহিত। দিল্লী, সিদ্ধ ও পঞ্জাব রেলপথ ইহার মধ্যে বিস্তৃত থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখানে ইক্ষুর চাষ ও চিনির কারবার আছে।



৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর এবং বিচার সদর। এখানে সেনানিবাস থাকায় এই স্থানের বিশেষ শ্রীলম্পর হইয়াছে। গঙ্গা ও যমুনা নদীর ঠিক মধ্যস্থলে মিরাট্ নগরী অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৪১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৫' ৩" পূঃ। কলিকাতা হইতে যে গাওঁটাকরোড উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গিয়াছে, তাহাও এই নগরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। সিন্ধু, দিল্লী ও পঞ্জাব-রেলপথের ট্রেন নগরে ও সেনানিবাসে আছে। এইজন্য স্থানীয় বাণিজ্য এবং সেনাপ্রেরণাদির বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

বর্তমান সেনাবাসের দক্ষিণভাগে মিরাট্ নগর। বহু-পূর্বকাল হইতেই ইহার চতুর্পার্শ্ব প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ঐ সীমা প্রাচীরের নয়টি প্রবেশদ্বারের মধ্যে ৮টি বহু প্রাচীন কালের নির্মিত। বৌদ্ধযুগে সম্রাট অশোকের রাজ্যকালে এই স্থানের সমৃদ্ধ অবস্থার পরিচয় পাইলেও প্রকৃত পক্ষে ইংরাজরাজের সেনাবাস গঠিত হইবার পূর্বে হইতেই এখানকার বর্তমান সমৃদ্ধি হইয়াছে।

মিরাট্ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে চারিটা বিভিন্ন আখ্যান কল্পিত হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকে বলেন, এই স্থানের পূর্ব নাম মীরথ বা মীরঠ। মহী নামক স্থপতি ইন্দ্রপ্রস্তরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিলে, রাজা প্রীত হইয়া তাহাকে মীরথ গ্রাম দান করেন। মহী স্ত্রী নামে এই নতুন জনপদের নাম মহিরাষ্ট্র রাখেন। তাহাও নির্মিত অনুরকোট নামক দুর্গ অগ্নিপিত্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

আবার জাটগণ বলে যে, তাহাদেব মহীরাষ্ট্র গোত্রীয় কোন উপনিবেশিক এই মীরঠ নগর স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইন্দ্রপ্রস্তরাজ মহীপালের নামানুসারে তাহার অধিকৃত এইস্থান মীরঠ নামে প্রসিদ্ধ হয়। অপর বলেন, এইস্থান বহু প্রাচীনকাল হইতে মহিদত্ত-কা-খেরা নামে পরিচিত ছিল। তাহা হইতে পবে মীরঠ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মহিদত্ত-কা-খেরা বৌদ্ধযুগের প্রাণান্যতক। শামসু ই-সিরাজ-পাঠে জানা যায় যে, অশোক-প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভলিপি দিল্লীর ফিরোজ শাহ কর্তৃক 'কুশাক-লিকার' প্রাসাদে আনীত হইয়াছিল।

প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপ এখানে আরও অনেকগুলি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৭১৪ অব্যাহির মল্ল প্রতিষ্ঠিত গৌড়াকুণ্ড (নভাঙ্গরে সূর্য্যকুণ্ড) ইহার চতুর্পার্শ্বে অসংখ্য মন্দির, ধর্মশালা ও সতীতত্ত্ব স্থাপিত আছে। ঐ মন্দিরসমূহের মধ্যে সম্রাট শাহজহানের রাজত্বকালে নির্মিত মনোহর শাহের মন্দির সর্বাঙ্গতঃ সুসজ্জিত।

বিষেখরনাথের মন্দির মুসলমান আক্রমণের বহুপূর্বে নির্মিত হয়। স্থানীয় লোকমুখে শুনা যায়, এখানকার মহেশ্বর মন্দির পাণ্ডববংশীয় কোন ভূপালের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল।

এতদ্বির ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে লাল দালালদাসের প্রতিষ্ঠিত তলাও মাতবল নামক দীঘিকা, কুতবউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত নৌবন্দী মহল্লার দরগা, ১৬২০ খৃষ্টাব্দে নুরজাহান-স্থাপিত শাহপীরের দরগা, ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে গজনিগতি মাক্সুদের উজীর হাসনুমহদী-নির্মিত কামি মসজিদ, মৎসুম শাহ তিলায়তের দরগা, ১১৯০ খৃঃ আবু মহম্মদ কখোর মকবাড়া, সাগর মসজিদ গাজীর মকবাড়া (১১৯১), আবু য়ার মহম্মদ খাঁর মকবাড়া (১৩৩৯ খৃঃ), কারবালা (১৬০০ খৃঃ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নোয়াটে যে খৃষ্টধর্ম-মন্দির নির্মিত হয়, তাহার উচ্চ চূড়া হিমালয়ের বহিঃপ্রান্তস্থ শিখরভূমে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে।

মিরাস্, উত্তরাধিকারসূত্রে লক্ষ্যসম্পত্তি। কখন কখন মিরাস্ শব্দে উত্তরাধিকারিতা এবং মিরাসীদার শব্দে ভূসম্পত্তির পরম্পরাগত অধিকারীকে বুঝায়।

মিরাসি, বারানসী প্রভৃতি উঃ পঃ প্রদেশবাসী এক শ্রেণীর মুসলমান। ডোম বা ডুম-মিরাসি নামে খ্যাত। পূর্বে ইহারা ডোম ছিল, পরে ইসলামধর্ম গ্রহণ করার মুসলমান-ডোম নামে পরিচিত হইয়াছে। গীতবিদ্যা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। কোথাও কোথাও ইহারা ধর্মগীতি গাইয়া, কোথাও বা ভট্টকবিদিগের মত বংশাশুচরিত কীটন করিয়া বেড়ায়। আপনাপন কতাদিগকে অতি শ্রেণ্যবান হইতেই নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা দেয়। সাধারণে ইহারা পাথোয়াজী, কলাবত ও ককাল (গল্পকার) নামে প্রসিদ্ধ। খাড়া নামক মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের আদান প্রদান চলে। নৃত্য-গীতপটু মিরাসি রমণীগণ সম্রাটবংশীয় ভদ্রমহিলাদিগের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ কোরু প্রদর্শন দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করে এবং তদ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া থাকে।

পুরুষগণ প্রধানতঃ ঢোলক, মঞ্জিরা (খরতাল) ও কিল্লি (বংশী) লইয়া গান করে। জাট জাতির বিবাহে ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ইহারা আসিয়া গীতবাত্ত করে।

কিংবদন্তী এতরূপে যে, মুলতান আলাউদ্দীন খিলজির রাজত্ব কালে ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে আমীর খস্র নামক জনৈক মুসলমান-কবি কর্তৃক নিমজ্জিত হইয়া ইহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

বর্তমান সময়ে এই বংশের রাজা উদ্দৌলা নামক জনৈক ব্যক্তি অযোধ্যারাজসভার কাণ্ড্যবিধি পরিদর্শন করিয়া

থাকেন। তত্ত্বির আলি বকস নামক অপর এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। ইনি যুরোপীয় রমণীর পাণিগীড়ন করেন, ইহারই ফলস্বরূপে সহিত নাসির উদ্দীন হামদরের বিবাহ হয়।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহাদের নিম্নাবাদস্থচক কএকটি প্রচলিত বাক্য আছে,—

“ডোম বণিয়া পোস্তি—তিওন বৈমান্”

“বাপ্ ডোম আউর ডোম হি দাদা, কহে মিকো?

দইন্ মুক্কা জাদা।” ইত্যাদি—

সিদ্ধপ্রদেশে মিরাসিগণ ভাটের কার্য করে। ইহারা সন্দারদিগের সহিত রণক্ষেত্রে যায় এবং যুদ্ধকাল পর্যন্ত ‘শের’ (রণগীতি) গাইয়া পূর্বপুরুষদিগের বীরত্বকাহিনী প্রচার করিয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহারা বাস্তবকর, নাপিত ও গণকের কার্য করিতেছে।

মিরাসি, মুসলমান-রাজগণ-প্রবর্তিত রাজকরবিশেষ। দাক্ষিণাত্যে ও বোম্বাই-প্রদেশে ভূম্যধিকারিদিগের উপর একরূপ রাজস্বসংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। তামিল ভাষায় ইহাকে কনিয়াক্কি বলে। মিরাসিদারগণ কনিয়াক্কিকরণ নামে খ্যাত। ইহা আমাদের দেশের মৌরানী বন্দোবস্তের স্থায়। যে সকল প্রজা পুরুষসমূহক্ৰমে রাজকর দিয়া ভূমি দখল করিতেছে, স্বয়ং গবমেণ্ট তাহাদিগকে উহার স্বত্ব হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন না।

মিরি, ঔষধার্থে প্রযোজ্য বীজভেদ।

মিরি, (মীরী বা মিড়ী) আসামের পার্বত্য উপত্যকাবাসী জাতি বিশেষ। আসাম হইতে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত এই অনাথ্য জাতির বাস আছে। বস্ত্র আবার জাতি ইহার একটা শাখা মাত্র। অকা, আবার ও দফলা নামক পার্বত্য অসভ্য জাতিদ্বয় এই মিরি জাতি হইতে সমুদ্ভূত এবং বিভিন্ন সংস্কার অভিহিত। লখিমপুর, শিবগাঁও, দরঙ্গ প্রভৃতি জেলার উপত্যকা ভূমিতে এই জাতির বাস আছে। অকাগণ সমতল ক্ষেত্রে, দফলারা পার্বত্য উপত্যকার এবং মিরিগণ পর্বতের বনান্তরাল নিম্নজন বসে বাস করে। আসামের পার্বত্য অকাগণের পূর্বাংশে আবারদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। [ অকা, আবার ও দফলা দেখ। ]

মিরিদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটা পাক দৃষ্ট হয়—১ বারগাম ও ২ দহগাম। বারগামে বাদশটী বিভিন্ন শ্রেণী, আর দহগামে দশটী শ্রেণী আছে। এই দুইটা পাক পরস্পর অন্তর্ভুক্ত। কেহ কাহারও সহিত মিশে না।

আসামের সমতল ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক মিরির বাস দেখা যায়। আবারেরা বলে যে, উহারা দাস ছিল, পলাইয়া আসিয়া

এখানে বাস করিতেছে। কিন্তু ইহারা একথা স্বীকার করেন না। ইহাদের মধ্যে একরূপ প্রবাদ আছে যে, পূর্বে পার্বত্য মিরি ও আবারদিগের মধ্যে ঘোর কলহ ছিল। এই বিবাদ-স্থরে উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধব্যাপদেশে যে সকল মিরি পক্ষত ছাড়িয়া সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহারা আর পর্বতে উঠিয়া যায় নাই। আবারদিগকে পরাজিত করিয়া তাহারা সমতল-ভূমিই আশ্রয় করিয়াছে।

আসামের ডিহিং নদীর সৈকতভূমে বহু পূর্বকাল হইতে মিরিদিগের বাস আছে। ইহারা ‘খালাস’ নামে পরিচিত, অর্থাৎ ইহারা জাতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ছুটিয়া মিরিগণ আপনাদিগকে দিহিং নদীর অববাহিকা দেশ হইতে আগত বলিয়া পরিচিত করে।

মোঙ্গলীয় জাতির জায় কাঁচা হলুদের রং, দীর্ঘাকৃতি, ও দৃঢ় পঠন দেখিলে অনুমান হয় যে, ইহারা উত্তরদেশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ আসামের পার্বত্য উপত্যকা-ভূমি অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং স্বজাতীয় আবারদিগকে পর্বতের নিভৃত নিকেতন হইতে তাড়াইয়া সমতল প্রান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছে। দৃঢ়কার হইলেও ইহাদের অমুদেগ মুখাকৃতি দেখিলেই অলস প্রকৃতিক বলিয়া অনুমান হয়।

বহুকাল হইতে আসাম গবমেণ্টের অধীনে বাস করিয়া ইহারা আসামবাসীর সহিত আবার-জাতির বাণিজ্যের পরিচালক স্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ আবারদিগের পার্বত্যক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য সমুদায় আসামে আনিয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করে এবং আবশ্যক মত ভারতীয় পণ্য দ্রব্য লইয়া আবারদিগের নিকট যায়। ইহারা এইরূপে দুইটা বিভিন্ন জাতির সহিত বাণিজ্য কাব্য পরিচালন করে বলিয়া মিরি নামে আখ্যাত হইয়াছে।

ইহারা প্রধানতঃ নদীতীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে ৪৫ ফুট উচ্চ মাঁচার উপর ঘর বাঁধিয়া বাস করে। এই মাঁচার নিম্নে বেড়া ঘেরিয়া ইহারা আপনাপন পালিত মূষা, ও শূকরাদি রাখে। গ্রামে কোন ভোজাদির আয়োজন হইলে ইহারা ইচ্ছামত ঐ জীব সকল মারিয়া ভোজন করে। কোন কোন বর্জিত্র গ্রামে ইহাদিগকে মহিষপাল পূর্বভে দেখা যায়। ইহারা ছদ্ম মোহন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বন কাটিয়া ইহারা চালা বাস করিয়া থাকে। খাত্ত, সরিষা, মকা ও তুলা ইহাদের প্রধান কৃষিজাত।

ইহারা বলশালী এবং স্বভাবতঃ কষ্টপূর। প্রকৃত পক্ষে ইহারা স্বাভাবিক জীবের মাংস ভক্ষণ করে। যে সকল

মিরি সমতল প্রদেশের গ্রামাদিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা হিন্দু জাতির সংস্পর্শ হেতু গোমাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বালাবিবাহ আদৌ প্রচলিত নাই, কিন্তু বালা কালেই পাত্র এবং পাত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে। যখন তাহারা উভয়ে আপনাদের বাসবাটী নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়, তখনই সেই দম্পত্যের বিবাহ প্রকাশ্য স্থলে বিধো-বিত্ত হইয়া থাকে। অনেক সময় বরকে কত্কার পিত্রালয়ে থাকিয়া ভূতাবৎ কাণ্ড করিতে হয়। যতদিন না কত্কারপণের লগ্ন পরিশোধ হয়, ততদিন তাহার এতরূপ ব্যবস্থা।

রমণীগণ আপনাদের পরিমেষোপযোগী বস্ত্র বয়ন করে। কার্পাসবস্ত্রের এক প্রকার ছিট প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ইহার অঙ্গরাখা তৈয়ারী করিয়া থাকে। ইহাদের 'জীমু' নামক মোটা ঝড়ন গার্হস্থ্য ব্যাপারে বিশেষ উপযোগী। পুরুষেরা বন কাটিয়া চাস করে বটে, কিন্তু রমণীগণও সেই শস্তক্ষেত্রে যাইয়া কার্যিক পরিশ্রমে কাতর হয় না।

ইহারা শবদেহ পুতিয়া রাখে। গোর দিবার পর ইহা-দিগকে বিশেষ কোন পারলৌকিক এধা করিতে হয় না।

ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম অনেকাংশে অজ্ঞাত বহু জাতীয়েরই অনুরূপ। ক্রিয়াগুলির কোন প্রকৃষ্ট অর্থ নাই। ইহাদের মধ্যে কোন একটা হৃদৈব উপস্থিত হইলে, ইহারা প্রেতাছা-দিগের পরিতৃপ্তির জন্ত পূজা করে। ঐ প্রেতাছা নেকিরী বা নেকিরান্ নামে প্রসিদ্ধ। নেকিরী পুরুষদিগের ও নেকিরান্ রমণীদিগের প্রেতাছার আদর্শরূপে পূজিত হয়। এতদ্বিধ ইহারা ঘৃণা (দৈভ্য), স্বর্গ (ভলঙ্গ) এবং পৃথীকে (মোরা-সিন্) বিশেষ ভক্তি করে।

উপরোক্ত দেবতা ও মনুষ্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষার জন্ত মীষী বা মিষোয়া নামে এক শ্রেণীর পুরোহিত আছে। রোগীকে ঔষধ দান এবং ক্রিয়া কর্ম্মে জীববলি দেওয়া ইহাদের প্রধান কার্য্য। মিষোয়াগণ পুরুষাভূক্তমে এই পদে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। কখন কখন অপর নোকেও এই পদ পাইয়া থাকে। ইহারা সেই পদপ্রাপ্তিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করে। কিরূপে ইহারা দেবতাদিগকে আবাহন করে, নিম্নে তাহার প্রণালী লিপিবদ্ধ হইল।

১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রেতাছা দ্বারা বনান্তরে পরি-চালিত করিয়া ইহারা আপনাপন ইষ্টদেবকে তথায় লইয়া যায়। এখানে কেবল মাত্র বনফল খাইয়া সে কিছুকাল সেই স্থানে অবস্থিত করে। তৎপরে যেন সে নূতন উপা-দানে গঠিত হয়। তাহার অন্তরাছাও অনেক পরিমাণে পরি-

মার্জিত হইয়া থাকে। সে দিবা চক্ষে অদৃশ্য লোকের (স্বর্গ-পুয়ীর) ব্যবতীর ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা বস্তুর বাখ্যার্থ্য্য সপ্রমাণ করিয়া থাকে। ইহার, ত্রিটিপাঠ, দ্বারা চিত্তপরিপুষ্টিপূর্ব্বক রোগীকে রোগ মুক্ত করিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী দৈববাণীরূপে বলিয়া দেয়।

বারগামী মিরিগণ প্রাচীন প্রথমত নেকিরি ও নেকিরান্ পূজা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে শঙ্কর ও পয়মেস্বরের পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এই পূজা (বোরথোবা বা বুড়-থোপা) সাধারণে বিশেষ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন করে। গৃহ-স্থেরা কোন কোন সময়ে নেকিরি-নেকিরানের পূজাও দিয়া থাকে। মিষোয়াগণ এই উৎসবে পোরোহিত্য করে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের মত আর ঈশ্বরের কাল্পনিক আবাহন করিতে প্রয়াস পায় না। যে দেবতাই হউক না কেন, ইহাদের মূল পূজা-পদ্ধতি প্রায় একই প্রকার। সকল পূজাতেই ছাগ, মুরগী, শূকর ও মহিষবলির ব্যবস্থা আছে। উৎসবে সকলেই চাউল হইতে প্রস্তুত মত্ত পান করে।

ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে ভক্তিয়া ও অভক-তিয়া নামে দুইটা শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যাহারা গোসাইর শিষ্য তাহারা ভক্তিয়া এবং যাহারা গোসাইর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে না, তাহারই অভক্তিয়া নামে প্রসিদ্ধ। আসামের শিবসাগর জেলায় গোসাইদিগের প্রধান আধড়া। তাহারা প্রধানতঃ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে বাস করেন। সময় সময় মাঝুলদীপে এবং এক্সপুত্রের উত্তরতীরবাসী মিরিদিগের নিকট আসিয়া তাহারা গুরুর শ্রাপ্য দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

ইহারা কোন প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া উপাসনা করে না। কাহারও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই। অনেকে মহিষ মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা পাইতেছে। মাটিমিরগণ স্বজাতীয় অপর্যাপর লোকের মত মাচা-বাধা গৃহে বাস করে না। তাহারা অন্তান্ত নিকট শ্রেণীর হিন্দুর মত মৃত্তিকার উপরে গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে এবং জাতীয় প্রাচীন রীতিনীতি ও ধর্ম্মাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দু ক্রিয়াকলাপের অগ্রকরণ করিতেছে।

যে সকল পার্বত্য মিরি ইংরাজাধিকারের বাহভাগে সুবর্ণশ্রী নদীর উত্তরে বাস করে, তাহাদের মধ্যেও কএকটা শ্রেণী বিভাগ আছে, তন্মধ্যে ঘং-ঘাট্ট, পলরাক, পাণিবাটিয়া ও তরবাটিয়াগণই প্রধান। সীমান্ত প্রদেশেরকার জন্ত ইহারা আসামের দেশীয় রাজার নিকট হইতে বার্ষিক কিছু দান পাইত। এখন ইংরাজ গবমেণ্ট শরত্বত্বকার্য্য জন্ত ইহাদিগকে

কিছু কিছু দিয়া থাকেন। পার্শ্বত্যা মিরিগণ এক এক জন দলপতির অধীনে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। কোন কোন পরীতে এক একটা পরিবার সমগ্রপল্লাবাসীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। আবারদিগের মত ইহাদের শাসনশৃঙ্খলা নাই। ইহারা রাজি আসিয়া গ্রামে চৌকী দেয় না। অথবা মোরজ নামক সাধারণ-সম্মিলনগারে একত্র হইয়া কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করে না।

পাণিবোটিয়াদিগের সর্দার ডেমা নামে খ্যাত। ইহার বানভবন বাশে নির্মিত এবং ৭০ ফিট লম্বা। ইহাদের রমণীগণ বেশভূষা ও অলঙ্কারপ্রিয়। সাধারণতঃ ইহারা পার্শ্বত্যা নিকটে মণিসমূহের মালা গাঁথিয়া গলার পরে। পুরুষেরা বলিষ্ঠ, চুড়া করিয়া চুল বাঁধে। ইহাদের কর্ণে রূপার কুণ্ডল এবং নাথার ব্যাজ্ঞচাঁড়াদিত বেষ্টের টুপি থাকে। জামা ও বস্ত্রে ইহাদের বিশেষ পারিপাটা নাই।

হতী প্রভৃতি বিভিন্ন বস্ত্র জন্ত ষরিবার কোশল ইহারা বেশ জানে। প্রায়ই ফাঁদ পাতিয়া তাহারা পশু ধরে। পুরুষগণ ব্যাঘ্র মাংস খায়। ইহাদের বিশ্বাস ব্যাঘ্র মাংস ভক্ষণ করিলে শরীরে বৃদ্ধিলাভ হয়। রমণীগণ ব্যাঘ্র মাংস খায় না।

ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। সর্দারগণ অবস্থানরূপ পণ্যাদিয়া যত ইচ্ছা পত্নী ক্রয় করিতে পারে। পিতার মৃত্যু হইলে, গর্ভধারিণী মাতাকে বাদ দিয়া পুত্র অথবা অপর কোন উত্তরাধিকারী বিমাতাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। ষরিদিগকে পত্নীলাভের প্রত্যাশায় ঘোর পরিশ্রম করিতে হয়। কতাপণ দিতে অশ্রু হওয়ার প্রধানতঃ কতাদিগের বিবাহের গোলাযোগ্য বটে। এই কারণে অনেক স্থলে রমণীগণ বহুস্বামিক হইয়া পড়ে।

মিরি-রমণীগণ স্বামীকে ভক্তি করে। একরূপ কষ্টে থাকিয়াও তাহারা স্বামীকে কখন ক্ষুণ্ণ কথ্য বলে না। তাহারা যখন যে স্বামীর নিকট থাকে, কিছুতেই অবিশ্বাসী বা অবাধ্য হয় না। মাঠে পতির সহিত ভূমিকর্ষণ করিতেও তাহারা কাতর নহে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রত্যেক কণ্ঠেই ইহারা জীবলি দেয়। ইহাদের বিশ্বাস আছে যে, জীব মাজেই নিহত বা মৃত হইলে তাহার প্রেতাশ্মা স্বর্গে যায়। ঐ প্রেতাশ্মা-সমূহের উপর ষমরাজ কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। প্রেতাশ্মা দেহদগ্নিধানে যাঁয়\* বলিয়া ইহারা পূজাদিতে জীবহিংসা করিতে কাতর হয় না। এই ষমরাজ যে হিন্দুদিগের ষম তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

ইহারা বিশেষসংস্করণের সহিত শবদেহ প্রোথিত করে।

যদি কেহ সমস্তল ক্ষেত্রে আসিয়া পরলোকগত হয়, তাহা হইলেও তাহার মৃতদেহ পরীতে আনিয়া পূর্বপুরুষদিগের সমাধিস্থলে পুতিয়া ফেলে। কোন সংক্রামক রোগে মরিলে তাহাকে আর পরীতে আনা হয় না। পুতিবার সময় ইহারা গর্ভ মধ্যে অলঙ্কার, রক্ষণপাত্র ও ভোজ্যাদি দেয়। ইহাদের বিশ্বাস ঐ সকল ভোজ্য তাহাদের স্বর্গবারাকালে কাজে লাগিবে। প্রেতাশ্মাকে স্বর্গ-গমনকালে পাথের দিবার নিয়ম হিন্দুর মধ্যেও আছে। উহা বৈতরণী নামে খ্যাত। অলঙ্কারাদি দেখিয়া ষমরাজ ঐ প্রেতাশ্মার গুরুত্ব বুঝিয়া লইবেন।

ইহারা আপনাদের উৎপত্তি ও পরীতে বাস সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে, পরম পিতা কর্তৃক তাহারা পরীতে বাসযোগ্য উপাদানে গঠিত হইয়াছে এবং তাহারই আদেশ মতে তাহারা এই বনান্তরালে আসিয়া বাস করিতেছে। পূর্বে তাহারা হিমা-লয়ের তিব্বত বিভাগে বাস করিত। পক্ষীদিগকে আসাম-প্রদেশে উড়িয়া আসিতে দেখিয়া তাহারাও এই প্রদেশে অবতরণ করিয়াছে। ইহারা পরীতের সমুচ্চ চূড়ে আরোহণ করিতে পটু। এমন কি যে সকল সমুচ্চ ছাগাদ জীব পিঠাপিঠি করিয়া গমনাগমন করে, সেই দুক্লহ পথেও ইহারা অনায়াসে ভারবহন করিতে সমর্থ হয়।

মিরিক (স্ত্রী) লতাভেদ।

মির্গি (দেশজ) মৃগীরোগ।

মির্দাহ (পারস্য) গ্রামের মোড়োল।

মির্শ্বির (গ্রি) মিট্‌মিটে আলোকযুক্ত।

মিল্, শ্লেষ। তুদাং উতং অকং সেট্। লট্, মিলতি-তে। লুঙ্, অমেলীং অমেলিট্। এই ধাতু কেহ কেহ কুটাদি মধ্যে নির্দেশ করেন। তাহাদের মতে লুঙ্, অমিলীং। লুট্, মিলনম্।

মিল্, (অন্টুয়াট) সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-দার্শনিক। তিনি ১৮০৬ খৃঃ অব্দে ২০এ মে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা জেমস্ মিল একজন দরিদ্র কৃষকের সন্তান ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন ধনশালিনী রমণীর অর্থায়ুকুলো এডিনবর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যথোচিত শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন এবং নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাহার প্রণীত বহুসংখ্যক উপদেশ গ্রন্থ বিস্তারিত আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি ভারতবাসীদিগের প্রতি আন্তরিক সম্মতি ও সমবেদনার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার জন্য স্বমত পরিবর্তন করিতেন না।

তাহার এই সমস্ত গুণাবলী ও প্রকৃতি, পুত্র সমধিক পরিমাণে সংক্রান্ত হইয়াছিল। জনষ্টুয়ার্ট মিল তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র। জন ষ্টুয়ার্টের জন্ত তিনি যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—তাহা সাধারণের তাগে ঘটিয়া উঠে না। মেহময় পরিজনবর্গের শাস্তিনীতল কোমলাঙ্কে উপবেশন করিয়াই জন বিভারূপ কল্পবৃক্ষের ফলাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৃহই তাহার বিদ্যালয় ছিল। উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্ত তাহাকে বিখ-বিদ্যালয়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে হয় নাই।

ছাত্রজীবন।

জনষ্টুয়ার্টমিলের তিন বৎসর বয়সে তাহার পিতা তাহাকে ব্যাকরণের শব্দ ও ধাতুরূপ শিখাইতে আরম্ভ করেন। এক বর্ষ মধ্যে তিনি গ্রীক ভাষার অমূল্য করিতে আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই ‘দ্রিশপ’ প্রণীত কথামালা অধ্যয়ন করেন। এইরূপে বিভাসৌধের প্রাথমিক সোপান-মালায় দ্রুতগদে আরোহণ করিয়া মিল ৮ বৎসরের মধ্যে হিরোদোতাস, জেনোফন, স্যক্রেটিস, ডাইওজেনিস, আই-সোক্রেটিস ও প্লেটো প্রভৃতি সুবিখ্যাত গ্রীক গ্রন্থকারগণের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন। জেমস পুত্রকে একমুহূর্তের জন্ত নয়নের অন্তরাল করিতেন না। শয়ন, ভোজন, অধ্যয়ন ও ভ্রমণ সকল সময়েই পুত্রবৎসল পিতা মিলের নিকট থাকিতেন। মিল সমবয়স্ক বালকবৃন্দের সহিত ক্ষণমাত্রও বাক্যবিনিময় করিতে পারিতেন না। একজন্ত পিতাকে অনেক সময়ে পুত্রের শৈশবস্বভাবমূলত কোতূহলের মীমাংসা করিতে হইত। পিতা পুত্রকে কেবল পাঠ অভ্যাস করাইয়া নিবৃত্ত থাকিতেন না, পুত্রের প্রচ্ছন্ন-প্রতিভা উদ্দীপিত করিবার জন্ত পুস্তকের দ্রুত অংশ সকল নিজে নিজে বুঝিতে বলিতেন।

প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে জেমস পুত্রকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন এবং গল্পছলে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিতেন। জনষ্টুয়ার্ট সন্ধ্যাকালে পিতার নিকট গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল না। জেমস ভ্রমণকালেও পুত্রের নিকট অভ্যস্ত পাঠ জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপে অল্পকালের মধ্যে তিনি প্রেমময় পিতার একান্ত যত্নে রবার্টসন, হিউম, গিবন, প্রুটার্ক ও বর্ণেট প্রভৃতি গ্রন্থকারের ইতিহাস সকল অধ্যয়ন করিলেন। জেমস ভ্রমণকালে মিলকে মুখে মুখে ধর্মনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাসসম্পর্কীয় যে সমস্ত কোতূহলোদ্দীপক উপদেশ প্রদান করিতেন, পরদিন ভ্রমণকালে সেই সমস্ত

বিষয় তাহাকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করিতে বলিতেন এবং পুত্রের অধ্যয়নপ্রবৃত্তি ও জিজ্ঞাসা বলবতী করিবার নিমিত্ত মিলের নিকট নানা শাস্ত্রের সাহচর্য প্রসূতের অবতারণা করিতেন। তদনুসারে মিল গৃহে প্রত্যাগত হইয়া উল্লিখিত গ্রন্থ সকল স্বয়ং আত্মোপাস্ত পাঠ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। জেমস পুত্রকে নাটক ও উপভাস পড়িতে দিতেন না। আমোদজনক পুস্তকের মধ্যে মিল কেবল রবিন্সনক্রুসো পাঠ করিতে পাইতেন।

অষ্টম বৎসর বয়সে মিল গ্রীক ব্যাকরণ, সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হোমরের ইলিয়ড পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তিনি লাতিন ভাষা শিক্ষা করিতে লাগলেন। ইহা ব্যতীত তাহাকে প্রত্যহ নিয়মিত রূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীগুলিকে লাতিন শিখাইতে হইত। ইহাতেও তাহার একটা বিশেষ উপকার হইত। অল্পকালে বুঝাইতে যাইয়া অধীত বিষয়গুলি তাহার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া বাইত। ইহার কিছুদিন পরে তিনি পিতার নিকটে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও বোজগণিত শিখিতে আরম্ভ করেন। এই প্রকারে ১২ বৎসর বয়সের মধ্যে অলৌকিক প্রতিভাবলে মিল গ্রীক ও লাতিন ভাষার প্রায় সমস্ত গ্রন্থাংশ পাঠ করিয়া তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইলেন। যেন স্বাভাবিক সংস্কার বলে প্রাকৃত-বিজ্ঞা সকল তাহার আয়ত্ত হইল। মিল আত্মজীবনচরিতে নিজের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—“পাণ্ডিত্যমণ্ডিত পুত্রবৎসল পিতার ঐকান্তিক যত্নে ও মনোযোগে তিনি এই সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।”

মিল পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাস পড়িতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। গ্রীক ও রোমের ইতিহাস সম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থই তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মিটফোর্ডের গ্রীস ও ফার্গুসনের রোম তাহার অতি প্রিয়পাঠ্য ছিল।

মিল বাল্যকালেই রোমের ইতিহাস, পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ত্ব, ইংলণ্ডের ইতিহাস ও রোমের শাসন প্রণালী নামক চারিখানি ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেন। এই সমস্ত গ্রন্থে তিনি সাধারণ-তত্ত্বের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

পিতার অল্পমতিক্রমে মিল কৈশোরে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি কবি হইতে পারিলেন না। জেমস পুত্রকে কবি করিবার নিমিত্ত হোমর, হোরেস, বার্জিল, সেক্সপিয়র, মিল্টন, টমসন, পোপ, পেনসনসার, স্বট, ড্রাইডেন প্রভৃতি কবিগণের কাব্য পাঠ করিতে দিলেন। কিন্তু চিন্তামণিলাভে সমুৎসুক মিল গভীর চিন্তাশীলতা পরিভাগ

করিয়া কাব্যভাবের তন্ময়তা লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের পরীক্ষিত বিষয় সকল পাঠ করিতে ও তৎসমুদায়ের পরীক্ষা দেখিতে ভাল বাগিতেন।

দ্বাদশ বর্ষ বয়সের মধ্যে মিল্ বালালিকা সমাপ্ত করিয়া চিন্তারাজ্যের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে তর্কশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অর্গানন্ (Organon)-প্রণীত তর্কশাস্ত্র তাঁহার এ বিষয়ে প্রথম পাঠ্য। তর্কবিজ্ঞান যুক্তিপরিম্পরা তাঁহার চিন্তাপ্রবণ-চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল। এ সময়ে তিনি স্বীয় জীবন বুভুক্ষু লিখিয়াছেন যে,—তর্কশাস্ত্রের জ্ঞান কোন শাস্ত্রই বুদ্ধি পরিমার্জিত করিতে পারে না।

এই সময়ে তিনি বিখ্যাত গ্রীকবক্তা ডিমস্‌থিনিসের “ফিলিপিকস্” নামক বক্তৃতাগুলি পাঠ করেন এবং জীস্ দেশের রীতি নীতি ও সমাজপদ্ধতি অবগত হন। তৎপরে তাসিতাস্, জুভিনাল্ ও কুইন্টিলিয়ন্ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকার-গণের পুস্তক সকল পাঠ করিয়া প্লেটোর “জজিয়ান্” “প্রোটোগোরস্,” এবং “রিপাবলিক্” বা সাধারণ-তত্ত্ব নামক ভূবন-বিখ্যাত গ্রন্থ সকল পড়িতে আরম্ভ করেন। মিল স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন যে, আয়্যোংকর্ষ লাভ করিতে হইলে প্লেটোর গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে কখনই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

এই সময়ে ১৮১৮খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতা জেমস্ ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থ সমাপন করেন। উহা মিলের শিক্ষার প্রধান উপাদান স্বরূপ হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি হিন্দু-দিগের প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজপদ্ধতি প্রভৃতি জানিতে পারেন এবং ভারতবাসিগণের আন্তরিক হিতৈষী হইয়া উঠেন।

ইহার অল্পকাল পরে রিকার্ডো অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। জেমস্ পুস্তকের চিন্তাশক্তি উত্তরোত্তর মাজিত করিবার জন্য মিলকে মুখে মুখে ঐ পুস্তক-সম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল বিষয়ের উপদেশ দিতেন। পরে পুত্রকে-রিকার্ডোর পুস্তকের সহিত আডাম স্মিথ-প্রণীত অর্থনীতি-শাস্ত্র মিলাইয়া উৎকর্ষাপকর্ষের সমালোচনা করিতে বলিতেন। জেমসের জ্ঞান শিক্ষাগুরু পৃথিবীতে অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে এবং মিলের জ্ঞান ছাত্র ও সংসারে অতি বিরল। বিধাতার বিচিত্র বিধানে পিতাপুত্র ঐক-শিষ্যরূপে জ্ঞান-রাজ্যের দুর্গম দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে চতুর্দশ বৎসর বয়সে মিলের বিজ্ঞানশিক্ষা সমাপ্ত হইল। এখানে তিনি আর পিতার ছাত্র নহেন; - নিজেই শিক্ষক হইলেন। চতুর্দশ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি গ্রীক, লাতিন ও ইংরাজী জ্যাক্স ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও

দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া জ্ঞানরুদ্ধের উচ্চশাখায় আরোহণ করিলেন। তিনি কখনও বিভ্রাণে যান নাই এবং পিতা ভিন্ন অন্য শিক্ষকের নিকটে পড়েন নাই।

শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া মিল্ দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পিতা পুত্রকে উপদেশ দিলেন—তুমি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া দেখিবে, তোমার সমবয়স্ক যুবকেরা তোমার অপেক্ষা শিক্ষায় সহস্রগুণে পশ্চাৎপদ—তাহা দেখিয়া তোমার উৎকর্ষের বিষয় চিন্তা করিয়া আত্মাভিমানী হইও না এবং বিদ্যালোচনায় বিরত হইও না, কারণ শাস্ত্র অনন্ত ও বেদিতব্য-বিষয়ের সীমা নাই।

ভ্রমণ ও বিশ্বজনসন্মিলন।

মিল্ পূর্ষ হইতেই ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন। লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি মধ্যে মধ্যে পল্লীপ্রকৃতির স্মৃতিশ্রাবণ শোভা সম্বন্ধি দেখিবার জন্য পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করতে বাইতেন। এই সময়ে ১৮১৩ খৃঃ অব্দে পিতৃবন্ধু স্ম প্রসিদ্ধ বেছামের সহিত মিল্ অক্সফোর্ড, বাথ, ব্রিষ্টল, প্লাইমাউথ প্রভৃতি জনপদ ভ্রমণ করিয়া নানা উপদেশ লাভ করেন। নৈসর্গিক নিরূপম সৌন্দর্য্য তাঁহার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সময় হইতে মিল্ বেছামের সহিত প্রতিবৎসর ৬ মাস করিয়া একত্র অবস্থান করিতেন। ইংলণ্ডের নানান স্থান ভ্রমণ করিয়া মিল্ বেছামের সহিত ফ্রান্সে গমন করেন এবং পিরিনিয় পর্বতের উপত্যকাক্ষেত্রে বাস করিয়া জড়-প্রকৃতির মনোমোহন সৌন্দর্য্য অবলোকন করেন। এই স্থানে তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া উক্ত ভাষার বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং ফ্রান্সের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সহিত পরিচিত হইয়া নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলেন। একবৎসরের অধিককাল ফ্রান্সে অবস্থান করিয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিক সেন্ট সাইমনের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মে। এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয় স্বাধীন চিন্তার উদ্দীপনামত্রে দীক্ষিত হয়।

বেছাম, হিউম, রিকার্ডো প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণ জেমস্ মিলের বন্ধু ছিলেন। মিল্ পিতৃবন্ধুগণের পুস্তক-পাঠে ও কথোপকথনে শৈশবজীবনেই তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে শিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বেছামের নীতিই তাঁহার চিন্তাকেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছিল। পরে গ্রোট্, চার্লস্ অষ্টিন্ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত মিলের বনিষ্ঠতা জন্মিল। মিল্ এতদিন গৃহাভ্যন্তরেই অধ্যয়ন করিতেন। এই সময় হইতে তিনি সমাজের বিষয়বর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া নুতন জীবনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সকল অবস্থাতেই বিভ্রান্তশীলন তাঁহার হিরণ্যময় থাকিল।

কার্যক্ষেত্র ও গ্রন্থাবলী।

প্রগতি পান্ডিত্য লাভ করিয়া মিলকে জীবিকার্জনের নিমিত্ত কেরানী-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। জগতে সর্বত্রই শিক্ষাকাণ্ডের এই বৈষম্য দৃষ্ট হয়। ১৮২৩ খৃঃ অঃ ১৭ বৎসর বয়সে মিল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে লিখন বিভাগে কন্‌চারী নিযুক্ত হন। পরে ১৮৩৭ খৃঃ অঃ দেশীয় সামন্ত নৃপতিগণের সহিত পত্রাদি লিখিবার কাৰ্য্য প্রাপ্ত হন। পরে ১৮৫৬ খৃঃ অঃ উক্ত কোম্পানীর পরীক্ষাবিভাগের সন্মধ্যকপদ লাভ করেন। কিন্তু এ কার্য্য অধিক দিন করিতে না করিতে ১৮৫৮ খৃঃ অঃ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্বকাল-অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কৰ্ম্মও শেষ হয়। যখন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারত শাসন গ্রহণ করেন, মিল তখন তীব্র ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মত এই যে, কোম্পানীর কোন শাসনকর্ত্তা (ওয়ারেন হেস্টিংসের মত) ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করিলে পালিয়ামেন্টে তাঁহার প্রতিবিধান করিতে পারেন, কিন্তু রাজ্যের প্রতিনিধি ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করিলে, তাঁহাকে কেহই অভিযুক্ত করিতে সাহসী হইবে না। রাজ্যের অধীনে তিনি কৰ্ম্ম শাইয়া পরিত্যাগ করেন। মিলের ভবিষ্যদ্বাণী যে অনেকাংশে সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা শিক্ষিত ভারতবাসী বোধ হয় বৃত্তিতে পারিয়াছেন।

মিল ১৮৬৫ খৃঃ অঃ শ্রমজীবী-সম্প্রদায়েব প্রতিনিধি হইয়া পালিয়ামেন্টের সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি পালিয়ামেন্টে সংস্কারের উপকারার্থ অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই Reform bill বা সংস্কার-আইন রাজবিধিতে পরিণত হয়। মিল পালিয়ামেন্টে স্ত্রীলোক প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহা কাণ্ডে পরিণত হয় নাই। দামব্যবসায় লইয়া যখন আমেরিকাবাসীদের সহিত গৃহবিচ্ছেদজনিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সে সময়ে ইংলণ্ডের যে মানব হিতৈষিগণ দামত্ব-বিরোধি-দলের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, মিল তাহাদিগের অন্যতম। মিল ইউনাইটেড-ষ্টেটসের পক্ষে অমুকুল মত প্রকাশ করিয়া সজ্জনতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

মিল লেখনী ধারণ কবিয়া বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী লিখিয়া গিয়াছেন। স্বীয় পদোচিত কাণ্ডের অবসরে তিনি ঐ সমস্ত বিষয় রচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ১৮২৩ খৃঃ অঃ Traveiler ও Chronicle নামক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন।

তিনি অপর বহু পত্রিকায় ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করেন। তুর্কশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র ব্যতীত ১৮৫৬ হইতে

১৮৬১ এর মধ্যে স্বাধীনতা (Liberty), হিতবাদ (Utilitarianism) ও স্ত্রীপাতির অধীনতা (Subjection of women) নামক পুস্তকত্রয় তিনি সপত্রীক রচনা করেন।

১৮৫২-৩০ খৃঃ প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী (Representative Government) ও হ্যামিল্টনপ্রণীত দর্শনের সমালোচনা প্রকাশিত করেন।

ইহার পরে তিনি মেচার (Nature) এবং এক্সামিনার (Examiner) নামক পত্রিকায় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন।

মিল শেষ জীবন পর্য্যন্ত গ্রন্থ রচনার ও পুস্তকলিখিত প্রস্তাব সকলের সম্পাদনে ও সংশোধনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে মিলের পাক্ষিক সমালোচনী পত্রিকায় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

পত্রীর মৃত্যুর পর হইতেই মিল বৎসরে দুইবার লণ্ডনে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার লেখনী ও জিহ্বা পরহিত-সাধনে কখন পরাযুগ্য হয় নাই। বৎসরের অবশিষ্টাংশ পত্রীর সমাধিক্ষেত্রের সন্নিহিত নির্জন কূটরে অতিবাহিত করেন। উপরত পত্রীর গুণাবলী পরিচিন্তন করিয়া তিনি পত্রী-শোকের নিদারুণ শেলাঘাত কথঞ্চিৎ নিবারণ কবিতেন। পরে ১৮৭৩ খৃঃ ২ই মে সেই স্থানেই বিসর্প ব্যাধিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্বজ্জগৎ তাঁহার বিয়োগে ব্যথিত হৃদয়ের সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং রমণীকুল মিলের বহু অঙ্গ অঙ্গ বিসর্জন করিয়াছিলেন। মিল ভারতবাসিগণের হিতকল্পে যে সমস্ত প্রস্তাবাদি রচনাপুস্তক পালিয়ামেন্টে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত ভারতবাসিমাতেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। চংরাজস্বাতি দার্শনিকাগ্রগণ্য মিলকে হারাইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মিলের দার্শনিক মত বা নীতিশাস্ত্র।

যে সমস্ত মনীষিগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়কালে প্রতীচ্য-চিন্তারাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন—জন্ম ষ্টুয়ার্টমিল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুকাল পূর্বে মানবীয় স্বত্বস্বাধীনতার সিক্সেবক ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়ার ও প্রজাতন্ত্রপ্রতিনিধি বাগ্‌নিপ্রবর মিরাবৌ প্রভৃতি ননিস্ত্রিগণের স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত উন্মাদনাময় উদ্দীপনা-ময়ের স্ফুটস্বাভাবী ফল, ফ্রান্সের রাজসিংহাসন চূর্ণীকৃত ও রাজশক্তি উন্মূলিত করিয়া লোমহর্ষণ ফরাসী-বিপ্লবের সৃষ্টিপূর্বক যুরোপে সাধারণী শক্তির সাম্য-স্বচক বিজয়দোষণী কীর্তন করিতেছিল। এই সময়ে যুরোপ-



খণ্ডে স্বাধীনতার সজীবনী শক্তি ধীরে ধীরে চিন্তাশীল মানব-গণের অন্তঃকরণকে চিন্তারাজ্যের উন্নতিসোপানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল।

এইরূপে যখন ম্যাককাল্ পেটালোজি, উইলহেম, ভন-হাৎফেল্ট, গেটে, ভল্টেরার ও বেহাম প্রভৃতি মহামহো-পাধ্যায়দিগের স্বাধীন চিন্তার উদ্দীপনামত্রে চিরপ্রচলিত পুরাতন চিন্তার ক্ষুদ্রার্ঘ্য প্রচুরবহির উচ্চাঙ্গে প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার অচিরকাল মধ্যে অগাধস্ব মনোবী মিলের স্বাধীনতা ও হিতবাদের মহামত্রে চিন্তারাজ্যের কু-সংস্কারাচ্ছন্ন সূদৃঢ় প্রাচীন দুর্গ প্রজ্বলিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। দেবতা ও অসুরগণ অস্তহিত হইতে লাগিলেন। ঈশ্বরের চিরপ্রতিষ্ঠিত জ্বালের সিংহাসন কবিকল্পিত বলিয়া প্রমাণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িল। সাধারণী শক্তির বিজয়-চুম্বিত সর্বত্র নিনাদিত হইতে লাগিল। অবলাগণ যুক্তির শব্দসম্পাতে দাসত্বের দৃঢ় নিগড় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সাম্য স্বাধীনতাময়ী বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া সমাজশৃঙ্খলার বিপর্যয়সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মিলের নীতিশাস্ত্রই উন্নতিশীল উনবিংশ শতাব্দীর এই অভাবনীয় বিপ্লবের প্রবর্তক।

মিলের দার্শনিক মত বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে ৩টা বিষয় স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই-ত্রিধারার অপূর্ণ সম্মিলনে মিলের চিন্তাপ্রবাহ গঠিত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত ধর্ম ও নীতিশিক্ষার বীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মিল সন্দেহোত্তাপে পিতার মত্রেই দীক্ষিত ছিলেন। সমাজের অত্যাচার শক্তি তাঁহার চিত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। জেম্সের হৃদয়ে ধর্ম-চিন্তার স্বাধীনতাব সর্বপ্রথম উদিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া প্রমাণ-সাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তবে তিনি চার্লস প্রভৃতি প্রাচ্য দার্শনিকদিগের জ্ঞান নাস্তিক ছিলেন না। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের আদিকারণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তিনি পুত্রকে শিক্ষা দিয়া-ছিলেন, যে ঈশ্বর সংসারে বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, রোগ শোক প্রভৃতি ত্রিভাষে মনুষ্যকে অহনিশি দগ্ধ করি-তেছেন, তিনি কখনও সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে যুগপৎ জায়বান ও দয়াময় হওয়া অসম্ভব। এইরূপে তিনি ঋতুধর্মের বিবেচনা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার মত গ্রীক দার্শনিকদিগের অধরূপ ছিল। স্টোয়িক (Stoic), এপিউ-রিয়ান (Epicurian) এবং সিনিক (Cynic) এই ৩টা দার্শ-

নিক মতের সার হইতে তাঁহার মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানজনিত আনন্দ ও পরার্থপরতাকেই তিনি স্বার্থের মধ্যে সর্বোচ্চ আগুন দিয়াছিলেন।

পিতার এই মত মিলের মনে বহুমূল হইয়া গিয়াছিল। তথাবীত মিল্ পেটোর পুস্তকে বর্ণিত সক্রটিসের ধর্মমতগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া নীতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন। জ্ঞান-পরতা, পরিমিতাচার, সত্যপ্রিয়তা, উত্তমশীলতা, হৃৎসহিত্বতা প্রভৃতি সদগুণনিচয়কে সক্রটিস্ ধর্মগদের বাচ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। মিলও এই সমস্ত চিত্তবৃত্তিগুলিকে ধর্মের উচ্চসোপান বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ বেহামের নূতন মতই উনবিংশ শতাব্দীর অভ্য-দয়কালে প্রাচীন সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারঘাত করে। বেহাম্ মিলের পিতার পরম বন্ধু ছিলেন। কথাবার্তা ও পুস্তকপাঠ প্রভৃতি নানা কারণে মিল বেহামের নূতন প্রবর্তিত চিন্তা-মার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। বেহামের 'বাবহারশাস্ত্র' নামক পুস্তক পাশ্চাত্য জগতে নবযুগের অবতারণা করিয়াছিল। মিল আশ্চর্য এই মত্রেই দীক্ষিত ছিলেন। সুতরাং বেন্থাম-প্রবর্তিত হিতবাদের (utilitarianism) অঙ্কুর মিলের চিত্রে প্রকাণ্ড বিটপীতে পরিণত হইয়াছিল। বেন্থামের পূর্বে ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্র 'প্রকৃতির নিয়ম' ও 'বৈবেকবুদ্ধি' প্রভৃতির অভ্রান্ত যুক্তিতে পরিচালিত হইত। বেন্থাম অকুতোভয়ে প্রকাশ করিলেন—যাহা জগতের অত্যন্ত হিতকর ও বহুসংখ্যক লোকের স্বার্থের কারণ অর্থাৎ যে কার্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বহু-লোকের স্বর্থ উৎপাদন করিতে পারে, তাহাই লোকের ধর্ম ও কর্তব্য। ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম এবং অভ্রান্তযুক্তির অমুছো-দিত। যুক্তি ও প্রমাণ ব্যতীত অন্ধ-বিশ্বাসপ্রসূত কাল্পনিক প্রকৃতি-নিয়ম মনুষ্যের কর্তব্য নহে। মিল বেন্থামের নিকট হিতবাদ (Principles of utility) এবং সুখবাদ (Doctrine of happiness) এই দুইটা মত শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। এই দুইটা মতই তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ চিন্তারাজ্যের পথপ্রদর্শক। হিতবাদ ও সুখবাদই তাঁহার নীতির নিয়ামক। এই ধারণাই তাঁহাকে তড়িচ্চক্তির জ্ঞান নববলে বলীয়ান করিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ—মিলের প্রতি হ্যারিগেট টেলর নারী স্বাধীনতা-প্রিয় বিদ্বতী রমণীর আধিপত্য। মিল আত্ম-জীবন চরিতে ও তাঁহার জীবনীলেখকগণ স্ব স্ব পুস্তকে এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন জীব প্রভাবে নিমগ্ন হইয়াছিল।

মিলের পরিণত বয়সের রচনাবলীর অধিকাংশ পুস্তক (স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের) লিখিত। মিসেস টেলরও একপ বিদ্বা ছিলেন যে, মিলের রচনার অধিকাংশই তিনি সংশোধন করিয়া দিতেন। মিলের জীবনে কোমলতর চিত্তবৃত্তির যে বিকাশ দৃষ্ট হয়, তাহা পত্নীপ্রেম ব্যতীত অন্য কোন স্থানে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। টেলরপত্নী মিলের গৃহিণী হইয়া মিলের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হইয়াছিলেন। এই রমণীর অথবা স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও সমাজদোষিতার বাসনা মিলের চিত্তে সংক্রান্ত হইয়া যায় এবং তাহার ফল তাহার পরবর্তী গ্রন্থাবলীতেও দৃষ্ট হয়।

এইরূপে মিলের চিন্তারাজ্যে উল্লিখিত ত্রিধারা-সংযোগে অভিনব বিপ্লবপরম্পরার সৃষ্টি করিয়াছিল। মিল্ যে সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে তর্কবিজ্ঞা (Logic), হিতবাদ (Utilitarianism), রাজনীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র (Principles of Political Economy) এবং স্বাধীনতা (Liberty) নামক পুস্তকগুলিই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ও মৌলিক ভাষাপন্ন। 'নারী জাতির অধীনতা' (Subjection of women) নামক পুস্তকে তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার অমুকূলে অনেক দার্শনিক তর্ক ও যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

মিল্ প্রচলিত সমাজপদ্ধতির প্রতি দোষারোপ করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অমুকূলে মত প্রকাশ করিয়া যান। তাহার 'স্বাধীনতা' ও 'স্বাধীনতার অধীনতা' নামক পুস্তকে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে,—সমগ্রপ্রকার সামাজিক বন্ধন মনুষ্যের আকস্মিক আকাঙ্ক্ষিত উন্নতির অন্তরায়। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপোষক হইলেও উচ্ছৃঙ্খল স্বৈচ্ছাচারের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—পৃথিবীর প্রত্যেক মনুষ্যই কতকগুলি সাধারণ স্বত্বের উত্তরাধিকারী। তাহার মধ্যে স্বাধীনতা সর্বপ্রধান। তাহা ব্যক্তিগত ও জাতীয়ভেদে বিবিধ। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীলোক অভিন্নরূপে উহার অধিকারী। পুরুষজাতি যে, বহুদিন হইতে অস্বাভাবিক ও ভ্রাতৃবিগর্হিত নিয়মে স্ত্রীজাতিকে অধীন করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা সর্বস্বাঙ্গীণ সামাজিক উন্নতির অন্তরায়। যে দিন জীলময়ী প্রকৃতি বহুদূরার বিশালবক্ষে নিয়মের নিগড় ছেদনপূর্বক মুক্তপক্ষ-বিহঙ্গের স্থায় অবাধ ও অসঙ্কুচিত ভাবে বিচরণ করিবেন, সেই দিন পৃথিবীতে মনুষ্যের চিরপ্রার্থিত স্বর্গরাজ্যের সমাগম হইবে। এই মত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া মিল্ রমণীগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

• বিশ্বপ্রেমিক ও মানবহিতৈষী মহাত্মারা মানবজাতির

দুঃখনিবৃত্তির জন্যই বন্ধপাশবদ্ধ হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। যখন পাঠগৃহের সঙ্কীর্ণ সীমা এবং পাঠ্য-পুস্তকের কল্পনারঞ্জিত মনোমোহন লুপ্তপরম্পরা অভিক্রম করিয়া মিল্ ঘটনারাজ্যের কঠোরসংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি দেখিলেন তখন সংসারের চতুর্দিকেই বৈষম্যের বিচিত্র প্রভাব। মনুষ্যের এই বৈষম্য ও দৈন্ত্য দর্শনে ব্যাকুলিত হইয়া মিল্ যৌবনের উদ্যম কল্পনার পৃথিবীতে আদর্শরাজ্য-প্রতিষ্ঠার আশা করিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্পের বশবর্তী হইয়া তিনি সমাজসংস্কারের আশায় প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন। তিনি তাবিয়াছিলেন, দারিদ্র্যদূষণ বিদূরিত করিয়া সাধাবদকে শাস্ত্রস্বত্বের অধিকারী করিবেন। তদনুসারে তিনি তর্কবিজ্ঞা ও অর্থনীতি-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কিন্তু ১০ বৎসরের মধ্যে অভিলষিত উন্নতির পথে—কোন অধঃশিলা অতিক্রান্ত হইল না দেখিয়া কল্পনা ও ঘটনার পার্থক্য কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিলেন। তথ্যটি উন্নতিপ্রবাহের বিলম্বিত ও রুদ্ধগতিদর্শনে আশাতজ্জ্বলিত মানসিক কণ্ঠে পতিত না হইয়া তাহার উত্তম দিগুণিত হইয়া উঠিল। তদনুসারে অবচলিত ভাবে নির্ভীকহৃদয়ে তিনি স্বাধীনতার মূল-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

তিনি মানবের ভবিষ্যৎ আদর্শসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন—তাহা আপাততঃ আকাশ-কুসুম কিংবা গন্ধকর নগরের স্থায় অলৌক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানবপ্রেমিক প্লেটো, কোম্ভে, বেথাম, টাগট্ ও মিল্ প্রভৃতি প্রভাচ্য-মনোবিষমণ্ডলা উন্নতিত ভাবে ও আশাপূর্ণ অন্তঃকরণে অমূল্যসঙ্কেতে সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত আদর্শসমাজের পার্থিব স্বর্গ দেখাইয়া দিয়াছেন। কতকালে মনুষ্য সেও কল্পনাস্বপ্নে প্রবেশ করবে, সে বিষয়ে মিল্ ও পূর্বাচাধ্যায়গণের পদাঙ্গুলগণ-পূর্বক বলিয়াছেন,—যদি অনন্ত অস্থরীক্ষে নন্দনকাননা-লঙ্কত মন্দাকিনী প্রবাহিত সুখময় অমরাবতার সম্ভব হয়—তাহা হইলে অনন্তকালস্রোতে বহুসংখ্যক পুরুষপরম্পরার অক্রান্ত যত্রে পারদৃশ্যমান পৃথিবীর পৃষ্ঠে সুখশান্তিপূর্ণ স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। সে রাজ্যে রাজরাজেশ্বর কিংবা কান্দালের কোন পার্থক্য থাকিবে না, পুরুষ ও স্ত্রীলোক সাম্যভাবের সমান ভাগ গ্রহণ করিবে। সামাজিক নিয়মের লোহশৃঙ্খল মনুষ্যের বাসনাকে সংযত করিবে না। বৈষম্যের বাণাবিপাতপূর্ণ মেঘনাশার অন্তর্ধান হইলে সমুজ্জল সার্ব-স্বা সমাজে কিরণ প্রদানপূর্বক নর-নারীর অন্তঃকরণে নিম্নল জ্ঞানানন্দ-পদান করিবে।

মিল তদীয় হিতবাদ-গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন—“মহুযের স্বভাবের যেগুলি প্রধান কারণ, তাহার অধিকাংশই পুরুষ-কারের, প্রবল যত্নে ভবিষ্যতে দূরীকরণীয়। কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। মানবস্বভাবের অন্তরায়নিচয়ের সহিত সম্মুখসংগ্রামে অনেক পুরুষপরম্পরা নিহত হইবে, পরে জয়লাভ হইতে পারে। তথাপি বাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জিত এবং স্বল্প পরার্থপরতায় উদ্দীপিত, সেই সমস্ত চিন্তাশীল মানব-হিতৈষী দার্শনিক যোদ্ধাবর্গ সেই দুঃখসংঘর্ষেও বিমল সুখ অনুভব করিতে পারেন। উক্ত সুখের সহিত স্বার্থসিদ্ধিসম্বৃত কোন সুখেরই তুলনা হয় না। জ্ঞানের বিমললোকে উদ্ভাসিত তথাপি অতৃপ্তচিত্ত সক্রিয়ের সংশয়াশ্রিত আনন্দ বিষ্ঠাভোজী শূকরের তৃপ্তি হইতেও সহস্রগুণে শ্রেয়স্বর। সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা কপিলের ভ্রাতা মিল জগতে আনন্দের অনন্ততা ও আতিশয়া অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি যে পুরুষার্থ এবং অবিমিশ্র অনন্ত সুখের সম্ভাবনা হইলেও শাস্তি ও চিত্তপ্রসাদ যে, মানব-মাত্রেরই অধিগম্য; তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহার জ্ঞান যে অনুষ্ঠেয় সৃষ্টিক্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) জীবনে যাহা সম্ভবপর, তাহার অপেক্ষা অধিক আশা না করা, (২) বিতানুগীলনে অনুরক্তি, (৩) সচ্ছন্দতা বা ছন্দে অকৃত্রিম প্রণয়, ভক্তি ও মেহের সংস্থান করা। (৪) মহুযা প্রেম বা সন্তসাধারণের কল্যাণচিন্তায় আনন্দাতিশয়া অনুভব করা। ইহাই মিলের ধর্মনীতির মূল সূত্র। কিন্তু পরিণত-বয়সে সামাজিক সংসর্গের পক্ষে তিনি অনুকূল-মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মিল-প্রণীত পুস্তকের সমালোচনা ক্ষুদ্র-প্রসঙ্গে সম্ভবপর নহে। আমরা মিলের দার্শনিক মত ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া উপসংহার করিব। ১৮৫১খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে হামিল্টনের দর্শন প্রকাশিত হয়। মিল ৮ বৎসর পরে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে ঐ দর্শনের সমালোচনা করেন এবং হামিল্টনের ভ্রাতৃত্বপ্রদর্শনপুস্তক এক প্রকাণ্ড প্রস্তাব প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকে তাহার প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও দর্শনমত সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। যুরোপের দর্শনশাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। ১ম শ্রোত বা আপ্তবাদ (Intuitive), ২য় প্রমাণ ও প্রত্যক্ষবাদ (Empirical)। ১ম পক্ষ বিবেকের আলোকে কর্তব্যের পথ নির্দেশ করিতে বলেন এবং ২য় পক্ষ পরীক্ষা ও যুক্তির আলোকে গন্তব্যপথের অবধারণ করেন।

জন্মদার্শনিকগণের মত অনুসরণ করিয়া হামিল্টন ১ম পক্ষের (Intuitive) অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। সুতরাং প্রমাণবাদী মিল তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার যুক্তিবলে হামিল্টনের শ্রোতবাদ সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। হামিল্টনের শিষ্যেরা পুনর্বার মিলের মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এইরূপ দার্শনিক দ্বন্দ্ব ইংরাজদর্শন পরিপূর্ণ লাভ করিয়াছিল। ইহার পর মিল অগষ্টাস কোম্বের দার্শনিক মত সমালোচনা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মিল ও কোম্বের এই দুই জন মনস্বীই ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তারাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই চিন্তার শ্রোতঃ যুরোপ অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানের মানসরাজ্যে অনেকাংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

মিল সম্বন্ধে এই বক্তব্য যে তাহার দার্শনিক মত অনেকাংশে তমোগুণাধিত, আর কোম্বের মত রজোগুণাধিত। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি মানবীয় শাস্ত্রের কুসংস্কারের উচ্ছেদসাধনপূর্বক পৃথিবীতে সুখময় আদর্শ-রাজ্য স্থাপন করাই মিলের উদ্দেশ্য এবং কল্পিত নূতন সমাজ সৃষ্টি করাই কোম্বের উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর সামাজিক শাসনের শৃঙ্খল অর্পণ করিলে, জগতের উন্নতির গতি অবরুদ্ধ হইবে, ইহাই মিলের মত। মিল ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন,—যিনি ইচ্ছাপূর্বক জাগতিক দুঃখের সৃষ্টি করিয়া মহুযাকে দিবাশিশি দগ্ধ করিতেছেন, তিনি কখনই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হইতে পারেন না। তাহার মত কপিলের ‘ঈশ্বরাসিদ্ধে’ এই মতের পরিপোষক অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপন করা যায় না। অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্ত তিনি স্থলবিশেষে সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মিলের গ্রন্থাবলী পাঠে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মানববাংসল্যের সাধু-প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

বিবাহ ও সাংসারিক জীবন।

মিল গংসারের সহিত বিশেষভাবে মিশিতে পারেন নাই। এইজন্য সমাজের শক্তি কাৰ্য্যক্ষেত্রে তাহার উপর আধিপত্য করিতে পারে নাই। তাহার জ্ঞানার্জনীবৃত্তি বেক্রম পরিপূর্ণ হইয়াছিল—কাৰ্য্যকারিণী বৃত্তি সকলের সেরূপ বিকাশ হয় নাই। তাহার জন্মের ভাবরাশি অর্থাৎ মেহ, ভক্তি, প্রণয় প্রভৃতি প্রবৃত্তিনিচয় বথারীতি বিকশিত হইতে পারেন নাই। বালাজীবনে পিতার এবং যৌবনে প্রেমীর প্রতি তাহার জীব আধিপত্যই লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রেমের

সকলের উচ্ছ্বাস তাঁহার জীবনে দৃষ্ট হয় না। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা কেবল তাঁহার হৃদয়কে উচ্ছ্বাসিত করিত এবং লীলাময়ী প্রকৃতির বিচিত্রদৃশ্যে তাঁহার চিত্ত বিমগ্নবশে মগ্ন হইত।

মিল্ ঘোবনের প্রারম্ভে ১৮৩০ খৃঃ অঃ তাঁহার বালাবস্থায় মিঃ টেলরের বাটীতে গমনাগমন করিতেন। টেলর স্বীয় পত্নীর নিকটে মিলের পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার পত্নী ও মিল পরস্পর প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িবেন। মিল্ টেলর-পত্নীর বিত্যাবুদ্ধি ও প্রগল্ভতা দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীরূপে ভাবিতে থাকেন। স্বাধীনতাপ্রিয় টেলরপত্নীও জীজাতির প্রতি মিলের স্বাভাবিক অহুসার ও সমবেদনা দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকেই হৃদয়-সিংহাসনে বসাইলেন। দিনমণি-কিরণে নবোদ্ভিতা নলিনীর আয় স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী এই বিছুরী রমণীর উদ্যম আকাঙ্ক্ষা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিল। সমাজের বন্ধনে স্বাধীন-জীবনকে শৃঙ্খলবদ্ধ করা তাঁহার মতে পাতক বলিয়া বিবেচিত হইত। এইরূপ রমণীর সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে মিল্ স্বীয় মতের অহুসার প্রেরণা-সকল প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বন্ধুত্বস্থাপনের বিংশতি বৎসর পরে টেলরপত্নী পতিহীন হইলেন এবং সৌভাগ্যের অপূর্ণ সুযোগে তাঁহার বহুদিনের আশাশুভা প্রসারিত হইয়া উঠিল। মিল্ এই রমণীর গুণে এতদূর আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন যে, প্রণয়িজ্ঞানস্বলভ হর্ষলতার অহুরোধে তাঁহাকে শেণী ও কারলাইল অপেক্ষা উচ্চাঙ্গন প্রদান করিয়াছেন এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই টেলরপত্নীর রচিত, অবশিষ্টাংশ উভয়ের রচিত। তাঁহার ‘স্বাধীনতা’ পুস্তক জঁর নামে উৎসর্গ করিয়া উদ্বলহৃদয়ে বলিয়াছেন—“তাঁহার সহিত যে সকল মহতী চিন্তা সমাহিত হইল, তাহার অর্ধেক পরিমাণ জগতে ব্যক্ত হইলে জগতের উন্নতি চরমসীমার আরোহণ করিত।”

স্বাহারউক, মিল্ তাঁহার প্রণয়ীগণকে ধ্বংস ভাল বাসিতেন, তাছা প্রণয়িজ্ঞানের দৃষ্টান্তস্থানীয়। কিন্তু মিলের জীবনীলেখকেরা মিলকে পত্নীপরায়ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ দক্ষিণ-ফ্রান্সে অবস্থানকালে মিলের পত্নী ১৮৫১ খৃঃ অঃ কালগ্রাসে পতিত হন। পত্নীবিরোধের পর মিলের চিন্তাশীল সংযতচিত্তেও দারুণ শেলাঘাত লাগিয়াছিল। তিনি তদবধি সাংসারিক জুখে জলাঞ্জলি দিয়া আভিটন নামক স্থানে পত্নীর সমাধিসামিথ্যে কুটার নির্মাণপূর্বক অবিরামবাহি-অশ্রুজলের প্রণয়-তর্পণে সমাধিস্থতিকা সিক্ত করিয়াছিলেন। প্রকৃতির সেই

শান্তিময় কুটারে তৎপত্নীর পূনঃস্বামীয় ঔরসজাত কন্তা ভিন্ন আর কেহ তাঁহার সঙ্গিনী ছিল না। তাঁহার বন্ধুবর্গ অনেক সময়ে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। মিলের পুত্র, সন্তান, হয় নাই।

মিলক (পুং) মেলনকারী।

মিলকা সিংহ, জনৈক শিখ সর্দার। ইনি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাবলপিণ্ড অধিকারপূর্বক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ইহার যত্নে স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

মিলন (ক্লী) সমাগম, সংশ্লেষ, যোগ, সম্মম, সম্মিলন।

“ধ্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্।” (গীতগোঃ)

মিলনস্থান (ক্লী) যে স্থানে মিলন হয়।

মিলপত্র (পুং) অশ্বস্তক বৃক্ষ। (বৈজ্ঞানিকিঃ)

মিলমু, যুক্ত প্রদেশের কুশাবন জেলার জুহার পরগণার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগর। অক্ষাঃ ৩০°২৫'৩০" উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮০°১০'১৫" পূঃ। হিমালয় গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়া তিব্বতে যাইতে যে জুয়ার গিরিসঙ্কট আছে, তাহারই পার্শ্বে এই নগর অবস্থিত। এখানকার আধবাসিগণ ভূটিয়া। ইহার সর্বতোভাবে হিন্দু রীতি নীতি ও ধর্ম্মাচার অবলম্বন করিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ১৭২৭ ফিট উচ্চ।

মিলমিলিয়া, আসাম প্রদেশের কামরূপ জেলার অন্তর্গত একটি বিস্তীর্ণ শালবন। বুলশী নদীর বামকূলে অবস্থিত। এই বন ইংরাজরাজের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত।

মিলান (দেশজ) মিলনকরণ।

মিলাপ (চন্দী) ১ সভা। ২ সামাজিক প্রসঙ্গ।

মিলিক (মিল্—আরবী) বাদশাহ বা মুসলমানরাজের প্রদত্ত জমিজমাব ছাড়।

মিলিত (ত্রি) মিল-কর্ত্তরি ক্ত। ১ শ্লিষ্ট। ২ সম্বন্ধবিশিষ্ট। ৩ যুক্ত।

“পুনর্নিবাদঃ সজ্জাতো মিলিতা দেবদানবঃ।” (দেবীভাঃ ১৪।৮০)

মিলিতযন্ত্র (দেশজ) সুরসম্মিলিত বায়ুযন্ত্রসম্বন্ধ।

মিলিন্ (ত্রি) সম্মিলনশীল।

মিলিন্দ, ভারতের জনৈক যবনরাজ, (Menander)। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইনি মিলিন্দ নামে লিখিত হইয়াছেন। আলেকজান্দারের এসিয়া জয়ের পর, যে সকল গ্রীকদেশীয় শাসনকর্ত্তা প্রাচ্যভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই উত্তরকালে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। গ্রীকরাজ মিলিন্দ (Menander) বক্তৃত্ত্বাধি রাজত্ব করিতেন। এই জন্ত তিনি গ্রীকো-বাক্ত্রিয়রাজ (Graeco-Bactrian) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অশ্বদ্র, বিহৃত্ত জনপদ-

সমূহে তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়ার ঐতিহাসিকগণ অস্বীকার করেন যে, তিনি নিজ ভূতবলে বহুদেশ জয় করিয়া একটি ক্রীষ্টীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক লানেনের মতে মিলিন্দ ১৪৪ খৃঃ পূর্বে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ঐতিহাসিক ট্রাবো তাঁহার বিজয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তিনি বক্তৃত্যর রাজ্য করিতেন এবং ১১৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে তাঁহার পরলোক গমনের পর বিভিন্ন রাজধানীর অধিবাসিগণ তাহার ভগ্ন লইয়া বিবাদ বাধাইয়াছিল।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যোক্ত সাক্যেত (অযোধ্যা) অবরোধ-বৃত্তান্ত এবং যবনকর্তৃক মাধ্যমিকদিগের পরাভব, যবনরাজ মিনান্দরের (মিলিন্দ) বিজয়বার্তা জ্ঞাপন করিতেছে। মিলিন্দ-পন্থ নামক বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত মিলিন্দের আত্মবৃত্তিক বর্ণনার সহিত মিনান্দরের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে।

মিলিন্দক (পুং) সর্পভেদ।

মলিমিল (দেশজ) ১ চর্মরোগভেদ। ২ মিন্মিনে। (Measles)

মলৌমিলিন্ (ত্রি) শিবের নাম।

মল্লুর, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মছরা জেলার অন্তর্গত একটি তালুক ও নগর। [মেলুর দেখ।]

মল্লিকি, অযোধ্যাপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলবাসী মুসলমান জাতির একটি শাখা। কৃষিকর্ম করিয়া ইহাদের অধিকাংশই জীবিকা নিবাহ করে। অনেকে প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে। আজমগড়ের অধিবাসিগণের বিশ্বাস, মুসলমান-শাসনাধিকারে ইহার রাজ্যস্থের মিলক (মিলিক) পাইয়া ধনশালী হইয়াছে।

হিন্দুর মধ্যে কায়স্থগণ যেক্রপ লেখনদক্ষ এবং রাজকার্য্যে প্রতিভাবান, মুসলমান সমাজে এই মিল্কিরাও তদ্রূপ প্রতিপত্তিশালী। ইংরাজাধিকারেও ইহার বিশেষ উদ্ধৃতির সহিত রাজকার্য্য ও ওকালতী করিতেছে। ইহার কূটনৈতিক বলিয়া স্থানীয় লোকে ইহাদের সরলতায় এবং উদারতায় বিশেষরূপে বিশ্বাসস্থাপন করে না। উত্তরপশ্চিমভারতে ইহাদের নামে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে,—

“মিল্কিকি কা জানে পরাএ দিল কি?”

পৈঠে ছরার নিকলে খিড়কি”।

ইহার প্রধানতঃ সিয়া ও সুন্নী-মস্জিদায়ত্ব। সকলেই বিশ্বস্ত ভাবে ইসলাম ধর্মের অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে।

মিল্টন (জন), ইংলণ্ডের জনৈক সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি। তিনি “বর্গচ্ছাতি” (Paradise Lost) নামক ইংরাজী কাব্য রচনা করিয়া যুরোপীয় সমাজে এবং ইংরাজী অধ্যয়নপর সুসভ্য মাত্রেই নিকট প্রশংসাজনক হইয়াছেন। তাঁহার পিতা-

মাতার নাম জন ও সারা মিল্টন। লন্ডন মহানগরীর ড্রেড্‌ফীল্ড পিতৃভবনে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা এক জন সম্ভ্রান্ত বংশীর ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। পিতার শিক্ষার দৃষ্টান্তে পুত্রও অস্বাভাবিক উপাধীন করিয়াছিল। সংগীতশাস্ত্রে মিল্টনের পিতার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বর্ণির সঙ্গীততিহাসে (History of Music) তাঁহার রচিত সংগীত গুলি উদ্ধৃত আছে। বর্তমান গ্রন্থকারগণ ইংরাজীতে তাঁহার নামে Milton বানান লেখেন, কিন্তু তাঁহার খৃষ্টধর্মগ্রন্থের তালিকায় Mylton এই রূপ নাম লেখা আছে।

মিল্টন প্রথমে কাম্ব্রিজ নগরের যীশু কলেজে এবং তৎপরে সেন্টপল ও থাইট কলেজে বিভাগ্যভাগ্য গমন করেন। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার থাইট বিভাগ্যে প্রবেশ কাল লিপিবদ্ধ আছে। বাল্যাবস্থায় অক্ষশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ না থাকায় বোধ হয়, তিনি কেবল বিভাগ্যে বেত্রাঘাত খাইয়াছিলেন। থাইট কলেজে সাত বৎসর অধ্যয়নকালে তিনি লাতিন ভাষায় কবিতা লিখিয়া সাধারণের প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের এই কবিতাশ্রেণী ভবিষ্যতে তাঁহাকে সহযোগী কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছিল।

বিভাগ্যের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি তাঁহার পিতার বাকিংহামসায়ারস্থ হটন ভবনে আগমন করেন। এই সময়ে তিনি খ্রীষ্ট ধর্মমত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। গৃহে তিনি পাঁচ বৎসর কাল থাকিয়া গ্রীক ও লাতিন ভাষায় প্রসিদ্ধ কাব্য-সমূহ অধ্যয়ন করেন। এই কাব্যানুবাদে থাকিয়া তিনি কল্পনা-প্রসূনে Comus, L' Allegro, Il Penseroso ও Lycidas কাব্যমালা গ্রন্থন করিয়াছিলেন।

১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতার পরলোকগমনের পর তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া যথাক্রমে ফ্লোরেন্স, রোম, নেপলস ও ভিনিস পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গ্রোভিয়াস, গালিলিও এবং টাসোর প্রতিপালক মন্সোর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অতঃপর তিনি সিসিলি ও গ্রীক পরিভ্রমণে অভিলষী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজনৈতিক বিপ্লব উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইতে দেখিয়া তিনি ভ্রমণবাসনা বিসর্জন দিয়া ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজনৈতিক কার্য্যপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণে অভিনিবিষ্ট হইলেন।

রাজনৈতিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া এবং তাহার আলোচনা-পর হইয়া তিনি ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে Of Reformation, Prelatical

Episcopacy, The Reason of Church Government urged against Prelacy, An Apology for Smeect-mnious ও বিশপ হলের মত খণ্ডন করিয়া কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমবার বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী পিতৃগৃহ হইতে আসিতে অস্বীকার করায় ১৬৪৪ ও ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পত্নীকে তিরস্কার করিয়া ৪ খানি পত্র লিখেন। ঐ সময়েই তাহার Tractate on Education ও Areopagitica বা মুদ্রাবস্তুর স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রকাশিত হয়।

রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া অবধি তাঁহার সাংসারিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছিল। এই দারুণ কষ্টের সময় স্বীয় সহিত পুনর্মিলিত হইয়াও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। ইংলণ্ডপতি চার্লসেব হত্যাকাণ্ডের পর, তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস ও রাজ্যের শাস্তি-বিধানবিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র-পুস্তিকা রচনা করেন। অতঃপর তিনি মন্ত্রিসভা কর্তৃক ল্যাটিন-সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এই সময়ে রাজনৈতিক বিতণ্ডা ভঙ্গনার্থ তিনি Eikonoklastes ও Defensio Populi Anglicani নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ল্যাটিন-সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবার পর তিনি ওয়েস্টমিনষ্টারে আসিয়া বাস করেন।

তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর, তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। কিন্তু এই পত্নীও এক বৎসরের মধ্যে স্ত্রীত্যাগারে মরিয়া যান।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ গিন্সল নামা জনৈক রমণীকে তিনি ৩য় পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে পারাডাইস-লষ্ট নামক তাঁহার সুবিখ্যাত কাব্যরচনা সম্পূর্ণ হয়। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে উহার মুদ্রণকাৰ্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। স্যামুএল সাইমন্স নামক জনৈক প্রকাশক ৫ পাউণ্ড মূল্যে উহার সব ক্রয় করেন। ১৩ শত গ্রন্থ বিক্রয় হইলে তিনি গ্রন্থকারকে আরও ৫ পাউণ্ড দিতে স্বীকৃত ছিলেন। উক্ত গ্রন্থ প্রথম ১০ম এবং পরে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ২য় সংস্করণে ১২শ সর্গে মুদ্রিত হয়। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Paradise Regained ও Samson Agonistes বচিত হয়। অতঃপর ১৬৮৪ খৃঃ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি কএকখানি খণ্ডগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে ৮ই নবেম্বর রবিবারে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি ওলিভার-ক্রমওলের সহযোগী এবং স্বাধীনতা প্রিয়াদী দল (Independants) ভুক্ত ছিলেন।

মিল্টন বিভাগালের পাঠ শেষ করিয়া যখন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার কাব্য-কাননে প্রবেশ করিলেন, তখন কবিকীর্ত্তি-লাভের দুনিবার অভিলাষ তাঁহার চিত্তচাপলা উপস্থিত করিল, তিনি তদনুসারে যুরোপের নানাদান ভ্রমণ কবিতা নিরীক্ষণ, নিরূপণ দৃষ্টান্ত সম্বলিত করিলেন এবং জাতীয় মহাকাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যোবনেব প্রায়শ্চ হইতেই মহাশয় অধ্যয়ন অবলম্বন করিয়া একবারি অবিনশ্বর কাব্য লিখবেন, এরূপ সপ্ন করিয়া ছিলেন। যোবন-সুগত রচনাবলার মধ্যে তিনি অকৃতোভয়ে লিখিয়াছিলেন,—অধ্যবসার ও পরিশ্রমসংকারে আমি এমন কাব্য রচনা করিব, যাঁহা উত্তরকালের বংশধরগণ কখনই বিস্মৃত হইবে না (which the Posterity will not let it die)। বঙ্গীয় কাব্য মাণ্ডিকেলের গ্রন্থ কনিষশঃপেপ্পু মিল্টন ভাবিয়াছিলেন, তদ্রূপিত সমুদ্রকে মহাশয় চিবুয়া গান কাববেন।

কোন ভাষায় কাব্য লিখিবেন, প্রথমে তাহাও নিশ্চয় কবিত্তে পারেন নাই। শেষে ল্যাটিন-ভাষা অবলম্বনে লিখিবেন, ইহাও সম্বল করিয়াছিলেন। পরে স্বজাতিবাসন্যে পদোদিত হইয়া মাতৃভাষার কণ্ঠে তাহার অলঙ্কারভূমি তাঁ গাভীয়াগুণ-ভূমিতা অপূর্ণ কাব্যমালা প্রদান করিতে সম্বল করেন। বোধ হয়, কুললক্ষ্মী যথেষ্ট তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—“ওবে বাছা! গৃহে তোর রচনের রাজি—‘যা, কি’র অজান তুট যা-রে কি’র ঘরে’ বস! তোমার মাতৃভাষার উত্তরে রচিব অভাব নাই, তুমি সেই রচনা কাণ্ডিমরা কাব্যমেখলা মাতৃভাষার কটিদেশে অর্পণ কর।”

মিল্টনের সাম্প্রদায়িক মতের জন্ত তাহার মহাকাব্য নানাভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। কাব্যে রাজদ্রোহিতার ভাব আছে বলিয়া রাজকীয় পুস্তকপত্রীকর তাঁহার “পারগ্যাতি” (Paradise Lost) নামক কাব্যপ্রকাশের অমুমতি দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে উহা প্রকাশিত হয়। মিল্টনের নামের সহিত তাহার মহাকাব্য অমর হইয়া লাভ করিয়াছে।

মিল্টনের জীবন পণ্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীকমান হয়, যে তিনি বাল্যাবধি মহাকাব্যরচনার প্রয়াসে আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতেছিলেন। চল্লিশ বৎসরের পক্ষে তিনি আপনাকে মহাকাব্য লিখবার অযোগ্য বলিয়া বণনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মী-সরস্বতীর সপত্নীভাব দেশনিক্টিশেষে প্রসিদ্ধ। তাই কবিতা-দেবীর প্রসিদ্ধ সেবক মিল্টন দরিদ্র ছিলেন। কোন বঙ্গকবি তাঁহার দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মীকে তিবন্ধারচ্ছলে বলিয়াছেন—“ইংলণ্ডের মহাকবি, কবীন্দ্র, মিল্টন।

যজ্ঞ তাঁর কল্পনা কবিত্ব সম্মোহন।

কি আশ্চর্য্য মহাশবে ভুবন ভরিলা।

লোলে। তুমি তার প্রতি কিরে না চাহিলা।”

কিন্তু বিধাতার বিচিত্র নিয়মে পরস্পরবিরোধিনী লক্ষ্য-সরস্বতীর সঙ্গতি চিরকালই একাশ্রয়ত্বলতা। বিজ্ঞাতিলাষী বিংশলী হন না। সুতরাং সেই সনাতন-নিয়মে মিল্টনের দারিদ্র্য বিশ্বজনক নহে। তাঁহার ‘প্যারাডাইস্ লস্টের’ প্রথম সংস্করণ কেবল ৫০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

মিল্টনের চিত্তের দৃঢ়তা ও গাভীয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে। দারুণ দারিদ্র্য ও নির্ধাতনের কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দৃষ্টিহীনতারূপ হৃদয়ে বিড়ম্বিত হইয়াও কবিতারূপিণী উদ্দামলীলাময়ী কল্পনা স্বচ্ছন্দবিহারিণী বিজ্ঞাধরীর ভ্রাম্যমন্দার-কুসুমালঙ্কৃত নন্দনকাননের বিচিত্র শোভা এবং নরকের ভীষণ ও বাঁভংস দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছিল। ইংরাজী ভাষা চিরদিনই মিল্টনের নামে গৌরবান্বিত হইবে।

তিনি শামসন্ আগোনিষ্টস্ (Samson Agonistis) নামক ক্ষুদ্র নাটকে তাঁহার অন্ধ-জীবনের যে করুণচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অভ্যস্ত হৃদয়স্পর্শী। দাম্পত্য-জীবনে মিল্টন সুখলাভ করিতে পারেন নাই। সেই জন্ত ডেলাইলার চরিত্রে তিনি দারুণ কলঙ্ককাগিমা লেপন করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির প্রতি মিল্টনের শ্রদ্ধা বেশী ছিল না। শামসন্নের বিলাপকাহিনীতে অশ্রুস্রবণ করা যায় না। ইহাই মিল্টনের বার্থ চিত্র। মিল্টনের চিত্তের বীরত্বপূর্ণ ভাব বুঝিতে হইলে, (Satan)

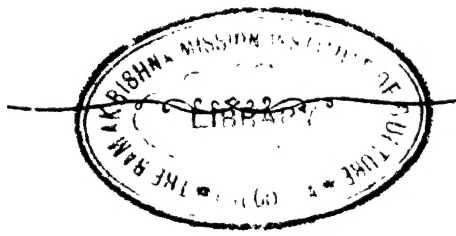
শয়তানের উক্তি শ্রবণ করিতে হয়। স্বর্গের দাসত্ব অপেক্ষা নরকের রাজত্ব সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। মল্লযোদ্য মন শিকা ও দীক্ষাপ্রভাবে দুঃখকেননিত শস্যার কোমলাভরণে কিংবা কারাগৃহের কণ্টকশস্যার শয়ন করিয়া সমান ভাবে থাকিতে পারে—মিল্টন এইরূপ ভাবে তাঁহার কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্যারাডাইস্-লস্টে বীররসে এবং দেবায়ের যুদ্ধের ভাষা নানা ঘটনায় পূর্ণ। মিল্টন পিউরিটান্ (পবিত্রতাবাসব্দী) সমিতির প্রতিনিধি ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রও মিল্টনের মধ্যে অকৃত্রিম ছিল না। তিনি পৌত্তালিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। গ্রীক-দেবদেবীগণকে লইয়া তিনি নানা কুৎসিত চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীক-সাহিত্যের রসগন্ধ অন্ধকার মিল্টন হেলেনার অন্ধকবি হোমরের ভাষা কাব্যরসে বাগ্‌দেবীকে বন্দনা করিয়াছেন। কাব্য-নিয়োগবিষয়ে তাঁহার অমুগ্রহ প্রাথনা করিয়া পুঙ্ককবিগণের পদাঙ্কিত পথে পদার্পণ করিয়াছেন। মিল্টনের কাব্য মধ্যে যে স্থলে ভারতবর্ষের উল্লেখ আছে—সেই স্থলে মিল্টন ভারতের অতুল ঐশ্ব্যের বর্ণনা করিয়াছেন। প্যারাডাইস্-লস্টে গ্রহে ইডেন উদ্ভান এবং আদম ও ইভের বর্ণনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী।

মিল্লা (স্ত্রী) বিজয়রাজের জননী।

“বিজয়তথ জননী মিল্লায়া স্বামিনোহর্জিতম্।”

(রাজতরং ৮।১০৭১)

মিব্ সেক, ভাদি। পরশ্মে। অক। সেট্। লট্ মিষতি।



চতুর্দশ ভাগ সমাপ্ত।







